

জ্ঞাপন কি বৈদেশিক আদিপত্বে করিবে

ত্রিকাঞ্চন বহু ৪৬

জাগতিকি শ্রীহরীচন্দ্র চাঃ ১৩২, ২০২,

২৭৬, ৩৪৬, ৪১২, ৪৭৮

জেলের চিঠি শ্রীমদ্রচন্দ্র গুহ ১৪৩, ২২১

জীবন সংঘাত ও পরিণতি লক্ষ্মীদেবী ৪৮৬

জান্নাই শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র গুহ ৬৬৪

কান্তধর্মকারীশের বখা শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী ৩৬৬

কংশে জাহ্নুদারী ১৩৪৮ শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩

১৩৪৪র সাহিত্য সংস্কৃতি শ্রীপ্রভাতকিরণ বহু ৭৭৬

লীলা শ্রীমতী বাবী রায় ৩৮

লল ভূমিরাজ নিশাবদান বাহুবল ধর্ম রায় ৪৮

দুইটি ভ্রমণ, দুইটি রাষ্ট্র শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বৈষ্ণব ১০৭

১) সেনের অভ্যন্তর ভ্রমণের সাপ্তাহিক ও অর্ধমাসিক পরিচিতি

রজন কুমার বসু ১৬২

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্রের পত্র শ্রীবিষ্ণুচন্দ্রের সেনগুপ্ত ৩০৮

শ্রীমদ্রচন্দ্র শ্রীশিবানন্দ চন্দ্রকান্ত ৩৪০

স্বর্গের, অরণ্য ও সর্বমানবিক রজন কুমার বসু ৩২০

খানডক শ্রীনিবাস চন্দ্রকান্ত ৩৩৬

ধর্মীন্দ্র শ্রীমলতা বসু ৪১৩

৫-কারের এলাকা ডাঃ বাহুবলগোপাল মুখার্জী ৭৭

৬৪ চট্টগ্রাম শ্রীমদ্রচন্দ্রকান্ত ৭৬৭

৭৬৬ শ্রীসাহিত্য প্রসঙ্গ চট্টোপাধ্যায় ১

৭৭৭ শ্রীনিবাস চন্দ্রকান্ত ৩৩

নারী বাবীন্দ্রের বসু ও কস্তুরবা এন সেবিকা

নিধির কথা নিধিরাজ সিংহ কিশোর ১৬৭

নেশাদিগান ও গল্প গোপ পাঠ্য শ্রীপতি চৌধুরী ১৭৬

নরেন্দ্রনাথ শ্রীমদ্রচন্দ্র চৌধুরী ১৮০

নোনা শ্রীপুণ্ডরীক বোম ১৮৭

নিজস্ব হস্ত শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র গুহ ৩০৪

নবক শ্রীপুণ্ডরীক বোম ৩১৩

নৃতন প্রেম শ্রীমতী বাবী রায় ৩৬৩

নবকান্তক নৃপালকান্তি মুখোপাধ্যায় ৪৩৭

প্রথম বৈদ্যন খণ্ড পতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকান্ত ৭২

পদ প্রকরণ

পাকারের চিঠি

পুনর্বারতি

প্রস্তাব

পঞ্চদশ

প্রসঙ্গ কটোপাধ্যায়

প্রস্তাবিত হিন্দু বোত কি

প্রান্তিক

পুস্তক পরিচয়

প্রথম জেলের অভিজ্ঞতা

পৃথিবী মোহন ও কচুড়ীপানার কণোপাধ্যায়

ভবনুয়ে

শ্রীকালীপদ চন্দ্রকান্ত

শ্রীনিবাস দেবী

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র গুহ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকান্ত

রামেন্দু সেনগুপ্ত

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকান্ত বোম

শ্রীসংস্কৃত কব

৪৪৪

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকান্ত বসু

৪২৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

৪৪৪

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্তী—

১৯০৭ খ্রিঃ

রাশিয়ার রাজদূত ২৥০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২৥০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

জীবনের বসন্ত ২৮০

করুণ ও সৌন্দর্য-স্থীতে উচ্চা
সাহিত্যের অঙ্গের স্থান পাইবার যোগ্য

—অনন্দবাজার—

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৮০

গল্প হিসাবে সব বইটিই উৎকর্ষতা দাবী করিতে
পারে

—বাবা

—ভারতপদ রাধা—

রাশিয়ার সেবা গল্প ৩

এই কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক গাতি সম্পন্ন
কালিক পর্যায়ের স্রোত গল্পগুলির বক্তব্যবোধ একত্রে
প্রকাশ করিয়া লেখক 'একটি গল্প' শব্দের পূরণ
করিলেন

—অনন্দবাজার—

—অন্যাপক দিলীপকুমার দিখাস

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও

সাম্প্রদায়িক সমস্যা ১৥০

অমৃতবাজার

প্রকাশিত

—ডাঃ রামকেশব মুখোপাধ্যায়—

বিশাল বাঙ্গলা ১

—অগ্নি রত্ন—

সাম্রাজ্যবাদ ও

ঔপনিবেশিক নীতি ২

—অরুণচন্দ্র গুহ—

কংগ্রেসের পথ ১৥০

সৃষ্টি ও সভ্যতা ১৥০

(ছোটের বই)

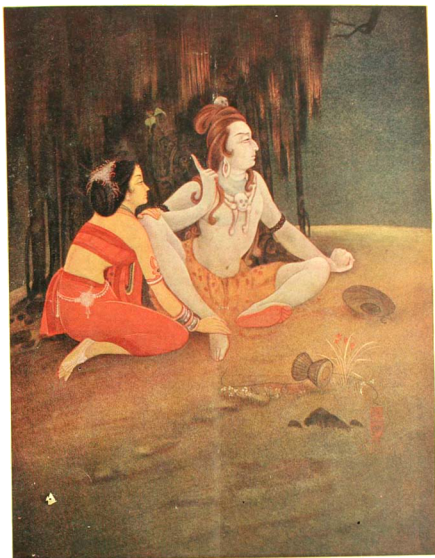
—ডাঃ বীমেনচন্দ্র সেন—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

(৩য় সংস্করণ সহস্র)

সরস্বতী লাইব্রেরী ৯, সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (বিভাগ)

ସମ୍ବିତ୍ରା



ନବ୍ୟାଞ୍ଜର ପୂର୍ବେ ମତୌର ବିଦ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତା

—স্বপ্ন—

একাদশ বর্ষ

বৈশাখ—১৩৫৫

৭১৬-৩

প্রথম সংখ্যা।

০১২/৫

নববর্ষে

শ্রীমাবিক্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নব বর্ষে বৈশাখের প্রথম প্রভাতে
আশা ও উৎসাহে ভরা তবিত্ত্ব দিবসের তরে
অগ্নরে আগিছে দৃত আকুল প্রার্থনা
বিধা শব্দা তত আসে মনে ;
যনে হয় কোথা যেন হইয়াছে হুল
কোথা পন-বিক্ষেপের বিজ্ঞাত গতিতে
হারারে ফেলেছি পথ
হাওয়ায় ফেলেছি যেন এ যাত্রার শেষ আকর্ষণ ।

বন্ধন-মোচন লোভে যেন স্বপ্ন ঘোরে
আপনারে বাঁধিলার লহজ বন্ধনে ।
লহজ প্রাণের মূল্যে যে মুক্তি পেলাম
সে প্রাণের কোনও মূল্য নাই,
মূল্য নাই অস্বাধ গতির ।
মুক্তির নিকর বাণী প্রাণে আনে বন্ধনের ভয় ;
হয়ত তুলিয়া যাবো ভগন্তার ঐবর্ষ্যপরিমা
হয়ত তুলিয়া যাবো
আম্রভোরে হীন মৃত্যু
ভারতের মহান আছারে ;
খেচ্ছাচারে অহঙ্কৃত অধিনয়ে উচ্চত বীথন ।
তুলে যাবো ইতিহাস
তুলে যাবো ঐতিহ্য মহান ।

তাই শব্দা আগিতেছে মনে
মুক্ত-বার মন্দিরের পাশাপাশি
আমিও কি মুক্ত নাই বেগিতেও কলঙ্ক কানিয়া,
এখনও কি জননী রিমম আননে
উষার আলোকছটা হুটে নাই গুহ্রি অদর্শনে ?
তাই বলি ওরে মন আজি এই নববর্ষ প্রাতে
নূতন সঙ্কল্প করি' নবমুখ পাঠে
মাতৃপুত্রা কর সমাপন ।
অধিকার করিবা গ্রহণ
অলে পাপ লহন প্রলীপ
মাঘের পূজার বেলা তলে,
সে আলোকে লহ আশীর্বাদ ।
মহাস্মার শেষের আঙ্গান
উচ্চারিত হোক দিকে দিকে
আগুত বিভাঙ্ক বেণে
মিলনের নব গঢ়াণনা ;
ত্রিধর্ম-সম্মুখি জাগ্রত চেতনা
উজ্জ্বল আকাশ হলে
মুক্তি পাক আলোক
রাগেপ্রাণী যা আমনি
আবার বহন সিংহাসনে—
নববর্ষে এই হোক আমাদের প্রাণের প্রার্থনা ।

প্রথম যদিন ধরা পড়ি

শ্রীকৃষ্ণকুমার দত্ত

ধরা তো কইবারই পড়েছি। কিন্তু সেই প্রথম ধারের কথাই বলছি।

জানিগি থেকে অস্ত এসে পৌছাতে পারলো না। আমেরিকা প্রবাসী ডেকোরোজাক্স কিশোরী ধর দিয়ে গিল—সমস্ত ভারত-ভার্মাণ বহুবলটা ধরা পড়ে গেল। বালেশ্বরের হস্তিচাঁটে হতীনরা নিহত হ'লেন। ও-পর্ব প্রাচ শেষ হ'য়েই গেল।

আশা ছাডলে আর ধারই চলুক, বিপ্লবীরা চলেনা। 'লানার' নৃত্যর পর সবাই প্রাণ তেড়ে পড়েছেন—আজ যেনে গাছীঘির নৃত্যর পর সারা দেশ। বাহ্যোগোপাল মুখাভি তখনও চোঁটা কলঙ্কন। পূর্ব বনোবস্ত মতো স্থলপথে চীনের ভিতর দিয়ে, ভ্রাতের ভিতর দিয়ে, আসামের সীমান্ত দিয়ে অস্ত আনবার জন্য লোক গেছে, ধরা পড়েছে, অবস্থা বাঁচার বা কিংবার পথে, বা কিরে এসে ধরা পড়েছে। বর্ষা কিছু অস্ত এসে পৌছেছিল। জা-ও একরম পাভাবী এতিনিয়ারের বিবাসবাতকভাট ধরা পড়ে গেল।

আর প্রাণ আশু কইবার হইলো না। কলকাতার বস্ত্র চট্টাঘির হস্তা হ'ল ৩০শে জুন ১৯১৬ সাল। ঐ দিন থেকে টেগার্ট সাহেবের ভাণ্ডার ভুক্ত হ'ল—এতদিনের সজ্জিত কোঁক-কেটে-পড়লো। 'সিঁদুরা' এটার নাম যিকি ছিলার জুলাই বিদ্রোহ।

কলকাতার এক-বিক্রমণে কত যে লোক ধরা পড়তে লাগলো, স্ত্রীর আর কুখ্যা নাই। আশ্রয়ের অভাবে কতো রাজনৈতিক কর্মী রাখার পক্ষ অপরিচিত বাড়ীর বা বাড়ীঘরে রোবাকে ভরে থাকে। নেক-ব্রিডের যিকে পুষ্টি এসে ধ'রে নিয়ে যায়। বানাতলাসী লেনেই আঁহ। রাস্তার বের চাঁচাচটে বাড়ী চোখে পড়তো লালপাগড়ীতে ঘেরা, প্রাইই বেল বাড়ী। ধরা-এদিক কোনো হিসাব বিচার নেই।

নরেন শেঠের বাড়ীর বাগিচা তোষক ছিঁড়ে ফুড়ে সমস্ত

তিনিষ লওউও ক'রে ১লা জুলাই জোরে ছেলে বুড়ো এগারটি লোককে ধরে নিয়ে গেল।

সকাল বেলাতে ঘেঁষের হা, সে যে ভাত খেতে দুপুর বেলায় কিংবে এমন আশা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না। বাগান্ধা হাউন্স ভরতি হয়ে গেল। সেখান থেকে পাঁচদিন, সাতদিন, দশ দিনের অন্ত্রে নিয়ে যায় কীট-টীট খানার টেগার্ট সাহেবের নিষেধ হেঁফাঙতে।

সে কয়দিন কাটকে যিনে রাতে বলতে বা শুতে ঘেবার নিয়ম ছিল না। পাতেনই কল হাউন্সে পাতিল সেবার অন্তে পুলিশ ঘোড়ায়েন ছিল। কল বা হাউন্সে ক'রে কোনো পাহারাওলা বদ্বি কয়েক মিনিটের অন্ত্রে মাছ বা ভাংতীর হয়ে পড়তো তা হ'লে তার চাকরী খেত।

ও কয়দিন জান করতে ঘেঁষারও নিয়ম ছিল না। খেতে দেওয়া হ'ত দুইবার দুপায়সা। মুচিমুচি—মুচি কি কোথা থেকে ফরমায়েন দিয়ে মুচি হ'ত আনা নেই, কিন্তু মুখে দেওয়া বেত না, এমন জুতো, হু-পাচখিনের। জুখতেও তা কাঁও কাঁও মুখে ফিঁ হ'য়ে উঠতোনা, কোল রেখে বিত।

এর উপর যিকি কলঙ্ক বাঁধা ছিল। একি তারই অন্তে কীট-টীটের বাগীকে নিয়ে-বাঁজা হ'ত। জুতো প্রাইই রাতেই বোলায়। স্নাকে মাতে টেগার্ট সাহেব নিষে এবং প্রাথমিক বাগীন্দী অধিদারবা বধে-কল হ'য়ে আসতো। মুখে জুতো বেরন মধের দুর্গুড, তেমনি ভাবার।

কিল, মুচি, চড, লাখি, কেশাকর্ষণ, আঙুল বোচাচানা পেছন যিকে হাতকড়ি লাগিয়ে শিঠের উপর কলের ঘা—এমন তো ছিল অতি সাধারণ ব্যবস্থা। নানাধি গলজব কলঙ্ক করানো, পাঁচলাত খিনের জুখিপায়া অনিষ্টাকাতর, অথবা তিন চার ভিত্তি করে আক্রান্ত বন্দীকে নিয়ে অস্ত্র এ-প্রাণ থেকে ও-প্রাণে তেল গুলির মিনিট আশংক্য ধ'রে, টেনিস পেনা, পুখারি রশি বেঁধে টানি বা কল দিয়ে ধ্যাংলানো, মলধারে কল চোকাবার চোঁটা, কয়োড, প্যান থেকে মলধর মাথায়, মুখে, সব্বাশে তেল দেওয়া এম-পর্ব

পত্র, যিনি পর দিন আলের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখা—ইত্যানি যতরকমের ধর্মকাম (sadist) জুলুম-বাকী করনা করা চলে বা করনা করাও চলে না, তেমনি সব অভিন্ন হ'ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সারারাত ধরে, অথবা বাকী জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত।

কলে কেউ কেউ ভেঙে পড়ে, এবং বীকারোক্তি করে। কিন্তু যত লোক বীকারোক্তি করে, তার চেয়ে অনেক বেশি ক'রে রটে যায়। রটানোটাও হাড়ের উপর কাজ করার উদ্দেশ্যে। সে কথা আচ্ছন্ন হুঁজি। তখন অবাক হয়ে শুধু ভাবি যে-সব লোকের কথা রইছে, তারা কি ক'রে বীকারোক্তি করতে পারে—জুলুম যতো প্রচণ্ডই হোক।

চারদিকে একটা চতুষ্পাশ খণ্ডখনে ডাব। তবু সব জড়োসড়ো। এদেশে-অমন ব্যাপক ধরপাকড়, তার সঙ্গে অন্ত জুলুমবাকী—সেই তো প্রথম।

এই সব বীকারোক্তির কলে আমিও পাছে বরা প'ড়ে যাই—চন্দননগর থেকে অতুল ঘোষ ব'লে পাঠালেন কলেজ ছেড়ে গ'রে গড়তে। হল পঠন ও পতিচালনার কাণ্ডে অতুলবা ছিলেন হতীনবার মন্থন হত। তখন তিনি পলাতক—ভারত-স্বাধীনতা যুদ্ধে যে কয়জনের নামে মোটা মোটা পুরস্কার ঘোষা হয়েছে, তাঁদের ভিতর একজন। কলকাতার আদালতেরা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। নতুন বিবর্তন আবার আনালেন অতুলবার নির্দেশের কথা। হতীনবা তখনও ঘোরাফেরা করেন—কিন্তু অস্তিত্বশূন্য। আর, পলাতকের পক্ষে সাধনাতী অবলম্বনের কাওদাকাহনে আদালতের ভিতর বায়ুঘর পরেই ছিলেন নতীশদা।

কলেজ ছেড়ে দিয়ে পলাতক হওয়া স্থির করলাম। কিন্তু বাধা ছিল। অতুলবার সঙ্গে চন্দননগরে বেধা ক'রে সব বললাম।

সেই বছরেই একটা মেল করেছিলাম। আমার সঙ্গে বাড়ার ভাড়াটে ছিলেন কবিমণ্ডলের অন্তত গুণ। স্রীযুত মাধনলাল শেনের প্রভাবে তখন তিনি ধর্মস্বীকৃতির নিকে থেকে পড়েছেন, বাস্তবীতি প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন।

তবু দেখাযে বরা পড়া থেকে বাঁচেন নাই। এবং পরে যত্নসহযোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেসটাতে প্রাচ্য আনালের পলের লোক বিয়েই ভ'রে ফেলেছিলাম। মেঘনাথ সাহা, শিবির মিত্র, শৈলেন ঘোষ, হতীন শেঠ, জ্ঞান মুখার্জি, জ্ঞান ঘোষ প্রভৃতি ধারা তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ হ'তে ভুলতে তার আশ্রিত্যে মুখার্জিকে সাহায্য করছিলেন, তাঁদের আটকান এই মেসে গীটু নিবেদিতেন। এঁরা প্রায় সবাই হতীনদা এবং নতীশদার (জননীবি শিক্ষার প্রযুক্ত শব্দভ্রম রাব চৌধুরী) সঙ্গে মিলতেন, কেউ কেউ ভারত-আর্দ্রান যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, হতীনদার পূর্ণোত্তম কার্যকলাপের সময় ১৯০৭ কলেজ টাটে নীল রঙন ধরের মেসে তাঁর যে আজ্ঞা ছিল, সেখানে, হিন্দু হোস্টেলে এবং আরও অন্তর ঘনিষ্ঠ ভাবে হাওয়া আদা করতেন, কেউ কেউ হা এ সব জায়গাতেই থাকতেন।

ইতিমধ্যে শৈলেন ঘোষ আমেরিকায় হাবার পাসপোর্ট পেয়েছেন। পাসপোর্ট পাবার পরে তিনি একবার মৌলভানুর, নড়াল ইত্যাদি অঞ্চল বেড়াতে যান। এদর অকলে তখন হতীনদার সহকর্মীরা বেশ কর্মকল। শৈলেন ঘোষের পাসপোর্ট বাতিল হয়ে গেল। তার পর তাঁর আত্মীয় পরিচয় নলিনী মহন্তদার (তখন আই বি এল-ইন্সপেক্টর) আমার মেসে একদিন তাঁকে গুঁতে এল। লক্ষ্য ভাল নয় বৃষ্টি হতীন শেঠের কাছে তাঁর আটকনের গীট ভাড়ার টাকাটা ফেরত দিয়ে এলাম, বলে এলাম ও-মেসে এখন এঁদের হাওয়া বৃষ্টিব কাজ হবে না। মেসের গীট ভরতি করা, বাড়ী ভাড়ার টাকা আদায় ক'রে বাড়ীওয়ারার মেসে যেটানো ইত্যাদি দায় তখন বাড়ি।

নিজে তবুই আর নিজেই মেসে থাকি না। ফারিপুরের ইন্সপেক্টর এক বৃষ্টি মেসে সেখানে হেঁচকির (বর্তমানে ভাষ্কার-একটি কলিঙ্গিটিকাল ওকাল এর) সঙ্গে রাত কাটাই। দিনের বেলায় হুঁকুম দিয়ে মেসের দায় মিটাতে চেষ্টা করি। যা নিজে

পারি, আন্তার (টাকি সৈমপুরের আন্তারের রাও জৌদুরী)
গড়ে চাপাই।

ইতিমধ্যে সতীশপালকে এক রায়ে খালখের এক
বাড়ীতে ঘিরে ফেললো। তিনি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে
বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পুত্র ধার নিয়ে ছুটতে
গিয়ে অন্ধকারে বেধতে পান নাই, ঘোড়ার শিঁটে থেকে
কোনো ইউরোপিয়ান পুলিশ মারলো। তাঁর বুকে এক লাথি।
হাতের রিভলভার ছিটকে পড়ে গেল, নিষেও পড়ে গিয়ে
ভাবলেন, খরাই পড়ে গেলেন—পকেটে ছিল পটামিয়ার
সামানাইড, খেতে ফেললেন। কিন্তু পালানেন। ডাগো
সামানাইডটা ওক্সিডো (oxidized) হয়ে গিয়েছিল।
জীবন বেঁচে গেলেন, কিন্তু চমৎকার বাত্মাটি সারা জীবনের
মতো হারালেন।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পরদিন মেহেরপুরের
রাখেন পালকে ধরলো সেক্ট রেভিয়ার কলেজে। বাজেন
থাকতেন আমার মেসে, তাঁর সীট তল্লাসী হ'ল। দু'এক
দিনের মধ্যেই কুমিলার গ্রেটারী পরোক্ষনার অধিনী
ডক্টার্স ধরা পড়লেন আমার মেসে। প্রথম সৈলেন
গোষ, তার পর হাওদন পাল, তারপর অধিনী ডক্টার্স—
পুলিশ ফলো, বেশি একটি অফিসি বৈনলিন মৌরাদ্য
ভুক্ত হ'ল। আশ একে ধরে, কাল ওর ভবানবকী দেখ,
পরন্ত ওব সীট তল্লাসী করে। আমার খোজ ভুক্ত হ'ল।
আমি ওরূপে হওতা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তখনও
জাধা পলাতক।

বিপদে পড়ান অস্ত্রভাবে। কুদলও (মোহর বহুর
“কুলি নাই” উপক্রাসের নাটক কুদল—সরকার নথ—
চক্রবর্তী) প্রায় এই সময়ই পলাতক হলেন। অতুল দা
তাঁর মত্রে চন্দননগরে একটা মঠারী বোগাড় করেছেন—
একখানা অতুল নামের সার্ভিকিটেট চাই। আনুদ বগলেন
কলেজে ট্রান্সকার সার্ভিকিটেট নিতে

কালমে অধ্যাপক প্রদুপ ছিলান। হুভাধ
তখন ওটেন-পর্ব শেষ করে পড়েছেন। ডাঃ
কুমিলতা দুখারি রোল ভাকতে ভাকতে একদিন বগলেন,
Faster Datta is also giving us the slip.

কিন্তু প্রেসিডেন্সিতে পড়তাম শুধু অন্যায় রাসে।
আমাকে ট্রান্সকার সার্ভিকিটেট নিতে হবে সংকৃত কলেজ
থেকে। ডাঃ মহেন্দ্র সরকার খুব বেহ করতেন।
জিজ্ঞাসা করলেন, কেন সার্ভিকিটেট নেবে?

অত্যানি বেহ যিনি করেন তাঁর কাছে বিখ্যা বলতে
আটকায়। কিন্তু জীবন তখন অস্ত্র লতো ভরপুর, আনুত
—বলি, বাড়ীতে বাবার অস্ত্র, তাঁর কাছে থাকতে হবে।

বাঁদেই কিন্তু তাঁর চোখের থেকে চোখ সরিয়ে ফেলি।
তার পরের পরীক্ষা প্রিন্সিপালের কাছে। প্রিন্সিপাল
তখন ডাঃ সতীশ বিভাজন। তিনি বলেন, তোমার
ভোমার বাবার অস্ত্র থাকবে, ততদিন তুমি তাঁর কাছে
থাক, সার্ভিকিটেট তোমার দেব না।

আমিও নাছোড়বান্দা। দু'তিন দিন ঘুরি। এদিকে
আমাকে ধরবার মতো জানা টিকানা পুলিশের কাছে
তখন শুধু ঐ কলেজেরই। হুভাধ সর্বশেষ বাই আসি।
অবশেষে সার্ভিকিটেট নিয়েই বেরিয়ে পড়ি।

তখন থেকে প্রায়ই আমি চন্দননগরে—কখনও
কুমিলার বাড়ীতে, কখনও অতুলদার বাড়ীতে, কখনও
হুয়েন ফাল্লর বাড়ীতে, কখনও খুলনার হুয়েন কুমারি
একখানা বাড়ী নিয়েছিলেন, সেখানে। মাঝে মাঝেই
বাড়ী বদল করার প্রয়োজন হ'ত। নিষেও একখানা
বাড়ী নিয়েছিলাম। কলকাতাতেও পর পর কয়েকখানা
বাড়ী নেওয়া হয়েছিল।

আমরা কয়েকজন তখন পলাতক বটে, কিন্তু ঘুরে
ফিরে বেড়াই—আমি, কুদল চক্রবর্তী, চক্র বোধ, হুয়েন
কুমারি, জীবন চট্টাঙ্গি, হুয়েন দাস। তখনকার মতো
কাল আমাদের প্রায় ফুরিয়ে গেছে—বিশেষ থেকে
অস্ত্রপাতি আলবার আশা আর সেই পরশাভে কলকাতার
এবং মেলায় মেলায় ফললও ভেবে পড়েছে। তখন
আমাদের কাজ হয়ে পড়েছে, এখন এখন পলাতক
কয়েকজনকে রক্ষা করা—এদের মধ্যে আছেন তখন
হাঙ্গোপাল মুখার্জি, অতুল বোধ, অমরেন্দ্র চট্টাঙ্গি,
সতীশ চক্রবর্তী, নলিনী কর, ময়দন বিবাস (মায়োর
বড়দত্ত মাহলার ফিলি বান বদন্ত বিবাস, তাঁর ভাই); ও

পাচুগোপাল বানার্জি। এঁদের বাচিয়ে রাখা তখন
বিশ্ববীরলের মর্গদ্বার প্রবেশ দিয়ে গেছে। পুলিশও
এঁদের না ধরতে পারলে আর শোচনীয় পাচ্ছে না।

কলকাতার জনাগত তাক্সি খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত
আমাদের প্রায় একমাত্র আশ্রয়স্থল দাঁড়িয়েছে তিলকলা
রেলওয়ে ক্যান্টিনের বেবেন ঘোষের বাড়ী। ইনি সেই
বিখ্যাত দিছুবালার স্বামী—যে দিছুবালার নাম পেয়ে
পুলিশ বাঁহুড়া বেলা থেকে দুই দিছুবালাকে ধরে
এনেছিল, তার কলে সে সময় খুব হৈ চৈ হয়।

চন্দননগরে বিরাট তোড়জোড় করে এক খানাতল্লাসী
হয়। বাহুগোপাল মুখার্জি ও নলিনী কর প্রথমটা প্রায়ই
ধাক্কেনে পূর্ববঙ্গে, আসামে, কুটান প্রান্তে। সে সময়
ভারতও এসেছেন। অহুস্টন হলরও কয়েকজন নেতা
অস্ত্র থেকে তাক্সি খেয়ে চন্দননগরে এসে এসেছেন।
এঁরা প্রায় সব একসঙ্গেই আসছেন। পুলিশ কোনোভাবে
খবর পেয়েছে। ট্রেনে করে তো এসেইছে, গলার গথও
বাম দায় নাই, কয়েক লক্ষ ভরতি করে এসেছে।

অতুল ঘোষ অনেক দিন চন্দননগরে থাকার ফলে
সরকারী মহলের সঙ্গে এখন বোঝাবোঝ দাঁড়িয়েছিল যে,
সেখানেতের দিকে কোনো খানাতল্লাসীর সম্ভাবনা থাকলে
সন্ধ্যার মধ্যে তাঁর কাছে খবর পৌঁছে যেত। এইভাবে খবর
পেয়ে তিনি একবার কুস্তলকে চন্দননগর হাঙ্গামাতালের
গেট টপকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই বারেই কুস্তলের
বাইলিগ দয়া পড়ে। এবং চন্দননগরের সিভিল সার্জনের
বিশেষ চেষ্টার বশত তখন স্বস্থ হয়ে উঠছিলেন।

এবারে যেমন খবর পাওয়া গেল যে তল্লাসী হবে,
লজীশা অহুস্টনের দুঃকন্ডনকে নিয়ে চন্দননগরের গলার
ঘাটে গিয়ে বসলেন। গুটাসিয়ায় সারানাইজ্ বাগঁদার
পর থেকে রাতে প্রায় তাঁর ঘুম হ'ত না, আর এই ধরনের
কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

খবর দিলেন, ব্যাপার গুইতর। তখন পলাতকদের
আজ্ঞাগুলো কতক বিবেচ্যে, কতকগুলোর চারপাশ নিয়ে
ঘন ঘন লাইকেল ঘুরছে। এঁরা তখন মনজনেই এক
বাড়ীতে এসে এসেছেন।

এক মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে বাহুগোপাল মুখার্জি
বেরিয়ে পড়লেন, পেছনে পেছনে আর সবাই
সমস্ত। পুলিশ বেশ টের পেলে, এই পালাচ্ছে। কিন্তু
এমন সাহস ভদরে হ'ল না যে তাক্সি করে ধরে।

অনরদা আর অতুলদা সহরেই এক বাড়ীতে কোনো
রকমে রয়ে গেলেন—বাইরে ঘুকে বেড়াবার পক্ষে
ছ'জনেরই চেহারা তখন অস্বস্তি নয়।

বামবাকীরা করানী রাতের লীমা পেরিয়ে দূরে
এক মাঠের পাশে কোঁপের কাছে আশ্রয় নিলেন।
লম্বা দিন এঁরা মাঠে মাঠে সেটেলমেন্ট অফিসার হয়ে
কাটিয়ে দিয়ে লক্ষ্য নামতে আবার চন্দননগরে ঢুকে
পড়লেন।

পুলিশ ইতিমধ্যে বিফলমনোবধ হয়ে ফিরে গেল।

আমি সেদিন ছিলাম কলকাতায়। বেলা নইটা
আমদার অতুলদার কাছে থেকে খবর পৌঁছাল যেমন করে
পারি হাজার নেত্রে টাকা নিয়ে লক্ষ্যার মধ্যে চন্দননগর
পৌঁছাতে হবে—পলাতকদের আশ্রয় নাই, অস্ত্র পাব
করে দিতে হবে।

তখনকার দিনে ময়ল আমাদের মূল কলহ—সে
মহলে আমি সীমকরা ডিহারা। কিন্তু তখন মূল
কলহেরও ছুটি। পেলান বসবসে অতুলদার বড়লার
কাছে। শোনামাত্র পাগলের মতো ছুটে হাতের কাছে
যা পেলেন নিয়ে দিলেন—হ'ল চহন' টাকা। আর
যেখান থেকে যা পেলাম নিয়ে রাতে চন্দননগরে
পৌঁছালাম।

তিলকলায় বেবেন ঘোষের ময়ফত বাংলার বিভিন্ন
কামন ঠেপনে আমার কতকগুলি পরিচিত হেল কর্মসূচী
ছুটেছিলেন। ঝুকের একজনের সাহায্যে নলিনী ঘোষ
আর প্রভাস লাহিড়িকে গোহাতির দিকে পার করলাম।

বাহুদার সুলীষ বাড়ির উপর মাথার একটা ফেঁদ পরলে
এক তাঁর পেছনে টুপি-সুঁচি, ছয় মুখে, গামছা কাপে,
মাছুর বগলে—এক হুকো হাতে নিয়ে নলিনীল
বাড়ীতে পরিচিত লোকের তাঁদের ডিনতে পারা—
বাছা সব লম্বা একভাবে পা কলে চলবার কভাস

ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাজেই তাঁদের পার করতে কারও সাহায্যের দরকার হ'ল না।

সত্যীন্দ্র ও 'মোটর'কে (দ্বন্দ্ব বিদ্যাল) নিয়ে যে কোথায় উবে গেলেন তা কেউ টেরও পেল না। অতুলনা নিম্নের চৌধুরী চন্দ্রনগরে স্থান ক'রে নিয়ে শেষ পর্যন্তই কাটিয়ে দেন।

কিন্তু মুক্তি হ'ল অমরনাকে নিয়ে। হৃদয় পৌরকারি পুরুষ, দীর্ঘ শত্রুবেশের সমাবেশে এমনই তখনকার দিনে তাঁর চেহারা গাঁড়িয়েছিল যে রক্তাক্ত শোকে দেখলে ডাকিয়ে থাকতো। তার উপর পরিত্যক্তের তাঁর কোথাও অভাব নেই। কিন্তু তাঁকে নিয়ে বিপদের কথা পরে বলছি।

অচুন্নানের নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন কানাই (কুক) সাহা। অতুলনা বললেন, তাঁদের একজন স্রেষ্ঠ নেতা, অপর দলের লোক, তার উপর এ'র বিরুদ্ধে অনেক গুলি হত্যা ও ভাঙাতির চার্জ। তোমাদের সব চাইতে নিরাপদ বা আশ্রয়স্থল আছে, সেখানে রাখবে।

তখন আমাদের সব চাইতে নিরাপদ আশ্রয় ঐ মেয়েন ঘোষের বাড়ী। ঠিক এনে রাখলাম ঐ বাড়ীর দোতলার ঘরে স্ক্রেনবানুর সঙ্গে। আমি আর কুন্তল সপ্তাহ হয়ে থাকি নীচের তলার ঘরে।

কিন্তু এঁকে নিয়ে আমরা বিপদে পড়লাম। ভদ্র-লোকের তখনই বেশ বানিজ্যটা অধোগতি হয়েছে। পরজাতিগণ টাকা বাইনের রেলওয়ে কর্তব্যরী বেকার ভাই পরিচয়ে ওখানে থাকেন, কিন্তু ঢাকায় তাঁদের দ্রুতি, আশ্রির পালাবী ছাড় পড়েন না, হাতের মুতিনটে আঙুলে জড়ায়। আঙটি। অথচ থাকতে হয় অস্ত্র রেল-কর্তব্যরীদের সঙ্গে পাশাপাশি। রাড্রে একজন সহকর্মী আসেন, হামী ভাস্কর্য্যপুত্র কামাল এসেলে দিয়ে হান। নিজে কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসাবেনা ভিক্টোরিয়া ক'রে বের হন—অনেক রাতে ফেরে ফসল, ফাঁকা আশ আর সন্ধ্যা নিয়ে।

কুন্তল বললেন, লক্ষণ ভাল নয়—এ শেষ পর্যন্ত অনেক অনর্থক হবে। আমরা কিছু বস্তুতে সাহায্য করিনে, কারণ

অপর দলের লোক। আডালে ইন্ডিতে বা বলি, তাঁতে কোনো সাড়া তো পাই-ই না, বং তিনি যে একজন নেতা, তা-ই বুঝিয়ে দেন। মেয়েন ঘোষ অতি সৎ এবং নিষ্ঠাবান লোক, আমাদের উপর অগাধ প্রভা। কতোদিন শুধু একবারই ফেন নিয়ে ভাত খেতে বসেছেন, আমি বা কুন্তল বা ভীষন কেউ গিয়ে পড়েছে—তাঁদের খালাসি পরিচয় দিয়ে বাজারে গেছেন হুঁপহুপার চিড়ে কিনতে। তা-ই ছন আর তেতুল ঘেঁষে খেয়েছেন। তাঁর এগব ভাল লাগে না। কিন্তু "দেবী চৌধুরাষ্ট্র" শিকারতো ভাবেন, বুঝি নোকাবাসরি।

কুন্তলের কথায় মতি হয়েছিল। বরা পড়ার আগে এবং পরে ইনি অনেক অনর্থ ঘটিয়েছিলেন। সমস্ত অচুন্নান দলটিকে সর্বান্ত করেছিলেন—এমন কি গেলেন ব'লে নতুন-খরা-পড়া বহুদের কাছ থেকে বহর সংগ্রহ ক'রে বহুলোককে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

গোদের উপর বিশ্ব কোঁড়া। অতুলনা আবার বহর পাঠালেন, অমরনাকে ঘামের কাছে রেখেছিলেন, তাঁরা আর একদিনও তাঁকে রাখবেন না, সেই দিনই তাঁকে নিয়ে আসতে হবে। ঐ কয়দিন তাঁকে শেখরাতে তুলে পায়খানা রান করিয়ে কিছু খাইয়ে একটা ঘরে ভালো দিয়ে দিতেন। ঘরের বায়ান্দার সারাদিন খ'রে তুল বসতো, অর্থাৎ একটু ভোরে নিঃশ্বাস কেপুলে বা কাশি দিলেই সর্বনাশ। আবার রাত বেশী হ'লে ঘর থেকে বের ক'রে কিছু খাওয়ার দাবার দিতেন। সেকালে অগবিন্দর যে কয়জন সহচর জুটে-ছিলেন, এরকম ভাবে তাঁরাই শুধু কাটাতে পারতেন। বাহুরাকেও দেখেছি অনেক লম্বা সারাদিন খ'রে ঘানায় হ'রে ব'লে কাটিয়ে দিতেন।

এই ভাবে হোক, যে ভাবে হোক, অমরনাকে পনের দিন রাখার কথা ছিল। কিন্তু চারদিনের দিন বললেন, আর একদিনও নয়। কুন্তল গেলেন অমরনাকে আনতে। বারাকপুরে অমরনার এক ভাস্করী ছিলেন—নৌকো ক'রে সেখানে গেলেন, ভাস্করী ঠিকে রাখতে অস্বীকার করলেন। গেলেন দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণে। চেহারা দেখে লোকের ভিত্তি অনেক ঘা। তখন এক ঘোড়ার গাড়ী ক'রে

ছদ্মন রওনা হ'লেন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে।

স্থান ও সময় বুঝে গাজীখানি হেঁটে পড়লো।। বেল। মাড়ে দশটা এগারটায় যখন ডেইলি প্যালেসবারের ভিড়, তখন অমর চাটালি এই চেহারা নিয়ে গাঁড়িরে হাওড়ার পূলে। ও-অকল থেকে দ্বারা আসে অমর চাটালি তাদের অনেকের পরিচিত। বাই-হোক, কুতল আবার গাজী টিক ক'রে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে সমস্ত দিন কাটালেন। রাতের বেলায় এসে উপস্থিত এই যেনে নির্দিষ্টের বাড়ীতে। আর উপায় নেই।

কানাই সাহা ইতিমধ্যে আরও এগিয়েছেন। রাত। থেকে উৎকলবাসী এক একজনকে ধ'রে নিয়ে আসেন, দুটো চারটে পরশা দেন, পা টিপে দিয়ে যায়। উৎকল-বাসী আসন-ক'রে-বসা অমর চাটালির দিকে কিং কিং তাকায়, আর শংকুচিত হয়ে যায়। অমরা শংকিত হয়ে গড়ি, পাছে বাইরে গিয়ে গল্প করে।

অমরদার অন্তে তখন ছুইটিকে চোঁটা করছি। এক কলকাতাতেই একখানা উপভুক্তমতো বাড়ী ভাড়া ক'রে সেখানে সরানো। আর, শৈলেন বোধকে আমেরিকার পাঠান হয়েছিল দার সহায়তায়, তাকে দিয়ে অমরদাকেও হাইরে পাঠিয়ে দেওয়া।

এই লোকটির নাম রামগোপাল দত্ত, শৈলেন বোধেরই আত্মীয়, বিন্দুরপুর ভকে চাকরী করে। সে অমরদার অন্তে একটা জাহাজে চোঁটা করে। হয়ে উঠলো না। পরে আর একটা জাহাজে চোঁটা করবে। ইতিমধ্যে বিন্দুরপুর অকলসেই একখানা বাড়ীর চোঁটা করতে থাকলো, জাহাজে উঠবার আগে যেন বতোয়িন প্রয়োজন সেখানে গিয়ে থাকতে পারেন।

আমরাও এসিকে নিশ্চিত থাকতে পারিনে। শৈলেন কুতল ও আমি দুপুরে বেরিয়ে ওদিকে ঝিরাযপুর, রিগড়া, কোরগণ ওকলে স্থবিধামতো বাড়ী খুঁজলাম, পেলাম না। পরে ব্যারাকপুরের এসিকে খুঁজে কলকাতাতেও ছুঁএকজননের কাছে খোঁজ নিয়ে জ্ঞাত হয়ে যখন বাড়ী কিরলাম তখন রাত বায়োট। ইতিমধ্যে কানাইয়ের

সেই সহচরটি এসেছেন। তাঁকে বিদায় ক'রে খেয়ে দেয়ে শুতে রাত আড়াইটা হয়ে গেল।

বড় পিদি শুয়ে ছিলেন পুশের একটা গুদাম মতো ঘরে, সঙ্গে তাঁর ছোট একটি পালিত পুত্র। এই বড় পিদি আর ছোট পিদি আমাদের আশ্রয়দাতা, আমাদের পলাতক জীবনের মা। এঁদের কাহিনী আর একবার বলব।

হঠাৎ রাত লাড়ে তিনটায় পিদিরা চীৎকার ক'রে উঠলেন। রিডলডার হাতে আমি আর কুতল বেরিয়ে আসতে বললেন, জানলাম দেখলাম সাহু।

উপরে অমরদা আর কানাই, নীচে আমি আর কুতল চারজনই পলাতক। উৎকল তখনকার দিনে সেগেই আছে। চারদিক ঘুরে এলাম। কোথাও লোকজনের কোনো চিহ্ন দেখলাম না। কিন্তু এর পর আর গুমও এল না। অর্থাৎ অন্ত জ্ঞানির পর দারারাত প্রায় খুব হ'ল না।

জোরে ঝিনবাবুকে নিয়ে আলবার কথা। জাকার ঝিন চাটালিকে কলকাতায় থবর দিয়ে আনা হয়েছে। এতগুলি পলাতক, খরচ কম নয়। সি, আর, দাস, হুয়েন হালদার, বি, সি, চাটালি ইত্যাদির সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে যাবেন বাতে অমরা। এঁদের কাছে থেকে সাহায্য পাই।

কথাবার্তী হয়ে গেল। ঝিনবাবুকে বাসায়ে পৌছে দিয়ে আরও দু'একটা কাজ সেতে বাড়ী থেকে যাওয়া দাওয়া ক'রে বের হ'ব। কথা ছিল, সেইদিনই রামগোপালের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা ক'রে ফেলতে হবে। এবং তারপর অমরদাকে তার আশ্রয়ে রেখে আমি নৌঘাটি চ'লে যাব। এই সময়ে পুশিণ আমায় ধরবার অন্তে উঠে প'ড়ে লেগে গেছে—সংজ্ঞিকই থবর পাই। বহুবাহুবও অনেককে ধরেছে। দাছদার নির্দেশ, কর্তৃত্ব-ভাবে পলাতকদের জীবন রক্ষা করা আর অন্যের চলবে না, আমি যেন-যা-না শনিবারেই তাঁর ওখানে চ'লে যাই।

ইতিমধ্যে অমরদার ব্যবস্থা করতে হবে। রাম-

গোপালের সাহায্য নিয়ে তাঁকে আহাতে তুলে দেওয়া এক কথা, আর তার আশ্রয়ে তাঁকে রাখা ঐক্য কথা। এটা আমি পছন্দ করি নাই বলেই আগের দিন অত যোষাকেরা করেছি অমরতার আশ্রয়ের ভয় একটা বাড়ী বুঝতে। বাড়ী এখন নেহায়ে পাওয়া গেল না, তখন রামগোপালের সাপেই ব্যবস্থা করতে হবে, অমরতা ও কুহেলের সঙ্গে পুরান্ন ক'রে সেই সিদ্ধান্তই হ'ল। অমরতা ভগবানে বিশ্বাসী, তাঁর উপর নির্ভর করতেই বললেন।

আদেশ নির্দেশ সেদিন অনেক গুলিরই ব্যতিক্রম হ'ল। অতুলতা বিদ্যুৎ বাতের বারবেলাকে বরাবর ভরাডোনে। সেবারে চন্দননগর থেকে বেরিয়ে আসি বিদ্যুৎবাতের বার বেলায়। বললেন, জাপ্তরে আও না গেলেই পারতিন, আমি একটু হেসে চ'লে এলাম।

বাছুর নির্দেশ ছিল, গোঁড়াটি ঘাবার আগে যেন কখনও দিনের বেলায় না বের হই, পারে হেটে না বের হই, একা যেন না বের হই, সমস্ত থাকলেও আর একজন সমস্ত লোক যেন সঙ্গে থাকে। এছাড়া আমার নিজের প্রতি নিজের একটা নির্দেশ ছিল। রামগোপালের মতো লোক, হারা আশ্বাসের ঠিক হলের লোক নয়, এক খুব বিশ্বাস বাহের করতে পারিনে, তাদের সঙ্গে কথা দিয়ে কথা না রাখতেই চেষ্টা করতাম—যদি বসতাম সনিবার আসব, তা হ'লে গুরুবার বেতাম, সন্ধ্যার কথা ব'লে ডোরে বেতাম।

সেদিন সব আদেশ নির্দেশেরই ব্যতিক্রম হ'ল, সব হাতে কব এই অস্ত্র। দুপুরের পর অমরতার সাপে কথা বলছিলেন, কানাই পাণ্ডে শুবে, কুহল মেঝের ওরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রামগোপালের ওখানে ঘাব, কুহল সাপে থাকবে, সেখান থেকেই ওকে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে চন্দননগর চ'লে যাব শিয়াল' ভ্রামনগর হয়ে।

কুহলকে কয়েকবার ডাকলাম, ডাকেরে বুঝেছে। ওর বধন ঘুম ভাঙলো না, আমি উঠে আসা পরছি দেখে অমরতা বললেন, একাই বের হবে? বললাম, এই

সেদিন ও হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছে, কাল সমস্ত দিন খুব পরিভ্রম পেছে, হাতে ঘুম গ্রাহ হব নাই। ও থাক, ঘুমোক। ওকে বলবেন বিকেলে ঠিক লাডে পাচটার সময় যেন ক্যাফেল হাসপাতালের দরজায় থাকে, সেখান থেকে ওকে নিয়ে চন্দননগর যাব। হাসপাতালের দরজায় কোথাও পাঁজাতে হবে, তা ও জানে।

হাতে টাকা কম—ট্রাম ক'রে বিদ্যুতপূরে পেলাম। রামগোপালের ওখানে ঢুকতে সবই কেমন একটু নতুন নতুন মনে হ'ল। অস্ত্র কোনোদিন সেবি নাই, সেদিন বেধলাম ডেউলার দরজায় দোরোয়ানের কাছে একটা দাড়িওয়ালা লোক কে বসে আছে। তার আঘার দিকে ডাকানোর ধরণটা ভাল লাগলো না।

রামগোপালের নিজেরও বেশ একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। অস্ত্রদিন তাকে সেবি খুব কিছুকট, আম মনে হ'ল কেমন একটা উত্তোষিতা ভাব, যেন জানও করে নাই। অস্ত্র দিন আঘার বেধেই উঠে আসে, বাইরে একটা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই, সেখানেই কথাবার্তা হয়।

এদিন ও যেন মূখ তুলেও ডাকতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলাম, অস্থ করছে? বললে, না। যা বললো, তার অর্থ, বাসার কোনো সুবিধা করতে পারে নাই।

বেরিয়ে এলাম। ডক থেকে বের হবার শুধিককার রেণিবেয়া পথটা এমন যে তিনচারটা রেণি ছাড়িয়ে যদি কোনো লোক আঘার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখে আসে, আঘার পক্ষে তা টের পাওয়া শক্ত।

এলে ট্রামের কার্ডব্রাসে বসেছি। ওয়াটগঞ্জের মোড় থেকে চারপাঁচজন সাধারণ পুলিশ কনটেবল সেকও ব্রাসে উঠলো। এমন তো কতো পাহারাওয়ালাই ওঠে। তখন কিছু গ্রাহ করিনি।

এসম্মানেতে নেমেছি। চার তখন চন্দননগর হাসপাতালে পথ্যগত—খাইসিরের সঙ্গে আগে থেকেই ছিল, তার উপর গিটে একটা গুলি সেগেছে। চন্দননগরের সেই শিভিল গার্লস যিনি আগে কুহলের চিকিৎসা করেছিলেন, তাঁরই চিকিৎসায় সেই

হাসপাতালেই চাককে রাখা হয়েছে। তার ওপরে কিছু ফল কিনে নিয়ে বেতে হবে। হগ্‌ মার্কেটের নিকে এগিয়ে চলেছি। পেছনে শুনি কতকগুলি ভারি জুড়োর শব্দ।

পেছন ফিরে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে আপুটে ধরেছে। কয়েকদিন আগে ভান হাতের পাতার পেছনে একটা গুলি লেগেছিল, গুলিটা হাতের পাতা হুঁড়ে হাতের রিভলভারের বাটের ভিতর ঢুক গিয়েছিল। হাতটা শুখনও ব্যাওজ রাখা। সগার একটা শিকের চামর পরি, হাতুই তুলার ব্যাওজটা ঢেকে রাখি।

পুলিশ আপুটে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো বাসিককার পকেটে একজন ডাচ্‌ কপালের একখানা চিঠি আছে। সেটা গোহাটিতে হাছবার কাছে নিয়ে বেতে হবে বলে কাছে রেখে গিয়েছি। তা'তে শুখন আর অনিষ্ট করার মতো কিছু ছিল না। তবু সেটাকে নষ্ট করারই প্রযুক্তি হ'ল অভ্যাস অহুযায়ী। ব্যাওজকরা ভান হাতে রিভলবার বের করতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম, এমন ক'রে ধরেছে দুটোর একটাও বের করা সক্ষম।

শুখন মাটিতে প'ড়ে চেষ্টা করছি, কাপড়ের ভিতরই যদি রিভলভারটার একটা আগুণ লাগতে পারি—এক মুহূর্তের মধ্যে আংকে উঠে যদি হাতগুলো একটু টিলে ক'রে দেয়। সেকটিটা সরিয়েছি, ট্রিগারও ঠিকই ধরেছি। কাপড়েরই আটকে গেল, কি, কি হ'ল, ট্রিগার আর কিছুতেই পড়লো না। অথচ সেটা খুব ভাল রিভলভারই ছিল।

এন্ড্রাসেনডের বোড়। বহু পুলিশ এসে মনে গেল। আমি ক্রমাগত কাপটা কাপটি এমন করছি যে ওরা আমার হাত পা কিছুই বাঁধতে পারছে না। গায়ে শুখন বেশ ঝোর ছিল। এই সেদিন যে পুলিশ একত্রিবিধন করেছিল, তাতে নিজের কটো বেধে নিজেরই হিঁসে হাছিল।

কিন্তু হ'লে কি হবে? পরে শুনেছি, সতের জন লোক মিলে—আমায় ধরেছিল। দু'জন ইউরোপিয়ান

মার্কেট ছিল। তার একজন মাটিতে ব'সে আমার গলায় পা দিয়ে গলার চামরটা ক্রমাগত পানিয়ে চলেছিল।

সেই অবস্থাতেও তুলনামূলক পরিস্থিতি করছি। ইতিমধ্যে বুঝলাম, ধরা পড়তেই হবে, রিভলভারও আর ব্যবহার করতে পারব না। শুখন চেষ্টা করলাম পকেট থেকে পটাসিয়াম সাইনাইড বের করতে। কিন্তু দেখি সে পকেটটা ছিঁড়েই নিয়ে গেছে।

মাঝে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, বহু লোক মনে গেছে। হুঁ একজন বলছে, কি করছ, কি করছ তোরনা? ছেড়ে দাও না ডল্লোককে!

পুলিশ তার সনাতন জবাব বিচ্ছে, ইয়ে তো ডাকু ছার। এই লব শুনতে শুনতে আর ক্ষত্যাগতি করতে করতে কখন অজান হয়ে গেছি। ওরা শুখন আমার হাত পা বেধেছে, একটা ট্যান্ডিতে তুলেছে। ট্যান্ডিওয়ালা রিজেন্স করছে কোথায় নিয়ে যাবে? সালবাজার? পুলিশের একজন বললে, ইলিশিয়ায় যো। ঠিক এই রকম সময়েই আমার জান ফিরে এল।

লব পুলিশগুলোও আর কয়েকটা ট্যান্ডিতে উঠলো, নাম লেখাবে, ইনাম মিলবে। নেপলম, আমার কাপড় মাঝা লব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, চামরটারই এক অংশ কোমরে জড়ানো, সর্কাস ক্ষতবিক্ষত, অনেক ভাঙখা থেকে রক্ত বরছে। বৈশাখের অপরাহ্ন, তুফান ছাতি কেটে যাচ্ছে।

ইলিশিয়ায় যেতে বখন পৌছলাম, হাত দুটোকে পেছনে নিয়ে হাতকড়ি লাগিয়ে দিল। বারান্দা দিয়ে বখন একটা ঘরের ভিতর নিয়ে যাব, শুনতে পেলাম, পাশের ঘরে কে বলছে, জুপেন সতর্ক ধ'রে নিয়ে এসেছে।

ঘরের ভিতর নিয়ে বেতে বহু লোক এসে পড়লো বেবতে, লবাই আই বির কর্মচোরী।

যিন্দুহানী একটি পেছনে এসে বাড়িয়ে আমার চুল ধ'রে টানতে শুরু করলো। চুল তখন ছোট ক'রে কাটা, বিশেষ জ্বাধি করতে পারছিল না। আর জানিই তো যাববে। চূপ ক'রে বইলাম।

সাহস পেয়ে চারদিক থেকে গা'ল শত্রুতে আরও

করলো। আর হয় তো সজ্জ হ'ত, কিন্তু গা'ল সজ্জ হয় না।

চীংকার করে বললাম,

Stop you brutes, you have sold your mother, sold your country, sold your conscience. And now don't you feel ashamed to use filthy language against a patriot?

চীংকারে ঘরটা মুক্ত হ'ল বেঁপে উঠলো। গা'ল খেয়ে গেল। ইন্সপেক্টর কালিদাস ঘোষাল হিন্দুস্থানীটাকে বললো, মেয়ো না, এর কেন্দ্র কোর্টে হবে। মাংস খেয়ে গেল। আমার ভাগ্যে এর পরে আর আর ছোট্ট মাই।

একে একে ঘর ছেড়ে সব বেরিয়ে গেল। দুইচারজন রইলো, তারই মধ্যে একজন পাশে এসে ধীরে ধীরে নিজেস্বরূপে, আপনাদের পিপাসা পেয়েছে? জল খাবেন? ইংরেজিতেই ধমক দিয়ে জবাব বিলম্ব, মনে করছে তোমার হাতে জল খাব? ইউরোপিয়ান মার্কেটটাকে দেখিয়ে বললাম, বয়ং এর হাতে খেতে পারি, এরা যা করছে নিজের বেশের সেবার জন্য করছে।

সামনেই একটা মলের কল ছিল। মার্কেটটা একটা পেছালা নিয়ে বেশ করে ধুয়ে জল এনে দিল, খেলান। তারপর আবার পেছালায় জল নিয়ে এসে, আমার মুক্তি আমার টুকরোগুলো কাছেই পড়ে ছিল, তা থেকে বানিকটা হাবুডা নিয়ে আমার সমস্ত গায়ের, মাথার খাগুলো ধুয়ে ধুয়ে বেগান বেগান থেকে তখনও রক্ত করছে, সেখানে সেখানে জলপটি নিয়ে দিতে লাগল।

একটা চেয়ারে বসে ছিলাম। বানিক বাসে একজন বৃদ্ধ গোছের অক্লান্ত এলেন, তাঁর কথায় একই কৃষ্ণার টান জেনে আশ্রয় করলাম, পূর্ণ স্নানার্থি। বললেন, আছা! এই ছেলেরি? বাবা, তোমার নাম কি?

বললাম, Are you the officer in charge here?

না, না, সে আছেন, সাহেবরা আছেন।

Then I have nothing to tell you.

আচ্ছা, আচ্ছা, ব'লে দ'রে পড়লেন।

মজার সময় কয়টি সাহেব একে একে এসে দেখে চলে গেল। মনে হ'ল, তারই একজন টেগার্ট। লর্ড রোলাওয়ে এই সময় পড়বার হয়ে এসে অভ্যাসের মূল্যের কথা শুনে টেগার্টকে সরিয়ে দেন। তখন টেগার্ট চার্জ হকিমে রয়েছে, কবেট ভি আই জি রয়েছে।

মজার পর দোতলার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে কবেট, গোন্ডি, সতীশ মজুমদার এবং আরও অনেকগুলি বিলিতি ও বৈধী অফিসার। কবেটের হাতে একটা পাতলা ছড়ি।

ছড়িটা টেবিলে রেখে কতগুলো কাগজ নিয়ে একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন করে গেল, What's your name? What's your father's name? Where's your native village? How old are you? Was this revolver found on your person?.....

আমি বললাম, Hear me once for all. My name is....., my father's name....., my native village....., P. S....., District....., my age....., Expect from me so far and no further, I refuse to answer all further questions from the officers of a foreign Government.

বল বল করে কথাগুলো লিখলো, অত তাড়াতাড়ি কথা বা বা মনে পড়লো না, তা লিখতে সতীশ মজুমদার সাহায্য করলো। লেখা হয়ে গেলো আমার নিজস্ব করলো, Was this revolver found on your person?

বললাম, I refuse to answer.

Was this monthly ticket found on your person?

Disso

আরও দু'একটা প্রশ্নের ঐ রকম জবাব শুনার পর, চট্টমটে কাগজগুলো টেবিল থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল, বেডটা ফুলে নিয়ে ঘোরাতে লাগলো, লম্বা লম্বা রাগে নাক দিয়ে ঠান্ডা কুহুরের নাকের ঝাঁপটোয় হাতো

একটা আওরাজ করতে লাগলো। বললো, you refuse to answer questions from a foreign Government's officers. You are a revolutionary then?

I am a patriot.

Do you know what this sort of behaviour will lead you to?

What? I know you have tortured many people, tortured some to death.....

We torture men! Don't you believe in British honesty?

Yes. From Robert Clive down to yourself I do not know whom to call more dishonest.

You want us to leave the country?

I know, you won't leave out of your own accord. We'll force you out.

You are a revolutionist then?

I am a patriot.

You were going to stir up a revolution. How many are you? I can count your number on my fingers. Have you got an army? Have you got a navy? Who is going to be your general? Satish Chakravarti? Satish Chakravarti going to be your general? Do you know what an ordinary man-of-war would cost you? It'll cost you three crores of rupees. Have you got the money?

এইভাবে প্রশ্নের বজা চললো। তার উত্তরে আমিও এক বক্তৃতা বেড়ে বিলাস—বার মর্ষ হ'ল: কিছু তো নেই আমাদের, জানি। কিন্তু আমরা মরতে জানি, আমরা এক এক মল ক'রে মরব, আর বেশকি নাগাধ—যেখি কতদিন তোমরা আমাদের লোকসংখ্যা আর টাকার হিসেব ক'রে বাবিরে রাখতে পার। বাধীনতা চাইতে শিখলে কোন্ জাতকে কোন্ জাত কবে বাবিরে রাখতে পেরেছে? আমরা জাতকে বাধীনতা চাইতেই শিখিয়ে দাও। তারপর না হয়, দীর্ঘকাল তোমাদের সাথে আমাদের ক্ষমতাপ্রতি করতে হবে।

আমার বক্তৃতা চম্চে, ওর হাতের ছড়ি ঘুরছে। আর আমি ভাবছি, এক যা যদি মারে, হাতেই না হয় হাতকড়ি আছে, একটা লাথিতে ওকে টেবিলের উপর দিয়ে ফেলব, তারপর বা হয় হবে।

বেথলায়, ছড়িটা সংকটই রইলো। আমার বক্তৃতা ধামবার পর অভ্যন্তরীণ ক্ষমতায় বললো, "লে যাও"। এই "লে যাও" কথাই অর্থ ভনেছিলাম, মারের ঘরে নিয়ে যাও। আমার বেলায় বেথলায় লাগবান্নারে নিয়ে চললো।

সে আর এক কাণ্ড। আফিসের সামনে বেথলায়, এক বন্ধ জ্যান গাড়িতে—তার সামনে পাঁচজন বন্ধুধারী দেশী পুলিশ, এবং দুইজন ইউরোপীয়ান সার্কেট। দেশী পুলিশগুলো ভিতরে ঢুকলো, একটা সার্কেট সামনে বললো, অজ্ঞাত বন্ধুকের চেয়ার ও হাতের গুলি খুলে পেছনের দরজায় বসলো। গাড়ীর দরজার সামনে গাড়িতে একটি আই বি অফিসার। সে আর ভিতরে ঢুকছে না। সতীশ মজুমদার এসে তাকে জিজ্ঞেস করছে, উঠে না কেন?

সে মূখ কাঁচুকাচু ক'রে বলে, আর একজন তাউকে দিলে হ'ত না?

তুমি বলছ কি? ওর রয়েছে পেছনে হাতকড়ি লাগানো, তার উপর বন্ধু নিয়ে অস্ত্রগুলো কনস্টেবল ভেতরে রয়েছে, দরজায় রয়েছে রাইফেল নিয়ে সার্কেট। তোমার কাছে আছে রিভলভার। আরও লোক? অস্ত্র বাঁধাচ্ছে কেন?

না, না, তবু, তবু, ক'রে তো উঠে পড়লো।

সেই প্রথম ব্রাক ম্যারিয়ার সোকা। ভেতরে অন্ধকার, আমার দনডরও তাই।

লজ্জাবান্নারে গিয়ে এক বুড়ো মতন ভালো মাহু সার্কেটের কাছে তো আমার নাম ইত্যাদি লেখাশো। তখনও আমার সেই শিখের চাদরের আর্দ্রকটা পতা। আই বির লোকটা সার্কেটটিকে বললো, এ কাপড় হাড়িয়ে নিয়ে ওকে একটা হাফপ্যান্ট দাও।

সার্কেট বলে, How can I national costume?

খাই বিটা বলে, সিলে ভালো করতে, আচ্ছা, যা খুশি কর।

এর পর সার্কেণ্ট আদার নিচে এতটা সেলে ঢুকলো। সেখানে দুখানা কখন ছিল। দরজার পাঁচতম পুলিশ বসালো। তারপর দরজার তাল লাগলো। এতটুকু বাদে দরজা খুলে, বোধ হয়, ঐ আই বিটার পরামর্শে ওর একজন পুলিশকে সতীন হুত্ব ভিতরে এনে দাঁড়ো করিয়ে দিল।

দরজার সামনে সামনি জানালার কাছে একটা কখন বিড়িয়ে বসলাম। এলোমেলো সমস্ত কথাগুলো মনের ভিতর ওলটপালট করতে রইলো। তিনটি কথাই তার ভিতর বড় হয়ে দেখা দিল।

প্রথম কথা, কেমন ক'রে ধরা পড়লাম। আহুপূর্বিক সমস্ত ভেবে তখন যা মনে হয়েছিল, পরে সমস্ত মনে-স্তনেও দেখলাম, আদার ঐ প্রথম সিদ্ধান্তই ঠিক। রামগোপালই আমার ধরিবে নিচ্ছে। পৈলেন যোবের আমেরিকার বাবার ব্যাপারের সঙ্গে আর যারা সন্নিবিষ্ট ছিল, তার একজন কখনই আগে ধরা পড়বে। সে স্বীকারোক্তি করার কলে রামগোপালকে ঐসি ভোরেই ধরতে পার। তখন, আমার ধরিয়ে দেবে, ঐ অস্বীকারে রামগোপাল সেইসিনিই চাড়া পায়। এবং আমিও ঠিক কথামতো এবং সময়মতো ঐসিনি তার কাছে বাওরতে সে হুদোগ পেয়ে যায়।

এ খবর বাইরে আসনা রইলো না—রামগোপাল সমাধে একঘরে এবং ডাইয়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু পুলিশ বিভাগে চাকুরী পায়।

দ্বিতীয় কথা যা আমার অস্থির ক'রে তুলছিল সে হচ্ছে এই—আমি ধরা পড়লাম, কিন্তু বাগা রইলেন তাঁদের চলবে কি ক'রে? কুতল, চাকি—অতজন পলাতকের তার ও'দের উপর, অথচ তারা তো বেশী লোককে চেনে না। আর অবধি কোনো কামেলাই ও'দের উপর দিয়ে যায়নি। তা ছাড়া স্রাঘ্যও দুজনেরই খরাপ। কি করে কোথা থেকে আওই ও'দের চলবে? তার উপর, কতোখানি হত্যার বে ওরা ভেঙে পড়বে! কুতল আর বখন

ক্যাথেনের দরজার এসে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি নির্দিষ্ট সময়ে যাব না, কতোখানি হত্যার নিয়ে ও বাড়ীতে ফিরবে! আর সন্ধ্যা চাক হাসপাতালের জানলা থেকে পথের দিকে চেয়ে থাকবে, আমি যাব না, হাসপাতালের দরজা বন্ধ হবে অনেক রাতে, তখন অবধি আমার আশার থাকবে। তারপর?

সব ছাপিয়ে মনে ছাপছিল এক ভাবনা। কত লোকের কথা শুনেছি, স্বীকারোক্তি করেছে। কি ক'রে হয়? টুকরো টুকরো কথা সব মনে ভেসে আসছিল। অতুললা বলেছিলেন একদিন: মারলেই যদি স্বীকারোক্তি করতে হয়, তা হ'লে কোনো দেশে কোনো কালে বিপ্লব সম্ভব হ'ত না।.....হুদোগ দাপ বলেছিলেন, আমি যদি সত্যি সত্যি কিছু না জানতাম, মারলেই বা কোথা থেকে বলতাম?.....কুতল বলেছিলেন, মারতে মারতে যেরে ফেলে দেবে, মুখ দিয়ে একটি কথা বের হবে না—এই তো বিপ্লবীর জীবন।.....

এসব কথাই জানি, মুক্তি। মুখ দিয়ে কথা বের হতে পারে না। নিতেনে গাভার জন্ত অপরের সর্বনাশ করা—বিপ্লবীর দর্বভাগ্য বিপ্লবীর আতিপাত। বিশ্বাস-ঘাতক হ'তে পারে, পুলিশের কাছে যাথা নোহাতে পারে—আশুদখানবোধের কতোখানি অভাব হ'লে! অথচ করে না নামে রটেছে? জীবন চাটাজির নামে পর্যন্ত, যে জীবনকে আমি নিজের চেয়েও বেশী বিশ্বাস করি। অস্থিরনের অস্থি দরকার—তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানিনি, কিন্তু কতো কথাই তো তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি! পরে শুনেছি, এঁদের নামে যা-কিছু রটেছে, সবই মিথ্যা, আশুদখান অন্যায় রেখেই এঁরা উৎরেছেন।

কিন্তু তখন ঐ জানলা দিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, মার গেছে বা কোনোরকম অত্যাচার জুলুমের ভয়ে তো এঁদের মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হওয়া সম্ভব নয়। তবে কি কোনো রকম ঔষধ পাওয়ায়? কোনো রকমে অজান ক'রে নিয়ে, উদ্বাস ক'রে নিয়ে কি তবে কথা বের করে?

যদি সত্যিই আমার তাই হয়? সেই কলংকিত,

জীবন বয়ে আবার বেঁচে থাকতে হবে? আর, আবার দুখ দিয়ে যদি কোনো কথা বের হয়, আবার কথায় প্রথমেই ধরা পড়বে কে? —হুসল আর চাক—কাল পৰ্বতও আবার কাঁধে মাথা রেখে দ্বারা পথম নিশ্বিত্তে ঘুমিয়েছে।

পরে শুনেছি, ঐ দিনই আলোচনা হয়েছে: কানাই নাহা বলেছে অমরগাংকে, কুপেন সন্ত যদি ধরা পড়ে থাকে, আমাদের তো আশাই বাসা বদলানো উচিত। অনবদা বলেছেন, কেন? কুপেন স্বীকারোক্তি করবে বলে? কুপেন যদি স্বীকারোক্তি করে, আমাদের ধরা পড়াই ভাল। আদরাই বা তা হ'লে পালিয়ে থাকব কিসের আশায়?

কানাইএর ঠিক বিপরীত কথাও বলেছেন অকুইলনের আর একজন পৌহাটিতে। আবার ধরা পড়ার খবর নিয়ে পৌহাটিতে যখন একজন বলেছেন, কুপেন সন্ত তো পৌহাটির খবর জানে, নলিনী ঘোষ জবাব দিয়েছেন, আমি তাকে অল্পই দেখেছি, কিন্তু যা দেখেছি, তা'তে মনে হয়েছে, দুইদলের আর যে কেউ স্বীকারোক্তি করতে পারে, আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু এ নয়।

তখনকার দিনে কেউ ধরা পড়লে এই রকমই সব আলোচনা চলতো। বাড়ী বদলের হিড়িক লেগে যেত। লোকে আমাদের উপর আস্থা রাখে আমি জানি। সেই আস্থাকে চিরদিনের মতো বল দিয়ে আবার বেঁচে থাকতে হবে?

পেরন দিকে একবার ক্রিরে তাকিয়ে নেই—ঘরের রাষ্ট্রবাসে সন্থীন নিয়ে সেই পাহাচাওয়ালাটি তখনও দাড়িয়ে। মনে মনে সংকল্প খাটি: রাতে গর দিকে চেয়ে বসে থাকব,—একবার না একবার গু রিমোডে গুল করবেই, তখন গর সন্থীন কেড়ে নিয়ে যা করার করব।

মন কবে দৃঢ় হয়ে ওঠে। কিন্তু রাত সাড়ে দশটা আন্দার সেলের' ডালা খুলে, ঘরে ঢুকলো কবট। আবার তার সেই বক্তৃতা। তার উত্তরে আবার আমায় স্বাকালো স্বাকালো কথা।

তারপর কবট প্রত্যেকটা আনলায় দরজার গেল, শিকগুলো টেনে টেনে বেগলো, শক্ত আছে কিনা—না,

কোনোটাকে ছেড়ে বা পেরিয়ে আমি সরে পড়তে পারি। পাখ্যানার ভিতরটাও ঢুকে দেখলো। তার পর বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে দাবার বেলায় সন্থীনওয়ালা পুলিশটাকে বাইরে নিয়ে দাঁড়ো ক'রে ঘরে আবার ডালা লাগিয়ে ডালা বাহকতক হেঁকে পরপ ক'রে চলে গেল।

ও আশা ছুরিয়ে গেল।

এর পর একবার পাখ্যানার ঢুকলাম প্রস্তাব করতে। ঢুকে সমস্ত দিকটা বেশ ক'রে ঘেঁষে এলাম।

সাতা রাত দুম আর হ'ল না। কখনও শুবে কখনও ব'সে সংকল্পটা দৃঢ় ক'রে নিছি, সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিছি।

রাত সাড়ে তিনটা আন্দার পাখ্যানার দাব ব'লে কনটেইলনের কাছ থেকে এক মগ জল চেয়ে নিলাম। পাখ্যানার ভিতর একটা কাঠ পড়ে ছিল, সেই কাঠের উপর কনটেইলটা চাপিয়ে দিতে উপরে জানলার গরাদে হাতে পেলাম। জানলায় বসে চারদিক কোমর থেকে খুলে নিলাম। পাকিয়ে গরাদেই বেঁধে গলায় পরিয়ে দিলাম।

মেডুলা ভাংবার তথ্যটা জানা ছিল না, হাস্যবোধ হয়ে মরার কল্পনাই মনে ছিল। তাই আত্মে আত্মে ফুলে পড়লাম, পাছে কোনো রকম অগোচর হয়। কিন্তু যা গর করেছিলাম, তা-ই হ'ল। জানলার নীচের দাঁঠান-গুলো ছিল পুরোপুরি, গড়মুচ ক'রে ভেঙে পড়লো কনটেইল উপর। অগোচর শুনে বাইরে কনটেইলগুলো টাউনমাউ ক'রে উঠলো কেহা হুয়া, কেহা হুয়া ক'রে।

সার্কেটটা চাষি নিয়ে ছুটে এসে দরজা খুলে ফেললো। ওরা চোচাতে লাগলো, ছুরি এো আও, ছুরি লে আও ক'রে। তখন আমার গলাটা বেশ শুকিয়ে আসছে। এক একবার মনে হচ্ছে আর বেশী সময় নয়।

কিন্তু সার্কেটটা হঠাৎ বদলো, দুতনে খ'রে উপর দিকে তোলো। ভয় হ'ল, আর তৌ বৃত্তি মরা হয় না!

তখন চোটা করলাম মাথা টুক হরি মরা যাবে। একটা কনটেইলের দুই কাঁধে দুই হাটু বেধে ফুলে একবার জানলার একদিকে মাথার সামনেটা, আর একবার

এর পর আর বৌই সময় ভাগ করে থাকে।
দীর্ঘ দীর্ঘ চোখ মেলায়। প্রথমেই থাকে
চোখে পড়লো যে কানাই বহু মলিক, আমার কুতূব
সংগতি, এখন মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র। বড়ো সময়ের
ওলাতে বিধি লাগছে, আর বাগেজ
এই এই স্পোর্ট প্রথম মনে হ'ল, মরাদে, মাঝার

চাবুকে তারিখে কয়েকটি ছাত্র ছাঁড়া
ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি ছাত্র পুলিশই সব—খাট-
খানিকে বিবে ধরেছে। একলায়, আর কোনো আশা
করা হয়।

পাহাড়ের বাবড়

হাজে।

একজন সাংবাদিক

বিড় বুঝতে

বাসে একজন

হাত চেড়ে দিয়ে হঠাৎ

জালিয়ে চোখের পাতা টেনে চোখের কাছে

ইসিম প্রভাতের প্রথম বৌয়ের মাঝে মাঝে কয়েক
বাইরের ভগ্নের উপর বনিকাপড়ে গেল।
আগের দিনট পড়েছিল। এখন মনের আশাটুকু শেষ-
বারের মতো একটু অগ্নি উঠে নিচ্ছে গেল। মাঝে মাঝে
মনের উপর চেপে বসে। এই শংকা, মরা তো হ'ল না,
এর পর কি? বেঁচে মরে থাকতে হবে না ভো?

শিশুর স্বাস্থ্য গঠনে ও পরিষ্কারি নিয়ন্ত্রণে

দুলালের

গালাসিছরি

১২১ গ্রামি ৩২৭ বারাতপ্তী ঘোষ ফুট, অনিচ্ছা ১২১

৬-১১



স্বাস্থ্য

সাধনার পথে

ঐতিহ্যগত স্তম্ভ

মন্দিরা তার দশন বৎসর পূর্ণ করল; নানা বাণা-
বিপত্তির ভিতর দিয়ে কড়-কাপটীর ভিতর দিয়ে “মন্দিরা”
তার দশ বৎসর অতিক্রম করেছে। ৭৮ বছর কারা-
ভোগের পর কয়েকটি বিপ্লবী সহকর্মী ও সহকর্মী
নিস্ফায় ও বিনা সফলে এই কাগরখানা শুরু করে।
১৯৩০ হ’তে ৩৪ সাল পর্যন্ত বাংলায় যে বিপ্লবী কর্ম-প্রবাহ
চলেছিল, তার সংবাহক হিলাবে দ্বারা কারাবণ্ড ভোগ
করছিল, এরা তাদেরই অন্ততম। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত-
ভাবে এক বিপ্লবী ঐতিহ্যের অধিকারী এই কয়টি দেশ-
সেবক এক নতুন পথায় অগ্রসর হল। প্রথমেই এরা
বাণা পেল—অন্তরঙ্গনের কাছ থেকে। এরা চেয়েছিল
বিপ্লবী কর্মীদের সম্মিলিত মুখপত্র হবে ‘মন্দিরা’। এতের
এই উদার মনোভাবের স্বযোগ-নিম্নে মন্দিরাকে কংগ্রেস
বিরোধী পথে চালিত করার প্রচেষ্টা কেউ কেউ শুরু
করে। ‘মন্দিরা’র প্রথম সংকট এল এইভাবে।

এই সংকট কাটিয়ে ‘মন্দিরা’ ঘোষণা করল একান্তভাবে
ও একনিষ্ঠ আহুগত্যের সঙ্গে ‘মন্দিরা’ কংগ্রেসের সেবা ও
অনুবর্তন করবে। বাংলার তৎকালীন রাজনীতিতে
এই মতবাদও এর পক্ষে একটা সংকট হয়ে উঠেছিল।
লোকের কাছ থেকে তিরস্কার পেয়েছে প্রচুর। কিন্তু
তবুও ‘মন্দিরা’ তার রাজনীতিক বিসর্জন দেয় নি।

তারপর এল রাজবোধের রক্ত রূপ। জামিন ডলব
করা হল। দেশবাসীর আহুকূলা সে সংকটও মন্দিরা
কাটিয়ে উঠল। হৃদয়ের গতি বৃত্ত উগ্র হয়ে উঠেছিল,
রাজবোধও তত উগ্ররূপে ‘মন্দিরা’র উপর পড়ছিল।
‘মন্দিরা’র পরিচালকবর্গ সবাই একে একে কারাবন্ড
হল। তবুও মন্দিরা তার দ্বাভাগ্যবিত্তি বন্ধ করে নি।

এরপর এল কাগজ নিয়ন্ত্রণের বিধি—যার বলে
সরকারের মুদ্রণীতির সমর্থক ও বিরোধী হিলাবে সাময়িক
পত্রের জাতি বিচারে কাগজের বরাদ্দ করা হ’ত।
মন্দিরার ভাগে যে পরিমাণ কাগজের বরাদ্দ হল তাতে

তার কলসের ক্রমে কীণ হতে কীণতর হতে লাগল।
কিন্তু তবুও সে গতি বন্ধ করে নি।

এমনি করে ‘মন্দিরা’র আট বছর কেটে গেল।
মন্দিরার কারাবন্ড হৃদয়গণ একে একে মুক্ত হতে লাগল।
মন্দিরাও আবার নতুনভাবে নতুন সম্মান পেতে হল।

এই দশ বছরের কাহিনী মন্দিরার অঙ্গে এইভাবে
লিখিত হয়েছে। মন্দিরার অস্তরে এই কাহিনী লিখিত
হয়েছে আরও গভীর রেখায়। জাতির অস্তরে সেই
কাহিনী যে রেখায় ও যে গভীরতায় লিখিত হয়েছে,
‘মন্দিরা’র অস্তরের লেখাও ঠিক সেই রেখায় ও সেই
গভীরতায় লিখিত হয়েছে।

শাশীন ভারতে ‘মন্দিরা’র এই প্রথম নববর্ষ। কত
বীর, কত মার্তিরে (martyr) কত দেশ সেবকের আশা-
আকাঙ্ক্ষার ঐতিহ্য ‘মন্দিরা’ বহন করছে! সে ত’ ঠিক
আজকার কথা নয়—যখন, যে দ্বারার উত্তরাধিকারী ও
সংবাহক আজ মন্দিরা—সে দ্বারা শুরু হয়েছিল। ভারতের
ত্রিংশ কোটি লোক সম্মানের প্রাপ্তে নতুন জীবনশক্তি সঞ্চার
করার ক্ষমতা যে ভবীতরুণ এই কর্ম-দ্বারাকে ভারতে
এনেছিল, আজ তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে
মন্দিরা তার নববর্ষ আরম্ভ করছে।

পূর্বভাগ্য বেবে কীদকারা স্নোভিনী বের হয়
তার কপালি দ্বারা বেয়ে। ক্রমে সে বেগবান হয়—আরও
যখন পাচটা এমনি স্নোভিনী এসে তার সঙ্গে মিশে।
যত নীচে নামে তত সে বেগবান হয়। পূর্বভাগ্য তার
অচিন্তা ও শুভ্রতাকে রেখে সে ধরণীর বক্ষকে উর্ধ্ব করে—
ধরণীর শঙ্কিততাকে তার নিম্নের অঙ্গে মেখে নিতেও সে
অস্বপ্ন করে না।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিপ্লবধারা এমনি
করে নেমে এলেছে—বেগবান হয়ে। এক এক করে
বহু বিপ্লবধারা এসে মিলিত হয়েছে। পরিমাণে ও
গতিতে তা বেড়ে চলেছে। ভারতের শাশীনতার মহা-
লাগ্নরে এসে সব দ্বারার সব প্রবাহ সার্থকতা লাভ
করেছে। আজ ভারত শাশীন,—বিদেশীর শাসন হতে
সে মুক্ত।

কিন্তু এই স্বাধীনতার রূপ কি? কেবল ইংরাজের শাসন হতে মুক্তিলাভেই তা কি পর্যাপ্ত হইবে?

স্বাধীনতার একটা ব্যাপক ও গভীর অর্থ আছে। সে অর্থ বিশেষভাবে সূত্রে তুলেছেন মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত অরুণলাল। দুজন দুনিখ থেকে সমস্তকে দেখেছেন। গান্ধীর দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল সাধারণ মানুষের উপর; নেহেরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল—প্রধানত পাশ্চাত্য পুস্তকের মতবোধ। মতের সংঘর্ষ এদের হয়েছে বিস্তর কিন্তু মিল ছিল একটা বিষয়ে;—জনসাধারণের দ্বাং লাখবের ইচ্ছা। এর ফলে উভয়ের মতের সামঞ্জস্য হ'তে লাগল। গান্ধীজী বুলেন পুস্তকের মতকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না;—তারও কিছু জুলা আছে। পণ্ডিতজী বুলেন পুস্তকের মত সংশোধন ও সর্বকালে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। দেশ ও কাল অনুসারে মতবাদের পরিবর্তন করা সরকার এবং সেই পরিবর্তন সাধনের উপরই অনেক সময় রাজনৈতিক শাসকলা নির্ভর করে।

ভারতবর্ষে এই ভাবে গান্ধী ও নেহেরুর সমন্বয়ে একটা নতুন সমাজ আদর্শ ও একটা নতুন রাজনীতি ও অর্থনীতি গড়ে উঠল। এই সমাজ ও অর্থনীতির গোড়ার কথা হল সাধারণ মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। বি-কেন্দ্রিত সমাজ, বি-কেন্দ্রিত অর্থনীতি ও বি-কেন্দ্রিত রাষ্ট্র—এই হল কংগ্রেসের আদর্শ। এই আদর্শে পৌছাবার জন্য অসংখ্য পথও অবলম্বন করা হল। ইংরাজের কবল থেকে দেশ মুক্ত হল—ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করল। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢালক ও নারক ছিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের চেঁচায় ও নেতৃত্বেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য মহান। স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ রচনা করেছে কংগ্রেস; জাতিকে উদ্ধৃত করেছে কংগ্রেস; লক্ষ লক্ষ নরনারী কংগ্রেসের নির্দেশে ও নেতৃত্বে দেশের স্বাভাবিক স্বাধীনতা বরণ করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসই দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে। সর্বাঙ্গ দিয়েই জনগণ কংগ্রেসের প্রতি প্রত্যাশিত থাকবে এটা আশা করা যায়।

কিন্তু আমরা দেখছি দেশের সর্বত্র লোক কংগ্রেসের

নিষ্ঠা করছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এদের মনোভাব যে কত প্রবল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল গান্ধীজীর হত্যা। কিন্তু সত্যটি কি দেশের লোক গান্ধীজীর হত্যা চেয়েছিল? না, তা চাই নি। দেশের লোক—শ্রেণী ও ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষের লোক গান্ধীজীকে যে কতটা ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত, তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আজও সাধারণের মনে গান্ধীজী ও কংগ্রেস অভিন্ন। দু'বছর হল সাধারণ নির্বাচনে দেশব্যাপী অসুষ্ঠুচিত্তে কংগ্রেসের প্রতি তাদের আস্থাভাৱা জাপন করেছে। সেই নির্বাচনের পর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা একটিই হয়েছিল—দেশের স্বাধীনতা লাভ; এবং তা হয়েছে কংগ্রেসের চেঁচায়, কংগ্রেসের ত্যাগে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে। কাজেই হঠাৎ দেশের লোকের পক্ষে কংগ্রেস ও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কিন্তু হবার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নেই। কিন্তু তবুও এটা সত্য যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী কোতাবাহি উগ্র হয়েছে।

এর কারণ অসংখ্য জান করা আজ দরকার। কংগ্রেস একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান; গণতান্ত্রিক উপায়ে কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে; গণতান্ত্রিক পথে আজ কংগ্রেস দেশের শাসন কার্য চালাচ্ছে। কংগ্রেসের এই গণতান্ত্রিক নীতি ও প্রকৃতিই আজ তার অগ্রিমতার অন্য অনেকটা দায়ী। কথাটা হযত গুনেও স্ব-বিরোধী মনে হবে।

বিপ্লবের মুখে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ও পরে, কোন দেশের কোন দলই এমনি গণতান্ত্রিক পথে চলে না এবং চলতে পারে না। ভারতীয় বিপ্লব থেকে শুরু করে কয় বিপ্লব পর্যন্ত সর্বত্রই দেখছি—ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সময় ও অব্যবহিত পরে, নবজন্মের পথে কেউ চলে নি। সমাজে বা রাষ্ট্রে বিপ্লব কখন আসে, তা বিচার করলেই, এর কারণ বুঝতে পারব। সমাজে নানা দিক থেকে অসন্তোষ বহন প্রবল হয় এবং বহন শাসকবর্গ স্বৈর ও দৃঢ়ভাবে শাসন কার্য চালাতে পারে না—তখনই কেবল বিপ্লব সম্ভব। ভাণ্ডা ও অসুখা বহু আশা ও হুমান্য তখন সমাজে জাগে; বহু দিক থেকে চোঁচা হয় নির্বিঘ্ন হয় হতে

শাসনও কেড়ে নেবার। সেই অবস্থায় যে দলটি অসহযোগের পর ক্ষমতার অধিকারী হয়, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র সব দলের বিধেয় ও ঈর্ষা উগ্র ও ভীত হয়। ঐ সময় লোকের অভাব ও দুঃখ কষ্ট এমন সীমানায় থাকে যে কাকর পক্ষেই তা পূরণ করা সম্ভব হয় না। ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জনতা আশা করে প্রচুর কিন্তু আশা পূরণ হবার কোনই উপায় দেখে না। এই দুঃখে কষ্টে অর্জিত ক্ষুদ্র জনতাকে তখন ক্ষমতা লাভে বঞ্চিত আশাব্যস্ত সব দলগুলি উন্মিষে তোলে। আগুনের সঙ্গে বায়ুর যোগ হলে যা হয়, এক্ষেত্রেও কতকটা তা হয়।

আমি দেশে অর-বস্ত্রের অভাব; তেল-নূনের অভাব; নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব। এমন কোন শাসন হতে পারে না, যে আজই এই অভাব দূর করতে পারে। কাম্বোই লোকের মনে অসন্তোষ আছে ভীত;—অসন্তোষকে ভাবে ও কাম্বো জুড়িয়ে তুলবার চুলাহস ও তাদের এসেছে। আশাহত ক্ষমতালোলুপ বিভিন্ন রাজ-নৈতিক দল আছে;—এদের উন্মিষে ঘোলা মলে মাছ ধরবার চেষ্টা বার্য্য করবে। এই যোগাযোগ বন্ধ করতে না পারলে অসন্তোষ প্রবল ও প্রকট হবেই। কিন্তু এই যোগাযোগ বন্ধ করতে হলে ক্রান্তি ও কবিঘাতে যা করেছে, তাই করা দরকার;—অর্থাৎ ক্ষমতালোলুপ আশাহত দলগুলির অনিষ্ট করার পথ রোধ করা দরকার। এখানে গণতন্ত্রের গায় হাত দেওয়ার প্রায় আসে। কবিঘাতে বলসেভিক দলের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার কাকর ছিল না। বলসেভিক দল ভিন্ন অস্ত্র কোন দল আম ও সেখানে রাজনীতির ক্ষেত্রে নামতে পারে না। কাম্বোই বলসেভিক দল লোককে বা শিখাতে চাছ, তার প্রতিফল কথা বলার কোন সুযোগ কাকর সেখানে আম ও নেই। দলের মধ্যে যদি কেউ একটু বেহুয়া কথা বলে, তবে তখনই তাকে বিপ্লব-বিরোধী প্রতিক্রিয়া-শীল (anti-revolutionary and-reactionary) বলে বখাযোগ্য ব্যবস্থা তার করা হয়। আমি ত্রিশ বছরের মধ্যে একটুই বিরোধী কথা বলে কেউ পার পার নি।

আর এখানে আমরা বিরোধী মতকে প্রচুর দিচ্ছি উৎসাহ দিচ্ছি। সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেসের বিরোধী শক্তি হিসাবে আলাদা দল পাড়ো করছে; আর কেন্দ্রীয় সরকারের কংগ্রেসী মন্ত্রী কিংবাচোই সাপেক্ষ তাদের তারিক করে বিরুদ্ধি নিলেন এই বলে যে বিরোধীমত এবার বানা বাগতে পারবে। গণপরিষদের বিরোধী দল নেই বলে কংগ্রেসদল থেকেই নির্দেশ দেওয়া হল যেন নিজেরাই সেই অভাব পূরণ করে। তাই পরিষদের আলোচনার সময় দলীয় সভাদিগকে মত ব্যক্ত করার প্রায় বঞ্চিত ও বঞ্চিত বানানতা দেওয়া হচ্ছে। যদি পরিষদের কংগ্রেসী সভ্যদের ভাষণ কেউ সংগ্রহ করে, তবে দেখা যাবে তাদের পরিষদের উক্তি বিধেই কংগ্রেসকে সাঁঝ করা যায়।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত এমন সরব (vocal) ও পরিষ্কৃত হবার একটা প্রধান কারণ হ'ল—কংগ্রেসের এই গণতান্ত্রিক কর্মনীতি ও গঠন। পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে ক্ষমতা হস্তান্তরের মুখে বা বিপ্লবের সময়, এই নীতি এইভাবে পালিত হয় নি। ৩০ বছর হয়ে গেলে কবিঘার বিপ্লব হয়েছে আজও সেখানে মূহুর্তে কেউ শাসনপদ্ধতি বা শাসনের বিপ্লব সমালোচনা করতে পারে না। অবশ্য পূর্বেই আমরা বলেছি—অবস্থার অনিবার্হ কারণে এমনি বিপ্লব-সময়ে জনসাধারণের মনে অসন্তোষ থাকতে বাধ্য। একটা রাষ্ট্র পরিবর্তন বা বিপ্লব খুব সহজ সামাজিক অবস্থায় হয় না,—যখন রাষ্ট্রে ও সমাজের অভ্যন্তর ভাঙ্গন খুব প্রকট হয়, কেবল তখনই এমনি বিপ্লব সম্ভব। লেনিন বলেছেন—“গোষ্ঠকগণ ও যখন বুঝবে যে পূর্বের ব্যবস্থা আর চলে না, তখনই কেবল বিপ্লব সম্ভব হবে। শোষক ও শোষিত উভয়েই আজ্ঞার করেছে, কেবল এমনি এক দরব্যাপক জাতীয় সংকটেই বিপ্লব হতে পারে।”

এমনি একটা সংকটকালে জনসাধারণের অভাব পূরণ

* “For the revolution it is necessary the exploiters should not be able to rule as of old..... Revolution is impossible without an all-national crisis affecting both the exploited and the exploiters.”

করা আলাদিনের প্রাণীপ নিয়ে এসেও কেউ পারবে কি না সম্ভব। আলাদিনের প্রাণীপ উপকণার হাইরে—
বাহুব জগতে ত পাওয়া যাবে না। বহুমান
জনসাধারণের অসন্তোষ দূর করার চেষ্টা, ওস্তা খোলায়
সেওয়া স্তোমের মতো দুর্ভাগ্য শুকিয়ে যাবে। তার পর,
কমতা হস্তান্তরের পূর্বে বিপ্লবীদের আঘাতে, গভ
শাসনকর্তাদের অযোগ্যতা ও অসন্তোষের ভিত্তি এবং নতুন
শাসনকর্তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাবের সুযোগে—
শাসন-ব্যবস্থার এমনিভাবে বিকল ও বিগড়ে থাকে যে তাকে
সিঁদে হুঁই ও সংস্কারে শাসনকার্য চালনা করাও সম্ভব
হয় না। ১৮৫১ ঐ শাসনব্যবস্থাকে এক সিনেট কাউন্সিলে
ফেলাও হয়ে ন। বিপ্লবের পরও অনেক দিন পর্যন্ত তাকে
বহুসংখ্য করতে হয়। কথ বিপ্লবের পরই সেখানকার
লোক হুঁইতে বর্ণা পার নি;—পেয়েছে লাঞ্ছনা, অত্যাচার,
মহানারী, বহুসংখ্য ও অল্প বহু প্রকারের দুর্ভোগ।
পুঁজোপুঁজি বেড়ে না গেলেও, তাদের কাজ করতে হয়েছে
পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী। আর আর নিশ্চিৎ কালের
চেয়ে একই ব্যতিক্রম হ'লে ১৩ হত চহন। আজ
এখানে কথার কথার বর্নবটের (strike) কথা চলেছে;—
কবিরাতে এমনি কথা বলার পর, সে মুখ হতে দ্বিতীয়
কথা উচ্চারণ করার সুযোগ থাকত না।

কবিরাতে বা অপর কোন দেশের অল্পকরণ আমরা
করতে চাই না;—কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক পথেই
ভারত চলছে ও চলবে। আজও আমরা বিপ্লবের
মারগণে;—আজও রাষ্ট্রকে পড়ে তুলবার মতো সময়
আনারের আগে নি। আজ যদি বিপ্লবকে স্থগিত রেখে
আমরা রাষ্ট্রকে গড়বার দিকেই হুঁকে পড়ি, তবে তা
হবে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। আনারের
বিপ্লবের আদর্শ ও শিক্ষা দিয়েছেন গান্ধীজী। আরই
যদি বিপ্লবকে অর্ধগণে স্থগিত রেখে আমরা রাষ্ট্রকে গড়তে
হাট, তবে সেই শিক্ষা ও আদর্শকে মূলত বর্জন করে তা
আনারের করতে হবে। কারণ আজকার রাষ্ট্র-কর্তাদের
গান্ধীজীর আদর্শ ও শিক্ষাকে হুঁইতে তোলা সম্ভব নয়।

আজ আনারের বিপ্লবের প্রতি এখানে এসে প্রতিষ্ঠিত

হ'য়ে আছে,—ঠিক যেন পথ চলতে চলতে ক্রান্ত পথিক
কোন ছায়া-শীতল স্থানে বিশ্রাম করছে। পথ প্রান্তরের
সেই আশ্রয়ে নিঃশেষ হারী আবার ব'লে মনে করলে
যে ভুল হবে, আজকার এই রাষ্ট্রকে আনারের চরম
কামা ও দমা ব'লে গণ্য করলে তার চেয়েও বড় ভুল
হবে। বিপ্লব বাণে বাণে এগিয়ে যায়; এই এগিয়ে
যাওয়ার মধ্যে একটা করে ছেদ থাকে। করানী বিপ্লব
স্বয়ং হয় ১৮৫১ ঐ: অথবা কটির মত একটা সাধারণ
বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে; কিন্তু তার ধারা চলছে বহু
বছর পর্যন্ত। এমন কথাও বলা যায়—১৮৭০ ঐ: অথবা
ঐ ধারার বিপ্লব ঘটে। তা বাহ মিলেও, অমৃত ১৮৮৮
অথবা পর্যন্ত ত নিশ্চয় করানী বিপ্লবের ধারা প্রবাহিত
হয়েছে। কথ বিপ্লব এখনও সম্পূর্ণ হয়েছে কি না—বলা
যায় না। ১৯১৭ ঐ: অথবা কেরানী মানে বা স্বয়ং
হয়েছিল, তা যে ওখানেই শেষ হয় নি—এ কথা ত সবাই
স্বীকার করবে। নভেম্বরের বিপ্লব কেবল বসন্তেরিকার
হাতে উপর প্রবাহের কমতা এনে দিল; কিন্তু ভদ্রার মিলে
তারের কমতা বিস্তৃত করতে ও বিপ্লবের প্রভাব বিস্তার
করতে অনেক সময় লেগেছে ও অনেক ধাপ পার হ'তে
হয়েছে।

এই যে জন মনে অসন্তোষ আছে, তার মূখ বহু ব'রে
যদি তাকে রাহিয়ে দেই—না কবিরাতে ঠালিন করেছে,
বা বিপ্লবের পর লব মেনেই করে—তা হ'লে বিপ্লবের
হুঁই বিকাশের পথট চলে ক'লা হবে। আজ একথা প্রায়
নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে কথ বিপ্লব পরগান্ধী আনতে
পারেনি। তার একটা প্রধান কারণ হল—জনসাধারণের
গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা। করানী বিপ্লবও যে নানা,
মৈত্রী, স্বাধীনতার স্বাক্ষর প্রকটিত করতে পারে নি—
তারও একটা প্রধান কারণ হল এই যে—অন্যমনের
বাসনা ও স্বাধীনকে সক্রিয় হ'তে না দিয়ে, তার মূখ বহু
ক'রে হস্তা করা হয়েছিল। গান্ধী প্রদর্শিত গণতান্ত্রিক
বিপ্লব অন্যমনের মূখ বহু করবে না; তারের অসন্তোষের
কঠোরতা ক'রে হস্তা করবে না। কিন্তু স্বাধীনকে লোক
বা দল তাকে বিপণে চালিয়ে বিপ্লবের পথকে বিপণে

চালিত করতে না পারে, তা অবশ্যই দেখতে হবে। সাধারণ লোকের গণতান্ত্রিক অধিকারে হাত দেওয়া হয় নি—হবে না। কিন্তু অভিসন্ধিহীন ক্ষমতা-লোভ লোক বা দল জনসাধারণকে বিপথে চালিত করছে; তা বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

জন-মনের ঐ অসন্তোষের বলিতে বিপ্লবের সমাটী পাণ্ডা পতিবে পাশিবে প্রাচ্যের দ্বারাও প্রবাহিত করার প্রয়োগ কংগ্রেস দিচ্ছে ও দিবে। বহু বছরের লংগ্রামের ফলে কর্মীদের মনে বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা এসেছে। ইংরাজ শাসনের চাপ থেকে মুক্ত হয়ে তারা মনে করছে—কোন্ ক্ষতে হল,—এবার বিদ্রোহ ও আত্মা। কিন্তু এই ধারণা খুবই ভুল। যে বিপ্লবের জন্য আমরা এতকাল চেষ্টা করেছি, তার একটা অর্থ আমাদের মনে ত ছিল। সেটা কি? ইংরাজকে দূরিয়ে নেওয়াতেই কি তার চরিতার্থ হবে? হয় নি! তার প্রমাণ দিচ্ছে—ভারতের সাধারণ জনতা। ১৯৪৭ অব্দের অগস্ট মাসের ১৪ ও ১৫ তারিখের মধ্যে ভারত ভীষনে ও ভীষন দ্বারা কোন পার্থক্যই না আশাও তার আর বহুর অভাব, তার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব, তার স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার অভাব—কোন কিছুই দূর করার কোন ভরসাও আমরা দিতে পারছি না। কাজেই বিপ্লব আমাদের পূর্ণ হয়েছে, এ কথা বলার কোনই কারণ বা অধিকার আমাদের নেই। গণপ্রান্তের ছাত্রকে যেন আমরা নিজেদের স্বামী নিবাস বলে ভুল না করি।

এই বিপ্লবকে পূর্ণ করার দায়িত্ব আজ আমাদেরই নিতে হবে। ইংরেজ যে সব অস্ত্র ও যন্ত্র দিয়ে আমাদের পেগন করেছে, আজও তা প্রায় অটুট আছে। সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের কলে ভারত বিভক্ত হয়েছে, প্রবেশ খণ্ডিত হয়েছে—এমন কি ছিলাও ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদবৃত্তি ইংরাজের হাতের একটি অস্ত্র ছিল। সেই অস্ত্র আজও আমাদের দেহ ও মনকে বিধ্ব ও কলিত করছে। স্বার্থ-সর্বস্ব রাষ্ট্রীয়তাবিরোধী অসং আন্দোলন দিয়ে ইংরাজ আমাদের শাসন করেছে; এটা ছিল তার হাতের যন্ত্র। এর মধ্যে মানুষের প্রতি কোন দরদ

নেই, শুধু স্বার্থের কোন স্পর্শ নেই, বেশ ও স্বাতির প্রতি কোন সমতা নেই;—ইংরাজের শেতলচক্ৰ চোখে বহুরের পর বহুর এরা কৃত্রিমক নির্গতিত ও অপ্রমাণিত করেছে। ইংরাজের সেই স্বাধীনতাও তেমনই ভাঙেট আছে।

আজ জনসাধারণের যে দুঃখ দুর্দশা, তার প্রধান কারণ হল—এই দুটি ইংরাজের অস্ত্র ও যন্ত্র। কংগ্রেস কর্মীরা সবাই প্রায় একমত যে ইংরাজের এই আন্দোলন স্বাধীনতাও তাদের পূর্ব মনোভাব নিয়েই চলছে;—কেবল উপরের ভোল বুল করেছে। কিন্তু তাদের অন্তরের দর্প বুল করে নি। আজ বিপ্লবকে গভীরতায় ও ব্যাপকতায় প্রসারিত করার পথে মন বড় বাধা হল এই ইংরাজের স্বতন্ত্র আন্দোলন। স্বাধীনতা: বিপ্লবকে বিপথে চালিত করেছে ইংরাজের স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও বৈষম্যবৃত্তি। আজ মানুষ করছে বিশ্ব-রাষ্ট্রের, আদর্শ গড়ছে Secular stale এর বা অস্বাভাবিক রাষ্ট্রের। এই দুপে একটা ভৌগোলিক সংযোগে বিভক্ত করে, দর্পের চিত্তিতে আলো রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র কথা নিভান্নই বিম্ব বিয়োয়ী। ১৯১৭ মালে লেলিন এমনি বিভাগ যেনে নিয়েছিলেন:—তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হলে কথিয়ার বিম্বিত জাতি নদুকে দতহ রাষ্ট্র গড়বার অধিকার দেন। আজ কংগ্রেসও ঠিক তেমনি অধিবার ভারতের কোন কোন অংশকে দিচ্ছে। কিন্তু এটাই স্বাধীনতার শেষ কথা নয়। কথিয়াতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়বার দাবী আসে কতক দর্পের চিত্তিতে এবং কতক আসে বিশেষ সাম্রাজ্যবাদের উপস্থানিতে। ভারতেও পৃথক্ হবার দাবী আসে এই দুই কারণেই। বাস্তবকে যেনে নিয়ে কংগ্রেস পৃথক্ হবার দাবী স্বীকার করে নিয়েছে।

“কিন্তু কোন এক সময়ে কোন কিছুতে যেনে নেওয়াই, সেই বিষয়ে শেষ কথা নয়। এই বিভাগ যেনে নিয়ে গড় বহুর ১৪ই জুন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাতেও ভারতের ঐক্যের কথা বলা হয়েছে—

“The unity of India must be retained” ভারতের ঐক্যকে বজায় রাখতেই হবে। ঐ প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে—“ভারতের ইতিহাসে, ঐতিহ্য, এর ভূগোল, পাহাড় ও পানির ভারতকে এক অংশও বেশ করে গড়ে

এবং মানুষের কোন কারসাজি তার রূপ বহনতে পারে না। ভাংতেই চরম পরিণতির পথ রোধ করতে পারে না। "The long course of India's history and tradition bears witness to this essential unity. Geography and the mountains and the seas fashioned India as she is and no human agency can change that shape and come in the way of her final destiny."

আজ মনে হচ্ছে ভারতের নেতৃগণ যেন কংগ্রেসের এই সংকল্প ও অতিমত তুলে যাচ্ছেন। বিপ্লবের যিনি দ্রষ্টা ও নায়ক ছিলেন, তিনি আজ নেই। তার পরবর্তী দ্বারা ভারত বহুবাহর বহুরূপে বিপ্লবের পথ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা গিয়েছিল। প্রতিবারই জাতির জনক বিপ্লবের নায়ক তাঁদের তুলে দেখিয়ে ঠিক পথে এনেছেন। আজ সম-পাওয়ার আন্তর্জাতিকের ভূমাকে ও মহৎকে তুলতে চলেছেন কিনা—তা নির্ণয় করার সময় আগছে। আজ কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীকে বিপ্লবের দায়িত্ব নিয়ে গণবিপ্লবের রাস্তা তৈরী করতে হবে। প্রতি কংগ্রেসে, প্রাদেশিক মহীমণ্ডলীর সহিত কংগ্রেসের প্রচণ্ড বিরোধ চলছে। এই বিরোধ যদি আত্মঘাতী কর্মতার মধ্যে পর্যবসিত হয়, তবে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হবে। জনমনের অসন্তোষ—তাকে বিপ্লবী-নীতির পথে কার্ণে ও ভাষায় ছুটিয়ে তুলবার দায়িত্ব আজ সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের উপর পড়ছে।

বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়কে এই ভাবে সফল করতে হবে—যার ফলে গণতন্ত্র কেবল রাষ্ট্রসীমাবদ্ধ না থেকে সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হবে। মীরট কংগ্রেসে প্রস্তাব হয়েছিল—স্বাধীনতার কোন অর্থই জনসাধারণের নিকট থাকতে পারে না, যতদিন পরাজয় সমাজ ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিস্তৃত না হয়। বরাককে এই ভাবে বিস্তৃত করাই হল বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়। বিপ্লবের এই ক্ষুণ্ণের দুইটি পূর্বোক্ত প্রতি-বিপ্লবী (counter-revolutionary) ছুটি বাধা দূর হবে। ইংরাজের আনন্ডতর ও ইংরাজের ছুটি বুদ্ধি-প্রবৃত্তি ভারত বিভাগ আজ বিপ্লবের প্রতিবেশকে রোধ করে রাখছে।

শেত-ঐরাবতের মতো বিপ্লবের প্রাণে তা—একদিন ভেঙে যাবে। বিপ্লবের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে বিপ্লবী সমাজ—যার আদর্শ দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্র ও বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি (decentralised state and decentralised economics) হবে সেই সমাজের ভিত্তি। তা রূপ নেবে গ্রাম-পঞ্চায়েতের—যেখানে সাধারণ মানুষের সামাজিক আধিকার স্বীকৃত হবে।

আজকে আজ রাষ্ট্র ক'রে পড়বে (withering away of the state) এই আদর্শ সেদিন সিয়েছিল। দ্বিতীয় সৈন্য, দ্বিতীয় পুলিশ ও আনন্ডতর নতুন বিপ্লবী সমাজে থাকবে না—এই ছিল সেদিনের আশা। সেই আশা কখন বিপ্লব পূর্ণ ক'রেনি;—সেই প্রায়শ ও আজ সেবার নেই। গান্ধী নতুন পথে আবার সেই আদর্শ নিয়েই ভারতীয় বিপ্লবের পরিচালনা করেছিলেন। গান্ধীর পথ হল গণতান্ত্রিক। সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র পথ হল—গান্ধীর পথ। বিপ্লবের এই দায়িত্ব আজ গ্রহণ করতে হবে—সাধারণ কংগ্রেস নেতাদের। বিপ্লবের দ্বিতীয় পথে নতুনরাষ্ট্র গড়বার স্বপ্নে দ্বারা বিভোর হচ্ছে—আজ দ্বারা কর্মতা-লোপুতায় বিভোর হচ্ছে—তাদের অতীত ঘাই থাক, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্য আশাবিত হবার কারণ দূরত থাকবে না। দূরত বিপ্লবের এই নতুন অধ্যায়ে নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন হবে। জনগণের মনে আজ যে অসন্তোষ আছে, তাকে কামে ছুটিয়ে তুলে এই নতুন বিপ্লব তার পথ রচনা করবে। সাধারণ কংগ্রেসীদের এই নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

তারের পথে বাধা আগবে দ্বিবিধ (১) এই জনমনের অসন্তোষের স্বরোপ নিয়ে কোন কোন হল বিপ্লবকে বিপণে চালিত করতে চেষ্টা করবে—যাতে রাষ্ট্র-কর্মতা তাদের হাতে আসে, (২) আনন্ডতর প্রাণ কর্মতার ঘোরে পুরাতন সন্থী ও নেতারা দূরত অনেক বিপ্লবের নতুন পথের তাঁদের যোগ্য হান ও দায়িত্ব বন্ধা করবেন না। তাতে কর্মীদের বিপ্লব হ'লে চলবে না।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্তী

১৯৪৪ সালে আত্মা হিন্দু কৌশল আণার বর্ধার অবস্থা সঙ্কল পার্জাত পথে অতিথান পরিচালনা করে চিন্মইন নদী পার্শ্ব হয়ে আক্রমণ করেছিল ভারতের সীমান্ত। সেই অগ্রসরমান বাহিনীর একবাহ উত্তরাভিমুখী হয়ে কোহিমাথ পৌঁছেছিল আর এক বাহু মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করে তার রাজধানী 'ইম্ফলে'র ওপর উজ্জীন করেছিল। বাহীন ভারতের বিজয় পতাকা। এ সব কাহিনী এখনও পুরোনো হয়নি লোকের স্মৃতিতে।

অবিস্ত্রি এই সামরিক অঘটন স্থায়ী হ'তে পারেনি অনেক কারণে। বর্ধার সমাপ্তমে পথঘাট সব দুর্গম হয়ে উঠলো অভিব্যাক্তি বাহিনীর পক্ষে। ওমিক শত্রুবাহিনীও কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগল, বতটা স্ট্রি তারা পরাজয় স্বীকার করে নেবে ভাবা গিয়েছিল, তা তারা করলো না। বস্ততঃ পক্ষে মণিপুরে দীর্ঘ অবরোধের মস্ত তারা প্রস্তুত হয়েই ছিল, উপরন্তু ব্রিটিশ পরাভিক, এবং মার্কিন বাহিনী ও বিমান বাহিনীর চাপ প্রতিদিনই বেড়ে উঠতে লাগল ক্রমে ক্রমে, কারণ সে পক্ষের যানবাহন ও রাজ্যঘাটের কোন অংশবিধা ছিল না। পক্ষান্তরে আত্মা হিন্দু বাহিনীর উপস্থিতি হলো সমূহ বিপদ। তাইয়ে ছুরিয়ে গেল রণসজ্জার ও রণম, নতুন সরবরাহের সম্ভাবনাও হয়ে এলো ক্ষীণ। অতিরিক্ত ঝুটিতে রাজ্যঘাট দুর্গম, ভারি যানবাহনের চলাচল প্রায় অসম্ভব। একালের যুগে শৌর্য বীর্য বৃত্তই থাক, অস্ত্র শস্ত্রের যথেষ্ট সম্ভলতা না থাকলে লড়াই জেতা যায় না। তাই বাধ্য হয়ে আত্মা হিন্দু বাহিনীকে পিছু হটতে হলো।

কিন্তু সব থেকে বড় কথা, রণম এবং রণসজ্জারের মস্ত আত্মা হিন্দু দলকে সর্বস্বতোভাবে নির্ভর করতে হয়েছিল আণানীদের ওপর। পরাক্রান্ত মার্কিন নৌ-বাহিনীর সাথে স্মরীর্ষ এবং স্মৃতীর সামুদ্রিক সংগ্রাম চালিয়ে আণানীদের যথেষ্ট শক্তিকর হয়েছিল, শেষের দিকে তারা হয়ে পড়েছিল অনেকটা অবশর ও দুর্বল। রণক্ষেত্রে

সকল প্রায়ে সমান সৃষ্টি দেওয়া আর সম্ভব ছিল না তাদের পক্ষে। তাই শৌর্য বীর্য এবং রণসজ্জারের যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েও আত্মা হিন্দু বাহিনীকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হলো, কারণ আণানীদের শক্তি ভেঙ্গে পড়ছিল ক্রমে ক্রমে। তারা আর সহায়তা করতে পারলো না এই আণানী-কামী বিষম বীরের দলকে।

অবশেষে সেনাপতি বাধ্য হ'লেন পক্ষান্তরদের আদেশ দিতে, ছত্রভঙ্গ না হয়ে বখালস্বয় হস্তখলা রক্ষা করে ক্রমে ক্রমে পেছিয়ে পড়বার নীতিই অগ্রসর করলো আত্মা হিন্দু কৌশল। একমল রওনা হলো টিউবের সরক ধরে আর একমল পেছোতে লাগল টাম্পালেম রোড দিয়ে। চিন্মইন নদী পুনরতিক্রম করে যে পথটা চলে গেছে মাঝামাঝের দিকে, সেইপথ দিয়ে ঘিরে আসছিল পাণাবী আর তাই সৈনিকদের স্মৃতি এতটা বল। চিন্মইনের পার থেকে দুমিনের পথ তারা পেছিয়ে এসেছিল, কর্মক্ষমতা দুমিনলিগ তাদের বেশবাস। পথপ্রমে বংপরনাতি রাস্তা তারা, অর্ধকৃত অংগর দেহে প্রায় দুমিন থেকে মার্জ করে আসছে। হাজার হলেও মাছবের শরীর তো! পা আর চলতে চলে না। সম্ভার সমাগমে মলপতি হস্তম নিলেন একত্রারি বিজ্ঞানের মস্ত।

পলময় পর বাহিনী, তাই অনেক সাম সমরাম পেছনে কেলে রেখে চলে আসতে হয়েছে। মবে নেই ভারি যানবাহনের বস্কাবস্ত, মাল টানে কে। সম্ভার অক্ষকার নেমে আসবার আগেই মস্ত আহোরারি সামান্ত আহোময়ন সমাধা করে সৈনিকেরা সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে শুয়ে পড়লো স্ট্রিগিরি স্ট্রিগিরি। রাত্রিতে আলো আলবার হস্তম নেই। সারাতাত আকাশে টহল দেয় মার্কিন বিমান। জী জানি, আলো আললে যদি মিলানা টের পার! রণসজ্জা সৈনিকের বৈশির্ষ ভোগেই ভাগ্যে জুটেছিল দুমিনম্যা আর তকতল। ওয়ের মধ্যে দাসের ভাগ্য একটু ভাল, তাইয়ে জুটেছিল পথপার্শ্ব পরিত্যক্ত পলাতক স্মবের দু'একখানা পূর্ণ স্ট্রি।

প্রভাতে 'উঠেই আবার দলপতির হুকুম হলো—
মার্চ অন্ (বায়া শুক কর) —লট বহর সামান্‌ই।
কি-প্রভাতে সাত প্রহর হতে লাগল সৈরদল। বায়া শুক
কংবার সময় আসল। টিক এমনই সময়ে তিনজন সৈনিক
যুরে পাড়ালো, তাদের ইচ্ছে তারা আর না পালিয়ে, যুরে
পাড়িয়ে শত্রুর সম্মুখীন হবে। কতদ খা, গলাগীন আর
ভগংখাম এই তিন জন। অকৃত বেখাল বটে!
বিস্মিত হ'য়ে দলপতি তেঁকে পাঠালেন ঐ তিনজনকে
তার সামনে। তিন বীরপুরুষের অভিজ্ঞতা শুনে হেসে
ফেরেন দলপতি, কৌতুকাবিত হ'য়ে তিনি বলেন—
একবার ভাল করে তেঁবে দেখো তোমরা। উৎকৃষ্ট এবং
ঘোর পরাক্রান্ত ষ্টিপ-মার্কিং বাহিনী আমাদের পলাতকরণ
করতে করতে আসছে, সেই বিপুল বস্তার দূরে তোমরা
এট কুহ তিনটি প্রাণী পাড়িয়ে কী করবে! এ যে সাধ
করে আত্মহত্যারই শাসিল।

সবিনয়ে জানালো ওরা তিন বন্ধু—আর কিছু না
পারি প্রাণ তো দিতে পারবো হজুর!—বীরের ধর্মে
বাধা দেওয়া সেনাপতির কর্তব্য নয়, তাই তিনি আর
পীড়াপীড়ি করলেন না। প্রাণের বিনিময়ে দ্বারা পৌরষ
অর্জন করতে কৃতসঙ্কল্প বাধা দিয়েই বা লাভ কী তাদের!
ওদের মধ্যে কতদ খাও পদ একটু উচু, সে হাবিলদার।
দলপতির সামনে এক কদম এগিয়ে এসে বৃট্ট ছুতোয়
গোড়ালি ঠুঁকে সাহসিক সেলাম দিয়ে ফলে,—আর একটা
নিবেদন আছে হজুর!

—কী!

—আমাদের এই ব্রাইকেলুগো ফেরৎ নিয়ে তার
বদলে পিত্তল দিতে হবে হজুর, এতোবড় হাড়িয়ার
লুকিয়ে নিয়ে চলা করা সূক্ষ্ম।

দলপতি কী বেন ভাবলেন একটুখানি, তারপরে
বলেন,—আজ্ঞা তাই হবে।

বেলা ষষ্ঠবার আগেই বার্চ ক'রে চলে গেল দলপতি
পলাতকরণ বাহিনী। পিছে পড়ে থাকলো ওরা তিন
বন্ধু। কতদ, গলাগীন আর ভগংখাম। শত্রু বস্ত
ভরতরই হোক, তার সম্মুখীন হবার দ্রুত ওরা কৃত-সঙ্কল্প।

ওদের ব্রাইকেল তিনটে সবকারী মালখানায় জ্বা করে
দিয়ে তার বদলে ওরা নিয়েছিল তিনটি দশঘরা পিত্তল,
দুই বাতিল ক'রে গুলি, এক বাতিল তিনেবাইটের
কার্তুজ, কয়েকটা ত্রিটোনেটার আর কয়েক গুঁড় ফিউজ।
বাওয়ার ভয়ে নিয়েছিল খানকবেক বড় বড় ছাট, এ
ছাড়াও সঙ্গে ছিল কিছু টাকা ক্রি।

চিন্মুইনের গার এখন প্রায় হু'মিনের পথ পিছে পড়ে
গেছে। ওরা স্থির করলো আবার ফিরে যাবে এই
পথটুকু এবং সেইখানেই তারা থামবে না। চিন্মুইন গার
হবে পরপারে যেতে হবে তাদের, কারণ সেইখানেই
আছে শত্রুর প্রধান সৈন্যসমাবেল; সর্বাংশকা সুরক্ষিত
বাটি। বীরবীর যদি কিছু পরিচয় দিতে হয় তবে
ওরা তিনজন তা বেবে সেই প্রধান ঠাড়িতে পৌঁছে,
এই হলো ওদের মনের লক্ষ্য। ওরা জানে মার দুটো
পথ খোলা আছে ওদের সামনে, হয় দূত্‌, না হয় লুন্‌ল।
বন্দী-দশা ওরা চায় না। বীরের মৃত্যুই বরণ করতে চায়,
সেই মৃত্যুই যুরে পাড়িয়েছে পলাতকরণ বাহিনীর মধ্য
থেকে। ওরা এখন ঘরীয়া, বিপদ বড়ই থাক, ওদের
স্থিরসঙ্কল্প, ওরা বাবেই শত্রুপুত্রীর ক্ষেত্রস্থলে এবং
সেইখানেই সেবে নিজেদের, রণচাতুর্যের পরিচয়।
তারপর যদি দূত্‌ আসে ক্ষতি নাই, কিন্তু এইটুকু সময়
বেঁচে থাকতে হবে যে করেই হোক।

বর্ষা পিছলি বন্ধুর দুর্গম বনপথ। ওরা তিন বন্ধু
ফিরে চর সেই পথ ধরে, চিন্মুইনের তীর ওদের লক্ষ্য।
বিপদলঙ্ঘন গমন অরণ্যের মধ্যে নির্জন পার্কত্যপথ।
পথিক বড় একটা চলে না এরাখায়; লড়াইএর হিড়িকেরই
মাত্র সৈন্যচলাচল বেড়ে উঠেছে। অস্ত্র সময়ে কার্তুজে
আর দুঃসাহসী শিকারী তির আসে না কেউ এখানে।
পথের পাশে আলম নেই। বিজ্ঞানের স্থান নেই। কথ্যচিত্র
চোখে পড়ে বস্ত পার্কত্য জাতির বাস। দুর্গোপা
তাদের ভাষা, দুর্জের তাদের আচরণ, সমাচার এবং
জাতিবৈরতা আশা করা বায় না তাদের কাছে। এই
ভরাবহ পথ ধরে ওরা তিনজন চলে এগিয়ে।

প্রথমদিন এক সাপেই পথ চর তিনজন এবং নির্মিয়েই

কেটেছিল দ্বারাপথ। অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য ঘটনিত্তেমন
 ষষ্ঠি, পঞ্চম আর আহারের কষ্ট ছাড়া। তৃতীয় দিন
 ওরা পথ চলতে লাগলো ছাড়াছাড়ি ভাবে, আগুপিছু
 হয়ে। যদিও পরিধানে ওদের ছিল পাগাড়ী দরবেশের
 ছদ্মবেশ, তবুও তিনজনে একসাথে হয়ে পথ না চলাই
 শ্রেয় মনে করলো। ক্রমেই ওরা শত্রুসেনার লক্ষ্যবিন্দু হয়ে
 আসছে; হঠাৎ যদি তাদের কারণে মাঝে দেখা হয়ে
 যায়, আর তারা যদি সন্দেহ করে ‘স্পাই’ বলে তা হ’লে
 নিত্যর নেই, তৎক্ষণাৎ গুলি ক’রে হত্যা করবে। তাই
 অতি সাবধানে চতুর্দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে
 ছাড়াছাড়ি ভাবে সতর্কপূর্ণে এগোতে লাগলো। হঠাৎ
 যদি কোন লক্ষ্য পোনে, অথবা সন্দেহ হয় কিছু অমনি
 সড়ক ছেড়ে নেমে পড়ে বন্যবনের মধ্যে। শূন্যের থেকে
 প্রতীক্ষা করে কিছুক্ষণ তারপর আবার উঠে আসে পথের
 ওপর। এমনি ক’রে চলতে চলতে বিকলের দিকে ওরা
 পৌছালো চিনুইনের তীরে।

নদীর অবস্থা দেখেই তো চমুহির, পায় হবে কী
 করে! কানায় কানায় ভরা সে নদী। যত তুরঙ্গের
 হাত দুর্বার দুর্ভব বেগে মলমলোত্তর গর্জ্জে গর্জ্জে ফুলে ফুলে
 চলেছে। এতোটা উদ্যম অবস্থা আশা করতে পারেনি
 তারা। হয়তো নশ্ত্রিতি উত্তরে পাহাড়ের ওপর প্রবল
 বর্ষা হয়ে গেছে, তাই তুমুল মলোচ্ছ্বাস ফুলে ফুলে নামছে
 নদীপথ ধরে। ওদিকে শত্রুও অলস হয়ে বসে নেই।
 দূর থেকে লক্ষ্য করলো, তারা পটু নরীহ পেষ্টে কেলোছে
 নদীর ওপর দিয়ে এবং ইতিমধ্যেই পায় করে এনেছে
 অল্প সংখ্যক কিছু সৈন্য, কয়েকটা হাভা ট্যাঙ্ক, আর
 বোটের টাঁক। হয়তো দুই একদিনের মধ্যেই তারা
 এপারে-এলে সমলবলে ঘাঁটি আগলে বসতে আরম্ভ
 করবে।

কতম র্থা একবার হতাশ এবং ককণ ভাবে চাইল
 দূরে শত্রু নিশ্চিত পটু নরীহের পানে; আর একবার
 উন্নত মলমলোত্তরের দিকে। পায় হওয়ার কোন ঘন্টি
 হঠাৎ তার মাথায় এলো না। শত্রুনিশ্চিত এবং স্বাক্ষিত
 পটু নরীহের ওপর দিয়ে পায় হওয়ার সাহস করা আর

দুঃ। বরণ করা এক কথাই। হতাশভাবে কৃত্তম ভিজেন
 করে তার বঁকুদের—এখন উপায়!

প্রকৃত্তরে তারা তেমন হতাশ ককণ ভাবে, চেয়ে
 থাকে কৃত্তমের মূগের দিকে, অর্থাৎ উপায় তো কিছু
 বেশছিল। অনিশ্চিত উদ্বেগে কৃত্তম বলে,—আচ্ছা চল
 খানিকটা উত্তরের দিকে এগিয়ে দেখি! যদি কোন দীঘর
 পরীটলী পাই, হয়তো জ্বিগে হয়ে বেতে পারে।

অগত্যা তাই করলো তারা। নদীর কিনারে মলমল-
 পা ঢাকা দিয়ে সড়ক একটা তঁড়ি পথ ধরে এগোতে লাগল।
 ওদিকে দক্ষা আগত গ্রাহ, হিংস্র শাপরসমূল বনের মধ্যে
 অমন ভাবে ঘুরে বেড়ানো কিছুতেই নিরাপদ নয়। তা
 ছাড়া বাত্রির অন্ধকারে কোথায় যে পাবে আশ্রয়, কোথায়
 পাবে আহার; নাই তার কোন ঠিকানা। যা হোক তারা
 ওদের ভাল, দুই-আড়াই মাইলের মধ্যেই ওরা পেয়ে
 গেল এক দীঘরের দাক্ষাৎ। দিনের কাক শেষ ক’রে
 যে ক্ষার কাঠের ডেলীখানা ঘাটে বেঁধে গুহে ফিরে
 আসছিল।

তিনজনে গিয়ে ধরলো তাকে। অনেক অতুন্ন-বিনয়
 করলো পায় করে হেওয়ার ভগ্নে। কিন্তু কিছুতেই সে
 রাজি হলো না, আসার বাত্রির প্রাণ্ডালে ভরকর আবর্জসমূল
 নদী পার করে দিতে,—তিনজনকে। দে তথ পাক্সিল,
 অন্ধকারে ঠিকমত চাহার ক’রে চালাতে না পারলে ডেলী-
 খানাই তার বান্ধাল হয়ে যাবে। বহু সাধাসাধনায় কোন
 ফল হলো না, এমন কি টাকা পয়সার প্রলোভনেও
 টললো না দীঘর। তখন অকস্মাৎ ওদিকেরা পিশুল তিনটে
 তিন বন্ধু তুলে ধরলো তার বঁকের ওপর, দীঘর বুঝলো
 শত্রু পালার পড়েছে সে। নিরীহ পথিক এরা নয়,
 দরবেশের ছদ্মবেশে তিন দস্যু। দ্বাই হোক, উন্নত
 দৃষ্টান্তের সাধনে সে হার মানলো। রাজি হলো পায়
 করে দিতে। দীঘরীহের নেমে এসে ওদেরকে তুলে নিয়ে
 বীধন ঘূলে ভাসিয়ে বিল ডেলী।

নিবিগে পৌছেছিল তারা পরপারে, বাত্রির অন্ধকারে
 নিবিড় বনের মধ্যে অন্তঃস্থ হয়ে গেল তিনজন চতুর্বেশী
 পথিক। তেলী নিয়ে ফিরে এলো দীঘর। অবিতি ফিরে

আসবাব আগে দু'হাত ভরে বণিশি, পেয়েছিল ঐ ছদ্মবেশী
সহায়ের কাছ থেকে।

সূতা স্থানচিত্ত কেনেই তিন বন্ধু প্রবেশ করেহে
শত্রু পুরীর মধ্যে: মিথ্যা মোহ নেই তাগের মনে, ওরা
চাও বরবার আগে শত্রুর একটা বড়রকম কিছু ক্ষতি করে
মরতে, এবং সেই উদ্দেশ্যে নিয়েই চুপি চুপি প্রবেশ করলো
শত্রু এলাকার; সেই উদ্দেশ্যেই সঙ্গে এনেছে তিনমাইট,
তিটোনেটার আর কিউজ। সতর্ক এবং সজাগ দুই উদ্ভুক্ত
রেখে প্রতীকা করতে লাগল উপযুক্ত ব্যবহারের। কাছটা
খুব সহজ নয়, ঘরের তথ্যভাঙ্গা এবং নির্ভুল কাঙ্ক্ষমের
প্রয়োজন আছে। ওদের অতিপ্রায়, এমন একটা ক্ষতি
করবে শত্রুর যা অসম্ভব: কিছুদিনের মত যেন তাদের মনে
ধাকে, তিনজনে নিলে পরামর্শ করে স্থির করলো, কোন
একটা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু চুপি চুপি রাত্রির অন্ধকারে তিনমাইট
যোগে উড়িয়ে দেবে, যাতে করে শত্রু সাধারণ ভাবে শব্দ
এবং হস্তচর্চ হয়ে পড়ে। কোন একটা গ্রীষ্ম, পাণ্ডার
টেনন, পাল্পিং টেনন, কারখানা, গুলিবারের গুদাম
অথবা ঐ জাতীয় অন্য কিছু বার সাহায্যে ব্যতিরেকে
সম্ভব নয় শত্রুর পক্ষে অগ্রসর হওয়া।

ওদের প্রায়শ্চিন্ত খুব সোজা হয়ে উঠলও সহজ নয় তাকে
কার্যে পরিণত করা। শত্রু দুর্ভাগ্য, সে জানে কোথায়
কোথায় তার বিপদের আশঙ্কা আছে এবং সেই সমস্ত
জায়গায় উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে কোন ঋতি
করেনি, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খাঁটিতে সমস্ত গ্রহণী সদা আগ্রহ।
কোন রকম কিছু সন্ধ্যের উল্লেখ হ'লে তৎক্ষণাত তাদের
গুলি চালানার হুকুম আছে। কাজেই কখন খাঁ, গবাদীন
আর তপুগ্রামের ভবিষ্যত যে ভয়ঙ্কর বিপদ-সঙ্কল তাতে
আর সন্দেহ কী! কিন্তু বিপদ মেখে পিছু হঠবে না, এই
সম্ভট নিয়েই ওরা ক্রিয়ার পিড়িয়েছে।

একটা-স্থিতি ছিল এই, যে এখানকার পার্শ্বতা
অজ্ঞানের ভাঁড়ি পথগুলো অনেকটা তাদের জানা। কারণ
আজ্ঞা-হিন্দু বাহিনী যখন ইঞ্চল অবরোধ করেছিল, এই
সব বনে জঙ্গলের পথে অনেকবার তাদের চলাফেরা
করতে হয়েছে। যে রাত্রিতে ওরা যীবনের তেলা

চিনুইনের পরপারে গিয়ে পৌঁছল, সেই রাত্রি থেকেই
গোপন পার্শ্বতা পথ বেয়ে বেয়ে শুরু করে দিল তৎক্ষণাত,
তরাসীর কাজ। অচেনা জায়গা বলে পড়ে থাকতে
হয়নি পেছনে। নৈশ অন্ধকারে পরপারের তটস্থিতিতে
অবতরণ করেই ওরা কান পেতে শুনলো, বহুদূর থেকে
একটা একটানা ধড়, ধড় শব্দ চলছে। কিছুক্ষণ শুনেই
ব্রহ্মতে পারলো তারা, বড় ভাড়া লামনেই এবং তার ওপর
সিঁরে শত্রুগণের 'কনভার্স' অধিরাণ হুসন এবং বণগম্বার
বচন করে চলছে। হয়তো তারা বাজে সেই পট্টন
ত্রীজের পারবাটার দিকে, শত্রুর অগ্রযাত্রা আগল প্রার্থী।

তৎক্ষণাত নিজেদের গতি পরিবর্তন করলো তিনজন।
ব্রহ্মতে পেয়েছিল একটা ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কল জায়গার
কাছাকাছি এসে পড়েছে। পথ পরিবর্তন করে চুকে
পড়লো আরও নির্ভিড অরণ্যের মধ্যে। শত্রুর সাথে,
কাঁধা সিঁড়ি না হওয়া পর্যন্ত, চাক্ষুশ সাক্ষ্যকার এড়িয়ে
চলা একান্ত প্রয়োজন। প্রায় তিনদিন তারা অরণ্যে
অরণ্যে গা ঢাকা দিয়ে, ছদ্মবেশে ভাব্যভাঙ্গা করে চোঁটা
করলো শত্রু বাহুর সম্ভ্রমভাণের গুরুত্বপূর্ণ খাঁটিগুলো
আবিষ্কার করতে। কিন্তু ব্যর্থ হলো সে চোঁটা। শত্রু
ভয়ানক সতর্ক, কোথাও ঠাঁক রাখেনি। গুপ্তচরের প্রবেশ
সেখানে অসম্ভব। এসিকে অনিত্রা, অনাহার, পথপ্রশ্ন
এবং জানের অভাবে তিনবন্ধু ভ্রান্ত ভ্রান্ত। মনেও মেয়েছে
অবশ্য এবং নৈরাস্ত, বতর্দিন আশা এবং উৎসাহ নিয়ে
তারা প্রথমে বেরিয়েছিল তা যেন ক্রমেই নিতে আসতে
লাগল অবিপ্রান্ত পরিপ্রশ্ন এবং তচ্ছন্দ্য তার নিশেষণে।
ভয়োভয় এবং স্ফূর্ত হারে একদিন রাত্রিকালে এক
গাছতলায় বসে তিন বন্ধুতে বিশ্রাম করছিল। এমন
সময়ে তপুগ্রাম বসে,—লামনের দিকে হুবিধে হবে না,
শত্রু খুব হসিয়ার। চল শত্রু বাহুর পতাকাভাণে গিয়ে
অবহাটা বুকে আসি।

কথাটা মনে ধরেছিল সকলের, পরদিন সকালে উঠে
ওরা সেই উদ্দেশ্যেই যাত্রা করলো। ছোট খাট একটা
পাহাড় ঘুরে শত্রু বাহুর প্রায় সাড়ে সাত মাইল পেছনে
ওরা উপস্থিত হলো একটা জায়গায় এবং সেখানে পেলো

তারা তাদের অতীত লক্ষ্যবস্ত। শত্রুগণের গুলিবারনের
প্রধান ভিণো। তিনঘনের মুখেই হুটে উঠলো আশা
এবং আশ্বিনের হাসি।

হঠাৎ খুব বেশি আশাবিত হবার কারণ তখনও
তখনও ঘটেনি, কারণ লক্ষ্যতা অর্জন করার পক্ষে তখনও
অনেক বাধা ছিল। লক্ষ্য প্রহরী মোতামেদে আছে
শিবিরের প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে।

জায়গাটাকে পাহাড়ের ওপর থেকে খুব ভাল করে
লক্ষ্য করলো ওরা। পাশাপাশি দুইসার পাকা ঘর; ঘর
তলোতে বোকাই আছে গুলিবারকের গুপ। মাঝখান
থিয়ে চওড়া রাস্তা। ঘন ঘন সেখানে এসে পৌছোচ্ছে
ভারি ভারি মোটর ট্রাক, দশদশ তাতে বোকাই হচ্ছে
গুলিবারক, হু হু করে সেগুলো ছুটে যাচ্ছে ক্রটিয়ারের
দিকে। দেখলে মনে হয়, জায়গাটা আগে ছিল একটা
হাসপাতাল, লড়াইএর তাকাতাকিতে হাসপাতাল তুলে
থিয়ে ওকে বোমাবারকের গুদামখানায় পরিণত করা
হয়েছে।

কতখান মনে মনে হিসেব করে দেখলো, যদি কোন-
ক্রমে ডিনেমাট চার্জ করে কোন একটা বিস্ফোরকের
তুপে আগুন ধরানো যায় তবে নির্দিষ্ট সময় শিবির
শুধুই আকাশে উড়ে যাবে। মাগাজিন ঘরগুলো যেমন
কাছাকাছি তাতে একটাতে আগুন ধরতে পারলে সব
কটাই যে কাটবে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু
এ কল্পনা এখনও আকাশ কুহুমের মত। যেতান ইংরেজ
প্রহরীরা উৎসাহী হয়ে পাহারা দিচ্ছে। তাদের দৃষ্টি
এড়িয়ে শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করা খুব সহজ কাজ হবে
না। দিনের বেলাতে তো অসম্ভব এমন কি রাত্রি
বেলাতেও দাকলোর আশা সীল। তবু তারা রাত্রির
ক্রীতীকায় করতে লাগল। একটা আশার কথা,
শিবিরটা শুক হয়েছে একেবারে পাহাড়ের গা ঘেঁষেই।
সোঁকের দৃষ্টি এড়িয়ে অবলম্বের আড়ালে আড়ালে পুরুত-
গাজ বেয়ে, ভিণোর সীমানার একেবারে কাছাকাছি
গিয়ে পৌছতে অনুবিধা হবে না, ভাবনা হচ্ছে তার
পরের ধাপে। তবে অন্ধকারের সুবোপে যদি কোন

ক্রমে একবার ঘেঁষে ঢুক পড়তে পারে তেতরে তবে শেষ
পর্বে চেষ্টা করবে নিশ্চয়।

পূর্ণ কল্পিত ম্যান অনুযায়ী সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে
পাহাড়ের গা বেয়ে বেড়ালের মত চুপি চুপি ওরা নেমে
এসে ওং পেতে বসে থাকলো শিবিরের সীমানার ঠিক
উপকণ্ঠেই, শিবিরগুলো সব বুকের কাছে এমন জায়গায়
রাখলো যাতে প্রয়োজন হলে সহজেই টেনে নিয়ে গুলি
চালতে পারে, সন্ধ্যার অন্ধকার নামলো ঘীরে ঘীরে।
বেশে ওরা একাধারে বিস্তৃত ও উন্নত হয়ে উঠলো,
শিবিরের মধ্যে কোন আলো জ্বলেনি, পরিপূর্ণ নিশ্চল
এবং অন্ধকার। শুধু বড় কটকের কাছে একটা টুপি
লাগানো আলো জ্বলছে। শত্রু-বিনামের দৃষ্টি এগাবার
অন্তই বোধহয় এই ব্যবস্থা।

রাত্রি যখন একটু গভীর হলো, ওদের অজ্ঞাতবাস
পরিভ্রমণ করে বেড়িয়ে এলো ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে
অন্ধকারে পথ হাংড়ে হাংড়ে ঢুকলো শিবিরের মধ্যে
নিঃশব্দ সন্ন্যাসের মত। প্রহরীদের বিচরণের পদশব্দ
ইতস্ততঃ শোনা যাচ্ছে। সে সব অগ্রাহ করে জন্মির
ওপর দিয়ে হুইয়ে হুইয়ে ওরা এগিয়ে চল, অন্ধকারে
হাংড়ে হাংড়ে ওরা দু'জনে পেলো একটা মাগাজিন
ঘরের ভিত্তি, তার নিচে ছুরি দিয়ে গর্ত করলো খানিকটা,
বেশ শক্ত করে পুরে দিল ডিনেমাটের কার্তুজ, তার
পিঠে ঠেলে দিল ডিটোনেটর, তার সঙ্গে বেঁধে দিল
ফিউজের লম্বা তার।

এইবার আগুন ধরাবার পালা। ওরা পড়বার ভয়
এখনই সব থেকে বেশি। ভয় শুধুই থাক থেমে যাওয়ার
পাত্র ওয়া নয়। তৎপরতার তার পকেট থেকে বেশলাই
বেহ করে সতর্কপন্থে আলালো একটা কাটি, কিন্তু চূড়ান্তের
কালে বাতালার দমকে নিতে গেল তা। সঙ্গে সঙ্গে
চোঁচিয়ে উঠলো একজন শিবিররক্ষী প্রহরী—who's
there (এখানে কে)—পার্জা'মিল না কেউ। সেই
প্রহরী যার তিনেক চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে গেই একই প্রহ
করলো কিন্তু অবশ্য পেলো না কিছু। তখন সে নির্দোষিত
বেশলাইএর আলো লক্ষ্য করে অন্ধকারের মধ্যেই গুলি

ছুড়লো। স্বয়ং অর্জুনও বোধহয় অত ভাল লক্ষ্য ভেদ করতে পারতেন না। গুনি এসে লাগলো ফিউজের তারে, অমনি লগ্ন ক'রে জলে উঠলো আগুন। সেই আগুনের কিলিকে বেধা গেল, একটু তত্বাতে পাশাপাশি ঠাণ্ডির আছে নিবিড় অন্ধকারের পাখে তিন ছায়াছায়া মত, তিন বন্ধু—কপ্তন, গয়াসীন আর ভগৎরায়। সমস্তের তারা ঠেঁতিয়ে উঠলো “জয়হিন্দ”। কাক তারের হাসিল হয়েছে; আগুন ধরে গেছে ভিনেমাইটের ফিউজে।

সেই জ্বলন্ত আর বাতাসে বিনীন হবার সময়

গেলো না। প্রচণ্ড গর্জনে সময় বনশরীর প্রকলিত করে কেটে পড়লো ভিনেমাইট। আগুন ধরলো গুলি-বাক্সের তুঙ্গে, তারপর যা কাণ্ড হলো তা বর্ণনাভীতি। মুহূর্তে বিপুল বিস্ফোরনে বাতাসের নিকমিগর কেঁপে কেঁপে উঠলো। জ্বলিগাং হ'য়ে গেল সময় শিবির। আকাশের গায়ে লেলিহান বহ্নিশিখা লক্ষ লক্ষ ক'রে কাপতে লাগল, বাউ বাউ ক'রে জলতে লাগলো বিলম্ব ঘরবাড়িগুলো। সেই রাত্রির সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরকের মুখে নিভিহ হ'য়ে গেল তিন বন্ধু, কপ্তন খা, গয়াসীন আর ভগৎরায়।

বাপুজী

ঐতিহ্যবাহীন ভাষা

বাপুজী যে আমাদের! তাঁকে আমরা ভুলবো না একথা যে জানাতে চাই বড়া করে—বারে বারে।
তাই গড়বো তাঁর মূর্তি, পাহাড় কেটে-উন্নতানী ফিট উঁচু
বোম্বন দূর থেকে বা চোপে পড়'বে,
সবাই দূর থেকে নীচু করবে বাধা।
নগরের প্রধান রাস্তাঘাটের নামকরণ করবে। তাঁর নামে,
লক্ষ লক্ষ পথচারী নিত্য তাঁর নাম উচ্চারণ কর'বে।
গড়বো স্মৃতিস্মারক, উন্নতানী লক্ষ টাকা ব্যয়ে
এ্যানিই পাথরের তার মেঝে, লাসা মার্বেলের মেঝে
মাথায় তার জলবে সোনার প্রসীপে অনির্লীণ আলো।
আসবে সে হিন্দের ভীর্ণবাত্রী, পৃথিবীর হৃদয় প্রান্ত হ'তে
তারা দেখবে বাপুজীকে আমরা ভুলিনি।
তাঁকে ভালোবাসি, তাই হাজার লোক তেকে লজা করবে
বন্ধুরের পর বছর—গাইবো সহস্রকণ্ঠ
বাপুজীর প্রিয় ভজন রানধুন গান বিস্তৃত তান, লগ্ন, হুরে।
গড়বো তাঁর নামে কলকারখানা, বিদ্যালয়, আলম
নগর, উপনিবেশ। তাঁর স্মৃতিকে ছড়িয়ে দেব
বেশের কোণে কোণে—সর্বত্র।

সত্যি কি বাপুজী আমাদের? সত্যি তাঁকে ভালবাসি?
সে প্রশ্ন কি মিতে হবে এমন উজ্জ্বলের যোগ্য করে?
সে প্রশ্ন মিতে হবে তুচ্ছ ইট আর পাথরে?
তাঁর জীবন দিয়ে এ বাপুজী কি দিয়ে গেলেন আমাদের?
নাহবকে কি সত্যিই বেলেছি ভাল? নাহবকে কি
করেছি বিশ্বাস?

‘ঈশ্বর আত্মা তেরে নাম’—একথা কি গ্রহণ করেছি
অন্তরে?

যারা বঞ্চিত, যারা হতভাগা, যারা নিপীড়িত
তাদের একজন হয়ে, কুকের রক্ত দিয়ে তাদের রক্ষা

করার
পণ কি নিয়েছি? অত্যাচারীর কাছে নোয়াইনি দির?
জটি হয়েছি, সত্য হয়েছি—বাক্যে, আচরণে, চিন্তায়?
হয়েছি কি বিনয়, আন্তরিক, সত্যপ্রিয়, নির্ভীক?
পড়েছে কি বাপুজীর জীবনের ছায়া আমাদের জীবনে?
আত্মবকনা নয়—নয় মিথ্যাপ্রচার, নয় সহস্র স্বত্বতত্ত্ব।
বাপুজীকে সত্য্য করি যেন আপন জীবনে
সকল করি তার অপূর্ণ স্বপ্নকে
তবেই পার্থক্য তাঁর স্মৃতি পুষা।

অনাগত

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

(চিহ্ন)

অনেকদিন কিছু লিখি নাই। আম্ম লিখিব, একটা কাঠামো ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি। কলমে কালি ভরিয়া বাধানো খাতাটা টানিয়া লইয়া বলিলাম—সম্মুখে একটা ছায়া আদিয়া ঝাড়াইল। বাধা পাইয়া বিরক্ত হইলাম, মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কে?

ছায়া উত্তর করিল, আমি বিজ্ঞান।

একটু বিস্মিত হইয়াই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে কি চাই?

আরও একটু আগাইয়া আদিয়া ছায়া বলিল, তোমাকে আখার গুণগান ক'রতে হবে সাহিত্যিক। তোমার প্রেমের গল্প রাখ; জগতের নামনে আমার যথিয়া প্রচার কর।

কলম বাখিয়া গোলা হইয়া বলিলাম, কি তোমার সহিয়া বিজ্ঞান!

বিজ্ঞান একটু বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিল, তবে কোন—

• • •

পাশাপাশি দুইটা রাজ্য—জানপুর আর বিজ্ঞানপুর। অন্ধকারের বেশ। উহারই মধ্যে নিম্নেদের মানাইয়া লইয়া প্রভাতী জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। পরস্পরের বিবাহ নিষেধাই মিটাইয়া লয়। রক্তপাত হয় না এখন নহে, কিন্তু রক্ত দেখিবার ইচ্ছাতেই শুণু তাহার হিংস্র হইয়া ওঠে না। একরকম সুখেই বাস করে সকলে।

একদিন কোথা হইতে এক ব্যক্তি জানপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একেবারে রাজ্যের সম্মুখে আদিয়া অভিবাসন করিয়া ঝাড়াইল। রাজ্য বিস্মিত হাসিয়া আনিতে চাহিলেন, কিসের প্রার্থী তুমি পথিক?

গমিত কণ্ঠে উত্তর দিল আগন্তুক, আমি নিতে আসিনি মহারাজ, দিতে এসেছি।

বিস্মিত রাজ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আছে তোমার?

লোকটা বৃহৎ হাসিয়া বুক টান করিয়া বলিল, আমার মধ্যে লুক্কিত আছে বিজ্ঞানের কল, তার বিনিময়ে দেবার কোন মূল্যই নেই কোন রাজ্যের। একটু খামিয়া সে পুনরায় বলিল, সম্মুখে আগনার অন্ধকার রাজ্য আসোয় উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে পারি আমি, বঁটার উজ্জ্বল নিয়ে যেতে পারি, পাচশো মাইল—আগনাকে দিতে পারি বিশ্ব-রাজ্য।

সম্মুখের দিকে ছুঁকিয়া পড়িয়া রাজ্য বলিলেন, ওর কোন কিছুতেই আমার প্রয়োজন নেই পথিক। আলো জালিয়ে ক'রবে কি যদি মাস্তবের আত্মা ভুবে যায় অন্ধকারে—বঁটার পাচশো মাইল ছুটে গিয়ে হবে কি যদি তার মন মরে যায় অন্ধ বসন্তে? আর বিশ্ব-রাজ্য। রাজ্য বৃহৎ হাসিলেন, সিংহাসনে বীরে বীরে হেলান দিয়ে উদার হাতে বলিলেন, প্রকৃতিটা মচকট ত' বিশ্বের রাজ্য।—

আগন্তুকের চোখে বিশ্ব ঘনাইয়া আসিল, সে কাঁধ কাঁকাইয়া বলিল, প্রকৃতিকে ধল ককন মহারাজ, নইলে অশান্তিতে ভুবে যাবে দেশ।

রাজ্য স্তম্ভন ভাবেই শুইয়া শান্ত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, বিভালি ক'রেছি প্রকৃতির সঙ্গে। সে ছুঁহাতে বিলিয়ে নিচ্ছে নিজেকে, সেহ খুসীই আছে—মন ভ'রে উঠেছে।

আগন্তুক শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, আমি রাজ্য অঘের হুমোণ ক'রে দেব—সামান্য ইচ্ছায় আমি সম্মুখে এই এতবড় রাজ্যটা ধ্বংস ক'রে ফেলতে পারি।

রাজ্য চমকিয়া উঠিয়া ঝাড়াইলেন, সম্মুখের অস্ত্র ভাঁহার সমস্ত বেধ ঘেন একেবারে রক্তশূন্য বলিয়া মনে হইল। পরসম্মুখেই তিনি সম্মুখে অশ্রুণী প্রণয়িত করিয়া পথ বেধাইয়া বলিলেন, ওই পথ ধ'রে তুমি গোলা চ'লে যাও বৈজ্ঞানিক, তুমি মাস্তব নও—মানব। জগৎ প্রসারিত ক'রে বিশ্ব জগৎ অঘের সাধনা ক'রছে জানপুর—যেদিন তুমি জগতের সম্মান পাবে সেদিন এল, তোমাকে বরণ ক'রে নেব'।

বৈজ্ঞানিকের চক্ষু অশ্রুশূন্যের অস্ত্র ধ্বংস করিয়া অলিয়া উঠিল। কিন্তু সম্মুখে নিজেকে সংহত করিয়া রাজ্যকে অভিবাসন জানাইয়া সে বাহির হইয়া গেল।***

এইবার বিজ্ঞাননগর। বৈজ্ঞানিককে মহালদায়তে গ্রহণ করিয়া রাজা বলিলেন, আপনার অগেফকাইই ছিলাম বিজ্ঞানওক, আপনার নাম স্বরণ ক'রেই বোধহয় এ রাজ্যের নামকরণ হ'য়েছে। আপনার পর্যাপণে আজ ধস্ত হলাম।

হুহু হাসিয়া বৈজ্ঞানিক রাজাকে আশীর্বাদ করিল। সেই আশীর্বাদের ফলে সেখিতে সেখিতে নানা হয়ে ভরিয়া উঠিল দেশ। গোটা দেশটাই বেন ছুটিয়া চলিয়াছে—গতির বড়াই, আরও ছোরে—আরও ছোরে। বিজাতীয় নানাপ্রকার লম্বে দুঃখিত হইয়া ওঠে দেশটা—বহুসংখ্যক দিলিয়ার আশায় দুঃখ্যমন করিয়া আছে।—সেই বিরাট দুঃখহরের সমস্ত দেশের মহত্ত্ব বীরে বীরে প্রবেশ করিতে থাকে।

আরও হইয়া যায় চুরি ভাকাতি, খুন মরন। স্বাধ টানিয়া লইয়া চলে বাহুরকে। চাই—আরও চাই, কিছু এ-চাইয়ের ড'শেষও নাই। দিব্যর মস্তও কেহ বলিয়া নাই। রাজা নিজেই হইয়াই যাত—স্বরাধ্বা পাইয়া উপজোগের স্মৃতা আঁহার বেন আর শেষ খুঁজিয়া পায় না। বহুমানকে সকলের ভেঁচে চাপাইয়া আয়াম করিবার প্রবোগ তিনি ছাড়িবেন কেন?

বৈজ্ঞানিককে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, চুরি-ভাকাতি নিবারণ কর—বিচারকরা যে অস্থির হ'রে উঠল' বৈজ্ঞানিক।

হাসিয়া বৈজ্ঞানিক উত্তর দিল, তাতে রাজকোষে অর্থ লগ্ন হ'ছে রাজা। চিন্তা দূর করুন—বাড়িয়ে খেব কয়েকখানা আর ভাঁসীর গজু।

দিংহাসনে বেলিয়া রাজা বলিলেন, তোমাও ভরলান্তেই আছি ওক কিছু সেবা চাই আরো আরো অনেক লোকের—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি দান না হ'লে যে চলে না।

বৈজ্ঞানিকের চক্ষু ছুটিয়া প্রবীণ হইয়া উঠিল, সমুখের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সোজা হইয়া ঠাড়াইয়া সে বলিল, সে প্রয়োজন বেটাবে জানপুর।***

বিজ্ঞানের ছায়াদৃষ্টি অপরূপ চূপ করিয়া থাকিয়া

বলিল, বুকে খেব সাহিত্যিক বিজ্ঞাননগর আজ কত লম্বশালী। সে ত শুষ্ক আঘাতে সেবা ক'রে! চাই বলি আঘাতে স্বরণ ক'রে তোমার লেখনী চালনা কর।

ছায়াদৃষ্টির দিকে দ্বির চক্রে চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, তোমাকে নিয়েই লিখব' বৈজ্ঞানিক কিন্তু আমার কলম ওখানেই থেমে যাবে না। সে কলম আরও এগিয়ে লম্বু-রূপে প্রকাশ ক'রবে তোমার স্বরূপ।

চকল দৃষ্টি মেলিয়া দৃষ্টি বিভ্রালা করিল, আরও কি জানাবে তোমার লেখনী?

হাত তুলিয়া বলিলাম, কান পেতে শোন—

দুঃ দৃষ্টি করিয়া একটা বহুমান খামিয়া গেল। চারিদিকে একটা গোরগোল উঠিল। কাজ করিতে করিতে একটা লোক পিথিয়া গিয়াছে বহুমানবের কঠিন আঙ্গিননে। লোকটার পিঠে বেহু টানিয়া আনিয়া লবলে মুহূর্তের অন্ত একবার সেদিকে চাহিয়া দেখিয়া পুনরায় কাজে লাগিয়া গেল। আর একজন আনিয়া ততক্ষণে গ্রহণ করিয়াছে বৃত্ত লোকটার স্থান। বহুর একটা অংশ বাতাপ হইয়া বাওয়ার বেন তাহা বাতিল করিয়া নতুন একটা অংশ এইমাত্র জুড়িয়া দেওয়া হইল। কে কাহার অন্ত পোক করিবে? সমস্ত গ্রাহ্য ভাতটাই ত ঘরিয়া গিয়াছে। যে কোন মুহূর্তে কেহ পিঠ হইয়া বাইতে পারে।.....

ক্যাচ' লম্বে একটা বহুমান খামিয়া গেল। ঢাকার কি বেন একটা লাগিয়া বাওয়ার বস চপিতে পারিতেছে না। আরোহী নামিয়া আনিয়া দেখিল একটা মহত্ত্বদেহ। বেহুটাকে সরাইয়া আরোহী নিঃস্বানে গিয়া বলিল—আহত বেহুটার আর্দ্রনাশ পোনার লম্ব তাহার নাই। চলাটাই যে বহুমানের বর্ধ, একবার স্বম দিয়া দিলেই হইল। হতভাগা বাহুব!

একটা ছোটখাট ছায়া কখন আসিয়া বিজ্ঞানের দৃষ্টির মধ্যে ভর করিয়া ঠাড়াইয়াছিল লক্ষ্য করি নাই। সেই দৃষ্টিটা এইবার বাধা দিয়া বলিল, এ তুমি আমার অথবা নিশা ক'রছ। আমি যে নতুন হুণ এনেছি তা কি তুমি অস্বীকার ক'রতে পার সাহিত্যিক?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিজ্ঞাপা করিলাম,

তুমি ?

নিশ্চয় বৃষ্টি উত্তর করিল, আমি বিজ্ঞানের পালিত পুত্র
—আমারই-নাম সভ্যতা।

সভ্যতা ? চক্ষু কোথায় জলিয়া উঠিল, বিরক্তি চাপিবার
কিছুমাত্রা চেষ্টা না করিয়াই বলিলাম, ধর্মের সঙ্গে লগেই
তোমার বৃত্তা হওয়া উচিত ছিল।

সে রাগ করিয়া বলিল, আমার অপরাধ ?

অপরাধ ? নত-নত অপরাধ। বলিলাম, কি দিবেছ
তুমি ? শুধু মানুষকে ক'রেছ অস্বাভাবিক—রাষ্ট্রের
মোড়া মানব।

সভ্যতার চক্ষু বিব্রোহ ঘনাইয়া উঠিল, সে বলিল, যে
ছিল পশু তাকে আমি করেছি হুম্বর—যে ছিল উলক
তাকে দিবেছি আবরণ।

শান্ত স্বরে বলিলাম, ওই আবরণ-ই মানুষকে ক'রেছে
শিশু। পশু বধন তার বৃত্তি বজায় রেখেও নিজে
অবতার ব'লে প্রচার ক'রতে চায় তখনই হয় শিশু।
উলক মানুষ হওয়া ক'রত না তা নয় কিন্তু ওই হত্যার ঝিক
পূর্ক মুহূর্তে সে তার শত্রুকে পরম প্রিয় ব'লে গলা ভড়িয়ে
ধ'রে আগর ক'রে শঠতা ক'রত না। প্রহর হাত্ত মুখে
প্রিয়তমের মুখে দিব ঢেলে দেওয়া শুধু তোমার সাহায্যেই
সম্ভব।

অকস্মাৎ সমুখের আকাশে শেঁা শেঁা করিয়া এককোণিক
বরষানব উড়িয়া আসিল—পরক্ষণেই ধুম ধুম করিয়া ঘন ঘন
প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল। চারিদিকে ভাসিয়া উঠিল
কোলাহল আর আর্দ্রনাস, তথাপি সেই ধুম ধুম শব্দের
বিরাম নাই।

অপকালের অস্ত চমকিয়া বাসিয়া পুনরায় বলিতে
লাগিলাম, ওই তোমার প্রকাশ। শূন্য থেকে বৃত্তা নেমে
আসছে শত সহস্র বাহু মেলে। আমি নিভয় ক'রে ব'লতে
পারি, যে রোগের বীজাগু সেই সঙ্গে ছাড়িয়ে দিচ্ছে

সভ্যতার ওই বরষানব হত্যার আনন্দে। আনন্দের হাসি
শেপতে চাও না তুমি কারও মূখে। মাতা ও পিতৃ, প্রিয়ও
প্রিয়তমী কারও অস্তিত্ব থাকবে না তোমার স্পর্শে। রোগে,
অনাচারে শুকিয়ে মরবে সব আর তারই ওপর রং কলিয়ে
তুমি পাইবে তোমার অধগণ। তাই বলি ওগো বৈজ্ঞানিক
জগতের রল নিঃড়ে নিও না—তাকে সঞ্জীৱিত করার পথ
অবেশ্য কর।

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ
হয় অন্তরমনক হইয়া পড়িয়াছিলাম। এতক্ষণে যেমাল
হওয়ায় সমুখের চাহিয়া দেখিলাম যে তাহার চনিয়া
শিয়াকে এবং সেই স্থানে আসিয়া ঠাড়াইয়াছে আর একজন
—তাহার মুখে শান্ত হুম্বর হাসি।

তাহার দিকে দৃষ্ট পড়িলামাই উঠিয়া ঠাড়াইলাম,
সমুখের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া অভিনন্দন জানাইয়া
বলিলাম, এল কবি।

কবি মুহু হাসিয়া আমাকে ভোর করিয়া ঘনাইয়া দিয়া
বলিল, উত্তেজিত হ'রো না বন্ধু। তোমার কলমে ভোর
আছে—গেয়ে যাও অনাগত ভবিষ্যতের গান। সেদিন
মানুষ ফিরে যাবে প্রকৃতির মধ্যে—স্বাভাব্য বাহ্যের
ধূয়ে মুছে গিয়ে সেদিন ছুটে উঠবে সত্যিকার লহর
মাছটী।

তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়াই বলিলাম, তোমার
যেথা ত আজকাল পাইনা কবি।

শান্ত স্বরে সে উত্তর করিল, আমি ব'য়েছি তোমার-ই
মধ্যে—সেখানে লন্ধান কর, পাবে আমাকে। বিশ্বের
সকলের ঘরে ঘারে যে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়, মূখে
আমার সেই আগামীদিনের অধগণ—সেই গানের স্বর
আমি সকলের জঘর বীণায় বাজিয়ে বেতে চাই।

সেই সন্ধ্যাতের উদাত্ত স্বর তুলিয়া কবি বীরে বীরে ঘর
হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি মাথা নত করিয়া
তাহাকে প্রণতি জানাইলাম।

এলো ঘামের দিন

ঐশ্বর্য জীবন মুখোপাধ্যায়

অনেক ঘামের দিন, ঘাম-করানোর দিন, এলো

বে আবার—

মাতা বহুমতী—হা, বুকের ঝাঁচল আঁধার তাঁর

বুহু সন্ধানের রক্তে আর ঘামে ভেবে—

অলস অলস করে হাঁকার !

রক্ত-ঘামের দিন, রক্ত-করার দিন এ বে—

গরমের ঘাম এলো বহুমতী-সেবে :

কপালের ঘাম নেনে বুকের রক্তে গিয়ে মিশে ।

তারপরে দিন-ভর ক'রে ক'রে ঘাম :

কোথায় ? কোথায় ? তাও জানোনা কি হাঃ ?

বেল—সাইনের পালে

পাথরে-পাথরে লেগে

ওই বে আঙুরাল আসে—

জ্বলতে পায়েই তিক একটুই থাকলেই ভেঙ্গে !

কহলা-খনির খালে বেধ করা হ'য়ে যায় কালো :

একটু ব্যতাল খোঁজে—আরেকটু আশো :

একটু এগিয়ে গেলে—

দেখতে তো পাবে—ভুখ চোখটাকে আরও কিছু মেলে !

শিক্টের বাঁধি বাজে—গর্জায়, ডাকে কারখানা—

মেসিনে কিম্বি ছোট :

কপালের ঘামে হাঃ দেখ কার চোখ হ'ল কাগা—

লাল-আঙুরের মুখে ওরাও পাগল হ'য়ে ওঠে !

এবারে এগিয়ে চলো আরো—

নিষ্ঠুর চিনে নিতে পায়ে—

ঠক-ঠক-ঠক তাঁত চলে :

বৈঠা ও পাড় ছোট জলে :

করাতে দু-তাক হু হু কাঠ :

পোড়ানো-মাটির হাড়ি-সরা :

হাড়ি-ঘাটে ঘাটে খুঁট-খুঁট—

ছুরি-কাঁচি চলে তাক-পড়া !

আরও আছে : বিল আর পাথ, ভরা কতো জল পাতা :

দুপুরের রোদে আসে ইটে-ইটে ইয়ারতু পাখা !

এখনও এ ঘামে—

মাঠেরা লম্বা হয় । সে মাঠের হাসি বেধ নাই ?

আকাশের সব মেঘ আঁধার সেবা নামে :

আঁধারও কেত-ভরা ধান : মিটে জ্বাল পাই— !

হে বাধীন বেশ !

হে নতুন বেশ !

এদে আর অদ্রে ঘেরা

আমাদের জীবনের সব-সেরা-সেরা

হুহুতগলিরে বেব । অনেক আরও বেব ঘাম—

রক্তও বেব । শুধু নয় ক'রে কিছু মিয়ো ঘাম :

আমাদের মায়েরের পেটে দুটি ভাত :

জীনের একটুখানি দুধ-ভরা রাত :

পরনের বান-কতো ধুতি-শাড়ী, আর

একটু আঁধা এই মাথাটা গোঁজার !

রোপা-শিতলের টোটে এক কোটা দুধ :

অহুখেতে একটু গুহু ।

বুহু-সন্ধানের রক্ত-ভেজা, ঘামে-ভেজা-বুকে—

মাতা-বহুমতী, হাঃ

কাঁধেইন নিরালায়,

শত ব্যথা শত লাজ—বায়

ছায়া ফেলে আঁধার তাঁর লকরণ ঘুহু ।

ছোটেলান

অবিরচিত্ত রায়

নাম তার ছোটেলান। কিন্তু বাহুখটি ছোট সে নয়, গায়ের রঙটিও তার লাল নয়। পুরো হুঁকিট লম্বা, কালো কুচুচে চেহারার এক বিরাটকার পুরুষ; বাধায় একরাশ কাঁকড়া চুল—টিক বাবুরী নয়, অমৃতপ্রসূত দীর্ঘ অক্লান্তিত কেন্দ্রায়। অত্যন্ত নোংরা একখানা ধূতি ও একটি ততোধিক নোংরা কোর্ডী লম্বল ক'রে ওর প্রথম আবির্ভাব। এই অস্বাস্থ্যই ওরা আসে—একজন নয় দুজন নয়, হলে, যলে। গিল্লী ছাড়িয়ে পাড়াবের পূর্ব সীমান্তের অবিবাসী ওরা। মেশে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সম্পত্তি আছে—অমী, অমা, হাল বলদ; ঘরে বাবারও আছে—গেদ্র, জোয়ার বজরা, কুঠা। এসব থাকতেও ওরা আসে কলকাতার—চাকরীর চেষ্টায়। সমাজের অস্ত্র গুয়ের লোকের ভুলনার চাকরীও ওরা অনেকটা সহজে পায়, যারনা ও অস্ত্রান্ত স্বপ্ন-সুবিধা বাই পাক না কেন!

ছোটেলানও বেশ সহজেই চাকরী পেল এই হাসপাতালে। চার নম্বর ওয়ার্ডের পুরান জমাদার দীর্ঘদিন একনাগার কাম ক'রে ছুটিতে মেশে যাবে; তার বায়পাথ ভর্তি হয়ে গেল ছোটেলান। ওর চেহারা দেখে কেউই খুশী হতে পারল না। রোগীরা ভাবল—বাইরের দিক যার এমন ভীষণ, অন্তরে সে বিতীৰ্ণ নয় নিশ্চয়ই। সে কেমন করে করবে জমাদারের কাম—রোগীর সেবা? এক বন্ধু ত' ঠাট্টার ছলে বলেই কেললেন—এই ছোটেলান, জেল দেখা, জেল-গারখানা?—পঙ্কজ বরে ছোটেলান অবাধ মিল—সেখা, অর্ডার উপেক্ষা ভিত্তর গিয়া ভি—সহ-বাসীদের চোখে চোখ দিয়ে বদ্ধ বৃত্তিরে মিলেন—এ ব্যাটা নিশ্চয়ই জ্ঞানাত। আগের দিন বা ছিল চোখের ইলারা, পরের দিন সেটা কিশ্কিন্সানি হয়ে হাওরায় ডাল, আরও করেকদিন বাদে তা জমাট বেঁধে একেবারে হাসপাতালের বড় কর্তার কাছে হাফির নাগিনের রূপ নিয়ে। রোগীদের মধ্যে এক কথা—লোকটার চেহারা যেবেই ভয় হয়, স্ত্রার, তারপর আবার এমন ধমকানি দিয়ে কথা বলে! —তার

বললেন—তোমরা বোঝনা, ওরা এমন অস্বাস্থ্যই বেশ থেকে প্রথম আসে। একেত' শুক মরুদেশের লোক, তারপর আবার তোমাদের ভাণা ওরা বোঝেনা, তোমরাও বুঝতে পারনা ওদের কথা—

—কথা ত নয়, কামানুবাণা—গুণের কেন জৈনক রোগীভাই!—বা বলেছ। গোপ-কটির দেশওয়ালী ওরা, মিহিহানার চিঁ চিঁ স্বর ওদের নয়; তাই তোমরা এত ভয় পাও ওদের কথা শুনে। আসলে কিন্তু ওটাই ওদের কথা বলার স্বাভাবিক ধরন, কলকাতায় ভরা হ'লেও ধমকানির কোন আভাষ নাই ওতে। কিছু ছেলেবোনা, দুমাস থাকতে নাও বাংলা দেশে, এখানকার জল পেতে গেলেই ও টিক বাঙালী ব'লে যাবে। আর তাছাড়া, বুললে হে, একটু হুং লাগতে নাও মনে; অর্থাৎ এই তোমাদের বাঙালীযুবকদের লাগ-পোষাক, আবহ-কাহনায় রঙটি একবার মনে লাগলেই—বাস! ব'লে বক্ত পাড়াব-কেশরীকে দেখলাম বাংলাদেশের হাটর স্পর্শে নরম হ'তে—কথা শেষ করে স্ত্রার ঠার খিওরীর চমৎকারিহে নিজেই মুহু হ'য়ে মুচুকী হাটতে লাগলেন।

স্ত্রারের কথা একটুও মিথ্যা নয়। দুমাস যেতেই দেখি ছোটেলান আর সে ছোটেলান নাই। তার সেই কাঁকড়া চুলের রাশ পরিপাটি ক'রে পাট করা, স্ত্রারের দিকে নিদুলও হ'য়েছে একাংশ। বাঙালী বাহুদের ধূতি পরার কারদা বেশ কুজিহের সঙ্গে আংথ করেছ সে, দুমশানের দিকেও উন্নতি হ'য়েছে তার, বিড়ি থেকে সিগ্রেট পর্যন্ত। আগের দিনের সেই মিলিটারী মেজাজের "সাল্যাম হজোব" সে জুলে গেছে, এখন দেখা হ'লেই একগাল হাসি টেনে সে বলে "নমস্কে বাবুজী!" বেশে শোনা রামলীলা একদিন তার মনে রেগাপাত ক'রে থাকলেও, পুরান কাহিনীর পুনরাবৃত্তি তার আর ভাল লাগে না—"পরদেশী" কথাচিত্তের গান এখন তার অবসর বিনোদনে হুর-মুখী। বাংলা দেশের হাওয়া তার গায়ে লেগেছে, বাঙালী যুবকের, হার-ভার চালচলনের এক অক্ষম অক্ষরপের মোহে ঘোরপাক খাচ্ছে সে। পরিবর্তনটা শুধু বাহ্যিকই নয়, ভেতরেরও। অর্থাৎ গোপ-কটির প্রসঙ্গের পাওনা

সোম। শরীরটা ভাতের রসে ভিজিয়ে পড়ছে বিনদিন।
 হুতে পারলাম, টাটকা ভাতের সঙ্গে পড়া ভাতের
 রসও আশ্বাসন করতে সুরু করেছে ছোট্টোলাল এবং
 হুতে শেখটার মাঝে টপানীং বেড়ে গেছে খুব। আমার
 আর সঙ্ক হয় না। একদি বিজ্ঞাপা করলাম একে—
 ছোট্টোলাল, তোমার শরীর এত খারাপ হচ্ছে কেন
 বিন দিন?—অথাবে ও জানাল দেশে বেনন প্রচুর
 স্বাস্থ্যকর খাবার পেতে, এখানে তা পায় না; হুতরায়
 শরীর থাকবে কি করে! জানতে চাইলাম—কেন
 তবে তার সোনার মলুক ছেড়ে এই গোড়া দেশে
 এসেছে সে? এর কথায় সে দিতে পারে না। সত্যি,
 মাত্র সাতাশটি টাকা মাছার মোড়ে কেন ও এসেছে
 এই দুইদেশে, বাংলা, ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধন
 ছেড়ে? বাংলার প্রাবলিমার কি এত দাড়া! সেই
 মাছার জালেই কি বাধা পড়ে ছায়া ওরা বলে ধলে!
 বাংলার মল, বাংলার বায়ু, বাঙালী যুবকের চেহারা
 কন্দীত। কি ওদের এতই কাব্য! নিরুচ্চ বাংলা
 দেশের টানেই কি ওরা ঘর-ছাড়া হু? না—সুখলাবত
 পারিবারিক জীবনের পৃথল থেকে হুতির মোড় দেখিয়ে
 ওদের টেনে আনে হাঙ্গবের ভিতরকার চিরকন্দী বাবাবর
 হুতি—সংসারের বৈশ্বিনিত্যের ইপিচে-ওঠা মন বেরিয়ে
 পরে নিরুচ্চদের পানে। তাই ওরা ছুটে আসে
 কলকাতার দিকে বেগানকার বড়ী জীবনের হুতি না
 থাকলেও হুতি আছে, আরাম না থাকলেও আয়োদ
 আছে, নিষ্ঠা না থাকলেও মেধা আছে।

নীচের তলার একটি বিশ্রী হস্তার আনাঘের আলোচনা
 বাধা পেল। ছোট্টোলাল ছুটে নেমে গেল এবং গোলমাল
 খেমে বেতেই ক্রিয়ে এসে জানাল যে ছুটু জমাদার
 মরণে কোথায় বের্হন হয়ে পড়ে ছিল—রাতে তারি
 কাজের প্রালা, কিন্তু কাম ত' হুয়ের কথা, ছুটুয় পাতাই
 মেলে নাই সারারাত! এখন সে ক্রিয়ে আসতেই বড়
 জমাদার পাকরাও করেছে, বকুনি দিচ্ছে তাকে—তাই
 এত হৈ-হুলা। সব কথা শুনে আমি বললাম—এ বড়
 জমাদারের মলুন, মাসে একদিন বহু খেয়ে হুতি করবে

তাও যদি ছুটি না যেলে—আমার হুয়ের কথা কেড়ে
 ছোট্টোলাল বলল—নেহি বাবুদী, ও আচ্ছা নেহি—

—কোন্ আচ্ছা নেহি, ছুটু?—

—নেহি, মাক পিনা আচ্ছা নেহি—বহুবা শুনে অব্যাহত

চাহনিত্তে ছোট্টোলালের হুয়ের দিকে তাকালাম—হুতের
 হুয়ের হাম নাম! তার কথার লজ্জার বে আমি বিবাস
 করিনি পরমুহূর্তেই তা তাকে জানিয়ে দিবে বললাম যে
 ছুটুও প্রথম প্রথম আমাকে এমনি সব বড় বড় কথা
 শুনিযেছিল—আর কতি নেহি সব বায়গা—যেহে তার
 মল আছে, পেড়কা আছে, এখন থেকে সব টাঙ্কা সৈ
 তাবের ভবিষ্যতের মতই জমাবে ইত্যাদি। আমার
 গা হুঁয়ে তার কত লগণ, কি করল অহুন্নর—আমি বেন
 তার বকুনি বড় না করি—কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই
 'বহা পূর্ক্স তথা পহ'—

একটু অব্যাহতিক গভীর বরে ছোট্টোলাল আমার
 কথার অব্যাহ মিল—ছুটুকা বাত ছোট্ট দি মিয়ে, যেহি
 বাত শুনিযে, হামু কতি নেহি মাক পিনা—

আমি বললাম—বাত, ত তোমার জনলাম, কিন্তু তপু
 কথায়ই ত কাম হয় না; একটা টাকা তোমাকে বকুনি
 যদি দিই এখন, সঙ্গে সঙ্গে তুমি ছুটুবে তারি দোকানের
 দিকে—

চেহারাটা আরও একটু কঠিন হ'য়ে উঠল
 ছোট্টোলালের, ও বলল—কিসকা মাখ, আপ, বাত, কহতে
 মালুম ছায়া—

—তরর, ঘেরে গিয়ারকা অব্যাহার ছোট্টোলাল সাব,
 কা মাখ—আমার ঠাট্টা বেন ওকে বিজ্ঞপের চাবুক মারল।
 ক্রিয়ে পড়া সিংহদিত্তর তজ্জাতকের মত হঠাৎ ছোট্টোলাল
 উঠে দাড়াল, দেহের উপরিভাগটা ইক্স পিছনে হেলিয়ে
 একটা গোথ একটু ছোট করে অত্যন্ত তাক্সিলাউরে
 সে আমাকে প্রের করল—

—মহ বিখ্যাসিনযে এক বহুত, বড়া ক্রান্তি হুয়া বা,
 জানতে?—আমাঘের হালকা আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কহীন
 অবিস্মরণীয় আপট বিমবের গভীর অবতারণা এবং
 ছোট্টোলালের কথা বলার ভণীর আভিলাষে আমি বেন

কেমন ঠৈ হারিয়ে কেললাম। আমার স্বতি-লাগয়
—প্রমিথ্য কর এক উত্তাল তুফানের আকস্মিক আবির্ভাবে
সমস্ত চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল, অবচেতনের অন্ধকারে
ভেসে উঠল এক ভীষণ আলোখা—মরিকর অগ্নি
বিদ্রবের অলস শিখার দাউ দাউ করে পুড়তে বেললাম—
লাতারা, বাঁশি, যেমিনীপুর—

—টপনপুর আগ্নেয় লাগায়া থা উন্মাদ্মোলনকে—
ছোটেলালের কথার চমকে উঠলাম—“স্বা”

—রেল টিশনে আগ্নেয় লাগায়া থা, ছ’মাহিনেকা
ফাটকি হরা থা, আভি শোচ্ছরিতে, হাম্ ত’ কংগেশ
কা’মান্নী ছায়, পাছী মহাস্বাক্য চেলা ছায়, হাম্ কডি

দার দিনা লক্খা!—বকুখা শেষ করে এক গর্বদীপ্ত
ভকীতে ঘারটি ঘোড়া করে নিঃশব্দ সালোম টুকে ঘর থেকে
বেরিয়ে গেল বাঙালীযুবকের কোলুখ—আচরণ অচরণের
অপচেষ্টার অংশভিত্তি ছোটেলাল—কিন্তু এক নতুন
চেহারায়ে সে উদ্ভাসিত ঠায়ে উঠল আমার মানসপটে।
ছোটেলাল হরত হাতাল, হরত নহ—কিন্তু অস্পষ্ট
নোংরা নিয়ে বারবার করার ফাকে অবনতির দাপে
ধাপেও জীবনের পরিহৃত্তম মুহূর্তের স্রবণে অমানার
ছোটেলাল খুঁজে পায় তার আত্মার পরম লঙ্কাধে—তার
বিদ্রাবের দৃষ্ট ভকীয়ার সেমিন বেন এই কথাই লেখা
দেখেছিলাম।

নববর্ষ

শ্রীনিবাস চক্রবর্তী

নূতনের সাজা জাগে এ বিশ্বের মন্দিরে বিপিনে,
সবারে প্রণাম করি আজি নব বৎসরের দিনে।

যতো দুঃখ, যতো বেদ,
যতো মানি, যতো ক্লেশ
ছিলো গ্রাণ বিরে,
অলিত পত্নের মত
উড়ে যাক্ অবিরত
ঈশান সমীরে।

নূতনের তাই দাও তুমি চিতে, ওগো পুরাতন—
কাজ শেষ হলে মিছে ওকতার জীবন বহন।

পূর্ব ভব আত্মজাল,
ছিন্ন করে যারাজাল
অকল্প অস্তরে,
ভুবনে গগনে আজি
শেষ পান ওঠে বাড়ি'
মেঘময়বর।

দাতো দাতো গতি আজি, হুগে হুগে এ মহামিলন
— স্বাক্ষর করিয়া দিক্ মহা-নর্তে তোমার লিখন।

নূতন এসেছে ধারে,
আশ্বিনাব করে তারে
হে মহা প্রবীণ,
সান্তির নবীন বাগী
বরাহ বে দিক্ আনি।
বিরাম বিহীন।

হে নব অভিবি, এগো, আলিসন জানাই তোমার—
উড়ায়ে বিষয়-অজ্ঞা মহালুপ্তে গতির বস্তার।

প্রভাতের মাহানিকে
শোনো আজি দিকে দিকে
তোমারি আত্মান;
পূরনারী অংশপূরে
হলু দেয় ফিরে ঘুরে
জননী সমান।

কোকিল-কুঙ্কন-স্রাব বসন্তের বনে উপবনে
তোমার সারিক বাগী গেথে ওঠে পতীর শবনে।

কর্মের কুপাণ হানি'
শুপ্র-জাল ফেলো টানি'
অশান্ত নবীন,
তোমার পরম লেগে
চেতনা উঠুক লেগে
বাধাবদ্ধহীন।

বেশ আজো তজ্রাতুর; তুমি লগা বিহব সমন
মোহাগে শোনায়ে বাও কাণে তার প্রভাতের গান।

উষার অরুণ দয়
নখা পাণে নিরুদয়
বসো আজি' তার;
তুলিয়া তন্ত্রিল দির
বলো—জাগে', জাগো বীর,
সুমাযোনা আর।

সাধারণ কয়েদীর দুঃখ কাহিনী (৩)

শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত

১৯৫২ সালের অগাষ্ট মাস। সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্বেলিত, অস্থির। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর রোধ করে রাখা যাবে না। এই অগাষ্ট গান্ধীজীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে প্রতাপ গ্রহণ করল। কংগ্রেস গান্ধীজীও সহজ ছোট ভাবার ইংরেজকে মোকদ্দম অস্থির হেনে বলে উঠলো 'Quit India' এই অগাষ্ট প্রত্যাহার সেবা গেল বৃটিশ শক্তি থেকে দাড়াচ্ছে কংগ্রেসের সংকল্পের বিরুদ্ধে। তারা চ্যালেঞ্জ করল কংগ্রেসকে। সমস্ত নেতাদের গ্রেপ্তার করে সংগ্রামের সুখ প্রথমেই রোধ করে ধরতে চাইলো। কংগ্রেসকে ঘোষণা করল যে আইনী প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস কর্মীরা বৃটিশ গভর্নমেন্টের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিল। সংগ্রাম বহুবারই করেছে তারা। এবার শেষ আঘাত হানবার জন্য তৈরী হয়েছে ওরা। একটার পর একটা ধাপে ধাপে হুলাহুলিক পথে তারা বিপর্যয় এনে কেলতে লাগলো। বোম্বাইতে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ বটে হাবার সঙ্গে সঙ্গেই টিক electricityর মতো অত্যন্ত দ্রুত ভাবে সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষে। ১৯২১ সন থেকে আরম্ভ করে সেদিন পর্যন্ত কংগ্রেস এবং বিদ্রোহী ইংরেজ গভর্নমেন্টকে অচল করে তুলতে তার বিরুদ্ধে যতগুলি পথ অবলম্বন করেছে, যা কিছু আন্দোলন চালিয়েছে, তার সমস্ত সুখই আজ সকলে মিলে ঘোড় দুরিবে দিয়েছে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে। কংগ্রেস কর্মী আজ বিদ্রোহী। বিদ্রোহী আজ কংগ্রেসের। দুইয়ের শক্তি আজ একত্রোতে দুবার বেগে ভেঙ্গে দিয়ে চলেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহীর শক্ত তিষ্ঠিতে। গান্ধীজী বলেছেন Do or Die, তাই কর্মীরা পণ করেছে, মস্তুর সাধন অথবা শরীর পতন। বাগিরা, লাভারা অকৃতপূর্ব সংগ্রাম করে চলেছে। টাটার প্রতিক্রিয়া অকৃতভাবে রাজনৈতিক ধর্মবৃত্ত চালিয়েছে। শত শত মাইল রেলের সাইন উপড়ে কোলা হয়েছে। কৃষকেরা অধিবাসের কাছারি পুড়িয়ে কেলছে। যেদিনীপুরে

হাজার হাজার কর্মী থানা আক্রমণ করে দেখল নিজে এবং ইংরেজ শাসনের পাশাপাশি স্বাধীন স্বাভাবিক গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে তারা ঘোষণা করল, জয় স্বাধীন ভারতের।

ইংরেজের হাতে যত তৃণ ছিল সেও বিদ্ধ করে দিতে থাকলো। বেগমহোদা গুলি চালিয়ে, বেয়নেটের আঘাতে, কামির কাঠে, লীপায়রের হুকুম দিয়েও ইংরেজ আজ পেয়ে উঠছে না। কাতারে কাতারে ওরা কেবলি বরতে আসে। ভারতবর্ষের যত মেল ছিল, আরো কত নতুন সৃষ্টি হ'ল, লবণালির দরজা খুলে দিয়েও তারা আজ বন্দীদের নিয়ে লামলে উঠতে পারছে না।

আবার সেই হাজার হাজার বন্দী, রাজবন্দী ছেদে-মেয়েরা মেলখানা পরিপূর্ণ করে কেলতে লাগলো। সমস্ত ভারতবর্ষই যেন সেদিন বিরাট মেলখানা এক বিশাল সংগ্রামক্ষেত্র।

পুরাতন বন্দীদের আবার আসে নতুন রাজবন্দী হ'য়ে। আবার কলকাতার সেই গ্রেসিডেন্সি মেল। লোহার বরজাটা তেমনি করে বনানী করে খুলে ফুঁকিয়ে নিলো সেই পুরাতন অভিজিৎ নতুন করে। অতি পরিচিত সেই বটগাছটা আজও যেন সকল দুঃখের সাক্ষী হয়ে, সকল বেহনার সমস্যা বী হয়ে বন্দীদের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন বলে, আর কত বেদী? বন্দীরা বলে, বৈধ ধর যত্ন, তীব্র ঐ যে ঘেণা যায়।

আবার সেই জ্ঞানানী কাটক। রাজ্যের অভিজিৎ হয়ে আরো বন্দীরা আসেই এসেছে। তারা জ্ঞানানী কাটকের দরজাটার দিকে কেবলি তাকিয়ে থাকে, আরো কত রাজবন্দী আসে। বিদ্রোহী এবং কংগ্রেসী আজ সবাই একই সংগ্রামের সৈনিক। একে একে আসছে সবাই। বন্দী মেয়ে এবারও অস্ত্রাস্ত্র রাজবন্দীদের সঙ্গে কাঁকে-কৈ কাঁকে মিশে গেল।

চার বছর পরে এসে বন্দী বেধে আজও মেল, কিছুই বদলায়নি। মেলখানা টিক তেমনি চলছে যেমন চলতো ১৯৩০ সালে ১৯৩২ সালে। সেই সাধারণ কয়েদীরা তেমনি চোখের মলে আজও দিন কাটায়। যদেই বন্দীরা এসে তারা যেন হাতে স্বর্ণ পায়। তাই অধৈর্য্য বৃষ্টি

ডানের হুগ দূর করতে পারবে। বন্দী ভাবে, এই হুগধারণের সুকবেশনা দূর ক'রে এদের মাছ ক'রে গড়ে "ভুলবে যে বাপীন ভারত তার অন্তই তো বশেষী করা, সেজন্যই তো স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মনা।

বন্দী দু'মুখে এক পুরাতন কয়েদীকে। জমাদারীকে ভিজেন করে, কোথায় আমাদের সেই ১০ বছরের মেয়ে কয়েদী? চালান দিয়েছ তাকে? তাকে এবার দেখছিনা কেন? জমাদারী বলে, সে তো নেই, মারা গেছে। বন্দীর অন্তর ভেদ ক'রে গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। মনে পড়ে সেই ছোট্টমেয়েটিকে। ১৯৩২ সনে এই প্রেসিডেন্সি জেলে ১০ বছরের মেয়ে কয়েদী হয়ে এসেছিল ২০ বছরের কালাপানি সাজা মাধ্যম নিয়ে। ইংরেজের বিচারালয় ১০ বছরের মেয়েকে গ্রেপ্তার ক'রে সংশোধন করার উপায় বুঝে পায়নি। তাকে চরম হুগ দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। কেন তার অমন শাস্তি হ'ল মিজেল করলে সে বলতো, দিদি, আমি কিছুই জানি না। আমার বুড়ভুতো ভাইর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। পাশাপাশি ঘর। ছোট ছিলাম ব'লে ম'র কাছে থাকতাম বেশীর ভাগ সময়। একদিন রাতে ম'র কাছে শুয়ে আছি। সকালে দেখি, আমার স্বামী মারা গেছে—পুলিশ বাড়ী দিয়ে ফেলেছে। আমাকে থানায় নিয়ে এস। রাত্রে আমি স্বামীকে ভাত দিয়েছিলাম। 'ওরা বললো, আমি নাকি ভাতে বিষ মিশিয়েছি। তাই হ'ল ২০ বছরের কালাপানি। বন্দী জিজ্ঞাস করে, সত্যি ক'রে বলতো ভাই তুমি কি বিষ খাইয়েছিলে? সে বলে, মিথ্যা বলে লাভ কি? এমন তো আর নতুন করে বেশী কিছু সাজা হ'বে না? আমি বিষ মিশাইনি দিদি। আমি কিছুই জানি না। কেনই বা বিষ খাওয়াব? সে তো ভাল লোক ছিল। বন্দীর আঙ্গ মনে পড়ে সেই ১০ বছরের মেয়ের লম্বাহাঁসি কচি মুখখানি। আঙ্গ সেই ভাললোকের স্ত্রী ইংরেজের বিচারে চরম উত্তর দিয়ে চলে গেছে। হরতো নির্দোষ ছিল সে, হরতো অন্তর পাপের বোকা তার মাধ্যম মিথ্যা চাপিয়ে বসিয়ে ইংরেজের কোর্ট বিচার

চালিয়ে গেছে। আজ সে বিচারকে কাকি দিয়ে ১০ বছরের মেয়ে অবাধ দিল।

বন্দী মনে মনে ভাবে, স্বাধীন ভারতে আমরা এমন বিচার রাখব না। তা'ছাড়া ১০ বছরের মেয়ের ধোব যদি প্রমাণ ও হব তবু তার এমনতরো ২০ বছরের কালাপানি হবে না। তাকে সংশোধন করার উদ্ভুক্ত ব্যবস্থা আমরা করব মহানুভূতি দিয়ে, দরম দিয়ে। স্বাধীন ভারতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জেল হবে না, কালাপানি তো নাই।

আরো একজন কয়েদী আঙ্গ নেই। জমাদারী বলে, তার যে কাল রোগ হ'ল। কান থালাস দিলে যড় লাচবে। বাড়ী থেকে কেউ নিতে এল না। কি করবে, এখানেই শেষ হ'ল। বন্দীর মনে পড়ে এই কালরোগ তার কেন হয়েছিল সেই স্মৃতি। সেটা ছিল ১৯৩৪ সন। এই কয়েদীকে দিয়ে, হাড়ি মেথরের কাজ করাতে। অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে শীতের ভোরেও তাকে লম্বা ময়লা পরিষ্কার করতে হ'ত। ভিতরে ভিতরে সে ধ্বন 'আর পারছেন না তখনো জোর ক'রে করাতে। একদিন অমনি এক ভোরে সে কাঁদু হাতে বলে পড়ছে, বলে আমি আর পারছি না। তবু জমাদারী তাকে মাগছে, বলে কাজে কাকি সেবার মতলব তোমার। পরিষ্কার তোমায় করতেই হবে। বন্দী বলে, জমাদারী, ছেড়ে দাও ওকে, ওর শরীর অসুস্থ। জমাদারী তেড়ে বলে, তুমি সরে বাও, এলবে তোমাদের কথা বলার নিয়ম নেই। ব'লে হিড়, হিড়, ক'রে টানতে টানতে তাকে নিয়ে দ্বার আর চৌচর, করতেই হ'বে কাজ তাকে, জর না ছাই হয়েছে। করালো তাকে দিয়ে কাজ। জেলারের কাছে বন্দী জানাঘ নাশিশ। লাভ নেই। জমাদারীর কথাই তারা বিশ্বাস করে। শেষে কয়েদীর জর ধ্বন থান্মোমিটারে ১০০°, ১০১°, ১০২° জিহ্বী উঠছে থাকে, দুধ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে তখন দ্বার কয়েদী হাসপাতালে কালরোগই হয়েছে বটে। বন্দী ভাবে আঙ্গ কোথায় গিয়ে বৈচ্ছে তুমি কালরোগ নিয়ে জমাদারীর নিষ্ঠুর হাতের পীড়ন থেকে। সেখানে তোমার ২০ বছরের

কয়েদীর? সমুদ্রের অন্তর গভীরে কত মণি মুক্তা ছড়িয়ে আছে, কে তার খবর রাখে? মুক্তি খেলে তারতর্ক্যে এইমত হীরের টুকরোর কাহিনী থাকবে সোনার অন্ধরে লেখা।

মাদারীয়া বেবে ধরনের। এরা যেমন সরল তেমনি আন্তরিক। কিন্তু তারা ঘন ঘন চুরি করে, পকেট নিয়ে আর ওলে আদে। বন্দী জিজ্ঞেস করে, কেন তোমরা এতবার চুরি কর আর ২৪ মাস করে জেল খেটে যাও? জীবন তোরা এমনি চুরি করে আর জেলে এসেই কাটাবে? জেলে এসে আমাদের বে কাজ করছ, কই, আমাদের কোন জিনিষ তো চুরি কর না। ছেড়ে যাও তোমাদের চুরি করার ব্যাবসা, সংপথে থাকো। মাদারী বলে, এখানে তোরা ভাল ভাল খেতে মিল, মোস্তাপাভা মিল, তেল সাবান মিল, আর চুরি করব কেন? বাইরে আমাদের ঘরবাড়ী নেই, যিতি নেই, ক্ষেত চাব নেই, বাগার পরবার নেই। আমাদের মাত শুণ্ড ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, হুব বেদী হ'লে চুড়ি বালা বিক্রি করে আর চুরি করে, পকেট কাটে। নইলে খেতে যেবে কে রে? পেটের জালায় চুরি করি। কি করে খাব বলে সে। বন্দী মনে মনে উপায় খোজে।

আরেক কয়েদী হাবলুং যা। বন্দী জিজ্ঞেস করে, হাবলুং বাবাকে তুমি কাটলে কেন? কয়েদী বলে, কেন কেটেছি? আমাকে খেঁতে দিতে পারে না, দিনের পর দিন মাছবে কত না খেয়ে থাকবে? হাবলুটা ও মাসের বাচ্চা, ওকে খাওয়াতে হবে না? নিজে না খেলে ওকে খাওয়াব কেনন করে? নিজে সন্ধ্যা বেলা ফিরে এসে বলবে, খেতে যে। কোথা থেকে রোজ রোজ আমি খাওয়াব? চুরি করেও তো দিন চলে না। খাওয়াতে পারে না, রোজগার নেই, আহার আহার মনে স্বগড়া করে - ভাত - রাগিনা বলে। আমিও স্বগড়া

করলাম। ভাত দেইনি বলে আমাকে মারতে এল। আমিও মিলায় এক কোণ বসিয়ে। বিনের জালায় রাগের মাধ্যম এমন কোণ পড়ন্ত হিদি, সে শেষ হয়ে গেল। রাগ করে না খেয়ে চলে গেল, আমি তো এমন শান্তি চাইনি। চোখের জলে তার বুক ভেলে যায়।

বন্দী ভাবে, স্বাধীন ভারতে আমরা এমন সমাজ ব্যবস্থা, এমন রাষ্ট্র গড়ে তুলব যেখানে মাছ স্বাধীন অন্ন পাবে। অভাবের অলঙ্ঘ্য দাতনাঃ মাছ যে কত অপকাজ করে তার অল্প নিজেও পরমুহুর্তে সে অল্পশোচনার মরে যায়, কিন্তু উপায় নেই। ইংরেজের রাষ্ট্র তার উপায় রাখেনি। শুণ্ড নিকশায়েক শান্তি দিয়েছে। স্বাধীন ভীত জালা, অভাবের তাকনা নীত্বকে তিলে তিলে ক্লিঙ্গ করে জুলেছে, তারা বিপথে দিয়েছে, কিন্তু তাদের তখনকার কাজের অল্প শে কি দারী? এই খেতে না পাওয়ার অল্প এবং তার কাজের অল্প দারী স্বার্থী মাছ নয়, দারী বৈষম্যমূলক অস্ত্রায় লম্বা ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা। স্বাধীন ভারতে এ ব্যবস্থা বলাতে হ'বে। আমরা আনব এমন রাষ্ট্র যেখানে সকলে হ'মুঠো খেতে পড়তে পাবে, কাজ পাবে, মাছ হবার উপায় দেখতে পাবে। সেখানে কোন মাদারীর চুরি করার দরকার হবে না, স্বার্থী হাবলুং যার স্বামীকে কেটে অহুতাপে দগ্ধ হ'তে হ'বে না। এরাই তো আমাদের দেশের লক্ষ কোটি অর্ধভুক্ত, উপবাসী মুক্ত জনসাধারণ। এরাই তো বিশাল ভারতবর্ষ। এদের মধ্যেই রয়েছি আমিও এক ভারত-বাসী। এই অসম্ম অবস্থা দূর করার অল্পই তো স্বাধীনতা সংগ্রাম। রাষ্ট্রী বনেছেন, সংগ্রাম করে বাজি আমরা কিমান মজুর প্রগা রাক প্রতিষ্ঠা করার অল্প। সে রাষ্ট্র আমাদের আনতেই হবে। করবে ইভা মরছে। *

দীক্ষা

শ্রীমতী বাম্বী রায়

সে জীবন ছুঁবে গেছে যাকে,
আগে তার পথে পথে ব্যাঘ্র বিচরণ ;
প্রতিদিন দেখা হ'ল জীবন-মরণ
সে অমর জীবনের নানে ।
কেনেছ কি তাকে ?
কেহ নাহি জানে,
চেনা পথে চোখে পড়ে চোখ একদিন ;
সহসা প্রাচীন
মুক্তি লভে কি নৃতন ?
মনে মনে মনের মিলন ।
নীচবে এসিয়ে ঝাই—
হাতে হাত ধরা পাই ।
নিবিড় নির্ঝম পথে ছাড়ি যে-আশন ।
শত নিষেধের বেড়া,
কণ্টকতে ঘেরা,
আমারে রাখেনা দূর ।
বিপুল স্বপ্ন
গনে গাব কানে কানে,
—ঘর ছাড়া স্বর ।

সে জীবন ছোঁয় যদি কারে,
একটি মুহূর্তে হয় ক্রান্ত বিবর্তন ;
একটি মুহূর্তে করে পুরানো জীবন
বিভিন্ন পাতার ভায়ে ।
ভনি বায়ে বায়ে
রোমন মুকুটে কানে বিহ্বল ফাগুন ।
পূর্বে আকান্দেতে জাগে আলোর আগুন,
রকে রকে গানি গার বিরোধ-নাপিনী ।
চেনা মনে কুলে ঘাই,
তোলা মনে তিনি ।

সে জীবন পূর্বের মতন,
নিষেধে উন্নত তার ভেদি অছকার ;
নিষেধে অধায়ে তার ক্রিয়-বিস্তার ।
ছিন্ন ভিন্ন তথ্যোজাল পড়ে বলে বলে ।
এহুপ্র আলোক
যে ছিল বিবরে গুপ্ত,
জাগে সে অন্তর ।
ভাঙে তার স্রু—
চির-জীবনের ভাঙে চির কালযুগ ;
প্রথম পূর্বের নীতি অনল-নীকার
জুলায়ে শাস্ত্র হুখে হানে ।
সর্বহারা টানে
বিরাগী পথের বুকে ।
অধীনতা-হুখে
মরণ আগত লানে বিপ্লব-বস্ত্রাব,
সে জীবন যদি ছুঁবে বায় ।
সে জীবন ছুঁলে কি আশায় ?
তাই চোখে যত নাই ?
নয়-নীতি পাই,
এম নয়, ফল নয়, ঠাণ নয় আর,—
তাই কি কণ্টকে মম বাম্বী তিতিকার ?
যদি তুবি এলে জ্যোতির্ঘর ;
হৃদয় ভাঙিয়া মম
এলে প্রিয়ভম,
বিরাগী লজ্জাগী ন্যমি ;
এসো আরও কাছে ।
ব্যাপ্তের মোতে
হৃদয়-অতীত হ'তে
বর্তমানে আজি
হে মিলিত জীবন-প্রবাহ,
এসো, এসো আরও কাছে ।
শোন বাজে, ওই বাজে-
অপল যাকর বাজে
শোণিতের বায়ে ।
কুমরে আমার
অগ্নিগিরি-বাহ
সিঁথে গেল হাদমের চির অধীকার
প্রিয়ভম, পায়েতে তোমার ।

হোমগ্রি

(পূর্ণ-প্রকাশিতের পর)

জীবনবৃত্তান্তের বঙ্গোপাখ্যান

উনিশ শো পত্রিশ সালে ডিসেম্বর মাসে একটা বড় মারাত্মক ঘটনা ঘটিয়া গেল। পরীক্ষার প্রয়োজন না পাইয়া একটি ছেলে—বোভিংএই থাকিত—আফিং বাইয়া বোভিংএই আত্মহত্যা করিল। সংবাদ পাইয়া তিনি তদ্বিষয়ে হইয়া গেলেন। তাহাকে ঠাট্টাইবার বহু চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। তবু সে বাচিল না। সেই ছেলেটির মৃত্যু তিনি বাহা করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া ছেলেটির সন্ত-আগত পিতা কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—
“আমার ছেলের দুর্ভাগ্য, তাই আপনাদের মত মানুষের কাছে পড়তে গেলে না, থাকতে গেলে না। আজ ওকে বাঁচাবার অন্তে যে চেষ্টা আপনি করলেন আমি বাগ হয়ে তা পারতাম না। আপনি যে আমার ছেলেকে আমার চেয়ে কম ভালবাসতেন না এই কথাটা হৃৎকের মধ্যেও অঁকেন গেলাম। এই ভেবে সাধনা পাব যে আমার ছেলে বতরিন বেঁচে ছিল, খুব আরায়ে ছিল। কিন্তু আমার কপাল।”

ঐ ঘটনাটিতে চন্দ্রবাবুও বড় আঘাত পাইয়াছিলেন। ছেলেটির কথা মনে পড়িলে তাঁহার মনে হয়—হৃৎকাগা ছেলে, বুদ্ধিতে পারিলি না, পরীক্ষার পাশ করা আর জীবনের মূল্য এক নহে! তুমি আগামীবার তো পাশ করিতে পারিতিস, কিন্তু একটা জীবনের বশলে কি আর একটা জীবন পাইবি? হায় রে!

ঐ হাস্যামিটিতে না মিটিতে উনিশ শো ছত্রিশ সালের আত্মহারীতে আবার মূল কমিটির ইলেকশনের হাস্যামিটি আসিল। উনিশ শো ছত্রিশেও একটা ইলেকশন পিছাছে। তাহাতে বহানিষয়ে পূর্ণবর্তী সভা দুইজন—রাধ সাহেব আর সাবরেজিষ্টার বাবুটি আবার সভা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। দেবারেও সদানন্দ বাবু পূর্ণ-বারের মত ভোট আপনাদের পছন্দমত প্রোককেই দেওয়াইলেন। এবারে কিন্তু সে বকমটি ঘটিল না। বরাবর যেমন ঘটনা আদিতোছে ঠিক তেমনিটি বে ঘটবে

না তাহা চন্দ্রবাবু এবং কাগিবাবু বুঝিয়াছিলেন। এইবার দুইটি পদের মন্ত্র প্রার্থী ছিল এগার জন।

ভোটের পূর্বে সদানন্দবাবু এখানে উপস্থিত ছিলেন। এতদিনে চন্দ্রবাবু এবং কাগিবাবু সদানন্দবাবুর অত্যন্ত কণ্ঠের বৌদ্ধিকতা বুঝিতে পারিলেন। সদানন্দবাবু শিক্ষকের লইয়া এতকাল একটি নিষ্কর্তৃক হুদ রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহারই ফলে তাঁহার বারবার বহুপ্রকার আঘাতের সম্মুখীন হইয়াও একবার অন্তর সম্মতকির বলে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছেন। তাই সম্মতকিকে স্মরণ করিবে, সম্মতের বিকলচরণ করিবে বলিয়া যে-কোন প্রার্থীকেই তাঁহার সম্মত করিবেন তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবেন না এই তাঁহারের নীতি। ইহারই মন্ত্র শিক্ষকের লক্ষ অনুরোধ চন্দ্রবাবু ও সদানন্দ বাবুকে কমা করিতে হয়। মাঝে মাঝে চন্দ্রবাবুর কেমন ভিত্ততা আসে। সম্মতকে মনে হইবে যেন যাবতীয় মন্ত্রের কণ্ঠকে স্মরণ করা ছাড়া ইহার কোন কাজ নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পালাইতে ইচ্ছা হয়। কখনও বা বিকলচরণ করিয়া উহাকে ভাঙিয়া ছুঁড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু উপায় নাই। হাত পা যেন বাঁধা। তাহা সবেও যখন বেশী বেঘনা অসহ্য করেন তখন প্রতিবাদ করেন এবং সেই অসহ্যকারী সম্মতকে পরিচালিতও করেন। আগে তাঁহার এ শক্তি ছিল না। এখন হইয়াছে।

দ্বাদশ। এবার এগার জন প্রার্থীর মধ্যে পূর্ণ বারের দুইজনও ছিলেন। আর বাকী সকলেই এই গ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, দুই তিন জন মন্ত্র দানী ব্যবসাদার। ভোট হইয়া গেল। সদানন্দবাবু ও তুলের মাত্রারদের অধমোদিত প্রার্থী দুইজন কোথায় তলাইয়া গেলেন। দুইজন অর্ধ-শিক্ষিত ব্যবসাদার আনিয়া দুইটি মন্ত্র চেঁচায়ে বলিল।

এ এক অকৃতপূর্ণ ও বিভিন্ন ব্যাপার।

এমনি করিয়া আরও কয়েকটি কাটিল। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ। সকাল বেলায় কাজ করিতেছেন এমন সময় অকস্মাৎ তাকাইয়া দেখিলেন একটি নীৎকার শব্দ কালো হুক তাঁহার সামনে ঠাড়াইয়া আছে। সে

তাহাকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল—চিনতে পারছেন আমার মশায়?

—না তো? বলিয়া চন্দ্রাবু অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন, তারপর বলিলেন—তুমি সাক্ষী গোপাল না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল খালাস পেয়েছি। বাড়ী ফিরে চলাম।

—কলাপ হোক বাবা। মঙ্গল হোক। শরীর তোমার বড় খারাপ হয়ে দিচ্ছে।

—আজ্ঞে তা কোঁ বাবেই।

অকস্মাৎ চন্দ্রাবুর কণির কথা মনে পড়িল। সেই বড় বড় উজ্জল চোখ, লামনের দুইটা উঁচু পাত, মোটা নাক, সেই অস্বাভাবিক হুল্লর ছেলেটি। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কণি, কণি কেমন আছে?

—কণির খবর অনেকদিন পাইনি। বাস ছুয়েক আগে তাকে অস্ত্র জেলে নিয়ে গেছে। তখন ভাল ছিল।

—সে কেনে আছে?

—চন্দ্রাকার আছে। হাসি খুশী, পড়া শুনা, কত নতুন নতুন। এখানকার চেয়ে ভাল আছে।

—ভাল।

চন্দ্রাবু খুশী হইলেন। আহা, সে ভাল থাকুক। সেই প্রাণধান দুঃসাহসী ছেলেটি! সাক্ষীগোপালের সহিত সেদিন পুরা দিনটা নানান কথা বলিয়া কাটাইলেন। বিকাল বেলায় সে বাড়ী চলিয়া গেল।

বাড়ী হাইবার আগে সাক্ষীগোপাল একবার মৌলবী সাহেবের কথা বলিল। চন্দ্রাবু তাহার কাছে শুনিলেন মৌলবী সাহেব সনাত্ত অস্থ। চন্দ্রাবুও অনেকদিন মৌলবী সাহেবকে যেমনে নাই। একত্র তাহার মনে হঠাৎ কেমন একটা অপরাধ বোধ করিলেন। তিনিও তাহার সঙ্গে মৌলবী সাহেবকে যেখানে পেলেন।

মৌলবী সাহেবের দোকানের সামনে গিয়া বেধিলেন বরজাটা চেমানো। চন্দ্রাবু বরজাটা খুলিলেন। ঘর অন্ধকার হইয়াই ছিল। বরজাটা খুলিয়া দিতে তবু আলো ছুটিল। অপরাহ্নের সুদূর আলোয় চন্দ্রাবু

বেধিলেন মৌলবী সাহেব শুইয়া আছেন। মাটির উপর খেদুর পাভার চাঁটাই, তাহার উপর চিত্র বিভিন্ন করিয়া সেলাই করা একটি মরলা কাথা, মরলা দর বাঁশ। তাহারই উপর তিনি শুইয়া আছেন। চন্দ্রাবু ঘরে ঢুকিতেই তিনি তাতাতাতি বিছানার উঠিয়া বলিলেন। বহুকাল পরে চন্দ্রাবুকে আগনার ঘরে দেখিয়া আতর্ষ হইলেন। সারা মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। তিনি পরমানন্দে আত্মার আনাইলেন—আইয়ে, আইয়ে, মেহেরবাণী করুক বৈঠিয়ে।

চন্দ্রাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—আগনার আর হয়েছে মৌলবী সাহেব? কবে থেকে?

—আর নেহি সাহেব। তবিরং ঠিক নেহি হায়ে খোড়া বিনলে।

চন্দ্রাবু তাহার বিছানাতেই বসিয়া পড়িলেন। মৌলবী সাহেব হা হা করিয়া উঠিয়া বলিলেন—উখানে মোড়া আছে। উঁ পুর হুহন।

চন্দ্রাবু তাহার পাশে বসিয়া গুলি কপালে হাত দিয়া তাহার পেছের উত্তাপ অনুভব করিলেন। আর আছে সনাত্ত। বলিলেন—কালকে আত্মার বেডিং এর জাকারকে নিয়ে আসব। আপনিলে উঁন। আবার আত্মার কুল আত্মন।

মৌলবী সাহেব একটু হাসিলেন। মিনশৈবের সুদূর আলো যেমন করিয়া অন্ধকারে সনাত্ত লাভ করে, তেমনি সে হাসিটুকুও ধীরে ধীরে দিলাইয়া গেল। বলিলেন—আউর হো গেয়া তাই সাহেব। খেলু খতম হোনে কা দিন আগিয়া?

অকস্মাৎ মরলা কপাল বেদনার মত মৌলবী সাহেবের কথাগুলি চন্দ্রাবুকে আঘাত করিল। চন্দ্রাবু ভিতরে চোখ দুইটা সমল হইয়া উঠিল। তিনি আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিলেন।

কিছুক্ষণ হইতে মৌলবী সাহেবের চন্দ্রাবুর মত নিঃশব্দে শুইয়া ছেলেদের পাঠ্যবার ব্যবস্থা করিলেন। জাকার আত্মা দেখাইলেন। প্রত্যহ বিকালে নিজে গিয়া কিছুক্ষণ করিয়া তাহার বিছানায় তাহার মাথার

কাছে বসিয়া থাকিলেন। প্রথম দিন কালিবাণু তাঁহাকে নিবেশ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—চন্দ্রবাবু, আপনি আমার একটা কাণ্ড না করে দেখছি ছাড়বেন না।

চন্দ্রবাবু ক্ষুণ্ণ কিছুই বলেন নাই। কেবল ভীত ভীতভাবে তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়াছিলেন।

ছেলেদের সম্মুখে পাইয়া আমার মৌলবী সাহেবের মূণে হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু শরীর দীরে দীরে ধারাপ হইতে লাগিল।

দেখিন সখ্যা বেলার মাথার কাছে লঠন জলিহেছিল এক পাশে চন্দ্রবাবু, অল্পপাশে একটি ছেলে বসিয়া বাতাল করিতেছিল। মৌলবী সাহেব অকস্মাৎ চন্দ্রবাবুর মুখের

দিকে চাহিয়া বলিলেন—ভাই সাহেব?

তাঁহার হাত্তে ও কপালে আপনার দুইটা হাত রাখিয়া বলিলেন—বন্দু!

মৌলবী সাহেবের গলাটা কান্নার চক্ক হইয়া আসিল, বলিলেন—তবে চলে ভাই? হাম বাতে হে? তাঁহার চোখ হইতে কয় ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। চন্দ্রবাবু তাঁহার মুখের উপর হুকিলা পরিলেন।

তারপর বেড় ময়লায় তিনি ছটকট করিতে করিতে বলিলেন—জানাসী গুলু যে ছোট্টই কেয়ারী খোল যে! বরজা জানাসা খুলিয়া দেওয়া হইল। সেই উজ্জ্বল ধারণেই বোধহয় মৌলবী সাহেব চিরকালের জন্য বাহির হইয়া অনন্ত অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন।

আঠারো

মৌলবী সাহেবের মৃত্যুর পর হইতেই যেন চন্দ্রবাবু অস্থির করিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়স হইয়াছে, তাঁহার কাজ করিবার শক্তি যেন দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। কথাটা বড়ই বেঈমান মনে হইয়াছে, ততই উল্লাহের সঙ্গে সেই বিয়্যাকাকে চাপিয়া কাজ করিয়া চলিতেছেন। মুখে প্রসন্ন হাসিটুকু, লাগিয়াই আছে। দিব্যে মলাটের অক্ষর দুইখন্ডের কীপ হাসিটুকুর মত সেইটুকু অক্ষর তো আছেই। কিন্তু যেন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

মৌলবী সাহেবের মৃত্যুতে মূল একদিন বন্ধ ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু চন্দ্রবাবুরই নয়, সমস্ত বয়স শিক্কদের মনে এই একটু চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। কালিবাণুর যখন তখন শরীর ভাল থাকে না। চিত্ত বাবু অস্থির অস্থির বাড়িকটা যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। হরিয়ালবাবু মাঝে মাঝে ডিপপেনসিয়া ও অথলেন লতাই ভোগেন। কেবল চন্দ্রবাবুরই কিছু বাহির হইতে বোধী যায় না এমনি করিয়াই মুখে মুখে দাঁড়ান কাটিয়া আটত্রিশ সাল পড়িল। নিশ্চিন্ততা ও শান্তির মধ্যেই ফুলের দিনগুলি কাটিয়া চলিল।

পরবর্ত্তে ছুটির মুখেই নীতানোথবাবু হিটোরার করিলেন। তাঁহার গত কিছুদিন হইতে শরীর ভাল হইতেছিল না। তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিলেন। ঘরের অবস্থা ভালই। তিনি একটু কল্পনাবিলাসী মানুষ। নদীর ধারে উচু ভাঙ্গার স্থল বাড়ী করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে তেমন মাটির বাড়ী মেথিলে আশ্চর্য্য না হইয়া উপায় নাই। নির্মিতোথী শায় মানুষ। কোন দিনই ফুলের কোন কামেলার মধ্যে দান নাই। তাঁহার কর্ম্মে আছে চাকরী ছাড়িয়া বাকী দিনগুলি অনাড়ম্বর শান্তির মধ্যে পড়াশুনা করিয়া কাটাইবেন। তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিবার সময় মাঠারবা বার বার তাঁহাকে নিবেশ করিলেন। কিন্তু কোন দিন যেমন কাহারও কথা প্রতিবাদ করেন নাই, তেমনি কাহারও কথা পোনেন নাই। আরও শুনিলেন না। চাকরী ছাড়িয়া দিলেন।

মাঠারেরা অস্থির করিলেন তাহাদের দল যেন ডাঙ্গিয়া গেল। বিল পড়িল বংশের পূর্বে যখন গ্রাম পাঁচ সাত বংশের ভিতর সকলে চাকরী লইয়া ফুলে ঢোকেন তখন সকলেই-তরুণ কৈ যুবক। আজ এতকাল তাঁহারা সকলে মিলিয়া যে কঠিন ব্যাহ রচনা করিয়া নিরাপদে বাস করিতেছিলেন তাহাতে প্রথম ভাঙন ঘরিল।

আবার নতুন মাঠারের প্রবেশন, একজন ইতিহাসের শিক্ক চাই। ইংরাজী কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। এ্যাসিস্টেন্সও কত আসিল। তাহার মধ্যে এক ডোলানাথ সেনকে নিয়োগ করা হইল। সে বি, এ.তে,

ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লইয়া পাস করিয়াছে। সকলে এই রকম শিক্ষক এত অল্প বেতনে পাওয়ায় আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। নবনিযুক্ত ভোলানাথ বাবুকে গরমের ছুটির পর স্থল বোকার দিন হইতে চাকরীতে বোগ দিতে দেখা হইল।

পরমা দুর্লভ। স্থল স্থল। সেদিন হাটের দিন। চন্দ্রাবু কি কারণে হাটে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া বারান্দায় উঠিতে গিয়া সেবিলেন একজন তরুণ ব্যক্তি খালি চেয়ারটার বসিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে চাহিতেই বারান্দায় উঠিলেন। লোকটিও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া শঙ্কিত হইল। চন্দ্রাবু মনে হইতে লাগিল কোথায় দেখিয়াছেন ইহাকে! বড় পরিচিত মুখ। তাহার মরণ শক্তি বড় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বড় ব্রহ্মর মুখ তো! অকস্মাৎ মনে পড়িল অশোক! হ্যাঁ, অশোকই তো! কেবল সে বড় হইয়াছে। তিমির-নাথের নতই লম্বা হইয়াছে। সামান্য গৌরব রাখিয়াছে।

লোকটি তাহাকে হাসিয়া প্রণাম করিল। চন্দ্রাবু সম্মতি বিহ্বলের সঙ্গে বলিলেন—অশোক না?

সে হাসিল, বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ?

চন্দ্রাবু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোথা থেকে এলে?

অশোক হাসিল, বলিল—আপনারা তো আমাকে চাকরী দিয়েছেন।

—চাকরী! তোমাকে!?

—কেন ভোলানাথ সেনকে?

—তুমি ভোলানাথ সেন না কি?

এবার অশোক সরবে হাসিয়া উঠিল, বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। অশোককে ভোলায় পরিণত করতে আর কতক্ষণ লাগে? আর আমি যিঁষি নিজের নামে দরখাস্ত দিতাম তা হলে চাকরী দিতেন না। নানান রকম লম্বে করতেন।

চন্দ্রাবু বহুকাল পরে আপনার একজন প্রিয়তম ছাত্রকে পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু কোন আনন্দ ব্যতীত কি কর্তব্য প্রকাশ করা তাহার রীতি নয়।

তিনি অশোকের কথায় হাসিয়া বলিলেন—তুমি কি মনে করছ আর তোমাকে লম্বে করছি না? বেশ লম্বে করছি তোমাকে। তিমির আই সি. এল; আর ছেলে তুমি। তুমি ফার্স্ ক্লাস অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেছ? তুমি এম. এ. পড়বে না? তুমি তার বসলে এখানে পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে চাকরী করতে এসেছ? এতে লম্বেই হবে না?

অশোক হাসিতে লাগিল, বলিল—লম্বেইটা একটু পরে প্রকাশ করবেন হাটার মশায়। এখন আমি একটু বিজ্ঞান করি। সম্ভব হয় যদি তা হলে—এই যে, এই ঘর খানাতে আমি থাকতাম—এই ঘরখানা আমাকে দেবেন। আমি স্থান করে ধেরে নি। তারপর সব বলক আপনাকে।

দুপুরে সমস্ত শিক্ষকের সহিত তাহার বৈঠক হইল। তাহার তাহাকে শিক্ষকত্বপে আবার আবির্ভূত হইতে দেখিয়া সকলেই খুশী হইলেন। আশ্চর্য্য হইলেন তাঁদের চেয়েও বেশী।

সকলের সামনেই সে লম্বেই উল্লস করিল। আঁতে সে টেনু' হইয়াছিল। এবারই সে-বি. এ. পাস করিয়াছে ইতিহাসে ফার্স্ ক্লাস সেকেন্ড হইয়া। তিমির-নাথ রিটারার করিয়া কলিকাতায় বাড়ী করিয়া বাস করিতেছেন। সে বাহা কিছুই করে পিতা তাহাকে কোন দিন বাধা দেন নাই। বরং উৎসাহ দেন। বি. এ. পাস করিয়া তাহার আর পড়িতে ভাল লাগে নাই। বাবাকে সে কথা বলিলে তিনি বলিলেন—‘সে তো ভাল কথা। Now just see something of life—any life you want.’ তাহারই কলে সে এখানে আদিয়া হাজির হইয়াছে।

তাহার কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য বিমিত, পানিকটা বিরক্ত হইলেন। আই. সি. এল.এর ছেলে, হীরাখ টুকরা ছেলে। কলিচৌকিত পবীক দিয়া অনায়াসেই বাপের মত বড় চাকরী পাইতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া এই পাড়াগায়ে পঞ্চাশটাকা মাইনের হাটার করিয়া নিজেই নষ্ট করিতে আদিয়াছে। এ নিজে

নষ্ট করা নহে তো কি ? আর যেমন ছেলে তেমনি বাপ !
 ব্যাধি সেওয়া দূরের কথা ছেলেকে এই সমস্ত দিশদুটে
 কাষে উৎসাহিত করেন। কত রকমের মাহুই যে
 সংসারে আছে তাহা ভাবিয়া মাটার মহানদের আশ্চর্য
 হইয়া যান।

কেবল এ কথা ভাবিলেন না চন্দ্রবাবু। এই তরুণটিকে

পাইয়া তাঁহার মন ভরিয়া উঠিয়াছে। সকলেই তাহাকে
 প্রসন্ন প্রেমের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রবাবু তাহাকে
 একেবারে অন্তরেও গ্রহণ করিলেন। পারিলেন না কেবল
 কাদিবাবু। তাঁহার মনে হইতে লাগিল এ ছেলের
 বার্ষত্যাগের পক্ষান্তে যেন 'কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য'
 আছে।

৩শে জানুয়ারী, ১৯৪৮

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতঃপর

হে ঈশ্বর,

তুমি যেন হিন্দু বংশে জন্মেছি একমা ;

অন্ধকার খরিজীর গর্তকোষ থেকে

চূর্ণহৃৎ তমিলার আবরণ ছিড়ে

ইতিহাসহীন সেই লক্ষ কোটি বংশের বনিকা পাবে,

যে ভারত জন্মেছিলো নূতন আগোকে ;

আজ তার নতুন হোলে !

এবারের ব্যাধি মুক্ত করি হৃৎপদে

সংকায় সংকোচে,

এবারের ব্যাধিপথে আলো নেই, 'ডালো নেই',

অন্ধকার ডানা মেলে আছে

নৃসিংহীন শহুরের মতো,

কোনো এক 'গুডলাই' মেবে

ছিড়ে বেবে জলন্ত বৌবন,

ভেঙে দেবে বুদ্ধিদীপ্ত ভ্রমে গড়া ধৈর্যের দুর্গকে।

হে আকাশ ! তোমার অনন্ত নীলে

বহু বৃক্ষ সবই নিঃশেষিত ?

পারোনি এচও তেজে জলে উঠে বকোর মতোন

দীর্ঘ দীর্ঘ ক'রে দিতে পুরাণো পৃথিবী

অভিশপ্ত সে বৈকালে ?

হে স্রীব হৃদায় !

তোমার গভীর ধনি শুনেছি অনেক

আমাকে প্রাণে

তিনি তিনি বর্ণের অশান্ত ধারায়

প্রভাতে নিশিথে !

অবাচীন ! পুড়ে ম'রে নিতে হ'ও, এ ভয়েও মতো,

আর দেখিও না মুখ,

ধ্বংস হও ধ্বংস হও তুমি !

হে সমুদ্র রত্নের আকর তুমি,

তাই তব বহুগর্তা নাম ;

অনেক সফর তব,

বতনের মূল্য বোধ তোমার কাছেতে

পূর্ণ মূল্য পাবে,

এই আশা ছিলো !

আজ ভাবি, বিচ্ছেদের পূর্ণ কলোচ্ছ্বাসে

পারোনি দ্রাবিত ক'রে সমস্ত যেদিনী

সে কলংক ধুয়ে দিতে ?

ধ্বংস হও—ধ্বংস হও তুমি

হে ঈশ্বর,

সংখ্যাহীন আত্ম গৌরবে

ব'সে আছে অচল অটল

—এ পাপের চাহিনা মার্চনা,

কালাতীত জীবনের প্রবল গর্বেতে

অন্ধ তুমি—মূঢ় তুমি

অনেক—অনেকবার ক'রেছো মার্চনা !

যে রক্তে ভিজেছে মাটি,

সে রক্তে প্রতি কণিকাতে

হিন্দা তার ধ্বংস-লিপি লিখে গেয়ে না কি ?

প্রাসাদের সেই লর লাগি

আদি আদি আসি ! !

পদ-প্রকরণ

ভবঘুরে

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—ঋগত পরিবর্তনশীল : ঋগতের বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া, ঐ দেশের অধিবাসীদের হৌতি-মৌতি, চাল-চলন, সামাজিক ব্যবস্থা লোক চরুর অন্তরালে দীরে দীরে পরিবর্তিত হতে থাকে : পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হুগে হুগে দেশে দেশে সাহিত্যেরও পরিবর্তন হয়ে এসেছে। শুধু সাহিত্য কেন—সাহিত্য ছাড়া মাহুৎ ওাত্তার পুংপুত্ববদের নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা কি কেলেকারী থাকিয়েছেন—সেখুন না! তাঁদের সিদ্ধান্ত বেনে নিলে (না যেনেও অবস্ত উপায় নাই—এখনই হুস্ত এটিব বোমা বের করে পিঠপুকবের প্রাক সাববার ড্র দেখাবেন) দেখতে পাই—এককালের বনবাসী, অসভ্য ‘বানরের’ পিছনের সিকটা ছেটে কেল দিয়ে তাঁরা আধুনিক, জন পদবাসী হুস্ত ‘নর’ বানিয়েছেন। মাহুদেরই এখন এই অবস্থা—তখন তাদের তৈরী সাহিত্যের যে আরও দুঃবস্থা হবে—তাতে আর আশ্ব কি!

সাহিত্যের এই পরিবর্তনের কলে ব্যাকরণ তাঁর মাহাত্ম্যর আনলের মাল মশলা নিয়ে আর সাহিত্যকে অহুসরণ করতে পারে না—তখন ব্যাকরণেরও পরিবর্তন করা দরকার হয়ে পড়ে। কখনও কখনও ব্যাকরণের এক একটা আখ্যায় নুতন করে লিগবারও প্রয়োজন দেখা দেয়। বর্তমানে ব্যাকরণের ‘পদ প্রকরণ’টাও ঠিক ঐ অবস্থায় এসে পৌছেছে। বেকালের ব্যাকরণ প্রণেতারা হরি দুগাকরেও ধানতে পারতেন—যে ভবিষ্যতে ‘পদ’ এই বকন বিপন ঘটাতে পারে—তাহলে তাঁরা নিচ্চই আগে থেকে সাবধান হতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বেকালের লোকেরা পদ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামতে চাইতেন না। তাই পদ প্রকরণের যে বিকৃতভাবে আলোচনা করার দরকার হ’তে পারে—সেটা তাঁদের মাথায় আসে নি।

সেকালে যা পারে হয়ে থাকুক—একাল নিয়েই

আমাদের কারবার। একাল ত’ আর সেকাল নয়। পদ মধ্যমা একালে বহুগুণ বেড়ে গেছে। ‘পদ’কে কেন্দ্র করেই একালের মাহুদের হাবভাব, চাল চলন, চলা কলা, নেতৃত্ব-কামী—সব কিছু নিরুদ্বিত হয়ে আসছে। অবস্ত হুগে হুটে পদবিজ্ঞা কথটা চরম নিরুদ্বিত। হুগে বলতে হবে—‘পদে আমার কিছুমাত্র সোত নাই’, ‘পদে মোর কিবা প্রয়োজন?’ আর অবস্ত তাহার লকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে—‘সেহি পদ পদমধুলাওনু।’ এটাই হচ্ছে ঠিক আদর্শ মেতার বোণা কাশ।

পদ গৌরব দিন দিন লশিকলার যত বেড়ে চলেছে—যেহে অনেকেই নামের মাহুতানে ‘পদ’ বোণ করে দিয়ে নিজেদের গৌরবাবিত কয়েছেন। হরিপদ, রামপদ, স্ত্রামাপদ থেকে আরম্ভ করে রমাপদ, বামাপদ পর্যন্ত এসে পৌছেছে। অবস্ত এতে পদের মধ্যমা বিশেষ কিছু বাড়ছে না—শুধু গীরা ‘পদ’ ধারণ করেন—তাঁরাই মধ্যমা হন।

তারপর শত্রু নিয়ে গীরা মাথা ঘামান—তাঁরা জানেন যে—শত্রু বলে—‘সেবা হি পরমো ধর্ম’। সব বকযেই সেবার মধ্যে আবার পদসেবাই হচ্ছে প্রেট সৈবী—এতে ধর্ম, অর্থ, কাহ মোক্ষ—চতুষ্পর্গ হল লাভ হয়। এই সেখুন না—কিছুকাল আগে পর্যন্ত এক স্রেণীর লোক—একটা বিশেষ জাতীয় সিংহের পদসেবা করে বাড়ী, গাভী, জুড়ি ত বাগিয়েছেনই,—তারপর পৈতৃক নামটার সঙ্গেও জুড়ে যেওয়ার জন্য একটা করে সেজুড় উপহার পেয়েছিলেন। আজকাল অবস্ত সিংহ মহাপদ পাতাড়ি গুটিয়ে নেওয়ার দেখসেবায় নামে চুটিয়ে প্রজুপদ সেবার ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছেন না। অবস্ত প্রাকৃতিক নিয়মেই কোন বান একেবারে নুত (vacant) অবস্থায় থাকতে পারে না। কাজেই তাঁরা ‘পদ’জাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের পরিভ্যক্ত পদে আর একবল অধিকৃত হয়েছেন। শুধু পদাধিকারীরা একই জোাল বদলিয়েছেন—এই বা তাক্য।

আমাদের জাতীয় জীবনে পদের অবস্থান লক্ষ্যে আলোচনা করতে গিয়ে পদ্য পাঠক পাঠিকার কাছে



The fountain head of Beauty is Health, and no effort to create Beauty can succeed unless it is supported by a Healthy Body. One of the most important factors in maintaining a Healthy Body is the secretion of bile; Stearns' Bicolates increase the secretion of bile to a marked extent, and help the assimilation of food, thus enriching the blood and creating sound Health, the foundation of real Beauty. A scientific remedy of

proved efficacy, Stearns' Bicolates are highly recommended by the medical profession.

BI-COLATES
STEARNS



অপদস্থ হ'তে চাই না। আর ডবীয়াস সম্বন্ধেও থেকে
আসন্ন করে আধুনিক কালের 'ভাষাসিদ্ধ' পর্যায় যে পদের
গুণীকৃত করে শেষ করতে পারেন নি—আমার মত
এ বস্তু ক্ষুদ্র শ্রেণীর এবং তত্ত্বাত্তিক ক্ষুদ্র এই দেখানীর
সাধ্য কি—সেই পদের মহিমা বলে শেষ করতে পারি ?

পদ ধার আছে—তিনিই ত সম্পদের অধিকারী—আর
পদধীন ব্যক্তির বিপর্য—পদে পদে। পদবুদ্ধিতে—(চলতি
ভাবের ব্যকে বলে পদাভ্যাসী) কে না সম্বোধন ? একটী
মাত্র 'পদ'ও কারও মন উঠে না—তাই গৃহীতবোধে একপদী
জীব মেলে না—বিপর্য, বিপর্য, চতুর্পদ—কেউ কেউ বা
ভারও বেশী অলম্ব্য করে আছেন। পদভ্যাগ বা
পদচ্যুতি কোনটাই বিশেষ আশ্রয়স্থানকর অবস্থা নয়।
'পদ'ই যদি ভ্যাগ করলেন—সংসার সমুদ্রে চলবেন কি
সমল করে ? কাণ্ডেই ওপাশ মাতান বুদ্ধিমানের কাজ
নয়। মহাভারতের পদাঙ্ক অলম্ব্য করে—পদ ঝাঁকড়ে
গ্যাট হয়ে বসে থাকুন—ছুটী লোকেরা বা পারে রটাল—
তাতে কি আসে যায় ?

এ হেন যে পদ—তাকে কি না সেকালের পণ্ডিতরা
বিশেষ আদর দিলেন না। তা হলেই না থাকেন ?
তারা ত সেকালের রাজ দরবারে টিকি নেড়ে ভাত খেতেন—
পদের মহিমা তারা বুঝবেন কোথা থেকে ? বুঝেছিল
যে দুগের বৈষ্ণব কবিরা তাই তাঁদের পদাবলী এখনও
অমর হয়ে আছে। আর বুঝেছেন আশ্চর্যের কংগ্রেসী
বাবুবা পরাম্বুতে তারা বনগ্রাম ঢেলে নিয়েছেন।

যাই হোক—পরম্পরায় এমন বুদ্ধি পেয়েছে যে
ব্যাকরণের সমস্ত পদ প্রকরণটাই আগাগোড়া নতুন করে
লিখবার দরকার হয়ে পড়েছে। এই নতুন পদপ্রকরণটা
কি রকম হবে—তার কিছু নমুনা উপস্থিত করছি।
পণ্ডিতেরা এই সম্বন্ধে বিচার করে দেখবেন আশা করি।

সংজ্ঞা—যে অধিকার বলে একজন বাহুব অস্ত্র
মাল্যের উপর প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব করে সেই অধিকারকে
'পদ' বলে।

পদ সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার—বিশেষ, বিশেষণ, সর্বনাম,
অব্যয় ও ক্রিয়া।

বিশেষ পদ—যে পদাধিকার বলে বিশেষভাবে সোধন
করার সুবিধা হয় সেই পদকে বিশেষ পদ বলে। উদাহরণ
নিম্নোক্ত।

বিশেষণ পদ—যে পদের নিম্নে বিশেষ কিছু কাঙ্ক্ষ
না থাকিলেও অস্ত্র পদের বিশেষণ বা অলম্ব্যরূপে অবস্থান
করেন—উদাহরণকে বিশেষণ পদ বলে। যথা—
পার্শ্বমেট্রারী শ্রেণীভারী, ডাইন প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি।

সর্বনাম পদ—যে পদের নামই সর্বব্য—সেই পদকে
সর্বনাম পদ বলে। যথা—ইংলণ্ডের রাজা, জনিফা এবং
চীন রাষ্ট্রের সভাপতি (President), আমদেমে
হেপের প্রাদেশিক গভর্ণরপণ এবং চূর্ণাপুটি আরও
অনেকে।

অব্যয় পদ—যে পদের কোন ব্যয় নাই, অর্থাৎ
পদাধিকারীকে পদ রক্ষার জন্য প্রকৃত বা গোপন বৃত্তে
নাথতে হয় না—তিনি অমর, অমর, অমর হয়ে পদে
অধিষ্ঠিত থাকেন—সেই পদকে অব্যয় পদ বলে। যথা—
কোনও প্রতিষ্ঠানের আত্মীয় সদস্য (life member),
স্থায়ী সম্পাদক (Permanent Secretary) ইত্যাদি।

[বিশেষ প্রত্যয়—(১২) কোনও কোনও ক্ষেত্রে
অস্ত্র পদাধিকারীগণও অব্যয়ের পদে উন্নীত হওয়ার
চেষ্টা থাকেন।

২২—পূর্বকালের ব্যাকরণে অব্যয়ে ক্রিয়, বিভক্তি,
উপসর্গ যোগ হ'ত না—কিন্তু আধুনিক ব্যাকরণে অলম্ব্য
অব্যয়েরও ক্রিয়, বিভক্তি, উপসর্গ যোগে পারে।]

ক্রিয়া—যে পদ চারিদিকে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি
করে—যার ফলে অস্ত্রের পকেটের দলসম্পন্ন পদাধিকারীর
পকেটে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে ক্রিয়াপদ
বলে। উদাহরণ দেওয়াটা নিরাপদ নয়।

৩৩ এবং কর অলম্ব্যের প্রত্যেকটী পদ আবার তিনটী
পূর্বে বিভক্ত। যথা—উত্তম, মধ্যম, অধম।

উত্তম পূর্ব—যে পদে অধিষ্ঠিত হ'লে পদাধিকারীর
নামের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু কাঙ্ক্ষ করবার কোনও
প্রয়োজন হয় না অথচ পকেট ভরে সোটা উত্তম পূর্ব।
উদাহরণের কিরিত্তি দেওয়াটা বাহুল্য মাত্র।

এলায়েড ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

সেন্ট্রাল অফিস: কলিকাতা

৩ নং ম্যাজে লেন

ফোন : ক্যাল ২৮৫৭

ঢাকা

ময়মনসিংহ

কিশোরগঞ্জ

বাড়িডপুর

মবাবপুর

এলায়েড ব্যাঙ্ক একটি নিউক্লিয়ার ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান

ইরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

অজিতকুমার সোম

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

স্থাপিত

বেঙ্ক ল ইন্ডিয়া লিমিটেড

এণ্ড

রিজার্ভ প্রপার্টি কোং লিমিটেড

হেড অফিস : ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

১৬,০০,০০০ টাকার উপরে দাবী মিটান হইয়াছে।

গত সালের ডালুফেশনে প্রশংসনীয় উদ্ধৃত

শ্রীঅমরকুমার ঘোষ, এম্-এল্-এ

চীফ ইন্সপেক্টর, পশ্চিম-বঙ্গ গভর্নমেন্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ বি. ই. এম. বোস

সেক্রেটারী

মধ্যম পুরুষ—যে পরে অস্বীকৃত হ'লে পদানতিকারী নাম দশ ও আছে আবার কিছু কিছু কাজও করতে হয় সেটা মধ্যম পুরুষ দ্বারা—কংগ্রেস-সভাপতি, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক মহোদয়, সাধারণভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের পর ইত্যাদি।

অধ্যম পুরুষ—যে পরে প্রাপ্তি ভাগে ছুটলে প্রাপ্তকে শুধু কাজ করেই সরাসরি হতে হয়, পকেটও ভরে না, অথচ হাজার কাজ করেছে নাম পান না সেটা অধ্যম পুরুষ। দ্বারা—যুদ্ধের সৈনিক। কংগ্রেসের নীচের স্তরের সাধারণ কর্মীরা ইত্যাদি।

এর পর যে কারক, বিভক্তি-উপসর্গ ইত্যাদি না ছুটবে এমন নয়—তবে সেটা ভবিষ্যৎ ব্যাকরণ প্রণেতাদের হাতেই ছেঁতে পড়বে।

উল্লিখিত ভাবে পর প্রকরণের পুনর্গঠন করা আস্ত

প্রয়োজন। আমি ব্যাকরণবিদ নই তাই আর কয়েকটা উদাহরণ দিয়েই অনধিকারচর্চা বন্ধ রাখলাম; আশা করি পরগণগ্রাহী সন্ধান এতেই সন্তুষ্ট হবেন। এট সবে এট নবগঠিত পরপ্রকরণ বাতে পূর্ণবৈধতা স্থল কলেজে অবশ্য পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করেন—তৎক্ষণ উপযুক্ত কঠোরতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শিক্ষক মহাশয়ের গাভির আরও কঠিন। তাঁদেরকে ব্যাকরণের উক্ত অধ্যায়টা কঠোর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের নগরে এমনভাবে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে যাতে তারা উত্তরকালে পৃথিবীর নামের বুক ছলিয়ে বলতে পারে—

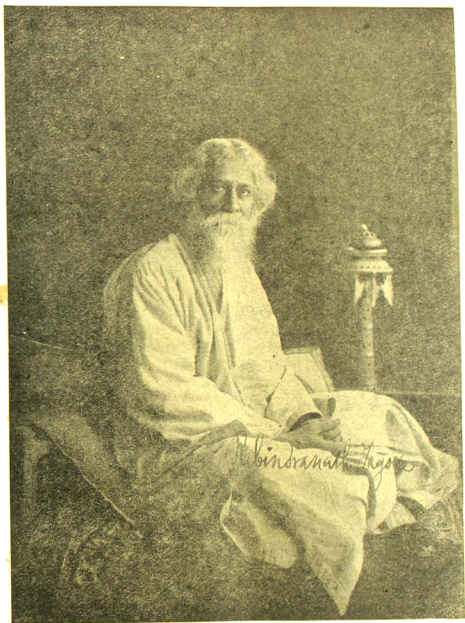
“নিশ্চয় বাঙালি: সর্গে, তাম্রজ হীহত্যাবধ,
জনা: হস্তম্ভাং নিত্যম্, তাম্রজা: নগরম্ বা।
সেবে সেবে পুণ: সেবে আমেব ‘পদ’ সেবেতে
অংগ্রাসাদবিয়েন পরাং দিগ্ধি লভেত মদে।”

রবীন্দ্র-প্রশস্তি

প্রিয়ান্বিতিকল্পন কর্তৃক

অস্বীকৃতম্ বসি শততম দ্ব্যন্ত
আরো বৈধি বিচলিত হোক না মত্ত
এককালে ভাগিত সংসার
রবীন্দ্র ঠাকুর তুমি যে মাগুই!
আমরা যা তুমি তাই—কাল নয়, কণ নয়,
সে কোন বৈশাখ নয়,—কালাতীত, কবি তুমি
আমাদের পরম বিশ্বাস!
তুমি শুধু ডাঙা বাও
যে কথা কহিতে চাহি প্রতি জনে জনে
যে শুভ সৌভাগ্যের অশ্রুত বৈশাখ
আমাদের আপনাকে রহে শুভ সৌন্দর্য
অস্বীকৃত অশ্রুত রোমনে,—
চাওবা আর না পাওবার বাধা,
চেনে সেনে অবগত পদ আত্মীয়তা
হলে থাকি সংকীর্ণ জীবনে।—
তুমি কথা কও,

কথা কও যুগাতীত! তোমার ভাষা
শ্রুত হ'য়ে জনি
আমাদেরই আশ্রয় সে বাই
অতীতের দিক হ'তে তুমি ভোল টানি
শে অন্তত স্থান সিদ্ধি।
তাঁই, তুমি হবে কথা-কও
কথা কই তোমার কথা
আমাদের আপন কথা।
হে বিরাট, আত্মা তব অমিরাছে
অতীতের শত আশ্রানে আশি
লভিছে পরম শান্তি—
শান্তি! কে জানে? আমি শুধু জানি।
আমাদের সংকীর্ণ জীবনে
তোমাকে ধন্য শ্রুতি—
সবে কাছে টানি
“মনে হয় বেন পায় হয়ে বাই
অন্য বিধীন পদ
আসিতে তোমার দ্বারে
মহতীর হ'তে হীহা তাম্রজী তীরে!”



রবীন্দ্রনাথ

“হেথা ও ওঠে চাঁদ”

ঐ অরুণচন্দ্র গুহ

(১)

মালতী ও তপনকুমার বহন শুভ দৃষ্টির আলনে বসে, বিবাহের লগ্ন মাত্র তখনই শুরু হয়েছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়াজে : ঠিক সেই সময় বিবাহ সজ্জা একটা সোরগোল পড়ে গেল। একটি অপরিচিত যুবক ও একটি যুবতী বিবাহ সজ্জা প্রবেশ করে কি যেন বলছে—যুবতীর কোলে একটি শিশু। সকলের বাধা অতিক্রম করে সেই যুবতী বিয়ের আলনের কাছে এসে তপনের সামনে কোলের শিশুটিকে রেখে বললে—“মামাকে না হারাবার কারণে, কিন্তু এঁকে অব্যবহার করে কি করে……”

তারপর যা শুরু হল সেটা বিবাহ সজ্জা মংগা কুন্ডি করল না। মালতীর ভাই ও প্যাডার প্রতিবেশী বাড়ি যুবক এসে তপনকে ধে লাঞ্ছনা করতে লাগল, তাতে মালতীর পক্ষে আর বিয়ের কনের লক্ষ্যবিলম্বতা বজায় রাখা সম্ভব হল না। সে তার দাদাকে বলল—“দাদা, বাই করুক, এর পায় কেউ হাত দেবেন না।” বলে সে নিজেই তপনকে আদালত করে দাঁড়াল।

উল্লেখ্যনা কেটে বেতে দেবী হল না; বাস্তব তার নির্ভয় রূপ নিয়ে সকলের সামনেই বেশ দিল। মালতীর বাবা ও প্যাডার কুন্ডা বলল—বাই হুক, এর পর নিয়ে হুনির রাখা চলে না। মালতীর দাদাও অসত্যতা তাকেই সম্মতি দিল। ঠিক হল—পরে আবার লগ্ন আছে; তখন বিয়ে হবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা হয়ে দাঁড়াল স্বয়ং মালতী।

সে যে একবার অধ্যব দিল—এ বিয়ে হ’তে পারে না—তারপর আর অন্য কথা তার মুখ থেকে কেউ বের করতে পারল না। বাবা দিয়ে অস্বস্তি ও পরে বন্ধক ও দাদাগণি শুরু করলেন; মালতী যে মুখ ঢেকে জুয়ে আছে, তা থেকে আর নড়ল না। বরোক্ত আত্মীয় ও মুরব্বীগণ এসে ডাকে বলল—“শান্ত” সে তপনের পত্নী।

অথচ কিয়ার মধ্যে খুঁত রয়ে গেল; জিন্দা সম্পন্ন না হলে তার পিতা সমাজে পতিত হবেন। সে কি তার পিতাকে এই শান্তি দেবে? সে কেবল মুখ খুলে একবার বলল—কালই আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। কাছেই আমার শাপ ও অপরাধ তাঁকে স্পর্শ করবে না।

তারপর এলেন তার মা—তার কান্না ও মিনতির কাছে, মালতী নিজেই দুর্বল বোধ করছিল। সে মার কোলে উশুড় হয়ে অশ্রুজল করে বলল—“মা, তোমার মনে কষ্ট হিতে চাইনা; তোমার কথার সব করতে পারি। কেবল এই অস্বস্তি হারতে পারব না।……আমি সত্যই তাঁকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারব না। তোমার ঘেয়েক কি তুমি বাড়িচারিটি হতে বল?”

মা তাত্তাত্তি মালতীর মুখ খুলে নিম্নের কুকর লগ্নে জড়িয়ে রাখলেন—ঠিক যেন মালতী আঙ ও হাতুড়গণারী ছোট্ট খুঁকি আছে। বালো মার বন্ধ থেকে সে তার দেহের পুষ্টি ও শক্তি আহরণ করত; আরও তার চরম নিঃসংহাৎ মিনে সে মার কুক জড়িয়ে তার মনের শক্তি ও অবলম্বন সংগ্রহ করছিল। সমস্ত প্রতিজ্ঞা আবেগনের বিকৃত শিশুর মতো মার কোলে সে গভীর আশ্রয় ও সুরক্ষা পেল।

তাকে শুইয়ে রেখে মা চলে গেলেন। কিন্তু তখনও সে নিস্তার পেল না। এরপর এল তপন নিজে। তখনও তার বরের পোষাক; তপন বলল—“মালতী, এটা বিবাহ করো তোমার প্রতি ভালবাসা থেকেই তোমাকে ছলনা করেছিলাম। ওকে স্বয়ং ভালবাসি নি—কখনও ডাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করি নি; করবও না। তোমাকেই ভালবেসেছি, এখনও বাসছি এবং পরেও বাসব। গোপের চোখে, সমাজের চোখে তুমি আমার স্ত্রী—তু এঁকে অস্বস্তি রেখে লাভ কি? তাতে-ই ত’ তুমি এ বন্ধন থেকে মুক্ত হ’তে পারবে না। মালতী চলো।”

তপন নামলে পর মালতী তাকে আঁতে আঁতে বলল—“আমি আশ্রয় হয়ে চলেছিলাম—এ কথাগুলি বলতে পারলে! একটু লক্ষ্য করল না বলতে! আশ্রয় হাতুয়!……



..ইতিহাসের পাঠ্য..

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ
এই প্রতীক মহামায়া সত্ৰাট অশোকের
পৌরবসায় কর্তৃক যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।
সত্ৰাট শুধু তখনোত্তর যুগের শিখরের
বিশিষ্ট শিল্প কৃশলতার প্রতীক নয়, এর
পশ্চাতে আছে ভাষা, শাস্তি ও মহত্বের
বিরাট এক ইতিহাস। আজি ও তাই
ভারতের প্রত্যেকটি নরনারী অবনত মস্তকে
তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। তাকে ভজ্ঞা করে।

লক্ষ্মীবিনাস ও নিম্নগুণে শতাব্দী কালব্যাপী
ভারতের প্রত্যেক মরনারীর চিত্ত জয় করে
এসেছে, এর শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই স্বীকার করেন।



লক্ষ্মীবিনায়ক

এম. এল. বসু প্রু কোং লিঃ • লক্ষ্মীবিনায়ক হাউস • কলিকাতা - ১

N.T.P.

“ঐ বেথলিক তুমি স্ত্রী বলে স্বীকার করছ না—অথচ সে তোমার সন্তানের জননী। ছি ছি…… বেনী কথা আমি বলব না। ওদের অভ্যাচারের হাত থেকে তোমার বাঁচিয়েছি; কিন্তু আর অমোঘ সামনে কখনও এগো না। যদি সম্ভব হয়, যদি অভিশপ্তান থাকে আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যাও।”

তখন চলে গেল।—বলে গেল, “মালতী এ মর্প একদিন তোমার ডাকবে।” মালতী তাকে শুনিয়ে বলল—“ডাকতে পারে—কিন্তু তোমার পায়ে নয়। আর একটা কথা শুনে যাও—লোক চক্ষু, সমাজ চক্ষু কথা বলে লাভ নেই আমার বিবেকের কাছে—তোমার লগে পরিচয়ের আগে যেমন সুমারী ছিলাম আজও আবার তাই। তাকে হুঁ বছরের একটা হৃৎস্পন্দ গেছে।”

শুষ্টি ছর খুলে দিয়ে জীবনের পিছন দিকে সে তাকিয়ে দেখল—তার বয়স পরিসর জীবনে অভিজ্ঞতা তার কম হল না। একসময় এসেছিল বিফু; সনাতনের বিধি নিষেধ মনকে স্বীকার করল; মনে ভাল করে প্রবেশের পূর্বেই সমাজবিধির আপত্তি তার পথ রোধ করল। মনের ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে গেল বিফু। ভেবেছিল—একদম মুছে গেছে সে কথা। কিন্তু আজ আঘাতের উত্তরজনার শক্তির ক্রম কক্ষ অর্পণ-মুক্ত হ’ল—না এখনও তা জমা আছে! তারপর এল তপন—প্রভাবক, মিথ্যাসূচী। একে সে ভুলবে—জোর করে মুছে ফেলবে। আর ও কত চলতি পথের-পথিক তার জীবনের সরাইখানার হুঁসুড়ের জন্ত আশ্রয় নিয়েছে।……

তারপর চোখের আল তার বাঁধাভাঙ্গা পতিভেবের হতে লাগল। পরদিনই মালতী কলিকাতা চ’লে গেল—শিক্ত বৃহের কাছে চিরবিদায় নিয়ে।

(২)

চাঃ পাঠ বছর আগে মালতী কলিকাতা যায়। বহন তার বিয়ের বর কিছুতেই ছুটছে না, তখন বাবা ও মা বিশেষ বাস্তব হয়ে পড়লেন। বর বা ২১টী ছুটছে, মালতীর মা ও বাবা মাদিকের কিছুতেই পছন্দ

হয় না। মালতীর বাবা একদিন খুব রেগে গিয়ে তাদের বললেন—“কোন সম্বন্ধই তোমাদের পছন্দ হবে না! এর বিষয়ে দেবে না? না, এর মন্ত জাতি-কুল খোঁজতে হবে।”

মাদিক অব্যবহিল—“একটাও কি সম্বন্ধের মতো সম্বন্ধ এসেছে যে, আপনি এই কথা তুলছেন? এই সব ছেলের হাতে ওকে দেওয়ার চেয়ে হাত-পা বেঁধে দলে ফেলে দিলেই হয়।”

রাত্রে মালতী মাদিককে বলল—“শাশু, আমাকে নিয়ে আপনাদের দললেবেই ছুঁতিনা হয়েছ; এমনি করে বেঁচে থাক। ত’ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

মাদিক বলল—“কি করতে চান তুই?”

—“এমন কোন ব্যবস্থা করে নিতে পারেন না, যাতে আমি নিজের পায়ে ঠাকাতে পারি।”

এর কিছুদিন পরেই মালতী মাদিকের লগে কলিকাতা যায়। সেখানে স্ট্রেটিক পাণ করে সে মাদারী শুরু করে।

এমনি অবস্থার তপনের লগে তার পরিচয় হয়।

তপনের চরিত্রে একটা তরল উদারতা ছিল, থাকে প্রায় পারিষদীয়তাও বলা চলে। চলতি মুহুর্তের মোতে তার জীবনভরী ভেসে বেড়াচ্ছে—কোনই বেন লক্ষ্য নেই, কোনই বেন গরব্য নেই। বয়সের ময়র হাওয়ার মুহু সোল গেতেও তার জীবন-ভরী যেমন ঐক্য ছিল, বর্ষার স্বভাব ওলট-পালট গেতেও তার ভেতর আপত্তি ছিল না। কোনটার মন্তই সে আগে থাকতে বিশেষ ক’রে তৈরী হত না। আবার এসে পড়লে কোনটাকে এড়িয়ে বাবার ব্যগ্রতাও তার ছিল না। তপনের চরিত্রে এই বিকটাই মালতীর মনে বিশেষ ক’রে রেখাপাত করল।

সেদিন তপনের ২১টি বন্ধু স-স্বীক, তপন ও মালতী সিনেমা বেথলে গেল—সমস্ত খরচই তপন বহন করল। তার দু’দিন পরে তপনের হাতে একটি পরমাণু নেই। তার নিত্যকার বয়স সিগারেট, চা প্রভৃতির ব্যয় প্রায় বন্ধ হল। সিগারেটের পরিবর্তে তখন সে বিড়ি খাচ্ছে। মালতীর ঘেমে সে বিকেলে এসেছে। মালতী তাকে চা এনে দিল—সুখার্ণ ও তুকার্তের আগ্রহ নিয়ে সে একে

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্

মিলন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২,০০,০০,০০০ টাকা।

আদায়ীকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা।

মজুত তহবিল ২৪,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে

ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" একটি শক্তিশালী এবং প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। সমস্ত দেশ-
ব্যাপী লাহাসমূহের সহায়তায় "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আপনার বাৎসরিক ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম।
মাত্র ১০০ টাকা জমা দিয়া এটো ব্যাঙ্কে একটো একাউন্ট খুলিতে পারেন। মাত্র ১০০ টাকা জমা দিয়া
একটো সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট বোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমাটাকার উপর শতকরা ১০ টাকা হারে
হিসাব দেওয়া হয়।

এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ২৫০ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

'ক্যালকাটা ন্যাশনালে' আপনার একটো একাউন্ট রাখুন

স্বাধীনতার মূল ভিত্তি

আত্মপ্রতিষ্ঠা

আর্থিক সচ্ছলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা না থাকিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা
লাভের আশা সফল হইতে পারে না। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ব্যক্তির
প্রধান ও প্রথম কর্তব্য নিজের এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার ব্যবস্থা
করা। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহার উপর নির্ভর করে।

হিন্দুস্থান

আপনাকে এ বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে। জীবন সংগ্রামে আপনার ও আপনার উপর
নির্ভরশীল পরিজনবর্গের ভবিষ্যৎ সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে। আত্মরক্ষায় জীবনের মূলমন্ত্র।



হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

হেড অফিস: হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, ৪মং চিত্তরঞ্জন এডিনিউ, কলিকাতা।

একে ২০ পেচালা চা পান করল। চা পানে তপনের কখনও অতৃষ্ণি ছিল না।

হঠাৎ তপন বলল—“আর কিছু খাবার আছে?”

মালতী বলল—“এতটু অপেক্ষা করুন, এখনই আনিবে সিদ্ধি।”

সে উঠে গিয়ে ঘোড়ান থেকে খাবার আনতে বসে এল। কিছুক্ষণ পরই কি খাবার নিয়ে এল। মালতী বলল—“আজ কি অফিস থেকে এসে কিছু খান নি?” বাসার এখনও ঘাননি, না কি?” তপন বলল—“বাসার গিয়েছিলেন।” চা খেতে খেতে সে পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাল। মালতী বিড়ির গন্ধ একমুহুরি গন্ধ করতে পারত না। তাই তপন বিড়ি বের করেই বলল—“মাশ করবেন, নিশ্চয়ই মজার, অমৃতমি বেন ত’ এটা ধরাই।”

মালতী বলল—“একি; হঠাৎ আপনাদের বিড়ি-প্রীতি হ’ল কেন? আপনার ত’ এতে কোন রিনই অমৃত্যুগ ছিল না?”

তপন বলল—“অমৃত্যুগ কি সহজে হয়। আজ আমার ননি-বাগ দূর।”

মালতী—“তাই বুঝি, বিকেলে মলখাবার বা চাও জোটে নি?”

তপন বলল—“আপনারা বড় সহজে খাবড়ে যান। ছুনিয়ার সবই পার্শ্বনিক দৃষ্টিতে নিতে হয়।”

মালতী—“আপনার বদন অর্ধের এই অবস্থা তখন পরজন্মি বাও চৌচ টাকা সিনেমা দেখার মত খরচ করলেন কেন?”

তপন—“পার্শ্বনিক হতে হলে, অভাবে-ও ল-ভাবে সবটাতেই সমজান হতে হয়।”

মালতী—“ঐ, তাই ত’ সেদিন বেখলায়, আপনার একটি বন্ধু আপনাকে হা-তা গালমন্ড করল—তার কাছ থেকে টাকা নিষাছিলেন, তা পরিশোধ করেন নি’ বলে। আপনার পরজন্মি বার চৌচ টাকা অনর্থক খরচ করলেন—আজ আপনার হাতে একটাও পয়সা নেই। অবচ হালের সিনেমা দেখালেন, তাহলে ঘরে বোধহয় পয়সার অভাব নেই এবং খাবারও বোধহয় অভাব নেই।”

তপন—“জানেন ত—বহুপতে: ৩ পতা মধ্যপূরী, বহুপতে ৩ পতাত্তর কোথলা—বহুপতি কুকের মধ্যপূরী বা কোথার, বহুপতি রাঘের উত্তর কোশলই বা কোথার!—তা আমার এই লগ পোনের টাকার মত শোক ক’য়ে কি হবে!”

মালতী মুখ গভীর করে বসে বসে বসে। তপন একটু পরে বলল—“বেশ, আগনি রাগ করছেন। এটা আমার একটা চরিত্রগত দুর্বলতা। হয়ত আমার জীবনের মধ্যে কোথাও এর একটা কারণ নিহিত আছে। আমার জীবনে কিছুই মূল্যবান নেই—কাজেই সফল করার পার্থক্যতাও পিথিনি। ছোট কাল থেকেই দেখছি—দিন আসছে দিন ছেটে যাচ্ছে। কেউ আমার মত আবেশের মত লাভিয়ে রাখেনি, আমার একেবারে অনাহারেও দিন কাটে নি—(মুতন একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল)। সফল করার আগ্রহ আর-ও আমার আসে নি। হাতে পয়সা এল, খরচ করলাম পয়সা থাকল না, ধার করলাম। ঘরের মত খরচ করি, ধার তাগের কাঁড়েই করি। তারা বা ধার দেহ—সেটা ত’ ধার; তারা তাঁর মত জাগি-ও দেহ, সময় মত ফেরত দিতে না পারলে, তারা গাল-মন্ড করে। আমি বা বিই, সে-ত আর ধার নয়—তাই তাঁর উপর আমার কোন দাবীও থাকে না। তারাও কোন হারিষ বোধ করে না।”...

মালতী বলল—“একটু বসুন, আমি আসছি।” সে কিয়ে এসে তপনের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলল—“আমি গভীর হালু—তবুও পাঁচ টাকা নিন। মাশ খাবার পথি, কোন হকমে চালিয়ে নিবেন এ দিয়ে। এটা ধার নয়।”

তপন টাকা করটি হাত পেতে নিল। সে বলল—“বেশ, ছোট বদন হতেই ঘরে দেখছি বিমাতা; বাবাও কোন দিন সময় ছিলেন না। বেহ আমি জীবনে বেধী পাই নি। এক মিথিয়া ছিলেন—তিনি মাঝে মাঝে দুই চারটা পয়সা দিতেন; সে বৃত্তী এয় বেধী কোথায়ই বা পাবে। তা-ও প্রায় বিমাতা বা মা-ও তাই বোনেরা নিয়ে বেত।...আপনার এই টাকা করটি কাউকে দেব না। ...আজ তবে উঠি।...

তপন বেরিয়ে গেল। প্রায় অন্ধকার ব্যাভাষ্য মালতী বসে রইল। তপনের জীবনের সে বিশেষ কিছু জানে না;—আমু যেটুকু সে আভাষ পেলে, তাতে তপনের প্রতি তার বৃহৎই মহাহুঁড়ি লাগলো। রেহশ্পর্হীন জীবন—এর

চেহে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে। নিজের জীবনের দুর্ভাগ্যের লগ্নে তুলনা করে সে দেখল তপন অনেক বেশী দুর্ভাগ্য। আত্মকার দিনটা তার সার্থক—হয়ত একটি রেহশ্পর্হীন জীবনে সে একটু রেহের স্পর্শ দিতে পেরেছে।

(ক্রমশঃ)

জীবন

ঐশ্বর্যময় চট্টোপাধ্যায়

শ্রেয় নয়, শ্রেষ্ঠতর আরো কিছু চাই—

দুঃখ, শোক কিংবা অভিমান,

দুর্গম জীবন—

বন্ধুর পথেতে বার দুতীর ইসারা,

অন্ধ ও শোষিতে বার খুলিকণা সিক্ত হয়ে গেছে।

অহর্নিশ মক—

আতপ্ত সূর্যের তাপে—দুঃখময় জীবনের মত,

মায়া বাসি—এখানে ওখানে

বিকল্পিত কক্ষণ।

সে কক্ষণ দাড়া হয়ে গেছে।

স্বার্থবাহ এসেছিল কবে

চিহ্নটুকু আনো আছে তার।

পৃথিবী ও আকাশের মিলন সীমায়

দেখেছ হঠাৎ বেলা সূর্যোদয় কালে,

স্বর্গবর্ণ প্রভূবের চকল আঙ্গান

হয়ত এগেছে কাণে বৃহৎ বাতাসেতে।

সে আঙ্গান স্বপ্ন হয়ে স্রাস্তির নিশ্চয়ে—

নক্ষত্রের মালা পরা আকাশের নীচে,

জুঁই ও চামেলী কোটা শব্দহীন পৃথিবীর বুকে

কবিতার গন্ধ মিল রহস্ত-মধুর।

পবিত্র প্রভূব আর তপালী স্রাস্তির

পূর্বতাকে বাহ দিবে শুধু সূচনার

কেবিল বর্ণনা!

অনর্থক মানসিক বিলাসের স্রোতে ভেসে চলা।

প্রচণ্ড নিদ্রাস্তপ্ত মধ্যাহ্নের দাহ—

প্রভাতের সম্পূর্ণ বিকাশ,

তপালী স্রাস্তির মূলে আছে সংগোপন—

নিবিড় কালিয়া।

যেমন প্রচ্ছন্ন হয়ে স্বীকৃত্যে থাকে বনস্পতি

দুর্ভিকার গুহ মর্দনশেবে।

আবর্তিত হোক

সেই স্রাস্তির আর মধ্যাহ্নের।

হৃদয় বিস্তার—

বৃদ্ধ মক্হুমি

স্বার্থবাহ করি অতিক্রম!

জীবন উঠুক জলে—দুঃখে, শোকে, তীব্র অভিমাণে।

দুর্গমের উত্তরুৎ বাধার—

সমুদ্রের মত হর্নিবার।

শ্রেয়, সে ত স্বপ্ন দেখা শুধু!

শ্রেয় নয়, শ্রেষ্ঠতর আরো কিছু চাই।

জাপান কি বৈদেশিক আধিপত্য সহ্য করিবে ?

শ্রীকান্ত বসু

[এশিয়ার ঐতিহাসিক জাপান আর কোন দিন শব্দভর্য বহন বা তারার ক্রুর অধিকৃত হতে পারে নাই : বিশেষতঃ তারার দুই চোকে দেখিতে পারে না। এখন অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে জাপান ফলশ্রুতি উদ্ভূত হুলস্থূলভীত, পরাজয়ের বেদনায় সে বিবৃত। অতীতের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিস্তৃত হুত্ব ভয়ঙ্কর একটা জাতি জাপানের পবিত্র বাসভূমিতে শিবিরী যৈতব্রহ্ম সঙ্গত পরাজয়ে বিরক্ত প্রবর্তনায় ভোগ করিবে এবং ইহাতে তাহার মনোবল ক্রিয়াকর্মিত হইতে পারে, সেই সম্ভাব্য পরিণতি এই প্রবর্তনায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইল। এই প্রবর্তনায় দুই লোক নিঃশেষ, আর উল্লেখ্য।]

মিত্রপক্ষ জাপান ধ্বংস করিচ্ছিলেন : শুধু করিচ্ছিলেন নয়, বেশ জাপানকেই করিচ্ছিলেন এবং শিকড় গাড়িয়া বসিচ্ছিলেন। এশিয়ার হৃদয় যে এত শীতল হইবে, তাহা কেহই আশা করেন নাই। তাই,—যে ভাবে ধ্বংস কার্য চলিয়াছিল, অপ্রত্যাশিত অস্তিত্ব জাপানে তৎপ্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া বলা হয় না। প্রাচ্য—পাক্কাভা-বাঙ্গী এই দশকমতের যোড়তর সম্ভূত পর্বাধ ধ্বংস চলিতেছিল, তখন ইরান ও ইরাকের অধিবাসীরাও তাহার মতো দেখে বিবেচনা সৈন্তের অবস্থিতিতে প্রবল আপত্তি জানায়। এই মহিমা তাহারও বেশে হুখেই আলোচনেরও দরী হয়। 'স্বর্ঘ্যোদয়ের দেশ' জাপানের বিক্ষোভটা যে তাহার চেয়েও অধিকতর প্রবল হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

জাপানীরা পবিত্র ও উৎকর্ষ স্বাধীনজাতির জাতি ; স্বাধীনতাও তাহার। জীবনের সর্বোপেক্ষা মূল্যবান বস্তু বলিয়া মনে করে। সম্রাট ও জাতির প্রতি তাহার অত্যাধিকার। চতুর প্রচারকের মত তাহার এই জাত্যাভিমানকে উদ্ভাসিত দিয়া তাহার মনোপ্রতি এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহাকে বিপজ্জনক বলিলেই চলে। তাহার মনে স্বাধীনতা সীমিত উদ্ভূত করার অস্তিত্ব শিকারের বাধ্য আছে এবং তাহার নিয়মকানুনও অত্যন্ত কঠোর।

জাপানের পরাজয় এই প্রথম। দুই সহস্রাব্দ

যংমতের হুত্বের ইতিহাসে জাপানী জাতিতে আর স্বপ্নও পোহরের প্রাণি ভোগ করিতে হয় নাই ; পেরুজ বর্তমান আধাতটা তাহার মতো প্রাণে আরও বেশী করিয়া থাকিবে।

আর শাসিত রাশিয়ার হৃদয় হাজারিমা জাপান মনোবলের বিষয়মুখ দুই আকর্ষণ করে এবং একটা বিরাট শক্তিরূপে মাথা উঠু গিয়া দাঁড়ায়। রাশিয়া ইউরোপের একটি প্রধান শক্তি ; তাহার উপর রাশিাবাদীরা মন এই প্রথম। জাপানের যে সকল বীর সেনানী মন-জাপান হৃদয় যোগ দিয়াছিলেন, তাহার মতো মনোবল এখনও জীবিত। বর্তমান পরাজয়ের বেদনা তাহার মতো প্রাণেই সবচেয়ে বেশী অহুত হইবে।

মিত্রপক্ষের যে সব সৈন্ত ও নৈমিত্তিক জাপান ধ্বংসে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার সৈন্যবিন চালচলন ও জাপানীদের জীবন যাপন প্রণালীতে অনেক তফাৎ। জাপানের যিনি সর্বোচ্চ সৈন্যধ্যক্ষ বা নৌ-ধ্যক্ষ,—তিনিও কঠোর মূল্যায়ন অধীন। সামান্য উপকণ্ডের সহিত মোটা চাউলের ভাত, এট খাইয়াই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। আর কোন ভোগ বিলাসের তাহার অধিকার নাই,—যতদিন অগ্রে সম্রাটের সামরিক পরিচ্ছন্ন থাকিবে, ততদিন এই কৃষ্ণ-ব্রত অবস্ত পালনীয়। পরাজয়ে মিত্রপক্ষীয় সৈন্তরা নানাবিধ রসনাভূষিত পান ভোজন, নাচগান, আবেশ-আজ্ঞা ও নারী লগ্না মত থাকিবে, এই স্তূত জাপানীদের দারুণ ঘর্ষণীয়া উৎসাহন করিবে। জাপানীদের সৈন্যের মত 'সাম্রাট' জাতি প্রবর্তিত নিয়মকানুন, আত্মবাসিনী যোদ্ধা ক্যাশনিক সম্রাটদের কৃষ্ণ-সামরিকও হার মানায়। এমন কি অতিথি সংকার সন্তোষও কঠোর বিধিনিষেধ বহিয়াছে। একবার এককনের বেশী অতিথিকে ভোজন করাইতে পারিবেনা—তালাও সেই অধ্যাক্ষিত তত্ত্বায় দায়।

জীবন মত জাপানীদের ধারণাও অহুত। কোনও নৈমিত্তিক বা নানিক কাব্যচর্চা করিলে তাহাকে বেহেদগিনা

বলা হয়। সামরিক কৃচ্ছাওরাজ ছাড়া তাহার আর কোন আদ্যোগ প্রমোদে ধোলাপান নিক্ষেপ। মিতথারিতা, নিষ্ঠা ও মাকৃশিত্বজ্ঞি এই তিনটি সামুগাইয়ের প্রধান গুণ। তাহাদের নিরমকান্ন অর্ধবর্জিতভাষাভাষি বনিয়া বোঝহ। বর্জমান সভ্যতাকে তাহার পৌল্লেখ্যকর বনিয়া মনে করে।

পৌল্লেখ্যকে ভিত্তি করিয়া তাহাদের নিরমনীতি রচিত। পৌল্লেখ্যের অন্তই তাহার সভ্যগারহণ; সভ্যের অন্ত সভ্যের সেবা,—ইহা জাপানীদের বৃত্তিতে নাই। আত্ম-হত্যাকে তারা জীবনের বাস্তবিক পরিণতি বনিয়া মনে করে। অসি হস্তে জীবন বিসর্জন তাহাদের জীবনে সবচেয়ে বড় কাম্য। বোধ হয় সেই কারণেই জাপানে 'হারাকিরি'র প্রচলন এত বেশী। ব্যক্তি বা লক্ষ্য বিশেষের জন্য আত্মবিসর্জনের এত বড় দৃষ্টান্ত ভগতের ইতিহাসে আর কুত্রাপি দৃষ্টিপোচর হয় না। ১৯০৪-০৭ মধ্যে জাপানে গড়ে প্রতি বৎসরে ১৭২২২টি আত্মহত্যা হয় এবং আত্মহত্যার চেষ্টা হয় ৬৭০০। ইহা শুধু পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আত্মহত্যা ব্রাকার আত্মবিনাশ প্রবৃত্তি নারীদের মধ্যেও প্রবল। আত্মহত্যাকারী পুরুষের সংখ্যা বেথানে দশ, সেখানে মেয়েদের সংখ্যা ছয় জনেরও বেশী। ঘোঁট কত নরনারী আত্মহত্যা করে, তাহাদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশের বয়স দশ হইতে পঁচিশ বৎসর; আত্মহত্যাকারী অষ্ট আশি জনের বয়স পনেরো বৎসরেরও কম ছিল। এত অল্প বয়সে আত্মহত্যার নেশা অতুত হইলেও জাপানীদের বোলায় সভ্য। এতদবস্থায় জাপানের তরুণ্য যে অত্যন্ত উত্তেজনাগ্রন্থ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার উপর তাহারিগকে বৈশ্বিক জীবনধারণে পাটল রাজকীয় অলঙ্কার মানিয়া চলিতে হয়; কাষেই শত্রু হিসাবে তাহারা চুর্ময়। কর্তব্য পূর্ণতের চেয়েও ভারী এবং জীবনধারণের গালকের চেয়েও হালকা,—ইহাই হইল রাজকীয় অলঙ্কার দায় কথা। এই পটভূমিকার নিজেদের পবিত্র ভূমিতে বিদেশী সৈন্তের পদার্পণ মাত্র, পরাজিত জাপ আত্মি মনে কি কোভের দকার হইবে,—মিত্রশকীয় সৈন্তদের

খানাপিনা, বিলাসবাসনের বহর দেখিয়া জাপ সৈন্তদের মনে দোষবহি কিত্রপ প্রচণ্ডতবে জলিয়া উঠিবে, তাহা লহজেই অস্বপ্নেয়।

জাপান-পাকাত্য ভাবধারার অস্বপ্নাশিত হইয়া আধুনিক সভ্যতার দান অনেক বানিই গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচ্যের আর কোন জাতিই এই দিক দিয়া তাহার মত অগ্রগী নহে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জাপানীরা নিজস্বপে বিদেশীদের অবস্থিতি দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। বৃহত্তর পূর্বে জাপানে ভিন্ন দেশবাসীর সংখ্যা ছিল সাতহাজার হইতে আটহাজার, তন্মধ্যে আমেরিকান দুই হাজার, পোবাক পরিষ্কর ও আচার ব্যবহারে চিনিতে কোন অস্বপ্না হয় না এবং তাহাদের দেখিয়া জাপানীরা ঘোটেই স্ত্রীতি অস্বপ্ন করে না।

জাপানীরা দেশবাসীকে বশবশ্যে উদ্বীণ করার জন্য সর্বস্বাই চেষ্টা করে। দৃষ্টান্তরূপ বলা দাঁড়িতে পারে ১৯০০ সালের 'কোর্ডো' আন্দোলনের কথা। তদানীন্তন সদরদপ্তর এই আন্দোলনের প্রবর্তক। কয়েক বৎসর এই আন্দোলন ভালভাবেই চলে,—তাহার পর শিক্ষা সচিবের হস্তবশে উহার চেয়ে জোড়ালো এক আন্দোলন শুরু হয়; উহার নাম 'কোমিনি গাকুতা'। এতদনুসারে বাধ্যতাবদ্ধক—প্রাথমিক শিক্ষার কাল ছয় বৎসরের বৃদ্ধি আট বৎসর করা হয় এবং প্রথম তিন বৎসরে অর্ধেকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়—বালকশিক্ষার মনে জাতীয় প্রেরণা এবং শাস্ত্রাচার প্রতি কর্তব্যবোধ জাগরু করার কাজে। জাপানের অবদান, বিশেষতঃ শিক্ষণ পূর্বে এশিয়ার জাপান কি কি কাম করিয়াছে, কোমনিগতি নিজের চিত্তে তাহা অতিত করিয়া দেওয়া হয়। ভগ্না, ইতিহাস, ভূগোল, বাহাই শিক্ষা দেওয়া হউক না কেন জাপানী হইয়া অগ্রগ্রহণ করাটাই যে শৌভাগ্যের বিবর তাহাই ছাত্রবিগকে বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। শাস্ত্রাচারের জন্য আকাংক্ষা, বাহাশ্বে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, নিজবিগকে সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়। তাপ শিক্ষকদের কঠোর শাসনে এই শ্রেণীক শিক্ষাদানের পরিণাম অস্বপ্নান করা কঠিন নহে। 'র্যাক ভ্রাপন' বা অস্বপ্ন প্রতীষ্টান-

দৈনন্দন বন্দন কাণ্ডল বন্দন করিয়াছিল, তখন ব্রিটিশ রাজত্বের সময়ে পনেরো হাজারের বেশি মৈত্র প্রাণ হারায়। আর একবার বীর বিক্ষোভ— ১৮৭২ সালে। অকল-গাম্বিয়ের তুলনায় গাম্বিয়ের রাজনৈতিক চেতনা অনেক বেশি জগদ্রত। কামেই আফগানরা বৈ বিক্ষোভ দেখাউয়-ছিল, কামানীসের পক্ষেও তারা দেখানো অসমর্থ নয়।

বংগের ধারাবাহী
১৮৫০-৪২ সালে ব্রিটিশ

ইতিহাসের এটী শিক্ষা আমেরিকানদের এত ইয়
দুন্দিতা হারায় উড়িত মনে।

দাস চুনিয়ার নিশাবসান

বাস্তবের মস্ত রাস্তা।

বিশ্ববী অন্ধ মিছিলে গাভাও অন্ধ নাক
চন্দ্রাবতী কীংকী কীংকী মেলাও
দুজির পদ
বিশ্ববী চন্দ্রাবতী
কত মল্লখ,
পুণ্ডরিক পুণ্ডরিক ঘন গোধে গোধে
কীংকী —
এবার বক্তা আমের নাক

বক্তাভা

হাজারো দুগের মস্ত নাকো, মনোবিশ্বাস,
বাইবেল আর বেচনেট অন্ধ গাভিবে গান
বুকেব বক্তা দাস চুনিয়ার—

নিশাবসান।

বহুদিন ধরে আমেরের মাস্টী

অগ্রগণ্য,

সাজাআব দানিয়ারী মোক শূটেছে ঘর;

এবার—

পোষিত মনতা করবে কৃত কাণ্ডাক,

মোহী পেমিয়ারা—

এমেরট বক্তা গাভিছে তাক।



১৯২৪ এ সর্বপ্রথম জাতিও সর্বপ্রধান

আপনার আদর্শ চিন্তাধারাকে
আখরে অমর করুক!

যেমন করছে
বহু বছর ধরে
বীন্দ্রনাথের
চিন্তাধারাকে

কেমিক্যাল এসোসিয়েশন (কলিঃ) ৫৫, কালিঃ ট্রাট
কলিকাতা

অভিভাষণ

শ্রীমন্তেশ্বরী মালগুণ

(ভারত রাষ্ট্রাঙ্গণত পশ্চিমবঙ্গপ্রদেশ জেলায় কালিদা-
গুণ বন্দ্যে সমগ্র মিনাক্ষর জেলায় কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনে
পঠিত ।) [১ই ফাল্গুন ১৩৪০, ইং ২২/২/১৯৮০]

সমবেত বহুগণ,

মহাত্মাজী শোভনীয় মৃত্যুর কাল ছাড়ার অঙ্ককারে
আমি আশ্রয় সমবেত হইয়াছি ।

জাতির জনকের মৃত্যুতে জাতি আজ মোহগ্রস্ত সমগ্র
দেশ আজ কিংকর্তব্য বিমূঢ় । আজ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ।

অহিংসার পথে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা প্রেমদাতক
গান্ধীজীর অভাবে জাতি আজ হিংসার তামসিকতার
ভয়ে পথের সন্ধান পাইয়া উঠিতেছে না ।

সকল ধর্মের মর্ম মহত্বের প্রতি প্রমাণিত সচর্মনিষ্ঠ,
গান্ধীজীর পরলোক প্রদানে ধর্মের অবাধর অর্থ অপর
ধর্মালম্বির প্রতি স্বাধীনতাযোদ্ধা হীনতার হিংস্রতা আর
প্রবল । জাতি আজ প্রাণের ভয়ে, বিস্ত্রাণের আতঙ্কে,
নারীর স্বাধীনতাযোদ্ধার বিতর্কিতব্যক্তিগতগত ।

বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বিভেদের মধ্যেও যে সনাতন
মানবতার মতীর প্রবাহ বহমান, তাহার উপলব্ধি ছিল
মহাত্মা গান্ধীজীর জীবনে ও বাস্তব কর্মনিষ্ঠায় । সেকালে
বেশন রামপুতনার শুভ এককেন্দ্রে সুরসিং সুরবতী
কোথার অমৃত হইয়া গিয়াছিল,—আজও ঠিক তেমনি
মহাত্মাজীর অভাবে শুভ আচাের কঠোর সাম্প্রদায়িক জীবনে
মানবতাবোধের সেই সুর সুর সুরিং ধারা লুপ্তপ্রায় । বেশ
আজ তার শুভ ।

সরিত্রের বাস্তব,—তাহারদিকে মাহুনের মর্ধ্যাসার
উন্নত করিবার অবশ্য কণ্ডব্যাপনসংগত—মহাত্মাজী
আজ আর নাই ;—অন্যের শোষণ হিংস্রতা আবার বৃদ্ধি
পাতি সফল করিতে আরম্ভ করিল । জাতি পথে অরুণাচের
আশা সরিত্র প্রমিতের নিকট হইতে বৃদ্ধি ধরে সরিয়া
বাঁহেতেছে । দেশের অগণিত হস্তি জনসাধারণ আজ
আবার শুভপ্রায় ।

প্রমের মর্ধ্যাসাযোদ্ধা কর্মনিষ্ঠ গান্ধীজীর সৈনিক কর্ম
আজ চিরকল্প । দেশের প্রমবৃদ্ধি ধনিক সন্তানার আবার
আজ চারুর্ধ্বকোশে পথের প্রমে ধনাতা হইবার প্রমানে
বৃদ্ধি কঠোরভাবে উপদ্র হইয়া উঠিতেছে । প্রমিতের
প্রমের মর্ধ্য সুর মধ্যে অবসর পাঠিবার ভরসা আজ বৃদ্ধি
আর নাই । প্রমিক আজ তাই জাতি বিজয় ।

সামাজিক অত্যাচার ও অন্যাচারের প্রতিবাদে আজ
আর নাই ;—হরিজন আজ বাস্তব হারা । অহর তাইবের
আজ অসহ্য বোনের অবসরতার স্রিয়মান ।

“হিংসার উন্নত পৃথকী” “সমুদ্রে শান্তির পাহারাবার”
মৃত্র মৃত্র উপলব্ধি করিবার যে চেষ্টা ও সাধনা মহাত্মাজী
ইংল্যান্ডবনে করিতেছিলেন, তাহার অভাবে সে চেষ্টা ও
সাধনা আজ দুর্বল হইয়া পড়িল । আবার হিংসার তাওবের
জাতি পৃথিবী বেগমান ।

এই বিরাট হতাশার মধ্যে আশ্রয় সমবেত ।

তাই মহাত্মার অমর আত্মার আধীর্ষন চিহ্ন করিয়া
আমরা আমাদের কর্তব্য চিন্তার অঙ্গুর হইব ; তাহার
পুত্ৰজীবনের স্বরণে কর্তব্যগালনে স্তম্ভের হইব,—তাঁহার
প্রতি প্রমাণবনতিনের প্রেমসিদ্ধি হৃদয়জাত—“চোখের
জলে—পৃথিবীর কঠোর শুভ “ধূলিকে ভিজিয়ে” দিয়ে সুর
ও কোমল এবং নির্মল করিয়া মাহুনের মধ্যে মানবতার
উদ্বোধন করিয়া দেশের ও সমাজের পুত্ৰ ও ধ্যানের ভরসা-
ননে উপবেশন করিয়া প্রাণগতমে আত্মনিয়োগ করিব ।

আমাদের সমবেত সাধনা নিষ্ঠাবতী ও সলবতী
হউক । আজ সমগ্র ভারতের সকল সৈবার কেন্দ্রই
মহাত্মাজীর প্রাণকেন্দ্র । সেবার সকল কেন্দ্রেই তাঁহার
অবদান স্বতঃস্ফূর্ত । তাঁহাকে প্রমা নিবেদন করিয়াই
আমাদিগকে সেবার প্রস্তুত হইতে হইবে ।

প্রাণকেন্দ্রে আমরা সকলেই পরস্পরে প্রাণকর্তা ও
নিয়ন্ত্রিত । আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা হইয়া পড়িতে হইবে
“ও অকোষধর্ম: পৌচপঠৈ: সত্যত: স্বচাচারিত: ।
তবিস্তব্যং তবস্তিক্তি মহা চ প্রাণকর্মনি ।”

বে সুরসং আততায়ী গান্ধীজীর হত্যাসাধন করিয়াছেন,
গান্ধীজীর প্রাণগতমে তাঁহার প্রতি কোষ প্রকাশের

আমাদের কোনোও অধিকার নাই। নিজের অন্তরের নিরতম ও নিঃসারী কৃত্তিকালির সেবার তৎপর যে সব ক্রুরকর্মব্যক্তির অপচেষ্টায় আজ দিকে দিকে হত্যা, লুণ্ঠন ও নারীর সতীত্বনাশের তাওবনীলা চলিতেছে, তাহাতে ও আমাদের ক্রুর হওয়া চলিবে না। আত্মপূর্ণ অবিচলিত থাকাই আমাদের কাজ। আনানিগকে একান্ত গোচিপার হইতে হইবে। আবেগ চিত্তক্লিষ্ট বাসনা সকলের আসে। জন্মে গ্রেম, মনে শ্রদ্ধা, চিতে বৈরাগ্য, গ্রামে আবরণ, কৃত্তিতে বৈরাগ্য ও কৃত্তিতে অবিচল বিবেক, ইহাই আমাদের পৌতের শাশন করিয়া লইতে হইবে। সত্ব, ধর্মীকতা ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভ্রাতের বিধানে দৃঢ়তা, ইহাই আমাদের ব্রহ্মচারিত্র হউক।

আমরা যেন শ্রদ্ধার পূর্ব হইয়া শ্রদ্ধাভাজনকে শ্রদ্ধা করিতে পারি।

হৃদয় অতীত হইতে সকল বৈশিষ্ট্যের ত্যাগীশ্ব কল্পনার ভারতের স্বাধীনতার যে ত্রণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহারই শ্রদ্ধাঙ্কুর আমাদের মানবনেত্রের পরিপ্রেক্ষিত ও উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই উজ্জ্বল্যের আকর্ষণ আমরাও আবাল্য ভারতের স্বাধীনতার অগুরুগাই ঘান করিয়া আসিয়াছি। সে ধ্যানের রূপ “এই ভারতের মহামানবে”র মহানিলিন ক্ষেত্রে সব “মাস্তবের ধাতা” মিলিবে মিলিবে যাবে না কি?” লই ধারণাই স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পরিধেয়ের বিভিন্নতার মত ধর্মের আচার অস্বাভাবিক হইতে পারে।—কিন্তু তাতে সেই পার্থক্যের অন্তরালে যে “নরসেবতা”র অধিষ্ঠান,—সে তো একই। তাঁরই আশ্রয়ে তাঁরই পুত লক্ষ্মণ, তাঁরই মিলন আত্মানে,—দেপতক আশা করিয়াছিল।—“বিভিন্ন ভুলিল, আগাবে ভুলিল, একটি বিরাট হিরা”।

আজ স্বাধীনতার সে অপরূপ যন্ত্র বাতবে অন্তরঙ্গ পরিগ্রহ করিয়াছে। সে কি আমাদের দুর্ভাগ্য? —না, —তারিকের পদাশনার, স্বপ্নানের নিশ্চিহ্নের মন্ডকারে মায়েরই পরীক্ষা মাত্র।

আজ আমাদের ভাবিতে হইবে,—সাধনার প্রথমধরে ইহা মায়ের পরীক্ষামূলক ভয়ের রূপ সাময়িক আবির্ভাব মাত্র।

আমাদের ভয় পাইলে চলিবে না; আসনে দৃঢ়তর হইয়া শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে পূর্ণতর হইয়া চিতে ও মৈত্রে পূর্ণতর হইয়া কঠোরতর সাধনা করিতে হইবে।

যে মহাপুরুষের নাম শ্রবণ করিয়া আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার ঘান ছিল, শুণু ভাওতের সাধন-শীটে মানবের একম নব, সমগ্র ধর্মীকতায় তাঁর সেই ধ্যানের বিশ্বাস অথবা মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা। আজ তাঁর অর্থমানে তাঁর সেই কঠোর সাধনাকে আনানিগকে কঠোরতর ভাবে সাধন করিতে হইবে। ভারতের ঐক্যসাধনা তো সে ভুলনার সহজতর। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন জাতির জনক। তাঁহার পুত নাম মুখে লইয়া কংগ্রেসের সেবার ক্ষেত্রে আমরা যারা ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, আসিয়াছি বা আসিব বা আসিতেছি, তারা আমরা সকলেই তাঁর ছাত্রাঙ্গ,—তাঁর উত্তরাধিকারী। মানবগ্রেম, মানবগ্রেম কেন?—সকল ভুতেই দয়া ও তাঁদের সেবাদাননাই ছিল জনকের বিত্ত। আমরা উত্তরাধিকারীসূত্রে সেই মাঘের অধিকারী হইয়াছি,—ইহা আমাদের সৌভাগ্য। আবার সেই মহৎ মাঘকে জীবনে অমলিন ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা আমাদের পিতের প্রচুর ভারও বটে।

এই দায়িত্বস্বারের সৌভাগ্য ও দায়িত্বকে স্বীকার করিয়াই আমরা আমাদের কর্তব্য অর্থধারণ করিব।

যে ভূমিধাতো আমরা সমবেত হইয়াছি, ইংল্যান্ডের ব্যবসায় এবং আমাদের বাধ্যকর সম্বন্ধিত তাহা ভারত-রাষ্ট্রের ভৌগলিক কৃত্তিকা মাত্র। আর আমি যে স্থান (বঙড়া) হইতে আসিয়াছি তাহাও সেইভাবে পাকিস্তানের ভূমিধাতো মাত্র। কিন্তু মাঘের স্তম্ভ এই পার্থক্যের ধার এবং ওধারে একই মানবমন বিরাটমান। হিন্দু নামেই অভিহিত হই, আর মুসলমান নামেই পরিচিত হই, আমাদের মধ্যে যে মানবতার ধারা বর্তমান, সে তো একই। একই “ভূমার” সন্ধান আমরা—আর বা বটে আমাদের হৃদয় বা কৃপ্তি নাই।—সকলেই আমরা “অনন্তের সন্ধান”—সংজ্ঞিতই আমাদের বল বা কৃতি, বিভেদে আমরা কৃত্যকে বরণ করিতে পারি না।

পল্লভূতের সংহতিই জীবন,—বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু। তাই ভারতব্রাট্ট ও পাকিস্তানের পরিবেশ পৃথক হইলেও আমরা যারা কংগ্রেসের নেতক, তারা যে ব্রাট্টেই থাকি না কেন, আমরা পরস্পরের মানবতার সাধনার সহায়ক, একে অন্ডের সাধনার উত্তরসায়ক। সাধনার এই উপকরণ আমরা যেন না তুলি।

ভারতব্রাট্টে ধারা স্থান বা আশ্রয় পাইয়াছেন, তাঁরাও হবেন মানবতার সাধক। সূত্র সাম্প্রদায়িক বোধের উর্দ্ধে তাঁদের উন্নীতে হইবে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বিকেই যে তিনি তুমি প্রেম করিবেন, মানবের প্রাণ্য স্রষ্টা নিবেদন করিবেন, মিলনের আলিখনে আপনায় করিয়া লইবেন, তাহা নহে;—পাকিস্তান হইতেও ধারা ও দেশে পিগাছেন, বাইতেছেন বা বাইবেন তাঁদেরও অঙ্গে তুপোলের কোন্ ধণ্ডের মুক্তিকার স্পর্শ আছে, তাহা তুলিতে হইবে। ভারতের যে অঞ্চলভার সাধনা এতদিন করা হইয়াছে তাহা তুলিয়া পিরা আক ভিন্নধর্মাবলম্বিকে অনাময় এবং পাকিস্তানাগত তাঁকে শোষণ, তুণ ও কুণার পায় করিয়া কেলিবেন না। ইহাই আমাদের নির্দিষ্ট জানিতে হইবে।

আম দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহা একটী কঠিন সমস্যা। মানুষের মধ্যে দুই প্রকারের ভাব আছে। এক উন্নত মানবতা। অপরটী আদিম মানব। আদিম মানব কেবলই জাগিতে চায়। মানবতার গর্বসংকে তাকে পবিত্র করাই, তাকে সংহত করাই মানবতার সাধনা। তাই, দেখিতে পাওয়া বাইতেছে, যে অবস্থাবৈকল্যে যখনই কোনোও অত্যাচারিত মানুষ দেশান্তর হইতে স্থানান্তরে বাইতেছে, তখন সে অঞ্চলের পূর্বাধিবাসির মধ্যে আদিম মনোবৃত্তি তুণ, ও লোভ প্রচণ্ডভাবে জাগিয়া উঠিতেছে। বিদেশী বা "বাঙাল" বলিয়া তুণ জমির মূল্য বাড়াইয়া তাহাকে শোষণ করা যেন নিত্যকার ব্যাপার হইয়া পড়াইয়াছে। সাধনার পথে অনেক সাধককে এইরূপ বিষাক্ত বা পতিত হইতে দেখা বাইতেছে।

সমস্ত কংগ্রেসসেবির আত্ম কঠোরভাবে এ বিষয়

অবহিত হইতে হইবে। সর্বস্ট অতুণের মতো সে আদিমমানব কর্তৃক সহচরই হউক, আর নর্থ সহচরই হউক, আত্মীয়ই হউক, আর অনাত্মীয়ই হউক, প্রচার বেশ পরিস্থিতিই থাকুক বা না থাকুক, কংগ্রেসের ধারা প্রত্যন্ত সেবক তাঁহার মনকে স্বয়ং রাখিতে হইবে—

"কমা বেধা কৌণ দুর্জলতা,

হে কত্র নিহঁর যেন হাতে পারি তথা,
তোমাও আসেনে, যেন রসনার মম
সত্যবাক্য তুলি, ওঠে বর বক্স লম
তোমার ইচ্ছিতে যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাগনে লয়ে নিজস্থান।
অস্তায় যে করে, আর অস্তায় যে লবে,
তব তুণ যেন তারে তুণ লম পাই।"

আমাদের পাকিস্তানে ও বিশেষাগত অনেকে আসিতেছেন। তাঁদের সম্বন্ধেও আমরা যেন কোমল অঞ্চল স্নায়বপরাগত হইতে পারি।

কংগ্রেস সেবিদের এই মানবতার সাধনা ও প্রচার অসুষ্ঠ হউক। অন্ডরে ও বাহিরে আমরা যেন এক হইতে পারি। দ্বিতপ্রজ্ঞ মহাত্মা গান্ধীর মতো আমরা যেন মান অপমান, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় লংঘ্যই লমান করিয়া সর্গকৃতহিতে রত থাকিতে পারি। আমাদের বর্তমান সমস্যা সমূহের মধ্যে স্থান ত্যাগের ও তদাঙ্গুধিক ব্যাপারের সমাধান সাধনা এই ভাবে করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

দেশের ভাঙে আমরা কংগ্রেসের পথে আলিলেও আমরা রক্তসঙ্গত হইয়া সাধনার আত্মনিবেগ কথিতে পারি নাই। ঘরের টান, বহনের মাগ, অর্ধের লোভ এবং ভয় বার্থ ত্যাগ করিতে পারি নাই। তাই, উত্তেজনার দিনে যে দুর্ভয় সাহস ও ত্যাগের পরিচয় পাই, শান্ত বাস্তবতার দিনে সে সব ভয়-সংঘাত যেন ত্যাগায় মিলাইয়া যায়। উত্তেজনার অভাবে যে পন্থে পরিবেশ প্রকাশ পায়, তাহাতেই ঘরের টান, বহনের মাগ, অর্ধের লোভ ও ভয় আবার মাগা তুলিতে থাকে। তখন হয় সেবকের অভাব। আর পাকিস্তানে আমাদের

কংগ্রেসনেবিদেঃ অন্ততঃ সংকট সেখানে। আর আমাদের সংস্কারের একটা অভাব। ভারত রাষ্ট্র কংগ্রেসের প্রতি সরকারের প্রতি আছে। তাই হয়তো সেখানে কংগ্রেসের নামে অনেক সেবকের সেবা পাওয়া গিয়েছে। পাকিস্তানের সরকারের কংগ্রেসের প্রকাশ্য অস্বীকার পরিচয় এখনও না পাইলেও প্রকৃত স্রীতিবও পরিচয় নাই। তাই লীপ সেবকের হল বাড়িতেছে। আর কংগ্রেস সেবক বিহীন হইয়া আসিতেছে।

আমরা ভনে ভনে মহাত্মা গান্ধীর মতো অশ্বও মতোর ত্রুটি বা সাধক নহি। আমরা কুহকীর্ণ সেবক মাত্র। অন্যদের সাধনায় পাথের মল, —তাই নিষ্টিগ্ন অজ্ঞান। হুতরাং কংগ্রেসের যে আদর্শ দেশকে মহান করিবে। নাহীক উভয় করিবে, স্বয়ং বিরোধের অবসান ঘটাইবে। চেমের নিগনদীতির প্রতিষ্ঠা করিবে, দরিদ্রের অর্থের অভাব দূরিতবে। আন্তের নৈবাধ্যা ফিরাটগা আনিবে, দুর্ভিক্ষ জ্ঞানী করিবে।—সে আদর্শ প্রচারের ক্ষমতা পাকিস্তানেও সহজ সহজ আদ্যাত্মগী দুবকের সাহচর্য প্রয়োজন। কর্তৃত্বের সরকার—তাহা পাইব কি করিয়া? এইটাই আর পাকিস্তানী কংগ্রেসনেবিদেঃ গুহং সমস্যা।

অর্থের অভাব আছে, তাহা স্বীকার করি, তবে সেটা খুব বড় নহে। বড় অভাব ভনের অভাব।

ভারতরাষ্ট্র অপেক্ষা পাকিস্তানে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার কঠিনতর,—তাই সেখানে অনবলের প্রয়োজন আরও অধিক। সে সমস্যা সংকটনর, উহা খুব হইবে কি করিয়া? —যে আদর্শবাবে একদিন উদ্ভূত হইয়া দেশবাসী তরুণের হল সর্বস্বগণ করিয়া স্বাধীনভাষ্যের সমরকেই বা পাইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই বা আর কোথায়? তাদের ভাবে অস্বাধীন অজ্ঞানের বলই বা আর কোথায়? এ সমস্যার সমাধান তাহারা পাইতেছি না। অস্বস্তি বোধ করিতেছি। আগমনের নিকট ভিত্তার সহযোগিতা চাই।

সম্পূর্ণ ভাবান্বিতগা না পেলেও কথির প্রয়োজন। অর্থের অভাব মিটাইতে পারিলে হুততা কন্যী পাইব। সেই কন্যাই প্রথমে কর্তব্যবোধ নিদা আনিবে। কর্তব্য

ব্যাপ্ত হইয়া স্রীতিমান হইয়া উঠিবে। তাই, চাই একটা অর্থের ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে শুধু পাকিস্তানীরা অর্থ দিবেন না—ভারতরাষ্ট্রের মানবতার সাধকরাও দিবেন।

ভারতরাষ্ট্রের অন্ততঃ সমস্যা সংখ্যালঘিই নহি। মহাত্মা গান্ধীর অনীম প্রভাব বাহ্যের উপর ছিল ঠাণ্ডা প্রায় সকলেই ভারতরাষ্ট্রের সহিত অন্ধিত। পাকিস্তানে বাহারা মহাত্মাগান্ধীর প্রভাবকে প্রভা করেন, সরকারে তাঁদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি কম। তাই, মানবত্বের কৃষিকার ভারতরাষ্ট্র হইবেই সন্তোষ নিরপেক্ষ নার্কটোমগা; আর পাকিস্তানে যোগ্য করা হইয়াছে যে এখানে হইয়াছে ও হইবে সাম্প্রদায়িক মোয়েমগা। এইখানেই মহাত্মাকীর মানবতার আদর্শের কৃষ্ণতা সাদিত হইল। হুতরাং ভারতরাষ্ট্র সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রায় অব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেননা যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার অশ্বও মানবতার দিক দিয়া স্বীকৃত ধর্মভেদে হাছবে হাছবে ভেদ সেখানে অস্বীকৃত। আর, পাকিস্তানে, সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র যোষিত হুতরাং হাছবে হাছবে ধর্মের ভেদে অশ্বও মানবতারও ভেদ স্বীকৃত। অন্তঃসংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের সমস্যা এখানে প্রবল। সংখ্যাগরিষ্ঠ এখানে অস্বগ্রহকারী এবং সংখ্যা-লঘিষ্ঠ এখানে অস্বগ্রহতিথারী।

এই ভাবের কলে সংখ্যালঘিষ্ঠের মনোভাব হীনতর হইবেই।

তাই ভারতরাষ্ট্রে যে আতঙ্ক এখনও প্রবলভাবে প্রকাশ পায় নাই, এখানে সে আতঙ্ক সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে বিচিত্রিকার পরিণত হইয়াছে। এই আতঙ্ক নিবারণের ক্ষমতা সরকারী কৃষ্ণতা অত্যাবশ্যক। তার চাইতেও অধিক প্রয়োজন স্রীতি, দলিত বেলকাকারী লোকের প্রচার ও আতঙ্কিত জনগণ মধ্যে অশ্বদান। অশ্বদানমানবিত্বের স্বানত্যাগে অবশিষ্ট বিম্বুদের মনে আতঙ্ক কুড়িই পাইতেছে।

বাহারা চলিয়া গাইতেছেন, তাহারের কণ্ঠে হাইতেছেন সৌধীনভাবে। এদের সংখ্যা খুব কম। বেশীর ভাগ গাইতেছেন, নিরুপা হইয়া। বিম্বুদের

আয়ের পথ চাহুড়ী—পাকিস্তানে সে সংখ্যা কমিয়া পেল। ওকালতী চিকিৎসা বৃদ্ধি প্রভৃতি,—সেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিধি উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ও সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়াছে। মান চলাচলের পথে দুর্নীতি। শিক্ষার ক্ষেত্রে মধ্যমশ্রেণী সাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রচলনের চেষ্টা হিন্দুদের ভয় বিতেছে।

আমার কিন্তু মনে হয় এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অত্যধিক প্রাবল্য সাময়িক বা স্থানিক উত্তেজনা মাত্র।

নৃতনের আহ্বানের প্রবল গর্জন মধ্য পৃথিবীতে শোনা গাইতেছে;—এই দুঃখের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করা পাকিস্তানী যোনের তরুণের পক্ষেও অসম্ভব। প্রকৃষ্ণগায়ণ প্রাচীনপন্থী আর অধিকদিন তাকনাখমী সেবারুতিপরায়ণ জনগণকে সমিত করিয়া রাখিতে পারিবে না। তাই, এই আপাতচর্য্যের বস্তার স্রোত শিথল হুল-প্রাবলকে স্থগিত করিতে বাধ্য। এরই পরে আসবে নবীর সেই শান্ত স্রোত, যে বহিবে “হুলে হুলে করি পরিবেশন মলমল বরণ”। কিন্তু সেই শান্ত সংঘত চিন্তার সেই সর্গহিতকারী কণ্ঠনিষ্ঠার, সেই আত্মত্যাগী উদারতার মনের আপসনের প্রতীকার আমাদের বৈধ্য ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। স্থান ত্যাগের তরুণীর বিতে হইবে। সকল আতঙ্কের মধ্যে অতয়ের সাধনা লাগল। ছাড়িয়া করিতে হইবে। কণিকের ভেদচাকল্যের মধ্যে অভেদ ও প্রেমের ধ্যান করিতে হইবে। রবীন্দ্র নাথের ভাষায় আমাদের প্রার্থনা করিতে হইবে—

“বীর্ঘ্যদেহেঃ জুঃখে

বাহেঃ ক্ষুঃ আপনাতঃ শান্তবিত্ত মুখে

পারে উপেক্ষিতে।”

“বীর্ঘ্যদেহে তোমার চরণে পাত্তি শির

অহনিশি আপনাতঃ রাখিবারে স্থির।”

অতরের আর্শ বড় ও সর্গসেহ হইলেও যেরের ধাবীও কম নয় বা উপেক্ষার বস্ত্র নহে। সেইজন্য পাকিস্তানে যাহারা অবিচলিতচিত্তে তথিস্ততের মানব মিলনের প্রতীকার রহিবেন তাঁহাদের ব্যবসায় বাদিলা, শিক্ষা

হীক। ও দ্বাঃ। সমান রক্ষার জন্য ভারতব্রাহ্মের নাগরীক-বিগলকও অবহিত হইতে হইবে। এই যে প্রত্যাখ্যানিতা ইহা চিন্তার লান নহে,—কপারতপা নহে,—ইহা হইবে মানবতার সাধনার ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের বলি নিবেদন। উভয় রাষ্ট্রের কংগ্রেসকর্মীদের এই মাধ্যম্যই হইবে এই সব সমস্তার সমাধানের অন্ততম পথ। স্থানত্যাগী ও স্থানবিত্ত উভয়েরই আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পাদনে আমাদের প্রাথমিক অবহিত হইতে হইবে।

পাকিস্তানে থাকের জমি ধরা আছে, তাঁরা দুই শ্রেণীর। এক কৃষক, অপর জোতদার ও ভূমিদার। হিন্দু কৃষকও আছে এখানে আতঙ্কগ্রস্ত। কংগ্রেসকর্মীর কাছ হইবে তাঁহাকে বল ভরসা দেওয়া। তাঁহার মধ্যে বাস করিয়া তাঁহার সাহচর্য্য করা এবং তাঁদের অভাব অভিযোগের প্রতীকার করিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে সর্ব্বদা অবহিত করা ও অবগত রাখা।

যাহারা জোতদার ও ভূমিদার তাঁহারা নিশ্চয়ই বৃদ্ধিহাছেন যে এই প্রধাণ অর্থসংস্থান আর ভারতব্রাহ্মও চলিবে না। পাকিস্তানেও নহে। তাঁদের পক্ষে উভয় রাষ্ট্রেই সমান। তাঁদের শিথিতে হইবে শ্রমের মধ্যান। যে ভাবে তাঁরা ভারতব্রাহ্মে জীবিকা অর্জনের কথা ভাবিতেছেন, সেই পন্থায় এখানেই অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিবেন; না পারিলে না হয় অগত্যা চলিবা গাইবেন।

এসব কালেও কংগ্রেসকর্মী হইবেন তাঁহাদের উপযেষ্টা, আশাসনাতা।

কৃষকদিগের যদি জমি ছাড়িয়া গাইতে হয়,— ভারতব্রাহ্মে তাঁদের কি হইবে হঃ। তাঁহারা নিমেষা, কংগ্রেসকর্মীরা এবং ভারতব্রাহ্মের িজ্ঞানায়করা তাবিদা দেখিবেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মধ্যমশ্রেণী ভাবধাঃ পরিত্যাগ করিয়া নবীনতা আনিতে হইবে। তার জন্য অনেক হিন্দুকে এখানেই বসবাস করিয়া সর্গহা বৈজ্ঞানিক শিক্ষার হাবী করিতে হইবে। এই ত্যাগ অবশ্য কর্তব্য। কংগ্রেসকর্মীরও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অতিপ্রয়োজনীয়তার বিষয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে।

মানবতায় সাধনার পথে, অহংকার পথে ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পথেই আমরা মিলনের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে পারিব।

তুই রাষ্ট্রে মিলন হইবে কি না হইবে সে প্রশ্ন অবাস্তব। কিন্তু উন্নত রাষ্ট্রের নগরিক সংসারে পরস্পর পরস্পরকে মানবতার কারণে আত্মীয় বলিয়া ভাবিতে গিবে তাহার চোখই আমাদের একমাত্র সাধনা হইবে। মহাস্বাধীন সেই পথ হইতে যেন আমরা উঠি না হই।

রাষ্ট্রের গড়ন কি হইবে তাহাও আমাদের পক্ষে ভাবিতে হইবে। ন্যূনতমকৈ যখন ভগবান আত্মা ও স্বতন্ত্র বুদ্ধি বিদ্যাহীন, তখন রাষ্ট্রের গঠনে সেই বুদ্ধির প্রয়োগ করাও ভগবানের অভিপ্রায়। ইহার ভিত্তি অপরোহ দ্বারা বা অন্তঃস্বের ভিত্তি নির্মিত পৃথিবীর উপর নির্ভর করা বুদ্ধিসিদ্ধ নহে। এই স্বতঃসিদ্ধ নতবাস্যের প্রত্যয়ে আমাদের পক্ষে অবহিত হইতে হইবে।

সকলের স্বাধীন মতের প্রকাশ করিয়া তাহাঃ সমন্বয়ে যে স্থান রাষ্ট্রের গঠনের কথা মহাস্বাধীন বিদ্যাহীন, সেই Neo Socialism বা নবীন সমাজবাদের কথা লোককে শুনাইতে চাইবে। তাহারই নিম্নেবের বুদ্ধির প্রয়োগে তাহা ইহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিবে, কি নূতনভাবে লইবে তাহা ঈশ্বরের বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। যে রাষ্ট্রে মানুষকে মানুষকে ভেদবুদ্ধি থাকিবে না, যে রাষ্ট্রের সকল কর্তব্য কেবল মানব ব্যক্তি বিশেষের বা জনবিশেষের বা সমুদায় বিশেষের হিতের জন্য প্রযুক্ত না হইয়া আপামর সাধারণ সকলের মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করা হইবে সেই সমাজতন্ত্রই আমাদের কাম।

সকল রাষ্ট্রেরই গোড়ার কথা হইবে প্রেম, অধিঃসা, আলোচ ও অন্তঃস্ব—ইহাই লোককে স্বাধীন সর্বস্ব প্রয়োগন।

এই কঠোর সাধনার চাই চিন্তার নিবিড়তা, চাই জনমঙ্গলের পরাকাষ্ঠা। প্রত্যেক কংগ্রেস কমিটির সেই সাধনার আন্তঃনিঃস্রাব করিতে হইবে। দলীয়তার বোঝে বুদ্ধিভর না তদ্ব্যবহার প্রায় পথে সাধুচিন্তার ক্ষেত্রে কর্তনিত লোকসেবকের সংগ্রহ করিতে হইবে।

সমস্ত বহু, সমস্ত গুরুতর,—সমস্ত সংকটময়। সকলগুলির আলোচনা ও সমাধান সম্ভবপর নহে। একের চিন্তাও তাহা হইবে না—সকল সময়েও তাহা ঘটিবে না।

তাই, মহাস্বাধীন স্বতন্ত্র পর যে বাস্তবতার আমরা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছি তাহাকে ত্যাগ করার অধিকার আর আমাদের নাই।

আমাদের পক্ষে তাঁর প্রচারিত প্রেমের পথে, তাঁরই আগ্রহের সত্যের পথে, তাঁরই প্রদর্শিত কর্তব্যনিষ্ঠার পথে আমাদের পক্ষে সাধনা করিয়া যাঁতে হইবে। সাধনশ্রী, সমাজশ্রী প্রেমচাত্ত আমাদেবের হস্তা চলিবে না।

যিহা লোকোচের দিন আমাদের দূরে সরাইতে হইবে। যে “কিবাণ মঙ্গলর রায়” প্রতিষ্ঠার সাধনা মহাস্বাধীন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সাধন, তাহার সহায় তাহার আত্মবিশ্বাস কর্তব্যবস্তির মধ্যেই নিহিত আছে।

নূতন সাধনার নবীন আলোকে সেই কর্তব্যবস্তিকে আমাদের পক্ষে লোকসমাজে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। উহার অবনিষ্ঠিত দার্শনিক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, উহার সত্যতার নিঃসর আচরণের দ্বারা জনগণকে বিশ্বাসী করিতে হইবে।

নিঃস্বার্থ প্রবন্ধী হইয়া কিবাণ মঙ্গলরদের কঠোর প্রেমের অংশ আদিও গ্রহণ করিব, মঙ্গলরদের দ্বাধ্যপ্রাপ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিব না, বহিঃকর লাভিদের মধ্যে তুলিয়া থাকিতে যিব না, বৃথকে শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত রাখিব না, আত্মকে হুয় ও সবল করিয়া তুলিব, পরকে ক্ষিঃ করিয়া লইব, ভগবতের দ্বন্দ্ব বিরোধকে শেষ করিয়া যিহা বেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথীকে সমুদয় করিয়া যিহা তুলিব। ইহাই আমাদের আর্থনা,—ইহাই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

কৃতির কঠোর কঠিলাইয়া আমরা পারিব—
ও মধু ভায়াতে—যাতাল মধুর হউক।
মধুকর সিন্ধবঃ—সকল নবীরজন মধুর বাস হউক—
নাথীনঃ সন্তোষকিঃ আমাদের পরসম্পত্তি মধুর হউক।

মধুনাথ—হাজি আমাদের মধুতলী হউক।

উদ্যোগ—প্রভাত আমাদের মধুপুত্র হউক।

মধুনাথ পান্থিক রক্ত—পৃথিবীর শ্রম ও মধুতল হউক।

ও মধুনাথ রক্ত—গিতা—সাক্ষর আমাদের গিতার মত মধুতল হউক।

মধুনাথ রক্ত—আমাদের বুদ্ধবান মধুতল কল্যাণী হউক।

মধুনাথ পুত্র—প্রভাত প্রথম তেজ ও মধুতল হউক।

মাকীর্ণবো ভবত নঃ—আমাদের গোপন মধুতল মধুতল হউক।

ও মধু—ও মধু—ও মধু।

মিকে মিকে, মেনে মেনে, কালে কালে, জনে জনে, সন্তানবে সন্তানবে মধুতল মধুতল হউক।

“বন্দেমাতরম”।

বন্ধুর চিঠি

শ্রীমদ্রাজন দাস গুপ্ত

()

“বশাই হেনের মত কটক করিলাম আমরা বেই আর এই বাদীনতার কতিও হইল আমাদের বেই”। অন্তর্ভুক্ত—বাদীনতা না বোড়ার ভিত্তি, পরস্পরিতর বাদীনতাবিশেষী মেতারা আর ইংরেজ কলীকাল মিলিয়া, ইংরেজের বড় শত্রু বাদীনতার দক্ষতা করিবার বড় বড় দায়। এই বেদ এবং পেটুত তানে আসে নিশ্চয়ই, আমাদেরও অন্তিতে হয় অহরহ।

বলা বাহুল্য, বলা আমাদের মাততাই—মধ্যবিত্ত (বর্ষ) হিন্দু, বাদীনতা হাজার হউক (বতই মাতগোয়াইয়া) “declassified হইয়াছে মনে করি” ইহাদের মনেই নাজির বন্ধন, রক্তের টান। মঙ্গল কাব্যের আধিতে ইহাদেরই বন্ধন করিয়া লই।

বাল্যের বাইরে বাদীনতাকে (মধ্যবিত্ত বর্ষ হিন্দু) কেমন লাগে? মটগোমারিকে (Montgomery) চার্চিল (Churchill) শাহেবের যেমন লাগিয়াছিল—Intolerable in defeat, insufferable in victory.

আমরা এক মনোভাব রাখিযা, আসরের নাকপোপাল অন্তে কেন আমাদের পুত্র পুত্র করিয়া রাখিবেনা!

“বাদীনতার মত ‘Suffer’ করিয়াছি আমরা বেই” বর্ষা বিনিই বত ‘গণ-আন্দোলনের কথা তুলুন, মধ্যবিত্ত মঙ্গল নিম্নের কটটাই লার বলিয়া জানে, যে এক মাত

কনার বোমামিশ্রল হুঁচিয়াছে, কলি গিহাছে, কলি গাটিয়াছে, তাহাকেই আন্দোলনের পরাকর্ষী এবং কটের চরম বলিয়া মনে করে। চম্পারণ, বহনৌদি, বালিখা, সাতারা তাহার মনে ছাড়া কেলে না, নিম্নের মতের নীল বিরোধের কথা জানে না! এমন কি হাল আন্দোলের যেমিনীপুত্র, বাসুবটাত হিমাব করেনা। মঙ্গলানের বক্তৃত্যনে পাণ্ডাবের কথা ভাবে না, আমার পারশা, ‘man-made’ হুঁচিকে চম্পি লক্ষ প্রতিবেই চাবী কৈবর্ত মঙ্গল কথাও ভাবেনা।

(অন্তর্ভুক্ত প্রদেশেরই মত) শতকরা পাঁচজনে ‘বহনৌ’ করিয়াছি, (অন্তর্ভুক্ত প্রদেশকে টেকা মিথ্য) শতকরা আর পাঁচজনরা ভারতের গোয়েন্দাবিভাগ চালাইয়াছি,—মধ্যবিত্ত বর্ষহিন্দুর মত আন্দোলন করিয়া বাহারা ‘বহনৌ’ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, মধ্যবিত্ত কাহাকেও বোধ হয় রেহাই দেয় নাই,—বাকি নকই জন হয় নিতীহ ডাল-মাছ লাখিয়া বৈ-কালায় হইতে শতভুত দুঃখ রহিয়াছি, নর নিরত্ন প্রবিধাবানী হইয়া পাঁচ মারিবার ফিকিরে রহিয়াছি, অনেক কাগজের নীতার-বাইটার প্রাশনাল-ওয়ার-অবের টাকায় পেট ভরাইয়াছি, শেখচকু প্রতিষ্ঠান দুখের ঠিকা লইয়া বাদীনতা রাখাইয়াছি। এই তো আমাদের ‘suffering’, ‘sacrifice’এব ইতিহাস।

নিজাত বিরক্ত হইলে বলি, বাদীনতা ভারত ইতিহাসে ঘরতারা বিভীষণ। ইংরেজকে তাকে বসাইয়া মদিরাবী

টাকার মিথ্যে, টংবের বাতন হইয়া সর্বত্র বিঘাছে।

• কুনকী হাফি'র মত অস্ত্রের পায়ে নিকলি মচাইয়া
গিরাছে—আমরা পরায়ীরা বাঙালীকে টংবোজব কুড়া
মনে করে, পায়ে কুড়িতে সেব না, ঘর কুড়ীলে ঘর ভাঙিয়া
কেনে,—মিউজিমির মনহও পললেন সবিতে কুলে নাই।
সোভারী হইয়া 'বা' বনিঘাচে, কাছারী আসলত
চালাইয়াছে, লগাবরী হৌলে 'House' লুণ্ঠকী হইয়াছে।

বলি যে বাঙালী স্বাধীনতার জন্তে কতি বীকার
কবে নাই, কতিপ্রক হইবার জন্ত স্বাধীনতার জিঙ্গির
সিগাছে। On His Majesty's service হিন্দু
মধ্যবিত্তের ভাগ্যেই ঘাইতেছিল, চর্যাং টংবের
মুলনামের চাকুরী সিন্ধে লুণ্ঠ করিল, ইংরেজী
শিলাইবার উৎসাহ করিল, বাংলার অর্ধেকটা তাহাদের
হাতে তুলিয়া দিতে চাইল।

কতি আমাদের হইয়াছে লড়াই। প্রজাপত্র আইন পাল
করিয়া লোক উৎখাত করার পথ বন্ধ করিল, গণ-শাসিনী
করিয়া। পদমস্ত তেজ্যগতি ব্যবসার মাটি করিল, মণি-অর্জার
যোগে রাজনা পরায়ীরা নাদের প্রোমত্তাকে পথে বলাইল,
এখন কতি কি করিয়া? কুটিলগিরি আর চলে না;
আমাদের ছেলেগুলি বেকার এমিকে একটা সাধারণ
কামলার রোগে চট টাকা। একটা বিকৃণ্ডালার ৫।
একটা ছুতোরে ৮।১০। একমণ ধান বিক্রী করিয়া
চারী ১৫ টাকা পর্যন্ত কামাই করে; একমণ পাট বিয়া
আরো বেশি টাকা করে আনে। বেটারা এখন মুখের উপর
কবাব খেয়; বাজারে সমানে সমানে দর করে; বেগার
খাটে না। মাথা গুন্ডি ভোটেই জোরে বসী হইয়া বলে।
চাকীর লাভ, বন্ধুর লাভ, তাহাতে আমাদের কি?
আজিকার স্বাধীনতার বাঙলার তিনভাগের দুইভাগ
বাঙালীই যদি লাভ মনে করিয়া ঘুরী ছব, তবু বাঙালীরই
কতি চটখাছে বলিতে হইবে, কেন না, আমরা পূর্ববাংলার
নব্যবিত্ত হিন্দু ব্রো ডিগাছাড়। (ডিটা অবত আপনই
জাতিভাঙিলান, বুড়ো বাপমাকে বেলিয়া রাখিতে
পারিতাম। এমন আবার ঠাট্টার খাড়ের উপর চড়াও
চটবেন।)

আর একটা কথা জনিত-জনিত কাণ কালাপালা
হইয়া গেল, আমাদের "Culture" নাকি খুঁই উঠে। এট
মানসিক উৎকর্ষটা এমনই প্রচণ্ড যে টহার হাপটে
আমরা আগায়ে বসিয়া অহমিয়ারের জালী বলি, বিঘারে
বসিয়া বিহারীরের চাকুখোর বলি, অস্ত্র মেছুটা বলি
এবং পরস্পর পরস্পরকে ঘটি-বাঙাল বলি, মনোযোগ
লহকারে বুকিতে চোঁটা করিগাছি, আমাদের কুটীর এতরকম
বক্তাসিদ্ধ দর্শনবোধো ভগটা কি? উত্তর, শেষ পর্যন্ত
ববীক্ষনাথ ও কলিকাতা, হাং ববীক্ষনাথ! আমাদের
হাতে মালা না হইয়া অস্ত্রের মাথা মারিবার ডাঙা
হইলে। অসুত এক লক্ষ্যতি! ধর্ম বোধ নাই, নীতিবোধ
নাই, সমাজবোধ নাই, নিরক্ষরতার জন্ত লুণ্ঠ নাই, অস্ত্রাঙ্গ
লমতার জন্ত লম্বা নাই, স্বাধীনতার জন্ত উৎসেগ নাই,
বিধবাবের জন্ত আকশোষ নাই। মূব খাইতে মিথা নাই,
ল্লাক মার্কেট করিতে বাধা নাই—শেবেরটা মাড়োয়ারীতেও
করে। পয়সার জন্ত সে না করে এমন কাছ নাই, কিন্তু
সে গোপালা করে, ধরমালা করে, রিলিক ফণ্ডে টাকা
বেধ, নিষেধ স্বার্থের বাইরেও কতগুলি বাধের মাঝার
আছে, ঐ তাহার লক্ষ্যতি। বাঙালীরও ব্যবসা আছে।
তাহার মনের কথা পোনেন কি? মাড়োয়ারী কোটি
টাকা কাবাই করে। লাখ টাকা দান করে; বাঙালী
লাখ টাকা কামাই করিলে একশ টাকা অস্ত্রকে
দেখনা। (যদি না অবত লক্ষ্যুরী বা কর্পোরেশনে
ট্রিকামারী পাইবার জন্ত পাটি সেলায়ী দিতে বাধা চয়)
মাড়োয়ারী একজন অস্ত্রজনকে সাহায্য করে। বাঙালী
(মধ্যবিত্ত) একে অস্ত্রের বিরুদ্ধে সাপাথ এবং লগে।

তুলনা স্বাধীনতার বাঙালীরই ফল, মানে আসিস
টাইবাল লক্ষ্যতির ধারক ও বাহক। নিটোল বাধা
যেহেহা কাছ করে, ঘরে-ঘরে তীত চালায়, ধান কাটে,
কলহ কম, কোলাহল কম। সমাছে ধানুী আছে।
মহত্তরের মা'র ধর্মগোলা করিয়া ঠেকাইয়াছে। আমাদের
দুর্গোপদেব নিজ নিজ ঢাক পিটাই, এদের বড় উৎসব
'বিহ'র ঢোল সাপরাধ লবার হাত লগে। ঘর ডাঙিয়া

শহর ছাড়িয়া যেহেতে পুরুষে মাঠে মিলে নাচে, গান গায়। তাহাতে বাঙ্গালী শরবারের বিলম্বিত তান, স্বভাবতঃ মীড় নাই, কিন্তু রক্তে ঢেটে ভোলে।

আসামে বাঙালীর সংস্কৃতির কীর্তি কি? প্রবন্ধনা এবং ইংরেজের দালালী। প্রথমটা অবশ্য সেপেক্ষ করিয়াছি নিরঙ্কর চারীর লাশকাগজে টিপসিহ নিয়াছি, ইংরেজী আটনের পাঁচ লবণ কাড়িয়া লইয়াছি। পকাশ টাকা কর্তৃ সিদ্ধ চক্রবর্ত্তি সুবের কলে পাচশ টাকা নিউক্যাটলা লইয়াছি। এখানে সে পণ এখনও সারা হয় নাই। কাজ করাটা কম হাজিরা দেই, বেশী নিয়া কম এখনও বলি। রেলের ইমারে ভাক ঘরে কাছারী আসানতে ইংরেজী নবীপ বাঙালী, সুবের করক চালাইয়াছি। মুন্সের বাজারে হিন্দুস্থানী গরুর গাড়ী চালাইয়াছে, হাঙ্গাইকর ভেঙর হইয়াছে, মুন্সির দোকান দিয়াছে, মাড়োয়ারী ব্যবসা করিয়াছে, নেপালীরা পর্বত ধে জোগাইয়াছে, শাক-সব্জীর ঠিকা দিয়াছে, বাঙালী শুষ্ক ঘূষ খাইয়াছি, কন্ট্রাক্টের দালালী করিয়াছি, কন্ট্রাক্টের হই নাই, সংস্কৃতির দৌলতে Smart হইয়া মদ ও মেয়ে মাছব সরবরাহ করিয়া ট্রিকা (Contract) জোগাড় করিয়াছি এবং এই একই কারণে কন্ট্রাক্টের অর্গানাইজেশন গড়িতে পারি নাই। বাজারে বিস্তারিত ব্যবসায়ের জ্ঞানিতে চেষ্টা করি নাই। একই কারণে মেহনতের কাজগুলি অ-সংস্কৃত মেডুয়া ও ছাত্তুখোরদের মস্ত রাখিয়া নির্ভে শহরে বসিয়া সিনেমা চর্চা করিয়াছি, শাকীর হাওয়া কলিয়ার লাগাইয়াছি। মেয়ে-মাছবের দালালী অবশ্য আজ নতুন করি না, চা-বাগানে নাহেবদের মন জোগাইতে ঐ-কাজে হাত পাকাইয়াছি। কামাখ্যায় গিয়া ভেড়া বনি নাই, ভেড়ার ব্যবসা করিয়াছি। মেয়ে-বাটা সমাজে প্রমাণিত হইয়া বলিয়াছি। পলাবনী সংস্কৃতির ভোগে গোলাই ঠাহুর হইয়া দাশীদের সেবা লইয়াছি। আর অনেক “কবলী দেখাইয়া” চলিয়া আসিয়াছি।

আমির অনেক সমাজে মেয়ে পুরুষে একটা সহজ বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু বর পরমাধুর হইলেও ভালবাসাই ছিল তার ভিত্তি ও অবলম্বন, আমরা তাহাকে

পণ্য করিয়াছি। শাহাড়ী গাঙ্গীনের মতো ‘অদ্যমিস্রণ’ আছে, বিশিনিবেশও আছে।

Taboo আছে, Incest আছে গাধের পাঁচেলরদের একত্র করিয়া রাখে ‘নাম-ঘরে’ পুরিয়া রাখিবার কঠোর অলঙ্ঘনীয় বিধান আছে। ঐ সমাজের বাইরে (আকার লগ্নে দাক্ষ্যার, মিরির লগ্নে নাগার) যেলামেনার বারণ আছে। ইহাঘের Promiscuity দেখিয়া আমরা হাসি কিন্তু বহুশূণ ধরিয়া: পাত ও সাহিত্য mobilise করিয়া যে একনিষ্ঠ পবিত্রতার সংস্কৃতি গড়িয়াছি, হৃদিকে পেটের দ্বারে প্রথমতে তাহাকে জ্বাট করিয়াছি, শুষ্ক কি পেটের দ্বারে? বিলালের দ্বারে টাকার গোড়ে মুন্সের বাজারে পরের মেয়ে, ঘরের মেয়ে অনেককেই ব্যবসার নামাইয়াছি।

আর স্বভাবের সূচনা করিয়া কি হইবে? আত্মবিশ্ব, মধ্যবিত্ত মগজ লড়াডাকে (Civilisation) লকনের মস্ত রাখিয়া সংস্কৃতিক (culture) ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও মগজের কলম বলিয়া চালাইয়াছে।

অন্ত প্রদেশের লম্বন্ধে সহস্রবোব (সংস্কৃত সাহিত্যে) বাহাকে রসাহুত্বিত এবং গুণগ্রাহিতা বলে। পবিত্র আশ্রমের জাতে সেগেন কি? আমরা শিত্তর জাহাৎ হইয়াছি অনেকদিন, ‘আশ্রমের ইতিহাস বা সমাজ বা আট সংঘে বাঙালীর ক’মানা নষ্ট আছে? বাচাদের সঙ্গে দেখা হয় না, সেই মণিপুরী ও পাহাড়ীদের curio বানাইয়া আপা রোমান্টিক, শিকি বৈজ্ঞানিক সচিত্ত প্রবন্ধ লিখিয়া মাসিক সাহিত্যে, নিম্নের নাম ও ছবি ছাপাইয়াছি, বাহাদের সঙ্গে বাগবিকই থাকি পাশাপাশি বাড়ী, একই ছলে পড়ি, একই অক্লি করি, সেট অহমিষাদের লম্বন্ধে আমরা একেবারে নির্লাক।

এক সময় ছেলেমেয়েদের মস্ত (এবং বেলাব গলগ্রহদের মাত্রারী কস্ত) বাঙালী খুল করিয়াছে বটে, আজ তাহাতেও উৎসাহ নাই। কলেকের মস্ত মাড়োয়ারী যদি ঘের সোরা লাগ, শিল্পী বিশ হাজার, বাঙালীর চার হাজারও ভঠে না, অত প্রায় শহরেই বহুতর পর বছর বাঙালী মুনিগিপাল চেদারমান হইয়াছে এবং

সেই সুযোগে বাড়ী ও ডালা হটম্বা আও গ্রুপ দপসা কামাইতেছে।

অবশ্য কত সহজেই এরা খুলী হইত। বঙ্গাল-দেশা আংশোলনের জোয়ারের মধ্যে এক শহরে বাঙালীরা এক অংশিয়া নটক অভিনয় করে। সঙ্গে সঙ্গে আংশোলনে তাঁটা পড়ে। এরাই দিন অবশ্য আর নেহি হইবেগা। আবারেরই চ্যাচে অংশিমাঃ মধ্যবিস্ত জালাই হইতেছে।

৩)

এখানে বাঙালী মধ্যবিস্ত দুই প্রকার—আমলা অক্ষিরা ও ক্যানডালার। অক্ষিদের বাবুয়া মিউজিয়ামের specimen (নমুনা) বড় সাহেব স্রোত্তের টানে তলাইয়াছে; পায়ের তলে বাবু সরিয়া ঘাইতেছে; গ্রবিক্স অক্ষকার। আগের দিনের জঙ্গ হাফতাল এদের নিত্যটেনমিত্তিক এবং স্বাভাবিক।

কৌতুকের কথা এই যে ইহারা অনেকেই ভাবে যে ডাহারা পুঁজিবারের শত্রু। কথায় কথায় টাটা-বিড়লার জ্ঞান করে। আসলে ইহারা কলোনিয়াল system-এর privileged পরসাদ। ইংরেজীতে কলম পোষার ক্ষমতাই ছিল ইহাদের একমাত্র qualification ইহাদের সত্যিকারের মানিণ হইতেছে শিল্প যুগের (Industrialisation) বিকক্ষে। ডাইটার মেকানিকের নতুন যান্ত্রিকো-ক্রাফির বিকক্ষে। (ইন্ডুজ বাটনের বিকক্ষে কলনের অভিবোধ!) তুল করিবার একটা হেতু কন্ট্রোল। কন্ট্রোল থাকিলে অক্ষি বাবুদের পোষাবারো:—গকটে দুটো পরসা আসে। কন্ট্রোল না থাকিলে, মহাকনের পোষাবারো:—লাভের বোল আনাই ধার তাহার পেটে, দ্বিতীয়, যুদ্ধের সময় বেশের বিকক্ষে কাজ করাইবাঃ জন্ত নাহেবমুনি তার পোষকের পলার Essential Services-এর বকলম্বাখিয়া বিরাছেন, হাতে করিয়া সজা রেশন্ড আর মাগ্নী ভাতাক কাঁচাটা আদুটা গাওয়াইয়াছেন। এখনকার ধর্মব্রাহ্মণের মহাবীর পুঁজিবীরদের হাত দিয়া পেটুকুও তাঁরা পাঠেছেন না।

ক্যানডালার জুত 'নীলমান মধ্যবিস্ত সংসার হইতে

টিকরাইয়া। পড়িয়া পথখাট ছাইয়া ফেলিয়াছে, ইহাদের পথ গুণ্য, জীবন কক্ষ বড় চৌহদি; রকমারি অভিজ্ঞতা, কিন্তু সে অভিজ্ঞতার জীবন রসের ভিন্ন নাই।

সমায়-বিজ্ঞানের পরিভাষায় ইহারা প্রভিউটার নয়, ডিষ্ট্রিবিউটার মাত্র, স্রোতা নয়, পরিবেষক মাত্র। ইহাদের জীবনে সংগ্রহ হয়, সঞ্চয় হয়, কিন্তু কলম্বা হয় না।

ইহারা Pioneer নয়, ইহারা ধাধা পথে না হটক, কাঁটা পথে চলে। কিন্তু ইহারা চোখ পেছনে ফেরানো। মধ্যবিস্তের সংসার ইহাদের বাণ্যপতির কল্লোলক। বেঙ্গমা—বেঙ্গনী বাহাই বসুক না কেন, রাজকন্তার ঘুম ডাঙাইয়া নতুন গুণে রাজকের শরীক হইবার আকাঙ্ক্ষা নাই। তেপান্তর পার ইহা যুগপাতনী মানিণিলীর কোলে কিরিয়া বাইবারই রোখ বেশী।

(৪)

তবে বাঙালীর কীতিও আছে। মননবীর উজ্জানে-উজ্জানে, চড়ায়-চড়ায়, পারে-পারে জলল কাটিয়া বাঘ ভাড়াইয়া দাপ মাটিয়া বলত করিয়াছে বাঙালী। কীকড় সরাইয়া আগুতা কেনিয়া বেত-বামার করিয়াছে বাঙালী, ধান ফলাইয়াছে বাঙালী, পাট বুনিয়াছে বাঙালী মোনোনশাহী বা সিলেটী বাঙালী। বাঙালী, তবে মূলমতান। বাঙালীর "Kultur"-এর হিসাবে বাহ্যকে চোখে পড়ে না, বাঙালীর 'suffering', 'sacrifice' লাভক্ষতির খতিয়ানে বাহার কথা মনেও আসে না।

আদাম সরকারের সঙ্গে লড়াই করিয়া মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া আছে, যে জমির আবাস করিয়াছে, বলত করিয়াছে, লাভল খরিয়াছে সে জমি তাহার। পুণ-বাঙালার আবারের কথা তুলনা করুন,—সেই বাহায়া 'suffer' করিয়াছি 'sacrifice' করিয়াছি, বীরত্ব মেধাইয়া ঠংরেজকে সাগর পার করিয়াছি, এখন বাতাসে শুকনাপাতার মত খসিয়া পড়িতেছি।

গুর্ভাগ্য, ইহাদের বিঘাও নতুন লম্বা গড়িয়া উঠিল না। বৈশ হইতে মোলা, মহাকল, বড়মিলাও জোতদার লইয়া আনিয়াছে, জলল কাটিয়া হাতী বাঘ ভাড়াইয়া

যেমনশাহী সমাধের miniatureই বলাইয়াছে। যানীর অভ্যন্তর। রক্তপাতে রোমাঞ্চ নাট। কিন্তু রোমা—
বালিন্দাসের সঙ্গে ইহারাই প্রথম মিলিয়াছে। তবে পিতৃদের রোমাঞ্চ কিছুটা আছে, মনে হয়, একটি
নিকাতালনের সুযোগ নিধা ভবির হাত বেগাত বড় রক্তপাতে আমাতের রোমাঞ্চ মধ্যস্থী মনোভাণে
বেশী করিয়াছে। (Mediaevalism) স্রষ্টাবর্ধনে (reversion), ভাতি

একটা বিকরে তুলনা করিয়া বড় কৌতুক বোধ হয়। মনরত্নাধঃ ইহারের রোমাঞ্চ বিজ্ঞানে ভাবীকালের
আমাদের দেশেও দেখিয়াছি মরিতে ও মারিতে ইহার। পটক্ষেপনে (Projection)।

রবীন্দ্র-সংগীতের নূতন রেকর্ড

রবীন্দ্র-সংগীতের রাগি ব্যক্তিমাতেই স্তম্ভে আনন্দিত হইবেন যে এগার রবীন্দ্র-সংগীতের
উপলক্ষ্যে বলিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী স্টুডিও নূতন ও বাছাইকরা রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড
করিয়াছেন। এ সব গানের স্বর শিক্ষা দিচ্ছেন রবীন্দ্র-সংগীতের বিখ্যাত অধ্যাপকগণ—শ্রীযুক্ত
অনাদি দত্তদ্বার, শ্রীযুক্ত শৈলজারতন বসুসহায়, শ্রীযুক্ত হরিনন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নীহারবিন্দু সেন
প্রভৃতি। আর রেকর্ডে গিয়েছেন চিত্রভাসক। শ্রীমতী কামন দেবী, শ্রীমতী বিনতা রায় (বহু),
শ্রীযুক্ত হেমন্ত সুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দেবব্রত বিশ্বাস, ভক্তি চৌধুরী, কুমারী ঈতা নাচা,
কুমারী নীলিমা গুপ্তা ও কুমারী বেলারায় প্রভৃতি।

প্রত্যেকটি গানই সকল যাদুর্বে শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। আমরা রেকর্ডগুলির তত্ত্ব বলিয়া
গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

আধুনিকতম ডিজাইনের হেডিং ও বডি
টাইপ ও বর্জার প্রভৃতি ফক হইতে
সর্বদা পাওয়া যায়।

শ্রী টাইপ ফাউণ্ডারী

—৮ বি, লালবাজার স্ট্রীট
বিকারীর বিজ্ঞান

সহকারী

জে, সি, হুই আণ্ড কোং



নববর্ষ

“মন্দিরা” তার চলৎশীল পূর্ণ কবল — বহু বাদ্য-
বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই চলৎশীল পূর্ণ কবল কাটাতে
চলেছে। পথেই হিমায়ে বৈশিষ্ট্যের সঞ্চয় তার কিছুটা ছিল
না ছিল তবল একতল কবল ঐকান্তিক আশ্রয়।
সেই সঞ্চয় নিয়ে মন্দিরা বছরের পর বছর এগিয়ে
চলেছে। যুদ্ধের চিত্তকে সন্তোষিত নিশ্চেষ্ট ও বৈশিষ্ট্য-
মূলক বাহক। ‘মন্দিরা’কে বহু ভাগ করতে হয়েছে।
তারপরে একে একে সব কর্মীরা কার্যকর হল। নৃত্য
সহায়ক ও কর্মীরা এসে ‘মন্দিরা’র সাহিত্য প্রণয় করল।
এমনি করে মন্দিরা তার গতি অব্যাহত রাখতে পেরেছে।
পিছনের চলৎশীল পূর্ণ কবল নিয়ে মন্দিরা নৃত্য
বছরে নৃত্য সাহিত্য গ্রহণ করেছে। যাত্রা এতদিন নানা-
ভাবে মন্দিরকে সাহায্য করেছেন, তাদের রচনা ‘মন্দিরা’
তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞান করেছে।

যাযাবর ভ্রমণের প্রথম নববর্ষে মন্দিরা সঞ্চয় সম্ভার
জানাজে— সেই সব দেশ সেবকদের দ্বারা নিশ্চেষ্টের সঞ্চয়
সিঁদে দেশের আশীষতার পথ প্রস্তুত করেছেন। ‘মন্দিরা’র
যাত্রা পরিচালক তাদের কর্মচারীর উৎসাহ হ’ল নৃত্য অতীতে
এই শতাব্দীর প্রারম্ভে। কত সন্ধ্যা এই সীমার পথে
এসেছে। কত ক্রান্ত হ’য়ে গিয়ে পড়েছে—কিন্তু জীবনের
একটা বিশেষ অংশকে তারা বিপ্লব সাধনার দিয়ে গেছে।
আজ প্রীতির সঙ্গে তাদের দ্রবণ করছি। কতক বিপ্লব
সাধনার চরম পূর্ণতার পেয়েছে—নিশ্চেষ্টের জীবন আত্মত্যাগ
দিয়ে। অর্থাৎ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আজ তাদেরও দ্রবণ
করছি। আর কতক—আজও বিপ্লব সাধনার মধ্যে
আছে। তাদের প্রতিষ্ঠা মন্দিরা তার সঞ্চয় নিবেদন করে
দ্রবণ করিয়ে নিচ্ছে—আরও, বন্ধু, আরও এগিয়ে যেতে
হবে,—এখনও বিপ্লবের সময় আসে নি।

সম্পাদক পরিবর্তন

“মন্দিরা” এই নাম থেকে নৃত্য সম্পাদকের চাপনাজ
বের হচ্ছে। এতে “মন্দিরা”র আকৃতি ও প্রকৃতির কোন
পরিবর্তন ঘটনা করছে না। যে কর্মী-পেশির চিন্তাধারার
বাহক হিসাবে মন্দিরা এতদিন চলছিল, আজও সে
তাদেরই চিন্তাধারার বাহক থাকছে। নিশ্চেষ্টের মধ্যে
পাশ্চাত্যিক সাহিত্যের ভাগবাতোষ্যের চিত্রিত-এই সম্পাদক
পরিবর্তন। আশা করি ‘মন্দিরা’র হিতাকাঙ্ক্ষীরা শ্রবণ
মতোই মন্দিরকে প্রীতি ও সহায়কৃতির চোখে দেখবেন।
আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন; নৃত্য সহায়ক ও ভাট্টা গড়বার
সাহিত্য বাহকের উপর পড়েছে, মন্দিরা তাদের অন্ততম।
সেই সাহিত্য মন্দিরা সঙ্কল্পে যাতে পালন করতে পারে,
সেই বিষয়ে মন্দিরা সকলের সাহায্য ও সহায়কৃতি প্রার্থনা
করছে।

রবীন্দ্র জয় জারিস

এই মাসের ২৪শে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। রবীন্দ্র
নাথের জন্ম একটা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ঘটনা নহে;
এমন কি এটা কেবলমাত্র একটা জাতির ঘটনাও নহে।
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবি; তাঁর জন্ম বিশ্ব-ঘটনার অন্ততম।
যুগে যুগে বহু কবি জন্মেছে মনেহীন। তাদের গভীরতায়
ও বিচিত্রতায়, প্রকৃতির ও মাহাত্ম্যের মনের গোপন
কথাটিকে ও ভাষার ছুটিয়ে তুলবার দক্ষতা, স্থান ও
কালের অতীত যে মাহাত্ম্য তার স্থান-স্থানকে কবিতা
রূপায়িত করার ক্ষমতার রবীন্দ্রনাথের কোন তুলনা নেই।
আমরা দত্ত এমন এক বিশ্বকবির যুগে ও দেশে আমরা
জন্মেছি। যুগ যুগের ধরে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মতো জীবিত
থাকবেন—তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে। তাঁকে স্মরণ করা
আমি বড় কথা নয়; তাঁর চিন্তা ও ভাবধারাকে জীবিত
জীবনে প্রতিফলিত করাই বড় কথা। তা বেন আমরা

করতে পারি—এই প্রার্থনা জানিয়েই আমরা ববীজনাথের প্রতি আশাধের প্রহা জ্ঞাপন করছি।

জাতীয় সপ্তাহ

গ্রাম গ্রাম বছর পূর্বে একটা বিশ-বৃক্ষের অব্যবহিত পরে বিকৃত ভারতের বন্ধ থেকে যে প্রাণন খাওয়া বের হয়েছিল—তার ভগ্নিরথ ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। শশত বিপ্লবী যুবকদের সমাবার চক্ৰ সরকার পক্ষ রৌপ্যট আইন জারি করল,—গান্ধী এর প্রতিরোধে ইচ্ছাশালেন—ভারতীয় জনসাধারণের নেতৃত্ব নিয়ে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সভা-গ্রন্থের যে স্থান ফুটে উঠল তা হ'ল নিরস্ত্র জনগণের বিপ্লব-প্রদর্শন। শাস্ত্র নিরীহ ও বস্তাবস্তই তারা সোচ্চারিত-কামী—এমনি বহুলোক ঐ বিপ্লবের আহ্বানের লাড়া দিয়েছিল। জাতির ইতিহাসে এমনি ঘটনা পৌরবের ওচির-স্মরণীয়। তা ছাড়া ঐ ঘটনা উপলক্ষ করেই ভারতের রাজনীতি এক নতুন রাস্তা গ্রহণ করেছিল। বাংলার ও অন্যান্য প্রদেশের যুবকদের যুদ্ধ কালীন শশত বিপ্লবপ্রদর্শন ব্যর্থ হয়েছে; রাজতন্ত্র ও নরম-পরীক্ণের সহযোগিতার পক্ষা ভাঙিকে মুক্তির লক্ষ্যন দিতে পারে নি। জাতি তখন বিভ্রান্ত; সে জানে না, কোন পথে সে এগুবে। এমনি এক লক্ষট মুহূর্তে গান্ধী এলেন তাঁর সভা-গ্রন্থের পক্ষা নিয়ে। সন্ত-বৃদ্ধ-জঘী ইংরাজ মায়ণ-মন্ত্র ও শাসন বুদ্ধি নিয়ে নিরস্ত্র জাতির এই শঙ্কাকে দাবিয়ে দিচ্ছে অগ্রদর হল। ভারতের শরীর বীরের বক্ত-খারায় ধূসর ধরনী রবীন হ'ল। এই রক্তচিহ্ন আজও অশ্রুতগরের জালিন ওঝালাবাগে সংঘে রক্ষিত হচ্ছে। জালিয়ানওয়ালাবাগেই ইংরাজের রক্তচক্ৰ সব চেয়ে বেশী প্রকট হ'ল। ইংরেজ সেনানী লাইই বলেছিলেন—*to teach them a lesson* এদের একটা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে সে বেপত্রোয়া ভলি চালিয়েছে। বছর বছর আমরা জাতীয় সপ্তাহ পালন করছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে; তবুও জাতীয় সপ্তাহ পালিত হ'ল। কারণ ঐ সপ্তাহের ঘটনাবলী জাতির ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে গেছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টি

পশ্চিম বাংলা সরকার কম্যুনিষ্টদলকে পে-আইনী বলে ঘোষণা করেছে এবং কিছু কম্যুনিষ্ট নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। কংগ্রেস একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করাট তার উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রকর্মতা স্বাধীনতার পর নতুন রাষ্ট্রাধিকারীরা সর্বত্রই বিরোধী দলকে শেখন করে। কমিউনিস্ট কম্যুনিষ্ট দল ডিগ্রি আর কোন দলই আইন-সিদ্ধ নয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রকৃতি বড় বড় বুলি দিয়ে তারা সোচ্চারিত কথাকে খোরালো করতে চান, তাদের অহুতাগ করছি—বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীযুগের কাহিনী যেন মন দিয়ে পাঠ করেন। এ কথা: 'ত' অব্যবহার করার উপায় নেই যে কম্যুনিষ্ট পার্টি সর্বত্রই তাদের নিজস্ব পথের রাষ্ট্র-কর্মতা ছিনিয়ে নিতে চায়। তারই চক্ৰ জনগণের অনিবার্য দুঃখ-কষ্টকে এরা নিজেদের শলীক কালে লাগাচ্ছে—*exploiting the unavoidable hardship of the masses for party interest* জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট দূর করা এদের উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হ'ল ঐ সব দুঃখ-কষ্টের কথা বলে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলা। আজ যখন দেশের প্রথম প্রয়োজন হল—ব্যবহার্য ও আহাৰ্য পক্ষা ও দ্রব্য উৎপাদন করা, তখন এরা চেষ্টা করেছে, ক্রমাগত ধর্মঘট ঘটিয়ে উৎপাদনে বাধা দিতে। তা ছাড়া বড় প্রকার অন্ত্রায় দাবী উঠিয়ে সমাজ ব্যবস্থায় গোণমাণ সৃষ্টির চেষ্টাও এরা করেছে। এই অবস্থায় এই লক্ষট লক্ষ্যে লক্ষ্য হওয়া নিতান্তই উচিত।

আজ তাদের চক্ৰ দাবী দরদ দেখাচ্ছেন তাঁদের মরণ করা উচিত কম্যুনিষ্টদের মত ও কার্য এই বিষয়ে কি? তারা ত কোন প্রকার বিরোধী দলকে বরদাশ করেনা; নিশেবে ডাকে উজাড় করে দেওয়াই এদের নীতি। তাদেরই অহুতগ ও অহুতগিত নীতির খিঁচুটা যদি অপবে গ্রহণ করে, তবে তাতে এদের কষ্ট চক্কা উচিত নয়।

অঙ্গ-বস্ত

দেশ স্বাধীন হয়েছে; দেশী লোকরা লাট ও মহারী চ'য়েছে। কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের কি আসে যায়?



তুংগবতীতে সল চেষ্টে বড় সনাত্তা হল—ভাত-কাপড়ের। নতাই গাছী বলেছেন—সুধার্তের নিকট তগবানকে আসতে হলে, আসতে হয় অস্বস্তি। এই কথাই অস্ব-করণে বলা হয়—সুধার্তের নিকট স্বাধীনতার একমাত্র তপস্বী হতে পারে—সেই হল অস্ব-বস্ত্র। বীরটি কংগ্রেসে বলা হ'য়েছে—জনসাধারণের নিকট স্বরাষ্ট্রের কোন অর্থই থাকতে পারে না—যদি স্বরাষ্ট্র কেবল রাষ্ট্রই সীমাবদ্ধ থাকে এবং যদি তা সমাজ ও অর্থনীতিতেও বিস্তৃত না হয়।

সেই অস্ব-বস্ত্রের অভাব পূর্বের মতোই চলছে। গাছীজীর আশ্রিত ও চাপে লোকের ক্রমে ক্রমে বিনিময় নীতি অবলম্বন করছে। বস্ত্র আজ বিনিময়িত; তার কল বই আজ সর্বজনপ্রাপ্য। এখন আর এক টুকরা কাপড়ের অল্প ঘণ্টার পর ঘণ্টা সার সিরে পাড়িয়ে থাকতে হয় না। বিনিময়নের পর অস্ত্র প্রসঙ্গে কাপড় কেবল লম্বা প্রাপ্য হয়নি; কতকটা স্থলভও হয়েছে। বাংলা যেসেও কাপড় হরত সর্বজনপ্রাপ্য হয়েছে; কিন্তু স্থলভ হয়নি। কেন, কি ব্যাধার—তা জনসাধারণ জানে না। তাই অনেক কথা এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্র হয়েছে ও হচ্ছে। ৪০০০ শত কাপড় যেদিন গুণম থেকে বাজারে ছাড়া হ'ল,—তা কোথাও সেল এবং কার হাত দিয়ে সেল—সে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা বুঝা। তবুও পশ্চিম বাংলা সরকার উচিত—সমস্ত কাহিনী জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা। আজ প্রকাশ বিবালোকে রাষ্ট্রের পাশে কাপড়ের চোরাকারবার চলছে; স্বাধীন বাংলার কংগ্রেসী সরকার হাত-পা উড়িয়ে বসে আছে—তার বেন কিছুই করার নেই। এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কিছুই হতে পারে না।

তারপর আসে অস্ত্রের কথা। আজ সরকারী গুণম থেকে সাধারণ লোকের হাবার থানায় যে চাউলের ভাত আসছে তা বাড়নের খাবার যোগ্য নয়। বাংলার চাউলে এমন পাথরের বা কীকরের ছড়া-ছড়ি স্বপ্নে। পূর্বে দেখা যায় নি। খন্যাহারে ও স্বর্গাহারে মানুষ ভকিয়ে গেছে, আর চাউলগুলো ফুলে স্বীকৃত্য হয়েছে; এমন ঘোটা

চাউল বাংলায় দরিদ্রতম জনতাও কোন দিন পায় নি, তার উপর আসে দায়ের কথা। সরকার কি দায় এই চাউল কিনেছে এবং কত লাভে বা লোকদানে তা জন-সাধারণকে দিচ্ছে, তা প্রকাশ করবে কি? এরপর আসে পরিমাণের কথা। সময় সময় যে পরিমাণ চাউলের বা পদের মৈনিক বরাদ্দ করা হয়—তা যে একজন দুই সর্বল মানুষের পক্ষে অচল, এই বোঝে বেন সরকার হাবিয়ে কেলেছে। তাঃ রাজস্বপ্রদান এখন ভারতের ব্যাৎ মন্ত্রী ছিলেন, তখন এমন একটা রেওয়াজ চলছিল—বাড়পত্রের মৈনিক বরাদ্দ কখনোই বেন বাড়-সমস্ত সমাধানের একমাত্র উপায়। ঐ পরিমাণ বাড়-পত্রের ভাত বা কট খেয়ে যে মানুষ দিনের ৭৫ দিন কাজ করে যেতে পারে না—এই সাধারণ সত্যটুকু সরকারী দপ্তরের কর্মচারীদের অবশ্যই আছে। লগাই বার বার প্রয়োজন মতো ভাত-কট থাকে; —ভবে এক টাকার চাউল চারটাকা দিয়ে কিনেছে।

স্বাধীন ভারতের এই যে তপ,—অস্ব-বস্ত্রের এই অভাব ও চোরাকারবারের প্রভাব—জনসাধারণের নিকট দিনকে দিন তা একটু হয়ে উঠছে। গাছীজী বলতেন সুধার্তের নিকট তগবানকেও অস্ব-ভূষণ আসতে হয়। স্বাধীনতাকেও অস্ব সুধার্ত ও বিবর জনসাধারণের নিকট অস্ব ও বস্ত্রের ভূষণ গ্রহণ করে আসতে হবে; নইলে সে স্বাধীনতার কোন অর্থই তারের নিকট থাকতে পারবে না।

সমাজতান্ত্রিকবলের পরাজয়

বোম্বাইর কর্ণারেশনে সমাজতান্ত্রিক হল কতকটা লক্ষ্য লাভ করে। অবশ্য তাদের বলের মনোনিষ্ঠ প্রতিনিধিদের মধ্যে তারা নির্বাচিত হয়েছেন তার মধ্যে কখনও প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক এবং কখনও বিশেষভাবে ধনী ও ধনপতি বলে পরিচিত—কতজন সমাজতান্ত্রিক মতের স্বত্ব এবং কতজন ধনতান্ত্রিক ক্ষমতার বলে নির্বাচিত হয়েছেন সে বিচার আশ্রয় করতে চাই না। উইং কংগ্রেসের বিরোধী ভাবে পাড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক দল ওখানে যে লক্ষ্য লাভ করেছে, তা আশ্রয়ের চরম

আশঙ্কায় বিভীত। তারপর এল বৃহৎ প্রবেশের মেলা বোর্ডের নির্বাচন। ভোটের সবই গ্রামের এবং বৈষ্ণব ডাঙাই ভূতক শ্রেণীর; তাই কৃষক-বহুল সমাজতান্ত্রিকগণ খুব আশঙ্কান করছিল—এবার এক হাত বেগিয়ে দিবে। নির্বাচনের অগ্রকিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত তারা কংগ্রেসের মধ্যে ছিল এবং বৃহৎপ্রবেশের প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি তাদেরই দখলে ছিল। তাই কংগ্রেসের মনোনীত নির্বাচন-প্রার্থীদের মধ্যে অনেক সমাজতান্ত্রিক ছিল; হঠাৎ নির্বাচনের পূর্বে এরা সবাই কংগ্রেসী-নামাবলী থেকে সমাজতান্ত্রিক প্রার্থী হয়ে উঠল। তখন কংগ্রেসকে এই সব প্রার্থীর নাম ব্যতিলি ক'রে আবার নতুন নির্বাচন প্রার্থী মনোনীত করতে হ'ল। এই সব অসুবিধা সবেও মেলা বোর্ডের নির্বাচনে কংগ্রেস আশাতীত লাফ লাফ করেছে এবং সমাজতান্ত্রিক বলের অতি সামান্য কিছু সমস্ত নির্বাচিত হয়েছে। ১১ শত সমস্তের মধ্যে মাত্র অর্ধেক ৭০ জন সমস্ত এরা পেয়েছে।

এ গ্রন্থকে উল্লেখযোগ্য যে বৃহৎপ্রবেশের মন্ত্রীমণ্ডলী কিছু দিন পূর্বে গ্রাম্য স্বরাজ বা গাও চকুমং আইন পাশ করে গ্রাম্যপঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছে। তার কলে স্থানীয় ব্যাপারে ইউনিয়ন বোর্ডের বা থানা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ উনত্তের (unit) হাতে অনেক ক্ষমতা প্রদত্ত করা হয়েছে। এই আইন পাশ হবার পর এই প্রথম নির্বাচন। তাই এই নির্বাচনের একটা বিশেষ বারনৈতিক গুরুত্ব। এই নির্বাচনে সমাজতান্ত্রিকদের পরাজয় সেই হিসাবে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ভারত ও পাকিস্তান—

পাকিস্তানের জন্ম ও সৃষ্টি যে বারনৈতিক মতবাদ ও ঘটনাবলীর ভিত্তর দিয়ে, তাতে ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক যে খুব ঘনিষ্ঠ হবে না, এ কথা সবাই মানবে। কিন্তু তবুও জানা করা গিয়েছিল—ছোট রাষ্ট্র ক্রমে স্বয়ংভাবে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অসুভব করে লায়ামন প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু তা হ'ল না;—যে দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছেদের মধ্যে পাকিস্তানের জন্ম, তার ঘের

উত্তর দক্ষ থেকেই চলতে লাগল। পাঞ্জাব এই নিয়ে হ'ল অগ্রণী। লক্ষ লক্ষ লোক নিজ নিজ ব্যক্তির ও বাসভিটা ছেড়ে পূর্বানুকালের বায়ান্নর জ্বাভের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল; রাষ্ট্রের এখানে-ওখানে তাঁবু গড়ে লক্ষ লক্ষ শোক প্রাপ্তিহীন হৃদয় তীব্রানু নিবাসদের মতো এখানে-ওখানে অস্থায়ী বাসগৃহ গড়ে তুলছে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ও হিংসাত্মক স্বভাবতই কতকটা ছিল, তা শত গুণ বেড়ে গেল।

এর মধ্যে বাংলা যেন এক বায়ুমণ্ডলের বলে নিজেও সঞ্চিত ক্রিয়ে গেল; যে যেন একটা নতুন পথের সন্ধান পেল ও অপর দিককে দিল। অবশ্য এই সত্যাত্মস্বভাবের মধ্যে পাকীরাও হাত অনেকটা ছিল,—ঠিক যেন দুইয়ের বোতাম (switch) টিপে ঘরে আলোর প্রবাহ চড়িয়ে দেওয়ার মতো। তারপর নানা বিকের দ্বাভ-প্রতিদ্বাভে বাংলার শুভক্ষিও যেন ঘুরিয়ে দাঙিল। এমনই সময় কলিকাতার বঙ্গল দুই রাষ্ট্রের এক সম্মেলন। এই সম্মেলনের আলোচনার উত্তর রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকটা ভালর দিকে মোড় ফিরিয়েছে। এটা খুবই আশার কথা। বাংলার পরিস্থিতির তীব্রতা থেকেই এই সম্মেলনের উদ্ভব; বাংলাতেই এই সম্মেলন বঙ্গল—এই সব দ্বন্দ্ব একেবারেই নিরর্থক আকস্মিকতা নয়। উত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে হিংসা ও বিচ্ছেদের বর্তমান আবহাওয়া প্রতীক হ'ল পাঞ্জাব;—যে নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করা দরকার, যে আদর্শ নিয়ে কংগ্রেস চলছে—তার প্রতীক হ'ল বাংলা। বাংলা তার এই গৌরব যেন রক্ষা করতে পারে।

মুন্ডা অবস্থা—

এই পথে একদিকে আমরা সহায় পাঞ্জি ভারত ও পাকিস্তানের বৃহৎ সম্মেলনের নতুন "কলিকাতা চুক্তি" (Calcutta Pact); অপর দিকে আমরা বাণা পাঞ্জি—পূর্ববাংলার এবং সমগ্র পাকিস্তানে কংগ্রেস গুটিয়ে নেওয়া। এই শেখোক্ত প্রস্তাবের আদ্যে ঘোরতর বিতর্কিত এবং আত্মবাদের সাধ্যমতো এর প্রতিরোধ করছি। এই

প্রতিবেশ সংবন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লিখিত ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তা অত্যন্ত প্রতিফলিত চিন্তাধারার পরিচায়ক। এই বক্তৃতা পণ্ডিতজীৱ জীব অতিথিত হয় এবং পরে বোম্বাইর শাখার সভায় যে সব কথা বলেছেন তা যদি পণ্ডিতজীৱ দ্বারা নতুন হয়, তবে গান্ধীজীৱ দ্বারা পণ্ডিত জীৱ মুখ থেকে যে বিলাপ বের হয়েছিল—the light has gone out of our lives—“আমাদের জীবনের আলো নিভে গেছে”—তা অত্যন্ত তাঁর পক্ষে নিষ্ঠুর সত্য।

তবে আমাদের আশা আছে—পণ্ডিতজীৱ ভাবগুরু লোক; আবেগের বশে অনেক কথা খুব তেজের স্রোতে বলেন—যা পরে সুস্থভাবে চিন্তা করে তিনি বললে নেন। এই ক্ষেত্রেও আশা সেই আশা পোষণ করি।

যাক, পণ্ডিতজীৱ আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী। জীবনের সাধনার বস্ত্র তিনি পেয়েছেন; তাঁর পক্ষে অনেক চুটো পাকির আশার হাতের একটা পাখিকে উড়িয়ে দেবার বিমলীকৃতি নিতান্তই বোকামী মনে হতে পারে। তিনি এই পণ্ডিত ভারতকে অবলম্বন করে নতুন গান্ধী গড়বার মোহে আছেন। বাংলার একমুখ লোক ও আজ শুধুমাত্র “সব পেয়েছির বেশে” এলে পৌঁছেছে বলে মনে করে। ভারতই বাংলার সব নয়;—সত্যিকার বাংলার রূপ মনে থেকে এই ৯১২ মাসেই মুছে বাহ নি—এমন লোক এখনও বাংলার কংগ্রেসে আছে। আজ বিশ্ববের এই বিস্তার অধ্যায়ের সার ও দাখিল তাদেরই উপর পড়ছে।

কলিকাতার ব’মে ভারত ও পাকিস্থানে যে চুক্তি সেদিন স্বাক্ষরিত হ’ল—আমাদের আশা আছে, তার ফলে এই শেকড়ের শ্রেণীর কর্মীদের পথ অনেক হৃদয় হবে।

এই চুক্তির বর্ধে অস্ত্র দেওয়া হ’ল।

ভারত-পাকিস্থান সংঘর্ষের চুক্তি—

ভারত-পাকিস্থান জোহিনিয়ন সংঘর্ষের গত ৬ই বৈশাখ সোমবারের অফিসানে উত্তর জোহিনিয়নের প্রতি-নিধির্গ সংখ্যালঘির্গণের দ্বারা সংরক্ষণের প্রথম সর্ব

যুক্তি এক চুক্তিনামার দ্বারা কথিত উত্তর সংঘর্ষের পক্ষ দ্বিগুণ ব্যাপী অধিবেশন পরিগম্য হয়।

সংঘর্ষের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা ও ভারত সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি সচিব শ্রীমন্ত কিশোরচন্দ্র নিয়োগী ভারতীয় জোহিনিয়নের পক্ষে উক্ত চুক্তিনামার স্বাক্ষর করেন। পাকিস্থান প্রতিনিধিবর্গের নেতা ও পাকিস্থান সরকারের অর্থ সচিব মিঃ গোলাম মদন পাকিস্থান জোহিনিয়নের পক্ষ হইতে উহাতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তিনামার সর্বপ্রধান বিবরণ নিয়ে প্রথম হইল :—

যেহেতু উত্তর জোহিনিয়নের গবর্নমেন্টের স্বীকার করিতেছেন যে, সংখ্যালঘুদের ব্যাপকভাবে বাস্তবতা কোন জোহিনিয়নেই পার্শ্বের পরিশোধক নহে, তাহাও বাস্তবতাপক্ষে নিরুৎসাহ করার ক্ষমতা ও বাস্তবতা বহু করিবার উপযুক্ত অবস্থা স্বীকার ক্ষমতা সর্বপ্রকার বাস্তবতা অবলম্বন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাও বাস্তবতাপক্ষ-লিগকে তাহাদের পৈতৃক বাড়ীতে কিরিতা দাঁড়িতে হইত দূর সম্বল উৎসাহ ও হৃদয় স্ববিধা দিবেন—সেই হেতু চুক্তি জোহিনিয়ন নিয়োগী বিষয়গুলি মানিলাসহিতহে—:

১। সংখ্যালঘুগণ যে জোহিনিয়নে বাস করে, তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার এবং তাহাদের স্ববিচার পাওয়ার ও নাগরিক অধিকার রক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সেই জোহিনিয়নের গবর্নমেন্টের উপর নির্ভর করে।

২। ভারতে ও পাকিস্থানে প্রত্যেক দোকানের প্রধান অধিকার, হৃদয় স্ববিধা, বিশেষ অধিকার ও দায়িত্ব থাকিবে; সংখ্যালঘুদের মধ্যে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা থাকিবে না; তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার সম্পূর্ণ নিরাপত্তা গণ্যের ব্যবস্থা করা হইবে।

বিশেষ ক্ষেত্র—“শিক্ষা বিষয়ক” অধিকার সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

৩। পাকিস্থান ও ভারতের কিংবা উহাদের অংশ-সমূহের একীকরণের কোনরূপ প্রচেষ্টা কার্য নিরুৎসাহ করা হইবে। অংশসমূহের মধ্যে এক পক্ষে পূর্ববর্ত এবং অংশ-

পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, হুচবিহার কিংবা ত্রিপুরা রাজ্যও ধরা হইবে।

৪। উত্তর গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিতেছেন যে আরও ভাল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সংবাদপত্রসমূহের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা একান্ত আবশ্যিক, হুতরাং উত্তর গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিতেছেন যে, প্রত্যেক ডোমিনিয়ানে সংবাদ-পত্রগুলি বাহ্যতে নির্যেক কাজসমূহ না করে শুদ্ধ শুধু যেখানে সম্ভবপর হইবে সেখানে সংবাদপত্রসমূহের প্রতি-নির্দিষ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া সবপ্রকার চেষ্টা করা হইবে—

(ক) অপর ডোমিনিয়ানের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য; (খ) কোন ডোমিনিয়ানের অধিবাসীদের কিংবা তাহাদের কোন অংশের মধ্যে উত্তেজনা, তৎ কিংবা আতঙ্কের সৃষ্টি হইতে পারে এমন সংবাদ অতিরিক্তভাবে প্রকাশ; (গ) এক ডোমিনিয়ান কর্তৃক অপর ডোমিনিয়ানের বিরুদ্ধে হুত যোষণায় সমর্থক অথবা হুই ডোমিনিয়ানের মধ্যে হুত অবশ্যস্বার্থী এইরূপ অর্থবোধক কোন বিষয় প্রকাশ।

৫। উত্তর ডোমিনিয়ানে সংখ্যালঘুগণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার বা অন্যর ব্যবহারের এজাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ার অভিযোগ করিলে তৎসম্বন্ধে সম্বর তত্ত্ব হইবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

৬। পূর্ব বাঙ্গলা ও পশ্চিম বাঙ্গলায় প্রাদেশিক সংখ্যালঘু বোর্ড থাকিবে এবং এই প্রাদেশিক বোর্ডের অধীনে জেলা সংখ্যালঘু বোর্ড থাকিবে। এই বোর্ড-সমূহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করিবে, তাহাদের মন হইতে ভীতি দূর করিবে ও বিশ্বাসের ভাব জাগ্রত করিবে। এই বোর্ডসমূহ ক্ষিপ্ততার সহিত সংখ্যালঘুদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিবে এবং সম্বোজনক-ভাবে ও ক্ষিপ্ততার সহিত তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা করিবে।

প্রাদেশিক সংখ্যালঘু বোর্ড পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্ততঃ তিনজন সদস্য থাকিবেন, উহার প্রাদেশিক আইন-সভার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের

সমস্তগণ দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট দুইজন প্রভূ-প্রতিনিধিসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন ও প্রাদেশিক সমুদায়ের দ্বারা মনোনীত হইবেন। জেলা সংখ্যালঘু বোর্ডের চেয়ারম্যান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রাদেশিক বোর্ডের চেয়ারম্যান একজন মহী প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

৭। উত্তর ডোমিনিয়ানের গবর্ণমেন্ট এবং উত্তর ডোমিনিয়ানের প্রদেশসমূহের গবর্ণমেন্ট তাহাদের কর্তৃ-চারীদের ভালভাবে জানাইয়া দিবেন যে, যদি কোন সরকারী কর্মচারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার কার্যে কোন অবহেলা যেহা-ন অথবা প্রত্যাক ও পরোক্ষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন অথবা কর্তব্যের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধমনোভাব প্রদর্শন করেন তবে তাহাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে।

৮। একক অথবা সমন্বিতভাবে যদি কেহ সংখ্যাল-সম্প্রদায়ের মনে ভীতির সঞ্চার করে তবে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

৯। উত্তর ডোমিনিয়ান নিয়ন্ত্রিত অভিযোগসমূহ দূর করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন :—

(ক) আমদানী ও রপানি লাইসেন্স যত্ন করা সম্পত্তি বৈষম্য এবং রেপে মাল প্রেরণের অগ্রাধিকার সম্পর্কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অত্যাচার-অভিযোগ।

(খ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে অর্থ-নীতিক বরকটের চেষ্টা অথবা তাহাদের আত্মবিক্রম জীবন-যাত্রা ব্যাহত করার চেষ্টা বন্ধ করা।

উত্তর ডোমিনিয়ান গবর্ণমেন্ট তাহাদের নিজ নিজ প্রদেশসমূহকে তাহাদের নিজ নিজ এলাকার ঐ নীতি অঙ্গুলারে কাজ করিতে বলিবেন।

যে সকল জেলা অথবা স্থান হইতে বহু সংখ্যক লোক চলিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থানে বাস্তবায়নের সম্পত্তি তবাবধানের জন্য বোর্ড গঠনের নিষিদ্ধ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট আইন প্রণয়ন করিবেন। ঐ প্রকার বোর্ড

পাঁচের সাহায্য করা হয় তবেই বোর্ড গঠিত হইবে। যদি সম্পত্তির মালিকগণ অস্বযোগ করেন তবেই বোর্ড সম্পত্তির ব্যবস্থান ভার গ্রহণ করিবে। তাহাৎবের কার্য তত্ত্বাবধায়কের কার্যের হ্রাস হইবে এবং এই সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে না। সংখ্যায় দশমাবদের লোকদের লইয়া এই দল বোর্ড গঠিত হইবে।

উদ্য—তাহারা ১৯৪৭ সালের ১লা জুন অথবা তাহার পরে প্রবেশ ভাগ করিয়াছেন এবং বাৎসরিক অবস্থা কিরিয়া আসিয়াং পর বগুহে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদেরই আশ্রয়প্রার্থী বলা হইবে।

প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্য বিস্তৃত প্রস্তাব রচনার জন্য উক্ত সর্বমোট অধিবেশে অফিসারদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করিবেন।

এই চুক্তি বাহাতে কার্যকরী হয়, তৎসম্পর্কে স্থানান্তিত হইবার জন্য দুই ভোমিনিয়ানের প্রতিনিধিগণ দুই মাসে অন্ততঃ একবার সম্মিলিত হইবেন। উক্ত বৈঠকে কোন ভোমিনিয়ানে উপরোক্ত নীতির প্রতিপাদিত না হওবার দৃষ্টান্ত থাকিলে উপস্থাপন করা চাইবে। পূর্ব বাঙ্গলা ও পশ্চিম বাঙ্গলা সম্পর্কে কর্তৃক প্রয়োজনের আবশ্যকতা বেতু দুই প্রদেশের প্রধান বহাগণ মাসে অন্ততঃ একবার উক্ত

উদ্দেশ্যে মিলিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত দুই প্রদেশের চীক সেক্রেটারীরা পুনরু দিন একবার সম্মিলিত হইবেন। যখন আদাম, কুচবিহার ও ত্রিপুরার সমস্ত আশোচিত, হইবার লক্ষ্যে থাকিবে তখন পশ্চিম যকের চীক সেক্রেটারী উক্ত সকলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতির ব্যবস্থা করিবেন।

কমিটি মনে করেন যে, ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য এবং হয়গনি ও সর্বপ্রকার বিলম্বের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য উভয় ভোমিনিয়ানের প্রত্যেক দলের কর্মচারীদের মধ্যে সংযোগরক্ষা একান্ত আবশ্যক। কাজের চাপ ও দ্রব্য বৃত্তিা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্পেশাল যোগাযোগ কর্মচারী (liaison officer) নিয়োগ ছাড়াও উভয়পক্ষের অধিবিদ্য দৃষ্টিকরণের উদ্দেশ্যে ভারত ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সর্বমোটসমূহের কর্মচারীগণকে পরস্পরের সহিত সংযোগ ও সহিচ্ছা রক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সার্বভভাবে কোন চুক্তি বা বিধি পাশন করিতে হইলে সর্বতরের সরকারী কর্মচারীদের সহিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর বহুদাংশে নির্ভর করিতে হয়। উভয় ভোমিনিয়ানের সর্বোচ্চ শাসনকর্তৃপক্ষকে তাহাদের অধীন সর্বতরের কর্মচারীদের মধ্যে এই মনোভাব আগ্রস্ত করার জন্য প্রয়াণী হইতে হইবে।





—হৃদয়—

প্রকাশ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৫

দ্বিতীয় সংখ্যা

ধ-কারের এলাকা

ডাঃ বাহুগোপাল মুখার্জী

জীবনটা এখানে এলে ধিকারের না হ'লেও একেবারে
ধ-কারের হয়ে যায়। পঞ্চকূতের সহকে পঞ্চ-কার
অধিকার করে। ধূলো, ধোঁয়া, ধাক্কা, ধূর্ততা বা
ধাওয়াবাতী ও ধোনাধুনির ঠেলা সামলান দায়। যদি বল
এ সব ব্যতীত এত থাকিল কে করে? তার উত্তরে বলা
যায়—ধাক্কা করতে হবে কেন, “ধাঁই-কিড়ি কিড়ি”
ক'রে সমস্তে নেওয়া চলবে। সেখানে পাখি বইত উড়ে
বেহারারা, চটপট ক'রে কিছু করাকে বলত “ধাঁই
কিড়িকিড়ি”। প্রথম ধাক্কা একমল লোক থাকে পারলে
অন্যের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে। ধোঁপে তাদের ঘামলা
টুকবে কি? না কে চোরে দেখে? লখা, ছোট, মাঝারী
রকমের সাঁজা হয়েও গেল সব। তারপর বড় হাকিম
এ রকম আবাসকে এক রকম উজাড় বা উজ্জ্বলই ক'রে
দিলেন। যেমন ধাঁই কিড়ি কিড়ি এল, গেলও তেমনি
ধাঁই কিড়ি কিড়ি। আর এক ধাঁই কিড়ি কিড়ি একদিন
স্বপ্নভাতে দেখা গেল। বাসি কার্ণকর্ষ দারা রইল পড়ে,
সহায়ক কন্যা বা মলবল কর্ণচাত্রী “পানিহা” তার “পাচ
কপসঙ্গ” নিয়ে মাধ্যপ্রপঞ্চ সমভিব্যাহারে আকর্ষণ মূল।
ব্যাপার কি? জুই সূরী, জুই আঁখি। আর টুপি, এই
বাক্যেই পঞ্চ মকারকে লক্ষ্য দিয়ে সাধের সাধী ক'রে
সাঁজা মারলে কোথায়? প্রয়োজনও বটে

নব নিষেধনের তাড়নাও বটে, কোতুল চরিতার্থতার
জ্বলন্ত ও মজী-বাধাগক যেমন লখা গলা বাড়িয়ে দূতের
ঘাল খাবার চেষ্টা করে তেমনি তালাবদ্ধ দরজার তেলি-
এর ঠাক হিরে আমাদের আঁজাটির ওধারে প্রলম্ব হৃদয়
যে আবদ্ধ অংশটুকু চোখে পড়ে সে দিকে ছাপুন্ মরনে
চেয়ে পাড়াতেই সেই নোংরা স্থপাভন পানিহা বেচাচার
গলা শোনা গেল। “নেহি হজুর, হম্ব ছোক্রা নেহি হ'ত,
হাঘরা সোঠো লেড্কা হাঘা।” ব্যাপার কি? কিছু
পরে আনা গেল যে, তখন বচনী বুঝানের ইংকাল পরকাল
রক্তার ক্ষত তাদের ভালর কারণই অল্পবয়সীদের অস্ত্র অস্ত্র
মেলায় আলাদা যে বহিঃস্থিত কাতম করা আছে
সেখানে একমল ছোকরাকে গেছে নিয়ে চালান দেওয়া
হচ্ছে। খুব ভাল। এখন কথা হচ্ছে এই যে, যার তুটো
ছেলে হ'রে গেছে সে কাঁচা ছোকরার পথ্যারে পড়ে
কিনা? এ বলছে—আমি ছেলের বাপ। জন্মদার
বলছে, উঁহ তুই ছেলে। আচ্ছা,—একটা কথা আছে না?
কিসিয়ে কাঁঠাল পাকান যায়। তাহ'লে দাতার চোটে
বড়কে ছোট করা যাবে না কেন? বিন্ধ্যম বলে পরমে
দাতব বিনিম বেড়ে লখা হ'বে বাহ, আবার ঠাণ্ডা হুঁকড়
ছোট হ'য়ে পড়ে। ইংলীর মত ভাষাটা হয়ে বোঝে?
তার অস্ত্র বুকুর দুকুহুনি বাড়াবার ব্যবহার নেই। ধক

ক'রে হু-বেটার বাণ শিল্প স্থান হ'য়ে গেল। অল্প আয়গ-৭ চলেও গেল। একে বলে "ধাক্।" হিমি ধাক্ কথার মানে হচ্ছে "বোল-বোলগ" পরিমু বা পদ্যর প্রতিপত্তি। বাই হোক সব জিনিষটাই বিজ্ঞান সম্বন্ধ হ'ল। এ বলে মহাহুতীর উক্তার অভাব সম্বন্ধ বিষয়ে জুইন হিম ছড়িয়ে চলে বৈকি।

এবারে ছবির উল্টো পিটটা দেখা যাক্। এই যে স্ব-পিতের ব্যবস্থাকারী "বালক"—এ চির নাবালক বালকটি কি ও কে? নাম এর ধরা যাক্ উধো রাম। বাড়ী ধরধাই গ্রাম। কি কেসে সাক্ষা হ'য়েছে? ধাম্মাধাম্মীতে। ধাম্মা? হ্যা, নিছক ধাম্মার। কিছু না ক'রে যদি কিছু করেছে প্রতীক্ষমান হয় তাকে ধাম্মা দেওয়া বসন্তে হবে। কাকে, কবে, কি করে? এর বেঘান বা উক্তি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। এখানে কি করত? ভিজ্ঞস করলে বলত—বাহুদের তুলো ধুনে বেড়াই। কথটা অকস্মে অকস্মে লভ্য। চক্রান্তকারী চক্রী না হোক, চরখী বাবুদের চরখা চালানার সাহায্যার্থে পাছের স্ত্রী তুলো ধুনে দিত। সত্যি কিছু বাবুদের পিঠে পেটে ধড়ধড় চড়-কিল লাগাত না। ধপাধপ্, লম্ব এর কানে কেউ কোনদিন শোনে নি। ধাপড়িং ধাপ, ধাপড়িং ধাপ আওহাস এর হাতের "বড়বড়"টা করত। ধুনোরীর ধুনিকি বোধ হয় থুটটার নাম।

এর অন্তত ইতিহাসের আরম্ভটা এই রকম। গ্রামের ছেলে, গরীবের সন্তান। সে বাই হ'ক্, মনটাত মাহুবেই। মাহুবে সমালব্ধ জীব। যে অবস্থাই থাক, মন সাথী খোঁজে, চায় ভালবাসা। ইহলৌকিক বা পার-লৌকিক—বাই হ'ক্ একটা না একটা সঙ্গের সাথী সে চাইই। আমাদের উধো ও তাই করলে। এগার বছর বয়সে স্ত্রীলাভ একজনকে করেছিল। গ্রামের জীবনের একবেয়েই কতকটা। কাটে সাধারণ হাতে গেল। হাতকে সে হিসাবে পরবও থলা চলতে পারে। কত রকম সব বেখে জনে, মিলেমিলে মনোরঞ্জন হয়। উধোর বন্ধু বুধো। জু'রনেই একদিন একসঙ্গে হাতে চলেছিল। এমন কথক-বার আলা বাওয়া করেছে। কিন্তু এদিন চাপল উধোর

থাকে বুধোর পিঠী। বুধো ভিতরে ভিতরে কিছু জ্ঞান বাড়িয়ে ফেলেছিল। দেহানা হ'য়েছিল। অভাব পুতির একটা কাগজা শিখে ফেলেছিল। উধো সে বিগয়ের কিছু জানত না। উধো একটা পটুহার বোকাগে বাড়িয়ে ছবি দেখেছে। বুধো এগিয়ে গেল ভীড়ের ভিতর। একটা কি কারচুপি শুরু করেছিল। হঠাৎ এক ব্যক্তি বুধোর হাত চেপে টেঁচিয়ে উঠলো—এ হাজারমালা আবার পকেট ঘেরেছিল। বামলে সমস্ত বুধো ধরা পড়ে গেল। হাতে সেহিন এক দিপাহী এসেছিলো। বুধোকে তার হাতে লম্বর্ণ করা হ'ল। সন্ধ্যা কেউ আছে কিনা ভিজ্ঞস ক'রতে বুধো উধোর কথা বলে হিল। উধোও গ্রেপ্তার হয়ে গেল। জু'রনেই ধানার নিয়ে বাওয়া হ'ল। বাউ... সত্যি হাতে নিয়ে ডর সেহিয়ে ব'লল, যদি সত্যি কথা না বলে, উধোকে বড় মার মারা হ'বে। উপস্থিত বিপর থেকে নিজার পাবার স্ত্রী উধো বারোগার মনের মত "পতি" কথা কইল। বারোগাধাবু মারলেন না, শুধু বলে দিলেন কাছাড়ীতে এইরকম সত্য বললে সে রেহাই পেয়ে যাবে। আদালতে এসে আধার লেইরকম সাবধানী কথা গোনালেন হাকিম সাহেব। সত্য বললে নিজার পাবে। বারোগার হাতে নিজার পেয়েছিল। তাই সে এখারও অপরাধ কবুল করল। ফলে হ'ল দুই বছর আট বেত ক'রে শাস্তি। "সদা সত্য কথা কহিবে" এই নীতিবাক্যে উধোর কতটা আস্থা বেড়েছিল তা জানা যাবে তার পরবর্তী ব্যবহারে।

উধোকে বিনা অপরাধে বেত খেতে হ'ল বলে সে মনে মনে তারী চুইলো বুধোর উপরে। গুর কৃতকার্যের স্ত্রী একে কলভোগ ক'রতে হ'ল বলে তাকে একটু মজা দেখাওয়ার প্রবৃত্তি এর মনে আগল। একদিন উধো এক কুচ অল্পলোকের বাড়ীতে গিয়ে চুটামী ক'রে একটা ঘরের শিকলি খানা করে খুলে পালান। কুচ চোর চোর বলে চীৎকার ক'রে উঠল। পাড়াপ্রতিবেশী সব ছুটে আগতেই পথে পলাতক উধোকে ধ'রে কেলল। দ্বিতীয় দিনে একে ধরা পড়ল। একা কি চুই করা যায়, কিন্তু নিজস্বই বেত ছিল। উধো "পতি" কথা বলল। বুধোর বাউ... বিচারে দুই বছর আড়াই বছর ক'রে

ছোট বয়স ব'লে ওবের পাঠান হ'ল রিকমেন্ডরীতে। পাছে আগে আগে কিলে এসে অগতঃ প'ড়ে আরও খারাপ হ'য়ে বার তাই হুপারিনটেন্টেট নাহেব আইনে প্রাপ্ত ক্ষমতার ভাবের মেঘাষ বাড়িবে আঠার বছরেরট ক'রে হু'মনকে ছাড়লেন।

কথার বলে 'বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিতি রকে।' এইবার এবের তৃতীয়বার রামসও প্রাপ্তি। এখন ভাগরটি হ'য়েছে। এলাকারনের ব্যবস্থা নিছেরটা নিছেকে ক'রে নিতে হয়। হু'মনেই করলার খনিতে কুলীপিরি হুক করল। বিয়েধা ক'রে বিন ওজার করছিল। কোথায় এক ডাকতি হ'ল। খোজ পড়ল দাগীদের। এই হু' ছাকরাও কাক গেল না। হু'মনের বেকহুয় খোজা অটি বছর ক'রে সশ্রম কারামত হ'য়ে গেল। ব্যাপার মন্ড হ'ল না। উৎসব, বাগন ও রাতখাতে যে পাশে এসে দাঁড়ায় সেই বহু এরা হু'মনে যে জন্ম-জন্মারের বহু তাতে সন্ধ্যের অবকাশ কৈ? কিন্তু খাঙোটা কোথায়, বার জন্ম এবের কয়েদ হ'তে হ'ল? সন্ধ্যের হুখ, শান্তি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষীদের যে এরা ঠকাতে চেষ্টা ক'রেছে। অপরাধ না ক'রেও অপরাধ করার মত জীবন গড়ে কেলেছে। এমন ধাঁধা এরা লাগাবে কেন?

তা'হলে এখানটা ধকারের এলাকা হ'ল কিনা? ঐ ধুলো, ধোঁয়া, ধাক, তুলো ধোনা, ধূর্ততার আবাসস্থি, জোমার বার বার অভিনন্দন জানাই। মনিব-সম্বাদের এদিকটায় ধ-কারের প্রভাব বা স্থান সত্যিই খুব জাঁকালো। ভক্ত রামপ্রসাদ ঠিকই বলেছেন—এই সংসার ধোঁকার টাটি।

এখানে এলে মাছেরে ধর্শন শাস্ত্রের জ্ঞান না বেড়ে

পারে না। কথার বলে ধুলোর শরীর একদিন ধুলোতে মিলিবে। সে জন্ম জানাওনশলাকা দিবে চোখে খোঁচা না মেয়ে চোখে, নাকে, কানে, গারে ধুলোর হুঁহু আগিয়ে মানবকে সজাগ রেখেছে। "অবিরত জ্ঞান নাই, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" অনাহত নাম এই রকমে দিনরাত বাজছে, ধোঁয়া, 'ধোঁয়ায়ে,—ধোঁয়া'—এই জ্ঞান একদিন সংসার সম্বন্ধে আগবে ত? এখানে আগেই তা আগিয়ে দিতে সাহায্য করা হ'চ্ছে। সব মাথা।

ভাটপার ধরা হাক ধাকা। জৈব বিজ্ঞানে আদি কথাই ধাকা। সংসারের কর্ত্তপ্রবাহ চলেছে দু'টা আধিন ধাকা আছে ব'লেই। পেটের খুখা ও বংশরকার খুখা। এখন বোকার ওপর শাফের খাঁটি বলি হয় কথার কথার ধাকা, তাকে মাথা পেতে নিতেই হয়। মোহ মূগেরের কাজ এতে হচ্ছে কিনা?

ধুনোদুনি আলবৎ একটা সার পথার্ধ। পূরমার্ধে মেলার প্রক্রিয়ার এটা আছে লম্বাধির নৈলে হওয়ার ইচ্ছা আগবে কেন?

ধূর্ততা। অচলকে সচল করা, সচলকে অচল করা যে শক্তি দিয়ে হয় তার নাম ধূর্ততা। শক্তিমানের শক্তিমানকে কতুর ক'রে যে সে হ'চ্ছে চতুর। এ বিষয়ে সম্বিত্যরে কিছু বলাই বাহুল্য। ভগবান আমাদের ভাল ক'রতে চাইছেন, পেয়ে উঠছেন না কেবল মায়োর জন্ম মাছের উন্টোমুখী হয়েছ ব'লে। "হুক নর যে জ্ঞান সন্ধান।" যদি যে-ওন্টি হাতে প্রহর হাত না থাকে তা'হলে হু-হেতে জানোয়ার মাছের কি ক'রবে? চাতুরী, ধূর্ততা বা কৌশল ক'রবে বৈকি। "যোগঃ কর্ত্ত্বকৌশলম্।" তার মানে কি নিছের কাজ গুছিয়ে নেওয়া—যেন ভেন প্রকারের?



হে বন্দী ! এবার জাগো

ঐক্যবিরহীতবন মুমোক্ষাখ্যায়

হে বন্দী ! এবার জাগো আমার বেহের কারাগারে

শীঘ্র নিহা হ'তে—

ধরিমো প্রতীক্ষমাণা। এবার কিরিয়া দেহ তরে

প্রত্যাহার প্রদর আলোতে।

বন্দী, বেগে ওঠো তুমি ! তোমার শিকল-ভাঙা-ছাতে

অবলম্ব দেহ বোঝ খসে কঠো আঘাতে আঘাতে,

আমার বেহের সীমা লসি' তুমি এসো কলস

অপতন বহিঃস্বারে আপনার বীর্বে নিরুপন !

আপনারে করো—মুক্ত করো—

সংসারের আপনারে অস্ত্র-প্রকাশে তুলে ধরো।

দুঃখ প্রাণের বেগে প্রকাশিত তুমি অহরহ

হে চির-একাকী,

আমি জানি নিশিদিন কী যথা অস্তর-তলে বহ

হে আমার গান-হারা-পাখী !

অনেক কামনা ছিল—বকে ছিল ঐশ্বর্যের ভালি

কল্পনার ঘাটে ঘাটে ছিল নিছক স্বপ্নের সীপালী,

অনেক সত্তর আর অনন্ত লক্ষণ—ছুটি হাতে

বিলায়ে চলার ছিল দুর্বর আকাঙ্ক্ষা মর্ম-পাতে,

কর্মের বিচিত্র পরিবেশে—

চেয়েছিলে অরী হ'তে অক্লান্ত সার্বকতা-পেয়ে !

মৃত্যুর দেহে বোর তোমারে ক'রেছি বন্দী আমি

ওগো মৃত্যুহীন,

বোর অস্ত্র-স্পর্শ লভি' তোমার বীরাণী পেছে আমি'

হে হুম্বর, হে চির-নবীন !

এ রাশি-অর্ধ-বেহ তার তব, সহিবেনা আমি—

মধ্যাক-আকাশ-তলে তব স্বর্গ-সিংহাসনখানি

মুক্তির আনন্দে থাক পাতা, মুগে মুগে। কত নয়—

এ দেহ তোমার তরে, হে অক্লান্ত ! ওগো ঘোড়তির্থ !

চিনি আমি, চিনি তো তোমারে—

তাই বোর এত লাজ, তাই যথা সতি বাধে বাধে।

নিম্নত এ দেহ মম—এ দেহে কয়ের আলা জানে,

তবু রাখি বাধি'—

তোমারে বে মৃতলম ! অপমান বকে তব লাপে—

জানি আমি, আমি অপরাধী !

নির্মম শীতলে আমি আমার দুল্লভ আশিষণি

হুয় করো, শুষ্ট করো। দূত, কিম্ব হাতে লহ তুমি'

বিজয়-পতাকা তব। কলহিত, এ চির-ভয়

অস্ত্রত বেহের বাণা নিরুপন স্পর্শ কর দূত,

চেতনা আঙুল পতি গনে—

কণিক ক্লান্তিতে তব, এই কণ-আত্মবিশ্বরণে।

আমি আমি সর্বহারা, আমি মুক-বেহনার রান

আমি অস্ত্রসাম্যী—

কত্যা-নীল চোখে বোর অীবনের নিরর্থ-সন্ধান—

নিছে বোর প্রাণের প্রদায়ী !

আমার বেহের বিবে কণিক আছর তুমি আমি

কণ-আত্ম-অবিশ্বাস তোমার চক্রে ওঠে বাজি'—

তাই তো এ হুগি তব। বোর এই বেহের শৃঙ্খলে

তুমি রহ অক্লম্বনা তাই কণিকের ক্লান্তি-তলে।

দেহ বোর পরাধর যানে—

তুমি আমি দাঁও লাড়া বোর অক্লম্বন এ আক্সনে !

ধরিজী তোমারে চাহে—আজো গান জানে তার মুখে

ওগো আত্মতোলা,

আমিও মূর্খ সে বে অক্লম্বন প্রাণে, কোতুর্কে

তার দার আজো আছে খোলা !

তাহার আকাশ ভরি' আজো জানে শান্ত লম্বা/ভায়া

রক্তনীপঙ্কার চোখে ইদিত ধ্যান আজো হারা,

নয়-লম্বা হীপালোকে আজো আছে তীক-পথ-চাওয়া

আজো আছে আপনারে শ্রুতির দ্বারা রেখে বাওয়া !

আমিও পুলকে রহে ভাঙা—

মিলনের শাকী হ'য়ে বাসর-রক্তনী—দুঃ-ভাঙা !

হে বোর অস্তর-বানী ! হে বন্দী, হে বদু শোভো মনে

ধরিজীরা তাক—

সে তোমারে চাহে আশি বেঞ্চ আলো জগে নাই কোনো
বেণা নবে নিবন্ধ, নির্বাণ !
ধরিত্রীর বন্ধ আশ্রয় পুত্রীকৃত বেনদায় হইবে
আনন্দ-দ্রব্যের আশ্রয় বহু অদম্যান সে বে বহে ।
পৃথিবী তোমারে তাকে : হে দুর্বার । ওগো বজ্রপানি—
চূর্ণ করো রাহবের সকল হীনতা, সব মানি :
মাহুবে বেধায় আশ্রয় তীত—
তোমার বজ্রের শিখা সেখানে হউক চমকিত ।

মাহুবে কুপায় কীদে—আশ্রয় নহে বহু অবিচার
সংগ্রহ শাহনা—
মকর বালুকা হ'য়ে হুপরে মিলার আশ্রয় তার
অপার্থক্য প্রত্যাহার কথা !
এই মাহুবে তীত হে বীর ! পাড়াও তুমি এসে—
তোমার অনেক কাজ ! যোর বেধে আশি বন্দী-বেধে
আপনারে ক'রোনা বকনা । আবার সমাপ্তি আনো—
আমার সকল তুলে—দব মোহে—তীত পর হানো !
মিথ্যা দায় গোক যোর শারা—
আপনুত এসো তুমি—হীর্ণ কবি' যোর বেধ-কারা !

বিপ্লবী গান্ধী

শ্রীমদ্রাজকুমার দত্ত

গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় বিপ্লব তার পরিণতির
পথে চলছিল। অন্ততম প্রতি-বিপ্লবী শক্তির হাতে
আমরা গান্ধীজীকে হারিয়েছি। তার পর থেকে তিন
মাস অতীত হয়েছে। এই তিন মাসে যা আমরা
দেখছি, এবং আজও যা' দেখছি তা'তে মনে হয় শুধু
দেবীর রাণ্যভগিনীতে ছাড়া অন্য ভারতীয় বিপ্লবের
অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গেছে। বিপ্লব যেন বমকে পাড়িয়ে
গেছে—ভারতের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতি, বৈদেশিক নীতি,
পাকিস্তান সম্পর্কিত নীতি, পুনর্গঠন নীতি, রুবি ও
শিল্পনীতি, কোনো রিক্কেই আজ আর কোনো বিপ্লবী
ধারার পরিচয় নেই।

ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে না
এলে উদারনীতিকদের বা হিন্দু মহাসভার হাতে এলেও
বেধনের দব নীতি অস্বহ্য হবার দস্তাবনা ছিল,
তা থেকে অন্তরকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে
একটা বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পেল সেদিন পশ্চিমবঙ্গে
মহাসভা সভাবার বেচেনা হর, তার বার্ষিকার ভিতর।
সংবিধানচক্র রাণ পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের কংগ্রেস দলের

নেতা নির্বাচিত হওয়া মাত্রই ঘোষণা করেন, তাঁর
মহাসভা কংগ্রেসীমহাসভা নয়। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস
এবং পরিষদেরও বাইরে থেকে মহাসভা নিষ্পত্তি করেন।
কংগ্রেস-নীতিকে উপেক্ষা ক'রে তার মহাসভা দত্ত বার্ষিক
খাতিরে বহিষ্কৃত জনসাধারণের দ্বারা নিপীড়নের কারণ
হ'তেও বিধা করেনি। এবং কংগ্রেস সংঘের দ্বারা
অসহযোগিতা ক'রে তাকেও চূর্ণ ক'রে তুলছে।

এই মহাসভা এখন বিপ্লবী মনোভাবের গৌরবে
পরিণত বাংলার অধিকাংশ কংগ্রেসী সমস্তের সমর্থন পেল,
তখন এই কথায় স্মৃতি হয়ে উঠলো যে, বিপ্লবোত্তর
প্রতিক্রিয়ায় দেশ ছোঁয়ে বাবার উপক্রম করেছে। এটা
একটা লক্ষণ মাত্র। শুধু বাংলার কথা নয়। ভারতের
কোথাও প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক মনোভাবগত অসং
প্রকৃতির কর্মচারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সংঘত করার
বিশ্বমাত্র তৎপরতা আজও দেখা দেয়নি। মহাসভার
সভতার সুনাম বিরল। কংগ্রেস-সংঘের সঙ্গে মহাসভার
সহযোগিতার অভাব। রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার পণ-
সাধারণের প্রতি আশ্রয় কোথাও পোনা যায় না।
এদিকেরই দুল ওখানে—বিপ্লব আজ উপেক্ষিত। হয়তো
উদারবিকারগত্রে বিপ্লব-নেতৃত্ব আজ ধীরে ধীরে হাতে,
ওদের ধারণা এই যে, ইংরেজ চলে যাওয়া মানেই
বিপ্লবের সফলতা।

এই মনোভাবই যদি আদর্শের এই লবণাক্ত প্রতিফলন হইল, তা হ'লে গান্ধী নেতৃত্বের বিপ্লব সম্বন্ধে আত্ম নতুন করে আর একবার ভাববার দিন এসেছে; কি এর আদর্শ, কি এর উদ্দেশ্য, তার আদ্য ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন হবে পড়েছে।

বিপ্লব মাত্রেরই আদর্শ এক: বৃহৎ থেকে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর মুক্তির চিত্তিতে সমগ্রকে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু প্রত্যেকটি বিপ্লবের লক্ষ্য ভিন্ন। বিপ্লবের লক্ষ্য নির্ভর করে সমাজের উৎপাদনশক্তি পদ্ধতির উপর। এককালে সমাজের উৎপাদনশক্তি ছিল মূলতঃ কৃষি বা তদানুযায়ী ব্যক্তিগত বা পরিবারগত শিল্প। সে যুগে সমাজগতি ছিল কৃষিকারীরা এবং তাদেরই শ্রেষ্ঠতম রাজা। এত পর সেবা দিল কারখানার শিল্প। এই কারখানার শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু শ্রেণীর জনমির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হ'ল। কারখানার শিল্পে সমাজের উৎপাদন শক্তি বেড়ে গেল। অথচ সমাজের ক্ষমতা প্রতিগতি সব কিছু হয়ে গেল জনমির মালিকদের ও রাজার হাতে। কৃষিকারীর শিল্প হারা চালাই, তারা তা লক্ষ্য করে কেন?

তারা ক্ষমতা চাইলো এবং আশা করলো যে, কারখানার মালিক ও শ্রমিক এক যোগে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে রাজা ও কৃষিকারীদের হাত থেকে। কৃষিচ্যুত শ্রমিকদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেরণা গেল। এই যে নতুন উৎপাদন শক্তির সঙ্গে জড়িত মানব-গোষ্ঠী এদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপমূর্ত করে তুললেন অর্থাৎ ব্যাক রূপে তার সাম্য, বৈষম্য, স্বাধীনতার বাটী দিয়ে।

কৃষক শ্রমিকের সঙ্গে কলকারখানার মালিক ও অপরায়ণ কর্তব্যীদের সাম্য হবে, বৈষম্য হবে, এবং একজনের রাজ্যের হাত থেকে স্বাধীনতা আসবে,—এই আশা, এই প্রেরণার গগণচাকলা ঘুরায় হয়ে উঠলো। আধুনিক অগতির প্রথম বিপ্লবে রাজ্যের মাথা গেল। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াও বেধে দিল প্রথমটা নেপোলিয়নের সম্রাট হবার প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে। কিন্তু নতুন উৎপাদনশক্তি ইতিমধ্যে সমগ্র ইউরোপে বেধে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাম্য বৈষম্য

স্বাধীনতার বিপ্লবাব্দে ইউরোপের ছড়িয়ে পড়লো। আর ইউরোপের প্রতিক্রিয়ার প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো মোটামুটি। বিপ্লবশক্তিকে প্রতিহত করে রাজ্যের শক্তিকেই অপ্রতিহত রাখবার চেষ্টা চললো।

কিন্তু বিপ্লবকে ধামাচোট পাড়া যায় নাই। এক শতাব্দী ধরে তার জের চলতে থাকে, এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চার বৎসরে ইউরোপের প্রায় সবগুলো রাজ্যমুহূর্ত ধ'রে পড়ে।

এ'তেই অবশ্য কয়টি বিপ্লবের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সাম্য, বৈষম্য, স্বাধীনতার যে আদর্শ, তার কলমে বা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে মোটামুটি বলা যায় মধ্যবিত্তের শাসন। আগেকার দিনে ছিল রাজা জমিদারের একচেঁয়া শাসন। একদিকে এই রাজা জমিদারকে জড়িয়ে অপরদিকে কৃষিকে জড়িয়ে একশ্রেণীর মধ্যবিত্ত ছিল। তার ফলে বেধে দিল কারখানার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার, চাকুর্যোধ্যাকুর্যো শ্রেণীর আর এক ধরনের মধ্যবিত্ত—যাদের ইউরোপীয় ভাষায় পরিচয় বুর্জোয়াশ্রেণীর হ'লে।

বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়ার ব্যস্তপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে যা' প্রতিষ্ঠিত হ'ল তা এই বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন। রাজ্যের শাসনের বদলে এল ভোটের শাসন। সাম্য, বৈষম্য, স্বাধীনতার নামে সাধারণ লোক, সাধারণ মজুর বা কৃষক যা' পেল, সে এই ভোটের অধিকার। ঐ ভোটের অধিকারের নামই হ'ল তারের স্বাধীনতা। ভোট নিয়ে তারা কিন্তু রাজ্যশাসনের কাজে গেল না। তারের পে আশ্রয়প্রত্যয়ও নেই, অবসরও নেই। অপর দিকে, বড় বড় ব্যবসায়ী বা ব্যাঙ্কাররাও রাজ্যশাসনের হাফাফা পোষানোর চেয়ে অধিকতর উপভোগই প্রেমভর-বলে সাব্যস্ত করলো—কলমে বা প্রতিষ্ঠিত হ'ল সে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্তশ্রেণীর শাসন। বিপ্লবের আদর্শ কিন্তু এর ভিতর দিয়েও প্রতিষ্ঠিত হ'ল—বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর হাত থেকে এক বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা এল।

কিন্তু ইতিমধ্যেই বিপ্লবের আদর্শ বিচ্ছিন্নভাবে আরও সরে গেল। কারণ, বহুশিল্প শক্তিময়

মানবসমাজের উৎপাদনশক্তি বেড়ে গেল। যন্ত্র হতে শক্তিমান হয়ে ওঠে, হাতে খেটে বারা জীবিকা অর্জন করে, তাদের প্রয়োজন তত কমে যায়। যন্ত্রের মালিক হবার মতো মূলধন হাদের আছে, তারা যেন করে, হতো কম লোককে খাটিয়ে পারি, আখারের মূল্যকার অল্প ততো বাড়ি। এতে করে হাতে বারা খেটে যায়, তাদের হাসখুশি বেড়ে যায়, বেকার হয়ে পড়বার ভয়ে যন্ত্রনিয়ের মালিকদের করুণার ভিখারী হয়ে ওঠে তারা। যন্ত্রনিয়ের মালিক, আর হাতে বারা খেটে যায়, তাদের এই প্রকৃ আর তাদের লক্ষ্যক ধন গ'ড়ে উঠেছে তখনই দেখা গিলেন বিপত হুগের বিপ্লবের স্ববি কার্গ মার্ক্‌ন।

তিনি দেখালেন, সমাজের অল্প উৎপাদন করে, সমাজের অল্প জীবিকা আহরণ করে মূলধনের মালিকরা নয়, পুঞ্জিপতিরা নয়—হাতে খেটে বারা যায় সেই শ্রমিক। অতএব সমাজের উপর কর্তৃত্ব অঙ্গল পুঞ্জিপতির হাতে বা তাদের আশ্রিত বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে হাওয়া সঙ্গত নয়, সমাজ শাসনের ক্ষমতা হাওয়া উচিত শ্রমিক শ্রেণীর হাতে। রাষ্ট্রকর্তৃত্বের ভিতর একনায়কত্ব ছুটেছে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাহায্যে মহাহুঁকিতে পুঞ্জিপতিদের। এ অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক সমাজব্যবস্থা। এর ফলে বা হওয়া উচিত সে উৎপাদনকারীদের, হাতে কলমে বারা খেটে যায়, তাদের একনায়কত্ব dictatorship of the proletariat. তারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে এখন অবস্থার সৃষ্টি করবে, হাতে করে ব্যক্তিগত মূলধন কারও থাকবে না, উৎপাদন কাজে হাত লাগাবে সবাই, এবং তাতে উৎপাদন বা হবে, তা ভোগ করবে সবাই মিলে এবং সকলের প্রয়োজন মতো। সকলের প্রয়োজন মতো ভোগের ব্যবস্থা হ'তে পারে বর্তমান স্রগতে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক শিল্পের উৎপাদনশক্তির কল্যাণে।

এই আদর্শে বিপ্লব সফলভাবে বিকে গেল কনিয়ার লেনিনের হাতে। লেনিন কিন্তু বিপ্লবকে যন্ত্রনিয় উৎপাদনকারী শ্রমিকের মনোই নিবদ্ধ রাখলেন না। তাঁর নিম্নে অধিকাংশ রূপবানী কৃষক। লেনিন কৃষিকেও

যন্ত্রনিয়ের আওতার এনে কৃষককেও বিপ্লবীশক্তির মধ্যে স্থান দিলেন। কৃষক কারখানার মন্ত্র নয় বটে, কিন্তু সে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক কৃষিক্ষেত্রের মন্ত্র—হুই পাচ বিঘা অধিক মালিক চাবী নয়। এমনি করে কনিয়ার শ্রমিক ও কৃষকের মূল্য প্রতিষ্ঠিত হ'তে চললো। আধুনিক স্রগতে বিপ্লব তার বিত্তীয় ক্ষরে পৌছালো—এক আত্মও কৃষকের মানবগোষ্ঠীর মূল্যের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হ'তে চললো।

কিন্তু বিপ্লবের আদর্শ আর একবার করে বিকৃতরূপাল-বেবার মতো পরে গেছে। কারণ মানবসমাজের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, গত দুই বিশ্বযুদ্ধের ফলে অকল্পনীয় পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু সে কথা পরে বলছি। ইতিমধ্যে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার শক্তিও প্রবল হয়ে উঠেছে। ক্রাসী বিপ্লবের পর বা দেখা দেয় মেটানিকের ভিতর, রুশ বিপ্লবের পর তাই দেখা দেয় মুলোসিনির ভিতর। এবং মুলোসিনি প্রতিক্রিয়ার যে লক্ষ্যে চলেছিল, তাকেই পরিপূর্ণতার রূপ দেয় হিটলার।

বিপ্লবের লক্ষ্যে মার্ক্‌ন ও লেনিন শ্রমিক কৃষকের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। হিটলার ও মুলোসিনি তাদের কাছ থেকে একনায়কত্বটা ধার করেছিল প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্যে, প্রতি-বিপ্লবীশক্তির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। তারা মূলধনের মালিক ও শ্রমের অধিকারী এই উভয়ের সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আধিপত্যিক একনায়কত্বের নামে নিজেদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এবং নিজেদের মার্ক্‌ন মূলধনের মালিকদেরই একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আর মুলোসিনিও নাই, হিটলারও নাই—তারা অল্প একনায়কত্বের পঞ্চরে গড় হয়ে বিশ্বদহ ছড়িয়ে গেছে। আর ওদের ফ্যানসিট একনায়কত্ব বহুবিধ মুখোশের আড়ালে আমেরিকা ইংল্যান্ড প্রমুখ দুনিয়ার অধিকাংশ কর্তারাষ্ট্রের নিজের নিজের দেশে এবং দুনিয়ার সবদেশেই প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যগ্র। কারণ, ও-পাশ ছাড়া মূলধনের মালিকদের পত্যা নয়। এবং দুনিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রই আরও পর্বত মূলধনের মালিকদের হাতের পুতুল।

এইখানেই এসে পড়েছে বর্তমান দুনিয়ার তৃতীয় বিপ্লবের গোড়ার কথা—গাভী—মেহুনের বিপ্লবের আদর্শ ও লক্ষ্য।

পূর্বে বলেছি, গভু দুই বিশ্বযুদ্ধের ভিতর দিয়ে মানব সমাজের উৎপাদন শক্তি অকল্পনীয়রূপে বেড়েছে। আজ যুদ্ধের এসে পৌঁছেছে আর্থিক যুগে। আর্থিক শক্তির ক্ষয়ের ভয় আমরা দেখেছি। আর্থিক শক্তির হ্রাসেরও আর একটা দিক আছে। যে-শক্তির একটি বোমা হুই লক্ষের প্রাণনাশ হতে পারে, সে-শক্তি হ্রাসের কালে লাগালে কত অল্প লবণ ও পরিপ্রস্নে মাছের প্রয়োজনীয় বস্তু কি পরিমাণে সৃষ্টি করতে পারে, বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্ক আর তাই নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত।

কিন্তু সে-গবেষণা লক্ষ হবার আগেই আমরা যেহি, বিশ্বযুদ্ধ দুইটির কালে যন্ত্রশিল্পকে বিজ্ঞান এত এগিয়ে নিয়েছে যে শতকরা নব্বুই ভাগ বয়স যখন দুছের ক্ষত্র প্রয়োজনীয় বস্তু সৃষ্টি করে, তখন বাকী শতকরা মাত্র ভাগ বস্তুই মাছের সব প্রয়োজনীয় গ্রন্থি সৃষ্টি করতে না পারলেও বহুল পরিমাণেই করে। এবং করে তখন দুটিমাত্র মাছের শারীরিক জীবনের সহায়তা নিয়ে—কারণ, বায়বাত্মিক অধিকাংশ মাছের জনশক্তি তখন ব্যস্ত থাকে নানাভাবে লড়াই নিয়ে। দুছের পর ঐ নব্বুই ভাগ বস্তুকে যখন দুছের সেবা থেকে বিরত করে শাশ্বির দিনের প্রয়োজনীয় স্রষ্টার কাছে লাগানো যায় বা যাবে, তখন বেধা যাবে মাছের প্রয়োজনীয় বস্তুতে বাজারে বাস ভেঁকে যাবে। অশ্রু অধিকাংশ মাছের তার ক্ষত্র কোনো রকম পরিপ্রস্ন করবার প্রয়োজন থাকবে না। অর্থাৎ এই অধিকাংশ মাছ বেকার হয়ে যাবে। রূপ-বিপ্লব কৃষকে কারখানার প্রতিকের শ্রেণীতে টেনে নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ এই শ্রমিক ও কৃষকসকল অধিকাংশের ক্ষত্র কোনো কাজ থাকবে না, বস্তুই তাদের কার্য করে যাবে। আর, এর উপর যদি আর্থিক শক্তির হ্রাসের ক্ষেত্রে আবির্ভাব হয়, তা হলে তো সোনার সোহাগা।

যে অবস্থার কথা বলেছি, তার অর্থ পাঠ্য: যখন

দুটিমাত্র লোক মানবসমাজের বাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু সৃষ্টি করতে তখন লোকের বাবতীয় অধিকাংশ লোক হবে বেকার। অর্থাৎ যখন প্রয়োজনীয় বস্তুই দেউ ধেনে যাবে দুনিয়ার, তখন তা ভোগ করবার শক্তি থাকবে না দুনিয়ার জনসত্ত লোক ছাড়া আর কারও। তার মানে একদিকে বাজার অচল, অপরদিকে কয়েকটি মাত্র মাছই হবে দুনিয়ার সব মাছের হর্তা। কতটা বিধাতা।

স্রষ্টার বিক দিয়েও একথা যেমন মস্তা ক্ষণের বিক দিয়েও ভেসে উঠে। একটি আর্থিক বোমা আর হাতের, দুনিয়ার বহু মাছের জীবন বরণ নির্ভর করবে তার ধরাধাঙ্কিত্যের উপর। মোটের উপর এক নির্দম একনায়েক আর মানবসমাজের সামনে। বিপ্লবের পর বিপ্লব যখন সমাজকে ক্রমবৃদ্ধির মানবগোষ্ঠীর স্রষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছিল, তখন প্রতি-বিপ্লবী শক্তি আজ এমন দেখা দিয়েছে যে, এর লক্ষ্যতা অর্থ সমাজকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা—পরিমিতকে উল্টে দিয়ে তার চূড়ার উপর পাড়ো করানো।

ঠিক এই অব্যাবহিক অবস্থা যখন ইতিহাসে দেখা দিতে চলেছে তখনই আমরা পেয়েছি বর্তমান দুনিয়ার তৃতীয় মহাবিপ্লবের জন্ম মহাস্রা গাভীকে।

কম্বোয়ার Social contract-এর ভিতর লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার এবং সামাজিক শক্তিগুলির পরস্পরের সম্পর্কের একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চেষ্টা ছিল। মার্ক্সের থিওরিগুলি পুরোপুরিই ঐ রকম একটা বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। গাভীজীর ভিতর সে রকম কোনো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চেষ্টার পরিচয় পাইনি। তাঁকে আত্মল করেছি মাছের দুই দুয়ের চিহ্নায়। বর্তমান যন্ত্রণে একান্ত সাধারণ মাছের তত্ত্ব কি—এই প্রশ্ন থেকেই যেন তার বিপ্লবী জীবনের স্রব্ধাত।

এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর তাঁর কাছে, বয়-মানব মাছের দুইধরনেরই কারণ হবে। তারপর থেকে অনেক রুদ্ধর গেছে, অনেক পর্ব গেছে, বিপ্লবের নানান রুদ্ধর ভিতর দিয়ে বিপ্লবাত্মক তত্ত্বের দুই ক্রমে তাঁর

কাছে স্পষ্ট হয়েছে, আর সেই ছবি তিনি হুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন। অনেক ক্ষেত্রে যেন হয়েছে কালকের ছবির আয়তনের ছবির সঙ্গে সংগতি নেই। শেষের ভিতর দিয়ে একটা মিনিবের সাঁধনা তাঁর ভিতর স্পষ্ট দেখা গেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত—সে সাধারণ মানুষের, একান্ত সাধারণ মানুষের জীবনে স্থশান্তি ও শক্তির সাঁধনা।

ক্রমে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়েছে টেলিগ্রাফ, টেলিকোন, রেল, মোটর, এরোগ্রেন ইত্যাদি বস্তু ও বস্তুট বস্তু মানুষের সৃষ্টিবৃত্তির কাছে লাপাৰ্ণো চলে—এমন কি সাধারণ মানুষের জীবনের স্থশ-শান্তি ও প্রশান্তি, এ দুইটি বিরুদ্ধবাহী বস্তু হয়ে উঠবার প্রয়োজন নেই যদি সম্ভাব্য ব্যবস্থাকে এমন ক'রে চলে সাজা যায় যা'তে ক'রে এগুলো কয়েকটিমান মানুষের প্রয়োজন ও বিলাস সৃষ্টির উপকরণ হয়ে না পাকে। বিজ্ঞান ও মানুষের মস্তিষ্কপ্রস্তুত সমস্ত রকম উপকরণই মানুষের, একান্ত সাধারণ মানুষের ভোগে একদিন না একদিন আসবে। কিন্তু ভোগটাই সেখানে আসল কথা নয়, আসল কথা শক্তি, সাধারণ মানুষেরও শক্তি। কয়েকটি মানুষের ভোগের ক্ষমতা অধিকাংশ মানুষের দ্বারা সমাজের স্বাভাবিক ব্যবস্থা নয়।

মানুষ দাস হয় তার জীবিকার জন্তে। এই জীবিকা অর্জন যদি যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হয়, বস্তু যদি প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রাপ্য সৃষ্টি করতে পারে, তা হ'লে মানুষ দাস হয়ে পড়ে থাকবে কেন? সমাজ-ব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যবস্থার এমন সামঞ্জস্য কেন সম্ভব হবে না যা'তে প্রতি মানুষই স্বাধীন জীবন বাসন করতে সক্ষম হবে?

এইখানেই গান্ধীবিপ্লবের মূল তত্ত্ব।

এই মূল তত্ত্বটি পরিষ্কৃত হয়েছে গান্ধীজীর অহিংসার নীতিতে। সমাজের উৎপাদন শক্তি যে কুপে বা-ই হোক না কেন, দেখা গেছে, উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদিত বস্তু এক একটা প্রধান অংশ আত্মসাৎ করেছে সমাজের স্ত্রীমেষলোক, আত্মসাৎ ক'রে তারা বিনা শ্রমে বা পর শ্রমে জীবিকার পথ তাই ক'রে নিয়েইছে, অধিকত

তারাই সমাজপতি, রাষ্ট্রপতি হয়ে বসেছে। আর, এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে তারা হিংসার জোরে, অশ্রের ব্যবহারে। অনেক ক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রের শক্তি, অধিকার ক'রে এই রাষ্ট্রশক্তির জোরে বা মোহাইয়ে নিজেদের স্থ-স্থবিধা ক্ষমতা প্রতিপত্তি অর্জন ও ভোগ করেছে। এই রাষ্ট্রশক্তির অর্থও পাড়িয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষের শক্তি নয়, রাষ্ট্রের নামে পুঞ্জীকৃত অশ্রের শক্তি।

এমনি ক'রে সমাজের উৎপাদন শক্তি হতো বেড়েছে, অর্থাৎ, হতো অল্প লোকে প্রচুর উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করেছে, ততো অধিকাল লোক ক্ষমতার বঞ্চিত হয়েছে, এবং অল্পলোক লোকের হাতে ক্ষমতা প্রচুর হয়ে উঠেছে। এই যে অধিকাংশ লোকের প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থা, এরই বিরুদ্ধে অভিধান গান্ধীজীর অহিংসা-নীতিতে। গান্ধীজী সমাজ-পতিদের বলেছেন, এই যে হিংসার ব্যবহারে অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিতের জীবন-বাগানে বাধ্য করা, অধিকাংশ মানুষকে দাস ক'রে রাখা, অধিকাংশ মানুষ তাদের মানুষের জীবিকাও পাবে না—এ এক অস্বাভাবিক, অমানুষিক সমাজব্যবস্থা। এ চলতে পারে না।

কিন্তু একে অচল করতে হ'লে হিংসার নীতিকেই অচল করতে হবে। কারণ হিংসা বৃত্তকণ চলেবে, মানুষ মানুষকে বঞ্চিত করবেই, মানুষ তার পশুশক্তির উর্ধে উঠতে পারবে না। তিনি তাই সমাজ-পতিদের হিংসার বৃত্তি ছাড়তে বলেছেন, তাদের মহত্বের বোধ আগাবার উদ্দেশ্যে উপদেশ দিয়েছেন, যা গৃহ শান্তিবিধি ধনম্।

কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী—একথাও তিনি জানেন। তাই স্বাধীনতার দৃষ্টি-বাগীতে প্রথম বাক্য হিসাবে প্রতি বঙ্গের তিনি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষকে শরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগের অধিকার আছে, এবং সে ফল ভোগে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার কারও নাই। এই যে প্রতিটি মানুষকে তার অধিকার বোঝে সজীবিত ক'রে তোলা, এইটাই গান্ধী-নেতৃত্বের

বিপ্লবের স্বেচ্ছায় নীতি—যার তুলনা বিশ্বের অন্য কোনো বিপ্লবের নীতিতে খুঁজে পাই না।

অতের সাহায্যে অতের মালিকের কান্না করা যাবে না—বিশেষতঃ যে-যুগে অত এসে পৌঁছেছে আণবিক বোমার দ্বারা। অতের সাহায্যে গুলির লাগে এঁটে ওঠা যাবে না। তার চেয়ে বড়ো নক্তি বরং সকল মানুষের অধিকার-বোধ। নেহাৎ practical মিত থেকেও, কেবো বুদ্ধির দিক থেকেও তাই আত্মকের বিপ্লবে হিংসা অচল, বরং সত্যগ্রহ তার চেয়ে বেশী জোরদার।

অধিকাংশ মানুষকে অত মানুষে বিন্ধিত করে। অত তা করে এই অধিকাংশ মানুষেরই কোনো না কোনো অংশের সাহায্যে। এই কোনো না কোনো অংশকে অগণ্যাক মানুষ বন্ধিত করে হৃদয় তারের জীবিকার দ্বারা তাদের হাতে কিছু ভুলে দিয়ে। আর সেই দুলো তাদেরই দিয়ে অত ধরার। আর সেই অতের অধিকাংশ মানুষকে দাস ক'রে রাখে। অর্থাৎ, আমিই আমার ভাইকে, বোনকে, আমার সন্তানকে, আমার ভবিষ্যৎস্বীয়কে দাস ক'রে রাখতে সাহায্য করি। আমি জীবিকার জন্যে যা পাই, তা বেন ঐ অগণ্যাক প্রভুর প্রান্তের দহায় পাই। তা-ও যে আমারই স্বপ্ন, তার উপরও যে আমার চূড়ান্ত অধিকার আছে এই কথাটি ভুলে যাই হ'লেই যদ্যৎ মানের প্রতিদান দিতে যাই—প্রতিদানে দাসত্বকেই লক্ষ্যবিন্দু ক'রে ভুলি।

এখানে “হিংসা কোনো না” এই উপদেশ বে-বস্তর এক শীঠ, তারই অপর শীঠ “নিজের অধিকার বুঝে লও।” নিজের অধিকার বুঝে নিতে গেলেই আত্ম মানুষকে বসতে হবে, অত ধরবে তো না-ই, যে কারখানার তুরি আণবিক বোমা তৈরী ক'রে আমার অগণিত ভাই-বোনকে, আমার স্বপ্নের (বিন্ধিত) কে, আমার ভবিষ্যৎস্বীয়কে দাস ক'রে রাখবে, সেই কারখানার কাজ ক'রেও আমি আমার জীবিকা অর্জন করব না।

অত জীবিকা অর্জন না করা অর্থ তো না থেকে দর। না থেকে নিজের অধিকার বুঝে নেবার সংগ্রাম চলে কই? এইখানে এসে গড়ে চরকার কথা, হুটীর শিল্পের কথা।

কলকারখানার মালিকরা আত্ম লব এক ছোট। কাপড়ের কলের মালিকই হোক, আর পাটের কলের মালিকই হোক—সবাই আণবিক বোমার কলের মালিকের ভাই বেরাধার। এই আণবিক বোমার কল না টিকলে কোনো কলই আর মালিকের হাতে টিকবে না—একথা লব কলের মালিকই জানে।

কাজেই কাপড়ের কলে চাকরী ক'রে থাব আর বোমার কলের মালিকের লাগে লড়াই করব, এ চলবে না। এই লড়াই মানুষে আছে হ'লেই, বিপ্লবের লড়াই ধরা করতে চাব তাদের গাভীকী চরক্য দ্বারাতে চেয়েছেন, নিজের নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে ছোটান চলে এমন শিল্প দ্বারাতে চেয়েছেন—সেইটেই একমাত্র জীবিকার উপায় না হ'লেও অত্যন্ত একটা দ্বিতীয় উপায় হিসাবে—বেন লড়াইয়ের মিনে না থেকে না দরতে দর।

এমনি ক'রে বিপ্লবের অত্রে গাভীকী প্রতিটি মানুষকে লগাণ করতে চেয়েছেন, লক করতে চেয়েছেন। এ যে সেই যুগের বিপ্লব যে যুগে অধিকাংশ মানুষ বেকার হ'তে চলেছে, অধিকাংশ মানুষকে যে-যুগে বেকার করা চলে, একটা দ্বিতীয় লগি ক'রে দিয়ে দারা চলে, এক একটা বোমার দ্বারা নিঃশেষ করা চলে।

আপে বলেছি, কদের বিপ্লব ছিল দণ্ডবিষয়ের বিপ্লব, মার্কসের বিপ্লব ছিল শ্রমিকের বিপ্লব, গাভীকীর বিপ্লব সাধারণ মানুষের বিপ্লব। এবিপ্লব এসেছে সেই যুগে যে-যুগে শ্রমিকের প্রয়োজন মার্কসের দিন থেকে অনেক কমে গেছে। শ্রমিক কৃষকের কাজ আত্ম প্রায়টুই হ্রাসজিই চালাবে। অধিকাংশ মানুষ আত্ম না দরকা, না দাটকা। তারা নিঃশেষ হয়ে গেলেও কারও কিছু কতিবুদ্ধি নেই।

এই অধিকাংশ মানুষের প্রয়োজনে গাভী-বিপ্লব। এই অধিকাংশ মানুষের আবাসভূমি প্রধানতঃ এশিয়ায়, আফ্রিকায়। এই দুটি মহাদেশের মানুষ শাক্ত হুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত মানুষের তারাবাহী পত। তারা অপর্যায় জীবাচাচাল তৈরী করবে, আর অপর্যায় তৈরী মানের বাজার চাসু রাখবে।

অভ্যর্থকার মানুষ গত কর শতাব্দী ধরে জমিদারের বিরুদ্ধে, সামগ্রিক রাজাদের বিরুদ্ধে শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে। লড়াই চালিয়ে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে কতকটা সন্ধান হয়েই রয়েছে। এ-দুই মহাযুগের এরা কিন্তু বহু বৃণ ওরফে কারও সাথে প্রায় কোনো লড়াই চালায় নাই—বা-কিছু এসেছে কপালের নিধন ব'লে যেনে নিয়েছে। যেনে যেনে নিজেদের অধিকার ব'লে কোনো বস্তু আছে, তা তুলেই গেছে। এরই চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসি বটেছিল আমাদেরই এই ভারতবর্ষে। আত্মবিশ্বাস নয় যে, আধুনিক জনস্বার্থের এই শেষ বিদ্রোহ, সাধারণ মানবের বিদ্রোহ স্মৃতি হয়েছে আমাদেরই এই ভারতবর্ষে।

এ-বিদ্রোহ এর পূর্ববর্তী বিদ্রোহের নীতিকে অহুসরণ করে নাই, অহুসরণ করেছে অহিংস বিদ্রোহের নীতিকে। তারও কারণ স্পষ্ট। এই নির্জীব রোশনির পাগে শ্রেষ্ঠ-সংগ্রামের ইনসেকশনের হুঁই ফুলসে ব্যাবির চেয়ে চিকিৎসা উৎকর্ষ হয়ে উঠতো। এর লব্ধিব্যাপী নিরাপরাধ অসাক্ষ্যতার মার খেয়ে স্বপ্ন ধকল করে বেগে উঠতো, তখন সে আগ্রহের স্বযোগ সাহায্য দ্বারা দারুণতায় তার দ্ব্যস্তাটা পেত, দ্ব্যস্তা চিরদিন মার খায় তার দ্ব্যস্তা ততোটা পেত না; বিদ্রোহ দ্ব্যস্তাটা পেত, তার চেয়ে অনেক বেশি ক'রে পেত প্রতিজ্ঞা। যেমন এককোরে পেয়েওছে এবং দারুণতায় তার ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি-তানের স্বপ্ন হয়েছে—সেখানে বৈপ্লবিক আগ্রহের পর নেতৃত্ব চলে গেছে প্রতি-বিদ্রোহী শ্রেষ্ঠাধিকারীদের হাতে।

গান্ধীজী এই অস্ত্রে কুশল হতে বিদ্রোহকে নিয়ে গেছেন গণতান্ত্রিক (ডিমোক্রাটিক) বিদ্রোহের পন্থায়। শ্রেষ্ঠ-সংগ্রামের কথা বা কৃষকসমূহের বা সাধারণ মানবের একনায়কত্বের কথা বলেন নাই। বলেছেন, বিদেশীয় হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হোক, তার পর আদি বা ভুল্ল, সে হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব, আত্মবিশ্বাস ভেদেই নয়।

ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে, কিন্তু বিদ্রোহের বাকী অংশ সবই পড়ে রয়েছে।

কিন্তু সে-আলোচনার আগে বিদ্রোহের মেধাভাঙনি পর পর আমাদের জীবনে এসে পড়েছে, তাদের স্পষ্ট ক'রে দেখে নেবার প্রয়োজন আছে। না হ'লে সংশয় দ্বিধা পরে পরে আমাদের চকল করবে, পথভ্রষ্ট করবে।

ইংরেজের কাছ থেকে যেনকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে একদিন আমরা কেশো, ম্যানিনি, মিলকে অহুসরণ করেছিলাম। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুগপৎ আমাদের কাছে দেখা দিল মার্ক্স ও গান্ধীজীর অহুসরণ বিদ্রোহের পথ। কোন্টার পার্থক্যতা কতোখানি, আমাদের মধ্যে ও যুগে কোন্ পথের উপস্থাপিতা কতোখানি, কোন্ বিদ্রোহের লক্ষ্য কি, না নুহে, না ভেবে অসুচারে যে যে-পন্থা খুঁজি অহুসরণ করেছি, দারুণতায় খুঁজি অহুসরণ করেছি। এতদিন এক রকম চলেছে। কিন্তু আজ একদিকে আমাদের বিদ্রোহ-নেতা চিরদিনের শান্তি, অপর দিকে ইতিহাসের বাস্তবিক নিয়মে বিদ্রোহ আর প্রতিজ্ঞার দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব কতদূর পড়াতে পারে, তা নেপোলিয়নে আর মেটর্নিকে আমরা দেখেছি, আর দেখেছি সুশোলিনিতে হিটলারে। তাই কোন্ দিকে আজ আমরা চলেছি, কি ক'রে আমরা এগিয়ে যাব—একবার যত্নে দাঁড়িয়ে ভেবে নেবার সময় এসেছে।

বিদ্রোহকে বানচাল করার চেষ্টার অস্ত্রের মতো কেমনোদিনই হয় নাই, আজও হচ্ছে না, হবে না। মিটো'র দিন থেকে শুরু ক'রে, মিটো'র কেন, ডাকারিন, কার্জনের দিন থেকে শুরু ক'রে ত্রাসুয়েল হোয়ের দিন পর্যন্ত, ত্রাসুয়েল হো'র কেন, লিন্‌লিথ্‌গো, ওয়াডেল, হাউকবার্টেনের দিন পর্যন্ত আমরা যেখানে বিদ্রোহশক্তির মাধ্যমে প্রতিজ্ঞার শক্তিকে চাপিয়ে বিদ্রোহকে বিপর্যস্ত করবার চেষ্টা। এ-চেষ্টা সফল হয়েছে, এবং এ-চেষ্টাকে অসুখ রাখবার সব-কিছু আয়োজন আমরা দেখেই ইংরেজ ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে।

অপরদিকে, বিদ্রোহকে সম্বোধন করবার স্বপ্ন, বিপক্ষে চালিত করবার স্বপ্ন দারুণ অ্যাগাস্টন ভারতীয় বিদ্রোহের ক্ষেত্রে “হুগিন পন্থা” ও “বামপন্থা” দুটি শব্দের আমদানী ক'রে তার অপব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেল।

মার্ক্স-নীতির বিপ্লবের দিনে কল্যাণ-ম্যাগি-মিলের পক্ষাঘাত কেউ “বামপন্থা” বলতো না, কিন্তু গান্ধী-নীতির বিপ্লবের দিনে মার্ক্স-নীতিকে “বামপন্থা” বলে চালানো হ’ল। অধিকতর লোকের স্বার্থ যে বিপ্লব চলে সেই বিপ্লবই বামপন্থী অঙ্গসংগঠনের দাবী রাখে। সেই হিসাবে আজ মার্ক্স-পন্থাই হয়ে পড়িয়েছে সত্যিকারে “সন্ধিপন্থা”। এ-ই দুগুণ্য। এমনি ক’রেই ইতিহাস এগোয়। এক দুগুণের বামপন্থা তার পরবর্তী দুগুণে সন্ধিপন্থা হয়ে ঠাড়াতে বাধ্য। শুধু তা-ই নয়। ভারতীয় বিপ্লবের পক্ষে মার্ক্স-পন্থা বরং বর্তমানে হয়ে ঠাড়াতে প্রতিক্রিয়ায় পক্ষে দুগুণ পন্থা। মার্ক্স পন্থার অঙ্গসংগঠন আজ যদি কেউ নারা তোলে “সম্মতিক্রমের একনায়কত্ব”—Dictatorship of the Proletariat—তা হলে তার অনিবার্য ফল কলমে ভারতের পক্ষে চীনের দুর্ভাগ্য, এবং বহুসংখ্যক দুর্ভাগ্য। ওখানে দুই একনায়কত্বের দ্বন্দ্ব বেগনি ধ্বংস হ’তে চলেছে। আজ কোন প্রাচ্যদেশে একনায়কত্বের পথে বিপ্লবের সাধনা, সাম্যবাদের সাধনা নয়, ফ্যাসিজমের সাধনা।

অথচ আজ হারা বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে চলতে সাহায্য করতে পারতো, তারা অনেক অগ্যাসনের তোলা কথার মোহে বিপ্লবকে বিপ্লবত্বই করছে, প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করছে। গান্ধীজী একনায়কত্বের পথে না গিয়ে গণতান্ত্রিক পথে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে চলতে চেয়েছিলেন। সেই পথের প্রধান বাধা তিনি সন্নিবেশে পেয়েছেন—ইংরেজের হাত থেকে সৈন্য লোকের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। শুধু সৈন্য লোকের হাতে নয়—ভারতীয় ইউনিয়নে কংগ্রেসের হাতেই ক্ষমতা এসেছে। গান্ধীজী কংগ্রেসকে ভারতের বিপ্লবী জনগণের সংঘ-পরিণত করেছিলেন। আজ এই সংঘের কাজ হবে জনগণের সঙ্গে যোগ রেখে একদিকে তাদের ক্ষমতাস্বার্থী বিপ্লবের ক্ষম উত্থাপন করে তোলা, নজরমান ক’রে তোলা, অপদ্রবিক কংগ্রেস গণবর্গমতগুলির তরফ থেকে তাদের হাতে, তাদের দ্বারা গঠিত পকারেতের হাতে অধিকতর ক্ষমতা হস্তান্তর করা—এই লক্ষ্য, যে একদিন এই

জনগণের পকারেতই থাকবে—বর্তমান রাষ্ট্র তখনো পাকড় ঘতো বলে পড়বে। এ-ই গান্ধীজীর গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের নীতি ও আদর্শ।

কিন্তু সে আদর্শে পৌঁছাবার আগে অনেক কাঠখড় পোড়াবার আছে। গান্ধীজীর অঙ্গসংগঠন যে বিপ্লবাবর্ণ ও বিপ্লবনীতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছিল কংগ্রেস, সে এক বিশ্ববিপ্লবের আদর্শ, বিশ্ববিপ্লবের নীতি—মানবিক-দুগুণের শিল্প, সমাজ ও রাষ্ট্রগতির বিপ্লবে অহিংস বিপ্লবের আদর্শ ও নীতি। এর দ্বার ও দ্বারিষ অনেকখানি। এ দ্বার দ্বারিষ পূর্ণ হ’তে পাও না বা



গান্ধী

পূর্ণ হবার দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় ততদিন, ততদিন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেসের শিকারী দীকার প্রভিটি ভারতবাসী তার বর্তমানকে ঘেঁষে ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় না চকল হয়ে ওঠে।

এখানেই গান্ধীজীর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ অনেকখানি নির্ভর করে কংগ্রেস গণবর্গমতগুলির উপর। অত্যন্ত দুঃখের সাথে স্বীকার করতে হবে, গান্ধীজী দুত্বার পূর্বে এমিকে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন কংগ্রেস সরকারের হাতে ক্ষমতা এসে সে-ক্ষমতা বাস্তবীকরণে রাষ্ট্রগঠনের দিকে যাবে না,

রাষ্ট্রগঠন যে রাষ্ট্রের উপরওয়াল হুঁচটটি কর্তাব্যক্তির উপর নির্ভর করে, সে কথা ভুলে বৈপ্লবিক আদর্শেই রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা হবে, রাষ্ট্রগঠনে জনগণেরও হাত থাকবে। আজ রাষ্ট্রের সমস্ত অনেক, কিন্তু সে-সমস্তা পূরণে সমগ্র ভারতীয় জনগণকে আহ্বান করলে অনেক সমস্তা সহজ হয়ে আসে—বৈপ্লবিক সংগঠনের এ-নীতি বর্তমান কংগ্রেস গবর্ণমেন্টগুলি অহুসরণ করে চলেছে না। শিল্পাংগঠনে শিল্পপতিদের সাথে হস্তবহুরের এক রফানিশ্চি করা হ'ল, কিন্তু শিল্পের শ্রমিকদের শুধু বলা হ'ল, তোমরা উৎপাদনকারী বাণী দ্বী কোরো না, ন্যায্য কর। এতে করে বিরাট বৈপ্লবিক শক্তিকে অস্বস্ত: হস্তবহুরের অস্ত চাপা দেওয়া হ'ল। এই বক্ষ্ম দীর্ঘকালের অস্ত চাপা পড়লে বৈপ্লবিক শক্তি ধ্বংসের শক্তিতে, প্রতিবিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হয়। ভারত গবর্ণমেন্ট কি অস্বস্ত: হুঁচটটি শিল্পেও শ্রমিকদের উপর নিম্ন পরিচালনার ভার দিতে পারতো না? শিল্প পরিচালনার শ্রমিকদের সহযোগিতা আহ্বান করতে পারতো না? মূনাকার অংগ শ্রমিকদের ভিতর বন্টনের ব্যবস্থা করতে পারতো না? কিন্তু এই নীতির কথা পর্যন্তও আজ পণ্ডিত জগদ্বদ্বালের মুখে শুদ্ধি না, বহু শ্রমময়ী জগজীওন রায় মাঝে মাঝে বলছেন। অথচ এই ভাবে দুই পাঁচ জায়গাতেও শিল্প পরিচালনার ব্যবস্থা করলে সব শিল্পেরই শ্রমিকরা এই আশার উন্মুখ হয়ে উঠতো যে, সময়ে সব শিল্পেরই মালিক হবে তারা। এই ছিল গান্ধীজীর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নীতি ও পথ।

কিন্তু কংগ্রেস গবর্ণমেন্টগুলি কোনো দিকেই এই বৈপ্লবিক পথায় যায় নাই। যায় নাই, তার কারণ, ইংরেজের শিক্ষায় দীক্ষায় শিক্ষিত দীক্ষিত সংরক্ষণপন্থী কর্তব্যচীৎসাই হয়ে উঠেছে আমাদের কংগ্রেসময়ীদের একমাত্র উপদেষ্টা। বিপ্লবীসংঘ কংগ্রেস সেদিকে ঊপেক্ষিতই হচ্ছে। এই কর্তব্যচীৎসার পরামর্শে চলতে গিয়ে ময়ীরা কংগ্রেস লং থেকে, স্ত্রুতরায় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। পরামর্শদাতাদের দোষে দুষ্ট হয়ে ময়ীরা দুর্গামই কিনছেন, সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস

সংঘগুলির সঙ্গে অসহযোগিতা করে তাদের এমন দুর্বল করে তুলছেন যে, যে-দিকি উাদের ময়ীত্বের আগনে তুলেছে, সেই দিকিকে ঘূর্ণ-খাওয়া করে ছাড়ছেন। তবু আশা করছেন যে, নির্বাচনে আবার কংগ্রেসের নামেই বিবেকবেন।' সেন্দ্বিন প্রয়োজনীয় চোরাবাভারে গিয়ে পৌছে গেছে, চোরাবাভারের উৎপাতে গরিত জনসাধারণের প্রাণ অতিষ্ঠ, অথচ সেই বাভারেরই মালিকতা এক একটি ময়ীত্বকে বক্ষা করছে। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ময়ীরা বলছেন, কাপড় বহি তোমরা না পাও, আমরা কিছু করতে পারিনে। এখনকার



জগদ্বদ্বার দত্ত

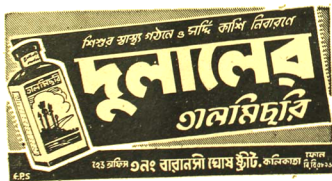
দিনে সরকার কিছু করতে পারে না একথা বলে একান্ত নীরবেকেও তুলে বোঝানো চলে না। শ্রমিকদের মুখে অভিযোগ সরকারের স্ত্রু কোটেও বেতে পারবে না যদি মালিকদের তা'তে আপত্তি থাকে—মতোরকম টালবাহানা সেখানে দেখা দেয়। এমনি করে বিপ্লবী গান্ধীর হাতে গড়া বিপ্লবী সরকারগুলি আজ হয়ে পড়ছে প্রতি-বিপ্লবী মালিকদের সরকার, বিপ্লবী জনগণের নয়।

আজ বহন কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা এসেছে, তখন কংগ্রেস-সংঘ ও কংগ্রেস-সরকারের পরস্পরের সহযোগি-

তাতেই যার বিপ্লবের অগ্রগতি লক্ষ্য। তা না হ'লে বিপ্লবও ক্ষয় হবে, কংগ্রেসও থাকবে না, আর কংগ্রেস সরকারের পরিবর্তে প্রতি-বিপ্লবী সরকার হেঁচা দেবে, অথবা এই সব কংগ্রেস সরকারেরই কোনো কোনোটি প্রতি-বিপ্লবী সরকারে রূপান্তরিত হবে। এ-রূপান্তর ইতিমধ্যেই হেঁচা দিচ্ছে। বিপ্লব নিয়ে খেলা আগুন নিয়ে খেলার চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর—বিশেষতঃ গান্ধীজীর অস্থিঃশ বিপ্লব। এ-বিপ্লবে যদি অনতিবিলম্বে ভারতের প্রতিটি নরনারী বিপ্লবী চেতনায়, বিপ্লবী প্রেরণায় উদ্ভূত না হয়ে ওঠে, তা হ'লে কংগ্রেস গবর্নমেন্টের পরিবর্তে যে প্রতি-বিপ্লবী গবর্নমেন্ট হেঁচা দেবে, সে আশংক্য বোমা নিয়ে ছেলে খেলা খেলতে শুরু করবে—ওদিকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে পড়বে। তার পরিণাম ও পরিণতি কি, তা অস্বপ্নান করা পত্ত নয়।

আর, আর যদি কংগ্রেস সরকারগুলি গান্ধীজীর উপদেষ্টা পদত্যাগিক বিপ্লবের পন্থা অস্বরণ করে চলে, তা হ'লে আশংক্য বোমার বালিক কোনো দেশের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে যে সব জাত ভৈরি হচ্ছে তারাও ভারতবর্ষকে ঘাঁটাতে মশবার ভাববে। কিন্তু বিপ্লবের পন্থা চলতে হ'লে প্রত্যেকটি রহিত ভারতবাসী, বেকার

ভারতবাসীকে ভাববার সুযোগ করে দিতে হবে, এ আর্মীর রাষ্ট্র, এ আয়ার জীবিকার-ক্ষেত্রে ভাবছে, আর উপবাসে কাটাতে হ'লেও এ রাষ্ট্রকে গ'ড়ে তুলতে আদি প্রাণশয় করবে। প্রতিটি কৃষকে ভাবতে দিতে হবে, যদি আবার থাকে বা না থাকে, আমি জমিতে যোগা বলাতে সাহায্য করব, আবার জীবনে বা-ই ঘটুক, আবার সন্তান আবার মতো বৈজ্ঞানিকভাবে দিন কাটাতে না। প্রতিটি মজুরকে অল্পতন করতে দিতে হবে, শিল্প তো আবার, পরের কথা আর দাসত্বের তত্ত্বাবধি আবার ঘুচে চলেছে। পাকিস্তান সম্পর্কে বৈদেশিক নীতি যেমন যদি আর কংগ্রেস সরকার চলে, পাকিস্তানের প্রতিটি সাধারণ বাহুরের এটুকু বুঝতে যেন প্রচারের প্রয়োজন না হয় যে, ভারতীয় ইউনিয়নের অনগণের সরকার পাকিস্তানের অনগণের হয়নী বহু। কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নে যে ম্যাজিস্ট্রেট থেকে চৌকিয়ার পর্যন্ত এখনও রাখা হয়ে রয়েছে, তাদের সামনে দিয়ে যে এখনও রাখা নীচু করেই চলতে হয়, এ ঘেঁষে এ ভরস করিতে সাহস হয় না যে, গান্ধীজীর বিপ্লবী আদর্শ কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির কোথাও একটু স্মৃতির আকারেও এখনও বেঁচে রয়েছে।



ইংরেজের কারাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য (৪)

শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত

১৯৪৩ সাল। বিশ্বযুদ্ধের বশভাষা অগতাকে বহির করে তুলেছে। ইংরেজের মেলে বন্দীদের বছর একটাব পর একটা আসে আর চলে যায়। ইংরেজ বিদ্রোহীশক্তিকে নিঃশেষে সেদিন মেলে পূরে নিয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ ইংরেজের লবণশক্তিকে চুষকের মত টানছে, সেই টানের শক্তি বোপাচ্ছে ভারতবর্ষ। সেদিন সে বাণবিশ্ব, রক্তক্ষরা। খাত পায় না ভারতবাসী। তার সমস্ত রস চলে বাচ্ছে সাম্রাজ্যবাহী War front এ। এসে গেল বৃত্তি দুর্ভিক্ষ। বাংলার বাতপরিহিতি বার বার মরীচিকাকে সতর্ক করে মিছে দুর্ভিক্ষ বৃত্তি এসে যায়। কোথায় সাবধানতা? স্ফূর্ত্ত মরিত্তের মূখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যায় সাম্রাজ্যবাহী হুহ। বলে রণক্ষেত্রে খাত বোপান না মিলে হুহ করবে কি ক'রে? অর হবে কি ক'রে? সত্যিই তো, দুর্ভিক্ষে কালো আননীগুলি মরে গেলে ইংরেজের কোন্ দায়?

ওদিকে কংগ্রেস কর্মীরা আগষ্ট বিপ্লব থেকে আরম্ভ ক'রে অবিরত বলে যাচ্ছেন, স-গ্রাম চালিয়ে যাও সাম্রাজ্যবাহীর বিরুদ্ধে। ওষের সঙ্গে আমাদের কোন সহযোগিতা নেই। তবুও এসে গেল দুর্ভিক্ষ তার বিতীষিকাময় হিংস মৃত্তি নিয়ে। বাংলার আকাশে বাতাসে উঠেছে হাহাকার, বুকভাঙা কারার রোল। তারি প্রতিধ্বনি পৌছায় গরাদের অন্ধরালে বন্দীদের কানে।

মুখশিত বিদ্রোহীশক্তি হাত পা কামড়ে মরছে, আর ভাবছে, কেন ওরা না গেয়ে বিনা প্রতিবাধে এমনি ক'রে মরে যায়? বন্দীরা Statesman এ ছবি দেখে আর চমকে ওঠে, একি? উপবাসী স্ফূর্ত্তের তিলে তিলে একি অসহ্য কৃত্তা? তারা গ্রাম থেকে সহরে এসেছিল **স্বাধীনতা**র প্রাণে আর তারপর স্ফূর্ত্ত দাতব্য হাভারে হাভারে কংকাল অমনি ছুটপাতে নীরবে শেষ হয়ে গেল? স্ফূর্ত্ত প্রাণ অর তাদের কেড়ে নিয়ে গেল সাম্রাজ্যবাহী। বন্দীরা সেদিন কুখাই জেলের আকাশ চিরে চিরে মিলে

করছে, একটী সোকও কি আশ বাইরে এমন নেই যে যোকানে খরে খরে লাফানো খাবারগুলি ওষের লুট করে খেতে বলে? চালের গুণামগুলি, ধানের গোলাগুলি লোপাট ক'রে কিদের আল্লা মেটাতে বলে? স্ফূর্ত্ত-লোকেরা ছুটকুট করে মরে যাচ্ছে, তবু কি মরিয়া হওয়া এমন একটী বিদ্রোহী সেদিন বাইরে ছিল না যে, মরশোমুখ জাতিটাকে মরবার আগে শেখবাবের মতো দাখিয়ে একবার আগিয়ে দেব? হাভার হাভার লম্বী বোকাই খাত বধন যুদ্ধের জন্ত পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, ধনীরা এই সুযোগে বধন কালোবাজার ঝাঁকিয়ে বসেছে, তখন কি একটী বিদ্রোহী এগিয়ে এসে স্ফূর্ত্ত নগরীকে আত্মান করতে পারেনা যে, তোমরা লুট কর, কেড়ে যাও তোমাদের নিজের খাবার? খাবার তর্তি গুণামের পাশে উপহাসে মরে বেগনা।

না, সত্যিকারের বিদ্রোহীরা সেদিন একটীও বাইরে ছিল না। ইংরেজ তাদের নিঃশেষে মেলে পূরে নিয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ বিচলিত হুহনি সেদিন সেই বিশ্বাসঘাতক শক্তি, যা বাইরে থেকে নিজহাতে জাতিকে কৃত্তার বিতীষিকার মধ্যে ঠেলে দিয়ে সাম্রাজ্যবাহী যুদ্ধকে সাহায্য করেছে, আর এরমধ্যে সেখানে জনযুদ্ধ। যে যুদ্ধে ভারতের লক্ষ লক্ষ জনগন হুহ না করেও কৃত্তাকেই আলিঙ্গন করতে বাধ্য হ'ল সেই যুদ্ধে তারা সেদিন জন বার্ষের কল্যাণ দেখতে গেল। তারা Destitute home এবং লম্বরথানা খুলে আশ-প্রশার লাভ করতে থাকলো। ওদিকে পিশাচ ধনিকের দল খাত অমিয়ে পচিয়ে কেলে দিয়ে কালোবাজার ঝাঁকিয়ে রাখলো। এরা সবাই মিলে একহাতে দুর্ভিক্ষ আনতে সাহায্য করেছে অন্ধহাতি লম্বরথানা খুলে নিজহাতে লম্বী বাইরে তাদের কৃত্তার দ্বারা এগিয়ে নিয়েছে।

বন্দীরা স্থির থাকতে পারছেননা। তারা জেল

কর্তৃপক্ষক জানার আদায়ের ব্যাপারের বরাদ্দ থেকে ভাগ দিতে লাগে। অতীত জাইবোনদের। কেন এত বরাদ্দ দিতে আমায়ের আর কুণিগে রাখতে দিতে তোমরা? ইংরেজ জানে বাইরে বহন কাতারে কাতারে বেশবানী অনাহারে বীভৎস হুয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে তখন বেশবানীতে তার স্পর্শ লাগতে দিলে চলবে না। দিলে যে' বাতল জলে উঠবে তাকে করে রাখা হুজরত শাহজাদাবাদীর গকে সত্ত্ব নয়। জেলে হাতা আছে তারা বিপ্লবী, জীবের বিপ্লবী প্রেরণা আছে, জালা আছে, নইবেনা এখানে কোন চাপ। জাই ইংরেজ বেশবানীর বরাদ্দ হ্রাস করনি। ওখানে জিনিষ গচিরে বন্দীদের উপহারী রাখেনি। বরং বা নেই তাও যেমন করে হোক যোগ্যত করে এনে দিয়েছে, যেন এটা অজাবের তাকনা। কিন্তু হুজর হুজর না পায়। যেন এটা খেতে গয়ে জেলে গিয়েছে। কিন্তু হয়ে ইংরেজের স্ট্রোনীতি বার্ষ করে না যায়। এবং বাইরের হুজরের ব্যাপার আগুন না জালাতে পারে। বন্দীরা সবই বুঝলো, বুঝলো ইংরেজ কেন কারাগার স্থাপন করেছে। কেন যে মনসাখারদের কাছ থেকে বিপ্লবীশক্তিকে কটনি হয়ে পৃথক করে রাখতে চাইছে। কেনইবা তাদের অজাবের স্পর্শ থেকে বাঁচাতে চাইলো। বন্দীরা যোকে সব কিছু করবার উপায় কৈ? বহু বরজার হস্তের নয়া দিয়ে হুজিরের হাফাকার তারা শোনে কিছু বরজা ভাঙবার উপায় বুঝে পায় না। তারা কিছু বাধে, কিছু বাধে না। তাতে ইংরেজের কী? ভাগ দিতে চাপ? সাধারণ দিতে পার হুজার যিন, কিছু ভিকা দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে হুজার হাত থেকে কি বাঁচানো যায়? সেদিনের প্রয়োজন হুজরকা ভিকা দিয়ে বাঁচানোর বার্ষ প্রচেষ্টা নয়। প্রয়োজন ছিল সেদিন প্রচণ্ড বিপ্লব এনে তিলে তিলে হুজরকে আকস্মিক হুজরজিত পথে কেড়ে যেতে দেখানো। বেশবানীর লোহার সরাসরি চোপে ধরে বিপ্লবীশক্তি সেদিন তাকে মরছে "কোথার আজ বিপ্লব, আজ শুভকল বয়ে যায়। বিপ্লবী-শক্তিকে পৃথক করে কারাগারে রাখার উদ্দেশ্য তুমি এসে বার্ষ করে দাও।" তাদের আঙ্গান সেদিন জেলের

আকাশ তরে বুধাই কেঁদে কেঁদে মিলিয়ে পেল। ইংরেজের কারাগার স্থাপনের প্রধান এক উদ্দেশ্য সেদিন লক্ষ্য হল।

১৯৪৪ সালের প্রথম মিকে ভারতের পূর্ণ নীমাত অন্তর্ভুক্ত করে আসছে নির্ভীক আত্মায় হিম্ম বাহিনী। তার পুরোভাগে রয়েছে হুজার চক্র। বাহিনীতার তিরকা পতাকা হাতে নিয়ে কোহিমা ভিমাপুর এসে জায়ন্তকুমিতে তাঁরা প্রোথিত করে গেলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম হুজরা। বন্দীরা শোনে ইংরেজের জোর প্রচার যে, জাপান আসছে হুজরচক্রকে সামনে নিয়ে। বন্দীরা ভাবে, আবার প্রকৃৎ বংশ? ওদিকে সাইগন রেভিও থেকে গোপনে সংবাদ আসছে নেতাজী বলেছেন, ভব নেই, আমি জাপানের হাতের পুতুল নই, জাপানের স্বার্থ আমি দেখব না। আমার তিরস্কীবনের বশ আমি ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে আনব স্বাধীন ভারত। দু' বছর ধরে আত্মায় হিম্ম বাহিনী শক্তি আহরণ করে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। জাপান বুঝেছে ভারতের এই খাটি সোনালো বাণ মেশানো চলবে না। জাপানের স্বার্থের গড় হুজরচক্রের মধ্যে ঢুকতে না দিতে পেয়ে হাল ছেড়ে জাপান ক্রমে সাময়িক সাহায্য বন্ধ করে দিল। কোহিমা ভিমাপুরে যে পতাকা বিজয়গর্বে উড়েছিল তার নীতি ক্ষয়িক হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার যান সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু এলব ভো সেদিন প্রকাশিত ছিল না। ইংরেজ প্রচার করেছে জাপান আসছে। বোম্বা পড়ছে কলকাতার। জেলের মধ্যে না আছে রেভিও না আসে সঠিক সংবাদ। সম্ভবাহুল-চিত্তে বিধাতরা অন্ধরে বন্দীরা ভাবে। শাহজাদাবাদী জাপান স্নায় নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করবে পরাবীন ভারতকে? এও কি সম্ভব? চীনের গদা কামড়ে রয়েছে যে জাপান তার সাহায্যে কি ভারতের স্বাধীনতা আসা সম্ভব? বন্দীরা অত্যন্ত চিন্তাভুল। ওদিক দিয়ে চিন্তাধারা। বাইরের স্বপতের সঙ্গে সম্পর্ক হীন, সমস্ত সংবাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা অস্থির ভাবে যিন কটাটা ইংরেজ বন্দীদের হাত পা শিকলে বেঁধে রেখেছে শু

এই রকম স্থির হয়ে উঠেলেও যথোপযুক্ত ভাবে ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। সেদিনও বয়ে গেল এক মহাবিশ্ববের স্তম্ভকণ। বিপ্লবীশক্তি কারার অধরাগে শুধু চুইকট করে মরলো। লাড়া দিতে পারলোনা সেই স্তম্ভকণ। ইংরেজের কারাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য এখানেও লক্ষ্য হল। কিন্তু ১৯৪৪ সালের সেই বিপ্লবের সত্তাবনার দিনে তবুও ইংরেজের সম্বন্ধে ছিল যে বৃষ্টি আসল খবর বন্দীরা টের পেয়ে যাচ্ছে। এসের অসাধ্য কিছু নেই। তাই বলে প্রতি সপ্তাহে বন্দীদের ঘর ও ভিত্তিগত বানা তরাসী। তবে ভাণ্ডারের সঙ্গে বড়বড় করে এরা বৃষ্টি জেলের ভিতর বোমা বাকল অস্ত্রপত্র আমদানী করছে বিপ্লব আনবার উদ্দেশ্যে।

প্রতি সপ্তাহে তরাসীর বুধা হুয়রাণির মধ্য দিয়ে স্নান বন্দীদের দিন কাটে। ইংরেজের কূটনৈতিক বুদ্ধি বন্দীদের চরমে এনে বিপ্লবীশক্তিকে হুয়রাণ রাগতে চায় এবং তরাসীর মধ্য দিয়ে নিজের চোখে সম্বন্ধে তখন স্পষ্টত চায়।

ইংরেজ কারাগার স্থাপন করেছিল ভারতের কূটনৈতিক শক্তিকে, সংগ্রামশক্তিকে পশু করে আটকে রাখবার জন্য। এই পশু করে রাখতে দিয়ে কারাগারকে সে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধতে গেল। কিন্তু হতই কঠিন হল সেই শৃঙ্খল, ততই কোন বাহুকেরও খেলায় যেন সে অবন হরে খপে গড়তে লাগলো। বিপুল সত্তাবনা নিয়ে এক একটা আন্দোলনের তরঙ্গ এসেছে আর ফিরে কিয়ে গেছে। ইংরেজ তার রক্তভাড়া চক্ষু আর জেলগানাকে দ্বায়ে এগিয়ে এনে টিপে ধরেছে তারগলা।

১৯১৪ সালের বিপ্লবী আন্দোলন সেদিন বার্ষ হয়ে গেছে, কিন্তু সে ঐতিহ্য রেখে গেছে সূচনা রেখে গেছে। বিশালতার ভবিষ্যৎ সত্তাবনা পুঞ্জিগুণি কার কানি দিয়ে সীপাত্য পাঠিয়ে তাকে শেষ করতে চেয়েছে, কিন্তু ঘেরে ফেলতে পারেনি।

১৯২১ সালে কংগ্রেসের বরকট আন্দোলন নিয়ে গান্ধীজী স্বনামধন্য সত্তাবনা সত্তাবনিক আহ্বান করলেন। যত্ন ভাতি পরিচিত কঠোর স্তম্ভে ভেঙ্গে জেগে

উঠল। তারপর এল তার অস্তরের ভাগরণ, এবং প্রতি আপনজনের গ্রিহ আস্রানে লাড়া দিয়ে উঠতে থাকে ভারতবাসী। সেদিনের দিনেই বন্দন আন্দোলনকেও অচল করে ধোবার জন্য ইংরেজ বাড়িয়ে বিল তার বেয়নেটগুলি ও জেলখানা। মনে হল বার্ষ বার বৃষ্টি সংগ্রাম। কিন্তু বার্ষ সেদিন বাধনি। মহাত্মা গান্ধী জাতীকে নিজ হাতে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ইংরেজ তার কারাগারে হাজারে হাজারে দেশদ্রোহিতাকে বন্দী করেছে, গির্বে কেসতে চেয়েছে কংগ্রেসের আন্দোলনকে, গান্ধীজীর কঠোরকে। ইংরেজের হাতে জেলখানার মধ্যে আন্দোলন সেদিন আগত বার্ষ। কিন্তু ভাতি লাহল পেয়েছে, তর ভেঙেছে, এগিয়ে গেছে। সেদিন শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন গান্ধীজী। তার পর ১৯৩০, ১৯৩২ সনের আন্দোলন। তখন চলছিল নিরস্ত্র আর্দ্র। অমাত্র আন্দোলন এবং লম্বা বিপ্লবী আন্দোলন চুটো পাশাপাশি। সেদিনও জনসাধারণের কাছ থেকে কারাগারে গঠিয়ে কেলে এই সংগ্রাম শক্তিকে ইংরেজ গলা টিপে ধরতে এল। মনে হল গলা বৃষ্টি চিরকালের জন্যই বন্ধ করে দিল। কারাগার বৃষ্টি আর ঘুলবে না ইংরেজ। হ' একবছর নয় ৮ বছর পরে দুয়ার না খুলে আর পারবে না সাম্রাজ্যবাদী। ১৯৩৮ সালে বন্দীগণা খুলে দিল। মনে করল বৃষ্টি কারার ঐ গোদার কপাটগুলি সংগ্রাম শক্তিকে পূর্ব-অব করে দিয়েছে। গ্রহিকে সংগ্রাম ক্ষমতা তখন দেশের মধ্যে জড় বেঁধে গেছে। তাকে কণ্ঠে কার শাখা ? গান্ধীজী গির্বিয়েছেন কেমন করে নাছোড় বাম্বা মরিচা হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হয়। তখনও তিনি আছে পূর্ণ মূর্তিতে হাল ধরে। ইংরেজের কারাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে তিনি কারাগারের মধ্যে থেকেই বার্ষ করে দিয়ে চলেছেন।

তারপর ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লব। হোতা সেদিন কারাগারে বুক। আগস্ট বিপ্লব তার অতীত সংগ্রামের সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে বতঃস্মৃতিভাবেই এগিয়ে চলেছে। শক্তি তার আপনাতেই বেগে গেছে। ইংরেজ বোধ করতে গেল তার শেষ শক্তি নিয়ে। জেলখানা, কানি, গুলি

সমস্ত অত্যাচারই যেন আতি হেসেই মাথা তুলে নিল। ইংরেজের অত্যাচারের ভয় সেদিন সেখানেই বার্ষিক্যে তরে গেল। ইতিহাস লিখলে) আগষ্ট বিন্দবে ইংরেজের জয়ে আসে ইংরেজের পরাজয়। ভারতের বাট বছরের সংগ্রামের ইতিহাস একটার পর একটা বিন্দবের ডেউ এনেছে—তার প্রত্যেকটা তরঙ্গ পরিপূর্ণ সন্তাবনার ভাবে ভরপুর হয়ে এসেছে। ইংরেজের অত্যাচাৰে নিপীড়নে কারাগারের অন্তহালে মনে হয়েছে হুঁচকি বাতের বাতেরই

বিস্ময় ব্যর্থ হয়ে কঁপে কঁপে গেছে। কিন্তু ইতিহাস বলেছে প্রতিবারেই আতি শক্ত হয়ে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে তাকে আর ইংরেজ রূপে রাখতে পারেনি। ইংরেজকে ভারতের সংগ্রাম শক্তির কাছে মাথা নত করতেই হল। গান্ধীজী Quit India সংগ্রাম শেষ করে ইংরেজের কারাগার ছাড়ানোর উদ্দেশ্যে, সাত্মাআবাহী শাসনের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ করে এনে দিয়ে সেদিন স্বাধীন ভারতবর্ষ।

৩-৩-১৭ তারিখে কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে পঠিত।

কন্ঠে দেবায়

শ্রীবিষ্ণুজন্ম ভব

তাদের উদ্দেশ্যে জানাই প্রণাম
দারা বীর—দারা শক্তিমান,
অস্তর দানের বিধাতার।
জীবন বঁচি নিতে হয় ভয়ে থাকেনা তাঁরা পেছিয়ে।
মৃত্যুর হাত থেকে, বোগের হাত থেকে
জীবনকে ছিনিয়ে বসি আনতে হয়
সেনিনও তাঁরা আসবে এগিয়ে।
ভরকে তাঁরা করেছেন জয়
পাগলা নদীকে সেতু নিয়ে বাধতে,
বিভ্রমস্থল অরণ্য পুড়িয়ে নতুন নগর গড়তে,
তাঁরাই যাবে এগিয়ে।
আত্মবিশ্বাস আর উৎসাহে অস্তর তাঁদের পূর্ণ—
দে যেন শুভো হাওয়া বা উড়িয়ে নিয়ে যায়
সব কুয়াশা, কুটির সামনে সমস্ত অথঙ্কতা

অনাবৃত্ত করে নিজ অর্থ দাতা,—
তাঁরা ভরা নির্ধেয় আকাশ।
তাঁদের জন্তে দরকার নেই শ্রুতিভঙ্গ,
মুন্দের মালা—মৃত্যুর কোন শোকচিন্তা।
তাঁরা তো দারাদারি কালের সর্বনাশা বিপত্তির মাঝে।
তাঁরা যে বেঁচে রইলো অনাগত ভবিষ্যতের অঙ্ককারে।
নতুন জগতে তাঁদের মানস সন্তানোন্মা
জানবে তাদের নাম—রূপকথার চেয়ে মন ভোলানো।
তাঁদের আত্মা দীপ্ততার করণে
নতুন যুগের সূর্য্যের আলোক।
তাঁদের রক্তের জীবন বেগ
উবেল করে তুলবে দেশের নদনদীকে।
তাঁদের অস্থির বঙ্গ গড়বে দেশের অন্দের প্রাণ।
সেই অমর আত্মাদের উদ্দেশ্যে জানাই প্রণাম

পাঞ্জাবের চিঠি

ঐকালীনগদ চন্দ্রকান্ত

অনুবৃত্ত

২২. ৩. ৪৮

স্বয়ংক্রিয়,

ভাই বাবু, তোমার ১৭৩৪৮-এর চিঠি পাইলাম। এত অল্পত তোমার চিন্তাধারার পরিবর্তন আর দেখি নাই, খুশাও করি নাই। আজও বিপ্লব। নেবার সময় তোমার আসেনি,—এত সহজেই ঘাবড়াইলে চলিবে কেন?

“আশ্রয়প্রার্থী সমস্তা আর পশ্চিম ভারতের শ্রম নয়”—সেটা আগেই জানা ছিল। এ সমস্তার কত রূপ, কত দৃষ্টই বা তোমরা দেখিয়াছ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—আমি দেখিয়াছি। বুদ্ধিগাছি, কামিগাছি। পকাশের ডিক্‌শনারি, ৩৬-এর Direct action, নোচোপারি ব্যাধ সব কিছুই নিম্নে চাকিয়া মিচাছে পাঞ্জাবের স্বাধীন প্রভাত। বাঙ্গালী নয়, বাঙ্গালী চিন্তাধারা, বাঙ্গালী দৃষ্টিভঙ্গী এ ভাবতেও বুদ্ধি পারে না। কি নরক ঘটনা দেখিয়াছি, কুশিগাছি—আমিই বুদ্ধি শুধু একজন বাঙ্গালী বিরাট হিন্দুস্থানের পশ্চিম সীমান্তে বসিয়া। Waga সীমারেবার কয়েক মাইলের মধ্যেই আমার ডেরা। কত রাত্রি ঘর ছাড়িয়া মাঠের দিকে বৌড়াইয়াছি অন্ধকারের বৃকে। কতদিন দুখের ভাত পাতে কেলিয়া ছুটিয়াছি অন্তঃসংসার আশ্রয়। কত ঝুঁতের রাত্রি ছাদের উপর আঙন জালিয়া ‘ধবরমারী হো’ করিয়া কাটাইয়াছি—তার ইত্থা নাই। কিন্তু তবু আমি কত সুখী! জি, টি, হোন্, এর উপরেই আমার ডেরা—১০ গজও নয়। আমার ঘরের দুয়ার দিয়া বহিয়াছে কত দিন রাত্রি—মাসের পর মাস, ঝড়, কল, কুখার্ড—আধরার, অকশরার কথার মূল উপাটিত মানব”।

চোর পাচটার নিলিটারী জানাইয়া গেল—অনিদিষ্ট সময়ের জন্য ‘কারকিট’। বড় ফাটকের ঠাক দিয়া

বেশিলাম—বিরাট “কাওলা”—মানে—সরগারীর পদাতিক বাহিনী চলিয়াছে। ৫১৭ গজ বিস্তৃতির অপরিমিত মৈবের জনসংখ্যা বহিয়া চলিয়াছে। লক্ষ লক্ষ পুরুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ—যেন বহুচালিতের মতই চলিতেছে। কেহ পাকিস্তানের পথে, কেহ হিন্দুস্থানের পথে—অথবা সবাই অনিদিষ্ট ভাগ্যের পথে অন্ধকারের বৃকে হাতুড়াইতেছে। উলক, কল, অলমব, উপবাসী, কুখার্ড—জাপাইয়া জাপাইয়া, খুঁকিয়া খুঁকিয়া, খোড়াইয়া খোড়াইয়া,—কেহ বা গড়াইয়া গড়াইয়া। কত শত মাসপথেই হাত্তা শেষ করিয়া—হেলিয়া হুনিয়া এলাইয়া পড়িতেছে—মরিতেছে। একদিন একটি বেয়ে, ১৪১৬ বছর বয়স—কতজন মনের দেখতে—, চলিতে চলিতে হঠাৎ পড়িয়া গেল—মরিয়া গেল, ষ্টিক আমার দুয়ারের সামনে। বুদ্ধি একটু জল চাহিয়াছিল—বুদ্ধি বৃকের ছাতি কাটিয়া গেল। বড় দুয়ারের ঠাক দিয়া চাহিয়া আছি, বড় ইচ্ছা হইল দুয়ার খুলিয়া একটু জল দিই মুখে, বেলোচ্, নিলিটারীর সলীন তা’ দেখ না। সাথের একটি চেলে—ভাই অথবা বামাই হইবে—নিজের গায়ে চোরখানার সবাক ঢাকা দিয়া, আপন পথে চলিয়া বায়—একবার শুধু কিরিয়া চাহিয়াছিল। মনে মনে মেয়েটির নাম রাখিয়াছি—শাখতী। চোর পাচটার দূর হইয়া সারাদিন সেই বামীদের শেষ নাই। সন্ধ্যায়ও দেখি সেই তাগাই যেন একটি বৃত্তের চারিদিকে ঘুরিতেছে বারে বারে। রাত্রি ১২-১-২ টায়ও শুনি গজর গাড়ীর ঘড়, ঘড়, শব্দ আর গাধার গলার ঘণ্টা। ভাবি—এরা কত জন, ভারতের জনসংখ্যার কতখানি রক্তমাংস, কত গুলো হাড়! এরা কারা? কি দোষ করিয়াছে—কার কাছে? এদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন জানেনা কি হিন্দুস্থান, কি পাকিস্তান—কি আফগানী, কি গোলামী, কে ষিরা, কে নেহের। বড় ছোরা নাথ শুনিয়াছে—তার বেদী নয়।

ভোরে ঘুম ভাঙিলে রাত্তার বের হই। দেখি সবাই তো ঘাব নাই, হিন্দুস্থানের হাড়মাংস অনেকটা হিন্দুস্থানেই পরিয়া বহিয়াছে—মরিয়া বহিয়াছে, হিন্দুস্থানের মাটিতেই মিশিয়া বাইতে চায়, কত বাপ বায়ের চক্ষের মনি, বৃকের

পাছ, কত পতি সোহাগিনী নতী, কত নারীর জীবন-
সর্বস্ব, কত ভাই, কত বোন। তারা বেন তোর করিগা
বলে—এ আমার ভয়ঙ্কর, এ আমার মা! কেন একে
ছাড়িয়া যাইবে? এই তো আমার দেশের মাটি কাছড়াইয়া
ধরিলাম। তারা প্রাণ দিয়া পেল। রক্তের উপরে।
পাশে কত মহা মেহিনাম—সবার গিছে, সবাই মীচে—
হাইতে বাহা পারিল না। এরূপ দৃশ্য কত দিন, কত মাস
দেখিতে পর?

সেপ্টেম্বর হইতে বেলোচ, রেভিমেন্ট বিহার নিল,
আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আদিল। তখন বারকিউ থাকা
সঙ্গে আমার ভাষার মধ্যে জাব করিগা। রক্তের বাহির
হইতে পলিলাম। কয়েকজন একত্র হইয়া—বে বা পারি
চলি দিয়া কিছু স্বর্ষ সংগ্রহ করিলাম। গ্রাও ট্রাক রোডের
আগে পাশে প্রয়োজনকত জল ও কুটির ব্যবস্থা করা গেল।
যে ঘরে হাইরা চাহিয়া চাহিয়া ৪-৭-১০ খানা করিগা কুটি
সংগ্রহ করিতাম। যাত্রা পথের পাশে পরিগা হাইতো
তাদের ঘুমে কত জুবে জল ঢালিয়া দিতাম। গরুর গাড়ীর
ভিতর, বাসের ভিতর—ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া কুটি ফেলিতাম।
তারা কি আনন্দে হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতেন। ঈর্ষ,
ক্রোধ, আশঙ্কা যাত্রা পথের পাশে এলাইয়া পরিত—তাদের
ধরাধরি করিগা। বাসে তুলিয়া দিতাম। কানে কানে
বলিয়া দিতাম—“ভূমি কিউ? আদি তোছাডা গ্রা হ”।
উদ্ধার থাকে কখন। হিন্দু শিখ কো উপর জুলুম না করনা।”
তারা ঘাড় নারিয়া সম্মতি জানাইতো। এ বার্তা কি সত্যি
তারা পারিতামে দিয়াছিল?

এইতো গেল পলাতকের কথা। শত শত বাস
বহরে (যে হুবিধা বাকলার চলে না—নবীমাতক বলিয়া)
লক্ষ লক্ষ লোক রোজ এগার ওপার হইতেছে। তিন
চার মাস পশ্চিম ভারতের প্রায় সব মেইল, এক্সপ্রেস ট্রেনই
বন্ধ ছিল। গাড়ী চলাচল, হাটবাজার, ব্যবসার কাগজ,
ডাকের চিঠি প্রভৃতি কিছুই ছিল না। শুধু আত্মপ্রশ্রাব
গাড়ী—জিন নাই, রাস নাই—হু হু করিয়া চলিতেছে।
গাড়ীর ভিতরে বসে যাত্রী, ছাদের উপর তার শিঙা—হুই-
পার্টেও অনেক—এমন কি দু’খানা কাষরার বাসের লোক

হানটু হুও নোকে ভক্তি। সি, টি, রোডের লম্বা বেল
লাইন—নিজের কেরার বাসিয়াই সব দেখিতাম। উপরের
যাত্রীরা দিনে পুরিতো রায়ে কাপিতো। ভিতরের
সবাই ভিতরেই বেখানে বসে দেখেবানেই বাওয়া খুশানে।
এমন কি মলমল ত্যাগ করতো। কি করিবে—এক ইকি
নড়িয়ার স্থান নাই। একদিনের পথ সাতদিনে শেষ
হইতো। কি বিধি, কি নোংরা—দুর্গন্ধ। নরককুণ্ড
আর কি! হু হইতে চাহিলে বেথা হাইতো এক জমাই-
বাধা মনমমরী চলিগা হাইতেছে। পরে রেলের পাশে
জলছয় ও কুটি বিতরণ সূত্র করা গেল। বেসকারী
Social service খু হইয়াছে। সরকারের Camp
বলিয়াছে—অনেক পরে। ঘরে ঘরে ১০ সেব ৪ সেব
আটা বেওয়া হইতো। টাওয়ার ভবন হইতে আটার
বস্তা তিনিয়া। ঘরের মধ্যে চটাশুট কুটি বানাইয়া
দিত আর চৌদা-গড়ীতে করিগা তাহা লাইনে নিগা বাওয়া
হইতো। কত হু পাটাইছি ভাতো!

এই তো গেল একদিক। আর একদিক সবচে
বেশি শিখিতে ইচ্ছা করে না। বেশিরাছি—১০ হাজার
১২ হাজার লোকের গাড়ী খাযানো হ’ল—খাযাইবার
প্রণালী অনেক আছে। নিরস্ত, অসহায়, ক্রোধ যাত্রীরা।
কম্বলমাঝে পৈত তাদের পাহারাঘার—কয়েকটি ঘায়ে
বন্ধু।—তারপর...বটীখানেকের মধ্যেই...। নীমানার
এখানে ওখানে পর পর এ ব্যাপার কম হয় নাই।
৪৬ বছরের মহাভূক্ত যে কোন একটি বগাধনে এত লোক
মরে নাই—বা হরিয়াছে দিনান্তে যাত্র ৬৪ মাসে।
কী ভয়ঙ্কর এদের চিকিৎসা, কর্মপ্রণালী। বাকালীমনে
এসব ব্যাপার ভাবিতে পার কি? শুধু অপরদর্শে বিদ্যাবী
বলে নির্ভিকারভাবে তুমি নোকে খু ক’রতে পার কি?
পার খু ক’রতে হাজার হাজার নারী ও শিশুকে? সে
এক নরক-কাণ্ড।

এবারে অনেকটা খাতক হইয়া গিয়াছি—অন্তে ভাবি
না। পশ্চিম বা সহিতে পারিয়াছে পূর্বকেও তাহা
সহিতে হইবে। পাণ্ডার লস হয় নাই, বাসলকেও
কাটিতে হইবে, একথা সত্য। তোমার মতবা ঠিক

নয়—হোক না হাওয়া, হোক না লাথ—পূর্ব বাঙ্গলার নরনারী কখনো অসহায় নয়, অস্ত্রহীন নয়। নীতি-গতভাবে তাদের বেশ ছাড়া উচিৎ নয়—কিন্তু বাস্তবতার হিসাবে তাদের বাসকৃষি ছাড়িয়ে হইলেও বিশাল ভারত তাদের অস্ত্র হাত বাড়াইয়াই থাকিবে। পূর্ববাঙ্গলাকে কে তুলিবে, কে তুচ্ছ করিবে? পূর্ব বাঙ্গলার লোকের অস্ত্রের মিলিবে না কোন গ্রন্থে? সহায় হইবে না কোন নেতা—কোন নীতি? পূর্ববাঙ্গলার ভাগ, সংগ্রাম, দুঃখভোগ কার চাইতে কম? কোথায় প্রতাপ এ বিরাট মহাভারতের? বিশ্বাস এবং নৈতিক শক্তি যদি থাকে—যার খাইয়া পাক্সব হয়ে নাই—সমক খাইয়া বাঙ্গলাও মরিবে না। তবে স্বাধীনতার স্বাদ সিতে হইবে আরও কিছুটা।

সিবিদ্যা—“লক্ষ লক্ষ ঘরে জাগ্রত লাগিয়াছে—” তা সত্য। লক্ষ লক্ষ ঘরা ভস জাগিতে হইবে। কে চলিবে? বিশ্বকবি নাই, মহাত্মা নাই। তাতে দুঃখ করিয়া কি হইবে তাই? এসো যে বতটা পারি চলিয়া যাই। “নির্ভরের স্বপ্নভঙ্গ” বার বার আবৃত্তি করি। তুমিও করিও।

সিবিদ্যা—এই পৃথিবী ভালও নয় মন্দও নয়—যম্মার স্থান। তা' যম্মার জিনিষ বলিলেই নিরাপদ ভাবিয়াছ, ভোর করিয়া মত প্রকাশ করার সাহস নেই কেন? আমি বলিতেছি সমস্ত দুনিয়া অভ্যস্ত বিগড়াইয়া গিয়াছে, ইহা সামান্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে, প্রেম এবং বিশ্বাসের অভাবে অশগুল স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে, ইহাকে নতুন করিয়া গড়িতে হইবে। বাপু নির্দেশ তো লেগানেই

‘দ্বন্দ্ব’ পরিবর্তন—দুগ্ন দুগ্ন খরিয়া মহান ভারতবর্ষ এই পথে কুলাই বলিয়া গিয়াছে, ইহাই আমাদের প্রকৃত জীবন মর্শন।

“বিরাট সামাজিক প্রেরণ” ভাবনার ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরিলে কেন? আরে ভাই, সমাজটাকে হাওয়ার উপর ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। নিঃস্বের হাতে তুলিয়া নিতে হইবে—গড়িয়া নিতে হইবে। যদিও খুব দেবী হইয়া গিয়াছে তবুও বাস্তব চিত্তিতে ইহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আইডিয়ালিজম সর্বদায়ের অল্প কয়েক জনের অস্ত্র। গোষ্ঠীর উপর ইহাকে চাপাইয়া দেওয়া যায় না। তাহা হইলে ইহা ব্যর্থ হইবে। জীবনের বাস্তবতাকে কে অবিশ্বাস করিতে পারে? যাহা ঘটতেছে, তাহার উপর কহোর কর্তব্য আছে? একটু ব্যাপক দৃষ্টি নিতে পারিলেই বিরাট প্রেরণ দ্বারা আড়ালে বর্ধা উত্তরের অন্ধুর দেখিতে পাউবে। ভীত হইয়াছ—“মৌলিক নৈতিক প্রেরণ ভিত্তি।” আমি বলিতেছি বতকণ পর্যন্ত না নয় এবং নারী—জীবনের বাস্তবতা—তাহার রূপ এবং প্রকৃতি বাহাই হটক না কেন—মাহসের সহিত সম্মুখীন না হয় বতকণ পর্যন্ত এই সমস্ত সামাজিক এবং নৈতিক প্রেরণ আরও ভীষণভাবে চলিতে থাকিবে। এই প্রেরণ সম্মুখীন হইতে তোমাকে, আমাকে, আমাদিগকে লুপনরূপে আগাইয়া যাইতে হইবে। জীবনে ঘটনার সমাবেশ খুবই অল্প। আমাদিগকে কান করিতে হইবে। খোলাখুলিভাবে বলিতেছি যে ভারতের আত্মার পূর্ণজীবনের অস্ত্র তিনটুকু ঝাড়া যদি ধুলিস্ত্রিতও হয়—আমি মনে কিছু করিব না।

—

“বিপ্লবী”

শ্রীমতী সুভদ্রা চৌধুরী

পায়ে চলার সৰু এককালি মাটির রাস্তা। মাঠের উপর দিয়ে বরাবর বাণ-বনের ভিতর চুকছে। এ পথ দিয়ে কারো বাওড়ারই সন্ধান পড়ে না বিশেষ। পাড়ার লোকেরা ত্রিষ্টক্‌ বোর্ডের বাধান নতুন সড়ক দিয়েই বাতায়ত করে। এতদিন তো তাদের বনে ভ্রমণে নিষেধের পথ বুঁতে তৈরী করেই নিতে হয়েছে; আজ যদি বা তারা তৈরী এমন একটা রাস্তা পার তার অপব্যবহার কেন তারা এমন ভাবে করে? ঘন নিবিড় বাণবন পার হয়েই হুক হয়েছে কেলে পাড়া, মুচিপাড়া, মেঘর পাড়া, চুলিপাড়া। বেশ বানিকীয়া রাস্তা নিয়ে ওদের পাড়াটা; বহু ঘরের বসতি। এ পাড়ার ছেলেদের কালেছক্রে কোনদিন হাতো মুচিপাড়ার বাওড়ার দরকার পড়ে, নয়তো এ বিরাট বাণবন পার হয়ে সড়কটির কেউ যেতে চায় না। এই বাণবন পাড়ার শিশু ও বৃদ্ধদের মনে এক আভ্যন্তরীণ স্মৃতি করে বছরের পর বছর আরো ঘন নিবিড় হয়ে বেড়ে উঠেছে। দুর্ভাগ্য নাতিকে ঠাকুরনা সামলাতে না পারলেই বাণবনের দিকে আত্মল নির্দেশ করে বলেন “ঐ কুত আছে। ছুছুছু আসছে ধরে নিতে।” গুরুত্ব ছেলেরা দিনের আলোর তর পাথ না; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ঐ দিকে চেয়ে চোখ বুজে থাকে। ঠাকুরনাও শিউরে উঠেন ক’বছর আগেকার কোন ঘটনা মনে করে, হাতের মালাটা খুব তাড়াতাড়ি ঘূড়ে চলে। ঘোরে ঘোরে উল্লেখ করেন “রান রান।”

১২০০ সালের ঘটনা। দেশে দেশে কত বছর কেটে গেছে। তবু বেন মনে হয় সেই পৈনিকার কথা। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সারা দেশ স্বেচ্ছায় অসামান্য আন্দোলনে জেগে উঠেছে। ১২০০ সালে ৬ই এপ্রিল মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক ভাণ্ডারী অভিযান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম অধিকারের কল্পনা কাখে পরিণত

করল। বিমল সেন ও ছিল সেই বিপ্লবী তরুণ নেতাদের মধ্যে একজন। সূর্য সেনের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে চট্টগ্রামের যুব সমাজের সঙ্গে সঙ্গে বিমলও অগ্রিমধ্যে নীকা গ্রহণ করে।

বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে বিমল। বাপ ছিলেন লামান্ত্র এক স্থল মালীক। পাতিভা তার হতই থাক না কেন, স্থল শিক্করের মর্মে বোঝে ক’মানে? তাই বিভাবানের বহলে তাগা বা পান তা’তে তাঁদের চিরযাত্রিতা যুব আর হয় না। বিমলের স্বপ্নের উজ্জ্বল হৃদয় দীপ্ত চেহারাও এত দারিত্র্যে ও তার কত স্থানের ও আনন্দের নীড় রচনা করেছিলেন। কত সময় বাপ ছেলেকে আশ্রয় করে থাকে বলতেন “জান একবেলা বেলেও বিমলকে মাল্লবের মত মাল্লব হয়ে তুলব। সে এমন আগুণ ছেলে তৈরী হবে যে সবাইই তার সঙ্গে যাবে। আমাদের সব ছাত্রের চরম সার্বিকতা হবে সেদিনই।” কোথার পূর্ণ হলো তাঁর সেই আশা? মাল্লব কত স্থানের বাসা কল্পনা করে, কিন্তু সব বাসস্থান করার মালিক তিনি সেই বিধবা আড়ালে হাসেন।

ঘন বছর বয়সের সময় বিমল পিতৃহীন হয়ে কাকারের দলদারে মার সঙ্গে চলে এসে। সে সময় মার হাত ধরে তার বাবা বলেছিলেন “বিমল রইল; আর বাই হোক সে অমায়িক কখনো হবে না। মুক্ত বাণীনতার মধ্যে তাকে বাড়তে দিও। বিদেশী সরকারের পেতাব ও উচ্চপদের আসা তাকে দিয়ে কখনো কনুতে যেয়ো না।” বাবার শেষ কথাগুলি বিমলের ভাল করেই মনে ছিল। খুজুত ডাইনের এক সঙ্গে বিমলও পড়াশোনা করে চলল। পড়াশোনার সে ভাল ছেলে। কৃতি নিয়ে সব পরীক্ষা সে পাস করে গেল। তার উচ্চ শিক্ষার মন্ত কোন বেগই কাউকে পেতে হয় নাই কোনদিন। কিন্তু তাকে নিয়ে হুজিল বাধল অবৈধ আন্দোলনের সময়। কাকারা অসন্তুষ্ট হলেন।

“যেখাবী এমন একটা ছেলে; সরকারী কত বড় চাকরী সে পেতে পারে তা না করে হুজুর মাথার

ডবিত্রাটা এমন ভাবে নষ্ট করতে বসেছে।” বিমলের মাঝে এসে অনেকবার জানিয়ে গান “বৌয়ান বিমলের দিকে কঁড়া নম্র নার। যে সংবাদ তার বিকছে আনছে গতিক বড় হুবিধের নর।” বিমলের মা মুখে কিছু বলেন না। মাথা পেতে সবার সব অভিযোগ যেনে বেন্ন। বাড়ী এলে বিমলকে বলেন “হায়ে বিমল, তোরা নাকি কি সব বিদ্যবী বল করেছিস্ সাক্ষনতিকে ধ্বংস করার মন্ত। অস্তার কিছু নেই তো এর মধ্যে?” বিমল পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, আন্তে আন্তে জিজ্ঞাস করে “তোমার কোন আপত্তি নেই তো?”—মা কি উত্তর দিতে গিয়েই যেন গড়ে যায় অস্থির শয্যার দ্বারীর সেই দেব অহরোধ “বিমলকে মুক্ত স্বাধীনতার মধ্যে বাড়তে দিও।” আন্তে আন্তে মাথা নেড়ে ছোট্ট অতট দৃষ্টিতে দেন “না”। বিমল ও উৎসাহের আবেগে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠে, “আমরা কোন অস্ত্রা করছি না মা, নিজেদের বেশ বিদেশীর শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে চাই। এতে অস্ত্রা কোথায়?” তার আর উত্তর দেবার কিছুই থাকে না। বোঝেন তিনি নই, এই বিদ্যবীদের বিপদ যে কতবড় তাও তার অজানা নেই। ছেলেকে বাধা দিতে তিনি পারেন না, কিন্তু দাড়াব্রণের অস্ত্রতম অস্ত্রহলে যে স্নেহের কষ্ট তার বয়ে চলেছে তাকে তিনি বোধ করেন কি করে? মাথের মন বৃষ্টিতে কি সব সময় চায়? অজানা আশঙ্কার তার বুক দুক দুক করতে থাকে; কিন্তু বাধা দেবার শক্তি তার কোথায়? মায়ের অস্তর দিয়ে তিনি সব উপলব্ধি করবেন, নিজের এতবড় কৃত্তিকেও বুকচোপে তার নম্র করে নিতে হবে।

বাইশ বছরের ছেলে বিমল কলেজের পড়া শেষ করতে না করতেই ত্রিশ সালের আন্দোলন শুরু হয়। সব আকর্ষণকে পেছনে রেখে বিমলও জাপিয়ে পড়ল আন্দোলনে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাণার সূত্রের কাজে বিমলও যোগ দিল সেই বিদ্যবীরদের সঙ্গে। কতবড় বিপদ ও কষ্টকে বরণ করে নিতে হয় এই পথে। থরা যদি পড়ে কি শোচনীয় পরিস্থিতি হবে। তার কথা যেন করে

বাধায় তার নুকাটা টনটন করতে থাকে। কত আশা ও ভরসা, নিয়ে মা তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন; কিন্তু এ দুর্গলভা তার কেটে যায় দেশ উদ্ধারের স্বপ্নের কাছে। ভাবে এমন করে কত মাই তো ছেড়ে দিয়েছে তাদের সম্মানকে। পরানীন দেশের এই তো সব চেয়ে বড় অভিশাপ।

পুলিশের লোকেরা বিদ্যবীরের বিকছে অভিযান শুরু করল। বিদ্যবীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিকে সরে পড়ল। পুলিশ-ভীতি তাদের নেই, কিন্তু পুলিশের কাছে থরা তারা দিতে চায় না। তাদের গুলি পরিমিতগলি ও কয়েকের তালিকা কিছুতেই বাইরে প্রকাশ করা চলে না। তাই তারা চায় আত্মগোপন করে থাকতে। বিমলও আর এক হলের লস্ক পাবত্যা অকলে অকলে আত্মগোপন করে চলে। তাদের মধ্যে ঠিক হলো কেউ যদি চলে অকদ হয়ে যায় অস্বস্থতার নরুণ তাকে লকীরা গুলি করে মেরে রেখে থাকে, তবু পুলিশের হাতে জীবন্ত অবস্থায় থরা থেকে না।

দু’তিন মাস পার হয়ে গেল বিমলের কোন খবর নেই। পাড়া প্রতিবেশীরা রোজই একবার করে এসে বিমলের মাঝে কেউ বা নিয়ে যায় মহাহুত্বিত, কেউ বা থরা দাখিয়া। মৌখিক মহাহুত্বিত্তে অস্ত্রের ছোখা এতটুকুও নেই। তাও নম্র হয়, অলভ হয়ে উঠল সেদিনই যেদিন বিমলের বন্ধু ললিতের মা মার্ক করে এসে বলে- ছিলেন “হ্যাঁ ছেলে পেটে ধরেছি আমি বটে। ললিত ও তো। সেই বিদ্যবী বলে যোগ দিয়েছিল। আমার চোখের মল দেখে ছেলে আর ঠিক বাবুতে পারল না। আমার পায়ে ধরে কমা চেয়ে, সেদিন থেকেই এই পথ ছাড়ল। কর্তার পর্ষদ এ নিয়ে তাকে কিছু বলতে হলো না। আর এলব ছেলে না পেটের শক্ত”। বেদনার আর বুক ভেঙে আসে, ‘কার সঙ্গে কার তুলনা।’ যে বাপ পুলিশের লোককে ঘূষ দিয়ে হাতে পায়ে ধরে ছেলেকে রাতব্যোষ থেকে মুক্ত করে এনেছেন তার সঙ্গে কি বিমলের তুলনা চলে? বিমল নিজীক লভ্যচারী, যেজ্ঞাৎ সে বরণ করে নিয়েছে সব হুঃখকষ্ট। নহম স্বাভাবিক জীবনই তো

সবার কাম্য, কে চাষ জীবনে বছর পথ বেছে নিতে ?

মাস তিন পর কৃৎসকের ঘন অন্ধকারে গা ঢেকে রাত নটার সময় বিমল এসে হাজির। বিমলকে দেখেই তার মা বলে উঠলেন “বিমল তুমি ? আমি তোমার অপেক্ষা করে থাকি তোমার জন্য। জানি রাত্রির অন্ধকারে তুমি এসে আমার সঙ্গে দেখা করে ঘাবি নিশ্বর। কোথাও একটু শব্দ হলেই কান খাড়া করে রাখি তুমি এলি কিনা ভেবে”। বিমল মার পায়ে হাত রেখে প্রণাম করে।

বল—“আমার সব কালের মতো তুমি ও যে একজন, তোমাকে কি ভুলতে পারি না ? একসিকে আমার বেশ আরেক সিকে তুমি, কোনটাই যে আমি ছাড়তে পারি না। ভাত আছে ? তিনদিন খাইনি”। মা ব্যস্ত হয়ে বলেন “বোস তুমি আনছি”। সবার খাওয়ার পর ঠাণ্ডা কড়কড়া ঘনিকটা ভাত ও ভালের তলানি একটুখানি পড়েছিল তাই নিয়ে এলেন। “এ কি বেতে পারবি রে ?” “জান না মা এই আমার কাছে অদৃত খাদ্য”।

পরম যত্নের সঙ্গে বিমল ভাত নাথতে আঁখি করল তাই দেখে মা চোখের জল আর সামলাতে পারলেন না। “হায়রে এই তো বিশ্বাসের জীবন। বিত্তি নেই, আশ্রয় নেই, সুখায় অন্ন পথও কোটে না। হুহুরের মত ঘুরে বেড়ায় স্থানে স্থানে, কেউ আশ্রয় দিতেও ভরসা পায় না। রান্না-ছোলা, উদ্ভাসের মত তারা মেনকে ভালবাসে এই তাদের মত বড় অপরাধ। বিমল সঙ্গে মাত্র দু’গ্রাস ভাত খেয়েছে অমনি খুঁ, খুঁ, শব্দ শুনে উঠে দাঁড়াল “মা আমি চলাম।

সময় হলো না সব গেরে ধাবার ; আর একদিন কোন হুবোপে ঠিক এই সময় তোমার সঙ্গে আবার দেখা করে যাব। আমি এখন এদিকেই আছি।” এই কথা বলে বিমল তার অভিভূত মাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বিরাটী দুয়ার দিয়ে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ততক্ষণে খানার দারোগাবাবু চারজন পুলিশসহ হাজির হয়ে বিমলের কাকাকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন। দুহুর্ডে মার কর্তব্য মুক্তি দিয়ে এল, চট করে ভাতের খাদ্য পরিবেশ, আনো নিবিঘে নিম্নের বিছানায়

* শুয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর বিমলের কাকার কর্তব্য

কঠোর কর্তব্যর কাশে এল “বৌঠান সেই হতভাগা কি এই বাতীতে আবার ঢুকছে ?” বিমলের মা বরষা খুলে দিয়ে দ্বির কঠোর বলেন “আমার বলার অপেক্ষা কেন কর। দারোগাবাবুকে বল বিমলকে পেলে খুঁজে নিয়ে যেতে।” এই দ্বির কর্তব্যের ভক্ত দারোগাবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। অপ্রস্তুত হয়ে বলেন “আমরা কি কর্তব্য বশুণ পয়ের চাকর। অনিচ্ছায় অনেক কাম করতে হয়, বিমলের মা উত্তর দিলেন “আর বাই কর্তব্য বিমলের উদ্দেশ্যে এ বাতীর লোকদের আর উৎসাহ করতে আসবেন না, আবার ছেলেকে আমি জানি এ বাতীরে তাকে কোনদিন কোনমতেই পাবেন না”। আসামীকে পাওয়া গেল না। কিন্তু দারোগাবাবুর চোখে আঁধা নতুন করে বিমলের মার বখাড়া ধরা পড়ল। দারোগাবাবু পুলিশ নিয়ে গিয়ে গেলেন।

দু’দিন পর, মেলে পাকার কৈবর্ত মণিক ঘাটের পথে মার সঙ্গে দেখা করে বিমলের একটা চিঠি মিল। বাট বছরের বুড়ো কৈবর্ত মণিক, ছোটবেলা থেকে বাবুদের পাকার বাছ নিয়ে আসা তার একচেটিয়া কাজ ছিল তাই সে সকলের পরিচিত। এই নতুন পথে গা দিয়ে বিমলের সঙ্গে কৈবর্ত মণিকের আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। কত চিঠি কত খবর এই বুড়ো বাছবটীর মাছের হুড়ির সঙ্গে চালান গিয়েছে। বিমল লিখেছে “মা সেদিন তোমার কাছে থেকে রাত্রির অন্ধকারে এসে এ কথাই কেবল মনে হয়েছে যে পেশাবীনে বেশে, বেশে ভালবাসার এই তো পুরণায়। রাত্রির অন্ধকারে আমাদের গা ঢাকা দিয়ে চলতে হয়। তেহ সঙ্গা মায়া কোন আকর্ষণেই আমাদের ধরা দেবার উপায় নেই। বাবীনে ভারতের কপট, আমাদের সব আকর্ষণকে পেছনে ফেলে এই পথে নিয়ে চলেছে। কে জানে কবে আমাদের এই বাজার শেষ হবে। কালের তীর্থে বড় যাত্রা, সময় পেলে নিশ্বর জোয়ার সঙ্গে দেখা করব এমন এক রাত্রির অন্ধকারে। শুধু এই আইনধীন কর প্রতিটি রক্তকণা দিয়ে আমরা যে সাধনা করে চলেছি তা বেন সার্থক হয়। সে দেখার হুবোপ আমরা না পেলেও অন্ন ভবিষ্যতে বাবীনে ভারতে বেশের প্রতিটি আইন

নাগরিকের মধ্যে আমরা আবার আগে উঠব। কৈবর্ত
মাসিক তত্ত্বক্ষেপে নাছ বিক্রি করতে সামনের বাড়ীতে
গিছে খুঁড়িটা নামিয়েছে। চিঠি পড়া শেষ হলে মার দুই
চোখ জলে ভরে উঠল “এরে তোরা কি বুঝি মায়ের
মন? সব বিপদ কেনেও তো যা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত
আশা করে। মার অহুতি মার ঘেঁষে সে যে বড় অবস্থা
বে। এখানে কোন খুঁকি বাটে না, তর্ক বাটে না, কোন
উপদেশ মানে না, তাই তাসা এত দুঃখ পায়। ওয়া
কেবল জানে বুক ভরা ভালবাসা দিয়ে আকড়ে ধরে
রাখতে আর বুক ঘাটা কান্না কাঁদতে”।

সারা গ্রামে রটে গেছে; ক’জন বিদ্রোহী ছেলের সঙ্গে
বিমলও এই ঝগ বনে এসে ঘোমা তৈরী এবং আরো
নানা কার্যকর্ম কি সব করে। কৈবর্ত মাসিক এসে ববার
দিল “মাঠান দায়াবাবুরা তো ঝগ বনে আইত্যা কাম কাছ
করতেছে কিন্তু পুলিশে সে ববার পাইছে ওন্লাব আজ
ঝগবন ঘেরাও কইরা লাইব, এখন উপায়? বিমলের
মা ব্যস্ত হয়ে বলেন “শিশু শ্রীর বিমলকে ববার হাও নরভো
তাদের সব নষ্ট হয়ে যাবে। কৈবর্ত মাসিক বর
“মাঠান প্রাণভা দিয়া দায়াবাবুর ইষ্ট করমু। নিশ্চিন্ত
বাইবেন”। সারাটা দিন মার ছটফট করে কাটল। যে
ঝগবনে দিনের বেলায় বেড়তেও মাছবে ভয় পায়, সেই
বনে এমনি ছয়ছাড়া বেপরোয়া গােটা ছেলে কি গভীর
মনযোগের সঙ্গে তাদের সাধনা নিয়ে ব্যস্ত তবু শান্তি নাই
শোয়াতি নাই; পলাতক আশাবীর মত স্থানে স্থানে
তাদের আশ্রয় খুঁজে নিতে হচ্ছে। মার ইচ্ছা করতে
লাগল একুনি ছুটে সেই ঝগবনে গিয়ে দেখে আসেন এই
বেপরোয়া ছেলের সাধনাগার। কি দুর্ভাগ্য আকর্ষণে
তারা সব ফেলে ছুটে চলেছে। সন্ধ্যার কিছুপরে দল
পুলিশবাহিনী এসে ঝগবন ঘিরে কেন্দ্র। বিমল সব-
কিছুকেই রক্ষা করতে গেরেছিল, পায়ল না কেবল
নিজে। সারা ঝগবন খুঁজে পুলিশ পেল দু’তিনটা
ডাকাডাকা জিনিষের সঙ্গে বিমলের প্রাণহীন দেহ। বিমলের
দেহ। গ্রামের লোকের ভীড় ঝগবনে আর ধরে না।
বিমলের বন্ধু বাচ্চব মুচিপাড়া, মেঘর পাড়া, হোলে পাড়ার

সব ছেলেরা এসে জড় হয়েচে সেখানে। ইদানীং বিদ্রোহী
বিমলকে এড়িয়ে বেত অনেকেই; কিন্তু আজ সবদমস্তার
সমাধান করে তত্ত্বার পরপায়ে গিয়ে বিমল সবাইকে টেনে
এনেছে এখানে। সবাই আজ বেগতে এসেছে তাদের
আত্মীয়দের ছোটবেলার খেলার সাথী সেই বিমলকে।

দিন দায় কেটে; দেখতে দেখতে দেশের উপর
ঘিরে কত দুর্ভোগ কত ঘটনা ঘটে গেল। হুড় গেল।
বিয়ার্লিং সালের আন্দোলন ডেভার্লিংয়ের হুঁড়িক, কত
লোক না খেতে পেয়ে মরল, কত লোকের কত রক্তের
হুঁড়িয়ায় অস্ত রইল না। বিমলের মায়ের দিন দেশের
আগে স্বপ্নমন পুস্তহীন দুর্ভাগা মায়ের মতই কেটে গেল।
ক্রিশ্চিয়ান, ওয়াভেল পরিকল্পনা, বগবিথও ভারত,
সমাগোচনার দেশের একগ্রাম থেকে আরেক গ্রাম
স্থগ্নিত হয়ে উঠল। তারপর একদিন ১৪ই আগষ্ট
উগার প্রথম আলোকে স্বাধীনতার নতুন যুগের উদ্বোধন
হলো। প্রতিটি গ্রামের আনাচে কানাচে এই নতুন
স্বাধীন যুগের, রম্মি বিকীর্ণ হয়ে পড়ল। বিমলের
মায়ের সেই ঘন নিবিড় অন্ধকার ঝগবনে স্বাধীন যুগের
আলো পড়ে তার ঐ কিরিয়ে দিল। এই দুর্ভটনার পরে
বহু বছর সেই ঝগবনের পাশ ঘিরে কেউ আর যেতে
পারেনি। মায়ের বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের অপসৃত্যর একটা
কাল্মসিক ভিত্তি তাদের সারাটা মন জুড়ে থাকত।
বিমলের বন্ধুবান্ধবের ভীতি ছিল না, কিন্তু বন্ধুর
শোচনীয় মৃত্যু এতই শীঘ্রিটে করে তুলেছিল যে ঐ
ঝগবনের স্মৃতিটা এড়িয়ে যেতো। বিমলের মৃত্যু
কৈবর্ত মাসিকের মনে এতই লেগেছিল যে বাচ্চের
পাড়াই পারতপক্ষে নাছ বিক্রি করতে এগম দিয়ে
আসতে চাইত না। আজ সেই ঝগবন কলকোলাহলে
স্থগ্নিত হয়ে উঠল। একটা ঝগের সঙ্গে বেধে
দিল জাতীয় পতাকা। হুড়টুকু, সারা দায় মানিকটা
হারগার, বস্ত্র ফুলের দালো গেথে লাগিয়ে দিল।
গভের আঠারে বছরের ব্যবধানে বিমলের মৃত্যুস্থানের
কোন চিহ্নই ছিল না। বড় বড় দাল আগাছায়
সে স্থান জঘলে পরিণত হয়েছিল। আজ তার

চাঞ্চলিক পরিষ্কার করে তিল সব ছেলেচোঁ মিলে। নদীও
যদি তপনে ধূপ ধনার আরো পবিত্র করে তুলে সে
স্বামীটাকে।

হঠাৎ সবাই চমকে উঠল বিমলের মার সহজ
স্বাভাবিক গলা শুনে। “বিমল তুমি কিংবদন্তি। তুমি
বে বলেছিলি শেখ হাখীন হলে আবার আসবি এই
দেশের নাসীতে।” বুঝতে কেউ পাল্ না কিছুই :
এলো মেলা বেস, বাধা একরাশ পাকা চুলের জটা,
বার্ছকোর জবা সে নার শাবা অন্ধ আধিপত্য ছুক করে

থিয়েছে। নবার চোখে জল এলো নিকর পাগল হয়ে
শেচ্ছেন ভেবে। কৈবর্ত যাদিক এগিয়ে এসে বল “নাটান
থরে চলুন। বিমল বাবা দেশের লাইগা মরছেন।
সেবনোকে জান স্থান হইছে।” কে বলেছে বিমল
মরেছে? সে জো মরে নাই কৈবর্ত যাদিক। দেশের
প্রতিটি স্বাধীন নাগরিকের মধ্যে আজ স্বরাজের জয়ধ্বনি
সে ভেগে উঠেছে। এদের মধ্যেই আজ আমার ছেলে
মুঠ হয়ে উঠেছে, এদের মধ্যেই আজ আমি আমার
হাজার ছেলেতে খুঁজে পেয়েছি।

রসতত্ত্ব

ঐবিলম্বক্কো ঘোষ

কবির হৃদয় শতদল যখন একটি মধুর অহুতবে ও
উপলব্ধিতে বিকশিত হইয়া উঠে, তখন সেই উপলব্ধি
আত্মোন্মাদনার আসে ভাষা, আসে ছন্দ, আসে শব্দ-
সঙ্কলন, আসে ছন্দের বিস্তার, আসে রসোন্মাদনা, অর্থাৎ
তাহারই পুঙ্খকরণে আত্মোৎপত্তি কবিরা কবির হৃদয়বাসিনী
সেই অতীতকে বর্তমানে, বর্তমানকে অতীতে ও
অতীত-বর্তমানকে ভবিষ্যতে, অস্তরকে বাহিরে এবং
বাহিরকে অস্তরে মূলপং গ্রহণ করিয়া একটি আনন্দের
ঐক্যের মধ্যে তাহাদের সকলকে ব্যাধ করিয়া ফেলেন।
কুপর্ভর অলরাশি যখন নিভের মধ্যে নিভেকে সমাধুত্বপে
ধারণ করিয়া বাহিরে পারে না, তখন উহা প্রত্যক্ষরাশি
বিদীর্ণ করিয়া, সমতলভূমিকে আপন পতিতভূমিতে
হাতিবান্দ করিয়া নিভের পথ নিভে প্রস্তুত করিয়া লয়।
সে যেমন কোন সাংসারের অপেক্ষা করে না, সেইরূপ
রসপ্রবাহিনী চিত্তা তার আপন পতিপথকে আপন গঠন
করিয়া নইয়া রস-নিকরিত্বপূর্ণে পরিণত হয়, আর সেই রস
পান করিয়া রসপিপাসা বিহীনভাবে তার বেহেশনকে বিদ্য ও
পবিত্র করিয়া তুলেন। কবির অস্তরে যে অনির্জন্য
ভাব আছে তাহা গীতার চিন্তার গোপন গুহায় লুপ্তাভিত

ব্যাক্ষা কত শত মনস্তত্ত্ব গড়িয়া তুলে এবং লেগনিকে
তপ-রস-গন্ধে, ভাষা-শব্দ-ছন্দে ব্যাক্যভূমিতে সর্বদা
নিরন্তর করিয়া থাকে।

অনর কবি কালিদাস তাঁহার কাব্যে যে রসের
নিকরিত্বপ্রাণ প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন রসপিপাসাপূর্ণ
বহুসাধাবি তাহা আকর্ষণ পান করিয়াও নিশ্চেষ্ট করিতে
পারিতেছেন না। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাঁহার
মেঘনাদ বধ কাব্যে পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে যে রসের
পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন তাহাও চিরন্তনে অক্ষুণ্ণ।
কবির ভারতচন্দ্রও তাঁহার অন্নদামঙ্গল ও বিভাহৃদয়ের
পাঠক-পাঠিকাগণকে পরিপূর্ণভাবে রসান্বাদন করাইয়া-
ছেন। রসই সকল রসের মূলধার। এই রস হইতে সব-
কিছুই উৎপত্তি ও ইহাতেই সব-কিছুই নিরুত্তি।

রস অর্থাৎ রসেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু; কটু, তিক্ত, কষাণ,
আর, মধুর এই ছয় প্রকার আশ্বাস; কাব্য শাস্ত্রের সার
ও সুসীকৃত আশ্বাস—সুখ, বীর, কল, অকৃত, হাত;
জ্ঞান, বীতম, রৌত্র, শাক, এই নয় প্রকার—কাহারও
কাহারও হতে বাৎসল্যও একটি রস, সুতরাং উক্ত
মতানুসারে কাব্যরস নয় প্রকার; নাট্যশাস্ত্রে শাস্ত্রমতে—
কল্পের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আটটি রসের উল্লেখ আছে;
দাম্ভ্যাবি, কণ, কুরুভাষ্য, ব্রব ব্রবা, বল, দুর্বল,
অহুতাপ, বিষ, পারদ, অতিপ্রাণ, ভোগ্যবস্তু, বেদন্য দ্যুত

বিশেষ। ইহা সর্বদা সর্বস্বরূপে বিচরণ করে বলিয়া রস নামে অভিহিত। কৃত্তব্যা. অষ্টায়াগা সত্যকল্পে পরিপাকপ্রাপ্ত হইলে ইহার সারাসংকে রস বলা হইয়া থাকে। রসের বিকারেই দেহের বিকার ঘটিল। থাকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রসের অল্পভূতি বেহে প্রতিফলিত হইলে নানাপ্রকার উৎসাহ-উত্তেজনায় আবর্তিত হয়; যথা :—ভ্রুভবী, নববধূর-সদাশ্রয়, ক্রোধ, ভয়, মাতার শিশুর প্রতি বাৎসল্য ইত্যাদি। এখন নিজে রসটি রস লব্ধে উদাহরণ দ্বারা স্বধামালা আলোচনা করাই উক্ত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পূর্বর রস—ইহা আদি রস বলিয়া কথিত। শ্রী-পুরুষের পরম্পর অমুরাগ হইতে এই রসের উৎপত্তি। অমুরাগ ইহাতে সর্বদা স্থায়ী থাকে। উত্তম প্রকৃতির নায়ক নায়িকা এই রসের আশ্রয়স্থল, এবং ইহা স্বীকৃতবে প্রবল অমুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। অলম্ব্য-মাত্রে ইহা ক্রামবর্ণ এবং কিছুই ইহার একমাত্র প্রতীক। বীর, কল্লণ, মৌল, ভয়ানক, বীভৎস রস ইহার বিপক্ষে। কবির ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিভাঙ্গবধে ইহার সুস্বাদু ভূতি উদাহরণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দুই-একটি নিজে উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১)

উৎসিল কামরঙ্গ জলধি।
কতমত মুখ নাহি অবধি।
ঘন ঘন তুচ্ছ-কামান টানে।
অর অর করে কটাক্ষ বানে।
ধর ধর ধনি আবেশে কাঁপে।
অধীরা হইয়া অধর চাপে।
ভর ভর করে অধর ঘায়।
কোথায় বসন ভূষণ হায়।
তহু সোমাক্ষিত শীংকার মুখে।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপবে মুখে।
অটল আছিল টলিল রসে।
অংশ হইয়া পড়ে অঙ্গনে।

পড়িল দেখিয়া উঠে নাপর।
আহা! মরি বলি চুপে অধর।
অবশ ধোয়ে মুখমুখ বেয়ে।
উৎসিল অঙ্গনে চেতন গেয়ে।
অর অর দুই বীরের বাহ।
রতি লয়ে রতিপতি পালায়। (বিভাঙ্গবধ)

(২)

হাসিয়া কহেন বেণী হইলা সখান।
হর গৌরী এক হৈ ইথে নাহি আন।
দুইজনে সখাস বধনে রসরঞ্জে।
হর গৌরী এক হইলা দুই অর্ধঅঙ্গে। (অন্নদামঙ্গল)

(৩)

কপাল লোচন আবেই আবে
মিলন হইল বড়ই সাখে।
দুই ভাগ অরি এক অবাখে।
হইল প্রণয় করি যে। (অন্নদামঙ্গল)

(৪)

চৈত্র মধুমাস বসন্ত প্রকাশ
তরুলা হৃদেভিঃ।
কোতিল হৃদ্যারে স্রবর বৃদ্ধারে
গৌরভে বিশ্ব মোহিত।
হৃদবনে গিয়া রমণী লইয়া
বিহরে নল কুবর।
রমণী লব্ধেতে বিহরে লব্ধেতে
আর হত সহচর। (অন্নদামঙ্গল)

(৫)

মত্ত হইল হুবহু অগতে না লহে ব্যাক
আরঙিলা মননের দাপ।
না ভাঙে নিত্যর ঘোর কামরসে হয়ে ভোর
অশ্রু বোঝে বাড়ে অমুরাগ।

বিবসে বজ্রনীভান চুখ-আলিনন মান
বহু বহু বিবিধ বহন ।
নিভাবেশে হুখ বহু জাগ্রতে বি. হুখ তত
বহু গোকে যে জানে শঙ্কান । (বিভাবক্ষর)

(৩)

তুই হইল কাতকাতা গনিয়া বিনয় ।
মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ হয় ।
ভাঙ্গিল কোমল দুঁহে দাঙিল অনয়ে ।
বহনী হইল শাক অনক এদয়ে ।
প্রভাতে হীরার ঘরে গোপন কুমার ।
এইরূপ বহদিন করয়ে বিহার । (বিভাবক্ষর)

বীর রস—লতা, ধর্ম, মান, বা সুকাহি উপলক্ষে
উৎসাহ হইতেই এই রসের উদ্ভব । উৎসাহজনক কার্যে
উপযোগী হওয়াই ইহার প্রধান লক্ষ্য ; ইহা যেকোন
কার্যে যোগ্যতা অর্জন ও জয়লাভের ক্ষমতা বহিত করে ।
উৎসাহ ইহার স্থায়ী ভাব । অলঙ্কারগায়ে ইহা উত্তম
প্রকৃতিযুক্ত, কাকনবর্ণ এবং দেবরাজ ইন্দ্রই ইহার প্রতীক ।
ভয়ানক ও শাস্তরস ইহার বিরোধী । কথা :—

সাজহে বীরেন্দ্র বৃদ্ধ, লম্বা ছুঁবণ ।
মেখি কি গুণ ধরে, বয়ুহলমণি ।
অরাম বা অরাবণ হবে ভর আশি । (মেঘনাদ বধ)

(২)

বার বীণা গজবীণা বাজে রক্তবীণা
ধনু মগড়ীবীর শত শত বীণা ।
হাতীর গলাতে বঁটা বাজে ঠনঠনী
কাম-করতাল বাজ করতালগুনি ।
—(কবিকবন চণ্ডী)

(৩)

দুর্গম গিরি কাঁড়ার মক
দুস্তর পারাবার ছে,
লজ্জিতে হবে রাতি নিকিষে
দাম্পত্য হসিয়ার :—(নজরুল ইসলাম)

কক্ষ রস—ইষ্টমান, অনিষ্টপাত অথবা শ্রিঃ বিরোধ-
শোক হইতে এই রসের উৎপত্তি । শোক ইহার স্থায়ী
ভাব । ইহাতে শোকের বিধগ্নই সম্যকরূপে প্রকাশ পায়
এবং ইহা শোকের বিধগ্নীকৃত বর্ণন শ্রবণ যননাদি বহিত
করে । পূনার ও হান্তরস ইহার বিরোধী । কথা—

যদি এ ফুলমালা পরাণ নিতে পারে
এই ত পারিষাছি মেল না প্রাণ,
বিধাতা করে যদি পরলও হয় স্থা
স্থাপণ বিকলা করে গো মান ।
—(বৃন্দাবন, অন্নবিলাস)

(২)

তুমি চলে গেছ, বসী, তোমার বয় বোহন হয়ে
আজিও থাকিছে বিষবানীর অন্তরতম হয়ে ।—(বীক্রনাথ)

(৩)

এ ছেন লজ্জা বসে বক্ষুসপতি,
বাক্যহীন পুন্ড্রশোকে ! 'কর কর করে
অবিরল অলংকার' তিতিয়া বসনে'
কথা তর, তীক্ষ্ণ নয় সরব শরীরে
বাঁজিলে কাঁধে নীরবে ।—(মেঘনাদ বধ)

(৪)

কিন্তু কাত যদি তুমি এ দুঃস্থ রূপে,
ধনুর্ধর ! চল কিরি বাই বনবাণে ।
নাহি কাঞ্চ প্রিয়ার সীতার উদ্ধারি,
অভাগিনী ! নাহি কাঞ্চ বিনাশি ক্ষুণ্ণে ।
ভরম বংশলা কথা সুমিত্রা জননী
কাদেন সরহু তীরে, কেমনে মেখাষ
এ দুঃ লক্ষণ ! আশি, তুমি না কিরিলে
সবে যের :—(মেঘনাদ বধ)

(৫)

শোভনে ! শ্রিঃ মনে মিলন হয়ে আনি
রাখিও মেঘনাদি করে না নাপ,

আতপ-বিশেষিতা ভট্টিনী শ্রোত সাধে

মিলে গো ফিরে এলে আবেণ মাস।

—(রতিবিলাস)

ককশদ্বন্দ্ব সখতে নানা ককশ কাহিনী কাব্যের বহু
স্থলে সূত্রাণা ও সূত্রকাশিত। উদাহরণ স্বরূপ আর
একটি অতি-ককশ কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি। ককশ-
রসের প্রকাশভঙ্গিমার রাবণশাসনের পদাবলী বেদপ
সূত্রাণারা বর্ণন করিয়া জনসম্মুখে সঙ্কট করিয়াছিল (স্তনা
ব্যয় মা যদ্য রাবণশাসনের সঙ্গীত শুনিতে আসিতেন)।
কালনা-নিবাসী কন্দাকান্ত ভট্টাচার্য নামক সাধকের
শ্রেণীভক্তি-নিবন্ধিত ভ্রাম্যন্তরীণও সেইরূপ অমৃতধারা
ঢালিয়া দিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তচকোর চরিতার্থ করিত।
একত্রারে তিনি একটি বিস্তীর্ণ মহানারের উপর দিয়া
হাইবার সময় একদল দস্যবর্জক আক্রান্ত হন। তখন
সেই জীবমুক্ত সাধক বিবেকশ্রোতে ভাগিয়া পরমানন্দে
ককশ হরে ভ্রাম্যন্তকে এইরূপে ভাঙিতে লাগিলেন—

আর কিছু নাই ভ্রাম্য তোমার, কেবল দুই চরণ রাগ।
তুমি তাও নিঃশব্দে জিহ্বাগ্রী অতের হলেম সাহস ভাঙ।
জাতিবহুভঙ্গারা, হ্রদের সময় লগাই ভাঙ।
কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই, ঘরবাড়ী

ভঙ গাঁয়ের ডোলা।

নিম্ন গুণে যদি রাগ, ককশা নরনে দেখ,
নইলে অণ করি যে তোমার পাওরা, সে সব
কথা ভুতের লগা।

কন্দাকান্তের কথা মারে বলি মনের কথা
আমার জপের মালা, কুলি কাঁধা অণের খরে রইল টাঙ্গা।

রৌদ্ররশ—ক্রোধ হইতে এই রসের উৎপত্তি। ক্রোধ
হইতে ইহার স্থায়ীভাব। ইহাতে শত্রুতাই প্রকাশ পায়
এবং শত্রুভাবাপন্ন হইয়া কোন স্বার্থোচ্চায়ে ইহাতে
উৎসাহ দেয়। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহা রক্তবর্ণ এবং
রক্তবর্ণতা অর্থাৎ যিনি অস্তিত্বে লক্ষ্যকোষে রোহন করান,
তিনিই ইহার প্রতীক। পূনার, ভয়ানক ও হস্তরস
ইহার বিরোধী। বধা—

(

কি করিলি বাসন্তি! পর্বত-পুংছ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধা যে সে বেধে তার গতি? (যেখনাবধ)

(

পতিভিত্তা একমাত্র সত্যী রমণীর
মহাধর্ম, অস্তিত্তা মনোপাশ তার
নারীর আবাহ কেবা শিতামাতা প্রাতা?
ভাহার সর্বস্ব স্বামী। বিবাহের সনে
ছাড়ি শিকুল, পতিভুলেতে ছাড়ি
হয় অকল্যাতী মত। হলে ব্রহ্মসত্তা,
ভাষিয়া গল্পক কতে, গল্পক হুঁয়ারে
পূর্ণতক, আছে তাহে কি দুঃখ লতার?
—(কৃষ্ণকল্প)

“ভ্রাতার সাক্ষাৎ সাধ থাকে-বসন্তলে।
ইচ্ছা—এই যবে শোভা বজ্রকাণ্ডিনি
ভাষি ককশপথি, করি বৎ বৎ
হুঁয়ারে অধিশক্ত” (কৃষ্ণকল্প)

অতুতরস—আতর্জনক বিষয় বা দৃশ্য হইতে উদ্ভূত
বিষয়ভাব হইতেই অতুত রসের উৎপত্তি। বিস্ময়ে
ইহার স্থায়ী ভাব। ইহাতে অলৌকিক বিষয় বা ব্যাপার
প্রকাশ পায় এবং মানবমনে ঐ বিষয়ের প্রতিক্রিয়া দেখা
যেয় ও মহিমাদির ভাব উদ্ভূত করে। অলঙ্কার-শাস্ত্রে
ইহা পীতবর্ণ ও গন্ধর্বেরা এই রসের প্রতীক। ইহার
বিরোধী রস নাই। বধা—

১)

“সবিস্ময়ে রত্ননাথ নদীর উপরে
হেরিলা অতুত সেতু, অগ্নিময় কল,
কলু ঘন দুর্ভাগ্য হৃদয় কলু বা
হৃদয়ে নিমিত্ত বেন। থাইছে লতত
সে সেতুর পানে প্রায় লক্ষ লক্ষ কোটি
হাছাকার নামে কেহ, কেহবা উল্লাসে।” (যেখনাবধ)

(২)

চন্দ্রনন্দক একটিও ফল দেখনি স্থিতিতে হুসে,
একটিও ফল হুটাবে কখনও ভাবেনিক অনিলহুসে।
দুর্গম মূল সেসে তার কেউ গায়নি ঈশ্বর ছায়া,
ব্যায়-লাহিত কানন তাহার সর্পে কুচিত কায়া।
একথা তাহার সকল অণু নিবেশিল অকাতরে,
হাতকৃত ঐ নিবিত্ত ভক্তি পলে পলে রসকরে।

(কবিশেষের কালিদাস দ্বাৰ)

ভয়ানক রস—ভর হইতে ইহার উত্থব। ইহা হইতে
বিভীষিকার উৎপত্তি হয় এবং ভয়ানক চেতনাই প্রকাশ
পায়। অলম্বার শায়ে ইহা কল্পবর্ণ; যমরাজ ইহার
প্রতীক এবং ইহা স্রীমন্ত নীচ প্রকৃতি বসিমা বর্ণিত
হইয়াছে। শূন্য, বীর, বৌদ্ধ, হস্ত ও শাস্ত রস ইহার
বিরোধী। বধা—

(১)

“কোথা বেধ—ভল অনল অনিল ঘুম সমস্তপার।
কোথা বা চেতন জীবের যোগ্য বার্তাবহন তার?” (যেধন্যবধ)

(২)

“এখনও কাপে দিয়া মম
খরখরি অরিল সে ভৈরব ছফার।” (যেধন্যবধ)

বীভৎস রস—সুংসিৎ বিষয়ের প্রতি চূপা হইতে এই
রসের উৎপত্তি। কেবল সুংসিত বিষয়ই ইহাতে প্রকাশ
পায় এবং তৎকাল বিকারামিত বর্ণনা আদিয়া পড়ে।
অলম্বারশায়ে ইহা নীলবর্ণ এবং মহাসেব ইহার প্রতীক।
শূন্য ইহার বিরোধী। বধা—

“অতীর্ণ ভোজন শ্রব্য উপায় দুর্গতি

পুনঃ পুনঃ হুই হস্তে ভুগিয়া দিসিছে। (যেধন্যবধ)

হাস্তরস—কৌতুকজনক কার্য বা বাক্য হইতে এই
রসের উত্থব। হাস্ত ইহার স্থায়ীভাব। ইহাতে
হাস্যোদ্দীপক অব্যাবিধিকতা দেখা যায় এবং তথ্যিক
চেতনাই প্রকাশ পায়। অলম্বারশায়ে ইহা কল্পবর্ণ এবং
মহাসেবের অলম্বরণ ইহার প্রতীক বসিমা কথিত। কল্প
ও ভয়ানক রস ইহার বিরোধী। বধা—

(

“নির্ধাইয়া দিব লজা যত পেছে শোভা।
দুর্গমবার নাক কান কিসে ধাবে ঘোড়া ?
অক্ষর সুমারেরে ঘেরেছে রাতের চরে,
তার স্রী বিধবা হয়ে আছে তোর ঘরে।
শে তোর দ্বারক পণ এমন করে কে,
কবে বলবি আমার বধুর স্বামী এনে বে।” (ভক্তিবাস)

(২)

“রাখাভোগ ত্যাগি কি কুপণে,
বর্ষের আইনি তুই এ কলকণ্ঠে ?
জাতিবৎ তারা তোর তারা কারা রূপে,

বিধবা মশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার দূচ ? দেবর কে আছে
আর তার ?” (যেধন্যবধ)

শান্তিরস—শান্তি অথবা নির্দোষ হইতে শান্তরসের
উত্থব। শান্তি বা নির্দোষ ইহার স্থায়ীভাব। অলম্বার-
শায়ে ইহা উত্তম প্রকৃতি, কল্পপুশোর দ্বাৰ উন্নতভাবিনিষ্ট
এবং নারায়ণই ইহার প্রতীক। শূন্য, বীর, বৌদ্ধ,
ভয়ানক ও হাস্তরস ইহার বিরোধী। বধা—

“কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক দায় এক আসে মগতের তীতি,
লাগর তরঙ্গ বধা।” (যেধন্যবধ)

বন্দ্যলয়—পুত্রাদির প্রতি স্নেহ হইতে এই রসের
উৎপত্তি। স্নেহ ইহার স্থায়ী ভাব। পুত্রাদি হইতেই
এই স্নেহভাব দেখা যায় ও মানব-পত্নীরে তাহারে
প্রতিভিয়া প্রকাশ পায়। অলম্বারশায়ে ইহা পশুগতাদি
কামিনিষ্ট এবং লোকনাক্ষয়ই ইহার প্রতীক বসিমা
কথিত। বধা—

“কেমনে বিহার তোরে করিবে বাছানি।
ঈশ্বর ছদ্মাকালে তুই পূর্ণ নষ্ট
আমার।—” (যেধন্যবধ)

“দুইটি শাশন”—দুইটি রাষ্ট্র

ঐশ্বরেশচন্দ্র দেব

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দাবী স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষ দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে। মুসলিম লীগের ভাষ্যকারদের মতে হিন্দু এক “জাশন”, মুসলিম আর এক “জাশন”। বাংলা ভাষায় একটি শব্দে “জাশন” বস্তু বা ভাবের ঠিক ঠিক বর্ণনা করা যায় না বলিয়া প্রায় পকাশ বস্তু পূর্বে বর্ণনায় এই বস্তু বা ভাবের বর্ণনা করিবার ক্ষমতা, এই “জাশন” শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং বাংলা ভাষার মধ্যে তাহা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। “জাশন” শব্দ এইভাবে আশ্রয়িতার মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে মনে করিয়াই, এই প্রবন্ধের শিরোনামের তাহা ব্যবহার করিয়াছি।

•

মুসলিম লীগের “জাশন” তত্ত্ব নিম্নে অনেক তর্ক-বিতর্ক, বাক-বিতণ্ডা হইয়াছে। এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাকালে অনেক বক্তৃতা, বক্তব্য, অনেক লুপ্ত ও অদিকালের উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও তার স্মরণ কমে নাই। এই বিপর্ষয় স্বীকার করিয়াই বেশ বিভক্ত হইয়াছে দুই রাষ্ট্রে, এবং বহুদিন পর্যন্ত একত্র বিপর্ষয়ের আশঙ্কার মধ্যে আশ্রয়িতার চলিতে হইবে। কারণ, ভারতবর্ষের লোকসমষ্টি, চল্লিশ কোটি লোকের সমষ্টি এমনি অস্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত যে “পাকিস্তান” প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও ভারত-রাষ্ট্রে থাকিয়া গিয়াছেন লাগে ডিন কোটি মুসলমান। “দুই জাশন” তত্ত্বের বিবাদের সহিত বর্তমান অবস্থার মধ্যে কি করিয়া লক্ষ্য আনা হইবে, তাহা “পাকিস্তানের” নেতৃবৃন্দ বলিতে পারেন। “জাশন” ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্বন্ধের কথা নিম্নে উঠা কি আন্দোলনের স্রষ্টা করিয়াছিলেন, তার বৌদ্ধিক লক্ষ্যে আর উঠা কি ভাবিতেছেন, তাহা আশ্রয়িতা জানি না। তবে ইহা মনে করি যে কোড়াতালি দিয়া একজন জীবন-বরণ লক্ষ্যের মীমাংসা হইবে না। এবং বহুদিন ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা না হয় ততদিন ভারত-বর্ষে একটা অনিশ্চয়তা থাকিবে। ভারত-রাষ্ট্রের কর্তব্যবৃত্ত

এই অনিশ্চয়তা—ভাব ও কর্তব্যগত এই অনিশ্চয়তার হাত হইতে বেশের লোকের মনতে কি করিয়া মুক্ত করিবেন। তাহা এখনও স্পষ্ট হইতেছি না।

সুতরাং তবিত্ত্ব নিম্নে আলোচনা করিব না। আশ্রয়িতা আলোচনা করিতে চাই একটা ইতিহাসের—এতদন্ত বংশের মধ্যে ভারতীয় মুসলিম মনের যে পরিচয় পাইয়াছি, সেই ইতিহাসের আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়। এই পরিচয় একদন্ত বংশের পূর্বের একজন মুসলিম প্রাণের কর্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর নাম আবদুল লতিফ; তিনি ছিলেন বাংলা দেশের করিমপুর জেলার অধিবাসী। তিনি কুদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন। আবদুল লতিফ শাসন বিভাগে যোগদান করেন, এবং কিছুটা ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে স্থানীয় অর্থনৈতিক কুদেবচন্দ্র শিক্ষা-বিভাগে যোগদান করিয়া বাংলা দেশে, তদানীন্তন বাংলা দেশে—বাংলা, বিহার ও উৎকলের যোগাযোগে সংগঠিত বাংলা প্রদেশ—শিক্ষা বিভাগ করিয়া ব্যক্তি অর্থনৈতিক করেন। তিনি বাংলা ভাষায় সামাজিক ইতিহাস রচনার গণ-প্রসঙ্গ। আবদুল লতিফ স্বাধীন পণ্ডীর মধ্যে স্বীয় সমাজের মধ্যে বর্তমান যুগোপ-যোগী শিক্ষা-নীতির প্রবর্তনের জন্য আত্মবিশ্বাস চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এবং এই কর্তব্য-উপলক্ষে মুসলিম সমাজের প্রয়োজনকে “পূর্বক” করিয়া দেখিবার জন্য রাজ-সরকারে আবেদন করিয়াছেন, এবং তাঁর সমাজের মনে প্রতিবেশী সমাজ হইতে একটা পার্থক্যের ভাব জাগ্রত করিয়াছেন। মহাপ্রাণ সমাজ মহাসিনের প্রবর্তন কল্পনা কেন কোন অ-মুসলমান পণ্ডিত হইবে, এই প্রশ্ন তিনিই তুলিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁর এই দাবী স্বীকার করিয়া নেওয়ার পর মহাসিনের দান কেবল মাত্র মুসলিম শিক্ষার জন্য “পূর্বক” হইল। তখন প্রশ্ন ওঠে—হাতা ধরন নিম্নে ছিলেন, তখন তাঁর দানে মুসলিম কেন উপকৃত হইবে? আর পর্যন্ত এই প্রশ্নের সত্ত্বের পাওয়া যায় নাই!

কেবল সরকারী চাহুরিয়া ও বিহার-কর্তা মুসলিম প্রাধান্যগণ এইজন্য পার্থক্য লক্ষ্যে লক্ষ্যে ছিলেন না,

ভারতীয় মুসলিম কবি, দার্শনিক, চিন্তা-নাট্যকণ্ঠ ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ছিলেন। ইহার পরিচয় পাওয়া যায় আলতাক হুসেন "হালির" ইহাতে মহান ইক্বাল পংক্ত মুসলিম কবির কবিতা, চিন্তানাট্যের দেখায়। ইসলাম ধর্মপন্থীর প্রাচীন সৌরভ, কথা-কাহিনী, তাদের বর্তমান অধোগতি— এই তিনটি বিষয়ে পান গাহিয়া তাঁরা সারা ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজের মনে জাগাইয়াছেন আবেগ ও বিশ্বাস। তাদের চোখে আনিয়াছেন জল, ভাষা বিম্বাছেন তাদের আপাদমাক্ষর, প্রকাশ করিয়াছেন তাদের ক্ষেত। আলতাক হুসেন আলীগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমদের সহ-কর্মী ছিলেন। তাঁর কবিতার আশ্রয় ছুটিয়া উঠিতে শেখিতে পাই একটা নতুন মনোভাব। তিনি ভারতবর্ষকে ভৎসনা করিতেছেন; তিনি নিজেদের মনে করিতেছেন হু'দারের "অতিমি" বলিয়া হু'দারের আশ্রয়-আপায়ণ শেষ হইয়াছে; এখন বিধায় নিতে হইবে। কবি কল্পনায় অনেক উচ্চতরিন প্রকাশ পায়। "হালির" এই ভূমনা সেক্ষণ হইতে পারে। আর ইহাও হইতে পারে যে "হালির" মতে ভারতবর্ষ কখনও মুসলিমের "আপনার" হইতে পারে নাই; ভারতবর্ষ "দার-উল্ আমান"—পাশ্চিম ও বহুতর দেশ হইতে পারে নাই; "দার-উল্ হাবাব" শত্রু পুতীই হইয়া গেল। কেবল কবি কল্পনায় এই ভাব ছুটিয়া উঠে নাই। এমন কথাও শুনিয়াছি ১৮৬৯ সালের পরে। এই বৎসর কাশ্মির পদ তুলিয়া দেওয়া হয়; হিন্দু রাজ পতিতের প্রদত্ত। ইহারা মুসলিম ও হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা করিতেন আইন-আদালতে। এই পরিবর্তনে মুসলিম সমাজ নাকি মনে করিতে আরম্ভ করেন যে ভারতবর্ষ "দার-উল্ হাবাব" হইয়া গিয়াছে। সেই মন্ত নাযাজের সময় ভারতবর্ষকে শত্রু দেশ ভাবিয়াই ধোঁকা পাঠ হয়।

জনাব ওয়াজেদ আলী বাংলা ভাষার একজন চিন্তাশীল লেখক; তিনি মুসলিম লীগ উদ্ভাবিত "হুই স্ত্রাপন" ভাবে বিশ্বাসী নয় বলিয়াই আমি। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে সাহিত্য শাখার সভাপতিত্বপে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তার মধ্যে "হালির" শৃংগের মুসলিম ও হিন্দু

লেখকের মনোভাব ও চিন্তার গতি তিনি বিশ্লেষণ করিয়া ছিলেন। এবং এই কথা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন যে স্বাধীনিকতা (patriotism) বলিতে মুসলিম সমাজ বা মুসলিম ও বিশ্বাস করেন, তাহা হিন্দুর বোধ ও বিশ্বাস হইতে পৃথক। এই পার্থক্যের কারণ বুঝাইতে গিয়া তিনি ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা পরিমিতা ও মুসলিমের সংখ্যা লঘিষ্ঠতার উপর বিশেষ জোর বিধাছিলেন। এবং দুইজন সাহিত্যকার—বকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও আবদুল হেদিস শাররার—সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। "আবদুল হেদিস ছিলেন বুদ্ধবোধের অধিবাসী। "রস-প্রতা হিসাবে তিনি বকিমচন্দ্র হইতে কোন অংশে নূন ছিলেন না"; তাঁর মধ্যে একটা বিশ্বজনীনতা ছিল বা" বকিমচন্দ্রের দেখায় নাকি অশ্লষ্ট দেখা যায়। একজন পশ্চিম সাহিত্যিক কেন মুসলিম সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, তৎ-দশকে ওয়াজেদ আলী সাহেবের মত বা বাখান প্রদধানযোগ্য। বর্তমান মুগ স্বাধীনিকতা মাহতকে বেমন অহুপ্রাপিত করে, অত্র কোন ভাব তাহা করিতে পারে না। বকিমচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে পাশ্চাত্য ভগত হইতে এই ভাব "খাও" করিয়া আনিয়া বাংলা সাহিত্যে নব ধারার প্রবর্তন করেন। আবদুল হেদিস মুগ-ধর্মের এই ইঙ্গিত ও আস্থান দেখিয়াতনিয়াও এই ভাব-সৃষ্টি করিতে পারিলেন না—পারিলেন না "বন্দে মাতরামের" মতন গান রচনা করিতে—পারিলেন না আনন্স-মঠের সন্তান-সম্প্রদায়ের আদর্শ-পুত উদাহরণের সৃষ্টি করিতে, পারিলেন না "বেবী-রাইর", "স্ত্রী-র" মতন আদর্শ নারী চরিত্রের সৃষ্টি করিতে।

কেন পারিলেন না? ওয়াজেদ আলী সাহেবের ভাষায়ই এই অশাফল্যের কারণ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। "স্বাধীনিকতার" আদর্শ গ্রহণ করিলে এবং সেট আদর্শ অম্বাবায়ী নব-ভাষার সৃষ্টি-কার্যে সাহায্য করিলে ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ ইংরেজের হাত হইতে হিন্দুর হাতে রাজত্ব ও তুলিয়া দিবে। যে প্রদেশে আবদুল

হেলিম অল্প-গ্রহণ করিয়াছিলেন সেখানে তাঁর সম্ভাব্য ছিল জন-সংখ্যার শতকরা দশ জন মাত্র। সেইজন্য আবদুল হেলিমের রদ-স্বস্তির মধ্যে বাবেশিকতা অত্যন্ত গৌন হইয়া গিয়াছিল। বহিমচক্রের লেখার মধ্যে এই বাবেশিকতাই কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়া আছে; বহিমচক্র সেইজন্য বাবেশিকতার ভাবুক, বাবেশিকতার গায়ক, বাবেশিকতার কবি। বাবেশিকতার প্রচার ছিল তাঁর পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। কারণ, তিনি যে প্রবেশের অধিবাসী ছিলেন, সেই বাংলা প্রবেশ তাঁর সমরে ছিল হিন্দু-গ্রন্থান, বাংলা প্রবেশের মধ্যে তখন বিহার ও উৎকল অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং হিন্দু-পরিষ্কৃত্য বর্ণীয়ান হইয়াই বহিমচক্র তাঁর সকল সাহিত্য সাধনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। গুহাধ্বজ আলী সাহেবের চাক্ত যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ হইতে হয়, তবে ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে বাবেশিকতা তাঁদের স্বাধ-বিবোধী, তাঁদের পক্ষে নৃত্য-বান। এই যে বিবোধ, ভাব-রাজ্য ও চিন্তা-মগ্নিতে এই যে বিবোধ, তাহা ভারতীয় মুসলিম সাহিত্যিক ও কবির জীবনে একটা অদ্ভুত বিপর্যয়ের স্রষ্টা করিয়াছে। বাবেশিকতা একটা স্বাভাবিক মানব ধর্ম। এই স্বাভাবিক ধর্মের অহুপ্রেরণা অগ্রাহ্য করিবার প্রয়োজনে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে অত্যাচার করিতে হয় আপনাদের প্রকৃতির উপর। সে স্ব-কৃত অত্যাচার আজও তাঁদের উপর চলিতেছে। এবং এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার মন্ত্র ভারতীয় মুসলিমকে করিতে হইয়াছে। বিশ্ব-ইসলামের (Pan-Islamism) আশ্রয় গ্রহণ। সেই ভাবুকতা তখন যথার্থ হইল তখন আবিষ্কার করিতে হইল “দুই ভাষন” তত্ত্বের, করিতে হইল “পাকিস্তানের” স্রষ্টা।

কবি মহম্মদ ইক্বালের জীবনেও এই বিবর্তনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে তিনি গাহিতে পারিয়াছিলেন “হিন্দুদান হামারায়” গান, তিনি ব্রাহ্মণের সঙ্গে টেকা দিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—তুমি যাঁটির স্তূতির মধ্যে সেবিতে পাও তোমার আরাধ্য দেবতাকে; আমি ভারতবর্ষের প্রতি হৃদ-কণার মধ্যে

দেখিতে পাই তাঁহাকে। (“In shapes of stone you fancied God's dwelling place; I see in each speck of my poor country's dust, a deity.”) এমো, আমরা হৃৎকেন্দ্রে আমাদের এই মন্ত্র-কৃষিতে একটি নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করি…… এবং প্রতি সূর্যোদয়ে এই স্তোত্র সেখানে স্তূতি হউক যাঁ সকল উপাসকের চিত্ত উদ্বেলিত করিবে এবং তাঁতে স্রীতির সোমরস ঢালিয়া দিবে……কারণ এই স্রীতির মধ্যেই মঙ্গল স্রষ্টা জীবের সৃষ্টি নিহিত আছে। (Let us build in this homeland a new temple's foundation……and there at every sun-rise let our sweet chanting move the hearts of all who worship, and pour the wine of Love— For, in love lies salvation to all earth's living things.)” মধ্য বয়সে তিনি নিম্না করিয়াছেন বাবেশিকতার “মাটির উপাসনা” বলিয়া, এক প্রকার পৌত্তলিকতা বলিয়া। পরিণত বয়সে, ১৯৩০ সালে, উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের অঙ্গ বিপের নিঃ—পাণ্ডায়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রবেশ, সিদ্ধুগ্রদেশ ও বেলুচিস্থান নিঃ—নূতন ‘রাষ্ট্রের’ স্রষ্টার কথা তিনি বলিয়া দিয়াছেন। তাঁর পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে পাকিস্তানে।

একটি ভাব-রাজ্যের একশত বৎসরের ইতিহাস আমি দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এর মধ্যে সৃষ্টি কোথায় আছে, অসৃষ্টি কোথায় আছে, তৎ-সংঘর্ষে কোন কথাও আমি বলি নাই, বলিতে চাই না। ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিম দুই ভাষন, ইংরেজ এই তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াই ভারতবর্ষে দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। স্মরণিচ্ছা কংগ্রেসের গল হইতে এতদূর কোন স্বীকৃতি নাই। কংগ্রেস নেতৃ-বৃন্দ এই ভাবে ভাগ-বাটোয়ারায় সম্মত হইয়াছেন যে দ্বারা এক সংসারে থাকিতে চাঁদ না তাদের বাঁধা দিয়া অবাঞ্ছিত বাড়াইতে চাই না, তারা তাদের ভাবে পৃথক হউক। পাকীরা এই তত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই, তবুও তিনি বিভাগ মানিয়া নিঃ হিন্দু-মুসলিমের মনে স্বাভাবিক ঐর্ষ্য আনিবার মন্ত্র জীবন বিদ্যাছিলেন। এই ঐর্ষ্য

এখনও আসে নাই। এই ভাবের সংঘাতে দুইটি রাষ্ট্রের
জীবে অনেকটা ছুঁত-ভুঁত। “পাকিস্তানের” পশ্চিম অংশ
হইতে প্রায় ৪০ লক্ষ হিন্দু ও শিব উৎপাত হইয়াছে,
সম-সংঘাত মুসলিম পুং পাগোব, দিল্লী হইতে চলিতা
গিরাছে—কেহ “পাকিস্তানের” প্রতি মমতার আকর্ষণে;
বৈধের ভাগ হিন্দু-শিবের অত্যাচারে। “পাকিস্তান”
প্রতিষ্ঠার পর প্রায় হেড় কোটি হিন্দু-শিব এখন তথায়
আছে; প্রায় লাখে তিন কোটি মুসলিম ভারত-রাষ্ট্রে
আছে। “দুই ভাষান” তবের উপর প্রতিষ্ঠিত দুই রাষ্ট্রে
কোন লতা থাকিলে, এই ৪ কোটি লোকের জীবনে শান্তি

আসিতে পারে না। “শব্দ” বিধান অনুযায়ী “পাকিস্তানের”
রাষ্ট্রীয় বাবদা চলিলে, তার প্রভাব হইতে ভারত-রাষ্ট্রকে
রক্ষা করা কঠিন হইবে, যেমন কঠিন হইয়া উঠিতেছে,
কামুনিজম ও বাস্তব-তাত্ত্বিক ব্যবহার বিরোধ। “এক বনে
নাকি দুইটি বাঘ থাকিতে পারে না। আমাদেরও কি
সেই পথেরে নামিতে হইবে? এই আশঙ্কা ও তজ্জনিত
অনিশ্চয়তা আমাদের নানা সমস্যার সমাধান বাহ্যত
করিতেছে। একমাত্র ভরসা মানব মনের বুদ্ধিমত্তা বতাব
—হারা নিরাপত্তা না, পরাজয় স্বীকার করে না। লক্ষ
লক্ষ বৎসরের বিপর্যয়ে তাই মানব সভ্যতা টিকিয়া আছে।

‘অকাল-মরণ’

লক্ষ্মীদেবী

শক্তি আর শক্তিসহায়
আশক্তির চাপে,
কৃত্তিক আর সূর্য্যাহার
লোভ—স্বার্থ লাগি।
নরদের উল্লস লভতি—
জীবনের লম্বা-বন্দিত্ব,

নির্জাণের বাধা বহিষ্কৃত
অনির্জাণ রহিয়াছে জাগি।
জনদের জীবন বিকাশ—
বিশ্ববের কলসময় হুকে,
গঠনের অক্লান্ত আশা—
চাহিবার অনন্ত-উত্থানে,
ভিকারেরে উঠিবে কি ভরি?
স্বাভাবিক দাবীর সংগ্রামে—
ভাগ্যতিক হুঁকি লবে বরি।

টেলিগ্রাম: ‘ব্যাঙ্ক’

ফোন: ক্যাল ২০১০

বেঙ্কল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(স্থাপিত: ১৯২৬)

হেড অফিস:

২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শাখাসমূহ:

বাগেরহাট, বাকুড়া, বহরমপুর (পশ্চিম
বাংলা), চরমুগড়িয়া, চাঁচুড়া, কাঁচি, ঘাটাল,
ঘোশাহর, কালনা, কাটোয়া, খজাপুর,
খুলনা, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, নবাবীপ, নাটোর,
মেদিনীপুর, নৈহাটি, নওগাঁ, রাক্ষসাহী,
সাহেবগঞ্জ, শান্তিপুর, সিরাজগঞ্জ ও তনসুক

জীবনের বসন্ত

শ্রী অরুণচন্দ্র গুহ

আনন্দবাজার, বুগান্ডার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড,
প্রকৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

মূল্য ২৫০ মাট

প্রাপ্তিস্থান:

সরস্বতী লাইব্রেরী

সি ১৮-১২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

স্মরণীয় দিন

শ্রীমতী ইলা সেন

মাঘবের জীবনে এমন এক একটি মুহূর্ত আছে যার স্মরণে তার গভীরতম জীবনধারণার এক বিশবের স্মৃতি হয়। সেই মহালয়ের মাঘে এমন একটি অশ্রুপ্রেরণা লাভ করে যা তার মারা জীবনকে হ্রাসিতভাবে পরিচালিত করে একটি আশ্রয়ের পিছনে। এমন একটি মুহূর্তের আবির্ভাব হয়েছিল আমার জীবনেও—যে মুহূর্তটিকে যথাবোধগম্যভাবে অভ্যর্থনা করার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

তখন ছিল আগস্ট মাস—১৯৪৭ সন। গান্ধীজী এসেছেন দাখানিড়িত কলকাতায়—নিষিদ্ধ সোমপুর আস্রম। বহুদিন পর স্বযোগ ঘটল তাঁকে বর্ন করার। তাই এক অস্বাভাবিক দিনে প্রচণ্ডভাবে চিত্তে সোমপুর অভিমুখে যাত্রা করলাম।

অনবহল কলকাতা নগরী ছাড়িয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে সোমপুরের শিউড়ালী গ্রামাঞ্চলে দিয়ে। দুটি ঘেলে ডাকিয়ে বেঁধে দুইদিকে অব্যাহত মাঠ সমুদ্র-সৌন্দর্যে ডুবে উঠেছে। উজ্জ্বল আকাশতলে গৃহ-পালিত গরু, মহিষ চড়ে বেড়াচ্ছে—দূর-দূরান্তে আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে চুম্বন করছে; অজ্ঞান স্বর্গের শেষ রশ্মিটুকু বড়ো পড়ছে স্বপ্নলোকের আলিঙ্গনবদ্ধ সেই সৌন্দর্যের উপর।

গাড়ী এসে থামল সোমপুর আশ্রমের সামনে। একটু বিশ্বয় লাগল আশ্রমের সেই একান্ত অনাড়ম্বর পরিবেশটি লক্ষ করে। যেখানে বসবাসের নির্দেশাবলী উপস্থিত হ'ল না যেসবের অপেক্ষা করার জন্য নির্ধারিত স্থানে। গাছপালা বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুটির পর পর নিয়ে আস্রমটি তৈরী। কিছুপূর্বেরি দুটি হয়ে গেছে। অশ্রুজ্বল উপর দিয়ে ভেসে আসা ডিঙি মেঠো গন্ধ—ব্যাঘের একটানা গর্জনধ্বনি—স্বরণ করিয়ে দেয় গ্রাম্যজীবনের কথা।

দীর্ঘ দীর্ঘ প্রার্থনা প্রাচীরে উপস্থিত হল। উজ্জ্বল আকাশের নীচে সৌন্দর্যের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে

বাসনা রয়েছে প্রার্থনার। প্রার্থনাকালীন শৃঙ্খলা কিভাবে বজায় রাখতে হবে বলে ছিলেন জনৈক আশ্রমবাসী।

কিছুক্ষণ পরেই ঘোষণা করা হল গান্ধীজী আসছেন। সমস্ত মন প্রাণ নিয়ে উদ্গ্রীব হয়ে রইলাম—যেন অহিংসা ও শান্তির জীবন প্রতিমূর্তিকে যথাবোধগম্যভাবে বর্নন করতে পারি। তাঁকে দেখা—সেতো শুধু চোখের দেখা নয়। অশ্রুজ্বল নিয়ে তাঁকে বর্নন করতে হবে—যেমন করে উক্ত বর্নন করে ভগবানকে। সেই দেখার কথা নিয়েই ত পাব শ্রীমতীকারের অশ্রুপ্রেরণা—যার ফলে আমার জীবনের ধারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে এক মুহূর্তে—যা শত শতকোটিতেও চূলাধা হয়ে থাকে মাঘবের কাছে।

হঠাৎ বেঁধে সমগ্র সভা নিবরণ সমুদ্রের মত নিঃশব্দ—গান্ধীজী আসছেন। দেখলাম ভ্রাতৃত্বপূর্ণ কাহিনীতে দিক উদ্ভাসিত করে, শান্তমিত মুখে এগিয়ে আসছেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব। দীর্ঘ দীর্ঘে তিনি এগিয়ে এলেন নির্ধারিত আসনটি গ্রহণ করার জন্য। তারপর জনতার প্রতি মুহূর্তে করজোড়ে সমস্ত অভিবাসন জানালেন।

প্রার্থনার অস্থান শুরু হল। উদাত্ত গভীর স্বরে জনৈক আশ্রমবাসী একে একে পাঠ করে চললেন উপনিষদ, কোরাণ, মেম্বারেকা। তারপর হললিত কণ্ঠে গাইলেন হামদুন—সর্বশেষে একটি বন্দনামূলক সঙ্গীত। সমস্ত সভা ধানাসীন। পূর্ব আকাশের প্রান্তে এক টুকু ভলভা মেঘ—তারই উপর দিয়ে ছুতমাত্র পাখা মেলে উড়ে চলেছে একটি বক;—তাল-তমাল বৃক্ষগুলি উর্ধ্বলোক আলোর মণি গ্রহণ করার জন্য ঘন সমুদ্র পর পর মেলে ধরেছে;—আর তারই তলায় বলে আছেন ধানময় একটি সভার শীর্ষে বিংশ শতাব্দীর বৃদ্ধ। কানে ভেসে আসছে প্রার্থনা-সঙ্গীতের মধুর স্বরধ্বনি—দুটি ঘেলে আছি সৌন্দর্য ভরা সেই পরিবেশটির প্রতি।

হঠাৎ চমক ডেকে গেল—প্রার্থনা সমাপ্ত হয়েছে—গান্ধীজী প্রার্থনাত্তিক কিছু বলছেন। খুব দীর্ঘ দীর্ঘে নিঃশব্দে কি বললেন তিনি বুঝতে পারলাম না। পরে যখন শ্রীমতী নির্বল বোধ গান্ধীজীর বক্তৃতার বহাধ্বান করে

হিংসে তখন জানতে পারলাম—বর্তমান যুগের ভীষণতম প্রতিজ্ঞা করেছেন দাখবিহীন কলকাতার কোন এক দুর্গম শরীতে আশ্রয় নেবেন হিংসার উন্নত জনতার সঙ্গে শাস্তির বাণী শৌছে দেবার জন্য। বতরিন না তাঁর এই গল্প নিছক হয় ততদিন তিনি কৃত্রিম উপেক্ষা করে এগিয়ে চলবেন লক্ষ্যের পথে। সমগ্র সভা বিশ্বর বিমূঢ় ভাবে অবগত হল সেই অসুস্থ প্রস্তাব।

সভা শেষ হল। পাণ্ডীতী মঞ্চ পরিত্যাগ করে অগ্রণর হলেন তাঁর হুটির অভিমুখে। সমগ্র রুম দিয়ে দ্রুত করে প্রস্থান জানালাম তাঁকে।

তখন সভা নেমে এসেছে ধীরে ধীরে। রেল লাইনের ওপারে নির্বিড় অন্ধকার—একটানা কি' কি'র শব্দ—এপারে নানা সমালোচনার গুজন। সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে সেই শব্দ সভার এগিয়ে চলুলাম উপনিষদের স্লোকটি স্বরণ করে—“যেনাহং নাতুততাম কিমহং তেনাং কুৰ্যাম।”

পাড়ী ছুটে চলেছে আলোকবিহীন বনপ্রান্তের মধ্য দিয়ে। ভাবতে ভাবতে চলেছি জীবনের ইতিহাসে এখন যখনই মুহূর্তটি কি সভাই সোনার কলমে ভরিয়ে তুলতে পারবো?

মানুষ, দেখিব কোন পথে তুমি চলো

শ্রীকীর্ত্তন বসু

মানুষ, দেখিব কোন পথে তুমি চলো;
অস্বর তব প্রেম বা হিংসা কোনটা মগিছে বসে।
দুই-ই আছে গড়ে তোমার স্মরণ, তোমার পথের পরে;
জগৎ চাহি'ছে কা'রে?
'আজি পরীক্ষা'—করে ঐ ভগবান;
হলেন তোনারে তুলাইবে শরতান;
হুটেছে সভ্য কণ্টক মাঝে
চাহ আজ কা'রে বসে।

মানুষ, দেখিব কোন পথে তুমি চলো।
যোদ্ধা, দেখিব আজিকে তোমার বাণ
বল্লের রোষে কা'রে করে খান খান।
নিঃশব্দে লুটাবে পোড়িতে অথবা বিখ্যাসী;
কা'রে চায় তব অসি?

কেহ হাসে, কেহ চীৎকারে অনাহারে;
যোদ্ধা আজিকে কেনেছ শত্রু কারে?
যা বোন কাঁদি'ছে কংস কাত্যায় ধ্বংস তোমারে ভাকে।
তাহারে বধিতে হে বীর সেনানী বল উঠিয়াছ ভোগে।

মহারাজ, তব নব পরীক্ষা এলো।
দেখিব—আজিকে কোন পথ ধিবে চলো;
হিংসা, শোষণ, অনাহার, মারী যা বোনেরে অপমান
গ্রাসিছে রাজ্যখান।
এ মহা ত্রিপুরে হানিবে না কি গো তব;
রাজ্যের লোভে ধ্বংসেরে যেনে নেবে।

জগৎ রাত্রি অথহেলা করে—যাহির-রাত্রি লাগি
ভগবান বাণী কুণিবে কি আজ; আনিবে ধ্বংসলক্ষ্য কি?
দুশক, ছাত্র, আজিকে হাইব বেধে
মহা আত্মানে ওঠো কিনা আজ আগে।
শিকারে আজি কর্মক্ষেত্রে অথবা পাতার কোণে—
কোনখানে নেবে চিনে?

যোহ কামনা ও প্রহার প্রেমের লাগি
ছুটিবে কি—ববে ওঠে হাহাকার আজি!
শোষণ যোহা পোড়িতে রুক বলে শুবে তার প্রাণ—
আগিবে না সেখা বন্ধ কর্ত্ত; চান্দাবে না অভিধান?
বিজ্ঞানী-বেধো অগং তোমার পানে
কি মহা আশার উৎসুক আজি হানে!
আর্জ অগং তোমারে চাহিছে, হিংসা মাগে তোমার;
কেন্দীয়ে প্রাণ চায়?

হুটেছে তুমি পোড়াইতে পারো ধরা,
হুটেছে তুমি চির বলন্ত ভরা;
অগং স্ত্রী করিবারে পারো আপবিক নিয়ে হাতে;
চলিবে কি তুমি স্ত্রী ছাড়িয়া আজিকে ধ্বংস পথে?
ভগবান এলো যুগ যুগে দূত সেজে,
ধিবে গেলো প্রেম প্রিথ-বাহুরের মাঝে;
আজি তাঁর বাণী মেনেছি অথবা হিংসা চেয়েছি তব—
জাগ্রি পরীক্ষা হবে!

সম্মুখে ঐ হিংসা ও প্রেমবাণী
চাহিছে তোমার তুমিরা বায় পানি।
হে মানুষ, তুমি প্রেমের বাণীকে মেনে তুলে লবে;
হাহুক ধরনী, আগুত্ব স্বর্গ, দাক্ষা যথা দুঃগহ।

পুনরাবৃত্তি

ঐক্লপমা দেবী

যুগে যুগে মানুষ অনন্য লভেছে
এই ধরতীর কোলে ।
যেথেকে গেছে বিরাট কীর্তি তার,
সিঁথি গেছে সত্তার সহজে অমৃত
জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে,
স্থাপত্যে, ভাবের-ভাষ্যে,-

* দেশ-সেবার, প্রেমভক্তি সাধনায় ।
কত না বিশ্ব !

দিয়েছে মানুষ অনেক, নিয়েছে কী সে !
মৃত্যু তার পলে পরায়ে গিয়েছে
বীরত্বের ভয়মালা,
অসীম তার ভালো ;
বিনিময়ে সিন্ধু হাসি দিয়ে নিয়েছে বর'
বিষয় পরিমা—
সে কত না মহিমা !

যুগে যুগে মানুষ অনন্য লভেছে
এই ধরতীর কোলে—
নিভাস্ত অমাহুত হয়ে ।
ব্রজ-লিখায় লিখে রেখে গেছে
ইতিহাসের পাতার পাতায়
নিজের কল্ম কলঙ্ক-কাহিনী,
সর্বকালে সর্বদেশে কেহ তাহা
করেনি ক্ষমা ।

মানেনি ধরতীর কোনো স্থান,
তাহেনি পুষ্পের কোনো স্থান ;
লাগা বিধে ছড়ারে দিয়েছে
পাণের বিববর জালা—
বীভৎস সে শয়তানের পাশব নীলা !
সর্বহারার হাংকার উঠেছে দিক দিগন্তে ।
সে কী অপৌরুষের !

যুগে যুগে মানুষ অনন্য লভেছে ।
এই ধরতীর কোলে —
আবার মানুষ হয়ে ।
যিশুদা ধরার বন্ধে আনিবে পুনঃ
শান্তির অমির ধারা ।
নব আলোকে, উদ্বেগে নব নব
পড়িয়া তুলিবে মানবতার মহিম স্মৃতি
বিশ্ব জনগণে ।

যেথেকে দেশান্তরে মানুষ সবারে লবে টানি
জাতব্ধের নিবিড় বন্ধনে ;
যা কিছু পাপ, যত কিছু অধর্ম, অত্যাচার
হুছে যাবে নিঃশেষে মানুষের অভিধান হতে ;
সত্যের পূর্ণ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে
অগতের পুণ্য বেদীমূলে
কি বিচিত্র সে !

আবার আনিবেন ঈষ্ট, হজরত, বৃহৎ,
আনিবেন চৈতন্য, নানক, কবীর, রামকৃষ্ণ,
আবার আনিবেন মহাত্মা গান্ধী
অন্যে অন্যে কালোত্তরে—
যুগে যুগে সেই মহাজন-অমৃত-বাণী
মানুষের নব অভিধান হবে হৃৎ ;
এক প্রাণ, এক মন, এক লক্ষ্য লবে
একজিহ্বা মানুষ করিবে যাত্রা শেষ ।

সে দিন হতে সর্বশক্তিমানের অক্ষর আনন্দ
স্মৃতি পড়িবে নিত্য মানব-শিরে ;
অধিবে, মঙ্গলদে, গীর্জার, স্তম্ভধারে সর্বস্থানে
মানুষ গাহিবে বিদুর বন্দনা-গান ।
মানব যাত্রা হবে স্মরণের পরম প্রকাশ
সেইদিন হতে । আঁধি বাহ্যার
উদ্বেগে তাঁর অন্তরের প্রগতি যোব ।

বাংলার মন্ত্রী সমস্যা

প্রিয়ারপট্টর গুহ

বাংলার মন্ত্রির নিয়ে নানা গোলমাল চলছিল। কমবছর দীর্ঘ মন্ত্রী বণ্ডলীর অনাচার ও অত্যাচার ভোগের পর, হঠাৎ এখন গত বছর জুন মাসে খতিব বাংলায় কংগ্রেসী মন্ত্রির প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ এল, তখন বাংলার কংগ্রেসী মহলে খুব সাড়া পড়ে গেল। তার প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'ল ডাঃ প্রহ্লাদ ঘোষের পূর্ববঙ্গে অবস্থান করার সমস্ত ত্যাগ করে পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী হবার চেষ্টা। এই চেষ্টার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি দ্বাচার রূপালী সপ্তমী কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাকে বলা যায় দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এক মাসের মধ্যে মন্ত্রী-মণ্ডলীর পিছনের সন্ধানে ভাঙ্গন হুক হ'ল। এই ভাঙ্গনের কারণ মন্ত্রিবর্গের মধ্যেই নিহিত ছিল। এর সন্ধনের গভীর সঙ্কট হবার মূলে রইল এই মন্ত্রী-মণ্ডলীর মনোভুক্তির গড়ন। তার ফলে সনের মধ্যে এই মন্ত্রী-মণ্ডলীর বিরুদ্ধে অসহ্যের ব্যাপ্তে লাগল।

যত এর বাইরের সমর্থন কমছিল, তত এর আশ্রয় খুঁজতে হ'ল অন্তর—অর্থাৎ নিজেদের গুণীর মধ্যে এবং স্থায়ী আমলাতন্ত্রের মধ্যে। এই মন্ত্রী-মণ্ডলীর প্রথম সিককার বহুবিধ প্রহাস ঘেন ক্রমেই মিলিয়ে আসছিল। এমনি ক'রে ডাঃ ঘোষের মন্ত্রী-মণ্ডলীর গড়ন হ'ল। এর পর এলেন ডাঃ রায়। প্রধান মন্ত্রী হ'য়েই তিনি ঘোষণা করলেন—তার ঐ মন্ত্রী বণ্ডলী অদলীয় (non-party) ; কোন দলের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কংগ্রেসের মনোনয়নে পরিষদের সভা হ'লেন; কংগ্রেসী পরিষদ-সভালের চোটে দলের নেতা নির্বাচিত হ'লেন এবং সেই বলেই প্রধান মন্ত্রী হলেন। আর প্রধান মন্ত্রী হয়েই বিবৃতি দিলেন—তার মন্ত্রী অদলীয় (non-party)। পরিষদের কংগ্রেসী হল ও সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রতি এর চেয়ে অসৌজন্য ও আত্মগতায় অত্যধার বড় দৃষ্টান্ত

হ'তে পারে না। প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে এক আখ্যা দিলে, ডাঃ রায় কোন অগ্ন্যয়োগ হয় না।

প্রধান মন্ত্রী হ'য়ে মন্ত্রী চয়নের সময় তিনি দলের নাম করলেন—তার মধ্যে ছিলেন প্রিন্সলীরজন সরকার, প্রিয়ারে রাধ চৌধুরী, প্রিয়ারুয়াল হিমাংগ সিংহা, কাপ্তান নরেন দত্ত, প্রিয়ারু বিখাল এবং বর্ধমানের মহারাজা। কংগ্রেসী হল ও সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর কতখানি আস্থা, তাইই পরিচয় তিনি দিলেন, এই সব নামের তালিকা দিয়ে। আশ্চর্য-পক্ষ সমর্থনের ক্ষমতাক্রমী সৎকারের অ-কংগ্রেসী সভ্যদের দৃষ্টান্ত দেখালেন। তিনি কেবল কুলে গেলেন কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ সব অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সঙ্গে পূর্বে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে (working committee) আলোচনা করে সাব্যস্ত করা হ'য়েছিল। দ্বিতীয় কথা—যা তাঁর মনে আসা উচিত ছিল তা হ'ল এই যে—পতিতশ্রী ও পর্গারজী বা হাম্বন করতে ও আরতে রাখতে পারেন তিনি তা পারেন না। তাঁদের যে কংগ্রেসের প্রতি আত্মগত ও নির্ভীক আছে, ডাঃ রায় তা নেই। এখানে যদি তিনি বন্ধীয় প্রাণেণিক কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বা অন্তত কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের বা পরিষদের কংগ্রেসী দলের অসুস্থতি ও অসুস্থ্যমান নিয়ে হুই শাসন কার্যের ক্ষমত কোন বাইরের লোকদের নাম করতেন, তবে তা ভেদন ঘোষণা হ'ত না। তাঁর নিজেই কংগ্রেস-আত্মগত অত্যন্ত নড়বড়ে; কাজেই তাঁকে আশ্রয় করে ঐ সব কংগ্রেস বিরোধী লোকদের নিয়ে মন্ত্রী-মণ্ডলী গঠন করতে বেওয়ার মতো আস্থা, ঘোষণার তাঁর প্রতি নেই। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে লাভ নেই। তা ছাড়া, নেতা হওয়ার পূর্বে আলোচনার সময় তিনি তাঁর এই মনোভাব সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিলেন;—এতে একটা অতিগতি মূলক গোপন বড়বস্ত্রের কথাই মনে আসে।

ডাঃ রায়কে নেতা করার পূর্বে যে সব কথাবার্তা হয় তার মধ্যে একথা স্পষ্টভাবে ছিল যে সাধারণত পরিষদের বাইরের লোক নেওয়া হবে না;—যদি পরিষদের বাইরে

থেকে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে মন্ত্রী করার প্রয়োজন হয়, তবে যে কর্মী-গোষ্ঠী থেকে তিনি আসবেন, সেই গোষ্ঠীই তাঁর-অন্ত পরিষদের আসনের ব্যবস্থা করে দিবে। যে লিখিত কাগজ নিয়ে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল—তার ভাষা নিয়ে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—“The Ministry must be formed from among the members of the Assembly only unless it is absolutely essential in the interest of good work to have any from outside provided that a seat is made vacant by the section which he will represent.” এর বাংলা মর্মার্থ উপরে বেওয়া হয়েছে। পরিষদের বাইরে থেকে মন্ত্রী না নেওয়ার এই সামান্য ব্যতিক্রম রাখা হয়েছিল কেবল ঐচ্ছক কৃষার সেনের ক্ষত। সে কথা লিখিত দলিলে ছিল না; কিন্তু মুখের কথায় সেইটুকু প্রকাশ ছিল। তখন ডাঃ রায় তাঁর মনোনীত লোকদের কথা উল্লেখও করেননি।

লিখিত দলিলের অন্ত এক লম্বা ছিল—“যৈনন্দিন শাসনকার্যে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সঙ্গে পরামর্শ করা হইত সম্ভব হইবে না, কিন্তু মৌলিক ও মুখ্য বিষয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞাঙ্গা করে সত্ব স্থির করা হইবে। বিভিন্ন জেলায় জন-কল্যাণজনক কাজের বিষয়ে মন্ত্রীমণ্ডলী বিভিন্ন জেলা কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ রাখবে।” কিন্তু প্রধান মন্ত্রী হবার পর ডাঃ রায় কোন একটা বিষয়েও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সঙ্গে কোন যোগ রাখেন নি। সব বিষয়েই তিনি কংগ্রেসকে উপেক্ষা করে চলেছেন;—এমন কি পরিষদের কংগ্রেসী দলকেও তিনি এড়িয়ে চলেছেন। মন্ত্রের সভায় পৰ্ব্বত তিনি উপস্থিত থাকতেন না। কয়েকজন সভ্য বহু বিষয়ের আলোচনার ক্ষত মন্ত্রের বিশেষ সভা আহ্বান করার আহ্বোধ করেছিলেন; কিন্তু নেতা হিসাবে ডাঃ রায় ঐ সব বিষয় আলোচনার ক্ষত কোন সভা আহ্বান করেননি। বহু তিনি পোপনে ডাঃ রায়ের প্রণামকে লিখেছিলেন—এই পত্রিকায় শুধু দিয়ে আবার নৃতন নির্বাচন করা হ'ক।

পরিষদের বাইরে থেকে মন্ত্রী করা নিয়ে মন্ত্রের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ প্রথম থেকেই শুরু হয়। নেতা নির্বাচিত হবার পূর্বে প্রারম্ভিক আলোচনার সময় তিনি তাঁর ঐ ইচ্ছার কোন আভাসই দেন নি। বহুঃ এখন এককণ্ঠে লিখিত কাগজ নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রের আলোচনা হয় তখন এমন আলোচনাই হয়েছে যে বাইরের কোন লোক বিশেষ কারণ ব্যতীত নেওয়া হবে না এবং ঐ ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল কেবল ঐচ্ছক সেনের ক্ষত। আর নেতা নির্বাচিত হবার পরই তিনি জেদ ধরলেন বাইরের হাঃ জনকে মন্ত্রী করতে হবে ঐচ্ছক সেন ব্যতীত। নির্মের হকের সঙ্গে আচরণে মন্ত্রের ডাঃ পোপন করে চলার ঐ চেষ্টা—মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসহানি তির আর কিছুই নয়। হাঃ জন থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি জেদ ধরলেন—ঐনলিনী সরকার ও ঐনরেন রাঃ চৌধুরীকে মন্ত্রী মণ্ডলীর মধ্যে না নিলেই চলবে না। সেই পরিস্থিতিতে পরিষদের কংগ্রেসী মন্ত্রের অধ্যক্ষ হ'ল শাপের চুটো গেলার মতো। অগত্যা মন্ত্রের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব হ'ল যে মন্ত্রের অভিন্নত যে পরিষদের বাইরে থেকে কোন মন্ত্রী গ্রহণ না করা উচিত—কিন্তু ঐ বিষয় ডাঃ নেতার উপর সব ছেড়ে দিচ্ছে। তখন তিনি নলিনীবাঈ ও হরেনবাবুকে মন্ত্রী করলেন, এবং ঐচ্ছকসহ বিশ্বাসকেও নেবার চেষ্টা রইলেন। কথা এতদূর এগিয়েছিল যে হাটকোট হ'তে চাকবাবুকে বিশ্বাস অভ্যর্থনা পৰ্ব্বত দিয়েছিল। ঐচ্ছক মন্ত্রালকে নেবারও তিনি ধংখট চেষ্টা করেছেন। বর্ধমানের মহারাণা ছিলেন, ডাঃ রায়ের অপর একজন বাছাই লোক। কাঃ নরেন মন্ত্রের ক্ষত পরে আর বিশেষ জেদ করেন নি। কংগ্রেসী মন্ত্রের নেতা হিসাবে তিনি মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন করবেন—এমনি সব ভাল ভাল কংগ্রেস-ডল লোক নিয়ে। এ হ'ল ডাঃ রায়ের মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন করার কাহিনী।

শাসনকার্য হাতে নিয়ে তিনি কি করেছেন, সে বিচার আসছে পরে। চোরা-বাজার ও অন্ততঃ ত মিনকেমিন বেড়েই চলেছে। শাসন নাপরিকের দুঃস্থবিধার ক্ষত

এই কথোপকথনে তিনি কোন প্রকাশ করেছেন কি? বরং আত্ম এ কথা সবইটা রাষ্ট্র যে ভা: রাষ্ট্রের মহিমে অ-বাঙ্গালী ধনকুবেরদেরই শোভা-বাংগা হচ্ছে। আমরা বঙ্গাবরই সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক বৃদ্ধির বিরোধী,—কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বাঙ্গালীর প্রাচ্য বার্থ অ-বাঙ্গালী ধনকুবেরদের কাছে বিসর্জন দিতে হবে। আমাদের আপত্তি—অ-বাঙ্গালী বলে ততটা নয়, বরং ধনকুবের মূল্যাক্ষোভী বলে। কলিকাতা শহরের যান-বারনের ক্ষুদ্র কিছু নতুন বাছ (bus) আনবার প্রস্তাব ভা: ঘোষের আনলে হয়েছিল। মধ্যস্থিত বাঙ্গালী দুবক্তা এবং বিশেষ ক'রে রাজনৈতিক লাক্ষিত্য হাতে এই সব বাছ পেতে পারে তার ক্ষুদ্র ছোট ছোট কোম্পানী ক'রে সমবেত ভাবে আবেদন করার নির্দেশ দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছিল। সেই বিজ্ঞপ্তি অমূল্যের বহু মধ্যস্থিত দুবক্তা ও রাজনৈতিক নির্ধাতিত ক'রে অনেক কোম্পানী রেজিষ্টারী করে; তাদের বেশ কিছু টাকা এতে আটকা পড়েছে। এরা প্রায় অনেকটা গরিব। এই ভাবে টাকা আটকে রাখা এদের পক্ষে খুব সহজ নয়।

কিন্তু ধনী বার্থ-রক্ষক ভা: রাষ্ট্রের মহীমতা এই বিচার করবে না। তারা ঐ ব্যবস্থা বাতিল ক'রে এক বিরাট কোম্পানীর হাতে সমস্ত বাছ (bus) চলাচলের ভার শ্বেতার সম্বল করল। তিনা বাজিল ঐ ব্যবস্থার ঐশ্বর্যমুগ্ধদের বিশেষ হাত ও অস্তিত্বের থাকার কথাও হয়েছিল। এমন কথাও হ'য়েছিল—টাকার একটা মোটা অংশ দিয়ে সরকার বিস্ত্র পরিচালনার ভার থাকবে একমল ধনপতির হাতে।

"Island gold" নামে একটি লঞ্চ (launch) ১৯৪৬ সালে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সরকারের অস্ত্রাবস্তক মাল থেকে ১২০০০, টাকার বিক্রী করা হয়। পরে মাসিক ৩২৪০, ভাড়ার ঐ লঞ্চ সরকার ভাড়া নেয়। এটা হ'ল অভিবক্ত বাংলায় আদানের কথা। ঐ লঞ্চটি সরকারের কোন সাধারণের কাছেই লাগেনি; লেগেছে প্রমোদ-ভ্রমণের (pleasure trip) জন্য। তারপর সরকারী দপ্তরের কোন সজ্ঞান কর্তারী এই অল্পত ব্যবস্থার

আপত্তি ক'রে—সমস্ত চুক্তি বাতিল করার চেষ্টা বেন। ভা: ঘোষের আমল পর্যন্ত এই অবস্থা এটা ছিল। ইতিমধ্যে নাকি ঐ কর্তারীটি স্থানান্তরিত হয়েছে এবং সরকারীনীতিও নাকি বদলে গেছে। কয়েকদিন পূর্বে ভা: রাষ্ট্রের অমূল্যিত ও অমূল্যোদনে ঐ লঞ্চ ব্যবস সমস্ত টাকা—বর্তমান সময় পর্যন্ত মাসিক ৩২৪০, ভাড়া হিসাবে বেওয়ার হকুম হয়েছে। তদুচ্চি পরে Advocate Generalএর আইনগত আপত্তি ও অর্থ বিভাগের (Finance Department) হিসাবগত আপত্তির ক্ষুদ্র টাকা এখনও বেওয়ার হয় নি। এই হ'ল বাঙ্গারের ক্ষুদ্র,—এর সম্ভ্রাতা বাচাই করার বাস্তবিক অনুসাধারণকেই নিতে হবে—কারণ সরকার ক্ষুদ্র হ'তে এই বিষয়ে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা সম্ভেহ। সম্ভ্রতি এক ইচ্ছাহার তারা দিয়েছে; তার ভাষ সত্যকে প্রকাশ করার চেয়ে, সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার পক্ষেই সাহায্য করেছে।

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার সীমান্ত জেলা সমূহের রক্ষাবেক্ষণের ক্ষুদ্র একটি সীমান্ত বেজা-সেবকবাহিনী করার প্রস্তাব বহু পূর্ব হ'তেই ছিল। কথা ছিল বিভিন্ন প্রান্তিক জেলার কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ রেখে এই বেজা-সেবক বাহিনী গঠন করা হবে। হঠাৎ ভা: রাষ্ট্র একদিন এই বাহিনী গঠন করার ক্ষুদ্র উদ্যোগী হলেন এবং এর বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সভাপতি করা হ'ল বর্তমানের মহারাজকে। আর যে সব লোক এর সঙ্গে অভিজ্ঞ বলে বোধিত হল, তাদের কংগ্রেস শ্রীতি বা জনসেবার পরিচয় বেশ দীর্ঘের বিশেষ জ্ঞান নেই। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা হল বিশেষের storm-trooper হিসাবে এমন বাহিনীর উপকারিতা থাকতে পারে; কিন্তু সীমান্ত বা পার্শ্ব রক্ষার কাছের ঐ সব ক্ষেত্রীয় লোকদের তত্তাবধানে গঠিত বেজাবাহিনীর কোন উপকারিতা আছে কিনা সম্ভেহ। তিনা থাকে এই বেজা-বাহিনীর ক্ষুদ্র বেশ একটি মোটা টাকা ইতিমধ্যে ব্যয় হয়েছে। কি কাম হচ্ছে বা হয়েছে—তা এখনও অনুসাধারণ জানে না।

ভা: রাষ্ট্রের মহী-মণ্ডলীর ক্রীতি-বিচ্যুতি সংঘে বিশ্ব আলোচনা করার হস্ত এখনও সময় হয়নি। সাধারণ

ভাবে সাধারণ লোকের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা বা চলছে তা থেকে অনেকটা অস্থান করা যাবে। সরকারের হাতে জন্য ১০-১৬ হাজার গট কাপড় যে কি ক'রে ধনী চোরাকারবারীদের হাতে গিয়ে পড়ল, সে রহস্য সাধারণ না জানিলেও, এর কল তারা হাতে হাতে ভোগ করছে। সে কাচিনী কিছু ইতিমধ্যে কাগজে বের হয়েছে; কিন্তু কোন প্রতিবাদ করার প্রয়োজন ও সংসদ সরকারের হয় নি। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়ে একটা কথা ভাববার আছে। এই মন্ত্রী-মণ্ডলীর শাসনে কংগ্রেসের অবস্থা কি ঠাড়াচ্ছে? বাংলা দেশে এই প্রথম কংগ্রেস শাসন চলছে;—লোকের অন্তর একে কংগ্রেসী শাসন মনে করে। অথচ সমস্ত শাসনকার্যের মধ্যে কংগ্রেস কোথাও নেই;—যারা এই মন্ত্রী-মণ্ডলীর কর্ণধার তাঁদের কংগ্রেসপ্রীতি সুবিম্বিত। এঁরা নিজেরা প্রমোদের উচ্চতরের লোক; এঁদের নৃষ্টিও সেই দিকে নিবদ্ধ। যে সব বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলে এঁরা লোকের মনে চমক লাগাচ্ছেন, তাও ঐ উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থেরই অস্থূল; দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ ওর তলায় বা আঁকিসের কইলার (file) তলায় চাপা পড়ে থাকছে।

কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্তম্ভ সংগ্রাম করেছে একটা বিশেষ আদর্শ নিয়ে যে আদর্শসূত্রে স্বাধীনতাস্তম্ভ সমাজ গঠন করার প্রয়াস সে করবে। সেই সমাজ আদর্শ হচ্ছে বি-কেব্রিত অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গ্রাম্যপন্থায়ে স্থাপন করা। মীরাট কংগ্রেস অল্পকথায় এই আদর্শকে ব্যাখ্যা করেছে—আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও গণ-স্বাধীনতা বিস্তৃত না হ'লে জনসাধারণের নিকট প্রয়োজের কোনই অর্থ হয় না। প্রায় এক বছর হ'তে চলল ভারত স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণস্বাধীনতা বিস্তারের চোঁটা খুব বেশী হয়নি। তবুও অগ্রান্ত প্রদেশে কিছু কিছু হয়েছে; বিহারে জমিদারী প্রথা রহিত হল; হৃৎপ্রদেশে গাঁও হুসুম বা গ্রাম্য পন্থায়ে আইন পাশ হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার আজ পর্যন্ত ঐদিকে কোন চোঁটাই হয়নি;

যদি ঐ দিকে তা; যোবের মন্ত্রিসভার বা একটু চোঁটা চলছিল, তাও এই মন্ত্রী-মণ্ডলী বদলে দিচ্ছে। সবপ্রকারে এদের মনের গতি হ'ল কাচেরী-স্বার্থ ধনপতিদের সুবিধা সংরক্ষণের দিকে—কাংগ এঁরা সেই শ্রেণীর লোক। এঁদের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের এককল কংগ্রেসকর্মী জুটেছেন; তাঁদের কাছে আজ সবচেয়ে বড় কথা হ'ল পূর্ণ বাংলার লোকদের প্রতিরোধ করা। এর জন্য তাঁরা যে কোন লোকের সঙ্গে মল পাকাতো রাখী। জুড় স্বার্থবুদ্ধির নিকট মহৎ আদর্শকে বিসর্জন দেবার এই এক বিড়ম্বনাময় মনোভাব। এই অন্ধকার গর্তে অনেক লোক—যারা ব্যক্তিগতভাবে হয়ত সং—পততাকে নির্মমভাবে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। বর্তমানের স্বার্থ এসে এদের নৃষ্টিকে অবলম্বন ক'রে দেখ, এবং স্বস্তের মতো চলতে চলতে তাদের গতির পরিণতি দ্বি স্ববিধাবাদের কালো গছরে। পূর্ববাংলার দুই 'বাক্য'দের ঠেকিয়ে রাখা এঁদের শ্রেণীস্বার্থের স্তম্ভ প্রয়োজন;—তার তাকনায় এঁরা সব মহৎ আদর্শ ভুলে যাচ্ছেন। জনাব বিহার রাজনীতি থেকে এদের রাজনীতির পার্থক্য হ'ল পরিমাণগত (quantitative) গুণগত (qualitative) নয়। উভয় রাজনীতির গোড়ার কথা হ'ল হিত-স্বার্থ উচ্চশ্রেণীর স্বার্থের সংঘর্ষের ফলে উৎকৃষ্ট বিষয় ও ঈর্ষা প্রচার করা। এই রাজনীতিই আজ এককল কংগ্রেসী চালাচ্ছে।

এঁরা আজ সুযোগ পেয়েছেন। মন্ত্রী-মণ্ডলীর মধ্যে একমাত্র এঁদেরই কংগ্রেসের সঙ্গে তথ্য জনসাধারণের সঙ্গে যোগ আছে। তাই মন্ত্রী-মণ্ডলীর অপর সবাই এদের সামনে যেখানে লোককে বোকাতে চায়—মন্ত্রী-মণ্ডলীর মধ্যে কি হুম কংগ্রেসী আছে। তাই অবান্তর ব্যাপারে, এদের প্রাধান্য দেখানো হচ্ছে এবং কাউ স্বত্বপ কিছু সুযোগ সুবিধাও এদের মলম লোককে দেওয়া হচ্ছে। Honorary Advisor—বে-তলবী উপদেষ্টা হিসাবে এঁদের লোকজনকে সুবিধাজনক স্থানে বসানো হচ্ছে। ইংরাজের আমলে বে-তলবী ম্যাজিস্ট্রেট (Honorary Magistrate) যে এ-এ-বারেই অন্যায়

থাকত না, তা দেশের লোক ভুলে যায় নি। এঘনি ক'রে সুবিধা খোঁজার ধাপে ধাপে এরা নেমে বাচ্ছে—উপায়েবীর্য পর্যায়। কাছেই মহী-মগলীর মধ্যে নীতিগত পার্থক্য আর প্রাচ্য থাকছে না;—পার্থক্য থাকছে কেবল কে কতটা হঠম করতে পারে, তার উপর।

এই প্রতিক্রিয়াশীল মহী-সভার বিলম্ব দায়ী ঠাড়িয়ে-ছেন, তার মধ্যে ছিলেন শ্রীহরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও ডাঃ শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ। এই দুই ব্যক্তির কংগ্রেস নির্ভা ও ব্যক্তিগত সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই সাধারণের মনে জাগতে পারে না। এই দুই নেতার অতীত জীবন ভ্যাগ ও লাঞ্ছনা বরণের কাহিনী জিরে আব কিছুরই নয়। জীবনে এঁরা কখনও কোন ব্যক্তিগত অর্থসকলের চেষ্টাও করেন নি। তবুও এঁদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সূচনা ঘটনা করতে বাংলার কাপড়গুলি কবুত করে নি। এঁদের সঙ্গে ছিলেন হুগলীর ও অন্তর আলমের ত্যাগী কর্মীসম। ১৯০৪ সাল থেকে হুগলীর হল যে বৈশ্ববিক দূরদূরী ও আদর্শবাদের পরিচয় দিয়েছে তার ভুলনা খুবই বিরল।

এর উঠবে—এতই যদি এঁরা সবাই ত্যাগী ও আদর্শ-বাহী হবেন—তবে মন্ত্রিষের মন্ত্র এঁরা এত লালসাবিত কেন? এঁরা কেউ ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রিষের মন্ত্র লালসাবিত নন; এটা ব্যক্তিগত প্রশ্নও নয়। এই মন্ত্রিষের সঙ্গে অভিত আছে বাংলার ভবিষ্যৎ। একথা কুণ্ডলে চলবে না যে আমরা একটা বিপ্লবের ভিতর দিয়ে চলছি; বিপ্লবের এক অধ্যায় শেষ হয়েছে—কিন্তু বিপ্লব এখনও তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নি। এক অধ্যায়ের শেষে, অপর অধ্যায় আরম্ভ করার মুখে বিপ্লবের পতি কিছু সময় থমকে আছে। এই সময় স্থিত-বার্ষ্য দনপতিরা চেষ্টা করছে বিপ্লবের পতিকে উল্টো দিকে কিরিয়ে দিতে। এই মহী-সভা হ'ল সেই চেষ্টার প্রতীক।

আজ চোরাকারবী, দুলাকা সোতীর হল এই মহী-সভার করে উল্লসিত। এরা নির্লক্ষ্যের মতো মহারাজাকে চোরা মরতা দিয়ে পরিবর্ধের কংগ্রেসী হলের সভা বলে গ্রহণ করল। যে কখন বাইরের লোককে তিনি মহী-

সভায় গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, তাদের কাউকেই ডাঃ রাধ ভোলেম নি কোন না কোন উপায়ে তিনি এঁদের উচ্চ স্থলে বলিয়ে দিয়েছেন। বর্ধমানের মহারাজাকেও তিনি ভোলেম নি। প্রাচ্যরকার বাহিনীর কমিটির সভাপতি বা chairman হয়েছেন বর্ধমানের মহারাজা। এর চেয়ে চাতুস্পদ ব্যাপার আর কি হতে পারে?

মহী-সভায় পূর্ণপোষক দনপতিরা বাংলার সমস্তগুলি কাগজের বিবেক-বুদ্ধিকে ক্রয় করেছে। মহী-সভা তাদের আদর্শে। কাছেই এরা সাহস করল বাংলার ব্যাচ-গুলিকে আকর্ষণ করতে। মহী-সভার কোন কোন পুরুষদের ব্যক্তিগত আকোশও এর মধ্যে কিছুটা কাজ করছে কোন ব্যাচের জিরেকটর বোর্ড থেকে হবে কোন হু-মন্ত্রীকে সরানো হয়েছিল, সেই হিসাবের মের চলল মহী হবার পর বাড়ওয়াড়ী দনপতিদের সহযোগিতায়। কম বছরের পুরাণো ব্যক্তিগত অভিযোগের উত্তরে মন্ত্রিষের শয়মবালা ও মাদুওয়াড়ী দনপতির ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার মিলন হ'ল। তারফলে বাহাদুরী সেই জুগতিগত ব্যাচের জমার তহবিল হ'তে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘের হয়ে গেল। মহীসভার সঙ্গে বাংলার সেবা করার এর চেয়ে প্রকট সুযোগ আর কি হতে পারে।

কিন্তু আজ করার কি? এই মহী-সভা কামেমী হ'লে বসেছে;—বে অ্যাম্পর্শ যোগ এই মহী-সভায় হয়েছে, তাতে অসামরিক, বিতাপের permit, licence, contract ও অন্ত বহু বিধ উপকরণ ও উপাযানের ব্যবহার ত হবে। সব্যাসাচীর মতো উভয় হতে যে এঁরা এই সব অন্তের সম্ভাবহার করবেন—সেই বিষয়েও বেশ-বাসীর সম্মেদ নেই। মন্ত্রীষের পর ব্যাচ,—আর তার পর আসছে—কংগ্রেস। মন্ত্রীষের টিকি বাধা ত আছেই; এবার যদি বাংলার কংগ্রেসকে গ্রাস করতে পারে, তবে দনপতিষের সব বাসনা পূর্ণ হয়।

পূর্বে বলেছি—বিপ্লবের অধ্যায় পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়ে আজ আমরা ঠাড়িয়েছি। বিপ্লব কোন পথে চালিত হবে তা নির্ভর করছে, বাংলার কংগ্রেস ও মন্ত্রিষের গড়নের উপর।—বে বিপ্লব-দ্রোহী প্রতিক্রিয়া-

কতকগুলো শক্তির সমাবেশ ও যোগাযোগ হয়েছে ঐ মহী-মন্ডায়। হালাহলিক ক্ষেত্রে দেখা যায়—বিভিন্ন নির্দোষ বা প্রায়-নির্দোষ বস্তুর সংযোগে হয়ত এক ভয়ঙ্কর বিবেগ উৎপত্তি হয়। বাংলার মহী-মন্ডায়ও তাই হয়েছে। যে যোগাযোগ ওখানে হয়েছে, তা বাংলার পক্ষে হয়ে উঠেছে প্রাণঘাতী বিষ।

বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের আশ এই পরিস্থিতি মনে
 রেখে এগুতে হবে। কৃত্ত বার্ষিকি যেন তাদের বৃত্তিকে
 বিপথে চালিত না করে;—অথবা ব্যক্তিগত মনঃ-বৃত্তিও
 যেন তাদের নিষ্ঠাকে বিচলিত না করে।

‘অধ্যাপক—শ্রী প্রবীন্দ্র হোড়রায়

আমি পৃথিবীর কবি, বেথা তার উঠে গান

আমার বঁশীর স্বরে সাদা তার জাগিবে তখনি

আর এ কথা সর্বদা 'নিকোণ বার বার বলেছেন :
আমি কবি মাত্র।

রবীন্দ্র কাব্য অঙ্কুড়ের বিবরণে এক কথার দল।
যার বিবাহাঙ্কুড়িই তাঁর কাব্যের গ্রাণ। কিন্তু বিবাহাঙ্কুড়ি
কথারি মহল নয়—আর আশার যেন হয় 'ভাবন দেহতা'।

অথবা 'বিবাহকৃত্তি' শ্রেণীর কথাগুলো অনেকটা কথার
কথা হয়ে পাড়িয়েছে—রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে ও কথাগুলো
খাপ খায়, বলতে ও বেশ গালভরা তাই বেন বলা হয়।

তাই 'জীবন দেবতা' কথাটি অসংলগ্ন হোয়ালীর বস্তু 'বিশ্বাত্মকৃতি' ও 'কথারী অবস্থা' দার্শনিক হবার নিদর্শন স্বতঃ। রবীন্দ্রনাথের অত্মকৃতির কেন্দ্র যে অতি প্রসঙ্গ এবং তা যে বিশ্বকৃত্তর ডরা সে দৃষ্টান্তে কবির সংসদ থাকলেও আমাদের নেই—তিনি কবি বলেই তাঁর পক্ষে বলা সহজ এখন কি স্বাভাবিক :

ডাই যেনে নিই সে নিম্নার কথা—

ଆସାର ଶ୍ରେୟ ଅନୁର୍ଣ୍ଣନା

আমার কবিতা, জানি আমি,
পেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বজন্যমী।

আমার জ মনে হয় এই অপূর্ণতার বেদনা বোধই
 তাঁর কাব্যকে পূর্ণতার পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এই বেদনা বোধ, বিশ্বকে জানবার এই আকৃতি
এক কথায় তাঁর সমগ্র কবি-ব্যক্তিত্বের উৎস কিন্তু এক।

এই উৎসটি কি? ইহা তার কবি-বল্লনা, ইংরেজিতে
বাক্যে বলা হয় imagination. বাংলা শব্দদেও চোঁটা
করলে কী হবে, ইংরেজী অনেক কথারই ঠিক ঠিক বাংলা
তরফা করা যায় না। clerkকে বহনিক বলা

পণ্ডিতদের পক্ষে সহজ কিছু clerk যেত। তাতে সভ্যই
যাযা পড়ে। ডেবনি imagination কবিতা। কবি
কল্পনা বলে ওকে হুত বোঝানো হয় কিছু ঠিক যে অর্থে
imagination কথা ইংরেজীতে ব্যবহৃত হয় তা স্পষ্ট
হয় না কেননা ইংরেজীতেও imagination কবিতার
যানে লক্কেব নিকট এক নয় কিছু imagination
কবিতার নানা অর্থের প্রতি আবার লোভ নেই—আমি
এ কথাটিকে কোলরিজ যে অর্থে ব্যবহার করেছেন সেই
অর্থেই শুধু ব্যবহার করতে চাই।

কোলরিজ বলেন : Imagination is the redupli-
cation of the process of creation that is
going on in the eternal mind in the mind
of the individual. অর্থাৎ সৃষ্টির যে লীলা অনামি মনে
অনন্তকাল ধরে চলছে তারই অসংখ্য বহন ব্যক্তির মনে
ঘটে তখনই হয় কবি মানবের সৃষ্টি—তখনই হয় কবি
কল্পনার উদ্ভব।

রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন আধুনিক কাব্য পুরুষ—তার সৃজনী
প্রতিভা তার কবি মানবকে কবি করানোর লীলারিত ও
রূপায়িত করেছে। আর কবি সে লক্ষ্যে সচেতনও।
আবারের পুরাণে সৃষ্টির লীলা লক্ষ্যে তারী সৃষ্টির একটি
রূপক উপাখ্যান আছে—মহেশ ও উমার প্রেম এবং
হুমার লভ্য লক্ষ্যে।

মহাযোগী মহেশ অনন্তকাল ধরে ধ্যান ময়। আর
প্রিয়রাজ তখন পাকতপা উন। লুকচোর তপস্তার দ্বারা
মহেশের সেই ধ্যান ভাঙবার চেষ্টা করছে।

লুকচোর আনন্দের মাধুর্যরূপে উদয়নরূপে মহেশের
কমলশু একথা নিবিড় 'আগনে' পূর্ণ হয়ে উঠে। সেদিন
মহাভিক্ষুর হাতের ডবক শিঙা পড়ে যায়—সন্ধ্যা
বাপরি উঠে হাতে। পুষ্প লক্ষ্যে লক্ষ্যদ্বারা বক্ষিণের
বাহুর কোড়কে মহেশের ধ্যান ময় হয়ে উঠে বহির্ভূমি।
সেউতি কালক করবিকা অরণ্য বীথিকার মবীন পক্ষে
জায় বহির্ভাঙ্গা জালি দেয় ; বসন্তের বস্ত্র মোতে মহেশের
লক্ষ্যদেয়-অবদান ঘটে।

মহেশের সঙ্গে হয় উমার বিলন—হয় হুমার

লভ্য। কিছু বিশ্বের সৃষ্টির লীলার কবির দান
গোপাল।

তা কবির ভাষাতেই বলি :

তার তপস্তার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
যেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতারে বাজাই তৈরী
আমি সে কবি।

শেখিন উদ্ভব জুনি যে নৃত্যে কিরিলে যনে যনে
সে নৃত্যের ছন্দে লয়ে সংগীত রচিত করে করে
তব লক্ষ ধরে।

ললাটের চক্ষুদ্বারক নন্দনের স্বপ্ন চোখে
নিভা নৃত্যের লীলা যেনেছি চিত্র ঘোর ভরে।
যেনেছি হৃদয়ের অন্তর্লীন হাসির রহিয়া,
যেনেছি লক্ষিতের পুস্কের স্মৃতি তথিয়া।
রূপতরঙ্গিয়া।

কিছু মহেশ ও উমার এই বিবাহ প্রেম লীলার কবি
শুধু নির্বাণ ও নিশ্চেষ্ট বর্ণক নয়।

ধ্যানময় মহেশের অন্তর্ভবক পার্থক্য বিলনের বিকে
এসিয়ে বিবাহ সচেতন ভূমিকাও কবিই :

আনি আনি, এ তপস্তা দীর্ঘ রাত্রি করিছে সন্ধান
চকলের নৃত্যমোতে আপন উদ্ভব অবদান
দ্রুত উল্লাসে।

যশী বৌদনের দিন আবার সৃজন হীন
বারে বারে বাহিরিবে যাগ্রে যোগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে
বিজোহী নবীন বীর স্ববিরের—শাসন-ন্যাসন
বারে বারে দেখা যাবে, আমি রচি তারি সিংহাসন—
তারি লভ্যদান।

কিছু এখানেই সৃষ্টি লীলার কবির পরিচেষ্টার
পরিমাণটি ঘটেনি।

পাকতপা দৌরীর লুকচোর তপস্তা এবং বসন্তের বস্ত্র-
মোতের সঙ্গে কবির কাব্য সাধনাও মহেশের ধ্যান
ভাষতে সাহায্য করেছে কেননা :

তপো ভগবন্ত আমি মহেশ্বরে, হে রক্ত সন্ন্যাসী,
স্বপ্নের চক্রান্ত আমি। আমি কবি হুগে হুগে আমি
তব ভগ্নাবশেষে।

দুর্ভয়ের জঘন্যতা পূর্ণ করে যোর ভাল,
উদ্ধারের উত্তরোত্তর বাধে যোর ছন্দের জন্মদে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী;
কিনলয়ে কিনলয়ে কোকুতুল কোলাহল আমি
মোর গান হানি।

কিছু কবির এই প্রগলভ, লব্ধ উক্তি করবার
সত্যকীরের ভিত্তি কি? মহেশ্বরের অকল্পিত-যজ্ঞ
প্রবনতার সম্যক উপলব্ধিই কবিকে এই প্রগলভ উক্তি
করতে সাহসী করেছে। কবির ভাষাতেই বলি:

হে শুভ বক্তৃতাধারী বৈরাগী, হলনা আমি লখ—
জন্মেরে হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাতন
ছন্দ রণ বেগে

বারে বারে পঞ্চমরে অগ্নিতেলে বদ্ধ ক'রে
বিগুণ উজ্জল করি বারে বারে বাঁচাইবে পেয়ে
বারে বারে তারি তুণ সম্বোধনে ভরি দিব ব'লে
আমি কবি সংসীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আমি চলে
মুক্তিকার কোলে।

মহেশ ও ঠুমার মিলনে লব্ধ হয় কাব্য পুস্তকের। কবি
কল্পনা—এই জীবলীলা সম্বন্ধে কবিকে সাহায্য করে।

এই কারণেই আমাদের শাস্ত্র বলে সাহিত্য আশ্রয়
ব্রহ্ম আশ্রয়ের সহোদর।

সাহিত্য ব্রহ্ম আশ্রয়ের সহোদর কিন্তু এক নয়।
ঐ পার্থক্যটাই কবিকে কবির স্রষ্টার সঙ্গে একাঙ্গনে
বসিয়েছে। ঐ পার্থক্যটাই art-এর মধ্যে nature-এর
পার্থক্য স্পষ্ট করে করে দেখে! Nature বিধাতার স্রষ্টি
আর art মস্তিষ্কের।

রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবেই পৃথিবীর কবি। এই জীব
ধাত্রী ধরিত্রীর সৌন্দর্যের সমারোহ কবির কাব্য উৎসকে
চিত্র প্রবাহমান রাখে।

যত বড় হোক ইন্দ্রধনু সে

সুন্দর আকাশে ঝাঁক।

আমি ভালবাসি যোর ধরিত্রীর

প্রজাপতিটির পাখা

কাব্যদৃষ্টি বিশ্বদৃষ্টির সৌমিত্র বলেই ধরিত্রীর লব
কিছুর প্রতিই কবির এত সম্বোধন।

হুলির হুলি আমি রহেছি

হুলিপুরে—

জেনেছি তাই বলে লগৎ চরাচরে।

এটা শুধু আকস্মিক কাব্যিক আভিনয় জাপক উক্তি
নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল কথা মাহুগ ও মাহুগের
পৃথিবী। অব্যক্ত ইন্দ্রপুত্রীর যন্দার মালিকা, দেবতা
বাসব মহেশ্বরের সৌভাগ্যের টিকার প্রতি তাঁর কোন
শোভ নেই:

বাকো, বর্ণ, হান্তমুখে—করো স্ব্যাপান,
মেঘগণ। বর্ণ তোমাদের সুবহান,
মোরা নরবানী। মর্ত কুমি বর্ণ নহে,
সে যে মাতৃকুমি।

• •

বর্ণে তব বরক অদ্ব্যত,
মর্তে থাক হুখে হুখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা অক্ষরশ্রেণি চিত্রভ্রম করি
মৃতদের বর্ণ খণ্ডগুলি।

মাহুগকে মাহুগের পৃথিবীর মাকে এমন একান্ত করে
সম্বন্ধন করার জন্যেই ধরিত্রীর ভ্রাম-সমারোহকে উপেক্ষা
করে অব্যক্তের মূর্তি সাধনা তিনি করেন নি।

কবির কথা কবির ভাষাতেই বলি:

বৈরাগ্য। শব্দে মূর্তি, সে আহার নয়। কবি অসংখ্য
বন্ধন মাকেও মহানন্দময় হরে মূর্তির স্বাদ গ্রহণ
করতে চান। এই বহুধার মূর্তিকার পাত্রধারি ধরিত্রীর
নানা বর্ণগন্ধময় অদ্ব্যতে বার বার পূর্ণ করে তুলবার
সাহিত্যই কবির।

কেননা:

হে কিছু আনন্দ আছে দূতে গড়ে গানে

তোমার আনন্দ হবে তার দাক্ষ্যানে।

কবির কাব্য সাধনা প্রাণের মতো লক্ষ বস্তুর

মস্তকের আলোই মস্তকের মস্তকের মাঝে জ্বলন্ত কবির
উজ্জ্বল একটা অস্তিত্ব।

তখন :

মোত মোত মুক্তি তপে উঠিবে অলিয়া,

শ্রেন মোত উত্তীর্ণ হইবে স্বাধীন।

৫৫ নিঃশব্দে লুপ্ত কবির এই নিগূঢ় মনঃবোধ কবি
মনের এই গভীর মানবিকতাই কবিকে বলিষ্ঠাচ্ছে :

‘মরিতে চাই না আমি হৃদয় কুবনে মানবের মাগে আমি
বাঁচিবার চাই।’

ঐ একই কারণে তিনি ‘সেবতাকে প্রাণ’ ও ‘প্রিয়াকে
সেবতা’ করবার সাধনাও ব্রতী হয়েছেন। এই অঙ্গই
সেবতার কাহিনী না বলে মাছুষকেই সেবতা করে
তুলেছেন। এবং তাই পেরেছেন বলেই স্বীকৃত কারো
সত্য বস্তু শিব ও হৃদয় হয়ে উঠেছে। (ক্রমশঃ)

বাংলার অতীত ও ভবিষ্যৎ

সমসাময়িক্য বস্তু

উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে
সমস্ত ভারত বাংলার নেতৃত্ব অধীনতায় মনে
নিষেধিত। সমস্ত ভারতের জাতীয় চেতনার জন্ম এই
বাংলাদেশেই হয়েছে। তারও পূর্বে আধুনিক ভারতের
জন্ম ও রক্ষা। রামমোহন রায়ের প্রেরণায় এই বাংলাদেশে।
বাংলার জাতিপ্রবর্তনা এবং জীভুত্বই এক সময় সমস্ত
ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জড়নের
উপর আঘাত করে নবজাগরণের আন্দোলন সৃষ্টি
করেছিল।

বিভিন্ন চিন্তাধারা এবং সভ্যতার সমন্বয় সাধনই
ভারতের বৈশিষ্ট্য। হুগু হুগু ধরে ভারতের উপর নানারকম
সভ্যতার সংঘাত হয়েছে। প্রতিবারই পূর্বের তাৎপর্য
পক্ষে নতনের সময় হ’লে ভারতীয় সভ্যতার পর্বাদীন
উন্নতি হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক হুগু থেকে ভারতীয়
সভ্যতার অস্তিত্বের ধারা এই। এখনই সময় সাধনে
অগারণ হয়েছে—তখনই ভারতের অধনতির হুচল
হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই ভারত তার স্বাভাবিক
বৈশিষ্ট্যের কলে এই অঙ্গের হুগু কাটিয়ে উঠে এগিয়ে
নিয়েছে আবার তার নিঃস্বপ্নে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।
বুদ্বীণ শাসন আমলেই ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে
বেশী অধনতি হয়েছে। পূর্বে যে সময় শক্তি ভারতে

এসেছে—তার ভারতবাণী হিসেবেই দেশ শাসন করেছে।
ভারতের উন্নতি করেই নিঃস্বপ্নের উন্নতি করেছে। মাগে
মাগে অঙ্গই এর অস্তিত্ব হয়েছে, তবে সে ব্যতিক্রম
খুব অল্পই আর তার স্বাধীন ও ছিল কণিকের। বুদ্বীণ শাসনই
প্রথম একবারেই অঙ্গ পথে চলেছে। বাইরে থেকে
ভাষা এসেছে—বাইরে থেকেই ভারত শোষণ করে
ভাষা নিঃস্বপ্নের উপর স্তব্ধ করেছে। সেই শোষণের
স্বাধীন অঙ্গ—ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক,
সাংস্কৃতিক, এককথায় ভারতের সভ্যতার জন্ম করতে
ভাষা বিপ্লবের হস্তিত্ব হয়নি।

বুদ্বীণ শাসনের ঐতিহাসিক আমলে এই বাংলা
দেশেই ভারতবর্ষ তার বৈশিষ্ট্যকে আবার ফিরে পেয়েছে।
বাংলা দেশেই রামকৃষ্ণ আবার সময়ের বাণী শুনিয়েছেন।
বাংলার বাণী বিবেকানন্দ সেই বাণী জগতের সমুখে
উদ্ভাসিত করে—ভারতীয় দর্শনের জ্যেষ্ঠ প্রমাণ
করে গেছেন। বাংলার ঐশ্বর্যবিশিষ্ট তার দর্শনে এই
সময়ের চরম উৎকর্ষতার উপনীত হয়ে দার্শনিক জগতে
তার নাম চিরস্মরণীয় করেছে।

আজও বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, কলা বিভাগে বাঙালীর স্থান
ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ। স্বাধীনতার কথা যদি বিবেচনা
বাংলার সাহিত্যের সমস্ত কথা যদি বিবেচনা
করতে যোগ্য ভারতের যে কোনও প্রামাণিক ভাষার
অনেক ফেরী আছে। ব্যাক্তনামা বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের
ছোঁতে বিবেচনা বাঙালী এত ছাত্রও অল্প কোনও

প্রদেপে আর নেই। প্রায় সমস্ত মৌলিক গবেষণা বাংলা দেশেই হয়েছে। সি, ডি, রমণ ও বাংলার গবেষণাগারে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। এখনও ভারতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন বাঙালী রসায়নিকরা। পলার্ধ বিভাও হু' একজন বাঙালী বাঙালী প্রায় সর্বত্র। কলা বিভাগ চর্কা এখনও প্রায় বাঙালীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভারতের যে কোনও বিশিষ্ট কলা কেন্দ্রের পরিচালক বাঙালী।

সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে এখনও কোনও নতুন আন্দোলনের স্রষ্টা হয় বাংলা দেশেই। প্রায় সমস্ত প্রদেপের ছেলেরের সঙ্গে নিশে দেখেছি, বুদ্ধি এবং সাম্প্রতিক চেতনার, বিশেষ করে ভাষা বীকারে এখনও বাঙালী ছেলেরা সবচেয়ে বেশী অগ্রসর। বাংলা দেশেই শুধু যে কোনও প্রতিক্রিয়াশীল আইনের বিরুদ্ধে (মূল পথে হলেও) যুক্তকরে এখনও গর্জে ওঠে। রুটীশ ভারত ছেড়ে যেতে এবার বাধ্য হয়েছে তাকেও বাঙালীর কৃতজ্ঞ যে সবচেয়ে বেশী এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৯৪২ সালের বিপ্লবে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করতে না পারলেও রুটীশ সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে তাদের দিন ঘনিষে এসেছে। ১৯৪২ সালের বিপ্লবের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্ব কাহিনী প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতে যে বিরাট আলোড়নের স্রষ্টা হয়েছিল এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যেও যে বিজ্রোহের সূচনা হয়েছিল, তাতেই রুটীশের ভারত ভাগকে ঘূর্ণায়িত করেছে। এই আলোড়নের কেন্দ্রস্থলে ছিল বাংলা দেশ। এই বিজ্রোহের সূচনা করেছিল এবং প্রেরণা জুগিয়েছিল বাংলার ছেলে হত্যাবচস্র বহু।

মহাত্মা গান্ধী জীবনে অনেক সাফল্য অর্জন করেছেন। কিন্তু কলকাতার সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বিতি সংস্থাপন বোধহয় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান। দেশবাসী সাম্প্রদায়িক বিষয়ের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর অভিযানে বাঙালীরাই ছিল অগ্রণী। দিল্লীতে যে কার্ণে তিনি

সফল হতে পারেননি কলকাতায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সেই কার্ণে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাঙালীরা সেই নতুন এবং মহাত্মা গান্ধীর শ্রেষ্ঠ আন্দোলনে নন উদ্ভিগ্নার যে অব্যতপূর্ণ সাড়া দিয়েছিল তা যেমন আশ্চর্যজনক তেমনি অভাবনীয়। ১৯৪৫ আগস্ট তারিখে বঙ্গস্বাধীনতা কালের সাম্প্রদায়িক চানাহানি রাতারাতি ভুলে যেতে হিন্দু-মুসলমান মিলিত কণ্ঠে নবমঙ্গল স্বাধীনতার স্বাগত সন্ধ্যাপ জানিয়েছিল বাংলা দেশেই। সে দৃশ্য যে দেখেছে সেই পতীরভাবে অতিকৃত হয়েছে। সেই দ্বন্দ্বিতি হু' একদিনের জন্য একটু বাহত হলেও আজও তা বাংলা দেশে অক্ষুর আছে। বাংলা দেশের মাতামাী পত্নীর পর্বন বলেছিলেন "এই অন্ধকারে রুটি মাত্র বীণ জ্বলছে—মাহুৎ হিংসেবে মহাত্মা গান্ধী আর প্রবেশ হিসেবে বাংলা দেশ" সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বিতি সংস্থাপনার বাংলা যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তা সম্পূর্ণ অস্বপ্নরূপ করতে অল্প কোনও প্রদেপ এখনও সমর্থ হয়নি। এও বাংলার গর্কের বস।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার আজ এ দুঃবস্থা কেন? কোন প্রদেপেই আজ আর বাঙালীর সম্মান নেই। নেতৃত্ব এখন কি অল্প প্রদেপের যুক্ত সম্প্রদায় পর্যন্ত বাংলার কথার তাজির প্রকাশ করে থাকেন। একজন বিশিষ্ট সর্বভারতীয় নেতা একদিন মন্তব্য করেছিলেন your Bengal is rotten। বাগ করেছিলেন কিন্তু তার চোয় বেশী জ্বল হয়েছিল। একথা একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির মুখ ঘিরে যেত্ব কেনম করে?

প্রশ্ননেই মনে হয়, যে বাংলার নেতৃত্ব সমস্ত ভারতজক পথ দেখিয়েছে সেই বাংলায় আজ একজনও সর্বভারতীয় নেতা নেই। দেশবহু চিত্তরজন দান, হতীজবোহন সেন গুপ্ত, সমস্ত ভারতের গৌরব নেতাশী হত্যাবচস্র বহু—সবাই অকালমৃত্যু বরণ করেছেন। বাংলার জুর্ভাগা বাংলার নেতারা 'কেউ দীর্ঘজীবী নন। সবার আত্মশীল একজনও নেতা আজ বাংলা দেশে না থাকার উপনেতাদের ক্ষমতা হস্তগত করার প্রয়াসে মনোদলি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বাংলার প্রকৃত

প্রগতিশীল কর্মীরা পাক্ষা পাচ্ছেন না, প্রতিষ্ঠাপনসময়ের চক্রান্তের ফল। বিরাট ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব না থাকা একমুখি দিগে অবশ্যই বাংলার সৌভাগ্যের কথা। কারণ এইরূপ নেতৃত্ব প্রগতিশীল না হলে শ্রেণীবার্ষিকের অগ্রদূত হয়ে পড়ে। বিরাট ব্যক্তিত্বের চাপে শ্রেণীবার্ষিকী সমষ্টিগত নেতৃত্বের অভ্যুত্থান বাহ্যিক হয়। বিরাট ব্যক্তিত্ব না থাকার বাইরে বাংলার গৌরবের হানি হলেও সমষ্টিগত নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ হয়েছে। এই সমষ্টিগত নেতৃত্ব বিকাশের অগ্রদূতগণে প্রতিষ্ঠাপনসময়ের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেলেও ভবিষ্যতে চিরন্তন প্রতিক্রিয়াশীলদের সমাধি রচনা করার সম্ভাবনা আছে।

সুখাত এগারসনের মন নীতির কল বর্তমান যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যেও নেতৃত্বের অভ্যুত্থান হতে পারেনি। যে রকম ব্যাপকভাবে বাংলার যুবকসম্প্রদায়ের উপর অসামান্য অত্যাচার এই আমলে চলছে তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। বাংলা দেশে প্রতিভাবান আশ্রয়শীল যুবকের অভাব ছিল না—তাদের দৃষ্টান্তে সাধারণ ছেলেরা ভাল কাজে উৎসাহিত হয়ে উঠতো। এগারসনের আমলে বাংলা দেশে এমন একজন প্রতিভাবান যুবকও ছিল না যে পুলিশের নির্বাক হস্তের উৎপীড়ন সহ্য করেনি। এক যুগের সমস্ত আশ্রয়শীল যুবকদের দীর্ঘদিন ধরে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে নিষেধিত করা হয়েছিল। তার প্রতিক্রিয়ায় তরানীচন বাংলার যুবক-সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ল। আজও তারা সোকা হয়ে ঈর্ষাক্তে পারছেন। এই সময়েই বাংলা দেশে সাম্যবাদের বস্তুতাত্ত্বিক রূপের প্রচার শুরু হয় (অনেকে বলেন যে এর পেছনে সরকারের পরোক্ষ সাহায্য ছিল)। এই রূপের প্রচার দিকটাই নেতৃবিহীন বাংলার যুবক-সম্প্রদায়কে প্রথমে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বস্তুতাত্ত্বিক রূপের নূতন মেশার—বাংলার ছেলেরা তাদের ঐতিহ্য বুলে; অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযমতা এবং অনিয়মাহুযবর্তীতাও বিমর্ষের অঙ্গ বলে মনে করতে শিখেছিল। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য একজন প্রতিভাবান যুবকও তখন কারাগারের বাইরে ছিল না।

সেই অনিয়মাহুযবর্তীতার ঐক্য এখনও চলছে। তাই বোলের দিনে অল্প সম্প্রদায়ের লোকের পাশে, অপরিসীম মেয়েদের পাশে ছোর করে বং মাথিতে বাধীন ভাষ্যের প্রথম দোল উৎসব পালন করতে শিকিত ভদ্র বাল্যলী যুবকেরা পর্যন্ত কৃতা বোধ করে না। বিমর্ষের পরে রানিয়ারকেও নাকি এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু সেখানকার নেতারা এর ফুল অচিরেই উপলব্ধি করে যুবক সম্প্রদায়ের অগ্রদূত নৃতিকে দেশের উন্নতির জন্য অগ্রদূতকে নিষেধিত করেছিলেন। সেদিকের দৃষ্টান্তের পরেই নাকি বিমর্ষের নেতারা যুবকদের, মধ্যে পরিচয়তার নূতন আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সেই আন্দোলনে ছিল পরিচয়র থাকা ধূমপান বন্ধের চেষ্টা করা, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগী করা, নিয়মাহুযবর্তীতার অগ্রদূত করা ইত্যাদি। নেতৃত্ব সেখানে একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের উন্নতি করতে হলে প্রথম থেকেই ছাত্রসম্প্রদায়ের উপর লংচেয়ে বেশী দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যুগ বলেও ভাতীয় নেতৃত্ব এ বিষয়ে কোনওরূপ কার্যকরী পরিকল্পনা করার কথা চিন্তাও করছেন না। যাদের বর্তমান ছাত্র সমাজের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ যোগ আছে তারাও উপলব্ধি করবেন যে তা না করে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কি ভীষণ ক্ষতি তারা করছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় প্রয়োজন ছিল ছাত্রদের সংগ্রাহক মধ্যে টেনে আনবার। প্রয়োজন ছিল বিশেষ শাসনের প্রত্যাখ্যাত বিভাগভিত্তিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযান করার। সেই প্রয়োজনের বাড়িরেই তাদের অনিয়মাহু-বর্তীতাকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আজ স্বাধীনতা অর্জনের পর একথা আর কেউ ভেবে দেখছে না যে ছাত্রদের যে পথে পরিচালিত করা হয়েছে—তারা সেদিকেই চলেছে। তাদের উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে দৃঢ়ত্ব করোই তাদের কাজ শেষ হল বলে মনে করছেন। কেউ কেউ বলেন যে ছাত্রদের পরে তাদের শাসন। নেই। তারা একথা ভাবেন না এক যুগের ছাত্রদের পরে শাসন হারিয়ে দেশের অর্থ পরবর্তী যুগের নাগরিকদের উপরেই

আম্বা হারিয়ে কেল। আর তার পরিণাম কি? বাংলা দেশের যুক্তসম্রাট কোনও প্রগতিশীল আন্দোলনে কোনদিনই পিছিয়ে থাকেনি! দেশের নেতৃত্ব একটু মনোযোগ দিয়ে তাদের অপরাধ শক্তিকে নতুন পথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করলে উরা। যে আবার পাড়া দেবে সে বিষয়েও সন্দেহ করবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু হুঁশিয়ারী, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও এ পর্যন্ত জাতিগঠনের কোনও কার্য—জাতীয় সরকার দেশের যুক্তসম্রাটকে আশ্রয় করেননি। বহুনিমিত্ত কুটীল শাসন ব্যবস্থার পূর্ণ অহরণ করা ছাড়া এ পর্যন্ত কোনও ক্ষেত্রেই (যেই প্রাচ্য ছাড়া) নতুন কিছু করার পরিকল্পনা তাদের নেই। এই অহরণপ্রিয়তা এত অসম্ভব রকম বেড়েছে যে পূর্বের বড় কিছু ব্যাঙ্গাভাষার দ্বার বিরুদ্ধে তীব্র যত্ন করা হত তারও একবিম্ব পর্যন্ত পরিবর্তন করা চরনি। হাসির কথা যে আগের বিদেশী গভর্ণরের জীবন বিপন্ন ছিল বলে যে ব্যবস্থার অবলম্বন করা হয়েছিল বর্তমান জনপ্রিয় গভর্ণরেরও জীবন রক্ষার জন্য সেই সমস্ত ব্যবস্থা রক্ষা করে চলা হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে পর্যন্ত অপরাধ পুলিশ এবং সার্কেল্ট বাংলার জনপ্রিয় গভর্ণরের জীবন রক্ষার জন্য নিয়োগ করা হয়। পূর্বের গভর্ণর বহুনিমিত্ত ঘোড় ঘোড়ের ঘাটে লাঞ্চ (lunch) খেতেন কালেই বর্তমান গভর্ণরেরও ঘোড় ঘোড়ের ঘাটে লাঞ্চ খেতে যেতে হয়। তবে তিনি “মম্বিরের বেবটা”—আমি ভাবি “পুন্ডারীয়া” কি করেন?

বাংলার বর্তমান দুর্ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কারণ বোধহয় বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক বিপর্যয়। বাংলার সংস্কৃতি এবং বাংলার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত সম্রাটদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই মধ্যবিত্ত সম্রাটরাই আদর্শের অন্য সর্বাপেক্ষা বেশী ভাষা স্বীকার করতে পারে। কুটীল শাসন আন্দলের গোড়ার দিকে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছে। আর কুটীল শাসনের শেষের দিকে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অবনতি

শুরু হয়েছে। বাংলার মধ্যবিত্ত সম্রাটের বিশেষভাবে চাকরী এবং স্বাধীন ব্যবসার (independent profession—উকিল, ডাক্তার, প্রকৃতি) উপরেই নির্ভরশীল। চাকরীর উপযুক্ত শিক্ষার প্রসারও বাংলা দেশেই সবচেয়ে বেশী ছিল। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে বাংলায়ই প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছিল—উদ্দেশ্য ছিল কেরানী সৃষ্টি করা। কিন্তু উদ্দেশ্য বাই থাক এই ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দ্বারা বাঙ্গালী ছেলেরা পাকাতা গণতন্ত্র সবচেয়ে জান লাভ করেছিল। নানা দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস অধ্যয়ন করে তাদের মনেও স্বাধীনতার সূচী প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা দিকটাও বাঙ্গালীদের অন্য প্রদেশে সন্মানহানির একটা বিশেষ কারণ। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে তারা জনসাধারণের লগে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি নতুন শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল। বাঙ্গালী ছেলেরা ইংরেজী শিখে এত বেশী গভিত হয়ে পড়েছিল যে অন্য প্রদেশবাণীদের উপর ভাবিষ্টির ভাব তাদের কথায় কাজে সব সময়ই প্রকাশ পেয়েছে। সমস্ত প্রদেশের চাকরীতে বাঙ্গালীরা তখন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল কিন্তু কোনও প্রদেশেই স্থানীয় লোকদের সঙ্গে না মিশে তারা তাদের শুধু অবজার চোখেই বেখেছে। এভাবে এখনও উড়িষ্যা, বিহার এবং আশামের বাঙ্গালীদের মধ্যে বর্তমান। তারই প্রতিক্রিয়ায় অন্তর্গত প্রদেশেও ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অক্ষয় হওয়ার বাঙ্গালী বিধে ভ্রমক বেড়ে উঠেছে। বাঙ্গালীদের তাদের প্রতি অবজা আর নিষেধের চাকরীর জন্য বাঙ্গালী অন্তরায় এই দুই কারণেই বাংলা খেদান আন্দোলন শুরু হয়েছে। আর তাতে ইচ্ছা ছুটিয়েছে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার হীন আন্দোলন। এই সব কারণে বাঙ্গালীর চাকরীর ক্ষেত্রও আর অনেকখানি সীমাবদ্ধ। অথচ ইংরেজী শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে চলেছে। কার্ণকরী বিচার অহুইলন এখনও প্রসার লাভ করেনি একটুও। বাঙ্গালীর দ্বিতীয় অবলম্বন ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি বণ্ড এবং উপবণ্ড। তাতেও

ভাষন করেছে অনেকদিন থেকেই। বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্ভ্রান্তের হরিব্রত অঙ্ককার হয়ে উঠেছে। তাই বাঙ্গালী নিত্যের মধ্যে ক্রমশঃ আত্ম হারিয়ে ফেলেছে। গণে ঘাটে বাঙ্গালীর মুখের ভিত্তে পাগো ধায় বাঙ্গালীর কিছু হবে না। এটাও একটা বিশেষ দুর্ভাবনার কথা। তাহা আমাদের নিত্যের অবস্থার বিবেচনা করে-সংকীর্ণ ক্রান্তিকালের অঙ্গ না হয়ে-অন্ত প্রদেশবাণীর উপর তাঙ্কির প্রকাশ না করে-নির্মল্লের শক্তি সম্বন্ধে সন্তোদন হবার প্রয়োজন হয়েছে। যে বাংলার বহিঃমস্ত, স্বাধীনতা, পরঃমস্তের মত সাহিত্যিকের ভ্রম হয়েছে, যে বাংলার ক্রান্তিকালের মত পার্শ্বিকের ভ্রম হয়েছে, যে বাংলার অবনীপ্রনাথ, পগনেপ্রনাথ, নন্দলালের মত কলাবীরের ভ্রম হয়েছে, যে বাংলার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, সন্তোদন বহুর মত বৈজ্ঞানিকের ভ্রম হয়েছে, যে বাংলার গান্ধীমোহন বাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাপরের মত পন্থা সংস্কারকের ভ্রম হয়েছে, যে বাংলার রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীহরীবন্দ্যের মত মহাপুরুষের ভ্রম হয়েছে, যে বাংলার সুহোদ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় বতীন্দ্র মোহন, দেশপৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত রাষ্ট্র-নৈতিকের ভ্রম হয়েছে এবং সবোপরি যে বাংলার দুর্বাক্তা লোকচন্দ্র অস্ত্রায়ে দেশের মুক্তিকল্পে অকৃতোভয়ে জীবন বলি দিয়েছে তার ভবিষ্যৎ অঙ্ককার হতে পারে না।

বাণীনাথ অর্থনের পর কার্যেই দার্শন্যবাদী প্রতিষ্ঠান-
মিল-শক্তির ক্ষমতা হস্তগত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে
স্বাক্ষরপ্রদানকরূপে বাণ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা বাণ্যকেই আবার
পথ দেখানো হবে। প্রেমী দার্শন্যবাদী সমষ্টিগত নেতৃত্বের
ক্ষমতা বাণ্যের বহুকর্মী ইতিহাসেই কাঙ্ক্ষিত ফল
করেছেন।

বাংলা ব্যবস্থাক্ষেত্রের পর আর এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব বঙ্গ থেকে হিম্মত চলে এসে পার্বত্যবর্তী বিভিন্ন প্রদেশে গলে গলে ছড়িয়ে পড়ছে। ইহুদীদের একদিন প্যালেস্টাইন থেকে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। ইহুদীরা তাদের জ্ঞানে, বিচার্য কৰ্ম দক্ষতাৰ পৃথিবীর সমস্ত দেশের সভ্যতার নতুন প্রেরণা এবং স্বয়ং-প্রতিভার বিকাশ করেছে। বাংলা দেশ সম্পর্কে এক সময় তিসিক বলেছিলেন, আজ বাংলা বে চিন্তা করে ভারত কাল সেই চিন্তা করে। এই উক্তি আমাদের দৃষ্টির সঙ্গে গ্রহণ না করে—বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। এই নতুন পরিস্থিতিতে অস্বস্তি কয়েকটি যে সময় বাংলাদেশ ছড়িয়ে পড়ছেন উন্নয়ন, পূর্বের তুলনা না করে বাংলার বুদ্ধিবৃত্তি, ভাবপ্রবণতা, ত্যাগ এবং সর্বাঙ্গের তার বিরাট সাংস্কৃতিক প্রভাবে যদি সেই সময় প্রবেশের জনসাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা না করে, তাদের দ্বারা আর কতবার চেষ্টা করেন তবেই প্রকৃত বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি হবে—বাংলা জাতির সমস্ত ভারতের নৈবেদ্য গ্রহণ করতে লক্ষ্য হবে।

कवि चोकार

আমাদের বৈশাখ সংখ্যাত্তে 'হাস তুনিহার নিশাবদান' নামক যে কবিতাটি ছিল সেই কবিতাটি ঐশ্বর্যর সোম কর্তৃক রচিত, বাস্তবের দস্তার নহে।

হেথাও ওঠে চাঁদ

ঐক্যশাস্ত্রী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

তারপর করমিন আর তপন আসেনি। মাকে মাকেই মালতীর মনে হয়েছে তপন আসছে না কেন। দিন বেশেক পরে, বিকালে তপন এল। মালতী চাবের আধোক্ষন করল। চা খেতে খেতে তপন পকেট থেকে পকাশটা টাকা বের করল। বলল—“এই দেখ...দেখুন মাগ করুন...”

মালতী বলল—“মাগ করার কিছুই নেই। আপনি বরষে বড়ই হবেন। কাজেই তুমি বললে কোন অপরাধ হবে না বরং সুখীই হব।...তারপর কি বলছিলেন?”

তপন—“তা হলে ওটা কিন্তু হুতরকে-ই হতে হবে। একতরফা ব্যবস্থাতে রাজী নই।”

মালতী—“তা পরে দেখা যাবে...”

তপন—“আজ মাইনে পেয়েছি। মেসের বেনা দিয়ে বাকি পকাশ টাকা আমার হাতে আছে; এখন বল কি করব?”

মালতী—“বা, আপনার ঠাণ্ডা কি করবেন তা আমি কি বলব।”

তপনের হাতবীণ সুখানা হঠাৎ বিসর্গ হয়ে গেল। সে বলল—“আমি যে এসব কিছুই পারি না।”

মালতী একটু দুঃখিত হয়ে বলল—“আচ্ছা, রাখুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।”

টিক চল টাকা মালতীর কাছেই থাকবে—তপনের বরকার মতো সে নিয়ে যাবে। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল তার বরকার এত ঘন ঘন ও এত বেশী পরিমাণে হয় যে মাসের শেষে তপনের পছিত টাকার চেয়ে পাঁচ সাত টাকা সে বেশী নিয়েছে।

সে একবার মনে করল, মাসের লব হিসাব তারিখ দিয়ে দিয়ে একখানা কাগজে লিখে তপনকে বেবে।

কিন্তু একটু পরেই তার মনে একটা কোমল ভাব এল— এই পাঁচ সাত টাকার মাত্র খেচারাকে এমন মল্ল করা টিক হবে না। সে এতে খুশি লক্ষিত ও দুঃখিত হবে। রাগে অনেক সময় পর্যন্ত মালতী এ নিয়ে ভাবল। তপনের প্রতি তার মন কলপায় ভরে উঠল। টিক করল, মাসনের মাসে এ রকম হতে বেবে না।

এ মাসেও তপন মাইনের টাকা এনে মালতীর হাতে দিল। মালতী বলল—“এমালে কিছু সাবধান হয়ে খরচ করতে হবে, তপনবা।”

তপন—“কেন, গত মাসেও ত সাবধান হ’য়ে খরচ করেছি—আমি ত’ খুব সাবধান হ’য়ে গেছি। তবে এমালে আমার একটা ইচ্ছা আছে—রাখবে, মালতী?”

মালতী—“কি ইচ্ছা, বলনা।”

তপন—“না, তুমি রাখবে, বল...”

দুই চারবার কথা কাটাকাটির পর মালতী মত দিল—খুব অল্পসল্প না হলে রাখবে। তপন বলল—“হুই একদিনের মধ্যে তুমি আর আমি—কেবল হু’তনে সিনেমা যাব। আর কেউ থাকবে না—কেবল তুমি ও আমি...কেমন, রাজী মালতী?”

মালতী একটু হেসে বলল—“তা কি করে হয়—কোম্পানী কেবল তোমার আমার মত কি সিনেমা দেখাবে?”

তপন হেসে বলল—“আমাকে কেবল বোকা বানাচ্ছ—আমি কি তাই বলছি! আর যারা থাকবে তাতে আমাদের কি! আমরা আর কাউকে লকে নেব না। কবে যাব বল?”

মালতী—“বেশ, বেদিন তোমার ইচ্ছা।”

টিক হল, শনি ও রবিবার বাস দিয়ে এ সপ্তাহে একদিন যাবে। শনি ও রবিবার বহু লোকের ভীড় হয় এবং হুতর পরিচিত লোকও হুঁচারণন চোখের সামনে পড়তে পারে—তাই এ হুঁটা দিন বাস বেওয়াই ভাল।

পাশাপাশি দুই সিটে ব’সে হু’তনে সিনেমা দেখছে। থর স্বভাব—চোখের সামনে পরবার উপর আলোর

নাচাপুরী বড়িত হয়েছে। নর-নারীর বিবাহ-মিলনের
অতি উজ্জ্বল ছবি সেই মাচাপুরী থেকে দেখা গিয়েছে।
যে ছবির বাস্তব কোন সন্ধান নেই—যে বিবাহ ও মিলনের
খেলা মাচাঘরের সজ্জাকার জীবনে কল্যাণিত দেখা যায়
—সেই রোমান্টিক ছবি পরমার পায়ে আলোর মাচাপুরী
থেকে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তারের মনকে স্পর্শ
করল। তারা যেমন তারের মনের মাঝে 'যে কামনা
ছুনিবে ছিল, যা তারা নিজেরাও জানতে পারেনি—
ছবির গায়ে তা ছুটে উঠেছে।' বিব্রিত নির্ভীক ছবি বেধে
কবি বলেছিলেন—“তুমি কি কেবল ছবি—ভূ পটে
লিখা।” এট চকমক করে ছবিকে আশ্রয় করে “নহয়
গায়ের ছোটে দুই জীবন-নির্ভরিতা।”—যা দেশে উভয়ের
মন ব'লে উঠল—“আমার নিখিল তোমাকে পেয়েছে
তার অন্ধরের নিল।”

তারের অন্ধর হা হা করে কেঁদে উঠল—নিজের
অজান্তারের দু'জনের হাত প্রগাঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হল

তিন ঘণ্টা পরে তারা যখন বেহিরে গেল—তখন
হুটী নৃতন মাহুর বেহিরে এল। রাত তখন বাঙা।
তখন বলল—“গভীর ধারে একই মাঝে?” মোহাবিষ্ট
মালতী যেন নিজের মনের বাসনার প্রতিফলিত ঐ কথা
মথো গেল।

নির্জন পল্লভীরে তারা ব'লে আছে। তারের সমস্ত
অবয়ব দিয়ে এত কথা বলেছে যে, মূখ দিয়ে কথা বলার
প্রয়োজন ছিল না। শব্দ করে পরস্পরের হাত ধরা
আছে। বিব্রলী বাতির আলো মালতীর মুখের উপর
পড়েছে—কচুইতে ভর দিয়ে তখন মালতীর মুখের বিকে
তাকিয়ে আছে। মালতী বলল—“কি দেখছ এমন
ক'রে?”

তখন বলল—“মালতীকে বহুবার দেখেছি—কিন্তু
আজ দেখছি আমার মানসীকে।”

সে আশে আশে তার মাথাটি ছুঁয়ে মালতীর উরুর
উপর রাখল। মালতী তার অঙ্গবৃত্ত কোণগাশির মধ্যে
অঙ্গুষ্ঠাচালনা করতে করতে মাথাটি উরুর উপর ভাল
করে গুঁইয়ে দিল। তখন সেই তাবেই তরে গড়ল।

দূরে ঘড়িতে ছুটী বেধে গেল। মালতী বলল—
“এবার বাড়ী চল……”

(৪)

একদিন তখন ও মালতীর কথাবার্তা হচ্ছে। মালতী
বলল—“বেশ, তোমার এমন উত্তমচর্চা স্বভাব ছাড়তে
হবে। আমায়ের আর ত'খুব বেশী নয়; দু'জনের আয়ে
কোন রকমে চলে যাবে। লাইক ইন্স্যুরেন্স কিছু প্রথমেই
করতে হবে।”

তখন বলল—“বেশ—এখনই তুমি সুবিরীনা শুরু
করো—কিন্তু তোমার এক হুটী কাপড়-জামা ও আমায়ের
বাসার শাক-সব্জা এ দুটো আমার ইচ্ছা মতো করতে
দেবে। তারপর যা খুশি তুমি কোরো। খেতে লাও খাব,
না লাও খবর হ্যা পান করেই কাটিয়ে দেব।”

মালতী বলল—“খালি হুঁমি……” তখন বলল—
“বেশ, আর এখটা কথা। আমি তোমার ভাকব লতা—
কখনও যা মালা, কিছু তুমি আমায় কি বলে ভাকবে?।
সেই মাছাতার আমায়ের 'গোপা' 'গো-গো'—ভলব চলবে
না।”

মালতী—“তবে কি ব'লে ভাকব?”

তখন—“কেন, আমায় কি নাহ নেই?”

মালতী—“ওগব চলবে না—যাও, ছিঃ।”

তখন—“বা, সে হুগের কোন কিছুই মানবে না……”

অথচ কুলংকারগুলি মানবে! এত বল পবিত্র আইডো
থেকে মাঠাষ্ট্র হ'লে কেন, যে এটা গায়বে না……”

এমনি ভরকের পর রক্তা হল মালতী নাম ধরে ভাকবে
না কিন্তু নামের অঙ্গ ধরে ভাকতে আপত্তি নেই—তাই
সে তপ, তপু বা পণ ও পণ্য বলে ভাকবে।

সেদিন যখন দু'জনে পরস্পর থেকে বিদায় নিল,
দু'জনেই মনে জানল এবং মুখেও বলল—এত স্থবী জগতে
কেউ কখনও হয়নি এবং এমন পৃথিবী ভালবাসাও কোন
ছুটি নরনারীর মধ্যে কখনও হয়নি।

এইই সাতদিন পর, তাদের পরস্পর দেখা হল স্নিহা
সত্যার।

যে নারী বিবাহ সভায় গিয়ে ছুটি প্রেমিক ভবনের সব কিছু ওলট-পালট করে দিল—তার নাম মণিকা। কয়েক বছর আগের কথা। তখনকে তার বাবা বাড়ী থেকে পাঠান—কি ভদ্র তা লেখেন নি—তবে মজারী প্রয়োজন। তখন বাড়ী গিয়েই শুনে তার বিয়ে। তখন প্রথমটা আশঙ্কিত করল। কিন্তু বাবা কথা দিয়েছেন—সব ঠিক হয়ে গেছে এবং মণিকার বাবা মণিকাকে পছন্দে মেবার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হাজারখানেক টাকাও দেবেন, সোনা-গহনাও ও হান-সামগ্রীতে আরও হাজার দুইশেক দেবেন।

কতক ইচ্ছা, কতক অনিচ্ছা, কতক বাবার ভয়ে, কতক মনের প্রবল বাসনা, কতক টাকার লোভে এবং কতক নব-বধূর যৌবনের আকর্ষণে হবোণ পুয়ের মতোই সে বিয়ে করে কেলল। কিন্তু বিয়ের পরেই বেখল—টাকা সবটা নিয়ে গেলেন বাবা, মণিকা একটি সাধারণ গ্রাম্য-বাগিকা; হাব-ভাবে মিক দিয়ে সে ঘোটেই আধুনিকা ছিল না; তপনের রোমাঞ্চক মনে তার ক্ষম-লক্ষ্যের বে ছবি ছিল, মৈত্রিক সৌন্দর্য ও মনের বিকাশে মণিকার সঙ্গে তার কোনই মিল হ'ল না। তারপর তার আশা ছিল, অন্ততঃ একটা সোনার ঘড়ি ও ডি-লুস কলম একটা পাবে। তার বাবা তাকে সেই প্রলোভন দেখিয়েছিলেন, যদিও মণিকার বাবার কোন সম্মতি এমন কি অবগতিও এর মধ্যে ছিল না। সে আশ পাঁচ বছর আগের কথা।

মণিকাকে সে নিষেধ স্ত্রী ব'লে কখনও গ্রহণ করল না। বিয়ের পরে সে কথাচিৎ বাড়ী বের—এবং কথাচিৎ বাড়ীতে চিঠি লিখত। আজ দু'বছর হল মণিকার একটি ছেলে হয়েছে। এর পরও বাবী বা পিতা হিসাবে কোন দায়িত্বই সে ওখানে বোধ করেনি। বরং ছেলে হওয়ার পর সে বেন মণিকাকে আরও বৃহৎ টেলে রাখল,—পাছে, ছেলের দাবীতে মণিকাও তার উপর নতুন কোন দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

(৫)

বিবাহ মণপ থেকে বেয়ে সে রাতে মালতী বে ঘরে ঢুকল, আর সে ঘর থেকে বের হল পরদিন প্রাতে, সে

বাড়ী থেকে মনে মনে চিরবিবাহ মেবার সময়। বাবা, কৈশোর ও যৌবনের কত স্মৃতি এই গৃহের সঙ্গে জড়িত ছিল। কাল ছিল সে বিয়ের কথা—সকলের আশ্রয় ও আশ্রয়দেয় দায়ী, আজ সেই বাড়ী থেকে সে বেরছে জীবনের সমস্ত লক্ষ্য হারিয়ে। সবচেয়ে তার লাগল এখন তার স্নেহময়ী মায়ের কাছে বিহার নিল। যা অতিক্রমে মনে ও চোখে বাধ দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন মালতী হাঁটু পেড়ে মায়ের পায়ে প্রণাম করতে গিয়ে কত ক্রমবর্ধন যে সে উঠতে পারছিল না, তখন তার মায়ের আর নিঃশব্দে সন্মরণ করতে পারেন না।

বিবাহ সভায় ঐ গোলামাল থেকে তার বিবাহ মেওয়া পর্যন্ত আর একটি দোক, সব সময় তার পক্ষ সমর্থন করেছে—সে হল তার দাদা মণিকার বন্ধু প্রতিবেশী বিজুবাবু। ঐ গৃহস্থার সময় মালতী তাকে-ও প্রণাম করল। বিজু বলল—“মালতী, আজ থেকে তোমার জীবন এক নতুন রাস্তায় চলতে শুরু করল। আমি জানি যা ছোট ও ছোট এমন কিছু তুমি করবে না। বাই তোমার জীবনে ঘটুক, নিঃশব্দে একেবারে বহনহীন ও আশ্রয়হীন ব'লে মনে কোণো না। আজও তুমি একই গ্রহণে অনেকের সঙ্গে জড়িত,—তুমি নিজের ইচ্ছে মতোই সেই গ্রহণ থেকে বের হয়ে যেতে পার না। তোমার আচরণের ভদ্র, তোমার ভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ভদ্র, ঐ সব গ্রহণের দায়িত্ব ও অংশ আছে।” একটু থেমে সে আবার বলল—“জীবনে তোমার বাই ঘটুক, আবার কাছে তুমি সব সময়ই আশ্রয় পাবে। আমার বাড়ীর ঠিকানা ও তোমার জানাই আছে, যেখানেই থাকি না কেন, ঐ ঠিকানায় চিঠি মিলে আমি পাব।.....জীবনে তোমাকে অনেক বা বেতে হবে, তার ভদ্র প্রস্তুত হবে চ'লো।”

পাড়ী ছেড়ে মিল—সঙ্গে তার দাদা মণিক। গাড়ীর গতির সঙ্গে তার মনও তার অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলল। অনিদিষ্ট “তার জীবনের গতি। ভবিষ্যত অনিশ্চয়—কোথাও এতটুক আলোর রেখা দেখা যায় না। সাত-আটদিন আগে এই পথে সে বাড়ী দিয়েছে—বিয়ের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী সে তখন

নিম্নে মনে করছে। আর আশা ? নিঃ—তিব্বতিয়
চেহেও নিঃ।.....

.....জ্বিন আগেও সে মনে করত, জীবন ভরে
যৌবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বিয়ে—সে কেবল তপনকেই
চেয়েছে; আর তার ভাগ্যবিধাতা তার সমস্ত কামনাতে
মুতি দিয়েছে তপনেই ভিত্তি। কি বিধার বেনাতি দিয়ে
ভরা তার—হৃদয় বা সমস্ত মেহেরই জীবন! কাল এ
সময় কি ছিল—আর আশা এ সময় কি-ই বা নেই—এই
একদিনের মধ্যে কি সে হারিয়েছে। যার জন্য তার সমস্ত
জীবন আজ সংসার। কাল যদি তপনের স্ত্রী না আসত
তবে বিয়ে হয়ে যেত; আরও সে দুখ লাগবে তুবে
থাকত। তারপর-ও তপন তাকে চেয়েছে—তার প্রণয়
নিবেদন করেছে; সে বলেছে, তার ভালবাসার
আনিকোই সে প্রস্তাবনা করছে। তার মনে পড়ল
তিহারবার কথা—বসন্ত ও বসন্তের সাহায্যে একদিনের
জন্ত সে নিজের সৈনিক সৈন্য ঢেকে অর্জনের মন হরণ
করল। তাও ত' প্রস্তাবনা—কিন্তু.....না, না তপনের
ব্যবহার এর সঙ্গে ভুলনীর নয়....। তার স্ত্রী আছে,
পুত্র আছে—এদের প্রস্তাবনা করেছে; তাকেও প্রস্তাবনা
করেছে।

আর মালতীর মনে পড়ল, তপনের বন্ধু হরিদাস
একদিন তপনকে তার বাসা থেকে বের করে দিয়েছিল।
কারণ, হরিদাসের অহুপস্থিতিতে তপন তার বুড়ী স্ত্রীর
সঙ্গে অত্যধিক মেলামেলা করত; এক সঙ্গে বেড়াতে
যেত; তাকে কি কি উপহার কিনে দিয়েছিল। তপন
তার কাছে কৈফিয়ত দিয়েছিল—এ বউটি ওকে বেতে
বলত। হরিদাস বউটির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না,
তার লখ-লাখ মতো কোন ভিনিবই তাকে দিত না—
তাই যেচারী খুব দুঃখ করত। তখন মালতী মনে মনে
বিখ্যাস করেছিল, এটা তপনের উদারতার পরিচয়—হয়ত
সে উদারতা অভ্যস্ত বেঁ-হিসাবী, হয়ত একটু অপোভন
—কিন্তু নির্দোষ। আর মনে হল হরত বন্ধুকে প্রস্তাবনা
করাও তপনের পক্ষে অসম্ভব নয়।

আর মনে পড়ল বিজ্ঞানীর কথা। দামার বন্ধু, গ্রামের

প্রতিবেশী এবং একটু আত্মীয়তা আছে। তাই বিজ্ঞানীর
সঙ্গে মেলামেলা বেশব থেকে শুরু হয়েছে এবং পুত্র
পঙ্কজ তাই চলেছে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত। বিজ্ঞানীর
কাছে পড়াশুনা করেছে, বিজ্ঞানীর সঙ্গে খেলা করেছে,
ছুটানি করেছে, বিজ্ঞানীর কাছে আশ্রয় পেয়েছে, মারও
খেয়েছে। মালতী তখন গ্রামের লম্বা বালিকা জীবনে
দিন কাটাচ্ছিল। বিজ্ঞানী তখন কলেজে পড়ে। কিসে
কি হল মালতী জানে না; গ্রামের ছুটিতে বিজ্ঞানী বাড়ী
এসেছে। কিছুদিন পরই যা যাবণ করে দিলেন
বিজ্ঞানীর সঙ্গে আর এমনিভাবে মিশতে পারবে না।
বিজ্ঞানীর সঙ্গে ছুটানি করতে না পেলে, তার সঙ্গে খেলতে
না পারলে মালতীর মনটা বেনে অল্প থাকত। বিজ্ঞানীও
খেঁচি বখন-তখন তাদের বাড়ী আসেন না—এলেও
মালতীর দামা মানিকের সঙ্গে বাইরের ঘরে বলে কথা
ব'লেই চলে যান। তখনও গরমের ছুটি ছুতোয়নি;
হঠাৎ বিজ্ঞানী পহরে চলে গেলেন।

নিজের মনকেই মালতী তখনও জানে না; কামেই
পরের মনকে বুঝার ক্ষমতা তখনও হয়নি। তখন
তার বয়স মাত্র তের-চৌদ্দ। পরের ঘটনা মিলিয়ে
মালতীর পরে মনে হয়েছে বিজ্ঞানী তাকে ভালবাসতেন।
বিজ্ঞানীর ঐ চ'লে যাওয়ার পর সাত-আট বছর কেটে
গেছে। পরে অনেক কথা সে জানে; অনেক কথা
পরে সে বুঝেছে। কিন্তু সে ত অতীতের কথা। আর
বিজ্ঞানী তার জীবনে কি! তার পক্ষে বিজ্ঞানী কেবল
হরত হ'তে পারত;—সবই অতিক্রান্ত, সম্ভাবনা এর
বর্তমান ভবিষ্যৎ কিছুই নেই।.....বিজ্ঞানী পুত্র, বহু পুত্র
তার নিকট উদ্ভূত আছে। দেশ সেবার পথ ধরে সে
একবার কিছুদিন মেলেও কাটিয়ে এসেছে। প্রথম
যৌবনের একটা খেলা—কবে তা বুঝে গেছে।...

তারপর তার দুটি পড়ল নিজের অস্থিরের দিকে।
কাল বা কানায় কানায় গ্রেমে ভরপুর ছিল, 'আর তা
তলা পর্যন্ত শুকিয়ে খা খা করছে। কেন এমন হল ?
তার এই হীনতা গ্রেম বা ভালবাসার দাম কি ? বা
কাল এত গভীর ও অস্থির মনে হয়েছে, আর তা

একবারে নিঃশেষ কেন? তপনের এটুকু প্রতারণায় সব উড়ে গেল! এর কি নিষেধ সত্তা কিছুই ছিল না—সবটাই কি ছিল তপনের আত্মবিকৃত্যের উপর পরগাছার মতো? ভালবাসা, প্রেম কি এমন আপেক্ষিক, এমনি পার্থক্যই!—এমনি প্রতিদান কামী

তাই ঠিক—তার ভালবাসা প্রেম সবই মিথ্যা। যে জিনিষ এত সহজে যায়, তার ব্যতীত কোথায়? কিন্তু তবে এ ব্যথা কেন?—আমি বেদনার তার মন ভরে উঠেছে কেন?—একি প্রতারণার বেদনা?—একি তার নারীত্বের প্রতি অপমানের ব্যথা? হত তাই! তও, প্রত্যেক তপন...

কিন্তু কাল রাতে তার মিনতিভরা মুখ... তাও কি প্রতারণা.....। সে আর ভাবতে পারছে না। বা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, তাই আমি মনে আগছে। সবই যেন আত্মপ্রতারণা। কালকে পর্বত বে গ্রেস, বে ভালবাসা সে অহত্ব করেছে, তাও যেন আত্ম-প্রতারণা; আমি যে ব্যর্থতা ও অপমানের জালায় মনে করছে যে প্রেমের এক বিদূষক আমি বই, তাও তেমনি আত্ম-প্রতারণা—হত ইশপের শৃঙ্গালের মতো সেও মনে করছে আমার বড় টক—কারণ তা তার পাওয়ার বাইরে। হত তপনের প্রতি আমায় বিতৃষ্ণা দতা নয়—হত তার সর্বগ্রাসী কামনা ব্যতীত হওয়াতে ঐ শৃঙ্গালের মতোই সে আমি মনে করছে—চাইনা, চাইনা তপনকে!

জীবনে কি সত্তা কিছুই নেই? সবই তবে আভাস মাত্র—সবই ভুল। প্রেম, ভালবাসা, ভালমুখ, হৃৎ-হৃৎ—সবই মিথ্যা। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা অতি সত্য—আমি সে নিঃশ, নিঃশব্দ। এই বোধ বেদনা-হারক—অপমান জনক-ও। সর্বজন পরিত্যক্ত সে; তার জীবনের কোন মূল্য কেউ দেয়নি; সমস্ত যৌবন—তার মনের হৃৎকা, দেহের সৌন্দর্য সবই কুখ্য ব্যাজে। কোন সঞ্চয় এর মিনিমরে তার মনের কোঠায় জমা হয় নাই। যে রূপ তার সিন্দুরের গর্ভে অর্থ জমিয়ে রাখে—তার

ব্যবহার করে না, সে হতভাগ্য। আর যে নারী তার যৌবনকে যেহের রক্তে রক্তে শুকিয়ে মারে—তা দিয়ে কারও মনে আনন্দের উদ্রেক করে না,—নিষেধ জীবনে তা দিয়ে কোন আনন্দ সঞ্চয় করতে পারে না—সে নারী অর্ধরূপের চেয়েও হতভাগিনী। তার যৌবন, ঐ সবই ব্যর্থ।

মালতী নিউরে উঠল—তার যৌবন কি তেমনি ব্যর্থ হবে? এর মিনিমরে কি কোন আনন্দই তার জীবনে বা অপর কারোর জীবনে সঞ্চারিত হবে না! না, না এমন ব্যর্থ তার যৌবন কেন হবে! এমন অভিসম্পাত তার জীবনে কেন আগবে! কাতকে জীবনে সে ত হৃৎ-হৃৎ চিন্তে চায়নি।

ট্রেন ছুটছে.....অবশেষে কলিকাতায় এসে সে পৌছাল। আবার নতুন চিন্তা উপস্থিত হল। মেসের শীট সে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। নতুন বাসা ভাড়াও তাদের ঠিক ছিল।

মেসের সবী ও বাছুরীরা সবাই তা জানে। অপমান ও লজ্জার বোকা নিয়ে আবার তাদের কাছে যেতে হবে। তার হঠাৎ আগমন যে অভ্যস্ত অপ্রত্যাশিত—বিয়ের পরদিন থেকেই এভাবে আসে না! তাদের উৎকর্ষিত ও কোতুলী শত প্রেমের অবাধে সে কি বলবে! তবুও সেই মেসেই তাকে যেতে হল। কোন কিছুই ত গোপন থাকবে না। অপমান ও লজ্জা তার জীবনে যা ক্ষয়ে উঠেছে তা একদিন দু'দিন গোপন করে আর কি হবে!

মেসে আসতেই তার সহবাসিনীরা সবাই কলরব করে এসে ধরল। মুখ নীচু করে তাদের পে এক কথাও জবাব দিল—বিয়ে হয়নি। কেন? তপনবাব কোথায়? আজই তুমি চলে এসে কেন?—এমনি বহু প্রশ্ন। কোন জবাবই সে দিল না—তার চোখ ভরা মিনতি নিয়ে সে তাদের কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিল। কিন্তু মাছবের কোতুল—বড়ই প্রবল। অবশেষে মালতী বলল—“বললাম ত' বিয়ে আমার হয়নি। তোমাদের কাছে থাক চাই—আর কিছু এখন আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না; আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও।”

শাফা বলে একটি ঘেরে—মালতীর চেয়ে দুই চার বছরের বড় হবে। সে বলল—“বাস্তবিকই, ওকে এখন একটু বিশ্রাম করতে হাও; দেখোনা কি রকম ওর চেহারা হয়েছে। ... মালতী, বৈশি দেখি কলি না; একটু বিশ্রাম করেই স্নানের ঘরে হাস—সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তাত্তাত্তি হান দেখে নে। তোর চা তৈরী করতে বলছি—...”

সবাইকে নিয়ে শাফা বেরিয়ে গেল। কতকণ পরে ফিরে এসে দেখে, মালতী তেমনি ভাবেই তার ঘরে বসে আছে। শাফা গিয়ে তার মাথার হাতে নিয়ে তাকাল—“মালতী, স্নান করলে না!”

মালতী শাফাকে ধরে পাশে বসল। তার মহাশু-কৃতির স্মরণে মালতীর চমটাটাকা বিদায় গলে গড়ল। সে শাফার কোলে মাথা রেখে ঠাণ্ডে লাগল। কাহার ভিতর থেকে ভাকা ভাকা করে সে বলল—“আমাকে সে প্রভাওয়া করেছে, শাফা—...”

শাফা তাকে বাধা দিচ্ছিল—“এখন বাস, মালতী, স্নান করে আয় আগে.” কিন্তু না; কাল থেকে—যা তার মনে জন্মে আছে, তা অতি গুরুভার—কাক কাছে তা বলে বন হাড়া না করলে, তার চলে না। আন্তে আন্তে সে লব বলল। শাফার সঙ্গে তার সম্পর্ক—আজ আরও ঘনিষ্ঠ হল। (ক্রমশঃ)

জাগতিক

ঐতিহাসিক স্মরণোত্তর

বয় দুগ আগে কবি স্মরণোত্তর—

“হোয়া আমেরিকা নব অত্যাচারে

পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আপন

বন বা টানিয়া হিঁড়িয়া ভূতলে

নৃতন করিয়া গড়িতে চায়।”

হাসের উদ্দেশ্য করিয়া কবি এই বাণী উচ্চারণ করিয়া ছিলেন এবং হাসের অধঃপাতার প্রাণির জন্ত আক্ষেপ করিয়াছিলেন সেই ভারতবাসী আত্ম স্বাধীন। সে আত্ম তাহার দেশকে নৃতন করিয়া গড়িতে চায়। কালচিত্ত আবেশে অহুপ্রাপিত হইয়া স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা সর্বক্ষেত্রে দুগাধর আনিতে সচেষ্ট। শুধু তাহাই নহে দুঃখবিশ্বস্ত জনতকে পুনর্গঠনের সর্বতোমুখী দুঃখ-প্রসারি প্রচেষ্টার বিশ্বজনের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে।

মার্সাল প্রাণ—কিন্তু কবি আমেরিকার যে মহান প্রয়াসকে আশ্রয়রূপে ভারতবর্ষের মানুষে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা যে কত দুঃখপ্রসারি এবং

ব্যাপকরূপে ধারণ করিয়াছে তাহা তখনকার দিনে কবির পক্ষে কেন সে সময়ের কোন মনীষার পক্ষেই সম্ভব ছিল না। প্রথম মহাদুঃখের সর্বাঙ্গীণ সাম্রাজ্যের পতনও আমেরিকা সত্ত্বির এবং শান্তির দাবিও গ্রহণে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় মহাদুঃখের অবসানে যে গুরু দাবি-ভার চতুঃপাক্ষিক উপরে বর্তিয়াছে, আমেরিকা সে দাবি-পালনে পত্যাংগ হয় নাই। সন্তোষিত জাতিপুঞ্জের মারকণ্ড এই পুনর্গঠন সমস্তা সমাধানের পথে বিপুল বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার কারণ সোভিয়েট ও মার্কিনের ভিত্তর আদর্শগত বিরোধ।

এই বিরোধের ফলে পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপ এই উভয় ভূখণ্ডের পরস্পর নিরপেক্ষ বস্তর অকল রূপে গড়িয়া উঠিতেছে। অথচ এই দুই অকল বয়ঃ সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক “Unit” হিসাবে কোন দিন চলিতে পারে নাই। তাই পূর্ব অকলের দেশগুলি সোভিয়েটের আশ্রয়ে অহুপ্রাপিত হইয়া সোভিয়েটের তত্ত্বাবধানে নৃতন ছাচে ঢালাই হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। আর পশ্চিম অকল আমেরিকার প্রভাবের এলাকাভুক্ত থাকিয়া পুরাতন আশ্রকে লবল করিয়া সোভিয়েট আশ্রকে বৎসলব একাইয়া চলিতেছে। তাই তাহার পুনর্গঠনের কাশ অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক

অবস্থা দিনে দিনে ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই ধ্বংস অবস্থা শুধু আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী পলিচম ইউরোপকে পুনর্গঠন করিবার কাজে নিজ দেশের সমস্ত শক্তি অস্বীকার করিলেন। এই অস্বীকারের ফলে পলিচম ইউরোপের বেশগুলির মধ্যে সারা পড়িয়া গেল। অস্বীকৃত সাহায্য বানের পরিকল্পনা মার্শাল পরিকল্পনা নামে সুপরিচিত। গত মাসে আমরা এই পরিকল্পনা বহু বক্তৃতা শুধু সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। বহু বাস্তবিকতা বিতর্ক ও বাগানানের ভিত্তর দিয়া এই পরিকল্পনা আইন প্রণয়নের সমস্ত পথ অসম্ভব করিয়া



ট্রুমান

গত ৩রা এপ্রিল সভাপতি ট্রুম্যানের স্বাক্ষর লাভ করিয়া আইনে পরিণত হইয়াছে। এই আইন অস্থায়ী সমস্ত ব্যবস্থা চালু করিবার ক্ষমতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সকল গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সরকারই ইউরোপের পথে রওনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মার্শাল পরিকল্পনা অস্থায়ী সাহায্য প্রাপ্ত ইউরোপ যে অল্প ভবিষ্যতে সমস্ত সমস্ত মুক্ত হইয়া আত্মস্বর্গীয় সমস্ত ব্যাপারে স্বাধীন এবং স্বাধীন হইতে সক্ষম হইবে। এমন আশা এই পরিকল্পনার গোড়া মনোভাবও কোন সময় করেন নাই। কিন্তু এই সম্ভাবনা নাই বলিয়াই যে কোন চেষ্টা করা হইবে না তাহারা এমন নিষ্ক্রিয়তার পক্ষপাতি নহেন। তাহারা আশা

করেন লক্ষ্য আরও তড়াস তড়াস। যি: মার্শালের ভাষায়, “পৃথিবীতে বর্তমানে যে এক প্রচণ্ড অস্থিরতা চলিতেছে এবং দেশের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনসাধারণ বিস্তৃতভাৱীনের তুলনায় তাহালাই অবস্থার নিষ্ঠুরতা যে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে সে কথা সম্পর্কে অস্বাভাব্য করিতে বলেন। এই অস্বাভাব্য বর্তমানে সামান্য হইলেও উহার বিরুদ্ধে হুনিদিত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে পরে যে কোন সময়ে উহা বস্তার ফলের মত সমস্ত কিছু তাহালাই লইয়া যাইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা ও বিশ্বের বৈশ্বিক পুনর্গঠন ইহাই একমাত্র সমাধান। ইহার ভিত্তিতেই আমেরিকার বর্তমান কার্যক্রম রচনা করা হইয়াছে।”

মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি—ইউরোপের পুনর্গঠন ব্যাপারে মার্কিন সাহায্য গ্রীসে এবং তুরস্কে অন্তরূপ প্রয়োগ করিয়াছে। গ্রীসে বর্তমান রাষ্ট্রপতি আত্মস্বর্গীয় বিশ্রবে সংকুচিত। রাষ্ট্রের এই সঙ্কটে আমেরিকা সর্বপ্রকার সাহায্য ব্যবস্থার পক্ষাপন হইয়া নাই। সরকার বিরোধী দলও বাহিরের সাহায্য লাভে পরিণত। কয়েকই তথ্য সঙ্কটের আশ্রয় সমাধানের কোন সম্ভাবনা নাই। আজ পর্যন্ত U. N. O.র মারফৎ সর্বপ্রকার শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তুরস্কে বহিরাগত হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিবার তত্ত্ব গ্রহণ অন্তরূপ, লাংমেইরিং, উডোআহাল এবং অন্যান্য মুদ্রাপ্রয়োগ আমেরিকা হইতে আমদানী করা হইতেছে এবং এইরূপ আমদানী ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। চীনদেশে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জাতীয় সরকারকে যে সাহায্য করা হইতেছে তাহার পরিমাণ এক বিশুল যে তাহাকে সাধারণ গণিতের সংখ্যায় হিসাব না করিয়া জ্যোতিষের সংখ্যা গণনা করার মত তুলনা করা হইতে পারে। কোরিয়া দেশটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইদিক দুই পক্ষের ঘাঁড়িতে বিরাজ করিতেছে। মার্কিন প্রভাবিত এলাকার সাধারণ নির্বাচন লক্ষ্যেই হইবার সময় মার্কিন বিরোধী-দলের কার্যকলাপ প্রসঙ্গীভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাহা সত্বেও সাধারণ নির্বাচন স্থগিত হইয়াছে এবং নতুন শাসনপ্রণালী গঠিত হইবার জন্য কার্যকরী প্রতিষ্ঠান

চাপু হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে মার্কিন প্রভাব এই অঞ্চলে দ্বারী আসল প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ইরান নজদিসের এক সভ্যতায় মতে মার্কিন উল্লেখের প্রভাব ইরানের জীবনের ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রসারিত। মার্কিন আমেরিকার দেশসমূহ মার্কিন পরিচালনার অন্তর্গত কোন ব্যবস্থা অস্বাভাবিক মার্কিন সাহায্য লাভে উৎসুক। ভাবতবর্ষের উৎসাহ ও সহরে এসিয়া ও দূর প্রান্তের দেশসমূহের আর্থিক কমিশনের যে অধিবেশন হইবে তাহাতেও নাকি অন্তর্গত দ্বারী উৎসাহিত হইবার সম্ভাবনা আছে। উল্লিখিত বর্ণনা হইতে মার্কিনের পৃথিবীতে নৃতন করিয়া গতিবার বিরাট প্রয়াসের আভাস পাওয়া যায়। এই হইল মার্কিন বৈদেশিক নীতি।

চেকোস্লোভাকিয়া—পূর্ব ইউরোপে পোল্যান্ডের প্রভাবের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মার্কিন পরিকল্পনার মারফৎ মার্কিন প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে লক্ষ্য কনিউনিটি প্রতিষ্ঠা পন্থিক সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া সক্রিয় ভাবে গতিয়া তুলিবার জন্য কমিশনের উদ্ভবের কথাও আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই সংহতির পক্ষে বাধ্যকরণ কয়েকটি রাষ্ট্রে মিলিত স্বেচ্ছার গড়নমতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। চেকোস্লোভাকিয়া তাহাদের অন্তর্গত। এখানকার মন্ত্রীসভার ভিতরে দলীয় বিরোধের ফলে সচরের সৃষ্টি হয় এবং কয়েকজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। কনিউনিটিপন্থ এই পদত্যাগকে Coupe অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত আক্রমণ করিয়া ক্ষমতা হস্তের পুনরাবলিঙ্গা ঘোষণা করেন এবং নিজেস্বায়ী লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন অঞ্চলের Action committee অর্থাৎ কনিউনিটি প্রভাবিত লক্ষ্য জনসমষ্টির সাহায্যে তাহা গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাজধানীতে সচরী অবস্থার সৃষ্টি করে। সভাপতি বেনিগ নিউমার্টের সচর সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া বিফল হনোরণ হন এবং অবশেষে কনিউনিটি প্রধান নৃতন মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল। ইহার ফলে চেকোস্লোভাকিয়াও পূর্ণাঙ্গভাবে পোল্যান্ডের প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিরুদ্ধবলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কারাবদ্ধ হন অথবা বিদেশে পলায়ন করিয়া আশ্রয়লা করেন। যেনের

ভিতরে যে স্বৈর দলীয় সংকল্পিত পরিণতি লক্ষ্যকার মতে, শিক্ষা প্রদানী, প্রতিষ্ঠান ও কর্মপ্রচেষ্টা সরকারের বিরুদ্ধে উদ্ভাষণে বদ্ধ হইয়া যায়। বিশ্ব দৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ উদ্দেশ্য মূলক প্রচার কাণে চালাইবার মান্দে প্রকৃত ঘটনাকে বিস্তৃত করিবার অপব্যব দিয়া বৈদেশিক সাংবাদিকদের বহিঃকৃত করা হয়। কিন্তু এই সচরের সবচেয়ে শোচনীয় ঘটনা প্রাচীন বিশ্ববিস্তৃত জননায়ক স্লাবাকিকের “আত্মহত্যা”। এই আত্মহত্যার বিষয়কোডা বিকোডের সৃষ্টি হয়। বিরুদ্ধ বলের মতে ইহা রাজনৈতিক হত্যা ছাড়া আর কিছুই নহে। অপরাধকে চেক সরকারের মতে, বৈদেশিক অপপ্রচারের ফলে হত্যা হনোডাব বন্দিত: তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন—এই শোচনীয় হত্যার জন্য দেশস্বায়ীপন এবং তাহাদের বৈদেশিক প্রকল্পগণই প্রকৃতপক্ষে দায়ী। বর্তমানে নৃতন পঠনতত্ত্ব অস্বাভাবিক চেকোস্লোভাকিয়ার সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হইয়া গেল। এই নির্বাচনের ফলে বর্তমান সরকার নুনায়িক শতকরা ২০% ভোটে জয়ী হইয়াছে।

ইটালি সাধারণ নির্বাচন—চেকোস্লোভাকিয়ার



ম্যাদারী

পোল্যান্ডের প্রভাব দ্বারী হইলেও ইটালির সাধারণ নির্বাচন তাহার পক্ষে পরাধর্মেরই সামিল। এই ওকসপূর্ণ

সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিষ্ট বিরোধী হল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। এই জয়ের ফলে অল্পভুক্ত কিছুকালের জন্য ইউরোপে কমিনকমের মার্কিন প্রতিরোধের তীব্রতা প্রশমিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। অভিন্ন পর্ববেক্ষণ মনে করেন এই জয় অষ্ট্রিয়া ও বার্লিনে সোভিয়েটের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে আনিবার চেষ্টা সাময়িক ভাবে স্থগিত রহিল। আরও মার্কিন প্রভাব নিম্ন সোভিয়েট শীমাবদ্ধের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইল।

বার্লিন—বার্লিন নগরী বরখান হইতে জার্মানীর রাষ্ট্রধারী রূপে বিখ্যাত। এক কথায় বলিতে গেলে বার্লিন শহর সমস্ত জার্মানী, আজ হউক কাল হউক, তাহার হস্তগত হইতেই হইবে। এই শিক হইতে বিচার করিলে এই নগরীকে পুরাপুরী নিজের আয়বে আনিবার চেষ্টা সোভিয়েটের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক এবং এজন্ত বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেওয়াও অসম্ভব নহে। তাই যখন বার্নবার্গের চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া সরকারী আদেশ জারী হইল, এবং যখন একখানি রুটিশ বিমান সংঘর্ষের ফলে ধ্বংস হইল তখন আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তথাপি এমন কিছু ঘটিল না তাহার ফলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়িতে পারে।

শ্বিড মলোটভ পত্রাবলী—যখন মার্সাল পরিকল্পনা মার্কিন এবং অন্যান্য খাতে আমেরিকার বহুপুঞ্জ ও রপ্তানিকার পুণিবীর্য দিকে দিকে আমেরিকার বিষয় অভিধান ঘোষণা করিতে ছিল এবং তাহারই প্রতিরূপ অভিধান সোভিয়েট কসিয়ার ছই মহাশেষ ব্যাপী বিয়াট সোভিয়েট ভূবণ্ডে সক্রিয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল সেই সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূত মি: শ্বিড ও মলোটভের মধ্যে কি ভাবে বিশ্বশান্তি পুন: প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং কি ভাবে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মতানৈক্য এবং সনাত্তর দ্বর হইতে পারে সে বিষয়ে পত্রালাপ চলিতেছিল। হঠাৎ সে মাসের বিত্তীয় সমস্যাহে এক পক্ষের সম্মতি না গইয়াই মত্যা রেডিও সেই মত সাধারণে প্রকাশ করিয়া দিল। তাহার ফলে পুণিবীর্য বেশ চাকল্যের সৃষ্টি হইল।

আমেরিকার মতে এই সিদ্ধান্ত উদ্ভাবনী পর প্রকাশ উদ্ভেদ মূলক এবং সোভিয়েট বার্লিন যে বৈত আলোচনার প্রস্তাব করিতেছে মি: মার্সাল তাহা অস্বীকার করিলেন। মার্কিন সভাপতিত্বের প্রান্তিকস্থি মন গঠিত তৃতীয় সনের নেতা মি: হেন্দ্রী ওয়ালেস্ কিছু এক খোলা চিত্রিতে এই আলোচনা সূক্ষ্মগ্রন্থ হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সর্বোপরি সোভিয়েট রাষ্ট্র নারক মি: ট্যালিন ওয়ালেসের এই চিত্রিকে সমর্থন করিয়া একাধন সূত্র সংবলিত একটি ঘোষণা পত্র প্রচাণ করিলেন। ইহার পরে আমেরিকার সরকারী দপ্তর হইতে পাট্টা একাধন সূত্র অগ্রোষণ সংবলিত ঘোষণা পত্র প্রচারিত হয়। মার্কিনের পক্ষেও কথা পোটা তিনেক সমস্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিলেই শান্ত হইয়া উঠে। সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের



মলোটভ

ফলে ইউরোপে সাময়িক ভাংসম্যা সোভিয়েটের অহুস্ন হইবে, কারণ, সোভিয়েটের সাময়িক শক্তি জনশক্তির উপর নির্ভর করিতেছে এবং এই জনশক্তি যে কোন দুর্ভেদে হুস্নাসে যে কোন ক্ষেত্রে পরিবেশিত হইতে পারে এই কারণেই হুস্নরাষ্ট্র তাহার আনবিক অস্ত্রের প্রাধান্য হাতছাড়া করিতে রাজী নহে। জাপানের সহিত শক্তি

ব্যাপারে অংশ গ্রহণকারী শক্তির সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টাও তাই সর্বপ্রকারে দুর্বল হইবে এবং অস্ত্রাস্ত্র শক্তির নিকট বাধা পাইতেছে।

ইহার পর হইতে উক্তর পক্ষ বেতার যোগে পাঠা অভিযোগ নিরবহিষ্ট ভাবে প্রচার করিয়া চলিয়াছে। এই প্রচারণা হইতে বেশ স্পষ্ট বোকা যায় যে যুদ্ধবন্দনের পর হইতে যে সব সমস্তা লইয়া তুলে এয়া আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, তাহা—নিরস্ত্রীকরণ—আপনিক শক্তি-নিয়ন্ত্রণ,—জাদীপী এবং অস্ত্রহীন সহিত শক্তি—সোভিয়েটের সীমিত বরাবর সৈন্ত সংস্থাপন, সেই সমস্ত বিষয়ে যে সচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়া আছে তাহা। আন্ত নিরাশ্রয়ত্বের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু—অভিশপ্ত ইহা! অভিশাপের ফলে সমস্ত বিষয়ের সে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার নিষেধ কোন দেশ নাই—This is my own native land—এই উচ্চারণ প্রকাশ করিবার সার্বভৌমতা তাহার নাই। এখনই কোন দেশকে সে আপন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে, তখনই যেন কোন অভিশাপের ফলে, তাহার সেই নবসম্প্রাপ্ত মনঃবাণকে বিকল করিয়া ভীত বিতরাগিতা তাহার সে প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করিয়াছে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে এই ইহুদীদের একটি মাতৃভূমি পড়িয়া তোলায় প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহুদী আত্মিক পুরাতন আবেগগুলি কিন্তিনকে এই মাতৃভূমিরূপে মনোনিবেশিত করা ইতিহাসের একটি accident। তাহা হইলেও একবার যখন এই মনোনিবেশিত হইয়াছিল তখন সমস্ত ইহুদী আত্মিক তাহাদের সমস্ত আত্মিক মনঃবাণ এবং সমস্ত আত্মিক সংগতি দিয়া ইহাকে নুতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার ত্রুটি গ্রহণ করেন এবং মঙ্গলরূপে কোন বাস্তবতাবলে যেন নুতন প্যালাস্তাইন মরুভূমি ফলে-ফুলে সর্বপ্রকার লঙ্ঘনের সঙ্গীতও লব্ধ হইয়া গঠিত। এই প্রদেশ Mandateরূপে ইংরেজের কর্তৃত্বাধীনে অবস্থান করে।

ইহুদীরা দাবী করে যে তাহাদের স্বাধীন আভিভাব প্রকাশ করা হউক। আরব আভিভাবও কিন্তু আরব দেশের অঞ্চলভার ভিত্তিতে আরব স্বাধীনতার আবেগগুলিরূপে কিন্তিনের স্বাধীন স্বাভাবিক মর্যাদা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে। তাই বহুদিন ধরিয়া বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। একদিকে কিন্তিনবাসি আরবগণ

কিন্তিনের বাহিরে সমস্ত আরবদেশের স্বাধীনতার প্রচেষ্টা এবং অস্ত্রবিক্রেয় পুখিরাপাণী ইহুদীরাঃশ্রীকরণ এবং মাতৃভূমি পুরাতনের শ্রুতি 'অবশ্য' সৃষ্টি ভিত্তিতে কৃত্রিমভাবে চালান হইতেছে। এই প্রচেষ্টা সংঘর্ষ কিন্তিনের সর্ববাসিন্দার সম্মুখীন করিয়া দিয়াছে।

পূর্বে মহাযুদ্ধের ফলে ইংরেজের বৈদেশিক নীতির আত্মপরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯৪৭ এর ১৪ই আগস্ট ইংরেজ ভারত ছাড়িয়াছে, তাহার বরফ মাস পরে ব্রহ্মদেশ এবং মিয়ানমার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এই নীতির অঙ্গুলি করিয়াই পূর্বে ১৯ই মে কিন্তিন হইতে নিজের কর্তৃত্বের অপসারণ করিয়াছে। এই অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই ইহুদীগণ কিন্তিনে স্বাধীন ইসরাইল রাজ্য ঘোষণা করিয়াছে এবং সেই মুহূর্তেই আরব লীগ এই স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতা ধ্বংস করিবার জন্য চারিদিক হইতে আক্রমণ চালাইতে শুরু করিয়াছে।

একদিকে যেমন আমেরিকা, কানাডা এবং অস্ত্রাস্ত্র কৃত কৃত্রিম এই স্বাধীন রাজ্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং আরব লীগের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আক্রমণকে aggression আখ্যা দিয়াছে, এবং এই aggressionর ফলে বিশ্ব-শান্তি বিপর্যাস হইতে পারে বলিয়া U. N. O.র মারফৎ ঘোষণা করিতে চাহিতেছে অস্ত্রবিক্রেয় যেমন ইংরেজ মনে করিতেছে যে ইসরাইল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা আন্তর্জাতিক বিধিসম্মত কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং সেই অবস্থা সমষ্টির সমগ্র ব্যতীত তাহা এই সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিতে অসম্ভব। পূর্বে প্রতিশ্রুতিমত বিভিন্ন আরবদেশকে ইংরেজ অস্ত্রপত্র, যুদ্ধসম্পদ ও অর্থ সাহায্য করিতেছে—এই সাহায্য সাময়িক। আমেরিকা ডব্লিউ. মেনা হইতেছে ইসরাইলের সাহায্যকরে অস্ত্রপত্র সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা ওহ করা হইবে। এমন কথাও উল্লেখিত যে আরবলীগকে সাহায্যমানে অবিশ্বাস্য বিরত না হইলে মার্কাল পরিকল্পনা সাহায্য হইতে ইংরেজকে বঞ্চিত করা হইবে এবং মার্কাল পরিকল্পনা অনুপ্রাণিত সাহায্য দ্বারা আরব লীগ ইংরেজের মারফৎ কিরণ উপকৃত হইতেছে যে সবচেয়ে তীব্র করিবার স্থাপন করা হইতেছে। একদিকে

মঙ্গল-কৃত ত্রুটি বিহীন
কৃত্রিম কৃত্রিম মনে।





বসন্ত সমস্যা

কাপড়ের দর নিয়ে বাজারে যে খেলা চলেছে—তার পিছনের চালক কে? আজ নানা দিক থেকে যে সব ধর ও গুচ্ছ আসছে—তাতে সাধারণের মনে এট ধারণাই বহুতুল হবে যে এর গোড়ায় আছে মিলনালিক-গণ। ভারত সরকার কাপড়ের এই উচ্চ দর সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রচার করেছেন; তাতে এমন ইমিত আছে যে এই ধারণা সত্য। ভারত সরকারের মনের ধারণা বা সম্বোধন স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা উচিত। ভারতের পরট কাপড়ের কথা আসে। এই বিবরণ চাকচাক গুড়গুড় নীতি মেন-বাসী অমুদোষন করবে না। বোম্বাইয়ের খুচরা ও পাইকারী বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা কতকটা স্পষ্ট ভাষায় মিল-মালিকদের নামে অভিযোগ এনেছে যে মিল হ'তে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে কাপড় ছাড়া হয়। এই সম্বন্ধে ভারত সরকারের অভিমত কি—তা মেন-বাসীকে জানানো উচিত।

যদি এই সম্বন্ধে সত্য হয় তবে, এই সব মিল-মালিক-দের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা সরকার। ভারতের ইণ্ডাস্ট্রিয় নীতির খণ্ডা তৈরীর সময় এবং এবার-কার কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের সময়—ধনপতি মিল-মালিকদের প্রতি একটু দরদ দেখানো হয়েছে। অর্থ-সচিব শ্রীমদ্বৈদ্য শেঠীর ধনপতি-প্রীতি কতকটা সুবিনিত। তিনি বাজেটের সময় বলেছিলেন—যদি ধনী মিল-মালিকগণ ঠিকভাবে না চলে, তবে তাদের সাহায্য করার অধিকারও সরকারের আছে এবং সেই অধিকার কাজে বাটাতে তারা বেরী করবে না। শ্রীমদ্বৈদ্যের এই ধর্মিক পরিচয়ের সভারা উপভোগ করেছিল এবং হয়ত দেশের সাধারণ লোকও তা উপভোগ করেছিল। আশা করি, ভারত সরকার এবার তাদের এই ধর্মিকে

কাজে পরিণত করার ব্যবস্থা করবে। ভারতের ইণ্ডাস্ট্রিয় নীতির প্রবর্তনের সময় যিলা হয়েছিল, 'সমস্ত ইণ্ডাস্ট্রিয় নীতির মূলে থাকছে মিশ্র-অর্থনীতি,—অর্থাৎ কতক ইণ্ডাস্ট্রিয় হবে ভারতীয় সম্পত্তি এবং কতক হবে বালিকগত সম্পত্তি। ক্রমে ভারতীয় সম্পত্তির গভী বাড়ানো হবে। বস্ত্র-সবটোর মধ্যে মিল-মালিকদের এট জন-ব্যবহার্য্যাদী দুনাফা-সোভরে আর প্রদর্শ দেওয়া উচিত নয়।

কংগ্রেসের নূতন গঠন তত্ত্ব—

বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধি-বেশন হয়ে গেল। এবারকার অধিবেশনের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এতদিন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে স্বাধীন করা। কিন্তু আজ ভারত স্বাধীন। স্বাধীনতা লাভ করার স্তম্ভ কার্যক্রম বা অবলম্বন করা হ'ত, আজ আর তার প্রয়োজন নেই। আজ তাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়েছে। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র নূতন করে গড়বার প্রয়োজনও সেই স্তম্ভে আসে। বোম্বাই অধিবেশনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল নূতন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পূর্বেই কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র বদলাবার কথা উঠেছিল এবং এই স্তম্ভ একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আজ হুই বছর ধাবৎ এই কমিটির কাজ চলছিল। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হওয়াতে ভারতের গমড়া অনেকটা বাস্তব করে আবার নূতন গমড়া করা হয়। এবার এখন শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে কেন্দ্রীয় মাসে কানপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র তৈরি করা হবে—তখন এল গান্ধীজী-র হস্তা। কানপুরের অধিবেশন দ্বিগিত রেখে দিল্লীতে কাজ চালানো গোছের এক অধিবেশন হয়। তাতে

নূতন গঠনভঙ্গের মূলনীতিগুলি কেবল স্বীকার করা হয়; এর বিস্তারিত আলোচনা তখন স্থগিত থাকে।

অন্যদিকে বোম্বাইতে যে অধিবেশন হ'লে গেল—তাতে কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়েছে। গঠনতন্ত্রে মহাস্বাক্ষরী প্রেরণা আছে অনেকখানি। হুজু পাঠকদের মনে আছে পাণ্ডীতীর হত্যার দিনই কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে তিনি তাঁর প্রস্তাব পাঠিয়ে দেন; গঠনতন্ত্র কমিটির খসড়া প্রস্তাব হ'তে পাণ্ডীতীর প্রস্তাবের মৌলিক পার্থক্য ছিল। জীবিত পাণ্ডীতীর প্রস্তাব ঐ কমিটি প্রায় প্রত্যাখ্যান করেছিল; কিন্তু তাঁর হত্যার পর পাণ্ডীতীর শেষ হলিল ব'লে তাঁর প্রস্তাবের আলোচনা মর্যাদা হল।

পাণ্ডীতীর প্রস্তাবের বিশেষত্ব ছিল কংগ্রেসকে লোক সেবা সংঘের রূপ দেওয়া; আর গঠন কমিটির প্রস্তাবের মূলত্বপূর্ণ ছিল কংগ্রেসকে নির্বাচন-ব্যয়ে পরিণত করা। শেষ পর্যন্ত এই দুই প্রায় বিরোধী ভাবের সমন্বয় করা হ'ল—নূতন গঠনতন্ত্রের পোড়ার সেবার ভাব ও আদর্শে নূতন সভা সংগ্রহের ব্যবস্থা ক'রে এবং সেবার নিকে নির্বাচন ও ব্যবস্থাপক বিবরণের ব্যবস্থা রেখে।

এই নূতন গঠন ভঙ্গের প্রধান বিষয় হ'ল দুটি—কংগ্রেসের নূতন উদ্দেশ্য বা প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করা এবং কংগ্রেসের সভা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। এত দিন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের এসেছে; তাই এবার নূতন উদ্দেশ্য নিয়ে নূতন প্রতিজ্ঞাপত্র তৈরি করার দরকার এসেছে। এই গঠনভঙ্গে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হ'ল। নূতন গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে—“কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হ'ল ভারতবাসীদের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করা এবং বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বযোগ-সুবিধার ও রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অবিচারের দাব্যের উপর প্রতিক্রিয়া এক সাময়িক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা; যার লক্ষ্য থাকবে বিশ্ব-শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের নিকে।” যে ইংরাজী শব্দ এই প্রতিজ্ঞাপত্রে ব্যবহার করা হয়েছে,—তা হ'ল co-operative commonwealth;—তার

গঠক সংজ্ঞা নিয়ে লোকের মনে প্রশ্নের আছে। অনেকে মনে করেন যে এই প্রতিজ্ঞাপত্রে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হিসাবে এমন ভাষা ব্যবহার করা উচিত ছিল যা সাধারণ জনতা লম্বাঘেঁষে বুঝতে পারে। সেই হিসাবে জনপক্ষে যে বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ বা এমনি সংকে বোধ-পুষ্য কোন ভাষা ব্যবহার করা ভাল ছিল। Co-operative Commonwealth এই দুটি ইংরাজী শব্দের অর্থ ইংরাজীতেই হ'ল এই নয়। ভারতীয় ভাষায় লম্বাঘেঁষে বা পাড়াবে, তাতে এর অর্থ জনসাধারণের নিকট খুব সহজ বোধ্য হবে না। তবে আমাদের আপনা আছে মন্তব্যের লক্ষ্যবর্ষে কলে এই শব্দ দুটির অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং জনসাধারণও এর অর্থ উপলব্ধি করবে।

পাণ্ডীতী যে আদর্শে কংগ্রেসকে গড়তে চেয়েছিলেন, যদি সেই আদর্শ নিয়ে কংগ্রেস চলতে পারে, তবেই কংগ্রেসের এত নূতন গঠনতন্ত্র লাফলা লাভ করবে। আপনা করি ভারতের সর্বত্র কংগ্রেসকর্মীরা সেই আদর্শ সামনে রেখে কংগ্রেসকে সত্যিকার লোক সেবার বাহন ক'রে তুলবে।

প্যালেস্টাইন—

যে কোন একটা ছোটখাটো ঘটনা নিয়ে আত্মকাল একটা বিশ্ব-বুদ্ধ লেগে যেতে পারে। ১৯১৪ সালে সেরায়েভো শহরে অস্ত্রিয়ার রাজকুমারকে হত্যা করা হ'ল; তা নিয়েই হ'ল প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ। এর প্রধান পাণ্ডা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও জার্মান সাম্রাজ্যলোভ। বিভিন্ন মহাদল হত হ'ল জানিগিল নিয়ে। সার, অস্ত্রিয়া, সেরায়েভোভিহা প্রভৃতি বড় বড় উটু ব্রিটেন হস্তম করতে পারল; কিন্তু জানিগিলের যতো মশক তার হস্তম হ'ল না। কাজেই কোন্ ছোট ঘটনা নিয়ে যে যাহুরের আত্মকালী বুদ্ধি মেলে উঠবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই প্যালেস্টাইনের ব্যাপার নিয়ে সকলেরই আশঙ্কা ছিল হুজু বা আর একটা বিশ্ব-যুদ্ধ লেগে যেতে পারে।

প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্যালেস্টাইন সমস্তার এই আশঙ্কাজনক সম্ভাবনার জন্ত, সকলেরই দৃষ্টি

ঐ ক্ষুদ্র দেশটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তমির আরবতনের ও লোকসংখ্যার পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী রাজনৈতিক ও কৃষ্ণ আত্ম প্যালেস্টাইনের উপর আরোপিত হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের তাগিদে ব্রিটেন তখন যোষণা করেছিল, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের নতুন মাতৃভূমি (homeland) প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তখনই আবার যুদ্ধের তাগিদ অন্তিমিক দিয়েও এল,—আরবদেরও সন্তুষ্ট করতে হল। একদিকে ব্যাল্কানের যোষণা ইহুদিদের বলস—প্যালেস্টাইনেই তোমাদের মাতৃভূমি স্থাপন করা হবে; অপর দিকে, লরেন্স আরবদের বললেন সমগ্র আরবভূমি (প্যালেস্টাইন সমেত) তোমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র হবে এবং সেই অঙ্গাঙ্গরে যুদ্ধের সারিক হাসেনী বংশের হাশেমের সঙ্গে সন্ধি করল। ইংরাজের এই দুই বিপরীত কূটনীতির জের চলছে আজও। আজও ইংরাজ সঠিকভাবে মনবির করতে পারেনি—ইহুদিদেরই সমর্থন করবে কি আরবদের সমর্থন করবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হ'তেই বিশ্ব-রাষ্ট্র লীগের (League of Nations) মাধ্যমে ব্রিটেন প্যালেস্টাইনের শাসন ভার গ্রহণ ও বহন করে এবং বরাবরই এই দুটি নীতির খেলা সে খবানে চালিয়েছে।

তার এই গৃহ-ভেদী নীতির ফলে আরম্মাও আত্ম বিধ্বস্ত; ভারত খণ্ডিত, প্যালেস্টাইন খণ্ডিত এবং হযত মিশরও এই ভাবে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হবে। ইংরাজের এই নীতির জের আজ এসে পড়ছে বিশ্বরাজনীতির উপর। সব দেশেরই আজ শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে—প্যালেস্টাইন। রোগের নিদান নির্ণয় করার অস্ত্র না হয় ইংরাজকে দুটা কড়া কথা বললাম; কিন্তু তাতে ত রোগের উপশম হবে না।

প্যালেস্টাইন আজ আরব ও ইহুদিদের দুটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। ইহুদি রাষ্ট্রের নাম হয়েছে ইজরেল; তাদের প্রাচীন ইতিহাস থেকে এই নাম গ্রহণ করা হয়েছে। জু' হাজার বছর পর ইহুদিরা নিজেদের একটা আবাসভূমি পেয়ে কোটি কোটি টাকা ঐ মরুভূমিতে ঢেলেছে এবং মরুভূমির এক অংশকে ফল-পুষ্প-শোভিত

উজানে পরিণত করেছে। আজ আরবগণ মানসিক হ'তে তাদের দেশ—নগর ও গ্রাম—আক্রমণ করছে।

আরবদের হাতে প্যালেস্টাইনের ভিত্তিমিকে ৬টি রাষ্ট্র আছে—উত্তরে আছে লেবানন ও সিরিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণে আছে—জর্ডন-উত্তর দেশ (Trans-Jordan), সৌদী আরব, ইয়েন এবং পশ্চিম-দক্ষিণে আছে মিশর। ছয়টি গঠিত রাষ্ট্রের সৈন্ত ও অস্ত্র-সজ্জা আজ নিঃশোভিত হচ্ছে শিঙরাষ্ট্র ইজরেলের উপর। দূর থেকে আমেরিকা ও নিউজিল্যান্ড সেভিয়েট রাষ্ট্র এই ইজরেল রাষ্ট্রকে স্বীকার করেছে; কিন্তু ইংরাজ এখনও প্রাচীরের উপর বসে ডামস বেধেছে—কোন পক্ষে পালা ভারী হয়।

ভারতের কি করণীয়

এত দিন এই সব বিশ্বরাজনীতিতে ভারতের কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল না; ইংরাজের খাড়ে ঘোষ চাপিয়েই আমরা দায় সেবেছি। আজ আর সে ভাবে দায় ও দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে না। গত প্রায় এক বছরে ভারতের একটা স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি পড়ে তুলবার অবকাশ ছিল কিন্তু ভারত এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেহেনি। বিশ্ব-রাজনীতির সঙ্গে যোগ রাখা ক'রে বাস্তব রাজনীতির পরিচয় আমরা দিতে পারিনি। খুব উঁচু পদার পণ্ডিত জগদ্বন্দ্বীলাল বার বার বলেছেন—আমরা কোন ক্ষমতা-কেন্দ্রিক রাজনীতির (power politics) সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব না। নীতির দিক দিয়ে এটা খুব ভাল কথা; কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে এর বিশেষ কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। চলতি কথার বলে—যদি যাচ্ছ, না ছুঁই পানি। পররাষ্ট্রনীতিতে আমাদের মনোভাব কতকটা ঐ প্রকার। তার ফল আমরা দেখেছি সঃ-সুখ রাষ্ট্র লীগে কান্ট্রীর নিয়ে বিতর্কে। ভারতের পক্ষে হাত তুলবার যতো একটি আভিও সেখানে ছিল না।

প্যালেস্টাইন সমস্যা নিয়েও ভারতের পররাষ্ট্রনীতি হুশিয়ারিভাবে ব্যস্ত করা সরকার।

পাকিস্তান হওয়ার ফলে মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মনোভাব যে ভারতের প্রতি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়,

তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। গত এশিয়া মহা-
সম্মেলনেও সমগ্র ও তার অব্যবহিত পরে ঐ সব মুসলমান
রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবর্গ যে সব উক্তি করেছেন, তা বাদ
হিলেও একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে তারা
ভারতের প্রতি খুব অস্বস্তিকর। তা ছাড়া পাকিস্তান
হওয়ার পর ও কলে সমগ্র মুসলিম বেশমুহুরে একটা
ঐশ্বর্য্যময় একচ্ছত্র আধিপত্যের আশা জাগ্রত হয়েছে।
তার মধ্যে আরবলীগ হল প্রধান খুঁটা। এটা প্রধানত
ইসলামের পন্থা ও তার পৃষ্ঠপোষিত। আরব লীগের ঐতিহ্য
ও চিন্তাধারা প্রগতি বিবেচ্য। আজ তারা পুরাতনের
দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্র গড়বার কথা বলে বা ধর্ম-শাসন
অনুমানিত রাষ্ট্র পদ্ধতি ও আইন-কানুন গড়তে চায়
তারের উদ্দেশ্য বত সাধুই থাক না কেন, তারা যে বর্তমান
ভাষাধারার বিবেচ্য, তাতে সন্দেহ করার কারণ নেই।

সেই হিসাবে মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও আরব-
লীগ ভারতের বন্ধু নয় এবং প্রগতির দায়ক ও বাধক নয়
—বরং তার অস্তরার খণ্ডন করছে।

বিত্যস্ত—ইহুদীদের বর্তমান অবস্থা ও প্যালেস্টাইনের
সঙ্গে তাদের ঐতিহাসিক সংযোগের কথাও মনে রাখা
উচিত। বিশ্বের সাংস্কৃতিক বিবর্তনে ইহুদীদের লম্বা প্রায়
অতুলনীয়, অবশ্য তাদের দোষও আছে, দার কলে সর্বত্র
তারা শাসিত ও নির্ধারিত হয়। তবুও স্বীকার করতে
হবে—সেদের চেয়েও হয়েছে তাদের অনেক বেশী।
সে বিচার স্বাধীনতার আশাচা নয়। আর এরা হুগতির
চরম অবস্থার গিয়েছে। বিশ্বের কোথাও এদের মাথা
গুঁজবার স্থান নেই। বাড়ি ছাড়া ঘর ছাড়া এই
প্রতিভাশালী জাতিটা তাদের পৈতৃক ভূমির এক টুকরা
পেরে বর্গরাস্তা গড়ে তুলছিল। বাধা মিল আরবরা—
যারা বহু শতাব্দী ধরে ঐ দেশকে মক্কুনি বানিয়ে রেখেছিল
এবং যারা সংখ্যার ভুলদায় অনেক বেশী ভূখণ্ড দখল করে
আছে এবং কোন দেশকেই ঠিক ভাবে গড়ে তুলতে
পারেনি। মরোকেও থেকে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত দেশগুলি
এদের দখলে; এই সব দেশেই লোক সংখ্যা অত্যন্ত
কম; সব দেশই মক্কুনি হয়ে আছে—কেবল

আলবেনীয় খেদিত মহম্মদ আলি ও ইংল্যান্ডের চৌধুরী
মিশরে মীল নদের দুই তীরে কিছু উর্বরতার সৃষ্টি
হয়েছে। প্যালেস্টাইনের ক্ষুদ্র আশ ছাড়াও এদের বহু
দেশ আছে; এবং প্যালেস্টাইনের উপরও এদের দাবী
অন্তর বলে ধরে দাবী।

তাই ভারতের ভবিষ্যৎ দার্থ ও নৈতিক বিচারের দিক
থেকে ভারতের উচিত অবিলম্বে ইকুয়েল রাষ্ট্রে স্বীকার
করা। যেখানে কান্দীর ও হারদ্রাবাহ নিয়ে ভারতকে
সংঘর্ষমূলক পন্থা গ্রহণ করতে হয়েছে বা হচ্ছে, সেখানে
অপ্রাণনিক কোন চুক্তিবন্দা যেন ভারতের বৈদেশিক
নীতিকে পলু করে না রাখে। বৈদেশিক নীতিতে
কেবল আগেরের মুখের দিকে তাকিয়ে গণ নির্দেশ করা
হুই স্বাধীনতার পরিচায়ক নয়।

স্বাধীনতা ও সত্যের বুদ্ধি—

বিশেষ শাসন বদল লোকের নিকট অসঙ্গ হয়, তখনই
তা হুই করার মতো কঠিন প্রয়াস লোক করতে পারে।
সেই অসঙ্গ অবস্থা থেকে বুদ্ধি পাবার মস্ত লোক স্বীকৃতি
করে। তারপর ধন হঠাৎ একদিন বিশেষ শাসন বা
পূর্বের অত্যাচারী শাসন হুই হয়, তখন লোকের মনে বত
মুগ্ধ স্বার্থ-বুদ্ধি মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে। এতদিন বা
আনন্দবাদের পোষাকে ভুজ্জাবে দেখা দিত, অত্যাচারী
শাসনের নাগপাণ থেকে মুক্ত হ'য়ে তা ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির
বেশে দেখা দেয়। তাই আজ ভারতের বহুস্থলে বহু
প্রকারের অত্যাচার দেখা দিচ্ছে।

তার একটা বিশেষরূপ দেখছি প্রাথমিক বুদ্ধিতে।
নূতন নূতন প্রদেশ গঠনের ও প্রদেশের গীমানা বুদ্ধির দাবী
চতুর্দিক থেকে উঠছে। স্বদেশের প্রত্যেক অকলেই
এমন দাবী দেখা দিচ্ছে। অন্ধ, তামিল, মালয়ালম,
কানাড়ী, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভাষার লোকেরা পৃথক প্রদেশ
দাবী করছে। তারপর, উত্তর ভারতে প্রাচ্যেপ্দি গীমা
ও আরতন নিয়ে পারম্পরিক বিষয় হুই এসব হয়ে
উঠছে। বিভিন্ন হুই হুই দেশীয় স্বাধীনতা ভারতের
অস্বীকৃত হচ্ছে; এই সব স্বাধীনতা কোন প্রদেশের স্বাধীনতা

হবে—তা নিবেও প্রচুর কলহ চলছে। এই কলহ আর আর কেবল বাচনিক নয়—এর সঙ্গে গোলা-গুলিও চলছে। কিন্তু নিরীহ আদিবাসীর প্রাণও এতে গিয়েছে। তারপর বাংলাতে আর হুক হরছে পূর্ব বাংলার আদিবাসীদের বিরুদ্ধে বিষে প্রচার। এক শ্রেণীর কংগ্রেসীদের মাঝে একমাত্র স্বাক্ষরিত হ'য়ে পাড়িয়েছে—“বাংলা” টেকানো বা টেকানো।

জিহ্বাসাহেব যে বিষেদ্রবুলক স্বাক্ষরিত হুক কবেছেন, আর তাই বকরফের নানাভাবে দেখা দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক বিষে—উভয়ই শ্রেণী-বার্ষিক বিবোধদ্বার; উভয়ই বিদ্বেষ-বিবোধী, প্রতিজ্ঞাবিশীল পক্ষীয় খেলা। ভারতের বিদ্বেষ আরও অসম্পূর্ণ, দ্বারা এই বিদ্বেষের বাহক ও ধারক, তারাই আর এই বিদ্বেষ-বিবোধী শক্তির কীড়নক হ'য়ে উঠছে।

বিহার ও বাংলা-ভাষী অঞ্চল—

পশ্চিম বাংলার আরতন এখন অত্যন্ত কম; অঞ্চল লোক সংখ্যা সেই অল্পপাতে অনেক বেশী। বোধহয় ভারতবর্ষের প্রবেশ সঙ্খের মধ্যে পশ্চিম বাংলা সবচেয়ে ঘন-বস্তি প্রবেশ। পূর্ব বাংলা থেকে ক্রমেই লোক এই প্রবেশে আসছে এবং আসবে। তার ফলে পশ্চিম বাংলার লোক সংখ্যা আরতনের তুলনার অনেক বেশী হবে। কিন্তু এর দুই ধারে এমন সব অঞ্চল আছে—বা এককালে বাংলার অন্তর্গত ছিল বা প্রধানত বাংলা-ভাষী। ছোট-নাগপুরের মানকুম, ধলকুম প্রভৃতি খাল বিহারের মধ্যে ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত পূর্ণিয়া, সীওড়ালপুরগণা প্রভৃতি স্থান মূলত বাংলা-ভাষী। সবাইকেলা নামের লোক সংখ্যার মধ্যে যে সব ভাষা প্রচলিত আছে, তার মধ্যে বাংলা সব চেয়ে বেশী প্রচলিত।

ভারতের ভিত্তিতে প্রত্যেক প্রদেশের সীমানা নির্দেশ করার নীতি কংগ্রেস গ্রহণ করেছে। সেই নীতি অনুসারে বিহারের এই সব অঞ্চল পশ্চিম বাংলার সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু বিহারের ময়ী-মণ্ডলী ও কংগ্রেসী নেতারা এর ঘোর বিরোধী। সীমানাহানে তাঁরা বাংলা ভাষাকে ধারিয়ে তার

মূলে হিন্দীকে চাপু করার চেষ্টা করছেন। একদিকে তাঁরা যেমন সংখ্যা-সমিতি বাংলা-ভাষীদের প্রতি অগ্রাধার করছেন, অপরদিকে তাঁরা কংগ্রেসের নীতির প্রতি নিষেধের অনাধার পরিচয় দিচ্ছেন।

যারা এই ভাবে সর্বীয় স্বার্থ-বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁদের একটা কথা মনে রাখা উচিত। আমরা একটা বিদ্বেষের ভিত্তর দিয়ে চলছি; বিদ্বেষের মূখে অনেক ভাষা-গড়া ঘটে। ভারতবর্ষে যে বিদ্বেষের মূখে কোনো ভাষা-গড়া ঘটবে না—এমন অল্প আশা পোষণ করা অগ্রাধার। ভারতের একা আঙ্গু প্রতীকিত বাস্তব নয়; অতীত ইতিহাস এর অল্পমূলে ইতিহাস করলেও ইতিহাসে এটা বাস্তব সত্য নয়। অতীতে কোন দিনই ভারতবর্ষ এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইংরাজের চাবুকের মাঝে সমগ্র ভারত একটা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আর ইংরাজের শাসন থেকে মুক্ত হ'য়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশ সেই একা স্বতই মেনে নেবে—এমন আশা করা চলে কিনা সম্ভব। আর যদি কোন অবস্থার স্বযোগ নিয়ে ভারতের কোন অংশ বিশেষ, অপর কোন অংশের উপর অগ্রাধার করতে থাকে এবং যদি কংগ্রেসের নেতৃবর্গ তার প্রতি চোখ মূখে থাকেন, তবে মূলত ভারতের একেবারে মূলেই আঘাত করা হয়। উড়িষ্যা ও বিহার পর্যায়ক্রমে পরগোদান ও মহাইকেলা নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়বার চেষ্টা দিচ্ছে। এখনও সাবধান না হলে কংগ্রেস নেতৃবর্গ আরও গুরুতর সমস্যার সামনে পড়বেন। বিহারের অন্তর্গত কোন কোন অঞ্চলে বাঙ্গালীদের উপর ও বাংলা ভাষার উপর ক্রমশঃ করা হচ্ছে; আসামে বাঙ্গালীদের উপর গুওমী ও মার-ধর হচ্ছে। উত্তর প্রদেশেই বাঙ্গালীদের প্রতিরোধ করার বিষেদ্রবুলক আন্দোলন চলছে। অঞ্চল সমগ্র আসাম প্রদেশে আসামী ভাষীর চেয়ে বাংলা-ভাষীর সংখ্যা বেশী। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের সীমা নির্দিষ্ট হ'লে সমগ্র আসামের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার বিষয় আছে।

বিহারের ছোটনাগপুরের কোন কোন অঞ্চল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীদের হাতে। আর ঐ সব অঞ্চলে কংগ্রেস থেকে বাঙ্গালী বিভাজনের চেষ্টা চলছে।

মানুষের ঐক্যবদ্ধতা বোধ ও ঐক্যবদ্ধত্বই বিশ্বের বড় বড়ের কারণ কবী। এদের চেয়ে একমিষ্ট ও নিঃস্বার্থ কারণ কবী বিহারে আর কেউ আছেন কিনা—ওকতের সম্বন্ধে বিবরণ। অতঃ পরা নিয়ে যে ভয়জনক ভয়জনক চলে, তার ফলে এরা মানবের জিন্দা কারণের সত্যপতি ও সম্প্রদায়ের পর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অতুলনাপ্রাপ্ত প্রদীপ বাকি, বঙ্গ ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ভয়জনক হওয়ার পক্ষে কিছু কথা তাঁর পক্ষে সত্য নয়।

সোনা ঘাট বাংলায় প্রধান মহী ভাঃ বার বিহারের প্রধান মহীও নিকট চিত্রি বিহেছিলে বাংলা ও বিহারের শীঘ্রা নির্ধারণের জন্য উভয় প্রদেশের সরকারের মধ্যে আলোচনা আলোচনার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করে। বিহারের প্রধান মহীও কোন জবাব ভাঃ বার এখনও পাননি—কিন্তু স্ববরের কাগজের মারফৎ বিহারের তরফ থেকে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সংবাদ জানা গিয়েছে। স্বস্ত ভাঃ রায়েও এই আশঙ্কন ঐক্যবদ্ধ সিংহ গ্রহণ না করতে পারেন; কিন্তু সামান্য সৌভাগ্য থেকে তাঁর এই দুঃসমস্যা কথা উঠিত ছিল যে ভাঃ রায়েও চিত্রি উভয় ভাঃ বার পাওয়ার পূর্বেই স্ববরের কাগজের মারফৎ প্রত্যাখ্যান বাকী পাঠানো খুব সম্ভব নয়। একই মেশের দুই বিভিন্ন প্রদেশের সরকারের মধ্যে আলোচনা পরামর্শের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবেই চলা উচিত; স্ববরের কাগজের মারফৎ উভয়-প্রভুক্ত হলে সেটা শোভন হয় না।

হাইড্রোবিদ্য—

হাটীয়া রাষ্ট্র হিসাবে নিজের স্থান গ্রহণ করার পরই ভারতকে যে সব গুরুতর সমস্যা সন্মুখীন হ'তে হয়েছে, তার মধ্যে দেশীয় রাজ্য ছিল একটি প্রধান। সর্গার বস্ত্র ভাইয়ের পরিচালনায় এই সমস্যাও অনেকটা সমাধান হয়েছে; বাকি আছে কার্ণাটক এক নিম্নাঙ্গের হাইড্রোবিদ্য। যে ভাবে সেখানকার সরকার ও সংস্থা-সমিতি সামাজিক অধিকার-ভোগী মুদ্রমানগণ ঐ রাজ্যটিকে চালাচ্ছে, তাতে ভারতের লোকই এর সংঘর্ষ ক্রমে আপনাতন্ত্রক আকার ধারণ করছে।

রাজ্যিক ও ইকোনমিক মিশ্রিত বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্ট্যের চরম সীমায় দেখাচ্ছে সেখানকার হাইড্রোবিদ্য পদাধিনাতি ব্যক্তিরা এমন সব হাইড্রোবিদ্য উক্তি করেছেন যে অর্থ হয় যে কোন নগরায়িক বা সামাজিক অধিকার সেখানকার চিন্তার পাতায় আশা নেই। তার উপর সরকারের গৃহপালিত রাজ্যিক ও উত্তেজিত মন প্রায় প্রকটভাবে চিন্তার সূত্র-ভাঙ্গা করছে।

হাইড্রোবিদ্যের এই মনস্তত্ত্ব হাটীয়া হাটীয়া সম্পূর্ণ হাটীয়া এবং এই হাটীয়াতা তারা বর্ণনা করবে। এই উপলক্ষে তারা নিম্নাঙ্গের সামাজিকিক হাটীয়া ও অধিকারের কথা বিশেষভাবেই বলেছে। চিত্রার ও মুসোলিনীও চেয়ে বর্তমান নিম্নাঙ্গ যে বৈশিষ্ট্যের শাসন চালাতে বেশী উপযুক্ত তার উল্লেখও করা হয়েছে।

এই অবস্থায় ভারত সরকার কি করবে তা বিশেষ ভাবে চিন্তা করার বিষয়। একমুখ্য সারী করছে ভারত সরকারের অধিনায়ে হাইড্রোবিদ্যের বিরুদ্ধে শক্ত কিছু করা সরকার; এমন কি প্রয়োজন হ'লে সশস্ত্র আক্রমণ পর্যন্ত করতে হবে। এমন হাটীয়া করা খুব সম্ভব; কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হাটীয়াভাবে কোন কাজ করা চলে না। আমায়ের মনে হয় হাইড্রোবিদ্যের প্রকট নিষেধের হাটীয়া প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এমন ভাবে চালাতে পারে, যার ফলে ওখানকার অবস্থা অস্বাভাবিক থাকতে পারবে না। তেমন অবস্থার সৃষ্টি করাই ওখানকার সংস্কারগঠিত, অধিকারহীন হিন্দু অধিবাসীদের উচিত। সেই রকম অবস্থার সৃষ্টি হ'লেই কেবল, ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে।

সর্গার প্যাটেল যে ভাবে দেশীয় রাজ্য সমস্যার সমাধান করছেন, তাতে আমাদের তরফা আছে, তিনি খুব হ'বে হাইড্রোবিদ্য সমস্যাও সমাধান করবেন। তিনি হাইড্রোবিদ্যে অস্থির; তাই খুব তাড়াতাড়ি ক'রে তাঁর অস্থিরতা যথেষ্ট এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা ক'রে লাভ হবে কি না, সম্ভব।



ଅମଳିନୀ, ଗୁଡ଼େ ଉଦାର ଚନ୍ଦ୍ର

— হৃদয় —

একাদশ বর্ষ

আষাঢ়—১৩৫৫

তৃতীয় সংখ্যা

মেঘদূত শ্রীবিজয়রত্ন গুহ

আষাঢ় প্রথমদিনে মেঘমাসিষ্টমানঃ
ব্রহ্মরীড়া পরিণতগন্ধ প্রেক্ষণীয় মনশঃ।
মেঘাশোক ভবতি হৃথিনোহপারবা বৃষ্টি চেতঃ
কঠোরেষ প্রণয়িনীভ্যঃ কিং পুনরুৎসবঃ।
কে পড়িছে মেঘদূত ? কোন দে বিরহী কবি ?
নাহি জানি কি যারা যে ছিল ওই ছন্দোময় মোকে।
সহসা টুটিল যেন প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মিথ্যা আবরণ।
মনে হোল মিথ্যা এষ্ট সংসারের শত কর্ণজাল,
মিথ্যা হোল নিত্য অভাবের 'নাই' নাই রব।
প্রতুপণ বিড়ম্বিত যে বন্ধ বিরহী
জগতের অকূল বেদনা নব মেঘ পানে
ঘিয়েছিলো উৎসারিত—শে ডো নহে শুধু
কবিরের অলস কল্পনা !
হুগে হুগে ওই কাণো মেঘ এগেছে অস্তর ধারে।
অদূর অলংপূরে বিরহ-মলিন-মুখী মানসী প্রিয়ারে
নিষে গেছে ঘোর ব্যর্থতা বহি।
ওই স্ফেটন হুগে হুগে আমার ক্রন্দন
চলিয়াছে খড়্গসার অঘরার প্রিয়ার উদ্দেশে।
ঐশ্বর্যবিলাসময়ী উজ্জ্বলিনী গিপ্রাতটে ঝাঁক
নবনীলবিকসিত চিত্রকূট পানকূট শোভা,
অসুখকথা অন্ধকার মনোরম দশান নগর।
বর্ষায়ে গৃহবিন্দুক শুকনাবী কাকলী মুখর গ্রাম চৈতাবট

উদয়ন কথা মূগরিত হৃদয়ী অবদীপ্তী,
বেগবতী আবর্ত চকলা পূর্ণাঙ্গো নরনারতিনী
সাহসং পর্কত বন্ধুর, নব নবী বন উপবনে
হৃদ্যোজিত বিস্তীর্ণ প্রাচীর পূর্ণজয়ে নবমেঘ মাধে
সমোছিলে আনারো জ্বল, তারি স্মৃতি আশ্রা

ভাগে মনে।

উতরিয়া নব-নবী গিরি ও প্রান্তর মেঘমাধে
উৎসুক অপর

পরিধাছে মৃত্যুশোক বিরহ অমলিন
অলকা অমরা পুখী মাঝে
আনন্দোৎসব নধন সলিলঃ স্বপ্ন নটননিমিত্তঃ
নাগতাপ কুণ্ডল শংখাদিহি সংযোগ সাধ্যাং।
হে সার্থক কবি নিমিল-বিরহী-জ্ঞান-হিরা
যে ব্যাধার উঠিছে শুনি নবমেঘ সমাগমে
তুমি তারে ধিলে ডাঝ।
হে মিশারী কবি, তুমি বেগাইলে পথ
মৃত্যুশকা বিরহমলিন পৃথিবীর অভিশাপ হ'তে
অমরার নিত্য নন্দলোকে।
স্বপ্নতার গতি হতে মুক্তি দিলে অমর আত্মাবে
জ্যোতির্পদ্মি অমৃতের মাঝে।
শে বিশ্বের কবি তাই তোমা গিরি আজি সপ্রভ অথরে
তাই তোমা আনাই প্রাণাঘা।

সমস্রাণ

ডাঃ বাহুগোপাল মুখার্জী

মহানতি মহাজন যে পথে গমন করেন তা কি সব সময় সরলীকৃত হতে পারে? মুক্তি-হীন বিচারে কোনো পক্ষা এতদূর সব সময় পরিহর্তব্য। মহাজনী হিলাব নিকাসে যদি তুল কোনক্রমে চুকে যায় সে হয় বেজার মারাত্মক, ছোটখাটসে তুল-তো-সে হিলাবে মার্জনীয়। আমাদের বিচার্য বিষয় হচ্ছে হিন্দু-মোসেম মিলন বা একত্ব। বেশ কথা। এ সমস্রাণের গোড়া কোথায় সেটা যদি বোঝা যায়, তার উল্লস, বুদ্ধি, ক্ষীতি ও ভাল-পছন্দের ইতিহাস যদি জানতে পারি তা'হলে হয়ত একটা বড় মিন্যামার শৌচাতে পারা যাবে।

মুসলমানের নামগন্ধ এতলে বড়ই অষ্টম নবন শতাব্দীর পূর্বে কেউ ভাবত না। আত্মবের বিষয় কিছু এতে নেই। পক্ষম বৃত্তকে ত হজরত মহম্মদের আদিভাব আরবে। তাঁর প্রবর্তিত নতুন ধর্মের নাম হ'ল ইসলাম। শব্দটির অর্থ শান্তি; এর পূর্বে আরবে যে ধর্ম ছিল তার মধ্যে ছিল পৌত্তলিকতা এবং বৌদ্ধধর্মের একটা বিকৃতরূপ। বৌদ্ধ কথ্যটা থেকে নাকি প্রতিন্যস্ত বৃদ্ধ, তার থেকে বৃদ্ধ তারা বলতে থাকে। প্রতিভা পূজার নাম হ'ল বৃদ্ধ-পেরেতি। হজরত মহম্মদ ছিলেন একেশ্বরবাদী। তাঁর শাস্তির ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্ম-যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল। তাঁকে আক্রমণ করার আশ্রয় বন্ধার্থে তাঁকে বৃদ্ধ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। তাঁর সমবে ধর্মের প্রচার অম্মদানেই হয়েছিল। তিনি রাজা নিয়ে রাজাদ্বীপ থাকার আশ্রয় লাগিত করার ওষ্মের মাহুবেয় যন বিশেষভাবে আকর্ষ করেন। নিজে কাক ক'রে নিজের জীবিকা অর্জন রাজ্যের উচিত, তিনি নিজের জীবনে কৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণিত ক'রে দান। তিনি কতদিন একান্ত পথীবেয় মত কাটিয়েছেন! নোনো বার তাঁর প্রিয় কস্তা বিবি কস্তেমার বিবাহ দিয়েছিলেন হজরত আলীর সঙ্গে।

আলীও ছিলেন বড় ধর্ম-প্রাণ, তদুৎ-প্রেমী। তিনি তাঁর সামসারিক অবস্থার উন্নতি করার দিকে যন মিতে পারেন নাই। প্রত্যাহ মহম্মদ সাহেব কস্তাকে দেখতে যেতেন। বারিক্রোর তাকুনায় একদিন অনাহারে বিবি কস্তেমাকে কাটাতে হয়। মূখচোষ শুকনো কেন ধোঁষ করার পিতাকে পুতী সামসারিক অভাব অনটনের কথা জ্ঞাত কয়েম। হজরত বক্তল কেময় ঘরে ঘরে দিয়েছেন একদম মর্ষণীকৃত ব্যাখিত হবার কারণ পেলেন না। তিনি সারের আবরণ একটু উকোলন ক'রে দেখালেন কয়েকটা পাখর নিজের পেটের উপর ধাঁধা। তিনিও অম্মভাবে একদিন মর, কয়েকটা দিন কাটিয়েছেন। পেটের-জ্বালা নিবারণের জন্য পেটকে পাখর চাপা দিয়ে রেখেছেন।

হজরত মহম্মদের পর চার আবিধা বা চারজন বলিফা, প্রতিনিহিত্রণ রাজ্য শাসন ও ধর্ম প্রচার করেন। তাঁদের নাম ধর্মাক্রমে হজরত আবুবকর সিদ্দিক। ইনি ছিলেন মহম্মদ সাহেবের বক্তর, বিবি আয়েশার পিতা), ওমর, ওম্মান্ন এবং আলী। দ্বিতীয় বলিফা হজরত ওমরের সময় ইসলাম খুব ছড়িয়ে পড়ে। এঁদের পর ঘর্ষের অম্মশাসন বিশেষ ক'রে সংস্কারী ও সংরক্ষিত হয়। আলী বা তদুবানের দা আমেশ তা হ'ল কর্ম্ম। তদুবানের আবেশ ছাড়া বক্তল বা বলন্তেন বা নির জীবনে শাসন করতেন তা হল হাদিস বা মতত্ব। তারপরে বক্তলের উপদেশ পণ্ডিত বা উলেমা ও তাঁর অম্মচরণের দ্বারা বা সংস্কারী হ'ল তার নাম কেক। কোরাণ, হাদিস ও কেকা দিয়ে মুসলমানের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন নিয়ন্ত্রিত। এখানে ডাই এল পরিহৎ, তরিকৎ, হকিকৎ ও মায়কৎ। এই হল চতুর্ভাষ ইসলামিক জীবন। পরিহৎ হচ্ছে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মবিধি। তরিকৎ কথ্যটি তরিকা বা পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত। কি ক'রে পরিহতের বিধিগুলি শাসন করতে হবে তাঁর নির্দেশ এতে আছে। হকিকৎ বোঝায় ইসলামের আভ্যন্তরিক বিধিগুলি কি? অর্থাৎ এতে হুক বা খাটি কিনিব কি আছে তার বিচার। মায়কতের অস্ত্র হুই নাম তাসাবুক, ইচ্ছে-লাইরি। একময় ব্রহ্মবিজ্ঞ। মায়কত মানে হুইয়ে

মধোর নদী। হাতে উঠতে লাগে শিঁড়ি, জীব ও অষ্টাব মণ্ডা মিলে করায় মাংস। তালাতুক বা পরাবিত্তা, ইশ্বে-লাহুই এই দুনিয়ার নয়; অস্ত্র দুনিয়ার বিদ্যা বা সেবা বিদ্যা। হুকা সমুদ্রার এইটিরই উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন। এককলি কথা ঠিক ধান ভানতে শিবের সীত হচ্ছে না, এরা মোটেই অবাস্তব নয়। ইসলামের গোড়াকার কথা, ভিতরকার বার্তা ও সৌন্দর্য কোথায় না কুসলে আমাদের সমস্যা বোঝা হবে না এবং সমাধানের পৌছানোও বাবে না। এর থেকেই দরতে পারব কোথায় এবং কতটা মিলেব, কোনখানেই বা কি পরিমাণে অমিলের সম্ভাবনা, অমিলের চৌহদ্দি কমান দায় কিনা তারও আশ্বাস পাওয়া বাবে। এগুলো বোঝার জন্য পরিপ্রভ লাগবে স্বীকার করি, কিন্তু না লেগে উপায় কি? পরমিলে কোন কিছু হবার নয়।

হজরত গুমর ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা। তাঁর জীবন ভারী অসাধারণ। এঁরই সময় সংগ্রামে মুসলমান আত্ম

লুপ্ত হয়। এটা ঘটে নবম শৃঙ্খলের গোড়ার দিকে। এরপর প্রায় দু'শ বছর হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ দেখা যায় না। তারপর ভাষাপথে বায় এল। একদল শতাব্দীতে আবার পাশ্চাত্যের উপর ও হিন্দুর উপর মুসলমান আক্রমণ হয়। সোমনাথ লুণ্ঠিত হয় এই সময়।

ঐতিহাসিক এই ঘটনাগুলির আড়ালে কি কি শক্তি ও তথ্য কাজ করছিল সেগুলি দেখা ও বিচার করা দরকার। হজরত গুমর ছিলেন অর্ধ-গৃহী ও অর্ধ-মহাসী। তাঁর ত্যাগ, তেজ, সেবাপরায়ণতা, নিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিকতা ছিল অতুলনীয়। অনেক অলোকসামান্য গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। ধর্মপ্রচারের জন্য পরজাতি আক্রমণ করা কিন্তু তাঁরই প্রার্থন। তাম বা প্যালালোইন মুসলমানরা জয় করলে সেখানকার এক সাধারণ ব্যক্তি কোতুলকবশে নতুন রাজার প্রাসাদ, রাজকুশল ও রাজ-সিংহাসন দেখতে আসে। শেষের দাবী প্রার্থক তাকে নিয়ে এসে বাড়ি কলে মদিনার এক ঘাটে।

এই লেখকের লিখিত বিদ্রব কাহিনী অধ্যায়ে অধ্যায়ে “মন্দিরা”তে আগামী সংখ্যা হ’তে প্রকাশিত হবে।

কর্তৃক ভারত আক্রমণ হয়। জলপথে সে আক্রমণ এগেছিল। আক্রমণকারী সেনাপতির নাম লবাই জানেন মহম্মদ বিনু কাসীর অর্থাৎ কাসীরের পুত্র মহম্মদ। ইমরেনের শাসনকর্তা হজ্জাজ্ বড় হজ্জাজ্ লোক ছিল। গুমরের সম্মতি না নিয়ে ভারত আক্রমণের হুকুম দেয়। এক শাফিঈ প্রতিনিধিকে এতপড়ায়ে বিপর ও আক্রমণ করার হজরত তাঁর প্রতিনিধির প্রতি খুব অপ্রসন্ন হ’ন এবং খবরক বেন। সিদ্ধ ছিল আক্রান্ত প্রদেশ। সিদ্ধুর রাশা বাহির ছিলেন জাত রাশন। ইতিহাসকার বলেন সিদ্ধু দু-বার আক্রান্ত হয়। প্রথমবার রাশা বাহির আক্রমণ দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেন। দ্বিতীয়বার আক্রমণে সিদ্ধুবেশের তিন্ম্ব হাতে দ্রুতগৌরব বোধরা ভিত্ত্ব থেকে বহিঃসক্রয় সঙ্গে যোগ দেয়। এই গুমর-বাহিনী বা বিজীপ বাহিনীর সাহায্যে সিদ্ধুর আধীনতা

দেখা গেল যা ও শেনা গেল যা তাতে পথিকের চিত্ত বিষম-বিজল ও তুষ্টিত। মাঝী বলল “এ যে দুগাথীর্প তুণ্ডটুই যেথহু ঐ হচ্ছে আমার বাহ্যার তক্ত-তাউল, সিংহাসন, ঐ যে থেছুর গাছটি এখানে গড়িয়ে রয়েছে— ঐ হচ্ছে আমার বাহ্যার প্রাসাদ, আর ঐবে কালো কথলটি থেছুরগাছে লটকান আছে—ঐ হচ্ছে তার রাজ-পরিচ্ছদ।” তখন পথিকটি আবিষ্কারে স্তম্ভ বলে উঠল—“এখন বুঝলাম কি বলে বলীমান হয়ে তোমরা আমাদের হারিয়েছ, তোমরা বাহ্যিক ও ভৌতিক বলে আমাদের পরাভূত করনি, আভ্যন্তরিক ও আধ্যাত্মিক বলেই জিতেছ।”

এখন দেখা যাক ইসলামের এই আভ্যন্তরিক শক্তিটি কি। প্রথম গুণের ইসলামের প্রাণের কথা ছিল বিদ্রব— সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিদ্রব। তার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র-

নৈতিক বিপ্লব। পুরান কথা মনে করে মুসলমান বহুদূর আত্মশোধে যেন—আল মুসলমান আছে কবের, তাঁদের ধর্ম রহে গেছে কেতাবে। তার গোলাম কবের বিলাতের এক বৈঠকে বলেছিলেন, “আরবের ইসলাম ভারতে পৌঁছায় নি, আরকের স্রষ্টা-বৈষম্য পরিবর্তিত আকারে এসেছিল।” বর্ধার্তঃ ইসলামের লক্ষণ ছিল তখনকার মত সমাজ-সাম্যবাদ, সমাজ নারীর স্বাধীনতা বহন করে উঠে। শিশু সম্পত্তিতে পুরু ও কস্তার অধিকার, বিবাহে স্বাধীনতা ও পুরুষের সমান অধিকার। বনিবনা না হলে পুরুষ যদি হিতে পারে ‘তালাক’, নারীও নিতে পারে ‘খোলা’। যে মুসলমানের বাঁধে এতবড় শক্তির খেলা কেউ দেখেনি। তাই আন্তিক ও এপিথার বহন হলে এর প্রচার ও প্রসার। মোস্তাফা মুসলিম জীবনে জাঙ্গল অনেকের ইসলামের প্রতি আগ্রহ। তার থেকে ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ। বোলায় ধর্ম, জনগণের উপাসনার রাজ্য ও ভিগারীতে ছিল না তত্কাং। রাজবি জনকের মত বোলা ও জোলা ছিল পুণ্যপ্রবর্তকের জীবনে ও আচরণে।

এদিকে ভারতে এর মধ্যে কি ঘটেছিল? প্রায় আট শতাব্দী বলেই হয়, এখন হয়েছিল এখানে শতাব্দীর আধিক্য। তিনি তাড়ালেন যৌথ ধর্মের। মুসলিমিত কংগ্রেস প্রাথমিক ধর্মকে। বৌদ্ধধর্ম: লোক ছিল সামাজিক গণতন্ত্র (social democracy)। লম-লমাব্যবহারের শ্রেষ্ঠ অর্থ যে সাম্যবাদ (communism) তা বৌদ্ধের মধ্যে প্রচার ও ব্যবহার হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে আত্মগল-কার মত বংশগত জাতি ছিল না। যা ছিল তার থেকে লোক এদিক ওদিক বেতে পাওত। ইজা ও অভিব্যক্ত মত শ্রেণী বা (guild) বহুলাবলী করা চলত। শতর শ্রেণী বা guild ভাগলেন। কংগ্রেস বংশপরম্পরায় জাতি। তার মধ্যে আবার বংশগত ছোট বড়, শূদ্র ও অশূদ্র এদিক বেতে তার আত্মশোভন ও গণ-শালটকে বলা চলত পারে প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লব।

লম-লমাব্যবহারের উচিত শক্তিতে শক্তমান রক্ত ইসলাম আসছে ভারতে এখন, তখন পানকার সমাজ-বিধানের বেধা দিয়েছে প্রতিষ্ঠা, প্রগতি বিরোধী

রক্ষাশীলতা। তখনও তারা যৌথ হয়ে গিয়েছিল তারা অমধ্যকার জালা চীনে অতুত্ব করছিল। তাঁদের প্রাণ ঈদ ছিল এই বলে হাওয়াকার যে রাজ্য গেল, খন গেল, ধর্ম গেল। এর প্রতিবিধান কি করা বাধ্য? সমাজের নিয়ন্ত্রণ জাতিগত বহুলা বোধ করছিল না। এই শুণেই পূর্ব সমাজে তাঁদের ভাল স্থান ছিল। এই বোলাবোলাে কিছু লোক যে ইসলামের নিকট চলবে তাতে আত্মবোধ কিছু নাই। ইসলামের সামাজিক দিকটা দেখে বৌদ্ধরা যা হাবিয়েছিল তা কিছু-ছে চিনল। তারা মনে মনে তাকে সত্যক স্বর্থনা করতে কাঁপ হলে না এই বলে—“ধর্ম আসিলেন বেশে হবনের বেশে।” শতর শতর ওত বহু। তুতরাং মুসলমানরা ভারত আক্রমণ করলে—আলে ও মনে—এ দেশের বহুলোক তাঁদের সাহায্য করল, এতল করল। কিছু বিগতি উৎপন্ন হল আরও বহুলোকের মনে। এইখানে আরম্ভ সংঘর্ষ। এই হল ইসলামের বিজিতা হয়ে আসার চিত্র। এ ছাড়া ইসলামের এসেলে আর এক বেশে আসার চিত্র আছে। শৈথিল্য আদর্শ নিরীক্ষণ করি এবার।

আবদা নৌ বহরের সাহায্যে বাণিজ্যের মত বিদেশে যেত। তারা ভারত, বাঙ্গা, তাম্রা, চীনে যেত। মুসলমান দ্বারা আগে থেকে, বাঙ্গাছের উপস্থলে তারা উঠত। মুসলমান দ্বারা পরেও এই রীতি চালু ছিল। বহুভাগে, লমাব্যবহারে, বেশ পরিজ্ঞানকরণে তারা আসত জাতি অতিথি অভ্যাগতের সংস্কার এসেলে শেত। রাজ্য পেকমল চেকমল মুসলমানদের ওলে এত মোহিত হয়েছিলেন যে তিনি নিজ রাজ্যে তাঁদের থাকতে বাবলা বা চাকরী করতে ও তাঁদের ধর্ম আচরণ ও প্রচার করতে অধিকার দিয়েছিলেন। মন্সির্ নির্বাণ করার হতুমও আবহবোধে মিলেছিল। চাকরী উপলক্ষ্যে লম্বা এসেছিল তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাজ্যের বিভাগ ও হুছে নৌ-বিভাগে নিয়োজিত হয়েছিল। এখান থেকে মুসলমান আবহবা ও গুজরাটের বরজী রাজ্যেরও নেক লম্বা লাভ করে। বেশ ভাল ব্যবহার দেখানেও তারা লাভ করে। যে আবহবা এ রকম করে এসে বাঙ্গাছ থেকে গেল

ভূমির বংশের লোকরা মণ্ডলা নামে পরিচিত। মণ্ডলা কবার অর্থ অতিথি বা ভাষ্য। অবিভেতা মুসলমানের এই ধর্মই আদর।

রাধা পেরুমল ইসলামের সৌন্দর্যে এত বিমুগ্ধ হয়েছিলেন যে ইসলামের ঘরে ইসলামকে দেখার ক্ষমতা তিনি হারান। কিন্তু তিনি আর ফেরেন নাই। সেখানে তাঁর প্রাণ বিরোধ হয়। কেউ কেউ বলে তিনি মোস্তফা ধর্ম বীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু আজও তাঁর বংশে কালিকোটের জামেয়িনদের রাজ্যাভিষেক যে প্রথা অস্তিত্ব হয় তা বহুভাবে আগন্তুক ইসলামের সঙ্গে হিন্দুর মিলনের বড়ই স্ত্রীতপ্রদ প্রতীক। অভিযেকের দিন হু-রাখা মুসলমানের মত লাল করেন, মাথা নুতান, একজন মৌলভী—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নয়—তাঁর মাথায় রাজ-মুহুর্ত পরিবেশে। সেদিনটা নতুন রাজ্যকে পরিবারের সবাই মুসলমান বলে মনে করে।

পেরুমল সম্বন্ধে এইরূপ সম্মানের স্মৃতি টাটকাছোঁরের রাজার অভিযেকেরও দৃষ্ট হয়। রাধা অভিযুক্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে পর্বত তাঁর মাথা (রাধা পেরুমল) না ফেরেন সে পর্বত তিনি তাঁর প্রতিিনিধিগণে রাধা শাসন করবেন।

তবেই মুসলমান মুসলমান বলেই তার সঙ্গে হিন্দুর কলহ নয়। কলহের আভ্যন্তরিক কয়েকটা দিক আছে। অ-বিভেতা মুসলমানদের সঙ্গে জাতৃত্বের প্রেমের মত সম্বন্ধ বন্ধা ছিল। বিভেতা মুসলমানদের সঙ্গে লেগেছিল গোলামাল।

হিন্দুধর্ম বলে সত্যি কোন ধর্ম নাই। আছে বা তা হ'ল হিন্দু সমাধ। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দুর মনবিধ সংস্কার যে করে সে হিন্দু। নইলে নাস্তিক চার্বাক, তাঁর শিষ্যরা হিন্দু, সম্বোধনকারী সাংখ্যকার ও মজ্জবাসী কন্য হিন্দু, আত্মিক অধৈতবাসী, বিশিষ্টাধৈতবাসী, পরিণামবাসী বা বৈত-বাসী এমন কি বহু-ঈশ্বর-বাসীও হিন্দু, হিন্দু সমাধ হচ্ছে ভারতীয় ভূমির সমবাধ। সমাধ মানে ধর্ম কেউ নীত ভাবে বা আদর্শ ভাবে সেও হিন্দু বলে পরিগণিত হতে পারে। এমন যে হিন্দু-সমাধ যাতে বহিরাগত গ্রীক,

পার্স, চীন, কৃশান প্রভৃতি মিশে গেছে, এখানে মুসলমানের স্থান কেন হ'ল না? এটাই বিচার করার ব্যাপার। ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দু উল্লার, কোন একটা ধারণা মতের সর্বোত্তম প্রাধিক্রম এদের কাছে নাই। তার ধর্ম সনাতন ধর্ম।

হিন্দু সমাধে পড়র যে পরিবর্তন এনেছিলেন তাও যেমন ঘটেছিল অষ্টম শতকে, তেমনি মুসলমানের সমাধস্তম্ভ ভারতে প্রথম প্রবেশও ঘটে প্রায় ঐ রকম সময়ে। একটি হ'ল আড়ট, দ্বিতীয় পণ্ডিত্য, সম-সমাধ-বোধকতার বিরোধী। অপরটি হ'ল ঠিক এর বিপরীত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পৌড়ানীতে ব্রাহ্মণতাব এসে সনাতন ধর্মের "জগৎ হইবে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যার।" হিন্দুতা বহিরাগত মুসলমানেরও কোথায় সূক্ষ্মগত করবে, না, নিষেধাই ইসলামের কল্যাণকর হ'তে লাগল। ক্ষত্রিয়রা বরাবর আভ্যন্তরিক, তাদের বিবে সাদি জগতের কোন জাতির সঙ্গে না চলত? শত্রুরের বেড়া পৌড়ানীতে তারাও হয়ে গেল সামাজিক পশু। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের বেয়ের বিয়ে কতকটা ব্যর্থ হয়েই যেন নিষেধ ছিল। কিন্তু নিষেধই কেন পাণ্ডিত্য ঘর করে নি? হুম্মশক্তি, পরকে নিজের করে নেওয়ার ক্ষমতা, কি পরিমাণ কমেছিল এর থেকে প্রতীকমান হয়। কথার বলে "বিপদে পড়িয়া সাধু কলার খোলা খায়।" সূচি মালগোরা মেলেনাত কি কংবে। না পেয়ে হিন্দুতা আত্মরক্ষার কামঠানীতি অবলম্বন করল। চল কথা বিলম্বী অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থানে ইসলাম জিতল। বহু বৌদ্ধরা ও বহু জাতির লোক মুসলমান হতে লাগল। অস্বাভাবিক হিন্দু সমাধ গুহ থাকতে বাধ্য থাকল। এই রকমে হিন্দু মুসলমানে অসহযোগ বৃদ্ধ আরম্ভ হয়। কামঠ বা কক্ষণ বিপদে পড়লে খোলায় আড়ালে সবার লুকায়। বিপদ কাটলে আবার ঠাঁকার হাত পা বেলে। তাই কামঠব্রত বা অসহযোগ হিন্দুদের গ্রহণ করতে হয়েছিল সমাধের আত্মরক্ষার। এই বিরোধ আজও চলে আসছে। তা হ'লে সামাজিক অকোশল, অস্বীকৃতি, অপরগতা, প্রতিবন্ধকতা মূলতঃ উভয়ে বিশবিশেষের অন্তরায়। তাই প্রায় আদর্শ আট' বছর ধরে চলে

আসছে। এটা কক্ষে পাগড় বসি ধর্ম প্রচারে মূল্যমান সাধু সন্তের জীবন, উপদেশ, শিক্ষা ছাড়া অহংস না বাবহার হত; যদি ধর্মাত্মের গ্রহণকারীরা আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তনে অতটা উৎকটভাবে গ্রহণ না করত। মিটমাটী অসন্তোষের অবস্থা দুই দিক থেকে গড়ে তুলেছিল। এক পক্ষের দোষ নাই। পুস্তানও-ত লোকে হয়েছে। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রাধান্য, নামধাম আগের মতই প্রায় রয়ে গেছে। ইসলামের সুবীতল ছায়ায় যে কারণেই যে এসেছে সে পোষাক পরিচ্ছদ, নিজ নাম, এমন কি গৌক-হাতি ও কেশ-বিভাগে একটা বৈদেশিক ছাপ লাগিরে থেলেছে। নিজেদের যিকোনো মনে মনে কটা একটা ক্যানন হ'য়ে গিয়েছিল। মনে মনে যে সব ক্ষেত্রের কারণ ছিল তা ধর্ম ও সমাজ রূপান্তর আনল।

হিন্দু সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাধনা ও সভ্যতাসে বহুকাল থেকে ছয় ও হুঁহির দাঁত লংঘাত চলে আসছিল হাতে

আজও হিন্দু আদিকা। হুহর বাংলা ও আসানের কিছু কার্যগত মূল্যমানের বাহ্যিক এই কথাই প্রমাণ করে। এরা যদি ভারতে মূল্যমান না হয়ে যৌদ্ধতা, বা এরা আগে ছিল, আগত তা হ'লে রাগপুত্র বা কবির হ'লে সমাজে গৃহীত হয়ে যেত। নিজেদের একটা বৈশিষ্ট্য এরা গোড়া থেকে রাখতে পেরেছে। তাই এদেশের সমাজে বেশেনি। বৌদ্ধধর্মের অবসানে এদের স্থিতি হল। অষ্টম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ইসলাম ছয় ও মনের যে দিক নিতে পারে, বিনা প্রতিযোগিতার, শৈবিক দিকে এগুতে লাগল। এর মধ্যে প্রথম বা যৌদ্ধধর্ম বেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হিন্দুদের মধ্যে আর একটা লাগরণের লাড়া পাওয়া যায়। হিন্দু-মোহরম ঐক্যের একটা দিক সমাজ বেন এতদিনে খুঁজে বার করল। রামায়ণ, রামানন্দ, বরভাচার্য, ঐতিহ্য, তুকারাম,

ডাঃ যাহ্নগোপাল মুখার্জীর বিপ্লব কাহিনী অধ্যায়ে অধ্যায়ে আগামী সংখ্যা হ'তে মন্দিরাতে প্রকাশিত হবে।

করে অমণের প্রগতিবিস্তার ও উন্নয়ন, গণের সর্বস্বার্থ হওয়ার উপর বৌদ্ধ, ব্রহ্মণের বুদ্ধি, যন্ত্রিকের প্রতিষ্ঠা-কাজ অগ্রগমনের কেন্দ্রাভিমুখীতার গতিবেগকে একটা সৌন্দর্যে বিভূষিত সামগ্র্যের পথ দিয়ে সমাজ জীবন প্রতিবাহিত করত। শবর জরী হওয়ার পর প্রমণের প্রভাব সমাজ-প্রাণ থেকে অপসারিত হ'ল। বৌদ্ধাধী, সংকীর্ণতা ক্রমে এত বেড়ে গেল যে পরকে আপন করার শৃঙ্খলা নষ্ট হল। আচরণে কোল বেগা আর রইল না। একটা দৃষ্ট অস্বাভাব্য সমাজ-ছয়রে পৌঁছাল। “বাজে গোড়া বটের কোটরে” ইসলামের বীর উগ্ধ হল। প্রাথমিকের স্থল তার হল। সংক্ষেপতঃ ইসলাম প্রতিফ্রিগনীয় বিপ্লবের দিনে এসেছিল ভারতে, প্রকৃত সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা বিপ্লবের সার ত্যাগে ছিল বলে সে সাক্ষ্যের সবে এখানে ক্রমে গেল। গুণ তুলোয়রে এতটা করেনি। দ্বিতীতে বাধনাত্মক আত্মা, পেগানে

তুলনীমান, হুহরাস প্রকৃতি সাধু সন্তরা আবিস্কৃত হলেন। আরও এলেন নানক, বাহু, কবীর। এরা সব মধ্য যুগের লোক। প্রাণের কথা মেটাতো এরা অনেকটা সক্ষম হলেন। ছয়রের দিক দিয়ে এরা এগলেন। আবার আচরণে কোল বেগা কিরল। ধর্মাত্মের গ্রহণ কমল বা অপরিহার্য রইল না। তাসাফুরের ভিতর দিয়ে মিলের পথ গড়ল। উত্তর সমাজের বৈবাহ্যের উগ্রতা কমল। মোহরম হুহীরে মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বহুই ছিল। সেইখান দিয়ে হুহীরা এদেশী সবে রাখ খেয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে সখিকর ও নিখিকর সমাধির চর্চা ও সাধনা খুব চলত। তাঁরা যে চার দোকান বা জুহি পার হয়ে পূর্ব সমাধিতে পৌঁছাতে হয় বলতেন, তা তুলনা করে দেখলে এদেশী সাধন সোপানের সঙ্গে মিলে যায়। জামাল, জামাল, হাছত, লাহত দিয়ে পেলে তবে বলা-বিলা ও কানাকিয়ার হালত বা অবস্থা প্রাণ

হওয়া যায়। শাখা মানুষের এবাদতে মগ্ন হলে, অর্থাৎ উপাসকের উপাসনার ঐকাদিকচিত্র হলে তার ভিতর কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে। ঐশ্বর্য, অশ্বরের আলো, অহংভব ছাড়া সব লয় বা সবিকল্প সমাধি। তারপর অহংভবেরও লয় বা নির্বিকল্প সমাধি। (জামাল, জামাল, হাফিজ ও লাহুজ)। আজমীরের রাজা মহম্মদীন চিহ্নি আসেন। তাঁরও হিন্দু যোগের ভক্ত ছিল বহু।

পূর্বেক্ত আচার্যদের মধ্যে বহু মহাত্মাই ছিলেন সুদী, এও একটা এমন বিক বেদান দিয়ে ইসলামের শিক্ষার অহংকুল শাখা-কৌশলের বেধা পাওয়া যায়। নানক, দাস, কবীর, তুকালাম নিম্ন ভক্তন পানে ভগবানকে সাহেব আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। জুগের বিষয় হিন্দু যোগের মিলনের এ চেষ্টাও শেষ পর্যন্ত ফলবতী হয় নাই। এঁদের লকলের হিন্দু ও যোগের ভক্ত ছিল। নানকের প্রসিদ্ধির সময় বাবার ভারতে আসেন। তিনি নানককে খুব ভক্তি করিতেন। হুত্ব কত বিষয়ের পরামর্শ নিতেন।

এবার আমরা কিছু আধুনিক ইতিহাসে আদি। কবীর সখারায় গণেশ বেউতার বনভেন শিবাজী ডেম হাজার মুসলমানকে হিন্দু সমাধে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। রাজপুতানার মালকানী মুসলমানরা হিন্দুর আচার বহু পরিমাণে এখনও রেখেছে। পাঞ্জাবে জাঠেরা হিন্দু, যোগের ও শিখ হলেও নিজেদের জাঠই বলে। অর্থাৎ আসে তারা জাঠ, পরে তাদের ধর্মের বেওয়ার্থ নাম। শি: জিয়া এদের বাগাতে পারেন নাই।

ইংরেজ আমলে মুসলমানরা রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অবনতির অবস্থায় আসেন। ১৮৫৭ খ্রীঃাব্দে যে স্বাধীনতা প্রচেষ্টা হয়, তাতে যোগের প্রাণাত্ম পুনঃ স্থাপিত হতে বাচ্ছিল। মারাঠী পেশওয়ারা প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি নিজেদের কবলে এনে কোললেও দিল্লীর বাহাদুরকে নামে মেনে চলতেন। আন্দোলন বার্ষ হলে ইংরেজ মুসলমানকে দাবিয়ে হিন্দুকে বাড়িয়ে চলার নীতি অহংরপ করল। আবার কংগ্রেসের শাকল্যে অনগণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বাড়লে, ১৯০০ সাল থেকে হিন্দুকে দাবিয়ে মুসলমানকে বাড়িয়ে চলার নীতি অবলম্বন

করেছে। মাছের তেলে মাছ ডাকার বেওয়ার্থ চির-দিনই আছে। গুস্তাফ লোক সেটা করবেনই, বৃত্ত দিন তেল-দার মাছ মিলবে। শাম-দান-ডেম-নওর নাম নীতি চতুর্ধ। রাজা বৃকে বৃকে ক্ষেত্রমত এগুলো ব্যবহার করবেন, এই হচ্ছে বিধি, "নও-বতীনকর, ডেম ধাঃ নর্তক-বৃত্তা সমাধ, জিঃই মনহি অল, জনিয়ে কপ, রামচন্দ্র কি রাজ।" রামচন্দ্রিতে তুলনীমান বলেছেন রাজার ব্যবহার্য দণ্ড প্রকার উপর থেকে চলে গেছে সমাজদার হাতে পথের একটা শব্দল হয়ে; ডেম সমাধ ছেড়ে চলে গেছে শুধু নীচের আসরে নর্তকের পায়ে বিড়ি তালে; বশ করার বা ক্ষিত্ত করার হওকার হচ্ছে শুধু মনকে। এমন হুন্সর চির হচ্ছে বান-রাজ্যের। একথা এখন অবাস্তব। তুলনীমান বলেন "শাম-দান-ডেম-নও" "শাম-দান" নব। এর মধ্যে শুধু শাম বা সবাইকে সমান করে নিয়ে চলাই হবে রাজার নীতি।

বাং ও কথা। ১৮৫৭ সালের আন্দোলনে যোগের সাম্রাজ্য আবার কার্যে হতে বাচ্ছিল। সেটা বার্ষ হল। ডেমন সময়ের কিছু আগে আরব দেশে ওহাবী আন্দোলন শুরু হয়। তারা ছিল ধর্ম সংস্কারে উৎকট পন্থী, ইংলণ্ডের পিউরিটানদের মত। হজ করতে গিয়ে ভারতীয় মুসলমান শিখে এল সে বিজ্ঞাটা। ভারতের মাটিতে সে বীজ উগ্ধ হল বোঝাই থেকে। তখনকার স্তবে বাংলায়, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা একত্র ছিল। সূতরাং ওহাবী আন্দোলন একটা মত্ত বড় প্রদেশে খুব শিকড় গেড়ে যায়। ওহাবীরা বড় গোড়া। পীরের আন্তোনাঃ গিয়ে ধরণা বেওয়া বা সিঁচি চড়ানো এরা বৃত্ত-পেবেধি মনে করে। হজ করতে গিয়ে হজরত মহম্মদের কবরে বহু-লোক মাথা ঠেকাত বা কাঁদত। এমন কি এও খবের হানিকর—ওহাবী মতে। তারা মনে করে অন্য ধর্মী রাজার অধীনে থাকলে মুসলমানের ঠিক ঠিক ধর্ম পালন হতে পারে না। আরবের বর্তমান বাঙ্গা ইবন্ সাউন্ হচ্ছেন ওহাবী। তিনি ওহাবী মতে বহুপ্রকার সংস্কার প্রবর্তন করেছেন বা হজকারীদের নিম্ন মন ও মস্তের বিরুদ্ধে যানতে হচ্ছে।

ভাঙতে ওহাবী আন্দোলন শুরু হল। গুপ্তভাবে এরা আন্দোলন চালাত। তারহকে তারা দাব-উল-হার মনে করত, দাব-উল-ইসলাম নয়। অর্থাৎ ভারত যে ছেতু ইংরেজের অধীনে দেহন্ত গোলামের আবাসস্থান, ইসলামের আবাসস্থান নয়। অতএব তারা এই হাজার উচ্চের কামনার কাজ করতে লাগল। এদের এ সব গুপ্ত প্রচার গোপনে রইল না। প্রকাশ হয়ে পড়ল। ইংরেজ সরকার এর বিরোধে আতঙ্কিত হলেন। বহুলোক গ্রেপ্তার হল। হুজুরের বাতলা হল। আমিরুলদীন (কিংবা আমীর আলী) নামে এক বড় সঙ্গী এই গ্রেপ্তার হয়েছিল। তার ভ্রত বিলাত থেকে ছুঁব বড় এবং নানী ব্যাঙিতার আনন্ডেকে আনা হয়। শেষ পর্যন্ত আমীর আলীর সাজা হয়ে যায়, তবে প্রাণদণ্ড হয় নি। বহুলোকের জেল ও কালাপানি (আন্দামানে নির্বাসন) হয়েছিল। এর কলে একজন ওই বহুল লোক কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে জজ নরিনকে হত্যা করে তাঁরী যায়। পরে বড় লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান পরিদর্শনে গেলে সেখান থেকে তাঁর নামে এক আন্দামানী ডাকে হত্যা করে। ওহাবী হাকামা দিততে বেশ কয়েক বছর লেগেছিল, প্রায় ১৮১০ পর্যন্ত এর জের মেটাতে লেগেছিল।

কারণ থাকলে কার্য হবেই। শেকড় থাকলে গাছ জন্ম থেকে রগ টানে। জন্ম যদি উর্বর হয়, ফসল সহজে জন্মে ওঠে। উর্বর জমিতে গাছ জন্মায় না। অন্ততঃ আবাস ভালরূপ হয় না। গাছ যদি ও বা মাথা চাড়া দেয়, তা'র দুর্বল। ভারতে ইসলামে ও ইসলামীতে (খুটনী) যে মনের স্বপ্ন লেগেছিল তা জুলুমের, অসংলিলা কিছুদিন রইল। ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধ হয়। গ্রীস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া এবং পরে রুমেলিয়া তুর্কির দখল যুদ্ধ ঘোষণা করে ও তার স্বপ্ন-ছোঁ করে। যুদ্ধের শেষে পূর্বে একজন ইংরেজ সেনাপতি তুর্কি নৌ-বাহরের প্রধান কর্তা ছিল। নিরপেক্ষ জাতির লোক হিসাবে সে যুদ্ধ শুরু হলে পদত্যাগ করে। তুর্কি এরূপ অচ্যুতানিত ঘটনায় ভাব্যভাষা খেয়ে যায়। মঙ্গলের মূলস্থান হলে সবটা নিয়ে ভারী চাকসের ব্যক্তি হল। ভারতে

তার ডেউ এসে পড়ল। এর আগে পারস্যের দক্ষিণ অংশে ইংরেজ নিজের প্রাধান্য জমিয়ে ফেলেছিল। এখান তুর্কীও দুর্বল হল। মূলস্থানের দাব গণবে গরব তা জান হ'য়ে পড়ল। ওহাবী আন্দোলনের ভাবব্যথা বলায় ছিল, এখান সে ভাবব্যথা কথা বিচার করল। একটা কুটিল পথ ধরল কিছু লোক। একাত্ত পথের ইসলামের প্রতিবাহ হয়েছিল। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের ব্যাপার নিয়ে এবং ১৯১২ সালে তুর্কীর কথা নিয়ে হিন্দুরা ভারতের মোরেশ ভাইয়ের প্রতি সহায়কৃতিতে সে প্রতিবাহে বোগ বেশ সংবাদপত্র এবং সভা-সমিতির মাধ্যমে।

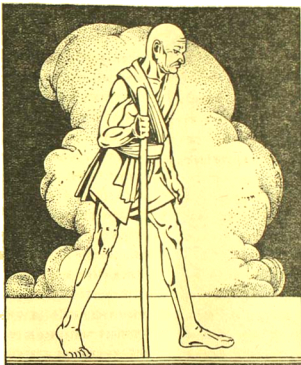
যারা কুটিল গুপ্তপথ গ্রহণ করেছিল তারা মহামেদিন নাম নিয়ে উত্তর পশ্চিম শীঘ্রে গিয়ে প্রধান আজ্ঞা পড়ল। ভারতের মধ্যে থেকে ইংরেজের বৈরতা করা তেমন সুবিধার নয় বলে বেগানে কেউ রাজা নাই, না ইংরেজ, না আকগান কাবুলী—সেই পাহাড় জমলে বলে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ও আয়োজন শুরু করল। দাব-উল-হার থেকে চলে গেল দাব-উল-ইসলাম কার্যে করতে বলে। তারা বাইরের থেকে বহু সাহায্য প্রত্যাশা করছিল। তা' ছাড়া ইংরেজের শাসনের ক্ষমতার বাইরে থেকে ক্রমশঃ দাবার দাবার একে কাহিল করে ভারতে এগিয়ে এই মূল্যবান ঋণ। তারা বেগানে থাকে তাই পবিত্র স্থান বা পাকিস্তান। এই পাকিস্তান হল তাদের যুদ্ধ নির্ধাণ। ইংরেজকে সরিয়ে বস্তুটা সাহায্য তাদের অধিকারে আনবে সবটা হয়ে যাবে পাকিস্তান—এই ছিল তাদের পরিকল্পনা। তা'হলে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান হচ্ছে একমুখ চরম-পন্থার মনের উৎকট পরিকল্পনা। সরকারী রাউলেট্টি রিপোর্টে মহামেদিনের কথা কিছু আছে।

১৯১৪ সালে প্রধান বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হলে তুর্কি জার্মানির সঙ্গে ব্রিটনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। তুর্কি ব্রিটনের বিরুদ্ধে নামা যানে মেহমদ ঘোষণা হ'য়ে যাওয়া। মূলস্থানের একে ধর্মবুদ্ধ মাফক এটা চাইত তুর্কি। মহামেদিন ও শীঘ্রের ধর্মবুদ্ধ মোহাম্মদ ভারতে

অসহ্যবের বহি ছাড়াই লাগল। আফগানিস্তানের মধ্যেও আন্দোলন চলল। আফগান অধিপতি আমীর হাবিবুল্লা ইংরেজের সঙ্গে যাতে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ভেতন চাপ পড়ল তাঁর ওপর। তিনি যুদ্ধে নামতে সাহস পেলেন না। তাঁকে গুপ্তহত্যা করা হল। সুব্রাহ্ম ইনারেংউল্লাকে ঠেলে দিয়ে আফগানকে আমীর করা

১৯১৯এর পেরে মহামুখ বন্ধ হয়। তুর্কির সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। আরব মুক্ত তাদের পক্ষে আলান করে নেওয়া হয়। ১৯২০-২১ পৃষ্ঠাখে ভারতে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। হিন্দু মুসলমান একত্রে। মহাত্মা গান্ধী তাদের সর্বস্বাসীদন্ত নেতা হন।

হিন্দু মোদ্রেম একতার কারণ বাইরের মুসলমান



মহাত্মা গান্ধী

হল। কারণ আমানুল্লা আমীরের তৃতীয় পুত্র হলেও মেহরাব ঘোষণা করতে রাজী ছিলেন। ১৯১৯ সালে তৃতীয় আফগান যুদ্ধ হয়। আফগানরা পেশোয়ারে চড়াও করে এবং রুল দখল করে। শেষে যুদ্ধ মিটে যায়। আফগান পুরোপুরি ইংরেজের প্রভাব থেকে মুক্ত হল। পাকিস্তানি মহামুখবিনরা ভারী বুলি হল। তাদের আশা বাড়তে লাগল।

বাধীন রাজ্যহুটির—পারস্ত ও তুর্কি—বিশেষভাবে খাতা গাওয়া, বিশেষ করে তুর্কির ভাণ্ডা অগ্রদূত হওয়া।

১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধের পর মিস্র মহম্মদ আলী ও মিস্র ওয়াশের হোসেন (পরে মোলানা মহম্মদ আলী ও মিস্র ওয়াশের হোসেন) বিলাতে বান ভারত সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে দিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে খেয়ে তুর্কির প্রতি একই হুঁচকার যদি কিরিয়ে আনতে পারেন।

সেখানে স্থিতি ছিল না। এঁরা ফিরে যোগেন লীগকে স্বাভাবী করলেন, কংগ্রেসের সহগামী করলেন, অগাধা খা লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন। এখন থেকে কংগ্রেস ও লীগ একই রেজিস্ট্রেশন পাশ করতে লাগলেন। এমন কি একই ভাষণও এদের অধিবেশন হতে লাগল। ‘অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন মত’।

এরপর মিঃ জিহা পুরায়ে ১৯১৬ সালে কংগ্রেস-লীগ লোকী চুক্তি হয়। জিহা সাহেব ছিলেন চরমপন্থী কংগ্রেসী, লোকমাত্র ভিলকের দলের। লোকমাত্র সেদিন বড়ই উল্লাসে বলেছিল “we have luck now



জিহা সাহা

এতকাল বাধে তাঁর অস্তিত্বের কংগ্রেস ত্যাগ করতে হল। আলি ভাটলার দ্বারা গোড়ায় কংগ্রেসের কেউ ছিলেন না তাঁরা হলেন মত্ত মত্ত লোক। এমন কি ১৯২৪ সালে মিট্রিতে মোলানা মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে লীগের এক সভায় মিঃ জিহা কিছু বলতে উঠলে সভাসভা চাঁৎকার করে তাঁকে থামিয়ে দেয়। বলতে দেয় না। অবশ্য: এই দুটি ঘটনা পরবর্তীকালে জিহা সাহেবকে পান্ডিত্যের থেকে বিদূষ ও বিমূখ করে।



মিঃ জিহা

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এর দাম অনেক। এই দাবী নিয়ে উভয় ব্যক্তির মনের মধ্যে যে বিরোধের পাঁচ অমিছিল তা’ খোলা যায়। জিহা সাহেব পরে একটা চৌদ্দ দফা সর্ত নিয়ে বিলেতে ব্যারোটারী করতে করতে চলে যান।

১৯২০ সালে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক বলে বিলাতে। সেখানে দার মহম্মদ ইক্বাল পাকিস্তানের গর্জা খোলাপুলি বিস্তারিত করেন। এইবার পাকিস্তান প্রচারে ইংরেজ রাজনীতিকদের বেশ আশ্চর্য্য ছিল। তারা এক চিলে দুই পাবী খারার চোঁচাই রইল। কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর মুখ হুক করেছিল! তার থেকে মূলমানকে আলাদা করে সংযুক্ত নজিচ্ছে খব করা এবং সেই যে সীমান্তের চরমপন্থী পাকিস্তানিদের আজ্ঞা তাকেও নিষেধ করা। ভারতের অনিকে তাদের কাছের পক্ষে তাদের রক্ষণই যোগাড়ের পক্ষে উত্তর করে তোলা। সীমান্ত নেতাদের হতে চললে প্রাণ বেওয়া-বেবী করতে হ’তে পারে। কিন্তু এপারের পাকিস্তানের আন্দোলনে যোগ দিলে প্রাণ বেওয়া-বেবী নয়, প্রাণ বাঁচাবাচি। প্রথম মুখে এই মিকেই লোক ভিজবে। তার ওপর বিপদ-বরণ বা আন্দোলনগের বাংলাই নেই এতে। এইজন্য এই পাকিস্তানীর ভিড়ে দড় সাহাও নবাবের জমায়েরং।



লোকমাত্র ভিলক

at Lucknow,” “এখানে এসে এখন আখ্যায়ের ভাগ্য ফিরল, কত আশার কথা।”

১৯২১ সালে বিলাত উপলক্ষ্যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন হুক হয়। পান্ডিত্যের সঙ্গে বহু পণ্যমাত্র কংগ্রেসী একমত্ত হলেন না—তাঁর সরাসরি প্রতিহত করার প্রক্রিয়ায় Direct Action এ। জিহা সাহেবকে

জেলের চিঠি*

(১)

কল্যাণীয়াহ,

আপনার ৩০।৪ তারিখের চিঠি কয়েকদিন হ'ল পেয়েছি। তারপর আপনার ১০।৪ তারিখের চিঠিখানা ১৬ তারিখে পেয়েছি। চিঠিখানা পেয়ে খুশীও হয়েছি, হেসেছিও খুব। মানুষ বস্তু rationalই হোক একটা illusion নিয়েই থাকতে চায়। নতুবা এই সব প্রশ্নের জবাব এমন জঙ্গলীভাবে চেয়ে পাঠাতেন না। আপনার কি ধারণা এইসব গুরুতর প্রশ্নের জবাব আমি (বা আমরা) দৃঢ়াশ্রয়িতাবে নিজেদের বিজ্ঞা ও বুদ্ধি থেকে দিতে পারি? হু'একজন বস্তুকেনিষ্ট বন্ধুকে বললাম—তোমরা এই চিঠির জবাব দাও। একজন হেসে গেল: আর একজন বলল—“একবছর পড়ে নিই, তারপর জবাব দেব।” এরা দু'জনই পড়ুয়া এবং বহু বছরের পাঠ লক্ষ্য এশের আছে।

বাক্য, ভাব ও চিঠি পেয়ে খুশী খুশী হ'য়েছি—আপনারা যে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে এবং নিজের বিশ্বতপ্রায় অসীম বিজ্ঞা আর একবার আলিয়ে নেবার সুযোগ ও উপলক্ষ্য পেয়ে। প্রথম আপনার ওটা নয়, অস্বস্ত: হাটটা এবং আমার চার পৃষ্ঠার চিঠির আয়তনে কুলোবে কিনা লক্ষ্যে। (১) Metaphysical materialism—আপনার কাছে যেন ছুট্টা বিপরীত অর্থবোধক terms মনে হচ্ছে.—তা ঠিক নয়। Metaphysics শব্দের অর্থ beyond matter নয়। এটা Greek শব্দ—meta (beyond) + phusika বা Physik (nature)—অর্থাৎ যে শাস্ত্র দৃষ্টমান জগতের বাইরের তথ্য নিয়ে আলোচনা করে। Aristotle বোধ হয় প্রথম এই শব্দ প্রয়োগ করেন। এইভাবে এর সংজ্ঞা কেওয়া বাহ—science of the creation of the universe (cosmology) and

of the final being (ontology); অনেক জান-বিজ্ঞান অর্থাৎ science of knowledgeকেও (Epistemology) এর মধ্যে ধরেন।

ইতিহাসের বিবর্তনে বা দৃষ্টমান প্রকৃতিতে matter বা জড়ের প্রাধান্য স্বীকার করেও কেউ হয়তো বিশ্বদৃষ্টির চরম তত্ত্ব ও বাধ্যা হিসাবে জড়ের একচ্ছত্রত্ব স্বীকার না করতেও পারে। অর্থাৎ matter in history এবং metaphysical materialism এক বস্তু নয়। খুব দৃষ্টভাবে দেখতে গেলে, Marxই প্রথম consistent metaphysical materialist. প্রথম গ্রীক দার্শনিক Thales (Father of Philosophy বলে পরিচিত) বলেছেন—জল থেকেই সব সৃষ্টি; কিন্তু water as matter is the final & ultimate reality—এমন কথা খেলসের মত থেকে বের করা কঠিন। তাই তাঁকে metaphysical materialist বলা চলে না। তাঁকে ও অপর কয়েকজন গ্রীক দার্শনিকদের বলা হয় hylozoist—bylo (matter) + zoist (from zoo—living animal)—বলা বাহ জড়প্রাণবাদী। Kant থেকে Hegel পর্যন্ত যে idealist critical & romantic philosophy চলেছে, ১৯শ শতাব্দীর মাক্সাধ্বিত্তিতে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে materialism এর দিকে ঝোঁক আসে। Dühring সেট যুগের—কিন্তু তিনি পুরোপুরি metaphysical materialist নয়। তিনি নিজে তাঁর দর্শনকে বলেছেন the philosophy of reality। তাঁর দর্শনে dialectic এর আভাস আছে; কিন্তু তাঁর law of difference ক্রিয়মান হয় সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে নয়—combination এর ভিতর দিয়ে। Thought & Being এর বিরোধও তিনি মেনেছেন—আবার তাদের perfect congruity এবং inner connection between thought & reality তাও স্বীকার করেছেন। তাঁর দর্শন সবচেয়ে Höffding মনেছেন—He comes very near materialism when he maintains, that everything in the world has a material side. Materialism is for Dühring nothing

* ২০।৪।৪০ তারিখে শ্রীমঙ্গলপুর জে কল্যাণীয়াহ বঙ্গীয় শ্রমিক লীগ হ'তে শ্রমী কল্যাণীয়াহের বিকট পিঠি।

but a "pedestal"—an exact foundation—not an exhaustive & full explanation of existence itself

হেগেলকে কোনমতেই materialist বলা যায় না—German idealist philosophyর culmination হ'লেন হেগেল। হেগেল সবচেয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রায় অসম্ভব। কবিতা আছে, তাঁকে একজন বলেছিল—to put his philosophy into one sentence—তাঁর জবাব হ'ল ১০ বই পুস্তক। তিনি dialecticsকে কেবল চিন্তার ও বিচারের রাস্তা নয়, বাস্তবের বা ইতিহাসের রাস্তাও মেনে নিয়েছেন। "Every condition of affairs contains a contradiction which evolution must resolve by a reconciling unity." পরিণত বয়সে হেগেল তাঁর philosophical revolutionary outlook বাগড়ে পারেন নি—অস্বস্ত: নাস্ত্র প্রভৃতির তাই নত। সেখানে, Feurbach, Bauer, Marx প্রভৃতি critical materialism এর দিকে এসে সিদ্ধান্ত করলেন "socialism inevitable." কিন্তু হেগেলকে কোনমতেই materialist বলা যায় না; তিনি ইতিহাসের materialist interpretation দেন নি; তিনি দিয়েছেন dialectic interpretation। Nature এর মধ্যেও তিনি এই dialectic এনেছেন। তাঁর মতে "Nature must be regarded as a system of stages (degrees) in which one necessarily proceeds from the other.....not, however, in such a way that one is naturally produced by the other but in the inner idea which constitutes the ground of Nature". "Proceeding of plants and animals from water and the proceeding of highly developed animal organisation from lower ones."—এই মতকে (অর্থাৎ Darwinএর Evolution কে) তিনি nebulous and at bottom senseless বলেছেন। তাঁর

এই মতকে বলা যায় idealistic doctrine of evolution. এখানে উল্লেখযোগ্য Dühring-ও Darwin-এর Evolution মানেই না; তাঁর evolution অর্থ বকয়ের।

আগনার প্রথম গ্রন্থ ও তার অন্তর্গত উপগ্রন্থের অর্থাৎ ঘোঁটাছুটি উপরে দিয়েছি। কিন্তু বিতীর্থ ও ভৃতীর্থ গ্রন্থের অর্থাৎ দেওয়া আমার পক্ষে আরও কঠিন। কারণ Anti-Dühring বইটা এখানে নেই; সাধারণ philosophyর বইতেও Dühring সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নেই। এই বিপক্ষে Marx এবং Engels এর মত পাঠ্য মতো কোন বইও পড়ে নেই। নিম্নে science এর student নই—কাজেই latest scientific theory সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান খুব বেইশী নয়। তবুও সাধারণভাবে কিছু লিখছি হয়ত কতকটা সাহায্য পেতে পারেন।

Matter এর motion এর সম্পর্ক সম্বন্ধে বা motion-এর ভাব সম্বন্ধে Dühring এর মত খুব পরিষ্কার নয়। আপনি থাকে state of identity বলেছেন (হয়তো Engels এর ভাষায়), তাকে আমি বলবো condition of perfect rest। Matterকে তিনি স্বখনও being, world-medium, the bearer of all reality বলেও সংজ্ঞা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এও বলেছেন—occasions for phenomena of consciousness and other natural phenomena এই matter থেকেই উদ্ভূত হয়; তাঁর মতে, এইমত matter must be widened and deepened। সব পরিবর্তন (including motion) matter এর মধ্যেই আছে। Matter এর মধ্যে different forces and tendencies আছে; তাদের combination-এ স্বখনও equilibrium এবং স্বখনও new motion এনে দেয়। ঘোঁটার উপর বলা যায়—condition of perfect rest থেকে successive differences and rhythmically changing states কি করে এল, Dühring বর্ণন করার ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। একখানে তিনি বলেছেন—force (এখনকার বিজ্ঞানের Energy) ক্রিয়মান হয় contrast বা বিভেদের দ্বিতর দিয়ে—Expressions

of force, motions, developments are conditioned by contrast and opposition.

এখন latest scientific theory। এই গ্রন্থে Einstein-এর Relativity theory এসে পড়ে। সে সবচেয়ে আমার বিজ্ঞান। তাই ওর মধ্যে ঢুকবো না—একথানা বই থেকে মোট কথাটা লিখে দিচ্ছি। Motion হ'ল energyর একটা রকমকর। একটা মনসীষ পরীক্ষকে টেনে রেখে ছেড়ে দিলে থলুকের মত তার একটা energy আছে। Light energy, heat energy প্রভৃতির বড়ো energy of motion—kinetic energy-ও আছে। একটা চলন্ত পদার্থ (moving body) বায়ু অবস্থার চেয়ে বেশী mass সংগ্রহ করে—এই extra mass আসে তার motion থেকে—অর্থাৎ motion এরও একটা mass আছে। কাজেই energy and matter are convertible terms; তফাৎ এই যে, mass of body at rest হ'ল mass of congealed energy।

কাজেই motion, matter-এর গুণ বা derivative নয়—তা matter-এর kinetic অবস্থা। অবস্থা এতে সমস্ত সমস্তার সীমাবদ্ধ হ'ল না। গ্রহ হ'তে পারে congealed energy, kinetic হ'ল কেন? এর উত্তর নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়—হরতো আধুনিক বিজ্ঞানও এখানে মুক। একমাত্র জবাব বোধ হয় এই ধরে নেওয়া হয় বা ধরে নেওয়া যায়—একটা working hypothesis হিসাবে—congealed energy becomes kinetic by virtue of its own nature.

আপনি ether theory সবচেয়ে দ্বা বলেছেন, তা আদ্যকাল বিশেষ প্রচলিত নয়। এখন matterকে electron, proton প্রভৃতির মাধ্যমে energyর সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরছে। এই হিসাবে প্রত্যেক mass of matter-এর মধ্যে electron ও proton-এর ছুটোছুটি চলছে। কাজেই কোন mass of matterই motionless নয়। বর্তমান বিজ্ঞানের মতে electron ও protonই শেষ reality; এরা ভীতবেগে ক্রমাগতই

ছুঁছে। তাই state of rest বলে কোন কিছু কোন কালে ছিল না। আর একটা কথা—energyর ক্ষয় নেই, টিক যেমন matter-এর ক্ষয় নেই। Matter বা energy সবচেয়ে বলা যায়—it cannot be created or destroyed। এক রকমের energyকে টিক সেই পরিমাণে অন্যর প্রকারের energyতে রূপান্তরিত করা যায়। Heat energy, light energy, electrical energy, motion energy—সবই পরস্পরের মধ্যে সমপরিমাণে রূপান্তর নিতে পারে কিন্তু সমস্ত জগৎ (material universe) ধরলে বলতে হয় যে, energy ক্রমে কমছে, ক'মে তা matter-এ পরিণত হচ্ছে। কাজেই বলতে হয় যে—matter and energy taken together are conserved—জড় ও শক্তির সমষ্টিগত পরিমাণে ক্ষয় হয় না।

Hegel, Engels, Duhring প্রভৃতির সময় বিজ্ঞান এক উন্নত হয় না; তাঁদের মত এখানে পূর্ব বিজ্ঞান-মুগ্ধতা নয়। এই সবচেয়ে Engels-এর মত কি তা সঠিক বলতে পারবো না। নিজেই anti-Duhring থেকে দেখে নেবেন।

এখন time ও space। এখানে বিজ্ঞানের ও দর্শনের হেরাণী আরও গুরুতর। এ সবচেয়ে Engels যে কি বলেছেন তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কারণ anti-Duhring বইখানা বা Engels-এর কোন বই-ই আমাদের এখানে নেই। বর্তমান মতের কথা আমলেই Einstein-এর relativity theory-এর four dimensions-এর কথা আসে। সে এক গহন বন, সেখান থেকে তথ্য আহরণ করা কঠিন।

সাধারণতঃ spaceকে infinite বলে না, কিন্তু space unbounded। কথটা একটু যে অবিকোণী মনে হচ্ছে। ধরুন একটা sphere—তার surface is not bounded by anything; তার তো কোন সীমা নেই, কিন্তু তা বলে একে infinite বলা যায় না। সমস্ত বিশ্বের spaceকে sphere-এর বা একটা স্ট্রবলের কলমায় কল্পন। তাছাড়া, যদি space সীমাবদ্ধ হ'ত, তবে কিসের

যায়। সীমাবদ্ধ ? এমন কিছুই বলনা করতে পারি না, যা বিশ্বের স্থানকে সীমাবদ্ধ করতে পারে। সে সীমার ওপারে কি থাকবে ? অপরিহিত Spaceকে infinite বুলে আকাশচাষী সোভিটদের—তাঁরা প্রকৃতির অবধান, গতি ও আলো প্রকৃতি নিয়ে Astronomyতে গোল বেধে দায়। সে কথা এখানে তুলতে চাই না। তাই Einsteinও বলেন “Universe is finite but unbounded.” Space হ’ল three dimensional : fourth dimension হ’ল time। Spherical space-এর time-ও curved ইত্যাদি।

Time, in science, extends indefinitely into the past & indefinitely into the future. Future & past are distinguished merely by a difference of sign; there is no essential difference between them. The present scientific conception of time regards the passage from the present to the future or from the present to the past as being no more than the passage to the right or to the left along a straight line.

এ সম্বন্ধে Duhring-এর মত দৃষ্টান্ত বুলতে পারছি তাতে বনে হয় infinity তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, প্রত্যেক datum, a definite number of temporal & spatial facts জ্ঞাপন করে। Infinity & illimitability কেবল further advance-এর সূচনা করে; কিন্তু এই possibility কখনও পূরণ হয় না। তিনি আরও বলেন—এখানে ইংরেজী quotationটা দিকি—“the process of Nature—the sum total of all changes of Nature—must have had a beginning. Infinite regress is unthinkable. Hence the time which is filled with change must have been preceded by an eternal being in which the distinctions, the inner differences had not arisen.

Existence was then absolutely identical with itself. Time & causal series had their origin at the transition from this uniform & unchanging state……” কাজেই time infinite নয় Duhring এর মতে। আর না, এবার শেষ করতে হয়। কেবল একটা কথা বলছি। প্রত্যেক datum স্থানে ও কালে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা জ্ঞাপন করে—এই সূত্রকে Duhring বলেন the law of definite number। তাঁর মর্মে এই সূত্রের একটা বিশেষ স্থান আছে।

পরিপেবে একটা কথা বলতে চাই। Duhring, Engels প্রকৃতির সময় বিজ্ঞান এতটা অগ্রসর হয় নাই যে এই সব সমস্তা সম্বন্ধে এঁদের মতামতের বিশেষ স্থান আছে। বিজ্ঞানের অসুন্নত অবস্থার বৈজ্ঞানিক বা লার্ননিক পদ্ধতিতে সুপরিণত ভড়বায় প্রচোর ও প্রতিষ্ঠা লভ্য হয় না। কাজেই এঁদের মত পড়বার সময় বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় হ’ল এঁদের tendency কোন দিকে।

যাক্ এবার এ পর্য্যন্তই। কেমন আছেন ? পড়ন্তনার আগ্রহে বেন শারীরিক অবস্থা তুলে ধাবেন না। আমার হেহ ও শুভেচ্ছা জানবেন। আমার ভালই আছি। ইতি

আপনাদের অরুণদা।

(২)

কল্যাণীয়ায়

আপনার ৪/৭ তারিখের চিঠি ১৫ই পেয়েছি। আমার সেই দীর্ঘ চিঠিখানা যে পেতেছেন, এতেই প্রথমতঃ হুদী। দীর্ঘকাল আপনার চিঠি না পেয়ে-ত আপনাকে হয়েছিল—চিঠিখানা হারত পেলেন না। যে কোন চিঠিই মাঝপথে মায়া গেলে ছুদ হয়; ঐ চিঠিখানা সম্বন্ধে

১০/১০/৪৫ তারিখের ইতিহাসগত ভয় ভয়ক নক্সা স্পেন্সার রেল হৌতে ইতিহাসী কল্যাণ দত্তের নিউট দিগন্ত।

বস্তুই মমতা বোধে ছিল। অনেকটা যেমন করতে হয়েছিল এবং মনে হয়েছিল—আপনার কাছেও কিছু প্রয়োজন দিচ্ছি কান্না বিবে। বাক্য শেষ পর্যন্ত যে পেয়েছেন এই ভাষা। দ্বিতীয় কথা যা মনে হয়েছিল—আমার যেমন বস্তুই হ'ল আপনার কতকটা কান্না লাগবে। মনে হ'ল যেন বিবর্তন দত্ত সহজ-বোধ্য হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নি। কতকটা বিবর্তনের দোষ এবং অনেকটা আমার। আমিও ত বিজ্ঞানের ছাত্র নই; কাজেই বিজ্ঞানের কথা খুব সহজ করে লিপিবদ্ধ যোগ্যতা ও ক্ষমতা আমার নেই। বাই হ'ল, আপনার ভাল লেগেছে এবং তিন চার দিন ধরে পড়ে বুঝবার চেষ্টা করেছেন—অর্থাৎ অনেকবার পড়েছেন। হৃদয় বিচুটা আলোচনাও করেছেন। লাভ এই পর্যন্ত। ভবিষ্যতে বুঝবার ও জানবার পক্ষে রাস্তা স্পষ্ট হ'বে রইল।

এবার আবার তিনটি প্রশ্ন তুলেছেন। প্রথমটির ঝোঁক (tendency) হচ্ছে চরমতাবের (finality) দিকে। ওদিকে যাওয়া বড়ই কঠিন। তাই এবার আর ঐ আলোচনার মধ্যে না ঢুকে ২৪ কথার দাব্য। কারণ এই আলোচনার শেষ নেই—একমাত্র শেষ হ'ল নিষেধ বিজ্ঞানবুদ্ধির সীমানা। সেই আয়তায় প্রায় এসে যাওয়া গেছে। আপনার প্রথম প্রশ্ন হ'ল—হেগেলের definition of Nature নিয়ে—“in the inner idea which constitutes the ground of nature.” এখানে inner idea বলতে কি বোঝায়? “God এর idea কি না?” না; inner idea বলতে idealistic evolution বোঝাচ্ছে। আমরা evolution বলতে evolution of species...or natural evolution বুঝি। “The proceedings of plants and animals from water and the proceeding of highly developed animal organisation from lower ones”—such nebulous and at bottom senseless ideas—তার মতে বর্জন করে চলতে হবে। “Metamorphosis can only happen to the concept as such”—এই হচ্ছে তাঁর evolution। Concepts or

ideas of things—এর মধ্যেই পরিবর্তন এবং বিবর্তন হবে—যার দ্বারা Nature has worked itself up stage by stage from mere externality to the inwardness of spirit। হেগেল ছিলেন idealist—অর্থাৎ ideaই তাঁর কাছে চরম দত্ত। idea, প্রকৃতির। Nature) মধ্যে প্রকাশ নিয়ে চুটে ওঠে তা হ'ল নিজস্বই form of externality। বসে এ প্রশ্ন এখনই শেষ করি। আলোচনা করলে এরূপ শেগ নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন :—mass এবং matter একই পদার্থ। matter তির অর্থ জিনিষের mass থাকতে পারে না। অথবা একই কয়লা ক'রে বলা যায়—matter-এর যে ভর weight এবং space-এ প্রকাশ পায়, তাই mass। matter in motion—অর্থাৎ energised matter, অন্তরীকৃত mass সংগ্রহ করে। কারণ যে energy'টা তখন matter-এ থাকে, তা extra mass-এর আকার নেই। কাজেই energy এবং mass বা matter-এর মধ্যে পার্থক্য রইল না। তাই matter এবং energyকে convertible terms বলা যায়।

তৃতীয় প্রশ্ন :—latest theory বলে যে কোন জিনিষই at rest—হাত অবস্থায় থাকে না। কাজেই mass of body at rest এবং mass of body in motion এই পার্থক্য হয় কি করে? কথা হচ্ছে—নবতম ও পুরাতন theory একসঙ্গে বিচার করি নি। latest theory চিহ্নিত শেষে লিখেছি এবং দ্বিতীয় কথা হল কোন জিনিষই at rest থাকে না, এটা হ'ল absolute sense এর কথা। body in motion হ'ল relative বা conventional sense এর কথা। সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে স্থায় ও চলন্ত জিনিষ দেখি। তাবের মধ্যেই তুলনা করে বলা হয়েছে যে matter in motion, extra mass সংগ্রহ করে। ultimate matter—electron এবং proton—কখনও স্থির থাকে না। relative বা conventional sense এ (অর্থাৎ প্রত্যক্ষগোচর পদার্থ মধ্যস্থ) mass of congealed energy বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গ এইখানে বস্তু করা দাক। হযত আগে যেমন পেচাটে ছিল, এখনও তাঁই রয়ে গেল। কিছু খোঁচা খাচ্। ভাল—একবারে ফণী হ'লে সব গোমর ফাঁক হয়ে যায়। science এবং philosophyর অগ্রগতির কোন scopeই তাইলৈ থাকবে না।

এবার অল্প কথা। লিখেছেন—“আমার brain-এর বোঝবার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। বাইরে গিয়ে যখন দেখা হবে, দেখবেন এক কিছুত্ব কিম্বাকারকে।”—মন্ড কি, তবুও ত একজন নতুন লোক দেখা যাবে—না হয় এক নতুন ভাবই দেখা যাবে। কিন্তু হঠাৎ এই ধারণা হ'ল কেন? “Capital” বই দু'বার বে পড়তে পারে, তার brain-fag-এর কোন লক্ষণ ত দেখা যায় না।

একটা খুব গোপন কথা বলছি—কথার Capital পড়বার সময় হয়েছে—কিন্তু ২৪ পৃষ্ঠার পর আর এগোই নি। Snowden বা Handerson বলেছিলেন তিনিও “Capital” পড়েন নি। ঐ ছিল আমার সাধনা। মনে করতাম এটা এ যুগের Gospel এবং সব Gospel এর মতই এর মধ্যে অনেক fanatic এবং অনেক scientific কথা চড় থাকিয়ে আছে। নীর থেকে ক্ষীর যেহে নেওয়ার মেহনৎ করার চেয়ে ক্ষীর দেখানে আলাদা পাওয়া যায়, দেখানে যাওয়াই ভাল। তাই ওটা বার দিয়েই গিয়েছি। কিন্তু আপনার চিঠির তাকুনার—ওটা পড়তে হচ্ছে এক all through running notes লিখে পড়ছি। কালোই খুব ধীর সময় গতি—হোচ্চট খেতে খেতে চলছি। মাকে মাকে লক্ষী বুঝ বন্ধুদের সাহায্য নিতে চেষ্টা করি এবং সেই সময় এই আলোচনাও করি—দু'বার এই বই কেউ পড়ে!

এই বই সম্বন্ধে উপরে যা বলেছি; এখনও কিছু আমার সেই মত। এখনও মনে করি—it is the Gospel of this age এবং অল্প সব Gospel এর

মতই বোধগ্ণ নিবে গঠিত। হযত কথাটা আপনারদের আঁতঃ; তার কালের ভাল লাগবে না। আশেনি-ত পড়েছেন; আপনার কি মনে হয়?

Marx এর অন্তঃ বইগুলি পড়েছেন—তালই। আর কি পড়াতনা করছেন? কি লিখেছেন?—• • • ...আপনি কি লিখেছেন? কিছু অবস্তই লিখবেন।

চিঠির এক কোণার লিখেছেন—• • (সহসা) বাইরে গিয়ে সেখান থেকে চিঠি বিলে, আর্দ্র হব কি না। খুব আর্দ্র হব না;—তবে বোধ হয় আপনাদেরও খেঁচা আশা করা উচিত হবে না। এই আশা করছেন কি থেকে? বাজীর খবর কি? মা কোথায় ও কেমন আছেন? ওখানে আর সবাই কেমন আছে? সকলকে আমার সেই জানাবেন।

আমরা ভালই আছি। নতুন কিছু খবর নেই; থাকলেও ত তা চলবে না। সকলেই কিছু কিছু পড়াতনা করছে; pastime হিসাবে আছে—২টা পোষমানা টিয়া—ছেড়ে রাখা হয়—বাঘ, আসে; চা পার, ক্ষীর বাগ, মিঠাই গায়; হাতে বা মাথার উপর উড়ে এসে বসে। আর আছে একটা দেব-শাবক। সেই ভেড়াটার সবচেয়ে গ্রিষ খাচ্ হ'ল চা। দিনে ২৪ পেদালা চা, তার চাই। আর আছে—এক ছাগ শিশু—এখনও চা খেতে শিখে নি। আরও আছে কয়েকটা মুরগী। আমি এর একটারও খোদ মালিক নাট; মতিমত্ত সব করটাকে নিয়ে কিছু সময় কাটাবার সুযোগ নিই। এবার ইতি

আপনাদের অরুণবা

... (সহসা) শব্দটার প্রয়োগে হযত আপনাদের আপত্তি আছে। কিন্তু আমাদের এখানে resolution হয়েছে—... (সহসা) অর্থ ক্ষয়—চট্টল বন্ধুদের ব্যতিয়ে। তাই আপনাদেরও জানিয়ে দিলাম।

কারী সংস্কার—(১১)

কমলা দাশ শুভা

১৯৪৫ সালের বন্দীজীবন ঠিক তেমনি করেই ঘটে চলেছে। Superintendent ঠিক তেমনি করেই সপ্তাহে একদিন roundএ আসেন। যেন মহামন্ত্র সম্রাট বিশেষ দয়্য করতে আসবেন সেদিন। জেলখানা ধ্বংসে খটখটে। কয়েকীরা যেটন জন্মদারগীর ঘন জুগিষে ছুঁদন ধরে জেলখানা পরিষ্কার ক'রে রেখেছে। তারপর জোড় হাতে মাথা নীচু ক'রে ছই কাভারে দারিবেঁধে ধাড়িয়ে থাকে তারা superএর অপেক্ষার। পায়ের কাছে ভাসের জেলের দেওয়াল সর্ব্বত্র ত্রিনিব ভাঁজ ক'রে গোছানো রয়েছে।

super আসছেন। এক বিশাল রাহুছর superএর মাথার ধ'রে আছে এক কয়েদী। সপ্তকে ঘটির আঙাঙা হ'ল। Super চুকপেন কিংগ ইয়ার্ডে। যেটন ছুটিতে ছুটিতে বাধ। জন্মদারগীর মহাবাহু হয়ে বরজা খুলে বের। দারিগাধা কয়েদীদের মধ্য দিয়ে চোখ বুলিয়ে চলতে থাকেন super এবং তাঁর দল। যেটন বা জন্মদারগীর যদি কিছু নালিশ থাকে কয়েদীদের বিরুদ্ধে তবে জানায় তারা সুপারের কাছে। সত্যি মিথ্যার কোনো গুণী লেখানে নেই। সুপার বিবাহ করেন। কর্তৃপক্ষের staffএর লোক হচ্ছে যেটন এবং জন্মদারগীর। নালিশ করার ফলে হয়ে গেল কয়েদীর শাস্তি। কয়েদীর কি অব্যব দেখার আছে তা স্তনবার খেঁপ সুপারের কোথায়। শাস্তির রায় শুনে কয়েদী বুকভাঙ্গা আতর্জন ক'রে ওঠে। জেলখানা পাখর হয়ে শোনে। কিন্তু যদি কয়েদীদের মধ্যে কারো কিছু নালিশ থাকে তবে সেটা আগে থেকে জন্মদারগীর যেটনকে জানিয়ে তাহের মনস্তত্ত্ব ক'রে জানাবে সে supperএর কাছে। Super ইচ্ছা করলে স্তনবেন, ইচ্ছা করলে হেসে অজ্ঞাতের উপেক্ষা করবেন। কী উপেক্ষাভরা অবজ্ঞা দেখানো চলা এদের। বাহুখকে বাহু ব'লে জান না ক'রে ক'রে কয়েদীদের ক'রে তোলে এরা বাহুদের সর্বারের বাইরে। এরা যেন সেই

আদিকালের ক্রীতদাসেরও অধম এইভাবে কর্তৃপক্ষ অবজ্ঞাভরা পদক্ষেপে এদের মধ্য দিয়ে চলে যান। কয়েদীরাও ক্রমে ক্রমে গোলামের মতো অজ্ঞা এবং অজ্ঞাচার পেতে পেতে হয়ে ওঠে গোলাম।

স্বাধীন ভারতের নতুন রাষ্ট্রে এর আদুল পরিবর্তনের বাধ্য ছাড়া বন্দী আর কোন উপায় দেখে না। ইংরেজের কাগাধারে বন্দী দেখেছে অপরাধী এখানে জেলের শাস্তি পেয়ে নিরপরাধ হ'তে দেখে না; শেষে কী ক'রে আরো কাকি দিয়ে আরো কদর কাজ করা যায় তার পথ খুঁজতে। এখানে প্রতিকারের পথ নেই। তুল করা কাজ শুধু নেবার উপায় নেই, অহুতাপে দগ হয়ে মরে গেলেও কেউ স্নেহভরা দখল দিয়ে আলো ধ'রে অন্ধকারে পথ দেখাতে আসবে না। বন্দী মনে মনে স্থির করে যে স্বাধীন ভারতে জেলখানা বাহুখকে বাহু হ'তে দেখাবে। যে শিক্ষা বাহুখকে আত্মবর্ধা শিক্ষা দেবে। সত্যতার পথে প্রস্তুত করে। আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার পথে পরিচালিত করে সেই শিক্ষা দেবে যে। সেই ভারতবর্ষ তাহের লম্বাছাত ক'রে রাখবে না। বহু ভাবের শুভ-বুদ্ধি ও ভালবাসকে জাগিয়ে তুলে বাহু করে তুলবে। তাহের ভবিষ্যতের উপায় ক'রে দিতে হবে।

কয়েদীদের ভোরে খেতে দেয় ছোলা সিদ্ধ বা কোনো দিন বরষা সিদ্ধ। এ খেয়ে ১১টা অবধি কেউ ভাল ভাততে পারে? চীনারা যদি স্বাধীন জাতি বলে চাটোই পায় তবে আমাদের বন্দীদের স্বাধীন ভারত দেখে চোট মাখন এবং চা।

আর দুপুরের খাওয়ার কথা ভাবতেও পারা যায় না। ভাল তরকারীতে কী যে দুর্গন্ধ থাকে যেন গলাটা চেঁচে ফেলতে ইচ্ছা করে। কী ক'রে যে শাস্তাভাবাদী ইংরেজ কয়েদীদের জন্ত বিকৃত বাগার অমন ভয়ঙ্কর আঁকার করতে পেয়েছিল সেটা আদর্শ।

বন্দীভাবে স্বাধীন ভারতে কয়েদীরা নিরোজা বা বৃন্দী রাস্য করবে। ওরা কাঁচা ত্রিনিব হবে। ত্রিনিব হত কই হোক, ভাল ক'রে রাস্য ভোগ্যত বা শাকভাতও এমচেয়ে ভাল।

মাছমাংস লগ্নাহে একটি বেলা ক'রে কয়েদীরা পায়। কয়েদীরা মাংসের টুকরো কথটা বা মাছটুকু তুলে রাখে জমাদারদীর ঘন ঘোগাবার ভিত্তি। সে এতে খুশী থাকবে। এবং এর ওপর যদি চুরি করে কিছু জিনিষ এনে দিতে পারে তবে একটু শোকাপাতা বা বিড়ি সে লুকিয়ে এনে দেবে। কয়েদী ওই বিড়ি বা শোকাপাতা টুকর ভক্ত তার আত্মসম্মান, মহত্ব সবই বিক্রি করে নেখানে।

বন্দী ভাবে নেহ, আমাদের দেশে বন্দন স্বাধীন হবে তখন এরা বিড়ি শোকাপাতা তো পাবেই, মাছও রোজ পাবে। তাতে ওরা ভাঁকি দিতে, চুরি করতে, প্রদত্ত হ'তে প্রয়োজন বোধই করবে না। বরং শুধুই বাবার একটা হযোগ পাবে।

এদের শেখবার খেতে ঘের বিকাল ও চাঁদ। রাত্রে খেতে ঘের না। প্রতিদিন সাতারাত না খেতে লড়াই থাকতে পারে না। কেউ হরতো নিজের ভাগের থেকে একটু ক্ষতি বা ভাত তুলে রাখলে রাত্রে খাবে ব'লে। জমাদারদীর যদি তার ওপর রূপা দুটী না থাকে প্রথমে চলে পালাগালি, তারপরে ভোরে যেটন এলে তার কাছে ঘাব নাগিল। তারপর চলে হরতো মেটনের কলের পিষ্ট এবং জমাদারদীর পরাধাত। এতেও যদি কয়েদী পাথোতা না হয় তবে গেল জেলার স্থপারের কাছে নাগিল। হয়ে গেল শান্তি। কয়েদী পায়ের খ'রে কেঁবে যত্নে গেলও জেলের পাখান প্রাচীর গলে না, জেলখানার তাদের কারা নিজের কাছেই বা খেবে কিরে আছে। এমনি ক'রে নিশবদের বাতনার ভয়ে কয়েদীদের যেটন এবং জমাদারদীর হাতের মুঠোর চলে যেতে বেশী বেয়ী লাগে না।

বন্দী ভাবে স্বাধীন ভারতে এদের রাতে খাবার ব্যবস্থা থাকবে। সবই স্বাভাবিক থাকবে। যেটনের হাতে রূপার থাকবে না। জমাদারদী মারলে তারই শান্তি হবে। জেলার স্থপারের বাহুরে মতো হস্ত নিয়ে ব্যবহার করতে শিখতে হবে। বন্দীর মনে হয় লম্বা systemটাই আমূল পরিবর্তন করতে হবে। জেলখানাকে অস্ত্র ভাবে গড়ে তুলতে হবে। পা টিপিরে নেওয়া যেটন,

কলার হাতে যেটন, জমাদারদী এমনি স্বাধীন ভারতে থাকবে না। তার বদলে আদর্শে দরপেচকা বরদী এবং বিশেষ শিক্ষা নিয়ে শিক্ষিত মেয়েরা। তাদের ওপর ভার থাকবে এবের হস্ত নিয়ে বাহুর ক'রে তুলবার, প্রতিশোধ নেবার নয়। এদিকে ইউরোপে ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ প্রতি বন্দী ও কয়েদীর মনে যা দিয়ে চলেছে। বিশ্বযুদ্ধের কথা মুঠোর ভিত্তিও কেউ তুলতে পারতো না। রাশিয়ার বুদ্ধশক্তি বতাই বেড়ে চলেছে ততই জার্মানিকে সে পশ্চিমপ্রান্তে হটিয়ে নিয়ে চলেছে। তবু জার্মানি যে হেরে যাবে এটা ধারণা করতে অসুত বিশ্বাসের লকার করছিল। হেলের চারিবিধে কর্তৃপক্ষের মনোভাবে একটা আশার লকার একটা সোহাতির ভাব টুটে উঠছিল। তার হোয়াছ লাগে কয়েদীদের মনে। বলে "বিশ্বমিতি, ইংরেজ কি সত্যি মিতবে? ওরা মিতলে কি আমাদের লকলকে খালাস দেবে?" বন্দী বলে "ইংরেজ মিতলে যদি তোমাদের খালাস দেবেও তাতে কী লাভ? তোমরা একমল ঘাবে, আরেকমলকে ঠিক এমনি করেই আদর্শে, এমনি করেই বিচার ক'রে এখানে এনে তেমনি কইই বেবে। জেলখানা তো এরকম জেলখানাই থাকবে। ইংরেজ বতবিন আছে, এর কোন পরিবর্তন হবে না।" কয়েদী বলে "তবে কি জাপান মিতলে ভাল?" বন্দী বলে "তাই বা কি লাভ? যদি প্রকৃ বহলই হয় তবে ইংরেজ আর জাপানে কোনো পার্থক্যই নেই। চীন দেশটাকে জাপান টুটি চেপে ধরতে চাইছে। ঠিক ইংরেজ যেমন বন্দীদের জেলে কই বেধ তেমনি ক'রে জাপানও বেবে। ওদের কাউকেই বিশ্বাস নেই, লব সমান।" কয়েদী বলে "তবে কি হবে বিশ্বমিতি?" বন্দী উত্তর দেয় "সেখো, আমাদের দেশে বন্দন স্বাধীন হবে তখন কয়েদীদের কত ভালো হবে, এখানে-ভাড়া বাহুর হয়ে উঠবে। কোনো ছুখ থাকবে না।" কথাটা কয়েদী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

হুত খেয়ে পেছে। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে আসে রাজ বন্দীদের মুক্তির আদেশ। ইংরেজের অস্ত্র হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধে। তাদের বিশেষ বিন কেটে পৈছে,

তাই বেলে বসিয়ে এদের ঝাণ্ডাবার মতো ইচ্ছা আর তাদের নেই।

অক্টোবর মাসের এক প্রাতে আসে বন্দীর মেল ছেড়ে বাইরে বাবার হুকুম। বাবার আগে কয়েকদলের কাছে বিদায় নিতে যায় সে। অন্যদের বন্ধু, দুদিনের মমতাপূর্ণা লাগি এরা। এদের ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে সে। এদের সেবা, এদের অন্তরঙ্গতা ভালবাসার কথা কি ক'রে ভুলবে সে? বন্দীজীবন ছাড়া এদের জীবন কথা, এদের মরমবাথা আরতো কোথাও বোঝা যায় না। বাইরের লোক এদের হত মনই বসুক তারা তো জানে না, এই মন্দেরও মধ্যে কত সত্যতার সন্ধাননা, কত অশ্রুট যক্ষ, কত হরমুজা সেবা, কত কোমল অন্তর হয়ে গেছে। জেলখানা এদের গিয়ে কেনেতে চায়, ফুলটি খেঁৎলে মরে যায়। এদের ছেড়ে যেতে বন্দীর গলাটা আটকে আসে। কয়েকরা চোখের জলে হাত ধ'রে বলে

“নিমিষনি, আনরাও ভাল হ'ব, আমাদের হাটরে নিয়ে চল।”

বন্দী মনে মনে বলে “ভাল তোমরা হবে বৈকি কোন তোমাদের ভাল হবার ক্ষমতা, তারতের অন্তরাত্ম্য সেই কাল মোছাবার ক্ষমতা তো। কংগ্রেসের এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম। স্বাধীন ভারত তোমাদের স্বপ্ন মোটাবে তবেই তো সে বেঁচে উঠবে। তবেই তো জগৎ সভায় তার আসন পাতা হবে। সেদিন তোমরা একহাতে সোনা ফলাবে, অন্য হাতে শিল্পকলার জগৎকে তৃপ্তিত ক'রে হবে। আমরাও তো আছি কোন তোমাদের মধ্যে। কোথাও তো তুফান নেই, দূরত্ব নেই। জাতিকে মাহুত ক'রে তুলে, ভাল ক'রে তুলে তবেই তো আসবে ভারতের অন্তরের মুক্তি। অথ হবে সেদিন স্বাধীন ভারতের।”

• ২-৩-৪৮ তারিখে কলিকাতা বেঙ্গলে পরিত।

প্রভেদ*

ত্রিভুজসম স্তম্ভ

তোমার অন্তে আর গোলাপের মালা
সোনার বোঝা
পতাকার লক্ষা।
আমার অন্তে আছে আত্মকুড়ের ছাই;
তুলে অমেছে ধূলা।
তোমার মিছিলে যারা চলেছে বোড়ায় চড়ে,
তারা গেল আমার পা বাড়িয়ে।

তোমার নাম আম সবার মুখে
যারা ধনী যারা দরিদ্র
সবাই দেয় তোমার জয় ধ্বনি,
স্বদেশা নারীরা পুষ্পবৃষ্টি করে
তোমার মাথায়।

আর আমি ?

আমার পেটে জলছে ক্ষুধা,
আমার গুংগু
আর দুঃগু নিঃশব্দতা
নিরে চলে যাব
কুঠিতে ডিমে ডিমে
ওই উত্তর পাহাড় গেরিমে
আমারই মত হতভাগ্য যারা
তাদের মাঝে। তারা আছে আশা করে
আমি নিরে কিংবা তাদের ক্ষুধার অর।

দেশের অভ্যন্তরভাগের সাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

রাজেন দত্ত

১৯৪৬ সালের উনিশে অক্টোবর নোয়াখালির লাক্ষার শান্তি প্রতিষ্ঠাৎ জন্ম প্রকল্পে শ্রীযুক্ত মতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের নেতৃত্বে অধিঃশ শান্তি মিশনের অনৈক সেবক হিসেবে নোয়াখালিতে বাই। সেই হতে নিরবচ্ছিন্নভাবে ওখানেই কাজ করছি। এতাবৎ বাইরের বহু তালিম লব্ধও নোয়াখালির কাজ থেকে ছুটি নিতে পারিনি। আমার লক্ষে কাজ থেকে ছুটি বেওয়াও খুব লম্বা ব্যাপার ছিল না।

বাই হোক বহু চেষ্টা করে গত ২৫শে এপ্রিল হতে মাত্র তথ্যকমিনের অবসর ঘেলে আমার। ইচ্ছা, এই অবসরটা পূর্বপাণ্ডিত্যানের কতকগুলো ভোলায় গল্পী ও শহর অকল পরিভ্রমণ করে দেশের অভ্যন্তরভাগের সত্যিকার অবস্থাটা জানা। নোয়াখালি ত্রিপুরার অবস্থাটা আমাদের চোখের ওপর সর্বসাই আছে। কিন্তু নোয়াখালির অবস্থাই যে পূর্বপাণ্ডিত্যানের সর্বই এমনটা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলাম না। তাই একবার বেওয়ানই আবশ্যক হ'য়ে পড়ে।

কাজিরখিল থেকে লাক্ষামের পথে শিলং রওনা হই। অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে হাঙ্গারের ওপর রেল ও কাঠমূল পুনি কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারের লব্ধে যে লব ত্রিপোর্টে অ্যামাদের কাছে আসে এবং সংবাদপত্রেও মধ্যে মধ্যে দেখতে পাই সেসব একেবারে অলীক ঘটনা নয়।

ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার এবং বাংলা বণ্ডিত হওয়ার জনসাধারণের দুঃখকষ্ট ক্রমাধারে বেড়েই চলছে। নানান রকমের অভাব-অভিযোগ ও হারিজা জো আছেই লেগে। ট্রেনে হাতারাতকালেও হাঙ্গারের হুহুরানির একশেষ। প্রতীকারের শব্দকও চেষ্টাও বার্ষিকতার পর্ববসিত হয়। সরকারী কর্মচারীদের এ বিষয়ে উদাসিন্ত ও উপেক্ষা প্রদর্শন ও বেদনামারক। পুনঃ পুনঃ তালিম লব্ধও গুরুতর বিষয়ের তাগেদে কাছে থেকে কোনো লাড়া

পাওয়া যায় না। জনসাধারণের মনে যে নৈরাস্ত ও হতাশা ভবে উঠেছে সে একেবারে অলীক নয়। সরকারী কর্মচারীদের নীতিজ্ঞানহীন আচরণও কতকালে শেখত গায়ী। তারা আইন মানে, আবার মানেও না—আইনের উল্লেখ লক্ষ্যে কর্মচারীদের অন্তিমজ্ঞতা ও মৃত্যুও কম নয়। এই মৃত্যুর ভয়ে হাঙ্গারের অনেক লম্বা অলীক অনেক মর্জোপ বৃগতে হয়, অতিগ্রস্ত হতে হয়। আইনের নৈতিকবর্ষ লক্ষ্যে কর্মচারীদের অজ্ঞতা পীড়ামারক, আবার আইন-মান্ততার প্রতি যে তাগেদ খুব নিষ্ঠা আছে এমনও নয়। কেননা কিছু দক্ষিণা মিলেই হল, লম্বা আপত্তিই তা হলে নিশ্চিতি হ'য়ে যায়। বস্তুত আইনের মর্জা তারা সর্বদা রক্ষা করে না।

গ্রিগেট কাস্টম্ আপিলে আমার মালপত্র ঢেকিং হয়। আমার সাথে দু'ছটাক তৈরী পাঁজ ছিল—তকলিতে দুটা কাটায় জন্ম। গঠনকর্মী আমরা—হাতে কাটা চরবার হুতার কাপড়ই আমাদের পরিধেয়। কাজেই হুতাকাটাও আমাদের বৈমমিন কর্তব্যের মধ্যে পড়ে—আহার নিজার হতোই। তাই যেমন দু'ছটাক পাঁজ ছিল আমার সাথে, তকলিও খাটী ছিল। কাস্টম্ আপিলের আপত্তি পাঁজ বেওয়া চলবে না, তকলি বেওয়া চলতে পারে। অনেক বোঝালাম, কিছুতেই বুঝ মানে না। তকলিতে আপত্তি নেই, দু'ছটাক তৈরী পাঁজই টেটের মর্জাশ যেন অবশ্যস্বারী। বোঝালাম—আইনের একটা নৈতিক বিক আছে, সে-নীতিবিরোধী হয় না এই পাঁজ দু'ছটাক নিলে, বরং এই পাঁজ দু'ছটাক নিতে না বেওয়াই আইনের অমর্জাবার কারণ, আইনের অমান্ততা। কিন্তু আমার কোনো বুজিই তাগেদ মৃত্যুর সাথে পেরে উঠল না। অপড্যা আমাকে হার মানতেই হল। লম্বা কম থাকার উপরন্তু কর্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্তা বলারও অবকাশ খটে না।

চোখেরই লামনে দেখতে পাই বাটপাড়ি 'চলছে,

দুব্বর ঘোহ দায় নি এখনও ; অগচ বাওরারই দরকার । তবে না দুর্নীতি ও চোরাবান্ধার বন্ধ হবে। আইনই চৌধুরিত্তির পোষক অর্থাৎ দুর্ভাবের প্ররোচনাই আইনের অর্থর্থ বা দ্বাভব হ'য়ে ধাড়িরছে । ত্রিটীনের আইন অস্ত্রারকেই প্রস্তর দিয়ে এসেছে আর তারই অহুসরণ চলেছে বর্তমানের স্বাধীন হিন্দুস্তানের ও পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে । এ রীতি আজকে অশোভন ও বর্জনীয় ।

সর্ববিশেষের উচিত—যে কোনো আইন সৃষ্টি ক'রে, সেই আইনের লক্ষণত ও নৈতিক ব্যাখ্যা দ্বারা আইনের উদ্দেশ্য লক্ষ্যকে জনসাধারণ এবং সরকারী কর্মচারীদের ভাগ্যমতো শিখা দেওয়া । আইনের উদ্দেশ্য লক্ষ্যকে, সর্বক্ষেত্রেই বেখতে পাই, আইনরক্ষক অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীদেরই অনতিজ্ঞতা ও শৈথিল্য বোধ । আইনের প্রতি কর্তব্যপালনে ডাবের কোনো নিষ্ঠাবোধ নেই । আইনের ওপর ব্যতিচার হচ্ছে আইনরক্ষকদের দ্বারা । অকারণে বহিষ্কার সাধারণ হিন্দু মুসলমানই নিপৃহীত হচ্ছে নানাক্ষেত্রে নানাভাবে সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা ।

অবশ্য সরকারী কর্মচারীরাই কেবল যে দুর্নীতিপরালে এও বলি না, জনসাধারণও । আবার শাসন-ব্যবস্থার অব্যবস্থার সৃষ্টি হওয়াতেও দুর্নীতি বেড়ে চলেছে । চোরকে তার চৌধুরিত্তিতে সাহায্য করাই লোকের স্বভাব হ'য়ে ধাড়িরছে, কেননা যে সাহায্য করে সেও চোরই । সততার স্থান নেই, লাস্তা দুনিয়া আদ চৌধুরিত্তির ওপরই চলেছে । চুরি ব্যতীত জীবনধারণই অসম্ভব হ'য়ে প'ড়েছে । এই চুরি বন্ধ করতে হলে, সর্বক্ষেত্রেই কঠোর শাসন আবশ্যক । সর্বস্তরের সমাজের গুণিকতক পাপীকে এমন দৃষ্টান্তিক দাণা (exemplary punishment) দেওয়া দরকার- যা সেই সেই ভাবে প্রথল ভীতির স্ফার করতে পারে । চৌধুরিত্তি ভাবেই ততকপরিমাণে প্রদর্শিত হ'তে পারে । অন্ততাবে হওয়ার সম্ভাবনা কম ।

ভারতবর্ষ বিখণ্ডিত হওয়ার হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান উভয় ভোমিনিয়নের লোকেরই দুর্গতি ও অভাব সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে । এক রাষ্ট্রে কোনো কোনো সামগ্রী

নিম্নাংশ অভাব ঘটেছে । অপর রাষ্ট্রে সেই সব ভ্রাব্য প্রাচুর্যবশত অপচয় হ'চ্ছে । এখনও কোনো রাষ্ট্রের ব্যবস্থাই স্বপূর্ণবলিত স্বব্যবস্থিত হ'তে পারে নি । উত্তরভাগের দিনাকপুরের যে অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে এবং বগড়া রাজসাহী প্রকৃতি অঞ্চলের দশোহর খুলনা অঞ্চলের পল্লী জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি চরমে পৌঁছেছে । জীবনব্যাপনই অসম্ভব হ'য়ে প'ড়েছে । প্রবাসী এত অস্বাভাবিক যে বহিষ্কার হিন্দু মুসলমানের পক্ষে তা সংগ্রহ করা আত্মসিক্তভাবে অসম্ভব । দশোহরের পল্লীতে প্রবাসীদের তালিকা সংগ্রহ ক'রে যা পেলার তাতে দেখতে পাই দুষ্টির জোড়া ১৮, ২০, লাড়ী ২৪, ২৬, চিনি বহুকাল থেকেই নেই, আটা নেই, সোতা ৩০ সের, সাবান ৫০ সের, কেরোসিন ১০ সের চাল ২০, ২৪, ঘণ, ঘণ: তেল ৩০ সের, বেশলাই একটা ১০ আনা । কলনের সমর্থ্য আছে এই মূল্যে অরব্বর সংগ্রহ ক'রে জীবনধারণ করে ? এই সব অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সন্তাব অস্থির আছে বলা চল কিন্তু জীবনধারণের একান্ত আবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহ অপর্যাপ্ত হ'য়েই পূর্ণ পাকিস্তানের এই সব অঞ্চলের হিন্দু মুসলমানের হিন্দুস্তানে চল গেছে, থাকছে, বাবার লংকল্লও রাখে । অভাবে অভাবে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে । অবিলম্বেই এই অবস্থার পরিবর্তন কাম্য । অন্তথা কেবল হিন্দু নয় মুসলমানেরাও পূর্ণ পাকিস্তানের বাস্তব্যাগে বাধ্য হবে ।

পল্লীর পথে পোশকট চালিয়ে থাকে মুসলমান গাড়োয়ানেরা । আমার পরিচানে থন্ডরের গোবাক দেখে তারা আমাকে গ্রহ করতে লাগল—“বাবু, আমাদের এই দুর্ভাগার অস্ত্র হবে কবে ? বাংলা বেশ কি আবার এক হবে ?”

বললাম—“কেন, এক হবে কেন ?”

এক না হলে আমরা যে বাঁচিনে । কাপড় নেই, চাল নেই, তেল নেই, চিনি নেই, সোতা নেই কিছুই যে পাইনে—আমরা বাঁচি কি করে ? আমাদের বাড়ী বাড়ী যেয়ে দেখুন আমরা কী খাই, কী পরি—আমরা কি ডাবে বেঁচে আছি একবার দেখে যান ।

—এক হবার কথা বলা যে এখন যে আইনী—তা জানো? ওকথা বললে, জরিমানা হতে পারে, জেল হতে পারে, হয়তো বা ঠাণ্ডিও হতে পারে। রাঙা আচ এই সব লাজা মাঝ পেতে নিতে?

—তা বাবু, এমন করে না যেয়ে না শরৎ অভাবে অভাবে তিলে তিলে কষ্ট পেয়ে মরার চাইতে আমবা পূর্বে অনেক ভালো ছিলাম। এমন ভাবে কষ্ট ধরি পেতে হবে জানতাম তাহলে কি পাকিস্তানের জন্তে চীৎকার করে বেড়াই? এ ঘটনার চাইতে মরাই যে ভালো।

—তাহলে তোমরা প্রকৃত হও—দুই টেট এক হোক একথা আর বলার সরকার নেই। তোমাদের যে অভাবে—চাল পাওনা, কাপড় পাওনা, তেল পাওনা—জীবনধারণের জন্তে আবতকীয় বেগব বয় পাওনা তা পাওয়ার জন্তে আন্দোলন করো—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে হাও—বলবক হ'য়ে বলা ঠাক, তিনি অনবরত হলে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাও, তিনি না পারলে আরো ওপরে হাও—এমনি কোরে আলোড়ন সৃষ্টি ক'রো তবে না তোমাদের দিকে ওপরওয়ালারের দৃষ্টি প'ড়বে? আতকে ভয় কি তোমাদের? আত হান্না কেউ নেই, হান্না শাসন করছে—কারনে আতম দিরাই হলো, আর ধান্না সাহেব নাহিমুদ্দিনই হলো—সকলেই তোমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। তোমাদের অর্ধাং সেনের অনশাধারণের ইচ্ছাছাওয়াই তারা চলতে বাধ্য। তোমরা বেজায়ে চলতে বলবে তার অন্তর্য করার পক্ষি নেই গবর্ণমেন্টের।

—কিন্তু প্রেসিডেন্ট তো আমাদের কথা শোনেন না। তাঁর কাছে বললে তিনি ধমক দিয়ে ত্যাগিয়ে দেন, আরো নানারকমের ভয়ও দেখান।

—তোমরা ভীক চাই। তোমরাই না ভোট দিয়ে তাঁকে প্রেসিডেন্ট করেছে? ভয় তো তিনিই করবেন তোমাদের। তোমাদের মনজনের জোরে না তিনি প্রেসিডেন্ট? তোমরা যদি তাঁকে না চাও, তাঁর সাধ্য কি ওই আসন ঝাঁকড়ে প'ড়ে থাকেন? তোমরা ইচ্ছে

করলে তাঁকে সরাত্তেও পারো, ওঁকে বসাত্তেও পারো—সব তোমাদেরই হাতে।

—কি বলবে বাবু—আমাদের পরিচালক নেই, আর লকলের সে—সাহসও নেই। প্রেসিডেন্ট আর সবার ওপরেই অন্তর্য করছেন, লকলকেই ভয় দেখান—বিশ্ব্বের ভো। দেখানই, মূলমানবেরও। কিন্তু তাঁর আচরণের প্রতিবাদ করার মতো সাহস নেই কারও।

আমাদের গ্রামে একটি গোষ্ঠী আশিগ আছে। গোষ্ঠী মাস্টার হিম্মু। গ্রামের জনকয়েক মুসলমানের নামে যদিঅর্ডারে টাকা এসেছিল, প্রেসিডেন্ট সাহেব গোষ্ঠী মাস্টারকে বলেন—ওই টাকা প্রার্থীদের না নিয়ে তাঁকেই বিলি করতে হবে—তিনি বেনামে সই ক'রে টাকা নিয়ে নেবেন। গোষ্ঠী মাস্টার আপত্তি করেন, বলেন—সে যে বেআইনী হয়, আমি তা করতে পারি কি? কিন্তু সে যুক্তি মানতে তিনি রাঙা নন। তিনি বলেন, এটা পাকিস্তান, এখানে আমিই বা বলবো তাই-ই করতে হবে, তাই-ই আইন।

গোষ্ঠী মাস্টার প্রকৃত প্রার্থীদের যদিঅর্ডার বিলি করার প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর ওপর খণ্ডান্ত হন। একদিন রায়ে তিনি তাঁর বাড়ীতে হান্নামেন ও তাঁকে অবিলম্বে কর্মভাগ করতে বলেন—অন্তথা তিনি তাঁকে অপমানিত করবেন, গ্রাম থেকে ত্যাগিয়ে দেবেন, তাঁকে হত্যা করা হবে বলে ভীতিও প্রদর্শন করা হয়।

এ মাজ কয়েকদিনের কথা। ফলে হিম্মুদের মধ্যে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সৃষ্টি হ'য়েছে। এ ছাড়াও নানা প্রকারের অবিচার চলছে হিম্মুদের ওপর। হরিজ মেলেয়া মনিবকে জলকর দিত—মাছধরার চুক্তিতে। তাদের ওপর এখন জুম্ম চলছে প্রেসিডেন্টকেও আবার জলকর দিতে হবে। এই পীড়নভয়ে মেলেয়া হান্না ভাগে বাধ্য হ'চ্ছে। চৌকিদারী ট্যাক্স অর্ধ ওপ বাড়ানো হ'য়েছে—প্রেসিডেন্টের খোয়াল খুদী মতোই, অথচ ইউনিয়ন বোর্ডের একটা কমিটি আছে—মনশাধারণের গ্রাম্য আপত্তি আছে, সে সবকে কোনো মন্যনাই বেওয়া হয় না। গ্রামের ছোটখাটো মামলার বিচারে যে সব জরিমানা আদায়

পারিবারিক বা তা বিয়ে গ্রামের রাঙাগুলো নির্ধান ও যেরামত করার কথা; কিন্তু তাতো হয়ই না, টাকা কি তাবে কোন্ কাজে ব্যয় হ'চ্ছে জানতে চাইলেও দে-হিসেব নেওয়া হয় না, উণ্টো চোখ রাংগানো হয়।

গ্রেসিডেণ্টের মতো আরো দুচারটে লোক যেখানে সেখানে আছে যাদের অস্ত্র ও ছলুমের ভয়ে হিন্দুদের মনে খুব নৈরাশ্র ও আতঙ্কের সৃষ্টি হ'য়েছে। আমরাও সেভাবে অশান্তি ভোগ করছি। তারা প্রচার ক'রে বেড়াই যে পাকিস্তান তাদেরই রাজ্য—এখানে তাদের খুবীমতোই শাসন চলবে, আবার কতক হিন্দুদের মনেও এই ধারণাই বহুদূর যে পাকিস্তান মুসলিম ছোট; এখানে হিন্দুদের মান-ইজ্জত, ধর্ম ও সম্পদ—কিছুই নিরাপন্ন নয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে এসব তাদের দুর্বুদ্ধি, অশিক্ষা ও আতঙ্কের ফল এর মধ্যে সভ্যতা নেই। আমরা তো বিশ্বাসই করিনে যে এই কোটি কোটি হিন্দু পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাবে? এ কখনো সম্ভব? তাহলে আমাদের বিচারই তো সংকট হবে। কোনো দেশেই কি এমন আছে যে সেখানে মাত্র এক ধর্মাবলম্বী লোকই আছে, ভিন্ন ধর্মী নাই?

—হী, ঠিক বলেছ তোমরা। তোমাদের অল্পবুদ্ধি হ'লেও সার কথাটা তোমরা বুঝে রেখেছ।

বসন্ত উত্তরবাংগ ও যশোর খুলনা অঞ্চলের শহর ও পল্লীসমূহ পরিভ্রমণান্তে এই মন্তব্য করতে পারি যে পূর্ব পাকিস্তানের শহরগুলি থেকে হিন্দুজনসাধারণ বহুলাংশেই বাহ্যভাগ করে গে'ছে। প্রায় বাড়ীগুলি তালাবন্দ, নীরবে দাঁড়িয়ে আছে—ঘোকারী-ব্যবসায়ীরাও চলে গেছে। শহরের অবস্থা অত্যন্ত ধীন, স্ত্রিয়ময়। তবে যে সব শহরে আইন আদালত আছে সেখানকার হিন্দু আইনব্যবসায়ীরা নড়েন নি, ব্যবসায়ের অস্থবিধা না ঘটলে স্নবস্তই অস্ত্র চলে বেড়েন। যান নি, এ আশার কথা। হিন্দুদের মনে মুখে বিবাহ অবসার, মুসলমানদের মনে হুণে হুণে-উল্লাস। বসন্ত অবস্থা তবনই স্বাভাবিক বলে মনে করা যাবে যখন হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই অন্তরে বাহিরে হাসি ফুটে উঠবে।

প্রায় ক্ষেত্রেই কিছু কিছু পরিবার স্বহানে প্রত্যাবর্তন করেছে, করছেও। পূনর্বগতির কার্য আরো দ্রুত অগ্রসর হতে পারত সরকারী বেসরকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থসংরক্ষণের বোর্ড গঠিত হ'লে এবং কোথাও তাদের উপর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ছলুম অবিচার অহুত হ'লে সংগে সংগে তার প্রতীকারে তৎপরতা দেখাতে পারলে। কোথাও কোনো সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বা থাকলেও কতকগুলো শিক্ষিত অশিক্ষিত মুসলমানের মনে ছলুম করার প্রবৃত্তি ও স্মরণ এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে তাদের সংখ্যা অল্প হ'লেও দুর্বলগতি হিন্দুদের মনে প্রবল ভীতি ও আতঙ্কের সঞ্চার করেছে।

ওসব দিকে হিন্দুদের ব্যস্তত্যাগের কোনো হুনিদিত কারণ ঘটে নি অথচ আধিক-সমতিসম্পন্ন ও চাকুরে ব্যবসায়ের পরিবারগুলো শহরে নেইই—গ্রামেও নেই, শুধু ভারত বিচ্ছিন্ন হওয়ার ত পাকিস্তানেই মুসলিম ছোট হ'লে দুই লোকদের প্রচারে যে কালনিক আতঙ্কের সৃষ্টি হ'য়েছে তারই আশংকা। এই নিভিত্তিক অলৌক প্রচার সরকারের পক্ষ থেকে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা সরকার।

উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মনে স্বস্তির ডান লাগানো সরকার। হিন্দুমুসলমান—সকলের মধ্যেই স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদাবোধ আগানো সরকার। সরকারী চাকরীতে, পাকিস্তান প্রশাসন গার্ডে নিয়োগ প্রাপ্তির ভয়ে হিন্দুদের কাছে শাস্ত্র আবেদন জানাতে হবে, যে সব হিন্দু পাকিস্তানে সরকারী কার্যে নিযুক্ত ছিল এবং যে সব মুসলমানে হিন্দুতানে সরকারী কার্যে নিযুক্ত ছিল তাদের কাছে পুনরায় টেটাস্বর হওয়ার ভয় আবেদন জানাতে হবে, ছোট বড় যে কোনো ব্রকমের ঘটনার দ্রুতগতি তদন্তের, বিচারের ও পুনরায় না হ'লে তার ধোঁচাচিৎ ব্যবস্থাবলম্বন সরকার।

কার্যত এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'লে এবং দুই টেটের মধ্যে বহুদুর্ঘটনা চুক্তিনামা রচনার দ্বারা অবস্থ-আবাসের স্থাবস্থা স্থাপিত হ'লে, লোকের জীবনধারণের অত্যাবতকীয় অব্যাসমূহ স্থলভ হ'লে পুনর্বগতির চেটা

জড় সাকল্য অর্জন করতে পারে। গ্রামের লোকের মনে এখনও বেশ স্বচ্ছন্দভাব বর্তমান, চাকুরে লোকের গ্রাম পরিত্যাগ করার তারা অনেকটা রম্য গেলেনও অপস্কিত আছে আশো। কিন্তু মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কতকের আচরণ এমন অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ও উচ্ছ্যতপূর্ণ যে চিন্মদের মনের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা মনীভূত হচ্ছে, তারা নিরাশ হ'য়ে পড়ছে বিন দিন।

হানে হানে অপিস্থা বিবেচ ও অজ্ঞতাবশত কতক শিক্ষিত অপিস্কিত মুসলমানের মনে অহংকার ও উচ্ছ্যতের ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রতন্ত্রীয় সরকারী কর্মচারীদের আচরণও বেআদর্শী ও ভীতিজনক। এতেও বাস্তবত্যাগের মনোভাব বাড়ছে হিন্দুদের ভেতর। বুদ্ধিমান বিবেকী মুসলমানদের উচিত—এদের অন্যায় ও চুবিনীত স্বভাব ও বিধি মনোভাবকে পরিবর্তিত করা কোনল ও ভাবাহরণ করার দিকে আগ্রহ রাখা। সরকারী ও বেসরকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তব্য ব্যাপক প্রচারকার্য চালানো, হিন্দু ও মুসলমানের সম-স্বার্থসাধনায় ন্যায়বোধের হাবিষ সযত্নে ভাষের লব্ধ করা।

বস্তুত অর ও বস্তুসংকটই আজ স্বাভাবিক ও শাস্তিপূর্ণ জীবন যাপনের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে

পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র—সমস্ত খেলাতেই—সংঘর্ষে পল্লীতে, অভাবের হাহাকার দেখা দিয়েছে। তাই লব্ধই হতাশা ও অবলাদ। ক্রেতা সমাজে যেমন একটা বিমূর্তভাব পরিলক্ষিত হ'চ্ছে—বিক্রেতা সমাজেও তেমনি একটা বিমূর্তের ভাব।

উত্তর ভোমিনিয়নের সরকার শব্দের দৃষ্টি এমিকে অবিলম্বে আকৃষ্ট হওয়া বরকার। হিন্দু মুসলমান—সকলেরই মুখে—“এসে দেখি থাকে থাকে? আমাদের কি এভাবেই থাকতে হবে?”

এর উত্তর আমাদের উত্তর পরকারকেই দিতে আজ্ঞান করছি। ভারত বিভক্ত হ'য়েছে ব'লেই হিন্দুতান সরকারের কোনো দাবিষ নেই—এ আমরা স্বীকার করি না। পাকিস্তান ভারতেরই অংশ—এই বুদ্ধিতেই পাকিস্তানকে লব্ধপ্রকারে সাহায্য করা চাই। এই মনোভাবের হারাই কোনো এক লম্বা দুই অংশ আবার মিলিত হতে পারবে। বিরোধিতার দ্বারা এই দুই টেটেরই সংখ্যালঘুতা নিখাতিত হবে, সংখ্যালগ্নিষ্ঠ লক্ষ্যদায়ও স্থখী হ'তে পারবে না অর্থাৎ কলহের মনোভাব পোষণ করতে থাকলে কোনো টেটের জনসাধারণের শান্তি কল্যাণ নেই।

জন্ম সংশোধন

গত ১৩৫৪ সালের ভাত্র মাসের মন্দিরতে “চন্দ্রালোক” নামক যে পত্রটি ছিল সেই পত্রটির লেখকের নাম হচ্ছে ঈপতি চৌধুরী ; ঐজ্যোতি চৌধুরী নহে।

নারী স্বাধীনতার স্বরূপ ও কস্তুরবা গ্রামসেবিকা শিক্ষার কথা।

—নিমিত্ত সিদ্ধান্ত বিশারদ

নারী স্বাধীনতার চক্র আর ভারতের শতলক্ষ গ্রামে যে বিশেষ আন্দোলনের প্রচোদন তা' আধুনিক শিক্ষিতা নারীরা অনেক উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। শুধু সহরের বৃক্ষে দাঁড়িয়ে লাউড্-স্পীকারে নারী স্বাধীনতার চক্র বকুতা দেওয়া যেমন ভুল, তেমন খবরের কাগজের পাতায়-কবিতা আর প্রবন্ধ লিখে নারীকে সচেতন করবার চেষ্টা করাও ভুল। ভারতের শতলক্ষ গ্রামে যেখানে ২০ জন শতকরা নিরক্ষর, সেখানে খবরের কাগজের প্রবন্ধ আর কবিতা নারীসেব কাছে দুর্বোধ্য আর দুরক্ষর হবে এটা লব্ধবাহী সম্মত। গ্রামই যেখানের মেকরও সেই মেকরও যেখানে ক্ষীণ দুর্বল, সেখানে মাথা হরি জোরের উপর তার বল দেখাতে হয়, তখন মেকরও ভেঙে যাবে, ফলে মাথা মুড়ে পড়বে।

গ্রাম যেমন সহরের মেকরও, তেমন নারী ও পুরুষের মেকরও। মা যেখানে ক্ষীণ দুর্বল লাক্ষিতা ও বন্দি, সম্মান সেখানে ক্ষীণ দুর্বল ডীক ও লাক্ষনাপ্রিয় হবেই হবে। আমাদের মনীষীরা বলেছেন—আমাদের প্রধান অবনতির কারণ আমাদের মাতুলজাতি দাসী। দাসীর গর্ভে অমগ্রহণ করে আমরা বৃকার ওয়াশিংটন হতে পারি, তবে তা' বেশী নয়, হু'চাবজন। কিন্তু আমাদের মা যদি দাসী না হতো, আমাদের মা যদি অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে না থাকতো, তা'হলে আজ আমাদের মধ্যে শত সহস্র বৃকার ওয়াশিংটন অমগ্রহণ করতো।

আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে আমরা কী দেখতে পাই? দেখতে পাই—নরলা বালিকা বধূর দল খাস্তরী নন্দীর লাক্ষনার লাক্ষিতা, নিষ্ঠুর স্বামীর কবাবাতে অর্ধরিতা, শত বাধা নিষেধের বন্ধনের বাধায় ব্যথিতা। আইনের কথা আমরা বলি—আইনের বলে আমরা নারীস্বাধীনতার পূর্ণতপ দেবার আশা করি, কিন্তু হায়! এ আশা আমাদের দুর্লভাভাব। তার প্রমাণ আমাদের চোখের উপরে—বিদ্যালয়গণের বিধব্য বিবাহ আইন, হরচরণ

সারদার দর্দার আইন, হরিদাসে মজুমদারের পণপ্রণা নিবারষ্ট আইন। এক বিদ্যালয়গণের বিধব্য বিবাহ আইনের কবকিৎ ছাড়া আর দুইজন আইন আইনই



গাভীরা

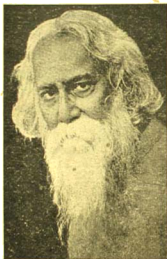
রহিল। তাকে কার্ণওহী করা গেল না শবিকরনা মতো। গাভীকীর মতে-পরিচরনাকে যদি বাগুবে পরিণত করবার

ইচ্ছা থাকে, তবে, বলাটোর সঙ্গে সঙ্গে কবিতার বিশেষ প্রয়োজন আর কবিতার নাইই বলা। অশুভ্রতা বর্জন আর জাতিভেদ দূরীকরণ নিয়ে আগে থেকে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট মহাপুরুষ বলে গিয়েছিলেন কিন্তু বলা সেই বলায় পর্য্যবে পড়েছিল। সম্প্রতি নোহাখালীর ব্যাপারে যেন একটু একটু সেটা কার্যকরী হতে চলেছে। এর আগে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ভারত সেনাবাহিনী সংঘ, আর্থনামিক প্রকৃতি অনেক সংঘ সমিতি জাতিভেদ দূরীকরণের প্রস্তাব করেছে ও সামরিকভাবে সভাসমিতি করে তাকে দূর করার চেষ্টা করেছে কিন্তু পরে বিফল হয়েছে। সেইজন্য গান্ধীজীর অধ্যক্ষ গ্রামে গঠনমূলক কাজ আরম্ভ না করলে শুধু আইন করে, বক্তৃতা দিয়ে, খবরের কাগজে প্রবন্ধ কবিতা লিখে, বেশী কিছু করা যাবে না। নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। ভারতবর্ষের সামন্তলক্ষ্য গ্রামের অন্ধ, অশিক্ষিতা, কুসংস্কারগত কর্মহীন নারীসমাজকে শিক্ষিতা, স্বসংস্কারগত কর্মহীন করে স্বাধীন করতে হলে তাদের মধ্যে চাই গঠনমূলক কাজ।

নারী স্বাধীনতার স্বরূপ নিয়ে অনেকের মধ্যে অনেক বাস্তববোধ ও বিরোধ বিষয়ে মতবাদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এসে এই বাস্তববোধের উপর আমি শুধু একটী কথা বলে দাঁড় হই যে—স্বাধীনতা বান্ধে বেজাচারিতা নয়। পুরুষের উপর অত্যাচার অত্যাচার করেছে ও করছে একথা সত্য, কিন্তু তার ফলে নারী ও পুরুষ উভয়েই দারী। কবিগুরু ভাবার প্রতিফলন করে বলে ঠিক বলা হবে—“অত্যাচার যে করে আর অত্যাচার যে সহ্যে, তব দুগা ভারে যেন দুপদম নহে।” যে অত্যাচার করে সে পাপী আর যে অত্যাচার সহ্য করে সে মহাপাপী। পুরুষ নারীদের উপর অত্যাচার অত্যাচার করেছে বলে নারীরা যে পুরুষ বিদ্বেষী হয়ে একথা পাগলার কথা। তাই আবেগবশত একথা বলেন—“বর্ধহিন্দুরা অত্যাচার করেছে আমাদের উপর অতএব আমরা মুসলমান হয়ে যাব।” কিন্তু বাপু একটী কথা—বর্ধহিন্দুরা শুধু তোমাদের উপর অত্যাচার করে, আর তোমরা কি তোমাদের উপর অত্যাচার করো না? তোমার থেকে যে অত্যাচার, মহাভারতের দাপে এক ভিত্তি

অথবা শুধু এক পরশটো ছোট, তাকে তুমি দম্বলমতো হুগা করো একথা আমি খেঁচি গলায় বলতে পারি।

নারীর শত্রু নারী। জাতি শত্রুর দ্বারা আমা নারী স্বাধীনতা অনেকটা যে ব্যাহত হয়েছে একথা সংস্কারিক নারীরাই জানেন। কি বিধবাবিবাহে, কি পণপ্রথা নিবারণে, কি বহুনির্ধাতন প্রতিরোধে, কি বাণিকা বিবাহ নিরোধে, দললটোতেই গ্রামের মেয়েরা বিবাহী। কোন বিধবাকে কেবলে গ্রামের মেয়েরা স্থান্য চোখমুখ



রবীন্দ্রনাথ

দিল্লীকোট, কোন কুমারী ১৩ থেকে ১৪ এগারে পা দিলেই আর তার বাপ স্নান পাড়ায় কাপ পাড়তে পারে না। কোন ঘোমটা গোলা মেয়েকে মেয়েলে দলে দলে গ্রামের মেয়েরা লাফায়। এই সব মেয়ে আমরা বুঝতে পারি—দোষ উত্তর পক্ষের।

আম নারীস্বাধীনতার সত্যিকারের রূপকে যেখানে ঘিরেছেন বিশ্বের কল্যাণকারী কবি গান্ধী। ভারতের সামন্তলক্ষ্য গ্রামের নারীকে স্বাধীন করতে হলে তাদের প্রত্যেককে দলদল ও দলদলিনী করতে হবে। মেয়েরা তাদের জাত—উর্দুর মেহ ও মারামমতা, গ্রেস ও শ্রীতি,

নারী স্বাধীনতার স্বরূপ ও কন্তুরবা গ্রামসেবিকা শিক্ষার কথা

শিশুকে পুত্র করেছে—পুরুষকে পৌরষ দিয়েছে। গৃহ প্রাকারের অন্তরালে অবগুপ্ততা হয়ে তাঁরা অস্বর্গস্পত্তা থাকবেন না সত্য, তবে একথা সত্য যে, তাঁদের গৃহের কাণ্ড করতে হবে। গৃহের কাণ্ড সেয়ে তাঁরা বাইরের কাণ্ড করতে পাঠেন, ব্যক্তিগতভাবে অনেককে অবশ্য শুধুই বাইরের কাণ্ড করতে হবে, এখনও অনেকে তা' করছেন কিন্তু সেটা সমসীর উপর প্রযোজ্য নয়।

এইরূপ আজ গাছীজী পরিকল্পিত কন্তুরবা গ্রাম সেবিকা শিক্ষা আমাদের মধ্যে নতন রূপ ও আশা



কন্তুরবা

আনিয়ে' দিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে কন্তুরবা

গ্রাম সেবিকা শিক্ষা শিশুর স্থাপিত হয়েছে এবং এই শিক্ষাশিবিরে মলে মলে শিক্ষিতা নারীর হল ট্রেনিং নিতে যাচ্ছেন। ট্রেনিং শেষে তাঁরা গ্রামে গিয়ে বসছেন গ্রাম সেবিকা রূপে।

কন্তুরবা গ্রাম সেবিকাধার এই সমস্ত শিক্ষা পদ্ধতি দেখে আমাদের মনে হচ্ছে এতোদিন পরে কবি গাছী তাঁর নারীস্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপকে দেখিয়ে দিয়েছেন ভারতের পরাধীন নারীসমাজকে। গাছীজী পরিকল্পিত এই গ্রামসেবা শিক্ষা লাভ করে ভারতের নারীসমাজ হবে বিশ্বের মাঝে আকর্ষণ স্থানীয়। ভারতের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস গাছীজী পরিকল্পনায় গঠিত এই নারীসমাজের সংগে বৃহৎ, শক্তিশালী ও উজ্জ্বলময় হয়ে উঠবে। এতোদিন ভারতের অস্বর্গস্পত্তা নারী বৃহৎপ্রাকারে মাঝে নিচকে রেখেছিল সীমাবদ্ধ করে, আজ সীমাহীন বৃহত্তর জগতের সংগে তার পরিচয় হবে সেবার অন্ততভাও নিঃ। ভবিষ্যতে কংগ্রেসের মধ্যে যির এই শিক্ষা এখন সারা ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে যাবে, তখন ভারতের লক্ষ লক্ষ বকিনী নারী স্বর্গগতা জ্যোতির্ময়ী গাছীজীর ডাকার প্রতিধ্বনি করে কংগ্রেসকে বলবে—“হে মহাপ্রতিষ্ঠান, তোমার আবির্ভাবে আমি খুশি হয়েছি, পূর্ণ হয়েছি, দেশ সেবকের কৃতার্ণ। জননীরূপে শুধু নয়,—বেশ প্রেমিকের সর্বসহা প্রেমসীরূপে শুধু নয়—নিজে দেশ সেবিকা হয়ে।”



হেথা ও ওঠে চাঁদ

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

৬

মাগতী তার অভ্যস্ত জীবন হুক করতে চেষ্টা করল।

মুগে ঘাঘ, ছাত্রী পড়ায়—নিজের পড়াশুনা করে। কিন্তু তার চরুপটের কথা তার পরিচিত মহলে সবাই প্রচারিত হল। তাদের পিছনের গুহন বা সাননের মহাছুকৃতি হুই-ই তার পক্ষে অসম্ভব বোধ হল।

একদিন শাস্তার সাথে তার কথা হচ্ছে। মালতী বলছিল—‘শাস্তারি, এখনকার আবেষ্টন আর আমার শূন্য হচ্ছে না। নাহব যে কত নীচ হতে পারে, তা আগে জানতাম না। আমার দুঃখা নিয়ে মেকেরা পরিহাস করে এবং হরত বা আনন্দ বোধ করে। আর পুরুষেরা করে অপমান……। নারী দেহের যেন অপর কোন সার্থকতা নেই—কেবল পুরুষের উশড়োপের উপাধান যোগাবে……স্থিত গৃহের মতো লোলুপ নৃতি নিয়ে ওরা আমার এই দেহের দিকে তাকিয়ে থাকে—যেন বিবাহের ঐ বিভ্রাটের কলে আমার দেহ ভুত শবে পরিণত হয়েছে……।’

শাস্তা বলল—‘মালতী, পুরুষের দোহ দিয়ে লাভ কি? নারীরাই যে নারীদের অপমান করে’ সত্যি জানাদের কাগালপনাও অতই পুরুষেরা আমাদের এমন ব্যবহার করতে পারে।……অথবা হরত বিধাতাই আমাদের এমন অপমা করে ঘটি করেছেন। তার হু’ বছর স্বামীর সহ পেয়েছি তারপর একদিন সব ছুঁয়ে গেল। কপালের সিন্দুর বধন মুঁছে ফেলল—যে বসে বধন তা তুলল—তখনও বন বলছিল, স্বামীর কাছে যা পেয়েছি, তাই আমার সাগা জীবনের সার্থী হবে। স্বামীর ছবি রোজ মূল দিয়ে পুড়া করেছি। আরও সেই ছবি আমার সঙ্গে আছে; কিন্তু আজ আর মূল দিতে পারি না…… ছবিতে যে বস হ’য়ে আছে—কিন্তু নাহবের জীবন লগা চকল, লগা গতিশীল। যে দেড় বছর চ’লে গেছে, সে

চিত্ততয়েই চ’লে গেছে—হাতের বাইরে, নাগালের বাইরে চলে গেছে। তাকে দিখে আমার যত্নমান ও ভবিষ্যৎ কি করে ভ’রে রাখব। মেয়েদের জীবন সত্যি যার্ন—যদি সে একজন সখী না পায়, যদি সে নিজের হুক সন্তান ধারণ করতে না পারে। আমার মনের এই যীনতা—এই যে বাসনা, তা ত’ আমার চোখ মূখ দিয়ে ছুটে পড়ে। তাই পুরুষেরা লালশ গায় আমার অপমান করতে। মালতী, নিজের মনকে বিরোধ ক’রে যেখো—যখন পুরুষের লোলুপ নৃতি তোমার অন্ধকে এসে চুপন করে, তখন কেবল কি তুমি অপমানই বোধ কর? সে পুরুষ যদি নিজের অভ্যাসচরণ না করে, তবে তোমার নারীত্বের, তোমার যৌবনের মর্যাদা পাছ ব’লে কি তোমার মনে একটা তুষ্টি আসে না?……নিজেকে প্রতারনা করে। না মালতী,—পুরুষ হরত শর, লস্কট…… সবই হরত সত্য—কিন্তু নিজের মনকেও বিচার ক’রে যেখো।……’

একই খেমে শাস্তা আমার বলতে শুরু করল—‘কেউ তোমার উদ্বিগ্ন যৌবন-শোভিত দেহের দিকে ফিরেও তাকায় না, একি তোমার ভাল লাগবে মালতী? তোমার আঘাত এখন লজ ও তাজা। তাই এখন তুমি শান্তভাবে বিচার করতে পারছ না। আমার কথা বলতে পারি—আমি ত’ আর সেই অতীতের দেড় বছর নিয়ে জীবন চালাতে পারছি না। এতে না আছে ধর্ম, না আছে আনন্দ।……আর-ও গুনবে। হুথাকে চেনো ত’? বার বছর বয়সে তার বিয়ে হয় বোল বছর বয়সে সে বিধবা হয়—এই তার বছর স্বামীর কাছে সে লাহনা, অপমান ও হারিত্যের তাড়না ছাড়া আর কিছুই পায়নি। তবু বিধবা হওয়ার পর স্বামীর বড়ন ও ছবি পুকা করতে শুরু করল। কিন্তু তাতে তার সুখার শান্তি হয়নি। তাই সে এল নার্স হতে। সে মনে করেছিল স্বামীর অত্যাচারে ও বৈধব্যের কষ্ট লাগলে, তার নারীত্বের অপঘটনা হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালের কাছে নর-নারীও নিলনের ছবি সে দেখল; তার নারীত্বও আমার আগে উঠল। তার অবস্থার আগুণ সেনিহান হয়ে

জলে উঠল। সে মনে করল—এই আগনে যা পড়বে তাই পুড়ে সোনা হবে।……আন মালতী, কি দুঃখের তার জীবন—প্রভাতরা থেকে প্রভাতরা, নৈরাশ্র থেকে নৈরাশ্র, বার্থতা থেকে বার্থতার যা খেরে খেরে আশ সে ভগ্নদেহ, ভরমনি। মেয়েবাই সবচেয়ে বেশী তাকে বিচার শেষ। তার তপনব্যায় তাকে এক ফোটা জল কেবারও কেউ নেই।……”

ছ'ম্নেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মালতী ঘিঁজাসা করল—“তুমি কি আবার বিয়ে করতে চাও, শান্তা দি।”

শান্তা—“অমৃত, চাই না, একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। হৃদয় চাইবার সাহস আশ-ও আমার হয় নি। কেউ যদি আশ এসে আমার বলে—শান্তা, আমি তোমার ভালবাসি—সে দিন যে কি পুলক সড়া বেছে খেলে হবে, তার কল্পনায়-ও আমার শরীর শিউরে ওঠে……।”

“যে দিন বামীকে হারিয়েছিলাম, সেদিন মনে হয়েছিল জীবনের সব কিছু এখানে হারালাম। মালতী, ঋণ্য হুজি এটা বিবম ভুল। তোমার জীবনের নিকে চেয়ে দেখ। জীবনে এত বছর ধরে যা কিছু পেয়েছ, আর ভবিষ্যতে পাবার যা কিছু সম্ভাবনা—সবই বার্থ হয়ে গেল। মাহুকের বিদানে—কেবল চিরস্থায়ী হয়ে রইল একটি ব্যক্তির একটা আচরণ, কেবল এক স্মৃতির একটা বকনা, কেবল এক মুহূর্তের একটা স্মৃতি। এই নিরুত্তা হল মাহুকের বিদান;—এমন নির্বম কেবল মাহুবই হতে পারে। বিধাতা-ও এত নিষ্ঠুর নয়—তার বিদানে এমন নির্বমতা নেই। পূত্র-শোক—বার চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না—মাতৃবন্ধের পূত্রশোক তাও ভগবানের বিদানে আত্মে আত্মে মুছে বাষ। মাহুকের বিদানে—এতটুকু মদ্য-ও নেই। এক মুহূর্তের একটা দুর্ভাগ্য—চিরস্থায়ী-করে রাখব নির্বম বিদানে মাহুকের।……”

“মালতী তপনের কাছ থেকে দু'বছর তুমি যা পেয়েছ তার কি কোন দান নেই? সে কি কোন আনন্দ তোমাকে দেব নি? তোমার অন্তরের পূণ্যকারকে ছুটিয়ে তুলতে তার ভালবাসার উত্তাপ কি কোন সাহায্য করে নি?”

মালতী—“কিন্তু সে ত' আমার সঙ্গে প্রভাতরা করেছে? সে বন্ধক, প্রভাতকের পক্ষ নিয়ে তুমি কিছু বলো না।”

শান্তা—“প্রভাতরা কে কাকে করেছে যা না করেছে, তার হিসাব-নিকাশ ত' একদিনের খাতা লেখে হয় না। চিত্তবল্লভ নাকি সব-তরফেরই হিসাব রাখেন—তার খাতা দেখলে ওটা ভাল রকম খোঁকা হবে। ও বাই হ'ক হৃদয় সত্যই সে তোমাকে প্রভাতরা করেছে। কিন্তু তা বলে সে যা তোমার জীবনে দিয়েছে, তাও-ত' উড়ে ধাব নি তার প্রেমের উত্তাপে তোমার অন্তর যে আত্মে আত্মে বিকশিত হয়ে উঠেছে—তাও কি মিথ্যা?…… থাক আশ আর না। একটা কথা ব'লে রাখি, জীবনটা প্রতিশ্রুতি—লাভ-লোকসান সংগ্রহ ক'রে ও বিলিয়ে সে চলছে। কোন গ্রীক দার্শনিক নাকি বলেছেন—যে জগতটা এমন পরিবর্তনশীল যে একই মনীতে দু'বার দান করা যায় না। এক ভূকম্প পর দ্বিতীয় ভূবৎখন তুমি দেখে, তখন আর সেই আগের নদী পাবে না। মাহুকের জীবনও তাই—পাওয়া বা ক্ষতি কোনটাই চিরস্থায়ী নয়—সবই আগছে ও থাকে……।”

মহানুভব মতো মালতী শুনছিল; শান্তার কথা সে গ্রহণ করতে পারছিল না; কিন্তু প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতাও তার ছিল না। একটু পরে শান্তা বলল—“এক কাজ কর মালতী; কয়েক দিন পরই গরমের ছুটি হবে—তুমি ত' বাড়ী থাকে না; এখানেও তোমার ভাল লাগবে না। চল আমার সঙ্গে ঢাকার আমাদের বাড়ীতে। একটা পরিবর্তন তোমার পক্ষে দরকার……।”

(৭)

বিবাহ-সভার সবকিছু ওলট-পালট ক'রে দিয়ে মণিক। তার ছেলেকে নিয়ে সেট রাতেই নিজেদের বাড়ী ফিরে এল। স্বস্তিসূহ কোনদিনই তার আপন গৃহে হয় নি। বামীর বিদ্যাত মণিকাকে একটি বিনা পঞ্চমার পরিচায়িকা ব'লেই লেখত। তপনের এক ভাই ছিল—নাম তেজেন। তার বয়স প্রায় মণিকার সমান। কেবল এই দু'কটির

সঙ্গে মণিকার একটু ভাব ছিল। তেজেন এখন কলিকাতায় থেকে বি-এ পড়ে। সেই তপনের গোপন বিষের সংবাদ পেয়ে বাড়ী দাখ ও বৌদিকে নিয়ে এই সব গোলমাল ঘটায়। সেদিনই রাত্রে আবার বৌদিকে নিয়ে সে বাড়ী এসে।

তার এই বকম হঠকারিয়ার বাড়ীতে যে তার স্বখ্যাতি বাড়ল তা মনে কখনো কোন কারণ নেই। মণিকার পক্ষে-ও বাড়ীর পরিস্থিতি বড় অস্বস্তিকর হয়ে উঠল না। তেজেনের বুক মনে এই হতভাগিনী নারীর প্রতি স্বভাবতই লম্বা ছিল। বাড়ীর আবেষ্টন হুঁতনেরই মনের তেমন অস্বস্তিক ছিল না বলে পরস্পরের মধ্যে একটা সহজ সহানুভূতি এবং সৌহার্দ্য ভাবও ছিল।

তেজেন জানত যে তপন মালতীকে নিয়ে থাকার প্রস্তাব পাগা ভাড়া করেছিল। যদিও তপন সবটাই তার কাছে গোপন রাখতেই চেষ্টা করছিল, তপনের বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে খবরটা শেষ পর্যন্ত ঘেঁসে তেজেনের কান পর্যন্তও গেল।

মণিকাকে এ খবর ব'লে, তেজেন বলল—“বৌদি, আমার সঙ্গে তুমি কলিকাতায় চল।”

মণিকা বলল—“তারপর? তোমার শাস্তি কি আমাকে আদরের সহিত গ্রহণ করবেন?”

তেজেন—“তা হকত, করবে না। কিন্তু তোমার অধিকার যদি নিয়ে আশ্রয় করতে না পার, তাহলে কেউ তোমার অধিকারে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না।...এ তিন চার বছর তুমি কিছু লেখা পড়া শিখবে, ওখানে গিয়ে না হয় একটা junior training পরীক্ষা দেবে—আমি জানি তুমি পাশ করতে পারবে। এখানে প'ড়ে থেকে তোমার কি হবে? কলিকাতায় গেলে বা হয় একটা ব্যবসা হবেই...।” মণিকা চুপ করে শুনছিল। একটু পরে সে বলল—“এটা কি ঠিক হবে ঠাকুরপো! তোমার দাদাও হয়ত আশ্রয় দেবেন না;—আর এখানকার আশ্রয়ও হয়ত হারাতে হবে।” বুক তেজেন এই উত্তরে অবৈধ হ'য়ে বলল—“যেহ, বৌদি তোমরা বেরো! এখনি প'ড়ে প'ড়ে যার খাও বলেই, সবাই তোমাঘের ঘারে।

আল্লাহ্‌কান্‌কার দিনে ঐ মাছাতার আমলের ঘন ও মত নিয়ে চলে না। নিম্নেও অধিকারে ও নিজের পায়ের উপর পাড়াতে হবে তোমাঘের...।”

শেষ পর্যন্ত মণিকা তেজেনের সঙ্গে কলিকাতায় এসে এবং তপনের সেই বাড়ীতেই গিয়ে উঠল। তেজেন তার বৌদিকে পৌছে দিয়ে ঘেঁসে চলে গেল।

মালতীকে বিয়ে করতে দাবার চারপাচতিন আগেই তপন এ বাড়ীতে উঠে আসে এবং বিষের পরই বাতে হুঁতনে এ বাড়ীতে উঠতে পারে, তেজেনি ভাবে শুঁচিয়ে রেখে যায়। বিবাহ লড়া থেকে ফিরে সে এ বাড়ীতেই ওঠে। সন্ধ্যার সময় অফিস থেকে ফিরে নিজের ঘরে চুকতেই দেখে বাইরে শাড়ী ও সেমিট মেলো বেওয়া আছে। ছাৎ করে তার মনে এল—জবে কি মালতী তাকে ক্ষমা করেছে। মালতী ভিন্ন শাড়ী সেমিট পরিহিত কে এ বাড়ীতে আসবে? তার মনে একটু হাদি খেলে গেল—যেহেহের রাগ ক'বিন রাখে—দায়ত সে আমার স্ত্রী।—রাগ পড়তেই এ বোখটা তার মাথায় চুকছে। একটা বিজয়ের পর বোধ করতেই দেখে হুঁ বহুরের খোকা তার অগুণ্ড পড়ে এগিরে আসছে।

সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এক মিনিটে তার আনন্দ ও স্বর্ণ হুই খুলিয়া হল। একটু পরেই খোকার পিছনে খোকার মা এসে তাকে প্রণাম করল। এখন তড়িং গতিতে সব ঘটে যাচ্ছে যে সে প্রায় সখিৎহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মণিকা বলল—“চল, ঘরে চল, আমা-কাপড় ছেড়ে হাতধুখ ধোও; তোমার জলখাবার নিয়ে আগছি তারপর।” তপন অবাধ হঠে মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—তারপর মণিকা যখন আবার তাকে ঘরে বেতে বলল, সে আত্মে আত্মে হয়ে গেল। মণিকা বামীর আমার বোডাম খুলে জামা রেখে দিল। বামীর পায় জুতার কিন্ডা খুলে, জুতা ছাড়িয়ে দিল এবং পায়ের সামনে জাতল রাখল। পাখা এনে বামীকে বাতাস করল—সবই যেন তার নিত্যকার স্বভাব কাজ করে যাচ্ছে।

বামীকে হাত-ধুখ গোবার মত আবার তাগিদ দিয়ে

সে বেরিয়ে গেল। একটু পরে চা ও সামস্ত কিছু জলধারার নিয়ে এল। মণিকা বলল—“বে চাকর তুমি রেখেছ যে ত' বেখছি পাকের কিছুই জানে না। বাক, এখন ত আর পাকের লোকের দরকার নেই। ঘরে যা ছিল, তা বিয়েই জলধারার তৈরি করে রেবেছি।”

তখন একটি কথাও বলল না। তার ভিতরে আগ্নায় অনেক সস্তা কথা ছ'বে ছিল, কিন্তু মণিকার এই সঙ্গতিভ ভাব দেখে সে আর সে-গুলো মুখের বার করতে পারল না।

মণিকা গেল পাকের ঘরে। তখনও বেরিয়ে গেল। রাত এগারটার সময় সে ঘন কিরল, তখন তার মনকে সে শক্ত করে এসেছে। খাবার পর সে বলল—“বে কদিন এখানে আছ তুমি শোবার ঘরে থেকো, আমি পাশের ছোট ঘরে থাকব।”

মণিকা বলল—“কেন শোবার ঘরে ত' দু'জনের মত ব্যবস্থাই আছে?”

তখন—হী, তা আছে—সে দু'জনের মধ্যে তুমি একজন নয়। কাজেই ও কথা তুলে লাভ নেই।”

তখনও অপেক্ষা করল না—মণিকাও ছাবাব দেবার মতো ভাবা বুঝে গেল না।

খোকা বিছানায় দুহুচ্ছে। মণিকার চোখে ঘুম নেই, বিবাহিত জীবনে ছুঁই তার সখী—এতে সে অচ্যুত হ'য়ে গেছে।

কিন্তু তবুও আজ তার বুক ফেটে কারা আসছে—তা, ছুঁখের কারা, কি অপমানের কারা,—তা সে জানে না। ঘরের সামনে ছোট বারান্দায় সে বসে আছে—রাত কয়টা বেজেছে সে হস-ও তার নেই। মহানমস্তা তার সামনে—এই লাহুনা ও অপমানের ভিতর কি করে বাস করবে অধ্বা বায়েই বা কোথায়। বিশে কোথাও তার আশ্রয় নেই—মুতুই কি তার একমাত্র ভরসা। মুতুকে তার ভয় কি? এখান থেকে লাফিয়ে পড়লেই—বাস্!—সব শেষ। সেবে, মেবে—একটা লাক...

এমনি সময় খোকা কৈদে উঠল—কোন অলঙ্ শক্তি বেন'তাকে পিছন থেকে আকর্ষণ করল। ঐ একটি স্ত্র

শিশু—এতই তার শক্তি... খোকা আবার কৈদে উঠল। মণিকা পৌড়ে গিয়ে খোকার বুকে ঝড়িয়ে ধরল। খোকার কোমল মাংসপিণ্ডকে নিজের বুকের সঙ্গে ঝড়িয়ে ধরে সে বেন নবজীবন লাভ করল। তার জীবনের পার্থক্যতা সে বুঝে গেল। তাঁকে বাচতে হবে—তার খোকাকে মাহুৎ করতে হবে।

পরদিন ভেজেন এল পর মণিকা তাকে সব বলল। সে ভেজেনকে বলল—“ভাই ত' আমার, এই উপকারটুকু তুমি কর—নিজের পায়ের উপর বেন ধাঁড়াতে পারি। আর কিছুই বস্ত না হ'ক, অন্তত খোকাকে মাহুৎ করার জন্য আমার এটা হরকার।”

ভেজেন বলল—“নারের কাজ কতকটা সহজে শিখতে পার; এর বোধ হয় ব্যবস্থা করা দায়। তোমার কোন আপত্তি নেই ত' বোধি।”

মণিকা—“না ভাই, আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই।”

ভেজেন—“আচ্ছা, আমি দেখছি।”
লাভ আটদিন পর সব ব্যবস্থা ক'রে ভেজেন খবর দিল। মণিকা তখনকে বলল—“আমি নারের কাজ শিখতে চাই—এমনি করে ত' আমার চিরকাল চলবে না।”

তখন বলল—“বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই। এটা ঠিকই, এমনি ক'রে চিরকাল চলতে পারে না।... তুমি যে নিজেই এ ব্যবস্থা করছ, ভালই। আমার থেকে তোমার স্বাধীন ও মুক্ত হওয়াই উচিত।”

(৮)

মণিকার দিন চলতে লাগল। অপমানের আর পাক করে, পরিবেশন করে ও গতিপাক করে তার দিন চলছিল। মাঝে মাঝে তার নারী জন্ম কৈদে উঠত। বিছানায় শুয়ে তার বুক হা হা করে উঠত। তার স্বরীকর্তাকে অরণ করে মাঝে মাঝে সে বলত—“গত সস্ত কার বাড়ি ভাতে ছাই দিয়েছিলাম, বে-আমাকে এমনি ক'রে বক্ষিত করছ তপনন? শিপাসার যখন বুক ফেটে

বার—এক বুক জলে দাঁড়িয়ে এক ফোটা জলপান করবার অধিকার-ও আমার নেই।”

একদিন তার মনে হয়েছে তপনের পাথের উপর মাথা টুটে বলে—“এ অপমান, এ দুঃখ বেধে আমাকে বাঁচাও।” কিন্তু তখন এমন উদারলীন উপেক্ষা দিয়ে মন্দিরকার অস্থির অস্বীকার করে—যে এতটুকু স্বাধোগ-ও সে পায় না। তখন যদি তার উপর রাগ করত, অজ্ঞানতার করত, তবে বরং তার পক্ষে অস্বাভাবিকতা সহজ হত। আবার কোন কোন সময়ে সে নিজের ক্ষয়কে কঠিন করে লক্ষ্য করত—উপেক্ষা দিয়েই উপেক্ষার জবাব দিয়ে সে নিজের মর্যাদা রক্ষা করবে। এর মধ্যেও তার জীবনে একটা মস্ত বড় শাস্তি ছিল—থোকা। ধন তার অস্থির বিবাদের সমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠত—তখনও যেন কালিদাসের কবলের মত থোকা তার উপর হেলে থাকত।

সে দিন তার বিয়ের তারিখ। কেন যেন মনটা আজ উলস হ’য়ে উঠল। পাঁচ বছর আগের সেই শুভ দিনটির কথা মনে পড়ল। কত আশা কামনা নিয়ে সে কনের আগমনে বসেছিল—বৃক্করগা কত লক্ষ্য সে নিয়ে এসেছিল। সব তার ব্যর্থ হল। হায় রে নারীর জীবন! ভবুর একবণ কাচের মতো। ঠিক কাচের মতোই রূপ-বীন। সোনার আভা যদি তার উপর পড়ে সোনালী হং হং; তপার আভা পড়লে তপালী হং হং; আর কালির আভা পড়লে তা হয়ে বাহ বীজিহীন কালো—ঠিক তার জীবন যেমন হয়েছে। সোনালী, তপালী গোলাপী, কল্যা—কত রংয়ের আভা তার জীবনে পড়তে পারত। তার বসলে তার জীবনে এসে পড়ল কালোর আভা;—আর জীবন হয়ে পড়ল কালীনর।

রাত তখন দশটা বাজে। তখন আন্ধারাল প্রায়ই রাত দশটা এগারটার সময় বানীর আসে। কখনও কখনও তার পরশ্বেপ অস্থির, কঠোর জড়িত, জ্বালা বোলাটে। মন্দিরকার সঙ্গে তপনের বাক্য বিনিময় কখনো হয়।

মন্দিরকার ধন পাঁচ বছর আগের সেই শুভ দিনটির

আশা আকাঙ্ক্ষা ও আত্মকার ব্যর্থতার তুলনা নিজের মনে মনে করছিল, এমনি সময় তখন সাধার চুকল। যন্ত্র পরিহার বাহাখা দিয়ে যেতে অন্ধকারে সে মন্দিরকারে দেখতে পারনি। চুঁচু তার পা উপবিষ্টা—মন্দিরকার গায়ে লাগল। তখন একটু পিছিয়ে থেমে গেল। মন্দিরকার যেন কি মনে হল। স্বামী পর-স্পর্শ যেন তাকে কোন বস্ত্র-লোকের নির্দেশ দিয়ে ছিল। সে, গলার উপর দিয়ে জাঁচল ভাষ করে হাঁটু পেড়ে তপনকে, প্রণাম করল। তপনের পাথের উপর মাথা চেপে রাখল। তখন পা টেনে নিতেই, কপালটা পাথের আশ্রয় হারিয়ে শানের উপর পড়ল।

সে শান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—“পাঁচ বছর পূর্বে আত্মকার দিনে আমাদের বিয়ে হয়েছিল।”

তখন কলকভাবে জবাব দিল—“কেন শুধু মিছে কথা দিয়ে নিজেকে প্রতারণা কর। তোমার সঙ্গে আমার কোনদিনই বিয়ে হয়নি।”

মন্দিরকার—“বিয়ের ঘটনাটাও তুমি অস্বীকার করছ। শালগ্রামের নামনে যে মন্ত্র পড়েছিল তাও অস্বীকার করছ।”

তখন—“ঘটনা পাঁচ বছর আগে এই দিনে যে একটা হয়েছিল এবং মন্ত্র যে পড়েছিল তা ত’ অস্বীকার করছি না। অস্বীকার করছি—তুমি থাকে বলছ তোমার সঙ্গে আবার বিয়ে—তাকে।”

মন্দিরকার তার শান্তভাবে বজায় রাখতে পারল না। সে তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—“বিয়েই যদি অস্বীকার করবে, তবে যের আগমনে সেদিন বলেছিল কেন, যেহেতু, আর ও ত’র সাক্ষী করে মন্ত্র পড়েছিল কেন?”

তখন—“তোমার বাবা তোমার ভায় আমার বাবার বাড়ি চাপাইতে চাইলেন এবং তার কতিপুত্রপুত্রপ হাজার বানেক টাকা দিতে রাজী হলেন। এই বৈবাহিক পেন-মেনের মন্ত্র দরকার ছিল আমার-বর-সাজা ও মন্ত্র পড়া। কোন দিনই ত’ তোমাকে দ্বী ব’ল গ্রহণ করিনি।”

মন্দিরকার অপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হ’য়ে উঠল,—“দৌকোর

ঐতর্য্যতা ও নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা থাকে, তোমার 'তাও নেই :.....সবই না হয় মানলাম—আমি তোমার সন্তানের জননী না?—স্বী-ই যদি না। হই, তবে সন্তানের জননী করলে কেন?"

তখন—"যেখ মণিকা, সন্তানের জননী হলেই স্বী হ'ব না। :.....স্বামী স্বী না হলেও, নর-নারীর বাড়িচারের সন্তান হতে পারে। এও আমার ও তোমার বাড়িচারের , সন্তান.....।"

মণিকা হঠাৎ রেগে তপনের গালে এক চাপড় মেরে তপনের গায়ের উপর বুকে পড়ল এবং গোঁ গোঁ লম্ব করতে করতে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

পরদিন ভোর বেলা, থোকাকে কোলে করে সে তপনের সামনে এসে দাঁড়াল, কপালের সিন্দুর চিহ্ন সে ঘষে ঘষে তুলেছে; হাত একেবারে নিরাস্তত্ব—সংসার সন্মুখ চিহ্ন বেধে থেকে লোপ করেছে। সে বলল— "তোমার কাছ থেকে বিবাহ নিতে এসেছি। নারী

হলেও এতটুকু মান অপমান বোধ আমার আছে। এই একথরে আমি বাড়ি। এ বস্ত্রও আমি আমার বেহে রাখব না। এ বস্ত্র খুলে না ফেলা পর্যন্ত আমার বেহে জালা করছে। স্বীবনে তুমি স্বপ্নী হয়ে—এ প্রার্থনা এখনও করছি।"

সে বেরিয়ে বাড়িল। তখন তাকল—"মণিকা, তুমি চ'লে যাক্, তা হ'য়ত উভয়ের পক্ষেই ভাল। কিন্তু এমনি ভাবেই যাবে? অন্ততঃ কয়েকদিনের ধরতুর সংস্থান করে দিলে তোমার আশ্রয় হবে কি?"

মণিকা—"নিশ্চয়! বললাম ত"—এই কাপড়খানা আমার মেহের প্রতি রেমেদুপে রুশিক সংসারের জালা নিচ্ছে।—তোমার সঙ্গে এত বছর বাড়িচার করেছি—নারীর শেখ-অবলম্বন ত' জানাই আছে। আর কোন গতি না হয়—ঐ পর ত' খোলা আছে."

মণিকা থোকাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

ভাগীরথী কূলে

শ্রীতিমহী কর, ভারতী

সর্বপূজা সমাপ্তির শেষ মালাধারি
আমি 'আনিয়াছি' অধি! আন্বী জননী!
তোমার চরণ প্রান্তে ধীন আঘোজনে,
বন্দনা সভার পর্কে সর্বশেখ কণে।
তোমার মাহাত্ম্য গানে মুগ্ধ তপস্বীর
তোমার সৌন্দর্য্যগানে বিহ্বল কবির
ভরিল কালের পুষ্টি আনিকাল হ'তে,
বুগে বুগে পৃথিবীর নব যাত্রা পথে।
আমার বিহ্বল চিত্তে বৌদন্তার ভাষা
'আনিয়াছে' আলি এক করুণ মিজাসা।
তুমি যদি ধরতীর সর্বদুঃখ লাগি'
বহিছ শান্ত কাল সর্বদুঃখ তেদাগি'

পরম প্রেমের বার্তা বহিছা হুবহু
আম্ব হারাগোর মত কাণে কাণে ক'রে।
শুধু ঢলা সমুপেতে দেওয়া—শুধু দেওয়া,
বিন্দু প্রতীদান তরে ফিরে নাছি চাওয়া।
তোমার বিচিত্র ছন্দে রচিত যে গাথা,
অহেতুকি প্রেম সনে অগণ মিহত।
অগমিতাৎ যত উল্লেখ্যিণ্ডা শেষে
সর্ব কথ্য বিরতির চরম উদ্দেশে
অনাধি অনন্ত গানে অবিরত পাওয়া
নিঃশেষিছা আপনারে দেওয়া, শুধু দেওয়া!
উহার উমুক্ত বক প্রসারিত! অধি!
সর্বদেহ বিধা চীনা পূর্ণা শ্রীতিমহী!
প্রচারি' চলেছ নিত্য যে মায়ের বাণী
মাহু কি কূলে গেল তার সবখানি?

নেপোলিয়ান ও সপ্তম পোপ-পায়াস *

ঐতিহ্য

আনরা কটেইনবুতে ছিলেন, সম্রাটের অভিষেক কার্য সম্পন্ন করার জন্য এইবার পোপ এসে পৌঁছলেন, অধীর আগ্রহে সম্রাট নেপোলিয়ান পোপের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন, নেপোলিয়ান নিজে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করেন, এক দশেই সাতার দুই বিপরীত দিক দিয়ে তারা প্রবেশ করেন। আগন্তুক দুইতে যেন হয় ভ্রমের বোধ হয় কোনও ভুল রইল কিন্তু অভ্যর্থনার ব্যক্তি অস্বাভাবিক রীতি-বিহীন হইল। কোনও হুঁত তাতে ছিল না, সম্রাট যেন পোপের কাছে আত্মপতা স্বীকার করছেন না কিন্তু জোর করে রাজতন্ত্রি আদায় করবার চেষ্টাও করছেন না, রাজ প্রাসাদের বিকে গাড়ী অগ্রসর হতে থাকে, সম্রাটের ঘরে তখন আমি একা ছিলাম, ঘরের রোমান মোজেকের কাজ করা বিরাট টেবিলটির পাশে আমি ঠাড়িয়ে ছিলাম, নানারকম কাগজ পত্র টেবিল বোকাই, আমি প্রায়ই লক্ষ্য করছি যে সম্রাটের কাগজ পত্র দেখবার একটা নিয়ম অদ্বৈত ধরণ আছে—সুখখলা বা বিস্ময়কর কিছুই ছিল না; বহন স্তম্ভ বৈকি কাগজপত্র অন্যতর তখন দু'হাত দিয়ে টেবিলের দু'ধারে কিছু কাগজ পত্র ফেলে দিতেন, যে কয়েকখানা পাকত তাই শুধু দেখতেন।

সম্রাটের এই অদ্বৈত ধরণের কাজ আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়তাম, অল্পই করে কত দুঃ পরিবার সম্রাটকে বোধহয় চিঠি দিয়েছে, কত বিপদায় ও পিতৃমাতৃ-হীন বাগকের আত্মল আবেদন বোধহয় দেখা আছে এই সব চিঠিতে উৎসাহ ভরে সম্রাট সব পরদর্শিত কচ্ছেন, অথচ এরাই ভবিষ্যৎ জ্বালের ভাগ্য নিঃসরণ করবে হয়ত, শুধু একজনের খেয়ালের উপর এত লোকের ভাগ্য নির্ভর কচ্ছে! আমার মনে হয় এ অত্যন্ত, এ পাশ, শুধু একই অল্পকম্পা খেয়ালেই বোধহয় এরা জ্বালের বিখ্যাত নাগরিক হতে পারে হয়ত কবিবাসতে কেউ কেউ তার রাজ্যের দ্বন্দ্ব স্বত্বপণ হতে পারে। সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে আমার মন, কিন্তু এ বিদ্রোহ সবলো বিদ্রোহ নয়

জীতদানের পরকণ্ঠেই বিদ্রোহের আগুন নিজে গিয়ে নিভাণার ভরে উঠে আমার মন, কতগুলো চিঠি ও আবেদন পত্র আমি পড়ি, আর নেপোলিয়ানকে সম্রাট করবার জন্য বার্তা বৃত্ত বরণ করল তাঁরও কথা শুধু তাই, তাবের প্রত্যেকটি আবেদন স্থগার সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং সুখল মনের পর দিন কটিন হতে কটিনতর হতে থাকে। হঠাৎ এমন সময় সাম্রাজ্য জ্বালের পক্ষ সম্রাটের আগমন বার্তা ঘোষণা করে, সম্রাটের সময় এত অল্প এবং উনি এত কর্ম; যে আগমন বার্তা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাটকে দীর্ঘ পরকণ্ঠে আগতে রেখা যায় এক দৃষ্টও তিনি বিলম্ব করেন না, তার সঙ্গে ঠাটতে গিয়ে কর্মচারীরা পেন্সন পড়ে যায়, সাম্রাজ্য অভিযান করবার সময় পান না, ডাড়াডাড়ি দিচ্ছি বেয়ে উপরে উঠতে থাকেন, পোপকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে একাই প্রাসাদে প্রবেশ করেন, তার ছুতোর বই বই লব ক্রমে স্মৃতি হয়ে উঠে, ঘরে একটা অনেক দিনের পুরানো খাট ছিল তার পেছনের একটা বেগাল আলমারীতে আমি লুকিয়ে পড়ি, খাটটাও পর্পা দিয়ে ঢাকা ছিল।

উত্তেজিত অবস্থায় ঘরে ঢুকে সম্রাট পাচচারী আরম্ভ করেন, অধিষ্ঠিতাবে করেকবার ঘুরে কাচের জানাঘার কাছে গিয়ে আত্মল নিয়ে আখ্যাত কর্তে থাকেন, রাজপ্রাসাদের আধিনায় একটা গাড়ী প্রবেশ করে তাই দেখে কার্পেন্টের উপর সম্রাট করেকবার পদাঘাত করেন তারপর কড়ের মত ছুটে গিয়ে পোপকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দরজা খুলে গাড়ান, বিনা সম্মারোহে সপ্তম পোপ ঘরে প্রবেশ করেন, কিংবদন্তি নেপোলিয়ান দরজা বন্ধ করে গিলেন, ঘরের মধ্যে আমিই তৃতীয় ব্যক্তি সের্বস্ত অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। আমি রক্ত নিঃখালে দেখানে ঠাড়িয়ে তাবের প্রতিটি কথা শুনতে চেষ্টা করি।

পোপের দীর্ঘ বৈব, দুঃ লক্ষা বাচের, কপালের দাগ-জ্বলা অতীতের ক্রমবর্ধীত জীবনের পরিচায়ক, চোখ জুটো

কালো ও গভীর, শিশুর মত স্বন্দর ও সরল হাসি মুখে সব সময় লেগে আছে, মাথার চোটে একটা টুপী চারদিকে অপোর মত শাল চুলের গুচ্ছগুলো দেখা যায়, ঠাঁথ খেঁকে পা পূর্ণস্থ লাল ডেন্‌ডেটের জোকা পড়া, মনের গলকেপে তিনি প্রবেশ করেন তারপর একটা বড় রোমান চেয়ারে বসেন, চেয়ারে একটা ঈগল গোঁসাই করা আছে—সভ্যদের বক্তব্য শোনার ভঙ্গ তিনি প্রতীকী করতে থাকেন।

কি দুষ্ট : এখনও যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে, মাস্তুলটির প্রতিভা—আমি লক্ষ্য করিনি তার চরিত্র পৰ্যালোচনা করছিলাম—শেষ বয়সের মত কুসিৎ চেহারা তখন বোনাপার্টীয় হয় নি। তিনি তখন বাস্তবায়িত হননি ও বিজীতভাবে মোটা হয়ে যান নি, চিত্রে তার চেহারা এক বিরক্তভাবে ঝাঁকি হয় যে তার বশবরণগণও বোধ হয় চিনতে পারবেন না, তখন তিনি বেশ হুজী ছিলেন, একটু নরম প্রকৃতির কিন্তু কর্মঠ, দামাঙ্ক ব্যাপারে মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে পড়তেন এবং নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ করতেন।

পোপের চেয়ারের চারদিকে কতকগুলি দুরলেন অভিজ্ঞ নীকারীর মত চোখের দুই তাঁর ; হঠাৎ পোপের সামনে গিয়ে পাড়ালেন, পাড়ীতে হুঁকনের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল আবার তুঁ হুঁক করেন। “আবার আপনাকে বলছি হোলিকাদার !” “স্বাধীন চিন্তাধারা আমার নেই, ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত তর্ক করে কখনও তাবের সাথে আমি একমত হতে পারবো না—রিপাবলিকান বড়ুঁবের আপত্তি মধ্যেও আমি প্রত্যেক ধর্মমুগ্ধের বোণ দেখ।”

কক্ষভাবে শেবের কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করেন। পোপের কাছে কি চাইকারের প্রশংসা ব্যাক্যের মত এই কথাগুলো লাগছে ? হঠাৎ খেমে পড়েন নেপোলিয়াম। পোপের মুখের ভাব পূর্ণবেশ্য করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৃদ্ধ পোপের দুই ধরের কার্পেটের দিকে নিবন্ধ, চেয়ারের ঈগল পায়ীর ঈগল হাতুখান ভ্রুত নিরিকার তার মুখ, যেন তিনি বলতে চান—“এই সব অগণিত কথা আমি শুনেছি। চাই বা—”

বোনাপার্ট দলের ভিতর আরও করেকবার পাথচারী করেন। পোপের এই ব্যবহারে তিনি সম্মত হন নি, হঠাৎ এইভাবে পৰ্যালোচনার ভঙ্গ তিনি লক্ষিত হন, মাঝে মাঝে তাঁর মুখের দিকে তিনি তাকান কিন্তু তাঁর চোখের সামনে গিয়ে পাড়ালে তিনি যেন শাহস পান না,— “একটা ব্যাপারে আমি মনে বড় আঘাত পাই হোলী কাদার !” কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলতে থাকেন “Concordat-এর অভিযোজ্ঞে আপনি যেভাবে সম্মতি দিয়েছেন আমার বেলায় ঠিক সেই ভাবে দেন নি, আপনি যেন বেজায় আসেন নি বাধ্য হয়ে এসেছেন, এখানে আমার মস্ত নিজেকে অপরাধী মনে কচ্ছেন, কিন্তু আপনি যা ভেবেছেন তা তুল, বলী আপনি নন, সত্যি আপনি স্বাধীন।” বৃহৎ হেসে সভ্যদের দিকে তাকান হোলী কাদার, বৃহতে পারেন যে তার আশ্বেশ মাস্ত করবার ব্যগ্রতা না দেখালে তার বৈয়াকারী মন তুল হয়ে না—

“আবার বলি আপনি স্বাধীন, আপনি হুঁচি চান তবে আপনি রোমে কিংবেতে পারেন, কেউ আপনাকে বাগা দেবে না।”

কোন উত্তর না দিয়ে বৃকে হুলানো ক্রশটির দিকে চেয়ে থাকেন।

“হোলী কাদার, আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে আপনার ওপর, তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনি একটু অসুস্থ, ক্রাণ আপনার মস্ত হা করেছে সব যেন আপনি অস্বীকার করতে চাইছেন, ভেনিসের মঙ্গীলতা আপনাকে যে পোপ নির্বাচন করেছেন সে শুধু আমার কথাতেই—

“অষ্ট্রিয়ারাসীরা আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্ব ব্যাপ্ত্য ব্যবহার করেছিল তখন আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম” উত্তরের অপেক্ষা করেন তিনি, পোপ শুধু একবার মাথা নাড়ল তারপর গভীর চিন্তার ময় হয়ে পড়েন, বোনাপার্ট একথানা চেয়ার পোপের চেয়ারের সামনে টেনে এনে তাতে বসেন, তারপর বলেন “ধর্মশাস্ত্র পড়বার সময় যদিও আবার কয় তবুও গীতার উপর আমার যে শ্রদ্ধা নেই তা নয়, বরঞ্চ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, অবশ্য ভলটেরার কিছুটা

কতি কবেছিল আপনি স্বীকার হলেই ভবিষ্যতে আমরা হুঁতনে নিলে অনেক বিরাট কাণ্ডমাধা করতে পারি।”

তার কণ্ঠে একটু তুহানলের হ্রস্ব স্ট্রেট ওঠে

“কেন যে প্যারিসে আপনি স্বাধিভাবে থাকতে চান না আমি কিছুতেই দ্বকতে পারি না, টুইলারীসের প্রাণে আপনার গুপ্ত চেত্রে বিচ্ছিন্ন আপনি কি জানেন না হোলী ফাফার, প্যারিসে স্বাক্ষর সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্ট স্বাক্ষর করেছে? যা আপনি অবশ্য করণে তাই আমি করব, লোকের মতটা বলে ততটা ব্যাখ্যা আমি সত্যি নই, কি চমৎকার হবে বলুন তো, হুঁতনে পরামর্শ করে আমরা রাজ্য চালাব আমি হবে আপনার সৈনিক। এক এক হুঁতন কর্তব্য হয়ে স্বাক্ষরদের স্তম্ভ আমি বাব আপনার কাছে।”

পাথরের মূর্তির মতই বলে আছেন পোপ, কোন চকলতা নেই তারপর ধীরে ধীরে আকাশের দিকে তাকান, দীর্ঘনিশ্বাস কেলে বৃহৎ কণ্ঠে বলেন,—

“কমেন্ডিগাতে”

আহত বাস্তবের মত চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেন নেপোলিয়ান, বার করেই বেকেতে পলায়িত করে ঘরঘর অস্ত্র উত্তেজিত করে ঘুরতে থাকেন, নীচের চৌকট্টা এতজোরে কানড়ে ধরেন যে রক্ত বেরিয়ে পড়ে, সমস্ত ঘর যেন কাঁপতে থাকে। “একটা দ্বর্ধটনার গুপ্ত আমি প্রস্তুত হই কিন্তু পোপের মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই, চৌকিবে বলে উঠেন নেপোলিয়ান—”

“কমেন্ডিগান! আমি কমেন্ডিগান! কিন্তু এমন কমেন্ডি আমি করব যে সাতোজীবন আপনাকে গুপ্ত কাঁপতে হবে, হ্যা—আমি কমেন্ডিগান! যদি চেয়ে থাকেন যে আনাকে অপমান করলে আপনার কোন শাস্তি হবে না তবে অস্ত্র তুল করেছেন, সারা পৃথিবী আমার রক্তনক অভিনেতা ও প্রবুর কৃমিক। অভিনয় করি আমি, আমিই আপনাদের কাউকে পোপ, কাউকে রাজা, কাউকে মন্ত্রী তৈরী করি, কিছু দিয়ে করি জানেন? গুপ্ত ভয় দেখিয়ে আনাকে প্রণাম বা দৃশ্য করবার বড় যোগ্যতা আমার নেই, আমি ইচ্ছা করলে আপনার এই পদমর্যাদা নষ্ট করে

দিতে পারি, সামান্য এক পরীক্ষাক হয়ে থাকতে হবে আপনাকে, আজ আমি যদি আপনাকে অভিমান না করতাম তাহলে শব্দে ক্রাণ আপনাকে বাধ করতে।”

কিছুক্ষণ খেমে আবার বলতে থাকেন,

“মাত্র চার বৎসর আগে দীপ্তবুরের নাম কেউ উচ্চারণ করতে সাহস পেত না, আমি জানতে চাই সেই অবস্থা স্বাক্ষর থাকলে কে আপনাকে ভক্তি করত? লুই দি সিঙ্কটিন্‌ এর মত দেশের স্বাধীনতা বিলিবে যেবার মত বোকা আমি নই, দেইকসই বোধ হয় আপনি অন্তর্ভুক্ত, আমি আপনাকে হুঁতনে গিবে মারতে পারি, পুঙ্খল নাচের মত আপনাকে যেখানে দেখানে নিয়ে যেতে পারি আপনার এই জীবী মতব্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ আমিই দিয়েছি আপনাকে, সোচ্চা কথা বলছি নিঃশব্দে কান আপনি করুন আমার ব্যাপারে আপনি ব্যস্ত হবেন না। হুঁত ভাঙেন আপনাকে আমার খুব প্রয়োজন। এই মেয়েদের পোষাক পরে নিঃশব্দে বোধ হয় গণমাধ্যম ভেবে গম্বিত হন, ওলব তড়ৎ দেখিয়ে আমাকে কীকি দিতে পারবেন না, এই সব ঢালোকী যদি আপনি না পরিভাগ করেন তাহলে Grand Vizier এর পোষাকের যা অবস্থা করেছিল চার্লস দি টুয়েলভ্‌, আমিও তাই করব, আমার এই ক্ষুভতার আঘাতে আপনার এই পোষাক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।”

সন্ধ্যার এই উগ্র মূর্তি ঘেঁষে আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে চায়, মুখ সামান্য একটু বাড়িয়ে পোপের মুখানা দেখি, হুঁত ভয়ে পোপের মৃত্যু হয়েছে।

সেই শব্দ সমাহিত ভাব কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না—আবার আকাশের দিকে চেয়ে বৃহৎ হেসে বলেন,—

“এক্সেইমিগাতে”

ঘরের অন্তপ্রান্তে একটা সার্বেলের চিমনীতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নেপোলিয়ান। স্বীকের মত ছুটে আসেন বৃহৎ পোপের দিকে, আমার মনে হল পোপকে বোধ হয় হত্যা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু মাঝপথে বেবে পড়েন হঠাৎ, টেবিলের উপর থেকে একটা ডাক্সনিয়ে

মাতীতে আছে ফেলে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলেন। তারপর টুকরোগুলোতে কচেকবার পদাঘাত করে অত্যন্ত শাস্ত হয়ে যান, আমি কিছুটা আশ্রয় হই উদ্ভেলনা অনেকটা শব্দে হয়েছিল, মাত্র দুটি কথাই পোপের বক্তৃতা সম্বন্ধে আছে উল্লেখিত হয়েছে গভীর গলায় তিনি বলেন শুধু—

“জীবন জীবন” তারপর অঙ্গের চিন্তাধারার মধ্যে হাঠিৎ ফেললেন নিঃশব্দে। চূপচাপ বলে শুধু টুপীর একমিহুটা টেনে ছিড়তে থাকেন আপনি মনেই বলেন,—

“সত্যি ট্রাজেডি কি কমেডি জানি না কিন্তু অভিনয় আমাকে করে বেতেই হয়। কত পোষাকে আমাকে সাজতে হয়, কত ভরিমাই না আমাকে করতে হয়, কি যে বিরক্তিকর। শুধু ভরিমা আর ভরিমা কখনও মূখের সবটা দেখাই, কখনও কিছুটা দেখাই শুধু নিচের বাঁধ সিঁড়ির জন্ত। জনসাধারণের প্রাচুর্যে দিনরাত ওদের বকনা করছি, ওরা বোঝে না ভাই মূর্খের মত আমাকে প্রমোদ করে। রাষ্ট্রকৌর্য জাকজমক বেশিবে ওদের চমক লাগাই। জানি ওদের সম্রাট আমি, ভয় আর আশার মাঝে ওদের রেখে দিয়েছি। কিন্তু কি যে করব ওদের নিয়ে বৃত্তে পারি না আমি। হোলী কাদার! এটাই চরম সত্য, দিনের পর দিন একই গ্রন্থন আমাকে করে যেতে হয় জীবন আমার অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, মাকে মাকে মরে যেতে ইচ্ছে করে। চূপচাপ বললে কি করব ভেবে আমি অস্থির হয়ে উঠি। আমাকে শুধু চলতে হয় আর চালাতে হয়, প্রতিদিন কত কলন। আমার মাথাও জমা হয়। বক্তৃতা আমি করতে চাই চল্লিশজন সম্রাট ও তা শেষ করতে পারবে না আমি বুঝি, কিন্তু তবুও আমার কলনার শেষ নেই জুখ এই আমার কাজ শেষ হবার আগেই আমি নিঃশেষ হয়ে যাব। সারা পৃথিবীকে এক বস্তুর ইচ্ছা বোধহয় অসম্পূর্ণই থাকবে। আমি বার্ষনিক নই, নানারকম তথ্য আমি বুঝি না কিন্তু বুঝি যে এই বস্তুর কালের জীবনে বিশ্রামের অবকাশ নেই। কিছু মনে হলোই আমি সেটা করতে চাই। ততকাং হলো অভিযান শুনি তা না হলে অভিযান আমার ভাগ্যে ঝোটে। শেষের সমস্ত মতবাদকে ছেঁড় করে, চেপে

রাশি আমি এবং বর্তমান বীচন ততদিন আমাকে করতেই হবে, কারণ সকল ইচ্ছাই আমার জীবনের ব্রত, আমাকে যে গীতেই হবে, রোগ মৃত্যু থেকে উঠি আর এক মহাকাব্য রচনা করি আমি।”

আবার তিনি ঘরঘর ঘুরতে থাকেন। সম্রাটের মূখ্যের আর নেই, আমি দেখছি মানুষ নেপোলিয়ানকে, সহস্র সরল মানুষ নেপোলিয়ান। কোন ভরিমাই তাকে করতে হয় না। তারপর পোপের সামনে বসে বলতে থাকেন—

“জমাই মানুষের ভাগ্যনির্ধারণ করে হোলী কাদার! দ্বিত্বের ঘরে ঘাঘের জন্ম হয় তারা স্বভাবতঃ হয় বেগমোহা তাদের ভিতর কেউ করে জীবনে উন্নতি, কেউ করে আঘাত। আমার মত ব্যক্তি করতে পারে তারা সাধা বেগে তুমুল আবেগলন করতে পারে, যা ইচ্ছে হয়েছে তাই করছি ব্যক্তি আমাকে বাধা দিয়েছে তাদের নির্দয়ভাবে অপসারণ করছি, কিন্তু আর আমি কি করব, খিয়ে গেলে শোকে খাব কিন্তু আবার ক্ষুধার যে ভূর্ণি নেই, ভানেন হোলী কাদার। টুপনে থাকার সময় সৈনিকের একটা সামান্য পোষাক কেনবার সামর্থ্য আমার ছিল না। তার উপর মা আর ভাই বোনদের প্রতিপালনের ভার আমার উপর পড়েছিল, বুড়ো নোটারীর আপত্তি সবেও ভোসেদিন আমাকে দিয়ে করেছিল, কেন আপত্তি করব না বলেন তো? একটা টুপী আর একটা জামা ছাড়াও আমার কিছুই ছিল না কিন্তু আজকে লে রাগী আমার সঙ্গেই বার অভিযেক হবে; কিন্তু রাগমুহূর্ত রাজপ্রাসাদ এত আমার জন্ত নয়। রাবার পোষাকে আমাকে অভিনয় করতে হবে, হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্ত রাজপোষাক পরব তারপর হুড়ে ফেলব সেব আবার সৈনিকের পোষাক পরে বোড়ায় চড়ব। সারাটা জীবন বোড়ায় পিঠে কাটবে, একটা দিনও গাব না বিশ্রামের জন্ত। বিপদের সামনে না গেলে দ্বির থাকতে পারি না আমি। আমার জীবনকে কি কেউ ঈর্ষা করতে পারে।” কিছুক্ষণ থেমে আবার বলতে থাকেন—

“পৃথিবীতে দুই প্রেমীর মানুষ আছে হোলী কাদার!

হাদের আছে আর হারা লাভ করে। হাদের আছে তারা শুধু বিজ্ঞান করে, আর হারা লাভ করে তারা হয় দুঃখ, বিশ্রাম তাদের ভর্য নয়।”

পোপের মূখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে আবার বলতে শুরু করেন :

“কত বকম কাজ বে পোপের করতে হয়—কিন্তু আমার কাজ শুধু দুঃখক্ষেত্র, মাত্র পরমিশ বছর বয়সে আঠারোটি দুঃখ আমি করেছি—আর সবগুলিতেই জমী হয়েছি, জয়ের দৃশ্য আমাকে পেতেই হবে। সে তুলনায় সিংহাসন বোধ হয় খুব সুখাবান নয়, ক্রাসের রাজবংশ আমিষ্ট হৃদয় সই করতেছি কিন্তু তবুও ত আমি দুইটুকোড় ছাড়া কিছুই নয়, আপনার মতই অমোঘ ও নির্বাসন করেছে জন সাধারণ, শুধু এখানেই আমাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই” করমর্দনের গুচ্ছ হাত বাড়িয়ে দেন সম্রাট, গভীরভাবে করমর্দন করেন পোপ, আমি অবাক

হয়ে দেখি ভালে ভরে গিয়েছে পোপের দুই চোখ, পোপের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ের হাসিতে ভরে যায় নেপোলিয়ানের মুখ কিন্তু আমার চোখে সেই মহান পোপের কাছে নেপোলিয়ান অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়, অহমিকার আবরণে বিরাট ভিনিষও কত অতিক্রান্ত হয়ে যায় আমি শুধু ভাবি আর বিধানে মনটা করে যায়। এই লাক্ষ্যকারে লাভবান হলেন সম্রাট, কিছুই তাকে ত্যাগ করতে হল না। পোপের জ্বরের কোমল তন্ত্রীতে শুধু আঘাত করেই নেপোলিয়ান হলেন অধী।

শেষ কথা বলতে সম্রাট চেষ্টা করেন কিন্তু হঠাৎ হৃদয়ের বেগে সপথে পরাট খুলে চলে যান কথা তার অদম্যই থেকে যায়। হাবার সময় পোপকে অভিযান করলেন কি না যেমতে পেলাম না।

• Alfred De Vigny Napoleon and pope pius the VII
গল্পের অসুখ্য।

নগজোয়ান

ঐক্যবোধ চৌকুরী

(এ) স্বাধীন দেশের স্বাধীন নগজোয়ান !

আগিরা পাড়ার আগি পুরোভাগে

দেখি কে আস কে কাহার আগে

রেখনাক কেহ পছোচ যনে, রেখনাক অভিমান।

এস স্বাধীন দেশের স্বাধীন নগজোয়ান !

(ঐ) দিকে দিকে শোন মুক্তি ডমরুধনি।

সবে বহু-মুহুরিতে ধরে বেধ হাতিয়ার।

সব ভেসে মিও হয় যদি অবিচার।

আকাশে-বাতাসে যেন শোনা যায় অজানা শব্দধনি।

দিকে দিকে শোন মুক্তি ডমরুধনি।

মেল ঐশি আজ যুবকযুগ হও সবে আগুয়ান।

লাজ সবে বীর বোঝার সাথে।

মহর ব্যত ঐ শোন ব্যত।

হরোনাক কেহ কবিরের তরে হরোনাক যুজমান।

তাই বলি বীর মেল ঐশি আজ হও সবে আগুয়ান।

মূরে পাড়াইয়া মুনতেছে জাল ইংরেজ শব্দমান।

বিদ্যাস কেহ কোরনাক তরে ;

(ধি) তিক্তক শাখি আসে তব ঘরে,

যনে রেখ শুধু অতীত কাহিনী অতীতের অভিমান।

(শোন) বাকসের কাছে এস নাক তুমি ইংরেজ শব্দমান।

একটি শরৎ সন্ধ্যা *

শ্রীসমর সোম

(অনুবাদ)

সেই একটি শরতের সন্ধ্যা।

জীবনে এমন অসুখিণা এমন অকৃষ্ণি আর বৃত্তি কখনো আসে নি। পকেটে একটি পরলা নেই, সারা শহরে এমন একটু আশ্রয় নেই যেখানে গিয়ে মাথাটা অন্ততঃ গুঁজে পাবি। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা, কাকেই বা চিনব!

পরের চলনসই জামাকাপড় রেখে বাকী সব বিক্রী করেই প্রথম কিছুমিনি কাটলো। শহর ছেড়ে এগিয়ে চলি পাশেরই এক গ্রামের দিকে। নাম হোল তার 'আমটাই।' বালাসীঘের মত এক আচ্ছাদিত দেখানে। বাগিচা, জাহাঙ্গির বাতায়নে কোলাহলমুখর এই 'আমটাই'। অক্টোবরের শেষ ক'টি দিন কিছু নিশ্চয়... জনহীন। চলেছি এগিয়ে। পাড়ের তলায় দিক্ত বাগুয়াশি। আশপাশ দেখতে দেখতে চলি। কোথাও কি একটুকরো ধাবার পড়ে নেই? শূন্য বাড়ী আর শোকানে শোকানে ঘুরে বেড়াই।' মনে হয় পেটচরা থাকলে শান্তি কত গভীর...কত অপূর্ণ হতে পারে। বর্তমান সভ্যতা। মাহুকের মুখে অন্ন দিয়ে তার সৈনিক স্বেচ্ছায় নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি। আশ্রয় স্থা নিশ্চিহ্ন উপাধানই সে দিতে পেরেছে। পথ চলতে চোখে পড়ে সুবাস প্রসাধন.....। স্থাপত্য, স্থা, বিজ্ঞান, আরো কত তত্ত্ব, কত স্বপ্নচিন্তাই না জাগিয়ে তোলে। কায়দা-দুরন্ত শাখ শোবাকে যেতে চলেছে পথচারী। সভ্য এরা! আশ্বাসের এড়িয়ে হাওয়ার ভবীটিও তাই বিশেষ ধরণের। দেখতে চারনা কতকগুলি বিধায়িত্তি জীবনের অস্তিত্ব।

নাঃ.....ঠিকই! বৃদ্ধ জীবনে আশ্রয় বিস্তার আছে.....বৃদ্ধি আছে। সন্ধ্যা আসছে বনিরে। শোনা দায় বৃষ্টির একটানা সংগীত। থেকে থেকে উত্তরে বাতাসের কাপটা এসে লাগে। শূন্য শোকান ঘর আর জোহনাগের অবলম্বন জানাশার তাই করাবাত বেয়ে ওঠে, ফুল ফুলে ওঠে নদী। ভেঙ্গে পড়ে ভীষণ

বাসুবাণির উপর তরঙ্গের পর তরঙ্গ সশব্দে। কাছে আসে...ফিরে ঘাব ঘুরে...ঈশনিধে পড়ে পরম্পরের উপর। মনে হয় পেয়েছে সে আসন্ন শৈতের ইংগিত। 'মাঝ রায়েই হবতো। উত্তরে হাওয়া বাগবে নদীকে তুমারের নিঃসৃত বাগবে। তাইতো তার ভগ্ন...মুক্তির এই উপান্ত কাননা। বিষয় আকাশটাও ঘেন ফুলে পড়বে এবার। একটানা চলেছে বৃষ্টির কবেরানি। ভেঙ্গে পড়া হতস্ত্রী ছুটি 'উইলো' পাছের তলায় পড়ে একটি উল্টানো নৌকা। সব মিলে মিলে গড়ে উঠেছে প্রকৃতির ভয় বেদনার এক সঙ্কলন মাথা।

তলাভাঙ্গা একটি নৌকা.....মাঠা হয়; বৃদ্ধ এক উইলো পাছ শিউরে শিউরে উঠছে ঠাণ্ডা হাওয়ায়। ধ্বংস...অনুর্বত্তা...বৃত্তার উপর আকাশের অপ্রাপ্ত আবিষ্কল করেই চলেছে। চারপাশে আমার বিধায় আর অপচার।

এই বৃত্তা কাতর সন্ধ্যার বৃত্তি জীবনের স্মৃতি নিয়ে একমাত্র আমিই বসে থাকবো। তারপর বৃত্তার ওই ব্যগ্র আলিঙ্গনে আমাকেও ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলবে।

বেদিন আমার বয়স মাত্র সাতসো বছর। সম্রাটের জীবন অগ্নিনিবার মত জ্যোতিঃস্বর।

ঠাণ্ডা বাণির উপর দিয়ে হেঁটেই চলেছি। প্রচণ্ড সূর্য্য মোচর মিছে। হঠাৎ জোহনাগেরওলিতে ধাবারের সন্ধ্যানে বুঝা ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ল কিছু। কে ঘেন বসে আছে গুঁড়ি ঘেরে। পোষাক দেখে মনে হয় বীর্ষোৎসাহ। বৃষ্টি ভেজা পোষাক ফুলে পড়া কাঁধ ছুঁতে চোখে বসেছে। পিছন থেকে দেখতে চোটা করি কি করছে সে। জু'হাতে বাগি খুঁড়ে চলেছে। ঢুকবে কোন জোহনাগের।

"কি বাপার?" অমনি ভাবে গুঁড়িঘেরে বসে বিজ্ঞাপা করি তাকে। অসুখ এক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সে ঠাড়িয়ে ওঠে। বিপাক আয়ত ছুটি চোখে তার দূসর দৃষ্টি। ভয় লেগানে ছমটা বাপ।

আমারই বয়সী একটি ঘের। সারা মুখভীতে এক অসুখ আকর্ষণ মাধানো। ভিনটি ক্ষতের দাগ কিন্তু

উচ্চ আত্মপ্রকাশে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছে সব আত্মবোধ, সব শৌন্দর্য। তবু এই ক্ষতের লাগ তিনটি ভেদন নিখুঁত এক মমতার স্বীকা। ভূটি চোখের নীচে আর একটি কপালের উপর লম্বাভাবে টান। দেখলে মনে হয় এই লাগগুলি যে টেনেছে তার হাতখানি বেশ পাকা। মাছের মূণে লাগ টানার ব্যবস্থা তার অনেকদিনের।

যেহেঁচো এখনও চেয়ে আছে আমার দিকে। তার চুইতে আর ভয় নেই। হাতের বালি কেড়ে কেলে মৃত্তির কলালখানা মাথায় ভড়িয়ে নেব ভাগ্যে করে। ঝাঁপ ভূটিকে টান করে বলে—“ভূমি ও খাবার খুঁজে বেড়াছ না? খুঁজতে থাকো সেখি!—আমার হুঁহাত রান্না হয়ে এসেছে।” এখানে, ভোক্তাশ্রমালয়ের দিকে দেখায়, “নিশ্চয় ভুটি আছে। আতো এগা খেচা কেনা বন্ধ করেনি।”

আমিও বালি খুঁজতে বসি। কয়েকটি মুহূর্ত হাত—…… আবার সে দেখে, তারপর আমারই পাশে আমারই মত বালি খুঁজে চলে।

নিঃশব্দে কাছ এগোচ্ছে আমাদের। ভ্রমিভ্রমাল কোঠা, নীতিবাস, অধিকারবাস কোন কিছু সে সময় মনে জেগেছিল কিনা বলতে পারি না। তাই বা কেন?—অলংকারে নির্ভীকভাবে সত্য কথাই বলব—এসব কিছুই মনে পড়েনি। মনে হয়েছে শুধু একটি বাহ্য কথা—কি পারো আনগা ভোক্তাশ্রমালয়ের মধ্যে?

সত্য মত গাঢ় হয়—চারিদিক থেকে ঠাণ্ডা সৈতে সৈতে অস্বাভাবিক অন্ধকার আমাদের ঘিরে কেলে। তেউরের গর্জন কেমন জড়ানো জড়ানো শোনায়। বৃষ্টির কোটালি শব্দ ভূমিছে ভোক্তাশ্রমালয়ের ছায়ে। বাতালে রাত্রির গ্রহগীর চিৎকার।……প্রতিধ্বনি।

“শেষ পর্বত মেঝেতে গিয়ে ঠেকবে না তো?” প্রশ্ন করে আমার সাহায্যকারিনী। গলে আগছে তার ঘর—এত বৃষ্টি। বৃষ্টিতে না পেরে কোন জায়গা মিসে পারি না।

আবার সেই স্বর—“বলছিলাম—শেষ পর্বত মেঝেতে

গিয়ে ঠেকবে না তো! তাহলে? সব পরিণত আমাদের বার্ষিক হবে? আজ্ঞা, যদি দেখি ভাড়াযেও সব সাফানো হয়েছে তাহলেই বা সহ্যবো কি করে? এক কাজ কর। দেখছো তো ভালোটা? ভেঙ্গে কেলে হাও গুটা। হাতা নায়ে হাত ভালো।……দেখনা গুটা করে!”

মেয়েদের কাছ থেকে সংপর্কার্ণ একান্ত দুর্গত বলেই গারগা ছিল দেখা যাচ্ছে সেটা ষ্টিক লতিয়ায়।

ভালোটা কড়া সমেত দুটো টেনে আনি।

লাপের মত হাসি হৈলে চৌকোনা ভোক্তাশ্রমালয়ের ভিতর সে নেমে লাড়ায়। বলে—“বাহারের বটে!”

মেয়েদের প্রশংসা-লাভ, অতি দাম্যস্ত পেলো চুইতে ভরে ওঠে সারা মন। নিপুণ বক্তৃতায় যদি কোন পুঙ্খ অতি জানায় তাহলেও বোধ হয় এত খুশি হই না। কিন্তু আভ্যন্তর মত সমাহার তো সেখান আমার ছিল না। কোন রেখা পড়ে না মেয়েটির কথায়। সংক্ষেপে প্রশ্ন করি—“কিছু পেলো?” নিঃস্বের বক্তৃতায় এক অসীম উদ্বেগ!

‘এক ঘরে একটানা’ ঘরে সে বলতে থাকে—“এক ছুড়ি বোতল, বালি বোলা, একটা ছাতা……” তার এক একটা আবিষ্কার।

কি হবে এ সব। অবসর হয়ে আসে এতঅধিকার সকল আশা।

হঠাৎ সে চীৎকার করে ওঠে।

কাপতে থাকে দিরাট উত্তেজনা—“এই যে……পেয়েছি……পেয়েছি এবার!”

—“কি?”

—“আরে কটি! একখানা আত্মকটি; কেবল ডিঙ্গে গেছে যা। তাতে কি! নাও……নাও না!”

একখানা আত্ম কটি! তুলে নিই। এক টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে চিনুতে থাকি।

—“বাঃ আমার মেবে না?……কিন্তু যেতে ও তো হয় এখন থেকে এবার। কোথায় যাই বলতো?”

শব্দ মুখের অন্ধকারের চারিদিকে বৃষ্টির গুটি আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়।

—“ওই যে একটা উটানো নৌকা রয়েছে! বাবে ওখানে?”

—“বেশ তো; চলো!”

এগুতে থাকি আমরা। লুঠ করা কটপানি টুকরো টুকরো করে মুখে কেলেতে থাকি। বৃষ্টি নেবেছে মূল-ধারে। কি ক্ষুধা গর্জন নদীর। বহু ঘুরে টেনে টেনে একটা গানী বেছে চলেছে। বিজ্ঞপের শব্দ শ্রোত...। মনে হয় কোন হৃদয় দৈত্য আত্ম ভোগে উঠেছে। তার চাপা নিঃশ্বাসের বিবে অর্ধরিত হবে নারা পৃথিবী...এই বিস্ত শব্দ সন্ধ্যা...আর আমার দুটি প্রাণী।

বাণীর শব্দে দারা প্রাণ কেমন যেন মোড়কু যিতে থাকে। ভবুও কটির টুকরো চিবুই লোভাভুরের মত। আমার ঝা পাশে মেয়েটি আগছিল; চেয়ে দেখি তার মুখেচোখেও সেই কটির লাগলা।

আনিয়া কেন হঠাৎ তাকে সিজাসা করে বললাম,—
“তোমার নাম কি?”

—“নাটানা;” শব্দ করে চিবুতে চিবুতে সে অগাধ দেয়।

দেখি তাকে ছুঁচোখ ভরে। মনে হয় ভেঙ্গে পড়ব বেননার। সামনে শুধু অতল অন্ধকার। ওদিকে চাইতেই দেখি ভাগ্যের বিজপ-বিকৃত হাসি। অশ্লষ্ট... প্রাণহীন হাসি।

• • • • •

নৌকার উপর বৃষ্টির ফোটা অশ্রুভায়ে ঝরে পড়ে। যুদ্ধ মধুর শব্দে হৃৎকের কত কত চিত্তাই না ভীড় করে। বাতাসের ক্রন্দন-মুখর নৌকার জীর্ণ খোল। অর্ধ মংলায় একটুকরো কাঠ কেঁপে শব্দ তোলে। উৎসেগ আর বেননার গড়া তার হুহ। পারে আছড়ে পড়ে একটির পর একটি চেউ—একঘেরে নৈরাশ্রমর শব্দে। কোন অসহনীয় অতৃপ্তিকর বেননার মর্মশাশী নীথাই না তারা গাইতে বসেছে আত্ম। স্রাতি তাদের অন্ধ কোড়া; মুক্তি তার মুখের এই বন্ধন থেকে। কি শ্লষ্ট উক্তি এই বেননার! চেউয়ের সর্জন আর বৃষ্টির শব্দ একাকার আঁধা। আমাদের উটানো নৌকাগানির উপর ভেঙ্গে

ভেঙ্গে পেছাচ্ছে ধবধব শীর্ণশাস। রৌহতপ্ত গ্রীষ্ম আর শরতের ঠাণ্ডা কুখ্যাতাকা। অশ্রুহীন দিনগুলির দাওয়া আঘাত স্রাতি উৎপীড়িত তার মংগু শব্দ। নিষ্ঠল নদী তীরে বাতাসের কাণ্টা...কেনাধিত নদীর প্রবাহ...কত হৃৎকের গানই না তারা গেয়ে চলেছে...

নৌকার তলার আমাদের আশ্রয়টুকু খুব আমাদের ছিল না। সংকীর্ণ দেওঘরেতে ঘাটি—ভাঙা খোলের মধ্য দিয়ে ঝরে পরছিল বরকের মত ঠাণ্ডা ফোটা ফোটা বৃষ্টি...আগছিল বাতাসের কাণ্টা। হুপচাপ বসে পীতে কপেচিলাস আমি। মনে পড়ে খুব খুশিও পাচ্ছিল আমার। নৌকার একপাশে শিঠি দিয়ে বনের মত পোল হয়ে বসে নাটানা। খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে হুটি হাঁটু, চিবুক তাতে ঠেকানো। নদীর দিকে বিশাল আঘাত দুটি চোখ তুলে দেখছে নাটানা। আঘাতে বিবর্ণ মুখগানির উপর আরো বিশাল বেখাচ্ছে তাদের। শুক পাখানের মত সে বসে আছে। আমার কেমন যেন ভয় করতে থাকে। ইচ্ছা হয় তার সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু কি করে আরম্ভ করি তা আর মাথাং আসে না।

সেই কিছু প্রথম কথা বললে। “কী অভিশপ্ত জীবন!” শ্লষ্টভাবে সে ঘোষণা করে। কতক হয় গভীর শ্রেণা আর হৃদয় বিশ্রাম।

একে অভিযোগ বলা যায় না। খুব নির্বিকারভাবে কথা ক’টি বলে যাচ্ছে নাটানা। যেন বহু দিনকার চিত্তার পাওয়া সিদ্ধান্ত। আজ সেই লম্ব সত্যের ঘোষণা তার কর্তব্যের! পারি না একে অস্বীকার করতে। কি করে করব? নিষেকেই যে তাহলে অস্বীকার করা হবে! তাই হুপ করে বসে থাকি। নাটানাও বসে থাকে পাখানের মত; যেন দেখতেই পাচ্ছে না আমাদের...।

—“যদি প্রতিবাদ করতে পারতাম বলতে ধের আশ্রয় করে সে। এবার কর্তব্যর ‘মুহ;’ বৃষ্টি নিগূঢ় চেতনার ছায়া পড়েছে তার মনে। আর নাটানার কথার কোন অভিযোগ খুঁজে পাইনা। পরিকার বৃষ্টিতে পারি মানব জীবনের অতলাতে ভুব দিয়েছে সে, দাচাই

বরতে নিজের জীবনের কষ্ট পাথরে এই সিদ্ধান্তকে। সে যে তার জীবনের অনন্ত ব্যাধের মধ্যেও আপনাকে বঁকা করতে! প্রতিবাদ হাজা আর কি সে করতে পারে?

নাট্যশার সিঁতার স্বচ্ছতা যে আমার কতখানি দুর্বল করে দিবেছিল তা আত্ম বলে বোঝাতে পারব না। যদে হোল আব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেই বৃত্তি আমি চীৎকার করে কোঁস উঠবে! এই মেয়েটির সামনে কী বিলী ব্যাপারই না এতে ঘটবে। সে তো এখনো এক কোটা ডোলের হল ফেলেনি।

নাট্যশার সঙ্গে তাই কথা বলার চেষ্টা করি।

কি বলব ভাবতে ভাবতে বলে কেলি,—“এমন ভাবে কে মেরেছিল তোমার?”

—“এনি পানকার উপকার!”

—“কে সে?”

—“আমার ভালবাসার লোক,.....একজন কটিগালা!”

—“এনি ভাবে বৃত্তি প্রায়ই সে তোমার মারতো?”

—“মুখ খেয়ে নাভাল হয়ে এলেই মারতো—হঠাৎ সে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে বলতে থাকে তার নিজের জীবনের কথা, পানকার কথা, তাদের দু'জনকার পারস্পরিক স্বচ্ছের কথা।

সে ছিল পথের ঘেয়ে। আর পানকা ছিল একজন কটিগালা। তার লাল গৌক, তার হারমোনিকা বাজানোর রকমতা.....এমনি কত কথাই না শুনি। পানকার ঘোঁবন মত্ত ব্যবহার, নিখুঁত লাভ গোলাক কত ভালোই না লাগতো নাট্যশার। তার গারে পনেরো কবল সানের কোট আর দাবী বৃত্ত থাকতো পারে। এই সব কারণে দেখতে দেখতে আগে ভালবাসা, ব্যক্ত স্বস্তরকতা; পরিশেষে পানকাকেই সে নের জীবন সঙ্গী। তার এতদিনকার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ পানকা ক্রমশ: দিয়ে আসে ময়ের বোকারে; আর কিরে এসে নাট্যশার উপর উৎসাহিত চালায়। পরে সবচেয়ে নিদারুণ হোল স্বপন চোরের উপর অস্ত্র দেয়েয়ের নিয়ে সে আবেগে আত্মীয়

করতে লাগলো।—“কি বলা এতে আঘাত পাব না? আমি ওদের চেয়ে কোন অংশে ছোট নইতো! দেখলাম আমার বি'দিয়ে মারার চেষ্টাই লক্ষ্য ওয়। ঝাউয়েল! গত পরভুদিন বেড়াবার ছুটি নিয়ে ওর কাছে গেছি। গিয়ে কি দেখলাম জানো!—দুন্কা—দুন্কা ওর সঙ্গে বলে আছে! দুজনেই মাতাল। থাকতে না। গেরে বলে ফেললাম—‘ঝাউয়েল!.....প্রত্যাক!’ জনেই সে মারতে আরম্ভ করলে। লাগি ঘেয়ে ফেলে বের, আমার চুল ধরে টেনে তোলেন; আমার লাগি মারে। তাতেও কিছু আসে যায়নি আমার। কিন্তু সে আমার পরদের সমস্ত কিছু যে ছিঁড়ে ফেললে! কি করে গিন্নী মার কাছে হুঁব সেখান? আমার অ্যাক্ট.....এমন কি আমার মাথার ক্রমালবান গর্ভক টেনে নিলে! হাহ ভগবান! কি করব আমি! প্রজ্ঞার বেদনার হঠাৎ সে হুঁপিয়ে ওঠে।.....কতদে পরছে তার কঠোর.....”

বাতালের সর্জন তখনও ধামেনি। ক্রমাগতই আরো ঠাণ্ডা আরো তীব্র হয়ে ওঠে তার স্পর্শ। ঠকঠক করে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। নাট্যশাও কৈশে কৈশে ওঠে। খেঁবে আসে সে, আরো...আরো কাছে; অন্ধকারে হুঁঠে ওঠে তার জলন্ত দৃষ্টি।

—“কি অসং তোমরা পুরুষ মাংসের দল! তোমরা সবাই এমনি! আমার ইচ্ছে তোমাদের পানে বাড়িয়ে চলে যাই। যদি কেউ অভিযোগ করে তো তার মুখে খুঁধু দিই। অতি নীচ, অতি সুখশিত তোমরা! মুখে আছে মিথ্যা ভিত্তিবাদ। খুব গোপ ঘেনেছো ভাব দেখিয়ে সুহৃদের মত ল্যাক নাড়ো,—কিন্তু বেই একবার বোকার মত আমরা নিজেদের বিলিয়ে দিই অমনি সর্বনাশ আসে ঘনিবে। ছিবড়ের মত আশাঘের ফেলে দাও। নিষ্ঠাহীন.....চরিত্রহীন সব!”

কি প্রচণ্ড তার তির্যকার, কিন্তু কত দুর্বল! কই যখন কোথায় বিবেক কোথায় নাট্যশার এই চরিত্রহীনদের উপর? বিবধ বস্তর সঙ্গে বলার মূহে কোন ছিল নেই। আঘে আঘে একটানা মূহে সে বলে চলেছে, আচ্ছন্ন হয়ে আসছে আমার সমস্ত চেতনা। মূললিত ভাবায়ু রুচিত

সমস্ত প্রমাণ বহল মৈত্রাসনানী গ্রন্থ, সমস্ত বক্তৃতাক্ষেপ হার মানালে নাট্যশা। সমসাময়িক গ্রন্থতে অনেক পড়েছি, বক্তৃতাও কম শুনিনি! বুঝতে পারি আজ—শিল্পী হুগল নিপুণ বক্তৃতা বর্ণনার চেয়ে বাস্তবে বক্তৃতা পণ-ধারীর বেদনা কত কল্পন কত স্বাভাবিক।

আমার অবস্থা আরো ধারাপ হয়ে ওঠে। নাট্যশার কথাই বসত না হোক শীতে বসন্ত বেশী কাণ্ড হয়ে পড়ছিলাম। অফুটভাবে শব্দ করে উঠি; ধাতু ধাতু ঘরে বাঘ……। সেই মুহূর্তে আমার বেহে এসে ঠেকে হুঁশানি ঠাণ্ডা হাত। একখানি বাড়ে আর একখানি মুখের উপর। জনতে পাই হুটি কথা,—“কি হোল?” কত হৈর্ষ কত উষেণ কত বেহই না করে পড়ে! মনে হয় যে নাট্যশা এতক্ষণ সমস্ত পুঙ্খ আভিটাকে লম্পট বলে ঘোষণা করলে, যে নাট্যশা তাবের এই পৃথিবীর ভোগসব কেড়ে নিতে চায়—এ যেন সে নয়। আবার সে তাড়াতাড়ি বসতে থাকে—“কি হোল? খুব ঠাণ্ডা লাগছে? কাপছো—না? ভারী অফুট মাল্হুডো! পোঁচার মত শান্ত হয়ে এমিকে বসে আছ! বলনি কেন এতক্ষণ যে ঠাণ্ডায় কই হচ্ছে? এস…… শুয়ে পড়ি হ্যাঁ-হ্যাঁ কথা হয়ে……আমিও শুয়ে পড়ছি……অমনি করে। এইবার জড়িয়ে ধর হুঁহাতে আমায়……জোর করে……শক্ত করে! হয়েছে?……পরম লাগছে এবার? এই ভাবেই কাটিয়ে দেব রাতটু……!”

নাট্যশার উৎসাহে সাক্ষ্যায় বিশেষত্ব হয় পড়ি। জাপোর এক নির্মম রহস্ত লুকোনো ছিল আমার মস্তে! ভাবো একবার! মাল্হুডের ভবিষ্যৎ ভাবনার আমার সকল কথা এখন জুবে আছে; ভাবছি সমস্ত বাবহার পুনঃপ্রবর্তনীয় কথা,……জটিল এষের তত্ত্বগুলিতে জুবে আবিষ্কার করতে চাইছি লেখকেরও অজ্ঞানিত সত্য। সেইদিনগুলি ছিল আমার অন্তরায়ের লাগরণ কণ।

নিজেষ্টের শক্তির উৎস বারার জন্তে আগ্রাণ সংগ্রাহের দিন। আর সেই আনিকে কিনা একজন গণিকা তার কল্পন ক্ষুতবিকৃত বেহ—যা একদিন লালসার শিকার ছিল—তাই দিয়ে ঘিরে রাখল! এ জীবনে তার স্থান

কোথায়? তার সাহায্যটুকু আপনা হতে না এসে এমন কথা আমি ভাবতেও পারতাম না। মনে হয় এ সবই যেন শব্দ……অর্থহীন……নিষ্ফল শব্দ। তাই বা কি করে হয়……কোঁটা কোঁটা গুঁই এসে গায়ে পড়ছে……নারীর বুকের স্পর্শ পাচ্ছি নিজের বুকে। মস্তের গন্ধ মেশানো উত্তপ্ত নিঃশ্বাস এসে লাগছে যে লালসা মুখে; বাতাস গর্জন করে শুটে, পোমরাতে থাকে। নৌকার উপর বৃষ্টির শব্দ শোনা যায়:……তরঙ্গের পর তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়ছে……। আর আমরা? নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে আছি পরস্পর। শীতেও কাঁপছিলাম বইকি। প্রত্যেকটিই কঠোর সত্য; তবু মনে হয় এমন কুৎসিত শব্দ আর কোন মানুষ কখন দেখেনি।

নাট্যশার কথাগুলো মহাহুত্বতির আর্হিতার ভেঙ্গে আসে আমার কাণে। মেঘেরাই বৃষ্টি এমনভাবে বসতে পারে শুধু! তার সরল বহু মত কথাগুলিতে আমার মনে লাগে আন্তরনে হোওয়া। ধীরে ধীরে জ্বল উঠতে থাকি। অস্ত্রমলে ভেসে যায় হুটি চক্ষু! আমার হৃদয়ের এতদিনকার পুঞ্জিত সকল পাপ, সকল হুঁসলতা, সকল মলিনতা ধুয়ে যায়। সাধনা শেষ নাট্যশা,—“আর না……আর না বন্ধু! বুকেছি……বুকেছি সব। ভগবান আছেন……আবার সব ঠিক হয়ে যাবে……আবার জুনি কাউকে ফিরে পাবে……”

চুপে চুপে নাট্যশা ভরিয়ে দেয় আমায়। অলংকা……আতপ্ত চুপন! জীবনে এই প্রথম শেলমা নারীর চুপন। আর এরাই রইল অজুসনীয় হয়ে। পরে যা পেয়েছি, তার অস্ত্র মূল্য দিতে হয়েছে অনেক, ……কিন্তু বার্য তারা! কিছুই দিতে পারিনি আমায়।—“আর না! এবার চুপ করো জুনি! কাল যদি কোথাও না স্থান পাও? তবু কি! আমি আছি!” হৃদয়ের পৃথিবী থেকে তেনে আসে মধুর শুভনকনি।

প্রভাত পর্যন্ত আমায়ের আলিঙ্গন থাকে অটুট।

দিনের আলো দেখতে দেখতে হুটে ওঠে। নৌকার তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসি আমায়।

এগিয়ে চলি শহরের পথে। শহরে পৌছে বিহার
নিলাম পরম্পর যত্নের মত।

তার পর? আর তো কেউ কারো দেখা পেলো
না! দীর্ঘ ছ'মাস নাট্যগার ঝঞ্জে কত না হীন পরীতে
দূরে বেরিয়েছি, কিন্তু পাই নি সেই শরৎ রাত্রির
বন্ধুটিকে।

জানি না কতটা তাকে আশ্রয় দিয়েছে কি না! তবে

দুড়াতেই তার কল্যাণ। বিশ্রাম নিতে পারবে শান্তিতে!
আর যদি বেঁচে থাকে?—আজ্ঞা যেন তার শান্তি পায়!
প্রার্থনা করি কোন্‌দিন যেন না তার চেতনার আপন
অধঃপতনিত জীবনের ছায়া পড়ে। এতে শুধু পাবে অধ্যাত্ম
হৃৎ। টলে উঠবে জীবনের তিত্তি।.....

• (Gorky's 'One Autumn Evening' গায়ক রম্ভার অনুবাদ)

অমরত

লক্ষী দেবী

একদিন গৃহবীর খির-বক্ষে
আনিয়াছি নানি,
আবর্জন-বিবর্জন-ভাঙ্গা-গড়া-সাথে,
চিরস্থল-নিষ্কনের গঠন-ভাঙারে
কতজন এসেছিলো, কতজন গিয়াছে চলিয়া,
রেখে গেছে ধরণীর-অদীম-জাঁধার—
জনম ও জীবনের-কুড়ি-চিহ্নটুই,
উদ্ভাবনী-প্রতিভার সঠে-ইতিহাসে।
মানবের-জন্ম কোন দিন,—
বিকাশের যাত-প্রতিযাত,
প্রাকৃতিক-উন্নয়ন, তিলে-তিলে ধরণীর বুকে—
মানিয়াছে-নব-নব-জন্মের প্রেরণা।
নৃতনের-আবাহ-বিগ্ৰবে,
করে গেছে-ভেঙে গেছে বসত—
শিষ্টনের নবীন হৃদয়,
নামহীন আভিকার নাট্য-নিকেতনে।
এরি যাত্রে-ক'বে কোনদিন,
জান আর গবেষণা বিদ্যা,

পুরাতন ফেলে আসা—
পুণ্ড বাহা স্মৃতির-ভাঙারে,
নবীন প্রেরণা গর্ভে—
পুরাতন লভিবে জনম,
মানবের মনোময় ধামে।
আনিবে প্রসূতি পথ বাহি,
রুগ্মগত পরিবেশ মাথে,
অতীতের যথনিকা-ভেমি।
আভিকার বস্তু কিছু—
বিখ্যা কুলে ভরা,
অবিচার ব্যক্তির নামে অতিহিত,
সে-লক্ষ্যে পাথের করিয়া—
কোনদিন ধ্বংস হয়ে ছ'ব উপাদান,
শুধু হবে শাস্ত শাস্তনা,
আবার আনিবে কিরি মোরে,
গৃহবীর রক্ষক—
নবরূপে ভাবে,
মানবের উদ্ভাবনী স্বজন-প্রতিভা।

নেশা

শ্রীপুস্পরামী ঘোষ

বিহারে তখন মায়কত্রব্য নিবারণের আইন প্রণয়ন লইয়া খুব আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে; এগ্রিসের মাক্যামি কংগ্রেস পত্ৰসম্মেট আইনজারী করিলেন। কংগ্রেস বরাবরই এই বিবরণ লইয়া পত্ৰসম্মেটের ঘণ্টে নিশা ও সমালোচনা করিয়াছেন, হুতরাং কখনো হাতে পাইলেই যে তাঁহারা আইন প্রণয়নের দ্বারা ইহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিবেন সে কথা দিগ্ধিত ভুলোক মাত্রেই জানিতেন। মজুরেরাও যে একেবারে কিছু কিছু না জানিত তাহা নহে; তাহাদের ভিতর সর্দারগোছের লোকেরা কাণাখুয়ার ভনিয়াছিল যে গাঙ্গী মহারাজ ওলব পছন্দ করেন না, এবারে শ্রীই তাহাদের মন ছাড়িতে হইবে। কিন্তু সে কথা তাহারা তেমন পারে মাখে নাই, “সে যখন হবেক তখন হবেক, এখন ত থায়েলি”—এই ছিল তাহাদের মনোভাব। কংগ্রেস ঘণ্টে বিবেচনার সহিত কাজ করিতেছিলেন, গোড়াতেই খুব কঠোর নিয়ম জারী করা হয় নাই। প্রথমে কয়লাকুঠীর কয়েকটি বড় বড় কেম্বের মন বিক্রয় বন্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্বত্র বন্ধ করা হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছিল। তত্ত্বিয় আইন চালু করিবার বয় পূর্ব হইতেই বহুবিধ প্রচারকার্যের দ্বারা জনসাধারণকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং মজুরদের বড় বড় কেম্বের আইন কোনদিন হইতে কার্যকরী হইবে, সে কথা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আইন জারী হইবার ঠিক পূর্বদিনটি সন্ধ্যা অকলে একটি দেখিবার যত দিন। সন্ধ্যায় আপোপাশে ছোট বড় অলংকার কয়লাকুঠী একে অপরের প্রায় পা বৈশিষ্ট্য বহিয়াছে, এই এতগুলি কুঠীর অগাধ মজুরমহলে সেদিন কি ভীষণ চাকলা! এক দিকে মহোৎসাহে কংগ্রেসের প্রচার-কার্য চলিতেছে অপরদিকে মজুরিক্রেতাদের এই শেখরিন; তাহারা যে হুতটা পারে লাভের আশায় নানারূপ প্রলোভন দেখাইতেছে, অবশ্য প্রলোভনের বিশেষ

প্রলোভনও ছিলনা, মজুরদের লকলেই এমন কি অনেক শ্রীলোক ও বালকও এই অরণীর মিনে মহাকৃতিতে শের মজ্ঞান করিয়া লইতেছিলেন।

আইন জারী হওয়ার প্রথম দ্বাট্টা কাটিয়া গেলে মজুরদের ভিতর চাকলা এবং আন্দোলনও মনোভূত হইয়া আসিল। তাহারা এই নতুন ব্যবস্থার অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। অনেকে, বিশেষ করিয়া বেধে মজুরেরা এই আইনের প্রশংসাই করিতে লাগিল। আগে যেমন লোকগানটা হইত তাহাদেরই বেশী এখন তেমন লাভটাও হইতেছে তাহাদেরই বেশী। সপ্তাহের মধ্যে একটিনিবের মাত্র ছুটী তা সেদিনটাতোও মনের নেশায় চটল পুরুষেরা একত্রে হলা করিতে বাহির হইয়া পড়িত। তাহাদের ভাগ্যে একদিনের ভ্রমও পতি, পুত্র, পিতা বা সাতার লগ জুটিত না। তারপর মজুরীর পয়সা যখন পুরুষেরাই বেশীর ভাগ মনে উড়াইয়া দিত বুদ্ধি পরিবার-বর্গের ভ্রম আহার্যের ব্যবস্থা করিতে হইত তাহাদেরই, নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলিয়ার, উপরন্তু নেশাখোর মাতাল পুরুষেরা হাতে গালিগালাব ও মার খেয়ে ত ছিলই।

এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। রবিবারে রবিবারে কংগ্রেসের লোকেরা কুঠীতে কুঠীতে হাটে ঘাটে বক্তৃতা দিয়া বেড়াই, ল্যান্টার্ন লেকচার দেয়, মোটর গাড়ীতে গ্রামোফোন বাজাইয়া আনন্দ দিতে চেষ্টা করে শ্রমিকদের ভিতর কেহ কেহ এই সব হচ্চে মাতিয়া বেগ থাকে। তাহাদের নেশা ছিন্ন তাহারা দ্বাধ দূর এলাকায় যেখানে মন বন্ধ তখনও হয় নাই।

আমাদের কুঠীটি গ্রামোফনের ঠিক উপরেই অবস্থিত, এখানকার কুঠীর উপরেই গ্রামোফনের তীরে বি, এন, আর এর একটি ছোট টেনন হুবাযতি আর নবীপার হইয়া বি, এন, আর এরই বড় অংশন টেনন ভলুটী—যথেষ্ট কোম্পানীর একটি সেজু। নবীর এপারের এলাকায় মন বন্ধ হইয়াছে, ওপারে তখনও হয় নাই। এই হুবাগ লইয়া এই কুঠীর কয়েকজন মজুর প্রায় নিশ্চিন্তভাবেই নবী পার হইত। ইহারা নবীপার হইয়া ভলুটীতে দ্বাধ মনের নেশায়। লেখানে বাইয়া হত খুশী মন বাইলে

আইনে কিছু করিতে পারে না। তবে মনের বেগতল লইয়া আসা নিষিদ্ধ, আদালতই পুলিশের হাতে পড়িতে হয়। কুঠাতে ইতিমধ্যে অল্পতপ বটনা খটিয়াও গিয়াছে। কীর্তন বাউরী খুব হসিয়ার নোক সে গ্রাণই এক বেতল মন লুকাইয়া লইয়া আসিত। একদিন সে ধরা পড়িল। পুলিশ তাহাকে চালান মিল। তাহার খে আসিয়া বাবুদের নিকট সাদিয়া পড়িল। বাবুদের তথিরের ফলে সেবারে সে সামান্য ভরখানা সিংহাই রেহাই পাইল। এই ভজুতী ঘাওর গলের মধ্যে প্রধান ছিল অর্জুন বাউরী, বসল তার গ্রাণ চরিত্র, টালোহানদের সর্গার, সংসারে এক স্ত্রী ভিন্ন আর কেহই নাই। নেশাখোর এই অর্জুন একটু কাক শাইলেই ভজুতী লাইয়া নিজেতে মন খাইয়া আসিতই লুকাইয়া হীর ক্ষত্র কিছু লইয়া আসিতেও তুলিত না। হী সানিনীর তাহাতে আগন্তিত ছিলই না বরং খুশীই হইত খুব কিছু কীর্তন ধরা পড়িবার পর হইতে তাহার ভয় হইল—সে অর্জুনকে বারণ করিয়া মিল আর মন আনিতে। কিন্তু অর্জুন তাহার ভয়কে হাসিয়া উড়াইয়া দিত—সে কি কীর্তন ছোকরাও মত বেহুধ নাকি?

সেবার বরা একটু বেগী করিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু যখন আরম্ভ হইল দেখি করিবার কাকটুই যেন হুবে আসলে পুরাইয়া লইবার ক্ষত্র উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। মনে একবার গ্রাণ ১০ দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে বর্ণ চলিল;—পথঘাট সব পিচ্ছিল, দামোদরে এবল বস্তা, আর ইহারই মধ্যে চতুর্নিকের শত্রুক্ষেত্রগুলিতে পরনোংগায়ে আরম্ভ হইয়াছে ধাত্র রোপন।

হুীর কর্তৃপক্ষের অনেক বেহন করিয়া মজুরদের বিয়া কান করাইতে হইতেছে। অর্জুন টালোহানদের সর্গার, সে তাহার মলবল লইয়া বারদিন এই জলের মধ্যে খুব খাটিয়াছে, বখশিলও মিলিয়াছে প্রচুর। রবিবার আসিতেই সে এই কর্মিনের পরিভ্রমস্ত্রান্ত শরীরকে চাড়া করিয়া লইবার আশায় ভজুতী ছুটিল। তখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া কুটি পড়িতেছে, দামিনী তাহাকে সেদিন আর ভজুতী না লাইবার ক্ষত্র অনেক মিনতি করিল, পিচ্ছিল

পথ, নলীতে বস্তা, এমন দিনে কি কেহ ঘরের বাহির হয়?

দামিনীর এই আশঙ্কায় অর্জুন লুকোচুর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। শালতরু ভ্রাব বিশাল তাহার বেহ, বেহে অহবেহ ভ্রাব শক্তি—সে নাকি এই সামান্য জলকাবাকে ভরাইবে? দামিনীর কি মন্থিক বিকৃতি ঘটিয়াছে? দামিনী এই এবল অবজ্ঞাতকতরী দেখিয়া আশঙ্ক্য প্রকাশের ক্ষত্র দামিনী একটু মজুতিতই হইয়া গেল। দামিনীর হুহ, মলম বেহের প্রতি চাহিয়া গবে ও আনন্দে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। ভাবিল, লতাই উহার ক্ষত্র আশঙ্ক্যর বিশেষ প্রয়োজন নাই। অবস্ত যন যে তাহাতে সম্পূর্ণ মায় ছিল তাহা নহে, একটু খুঁতখুঁতানি রহিয়াই গেল। কিন্তু কয়েকদিনের অস্ত্রান্ত পরিভ্রমের পর নেদাখোর অর্জুনের নেদার পথে কোন বাধাই যে কার্যকরী হইবেনা সে কথা খুব ভাল করিয়া জানা ছিল বলিয়াই সে চূপ করিয়া রহিল, অর্জুন বাহির হইয়া পড়িল।

ময়ের মোকামেও সেদিন বিশেষ জীড় ছিল না, এপারের মোকামাই বিশেষ আসে নাই, ওপারের লগ্যাণ্ড খুবই কম। যে ছাত্রজন আসিয়াছিল, তাহারাও ঝুইই কিরিল। কিরিবার সময় তাহারা অর্জুনকেও তাহাদের সঙ্গে কিরিবার ক্ষত্র অনেক অহুগোণ করিয়াছিল, কিন্তু অর্জুন তাহাদের কথা গ্রাণ করে নাই একটু বিস্ত্রণের হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল, “বা কেনে না তোরা, আমি যাক্সি পবে, আমার লাগে তোদের ভাবতে হবেক নাই।”

জন্মে লজ্জার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, সেই টিপ্ টিপ্ কুটি এখনও ধামে নাই, মদের মোকামে অর্জুন ভিন্ন বিতীয় ধরিকার নাই, আর ধরিকারের আশাও নাই হুস্তিয়া মোকামী মোকাম বহু করিয়া ফেলিল, অগত্যা অর্জুনকেও উঠিতে হইল। দামিনীর ক্ষত্র এক বেতল মন লুকাইয়া লইয়া সে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে কিরিয়া চলিল।

ভজুতী রিমের নীচে তখন বর্বার দামোদর হুসিয়া

হুঁসিয়া গর্জন করিয়া ছুটিয়াছে। বঙ্গের মধ্যে দীর্ঘ ৮ মাসকাল তাহাকে প্রকৃতির অভ্যাচারে নির্বিধ সন্ন্যাসের মতই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়; বাকী ৪ মাস সে তাহার লোক বিস্তৃত দুর্ভাগ্য প্রতাপের লক্ষ্য অঙ্গুর রাখিবার জন্য আগ্রাণ চেষ্টা করে। নদী পারাবার একমাত্র পথ বি, এন, আর, এর অনন্তপ্রসার সেতুটি। মধ্যে রেলের লাইন, উত্তর পার্শ্বে লটীর্ণ পথ। নীচে প্রচণ্ড বায়োর কহবেগে বহিয়া চলিয়াছে, উপরে রেললাইনে কখন কোন গাড়ী আসিয়া পড়ে এই আশঙ্কায় লোকে অতি সতর্পণে পথ চলাচল করে। এইরূপ বিপদমূল পথ দিয়া চলিয়াছে উন্নত অর্জুন মনের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে। হামিনীর ভক্ত আনা মনের বোতলটি পূর্বের খুব সাবধানে বসনগ্রাসে জড়াইয়া রাখিয়া লইয়াছিল। অর্জুন অতিক্রম করিবার পর তাহার মনে হইল ঘুরে ঘুরে ইন্ডিনের শব্দ শোনা যাইতেছে;—এখনি বুঝি কোন গাড়ী আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে অতিরিক্ত সাবধান হইতে গিয়া হঠাৎ সে পা পিছলাইয়া নদীর তলে পড়িয়া গেল।

হামোমরের সেই ধূঁয়াবর্তন প্রচণ্ড তৎপরতায় আঘাতে আঘাতে অর্জুনের শাণ্ডকর স্তায় বিশাল সন্ন্যাস কণিকের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল।

এখিকে প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া রাজির প্রথম গ্রহণও যখন অতীত হইয়া গেল তখন উৎকণ্ঠিত হামিনী আর ঘরে ভিত্তিতে পারিল না। একটি বস্তা ভূতর্জি করিয়া মাথায় বিয়া কেরোসিনের মনোভাটি হাতে লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল অর্জুনের সন্ন্যাসার্থীর নিকট তাহার খোঁজ করিতে। বাহারা ভক্তী গিয়াছিল, তাহার সন্দেশই সন্ধ্যার পূর্বে করিয়া আসিয়াছে, অর্জুন তাহারে সহিত করে নাই—বলিয়াছিল কিছু বাধে কিরিনে; হয়ত খুব বেশা করিয়াছে, সেবে আর কিহিতে পারে নাই, ভক্তীতেই রহিয়া গিয়াছে, কাল সকালে কিরিনে—ভাবনার আর কি আছে সেজন্য? তা ছাড়া এই রাতে এমন কুঁজির মধ্যে খোঁজই বা করা যায় কোথায়?

অগত্যা হামিনী ঘরে ফিরিয়া আসিল কিন্তু তাহার মন উৎসেগে আপনকার অভ্যাস চকল হইয়া রহিল। অর্জুন ভক্তীতেই বিশ্বাস হইল না; বত বেশাই ককর বত রাহিই হটক সে তো ঠিক হামিনীর নিকট কিরিনা আসেই—এত কালের মধ্যে একদিনও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। হামিনীর মন কেবলই ‘হু’ গাহিতে লাগিল। লারা রাত এইরূপ ভাবে ভাবনার কাটা গেল। ভোরের দিকে এক সময় সে ঘের নিম্নের অজ্ঞাতেই ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল জানে না, হঠাৎ একটা গোলমালে হামিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া দেখে চারিদিক রোহে ভরিয়া গিয়াছে; দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত স্বর্গাভ উজ্জল রোহ। মেঘমুক্ত নির্দল আকাশে তরুণ তপনের উজ্জল দীপ্তি ঘের শুধুই আশা ও আনন্দের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছে। বড়নড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই কিছু গত্তরাত্তির কথা সব মনে পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেই চোখে পড়িল অনতিদূরে কতকগুলি লোক ঝটলা করিতেছে, যোথ হইল তাহার ঘের কি একটা বিষয় লইয়া খুব উত্তেজিত ভাবে তর্কবিতর্ক করিতেছে। হামিনী ছুটিয়া দেখানে গেল।

আজ সকালে দূর গ্রাম হইতে যে সব মালকাটারা আসিয়াছে তাহার নাকি বলিয়াছে মাইল ঘুরে হামোমরের বুকে একটি লোকের মৃতদেহ ডাঙ্গিয়া উঠিয়াছে, পুলিশে খবর দেওয়া হইয়াছে, লাশ তখনও সন্ধান হয় নাই। শুনিয়াই হামিনী আতনাম করিয়া উঠিল—একটি অজ্ঞাত আপনকার তাহার মন ভরিয়া উঠিল, সে ছুটিয়া চলিল হুঁসীর আগমনের দিকে, দেখানে ততক্ষণ পুলিশ আসিয়া ভয়ত আরম্ভ করিয়াছে। হুঁসীর কর্তৃপক্ষ ঘটনা শুনিয়া এবং গত্ত রাত্তিতে অর্জুনের অহুগণিতের কথা জানিয়া একটু চিন্তিত হইলেন; তাহার খাপের ওতামান ও অন্তর্ভুক্ত একজনকে পুলিশের সঙ্গে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিলেন। হামিনীকে ধরিয়া রাখিতে পারা গেল না, সে কাহারও কোন কথা শুনিল না ঘোর করিয়া তাহারে সঙ্গে চলিল।

ঘটনাস্থলে দেখা গেল হামিনীর তথ্যমূল অন্তরের

আশা অমূলক নহে, শব্দ অর্ছনেরই; বহুক্ষণ জলে
ভিষিয়া বিরূত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু তাহাতে দামিনীর
চিনিবার কোন বাধা হইল না। একটা দুকফাটা
আর্জন্য করিয়া সে অর্ছনের শব্দেদের উপর লুটাইয়া
পড়িল।

শব্দ পতীকার সময় দেখা গেল দামিনীর জন্ত আনা
সেই ঘরের বোতলটি তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে
ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু সেই ভাঙা বোতলের টুকরা-
গুলি তখনও অতি ঘরে তাহার বন্দনপ্রাণে বাধা
রহিয়াছে।

আসনে যাহারা আছে

ঐক্যের বোধন বন্ধ

আসনে যাহারা আছে তাহাদের পদ
দেখিব না কাজে—শুধু কাগজে হুন্স ?
বিরুদ্ধিই শুধু যদি দাগ পরিক্রান্তে
আলোচনা শেষ যদি পরিকল্পনাতে
তাতে কি বাঁচিব—শোকে কেহ কেহ বলে
পুরাণে জগৎপেঠ তোমাদের লগে।
বিলেপ্তরা নেই আশি—এ বেগেরি লোক
রামস্ব চালাও তবু কেন এ ছর্ভোগ ?
শৃঙ্খলিত ব্যবস্থার বাধীনতা লাগি'
বঙ্গ পরম্পরা যারা ছিল রাত আগি'
তাদের সন্তান আশ সব কিছু হারা
বাঁচিবার পথ কক, ঘীষন-সাহারা।

বিস্তারিত, কর্ণচ্যুত কেন এ দুর্গতি ?
দুঃখের রক্ত বিবে এই পরিণতি !
ভাড়াবার স্থান নেই—নাহি পাই খেতে
শিক্তপুত্রের ঘরে আশি নাচে শ্রোতে
গভীর দুর্ভোগে যারা ছাড়েনিধ' হাল
তা'রাই নাথিছে পথে হয়ে নায়েহাল !
ঐধার কাটিয়া গেছে—পেয়েছ কমতা
অবিচার তবু র'বে—র'বে নির্মমতা ?
অশোভন—যদি হবে বেহল—অধীর,
গভীর দারিদ্র্য হাতে—হাতে হবে বীর।
দাবী শুধু—দুঃখের দাগ পরিচয়
কথার সময় কোথা—কালের সময় !



হোমিগ্লি

শ্রীমৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আলোক দেখিয়া চন্দ্রবাবুর ভাল তো লাগিয়াছে। তিনি অনেক আশা করিয়াছেন তাহার উপর মনে মনে। তাহার কথার বার্তায়, ভাবে শুধীতে, মুখের চেহারা চোখের দৃষ্টিতে যে বাস্তবটির পরিচয় দৃষ্টিয়া উঠিতেছে তাহা তাহার কাছে বড় লোভনীয়, বড় বিচিত্র লাগিতেছে। ইহাকে লক্ষ্যরূপে, সহকর্মীরূপে পাওয়া কম কথা নয়। অথচ যে কিশোরটি এই স্থলে পড়িত তাহারই চরিত্রের পরিণত রূপ কাহনা করিতে গিয়া ঠিক যেন এমনিটিই কল্পনায় দেখিয়াছিলেন। তবু তাহার সমস্ত কিছুই এত অপরিচিত যে বড় আশ্চর্য লাগে।

গল্প করার পর সে নিজে হইতেই বলিল—আমাকে কোথায় পড়াতে হবে নিয়ে চলুন।

চন্দ্রবাবু বলিলেন—তুমি আশ্ব এসেছ। ক্রান্ত হয়ে আছ। আশ্ব থাক না। কাল থেকে আরম্ভ করবে।

—না মাস্টারশ্য, I am particularly anxious to begin my work to-day.

চন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—চল দেখি। তাহার উপর রুচিন দেখিয়া তাহাকে লইয়া উঠিলেন। চন্দ্রবাবুর পিছন পিছন সে অভিসের দি'ড়ি বাহিয়া স্থলের সামনের মাঠে নামিল।

হাঁতে হাঁতে চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি কি পড়াতে পারবে?

অশোক হাসিল, বলিল—সব পড়াতে হবে নাকি? সর্বনাশ! অল্প আমি কথাতো পারব না।

চন্দ্রবাবু তাহার ভয় দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পার্শ্ববর্তী তরুণটির তাকণ্যের স্পর্শ যেন তাহাকেও লাগিয়াছে। হাসি কমাইয়া বলিলেন—না, তোমাকে অল্প কথাতো হবে না।

সে যেন ধাপ ছাড়িয়া বলিল—তা ছাড়া আমি আপনাদের ইতিহাস, ইংরেজী, সংস্কৃত সব পড়াতে পারব।

আবার নদী ত্যাগজন্য বি. এ. ক্লাবের ছেলে পর্যন্ত পড়িয়েছি আমি।

চন্দ্রবাবু চকিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার চট করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তাহার কাঠ'ক্লাসে আসিয়া পড়িয়াছেন। অশোকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—অশোক তোমার বয়স কত হ'ল?

—তুড়ি।

—ক্লাস মানেজ করতে পারবে তো?

উত্তরে সে মুখে কিছু বলিল না কেবল মাথা নাড়িল। তাহাকে লইয়া চন্দ্রবাবু ক্লাসে ঢুকিলেন। ছেলেরা ক্লাসে মাটির না থাকায় হৈ চৈ করিতেছিল, চন্দ্রবাবুকে ও তাহার সঙ্গে একটি অপরিচিত হুন্সর দীর্ঘকাল তরুণকে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া চুপ করিল।

চন্দ্রবাবু অশোকের সঙ্গে ক্লাসের ছেলেরদের পরিচয় করাইয়া দিলেন,—ইনি তোমাদের নতুন মাস্টারশ্য হয়ে এসেছেন। তোমাদের এখন থেকে ইনিই টিউটরাল পড়াবেন। তোমাদের মধ্যে যারা এ ক্লাসের ছেলে আছ, বা যারা একেবারে নীচের ক্লাস থেকে এখানে পড়ে আসছে তারা আগে ঠেকে এখানে সেপে থাকবে। উনি এই স্থলের ছাত্র ছিলেন। এখন থেকেই পনের টাকা মাসারিশ নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হবে গেছেন। তারপর আই. এ.তে টেন্ডে হয়েছিলেন। বি. এ.তে দ্বিতী 'অনার্সে' ফাইনাল সেকেন্ড হয়েছেন। এখন তোমাদের মাস্টারশ্য হয়ে এসেছেন।

চন্দ্রবাবু যখন তাহার পরিচয় দিতে গিয়া তাহার গুণ বর্ণনা দিতেছিলেন তখন কথাগুলো শুনিয়া তাহার লজ্জা লাগে নাই, হাসি আসিতেছিল। যেন সে এ মাসের এক সুবিশাল কাজ করিয়াছে। বিশেষ এই বকম ক্ষেত্রে আবার চন্দ্রবাবুর কষ্টের কেমন বিচিত্র, ও নাটকীয়ভাবে গভীর হইয়া উঠে। এই ধরণটা তিনি খুব ভালবাসেন। আর এই জাতীয় ভিত্তিতে কথা বলিবার সময় কথাগুলো ছেলেরা হৃদিতে পারিবে কিনা তাহা ভুলিয়া যান। অথচ অল্প সময়ে সব ঠিক থাকে। আশ্চর্য! এই যে তিনি 'অনার্স', ফাইনাল প্রভৃতি

বলিলেন, অশোক সঠিক জানে, ছেলেরা তাহার কিছুই বুঝে নাই।

পরিচয় করাইয়া দিয়া চন্দ্রাবু বাহির হইয়া গেলেন। অশোক উদ্ভিগ্ন চেয়ারে বসিল এবং হাতমুখে ছেলের দিকে চাহিল। তাহার প্রথমেই মনে হইল একমিনি ছেলেরা যেখানে বসিয়া আছে, এখানে সেও বসিয়া ঠিক অমনি করিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট শিককের মূখের দিকে চাহিয়া থাকিত। সে একবার ক্রানের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ছেলের দিকে হাদিমুখে চাহিয়া গেলিল।

অকস্মাৎ ছুতা ঘটার শব্দ উঠিল। প্রথম একটা। তারপর একদিকে অনেক ছুতার শব্দ। সে হাদিমুখে চেয়ারে বসিয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পর ছুতার শব্দ থামিল। থামিতেই সে বলিল—তোমরা কি আশ পড়তে চাও না, না আমার কাছে পড়তে চাও না? বল।

কেহ কোন উত্তর দিল না। সে বলিল—বেশ আমি আশ একটা গল্প বলি শোন। আশ পড়ানো বস্তু থাক। তোমাদের বহি স্তনতে ভাল না লাগে তখন পা ঘষবে। কেমন?

সে আরম্ভ করিল—আজ থেকে ঠিক সপ্তম পাঠশালা বছর আগে ক্রান্তে লোরেন বলে যে ছেলটি আছে—এর কথা তোমরা আজকালকার ইতিহাসে বারবার পাবে, গত একশো বছর থেকে এই ছেলটি ক্রান্ত আর জার্মানির বসন্তের কাটা হয়ে গাড়িয়েছে—সেই ছেলার একটি শাস্ত পল্লীগ্রামে, একটি স্বচ্ছ চাবার পরিবারে একটি মেয়ের কন্য হয়। মোটেই আশ্চর্য কথা নয় তার জন্ম, কারণ প্রতি দুহুটেই তো কত লোক জন্মচ্ছে। আশ্চর্য তার জীবনের কথা। পল্লীগ্রামের শাস্ত আবেদনের মধ্যে যেটি বড় হতে লাগল। হৃদয়ের স্বাস্থ্য, অনেকটা লক্ষ্য, হৃদয় মুখী। চাবার মেয়ে, সেখানকা তাকে সেখানে হার্মি; সে হুতো কাঠতে জানত সেলাই ফোঁড়াই জানত। স্বপ্ন মেয়েরের মত সে হেসে খেলে বেড়াতে পারতো না। সে তার বড়বাই ছিল না। সে একা একা আপনায় মনে দুরত, বসে থাকত। ধীরে ধীরে তার জাগ্রত স্বপ্ন দেখা

অজ্ঞান হয়ে গেল। মনে থাকলেই সে স্বপ্ন দেখত। দুর্গত ক্রান্তের স্বপ্ন।

তখন ইংরেজরা ক্রান্তে আক্রমণ চালায় ক্রান্তের গ্রাম সবটাই মূল্য করে ফেলেছে। অগ্নিদেবী দুর্গ পবন তখন আক্রান্ত হয়েছে। প্যারিস, রিমস তারা গুণ করে নিচ্ছে। এই চাবার মেয়েটির মনে সেই বেদনা কেমন করে আঘাত করেছিল কে জানে, সে দুর্গত-ক্রান্তের মতো ভগবানের কাছে বার বার বেদনাকাতর প্রার্থনা জানাত, কামত। আর তার মনের সেই প্রার্থনা তার কাছে ষোড়শের রূপ নিয়ে দেখা দিত। প্রথম প্রথম সে ভয় পেত, ভাবত তাকে কি ক্ষুতে পেল, সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে সেই অপরিসর্য বস্তু, ষোড়শের রূপকে বিশ্বাস করতে লাগল, হৃদয়ে তারা পবিত্রতার প্রেরিত নয়, ঈশ্বর-প্রেরিত। সে প্রত্যাদেশ পেল পবিত্র দুর্গও লাহিত ক্রান্তকে রক্ষা করবার। আর তার মনের শান্তির মধ্যে বসে থাকা হোলো না। সে বললে,—আমার ইচ্ছা ছিল, আমার মনের কাছে থেকে হুতো কাটি, সেলাই করি। তাই আমার মনের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে বার বার ক্রান্তকে উদ্ধার করবার বস্তু দিচ্ছেন। আমার মনে থাকা আর হল কৈ? বোল বছরের তরুণী মেয়ে, বেটা ছেলের, সৈনিকের গোথাক পড়লে, হাতে বেবুন্ডের মৃতি ঝাঁক। ক্রান্তের মত সাধা পতাকা হাতে নিলে, সাধা খোড়ার শিটে চড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বাক্স করলে ক্রান্তকে উদ্ধার করতে।

অগোচর বসিয়া চলিল কেমন করিয়া সে ধীরে ধীরে বার বার অবিবাসের পর অবিবাসী সৈন্তদের বিশ্বাস করাইল, তকিনেব মদে লাক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে আপনায় বসে টানিল, ওয়ালিয়েল হইতে ইংরাজ সৈন্তদের ডাকাইয়া দিল, তকিনকে রিম্‌স ক্যাথিড্রালে অভিব্যক্ত করাইয়া রাখা করাইল। ছেলেরা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গল্প শুনিতেছে। এমন কথা, এমন বলা, এমন কষ্ট, এমন বলা তাহার পূর্বে কোনদিন দেখে নাই। গোটা ক্রান্তে নাব্যস্ত বিশ্বাস পড়িবার শব্দও শোনা যায় নাই।

অশোক বৃক্ষিতে পারিল ছেলেরের জড়পিণ্ডির মত অচল
অন্তঃকরণ উত্তেজনার উত্তাপে 'খালোড়িত' হইতেছে,
চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্নের ঘোর লাগিয়াছে। তাহার কর্ণের
আরও কম্পিত হইয়া আনন্দহী হইয়া উঠিল। সে ধীরে
ধীরে গয়ের শেষ পর্বাণে আসিয়া পৌছিল।

যখন তারই শক্তিতে অভিযুক্ত রাজা তাকে পূর্বকার
প্রার্থনা করতে বললেন তখন সে নিঃশব্দে কিছুই চাইলেন
না। শুধু তার গ্রামের ওপর থেকে খাওয়া তুলে দেবার
অবেশ চাইল। ক্রোধের পরকরণত অংশকে উদ্ধার
করার ক্ষেত্রে সে তারপর অগ্রসর হ'ল। অসম্ভব বিব্রোহী
সেনাদের সে বশীকৃত করলে। তারপর অবেশ রক্ষার
ক্ষেত্রে দুইয়ের পর দুই সে নিঃশব্দে উপস্থিত ছিল। কিছু
রাজার ধনী অভিযুক্ত সভাসদরা দেখলে সামান্য একটা
চাচার ছোট্ট মেয়ের প্রতিপত্তি রাজার চেয়েও বেশী।
সে তাদের লজ্জা হ'ল না। যেহেতু যখন প্যারিস উদ্ধার
করবার ক্ষেত্রে সামান্য একজন সৈন্যের সঙ্গে বাজিল তখন
তার সর্বাধিকার সভাসদদের একজনের প্রচেষ্টায় রাজার
ইঙ্গিতে সে খরা পড়ল এবং তার কণ্ঠকম্পাস পরেই
ইংরেজদের হাতে তাকে বিক্রী করা হ'ল।

ছোট্ট একটি সরল চাচার মেয়ের বিচারের ক্ষেত্রে বড়
বড় গভীর রাজকর্মের সভা বলল, মেয়েটাকে একান্তে
এক গোপনে জেরাধ ধেরাধ উত্তাক্ত করে তুলে তাকে
হও দেওয়া হ'ল বৃত্তান্ত। তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা
হ'ল। তখন তার উনিশ বছর বয়স, সরল অগাধবিশ্ব
চাচার মেয়েটি অর্ধ ক্রান্তকে উদ্ধার করে তার পূর্বকার
পেলে।

মেয়েটির দেহ গেল। তার মন মরল না। লম্বা
ক্রোধের প্রত্যেকটি মাছবের মধ্যে সে নতুন করে বেঁচে
উঠল। ক্রোধের লোকের মনে তার বৃত্তান্তে সাহস দিয়ে
এল, বাজতে বল এল, শত্রুকে পরাজিত করে তাড়িয়ে
দিলে।

সেই মেয়েটির নাম জোয়ান-অব আর্ক। তার
বৃত্তার পাত্তাণে বছর পরে উনিশশো হুড়ি লাল থেকে
তিনি হয়েছেন সেন্ট জোয়ান।

আমার গল্প শেষ হ'ল। এট সবে বলে রানি,
পৃথিবীতে এট জাতীয় গল্প এট একটাই নয়। হাজার
হাজার সংখ্যাতীত এমনি ঘটনা অতীতকালে ঘটেছে,
বর্তমানে ঘটছে, ভবিষ্যত কালেও ঘটবে। আমরা
সেগুলি জানি না। আমরা পড়েছি পীড়া বার বার
অস্থিপরীক্ষা দিয়েছেন, শ্রৌণদীর বয় রামসভায় দ্রুত
হয়েছে, বিত্ত ক্রুশ বিদ্র হয়েছেন। কারিবালায় মন্ত্রপ্রাচুরে
হল্লগত মোহনদের গ্রিথ সৌহিত্র ধর্মগুরু হাসেন মৃত্যু
বরণ করেছেন। কত ঘটনা ইতিহাসে এমনভাবে
ছড়ানো আছে! আরও কতগুলো ছড়ানো নেই। তা
কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। কিন্তু তবু তাও
আছে, চিরকাল আছে। সেই অপরাধিত মছমাষের
মৃত্যু কোন কালে ঘটে না। সে গোপনে তোমাষের
মধ্যে আগ্রস্ত আছে। সময় হলে, প্রয়োজন হ'লে, তাকে
জাগ্রত করতে পারলে সে উঠে ধাঁড়াবে।

ঘটা পড়িল। অশোকও শেষ করিল। ছেলেরা
চুপ করিয়া বলিয়া থাকিল। ধীরে ধীরে কম্পিত নিখাদ
একটি একটি করিয়া পড়িতে লাগিল। সে ক্রাস হইতে
বাহির হইয়া হাতের চক্ লুকিতে লুকিতে চলিয়া গেল।

পনের দিনের মধ্যে ইহারই ফলে ছেলেরের মন লুটিয়া
লইল। ছেলেরা তাহাকে দেবতার মত ভালবাসে।
তাহাকে দেখিতে পাটলেই সবিম্ববে তাহার দিকে
চাহিয়া থাকে। দীর্ঘ স্বন্দর চেহারা, টকটকে রং, বড়
বড় চোখ, এলোমেলো চুল, মুখে মিষ্ট হাসি। একটু বেশী
হাসিলেই তাহার পাতলা ঠোঁটের পিছনে মুক্তার পতির
মত ধাতের সাদ্রি দেখা যায়। তখন তাহাকে আরও
স্বন্দর লাগে। গায়ে বদরের পাত্তাবী, জায়গায় জায়গায়
ছিঁড়িয়া গিয়াছে। পরণে অন্নদামী মিলের মোটা দ্রুতি,
গায়ে ত্রাঙেল চটি। লজ্জা সময়েই হাসি হাসি ভাব।
ছেলেরা তাহাকে লইয়া কি করিবে ঠিক করিতে পারে
না। লকালে কোন ছেলে আসিলে পড়া বলিয়া দেয়।
টিউশানি সে করে না। চুপেই বুল। ঘটা পড়িবার
লগ্নে লগ্নে সে ক্রাসে আসে, পুরো ঘটা পড়াইয়া ঘটা
পড়িলে তবে যায়। বিকালে ছেলেরের খেলার মাঠে

হায়। সে খেলিতে পারে না, তবু হৈ হৈ করে। সন্ধ্যায় সময় কিয়দা কিছুকণ চন্দ্রবাবুর সঙ্গে গল্প করে। বাগ্‌চার পর সে আর বাহির হয় না। সে কি করে সেই জানে। তবে রাত্রি যাবোটা একটা পর্যন্ত তাহার ঘরে আলো জ্বলে। বোধ হয় পড়াশুনা করে।

কিন্তুদিন থাকিতে থাকিতেই অশোক খুলটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। খুলের সেই প্রাচীন রীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই এইটাই সে সর্বপ্রথম বুঝিতে পারিল। দুই দুইটা বিরাট আঁখালনের আঘাত খুলটির উপর পড়িয়াছে, তবু কোন পরিবর্তন হয় নাই এইটাই তাহাকে সবচেয়ে আশ্চর্য করিল। সে এখন এখানে লেগাপড়া করিত তখন যেমন শিক্ষক ও ছাত্রদের নাকখানে একটা ছত্র ব্যবধান ছিল, আজও তেমনিই আছে। কোন পরিবর্তন হয় নাই। এমন কি তিগমার কনে নাই। কেবল ব্যক্তিগতভাবে চন্দ্রবাবুর চরিত্রের বহু গুণ পরিবর্তন হইয়াছে তাহার ফলে তিনি একান্তভাবে ছেলের সঙ্গে অভ্যস্ত সহজে মিশিতে পারেন। ভিন্সিগ্নিনের ব্যক্তিক তাহার আর নাই। সেই প্রাচীন ভিন্সিগ্নিনেরিয়ান বাটারটির পাত্রী সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া গিয়া, সহজ মানুষের সহজতা ও প্রীতি তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহারই ফলে তাহার মূখ সর্বদা এমন প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে বিশেষরূপে ব্যক্তিগত পরিবর্তন। শিক্ষকের সে সময় যে একটা স্বক্ৰিয় গভীরত্ব কেন্দ্র ছিল চন্দ্রবাবু তখনকার দিনে একান্তভাবে তাহারই মধ্যে মাহুত ছিলেন। আজও তিনি বাহির হইয়া আসিতে পারেন নাই। দরজা আঘাতের পর আঘাত করিয়াছেন, কিন্তু সেই স্বক্ৰিয় বেটনী তাহাতে ভাঙে নাই। তাই সেদিকে পথ না পাইয়া তিনি অন্ত দিকে বাড়িয়াছেন। সময় বেটনীর উর্ধ্বে উঠিয়াছেন তিনি। কিন্তু আর সব ঠিক তেমনিই আছে। এই যে বেটনী ইহা ভাল কি নয় তাহা লইয়াও তাহার মনে প্রথমে বার বার দ্বন্দ্ব আসিয়াছিল। অন্ত দিককল্পনিক সে ভাল করিয়াই পূর্ব হইতে জানে। এবার আসিয়াও দেখিল। ইহারা

ঘোড়ের উপর নানান লেগজটি লক্‌ও ভাল মাহুত, সাধারণ মাহুত। সাধারণ মাহুতের মতই স্বাধীনতা অত্যন্ত সচেতন। আর এই স্বাধীনতার গহিত ঘনিষ্ঠভাবে অভিত আছে একটা ভয়। কোথায় স্বাধীন হইবে সেই ভয়। যেটুকু আবেষ্টনীর মধ্যে গিচরণ করিয়া উঠায়া জীবনে মূখ ও বাজ্জা লাভ করিয়াছে, উদাহরণ স্বাক্ষর করনার তাহার পর বিপর আছে বলিয়াই উদাহরণ ধারণা। তাহার অধিক অগ্রসর হইলে লভ মূখ ও বাজ্জা আহত হইবে ইহাই উদাহরণের বিশ্বাস। তাই বেটনীর বাহিরে উদাহরণ আসিতে চাচে না বা এমন লোকও ভিতরে প্রবেশ করিতে হিতে চাচে না যে অপরিচিত, তাহার ধারা ১
কতি বা উপকার বাহাই হইবার সম্ভাবনা থাকুক না কেন। আর বেটনীর মধ্যে একান্ত স্বাধীনতাপ্রণোমিত হইয়া বল পাকাইবার মত ছেলের যে উপকার হয় না, অপকার হয় তাহা অশোক ছাত্রহিসাবে পূর্বে দেখিয়া গিয়াছে, আজ শিক্ষক হিসাবে দেখিয়াছে। কারণ বাহা কিছুই তাহার্য করে তাহা নিম্নের স্বার্থের মূখ তাকাইয়া, ছেলের মত নহে। আর সেই মতই ছেলের মত কোন রকম চিন্তা বা কল্পনা বা সহায়ত্ব ইহাদের মধ্যে নাই। তাই নিম্নে এই বেটনীর মধ্যে আসিয়া বুঝিতেছে যে ইহা বার বার ছেলের কতি করিতেছে। আর ছেলের সঙ্গে তাহারই ফলে ব্যবধান দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এইতো গেল বাটারদের আশ্চর্যকার বিচিত্র পদ্ধতির কথা। আর একটা বিপর তাহাদের চিন্তা অশোক কোন ক্রমেই সমর্থন করিতে পারে না। সে তাঁহাদের খুল লক্‌ও ধারণা। খুল বলিতে তাহারা একটা আইভিয়ার, কতকগুলো ভিন্সিগ্নিনের, কতকগুলো আইনকারদের মত শিক্ষার কল্পনা করেন। সে কল্পনা একেবারে একটা ভগ্নক অধ্যক্ষ্যাই। আর সেই ভগ্নহীন আদর্শকে বেন তাহারাই ধারণ করিয়া আছে এমন একটা কল্পনা সে এগনকার বাটারদের মনে দেখিয়াছে। ইহারা খুলের বাহারা প্রাণ একেবারে তাহাদিগকে কল্পনা হইতে বার দিয়া আশনার কল্পনা রচনা করিয়াছে। অশোক

কিছুতেই তেমনভাবে ভাবিতে পারে না। স্থল কথাটা মনে হইলে অল্প পিণ্ডের মন্থিত কোলাহল ও হাতের ছবি বার বার তাহার মনে আসে। স্থল যে একত্রিত অল্প তরুণ ছাত্রের গ্রাণ-বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু, আর সেই বিকাশের সহায়ক হিসাবে আছেন—এই কথাটা তাহার মনে বহুস্থল হইয়াছে। তাহার ধারণা—ছাত্রদের সেই আত্মবিকাশের পথে যে বিধি, যে নিয়ম বাধা হইয়া পড়িয়াছে তাহা নিষেধ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সে নিষেধকে যে কোন উপায়েই হউক সরাসরি পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। তাহার আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই।

তারপর ছেলেদের কথা। তাহার সম্বন্ধে ছেলেরা যেমন ছিল আপাতদৃষ্টিতে তাহার আরও তেমনই আছে। কিন্তু কিছুদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া সে বৃহৎ পরিবর্তন অনেকই হইয়াছে। তাহার সময় ছাত্রদের মধ্যে যে একটা সহযোগিতা ও একতার মিলনবৃত্ত ছিল তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেখান মনে হয় ইহাও যেন খটখা গিয়াছে বহুদিন পূর্বে। এখনকার সময় ছেলেবাই যেন কেমন আত্মকেন্দ্রিক; অপরের সম্বন্ধে, একেবারে পানের গিটের ছেলেটির সম্বন্ধে; ক্রমে একেবারে তাহার গানেরই ছাত্র সম্বন্ধে কেমন নিপীড় উপাশীন। তখনকার মত আর হল বাঁধিয়া বেড়াইবার সমাধোহ নাই বিকাল বেলায়। বেলায় মাঠে ভীড় নাই। ডাউট করা কবে উঠিয়া গিয়াছে। এখন শিক্ষকের দিকে ছেলেরা নিশ্চেষ্ট, একা একা বেড়াইতে যায়। হল নাই। কখনও একসঙ্গে দুইজন, বড়জোড় তিনজন। বেলাখুপাও নাই। এখনকার ছেলেরা আগের চেয়ে অনেক ছোট, মাথায বেঁটে। বয়সও অল্প হয়, তবু শরীর ভাল নয়। কিন্তু ব্যায়ামেরও কোন চেষ্টা নাই। অল্প কিছুলের ভিতরেই গ্যারাগল যায়, কোয়ার্টার্সের বার পোতা বহিয়াছে। কোন কোন ছেলে সে দিকে ক্রিয়াশীল চাহে না। তবে কখন-কবে কিছু ভীড় হয়। বাগলা খবরের কাগজখানা একবার চোখ ব্লাইয়া দেখিবার জন্য ছেলেরা কাড়াকাড়ি করে।

কিন্তু পড়াশুনার দিকেও ছেলেরা তেমন মন নাই। ক্লাসেও ছেলেরা ভাল করিয়া পড়াশুনা করে না। পরীক্ষাতেও তাই। পরীক্ষার পাতায় পণ্ডিত নম্বর বাটও উঠে না। অল্প এ যেন আংশিক মাস্টারদের। তাহার বয়স হইয়াছে। পড়াইবার শক্তি ও উৎসাহ দুইই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার আগের চেয়ে বেশী ঘেরী করিয়া ক্লাসে আসেন। আসিয়া ভাল করিয়া পড়ান না, গল্প করেন। খটা পড়িবার অনেক আগ চলিয়া যান। একমাত্র চম্ভাবুই টিক আছেন। এখনও টিক তেমন নিম্নমাত্রবর্তী, তেমনই স্বল্প পড়ান। কিন্তু তিনি যে শাবন শিবানো, তাঁদের ক্লাস, ডিবেটিং শোলাইটি করিয়াছিলেন তাহা কবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার কথা ছেলেরা একেবারে তুলিয়া গিয়াছে। ধর্মশিক্ষার ক্লাসও উঠিয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র টিকিয়া আছে স্থল বসিবার পূর্বের প্রার্থনা করা। তাহাও টিকিয়া আছে কোন ক্রমে। ছেলেরা টেকা করিয়া ঐ সময়টার পর ক্লাসে আসে। চম্ভাবুও বহু চেষ্টা করিয়া টেকাইতে পারেন নাই। তাই তিনি এখনও সব একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

যোভিএ আর একটা বিচিত্র জিনিষ তাহার চোখে পড়িয়াছে। খাওয়ার সময় ছেলেরা পূর্বে যেমন স্নাত বাচাইয়া বসিত এখন আর সে সময় নাই। খাইবার খটা পড়িলে যে বেখানে পারে আসিয়া বসিয়া যায়। প্রয়োজন বা খেদাল হইলে পার্শ্ববর্তী ছেলের পাত হইতে খাটবস্ত তুলিয়াও লয় বিনা বিমতেই। পার্শ্ববর্তী ছেলেটি কোন বর্ণের তাহার খেদালই করে না।

চম্ভাবুর সঙ্গে সে একদিন এই লইয়া আলোচনাও করিয়াছে। শিক্ষকের সম্বন্ধে কোন আলোচনা সে করে নাই। ইচ্ছা করিয়াই করে নাই। ছেলের কথা লইয়াই সে আলোচনা করিয়াছিল। তাহাতে চম্ভাবু হাসিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন—বাবা অপেক্ষ, তুমি যখন ছাত্র ছিলে তখন আমার বয়স অনেক কম ছিল। উৎসাহও সেদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। এখন বৃদ্ধিতে পারি স্থলের ছেলেরা re-model করা আমার মাথাভীত।

এখন আর আমার সে কন্ডাও নেই, সে উল্লাহও গিয়েছে। এখন হয়তো আমার রিটার্নের করে ভগবানের নাম নেওয়াই উচিত। কিন্তু সে কথা মনে করতেও বুক টন টন করে। এই মূলকে ছেড়ে বাবার কর্তব্য আমি করতেই পারি না।

চন্দ্রাবূর আত্মিক কথাগুলি তাহার অস্থায়ক স্পর্শ করিয়া গেল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আগনি যদি আমাকে বাইরের সমস্ত কিছুও তার হেন আমি করতে পারি।

চন্দ্রাবূর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি দুইহাতে তাকাকে হৃৎ জড়াইয়া বসিয়া বলেগেল—আমি বাচলাম অশোক। আমি শাচলাম। আমি তোমাকে বলব বলব করেও বলতে পারিনি। সন্ধ্যা হয়েচে। বে সামান্য মাইনে তুমি এখানে পাও, তার পরিবর্তে তুমি বড় কাজ কর, বড় পড়াও সে অনেক বেশী। তার ওপর আমার এত কাজ নিয়ে তোমার

যাচ্ছে কি করে চাপিয়ে দেব? তুমি যদি তার নাও আমি কত মূল্যী হব তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না। এই মূলটি আমি গড়ে তুলেছি। আমি জানি এর মূল্য তোমার দ্বারা বড়টা হবে আর কারও দ্বারা তা হবে না। আর আমি জানি তুমি পারবে। কারণ ছেলেরা তোমাকে দেবতার মত ভালবাসে, ভক্তি করে। তবে একটা কথা। তোমাকে এই সমস্ত ঠাব মিলে অল্প মাস্টাররা একেবারে খেপে উঠবেন। জানতো মাস্টারদের!

অশোক হাসিল। বলিল—আগনার সাহায্য এবং লক্ষ্যন পেলে আমি নিশ্চিত থাকব। আমি যদি জানি যে আগনি আমাকে এবং আমার কাজকে অহুযোজন করছেন তা হ'লে আমার কোনোও অহুবিধা হবে না। বলিয়া চন্দ্রাবূরকে সে প্রণাম করিল। অন্ধকারের মধ্যে দুইজনের কাহাণী কি অহুভূতি হইল তাহা বোঝা গেল না।

(ক্রমশঃ)

অসময়ে

শ্রীকৃষ্ণরজন বল্লিক

ফুলের মধুর মরত্তম গেছে

ফুরিয়ে আসিছে কল,

এলে অসময়ে কি বিব তোমারে

আঁখি করে ছল ছল!

ফলের গুচ্ছ, রত্নের বাহার

এখন বন্ধু কিছু নাহি আর,

কোথায় লুকানো রূপের কোয়ার

সে বহির পরিধল?

এলো ফল শেষ ডকতলে বসি

হের মূরে ভোবে চাকি,

কৃতঙ্গ গগন রাগ হইয়াছে

বিদারী আবার মাখি

শোন ওই মূরে ডাকিতেছে পিক

ভাবী বসন্ত দিনের প্রতীক

উৎসব শেষ গন্ধ পীতুর

লহ বাহা আছে বাকি।

মগেন মন্ত

শবদাত্মা চলিতেছিল। শীতের রাত। আকাশে
খণ্ড মেঘ, কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে জ্বলন্ত করিয়া
তুলিয়া তাহা বেন ধীরে ধীরে নিজ অস্তিত্বের পরিধি
বাড়াইতেছে। বাতাসা কাঁপে শব্দেহ বহন করিতেছিল
তাহাদের ক্ষিপ্ত পথ স্ফালন, ঘনবাসের শব্দ রাত্রির
নীরবতাকে বিদ্রুত করিতেছে। মনে হয় এই শব্দজঙ্ঘ
রাত্রির নীরবতাকে ভাঙিয়া দিয়া এক ইন্দিতির ভাবের
সৃষ্টি করিয়াছে। এ ভাষা আর কেউ না বুঝুক, সাধনত
বোঝে। সাধনের মনের সম্বন্ধে বিদ্যুর মত পৃথক
কিন্তু গূঢ় অর্থে পরিপূর্ণ ছিল। আর রাত্রির অন্ধকারে
বিশ্রুতি যেন নিজ ক্ষেত্র সীমা অতিক্রম করিয়া স্ব-মহিমায়
প্রকাশ পাইতেছে। সাধন ইহার মর্মকথা বুঝিয়া
আঁৎকাইয়া উঠিল। শব্দেহটির গায়ে একটি স্পন্দন
লাগিল। নবকুমার প্রশ্ন করিল, কি হল সাধনবা ?
চাটাই-ঝড়ানো শব্দেহটি চলিবার তালে তালে
দুলিতেছিল। বহনকারীদের পায়ে তলায় পড়িয়া
যে সব ছোটখাট গাছ-পাছড়া আতঙ্কভাগ করিতেছে,
তাহারাও ছোটখাট প্রতিবাদ রাবিয়া বাইতেছে। আর
প্রতিবাদ রাবিয়া গেল না সেই জন যে এই রাত্রির
নীরব মুহূর্তে চারিটি প্রাণীর কাঁপে চড়িয়া মহাবাতায়
চলিয়াছে। প্রতিবাদ করিলেই বা কে গুনিত ? কেহ
জনে নাই। নীলিমা স্বামীকে বলিয়াছিল, “তোমাকে
তপ-বোধন দিয়েছি, কিন্তু সেবার ঘরঘি নিতে পারব না।
সেখান তার যে মন সে মন আমার সবাকার ভ্রূতে, শুধু
তোমাকে নিয়ে শান্তি পাব না।”

স্বামী হরেন্দ্রনাথ বহমনি ভাবিয়াছে, স্বীর মন স্বামীতে
থাকিবে না শু কোথায় থাকিবে ? পর পুরুষে ? কিন্তু
তাহারও লক্ষণ বাইরে প্রকাশ নাই। হরেন্দ্রনাথ অবাক
হইয়া ভাবিয়াছিল, নীলিমা কি চায় ?

সনাতন ‘মহা গুরু মহা গুরু’ করিয়া কাঁদা বহল করিল
এবং বাহা বলিবার ইচ্ছা ছিল তাহা সাধনকে লক্ষ্য করিয়া
বলিয়া বাইতে লাগিল, “বাপুদে, এই ব্রতের এই ফল,
ভেনে রেখো। তোমরা যখন এই পৃথিবীতে গা ভাদিয়ে-
ছিলে তখন কি কোন ফলের বাসনা করেছিল। কিন্তু
ফলের আশা কি শুধু নিমেষের কামনায়ে সৃষ্টি হয় ? তা নয়।
যোটেই তা নয় একের আশা অপরকে আগ্রহের মত স্পর্শ
করে ও জানিয়ে-পুড়িয়ে মারে। এ শুধু কথা নয় বাছা,
অভিজ্ঞতার কথা।”

একটু ধাবিয়া সনাতন একটা গুরু গম্ভীর নাটকীয় স্বরে
বলিয়া বাইতে লাগিল, “অতএব হে সাধনচক্র যে বোঝা বহন
করছ, কর, নামাধার চেষ্টাটা করো না ; বোঝা বহে চল।”

ইহার পর হর আর এক পর্দায় ঢড়াইয়া দিয়া সনাতন
গান ধরিল।

“ওরে সাধন

কেন ব্যথ হলি

পরম ধনে।”

সাধন নীরব। উত্তর দিল নবকুমার, বলিল, “সাধাও
কি মাত্রা আজ একটু বেঁধে হরছে ?” সনাতন উচ্চ হাতে
কাটিয়া পড়িয়া রাত্রির আকাশ শব্দে ভরিয়া দিল, কহিল
“জানিস ত নবু, আমার একটু এই সব মন—এ, হুঃ।”

“তা হোক সনাতন দা” ভল্লহরি কহিল, “যে কাজে
যাচ্ছি সেই কাজটা ত্যাগভক্তি দিয়ে গেলি। অজ্ঞে-
বাক্যে ব্যাপারে মন দিও না। অনেক দূর থেকে হবে
ধেয়াল রাখ ?” “হে রাখি বই কি ?” বলিয়া সনাতন
গলার কজ্জাকের মালাটা একবার ঘুরাইয়া দিল। কাঁচা-
পাকা দাড়িতে হাত ঘুরাইয়া সনাতন নিম্ন-নিম্নেই
হালিয়া উঠিল। সাধনের মনে হইল, অন্ধকারের মাঝেও
সনাতনের হাসি সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। আর একটি
অতিরিক্ত প্রাণী এই শব্দাত্মার সঙ্গে হাতে লগ্নন লইয়া
চলিতেছিল—তাহার নাম কমলা।

স্বাহাকে বহন করিয়া লইয়া বাওয়া হইতেছে তাহার

সঙ্গে এই কমলার নাকীর যোগ একদিন অচ্ছেদ ছিল। সবাই কহিয়াছিল একটি ছেলে হইলে ভাল হইত।—কমলা হইয়া বোকা যেন আরো বাড়িয়াছে। আজ সবাই কমলার ভাগ্য লইয়া ভ্রমণা-কল্পনা করিতেছে। নবকুমার একবার চারিদিকে পক্ষিতৃপ্তি হানিয়া কহিল, “কুমলি, তুই আমার পাশা-পাশি থাক।” কিন্তু পথত গাঁয়ের পথ নবকুমারের পাশা-পাশি হাঁটিতে হইলে, বন-বাগাড় ভাঙ্গিয়া হাঁটিতে হইবে—তা কমলা পারিবে কেন? তুই—একবার ভেটা করিয়া কমলা যেমন চলিতেছিল তেমনি হাঁটিয়া চলিল। কমলার ইচ্ছা হয় সাধনের পাশা-পাশি চলে। কিন্তু উপায় নাই সেই বন-বাগাড় হোচট খাইবার বাধা। নবু ধরিয়া লইল মেয়েটাকে তুতে পাইবে, সোমেন্দ্র বৎসের মেয়ে বিপদ বাধাইবে। যেখানে সবদেহ সেখানেই তুতগ্রেভের আবির্ভাব। কি জানি কার উপর নজর হয়—ভক্তহরি ইতিমধ্যে মনে মনে সবাইকে একবার স্তমিয়া লইল। আমি (ভক্তহরি) নবকুমার, সনাতন, সাধন—আর...আর ঐ কুমলি মেটো। বাপু তোয় কি দরকার ছিল আগবাধ? যতকি আর স্থির পাই? এই বধনে এই বাতের বেলা—কাকর দৃষ্টি-কিষ্ট পড়ে না কি। ভক্তহরি যেন নানা কল্পনার মধ্যে কি একটা অম্পট ছায়া সৃষ্টি দেখিতে পাইল। সে নবকুমারকে কহিল, নবু, রাম নাম বল। সনাতন সম্বোধে হাসিয়া উঠিল। ভক্তহরি হাসির শেষে চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, কি যে কচ্ছ সনাতনবা।”

যে নারী আজ এই নীরব মূর্ত্তে চারিটি প্রাণীর কাঁধে চড়িয়া সাহাবাজ্ঞা করিয়াছে তাহাকে সাধন চিনিত নাত্র। সাধন জানিত, চেনা আর জানা এক নয়। আর কোন দিন কোন নারীকে জানিবার অবকাশও তাহার ঘটে নাই। এ সবকিছু তাহার অভিজ্ঞতা সাধারণ হইতে কিছু স্বতন্ত্র। সাধনের মনে তাহার বৌদি যে ছাপ আঁকিয়া দিয়াছিল তাহাই যথেষ্ট। ইহার পর আর নারী জাতি দখলে তার ভাবিবার অবকাশ হয় নাই।

মনে আছে তিনখটা সমানে গাল-মন্ম খাইবার পর বৌদি খাবার ঘরে ভাত খাইবার মত্ত জাকিয়াছে, ভাতের খালি সাধনে পাইবার পর লক্ষা ধুপা বিলম্বন মিথ্যা সাধন নিমিষিকার ভিত্তে ভাতের সন্ধ্যাবহার শুরু করিয়াছে, এমন সময় দুই গাল টিণিয়া মিথ্যা বৌদি কহিল, ঠাকুরপো, আর বেধোনা অলেশী করতে। সাধন মুখ তুলিয়া তাকাইয়া বেধে বৌদির চোখে ম্লল। এ কি রকম মনে বাবা! সারাক্ষণ গালি পাড়িবে আবার নিজেই কামিবে। সাধন এই প্রলম্ব ভটিগতখ্যাজানে ববাবর এড়াইয়া চলিয়াছে। বাহাকে গালোগালি করিতে হইবে তাহার মজ্জাই আবার কামিতে হইবে? ইহা একমাত্র বহুতলীতেই দ্রব। আমরা কর্মী মানুষ অত কথা ভাবিবার, অত ভাবের খেলা খেলিবার সময় কই? পোড়াছাই এই তড়া-ছড়া মতোই একদিন কর্মী সাধনচন্দ্রের সঙ্গে নীলিমার লাক্ষ্য ঘটে।

সাধন গ্রাম হইতে শহরে গিয়াছিল অধ্যাপক বন্ধু হরেন্দ্রনাথ লম্বীক বাল করিতেছেন। তাবিল, স্নিহলবাটী গর কান্ধেই রাখিয়া দাই। কোবার রাখিব আবার খানাতলাসী হইবে—, তার চাইতে ও নিরাপদ আলস ঘটে। শব্দকে কহিল, আমি একটু এ পর্বতী ঘুরে থাকছি, তুই হরেনকে খবর দে।

সন্ধ্যা ঘোর হইয়াছে সাধন হরেনের বাড়িতে আসিয়া কড়া নাড়িল। হরেন বাড়ি নাই, নীলিমা হরজা খুলিয়া বলিল, ভেতরে আসুন!

নারী কষ্ট স্তমিয়া সাধন একটু থিগা করিতেছিল, পরিচয় নাট তাইত। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার অহরোধা আগিল, ভেতরে আসুন।

আগনি সাধনবাবু?

সাধন একটু ইতস্তত করিয়া উত্তর দিল, হ্যাঁ।

উনি আগনায়ই কথা বলে গেলেন। এত্নি কিয়ে আসবেন।

—আমি এত্নি আসব কি করে জানল? ও, বোধ হয় শব্দ এখন থেকে কিয়ে গেছে।

সাধন নিজেই উত্তর জোগাইল।

নীলিমা কহিল, আপনায় বিখার কোন কারণ নেই, আমিই গৃহকর্তা : আমি হতক্ষণ আপনায় সশঙ্কে ওতক্ষণ আর ভয় কি ?

—না—না আপনায় ভাবি তাতাতাড়ি পক্ষ বদল করেন কিনা, তাই ভয় : স্বপ্নে এলে কোন পক্ষ নেবেন তাকে জানে ?

নীলিমা হাসিয়া কহিল, না হয় আপনায় পক্ষই নেব।

—হ্যাঁ আমি বলছিলাম স্বপ্নে এলো কি না ?

—ঐ ত মশাইএর টিকি দেখতে পাওয়া গাচ্ছে বেন—
নীলিমা কহিল।

—আরে সাধন এপি নাকি, বলিয়া স্বপ্নে ঘবে ঢুকিল। সাধনও স্বস্তির নিবাস কেলিয়া বাটিল। স্বপ্নে একটু ঘুরে ভাকিয়া নিয়া সাধন রিডলবারটি হাতে দিয়া কহিল, সাবধানে যোগা, প্রভুরা ভারি সতর্ক হয়েছেন।

—আচ্ছা গে হবে।

নীলিমা সঙ্কল্প দৃষ্টিতে সাধনের নিকে তাকাইল। মনে হয় কোথায় বেন তার আত্মাভিমান বড় আঘাত লাগিল। সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া চাদের আয়োজনে মন দিল। কিন্তু কাঁটাটা ঠিকই বিধিল।

—কী, আমাকে এড়ানো হচ্ছে! কমলা কোথা হইতে ভুটিয়া আসিয়া নীলিমায় গলা জড়াইয়া ধরিল : মহলা একটা নিদাক্ষণ চড় বাইয়া কমলা কামিতেও পারিল না নড়িলও না : বেচারি একেবারে মাঘের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।—ও, অতটুই মেয়ে ওকি বোঝে ? নাই বুদ্ধক, সব সময় আমার আলাতন ভাল লাগে না—
নীলিমা ক্রুদ্ধ হইয়া নিষেধ মনে-মনেই উত্তর দিল।

কিছুক্ষণ পরে চা ও খাবার হাতে করিয়া নীলিমা ঘরে ফিরিয়া প্রের করিল, রাগে কি একক না বহুসহ ভোজন? সাধন নীলিমায় পানে তাকাইয়া কহিল, প্রার্থনা মধুর। স্বপ্নে শ্রিতহাতে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। কাঁটাটা বেন আর এক ইকি বেশি বিধিল।

রাগে এমন বহু না আসিলেই ভাল হয়।

সাধন তখনও ঘেঁষিয়া নিশিতে অভ্যস্ত হয় নাই।

পরে অবশ্য ঠোঁকিয়া অনেক শিপিগাড়ে : সাধন কি করিয়া বৃত্তিবে যে সে নীলিমায় অভিমানে যা বিগোছে। একিকের অভিমান হইল, আমাকে এড়ানো চইতেছে, আমিও প্রয়োজন যোগে যথেষ্ট কাজ করতে পারি—এবং কাজের চেয়ে কম নয়। হঠত এই প্রতিশ্রুতিয়া নীলিমায় মনে আসিয়াছে স্বপ্নে একে লক্ষ্য করিয়া। যে কর্ণের সন্ধিনী হিসাবে নীলিমাকে গ্রহণ করে নাই, অথচ নিরপেক্ষ মর্শক ও বাহক হইতে বলে তাহার সাহচর্যে আর বাহাই থাকুক স্থির বিশ্বাসের ভিত্তি নাই। তবুও নীলিমা স্বামী হয়েপ্রনাথের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, “আমায় একটু কাজের সুযোগ লাগে, আমিও তোমাদেরই সঙ্গী হব।” স্বপ্নে এ কথা শুনে মন অমন সেব নাই। কিন্তু বাহারা এমন ছয়ছাড়া জীবন গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের লক্ষে মিলিয়া কাজ করিবার নীলিমারই বা এমন দুর্বমনীয় আকর্ষণ কোথা হইতে জন্মিল? এ প্রশ্নের ভাব্য নাই। নীলিমা স্বামীর লক্ষে কথা বন্ধ করিল। স্বপ্নেই সভায় প্রথম গোপনে ও পরে প্রকাশ্যে বাটতে শুরু করিল। অঙ্গশঙ্কা মলিন চইল, দেহ আভরণহীন হইল। স্বপ্নে সবই লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু কিছু বলিতে সাহস পায় নাই। তবু সে নিজেকে প্রের করিয়াছে, নীলিমায় আত্মনিগ্রহ কোন লক্ষ্যের পানে খাইতেছে?

চাকর পাক করিতেছে। স্বপ্নের টিকমত আচাষানি হয় কিনা ইহা লইয়া অভিযোগ করিবার কেহ নাই। পুঁথিপত্র কোথায় থাকে তাহা শুনারক করিবার কেহ নাই। ইহাও সেদিন কমলাকে কোলে পরিঃ স্বপ্নে তিক্কালা করিল, কোথায় গিয়েছিল মৃগশি। কমলা উত্তর করিল, কেন, সেই সভাতে। মা খুব জোর বক্তৃতা করলে। আর লোকেরা খুব হাততালি দিল। মুহুর্তে কমলাকে কোলে হইতে নামাইয়া দিয়া স্বপ্নে অস্ত ঘরে চলিয়া গেল। কমলা বাবার সুখের পানে একবার অব্যাহত হইয়া তাকাইয়া মাঘের লক্ষ্যে অস্ত ঘরে চলিয়া গেল।

একদিন অশহিষ্ণু হইয়া স্বপ্নে ভুটিয়া গিয়া নীলিমায়

হুই কাঁধ ধরিয়া কাঁহুনি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে বল সংসার পর্য্যটী ছেড়ে দেই।

নীলিমা নিরুত্তর। তার দুখখানি যেন বেপাখরে গঠিত, সেখানে ভাব নাই, ভাষা নাই। স্বপ্নের অধিক রাত্রি অবধি পড়িতে শুরু করিল, কিন্তু কোথাও কোন প্রতিবাদ নাই। এথিকে দাব্যপ্রীতি বদেবী সভাতে থাকে। হুইতেছে। হু'একটি ছেলের আশিতে গুরু করিয়াছে। স্বপ্নের অন্ধকার ইচ্ছা হুইয়াছে ছেল-গুলোকে তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু এ ইচ্ছা পর্য্যন্ত হুই। স্বপ্নের জাবিল তাহলে কি হুইবে, নীলিমা স্বপ্নেই করিবে? স্বপ্নের উদ্ভব হুইয়া ছুটিয়া গিয়া রক্তবাহারী কলে ফেলিয়া দিল।

নীলিমা টের পাইয়া ক্রুদ্ধ হুইয়া প্রশ্ন করিল, ওটা কলে দিলে কেন?

স্বপ্নের বিজ্ঞপের হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, তার উত্তর তোমার মত বেরেকে দিবে লাভ নেই। নিলীমা ক্রুদ্ধ হুইয়া নিজেকে প্রশ্ন করিল, আমার মত বেরেকে উত্তর দিবে লাভ নেই! নীলিমার চোখ কাটিয়া বল আসিল। সে নিজের বিছানার উপর হুইয়া পড়িয়া কাহাকে কি জানাইবার মত বেন ব্যাকুল হুইয়া উঠিল। সেই দিন রাত্রির অন্ধকারে নীলিমা কলে নামিয়া অল্পসন্ধান করিয়া রক্তবাহারী উদ্ধার করিল। সিক্তবদনে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাত্তর বাহির হুইয়া পড়িল। এ কথা সভা কি না আকাশের তারারও সাক্ষী দিবে। কমলা এ-পাশ ও-পাশ গড়াপড়ি দিয়া বিছানার ঘুমাইতেছিল, স্বপ্নের ঘরে আলো তখনও জ্বলিতেছিল। সে ঘরে আর এক পর্ষদ আত্মনিগ্রহের সাধনা চলিতেছে। সাধন বন্ধ জন্ত হুইয়া স্বপ্নের বসায় চুকিয়া স্বপ্নকে জ্বালাইল,—কী রে ব্যাপার কি?

স্বপ্নের তখন আগিয়া ছুঃখ বোধিতেছিল। সারা রাত্রি বসিয়া মাতাল যেমন মন খাইয়া নিজের দুঃখের বিলাপ রচনা করে তেমনি স্বপ্নের বেন কাকে উদ্বেগ করিয়া বিলাপ রচনা করিয়া বাইতেছে। তাহার চোখের কোনে কাপি পড়িয়াছে, চোখ রক্তবর্ণ হুইয়াছে, চুল

বিজ্ঞত। হুঠাৎ সামনে সামনকে বেবিয়াই স্বপ্নের টেচাইয়া উঠিল,—বেবে আমার বাড়ি থেকে। অল্প বিদ্যাপ্রাণতঃ। সাধন অ-সামনের জালা লইয়া পথে ফিরিতেছিল বটে, তবু তার ব্যতীত মনে হুইয়াছে, স্বপ্নের অগ্রজতঃ।

(৪)

জীবন দীপ ক্রমশই কীপ আলো ছড়াইতেছে। স্বপ্নের ক্রমেই নিশ্চয় হুইয়া পড়িতেছে। হানপাতাল হুইতে এই সংবোধ নীলিমা পাইয়াছে। নীলিমা স্বামী সন্ধাননে চলিল। সে যেদিন স্বামীর ঘরের উপর এই কথা বলিয়াছিল, 'তপ বোধন যিহেদি সেবার রাত্রি নিতে পারব না।' সেদিন কি ঘনিষ্ঠ, স্বামী সেবার তিথ্য হুইয়া হানপাতালে আসিবেন। কিন্তু উপায় নাই, চাক্য অল্প দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে তাহাকে এ পথে ঘুরাইয়া আনা নীলিমার সামর্থ্যের বাহিরে। স্বপ্নের ঘরের দিকে তাড়াইয়া নীলিমা কমা চাহিয়া লাইয়াছে। ভগ্নবানকে তাকিয়া কহিয়াছে, শক্তি থাক, দুঃখ সহিব।

পুলিশ হানপাতালে থবর লইয়া তালিল, নীলিমা এখানে আগিয়াছিল। তারপর ধরপাকড় শুরু হুইতেই কলে পড়িয়া নীলিমাও জেলে গিয়াছে। কমলা গ্রামে পিসিমার বাড়িতে দুটি অল্প পাইতেছে, বাকের-মধ্যে মায়ের চিঠি-পত্র আলো, নিজে পড়ে ও পিসিমাকে পড়িয়া শোনায়। পিসিমা দীর্ঘকাল ছাড়িয়া বলেন, মা-মেয়ে দুটোই সমান হুতভাগী। জেলখানা খোটাখুটি নীলিমার স্বপ্নেই কাটিল। জেল প্রবেশের ছয় মাস পর সিদ্ধুর হুছিল। আর ছয় মাস পর ডাক্তার সন্বেদ করিয়া সবাকার হুইতে নীলিমাকে ঘুরে রাখিল। নিত্য বল অল্প উঠিতেছে, রক্ত বমন হুইতেছে, শরীরও ব্যাধীতি দুর্বল হুইয়াছে। এখন এক প্রান্তে বসিয়া পড়িতে পারিলেই জীবন পূর্ণ হুইয়া ওঠে। তাইত সাধনের বহনিন দেখা নাই। বহু চেষ্টা স্বপ্নের পর সাধন জেল বদলী হুইয়া নীলিমার কাছে আসিল। নীলিমার দীর্ঘদিন ক্রম হুইয়া গেল। মনে হয় বেন এখন মারিতেও আগ্রহ নাই।

একদিন জেলখণ্ডে ঘাইবার অস্ত্র অনেকেরই ডাক আসিল তার মধ্যে সাধন ও নীলিমার নাম ছিল। সাধন বাইরে আসিয়া নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কোথায় থাকেন ভাবছেন ?

—একবার কলমাকে দেখব।

—তাহলে পিসিমার বাড়িতে যেতে হয়।

—তাই চলুন।

পাড়িতে উঠিয়া নীলিমা কহিল, সাধনবাবু, আপনাদের বেশেবাবর পেছনে কোন ঘন নেই, আছে অভিমানে

—সেত আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি।

নীলিমা চমকিয়া উঠিয়া একবার সাধনের দিকে আহত দৃষ্টিতে তাকাইল। সাধনও চোখের পলক নীচু করিল। তার ঘনে হইল, এ আঘাতটা না বিশেষ ভাল হইল।

(৬)

একদিন নীলিমা সাধনকে ডাকিয়া কহিল, 'সাধনবাবু, চিন্তার বোঝাত হাতা হয় না, এ যে ভূবিসহ হয়ে উঠল। আমি ত কলমার মুখের পানে তাকাতে পারছি না।' সেদিন সাধন উত্তর খুঁজিয়া পায় নাই। জানালায় ঝাঁকে মাঠের দিকে তাকাইয়া সে মাঠের নীমানা হাথাইয়া ফেলিয়াছিল। দৃষ্টির সামনে সমস্ত পৃথিবীটা হুয়াশাময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। নীলিমার দিন দতাই ঘনাইয়া আসিতেছে ততই সাধনের ঘন উপাশীন হইয়া উঠিতেছে। কোন-কোন দিন গুহু আনিবেও ভুল হয়। কাহাকেও গীড়াগীড়ি করিয়া আর অর্থ সাহায্য লইতে সাধনের ঘন চায় না। নীলিমা লক্ষ্য করিয়াছিল সাধন আদ্যকাল অনেকটা উপাশীন, অমনোযোগী। কিন্তু কেন এই উপাশীত, এমন অমনোযোগীত সাধন ছিল না, নীলিমা বহবার ভাবিয়াছে। কিন্তু পানের ঘরে কলমা কার সঙ্গে কথা কহিতেছে? সাধন! নীলিমার ধূপগিওটা ঘনে একটা ঘোচড় দিয়া উঠিল, ঘনে হইল এখনই ছিঁড়িয়া পড়িবে। হঠাৎ নীলিমাও কাশির বেগ বাড়িয়া গেল, সমস্ত দেহ ঘর্ষাক হইয়া গে। কপিকের অস্ত্র অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

কলমা ও সাধন গিহরে বসিয়া শব্দাকুল নেত্রে নীলিমার মুখের পানে তাকাইয়াছিল।

নীলিমা চক্ষু মেণিঘাই কহিল, স্মৃশী, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ'। স্বপকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় দৃঢ়কণ্ঠে নীলিমা কহিল, 'সাধনবাবু, দেখে চলে যান। যাকী বিনগুলো আমার আঁখিই বুকে নিতে পারব।'।

পাপ কিরিয়া নীলিমা যে অস্ত্রের ধারা কাটিয়া পড়িতেছিল তাহা সামলাইয়া নইল। ক্রমে বেতের উত্তেজনা কমিয়া বেহ হিমশীতল হইয়া আসিল। শেষ নিশ্বাস করিয়া পড়িল।

(৭)

আকাশে মেঘের উন্নততা দেখিয়া তজহরির মাহুত চন্দ্রিত্র কাঁপটা আরো বাড়িয়া গেল। সে মতর আগাদের দিকে তাকাইয়া শুণু অন্ধকার বেঘিতে পাইল। আর কানে গুলিল ক্রুত বাতাদের চলার ধ্বনি যে মেঘ উঠিয়াছিল তা ব্যর্থ হয় নাই, অল তরাইয়া অলপ চিত্তা নিভাইয়া গিল। সনাতন অলকড় দেখিয়া গাঁজাঘবেণ জোব সম দিয়াছিল, নেশার মল্লগল হইয়া সাহকার্যে মননিবেশ করিয়াছিল। কিন্তু অলপ চিত্তা বধন বলে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিল তখন তার নেশার ঘোর কাটিল। সে আশ্রয়কা ধর্মের আশ্রয় লইয়া সরিয়া পড়িল। ঘাইবার বেলা কিস্ কিস্ করিয়া নবহুমাধকে ডাকিয়া কহিল, নবু গরে পড়, নিশ্চয় কোন হুগ্হ আছে।

ডজহরি শুণু "হুগ্হ" শব্দটা গুলিয়াছিল। তারপর সেও অন্ধকারে বিলীন হইল। যে অন্ধকার ইতিপূর্বে ছিল এখনও তাহাই বিরাজমান শুণু বাহাদের অস্তিত্ব এই অন্ধকারের মধ্য দিয়াও এতক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল তাহারা আর নাই। আর্দ্র বেদে, কম্পিত বৃক্ কলমা পাগলের মত প্রার ছুটিয়া সাধনকে গুড়াইয়া ধরিল। অকিঞ্চিদ বাহিরবারার মাতে কলমা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, সাধনবাবু কি করব বলুন? সাধন দিক্ ললাট মুছিয়া লইয়া নির্দোষিত চিত্তাতির পানে আত্মপদুতে তাকাইয়া রহিল; সেখানে যে প্রস্তর উত্তর সে খুঁজিতেছিল তাহা কলমাকে বলিবার নহে।

ভাগ্যতিক

স্ববীর চন্দ্র বারকোমুরী

পৃথিবীর যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় সর্বত্রই অশান্তি, বিক্ষোভ এবং হানাহানির শোচনীয় দৃশ্য লক্ষিত হয়। গত মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ লীলার হাত হইতে পৃথিবী এখনও মুক্ত হয় নাই। কোথায় সেই ফলস্বরূপের ফল নিম্নেবে মুছিয়া পৃথিবীকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় সৎপন্থি নিয়োগ করা, তাহাকে স্বাধীন, স্বাধীন, স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ, মহত্ত্ব সম্বলিত আশাশুঙ্কলে পরিবর্তন করা; তাহা না করিয়া ব্রাহ্মণ আচার ভিত্তীয় মহাযুদ্ধের বিতর্কিতকার স্বপ্ন দেখিতেছে। অথচ শাস্তি কে না চায়! প্রত্যেক দেশে কোন্ কোন্ লোক শাস্তির জন্ত পাগল, অথচ এই শাস্তিকামীদের সঙ্কল্পে কিছুটা তোলা। এবং সূচকীয়ের প্রভাবকে নেগার সংখ্যার জোড়েই রাখাইয়া রাখিয়া স্বাধীন শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করা—এই ব্রহ্মদেব শাস্তি বরণ করিয়া লইবার নতুন নৈতিক এবং আন্তরিক পন্থা কোথায়! ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শাস্তি স্থাপনের সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সমাজনৈতিক পরিধি অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক পথে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তা না হইলে, "প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও অর্থনৈতিক অগতির বীজ" এই উভয় ক্ষেত্রে আরব ও ইহুদীদের ভিতর মতানৈক্য না থাকা সত্ত্বেও কিলিষ্টনে শান্তি স্থাপিত হইতেছে না কেন?

কিলিষ্টন—উ. এন. ও.-র মহাযুদ্ধের গত ১১ই জুন হইতে লুড বিবর্তিত চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর হইতে কিলিষ্টনে আগোব-আলোচনা চলাইবার অল্প নিয়ন্ত্রণ প্রদানের কাউন্ট বার্লোডোতকে সালিশ নিযুক্ত করেন। এই সালিশ গ্রাম ফ্রান্স সত্ত্বে আলোচনার পর গত ৪ঠা জুলাই তাহার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপক্ষে পেশ করেন এবং গত ৪ঠা জুলাই আগোব প্রস্তাব হিসাবে ইহা পরবর্তীভাবে ঘোষিত হয়। নিম্নে এই প্রস্তাবের সারাংশ প্রদত্ত হইল—প্রথমে বার্লোডোতের সাহায্য লইয়া জুটি রাষ্ট্রের সীমানা

সম্পর্কে আগোব-আলোচনা করিতে হইবে এবং অন্তঃপর উহা একটি সীমানা কমিশন কর্তৃক সুনির্দিষ্টরূপে স্থির হইবে। যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত বিষয়ক অর্থনৈতিক ব্যাপার উন্নয়নের ব্যবস্থা করিবে, উৎপাদন ও বাণিজ্য তত্ত্ব সব একপ্রকার স্থানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা বহাল রাখিবে, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রচনা করিবে এবং বৈদেশিক নীতি ও উভয় রাষ্ট্রের স্বৈরত্বক্য ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করিবে। একটি কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের ব্যবস্থা উল্লিখিত কাই ও কর্তৃক পরিচালিত হইত, অল্পত উহার প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্কসহ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

বাহির হইতে লোক আমদানী সম্পর্কে কাউন্ট বার্লোডোত এই মর্মে প্রস্তাব করেন যে, কোন রাষ্ট্রে কিস্তি সংগ্রহ বহিরাগত আমদানী করা হইবে, তাহা নির্ধারণের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিনিধির থাকিবে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধির হইবৎসর পর উভয় রাষ্ট্রের যে কোন সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের নিকট বহিরাগত আমদানী সংক্রান্ত নীতি অথবা অস্ত্রাধি বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্ত অনুরোধ করিতে পারিবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সম্পন্ন ব্যাপার নতুন করিয়া স্থির করিয়া দিতে পারিবেন। শাসন পরিষদ এই বিষয়ে ব্যবস্থা না করিলে সংশ্লিষ্ট প্রদেশে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর রাষ্ট্রপক্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে তাহা পেশ করা চলিবে।

বলা বাহুল্য এই প্রস্তাব আরব এবং ইহুদী কোন পক্ষই মানিয়া লইতে রাহি হয় নাই। ইহুদীরা চাহে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দেখানো অথবা পৃথিবীর সব দেশ হইতে ইহুদীসমূহ আগিয়া স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রীয় নাগরিক হিসাবে বসবাস করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে জুটিপন্থা যোগেই অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই রাষ্ট্রীয় পরিষদের পতন হইয়াছে এবং আমেরিকা ও রাশিয়া এবং আরও অনেক ছোট ছোট দেশ এই ইহুদীরা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছে। এমন কি সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অধিবেশনে পরিষদের সাময়িক সভাপতি এই ইহুদীরাই

রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে ইহুদীদের বক্তব্য বলিবার অল্প আশ্রয় করেন, এবং সভায় তুমুল প্রতিবাদ শেষেও তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ভোটের সংখ্যাধিক্যে পৃথীত হয়। আরবগণের পক্ষে এমন কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নহে যাঁহাদের কল কলিভিনিবের অবশেষে আংশিকভাবেও ক্ষুণ্ণ হয়।

হুতগাং হুতবিরতির কাল পূর্ব হইবার পক্ষে লক্ষ সারকারিভাবে উভয় পক্ষের হুত আবার হুত হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদে কলিভিনিব সমস্তার আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধি তথায় শান্তি স্থাপনের জন্য সাময়িক চরমক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করিয়াছেন এবং সে ক্ষেত্রে আমেরিকাকে তাঁহার উপরূপ অংশ গ্রহণ করিতে প্ররোচিত তাহাও জানাইয়াছেন। সোভিয়েট প্রতিনিধির প্রস্তাব অনুসারে আন্তর্জাতিক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সভাপতি তাঁর যোগে কলিভিনিব কমিশনকে আদেশ দিয়াছেন।

মাল্ল—চীন দেশের দুইহুত বনাম রুশ মার্কিন বিরোধ অর্থাৎ চলিতেছে। কিন্তু সমস্ত মাল্ল দেশ জুড়িয়া যে অশান্তির আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাও কি এইরূপ একটি শিথিল সামরিক বাহিনী ইক-কম বিরোধের ফল? অস্তিত্ব ইংরেজ মন্ত্রিসভার বৈশিষ্ট্য এইরূপ একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কৈফিয়ৎ পাড়া করা। এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না মাল্লের সাময়িক গুরুত্বের কথা চাওয়া; নিজেও তথাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব সর্বস্বীকৃত। কারণ এখানকার রবার এবং অস্ত্রাদি পণ্যের চাহিদা আমেরিকার বাজারে প্রচুর এবং মাল্লের এইসব পণ্য যেতিয়া ইংরেজ তাহার অভ্যন্তর প্রয়োজনীয় উলার মুদ্রা অর্জন করিতেছে। এই রবার বনের মালিকরা মাল্লকে তাহাদের অধীগমের ক্ষেত্রে হিসাবেই দেখিয়াছে এবং গজ মহাভূক্তে নিঃশংখে এই সভ্য প্রমোদিত হইয়াছে যে তাহারা শুধু অর্থ শোষণই করিয়াছে, না চাহিয়াছে তদুপবাসির মূলতত্ত্ব উন্নতির দিকে না চাহিয়াছে দেশের লোকের নিরাপত্তার সমস্তার দিকে। তাই মাল্লানী আক্রমণের লক্ষ্যে লক্ষ্য তাহাদের এত সাধের তাঁদের ঘর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল এবং “মাক্টার” গোষ্ঠি

কোয়ালিফিকেশন মত আপন-আপন প্রাণ লইয়া পালিয়া গিয়াছে। হুতাবাসানে সেই ভীক কাপুরুষগণ সেই পূর্ব পদবীতে উন্নীত করিয়া ত্যাগ নব সামরিক কাঠামোর অন্তর্গত উলার মুদ্রা আয়ের দ্বারা বাবদ পণ্য করা হইয়াছে। দেশের ভিতরে মুদ্রাভিত্তি অসংখ্য আত্ম বিপুল বহিষ্কারায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আর যদি এই কথা সভ্য হয় যে দেশের লোকেরা মাত্র ১ জন লোক এই আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করিতেছে আর দ্বারা ১১ জন শান্তিকামী, তবুও এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে শান্তি স্থাপনের গুরুত্বাধি এই ১১ই জনের পর চাওয়া দিয়া উৎসাহিত করা, ভারত এবং কলিভিনিব হইতে যেভাবে নিজের দায়িত্ব পালিত করিয়াছে মাল্ল হইতেও সেইরূপ আপনাকে সরাইয়া লইক। তা না করিয়া উৎসাহ বাণক সমরায়োজন করিতেছে, দেশের ভিতর অভ্যাসের প্রোত বহাইয়া দিয়াছে। আপন হইতে যোমা বর্ণের ব্যবস্থা করিতেছে।

তিতো—মার্সাল তিতো মুনোরাড রাষ্ট্রের নেতা যখন সমস্ত ইউরোপ নামসী আক্রমণের সম্মুখে মাথা নত করিয়াছিল, তখন বাহারা সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চাহিয়াছিলেন মার্সাল তিতো। তাহাদের অন্ততম। প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব ভিতর দিয়া অতি স্বাভাবিক রূপেই তিনি আজ মুনোরাড রাষ্ট্রের নেতা। তাঁহার বীরত্বকাহিনী আজ রূপবর্ণার গুরে উন্নীত হইয়াছে।

কিন্তু সেই তিতো বিশ্ব কমুনিষ্ট লগারে একঘরে হইবার অর্থায় আদিত্য গড়াইয়াছেন। নয়টি দেশ লইয়া গঠিত লক্ষ ‘কমিন কম’ লগে লুন এক ইত্তাহার প্রকাশ করিয়াছে। এই ইত্তাহারে বলা হইয়াছে, “মুনোরাড কমুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব নীচে এই লগোয়া জাতীয়তাবাদী মতবাদ গ্রহণ করিয়াছে যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি মুনো-রোভিচার স্বাধীনতার দিক দিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের তুলনায় কম অনিষ্টকর। ইত্তাহারে মুনোরাড কমুনিষ্ট-বিপক্ষে অস্ত্রপ্রেরণ করা হইয়াছে, বাহাতে তাহারা তাহাদের নেতৃত্বকে নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য

করেন; আর তাহা সম্ভব না হইলে তাঁহারা যেন তাহাদের নেতৃ-পরিবর্তন করেন।

ইতাহারে আরও বলা হইয়াছে, যুগোশ্লাভ কমুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নিজকে এবং সমগ্র যুগোস্লাভ কমুনিষ্ট পার্টিকে সোভারেনপূর্ণ স্বতন্ত্র কমুনিষ্ট পার্টি ও সম্মিলিত কমুনিষ্ট সংগঠন হইতে বাহিরে টানিয়া লইয়া নিদাছেন; ফলে 'কমিন কমের' মধ্যেও তাঁহারা আর স্থান পাইতে পারেন না।"

'কমিন কম' বিত্তের পক্ষীয় কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন যে "তাঁহারা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইয়াছেন, সোভিয়েট বাহিনীকে লোকচক্ষে হের প্রতীপদের চোঁটা করিয়াছেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সোভিয়েট কমুনিষ্ট পার্টির প্রতি বিশেষপূর্ণ মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন।"

যুগোস্লাভিয়ার সোভিয়েট সামরিক বিশেষজ্ঞদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। সোভিয়েট সামরিক বিশেষজ্ঞদিগকে এক বিশেষ অবস্থার অধীন করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের উপর যুগোস্লাভ নিরাপত্তা বৃদ্ধি না কর রাখিতেছে।

যুগোস্লাভিয়ার সোভিয়েট কমুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি যথেষ্টদিন এবং কয়েকজন সোভিয়েট সরকারী প্রতিনিধির প্রতিও একইরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে।

ইতাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বিরোধী এই মনোভাব এক মনে জাতীয়তাবাদের সঙ্গেই ব্যাপ খায়। যুগোস্লাভ নেতৃবৃন্দ 'মার্ক্সবাদ ও লেনিন-বাদকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী যে কোর করিয়া কমুনিষ্ট দেশের আধিপত্য স্থাপন করা আবশ্যক।' যুগোস্লাভ কমুনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে ডিক্টেটরশিপ বিস্তারন; ফলে তাঁহারা নিবাচন ও স্বাভাৱ সমালোচনার পথ একাইয়া চলিয়াছেন। তিতো ও কারদেলস্কী প্রতিজ্ঞাতি দেওয়া সম্বন্ধে কার্যনির্বাহক সমিতি মনোনীত সমস্তের লইয়া গঠিত হইয়াছে এবং কেহ কোন বিষয়ের সমালোচনা করিলে নিহঁরভাবে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়।

এই অভিযোগগুলি সোভিয়েটের কমুনিষ্ট পার্টি

কমিন কমের সামনে উপস্থিত করে। অভিযোগ যুগোস্লাভিয়ার কমুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে বিশেষ করিয়া তিতো, কারদেলস্কী, নিলাম এবং ব্যাঙ্কেভিনের বিরুদ্ধে। কমিন কম এই অভিযোগগুলি মানিয়া লইয়াছেন।

যেহা হাউতেই অভিযোগকারী সোভিয়েট মহোদয় নচে। তাই যুগোস্লাভিয়া এই ইতাহাবে বর্ণিত অভিযোগের ভিত্তি প্রতিবার করিয়াছে এবং মার্সাল ট্যালিনের কাছে আবেদন জানাইয়াছে, বাহাতে তিনি স্থিতিচার করেন। এই আবেদনের এখনও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

একিঞ্চ পূর্বে ইউরোপের সোভিয়েট প্রভাবিত দেশ-গুলি একে একে যুগোস্লাভিয়ার সহিত অর্থ নৈতিক চুক্তি বাতিল করিয়া দিতেছে। একমাত্র পোলাণ্ড সংকরী ভাবে এখনও কোন পদা অবলম্বন করে নাই। যুগোস্লাভিয়ার প্রধান সমস্ত কৃষকশ্রেণী লইয়া, পোলাণ্ডেরও তাই মার্ক্সবাদের সোভিয়েট অঙ্গত কৃষক শ্রেণীর প্রতি মনোভাব এবং তৎসম্বন্ধীয় কর্মদ্বারা যুগোস্লাভিয়া তথা পোলাণ্ড হইতে পুরাপুরিভাবে এবং দূরদূরিত ভাবে অবলম্বন করিতে তাহা পার। তাই পোলাণ্ড এখনও অগ্রণি হইয়া যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতেছে না। রিএল্ডএর কমুনিষ্ট পার্টিও কতকটা ন দ্ব্যে ন তথ্যে অবস্থা। এই পার্টির সহচর্যে শক্তিশালী ও সংখ্যায় বিপুল সমর্থক যুগোস্লাভিয়ার কৃষকশ্রেণী। তাই হইতে বাস্তব অবস্থা এবং আদর্শের ভিত্তি বিরোধের ফলে এখানকার কমুনিষ্ট পার্টি দুর্বল হইয়া পড়িবে। সব বলকান সমগ্রের গ্রন্থ লইয়াও মতবৈধের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

যাহা হউক এই ব্যাপারের কারণ সম্বন্ধে যত কিছু জ্ঞান-কল্পনাই করা হউক না কেন এবং ইহার পরিণাম ফল সম্বন্ধে কবিত্ত বাণী মহাশয়ের সহিতই যাহা হউক না কেন তাহা সবই ইংরেজীতে বাহাকে বলে wishful thinking অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাকে কার্যকারণ পরম্পরা মনে মনে সৃষ্টি করিয়া সমর্থন করা। বাস্তবে বাহার হইতে কোথ ভিত্তি নাই।



জনসাধারণের দুরবস্থা

বিভিন্ন প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় শাসনকার্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী বা করণ্ডে, তাতে দেশের জনসাধারণ তুষ্ট নহে। বহুং আজ পর্যন্ত অভিব্যক্তি উঠছে,—“এই স্বাধীনতার চেয়ে ইংরেজ রাজত্ব ছিল ভাল।” ব্যক্তিগতকৈ জনসাধারণের স্বাধীনতার দিক থেকে অবস্থা দিনের পর দিন খারাপই হচ্ছে। অসন্তোষ আর এমন ব্যাপক, যে ঠগ বাড়তে গা উজাড় হবার ব্যোপাত। অথচ অসন্তোষ দূর করতে না পারলে, জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার কোন পন্থাই নেই। ভাত কাণ্ডের অগ্রাণাত্য বা দুর্ভাগ্যটাই আর সব চেয়ে বড় সমস্যা অথচ এই অগ্রাণাত্য বা দুর্ভাগ্যতার ওস্তাদ দায়ী হল—ব্যাপক অসন্তোষ। জিনিস যে নেই, তা ঠিক বলা যায় না; জিনিস সবর বাজারে না গিয়ে ব্যাপক অসন্তোষের পথে চলে যায় চোরা বাজারে। চোরাবাজারে মালপত্র বাবার যে পথ—তার গোড়া হ’ল সরকারী দপ্তরখানায়।

সাম্রাজ্যিক যুদ্ধের প্রয়োজনে ইংরেজ ব্যাপক ভাণ্ডে অসন্তোষের চালু করে। এই কাজে তার প্রধান সহায় ছিল সরকারী কর্মচারী বা আমলাতন্ত্র। আজও সমাজে হত প্রকারের অসন্তোষ চলছে, তার মূলে আছে সরকারী দপ্তরখানার ঐক্যমীত্র বা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা। আর এমন কথাও বলা যায় যে কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভা বা মন্ত্রীগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ এই ব্যাপক অসন্তোষের প্রসার দিচ্ছে এবং এর প্রসারে সহায়তা করছে।

দেশের জনসাধারণ আর ততটাই এই সব মন্ত্রী সভা বা এই সব মন্ত্রীদের উপর আস্থা হারিয়েছে। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে—কংগ্রেসের উপরও জনসাধারণের আস্থা কমছে। এটা এক ওস্তাদ পরিণতি।

এট এট হচ্ছে কংগ্রেস কর্মীদের মতর্ক হওয়া সরকার।

কংগ্রেসের কর্তব্য কি?

বর্তমান হ’তে কংগ্রেস কর্মীদের প্রথ আদর্শ পেয়েছি—“কি আমরা করব নিঃসরঃ সেখান্দ কংগ্রেসী মন্ত্রীরা জনসাধারণের মঙ্গলের ওস্তাদ তিচ্ছ ত’ করণ্ডেই না এমন কি ই দিকে চোঁও করণ্ডে না দেশের লোকের কাছে, আমরা বলব কি?”

কংগ্রেস কর্মীদের পক্ষে সমস্তা সমস্তা ওস্তাদ।

দিন লোককে বলা হয়েছে—দেশ স্বাধীন হ’লে, সব দুঃখের অবসান হবে। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে প্রায় এক দশমর স্বাধীনতা ভোগের পর লোক এখন স্বাধীনতার উপরই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। একদিকে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী; অপরদিকে সাধারণ জনতা—বাংলা কংগ্রেসের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে এতদিন দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে। আর এখন কংগ্রেসের হাতে জনতা এসেও লোকের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও হচ্ছে না, তখন কি অবশ্য তারা জনসাধারণকে দিবে?

বিভিন্ন বল কংগ্রেসের এট অক্ষমতা ও কুটির হ্রব্যোগ নিয়ে নিজেদের প্রত্যাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলছে। অস্তান্ত বল কংগ্রেস মন্ত্রী-মণ্ডলীকে একপেশুণ গাল দিচ্ছে; আর জনসাধারণকে স্বর্গরাজ্যের লোভ দেখাচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেস কর্মীরা তা পারে না; কংগ্রেস মন্ত্রী-মণ্ডলীর কাছে সব লোভ চাপিয়ে তারা হাত ধুয়ে বসে থাকতে পারে না। অপর দিকে জনসাধারণের দুঃখ কষ্টকেও তারা উপেক্ষা করতে পারে না।

এই অবস্থায় তাৎক্ষণিক কতক হবে যখন যখন জনসাধারণের শাবীকে মূর ক’রে তোলা এবং কংগ্রেস মন্ত্রীরা

কেন সব কিছু করতে বা দিতে পারছে না—ঐতিহাসিক ও নৈতিক দৃষ্টি নিয়ে তা ব্যাখ্যা করা। নীচের থেকে যে সব দানী উঠবে, তা সব পাঠিয়ে দিতে হবে উচ্চতর কংগ্রেস কমিটিতে ও মহা-নগরীর নিকট।

কংগ্রেস-কমিটির একথা কুলে চলবে না—আমাদের আকাজিক বিপ্লব এখনও বহু দূরে; যে সামাজিক ও আর্থিক আদর্শ নিয়ে আমরা এত লড়াই করছি, এখনও তা প্রতিষ্ঠার পথে আমরা যেতে পারি নি। ইংরেজের হাত থেকে কমতা হওয়া দিও হওয়াতেই আমাদের দায় ও দায়িত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না। এই বিষয়ে ইতিহাসের নির্দেশ স্পষ্ট;—এক দাক্ষিণ্য বিপ্লব পূর্ণতা পায় না, এক অধ্যায়ে বিপ্লব শেষ হয় না। ফরাসী ও কম-বিস্ময় তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে বিকশিত হয়েছে। ভারতের বিপ্লবেও তাই হবে। এর কেবল প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে; এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি হতে হবে। বিপ্লবের গতি স্তব্ধ হতে থাকতে পারে না; দ্বিতীয় অধ্যায় আসবে—অনিবার্য গতিতেই তা আসবে। তখন যাতে তার নেতৃত্ব কংগ্রেসের হাতে থাকে, জনগণ যাতে ভুলে বাতিলকার মতো তাকে বিস্তারিত হ'য়ে বিপথে চালিত না হয়, তার জন্য পূর্বাঙ্কেই তৈরি হতে হবে।

বিপ্লবের যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের আগমন অনিবার্য, তা যে রক্তস্রাবহীন চলেই আসবে, এমন কথা বলা যায় না। বরং আর যদি কংগ্রেস কমিটি জনগণের হাতীকে তাড়ায় ও কাণে মূর্ত করে তুলতে পারে, তবে পূর্বই আশা করা যায়—ভারতীয় বিপ্লবের ঐতিহ্য বজায় রেখে গান্ধী-নির্দেশ পথেই বিপ্লবের দ্বিতীয় ধারা প্রবাহিত হবে। কংগ্রেস মহাসভার বৈশিষ্ট্যের দায়িত্ব স্বীকার করেও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও হাতীকে ক্ষুণ্ণ করে তোলায় নেতৃত্ব কমিটি গ্রহণ করবে। ক্রমাগত নীচের থেকে চাপ আসার ফলে ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত যে পান্থ-বৈধীর উপর আর কংগ্রেস মহাসভা নির্ভর করছে, তা সত্যই ধল পড়তে বাধ্য হবে। গান্ধী-নির্দেশ গণতান্ত্রিক বিপ্লব এইভাবেই গাঢ়িত হবে।

পূর্ব বাংলার কংগ্রেস

নূতন গঠনভঙ্গি অনুসারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আনু-কূল ভারত মুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান; ভারতের যে অংশ এই মুক্তরাষ্ট্রের বাইরে পড়েছে বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সে অংশ কংগ্রেস'র ভারতীয় কংগ্রেস থাকবে না। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের আমরা বিরোধী; আমরা মনে করি কংগ্রেস নেতৃত্ব এই বিষয়ে বিপ্লব-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এখন হয়েছে, তখন আর এর দোষিতার আলোচনা করে লাভ নেই।

আমাদের প্রত্যেক সমস্ত হ'ল পূর্ববাংলা নিয়ে; পাকিস্তানের পাকিস্তান নিয়ে আমরা সে ভাবে জড়িত বা জড়িত নই। ভারতীয় কংগ্রেস থেকে যদিও পূর্ব বাংলাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তবুও কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠা সেখানে পূর্ণভাবে আছে। আমরা মনে করি পূর্ব বাংলার কংগ্রেস কমিটি, কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব ও বিভিন্ন মেলা কংগ্রেসের কর্তৃত্বভার এক সমাবর্তনে (convention) বসে পূর্ববাংলা জাতীয় কংগ্রেস নামে নিজেদের প্রতিষ্ঠান করতে পারেন, এবং তাতে তাঁদের এতদিনকার জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য এবং তাঁদের এতদিনের লড়াই বরণ ও পান্থনতা সংগ্রামের দায়-দায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে। এ কথা তাঁদের কুলে চলবে না যে আরও কিছু-দুসলমান অন্যতার কাছে কংগ্রেসের একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে। তা বজায় রেখে নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নির্ধারণ করে এদের গণক সমস্ত; অতঃপর কোন ক্রমে এতে যেন এই বৃহত্তর মঙ্গলের পথে বাধা সৃষ্টি না করে।

পূর্ব বাংলার অবস্থা—

জনগণাগণের অবস্থা পূর্ব বা পশ্চিম বাংলায় কোথাও সমানোয়নক নয়। কিন্তু এর মধ্যে আবার পূর্ব বাংলার নিম্ন কিছু সমতা আছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক এখানে এখন অভাব যে বাস্তবের দৈনন্দিন জীবন প্রায় অচল। প্রথমই মনে আসে, কাপড়ের কথা। কাপড়ের অভাবে

ছাঁইনের লেখাপড়া ও পরীক্ষা প্রায় বন্ধ; কাজ কাববার যাহ; পোষ্টঅফিস প্রায় অটল; অফিস-কাছারীর বাজ কোন ক্রমে না চললে নয় বলেই চলছে। বহুদানে ডাকঘরে রেজিষ্ট্রারী করা যায় না,—কারণ রেজিষ্ট্রারীর কৰ্ম নেই। বহু চাপাখানা প্রায় বন্ধ হয়ে আছে; এর কয়েক হাজার কৰ্মচারী ও তাদের কয়েক লক্ষ পোস্তবর্গ আধিকারী হ'য়ে পড়ছে। বুকের সময় ইংরেজ বহু বিজ্ঞাপন দিয়েছে—সভ্যজীবনে কাগজের স্থান সম্বন্ধে। কিন্তু আজ পূর্ববাংলার কাগজ কেবল ভ্রুশাণ্য নয়—প্রায় একেবারে অপ্রাণ্য। অথচ সভ্য সমাজ পূর্ব বাংলার চালু রাখতে হবে।

ডাকঘরে পোষ্টকার্ড ও এন্ডেলাপ অনেক সময়ে থাকে না; চিঠি দাতাঘাতের সময়ে কোন নিশিষ্টতা নেই। ডাক টিকিটের অভাবে হয় বেশী মূল্যের টিকিট লাগিয়ে চিঠি ডাকে দিতে হয়, নতুবা কম টিকিট লাগিয়ে সেবার অপরাধে চিঠি বেরিং হয়ে যায়। পূর্বে বলেছি ডাকঘরে রেজিষ্ট্রারী করার কার্য না থাকায়, বহুদলে রেজিষ্ট্রারী করা যায় না। এমনি করে কোন সভ্য সমাজ-জীবন চালানো অসম্ভব।

আঠা ও চিনি প্রায় দুর্ঘট, কাগড়ও প্রায় তাই। এ সব জিনিস পাওয়া গেলেও সরকারের নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী মরে। সাধারণ ঔষধপত্রও দুর্লভ। রোগে লোকের চিকিৎসা চালানো কঠিন। তার উপর কলিকাতার সঙ্গে লেন-দেনের নিয়মকানুন ক্রমে অটল হচ্ছে। ব্যবসারের অল্প ছোটো খাটো জিনিষপত্র কলিকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া বা কলিকাতার দিকে নিয়ে আসা—বিনু-মুলমান নিবিধেবে বাঙ্গালী বাজীরের পক্ষে খুঁই স্বাভাবিক। কিন্তু আজ শুষ্ক-বিভাগের তালান্দীর ফলে, চোরাই কারবারের অহুবিধা কতটুকু হয়, জানি না; সাধারণ বাজীরের ও গৃহস্থদের হুহুয়াশী ও অহুবিধা হয় অপেক্ষ। হুহুয়াশী পত্র মুদ্রার পার্ণাৰ্য্য এসে সাধারণ বাজী ও গৃহস্থদের আরও অহুবিধার সৃষ্টি করবে।

উডয় রাষ্ট্রই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এমন বাণ্ড যে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বিশেষ সমস্তা দূরবার অবলম্বনের

নেই। আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে উডয় বঙ্গ প্রায় আবিভাজ্য; দুই বিভিন্ন রাষ্ট্র মেলও এত ঐক্য বন্ধে রাখা যায়। শুষ্ক ও ভাবের সংযুক্ততা (customs and postal union) বজায় রেখেও বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে। এমনি দুইটি ইংরেজি বিবল নয়। এখানে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার তৎক হতে এমনি কোন প্রয়াসই হয় নি।

অবশ্য এর ফলে পশ্চিম বাংলার চেয়ে পূর্ব বাংলার সাধারণ লোকদেরই অহুবিধা বেশী হয়েছে। জনতে পাই ভারতীয় মুদ্রার ঐ থেকে নাকি শুষ্ক সংযুক্ততা (customs union) রাখার প্রয়াস করা হয়েছিল; কিন্তু পাকিস্তান তা প্রত্যাখ্যান করেছে। জানি না এই শুষ্কতার মূল কতটা সভ্য আছে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে উডয় বঙ্গের পার্ণাৰ্য্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টায় ও মেল পূর্ববাংলার সাধারণ লোকদের দুঃখ দুর্গণা ক্রমে বেড়েই চলছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ও দুর্মূল্যতা এবং পাট, তপাতী, তামাক প্রভৃতি মুদ্রা-কমলের (money-crop-এর) মূল্য হ্রাসের ফলেই সাধারণ জনতা ও গৃহস্থ পূর্ববাংলার অপেক্ষ দুঃখোগ করছে।

পশ্চিম বাংলার অবস্থা—

পূর্ব বাংলা একটি পথ প্রবেশ। এর মূল রাষ্ট্র থেকে হুপথে ২০০০ মাইল দূরে এবং চলপথে কয়দিনের পথ ব্যবধানে এই প্রদেশ অবস্থিত। পূর্ব বাংলায় প্রায় কোন ইণ্ডাস্ট্রি নেই; এর প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাইরে থেকে আনতে হয়। এর তেমন কোন বড় বন্দর নেই—যার মারফৎ এর ব্যবসার-বাণিজ্য চলতে পারে। কায়েই হঠাৎ স্বাতন্ত্র্য লাভের পর, এর দুঃখ কষ্ট কতকটা অনিবার্য। কিন্তু পশ্চিম বাংলার সমস্তা স্পষ্ট নয়:—মূল রাষ্ট্রের সঙ্গে এর ভৌগোলিক যোগ প্রত্যক্ষ; এই প্রদেশ ইণ্ডাস্ট্রি (industry) ব্যাপারে ভারতের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; তারের মধ্যে প্রায় সব শ্রেষ্ঠ বন্দর কলিকাতা এই প্রদেশে। তদুও

এখানকার জনসাধারণ যে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করছে, তার কোন সম্ভাব্যজনক তৈফিয়া নেই।

পশ্চিম বঙ্গের লোকদের পক্ষে মর্মান্বিত হচ্ছে—
এখনকার মহীশের কার্য-কলাপ এবং উক্তি। আর
এঁদের মূর্খের কথাই বা আরওপে জন-সেবার কোন
নির্জনাই নেই। কংগ্রেসের নামে গঠিত ও কংগ্রেসের
নামে চালিত এই মহী-সভা আর জন-সাধারণের
দুঃখ-কষ্টের প্রতি একটু মহাহুঁকৃতি পর্যন্ত দেখায় না বরং
অনেক সন্দেহ প্রকট করা বলে। এই মহী-সভার
ঈরা প্রধান ব্যক্তি তাঁরা জন-সাধারণের সংস্পর্শ গ্রাহ্যই
এড়িয়ে চলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের যোগ কোন
দিনই তেমন প্রত্যক্ষ ছিল না; আরও কংগ্রেস বা
কংগ্রেস-অনুরক্ত জনতার সঙ্গে কোন যোগ স্থাপন করতে
এঁরা উৎসাহী নন। কিন্তু যে কংগ্রেস মহী এতদিন
কংগ্রেসের সেবক ও কর্মী ছিলেন এবং কংগ্রেসের ছাপ
বাকি দিয়ে কেবল ব্যক্তিগত প্রভাব বা প্রতিভার জোরে
বাক্যের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ তেমন উজ্জল নয়, তাঁরা শুধু
কংগ্রেস ও জনতাকে এড়িয়ে চলতে পারেন না। তাঁরা
আজ যে ভাবায় কথা বলতে শুরু করেছেন, তা কংগ্রেস
মহীশের পক্ষে পরম লজ্জার কারণ হয়ে উঠেছে।
বিশেষ করে হুগলি-বর্ধমানের যে কংগ্রেস মহী আছেন,
তাঁদের অতীত জীবনে যে জন-সেবা ও ভোগবরণের স্পর্শ
ছিল, তাঁদের আজকার কথাই শুধুকার্যে সেই সেবা ও
ভোগের কোন ছোঁয়াচাই থাকে না। জন-সাধারণ এখন
দুঃখ-কষ্টের আবেশন নিয়ে তাঁদের কাছে যায়, তখন
তাঁরা আর ধমকে কথা বলেন। আর কুতের ভয়ের
মতো মহীরা ঐ জনতা-শিককে কমানিষ্টের ভয় দেখিয়ে
ভীত ও ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করেন। আর আর নেই,
বহু নেই; স্বাস্থ্য-খাতি নেই, তেল, নুন, লাকড়ি, কয়লা,
ঔষধ-পাখা—প্রয়োজনীয় ব্রহ্ম সব কিছুই অভাব। কিন্তু
সে কথা বললেই মহীরা ধমকে বলছেন, দাবদান
কমানিষ্টের হাতে পড়ছে কিন্তু; ওরা একবার মরতে
পারলে আর রক্ষা নেই।

দুঃখ শিশুরও একদিন কুতের ভয় ভেঙ্গে যায়,—
বিপ্লবোন্মুখ জনতারও একদিন এই কুমুদিনি ভয় ভেঙ্গে
যাবে। তখন এদের বামিধে গাথা কট্টনি হবে। তাই
আমরাই কংগ্রেস-কর্মীদের সাবধান হওয়া উচিত। এই
অশান্ত জনতাকে বাঁতে ক্ষমতা-লিপ্সু লোক বা হল
বিপণে চালিত করতে না পারে তার অস্ত্র কংগ্রেস-
কর্মীদের সমাজ থাকতে হবে। আমরা যন্ত্রীদের উপর
নির্ভর করার দিন প্রায় বিগত। কিন্তু এরা কংগ্রেস-দলী;
এদের দৃষ্টি যাতে কংগ্রেসের আশ্রয় হ'তে একেবারে
সরে না যায়, তাবতঃ জনতার সম্বন্ধে ও শ্রাব্য দাবীকে
মুখর ক'রে নীচ হ'তে চাপ পড়ি করতে হ'বে। ক্ষমতার
মোহে, পদাধিকার জৌলসে, দীর্ঘকষ্টের জীবনের পর
আমরকার আগমনের লাগলার—এঁরা বিবুধ। নীচ হ'তে
জনতার দাবীর চাপ দিবে যদি এদের দমিত কিরিয়ে
আনা না যায়—তবে কংগ্রেস-কর্মীরা একথাই স্মরণ ক'রে
জনতার নেতৃত্ব গ্রহণ করবে—যাক্তির চেয়ে ভাতি অনেক
বড়; যাক্তি আসে আর যায়; কিন্তু ভাতির পতি চলে
চিরকাল।

जयश्री वारिजात अरुणा—

দৈনিক ও বৈষয়িক দৃষ্টি-বশত ও অস্ত্রাঘ উত্তর বা-সারাই
বহু আছে; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হ'ল জাতির
নৈতিক চরিত্র। অসততার আম আম লোকের সম্মু-
খেই। মুন্সের লম্বা সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে ইংরাজ সরকার
ব্যাপকভাবে অসততার প্রস্তাব দিয়ে জাতির নৈতিক
চরিত্রকে ভেঙে দিবার ব্যবস্থা করত্রে এবং বৈধ
রাজকর্মস্বামী, ব্যবসায়ীরা, স্বেচ্ছাসেবকী গণেরগণ মল এবং
জনমুখের ভিত্তির নিয়ে কমান্ডিও হল এই অগচেষ্টার
ইংরাজ সরকারকে সাহায্য করেছে। আম তারত
স্বাধীন। এক অংশে কংগ্রেস ও অপর অংশে মুসলিম
লীগ—বাংলার কার্য চালাচ্ছে। কংগ্রেস বা লীগ কেউ
ঐ ব্যাপক অসততা নিবারণ করতে পারছে না,—বহু
দিনকে দিন এর প্রকার বেড়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস বা
লীগ যতীবর বিকটেও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে

অন্যতঃ অভিযোগ উঠেছে। মহীবা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কে কতটা অসত আচরণে লিপ্ত বা এই ব্যাপক অন্ততঃ ব্যাধি গ্রহণ করছে, তা থালা কঠিন এবং তা অনেকাংশে অবাস্তব। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে শাসন কার্যের দায়িত্ব বোধের উপর, এই ব্যাপক অন্ততঃ ও এর ক্ষুদ্র প্রদানের দায়িত্ব তাঁরা এড়াতে পারেন না।

আজ শাসন-তাত্ত্বিক হিসাবে বাংলা বিভক্ত হ'তে পারে। কিন্তু বাংলার ও বাঙ্গালীর একো আদমি বিখ্যাত। আর্ম্যানী একদিন বহু বহু বহীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল; অষ্ট্রিয়া ও জার্মানী প্রায় বরাবরই বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছিল। কিন্তু জার্মান সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ঐ শাসন-তাত্ত্বিক পার্থক্য বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নি। আমরা যেন করি এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আজকার শাসন-তাত্ত্বিক বিভাগ বাংলার আত্মিক (spiritual) একাক্যে ভাঙতে পারবে না। ভাত-কাপড়ের অভাব প্রবেশ বা বাট্ট হিসাবে ছুই বাংলার বিভিন্ন হ'তে পারে কিন্তু বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি উভয় বাংলার সমবেত চেষ্টায় আরো মহীমান হয়ে গড়ে উঠবে, এই আমরা আশা করি।

বাঙ্গালী চরিত্রের এই নৈতিক অবনতি তাই আজ আমাদের শঙ্কিত ক'রে তুলছে। জাতির নৈতিক চরিত্র না থাকলে, জাতির সংস্কৃতি ও সাহিত্য—তার মনের সম্পদ কিসের উপর দাঁড়াবে! আজ বোধের হাতে উভয় বাংলার শাসন ভার, তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ—জাতির নৈতিক চরিত্রের এই ব্যাপক অবনতিতে রোধ করার কোন প্রায়শই তাঁরা করেছেন না; বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁরা এতে সাহায্য করছেন। ইতিহাসের নিকট, বাংলার ভবিষ্যৎ সংস্কারের নিকট, তাঁদের এই অপরোধ অক্ষমার ব'লে গণ্য হবে। বাংলার বিন্দু-মুদগমান যুবকদের নিকট আমাদের আবেদন—সমবেত হ'য়ে তারা সফল করুক, জাতির নৈতিক চরিত্রকে গড়ে তুলতে হবে। ইংরাজের স্তম্ভ আমলাতন্ত্র বিশেষে প্রবৃত্ত নীতি অপর্যায়ই আশ্রিত ও চলছে। ব্যতিক্রম স্বতঃ

২১ জন আছে; কিন্তু এই হল সাধারণ নিয়ম। মহীবা নিজেদের কর্তৃত্বাধীন জড়িত হ'য়ে আজ এদের নিঃশ্রুত ও সংঘত বা চাপিত করতে অক্ষম। তাহলেই শাসন যন্ত্রের উপর নির্ভর না ক'রেই যেন বাংলার যুবকগণ—চিন্তা ও মূল্যমান যুবকগণ বাংলার ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে বাঙ্গালীর নৈতিক চরিত্রকে উদ্ধার করার আন্দোলন শুরু ক'রে। জার্মানিতে, চীনে ও অন্যান্য দেশে যুবকগণই এমনি আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েছে;—তারা ইহুদী-খ্রীষ্টীয় উর্দ্ধে উঠতে পারে। জাতির নৈতিক চরিত্রকে ঠিক করতে না পারলে আমাদের অগ্র-বস্ত্রের অভাব কেউ যেটাতে পারবে না। বিবেকানন্দের বাংলার বিভাগপ্রণয়ের বাংলায়, রামনারায়ণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, অম্বিনীহুয়ার দলের বাংলায় এই দায়িত্ব নেবার মতো যুবকের অভাব হবে ব'লে মনে হয় না।

লাট পরিবর্তন

ভারতের সর্বশেষ ইংরাজ বড় লাট লর্ড মাইন্টবাটেন ভারত ত্যাগ করলেন। তাঁর স্থলে বাংলার লাট বা প্রদেশ-পাল—রাফাজী বড়লাট হলেন। বাংলায় এলেন উড়িষ্যার লাট ব্রিষ্টলাস নাথ কার্টজ্জ এবং উড়িষ্যা এলেন মিঃ আসফ আলী। গণতান্ত্রিক শাসনের যুগে লাটের কানা-গোনা নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত হবার নেই। শাসনকার্যে এদের প্রত্যক্ষ কোন হাত থাকে না। তবুও রাষ্ট্রের প্রতীক হিসাবেই এঁদের চলে ও নিয়োগ একেবারে নৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। সে হিসাবে মিঃ আসফ আলির নিয়োগ খুব অনগ্রসর হবে কি না, সন্দেহ আছে। সাম্প্রদায়িক কোন বৃত্তি এর মধ্যে আসছে না; আসছে নিম্নতম ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত দোষ-গুণের বিচার। আমেরিকায় ভারতের রাজদূত হিসাবে তাঁর কিয়দ-কাল ও ব্যক্তিগত আচরণ নিয়ে যে সব সন্দেহ ও অনশ্রুতি এখানে এসেছে, তার অনেকটাই হতে সত্য নয়। তবুও ঐ সব কথা যে সম্পূর্ণ অসত্য এমন প্রমাণও দেখাবার শর্য নি। তা ছাড়া—গুণানে তাঁর কাৰ্যকাল যে ভারতের গণকে সফল ও সার্থক হ'তে নি—তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ

পাওয়া গিয়েছে বিস্মৃতিতে সংঘে কান্ট্রীর আলোচনার সত্তা।

লর্ড ও মেডি হাউস বাউটনের বিদ্যমান সমগ্র দৌলত হিন্দু উপায়ে বিদ্যার অধীনস্থ দেওয়া উচিত এবং ছুটারটা ভাল ভাল কথাও তা'তে বলতে হয়। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে হাউস বাউটনের শাসন নিবন্ধিতভাবে ভারতের নতুন সাধনাই নিয়োজিত হয় নি। এই বিশদ লভ্য বিলাসী প্রথা (toast) বা স্বাধা পানের আয়োজন ক'রে পণ্ডিত জগৎমালা যে সব উক্তি করেছেন—তা সাধারণ দৌলতের নীমা ছাড়াই আত্মিক আত্ম-বর্ণনাকেও সূত্র করেছে। ভারতের প্রধান মহী হিসাবে এই সব অসত্য জোকসাকা তাঁর না বলাই উচিত ছিল। ইংরাজী করে বললে তাঁর উক্তির অনেক অংশকে বলা যায় sickening এবং বাংলা করে বললে প্রকারজনক। পণ্ডিতজী কেবল একটি ব্যক্তি নন; তিনি ভারতীয় আত্মিক মুখপাত্র। কাজেই তাঁর উক্তি উজ্জ্বল, তারল্য ও অতিশয়োক্তি থাকলে আত্মিক আত্ম-সমানে আদ্যত মাপে।

রাজ্যতীর ও কাউন্সিল মহাপ্রের নিয়োগে বিশেষ কিছু বলায় নেই। এঁরা উভয়ে ব্যক্তিগত চরিত্রে ও কর্ম-দক্ষতার—ত্যাগে ও বেশ সেবার জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

পরিষদ সভ্যদের চাকুরিতে নিয়োগ

বাহুদার ঐকমলকর রায় বিলীতে বাংলার লস্যাগ-কর্তা হিসাবে সরকারী চাকুরির নিয়োগ পেয়েছেন। শোনা যাচ্ছে আরও ২১ জন পরিষদ সভ্য এই ভাবে চাকুরিতে নিযুক্ত হবেন। এই নিয়োগের ফলে, পরিষদে যে সব আসন পূর্ণ হবে, তাতে আসনহীন মহীসের স্থান বরাব হবে। বর্তমানে নতুন মহীসের মধ্যে চার জনের পরিষদে কোন আসন ছিল না; আর আর কিছু দিনের মধ্যে এঁদের তিন জনকে পরিষদের সভ্য হ'তে হবে—নইলে এঁদের মন্তব্য গলে যাবে। যদি এইভাবে পরিষদের সভ্যদের চাকুরি দিয়ে আসন-হীন মহীসের প্র

শাসনের ব্যবস্থা করা হয়, তবে এটা খুব উচ্চতর স্বকর্মের অসম্ভাব্য। এর পূর্বে এই মহীসের দিককে কাপড় ও অস্ত্রাত্র হস্তের লাইসেন্স (license) ও পারমিটের (permit) সাহায্যে বহন-তোষণের অনেক অভিযোগ প্রকাশিতই হয়েছে। তার কোন সন্তোষজনক ফৈকিহ মহী সভ্য থেকে আশঙ্ক্যই নি। কাজেই এই নতুন অসম্ভাব্যের অভিযোগ সহজেই লোকে বিশ্বাস করবে।

পূর্ব বাংলার আশ্রয় প্রার্থী

লক্ষ লক্ষ নরনারী ব্যক্তিদের ছেড়ে পূর্ব বাংলা হ'তে পশ্চিম বাংলায় এসেছে। এই ভাবে খুব ও-বেশ ছেড়ে চলে আসা আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু যারা চলে এসেছে, তাদের লম্বা ভাংত সরকার ও পশ্চিম বাংলা সরকারের বিশেষ একটা কর্তব্য আছে। পশ্চিম পাঠ্য, উত্তর পশ্চিম নীমাত্ত গ্রহণ ও কিছু থেকে যে সব লোক ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রে এসেছে, তাদের লজ্জা যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ভারতীয় সরকার অহত্ব করে, পূর্ব বাংলা হ'তে আগত আশ্রয়হীন লোকদের প্রতিও তাদের ঠিক তেমন দায়িত্ব আছে। ভারতীয় সরকার নীতি হিসাবে এই দায়িত্ব স্বীকারও করেছে। এই দায়িত্ব পূরণের লজ্জা টাকার ব্যয়ও তারা করেছে। কিন্তু এই কাজের ভার দিয়েছে পশ্চিম বাংলা সরকারের উপর। তারা এই ব্যাপারে যা করছে, তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ সর্বত্র। অবশ্য, আমরা জানি এই ব্যাপারে লেখকজনকভাবে কোন ব্যবস্থা করা কঠিন। পশ্চিম বাংলা মহী-সভায় এমন কয়েকজন মহী আছেন, যাদের মত ও মনোভাব পূর্ব বাংলা হ'তে আগত লোকদের প্রতি আদৌ অহত্ব নর। আশ্রয়প্রার্থীদের তার পাড়ছে এমন একজন মহীর উপর, যিনি নিজে ঐ মনের অধর্গত। কাজেই এই মহী-সভার কাছে হতে খুব কিছু আশা করাও লজ্জা নর।

সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা মহী-মণ্ডলী জানিয়ে দিয়েছে যে ২৫শে জুনের পর আর কোন আশ্রয় প্রার্থীর নাম রেজিস্ট্রিকৃত করা হবে না। এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার কি উদ্দেশ্য জানি। কিন্তু ভারত সরকারের কি

এমন কোন দিন তারিখের নির্দেশ আছে? অটনগত এই প্রশ্ন ছাড়াও, যারা মাঝে মাঝে বাড়ি ঘর ছেড়ে নিরাশ্রয় হয়ে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে ভারত সরকার পান্থিক স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের সম্বন্ধে ধান-খেয়ালীভাবে দিন-কণ নিশ্চিৎ করা ক্রমবহীনের পরিচায়ক। যারা কংগ্রেসের নামে মহিষ চালাচ্ছেন তাদের পক্ষে এমন ক্রমবহীনের আচরণ সম্ভব নয়। আশ্রয়প্রার্থীরা এখন ঘলে ঘলে ডিঙি করবে—তখন এই সব মন্ত্রী কি করবেন? এই বিজ্ঞপ্তির মধ্যদ্বারা কি তাঁরা তখন রক্ষা করতে পারবেন?

ভারত মুক্তরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্য—

গত বছর এই জুলাই ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য মন্ত্রীদ্বারা স্থাপিত হয়। এর মধ্যে বেঙ্গলস অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত গিয়েছে লীপ সহযোগিতার সঙ্গে জগড়া-বিবাদে। ১৫ই আগষ্টের পরও বেশ কিছুদিন গিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান হাতে হিন্দু ও শিখ উদ্বার আশ্রয়-প্রার্থীদের ব্যবস্থা করতে। ভারত সরকারের সব বিভাগ ও মন্ত্রণালয় এই সব নিয়ে এমন বিস্তৃত ভিল যে সরকারের স্বাভাবিক কার্যক্রম প্রায় বন্ধই ছিল। তারপর এস—কান্ট্রি অস্তিত্ব। এই সব নানা কারণে ভারত সরকারের কার্যক্রম ক্রমাগত পর্যন্ত ঠিকভাবে চলতে পারে নি। তবুও ভারত সরকারের অন্তত একটি মন্ত্রণ এই ক্রমবন্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে;—গেটি হ'ল মন্ত্রণার প্যাট্রলের অধীন দেশীয় রাজ্য মন্ত্রণ।

এই এক বছরে দেশীয় রাজ্য মন্ত্রণ কি করেছে, তার বিবরণসহ ভারত সরকার একখানা বেড-পত্রিকা (White Paper) প্রস্তুত করেছে। প্রায় সব দেশীয় রাজ্যই ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিয়েছে। বহু রাজ্য প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্ব প্রদানের অধীভূত হয়েছে; কতক রাজ্য একসঙ্গে একত্র হয়ে একটি আঞ্চলিক শাসন-সংস্থা করেছে। ছোট্ট বাগার মূণে ইংল্যান্ড দেশীয় রাজ্যসমূহের পরমর্শদা বহু বাড়িয়েই দিয়ে যায়। ছয় শতের উপর ছোট ছোট রাজ্য;—সবাইকে সার্বভৌম

ও স্বাধীন রাষ্ট্রের পরগৌরব ইংল্যান্ড দিয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভারতের স্বাধাতিক ঐক্য এই সব রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র সত্তার বিলোপ সাধন করেছে। এই কাজ তিনটি পৃথক পৃথক সাদিত হয়েছে।—

(১) কতক ছোট ছোট রাজ্য পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

কোন প্রদেশে কি পরিমাণ রাজ্য এই ভাবে যুক্ত হয়েছে—তা নীচে দেখানো হ'ল।

	রাজ্যের সংখ্যা	কত বর্গ মাইল	লোক সংখ্যা	রাজস্ব (লাখ টাকা)
উড়িষ্যা	২০	২০৮০৭	৪০.২ লক্ষ	২২৫
মধ্য প্রদেশ	১৪	৩১৭৪০	২৮	৮৮৫
বিহার	২	৬২০	২	৬২
মাদ্রাস	৩	১৪৭৭	৪	৩০৫
পূর্ব পাকিস্থ	৩	৩৭০	৮০ হাজার	১০৫
বোম্বাই	১৭৪	২৩২৪১	৪৪ লক্ষ	৩০৭
মোট	২১০	৮৩৭৭৪	২০০	৪৪১৮৪

(২) কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য একত্র হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নূতন শাসন উনিত (Unit) গঠন করেছে।

হিমালয় প্রদেশ	২১	১০৮০০	২	৮৪'৪৬
কচ্ছ	১	৮৪৬১	৪	৮০
	২২	১০৮৬১	১৪	১৩৪

(৩) আর কতক ছোট ছোট রাজ্য এক সঙ্গে হয়ে এক একটি নূতন প্রাদেশিক পর্যায় লাভ করেছে। এদের বিবরণ নীচে দেওয়া হ'ল।

মৌরাট্ট	২১৭	৩১৮৮৪		
মৃত্ত	৪	১২৩৬		
রাষ্ট্রশাসন	১০	২২২৭৭		
মধ্য ভারত	২০	৪৬২৭০		
পাতিয়ালা ও				
পূর্ব পাকিস্থ	৮	১০১১০	৩৪'৩৪	৪০০
	২২১	১৪০৮০০	৩৭'৩৪	২০১২'৪৪

ইহা তির কয়েকটি বড় বড় রাজ্য আছে—যথা,

ভারতীয় লীগের মতামত বলেছেন—মাইটব্যাকটন অতি তাড়াতাড়ি এবং সব বাধ্যতা না করে ভারত বিভাগ কলেন এবং এর পর যে ব্যাপক দাঙ্গা ও নরহত্যা চলল তা প্রতিরোধ করতেনই নি এবং পরোক্ষভাবে এতে সাহায্য করেছেন। মাইটব্যাকটনকে সর্বজন ক'রে নোয়েল বেকার বা বলেছেন তাতেও এ কথা স্বীকৃত হয়েছে যে যখন সমস্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা ও সার্বভৌমতার হাতে, তখন ব্যাপক নরহত্যা ও লুণ্ঠস্বার রোধ করার ক্ষমতা তিনি যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেন নি;—তিনি কতকটা উদারমণি প্রকারে নতুন দাতা গুটিয়ে ব'লে ছিলেন। সার্বভৌমত্ব নিয়ে এমন সমস্ত চূপ ক'রে দল বাধা ওলুতের অগ্রাধ। এমন ক'রে দাতা গুটিয়ে ব'লে দাতা ইংরাজ শাসনের ঐতিহ্য নেই। এর একমাত্র তুলনা পাওয়া যায়—বাংলায় ব্রিটিশের সময় লিনলিথগোর নির্মম উদারমণি। তিনি তাঁর লাটসাহেবী খানা-পিনা, বিলাস ও আদেয়ে নিজেই মগন হয়েছেন; একবার বাংলায় এলেন না পর্যন্ত—যদিও তখন প্রায় ৪০ লক্ষ লোক বাংলায় মাছের সই হুজিক মারা যায়।

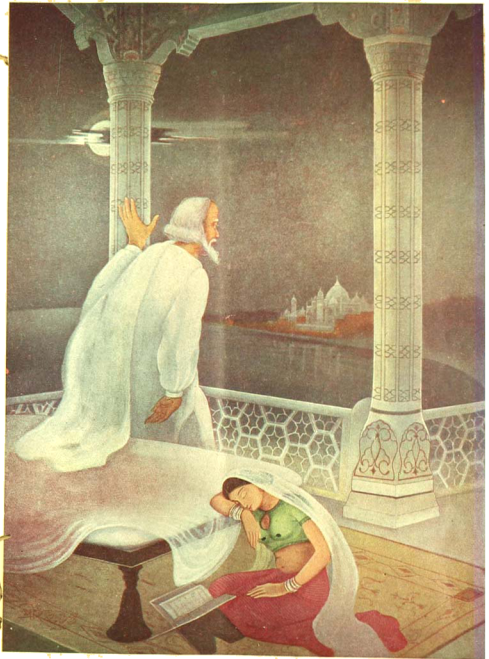
সমাজতান্ত্রিকদের পরাজয়

মুক্তপ্রদেশে ১৪টি উপনির্বাচন হ'বে গেল। কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে সমাজতান্ত্রিকগণ এই আসনগুলির অধিকারী ছিল। এরা যখন আসায়া হল গঠন করল, তখন পরিষদের সভাপন থেকে এরা ইস্তাফা দিল। কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে এরা নির্বাচিত হয়েছিল; কংগ্রেস ত্যাগ করার সঙ্গে ঐ সব পনও ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু কেবল এই উচিতবুদ্ধি থেকেই যে এরা এই সব সমস্তপন থেকে ইস্তাফা দিয়েছে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। এদের মনে ধারণা ছিল মুক্তপ্রদেশে এদের প্রভাব যুগ বেনে, তাই পরিষদ থেকে পদত্যাগ করলে যে পরিবাচন হবে তাতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি ও সামর্থ্য কতটা তা পরীক্ষা করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

কয়েকমাস পূর্বে মুক্তপ্রদেশে এরা লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে কংগ্রেসের কাছে মার পেয়েছে হয়েছে। ১১০০ আসনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিকগণ ৭০টি আসনেরও কম পেয়েছিল। এবার পরিষদের উপনির্বাচনে ১৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের উপর এরা একটি আসন পেয়েছে। কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়ন পক্ষে কি তুল জট ছিল, সেই জট তা নাড়চ হয়; সেই সুযোগে সমাজতান্ত্রিক প্রার্থী একজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে। আর সব কংগ্রেস আসনই এরা হারিয়েছে এবং কংগ্রেস প্রার্থীরা পেয়েছে।

সমাজতান্ত্রিকদের এই পরাজয় বিশেষ উদ্বেগবোধ্য। মহীশওলীর গোষ্ঠী-জট বহু আছে; বহু ব্যাপারেই জনসাধারণের বহু আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। আদম সেপে আর বস্তের অভাব বিস্তর। এর কলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা মনোভাব গড়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও যে জনসাধারণ কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকেই নির্বাচিত করেছে এতে ভোটদাতাদের সাধারণ রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এরা জানে যে কোন ছাঁক ময় দিয়েই আর মহীশা অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর করতে পারে না। কিন্তু কংগ্রেস সেই দিক চোঁকা করছে এবং আর্থিকতার সঙ্গেই করছে। তাছাড়া এত বছর কংগ্রেস যা করেছে, তাও এরা কুলতে পারে না। কংগ্রেসের এতদিনের সেবা ও স্বাধের কথা তুলে, আর সমাজতান্ত্রিকদের কীকা কথায় আস্থা স্থাপন করতে এরা পারে নি।

মুক্তপ্রদেশের উপনির্বাচনের এই শিক্ষা আশা করি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রচার বিস্তার করবে। আচার্য নরেন্দ্র দেবের মতো লোক নিছের বাগদান, যে পহরে সেই পহরে এবং নিজের পূর্ব নির্বাচন কেন্দ্রে এক প্রায় অখ্যাত বাহিরের প্রার্থীর নিকট পরাজিত হলেন—এর গুরুত্ব অবহেলা করা উচিত নয়। অপরদিক কংগ্রেস মহীশেরও বলবৎ, এত জয়ের কলে তাঁরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও ঘোষণার কথা যেন তাঁরা বিশ্বাস না করেন।



— ইন্দিরা —

একাদশ বর্ষ

শ্রাবণ—১৩৫৫

চতুর্থ সংখ্যা

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ বাহুগোপাল মুখার্জী

প্রারম্ভিক কয়েকটি কথা—

ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস লেখার কথা আমাদের ভিতর উঠেছে অনেক দিন থেকে। কেনে একজন কেউ এই ব্রতকে পূর্ণরূপে উদ্ভাষন করতে পারেন না। গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে সকলের সব কথা জানা সম্ভব নয়। কয়েকজনের সমবেত চেষ্টার লে কার্ণা সম্পন্ন হতে পারে। মাল মসলা হারি বিয়ে চাই, পরবর্তী কালে কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক তা কাজে লাগাতে পারেন। আমাদের তিনটি বিশিষ্ট বন্ধুর অজুহাতে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি। প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন স্বর্গীয় সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। চম্পন পরগণার মজিলপুরে বাড়ী। দেশহিতব্রত, আত্মগোপনকারী, বিপ্লবী কাজে অনন্ত-মন, সর্পানহাতি সমচিত্ত—আমার প্রথম অধ্যয়ন বন্ধু সাতকড়ি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমাদের গেরিলা যুদ্ধে প্রয়োজনে লাগতে পারে দ্রুত প্রকারের ম্যাপ বা নকশা তার প্রাণে সজ্জালাই তিনি সংগ্রহ করে এনে দিবেছিলেন। মেলে দস্তাবর পেছেন তিনি ছিলেন সর্বজন প্রিয়। কংগ্রেস গঠন প্রতিভা দেখা গিয়েছিল তাঁর হস্তে। নিজে গেছে বীপ; কিন্তু আত্মদান তার অসামান্য হয় নাই।

১৯৩৭ সালে সেউলি বন্দী নিবাসে গেছে তাঁর নব্বয় বৈধী। তাঁর সময় স্মৃতি চিরদিন আমাদের মনে ভাগ্যকর থাকবে।

সাতকড়ির অতুরোধে লেখার একটা সংক্ষিপ্ত কাঠামো তৈয়ারি করেছিলেন। আজ সে কাঠামো আর কাজে লাগাতে পারা গেল না। লেখক ও লিখিতবোর দ্বারকের মধ্যে উৎসাহের ভেলের ব্যবধান তুল্যজনীত।

দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার সোহরবদ হুসান



দস্ত। মেলে তাঁর মান ছিল “ব্যাঘা”। সন্তোষ পক্ষীর বড় কর্তায়া নিজেদের অভাবের কারণে স্বভাবতঃ মিট

যেভাবে কৃপেনের ব্যাভ্যচরণে স্তম্ভিত ও কণ্ঠিত হয়ে উঠত। ১৯২৩-২৪ সালে বাবুলার বহু কন্যাকে বিশেষ আটনে বিনা বিচারে আটক রাখা কালে বর্ধা মেল থেকে সে ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় বে বিবৃতি শুন্ত উপায়ে দেশবন্ধু ও গভিত মতিলালসহ নিকট পাঠাতে গেরেছিল, তা পড়েই মহাত্মা গান্ধী নিঃশব্দে হয়ে যান যে শুধু বরাদ্দ মলকে পশু করার মনসে কৃষ্ণি সত্যকার ঐ গহিত নীতির অঙ্গসরণ করে; কৃপেনের গনির্ভে অহুঃখঃ এডার আদার পক্ষে হুসর ছিল। তবু সেবার সময় অসেনি মনে করে, লিখতে গভিমনি করছিলাম।

আর একজন বে আদার হাতে কলম গুঁজে লিখিয়ে ছেড়েছে সে হচ্ছে আদার অহুঃখের মত ব্রিহান নারায়ণ চন্দ্র লাচড়ী।

১৯৩০ সালের আন্দোলনে ছাত্রশক্তির একজন লক্ষ্যলক্ষ্যে কাজ করার নাগায়ণ আট বছর জেল খাল করে। ঘানীটানা কছলী থেকে বিশেষ পর্যায়ের কয়েদীরূপে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে বহুবিধ অটিল রোগে তাঁর স্বাস্থ্য স্বাধ। ডক করে সে রাঁচি আসে। এখানে আনন্দের এককম কানাই-বলাই হয়ে গেছি বললে খুব বেশি অত্যাতি হব না।

বাইরের রোগী-ভাকার সম্পর্ক ১৯৪২-৪৫ সাল পর্যন্ত বিহারের জেলের বজায় রাখতে আনন্দের পেরেছি। এরই ভেতরে নারায়ণের জিৎ। তার কলমে বইখানি আভ্যোপায় সেবার অহুঃখের মোটামুটি বজায় রাখতে পেরেছি। সেও এই সেবার এক অতুতপূর্ণ আনন্দ।

সেবার স্রুটি অনেক। নিবেদের কথা মনের মত গোপন রাখবার চেষ্টায় মেধা প্রায় বহুদূর পরোক্ষভাবে হার মানাবার ভোগাড় করেছিল। দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসে, জেল জীবনে, পাহারত ও বরণে সারাছে এসে পড়ায় সে মেধা হান হয়ে পড়েছে; স্মৃতিশক্তির আগের দিনের সে প্রাণবী আর নাই। অনেক কথা কুলে গেছি। জীবনে এত বৈপরীত্য বিরাজ করছে যে আগের সঙ্গে শেষের অস্বকৃতিগুলিকে মিলিয়ে বলতে পারি—যখন বসবার অনেক কিছু ছিল তখন বজার দিন পাই নাই; যখন

বজার দিন পেলায় তখন বজার অনেক কিছু হারিয়েছি। লিখতে বসে দেখি পূর্বের পত্রিতে গুটী ধরেছে।

এই একই কারণে বক্তব্যগুলি কোথাও কোথাও খাধাবাহিত পারস্পর্য রক্ষা করে প্রকাশ লাভ ~~করেনি~~। তবে উপাধান রেখে থাকি—এই তরলয় লিখতে লাহদী হলাম।

কয়েকটি ব্যক্তি ও বিষয় যা স্মৃতির তাড়ার ঠেলে উপরের ঘরে এনে চিহ্নানোতকে তরলয়িত করছে সেগুলিকে এইখানে লিপিবদ্ধ রাখছি। এখানে পূর্বাঙ্গর সঙ্গতির কোন নিয়ম পালন হয়ত হচ্ছে না। তবু “বে আসছে তাকে আসতে হাও” এই প্রথানবাক্যকে অঙ্গসরণ করছি।

আমার রাজনৈতিক জীবনে কিছু বড় বস্তুয়ের আদ্যন্তক ঘটনার আশা আমি কেমন পূর্নাচ্ছেই ধরতে পারতাম। তবিত্ত্বখানীর মত আমার কথাগুলি খেটে গেছে। এই দুই শালার সর্পন নিয়ে আমি কর্তব্য-তালিকার পরিষ্করনা করতে ভালবাসতাম। ফলে হত অস্ববিধা বা অঙ্গ রকম।

আমি যখন বে নব নীতি অঙ্গসরণ করতে বলতাম সে সময় আমার সময়ক জুটত কম। যখন আমার কথা ঠিক প্রমাণ হত, ততক্ষণে আমায়ের প্রস্তুতির আবত্কততা চলে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আমার দায়বা ও তবিত্ত্ববাসী ঠিক ঠিক খেটে গেছে। কিছু এগুলি থেকে আয়ত্তা লাভ গুটীতে সেরকম পারি নাই।

গোড়ার আমায়ের অভিজ্ঞতা নাই। সেজন্য একটা দুর্বোধ্য ধরা পেল না। আমার অভিজ্ঞতা যখন হল তখন তার হঠাৎগের সুবিধা হইল না। এইরূপ ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আয়ত্তা চলে এসেছি। কিছু স্মৃতি ভাগ্যবিধাতা একজন আছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্মৃতি বজায় রইল। তিনি স্মৃতিয়ে ছাড়লেন চলার কুল-ভাষি, ভাগ্য-বিপর্যয়, প্রায় পুণ্ডা-সর্কনাসের দিয়ে আমার মনের অঙ্গগতির পথ পড়েছে। পর্যন্ত পূর্ণরঙ্গ অবস্তারবী। এ রকমভাবে জীবনে

চলে এলেও “বর ভাগ্য মানি” এমন কিছু কিছু ঘটেছে। সেই কথাই বলছি।

হুগান্ডর ও অমুইলন দলের কথা। হুগান্ডর নাম কি করে এল? তবে হতে এল? এই এক মহাশয়ত্ব। আবার ১৯৩৮ সালে খবরের কাগজে ইতাল্যের নিয়ে বল তুলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ হুগান্ডর নামটা কালমধ্যে বিলীন করা হয়। কোন কোন ভাই গেল্ড আমায় কৈলিং ডলব করেছেন। তাঁদের দেয়কম অবিকার আছে বীকার করি। আবারের ছিল ভালবাসার সংসার। কর্তব্য নিয়ে কাড়াকাড়ি ছিল না। কর্তব্যের মত লালসিত কাউকে বিশেষ বেধি নাই। পেটা ছিল সর্বভাগের হুগ। বোম্বাতাকে বরাবর আসন ছেড়ে দেওয়া হত।

এখন কালের কথা আর আগা থাক। ঠিক ১৯১০ সালে সরকারী দপ্তরে “হুগান্ডর গুপ” নামটা পাওয়া যায়। হাওড়া-বড়বর মামলার সর্বপ্রথম এই নাম প্রচলিত হয়। এই মোকদ্দমার সরকারী মন্তব্যে আসামীরের ভিন্ন ভিন্ন বাক্য ভাগ করা হয়—যথা, “ককনপুর গুপ,” “হলুদবাড়ী গুপ,” “রামলাহী গুপ,” “বিবপুত গুপ,” “বিধিরপুর গুপ,” “ছাত্রভাণ্ডার গুপ”। কর্তাদের উদ্দেশ্য ছিল যেমন করে হ’ক কিছু লোককে জেল খাটিয়ে দেওয়া। সত্যি এ রকম “গুপ”-ভাবে বল ছিল না।

হুগান্ডর কাগজ নিয়ে ধরা থাকতেন তাঁদের বাকটা। “হুগান্ডর গুপ” নামে অভিহিত হয়েছে দেখা যাচ্ছে। গোড়ার হুগান্ডরের স্থাপতি ও পরিচালকতা যে বড় মামলার পড়লেন তার নাম ছিল “আলিপুর বোমার মামলা”। সে সময় “হুগান্ডর গুপ” নামে কাউকে আদালতের কাঠ-গড়ার দেখা যায় না। কিন্তু হাওড়া-বড়বর সময় আসামীরের মধ্যে ছিলেন তারানাথ রায় বিহারী, কেন্দ্র যে। এঁরা সরাসরি হুগান্ডর কাগজের লোক। এক সময় তারানাথ হুগান্ডরের সম্পাদক ছিলেন। আসলে হুগান্ডরের স্থাপনিতা অরবিন্দ, বারীশ্র, বাবী দিল্লিশ প্রমুখ।

ওই যে দেখা যাচ্ছে “হুগান্ডর”কে বলীর প্রচারণা

করার মত সরকার তাদের ত্রিগণ টিক রাখতে এক শ্রেণীর দেশকর্মীকে “হুগান্ডর বল” আশা দেন। এই বিশেষভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্দোলনের সময়ে সংঘ-শক্তিকে ঐ আশা। তারা দিয়েছিল অমুইলন থেকে গৃথক করে দেখার সূত্র-ভবি থেকে। হিন্দু নামের মত হুগান্ডর বল নামটা অপরের দেওয়া। কর্মীর নিজের ওরকম নাম-করণটা গোড়া থেকে করেন নাই। কিন্তু লংঘের গৌরবময় ইতিহাসে পরবর্তীকালে নামের ওপর লংঘের সংসারের মাথা পড়ে যায়।

কথার বলে নামীর চেয়ে নাম বড়। কিন্তু এখানে কিছু কিছু লোক ছিলেন যারা নামের চেয়ে চেয়ে বড় ছিলেন। গোড়া থেকেই এই বলে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট বেশী। এই দলের একটি বিশিষ্টতা—এঁরা শিক্ষা বিরাগী তো ঘোটেই নন, বরং বিজ্ঞানপন্থী।

সারদীর সংখ্যা “সাদীনতা” (১৯৪৪ সাল, ইং ১৯৪৭; পৃ: ৪১—৪২) একটি চিঠি প্রকাশ করে। সে চিঠিখানি ১৯৪৪ সালে বাঙালার গৃহযুদ্ধের কৈশি গো-নোডোবে তরানীতন বড় লাট ওয়াডেলকে লিখেছিলেন। চিঠিখানির বন্ধুত্ববাদের কিংবদন্তি এখানে দেওয়া হল।

“বারীশ্র হুমার ঘোষ ও অরও কয়েকজন মিলিত হইয়া “হুগান্ডর” পত্রিকা প্রকাশ করেন। গুপ সমিতি গঠন করিয়া হিন্দু যুবকদের আধুনিক মরণ্যাত্ত তৈরী ও ব্যবহার সেখানে থাকেন। তারা প্রচার করতে লাগলেন—যুটিশ এ দেশ শাসন করছে ছল আর বলের মাধ্যমে এবং তাদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।……এই হুগান্ডর বল ডবল শক্তিশালী সংগঠনিক সমিতিতে পরিণত হয়। বাংলার অগ্রাঙ্গ বলজলিৎ মধ্যে এতদ প্রাধান্যে ভীষণী যুবক দেখা যায় না। এই বলের মধ্যেই ছিলেন যুটিনেব সভাপতির চরিত্র শ্রুতি।”

হাওড়া বড়বর মামলার সরকার এতগুলি গুপের বা বীকের নাম করেছিল কিছু না কিছু লোককে যেন শক্তি দেওয়াতে পারে এই মন্তব্যে। অর্থাৎ কাগজ না কাগজ বিকল্পে অভিযোগ প্রমাণ হবে এই ভেবে। সত্য কথা

বলতে গেলে এর মধ্যে অমিত্রাংশ লোক ছিলেন কলিকতা) অহুইল সমিতির সভা। এবং “হুগাবর” ছিল সকলের উল্লিখিত প্রচারসম্মত।

ঐতিহাসিক তথ্য বলে, সর্বাঙ্গের একটি মাত্র বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। তার নাম অহুইল সমিতি। সকলে তার সভা ছিলেন বা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১২০৭ সালে সরকারের চক্রান্তের প্রতিবাদ-রূপে উপায় নিয়ে ব্যস্ত হন। তখন সারা বাংলায় একটি মাত্র অহুইল সমিতি ছিল। তার প্রধান কেন্দ্র কলিকাতায়। মিত্র সাহেব (ব্যাট্টার পি. মিত্র) ছিলেন সলারক বা ডিরেক্টর পুর্ন বাবু (পুর্ন মাল) পূর্ববর্তে এই সমিতির সংগঠন ও সংকল্প এমনভাবে সকল করে তোলেন যে তাৎক্ষণিক হন। এখনই “হুগাবর” নিয়ে বার্ষিক বাৎসরিক লক্ষ্য মিত্র সাহেব একমত হতে পারেন নাই। তিনি আরও ভাল করে সংগঠন গড়ে তোলেন ও অহুইল সমিতির করার পক্ষে ছিলেন।

এই বছর থেকে “হুগাবরগ্রুপ” বা হুগাবরের স্বাক্ষর আলাদা করে নতুন করে। স্বাক্ষর কথাটি বলায় এই ক্ষেত্রে যে কিছুদিন আগে বার্ষিক বাবু মুদ্রারপত্র আঁকড়া বা সমিতিতে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। পোনা মাত্র ওয়া এই সময় হুগাবর কাগজ চালানোর তত্ত্ব বিশেষ কিছু করতেন না। কবিতার অনাথ রায়, অতীত বহু নরেন শেঠ প্রভৃতির সাহায্যে এবং বিরুদ্ধত মুখোপাধ্যায়, নিমিল রায়, কান্তিক দত্ত প্রভৃতির কথ-পত্নিতে কাগজ চলতে লাগল। এদের তখন কোন কোন দোকান বলত “হুগাবর গ্রুপ”।

১২১০ সালে বাঙ্গালার দেশসেবীদের ইতিহাসে রেকর্ডা ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে। এই বছরে “হুগাবর গ্রুপ” সরকারী নামকরণের মাঝে পাকাপোক্তভাবে বেশি যায়। এদের অহুইল সমিতি থেকে—সারা বাঙ্গালার একমাত্র অহুইল সমিতি থেকে—বিচ্ছিন্ন করে দেয়ান হয়। এই বছরে ঢাকা বড়বর মামলায় পুর্ন বাবু প্রচার হন। বড়বর দত্ত আখতার শেখের অনুপ্রাণিত সলারক মিত্র সাহেব মাঝার পিতা ছিঁড়ে পরমাণবে গমন করেন। তিনি চলে

গেলেন। পুর্ন বাবু কারাককে। সমিতি তো ইতিপূর্বে ১২০৮ সালে ভিসম্বর মংল বে-আইনী ঘোষিত হয়ে প্রচার ভাবন থেকে উঠে গিয়েছিল। মিত্র সাহেবের অহুইল চুই বঙ্গের যোগদান নষ্ট হয়ে গেল। এরপর ঢাকা অহুইল সমিতি নামটা বেছে উঠল।

ভেলে বাঙালি পুর্ন পর্ষদ পুর্ন বাবু অভ্যন্তরীণ স্বাশুপ্ত ও ভূগণ নগের সহযোগিতায় যে গঠনপত্র, নেতৃত্ব এবং বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তার কৃতি প্রমাণ। কলিকতা থেকে প্রমাণ করা হয় না।

১২১১ সাল থেকে বাঙ্গালার বিদ্রোহের অবসান ও অহুইল সমিতির আলো ছেলে রেখেছিলেন বলে আমি নতুন-গড়া অহুইলনের প্রাথমিক বা প্রাথমিকীয় আরও বেশী করে। ১৮-২৪ বছর বয়স কবেকজন যুবক ছিলেন এর সারথি। হতে পারে তারা বিদ্রোহ ছিলেন না, অর্ধ সম্পন্ন ছিলেন না, অস্তিত্বের সত্য করতে পারেন নাই, জনসাধারণে অপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কি প্রাণে আত্মবিশ্বাস ছিল তাদের! সত্য বিদ্রোহ নিয়ে বেশ স্বাধীন করার বেশার মশগুল।

বাঙ্গালার লাই কেদ্র সাহেবের সেই চিঠিখানা থেকে অহুইল সমিতি কিছু উদ্ধৃত করছি।

“এ ছাড়া আরও দল আছে, উদ্যোগের উদ্বেগ ও কার্য পদ্ধতিও অস্বাভাবিক। এদের মধ্যে অহুইল সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের প্রধান খাঁচা ঢাকায় এবং এই সমিতি প্রদেশের সবচেয়ে বিপ্লবনক সংগঠন। ইহার শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমতা আছে। এদের সভ্যও অনেক, বিভিন্ন প্রদেশে এদের শাখা-প্রশাখা আছে। এই দেশের বহু সভ্য বিভিন্ন বড়বর মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন। তা ছাড়া বিশেষ আইনের বলে এদের অনেককে আটক করে রাখা হয়েছিল।”

নব অহুইল আলাদাভাবে পরিচিত হলেন পুর্ন নতুন প্রচার পত্র দিয়েও। “হুগাবর” নাম না রেখে তারা তাদের কাগজের নাম রাখলেন “স্বাধীন ভারত।” বরিশত ও “স্বাধীনতা”, “অস্বাভাবিক”, “বিশেষ প্রতিজ্ঞা” তুলে দিয়ে সভ্য করতে লাগলেন, অহুইল নাম ব্যবহার

বন্ধ করলেন, অগ্নির ঠাঁয়ের চিনবার অন্ত ঢাকা-অস্থূলন বলতে লাগল।

১৯১৩ সালে নেতাজী হুভানচেন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় কলকাতার মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মেডিকেল

আজ্ঞা ছিল। উদ্দেশ্য মহৎ। ভবিষ্যৎ দেশতর্কীর সংখ্যা বাড়ানো। হরেশবাবু হুভানচেন্দ্রকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। নেতাজী তখন কটক থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছেন।



নেতাজী

ছাত্রদের একটি ঘেঁষে। ডাঃ হরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি ছেলে দ্বারা

১৯১৬ সালে, বোম্ব হব মার্চ মাস হবে, আমি গা-ঢাকা অবস্থায় কলকাতায় ছিলাম। সরকার আমায়ের

নামে চ্যুতিকে হলিয্যে নটকে লিখেছে এবং আমাদের ধরে লিখে পুস্তকের সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে।

এইরকম সময়ে একদিন কুমল্যদেব চাংসের প্রতি অসভ্য ব্যবহারের জন্য অন্যতম সমুদ্র নেতাও প্রফেসর ওটেনকে উক্ত-মধ্যম লাগিয়ে দিয়েছেন। ইচ্ছা হলে নিজে গিয়ে এসেই অভিনবিত করে আসি কিন্তু অসভ্য পড়ে কোন একটি লোক মারফৎ অভিনবন পাঠাই। তারপর আমি কলকাতা থেকে চলে যাই।

পরে নেতাজীরা সঙ্গে সাফাং হর অসভ্যেণ আলোচনের সময় আনন্দের তখন মনে হত এই দুইক দেশবন্ধুর পরে একদিন বাংলার প্রকান্ত-আন্দোলনের নেতা হবেন। এর ভিতর অনেক গুণ ছিল। বেঙ্কা-সেবকের নেতা হয়েও সাধারণ বেঙ্কা-সেবকের মত ইনি চলতেন। ঠিক এই গুণটিতে আতীর সেনাবাহিনীর মধ্যে ১৯২০-৪৫ সালে তিনি “মনোহরণ” হতে পেরেছিলেন।

তার মারস, এগিয়ে চলার যোগ, প্রত্যাশামতি ছিল অসাধারণ স্বভাবের।



দেশবন্ধু

১৯২০ সালে তিনি দেশবন্ধুর প্রতিনিধিত্ব আদ্যদের সঙ্গে কথা বলতে এগে আমি তাঁকে বিপ্লবী ও অ-বিপ্লবী দুটো পনের কথা, অরণ করিয়ে দিই। তিনি বলেন,

“দেশ বন্ধুকে সাহায্য করন। তারপর আমি আপনাদের পথে আসব।” দেশবন্ধুকে আমরা সাহায্য করেছিলাম, বরাতা পাটি তবী হর আমাদের সহোদার। দেশবন্ধুর ছিল অসামান্য প্রতিভা। তিনি বাংলা কংগ্রেসে খান করে নিয়ে সারা ভারতে অসী হলেন তিন মাসের মধ্যে।

এরিক বহুবার টাটে চেতী থেলে আমাদের আত্মতার হুতাংগার বাতায়ত বাততে লাগল। বিদ্য যে চতুর্থ - ছাত্র, কৃষক, মজুর ও সৈন্য নিয়ে—এই তত্ত্বটি তাঁর এখানেই অবিগদা হয়। কুপতি মজুরদার, উপেন্দ্র নাথ বক্ষোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চেতী প্রেসের আলোচনার বৈশিষ্ট্য অংশ গ্রহণ করতেন। উপেন্দ্র বাবু ছিলেন তখন আমাদের সাপ্তাহিক পত্রিকা “আত্ম-মুক্তি”র সম্পাদক তিনি দ্বা লিখতেন তা পড়ে অনেকে বলতেন কমিউনিজম প্রচার হচ্ছে। উপেন্দ্রবাবু কংগ্রেসকে সাধারণতী প্রতিষ্ঠান বলে কটাক্ষ করতেন। এ ছাড়া হুতাংগাবু, সুব্রত গোস্বামী, সত্যীন্দ্র চক্রবর্তী, কীদার চট্টোয় সঙ্গেও খুব আলোচনা চালাতেন। চাকার প্রতিষ্ঠান (নথ) অস্ট্রেলিয়ার প্রধানকর্মীদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছিল।

ক্রমে তিনি অহিংসাকে স্বয়ংমতের মত গ্রহণ না করে কাজ চালানো নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন।

কোন কোন প্রদেশে কথা শুনে যে নেতাজী দুই-দুইবার রাষ্ট্রপতি হন। কংগ্রেসের মূল নীতি অহিংসা, তবে তিনি বিশেষ গিয়ে শরণ হুঁদের করনা করেন কি করে? তাহলে কোনটি তাঁর আসলরূপ?

এরূপ বিচারে জুল দিম্বাং আসে। হুতাংগ প্রদেশের বিপ্লব-বাহী আত্মমুক্তি ফল। প্রকৃত স্বাধীনতা পনের বাহ-বিচার করে না। আত্ম-স্বাধীন পতি-ভবিষ্যত তার পূর্ণপ্রকাশ। বাংলার দুর্গল হুতাংগ বিপ্লবী বাংলার মানস-পুত্র। তিনি বাংলার বৈশিষ্ট্য বড়ার রেখেছেন। বিপ্লবীহুদে তিনি মাহুদ, দেশবন্ধুর উপহৃত শিত ও উত্তরাধিকারী।

মজুর হুতাংগ! নেতাজী হিন্দাধার!

(ক্রমশঃ)

বিদ্যাত প্রৌঢ়া: আত্মপোষণ দুর্গারী। কীদারপতি এখন হুঁতে বিদিত প্রকাশিত হয়েছে।

জেলের চিঠি—(৩)৩

কল্যাণীয়াহ,

আপনার ২৯/৮ তারিখের চিঠি ১ দিন হ'ল পেয়েছি। আপনার ২-৮ তারিখের কোন চিঠি পাঠ নাই। পেনে এক দিনে তার জবাব বিতায়। চিঠির ব্যাপারে সব সময়ই যেনো থাকি—কোন কোন সময় ৩০-৩৫ ঘণ্টাও চিঠি জমে থাকে। তবুও কতগুলি চিঠি preferential treatment পায়—চিঠিগুলির বিষয়বস্তুর ভিত্তি। জেলখানায় চিঠি—বয়স-ত কিছু নেই; তারপর আপনার নামের উপর ১৪৪ ধারা। কাজেই একেবারেই নীরপ—“ভাল আছি, কেমন আছেন”—গোছের। সে হিসাবে আপনার এবং আমাবোৎ সভাপতির চিঠিগুলি বেশ লাগে। আরও ২১ জনকে এসিকে চানবার চৌরী করেছে—কমবয়স্কদের মধ্য থেকে। বিশেষ কৃতকার্য হই নাই।



অরুণচন্দ্র গুপ্ত

এবার আপনার চিঠির জবাব। খুব আকস্মিক হয়েছে। খুঁজি যে অনেক ব্যক্তিগত কথা লিখেছেন? কি আর

এমন গোপন কথা বলেছেন? কিন্তু আমি-ত এমন কিছু গুপ্ত চিঠিতে লিখি নাই—যদি ভুলে আপনাকে এতখানি লিখতে চলেছে। আমি-ত লিখি নাই যে এই বিষয়ে আপনার আগ্রহ নেই। আমি তেবল লগেছিলাম যে আপনার যে রকম আগ্রহ, তাতে আমার চিঠিতে আপনার কোন কাজ হয়েছে কি না লক্ষ্যে। Hegel-এর “inner idea”—নির্ভে ত আপনি মহা ভাণনায়ে পড়ে গেছেন। এই ভিন্নিধটা খুবই গোলমেলে। এটা হ'ল idealist philosophy-র বিশেষত্ব। বস্তুর দ্বারা বস্তুতে নয়—বস্তুর idea-তে। কাজেই তাহের ক্রমবিকাশ হচ্ছে—এই idea-র মধ্যে। Idea-কে সাধারণ ভাষায় বলা যায়—prototype of the external things। বা আরও খুলিয়ে বলা যায়—thing হ'ল idea-র reflection বা ছায়া।

এখানে এই জাতীয় দার্শনিক মতের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ইউগোপীয় দর্শনে Socrates-কে বলা যায় প্রথম idealist philosopher. এঁর philosophy মতে কোন বাস্তব পদার্থের সঙ্গে যখন আমাদের ইন্দ্রিয়ের যোগ হয়, তখন হয় আমাদের perception। দেখা, শোনা, স্পর্শ করা—সবই perception; এতে জ্ঞান বা knowledge হয় না। এই perception নিয়ে যখন আমরা চিন্তা করি, —যখন ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতালব্ধ পদার্থের ছবি মনে আঁকি, তখন হয় imagination বা image! কিন্তু জ্ঞান বা knowledge হয় concept থেকে। Concept কি? The idea common to all the members of a class. লক্ষ্যেটিকে দেখতে সূক্ষ্মিত ছিলেন, বা Socrates was mortal—এটা কোন জ্ঞান নয়। Man is mortal—এটা হ'ল concept—এর থেকে জ্ঞান বা knowledge হ'বে। Man is mortal; কিন্তু Socrates যে man তার ত প্রমাণ হ'ল না। দার্শনিক পরিভাষা বসায় রেখে বিষয়টা বললে আরও খোঁরানো হ'ত। এই chain Socrates হতবুদ্ধ পঞ্চম নিয়েছেন, ততবুদ্ধ পঞ্চম বাওড়াও সমীচীন নয়। এ তব্ব এখানেই শেষ করা দাক।
Matter, motion, radiation প্রভৃতি নিয়ে খুব

৩ ১২/৯/৪২ তারিখে অরুণচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক কল্যাণীয়া পেনাল জেল হইতে কল্যাণ গুপ্তের নিকট লিখিত।

eloquent (এর বাংলা করলেত চটে দাবেন) চড়ে, ভাগিয়া খেদে গেছেন। নইলে বিশেষজ্ঞদের ভাষায় বলতে হ'ত—“আবার পানিনি!”

চর্চন এবং বিজ্ঞান—দুটাই এমনি ব্যোম প্রলোভিত করে নিয়ে য'ছ, যে সেখানে গিয়ে আর “নাওকে চেয়ে



দিকোবল

পথ বেধা দাও” না। অথচ দনাতনকাল থেকে মানুষ এই প্রলোভনে প'ড়ে—Sisyphian labour করেছে। বর্তমানে মানুষ জানছে, তত-ই অজ্ঞাত রাস্মাও বেড়ে যাচ্ছে। আত্মকার বড় বড় দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক সবাই চরম স্তর নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে খমকে গাড়িয়েছে।

এই নতুনাবীর প্রথম অংশে বাংলার মহাপ্রতি জেইর মধ্যে বিভিন্ন ও বিবেকানন্দের প্রভাবে একটা religious revival হুচ্চ হয়। Political revival এল এর পেছনে! এই প্রচাবে থেকে আমরা কেউ বাম হাইনি। তার উপর, আমার জীবনে একজন প্রতিভাশালী শিষ্য—এবং তেজোয়ান সন্ন্যাসীর প্রভাব পড়েছিল। কাছেরই বর্ষ সফরে একটা আকর্ষণ নিয়ে যৌবন হুচ্চ হয়। রাজনীতি এবং জীবনের অর্থ হিসাবেই একে নিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার জেল থেকে বের হ'লান '২৮ সালে; তখন

যন হ'য়েছিল অনেকটা blank পাতবার জেলে—এখান থেকে '৩১ সালের শেষভাগে যখন বিদ্যানগরী গেলাম—তখন blankness হুচে গেল। সেখানে যাত্রা তিনটি সন্ধ্যা। পরিচিত আবেগের থেকে যন মুক্ত হ'ল। ওখানে বাঙালীর গোধ হু হু'মাসের মধ্যে যন একটা positive পথ হু'য়ে নিল। এই পথে খুব সাহায্য পেয়েছিলাম—mythology আলোচনায়। খুব হুয়ত অবাক হলেন? Mythology আমার কাছে—store house of human knowledge। Nature and creation as seen by unsophisticated mind—তার পরিচয় পাই mythologyতে। সামাজিক প্রয়োজন সাধনের জন্ত, সমাজকে, প্রকৃতিকে, স্বরূপকে, উৎসকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—অর্থাৎ বিকৃত ব্যাখ্যা—তা থেকে mythology মুক্ত।

“শিক্ষা”তে আমার দুটো লেখা বের হওয়ার পর, আপনাতা হুই বহু আমাকে অনেক ভেঙা করেছিলেন—finality সফরে আমরা মত কি। আমার পক্ষে কোন positive উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না এবং এখনও নেই। আপনাতা leading question করতে করতে, কিছু জবাব আদায় ক'রে নিয়েছিলেন।

এর কোন শেষ উত্তর কোথাও পাবেন না। Materialist বা idealist—দু'পক্ষই dogmatic না হলে metaphysical finalityতে যেতে পারে না। যদি যাঁহো কুলায় এবং যদি বই বোপাড় হয়, তবে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় মর্শন কিছু পড়ুন, এবং ইতিহাস বা পড়বেন—তাকে socio'logical view থেকে পড়ুন। ভারতীয় মর্শনের মধ্যে উপনিষদ্ এবং সাংখ্য পড়তে পারলে ভাল। এর কোনটাই আমার ভাল পড়া নেই; তবুও এই'ই বলতে পারি—পড়বার মতো জিনিষ এবং পড়া উচিত।

এবার ২১১টা কাছের কথা দিয়ে চিঠি শেষ করি। নির্দল বোধ হয় দিরাধ থেকে আপনাকে চিঠি দিত। আমার নিকট ১১০ পৃষ্ঠা এক চিঠি দিয়ে সে notice দিয়েছে। পঞ্চদশ অতাবে সে আর কাউকেই হুয়ত

চিঠি দিতে পারবে না এবং আমাকে অহুতোখ করেছে যেন তার correspondentদের জানিয়ে দেই, তার চিঠি না পেতে তারা যেন কিছু মনে না করে। তার সেই correspondentদের listএর মধ্যে আপনার নামও আছে। নিরাক্ষ থেকে পে ইন্সট discharged হবে। ২৭২৮ দিন আগে আমাকে কলিকাতার টিকানায় চিঠি দিতে বলেছে; কিন্তু ৬ তারিখ পর্যন্ত সে কলিকাতা আসে নাই। বোধ হয় এখনও discharged হয় নি। বাড়ি থেকে তাকে জানিয়ে দিয়েছে—তার বাংলায় কিরে আসার দরকার নেই এবং তারা আর তার চিন্তা কিছু করতে পারবে না। এই চিঠির reaction হ'ল ঐ দীর্ঘচিঠি এবং বহু দুঃখ। বাড়ির লোকের মেথার কিছু নেই—তাদের সাধের চেয়ে বেশী তারা করেছে। আর-কার হুদিনে T. B. রোগীর পথ্য ও ঔষধাক সংগ্রহ করা যে কি ব্যাপার, তা কল্পনা করতে পারি না। নির্ঘনের পক্ষেও মহা-সমস্যা। বাঁচবার অম্বা আগ্রহে সে এত ছুটাছুটি করেছে! আজ অনেকটা রোগমুক্ত; অর্থাৎ তার সব চেয়ে সাবধান ইওরা দরকার। তার মধ্যে কলিকাতা চিঠি দিয়েছি। দেখা যাক, কি হয়।

ডালটনগঞ্জের বিস্তার কথা বোধ হয় জানেন। ইউকী সানটেরিয়ামে T. B.তে ভুগছিল। গত ২৪শে তার সব রোগ শেষ হয়েছে। আমাদের জরেশ বাবুর পরিচিত একটা রোগী দায়বপুরে ছিল—বোধ হয় জানেন। তারও চিঠি পাই। বোধ হয় তার-ও রোগের অবসান নিকটবর্তী। স্বাধীর ঘরের ছোট ভাই দায়বপুরে আছে। দু'টা lungই affected হয়েছে। চিকিৎসার কিছুই নেই। তবে জরোঁগ বোধ হয় আরও কিছুকাল আছে। বিস্তার খবর আজই এসেছে। বৃদ্ধা না, একটা ছোট ভাই ও এবানকে নিরাশ্রয় করে গেল।



আপনার সবাই কেমন আছেন? শরীর আমার বেহে জানবেন। দেশের অবস্থার কথা বলনা করতেও কষ্ট হয়। মন্দিরার তরফ থেকে তবুও কিছু করছে মেগে খুসী হলাম। পৈলেন বাবুর চিঠিতে জানলাম—সবই প্রায় নিজেদের টাকায়—পৈলেন, মহেন্দ্র ও অপর একজন বিয়েছে ২৪০০। আমার কলজনে মিলে ৭৭ পাঠিয়েছি—private cash থেকে।

আপনাদের অরুণলা

কল্যাণীয়াহ, (৪) =

আমার বিষমার স্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন এবং আপনার লজ্জার দেখেন।

১৩১৩-১৩৪ তারিখ দি.কলকাতা ৩৪ কতক বঙ্গা শেখান
হাতে স্বাক্ষর কল্যাণ দাস ওপর দিকটি দিখিত

গত মানের ১২ই আগুনকে এক চিঠি দিয়েছি।
হয়ত এতদিনে তা পেয়েছেন।

কিছুদিন আগে আমার Capital পড়া শেষ হয়েছে।
আপনার পুস্তকের ২১৩ খানা চিঠির চিঠি প্রথমে কিছু ভাব
এর মধ্যে পেয়েছি। এই চিঠিটা নিছক বিতর্ক আর
নির্দেশ দাবে কেন? এই চিঠি প্রথমে কিছু ভাব
Capital থেকে দিচ্ছি।

আপনি হেগেলের (Hegel) Idea সম্বন্ধে প্র
কতছিলেন। Marx ঐ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, দেখুন—
“For Hegel, the thought process (which he
actually transforms into an independent
subject giving to it the name Idea) is the
……creator) of the real ; & for him the
real is only the outward manifestation of
the Idea. In my view, on the other hand,
the ideal is nothing other than the material
when it has been transposed & translated
inside the human heart.”

মার্কস হাকে real বলেছেন, তা হ'ল ইন্ড্রিগ্যান্স বস্তু ;
কিন্তু হেগেলের কাছে Idea হ'ল মূল—তার বহিঃপ্রকাশ
হ'ল বাইরের বস্তু। কালেই evolution এর মূল হবে
ঐ Idea এর মধ্যে evolution। সেখান থেকে বাইরের
পদার্থে evolution রূপ নেবে। Berkelyর ভাষায়-ও
Idea-ই হ'ল real ; বাইরের বস্তু ভিতরের idea
বহিঃপ্রকাশ।

আর একটা প্রাণ আপনি তুলেছিলেন—negation
of negation সম্বন্ধে। তখন ভাব দিয়েছিলেন—এর
context না মনে। কালেই ভাব হয়ত ঠিক হয়
নাই। এটা হ'ল dialectic-এর একটা রূপ।
Capitalist method of production-এর মধ্যে যে

dialectic process work করছে, তার ফলে এর
inherent contradictions গুলি develop করবে।
Capitalism এগেচে এর পূর্ববর্তী উৎপাদন প্রণালী
inherent contradiction-এর ফলে :—অর্থাৎ পূর্ব
ব্যবহার negation রূপে—অর্থাৎ by expropriation
of the few from the means of production &
the appropriation of them by the masses।
কিন্তু দেখুন—প্রথম negation হয়েছিল—negation of
the individual private property। তখন
method of production ছিল individual কিন্তু
capitalism-এর ফলে individual method of
production রইল না ; co-operation concentra-
tion প্রকৃতি আগের productionটা হ'ল একটা
collective & co-operative process. Second
negation তখন আসবে—তখন production-এর এই
basisটা উল্টে দেবে না এবং individual production
কিভাবে আসবে না। অতঃপর এটা Marx আশা করেন ;
কোন দৃষ্টি এর স্বপক্ষে মনে নাই। অর্থাৎ তিনি আশা
করেন second negation-এর ফলে ownership of
money & production on collective & co-
operative basis and use of the means of
production আসবে।

এখানেই শেষ করি—আর এক পৃষ্ঠা দ্রুত করতে চাই
না। পূজা সংখ্যা “মন্দিরা” নাকি ২০০০ টাকার
বিজ্ঞাপন পেয়েছে। খবর পেলাম আপনার শরীর
অস্থির। অথচ তাত কিছু লিখেন নাই। শারীরিক
খবর গোপন করবেন না—এটা আশা করি। আমরা
চিন্তিত আছি, বিজ্ঞাপিত লিখবেন।

আপনাদের অনুরোধ

বাইশে শ্রাবণ

অমল সেন

আজ বাইশে শ্রাবণ মহাকালের অপরিমোচনীয় আকর নিয়ে চিহ্নিত হ'য়ে রইলো এই বাইশে শ্রাবণ ঈতিহাসের পাঠ্য, পেলো সে স্মরণীয় হবার সুযোগ। রবীন্দ্রনাথের দুজা-দিনের পূর্বকার বাইশে শ্রাবণকে আমরা লক্ষ্য করে দেখিনি কোনদিন, বসন্তে বংগরে সে এসেছে পৃথিবীর ছায়ায় বর্ষা নবীন মেঘ নিয়ে, স্রবণাতীত কাল থেকে বর্ষণ-কাঙাল ধ্বজীকে সে মান করিয়েছে বিরামহীন ঝুঁটিধারা, বিরহী-চিন্তে সে আগিয়েছে আতুলতার সাড়া,—কিন্তু তাকে আমরা গ্রহণ করিনি, বরণ করিনি কোন দিন। সে বাইশে শ্রাবণ ছিল সকলের দৃষ্টির অগোচরে, অনাসূত, উপেক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের দিনটিতে সে এলো সম্পূর্ণ নতুনরূপে—আজকের এই বাইশে শ্রাবণকে পৃথিবীর মাহুৎ কখনো নিঃশেষে তুলে যাবে না। অনাগত বৃন্দে মাহুৎ বরণ ক'রে এই দিনটিকে, প্রণাম করবে মনে মনে, নিবেদন ক'রে বৃন্দে বরণের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। রবীন্দ্রনাথের দীপ্তি থেকে দীপ্তি নিয়ে এই বাইশে শ্রাবণ অমরতার দাবী ক'রে নিখিল বিশ্বের নর-নারীর কাছে, তারা রবীন্দ্রনাথকে পাবে না, পাবে তাঁর স্মৃতির সৌরভ বাইশে শ্রাবণের স্মরণীয় তিথিতে।

আমার অস্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে উপলব্ধি ক'রেছি থাকে আজ বাইশে শ্রাবণের স্মরণীয় তিথিতে সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রজ্ঞা নিবেদন ক'রে এসেছি আমার, জানাতে এসেছি সেই লোকোত্তর প্রতিভার উদ্দেশে অশ্লিস্ক একটি প্রণাম। এ কোন বিশেষ অঙ্গুষ্ঠানে অর্ঘ্য নিবেদন নধ—থাকে নির্ভনে নিতুতে কত ব্যর্থব্যর্থ অর্ঘ্য নিবেদন ক'রেছি সেই অর্ঘ্যই নিয়ে এসেছি আজ।

রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ শিল্পী, রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বর্য, রবীন্দ্রনাথ সভ্য-শিব-হৃদয়ের পূজারী; এ বিশ্বের বা' কিছু হৃদয়, বা' কিছু মনোমুগ্ধকর, বা' কিছু বিচিত্র এবং

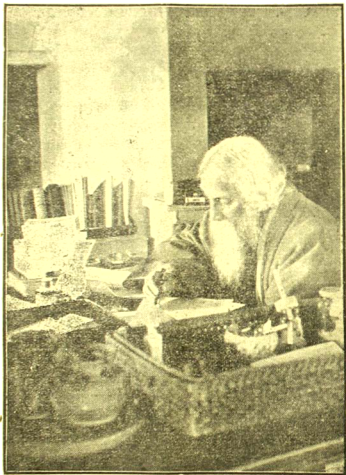
শোভন, ভূপে-বসে-গড়ে বা' কিছু নির্ভল এবং পবিত্র, সে-সব কিছুকেই কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের অস্থর দিয়ে উপলব্ধি “আগুন-মনের মাদুরী মিশারে” কবো ও সাহিত্যে প্রাণবান ক'রে তুলিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত ক'রেছেন বাঙালার সাহিত্য-গগন। তাঁর অমল রানের বক্ষায় প্রাণিত ক'রেছেন বাঙালীর পরিকীর্ণ উৎস-ময়। সাহিত্যের এমন কোন দিক নেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি হে দিকে পড়েনি—সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে বিচরণ ক'রেছেন তিনি। তাঁর একক জীবনে কবিতা-গানে, নাটকে-উপন্যাসে, প্রবন্ধ-গলে, কোতুক-প্রহসনে যে বিপুল দান তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর কথা ভাবতেও আমাদের মনে বিশ্বাস জাগে। তিনি একাকী তাঁর একটিমাত্র জীবনে বা দিয়ে গিয়েছেন আমরা আমাদের বহু-জীবনেও তা পাঠ ক'রে শেষ ক'রতে পারবো না। তিনি আমাদের সাহিত্যকেই শুধু সমৃদ্ধ করেন নি, আমাদের ভাষাকেও তিনি সুলভ ক'রেছেন—আমাদের মনকে তিনি হাত ধ'রে নিয়ে গিয়েছেন কল্পনার মহা-সমুদ্রে অবগাহন করাবার মতো। ভাবের প্রত্যো, প্রেমের মাঝে রবীন্দ্রনাথ হ'য়ে রইলেন আমাদের চিরসঙ্গী।

পূরীর সমুদ্রতীরে গাড়িয়ে হৃৎকোর বেগেছিলাম একদিন, পূর্ব-দিগপথের ছায়া খুলে জ্যোতির্ময় মৃত্তিতে সূর্য ভেগে উঠলো সমুদ্রের উত্তলে তরঙ্গ-নিপথে; অকস্মাৎ তিমির রাত্রির চল অবগান, ছলেদে মুখে ভাগলো হাসি, পাখীর মুখে ভাগলো গান, পোনার আলোকে ভ'রে গেল পৃথিবী, নিখিল বিশ্বের প্রাণ স্পন্দিত হ'য়ে উঠলো যেন প্রথম চেতনা-প্রত্যুৎ। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও আমাদের জাতীয়-জীবনে এই হৃৎকোরের মতই অপূর্ব এবং বিশ্ময়কর। তাঁর আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই যেন আমরা তাঁকে চেয়েছিলাম অস্থরে অস্থবে, অহতব ক'রেছিলাম তাঁকে পাওয়ার সার্বকতা। তাইতো তিনি এসেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন মাত্র কবি নন, শুধু একটিমাত্র মাহুৎ নন,—তিনি একাকী একটি বৃণ, একটি মহা-বৃণ

দারাক বহন করে তিনি এসেছিলেন আমাদের মধ্যে।
রবীন্দ্রনাথের জন্ম কুশকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—তিনি
জন্মগ্রহণ করেছেন মন্দির-বিশ্বের নব-মন্দির
তিনি করেছিলেন এটাই সব নয়—প্রতিদিন

রবীন্দ্র-প্রতিভাকে অনেক অনেক দিক দিয়ে বিচার
করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন—কেউ পেয়েছেন তার
মধ্যে কপের সন্ধান, কেউ পেয়েছেন রঙ্গের সন্ধান, কেউ
পেয়েছেন বীণের সন্ধান, আবার কেউ বা পেয়েছেন



রবীন্দ্রনাথ

জন্মাবেন, প্রতিদিন তিনি বেঁচে থাকবেন। তিনি সমগ্র
মানব-চিত্রে জন্ম নিয়েছিলেন বলেই বর্তমানে আমরা
তার পূজা করছি, ভাবীকালে দ্বারা আসবে পৃথিবীতে
তারের মধ্যেও তার আসন রচিত হবে।

ভগবৎ-ভক্তির সন্ধান—হার বা কামা, হার বা শ্রেষ্ঠ
অকাংক্ষা। মাঘগ্রী সকলে তাই পেয়ে স্তম্ভ হয়েছেন,
কেউ কোন অভিযোগ করেন নি, অসম্ভাব জানান নি।
আশিষ্ট বছর ধরে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার খাড়া

অবিশ্রান্ত গতিতে য'রে চ'লেছিল, তাঁর নিত্য মন্থন সৃষ্টি আমাদের মনে বিশ্বাস জাগিয়েছে। পুরীষ সমুদ্রের তীরে ঠাঁড়িয়ে এমনি বিশ্বাসের সঙ্গে অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছিলেন কোটি কোটি তরুণগণ নীলান্বিত বিস্ফোভ—তার কোনো একটি তরুণকে সম্পূর্ণ পৃথক ক'রে বেপার্য স্বযোগ পাইনি, শক্তিও ছিল না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও তরুণাবৃত সমুদ্রের মতোই বিরাট এবং বিশ্বাকর, তার মহা উপকূলে ঠাঁড়িয়ে তার কোনো একটি রচনাকে পৃথক ক'রে বিচার ক'রবার বিশ্লেষণ কববার যোগ্যতা আমার নেই। সে চোটা আমি ক'রবো না। আমি শুধু নতুনভাবে নব্বার করি সেই মহা কবিতা।

অনেক বলেন রবীন্দ্রনাথ শুধু কল্পলোকের কবি, মাটির পৃথিবীর সঙ্গে ছিল না তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়, বেশের বাড়ীর সঙ্গে ছিল না তাঁর অস্তরের সংযোগ,— কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা অধিকাংশমাই তাঁকে দূর থেকে দেখেছি ব'লে তাঁর সম্পূর্ণ চেহারা আমাদের চোখে পড়েনি, তাঁকে আমরা চিনতে পারিনি। আমরা যদি তাঁকে আরো ভালো ক'রে দেখতুম, আরো ভালো ক'রে জানতুম, আমাদের অস্তরের সত্যদৃষ্টি নিয়ে যদি তাঁর অস্তরের অশাস্তির দিকে দৃষ্টিপাত করতুম, তাহ'লে স্রষ্টা দেহতে পেতুম আমাদের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না। দেশকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। যে কারণ এখন ঘটেছে তাতে তাঁরো যোগ ছিল। বেশের দ্বন্দ্ব, প্রতির অবমাননায় তাঁর অস্তরের বিস্ফোভ জাগতো, তাঁরো অস্তরের প্রতি যুগা ছিল, অভ্যাচারের বিষণ্ণে বিরোধ ছিল, এবং শুধু ছিল না—তাঁর অস্তরের সেই অশান্তি ও বিস্ফোভের জ্বালা অগ্নি-তরুণের মতো বার বার আলোড়িত হ'তে দেখছি আমরা। সাম্রাজ্যবাদী জলন্ত মনোভুক্তিকে কখনো তিনি সমর্থন করেন নি, সহ্যহুত্বিত জানান নি—বরং তাঁর উদ্বাস কণ্ঠে জনিত হ'তে শুনেছি আমরা—

“দানবের দূর অপব্যয়

রচিবে না কোনোদিন ইতিবৃত্তে শাস্ত অধ্যায়।”

রাজনীতির শত্রুগণীমায় তিনি নিজেই আবদ্ধ করেন

নি মতা, কিন্তু বেশের দানীনতা। সংগ্রামের সংগে তাঁরো অস্তরের অভিক্ষেপ সম্পর্ক ছিল, তাঁর অনেক পরিচয় আমরা পেয়েছি। আমরা, লাগারন মাতৃশ্রী, অনেক সময় সকল মাতৃশ্রীকে এক পংক্তিতে এনে পাড় করিয়ে বিচার করি। কবি যে, শিল্পী যে, তাঁকে আমরা এনে পাড় করতে চাই জনসভার মাঝখানে বক্তৃত্যমকে, লাহির্ভিত্যক যে সে কেন বোঝানমারী ক'রনো না,—এ নিয়েও আমাদের অভিযোগের অর্থ নেই। কিন্তু এ সব অভিযোগ একেবারেই মূল্যহীন। এ সব কথা অসৌজন্যিক। কারণ সংসারে বা সমাজে ত্যাগও তা হয় না। রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি কেন রাজনীতিক হ'লেন না, এ নিষ্কল আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই।

জগৎজোড়া বেদনাকে যারা আপন অস্তর দিয়ে অল্পতব ক'রেছেন যুগে যুগে ঠারাই পেয়েছেন ঈধন-ভাঙার পান, তাঁদেরই কণ্ঠে জনিত হ'তে শুনেছি মুক্তির জয়-সংগীত, বিদ্রোহের অরিমহুহর। মাতৃশ্রীর বেদনার রক্ত-ভিলক ললাটে প'রে রবীন্দ্রনাথ হ'য়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি শুধু কল্পলোকের কবি ছিলেন না। তিনি যদি শুধুমাত্র কল্পলোকের কবি হ'তেন তাহ'লে কেমন ক'রে দুটলো “রক্ত-কবী” তাঁর মনের আধিনায় কেমন ক'রে “দুস্ত-খারার” করণা অভিভূতির দৃঢ়তার মোহানায় গেলো গৌরবের মুক্তি। কেমন ক'রে তাপের প্রাসাদের মতো “অচলাবৃত্তন” ভেঙে প'ড়লো মাটির ধূলায়, কেমন ক'রে “ভাঙ্গনী”র আবির্ভাব হ'ল মৌন উদ্বোধনের সংগে সংগে নব বসন্তের বার্তা নিয়ে? আমরা কি একথা কেউ ভালো ক'রে ভেবে দেখেছি? যে অলব বেদনার তীব্র জ্বালা যুগে নিয়ে তিনি ব'লেছিলেন—

“ভগবান, তুমি যুগে যুগে হুত পাঠায়েছ বারে বারে

মহাহীন মনসাবে,—

তাঁরা ব'লে গেল “কথা কবো লবে”, ব'লে গেল

“ভালোবাসো—

অস্তর হ'তে বিবেক বিব নাশে”।

বরদীষ তারা, বরদীষ তারা, তবুও বাহির হারে

আজি হুঁদিয়ে ফিরাছ তাপের বার্ষ নমস্বারে।

আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট রাগি-ছায়ে
হেননহে নিঃসহায়ে :

আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শত্রুর অপরাধে
বিচারের বাঁকী নীড়ে নিভুতে কাঁপে ।

আমি যে দেখিছ তরুণ বালক উন্মাদ ধ'রে ছুটে
কী বহুদায় ম'রেছে পাথরে নিফল মাথা কুটে ।
ক'ল আনার রক্ত আত্মকে, ধাঁই সংশ্লিষ্ট হারা,
অমাবস্যাঃ কারা

লুপ্ত ক'রেছে আনার ত্বনন কুৎসননের তলে—
তা'ই তো তোমার গুণাই অক্ষতলে—

বাহ্যায় তোমার বিলাইছে যাবু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তালের কনা করিছাছ, তুমি কি বেগেছ ভালো?"

রবীন্দ্রনাথের এই বৈয়াক্যে আদর্শ বৃত্তে চাইনি,
বৃত্তে পাইনি । তিনি যে মাহুকের কবি—আমাদের
মতো। সাধারণ মাহুকের বারা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা,
হাসি-কান্নার মোসনার হুলছে তাদের কথা তিনি
ব'লেছেন, তাদের ছোটখাটো সুখ-দুঃখের হিসাব তিনি
রেখেছেন । বাঙলার পল্লী-ভীষনের সব ছবি তাঁর চোখে
প'ড়েছে এবং তিনি তা এঁকেছেন নানা তুলিকার নানা
বর্ণসমাবেশে । 'পোটমাতার' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য
রচনা । গণগ্রামের গভীর ভাঙাবানু । সঙ্গীহীন অজ্ঞাত
অধ্যাত সে শুধু রতনের নবীন । কে এই রতন? গ্রামের
পান্ডার এক বালিকা তার ছোট হাতের পেচা-বয়ে
পোটমাতারের বিচ্ছেদকাতর মিনগুলি ভরিয়ে তোলে ।
তারপর একদিন পোটমাতার বিদায় নিয়ে চ'লে গেল ।
বালিকা রতন অজ্ঞানমূল চোখে নদীর তীরে পাড়িয়ে
ভাঙিয়ে আছে দূরের ভেসে যাওয়া নৌকোখানার দিকে ।
এমনি বহু বিচিত্র কাহিনী বাঙলার পল্লীভীষনকে নিয়ে
রচনা ক'রেছেন রবীন্দ্রনাথ । গল্পগুচ্ছ প'ড়লে যেখতে
পাই তাঁর মুগ্ধ থেকে কেউ বাদ পড়েনি । আর শুধু
বাঙলার পল্লীর মাহুকেই নয়, বাঙলার কলমরমুখরা
পদ্মাকেও তিনি তাঁর সাহিত্যে, তাঁর কাব্যে অবর ক'রে
রেখে গিয়েছেন—

"হে পদ্মা আবার,
তোমার আবার বেধা নত শতবার ।"

একটা কথা যেন আমরা না ভুলি, রবীন্দ্রনাথ কবি—
সম্পূর্ণ মাহুকের কবি, সতল মাহুকের কবি—কিন্তু কোন
মতবাদের কবি তিনি নন । সবকিছু তিনি স্পর্শ ক'রেছেন
নবী তাঁর ছোঁয়ার রঙীন । তাঁরই কথা—

"আমি পৃথিবীর কবি, যেখা তার গঠে যত জনি,
আমার বাঁকির হরে সাজা তার আশিবে তখনি,
তিনি চির-চকল, তাঁর ঘন "হৃদয়ের পিয়ারী"—

পৃথিবীতে নতুন যুগের লজ্জাবনা তিনি ঘিরে গেছেন, বাগত
অভিনন্দন আনিতে পেছেন তাকে, আর তার সাথে সাথে
সতল মাহুকে তিনি আলোন ক'রেছেন নব-পুষ্টির কাজে
আশনাকে নিয়োজিত ক'রবার অঙ্গ । তিনি ফেঁকেছেন
সমাজের উচ্চতর বারা ব'লে আছেন, সোনার ভালের
উপর ব'লে সুখের স্বপ্ন রেখেছেন তাদের নয়, তিনি
ফেঁকেছেন যুগ-যুগান্তকাল ধ'রে দ্বারা বৃক্কের রক্ত ঘিরে ঘন
উৎপাদন ক'রছে, কলে কারখানায় বায়লা-বাগিচায় দ্বারা
চিরদিন দালত ক'রে আগছে দ্বারা চিরবিকিত, চির-বৃক্ষ
প্রবিক, দ্বারা চাষী দ্বাদের প্রদে অঙ্গ জন্মাচ্ছে তিনি
ব'লেছেন—

"চিরকাল
টানে পাড়, ধ'রে থাকে হাল ;
গুয়া ঘাটে ঘাটে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
গুয়া কাজ করে
নগরে প্রান্তরে ।

গুয়া কাজ করে
অঙ্গে বংগ কলিঙ্গের সহুত-নদীর ঘাটে
পাড়ায়ে, বোকাই, গুয়াঘাটে,
গুজ গুজ গুজন, গুজ গুজ গুজ
দিন রাতে পাঁচা পড়ি দিনযাত্রা করিছে যুগের ।
দুঃখ দুঃখ দিবস রজনী
যজ্ঞিত করিছা তোলে নীচনের মহা-যজ্ঞ গুনি ।
নত নত দ্বারাভোর তরুণের পরে

গুয়া কাজ করে ।

দ্বারা রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ অভিযোগ ক'রে বলেন

তিনি জনগণের কবি, ব্যাঙ্গ বলেন, “বেগমম্ম না তো। তাঁর রচনায় সেই সব মাহুকের স্বীকৃতি, মাথার গাম পাথ ফেলে ব্যাঙ্গ এ অগ্ন্যস্ত্র ক’রেছে,” আমরা বেগতে পাই তাঁদের এ অস্বাভাবিক সম্পূর্ণ সত্য নয়। তিনি মাহুকের কবি, তিনি জনগণের কবি তাঁর কাছ থেকে আমরা বা বাবী ক’রেছি,—কান্ত কোদাল আর হাতুড়ির গান, তা হুতো তিনি ঘিরে যেতে পারেন নি, তবুও তিনি ঘিরে গিয়েছেন। তিনি শুধুই কল্লোলকের কবি, এ অস্বাভাবিক মিথ্যা। যা তিনি ঘিরে যেতে পারেন নি, যে অসম্পূর্ণতা তিনি নিজের মধ্যে নিয়ে উপলব্ধি ক’রেছেন তাকে ছিঁদ্রাঙ্গীনে চিত্তে তিনি স্বীকার ক’রেছেন। তিনি আপা ক’রে গেছেন নতুন যুগের কবি ব্যাঙ্গ সম্মানে এ দেশে, নবজীবনের স্বপ্নান ব্যাঙ্গ পোনাতে আত্মিক, তারা তাঁর এ মৈত্র, এ অপূর্ণতাটুকু ঢেকে দেবে—তিনি বলেছেন—

“তাই আমি যেনে নিই সে নিম্নার কথা—

আমার দ্বরের অপূর্ণতা।

আমার কবিতা জানি আমি

গেলেও বিচ্ছিন্ন পথে হর নাই সে সর্বত্রগামী।”

নতুন কবিকে তিনি খাগত সন্তোষ জানিয়ে বলেছেন—

“কৃষকের জীবনের শত্রিক যে জন,

কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা ক’রেছে অর্জন,

যে আছে মাটির কাছাকাছি

সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

মাহিত্যের আনন্দের জোলে

নিজে বা পারিনি দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।”

রবীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে বা আশা করবার ছিল তাঁর অনেক বেশী তিনি ঘিরে গিয়েছেন। সংগঠনে বড় কথা, বড় গর্ব আমাদের এই, যে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য একদিন উপেক্ষিত ও অনাস্তিত ছিল, যে বাঙলা ভাষায় কথা বলতে এ দেশের শিক্ষিত সমাজ একদিন ঘেঁটে লজ্জা ও কুষ্ঠা অস্বস্তি ক’রতো। যে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে মান দিতে চাইতো না, মান দিতে চাইতো না সমাজে, রবীন্দ্রনাথ সেই চির উপেক্ষিত

চির অনাস্তিত বঙ্গ-সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যে উন্নীত ক’রেছেন, সম্মানিত ক’রেছেন, বাঙলার শিল্প ও সংস্কৃতিকে তিনি নিয়ে গিয়েছেন সমুদ্র পার হ’য়ে পশ্চিম জগতে যেখানে আছে জানী, গুপী, সমস্তপার, যেখানে আছে রসিক, নিয়ে গিয়েছেন বিশ্বমানের কাছে—বাঙলার সংস্কৃত গনিয়ে এগেছেন তিনি সমুদ্রের ওপারে—তাঁরইতো আমরা আনন্দের সাথে বলতে পারি—

“অগ্ন্যস্ত্রের আমরা কবি, তোমার কবি গর্ব

বাঙালী আম গানের রাজা, বাঙালী নহে বর্ষ।”

কিন্তু তবু আজ মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যদি এখনো ঠেঁচে থাকতেন বাঙলার এই বিংশ শতাব্দীর মহা-মহত্বের ইতিহাস থাকতেন হ’তে পারতো তাঁর হাতের লেখায়, ছিন্নান্তরের মনস্তত্ত্বের কাহিনী উজ্জল হ’য়ে আছে বংকিমচন্দ্রের “আনন্দমঠে”—এই আনন্দমঠ একদিন বাঙলার বিপ্লব আন্দোলনকেও প্রভাবান্বিত ক’রেছিল। রবীন্দ্রনাথও ঘিরে যেতেন অনবদ্য দান। রচনা ক’রতেন অমর সাহিত্য—তাঁর ওপরে থাকতো আমাদের অস্তুর অমলিন দান। বাঙলার সাহিত্যিকরা বিমুচ, বিভ্রান্ত, পথ তারা খুঁজে পাচ্ছেন না, বাঙলার এই হুতিকের দখল রণ তারা ছুঁয়ে তুলতে পাচ্ছেন না, তাই আজ কেবল ব্যর্থবারই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যদি থাকতেন। চিরদিন দেখে এসেছি, দেশে দেশে ব্যাঙ্গ সাহিত্যিক, ব্যাঙ্গ কবি তারা নতুন আশ্রয় নতুন বাণী ঘিরে আত্মিক উদ্বোধিত, আশ্রয় ক’রেছেন—আর আজ বাঙলার হুতিকের আশ্রয় মাহুতকে সচেতন ক’রে তুলেছে, তারা আশ্রয়, তারা চকল, কিন্তু তাদের সমুদ্রে আসে। মেলে পথ দেখাবার কেউ নেই, আজ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ নীরব—কোনো নতুন কবি নেই আত্মিক নতুন মন্ত্র শুনার অগ্রে।

রবীন্দ্রনাথ নেই, তবু একথা মনে ক’রব না আমরা তাঁকে হারিয়েছি। তিনি আমাদের মধ্যে আছেন আমাদের সকলের অস্তরের সংগে ঘিশে। যে বাণী তিনি রেখে গিয়েছেন তাই আমাদের বুকে আশার প্রদীপ জ্বলবে বাহুতে শক্তির বিদ্যুৎ সঞ্চার ক’রবে।

আপনি, আমি এবং ওরা

ঐশ্বরীশচন্দ্র ভৌমিক

লোক চরিত্র

আমাদের মধ্যে যে কত বিভিন্ন ধরনের লোক আছে তা আপনিরা জানেন। কেন্দ্র লোকের সাথে কিত্তপ ব্যবহার ঠিক, সন্ত ও শোভন হবে তা বুঝতে হলে অসংখ্য অনেক বিষয়ের মধ্যে এটাও জানা সরকারি যে লোকটি কিত্তপ—বিশেষ করে তার অভ্যাস, মেজাজ এবং কোন বিশেষ সময়ে তার পারিবারিক ও মানসিক অবস্থা। কত বিভিন্ন মেজাজের লোক আছে। দু' একটা উদাহরণ দিন। এমন এক একজন লোকের সাথে আমাদের অনেক সময় দেখা হয়, যার মেজাজ সব সময় তিরিকি হচ্ছে। কথায় কথায় সে চটে যায়, এমন কি হৃদয় হৃদয়ে আত্মনিই গুলোতে থাকে; সব সময়ে সব কিছু বিকটে নালিশ তার লেগেই আছে। অল্প সবাই তাকে offend করতে কল্লা করে সবাইকে সে offend করতে চেষ্টা করে। এ মাতী লোকদের নিয়ে আমাদের সময় সময় কি ভয়ানক মুন্সিলেই পড়তে হয়। অথচ সহিষ্ণু না হয়ে উপায় নেই। সব সময় তারা যে ইচ্ছে করেই deliberately ও রকম ব্যবহার করে তাও নয়। খোজ করলে হয়ত দেখবেন যে তাদের আয়তের বাইরে কোন পারিবারিক (physiological) কারণের জন্ত ওদের মেজাজ ওরকম খিটখিটে হয়। ওদের মধ্যে কেউ হয়ত chronic পেটের অস্থির বা constipation-এ ভুগছে। কারণ হয়ত কোন মাস্ট্রিক কাল করছে না—কোন মাস্ট্রিক স্ক্রপ বেটী বা কন হচ্ছে। কারণ হয়ত মাথার একটু ভিট আছে, কারণ হয়ত হিষ্টিরিয়া আছে, কারণ হয়ত কোন নারসিক অস্থির বা কোন প্যাথলজিক্যাল defect রয়েছে। যাদের মেজাজ সাধারণত স্বাভাবিক তারাও হয়ত কোন আকস্মিক জ্বটিনার বা রোগে পোকে জ্বলে সাময়িকভাবে অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। এসব লোকদের সম্বন্ধে আমাদের সহিষ্ণুতা ও বিবেচনা থাকা উচিত।

আর একধরনের লোক আছে যে সব সময়ে মনে করে অস্ত্রা তার জন্ত কিছুই করছে না—অথচ তারা ইচ্ছে করলেই তার জন্ত অনেক কিছু করতে পারে। সে চাকরি পাচ্ছে না, বহসিন বেকার বসে আছে—অথচ তার অস্থির আত্মীয় অস্থির বন্ধু বা অস্থির পরিচিত ব্যক্তি একটু চেষ্টা করলেই কি তার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারত না? কেউই তার জন্ত কিছু করে না, তাই না—এমনি জ্বটিনা সে! সমস্ত সংসারের বিকটেই তার নালিশ ও অভিমান! তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে আপনার শক্তি, লম্বল ও স্ববোধ সম্বন্ধে তার ধারণা সব সময় অতিরিক্ত থেকে যাচ্ছে—আপনি কিছুতেই তাকে বোকাতে পারবেন না যে আপনার একান্ত আত্মিক ইচ্ছা ও সহায়কৃতি থাকা সত্ত্বেও তার একটা 'স্থিতি' করে যেওয়ার শক্তি আপনার নাও থাকতে পারে।

তারপর আর এক ধরনের লোক আছে দেখবেন যে সব সময় 'প্রতিবাদ' করার জন্ত উদ্ভট হয়ে আছে—প্রতিপাত বিষয় কি বা আপনার মতের সাথে তার মতের অনিল কোথায় তা ডাববার তার সময় নেই। আপনি বা কিছুই বসুন না কেন সে প্রথমে তার একবার প্রতিবাদ করার চেষ্টা না করে ছাড়বে না। পাঁচজনে মিলে একটা বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে, আপনি আপনার একটা ধারণা বা সিদ্ধান্ত বললেন কি অমনিই আপনাকে ধামিয়ে দিয়ে সে বলবে—'না, তা নয়।' কিন্তু এই 'না, তা নয়' বলে সে বা বলল, তা হয়ত আপনি বা বলেছেন ঠিক তাই। আপনি এ সম্বন্ধে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সে কিছুমাত্র অপ্রতিত হবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আবার আগের মতোই সব কথাতে 'না, তা নয়' বলে ছক করবে। বুঝতেই পারছেন 'প্রতিবাদ' করার একটা বোঁক কেনন যেন তার স্বভাবে ছুকে গেছে। আর এক রকমের লোক আছে যে মনে করে তার চেয়ে বেটী ঢালাক কেউ নেই। ঢালাক হওয়া নিস্তার ভাল, তাতে অস্ত্রের মতলব সম্বন্ধে বোকা যায় এবং কম ঠকুতে হয়। কিন্তু 'নিছক ঢালাক' জিনিষটা সব সময়ে ভাল নয়, বিশেষ করে যখন সেই ঢালাকীর লক্ষ্য হচ্ছে অস্ত্রকে

ঠিকান, অস্ত্রের অনিষ্ট করা বা অস্ত্রের খরচে নিজের সুবিধা করে নেওয়া। আমি বিবেকানন্দ বলতেন, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না। বাস্তবিক পক্ষে বলতে গেলে, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ ত হয়ই না, এমনকি সাধারণ ভাল কাজ বা দ্বারী কল দেখে এমন কাশও হয় না। তারপর বেধুন, কবীর বলে, অতি চালাকের গলায় ধড়ি। সেই সব অতিচালাক, দ্বারা নিজেদের অতিচালাক মনে করে, মনে করে তাদের চেয়ে বেশী চালাক কেউ নেই, সাধারণত তাদের গলায়ই ধড়ি পড়ে;—প্রধানতঃ এই ভ্রম যে তাদের চেয়ে বেশী চালাক কেউ নেই, কেউ তাদের চালাকী ধরতে পারবে না, এই মনে করে তারা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাদের চেয়েও বেশী চালাক লোক থাকতে পারে, এবং সাধারণতঃ থাকেও। এই অসতর্কতার জন্য অতিচালাকের চালাকী ধরা পড়ে যায়। ফলে, তার নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া ঘুরের কথা, সে নিজেই বিপদে পড়ে যায়।

সত্যিকারের চালাক লোক কখনই মনে করবে না যে তার চেয়ে বেশী চালাক কেউ নেই বা থাকতে পারে না। সে সব সময়েই মনে রাখবে তার চেয়ে বেশী চালাক লোক থাকতেই পারে। অর্থাৎ সে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্কতা অবলম্বন করবে। অন্তরা তার মতলব বুঝে কি কি করতে পারে, সেটা হিসেব করে সে তার অন্যতর থাকবে। অর্থাৎ কোন লোককে আপাত দৃষ্টিতে অতি-চালাক মনে হলেই প্রজ্ঞা পরগণ বা ভয়ে নতর হয়ে পড়া ঠিক নয়। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার ‘অতি চালাক’ সত্যিই চালাক কি না, তারপর সেই অনুসারে দরকার মতো সতর্কতা অবলম্বন করে তার সাথে মেলাবেনা বা ব্যবহার করবেন।

ঐকমত্য লোক ভিন্তে হলে কে কি রকমের লোক তা জানা যেমন দরকার, তেমনি নিজের লক্ষ্যে সে সে লোকের কি ধারণা তাও জানা দরকার। এ লক্ষ্যে একটা স্থির আরবী প্রবাস বাকা আছে। প্রবাসটিতে নিরূপিত করে কয়েক রকম লোকের লক্ষ্যে বলা হয়েছে:—

১৪—যে জানে, এক নিজে জানে যে সে জানে।

২৪—যে জানে, কিন্তু নিজে জানে না যে সে জানে।

৩৪—যে জানেনা, এবং নিজে জানে যে সে জানে না।

৪৪—যে জানেনা, কিন্তু নিজে জানে না যে সে জানে না।

এদের মধ্যে প্রথম ধরনের লোকই হচ্ছে জ্ঞেয়। এদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে এবং শিখবার চেষ্টা করা উচিত। দ্বিতীয় ধরনের লোকের কাছেও আমাদের অনেক শিক্ষণীয় আছে। তবে তারা যে সত্যিই জানে সে লক্ষ্যে তাদের লক্ষ্যে মন দিয়ে নেই। তৃতীয় ধরনের লোকেরা অজ্ঞ বটে, কিন্তু তাদের অহঙ্কারও নেই, নিজের লক্ষ্যে মন দায়গাও নেই। শেখবার ও জানার তত্ত্ব, গ্রহণ করার ও বোঝার তত্ত্ব এদের মন প্রকৃত শিক্ষার্থীর মতো প্রস্তুত থাকে এবং এদের শেখানও যায়। চতুর্থ ধরনের লোকদের নিয়ে সত্যিই বিষয়: এরা সত্যিই কিছু জানেনা, অথচ নিজেরা মনে করে যে জানে। এরা শুধু অজ্ঞ নয়, বেকুবও। এদের মধ্যে অনেকে আবার আত্মপ্রসাদীও। এরা কোনদিন বিশেষ কিছু শিখবেও না—আর এদের কিছু শেখাতে দাওয়াও পণ্ডিত, বিড়ম্বনা মাত্র।

শেখাবার প্রসঙ্গে আরও দু’একটি কথা মনে পড়ে গেল। এ সম্পর্কে আমাদের শাস্ত্রে একটা খুব মূল্যবান কথা আছে প্রজ্ঞাহীন ও অনাগ্রহণীয় ব্যক্তিকে এবং অনধিকারীকে কখনও বিদ্যাদান করতে নেই। যাদের শেখবার সত্যিকারের আগ্রহ নেই, এবং তারা প্রজ্ঞা নিয়ে শিখতে আসে না, তারা বিশেষ কিছু শিখতেও পারে না, আর তাদের শেখাবার চেষ্টা করাও পণ্ডিত। আর অনধিকারীকেও বিদ্যাদান করা বাতিলীয় নয়। এখানে অনধিকারী বলতে বুঝতে হবে, তারা বিশেষ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ বিজ্ঞা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হইনি, সে বিজ্ঞা ঐকমত্যে গ্রহণ করতে হলে তার অ, আ, ক, খ, বা যে প্রাথমিক স্তরগুলো জানা দরকার তার প্রস্তুত করেনি, বা তারা সেই বিজ্ঞার অপপ্রয়োগ করতে পারে—অর্থাৎ নিজের নীচ স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে সেই বিজ্ঞা অপব্যবহার করিবার জন্য প্রয়োগ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে

গোপনীয় কথা কাক বলা উচিত বা অহতিত সেই কথা উঠে পড়ে। হাতা ইচ্ছা করে গোপনীয় কথা গোপন রাখেনা, বা অন্তের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তাহলে কাছে গোপনীয় কথা বলা যে বাহনীয় নয় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এমন অনেক ভাল লোক আছে, যাদের কাছেও গোপনীয় কথা গোপন রাখা ভাল। এরা লোক ভাল, ইচ্ছে করেই যে গোপনীয় কথা প্রকাশ করে ফেলে তাও নয়, বা অন্তের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে

যে গোপনীয় কথা ব্যবহার করে তাও নয়। তবু তারা গোপনীয় কথা গোপন রাখতে পারে না। কলে হয়ত অন্তের, আপনার এমনকি তার নিজেরও অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, এবং অনর্থক নানা ঝটিকতার সৃষ্টি করে। ভাল লোক হলেই বা আপনার আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেই যে গোপনীয় কথা গোপন রাখবার ক্রমতা থাকবে এমন কোন কথা নয়—সেটা চরিত্রের স্বভাব ওপর নির্ভর করে।

সুধাপাত্র

অম্বল্যাকুমার চন্দ্রবর্তী

জীবনের পূর্ণপাত্র হ'তে
নিভা নিভা কত করি পান।
আপন বর্ষের হৃগভীরে
পান হবে করি হৃগভীরে
মানবের ভগ্নকাল হ'তে
কে তার সমুদ্রে ধরেছিল
সুধাপাত্র। পূর্ণ মনোরথে
শিশু তাহে পান করেছিল।
মকারিচা দ্বালোক কুশোক
ভাসিত সে প্রাণের পূলক,
উছলিয়া প্রতি কণে কণে
বিচিত্র বিপুল অলোড়নে
গাহিত যে কত ছন্দ তুলি
হৃগ হৃগ নানা ব্রহ্মসুনি।
তথা—সুধু মগ্নাভ্যাসে
করেছিল পান এ পানীয়
কিন্তু এই জীব-বায়ু সুধা
আপটবে নিভা এর সূপা
তৃপ্তিহীন অনির্কটনীর।

সুধাপাত্র করেছিল পান
জীবনের পূর্ণপাত্র হ'তে !
অমান্য অনর্থ সমুদ্রেতে
বেধা অবিরাম যেতে যেতে
জীবনের কানায় কানায়
পরম রহস্য আনি ধরে
পদ্মায় সে লুপ্ত হয়ে যায়,
আগে চাখি কৌতুহল ভরে।
নিভা অবিরাম বিচরণ
অমান্য টানে শিরহণ
বিরহণ কত যে উল্লাসে।
পরম পরবে যেমন সে
প্রশান্তি ধরে হাত ছুটি
দ্বাধার কথির পড়ে ছুটি
বেধনা প্রহত দ্ব্যয়েতে।
তবু, তবু যে এ চিরতপ
জীবন-বায়ু এই পানীয়তে
মানবের শাশ্বত পিপাসা
অপূর্ণ কত কাঁধাধা
চিরবায়ু পথে অসুখণ।

স্বাধীন ভারতের কারাগার—৬

কমলা দাস গুপ্ত

গতকাল ১৫ই অগাষ্ট থেকে চলেছে সমগ্র ভারতবর্ষ-ব্যাপী স্বাধীনতা উৎসব। আজ ১৬ই অগাষ্ট ১৯৪৭ সন। বন্দী এখন আর বন্দী নেই। কংগ্রেস আজ রাষ্ট্রের কর্তার। সমগ্র দেশ মন পরিপূর্ণ করে সে প্রাণভরে মুক্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তার অল্প পরমাহু দিবে সে অহুতব করছে, ইংরেজ চলে গেছে, ভারতবর্ষ স্বাধীন, কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রাম সার্থক।

উৎসব মুহুরিত কলকাতা নগরী। অপকৃত্য লাজে সেজেছে সে। হিন্দু-মুসলমান বহুদিন পরে হাত ধরে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। গান্ধীজী আছেন গুরোভাগে। কে বলবে জাতি মরে গিয়েছিল? যে জাতিকে গান্ধীজী নিয়ে হাতে ধরে মনে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন সে জাতি কখনো না বেঁচে থাকতে পারে? সমগ্র ভারতবর্ষের জীবন স্পন্দন চলছে সেদিন কলকাতায়। ইংরেজ চলে গেছে, আমরা স্বাধীন, গান্ধীজী আছেন আমাদের কাছে। এতবড় সম্পদ, এমন দৌভাগ্য জীবনে কোথায় আছে? জাতির জীবনে কত সুগুণ অসিদ্ধি ঘাবে, কিন্তু যে সম্পদ ১৫ই ১৬ই অগাষ্ট কলকাতা সহর পেয়েছিল তা আর কোন স্থানই পাবে না, জুগুতও পাববে না।

অল্প খুণীতে ডরা আজ সেই মুক্ত রাজবন্দী। আনন্দ বিচোর মনের মধ্যে থেকে থেকে তার মনে পড়ছে দুঃখের দিনের কারাগারের সেই মাঝীঘের। কী জানি তারা কেমন আছে। আশঙ্কের দিন তারা কেমন করে কাটাচ্ছে? সমগ্র ভারতবর্ষের মুক্তির দিনে তারা কি মুক্তি পাবে না? ভারতবর্ষের বৃহৎ মুক্তির দিনে জেলের মধ্যে কারাগার পাত্রবা কি বুঝাই মুক্তির আশায় লোহার দরজার দিকে তাকিয়ে যা থেকে মুক্তি কিরিয়ে নিচ্ছে?

চলে যায় সে তার অতি পরিচিত সেই জেলখানা। প্রকাণ্ড লোহার দরজাটা তেমনি ভালো স্থিতিতে দাঁড়

করে আছে। সেই সিঁপাট, সেই জেলার দরজার দাঁহারা দিচ্ছে। জেলখানা তেমনি নিরানন্দ, নৈরাজ্যভরা। মুক্তির উৎসব, আনন্দের চোখেও শুধু কি এখানেই পৌছবে না? জেলার থেকে পরিভ্রমণ করে, কয়েদীদের কথা। লালমুণ্ডো জেলার সুনিরে দেয় জেলকল নেই কিছু দলার। আবার সেই জেলকল! ইংরেজ চলে গেছে, যার নি কি তার নিষ্কল জেলকল? ইংরেজ চলে গেল, রেখে গেল কি দেশের খুশী কয়েদীদের তেমনি দুর্গত, তেমনি অবনতিত?

মুক্ত রাজবন্দী আজ জেলের বাইরে পোহার কাটকটার মোটা মোটা গহাবগুলি ধরে পাড়িয়ে আছে। দুঃখভরা অতীতের স্মৃতি একে একে মনের মধ্যে তার জীত করে আসে। মনে পড়ে জেলখানার বলে স্বাধীন ভারতের কারাগারের কী রূপ সে কল্পনাও চেয়েছিল, আর আজ কি করতে হবে। সব নাহিই তো। আজ নিজের দেশের।

নিজেকে সে বলে চলেছে, স্বাধীন ভারতের কারাগার হবে সংশোধনকার। কেবল সশ্রম কারাবন্দীই মানসিক বিকার ঘোচায় না। মাহুৎ যে চুরি ডাকাতি করে; খুন করে; আরো কত কি অস্তায় করে তার বেষ্টীর ভাগই হচ্ছে হারিত্রা এবং অভাবের তৃণভাষ। যে দেশে সুখায় আর নেই, পরিধান নেই, শিক্ষা নেই, উপায় নেই অথচ বহুস্বয়মী হতে গঠার সমগ্র প্রলোভন আছে সেই দেশের অতীত শাসনব্যবস্থার স্মৃতি হচ্ছে এই কয়েদীরা। এদের উপর প্রতিশোধ নিলে, শুধু পীড়ন করলে, এই মানি তো হু হু হবে না। হু করতে হবে আমাদের সমাজকে, নতুন রাষ্ট্রকে নতুন করে গড়ে তুলে। যে রাষ্ট্রে সকলে স্বতন্ত্র: কিংবা দুইটো খেতে পাবে, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র পাবে, বোখানে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, যোগে চিকিৎসার উপায় থাকবে, সকলের সমান অধিকার থাকবে, সে রাষ্ট্রে গড়ব আমরা। অভাবের নিষ্পেষণ আমাদের রাষ্ট্র বস্ত্র কমিষে আনতে পাবে, শিক্ষার প্রচার বস্ত্র বৈদ্য হবে মনে মনে আমাদের সমাজের মানি ততই কমে আসবে। তত্ত্ব অভাবহীন,

শেষদশায়, সকল নাসরিককে সমান সুযোগ দেওয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সেই ক্রমক মজুতবাহ্য বৃত্তান্ত না আশ্রয়ে তত্ত্ববিন কয়েকই অগ্রবাহ্য থাকবে, কয়েকদলের কয়েকই আনন্দোদয় থাকবে। তত্ত্ববিন জেলখানা সেই ক্রান্তিপূর্ণ করে কয়েকদলের শিক্ষা ও সুযোগ দিয়ে মানুষ করে তুলবে, যোগ্য নাসরিক করে তুলবে।

ইংরেজের জেল আইন কেবল শাস্তিরিক শাস্তি দিয়েই বেন কয়েকদলের উপর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই শাস্তিরিক শাস্তি দিয়ে দিয়ে ভয় দেখিয়ে তো কয়েকদলের মনের অপর্যায় কাটে না, মনের ভয়ও যে আস্তে আস্তে বেড়ে যায়। জেলের শাস্তি শেষে কোথাও কেউ না হতে শিখেছে, নিরপরাধ হতে শিখেছে, এমন তো শোনা যায়নি। সেখানকার আবহাওয়াই যে বিধাক্ত। সেখানে বন্ধ করে, ভিত্তি বন্ধ করে, ছালায় চট পড়িয়ে, শিকল বেঁধে, ভাঙাখেকি পড়িয়ে, মারপিট করে কয়েকদলে বেন আরও মানসিক উত্তেজনার সমুদ্রে ঝেঁপে দেওয়া হয়। তারা বেন শুধু কখন গিয়ে আরো প্রতিহিংসাপরায়ণ, আরো অপর্যায়গ্রন্থ হয়ে ওঠে, মরিচা হয়ে ওঠে। এটা তো মানুষের তৈরী করার কথা নয়, এতে লেভটাও যে মানব হয়ে ওঠে। এতে নৈতিক অধ্যয়নই হয়। কাজেই ওই শাস্তিরিক শাস্তি বন্ধ করে দিয়ে জেলে সংশোধনমূলক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। মানসিক শিক্ষার দ্বারা দিয়ে অপর্যায় সম্বন্ধে বুঝিয়ে বুঝিয়ে ওদের সচেতন করে তুলতে হবে।

কয়েকদলে জেলে এসে লেখাপড়া শিখবে। তাছাড়া তাদের নৈতিক জীবনও জেলখানা গড়ে তুলবে। সে জীবন গড়ে তুলবার জন্য জেলের মধ্যে বিভিন্ন আগোজ রাখবে। এখানে রেডিও থাকবে যাবতের কাগজ সমস্ত রকমের আশ্রয়। সেখান দিয়েও কথা মজুতভাবে আকর্ষণ করে যোগ্যতার তার থাকবে বিশেষভাবে শিক্ষিতদের উপর। নানারকমের বই পুঁজি চিত্তাকর্ষক করে পড়ে ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে লেখাপড়া এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে ওদের মনটা নিজের থেকে আনন্দের সঙ্গে লাড়ানো দিয়ে ওঠে। যেদর সবসময়

মুখিয়া থাকবে। তাতে ওরা আনন্দ পাবে। ওদের বক্তিত জীবনে যদি কিছু আনন্দগ্রন্থই এসে যেওনা যায় তবে হয়তো মন্য কাজের দিকে প্রলোভন খানিকটা কমে যাবে। মাকে মাকে বাইরে নিয়ে গেলে, বাইরের জীবনের চাকলা দেখলে ওদের ভালো লাগবে। বছরে একবার যদি কয়েকদিনের জন্য বাড়ী বেতে পারা তবে বাড়ীর আনন্দ পরিবেশের মধ্যে কিরে যাবার জন্য যে মজুত আকর্ষণ বোধ করবে সেজন্য ওরা হয়তো ভালো হয়ে উঠতে চাইবে। মজুতের মনোভাড়া জীবন যাপন করার জন্য একটা চেষ্টা লাগবে। সমাজ যাতে কয়েকদলের সমাজচ্যুত চোপে না দেখে লেজ মন্যকে সচেতন হতে হবে।

তার চেয়ে বড় কথা আছে। কয়েকদলে জেলে এসে যাতে যাবলগী হতে শিখতে পারে সে দায়িত্ব থাকবে জেলখানার। এইখানে কোনও অর্থকরী বিভা দিখে দিয়ে বাইরে যাবার পর তারা নিজের পারে ঠাড়াবে। এখানে তারা শিখবে উত্তেজনা, চরকা কাটা, দেলাই করা, লোহা, পিতল, কাঠের কাজ, চামড়া পশমের কাজ, কুটির কাজ সমস্ত কাজেই তারা এখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষালাভ করে শক হয়ে উঠবে। এটা বেন ওদের একটা শিক্ষালাভ করার বিভাট কেন্দ্র হবে। তারপর মজুতের পর গভর্ণমেণ্টই শুকতে তাকে নিজের পারে ঠাড়াতে সাহায্য করবে। তাদের শিল্প, কৃষি ও যাবলগী চাপু করে দিতে সাহায্য করবে। কয়েকদলে মজুতের হাঙ্গিরে জেলখানা থেকে বেরিয়ে যাবে। আশ্রয়বিধান জন্মেছে তার, যাবলগী হবে সে। ছবি তাকাত্তি করার প্রয়োজনই নেই আর তার।

জেলে যখন সে পরিচয় করবে, যা উৎপাদন করবে, তার একটা অংশ মজুতী হিসাবে যদি সে পারা তবে সে আরো দৃষ্টি হয়ে কাজ করবে, কাজে আকর্ষণ বোধ করবে। এই আকর্ষণ বোধ ওদের কাছে কীকি না দিতে দেখাবে এবং আরো শক করে তুলবে। জেলজীবন শুকিয়ে ওদের পাপন করে তুলবে না। আশ্রয় মজুত দিয়ে এই মজুতেরই একটা অংশ মূল্যন হিসাবে গভর্ণমেণ্ট

গুনের দ্বিগুণে দিতে পারে। সেই টাকাটা তাদের নিজের উপার্জিত টাকা। নিজের উপার্জনের টাকার আশ্বাস পেয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার উপায় পেয়ে ওরা সন্তোষ লাভে নাগরিক জীবন গাণন করবার প্রেরণা লাভ করবে। ওরা মাহুস হয়ে উঠে বাধীন ভারতের এক পরম লক্ষ্য হয়ে উঠবে।

আরেকটা কথা আছে। একবার জেলে গেলে আমাদের সমাজ তাদের বলে জেলখুসু এবং এমন ব্যবহার করে যেন ওরা সমাজের অশুভ। তাদের অবজ্ঞায় ভুগা করে, তবে পরিহাস্য করে চলতে চায়। তার ফলে একবার জেলে গেলে তারা আর সমাজে স্থান পায় না, ভাল ব্যবহার পায় না। তারপর হয়ে দায় সমাজের একঘরে এবং সমাজচ্যুত। শুধু সেট সমাজচ্যুত নিকপায় জীবন অল্প কোন পথ না পেয়ে গেটের দ্বারে আবার হয়ে ওঠে নিকপায় চোর ডাকাতি। আমাদের সমাজের সৃষ্টিভঙ্গী এই সংকীর্ণতা দূর করে কেলতে হবে। উন্নয়ন হয়ে মাহুস গড়ে তুলতে হবে। এদের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে দরম নিয়ে ব্যবহার করতে হবে, এদের আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে, সং হতে সাহায্য করতে হবে।

তা'ছাড়া মানবিকতার দিক থেকে প্রত্যেকেরই সমানে নাগরিক হবার অধিকার আছে—এদেরও থাকবে। একবার অপরাধ করলেই মাহুস চির অপরাধী হয় না। অন্ততঃ আচকের নতুন বিশেষ একথা ঠিক। হাজার হাজার লোক আছে যারা অপরাধ করেছে কিন্তু খরা পড়েনি বলে জেলে বাধিনি। এই অপরাধীরা যদি শুধু খরা পড়েনি বলে সর্বোপরি নাগরিক জীবন গাণন করে যায় এবং বাকী জীবন শুধরে নেয় তবে যে অপরাধীরা হোক আর মত খরা পড়েছে তারাই শুধু খরা পড়ার অপরাধে সমাজচ্যুত এবং স্থানীয় পাত্র হয়ে থাকবে কেন? এবং শুধরে নেবার সুযোগ পাবেনা কেন? নাগরিক জীবন গাণন করবার অধিকার পাবেনা কেন? আমাদের বাধীন ভারতে এই সংকীর্ণতা থাকতে আমরা যেননা। সূত্র ভারত নিজের মনের সমতা দিয়ে কর্মীদের মানসিক সমতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

এমন সব কর্মেরী আছে যারা মুক্তি সমর অক্ষম, সূত্র বা ভিন্নকর হয়ে যায় তাদের গড়গমেটের পেন্সন দিতে হবে। তাতে তারা আর অসহযোগ অবলম্বন করার দরকার বেশি করবে না।

আবার একদল আছে যারা habitual criminals. এদের কথা স্বতন্ত্র। এদের মনের রোগী হিসাবে দেখা দরকার। এদের মানসিক বিকাশ বোচাবার অল্প জ্ঞান, চিকিৎসা এবং খুব সহানুভূতিসহ ব্যবহার প্রয়োজন যেমন পাশলা গরিবের রোগীদের অল্প করা হয়। বর্তমানে না এদের মানসিক রোগ গেরে যাব ততদিন পর্যন্ত সাধারণ কর্মীদের থেকে এদের আলাদা করে রাখতে হবে—সব ব্যবস্থাই আলাদা করতে হবে। নইলে এই ধরনের মানসিক রোগীর সংস্পর্শে থাকতে থাকতে সাধারণ কর্মীদের এদের প্রভাবে গড়ে যেতে পারে।

Habitual criminals-দের অল্প মুক্তি পরেও আলাদা colony বা settlement থাকবে। সেটা থাকবে গড়গমেটের তত্ত্বাবধানে। সেখানেও এবং রুমি, শিল্প করে থাকবে। আবার পথ থাকবে, ব্যবসায়ী হবার পথ থাকবে, মাহুস হয়ে উঠার নানা ব্যবস্থা থাকবে। নীতিবর্ধ শিল্পার ব্যবস্থা থাকবে। মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। বিশেষ রোগী হিসাবে এদের চিকিৎসার বিশেষ একটা ব্যবস্থা থাকবে। আবার আলাদা কলোনিতে থাকবে বলে বাইরে এদের প্রভাব কম যাবে, criminal কাজ করার সুযোগও কম পাবে। অবশ্য রোগ গেরে গেলে সকলের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে।

এমনি করে জেলের ভিতরে এবং এই সব কলোনিতে বাধীন ভারতবর্ষের সমস্ত কর্মীদের, যারা আর সমাজের দানি হয়ে আছে, তার বোকা হয়ে আছে তারা হয়ে উঠবে যোগা নাগরিক এবং পরম লক্ষ্য, বৈজ্ঞানিক কৃষি শিল্পের একটা উৎস।

বাধীন ভারতের এমনি কারাগার তৈরী করতে কে? ইংরেজের চাওয়া উচ্চতর super নয়, বরঞ্চ মেলায় নয়। এখানে আসবেন মগতের শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক

তার গভীর জ্ঞানে আর অসীম মহাহুত্ব নিয়ে। মুক্ত রাজবন্দী অস্ত্র কর্তন করে, আশাহের এই জেলের প্রাঙ্গণে আশাহের সৌন্দর্য্যী কল্যাণেশ্বর এই “বাধিত নগরী” পথে বুকের ককণ জ্বলি উঠি লক্ষ্যাতারা সম রথে ছুটি।” শেনিন ভারতের সর্বাধিকা বড় পানী যে সেও তার সর্বশ্রেষ্ঠ বান মহাভিক্তকের পায়ে এনে দিয়ে থক হয়ে

যাবে। স্বাধীন ভারত সার্থক হবে। সেই ভারতবর্ষে কারাগার স্থাপন করার পেনিন প্রয়োজন থাকবে না। এমনি একটা ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নে থিতোর হয়ে মুক্ত রাজবন্দী জেলের গরাম ছেড়ে হামিমুখে চলে আসে।

এ নগরী তারিখে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে পঠিত।

ঈগল

ঐশ্বর্য মিত্র

গোনালী ঈগল বল কতদিন যায়! হুক!
কিরোকা আকাশে দিবেছ ভাসিয়ে কামল কায়া,
তীক্ষ্ণ চক্ষু ব্যাগ্র নখেতে বলের ভাষা,
তোমারে বিরোদ্ধে আসিম পিশাচী হাতের মালা!
জানো কি ঈগল অনেক নেতুণ দুমোর মাজ
তোমারি বুকের গোপন নীলচে রক্তবীজে,
স্থাপনী চোখের জিহ্বা আত্মা নিমিষিবে
দূরধিগম্যে খুঁজে খুঁজে কেরে কি জানি কি বে।
ঈগল ঈগল ষাঁকানো নখেতে ঠকি ও ভাষা!
কঠিন চকু বলে যায় কি বে কড়া পথ?
লুপ্তন হুক—রমভাবিনী কি অভিবান,
তারি বাতাসের বুক চিরে চিরে তোমার পথ!
ঈগল এখানে ভাগ্যের ভরা তোমার নীড়ে,
দূরধিগম্য বক্ষপূরীর গোপন হুঁড়া,
লুপ্তিত বস্ত স্বপ্নাকার ঘেঁষি কি লক্ষ্য!

আরো নীচে নামো রিক্তা পৃথিবী মুর্ছাতুরা।
কুবনখন হলবে পৃথিবী হলেলা কই?
বাহত শান্ত প্রবাহি পঙ্কর জীবনাবেগ,
অলস বেলায় নিরাপন্ন নথ রোমেশন,
পরম আকাশে তুনি উড়ে আগ বহ্নবেগ।
ঈগল ঈগল উপত্যকার কি অভিযাণ।
ইন্দ্রাভি নখে শান্ত জীবনে ঝাঁকি কি ক্ষত;
বিষে নীল হোলো হলদে নীড়ের শায়স্থর,
এখানে তোমার নীড়েতে গোনালী বগ্ন কত।
ভবু শোন শোন শেখ কথা বলি ঈগল শোন—
হাত শেখ হোল উপত্যকাতে এলো সে কায়া?
বাইশনি শিঙে চল অভিজ্ঞের নীল স্কিলিক,
তোমার সংগে কেহাষ এখার ঢালাবে তারা!
গোনালী ঈগল জীবনে তোমার জবে যে মেধ,
অনেক দুঃখের মরণস্থর বারতা শোনো,
উপত্যকাতে অলস ফলাবে তোমারি হাড়,
আজ থেকে তথ্য সেই সে মিনের সম্ম গোনো।



স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের মর্যাদা, সুন্নাহ ও শক্তি বৃদ্ধির উপায়

রাজন কুমার দত্ত

সংখ্যালঘিষ্ঠদের মনে থেকে আড়ৎ দূর করা
আম্ব কৰ্তব্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এ কাজ কার? যেমন সরকারের, তেমনই সমাজসেবী-
দেরও, তেমনই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জনসাধারণেরও।
সরকারের চেইর ভেতরে কোন উদ্বেগ নেই, আতঙ্কিত;ও
নেই। সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহারে বরং সংখ্যালঘিষ্ঠ
জনসাধারণ ব্যক্তি, উড্ডাক তাই আরও আতঙ্কগ্রস্ত।
পাসপোর্ট ও স্থান ত্যাগীদের উপর অথবা হরণাদি তাহা-
দিগকে আরো হতাশ ক'রে তুলেছে। আইন সভায়
আলোচনাকালে নিঃসিধ্যাক্ত আলি দেখিন পাকিস্তানে
মুসলিম ষ্টেট ব'লে হিন্দুদের হৃত্তিকে অথবা প্রদর্শন করেন।
তাহাদিগকে বস্ত্রতপকে শত্রুপক্ষ ব'লে মনে কবা
হচ্ছে এবং বিরুদ্ধি ও বক্তৃতাকালে তার স্বরে সেই কথা
প্রচার ক'রে বিবেচ্য স্তম্ভিতও চেষ্টা চলছে। এসবও
হিন্দুদের মনে ভীতি, দুর্বলতা ও হতাশার স্তম্ভিত করে।

বস্ত্রত পাকিস্তান মুসলিম ষ্টেট নয়, পিপলস ষ্টেট অর্থাৎ
গণরাষ্ট্র। এর শাসনতন্ত্র, শিক্ষাতন্ত্র, সমারতন্ত্র কোন
একটী বিশেষ সাম্প্রদায়িক সংস্কারকে অবলম্বন ক'রে
গড়ে তোলা অগংগত, অস্ত্রায়। শাসন, শিক্ষা ও সমাজ
সম্পর্কীয় তত্ত্বসমূহ বিশ্বগ্রন্থাগারী, সর্বলোক প্রণামী হওয়াই
বাঞ্ছনীয়। এরই মাশকাঠিতে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতির শ্রেষ্ঠত্ব
মহত্ব ও সম্পূর্ণতা বিচার করা হয়। এর হুকম এই যে
রাষ্ট্রের কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বা কোন বিশেষ মতবাদী
দলের অঙ্গস্বেষের কোনো কারণ থাকে না, ভীতি বা
হতাশারও কোনো কারণ থাকে না। রাষ্ট্রের শক্তি
তাতে হয় সংহত, পায় বৃদ্ধি। প্রত্যেকটী সম্প্রদায় বা
ব্যক্তিগণেশেণ যেন মনে করতে পারে যে তাদের বা তারও
এই রাষ্ট্রকে আগনার বলার অধিকার আছে এবং
সে-দাবী ক'রে গৌরব বোধ করবার হেতুও আছে।
সংখ্যাল ব'লে তাদের প্রতি যে কোনোদিক উপেক্ষা নেই,

কোনোদিক অন্যদিক নেই এই বোধ প্রত্যেক অধিবাসীর
মনে আগা চাই- কি হিন্দু কি মুসলমান। এমনটা হলেই
প্রকৃত শোষণাদি হিন্দুবা পেতে পারে। কিন্তু এমন
অবস্থার স্তম্ভিত করতে হলে মুসলিম জনসাধারণের চরিত্র ও
আচরণে পরিবর্তন আনা চাই। পাকিস্তান মুসলিম
ষ্টেট এবং হিন্দুবা এখানে প্রবাসী বা পরগাছা স্বত্বগ,
অতএব হিন্দুদের ওপর মুসলমানরা যেমন টেচ্ছে তেমন
ব্যবহার করতে পারে, তার কোনো বিচার নেই, শাসন
নেই, এই যে বোধ পূর্বকণের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের
মনে স্থান পেয়েছে এবং এ রাষ্ট্রের দৃষ্টিকার যেন তারাই
এই জ্ঞানধারণা অগনোদন করা একান্ত আবশ্যক। এ
না হওয়া পর্বত পাকিস্তানে শান্তি ও মৃদুলা প্রতীতি
হতে পারে না। রাষ্ট্রের শক্তি, স্থান ও মর্যাদাও ব্যভ্রত
পারে না। সরকারের উচিত একটা স্থপতিকল্পিত
ব্যবস্থার গ্রাবে গ্রাবে কর্মচারিদল শ্রেণণ করা, সভা বৈঠক
ভেঁকে হাটে বাজারে জোলসহরতে সর্বসাধারণকে ত'নানো,
তারের শ্রান্তি অগনোদন করা, বৃত্ততি, চুরি, রাধাভাষি
বদ্ধ করতে বলা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সন্ধান খোঁজাবোধ
আগ্রত করা, পাকিস্তান যে কেবল মুসলিম ষ্টেট নয় গণ-
ষ্টেট অর্থাৎ সর্বসাধারণের নিম্ন-বাস-ভূমি সে কথা বলা।
এই ব্যবস্থা না হওয়া পর্বত এং জনসাধারণের অনিষ্ট
করবার প্রকৃতি বিশেষকোরে হিন্দুদের ওপর দমিত না
হওয়া পর্বত পাকিস্তানের গ্রনাম মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি
পেতে পারে না। একজন মর্যাদাশীল নাগরীকের আচরণ
কেমন হওয়া উচিত এ শিক্ষা জনসাধারণকে বেওয়া
দরকার। এ ক্ষেত্রে গ্রামে গ্রামে ছায়াচিত্র ও রেডিও
সহযোগে লোকশিক্ষা দুলক প্রচারকার্য অত্যাশক্ত এবং
অনতিবিলম্বে।

কেন না, লোকের মনে বিবেচ্য এবং ঠৈশপাটিক জোপ-
সূহা আশ্রম ও এমন তাবে বর্তমান যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের
স্বী অথবা পুঙ্খ কাঠে ওপর কোনদিক পীড়ন বা অত্যাচার
করতে পারলে সংখ্যাগরিষ্ঠেরা খুদীই হয়, পর্ব অস্থত্ব
করে, তাদের মনে ক্ষেণের পরিচয় বেধতে পাই না,
বেদনার রেখাপাত হয় না সে শিশ্য মনে! তাই বোলে

সমগ্র সম্প্রদায়ের ওপর এর ভক্তে সোবারোণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বলার এই যে এই ঐশ্বর্যশীল ভাণ্ডার ও গুণ্ডিনেজ্জা বোধ করা সরকার। জনসাধারণকে নীতিপরিচয়নার পাঠ্য না মিলে এবং সাধারণ নিষ্ঠার বোধ তাদের মনে জাগ্রত করতে না পারলে—এ রাষ্ট্রের শক্তি নেই, সমৃদ্ধি নেই। বহিঃশক্তির সহায়ত্বিত পাওয়া পথও সংকুচিত হবে—সংখ্যালঘিদের আত্মরও কমবে না বিশ্বমায়। বিবুদ্ধের স্বানভাগ বহু করতে হলে মূলমীম জনসাধারণের মধ্যে নীতি ও মর্যাদাবোধ ভাগাতে হবে। রাষ্ট্রকল্যাণে সকল কার্যের আগে সরকারের উচিত এমিকে দৃষ্টি দেওয়া। নেতৃত্বের বিবৃতি ও বক্তার ঘাটা কেবল এই সমীক্ষা লোকের মনে ভাগবে না, এর ভক্তে কার্যক্রমে বরতরকে উজ্জাগরিত হতে হবে। সরকারী কর্মচারীদের চিন্তা বাক্য ও কাণ্ডে পবির মেশাভাবের পরিচয় পাওয়া চাই—আমলাতাত্ত্বিক ঘূষার্থী মনোভাব পরিহার করতে হবে। বেশ পর-মাসন-মুক্ত হবার পরও কি এই পরিবর্তন তাদের কাছে আশা করা যাবেনা ?

আমানের বিশ্বাস, সরকারী কর্মচারীদের মনে শুভ আত্মরভাবোণ ও ভ্রাতৃবোধ জাগ্রত হলে জনসাধারণও তাদের আচরণ ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হবে। আভকার দ্বিত এই যে সরকারী নীতি এবং সরকারী কর্মচারীকূই এখনও জনসাধারণের নিকট অশ্পষ্ট, ভূবোধ। স্বাধীন নাগরীকত্ব লাভের পর একজন মূলভা নাগরীকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী সে সম্বন্ধে আজও কোন প্রচার ব্যবস্থা সরকারপক্ষ থেকে করা হয় নি অথচ এর আভ প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সম্প্রতি এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে যা সংখ্যালঘিদের বিচলিত আত্মকগ্রস্ত না করে পারে না। এ কিছুতেই কাম্য নয়। অথচ এই-ই পুনঃপুনঃ ঘটছে। যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো স্বীলোককে ছোরপূর্বক অথবা ভয় বৈধিবে বা কোনোভাবে ধর্মচ্যুত করতে পারলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মনে মূলির ছড়াছড়ি বেধতে পাওয়া যায়,

শোভাযাত্রা আনন্দের চরোড় বেধতে পাওয়া যায়, গৌরব বোধ, শ্রাব ও আভাগন প্রকাশ পায়, বেধনা বা অহুতাপ নয়, সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জ্বলম্প কেন না উপস্থিত হবে ? সরকারী কর্মচারীরা এ বেধেও যেধেন না, ভুনেও ভুনের না। ব্যাধার্থী পতাকাধারী সমাধসেবীরাও তথৈব। ব্যাধটি আছে—আমি রাষ্ট্রের গৌরব অর্জনকারী একজন নাগরিক—এ ‘অহং’ আছে, অবিনয় ও কহাচার আছে। সমাধসেবীর চরিত্র ও আচার নির্দলীন ও নিরপেক্ষ হওয়া চাই, সমাধ ও লোককল্যানই তাদের ব্রত যে। সমাধসেবীদের কি সে-বোধ ও ব্রতি আছে ? খাফা চাই, অথচ নেই—

সমাক সেবকের মন বাক্য ও আচার হবে নিরজন, হবে সর্বলোকপ্রিয়, যে কোনো একজন পথহারা অসহায় স্বীলোক ও তাদের আভ্রকে নিরাপন্ন ব’লে মনে করবে, কিছু আমাধের কাছে অভিযোগ আগে এর বিপরীত। এখানে সমাধসেবকের নামে লোক পিটরে ওঠে, ভ্রাপনাল গার্ভের উৎসীড়নের ধবর কতই না আলে। এমন ভো হওয়ার কথা নয় ? ঘাটা হবে নির্বলের বল, অসহায়ের সহায়, অনির্ভরে নির্ভর সেই তারাই কেন ভয়ের কারণ হবে ব্রুতে পরি না। এইখানেই ব্রুতে আমরা অক্ষম। এর ঘাটা এমন বলি না যে সমগ্র সংস্থাটিই ভয়ংকর বা ভয়ের কারণ। কিছু এই অনির্ভিত দ্বিভিতে দুটি চারটি ঘটনাই যে ব্যাপক অনর্থ সৃষ্টি করতে পারে, করে থাকে। এই ভক্তে জনসেবক ও জনসাধারণকে উচিত শিক্ষা গ্রহান করা একান্তভাবে আবশ্যক।

সেবকের উচিতবোধ কোথায় ? শ্রিষ্টাকণ্ডের চায়া চাই। চায়া দিতে হবে,—ভালকথা। কিছু বাধ্যতা-মূলক হ’তে পারে না। অবয়বটি চলতে পারে না। সমর্থ অসমর্থের বিচার আছে তো ? শোকেব ধরে অরসংহান নেই, ব্রত্যাভাব, গৃহাভাব—তারের কিছু সাহায্য দিতে পারলেই তারা বাচে, তা নয়, তাদের ওপর মূল্য, “তোমাকে এত দিতে হবে, তোমাকে অত দিতে হবে ইত্যাদি।”

এমন মূল্য দরিত্র মূল্যমানদের ওপর করলেও তারা

সইবে না, অথচ পীড়িত জীত মনসরা হিন্দুদের ওপরই
এই হুমকি। অক্ষমতা জানালে ভীতি-প্রদর্শন। পূর্ব
জনসাধারণ বা উচ্চ-শ্রম জনতার কাছ এমনি, শিক্ত
ডঃবেঙ্গী। ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, সভাপতি ও এই
জাতীয় অগ্রদূতরাই পত্রাধিকার নন। গ্রামে গ্রামে
সালিসিওর্ড আছে অথচ হুগুন্দের বিচার—এ একটা
গ্রহণন মাত্র। ইউনিয়নবোর্ডের সভাপতি, গ্রামসভাপতি
এদেরও দুর্বলতা কম নয়। হুগুন্দের বিচারকালে তা
ধরা পড়ে। এই দুর্বলতা কেন? এই জন্তে যে এরাই
স্বাধীনকালে পরিচালকের স্থান গ্রহণ করেছিলেন। এরাই
নাকি শহীদ! কাজেই হুগুন্দের আশ্রয় সেই সুযোগ
নিতে ভুল করে না। করবেই বা কেন? এমন সত্য
ব্যবস্থা ও শহীদ পক্ষী আর কিসে বা আছে? মাংসা-
কারীরা গ্রাম সম্পর্কিতই মুক্ত। আইনেও ঠিক। হুগুন্দের
এমন আইন যে অপরাধীর সাজা নেই, মিথ্যাবী জেলে
পড়ে, কামীতে কোলে।

ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রবর্তিত আইন-আদালত, উকিল
বোক্তার বিচারক সব কিছুইই সৃষ্টি এদেশকে চিরকালের
মতো শূন্যলিত করে রাখার উদ্দেশ্যে। আজ স্বাধীন
শাসনপ্রাপ্ত আমাদের এই রাষ্ট্র, কাজেই শাসন, আইন
আদালতের সংস্কার আদ্য ও অবশ্য কর্তব্য। বিলম্ব
করার কোন ক্ষেত্র নাই। শাসন-ধর্ম, সমাজ-ধর্ম, শিক্ষা-ধর্ম
—সবইই জাতীয়তার ভিত্তিতে হৃদয়বৃত্ত, হৃদয়বৃত্ত, ও
হৃদয়বৃত্ত হওয়া দরকার। কিন্তু বা প্রকাশ পায় নেতৃত্বের
মুখে বিরুদ্ধ বক্তৃতার ভাঙে হিন্দুদের ভবিষ্যত আশা
আরো সঙ্কটিত হয়ে বাড়ে। ঐশ্বর্যময় কালচারের
ভিত্তিতেই কেবল সব কিছুকে গড়ে তোলা হবে—এমন
বললে হিন্দু জনসাধারণ কেন কোরে এই রাষ্ট্রকে
স্বাধীনতার পথে গ্রহণ করবে।

বর্ত্ত গ্রাম-পকারেই যদি লম্বল ও ক্রান্তিগ্রহণ হয় তবে
আইন-আদালতের প্রয়োজনটা কোথায়? গ্রামবাসীর
মনে সন্তোষ আশ্রয় হলে ছুটি চারটি সদাশ্রমী কি
করতে পারে সমাজের?

পাকিস্তানের বড়লাট বাহাদুরের ঢাকার প্রদত্ত

সাম্প্রতিক বক্তৃতার অনেক আশার কথা আবার অনেক
নিরাশার কথাও আছে বড়লাট বাহাদুর জনাব তিন
সাতবেশ বলেছেন যে পাকিস্তানের সংখ্যালঘি সম্প্রদায়ের
লোকেরা ভারত জোখিনিয়নের যে কোন প্রদেশের সংখ্যা
সমিতির চাইতে অধিকতর নিরাপত্তা ভোগ করছে।
তিন সাতবেশের এই উক্তি শুনে মনে পড়ে একটা গ্রাম
প্রবাসের কথা :—“চোরে খাষ ছুপ কদা আরো তার ভাগ্য
দলা।” মিথ্যাকে জোর কোরে সত্য বলার প্রয়াস
করার আজকের জীবনে এই প্রথম নয়। রাজনৈতিক
ক্ষেত্রে এই বৃত্তিতে তিনি বিশেষভাবে অস্তিত্ব। কংগ্রেসকে
‘হিন্দু প্রতীক’ বলার যে রোগ তিনি বহনিত হাতে
শোষণ কোরে এনেছেন, মুসলিম লীগের অস্ত্র কোন
সময় ও সাধু চিত্র নেতা তার প্রতিবাদ করেন নি
কোন দিন। মিথ্যাকে সত্য বলার রীতিকে তারও
মেনে নিয়েছেন বলবো। রাজনৈতিক স্বার্থ চাষিলের
জন্তে এ একটা পথ বা কৌশল-বটে। স্বাধীনতার চিন্তার
বক্তৃতা দেওয়ার একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল—ইউনি-বিবে-
প্রচারণা, আমাদের বড়লাট বাহাদুরেরও একটা লক্ষ্য আছে
—সেটা হল হিন্দু-বিবে-প্রচারণা। এতাবৎ তার বক্তৃতার
বিষয় বস্তু ছিল হিন্দু বিবে ও কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতীক
বোলে আখ্যায়িত করা। আজকের তিনি খুঁজে কেন না
হিন্দু শ্রীতির কথা বলুন, মুসলিম জনসাধারণ মনে করতে
পারে যে এ মিথ্যার তিন সাত মনের কথা নয়। এ তাঁর
একটা রাজনৈতিক চাল মাত্র। বর্ত্ত পূর্ব পাকিস্তানের
সংখ্যালঘি সম্প্রদায়ের লোকেরা নিরাপত্তা অসুবিধ
করছে কিনা তা অস্বপ্নে না ঘুরে বেগলে জানা
যায় না। প্রকৃত অবস্থাতো বড়লাট বাহাদুরের উক্তি
বিপরীত।

তাই বলবো যে আজ বক্তৃতার কোন কাজ হবে না।
যে বিষ জনসাধারণের মনে প্রবেশ, করানো হচ্ছে
একবার এতকালের চোখ তাক শোষণ করতে হলে
মুসলিম জনসাধারণের উচিত হিন্দুদের সহিত একযোগে
সম্মিলিতভাবে গ্রামের সাম্প্রতিক কল্যাণরত উদ্দেশ্য
হওয়া। হিন্দুদের বৃত্তে দেওয়া যে এ দেশের সকল

ব্যবস্থায় তাদেরও সমান দাবী আছে, তারাও সমান হকদার। হিন্দুরা এতে স্বত্তি পোষ করবে। গ্রাম পাবে, প্রদেশ পাবে সকল কাজে ও চলাকোরায়।

সমুদ্র কর্মপ্রচেষ্টায় সংতোমুখে এবং সহজ একটা নতুন উদ্দীপনা, সাহস ও শক্তির সঞ্চার করতে পারে, করবে। হিন্দুরা পুর্বে তার নিরুৎসাহে শান্তিতে বদলাশ করার আশা পোষণ করতে পারবে—যদি সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার আয়োজন সর্বক্ষেত্রে করা যায়। শত শত বক্তৃতায় কিছু প্রত্যাক ফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। ভাল হই, গ্রামে গ্রামে যুগ কর্ম প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা যদি সম্ভব হয়।

এই ধরনের হিন্দু মূলমানের সমবেত কর্মপ্রচেষ্টার আনন্ড অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় বাধা অতিক্রম করতে পেরেছি। এই রীতির ব্যতীহ আনন্ডা হৃদিক ঐক্য প'ড়ে কুলতে পারি। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে এবং রাষ্ট্র-নৈতিক আন্দোলন চলি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাবে যে যে আন্দোলনে যুগ কর্মপ্রচেষ্টা প্রযুক্ত করা সম্ভব হ'য়েছে—তার শক্তি কত বিরাট কত কার্যকরী ও কি পরিমাণ লক্ষ্য লাভ করেছে? বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, থাকবার কথাও নয়। বাংলাদেশে হিন্দু মূলমান একটা বিশেষ ভাবধারায় মাতৃহ, কিন্তু এই কয়েক বছরের বিবেষ প্রচারণার ফলে সেই ভাবধারায় একটা ভাঙ্গন শুরু হ'য়েছে। অশান্তি ও ভুখ তাই।

সম্প্রতি হাশাহরে সংঘটিত একটি ববর থেকে বোঝা যায় যে হানীর মূলমান ও হিন্দুদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সম্ভাব্য পূর্ণাঙ্গায়া বিচ্ছিন্ন, বহিঃপ্রদেশের যেমন বিহারাস্ত মূলদীন আশ্রয় প্রার্থীরাই সেখানে অনর্থ ঘটাবার চেষ্টা করছে এবং এর পেছনে সরকারের পরোক্ষ সমর্থনও যে আছে তারও পরিচয় পাওয়া যাবে। সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট বর্তমানে একজন বিহারী মূলদীন। বিহারী আশ্রয়প্রার্থীদের শতকরা চেষ্টা সম্বন্ধে হানীর মূলমানদের সন্তুষ্টি নষ্ট হয় নি। এ অভ্যন্তর গোষ্ঠাবের বিষয় যে বহিঃপ্রদেশস্থ লোকের চেষ্টায়ও যে হানীর মূলমানেরা অগ্রাধ

ও অজেনাবানী হিন্দু প্রতিবেশীদের প্রতি কতব্য ও হাতিবাবোহ ভোলেমি। আরো যুখের হ'ত এই সম্ভাব্য রোধে হানীর মূলমানেরা যদি সামান্যসামান্য অগ্রসর হ'তেন।

সারা প্রদেশে এই বোধ প্রত্যেক হিন্দু মূলমানের মনে প্রাগ্রত হওয়া চাই যে তারা সর্বাঙ্গে বাঙ্গালী, হিন্দু কি মূলমান এ নয়। একই মাটিতে একই মলবায়ু প্রভাবের তারা বড় হ'য়েছে, একই পথে একই হাটে বাজারে পাশাপাশি চলেছে, মিলেছে। বিপক্ষে লক্ষ্যের তারা যে এক। প্রতিবেশী হিন্দুরা মূলমান তাদের আত্মীয় আপন না বিহার বা পাঞ্জাবাস্ত ভিত্তাবানী হিন্দু বা মূলমান তাদের আপন এ বিচার করার আছে? আমরা তো প্রাণেনিকতাও অপরূপ করি, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা যে আরো বেশী ভয়ংকর। এই ভয়ে সবার আগে সাম্প্রদায়িক বার্ষ বন্ধই পরিহার করতে বলি। রাষ্ট্রের শক্তি ও শান্তি তাহলেই বৃদ্ধি পাবে। অস্ত-বিরোধের ব্যাধি এ অবস্থা আরো ছাত্রাণ্য হবে।

আমাদের সৃষ্টিবিচার বসমানো আবশ্যক। সর্বাঙ্গে পরিজন প্রতিবেশী আমাদের আপন, ক্রমে এই সম্পর্কে বাড়িয়ে গ্রাম, জেলা, প্রদেশ রাষ্ট্র, বহিরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পারি। সবার আগে প্রতিবেশী পরিজনই আমাদের আপন সে হিন্দু হোক বা মূলমান। আমাদের মনে মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি ক'রে এই মনোভাবের বিকৃত মনোভাবকেই প্রাগ্রত করা হ'য়েছে। কাকেই এ সব অনর্থের লক্ষ্যোদন আবশ্যক বোধ করলে আমাকে কেবল আইন সভার ধাঁড়িয়ে ছুটি চারিটি বক্তৃতা মিলেই তা হবে না, কার্ণক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে এই ভুল শোধরাতে হবে। নেতাদের, গ্রাম ও সমাজসেবীদের—হিন্দু ও মূলমানের প্রচেষ্টায় এই কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হ'তে বলি। তবেই সেই শান্তি-যুখের দিন ফিরে আসবে। কেবল কি যুখের কথা? চিন্তা, ব্যাক ও কালে লকলকে অকপট ও শুভাঙ্গার্য্য হ'তে হবে। রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন কল্যান সাধনের দিকে হিন্দু মূলমান নিরিন্দেবে লকলেইই সৃষ্টি বেওয়া সরকার। হিন্দুদের হত্যা বা নিরাস হবার

বিশ্ববৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দাবীর বোধ্যতা অর্জন করতে হবে। ভীত বিমূঢ় হ'লে পরাহুতলা-প্রানী হওয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিকের পরিচয় নয়। স্বাধীনতার মর্যাদা নিজেস্বত্ব অর্জন করতে হবে। এ কথা তুললে তাদের চলবে না। তাদের কাছে রাষ্ট্রের দাবী আছে।

সে হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন ও অধিবাসীরা রাষ্ট্রের উন্নতিবিধানের আন্তরিক সহযোগিতা ও নিষ্ঠা।

উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ কর্ম প্রচেষ্টাই একমাত্র পাকিস্তানকে লব্ধ প্রকারে শান্তি, শক্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চলতে পারে।

যুগবাণী

অনিবাস চন্দ্রবর্তী

দুঃখের দীর্ঘ তিমির রাত্রির অবশানে হবে এসেছে ভোর,
স্বাধীনতা-রবি আছে। মেখে-চাকা,—যমনি ছোঁয়ার

তার আলোর।

বন্ধনবশা খুঁচেছে—এ ঠিক, কখন তবু খানেনি তার,
জাড়া বাংলা ও পাঞ্জাবে তাই 'জাহি জাহি'-ভাক

গগন ছায়।

সেলেছো তোমরা অনেক রক্ত, দিয়েছো তোমরা

অনেক প্রাণ,

স'য়েছো অলহ কতো লাহনা, মাকুমাতির অলখান,
'দা' চেয়েছি তাহা পেয়েছি' ভাবিয়া এখনি তোমরা

হ'খোনা চূপ,

যাহা পেলে তারে মনোমত্ত ক'রে দাও হৃদয় ইষ্টরূপ।

হিংসার পথ রক্ত পিছিল, তেকে আনে তাহা অকলাপ,

তাগ, কমা, প্রেম—ইহারই মহিমা তোমরা

মিলিয়া করিও গান।

নানা 'ইম্মের' কাক। হুলি শিখে ক'রোনা জানের

মিছে বড়াই,

মাহুদ না হ'বে উঠিতে পারিলে কোনো শিকারই

ফুলা নাই।

সমাজের চোখ আছে। তেকে আছে দীর্ঘযুগের কুসংস্কার,

সন্তোর আলো তারে বেগাবার তোমাদের

দরে কঠিন তার।

ভাইয়ে ভাইয়ে মিছে উচু-নীচ ভেদ, অশুভতা—কী হল্যল

নিঃসংঘের প্রমাণ ক'রেছে মোহাখানী তার বিঘ্ন কল।

আছে। কতো লোক না ধোয়ে কাটাধ, গাছতলে

তুরে ধাপে যে রাত,

যাবিতে গুণ পথা মেলেনা—বেশির ভাগেরই এট বহাত।

দিনহাপনের এ সব দৈন্ত খুঁচবেনা বেশে যাবৎদিন

ততোদিন বেশবাসীও লকালে স্বাধীনতা হবে অর্থহীন।

বাণী বেশ 'আনি' ভেঙের জীবন ঘরি তার পিছে হৃদয় রথ,

নহিলে সে শুধু স্বাক্ষরহাল—শক্তেরও করে শক্তি ক্ষয়।

নতুন যুগের বাণী তোমরা, তোমাদের আমি কী কবে। ভাই,

তোমাদের বাণী হোক 'যুগবাণী', হুজু-বাণী না—

এইটি চাই।



হেথাও ওঠে চাঁদ

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১)

শাখার শাখা সমীর বাবু তখনও ঘুমচ্ছিলেন। তার স্ত্রী হুসুমতী তাকে ভেঁকে তুললেন—“কি যে কুড়ে দিন দিন হচ্ছে—এতটা বেলা হল, এখনও তোমার ঘুম ভাঙল না।”

সমীর বলল—“কেম, আমার ঘুম ভাঙার সঙ্গে কুড়ের কি সম্পর্ক? তোমারই যা কি এমন আটকাচ্ছে—আমি ত আর যিরিকি বাধা নই যে আমি ঘুমিয়ে থাকলে চন্দ্রবর্ষ সব খেমে যাবে, তোমার উল্লান ঝগড়ে না, চাঁদের চল গরম হবে না। অনর্ধক এমনি করে তুমি আমার মিনতলি মাতী করে ধাও।”

হুসুমতী—“এখন তুমি ওঠো ত,—আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।”

ইতিমধ্যে শাখা ও মালতী ঘরে ঢুকল। শাখা বলল—“সকালবেলা-ই তোমাদের কি ঝগড়া হচ্ছে বৌদি?”

হুসুমতী—“তোমার দাদাকে শুধো—তগড়ার রাজা তিনি……

সমীর—“ঝাঙ্কা দেখ, ত' শাখা—তুমিও দেখ, মালতী। সকাল বেলাটাই যে দিনের খারাপ দায়, মনও দিনটাই তার খারাপ যায়। এটা সত্যি কিনা?”

শাখা একটু হেসে বলল—“ঝাঙ্কা এটা না হয় খ'রে নিলাম। তারপর কি?”

সমীর—“সকাল বেলায় ঘুমটাই হল আরামের;—ছেলেবেলার লুকিয়ে কচি আন, কাচা উড়ুল খাওয়া যেমন আরামের, নাকে ঠাকি দিয়ে উগোর বা মাচা থেকে নারকেল নালু ও মুড়ি চুরি করে বাশের ঝোপে ব'সে থেতে যে আরাম—বনে আছে ত' তোব শাখা—প্রাতঃকালের ঘুম হল তেমনি আরামের। বোকা সকাল বেলা—আমার সেই পরম আরামটি নষ্ট ক'রে দেয়।

তার কলে সন্ধ্যাবিন্দই নষ্ট হয়ে যায়। আর, রোজই যখন নষ্ট হয়, জীবনটাই নষ্ট হ'ল ত'—কারণ দিন গুণে গুণে-ই ত' জীবন। কতদিন বলছি সকাল বেলাটা আমার এমনি ক'রে নষ্ট করে না, কে শোনে!”

শাখা ও মালতী হেসে উঠল। সমীর এবার বিছানার উপর উঠে বসেছে। হুসুমতীও হাসছে। সমীর বলল—“শত হল-ও শ্রেয়-স্বার্থ বা class interest ত'—তাই আমার ছুঁখের কথায় তোমরা তিনজনই হাসছ। পুরুষের জীবন যে কি ছুঁখের তা তোমরা বুঝবে না, এর মধ্যে যা একটু আনন্দ বল, সুখ বল, স্বাধীনতা বল—তা এই প্রান্তের নিছাইটু। অর্ধাবিনী হ'য়ে সর্বত্র আড়ষ্ট ক'রে আছেন—টাকা-পরশা, ঘর-বরখা, এমন কি ধর্ম কর্বে পর্যন্ত তার ভাগ আছে। কেবল ভোর বেলা—এই বিছানাইটু আমার একা স্বপ্নে পাই। তা কি আর সম্ভব হয়। থাক, পকাশের আর ক'বছর বা বাকি আছে—বনং ব্রহ্মোং-ই কহা যাবে। শাস্ত্রকাররা অনেক ছুঁখে বনে বাঘার বাবুয়া নিজেছেন।”……

এবার হুসুমতী রীতিমত রেগে উঠল। সে বলল—“কি যে লগালবেলা লুক করেছে। আমার কি আর কাজ কর্ম নেই যে বাড়িঘরে বাড়িঘরে তোমার এ-সব কাঙ্ক্ষণাধি শুনব।”

সমীর বলল—“বাড়িঘরে থাকতে কে বলেছে? আমি বসে শুনেই নিমেষ করেছি? আর যেখানে ত' তোমরা, আমি কথা বললেই হয় কাঙ্ক্ষণাধি। আমার যখন অকস্মীত কাছে—অর্থাৎ টাকা উপার্জন করে কাছে বের হতে হবে, তখন ইনি কখন-ও ত' কখন-ও গাছ'ন, কখন-ও অহুসান, কখন-ও কখন-ও নাকি হুয়ে, কখন-ও হুসুম……প্রকৃতি .এখ ঘর সাধনা করে নানা রকম ক্রিয়াক্রিয়া ও তে থাকেন, তখন আমাকে নতদৃষ্টকে শেষ পর্যন্ত হ'নেতে হবে—এবং সবটা মনে করে আবার পুরানো পড়ার মতো আকৃতি জন্মতে হবে—এবং তদনুযায়ী সব পালন করতে হবে, নইলে একমহা court martial। ইয়. এক চোখে ভগবান……।”

তিনজনই হো হো করে হেসে উঠল। সমীর বলল—

—“আমি তো জানিই ত'নিম খারাপ হবে—

তোমার বেলার দুখ-ভাঙ্গা গিরে যে দিন শুরু হয়, তা কি আর ভাল বেতে পারে। তার উপর যদি আমার কোণস্বর্তিভাঙ্গার স্ত্রীর অভিসাপ সত্যাল বেলা পড়ে, তবে কি আর রক্ষা আছে! এখন দেখো প্রাণীমতৃ ভবতী—এখন প্রসন্ন হউন!—এবং কি এখন আদেশ আপনায়!”

হুম্মারী—“বাক্যের টাকা পছন্দ লাগবে না।”

সমীর—“সে কি আমার কাছে—বরং আর চুল কাটবার ইচ্ছা আছে ছ'গুণা পছন্দ যদি মজুর করেন আর তবে বড়ই বাঞ্ছিত হবে।”

হুম্মারী—“আঃ কি জ্বালাতনেই পড়া গেছে—চাবী কোথাও রেবেছ?”

সমীর—“চাবী! আমার কাছে! এ অভ্যাস ত' কোন কালেই নেই!”

হুম্মারী—“তা থাকবে কেন, দরকার পড়লে বাস্তব ভাগেই পার। ছোট কালে মার বাস্তু হাত থাকিয়েছ, এখন সে বিদ্যা আমার বাস্তুের উপরও চলে। কাল রাতে চাবি নিয়েছিলে—কোথাও রেবেছ?” অনেক খোঁজাখুঁজির পর চাবি বের হল। হুম্মারী টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। বলে গেল—“তাড়াতাড়ি দুখ ঘূরে এসো চা তৈরী হয়ে গেছে। শাখা, তুমি ভাই, চাবের টেবিলটা গুছিয়ে নাও ত'—আর পেয়লাগুলো ঘূরে রাখো।”

সমীর বলল—“কি রকম হুম্ম হল—চাবের টেবিল গুছিয়ে নাও। না বলে বলা উচিত ছিল, আমার পড়ার টেবিল থেকে তুণ্যাকার বই-কাগজপত্র সরিয়ে ওকে চাবের টেবিলে পরিণত কর। কেমন মালতী ঠিক বনছি ত'।”

মালতী একটু হাসল। হুম্মারী ও সমীর বেরিয়ে গেল। মালতী বলল—“শাখা, তোমার বৌদি কিন্তু বেশ! তোমার দাদার ঠিক কোড় মিলেছে। এদের কথাবার্তা শুনে বেশ লাগে।”

— হুম্মারী চা দিচ্ছে—ওরা ব'ল চা খাচ্ছে। চাবের লগে কামান্ড কিছ্র অলখাবার—সবই হুম্মারীর তৈরী।

মালতী বলল—“অনেক ভাগ্যবান চা খেয়েছি, কিন্তু বৌদির হাতে যেমন চা খাচ্ছি—এমন ঘেন্না আর কোথাও……।”

তার দুখের কথা কেড়ে নিয়ে সমীর বলল—“এমন আর কোথাও থাকনি। এই ত'! দেখলে ত'। আমি ত' আর বলছি না—দেখনি ত' আমার প্রায় divorce করছিলে আর কি……।”

আবার ওরা দু'জনে হো হো করে হেসে উঠল—হুম্মারী মুচকি হাসছে। সে বলল—“কি বাচাল বে তুমি হয়েছ, বাখা!”

সমীর বলল—“বাচাল নয়, বল বানচাল—বে ঘোরপাকে পড়ে আছি।”

আবার ওরা দু'জনে হেসে উঠল; মালতী বলল—“divorce-এর কথা কি বলছিলেন?”

সমীর—“সে আর বলে না কোন, অতিকষ্টে তোমার বৌদিকে ঠাণ্ডা করি। আমার অপরাধ, আমার কয় বন্ধু ব'লে আজ্ঞা দিচ্ছি। আর আর দু'বন্ধুর কথা বলছি, পরীক্ষাবীরের হাতে কি রকম লাঞ্ছনা হয়। এক বন্ধু বলছিল—dyspepsia তে ভুগছে, উড়ে বায়ুনের পাচা খেয়ে dyspepsia আরও বেড়ে যাচ্ছে। বললাম—কেন বৌ কি করে? সে তোমার গর পাক করে দিতে পারে না। ছ'তিন বন্ধু সমস্বরে ব'লে উঠল—‘বল কি দে, এ সব নবীনা কলেজে পড়া মেয়ে তারা করবে পাক।’ আমি তখন বলছিলাম—‘না ভাই, আমার বাড়ীতে অল্প রকম—এমন চমৎকার পাক করে, পাক করার গুণেই একে বিধে করেছি। স্ত্রী ঘরে থাকতে উড়ে বা বাঁকুড়া নিখাণী বায়ুনের হাতে রান্না পেয়ে মরবে, তা হয় না। এই হল আমার অপরাধ। বন্ধুতা বোধহয় আমার স্ত্রী ভাগ্য সন্দেহে নিষ নিষ গৃহিণীদের কাছে পর করেছেন। তাদের মারকম তোমার বৌদি এই কথা শুনে এলেন—তারা হয়ত একে decuse করল—Trade union এর rule violate করেছেন ব'লে। আর তাঁর ফলে আমার জানটা যায়। (হুম্মারীর দিকে তাকিয়ে) কি, ঠিক বলেছি ত'?”

বিধু—“damn it—চূণের হাফ। তোমাদের আইনের বাধা।”

সুনী—“সে সাহস যদি তার ও অপর কাজের হয় আপত্তি কি! তোমরা একে এখানে একটা মারাত্মক বোম্বার্ড করে দাও না? ও’ এমন কলকাতা থেকে একটু দূরে থাকতে চায়।”

বিমান—“তা চেষ্টা করলে কোটানো যায়।”

রায়ে মালতী স্বপ্ন দেখছিল—স্বপ্ন-চকল নদী—তার মধ্যে সে হাবুডু খাচ্ছে—গ্রায় ভূবে যায় যাবে—কেউ তাকে রক্ষা করছে না। তার বুক কেটে কাঠা আসছে হঠাৎ স্নেহ ছোট একখানা তরী থেকে একটি ঘোড়ার পৃষ্ঠ থেকে অস্তর দিচ্ছে—মালতীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমন সময় তার ঘুম ভেঙে পেল।

আর ঘুম আসছে না—আকাশে তখনও মেঘ আছে, অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। সে বিছানা থেকে উঠে বাতান্বার বেলিং ঘরে বাইরে গিয়ে পাড়াল।

পতীর রজনী, আকাশ দেখে ভরা সমস্ত মনের বর্ণনের ভেতর তখনও চলছে। যদিও বৃষ্টি তখন থেমে গেছে;—তখনও আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন,—আর পৃথিবীর বুক পড়ছে তার প্রতিছায়া—কালো অন্ধকার। স্নাত্যার বিজলী আলো প্রকৃতির অন্ধকার আবরণকে হানে হানে বিদীর্ণ করছে। তেমনি একখণ্ড আলো পড়ছে মালতীর চোখের সামনে। পৃথিবীর সামনে হুগের বাগান—একটু দূরে আপে-পাশে মাঝে মাঝে হুঁচটটি বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। গোড়ার দিকে তাইয়ের অন্ধকার—বিজলী আলোর স্পর্শ লেগে কেবল তাইয়ের শীর্ষভাগ আলোকিত হয়েছে। এই আলো স্বাধারের মিলন তার কাছে একটা প্রহেলিকার মতো মনে হ’ল। গাছের পাতা থেকে টপ্ টপ্ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। যেন হৃদয় বেন তারই মতো অবশেষে নারী অশ্রুবর্ষণ করছে। তার সমস্ত অন্তর অন্ধকারে ছেয়ে আছে; বাইরের আলো এসে তার বাহিরেই আলোকিত করছে। কিন্তু তার অন্তরে কি কোনমিষ্টই আলো প্রবেশ করবে না।

সে ভাবল “আমার অদৃষ্টের প্রতি কির্যাবার পক্ষে

আইনের বাধা আছে। এই আইনের মূল্য কি আছে? এক প্রত্যেক ছুটি নারী জীবনকে ব্যর্থ করতে বসেছে। তার মস্ত সমাজের ও রাষ্ট্রের কোন দণ্ডই নেই—সব এক কেবল এই ছুটিই নির্দোষ নারীর মৃত্যু। এর প্রত্যাহারের জীবনের রথচক্রের তলে এদের জীবনভর পিঠ হতেই হবে। অথচ আমার কৃপা; কৃপার অন্তর পুড়ে যাচ্ছে—অথচ বিশ্বের সমস্ত তাগীর আমার পক্ষে ক্ষম। গ্রীক উপকথার টেকালাসের কাহিনী পড়েছিলাম। গলা সমান জলে ঝুঁকিয়ে তুলার সে মরে যাচ্ছে, অথচ সেই সে জল খেতে যাচ্ছে, অমনি জল তার মুখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। আমার অদৃষ্ট কি এমনই ই হতে।

—না, এ হতে পারে না; এমনি ক’রে নিজের জীবনকে, যৌবনকে ব্যর্থ হতে দিবে না যেন—”

কত সময় চলে গেল—তার ঘোলাও নেই। হঠাৎ তার মাথার কার হাতের স্পর্শ পেয়ে সে চমকে উঠল; ডাকিয়ে দেখে শাভা। মালতী শাভার হাত চেপে বলল—শাভা তার পাশে বলল। মালতী শাভার কোলের উপর মাথা গুঁইয়ে দিল। কিছু সময় এমনি করে গেল। মালতী কাঁদছিল—শাভা তার মাথার ও পিঠে হাত বুলায়ে দিচ্ছিল। সে বলল—“মালতী চল, ও’তে চল।”

মালতী বলল—“শাভা, এমন করেই কি আমাদের জীবন বাবে? এই যে, সববর্ষীয় সমস্ত প্রকৃতি তেমন সবুজ শোভার হেলে উঠছে;—বহুরে বহুরে এসে যৌবনশ্রী ফিরে আসে। বহুরে বহুরে এদের জীবনে মিলনের জোয়ার ফিরে আসে। সাহসের জীবনেই কি মিলনের জোয়ার একবারের বেশি আসে না?”

শাভা—“মালতী, চরকা কেটেছে কখন-ও?”

মালতী—“না।”

শাভা—“আমি কেটেছি। হতা কাটা বেশি কঠিন নয়; কিন্তু এর মধ্যে মুক্তির কাছ একটা আছে—”
—মাঝে মাঝে হতো ছিড়ে যায়। বেশ হতো কাটছে—ফট করে ছিড়ে গেল। তারপর শুধু ঠিকমতো জোড়া লাগানো কঠিন। আমাদের জীবনের হতো ছিন্ন হ’লে

গেছে- আবে দৈর্ঘ্যের সহিত যদি একে ছোড়া লাগাতে
পার তবেই আবার জীবনের চরকা ঘুরবে।...চল, এখন
ভেতে চল।”

মালতী—“শাস্তাধি, আমি একটিকে নিঃশব্দ এবং
অপরদিকে দুর্বল। পথে চলতে চলতে যদি হোটেল খাই,
তুমি আমাকে ধরে তুলবে?”

শাস্তা একে বুকের সঙ্গে অড়িয়ে ধরল—ওর কপালে
আন্তে একটু চুমো দিয়ে বলল—“তুমি আবার হোটেল বোন
তুমি প’ড়ে গেলে তুলে ধরব না। নিশ্চয়ই ধরব।”

মালতী—“হাঁ আমি পাথের পথে হাই?”

শাস্তা—“হিঃ এমন কথা বলে না। পাথের পথে
তুমি যেতে পার না। সে প্রকৃতি তোমার নয়। বেখ

মালতী, সমাজের প্রতি বা অপর লোকের প্রতি অভিযোগ
ও অহুযোগ নিয়ে জীবনকে চালিও না। কমা করতে
গেখো—বেখবে বিশ্ব তোমার কাছে অনেক হুম্বর হয়ে
উঠবে; আর যদি কেবল জোখ-জুটিল দুই নিয়ে দুনিয়া
গেখো, সমস্ত সৃষ্টি তোমার কাছে বিঘাত হয়ে যাবে।
তারপর আশ্রয় ঘেরে—আমাদের জালা বড় বেশী সইতে
হয়। রাগ করো না—সমাজের গতি্য ভগ্নকে অস্বীকার
করলেই তা নোপ পাবে না—চটীয়াপের পানের
দু’লাইন মনে রেখো—

“এতক সহিল অবলা বলে
কাউরা বাহিত পাষণ বলে।”

(ক্রমশঃ)

ওয়েসিস্

শ্রীমদেব রজন রায়

যেয় জানালায় এক কালি আলো তৃতীয়া চাঁদে

পড়ে এসে আবে বীকা ধূকের মত ;

মুদ্র হবার অবসর বলে আছে বা কাদের ?

ভীড় করে আগে মনে উৎসেগ দত ।

আভিনার কোণে রজনীগন্ধা গন্ধ বিলাস,

ভাগে না তো মনে মদির চকলতা,

মোহনিনী বীণী উঠে উচ্ছ্বসি দুব নিয়ন্ত্রা

পশে না শব্দে নে ম্লয়ের আত্মলতা ।

হাযরে মাছ ! কোন্ পাণে সে বে হারানো মনের

সব লম্পা কাহনা ও করনা,

আমি প্রতিপদে দুঃখ-মাধুর উত্তরণের

উষর অন্ত চোটা ও জলনা ।

চাঁদ মরে গেছে, বাহুর মনে ছন্দেতা বাসি,

সকৌত শুধু কখন কোলাহল,

বিবর্ষ দুখ, রসহীন বৃক্ষ, মলিন হাসি,

কণ্ঠে তাহার বেধনার হলাহল ।

এবি বাকে ভবু নব স্রষ্টির প্রয়াণ চলে,

আপন স্বরূপে আপনি মাছব ভাগে,

বন্ধা মাটির বৃক্ষে ভবু হাঙা কল কলে,

আলোকের ধান স্বর্ষোদয়ের আগে ।

জীবনের মত প্রাক্তরে ঐ পশুদুখি,

ঐ পথে চলে মাশা লয়ে বাঘার ;

মনের মাধুরী পূন দিয়ে পাচো আমি ও তুমি,

প্রাণ-ধণ্ডায় ধরা হবে উর্বর ।

সমস্রা।

ডাঃ বাহুগোপাল মুখার্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রাঙ্কননীতিতে বিষ্ণু-মুসলমানের মতের অস্বীতি চমৎকার রূপ বেছে চলল। সত্যিকার অধীনতার কৃপায় লাভ-লাভের খতিয়ান বাসা বাধল।

খাঁটি দেশ-প্রেম এবং অর্থাটি দেশ-প্রেম এই দুই স্রোতে পান্যপানি বইতে লাগল। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে বেশা ব্যয় খুব চরম হার কাবী তেমন আন্দোলনের পিছনে লোকনত বেড়ে চলে। এবং তা জনপ্রিয় হয়। ইসলামিক দেশ-প্রেমের বেলারও হল তাই। জু হিন্দুর বিকড়ে বা অ-মুসলমানের বিপক্ষে একটা প্রতিফ্রিয়া ভাগানো মোহা। ঠাকতালে লজামত খুব বড়। ভাষ্যস্বর্ষের বিকড়ে লজামত-বাহ বেজার মন-মাতানো ব্যাপার। তাই নিবে লজাইবে নামনে স্রেনবরণ ও লাকনাভোগকে ঘূরে তৈলে অত্যাধীরা বিরাট ভোগে জোড়ী হবার আশায় বিশাল হীড় জন্যতে লেগে যায়। ইংলৌকিক অত্মস্ব এবং পারলৌকিক মুক্তির লোভ দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক বলয়ে ভাগ দিলে লোকজন যে খুব জমা হবে তাতে পতঃসিদ্ধ, “বহিঃতে বন্দী হ’তে পরের বাধন খুলে আর” এই ভাবে কোন ধর্মগ্রাণ মুসলমান না লাভা দিবে?

মাসার এদিকে কংগ্রেস বহোড়তির সঙ্গে খুব বেওরা-সেদীর ভাষ পথ গ্রহণ করে নাভেহাল হ’ল। ইংরেজ একদিকে রাষ্ট্রনৈতিক খুব দেহ, অপরদিকে দিতে লাগল কংগ্রেস। এতে মুসলমান ভাইরা বেশ মজা পেয়ে গেলেন বিনা কসরতে—অর্থাৎ বিনা প্রয়াসে শক্তি-অর্থ-পদ-মর্যাদা ভাষের হস্তগত হতে লাগল। ১৯০২ সালে মলি-মিক্টো খুব। ১৯১৬ সালে লাক্টো সন্নিগনে জিয়া সাহেবের পরামর্শে কংগ্রেস দিল অধিকতর খুব। তারপর ১৯১৯ সালে মট-ফোর্ড সংকারে ইংরেজ দিল খুব। স্বাধা পার্টি দিতে চাইল আরও বেশী খুব। ১৯২৪ সালের সংসায়ে যে খুব ইংরাজেরা দিল তাতে হবে গেল কংগ্রেস চালমাত। তার বেশী আর

কিছু বেবার এঁদের হাতে ছিল না। মিঃ জিয়া সাহাবের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে কয়েকবার লাক্ষ্য করতে রাজী হয়েছিলেন এবং উভয় পক্ষের লাক্ষ্যকারও হয়েছিল। কিন্তু আর বেশী কিছু না পেয়ে জিয়া সাহেব গোবাই রইলেন। ইংরেজের হাতে বেবার মত নিন্দন বেশী, স্বতরাং তার সঙ্গে খুবের খেমে পাড়া বাবে না এটা তো ঘরা কথা।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস বা অলৌপি মোয়েম শাসন পরিষদ রাজ্য ভারতে গড়ে উঠল। মোয়েম লীগ একটিও মস্তীমওলী গড়তে পারে নাই। তাঁরা অপর এক রাজ্য গ্রহণ করলেন। মস্তীমওলীর বিকড়ে খুব ঘরা ও ধর্মাত সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হুক করে বেওরা হল তাদের কাম। বাংলায় ও পাক্ষাথে লীগকে হারিয়ে জ্ঞানাব কমলুল হুক ও তার লোকম্বর হায়াৎ ধী অ-লৌপি মস্তীমওলী গড়েছিলেন। বহু ওয়ে ভগী মওহরলালজী ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কিছু ছ’বার হুঁটা মারাত্মক ভুল চাল চাললেন। তার ফল হল ভগাবহু প্রথম ভুল—তিনি Moslem Mass Contact বা মোয়েম গণ-সংযোগের কর্ণহুতী দিলেন। অর্থাৎ হাযাওলা মেয়েময়রা কংগ্রেসে নাই আত্মক অর্ধনৌতির উত্ততির ভাক দিবে তিনি মোয়েম জনসাধারণকে কংগ্রেসে টেনে নিবে আসার স্বপ্ন দেখলেন। কাজে হল না কিছুই; এল না কেউই, উঠা ফল কমল। অহুচরহীন ক’রে মোয়েম নেতাদের অংখা পোচনীর করবার পরিকল্পনা এনেছেন ব’লে কংগ্রেসের বিকড়ে কমলুল হুক সাহেব ও পাক্ষাবের লোকম্বর হায়াৎ ধী সাহেব লীগে বেগ দিলেন এবং জিয়া সাহেবকে সমগ্র মুসলমান সমাজের একমাত্র নেতা বেনে নিলেন। এমনি ক’রে জ্ঞানাব জিয়া কাছেরে আমম বা সর্বম্ব কর্তী হলেন। তাঁর বিশেষ অবদান ১৯৪০ সালে’ দুই খাতি (হিন্দু-মোয়েম) মতবায়।

মওহরলালজীর দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল চাল হল ১৯৪৬ সালে বিলাতের মস্তী-মিশনের প্রভাব গ্রহণ ক’রে বাইরে আশর-হাৎ করার মত বল-নির্বোমে বলাবে তাঁরা বিধান পরিষদে (Constituent Assembly) যাক্‌নে

নির্জলা স্বাধীনতা আনতে (এদিকে যানা হয়েছে বা তা মার ঔপনিবেশিক স্বাতন্ত্র্য-শাসন)। যদি মনের মত স্বাধীনতা পাওয়া যায় তবে বিধান-পরিষদকে পায়ে বাড়িয়ে দিলে, তেঁকে চুরে বেরিয়ে আসবেন। কারণে আম্মু জিয়া গেয়ে গেলেন দকদমা জেতার অজুয়াং। তিনি বলেন কংগ্রেস তো মহীমের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাহলে কংগ্রেস নীচ মিলে অস্ত্র-যতিকাণীল শাসনপরিষদ কেন, কি ক'রে গঠন করা হবে? এই ধ্বনি শোনা মার পণ্ডিতজীকে কতবার বলতে হয়েছে—“আমরা মহী-মিনের প্রস্তাব, কিছু না ঢেকে রেখে পুরোপুরি যেনে নিয়েছি। কিন্তু একথা অরণ্যে রোমন হল। কোন কল হল না। জিয়া সাহেব মোরাম জাতির অস্ত্র পাতিদ্বানের বায়না ধরে রটলেন।

ভারতের দুর্ভাগ্য ঠাট্টা ভারতের ভাগ্যভাগি কিছুতে মানতে রাজী ছিলেন না, তাঁরা ভারতের অপক্ষেণ যেনে নিতে বাধ্য হলেন। আবার নিরস্তির পরিহাস।

যা পেলেন আর চাপেলেন না, দুইয়ের মধ্যে তাওতম্য প্রথম অবস্থায় মানলেও পরে সব কথা তুপে গেলেন আমাদের নেতারা, তাঁরা চেয়েছিলেন অণ্ড ভাঙত, পেয়েছেন খণ্ড খণ্ড ভাঙত। চেয়েছিলেন বৃষ্টির সম্পর্ক-মুক্ত স্বাধীনতা, পেয়েছেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। চেয়েছিলেন কৃষক-মজুর-প্রগরাজ। পেয়েছেন ধনী ও সমাগরদের বরাদ্দ। এই রকমে চুপের সাধ খোলে মিটিয়ে যাচ্ছেন।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীজয়ন্তী দেবী

বলিও না বারে বারে

‘সে নাই; সে নাই’;

এ কথাটা মিথ্যা তাই

আমি আর চাহি না শুনিতে;

আকাশের গভীর ধ্বনিতে,

তাহারি আশাস-বাণী!

ভাবি গানগানি,

বেড়াইছে জীবনে বার হতে বারে,

আলো হাতে গাড় অন্ধকারে।

জুতরাং সমস্যা এখন বক্তৃতিতে দেখা দিয়েছে। হিন্দু-মোরাম সমস্যা তো আছেই। তার ওপর সমাজ ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে গোড়ে তোলা সম্পূর্ণ বাকি। হিন্দুধর্মে মোরাম নীচ সমাজ-ভাঙন। পাতিদ্বানে কংগ্রেসও সমাজ-ভাঙন। এর উপর জুটেছে ত্রীত, ন্যাকীর্ণ প্রাণেশিকতা।

এ সবটার সমাধান বিজ্ঞানকে লব্ধি দরের লোকের-দ্বীপে এনে ফেলা। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ধর্মাত্মতা একমাত্র বিজ্ঞান কমাতে বা দূর করতে পারে। চতুর্পশু শতাব্দীর মনোভাবকে হিংস শতাব্দীতে অচল করে দিতে হবে। গণ-তান্ত্রিক সীমাম ও মাধ্যম লোকের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাছে ব্রতী দেশ-দেবক দারা ভাবের উপর সব কিছু নির্ভর করছে। কিন্তু আত্ম-বে-হুনের গুলু লম্হের অলে গলে যাচ্ছে। নিজেদের আর্থিক অবজ্ঞানতা দূর করতে দেশ-দেবকদের অধিকাংশই অনিচ্ছাসহে ও ক্রমিক ধনী ও পুঁজিপতিদের করণে পণ্ডিত হচ্ছেন। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে পূর্ণ স্বাধীনতা মনে করছেন, ধনীদের রাষ্ট্রকে জনসাধারণের নিজেদের বরাদ্দ বলে প্রচার করে যাচ্ছেন।

যেন হয় পাখাণ প্রাচীর ভাঙবার লোকেরা কোথায় থাকবে? তারা কিন্তু আসবে। কৃষি-প্রধান-শতাব্দী ও শিল্পপ্রধান-শতাব্দীর সংঘর্ষে ভেগেছে বিপ্লবের বেগম। ও প্রয়োজনবোধ। যে বিপ্লব মধ্যপথে কিছুতেই থামবে না, সে নিজের পথ নিয়ে করে দেবেই।

মাছের কাঁচে,

চিহ্ন তার চিরতরে হোবা পড়ে আছে;

তাই তার ভাষা,

পড়ে আছে সাথে নিয়ে কত নব আশা

তবু কেন বলা শুধু মিছে,

‘সে যে নাই নিজে’

নাহি থাক,—

রেখে গেছে তার প্রতিমি

ছন্দে, গানে, গগনের অশ্লু সে নিবি,

তাহার পরাণ

রেখে গেছে এইখানে,—নিখে গেছে গান।

হোমোগ্রি

ঈশনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন হইতেই সে বিপুল উন্মেষে কাজ আরম্ভ করিল। প্রথমেই পড়িল লাইব্রেরী লইয়া। বিচিত্রচকী তাহার কাছে। মুখে যেমন হাসি লাগিয়া থাকে তেমনি হাসিই লাগিয়া আছে। উন্মাদের আতিশয্য কি বিরক্তির মাত্রাধিক। কোনটাই মুখে প্রকাশ পায় না।

প্রথমেই পদ্ম মাঠারদের সামনে চন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—লাইব্রেরী কাণ্ডে কত টাকা জমা আছে? হিন্দাথে দেখা গেল বাৎসরিক আশি টাকা হারে চার বৎসরের জমা তিন শো কুড়ি টাকা। সে নানান বকমে ব্যবস্থা করিয়া নুতন বই কিনিবার জন্ত কাড়াই শো টাকার ব্যবস্থা করিল। আনাইল রাশি রাশি বাংলা বই। কুলে ইহার পূর্বে বাহ্য বাহ্য। বাংলা বই ছাড়া কেবল ইংরাজী বই-ই আদিত। চন্দ্রবাবু বাংলা বই কেনা পছন্দ করিতেন না। কেবল ইংরাজী বই-ই কেনা হইত। তাহার কলে ছেলেরাও কখনও কিছু পড়িত পাইত না। (পড়িবার ইচ্ছাও তাহাদের ছিল না কোনো কালে)। সীতানাথ বাবু লাইব্রেরীর চার্জ লইয়া কিছু কিছু বাংলা বই আনাইতেন। সে বই অবশ্য বাছাই বই, দামী বই। ছেলেরা চাহিয়াও পাইত না। চাহিলে সীতানাথবাবু বলিতেন—ও সব পাবে না। Reference-এর বই ওপস।

অশোকের হাতে পড়িয়া লাইব্রেরীর চেহারা একেবারে পাটাইয়া গেল। বিকাশের দিকে ভিন্নটা হইতে চারটা পর্বত বই বেেয়া লওয়ার সময় নির্ধারিত হইয়াছে। সে সময় ছেলেরের ভীড়ে মাঠা-রা অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন। কারণ পালশেই অফিস। ভিন্নটা হইতে চারটা পর্বত অফিস ও লাইব্রেরীর দরজাটা অশোক নিজেই বন্ধ করিয়া দেয়। ছেলেরা প্রথম প্রথম বই লইবার জন্ত কাড়াকাড়ি করিত। তারপর অশোকই ছেলেরের প্রত্যেকের জন্ত বই পছন্দ করিয়া তাহাদের

হাতে তুলিয়া দিত। তাহাতে প্রত্যেকেই খুশী হইয়া উঠিত। ছেলেরের মধ্যে পড়াশুনা করিবার উন্মাদ-যেথিতে যেথিতে বাড়িয়া উঠিল।

তাহার পর সে পড়িল খেলার মাঠ লইয়া। একটা সুযোগও ঘটয়া গেল। ডিরেক্টর অব পাথলিক ইন্স-ট্রাকশন ক্লব দেখিতে আসিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই অশোক তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ফেলিল। সে জানে কোথায় কিনে কাজ হয়। আপনার পিতা ও বাস্তবমহের পরিচয় দিয়া আলাপ করিতেই কুড় ডিরেক্টর লাফাইয়া উঠিলেন। তিনি অশোকের মাতামহ তার হাঘের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি তাহার লম্ব কথো জুনিয়া আদর্শ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সে এখানে থাকিয়া আপনাকে নষ্ট করিতেছে কেন। অশোক হাসিয়াই বলিল—সে এই লাইন ভালবাসে বলিয়াই এখানে আছে। কুড় বাইবার সময় খেলাধুলার ব্যবস্থার জন্ত এক হাজার টাকা দিয়া গেলেন। নুতন করিয়া খেলার সব গ্যাম্বা হইল। কুটবল খেলার গ্রাউণ্ড নুতন করিয়া তৈয়ারী করা হইল। নুতন টিম তৈয়ারী করিয়া কুটবল খেলার খুম পড়িয়া গেল। তাহার পর বিকাশে কম্পালগারি এন্ডগাম্বাং। তাহা হইতে কাহারও পরিজ্ঞান নাই। বাস্তবমহের প্রত্যেকজনীওতা অশোক জনে জনে বুকাইয়া দিয়াছে। অনিচ্ছুক ভেবে তাহার পর ছিল না। তাহার পরও যদি অনিচ্ছুক ভেবে ছিল তাহাকে ভোর করিয়া বরাইয়াছে।

তাহার পর ডিবেটিং সোসাইটি। তাহার হাতে পড়িয়া মিনিমটি এড প্রোগ্রাম ক্লবের অধ্যক্ষ হইয়া লাড়াইয়াছে যে কোন ছেলেকে আর নুতন করিয়া বলিচা দিবার দরকার হয় না যে প্রতি মিনিবারে উপস্থিত থাকিও। সাহিত্য-লজা আকৃতি তো ভাল হইবে, উপরন্তু সব চেয়ে ডিবেটিং সোসাইটির দিন। তর্কের জন্ত কোন একটা বিষয় পূর্ব হইতে ঠিক করা থাকে। অশোক অকস্মাৎ বাহার খুশী তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া যত তাহাকে অশকে কিয়া!বশকে যে এখন বিকেই হুটক কিছু বলিবার জন্ত। কাহার ডাক পড়িলে তাহা লইয়া

লকলেই গভীর উৎকর্ষার মধ্যে থাকে। সেই ভক্ত সেদিন তাম আরও বেশী।

ওঁদের ঘর ও সাবান তৈয়ারীর ঘরে ভীড়ের কামাই নাই। অশোক ছেলেদের বিবধ ছুটির প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া নিজেই লকলেই ঠিক বসে আদে। পারত পক্ষে কীকি বেশ নাই।

এমন করিয়া গোটা দুগুটি জুড়িয়া অশোককে কেন্দ্র করিয়া বেন একটা সমারোহ পড়িয়া পেল। সেই সমারোহের মধ্যে চন্দ্রবাহু অদ্বুতভাবে বিরামমান। কিন্তু অল্প সময় মাটীতেই সে উৎসবের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কোথায় তাঁহাদের ঘন বাধিতে লাগিল। তাই ধীরে ধীরে একটা ঈর্ষাকাতরতা তাহাদিগকে জর্জরিত করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। ধীরে ধীরে আবার তাহারা দল বাধিতে শুরু করিলেন। আর যেখানে যেখানে স্থানের দ্রুত পরিবর্তন ঘটয়া যাঠেতেছে। চেলেয়া কোলাহলে গভীর শান্ত দুগুটিকে অবিস্মারিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাও তাহাদের চোখে কেমন বিদগ্ধ লাগিতেছে। ইহাতে তাহারা কোন কালে অভ্যস্ত নহেন। বৎ তাহারা বেঁধেছেন এখন এও রকম উৎসাহ ছেলেদের মধ্যে লকরিত হইয়াছে। তখনই ছেলেরা ধীরে ধীরে উত্তর হইয়াছে। এবং সামান্য কারণেই শিককদের নিষেধ উপেক্ষা করিয়াছে, তাহাদের পরোক্ষভাবে অপমান করিয়াছে। (তাহাদের ধারণা) এবং লব্ধেই সমস্ত ভিসিসিনকে দুই পায়ে মাড়িয়াই গিয়াছে। কালেই সমস্ত বেবিয়া ভগ্নিয়া তাহারা একমিকে দ্বিভিত হইয়া উঠিলেন। অন্য দিকে একান্ত অপ্রত্ন, তাহাদের দলের কেহ নচে, এমন এওনের এই কীভাবে তাহাদের ঈর্ষা ধীরে ধীরে অসহ্যভাবে পরিণত হইল।

অশোক সমস্ত বৃত্তিতে পারে। সে তাহাতে কিছুটা জ্বলিত হয়, থানকটা কৌতুক অপ্রত্ন করে। সে জানে ইহাকে এড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব। আরো একটা ভিনিস সে ধীরে ধীরে অপ্রত্ন করিয়াছে। এতকাল পরিয়া ছাত্রেরা যে ভাবে চলিয়া আসিতেছিল তাহা প্রাণীদের

চল। অকস্মাৎ যে দুইটা চাকলা স্থলের ছেলেদের মধ্য নিয়া বহিয়া গিয়াছে তাহার একটি অত্যন্ত বাপক, অন্যটি অত্যন্ত পুষ্ক। এক আটন-অমাত্র-আমোলন, অন্যটি কবির বড়বহীরের সঙ্গে যোগাযোগ। দুইটা বহুই বাহিরের। স্থলের ছেলেরা যে উত্তাতে যোগ দিয়াছিল তাহার কোন বস্তু তপ তাহাদের কল্পনা ছিল না। একান্ত আশ্চর্যিত প্রাণ চাকলা। যদি কোন বারের কল্পনা তাহাদের মধ্যে ছিল সে বার্ষিক ছিল অপ্রত্ন। যে বার্ষিক বর্ষকেশের সে বার্ষিক তাহারও এই ছিল সে আশ্চর্যের ব্রিত্তিকুমি। তাই অত্যন্ত সহজে উৎসাহ কমিয়া গিয়াছিল। যেই হয় নাই। আজ যদি কোন বার্ষিকের কথা লব্ধপ্রথম তাহাকে ছেলেদের ব্রিত্তিতে হয়, তবে ব্রিত্তিতে হইবে তাহাদেরই বার্ষিকের কথা। যদি সেই ব্যক্তিকৃত বার্ষিকের দৃষ্ট ক্রমিতে থাকিয়া তাহাকে ব্রুকা করিবার ক্ষমতা তাহাদের লড়াই করিতে হয় তবেই তাহারা বর্ষকাল ব্রুকা চালাইয়াও ভিত্তিতে পারিবে। তখন আপনাদের সংঘর্ষ লক্ষির মূল্য অতি সহজে ব্রুত্বিতে পারিবে। এবং তাহাই ফলে ব্রুত্বের বার্ষিক অল্প অল্প অসহ্যভাবেই আরম্ভকরা ব্রুকা কোন প্রয়োগ করিয়া ব্রুত্বের জ্বলন্ত কথা অসম্ভব হইবে না।

কিন্তু নৃতন কোনো ব্রুত্বের মধ্যে তাহার ব্রুত্বিতে ইচ্ছা করে না। এই করমানের পরিপ্রসঙ্গে যে নৃতনতর প্রাণের ব্রুত্বের স্পন্দন স্থলের মধ্যে দেখা গিয়াছে তাহা অসম্ভবভাবেই বিকশিত হইয়া উঠুক ইহাই সে একান্তভাবে কামনা করে। আজ ছেলেদের যে হাজিরবিশিষ্ট ব্রুকা পেয়েছে তাহা কোনো কারণে যে অকস্মাৎ পরিবর্তিত হইয়া গিয়া আশ্চর্যকৃত ব্রুত্বের উত্তেজনার উত্তেজিত ব্রুত্বের জ্বলন্ত হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিতে তাহার বেদনা লাগে। তবু সে ধীরে ধীরে ব্রুত্বিতেছে যে সে অত্যন্ত দ্রুত শিককদের সঙ্গে নৃতন ব্রুত্বের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছে। তাহার সামান্য অপ্রত্নতা দেখা গিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে শিককদের অদ্বুততা তো ছিলই, প্রকাশের একটা ক্ষেত্র পাইয়া তাহা প্রকণিতও হইল। প্রকাশ পাইল টিপানী গইয়া।

ফার্সিসের কুশান বলিষ্ঠা হেলেনটি হরেরাম বাবু কাছে প্রাইভেট পড়িত। তাহার মাথা গোপাল ও সে ববাবর এই দুই একবারে নীচেব্রাস হতে পড়িয়া আসিতেছে। পড়াভ্রমর সে মোটেই ভাল নহে। তবে সে খুব ভাল ফুটবল খেলিতে পারে। সমস্ত স্পোর্টসই সে প্রায় অধিকার। সেই হিঙ্গাবে অপেক্ষা তাহাকে খুব ভালগালে। একে পড়াভ্রমর ভাল নহে, তাহার উপর পরীক্ষার বসে। বংলার প্রথম বিকটায় সে হরেরাম বাবু কাছে প্রাইভেট পড়িত। পরে যখন মেথন অপেক্ষা এমনই অনেক ছেলের পড়া বেশাইরা দেয়, পরল। লর না, তখন সে নিরমিতভাবে অপেক্ষার কাছেই হাইতে জুট করিল। এবং তাহার পুত্রের হরেরাম বাবু কংগ্রেস পড়া ছাড়িয়া দিল। ইহাই হইল হরেরাম বাবু প্রচলিত কংগ্রেস কার্য। কালি বাবু পরই এখন শিক্ষকের মধ্যে তাহার পাতিয়। শুধু হরেরাম বাবুই নহে, প্রায় সমস্ত মাস্টার বাহারা বাহারা টিউনানী করিয়া বেশ ছুঁপলা রোগগার করেন, তাহারা সকলেই বেশ ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র হইলেন। হরেরাম বাবুই একদিন নিজের কোমরের সহিত সমস্ত শিক্ষকের কোমর বন্ধ করিয়া চন্দ্রাবাবু কাছে উপস্থিত হইলেন। তখন চন্দ্রাবাবু কাছে অপেক্ষা বসিয়াছিল। হরেরাম বাবু আশির্বাদ বলিলেন—এই তো অপেক্ষাও রয়েছে! ভালই হল। তোমার সামনেই কথাটা হবে থাক। শুধু হেঁচ মাস্টার মনায়, আমরা গরীব লোক, মাইনেই বা খুল থেকে কত পাই? আমরা টিউনানী করে যদি ছুঁপলা রোগগার করতে পারি তাহা অপেক্ষার বাগড়া দেওয়া কি উচিত হবে। অপেক্ষা নিয়ে পড়া নেই না, অথচ বস বিপটা ছেলেকে নিরমিত পড়া। ও যদি মাইনে নিয়ে পড়াত আমাদের কোন আপত্তি থাকত না। কিন্তু ও সমস্ত নিরম আমোদেট নষ্ট করে দিচ্ছে। এ শুধু আমার একার কথা নহে, সমস্ত মাস্টারদের কমপেন।

চন্দ্রাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তা আমি এর কি করব? আমাকে কি করতে বলেন আপনারা?

—আমরা বলি এই যে ছব অপেক্ষা পড়া নিয়ে পড়াক, নহে সে পড়ানো ছেঁড়ে দিক।

চন্দ্রাবাবু বলিলেন—তা আমি কি করে বলি বলুন। কতকগুলি ছেলে তার কাছ থেকে বিনা খরচে যে উপকার পাচ্ছে, সেই উপকারটুকু নষ্ট করে দিতে বলেন আমাদের?

—বেশ তো, সে টাকার নিয়ে পড়াক।

—সে টাকা নিয়ে পড়াক বা না পড়াক তাতে আপনাদের কি পেল এল? অপেক্ষা বাই কতক আপনাদের তাতে লাভ হচ্ছে না এই পর্যন্ত বলতে পারেন, কতি হচ্ছে বলবেন কি করে?

এই বার অপেক্ষা কথা বলিল। সে এতকণ হাসিতেছিল। হাসিতে হাসিতেই বলিল—তা মাস্টার মনায়, অনেক টাকা তো পোষ্টাণিসের পাল বইয়ে তদিয়েছেন। আর কেন? প্রকৃতির পরে এবার নিয়তি হোক।

হরেরাম বাবু রাগে ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন, বলিলেন—অপেক্ষা, আমি এক সময় তোমাকে পড়িয়েছি। তার অন্তে যদি লখন না কর, ব'র না। কিন্তু আমি তোমার superior মাস্টার হিসেবে বলছি আমাকে মেনে চলো।

অপেক্ষার হাসি কমিল না, বলিল—‘অস্টিগেনাস, আমার বংশ না মানো, পদবী মেনে চলো’। তা ভাল। তা আমি আপনাকে প্রকটায় উত্তর দিই। বগড়া করে কাজ নেই। রাগ না করে শুধু। আমি যতদিন এই খুলে থাকব পর্যন্ত না নিজেই ছেলের পড়া মেথিরে দেব। আপনাদের দুটো কথার একটাও রাখতে পারব না।

সেই হইতে বনগড়ার হুজপাত হইল। অবশ্য সেটা গোপনে গোপনেই চলিতে লাগিল। একাত্তে আর তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না। কিন্তু খুসে কিছুটা পরিবর্তন ঘটিল। তাহারই কলে বিরোধ তদাধিত হইল।

কিছুদিন হইতে কালিাবাবু শরীর ভাল হইতেছিল না। তাহার উপর লখনবাবুর নবো ব্যক্তিগত কারণে লামাড পোষাঘোষ ঘটিল। তাহার আর চাকরী

করিতে ভালও নাগিতেছিল না। বাড়ীতে তাঁহার ব্যবহৃত সম্পত্তি আছে, তাঁহার উপর ছেলে তাঁহার রক্তবিশ্ব হইয়া উঠিয়া ভাল চাকরী করিতেছে। তিনি ফুলের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। বাইবার পূর্বে যহা সমারোহ করিয়া অভিনন্দনের ব্যবস্থা মনোহর বড় লম্বা ভাবেই করিয়াছিল। অভিনন্দন হইল, তাঁহাকে কিছু কিছু উপহার দেওয়া হইল, ছেলেরা কামিল। বিদ্যায়ের সময় শিক্ষকেরা কামিলা বিদ্যায় ছিলেন। চন্দ্রবাবুর সঙ্গে যখন কালিবাবু সাক্ষাৎ করিলেন বিদ্যায়ের জ্ঞান তখন দুইজনই কামিলেন। দীর্ঘ দিনের জ্ঞান দুজনের বন্ধু তাঁহারা। তরুণ বয়স হইতে একসঙ্গে জীবন আরম্ভ করিয়া এতদিন একসঙ্গে চলিবার পর আজ ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। চন্দ্রবাবু শেষে বলিলেন—আম্বন ভাট কালিবাবু! আগনি চললেন, আবার কুকের একটা দিক খালি হয়ে গেল।

এ জাতীয় আত্মীয়তার কথা কালিবাবু চন্দ্রবাবুর মূখ হইতে কখনও শুনে নাই। আজ প্রথম শুনিলেন। অথচ ফুল জীবনে যত ভ্রাণ, যত কোভ তাঁহার মনে আনিত সে ঐ চন্দ্রবাবুর বন্ধুত্বই আপনায় ইচ্ছামত না পাইয়াই। উজ্জ্বল হইয়া যখন তিনি জ্বরের জ্ঞান হৃদয়ে যত চন্দ্রবাবুর দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, সেবিদ্যাছেন চন্দ্রবাবু কেমন গরিয়া গিয়াছেন। আর আজ আপনিত চন্দ্রবাবু সে কথা প্রকাশ করিলেন। কালিবাবুর চোপ হইতে বিভগতর বেগে জলের খায়া করিয়া পড়িল।

কালিবাবু সেলেন বিরহীর মত। দীর্ঘকাল ফুলকে শাসন করিয়া, লম্বানের সঙ্গে সমারোহের সঙ্গে তিনি তাঁহার শিক্ষকের জীবনকে শেষ করিয়া গিলেন। বাইবার সময় চন্দ্রবাবুকে বলিয়া গেলেন—আমাদের মল এবং ভাটল চন্দ্রবাবু। আমি আরও সেইভাবেই চলে থাকি।

তবু কালিবাবুর ফুল ভাণ কবাটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। কারণ তাঁহার যে বাহা ছিল তাহাতে অবলীলাক্রমেই সময় কাছকাড় তিনি করিতেন। কয়েক দিনের মধ্যেই আরও আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। লম্বান ফুলের স্থপারিষে তাহাবাবু আবার ফুলে মাটির হিসাবে

চুকিলেন। তারপরও এতদিন বাড়ীতে বসিয়াই ছিলেন। হরেরামবাবু সেলেন কালিবাবুর সঙ্গে, আর তারপরও হরেরাম বাবুর সঙ্গে কাজের রক্ত বহাল হইলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই বোকা গেল এ তারপ আনন্দময়ের বন্ধু আশ্চর্য প্রমাণ। কীদ্রাণ তারপরও নহেন, তিনি লম্বানফুলের অগ্রদূত প্রভাপাণিত শিক্ষক। চন্দ্রবাবুই তাহা ভাল করিয়া বুঝিলেন। অনেক প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারে নাই প্রথমটায় সে বহু অসহযোগের সময় চাকরীভ্যাগি এক শিক্ষককে আবার ফুলে শিক্ষক হিসাবে আনিতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে সে কিছুদিন তাঁহার সঙ্গে কাজ করিয়া বুঝিতে পারিল এ তারপরও গতকালের তারপরও বিপরীত ব্যক্তি কালিবাবু শিক্ষকদের যে মানটি পূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি সেইটুকু পূর্ণ করিয়াছেন মার

যে গোপন বিবোধীতা গোপনে অনেকের বিবেকে বিবেকের আকারে ঘটিতেছিল তাহাট একদিন লম্বান একটা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশে বিবোধতপে আত্মপ্রকাশ করিল।

হরেরাম বাবুর মধ্যমা এমনিট বখেট বাড়িয়াছিল। তাহার উপর কালিবাবুর মৃত আসলেন বলিয়া তাহার মধ্যমা আরও বাড়িয়া গেল। এখন ফুলের কালিদায় তিনিই। তিনিই একদিন ফাইল্লাসে লম্বান পড়াইতে ছিলেন। লম্বানের ঘটা, পড়া চাপ দেখে থাকে না। ছেলেরা আপনায় কাজ করিয়া গল্প করে। হরেরামবাবু জ্ঞানে বলিয়াই ফুলের টাকাকড়ির হিসাব নিকাশ করেন, নিষের হিসাবও অবদ্য বাধ দার না সেকেও থেকে বলিয়া সেই দুপাল আর দুটো ছেলের সঙ্গে গল্প করিতে ছিল। কথাবাড়টা চলিতেছিল একটু কোয়েই। তাহারা বার বার ‘অপেক্ষা’, ‘অপেক্ষা’ করিতেছিল বলিয়া হরেরাম বাবুর কান সেই সিকেই আত্মই হইয়াছিল। তিনি কাগজে চোখ বাগিয়া একমনে তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন। পাশের জ্ঞানেই অপেক্ষা বাংলা পড়াইতেছিল। সে বার দুই আপনায় ও দখির নাম শুনিয়া হুপ করিয়া গেল। গল্প চলিতেছে,

অশোকের একেবারে প্রথম দিনের বৃত্ত গল্প লইয়া।
তুপাল বলিতেছে—অশোকদা প্রথম দিন ছোয়াড় অব
অশোকের কথা বলে শেষের বিকে যে কথাগুলো বলেছিলেন
মনে আছে তোদের? তিনি বলেছিলেন না যে শক্তি
ছোয়াড়ের মধ্যে ছিল সে শক্তি তোমাদের মধ্যেও আছে।
এমনি মানুষও পৃথিবীতে অনেক আছে। তার বিশেষ
মানে ছিল জানিস? এই স্থলে ঠিক লক্ষ্য একটি ছেলে
পড়ত। তার নাম ফনী। সে ঠিক চোখেও ভাল ছেলে
ছিল। সে বড় বড় মানুষেরা পড়ে।

হরেন্দ্রমহাবাহুও শুনিলেন, অশোকও শুনিল। অশোক
আবার পড়াইতে লাগিল। কিন্তু হরেন্দ্রমহাবাহু তার
স্ব স্বপ্নে ছিল না। তিনি মাঝিমা আসিলেন চোয়ার
হইতে, তারপর তুপালের কাছে গিয়া বলিলেন—তাই
তোমার সংকল্প টানছেন যেখি? খাতাটা যেখিতে
দেখিতে কেবল ফুলই নম্বর পড়িতে লাগিল। তিনি
পেন্সিল দিয়া সপোর ফুলগুলো কাটিতে আরম্ভ করিলেন।
খাতার পাতাখানা তারপর তারপর ছিঁড়িয়া গেল।
তিনি খাতাখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বিলেন। তারপর
আরম্ভ করিলেন গ্রন্থার।

ছেলেটি নিবিবাসে গ্রন্থার বাইতে লাগিল।
প্রতিবাদ করিল না। মারিতে মারিতেই তিনি বলিলেন
বাসর, মাটি-স্থলেন-পরীক্ষা দিবি? আর খাতাও এত
ফুল? আর ক্রমে বলে মহাপুরুষের গল্প হচ্ছে! ছোয়াড়
অব অশোক আর ফনী! মহাপুরুষ ফনী! বরেন্দ্র, তার
বলি নাম করবি তা হলে ভাল হবে না। আর অশোকও
খুব ভাল শিক্ষা দিচ্ছে। চমৎকার! খুব ভাল মাঠারী
যা হোক।

ছেলেটি কৌশল করিয়া উঠিল, বলিল—আমার
translation ফুল হয়েছে তার মন্ত আশাকে মাঠে
চান মাকন। ফনী, অশোকদা এবার নিজে করবেন না,
যা ঠিকের নামে কিছু বলবেন না।

হরেন্দ্রমহাবাহু কিছু হইয়া গেলেন—কি, আমাকে
শাসাবি তুই? তবে—বলিয়া আবার প্রচার।
মারিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার আর জ্ঞান থাকে না।

পাশের ক্রাসে পড়াইতে পড়াইতে অশোক সমস্ত
বেশিল, শুনিগ। একবার খামিমা কথাগুলি শুনিয়া লইয়া
সে যেন পড়াইতেছিল, পড়াইতে লাগিল। ফনী শেষ
হইলে হাতের চকগুলো ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।
ছেলেমা বেশিল তাহার মুখখানা কেমন রাঙা হইয়া
উঠিয়াছে।

অশোকের শিঙিতে উঠিতে উঠিতেই সে শুনিগ
হরেন্দ্রমহাবাহু সমস্ত মারিবারের সামনে চম্রমহাবাহুকে
বলিতেছেন—মহার, এ ভাল হচ্ছে না। অশোক
ছেলেদের politics দেখাচ্ছে। এটা ভাল কথা নয়!
কাট ক্রাসের তুপাল আর ফনিকে মহাপুরুষ হিগেবে বর্ণনা
করছিলেন। আমি নিজেই শায়েস্তা করে! তার ওপর
ছেলের আর কথা কত!

চম্রমহাবাহু চমকিয়া উঠিলেন। আবার হাননীতি!
ফনীর ও অশোকের নাম একসঙ্গে ফুট হইতেই সেই
আইন-অমাত্র-আমোলের গোড়াখানার পুরোভাবে
চলমনে দুইটি কিশোরের ছবি মনে পড়িল। একসঙ্গে
বহু বিচিত্র বিবরাবী বৈশ্বনাথ শব্দের ছবি তাঁহার মনের
উপর দিয়া পার হইয়া চলিয়া গেল।

শিঙিতে লম্ব হইতেই যেখিলেন অশোক উঠিতেছে।
আম তাহার গতি বীর, মুখখানা রাঙা। সে কাহাকেও
কিছু না বলিয়া লাইব্রেরীর টেবিলের উপর হাতের
বইখানা রাখিয়া আন্দারী খুলিয়া চক বাহির করিতে
লাগিল। হরেন্দ্রমহাবাহু তখনও বলিতেছিলেন—বেশ
মাঠার মহার, আমার মনে হয় যে অশোককে এখনই
শাসখান করে দেওয়া বরকার। আপনি অশোককে বলুন।

অশোক চক হাতে করিয়া পরদত্তী ক্রাসের মন্ত অশোক
হইতে বাহির হইয়া বাইতেছিল। শেষের কথাগুলো
শুনিয়া সে অশোকদা খুসিয়া ঝাঁকাল। দুই পা আশাবিমা
আশিয়া সে টেবিলের কাছে ঝাঁকাল। তাঁহার মুখখানা
আরও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, বড় বড় চোখ দুটো
বিস্ফারিত, চোখের তারা দুইটা তাহারই মধ্যে যেন
নীলাভ অগ্নিগণের মত জলিতেছে, তাহারই আভার
চোখের স্থবিত্ত ক্ষেত্র শুভ উজ্জল। সে একবার

চারিদিকে চাহিয়া লইয়া হরেরাম বাবুকে বলিল—‘আজ কিছু দলবদল নাই ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম আজকের ঘটনাটাও চোপে ধাবে। তা আর আপনি হতে মিলেন না। প্রথমেই বলি হেভমাটার মশায়কে উপদেশ দেবার পক্ষা যেন ভবিষ্যতে আর আপনায় না হয়। তিনি যে কেমন বাত্ব তা আপনাদের কারো সাধ্য নেই বুঝেন। কাজেই নিজের কাজ নিয়ে থাকবেন। দ্বিতীয়তঃ আর একটা কথা মনে রাখবেন। আমি এখন আর আপনায় ছাত্র নই জানবেন। আমি এখন আপনাদের সমান, আমি একজন শিক্ষক। আমার সেই সমান ঠিক বেধে চলবেন। তৃতীয়তঃ আপনি যেন কোনদিন কোন মতঃ গ্রাণকে অপমান করবার চেষ্টা করবেন না। চতুর্থতঃ আমি ব্যক্তিগতভাবে বন্ধু হিসাবে আপনাকে জানিয়ে রাখি ফার্স সেকেন্ড ক্লাসের কোন ছেলের গায়ে হাত রেবেন না। আমার কথা শেষ হয়েছে। একটু বাকী আছে। আজকের এই ঘটনাটি দেখে আমি যখন কোর্স ক্লাসে গড়তাম তখনকার দিনের একটি ছবি আমার মনে আছে। আপনি আমাকে, কবিতা আর নিত্যইকে মেরেছিলেন। আজও দেবলায় সমস্ত ঘটনাটি একেবারে অবিকল ঠিক ভেমনি। দুটোর কারণ, দুটোর মনোভাব, আর দুটোর ফল।

কথা বলিবার সময় যেন তাহার চোখের নীলি ও ভেজ আরও বাড়িয়া গেল। তাহার অভি কঠিন কোথের সামনে সমস্ত শিক্ষকরা যেন কেমন বিভ্রান্ত ও ভীত হইয়া গেলেন। কেবল চন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে তাহার ঐ বিচিত্র রূপের দিকে চাহিয়াছিলেন। এ সমস্ত কোন কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই যেন। তিনি শুধু ভাবিতেছিলেন অতিপরিচিত চান্দ্রময় দ্বিষ্টবাক্য দুবকের মধ্যে একজন কোথায় ছিল? কেমন করিয়া ছিল?

কথা শেষ করিয়াই অশোক হাতের চকগুলি মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল। ‘অজ্ঞান পণ্ডিত তাহার তরুণ কণ্ঠের স্মৃতি হইয়া উঠিল—

“অজ্ঞান যে করে আর, অজ্ঞান যে লড়ে
তব গুণ তাতে যেন তৃপসম হতে।”

শে বাংলা পড়াইতেছে।

এতক্ষণে অজ্ঞানের মত নিশ্বাস লইয়া হরেরাম বাবু উঠিলেন, বলিলেন—‘আপনি যদি এর কিছু প্রতিকার না করেন চন্দ্রবাবু আমি ডিপার্টমেন্টে হরখাত্ত করব। জানাব যে এই স্কুলে পলিটিক্স শেখানো হচ্ছে।

চন্দ্রবাবু চুপ করিয়াই ছিলেন। এতক্ষণে কথা বলিলেন—‘জানাবার আগে একবার আমার লক্ষে দেখা করবেন!

কিছু ঘটনার পূর্বেই সন্ধ্যাবেলায় শিক্ষকেরা সংবাদ পাইলেন যে স্কুলের ছেলেনের লইয়া ‘ইন্ডেন্টস্ ইউনিয়ন’ তৈয়ারী করা হইয়াছে। ব্যাহতে স্কুলের ছেলেনের দ্বার সম্বন্ধ কোনো অধিকার ব্যাহত হইতে না পারে। সংবাদ চন্দ্রবাবুকে মিল অশোক নিজেই। সংবাদ দিগা পে বলিল—‘আপনি জানবেন, আমাকে বিশ্বাস করবেন আমার মশায়; আমি স্কুলের কোনো ক্ষতি হতে সেবাই না, এতে স্কুলের ছেলেনের মস্ত উপকার হবে।

চন্দ্রবাবু কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—‘তোমাকে আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি বাবা অশোক। তবে কি জানো? আমার নতুন করে বিরোধের সুখো ধাওয়া! তিনি আমার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

অশোক তাঁহাকে বার বার আশ্বাস নিয়া বুকাইল।

(ক্রমশঃ)



গদ্যকবিতা ও রবীন্দ্রনাথ

প্রাচ্যেশ্বর মেশ্রমুখ্য

অজ্ঞান কথ্য বলতে আমরা বা' বৃত্তি, পাণ্ডুরের
আমলে গদ্য ব্যক্তিরা কথ্য বলতে তার চেয়ে বেশী কিছু
বুঝেন। কালিদাসের কথ্য বলতে কালিদাসের সর্ব-
প্রকার সাহিত্য রচনাই বুঝতে। অর্থাৎ, সেখানে গদ্য-
নিধনও কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো। মাঘকাল
কথ্য বলতে কিছু সাধারণত আমরা বৃত্তি কবিতাকে।
সাহিত্যের অঙ্গ বিভাগ থেকে স্পষ্টতই কবিতাকে
সবিয়ে এনে তার সঙ্গে গদ্য পরিচয় স্থাপনা করেছি।
কিন্তু সাবেক আমলের একটা জিনিস অর্থাৎ কথ্য
শব্দটিকে তবু আমরা বেধে দিয়েছি—এক কবিতা ও
কথ্য এই দুই শব্দার্থের তফাৎবাদ বড়ো করি না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আমরা এই প্রবণতাই
লিখছি। সর্বদা মনে করছি যে—এখনও এমন বহু
আছেন যারা কবিতার আকৃতি নিয়ে বিশেষ একটি
সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। সে সমস্যা হলো:
কবিতায় বহু পদের দ্বারা মিল না থাকে, তবে তা'
কবিতা হবে কেমন করে? আধুনিক ভাবের দ্বারা বলা
হয় গদ্য কবিতা, সে কি সত্যই কবিতা? এবং কবিতা
হলে সে কি পাঠকের মনোহরণ করতে সক্ষম?

প্রথমে আলোচনা করা দ্বাক এ গদ্য কবিতার ডেউ
আনলো কারা? কারা এমন দুঃসাহসী অভিমত
করলো? এবার দুখ কেসাতে হবে পক্ষিযে। ইউরোপীয়
কাব্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করে গদ্য শতাব্দী পর্যন্ত
শৌচিলে হঠাৎ পথে দেখা হবে কবি ব্রাউনিঙের সঙ্গে।
ইনি বুঝছিলেন যে আইডরি গল্পে গদ্য দেখার দিন
ফুরিয়ে আসছে। অস্পষ্টভাবে ইনি যেন অনুসরণের
কল্লোল কলরব শুনেছিলেন। হাটের দ্বারে কবির পথ—
কতো দূরত্বের আশা, নিরাশা, পাপপুণ্যের বিচিত্র
জটিল কবির বীণা কিংবা ধীরে ক্রান্ত হবে। কিন্তু
ব্রাউনিং শুধু বুঝছিলেনই—চেষ্টার হারও সফলকাম-
ঘটা হননি। ব্রাউনিংও সমসাময়িক কবিরা স্বপ্রভাঙ্গের

ততোটা আশঙ্কিতা অনুভব করেননি। রসজ্ঞরা এমিক
আলোচনা করে ব্রাউনিং-এর অনেকখানি মর্দাণ ব্যক্তি-
গিয়েছেন। এরপর গদ্য শতাব্দীতেই আরো উল্লেখযোগ্য
কবি এসেছেন এবং তারা ক্রমশঃ এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।
স্পষ্টতরভাবে চলকল্লোল শুনেছেন।

অতঃপর ইউরোপীয় প্রথম মহানগরকে মোটাট্ট গদ্য
কবিতার সিম্পর্নীকপেটিভিত করা যেতে পারে।

মাত্র আশাত পেরেছে—দ্বারা ধরেছে, আর পবিত্র
বিজ্ঞান বর্ষায়ন হতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানের সত্য
গতিংগা—দুঃসহ্য সত্য নিরাশরণ নিরাশরণতা কাব্যের
অন্তরংগ এবং বহিঃসংগে পরিণত করেছে। যে দেশ
আশাত পেলে, সচকিত হলো, সেই বিজ্ঞানপ্রভাবিত
দেশের কবিতা পথে বেরিয়ে এলো—এবার মালা নিয়ে
নয়, নিশান নিয়ে। বেরোবার স্তম্ভ দ্বারা এতোকাল
তোড়তোড় করছিল, তারাই যেন আশে পাশে বেরোতে
বেরোতে প্রথম মহানগরের গৃহের মধ্য দিয়ে হঠাৎ
প্রকাশে বেরিয়ে এলো। গদ্যকবিতার অন্ধকারে
বিজ্ঞানের পর বিবর্তনের অবস্ফুর্ত ইতিহাসের গুহ
রক্তচিহ্ন অঙ্কিত আছে।

গদ্য ও গদ্যের আকৃতিগত তারতম্য সর্বসাধারণের
মোটাট্ট জানা আছে। প্রকৃতিগত যে তারতম্য রয়েছে
—তাও জানি লোকেরা অন্তত জানেন। সংক্ষেপে সে
সবচেয়ে কিছু বলছি। কাব্য ও গদ্যে শব্দবোধানাও
প্রকারভেদ আছে। কাব্যের শব্দগুলি স্পষ্টতই গদ্যের
শব্দ থেকে বিভিন্ন। হলে হয়তো আমাদের কতোখানি
মানসিক সত্যের আছে জানি না, কিন্তু তবু এ কথা
স্বীকার্য যে, কাব্যের শব্দগুলি তড়িৎ ভাবলকারী এবং
আবেগবাহী। শব্দের অভিধা-লক্ষণ-ব্যবহা প্রকৃতি বহু
প্রকার শক্তির কথা আলাকারিকের স্বীকার করতেন।
পণ্ডিতেরা শব্দকে ত্রয়ের সহিতও তুলনা করেছেন।
আসলে আমরা যতদূর এই যে, কাব্যের আসরে বহু
শব্দ স্থান পেয়েছে এবং বহু শব্দ স্থান পায়নি। দ্বারা
স্থান পেয়েছে তারা ভাগ্যবান, তারা অশোক, মানসী
পুণ্ডের দল—কিন্তু কিছু কিছু সে আসরে স্থান পায়নি।

এ পেলো পদ্ম যুগের কথা। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন যে তিনি ভয়ে ভয়ে বাঁচছেন কাব্যে। চুপাতে না পেয়ে বেদুনের পঙ্খের সঙ্গী করেছেন। অর্থাৎ, বাঁচের বশে 'বেদু' পঙ্খকে আয়ুল গিরেছেন। ঈদানীং গল্পকবিতার নতুন যুগ পড়ছে। বহু অধ্যাক্ষের শব্দ এখন কবিতাতে আমন্ত্রিত হচ্ছে।

আবার বিলাতি কাব্যের পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করা যাক। জনৈক আধুনিক কবি-সমালোচকের একথানি পুস্তক থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করছি। পদ্ম পদ্মের সবীকরণ প্রচেষ্টায় ওয়ার্ল্ডওয়ার্থ কৃতকার্য হননি। কারণ যৈনম্বিন ভাবা আর কাব্যের ভাষা বস্ত্তই বিভিন্ন, বৈষম্যভেদে বিভিন্ন। এই প্রচেষ্টা গল্পের ও পদ্মেও অসম্ভবগত।

গল্পের অবলম্বন বিজ্ঞান, কাব্যের অধিষ্ট প্রজ্ঞান। গল্প চার আঘাতের স্বীকৃতি আর কাব্য ধোঁয়ে আঘাতের নিষ্ঠা। গল্প চলে স্বীকৃতি গলে পা মিলিয়ে, আর কাব্য নাচে জ্বাবের তালে তালে। রেখার পর রেখা টেনে গল্প যে ছবি আঁকে, গোষ্ঠীকরকে বিস্তারিত কাব্যের বাইরে সেই ছবিকে ছুটিয়ে তোলে আঘাতের অচরু-স্পর্শ পড়ে। পদ্মপ্রচেষ্টাই দুটো দিক আছে—একটা তার আঘাতের দিক, অল্পটা তার রসপ্রতিপত্তির দিক। প্রথম দিকটার সহিত গল্প সম্পর্কিত, দ্বিতীয় দিকটার সহিত কাব্য। 'ভাইতো কাব্যের ভাষান্তর হুসোখা।'

উপযুক্ত অংশ থেকে আমরা অল্পট দুটো জিনিষ পেশায। প্রথমত, যাকে আমরা গল্পকবিতা বলি সে প্রকৃতিতে কিছুমাত্রও গল্পধর্মী নয়। যে কারণে সে কবিতা হলো, সে কারণেই সে গল্পাংগকে অন্তর্ভুক্ত করলো। আধুনিক যুগে গল্প কবিতায় বীতশ্রদ্ধ পাঠকের অভাব নেই। তাদের মস্তেই এ প্রসংগের অবতারণার প্রয়াস পাচ্ছি। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃত জন্মের মৌখিক যেকথা নিয়ে কাব্যে ওয়ার্ল্ডওয়ার্থ এক্সপেরিয়েন্ট করতে চেয়েছিলেন, তা নিফল হওয়ার মূলে এই সত্য ছিল যে—কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করতে পঙ্খগুলির বাত্পকৃতিকে ওয়ার্ল্ডওয়ার্থ পরীক্ষা করে নেননি। থরা যাক—রবীন্দ্রনাথের মাদিনী নাটকের কথা। এ নাটকে মাহুয়ের মৌখিক

কথাগুলি অনায়াসে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। কোথাও-কোন পুঁত নেই—গতি এমন পরিপূর্ণ ভাবে নিটোল ও স্পষ্ট।

কাব্যে ছন্দ আর মিলের প্রয়োজন আমরা এককালে বুঝেছিলাম। ছন্দ বহল হিসাবে মিলের জোড়। ছন্দ অনাধি, মিলের বহল বেধেই হয় নি, অপেক্ষাকৃত অর্থাচীন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসু বলেন : "ছন্দ আর আবেগ যমজ, তাদের টান নাড়ির টান এবং আবেগ আর বেগ বিষমার্থবাক্য, আবেগের মধ্যে বেগের চেয়ে বিরাটই বেশী; অর্থাৎ যুগের আবেগ উল্লসে সোড়ার না, চলে বিরাট বহল গতিতে। ধনি ও ধতির এই ব্যবস্থিত নক্সাই বোঝে হয় ছন্দ।" রবীন্দ্রনাথ এই প্রসংগে আমাদের রবীন্দ্রনাথের "নিপিকা"র নিচন শ্রবণ করিয়ে দিয়েছেন।

"এখানে নামলো লক্ষ্য। স্বর্গধেব, কোনকালে, কোন সমুদ্র পারে তোমার প্রভাত হলো ?

অন্তকারে এখানে কেঁপে উঠে রজনীগন্ধা, বাসব গবের ঘরের কাছে অবগতিতা নব বহুর মতো ; কোনখানে ফুটলো জোরবেলাকার কনকটীণা ?

আগলো কে ? নিবিঘ্নে নিলো লক্ষ্যে আলানো লীপ, ক্লেমে নিলো হাতে-গাঁথা শেঁওতি ফুলের মালা।"

রবীন্দ্রনাথের এই প্রকার আবেগ-প্রবণ লেখা আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি। রবীন্দ্রনাথের প্রাণ যেখানে সংগীত, যেখানে স্রুতি কবিতায় তার আশ্রয় উদ্বেগ, সেই যে সমস্তের মর্মস্থলে অধিষ্ঠিত আবেগপ্রবণতা—সেইটুকুই থাকে এমন চম্পকোজ্জ্বল অধিকারী করেছে। ঈশ্বর পরিবারে উপনিষদের মত উচ্চ-অমৃত্যু কঠোর উচ্চারিত হতো। সেই হয় ছন্দ কবিতাকে আকৃষ্ট করেছিল—সেই অন্তর্ভুক্ত জীবন স্রুতিতে যেখান রবীন্দ্রনাথ "স্রুতি-সোবিশ্ব"কে না-বুঝেও বাব বাব পড়তেন। তিনি এতো বড়ো ছন্দজ্ঞ বলেই—এতো বড়ো সংগীতজ্ঞ। বলাকা-কাব্যে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ কী গতিবার এবং কী সংহত। মনে হয় বলাকার মতো জানা মেলে কবিতাওলো ধরো থরো লীপাচ্ছে। পটভূমিতে আকাশ চাই—যেখানে বলাকা উল্লস হলো আর নাচে পৃথিবী চাই, যেখানে গতি

সত্য পর্যবেক্ষিত নহ, ব্যবহার্য নৈমিত্তিক নহ, ভাবযাতক নহ, এ সত্য গৃহীত। অর্থাৎ, সে হৃদে উঠেছে বলেই তাকে স্বীকার করতে হয়। যেমন আমরা মন্থকে যেনে নেই, মন্থনিকেও মানি, স্ত্রীরকে স্বীকার করতে পারি। হরিণকেও তাই।’

‘আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কতো বিস্তৃত আধুনিকতায় কী, তাহা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আদর্শ ভাবে না বেঁধে বিশ্বকে নির্বিকার তৎপত্বে দেখা। এট বোঝাই উচ্চ, বিস্তৃত, এই বোধমূলক বোধভেদেই খাটি আদর্শ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেট নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখে এইটাই শাস্ত্রতত্ত্বের আধুনিক।’

‘চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেকী হোলো। তিনি ছিলেন আধুনিক, তাঁর ছিল বিশ্বকে সত্ত্ব-বোধ চোখ। চারটি লাইনে সারা ভাষার তিনি লিখছেন :—

এই সমুদ্র পালাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন।

এর শুনে হাসি পায়, অব্যবহিতই। আমার মন নিস্তব্ধ।

যে আর এক আকাশে আর এক পৃথিবীতে বাস করি—
সে জগৎ কোনো যন্ত্রণের না।

গীত গাছে ফুল ধরে

জলের স্রোত বার বারে।’

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিদের ব্যাপারে খুব অধ্যাণী হয়েও খুব শংকিত। তিনি আধুনিক কবিদের বস্তুর রুচিবোধের পেছন দিকটা দেখে বুঝেছেন যে, সেখানে বিশ্বের প্রতি একটা উজ্জ্বল অবিচল ও সুন্দার দৃষ্টি রয়েছে এবং অবশ্যকার রুচিবোধকে তিনি চিন্তাবিকার বলে সাব্যস্ত করেছেন। সাম্প্রতিক কবিতায় বেধা যায়—স্ববোধানার কোনো কবিতা একটু ইচ্ছা করেই কর্কশ ও কঠিন। সাম্প্রতিক কাব্যের বিষয়বস্তুও অভিযান্ত্রিক। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—‘যদি বলা হয়, আগেকার কবিতা বাছাই ক’রে কবিতা লিখতেন অতি আধুনিকরা

সাজাই করতেন না সে কথা মানতে পারি। এঁরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই। আর শুকনো শোকার শাওর ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তত্বই এই যে এঁরা সর্বত্রই ভাব করেন পাছে এঁদের বহন্যম দেখে যে এঁদের বাছাই করার সন আছে। অর্থাৎ পছন্দী বেছে বেছে স্ফুটিত জিনিষ ধার, স্ফুটিত জিনিষ ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিষে তাদের পক্ষপাত, তাতে ফল হয়, অভ্যাসে জিনিষেই তাদের পক্ষপাত শাস্ত্র হয়ে ওঠে। কারো অধ্যয়নপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয়, তা হলে শুষ্ক জিনিষে তাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়?’

আমরা রবীন্দ্রনাথ এই শংকিত মন নিয়েই উজ্জয়ণ করেন—‘কবি তো বৈরাগীর চেলা নয়, সে তো অহংগণের পক্ষ নিতেই এগেছে। কিন্তু এই আধুনিক যুগ কি এমনি অস্বাভাবিক যে সেই কবিকেও লাগলো অহংগণের হাওয়া,— এমন কথা সে খুঁটি হয়ে বলতে শুরু করেছে, যাকে মহৎ বলে মনে করি সে যুগে ধরা, যাকে বৃন্দর বলে আমরা কবি তারই মধ্যে অশুভতা?’

উপসংহারে বলেছেন—‘সার্বভৌম বৈরাগীর চেলা হয়ে পড়েই যখন নিরাসক্ত মনট হুড়ে সর্বত্রই বাহন, সুরাশ পাশাপাশি গেবা পেয়েছে কিছু সাহিত্য পাথর নি।’

আধুনিক কাব্যের অন্তরংগ দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এই পর্যন্তই।

গল্প কবিতার বহিঃরং দিক সম্বন্ধে এমার আলেক্সান্দ্রা শুরু করলাম। গল্পকবিতা বলতে গাথা কথার বুদ্ধির ছন্দোবদ্ধি। মুক্তছন্দকে বহন করা হয়েছে কবিতায়। অনেকের ধারণা গল্পকবিতার রসপ্রতিপত্তির দিক বাধা মিলে গল্প কবিতায় গল্প ছাড়া কিছুই থাকে না। অথচ এ ধারণা যথাস্থক রকমে ভুল। জটিল আধুনিক কবির ভাষণ গ্রহণ করা যাক—‘আজকাল, কাব্যের এক নতুন বাহনের সৃষ্টি হয়েছে—এট এক বাহক যার মধ্যে কোন বাচ্যবিচার নেই, যাতে খুঁটিযতো গল্প থেকে গল্প ও গল্প থেকে গল্পে বাতায়বাতের পথ রয়েছে। কাব্যের এই ধাতুমণ্ডকে নির্মিত আখ্যায়িকার নামই মুক্তছন্দ। এই

মুক্তহৃদে পোষ্য প্রভাব প্রচুর। এমন কি আমবা
এতোম্বর পর্যন্ত মানতে বধ্য। যে, তাতে যে-গল্প বাস্তব,
তাও একেবারে সাম্প্রতিক নয়। কারণ কবিতার
প্রকাশ বড়ই সামান্য রোজ, তার উল্লস উল্লস একটা
অসাধারণ আবেগের উদ্দেশ্য থাকে এবং আবেগজাত ব্যাধি
যেহেতু উদ্ভূত ব্যাধি, তাই মুক্তহৃদের ভাষাও গৃহকর্মের
ভাষা নয়, মাতৃবীর উদ্ভূত চৈতন্যের ভাষা। এই অর্ধ-
নারীধর কৃতিটি আধুনিক শিল্পেরই ধান।'

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা গ্রহণ করা যাক—

এমন মন সিংহ বেশিদিন তোমাকে অনেকদিন :

চেতিনি এমন ব্যাধি করে যাথা হেলানো

চল রাখার কারিগরিতে,

এমন হই চাতকের বিস্তারি

চুড়িবালায় চূর্ণকৃষ্ণি তালে

শেষে ঐ ধানী রঙের ঝাঁড়লানিতে

কোথাও তিলু তিল মিলে,

আট করলে কোথাও বা

কোথাও একটু টেনে মিলে নিচের মিলে,

কবিতা বেদন ছন্দ বদল ক'রে

কেটে আঘট ব্যক্তিবে চুরিয়ে।

(ভ্রামণী)

এই মুক্তহৃদে পোষ্যে অবশ্যই আবেগ আছে। এর
ভাষা-কোমল কথাগুলো সহজ অথচ মধুর। এখানে
প্রিয়াকে সন্ধ্যায় করা হয়েছে এবং এই হিসাবে চিত্রকালই
এটা কাব্যের বিষয় বস্তু। এখানে কোথায় হৃদয়ের চটুল
মর্দন, কোথায় বা অলংকারের বাহন? তবু এ হৃদয়ের
এক পক্ষের বলেই হৃদয়। এখানে এ বেশ অলংকারহীন
স্বকল্প। একটি আঘট ব্যক্তিবে চুরিয়ে এখানে মুক্তহৃদকে
চেতে বোঝা হলো। এখানে কাব্যমখীর নিরাশ্রয়,
সহজ অসুস্থ রূপ। কালিদাসের কথা আমায় এখন মনে
পড়েছে। 'চম্পুকাণ্ডে' গতিষ্ট্রী রাণী হৃদয়িকা অলংকার
জাপ করছে।

'তবুপ্রকাশেন বিচের তারকা

প্রত্যাকবলা শশিনেব পবরী'

শেষরাহি তারার অলংকার জাপ করছে—কারণ
এখন সে প্রভাতকে প্রদর্শন করছে। আমার মাতৃবে সে
মহিমায়িত।। নিঃস্বপ্নে যা বলে স্নেহেছে বলেই তার
এমন অসুস্থ আশ্রয়প্রার্থ। এই সত্যাবোধ হয়েছে বলেই
বিনা-অলংকারেই হৃদয়। আমি বলি উক্তই গদ্য
সৌন্দর্যের সত্য এইখানেই।

পাকাতা সমালোচক কোচে বলেছেন, কবির চেতনের
বহন অসুস্থতা জাপবে তখন তার প্রকাশ্যেই আপনা-
আপনিই গড়ে উঠবে। নরীষ ব্যত্যাখনি অল, ততোখনি
সে পতীর ও প্রসঙ্গ; এবং নিঃস্বপ্নের পতিপথ সেই করে
নিষেছে। এ যদি সত্য হয়—তবে গদ্য কবিতাকে
সাহিত্যে নিকটই স্বীকার করতে হবে। ধরা যাক
আমি কবি বাস্তবিক কথা। ওর কাছে কাব্যের বাহন
হলো ছন্দ। আমি বলি আত্ম যদি তিনি জন্মাতেন,
তাহলে হয়তো মুক্তহৃদেই কৌকুমিধূনের বিরহ-দুঃখ-
জাত অসুস্থতিকে উপায়িত করতেন। তার সময়ে হৃদয়ের
প্রকাশ ছিল অসুস্থ,—সেকালে তিনি যদি ছন্দছাড়া কিছু
লিখতেন, তা হলে সত্যিই হতেন, সম্ভব নেই।
সেইসময়ের যে আবেগ অসুস্থ করেছিলেন, তার উপস্থিত
ভাষাও সেই সময়ে তৈরী হয়েছিল।

আধুনিক গদ্য কবিতার একটা ছন্দ আছে অথবা
হায় আছে। সে ছন্দ প্রচ্ছন্ন, অথচ সে আছে।
সেইসময়ই সে উজ্জ্বল নয়, সংঘত। হৃদয়ের মোহাই
রিয়ে এখানে আপনারা কোথায় বিবাদ জন্মাতেন?
আপনারা কি মোহকে মুক্তিগ্রহে জ্বালাতে চান না?

আর একটা কবিতা বেঝা যাক—(আমরা শুধু বহিঃসং
বিক দেখছি।)

অবশেষে পরতের প্রথম হাওয়া তার উপরে অবে

উঠল তবু পাতা।

এখন আর মাস, হলাম প্রজাপতিগুলো

আমাদের পক্ষি বাগানের বাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

আমায় বুক যে কেটে যাচ্ছে, তবু হয় নাহে আমায়

তবু যায় জান হয়ে।

ওগো, বন্দন ভিন্নটে মেলা পার হবে তুমি কিরবে
আগে থাকতে আমাকে নবর পাঠাতে কুলোনা।
চাঁদ ফেড়, শার দীর্ঘ পথ বেতে আমি আসব,

তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

দূর ব'লে একটুও ভয় করব না।

(একটি চৈনিক কবিতার অনুবাদ)

অনুবাদটা রবীন্দ্রনাথই করেছেন। কাব্যকে ভাষান্তর
করা তো অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু সে সমস্তা এমন
থাক। আগনারা এখানে প্রয় করতে পারেন যে,
এ-প্রকার গল্প কবিতার বহন মাগনে কোনো নিয়ম-পদ্ধতি
আছে কি? আছে অবশ্যই। এখানে যদিও মিলনেই
এক সমস্যাও নেই, তথাপি খেয়াল খুলীতে সব কিছু
হয়ে উঠেনি। আগেই বলে রাখি, কাব্যের কারিগরি

সমস্ত কারিগরির চাইতে সত্তর। এখানে কাব্য বলতে
আমি শিল্প বলছি। উপস্থিত গাথাংটি সুনিয়ন্ত্রিত।
এখানে কনি কবিতাও হয়ে চন্দ্রের নাড়ির উপর বিশেষ
অধিকার রেখেছেন। তবু চক্ষকে মুক্ত করেছেন—তার
অধিকার-প্রত্যর্পণ করেছেন। আগনারা বলতেও পারেন
এখানে যাদের গহিত সম্পর্ক আছে। কিন্তু তার চাইতে
বেশী সম্পর্ক আমার মনে হয় স্রুতির সহিত সেখানে
বাক্য কমেছে সেখানে সে পুনর্বারে একটু এগিয়ে বড়ো
হয়েছে। এখানে ভাল প্রচ্ছন্ন। আমার মনে চক্ষে,
আমি যদি বলি ভাবের প্রতিসামা বাধা হয়েছে, তা
হলেই আগনারা পরিহার করে দৃষ্টবোধ। এ চাইতে
বেশী কিছু বলা কঠিন আর কবির সরসবোধ তো
আছেই।

অপরাধ কার ?

এশজী ঘোষ

আমি তো চাইনি হৃদয় জীবনের পরপূট ভরে
তবু এ হৃদয় ধরীতে একটুই ঠাই
আর দবাকার সাথে শত দুঃখ দিয়ে
ভাগ করে নিতে আমি চাই।
সে ব্যাধির রজনী কোনদিন
অবসান নাও যদি হয়
আর আমি কবিতাক'ভর
চিত্র মোর ভাবনা বিহীন।
তবু কেন কিরাইবা দিলে
অবহেলা ভরে ?
চাওরা মোর সীমা রেখা ধরে
যাযনি তো বহুদূরে চলে।

লক্ষ্মণে অনন্ত এ রাত—

টানে নাভো পিঙনের দিন
জীবনের দীপ তৈলহীন
সে কাহার অপরাধ ?
তবু আমি চাই বাচিবারে !
রৌদ্রের শুক তৃণ হয়ে
তোমার পথের দুই ধারে।
শোনাইব র'য়ে র'য়ে—
“অপরাধ কার ?
কেন আমি পাই নাই দুল্লভের মত
বাচিবাব মৃত অধিকার ?
কেন আমি রিক্ত, ভাণ্যহত ?”

শিক্ষায় স্বাস্থ্যের স্থান

প্রবন্ধতা কর

আমাদের দেশে শিক্ষার মধ্যে স্বাস্থ্যের কোন স্থান নাই, একথা বুল, কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের দিকে একবার তাকালেই নিঃসন্দেহে বলা যায়। দেশের নির্বোধ, কীপট ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে পাকাতোর স্বাস্থ্যসম্মেলন, জীবনী পত্রিতে গুরুপুত্র, আনন্দের প্রতীকতরী ছাত্র ছাত্রীদের তুলনা করলে, মন হতাপায় চলে ওঠে।

কিন্তু সেসব কার? শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতার মত লম্বী কে? এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

মানার মনে হয় ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্যহীনতার মত লম্বী আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি।

'স্বাস্থ্য জাতীয় জীবনের প্রাণপক্তি' এই নীতি যেমন নিজে হ'ল শিক্ষাপদ্ধতিতে কতকগুলি পরিবর্তন না করা যায় তবে দুঃশক্তির প্রাণদান হবে ওঁদের কোনটো আপ: নাই।

ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য ভাঙার একটি প্রধান কারণ গরীকার পড়ার চাপ।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিকসংখ্যক বই প্রাণপন পত্রিতে বুঝ করতে হয় যে তাদের পক্ষে বিশ্রাম করা, খেলাধুলা করা বা ব্যায়াম করা অসম্ভব হয়ে পড়ার।

বালা থেকে বৌবন পর্যন্ত এইভাবে ছেলেমেয়েদের একটার পর একটা করে পরীক্ষা দিয়ে আসতে হয়। কয়েকটি বিবিবিজ্ঞানর থেকে সর্বশেষ পরীক্ষার মগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে যখন ছাত্রছাত্রীরা জীবনমুন্ডের নামনে এগে পড়ার তখন তাদের শীর্ষ শরীরে সিবর্ণ মুণ্ডের সিতে তাকিয়ে হতাপ চলে ওঠা ছাড়া উপায় থাকে না। এই অবস্থার প্রতিকার অনায়াসে করা যায়। যদি প্রত্যেক শেষ পরীক্ষা দুইভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রথম বংসরে একভাগ এবং দ্বিতীয় বংসরে আর একভাগ দেওয়া যাবে, এই ব্যবস্থা করা হয়। এরূপ করলে পড়ার অত্যধিক চাপ এবং তার মত কঠোর পরিশ্রম ও স্বাস্থ্য-হানির হাত থেকে ছাত্রছাত্রীরা মুক্তি পাবে।

ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যভঙ্গের আর একটি কারণ ব্যায়াম চর্চার অভাব। ছাত্রছাত্রীরা বুলকলেজে, পাঠ, ছয় ঘণ্টা একভাবে বলে থাকে। সারাদিন ধরে অল্প প্রত্যাহার কোন চালনা হয় না। বালা থেকে বৌবন পর্যন্ত এইভাবে কোন শারীরিক পরিশ্রম না করার মত অল্প প্রত্যাহা কীপ চর্চাল ছয় ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে ব্যায়াম চর্চাকে বাধ্যতামূলক করা হলে অনায়াসে এ অবস্থার প্রতিকার ঘটে কিন্তু এই সঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যায়াম চর্চা যদি বাধ্যতামূলক করা হয় তা' হ'লে দুপুরে টিকিনের সময় ছাত্র ছাত্রীদের বিনামূল্যে বা মল্লমূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার অবসর দিতে হবে।

আমাদের পরিচিত দেশে অধিকাংশ বালক, বালিকা কিন্দোব, কিন্দোবী বাড়ী থেকে পুষ্টিকর খাদ্য পাননা, তার উপর যদি তুল, বলেজে যথেষ্ট ব্যায়াম করে ও তরুণবোম্বী খাদ্য না পায় তবে তাদের যে স্বাস্থ্যহানি ঘটেবে কিছুতেই তার পূরণ হবে না। বাধ্যবশ্যেও যেহেতু পাই অনেক তুল, কলেজে ছুটির সময় বাধ্যতামূলক ব্যায়াম বা খেলার ব্যবস্থা আছে, তাতে যোগ না মিলে অধিমানা করা হয়, কিন্তু ছাত্র ছাত্রীরা দুপুরে টিকিনের সময় কোন পুষ্টিকর খাদ্য পায় কি না, এবং আর্মো কিছুমাত্র পায় কি না সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য রাখেন না।

ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির মত আরও কতকগুলি ব্যবস্থা সহজেই করা যেতে পারে। একটি ব্যবস্থা হল—জাতীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি তুল কলেজে স্বাস্থ্য গরীক্ষক রাখা। স্বাস্থ্য গরীক্ষকেরা প্রতি মাসে তুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য গরীক্ষা করে কর্তৃপক্ষের কাছে ফলাফল আনাবেন। যে সব ছাত্র ছাত্রীর স্বাস্থ্য মস্তোবলনক নয় বলে জানা যাবে তাদের পড়া বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হবে। যে পর্যন্ত না স্বাস্থ্য পরিশ্রমের অহুতুল ছয় সে পর্যন্ত তাদের রূপে যোগদানের অহুতমি দেওয়া হবে না। এ ছাড়া স্বাস্থ্য গরীক্ষকের আর একটি বিশেষ কর্তব্য হবে তুল কলেজ

গৃহগুলি স্বাধীনতার উপযোগী কি না, যথেষ্ট আলো বাতাস
আপে কি না, ছাত্র ছাত্রীদের স্বান শংসুলান হয় কি না,
শে বিধেই পরীক্ষা করে বিবৃতি দেওয়া।

যে গৃহগুলি অসুপযুক্ত বিবেচিত হবে সে গুলিকে
জাতীয় সরকার তৎক্ষণাত্ বন্ধ করার নির্দেশ
দিবে।

বর্তমান সময়ে বিশেষভাবে শহরগুলিতে এই সমস্যাটি
বেশা বিদ্যমান। কলিকাতার দ্বার রাস্তার দ্বার অসংখ্য
স্কুল কলেজ গৃহগুলি যদি পরিদর্শন করা যায় তবে স্তম্ভিত
হয়ে যেতে হয়। ছোট ছোট শিশুগণ পর্বত আলো
বাতাসহীন অন্ধকূপের মত স্কুল ঘরে সকাল রপটা থেকে
বিকাল চারটা পর্যন্ত, ছেগশমানের কয়েকটি মত আবহ
থেকে যে ভাবে লেগাপড়া করে তাহা বেথলে বিশ্বের
নির্বাক হয়ে যেতে হয়.. অথচ জাতীয় সরকার টঙ্কা
করলে কত সহজেই এ অবস্থার প্রতিকার করতে
পারেন।

ছাত্র ছাত্রীদের স্বাধীনতার উন্নতি করার আর একটি

উপায় বহুতে অসংখ্য: ছাত্র ছাত্রীদের স্বান করতে নিষে
হওয়া।

একজন প্রমথের কপে ছাত্র ছাত্রীদের যেমন স্বাধীনতার
উন্নতি হবে তেমনি দেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক
নানা উত্তরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে স্বার্থ বৈশাখ্যে
উৎসাহ হবে। কেবলমাত্র নীরস বই মুদ্রিতে জ্ঞান
সীমাবদ্ধ থাকবে না।

ইউরোপে ছাত্র ছাত্রীদের স্কুল কলেজ থেকে প্রায়ই
পৰ্বতনের ব্যাবস্থা হয়, এবং সেই খণ্ড বহন করেন
শিক্ষায়তনগুলির কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় সরকার।

আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি বটে কিন্তু জগতের অন্য
স্বাধীন জাতিগণ উন্নতির যে ক্ষেত্রে উঠেছে, সে তুলনায়
আমরা কোথায় পড়ে আছি।

জাতিকে স্বাধীন, প্রাণশক্তিভে তরপুর করে তে-সা
জাতীয় সরকারের ও জাতীয় নেতাদের অবশ্য কর্তব্য।
শিক্ষার মধ্যে স্বাধীনতার স্বান কেনন করে হতে পারে
এ বিষয়ে বিশেষভাবে তাৎপর্য সমন এগেছে।

হিমালয়

ঐক্যবান বন্ধন মল্লিক

১

(আবাদের 'মল্লিক'র হিমালয়ের ঘরে উমার
জন্ম নামক সুলার চিত্র দর্শনে)

গিরি। তোমার গুপ্ত গৃহ কিন্তু মনোহর

গিরিরাজের বোণা বটে সুরম্য অন্দর।

তুমি ঢাকা শুভ উজল তুমি শিখরে

নব রবির, স্বর্ণ কিরণ পড়ছে ঠিক করে।

বাহির পাষণ, ভিতর তোমার কি মহিমাময় ?
বন্দী হিমালয়।

২

গোত্রাবিশেষ যে তুমি, আদমি যুগের কথা কহ
জগন্মাতার পিতা তুমি, মোদের মাতামহ।

তোমার চরণ চুঁই 'চলে' গঙ্গা যমুনা,

শিলায় তোমার পাই যে হিম ও হেমের নমুনা,

তোমার বৃক্ক দেব মানবের নিত্য পরিচয়

বন্দী হিমালয়।

৩

পাষণ সাধে কুটুস্থিতা পাষণ সাধে ঘর,

আমরা কবি আমরা হলম প্রেমের যাদুকর।

ঐতিহ্য কার এমন? আভিজাত্য এমন কার?

নিভড়ে পাষণ অমৃত নিই বৃহৎ সে কারবার।

স্বর্ণ তুমি মর্ত তুমি জয় তোমারি জয়

বন্দী হিমালয়।

“এবার ফিরাও মোরে”

ঐশ্বরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্-এল-এ

(রবীন্দ্রনাথের কবিতার নাট্যরূপ)

মক্কাবাসী। মকের প্রবেশের যাকামারি হুজ নেটের
এক পদা মকের একপাশ থেকে আর এক পাশ অবধি
টানানো থাকবে। শেছনে একটি ঘোর রঙের পদা।
প্রথমদৃশ্য।

দারা বক আলোর উজ্জ্বল ছিপ্রহরের দ্বার। যবনিকা
উইতেই দেখা গেল এক হুজ উপাসনাবে উপরের দিকে
চেয়ে আছে। বেশকুণ্ডা বেশ অচূত ধরনের। মকের
ভেতর থেকে গান ভেসে আসছে :—

“আমি চকল হে,
আমি হুজের পিয়াদী !
দিন চলে যায়, আমি আনমনে,
তারি আসে চেয়ে থাকি ব্যস্তমনে
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পদ্য পাবার প্রাণী
আমি হুজের পিয়াদী !”
ওগো হুজ, যিগল হুজ ! তুমি যে
বাক্সাও ব্যাকুল ঝগরী।
যোর আনা নাই, আছি একটাই,
সে কথা যে ঘাই পানরি !”

গান খেমে গেল, কিন্তু হুজ শেষ হয় না। হুজের
মুহূনা প্রকাশ করতে লাগলো হুজকের অশীমের প্রতি
ব্যাকুলতা, হুজকের মুখেও সে ভাবের প্রকাশ পেতে
লাগলো। হুজক পাশ হ’তে বাঁধি তুলে নিয়ে ব্যাকুল
লাগলো। মকের আলোর উজ্জ্বলতা কমে এলো।
হুজের ব্যাকুলতায় লাগলো বিদায়ের ছোঁয়াত। ছিপ্রহরের
অবদান হয়ে এলো। অপরাহ্ন গড়িয়ে চলেছে লক্ষ্যার
দিকে। পর্দার পিছনে দেখা গেল মধ্যাহ্ন প্রেক্ষীর
এক হল পুরুষ আগিসাদি কাষের পর ক্রান্তবেদে
গৃহাভিমুখে চলেছে। মকের ভেতর থেকে—“দিনের
দেবে হুজের বেশ”র গানটির হুজ ভেসে আসছে।

কেকাঙ্গীরা চলে গেল। বিদায়ের হুজ কিন্তু থামলো না।
সারান্বিনের খাটুনার পর হুজ নীচু ক’রে লাঙল কাখে এক
হল চাষী ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। ভেতর থেকে গান
ভেসে এলো—

“নামিরে হুজ চুকিয়ে হুজ বাবার পথে বাব বাবা
কেরার পথে ফিরেও নাহি চাব,
যবেও নহে পারবেও নহে যে জন আছে দারখানে
লক্ষ্যাবেলা কে ভেবে নেয় তারে”

এরাও চলে গেল। লক্ষ্যা ঘনিষে এসেছে। প্রবেশ
করলো গাঁইতি ইত্যাদি বস্তুপাতি সমেত একদল হুজ।
ভেসে আসছে গানের এই অংশটি :—

“কুলের বাহার নাইক বাহার কলম বাহার কলো না।
অক বাহার ফেলতে হাসি পায়।
দিনের আলো বার কুরাণো লাকের আলো কলো না
সেই বসেছে বাটের কিনারায়।
ওরে আর ! আবার নিয়ে বাবি কেরে
দিনের শেষের শেষ খেয়ে ! ওরে আর !”

মজুরেরা চলে গেল। এদের ব্যাকুল আস্থানে মকের
গামনের দিকে প্রবেশ করলো এক কর্মযোগী, গান গাইতে
গাইতে।

“ক্রান্তি আবার কমা করো প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি ককু।”

হুজক নিধিকার চিত্তে বাঁধি বাঁধিয়ে চলেছে, কোনও
দিকে দৃষ্টিপাত না করে। কর্মযোগী চ’লে বাঁধিল ;
চঠাৎ এই অচূত-বেশী হুজকে ধোঁধ বমকিয়ে পাড়ালো।
কিছুক্ষণ নিরাশ্রয় ক’রে ব’লে উঠলো।

কর্মযোগী। “সংসারে লবাই হবে সারাক্ষণ

শত কর্ণে রত, তুই শুধু

ছিহবাধা পলাতক বালকের মত”

মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষম তরুন্দ্যারে
হুজ বনগছবহ বনগতি ক্রান্ত শুণ্ড বাঘে

লাগোনি ব্যাকুহিলি বাঁধি ! ওরে তুই শুঁ

আজি !”

হুজক বাঁধি খামাইয়া বিস্তৃত দোচনে কর্মযোগীকে

বেথতে লাগলো। তারপর ধীরে নিশ্বাসে এসে জিজ্ঞাসা-
নেয়ে চেয়ে রইলো। পর্বর পেছনে রক্তিমের আভাস।
অন্তরালে হ'তে ভেসে আসছে অত্যাচারিত জনসাধারণের
শব্দস্বরে ভটা বেদনা—করণ জাগিনী থেকে থেকে
শব্দস্বরে উঠতে লাগলো।

কর্মযোগী। “আমর লেগেছে কোথা? কার পথ
উন্মিষাছে বারি,

জাগতে জগতজনে? কোথা হ'তে
লনিছে কখনে

পৃথল? কোন্ অন্ধকারা বারে লক্ষ্য বন্ধনে
অনাখিনী বাগিছে সহায়?”

যুবক পর্বর দ্বার মুচের মত চেয়ে রইল। পর্বর
পেছনে যেতল নৌম্যুতি এক বৃদ্ধ বলিতে বলিতে
গেল।

“নাসিনীরা চারিদিকে কেলিতেছে বিবাক নিশাস।

পাঞ্জির ললিত বাঈ শুনাইবে বার্থ পরিহাস—

বিবাহ নেবার আগে তাই

ভাক দিয়ে বাই

হানবের সাথে ধারা লংগ্রামের ভরে

প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।”

ভাবাবেগে কর্মযোগীর মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছে।

কর্মযোগী। “কীতকার অপমান

অন্ধের বন্ধ হতে রক্তগুণি করিতেছে পান

লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস

আরোহিত অবিচার। সচ্চিত্র ভীত কীতদাগ

লুণ্ঠাইছে ছববেশে।”

পর্বর পিছনের চাবীমজুরদের হামাগুণ লক্ষ্য করে বলতে
লাগলো।—

“ওই যে পাড়ারে নভণির

মুখ লবে,—রানমুখে লেগা শুধু লত পতাকীর

বেদনারে করণ কাহিনী; শুদ্ধ বস্ত চাপে ভার

বহি' চলে মন্মগতি, বসন্তক থাকে শ্রাণ তার,—

তারপরে সজ্ঞানেই বিয়ে বার বংশ বংশ ধরি;

নাহি ভরণে অদৃষ্টের, নাহি নিষে বেবতারে শ্রি,

মানবেবের নাহি পের শেষ, নাহি জানে অন্তিমান,

শুধু ভুটি অশুভটি কোনমতে কইটিই প্রাণ

বেশে দেয় বাচাইয়া। সে অশ্রু বংশ কেহ কাড়ে,

সে প্রাণে আঘাত দেয় গুরুত্ব নিষ্ঠুর অত্যাচারে

নাহি জানে কার বারে পাড়াটবে বিচারের আসে

ধরিত্রের ভগবানে বারেক ভাকিয়া দীর্ঘখানে

মরে সে নীরবে।”

যুবক নীরবে গাড়িবে রইলো; বাটে, কিছু ছবয়ের আলোড়ন
মুখের ডাবে প্রকাশ পেতে লাগলো। অশ্রুগলে
শব্দরানো বেদনার মধ্যে আবেগমনের আভাস পাওয়া যেতে
লাগলো। ভেতর থেকে গান ভেসে এলো:—

“এই করেছো ভালো নিষ্ঠুর এই করেছো ভালো।

এমনি ক'রে ভগবে নোর তীর বহন আলো।

আমার এ মূণ না পোড়াল

গন্ধ কিছু নাহি চালে,

আমার এ মূণ না জ্বাললে বেদনা কিছুই আলো।”

কর্মযোগী। “এই মন মূঢ় রান মূঢ় মুখে

যিতে হ'বে ভাষা; এই মন শ্রান্ত শুধু ভর বৃক

লনিয়া তুলিতে হবে আপা; ভাকিয়া বলিতে হবে

‘মুহুর্ত তুলিয়া শির একত্র পাড়াও বেগি লবে;

‘বার ভরে তুমি ভীত, সে অশ্রু ভীক তোমা চেয়ে

‘বহনি জাগিবে তুমি ভখনই সে পলাইবে ধরে

‘বহনি পাড়াবে তুমি লম্বুতে তাহার, ভখনই সে

‘পথ লুপ্তের মত লভ্যেতে লম্বায়ে বাবে মিলে।

‘বেবতা বিম্ব তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার

‘মুখে করে আক্ষান, জানে সে বীনতা আপনার

মনে মনে।”

যুবক। (স্বপ্নাধিতের প্রাণ)

“জন্মের তুমি চন্দ্র ভরিয়া এনেছ মল্লমল

এনেছ তোমার বন্ধে ধরিয়া হুগেই হোমানল।

হুগেইবে তার উজ্জল হ'বে উঠে

মুখ প্রাণের অন্ধ আবেগ হুটে

সে ভাণ বসিয়া ওঠে বিকশিতা বিজ্ঞের শতরল।”

কর্মযোগী। “কবি, তবে উঠে এল, বহি থাকে প্রাণ

তবে তাই সহ লাগে,—তবে তাই কর আমি দান !
বড় হুংস, বড় ব্যস্ততা, সমুখেতে করেব সংসার
বড়ই দরিদ্র, মূগ, বড় ক্ষুধ, বড় অসুস্থতা ।
আর চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাধা, আনন্দ উজ্জ্বল পরমাণু ।
সাহস বিহীন বসন্ত । এ বৈশাখ মাসেরে কবি
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি ।
(প্রস্থান) ।

স্বপ্ন । (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর উপর দিক চেয়ে)
“এবার কিরাও যোরে, দাঁয়ে বাও সংসারের তীরে
যে কল্পে, বসন্তি ! তুলো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে স্বপ্ন, তুলোনা না মোহিনী-মায়ায়,
বিহীন বিবাহধন অক্লেশে নিম্নে ছায়ায়
বেগো না বসারে । দিন যায় সন্ধ্যা হ'য়ে আসে ।
অসুস্থের চাকে শিশি, নিরাশ্রয় উদাস বাতাসে
নিঃশেষিতা কেঁদে ওঠে বন ।”

(একটু খানিকটা চলিতে চলিতে)

“বাহিরিছ হেথা হ'তে
উজ্জ্বল অশ্রুতলে, মূল্য-প্রথর রামণে
জনতার দারদানে ।” (প্রস্থান) ।

মন্দের আলো পুনরায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠিলো । বসন্ত
রাগিণী বেবে গেছে, হয় এখন সরল গতিতে বয়ে
চলেছে । পর্বত পিছনে সুবকের প্রবেশ । গান পাইতে
পাইতে চ'লে গেল ।

“আমারে কে নিধি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে ।
আমার এই বন গলি-কাষ ভুলিয়ে, সঙ্গে
তোমার নিয়ে যারে ।

আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা লুটেপুটে
পড়ে থাক মনের বোকা ঘরের ঘারে ।

বেদন ঐ এক বসন্ত এসে তাগিয়ে নে বায় পারদ্বীপে ।

পর্বত মননে মিলে কর্মব্যস্ত জনতার প্রবেশ । জনতা
চ'লে যাচ্ছে এখন সময় সুবকের গান পাইতে পাইতে
প্রবেশ ।

স্বপ্ন । (জনতাকে লক্ষ্য করে) ।
“কোথা বাও পাখ, কোথা বাও,
আমি নহি পরিত্যক্ত, যোব পানে কিরণ তাকাত ।
বল মোরে নাম তব, আবারে করো না অবিশ্বাস,
স্বপ্নিছাড়া স্বপ্নমাতে বহুকাল করিছাছি বাস,
লজ্জা-হীন রাতি মন, তাই মোর অপমান বেশ
আচাৎ নৃতনতরো ; তাই মোর চক্ষে অশ্রুবেশ
বসন্তে জ্বল সুখ-মল ।”

জনতা ততক্ষণ প্রাণ চ'লে গেছে । শেষ লোকটি
কিছুক্ষণ অস্বাক হয়ে সুবকে বেবে দেও চ'লে গেল ।
হত্যাধ হত্যা সুবকের মূগে হুটে উঠিলো রাগিণীরও হলো
পরিবর্তন ।

স্বপ্ন । (হত্যাধার হুটে) “বেদন অগতে চ'লে আমি,
কোন মা আবারে দিলি শুধু এই খেলাবার রাশি ।
বাজাতে বাজাতে তাই মৃত হবে আপনার হুটে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাতি চ'লে গেছে একাত সুবয়ে
ছাড়ারে সংসার শোবা ।”
স্বপ্ন হত্যাধ হ'য়ে পূর্বের জায়গায় ব'সে পড়লো ।
অন্তরাল হ'তে গান শোনা গেল ।

“যদি তোর ভাক ওনে কেউ না আসে, তবে
একলা চলোরে ।

একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো ।

যদি কেউ কথা না ভর (ওয়ে ও অভাগা) ।

যদি সবাই থাকে মূগ কিরায়ে, সবাই ক'রে ভর
তবে পরাণ মূগে, ও তুই মূগ হুটে তোর মনের কথা
একলা হলো রে ।

যদি সবাই ভিড়ে যায় (ওয়ে ও অভাগা)

যদি পূজন পথে বাবার কালে কেউ কিংবা না চায়
তবে পথের কাঁটা, ও তুই রক্তমাখা চরণতলে
একলা হলো রে ।

যদি আলো না ধরে—(ওয়ে ও অভাগা)

যদি কড় বাসলে আঁধার রাতে দূরার দেখ ঘরে,
তবে বজানলে আপন সুবক পাখর আলিয়ে নিয়ে,
একলা আলোরে ।”

গান শুনেতে শুনেতে বুকের মুখ উজ্জল হ'বে উঠলো।
নতুন উৎসাহ পেয়ে বুকের উঠে ঠাড়ালো। রাগিণীও
তখন প্রকাশ করছে দূততার সুর।

বুকের। "দে বাণিতে শিখেছি যে স্বর
ভাট্টারি উল্লাসে যদি শীতলত অবসারপুর
ধনিরা তুলিতে শরি মুড়াগাণী আশার লস্কীতে
কর্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরবিতে
শুধু মূর্খের তরে, হৃৎক ব'ধি পার তার ভাষা
স্বপ্ন হ'তে জেপে ওঠে অহরের গভীর দিপাল্য
অর্ণবের অন্তর লাগি,"—তবে ধর হ'বে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাপীড়ে লজ্জিবে নির্দোষ।"

(প্রস্থান)।

সবনিকা

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মকরানন্দা পূর্বের ভাব। জিজ্ঞাস্য বুকের কর্মব্যাপির
নিকট ঠাকিয়ে আছে। সকের সামনের দিকে আলো
উজ্জল। পর্বার পিছনে অশেষক্লান্ত অন্ধকার।

কর্মযোগী। "কি গাহিবে, কি শুনাবে? বলে।

বিখ্যা আপনার সুখ

বিখ্যা আপনার সুখ। "আর্থময় যে জন বিমুখ
কুহল জগত হ'তে সে কখনো পেথেনি ঝটিতে।

মহাবিশ্বকর্ষকের তরসেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভঃর ছুটিতে হ'বে, সন্তোরে করিবা প্রবতারা।

মৃত্যুরে করি না পশা। হৃদি:নর অক্ষয়ল ধারা
মজ্জকে পড়িবে বড়ি—তারি সাকে বাব অসিলারে
তার কাছে,—জীবন সর্ব্ব ধন অগিরাছি বারে
অম্ম অম্ম ধরি।"

বুকের। "কে সে?"

কর্মযোগী। "জানিবা কে? চিনি নাই তারে—

শুধু এটাই জানি—তারি লাগি" রামি অন্ধগারে

চলেছে মানবধাতী হুগ হ'তে দুগাধর পাশে

কড় বন্ধা বন্ধপাতে জাগারে ধরিয়া সাবধানে

অস্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার মাগ্যোন শীত—ছুটেছে বে মিত্রীক পরানে
শব্দট আবার নাহে; বিবেছে সে বিলস্কন
নিখাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি; মৃত্যুর পর্জন
শুনেছে সে লস্কীতের মতো।"

পর্বার পিছনে প্রজ্ঞাধের আবির্ভাব ও গান গাহিতে
গাহিতে প্রস্থান।—

"হৃৎকের বেশে এসেছ ব'লে তোমারি নাহি ভরি হে।

বেধানে বাধা তোমারে লেগা মিথি় করে ধর্য হে।

জাগারে মুখ ঢাকিলে স্বামী তোমারে তবু চিনিব জানি
মরণরূপে আগিলে প্রহ, চরণ ধরি মরিব হে।

বেধন ক'রে লগনা দেখা, তোমারে নাহি ভরিব হে।

নয়নে আঁখি বরিছে জল স্রবক জল নয়নে হে,

বাঁধিছে বুকে বাজুক তব কঠিন বাহ বাঁধনে হে।

তুমি যে আহ বকে ধরে বেধনা তাহা জানাক মোরে
চাওবা না কিছু, কথো না কথা, চাহিয়া রব বধনে হে।

নয়নে আঁখি বরিছে জল, স্রবক জল নয়নে হে।"

কর্মযোগী। (প্রজ্ঞাধের পতির দিকে দেখাইয়া।

"বহিয়াছে অরি তারে

বিধ করিয়াছে শূল, হির তারে করেছ কুঠারে

লক্ষ্মীপ্রিয় বস্ত্রতার অকাতবে করেছে ইচ্ছন

চিরজন্ম তারি লাগি' জেলেছে সে হোমহত্যাশন।—

জুপিত করিবা হির রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে

ভক্তি ভরে জন্মপোষ শেব পুণ্ডা পুন্নিয়াছে তারে

মরণে কৃত্য করি প্রাণ।"

পর্বার পিছনে বৌদ্ধিকবৃক্ষের বেশে বৃক্ষের প্রবেশ ও
গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান—

"এবার চলিছ তবে

লম্ব হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিড়িতে হবে।

বিশ্বজগৎ আবারে মাগিলে কে মোর আশ্রয়

আবার বিধাতা আমাতে আগিলে কোবার

আযাব ঘব।

পানী উড়ে বাবে সাগরের পার, লুপ্তময় নীড়

পড়ে রবে তার

মহাকাশ হ'তে ঐ বায়ে বার, আমারে
ডাবিছে ধবে।"

কর্মযোগী । (বৃক্ষের দেখাইয়া) "তিনিহাছি, তারি লাগি
রামপুর পরিচাছে কীৰ্ত্তন, বিবরে বিরাজি
পথের ভিড়ক।"

পর্দার পিছনে গান গাইতে গাইতে বীণের প্রবেশ ও
গান শেষে প্রস্থান ।

"তোমার পতাকা যারে দাগ, তারে বহিবারে
দাগ পড়তি

তোমার সেবার মহান ধ্রুবে সহিবারে দাগ ডকতি ।

আমি তাই চাই করিচা পরাণ, ধ্রুবের পাথে
ধ্রুবের ইঙ্গ,

তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহিনা মৃত্যুতি ।
ধ্রুবে হবে মোর নাথার জ্বলন পাথে যদি দাগ ডকতি ।

কর্মযোগী । মহাপ্রাণ সহিয়াছে মলে মলে
সংসারের কৃত উৎপীড়ন, বিবিধাছে শতভলে
প্রত্যাহার কৃপাকৃত, করিয়াছে তাহারে অবিশ্বাস
মৃত বিজ্ঞানে, প্রেমেরে বহিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞা, গেছে সে করিয়া কমা
নীলবে কখন নেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিকমমা
সৌন্দর্য্য প্রতিমা।"

পর্দার পিছনে মলে মলে অল্পতপ্ত জনতার প্রবেশ ও
গান গাইতে গাইতে প্রস্থান ।

"হার মানসে ভাঙালো অভিমান, কীণ হাতে জ্বালা
হানসীপের আলো হ'লো ধান ধান ।

এবার তবে জ্বালো, আগুন ওয়ায়ে আলো

রত্নান ছায়ায় এই গোমূলি হোক অবদান।"

কর্মযোগী । "তারই মলে জানি সঁপিয়াছে দান
ধনী সঁপিয়াছে ঘন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ
তারারি উদ্দেশে কবি বিচিত্রা লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে ঘেঁপে ঘেঁপে।"

কিছুক্ষণ শব্দ নিবৃত্ত । পর্দার পিছনে আলো তক্টিম
হ'য়ে উঠিলো । একটু পরে শোনা যেতে লাগিলো জনতার
হাছাকার জ্বনি । সমবেত কণ্ঠের গান ভেসে এলো ।

"হিংসার উত্তর গুলী, নিভা নিরীহ বন ।
খোর কুটিল পথ তা'র লোভকটিল বন ।
নৃতন ভব চক্র লাগি তাতর বত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আন অশ্রুত বাণী ;
বিকলিত কর প্রেমপন্থ চরমধূনির
পাথে হে, মৃত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
ককণাঘন ধরিতল কর কলর মৃত ।

এসো হানবীর হাও ত্যাগ অটল বীক্ষা
মহাভিক্ষু লও মদার অবজ্ঞা তিক্তা ।
অন্ধনয় নিবিল জ্বর ত্যাগ হান বীণ
বিষবিষবিকার কীর্ণ বিধ অগ্নিরূপ ।
বেশ বেশ পরিণ তিলকককলুধ গ্রানি
তব মললম্ব আন তব বক্ষিণ পাণি
তব শুভ লবীতরঙ্গ তব হৃদয় ছন্দ ।
দাও হে, মৃত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
ককণাঘন ধরিতল কর কলর মৃত।"

গান শেষ হ'লো । কিছু গভীর রানিটির শেষ হলো
না । রানিটির পাথে কষ্ট মিলিয়ে কর্মযোগী বলে উঠলো ।
কর্মযোগী । "তুমি জানি তাহারি মহান

গভীর মললম্ব নিশানা ঘাঘ সমুদ্রে সমীরে ;
তারারি অকলগ্রাণ সূটাইছে নীলগহবিরে,
তারি বিববিষজ্বিনি পরিপূর্ণ প্রেমধূনিরানি
বিকানে পংমগনে প্রিয়জন ধুবে ! তুমি জানি
সে বিশ্বপ্রাণের প্রেমে স্তব্ধতারে নিয়ে বসিমান
যন্ত্রিতে হইবে বুঝে জীবনের সর্ব্ব অলম্বান
লম্ববে পাড়তে হবে উত্তর মতক উড়ে তুলি
যে মতকে তার সেবে নাই দেহা, হাসখেল ধূলি
আঁকে নাই কলর তিলক।"

ইতিমধ্যে পর্দার পিছনে মহাকাশ পাখী, বেশবন্ধ
চিত্তরঞ্জন ও হৃৎযন্ত্র প্রমুখ বেশনেকসূত্বের আবির্ভাব ।
কর্মযোগী বক্তব্যের পরে গান গাইতে গাইতে প্রস্থান ।

"লোভের বিজ্ঞলতা নিজেই অপমান

লভেই করনাতে হইলো প্রিয়মান ।

মুক্তকথোত্তর, আগুন হাতে পতি ধরে নিজেরে

করো অর ।

চরুসেবের ককা করো, চরুসেবের হানো,
নিঃস্বের বীন নিঃসহায যেনো কতু না জানো।
মুকু করো ভর, নিঃস্বের পর করিতে ভর না রেখো
ক-শয্য।”

কর্মযোশী ও বুঝক। (একত্রে) “ভাগ্যের অমরতরু
জীবন কষ্টকপথে বেতে হ’বে নীরবে একাকী।
সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে মূঢ়িমা অশ্রুধারা
প্রতি মিথসের কর্ণে প্রতিদিন নিরলস থাকি
স্বাধী করি সর্বজন।”

উভয়ের গান পাইতে পাঠিতে প্রস্থান।

“স্রাস্তি আবার কমা করো প্রভু
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কতু
এই যে বিরা পর ধর, কাঁপে আঁরি এখনতরো
এই যেমনা কমা করো—কমা করো প্রভু।
এই বীনতা কমা কর প্রভু, পিছন পানে তাকাই
যদি কতু
যিনের তাপে রৌদ্র জ্বালায়, শুকাই মালা পুজার মালায়
সেই স্নানতা কমা করো, কমা করো প্রভু”
(অথবা) “আগে চল আগে চল ভাই।
প’ড়ে থাকি পিছে, মরে থাকি মিছে, বেঁচে য’য়ে
কিবা হল ভাই?”

আগে চল আগে চল ভাই।
চিরদিন আছি ভিখারির মত, জগতের পথ পাশে
ধারা চলে যায় কুপা চক্রে চায়, পদব্র্ণা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছেড়ে উঠ উঠ লবে, মানবের লাগে যোগ
দিতে হবে

ভা যদি না পারো, চেয়ে বেশ তবে ঐ আছে
রদাতন ভাই

আগে চল আগে চল ভাই।
গান শেষ হলো অমরতরু। রাগিনীতে লাগলো
পুরবীর টোঁটাত কবির বিদ্যায়ের আশ্রয়। পর্যায়
পিছন উজ্জল। দেখা গেলো ভাংতমাতা পাড়িয়ে
আছেন। বুঝ ও কর্মযোশীর প্রবেশ।

বুঝক। “তারপরে বীর্ষ পথ শেষে
জীবনাত্মা অবদানে ক্রান্তপথে রক্তসিক্ত বেগে
উত্তরির একদিন আত্মহারা শাবির উদ্দেশে
ছুপ হীন নিকতনে।”

কর্মযোশী। “প্রসন্ন বসনে মন হেসে
পরাবে মহিমালাসী ভক্তকর্ণে বঙ্গমালাধারি।
করশতপদধনে লাগ্ন্য হবে সর্বদুঃখ হারি
সর্ব অমরল।”

ইতিমধ্যে বুঝকে ভাঙতমাতার মালাদান।
বুঝক। (প্রণত হয়ে) “লুটাইয়া বস্ত্রিম চন্দ্রতলে
মৌত করি দিব পর অজস্রের রক্ত অশ্রুজলে।
মূঢ়ির সন্ধিত আশা সমুদ্রে কঠিনা উদ্ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদায় কবির নিবেদন,
মাগিব অনন্ত কমা।”

(উঠে পাড়িয়ে দর্শকদিগকে লক্ষ্য করে)

“হয়তো মূঢ়িবে দুঃখ নিশা
তুপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেম তৃষা।”
ব্যবসিক।

বরিশালের প্রাচীন স্মৃতি

মোঃ নিয়াকত হোসেন

ঐচ্ছিকমোহন সেন

সে আষা ৪২ বৎসর পূর্বের কথা। সবে মাত্র ১৯০৬ সনের এপ্রিল মাসে বরিশাল কনফারেন্সে লগ্ন ও করিয়া যেও। হইয়াছে আর সে বছরের ভাষ্য ভারতময় ছড়াটাই পড়িয়াছে ক্রমে স্মৃতির ঘরে পুণো বিলাল বরিশালে ভারতের নেতৃবর্গ এক এক করিয়া গম্বুশি দিতে আরম্ভ করিলেন সকলেই প্রথিতব্য। কিন্তু তৎপরে আসিলেন অজ্ঞাতকুলসিদ্ধ একটা অবাসানী মূলময়ান পাটনা হইতে না জানে বাংলা না জানে ইংরেজী। সকলেহই আশ্চর্যবল বরিশালের প্রাণ-বেত্র অধিনীকুমারের হৃদয়স্থিত পান। আর উর্দ্ধ ও জানেন অধিনীকুমার—আকারে ইচ্ছিতে কথা চর হইতেন। আমরা যেহি একটা নিরীহ লোক বসিয়া আছে নিকার নিশুর নীরব কোনও কথাই সন্তিত হারার যোগ নাই নিশিথ পুরুষ। কিন্তু তাহার চকু কোথিলগ্নম রক্তবর্ণ, উজ্জ নাসিকা, বিরল গোপন্যচি চরিত্রত্ব স্বয়ংসে অধি ঠিকরিয়া বাহির হইতেছে কিছুদিন থাকিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কে তার সংবাদ লয়?

আবার আসিলেন ১৯০৭ সালের প্রথমভাগে। সহরে মহলা একটা মোর গোল পড়িয়া গেল নিয়াকত হোসেন ১০৮ বারা সৌভাগ্যী কার্ধবিধি অঙ্গসারে চরণার চইয়াছেন। কি সে অপরাধ শোনা গেল তিনি উর্দ্ধ ভাষায় কি এক খানা কাগজ স্মৃতিত করিয়া আনিয়া ছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া সাহেবদারদের তদানীন্তন ভবিষ্য নবাবজাদা মহম্মদ হোসেন তাহাকে তাহার কোটে ডাকিয়া নেন এবং উহার একখানি কাগজ চাহিয়া লন। কলে বিস্ত্রোহ প্রচারকারী বলিয়া তাহার এই প্রেরণ।

মোকর্দমার তারিখ পড়িল। তাহাকে হাজতে রাখা হইল। তারিখের দিন বণ্য সময় কাছারীতে হাজির করা হইল। তখন খারা বলাইয়া ১২৪ক খারায় পরিবর্তিত হইল এবং ২০০০০ বিল হাজার টাকার ভাষিন অঙ্গব করা হইল। বৃষ্টি তখন গলনধারে পড়িতেছে।

এই বিশেষীলোক—অজ্ঞাত আর্থিক অবস্থা—যত্ন বাধ্যব আছে কি নাই, ইহার ভর ২১০০০ নহে ২০০০০ বিল হাজার টাকার দায়িত্ব গ্রহণ! কে করিবে? অধিনী বাবুকে সংবাদ দিলাম তিনি বলিলেন এখন উপায়। বরিশালের দৌরবৃত্ত নই হইতে যেও। বাহ না। তিনি প্রথমে বাগটার অনুভূতভর ভবিষ্য উৎপন্ননা সেন তার চৌকুরীর নিকট গেলেন তিনি শুক্লির (অধিনী বাবুর) আদেশ শিরোধার্য করিলেন। অপর ভাষিন হইলেন সীনবন্ধ সেন উকিল ও ভবিষ্য। এই ভাবে গভর্মেন্টকে লাভা বিধা তাহারের অভিজ্ঞি বার্য করিয়া যেও। হইল সকলে চমৎকৃত হইল।

বিচারে তাহার ৩ বৎসর শ্রম্য কারাদণ্ড হইল ইহার পূর্বেই আমাকে রাজস্রোহ অপরাধে কারাগারে বাইতে হইয়াছিল। কাজেই আমাকে করিতে হইল শরৎনা। মেখিলাম সেখানে তাহার অনুভূতভর নির্ভিকতা। আই, এম, এল সাহেব হুগারিভেট—কেলে প্রবেশ করা মাত্র ধনি উঠে "সরকার, সেলাম" মোলবী উঠিল না—সেলাম বিল না। রিজালা করিলাম মোলবী, সেলাম বিলেন না কেন? মোলবী সাহেব বলিলেন "ওতো হানুকে। মোকর্দমার! ব্যাবারি হোয়েনেসে মাইয়ে হেরগা-উংকো সেলাম খে না কাহে।"

অমায়ে নেমায় পড়ার ব্যবস্থা কেলে নাই—কিন্তু মোলবীকে নেমায় পড়িতে কেহ বাধ্য হের না। ক্রমে অস্ত্রান্ত স্বয়ংগণ তাহার সহিত অমায়ে হইতে লাগিল। কেলে স্বত্বগণক আগতি জানাইল। মোলবীকে বলিল নখরে গিয়া সময় রাত্রি নেমায় পড়ুন কিন্তু বাহিরে অমায়ে হইতে নিতে পারি না। মোলবী বলে কেহ আমার সঙ্গে নেমায় পড়িতে আসিলে আমি কেমনে নিবেদ করি। অগত্যা মোলবীকে ভাল ভাষিতে যেও। হইল। মোলবী সময় দিন বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার সময় তেপুটী খেলার বলিলেন আপনি কিছু ভাল ভাষুন। মোলবী বলিলেন "এক কথা বি ভাষে না নেই" অগত্যা ভাষাকে নির্জন কারাবাগে বাইতে হইল—লুকাইয়া থেগা করিলাম—বলিলাম এ কেমন হইল—মোলবী উত্তর

মিলেন "খাড়া ভয়া"—দিনভর আলোকে নাম লেগা ফুৎ কান করেণা নেই। অতঃপর তাহাকে সৌহাগী মেলে চালান দিল।



লোকমাত্র তিসক

তিন বৎসর পরে মৌলবী খালান হইলেন। কলিকাতা গেলেন। সেখানে তিনি বঙ্গসংখ্যক ভক্ত লইয়া কলের ষ্ট্রীট হইতে শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিয়া নগর পরিভ্রমণ করিতেন।



মহাশয় গান্ধী

আমিলুপ্রথম আর্থান হুজ, গান্ধীজী ও লোকমাত্র

ইংরেজের পক্ষে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেলেন কিন্তু মৌলবী সে শাস্ত্র নুহেন—তিনি চরমপন্থী—তিনি ঢাকায় গিয়া বক্তৃতা দিলেন—এই মুহূর্ত্তে কেহ ঘাইও না উঠা ছায়ায়। হইল মৌলবীর দুই বৎসর সশ্রম কাটাবও।



ডাঃ রক্তেন্দ্রপ্রসাদ

হুকি পাইয়া তিনি সমাধ সেবার লাগিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের কস্তাধার—মৌলানার কাছে গেলেন, মৌলবী ত্রিকাশাস্ত্র হাতে রাখিয়া রাখার শোভাযাত্রা বাহির হইলেন মিলেন তাহাকে ছদ্মস্ত টাকা। তত পরীক্ষা ছাত্রের ভিত্তি তিনি ভিক্ষা করিয়াছেন।

অসাম্প্রদায়িক মৌলবী জাতি নির্বিশেষে সকলের ভক্ত তাহার প্রাণের দরদ। অসম্প্রদায়িক হুগে বৃত্ত হিন্দু মুসলমান দেশসেবা করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন মৌলবী তাহাদের মধ্যে স্বেচ্ছাস্থ। এমন মানব বরদী, এমন দেশপ্রেমিক এমন স্বাভাবিকই অধিক দেখা যায় নাই। কিন্তু দেশ তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে—বাহারা একদিন তাহার সাহায্যে মাহুদ হইবার পথ পাইয়াছে তাহারাত আর

কতজ্ঞতা প্রকাশের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছে না। তিনিই হিন্দু মূলমন্ত্রের মধ্যে একতাবন্ধন দৃঢ় করিতে হাতে হাতে “রাবী” বাঁধিয়া দিয়াছেন। বাঁধিয়া থাকিলে হৃদয় Direct Action-এর স্ফিট তাহাকে জীবন বিসর্জন দিতে হইত। আমরা আপাতকরি তাহার স্মৃতিরকার একটা চেষ্টা হইবে কারণ এখনও সকলে তাহাকে ভুলিতে পারে নাই, কারণ সেবা দায় একটা

পত্রিকা অফিলে তাহার তৈলচিত্র রচিত আছে—তিনি নির্বাপিত হটে, টাকার কম ভরসা নাই তাহার এক অংশ দিয়া একটা বস্ত্র সজ্জন করিতে পারেন। মাজোমারী এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হইবে না কিন্তু পাটনার পৌরব হিলাবে রাজেন্দ্রপ্রসাদের লাহায়া গ্রহণ করা হইতে পারে।

আমরা উপলংহায়ে এই পুণ্যস্মৃতি অকৃত্রিম যেশ-দেবকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শ্রাবণী

শ্রীমৎসুতা কর বি. এ।

কমন কেশর বিছাইয়া ফুল নয়নে
কৃষ্ণ বাহার মূলের মত নাচে রে
তিন ঠাই হাঙ্গা আঘাতে ঘন গগনে
বিসূল হরয়ে প্রাণমন হার মাতে রে।
বেদমুহুরা শ্রাবণ রজনী মাতে
চিত্র বিরহীর তপ্ত নিশাস বেশা
বকুল গন্ধে মৃগর বিমদা মাতে
পাতুর চাঁদে ভাতিছে মলিন বেশা।
পথ-চাণ্ডা-দিগ্ধি মৃগমুগ্ধাধর
পাঠাইছে কোন মালবিকা অনিমিত্তা
মেঘ খঙনী বাতাইয়া তালে তালে
বারতা পাঠায় সে কোন পত্রলিখা।
কোথা সে চারণ কোথা সে বীণার ধনি
বরবার রূপ বাহাতে আক্কেহারা
হায় বেদমুহুর নাই মেঘপ্রিয় কবি
সীমার সে গান অসৌমে লুপ্ত সারা।
জীবনের অর পাহিছা গাহিয়া যে গো
এ কুল হইতে নবকূলে ছুটে চলে
প্রলয়ের রাতে পূরণ ধীরে ধীরে
জানি যেইজন কুলনের ঘোলে গেলে।
আমি তারি স্বপ্ন প্রভাতের দ্বার চাহি
চলে দুর্বার নৃতন ছন্দে গানে

হাইশে শ্রাবণ কিছুই যে তব নাহি
বাণিবে তাহারে কোন নব বন্ধনে।
কৃপাই করিছে তবে কি শাসন বারি
অথ সাধন কৃপাই কি বেয়া বনে।
মৃগ কখনে কোথা অধরার গীতি
মাধবী রাগিনী বলাকার মূল-তানে।
বার্ততা লিপি এনেছ কি শুধু পাণি
হাইশে শ্রাবণ শোনাও আশার বাণী
ধামাও ধামাও মহাকাল তব গতি
জীবিতল নহে, তোল নিরাশার জানি।
নব নামে নিতি এই বাটে আগা স্বাগত
শোন নি কি তার মহাযরণের অর্থ।
পসরা তাহার বাটে ঘটে নেয়া বেওয়া
উমরের কবি নাহি তার নাহি কথ।
খণ্ড জীবন শূন্য নাহি সহ
অনন্ত-পথ-পাথ যে চিরদিন
জীর্ণ সূত্র বেড়া তার তরে নহে
অবৃত্ত-বর্ধ-বৃত্ত তারি নীন।
ভায়ায় ভায়ায় এহে এহে কানাকানি
বিষে বিষে কিলিনী ওঠে মূরে
মুক্তি পথের প্রবেশ তোরণ তুমি
বন্দনা তব নিখিল চিত্ত স্বতে।

আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি

শ্রীমদ্রথ

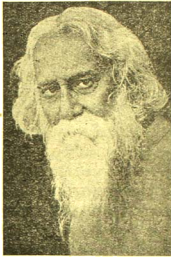
একদিন ছিল যখন কাব্য হতে হলে কোন একটা রচনার মধ্যে 'ধাক' প্রয়োজন ছিল নানারূপ আনন্দাত্মিক নির্দেশের বধ্যবধ প্রয়োগ—এবং সেদিন মোটামুটি কতকগুলি লক্ষণ দেখে বলে দেওয়া যেত এটি বধ্যবধ কাব্য কিনা এবং বধ্যবধ কাব্যকে দেখে বলা যেত কাব্যের মোটামুটি লক্ষণগুলি কি। কিন্তু সেদিন আজ আর নেই। আজকে বেশি আনন্দাত্মিক বিবিনিবেশ আশ্রয় 'ত' মানছিই না, তার উপরে আজকের দিনেও যে সব লক্ষণগুলিকে—যেমন ছন্দের পর্ব বা মাত্রা-সমকক্ষ ও মিলের সূক্ষতা ইত্যাদি—সাধারণভাবে স্বীকৃত তার ব্যতিক্রম করারও কখনো কখনো কবিতা ব্যাতি মিলে বাধে বৈকি। মোটকথা আজকের দিনে আমাদের বেশির কবিতা চায়, আরও বেশী স্বাধীনতা, এই জগ্রেই সেদিনকার নিচম আজ আর খাটুচ্ছে না এবং তাই আমরা রাম ও অযোধ্যার সঙ্গে তুলনা না দিয়েও বলতে পারি 'সেদিন আর নেই', কেন নেই লেখকা বিচার করতে হলে অনেককিছু বিবেচনা ও বিচার করে দেখা দরকার।

এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃই যে কথা আমাদের মনে আসে তা হচ্ছে গম্ভীর বা গম্ভীর ভাব-প্রকাশের স্বাধীনতা। সাধারণতঃ একটি কবিতার দুটি দিক আছে—একটি হচ্ছে এর ভাব এবং, অপরটি হচ্ছে এর প্রকাশভঙ্গী, শুধু ভাবটি ভাল হবে তার প্রকাশভঙ্গীটি কর্তব্য হলে তা কখনও যেমন কাজে কাজেই মনোমুগ্ধকর হতে পারে না তেমনি শুধু প্রকাশভঙ্গী বা বর্ণনাত্মকটি ভাল হলে এবং তার অন্তর্নিহিত ভাবটি নিভাত্তই সাধারণ হলে তাও লোকের মনোহারী হয় কদাচিত্। অধিকতর একথা বুঝি সত্যি—যে ২৫ পাউন্ডের মধ্যে কোনো বস্তু আঁকেনা তেমন বহু মর্শকের কাছ থেকে তার লোকের প্রাণাশা পেতে পারেন তেমনি অতি সাধারণ বিষয় বস্তু ও বর্ণনা-বা প্রকাশভঙ্গীর গুণে সময়ে সময়ে মনোহারী হয় বৈকি! কিন্তু মার্ঘ্য প্রসাধন করা অভিনেত্রীর গায়ের

রাটির মতই যেহী এবং অপহাস্যীয় মাত্র। এই জগ্রে সময়ে সময়ে এমন অনেক দিনেমার সঙ্গীত বা নৃতন কবিতাকে নিয়ে আমরা অনেক আলোচন করি সত্যি কিন্তু দুদিন বাতাই আরেকটি সেই রকমের জিনিষ পেতেই আগেরটিকে আমরা ভুলে যাই। কিন্তু সত্যিকারের যেটি বাটী জিনিষ—যেমন একটা উচ্চমানের classic সঙ্গীত বা রবীন্দ্র সঙ্গীত ও কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্য—এ আমাদের কাছে চিরনবীন।

মাহুকের কচি নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই জগতের সব কিছুই যথো গতিই হচ্ছে একমাত্র সত্যি—রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাকা'র অনেক কবিতাতে এই কথাটিই আমাদের বলতে চেয়েছিলেন, কবির লেখকা যে সত্যি তা তাঁর রচিত 'বলাকা'র কবিতা পড়ে আমরা যেমন উপলব্ধি করি তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মাহুকের কচি এই পরিবর্তনশীলতা দেখে বিস্মিত হয়ে যাই কবির কথার সত্যতা উপলব্ধি করে। এ জগতের নিয়মই হচ্ছে এই যে কোন কিছুই স্থির হয়ে রইবে না—চলার উপরেই জগত বিরাজমান। সব কিছুই চলছে এবং চলছে বলেই সব কিছু অহরহ পরিণতিতে হচ্ছে। মাহুকের কচি এই নিয়ম যেমন চলছে বলেই মাহুচ চায় দিনে দিনে নতন নতন রসের আধাশন করতে। তাই কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের কবিতারও প্রয়োজন হয় পাঠকদের কাছে 'বা আছে তার চাইতে ভিন্ন কিছু, অভিন্ন কিছু, বিভিন্ন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করতে।' এই বৈচিত্র্য আছে বলেই বাংলা কাব্যের আরর আজও আছে। এই বৈচিত্র্য আছে বলেই—অর্থাৎ কবে কবে নানান শব্দ আঘাতানী করে পুষ্ট হচ্ছে বলেই বাংলা ভাষা আশো সঙ্গীত ভাষা আর এই বৈচিত্র্য সংকৃত ভাষা হাড়িরে ফেলেছে তার ব্যাকরণের বিধি-নিষেধের বন্ধনে—তাই সংকৃত আর একটা dead language. নতন চিন্তা, নতন ভাব এবং নতন টেকনিক—নতন যুগের লোকেরা চায়, তাই বেশির দাবিতোয় প্রথম যুগে যুগে বললে দাঁড়, মাইকেল মধুসূদনের সময় যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছিল বিস্তারের আভাস এবং বা ছিল বিভিন্নতম ছন্দ আরকে তাতে কবিতা লিখে যেত

আগা:গোড়া ভাই রবীন্দ্রনাথের সকল কবিতাতে এমন একটা অস্পষ্টতা আছে যার ব্যাখ্যা করতে আমরা হ'



রবীন্দ্রনাথ

আমরা, রবীন্দ্রনাথ নিজেই সকল সময়ে একমত থাকতেন না। তিনি নিজেই তাঁর কবিতা সম্বন্ধে আলোচনায় একস্থলে বলেছেন "আমার কবিতা আমি এখন গিঁথিতেন

আমার মনে যে অর্থ আছে, তা পরে যার হারিয়ে ;—
তখন আমিও তোমাদের আর সম্বন্ধের মতটী নানা মতে
তাকে ব্যাখ্যা করি। লিখনার সময়ের বর্ধার অর্থটি যে
কি তা এখন খুঁজে পাই না তখন তোমাদের মত আমিও
আমার কবিতার সমালোচনার প্রবৃত্তি হওয়া ছাড়া আর
কিই বা করতে পারি ?"—

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই অস্পষ্টতার প্রধান কারণ
তার দার্শনিকতা,—যাকে আমরা যিনিও আধুনিক
কবিতা স্বীকার করতে চাইছেন। এই দার্শনিকতাকে
পরিহার করে আমরা গর্বিত কেউ আমরা চতে পেয়েছেন
কি না জানি না, কিন্তু আমাদের যিনিও বৈচিত্র্যের মাধ্যম
আধুনিক কবিতা কতটুকু এতে সকল হবেন তা বিচার
করবে আগামী কালের পাঠকরা। গল্প-কবিতার
টেকনিক সম্বন্ধেও অনেক কিছু বলবার আছে, রবীন্দ্রনাথের
গল্প-কবিতার চাইতে এখনকার গল্প-কবিতা বহুলাংশে
পূর্ণক, এ সম্বন্ধে বর্তমানে আলোচনা করা সম্ভব হল না।
পরে সময় এবং সুযোগ পেলে কংবার ইচ্ছা রটল, কিন্তু
একটি প্রায় আমি আধুনিক পাঠকদের সম্মুখে করে দাছি
—দার্শনিকতাকে বাদ দিয়ে বাস্তবের স্বাধাধরত্বের প্রকাশ
কাব্যের মধ্যে থাকলে তা কাব্যপদার্থ কি না? স্থগিত
আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

রাজপথ

প্রথমদিক গল্পোপাখ্যান

রাজপথে গড়ে অসীম কালের ছায়া,
অদে কতো আলো, কতো রহস্য যার।
রাজপথে গড়ে পথিক জনের ছাপ,
ওঠে রসাইয়া ভীনের উত্তাপ।
মিছা অভিমান কেঁদে না রে তীক্ষ্ণ মন,
পথে পথে তোর মিলিয়ে বহুজন।
অচেনা আসর বসেছে আকাশতলে—
অটল করিছে মিলি সুশীলবরলে ;
সেখানে মিশিয়া অন্তরে কথা ক'য়ে—

মাছের ডিড়ে সাধনা বাগানে ল'য়ে।
শোন শোন কহি সেরা রহস্য কথা,
এ ধরাতে স্থিতি খোঁচেনি যাতার ব্যথা।
স্বপ্নের শূণ্য সামনে পড়িয়া হাসে,
কাঁদনা উত্তার কাঁদে নব রূপ আসে।
অটল ধরাব বৃহৎ সৃষ্টিপন,
বহু প্রেমিকের তাই আমি প্রয়োজন।
আমার কথা কি তোমার মনে না লাগে ?
এই পথ দিয়ে চলি হাও অল্পদাগে।
চলে যাব দিন—খুঁজি ওড়ে নগরীতে,
এখনো বিচার্য্য পারিবে স্তমি আসিতে ?

জাগতিক

ঐশ্বরীর স্ত্রী রায় চৌধুরী

পৃথিবীর সর্বত্র আদর্শগত বৈশিষ্ট্যের দানাদানি আশ্রয়স্থান করিতেছে। কোথাও শিশুতীর মত নিবীৰ্ণ জাতিগুলিকে সন্মানে রাখিয়া ছুই বহুশক্তি পরস্পরকে আঘাত করিবার হযোগ খুঁজিতেছে। চীনের গৃহযুদ্ধ, কোরিয়ার উত্তর দক্ষিণ ছুই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতি এই পূর্বোক্ত পরোক্ষ আদর্শগত বিরোধের উদাহরণ।

বালিন:—কিছু বালিনে আছে যে লক্ষ্যের উদ্ভব হইয়াছে তথায় দুই শক্তি একেবারে পরস্পরের সূচামুখি পাড়াইয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের পরে লক্ষ্য জার্মানিকে সোভিয়েত, যুক্তরাষ্ট্র, ইংরেজ ও ক্যান্সী অঞ্চলে ভাগ করিয়া লগ্ন্য হয় এবং এই বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনের অস্ত্র এই চারটি জাতি নিজেদের পৃথক পৃথক সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বালিন লক্ষ্য জার্মানীর রাজধানী। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই লক্ষ্য তাহার এই মর্যাদা অক্ষুর রাখিয়া আসিয়াছে। যে কোন দেশের রাজধানী তাহার জাতীয় জীবনে বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন কষ্ট, লক্ষ্যতা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্র হিসাবে যেমনই রাজধানীর স্থান অতুলনীয়। এই বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বালিনকেও লক্ষ্য জার্মানীর মত চতুঃশক্তি-শাসিত চারটি পৃথক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। আশা ছিল পূর্ব শান্তি স্থাপিত হওয়ার পরে জার্মানীর সহিত স্বাধীন সন্ধি দাখিল হইলেই এই ব্যবস্থা উঠাইয়া গিয়া নব প্রতিষ্ঠিত জার্মান রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার হাতে শাসনকর্তা অর্পণ করা হইবে। কিন্তু এই পূর্ব শান্তি প্রতিষ্ঠাত হইলই না পরবর্ত্ত দিনের পর দিন এই চতুঃশক্তির ভিত্তর বিরোধ বাড়িয়াই চলিল। বহুবার বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। একপক্ষ অপরপক্ষকে এই ব্যর্থতার অস্ত্র মারী করিয়াছে এবং জার্মানী তথা লক্ষ্য ইউরোপের আর্থিক ও সামাজিক জীবন বিঘ্নের হইয়া উঠিয়াছে।

একদিকে রাশিয়া তাহার নিউক্লিয়ার ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের বেশগুলির উপর আগুন প্রত্যাব বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে জর্জীর পূর্বাঞ্চল কন্সটান্টিনোপল ও সমগ্র বাসিয়া প্রবর্তন করিয়াছে। এবং এই বেশগুলি লইয়া কনিস্তান্টিনোপল এক নতুন লক্ষ্য গঠন করিয়াছে। ত্রিশকিওর যেমনই ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলের বেশগুলি লইয়া একটি নতুন পাক্ষাত্য ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে এবং আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্সালিংগের প্রস্তাবিত এক আর্থিক পরিকল্পনা পড়িয়া উঠে তাহার উদ্দেশ্য ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলকে যুদ্ধের কলঙ্কিত দূর করিয়া নতুনভাবে গড়িয়া তোলা। এই ব্যবস্থার নাম মার্সালিং-প্ল্যান। সোভিয়েত রাশিয়া এই প্লানকে মার্কিন ধনতন্ত্রের ইউরোপে আশ্রয়স্থানের উপায়রূপে আক্রমণ করিতেছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, যে উদ্দেশ্য জার্মানিকে ভাগ করা হইয়াছিল সে ব্যবস্থা কার্যকরী হয় নাই। ইউ, এন, ওর আগন্তুক বাইরে চতুঃশক্তি নিজেদের মনোভাব এবং প্রয়োজনানুযায়ী স্ব স্ব কর্তব্য বাহিরা লইতেছে। ইয়ান্টো এবং পটুপটু চুক্তি কাণ্ড: বাতিল হইয়া গিয়াছে।

বালিন লক্ষ্য প্রচুরপক্ষে সোভিয়েত প্রভাবিত অঞ্চলের অস্থূলক। কাজেই ইহাকে রাশিয়া অতি স্বাভাবিকভাবে অপর ত্রিশকিওর প্রভাব বইতে দুল করিতে ইচ্ছুক। পূর্বেও একবার সে চেষ্টার ব্যর্থতা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা পরিত্যক্ত হয়।

কয়েক লগ্ন্য পূর্বে পশ্চিম জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে এক নতুন দ্বারা প্রচলিত করা হয় এবং বালিনের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতেও এই দ্বারা প্রচলিত করা হয়। সোভিয়েত সরকার এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পশ্চিমাঞ্চল হইতে বালিন প্রবেশের সব পথ বন্ধ করিয়া দেন। লগ্ন্য, লগ্ন্য কোন পথেই সরবরাহ বালিনে আসিয়া পৌছিতে পারিতেছে না। এই অংগের প্রত্যেক কাণ্ড ত্রিশকিওর প্রতিবন্ধ নতুন দ্বারা বালিনের সোভিয়েত প্রভাবিত অঞ্চলে প্রবেশ করিতে না দেওয়া এবং লগ্ন্য এবং লগ্ন্যের অস্ত্র প্রয়োজনীয় এবং বহুদিন ধরিয়া অবহেলিত অস্ত্রী সংস্থার সাধন।

ত্রিশক্তি এই অবরোধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পৃথক-পৃথকভাবে সোভিয়েত সরকারের নিকট নোট দিচ্ছিলেন। সোভিয়েত সরকার সেই নোটের জবাব দিচ্ছিলেন। এই জবাবের মূল কথা হইল পাশ্চাত্য শক্তির একত্রে ইউরোপ এবং কার্দিগীর অগত্যা বৃদ্ধ করিয়াছেন। অতএব সোভিয়েত অঞ্চলের অস্থবৃত্ত বালিনের প্রতি তাহাদের স্বেচ্ছাস্বত্ব কোন দাবী থাকিতে পারে না এবং বালিন সমস্ত সমগ্র কার্দিগী ও ইউরোপের শান্তি এবং সন্ধি সমস্ত নিরপেক্ষ নহে। কারণেই শুধু বালিন লইয়া আলোচনা করিয়া কোন ফল হইবে না। ত্রিশক্তির বক্তব্য হইল তাহারাও কার্দিগী এবং সমস্ত ইউরোপে শান্তি এবং সন্ধি সমস্ত সমাপনের জন্য উদ্বোধন এবং সচেষ্ট। শুধু বালিনের কোনোই এই জবাবদ্বারা এতদিন ঘটয়া উঠে নাই। পশ্চিম কার্দিগীতে প্রবর্তিত মুদ্রা বালিনে ব্যবহার তাহারা বন্ধ করিতে পারেন যদি গোটা বালিনে প্রবর্তিত মুদ্রা ব্যবহার উপর সোভিয়েটের মত অপর ত্রিশক্তিরও কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু সব আলোচনার পূর্বে এই অবরোধ-প্রথা উঠাইয়া লইতে হইবে এবং তাহারা বালিন কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না। এমন কি যদি বালিনে থাকিতে গিয়া সোভিয়েটের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার নানিতে হয় তাহা হইতেও তাহারা পলায়ন হইবেন না। অবস্থা যে অতি লজ্জজনক তাহা নিরানবিত তথ্যগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

টালিনগ্রাড বিজয়ী মার্সাল ককোসডস্কি বালিনে উপস্থিত হইয়াছেন। অন্য বাইতেছে ত্রিশক্তি বিভাজনের শেষ অর্থে তিনি বালিনের সৈন্যপতা গ্রহণ করিবেন :— আমেরিকা হইতে বনর আগিয়াছে যে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আঠার-হইতে ছাফিল বৎসর বয়স রক্ত-কুঁপনকে ধ্বংসের জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং অস্ত্রাশ্রয় বৎস পর্যায়গুলিকেও ক্রমাগত আহ্বান করা হইবে :—লণ্ডন সরেই পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নের সামরিক কমিটির অধিবেশন চলিতেছে। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হইল আক্রান্ত হইলে পশ্চিমবঙ্গের দেশগুলি আত্মরক্ষা

ব্যবস্থার উপযোগী কর্মণশা নির্ধারণ করা। যদিও আমেরিকা ও কানাডা এট ইউনিয়নের সভ্য নহে তথাপি এই দুই দেশের প্রতিনিধি পর্যবেক্ষক (i) হিসাবে যোগ দিতেছেন। মার্কিন হইতে বহু আধুনিকতম যুগ্মের কোর্সেই ইউরোপে আমদানি করা হইয়াছে, অপর পক্ষে সোভিয়েত অঞ্চলেও সম-পরিমাণেরও অধিক যুগ্ম-পাঞ্জার সোভিয়েত বোম্বার বিমানও সমুদ্র করা হইতেছে।

এদিকে পশ্চিম বালিনের অধিবাসীগণ বাত্ম, কল্যাণ বিদ্যাম্পক্তি এবং অন্যান্য অস্ত্র প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির অভাবে চরম কষ্ট ভোগ করিতেছে। তাহাদের এই অভাব দূর করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ হইতে আকাশপথে সরবরাহ পাঠান হইতেছে। সোভিয়েত এই আকাশপথে বাধা জন্মাইবার চেষ্টা করিতে পারে। তাহারা অধিবেশন করিতেছে যে রিটেই বিমানগুলি বহুবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অব্যাহত করিয়াছে। কতদিন আর এট অব্যবস্থা লক্ষ করা যাইবে ?

সোভিয়েত শক্তি হইতে প্রত্যাহ করা হইয়াছে যে তাহারা অভাবগ্রস্ত বালিনকে প্রয়োজনীয় অব্যাসি সরবরাহ করিবার ভার লইবে। এর মধ্যেই দুই মাসের উপযোগী আহাৰ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অব্যাসি সোভিয়েত প্রত্যাগী দেশগুলি হইতে বালিনের পক্ষে বণ্টন হইয়াছে।

এই প্রত্যাহ এবং ব্যবস্থা পাশ্চাত্য শক্তিগুলিকে উভয় সচেষ্ট ফেলিয়াছে। অভাবগ্রস্ত বালিনবাসীর মুখের হাসি কাড়িয়া লওয়ার মত ব্যবস্থা মানবতা-বিরোধী এবং বিশ্ব-বাসীর চক্ষু অতীব নিম্নের। কিন্তু অপর পক্ষে সোভিয়েতকে এই অব্যাসি এবং অধিকার কার্যের করিতে দিলে বালিনের উপর বৎস প্রকৃত প্রস্তাবে ছাড়িয়া দিতে হয়। তাই নূতন আলোচনার সৌভাগ্য চলিতেছে।

ইটালী—পূর্বে ১৫ই জুলাই দিনের টেলিগ্রাফিক একটি ছাত্র পর পর চারিবার শিশুর দ্বারা গুলি করে। তিনি সংঘাতিকভাবে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হন। সেখানে তাহার অবস্থা প্রথমে অত্যন্ত লজ্জজনক হয়। কিন্তু হুচিকিৎসা ও সেবার ফলে তিনি বিপদমুক্ত লক্ষ্য-

জনকভাবে আত্মগোপন পথে আগ্রসর হইতেছেন। সৎ-
শেষ সংসারে প্রকাশ তিনি নিঃসই প্রবু হইয়া চাম্পাভাগ
হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

আততায়ী অনুমান ৩০ বৎসর বয়স একটি ছাত্র।
সে বলিয়াছে, সে সম্পূর্ণ নিজের দারিদ্রে এই কাজ
করিয়াছে।

সিনর টোরিগেটে ইটালীয় অতি শক্তিশালী কমিউনিষ্ট
পার্টির নেতা। তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর। তাঁহার প্রচেষ্টা
ও প্রতিপত্তি বহু-বহু-প্রচেষ্টা। পৃথিবীর সবই তাঁহার
প্রতি এই অথচ আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা
হইয়াছে। মার্সাল ট্যালিন শোভিষেট কমিউনিষ্ট পার্টির
শক্ত হইতে একটি তার করিয়া জানাইয়াছেন, যে সমগ্র
হানিয়াবানী একজন সমগ্র পবিত্রাত্মক উদ্ভাসের এই বন্দনা
কার্যে তাহার বিরুদ্ধে প্রাণন করিতেছে এবং তাহার
এই মনে করিয়া অত্যন্ত দুঃখ পোষ করিতেছেন যে
টোরিগেটের বন্ধুসমূহ তাঁহাকে এই গুপ্ত আক্রমণের হাত
হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। শান্তি নগর মনে
করিতেছেন এই আক্রমণের পিছনে ইটালীতে জনবর্জমান
ফ্যাসী শক্তির অগ্রগতি হুচনা করিতেছে, এমনও মনে
করা হইতেছে যে ফাসিন ধনতন্ত্রব্যয়ের গোপন শক্তিতে
এবং পূর্ণগোপনতাও এর পিছনে আছে।

সমগ্র ইটালীতে দারুণ বিক্ষোভের স্রষ্টা হইয়াছিল।
প্রায় ১০ লক্ষ প্রমিষের বর্ষবট ইটালীর সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টা
এক দিনের ভিত্তি অচল করিয়া দেয়। বহুসংখ্য অফিসে
পুলিশ এবং প্রমিষের চিত্তের বিরোধ চরম আকার ধারণ
করিয়াছিল। কোন কোন স্থানে দলবদ্ধ জনতা কিছু
কিছু জনসম্মত কার্যকলাপের পর পার্বত্য অফিসে গা
লাক দিয়া তাহারের প্রতিরোধ চালাইতে থাকে।

এই সাধারণ বর্ষবট রাষ্ট্রনৈতিক ধন-নিবিশেষে
দলত জনসাধারণই বোপ দিয়াছিল। ইটালীর প্রধান
বস্ত্রীও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি
জানান যে রাষ্ট্রশক্তিকে পশু করিবার দরবরনের চেষ্টা
বার্ষ করিতে বন্ধপরিবর। যে প্রতিক দল এই সাধারণ
বর্ষবটের প্রধান উত্তোক্তা তাহার সম্পাদক সিনর

ভিত্তিও সাধারণ বর্ষবট বন্ধ করিবার সমস্ত দাবি
গ্রহণ করেন। যদিও বহু নিরুহ এবং স্থানীয় ইউনিয়ন
এই বর্ষবট চালাইয়া বাইবার ভ্রম চাপ দিতেছিলেন।
কিন্তু তিনি আশা করেন বর্ষবটকারীসেব বিরুদ্ধে কোনরূপ
শান্তিহীনতা বাধ্য হইবে না। তিনি আরও আশা
করেন যে আততায়ী সর্বকারী নীতির ফলে যে হত্যা
ও বিক্ষোভের স্রষ্টা হইতেছে, সেই নীতি সংশোধন করা
হইবে।

এশিয়া ছাত্র—মালয়—মাগের অনুপ্রাণন অব্যাহত
পতিতে সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার উত্থাপ। ভাষা-
কারী ইংরেজশক্তি ইহাকে কিছুতেই মদন করিতে
পারিতেছে না। দল, ভল, আকাশ যোগানে বহু শক্তি
সে প্রবেশ করিতে সক্ষম, সে সব একত্র করিয়াও
উদ্বোধিত মানবদায়ীর প্রতিরোধকে প্রশমিত করিতে
পারিতেছে না। অনমনীয় দৃঢ়তা ও সাহস, অসম
উৎসাহ ও উন্নয় কোন পাণবিক শক্তির তড়ানেই
লক্ষ্যভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। অশ্রুচর ও
আত্মপ্রতিষ্ঠা কৃৎসা রটনাই ইংরেজদের দাবীর
অমৌক্তিকতা, অসামর্থ্য লক্ষ্যে বিব্রাণীর মনে স্রষ্টা
ধারণা স্রষ্টা করিতে সক্ষম হইবে না। মানবের এই
আন্দোলন এশিয়াবাসী জনগণের বহিঃশক্তিকে এই
বহাধেন হইতে বিভাঙিত করিবার দাব্যবাপী প্রকাশ
এবং এ হিসাবে প্রত্যেক লক্ষ্যেচন এশিয়াবাসীর লক্ষ্যবৃত্তি
সে আশ্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ইন্ডোনেশিয়া—ইন্ডোনেশিয়াতেও এই এশিয়া ছাত্র
আন্দোলনের এক নতুন পর্যায়ের সূচনা হইয়াছে। মালয়
পর মাল পরিত্যক্ত ওলন্দাজ সরকার সর্বত্রকার কুটমাল
স্রষ্টা করিয়া এখানে স্বাধীন শান্তি স্থাপনের চেষ্টা বার্ষ
করিতেছে। তাই কোন প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা
আর তার পথে সত্ত্ব নব বলিয়া ইন্ডোনেশিয় সরকার
এইতপ আলোচনা করিতে অস্বীকার করিয়াছে।
এতৎসত্ত্বেও তাহার স্রষ্টাভিত্তির দলওলি দানিয়া
চলিতে ইউ. এন. ও, কমিউনিস্টের সহিত সহযোগিতা
করিতে কৃতশঙ্কর। তাই এই সমস্ত আবার নতুন করিয়া

নিরাপত্তা পরিধানে আলোচিত হইবে। আলোচনার ফল মধ্যস্থ আমরা আশাবিত্ত হইতে পারিতেছি না কারণ, তৃতীয় মহাসম্মেলনের ঘনোচ্ছাসে কংগ্রেসদ্বারা নিরাপত্তা পরিধানেও ব্যাপ্ত হইয়া পরিচালিত।

পত্নী-স্বতন্ত্রতা—ভারতে ইংরেজ শাসনের অবদান হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কতকংশ—তাঁহা বহুই ক্ষুদ্র হউক না কেন আরও দুইটি বিবেচ্য জাতি আদিপত্য করিতেছে। এই জাতি দুইটি করাণী এবং পত্নী-স্বতন্ত্র। করাণী সরকার ভারত সরকারের সহিত চুক্তি সহকারে আলাপ আলোচনার ভিত্তির দ্বারা তাহাদের ভারতীয় অধিকার বৈধতাধে অবদান ঘটাঁইবার ব্যবস্থার অনেক-কিছু অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু পত্নী-স্বতন্ত্র সরকার এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতেই নারায়। পরন্তু একদিকে যেমন তাহারা তাহাদের অধিকৃত অংশের কৃষ্ণপত্নী লক্ষ্যে রাখেন করিতেছেন অপরদিকে তেমনি জাতি কঠোরভাবে রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে চূড়ান্তভাবে লক্ষ্য করিতে প্রয়াণী। রাজনৈতিক কর্মীদিগকে বন্ধী করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়া ভাষার চরম নির্ধারন ও নিপীড়ন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষতা-নীতি লঙ্ঘন করিয়া গোষ্ঠাবলীর ভিত্তির দ্বারা ভাগ্যাহবী আরও সৈন্তগণকে এবং বে-আইনি অস্ত্রের হায্যবাহী রাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ করিয়া দিতেছে। তাহারা এই কার্যের ফলে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান অটলতার দৃষ্টি হইতেছে। বাহির হইতে এইরূপ অব্যাহিত ও বিধিবিধিভূক্ত সাহায্য না পাইলে অথবা অধিবাসিগণের ভাষা অধিকার ও স্বাধীনতা অধীকার করিয়া হায্যবাহী আশ্রয় পথ এতপ অর্থোক্তিক, অনমনীয় মনোভাব বজায় রাখিতে পারিত না। ভারত সরকারের সম্মুখে একটা দীর্ঘা আছে। পত্নী-স্বতন্ত্রের ভারত ছাড়িতেই হইবে। সদস্যানে সেই

অবস্থানবী নিয়মিতক মানিয়া না লইলে যে অটলতার দৃষ্টি হইবে তাহার নৈতিক সাধিত পত্নী-স্বতন্ত্রই।

নিরস্ত্রী-করণ—অগৎ জড়িয়া বহন অসম্মেলনের আগ্রন ছড়াইয়া পড়িতেছে, তখন জাতিপুত্র পরিধানে নিরস্ত্রী-করণের প্রস্তাব লইয়া আলোচনা হস্তাকব বসিরাট মনে হয়। তাই যোগের বিশুল ভোটাধিকার অস্ত্রত; সামরিক-ভাবে এই আলোচনা হৃদিত রাখা হইল। হৃদিত রাখার প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে পথ্য না বিভিন্ন জাতির ভিত্তির পারস্পরিক বিশ্বাস করিয়া না আস সে পথ্য একপ আলোচনা ও সাধারণ নিরস্ত্রী-করণের ক্ষত কোন কর্মব্যার স্থির করা নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়। মূল প্রস্তাবের সংশোধক হিসাবে বলা হইয়াছে (১) আনবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রী-করণ (২) অর্থোনি এবং জাপানের সহিত শান্তি স্থাপন (৩) আনবিক শক্তির নিরস্ত্রী করণের সর্ভাবলী অমাত্র না হইতে পারে সে সম্বন্ধে যোগাযুক্ত পথ্যবক্ষণ ও নিরাপত্তা-লক্ষ্য ব্যবস্থা কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা—যে পথ্য না এ সম্বন্ধে বলাবল্য করা হইতেছে ততদিন পথ্য নিরস্ত্রীকরণের আলোচনা নিরর্থক।

সোভিয়েট সরকারের মতে বিশ্বাস করিয়া আগার একমাত্র উপায় হইল পূর্ব হইতেই অস্ত্রপন নিয়ন্ত্রণ এবং জ্বাল প্রথম প্রয়োজন। সোভিয়েটের বাস্তব করা পাল্টা প্রস্তাব ছিল—(১) আনবিক এবং সাধারণ লক্ষ্যসকারী অস্ত্রসম্মেলন উৎপাদন এবং বাহ্যার একেবারে বে-আইনি যোগ্য করা এবং (২) সক্রিত আনবিক অস্ত্রপন নিঃশেষে লক্ষ্য করিয়া ফেলা।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে নিরস্ত্রী-করণ সমস্ত সমস্যানের চেয়ে সম্পূর্ণভাবে আপাতত; বন্ধ রাখিল। আনবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের আলোচনাও এইভাবে ব্যর্থতার পথ্যবিত্ত হইয়াছে।



উষান্তরের পূর্বসন্তি—

ভারতীয় মুক্তচাক্ষুর পক্ষে আর সব চেয়ে বড় আত্মসম্মতি সমস্তা হল পাকিস্থান হতে আগত উষান্তরের পূর্বসন্তির ব্যবস্থা করা। ঐতিহাসিক হিসাব না পেলেও মোটামুটি হিসাবে বলা চলে যে অল্পত ৮-৯ লক্ষ লোক পাকিস্থানের বিভিন্ন অংশ থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রে এসেছে। স্বাধীনতা লাভের পরই এত বড় বিরাট সমস্যাতোম নূতন রাষ্ট্রকে বহন করতে হয়েছে কিনা লক্ষ্যের। ভারতের পশ্চিম অংশে যা হয়েছে, তার সঙ্গে পূর্বাংশের ঘটনার কোন তুলনা চলে না। তবু এমিরেও সমস্তা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এর মূল প্রাধান্ত: দারী পশ্চিম বাংলার মহীমওলী। প্রথমত: পশ্চিম বাংলার মহী-মওলী আত্মপ্রার্থী উষান্তরের সমস্যাই স্বীকার করতেন। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারও এর সুযোগ নিয়ে বহুদিন পর্যন্ত এই সমস্তা বাধিষ অস্বীকার করেছেন। তারপর অবশ্য মহীমওলী স্বীকার করলেন যে পশ্চিম বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক পূর্ব বাংলা থেকে আত্মপ্রের মূল এসেছে এবং তাদের ব্যবস্থা করা সরকার।

সম্প্রতি দিল্লীতে উষান্তরের পূর্বসন্তি নিয়ে এক আলোচনা হয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব সন্থে সরকারের অস্বীকারিতার অভাব নেই; তাই প্রাথমিক প্রধান মহীরা, ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্থান হ'তে প্রায় বাট লক্ষ বা কিছু বেশী লোক ভারতে এসেছে। এদের প্রায় অর্ধেক আত্মও কোন নূতন জীবন দ্বারা মুক্ত করতে পারেনি। এর মধ্যে দাড়ে দাড়ে লক্ষ লোক এখনও তাঁবুতে বাস করছে। দিল্লী ও পূর্ব পাঞ্জাবের অত্যাশ্রয় দৈতে ও অত্যাশ্রয় গরমে তাঁবুতে বাস যে কি কষ্টসাধ্য, তা বাংলার লোকদের

পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন; এখন আবার আসছে বর্ষ। যদিও বাংলার মতো বর্ষা এখানে তেমন প্রবল নয়, তবুও আত্মপ্রার্থীদের মূল তাঁবু পাড়া হয়েছে প্রায়ই অপেক্ষাকৃত নীচু পতিত ভবিত্তে—যেখানে কুষ্টির দিনে মল ঝাড়ার। এই লোকদের ভবন-পোষণ ব্যবস্থা ভারত সরকারকে দৈনিক দাড়ে এগার লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়। আর যখন সবমিলকেই প্রয়োজন হয়েছে আত্মির প্রম-পত্নিকে যথালো কালে দাসিরে উৎপারন বাড়ানো, তখন এই ভাবে লক্ষ লক্ষ লোক বহু আলসে দিন কাটাচ্ছে:— এটা যে স্বাভাবিক সম্পদের বিক থেকে কত বড় ক্ষতিকর, তা সবজেরই বোকা যায়। তা ছাড়া যে লোকগুলি এই ভাবে মাসের পর মাস আলসে দিন বাপন করছে, তাদের অতীত স্মৃতি অতি ভিত্তি এবং দায়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাদের মানসিক ও নৈতিক অবনতি যা হচ্ছে, তাতেও আত্মির যে ক্ষতি হচ্ছে, তার কোনই হিসাব নেওয়া যায় না। অবিলম্বে এদের পূর্বসন্তির ব্যবস্থা করে এই লক্ষ লক্ষ লোককে স্বাভাবিক নাগরিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা বিশেষ সরকার।

পূর্ব বাংলার উষান্ত—

এদের সংখ্যা কত, তার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। এখানকার সম্মেলনে পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায় বলেছেন পশ্চিম বাংলার এদের সংখ্যা এগার লক্ষ হবে। কিন্তু তার এই উক্তিই বাখ্যার্য সন্থে সন্থেহের বন্থেই কারণ আছে। কারণ কলিকাতাতেই মধ্যাহ্নে ১৪১৪ হাজার করে কয়েকমাস পর্যন্ত পূর্ব বাংলা থেকে লোক এসেছে। পশ্চিম বাংলা ছাড়াও আসাম, বিহার, ত্রিপুরা দাখ ও কুচবিহার দাখোও বহুলোক পূর্ব বাংলা হ'তে এসেছে। এর চেয়ে দূর দূর অঞ্চলেও কিছু

লোক এসেছে। এখনও পূর্ব বাংলা হ'তে লোক আসছে। ভারত সরকারের এক একটি বেসিসাবী হুম্ব বের হব—আর পূর্ব বাংলা থেকে লোক সরতে শুরু করে। সম্ভ্রতি পশ্চিম পাকিস্থানে ও ভারতের মধ্যে বাতায়াতের উপর কে ছাড়পত্র প্রচলন করা হ'ল, এর অনিব্যর্থ প্রতিক্রিয়া হিসাবে পাকিস্থান সরকার পূর্ব ও পশ্চিম বংকর মধ্যে বাতায়াতের অস্ত ছাড়পত্রের দাবী করবে এবং তার আবার অপরিহার্য ফল হ'বে পূর্ব বাংলা হ'তে হিন্দুদের অপসারণ। কাজেই এ কথা বরেন নেওরা দায় যে পূর্ব বাংলা থেকে আসতে ধীরে বহ লক্ষ লোক ভাংতে আসবে।

এই উদ্বাস্থের অন্ত কি ব্যবস্থা হচ্ছে ও হবে? আমরা হতটা জানি—এখন পর্যন্ত এদের অন্ত কোন ব্যবস্থাই হয়নি। পশ্চিম বংক ময়ী-মণ্ডলীর মধ্যে এখন এতটা প্রবল উপদ্রব আছে—বাসেন্না-রাজনৈতিক মত হ'ল পূর্ব বাংলার লোকদের পশ্চিম বাংলার কোনমতেই চুকেতে বেগা উচিত নয়। সাহায্য ও পুনর্বসতি মন্ত্রের ময়ী-কতকটা এই উপদ্রবের অন্তর্গত। কাজেই পশ্চিম বাংলার ময়ী-মণ্ডলী যে ডালি-বালি করে সময় ক্ষেপ করবে এবং উদ্বাস্থের প্রকৃত মবলের অন্ত চেষ্টা করবে না—এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

ভারত সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি মন্ত্রের ময়ী-শ্রীমোহনলাল স্যাক্সেনা এই সম্মেলনে বলেছেন—পূর্ব বাংলার আশ্রয়প্রার্থীরা পশ্চিম পাকিস্থানের আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে একই পর্যায়ে গণ্য হবে এবং একই ব্যবস্থা তাদের অন্ত ও করা হবে। এতে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্থের কিছুটা আশ্বস্ত হবার কারণ আছে। কিন্তু এই নীতি বহনিন পূর্বেই বীকৃত হয়েছে। একে কাজে পরিণত করার দায়িত্ব পড়েছে প্রধানতঃ পশ্চিম বাংলা সরকারের উপর। তারা এই বিষয়ে এ পর্যন্ত কিছুই করেননি। শ্রীকৃষ্ণ লাক্ষেনা বলেছেন—পূর্ব বাংলা হ'তে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের সম্বন্ধে এখনও সঠিক সব সংবাদ না পাওয়ায় আমি তাদের সম্বন্ধে কোন কার্যকরী প্রস্তাব (concrete suggestion) করতে পারছি না। তিনি আরও

বলেছেন যে পশ্চিম বাংলা সরকার এখন পর্যন্ত আশ্রয়-প্রার্থীদের শ্রেণী বিভাগ, সংখ্যা, পূর্ব বাংলা হ'তে কি পরিমাণে ও কোন লোক আসছে, কি ভাবে এদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা যায়—এর কোন তথ্যই দেয় নি।

তারের এই প্রতিক্রিয়ার ফলে, কেবল যে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর অস্থিবিধা হচ্ছে, তা নয়, পশ্চিমবাংলারও মধ্যেই ক্ষতি হচ্ছে। সরকারের টাকা কিছু নষ্ট হচ্ছে—বন্দি ও তা ভারতসরকারের দেওয়া। এতগুলি লোক কিছু উৎপাদন না করে পশ্চিমবাংলার শান্ত থাকে। এরা প্রায় কেউ পূর্ব বাংলার কিরে রাখে না;—পশ্চিম বাংলায়ই থাকছে ও থাকবে। এদের স্বাধীনতায়, নৈতিক চরিত্রের অবনতি, অরব্যবস্থার বিস্তার অভাব প্রভৃতি দেয় পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায়ই শিরশীড়ার কারণ হবে। তা ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের মধ্যে যে বিশেষ-মুখি জাগছে, তার ফলও ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলার নক্ষে শুভ হবে না।

শ্রীমোহনলাল বাংলাদেশে এসে সব নিয়ে দেখে গেছেন। আসা করি এখন এই সমস্তার ওকত উপলক্ষ করে পশ্চিমবাংলার ময়ীমণ্ডলী তারের ব্যক্তিগত রাগ-বিরাগ বর্জন করবেন এবং এই লক্ষ লক্ষ লোকের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করবেন।

আসাম, ত্রিপুরা ও কুচবিহার—

চনা বাচ্ছে—আসাম সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করেছিল যে পূর্ববাংলা হতে কোন আশ্রয়প্রার্থী যাতে আসায়ে প্রবেশ করতে না পারে, তেমন আইন বা আদেশ বেন কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে জারি করে। আসাম সরকারের নাকি মুক্তি ছিল—পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্থরা গাড়ীতির আশ্রয় ও নির্দেশ অগ্রাহ্য করে—নিজেদের দান-ভিতা ত্যাগ করছে; অতএব এই সব আশ্রয়প্রার্থী পতিত লোকের গাড়ীতির আশ্রয়ে আর করে ফিরিয়ে আনা সরকার। একটা সাহিত্যিক সরকার যে কতখানি তগাধারী আশ্রয় নিতে পারে এটা তার প্রকৃত প্রমাণ। শেষ পর্যন্ত শ্রীগোপীনাথ বরশৌলি নিজে তথ্যের ক'রে

কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এক আসদেশ আদায় করে নিয়েছেন হার বলে তাঁর সরকার ইচ্ছা করলে পূর্ববঙ্গ হতে আগমনোন্মুখ আশ্রয়প্রার্থীদের হস্তাক্ষর করতে পারবেন। এই আসদেশের মর্ম নাকি এই যে বেশী সংখ্যক (in large number) আশ্রয়প্রার্থী এলে আসাম সরকার তাদের গ্রহণে বাধ্য দিতে পারবে।

যারা বাড়ি ঘর ছেড়ে আসবে, তারা যদি পাণ্ডুঘাটে বা এমনি কোন রেল বা ষ্ট্রিমারের সংযোগস্থলে পুলিশের লাঠিয়ারা অভিযুক্ত হয়, তবে কি তা ভারত সরকারের জ্ঞানম ও হস্তক্ষেপ পক্ষে সহায়ক হবে? আসাম সরকারের মনোভাব স্পষ্ট—যতই তারা পান্ডুগিরি দোহাই দিক। এই অবস্থায় আসাম সরকারকে যে অধিকার দেওয়া হল, তার কল্যাণ ভারত সরকার ভেবে দেখেছেন কি? অথবা শেষ পর্যন্ত কি ভারত সরকার এই মনোভাব বজায় রাখতে পারবেন? এমন অবস্থায় হাতে পায়ে বন্দন পড়ে পড়ে নয়, হাজারে হাজারে লোক পূর্ববঙ্গ হতে বিভিন্ন পথে ভারতে প্রবেশ করতে থাকবে। আমরা এখনও ভারত সরকারকে অস্বপ্ন দেখি কি তারা যেন আসাম সরকারকে যে অধিকার দিয়েছে তা প্রত্যাহার করে।

দ্বিতীয় কথা—পূর্ববাংলার উদ্বাস্তদের ক্ষত ভারত সরকার এক নীতি গ্রহণ করেছেন এবং তা পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তদের ক্ষত যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তা হতে অভিন্ন। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তরা পূর্ব পাঞ্জাবে, দিল্লীতে, সংযুক্ত প্রদেশে, যম্মা প্রদেশে, যম্মা ভারতের ও পূর্ব পাঞ্জাবের রাজ্যসমূহে, বিহারে ও অন্ধ্রপ্রদেশে আশ্রয়লাভ করেছে এবং এই সব অঞ্চলে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও হয়েছে। সেই হিসাবে, পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের ক্ষত আসাম, বিহারের কতক অংশ, ত্রিপুরা, কুচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে পুনর্বাসিত ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অতুত এই নীতি ও এর ব্যয় তার কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের; কিন্তু এই সব আর্থনিক শাসক-বণী হাতে-কলমে এই নীতি কার্যে পরিণত করবেন।

তদুহি আশায সরকার আসামে আগত পূর্ববাংলার আশ্রয়প্রার্থীদের ক্ষত আশ্রয় পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই করেন নি—ভারত সরকারের নির্দেশ সত্ত্বেও; এবং তারা কাঁপতে কোন ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করেছে। এ সম্বন্ধে কি ভারত সরকারের কিছুই করবার নেই? কুচবিহার রাজ্যও এ বিষয়ে কিছুই করেছে না। অতুত সেখানে অন্তত ৩০০০ হাজার আশ্রয়প্রার্থী পূর্ববাংলা হতে গিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে বোধ হয় লক্ষাধিক আশ্রয়প্রার্থী গিয়েছে। ত্রিপুরা সরকার তাদের ক্ষত কি করেছে, জানি না। আমরা আশা করি ভারত সরকার এই সব দিকে দৃষ্টি দিবেন।

বস্ত্র সমস্যা—

নয়া দিল্লীতে প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীদের সমাবেশের সুযোগ নিয়ে অনেক বিষয়ের আলোচনায় ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বস্ত্রসমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়। যে আশায় বস্ত্রের উপর হতে নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হয়েছিল, তা পূর্ণ হয় নি। কাপড়গুলোর মালিক ইণ্ডাস্ট্রিয়গণ ও বস্ত্র ব্যবসায়িগণের চীন বড়বস্ত্রের দলে সবই বাঁধ হয়েচে এবং জনসাধারণের পক্ষে অকথা লাগনার সৃষ্টি হয়েছে। এই আলোচনার সবাই লক্ষ্যের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে তাঁরা হার যেনেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল অত্যন্ত রাগতভাবে অনেক কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, যে সব অসামুহিক মালিক ও ব্যবসায়িগণ এই বিপদের সময় জনসাধারণের অশেষ লাগনা উপাধন করে প্রায় একশত কোটি টাকা উপার্জন করেছে—তারা মাহুদ নয়—তারা দানব—monster। তিনি আরও বলেছেন—এরা জনসাধারণকে লাগনার যথোপযোজ্যে নিয়েছে এবং সরকারকে আরও কষ্ট দিয়েছে। তিনি নাকি এখন কণ্ঠ বসেছেন যে বা তারা এই সব পণ্ডিত কাঁধ করেছে, তা তাঁর অজ্ঞাত নয় এবং সরকারকে যে টাকা তাঁরা কষ্ট দিয়েছে তা কিরিয়ে নেওয়া যায় কিনা, তা সরকার দেখে নেবে।

প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীরা সবাই অনেক কড়া কড়া ও তিরস্কারপূর্ণ কথা বলেছেন। পশ্চিম বাংলার প্রধান

মন্ত্রী ভাঃ রাই বলেছেন মার্চ ও এপ্রিল মাসে গোবাই ও আমোদবাস থেকে প্রচুর বস্ত্র পশ্চিম বাংলায় গিয়েছে। কিন্তু তিনি নাকি উল্লেখ করে জেনেছেন—ঐ সব কাপড়ের প্রেরক ও গ্রাহকের নাম সমস্তই কাল্পনিক। এ কথাই অর্থ কি? গোবাই ও আমোদবাস হতে বাংলার যে সব কাপড় এসেছে—তা ব্যতীত পারিষেছে, যাদের উক্ত পারিষেছে—এই সব নামই জাল ও ঝাঁকি। অথচ কাপড় আমদানী করতে হ'লে সরকারের ছাড়পত্র বা পারমিট সরকার হয়। জাল ও ভুলো নামে এই লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন চলল—এর মধ্যে সরকার কিছুই জানতে পারল না!

স্বাক—বা হবার, তাঁত হ'বে পেছে। হিসাব থেকে জানা পেছে কাপড়ের অভাব ভেদন নেই। এই বছর যে পরিমাণ কাপড় বিভিন্ন প্রদেশে হাবার কথা ছিল, তার চেয়ে সতকরা ১০ ভাগ বেশি গিয়েছে বা মোটের উপর ৬০ হাজার পাঁচ কাপড় বেশি গিয়েছে। কারণই কাপড়ের অভাব নেই। অভাব হচ্ছে মিল মালিক ও ব্যবসায়ীদের সততার। যেখানে খেজা প্রণোদিত সততা নেই, সেখানে আইনের সাহায্যে সততা আনতে হয়। যে রাষ্ট্র বা শাসকশক্তি তা পারে না, তাদের শাসনভার হাতে নিয়ে বসে থাকা লক্ষ্য কর। ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর লোক-বলে এই সব দুর্ভৃত্তকারীরা কেন স্বাক না পায়—রাষ্ট্র-কর্তাদের তা দেখা সরকার।

এর পর খবর পাওয়া গিয়েছে ভারত সরকার সমস্ত কাপড় কলের উপর পুলিশ মোতায়েন করে কলের সব কাপড় সরকারের অধীনে আটক করেছেন। অনেকটা বিলম্ব হলও, ভারত সরকারের এই কাজে দেশবাসী সন্তুষ্ট হবে। আশা করি—এর পর আর বা কখনোই তাও ভারত সরকার করবে—যাতে জনসাধারণ বাতাসিক মূল্যে নিজেকে পরবার কাপড় পায়।

ভারত ও হায়দরাবাদ

হায়দরাবাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্রমেই ঠাটল হয়ে উঠেছে। আজ এই সমস্তা এমন, তর গিয়ে পৌঁছেছে

—যে ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক—এমন কি ভারতের প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত প্রকৃত্তত বলছেন—সরকার হলো ভারত অস্ত্রের লাঠা লাঠি নিয়ে এই সমস্তার সমাধান করবে। হায়দরাবাদ যে ভূমি অধিদ্বির বসে এবং হযত বা বাইরের উত্তারির বসে ভারতের সঙ্গে বিরোধের রাস্তা নিয়েছে ও নিচ্ছে—তাতে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। হযত শেষ পর্যন্ত অস্ত্র প্রয়োগের পক্ষেই বেতে হবে। তবুও ভারতের স্বাধীনতা বাস্তবতার প্রকৃত্ত উত্তিতে অস্ত্র প্রয়োগ ও যুদ্ধের কথা না থাকাই শোভন মনে হয়। কারণ পূর্বেও আমরা বলেছি হায়দরাবাদের একটি বিচ্ছিন্ন ও একক ঘটনা নয়;—বরং অস্ত্রাভিযয় এর সঙ্গে জড়িত আছে। সর্বোপরি জড়িত আছে কয়েক লক্ষ বা কয়েক কোটি নিরীহ মুসলমান ও হিন্দু নাগরিকের জীবন, স্বপ্ন, শান্তি ও ধন-সম্পত্তি। সামান্য সুলভ হতে যে কত বড় সাম্প্রদায়িক লাবানল জলে গুটে—তার জ্বালাময় অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। মাদ্রাজ বা নাগপুরের ময়দানে যুদ্ধের কথা বলে হায়দরাবাদ সমস্তার মীমাংসা হবে না; হযত চ'বে ভারতের ও পাকিস্থানের আত্মরক্ষার শাস্তির নাপ

সে যা-ই হ'ক হায়দরাবাদ নিয়ে ভারত সরকারকে এবার স্তব্ধতার দায়িত্বের সন্মুখীন হতে হচ্ছে। নিজা খ্রিটেনের রাস্তার নিচটা সাহায্য প্রার্থনা ক'বে চিঠি গিয়েছেন; এর অর্থ ভারতের যে অস্ত্র পরীক্ষার রাস্তায় নিষাধ ও তাঁর হায়দরাবাদ যাজে—তাতে তিনি খ্রিটেনের রাস্তার সাহায্য চান। খ্রিটেনের সঙ্গে ভারতের আর যৈরীর সম্পর্ক আছে; বহুদূর দূরে আত্মক একটি রাষ্ট্রকে ভারতের বিরুদ্ধে চালিত করার চেষ্টা আন্তর্জাতিক ভাষায় hostile activity—পক্ষতামূলক কাজ। তারপর আমাদের মনে রাখা সরকার—খ্রিটেনে এখনও চাটিলের দল আছে; হায়দরাবাদের ব্যাপারে তাদের মত স্থানীয়। আগামী নির্বাচনে স্বধিকমলের হাতে ক্ষমতা থাকবে কিনা—তাও ভাববার বিষয়। স্বতঃএব যেই লক্ষ্যকে না করে হায়দরাবাদ সমস্তার মীমাংসা এখনই করা সরকার। এই সমস্তার সমাধানের উপর ভারতের কয়েক কোটি

মূলমানের এবং পুণ্যপাকস্থানের এক কোটি হিন্দুর স্বধ-শান্তি ও নিরাপত্তা অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে। কাজেই যা করবার শ্রেয়ই করা সরকার। অপর এই সম্পর্কে সব চেয়ে বড় কথা হল হায়দরাবাদের জনসাধারণের স্বধ-শান্তি।

পণ্ডিতজী বলেছেন—হায়দরাবাদের সম্পর্কে যদি অল্প প্রচোপ করতেও হয়, তবুও তিনি তাকে স্বধ বসবেন না; কারণ স্বধ হয় হুঁটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রে। হায়দরাবাদেরকে তিনি সেই স্বধা দিতে রাজী নন; এটা ভারতের আত্মস্বত্ব ব্যাপার। পণ্ডিতজীর এই উক্তি আমাদের সম্মান করে। ভারতেরই এক অংশের প্রায় বেকর হুঁটা কোটি লোক আজ যে অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ভোগ করছে—তার প্রতি ভারত আর উপাধীন থাকতে পারে না।

এই সম্পর্কে আর একটা কথাও বলা সরকার। হায়দরাবাদের নিজাম বা রেজি-ন্যারেক আলির মল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বধ হয়ত দেখছে। কিন্তু তাদের মনে স্বাধা উচিত—হায়দরাবাদ কোন দিনও স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না। দিল্লীর মোগল সম্রাটের বেতনভূক লোক হিসাবে জাতিপাতো গিয়ে, নিজ প্রভুর ক্রমবর্ধমান অধিপত্যের স্বযোগ নিয়ে কিছুদিন ভারতঃ স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার ভোগ করতে চেষ্টা করে, যদিও শেষে ও আইনে তখনও বিজ্ঞান সম্রাটের অধীন রাষ্ট্রই ছিল। তারপরই ইংরাজের স্বাধীনতা যেনে নিয়ে বেজাচার শাসনও এই ঘেড়ন বহর ওখানে চালিয়েছে। ইংরেজ বেশ ছেড়ে দাবার মুখে পার্লিয়ারমেন্টে যে “ভারতীয় স্বাধীনতা আইন” পাশ করে তার ৭৭ ধারায় হুন্ট ভাষায় বলা হয়েছে—ব্রিটেনের রাজার সঙ্গে যেই রাজ্যদ্বয়ের সমস্ত সম্পর্ক শেষ হ’ল—(the suzerainty of His Majesty over the Indian States lapses and with it, all treaties and agreements in force……)। এখন কি ব্রিটেনের রাজা ইংরাজী ও ল্যাটিন ভাষায় ভারতের সম্রাট বলে যে উপাধি গ্রহণ করতেন, তাও স্বর্জন করা হ’ল।

কাজেই আজ নিজাম ব্রিটেনের রাজার নিকট গোপনে যে আবেদন পাঠিয়েছেন, তার মূলে রয়েছে তাঁর মনের স্বাধ দাবা। তাছাড়া, দিনের রাজনীতি সবচেয়ে জানের পরিসর যে কত সর্বোত্তম তারও পরিচয় লাওয়া যায় ব্রিটেনের রাজার নিকট সাধা সাধারণ প্রার্থনা করায়। তিনি হয়ত মনে করেছেন ব্রিটেনের রাজাও তাঁরই মতো একজন বেজাচারী শাসনকর্তা—নিজের খুশী ও খেয়াল মতো তিনি সবকিছু করতে পারেন। তাঁর শাসনব্যবস্থা সবচেয়ে লর্ড মন্টগ্যাটেন কিছুদিন পূর্বে এক চিঠিতে যা লিখেছেন, তা থেকেও তাঁর অহমান করা উচিত যে ব্রিটেনের রাজা তাঁর মতো নয়। নিজের মনের এই সব স্বাধ দাবার ক্ষর হয়ত লর্ড মন্টগ্যাটেন কিছুটা স্বাধী; পরিহার করে নিজামকে তাঁর জানিয়ে যেওনা উচিত ছিল যে ব্রিটেনের আর কোন দাবিও তাঁর প্রতি নেই। হয়ত সব কিছু মেনেও চাচিল-মলের ও তাঁর নিজের পরাবর্ণ-শাসনের উল্লেখানিতে মূল বুঝছিলেন। সর্বোপরি একজন দায়িত্বপূর্ণ পত্রিকারী ব্রিটিশ কি ক’রে ব্রিটেনের রাজার নিকট এই গোপন লিপি নিয়ে থাকতেন তাও ভাববার বিষয়। এ থেকে এই অহমান করা অসম্ভব নয় যে ব্রিটেনে ভারতের শত্রুতা মোট পাকাচ্ছে।

ভারত ও পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক বিধানে, রাজনৈতিক পরিচায়ক ভারত ও পাকিস্তান হুঁটা আলাদা দেশ—হুঁটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। অবাধ নিমন্তব্য সমবর্ণী সহযোগিতার মধ্যে পরস্পর স্বগড়া ক’রে বেতার টোপা-মুছি প্রভৃতি ভাগ ক’রে আলাদা হয়, আবার অল্প সময় পরই তারা এক সঙ্গে একযোগে বেলে। তেমনি ছেনেবাহুবি স্বগড়ায় ভারত ও পাকিস্তান বতর হয়েছে। কিন্তু এতে ভারতের কুপোল ও ইতিহাস বদলে যায়নি। অস্বত ৪৯ হাজার বৎসর হ’তে কুপোল ও ইতিহাসের বদলে ভৌগোলিক ভারতবর্ষ একই দেশ হিসাবে গড়ে উঠেছে। আজ উভয় পক্ষের অধিবাসীদের মোটামুটি সম্মতি নিয়ে ভৌগোলিক ভারতবর্ষ রাষ্ট্রিক হিসাবে বিতর হয়েছে। কিন্তু তাতে ইতিহাস ও কুপোল

নিখা হয়ে বাতনি। বোধ হয় উভয় রাষ্ট্রের কোটি কোটি লোকের মনে এই ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ঐক্যের বোধ আঁধার আছে।

পণ্ডিতজীর উক্তি—

আমরা সাধারণ নাগরিক; বাক্যের স্বাধীনতা আমাদের বড়টা আছে, রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর তা নেই। ব্যক্তিগত হিসাবে তিনি প্রকৃত্তে কথা বলতে পারেন না; তাঁর প্রত্যেক কথা রাষ্ট্রিক দায়িত্বে বিশেষ গুরুত্ব পায়। সেদিন মাস্তোজের মনসভায় তিনি বলেছেন—বড়ই পাকিস্তান আমাদের থেকে দূরে দূরে যেতে চায় এবং যদি, আমার মনে ইহা এখনও ভারতবর্ষের অঙ্গ,— তাই তিনি পাকিস্তানের ব্যাপারে সম্পৃক্ত। (I am interested in Pakistan because to my mind, however much it may cut itself away, it still remains part of India.)

পণ্ডিতজীর এই উক্তি বহু লোকের মনে একটা দৃষ্টান্তের বেনমার সঞ্চার করবে। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী আর বা বলেছেন—তাঁও আমাদের স্বরস্বীর। ভারত বিভাগে তিনি সম্মত হয়েছিলেন এই আশায় যে ভাগ-বাটোয়ারার পর হরত উভয় দেশ ও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিবেদনিক সৌহার্দ্য ক্রিয়ের আশা হবে। বহু কংগ্রেস কর্মী পণ্ডিতজীর সঙ্গে একমত। এবং তাঁরা আজ সবাই পণ্ডিতজীর মতো বিবাদের সঙ্গে বলবেন—ওঁদের সেই আশা-দুর্লভ বার্থ হয়েছে। এঁরা আজ অনেকেই পণ্ডিতজীর সঙ্গে বলবেন—ভারত বিভাগের পর যে বৈশ্বাস্থ্যক অভিজ্ঞতা ওঁদের হয়েছে, তাতে আজ যদি ভারত বিভাগের মীমাংসার প্রশ্ন আসত হরত ওঁরা লম্বত হতেন না।

এ সব তা' পেল অতীতের কথা। আজ ভারতবর্ষ বিভক্ত; আজ ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। যে ভৌগোলিক লংহান ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এই দুই রাষ্ট্র আছে, তাতে এদের মধ্যে সৌহার্দ্যের বন্ধন না থাকলে বিষময় পরিস্থিতি হতে বাধ্য। পণ্ডিতজী ঠিকই

বলেছেন এই দুটি রাষ্ট্র কেবল পরস্পর নিরপেক্ষ থাকতে পারে না; হয়ত এরা পরস্পর বন্ধু ও মিত্র হবে—নইলে শেষ পর্যন্ত এরা পরস্পরের শত্রু হবে। শেষ পর্যন্ত এর আর কোন মধ্য পথ নেই। (We have either to co-operate or be hostile to each other and there is no middle course ultimately)

তিনি আরও বলেছেন হরত সাময়িক ভাবে মধ্য পথ নিতে পারি—কিন্তু হয় এগুতে হবে নয় পিছুতে হবে। তিনি জুগুপ্সের সঙ্গে বলেছেন—বন্ধুত্বের পথে এই দুই রাষ্ট্র এগুতে পারেনি, বরং পিছিয়ে গিয়েছে। তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি দুইদিক দিয়েছেন কান্দীর ও হায়দরাবাদ। বিশেষ করে কান্দীরে আজ আর পাকিস্তান পনোক্ষ উৎসাহবাদী ও সহায়ক নহ; আজ পাকিস্তানের নিরস্ত্র নিরস্ত্র সৈন্যবাহিনী ভারতীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে কান্দীরে লড়ছে। কান্দীর ভারত রাষ্ট্রের স্বত্বকৃত অঙ্গ; ভারতীয় জুগুপ্সে পাকিস্তানী সৈন্য প্রবেশ করে ভারতীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়ছে। এটা স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ বৈরাচরণ। এতদিন পার্বত্য উপভাতির লোকদের ক্ষেপিয়ে আজাল থেকে পাকিস্তান কান্দীরে অভিযান চালাচ্ছিল। এখন সে প্রত্যক্ষভাবেই ভারতের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করছে।

পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমরা একমত যে এই দুই রাষ্ট্র বৈশ্বাস্থ্যক পরস্পর নিরপেক্ষ থাকতে পারে না,—হয় এরা পরস্পরের মিত্র হবে, না হয় এরা পরস্পরের শত্রু হবে। আদ্যাত্ত বেখছি—পণ্ডিতজীও জুগুপ্সের সঙ্গে স্বীকার করেছেন মিত্রতার পথে এরা এগুচ্ছে না। বরং উল্টো পথ নেবারই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

পণ্ডিতজীর স্বাধার মধ্যে অল্প গুরুতর আভাসও আছে। পাকিস্তানের কোন কোন খুব দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারী লোকও বলেছেন যে ভারতীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ধসে করার চেষ্টা করছে। পণ্ডিতজী এর জবাবে বলেছেন—এটা একেবারেই মিথ্যা অভিযোগ;—কারও পাকিস্তানের শত্রুত দল সম্ভার মধ্যে ভারত অভিযে পড়তে চায় না। পণ্ডিতজী বলেছেন—“পাকিস্তান জন্ম: যে বলে ভক্তিয়ে পড়ছে, আমরা তার মধ্যে গিয়ে পড়তে চাই না।” (We

do not want to get caught up in the webs that Pakistan is gradually getting into.) তাঁর মতে যদি পাকিস্তান রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে ভেঙে পড়ে, তবে ভারতের হাতামা অনেক বাড়বে। পাকিস্তান নিজকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলছে, নিজকে দাতব্যকর (theocratic) বা সাম্রাজ্যিক চিন্তিতে গড়াতে চাচ্ছে। পণ্ডিতজী মনে করেন এদব হ'ল কয়েক শতাব্দী পূর্বের মনোভাব, আজকার দিনে ঐ চিন্তিতে কোন আধুনিক ও ধনসম্পন্ন (prosperous) রাষ্ট্র গড়াতে পারবে না। পণ্ডিতজী'র মতে পাকিস্তানের এই চেঁচা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং এর ফলেই একদিন পাকিস্তান ভেঙে পড়বে। পাকিস্তান আজ কি ভাবে লেগে ও মনে পাহাড় খেঁচে গড়িয়ে পড়ছে—(how rapidly Pakistan is going downhill in mind and body.)—তা দেখে তিনি বিমিত ও হতবিস্ত হচ্ছেন।

পাকিস্তান ও ভারতের পারস্পরিক সম্পর্কের যে ছবি পণ্ডিতজী দিয়েছেন এবং পাকিস্তানের বর্তমান ও ভবিষ্যতের যে পরিণতি পণ্ডিতজী দেখাচ্ছেন তা বিশেষভাবে গ্রন্থনির্বোধগোপ্য।

ছাড়পত্র—

পশ্চিম পাকিস্তান হ'তে বহু মুসলমান ভারতে ফিরে আসছিল। এই একমুখী প্রবাহ অনেক দিন পর্যন্ত ভারত সরকার একটু শঙ্কার সহিত ঘেঁষে ছাড়ছিল। শঙ্কার কারণ ছিল একাধিক। প্রথম কথা হল—পশ্চিম পাকিস্তানে অ-মুসলমান কেউ থাকছে না; প্রায় সবাই চলে এসেছে বা আসছে। এই ৫০-৬০ লক্ষ লোকের বিলি-ব্যবস্থা করা এক বিরাট ব্যাপার। তার উপর যদি আবার বোম্ব প্রায় দু' হাজারের মতো মুসলমান আসে তবে তাদের সংস্থানের দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে। ভারত সরকারের পক্ষে এই দায়িত্ব বর্তমানে নেওয়া চলে না। দ্বিতীয়তঃ—ভারতের সাম্রাজ্যিক শাস্তিও এতে নষ্ট হতে পারে। যে ৫০-৬০ লক্ষ হিন্দু ও শিখ

পশ্চিম পাকিস্তান হতে প্রায় সর্বশাস্ত হতে এসেছে, তাদের মানসিক অবস্থা ঐ নবগত মুসলমানদের লগ্নে ঘোটেই অস্বস্তি হতে পারে না। কোন একটা ছুঁতানাতা নিয়ে যদি পোলমাগ লেগে যায়, তখন হয়ত তা কেন্দ্রল একটা আকলিক ব্যাপার থাকবে না। হয়ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে তা ছড়িয়ে পড়বে। এই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির মধ্যে ভারত সরকার এখন যেতে পারে না। তৃতীয়তঃ—এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই—অধিকাংশ মুসলমান অল্পের পাকিস্তানের সমর্থক; সুযোগ ও সুবিধা পেলে এরা সবাই পাকিস্তানে চলে যেত বা পাকিস্তানের পরিসর বাড়িয়ে নিজেদের বাসস্থানকেও তার অন্তর্গত করত। ঠিক তেমনি মনোভাব অধিকাংশ হিন্দু ভারত ছাড়ার চেষ্টা সফল পোষণ করে। সে সবে এ কথাও এসে যায়—যে সাধারণতঃ অধিকাংশ মুসলমান ও অধিকাংশ হিন্দু পরস্পরকে ভারতীয় রাষ্ট্র ও পাকিস্তান সফল অস্বস্তি মনোভাব পোষণ করে না! তাই হঠাৎ বোম্ব বোম্ব এত মুসলমান ফিরে আসছে এতে ভারত সরকারের একটু শঙ্কিত হবার কারণ হ'তে পারে। বিশেষ করে কাশ্মির ও হায়দরাবাদ নিয়ে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বেশ কিছু মন কষাকষি চলছে।

কাজেই ভারত সরকার আবেদন জারি করলেন—পশ্চিম পাকিস্তান হ'তে কাউকে ভারতে আসতে হ'লে পাকিস্তানি ভারতের হাইকমিশনারের ছাড়পত্র নিয়ে আসতে হবে। ভারত সরকারের এই আবেদন পূর্ববঙ্গ সফল প্রবেশা নথ। কিন্তু পাকিস্তান সরকার প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা কল্পনা করছে এবং বলছে তারা পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের দাড়াগাত সফল ছাড়পত্র দাবী করবে। এর ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে বেশ চাকলা হুজ হয়েছিল এবং পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তবায়িত আশ্রয়প্রার্থী স্বাভাবিক সংখ্যা বেড়ে গেছে। ভারত ও পাকিস্তানের ব্যাপার যে কতটা ঝটিল তা এমনি নানা বিষয়েই বোঝা যায়। তাই পণ্ডিতজী'র লগ্নে বলতে হয়—নিরপেক্ষ প্রতিবেদী হিসাবে এরা বাস করতে পারে না।—হয়ত এই দুই রাষ্ট্র পরস্পরের মিত্র হবে নইলে লক্ষ হবে। এই

এক বিষয়ক সৃষ্টি হয়েছে। এর সমাধান না হলে দূর ভাবের কথা হয়ত বলা কঠিন—বাংলায়, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার কথা বলতে পারি—জনসাধারণের মঙ্গলজনক কোন কালক্ষেত্র খুঁজি করিম।

পূর্ববাংলার রাজনৈতিক সংস্থা—

ভারতের কংগ্রেস থেকে পাকিস্তান অকলকে কেটে বাকি দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে হয়ত এতে তেমন কিছু বিপর্ষ্য হবে না। কিন্তু পূর্ববাংলার রাজনৈতিক কর্মীরা আজ নিজেদের অলম্ব্যর মনে করছে। "They feel to have been orphaned" (যে মনে কোড়ে এতদিন তারা মাতৃবহু হয়েছিল, আজ সে মা নির্মমভাবে তাদের ত্যাগ করে গেল—এই তাদের মনের ভাব) কিন্তু বাংলার একটা কথা আছে—কায়রার ঘর গোড়ে কেউ বই যায়। এই বিপর্ষ্যের বই খাবার মতো লোকের অভাব নেই। এমন লোক অনেক আছে কংগ্রেসের প্রতি বাক্যের আহ্বানতা কেবল উদ্বেগমূলক এবং সেই উদ্বেগে জাতির মঙ্গলসাধন নয়—ব্যক্তিগত বা উপলব্ধিত স্বার্থসাধক কাজ হাসিল করার জন্য। তা ছাড়া একজন গভীর্ণকার কংগ্রেসকর্মীও আছেন। তারা মনে করেন যে তারা পূর্ব বাংলার কংগ্রেসে সংখ্যালঘিষ্ট হবেন এবং আত্মকার ক্ষমতার কাড়াকাড়ির দিনে সংখ্যা-লঘিষ্ট হওয়া সুবিধার নয়;—তাই তারাও কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়বার পক্ষে। এমনই সব লোকের সমাবেশ হয়েছিল সুখিলা এক কনফারেন্সে যেখানে "পাকিস্তান গণ-সমিতি" নাম দিয়ে এক রাজনৈতিক সংস্থা গঠিত হ'ল।

অপরূপে পূর্ববাংলার অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী কংগ্রেস নাম ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন এবং তারা নিজেদের সম্মেলন ডাকছেন ঢাকায়। এই সময় পূর্ব বাংলায় কংগ্রেসকর্মীদের বা রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে একটা ঈর্ষা থাকলে ভাল হত। কিন্তু বহু ভাল তিনিসই দীর্ঘবাকের ভিত্তর দিয়ে ছেড়ে দিতে হয়। এটাও সেই ভাবেই ত্যাগ করতে হ'ল। কিন্তু এতে লাভও কিছু

হবে। আজ পূর্ববাংলার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তিলে-তালি না হ'য়ে সুদূর ভিত্তিতে গঠিত হওয়া দরকার—যাতে ঘোড়ামুঠি একমতাবলম্বীরা সব এককণ্ঠী হ'তে পারে। বাংলা নামে উদ্বেগে এবং ব্যক্তিগত ও উপলব্ধিত সুবিধা আশায় করার ভয় কংগ্রেসে ছিল, তারা যদি আজ বেত্রের বিধে আলাদা সংস্থা গঠন করে, তবে তা কংগ্রেসের পক্ষে ভালই বলতে হবে। তারা ঢাকায় সম্মেলন হবেন, আলা করি, তারা অবিচলিত থাকাতে নির্ভর করে কংগ্রেসের নামেই নিজেদের রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন। আরও পূর্ববাংলায় হিন্দু ও মুসলমান জনতার যদি কোন রাজনৈতিক নাম ও সংস্থার প্রতি আস্থা ও আস্থা থাকে, তবে তা আছে কংগ্রেসের প্রতি। একমুখ সুবিধা-মথেরী ভূমিই প্রতিষ্ঠানের মূলত্ব বাড়ানো দেয়; কিন্তু তাতে প্রতিষ্ঠানের মার্চা ও কর্ম-মূলত্ব বাড়ত না।

কংগ্রেস ও মন্ত্রীসভা—

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছেন যে কংগ্রেসকর্মীরা যেন সৈন্যদল নাম-কার্যে কোনরূপ ঘোড়ামুঠি করতে না যান। ঘোড়ামুঠির প্রধান মন্ত্রী শ্রীমুখ খের প্রকৃত্তে এই সম্পর্কে কংগ্রেস কর্মীদের শিক্ষা করেছেন এবং তাদের কাছে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। খের মহাশয় মিঠাসাধী ও মল্লভাষী। তিনিও যখন কংগ্রেস-মতাপত্তির নিকট নামিন করার পর নিজেই এ সংঘর্ষ প্রকৃত্ত মত ব্যক্ত করেছেন, তখন বুঝতে হবে—ওখানে অবস্থা কিছু গুরুতর হয়েছে। অজ্ঞাত প্রবেশ হ'তেও কংগ্রেস-কর্মীদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ রাষ্ট্রপতির নিকট এসেছে।

কংগ্রেস আজ বেশেৎ শাসনভার গ্রহণ করেছে; বেশের শাসনকার্য হাতে গৃহীতভাবে চলে কংগ্রেসকর্মীদের সেবিকে যথেষ্ট তাগিদ আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যে কোন কংগ্রেসকর্মী দিয়ে স্থানীয় কর্মচারীদের উপর হুকুম চালাবে বা দমক দেবে বা শাসাবে। স্থানীয় কর্মচারীরা যদি কংগ্রেসকর্মীদের সাহায্য কোন ব্যাপারে

চাও কেন্দ্রল তবেই তারা স্থানীয় শাসন-ব্যাপারের মধ্যে আসতে পারে। তাছাড়া তারা যা পারে—তা প্রধানত মন্ত্রী বা কংগ্রেস স্থানীয় কর্মচারীদের নিকট কোন প্রস্তাব বা ব্যবস্থাপনা, তারা কোন ভুল-ত্রুটি করলে, তা বোঝাতে সিতে পারে—তাও হুজুরের দ্বারা নয়, দেশের একজন সাধারণ ন্যায়িক হিসাবে। কংগ্রেসকর্মীরা যে স্থানে স্থানে নিজের অধিকারের গভী ছাড়িয়ে যায়, তা আমরা মানি। তাই রায়েনবাবুর এই বিজ্ঞপ্তি মূলতঃ সঙ্গতই হয়েছে বলে মনে করি।

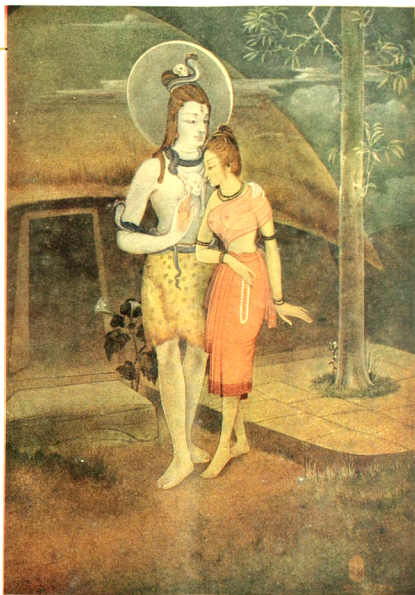
কিন্তু কার্ভি এর কল ভাল হ'বে কিনা আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে। আমরা বহুবার বলেছি মন্ত্রীদের কাছঃ কংগ্রেসের কলে সোমকটির জন্য সাধারণ কংগ্রেসকর্মীরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়; লোকের কাছে তাদের কৈফিয়ৎ দেবার মতো কিছুই থাকে না। রায়েনবাবু ভারতের যত জন স্বাধীনতার নেতাদের অগ্রতম এবং তিনি কংগ্রেসের সভাপতি, গণ-পরিষদের সভাপতি তিনি লোকের নিকট সর্বত্র অধিগম্য নন। তবুও আমাদের বিশ্বাস কংগ্রেস-মন্ত্রীদের কাব্যকলাপ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে রায়েন বাবুকেও বিরক্ত হতে হয়। তাছাড়া অধিকাংশ গুলেট কংগ্রেসকর্মীদের বা কংগ্রেসকমিটি লন্ডনের কোন পরামর্শ বা মতের প্রতি মন্ত্রী-সভা বিশেষ মর্মে প্রকাশ করেন। এর ফলে স্থানীয় কর্মচারীরাও স্থানীয় কংগ্রেসের বা কংগ্রেসকর্মীদের মতের বা পরামর্শের প্রতি কোন সৌজন্য দেখায় না! অথচ সাধারণ জনতার নিকট কংগ্রেসের মন্ত্রীদের শাসনের সোমকটির জন্য এদেরই অভিযোগ দিতে হয় এবং সাধারণ জনতার নিকট এরা কংগ্রেস-মন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার দারিদ্র এড়াতে পারে না।

রায়েনবাবু একমিকে শাসন করলেন এবং বাগের তিনি শাসন করলেন, তারা তাঁরই বাস অধীনস্থ লোক। সেমিক থেকে তাঁর কাজের সনদীভূত অধীকার করতে

চাই না। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর একমিকে তেবে দেখা সরকার যে কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতি করে; মন্ত্রীদের শাসন ব্যবস্থার সোমকটির জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান যাঁ বাহ। আজ জনসাধারণের সর্বমাপ্তি দুঃখকষ্টের সময়, জনসাধারণ সহজেই ও স্বাভাবিকই কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস কর্মীদের নিকট যায়, তাদের অভিযোগ-অভিযোগ নিয়ে। তখন তারা কি করবে? স্থানীয় কর্মচারীদের কাছে যদি তা বলবার বা প্রতিজ্ঞার তথ্য করবার অধিকার তাদের না থাকে, তবে ত তাদের একমাত্র পথ থাকে জনসাধারণকে বলা এর মধ্যে কংগ্রেসের কোন দায়-দায়ের নেই; যা ভাল বোঝে কর।

সেই হিসাবে আমরা মনে করি রায়েনবাবুর এই নির্দেশ একপেশে চলেছে এবং এর ফলে কংগ্রেসের মর্মেলায় ও প্রতিষ্ঠার হানি হবে। কংগ্রেস মন্ত্রীদের প্রতিও নির্দেশ দাওয়া উচিত যাতে তারা সাধারণত কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে যোগ রেখে শাসনকার্য চালায়। এতদিনের একনিষ্ঠ সেবার দ্বারা এরা জনসাধারণের যে আস্থা অর্জন করেছে এবং যে অস্বস্তি লাভ করেছে দেশের শাসনকার্যে তা প্রয়োগ করলে দেশের মঙ্গলই হবে। এক বছর বা দু' বছর বা তিন বছর পরে দেখিনাই হক, সাধারণ নিবাচন হবে এবং তখন ঐ সব কংগ্রেসকর্মী ও কংগ্রেস কমিটির মারফৎ জনসাধারণের কাছে ভোট ডিমা করতে যেতে হবে। আজ যদি ঐ সব কর্মী ও কমিটিগুলিকে মন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ও বন্ধা করে রেখে দেন, তখন এর ফল ভোগ করতে হবে সাধারণত রায়েনবাবু ও তাঁর বাস এলাকা কংগ্রেসকে। মন্ত্রীরা হস্ত ব্যক্তিগতভাবে, ভাবছে, অ্যাক্টর মাথের তাগের দৃষ্ট শেষ—আরও যে মাযনাস আসবে, সে ভাবনা হস্ত তাগের নেই। কিন্তু রায়েনবাবুকে ত' সে ভাবনাও ভাবতে হবে।

ਅੰਨ੍ਹਿਕਾ



ਏਮਾਰ ਸਿਫ਼ਲਾਤ

ਪਿਰੋ—ਏਸ਼ੁ ੬੭

— স্বাধীনতা —

একাদশ বর্ষ

ভাদ্র—১৩৫৫

পঞ্চম সংখ্যা।

স্বাধীনতা দিবস

ঐক্যপেত্র কুমার দত্ত

এক বৎসর হইয়া গেল ইংরেজ আমাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া গিয়াছে। কত দশক ধরিয়া, কখনও বা সিপাহী বিদ্রোহের-কখনও বা বালেশ্বরের ক্ষুদ্র, কখনও বা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার স্তূপের স্মরণে এই দিনটির স্মৃতি নীরবে কাল গণিঘাছি। একই ভাবে কাহারও মনে ঘটে না—স্বাধীনতা সংগ্রামেরও না। বাহা একদিন ছিল গোপন আশা, আর একদিন তাহা ছুটিয়া উঠিল দাখানপের ভাষায়। সন্তের বছর ধরিয়া আমরা বিশ্ব সমক্ষে সকল ভারতবাসী মিলিয়া স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি।

শুধু ইংরেজ চলিয়া গেলেই আমাদের স্বাধীনতা হইল। এমন ভ্রান্ত ধারণা আমাদের কাহারও কাহারও একদিন হয়তো ছিল, আজও হয়তো কাহারও কাহারও আছে। এই সন্তের বছর ধরিয়া আমরা যে সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি, তাহারও এক চরম দিনে আমরা বলিয়াছিলাম, ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়িয়া যাও। কিন্তু ওটা চরম কথাই—তুমি আমাদের সর্বনাশ করিয়াছ, ধনে, প্রাণে, জ্ঞানে, নীতিতে, ধর্মে মারিয়াছ, আর না, তুমি ছাড়িয়া চলিয়া যাও, আমরা যেমন করিয়া পারি, নিজেরা বাঁচিবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

চরম কথা, কিন্তু গোড়ার কথা নয়। গোড়ার কথা ছিল, আমাদের সন্তের বছরের স্বাধীনতার সংকল্প বাণীর প্রথম কথা ছিল—প্রত্যেকটি মানুষ পরিত্রা করিয়া যে দেশ

কল্যাণ, তাহার ভোগে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। এটা মানুষের অধিকার, শুধু ভারতের মানুষের নয়—সারা বিশ্বের মানুষেরই অধিকার। সেই অধিকারে দ্বারা আমাদের বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে—সেই বিশেষ হইতে ইংরেজ বা ফরাসী বা জাপানী আদিয়াই ককক, আর আমাদের দেশের লোক দ্বারা চন্দ্রিমাতে তাহারাই ককক, তাহারাই চুরি করিয়াছে, দস্যুতা করিয়াছে, করিতেছে।

এই চোরকে, দস্যুকে তাহার ঘানে বশাইয়া রাখিয়া থাকাইব, আর আমি স্ত্রী-পুত্র লইয়া শুকাইয়া মরিব, মানুষের ভবিষ্যৎকে শুকাইয়া মরিব, ইত্যাদি। মানুষের জীবন নয়, মানুষের ধর্ম নয়। ইংরেজকে সরাইতে চাইয়াছি, কারণ সে নিজে চুরি করিয়াছে, দস্যুতা করিয়াছে, আমাদের শুকাইয়া মারিয়াছে, আমাদের ভবিষ্যৎজীবনের ঈর্ষ, শুক ছুটো নিঃশেষ হইবার পথে আনিয়াছে—এবং শুধু ইহাই নয়, আমাদের দেশের লোক যে দস্যু তত্ত্বের জয়, তাহাদের সহিত মল বাঁধিয়াছে, তাহাদের দস্যু তত্ত্বের বৃত্তিকে আইনে বাঁচাইয়া পুঁজি করিয়াছে—যেন দস্যু তত্ত্বের হাতে আমরা চিরবঞ্চিত হইয়া থাকি, আমাদের পরিত্রা মলকে বঞ্চিত হইয়া বৎসপরম্পরায় আমরা শুকাইয়া মরি।

স্বাধীনতার সংকল্পবানীতে সন্তের বছর ধরিয়া প্রতি

বছর আমরা একটি দিনে খরচ করিছি, সংকল্প করিছি। বেশবিশেষের এই সহ্যতত্ত্বের হাত হইতে আমাদের মাহুদের বংশকে বাঁচাইতে হইবে। বংশের পর বংশ পুনরাবৃত্তিতে এই সংকল্প ধন অনেক মাহুদের বুক লাগিল, ইংরেজ আমাদের উপর যে চিরস্থান অধিকার আসন জুড়িয়া বসিয়াছিল, তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। এখনও ইংরেজকে আমরা গড়াইবা ধরিবা থাকিব বা না থাকিব, ইহার পর তাহা নির্ভর করিবে আমাদেরই উপর। ইংরেজ যে সহ্যতত্ত্বকে পুষ্ট করিয়া রাখিবা গিয়াছে, এখনও যদি তাহাঙ্গেরই মুখে আমরা কাল বাই, আমাদের হইতা তাহাদেরই যদি কথা বলিবার অধিকার দিই, ইংরেজকে গড়াইচাই আমরা থাকিব, গোলাদের পরিচর আমাদের ঘূচিবে না, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মাহুদ বলিচাই আমরা আন্তঃপরিচর দিতে থাকিব।

তবু একদিন ছিল যখন ভবিষ্যতের দিকেই আমরা তাকাইতাম—অতীতের দিকে তাকাইবার আমাদের ছিল হয় কোনো গৌরবময় ব্যর্থতার ইতিহাস, নহতো কোনো মনগড়া দিন—যে দিনে আমরা সকলে মিলিয়া সংকল্প গ্রহণ করিছি। আজ আমাদের তাকাইবার মতো একটি দিন জুটিগাছে যেদিনে ইংরেজ সরিতে পারন্ত করিয়াছে—যে দিন হইতে আমরাই আমাদের দর গড়াইবার ভার পাইয়াছি। সেই দিন হইতে আজ এক বংশের কাটিল। আজ হিসাব করিব, এখন হইতে প্রতি বংশের এই দিনটিতে, হিসাব করিব, যে পথে পা বাড়াইবার সুযোগ পাইলাম, সেই পথে কতদূর অগ্রসর হইলাম। আমাদের লক্ষ্য—এ—বাহা ছিল আমাদের সত্যের বছরের সংকল্প-বান্ধিত—প্রতিটি ভারতবাসীকে, প্রতিটি মাহুদকে তাহার আপন আপনে বসাইব। যে স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি সেই স্বাধীনতা এই পায় ও দাবি আমাদের উপর অর্পণ করিয়াছে। আজ প্রশ্ন, সেই পায় ও দাবি আমরা পালন করিব, না, কাকি বিব? তাহার নিকট বিবাসন্যাতকতা করিব?

মুদ্রিল হইয়াছে—আমরা পথের সফল হারাষ্ট্রাছি। এক বছর দূরীতে পথের সফল পাইয়াছিলাম, জীবন তুচ্ছ,

সকলেই দিতে পারে, তাহার অংশকা বড় বাহা তাহাই দিতে হইবে—সে বস্তু ভক্তি। ভক্তিতে উদ্ধার হইবা জীবনে বাহা কিছু শ্রম ও শ্রেষ্ঠ, তাহা ছাড়িতে হইবে, ছাড়িবার ভর প্রস্তুত হইতে হইবে। এক বছর দূরীতে একদিন আমরা বাহা পাইয়াছিলাম, আজ এক বছর জীবনে তাহাই পাইবা পরবর্তী জীবনে আমরা সফল হইবা উঠিয়াছিলাম।

কিন্তু ইংরেজ বাটবার আগে এ সম্পদ আমাদের নিঃশেষ করিবা দিয়া গিয়াছে। আমাদের সকলকে দ্বিতীয় তত্ত্ব বানাইবা গিয়াছে, আমাদের সকলকে লোভে অর্জিত করিবা রাখিবা গিয়াছে। দুইশত বংশের ধরিবা যে আমাদের ধনে গ্রাণে জ্বলে নীতিতে ধর্ম নিঃশেষ করিবা জুলিয়াছে, বাইবার পূর্বে সে আমাদের করিবা রাখিবা গিয়াছে চাকরীর কাঙাল, কট্টারীর ভিত্তি, লাইসেন্স পারমিটের উন্মেষ, ঘুর আর মুনাফা অন্তে লাগানিত। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় সর্বনাশ করিবা গিয়াছে। আমাদের অতীতের সহ্যতত্ত্বের সক্তি ধনও প্রত্যর্পণে নারাজ হইবার শিক্ষা দিয়া গিয়াছে।

চুরি করিবা সহ্যতা করিবা আজ বাহা সফল করি, আইনের কাছে তাহার ভর সংস্কৃতি থাকিতে হয়; আর পুরানো দিনের সহ্যতা তত্ত্বরতায় বাহা জন্মে ইতিহাসের কাছে তাহার দায় বহন করিতে হয়। ইতিহাস সে দায় তুলে না। সে দায় কেন বহন করিব বলিবা যদি চক্ষু রাগাই, দুই মণ জন্মে সেই রক্তচক্ষু প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় সমস্ত জাতিকে। জাতির এক বিরাট অংশকে স্রবাসীত হুণ হইতে বক্তিত করিবা রাখিয়াছিলাম তাহার মাহুদের অধিকারে। এক দিনে নয়, কিন্তু দীর্ঘে দীর্ঘে তাহার কণ পরিশোধের অধিকার চাহিবা অনশন পণ করিয়াছিলেন জাতির শিশু, জাতির পথপ্রদর্শক আজ হইতে চতুর্থ বংশের পূর্বে। গোলাদীর কাঙাল আমরা উজ্জ্বলবীরের রক্ত-চক্ষু হইবা উঠিলাম। জাতির পথপ্রদর্শককে পালি দিলাম, বারিতে শেলায়। সে-আফালনে কিন্তু জাতির তুর্ভলতা কাটিল না। ঐ তুর্ভল অংশে বারবারই জাতি হিসাবে আমরা আঘাত

পাইতেছি—যে কোনো মুহুর্তে ঐ পথে যে কোনো সর্বনাশ আমাদের দুয়ারে পৌছাইতে পারে।

পৌছাইয়াছেও। কিন্তু ভিন্নরূপে। মানুষের অধিকারে শতাব্দীর পর শতাব্দী বাহাদুরের বক্তিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহার ধর্মাত্মের গ্রন্থ করিয়া সেই অধিকার জিরিয়া পাইবার প্রয়াস পাইল। তাহার জাতির জন্য প্রচণ্ডতর লমতা সৃষ্টি করিল।

জাতির পথ-প্রদর্শক বলিলেন, জাতির কোনো বিশাল অংশকে মানুষের অধিকারে বক্তিত রাখিয়া, জাতি জাতি হইয়া উঠে না, জাতি শক্তিশালী হয় না, জাতিকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা যায় না। বাহাদুরের হুগ হুগ ধরিয়া সে অধিকারে বক্তিত করিয়া রাখা হইয়াছে, প্রবোজন হইলে, প্রাচুর্যবস্ত্র, তাহার বর্তমান অধিকারের অধিক তাহারকে দিতে হইবে। বিদেশী প্রবক্তক এটী অস্বীকারের হুমোণ লইবে, সে আরও অধিক দিতে চাহিবে। কিছুই দায় আসে না। আমরা চাই শক্তিশালী জাতি, সমৃদ্ধ জাতি। প্রবক্তক তো তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিবেই। কিন্তু আমরা যদি বক্তক আর বক্তিতের সম্পর্ক ঘূড়াইয়া হিন্দু আর মুসলমানকে সমানভাবে মানুষের আগনে স্থান দিতে পারি, বাহিরের প্রবক্তক এক দিন না একদিন ধরা পড়িবেই, আমাদের জাতি গড়িবার প্রয়াস ব্যর্থ হইবে না।

কিন্তু ডোন্টের অধিকারে বিশাল রাষ্ট্রের ভোগ একচেটিয়া রাখিব—এই স্বপ্নে আমাদের পাগল করিয়া তুলিল, বক্তিতের অধিকার কিরাইরা দিবার নাম আমরা দিলাম “মুসলমান ভোষণ নীতি”। এবং ভারতের,

আমাদেরই একজনের হাতে আমাদের জাতির পথ-প্রদর্শককে হারাইল মানবজাতি। এক বঙ্গের পূর্বে ইংরেজ আমাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে, সে-ক্ষমতা হাতে লইয়া সন্তের বছরের সংকল্প অম্বাঘী সন্ধ্যাকে মানুষের গ্রাণে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস আমরা করিলাম না, বরং এই দুইশত বঙ্গের পরিচা (সে-সহ)তার শিক্ষা আমরা পাইয়াছি, সেই বিস্তার সন্ধ্যার পরিচয় দিলাম, “জাতির পিতা”কে নিহত করিয়া। তথাকথিত স্বাধীনতা বর না হইয়া অভিশাপ হইয়া আমাদের কাছে আসিল।

আজিও সময় আছে। “জাতির পিতা” নাই। কিন্তু পিতার বেগু শিক্ষা আমাদের সম্পদস্বরূপ আমাদের হাতে রহিয়াছে। এই এক বঙ্গের স্বাধীনতা ভোগের পর আজ আমাদের নতুন করিয়া সংকল্প লইবার দিন আসিয়াছে। সেই দিনে সংকল্প লইবার পূর্বে আমাদের প্রথম বিচার্য, আমরা এই দুইশত বঙ্গের শিক্ষাকে মানিয়া লইয়া তত্ত্ব-বৃত্তি অবলম্বন করিব, পরস্পরের শ্রমজাত ফল হইতে পরস্পরকে বক্তিত রাখিতে প্রয়াস পাইব, পরস্পরকে নীচে টেনিয়া নিজে উঠাসনে বসিতে চেষ্টা করিব, সব যথ হুবিধাব একচেটিয়া ভোগের বাসনাকেই জীবনের ব্রত করিব, অথবা জাতির পথ-প্রদর্শকের শিক্ষাকে মানিয়া লইয়া “ডাফেন দুকীপা”কেই জীবন-পথের পাথরে করিব? এই সন্তের বছরের সংকল্পে নবজীবনের পথে বাহারা লীকা লইয়াছিলেন, অসুতঃ তাঁহাদের আর তুলিয়া যাওয়া চলে না যে, আজিকার দুনিয়ায় আমরা সব না ছড়িয়া সব পাইব না।



রবীন্দ্র কাব্যের দার্শনিক ভিত্তি

প্রিয়দর্শন গুহ

পরিণত বয়সে, পরিপূর্ণ গৌরবের মাঝে, অজান প্রতিকা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। যখন তিনি যুগ ও খ্যাতির উচ্চতম পিরামিডে, জনপ্রিয়তা যখন তাঁর সর্বোচ্চ, প্রতিকা যখনও নিতান্ত নূতন নূতন পানে সেশ তান্তি ও বিশ্বনাশকে কষ্টী তংছিল, সেই সময় তিনি চলে গেছেন। কিন্তু এমনি জনপ্রিয়তা তিনি বরাবর পাননি; বরং জীবনের শেষ ২৫-৩০ বছর ছাড়া জনবিরোধিতা তিনি পেয়েছেন বেশী। এই নতাতীত প্রথম সপক্ষে, যশস্বী দুগের দুচন্দ্রা ও আসিতে, তাঁর দেশপ্রীতির ত কোন সীমিত ছিলই না, এমন কি তাঁর সাহিত্যিক প্রতিকাও তখন সন্ধ্যার বিঘ্ন ছিল।

জনবিরোধ কাটরে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় হবার যে কাহিনী, তা আনন্দের সববসী প্রার সতলের জীবনের সংগেই কিছুটা স্পর্শ রেখে গেছে। আবার জীবনে, সাহিত্যিক হিসাবে তিনবার নূতন করে বেধা দিয়েছেন। তখনও তুলে পড়ি। হিতবাসী ও বহুদতীর তুলস সংস্করণ গ্রন্থাবলীগুলি অভিজাতবর্গের দৃষ্টি এড়িয়ে পড়তাম। এই হল বাংলা সাহিত্যের উত্তানে আমার প্রথম প্রবেশ। প্রত্যন্ত ঘৃণাতির গল্প তখন সবে বের হচ্ছে, সহস্রেই নাম করেছে। গ্রন্থালীর পৃষ্ঠাও নানারকম ছোট গল্প বের হতো। বেশ লাগত সে সব পড়তে।

হঠাৎ পেয়ে গেলাম রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের বই—গল্পগুচ্ছই বোধ হয় তখনও নাম ছিল। অস্বাভব হয়ে গেলান এ' যেন এক নূতন জিনিস। আজও আমার যৌবনের প্রথম দিনের সে উল্লাস মনে আছে। তখন হস্ত ঠিক তুল পেরিয়ে এসেছি, কিংবা আসব আসব করছি। 'Psychology' শব্দটা তখন আমার পরিচিত। আজও মনে পড়ে—তখনকার আমার মনের ভাব। সাহিত্যের নথ্যে Psychology কি করে ছুটতে হয়, চোখ বঙ্গসানো রঙীন না করেও সাহিত্যে কি করে সৌন্দর্য ছুটিয়ে তুলতে পারা যায়—তাঁর প্রথম পরিচয়ে

মন আনলো হয়ে উঠলো। এতদিন যে সব ছোট গল্প পড়েছি তা থেকে যেন এ জিনিষ সম্পূর্ণ অস্ত্র ভাঙের। আজও আমার মনে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, ছোট গল্পের standard বা নিকষ হয়ে আছে। এই নিকষে পড়ে পাচ্চাত। অনেক খ্যাতিনামা ছোটগল্প লেখক আমার মনের হরবারে ঠাঁট পাননি। একটি পাচ্চাত গল্পলেখক বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছেন—তিনি হলেন লেখক (Tchekhov), বরং অখ্যাত দু'একজন লেখক—অখ্যাত ভারতীয় লেখক ঠায়া—Polish, Czech, 'Armenian ও Jewish—২৫ জন কল্পকটা সমানে পার হয়েছেন। ইংরাজী ছোটগল্প এই হিসাবে আমার কাছে তেমন প্রভা পায় নি। আমার valuation বা মূল্য নির্ধারণকে একটা objective standard—বস্তুগত মানস ও হিসাবে ধরতে বসছি না। এটুকু অব্যক্ত কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য—রবীন্দ্রসাহিত্য প্রথম আমার মনকে যখন মোহিত করলো, তখন একেবারে অতিক্রান্ত করেছিল, আজও সেই প্রভাব হতে আমার মন মুক্ত হয় নি।

এর পর বিতরণ রবীন্দ্রনাথ আমার মনকে স্পর্শ করলেন বত বছর পর তাঁর *Religion of Man* দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য বুঝবার পক্ষে এবং নিজের চিন্তাধারার বিকাশের পক্ষে *Religion of Man* বইখানা আমাকে অনেকটা সাহায্য করেছে।

এই বই থেকে দু'টা কথা আমার কাছে বিশেষ করে ধরা দিল—Personal God ও Cosmic God—ব্যক্তিক ঈশ্বর ও বিশ্বদেবতার বিরোধ তখন আমার মনে জাগছিল, এই সমস্যার সমাধানের পক্ষে ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিকাশ বুঝবার পক্ষে *Religion of Man* থেকে অনেক সাহায্য আমার মন তখন পেয়েছে।

ঐ পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের বালাজীবনের একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ আছে। বহুদিন পূর্বে অদীত—তাই বিশ্বব্রহ্মে সেই ঘটনাটির বিবরণ দিতে পারব না—(বইখানাও ধারে নেই), ঘটনাটি এই—তখন তিনি বর্ণপরিচয় নিয়ে কলং করছেন, কিছুতেই তাঁর মন

চুকে না তাকে। হঠাৎ একদিন তিনি টের পেলেন বর্ণবোঝনা করে শব্দ হব এবং শব্দ থেকে অর্থ পাওয়া যায়। বেই এই অর্থের অহুত্ব তার মনে এলো—অমনি একটা অহুতপূর্ণ আনন্দের ঢেউ তাঁর বালক মনের উপর ঘিরে খেল গেল। বর্ণ ও বর্ণবোঝনা তখন আর তাঁর কাছে স্থাপু মড় পদার্থ নয়, তাঁর কাছে এক মুহূর্তে তারা হয়ে উঠলো প্রাণবন্ত, গতিশীল। বোধ হও সেই স্রুতি থেকেই অতি পরিণত বয়সেও তিনি কল্পনা করেছেন—

“মনে ভাবিতেছি যেন অসংখ্য ভাবের শব্দরাচি
ছাড়া পেল আশি ;”—

এবং তারাই বলছে—

“সিরিশিরে যে পাগলা বোরা
প্রাণের হৃদ, তারি আত্মীর আয়ত্ন
আদিরাছি লোকালয়ে
স্রষ্টার ধনিত ময় লয়ে,
মর্মর মুখর বেগে
যে ধনির কলোৎসব অরণ্যের পল্লবে—” ঠাণ্ডা

রবীন্দ্রনাথ শিল্পী, তিনি সৌন্দর্য স্রষ্টি করেছেন, কিন্তু *Religion of Man* বই পড়ে তাঁর জীবন ও সাহিত্যের আর একটা দিক আমার চোখে বিশেষ ভাবে ছুটে উঠলো। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের স্রষ্টা কিন্তু তার চেয়েও বড় হ'ল—রবীন্দ্রনাথ ভাবের স্রষ্টা; সৌন্দর্যের পিছনে থাকবে অর্থ, থাকবে অহুত্ব, থাকবে স্রষ্টি, থাকবে প্রাণের কল্পন, থাকবে গতি : তবেই সৌন্দর্য সার্থক ও গভীর।

বালক রবীন্দ্রনাথ বর্ণের বোঝনা করে, যখন অর্থের সন্ধান পেলেন, তখনই তাঁর মন চকল হয়ে উঠল। তাঁর শিশুমনের সেই অহুত্ব পরিণত বয়সে দার্শনিক মনের ছাপে, আরও ছুটে উঠেছে। কত দুঃস্বাদে তাঁর মন চলে গেল। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, অর্থের পেছনেই আছে অহুত্ব এবং তার সংগেই আসে কামনা। নিজের কামনার সংগে জড়িত না থাকলে

অর্থও নিরর্থক হয়। তাই অর্থবোধের সংগেই মন চকল হয়ে ওঠে। সম্মেল বা ব্রহ্মোপোদ্রার অর্থ অহুত্বের সংগে সংগে মনের একটা চূর্ণল হানে স্পর্শ পড়ে। তাই মন চকল হয় অর্থ সার্থক হয়ে উঠে। স্বক্বেদে একেই বলেছে “মনসোয়েতঃ”—বা কাম। যখন সর্বব্যাপী অ-স্রষ্টি ছিল তখন মনসোয়েতঃ আনলো ঢাকল্য—স্রষ্টির গতি মুক হলো তা থেকেই।

এরপর এল আর এক স্তর—যেখানে রবীন্দ্র সাহিত্য আমার মনকে আর একবার ধাক্কা মিল। এটা হ'ল তার গদ্য কবিতার ভিতর দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা আমার কাছে এক নতুন ভগ্ন খুলে দিল। এমনও বলতে ইচ্ছা হয় যেন তাঁর সমগ্র জীবন সাধনার পরিণতি হ'ল তাঁর গদ্য কবিতা ও তৎসাময়িক মন্ত্রান্ত কবিতার ভিতর দিয়ে।

যে কবি একদিন লিখেছিলেন—

“অল লয়ে থাকি তাই ঘোর বাহা ধায় তাহা হার
কণাইহু বহি হারায তা লয়ে প্রাণ করে হার চার।”

সেই কবিই এই সময় লিখলেন

“ঐ চান, ঐ তারা, ঐ তমপুত্র গাহুগলি
এক হোলো, বিরাট হোলো, সম্পূর্ণ হোলো।
আমার চেতনার,
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে।”

যে কবি তাঁর কাব্য জীবনের মধ্যাহ্নে বহুস্বরাৎকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন—

“জননী, লচগো ঘোরে,
যখন বন্ধন তব বাহু মুগে ধরে।
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকত,
তোমার ব্যাঙ্কল গ্রাণে বিচিত্র অর্থের
উৎস উঠিতেছে বেধা, সে গোপন পূরে
আবারে লইয়া ছাও, রাখিও না ধরে।”

সেই কবিই চম্পন বছর পরে লিখলেন—

"হে উদাসীন পৃথিবী
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্ধন পদপ্রান্তে
আমি ঘেঁষে বাই আমার প্রগতি।"

বেখানে ছিল তারাই হাফাই ভাবে, তীতি ৫৭ল মন,
সেখানে পরিপূর্ণ বসনে ছুটে উঠলো আশ্রয় জ্ঞানের অতল
ভাব। সেখানে মৃত্যু দ্বার মেনেছে, বিসর্জন সেখানে
নব সৃষ্টির পুরো নৃত্য বেখানে ছিল শান্ত দীর্ঘ গতি বা
দ্বাহ দ্বা, সেখানে এল উদার গতি—"প্রতিমূর্ত্তের
সংগ্রাম" সেখানে "বিভ্রান্তী প্রাণের জয়যাত্রা" ঘোষণা
করেছে।

এ যুগের দু' সাধারণ একটা কবিতা থেকে এক
চৈতালী কড়ের বর্ণনা তুলে দিচ্ছি : এই কাব্য স্তরের
বৈশিষ্ট্য তাতেও ছুটে উঠেছে—

"হৈকে উঠল কড়

লাগলো প্রচণ্ড তড়াক,

স্বর্গাশ্রমী সীমাব রহীন পাঁচিল ভিত্তির

ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ডিক্,

বুঝি ইল্ললোকের আশ্রম লাগা হাতিশালা থেকে
গা গা। শব্দে ছুটেছে ঐরাবতের কালো কালো দাবক

তড় আছড়িয়ে।

মেঘের গায়ে গায়ে দগ্, দগ্, করছে লাল আলো

তার ছিট-বকের রক্তরেখা

বিদ্যুৎ লাফ মারছে মেঘের থেকে মেঘে

চালাচ্ছে কণ্ঠমকে পাড়া,

বজ্রপথে গর্তে উঠছে দিগন্ত,....."

ইত্যাদি।

এই কবিই একদিন তার অল্পশব্দ ভাবার কড় সৃষ্টির
রাতের কথা বর্ণনা করেছিলেন—

"শনি তারা হীন। অন্ধ তামসী বায়িনী,
কেবা তোরা পুর কামিনী।

আজিকে দুয়ার কড় তখনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁপিয়ে কড় পবনে
চমকে হীল বায়িনী
নৃত্য নরনে কোথা রাগে পুরকামিনী

আবার—

"শতক যুগের কবিরস মিলি আকাশে

স্নানিবা তুলিছে মত্ত মদির বাতালে

শতক যুগের স্মৃতিকা

১ শত শত স্মৃত মধুরিত বন-বীথিকা।"

বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়লে ঘনে হবে যেন—ছুই বিভিন্ন
কবির লেখা। প্রকাশভঙ্গী, শব্দচয়ন ও ভাবপ্রকাশন—
সবই শেষ জীবনের প্রথমোক্ত কবিতাটিতে আলোচ্য
রকমের। রবীন্দ্র কাব্যের এটা চরম রূপ—তার সমগ্র
জীবন ধর্মের শেষ কথা যেন তাঁর এই যুগের লেখার
কণ্ঠেই বিশেষভাবে ছুটে উঠেছে। সৃষ্টি থেকে শুরু করে
শব্দ মানব সভ্যতার আধুনিকতম বিকাশের যে philo-
sophy রবীন্দ্রনাথের মনে গিয়েছে—তারই রূপ প্রকাশ
পেয়েছে এই যুগের লেখার।

এ পর্যন্ত বা' বললাম তা হচ্ছে নিত্যস্বই আবার
মনের গতির কথা। মনের গতির তিনটা ধাপে
রবীন্দ্রনাথ আমাকে মোতের দু' থেকে পার করে
দিয়েছে : এ তাঁরই কথা। রবীন্দ্র সাহিত্যকে এ ভাবে
তিনটা ভাগে বিভক্ত করা নিত্যস্বই আবার চিন্তাগত
(subjective) এর বস্তুগত (objective) যুগা স্বয়ং
কিছুই নেই।

রবীন্দ্রনাথের বহুবী প্রতিভা ; বহু সৌকর্য জীবনে
বহু ভাবে তিনি বেধা দিয়েছেন ; কিন্তু আমি আজ একটা
মিক থেকে তাঁর আলোচনা করব। তাঁর এই গড়-কাব্য
যুগের অর্থাৎ শেষ বয়সের কাব্যের অনন্বিত য়ে-বিশ-
দর্শন, শব্দ সৃষ্টির ও শব্দ ইতিহাসের যে বর্ণন তাঁর এই
সময়কার কাব্যে ছুটে উঠেছে, তাইই আলোচনা করতে
চেষ্টা করবো।

রবীন্দ্রনাথ একটা যুগ, কেবল যুগ প্রবর্তক নন। ডিক্টর হিউগো বলেছেন—“To name Voltaire is to characterise the entire eighteenth century” ভল্টেরের নাম করলেই সমস্ত ১৮শ শতাব্দীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়। তেমনি বাংলা দেশেও নিকটবর্তী, হয়ত সমস্ত ভারতবর্ষেই রবীন্দ্রনাথের নাম করলেই একটা কৃষ্টির যুগ বুঝায়। বাংলার বা ভারতের কৃষ্টির ইতিহাসে, রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি স্থান দখল করে থাকবেন, তার পূর্ণ পরিমাণ করা এখন সম্ভব নয়, ত্রাণ-সমাধ ও রামকৃষ্ণ নিয়ে যে কৃষ্টির স্রুজ হয়েছিল, তা' উত্তীর্ণ করে তিনি আমাদের নিয়ে এসেছেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে। রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনে এই পাড়ি দেওয়ার কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার ‘Religion of Man’ নামক গ্রন্থে।

ব্যক্তির জীবনে যা' দু'চার দিনের ব্যাপার একটা জাতির জীবনে তা একটা যুগ। বাংলা দেশে এটাই হ'ল রবীন্দ্রনাথের যুগ। ত্রাণ সমাধ ও রামকৃষ্ণের যুগের পরিণতি রবীন্দ্রনাথে দেখতে পাই স্বীকৃতিসহিত এবং নতুন যুগের সূচনা দেখা যায় বলাকায়ে। আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়—প্রথমটা গিয়েছে Deism বা ব্যক্তিক ঈশ্বরবাদের যুগ এবং দ্বিতীয়টা হ'ল Dialectic cosmology বা দ্ব্যর্থিক বিশ্ব-দর্শনের যুগ। Deism-এর যুগে যেমন মাহুকের জীবন ও সমাজ বাতলা তার অস্বপ্ন হ'ল—শান্ত, মন্থ, অদৃষ্টবাহী বদ-ভুট প্রকৃতি গুণে স্তব্ধ হ'ল দialectic cosmology-র যুগে আবার মাহুকের জীবন ও সমাজ এই দর্শনের অস্বপ্ন হ'ল। এই যুগের ধর্ম হ'ল অজ্ঞানতা, ক্ষিপ্ততা, উদ্ভ্রাণ, নতুন সৃষ্টি শূন্য, ভোগলিপ্সা প্রকৃতি, গুটা হ'ল দ্বিতীয় সমাজ, এটা হল গতির সমাজ, গুটা হ'ল যা আছে তাতেই ভুট থেকে, তা বজায় রাখার ধর্ম, এটা হ'ল নব নব অর হতে অর নিজের সার্বকল্যকে কৃতিয়ে তোলার ধর্ম, গুটা হ'ল ভীকৃতাকে স্রাব্য করে ধর্মভীক, সমাজভীক, রাষ্ট্র-ভীকর লম্বা। এক কথায় গুটা ছিল পুরাতনকে বজায় রাখার নীতি, আর এটা হ'ল বিপ্লবের দর্শন।

বিপ্লবের গোড়ায় যে দর্শন তা মূলতঃ হ'ল সৃষ্টির খেলায় সম্ভতি বোধ, সৃষ্টি ও বিলুপ্তির একত্ববোধ। সাগরের তরঙ্গমালা একটার পর একটা চলছে—একটা তরঙ্গ কোথায় শেষ হ'ল আর একটা কোথায় আরম্ভ হ'ল তা কেউ নির্দেশ করতে পারে না। একটা অগিছে তরঙ্গমালা চলছে, সৃষ্টি ও বিলুপ্তিও ঠিক তাই। কৃৎসনের পুঙ্খমুখে বলেছে সৃষ্টি হ'ল একটা। বজ্র, পুঙ্খ হ'ল এর বলি বা পুঙ্খই হ'ল সৃষ্টি। বাহা আছে ও বাহা হ'ল। হেগেল ঠিক এই তরঙ্গ বলেছেন—The seed-corn must perish if the plant is come into being but the plant contains all that was the essence of the seed-corn.”

সৃষ্টির এই দুজোঁর তরঙ্গ সম্বন্ধেই কৃৎসনের মাসনীর মুক্ত বিজ্ঞান করেছেন—“কো বেধ?” কে জানে এই সৃষ্টির আদি কথা? দেবতা? জীব? সৃষ্টির পরে এসেছেন, আর সৃষ্টিকর্তা? তিনিই কি সৃষ্টি করেছেন—কি করেননি? তিনি জানেন কি জানেন না? কেউ তা বলতে পারে না। প্রাচীন দর্শনের দ্বায় বর্তমান বিজ্ঞানও এখানে এসে মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু একবারে মুক্ত হয়নি কবির কল্পনা।

এর আসবে দর্শন বিজ্ঞানে যেখানে মুক্ত, কবির কল্পনা সেখানে মূব হ'ল কোন সাহসে। একি নিছক তাঁর বাচালতা নয়? ঠিক তা বোধ হয় না কিংবা হয়তো বা বাচালতাই। কিন্তু তেমনি বাচালতাই—তেমনি দুর্বল সাহসই মাহুকে অজ্ঞাত থেকে জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়; এমন করেই মানবজ্ঞানের সীমা বেড়ে যায়। কবি হল লম্বার সমষ্টিগত সৌন্দর্যবোধের—সমাজের সমষ্টিগত সামঞ্জস্য ও সংগতিবোধের অভিব্যক্তি। এই সৌন্দর্যবোধ বা সংগতিবোধ যদিও বিচার বুদ্ধির পরিসরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু ইহা বিচার বিরোধীও নয়, বিচার যেখানে গিয়ে প্রতিরত হয় সৌন্দর্যবোধ বা সংগতি অস্বপ্নিত তাই পরিপূরক হিসাবে সেখানে এগিয়ে যায়।

তাই দেখতে পাই প্রাচীন ধর্ম বা দর্শন যেখানে গিয়ে

যেদে গেছে বা বিপথে গেছে সেখানে উপকথা মানব মনকে পথ-প্রদৰ্শন করেছে। তাই ধৰ্ম বা ধৰ্মাত্মক দৰ্শনের সাপে বিজ্ঞানের হত বিরোধ উপকথাদুলক প্রাচীন কাব্য বা উপকথা মূলক প্রাচীন দৰ্শনের সাপে বিজ্ঞানের তত বিরোধ নেই। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, চীন বা বৈদিক ভারতের উপকথা মূলক কাব্যে স্মৃতি বা কাব্য আছে তা অনেক পরিমাণে বিজ্ঞান সম্মানোচিত। পতি ও ক্রমবিকাশ বিজ্ঞানের হতে স্মৃতিত্বের দুটা প্রধান উপাধান। ধৰ্মগ্রন্থে যে স্মৃতিত্ব আছে তা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক বিজ্ঞান বিরোধী, কিন্তু প্রাচীন সভা দ্বারা যে কাব্যবৃত্তি যে স্মৃতিত্ব দিয়েছে তা তেননিভাবে বিজ্ঞান বিরোধী নয়।

তাই বলছিলাম এই বিশ্বের জুড়েই রহস্যের নামে এসে বিজ্ঞান ও দৰ্শন বেখানে যুক হয়েছে, সেখানে যুক হয়নি কাব্যের কল্পনা মানব মনের সৌন্দৰ্যবোধ বা সামঞ্জস্য অহুত্ব।

রবীন্দ্র সাহিত্যে এটা কিভাবে বিকশিত হয়েছে এখান ভাবাই আশোচন্য করবে। পূর্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ ভয়েছেন এবং লালিত পালিত হয়েছেন ব্যক্তিক ঈশ্বরবাদের সমাজে ও প্রভাবে। কিন্তু সে সমাজের গঠের মধ্যে তিনি আটকা পড়ে থাকেন নি। সে সমাজকে অতিক্রম করেছেন তিনি অনেকটা পরিপক্ব বয়সে; কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভেই হৃদয় তার নিজেই অজ্ঞাতসারে তার মনেরই এক কোণে এক নতুন সমাজের বীজ স্ফুটানিত ছিল। তাঁর সভ্যতার স্ফুটন, তাঁর আবেগ, তাঁর শিক্কা সবারক অতিক্রম করে তাঁর স্বত্বনিহিত আবেগ থেকে থেকেই ফুটে উঠেছে। কবির সৃষ্টি দিয়ে তার সমস্ত সম্ভা যে অহুত্বকে গেছেছিল, তার সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষ চলছে তার পারিপাট্যিকের।

তাঁর সাহিত্যে যার নাম তিনি দিয়েছেন “নির্ব্বয়ের স্বপ্নতপ,” তা এক হিসাবে তাঁর নিজের জীবনেরও স্বপ্নতপ। কবির সৃষ্টি তার সেদিন খুলে গিয়েছিল। যখন তিনি গেরেছেন—

“আগিয়া উঠেছে গ্রাণ
ওরে, উঠলে উঠেছে বাহি

ওরে গ্রাণের বেদনা, গ্রাণের আবেগ, কবিয়া রাখিতে
নাহি,”—

তখন তিনি নিজের গ্রাণের মধ্যেও অহুত্ব করেছেন—“কবিয়া রাখিতে নাহি।”

সাময়িকতার ঠিক দিয়া “নির্ব্বয়ের স্বপ্নতপ” একটা অকাল হুহু। বিবর্তনের হিসাবে এই কবিতার স্থান গ্রাণের পূর্ণতা বহুর পরে অর্থাৎ বলাকার পরে, যে বীজ অন্ন অন্ন করে তার মধ্যে অহুত্ব হচ্ছিল—“নির্ব্বয়ের স্বপ্নতপ” হঠাৎ পূর্ণাঙ্গ রূপে দেখা দিয়া আবার লুকিয়ে গেল। ঠিক যেন অহুত্ব অবস্থা বীজের মনে যে বিয়ট বটবুক ছুঁয়ে আছে, সোনার কাগির পরশে তাকে এক হস্তের মত ধাসিয়ে তুলল, ঐ কবিতার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর অহুত্বের হস্ত তাবধারা থেকে—বা potential আছে তাকে actual বলে অহুত্ব করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর জবি সৃষ্টি দিয়ে।

হুপজ্ঞার পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা হ’ল অনাগতকে অহুত্ব করতে পারা, বাস্তবের মধ্যে বা লুকিয়ে আছে, সত্যাপেক্ষের সৃষ্টিতে তা’ ধরা পড়ে না। কবির সৃষ্টিতে, কবির সৃষ্টিতে, সত্যের সৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে।

ব্যক্তিক ঈশ্বরবাদের শাস্ত ও স্থিতিমূলক সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যেও থেকে থেকে রবীন্দ্রনাথের নৈমিত্ত্য সৃষ্টিতত্ত্বী ফুটে উঠেছে। তাঁর বহুরূপের পরিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐ অনাগত গতি-মূলক সৃষ্টিতত্ত্বী পরিপত্তি লাভ করেছে। এখানেই হ’ল রবীন্দ্র নাথের বিমর্ষ সৃষ্টিতত্ত্বী—ইহাই হ’ল তাঁর নিমিত্ত দৰ্শন।

১০০৪ অব্দে তাঁর “কল্পনা” কবিতার বই বের হয়। তাইই দুটা কবিতার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি—তাতে এই দুটা সৃষ্টিতত্ত্বীর বিকাশই দেখতে পাওয়া যাবে। ‘বিদ্যার’ নামক কবিতার তিনি দিয়েছেন—

“বৃত্তা নয়, কণ্ড নয়, নহে বিচ্ছেদে গুহ,
তমু সন্ধান
তমু হুহু হতে সৃতি তমু ব্যাধা হতে সৃতি
তরী হতে তীর
বেলা হতে বেলাভাঙি বাসনা হতে পাতি
নত হতে নীড়।”

ঐ কবিভাতেই আবার লিখেছেন—

“হে মহাত্মনের পেশ হে বিদ্যার অনিমেষ
হে সৌন্দর্য্য বিধান,
কণেক পাড়াও স্থির মুছায়ে নয়ন নীর
করো আশীর্বাদ
কণেক পাড়াও স্থির পদতলে নমি দির
তব হারা পথে
নিষ্কল প্রবীণ ধরি নিঃশেষে আবতি কতি
নিভৃত্ত অগতে।”

এখানে পাচ্ছি একটা শান্ত দ্বিতিমূলক দ্বিষ্টকী এর
সঙ্গে ভুলনা করা যাক্ ঐ পুস্তকের “বর্ণনাব” নামক
কবিতার কয়েক লাইন। তিনি হুক করেছেন যে পংক্তি
দিয়ে তা হ’ল এই—

“ঈশানের পুত্রবেশ অজবেগে ধরে চলে আসে
বাধাশূন্য হারা
গ্রামান্তের বেবুজ্ঞে নীলাকন ছায়া সকারিণী
হানি স্বীকৃত্য।”

তারপরে লিখেছেন—

“উড়ে যাক্, ধূরে যাক্, বিবর্ণ বিবর্ণ জীর্ণপাতা
বিপুল নিঃবাসে।
আনন্দে আতঙ্কে মিশি’ ক্রন্দনে উল্লাসে গরবিয়া
মত্ত হাহাধরে

অন্ধার মহীর বাপি উরাগিনী কাল বৈশাখীর
নৃত্য হোক তপে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অকালের আবর্ত অগাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিদম, তৃণদম পুরাতন বংশেরের ধত
নিফল সঞ্চয়।”

পুরাতনকে বিদায় বিধে তিনি নৃতনকে বরণ
করেছেন—

“হে নৃতন এসো তুমি সম্পূর্ণ গগণ পূর্ণ করি
পুত্র পুত্র রূপে,
ব্যাধ করি, লুপ্ত করি গুরে গুরে তবকে তবকে
ঘনঘোর স্বপ্নে।”

আবার তিনি নৃতনের বন্দনা করেছেন—

“হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নৃতন, নিহঁর নৃতন”
এবং তার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—
“ভেল সব অকস্মাত্ স্থির করে উত্তেজ লয়ে যাও
গুরুগুণ হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মৃণালুণি করে দাও মোরে
বহুর আলোতে।
তার পরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো, দাহ্য ইচ্ছা ডব
ভয় করো পাখা।”

—ইত্যাদি।

(ক্রমণঃ)

ভারতের মর্মবাণী

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য

হিন্ন কোরেছি পায়ের শিকল পরাধীনতার আলা,
আমরা হতেছি নব ইতিহাস হকের রক্ত ঢালা।
নৃতন আলোক-শিখা
এনে দেছে অরটিকা,
আমরা করিব নিঃশেষে পান বিশ্বের বিদ্যভাণ্ড।

ভারতজন্মির ধূসি উড়াইয়া অসুত লুটেছে ধারা,
ভাবের লুক গোপিতে মিশায়ে মহাভারতের ধারা।
সামোর গান গাহি’
মত্তের বাণী বহি’
আমরা গাঁথিব মবার তরে প্রেমের হৃদয়-মালা।

মুখর অতীত

ভাতি অভিবান (৩)

কমলা দাশগুপ্ত

১৯২৯ সাল থেকে ভারতবর্ষের অবস্থা ক্রমে একটা স্থানিষ্ঠিত পরিণতির দিকে দৃঢ় পথক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল। এই অবস্তাভাবী পরিণতি ছিল গান্ধীজীর ভাতি অভিবান।

লাহোর বড়ব্রহ্ম নামলার জন্ত একবার টাকা সংগ্রহ করছিল ৭টি ছেলে। বেলা ম্যাগিষ্ট্রেটের নামনে পুলিশ তাদের মারতে মারতে আক্রান করে ফেলল। তারা নাকি বলেছিল ‘সাদাভাবাদ ধ্বংস হোক।’ শুধু তাই নয়। লাহোর বড়ব্রহ্ম নামলার আসানীমের কোর্টের মধ্যে বিচারপতির সাননেই প্রেহার করা হ’ত। কোর্টের বাইরে তো কথাই নেই।

ওদিকে জেলের মধ্যে জেল কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের পাওয়া পরায় যে ব্যবস্থা



বতীন দাস

ছিল তার বিরুদ্ধে লাহোর বড়ব্রহ্ম নামলার আসানীমার অনশন ধর্মঘট শুরু করল। একে একে সকলেই নিরস্ত হ’ল কিন্তু বীর বতীন দাস বিদেশী শাসনের অত্যাচারের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ৬৪ দিন অনশন করে নিশ্চেষ্ট জীবন বিসর্জন দিয়ে গেল। তার এই তিলে তিলে মৃত্যু। ভাতিকে যেন চাবুক ঘেরে জাপিয়ে দিয়ে গেল। বিশ্বব্যাপী তত্ত্বিত লক্ষ লক্ষ নরনারী লেগিওন অকুড়ারে নহুশিরে বতীন দাসের শব্দার্থারের অহুগমন করল। অধর্ম বামাধ তাৎকে বিষায় নিতে গিয়ে ভাতি বৃষ্টি সেদিন নতমতকে বতীন দাসের গুণরক্ষার তার আগুন মাথায় জ্বলে নিল।

ওদিকে Rev. Wizarphongy ষ্টিক তার ৬ দিন পরে বার্মা জেলে একই কারণে ১৬৪ দিন অনশনের পর জীবন ত্যাগ করেন। এমনি করে বিদেশী শাসনের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে



বতিনাম সেদে

দেশপ্রেমিকগণ জীবন বলি নিতে লাগলেন। আর এই সব শহীদব্রহ্মের আত্মবিসর্জনে ভাতি পরাধীনতার বেধনা মর্মে মর্মে অহুতব করতে লাগলো, স্বাধীনতার স্মৃতি অহুতের অহুতের দুর্বার হয়ে উঠতে লাগলো।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেস আদায়। ইংরেজ চায় কংগ্রেস খুদী হয়ে Round Table Conferenceএ সহযোগিতা করুক, তাবের মনোবাহা পূর্ণ করুক। Viceroy Lord Irwin কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে আলোচনার

জন্ত আমরণ জানালেন। আত্মসম্মানের দরজার খানা দেওয়া পর্যন্ত সত্যগ্রহী আলোচনা ও সহযোগিতার পথ খোলা রাখে। তাঁরা গেলেন আলোচনায় যোগদান করতে। গান্ধীজী প্রথমেই সোভার্বিগি Dominion Status-এর কথা ভুললেন। তিনি Viceroy-এর কাছে থেকে এই কথাটাই চাইলেন যে, R.T.C. পূর্ণ Dominion Status-এর ভিত্তিতে আরম্ভ করা হবে। Viceroy উত্তর দিলেন যে তিনি কথা দিতে পারেন না। আসন্ন সংগ্রামের সংকেত রাগা করে চললো। লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশন রণবাহুর বন্ধার ভুলে গুল হ'ল। ১৯২২ সালের লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত



মহাত্মা গান্ধী

মহোদয়লাল তাঁর ঐতিহাসিক অভিভাষণে জাতির অন্তরের ধুমায়িত বহি ও আলোড়নকে তাঁর অপূর্বভকীতে ভগদূর্ভ করে ভুললেন। লাহোর কংগ্রেস সেদিন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রজ্ঞাপ্ত গ্রহণ করল। এবং বলল যে R.T.C. এ গিয়ে কংগ্রেসের কোন লাভ নেই। স্বরাজ অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা। সেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার জন্ত কংগ্রেস আত্মনিয়োগ করবে। আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ করে কংগ্রেস সংগ্রাম আরম্ভ করবে।

সেনিন লাহোর কংগ্রেসে কারো কারো মনে ভয় ছিল। কিন্তু বেশ পেয়েছিল সেনিন গান্ধীজীর পুণ্ডরীকানি। বজ্রাবিকৃত অশান্ত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশি সেনিন ছিল ভারতবর্ষের সামনে, সুরাসাজির পরিবেশে কীণ তরী সাহসভরে এগিয়ে চললো। ভর কি তার? সেই অজানা সমুদ্রে অনভিজ্ঞ নাবিকেরা বলে আছে মরণ পণ করে। সন্ত হাতে হাল ধরে আছেন অথ গান্ধীজী। পথের সন্ধান তাঁর জানা আছে, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর তিনি। তাঁকে যেনে চললে পরাজয় নেই।

১৯৩০ সালের ২৬শে জুলাইরী রাতি প্রথম স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য গ্রহণ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ করল যে, স্বাধীনতার জন্তে আইন অমান্ত আন্দোলনে তাঁরা কান্দিয়ে পড়বে।

গান্ধীজী Lord Irwin-এর বক্তৃতার উত্তরে Young India-তে এক ভাবাব লিখলেন। তাতে Irwinকে ১১টা সতর্ক দিলেন। যেমন লবণ কর উঠিয়ে দেওয়া, সেনা বিভাগের বরচ অর্ধেক করে দেওয়া, বিদেশী বস্ত্রের উপর শুক বলানো, C. I. D. উঠিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলি কার্যে পরিণত করলে আইন অমান্ত আন্দোলন হবে না। অস্ত্রাধা অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করা তিন্ন কংগ্রেসের আর কোন উপায় থাকবে না। Viceroy-এর কাছে থেকে কোন লাভা এল না।

সবরমতী আশ্রমে কংগ্রেস ওয়ারিং কমিটির বৈঠক বসল ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তাঁরা মহাত্মা গান্ধীজীর প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন করলেন। এবং আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ করার জন্ত গান্ধীজীকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দিলেন। তাঁরা এই আন্দোলনে যোগ দেবার জন্ত সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের আহ্বান করলেন। সবরমতীতে লবণ আইন অমান্ত সম্বন্ধে ঘরোয়া আলোচনা হয়েছিল। আঘাতের মেশে লবণ সমুদ্র থেকে পাওয়া গেলেও সরিষার কিলে খেতে হয়। মিসিভী ল্যাভেশায়াবের লবণই কিনতে হয়। প্রথমে এই লবণ আইন ভঙ্গ করার কথাই হ'ল।

গান্ধীজী স্থির করলেন যে, তিনি নিজে আগে লবণ

আইন তৈরি করবেন। তাঁর প্রেঞ্জারের পর কংগ্রেস কনিগণ আন্দোলনে নেমে পড়বে। তার আগে তারা প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

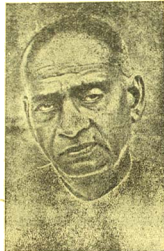
এই আন্দোলন শুরু করার পূর্বে গান্ধীজী Lord Irwinকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন তা ইতিহাসে অক্ষর হয়ে থাকবে। সেই চিঠির সারমর্ম ছিল এই যে, আন্দোলন আরম্ভ করার আগে আলোচনা দ্বারা সমাধানের পথ হার করা যায় কিনা। তিনি লিখলেন, ইংরেজের তিনি বন্ধু, কিন্তু ইংরেজশাসন ভারতের এক অধিশাশন। কারণ এই শাসন কোটি কোটি মুক জনগণকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে হাস্যশূন্য করে রেখেছে। তিনি বললেন, লবণ কর সরিষারের পক্ষে সর্বাঙ্গীকায়ক। অর্থ লবণ ব্যয় তারা ই বেই। কাজেই ওটা উঠিয়ে দিতে হবে। নানাভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কর আশায় করে ব্যয়বহুল শাসনব্যয়টিকে রক্ষা করে। যেমন Viceroyএর নিজের বেতন হচ্ছে মাসে ২১,০০০ টাকারও বেশী। প্রতি ভারতবাসীর গড়পড়তা আয় যেখানে দিনে দু আনা সেখানে Viceroy পান দিনে ১০০ টাকারও বেশী। ওসিকে ইংলণ্ডের জনসাধারণের গড়পড়তা আয় যেখানে দিনে ২০ সেখানে ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রীর আয় ১৮০০। Viceroyএর বেতনের দতই শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব ধ্বংস। কাজেই শাসনতন্ত্রের ব্যয় কমিয়ে দিতে হবে। স্বাধীনতা ছাড়া এই পরিবর্তন আসা অসম্ভব। ভারতবর্ষকে যদি ধীরে ধীরে উপবাসে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হয় তবে প্রতিকারের উপায় দু'জনেই হবে। ভারতে ইংরেজ তার নিজের ব্যবসাকে যেমন বাঁচাতে চাইবেই তেমনি ভারতবর্ষও মৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হতে চাইবে। সুতরাং আপেক্ষা করার সময় নাই।

যদি এই চিঠি Viceroyএর অন্তরে কোন আবেদন জাগাতে না পারে তবে সর্বমস্তী আন্দোলনের সহকারীদের নিয়ে তিনি ১১ই মার্চ তারিখে লবণ আইন অমান্য করতে বাবেন। সরিষার উপর এই কর অস্ত্রাণ ও পাপ। স্বাধীনতা আন্দোলনও সরিষারই অস্ত্র।

গান্ধীজীরা এই চিঠির উত্তরে Viceroy বললেন যে, গান্ধীজী ইংরেজের আইন ভঙ্গ করে জনসাধারণের শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক কাজ করছেন।

গান্ধীজী তখন জানালেন "নশ্তা হলে আমি কীট চেয়েছিলাম, কিন্তু তার বদলে আমি পাখি পেয়েছি। ইংরেজ জাতি কেবলমাত্র শক্তির কাছে দাড়া দেয়। তাই আমি Viceroyএর অবাধে অবাধ হই নাই। তারতবর্ষ এক বিরাট বন্দীশালা। মুক্তির অভাবে যে জাতির হাস্যকর হয়ে আসছে সে জাতির এই শোকাবহ বাতাকরী শাস্তিকে ভুল করাই আমার পবিত্র কর্তব্য।"

তাঁর হৃদয়ে সন্তুষ্টপায়ে একটি গ্রাম। গান্ধীজী ২০০ মাইল রাত্তা পাবে হেঁটে যাবেন সেই অভিধানে। সঙ্গে



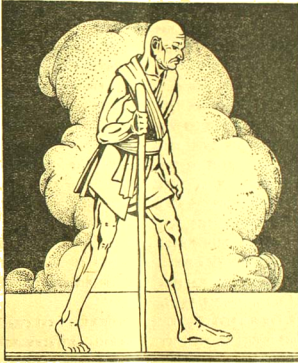
সর্বদা যত্নবাহী প্যাটেল

আছেন সখরমতী আন্দোলনের ১২ জন সহকারী। ১৯০০ শত বৎসর পূর্ব ঠিক যেমন Jesusএর পূর্বগামী ছিলেন John the Baptist ঠিক তেমনি আশুও সর্বদা যত্ন ডাই প্যাটেল গান্ধীজীর পূর্বগামী হয়ে গান্ধীজীর বাতাকরণের গ্রামগুলিকে সচেতন করে তুলতে লাগলেন। প্রথম যা গড়ল তাঁরই উপর। তাকে এগুয়ার কথা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ১৫০০ গমরাটবাসী একত্রিত হয়ে গান্ধীজীর

কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝগে দেবার শপথ গ্রহণ করল। গান্ধীজী তাঁদের সতর্ক করে দিলেন যে, তাঁদের জমি, সম্পত্তি, গরু, ছাগল সমগ্রই ব্যাঙেরাপ্ত হয়ে যেতে পারে। গ্রামগুলিকে তৈরী হতে নির্দেশ দিয়ে তিনি বললেন, গভর্নমেন্ট একজন প্যাটেলকে পেতে পারেন কিন্তু আমাদের কাছে প্রতিটি গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক খেজুরসেবক সৈনিক।

হাতে হাট্ট, পরিধানে কটিবস্ত্র, গান্ধীজী চলছেন অভিবাসনে। পুলিশ চারিদিকে তৎপর হয়ে উঠলো। অসহযোগীদের সাহায্য করলে শাস্তি চলতে লাগলো। যেথা গেল শহরের চেয়ে গ্রামবাসীরা সেই শত্রু এবং শেখশ্রেণিক। গ্রামের নেতাকে গ্রেপ্তার করলে সমস্ত গ্রাম ঝুগিয়ে পড়ে।

কুড় সেই সেনাপতি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে



গান্ধীজীর ভাণ্ডি অভিবাস শুরু হ'ল ১২ই মার্চ। গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে এগিয়ে চলেছেন তিনি। শত শত গ্রামের অকিয়ারগণ পরভ্যাগ করতে লাগলেন। তাঁর ভাণ্ডি অভিবাস সম্বন্ধে প্রথমে সোক হেলেছে, তারপর মনোবোণ দিয়ে বেখেছে, তারপর তারা সন্ত্রস্ত অভিনন্দন জানিয়েছে।

চলেছেন, হাজার হাজার লোকের অন্তা মূক্তির দৃতকে দর্শনের অপেক্ষায় ঘন্টার পর ঘন্টা প্রতীক্ষা করছে। আর সেই মহা সেনাপতি নির্দেশ দিয়ে চলেছেন, তোমরা বন্দ্য পর, চুপা। কেটে আত্মনির্ভরশীল হও, অশস্যভ্রতা বর্জন কর, মস্তশান করোনা, লজ্যাগ্রহে যোগদান কর। তিনি পথ করে যাচ্ছেন যে, লবণ আইন প্রত্যাহার না

করলে সবরবতী আঁধারে তিনি আর ফিরবেন না। তাঁর সেবিনকার সংগ্রামের আঙ্গানে হাজার হাজার সৈনিক তৈরী হয়ে আসছে সংগ্রামে আত্মবলিদান অবধার জন্য।

এইভাবে ২৪ দিন ধরে পায়ে হেঁটে তিনি ও তাঁর সৈন্যসহ এসে পৌঁছলেন জাতিতে এই এগ্রিল। এই এগ্রিল ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের দরবে জাতীয় সন্থাহের পুণ্যস্থান। সেই পুণ্যস্থানে গান্ধীজী তাঁর যেক্ষাসেবকবাহিনী নিয়ে গিয়ে তোর ৬-৩০ টার লবণ আইন ভঙ্গ ক'রে লবণ তুলে নিলেন। নিজে লবণ আইন ভঙ্গ করার পর, যে যেখানে আছে সকল কর্মীদের তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করতে আহ্বান করলেন। লবণ তাঁরা নিতে পারেন, তৈরী করতে পারেন, বিক্রি করতে পারেন। অবশ্য পুলিশের অভিযাত্রার সতর্কতায় তিনি অবহিত হয়ে বাড়ির নিচে বললেন। নারীদের তিনি বললেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষের চেয়ে নারীই বেশী দান করতে পারে। তাইই অহিন্সার বেশী ভাল ব্যাখ্যা করতে পারে, কারণ তাঁদের আত্মত্যাগের আতঙ্ক পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী তীব্র।

তাঁর আহ্বানে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেন আগুন ধরে গেল। আইন অমান্তের তরফে যেন লহরীর পর লহরী তুলে গর্মে উঠতে লাগলো তেননি চললো পুলিশের গুলি, লাঠি ও অভিযাত্রার। বালালা, বিহার, উৎকল, ইউ. পি., দিল্লী, বম্বে, গুজরাট, পেশোয়ার, করাচী, মাদ্রাজ, কিছু আর বাকী রইল না।

এবার গান্ধীজী Irwinকে লিখলেন যে, ধারমানাতে যে লবণের ভিণ্ডো আছে, সেখানে তিনি ও তাঁর লগ গিয়ে লবণের ভিণ্ডো দখল করবেন। গভর্নমেন্টের অভিযাত্রার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এবং বললেন যে, সে লড়াই তিনি আরো দুসাহসিক পথে এগিয়ে যাবেন।

এই চিঠির পর গভর্নমেন্টের আর সেরা মইল না। এই যে রাত ১টা বেজে ১০ মিনিটের সময় জাতির লিডাকে অতি চুপে চুপে মটরে করে পুলিশ হারবেশ

জেলের দিকে নিয়ে চললো। ধাবার সময় তিনি সমস্ত দেশকে আহ্বান করে বলে গেলেন “আমার প্রোগ্রামের পর তোমরা লাল হারিও না। সমস্ত গ্রামবাসীগণ লবণ তৈরী কর। নারী, তোমরা বিবেশী বস্ত্র, আঁকি ও যনের বোকারে পিকেটি কর। বিবেশী বস্ত্র পরিধান কর। অশুশ্রুতা দূর কর। সমস্ত প্রকার ধর্ষণপ্রদায়, তোমরা পশুপক্ষকে আশ্রয় কর। ছাত্রগণ, গভর্নমেন্টে ছল কলমে বর্জন কর। গভর্নমেন্ট কর্মচারীগণ, চাকুরীতে পশুত্যাগ কর। এরকম করলেই আমরা স্বাধ্য পাব।” গান্ধীজী চলে সেলেন কারার অন্তরালে। রয়ে গেল তাঁর সংগ্রামের আহ্বান আহ্বান। দেশ যেন কেঁপে গেল।

মলে মলে কর্মী ধারমানা লবণের ভিণ্ডো লুট করতে যেতে লাগলো। ২১শে মে তারিখে ২৪,০০০ যেক্ষাসেবক নানাবিক থেকে সেখানে আক্রমণ করতে যেতে লাগলো। পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করল। ধারমানাকে তারা বিচ্ছিন্ন করে রেখে দিল। হস্তার মুণ্ডলি বন্ধ ক'রে দিল। Mr. Webb Miller ঔর New Freeman কাগজে লিখলেন “আমি গত ১৮ বছরে ২২টা দেশে আন্দোলন দেখেছি কিন্তু ধারমানার মত দৃঢ় আঁমি কোথাও দেখি নাই। অভিযাত্রার নির্মমতা দেখে আঁমি তৎক্ষণাৎ চোখ ক্রিরিয়ে নিয়েছি। অথচ অতুত সেই মৃদুলাবন্ধ যেক্ষাসৈনিকেরা। যনে হ'ত যেন গান্ধীজীর অহিন্সার এরা মজার মজার দীক্ষিত।”

অস্ত্রাভ লবণের ভিণ্ডো, যেন Wadala, Shiroda, Sane-katta প্রভৃতিতেও আক্রমণ চললো। সবরই লাঠিচার্জ এবং প্রেধার চললো। হাসপাতালগুলি ভর্তি হয়ে যেতে লাগলো। বিবেশীবস্ত্র বর্জন এমনভাবে চলছিল যেন ল্যাৎশোয়ারের ভাঙতে বাঁধা করা বন্ধ করার উপক্রম হ'ল। হাজারে হাজারে নারী বোকারে পিকেটি ক'রে এবং আইন অমান্ত ক'রে লাঠি ও কারাবরণ ক'রে দিল। Bombayতে লম্বুপারে dock yardএ হাজার হাজার Bale কাপড় গড়ে আছে, মার্চেন্টরা নিয়ে যাবে না। তারা নেবে না দির করেছে। গান্ধীজীর

বিশেষী বর্জন ঘেন আকাশে বাতালে ছেয়ে গেছে।
ওদিকে পিকেটিংএর বিকছে, করবন্ধের বিকছে, বহুকেটের
বিকছে Ordinance জারী হ'তে লাগলো। সারা
ভারতবর্ষে নির্মমভাবে লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ চললো।

ছাত্ররা মলে মলে মূল কলেজ ছাড়তে লাগলো।
সেখানেও পুলিশের অত্যাচার। বাংলা, বিহার,
উড়িষ্যাতে বিলাতীবর্জন সর্বাপেক্ষা বেশী হয়েছিল।
ইউ. পি.এড. কর্ণাটকে করবন্ধ আন্দোলন পূর্ণোচ্চমে
চলেছিল। বিহারে চলেছিল চৌকিমারী করবন্ধ
আন্দোলন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও আন্দোলনে
জ্বলিয়ে পড়েছিল। অসুখানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ছিল
সর্বত্রই। মধ্যপ্রদেশে চলছিল forest সভ্যাগ্রহ।
সোলাপুরে পুলিশের স্থান বধল করে নিয়েছিল
খেজাসেবকেরা। সংঘর্ষ বাধলো পুলিশের সঙ্গে। ৪৫
জন পুলিশ মারা গেল। অবশি সেখানে জারী হয়ে
গেল Martial Law. চললো তার নির্মম অত্যাচার।

সীমান্ত প্রদেশে এক মহার ব্যাপার ঘটল। অত্যাচার
ক'রে দমন করবার সময় কিছু গাড়োয়ালী সৈন্তদেরকে
একটা শান্তিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অন্তর সভায় গুলি চালাতে
আদেশ দেওয়া হয়। গুলি করতে নিয়ে যেতে লরী এল।
গাড়োয়ালী সৈন্তরা সেখানে যেতে অস্বীকার করল।
Court Martial ক'রে এদের ১০ থেকে ২০ বছর
পর্বত কারাদণ্ড হয়ে গেল।

এভাবে ক্ষত বিক্ষত ক'রেও ধ্বন ভারতের স্বাধীনতা।

আন্দোলনকে কিছুতেই নত করা গেল না, বরং তার
সংগ্রাম শক্তি প্রচণ্ডতর হয়ে উঠতে লাগলো। তখন
Viceroy গান্ধীজী এবং অস্ত্রান্ত নেতাদের সঙ্গে
আন্দোলনের আলোচনা চালাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ওদিকে ইংলেণ্ডে প্রথম R. T. C. বসে গেল।
প্রধান মন্ত্রী বললেন যে যদি Viceroyএর আলোচনার
আবেদনে সাড়া পাওয়া যায় তবে আরো কি করা যায়
বোধ্য হবে। এরপরেই ৭ দিনের মধ্যেই ১৯৩১ সালের
২৬শে জুলাইরী গান্ধীজী এবং অস্ত্রান্ত নেতারা মুক্তি
পেলেন। তারপর প্রায় একমাস ধরে চললো গান্ধী
Irwin আলোচনা। অবশেষে ১৯৩১ সালের ৪ই মার্চ
গান্ধী-Irwin চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। গান্ধীজীর সম্মান
তরে নেমে এসে Irwin সেই চুক্তি করলেন। সমস্ত
Ordinance প্রত্যাহার করা হ'ল। লবং আইন বহল
পরিমানে শিথিল করে দেওয়া হ'ল। প্রতিহারা স্বাধীন
ভাবে নিষেধা লগণ তৈরী ও ব্যবহার করার অধুনতি
পেল। অস্ত্র বিক্রি বা ব্যবসা করার নথ। আইন
অস্ত্র বন্দীরা মুক্তি পেল।

সর্বাপেক্ষা বড় বা বেশ পেল তা হচ্ছে সংগ্রাম কববার
শক্তি ও লাহল। এবং প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজের
বিকছে অহিংস অসহযোগিতার মুখোমুখি ধাঁড়াবার
শক্তি।

• অল ইন্ডিয়া রেডিক্স কলিকাতা কেন্দ্রে গঠিত।



নিষ্কলুষ হস্ত

অধ্যাপক শ্রীবিভূষণ গুহ

(Carl Sandburg's Clean Hands নামক কবিতার অনুবাদ)

এর চেয়ে বড় গর্জের কি আছে
সূর্যের পানে নিষ্কলুষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে
অহুভব করা,—যে আমার আত্মা বাখীন ?
সূর্যের আলো পড়বে আমার মাথা,
পৃথিবীর গায়ে পড়বে তার বাঁকা ছায়া,
হৃদয় আমার আনন্দে উদ্বেলিত—

যে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম তা রক্ষা করেছি,
আমার নিষ্কলুষ রক্ত ধমনীতে গান গাইবে ।
জীবনে একটি দিন নিষ্কলুষ হুটি হাত নিয়ে
যেতে পারি যদি, মাথা উঁচু করে'
সব মাহুষের মেনায়—

তার চেয়ে বড় গর্জের কি আছে ?
আমি একটি নিষ্কলুষ দিন যদি কাটিয়ে থাকি,
আগামী আর একটি নিষ্কলুষ দিনের প্রতিশ্রুতিও
থাকবে আমার ইচ্ছায় ।
কী অপরিণীত কৃষ্টি, গর্জের সঙ্গে হুটি হাত
হুলিয়ে চলা,—যে হাত অন্ততঃ একটি দিনও
করেনি কোন অস্ত্রায় ।

যে ঈশ্বর, একি সামান্য পর্গ
জীবনে অন্ততঃ একটি দিনও অহুভব করা—
আমার হাত হুটি অপবিত্র করিনি—পাপ আচরণে ?
এর নৃতি যে ভেগে থাকবে অন্তরে
কল্লান্ত পর্গান্ত—সেই শেখনি পর্গান্ত
যেদিন আকাশের তারাগুণি জলে উঠে
ছাই হয়ে যাবে ।
হ্যাঁ । অল্পসন্ধান করো এমন মাহুষদেরই
হাদের হাত অন্ততঃ একটি দিনও
লিপ্ত হয়নি পাপের কলকে ।

তাদের জীবনে এই একটি দিনের পৌরব,
এই একটি দিনের নৃতি, এই একটি দিনের আনন্দ
এ যেন স্তূটে আছড়ে-পড়া মনুষ্যের চেউএর
উজ্জল আনন্দ—এ বুঝি পৃথিবীর বুকের
অনির্জন্য বহির চেয়ে শাশ্বত ।

এ নিষ্কলুষ হাতেরই গাই অগণন ।
আমাদের মনে ভেগে আছে এই আশ্রয়হীন ক্রন্দন,
প্রিয়ার তরে, বন্ধুর তরে, যে কামনা,
তার চেয়েও গভীরতর এই কামনা ।
নিষ্কলুষ হাতের জপ প্রাণের এ আহুতি ।

সেই বীরদের জানাই প্রণাম,
যারা এ আশ্রয় মঙ্গল করেছেন জীবনে ।
জন্ম জানাই তাদের নীরব কঠিন সংগ্রামকে,
এই আশ্রয় প্রতিষ্ঠা করতে তারা দিয়েছেন বাম
থারা বজ্রমুষ্টিতে হুকেছেন ভাগ্যের সঙ্গে,
লোভের সঙ্গে, বৃত্তার সঙ্গে ।
তারাই তো সত্যিকারের বীর ।
নিষ্কলুষ হাতের পর্গ তাদের
জারা যে বেধতার চেয়ে বড়—
প্রণাম জানাই তাদের ।

কংগ্রেসের কাজ এবং বাড়ী

কালম গোশ্বামী

হাশপুর শহীর দিবস ৬ই জুন উৎসাহিত হয়ে গেল। বিরাট গোলমালের মধ্য দিয়ে দিন গেল কেটে। এখন নিষেধ সংস্থা করে নিতে পারবো তার প্রচুর সময় যাবে পাওয়া।

রাত্রে শ্রী বিচ্ বিচ্ করতে লাগলো; বেশ তোমার কাত-জ্ঞান নেই। অধিনীদা, লোকনাথ বাবুদা এলেন তাঁদের আর কলকাতার দিয়ে আসার সময় হোল না। আমাকে মিটিংয়ে একটু বলারও অসুযোগ বেওয়া হোল না। তারপর ছদ্ম বিতরণের ভার...আমি যাড়ে নিতে চাই না। কারণ শহীদ মিসেস বহু ছদ্ম নষ্ট করেছে। সারকেল অফিসার লিখেছেন; এ মাদের ছদ্ম শেষ হয়ে গেছে...। হ্যা...বাড়ী তোলায় যিক একটু বন লাগ...। উ কি পরম! তোমার যা কাত...রাগা ঘাটের সুবিধা নেই নেভাদের আনার সের্কা...। আহা...অভ্যর্থনা সমিতির রিপোর্ট পাঠ...। বেধ! তুমিও ছোট আর আদিও ছুটি...আর তোমার বলাই পার কিত বেশ পরিচয়ী তা বেশ বাড়ী তোলা হবে তো? বাসি কংগ্রেস...কংগ্রেস...। অস্তের বাড়ীতে আর কতদিন থাক চলে শুনি! যেব্ছ তো...তুমি বুঝেও বুঝে না...। কি করবে আশ্রই বল!

জ্ঞান শরীর। চাই আশ্রয়, অবশ্যই দূর করতে। কিছু নিরস্তির হু-লেখা আমার ভাগ্যানিপিতে মোটেই ওঠেনি। স্বামী-স্ত্রীর গোপন বাক্তা বহি এই হয় তাহে অশ্রুতের পরিহাস ভিন্ন কি বলা চলে। উভয়েই চূপ-চাপ। হারিকেনের বাতি জ্বলেছে। মাথার ওপর ঘড়ি টিক্ টিক্ আওয়াজ করছে। রাত হুটো বাজলো! রাতের আকাশ মলুকুমির যত খাঁ খাঁ করছে।

দুখ আসছে না চিন্তায়। সত্যিই-কি করা যায়। যদি আশ্রয় সব গেল। প্রতিজ্ঞা করলাম যে পর্যন্ত না বাড়ী তোলা শেষ হয় সে পর্যন্ত কোথাও যাবো না।

শ্রী চিন্তারত ঘেমে আলো কমিয়ে দিয়ে পায়ে খোঁচা

দিয়ে বলছে: শুনছ বুঝলে নাকি?...এমন বোধহয় অধিনীদার। সরস্বতী প্রেসে...। আমার বেতে ইচ্ছে করছিল...টাকা নেই। যেখ মিটিংয়ে যেহদি এসে অনেক ভাল হোত। তোমারও যা—অকপদা, ভূপেনবা আসবেন...লোককে বলাই বা কেন?...বাড়ী তৈরী হলে এত আনন্দ হোত।

চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার মত বজ্রম তুমি আছা লোক তো! রাত হুটো...। পরমে বাহুব বাচে না আর তোমার অধিনীদা। এত করে বজ্রম হুতো। হারাবার কথা বলো না...তুমি আমার অপমান করেছে। এতএব এই স্থান ত্যাগ করে ভিন্ন শয্যার ব্যবস্থা করছি। আর লোকনাথবাবু বলে গেছেন...শ্রী ত্যাগ করন। অধিনীদা বলে গেছেন...শ্রী ত্যাগ না করলে বদলেই হয় না।...বলেই বাড়ুংখানা বগলদাবাং করে বাবাগায় এসে শুয়ে পড়লাম।

রাত্কার কি তাহে কেটেছে বলা শক্ত। তপে নিষেধ ব্যাপার...পরমে খুব হয়নি। রাত্রে শ্রীকে মেবেছি আলো জ্বলে চিঠি লেখালোঁ করতে। সকালে উঠেই এক ব্রাদার জল; তারপর চূপ করে কিছু সময় বস।

নিষেধ বাড়ী তুলতে হবে। বেরিয়ে গেলাম বাড়ীধ কাছে। ভ্রাম যাত্রা কথঁ লোক...বাড়ী তোলায় ভার নিয়েছে, মজুর লাগিয়েছে। মিজাদা করলে; এমন যে পর্যন্ত না বাড়ী শেষ হয় সে পর্যন্ত কংগ্রেসের নাম নেবেন না এই টিক হ'লো তো?

কই হাস সমিতির সভ্য এসে হাজির। এসেই প্রণাম করলে। বলতে লাগলো; আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর বয়স বছর তেইশ। তাকে একজন কুলিয়ে নিয়ে গেছে। কংগ্রেসের কাছে বিচার অনাছি। বজ্রব; আছা বেখা যাবে। ভাবলাম—ধন্য কংগ্রেসের কাজ। তাকে বিদায় দিলাম।

দু'খানা বাইক এসে হাজির। P. W. D.র "ওভারসিয়ার"। নদীর বাঁধ কি করে বন্ধ করা যাবে তার সম্বন্ধে আলোচনার মত। জনসাধারণের সাহায্য বাড়ীত হওয়া অসম্ভব। এক মাইল বাঁধ বুঝে দেখা হোল।

দূরে ফিরে বাড়ীতে এসেছি। একজন এসে হাফিজা। বলছে : আপনাকে একবার 'দি, ওর' কাছে যেতে হবে। একটা লোক "পাপর" জারী করেছে। দেখুন না কেন ছেলের জমি বিক্রী করলো এখন আবার পাপর জারী! কংগ্রেসের নিকট বিচার আনাচ্ছি। হরি পাপর জারী ৩৭ হয় তবে আপনাকে কিছু হবে।

কংগ্রেস অফিস এলাম। বেলা ১২টা। কাননবাবু একি ব্যাপার? P. W. ডর কলীরা আমার জমি থেকে তিন ফুট মাটি কাটছে। এ বছর কী আর ধান চাষ হবে। কংগ্রেসের কাছে দরখাস্ত করে গেলাম।

হাঁ! বাবু আমার খালার বিচার করে দিন। সবাই জানে খালার চেয়ে নিয়ে গেল...তারপর অস্বীকার; ধর্মদাণ্ডার হরিজন বিদ্যালয়ের সম্প্রদায় উপস্থিত হলেন। ফুলের রিপোর্ট দিলেন। এখন কংগ্রেসের কী কার্য-তালিকা বসুন তো? আপনার কাছে এট বিচার আসবে; বললি—নথি-পত্রের সামনে ধরলো। স্ত্রী পর্বতী। সকালে উঠেই তালের শাঁশ খেতে আরম্ভ করেছে। বাড়ীর বাসি-পাট হয়নি। কি লক্ষীচাঁচা কাণ্ড। স্বামীই হলো রাগ। সন্ধ্যা ছিল কাঠের চেলো। দিলে বসিয়ে দা কতক। বাস।...গ্রামের লোক টাকা খেয়ে ছেড়ে দিয়েছে।...পুলিশকে এজাহার দিতে বাধ্য করেনি।

বাবু! জুলোর বীজ দেন না আমাদের!

একজন বুড়ীনা কোলে কলসার শিশু। পায়ের কাছে বসে বলছে—“তু খেওগা বড় করলেন কেন?” কি উত্তর দেওগা বাবু!

একজন এসে খবর দিলে তেহসিলদারীতে সারোগাবাবু আপনাকে ডাকছেন। ১০৭ ধারার তদন্ত। বাবের ওপর দিয়ে যাচ্ছি...একজন কটাক্ষের মেয়ে। মাথার বেড় মনের ধানের বস্তা। পানের সাথীকে বলছে : মুখপোড়া কংগ্রেসের জালার চালের ব্যবস্থা করা যায়। দু'পদা করে দিয়ে তাও আবার বশ সের চালের পারমিট কাটান...হাঁ, সিঁচি পত্ত কেপে দু'মকমরা দিয়ে কত পেলো? কি আর পাখ...দু'পত্তা হুঁ টাকা।

যাচ্ছি...হাক মোলই সান্দনে পড়লো। হাঁ, বাবু চালগুলো কি কটাক্ষের বস্তা থাকবে না। হাঁ! ওদের মেয়েটা পাণিয়ে এসেছে। জুবীর সোয়াখি এসে হাফিজা, বা হব বিচার করে দিন।

তেহসিলদারীতে গেলাম। সারোগাবাবু বসে, আপনাদের বিকছে বিরাট অভিযোগ বড় বাবু আনবেন। আপনারা হাফিজার হাফিজার টাকা খুব থাকেন। হাসি এলো। বাড়ীতে এসেছি। বাওগা বাওগা সেয়ে উঠেছি; বাওগার একজন এসে বসে রয়েছে, দেখুন—অনুর পোঁসাই বাবুনের ছেলে বউ ত্যাগ করলে। বিয়ে করার আগে যেখানি না কেন কনে পোঁসাই...এখন নেবে না... প্রায়শ্চিত্ত করে নিলেই চুক যায়...! আরেকটা ব্রাহ্মণের বিবাহিতা কন্যা বাড়ীতে এনেছে যে করার মন্ত। মেয়েটাকে আবার তার স্বামী নেয় না। এখন বাপ বলছে আমি যে করবো আর ছেলে বলছে আমি যে করবো।

সংবাদ এলো "বেচার"-বা যাচে না। তাড়াতাড়ি যেতে গেলাম। পাচটার কংগ্রেস অফিসে গেলাম, বলা যায় নাশিন এলো; এই সেদিন বিচার করে দিলেন আবার আমার স্বামী মারখোর হুক করেছে সেই মেয়ে মাছবটীর কথার।

পাশে কখন একটা মেয়ে এসে হাঁড়িয়ে রয়েছে। বলতে লাগলো; বিধবা বিধবা দিলেন আপনারা...কিন্তু এক-মোরে করে তবে ছাড়লো...এখন আমার দেব দেবা পর্যায় বড়...ওঁটার বিচার কি করলেন? আর শুধু... নটুর জীকে তার বাপ নিয়ে গিয়ে পুনরায় বিয়ে নিয়েছে। তার কি করলেন? ব্রাহ্ম আচ্ছা ভাবছি কি করা যাবে!

বাড়ীর কাছে বখন গেলার তখন হাত বাটটা। পাশে মাভুলের বাড়ী, সেখানে গিয়ে যেখি স্ত্রী লসরীয়ে উপস্থিত। চা পান করছি মাঝীমা বলেন : তোমার স্বামী এলে আমাদের দরকট করবে পড়ার ব্রাহ্মণরা, তোমরা মুজীর বাড়ীতে গিয়েছ। আর তোমাদের আমরা স্বান দিই...এই অপরাধের মন্ত। বলবেন : "ভতী হয়ে মুচি হয় যদি কুক ভাবে...আর মুচি হয়ে ওঠী হয় যদি কুক

ভয়ে।" স্ত্রীকে বলান; এখন তোমার অনিন্দ্য
কোথায়! ... এখন বোর...

ভাবছি ... কংগ্রেস...কংগ্রেস...মহীম দিবস...মহীম
দিবস করে কাটালে চ'লে কোথায়! স্ত্রীর গুণনা বাড়ীর

কাছে নিয়ে গেল। জন-মজুর কেউ নেই...বাথের দোরের
দাঁশের স্কেপে অঙ্ককারের খেলা...। বাড়ীর বড়ের
চালে জ্যোৎস্নার হাদি...আমি একা দাড়িয়ে। বাড়ী
তোলা দেখ হবে কিনা কে জানে।

পথভ্রষ্ট

শ্রীকৃষ্ণরজন মল্লিক

হিন্দু তুমিও পরিবর্তনে

হয়েছ কলঙ্কিত,

কোনো হীন কাম করিতে হওনা।

কই তো এখন তীত ?

পুণ্ডন, অণুদ্রব, হত্যা কাণ্ডে,

আর কই ভব বিবেকেতো নাহি বাজে ?

আগেকার মত হীনতা পরশে

নও তো সচ্চিত ?

তোমায়ে বলিত লোকে কাপুরুষ

দুর্গাম সেটা বটে,

এখন যে তুমি টানিয়া আনিছ

নরক মল্লিকটে।

জংম, নষ্ট, হৃত, বিকৃত করা—

বীর্য বলি গণে বলি এই ধরা

তুমিও কি বোঝ তাতে দানবের

গৌরব বেশী রটে ?

আদর্শকেই বেছ চিরদিন

অমমাল্য যে দান,

চিরদিন ধরি তুমি করিয়াছ

ধর্মের অর গান।

করিয়াছ তুমি বহু দুর্গতি ভোগ।

তবু ছিল চিরকল্যাণ সাথে বোণ।

দীন ছিলে হয়ে দীনবন্ধুর প্রিয়

কাছে ছিল ভগবান।

শক্ত হয়েও কম্পাঙ্গল হওয়া

ভ্যাগে ও অগমিত,

ধনী হয়ে তুমি ছিলে দীন সম

নহে কি আকাঙ্ক্ষিত ?

অহিংসা নিয়ে করিতে হিংসা অর,

হুসি হয়ে থাকে পনে পনে পরাম্ব

তাহাও প্রাণ্য—আত্ম করিতেছ

আশনারে বঞ্চিত।

এখন তুমি যে করিয়া বেতেছ,

কেমনে নীরবে রবে।

বেদনা দিতেছে—এ অবতরণ

পদখলন শুধ।

মহামহিমার জ্যোতির্বর্ষ ছাড়ি

কর পুলা মাখি পুলা লবে কাড়াকাড়ি,

বেদতা হইয়া অহর মাধার

উদ্ভম অভিনব।

দেশসেবকের পত্র

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত জীবিতেশ চক্রবর্তী, কলিকাতা।

বন্ধুহরেবু,

আকাশে আলোর বেগা এখনো কোটেরি, গাঢ় রাতির তন্দ্রা কাটেরি এখনো, আমার টেবিলের উপর ঘোম বাজিটা গলে গলে এখনো জলছে। টলটল করে গড়িয়ে পড়ছে তরল মোন, তার শিক্রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, কি মনে হচ্ছে জানো? এ যেন সারা ভারতবর্ষের উপর অন্ধ, লক্ষার হানিতে, নিরাশার বেদনায় যে অন্ধ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

তোমার কাছে লিখতে বসেছি কেন জানো, কলম আমার চলছে না, সারা মনের ভিড় করা বেদনা খামিয়ে দিচ্ছে লেখার প্রবাহ, তবু আমি না সারা জীবনটা একটা ঘোঁষ চাচার নত্যা আমার চোখের সামনে এসে গাড়িয়েছে, বহননের ভূগে বাওরা পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি যেন আমি।

জানি তোমার আকাশও আত্মজ্ঞান, তোমার খাটও আজ বেদনার অস্ত্রতে সিক্ত হয়ে উঠেছে, তোমার রাজপথ আজ ধূহ, অর্থনৈতিক তোমার জাতীয় পতাকা, তোমার নগরীতে আজ আমার এই গ্রামের মতোই নীরব শুষ্কতা, আমি আমার চিরি তোমাকে বিব্রত করে তুলবে, যে মহাপুরুষের মহাপ্রাণে তুমি আজ গুপ্তিত সেই বেদনাকে মোচড় দিয়ে আরও বাড়িয়ে দেবে, তবু তোমাকে না জানিয়ে পারছি না, আমার মনের সমস্ত তন্ত্রী আজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, এই ব্যথার দুর্বল ধোঁবাকে নামাতে না পারলে জীবনে আমি শান্তি পাবো না।

১৯২১ সালের কথা তোমারও বোধ হয় মনে পড়ে, সেদিন যে বড় উঠেছিল পরায়ী ভারতবর্ষের আকাশে সেই স্বভের ছোতা ছিলেন যিনি সেই অধিনা—অদহযোগ ময়ের যিনি ছিলেন উল্গাভা, সেদিনকার ভারতবাসী সেই মহাপুরুষকে সম্পূর্ণ চিনতে পারেনি। তবু তারা তাঁর

আদেশ যেনে নিয়েছিল, তাঁর আশ্বাসনে জাঁপিয়ে পড়েছিল।

আমার বয়স তখন মশ বছর, আমার বাবা সেদিন জাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই আশ্বাসনে। সেই যে সেবার জেলে গেলেন আর তাঁকে কখনো আমি ঘেঁষিনি। তাঁকে গ্রেপ্তার করার কয়েকদিন পরে পুলিশ আমার মাকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল। আমি আর আমার দিদি ছাড়া পরিবারে আর কেউ ছিল না। আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিলাম নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছিলাম, কিন্তু পুত্রের সেহের বন্ধন পারবে কেন এত বড় রাজশক্তির অস্ত্রবলের সংগে, লিপাইরা টেনে ছিনিয়ে নিলো আমাদের। মা বাবার সময় আমাদের একটা চুপন করলেন, বললেন তোমার মাকে ধরে রাখতে পারে এতবড় শক্তি কারো হয়নি। আমি আমার তোমার কাছেই ফিরে আসবো, তাঁর চোখের কোণে ক্ষতিক্ষের মতো অশ্রুতপা টলটল করছিল, আমার শিশুদৃষ্টি বোবা বিম্বের সেদিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর.....

তারপর এত বড় নিষ্পন্ন বাড়ীটোতে আমরা একা, আমি আর দিদি। আমার শিশুমন মাঝে মাঝে হাহাকার করে উঠতো, কেঁদে উঠতাম আমি, দিদি ভাড়াভাড়ি চরকাটা আমার কাছে এনে দিতেন। আমার বাবার প্রতিদিনের সংস্কার এই চরকা। দিদি বলতেন—চরকা কাটলে কোন দুখ থাকবে না, বেদনা মিলিয়ে যাবে, গাঝীকী বলছেন। আমিও একান্ত বিবাসে চরকা ঘুরাতাম।

তোমার বলা হয়নি যে আমার দা ছিলেন লন্ডান লন্ডা। হুঁতিন মাসের মধ্যেই জেলে তাঁর লন্ডান কুমিঠ হলো, আমি দিদি পেলাম বেগা করতে। মাকে ঘেঁষেই কেমন চমকে উঠলাম আমি। তাঁর সারা ঘেহে একমোটা ব্রহ্ম ছিল না, শ্রী কাশ্যে সারা দুখ, অচেতন হয়ে পড়েছিলেন জেলের হাসপাতালে। মার এখনিতর অস্থবেও বাবারকে আসতে দেওয়া হয়নি। হাসপাতালের ডাক্তার বললেন যে মার বাঁচবার আশা খুবই কম, তবে আমার ভাই বাঁচতে পারে।

হলোও ঠিক তাই। পরদিন সকালে যা যারা গেলেন। আমি আর যিনি দাভারাত তাঁর বিছানার পাশে বসেছিলেন উদ্ভাসী হয়ে। সন্ধ্যার আগে যা বলেছিলেন—আমাদের জন্য যারি বলে আমার আনন্দ হচ্ছে। তোরাও আদর্শকে ছাড়িস না, তাঁর আদেশ বেনে চলিস। তাঁর শিখিল হাতটি চেপে ধরেছিলেন আমি। আমার কিছু কাগা পারনি, সমস্ত অস্ত্র স্তবিরে গিয়েছিল।

বেলা আটটার সময় ছোট ভাইটিকে কোলে করে আমি আর যিনি ঘেলের হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার দশ বছরের শিশুমন প্রতিজ্ঞা করেছিল জীবনে এদের কখনো কমা করবো না আমি।

ভাষণের থেকে সেই ভাইকে বাহুর কড়াই আমার একমাত্র কর্তব্য হয়ে উঠলো। যিনি থেকে লসাবের সব কিছুই করতে হতো। তাই তিনি লম্বা পেতেন না বেশি। আমার মূলে হাওয়া বহু হয়ে গেলো। অতটুই ছেলেকে বড় করার মতো শক্ত কাঁধ বোধ হয় তুমি নেই পৃথিবীতে। মাঝের দুধের অভাবে তাকে ছাগলের দুধ খাওয়ানো হতো। রাতে প্রায়ই কান্ডো খোকা। তাঁর শ্বাসের যিনি অস্ত্র হয়ে উঠতেন, আমিও ঘুম থেকে জেগে উঠতাম। কতদিন ঘুমের ঘোরে দেখেছি আপন বুক অনাবৃত করে যিনি নিজের স্তন গোকার মুখে চেপে ধরে তাঁর কাগা খানানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু কুমারী মেয়েই সেই স্তন খোকার মুখে থাকতো না, সরে যেতো। যিনি আরও বিরক্ত হয়ে উঠতেন। মাঝে মাঝে তাঁকে কান্ডাতেও দেখেছি। আমার চোখ যিৎও অকারণ জল গড়িয়ে পড়তো। এমনি রাতেই মনে পড়তো আমার মাকে।

বছর দু'রেক পরে বাবার বৃত্তা সংবাদ আমাদের কাছে এলো 'হেলে টিউবারকুলোসিস তাঁর বৃত্তা হয়েছে। আমার এক পিসেমশায়ও হেলে ছিলেন বাবার সংগে। তিনি আমাদের কাছে ফিরে এসেন সেই সংবাদ নিয়ে। ছোটখোকা তখন হাঁটতে শিখেছে। তাকে দেখেই পিসেমশায় অড়ির বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। তাঁকেও বিরক্ত হয়ে পড়তে দেখেছি সেদিন।

কয়েকদিন পরে ঠিক হলো আমরা সবাই গাভীমৌকে দেখতে যাবো। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম আমি আর যিনি। সেদিনকার কিশোর মনের স্বপ্ন, আত্ম হস্তিমে গেছে, নইলে তোমাকে তা উপহার দিতে পারতাম।

সবরমতী আশ্রমে গাভীমৌর সাথে দেখা করতে গেলাম। বেশি সকালবেলা ছোট একটি বিছানার বসে বসে কি বেন দেখছেন। পিসেমশায় আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি আর যিনি প্রণাম করলাম, আমার ছোট ভাইকে কোলে নিলেন। তাঁর জন্য কাহিনী শুনে একটি হাসলেন, বললেন—'He is born in heaven'. আমার মিকে তারিখে কি বেন বললেন, পিসেমশায় বুঝিয়ে দিলেন গাভীমৌ ব'লছেন—আমাদের যা বাবার আশঙ্ক ত্রুত বেন আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর কাছে বসে মনে মনে সেদিন প্রতিজ্ঞা করলাম—জীবনে এ ত্রুত ছাড়া আমার আর কোন কাহ নেই, কর্তব্য নেই।

ফিরে এলাম কুমিল্লাতে নিজেই বাড়ীতে। পিসেমশায়, যিনি আর আমি মিলে আমাদের সেই বাড়ীকে করলাম আশ্রম। এখানে নৃত্য। কাটা হবে, তাঁত বোনা হবে, গ্রামের গরীব মেয়েদের আশ্রয় দেওয়া হবে, তাঁদের জীবিকার জন্য নানারকমের কৃষ্টিশিল্পের বন্দোবস্ত হবে। তাঁর স্বপ্নে যেতে উঠলো আমার সারা মন।

সারাদিন কাজের কোঁকে কেটে যেতো, নিজেরের প্রতি নজর দেবার অবকাশ হতো না আমাদের। লক্ষ্যে লাগার মাতুর পেতে আমরা বলতাম, আমাদের পড়াশুনার ক্রীণ বলতো, পিসেমশায় আমাদের পড়াতেন। তাঁর ক্রীণে ছাত্র ছিলাম আমরা বেশ কয়েকজন। গ্রামের ত্রুত ছেলেরা অবশ্য আসতো না, কারণ আমাদের আশ্রমে গরুর থাকতেন তাঁরা ছিলেন আমাদের সমাজের নীচু শ্রেণীর লোক, আমাদের সংগে গ্রামের ত্রুত ছেলেরা আসাপ পর্ব্ব করতো না, তবু আমরা মনে হাইনি, নিরাশ হইনি।

কয়েক বছর এমনি করেই কেটে গেলো। গ্রামের

একটি কামৰ ছেলের সংগেই দিগ্ৰি বিয়ে হলো। কাণ্ডের অশ্লিষ্টতা হতে পারে বলে দিগ্ৰি বিয়ে করতে আপত্তি ছিল, কিন্তু পিসেমশায় শোনে ননি। বলেছিলেন গাৰ্হৰ খৰ্কে অস্বীকার করলে আমাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। গান্ধীজীও ত বিবাহিত।

কিন্তু যেমন পেতে চাইছিল আমাদের সবাইকে। গ্রামের ভুলপোকলের পরামর্শে দিগ্ৰি স্বামী দিগ্ৰিকে আশ্রম ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। ছেড়ে যাবার সময় দিগ্ৰি সে কি কহা। আমরা ছ' ভাইও সেদিন দিগ্ৰিকে অড়িয়ে কেঁপেছিলাম, আমার ছোট ভাই ত দিগ্ৰিকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারত না। তবু সেদিনকার সে বিচ্ছেদ আমাদের মনে নিতে হইছিল বিধাতার অভিশাপ হিসাবে।

বেশনাহত মন নিয়ে সেদিন গান্ধীজীর কাছে পত্র লিখেছিলাম। গান্ধীজী সন্মত মিলেন, লিখলেন—মাহুকের অৰ্দ্ধলোকে মাহুঘ ত একাই, যারা ভোবার সংগে বতদিন থাকে ভক্তসিনই ত তোমার আপন, তাবের যদি ছেড়ে দিতেই হয়, তবে সে ক্ষতিও স্বীকার করতে হবে বৈকি। মনে মনে গভীর একটা সান্না পেরেছিলাম সেদিন। ছোট ভাইকে বৃকে অড়িয়ে ধরে আমার প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করলাম।

তারপর ১৯৩০ সালে পিসেমশায় আর আমি এক সংগেই গ্রেণ্ডার হলাম, পুলিশ আমাদের আশ্রমকে প্রায়ে ভেঙে দিলো। অনেককে গ্রেণ্ডার করলো, অনেককে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দিলো। সেই আশ্রমের ভগ্নাবশেষ মধ্যে পড়ে রইলো আমার মল বছরের ছোট ভাই।

আমার সংগে সংগে অনেককূর অবধি সে এগিয়ে এসেছিল। তারঅন্ত ভারী চিহ্নিত হয়ে পড়েছিলাম আমি, কিন্তু তার মল বছরের বিশোর মুখে একটা ব্যথের হাসি ফুটে উঠেছিল, বলেছিল তুমি কিছুই ভেবে না, এই ভাংগা আশ্রমের প্রত্যেকটি টুকরোকে জড়ো করে আমরা আবার আশ্রম গড়ে তুলবো। তার কথা শুনে একটু হাসলাম আমি, মনে পড়লো গান্ধীজীর সেই কথা—He is born in heaven. দেশপ্রেমিকের জ্ঞ

মেলখানায় ত স্বর্ণ, এখানে না এসে দেশকে ভালবাসতে ত পারা যাবে না।

তারপর জেলের বাইরে বেশদিন থাকার সৌভাগ্য আমার হয়নি কয়েকবছরের পরে কয়েকমাস বধন ছুটি পেতাম তখন দেখতে পেতাম আমাদের আশ্রমটি, দেখতাম শৈলেন সেই বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলোকে জড়ো করেছে, ঠাকা ভরে উঠেছে মিন মিন, মিন মিন ত্রি ফিরে আসছে আশ্রমের, দেখে আমার মনে হতো পৃথিবী তারতবর্ষের বৃকের উপর স্বাধীনতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই আশ্রমে, এর পাখক, এর মনক গান্ধীজী, আর আমরা তার অঙ্গাঙ্গী পুজারী।

১৯৩৭ সালে গান্ধীজীর সাথে আমার আবার দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—বাংলাদেশে গেলেই তোমার আশ্রম বেধে আসবো, আনন্দে অবীর হয়ে পড়েছিলাম আমি, আমার আশ্রমেও একদিন পদাূলি পড়বে সেই মহামানবের, দয়া তারতবর্ষ বাকে প্রদা করে, গীর কাছে মৃতক অবনত করে সমস্ত তারতবাদী, সেদিন হবে আসবে, কবে ?

১৯৩৯ সালে গান্ধীজী বধন ব্যক্তিগত সভ্যগ্রহ করেন তখন আমি আর শৈলেন ঠিক করলাম, আমরা তাতে যোগ দেবো, গান্ধীজীর সংগে দেখা করতে গেলাম, শৈলেনকে বেধে প্রথম চিনতেই পারলেন না, আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম, বললাম—Here is your heaven born child, Bapuji, now a man !

অনাবিল হাসিতে গারাম্ভ ভরে উঠলো বাপুজির, সেই হাসি তুমিও ত কতবার দেখেছ বন্ধু, ভাবতে পারো তারতবর্ষের আর কোনো লোক তেমন হাসতে পারে ! বলেন—You're for heavenly purposes Sailen, don't forget it. ঠাাকে আবার আমরা প্রণাম করলাম।

আমাদের প্রত্যাবৃত্তনে গভীর হয়ে গেলেন তিনি, অনেককণ চুপ করে রইলেন। তারপর বলেন—মহার ত একই কাজ নয় স্বপ্নী, তোমাদের কাজ গঠনমূলক, স্বাধীনতার চাইতেও তোমাদের মূল বেশি আমার

কাছে। কারণ তোমরাই সত্যিকারের দেশসেবক, একটা দিন জেলের ভিতর কাটলে দেশের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে, তোমরা ফিরে যাও। আমরা নতুনভাবে প্রণাম করে কিংবদন্তি আশার সহায় হয়ে বসে—“Remember, country needs you more than myself.”

বাংলাদেশের একটা কোথেকে আমাদের দিন কাটছিল। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস লিখতে বসিনি আমি, তা ছাড়া তুমি ত তখনকার রাজনীতির সংগে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত ছিলে। আমাদের সেই ক্ষুদ্র আশ্রমটি বৃহত্তর পরিবেশে তৈরী হয়েছিল। গান্ধীজীর আশ্রমে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের পরিকল্পনা নিবেই আমরা কাজ করছিলাম, রাজনীতির সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তখন পর্যন্ত আমাদের ছিল না, যেমন ছিল না আরও অনেক গান্ধীভক্তের। গঠনমূলক কর্তব্যকর্মের দিকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল।

হঠাৎ একদিন গান্ধীজী লণ্ডন গেলেন, “করবেইয়া মরকে”। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে বললেন—“Quit India”. ৬ই আগস্টের কংগ্রেস প্রত্যাহার পাশ হলো, সেদিনই রাত্রিবেলা গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হলো, গ্রেপ্তার করা হলো মহরলাল নেহরুকে, আচার্য কৃপালনীরকে, আর হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মীদেরকে, পরদিন অকস্মাৎ আমাদেরও গ্রেপ্তার করা হলো, শৈলেনের নামেও পরওয়ানা এসেছিল কিন্তু আশ্রমে ছিল না বলে তাকে গ্রেপ্তার করা গেলো না।

গেদিন বৈকালেই জনলাহ—দেশনেতাদের প্রতি এই অভ্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ দেশময় বিদ্রোহ ছড় হয়েছিল। মনে হলো ভারতের অগণিত স্বাধীনতাকামীদের সংগে মিলে যোগ দিয়ে এই বিদ্রোহে। অভিনন্দন জানাই কংগ্রেসের প্রত্যাশকে, গান্ধীজীর প্রতিজ্ঞাকে, কিন্তু জনতার স্পর্শ থেকে আমাদের অনেকদূরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, আমার চারিদিকে কারাগারীয়েদের বাঁধ, আমার চোখের দৃষ্টি প্রতিবন্ধ হতে কিংবদন্তি আসে, আমার ঘরের ঘরজায় রাইফেল হাতে ঘুর বেড়ায় জেলের প্রহরী, মনে হলো আমার মত হাজার হাজার কর্মী আজ বন্দী;

তারদের মনে বিদ্রোহের শিখা, তাদের মনে স্বাধীনতার অত্যাগ্র আগ্রহ, মনে মনে প্রণাম করি এ যুগের স্মৃতি গান্ধীজীকে পণ্ডিতের ভারতবর্ষের জাতীয়তার জনককে, অত্যাগ্র দেশপ্রেমিকের অদ্বৈতবাদী ব্যক্তিত্বকে।

কিন্তু তুমি পরেরই বা জনলাহ আমার ডাকে মুহূর্তমান হয়ে পড়ার মধ্যেই কারণ ছিল, পুলিশের গুলিতে শৈলেনের মৃত্যু হয়েছে। আমার মনে হলো আমার পাখের তলা থেকে পৃথিবী সরে যাচ্ছে আশ্রমে আসতে, আমার আর আশা করার রইলো না কিছুই, নির্ভর করার রইলো না কিছুই, কোন জানি না আমার দার সেই কবর ক্যাকাশে যুগ চোখের সামনে কেমন উঠলো, আমার হাতে তিনি জুড়ে বিয়েছিলেন তাকে। হুঁচোখে ছাপিয়ে পড়লো উল্লসিত অশ্রু, দশ বছরের শিশুর মতই কাঁদতে লাগলাম আমি। পরবর্তী ভারতবর্ষ আমার কিছুই রাখলো না, কোন আনন্দই আমাকে পেতে দিলো না; কোন ভবিষ্যৎই এলো না আমার জীবনে।

গভীর রাত পর্যন্ত নিজের ঘরের মধ্যে পাগড়ারী করে বেড়াতে লাগলাম আমি, বন্ধুরা সাধনা দিতে লাগলেন—কিন্তু সাধনা কি ডাকে পাওয়া যায় বন্ধু! হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাপুজির কথা—He is born in heaven. মনে হলো আমার মতোই অন্ধকার কারাগারের একটা প্রকোষ্ঠে তিনি বন্দী, এ যুগের দর্শনশ্রেষ্ঠ মানব। ত্যাগত্যাগি কাগজ কলম নিয়ে তাঁর কাছে লিখতে বসলাম, লিখলাম—শৈলেন আর নেই, রাজপথের শুভ ধূলি তাঁর বুকের রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে। আমার মন কিছুতেই সাধনা মানছে না।

কয়েকদিন পরেরই তাঁর সমাধি এলো, লিখছেন,—Why do you worry about his death? He was born for the Mother, he worked for the Mother, he died for the Mother. I am proud for him.

তাঁর সেই চিঠির টুকরোটি আজও নিজের কাছে সন্নিবিষ্ট করে রেখে দিয়েছি। এখনই হুঁচকি হঠাৎ করে পড়ে যেছি।

ওয়েল থেকে বহন বেরিয়ে এলাম, তখন শরীর ভেঙে পড়েছে, মনে এসেছে অবসান, ভাংগা শরীর আর কণ মনকে টেনে টেনে নিয়ে এলাম আশ্রমে। দেখি, শৈলেন মুকুট দিয়ে বরণ করে নিয়েছে আশ্রমের মহিষাকে, তার ভক্ত বেনী তৈরী হয়েছে আশ্রমের সামনে, প্রতিদিন আশ্রমের মেয়েরা সন্ধ্যা সেখানে ব্যতি জালায়, প্রার্থনা করে, তাদের অঙ্গুল সেই বেনীর উপর করে পড়ে টপ্ টপ্ করে।—আশ্রমে প্রবেশ করার পথই মাথানত করে সেই বেনীকে প্রণাম করলাম।

তার পরের কটি বছরের ইতিহাস দিয়ে ভারাক্রান্ত করবো না তোমার মুহূর্তগুলোকে। সাম্প্রতিকতার যে বিষ ভারতবর্ষের নাকীতে নাকীতে ছড়ানো হয়েছে, সেই বিষ জরুরিত করে দিলো ভারতবর্ষকে, সেই বিষ কেন্দ্রিত হয়ে উঠে গ্রাস করলো মাহুঘের স্থবনীড়কে, হুহুভাবে বাঁচবার কলনাকে, সেই বিষের প্রতিক্রিয়া প্রথম দেখা গেল কোলকাতায়, তারপর নোয়াখালিতে, তারপর বিহারে। ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়লো সেই কণা, পাণ্ডায়ে, বৃক্ক-প্রদেশে, জলে উঠলো গোবাল, ভনীহুত হয়ে পড়লো মাহুঘের স্থবনীড়, আর তার সাথে সাথে ভেঙে পড়লো গাড়ীকীর আকৌবনের দানবার বাঁধ, তিনি নব নব অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠলেন সাম্প্রতিকতার এই বিধ-বান্ধের কবল থেকে বেশকি বাঁচাতে, সেই মানব প্রেমের আকর্ষণ তাঁকে টেনে আনলো নোয়াখালিতে এবং আমার আশ্রমে।

নোয়াখালি থেকে আগত অনেক নির্ধারিতা ধর্মাব্রতা মহিলা আমার আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল। তাঁদের মধ্যেতেই একদিন এলেন গাড়ীকী, আশ্রমে ক্রীতেই বেধলেন শৈলেনের ভক্ত নিখিড বেনী—এর করলেন—এমি কার ?

বলান—‘শৈলেনের’,

মুহূর্তের ভক্ত রান হ’লো নুং, তারপর আমার নির্বল চাপিতে করে উঠলো, বলেন, ‘Here lies the heaven born child.’ তারপর হাততুলে বেনীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন।

আশ্রমে চুকেই আমার বললেন—তোমাকে বলে-ছিলাম তোমার আশ্রম দেখবো! অবশেষে এগাম ত। বলান,—না এলে পারতেন না বলেই ত আসতে হলো। হাললেন তিনি।

আমার ঘরে চুকে বিবেকানন্দের কটোটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর কাছে গিয়ে বীতে বীতে ছবির নিচের দেবাঙ্কুরো পড়লেন—‘I am Existence absolute, Knowledge absolute, Bliss absolute, I am He, I am He, (Shivo aham, Shivo obam)’ পড়েই সারামুখ তার উজ্জল হয়ে উঠলো, হাত তুলে নমস্কার করলেন, অশ্রুটভাবে কি বেন একটা বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। অনেকক্ষণ নিম্নত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, বেন দখি হারিয়ে কেলেছেন, চোখ ছুঁী অর্থমুদিত হাত ছুঁী জোড়করা, আমি নির্বাক বিষয়ে তাঁর সেই ধ্যানস্থ স্মৃতির দিকে তাকিয়ে ছিলাম, আমারও ত দখি ছিল না।

হঠাৎ তিনি বললেন—চলো, সবার সাথে দেখা করি। আমি চমকে উঠে বলান—হ্যাঁ চলুন।

আমি কটী ছিলাম আমার আশ্রমে, সেই আশ্রমটার প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমার জীবনের সক্ষ, ভবিষ্যতে বাঁচবার একমাত্র প্রেরণা।

কিছুদিন পরে চলে গেলেন নোয়াখালি থেকে বিহারে। তার পরের ঘটনা ত সবই তোমার জানা আছে বন্ধু।

কাল রাত্রে হঠাৎ খবর পেলাম তাঁকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে, চীৎকার করে কেঁপে উঠলাম আমি, সেই চীৎকারে সবাই জেপে উঠলো। সারা আশ্রমটাই বেন - কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো, বাপুভীর বিরাট প্রতিমূর্তিটিকে হলধরের হাতখানে এনে হুল দিয়ে লাগানো হলো। তার মাথনে জালিয়ে বেওয়া হলো অলংকার মালীর প্রায়ীপ, সবাই ঘিরে বসলো তার নামনে। স্বীতার পোক পড়ছিল ভায়া। চোখ দিয়ে তাদের পড়ছিলো দর দর করে অজ্ঞারো। আর তাদের একমাত্র আশার আলো নিবে গেছে। আমি আর আশা করার

বিছুই নেই। গান্ধীজীও আর অতীত হয়ে গেলেন। তিনিও ত আর ইতিহাস, সেই ইতিহাস আশা ভোগাবে ভবিষ্যতের, আনন্দ ভোগাবে অতীতের কিছু পথ ধরাবে না বর্তমানের। বাইরে এসে ধাঁড়ালান আমি, শৈতের রাতে খনকুশার কুহেলীতে আরত চারিধার। নিভৃত রাত্রি অমীট হয়ে আসন পেতেছে পৃথিবীর কৃকর উপর। আলো নাই, কোন দিকে আলো নাই, আলো নিবে গেছে। সেই অন্ধকারের দিকে তারিয়ে ধাক্কিরে হইলাম আমি।

একটা কান্নার স্বর ভেসে এলো কানে, পাণের বাড়ীর মৌলভী গাহেব কীষছেন, আলার কাছে প্রার্থনা করছেন তাঁর আশ্রয় অমর শাহির সঙ্গ, প্রার্থনা করছেন এই লবঙ্গ পাণের হাত থেকে আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের

ডাইবোন, হিন্দু মুসলমান ধেন মুকি পাণ, যেন বিদ্যাত। এধেনবাণীকে ক্ষমা করেন, তারের অপরাধ মার্জন করেন।

কি জানি, আমার হুঁচোপের অস্ত্র বাধা মানলো না। তুমি আমার মনে হলো গান্ধীজীর একটা কথা "I shall work for an India in which the poorest will feel it is their country." গান্ধীজীর সেই ভারতবর্ষ তৈরী হয়ে উঠেছে কি? এখনো কি ভারতের চল্লিশ কোটি নয়নারী ভাবে যে এটাই আমার ভগ্নহৃদি, এখানে বাস করার অধিকার আমার ভগ্নগত? সেই অর্ধগত, সমাজগত সাম্য কি এসেছে এখনে, বর্ষে বর্ষে যাচ্ছে কি অশুভতা, বদী এখনো সেই ভারতবর্ষের স্মরণ না হয়ে থাকে, তবে কবে সেই ভারতবর্ষের স্মৃতি হবে, কবে?

নক্ষত্র

ঐশ্বর্যবাহী যোয

নববর্ষের প্রথম দিনেই তিনটি মানবন্ধির হইতে শ্রাদ একসঙ্গেই ঘোষিত হইয়াছিল যে সূর্যের চতুর্পার্শ্ব পরিভ্রাম্যমাণ গ্রহগণের মধ্যে সর্বাধিক দ্রুতবেগে নেপচুনের গতি অত্যন্ত অব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক অগ্নিভি (Ogilvy) গত ডিসেম্বর মাসেই বলিয়াছিলেন যে নেপচুনের গতি যেন কোন প্রতিবন্ধক-হেতু বিলম্বিত হইতেছে বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়। যে পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসীই নেপচূন গ্রহের অত্যন্ত দ্রুতবেগে অজ্ঞ, সেখানে যে এই সংসার বিশেষ কোন চাকল্যের উল্লেখ করে নাই তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার পর যখন আবিষ্কৃত হইল যে উক্তগ্রহের নিকটবর্তী গ্রন্থে একটি আলোর রেখা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তখনও তাহা ভ্রোতাসিন্ধুগণ ব্যতীত আর কাহারও ভিতর কোন উত্তেজনার সঞ্চার করিল না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কিন্তু প্রথম হইতেই ইহাকে একটি বিশেষ ঘটনা বলিয়া

ধরিয়া লইয়াছিলেন। ক্রমে জানা গেল, এই নূতন বস্তুটি ক্রমশঃ বৃহত্তর উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে এবং ইহার গতিও গ্রহগণের নিয়মিত গতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নেপচূন ও তাহার উপগ্রহের বিপর্যয়নও ক্রমেই একটা অস্বাভাবিক ঘটনা হইয়া ধাঁড়ালেছে।

বিজ্ঞানবিদগণ ব্যতীত অপর কাহারও শব্দে সৌরমণ্ডলের বিশাল ব্যাস্ত্র উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। সূর্য্য তাহার বিদ্যুৎ গ্রহ, মূল্যবৎ উপগ্রহ ও অতি দৃশ্য অননুভবনীয় ধূমকেতু লইয়া এমন এক বিশাল সূর্য্যমণ্ডলে ভাসিয়া রহিয়াছে যাহা কল্পনার দ্বারা ধারণা করা অসম্ভব। নেপচুনের কক্ষের বহিঃক্ষেপে মানবের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির শেষ সীমা পর্য্যন্ত যে আলোহীন, তাপহীন, শব্দহীন, বিপুল মহাপ্রত্যয় বিশ হাজার মাইল দূরিত্য পরিভ্রাম্য রহিয়াছে নেপচূন ও তাহার নিকটতম নক্ষত্রের ভিতর ইহা নূনতম ব্যবধান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যাহাযের বস্তুধর্ম জান, কিনৎতাক্ষীর প্রাচুর্যে এই নূতন পথিকটীর আলমনের পূর্বে দৃশ্যতম অধিশিখা অপেক্ষাও অধিকার দুই একটা ধূমকেতু ব্যতীত আর কোন বস্তুই

এই মহাপুত্র অতিক্রম করে নাই। অতি সুস্থ, ওজস্বী, পিণ্ডবৎ এই বিশাল পদার্থবান পূর্বে কোনজন আভাস না দিয়াই লক্ষ্য একদিন আকাশের রূপসংগ বানিমার ভিতর হইতে স্থোমর ডাঙর উচ্ছল্য অভিমুখে ছুটিতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় দিনে যে কোন ভাল যন্ত্রের ভিতর বিয়াই উঠাকে সিংহাসনের নিকট অতি ক্ষুদ্র ন্যাস বিশিষ্ট বিস্তৃত স্রাব দেখা বাটতেছিল।

অস্বস্তীকে এই অসাধারণ আবির্ভাবের প্রকৃত ওজন নববর্ষের কৃতীর্ণ দিনে পৃথিবীর উত্তর অংশেরই সংবাসপত্র পরীক্ষেরা প্রথম বুঝিতে পারিল। লগুনের এক সংবাসপত্র 'গ্রহ-সংঘর্ষ' এই নাম দিয়া সংবাস্ত্রী প্রকাশ করিল। বৈজ্ঞানিক ডুসেনের (Duchaine) হাতে এই অদৃশ্য নৃতন গ্রহের নেপচুনের গতিতে সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাও ঘোষণা করিয়া দিল। সংবাসপত্র সচেতন যুগ প্রবন্ধ লেখকগণ এই বিষয় চাইয়া বহু আলোচনা করিলেন ফলে এরা ভূ-হুমায়ী পৃথিবীর প্রধান প্রধান গ্রার সকল সহরেই আকাশে অসাধারণ কোন ঘটনার আসন্ন আবির্ভাব সম্বন্ধে লোকের মনে একটা অনিশ্চিত প্রত্যাশার ভাব জাগিয়া রহিল। সেই সন্নিহিত সূর্য্যাস্তের পরই পৃথিবীর দর্শন সহস্র সহস্র লোক আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু অতি পরিচিত চিত্রখন সেই নক্ষত্রবগলী দ্বিঃ আর কিছুই দেখা গেলনা।

ক্রমে লগুনে প্রভাতের উদয় হইল, মিশুরাশির সূর্য নক্ষত্র অদৃশ্য হইয়া গেল, মাঝার উপরে তারাগুলি নিশ্চল ঘোড়াতে লাগিল, ঐতের প্রভাতের ক্ষীণ তরঙ্গ আলোয় চক্ষুদ্বিক ভরিয়া উঠিল। সেই সব রাজ্যজাগরণকার্য পুনিসেরা ঘটনাটী যেখানে পাইল। পথে ঘাটে কর্ণব্যত ঘনত। উঠা যেখিয়া হস্তভব হইয়া পাড়াইয়া রহিল। লগুর কার্যগবনোদ্ভূত মনুষ্যেরা ও পোয়ালারা, খবরের কাগজের পাতীর চালকেরা, সূর্য্যহীন পথিকেরা, পৃথগমন-রত জ্ঞান লক্ষ্যেবরা, প্রাচ্যগণ অতিক্রমকারী কৃষকেরা, পলায়নরত চোরেরা এবং সমুদ্রস্রোত পর্ধ্যবেক্ষকগণও নাথিকেরা—সকলে যেখানে পাইল লক্ষ্য পশ্চিম আকাশে একটী প্রকাণ্ড ওজন নক্ষত্রের উদয় ঘটিল।

আকাশে আঘাতের পরিচিত সকল নক্ষত্র অপেক্ষা উজ্জলতর, উজ্জলতম সমায়াতরা অপেক্ষাও উজ্জলতর এই নক্ষত্র ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর হইয়া উঠিতে লাগিল। আর ইহা ক্ষুদ্র একটী আলোর চিহ্ন রহিল না—প্রভাতের একঘণ্টা পরেই ক্রমে ক্রমে একটী উজ্জল ভাবের দীপ্তিমান চক্রে পরিণত হইল। যে সকল স্থানে এখনও বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তার হয় নাই তথাকার অধিবাসিসমূহ ভীতভাবে পরস্পরের প্রতি তাকাইয়া রহিল ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল যে আকাশের এই সকল অগ্নিময় অভিজ্ঞান সূর্য্যগ্রহ ও মহামারীর সূচনা করে। বলিষ্ট সূর্য, কক্ষকার হট্টকট্ট, ও নিগ্রো হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রান্সীয়া, স্পেনীশেরা ও পতুশীমেরা সকলেই সেই সূর্য্য-কিরণোচ্ছল প্রভাতে পাড়াইয়া পাড়াইয়া এই অদৃশ্য নৃতন তারকার অভ্যুদয় দেখিল। বহুব্রহ্মিত বহুসংখ্য যখন একত্রে মহাবাগে পরস্পরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল সেই সময় নত নত মানসম্বিরে বৈজ্ঞানিকগণের ভিতর নানাধি বহুপাতির ব্যবহার লইয়া ও নব নব প্রণালীর প্রয়োগবিধি লইয়া অত্যন্ত উত্তেজনার সকার হইল। একটী মগনের বিন্যাসতপ এই অদৃশ্যপূর্ণ আশ্চর্য্য যন্ত্রের প্রতিমিপি গ্রহণ ও সংরক্ষণ করিবার আগ্রহে স্রোতিবিশৃঙ্গ এইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ একটী মগ্ন—আঘাতের পৃথিবীর স্রাব অপর একটী গ্রহ—পৃথিবীর অপেক্ষাও বৃহদায়তন নেপচুনের বিন্যাস আসন্ন হইয়াছিল। যদির্দেপ হইতে সেই নৃতন নক্ষত্রটী নেপচুনকে আঘাত করিল এবং সংঘর্ষের প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে কঠিন খোলক হুইটী অবিসর্গে এক বিশাল মল্লত স্রোতোজ্ঞাপ হাশিতে পরিণত হইল। সেদিন পৃথিবীর সর্বত্র দেখা গেল যে সেই যেতকার প্রকাণ্ড নক্ষত্রটী প্রভাতের ছই লগ্নী পূর্বে ক্রমশঃ জ্ঞান হইয়া পশ্চিম আকাশে অস্ত গেল ও গ্রার লগ্নে লগ্নেই সূর্য্যোদয় হইল। এই নৃতন সূর্য দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল কিন্তু দর্শ্য-পেক্ষা আশ্চর্য্য হইল সমুদ্রযাত্রী নাবিকগণ—বাহারা প্রতিদিন নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে অভ্যস্ত। সূর্য সমুদ্রে এই নবতম নক্ষত্রের আবির্ভাবের বিষয় তাহারা

কিছুই পোনে নাই, এখন সবিস্ময়ে দেখিল যে মহলা কুহাবতঃ চম্পের ছায়া এই নক্ষত্রী আকাশে উদ্ভিত হইয়া ধীরে ধীরে মধ্যগগনে আরোহণ করিল ও রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম আকাশে অন্তর্নিহিত হইয়া গেল।

ইহার পর যখন ইউরোপে এই নূতন নক্ষত্রীর উদয় হইল তাহার পূর্বে পার্শ্বতঃ উপত্যকার গৃহদ্বারের মত প্রাচীর—সর্বত্র বিশাল জনতা পূর্বদিকে চাহিয়া উহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। নক্ষত্রীর আবির্ভাবের পূর্বে শুধু অগ্নিশিখার দীপ্ত প্রভাৱ ছায়া শুধু উজ্জল আলোক-সম্পাতে পূর্ণোভাগ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; বাহ্যিক পত প্রাকৃতিতে উহার উদয় দেখিগাছিল তাহারা এখন দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল “আরও বড় হইয়াছে”, “আরও উজ্জল হইয়াছে”। পথে লোকেরা মলে মলে একত্র হইত; বলাবলি করিতে লাগিল “আরও উজ্জল হইয়াছে” কিন্তু মানবমিতির পর্ষদেবক্ষণমত জ্যোতির্বিদগণ অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে পরামর্শের প্রতি ভাবকাইয়া সদস্যের বলিয়া উঠিলেন “আরও নিকটে আসিয়াছে”।

তখন সকলেই বলিতে আরম্ভ করিল “আরও নিকটে আসিয়াছে”, টেলিগ্রাফের টেরেটভাৱ ভিতর দিয়া—টেলিফোনের তারের মধ্য দিয়া এই কথা দূর দূরান্তরে ডালিয়া গেল। মহতঃ মহতঃ নগরীতে মহতঃ মহতঃ মূত্র-পালনে মুগ্ধিত হইতে লাগিল “আরও নিকটে আসিয়াছে”। কণ্ঠস্থলে লিখনরত কণ্ঠচারীরা এই সংবাদ শুনিয়া এক নূতন ভাবে অভিভূত হইয়া লেখনী দ্বারা নিক্ষেপ করিল, শত মহতঃ স্থানে কথোপকথোনরত ব্যক্তিরা এই সংবাদে এক অন্তরঃ সজাবনার আভাস পাইল। রাজপথে আগ্রস্ত জনগণের মধ্যে এই সংবাদ বহুবল বিদ্যুত হইয়া গেল। নির্জন পটীশমূহের তুষারাক্ষর পথে পথে টহা ঘোষণা করিয়া বেগা হইল। বাহ্যিক পূর্বে এই সংবাদ শুনিয়াছে তাহারা পর্যালোচিত গৃহদ্বারে ঠাড়াইয়া পথিকবৃন্দকে ইহা জানাইয়া দিতে লাগিল। নৃত্যগৃহে নৃত্যের কীকে কীকে রহস্তচ্ছলে উক্ত এই সংবাদ শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম হৃদয়ী ডকুমীরা বিজ্ঞের ছায়া পরমাগ্রহের ভাব করিয়া বলিল “আরও নিকটে—দতি কি আশ্চর্য—বার

এই সব আবিষ্কার করে তাদের কি গভীর বুদ্ধি”! ইতের রাষ্ট্রিতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে করিতে গৃহদ্বার নিঃশব্দ পথিকেরা আকাশের নিকে চাহিয়া নিঃশব্দেই লক্ষ্যনা দিবার জগ্ন যেন যেন বলিতে লাগিল “আরও নিকটে আসাও বরফারও হইয়াছে কারণ এখনকার রাত্রিও মাহুকের মতই ঈতল—উত্তাপবিহীন। বাট হোক—আরও কাছে আহুক বা না আহুক কোন উত্তাপের আভাস ত পাচ্ছি না।”

বৃত্ত গ্রহযানের পার্শ্বপরিধি ব্রহ্মী কামিতে কামিতে বলিল “নূতন তারার আবির্ভাব হোক বা না হোক আমার তাতে কি আসে যায়—”

পরীক্ষার পাঠ প্রস্তুত করিবার জগ্ন যে সকল বিশালবহুর ছাত্রেরা প্রাতঃকালে উঠিয়াছিল—জানলার ভিতর দিয়া সেই ব্রহ্ম জগ্ন নক্ষত্রের উজ্জল আলোকের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাহারা নিঃশব্দেই ইতঃ একটী মীমাংসা করিয়া লইল। অনেক দিবাং পর তাহারা স্থির করিল “এ সবই হোল কেন্দ্রাভিগ (Centrifugal) ও কেন্দ্রাভিগামী (Centripetal) শক্তির ফল। কোন গ্রহের কেন্দ্রাভিগ শক্তি বাড়িয়া লইয়া তাহার গতিপথে বাধা প্রদান করিলে কি হইবে? ইহা তখন নিশ্চয়ই কেন্দ্রাভিগামী শক্তি লাভ করিয়া স্বর্গাভিমুখে ছুটিতে আরম্ভ করিবে। এখনও ঠিক এই ব্যাপারই হইয়াছে—কিন্তু আমাদের পৃথিবী কি পথের মাঝে পড়ে—কে জানে?”

কমে কমে প্রতিদিনের মতই দিনের আলো মিলাইয়া গেল এবং রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নক্ষত্রের উদয় হইল। বাত উহা এত বেশী উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল যে উহার পার্শ্ব জন্মবর্ধমান পীতভাৱ বিষর্ষ চক্রে যেন ছায়ায় মত দেখাইতেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার একটা মহাব্যাস্তানামা এক ব্যক্তিও বিষাদ হইয়াছিল এবং নববয়স্ক তাহার প্রত্যাগমন উপলক্ষে হৃদয়ঙ্গম আলোকিত করা চাইছিল। তাহার অগতঃেরা তাঁহাকে এই বলিয়া দৃষ্টিপান করিতে লাগিল যে তাহার লক্ষ্যনার্থ আকাশও আজ নূতন আলোকে সজ্জিত

হইল। ব্যাপ্রিকর্ষের (Capricorn) দুইটি নিম্নো প্রেমিক পরস্পরের প্রেমের ভঙ্গ বস্তু পুণ্ড ও কুতূহলের উৎস সঙ্গই তুলু করিয়া ক্রীড়াধর্মিত পঞ্চোত্তমচিত্র একটা বেগুনে বসিয়াছিল, তাহাকে হেন্সি তাহার কাপে কাপে চুপি চুপি বলিল “এটা আমারের তাহা।” নক্ষত্রীর স্মিত বস্মিপমাতে তাহার মনে নূতন উৎসাহ ও আশাসম্ভাষ করিল।

শেষের প্রেম গণিতের তাহার পাঠাগারে বসিয়া কার্যবস্ত ছিলেন। তাহার গণনা শেষ হইয়া আসিয়াছে যে সেখ সেবনের ফলে তিনি চারিটি ঘোঁষ রজনী বিন্দিত থাকিয়া কাল করিতে পারিয়াছিলেন, একটা ছোট পাখা শিশিতে তখনও তাহার অবশিষ্ট বানিকটা পড়িয়াছিল। প্রতিদিনই তিনি ছাত্রদের নিকট চিৎকারিত ভাবে পরম মৈত্রীর সহিত শাস্যচিত্রে প্রাচলভরিতে বক্তৃতা দিয়া আসিতেন এবং তথা হইতে আসিয়াই এই দুর্ভাগ্য গণনাকার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। প্রণাম সম্বীর বসনে তিনি ঈর্ষাটীয়া ছিলেন, রাষ্ট্র ভাষ্যভরিত কার্যের ফলে তাহাকে একটু ক্রোধ ও ঈর্ষা দেখাইতেছিল। কিছুকালের অন্ত তাহাকে অত্যন্ত চিন্তায় মনে হইল, তাহার পর তিনি ভাষ্যলার নিকট গিয়া পড়খড়ি তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন—আকাশের মহাপথে, সহরের সমস্ত ঘরবাড়ী, চিমনি ও ঈর্ষার চূড়ার উপরে তখন নূতন নক্ষত্রী শোভা পাঠিতেছিল।

দুর্ভাগ্য পক্ষের চক্ষুতে চক্ষু রাখিয়া লোকে বেতন ভাবে চাহিয়া থাকে তিনি সেইভাবে কিছুকাল নক্ষত্রীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন “গভা বটে তুমি আমার বিনাম সাধন করিতে লক্ষ্য, কিন্তু আমি আমার এই ক্ষুদ্র বস্তুকে তোমাকে, শুধু তোমাকে কেন নয় বিনামে খরিদ রাখিতে পারি। আমার কোন পরিবর্তন হইবেনা—এখনও না।” ছোট শিশির পতি পৃষ্ঠ পড়ায় তিনি বৃহস্পতি বলিলেন “তার ইহার প্রয়োজন হইবে না।” পরদিন বিলম্বের ঠিক নিয়মিত সময়ে তিনি বক্তৃতাৎক প্রবেশ করিয়া অধ্যাপকটী ঠুপীটি টেবিলের এক কোণে রাখিলেন ও অত্যন্ত মনোযোগের সহিত

একখণ্ড পড়ি লুপ্ত করিলেন। তাহার ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে হৃদয়গো একখণ্ড পড়ি লইয়া নাকচাচা করিতে না পারিলে তাহার বক্তৃতা ভাল হয় না; একবার নাকি পড়ি লুকাইয়া রাখার ফলে তাহার বক্তৃতা একেবারেই পশু হইয়া গিয়াছিল। কখনো তিনি যির দৃষ্টিতে লক্ষ্য উৎসাহীল নবীন মুখগুলির প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর তাহার নিম্ন বিন্দিত ভরিতে স্থিতিত প্রাচল ভাষ্য বলিতে আরম্ভ করিলেন “আমার কক্ষতার বহির্ভূত এরূপ কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে বাহার ফলে আমি যে বিষয় বক্তৃতা দিবার সময় করিয়াছিলাম, তাহা শেষ করিতে পারিব না। প্রক্ষেপ-ও স্পষ্ট ভাষ্য বলিতে গেলে ব্যাপার এই যে মাত্র একদিন বুধাই জীবনধারণ করিয়া আসিয়াছে”..... ছাত্রেরা আশ্চর্য হইয়া পরস্পরের প্রতি তাকাইয়া রহিল—তাহারা কি ঠিক ভনিমাছে? অধ্যাপক মহলা উল্লাস হইয়া গেলেন না ত? অবিশ্যি ছাত্রেরা জুটী করিয়া পরিহাসপূচক বৃহস্পতি এই সকল ভাবিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুই একজন গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যাপকের এলাত, গভীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। অধ্যাপক তখন বলিতেছিলেন “যে গণনার দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি আজ যদি সেইটাই আমার সাধ্যমত বুধাইতে চেষ্টা করি তাহা হইলে সকলেই যোগ্যের আগ্রহাধিত হইবে—এখন ধরা থাক” —এই বলিয়া তিনি তাহার অধ্যাপকত বোর্ডে নানাতরঙ্গ আকর্ষণক কাটিতে লাগিলেন। তখন একজন ছাত্র আর একজনকে চুপি চুপি বলিল “যেই যে তখন বলেন—বুধাই জীবনধারণ করিয়াছেন—তার মানেটা কি হ’ল বুঝতে পারছি না ত?” সে অধ্যাপকের প্রতি নির্দেশ করিয়া বলিল “চুপ করে শোন।”

অল্পকাল পরেই তাহারা বৃষ্টিতে আরম্ভ করিল।

সেই রাত্রিতে নক্ষত্রী একটু বেরী করিয়া উঠিল। পূর্বাভিষেকী গতির ফলে উচ্চ গিহ রাশির বানিকটা ঘুরে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার ঈর্ষাও এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে মনে হইতেছিল সমস্ত আকাশ বেন নীল আলোক

বালিতে প্রাণিত হইয়া গিয়াছে। উহার ভাষণ বীপিতে বৃহস্পতি ও আর দুই একটা নক্ষত্র ব্যতীত অত্যন্ত সৰল গ্রহ নক্ষত্র চাকা পড়িয়া গিয়াছিল। উতাকে অত্যন্ত ভয় ও হৃদয় বেধাইতেছিল। সে রাতে পৃথিবীর কোন কোন স্থান হইতে উহার চতুঃপার্শ্বে একটা ক্ষীণ সৌভাগ্যবিশেষ বিদ্যমান করিতে দেখা গিয়াছিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে উহার আরও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রীষ্ম-মণ্ডলের স্বচ্ছ নির্মল আকাশে ইহাকে পূর্ণচন্দ্রের প্রায় চতুঃপার্শ্বের স্থায় বড় মনে হইতেছিল। ইংলণ্ডের পঞ্চাশট তখনও তুষারাকৃত ছিল কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই উষ্ণ উজ্জল আলোর আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল যে মনে হইতেছিল ইহা যেন গ্রীষ্মের চন্দ্রালোকপ্রায় রঙের। সেই উজ্জল স্বতন আলোর সাধারণ ছাপার নৈশ স্বচ্ছন্দই পড়া যাইতেছিল এবং সেই আলোর নিকট সহরের কৃত্রিম আলোকগুলি পীতভা, বিবর্ণ দেখাইতেছিল।

সেই রাত্রিতে পৃথিবীর সর্বত্রই জনগণ ভাগিরা রহিল এবং সমগ্র জীবন ভগত একটা বৃহৎ পক্ষীর শব্দে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। গ্রাহকের পথে ঘাটে এই শব্দ মোমাড়ির বৃহৎ গুহনের স্থায় ক্ষীণভাবে ভাদিয়া চলিল; সহরের রাস্তায় রাস্তায় এই শব্দ কর্ণভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—
বেশবাসী সকল গীর্জার সমবেত ঘণ্টাধ্বনির ফলে এই শব্দ হইতেছিল। গীর্জার ঘণ্টা সকল লোককে ভাঙিয়া বলিতেছিল—“কেহ আর সুখাইও না, কেহ আর কোন পাণ্ডিত্যের প্রার্থনা বিও না, সকলে মিলিয়ে সমবেত হও ও ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা কর।” আকাশে তখন অগ্রস্ত জনমণ্ডলীর সাধারণ উপর, পৃথিবীর গতি ও রাত্রি বৃদ্ধি সহিত ক্রমবর্ধমান ও উজ্জলতর সেই নক্ষত্র প্রেরণ বীপিত বিকীরণ করিয়া শোভা পাইতেছিল।

সহরের সমস্ত রাস্তা ও সমস্ত বাড়ী সেই রাতে আলোকিত করা হইয়াছিল, আলোকমালাশোভিত হইয়া আশাধা নির্মাণ স্থানগুলি দ্ব্যস্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল, গ্রাহকের সকল বড় বড় রাস্তাও সমস্ত রাত্রি আলোকোজ্জ্বল ও জনকোলাহল মুখরিত ছিল। সভ্য ভগতের নিকটবর্তী সমুদ্রমাত্রেরই-সেধিন পালতোলা ও ইন্ডিন চালিত—সর্ব-

প্রকার জাহাজে করিয়াই শত শত লোক মলে মলে সমুদ্র যাত্রা করিতেছিল; কারণ শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞের সেই সত্যকথা বীপিত শত শত ভাষণে অস্বাভাব্য করিয়া পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টেলিগ্রাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নতুন নক্ষত্র ও নৈশচন্দ্র অগ্নিময় আলিনবাহক হইয়া ক্রমবর্ধমান অতি দ্রুত গতিতে যাবার দৃষ্টান্তসমূহে চুটিয়া চলিয়াছে। এই প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি এখনই প্রতি মুহূর্তে শত মাইল বেগে ছুটিতেছে এবং প্রতি মুহূর্তে ইহার ভাঙনী গতির বেগ বাড়িয়া যাইতেছে। এখন ইহা বেগভায়ে চলিতেছে তাহাতে মনে হয় যে ঐহা পৃথিবীর শতকোষী মাইল দূর হইতে চলিয়া যাইবে ও পৃথিবীর কোন অন্তি হইবে না কিন্তু ইহার নিশ্চিত পথের অতি নিকটেই বৃহস্পতি গ্রহ তাহার উপগ্রহসমূহের সহিত নিকটেই বৃহস্পতি গ্রহ তাহার উপগ্রহসমূহের সহিত সূর্যের চতুর্দিক পরিভ্রমণ করিয়া চলিয়াছে। এখনও পর্যন্ত অবশ্য বৃহস্পতিতে আলোড়ন বা বিক্ষোভ উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই এই নতুন অগ্নিময় নক্ষত্র ও বৃহস্পতি গ্রহের পারস্পরিক আকর্ষণ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই আকর্ষণের ফলে বৃহস্পতি নিকট তাহার কক্ষস্থিত হইয়া ভিত্তাকৃতি হার্যবৃত্ত পথ অহুসরণ করিবে ও নতুন নক্ষত্রী বৃহস্পতির আকর্ষণের ফলে দুয়টিচন্দ্রী গতি পরিত্যাগ করিয়া এক বক্রগতি অগমন করিবে। ইহার ফলে সম্ভবতঃ এই অগ্নিময় নক্ষত্রের সহিত আনাদের পৃথিবীর সংঘর্ষ হইবে। অদ্ব্যস্তপক্ষে ইহা যে পৃথিবীর অতি নিকট দিয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। “ইহার ফলে আসিবে ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরির উদ্ভেদ, প্রবল বৃশিধাতা, সমুদ্রতরঙ্গের স্রাবন ও বজা—আবহাওয়ায় উচ্চতার পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিবে এবং উহা যে কতদূর পর্যন্ত বাড়িবে তাহা আবার জানের অতীত”—শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ এই ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন।

নতুন তাহার কথা প্রতিপন্ন করিবার অগ্রই আসিয়া বিনাশের কর্তা সেই নক্ষত্র মহাতেজে আকাশে শোভা পাইতে লাগিল। সেই রাত্রিতে উহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া অনেকেরই চক্ষু বাধা হইয়া গেল—তাহাদের মনে হইল উহা যেন ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতেছে। সেই

সাহিত্যেই আবহাওয়ার পরিবর্তন আরম্ভ হইল। সমগ্র মধ্য ইউরোপ, ক্রান্ত এবং ইংলণ্ড যে কৃষ্যরাসি ভাষা আচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা গলিতে আরম্ভ করিল।

কয়েকজন লোক সমগ্র রাষ্ট্র প্রার্থনার অভিযাত্রিত করিতেছিল, কয়েকজন লোক দূরদেশে অনুগ্রহে যাত্রা করিতেছিল এবং কয়েকজন লোক পার্শ্বপ্রদেশে পলায়ন করিতেছিল সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে পৃথিবীতল লোকই এই নক্ষত্রের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা বলা যায়না। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণ পূর্বের মতই অচ্যাস ও গ্রন্থের অচমরণ করিয়া চলিতেছিল। শতকরা নিরানব্বই জন লোকই মঙ্গলের যুদ্ধে ও রাষ্ট্রের অস্তব্যয়ে এই বিষয় আলোচনা করা ছাড়া চিন্তাচরিতভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যতীত করিয়া বাইতেছিল। সকল মহলেই চুই একটী ব্যাপ্তে সব লোকানপাটই নিয়মিত সময়ে চলিতেছিল ও বন্ধ চুইতেছিল, চিকিৎসাগণ ও অস্থানা বাসদায়ীরা স্বাধীন কাণ্ড করিয়া বাইতেছিলেন, প্রমিক্তা ধ্যাসময়ে কাণ্ডানার উপস্থিত হইতেছিল, সৈন্যেরা কৃচকাগাশ করিতেছিল, পতিভেদা অধারন করিতেছিলেন, প্রেমিক-বৃন্দ পরস্পরের সান্নিধ্য খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, চোবেরা চুই করিয়া পলায়নের সুযোগ অবধান করিয়া ফিরিতেছিল এবং রাজনীতিজ্ঞেরা নানাবিধ মন্তব্য ও অভিমতের উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন। সংবাদপত্রসমূহ নানা সংবাদ প্রচার করিতে লাগিল—কোন কোন সীমার পুরোহিতেরা এই নিকোলের স্তায় অদলক আতঙ্কের প্রস্তাব দিবেননা বলিয়া সীমার দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিলেন। সাধারণপত্রগুলি মহোৎসাহে সবল শক্তিশীল কথা স্বরণ করাইয়া দিতে লাগিল কারণ তখনও লোকেরা ভাবিয়াছিল যে বিনাশ অবশ্যবাদী। নক্ষত্রটী প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্র নহে—বাস্পপুঞ্জ-মাত্র—ধুবকতু—আর নক্ষত্র হইলেও উহার পৃথিবীকে আঘাত করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। একদল ঘটনা ঘটনার কোন ঘটনা বা আতঙ্ক এ পর্যন্ত পাওরা যায় নাই। সকলদ্বারাই সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধি প্রবল ছিল, তাহারা এই ব্যাপার লইয়া উপহাস বিক্রম করিতে লাগিল ও হাজার তখনও পর্যন্ত আতঙ্কের ভেদ কাটাইয়া

উঠিতে পারে নাই তীক্ষ্ণ ব্যাক্যণে তাহাদের অক্ষরিত করিয়া তুলিল। সেটী রাখে গ্রীষ্মের হিসাবে খটা ১৪ মিনিটের সময়ে নক্ষত্র কৃচক্ষতির নিকটতম দূরত্বে উপস্থিত হইবে এবং সেই সময় হইতেই প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পরিবর্তন আরম্ভ হইবে—শ্রেষ্ঠ পণিতাজের এই ভাষার মন্তব্যবাবীকে অনেকেই আতঙ্কিতাপনের একটা হুত্বিত্তি অভিমত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। সাধারণ লোকেরা কিছুখন অকবিতর্ক করিবার পর নিশ্চিতচিত্তে ভুইতে বাইবা তাহাদের বিশ্বাস যে অপরিবর্তনীয় তাহাই প্রমাণ করিল। বন্ধ অলভোরা নৃতনযের বোহ কাটিয়া বাওবার ফলে যে বাহার কালে চলিয়া গেল। দুই একটা চীৎকার-নিরত কুহুর বাতীত সমগ্র প্রাণীজগতে নক্ষত্রটী লম্বা আর বিশেষ কোন অনোযোগের চিহ্ন দেখিতে পরওয়া গেল না।

তথ্যদি ইউরোপীয় রাজ্যসমূহের প্রহরীরা এককণ্টা পরে ধোনিরয়ে নক্ষত্রটী উত্তর দেখিতে পাইল। তখনও উহার আকার পৃথগরি অগণ্য বুদ্ধি পায় নাই। কয়েক-জন লোক তখন আগিয়া ছিল, ইহা দেখিয়া তাহারা শ্রেষ্ঠ পণিতাজকে উপহাস করিতে লাগিল; তাহাদের ভাব দেখিয়া বোহ হইল যে তাহারা ভাবিয়াছে বিশ্বের সম্ভাবনা একেবারেই কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছুখন পরেই তাহাদের সেই উপহাস বিক্রম ধামিরা গেল। নক্ষত্রটী বাড়িতে আরম্ভ করিল, ঘটকী ঘটকী উচ্চা ভীষণ বেগে বাড়িয়া চলিল; বাড়িতে বাড়িতে উচ্চা মধ্যগমনের নিকটবর্তী হইতে লাগিল ও ক্রমশঃ উচ্চতর হইতে হইতে রাষ্ট্রকে যিনের স্তায় আলোকোচ্ছাদিত করিয়া তুলিল। যদি ইহা বক্রগতি অবলম্বন না করিয়া সোজাখি পৃথিবীর দিকে আসিত—যদি কৃচক্ষতির আকর্ষণের ফলে ইহার বেগ কমিয়া না বাইত তাহা হইলে মধ্যবর্তী পথটুকু উচ্চা এক মিনিটে অতিক্রম করিয়া দেনিত। কিন্তু এইসকল ঘটনাচক্রের ফলে আমাদের প্রহের নিকট আসিতে উহার পাঁচ দিন লম্বা লাগিল। পরের রাষ্ট্রকে ইংলণ্ডে অত বাইবার পূর্ব উহার আতঙ্ক আরও অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল। আয়েরিকার

যখন উহার উদয় হইল তখন উহা গ্রাণ চক্রে সমান হইয়া গিয়াছিল—উহাকে এত শুভ ও সৌভাগ্যবশত দেখাইতেছিল যে উহার প্রতি দৃষ্টপাত করা বাটতেছিল না। ইহা বাতীত নক্ষত্রটী হইতে এইবার উত্থাপ নির্গত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। উহার উদয় এবং গ্রাণের সহিত উত্তম বায়ু বহিতেছিল। ভার্ভিনিয়া, ব্রেবিল, ও সেন্ট লরেন্সের উপত্যকার নিবিড়কূট তড়িতপূর্ণ মেঘ, দুইদুই বস্ত্রপাত, বিদ্যুৎ ক্ষুরণ ও শিলাকূটের মাঝে মাঝে এক একবার উহার দীপ্তি দেখা যাইতেছিল। (Manitoba) ম্যানিটোবাতে অতি ক্ষতগতিতে তৃণের গলিতে আরম্ভ করিল। ফলে প্রবল বজা হইল। পৃথিবীর সকল পর্বতেই সে রাত্রিতে বরফ গলিতে লাগিল এবং পার্কটানদীসমূহ আবার চলরাশির ঘায়া পূর্ণ হইয়া গেল। সেই প্রবল স্রোতের মুখে পড়িয়া কুলতাপ্রান্তরাশি এবং পতঙ্গশব্দ ও বাতুলের শব্দ আবর্তিত হইয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল—তখনও নক্ষত্রের সেই ভাঙ্করী দীপ্তির নিরে তাহারের মল আরও বাড়িয়া চলিল এবং অবশেষে তাহা দুই কুল প্রাণিত করিয়া পলায়নরত জনমণ্ডলীর পক্ষাভাবন করিল।

আর্কটিকাইন্ডার উপকূলে ও দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে সমুদ্রতরঙ্গ এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল যে লোকে কখনও সন্দেহ দেখে নাই বা শোনে নাই। বহু-স্থানে কড় উঠিয়া এই বর্ধমান সমুদ্রপ্রবাহকে কুলের ভিতর বহুদূর পর্যন্ত পৌছাইয়া গিয়া শত শত সহর ডুবাইয়া দিল। রাত্রিতে উত্থাপ এত বেশী বাড়িয়া গেল যে হৃৎযোগের নব লোকে যেন কথঞ্চিৎ শীতলতা অনুভব করিল। আমেরিকার আর্কটিক সার্কেল (Arctic Circle) হইতে কেপ হর্ন (Cape Horn) অবধি ভীষণ ভূমিকম্প হইতে লাগিল, পার্কট প্রবেশনমূহ ভাঙিয়া ভাঙিয়া নীচে পড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, স্থানে স্থানে বৃত্তিকা বিকীর্ণ হইয়া গেল ও ঘরবাড়ী ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল।

সমস্ত কটোপাক্সি (Cotopaxi) অতি ভয়ঙ্কর প্রকল্পনে আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং আয়োগিসিরিনমূহ

হইতে গলিত দাতবনসাবরাশি একপ উচ্চ হইতে, এত বেশী পরিমাণে, একপ ক্ষতবেগে এবং এত বেশী তরল হইয়া পড়িতে লাগিল যে একদিনেই উহা সমস্তকল অবশি বিস্কৃত হইয়া গেল।

পাতৃব চক্রবারা অশ্রুত সেই ভীষণ নক্ষত্র এতপড়ায়ে প্রবাহ মহাসাগর পার হইয়া চলিল, কল্যাণাত্মা উহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল এবং ক্রমবর্ধমান ফেলিল সমুদ্র-প্রবাহ উহার পক্ষাভাবন করিয়া অধীবাভাবে যৌগপুঞ্জের উপর পড়িয়া তাহারের জনশূন্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীত আলোকসম্পাতে সমুদ্রঙ্গ, অগ্নি-কূণের স্রাব উত্তপ্ত ও পক্ষাশক্তি উচ্চ প্রাচীরের স্রাব বিশালাকার সেই চলরাশি অবশেষে এগিয়া বহুবু বিস্কৃত উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল ও ক্রমশঃ ভিতরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে চীনের সমস্তলক্ষ্মিকে জালাইয়া লইয়া গেল। উচ্চতর, বৃহত্তর এবং সূর্য্যের অপেক্ষাও প্রধরোচ্ছল নক্ষত্র এইবার বিস্কৃপের ভক্ত জনমসাকীর্ণ সেই বিশাল ভূভাগের উপর নিষ্কলভাবে দীপ্তি বিকিরণ করিতে লাগিল। গ্রামে ও মহলে, মন্দিরে ও কুলতলে, পথে ও কদিত ক্ষেত্রে কোটি কোটি বিনিম্ব মানব অলহায আতঙ্কে সেই ভাঙ্কর গগনের প্রতি চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে বজ্রপ্রবাহের ক্রমবর্ধমান গর্জন শোনা যাইতে লাগিল। পলাইয়া রক্ষা পাইবার কোন পথ নাই, প্রথর উত্থাপে অশ্রুতাত্মা দিলি হইয়া গিয়াছে, নিশানপ্রাধান গ্রহণে অস্ত্রাত্মক বট হইতেছে এবং অতুল প্রাচীরের স্রাব বিশাল, কেননাকুল সেই বজ্রপ্রবাহ অতি ক্ষতবেগে পক্ষাভাবন করিতেছে—কোটি কোটি মানব সেইখানে এইভাবে স্ফূটস্থগে পতিত হইল।

চীনদেশে ও উচ্চ আলোকে প্রাণিত হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু আপানে, তাভাঘ—পূর্বে এশিয়ার সকল যৌগপুঞ্জই ঐ বৃহদায়তন নক্ষত্রটির আবির্ভাবের সবে দিকে আয়োগিসিরিনমূহ হইতে যে বাশ দৃশ ও ভয় নির্গত হইতেছিল তাহার ফলে উহাকে নিশাচ, বক্রিম অগ্নিওবং বোধ হইতেছিল।

উপরে গলিত দাত, উচ্চ দাত ও ভাঙ্করাশি : নিচে

উন্নত বাহিরাবির বজ্রগ্রাবন, কুমিকম্পজনিত প্রবল আলোড়ন ও বহুনির্দোষবৎ গর্জনধ্বনি,—ইহুট হিমালয় ও তিস্তের বিবিকিত চিব্বন তুষাবাবি গণিতে আরম্ভ করিল—প্রচণ্ডবেগে নিয়ে পতিত হইয়া উঠা হিম্মান ও বর্ষা সমতল প্রদেশের উপর দিগ্বাকোটি কোটি হুগভীর, অভিমারী স্রোতপথ বাহিরা বহিতে আরম্ভ করিল। ভট্টাবস্থশির—বনশ্চতিসবলিত ভারতীর অরণ্যানীর সহস্র সহস্র স্থানে দাবানল জলিয়া উঠিল। অগণিত নরনারী প্রপথ মনোপথ বাহিয়া হাংহুয়েব শেষ আশ্রয় উদ্ধক স্তম্ভবৎক পলায়ন করিল।

অতি ভয়ঙ্কর ক্রতবেগে নক্ষত্রটী এখন উত্তরোত্তর, বৃহত্তর, উচ্চতর ও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ঐশ্বর্যময় সাগরবারি সুরক্ষোভিতঃ চটো উঠিল। কুম্বাৎ প্রকাণ্ড তরঙ্গমালা হইতে আরম্ভমান বাশবাশি মণ্ডলাকারে উজ্জ্বলিত্বগুণে উথিত হইতেছিল এবং সেই তরঙ্গমালাতে বিবুৎ প্রতীক্ষমান, বাহ্যাহত অর্ধপাতলমুহু প্রতিমুহুর্ন্তে স্তম্ভগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছিল।

উহার পর একটি আকর্ষণ ঘটনা ঘটিল। উত্তরোপে বাহ্যায় নক্ষত্রোত্তরে প্রতীক্ষার ভাগিয়া ছিল তাহার মনে হইল ভগ্নতের আর্দ্রন বৃষ্টি বামিয়া গিয়াছে। নিম্নত্বনি ও পার্শ্বতা প্রদেশের সহস্র সহস্র উদ্ধক স্থানে—বেগানে লোকেয়া বজ্রগ্রাবন, পতনশীল গৃহ ও অলনোগুণ পর্কতশিখর হইতে আশ্রয়কা করিবার মন্ত্র, পলায়ন করিয়াছিল—সেই সকল স্থানে ঠাড়াইয়া উৎকৃষ্ট জনগণ বুঝাই নক্ষত্রের আশার গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ঘটীর পর ঘটী প্রবল উৎকর্ষার ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল, তথাপি সে নক্ষত্রের দেখা নাই; বরং যে পুরাতন নক্ষত্রপুত্র আর কোন দিন দেখা বাইবে না বলিয়া লোকেরা ভাবিয়াছিল সেইগুলি আবার দেখা বাইতে লাগিল। ইংলেও তখনও অধিরত স্তুমিকম্প হইতেছিল কিন্তু আকাশ নির্ধন হইয়া গিয়াছিল ও আবহাওয়ার উত্তাপের দলার হইয়াছিল কিন্তু ঐশ্বর্যমণ্ডলের স্থানে স্থানে আকাশ তখনও বাশ্পাচ্ছন্ন দেখাইতেছিল। অবশেষে প্রায় বশম্ভটী সেরী করিয়া সেই মহাকার নক্ষত্রের উপর

হইল ও তাহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুর্গোষ হইল এবং উহার শুভ বেগের ঠিক মধ্যস্থলে একটি চক্রবৎ কক্ষণে বিন্দু দেখা গেল।

এনিম্বাতে নক্ষত্রটী আকাশের গতির পৃথক্যে পড়িয়া গেল এবং উহা এখন ভারতবর্ষের আকাশে দেখা গেল সেই সময় উহার আলোক মহলা আকৃত হইয়া গেল নিম্নন হইতে গলা অবধি ভারতবর্ষের বিশাল সমতলমুহি সেই দ্বারে একটি অগভীর অলম্বিত পরিণত হইল। আসে। পড়িয়া সেই বিতর্প অলম্বি অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাইতেছিল এবং তাহার ভিতর মধ্যে মধ্যে জননমার্শী মন্দিরচূড়া, প্রাসাদশিখর ও পর্কতপুত্র ভাগিয়া বহিয়াছে দেখা বাইতেছিল। লোকেরা দেখানেই উজ্জ্বল পাইয়াছিল দেখানেই মলে মলে আশ্রয় লইয়াছিল—এখন তাহারা অশ্লু উত্তাপে, প্রবল আতঙ্কে, অত্যন্ত জাঙ্ক ও অবসর হইয়া একে একে নিয়েও পলি অলম্বির মধ্যে পড়িয়া বাইতেছিল—আর প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। সমস্ত দেশ কক্ষ বিলাপ-ননিত্তে ভরিয়া উঠিল। এমন সময়ে সহস্র সময় দেশ ভরিয়া নিম্নহাওয়ার আবির্ভাব হইল, শীতল বাতাস বহিতে লাগিল ও আকাশে মেঘ অমিয়া উঠিল। নক্ষত্রের নীতির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া অন্ধবৎ জনবৃন্দের নিকট মনে হইল যেন একটি গোলাকার, কক্ষবর্ধ, ছায়া উহার আলোর উপর দিগ্বাকোটি চলিয়াছে। নক্ষত্র এবং পৃথিবীর মধ্যস্থলে চক্র আসিয়া পড়ায় ঐরূপ দেখাইতেছিল। এই হুগভীল ছায়ার মন্ত্র লোকে ঐশ্বরের বন্দনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে যাত্রা—এমন সময় সহস্রা পূর্ববিগত হইতে অদৃষ্ট ক্রতগতিতে হুর্গোর উদয় হইল। তখন নক্ষত্র, পৃথ্বী ও চক্র একত্রে গগনমণ্ডলের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল। এই ঘটনার দলেই 'ইউরোপীয় পর্যবেক্ষণকারীরা' অক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন যে পৃথ্বী ও নক্ষত্র পরস্পরের অত্যন্ত নিকটে উঠিয়া কিছুক্ষণ অতি ক্রতবেগে ছুটিতে লাগিল—তাহার পর উহাদের গতি ক্রমবৎ দীরতর হইয়া আসিল এবং অবশেষে মধ্যগগনে আসিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাময়ী আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া

খামিয়া গেল। তখন আর নক্ষত্রের উপর চন্দ্ৰের ভাষা সেবা বাইতেছিল না কারণ আকাশের সেই অসুখজন প্রহায সে নিজেই চাণা পড়িয়া গিয়াছিল। যে সকল লোক তখনও বাঁচিয়াছিল তাহাদের মধ্যে যেসব ভাগট অবশ্য তীব্র সূঁধা, অপরিসীম প্রাণি, প্রথর উত্তাপ ও গভীর নিঃশ্বাস অতিশয় কঠোর ও অসহন হইয়া নিরাশ্রয়চিত্তে, নিঃশেষভাবে, মৃতের স্তায় এই সকল ঘটনা দেখিতেছিল; কিন্তু তখনও এমন অনেক লোক বাঁচিয়া ছিলেন তাহারা এই সকল ঘটনার অস্বপ্নমিত অর্থ ও ভয়ক বৃত্তিতে পারিলেন। পৃথিবী ও নক্ষত্র পরস্পরের নিকটতম সারিধো উপস্থিত হইয়া পরস্পরকে বোলা মিলা গিয়াছে এবং নক্ষত্র পৃথিবীর নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছে। ক্রমশঃই ইহা অতি দ্রুতবেগে পৃথিবীর নিকট হইতে সরিয়া পৃথ্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

তাহার পর বনকক বেবে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অবিরত বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ ক্ষুরেণে পৃথিবী প্রকলিত হইয়া উঠিল। সেই রাতে একপ ভীষণ ভূকম্প হইল যে পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই বা শোনা যায় নাই। যে সকল স্থানে আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নিবিখা নির্গত হইতেছিল সেই সকল স্থান হইতে এখনঃপ্রবলবেগে কর্কশ পতিত হইতে লাগিল। সর্বত্রই পঙ্কিল ধ্বংসাবশেষ রাখিয়া ভলগাশি উচ্ছ্বসিত হইতে নিরে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল—মানব ও পশুপক্ষীর শব ও অস্ত্রাস্ত্র নানাতরঙ্গে ধরাবক পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুদিন ধরিয়া অবিহত জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং স্রোতের বেগে কুলকলত, গৃহাদি, অমির স্তম্ভিকা; সকলই ডাসাইয়া চলিল। সেনের সর্বত্রই উহা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পরিগণালি কুলে কুলে পরিপূর্ণ করিয়া দিল এবং অতি বিশাল জল-প্রণালীসমূহের সৃষ্টি করিল। নক্ষত্রের প্রথর উত্তাপ বিকিরণের পর কয়েকটা ছায়াশীতল অন্ধকার বিবদের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সময় এবং ইহার পরেও বহুমান ধরিয়া অবিরত কুলকল চলিয়াছিল। কিন্তু নক্ষত্রটি এবার মূরে চলিয়া গিয়াছে এবং ক্ষুণ্ণীভূত মানবগণের পক্ষে এখন বীরে বীরে সাহস সঞ্চয় করিয়া

তাহাদের বিশেষ নগরী, নিমজ্জিত শস্তাগার ও জনসম্মিলিত শস্তক্ষেত্রের কিরিয়া আশা সম্ভল হইয়াছে। যে বহুসংখ্যক অর্ধবপোত বাতায় কল হইতে রক্তা পাইয়াছিল তাহারা এখন একে একে পিঞ্চবিন্দু চিত্তে ভয়ঙ্করে, অতি-সম্পর্ণে, পূর্ণপরিচিতি বক্ষঃসমূহের নবেদুত পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া স্থলভিমুখে আসিতে আরম্ভ করিল। কড়কুটী খামিয়া গেলে সেবা গেল, সর্বত্রই উত্তাপের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, সূঁধা বৃহত্তর হইয়া উঠিয়াছে এবং চন্দ্ৰের আয়তন ক্রমিতে ক্রমিতে উহার তিন ভাগের একভাগে আসিয়া গাড়াটোয়াছে—একটা পুদিনা হইতে অল্প একটা পুদিনার ভিতর এখন ৮০ দিন সময় লাগিতেছে।

এইবার জগতে যে নূতন জাতবসন্ত গড়িয়া উঠিল, যে সকল রীতিনীতি ও আচার সাধারণ; যে সকল গ্রন্থাবলী ও যে সকল বহুপাতি রক্তা পাটো গেল এবং আইনশাস্ত্র ও গ্রীষ্মশাস্ত্রে যে আশঙ্কা পরিবর্তন সংঘটিত হইল—যে পরিবর্তনের কলে নাবিকেরা দেখানো আসিয়া সজীব, সরল, হস্তির সমাবেশ দেখিয়া বিম্বদে হতশাস্ত্র হইয়া গিয়াছিল—যে সকল বিশেষ এ কাহিনীতে কিছুই বলা হয় নাই। পৃথিবীর আবহাওয়া উচ্চতর হওয়ার কলে মাছের উত্তর মেঘ ও দক্ষিণ মেঘ অভিমুখে ধায়া ও উপনিবেশ স্থাপন করার কোন কথাও ইহাতে নাই। ইহাতে কেবলমাত্র এই নক্ষত্রের আবির্ভাব ও তিরো-ভাবের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

মঙ্গলগ্রহের জ্যোতির্বিদগণ—কারণ মঙ্গলগ্রহও জ্যোতির্বিদ্যে আসেন, যদিও তাহারা মন্থর হইতে সম্পূর্ণ অস্ত্রপ্রকার জীব—বতঃই এই সকল ব্যাপারে অন্তঃস্থ আগ্রহাধিত হইয়াছিলেন। তাহারা অবশ্য ব্যাপারটিকে তাহাদের বিশেষ দিক হইতেই আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন লিখিলেন “আমাদের দৌঃসংগ হইতে যে লক্ষ্য পৃথ্যাভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহার বসন্তান ও ভাগপরিমাণ বিশেষতঃ করিয়া দেখিলে এই ভাবিয়া আশঙ্কা হইতে হয় যে পৃথিবীর অতি নিকট মিলা যাওয়া সম্ভবও উহা পৃথিবীর কত দাম্যস্ত ক্ষতি

করিয়াছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান জলভাগ ও স্থলভাগের
নৌমানা পূর্বের দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে; এরূপক্ষে
এইমাত্র পার্থক্য দৃষ্টিদেয় হইতেছে যে উভয় মেরু
প্রদেশের নিকটে যেতপদার্থরাশি (যাহাকে ঘনীভূত জল
নামিয়া করা হয়) বহুল পরিমাণে জ্বাল জ্বাল হইয়াছে।”

এই দ্বিগুণিত হইতে ইংাই প্রতীয়মান হয় যে মানবের
চরম ভূবর্তনাও কয়েককোটি বার হাইল দূর হইতে কত
ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়।

= H. G. Wells লিখিত "The War" নামক গ্রন্থের মূল্যায়ন।

মা-এরা

ঐকান্তিকতাবর্ণন মজুমদার

প্রাণ-খার: আর কথা। মেয়ে ইন্সুলের শিকড়ি
এরা। বাল্য। মেয়ের হৃদয় পশ্চিম প্রান্তে মৃদু-
কেন্দ্রের বৃক এককালি দাগ টেনে একটা মূল্যবান
সুপিন পথ এসে বেগানে হারিয়ে কেলেছে নিত্যকে—
সেটি একটা নান্দ-বিভীর্ণ মনুষ্য বাই। সোণালী ভাবে
ঐকান্তিকতার মোহান মাথা বেগা বায় উল্লাস চৈতি-হাওয়ার
অরুণণ হোলে। প্রাত্যহিক পান্ডিত্য আর বটে রচিত চরিত্রে
জানল বনজি। মেয়েহীওচ্ছে কুসুমে খোব-খরা হৃদয়ফল।
জানল বিছিরে বসে পড়ল কথা। খতাবোচিত ঘেসে
বলল প্রাণ-খার: এক বেঁবে জীবনে বা হোক বৈচিত্র্য
এল তু.....

—কিনের কথা বলছ হিনি?—কথার কৌতুকলী
জিজ্ঞাসা উৎসাহিত হ'ল বয়ে দ্বাওদ্য বাতালে।

—এই বাস্তবতারের কথা ভাই। হিন্দুতান—
পাকীতানের ছোচায়ে মস্তর আর বাপ দাদাদের ভিটে
ভেগে গেল কোথায়? ওদের আলহা শিবিরে যাবি
একদিন, ভাই?

—সেট ত নদীর ওপারে?

—হোক না নদীর ওপার। চল্ ঘাই। তুই কিন্তু
সেদিন না বলতে পারবিনে।

সেদিন বিকেলে প্রাণ-খার:র গারে ভর দিয়ে কুলে
ভিতান খেঁচা থেকে লাকিয়ে নাবল কথা। যরসের

নবীনতার এখানে উজ্জল। হাতখানা বাকিয়ে প্রাণ-
খার: হাত চেপে বরল ময়ে। নাবল প্রাণ-খার:।

পর পর শিবির পড়েছে। গুণে শেষ করা যায় না।
তারপর আরও আছে খাত, চিকিৎসা আর নাম রেজেক্ট
ক'রবার সরকারি শিবির কাঁটি। প্রাণ-খার: আর
কথা ঘুরে ঘুরে ফেলেছে। পূর্বদৃষ্টিতে সমবয়সী মেয়েরা
চেয়ে আছে নিরাশ্রয় দুত্তর তবিত্ত্ব-এর দিকে। দুত্তর
জ্বালা কিশোর কিশোরীরা ছুটোছুটি করছে। ছোট
যাত্রা গাড়িরে আছে সরকারি হস্তরগুলোর দুয়ারে ভীত
ক'রে।

—হিনি আবার ঘনি এত টাকা থাকত—!

—কি কল্পিত্ব তবে?

শিবিরের সামনে ঘিরে এগিয়ে চলেছে এরা।
তারপর একটু হেসে আবার জঁখোন প্রাণ-খার: কতদিন
বসিয়ে থাকতাত্ব? সুবেয়ের ভাঁড়ারও শেষ হ'য়ে
যেত বে—।

এ সারির শেষ শিবিরের কাছে এসে সহসা থমকে
দাঁড়াল প্রাণ-খার: আর কথা।

বিভিন্ন পরিবার এগে ঘিলেছে এক শিবিরে। বর্ণ-
বৈষম্য ও আয়ের অর্থ আর এদের শান্তি ভুল করতে পারছে
না। নিজেদের পরিবারের দ্বারা হইল বেঁচে তাইবরকে নিয়ে
এক একটি ছোট ছোট সংসার। কোন কোন পরিবার
আবার লকীভতার পতি পেরিয়ে আর এক পরিবারের সাথে
জ্বল হুংখের কাহিনী বন্ধুত্ব গিরে কানছে অত্যাচার—হাসলে
পাগলের মত।

খড়ের ছাউনী বেধা ঘর। পাতে মুখে খ'লে আছে

একটি প্রৌঢ়। মাটির ভিত্তে খাঁসি মতরকে শুয়ে পড়ে আছে সব-হারাঙ্গের একজন। নাম এর দুমরী। শুক্ল-নীতল দেহ। কিছুটা আগেও ঘোলাটে চোখ মেলে খুঁজেছিল ভিলে ভিলে নিভের ঘেহ দিয়ে গড়া—বৃক্কের বক্ক শুধিরে এত বড় ক'রে তোলা প্রাণ-প্রতিম অলককে।

হ' বছরের অলক। দুমরীর ছেলে। পাবারের খাল। কেল রেখে মরা বারের বৃক্কের পর সূতিয়ে আছে অলক। বারের চিবুকে নাক। ঘিরে অলক লাড়া খুঁজছে—মা—মাগো?

স্রাবণ-ধারা আর পাড়িরে থাকতে পারছিল না। দেহের প্রতি তক্ততে তক্ততে অলকের নিতল আকৃতি আখাত হেনে উত্তর চাইছে। উল্লসত অল পোশন ক'রে কথার হাত টেনে নিয়ে দুমরীর শিরের গিয়ে বসল।

—মাগো—ও মা?—অলক আছড়ে পড়ছে দুমরীর বৃক্ক।

জামার হাতাধ চোখের কোনাটাকে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে প্রৌঢ় গেরিয়ে গেল দর ছেড়ে চোরের মত নিঃশব্দে।

—ছিঃ বাবা কালতে নেই। অলককে নিভের বৃক্কের কাছে টেনে নিয়ে আচল দিয়ে তার চোখ মুড়িয়ে দিচ্ছিল স্রাবণ-ধারা। কথা স্মৃতিত হয়ে আছে। স্রাবণ-ধারার দাল বেয়ে নেবে দালতে ক্রন্দসীর নাম সার্থক ক'রে অজ্ঞত দারা। সহসা স্রাবণ-ধারা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল অলককে বৃক্কের সাথে গাঢ় ক'রে।

না-না, কেউ হিমিয়ে নিতে পারবে না। অলককে তার বৃক্ক থেকে। দুমরীর ভালবাদ। কি তার বৃক্ক নেই? স্রাবণ-ধারা অলকের মাথায় চিবুক ছোঁগাল।

কোল পাটাত্তে পাটাত্তে শিথিরের আর এক কোন থেকে তখন ঝেঁকিয়ে উঠল আর এক মা তার বৃক্কের রক্ত-লোলুপ ক্রান্তিত শিক্তর পর—মহু—মহু বালটি।

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ বাল্লগোপাল মুখোপাধ্যায়

(পুংপ্রকাশিতের পর)

(২)

কেন্দ্রিয় দত্তীপ্রবোধন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সেদিন ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমায় বেঙ্গল রেল ধর্মঘট করিয়েছেন। ষ্টিক এর পূর্বে এতবড় ধর্মঘট কম হয়েছে। অধিক শক্তি বিপ্লব বাহিনীর একটি প্রধান অঙ্গ। তার আগরণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই কারণে বেশপ্রিয়কে সেদিন পরম আত্মীয় মনে হয়েছিল। তিনিও দেশবন্ধুর অপর বোঙ্গা শিক্ত ও সহচর। তার মাথা বেশ, চিন্তা বিচার বিচক্ষণতাপূর্ণ। তিনি ছিলেন তাসী, দাহলী, ছাত্র ও বৃক্কগণের প্রিয়। তিনিও ভালবাসার মত লোক ছিলেন। বেশের জুঁতা তিনি ও

হুতাশক একযোগে কাছ করতে পারেন নাই। দেশবন্ধুর পর তিনি ব্রাহ্মপার্শ্বের বাংলা বেশের নেতা হন। কলকাতা কর্পোরেশনের পাচবার মেম্বর হন। বাংলার কংগ্রেসমল, বাবুদ্বা পরিহারের মল, ও কর্পোরেশন মলের নেতা দেশবন্ধুর অবিসম্বারী উত্তরাধিকারী হিসাবে এক তিনিই হতে পেরেছিলেন। দেশবন্ধুর পর এতবড় পৌরষ আর কেউ লাভ করেন নাই।

বাঁচীতে ১৯২২ সালে তিনি রাজবন্দী হয়ে আসেন। তার সঙ্গে কাউকে মিশতে দেওয়া হত না। কাবও মল তাকে কথা বলতে দেওয়া হত না, তিনি ভাক্তারতপে আযাকে পেতে, চান। কিন্তু মরকার মর্শ্ব দিল আনি ধন বেশপ্রিয়কে দেখতে দাব তখন একজন উক্তপদস্থ পুলিশ কর্মচারী সেখানে থাকতেন। অগত যেতাক সিভিল সার্জন ধন ইচ্ছা যেতে পারতেন। দ্বিমতী নেলী সেনগুপ্ত আযা পরিম্বিত্তির কথা জানালে আযি

উত্তর দিই যে দেশপ্রিয় যেন এই স্তম্ভ যেনে না মেন।
আমিও ঐ স্তম্ভে ভ্যাক্সারী করতে অস্বীকার করব। তবে
ঐমতী সেনগুপ্তকে একথাও জানিয়ে দিই যখন উত্তর
আমার উপস্থিতি অপরিহার্য্য বিবেচনা করবেন আমি
স্তম্ভের তরু না তুলে দেশপ্রিয়ের রোগশয্যা পার্শ্বে
উপস্থিত হব।

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! কি গভীর পরিতাপের বিষয়! তিনি
হঠাৎ এমনই জ্বরস্থলে (Angina Pectoris) আক্রান্ত
হলেন যে আমার খবর নেবার সমর্থও হল না। অল্পকাল
সম্পন্ন। সর্বজনমাত্র, ভারতের অভিন্ন নেতা সকলকে
শোকসাগরে ডালিয়ে বন্দী অবস্থাতেই চলে গেলেন।

প্রাতঃকাল হতে না হতে রাঁচির সারা সহরে গভীর
দুঃখ-বাধ ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বাসস্থলে আমার ছুটে চললাম।
সন্নিধ কলকাতার সুইল বন্দোপাধ্যায় তখন রাঁচিতে
দেশাস্ত্রী হয়ে বাস করছিলেন। তাঁকেও সঙ্গে নিলাম।
জীবন্তকে সন্মান দেবারে ঘের নাই সরকার ততকাল
সন্মান প্রদর্শনে বাধা তুলে নিল। কলকাতা থেকে ভাঃ
বিধান চন্দ্র চাট্টের তার পেরে আমার ছুটি ভাক্সার বন্ধু
শিশির সূমার বহু ও কণী চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে শবেক
ভাক্সা রাখার চক্র যথোপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগাদি করলাম।
ব্রাহ্ম ও হিন্দু মতে শেখ কর্তব্যগুলি করে সন্মানে বিরাট
শোভাযাত্রাসহ বন্দোপাধ্যায়ের গুলিতে গিলন্ত সুব্রিত করে
ষ্টমেন শরণে পৌঁছে দিলাম। ঐমতী সেনগুপ্তের শেষ
অন্ত্যেষ্ট যেন তাঁর অশ্রুশ্রিত সন্তানদের স্বর্গত পিতৃবেশের
নম্র দেহ দেখার হৃদয়োগের আগে কোনরূপ বিকৃতি না
দেখা দেয়।—এই অন্ত্যেষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে
আমি রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। রাঁচির আবাস-স্থল-
বণিতা আত্মল অন্তরে সেখতে ছুটেছিল মহানিন্দা নিমর
মহাপ্রাণকে। তাদের চিরপ্রিয় দেশপ্রিয়কে উপযুক্ত
সন্মান তারা দেখাতে পেরেছিল।

রাঁচিতে তাঁর আসার দিন দুটী জলন থেকে দায়ের
আমার গাড়ীতে ঠাঁকে আনিয়েছিলাম। যাবার দিন
তাঁকে এমনই ভাবে বিদায় দিতে হবে কে ভাবতে
পেরেছিল?

মহত্তর সবই মহৎ। তাঁর শেষ আশ্রয় রাঁচি দেশ-
সেবীত্বের কাছে পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছে।

এবার একটা তৈফিৎ। যদি আমাকে গ্রহ করা
হয় মহানারীত্বের চেয়ে কে বড়? আমি বিনা বিধায়
অমানিতাবে বলব—অনারী। যদি ভিজাস করা যায় কেন?
কেনন তবে? অতপটে উত্তর দেব—তাঁদের মহত্ব এত
উচ্চস্থিতে তারা নিজে বেতে পেয়েছে যে হাত বাড়িয়ে
নাগাল পাবার বো নাই। পৌর্য, বীর্ঘ্য, ত্যাগ, তিত্তিক্য,
জন-সেবা, অধ্যায়সূত্র, স্বার্থবলি, ক্রেশ-সহন, বিশেষ বরণ,
দুঃস্বপ্ন-কোথাও তারা এতটুকু খুঁজে রেখে যায়
নাই। স্বাষ্টান্তি বহু বড় লোককে বশ হয়েছে। বলা
যে বৈশ্বিক ভাও হয়ত নয়। এ কথা যেনে নিসেও
বলতে হবে অনারীয়া রাষ্ট্রের পিতামহ। তারাই রাষ্ট্র
পিতাদের এনেছে ও প্রতিষ্ঠিত করছে। অন্তরের মুক্তি-
বন্ধের কষিক, হোতা, উল্লাসতা প্রভৃতি বাক্য বিশেষণে
বিশোধিত করা হয়ে গেছে। তাদের তাই রইল চাঁদের
মালা, বিকৃতিশূন্য ও বাধ্যতর। তাদের হাতে তমক—
যার গুরু গুরু তাকে স্মানত্বমিতে জীবনের নিঃশ্বাস
হয়েছে। তাদের কথা কইতে, তাদের গাথা গুনতে,
তাদের গান গাইতে ভাল লাগে। আমার অন্তরের
ভরা অতলি তাদের স্বার্থার্থে নিবেদন করি। যে জ্ঞান-
চক্র অন্তরালবাসী আমার হৃদয়ের বেগবন, অধিকারের
নৈবদ্য গ্রহণ কর।

হী, হৃদয়র উট্রিয়ে সেগরার তৈফিৎ তলব করেছেন
আমার কয়েকটি কই। যে একটা সাময়িক যত্ন বা
কাঠামো নিয়ে হৃদয়তী আত্ম বা বিব্রলজি দাড়িয়ে-
ছিল জীর্ণ সে কাঠামো আজ আর নেই। যাত্র সেটুকু
বদলান হয়েছে। হৃদয়র ডো শুধু একটা খোলস নয়।
হৃদয়র যে একটা আত্মিক শক্তি। হৃদ পাগে বোবার
ঐচ্ছিক সাধ্য কি কোন দিন মরে বা নষ্ট হয়? তাকে
উট্রিয়ে দেবার কলনা কোন পাগলে করবে? হৃদয়র
কাগুর পড়ে যে বিম্বী ভাবধারা বনজনে পেয়েছিল
প্রকৃত হৃদয়র না আসা পর্যন্ত সে চিত্ত-শক্তি কোথায়

অনুভব হবে? বা জলের মধ্যে ছিল তা বহু ব্যাপক হয়ে পড়েছে। দুগাছুরী কাঠামো বসলে বসলে দাঁড়, কিন্তু তার শক্তি ঠিক বজায় থাকে। দুগাছুর চোখেছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও মুক্তি। ১৯০১ সালে মার্ট মাসে দুগাছুরের আবির্ভাব। তার দ্বিতীয় সংখ্যার সম-সম্পাদকদের একটি ইচ্ছাচার ও কর্তৃত্ববাদী প্রকাশিত হয়। এর নাম বিপ্লব। যেদিন তার সে ত্রুটি সাক্ষ্য হবে সে দিন না তার নিরঞ্জনের অবকাশ?

বিপ্লবের জন্ম হ'ক। দুগাছুর দাক্ষ্যমণ্ডিত হয়ে আত্মক। প্রথম হ'ক তার প্রথম দিনের আত্মক।

বিপ্লবের ক্রমবিকাশ যে স্বীকার করে না সে নিজের ওপর অধিকার করে, নিজের ইচ্ছামতাক্ষে অপমান করে। প্রভুত্বের প্রাধান্যকে যে না মানে সে অজ্ঞ, অনির্ভর-যোগ্য।

আবেদন-নিবেদনের দিনগুলি এনেছে নিজের প্রতিরোধ। নিজের প্রতিরোধ এনেছে লক্ষ্য বিপ্লবের আত্মক। লক্ষ্য-বিপ্লব প্রচেষ্টা এনেছে মহাশক্তি। তার সভাপ্রবের অবস্থান-সহ। সভাপ্রব এনেছে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। সে আবার এনেছে আইন অমান্য আন্দোলন। তা' আবার এনেছে ১৯৩২ সালের আন্দোলন। ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এতদূর একটি ঘটনা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। প্রায়ের লোকে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটয়েছিল। এবং হিংসা-অহিংসার চুলচেরা ওঠের বাসাই রাখে নাই।

আবার শুধু পুরুষের অবস্থান নিয়ে এনেছে নর ও নারীর অবস্থান—সহিংস ও অহিংস—চুই পথেই।

১৯১৪—১৯১৭ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টা এনেছিল লক্ষ্যেছে জেলে আটক বন্দী—কিছুদিনের অল্প দুখন সিদ্ধবাস।

প্রথম নারী রাজবন্দী (মনীষা দেবী) ও প্রথম নারী শ্রমপ্রাপ্ত কয়েদী (মুহুরিবালা দেবী)। তাদের স্ত্রী আরও এনেছে ১৯৩০—১৯৩৪ সালের লক্ষ্য অত্যাচারের প্রচেষ্টার শ্রীতি ওৎসাহকার, কল্যাণ হস্ত, শান্তি ঘোষ, স্মৃতি চৌধুরী, বীণা রায়, উজ্জ্বলা মজুমদার, লীলা রায়, কমলা দাসগুপ্ত এবং আরও বহু মহিলা বীরবাহিনী। এঁরাই লক্ষ্য করেছেন নেতাজীর কামীর-রাশি বাহিনী।

যোমার কথা। যোমার কি বিবোহিনী শক্তি। লক্ষ্যের নেহিলাগানের কর্তৃক তৎপরতার অত্যাচারে এবেশে যোমা আত্মদানী হয়। আইনের নিগড়ে আবদ্ধ, পরাধীন জাতির পক্ষে অসহ সংগ্রহ করা বড় শক্তি ছিল।

এবেশের অভিজ্ঞতা। যোমা নিবেশে যোমার শিকার প্রায়ই অক্ষত থেকে গেছে। শিকারী বা অপর নিরপরাধ লোক শান্তি ভোগ করেছে।

এর থেকে আমি শিক্ষা গ্রহণ করে যে প্রথম বিপ্লবের লক্ষ্যে আবেদনের বিপ্লবী অভিব্যক্তি এটিকে বর্জন করা হবে। এই শিক্ষা আমরা সূত্রভাবে গ্রহণ ছিলাম। কিন্তু বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিদ্রা যোমা পাওয়া যাবে না জেনে বিমর্ষ হন। কারণটা জানিয়ে দেওয়ার তাঁদের মন শুধুমাত্র ভুল না। তাঁরা প্রতিবাদে জানালেন বাংলার বোম্বার নামের এত অকর্ণণ যে বাংলার আমরা তা আত্মক করতে পারি না। আমি তাঁদের "মশার" পিঙ্কল দিতে চাইলেও হস্তার স্মৃতি মাসের আকাশ-বাট। নাম তাঁদের মনে রেখাপাত করতে পারছিলাম না।

শেষপর্যন্ত আমাদের কথা আমরা রক্ষা করেছিলাম। দৌড়গোর বিবধ ১৯৩৪—১৯৩৭ সালের বিপ্লবী কার্যে বোম্বার চিহ্নটিও দেখা যায় নাই। (ক্রমশঃ)

হেথাও ওঠে চাঁদ

প্রথম অঙ্ক

পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মণিকা রাত্বেই বেহিঁয়ে তার হাসপাতালের প্রধান খেইনের অগ্নিসের মিকে চলল। তখন কোন্ উঠেছে—
রোমে ভেঁতে ছেই গোকাটির দুখানা লাল হ'রে উঠেছে।
মেইন এটি বচকা বাতালী মহিলা। তিনি নিসেতানে
বিধবা। মণিকাকে তিনি একটু হেহের চকে দেখেহেন।
মণিকার কাত্তে আগ্রহ ও উৎসাহ তার দৃষ্টি আকর্ষণ
করেছিল। তার নাম বিজয়া।

মণিকা তার পায়ের কাছে ব'লে পড়ে বরা গলায়
বলল—“আপনি, আমার মা—আমি নিরাজ্ঞ, আপনি
আমাকে গাচান। আমার জন্ত না হ'ক, অজ্ঞত এই
গোকার জন্তও আমাকে একটু লাড়াবার স্থান করে দিন।”

বিজয়া বললেন—“কি ব্যাপার কি? তোমার এ
লাজ কেন? কি হয়েছো?”

মণিকা—“এই লাগই আজ থেকে আমার পাছ—
আমি এই গোকাতে নিয়ে নিরাজ্ঞ। আমাকে একটু
আল্লাহ দিন।”

বিজয়া—“মণিকা, আল্লাহ না হয় তোমাকে সিঁদায়।
সব ব্যাপারটা আমাকে বুলে বল। এই লাজ কেন
পুলে—সব আমার বল।”

মণিকা—“আমার স্বামী নেই—বাক্তে স্বামী ব'লে
জানতাম সে আমার স্বামী নয়……বলুন আমাকে আল্লাহ
দেবেন? বলুন।”

বিজয়া—“আল্লাহ তোমাকে দিচ্ছি। কিন্তু সব কথা
আমার না বললে, সব কথা না জানালে তোমার দারিদ্র
নেব কি করে?”

মণিকা তখন বিজয়াকে মোটামুটি কাহিনীটা বলল।
সব শুনে বিজয়া কিছুটা সময় জন্ত হ'রে রইলেন—তারপর
দীর্ঘ কষ্টে বললেন—“মণিকা, আমার জীবনে মেয়েদের
অনেক দুঃখের কাহিনী শুনেছি। বাক্তা তোমার আমার

মতো এ কাত্তে আসে, তাদের সকলেরই অসীম দুঃখের
জীবন। যে সব রোগিণী হাসপাতালে আসে, তাদেরও
অনেক দুঃখের কাহিনী আমি শুনেছি। এ দুঃখ তোমার
একান্ত নয়। এতে এত অসীম হয়ে না। নিজেই সন্ত
রাখবে। ভবিষ্যতে অনেক অপমানের আশাত তোমাকে
সইতে হবে। মারীমান-লোলুপ অনেক নয়-পূর দৃষ্টি
তোমার হেহের উপর পড়বে। তাদের কাউকে বিশ্বাস
ক'রো না। তারা সব নরকের দ্বারপাল—তাদের প্রতাব,
প্রলোভন, প্রেমনিবেদন, প্রমোদ কথা—কুপার সহিত
সব প্রত্যাখ্যান করবে। সাপের মতো এদের এড়িয়ে
চলবে।—

মণিকা বলল—“মা, এই কাণ্ডখানা ছেড়ে আমি
খরে বাব—ওখানকার কোন মিনিমাই অশে ধারণ করতে
চাই না। আমাকে আপনার একখানা কাপড় দিন—
সেখানা পরে এখানা ফেলে দেব।”

বিজয়া নিজের একখানা কাপড় তাকে দিলেন।
বিজয়া তার ব্যবস্থাও করে দিলেন, অপর দাসীদের মধ্যে
এক মেয়ে মণিকা আশ্রয় নিল।

সেখান থেকে সে ডেজেনকে বরদ দিল। ডেজেন
সেখা করতে এসে। সব কাহিনী শুনে সে বলল—“বেশ,
করেছেন বৌদি, আপনি কিছু ভাববেন না। আমার
নিজের খরচের টাকা থেকে আমি আপনার খরচ চালিয়ে
দেব; না হয় একটা টিউশনী করব।”

মণিকা বলল—“খরচের জন্ত ভাবতে হবে না।
আমাদের মেইন আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন—সামনের
মাস থেকে আমি মাইনে পাব; তাতেই আমার খরচ
চলে যাবে।”

ডেজেন বলল—“বেশ, বৌদি, এখন ত' জুঁমি দ্বজ;
এখন ঘরকার মত একটু খেদের কাত্তে আমাকে সাহায্য
করো। তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি—জুঁমি ত'
রাখী হও নি। তোমার আশা ছিল খোনার লগোর
প'ড়ে তুলবে। তা ত' আর হ'ল না। জীবনটা একেবারে
বৃথা যেতে মিও না।”

মণিকা লাগ্রেই রাখী হল। সে বলল—“আমি-ও

তোমার এ কথা বলল মনে করেছিলাম। যে কোন দিক দিয়ে আমার জীবনকে সার্থক করতে চাই— তোমার কাজে আমাকে টেনে নাও ডাই।”

মণিকার দিন চলছে—আশাহীন, আনন্দহীন। তার সমস্ত জীবনের অবলম্বন হ’ল তার খোকা। আর তেজেনের কথা, তেজেনের কাজ তার জীবনে যোগ্য একটা সাময়িক উদ্বেগনা। যিনের কাজের পর ফ্রান্স হ’লে বাগায় করে, তখন খোকা তার একমাত্র শান্তি যুক্ত শিল্পের উচ্চ নরম স্বেচ্ছিক বুদ্ধির সঙ্গে চলে পরে, সে বেন সমস্ত দিনের সুখ নিবৃত্ত করে। আর এক এক সময় যখন মনে হয় জীবনে তার কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই, জীবনের নিজস্ব কোন মাদুর নেই—তখন তেজেনের কথা ও কাজ তার মনে একটা প্রেরণা এনে দেয়—তার জীবন দিয়েও যে কোন মহৎ কাজ হয়—এই তার লক্ষ্যনা।

এরই মধ্যে একদিন রবর পেল—তেজেনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। সাত আট বছরের সন্ত তেজেন বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তেজেন চলে গেল; তার জীবনকে নিরস্ত্র করে তেজেন অনেকটা সহায়তা করেছে। সে-ই তাকে শিখিয়েছে—নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াটা যে মনে নেই, যে আর ঘাই হক, তার জীবন মল্লভাষিত জীবন নয়। গ্রাম্য বাসিকা সে—কোনদিন ঘর সংসারের বাইরে কিছু চিন্তা করতে শেখেনি। ছোট কাল থেকে শিখেছে নারীর পক্ষে পতি-ই একমাত্র গতি। ছোট কাল থেকে শিখেছে, অদৃষ্ট মেনে নিতে হবে। তেজেনই তাকে শিখিয়েছে বাবীর কাছেও হীরে একটা অধিকার আছে, বাবী আছে: তা বর্জন করা অসম্ভব, বাহুরের অযোগ্য কাজ। সে-ই মণিকাকে শিখিয়েছে—অদৃষ্টের বিরুদ্ধেও বাহুরের বিরোধ করা উচিত; অদৃষ্টকে বাহুর নিজের হাতে গ’ড়ে নিতে পারে। ভারতকে বাবীন করবে, ভারতের নর-নারী নিজ নিজ অধিকার বাবীন ভাবে ভোগ করবে—বাবনের প্রায়শ্চেষ্ট এই লক্ষ্যনা নিয়ে

এই পাগল যুবক ছুটছিল। তার এই আশাহীন সন্ত বাবীর সবাই তেজেনের উপর নির্ভর ছিল। এমনি মাদুরতা এই যুবক কোথায় পেল? তার পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে তা নেই?

এই স্বেচ্ছিক প্রাপ্তি মণিকার সত্যিকার স্বেচ্ছিক ছিল। তেজেন-ও লালিতা বিব্রলতা এই নারীকে ছেঁদ করত। উদ্বেগের মধ্যে একটা মধুর আত্মরিকতার স্পর্শ ছিল। সেই সত্যীর সমস্ত স্পর্শ ভাগ করে আশার পরে-ও মণিকা তেজেনকে ছাড়তে পারে নি। মাদুরীন স্বেচ্ছিক তেজেনের বাস্যজীবন ও যৌবন তার মনে পড়ল। এক কোটা অল্পও এই যুবকের সন্ত কেউ কলবে না। বিবাতার অন্যতর ৭ পিতার তাক্কিলোর ভিতর দিয়ে এর বাসা ও কৈশোর কেটেছে—যৌবন কাটছে এর স্বপ্নের ঘোরে।

মণিকার চোখ দিয়ে কয়েক কোটা মল গড়িয়ে পড়ল। তেজেনের মহাস্বপ্ন ও সাদৃশ্যতা তার নিজস্ব জীবনে একটা শান্তির উৎস ছিল। সাত তা-ও গেল। সেই অল্প বেধন তেজেনের সন্ত, তেহনি তার নিজের সন্ত-ও।

হুসের দিনও চলে,—হুসের দিনের মতোই চলে। মণিকার দিন-ও চলছিল তার খোকার বসে তখন চার বছর। মেনের সব মেয়েদের আসরের তুলস ছিল, এই বাসকটি। তাদের বক্তিত মাদুর যেন এই শিল্পটিকে আভার করে অপ্রত্যাশিত তৃপ্তি পেল। কাশ্মীরে এর: পালো ক্রমে বেত: কালেই শিল্পটির মুরগী ও অতিভাবকের অভাব কোন সময়েই হ’ত না।

মণিকা হুপুর বেলা কাজে চলে গেছে—সন্ধ্যার সময় যখন বাগায় এল, বাসায় অভ্যন্তর কোলাহল ও অগোলের ছটা নেই। বাইরে কাউকে দেখা গেল না। তার নিজের কক অন্ধকার ঘরে ঢুকল—গোকা ঘরে নেই। তার কলসর শোনা যাচ্ছে না। ঘরে অগোলে আছে সে একটু বিস্ময় করছে, এমন সময় তার একটি গহতরী—রাই ঘরে ঢুকল। রাই এসে মণিকার ঘাটের পাশে বসল।

হঠাৎ নৌতে ৰাভাৰ গিৰে পড়ে—এমনি লম্বা একটা মোটাৰ লৰি এসে খোকাৰ কোমল দেহকে দিঠ ক'ৰে চ'লে দাৰ। বেহেৰ পুতুল খোকাৰ বেহেৰ সেই দৃষ্ট মা'ৰ দৃষ্টিৰ সামনে আনতে-ও কঠ হয়।

মণিকা অজান হ'বৈ পড়ল—বৰন জান হ'ল, তবন-ও ঠিক অহুচৰ কৰতে পায়ল না, কি তাৰ ছিল আৰ কি সে ছাৱাল। ইহা যে কেবল ভাৱাৰ অতীত, তানহ, ইহা অহুচৰি-ও অতীত। জীৱনৰ সব গ্ৰহি যেন ছিৰ হৈয়ে গেল।

(১২)

কলিহাস্তা মণিকাৰ কাছে অসত্ব হৈয়ে উঠিল। গতি পিত্তৰ মুখে সে তাৰ খোকাৰ মুখছবি দেখতে পাৰ; ৰাভা দিহে মোটাৰ গাড়ী বেতে দেখলেই তাৰ আশঙ্কা হ'ব যেন ঐ ছফলানৰ আঁহাৰ কোন পিত্তৰ কোমল দেহকে নিৰ্মমভাবে গিৰে দাৰে। ৰাভাৰ কোন পিত্ত দেখলে তাৰ বুক কেঁপে ওঠে—কোন কোন ছফ-লানব ঐ নিপাণ পিত্তকে পেৰণ কৰতে আগছে।

তবুও তাৰ দিন চলছিল। আৰ এক বছৰ সে তপনৰ লম্পৰ্ক ও আৰ্দ্ৰ ত্যাগ ক'ৰে এসেছে। এৰ মধ্যে তপনৰ লগে তাৰ কোন যোগা-যোগই হয়নি। গেলিন হঠাৎ হাসপাতাল প্ৰাঙ্গনে তপনৰ লগে সাননা-সাননি হ'য়ে পড়ল। তপন বলল—“কি মণিকা, এক বছৰেৰ মধ্যে একবাৰ খোজ-ও নিলে না। আঁহাৰ শৰীৰ খুব খাৱাণ, তোমাৰেৰ হাসপাতালে ভতি হতে এগেছি।”

মণিকাৰ মুখ দিহে কোন অৰ্থাৰ বেৰ হুবাৰ আগেই, তপন আঁহাৰ বলল—“খুবই অৰ্থ কৰেছে, মণিকা, বাচব কিনা জানি না। ৰোজ একবাৰ কৰে আমাকে দেখতে দাৰে কিছ।”

মণিকা বাঢ় নেড়ে সন্মতিৰ মতো কিছু একটা জাণিয়ে দৰে পড়ল। নিজেৰ ওয়াৰ্ডে গিৰে, সে লম্বত অৰ্থাটা বৃত্তে চোঁৱ কৰল। নিজেৰ মনকেও সে বৃত্তে চোঁৱ কৰল।

বিৰালবেলা অগৰ এক ওয়াৰ্ডেৰ নাৰ মণিকাকে ভেকে পাঠাল। সে ওয়াৰ্ডেই তপন আছে। তপন-ই বলেছে মণিকাকে ভাকতে। সে মণিকাৰ বামী, এই পৰিচয় দিহেই মণিকাকে ভাকিথৈছে।

লম্বাৰ পাণে টুলে মণিকা বলেছে। তপন কথা বলছিল—“মণিকা, এক মাল দাৰা অৰ্থে তুলছি। আঁহাৰ নিজেৰ জন কেউ নেই যে এক কোটা মাল লুখে বেৰ। হাত-ও পৰা নেই—না চলছে ষ্টম, না চলছে পৰা। ... কতবাৰ তোমাৰ কথা মনে হৈছে—কৰেক মাল এক লগে ছিলাম; তোমাৰ নিপুন ও লম্ব দেবাৰ কথা তুলব না। ...

“মণিকা, এই এক বছৰেৰ মধ্যে একবাৰ তুমি খবৰ-ও নিলে না। এক নিষ্ঠুৰ তোমাৰ হতে পাৰ। একটা সানাত্ত কথাৰ তুমি এমনি ক'ৰে চ'লে এসে—এখনও সেই বেশ পৰে আৰ। হিন্দু স্ত্ৰী হৰে বামীৰ অকল্যাণ কৰছ? বিধবাৰ বেণ কেন পৰছ? দেখ, হিন্দুৰ বিয়ে—আমি ই ৰাগ কৰি, আৰ তুমি-ই ৰাগ কৰ—যেই বত অৰীকাৰ কৰি না কেন, সত্যি ত' আৰ লম্পৰ্ক মুছে দাৰ না.....।”

মণিকা এবাৰ চকল হৈয়ে উঠে দাঁড়াল। সে বলল—“আমাৰ এখন বেতে হৰে, ওয়াৰ্ডেৰ কণীয়া সবাই ভাকবে—যেটন মাল দেখেন।”

তপন—“আৰ একটু বল, মণিকা। ...

মণিকা বলল—“না, আৰ বলতে পাৰব না।” উত্তৰেৰ অপেক্ষা না ক'ৰেই সে দেখিয়ে গেল। পৰদিন আঁহাৰ তপন তাকে ভেকে পাঠাল। মণিকা যেন কতকটা ভাৰাৰ প্ৰতীকাৰ ছিল; কিন্তু বেতে-ও যেন তাৰ পা' বাঁধছিল।

যে ভাকতে এসেছিল তাকে মণিকা জবাব দিল—“এখন আমাৰ কাৰ আছে। ... এখন বেতে পাৰব না।”

মণিকা হ'লে হ'লে ভাবছিল কি সে কৰবে। একবাৰ বিচাৰ আসছিল নিজেৰ কাগালপনাৰ জন্ত নিজেৰ প্ৰতি; আঁহাৰ বিচাৰ দিছিল তপনকে, তাৰ নিৰ্মল আচৰণেৰ

মস্ত। আবার থেকে থেকে মন উল্খল করছিল যাওয়ার কল্প। মনকে সে প্রবেশ দিল—শত হ'ত—আমি তখন রোগী—সহায়দীন, সমলহীন—নিভাশূন্য করণার বেগ। কিছুক্ষণ পর আবার ঐ ওয়ার্ড থেকে লোক এল মণিকাকে ডাকতে। এবার সে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। তপনের কাছে যেতেই তপন কেঁদে ফেলল;—সে বলল—“মণিকা, তোমার একটু-ও দয়া হয় না।—এমনিভাবে আমি প'ড়ে আছি; আর দারাদিনের মধ্যে তুমি একবার এলে না।”

মণিকা কঠিনভাবে পাঁড়িয়ে রইল; তার মনে তখন একটা বড় বইতেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তপনের বিছানার ধারে বসল। কিছু সময় চুপ করে থাকার পর, তপন আবার বলল—“নেয়েমাছুর এমন নিষ্ঠুর হ'তে পারে, আবার দান্য ছিল না। এখন-ও তুমি কাঁচ হ'য়ে বসে আছ।.....”

একটু পরে মণিকা বলল—“আমার এভাবে ডেকে পাঠিও না। তুমি ত নিজেই সব সম্পর্ক ছুঁছে ফেলেছ। ভগবান আমার সব রকমেই মুক্তি দিয়েছেন; এই আমার ভাল। আর আমাকে জড়িও না।”

তপন মণিকার হাতখানা টেনে নিজের কপালে চেপে ধরল; মণিকার এমন শক্তি হ'ল না, হাতখানা সরিয়ে আনে। এমনি ক'রে দিন চলছিল। মণিকার মনের বাধ আতে আতে ভেঙে বাজিল;—আতর্কণ ও বিকর্ষণের দোলায় দোল খেতে খেতে মণিকা প্রায় রোজই একবার তপনের ভগানে আসত। একটা অনুভূতানে সে তপনের ঘরে যায়, কিন্তু ‘বুধ’ হ'য়ে বসতে পারে না। ওখানে বসতে কোথায় যেন একটা পীড়; বোধ ক'রে। তারপর সে বেরিয়ে গেল। পরদিন আবার তপন ডাকে জেগে পঠাট। মণিকা কতকটা যেন এই ডাকার প্রতীক্ষার ছিল। কিন্তু যেতে-ও যেন পা বাধছিল।

একদিন তপন বলল—“দেখ, আমার হাতে একটাও পয়সা নেই। জান ত' হাঙ্গামাডালে-ও হুঁচাবটা পথদার লুকায় হয়। আমাকে কতকটা টাকা ধরে;”

একটু ইতস্ততঃ করে মণিকা বলল—“আচ্ছা, কাল দেব।”

বাত্তে মণিকা নিজের মন নিয়ে অনেক যোজ্ঞাশূড়ী করল। তার ডিবারী মন, একমুঠি উন্মিত্তি আর পেয়ে যেন কৃতার্থ বোধ করছিল। নিজের মনকে সে শক্ত ক'রে নিল।

পরদিন শশি টাকা সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে গেল। নিজের ওয়ার্ডের কাছে বসন ব্যস্ত তখন কালকের মতো। আবার তপনের ওয়ার্ড থেকে তার আহ্বান এল। হাতের কাছে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তার মনটা যেন ধুঁদী হয়ে উঠল। নিজের মনকে দমক দিয়ে সে আবার ব্যস্ত মন দিল। কিন্তু কালের টাকে টাকে তার মন ঐ ওয়ার্ডের দিকে তাকাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে মণিকা তপনের কাছে গেল। তার হাতে শশি টাকা দিল। তপনের যোগদর্শন মুখ চাশ্বে উজ্জল হ'য়ে উঠল। টাকা কয়টি নেবার সময় মণিকার হাতখানা একটু চেপে ধরে সে বলল—“মণিকা, দিয়া তুমি আমার টাকা দিলে? বেশ, এখানে।

মণিকা বলল। তপন আমার বলল—“মণিকা, আমি ভাল হব ত'। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। বাতে প্রায় দুই হয়নি। খুব বেহুশা গিয়েছে। আমি ভাল হয়ে উঠলে আবার নৃতন ক'রে জীবন শুরু করব। কেমন মণিকা? খোকা কোথায়? সে এখন কত বড় হয়েছে।”

কিছু সময় ইতস্ততঃ ক'রে মণিকা বলল—“সে নেই।” তপন বলল—“খোকা নেই? কি হয়েছিল?”

অতি সংক্ষেপে মণিকা বলল—“তবে একটু সময় তপন চুপ ক'রে রইল। পরে বলল—“মণিকা, কত দয়ালু দেখছি—এই এক বছর খোকা বড় হবে। দেত' আমাকে অধীকার করতে পারত না; তার পিতৃপরিচয় সে কি করে অধীকার করত। তুমি—আমি যা-ই বলি, যা-ই করি; খোকা আমাকে অধীকার করত কি ক'রে?.....”

খোকার কথা মণিকার রক্ত মাথায়ে চেপে গেল—তার মুকের ঘন, অন্ধরের মণি খোকাও সে বাড়িচাঁদের সহ্যন বলেছিল, তার কপালে কলকের টাকা পেয়ে দিয়েছিল।

আর আর সে সেই খোকার পিতৃস্বের দাবী করছে। এই স্পর্ধা তার সহ্য হ'ল না। সে বলল—“খোকা মরে গিয়ে গেছে, নইলে ত' তাকে পিতৃপরিচর্য্যই বা ডিঙিয়েব সম্ভাবন বলে সমাজে গারিত হু'তে হ'ত।”

তখন বলল—“রাকশী, একদিনের একটা কথা আরও ভুলতে পারিনি? তাঁর মস্ত নিষেধ সন্ধানের মৃত্যু কখনো বরঙা...মেরেসের মতো এমন হিংস্র আর কেউ নেই, কখন ব'লে কোন পদার্থ তারের অন্তরে নেই।...”

মণিকা টল থেকে উঠে গাভাল। তিক্ত কণ্ঠে সে বলল—“আর তোমরা পুরুষরা কন্মার অবতার কীট-পতঙ্গের মতো মেরেসের জীবন পায়ের তলায় গিয়ে মিছ, আর মুখে কন্মার বড়াই করছ...।”

সে বেরিয়ে দাঁড়িল। তখন তার এগনের কোণা ধ'রে কেলন। সে বলল—“রাগ করলে, মণিকা? খোকার মৃত্যু দাব্যবের পর তোমার ঐ রকম উক্তি কি পোভন হয়েছে? একদিনের একটা ভুল কি চিরবাহী করে রাখতে হয়?”

মণিকা চোখের মল চেপে বলল—“এখন ছাড়, যা এখানে কাজ আছে।”

তখন বলল—“হাবার আগে আর একবার আসবে? আর একবার এলো মণিকা।”

মণিকা বাড় নেড়ে সম্বন্ধ জানাল। সন্ধ্যার আগে সে আবার এল। ইচ্ছায় এল, কি অনিচ্ছায় এল—ঠিক জানে না। কোন এক অশুভ বাহু বেন তাকে টেনে আনল। আবার সে বিছানার পাশে টুল বলল।

এবার তখন বলল—“উপরে উঠে বসো মণিকা। আমার বিছানার পাশে বসো।”

বসন্তের মতো মণিকা তাই করল। তখন মণিকার হাতখানা ধ'রে নিষেধ চাতের মধ্যে চেপে রাখল। তখন বলল—“মণিকা, বেশ, এ জীবন তোমার পক্ষেও যুগের নয়; আমার পক্ষেও আনন্দের নয়। এভাবে চলি আর ক্রান্ত হয়েছি। ভূমি কিরে চলো।...”

মণিকা কোন জবাব দিল না। চুপ ক'রে বসে আছে। এমন সময় একটা দাঁস এসে তাকে বলল—

দেউন বিজয়া তাকে ডাকছেন। সে তাড়াতাড়ি উঠে চ'লে গেল। দেউনের কক্ষ বিজয়া একা। বিজয়া বলল—“মণিকা, তোমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কি করবে, তা নিয়ে আমার কিছু বলবার নেই—আন্তঃমান-বোধ তোমার যদি না থাকে, তা আমার কিছু নয়। কিন্তু হালপাতালের দাঁস হ'রে ভূমি এমনি বেহাগ্যপনা করবে তা চলতে পারে না। এখানেকার একটা নিয়ম সুখলা আছে।”

মণিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—যাযা ভুলতেও সে পারল না।

বিজয়া বলল—“এখানে ভূমি দাঁস—এখানেই শিষ্টতা ও নিয়ম তোমাকে বেনে চলতে হবে। নিষেধ ওয়ার্ড ছেড়ে মস্ত ওয়ার্ডে গিয়ে আড্ডা মিতে পারবে না। তার উপর এক পুরুষ গোপীর লগে নার্সের এত ঘনিষ্ঠতাও চলতে পারে না।”

মণিকা নতমুখেই জবাব দিল—“আমার অন্তর হয়েছ, মাপ করুন।”

বিজয়া বলল—“আর বেন এমনি না হয়।”

মণিকা অবনত মস্তকেই চ'লে গেল।

(১৩)

রাত্রে বিছানায় গড়ে মণিকা অনেক কাহা কীদল—এ কি দুর্বলতা তাকে পেয়েছে। সেই অপমানের আধরের দিকে দ্ব্যর্থ কুসুরের মতো সে লোমুখ দৃষ্টি মিছে। যে গর্ভ নিয়ে সে বেরিয়ে এসেছিল, আর তার এতটুকুও অন্তরে খুঁজে পাচ্ছে না। নারী জীবন কি বিভবনায়। সবই বুধা;—তার জীবন যৌবন, বেহ ও মনের সব সম্পদ কোনটাইই কোন মূল্য নেই, যদি একটি নর-বেহতার পায়ের সম্বন্ধ জীবনটা ধরে অর্গলি মিতে না পারে—এক যদি সেই নর-বেহতাই অগ্রহ ক'রে তার জীবন অর্গলি গ্রহণ না করে।...এইরকম জীবনে পূর্ব, সম্মানবোধ সবই বুধা...কিন্তু, না, তা হতে পারে না। এই জীবনকে যে ক'রে হ'ক গ'ড়ে তুলতে হবে, অতীতকে মুছে ফেলতে হবে—নিষেধ এত বছরের জীবন তুলতে

যে—খোঁকাঁকে তুলবে, তখনকে তুলবে—যে ছপের দাঁহন তার জীবনে এসেছে, তার ফলে জীবনের সমস্ত ত্রেম যেন ভঙ্গ হয়ে যায়;—আর যেন থেকে যায় শুধু পাথরীন সোনা—কেবল যা কিছু হৃদয়, যা কিছু মনসের। তার অতীত জীবনের শুধু এই সমস্ত নিয়ে সে কি তার নূতন জীবন আরম্ভ করতে পারবে না! জীবনের সমস্তি—এর ধারাবাহিকতা কি ছিন্ন করা যায় না? একি একটা একটানা গতি? জীবনের অতীত কি তার ভবিষ্যতের সঙ্গে অবিকল্পিতভাবে মিলিয়ে থাকবেই? থাক না! অতীতকে ত' সে মুছে ফেলতে চায়না। কিন্তু অতীতকে সে চিরকালের জন্য বর্জন করে রাখবে না—এই তার পন্থা হ'ক। অতীত থাকবে অতীতের গুণামন্ত্রণে—বর্তমানের চলতি পথে নয়। পর পর তার জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত যে ভবিষ্যতের পর্বে থেকে আসবে, সেই মুহূর্তগুলিকেই যেন সে লতা ও বাস্তব বঁসে সার্থক করে তুলতে পারে।

পরদিন মণিকার খোঁজ নিয়ে তখন জানল সে আজ কাছে আসেনি। নার্সকে সে তৃতীয়বার খোঁজ নিতে অসুযোগ করে সে নার্সের কাছে বসক গেল—“বলছি, কাছে আসেনি; সে আর আগবে না। আবার কি খোঁজ নেব?”

তখনই মন চিন্তার জাল বুনতে লাগল—তবে কি মণিকার কোন অসুখ করেছে—তার জীবন এখন মকতুম হয়েছে, তখন মণিকা এল একটি চিঠি ছোটখাটোয় বড়ো। হৃদয় এর শীতল ধারার আবার তার জীবন উর্বর হয়ে উঠবে।

বিভালের দিকে আর একজন নার্স এল; তখন তার কাছে মণিকার কথা পাড়ল। সমস্ত দিন একটা অস্বস্তিকর উৎকণ্ঠার কাঁটিয়ে শরীর তার একটু অবসন্ন হয়েছে। লিভারের স্থানে একটু বেদনা বোধ করছিল। নার্স এলে তার নিয়মিত কর্তব্য হিসাবেই তখনই তার হাতকে খোঁজ নিল। একটু দুর্বলতায় তখন বলল—“আজ ভাল নেই।”

নার্স—“কেন, কি হয়েছে?”

তখন—“পেটেও ব্যথা করছে। এমনটা শরীরটা একটু দুর্বল লাগছে।……ভাল লাগেনা।”

নার্স আর দু' একটি প্রশ্ন করল। তখন বিশেষ জবাব দিল না। নার্স পার্থেবিটার লাগিতে বাড়িয়ে আছে। তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—“আজ্ঞা বলতে পারেন—মণিকার কি হয়েছে? সে আসেনি কেন?”

নার্স—“কেন? মণিকার সমস্ত আপনি এত ব্যাধি কেন? তার খবর নিয়ে আপনার কি?”

তখন—“হরকার! মণিকার খবর নিয়ে আমার কি হরকার!……”

সে উপহাস করে মুখ ঢেকে নিজের কাঁদা সমন করতে চেষ্টা করল। তখনও নার্সের কর্তব্য শেষ হয়নি, এবার তার নাকী দেখবার পালা এল। সে বলল—“হাতটা দিন।” এগিয়ে হাত বাড়িয়ে তখনই হাত ধরতে গিয়ে সে টের গেল, তখন কাঁদছে। সে বিম্বিত হয়ে বলল—“একি, আপনি কাঁদছেন?”

তখনও মণিকার কাহিনী হাসপাতালের নার্সরা প্রায় সবাই অল্পবিস্তর জানত। নার্সদের নিয়ে হোটেলের এমনি ঘনিষ্ঠতার ব্যাপার, তাদের জীবনে খুব বিরল নয় একটু ভিত্তিকতার সঙ্গেই সে এবার বলল—“আপনার দুদিনের খেয়ালের বশে একটি মেয়েকে আশ্রয়শীল করলেন। …আর এখন মায়াকাটা মুক্ত করেছেন! মণিকা চাকুরি ছেড়ে চলে গেছে; যেটন তাকে তিরসার করেছেন। অথচ মোখটা সবই আপনার।”

তখন চুপ করে গুলল;—কোন জবাব দিল না। নার্স নিজের কাজ শেষ করে চলে গেল।

তখন আবার নিজের মনকে নিয়ে পড়ল। মণিকা এইভাবে চলে গেল! কেমনটা গেল সে! তার ভাসমান জীবন জীবনতরী একটা আশ্রয় খুঁজছিল। যেন করেছিল—মণিকার কাছে সে আশ্রয় পাবে। কিন্তু মণিকা তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল। জীবনে কত অপরাধ সে করেছে! নারী মনস তার জীবনে অনেক হয়েছে, হৃদয় দেও তার প্রত্যাখ্যান করেছে, আবার তাদের হাতেও সে প্রভাবিত হয়েছে। মালতী

তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে আজ দেড় বছর হল। এই দেড় বছরের জীবন তার নিজের কাছেও কুণিত মনে হয়। মণিকা বত দিন ছিল, ততদিন তবুও একটা সংকেত হয়ে চলেত। তারপর এই একবছর কোন বাতই রইল না। জীবনে সবাই যখন তাকে ভাগ করল, তখনই নিজের জীবনের প্রতি এমন কি মমতা আছে! তারপর তেজেন জেলে চলে গেল। শেরি বন্ধন টুটে গেল। তেজেনকে যে সে রেহ করত, তা এর পূর্বে কোন দিন সে জানতও না।

তেজেন ও তখন সহোদর ভাই;—তখন থেকে তেজেন ছ'মাস বছরের ছোট। তেজেনের মনের পরই তাদের মনের দৃষ্টি হয়। তেজেনের বাল্যকাল কেটেছে মাতৃশ্রমে, কৈশোরের প্রারম্ভে তেজেন পিতৃগৃহে আসে। তখন হতে ছ'ভাই এক যোগে বিনাতার অভ্যাচার এবং পিতার অন্যায় ও অবহেলা লক্ষ করেছে। এর চু'স্তিন বছর পরেই তখন চলে আসে মেলার সহর এবং পরে ক'লকাতায়। ঐ চু'স্তিন বছর ছোট অন্যায় ভাইটির প্রতি তখনের যে রেহ ও মমতা জন্মেছিল, সহরের স্থানান্তরে তা চাপা পড়ে গেল। সেই হ'তে নিজের মনে তখন নির্বাক ও একক। তাই তেজেন যখন ক'লকাতার পড়তে এসে, তখনও ভাইয়ের প্রতি কোন দ্বিধা বা ক'লকাতায় সে অস্বস্তি করেনি। নিজেকে নিয়েই সে বরাবর ব্যস্ত ছিল। তবুও যখন কোন যত্নে তেজেনের চরিত্রের ও যোগ্য স্থাপতি গুলত, তখন তখন একটা সহর মৌরব বোধ করত। কথ্যচিত্র ছ'চারটা টাকার তেজেনকে গিয়েছে;—তার মনের কোন গুল মুহুর্তে যি তেজেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তবু তার সহর ছ'চারটা সহর গ্রহণ করেছে। এর বেশী তেজেনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না।

এমনি করে তখনের ক'লকাতার জীবন কাটছিল—এক পড়িল পথ বেয়ে। স্থানের অবস্থানে সে গিয়েছিল, কিন্তু

যখন সে পাখি অপরকেও হারী করতে পারেনি। এ পিকা তার কোনদিন হয়নি যে; যখন একক-ভোগ্য নয়; যখন একটা গ্রহ বা থেকে এক টুকরা কেটে বের ক'রে নিলে সেই গ্রহের দর্শন্যই নষ্ট হয়ে যায়। সে ছিল সাক্ষ-স্বী। বাল্য ও কৈশোরে সে পিতৃমাতৃ রেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তার বক্তিত যন দ্বাৰী করছিল—লকলের কাছ থেকে সে কেবল পায়ে; তার মনে আছে কেবল পাওয়ার দ্বাৰী; যেওয়ার দ্বিধা তার নেই। মালতীকে ভাল বেলেছে—নিজের স্ব-শুধার, মালতীর ভাটার লুট করেছে সে। তাকে যে কিসের কিছু দিতে হবে—এ যোগ তার হয়নি। বাড়ীতে বা ক'লকাতার বাসার মণিকা তাকে দেখা করেছে—সে মনে করেছে, এ তার প্রাণ্য। মণিকার দেখা সে উপভোগ করেছে। তেজেন তার ভাই—তেজেন চরিত্রবান, সে লকলের শ্রম, সে মৃদুশ্রম, সে যোগ্যী এতে সে গর্ব অহুস্তব করেছে; কিন্তু তেজেনকে রেহ গিয়ে বা টাকার দ্বিধে সাহায্য করা, সে দ্বিধাযোগ্য তার নেই।

সে মালতীকেও ভালবাসেনি,—সে মণিকাকেও হুগা করেনি। আজও সে মণিকাকেই চারনি,—আর যে সব নারী তার জীবনকে স্পর্শ ক'রে গিয়েছে, তাদের কাউকে পেলেই সে আজ কুণিত হত। একাকীস্থের স্বদ্বাৰে যখন তার জীবন তপ্ত হয়ে উঠেছে, তখন সে চেয়েছে একটু জায়া, একটু আদর—তা সে মণিকা-ই-হ'ক, মালতী-ই বা আর দ্বাৰই হ'ক।

মণিকা চলে গেল। এ ভাবে হঠাৎ মণিকার চলে যাওয়ার অর্থ যে কি, তা সে বুঝল না। তা বুঝার মতো যন তার নেই—কোনদিনও ছিল না। তার মনে রইল কেবল মণিকার প্রতি একটা অহুযোগ—একটা রাগ—মণিকা তাকে এমনভাবে বর্জন করে গেল। 'মণিকা নিষ্ঠুর—মণিকা অবিদ্যাগী!

(ক্রমশঃ)

ভারত ও পাকিস্তানের সম্ভাব্য ভবিষ্যত সম্পর্কের পটভূমিকায় পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমস্যা

শ্রীকীর্ত্তি চন্দ্র সান্যাল

এক।

বিগত কয়েকমাসে পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমস্যার সূত্র ধরে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ এবং কিশোরগঞ্জের ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অসহায় অংশে চলিয়া আসার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমস্যা সর্ব ভারতীয় গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। এখন পর্যন্তও এই সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ ও জন-সাধারণ সম্যকরূপে সচেতন হইয়াছেন একথা বলা চলে না। কেবলমাত্র লক্ষ লক্ষ বাস্তুত্যাগী নরনারীকে নুতন করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যস্ত অস্ত্রবিধাই ইহাদের চোখে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। তাই পূর্ববঙ্গবাসী সংখ্যালঘু সমস্যার সূত্র জন-সাধারণের বাস্তব জ্ঞানের বিকক্ষে বড় জলি শুনা যায় তাহাদের মধ্যে প্রধানতম সূত্র এই যে সত্তা কেটি লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা একতরফা অসম্ভব এবং তাহা করিতে গেলে যে গুরু ধারিত্ব আসিবে বড়টাই তাহার চাপে নবগঠিত ভারতীয় রাষ্ট্রের পরিমিত সম্পদ ও সামর্থ্য হইবে নিঃশেষিতপ্রায়। পণ্ডিত জগদ্বল্লাসকে ও তাই বলতে শুনা যায়—রলে দলে বাস্তুত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গবাসী অহুসমানমগ্ন যেন অবস্থা জটিলতর করিয়া না তুলেন—(They must not complicate matters)।

ব্যাগক বাস্তুত্যাগ সম্বন্ধে কথা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুসমস্যার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়া ইহার হ্রাসমার্যের সূত্রাংবেষণ করাই উদ্দেশ্য। প্রকৃত প্রত্যয়ে বাস্তুত্যাগ আসল সমস্যা নয়, আসল সমস্যা হইল যে ঘটনা পরম্পরা পারিবারিক অবস্থা ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার (psychological reaction) ফলে সহন সহ্য লোক স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ নিবিধেয়ে তাহাদের চিরপরিচিত আবাসভূমি ও পিতৃপুরুষের ভিটামাটি ছাড়িয়া

অনিশ্চিত অন্ধকারে কাপাইয়া পড়িবার প্রেরণা পাইতেছে—তাহাই। সমস্যাটির মর্মাহঙ্গম নহে কিংবা তাহার বাস্তুত্যাগত বহিঃপ্রকাশকেই বড় করিয়া দেখেন তাহারা রোগের মূলগত প্রকৃতি নিরূপণ না করিয়া উহার বহিঃলক্ষণগুলিকেই (symptoms) ব্যাধি বলিয়া ভুল করেন। এক্ষণে কেন্দ্রে ব্যাধির মূলোৎপাটন সম্ভব হয় না। বাহির হইতে প্রবেশ লাগাইবার ফলে লক্ষণগুলি সাময়িকভাবে প্রশমিত হইতে পারে মাত্র। রোগবিভাগের অপরিহার্য পরিশ্রম হিসাবেই ব্যাপক বাস্তুত্যাগ আরম্ভ হইয়াছে। তাহারা রোগবিভাগের ওস্তাদ সাহী বাস্তুত্যাগ প্রতিরোধমূলক তাহাদের বর্তমান মৌলিক গায়েব গোড়া কাটিয়ে আগায় জল ঢালিবারই মত। কেহ যদি বহু প্রতিবাদকরে নদীর উৎসস্থিতি হইতে উহার নিরুদ্ধের করিয়া সাগরমগ্নে রাখিবার আয়োজন করেন তাহা হইলে যেমন তাহার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে, ঠিক তেমনিই যে ঘটনাস্রোতের বিগতনে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সমস্যা আশ্রয়ভরণ করণ করিয়াছে সেট অব্যাহিত ঘটনাবর্তকে উহার উৎস মূখ হইতে নিরুদ্ধের ব্যবস্থা না করা কিছুতেই বাস্তুত্যাগ বন্ধ করা সম্ভব হইতেছে না। যাহা যাহো সমস্যাটি সরল হইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে চইলেও আবার নব নব ভগ্নে ইহা আশ্রয়প্রকাশ করে।

কেবলমাত্র ভারতীয় রাষ্ট্রের স্থিতি অস্থিতির মাপ কাটিতে বিচার করিলে একদেশবন্ধিত্যেই পরিচয় দেওয়া হইবে এবং কৃতকর্মের ফলস্বরূপ উদ্ভূত দায়িত্বকে এড়াইয়া যাওয়া হইবে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক বাধ্যবাধকতার দিক হইতে বহা করা সূত্রসমত তাহা করিতে গেলে ভারতীয় সরকার ও জনসাধারণের কত বড় সূত্র লইতে হইবে তাহা বিচার করিবার সময় সংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘুগণের

সত্যিকারের অবস্থা কি তাহা নিরূপণ করিয়া, তাহাদের
 দুঃখভরণের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিয়া, পরিপূর্ণ মহাদুঃখিত
 সবে সেই দুঃখভরণ বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে
 কত বেশী পরিমাণে লাভবান করা যায় তাহাই উপায়
 উদ্ভাবন করিতে হইবে। তাহার বলের অহেতুক ও
 অনাবশ্যক আতঙ্কই ব্যাপক ব্যস্ততাপের প্রধান কারণ
 তাহার। শুধু আত্মপ্রত্যাশা করিতেছেন। ঘটনাস্রোতের
 অবগতাব্যাপী পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারমুক্ত মন লইয়া স্বীকার
 করিয়া নিলে পাছে বিরাট দায়িত্বভার কাঁধে আসিয়া
 চাপে সেই অসহনীয় ধামাচাপা বিরাট অস্তিত্ব তাহারা
 অপরের উপর আতঙ্ক আরোপ করেন। অসহায়
 প্রতিবেদনকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করা কাপুরুষোচিত
 কাজ সম্ভব নাই। কিন্তু যোগবিভাগ করিয়া গতির
 বৃহত্তর অংশ ও ইহার নেতৃত্ব তাহাদের প্রতিবেদন,
 বর্তমানে পাকিস্তানের অধিবাসী সংখ্যালঘুগণকে তাহাদের
 ইহার বিরুদ্ধে অসহায় অবস্থার কেলিমা রাখিয়া আত্মরক্ষার্থে
 বিদেশের প্রাচীর তুলিয়া নিরুপদ্রব আশ্রয়শালা নির্মাণের
 নীতি গ্রহণ করেন নাই কি? অন্তর্য করিয়া অন্তর্যের
 প্রতিকার হয় না সত্য, কিন্তু দোষারোপ করিয়া অবস্থা
 অপহার দিয়াও সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, ইহাতে কেবল
 তিক্ততা দৃষ্টিই সম্ভব। বিহারের দাশাকারীগণকে দণ্ড
 করিয়া মহাস্বাধীন বলিয়াছিলেন যে যদি তাহারা
 নোয়াখালীর নৃপংসার সংঘর্ষে লড়াই মর্মান্বিত হইয়াছিল
 তাহা হইলে তাহাদের উচিত ছিল নোয়াখালীর প্রতিপক্ষ
 বিহারে লইয়া নোয়াখালীতে অসহায় সংখ্যালঘুগণের
 পাশে দাঁড়াইয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে বীরের মত লড়াই
 করিয়া প্রাণোদন হইলে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া। আজ
 তাহারা বলিতেছেন—প্রতিবেদনকে কেলিমা চলিয়া আসিও
 না, তাহাই কিছুরিন পূর্বে গতির একটা বিরাট অংশকে
 অতিক্রান্ত করিয়াছেন, তাই স্বতন্ত্রের প্রায়চিত্র বস্ত্র
 তাহাদেরই উচিত পূর্ববৎ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়া
 সেখানকার বৈশিষ্ট্য জীবনের সর্ববিধ অহংকা ও
 অভিযোগের সমান অংশভাষী হইয়া অসহায় সংখ্যালঘুগণের
 প্রাণে বহনকারের চেষ্টা করা, তাহাবিধকে দায়বোধের

মর্যাদা লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য করা। কেবলমাত্র
 পূর্ববোধের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের পূর্ববৎ বাণ করা উচিত
 একথা বলার অর্থ পূর্ববোধের প্রতি ভারতীয় রাষ্ট্রের কোন
 দায়িত্ব নাই তাহাই স্বীকার করিয়া দেওয়া। যদি পূর্ববোধের
 সমস্ত সর্বভারতীয় সমস্তা হয় তাহা হইলে শুধু পূর্ববোধের
 কেন, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অন্তর্য স্থানের নেতৃস্থানীয়
 ব্যক্তিগণেরও উচিত পূর্ববোধের সংখ্যালঘুগণের দাবি থাকিবে,
 তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া, দায়বোধের মৌলিক অধিকার
 রক্ষার দাবীতে সংগ্রাম করা, যদি এইরূপ কর্মপ্রণালীই
 হুজিযুক্ত বিবেচিত হয়। অন্যর পক্ষে যদি ব্যস্ত-
 ত্যাপের কোন বাস্তবিক কারণ না ঘটনা থাকে,
 যদি পূর্ববোধের অবস্থা তেমন কিছু অবাধ্যাত্মিক না
 হয় তাহা হইলে তো কাহারও পক্ষেই সেখানে
 বাস করিবার কোন বাধাই থাকিতে পারে না।
 অবস্থা যে বাস্তবিক, ব্যস্ততাপের যে কোন প্রকৃত
 কারণ ঘটে নাই তাহা চোখে আঁচল দিয়া হুজিযুক্ত
 বিহার অস্ত ভারতীয় নাগরিকগণের মধ্য হইতে অন্তত
 কিছুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের উচিত দীর্ঘমেয়াদী
 পরিকল্পনা লইয়া পূর্ববৎ আসিয়া বাস করা। ইহাই
 মহাস্বাধীন পথ। তিনি আরও কিছুকাল বাঁচিয়া
 থাকিলে তাহার জীবনের শেষদিনগুলি হয়তো
 পাকিস্তানেই কাটাইতেন। এই সমস্ত তিনি একাধিকবার
 ব্যস্ত ও করিয়াছিলেন। দিল্লীর অবস্থা শাস্ত হইয়া
 আসিয়াছিল। ভারতের অন্ত কোথাও কোন সাম্প্রদায়িক
 দাঙ্গামা ছিল না বলিলেই হয়। তাহার পাকিস্তান
 দাবার আর হয়তো বেশী বিলম্ব হইত না। কিন্তু
 ভারত-ভাঙ্গা বিপাতার ইচ্ছা অন্তরঙ্গ, মহাস্বাধীন
 আতন্ত্র্যীয় গুলিতে নিহত হইলেন। তাহার আত্মরক্ষার
 পুরাপুরি রূপারিত করিবার লক্ষ্য ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণ
 বহুবার ব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পার্শ্বের
 পিছারীপালনী ও অন্ত হুঁ-একজন ছাড়া সর্বভারতীয়
 প্রতিষ্ঠানসমূহ আর কেহ পাকিস্তানকে তাহাদের দায়ী
 কর্মক্ষেত্র করিবার ব্রত গ্রহণ করেন নাই। বহন পশ্চিম
 বোধের অগ্রগতকর্মী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এক

জনসংখ্যাগণের একটা অংশকে (আসাম সম্পর্কেও একথা খাটে) বলিতে চেনা যায় যে পূর্ববঙ্গবাসী সংখ্যালঘুগণের চলিয়া আসা উচিত নয়, আশিলে তাহাদের দুর্গণার সীমা থাকিবে না, তখন বৃত্তিতে কত হয় না যে সংখ্যালঘুগণের দুর্গণা মোচন করিতে তাহাদের যত না আগ্রহ তাহা অপেক্ষা এই আশঙ্কাই তাহাদের মনকে অধিক পীড়া দেয় যে ক্ষমতার স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়াবে এবং তাহাদের সম্পত্তিতে অগ্নে আসিয়া ভাগ বসাইবে।

আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক নাও হইতে পারে। এ পর্যন্ত যে পরিমাণ অমূল্যমান পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ভ্রমস্থাবিত্ত শ্রেণীর। কেহ কেহ বলেন—ইহারা এতদিন অপরকে শোষণ করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল, এমন শোষণের পথ বন্ধ হইয়াছে, প্রতিষ্ঠাও সিঁচাছে, সুতরাং ইহারা পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে। এই মুক্তি মানিতে হইলে ধরিয়া নিতে হয় যে তাহারা যেখানে আসিতেছে সেখানে শোষণের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে এবং প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথও হ্রাস। কিন্তু একথা কেহ স্বীকার করিবে বলিয়া মনে হয় না। আসল কথা ঐহারা পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছেন তাহারা মনে করেন যে ভারতীয় রাষ্ট্রে কাহাকেও অপরকে চাঁটতে বেশী সুবিধা দেওয়া হইবে না সত্য, কিন্তু প্রত্যেককেই তাহার বোগ্যতা অনুযায়ী আত্মবিকাশের পূর্বপ্রযোজ দেওয়া হইবে, শ্রেণীগত অথবা সাম্প্রদায়িক কারণে কাহাকেও অসুবিধা অথবা ভূত্যাগ পোহাইতে হইবে না। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সূত্রিত হইয়াছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পর ইহাকে ব্যবহারিক জীবনে সমাজ ও জাতির কল্যাণে কাজে লাগাইবার একটা অস্পষ্ট চিত্রও ইহাদের মনে ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে না পাইলে কোন জাতিগঠন মূলক পরিকল্পনাই কার্যকরী করা সম্ভব নয় (পার্বীভীর আদর্শমত নৈরাশ্রের অবস্থা (anarchic state) না আসা পর্যন্ত)। পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমস্যার

পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা অংশ দাও করার আশা অল্প পরাহত। ভারতীয় রাষ্ট্রে সেই বাধা নাই। সেখানে যন্ত্রকে বাস্তবে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষাকে, স্বজন সৃষ্টিকে (creative urge) পিষিয়া দিবার উল্লেখ কেহ করিবে না। পাকিস্তানে থাকিতে গেলে সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য বাহিত হইবে মাহুকের মৌলিক অধিকার অর্জন ও রক্ষা করার সংগ্রামে। বিদেশী ইংরেজ মেনপ্যাগ করিবার পরও সেই লংগ্রাম অধিকন্তর বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া—কেননা এবারকার প্রতিদ্বন্দ্বী সুইসের বিবেচনী নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ, শর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বিধানী স্বদেশবাসী—চলিয়া দাঁড়িতে হইবে, অর্থাৎ সেই সময় ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব তাহাদের কর্মকর্তৃপন্থাকে নয় নয় স্তরের ক্ষেত্রে দার্ক করা তুলিবে; চেতন ও অচেতন মনের এই অসুস্থ পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্তশ্রেণীর ব্যক্তত্যাগে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষেত্রণা যোগাইয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া তাহারা সুবিধাবাদের পতিলবরে নামিয়া আনিবে, ক্ষমতার স্বার্থে মাতিবে, অথবা সভ্যসভাই জাতিগঠনমূলক কাজে অকুনিয়োগ করিবে সে কথা সত্য। কেহ কেহ চরিতে: নানান প চক্রান্ত লিপ্ত হইবে। ভাগ্যক্রমে ঐহারা বিনা আদ্যেই নয় ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া পড়িয়াছেন তাহাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশও মূলিকর্মের হস্তগত কর্মবিত্ত করিতেছেন। কিন্তু ব্যক্তত্যাগী পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্তশ্রেণীর অধিকাংশ লোকই যে খোলা মন ও মনিক্কা লটো আসিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভুক্ত উঠিতে পারে, যে কাজ যত কঠিন তাহা তত মহৎ। ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করিয়া সন্তোষ লইয়াও সাধাঅসাধী কাজ করিয়া যাওয়া অপেক্ষা পাকিস্তানে থাকিয়া মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে লড়াই করা মহত্তর। বার্ষিক বিচারে একথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জন মাহু মীতোক্ত “কর্মণো-বাধিকারতে মা কলেশু কর্মসম”—এই মহাবাক্য মানিয়া চলার মত উচ্চতরে এখনও উঠিতে পারে নাই। তাহারা আত কল লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখে। ইহা অতিশ্রেষ্ঠ নয়

হইতে পাৰে কিন্তু বাস্তব নহয়। তাছাড়া মহৎ কাৰ্য
লক্ষ্যৰ পক্ষেই জাৰ্জৰ যত্ন কেবলমাত্ৰ পূৰ্ববৰ্ত্তমানী
সংখ্যালঘুগণকেই সেই মহত্বৰ অধিকাৰী কৰা কেন?
তাহাৰো তেনে বৈজ্ঞানিক এই দাবিৰ বৰণ কৰিয়া লব নাই।
গাছাৰো মূৰেৰে কথা বলিয়া তাৰালিগকে পাকিস্তানে
ৰাখিয়া মাহুৰেৰে অধিকাৰ অৰ্জনৰূপে মহৎকাৰ্য আন্ত-
নিয়োগ কৰিতে উৎসাহ দেন, তাহাৰো অনাধাৰেই আশিয়া
মহত্বৰ অধিকাৰ হইবাব প্ৰদান পাটতে পায়ন।
তাছাৰেও দাবিৰ অধিক। বেহেতু আন্তৰ্জাতিক
আশাৰ প্ৰদানকো পাকিস্তান প্ৰত্যাবে লগালে ৰাজী
হুইয়াছিলে। মহাত্মাৰ বিৰোধিতা, "শেখ-বিভাগ
মহাপাণ"—তাৰো এই হুশীৰ অভিধাত লগেও তাহাৰ
পাকিস্তানেৰে বিৰুদ্ধে ৰোপন কৰিয়াছিলে।

উচ্চ শ্ৰেণীৰ হিন্দু পাকিস্তান ছাড়িও আশিলে তথা-
কবিত নিঃশেষীৰ লোকৰো মূলমানে হইয়া গাইবে—
এইজন কথাও শুনা যায়। অত্যাচাৰেৰে ভয়ে বৰ্খাস্তৰ গ্ৰহণ
অবস্থাই নিৰ্জনীৰ এং অবস্থাবৈজ্ঞান্যে পূৰ্ববৰ্ত্তমান সংখ্যালঘু
সম্প্ৰদায়ৰ একটা অংশ হৰতো ধৰ্মাঙ্গৰ গ্ৰহণে বাধা
হইতে পাৰে। কিন্তু শেখবিভাগে ৰাজী হুইবাব লগতই
এই লক্ষ্যবানৰ কথা ভাল কৰিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত
ছিল; পাকিস্তান আন্দোলনেৰে উৎপত্তি ও বিকাশৰ

ধাৰা পুৰণৰ বিচাৰ কৰিলে, সাম্প্ৰদায়িক বিদ্বেষই বেটোৱা
প্ৰধান উপজীব্য একথা মনে দাবিলে অহমান কৰা কঠিন
হইত না বে পাকিস্তানেৰে পৰিপূৰ্ণ মৰ্যাদা লটোৱা বাল কৰা
অমূল্যমানগণেৰে পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিব। তাহাৰ
কলে হাছাৰা কতকটা বিতৰ্ণানী ও লম্বৰ তাহাৰাই এপনে
হানতাপ কৰিতে ব্যৱ হইবে এং তাহাৰো চলি।
আশিলে বিজ্ঞানী ও অসম্বৰ জনসাধাৰণ আৱণ অসম্বৰ
বোধ কৰিব। এংন আৰ অতীতৰ কুলজাতিৰ কথা
ভুলিয়া লাভ নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি জয় এংন
বদলান্তৰ এড়াইয়া চলিতে হয় তাহা হইলে পতীৰতাবে
বিচাৰ বিবেচনা কৰিয়া কৰ্তব্য নিৰ্ধাৰণ কৰিতে হইবে।
বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় তাৰতীৰ নেতৃবৰ্গ পাকিস্তান-
বাসীসিগেৰে সহিত ব্যবহাৰে এ পৰ্বত বে নীতি অহুসৰণ
কৰিয়া আশিত্বেহে তাহাতে ব্ৰহ্মনিষ্ঠাৰ ছাপ অছাই
বহিয়াছে।

অনেকক্ষেত্ৰেই তাহাৰো ঘটনাত্মকতাকে পূৰ্ব হইতে
অভিলক্ষিত হাতে প্ৰবাহিত কৰাৰ চোৱা না কৰিয়া যেন
জোন্তেৰে টানে ভাগিয়া নিৰ্বাছন, পৰিঘৰ্ত্তন না ঘটাইয়া
পৰিঘৰ্ত্তিত হইয়াছন, নিৰ্বাচক না হইয়া জীৱনক
হইয়াছন। ইহাৰই নাম Policy of drift।

(কৃষ্ণা)



হোমগি

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উদিশ

পরদিন বেলা বায়টার সময় অশোক বখন খাড ত্রাণে ইতিহাস পড়াইয়া অফিসে কিরিয়া আসিল তখন অফিস সুস্থ, কেবল চক্সবাবু বদিয়া কাজ করিতেছেন। তাহাকে বেশিরাই চক্সবাবু কলম নামাইয়া রাখিলেন। তাহার ঘূষের দিকে চাহিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন— ভীমকলের চাকে খোঁচা নিয়েছ অশোক—ভীমকল এইবার তোমাকে ভাঙা করে কামড়াবে।

অশোক হাসিয়া বলিল—আমারও ভীমকল নারদার অন্ন আছে মাঠার মশায়।

চক্সবাবু বলিলেন—তা যেন হ'লো। মাঠারদের আমি তোমার চেয়েও ভাল করে জানি অশোক। দরওয়ানাবাবু যে ভুল অধরিত আর ডিপার্টমেন্টে ভান্নায়ে বলে চীৎকার করছিলেন, আমি জানি সেটা তাঁদের পুত্ৰ গর্জন। অতখানি করতে তাঁরা দাফল করবেন না। তবে তোমার বিরুদ্ধে ওঁরা উঠে পড়ে লাগবেন।

অশোক আবার তাহার অভ্যস্ত মিঠা হাসি হাসিল, বলিল—তা আমি জানি মাঠার মশায়। যেদিন আমি আপনাদের সঙ্গে ফুলের ছেলেদের সম্বন্ধে আলোচনা করে remodel করবার ভার নিয়েছিলাম সেদিন একটা কথা আপনাকে আমি বলিনি। মাঠার মশাইদের সম্বন্ধে। এই ফুলকে নতুন চেহারা দেবার পথে এখন একটা মার বাধা আছে। সে এই মাঠার মশায়রা। ওঁদের সকলেরই বয়স হয়েছে। দৃষ্টি একেই সূচীর্ণতার ৫৭২ বছরের অন্তে সূচীর্ণতার হয়ে এসেছে। কর্তৃপক্ষিও দিখিল হয়ে এসেছে। ওঁদের চিত্রাচরিত ক্রটিগুলো ওঁরাও জানেন। তাই প্রথম থেকেই ওঁরা একটা শব্দ করে দল তৈরী করে রেখেছেন। কেবলমাত্র উদ্বেগ কোনরকম পরিবর্তন ঘটতে না পারে, সেই চিত্রাচরিত পথে আদরক। আমি এখন এখানে পড়তাম তখনও দেখছি। আম

মাঠার চয়ে সেটা ভাল করে দেখছি এবং নৃত্তি। আপনাকে বার গাং ওঁরা অল্প বয়স বাবুয়ার করতে চেয়েছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না জানি। তাই বলছি। আপনাদের ঐ দল গুডাটা কোনকালে ভাল লাগেনি। আমায় লাগে না। অবশ্য আপনি বার বার চেষ্টা করে যেখানে আসতেও পারেননি। অবশ্য যেখানে আসা মানেই হত ফুল থেকে যেখানে যাওয়া। তাইই অন্তে দলের মধ্যে থেকেও কোনগদিন ওঁদের দলের গোগ হতে পারেন নি। তাই এবার ওঁরা আপনাকে বান দিয়েই দল গুডছেন। আর আমার দায়িত্ব তাঁদের ঐ দলগত মনোভাবই এখন ছেলেদের উদ্ভাবনে পড়াভান্না করবার ও দাকবার পথে বাধা। আমি সেই সমস্যাতে ভেঙে যেব।

চক্সবাবু শিহরিচা উঠিলেন। অশোক বলিতেছে কি? তাহা হইলে যে ফুলটাই নষ্ট হইয়া যাইবে! সে তিনি কি করিয়া যটিতে যিগেন? তিনি সে কথা অশোককে খুশিয়া বলিলেন—অশোককে কোন কথাই তিনি গোপন করেন না—তা হ'লে যে ফুলটাই নষ্ট হয়ে যাবে! সে কেমন করে হয়?

অশোক এবার ভাল করিয়া হাসিল, বলিল—এখানে আপনাদের ফুল হ'ল মাঠার মশায়। ওঁদের দলটা যদি ভেঙে যায় তা হ'লে কি কতি হবে? ওঁদের এই 'গিডই' ছেলেদের সর্জন্য করছে এ কথাটা আপনিও জানেন। ওঁরা অকারণ উত্তর করেন ওঁদের কাছেই স্বার্থ নষ্ট হবে। স্বার্থ মোটেই নষ্ট হবে না বহুদিন ফুলে থাকবেন। তবে কায়েমী হওয়ার কোনো অর্থ হয় না। দলন এখন পুরানো শিক্ষকদের কেউ থাকবেন না তখন কি এ ফুল বন্ধ হয়ে যাবে? তা তো যাবে না!

চক্সবাবুর চোখের সামনে হুটখা উঠিল চলমান ফুলের ছবি। তাহার কন্ঠায় তিনি এই ফুলটিকে চিরকাল ছাত্রদের হৃদয়িকিত করিয়া রাখির করিয়া গিতেছে, তাইই যেখিতে পান। সঙ্গে সঙ্গে এখন এই শিক্ষকবাই যেন তাঁহাদের চিরকাল শিক্ষা দিয়া চলিয়াছেন। আম অশোকের কথাই তাহার সে ফুল ডাঙিল। সত্যই তো,

একদিন আসিবে বৈশি এই ফুল তিনি থাকিবেন না।
কিন্তু তাই বলিছা কি ফুল বন্ধ হইয়া যাইবে। অশোকের
মতই ডক্তরের দল তাহাকে চালাই কৰিবে দেখিব।

চক্ৰবাসু অশোকের কথা মানিছা লইলেন। অশোক
বলিল—আৰ মাঠাৰ মশাই, শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের
সম্বন্ধ কি এই? পক্ষতায় সম্বন্ধ, বিরোধিতার সম্পর্ক?
সম্বন্ধটা তো সহযোগিতার? সেই সহযোগিতা? যদি
কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় তবে তাকে নষ্ট করে ফেলাই উচিত?
চক্ৰবাসু বিজ্ঞাপা কবিলেন—দুৰ্ভাগ্য। কিন্তু কি কৰে
নষ্ট কৰবে?

—এখনও তো প্রত্যক্ষভাবে সেই সহযোগিতার বা
ছাত্রদের মাৰ্গে আঘাত লাগে নাই। আর আঘাত না
পেলে প্রতিঘাত বা কলহের দরকার নেই তো।

—দুব ভাল কথা। সন্তাই তো। আর তা হলে
কগডাই অৰ কি?

—কিন্তু না। মাঠাৰ মশাইয়া অকাৰণে বাগ
কৰেছেন। আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন।

বৃন্দা অশোক তাহাৰ পকেট হইতে একখানা চিঠি
বাহির কৰিয়া চক্ৰবাসুকে দিল। অকস্মিয়াল চিঠি,
টুভেটস্ ইউনিয়ন লিখি আছে। বৃন্দেৰ লমত ছাত্ৰেৰা
মিলিয়া তাহাৰে স্তাৱলমত অধিকাৰ বন্ধ কৰিবাৰ তত্ত্ব
এই ইউনিয়ন গঠন কৰিতেছে। এবং সেই উদ্দেশ্যে
তাহাৰা শিক্ষক মহাশয়ৰে সহযোগিতা প্রার্থনা কৰিয়া
পত্ৰ দিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সাক্ষাতিয়
কোনো যোগাযোগ নাই।

পৰামিত হইয়া চক্ৰবাসু ব্যথিত মন লইয়া কিৰিয়া
আসিলেন। কি কৰিয়া ছেলেদের কাছ হইতে বৈশি
নাহিনা তিনি দাবী কৰিবেন? আৰ বে দাবীতে
শিক্ষকৰা নাহিনা বাড়াইবাৰ দাবী কৰিতেছেন তাহাৰ
চেয়ে বৈশি দাবী বে ঐ ছেলেদের আছে। তাহাৰে
তো ঐ কষ্ট আরও বৈশি কৰিয়া পাইতে হইতেছে।
উদাহৰে বাগদের তিনি জানেন। কত দণ্ডিত, কত
অসহায় উদাহৰ! লামাত ছই তিনিটা টাকা—তাহা
মিতেই উদাহৰে প্রাপ্য হইয়া যাবে।

আজ তাহাৰ লামাৰ প্রয়োজন ছিল। সে লামনা
কোথাৰ মিলিবে তাহাও তিনি জানিতেন। অশোককে
সংবাদ দিতেই সে 'মন্দিরা' উঠিল। সে বলিল—বটে!
মাঠাৰ মশাই, এইবাৰ আপনাৰ প্রতিশ্রুতি পালনের সময়
এসেছে। আপনি ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিন। শুধু
ভোট দিয়ে চুপ করে থাকলে চলবে না।

চক্ৰবাসু বলিলেন—এবার তুমি কি করবে?

অশোক বলিল—আমি কিছুই করব না। করবে
ছেলেরা। যে কারণে মাঠাৰয়া মাইনে বাড়াবাৰ কথা
বলেছেন, ঠিক সেই কারণে ছেলেরা মাইনে কমাবার দাবী
কৰবে।

চক্ৰবাসু বলিলেন—কি করে দাবী করবে।

—অত্যাৱ সহজ। ছেলেৰা ঠাইক কৰবে।

চক্ৰবাসু শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—সে কি? সে
কি হয়?

—আপনি কি ছেলেদের দাবী অজ্ঞাৰ মনে করেন?

—না।

—তবে কেবলমাত্র একটা গোলাযোগের ভয়ে
অজ্ঞাৱকে সমর্থন করবেন?

চক্ৰবাসু চুপ কৰিয়া থাকিলেন। তাহাৰ লমত মন
বাগু দিবাৰ অস্ত আদোড়িত হইতেছিল, কিন্তু কোথাৰ
একটা অজ্ঞাত ভয় থাকিবা থাকিবা তাহাকে দাবী
দিতেছিল।

অশোক বলিল—মাঠাৰ মশাই, এখনও কি আপনাৰ
খিদা থাকবে? এখনও কি ভাৱ-অজ্ঞাৱেৰ বিচাৰ করবেন?
একবাৰ আহুন, পুৰাণো কালের শেওলা-খয়া দেওলাল
ঠেলে ভেঙে বৈঠিয়ে আহুন।

চক্ৰবাসু একটা লম্বা নিঃশ্বাস টানিবা লইয়া বলিলেন—
কই দাও, কাগজ কলম দাও।

অশোকের কাছেই ইউনিয়নের খাতা ছিল। চক্ৰবাসু
আপনাৰ নামটা লই কৰিয়া দিলেন। অশোক বলিল
—আম 'শিঙ' ভাঙল।

অশোক বলিল—এখন লমত কিছু পোপন রাখা হবে।
দরকার হলে প্রকাশ করা হবে।

কিছু দিনের মধ্যেই ডিভিসনাল ইনস্পেকটর অফ স্কুল স্কুল ঘেঁষিয়া গেলেন। অশোকের সস্ত্র স্কুলের যে সমস্ত পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহাতে ছেলেরা যেত্রেণ কাজ করিতেছে ও পড়িতেছে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। খাতার উজ্জ্বলিত প্রশংসাও করিয়া গেলেন স্কুলের। বিশেষ করিয়া চন্দ্রাবাবু। এতু বাড়িয়া গেল।

কাগজেট মাহিনা বাড়াইবার প্রস্তাব মানেজিং কমিটির নতুন অধিবেশনে বাতিল করিয়া দেওয়া হইল।

সদানন্দবাবু আনন্দের সীমা নাই। ছেলেকের মাহিনা বাড়িল না; অথচ সরকারের টাকার মাটারের মাহিনা বাড়িয়া গেল। আবার স্কুলের উজ্জ্বলিত প্রশংসা! মিটিং শেষ করিয়া তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন, একটি ছেলে আসিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল।

সদানন্দবাবু স্থিলেন পত্রখানা। পড়িতে পড়িতে তাহার মূখ রাঙা হইয়া উঠিল। তিনি আবার কিরিতা আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। আবার মিটিং বসিল। তিনি চিঠিখানা পড়িতে লাগিলেন "তারকনাথ হাইস্কুলের ট্রেজেন্টস ইউনিয়ন স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানাইতেছেন যে বর্তমান অবস্থার ধান চালের ও অন্ত্রান্ত বস্তুর আর্থপাতিক স্কুলের সস্ত্র ছাত্রের আর্থিক অবস্থার অত্যন্ত অবনতি ঘটয়াছে। যেহেতু অধিকাংশ ছাত্রই কৃষিকারি মহান সেই হেতু বর্তমানে দারিদ্র উচ্চ মাস-মাহিনা যোগ্যেন তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। আবার সরকার হইতে নতুন এত স্কুলকে দেওয়া হইতেছে জানিয়া ট্রেজেন্টস ইউনিয়ন অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া এই প্রস্তাব করিতেছে যে টাকার দুই আনা করিয়া মাহিনা যেন কর্তৃপক্ষ কমাইয়া যেন। বিশেষ তাহারা ইউনিয়নের অল্প কতকগুলির পাত্র হইবেন।"

তিনি কাগজখানা মুড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। বসিলেন—ইউনিয়ন টিউনিয়ন চলবে না। তার আবার কে?

লড়া ডাডিয়া গেল এবং ছাত্ররা যথা সময়ে সে সংবাদ পাইল। পরদিনও সদানন্দবাবু ছিলেন। চন্দ্রাবাবু

অপরোক্ষে আবার একখানা পত্র পাইয়া তাহাকে দিয়া আসিলেন। স্কুলে তিনশো বার জন ছাত্র সংখ্যা। তিনশো পাঁচজনের সহিত একখানা পত্র চন্দ্রাবাবু সদানন্দবাবুর হাতে দিলেন।

সদানন্দবাবু পড়িলেন—"ট্রেজেন্টস ইউনিয়ন স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানাইতেছেন যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাহারা যেন বিশেষ বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করিয়া সম্মতিস্বত্বক পত্র যেন :—

(১) ট্রেজেন্টস ইউনিয়ন ছাত্রদের প্রতিনিমিত্তস্বত্বক প্রতিষ্ঠান ইহা মানিয়া লইতে হইবে।

(২) পূর্ণপক্ষে উল্লিখিত হারের মাহিনা কমাইয়া দিতে হইবে।

(৩) শিক্ষকেরা অকারণে ছাত্রদিককে গ্রাহ্য বা তিরস্কার করিতে পারিবেন না।

ট্রেজেন্টস ইউনিয়ন আপাদী ৪০ বস্তীর মধ্যে উত্তর প্রত্যাশা করেন। নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উত্তর না পাইলে ছাত্রেরা স্কুলে আসা অত্যন্ত কষ্টকর সহিত বন্ধ করিবে।"

সদানন্দবাবু প্রায় কিছু হইয়া গেলেন এবং সস্ত্র সস্ত্র কেমন অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি চন্দ্রাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ্ঞা চন্দ্রাবাবু, এ সমস্ত কোন্ কোন্ ছেলে করছে? আপনি জানেন? তাদের চাবকে দিতে পারছেন না?

চন্দ্রাবাবু হাসিলেন অত্যন্ত কলম হাসি। বসিলেন—দেনিন আর নাই রায় বাহাদুর। ছেলেকের গায়ে হাত তোলা অসম্ভব। আর একটা বলে রাখি। এবার আর ছেলেকের দাবাতে পারবেন না। এবার কোন আদর্শ নিয়ে নয়, কোন বড় কিছুই করতে পারা লড়ছে না—নিজের দারিদ্র নিয়ে লড়ছে। এবার আমরা ওদের আর ধামাতে পারব না। একটা Compromise করে নিল।

—আপনি ভয় পাচ্ছেন মিছেমিছি চন্দ্রাবাবু। ও সব শেই আগের মত দু'দিন হবে, আবার উৎসাহ নিয়ে যাবে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ্ঞা এ সব কে ওদের মাথার ঢোকাচ্ছে ভাবেন?

—ও সব আদর্শকাল মাথাধার আর কাউকে ঢোকাতে

হে না বাত বাতাহুৱ। Its in the air. তৰে আপনাকে জানিঃে ৱাৰি ওঃৱ শক্তি আৱ বুদ্ধি দিছেহে অশোভ।
 ৰোক্তিঃ হইতে আসিবাৱ লহৰ এ কথাটা লগানকৰাবুকে
 বলিবাৱ ভক্ত তাঃগকে বিশেষভাবে বলিবাৱ সিংহাছিল
 অশোকই।

—হঁ, ওকে লৱিৱে সিদ্ধি পাঃন।

—ও কাম ৰবৰবাৱ কৱবেন না ৱাৰ বাতাহুৱ।
 তাতে ছেলেৰে লে হৰি compromise হবাৱ কোনো
 সম্ভাবনা থাকে সেটিও হাবে। ছেলেৱা ওকে বেবতাৱ
 মত ভক্তি কৱে। আৰ এখন ওকে লৱালেই বা কি
 হবে? বা আইভিয়া সেবাৱ তা সে বিৱে বিহেছে।

—ভাল, ও থাকুক। তৰে ওলেৱ লে আবাৱ
 কম্প্ৰোমাইজ আবাৱ কি? আমৱা বা কৱব তাই হবে।

—বেশ। বেশুন কি হৰ।

লৱোৱাতি ধৰিয়া অশোক ভাবিয়া শেৰিল সে
 ছেলেৰে সৰ্গনাণেৱ পথে টানিয়া লইঃ বাইতেছে

কিন। সে লম্ভাৱ সমত পৱিপতিৱ কথা চিন্তা কৰিয়া।
 শেৰিল। কি খটিল সে কি কৰিবে তাঃও ঠিক কৰিয়া
 ৱাৰিল। সে ভাবিয়া শেৰিল ছেলেৰে এইবাৱ আপনাৱ
 ৰাৰেৱ তিতিকৃষিতে প্ৰতিঃা নিশ্চয়ই হইবে। অৰ
 অৰধাৱিত। সে হৰ শান্ত মনে ঘূমাইঃা গড়িল।

শেৰিল ধ্যানিয়মে শুল হইল। শেৰিল পঃেৱ কোনো
 উত্তৰ আসিল না। তাঃাৱ পৱ দিনও শুল হইল।
 পঃেৱ উত্তৰ আসিল না। চম্ভাবু তাঃাকে লগানকৰাবু
 সিদ্ধাৱেৱ কথা বলিগাছেন। সে অৰত তাঃা ছাঃৰেৱ
 বলে নাই।

তাঃাৱ পৱদিন। তাঃাৱ আপেৱ দিন বিকালবেলাৱ
 সমত উত্তীৰ্ণ হইঃা শেল। পৱদিন হইতে কোনো ছেলে
 শুলে আসিল না। বাহিৰেৱ ছেলেঃা কেহ আসিলনই
 না। ৰোক্তিঃএৱ ছেলেঃা আপন আপন ঘৰে ঘৰ বন্ধ
 কৰিয়া শুইঃা থাকিল।

(ক্ৰমঃ)

দ্বিপ্ৰহৰে

শ্ৰীশ্ৰীলাকী ব্ৰজেন কৰ্মকাৱ

অদূৰ ভান শ্ৰাৱেৱে নামিয়া এসেছে ধীৰে
 চায়া ঘন শুভতা হুপুৱেৱ।
 ভিৱিৱ কিমব্ৰিম অজ্ঞাত কৃষ্টিৰ
 ক্ষণে ক্ষণে বনবালা হুপুৱেৱ।
 ভক্ত কৃষ্টিৰ 'পৰে কপোত কপোতী হুঁজী
 মুণোমুৰি গাঃে পান নিৱালাৱ।
 অৰণ্যে আৱতী কৱে হৃগন্ধ উপচাৱে
 মনসিৱ মল ৰাগ মৰিয়াৱ।
 কৃষিকাৱ চায়া বনে ছোট হুঁজী বুলুল
 ছোট কোণে বসে কৱে বহু আলাপন।
 লৱকাৱ পলবে পলবে শিহুৱিয়া ক্ষণে ক্ষণে
 জাগিতেছে লুঃেৱ নিশন।
 কাঃো জাঃা নীল জলে নিকল ঢলঢল
 আকাশ নিশৰ আঃে নীলিঘাৱ।
 এ ৱঃ নীৱবত। উঃেৱ অসীংবেৱে
 কি কাঁহেছে ভাষাঃীন ইশাৱাৱ।

ভংগ কৰিও না কুহেলিকা কলনা
 লংঘৰে তৱিও না মন আৱ।
 আবৰণ কৱা নাঃো উঃোচন
 এ মদূৰ মাঃাময়ী নিখাৱ।
 লতা ৱয়েছে কোপা—? ৰক্তদূৰ আঁধি ৰাঃ
 হুনি শুণু অঃ্ৰেৱ মাঃাঃাল।
 ঘোৱ নিশীল ঘূমে অঃ্ৰ শেখি শুণু
 বিখবিখতা এক মহাকাঃল।
 সে বহা অঃ্ৰে ভাংগে এঃ তাত্ৰা ৰলে ৰলে
 অঃ্ৰে হালিছে ৰবিচক্ৰ।
 অঃ্ৰে হুটিছে গুৰী শূঃেৱ বৃক চিঃে
 নমনশূল ৰে লক্ৰঃ।
 অঃ্ৰেৱ সেই হাসি সেই হুঁজী আঁখিঃল
 পড়িতেছে জীৱনেৱ দম্ব।
 ৱৱশীৱ নিৰ্জন প্ৰাঃেৱে কুটে ওটে আঃ
 কলনাৱ শিহৰণ বম্ব।

সহজ মানুষ

ঐশ্বর্যবান্নারায়ণ বসু

পুত্রের পাশে বিতর্ক বিলের মত বিশাল একটা প্রান্তর। চারিদিকে কোণ-কাড়ের মত গ্রামগুলি বাসনিক ঘন সন্মুখ। বর্ষাকালে এই ঘাটটি যে কি আকার ধারণ করে বন্যের স্রোত হাওয়ায় চোখ মেলিয়া তাহা ব্রহ্মাবার উপর নাই। এক পা-ও ভিঁবী বা লাগতি ছাড়া চলিবার বোধকে না। কিন্তু এই ভিঁবী সাসতি লইয়া চলায়ও বিপর আছে। ধান চাষ শেষ হইলে, তাহার শিথলি ঘা যে ভিকিওয়ালা চরম ভবতরীমতর পরিচয় দেয়, অনির কবকের কাছে তাহার আর রক্ষা নাই। শাক্য পাইলে উত্তম-মধ্যম দিবা বিলার করে, না পাইলে অক্ষয় গালি-গালামে চৌকশুরু উদ্ধার করে। তবে বর্তমানে সে ভয় নাই। কানুন ছাড়িয়া চৈত্রে আসিয়া বর্ষা ঠেকিয়াছে। মাঠে ফুটাগাছাও নাই। বিস্তৃত মাঠের স্রোতে ধুধু করে, নানা লোকের বাতায়তে বিভিন্ন পায়ে-চলা-পথের স্রুতি হইয়াছে। সকালে বিকালে রাখামদল ছোট বড় গরু লইয়া বিচরণ করে। নির্জনতা-প্রিয় ব্যক্তির পক্ষে স্থানটি উপযুক্তই বটে! আমি মাকে মাকে ইহার মাঝখানে সিঁধা বসি; এবং চৈত্রদিনের খোলা হাওয়ায় নিম্নে বিলাইয়া মিহা অনন্তরূত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি।

সেদিনটি ছিল সুবাস। হুল হুলি পরে বিশ্রাম করিয়া শাক্য লক্ষণে বাহির হইয়াছি, পিছু থাকে চমকিয়া উঠিয়া—মাঠারবাবু—পেচায় হই।

মুখ কিরাইয়া বাহাকে দেখিলাম, তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। পরনে তাহার আধ-মরলা একখানি ধুতি। গায়ে একটা জীর্ণ মসিন গেজি, হাতের দীর্ঘ পুই অঙ্গুলিগুলি কি একটা মিনির বৃত্তিতে ব্যস্ত। কান ছাড়া সে যে এক গণ্ডও থাকিতে পারে না, তা তাহার বলিষ্ঠ কন্ড দেহটির নিখুঁত স্মরণ পরিপূর্ণি প্রত্যাশায় হইতে পারে। বঙ্গ আটশিশ-উনচলিশ, কি চলিশের প্রথম দিকে হইতেও পারে। সবে তাহার বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে। সে আমার পরিচিত। ক্রমে যে সব ছাত্র পড়াশুনা না

করিয়া 'ব্যাঙ্ক বেঞ্চে' বসিয়া নানান গল্প করিয়া শিক্ষক মহাশয়ের চোখে দুলি দেবার চেষ্টা করে, সে তাহাশেষই একজন। কহিলাম—মনোউদ্বীগ্ন দে।

প্রত্যুত্তরে বয়স লোকটি অব্যব দিল—ঠ্যা মাঠারবাবু, ওরই ভ্রাত্রে আপনার কাছে এসেছি।—আমি কি করে আর আপনাকে চিনবো—বাবু। এই কাজ দেবে বাড়ী কিবুছি, ছেলে বললে—ঐ আমায়ের মাঠারবাবু ধার। তাই একবার গুণীকরেক কথা বলতে এলাম।—আজ্ঞা, ছেলে আমার পড়াশুনা কেনম করে—মাঠারবাবু?

আমার উত্তর লভত, কহিলাম—একেবারেই না।

শিতার গুরু সাহিব সে তুলিল না, ভৎসনা করিয়া কহিল—কিরে—মাঠারবাবু বা বললেন তুলিল। বসি পড়াশুনা কর না কেন? গায়ের রক্ত জল করে টাকা রোজগার করি, বাওয়াই পরাই, আর তুই আমাকে ঠকাস।—আমার আর কি, আজ গায়ে কাল দহত মরে যাব। কিন্তু আদা লইবে না—নিজে ঠকবিবে, নিজে ঠকবি। মহা আনার প্রতি চাহিয়া কহিল—মাঠারবাবু আজ আপনাকে বসি—পড়াশুনা করে ত ভাল, তা না হলে রক্ত-মাংস আজ থেকে সব আপনার; আমাকে শুধু হাড়-টুকুর সাথে কল্‌জার দুধদুর্কানিটুকু কিরিখে মিলেই চলবে।

আমি আমার হাতের প্রতি চাহিলাম, দেখি—শুভ নতমুখে পাড়াইয়া আছে, কহিলাম—তুলে ত, এবার থেকে পড়াশুনার ভাল করে মন দাও। তা না হলে—

কথার মধ্যেই সে বলিয়া উঠিল—তা না হলে মেরে একেবারে ছাড়ু করে দেবেন—বাবু।

প্রায় কহিলাম—আপনার নাম কি?

অকস্মাৎ তাহার মুখ মলমল হাসিতে ভরিয়া উঠিল, কহিল—নাম আমার কহিম—বাবু, কিন্তু আমি চাষাভূষা লোক, আমাকে 'আপনি' বলবেন না বাবু। আমি ওর ঘোণা নই।

কহিলাম—ও একটা কথা হ'ল না ভাই। আপনি বা বললেন, আমি তা জানি না, আমি পুঁথি-পতুর পড়াতে পারবো, পড়তে পারবো। কিন্তু হাল ধরে চাষ-আবাদ করি এমন শিক্ষা আমার আছে কই। সেদিক দিয়ে

আপনি আমার চেয়ে অনেক বড়। আমার
খাবার রস ত আপনি খোঁগাচ্ছেন। এবং
দিয়ে আপনি আমার প্রদত্ত।

সে ব্যক্তি হইয়া বলিয়া উঠিল—ছি-ছি, যাঁহাওয়া,
আপনি এ সব যে কি বলেন।

কহিলাম—ঠিকই বলি ভাই। আপনার আমার
যেকোন। আপনারা না হলে আমার একতরফে হাচতে
পারি না,—আজ্ঞা আমি শুকে দেখাবো। বলিয়া
বানিকমণ্ড মোনমুখে ধাঁড়াইয়া রহিলাম। সে-ও কিছুক্ষণ
নীচ খাচ্ছিল। কহিল—যাঁহাওয়াবর সঙ্গে কয়েকটি কথা
বলতে সাধ হাত।

স্বাী হইয়াই বলিলাম—তবে আনুন, বলিয়া বানিকটা
অগ্রসর হইয়া মাঠের মধ্যেই একখানে বসিয়া পড়িলাম।
সে-ও আমার লাবনে উবু হইয়া বসিল, কহিল—আজ্ঞা
যাঁহাওয়াবর আপনার বাড়ী কোথায়?

কহিলাম—পূর্ববঙ্গে, বরিশালে।

—সেখানেটা নাকি পাকিস্তান?

সংক্ষেপে উত্তর করিলাম—হ্যাঁ।

—আপনারা কি বাড়ীঘর সব ছেড়ে এসেছেন?

বলিলাম—না না—কেউ কেউ আমার এগেছি বটে,
তবে সকলেই আসিনি। বাবা-মা এখনও সেখানেই
আছেন। তা ছাড়া বরিশাল জেলাটা পাকিস্তানের
অন্তর্ভুক্ত হোলে থেকে অনেকটা ভাল। হিন্দু-মুসলমান
বৈতী এখনও সেখানে অস্থির।

চোপ তার উজ্জল, মুখ তার প্রসন্ন হইয়া উঠিল,
কহিল—ভাই বেন চিরদিন থাকে, যাঁহাওয়াবর। আজ
বেন তাই করেন। একটু গমিরা কহিল—আজ্ঞা যাঁহাওয়া-
বাবু, এই যে পাকিস্তান হিন্দুস্থান নামে ছুঁটা স্থানের
পুলি হল, এটা কি ভাল মনে করেন?

প্রশ্ন করিলাম—আপনি কি বলেন?

সে সহসা হাসিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই অত্যন্ত গভীর
হইয়া কহিল—আমি একটা আকাট মুখ লোক। এ
সবের কিই-বা বুঝি আর কিই-বা বলবো—তবুও মনে হয়
এ অত্যন্ত ব্যাপারই হয়েছে।

বলিলাম—কি রকম?

অত্যন্ত হাসিবারী বটে সে কহিল—আগেই বলেছি,
আমি একটা আকাট মুখ। আমার কথার কোনই মূল্য
নেই বাবু। কিন্তু তবু বলি—একটা খাল, একটা বাটি
বা একটা হাড়ি ভাললেই তার ভাষা চুকোয়াগুলি দিয়ে
পরস্পরে শুধু বাতানই চলে—জোড়া লাগানো চলে না।

আমি শুদ্ধিত হইয়া গেলাম। মনে মনে ভাবিলাম
এ কি মূর্খ চাহীর বিরোধ উক্তি; না অতি বড় শিক্ষকের
ক্ষমতা সত্যোপলব্ধি! কহিলাম—আপনি ঠিকই
বলেছেন। এ ভাল করে নাই, ব্যাপারই করেছে।

মূর্খা স্পষ্টের পাছপালার উপরে গিয়া ঠেকিয়েছে।
তখনও লাল হইয়া গঠে নাই। কিন্তু রূপারংয়ের ছেঁড়া
পাতলা মেথের ঠাকে পড়িয়া অনেকটা নিশ্চত হইয়া গিয়া
এখনই একটা পরিবেশের স্বাী হইয়াছে, বাহ্যিক অস্থির
না বলিলে সত্যকে অস্বীকার করা হইবে। সেই
পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে সরল ছাতি তার মুখ-
মণ্ডলে ছুটিয়া উঠিল, তাহা ভাষার ত সম্ভবে না।
নিম্নেই যে নেচে একান্ত হস্তান্তর তার তাহার দিকে
চাহিয়া রহিলাম। সে পুনরাবৃত্তি বলিল—যাঁহাওয়াবর একটা
রব শুনেতে পাই শু কি সত্য?

জিজ্ঞাস্যচোখে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম—
কি রব?

সে কোনরূপ সূক্ষ্মতা না করিয়া বলিল—তিনি হিন্দুদের
হিন্দুস্থানে, মুসলমানদের পাকিস্তানে বেতে হবে—এটা কি
মতিভাই বাবু?

কহিলাম—হ্যাঁ-ভাই একবারে মিথ্যা নয়। দেশের
কেহ কেহ এটাকেই হিন্দু-মুসলিম সমতার একটা প্রধান
সমাধান বলে মনে করেন। কিন্তু এ-ও ত সম্ভব নয়—
ভাই।

সে সংক্ষিপ্ত বলিয়া উঠিল—আমিও তাই বলি বাবু।
আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার পুরুষ-তোবা, আমার-
কেউ, এসব কেনে আমি বাব কোথায়?—না, বাবু মাছের
বুড়িও ঘেন ঘিন ঘিন কেমন বিগড়ে যাচ্ছে। তা না হলে
এমন সর্বনাশ প্রত্যাবণ নাকি কেউ করে? এখানে

আমার এক ফোটা জমি আছে, তার কলমে আমার সখ্যসর চলে। তা কলে আমি কোথায় দান মরতে—আগনিই বসুন বাবু।

বলিলাম—তার। ত আপনায় মত সহক
বোঝেন না।

সে কিছুটা দৃষ্টকণ্ঠে কহিল—তার। না বৃক্ষ—গোলায়
দাঙ্। কিন্তু আমরা যেন বৃষ্টি বাবু। আমরা আমাদের
এই বৃষ্টিটুকু চিরদিন যেন অক্ষর রাখেন।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্য ভূমিমা গিয়াছে। তথাপি
তাহার শেষ অত্যাশ্চর্য্য রক্তিম আভাষ চারিদিকটা
পলকের ভগ্নে যেন একবার হাসিয়া উঠিল। আমি
আনমনা ভাবে কি সব ভাবিয়া চলিরাছি। সহসা তাহা
বর্ষার অন্তর্য্য মধুর হইয়া আমার কানের পর্দায় বাইর
স্থলিত সুরধ্বনির দ্বার বাক্রিতে লাগিল—খোলা আছেন
কারও সাধ্য নাই আমাদের ভায়ে ভায়ে ভগড়া ঝাড়া।
এ গ্রামে হিন্দু মুসলমান কেমন মিলেমিলে আছি, তা
আপনি ত চোখেই দেখেছেন বাবু। আমাদের মধ্যে
বিবাদ আনে এমন আর্য্যী কোন দৃষ্টকে আছে! সে যেন
একবার এদিকে আসে, পিঠি লোভা করে আর খেতে
হবে না। এই বলিয়া সে উঠিয়া পাড়াইল এবং পাল
উপবিষ্ট ছেলেকে কহিল—চল যহু, এবারে আমরা ঘাই।
আমার প্রতি চাহিয়া বলিল—লক্ষ্য। হয়ে এলো

মস্তারবাবু। গরুরাঙ্গুর সব মাঠে রয়েছে, নদায় পড়া
বাঁকা। আমার অনেক কাজ—এবার ঘাই। মেহেরবাবু
সরে ছেলেটাকে আমার দেখবেন। হঠাৎ চাতের পুতক
খানির গুণর পুঁঠি পড়িতেই বলিল—মাগ করবেন, মস্তার-
বাবু। আপনায় অমূল্য সময় অনেক নষ্ট করলাম।
বলিয়া সে আমাকে সেলাম করিয়া চোতরের শুক পুর মাঠ
চাষিয়া ক্ষতপনে চলিতে লাগিল।

তখন লক্ষ্য। উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এবং নিম্ন
প্রান্তরে শুক অক্ষর নামিয়া আসিয়াছে। তাহার কথা
জনিয়া এতটা গম্ভীর ও বিস্তৃত হইয়া গিয়াছিল যে
বিষয় কালে একটা লক্ষ্য পর্য্যন্ত উভায়ন করিতে পারিলাম
না। লোকটা কিই না ভাবিয়া গেল। যখন লক্ষ্য
কিরিয়া পাইলাম, শেখিলাম—হুই পিতাপুত্রে ততক্ষণে যন
অক্ষরে অদৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। জাখিলাম—এমনি করিয়া;
যদি সকলেই ভাবিত—বৃষ্টিত—উপলব্ধি করিত, তা
হইলে আমাদের এ ভায়তবর্ষ একদিনে পোনার ভায়েতে
পরিণত হইয়া ঘাইত। মনে মনে শুধু কহিলাম—তোমরা
গতা, তোমরা যত, তোমরাই মাছুষ—হে ভায়তের নগণ্য
কৃষকহুল! তোমরা একবার গুই, আগো তবই আমাদের
এই দুর্ভাগ্য দেশ তার পুঙ্ককাব জাতীয়তাবাদ, সংক্ৰতি,
আনন্দ কিরিয়া পাইবে, স্বাধীনতা—শান্তি—প্রগতির পথে
অবাহন্ত দ্বার্য্য চলিতে শিখিবে।

কলেজের দিনগুলি

লক্ষ্যী বহু

ভূমিকা:—হুলের পাগা কল্কাভার বাইরে মাগ করে
এসে ডিস্ট্রি হয়েছিলুম কল্কাভার একটা বেয়ে কলেজে।
দালটা উনিশ শো তেতাল্লিশ। এই কলেজে আমার
ছাত্রী জীবনের দৈর্ঘ্য ছিলো ক্যালেন্ডারের বছর হিসেবে
হুবচরের কিছু কম, কলেজের 'বর্ষ' (session) হিসেবে
দু'বর্ষ অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক সেশন। আমার
দৃষ্টিকোণে বৈজ্ঞানিক হলও—অর্থবা হয় তো আমার

দৃষ্টিকোণে বৈজ্ঞানিক হলই—কলা বিভাগটাই (Arts)
আমি আমার গুপ্ত অধিকতর উপযুক্ত মনে করেছিলুম
বিজ্ঞান বিভাগের চাইতে।

হুল থেকে কলেজে এসে একটা; যেন পরিবর্তন এসে
গেছে, অর্থবা আসর, একথা মনে এলো। তারই লেখার
অভ্যাস আমার ম্যাট্রিক দেবার এক বছর আগে থেকেই
—সাক্ষিতে খ্যাতি মেবার আগে ভায়েরী খাতায় অস্বস্ত;
হু চার লাইন না লিখলে আমার যুম হতো না, যেমন
এখনো প্রায় হয় না। কলেজে প্রবেশ করে মনে হলো
আমার জীবনে বা এলছে বা অগ্ছে' তা হচ্ছে থাকে

ইংরাজী কান্ডার বাংলায় বলা যায় বিপ্লবাত্মক বা বিপ্লববর্তন (revolutionary change)। অতএব আমার কলেজের জীবন আমার সাধারণ জীবনের ভায়েকীর মধ্যে চুক্তিতে না চেয়ে তার নিজের জন্যে একটা সম্পূর্ণ আলাদা ভায়েকীই দাবী করতে পারে। তার সে দাবী আমি মেনে নিলাম। সেই থেকেই হলো আমার “কলেজের দিনগুলি”-র গোড়াপত্তন। আমার এই “কলেজের দিনগুলি” আমার কলেজ জীবনের প্রথম মাসে লুক হয়ে শেষ হলো। একেবারে আমার কলেজ জীবনের শেষ মাসে। প্রথম উল্লাহের তৌকে কল টানা দুশ্ল-কাপ কাপতে লম্বা আকারের পুরু একখানা বাঁধানো খাতা তৈরী করালুম। তাবলুম ঐ এক খাতাতেই আমার কলেজের ভায়েকী লেখা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হলো না। প্রথম ভেবেছিলুম কতই আর লিখবো, কতই বা পাখো লিখবার খোরাক? কিন্তু হঠাৎ নিশে চললুম ততই বেগতে লাগলুম

“চলার বেগে পারের তলায়

গভা ভেগেছে।”

শেখলুম লিখবার অল্প খোরাক রয়েছে, অত খোরাক সম্বাহার যতো সমর্থ্য বা সমর্থ আমার নেই। কালেজই বেছে বেছে নিতে হলো, কতক বেগে আর সতক বার দিয়ে।

কলেজ জীবনের শেষে দেখা গেল তিনখানা লম্বা পুরু বাঁধানো খাতা ভরে গেছে আমার কলেজের ভায়েকীতে। এ তিনখানা খাতা আমার কাছে অনুলা, অন্তের কাছে এরা হোক না কেন খড়ই মূল্যহীন। এদের জন্তে আমি কণ বীকার করি কবিত্তক রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাঁর “জীবন-বৃত্তি” একবার পড়েছিলুম হুলে থাকতে, তখন বইখানা ভালো লাগলেও এই ভালো লাগার ভাবটা একেবারে মর্ষের হুলে গিয়ে পরশ দেয় নি। কিন্তু বিত্তীয় বার বধন জীবন-বৃত্তির পাতা। গুল্টালুম কলেজে ভর্ত্তি হবার কিছু আগে, আর ব্যাঙ্গিক সেবার কিছু পরে, তখন আমার মনের গহনে যেন হলো নিকরের যন্ত্রভব। ভাবনক ভীতভাবে অহতব কল্পলুম যে, যে দিন চলে যায়

সে দিন আর কিংরে আসে না, শুধু থেকে যায় বৃত্তি। থেকে যায় ভায়েকীই বুক, বার। বৃত্তিকে জানে বাচিয়ে রাখতে। আমার এই ভীত অহত্বিত্তির শেষ কাটে নি তখনো বধন ভর্ত্তি চললুম কলেজে এবং ভর্ত্তি হয়ে ক্রাপ করতে লাগলুম বধারীতি। কলেজ জীবনের বৃত্তি বাচিয়ে রাখবার জন্তেই “কলেজের দিনগুলি” সেবার প্রয়োজন অহতব কল্পলুম।

“জীবন-বৃত্তি”র উল্লেখ কল্পলুম, তার মানে এই নয় যে জীবন-বৃত্তির লগে আমার “কলেজের দিনগুলি”-র তুলনা টেনে আনছি। জীবন-বৃত্তি সাহিত্য, আমার কলেজের ভায়েকী মোটেই সাহিত্য নয়! জীবন-বৃত্তি হচ্ছে বৃত্তি কথা, অতীতকে শরণ করে কথার তুলি দিয়ে তার কিছু কিছু ছবি আঁকা; সে সব ছবি ঠিক অতীতের ‘কার্বন কপি’ বা স্ববর প্রতিরূপ নয়, তাতে আছে কল্পনার আদ্যনা। কবিত্তক জীবন-বৃত্তি রচনা করেছেন তার লগে মিশিয়ে “আগন মনের মাদুরী”, অথবা “The light that never was on sea or land”—কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের ভাষায়। আমার “কলেজের দিনগুলি” নিচক সমসাময়িক ভায়েকী মাত্র, বৃত্তি-কথা নয়। এ ভায়েকীতে আমার মনের মাদুরী কিছু মিশাতে পারি নি, কেন না মনে এমন কিছু মাদুরী ছিলো না যে মিশাবো। শুধু লিখে গেছি বধনকার কথা তখন, যেমন এসেছে কলসের উপায়। সাহিত্য রচনা করি নি, কালেজ কলসের হুমিয়ার কল্পনার কোনো তাগিদ বা দরকার ছিলো না। শুধু যে সব ঘটনা, যে সব কথা, যে সব চরিত্র আমার মনে লাগ কেটেছে তাদের কথাই লিখে গেছি আমার “কলেজের দিনগুলি”-র খাতার সাধ। পাতার বুকে তর্পী কলম দিয়ে দুর্যাক বা রয়াল দু কালীর লাগ কেটে।

কলেজ ছেড়েছি খুব বেশী মনের কথা নয়। পদবীও বদলেছে সম্প্রতি। লগপার্সিনদের অনেকেরি এখনো পর্দা পৈতৃক পদবীই চলছে; কেউ কেউ কলেজের পড়া এখনো ছাড়ে নি, ইচ্ছাটা হয় তো বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ক শেষ ডিগ্রী না নিয়ে পদবী পরিবর্তন করবে না।

তা বহি হোক, আমার হয়েছে কলেজের পালা লাম,

হলোই বা তা এই সেদিনের কথা। তাই আমার "কলেজের দিনগুলি"র নাম আমার কাছে বেড়েছে। অতীত অতীতই, তা সেদিনেই হোক বা অনেক দিনেরই হোক।

আমার এই "কলেজের দিনগুলি" অস্ত্রের কাছে ভালো লাগতে পারে কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি। কারণ অস্ত্রের ভালো লাগার ক্ষেত্রে এ ভিন্নিধ দেখা হয় নি। লিখে গেছি খেয়ালের বশে, না লিখে থাকতে পারি নি বলে, লিখতে নিজে ভালো লাগতো বলে এবং ভবিষ্যতে এ দেখা আমার ভালো লাগবে বলে। কিন্তু "কলেজের দিনগুলি" আমার ব্যক্তিগত ডায়েরী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, হুতরাং এর সঙ্গে কোনো secretness বা গোপনীয়তা জড়িয়ে নেই। তাই পড়তে যারা চেয়েছেন তাদের পড়তে দিয়েছি—অবশ্য আমার কাছে বলে, "আজ্ঞা ভাই, বাড়ী নিয়ে যাই, পড়ে' পরে কেবল দেবো" দ্বাতীয় অহরোধ কখনো রক্ষা করি নি, কেন না আমি জানি বই বা খাতা পড়তে নিয়ে গিয়ে কেবল যেন এমন মহামানব বা মহামানবী এ বেশে বিরল। যারা পড়েছেন তাঁদের কেউ কেউ যেমন একটু পড়ে' আর পড়তে চান নি তেমনি আমার অনেকেই আগা গোড়া পড়ে বলেছেন তাঁদের লেগেছে ভালো অস্ত্রের অনেকেও ভালো লাগতে বাধ্য।

যাযা কিনা তা বলতে পারি না, কিন্তু ভালো লাগা হয় তো একেবারে অসম্ভব নয়। যে ছবিগুলো আমি ছুটিতে তুলতে চেয়েছি তা যদি ছুটিতে তুলতে পেরে থাকি তাহলে ভালো লাগবাই কথা। কিন্তু আমি তো কথাশিল্পী নই, কতটা পেরেছি তা আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয়। পাকা কথাশিল্পী যারা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীরাও, যা কোঠাতে চান তার অতি সামান্য অংশই ছুটিতে তুলতে পারেন, যা বলতে পারেন তার চাইতে ঢের বেশী থেকে যায় না-বলা। যার বর্ণিত দিতে চোটা করেন তার সামান্য অংশই বর্ণিত হয়, অসামান্য অংশ থেকে যায় অবর্ণিত। বর্ণনা আর বর্ণনার মধ্যে এই ব্যবধান চিরন্তন, একে পুরোপুরি দূতাবার উপায় নেই। এদের

মাঝামাঝি সেতু যদি বা থাকে তো সে লছমন-কোণা, হাওড়া ব্রীজ নহ। এই সেতু পার হয়ে বর্ণনা থেকে বর্ণনারে পৌছতে হলে চাই কল্পনা; সব পাঠকের কল্পনা এক রকম নয়, এমন কি অনেকের কল্পনার অঙ্গ হয় তো শূন্যের কাছাকাছি পাঠকে পাঠকে এই কল্পনার তারতম্য অল্পদূরেই হয়ে থাকে রসবোধ ও রস-উপভোগের তারতম্য।

বলেছি যে বর্ণনা আর বর্ণনারে মাঝখানে ব্যবধান থাকবেই—তবে পাকা কথাশিল্পী বা পাকা লেখক এই ব্যবধানটা কমাতে পারেন। সেইখানেই লেখকের দক্ষতা। কিন্তু বক্তৃতাংশ লিখবার চেষ্টাও আমি করি নি, চেষ্টাবিহীন স্বতঃস্ফূর্ত দক্ষতাও আমার ছিলো না। আমার "কলেজের দিনগুলি" পড়ে' কারো ভালো লাগলে তা বিশ্বের শুণেই ভালো লাগবে, লেখার শুণে নয়। বিশ্বের শুণে অনেকের হয় তো ভালো লাগবে এই আশায়—হয় তো ভালো লাগবে না এ আশা থাক। সত্যও—আমার "কলেজের দিনগুলি"র কিছু কিছু অংশ প্রকাশ করছি।

তুমিকা শেষ করবার আগে একটা কথা আরো বলতে চাই। আমার এ ডায়েরী ঠিক দিনপতী বা রোজনাম্ভা নয়। অর্থাৎ আমি হোও লিখতুম না! এ ডায়েরী লিখবার বেলায় ঘটনাক্রমে আমি প্রাথমিক দিই নি, উপলক্ষ্য বলে' মনে করেছি মাত্র। যতটুকু বলেই ঘটনার নাম নয়, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তুটে ওঠে মাহুকের চরিত্র, সেইখানেই ঘটনার সার্থকতা। ইংরাজ কবি আলেক্সান্ডার পোপ্‌এর "The proper study of mankind is man" কথাটা আমি মর্মে মর্মে অহুতব করি। কলেজ জীবনে প্রত্যেকে বা পরোকে সংস্পর্শে এসেছি। অনেকের—ছোটো বড়ো, গরীব ধনী, মন্দ ভালো, মানা রকমের প্রাণী তারা বিভিন্ন চরিত্রের। আমার একাধক কোঁতুল হয়েছি তাদের চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে (যাকে বলে বোধ হয় character study), আর আমার বিধানো খাতার পাতার কথা নিয়ে তাদের রেখাচিত্র এঁকে রাখতে। আমার "কলেজের দিনগুলি"র

বেশির ভাগই এই রেখাচিত্র। অনেক চরিত্র পৃথানেকপেই
হয়তো আমার কুল হয়েছে, কোন না আমি এ বিষয়ে
তখন খুব লক্ষ ছিলুম না এবং এখনও নই। মানব-
চরিত্রে অনিচ্ছাতাব এবং অস্বাভাবিকতার পরিচয় ভিত্তি
আছে আমার এই ভাবেরীর পাতার পাতায়। তাই
বায়। আমার “কলেক্টর দিনগুলি” পড়বেন—এই কেউ

পড়েন—তারা একে মানব-চরিত্র লব্ধে গ্রাম্যণ্য
গচনা হিসেবে গ্রহণ না করে’ সত্ত্ব কুল থেকে বেয়ে আসা
কলেজের ছাত্রীর কাটা হাতের আঁকা। কতকগুলো
রেখাচিত্র রূপে গ্রহণ করলেই আর কোন গোল
থাকবে না।

(ক্রমশঃ)

জাগতিক

স্বাধীনতা রায় চৌধুরী

পূর্বচরিত্র ৭৩।

জাগতিক পরিস্থিতি অনিবার্যরূপে এক বিশ্বসংঘর্ষের
লিকে আগাইয়া চলিতেছে। কখনও তাহার গতি মন্থর,
কখনও দ্রুত। কিন্তু লক্ষ্যের অবসানের লগ্নাবলী কখনও
কোথা যায় না। ঘটনা স্রোত এখন দ্রুত তালে ধাবিত
হয় তখন আমরা মনে করি সংঘর্ষ আসন্ন। আবার যখন
স্রোতের গতি বন্ধীভূত হয় তখন আমরা উৎকর্ষ হঠাৎ
আশা করি এবার কৃষ্ণ ক্রমশঃ সব বিপদের অবসান
হইবে।

বাল্কিন—বাল্কিন সম্রাট লইয়া এইরূপ একটি
সমাধানের আশা মানুষের মনে জাগিয়াছে। এই
বাল্কিনকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম শক্তিগুণের ভিতরে
যে বিরোধ চলিতেছে তাহার সমাধান কল্পে দ্বিপাক্ষিক
দূতপত্র মঃ টালিনের সঙ্গে লাক্সা করিয়াছেন। যদিও
এই লাক্সাক্ষার লব্ধে কোন খবর আজিও প্রকাশিত
হয় নাই এবং গোপনতা রক্ষা করিবার জন্য উভয় পক্ষই
বন্ধপরিকর, তথাপি সর্বত্রই এই আশা পোষণ করা
হইতেছে যে কোন একটা সমীচামা হইবেই। এমন
কি মঃ টালিন নাকি বলিয়াছেন যে, সকল সম্রাট
সমাধান তাহার কায়া। বাল্কিন সম্রাটের সহিত ঘড়িত
বস্ত্র সম্রাটগুলিও বাহ্যতে সমাধানের পথে অগ্রসর
হয় তাহাই সর্বসাধারণের কায়া। এই সম্রাট জু

বাল্কিনের মুহাসম্রাট। বা পশ্চিম বাল্কিনে প্রবেশ পথের
সম্রাট মতে। বুল সম্রাট হটল আর্থান আতির একতা,
সপ্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন ও আর্থান উৎপাদন
ব্যবস্থার লক্ষ্যমাত্র প্রবর্তন। কিন্তু দুই দুই বার এট
নবমাত্র আর্থান ভাতিয়তাবোধের দ্রুত সংগ্রামমুখী
বিবর্তন লব্ধই তাহাই প্রতিপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহের ভিতর
এই নতুন ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্যের উদ্বেক করে। তাই
এই ব্যবস্থা চালু করিবার পূর্বে এবেশ হইতে নাখানী-
নীতির প্রতি সচাচকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং লক্ষ্যগুলিকে
সকলে বিনাশ করার প্রয়োজনীয়তা বহুপূর্বে স্বীকৃত
হইয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন আর্থণে অল্পপ্রাণিত পূর্ব ও
পশ্চিম শক্তিগুণের ক্রমে ক্রমে নিম্নোক্তের ভিতর লুক্কানী
আশা ও নির্ভরশীলতা চারাইয়া ফেলে। ফলে আর্থান
সম্রাট সমাধানের কথা তো কোথায় পড়িয়া বহিল
আম গোটা আর্থানী দ্বিধা-বিতর্ক। শুধু তাহাই নহে
দ্বিধাবিতর্ক বাল্কিন হইতে দ্বিপাক্ষিক অসুবিধা লব্ধও
হইয়া বহিতে লাগি নহে।

তাঁই যদিও মতো আলোচনা সমাধানের পথ
খুজিতেছে তথাপি বাল্কিনে একটার পর একটা বিরোধ
লাগিয়াই আছে। এই সেমিন পূর্ব বাল্কিনের
চোরাকারবারিষের বিকল্পে শান্তিসূলক ব্যবস্থা গ্রহণ
করিতে গিয়া গোতিবেট পুলিশ এবং সৈন্যবল দ্বিগুণ
এলাকার বে-আইনিভাবে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া শুনা
গিয়াছিল। পুলিশের কর্তৃক লইয়াও গোপনবোধ সৃষ্টি
হইয়াছিল। সর্বশেষ সম্রাট হইতেছে বাল্কিনের নাগরিক
পরিচালনা সমিতির ব্যাপার লইয়া। এই সমিতির এক

সভা পূর্ব বালিনে অবস্থিত সমিতির কেন্দ্রিক ভবনে আচুত হইয়াছিল। কিন্তু কমিউনিষ্ট পরিচালিত Unity Partyর উদ্যোগে জনসাধারণের একাংশ দাঙ্গা বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। ফলে এই সভা অল্পকাল হইতে পারের নাট পন্ডির বালিনে আবার Unity Partyর দিকতে পাট্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। নগর সমিতি জানাইয়া দিয়াছেন নিশ্চিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি এই সভা অল্পকাল হওয়ার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে নগর সমিতি তাহার পরিচালনকেন্দ্রগুলি পশ্চিম বালিনে স্থানান্তরিত করিবে।

কোসেনকিনা—কোসেনকিনা নদী এক শিক্ষক এক শিক্ষাবিদকে কেন্দ্র করিয়া ক্রম মার্কিন সম্পর্কের আর এক অটল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ আমেরিকা হইতে তাহাদের সমস্ত বাণিজ্য নৃত-আবাস ভুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন এবং মার্কিন সরকারকে ব্রাভিভোষ্টক বন্দর হইতে তাহাদের অল্পকাল নৃতাবাস ভুলিয়া দিবার দাবী জানাইয়াছে। যে পক্ষে এই সিদ্ধান্ত জানান হয় তাহা এইরূপ—সোভিয়েট পক্ষে বলা হইয়াছে যে, মার্কিন নোটে যে সব অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা ভিত্তিহীন এবং প্রকৃত ঘটনার সত্য উদার কোন সামগ্রিক নাই। ওয়াশিংটনস্থিত সোভিয়েট নৃতাবাস কর্তৃক উদ্ভিগ্ধমণ্ডাই মার্কিন রাষ্ট্রপণ্ডের এই পত্র প্রেরিত হইয়াছে। তৎপরি সোভিয়েট পক্ষে ইহাও বলা হইয়াছে যে, বর্তমান মাসের প্রথমভাগে সোভিয়েট পত্র পত্র তিনটি প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করিয়া যে সব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন মার্কিন পক্ষে তাহা এড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মার্কিন রাষ্ট্রপণ্ডের পত্রদ্বারা মিসেস কোসেনকিনা, মঃ সামারিন, তদীয় পত্নী এবং তিনটি শিশুর অপহরণ সংক্রান্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান নূরে থাকুক পরক উহার অটলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশস্থিত সোভিয়েট প্রচার স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার রক্ষার বিষয় বিবেচনা করিয়া সোভিয়েট গভর্নমেন্ট সেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে কোসেনকিনা ও সামারিন সংক্রান্ত

ব্যাপার সম্পর্কে সোভিয়েট সরকার ও সোভিয়েটের মার্কিন দূতরাষ্ট্রস্থিত প্রতিনিধিগণের কাগজলাপ ও বিবৃতি সম্পূর্ণ সত্য ও আইনানুগত হইয়াছে। মিসেস ওকনানা পেন্টানোভা কোসেনকিনা ও মঃ সন্সক সামারিন সংক্রান্ত ব্যাপারে সোভিয়েটের অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ১লা আগষ্ট তারিখ মার্কিন দূতরাষ্ট্র কনিয়ার নিকট পত্র প্রেরণ করে। কনিয়া তাহার যে জবাব প্রেরণ করে তাহাতে বলা হয় যে, মার্কিন দূতরাষ্ট্রস্থিত সোভিয়েট বাণিজ্য নৃতাবাসের কাগজলাপ স্বাভাবিকভাবে চালানো অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রাভিভোষ্টক বন্দরস্থিত মার্কিন বাণিজ্য নৃতাবাস ভুলিয়া দিবার ব্যবস্থা লগ্নে বলা হইয়াছে যে নৃতাবাসের প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিক অবস্থার হেতু থাকে সেরূপ নাই। কারণ তথাকার কর্তৃত্ববিষয় সব সময়ই নানারূপ বাধার সম্মুখীন হন। কাজেই এই নৃতাবাস ভুলিয়া দিলে মার্কিন সরকার বা মার্কিন বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

ওয়াকিংহোল মঙ্গল মনে করেন এই কোসেনকিনা সমস্যা মধ্যে আমেরিকার উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে না।

ফিলিস্তিন—ফিলিস্তিন সমস্যাও কোনরূপ সমাধান আর পর্যন্ত হইল না। দুইবিধতির চুক্তি মানিয়া চলার লক্ষ্য কোন পক্ষেই দেখা বাইতেছে না। চুক্তি মাত্র করা হইতেছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার স্পষ্ট নিরাপত্তা পরিবর্তনের পক্ষ হইতে পর্যবেক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে কিন্তু তাহারও বিবরণমান দুই পক্ষের নিকট কোনরূপ লাভালাভ পাইতেছেন না। এমন কি কোন কোন স্থানে তাহারাই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হইয়াছে এই অবস্থাও ইহাও শেষ পর্যন্ত চরম পন্থা অবলম্বন করিতে নিরাপত্তা পরিবর্তন বাধ্য হইবে। কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয়না। কারণ ইংরেজ মার্কিন এবং সোভিয়েট এই ত্রিশক্তির স্বার্থ পল্লব বিস্তার। লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে যদিও ইংরেজ আধুনিকভাবে ফিলিস্তিন

‘ত্যাগ’ করিয়াছে তাহাশি ইচ্ছাশীলগণ তাহাদের নিজস্ব নিয়মিত প্রভাব কাহা চানাইতেছে। বাড়তি মুক্তবৃত্তম বাহা ইংরেজ সবে লইয়া বাইতে পার নাই, ইচ্ছাশীলগণ তাহা অল্পমুদা কিনিয়া লইয়া মুক্ত ব্যবহার করিতেছে। বহু ইংরেজ ইচ্ছাশীলগণ পক্ষ হইয়া লড়িতেছে এবং তাহাদের সনদ প্রদানী ও সাময়িক শিক্ষা প্রদানী ইংরেজের অব্যবস্থানই পরিচালিত হইতেছে। অন্তর্ভুক্ত আরব পক্ষেও বহু ইংরেজ মুক্ত পরিচালনা করিতেছে। ইংরেজের মুক্তশেখরগণ তাহারা ব্যবহার করিতেছে। তাহাশি এমন কি নিম্নতম স্তরেও ইংরেজ বিবেক অতি উন্নতভাবে পরিচালিত। কেহ কেহ মনে করেন আরবদের পক্ষে মুক্ত শেখ হইয়াছে; ইচ্ছাশীলগণ অধিকাংশই নিম্নতম স্তরে মুক্তপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজের চাল বাধ হইয়াছে; এই অঞ্চলে মুক্তপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম সংহতি ক্ষুদ্র হইয়াছে; কারণ ইচ্ছাশীলগণের হাবিবেক কেন্দ্র করিয়া কিলিভিদের ইচ্ছাশীলগণদের খুদা এবং ইচ্ছাশীলগণের জনগণ ভারতের হিন্দুদের সবে মিলিত হইয়া এই অঞ্চলে এক নবীন সাম্প্রতিক চক্র সৃষ্টি করিবে তাহাও ফলে পান ইসলামিক শক্তিসংহতির বিস্তারিতার্থী প্রভাব বহল পরিমাণে নিম্নিষ্ট হইয়া পড়িবে।

হিন্দুপূর্ণ এলিফা—কিলিভিদের আরব-ইচ্ছাশীলগণের একমাত্র সমাধা সমাধান হইল বহিঃশক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া। হিন্দুপূর্ণ অঞ্চলে এই সমাধা পূর্ণাঙ্গভাবে জনগণাধারের মনে মুক্তপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই এই অঞ্চলে করানী, ইংরেজ ও ওলন্দাজ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে জনগণাধারের অভিযান কোথাও মন্দীভূত হয় নাই।

ইচ্ছাশীলগণের পণ্ডিত্যী ভিত্তিগতামবাদিনী করানী সৈন্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চানাইয়া অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আশিকার করিয়াছে। পাশ্চাত্য আক্রমণের পক্ষ বাহাতে করানী সৈন্তের হাতে না থাকে সেইও গুরুত্বপূর্ণ রেলগণ তাহারা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। একদিনও যেমন করানী সরকার রক্ষণশীল শক্তিশালী একত্রিত করিয়া

কিছু কিছু ব্যবসায় হাবিবা গিয়া ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া তাহাদের সহিত একটা বন্ধা করিতে চেষ্টা করিতেছে, অল্পমুদা যেমনি চর্চামিনের নেতৃত্বে স্বাধীনতাকামী জনগণ সমস্ত অপোগেবী মীমাংসার প্রভাব, অগ্রাহ্য করিয়া পার্জাতীয় অধিকারের ক্ষত্র জীবন পণ করিয়া লড়িতেছে।

আলগ—মানবের নবজাগৃত জনগণিত যে বিপুল উচ্চমে আগনার স্বাধীনতা লাভের জন্য অগ্রসর হইয়াছে তাহাকে বাধা করিবার জন্য ইংরেজ শক্তি সর্বপ্রকার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছে। স্বদ, নৌ এবং বিমানশক্তি যোগদোষভাবে ব্যবহার করিয়াও এই উচ্চমে বর্ধন করিতে সক্ষম হয় নাই—নতুন নতুন অস্ত্র, হস্তশিল্পিত সৈন্যবল বেশ হইতে আমদানী করিয়াছে এবং করিতেছে, বিশেষ হইতে অসুস্থ আমদানী করিতেছে। অষ্ট্রেলিয়া, চীন এবং জাপান দেশের সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছে এবং যাকিনের গোপন সাহায্যও লাভ করিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতাও যে কোয়ার বাগের মত সমস্ত বেশক আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহাও সমুদ্রে শক্তিসমোহিত ঐক্যবস্তের জ্ঞান বিবেচনা পান চানিয়া বাইবেই বাইবে।

ওলন্দাজ সরকার ও ইচ্ছাশীলগণের সাধারণতন্ত্রী সরকারের ভিতর বিবাদ স্বাধীনতাই হইয়া গিয়াছে। ইউ. এন. ওর বেকমিশন মধ্যস্থতা করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল তাহা কোনপ্রকার সমাধানের পক্ষ হইয়া যায় নাই। ইউ. এন. ওর আগামী অবিশেষণে তাহাদের চেষ্টার ব্যর্থতার দাব্যই তাহাদের দাবিলা করিতে হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এমিকে গণতন্ত্রী সরকারকে অগ্রাহ্য করিয়া এক নতুন ফেডারাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। বিভিন্ন নীতির সাহায্য লইয়াই এই ব্যবস্থা করিতে তাহারা সক্ষম হইতেছে। গণতন্ত্রী সরকার কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতার দাবীতে অটল রহিয়াছে এবং বর্তমান না তাহাদের অভিন্ন সিদ্ধ হয় ততদিন সংগ্রাম চানাইয়াই বাইবে। ওলন্দাজের বড়বস্ত্রে কখনও আত্মসমর্পণ করিবে না।



স্বাধীনতার এক বছর

গত ১৫ই আগস্ট ভারতে সবচেয়ে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে,—ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান এক বছর হল ঈংরাজের শাসন হ'তে মুক্ত হয়েছে। অবশ্য আইন অনুসারে আজও এই দুই রাষ্ট্র ঈংরাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। সেই হিসাবে হয়ত এই দুই দেশকে পূর্ণভাবে স্বাধীন বলা যায় না। কিন্তু ঈংরাজের শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে—এটাই এই দুই রাষ্ট্রের ৪০৪২ কোটি মানবের পক্ষে একটা মহাশয় ঘটনা। গত বছর স্বাধীনতার উৎসবে যে উৎসাহ ও উদীপনা দেখা গিয়েছিল, এ বছর এই মহাশয় দিবসের উৎসবে সে উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা দেয়নি। কেন?

একথা আজ অস্বীকার করে লাভ নেই—মাত্র ৪ বছর আগে স্বাধীনতা দিবসের স্বাধীনতাকে গড়ে তুলতে পারিনি। ঈংরাজ চল গেছে—এটা কেবল চোখের দেখবার ব্যাপার হয়েই যদি থাকে, যদি এটা অস্বয় দিয়ে অস্বস্তি করা না যায়—তবে সে স্বাধীনতা কেবল কাগজপত্রের স্বাধীনতা, বাস্তব জীবনের স্বাধীনতা তা নয়। এই স্বাধীনতাও গ'ড়ে তোলার দীক্ষাই আমরা কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধী কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

স্বাধীনতা উৎসবে সর্বপ্রথমেই যেন গড়ে জাতির জনক, স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক, ভারতীয় বিপ্লবের ধারক ও বাহক—মহাত্মা গান্ধী তাঁর বিপ্লব-সাধনার বেলী-মূলে নিজেকে আহুতি দিয়েছেন। তাঁর অত্যাধ বিশেষভাবে আরও যেন গড়ে এই জন্ত যে-তিনি যে আদর্শের দীক্ষা আমাদের ঘিরেছিলেন চোখে করেও যেন আমরা সে পথে অবিলম্বে থাকতে পারছি না। জন-সাধারণের হৃৎস্পন্দ কষ্টদূর করাই ছিল, এই বিপ্লবের প্রথম কথা এবং এর শেষ কথা ছিল—শ্রমবীল জনতার হাতে সত্যিকার

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষমতা স্থাপন করা। এই শেষের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব লাগে না। কিন্তু প্রথমটা অবশ্য সর্ব-প্রথমেই করণীয়। কিন্তু এক বছরে জাতীয় সরকার সে মিকে কিছুই করতে পারেনি,—অবশ্য চোঁচের তুটী হয়েছে যা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভা সে সবচেয়ে উদাসীন, তা আমরা বলছি না। যে অবস্থায় দেশের শাসনভার এসেছে হাতে এসেছে, সেই অবস্থা খাল্লাউজীনের শ্রমীপ নিয়ে এসেছে কেউ এক বছরে সব হুবাবস্থার আমলে পারত না। প্রত্যেক দেশেই শাসন-ব্যবস্থাপনিত হবার পর এটরূপ বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। কপিলাতে বলসেভিকগণ ১৯১৭ সূর অল্পে শাসন ব্যবস্থার হাতে মেচে, কিন্তু তাই পর অল্পে ১৮ বছরের মধ্যে তারা দেশের জনসাধারণের হৃৎস্পন্দ স্থাপন করার দিকে কিছুই করতে পারেনি। গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতা ত ছিলই তারপর রুশিক, মহানারী, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম অভাব, আবাস গৃহের অভাব—শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি সবই তখন জনসাধারণের জীবনকে প্রাণ অস্বস্তি করে তুলছিল। সরকারী ব্যবস্থারও স্থিতিশীল থাকত না; একটার পর একটা ব্যবস্থা পরিবর্তন হচ্ছিল, উগ্র সাম্যবাদ (War Communism), নতুন আর্থিক নীতি (New Economic Policy), পাঁচ বছরের পরিকল্পনা (Five Years' Plan) কৃষকদের উৎপাদন, কৃষকদের ভোষণ—প্রভৃতি বহু আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা পরীক্ষামূলক ভাবে ওখানে গ্রহণ ও বর্জন করা হয়েছিল। আমাদের আশঙ্কার নানা অব্যবস্থার মধ্যে এই ঐতিহাসিক তথ্য স্মরণ করে আমরা আশ্চর্য্য প্রকাশ পেতে চাই না,—তবে যারা হ্রস্বমেগ পেলেই কংগ্রেস ও জাতীয় সরকারকে এক থা লাগিয়ে দিতে উৎসুক তাদের স্মরণ করতে যদি ইতিহাসের দিকে যেন একবার তাকিয়ে দেখে। আর দেশের জনসাধারণকে

মতে চাই—তাদেরই বিমত নেতাদের দ্বারা পরিচালিত
জাতীয় সরকারের প্রতি যেন তারা আস্থা রাখে;
কংগ্রেসের প্রতি যেন তারা আস্থা রাখে। আর বাংলার
হাতে আর দেশের শাসনভার তাদের বলতে চাই বর্ণগত
নেতার কাছ থেকে তারা যে বিশ্বাসের স্বীকা নায়েছিলে,
তা আরও অপূর্ণ। সে স্বীকা যেন তারা কুলে না বান।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি—

পশ্চিম বঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত
হয়েছে। ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসুগোপাধ্যায় এর সভাপতি
এবং শ্রীমতী। যোগ্য এর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
এঁরা উভয়ে বর্তমানের কংগ্রেসকর্মী এবং এঁদের ত্যাগ,
দেশের গুরু দায়িত্ব বহন ও কংগ্রেসনিষ্ঠা সুবিস্তৃত।
জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁরা উভয়েই সংগঠন
শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই নতুন দায়িত্বের পথে
আমরা এঁদের দায়িত্ব অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি
এঁদের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পশ্চিম
বাংলার কংগ্রেস গড়ে উঠবে।

কিন্তু যেভাবে এর কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে,
তাতে আমাদের মনে আশঙ্কা হয়, আমাদের আশা
কতদূর কলহতী হবে। সহকারী সভাপতি ও সহকারী
সম্পাদক হিসাবে ও কার্যকরী সমিতির সভা (২২ জন)
হিসাবে নামের তালিকা দেখে একটু বিমিত হ'তে হবে।
কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন দল বা উপদল আছে; এঁদের
দ্বারা হাতে কর্তৃক থাক না কেন, কার্যকরী সমিতি ও
সহকারীদের মধ্যে বিভিন্ন দলের বা উপদলের সংখ্যা-
পাতিক লোক রাখার রোমাঞ্চ ঘোঁরাটু চলে আগলি।
যে কার্যকরী সমিতি সেদিন বাতিল হ'ল—ভাতেও
প্রত্যেক দলের সংখ্যা-পাতিক সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এই
নতুন ব্যবস্থা দেখছি—বিদ্যারী সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রনাথ
বসুর অস্বভাবী মোকাবেলা দেখা তিনি ও দ্বিতী তৃপ্তিবাবু
ব্যতীত আর কোন মোকাবেলা কার্যকরী সমিতিতে বা
সহকারী সভাপতি বা সম্পাদকের পথে নেই। অথচ নতুন
প্রাদেশিক সমিতির ২৩ জন সভ্যের মধ্যে এক

তৃতীয়াংশের বেশী হরেনবাবুর অস্বভাবী। ডাঃ গুরুচন্দ্র
বসু এই প্রকার একটা অশোভন ব্যবস্থা জাতীয় হলেন—
একটা বাতারাতির চুক্তির ফলে এটা খুবই নিঃশেষ ও
দুঃখের বিষয়।

সেদিনকার নির্বাচন সভায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু খুব
জ্বালন্ত বৈধত্যের প্রেরণে নির্বাচন স্থগিত রাখতে পারতেন
এবং একদিনের জন্তও স্থগিত থাকলে, পরের দিন ভোটের
কি অমল-বলন হ'ত তা বলা যায় না। হরেনবাবু তা না
করে নির্বাচনের অধিমাত্র ফলাফলের উপরই নির্ভর
পরামর্শ ও প্রতিদ্বন্দ্বীর বিজয় ঘোষণা করেন। তাঁর এই
উদারতা বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে যে কত বিরল, তার
প্রকট প্রমাণ হল বিহারী দলের বেপরোয়াভাবে নিজেদের
দলের লোক ঘিরে সমস্ত কার্যকরী সমিতি গঠন করা—যা
হরেনবাবু করেন ও করেন নি।

এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে বৈধতার আপত্তি উঠেছিল।
নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতির নির্দেশে সভাপতির
নির্বাচন হওয়া উচিত গোপন ভোটে—secret ballot—
—প্রকৃত ভোটে নয়। নিখিল ভারতের এই সার্বভৌমটি
প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে হরেনবাবুর
জানা উচিত ছিল। প্রায় বহন শ্রীমদ্রত্ন যোগ্য প্রথম
তুলনেন ও ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় বহন ঐ কারণে
বৈধতার প্রশ্ন উঠালেন, তখন হরেনবাবু ঐ বিজ্ঞপ্তি লম্বা
কিছুই জানতেন না। কারণ তৎকালীন সম্পাদক তাঁকে
ঐ বিজ্ঞপ্তি দেখান নি। তখন ইচ্ছা করলেই তিনি
নির্বাচন বন্ধ ক'রে গোপন ভোটের জন্ত সভা স্থগিত
রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি; হয়ত
তাঁর মনে একটা সন্দেহ এসেছিল—তিনি সভাপতিপদের
একজন প্রার্থী এবং তখনকার গণনার ভোটের সংখ্যা তাঁর
প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকেই বেশী দেখাচ্ছিল। তাই ঐ অবস্থায়
ডাঃ হরেন্দ্র চন্দ্র বসু বানানীক সভাপতি ঘোষণা করেন।
তবে তিনি সভায় প্রকৃতই বলেন নিখিল ভারত
কংগ্রেসের ঐ বিজ্ঞপ্তির কথা তিনি জানতেন না এবং
তিনি সমস্ত বিষয় হস্তিগতি ডাঃ রাজেন্দ্রনাথের নিকট
রিপোর্ট করবেন—এর শেষ স্বীকার্যমূলক জ্ঞান।

অৰ্ধসচিবের পদত্যাগ

স্বাধীন ভারতের প্রথম অৰ্ধসচিব নিযুক্ত হবার গৌরব শ্রীনৃপম শেঠীর ভাগ্যে জুটেছিল। যে গৌরব ও সুযোগ মাত্রের ভাগ্যে একবারই আসে না, তা শ্রীনৃপ শেঠীর ভাগ্যে জুঁবার এগেছিল এবং দু'বারই তিনি তা হেলার হারালেন। প্রথম বার ইংরাজ সরকারের কাঁচের পড়ে তিনি এটোম্যাতে গিয়ে যে সাম্রাজ্যিক বাণিজ্য চুক্তি ক'রে এসেন। তাতে তিনি বেশ ও জ্ঞাতির স্বার্থকে বিসর্জন করেছিলেন বলে দেশবাসীর ধারণা। তখন মবাই মনে করত সেটা তার বিচারশক্তির ক্রটির তত্ত্ব নহে সেটা করেছিলেন স্বার্থবৃত্তি থেকে। এই অপরাধে তাঁকে তখন কংগ্রেস ত্যাগ করতে হয়েছিল এবং যিম্মই সরকারের অধুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে অনেক কাল চলতে হ'য়েছিল।

তারপর ভারত স্বাধীন হবার পর, তাঁকে ডেকে এনে জওহরলালজী অৰ্ধসচিব করলেন। ট্রিক এক বছরই তিনি অৰ্ধসচিব ছিলেন। তাঁর এই এক বছর কার্যকালে তাঁর লব্ধে পরিষদের কংগ্রেসী সভ্যদের মনে একটা সংশোধের ভাব বয়্যাবরই ছিল। গত বাৎসরিক বাজেট বক্তৃতার সময় তিনি দাব পড়েই ইংরাজের স্বত্বিগান করলেন— কিন্তু স্বাধীনতা লাভে যে মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেসের কোন অংশ বাহান আছে, তাও উল্লেখ না করে ইংরাজ মহাভ্রতবতা ক'রে ভারতকে স্বাধীনতা দিলেন—এই হ'ল তাঁর ভারতের স্বাধীনতা লাভের ব্যাখ্যা। পরে অপর কংগ্রেসী সভ্যদের সমালোচনার ফলে তিনি ক্রটি বীকার করেছিলেন।

শ্রীনৃপ শেঠীর কার্যকলাপ লব্ধে কংগ্রেসী দলের সন্তক পুষ্টি বরাবরই ছিল। তাঁর কর্মকুশলতা ও যোগ্যতার স্বত্তই তাঁকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে আসা হয়েছিল। যে ব্যাপার নিয়ে তাঁকে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয়েছিল, তা অত্যন্ত পরিভাণের। সংক্ষেপে ব্যাপারটা হল এই— গতবৃদ্ধের সময় বহু ধনীরা চোরাবাজারে বহু চোরা অর্থ (black money) উপার্জন করেছেন; তারা আনকরের ব্যাপারে সরকারকে করে কোটি টাকা ঠাকি দিয়েছে।

তা ছাড়া ঐ চোরা টাকাট আত চোরা বাজারে খাটিয়ে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় ভবোহ লাম অভাদিক বাড়িয়ে রাখছে। ভারত সরকার—স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই ঐ লব্ধে তদন্ত করার লক্ষ্য করে। কিন্তু নানা কারণে এতে বিলম্ব ঘটে। গত বছর এপ্রিল মাসে এট বিষয় তদ্বের স্বত্ত এক কমিশন প্রতিষ্ঠা করার আইন পাশ হয়। কিন্তু তখন সাম্প্রতিক বিপর্যাস্তক বহু ঘটনার ভিত্তর নিয়ে বেশকি বেতে হয়েছিল বলে ঐ আইনের পরিবর্তিত তদন্ত কমিশন আর বসানো হয় নি। গত ডিসেম্বরে ঐ কমিশন বসানো হয়। কিন্তুমিন পরই ঐ কমিশন স্থগারিস পাঠান ঐ আইন আরও কড় করা সরকার.—নইলে ঠাকীবাজ দলীনের দয়া বাবে না।

সেই অল্পশারে এই বছর ১০ই ফেব্রুয়ারী এক সংশোধক আইন পরিষদে উপস্থিত করা হয়। তাতে একটি ধারা থাকে যে কোন মামলা কমিশনের লামনে হিলে আর সরকার তা তুলে আনতে পারবে না। কিন্তু ২২ই মার্চ চারিটি খুব ধনীরা মামলা সরকার কমিশনের হাত থেকে তুলে আনে। এখানে অপর রাধা সরকার ১৩া মার্চ ঐ সংশোধক আইন বিবেচনা কমিটির (Select Committee) হাতে দেওয়া হয়। ১৮ই মার্চ ঐ কমিটি সামান্য অমল-বয়ল ক'রে তাদের স্থগারিস দাখিল করে। ১৮ই বা ১৯শে মার্চ ঐ বিলের আলোচনা শুরু হয়। আর ২২ই মার্চ সরকার চারটি মামলা তুলে নেয়। শ্রীনৃপম বধন বিলাতে ছিলেন তখন ঐ বিষয়টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর কর্ণগোচর হয়। তাঁরা ঐ লব্ধে খোজ ক'রে আবার ঐ চারটি মামলা কমিশনের হাতে পেন। কিন্তু মন্ত্রী-সভা তখনও ঐ খুব গোলমালে তারিগগুলি জানত না;—সেইগুলি প্রকাশ পায় ১৪ই কংগ্রেসীদলের সভায়।

ঐ পরিষদের কংগ্রেসীদলের আলোচনার পর, শ্রীশেঠী ট্রিক করেন যে যদিও তাঁর সন্ততার উপর কোন প্রকাশ লব্ধে প্রকাশ করা হয় নি তবুও তাঁর ত্রুফ থেকে বিচারের তুল (error of judgement) হয়েছিল এবং কোন মন্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস্য লব্ধে প্রকাশ

বাক্যত। এট বে মাল আমরা পরিস কর্তে পারিনি, তাতে ব্রিটেনে কারাগারি কিছুটা আছে। ব্যবসা-সচীষ ঐক্য ভাবার ও অর্থ-সচীষ ঐক্য শেীষ অনেকটা। তুট আছে বলে সাধারণ মনে করে। সমুদ্রের ওপারে টাকা পড়ে আছে;—আর এখানে আমবা প্রযোজনীর তথা পার্জি না। এট বিসত্বন ব্যবহার কর্তে ওঁরা দুজনই পারী। এ কর্তে পুবে বলেছি—আমকার এই মুদ্রা-স্ীতি সমুদ্রের কর্তে এঁরা দুজন অনেকটা পারী। তাছাড়া জাতির সমুদ্র আর্থিক ব্যাপারে এট দুজন মহীট প্রত্যক্ষভাবে পারিই। এই মুদ্রা-স্ীতির পতি পূর্বাঙ্কেই অস্বাভাবিক বোধে ব্যাখ্য কর্তে অনেক কটা এঁদের উচিত ছিল। আর এটা একটা বিবর্তিত জাতীয় সমুদ্রা হ'বে ঠাঙিয়েছে।

এর পর আমবা গোলের উপর বিব কোটেব মতো এসে জুটেছে—বিনিয়ন্ত্রণ (decontrol)।

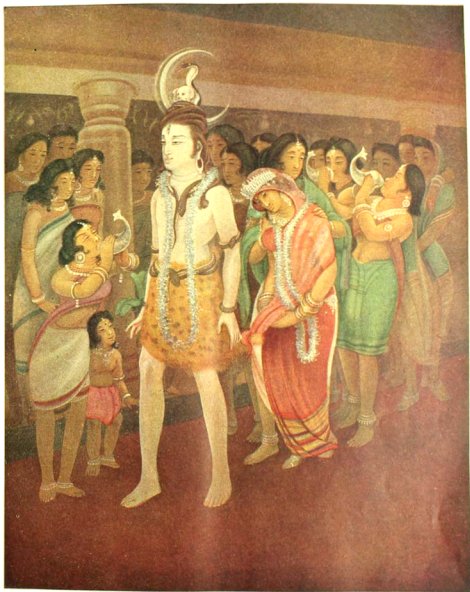
বাক্য, বস্ত্র প্রভৃতি প্রযোজনীর তবোব উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রথা রহিত করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ প্রথার সমুদ্র সাধারণ মাত্রাধের বে সাহন। ও দুর্ভোগ দুগতে তবোব, তাতে মহান্দা পারী অত্যধ বিচলিত জন। অনেকটা

তাইই আশ্রয়ে ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রথা আনিকভাবে রহিত করে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দেবার পর বে কর্তেনৈপুণ্য, দুর্ভোগ ও লভতা প্রযোজন ছিল, সরকারী কর্তচরী মহলে তা পাওতা গেল না। ব্যবসায়ী মহলও এই বিনিয়ন্ত্রণকে মফল কর্তার কাছে আর্থিকতার লবে লাড়া ছিল না। এর ফলে বিনিয়ন্ত্রণ প্রথা বার্ষ হ'ল। শোন। বাক্যে—এট ৯৭ মাসের বিনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা ব্যবসায়ী মিল-মালিকগণ বস্ত্র ব্যবসারেই ৭০০ কোটি টাকা চোরা কারবারে উপার্জন করেছে। মিল-মালিক ও ব্যবসায়ীরা মালপত্র চেপে বেধে লাম বাড়িয়ে তোলে। কাজেই প্রায় আবার কথা উঠেছে নিয়ন্ত্রণ প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করা সরকার। হয়ত লতাই এর প্রযোজন আছে। কিন্তু এখনভাবে নিয়ন্ত্রণ চালাতে হবে যাতে পণ্য-প্রবোর উপায়ন থেকে একেবারে মুচরা বেচা-কেনা পর্যন্ত সমুদ্র বাজারই যাতে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

আর এট মুদ্রা-স্ীতিই চল সবচেয়ে বড় সমুদ্র। মূলতঃ একে উদ্ধার করতে না পারলে কোন বিষয়েই আমরা একত্রে পারব না।



ଅମଳିନୀ



ଓମାର ବିଘ୍ନ

—স্মৃতি—

একাদশ নম্বর

আশ্বিন—১৩৫৫

ষষ্ঠ সংখ্যা

স্মৃতি-দিবস শ্রীকৃষ্ণকুমার দত্ত

তমসাকাঙ্ক্ষের মতো আমিও বঙ্গের পদ। বঙ্গের পদ সেই ১৯১৫ সালের ২ই সেপ্টেম্বর হইতে। ঐ দিন হইতে বঙ্গের পদ, কারণ, যুগযুগান্তের পর জাতি ঐ দিনে নিঃশেষে নিঃশেষে দিয়া নিঃশেষে পরিপূর্ণ করিয়া পাটবাং ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন করিয়াছিল।

কত বিবৃত যুগ হইতে এ জাতির ব্যক্তিত্ব কেবল বাচিবীর প্রয়াস করিতেই শিখিয়াছিল—জুড়িয়াতাজিয়া কোনোমতে বাচিয়া থাকাকেই আদর্শ করিয়া লইয়াছিল—সেহের, প্রাপের, সংসারের, স্বপ্নের, সম্পদের কোথাও কখনও এতটুকুও পসিতে দিব না—যেহান হইতে যাহা পাই, যেমন করিয়া পাই, তাহাই কেবল জমাইয়া রাখি। ব্যক্তির জীবনে আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিলাম, সফটী লোক হুখে থাকে।

যুগযুগের সফটের সৃষ্টিতে জীবন বিরুদ্ধ হইয়া উঠিল সেহেরও প্রতি কণার প্রতি দুহর্তের দৃষ্টাকে, কথকতিতে পুরণ করিয়া যে সফট সেই সফটেই স্বাস্থ্য। পরিশ্রমে, ব্যাধিতে, স্নেহনিঃসরণে যায় যদি না থাকে, আর সেখানে ব্যাধির স্রষ্টা করে, নিঃশাল না ফেলিতে পারিলে প্রাণের দৃষ্টাকে ডাকিয়া আনে। জাতি এমনই করিয়াসফটের সাধনায় যেদিন দৃষ্টাকে ডাকিয়া আনিতেছিল, তেমনই দিনে নিঃশেষে নিঃশেষে হুঁচিয়া কেলিয়া দ্বীপপ্রনাথ জাতিতে শিখাইয়াছিলেন, জীবন জ্বালার পথেই জীবন পাঠিতেহইবে

কিন্তু ১৯১৫ সালের ২ই সেপ্টেম্বর হইতেই ৭১ দিন গতি কেন? ঐ দিনের আগে ঐ দিনের পরেও যে বীরের সাক্ষাৎ মিলিয়াছে, শতীরের সাক্ষাৎ, চমকপ্রদ আত্মবলিমান দেখিয়াছি। কিন্তু দ্বীপপ্রনাথকে দরি একটু যুগের প্রতীক। ইমার্সন বলিয়াছিলেন, নেপোলিয়নের যুগে প্রতিটি করানী ছিল এক একটি কৃত নেপোলিয়ন



দ্বীপ প্রনাথ

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে অথবা বিগত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দ্বীপপ্রনাথ পথ বুঝিয়া ফিবিতেছিলেন ১৯০১ সালে আমবা তাঁহাকে মেমি, উদ্ভাসস্থল

হিমালয়ের শাহাড়ে জলক ঘূর্ণিঝড় ক্রিয়াতেছেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে ধরিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমনভাবে ঘুরিছা কিরিত্তেহিস কেন? বতীভ্রনাথের মুখে যেন সেই প্রশ্ন—আমার মনকামনা কি পূর্ণ হইবে না? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বেশ কি কখনও বাধীন হইবে না? সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, হইবে, তোর মতো যুবকেরা যখন এষ্ট ইংরেজের সাম্রাজ্যকে তলা হইতে মুক্তিকর মতো কাটিতে শুরু করিবে, তখন হইতেই এষ্ট দেশের হুহিনের পূচনা হইবে।

বতীভ্রনাথের শিকার ইহা আহত নাহ, শেষ নহে। কিন্তু ইহাও আরহ নহে। আরহ আরও পূর্বেই হইয়াছিল। বতীভ্রনাথ আবাসাট জানিতেন, এষ্ট শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে তলা হইতে কাটা মুক্তিকর শক্তির বর্ষ নহে। ইহার বিপদ আপদ কোন কিছুই যেন ঠায়র অজানা ছিল না। নিজেই শারীরিক শক্তি, নিজেই ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, যুধ্বগ্রন্থারী দৃষ্টি, জ্ঞান, রূপবস্তা, ভেষজ, সাহস, উদ্ভব, আচরণের একমিকে অনমনীয় দৃঢ়তা, অপরদিকে অপরিশীম কোমলতা, লৈহিকশক্তি প্রত্যোগের নানানুশী কোমল—একে একে বহিরা ধরিয়া জীবনের প্রতিটি সিকের উৎকর্ষ সাধনার অকাত্ত, অনিমেঘ দৃষ্টি তাঁহার জীবনে বেশি প্রায় জানোয়েবেক সঙ্গে লগ্নেই। এমনই করিয়া নিজেই গড়িয়া তুলিবার প্রতি মুহূর্তের যে প্রয়াস, তাহারই যেন আবার প্রতিবন্ধ্য শক্তিতে বেশি 'উড়িয়ে দেবার মাতন।' বেকণ্য জীবনের লকার হইতেছে, তাহারই সহিত 'মরণ তে, তুঁহ যোর ক্রাম সমান'—এই সাধনায় জীবন যেন আরও ত্বরান্বিত, তুর্দমনীয় শক্তিতে উৎকর্ষ, উৎকর্ষ, উৎকর্ষ হইয়া উঠিতেছে।

এই যে সাধনা, ইহার কোনো সীমা বেশি না, সমকক্ষ বেশি না। একমাত্র সহযোগী তাঁহার বেশি বতীভ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়—পরে যিনি নিরলস বানী বসিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এই পথের সাহচর্য তাঁহাদের বেশি বিগত শতাব্দী হইতে না হইলেও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে। সন্ন্যাসীর সহিত শাক্যতের পূর্ব হইতেও বতীভ্রনাথকে বেশি নিরলসের রক্ত সন্নিবি সংগ্রহের ব্রতে

ব্রতী। বেখানে গিয়াছেন মাছুষ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বতীভ্রনাথ কখনও বল পড়েন নাহ, মাছুষ গড়িয়াছেন। এবং সেই সঙ্গে মাছুষই পরবর্তী যুগে এক একজন এক একস্থানে বিস্তারের শক্তিকেই হইয়া উঠিয়াছেন বহুদূর বেশি, বাংলায় প্রথম বিদ্রোহী স্ত্রীর কাছে লাগেন বতীভ্রনাথ, বাংলার বাহিরে বতীভ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। বাংলায় প্রথম বিদ্রোহী বল পড়েন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র, আর প্রথম বিদ্রোহী কার্যকলাপ শুরু করেন ব্যারিষ্টার যোগ।



নিরলস বানী

কিন্তু একেবারেও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। বহু-উৎসে উদ্ভবনা স্ত্রী হইবারও পূর্বে সর্গ কার্জন আর এক উদ্ভবনার স্ত্রী করিয়াছিল। করিয়াছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় সমস্ত প্রাচ্যের লোককে, সমস্ত বাঙালী জাতিতে শাসাশাসি করিয়া। এই উদ্ভবনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই বতীভ্রনাথ জাতিতে আপাইবার প্রথম প্রয়াস পাঠাইছিলেন। কোণা হইতে আচরণ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন জানি না। কিন্তু তিনি

দুইটি বিভাগের দ্বারা দুই প্রকার সহকর্মীকে পাঠাইয়া—
‘জেলেন চট্টগ্রামে কার্জনকে হত্যা করিতে ।

এই কারণে বতীজ্ঞানাথকে বিপ্লবী বাংলার প্রতীক হিসাবে দেখি—প্রতীক হিসাবে দেখি যেমন ইতিহাসের দিক হইতে, তেমন চরিত্রের দিক হইতে । কি করিয়া নিজেকে বিলাইয়া দিব, কি করিয়া জাতিতে আগাইব—
এই দুই অগ্নির আগ্রহে বিপ্লবী ‘বাংলার দুবক্তা’ উল্লসভাবে দুটাদুটি করিয়া বাংলার ত্রিণ বংশের ইতিহাসকে সৌরভময় করিয়া রাখিয়াছে । এই প্রেক্ষার বিরাট উৎসব দেখি বতীজ্ঞানাথের জীবনে ও মৃত্যুতে ।

সত্যসীর সহিত সাক্ষাতের পর আমরা দুই বতীজ্ঞানাথেরই সাক্ষাৎ পাই ১৯৩০ সালে শ্রীমদবিশ্বের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাকৃষ্ণের দূহে । এই যে সত্যসীরের বিলন, বাংলার বিপ্লবের ইতিহাস এখানেই উদ্ভূত হয়, এবং সমস্ত ইতিহাসের উপর ইহার একটি বিশেষ ছাপ রাখিয়া যায় । গেজুয়া না পরিচাও এবং অনেককালে ভগবানের অতিবে অবিদ্যার হইয়াও ঠাহার। সত্যসীর চরম আশ্রয়ে উদ্ভূত হন, সত্যসীর নিকট কৰ্মকে ইতিহাসের পাতা হইতে উদ্ধার করিয়া জীবনে প্রতিফলিত করিয়া তুলেন, তাহারই আশ্রয়ে কেহ কেহ এখানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিলেন, অথবা অন্নসিনের মধ্যেই ইহারই সহিত যোগ দিয়াছিলেন । তাহারই মধ্যে আশ্রয় তিনটি নাম বিশেষ করিয়া স্মরণীয়—প্রথমনাথ ফিল্ড, অবিদ্যার চক্রবর্তী ও রাসবিহারী বসু ।

ইহার পর হইতে বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসে বতীজ্ঞানাথ কখনও সমুখে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কখনও পশ্চাতে সরিয়া প্রেরণা যোগাইয়াছেন । পশ্চাতে সরিয়া যখন পড়িয়াছিলেন, তখনও আশ্রয়ের স্রষ্টা নিঃশেষে নিজেই মুছিয়া ফেলিবার সাধনাই পরিচুত হইয়া উঠিয়াছে । শেষে আশ্রয়লেনের সময়ে ও পূর্ব হইতেই মধুসূতা নদীর তীরে তীরে, একা ফুরিয়া ফিরিয়াছেন মাথার সংগ্রহের স্রষ্টা । আবার যখন সময় আসিল কলিকাতায় আসিয়া নেতৃত্ব লইলেন । দ্বারা পড়িলেন । বাহিরে

আসিয়া কৰ্মধারার সমযোগ্যে পরিণত করিয়া নিজে দূরে সরিয়া গেলেন ।

বতীজ্ঞানাথের নেতৃত্বে কৰ্মধারার এই পরিবর্তনের পূর্বে ও পরে বিপ্লবী বাংলার দুইটি পৃথক পৃথক । দুইটি পৃথক পার্থক্য আছে, দুইটি পৃথক সাদৃশ্যও আছে । বাংলার বিপ্লবীপৃথক প্রথম পর্বায়ে আমরা পাই এক একজনের জীবন লইবার চেষ্টার এক বা একাধিকজন জীবন বিদ্যা দিয়াছেন । তখনকার দিনের কথা ছিল life for life. এক একটি জীবন খেঁজার যখন আশ্রয়লেনের দ্বারা গিয়াছে, এমন এক চরিত্রের পরিচয় দিয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসেই বিরল । এই চরিত্রের আশ্রয়েই তখন বাঙালী যুবক নিঃশেষে নিজেই বিলাইয়া দিবার স্রষ্টা উদ্ভাস হইয়া উঠিয়াছিল । তাহারই একটি একটি করিয়া জাতিরা নলে ভর্তি করার প্রয়োজন অল্পই ছিল । এমন করিয়া জীবনের পরিবর্তে জীবন—এই দ্বারা বিদ্যা বতীজ্ঞানাথ একটি আশ্রয়লেনের দৃষ্টি করিয়াছিলেন—তাহার ষ্টেট পৌছাইয়াছিল ১৯৩০—৩২ সাল পর্যন্ত, এমন কি, ১৯৪২ সাল পর্যন্তও ।

ইহার পর যখন বতীজ্ঞানাথ স্রষ্টা আশ্রয়লেনের প্রথম দিলেন, তখনও সমবেতভাবে জীবন বিদ্যা প্রেরণে আগাইয়া যাইব—ইহাই ছিল তাহার পণ । ইহার মাত্রের-কয়টি বছর অল্প দিক হইতে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়, তাহার চরিত্র পৃথক । তাহার লক্ষ্য ছিল, প্রচেষ্টা জীবন লইব, সম্বল হইলে পরিচাওইব, জীবন নিব না । এই উদ্দেশ্যে একই ব্যক্তির জীবন লইতে কয়েকজনের সমবেত চেষ্টাই হইত । এই পদ্ধতির প্রেরণা বতীজ্ঞানাথের নিকট হইতে আসে নাই ।

তাহার দিক হইতে কৰ্মধারার পরিবর্তনের প্রয়োজন হইল যখন বিশেষ হইতে সহকর্মীরা সংবাদ পাঠাইলেন, বিশ্ববুদ্ধ আসিতেছে, ভারতীয় বিপ্লবের স্রষ্টা সহায়তা দিগিবে । আশ্রয়লেন হইতে গাঙ্গিল । প্রবিশিষ্টকে স্রষ্টা করিলেন, তবে কি বলি সময় আসিয়াছে ? একবার ঘরের দিকে চাহিলেন না—সেইস্রষ্টা দ্বারা—একবার স্রষ্টাকৃত্যের সংবাদ লইলেন না, বিপ্লবের দৃষ্টে নাহি

পড়িলেন কিছু বহন নাযিয়া পড়িলেন, এ করন।
বহনও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই, ঐ প্রথম প্রচেষ্টাতেই
শেষ হাটান হইয়া যাইবে। দেশের অগণিত জনগণ
তখনও অসত্য নিম্ন। বতীন্দ্রনাথ চাহিয়াছিলেন,
বিদেশ হইতে গ্রাম অবস্থার লাহাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে
শাক কাক লোক মুক্ত করিয়া গ্রাম নিবে, কৃষকের
প্রাণের বিরুদ্ধে জাতি গ্রাম পাইবে।

বিভিন্ন বুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। 'ব্রহ্ম
বুদ্ধের' নিষেধ বতীন্দ্রনাথ বৃহৎ কল্পিতব্যর আশ্রয় লইলেন।
তাঁহাকে প্রতিবার আয়োজন বহন নিজ চক্ষেই দেখিয়া
আসিলেন, তখনও লহর চিত্তগ্রন্থ ও মনোরঞ্জনকে
লইয়া সন্নিহা হাইবার লম্ব ছিল। কিছু নর হাটল হুবে
তালভিত্তিক তলে বহিয়াছে নীরেন ও বতীন্দ্র। তাহার
লহে নঃ লইয়া হাইবেন না। শত্রু প্রভুত চটবার সময়
পটল। বহ লোক পক্ষাঘাতন করিল। সমস্ত দিন
জলে, জললে, কাটাবনে বুদ্ধি। স্থাপিলালা কাতর হইয়া
যখন তাঁহার চক্ষাঘাতের নিকটবর্তী বতনান বাংলায়
চলিয়াযাটের মারে পৌঁছিলেন, তখন শত্রু গুলি ছুঁড়িতে
জ্ঞক করিয়াছে। আর এক ক্রোশের মতো হাটতে
পারিলে আবার তাঁহার বৃহৎজের অগলে প্রবেশ করিতে
পারিতেন। কিছু তাহা আর হইল না। উই পোকার
মাটি কুলিয়া বনের মধ্যে ঘোড়ার আশ্রয় স্রষ্ট করিয়া
রাখিয়াছিল, তাহারই পক্ষাঘ হইতে গুলি ছুঁড়িতে লাগি-
লেন। গুলি ঘাড়া হাতে পাটলেন নিঃশেষ হইয়া গেল। চিত্ত

প্রিয় তখন বৃত্তপ্রায়। তাহার মাথাটি নিম্নের কোলের উপর।
নিঃশেষ ও লগেটে গুলি লাগিয়াছে। এই অবস্থায় বাল-
বরের ও কলিকাতার পুলিশ ও টানিপুরের সৈন্যরা তাঁহাদের
পারিল। এই লোকের বহনের অবস্থান হইল, বর্ধ অতঃপেল।

বতীন্দ্রনাথের বৃত্ত। সংবাদ তনিকা উত্তরবঙ্গের বতীন্দ্র
ঘোষন দ্বায় বহিয়াছিলেন, লালগ্রাম দিয়া তোমরা যশদা
শিখিয়া পাইলে? কিন্তু এতো লালগ্রামের শিলাস্তম্ভ নঃ
—বাগ্যকে চক্ষন চচিত করিয়া কুলকুলনীর আশ্রয়ে
বসাইয়া রাখা যায়। এ বে তাহার জীবন্ত রূপ। আর
সে জীবনও কুলার, চর্ম হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কণায়
কণায় 'উড়িয়ে দেবার মাতন'ের কলার সকারে। এই
'উড়িয়ে দেবার মাতন'ই তাঁহাকে বতীন্দ্রনাথ করিয়া
কুলিয়াছিল, তাহা না হইলে তো তিনি বাঙালী হইয়া।
আজ উল্লসিত বৎসর বহলে আঘাতের পরম প্রভের চটয়া
বাঁচিয়া থাকিতেন।

বে অমর জীবনকে তেত্রিশ বৎসর পূর্বে এই দিনে
আমরা হায়াইয়াছি, আজ মনে হইতে পারে, বিরাটন্তর
চরিতার্থতাও সে জীবনের হইতে পারিত। কিছু নিম্নবের
পথ হিসাবের পথ নঃ। অথবা হুত তাহার হিসাব মিলে
বৃহৎসের ইতিহাসের পাতায় প্রায়চিত্তকে জমার ধরে
দেখাইতে পারিলে। বতীন্দ্রনাথের জীবন দিয়াও সে
হিসাব মিলান যায় নাই, পাঁচীজির জীবন দিয়াও গেল না।
কবে, কি ভাবে হাইবে তাহারই মন্ত আজও কমলাকান্তের
মতো বৎসর পণিব।



প্রেস-ফটোগ্রাফার

স্বাধীন দেশসুখ

কাপড়ে-ঢাকা সূতির ভেতর এত হৈহালী, এত বেহনা ছিল, কে জানিত! আমার ক্যামেরার প্রতিফলন-কাচ যেন কাপড় হতে গেল। কাপড়ে-ঢাকা সূতিকে যেন আর দেখতে পেলাম না।

খবরের কাগজের ওড়ে ছবি সংগ্রহ করে বেড়াই। সোজা কথাই আমি ফটোগ্রাফার। দেশে-বিদেশে, সহরে, গ্রামে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে ছবি তুলি। আরও ছবি তুলতে বলকাতার এক হুং শিবিরে এসেছি। হুং-শিবিরের কর্তৃপক্ষ এক কাপড়ে ঢাকা রঙভরা সূতির আলোক-চিত্র নেবার জন্তে আমাকে বেসরকারী ভাবে পরামর্শ দিলেন। কৌতূহলী হয়ে আলোকচিত্র নিতে পেলাম। কিন্তু কে জানিত, কাপড়ে-ঢাকা সূতির ভেতর এত গোলমাল রয়েছে। লোকাল শাট হওয়ার পরও ছবি কিছু তোলা হল না। মাথার মধ্যে যেন ঢলাচ্ করে রক্ত উঠল। প্রতিফলন-কাচে সূতিকে যেন খুঁজে পেলাম সুলিয়ে গেল সব কিছু।

কিন্তু ক্রমেই অশাট যেন শাট হতে লাগল। সূতির উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দিতে চিন্তা যেন নিগল খুঁজে পাচ্ছিল। তথাপি থেমে উঠেছি। হুং-শিবিরের একজন সুলজিকে আমার জন্তে এক গ্লাস জল আনাতে বলে উঠানে নেবে এলাম। হুং-শিবিরের ভেতরে এতক্ষণ যে দাণ-রোধী চর্গা ছিল, তা যেন উঠানে আর নেই।

বাইরে একটা বেলগাছের নিচে একখানা চেয়ার আনিতে গা এলিয়ে দিলাম। বেশ বড় বাতাল বইছিল। আমাকে দশমিনিট একলা বিজ্রাম করার সুযোগ দেবার জন্তে একজন সুলজিকে অহরোধ করতাই তিনি হস্তস্ত হয়ে ধারে-কাছের লোকজনকে সরিয়ে নিয়ে নিজেও গবে গেলেন।

ফটোগ্রাফারি করে বেড়াই। প্রতিদিন কত লোকের সংস্পর্শে আছি। হাজার হাজার মানুষের মুখ আমার

ক্যামেরার দর। পড়েছে। শত শত মানুষের চোখের উপর ক্যামেরাকে সোজা করে বসতে হয়েছে। কত চোখের উপর তীর দৃষ্টি নিতে হয়েছে। কত গাছ, নদী, মেঘ, হুল আমার পরিচিত। মানুষের কত দুর্লভতা আমার ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। রাজনৈতিক নেতার গভীর ভাব, কবির ভাবপ্রবলতা, দার্শনিকের ঐশ্বর্য, রমণীর কখনো লজ্জা, কখনো লজ্জার কত কত ছবি।

গান্ধীজী তখন নোরাখালি সন্ধর করছেন। গান্ধীজীর ঐতিহাসিক নোরাখালি-পরিকল্পার ছবি নেবার জন্তে পদ্মা পাড়ি দিয়ে টাঙ্গুর এলাম। লেখান থেকে চৌমুহনী। তারপর গ্রামের দিকে এগোতে লাগলাম। আজ এই স্রু সিথতে বলে একটা কথা বীকার না করে পারলাম না। গান্ধীজীর ফটো আনাতে নোরাখালি দিয়েও শেষ পথ গান্ধীজীর নোরাখালি ভ্রমণের ছবি তোলা আমার হৃদয়। হুং-একদিন যাত্র নোরাখালি ছিলাম। তারপরই দ্বীপ অর্থের ধবং পেয়ে ভাড়াভাড়া চলে আসতে হল বলকাতার। আমার যেমন কপাল!

তবু আমি ঐ সময় নোরাখালি ছিলাম একথা আমারও জানাতেই হবে। এক অখ্যাত গ্রামেই ছিলাম হুং। বাড়ির পর ঘন। ঘনই ভেতরে গ্রাম। ঘন রিক নট, হাজার হাজার গাছের ভেতরে গ্রাম। হুংদী, তাল, নারকেল, খেজুর, আম কাঠালের ঘন ঘন। মাঠ থেকে যেন হুং, ঘনের ভেতরে যেন গ্রাম হারিয়ে গেছে।

বিপদ হয়েছিল ছবি তুলতে গিয়ে। রোগ ছিল চমৎকার। ক্যামেরা যাতে সুলিরে বেরিয়েছি সেটা পথ ছেড়ে বীকা পথ নিলাম। একটা প্রকাণ্ড পুষ্কর, তাতে শিঙি-বাঘানো জল। সত্যাপীর গটার মত অসংখ্য লতার সূরি নেমেছে পুষ্করে। গ্রামের এক বৃষ্টি অস্তমন্তকা হয়ে বালন মাঝছিল। চটপট তার ছবি তুলে নিতে গিয়েই বিপদে পড়লাম।

বিষা বলে লাভ কী। চাপা কঠে ডংগনা শুনে ক্যামেরা গুটিয়ে নিয়ে গবে পড়বার চেষ্টা করেছিলাম। চুরি বৈকি, ধরা পড়লে এ বড় লজ্জা, আর ধরা না পড়লে মত বড় একটা আট দৃষ্টি হবে বেত। পরে বলকাতা

জামিলা—আপনি,

কিংবা মাতাভের কাগজে ছাপলে কে তার পাতা পেতে ?
নোচাখালির বধু সে-ছবির পাতাই পেতে না।

পালাবার চেষ্টা করছিলেন ; কিন্তু তাও পারলেন না।
তাত্তাত্তি সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।
পৌছাল সব উপরের ধাপে। কী লম্বা পতি ! এগোতে
লাগল আমার দিকে।

—আপনাকে দেখে অবাক হচ্ছি দাদা, আপনি এখানে
কেমন করে ? বহুটি আমার দিকে চেয়ে শ্রম করল।
খোঁচটা একেবারে খুলে দিলে এবার।

—সেমন তো, চিনতে পারছেন কি না ? আমি
কিন্তু আপনাকে বেশ চিনতে পারছি—সে বললে।

তবু ও আমাকে বিস্মিত রেখে বললে, আমার একটু
পরিবর্তন হয়েছে দাদা। তা হলেও আপনার কি মনে
নেই, সেই কৌতুকে আমারের কি করে জানাপোনা হল ?

এবারে বুতলাম যে, বহুটি কুল করেছে। তবু বজায়,
মানার ঠিক মনে হচ্ছে না মিসি।

—আমার নাম আভা, মনে নেই, সেই যে কৌতুকে
আপনি আমার ফটো তুলেছিলেন ?

এক কোড়া পরিচয়, সরল চোখ আমার চোখের
উপর যেন উল্লসিত হয়ে আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে তাই
কেনেছিলাম। এতক্ষণ আমি স্থির সিঁদ্বায়ে পৌঁচেছি
যে, বহুটি আমাকে চেনেনি।

বললাম, কিন্তু আমি ত' মিসি কোনদিন কেনী হাই
নি। কোনদিনও না।

—পরিচয় করছেন আমার সংগে, বহুটি বললে।

—না মিসি, পরিচয় কেন করব, স্বাধা বিলায়।

আমার আশ্চর্যকথা সম্পর্কে এবার যেন সে নিঃশব্দ
হল। স্বস্তিতে আবার ঘোমটা টেনে দিল। তারপরেই
পিছনে ফিরলে। তরানক জম্বিত হয়েছে বলে মনে হল।
আমিও সাবনের দিকে পা বাড়ালুম।

—ভুলন, আবার সে ডাক দিলে। তারপরে আবার
কাছাকাছি এগিয়ে এল। বললে আপনি আমার ফটো
দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তা বহি আপনি ইচ্ছে করেন,
ত' নিতে পারেন।

—আর লক্ষ্য দিবে লাভ কি ? মাথা নিচু করেই
কথা কহটি বজায়।

সে কিন্তু তেমে ফেললে। চটপট বললে, আপনি
আমার লাবার মতন। ছোট বোনের ছবি নিতে
লক্ষ্য কি ?

ওর কথার কাছে হার মানলাম। ওকে ঠাঁড় করিয়েই
ছবি নিলাম। কী প্রসন্ন মুখি ওর। ঠাঁড়বার তপ্ত
চমৎকার। ছবি তুলবার সময় ওরের লাবান লম্বারেরও
ছবি নিলাম ঐ সংগে। চূপকাম-করা ছোট বাড়ীটার
সংগে সংগে করেচা নারকেল পাছও ছবিতো এসে গেল।
ওদেরই নারকেল পাছ। মনে হয় লম্বা ভাব কুলছিল।

সেই মাত্র করেক মিনিটের দেখা। তার ছোট
লম্বারে রাত্রেজানীর মতই তাকে মহিমাবিত্তা দেখে-
ছিলাম। বেশী পরিচয় ওর পাইনি। আর ফটো-
গ্রাফারের সংগে বাছবের পরিচয় তো সাধারণত করেক
মিনিটেরই যাত্র হয়। তারপর হতকণ মনে থাকে
ফটোগ্রাফের বিষয় বস্তুটিকে। ক্রমে আর মনে থাকে না।

কিন্তু তারপরেও তাকে বেধেছিলাম। বাংলা-
বিভাগেও পর পাকিস্তান থেকে যখন বলে বলে বাস্তবতার
নরনারী কলকাতায় আসছিল, তখন তাকে ভীড়ের মধ্যে
শেফাল্যা স্টেশনে বেধেছিলাম। চেহারা দেখে পরিচিত
পরিচিত মনে হচ্ছিল ; কিন্তু প্রথমটা ঠিক চিনতে
পারিনি। পরে যখন চিনলাম, তখন বাস্তবতারের গাড়ী
টাট মিলেছে। গাড়ী তাকে নিয়ে যকঃবলের কোনও
নিবিঘ্নে চলে গেল। সেখানে তার খবর নেহা আর
সম্ভব ছিল না।

ওর মাথার অসংখ্য ফুল চুলের স্ত্রি চকিতে দেখলাম।
স্বস্তির ভেতর অত তাত্তাত্তি স্পষ্ট রূপ পারিনি ; কিন্তু
তবু, সন্ধ্যায়ের স্তার মত অসংখ্য স্তারের স্ত্রি নামানো
এক পুঙ্খের রূপ ক্রমাগত যেন স্বস্তির ভেতর নিঃশব্দে
স্পষ্ট আকারে বুঁজে পাবার চেষ্টা করছিল।

দুর্ভাগ্যও বটে এবং সৌভাগ্যও বটে যে, পাক্যা
ফটোগ্রাফারের অত সেলিফট থাকে না। হাবার স্তরের
ছবি, নিষ্ঠুর গুলি চালনার ছবি, কল চিতা-শয্যার ছবি

শিই আমদিকাল থেকে.....

[illegible]

এম, এল., বসু এও কোং লিঃ

सत्यविस्तारः २००३

তুলে তুলে ঘট্টাগ্রাসকেরা মিষ্ট হতে ব্যয় বৈকি।
তবু সেদিন রাতে আমার এলব্যম থেকে সে ছবি বের
করলাম। এক প্রসঙ্গময়ী নারী-মূর্তি। কক্ষমক এক
পরিপূর্ণ বাস্তবতার ছবি। কী জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড। শেয়ালা
শৈশবের বাস্তবতা রমণীর চেহারার সঙ্গে এর কোন
সংশয় নেই, কিছুনাও নেই।

কিন্তু ছবিটা যেন কী নির্ভর পরিহাস। ছবিতে
দেখানো সব আছে, বাস্তবে দেখানো কিছুই নেই।
অভ্যন্তরীণ নামও জানি না। তিনি মাত্র তাকে
কিন্তু নাম জানবার চেষ্টা করি নি।

—আপনার কি হয়েছে বলুন তো?

ভিয়ার গুহ ছিঁচি হল। চেয়ে দেখলাম এক ছেঁড়া
পাতালী-পত্র বহর তিরিশের একজন লোক আমার কাছে
এসে পড়িয়েছে। গালাঘ ওর স্টেবলকোপ খুলানো।

—আমি এই দুঃস্থ শিবিরের কল্যাণীভার।
জনসাম আমারি নাকি অস্ত্র বোপ করছেন, সেই ভয়
এলাম।

একটু সোজা হয়েই এবার বসতে হল। বলায়,
নাথটা ধরেছিল সামান্য, এখন সেয়ে গেছে।

—হ্যাঁ বা দুর্গন্ধ ঐ হতভাগীর, নতুন লোকের পক্ষে
এদের মেগতে এসে প্রথমে একটু আশঙ্কিত হতে বৈকি।
এই বলে গলায় স্টেবলকোপ খুলানো। কল্যাণীভার অস্ত্র
লিখে চলে গেলেন।

দুর্গন্ধ যেন ব্যাভাসে একটু একটু ভেসে আসছিল।
এখানে তবু কিছুই গন্ধ নেই। সেই শিবিরের ভেতর
সাত্ত্বের চিড়িয়াখানার কী দুর্গন্ধ। চিড়িয়াখানা বৈকি।
এক ঘরে গলাপ বাট জন লোক গারে গা লাগিয়ে দুখার।
আর মোংরা শরীর থেকে বিচিত্র গন্ধ ওঠে বাতাসকে
অস্থির করে তুলে। সেই গরের ভেতরের কথা যেন হলেই
বাখাটা কি রকম করে যেন।

বেলগাছটার নিচে ছায়াটাও ঘন এবং বাতাসটাও
ঐ গন্ধে এখানে আরাবগ্রহ। কিন্তু বলে থাকবার ভয়েই
ত' এখানে আসিনি। আবার ক্যামেরা নিয়ে উঠলাম।
কাপড়ে ঢাকা মূর্তির ছবি নিজেই হবে।

দুর্গন্ধ সেই দুর্গন্ধের চৌহদ্দিতে গারি গারি দুঃস্থ
রমণী বলে আছে পথ থেকে এদের তুলে আনা হয়েছে।
হাতায় এরা বলে বলে হুং টেনে তিন্কা চাইত। এরাই
অজানন্য পার্কে কুটপাথে বলে গুড়ুটো জেলে হাঁকিতে
চাল দেখে করে খেত। পনর থেকে ওদের গলাপ বহর
বহরের মধ্যে যেন কোন তত্ব নেই। সেই অগুণ্ণের,
কংকালসার কাঠামো। আর সেই কাঠামোর মাধ্যম
এক এক ছোড়া চোখ কী হতভাগীর কক্ষ। অথবা,
হতভাগী কিংবা আশা, কোনটাই ওদের নেই, আছে কেবল
গুটির মূর্ততা, চাহনির ঘোলাটে ভাব।

খুঁজে পেলাম সেই কাপড়ে ঢাকা মূর্তিকে। দুঃস্থ
শিবিরের লোকেরা ওকে পাগলী বলে। পাগলী নাকি
কাতো সংসে বড় কথা বলে না। সাত্ত্বিক নিজে
কাপড়ে ঢেকে বলে থাকে। কাপড়ের সৈবর্ষে যখন কুলোয়
না, তখন নিজের চোখকে দুঃস্থ হিরে ঢেকে বলে থাকে।
অথচ, দুঃস্থ শিবিরের দুঃস্থদের মধ্যে এই পাগলী নাকি
কোন বড় খয়ের মধ্যে। হেজিটার বাতায় ওরা কোন
নাম লেখনি ওর। নামের ছায়ায় কেবল লিখে
রেখেছে 'অজাত'।

সেই চোখ। উন্মোচন করলাম কাপড়ের আঁবরণকে।
একটা ঠাণ্ডা গুটি ক্রমে যেন হিম্ন হতে হতে শেষ পর্যন্ত
অসহ্য হয়ে গেল।

কাছেই জানলাম। ঘরে বা আসো আসছে, তা
পর্যাপ্ত নয়। তবু তাতে ছবি হতে পারে। জানলাম
আলোর তাকে টেনে নিয়ে এলাম। কাছে থেকেই
তাকে কোপা করলাম।

আমার মিকে সে চেয়েই আছে। তার চুল নিভাভ
কক্ষ, ঘরা গাছের শেকড়ের মত। তার গালে কোন
খাড়া নেই। কোন অলংকার নেই তার গলায়। হাতের
মিকে অজ্ঞান ঘামটি। সেই রঙের উজ্জ্বল কোথায় যেন
অভ্যর্থিত হয়েছে। হুয়ারের তৈরী প্রতিমার রঙ যেন
বর্ণার সঙ্গে মূছে গেছে। আর সে রঙ কিরবে না, তার
সে সৌন্দর্য কিরবে না।

আমার মিকে সে চেয়েই আছে। এক বাস্তবায়।

তমসীত শূন্য-দৃষ্ট আমার কায়েরায় ধরা পড়েছে। আমি
বটো ঢাকার, সব মনে রাখতে পারি কিন্তু আমার
কামেরা আকানের মত বগা, বসন্ত সকলই তুলে ধার।
মেঘেরি পেছনে চাওয়া; আমি আর নাহকেন পাছে
জাবের লম্বারোহ নেই। ওর পলার হাড় কী বিশ্রীভাবে
বেন বেরিয়ে আসছে। ডঃবনায়, থাক না হাড়। ও

একদৃষ্টে খেঁষেই আছে। জানি ও চিরকাল এমনি করে
আমার কামেরার মিলে চেয়েই থাকতে পারে। বাংলা
বিভাগের কলে ওর সব পেতে, সেই দৃষ্টও পেছে
কিন্তু তবু সে চেয়ে আছে। আমার চিন্তনলন কাঁচে
শ্মশিত হয়েছে ওর চোখ। এপারতাবকে মথোচ্ছে এনে
বেশী একগোছারের খাটার টিপে নিলাম।

নূতন প্রেম

শ্রীমতী বামী রায়

প্রমত্ত উৎসব-রাত্রি আমি দেখেছি তো বহুবার।
প্রহরের হুগ ককে রাগিনী-উজ্জ্বল
পনিরাছে প্রবণে আমার।
রাংয়ের তুফান
দুঃ থেকে আনুচান করেছে এ প্রাণ।
সেইসব নিম্ন-বিলাস
নিচের ঘ্রীবনে আত্ম চাহি মিলাইতে
যদি পরম্পর হর কক সরস্বীতে,
তবে তুমি কমা কোর, কমা কোর, প্রিয়।
তবু ভালবাসা
—ভীক হুগের ২ম ভীক ভালবাসা,
চাখ যে বাধিতে বর্ণহীনতায়ে;
শাতরং হুমিপ্রণ শুভের রেখার।
অভিসারী পায়ে
প্রেম আগে না তো থাকে,
মজ্জার আধারে।
নূতন বিবাহোত্তে
বাধাবর প্রেম আগে ঘোঃশূত চোখে।
আমার এ প্রেম,—শোন, শোনা বলি, প্রিয়—
কানে কানে বলি—
কর্ণের ভগতে প্রেম নহে অভিসারী।
কর্ম-কেতুকী-জাওয়া গুপ্ত হুগগুলি

এ প্রেমের পথ নয়। বাহন তাগারি
উত্তম অনিত ২৮। নূতন তরঙ্গারী
কেটে কেলে গলে গলে নৃশলের ভার,
শাসনের—ভীকবের—চার, মমতার।
চন্দন-মালিকা এর নহে উপচার;
হৃদিকা যে তার—
শুক হরিতকী মাংস, নহে হৃদ্য-পার।
কুমারীর স্বপ্ন বাসনার
সেহ হ'ল অবশেষে
এরি পারে এলে।
রাজার কুমার
সেজে এল উদাসীন বিরাটীর বেশে।
অপন—বেলায় প্রিয়, এত শিলা ছিল?
ভাঙা স্বপ্ন ধান্থান,
হোল তার, হোল গান,
কাকের দিনেতে এসে
কাজে কি মিলিল?
শান্ত বৈরাগ্যের হুগের প্রেম, কথা বল,
এখন এমনি কথা,—
হুগের বাধা
তিতিক্ষার মত্রে বল।
শান্তি বাসনার,
অমর আলোক ছোঁয়া নূতন আলকার
এনে দাঁও, দাঁও মনে। ধরো, ধরো হাড়,
এবার তোমার বেশে পোষাক প্রভাত।

প্রস্তাবিত হিন্দু 'কোড বিল'

শ্রীমুরেশ্বরমোহন ঘোষ

হিন্দু কোড বিল নিয়ে দেশে জনমত গঠন আরম্ভ হয়েছে। আমাদের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে কংগ্রেস পার্টিও সিদ্ধান্ত অনুসারে এই বিল আগামী এসেম্বলী অধিবেশনে আলোচনা এবং আলোচনান্তে গ্রহণের জন্য উপস্থাপিত হবে।

বিল সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আজকের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, বিল সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাবে আলোচনার পূর্বে কতকগুলি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যিক। বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিষয়গুলির অবতারণা করছি।

ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের অভিব্যক্তি এবং তাহার নিঃস্থপ প্রদানত দুই দিক থেকে হয়েছে। এক বেসিক কেন্দ্র করে, বেষ্টকে অবলম্বন করে, বেসিক অনুসরণ করে ভারতবর্ষের সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রিত হতে হতে অভিব্যক্তির পথে এগিয়ে চলেছে, আর তত্বকে কেন্দ্র করে, তত্বকে অবলম্বন করে, তত্বকে অনুসরণ করে নিয়ন্ত্রিত হতে হতে অভিব্যক্তির পথে এগিয়ে এসেছে।

বেধ ও তত্ত্ব এই দুইটির মধ্যে কোনটী আগে—বেধ আগে কি তত্ত্ব আগে—এই নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে বিবাহ, বিচার, বিস্তৃতা চলে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। তত্ত্বের দিক থেকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে খ্রিষ্ট চন্দ্র বিজ্ঞানিদি মহানগরের কথা। তিনি তাঁর গ্রন্থে এই বিতর্ক উপস্থাপন করে নানা আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করেছেন বেধ ও তত্ত্বের মধ্যে কোন একটিকে আগে বা পরে বলা যায় না দুইই অনাধি। তাঁর মতে এই দুই ধারা একসঙ্গে বয়ে চলেছে ভারতবর্ষের নৃকেশর উপর দিয়ে।

মহেন-কো-দারোর সত্যতা বৈদিক মূলপুর্ন এবং তাত্ত্বিক, এই মত বৈদ্যন রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নৃতন মত ও প্রচার আরম্ভ হয়েছে—মহেন-কো-দারোর সত্যতা শুক-বেধ দুগের সত্যতা এবং তত্ত্ব ও শুকবেদ একই বস্তু।

এ আলোচনাও আমাদের আজকের বস্তু যা বিষয়ের

বাইরে। আমরা দেখতে পাবি ভারতের সমাজ জীবনের উপর বেধ ও তত্ত্বের প্রভাব মহেন-কো-দারো থেকে আজ পর্যন্ত সমান ভাবে চলে এসেছে। আমরা বেধ ও তত্ত্বের মধ্যে শুধু একটি বিষয়ের আলোচনার আয়োজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চাইছি। বর্তমান হিন্দু 'কোড বিল' আলোচনার সেই একটি বিষয়েই প্রয়োজন হবে সব চাইতে বেশি। সেই বিষয়টি হচ্ছে এই—

শ্রী ও নৃত্তের অধিকার নিয়ে বেধ এবং তত্ত্বের বিরোধ। এখানেও আমি একথা বলে রাখতে চাই যে সত্যি সত্যি শ্রী ও নৃত্তের অধিকার নিয়ে বেধ ও তত্ত্ব দুগত: কোন বিরোধ আছে বলে আমি নিজে বিশ্বাস করিনা, তথাপি বৈদিক স্মৃতিগ্রন্থ এবং তাত্ত্বিক স্মৃতিগ্রন্থগুলি দেখলে দেখতে পাই বৈদিক স্মৃতিগুলি প্রায় একথাকো বলেছে বৈদিক যামদজ্ঞে শ্রী ও নৃত্তের অধিকার নাই। বিবাহামিতে আতি, সুল, শিল, গোত্র প্রভৃতির বিচার অপরিহার্য। পক্ষাঙ্ঘরে তাত্ত্বিক স্মৃতিগ্রন্থগুলি নানা বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা যামদজ্ঞে তাত্ত্বিক স্মৃতিগ্রন্থে পূজা দুই শাখায়—নিবপূজা এবং শাপগ্রাম পূজা—ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলের সঙ্গে শ্রী ও নৃত্তের সর্জন বিষয়ে সমান অধিকার। বিবাহামি সম্পর্কে এসেই যামদজ্ঞ উদারতার চরম। যে কোন বর্ষের সঙ্গে যে কোন বর্ষের বিবাহ পাত্র-সম্বত। এমন কি স্বনকেও ভার্য্য রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিবাহে সুলশিল-জাতি গোত্রের বিচার আবশ্যিক নাই।

ভারতবর্ষের মহাভারতীয় অভিব্যক্তিকে দুই দিক থেকে পরিচালনের চেষ্টা চলে আসতে অব্যাহতমানকাল থেকে। সমাজজীবনে কখনো কোন মতের প্রামাণ্য হয়েছে কখনো অন্য মতের প্রামাণ্য হয়েছে। অবিকাল সমগ্র উভয় মতই মূলপং কোথাও এটা কোথাও ওটা কোকের শুদ্ধা পেয়ে এসেছে। ভারতজীবনের ইতিহাসের দিকে চাইলে যেখি এই যম্বের সীমাংসা হয় নি কিন্তু উভয় দিক থেকেই অপর সুলের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা হয়েছে এবং সেই চেষ্টার ফলে তাত্ত্বিক স্মৃতিগুলি বৈদিক যামদজ্ঞে শ্রী ও নৃত্তের অধিকার নাই এটি স্বীকার করতে না পারলেও বিবাহামিতে বৈদিক বিবাহকেও তাত্ত্বিক বিবাহের সঙ্গে

সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন। মহা-নির্দোষ-ভয়ে দুই রকম বিবাহের কথাই বলা হয়েছে এবং দুই রকম বিবাহের সম্বানাদির দুই রকম উত্তরাধিকারের কথা বলেছেন।

হয়তো অশ্রাসনিক হবে না; মহাভারতে দেখতে পাই সমস্তা দেখা হিল দ্রৌপদীর বিবাহ-বাসরে। অর্জুন ভিন্ন অস্ত্র চার পাণ্ডবকে বধন দ্রৌপদীর পতিত্বে বরণ করার কথা উঠলো। তখন এর বিধান নাই বলে আপত্তি এলো চারমিক থেকে। ব্যাসদেব বিধান ছিলেন নতির ঘেরি যে প্রচলিত ভূতিতে এই বিধান না থাকলেও অস্ত্র ভূতিতে বিধান হয়েছে এবং সেই বিধান বলেই এই বিবাহ সিদ্ধ হবে। মহাই মেনেও নিলো ব্যাসদেবের সেই বিধান।

মোক্ষা কথা—দ্রী ও শূত্রের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব ভাণ্ডবেরে চলে আসছে ভারত-জীবনের আরম্ভ থেকে। আজ ঝাড়া এই হিন্দু কোড বিলের আওতায় আসছেন তাঁরা। সকলেই ভারত-জীবনের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারা তাঁদের রক্তের মধ্যে বহন করে চলেছেন। সেই ইতিহাস তাঁদের দুগুণাত্মক সাধনার ইতিহাস—এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস দ্রী ও শূত্রের সকল মানবের সঙ্গে সর্ব বিষয়ে সমান অধিকার স্থাপনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস।

আজ যখন সেই হাজার হাজার বৎসরের সংগ্রামের পর ভারতবর্ষ তার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেবার সুযোগ পেয়েছে এমন কোন ভারতবাসী থাকতে পারে যে এই বিরোধিতা করে নিজের জীবনের সমস্ত সাধনাকে বার্ষ্য করার প্রয়াস পাবে! আমাদের দেশে একদল লোক আছে ঝাড়া তাঁদের রক্তের সমর্থনে কথায় কথায় কবি বাক্যের অজ্ঞাতভার ঝোঁপে বেন তাঁরা। জুলে বান মূগে মূগে কবি বাক্যের ভাষণ্য নিয়ে কবিবাক্যের অর্থ নিয়ে কত বিপ্লব কত বিরোধ হয়ে গেছে। আমি নিজে কবিবাক্যের অজ্ঞাতভার বিখাল করি কিন্তু আজ আমাদের সমাজে সেই সব কবি কোথায় ঝাড়া কবি-বাক্যের অর্থ আমাদের বুঝিয়ে যেবেন? আজকের জুলে কলমে কিবা চৌলে সেই শিক্ষা বাবু। কোথায় যার মধ্য দিয়ে কবিবাক্যের অর্থ বুঝবার লোক তৈরী হতে পারে। নেই সে বাবু।

আমাদের, যা আজ নেই তার ঝাড়া মোহাই দিলে কেউ মানবে না সে মোহাইট।

পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ আমাদের সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে যদি সত্য কথা তাদের বলতে পারি তারা বুঝবে সে কথা—পায়ও হবে সে কথা। বুঝ করে গেছেন সে কাজ একদিন কবি বাক্যের অর্থ কথা সাধারণের ভাষায়—সাধারণের বোধগম্য করে দিয়েছিলেন সাধারণের কাছে, তাই ভারতের আগন্তুক হিমাচল গ্রহণ করলো সেই কবিবাক্য—সেই কবিবাক্যের অর্থ কথা কিন্তু অস্ত্র ভাষায়। আমাদের চোখের সামনেও আমরা দেখছি বাংলার যেশবন্ধুকে—দেখেছি কবিগুরুবীরেন্দ্রনাথকে এবং সর্বোপরি মহাত্মা গান্ধীকে সাধারণের ভাষায় সাধারণের মতো আমাদের কবিবাক্যের অর্থ কথা কেমন করে প্রচার করে গেলেন এবং জনসাধারণ তা গ্রহণ করলো অবিচলিত প্রাণে।

যেশবন্ধু বলতেন—“ইতিহাস মরেনা—ইতিহাস তার কথা একদিন কইবেই কটবে।” আজ আমার দেশের সন্তান বৎসরের ইতিহাস তার কথা নিয়ে সমুদ্রে এসে ঝাঁড়োচ্ছে। অজ্ঞাতভার হয়ে স্বীকার কর তাকে—অভিনন্দন করে তাকে ভারতজীবনের জয়গাত্র। জাবার আরম্ভ হোক—পিতৃপুরুষের উপস্তা সার্বক হোক—সকল হোক—করুক হোক।

মহাপ্রভু বলে গেছেন জীবগোবামী নিজে গেছেন ইতিহাস বাদ দিয়ে বেলায় নির্ধর হর না। যের জ্ঞান অজ্ঞাত। লাক্ষা বহন করে চলেছে তার ইতিহাস। ইতিহাসের অমূল্য সম্বন্ধকে দেখে নিয়ে আমাদের অগ্রগতির পথ বেছে নিতে হবে।

কথা শেষ করার পূর্বে সাধারণ স্বরণ করতে বলছি ভারত ইতিহাসের আশ্রয় থেকে আমাদের পিতৃপুরুষগণ একটানা সংগ্রাম করে এসেছেন দ্রী ও শূত্রের সমান অধিকার স্থাপনের জন্যে অপর সকল মানুষের সঙ্গে। আজ সেই ইতিহাস স্বরণ করে হিন্দু কোড বিল-এ স্ত্রীকে যে অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব আছে আমরা সর্গাভ্যাস করে তা স্বীকার করি।

“বাড়িখণ্ডবাসীদের কথা”

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাহিত্তী

আর বছর দশেক যাবত আদিবাসী আন্দোলনের কথা চোখেদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকের মনে নানাপ্রকার ধারণা রয়েছে কিন্তু প্রকৃত আন্দোলনের স্বরূপ অনেকেই জানেন না।

আমি এটি প্রবন্ধের মধ্যে আদিবাসী আন্দোলনের কথা অল্প আলোচনা করবো। সম্পূর্ণ ইতিহাস বলতে গেলে কয়েকটা প্রবন্ধের প্রয়োজন। মন্দিয়ার পট্টক পত্রিকার সেটা জানার আগ্রহ থাকলে ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস লিপিতে হবে। তবে স্মৃতিতে কাড়খণ্ডের পটন কি ভাবে হলো—সে বিষয় কিছু আগেই বলবো।

মৃত্যবশীসহের গবেষণা থেকে জানা যায় যে হিন্দু রাজত্বকালে প্রথম মৃত্য প্রকৃতিরা মহাবাহু ভেলার দিক হ’তে এসে ছোটনাগপুরের ভঙ্গলে বসবাস শুরু করে। ভঙ্গল থেকে মৃত্যন করে গ্রাম বসিছে নিজেদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ঘনিধে বলে। আদিবাসীদের দাবী এই যে তারা এখানকার প্রথম বাসিন্দা; একথা ইতিহাস প্রমাণ করে না। তবে একথা ঠিক যে মৃত্য মৃত্য ওঁরাও এখানে আসে মৃত্যন অধিকাংশ স্থান গভীর ভঙ্গলে পূর্ণ ছিল; আর তারাও সভ্য সমাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে রাখতে চায়। একমুখ বেসব স্থান তারা নির্মাচন করে নিয়েছিল—সে সব ভাষণা অনমানসমুদ্র। এ থেকে তাদের ধারণা যে তারা ই প্রকৃত আদিবাসী। এখানে একথা বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না যে হিন্দু রাজ্য কর্তৃক মৃত্যের নামানুসারে নদীর নাম স্থবর্ণরেণা হয়েছে—এমন কথাও প্রচার আছে। অত্যাচার অনেক বঙ্গেন নদীর বাসির কণার গোনার কথা বেগান পাওয়া যেত—তার থেকে নদীর নাম স্থবর্ণরেণা হয়েছে।

ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা মৃত্য, অম্বর, পাঁওতাল, হো, প্রকৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। একেতকে ‘কোনোবীর’ ভাতিত্বক বলা হয়। সাধারণতঃ চলতি

ভাষায় “কোল” নামেও পরিচিত আছে। এ ছাড়া “ওঁরাও” আছে—এরা ভাবিত ভাতীর। রাঁচি ও পালান্দো ভেলার মৃত্য ও ওঁরাও অধিক সংখ্যার বাস করে। শিকুম ভেলার হো এবং মানকুম ভেলার মৃত্য ও পাঁওতাল বাস করে।

সাধারণতঃ কুবি-ই এদের উপভাষিকা। শিকারেও খুব পাকাপোক্ত। আর ‘নেশা, পান’—সেতো সামাজিক রীতিতে গাড়িয়ে গেছে। এখনও গ্রামে দেখা যায়—সারানিন কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলা ঘেয়ে পুঙ্ক সবাই মিলে সানবাধনা নেশাপানে ঘন্ত থাকে। বংগ্রেস সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষের কথা থেকে নেশাপান বহু বরাহ অল্প আন্দোলন, Prohibition act প্রকৃতি দ্বারা চোটা করছে।

মূলক আদিম ভাতিদের মধ্যেই সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা ঐর এক প্রকার দেখা যায়। কিছুটা সাম্যবাদের প্রভাব দেখা যায়। এদের মধ্যেও তাই। প্রথমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। সামাজিক সম্পত্তি বলে গণ্য হতো। নিজেদের শাসনে রাখবার জন্য নির্ধাচিত নেতা থাকতো। “মৃত্য” ও “মানকী” নামে পরিচিত ছিল। কাড়খণ্ড প্রথম মৃত্যদের বাসস্থান ছিল। পরে ওঁরাওরা সভ্যভাতিদের দ্বারা ভ্যাড়িত হয়ে এখানে এসে আশ্রয় নেয়। কলে কোনেবীর ও ভাবীভ ভাতীর দুই শ্রেণীর মধ্যে এক মিশ্রিত রীতির প্রাথমিক সেক্ষেপে পাই। মৃত্যদের সামাজিক রীতিনীতি, সম্পত্তি ব্যবস্থা, গ্রাম শাসন, ধর্ম প্রকৃতিতে ওঁরাওরা এগে যোগ দেয়। উভয়ে পরস্পরের কাছ থেকে ভাব ও ব্যবহার বিনিময় করে। মৃত্যরা গ্রাম সঙ্ঘের নির্ধাচিত মৃত্য ব্যক্তিকে মানকী বলতো। কিন্তু ওঁরাওদের প্রভাবে ‘রাজা’ বলতে লাগলো। ওঁরাওরা নিজেদের রাবণ রাজার বংশধর বলে নিজেদেরকে পরিচয় দেয়। লোক সংখ্যার দৃষ্টিয় সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্তন আসতে লাগলো। পূর্নতন গণতন্ত্র প্রধায় নির্ধাচিত মৃত্য ও মানকীগণ নিজেদের বংশগত দাবীর কথা জানাশো। দীর্ঘে দীর্ঘে প্রথম রাজাও নির্ধাচিত হলো। তার নাম

রাজা ফরিদুদ্দীন হাফিজ। রাজার গ্রাম প্রধানগণ (মানিকরা) একত্রিত হয়ে একে নির্দোষ করেন। উভা চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমে কথা। রাজার সঙ্গে স্নেহ রাজাচন্দ্রের জন্ম সৈন্তাম্বর, অর্থাৎ সন্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা এলো।’ ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বর্গ হতে লাগলো। আধিবাসী প্রজার বৈজ্ঞানিক নগর দানের পরিবর্তে কাড়খণ্ড নিধনে বাসনাগ্রন্থ (মানিকরা) প্রবর্তন হলো।

কিছুকাল বাবে রাজা বধারীতি হিন্দু গ্রন্থ করলেন। বাইরের সঙ্গে বিবাহ ও অন্তঃস্থ সম্পর্ক স্থাপিত হলো। বর্ধমানী সৈন্ত প্রভৃতির আমদানী হলো। এই সব নতুন আদর্শ ও অঙ্গুষ্ঠীতনের দৃষ্ট অঙ্গ গ্রামের জমিদারীও দিলেন। এরা অত্যাচার ও দুর্ কঠোরে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বব্যবস্থার ব্যতির ক্ষমিমে নিলে। মিঃ ওয়েবস্টার (Mr. Webster) বলেছেন যে এদয় হিন্দুত্বগোষ্ঠী ও অঙ্গুষ্ঠীত ব্যক্তিদের আমদানীর পূর্বে জমিদারী ছিল না এবং খাজনা আদায়ের ব্যবস্থাও ছিল না। অত্যাচারও হত হলো। এদের শাস্তির জীবনে আবার অশান্তির স্রষ্টা হলো। ঘনিষ্ঠাচিত রাজার স্রষ্টা বি ভাদের জীবনকে দুর্ভর করে ফেললো। গণতন্ত্রে বিদ্যমান ও প্রভৃতির শ্রম—আধিবাসীরা এ অত্যাচার শাস্ত্রমানে গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে অনেক গান আছে। একটা নীচে দিলাম :—
“কলোজা ধর্মের সেবা, ভাষায়া আত্মকা পায়া।
বক্সিত খানদানীকা, মরমা কা বনা হারা।
বেগারে কাপতে ফার মূড়া, ভটকতে ফার অতো। হু-হু-
সৈরিক এক হী হালত, কা মূড়া খোর কা ভূইয়।
কর রহি ফার রাজা অরীতি, তেরে হী সেমেই উচা।
লো অব বো গধা আনক, উবারে কোন অব নৈরা।”

বীরে বীরে মূলমান আমলে আয়ত্তা উপস্থিত হয়েছিল। আকবরনামা, ডুঙ্গু-ই-আহকামি প্রভৃতি পাঠে জানা যায় মহামাত্র আকবর বাদশার শাসনকালে প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত এরা স্বাধীন ছিল। ১৫৪৬ খৃঃ অব্দ সর্বপ্রথম মহারাজ মানসিংহ ছোটনাগপুর আক্রমণ

করেন। উভার পর ১৬০৬ তে মহারাজ ধী আক্রমণ করেন ও তখনীবন মহারাজকে মৃত্যু দারয়ে কাড়খণ্ডকে বরদারাজ্যে পবিত্র করেন। মূল রাজত্বকালে ছোটনাগপুর “মুখরা” নামে অভিহিত হয়েছিল। সম্রাট ঐরব্বৎয়ের সময় ছোটনাগপুরের রাজধানী রাঠা থেকে ৪০ মাইল দূরে “তেইস”তে স্থানান্তরিত হয়। পর পর পিটৌরিয়া, চুটরা, পালকোট, তরনো প্রভৃতি স্থানেও রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল। সর্বশেষে রাঠা নগর থেকে ৮১ মাইল দূরে “রাঠা”তে স্থানান্তরিত হয়। এখনও ছোটনাগপুরের মহারাজা এখানেই থাকেন।

হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারকগণ আসতে আরম্ভ করেন ও বীরে বীরে বাহিরের সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকে। ইংরেজ ১৭৭২ সালে প্রথম এত্রিকে আসে। এসময় মণ্ডিয়ারীও মাকে মাকে এদেশ আক্রমণ করতো। ১৭৭২ এ পালামে রাজার নিয়মে ইংরেজ সৈন্ত মারাঠা সৈন্তদের হাত থেকে রাজ্যকে কাচবার জন্ম এম উপস্থিত হয়। ১৭৭২ সালে ছোটনাগপুরের মহারাজা ইংরেজের আত্মগতা স্বীকার করেন।

জমিদার, কন্ট্রোল, রাজকর্ণচাণী প্রভৃতির অত্যাচারে লোক স্রষ্টা হয়ে উঠলো। কানে কানে বিদ্রোহ দেখা দিল। ১৮০৩-৮৪ আমাচ্ বিদ্রোহ ; ১৮১১-১৩ মূড়া ও ওরাও বিদ্রোহ চলে। যলে ১৮১৭ সালে ঠেই ইতিহা কোলানী মহারাজের হাত থেকে রাজ্য নিজ শাসনে আনে রাজ্যকে কর রাজার শ্রমানে দেয়। ১৮২০ সালে আগার প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহী নেতা রাজদের এবং কোচার নাম এক প্রসিদ্ধ ছিল আজও তাবের নামে পৌরাণিক খাবার প্রচার পাওয়া যায়। কতকাল চোঁচার পর এই বিদ্রোহ সমন হয় এবং নেতাদের ধানী হয়। মূড়ার বল—“পাঠানোনে হু শোপোকে মজ্জব খোর ভাবিকানীহকে উপায় খোর শিব হামারী মাত। তখা বংনো কোলে গধে ফায়। অব হামারী জিন্দগী কা মোল রহা ? হু শোপ সব এক জাতি ইয়া। অতো হু শোপ এক গধ মিলে বিনেবীহোকা মুটে উমক জান মো।” এইপ্রকার

মানসিক অবস্থার মধ্যে ১৮৯২ সালের বিদ্রোহ দেখা গেল। এই বিদ্রোহের বর্ণনা Col Dalton দিয়েছেন—
 “In every Pargana, the villages in which the Sads (Hindus) resided were destroyed and all Dikus (foreigners) who fell into the hands of the insurgents were murdered.”
 এ অবস্থার বোঝনা করা হলো যে যদি কোনো দুঃস্থ বন্ধ করে তবে তাদের ভাড়াগা জমি কেবলতঃ করা হবে। তার জবাব Mr. Bradley Bist দিয়েছেন—“The insurgents indignantly replied that they would obey none but the Maharaja alone and would not leave a single foreigner alive in Nagpur. And for a time the insurgents had all their own way.” এদের পেরিল: দুজের কাহিনী, রীতি, বীরদের বীরত্বের কথা কত গল্প ও গানের মধ্যে আকণ্ঠে বেঁচে আছে। একটা গান তুলে দিচ্ছি:—

আ উঠি টংরেজ সেনা, শিটোরিয়া বন্দকতরা
 লড়াই হাওয়া: বে অভে, লড়াই হি অহিগ্রেত থা।
 ঐকিমতা মৈলান বে তো, তীক্ষণ উমকে তার থে।
 হোতা নামক ঘাট বে ভী 'হো' ক্যা হী বীর থে:
 ক্ষেত আরা পরসেনা ঐকিমতা তে ঘাট বে।
 লড়াই নে ভী জয় পতাকা পূব উড়াই রাই থে।

এরপর সিপাহীবিদ্রোহ আসে। স্বাধীনতার পুণ্যরী
 আদির জাতি এ হুযোগে ছাড়শো না—শোবক শ্রেণীকে
 নাকানাহুল করতে এখানে বিদ্রোহ বছর তিনেক
 পর্যন্ত জ্বলিত ছিল। সে দুজের কিছু বিবরণ Mr.
 Bradley Bist এর লেখার পাঠ—“They kept alive
 the revolt with wonderful tenacity. Several
 Skirmishes were fought with varying success,
 the mutineers at times, with their rapid
 irregular movements going unexpected
 victories.” আরেক স্থানে তিনি বলেছেন—“But
 these outnumbered the British troops, who

with difficulty threw up defences and
 escaped total annihilation. For four days
 Col. Dalton and his force held out until at
 last a messenger got through and help came
 from Chaibasa.”

এদিকে যেমন বিদ্রোহ উঠছে আর নিশেধ চলছে
 তেমনই লম্বে লম্বে ‘মিঠা-মাওয়াই’ শাসকবীরের আগমন
 হুক হলো। আহিমজাতির চর, ধর্ম, ধর্ম জাতীয়তার
 গলা টিপে ঘেঁষে ‘বীর বাহী’র মর দ্বারা দেশের বিধকে
 কাঁড়কুঁক দেয়া আরম্ভ হলো। আমরা একে Cultural
 conquest’ বলি। দেখতে দেখতে পরাজে, জনসে
 মিশন গড়ে উঠতে লাগলো। ইংরাজ, আমেরিকান,
 ডাচ, ফরাসি, পর্তুগীজ: যারা এদের ধর্মান্তন কার্য আরম্ভ
 করলেন। শিক্ষা এরা পেলো—জানেন আলোকের
 বিকাশের লম্বে সেনকে পর তাবতে হুক করলো।
 ইংরাজরা আগুন চালা।



বিদ্রোহী নেতা

১৮৫৭-১৮৫৮ সালের মধ্যে বিদ্রোহের পথে নেতৃত্ব
 দিলেন বিদ্রোহী নেতারা। এর জীবনী এবং কাণ্ডাক্ষ

বাংলা তথা ভারতের অগ্রান্ত প্রমুখ বিপ্লবী নেতার সঙ্গে মিল রেখেছিল। এর বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রবন্ধ অল্প সংখ্যায় লেখার ইচ্ছা রটলো। অল্প কথায় লিখতে গেলে বিপ্লবী চরিত্রেও হানী খেতে পারে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আদিবাসীদের বিষয় আন্দোলনের কথা বলেছি। এখন আন্দোলনের আরেকটা দিক বলবো। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই আন্দোলনের সূচ। আমরা এ প্রসঙ্গে একে “ভগত-আন্দোলন” বলি। ভগত অর্থাৎ ভক্ত। এদের মধ্যে অধিকাংশ মূঢ়া এবং ঠগাও। ইংরেজীতে বলতে পারি ‘Protestants’। এরা হিংসার বিদ্যান করে না—অনেকটা বৈষ্ণবধর্মে মত। রাজ-নৈতিক বিশাল বিপ্লবীদের মত। কোনও প্রকারের লোষণও সঙ্গ করবে না! মালগুজারী, বেগারী, চৌকীদারী টাক্স না দেওয়া—এসব বর্ণাশ্রমীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক শোষণের প্রতিবাদে ব্যবহৃত হয়েছে। মহাযুদ্ধের পর মহাশত্রু বন্ধন ভারতব্যাপী অসংখ্য ও অহিংস আন্দোলন নিয়ে এলেন—ছোটনাগপুরের ঠগাও, মূঢ়া, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাস্ত্রীরা তাতে যোগ দেয়। এর মধ্যে ভগত, শ্রেষ্ঠ ঠগাও ও মূঢ়ারা প্রধান। টাক্স না দেবার ফলে কয়েক সহস্র ভগতের জমিবাড়ী নিলাম হয়েছিল। এবার বিহারের কংগ্রেস গবর্নমেন্ট নূন আইন দ্বারা সে সব নিলামী জমি আবার ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৩০, ১৯৩১-৩২, ১৯৩৫-৩৬ সব আন্দোলনে এরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। এমিকের বিভিন্ন জেলা কংগ্রেসের সভা হিপেবে বহু সহস্র ঠগাও, মূঢ়া, সাঁওতাল কংগ্রেসের কাছে নানা লাঞ্ছনা ও উপহাস সঙ্গ করেছে। আতঙ্ক এরা এমিকের কংগ্রেসের অনেক উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছে।

এবার আদিবাসী আন্দোলন তথা স্রাজনও আন্দোলনের বিষয় আলোচনা করবো।

আগেই বলেছি ইংরাজের সৈন্যদের সঙ্গে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও ইউরোপীয় মিশনারীরা এমিকে জবলে জবলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা ধর্ম, বিদ্যা, সভ্যতা ও বহুদলের প্রতি বিতৃষ্ণা—এ সবই শিক্ষা দিচ্ছিল। যে অল্পপাতে ক্রীড়ন

সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল সে অল্পপাতে দেশের সঙ্গে মাতার যোগ ছিন্ন হচ্ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা আশ্রিত পঞ্চাশ বৎ শতাব্দী আন্দোলন এমিকে উত্তেজিত—মিশনারী ও ইংরেজ কথচারীর নেতৃত্বে এই সব ক্রীড়ন আদিবাসীরা সমস্ত আন্দোলনের গাভীরোদ করার কাণ্ডে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। বিদ্রোহী শিক্ষার বিজাতী আক্রোশে এ দেশের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করাই যেন এদের উদ্দেশ্য।

১৯৪৭ সালে যখন প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রী বিহারে গঠিত হলো—তখনই প্রথম প্রথম যি: কম্পাল সিংহের নেতৃত্বেও মিশনারী এবং পান্ডারীদের সমস্ত প্রকার সাহায্য ও মন্ত্রণার আদিবাসী আন্দোলন বহিঃপ্রকাশ পেল। এককথার এর স্বরূপ অনেকটা লীগ আন্দোলনের মত। তাই আমরা দেখতে পাই ভারত স্বাধীনতার স্বাধীন পূর্ণ পঞ্চাশ এমিকে প্রতি কাণ্ডে লীগ ও আদিবাসী মহাপ্রভা পরস্পর সহযোগিতা করেছে। গত দীর্ঘদিনের সময় লীগ লক থেকে কঠোর ও অর্থ সংকট পরিস্থিতি নিয়োজিত হয়েছিল কংগ্রেসনেতাকে দীর্ঘদিনে হারাবার ভয়। একট: বিশদূর “unholy alliance” উভয়ের মধ্যে গঠিত হয়েছিল। ‘৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীর গঠনের পর একে লোকচক্ষুকে হেয় করার ভয় হারায লাভ ও কথচারীরা এই মহাপ্রভাকে সঙ্গপ্রকারে সাহায্য করেছিল। ১৫ অক্টোবর সিংহ দ্বারা বন্দাবলী হংরেজ পান্ডারীর অর্থ পালিত ও বিলাতে শিক্ত। তার চিন্তা কাণ্ড সব কিছু ইংরেজের সঙ্গে মিশ্রিত। রাজনীতি জান তার খুব গভীর নয়; মতে কাণ্ডে তিনি সংরক্ষণশীল (conservative) ও প্রতিক্রিয়াশীল (reactionary)। ‘৩৮ সালে কংগ্রেস শাসনে তখন civil liberty পুরাপুরি; এই সুযোগে অশ্রম যোগ খেতে গেল—পান্ডারী, ইংরেজ কথচারী ও দ্বিগুন মহাবলী প্রতিক্রিয়া-পন্থী আদিবাসী নেতা। Islam in danger’এর ঘোষাই দিয়ে যেমন লীগ-নেতারা বন্দা আন্দোলন মুদ্রণমানের ফেনিয়ে তুলেছিল—তেমনি ‘Adibasi culture in danger under Congress Raj’ এই খুঁচা তুলেছিল

এই ছাড়া। সাক্ষীদান-এর মত এরাও হারী জানালো।
 সাক্ষীদান পুথক প্রদান করে আদিবাসীরা না ম পিকিত
 স্থানে আদিবাসীরা দল্লি বিধি স্বাক্ষর বিশেষ হুংবা দাবী
 করলো। অপর লক্ষ্য লক্ষ্য অধুনা আদিবাসীরা হুং
 পড়ে আছে। তারা এদের প্রভাব থেকে অনেক দূরে
 ছাড়া আশা:র ওর এদেরকেও লক্ষ্য ছাড়াও চোখ ছিল।
 কিন্তু যে চোখ ফলবতী হয় নি। এর অবস্থা হুং বেধে
 ওঠার কংগ্রেস মন্ত্রী সব দেখে। তখন থেকে হুং শেষ না
 হওয়া পর্যন্ত আর আদিবাসী আন্দোলন নেই। তখন এই
 নেতারা হুংর recruitment ও অস্ত্র প্রকারে হুংর
 লাহা:বা তৎপর একটা আর্কিট:ছাড়া ঘটনা বলি। হুংকাণ্ডে
 কিন্তু 'Sappers and Miners' এর হলে ও বিহার আমির
 ন'নে বর আদিবাসীকে এই নেতারা তত্ত্বি করিয়ে
 কমিশন বাবল করে লক্ষ্য হুং এরা লক্ষ্য করেছিলেন।
 হুং শেষ হবার পর আবার 'মহানগর' কার্ধ্য শুরু হলো।
 এরা বলেন যে বিহার কংগ্রেস মন্ত্রী ও বিহার কংগ্রেসের
 নেতাদের উপর এদের বিবাস নেই। কিন্তু দল্লি-চারতীর
 কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর স্রষ্টা আছে। মি: ভদ্রপাল
 সিংহ ব্যতীত আরও কয়েকজন নেতা আছেন। তারা
 অপেক্ষাকৃত বিবেচনাবলি লোক কিন্তু এরা আদিবাস
 পরামর্শ না হওয়ায় স্রষ্টা মি: সিংহের নেতাদের উপর আশ্বাস
 থাকলেও বিচ্ছিন্নতা করতে পারেনি। এরা সাধারণ আদি-
 বাসীরা লক্ষ্যে নাহ ও লক্ষ্য প্রতিরোধ। অপর দূর লক্ষ্যেই
 হুং হুং উঠতে পারে। বর্তমান নেতারা এদের এই
 স্রষ্টাতে লক্ষ্য দিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব তখন রাখতে চান।

কংগ্রেস মন্ত্রী বর্তমানে নিরক্ষর অধুনা
 আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য নানাবিধ
 পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ'নে গ্রামে গিলাস প্রি:ন্টা,
 প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজের ছাত্রদের ছাত্রত্ব
 দান, পুস্তক ইত্যাদি বিতরণ, বিনাব্যয় বসবাসের জন্য
 বিহার মন্ত্রণালয় সহরে ও গ্রামে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা প্রকৃতি
 অনেক জনস্বার্থকর কাজ করেছেন ও করছেন।

তা: ওয়েস্ট প্রদেশের নেতৃত্ব 'আমিন জাতি সেবা লক্ষ্য'
 নামে প্রতিষ্ঠান এই কাজে তার প্রায়।

প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা কংগ্রেস কর্তৃক প্রথম থেকেই
 এই আন্দোলনে প্রদত্ত করা হয় যে মহাত্মা হুং



ডা: হরেন্দ্রনাথ

প্রচেষ্টার প্রয়োজন—লক্ষ্য করেন নাই। আজ পর্যন্ত
 সেরকম কোনও বিশেষ চোখ ছাড়া। আদিবাসী
 নেতারা এটা বলি করেন। এর মধ্যে কিছুটা লক্ষ্য
 আছে। 'স্বাধীনতা' পুথক প্রদান হওয়ার যে লক্ষ্য তাহ
 পেছনে আদিবাসী জনমত কিছু আছে। সাধারণ
 অধুনা বা:—সাধারণ লোক—তাদের মধ্যে উৎসাহ,
 সংগঠন, লক্ষ্য চরিত্র ও নেতাদের প্রতি অধুনা
 বর্তমান। এখনও আদিবাসীরা হুং সিংহ ও
 সিংহের পরম্পরা লক্ষ্যগরিষ্ঠ। ছোটনাগপুরের পাঁচ
 জেলা ও সিংহের পরম্পরা নিয়ে এরা 'স্বাধীনতা' বলে
 থাকে। লোকসংখ্যা বিচার করলে এই ছোট জেলা
 একত্রে আদিবাসী লক্ষ্যগরিষ্ঠ হবে না। তা ছাড়া
 ছোট জেলা বিচার করলেও অধুনা আদিবাসীদের মধ্যে

শারদোৎসব অপরিস্রব

প্রসাধন উপচার



কস্তুরী
চিহ্নহাৰী হুগুটি



উষসী
অচিহ্নিত প্রসাধন-বোতল



অগুৰু
চিহ্নহাৰী হুগুটি

কেমেল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

কলিকতা :: বেঙ্গাল

স্থাপিত

বেঙ্গল ইন্ডিয়া কোং লিঃ

এণ্ড

বিস্মেল প্রপার্টি কোং লিঃ

হেড অফিস : ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকতা

১৬,০০,০০০ টাকার উপরে দাবী মিটান হইয়াছে।

গত সালের ডিসেম্বরে প্রদত্ত সনদ উত্তর

শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ, এম্-এল্-এ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ বি. ই. এন. বোস

সেক্রেটারী

এক বিরাট সংখ্যা মহাসভার সঙ্গে মিলিত না হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশী।

বিহার কংগ্রেস মন্ত্রী ও কংগ্রেস প্রতিনিধির সম্মুখে 'রাড়বও' সমস্যা এক বিরাট সমস্যা। এর অষ্ট সমস্যার উপর এ বিভাগের শান্তি অনেকখানি নির্ভর করে। অসি-বাসীনের মধ্যে যে সংগঠন দৃঢ় চরিত্রতা বর্তমান—একে যদি কোনও ক্রমে অসামান্য নেতৃত্বের হাত থেকে দূরে দিতে

পারা যায় তবে এক বিরাট শক্তির উৎস হবে। পাহারী ও ইংরাজ কথ্যচারীর এতকালের প্রচারণাধারা ফলে এরা কাউকেই বন্ধ বলে গ্রহণ করতে চায় না। কাড়খণ্ডের সাবীকেই এরা এসব পাহারীমত্তার দৃষ্টি বলে মনে করে। এই ক্ষুদ্র এই আন্দোলনের মধ্যে যেমন creative potentiality বর্তমান তেমনি কাকেশের জুপও বলা যেতে পারে। বিহারের কংগ্রেস নেতৃত্বের দামনে এ এক আঁরি পরীক্ষা।

বিদ্র

নকেলু ঘোষ

ডাঃ পাল তাঁর টেবিলের ওপর হুঁকে কাগজপত্র পড়ছিলেন। আরো কয়েকটা কাইলে বাঁধা কাগজ তাঁর ডানদিকে রাখা ছিল। রোষ্ট্রের রোগের বিবরণ নয়। মেডিক্যাল ম্যাসাজিন বা তাঁর মত বড় চাপু ডিসপেনসারীর হিসেব পত্রও নয়। তিনি কাউন্সিলের রিপোর্ট পড়ছিলেন, পড়ছিলেন একটা নতুন বিশেষ খসড়া। শুধু একজন সেবা ডাক্তারই নন তিনি, রাষ্ট্রনৈতিক জগতেও তাঁর প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। গত নির্বাচনে তিনি কাউন্সিলের সমস্ত নিযুক্ত হয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই সেখানে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ডাক্তার অতাব নেই তাঁর। জন্মমাত্র গ্র্যাক্টিস ডাঃ পালের, মত বড় ডিসপেনসারীটা তাঁর সমাসর্বমাই লোকে দিঙ্গদিত্ত করে। কথার বলে যে হাতের লম্বী পায়ে ট্রেনতে নেই, কিন্তু ডাঃ পাল তা করেন। সময়ে হুগিরে উঠতে পারেন না বলে বহু রোষ্ট্রকে তিনি কিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। উপায় কি, হাজার হোক তাঁর মাহুকের শরীর তো, বেশী প্রম তার নয় না। তাছাড়া সামান্যিত চর্চার জন্তও একটুও সময় দরকার।

সহরে শুভাষের প্রাধুর্ভাব হয়েছে, তাদের উপরবে সহরের শান্তি বিপর হয়েছে। তাদের দমনকরমে একটি হুগিত্ত বিল পাল করতে হবে, সেই বিশেষই খসড়াটা আর একবার পড়ছিলেন ডাঃ পাল।

মাথার ওপর বিলিতী ক্যানটা প্রায় নিশ্চেষ্টে ঘুরে যাচ্ছে। পবি-খাঁটা চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছেন ডাঃ পাল। এ্যাস-ট্রেতে জলর দিগারেটা পুতে নিঃশেষ হতে চলছে, তবু শেখিকে ঘোষণা নেই তাঁর। ওপরের ঘরে ছেলেমেয়েরা রেডিয়ো শুনছে, বিশেষী স্বরের দু'একটা টুকরো মাঝে মাঝে থাকে একটু অজস্র করে দেয়। কিন্তু সে দুইজনের জন্ত। আবার তিনি সামনের দিকে হুঁকে পড়েন। বৈশাখ-ভৈতে সময়ের কাঁটাটা টিক্ টিক্ করে রাত দশটার দিকে এগিয়ে যায়।

হঠাৎ বাগোয়ানের ডাক শোনা গেল, "হুজোর—"

ডাঃ পাল মাথা তুললেন। দারোয়ান হুজমান সিং এসে পর্দার পাশে দাঁড়িয়েছে।

"কি ববর হুজমান?"

"একজন মরিজ এসেছে—"

"কে?"

"চিনি না হুজুর। আমি প্রথমে ডাঃগিরে দিয়েছিলাম, लेकिन শুনল না দোকটা, পাগলার মাফিক বারবার বলতে লাগল—তাই—"

"কি বলতে লাগল?" হঠাৎ ভারী বিরক্ত হয়ে উঠলেন ডাঃ পাল। সাথে কি আর ছাত্ত বলা হয়—এতদিন কলকাতাতে থেকেও হুজমান সিংয়ের মাথাই হুঁচি পড়াল না। কেন? আর কিছু বলে দোকটাকে সরাস্তে পাবত না সে?

আত্মা আত্মা করে হুজমান সিং বলল, "জী বলল কি বাড়ীতে ওর বহর হালৎ বড় বতরনা—"

“খতরনাক্ না ছাই”—বিড়বিড় করে আঙুলে দেন ডাঃ পাল, পরে বললেন, “আজ্ঞা হাও, ডেকে নিয়ে এসো”—

হুহুয়ান সিং বেরিয়ে গেল। তার নাল লাগানো জুংগার শব্দটা ধানিকদূর এগিয়ে গিয়েই আবার ফিরে এস। পেছনে একজন লোক।

লোকটি নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে এগিয়ে এস, কান্ডরকণ্ঠে বলল, “একবার আমার বাড়ীতে চলুন ডাক্তারবাবু, শিশুটির চলুন—”

ডাঃ পাল ডাকালেন লোকটির দিকে। দীর্ঘকাল চেহারা তার, লিকলিকে বাশের মত শীর্ণ, মাংসহীন চোখের তারা দুটোর একটা অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক জলজল করছে, পরনে হলিন ও ছিন্নগ্রাফ মূর্তি ও হাফসার্ট, বেগে বয়স কত তা বোঝা যায় না। লোকটিকে দেখে মোটেই খুশি হলেন না ডাঃ পাল, কিন্তু সরাসরি তাকে অগ্রাহ্য করে দিতেও পারলেন না তিনি। লোকটির চেহারা ও ভঙ্গীতে কোথায় যেন একটা মরিচা ও বেপরোয়া ভাব লুকিয়ে আছে। তাছাড়া গুণা মন বিলের বগড়া পড়াতে ব্যস্ত থাকলেও ডাঃ পালের ডাকের ঘনটা কর্তব্য-পরায়ণ হয়ে উঠল।

তিনি প্রশ্ন করলেন, “কি হয়েছে? তোমার বাড়ীতে কার অসুখ?”

লোকটি ক্ষুদ্রকণ্ঠে ইঁপাতে ইঁপাতে বলল, “আজ্ঞে আমার বৌধের—মরমর ডাক্তারবাবু, একবার শিশুটির—”

ডাঃ পাল আবার প্রশ্ন করলেন, “কি হয়েছিল?”

লোকটি মাথা নাড়ল, “আজ্ঞে তা বলতে পারব না, বুঝতেই পারিনি”—

“আর কাউকে দেখিয়েছিলে?”

“আজ্ঞে না।”

ঘড়ির দিকে তাকালেন ডাঃ পাল, বললেন, “বাত হয়ে গেছে—আর কাউকে নিয়ে যাও না কেন?”

লোকটি উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার পলটো কঁপে উঠল, “আজ্ঞে আর কোথায় যাব? আপনিই চলুন ডাক্তারবাবু—এতক্ষণ হুত আমার বৌ মরেই পেল”—

মূর্ছকাল তালেন ডাঃ পাল। মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন, হুহুয়ান সিংয়ের ওপর রাগও জন্মাল তাঁর মনে। একবার ডাবলেন যে সরাসরি না করে যেবেন তিনি কিন্তু পারলেন না, জিহ্বের মধ্যে জড়িয়ে গেল কথাগুলো।

“ডাক্তারবাবু—চলুন—”

ডাঃ পালের শায়ের কাছে হঠাৎ লোকটি হাঁটু পেড়ে বলে পড়ল, কান্ডরকণ্ঠে বলল দুটো কথা। মস্ত বড় চেহােরের মাঝখানে, অত্যন্ত বেমানান লোকটির এই কান্ডর অছন্দনের তরীটা ডাঃ পালকে বিচলিত করে জ্বলল।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি, টেবিলের একপাশে রাখা টেবিলস্কেপ ও ব্যাণ্ড। তুলে নিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, “কোথায় থাকো জুনি?”

“আজ্ঞে কাছেই, লাহুলার রোডের ওদিকে—মাথব গুপ্ত লেনে”—

“তা হলেন চল”—

বাইরে গিয়ে ড্রাইভারকে ডাকলেন তিনি। ঠিকানাটা খুব কাছেই মনে হল, হুত খুব বেগী হয়ে না। কি রোগ কে জানে? কিন্তু লোকটি পথলা দেখে তো?

ডাঃ পাল লোকটির দিকে তাকালেন, বললেন, “রাস্তার বেলায় কল এন্টেনন্স করলে কিন্তু আমাদের বেশী টাকা দিতে হয়—বরিশ টাকা—জানো তো?”

লোকটি মাথা নাড়ল, থরা গলায় হুতকণ্ঠে বলল, “আজ্ঞে জানি”—

গ্যারেজ থেকে গাড়ী বেরিয়ে এস।

ডাঃ পাল লোকটিকে নিয়ে তাতে চড়লেন। গাড়ী ছাড়ল।

রাস্তা মশটার রাস্তা। লোক-চলাচল কমে গেছে, গাড়ীবোঝাও কমে এসেছে। মাঝে মাঝে দু’একটা ভিপোমুখো ট্রাম জং জং করতে করতে ভেড়ের মত চলে যাচ্ছে।

যিনিট দুবেক চলাব পর লোকটি বলল, “এইখানে থামতে হবে ডাক্তারবাবু”—

“ডাইভার”—

গাড়ী পাড়াল।

“কোথায় হে, কোন বাড়ীতে যেতে হবে?” গাড়ী থেকে নামতে নামতে তা: পাল প্রশ্ন করলেন।

লোকটি সন্নিহন বলল, “আজ্ঞে এই গলির ভেতর”—

“বেশ দূরে নয় তো?”

“আজ্ঞে না”—

লড়াইয়ের খোজার মতই যেন চক্কল হয়ে উঠেছে লোকটি। যেন আর তর সইছে না তার, কোনোভাবে বাড়ীতে পৌঁছাতে পারলেই যেন সে বাঁচে।

বাগ আঁধার কোণে হাতে নিতেই লোকটি শব্দবান হয়ে উঠল, “লিঙ্গ, আবার হাতে দিন ভাস্করবারু”—

তা: পাল চারলিক তাকালেন। গলির ভেতরটা ভালো মনে হচ্ছে না। লম্বাঘন, ঘনবিশি পাড়া। লোকটিকে অহুসরণ করলেন তিনি। গলিটা খুব চওড়া নয়। স্রাঁতপেটে, ভিত্ত-ভিত্তে, অন্ধকার-প্রায়। মাঝে একটা প্রাঙ্গণবানি জলছে। নিম্নত, বিবর্ণ, বিবর্ণ তার আলোক-বৃষ্টি। সেই আলোর মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে কেমন যেন অব্যবস্থিত ছায়াবহ মনে হয় লোকটিকে। যেন কোনো অপরাধীর অহুসরণ করছেন তিনি। হু’শানের বাড়ীগুলো আসন্ন মধ্যরাত্রির অপেক্ষায় কেমন যেন ভাবাবিহীন হয়ে উঠেছে। হু’একটার ঘরবাড়ি জানালা খোলা দেখা যায়, তা দিয়ে মাঝে মাঝে তেতরবার বানিআলের মুখ দেখা যায়। তা ছাড়া আর যাহা বড় বেশি দেখা যায় না। কিন্তু কোথায় লোকটার বাড়ী?

“আর কতদূর হে?” তা: পাল প্রশ্ন করলেন।

লোকটি ক্ষতকণ্ঠে বলল, “এই একটু আগেই ভাস্কর বারু—এই কয়েক পা আগে”—

তা: পাল আবার নিশ্চয় অহুসরণ করলেন লোকটিকে। লোকটি ভানসিকে ঘোড় ফিরল। অন্ধকার। গলিটা একটু সংকীর্ণ মনে হচ্ছে। এখানে ওখানে ভরকারীর ঘোসা, ছাই, ছেঁড়া কাগজ, ময়লা ভাস্করা।

একটা দিগ্ধে দুর্গন্ধ। ভারী বাতাস। কিছুদূরে আর একটা গাধাপোরা। যেন ভৌতিক অগস্তের নিঃশব্দ গ্রহণী। আর কতদূর?

আবার বা দিগ্ধে ঘোড় ফিরল লোকটি। তা: পাল অহুসরণ করলেন! এবার তার শরীর গম্ব হয়ে উঠল। কি ভেবেছে লোকটা?

“ভবে—”

“আজ্ঞে—”

“বলি তোমার বাড়ীটা কি খুঁজে পাচ্ছনা নাকি?”

“আজ্ঞে এই এল বলে—”

ভাস্করাড়ি চলতে আরম্ভ করল লোকটি। তা: পালকেও স্থান ভালো পেছু নিতে হল। আবার তাইনে। গলি এবার আরো সংকীর্ণ হল। কাছাকাছি আলো নেই। এখানে হু’শানে ছোট ছোট বাড়ীর মাঝে কাঠ আর মাটির বাড়ী, তাতে খোলায় ছায়া। ভাগ্যপূর্ণা, ভিত্তে দুর্গন্ধটা এবার ভয়ানক তীব্র মনে হয়। পারের তলা আর হু’শানের শেঁখাল থেকে যেন একটা ঠাণ্ডা হ্রোত এসে শরীর ভেদ করে বয়ে যাচ্ছে। এগনকার বাড়ীগুলোতেও অন্ধকার। কেবল হু’একটা দৃষ্টির জুতো তৈরীর কারখানাতে তখনো আলো জলছে। পারের নীচে কি যেন নরম জিনিষ টেকল! তা: পাল পাড়ালেন, কীপ আলোতে দেখলেন পারের দিকে। একটা মরা ইঁদুর। এদিকে ওদিকে পড়ে আছে ভাঁড়, দাদপাতার টোলা, কাগজে ঘোড়া শিশুর ময়লা আর নানারকমের নোংরা জিনিষ। বিবর্ণ, বিবাক্ত বাতাস শুষ্ক হয়ে আছে এখানে। নরক, একটা শাফাৎ নরক। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে লোকটা। তা: পাল কেণে উঠলেন, অস্বস্তিতে তরে উঠল তাঁর মন। লম্বা একটা ছায়াহুঁহির মত এগিয়ে যাচ্ছে লোকটা, যেন তা: পালকে সন্মোহিত করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে। দূর। তা: পাল মনে মনে একটু হাসল। কিন্তু ব্যাপার কি? লোকটার মংলব কি? পাড়াটা অবিধের মনে হচ্ছে না, বড়ী এলাকা দেখা যাচ্ছে। এদিকেই থাকে নাকি লোকটা?

“এদিকে ভাস্কর বারু”—

লোকটি ঠাডাল। ভা: পাল খামসেন। ডানদিকে একটা ত্রিচ চল্লি হাত লগা অছ গলি। তারই মূখে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

“আহ্ন”—লোকটির স্বরে চকলতা, ভেতরে গিয়ে জীর অবস্থা দেখার কল্প সে বেন একেবারে অশৈথব্য হয়ে পড়েছে।

ডানদিকে হুকেই বাঁহাতি খোলায় ঘরটা। মাটি বিয়ে বনানো ইটের সিঁড়িটার ওপর বিয়ে উঠে ব্যাংক্যার এক পানে ঠাডাল। ভা: পাল একবার ধমকে ঠাডালেন। এই বাড়ী! লোকটা এত রাতে এইখানে বিয়ে আসবে জানলে তিনি মোটেই আসতেন না। কিন্তু এখন? ভা: পাল ব্যাংক্যার উঠলেন। না, তাঁর ভাস্করী মন রোগীকে না দেখে কেবল যেতে দেখে না এখন। তাছাড়া ভারী কৌতূহল বোধ হচ্ছে, খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে চারদিক। সেগই বাকুনা শেষ পর্যন্ত—

“উঃ, ভারী অন্ধকার তো”—বললেন ভা: পাল।

লোকটি শুককণ্ঠে বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ,—অন্ধকার—ইলেকট্রিক থাকলে খুবই ভালো হত। দিনে রাতে চান স্থিতির আলো এখানে এমনি আঁধার দেখে ভেতরে আসে না—আর যখন কাঁচা কয়লার ঘোঁরা হয় ভাস্কর্য্যবাবু তখন মনে হয় বেন অন্ধকারে কালো হুয়াসা”—

“চল চল—ভেতরে চল”—অসহিষ্ণু হয়ে বললেন ভা: পাল।

“আজ্ঞে আহ্ন।”—

সামনের ঘরঘাটা ঠেলতেই খুলে গেল, ভেতরে গেল লোকটি। ভা: পালও তার ভেতরে গেলেন।

ভা: পাল ভাকালেন চারদিকে। একটা মাত্র ঘর। মাটির গ্রসেপ-বুদ্ধি বাঁশের বেলাল। এক কোণে ডোলা উয়ন, হাড়িহুড়ি। একটা টিনের তাঁবা বাক্স, হাঁকো, হেঁড়া কাগজ—সব কিছু প্রথমে পরিষ্কার দেখতে পান না ভা: পাল। কেমন বেন কাপ্লা মনে হয় সব কিছু। না, আলো আছে। ডানদিকে দ্বি:মিট করে জ্বলছে একটা কেগোসিনের ডিবে। আর তারি পানে মাটির ঘেঁষের

ওপর, একটা শতবস্ত্র ও হেঁড়া কাঁথা বিছিয়ে একজন শুয়ে আছে। ভারী নোঁরা বিড়ানাটা। আর তার ওপর শুয়ে আছে একজন ব্রীলোক, তার গায়ের ওপর একটা পাখা ঢাকার।

লোকটি শুককণ্ঠে বলল, “ঐ আমার বৌ ভাস্কর্য্যবাবু”—

“হুঁ”—ভা: পাল ঠাড়িয়ে ঠাড়িয়ে রোগিনীকে দেখতে লাগলেন।

ব্রী লোকটির বয়সও অল্পমান করা যায় না। ত্রিশও হতে পারে, চল্লিশও অসম্ভব নয়। কক্ষ চুলগুলো ঝেঁপে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। মুখটা পাত্ৰ, শীর্ষ সোপ মুটো নিম্নীলিত। দেখতে ভালো কি মন্দ তা এককথায় কিছুই বলা যায় না।

লোকটির গলা শোনা গেল, “বুঝলেন ভাস্কর্য্যবাবু—খার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিলাম আমি। আজ্ঞে হ্যাঁ ঐ খার্ড ক্লাসে উঠেই জীবনটা একেবারে খার্ড ক্লাস হয়ে গেল। বকাটে ছোঁচাদের মলে ভিড়ে, ইংকালটি নষ্ট করে যখন হাঁস হল তখন লোহালকড়ের কারখানা ছাড়া আর গতি হল না”—

কি বলছে লোকটা? ভা: পাল রোগিনীর সিকে এগিয়ে গেলেন, ভাড়াভাড়ি বেখে বাড়ী ফিরতে পারলে বাঁচেন তিনি। খলচাটা ঠিক করে কতকগুলো বই খেঁটে তার অংশকে আরো দৃষ্টিভর্য্য বাড়ী করবেন তিনি। এই বিল পাগ করাতে পারলে তিনি সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য বলে পরিগণিত হবেন।

রোগিনীর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন ভা: পাল, তাঁর গুটি মেলে ভাকালেন তার দিকে। কোটরাগত চোখ, ভাড়া পাল, শ্রেড়িনীর মত লিঙ্গনিকে হাত আর হাড়ের ওপর পাখা একটা চামড়ার আবরণ। দেখে মনটা বিস্ময় হয়ে ওঠে, অস্বস্তিকর একটা অস্বকৃতি শিরশির করে হয়ে যায় তার দেহের ভেতর।

রোগিনীর ডান হাতটা তুলে নিলেন ভা: পাল। কীপ অতি দুর্বল তার নাড়ির স্পন্দন। না, অর নেই। বুকের ওপর টেবিলকোণটা বেখে পরীক্ষা করলেন ভা: পাল। না, সেমার লেশমাত্র অস্তির নেই। চোখের পাতাটা

উলট দেখলেন তিনি। রক্তশূন্যতা আছে। রোগিণী
একটুও নড়ছে না বোধহয় সে ঘুমিয়ে আছে কিংবা
দুর্লভতাবশতঃ হয়ত আশ্রয়ের মত পড়ে আছে। পেটেটা
টিপে দেখলেন তিনি। পেটে কিছুই নেই মনে হচ্ছে।

ভাঃ পাল তাকালেন লোকটির দিকে। লোকটি
তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

তিনি প্রশ্ন করলেন, “তোমার বৌয়ের কি আগে
জ্বর হত?”

লোকটি মাথা নাড়ল, “আজ্ঞে না।

“কানি ছিল?”

“আজ্ঞে না?”

“পেটের অবস্থা ভালো?”

“হ্যাঁ।”

তাগলে কি? জ্বরজ্বারি নয়, পেটের গোলমাল নয়,
করোণাও নয়, তাহলে কি? ব্যাধির একমাত্র লক্ষণ
রক্তশূন্যতা আর দুর্লভতা। যেহেতু লোকটা এত দুর্লভ যে
দুর্লভতার কলেই হতুত সে হার্টফেল করবে। কোনো
কৌতুক বা বৌনব্যাদি নেই তো?

“আর কোনো রোগ আছে?”

“আজ্ঞে না।”

“হেবে বল—অত তাড়াতাড়ি হ্যাঁ না করো না।”

“আজ্ঞে ঠিকই বলছি—”

“হঁ”—একটু ভাবলেন ভাঃ পাল, পরে বললেন, আচ্ছা,
আমি একটা প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছি—এনে এখুনি
খাটয়ে দাও। কাল সকালে কাউকে দিয়ে রক্ত-পরীক্ষা
করিয়ে নিতে হবে।”

লোকটি বৃহৎ হেসে প্রশ্ন করল, “খাশা আছে তো
ডাক্তারবাবু?”

“বলা যায় না”—

“বলা যায় না, না?” লোকটির সারাযুগে নিঃশব্দ হাসি
ছড়িয়ে পড়ল। তা দেখে অবাক হলেন ভাঃ পাল।
লোকটা পাগল নাকি?

ব্যাপ খেতে কাগরের প্যাড বের করে খবর করে
গোটা সিনেক ওখের নাম লিখে গিলেন তিনি।

“এগুলো পাওয়াবে, কাল ব্রাড রিপোর্ট দেখে
ইনসেকশন দেখ”—

“আজ্ঞে—

ভাঃ পাল উঠে পাড়ালেন।

লোকটি হুঁপা এগিয়ে এল কাছে, প্রশ্ন করল, “রোগটা
কি ডাক্তারবাবু?”

“কিছুই বলা যায় না আজ।”

“কিন্তু আমি বলতে পারি ডাক্তারবাবু—

ভাঃ পাল অবজার বৃহৎ হাসি হাসলেন, “বটে! তা
কি নির্ণয় করেছ তুমি।”

লোকটি হুলে উঠল, অস্বাভাবিক দুটো চোখের দৃষ্টি
ডাক্তারের ওপর নিবদ্ধ করে সে বলল, “তার আগে
আমার বিয়ের একটা বলে নিই”—

“বল”—

“একটা কাগজের নিলে কাজ করতাম আমি, কিন্তু বা
পেতাম তাতে পোষাক না। শুধু আমি নয়, বেশির ভাগ
লোকেরই ঐ একই কথা। ফলে একদিন ষ্ট্রাইক হল—

“এলব কি বলছ আমার—ওদম্ব কথা শুনে আমার
লাভ কি?” ভাঃ পাল বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

লোকটি কর্কশকণ্ঠে বলল, “দরকার আছে ডাক্তারবাবু
—জ্বন। ষ্ট্রাইকটাতে ক্ষিতলায় আমরা—কিন্তু
কিছুদিন পরেই হঠাৎ আমার চাকরী গেল—একেবারে
আচমকা”—

“এলব শোনার মত সময় নেই আমার, বুলে?”
গলার হ্রস্ব চড়িয়ে বললেন ভাঃ পাল।

লোকটি মাথা নাড়ল, “বুকেছি। তবু একটু বলবই
ডাক্তারবাবু। আমার এই বোঝা ঘর আলো করে
ধাক্ত একটা ছুঁবছরের ছেলে, সেটা কিছুদিন বাবেই
মারা গেল ডাক্তারবাবু—কেন জানেন।”

ভাঃ পাল টেঁচিয়ে উঠলেন, “তুমি খাবো তো হে
বাপু—খাবো। এই নাও প্রেসক্রিপশন, যা বলেছি
তাই কহো, বাবু। ওদম্ব কথার ধার ধারিনা আমি।”

প্রেসক্রিপশনটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি কিন্তু লোকটি
তা নিল না।

মুহু হৈসে সে বলল, “ওনিযে কি করব ডাক্তারবাবু—
সেই যে চাকরী গেছে তারপরে তো আর চাকরী
কোটেনি আমার”—

“মানে?”

“মানে পরমা নেই”—

ডাঃ পাল রাগে কঁপে উঠলেন, “মানে? আমার
সঙ্গে ইয়ারকি করছ তুমি? ইয়ারকি করছ এই এতরাস্তে
ডেকে এনে? কই, যাও আমার ভিজিট—আমি চলে বাই”—

লোকটির হুঁচোখে অপ্রতীক্ষিতর ছায়া, আগের মত
আবার সে লহাস্তে বলল, “ভিজিট বিই কি করে? আপে
বলুন আমার বৌয়ের কি হয়েছে?”

“কাল বলব—ব্রাড-রিপোর্ট দেবে”—

“কাল! আর পারলেন না! আশ্চর্য! আমি
ভাবলাম যে আপনার মত নামজাদা ডাক্তার রোগটা
নিশ্চয়ই ধরতে পারবেন। তাছাড়া আপনি কাউন্সিলের
মেম্বর, ভেবেছিলাম সেশের লোকের হাড়ির খবরের সঙ্গে
হয়ত নাড়ির খবরটাও রাখবেন আপনি।”

ডাঃ পাল দাঁতে দাঁত চেপে রাগ দমন করলেন,
কড়া গলায় প্রহর করলেন, “শেষবার বলছি—আমার
ভিজিট দেবে?”—

লোকটির হুঁচোখের তারার যেন আঙন ঝলসাল,
বলল, “না।”

পাতের ধাপে বাটি ঝাঁপিয়ে তুলে ডাঃ পাল দরজার
দিকে এগোলেন। কিন্তু লোকটি হঠাৎ পিছিয়ে দরজা
আগলে দাঁড়াল। ধমক দাঁড়ালেন ডাঃ পাল। লোকটির
চোখে যেন পিশাচের ডায়মন্ড নুটি। ঘরের ভেতর
গ্রেডলোকের নিশ্চিন্ততা হঠাৎ জমাট হয়ে এল। বাইরের
নির্জন সংকীর্ণ, ভাঁজসেতে ও অন্ধকার গলিটার কোথাও
একটা ফুফুর মড়াকাতা কেঁদে উঠল। ডাঃ পাল নিউরে
উঠলেন। লোকটা যে তাঁকে মারবে মনে হচ্ছে! ওও,
নির্দায ওও! রোগী দেখানোর ছল করে আমাকে ডেকে
নিযে এগেছে, এবার খুন করে বোধ হয় লুট করতে চায়।

লোকটি হঠাৎ কবা বলল, গলার স্বর তার ভারী
বোলায়েব, ভারী বিষয়।

সে বলল, “ভিজিটের টাকা নেই ডাক্তারবাবু—একটা
পরমাও নেই, কিন্তু আমার বৌয়ের কি অসুখ তা জানবেন?”

রাগ এবং ভয়ের মধ্যেও কৌতূহল হল ডাঃ পালের,
বিস্মৃতিনি একটাও কথা বললেন না, আদমদ্বারনে লাগলো।

লোকটি আগের মতই মুহু ও বিযোগাত্ত কষ্টে বলল,
“চাকরী গেছে বহরিন হল, একবেলাও বহরিন পেয়েছে
আমার বৌ কিন্তু এই গত বাগোনি বাবু অবস্থা আমার
এত খারাপ ডাক্তারবাবু যে একমাত্র চলেও নেই
বাড়ীতে। আটদিন ধরে একেবারে না খেয়ে খাচ্ছে
আমার বৌ। কোথেকে সে কি করতে তা আমি জানি
না—আমার একবেলা করে টিকিই জুটে যেত, কিন্তু
তাকে আমি পেতে বেগিনি একদিনও। আজো হ্যা,
এই আটদিন ধরে মল ছাড়া সে কিছুই খায়নি। তাও
কবে মেনেছি জানেন? আর দুপুরে—বহন সে আর
বিছানা থেকে উঠতে পারছে না”—

দরজার পাশে হেলান দিয়ে হঠাৎ খেন গেল লোকটি,
গলাটা তার শুকিয়ে এশেছে। হুটো চোখের তারার
জুঁ আলেয়ার মত একটা অনর্থের দীপ্তি জলছে আর
নিহুচ্ছে, নিহুচ্ছে আর মলছে।

রোগীটির দিকে মুহূর্তের ভঙ্গ একবার তাকিয়ে
ডাঃ পাল লোকটির গায়ে ঘব থেকে বেরিয়ে গেলেন।
তার প্রেসক্রিপশন তাঁর হাতেই রয়ে গেল। বাতুকগে,
এখন কোনোমতে এই নরক থেকে জীবন্ত ফিরে গেলেই
যথেষ্ট। ভিজিট চুলোয় দাক, টাকার অভাব নেই তাঁর।
ওও, একটা সামান্যিক ওওর হাতে আর পড়েছিলেন
তিনি। সহরের শান্তি ভল করে এরা, যদের উপহ্রবে নিরীহ
লোকেরা আর বিষয়। না: বরচিত্ত ওও-মমত বিলটিকে
কাল পাশ করাতেরই হবে—এদের চিই করাতেরই হবে।

মাত্র কয়েকশা এগোতেই ডাঃ পাল সেই লোকটির
গলা শুনতে পেলেন, তারি উচ্চৈঃ কথাগুলো বলছে
লোকটি।

বিস্ময়াক্ত হাসির সঙ্গে লোকটির কথা হেসে এল,
“বাবু—রক্তের রিপোর্ট নিয়ে কাল নিশ্চয়ই বাব
ডাক্তারবাবু”—

ভগবানের নাম

শ্রীকৃষ্ণ রজন মল্লিক

বড় ভমিসার, বড়ই বিলাসী, ধনী ভমলার বরে
শকালে পিকালে তবু দুটবার হিন্দাম দিন করে।
সোনার মতন বরণ তাহার, স্নিগ্ধ গুহ্র বেশ,
দেখে মনে হয় কোথাও নাহিক যেন মলিগ্র লেপ।
মহলা বসন পরিচিত লোক হাতেতে পার না আছে
দেব অননে চৈকায় না মাথা ধুগা মাটি লাগে পাছে।

(২)

চক্ষে পড়িল বৈকালে হবে করিতেছে বিভ্রাম
খতি দিয়া কালো মরলার টবে কে লিখেছে হরিনাম।
জীবা বাক্য সব হরক, বালক মেঘরের লেখা বটে,
কি নাম অবোধ কোথায় লিখেছে—লিখেছে নিষ্কণ্টে।
কিশোর সে তাই লম্বোচ নাই খুঁটেরা লসিমুখে—
কৌতুহল যদি হেলায় রেখেছে গলিত গবের বৃকে।

(৩)

ভাবে ভমিসার যে নামে মনেও মরলা থাকে না আর।
চপার মলয় পর্কত হয় স্রুতির ভাটার।

ভিতর বাতির নির্খল করে অন্তরটিকে করে ততি,
ভুবনকে করে পুত পবিত্র যে নামে মহক কতি।
নাম নারায়ণ, বেবায় ধাতুন, মঙ্গলময় নাম—
মরলার টবে আদি কি কমিবে লহণা তাহার নাম।

(৪)

শবের উপর বসি কাপালিক রূপে নাম মনোমুখে,
আবর্জনার অঘোর গহী ওই নাম লয় মুখে।
নাম মহিমা কি কমাতে পারা কালের শক্তি আছে?
সেই ত সৌম্যওল বেধা নাম মিনমনি রাখে।
যে নাম প্রভাবে সব কলক খোঁজায় কলচিনী।
তাহার কণ্ঠ যে মধ্যায়া তাহা অবোধ হলেও চিনি।

(৫)

অনিমিষ জ্বাধি জ্বাধর গুণিবে হেরিতেছে ভমিসার,
বড় দেখে, দেখে ধ্যানের দ্বীপি বিরাগিছে মাঝে তার।
বলে যে লিখুক যেখানে লিখুক প্রগতি আনাই তাকে,
হোক সে বেথর মধুখানার কিছু সে ধরণ রাখে।
শরীর তাহার পুলাকে শিহরে, কোনো ঝিা নাই মনে
মরলার টবে নামে বারবার নামের পলাসনে।

কবিরাজ গোস্বামী*

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

বৈকবের হাস নহি মাগাশনে বন্ধ রহি
ভক্ত নই করি না ভজন,
তব গ্রন্থ বৃকে ধরি' তবু মিথ্যা বিভাবণী
ভাব ঘোরের করেছি যাপন।
তবু উহা ভালখাসি অক্ষর পাথারে ভাসি,
তার মাঝে গন্তরে অক্ষর।
কোন হৃদয়ের স্বতি অই অক্ষর গলে ভিত্তি
উদাসীন করে এ অন্তর!
সে স্বতি প্রত্যেক রোকে বিধে এ মনের চোখে
জানাওন শলাকার মত,

কমল কোরক অধে গুণের লগ্নে লগ্নে
দাশে বেন শতযু ভ্রত।
ছিন্ন করে সব ভোর ভাপিত অন্তরে মোর
অবুজের তুলিকা কুনা;
ইহার পরশে মন 'রচি' নব কৃষ্ণাবন
মুটে গড়ে তাহার পুলায়।
হুজাকারে তব বাণী মলয় কাটখানি
কটিন বলিয়া যানি তার।
এ পাষণ চিত্তে বড় যদি তাহ অবিরত
সৌরভে জীবন ভরি যায়।



সব চাইকে দেশের দিনে সকলের অগ্র
 হাশিয়ে উঠে কাজে কিছু বেতারের আদেশ।
 সকল বেতারের জেষ্ঠ্য বেতার—শ্রদ্ধা করে।
 প্রতিক্রিয়া পাইলো, লক্ষ্যে রাখের উচিত।
 সত্যকে সত্যিই, শিখরে চড়া, সত্যকে
 সত্যের চিত্রিত্বের, নিজেকে সত্যের এবং সত্যের
 সত্যকেই ভালবাসে—যার শিরশিখরে সত্য
 সত্যের উদ্দেশ্যে বিশ্বাসের বীজপত্র।

বঙ্গদেশ প্রদেশ, বঙ্গদেশের আশ্রয়, ১৯৫৭
 প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭



হিন্দুস্থান

কো-অপারেশন ইন্ডিয়া
 সো-আই-টি, সি-সি-টি
 ১৯৫৭, বিজয়ন এডিশন, কলিকতা

উত্তর বঙ্গ সফর

কমলা দাশগুপ্ত

কদিন থেকেই দাদা তপস্বি গিচ্ছেন উত্তর বাংলা টুরে ঘাবাঘ ভ্রম। নিভেয়াও যাচ্ছেন। রাজনৈতিক সফর জনসেই মনে হয়, শত শত লোক হৈ হৈ করে ঠেপন থেকে জয়ধ্বনি করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে আবার নামটাও ছুড়ে দিচ্ছে, ফুলের মালায় রাশি শুশুকৃত হয়ে উঠেছে এবং থেকে থেকে কটো তুলছে। মনে হয়, এর চেয়ে বদন ভুললে গালিয়ে বাওড়া ভাল, তার উপরে আছে বক্তৃতা। নাইকিএর সামনে ঠাকুরি বড় দলার হাতার হাতার পোক্তের কাছে বক্তৃতা বেগা সেও এক অদ্বুত ব্যাপার। বেন কত বড় বড় নেতা বহু উচ্চ থেকে বক্তৃতা করছেন, জীবনের সার কথা হত তাঁরা সবাই তা বুকে নিয়েছেন, সর্শনের চরম জ্ঞান, রাজনৈতিক অগ্রগতির Injection সবই থাকে বেন বক্তাদের সকলেরই নখ স্পর্শ। বাসীতান্তে সবাই বেন স্বরেন ব্যানার্জী, গোখলে, জহরলাল। জনতাকে বেন সকলেই জাসিয়ে নিয়ে চলতে পারেন বক্তৃতার বিপুল বেগে।

মনের মধ্যে এই সব ভোলপাড় করে উঠেছে, কাছেই রাজী হাচ্ছি না টুরে যেতে। নারাজ বেধে মোক্ষম অস্ত্র হেনে দাদা বংশেন "অপবয়ে কেউ যেতে চায় না।" রাজনৈতিক জীবনে, অসবয়ে আয়াকে প্রয়োজন ছিল, অথচ কাছে আশিনি, একথা অল্পভব করা অসম্ভব। কংগ্রেসের বসি বিন্দুযাত্রও কাছে আসি সেইহু আশি করে যাবো। কাছেই শেব পর্বাঙ্ক রাজী হয়ে গেলান। তবুও সর্ব দিলাম, বক্তৃতা করতে পারবো না, বরং ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা করবো। দাদা রাজী হয়ে চলে গেলেন। আরেকজন দাদা সব শুনে অবিবাসের হাসি হেসে বললেন, বাইরে গিয়ে বক্তৃতা করতে হবে না? শেব অবধি বক্তৃতার মন্ত্র তৈরী থাকাই ভাল। তবুও প্রস্তুত না হয়েই যাত্রা করলাম।

কুচবিহার ঠেপনে ঠেপ ধামলো। দা চেবেছিলান ঠিক তাই। সেই জয়ধ্বনি, ফুলের মালা আর কটো।

কুক কুচকে, ঠাকুরিখে এগোচ্ছি, আর ওরা বা করতে সবাই নীরবে যেনে চলছি। জয়ধ্বনির সঙ্গে নামটাও যিচ্ছে। দাদা এইবার বারন করলেন। কেবা কার কথা শোনে। বত কাষপায় গেছি এই একই প্রহসন ঘটে চলেছে।

কুচবিহারে রাধা এবং প্রহসনের মধ্যে কংগ্রেস নিয়ে নানা পণ্ডগোল ছিল। সেই পণ্ডগোল মিটিয়ে কংগ্রেসকে চালু করা ছিল এখানে আবার প্রধান উদ্দেশ্য, বাংলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি গেঁথে দিয়ে যেতে এসেছিলেন দাদা। যে বাড়ীতে উঠেছি তাঁরা যে কুচবিহারের শুধু বিশিষ্ট ঘর তাই নয়, তাঁরা রাজনৈতিক কর্মীও। দুইবে বেলার ভনছি এই ঘরে কর্মীর দল জুটে দায়ার সঙ্গে গুরুতর সমস্যা ও তার আলোচনা করছেন। কিন্তু সেই কোলাহল ছাড়িয়ে বহুধর থেকে বেন একটা চোপা বা মাইকের আওরাম ভেসে আসছে। আওরাম হত কাছে আসছে শুনিছি, আশাখী কাল বিকালে কোন্ কোন্ নেতা কোথায় কখন বক্তৃতা করবেন। হঠাৎ মাইকের ঘোষণা নিকটবর্তী হতেই নিজেই নাম বক্তৃতাকারীদের মধ্যে শুনে একেবারে লাফিয়ে উঠে বসলান। ইচ্ছে হোল মাইকটাকে আছড়ে ছেঁকে দিয়ে আসি। ইচ্ছা করলো দাদাকে পারের জালা মিটিয়ে কথা শুনিবে আসি। আবার মনে হোল তাতেই বা-আর এখন কী হবে? মাইক এতক্ষণ ঘরে সহরমথ বা ঘোষণা করেছে লোকে তা শুনেছেই, সেই শোনাকে তো আর রোধ করা যাবে না। মনের কাল মনেই রইল।

রাত্রে মহিলাদের ঘরোয়া বৈঠক। মনে বলে মহিলা এলেন কী উল্লাহ, দীপ্তিতরা তাদের মুখ, কী বিশ্বাস এবং আশা নিয়ে এসেছেন তাঁরা, ঘরোয়া আলোচনায় আবার কিছু আদ্য আঙে, এতে উত্তেজনা নেই, কিন্তু কাম আছে, আলোচনার পরে প্রতিশ্রুতি আছে, কাছে পরিণত করবার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু দায়ার সমস্যার বক্তৃতায় আছে বক্তার গগনস্পর্শী কথায় ধোঁয়া, জোড়ার আছে ঔৎসুক্য, উত্তেজনা, লগা সমালোচনার বহর, অথচ দায়িত্ব নিয়ে কাম করার কষ্টই তাগের না করলেও চলে।

ঘরোয়া বৈঠক এখন শেব হোল শুখনও কিন্তু তাঁদের

আন্তরিক ক্রীতি হাসির উৎস ধারাধ ঠারা ছড়িয়ে রেখে গেলেন। এ ভিনিথ তো বক্তৃতার মকে নেই, এটুই আছে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার, আছে স্বয়ং জ্ঞানের অংশ গ্রহণে, আছে লামনা লামনি পরিচয়। সূচবিহার বহু আশ্রয়প্রার্থী এসেছেন পূর্ব পাকিস্থান থেকে। তাঁদের অবস্থা বর্ণনা করা শক্ত। নীচু জমির উপরে ছোট ছোট কুটার তৈরী করে নিয়েছেন। অতি সাময়িক ব্যবস্থা। বহা প্রাণ আগুত, বর্ষার জলে মাঠ এখন ভুবে বাবে তখন এই সব নীচু ভিত্তি ছাপিয়ে যত্নের মধ্যে জল উঠবে। কী ভাবে যে এঁরা তখন দিন কাটাবেন সে কথা ভাবাও যায় না। এঁদের দুঃবস্থা কী করে যে লাঘব করা যায় আশ্রয়প্রার্থীদের দেখলেই সে কথা মনটাকে ভোলশাড় করে তোলে। অথচ করতে পারি না কিছুই, হাতখানা শুধু হাতের মুঠোর দর্য থাকে।

তারপর দিন বিকালে সেই জনসভা সেই শত শত লোক, মাইক, বক্তৃতা মক, ফুলের মালা আর বস্ত্রবাস জ্ঞাপন। জীবনটাতে স্বখশান্তি যলোবেন কোথাও কিছু নেই। সভার কাজ শেষ হোল। কোথায় কোথায় ধোত হবে, এখানকার কাজের জন্ত কী কী করার প্রয়োজন সব জুড়ের বেগে সারা হতে লাগলো। সময় নেই বেশী, এরপরে বিনহাটা বেতে হবে।

পরদিন বিনহাটা। এখান থেকে বক্তৃতামক ছেড়ে সন্ধ্যা ৬টার রঙনা হতে হবে আলিপুর ডুয়ার্সের দিকে। হঠাৎ মাইক গেল বিগড়ে। বক্তৃতা ফেল করল সঙ্গে সঙ্গে। হায়রে মাইক! ২০২৪ বছর আগে কোথায় ছিলে তুমি? এখন তুমি না থাকলে অকরী কাজ বন্ধ করেও তোমার সেরামতের জন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কাজেই যেখানে সন্ধ্যা ৬টার রঙনা হবো সেখানে হয়ে গেল রাত ৮টা।

প্রাইভেট বাণ কর্মীদের নিয়ে ছুটে চললো। দুপায়ের বন অশল পেরিয়ে ডুকানের বেগে বাস চলছে ডুয়ার্সের দিকে। প্রকাণ্ড টর্চ লাইটের আলোর সামনের সব কিছু আগে উঠছে, বন অশল সবই লাড়া বিয়ে উঠছে। রাত্রির গভীরতাকে ভেদ করে নিবিড়

নির্জনতাকে সচকিত করে মাইলের পর মাইল এগিয়ে চলছে আবারের বিরাট বাস। হঠাৎ একটা শোরালের বাচ্চা টর্চের আলোর দূর থেকেই বোনা গেল। Driver হর্ষসিঙ্গে প্রাণপণে, পাড়ার পূর্ণগতি ব্রেক কসে থামিয়ে দেবার সময় আর নেই। শোরালের বাচ্চাটা অশলের মধ্যে চুকে পড়বে তা নয়, ভয়ের চোটে একবার দাঁয়ে একবার তাইনে ছুটোছুটি করছে রাস্তার উপরেই। নির্বোধ শিশু বুঝতে পারছে না কোন দিকটা নিরাপত্তা। বাসের ব্রেক করার আগেই স্ক্যাঙ্ক করে একটা শব্দ হোল, বুঝলাম বাচ্চাটার অস্থির আত্মনায়। একটা অবোধ শিশুর অতি ছোট আত্মনায় বেন সেই রাত্রির গভীরতাকে বুক চিরে আমাদের চারিদিকে কেঁবে ফিরতে লাগলো। অগতঃ আর কারোই কিছু ক্ষতি হোল না, সবই চললো তেমনি করে যেমন রোজই চলে যায়।

বাস আবার তাৎক্ষণিকভাবে আরও দ্রুত করে দিলো, সময় নাই আর। বাটে পৌঁছবার কথা ৬টার মধ্যে, এখন রাত প্রায় ১১টা। কী জানি এতদূরে কী হবে। হঠাৎ সামনে এসে একটা রেল লাইন, তার সামনে একটা দরজা, পথ আটকে রয়েছে। দরজায় আবার ডালাবন্ধ, খোলবার জন্ত সন্ধ্যা দব নেনে পড়লেন। স্টেশন নয় ওটা, কিন্তু ঘূমিটির মতো রয়েছে। লোক নেই একজনও। মহামুদ্রিল, একটা কোনও রয়েছে সেখানে। ধোনে খবর নিয়ে পরের স্টেশন থেকে লোক আনিয়ে চাবি দিয়ে ডালটা খোলার চেষ্টা চলতে লাগলো। কিন্তু কোন উত্তরই পাওয়া গেল না। বন্ধুরা জ্ঞাত হয়ে ভাবছেন ডালটা ডেকেই ফেলা দাক। তবু ইতস্ততঃ চলছে। ওনিকে দেখা হয়ে যাচ্ছে, সবাই অস্থির। এখন সময় বেগা গেল একজন লোক ঘীরে হুয়ে একটা দষ্টন হাতে এখিকে আসছে, লোকটির গল্লে পমনে আসা দেখে সবাই অর্ধেক হয়ে উঠছিলেন, ঘেন ওর পা দুটোকে এক সেকেন্ডে বাসের কাছে টেনে আনতে পারলে ঠিক হোত।

হাই হোক লোকটা এসে বসলো, ডালটা টানসেই ধুলে ধাবে, চাবি দেওয়া নেই।

দরজা তো খুললো! বাস রেল লাইনটা ধরে দীর্ঘ পথ পূর্ণ হয়ে চললো। হঠাৎ দেখি সামনে এক প্রকাণ্ড আলো পুন্ডের ওপার থেকে বাসের মুখোমুখি এসিয়ে আসছে, মনে হোল একটা ট্রেন আসছে, নক পুন্ডের উপর ছুঁগাশে এমন মারমা নেই যেখানে বাস সরে গিয়ে ট্রেনকে চলে যেতে লাইন ছেড়ে দেবে। অথচ প্রথমে আলোটা এসিয়ে আসছে। “Driver ওসিক থেকে যে ট্রেন আসছে কী হবে?” Driver বাস না থানিয়ে speed চরমে নিয়ে গিয়ে বলেন “লাইনে উঠে পড়েছি যে, এসিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।” ক্ৰমশঃ মনে হ’ল এই দুইটে ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে সব নিশ্চয় হয়ে যাবে। হঠাৎ দেখি উঠো বিক থেকে আলো আলোটা নিতে গেল। আবার জলে উঠলো। তারপর দেখা গেল একটা লোক প্রকাণ্ড একটা টর্চ লাইট নিয়ে আসছিল। তারই চোখ ধাঁধানো আলোকে ট্রেনের আলো বলে ভুল করেছি আমরা। আবার সেই প্রান্তর ভেঙে প্রায়শঃ বাস ছুটলো। চলন্ত বাসের সঙ্গে সঙ্গে যনজলগ ঝাপছে। সেই পড়ার জ্বলে রয়েছে বড় বড় বাঘ ভাঙুক আরো কত কী! আশিপুর ডুরারের কাছাকাছি জল কত যে ঘন কত যে ভয়ঙ্কর তা যেন রাস্তার অন্ধকারে ভয় পাইয়ে মিছিল। হঠাৎ বাসটার ইঞ্জিন গেল বিগড়ে। দেখে গেল তার গতি, ছেলেরা কেউ বলে এ জ্বলে আবার ছাই বাস পামে কেন? আরেকজন বলে “পাতলা যাওয়া” জ্বলটা ভাগ্যে পার হয়ে এসেছি। ওর মধ্যে বত বাঘ গুংপেতে রয়েছে। আরেকজন বলে বাসের লাইটটা জ্বলিয়ে যাও। ড্রাইভার বলেন “লাইটটা নিভিয়ে রাখাই ভাল।”

ছোট টর্চ হাতে Driver হুঁকাক, হুঁকাক করে ইঞ্জিন মোরামত করা শুরু করলেন। গরু রাত্রির ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ডুরারের জ্বল শুধন হয়তো বাসের যাত্রীগুলির কথা বাঘের কাণে কাণে বহছিল, আর লোভ দেখাচ্ছিল। ততক্ষণে ইঞ্জিন কিছু ঠিক হয়ে গেছে। আবার পাড়ী ছুটলো বাট্রের দিকে। রাত ১২টা বেয়ে গেছে শুধন। বাটে এসে দেখি ওপারে বাবার বেড়া বড় হয়ে গেছে

বহুজন। অনেকগুলি বাস ধাঁড়িয়ে আছে, তাদের ড্রাইভাররা বাসের মতোই পড়ার নিয়ন্ত্রণ কর। এখন কী করে ওপারে বেড়া যাওয়ানো যায়? একজন বলে “বেড়া পার করে ফু। ডাকো ডাকে।”

ছোট একটা ঘর, দরজা তার ভিতর থেকে বন্ধ। সবাই তাকে অহুস করে ডাকতে লাগলেন “ফু ও ফু, তাই, ওঠো, আমাদের পার করে দাও তাই।”

কিন্তু ওঠবে ফু তাই। কিন্তু তেই ঘর তাকে অহুস বিনয় করে জাগানো গেলোনা, শুধন সবাই মিলে দরজাটা খাড়া মিতে লাগলেন। খাকার চোটে দরজা গেল ভেঙে, আর কোথায় যাবে? ব্যাঘ্রুতি ফু তাই বেরিয়ে এসে সবাইকে ঘেরে ফেল আর কি? চাঁৎকার করে ডাকতে লাগলো—“কোথায় আছ করিম বিঞা, কোথায় আছ কে, সবাই বেরিয়ে এসো। দেখে নেব আছ এরা কে? আবার দরজা ভেঙে কে আমার বাড়ী ঢাকে? কোথায় আছ সবাই চলে এসো।” একবার এইমিকের বাসে ঢুকে ভাঙা বেয়ে, একবার এইমিকের বাসে গিয়ে বোধ হয় ছোরাই খুললো। আর রণ বেহি বলে নিম্নের পক্ষের লোক যোগাড় করতে লাগলো। ফু সেখানেও রণ বেহি, বাকো এবং কার্ণেও তাই। বাসা বত বলেন দরজা ভাঙতে আছা চাইনি, আমাদের শু পায় করে দাও, ফু তত চাঁৎকার করে “কেন পার করবো? সন্ধ্যার পরে আমি বেড়া চালাই না। রাত ১২টার পর এসে কেন আমার দরজা ভাঙলেন! দেখে নেব আছ, কে যেন বলে যল “উনি এখানকার হাকিম, বেড়া পার না করলে কি করে চলবে?” ফু একবারে জলে উঠলো। “কী হাকিম? হাকিম আমার কী করবে করুক আমি কারো পরোয়া করি না, রাত্তি আমি বেড়া পার করি না, করবো না, এই আমার কথা। আমার দরজা কেন ভেঙেছ সেই কথা বলো।”

বাসের মধ্যে যল থেকে, ফু য ছোরা, ভাঙার জত লাফালাফি আর বিকট চাঁৎকার করে লোক সংগ্রহের ব্রহ্ম দেখে তাবছি কি করবো? যদি খুনোখুনি শুরু হয়ে দায় তথ আছি একবার তাদের দারে গিয়ে

ধামাতে চোরা করব। লাভ তো কিছুই হবে না, তারপর এই আহতদের নিয়ে আবার সেই ভূমিরে জল পার হয়ে ক্রিকে বাবো কুচবিহার হাসপাতালে। কর্মী গীহেনবানু একটাকে এসে বলেন “মিসি, মিসি কিছু হয়, আপনি ফিরে যাবেন। আমি একটু হেসে নিলাম। মন তখন খুনোখুনি খামারার জন্ত নেমে যেতে ঠিক হয়ে আছে। ভ্রাইভার ভাবছে খুনোখুনি আরম্ভ হলোই গাড়ী back করাবে বিম্বিক নিয়ে। মিসি তখন বাসের খোলা দরজাটার পা বাড়িয়ে রয়েছে নেমে পড়বার জন্ত।

ওম্বিকো দাধাও চিৎকার করে বলছেন “কেন তুমি সাড়া দিলে না? তাই তো দরজা ভাঙলো। আমরা তখন থেকে কত করে ডাকছি।” খোয়াঘাট কাটিয়ে বুলু বলছে “বেশ করেছি, আমার খুঁচী আমি সাড়া দিইনি, আমি খোয়া পার করবো না। আমি তো ভেগেই ছিলাম, রাতে আমি পার করি না, সাড়াই বা শব্দ কেন? আমার দরজা তোমরা ভাঙবার কে?”

মনে হোল মাগামারি আরম্ভ হয় আর কি? কিছু ভুলু বোধহয় এতক্ষণ টেঁচিয়ে লাফিয়ে রক্ত হয়ে কানড় দেবার আগে একটু হন নিচ্ছিল। দাধা নরম হয়ে বললেন “এত রাতে আমরা কি করে ওপারে বাই বল তো? কংগ্রেসের কাজে এসেছি আমরা, আজ রাতে পৌছতেই হবে যে। সমস্ত রাত ব্রজেনবানু অপেক্ষা করবেন। রাতে কাজ শেষে সকালেই অস্ত্র রওনা হবার কথা। পার না করলে কী করি আমরা?”

ফাটা উঠিয়ে বে বিবাক সাপ ছোঁয়াল মারবার উপক্রম করছিল হঠাৎ সে মুহূর্তে মরণকা সাপের মতো গল হয়ে গেল। ভুলু বলে “কংগ্রেস? কংগ্রেসের কাজ? এতক্ষণ একথা বলেননি কেন? ব্রজেনবানু তো রাত ১০টা অবধি এখানে আপনাদের জন্ত অপেক্ষা করছিলেন। এতক্ষণ বলতে হয় যে কংগ্রেসের কাজ, তাহলে আমি কেন, আমার দাধা এসে পার করে দিত। উঠুন আপনারা দোকান। ওরে কে আছিল, এদের পার করে দিয়ে আয়তো? বেশী দেরী করিস না। আর

দেখিস, বাবু! টাকা বা বখশিস মিলে খবরদার কখনো নিবি না। কংগ্রেসের লোক বুকসি তো? কংগ্রেস বললে আমার দাধা পার করে দিবে বাবে।”

মুহূর্তে যেন কী ঘটে গেল। একি ভেদ? একি ম্যাক্সিক? নির্জন খোয়াঘাটে মধ্যরাত্রে শিশু এক অস্বাভাবিক মাকি কোথায় সমন্বয়ে বুলু করতে উঠেছে, সমস্ত খোয়াঘাট কোথায় রক্তের ধারায় রক্তিত হয়ে, তা না হয়ে কংগ্রেসের নাম শোনাযার মুহূর্তে প্রেমের বজ্রা হয়ে এলো খোয়া পার করিয়ে দিতে। আবার কড়া শাসন কত! বখশিস বা দ্বন্দ্ব বেওয়া চলবে না! দাধাভিত্তিক হোক—ভুলু অস্বস্তি মাহু, তার আসল তপ একেবারে খাটি, একেবারে সাদা, কংগ্রেস তার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তার মত সব কিছুই করতে পারে সে।

প্রাণ করে ভুলু শুভ কামনা করতে করতে চলছে। খোয়া পার হ’তে হ’তে যেন হ’তে লাগলো গাড়ীজী এইতো চেয়েছিলেন। তারতের সাত লক্ষ গ্রামের চাষী মজুররা যেসিন কংগ্রেসকে ভালবাসবে, তার পিছনে এসে পাড়াবে, সেসিন লক্ষ কোটি ইংরেজও ভারতকে শাসন করতে পারবে না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এমনি কবে যদি আমরা খুঁজে ক্রি হয়তো, নেপথ্যে কংগ্রেস গ্রামের অজ্ঞেয়র মধ্যে আসন পেতেছে। আর দরজা উরা হাতখানা বাড়িয়ে তাদের বাছে যেন আছেন গাড়ীজী। তাদেরি জন্ত আনছেন তিনি স্বাধীনতা, তাঁর অস্ত্রের কথা গ্রামের অস্ত্রের অস্ত্রের মধ্যে চলছেন তিনি। সেখানে বক্তৃতামস্ত্রের বক্তৃতার চট্টার দরকার নেই, তাদের প্রতিদিনের দুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করে, পাড়িয়ে আছেন বাপুজী, নকে আছে তাঁর কংগ্রেস। তাই তারা ভালবাসে কংগ্রেসকে, ভালবাসে গাড়ীজীকে। মনটা ভাবে গেল গর্বের মাহূর্বে। মনকে বলি, আমরা যেন কংগ্রেসকে এমনিতর করে রাখতে পারি, আমরা যেন ভুলু চাওয়া কংগ্রেসের বোধ্য কর্মী হতে পারি।

ওপারে গিয়েও সেই ভূমিরে জল দুধারে ফেলে যেতে চললাম বোধহয় প্রাণ মাইলখানেক। তারপর রাত ২টার পর পেলাম ব্রজেন বাবুর বাড়ী, একঘরে বাড়ি

মেলে কংগ্রেসের কাজ ও কথাবার্তা চলতে লাগলো। আমি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে নিলাম। তারপর দিন রওনা হলো মাথাভাঙ্গার দিকে।

রাত্তা যেমন লম্বা, বাসের ইঞ্জিন ততই ঘন ঘন জ্বাধ দিতে লাগলো। তখন অল্প বাসের সাহায্যে মাটির রাস্তা শেষ করে, নৌকা বেয়ে নদীর পথ পায় হয়ে, অবশেষে পৌঁছলাম সন্ধ্যার পর—তখন বেশ রাত হয়েচে। নিরাশ হয়ে আমাদের অনুভূতি তখন কিরে গেছে। তবুও যাত্রা এলেন তাঁদের আন্তরিকতাটুকু এসে স্পর্শ করে, সবই সহ্য, ধুব।

বাড়ীর ভিতরে গেছি, মহিলারা ভিড় করে এসে বসলেন। বলেন গান্ধীজীর কথা শুনব। বলি আমার তো সে মাথা নেই তাই, তবুও যা পারি বলব। মুখে মুখে তাঁরা শ্রব করেন, আবি উত্তর দিয়ে চলি। তারপর বলেন, কালকের মিটিংএর বক্তৃতায় আরো অনেক বলবেন, সব বলবেন। বক্তৃতার কথা শুনলেই হার গাড়ে জর আসে তাকেও সব জায়গায় বক্তৃতা করতেই হবে। মুখে বললাম, কিন্তু শুধু গান্ধীজীর কথা শুনলেই তো চলবে না, তাঁর কাজ, কংগ্রেসের কাজ তো করতে হবে। তাঁরা তত্বনি কাজ করতে রাণী, বলি, তাহলে এখানে ইচ্ছাবিহীন মতো কংগ্রেসের মহিলা বিভাগ পোলা দোক। সত্যিই, তারপর দিনই স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি মহিলা শাব কমিটি গঠন করে দেন। পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার সব আলোচনাই হয়ে গেল। অনেকেই উৎসাহের সঙ্গে রাণী হয়ে এসিয়ে এলেন। গ্রামটা বেন ভৈরী হয়েই ছিল, শুধু কেউ একজন আরও করার প্রতীক্ষা চলছিল।

সকাল থেকে মেয়েরা দলে দলে আসছেন, গল্প করছেন, গল্প করছেন, সবসময় আলোচনা করছেন, উৎসাহ উদ্বীণনায় খুসীর স্বরশ্রবণে বয়ে চলেছে। আশেই রাত্তি চল বাবো শুনে কারো কারো মুখ কলঙ্ক হয়ে উঠছিল। বিকালে মিটিং হয়ে গেল, রাত্তি বাজার আহ্বোজন। দায়া বলেছিলেন রাত ১০টার রওনা হবো। ওদিকে কংগ্রেসের স্থানীয় সভাপতি সমাধান আর হয়ই না। রাত

১২টার সময় হোল। গাড়ীতে উঠতে গিয়ে দেখি গরুর গাড়ী। বাড়ীর কত্তা বলেন, “গরী করে দিয়েছি পুর ক’রে গড় দিয়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চল বাবো, কিন্তু কট হবে না। তিন ঘণ্টার পৌঁছে বাবো।”

উঠে বসেছি গরুর গাড়ীতে, কত ঘর করে গরীর উপরে বিছানা করেছেন। ঘুমে চোখ খুলে রাখতে পারছি না। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে শুয়ে পড়েছি। গরুর গাড়ী চললো। ওরে বাগরে! শোবে কার সাধা? গরুর গাড়ী যে মেরুদণ্ডকে এমন করে ঝাঁকিয়ে থাকবে তাতো আনিনি। উঠে বসলাম। মেরুদণ্ড বাঁচিয়ে ঝাঁকুনি খেতে ভেঁটা করলাম। শোওয়া ত অসম্ভব। কোথায় হইল বড়ের গরীর আরাম, কোথায় বা ঘুম। ১২ মাইল রাস্তা পাকা ৬ ঘণ্টা ধরে বৃত্তির মধ্যে গরু টেনে নিয়ে চললো। বসেই রাত কাটিয়ে দিলাম। তোরে পৌঁছলাম যথাস্থানে, তারপর বাগ। বাস গিয়ে থামলো নদীর কাছাকাছি একটা মাঠের ধারে। বাবো ওপারে জলপাইগুড়ি। মাইলখানেক হেঁটে চলেছি মাঠের মধ্যে দিয়ে, বেন বিরামপুরের পাড়তাকা নদীর তীরে বেড়াতে বেরিয়েছি। ক্ষেতের রাশি ছ’পাশে কেলে পাবের তলায় অজল জলকানা ভেঙ্গে চলেছি নদীর পাড়ে। নিষ্টি বাতালে নদীর মন ছড়িয়ে যাচ্ছে। কে বলবে আমরা বিদেশী। বেড়াবার এই আনন্দ, প্রকৃতির এই পৌষ এইমনটি আর কোথায় পাবো? নদীর তীরে ঘাটে পৌঁছে দেখি তিনটা এক বিরাট নদী, বেন বর্ষার পদ্মা। উঠলাম নৌকায়। খোয়া পার হয়ে ওপারে চলেছি। পানিকটা মাথোঁ দিবি শান্ত, কিন্তু বাকী অর্ধেকটা দুঃস্বপ্ন ঘোড়, একেবারে প্রচণ্ড তার তীব্রতা। নৌকাকে দুহুর্ন্তে ছিঁকিয়ে ফেলতে চায়। মাঝিরা পাকা। দুর্ভাগ্য প্রকৃতির সঙ্গে তারা লড়াই ক’রে ওপারে নিয়ে চললো নৌকা। কী প্রকাণ্ড নদী, কী স্নায়ু তার গতিভঙ্গী, কী চমৎকার আমাদের পার হয়ে যাওয়া। ঘন বলে, বাজা আমাদের সার্থক হ’ল এই নদী পার হ’তে গিয়ে।

তারপর একে একে জলপাইগুড়ি, হিলি, বাসুদহাট, সব জায়গাই এক একদিন ক’রে থেকে অতি দ্রুত কাজ

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আম্মানতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদ্রাপদ প্রতিষ্ঠান।

অল্পমোদিত মূলধন	২,০০,০০,০০০
বিলম্বার্ধ ও বিলম্বিত মূলধন ...	৭৫,০০,০০০
আকারীকৃত মূলধন	৭৪,৭০,২৮১
মজুত তহবিল	১৮,৫০,০০০
কোম্পানীর কাগজের বাজার দর	
খাতের লিখিত মূল্য অংশ।	৩৫,০০,০০০
	টাকা বেই
	৫৩,৫০,০০০

নগর ও ব্যাহ্বিত টাকা এবং কোম্পানীর কাগজে ব্যাঙ্কের নারন টাকার পরিমাণ মোট আমদানী
টাকার শতকরা ৮২ ভাগ এবং চাহিবানার বেহ টাকার শতকরা ১৪৭ ভাগের অধিক

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কের কার্য করা হয়:

লোন এক্চেটস—বিড্‌লাও ব্যাঙ্ক সিং, নিউইংক এক্চেটস—গ্রাশহাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইংক, এবং
চেক গ্রাশহাল ব্যাঙ্ক অব সি সিটি অব নিউইংক, অষ্ট্রেলিয়ান এক্চেটস—ব্যাঙ্ক অব সি সিটি অব লন্ডন।

শ্রী ডে, সি, হাস
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইমারতের কারুকার্যাবির জগ্য এবং শিটীর কাজ নিখুঁত করিতে আমাদের প্রস্তুত

প্ল্যাষ্টার অব্‌ প্যারিস

সাবান প্রস্তুত করিতে এবং নানাপ্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং কার্যের জগ্য আমাদের প্রস্তুত

সিলিকেট সোডা

ব্যবহার করুন

নানাবিধ খনিজ পদার্থের ও সাবান প্রস্তুতের সরঞ্জামাদির জগ্য লিখুন—

কলিকাতা মিনারেল জাম্পাই কোং লিঃ

৩১ জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—চীনাঘাট

টেলিফোন—বড়বাড়ার ১০২৭

লম্বা করে নেওয়া হচ্ছে। ১১১২ তারিখে কলকাতা কিরবার কথা। কিন্তু এখনও মালদহ যাওয়া হয়নি।

পাকিস্তানের একটা ট্রেনে ট্রেন বঙ্গল ক'রে বেতে হবে মালদহ। ট্রেনে ট্রেন আর আসেই না। ৯২টারও বেশী লেট। এখন থেকে মালদহ লম্বা রাস্তা নয়; তবুও আর একটা সন্ধ্যা ট্রেনে আবার গাড়ী বঙ্গল করতে হ'বে। সেখানে লম্বা রাস্তা পড়ে থাকতে হ'বে। লম্বা বিশেষ ক'রে চিন্তিত হ'লেন আমার ভ্রাতা। কোথাও গিয়ে লম্বা রাস্তা প'ড়ে থাকতে হ'বে। লম্বা হয়ে আসছে, যৈশ্ব হুঁরিয়ে আসছে। লম্বা সেই ট্রেনে চকল পাড়ে পাচচারি করছেন আর বলছেন "আজ রাস্তাে রাজলারী বাই, একটু দুমিকে তো নেওয়া যাবে, তারপর কালও যদি ট্রেন এত লেট করে তবে আর মালদহ না গিয়ে একেবারে কলকাতাই কিরে যাবো। শরীর মন আর পারছে না।" সত্যিই তিনি যেন আর পারছিলেন না। হঠাৎ তাঁর মা তখন পূর্ববঙ্গের আর এক প্রান্তে অস্তিত্ব লম্বার গুহে পুঙ্কে একান্ত মনে ডাকছেন। হঠাৎ প্রিয় পুঙ্কের মুখ একটাবার মেঘবার ভ্রাতা অস্তিত্ব কামনা করছেন। তাই পুঙ্ক হঠাৎ না।

বুকেই একটা ট্রেনে ভ্রাতা পায়ে খুঁছেন আর কিরবার ভ্রাতা হুঁরিয়ে করছেন। অথচ কর্তব্য পড়ে রয়েছে এখনও মালদহে।

চললাম সেদিন রাজলারী, তারপর মালদহ। সকল কর্তব্য লম্বা হয়ে গেল। রাজনৈতিক জীবনে যা কিছু কাজের আহ্বান, বখনি যা কিছু প্রয়োজন, তখন তাতে লম্বা না দিয়ে এ হতভাগা দেশের রাজনৈতিক কর্মী থাকতে পারে না। তাই ১১ই জুন সকল কর্তব্য লম্বা করে মালদহ থেকে কলকাতার দিকে পুঙ্ক রওনা হলেন। এ-প্রান্ত থেকে তিনি বখন রওনা হচ্ছেন মাছের দিকে, তখন আরেক প্রান্ত থেকে মা তাঁর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিচ্ছেন।

একটা মুহুর্তে প্রবাসী পুঙ্কে হুঁরিয়ে যা হঠাৎ মনে মনে বলছেন, এবার বাই বাবা। পুঙ্ক হঠাৎ সেই মুহুর্তে ট্রেনের মধ্যে বলে মাছের কথা ডাকছেন, আর বলছেন, এই যে আমি আসছি মা। মাতাপুঙ্কে দেখা আর হোল না। এখনিই হয় বুদ্ধি আবার দেশের বিপ্লবীরা কর্তব্যবান।

লম্বা শেষ করে দিয়ে এলাম কলকাতায়।

ইঙ্গিত

শ্রীমন্তে বসু

মেখিলাম পৃথিবীর রক্তাক্ত বিপ্লব।—
সাধারণ জীবনের নিষ্পথ-কারিনী;
ভয়াবহ আনবিক বিজ্ঞান-বাহিনী,
আর এই ভারতের কবন্ধ-উৎসব।

কতো দিন হ'তে এরা কোলে এলো ঘাম
মুগ পিপাসায়, ভবু—বোবা ইতিহাস।
অর্থ আর অনর্থের মাঝে বারো মাস
এসেছে ও আসিতেছে কতো ক্ষুরিাম।

মেখিলাম অদেশের সলজ্ঞ আকালে
ক্ষুধা আর ক্ষুধিভের বড়ো প্রতীক।
বুদ্ধিজীবী বণিকের বর্ণচোরা কাদ
গেঁথেছে কি পৃথিবীর শাস্তির এয়ারে।

সকলতা পেতে গিয়ে বিভক্ত-ভারত
নতুন মৃত্যুর দিকে করিছে কি টিপ ?
রাষ্ট্র-গোষ্ঠীদের এক আকর্ষণী ছিপ
মাছের মতন টানে কাছের লগত ॥

গ্রামের আর্থিক দুর্ববস্থা

শ্রীশিলাপতি মারি

আমি ভুবনভাঙ্গা গ্রামের লোকসকলে ১৯০০ সাল হতে প্রায় ১২০+ সাল পর্যন্ত লিপ্ত ছিলাম। এই গ্রামটী হরিজন প্রধান। এদের প্রধান সমস্যা ভাগ ভাত। আর কোন কিছু এরা বোঝে না। অল্প কথাই এরা বল কিছুই বোঝে একশ ভাগ করে কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় এদের ভাগভাতই প্রধান। শান্তিনিকেতন, বোলপুর, এবং বাগেনোড়ার টাকাওয়ালারা এদের শিতামাতা। কিন্তু শিতামাতারা সাধারণতঃ এদের স্বহস্ত্রাধার কোন খোঁজ রাখতে চাননা। কারণের সময় কাজ করিতে মজুরি দেন। সময়ে সময়ে কিছু কিছু অগ্রিম দান করে বেশ ভালভাবে বাধ্যবাধকতার মাঝে রাখবার মতনই করেন। তাও তারা গেয়ে ওঠেন না। একজন ভুবনভাঙ্গা অধিবাসীদের উপর স্থানীয় টাকাওয়ালাদের ধারণা খুব খারাপ। একজন ধারণা ধারণার মধ্যে সভ্যই ভীষনধারণ করা হরিজনদের দুঃস্থ ব্যাপার। হরিজনরা সাধারণতঃ এইভাবেই জীবনধারণ করে। তারা ঘনিষ্ঠের কাছে আর্থিক কোন সহায়কৃতি পায় না। খেটুই খেঁকি দরদ দেখতে পড়ে তাতে তাদের অধিবাগ অলঙ্ঘ্য দূর হয় না। ধনতাত্ত্বিক বিলিয়ার্ডস্টাই এই দুর্ভাগ্যের কারণ বর্ণনায় সর্বোত্তম হরিজনদের এই মনোভাব। এক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠপ্রবেশ, কৃপাল্প, অশুভভাববর্জন, এক পাকিত্তে বাধ্যমান প্রকৃতি দাবী করা অনর্থক। মাহুকের সাথে মাহুকের প্রাপের দিনই আমলের দিনে বড় কাজ। এই কাজের জোরেই অশুভ হতে মাহুদ্বন্দ্বিত হয়। কিন্তু তা ধন হবার উপায় নাই তখন অনর্থক লম্বা লম্বার ভূমিকা করে কিছু না করাই ভাল। ভুবনভাঙ্গার হরিজনরা পার্শ্ববর্তী বহু সভা, বহু পাণ্ডার বাথলা এবং বহু রকমের আয়োজন করেছে। কিন্তু গ্রামের দ্বারা আদিকালে রক্ষণশীল তারা সেই রক্ষণশীলই রয়ে গেছেন। তাদের মনের কোন পরিবর্তন হয় নাই। ফলে জোদের মেঘে হাতীর ছোঁচা খায় না। হাতীর মেথেকে বাম্পীর মেথেরা ছোঁয় না। মূর্খির মেথ

বাউরীর মেথেকে ছুঁয়ে দান করে পবিত্র হয়। মেথর ও মেথেরাটী ভুবনভাঙ্গার একটিকে থাকে—তাদের ডোম, হাড়ী, মূর্তি, বাউরী কেউ ছোঁয় না। তাদের ছোঁয়া লাগেই বেশে মশ হাত শুকাতো থাকে। অতএব এ রোগের প্রাণ। যে সমাজে, সেই সমাজকে একেবারে ঢেলে না মাঝেলে অশুভতা পাশ দূর হবার নয়। তা যদি হ'তো বিগত দশ বৎসরে শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনের আলোকে আলোকিত হ'তে পারতো। এই গ্রামে জোমপাড়ার মধ্যে কৃপ, গ্রামের মাঝখানে গ্রামের বিভাগ, এবং গ্রামের প্রকাণ্ড মলার ভুবনভাঙ্গার সংস্কৃত হ'য়েছে। মলারঘের মল যেমন প্রয়োজনীয় সেক্ষেপ প্রয়োজনীয় তথা বসেই লকমেই সব কিছু অবাধ হুবিধা গ্রহণ করেছে। কিন্তু যে শ্রীনিকেতনের দ্বারা এই সব কাজ সংস্কৃত হয়েছে, তাদের পরামর্শ মত অপরাধের কাজ কেউ কর'তে চায় না। আমি এই গ্রামে নলকূপ পাথরানা প্রবর্তনের ব্যস্থা করি। শ্রীনিকেতন একজন কয়েকটা পরিবারের নলকূপ পাথরানা খননের ব্যবস্থা বাধ্যতাবহন করে। কিন্তু পাথরানা পরিচরন করতে যেহে নেপতে পেতাম কেউ পাথরানা ব্যবহার করতে চায় না। সেইরূপ টায়ের, সেইরূপ সমীবাগানের, সেইরূপ পরিবার পরিচ্ছন্নতার কাজ বিফল হয়েছে। আমার শক্তিমত্ত উৎসাহ দিয়েও কাজ টানতে পারি নাই। তারা কেন যে জেন পরেছে আমার ছেসেমেয়েদের লেখাপড়া শিখানো না। নিকেতনের আর্থিক উন্নতির দিকে এগিয়ে কোন কাজ করবে না, আয়ের ক্ষেত্রও নিকেতন কোনকিছু করবে না, সমাজেরও কোন কল্যাণ চাই না। কিন্তু কেন তারা এসব বিষয় খোলাখুলি আলোচনা করতে চায় না? তাই কারণ আজও তাদের ভয় আছে। আজও তারা নিকেতন অপমান ভাবে নিজেই পীড়িত হয়ে থাকতে চায়, অপরকে অপমানিত করতে চায় না। তাই ভাগ-ভাতের কোলাহলে ভুবনভাঙ্গা গ্রাম সঙ্ঘার সময় প্রায় তেতে উঠে। ভাগভাত সংগ্রহের ক্ষেত্র কে কতটা ধারণা কাজ করেছে তাই গলাহেড়ে আলোচনা করে। বস্ত্রের অভাবে তারা সকলকেই দোষী স্থির করে বাস্তবগতি এর প্রতি-

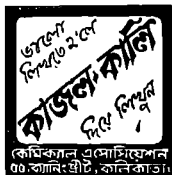
বিধান কান্না করে। কিন্তু এক হাত এগিয়ে দেবে
কাউকে কোন কথা বলতে পারে না।

আজ তাই বলতে ইচ্ছা করে শীগতালার যে যে
শব্দ তাদের বুকের রক্তচূষে খাচ্ছে হরিজনদের সেই
সেই শব্দ অব্যাহতভাবে নত বুকের উপর বসে আছে।
তাই শীগতালার দিবা আছে—বারম্বা বীশি বাজায়।
কিন্তু মাঙ্গল, ঢোল, নাগরী ও ঢাক বাজিয়ে সকলের যে
এক সঙ্গে চলবে দিন এগিয়ে আসছে তা কেউ জানে না।
শব্দরা এতদূর দাঁতের দাঁতের বসে থেকে কত প্রবেশ
শিচ্ছে। কত হৃৎকরের ছেলে কুমারো চড়া গুলিরে
“খোজেন দুমগো পাড়া জুড়ালো” বলে গান পাঠিচ্ছে।
ব্রিটিশের পত্নীসেবা বিভাগের এলাকাভুক্ত অপর ঘরে
একটা গ্রামের কামের জার পাই। এই গ্রামটিতে ৮৭
ঘর মুসলমানের বাস আর ৬ ঘর হুঁচি হিন্দুর বাস।
কান্দিপুর নামে গ্রামটি বিখ্যাত। পঠানদের বর্গীর
দাস্যতার সময় নবাবরা এইখানে এসে ছিলেন। এই
জায়গাটি কান্দিবর্গ নাম অসুখারী কান্দিপুর হইয়াছে।
গ্রামটিতে মুসলমান মেয়েরা স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীর
সাধারণ্যে চককা কাটতো, গ্রামের মধ্যে ভূতপূর্ণ শরণা
তেহির গোসেন এবং হুসতান খাঁ গ্রামের প্রধান।
একজন কৃষক ও ব্যবসায়ী অপরজন জনসেবক। অল্প
দিনের মধ্যে দারোগাদারের গ্রামের মধ্যে নলকূপ, রাস্তা
এবং বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি গ্রামের পেশদিকে ২টা
নতুন জলাশয়ও খনন করাবেন। গ্রামের লোকের কৃষিকাজে
এবং উন্নয়ন নানাবিধ একটা কাঁধের উপর ঝাঁপ বেধে
বর্ষাকালে অলসেতের ব্যবস্থাও করেছেন। গ্রামের
অধিকাংশ লোকই চাষের সময় নিজের ভ্রমিতে অথবা
স্থানীয় হিন্দুনাগিক অধিগঙ্গাসাধের ভ্রমিতে ভাগে চাষ
করে। বৎসরের অপর পাঁচমাগ বহন কৃষিকাজ থাকে না
(ধান চাষ) তখন বোলপুরে ধান চাউল প্রভৃতি বহন
করার জন্য পাড়োয়ালী করে। বাসর লোক খেঁদুরের
গুড় তৈরী করে। ৪ ঘরের মুসলমান মেয়েরা ভাল কাঁধা
তৈরারী করিতে পারে। খেঁদুর পাতা এবং অনেক
হাতের কাজও জানে। তিন ঘর হুঁচি ভাল চামড়ার কাজ

ও জুতা রং করার কাজ জানে। একজন বৃদ্ধ হুঁচি
গ্রামে গ্রামে দ্রুত গরুর চামড়া চটে নানা ভিন্ন
তৈরারী করে ও বিক্রি করে বেড়ায়। এরা ঢাকের
বাজনাও জানে। এখানকার হুঁচিরা হস্ত প্রকৃষ্টে
মুসলমানদের হাতে জানে। কিন্তু বার্য মানবারী করে
এবং বিশেষভাবে মুসলমান পরিবারে থাকে তারা
ভাত, ভাল, মাংস, দুগ্ধী ওড় লবই বায়। এইজন্যেখানে
মুসলমান পরিবারের অধিক সংখ্যা দেখানো হাড়ী, ডোম,
হুঁচী, বাউড়ী শীগতালার প্রকৃষ্টে কিছুই ওদের হোঁচা
যায়না বলে কিন্তু সব কিছুই খেবে-মেয়ে তাদের
জীবনরক্ষা হয়। এইজন্য সাংখ্যলিখিত পরিবারগুলির
আর্থিক, নৈতিক এবং মৈত্রিক দুরবস্থা দেখানো হুঁচা যায়
এরা আত্মরক্ষার জন্য মানবধর্মই গ্রহণ করেছে। হিন্দু
মুসলমানের সামাজিক পরীচ এবং অনেক উর্ধ্বে উঠতে
যাওয়া হয়েছে। এখন এই গ্রামের মজুর, ভাগচাষী,
কৃষক ও শিল্পীর চারিভাগে ভাগ করে এই গ্রামের
আর্থায়ন অবস্থার কথা আলোচনা করছি। এদের
দুরবস্থা ও আর্থিক দম্ভা হরিজনদের অপেক্ষা মোটেই
ভাল নয়। হুঁচিকের সময় এদের অবস্থা হরিজনদের
জায়ই ভয়াবহ হ'য়ে উঠে। কৃষি, শিল্প, শিকার ও
বাণিজ্যমন্ত্রার সমাধান ব্যতীত এদের অবস্থার উন্নতির
কোন আশা নাই। মুসলমান হুঁচকগণ হস্ত শীপের
আজ্ঞানে ভোটের সময় শীপকে জয়ী করবার দিকে
আকৃষ্ট হয় কিন্তু গ্রামের গার্সবনী আর্থিক উন্নতির কারণে
কোনরূপ বিরক্ত মনোভাব নাই। বিশেষ করে ভিন্নতার
মহাভন এবং চোরাকারবারীদের উপর এদের ঘন বিঘিয়ে
উঠেছে। এরাও হুঁচোগ ও সময় বুললে সে চাষী
মজুরদের হাবীর তালে তালে পা কেশেবা না তা ব'লে
ভুল হবে। উপরন্তু বলা চলে এই যে পঠানরা একত্রিত
হয়ে যে শক্তির পরিচয় যেন—সে শক্তির ঠিকানা
হরিজন বা কৃষক গরীর নোকেরা দিতে পারবে কিনা
সন্দেহ। এইবার কান্দিবর্গের গুড়কে ঝাঁপোড়ার
কৃষক পরিবার এবং স্থানীয় লোহার ও বান্দিয়ের কথা
আলোচনা করা যাচ্ছে। এই গ্রামে আদি গ্রাম ১০

বৎসর বসবাস করছি। আঠারো ঘর কৃষক পরিবার মাথাপিছু চার বিঘা জমির মালিক হয়ে লোহারদের দিবে ভাগে চাব করার। নিজহাতে তিনজন কৃষকমাত্র চাব করে। বাকী ১৪জন কৃষক লোহারদের বাড়িতে নিম্নাতিপাত হবে। ৬ জন দানচাউলের ব্যবসা করেও থাকেন, এদের সাংসারিক জীবনযাত্রাও বদলে গিয়েছে। ঘরের মেয়েরা পূর্বে তৈকিতে দান ভাঙত, গরুপালন করত, হাল ও ছাগলপালন এবং সজী-চাষ করত। এখন এরা সকলেই ব্যবসা ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। ফলে গ্রামের চেগেমেয়ে শ্রী-পুরুষের জীবনধারণের পূর্ণপরিমাণ বদল হয়ে যাচ্ছে। জমির মালিক এবং ব্যবসায়িকগণই লাভবান হচ্ছে। প্রদীপিতা বৎসরের

৩০৪ দিনের পাওরাপায়ের মত ধান, চাউল, আলু, গুড় পেঁয়াজ, গম, কলাই প্রভৃতিও মগন টোকাড় ফোপাড় করতে পারছে না। বৎসরের ৩৮৫ দিনের মধ্যে পাওরাপায়ের মত মাত্র ২২০ দিনের উপায় হয়, বাকী ১৬ দিনের কোন বিহিত করতে না পেরে মনিবের কাছে বেনা করে। দ্বারা মনিবের কাছে বেনা পাও না, অথবা মাগেলিয়ারোগে অক্ষম হয় তাদের দুর্ভাগ্যের তো কথাই নাই। অর্থাৎ জনকল্যাণের নামে কয়েকজনের কল্যাণের কাছে মজুর-শ্রমী নিহত। নিবেদের কল্যাণের কথা চাবতেই পারে না। আজ এটমজুর হরিজনপটী, দুদলমানপটী, পাওতালপটী এবং কৃষকপটীকে চারভাগে বিভক্ত করে কোন বিচার বিবেচনা করা হতে না।



টেলিগ্রাম : 'ব্যাং'

ফোন : ক্যাল ২০৭০

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(স্থাপিত : ১৯২৬)

হেড অফিস :

২২ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শাখাসমূহ :

বাগেরহাট, বাঁকুড়া, বহরমপুর (পশ্চিম বাংলা), চরমুগড়িয়া, চুঁচুড়া, কাঁথি, বাটাল, যশোহর, কালনা, কাটোয়া, খড়গপুর, খুলনা, কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া, নবাবীপ, নাটোর, মেদিনীপুর, নৈহাটী, নওগাঁ, রাতসাহী, সাহেবগঞ্জ, শান্তিপুর, সিরাজগঞ্জ ও তমলুক

ধর্ম এক, অর্থও ও সর্বমানবিক

ब्रह्मसूत्रान्न सत्यं

ধর্ম এক—অবগুণ। উদার অথবা দুষ্ট দুইটো বিচার করিলে দেখা যায় মানুষের ধর্মভাব বিকাশের মূল একই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর ধর্মবিভাগের হাত বসিগাছে। হিন্দু, ইসলাম, খ্রিষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, জাভ, ভোবোহীচান ইত্যাদি কত বিভাগ! মানুষের ধর্মভাব বিকাশের মূলে ইহার কোনটাইই পরিচয় ছিল না। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত—কোথাও 'হিন্দু' বলিয়া ধর্মের কোন পরিচয় নাই। অপর ধর্মবিভাগগুলি তো মানুষকেই সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের উদ্ভব। কিন্তু ধর্ম একটাই ছিল ও আছে এবং তাহা হইতেছে অবিভাজ্যভাবে বিশ্বজনীন। পরবর্তীকালে ইহারই নাম দেওয়া হয় 'হিন্দুধর্ম' আর ইহার নির্ধেণ ও অমূল্যসমগুলি যে মৌলিক ধর্মাত্ম্যগণিতে বর্ণিত হ। রচিত সেগুলিকে বলা হয় 'হিন্দু' ধর্ম।

হিন্দুধর্ম আরি ধর্ম ও বিশ্বধর্ম। হঠাৎত মহামান
আলিতে হিন্দু ছিলেন, তাঁহার মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের একটা
বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ভ্রূপেরই নাম দেওয়া
হয় ইসলাম ধর্ম। ইহাকে হিন্দুদের অর্থাৎ বিশ্বধর্মের একটা
বিশেষ বিকাশই বলিব এবং হাজার। মুসলমান
তাহারিগকে হিন্দুর একটা অংশই বলিব। রাজা
রায়মোহন রায় হিন্দু ছিলেন। হিন্দুধর্মের সম্পদ লষ্টাই
তাঁহার প্রযুক্তি ব্রাহ্মধর্মের স্বত্ব। ভগবান বৃদ্ধ হিন্দু
ছিলেন, যৌব ধর্মের বিকাশ হিন্দুধর্মের সম্পদ লষ্টাই।
ভগবান বীণ হিন্দুই ছিলেন, হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রকৃষিতেই
গৃহধর্মেরও বিকাশ। এইরূপে উহার ও হুহ পৃষ্ঠ লষ্টাই
বিচার করিলে দেখা যাইবে একমাত্র মৌলিক ধর্ম
‘হিন্দুধর্ম’, ইহা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম নহে; এই
হিন্দুধর্ম লোকের এমনকার ধর্মজ্ঞানের চাইতে অনেক বড়,
অনেক উদার। হিন্দুধর্মকে ‘হিন্দুধর্ম’ নামে অভিহিত না
করিয়া ‘বিশ্বধর্ম’ বলিলেই উহার বর্ণার পরিচয় ধটাই উঠে।
হিন্দুধর্মে ইহার বিকাশ বলিচাই ইহার নাম হিন্দুধর্ম।

সেই ধর্মের প্রতি, সেই মতের প্রতি যাত্রাবের নিষ্ঠা, বিশাশ, ও প্রেম যখন হ্রাস পায়, ঐক্যবাহুবৃত্তি যখন নিখিল হইয়া পড়ে তখন কতকগুলি বাজ্যচাতকে অবলম্বন করিয়া আচার ও অহংসান্বলিত ধর্মবোধ জাগে এবং এই ধর্মবোধ সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রপত্তায় পরিণত হয় অর্থাৎ শ্রীকী, যম্বির ও মন্ডিকের যেরূপ ইচ্ছারোপাসনা প্রবর্তিত হয় তাহাকেই সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক উপাসনা বলা চলে।

এই সাম্প্রদায়িক উপাশনার ভূপ না অহুতান বেশকালের
ও লোকসমাজের অহুতান ও কতিবেবে বিগ্নি হয়।
কিন্তু বিভিন্ন হইলেও, কোন এক সাম্প্রদায়িক ধর্মোতান
অন্য সাম্প্রদায়িক ধর্মোতানের প্রকৃতি হইতে বহুত হইলেও
মূলতঃ উভেত ছিল এবং তাহা মনুষ্য-বিবোধী ছিল
না। সেউকল সংখ্যকল হইতে পাঠে না।

হিম্মত ছিল উত্তর বিশাল, ও সর্বমানবিক। এই ধর্মের অনুশাসন মিলিবৎ ছিল বেদ, উপনিষদ, শ্রীতা, ভাগবত প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থগুলিতে। এই গ্রন্থগুলি কোন ব্যক্তিক আশ্রয় করিতা গড়িয়া উঠে নাই। এই শব্দক অনুশাসনান্ত্রিত মতে যখন শাপ প্রদেব করে, যখন স্বাধীনতা ও গোঁড়াহি, বৈরাচার ও ব্যক্তিচারকে নানা অহিন্দার প্রস্তর দেওয়া হইতে থাকে তখন, বাংলা জাতি, ধারাহা বোধহুজ ঠারাদের বিস্তার শুক হয়—হিম্মতের এই ব্যক্তিচার ও স্বাধীনতাবির বিলুপ্তি। ইসলামের প্রবর্তন—হিম্মতের নামে যে অধর্ম চলিতেছিল তাহারাই বিলুপ্তি বিস্তারের প্রকাশ্যায়। বস্তত কোরাণের মূলতত্ত্ব ও উদ্দেশ্য হিম্মতের মধ্যেই নিহিত আছে; যেখানে ইসলামের প্রকাশ হয় সেখানে এই ধর্মনীতিক লোকে জুলিয়াছিল। যেমন বৈক্য ও শান্তধর্মী, রাষ্ট্র ও বোধধর্মী—হিম্মত মোটেই নয়, তেখনি ইসলাম ধর্মীও এইভাবে হিম্মত মধ্যেই পণ্য। এইশব্দক ধর্মবিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসান্ত্রিত সন্তান্যর এক একজন মহামানবকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মূলত ইহারাই হিম্মতধর্মী, এ বিষয়ে বিশ্বাস করিবার কোন দৃষ্টি নাই।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେ ଯେ ମୌଳିକତାର ଘନୋକାବ ଲାଞ୍ଛେ ତାହାର
ବିରୁଦ୍ଧେ ଇସଲାମ, ବ୍ରାହ୍ମ ଓ କୃଷ୍ଣସୌଦେବ ଅଧିବୋଗ ଓ

বিত্রোহ : কিন্তু যে-কল্প বিত্রোহ, সেই কারণকে একাধারে গিয়া সেই কারণকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে সকলকে। ধার্মিক ভগবানের সাক্ষর স্মৃতির উপাসনকে শিক্ষা করেন অর্থাৎ ধার্মিক নিত্যকার প্রয়োজনক তাঁহারও একটা প্রতীককে উপলক্ষ্য করিয়া প্রতি আপন করেন ; মগজিধে, স্বীকার্য, এমন প্রতীককে প্রত্যাহারে আত্মনিবেশন করেন। শেষ বা মন্ত দ্বারা ধার্মিক উপাসনা করেন তাঁহাদেরও তো যখন দৃষ্টিতে পৌত্তলিক বলা যায়। কারণ তাঁহারাই ঐশ্বরকে 'স্মৃতি'তে আকার না দিয়া 'শব্দে' আকার দিয়া থাকেন। ঐশ্বরকে স্বীকার্য করে প্রার্থনা করে বাহ্যে দ্বারা দিয়া নাই, পঞ্চমের বা অবতারের নাম কীর্তনে বাহ্যেও স্মৃতি নাই, মগজি ও স্বীকার্যেরই বাহ্যে ঐশ্বর আধার্যের প্রকৃতি স্থান তাহারিগকে একটা আকার বা প্রতীকের উপলক্ষ্য বলিতে নি পারা যায় না? এই দৃষ্টি দিয়া দেখিলে তাহারও তো পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতার ক্ষেত্রেরই হইতেই সকল ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছে এবং এই দৃষ্টিতে দেখিলে পেনে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম প্রভৃতির দ্বারা স্মৃতি ও ঐশ্বর্য ধর্মবিধানের অধিকারীরাও 'হিন্দু' বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন। হিন্দুধর্মের মধ্যে সেই বিশালতা, সেই সত্ত্বীয়তা আছে দ্বারা দ্বারা সর্বপ্রকার ধর্মবিশ্বসীকেই অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু হিন্দুধর্মের বর্তমান সময়ের সংকীর্ণতা ও অল্পমাত্রার ফলে হিন্দুরা মূলমমানের সহিত এতবড় একটা বাধ্যতান পড়িয়া তুলিয়াছে যে মূলমমানের তাহারাই স্বীয় সময়ের অংশ হিসাবে গ্রহণ করিবার পরিবর্তে একটি বিকৃত 'সম্প্রদায়' পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার দ্বারা হিন্দুধর্মের ও সমাজের বিকাশের অভাব ও দুর্বলতাই সৃষ্টিত করে এবং এই বিকাশের অভাবের ফলে ছিল পরস্পর শাসনের বিকৃত চাপ।

ধর্মের সামাজিক অল্পমাত্রার বিকাশশীল এবং পরিবর্তনশীল। মাছের মনে গোঁড়ামি দেখা দিলেই এই বিকাশ ও পরিবর্তনের মধ্যে বাধা পড়ে। অনেক হিন্দু ও মূলমমানের মধ্যে এই মনোভাব আছে যে শাস্ত্রের অল্পমাত্রা, কাল ও ক্ষেত্র ভেদে বলাইতে পারে না।

বিশেষতঃ বাঙ্গালী মূলমমান সমাজে এই গোঁড়ামির প্রভাব অধিক পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সত্যপূর্ণের নীতি প্রতিষ্ঠা নাহ। বিকাশের মূলমমান মন কখনোই একথা স্বীকার করিতে পারে না যে পুণ্ডের অল্পমাত্রা বা চমকিত মনুষ্যের অল্পমাত্রাই শ্রেষ্ঠ অল্পমাত্রা এবং উচ্চ পরিবর্তন হইতে পারে না। এই মনোভাবের অল্পমাত্রার মধ্যে দুইটা দিক আছে—একদিকে তত্ত্বাত্মিক অবস্থার পরিবর্তনকে অবলম্বন করিয়া অল্পমাত্রাগুলি সৃষ্টি হইয়াছে, অপরদিকে সর্বকালের এবং সর্বমাত্রার গোঁড়ামি কল্যাণের ব্যবস্থার দৃষ্টি দ্বারা অল্পমাত্রাগুলি সৃষ্টি হইয়াছে। এই দৃষ্টি দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায় যে প্রথমোক্ত অল্পমাত্রাগুলি সংস্কারশীল—পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়কেই স্বীকার করিতে হয়—স্বীকার না করার নাম গোঁড়ামি ও অন্ধ সংস্কার। পরস্পর শাসন ধর্ম বিতর্কের উদ্দেশ্য লইয়া ব্যক্তির উপর চাপিয়া বলে তখন এই বিকাশ বা সংস্কারের পথে বড় বাধা হয়। আজ যে হিন্দু মূলমমান সমাজে উত্তরোত্তর ও সংস্কার মনোভাবের অভাব তাহারও ফলে এই পরস্পর শাসনের চাপ ছিল মনুষ্য এতদিনে হিন্দু মূলমমান যে একেই এক সমাজে মিলিয়া যাঁতে পারিত তাহা কল্পনা করা বা আশা করা বাস্তবিক বলিয়াই গ্রহণ করা যাঁতে পারে।

আজিকার অবস্থাতে এই যে হিন্দু সমাজধর্মের অল্পমাত্রা মানিয়া চলে না, কিন্তু যেমন সাধারণ হিন্দুরা ঠিক ধর্ম পথে চলে না তেমনি চমকিত মনুষ্যের দ্বারা, স্বীকৃতির দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন গোঁড়ামি সংস্কার চর্চা দ্বারা সেই মূলমমানই আজ মোহমত্তের দর্শন নির্দেশ বা ঐশ্বর্য স্বীকৃতির নির্দেশ মানিয়া চলে না। অল্পমাত্রা ধর্ম সম্প্রদায় মধ্যেও এই পত্তন দেখা যায়। উচ্চ হইতে একটা দিকান্তে আদম্য আদম্যে পারি যে প্রত্যেক ধর্মমতই সংস্কারশীল। সংস্কারকে স্বীকার করিয়াই ধর্মমতের বিকাশ। কিন্তু মূল সংস্কার বা প্রবর্তকের স্মৃতি ও শুদ্ধ অভিপ্রায় তাঁহার দেহ ত্যাগের পর তাঁহার শিষ্য প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি দ্বারা পরস্পর ও পরস্পর অসহিষ্ণুতার ফলে সেই সংস্কারের বিকাশের পথে বাধা পায়—মূল প্রবর্তকের শুদ্ধ ইচ্ছা।

সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। বর্তমানে নানান ধর্ম আদর্শ ও পাণ্ডাচারে ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পরস্পরে ভাট্ট এখন সংঘাত।

যে যে মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া এক একটি ধর্ম বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই সম্প্রদায়ের সদাশ-ধর্মের নামকরণ করা হয়। এই ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে গোড়ামী আশাও কলে ধর্মের মহত্ব খর্ব হইয়াছে। বস্তুত সাম্প্রদায়িক আচার বা উপাসনার প্রথা আর ধর্ম এক তিনিস নহে। মানুষের কি এক রকমের পতন? সামাজিক আচারকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে, সাম্প্রদায়িককেই বলে জাতি। অথচ ধর্মের দ্বার ধারে না কেহই।

সংসারের, এমন পরিবার আত্মকাল ভেদেই পাণ্ডাচার দ্বার যে পরিবারে বা হিন্দু-আচারী, বাপ ও চেলেরা দ্রাক্ষধর্মী, বটনারা কেহ শাক্ত, কেহ বা বৈষ্ণবাচারী, কেহ বা নাস্তিকাচারী; অথচ একই বাড়ীতে, একই পাকশালায় তাহাদের সব কাজ নিধিরোপে চলিয়া গাইতেছে। এমন এমন দৃষ্টান্তও আছে কত। ইসলাম ধর্মোচারা ইহাও হিন্দুধর্মের পূজা মণ্ডপে প্রবেশ করিতে বাধা পায় না। সাদরে অভিনন্দিত হয়। ধর্ম নিত্যস্বই ব্যক্তিগত জিনিস। ঈশ্বরের সংগেই তাহার সম্পর্ক। এইরূপ পরিহিতিকে গোড়ামী মুক্ত সাম্প্রদায়িক হিত বলিব।

বর্তমান যুগের স্রোত তথি ও মহামানব মহাত্মা গান্ধী বলেন: “এক অধীতীয় ভগবানে বিশ্বাসই তো হইল প্রকৃত ধর্ম। বর্তমান জগত বিশেষ ধর্মমত বা ধর্মের গোড়ামিকে ক্রম চাড়াইয়া উঠিতেছে। কারণ এই সব বস্তুত ধর্মমতের গোড়ামীর পীড়নে জগত পরিত্রিষ্ট ও বিভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফলে তাহারা জগতের প্রত্যেকেই অধীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।”

(বাংলা হরিজন, ২০/১/১৯৪৭)

ধর্মার্ণ ধর্মগ্রাণ ব্যক্তির মর্যাদা লম্বায়ে আত্ম নাই। নষ্টতার পূর্ণ মানুষের বন, তাহার তৈরি বিধান। হিন্দু তাহার চতুর্পার্শ্বে প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে—কতকগুলি

বাধ্যচারকে আশ্রয় করিয়া, মূলমানেও করিয়াছে ভাঙাই। সকলেই বাহিরের আবরণ ও সংকীর্ণতাকে ধাক্কাইয়া খরিয়া আত্মকলমে হাতিয়াছে। যারাখাতি, কাটাখাতি, পুনাবুনি করিয়া ধর্মের স্রাভবাসনের আবোজন করিয়া তুলিয়াছে। ইহাই কি ঈশ্বরোপাসনা? না ধর্মশালন? ছোড়াছড়ি সাব বস্ত্র মনে করিয়া ছোড়াছড়া লইয়াই যদি আত্মকলমে যাতে হিন্দু মূলমান, তবে আসল জিনিস খাঁসি কাহারো ভাগ্যে জুটিবে না। ধর্মের বেলাতেও ঠিক তাহাই। কতকগুলি বাহ্য মলিন সংস্কারকে ‘ধর্ম’ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বিশ্বাসোৎসাহ কিঞ্চিৎ উত্তম হইয়া উঠিয়াছে। ফলে মহত্ত্ববুদ্ধি লোপ পাইতেছে। ধর্মবুদ্ধি জড়ত্ব পাইতেছে।

কিন্তু গোড়ামির মোহে যে বাহাই কলম না, বাহাই হলুদ না হিন্দু তাহার অন্তর্নিহিত উদারতা ও মর্যাদা হারাইতে পারে না। হিন্দু আদি ধর্ম এবং বিশ্বধর্ম। চিন্তুর পক্ষে বেঁড়াধারি প্রতিযোগিতা করিয়া ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা অশোভন, সে দুর্বলতা। হিন্দুধর্মের দ্বার থাকিবে মর্যাদা উজ্জ্বল, সর্বলের জন্ত। হিন্দু ধর্ম মহাদেশের সন্তান, জগতের ধর্ম মন্দির বিশেষ—সকলেই এই মহাদেশের হইতে উজ্জ্বল হইয়াছে এবং ইহার মধ্যেই মিলিয়া বাইবে ইহাই হিন্দুধর্মের মৌলিক রূপ।

গান্ধীজি বলেন: “হিন্দুগণ তাহাদের ধর্মকে সকল প্রকার আবর্জনা, অন্তঃকর্তা হইতে মুক্ত করিবার এবং ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের হিন্দুধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম হইতে অভিন্ন, কঠোর নিরপেক্ষতা যারা ইহা দেখাইবার তথোপ পাইয়াছেন। এই স্বেচ্ছা সহজে পাণ্ডাচার দ্বার না। মাত্র সেহিন্দু আদি বলিয়াছি যে ভারতীয়গণ এক জাতি। ইহাতে বাহ্যেরা বিশ্বাস করেন তাহাদের কাছে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু বলিয়া কোন প্রের থাকিতে পারে না। সকলেই সেখানে সমান অধিকার ও তুল্য ব্যবহার পাইবে।” (বাংলা হরিজন, ২০/১/১৯৪৭)

ধর্ম সামাজিক শাসনের কতকগুলি বাধ্যচারে পরিণত হইলেও ধর্ম কি এতই হালকা, এতই তুচ্ছ? এতই সংকীর্ণ যে প্রতিপক্ষে পরস্পরে আবলংঘাত উপস্থিত

হইবে? ধর্মের স্রষ্টা, জীবের স্রষ্টা সেই একই পুরুষ। তিনি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষের ধর্মও তাঁহারই সৃষ্টি, কিন্তু তিনি 'হিন্দু' সৃষ্টি করেন নাই বা 'মুসলমান' সৃষ্টি করেন নাই, না অন্য কোন সম্প্রদায়। সম্প্রদায় মানুষের সৃষ্টি, ধর্ম ঈশ্বরের।

বেশভেদে মানুষের ভাষা বিভিন্ন। একই মনোভাবের প্রকাশে ভাষা বিভিন্নরূপ ধারণ করে। কিন্তু ধর্ম এক, ঈশ্বর এক। যে যে নামেই ডাকে না তেন সেই একজনকেই ডাকে সবাই। রাম, রহিম, গড একই তিনি। মানুষ যখন আত্মপন্ডিতে অসহায় গোথ করে তখন আশ্রয়রূপে সেই রামকেই স্মরণ করে, সেই আল্লাহকেই স্মরণ করে। মন্দির, মসজিদ, গীর্জা সেই একই উদ্দেশ্য পূর্বের সঙ্গ। তবে কবে কোথায়? ধর্ম লইয়া কি? শ্রীতার লতার্য্য বাহা বলেন, কোরাণ শরীফ পরম্পর মহম্মদ সেই কথাই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

১২৭৭, ১৩ই জুলাই বাংলা হরিজনে ঐশ্বর্য্য কণ্ড বর্জ্জ লিখিত "মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব" প্রবন্ধে কোরাণ শরীফ হইতে পুণ্যহৃত উক্তির কতিপয় এখানে উল্লেখ করিতেছি :

"যে ব্যক্তি নিজে বাহা কামনা করে, তাহার জাতির অন্তর্গত যিনি সেইরূপ কামনা না করে তবে সে প্রকৃত খামিত নহে।

"ভগবানের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কে? ভগবানের সৃষ্ট সকল জীব বাহার নিকট হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক উপকার পাইয়া থাকে।

তিনিই মানবশ্রেষ্ঠ, পমগ্র মানবজাতি বাহার দ্বারা উপকৃত। ভগবানের সকল জীবই তাঁহার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনিই ভগবানের সর্বাপেক্ষা প্রিয় যিনি ভগবানের সৃষ্ট সকল জীবের বদল করিতে চেষ্টা করেন।"

স্বার্থকে ব্যত মান কর, রোপিত সন্তুষ্ট কর, যদি অন্যভাবে কাহাকেও বন্দী করিয়া রাখা হইয়া থাকে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দাও। মুসলমানই হউক আর অমুসলমানই হউক, উৎপীড়িতকে সাহায্য কর। ভগবানের নির্দেশ স্বীকারিত প্রতি ভাল ব্যবহার কর, কারণ তাহারা তোমাদের মাতা, কন্যা, পিতা, মাতা।"

পলেম্বর তাঁহার শেখ তাঁহাদ্বারা কালে বলিয়াছেন :

"মনে রাখিও তোমরা সকলে ডাট ডাট, ভগবানের কাছে সকলেই সমান। তোমাদের প্রাণ ও তোমাদের সম্পত্তি পবিত্র, তখনও পরস্পরের প্রাণ ও সম্পত্তির উপর আক্রমণ করিও না। আর আমি জাতি, বর্ণ ও জাতীয়তার লবল পার্থক্য পায়ের নীচে মলিখা চলিযাছি। সকল মানবই আমারে সমান। আমনও হুঁল হইতেই উৎপন্ন।"

এইরূপ আরো বহু উক্তি উল্লেখ করা যাইতে পারে ধানের লহিত বেসোক, গীতোক নির্দেশের পার্থক্য নাই। কিন্তু ধর্ম্মাঙ্ক কে মানিয়া চলে? এইসময়ই প্রশ্ন ও কলহ।

স্বতন্ত্র ধর্মের মর্থাৎ আজ নাই। রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ হাসিলের স্তম্ভ ধর্মের অহিলায় মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপদগ্রামী করা হইতেছে। কুটিল স্বার্থবলে মনুষ্যকে বিলম্বন দিয়া গীতা কোরাণের অর্থকে করা হইতেছে বিকৃত, ধর্মকে করা হইতেছে চান কলুজিত। যখন মৌলানা মৌলবীদের মূখে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মূখে, শাস্ত্রের অপর্যায়্য তিনি, তখনই বৃত্তি বেশ তোমায় নামিতেছে? আর সাম্প্রদায়িক সংঘাত কেন? শ্রেষ্ঠ-সংঘাত কেন? পরস্পরের প্রতি প্রত্যাশা বা মর্থাৎ-বোধ নাই বলিয়া। একদল লোক অন্য পাংতে চাহ, মান পাইতে চায় অর্থ অপরকে প্রত্যা মান বিতে কুটী, এমনই সংকীর্ণতা তাহাদের। অপরকে আত্মমর্থাৎবোধ অনেক-বারেই অস্বীকার করিতে চায়।

সমাজের শৃংখলা নানা কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক অসম ব্যবস্থা, অশৃঙ্খলতা পাপাচার, ধর্মের নামে ব্যাভিচার ও শোষণ ইত্যাদি অনেক কারণেই সমাজের ধর্ম ও শৃংখলাবলে নষ্ট হইয়াছে।

লভ্যমণী যিনি তাঁহার কাছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এই সকল ভেদ তপ্পন মাত্র...এই ভেদ বড় ছোটর প্রমাণীন নহে। যিনি শুধু জানী ও ভক্ত, তাহাকে যদি কেহ 'হিন্দু' বলে বা 'মুসলমান' বলে বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক বলে, তাহাতে তাঁহার

কিন্তু কতিপয় নাই। কেননা তিনি তো বিপাদই করেন, "যে নামেই ভাষিক না কেন, ভাষিক সেট এতকমাটো।" তাঁহার কাছে আরা, উবর, গজ, একাধিক। তাঁহার ইহা মনেন না। তাঁহার ধর্মকে গোঁড়াবি ও অস্বাভাবিকের প্রাচীর দিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, সংকীর্ণতার কৃপণভীতে তাঁহারের 'চলমান'কে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারের সেই ভগবান তাঁহারের বন্ধু করিতে অক্ষম। য য় সম্প্রদায়কে তাঁহারাই তুলিয়াছেন। বর্তমান সাম্প্রদায়িক অস্বাভাবিকতা ও অসহিষ্ণুতার মত তাঁহারাই দায়ী। প্রেমী, জ্ঞানী ও সম্প্রদায় নিবিশেষে সকলের পক্ষে শুভ বাহা, যাঃ সকলকেই একাভিমুখী করে তাহাই বস্তুর ধর্ম। সেই ধর্মালয়ের দ্বার সকলের জন্যই সর্ব কালের জন্যই উন্মুক্ত। সেখানে প্রবেশের ক্ষমতা সকলের দেওয়া কোন 'ছাড়পত্র'র আবশ্যকতা নাই। একমাত্র 'ছাড়পত্র' 'সর্বদায় ধর্ম-প্রাপত্যের বিধান' অর্থাৎ "ঈশ্বর এক অভিন্ন, ধর্ম এক অভিন্ন" এই বিধানের সূচনা।

বর্তমান যুগে এক সংস্কারের মধ্যেও এই শুভ দেখা যায় যে, সকল ধর্ম সম্প্রদায় মধ্যে সংস্কার-সুখ ও ধার্মিক ঐক্য-সাধন সুখ। আগ্রহ বর্ততেছে। সম্প্রদায় ও জাতিগুলির সকলেই আজ ধর্মের মানি অঙ্গীকার করিতেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উদ্বোধনোত্তর ধর্মপ্রাণ বিজ্ঞানীরা যাহাদের হৈরি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক গভীর সীমানা অতিক্রম করিয়া সকলের মাঝে হাত মিলাইতে বাস্তুল হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্মভিধানীরা ও পণ্ডিত-সমাজ য য় সম্প্রদায়কে, ধর্মকে বদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে এত দূর মিথ্যার আশ্রয় লইতেছেন যে প্রকৃত সাধু ব্যক্তির দ্বান ধর্মবর্ণনায় নাই! তাই ব্যক্তিগত শীর্ণতা চিত্তে তাঁহার অস্তরলোকে একটি সর্বদায় ধর্মপ্রাণ আধোজন করিয়াছেন। এই সভার কাজ বিনা আড়ম্বরে, সত্যসমিতির বিনা অবিবেচনাই চলিতেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাবিলসন প্রকাশী বিজ্ঞানীদের এই চেষ্টা চলিতেছে এবং উহা সার্থক হইবে সুনিশ্চিত।

হিন্দু বা মুসলমান হইলেই নিশ্চিত চরিত্র হয় না বা

যেদল সাধুও হয় না। দুইএর মধ্যেই প্রকৃত ধার্মিক ও প্রকৃত সাধুর পরিচয় পাওয়া যায়। জগৎ হইতে হঠাৎই নৈতিক উদ্বেগ হারিয়া কঠিতে হুসলিন যৌনানা যৌনবীরের অনেক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোথায় পরিচয়ের যোগ্যই দিয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে দরিত্র ও নিরোধ নিরীহ অসাম্প্রদায়িক প্রাণ মুসলমানদের উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করিয়াছেন, মনস্তত্ত্বের অধ্যয়ন করিয়াছেন, ধর্মকে পাপ ও নিতীহিকার করিয়া তুলিয়াছেন যাহাদের চোখে। ধর্মের নামে গোঁড়াবি ও পাপচারের যেখা যে মহাপুরুষ ইসলামের প্রবর্তন করিলেন, সংস্কারের দাবী লইয়া এবং তাহার ফলে যে সম্প্রদায় গঠিতা উদ্ভূত হইয়াছে তাহা। হইতেছে 'মুসলমান' সম্প্রদায়। আজ মুসলমানদের দ্বারা আচার তাহাতে সেট মহাপুরুষের উদ্বেগ বার্য হইয়া গিয়াছে। তেমনি ব্রাহ্ম প্রবর্তকেও, বৌদ্ধ প্রবর্তকেও, খৃষ্টান প্রবর্তকের সকল মহাপুরুষ ও পণ্ডিতের এর উদ্বেগ আজ বার্যতার কলংক বহিয়া বেড়াইতেছে। বস্ত ও সাম্প্রদায়িক বার্যতাকেই আজ আচারের ধর্ম বন্ধার দামিন হইয়া ধরাইয়াছে। সেই বার্য পুরণের জন্য যদি কোন অপর্যম করিতে চাই বা অপর সম্প্রদায়ের উপর অবিচার অত্যাচার করিতে হয়, অপরকে বঞ্চিত করিতে হয় তবে তাহাও করা চলিবে। কোন পাপ নাই তাহাতে—এই হল এখানকার ধর্ম।

কারণই ধর্মের বন্ধাই করিবার মতো সত্যতা ও পবিত্রতা আজ কোন সম্প্রদায়েরই নাই—কি হিন্দু কি মুসলমানের কি বৌদ্ধ-খৃষ্টানের। ঐহিকতা দে দাবী করিতে পাবেন তাঁহারের সে অসংস্কার নাই। ঐহিকতার দাবী নাই তাঁহারেরই আছে অসংস্কার, হুঁতলা ও বেয়াসবী। তাঁহারাই হইলেন আধিকার নেতা বা সমাজপতি। তাঁহারের নির্দেশই চলে এখানকার ধর্মপ্রাণ। তাই এক সংস্কার ও বিবেচ, সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা, গভীর ও ব্যক্তিচার। কিন্তু বই দখল হবার দাবী ঐহিকতার আছে বা থাকিতে পারে তাঁহারের কথা পোনে কে ? তবিলে জাতির অপর্যম ও হিংসাত্মকতা রূপ ও অপর্যম হইতে।

আজ ধর্ম দখলে বিশ্বাতিমান ত্যাগ করিয়া সকল

সম্রাটের যোদা ও শুভাচারী ধর্মপ্রাণ মহাসম্রাটের মিলিত
বৈঠকে সর্বপ্রাচ্য 'ধর্মরত' 'ঈশ্বর এক' 'অভিমন, বর্ষ এক
অশ্বিন' এই বস্তুকে চিহ্নিত করিয়া গঠিত হওয়া সরকার।
বর্ষ সম্বন্ধে বাহুবীরে প্রাচ্য অগ্নোদয়ন করা বহুকার। বর্ষের
নামে অশ্বিনীর সৌন্দর্যে 'স্যাটি-বা' 'অগ্নি' পীড়িত হইয়া
হইয়া গড়িয়াছে। এই পীড়া অগ্নিনীর হইয়া উঠিয়াছে।
ইহার নিবৃত্তি চাই এখন। এখন করিয়া বহুভবের অগ্নমান
হইতে দেওয়া বাহুবীরে কাজ নয়, ইহা বর্ষ নয়।

বর্ষ পীড়াময়ক নয়, উহা পজন্মের পূজা নয়। যে
অর্থে সাম্প্রায়িক বা সৌপ্তিক আচারকে বর্ষ বলা হইয়া
যাকে তাহা হইতেছে নিরন্তরের ব্যাখ্যা। তাহা হইলেও
এই বিভিন্ন আচারকেও একটা সর্বপ্রাচ্য কলিঙ্গের তপ
বিদ্যা গড়িয়া তোলা যায়। উদ্দেশ্য ছিল তাহা হইতে
বর্ষ হইয়াছে।

হুগে হুগে বহন বাহুব পাগাচারে ভূষিতে বসে, বিভা
হর পথ না পাইয়া, তখন তপস্বীর প্রেরিত পুণ্য অগ্নি
এই পাগাচারগণ বাহুবকে উদ্ধার করে। বর্তমান
কালের পুণ্যবীর নবপ্রেরিত মহাসম্রাট মহাপ্রাচ্য পীড়া
একজন মহাপুণ্য। বর্ত্ত সমাপোচকগণ যদি জানপূর্ণ
দুষ্টি লক্ষ্য। বিচার করিয়া যেনেন তবে যেনেন যে
এতাবৎ বেলব মহাপুণ্য ও পদবীর বহুসমাপো
আবির্ভূত হইয়াছেন সে সকলকেই অতিক্রম করিয়া
গিয়াছেন পীড়াম—অচ্যুত, চিত্তাঙ্গিনীভাষ ও বহুবীরে
পূর্ণতার বিকাশে। তিনি পূর্ণ পীড়ামপূর্ণের বা পদ-
এতকবীরে চিত্তাঙ্গিনীকে পূর্ণভাবে প্রেরিত করিয়া আগাইয়া
গিয়াছেন। একথা বলিতে কিছুমাত্র বিদ্যা আনন্দের
নাই যে পদবীর বহুবীরে মহাপুণ্য, তপস্বীর বিদ্য, তপস্বীর
দুষ্টি প্রেরিত বর্ষপ্রবর্তকবীরে দুষ্টি ও বিদ্য বর্ষপ্রবর্তন।
হইতেও পীড়াম—চিত্তাঙ্গিনী, পীড়ামের বর্ষপ্রবর্তন। পূর্ণতার
ও বহুবীরে। পীড়াম যৌনিক বর্ষকে পদ করিয়া
নতন বর্ষের প্রেরিত করার স্পর্শ রাখেন নাই। বাহুবীরে

হুগবর্ষ—সত্যবর্ষকেই অশ্বিন ভাবে অশ্বিনের সমকে তুলিয়া
বহিবীরে প্রকাশিত তিনি করিয়াছেন ও করিতেছেন।
তিনি সত্যকেই ঈশ্বর বা বর্ষপ্রাচ্য প্রেরিতছেন বাহু
মানবের হুগবর্ষ—বাহু বিদ্যবর্তন।

উহার বর্ষের হুগবর্ষ :

"অগ্নি-সত্য সত্য অশ্বিনের ব্রহ্মবর্তন অশ্বিন।

পদীর-অশ্ব অশ্বিন সর্বর ভববর্তন।

সর্ববর্ষ সমাপন বহুব স্পর্শপ্রবর্তন।

হুগ একাঙ্গ সত্যবর্তন ব্রহ্মবর্তন অশ্বিন।"

বাহুব ব্যক্তিগত জীবনে যে ব্রহ্মবর্তন মাঝি চলিতে
চলি করে সমাপ জীবনেও যদি সেই ব্রহ্মবর্তন মাঝি
চলি করিয়া চলে তাহা হইলেই সমাপ বর্ষবর্তন ও বহিবর্তন
হয়। আবার সমাপকে নিরাত হোয়াট। কয়েকটি
সমাপবর্তনের চিহ্ন যদি প্রাচ্য ও বহুবর্তনবাহুবের ঈশ্বর
প্রেরিত করিয়া প্রকাশ চলিতে থাকে তবে তাহা ব্রহ্মবর্তন
বহুবর্তনবাহুব ও প্রাচ্যের বিভিন্ন প্রেরিত হইতে পারে।
পীড়ামি সেই মহাপুণ্যবর্তন পদবর্তনক। তিনি ব্রহ্মবর্তন
পদী রাখেন নাই। ব্রহ্মবর্তনকে তিনি সত্য ও অগ্নি-সত্য
ভিত্তির ঈশ্বর প্রেরিত করিতে চাহেন। এটি প্রেরিত
প্রেরিতহইয়া রাষ্ট্র রাষ্ট্র বহুব ও সামাজিকতার ব্রহ্ম স্পর্শ
গড়িয়া উঠিতে পারে। পীড়ামি সেই বহুবর্তন পদী
চলিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্মবর্তনকেই আত্ম ব্রহ্মবর্তন হইবে—সত্যকে
বর্ষকে সত্যাপ ও ব্রহ্মবর্তন প্রেরিত ব্রহ্মবর্তন সত্য
আদিত্য। বাহুবকে বর্ষ মনে করিয়া সত্যকে তুল
করিয়াছে সেই ব্রহ্মবর্তন সত্য সত্যকে পীড়িত করিয়া
তুলিয়াছে। এখন সেই ব্রহ্ম ব্রহ্মবর্তন সত্য হইতে হয়,
প্রেরিত ও আত্ম ব্রহ্মবর্তন হয়, বহুবর্তন সত্য। ঈশ্বর
করিতে হয়।

সত্যবর্তন
১৯৩৩

ধানভঙ্গ

শ্রীনিবাস চক্রবর্তী

—বাবা কী খেতে দিবি মা ?

—কলাভাতে, পুঁইশাক চুড়ড়ি, মটরের ডাল আর বড়ি ভাজা;—তুণী কণ্ঠে উত্তর এলো।

—হঁ, আদোষন দে অনেক করে ফেলেছিল।

—ঠাট্টা করছো বুকি বাবা ?

—না, না ঠাট্টা করবো কেন রে ? ভাতের সঙ্গে চাংটি সহজোজোর আদোষন, এ ক'জনের কপালে জোটে বল ? —মেহের প্রসন্নর ঘরবাড়ি বিতে বিতে গ্রৌঢ় বাবার মন চকল হয়ে ওঠে ; সে চাকলা ভাষা পাখি ছলছল চোখের চাহনির মাঝে। মেয়ে তা' লক্ষ্য করে।

মেয়ে একটু আঁধারের হুহে বলে—আজ্ঞা বাবা, তোমার তো কোনদিনই কোন ভিনিস পেতে সাধ বায়না; আজ সন্তা করে বলোনা তোমার কী খেতে ইচ্ছা করছে।

—হাত ? এমন এক পেলাস ঠাণ্ডা মল দিতে পারিস্ মা ঘা' বহনিন ধ'রে বুকুর মাঝে অমে-ওঠা ভুবা মুহুর্তে মিটিয়ে দিতে পারে ?

—বাবা, তুমি আমকাল সবার কাছে কেমন হৈয়ালী হয়ে উঠেছো, সহজ ভাষায় কথা ব'লেও তা' ব্রূতা কঠিন হয়ে ওঠে।

বাবা একটু গম্ভীর হাসি হেসে সহজ মেহের হুহে বলেন—শুধু সবার কাছে নয় রে, নিজের কাছেও হৈয়ালী হয়ে প'ড়েছি। কী বলি, আমি-ই কি সব বুঝি মা !

—কেন এমন হলো বাবা ? আগে তো এমন ছিলোনা।

মেয়ের প্রশ্নঘাতে বাবার মনের বেহুঁর তারগুলি ঝড়ত হয়ে ওঠে, কণ্ঠস্থর কণ্ঠ হয়, তিনি বলেন—সে অনেক কিছু ভাবে, কিছুই বস্তুতে পারেনা, অনেক কিছু চায়, কিছুই পায়না, তার হৈয়ালী না হতে উপায় কী !

মেয়ে এলম ঘোরালো কথার মর্ম বুঝতে পারে না। আলাপনের প্রসঙ্গ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আঁধারের হুহে বলে—বাবা, বাবা, তোমার আঁখ ভাঙা' স্থল্য দেগাচ্ছে। তোমার কাছে যে কবিরের গল্প শুনেছি—টিক সেই কবির

মডন। কাচাপাকা চুল, টামাটামা বড়ো বড়ো চোপ আলোড় উজ্জল, বাঙা মুখখানি কাচাপাকা দাড়িতে ভরা। ধাঁড়া বাবা, তোমার একটি প্রশ্নাম করবো।

অবশর না দিহে চিগ করে মেয়ে বাবার পায়ে প্রণাম করে পায়ের খুঁলা মাখায় বেধে। বাবার হিঁহ আঁখিকোণে বিষ্মু বিস্মু মল মনে ওঠে।

বাবা মেহের গালে মেহের আঘাত করে বলেন—তোমার মা তোমার নাম রেখেছিলো যদি; সার্থক হয়েছে তোমার নাম বাবা। তুই লড়াই অশ্বের নয়নের মণি, আবার নিরাজয় বিনের পরম আজয়। আমার কাছে আয় না, আমার বুক হাত দিয়ে জাপতো !

মণি ভাড়াভাটি বাবার বুক হাত দিয়ে ব'লে ওঠে—এ কী বাবা, তোমার বুক ধে দুবুধু করছে। তোমার বুকের কোন অঙ্গুণ হয়নি তো ?

—অঙ্গুণ একটু হরেছে বৈকি !

—ভবে কষ্টীকাকাকে একটু বেধাও না ; তিনি তো নতুন পাশ করা ভাঙার ?

—ওরে পাগলী, এ অঙ্গুণ আনন্দের অঙ্গুণ, যতোগল থাকে ততোগলই ভালো। জীবনে কাউকে আনন্দ দিইনি, আমাকেও কেউ দেখনি। কিন্তু তোমার এই ছোটো ছুটি হাতের মাঝে এত আনন্দ কোথায় লুকিয়ে থাকে বুঝতে পারিনি। তোমার এই ভালোবাসাই আমাকে পাগল ক'রে দেবে।

পাগল হবার কথা শুনে মেয়ে মিউরে ওঠে, ভয়ে ভয়ে বলে—পাগল হবার কথা বলোনা বাবা। তুমি পাগল হ'লে আমার কী হবে বলা তো ?

—ওয়ে ভয় নেই ; লড়াই আমি পাগল হয়ে থাকিনে। কাঙালকে যে রাষ্ট্রধর্মের ভূমিবে রেখেছিল—মারের মাঝে ভয় হয় এ আশার সইবে কি না ! কথার হুহ পরিবর্তন ক'রে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হয়ে বলেন—আজ্ঞা বলতো, আমি তোকে ভালোবাসি কি না ?

এ ধরনের প্রশ্নে মেয়ের মন অভিযানে ভরে যায়। কৃত্রিম কোণে সে ব'লে ওঠে—না, মোটেই না।

—এই তো তুই টিক ধ'রেছিলি মা। আনন্দ-বেধনা-

মোলা কর্তব্যের কৈশে ঘায়, তিনি বসন্তে থাকেন—সত্যি কথা বলেছিল যদি। জীবনে আমি কাউকেই ভালোবাসতে পারিনি, তাকেও না। তবে প্রাণোন্নতির আগিদে ভালোবাসার ছন্দ কর্তৃত্ব চলেছে অনেকবার।

মেঘে বাধার উত্তরণমায় উতিক্রমে প্রবাহ না দিয়ে বলে—খাব বাবা ওসব; আমি হাই, আমার রাসাবায়া কর্তৃত্ব হবে।

—বাসুদে শোন; তোমার বাবাকে তুই অন্ধের মতো ভালোবাসেই গেলি, তার স্বরূপ চিন্‌লি।

—চিনেছি, খুব চিনেছি;—সেবের কথা খাঙ্ক রাগের স্বাভাৱ।

—ভেবেছিলাম চিনেছিল; কিন্তু এখন দেখছি চিনিন্‌নি। জীবনে আমি কাউকেই স্নেহ হিইনি, ভালোবাসিনি। নিজের জীবনকেই ভালোবাসতে পারিনি, অপহৃৎ কেমন করে বাসবে! অগতঃ সেবেছি কর্তৃত্বের ভাৱ। তার ক্ষুণ্ণ সেবেছি অকল্যাণের ছবি, তার চোখে সেবেছি হিংসার কুটিলতা, বুকের স্পর্শে পেয়েছি ঈর্ষার উত্তাপ, তার চলার গতিতে অজ্ঞানের ক্রুর ছন্দ। মাহুতের জীবনটাকে আমার একঘেয়ে বাসনের মতো মনে হ'য়েছে। তাই লোকে বন্ধন বলে—‘কী জন্ম এই সংসার, ধর এট মানবজন্ম।’ তখন আমি হাসি সংবরণ করতে পারিনি।—বলতে বলতে বাবা সন্ধ্যার হেসে ওঠেন। চোখে মুখে তাঁর কঠোরতার বিদ্রাৱ খেলে যায়।

মেঘের তা' লক্ষ্য এড়ায় না, নিউরে উঠে সে বলে—আমি ওসব কথা বলোনা বাবা; তোমার অমন চেহারা দেখলে ভয় করে আমার।

সেই কঠোরতার পরে একটু সন্ধ্যার হাসি টেনে এনে বাবা বলতে থাকেন, তখনও তাঁর আবেগ রুদ্ধ হয় না।

—না, না, ভয় করলে চলবে না। এই ভয়ই মাহুতের সর্বনাশ। বাবা ব'লে বান—ভবু আমি জানি জন্মের বলে কিছু আছে কিন্তু সে মাহুতের মনের গোপনে। সে বেরিয়ে আসতে চায়, ভয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না পাছে অজ্ঞাত তার টুটি চেপে ধরে। এই ভয়কে মাহুতের আগে টুটি চেপে ধরতে হবে। লোকে ভগবান পাবার

অস্ত্রে সাধনা করে, কী তাদের সাধনা জানিনে। তবে আমি বুঝি ভয়-ভাণের সাধনার ব্যারাই মাহুত সেই ভগবানকে পাবার অপিতারী চ'তে পারে।

মেঘে কী বেন বলবার অস্ত্রে উজ্জ্বল হয় কিন্তু বাবার ভাব-গতীর ভাবনের চাপে তার কর্তৃত্ব হ'বে আসে। বাবা বলে যেতে থাকেন—সে অনেকদিন আগেকার কথা, তখন তোরা এ পৃথিবীর কেউ ন'স। সেদিন কে বেন কানে কানে ব'লে গেল, সবচেয়ে ভয় হচ্ছে অগতির শব্দন মেনে চলার ভয়। সবার চোখঝাড়ানী মেনে-চলা যে জীবন, সে জীবন বড়ো বিড়ম্বনাময়। তাই সেদিন তরল রক্তে প্রবাহের রাগিনী বেধে উঠেছিলো। ঠেঁচে-থাকার মতো বাচতে না পারলে সে বাটার কোনো নাম নেই: এই ভেবে অজ্ঞানের বিকটে বুক দোষ। ক'রে অগতে নেমে পড়লাম। সবাইকে আমার বেধনা বুঝতে চাইলাম। কেউ শুনলো, কেউ শুনলোনা; কেউ লাড়া দিয়ে পালিয়ে গেল, কেউ সাড়াই দিলোনা। শুধু জীবনে কত বিকৃত হলাম। বা' চাইলাম পেলাম না, বা' ছিলো তা'ও হারালো। তাই হোর আম এই কথা।

মেঘে বাবার কথা মর্ম বোঝে না। বাবাও তাকে পরিত্যক্তভাবে বুঝতে চাননা। এমনভাবে অন্ধের অতি কাছাকাছি এসেও বাবা মেঘের কাছে হেঁসালী থেকে বান। মেঘে বাবার পাল্‌ল্যামীর প্রবাহ না দিয়ে বলে—তোমার আত্মকাল আবার অন্ধের অন্ধ বেড়েছে। আমি হাই, সকাল সকাল রাসাবায়া মেরে তোমার বাবার ব্যবস্থা করিগে। এই বলে মেঘে চ'লে যায়।

সারামিনের কাকতবর্ধের পর সন্ধ্যাবেলা সকাল সকাল বাওয়া বাওয়া মেরে মেঘে বাবার কাছে এসে বসে। ছোট একখানা সত্তরকির পর একটি মহলা বালিশে ভর দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বাবা একখানি ‘গীতা’ খুলে মনে মনে পড়েন। মেঘে পাশে ব'সে বাবার মাথা হুলের মাঝে হাত বুলিয়ে নিতে থাকে, কখনো বা পা'দ্বানি ঠেপে।

সহসা উত্তেজিত হয়ে বাবা মস্তকবে আবৃত্তি করেন—

‘পরিত্যক্তায় সাধুনাম বিনাশত চ হৃৎকৃত্যু

ধর্মসংস্থাপনার্থে সত্ত্বানি হৃগে হৃগে।’

যেহেতু অর্থবোধ হয় না, অর্থাৎ হ'য়ে বাবার মুখের পানে চেয়ে থাকে। তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন—বুদ্ধিগণে, শ্রীভগবান নিকে বলেছেন—অজ্ঞানের অজ্ঞাতাচারে পৃথিবীর মাল্লখ হবে অজ্ঞানিত হ'য়ে উঠবে, অর্থবোধ কাছে দূর হবে লাক্ষিত, তখন দ্রুততমের নাপ ক'রে শাস্ত্রের উপায় এবং ধর্মপালনের ক্ষেত্রে আমি আসুবো এই পৃথিবীতে ধূলিমাটির মাল্লখ হ'য়ে।

—কতোদিনে তিনি আসবেন বাবা?—যেবে প্রায় করে।

যেহেতু অজ্ঞানের লাড়া পেয়ে তিনি বলেন—আগে তাঁর আসবার কল্পে আসন তৈরী ক'রতে হবে তো! কিন্তু আমাদের সিরে আর কিছু হবে না। আমরা শুধু ভীতবৎ সননগত সিরে পথ একে রেখে গেলাম সেই মহানারকের আবির্ভাবের ক্ষণ।

যার তাঁর মধ্য হরে আসে তবু সে উজ্জ্বলের গতি কণ্ঠ হয় না—জানি না, আমি পিতাখানি নিয়ে যখন বসি আমার পাননে প্রত্যক্ষ হ'য়ে ভেগে ওঠে শ্রীকৃষ্ণ সেই অনাগত পুরুষোত্তমের অচর মূর্তি।

বাবার কথার অর্থ না বুঝলেও যেহেতু সমস্ত প্রাণ সিরে পোনে সে কথাগুলি। কী যেন রহস্যময় ইমিত তাঁর অপরিসৃত মনকে উবেল ক'রে তোলে। অসংলগ্নভাবেই তাঁর মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে আসে—ভগবান আসবেন সাধারণ মানুষের মতো?

গভীর করে বক্তব্যকে দৃঢ় ক'রবার ক্ষেত্রে তিনি অর্থবোধ দেন—নিশ্চয়ই, বেশ হবে তাঁর সাধারণের চেয়েও সাধারণ কিন্তু উদ্ভেদ হবে অসাধারণের চেয়েও অসাধারণ।

যেহেতু চোখ থেকে বিশ্বের বিরলতা উঠি যায়। বাবা তাঁর জ্ঞানের ডাবকে বাইরে রূপান্তরিত ক'রবার প্রচাসে বলেন—কতোদিন বাচবো আর; আমি ঠিক ক'রেছি তোমার একটি বিবে বোবো। তুই কামনোবাক্যে তাঁকে কামনা ক'রবি; তোমার কামনা আর আমার ইচ্ছাপত্রের টানে তিনি তোমারই কোল আলো ক'রে আসবেন।

যেহেতু মুখ লক্ষ্যের রক্তিমাতা দেখা যায়। সে বলে—একথা এখন থাক বাবা।

বাবা তাঁর সত্যোচ-ভাব লক্ষ্য ক'রে বলেন—না, না, এতে লক্ষ্যও কিছু নেই; ভগবান নির্বিকার, নিরহঙ্কার। তিনি আসবেন সাধারণের যেরে অসাধারণ শক্তির অধিকারী হ'য়ে। তাঁর কাছে ভাতি নেই, ছোটবড়ো নেই। অকপট আকৃতি নিয়ে যে তাঁকে আবাহন ক'রবে, ভাতিধর্মের অবিচারে তিনি সেই যেরে শিত হ'য়ে আসবেন।

—বাবা, রাত অনেক হ'য়ে এলো, শোবে চলো। তোমার বাবা গরম হ'য়ে উঠেছে।

—না, না, যখন আমার অনেকদিন থেকেই ছেড়ে গেছে। যাকে মাকে তন্ত্রা চোখ চুল আসে। স্বপ্নে যেহেতু আনন্দে তন্ত্রা চেয়ে বাব। হ্যাঁ হ্যাঁ ব'লছিলাম—তিনি আসবেন সারা ভারতের মুক্তির মাঞ্চল্যের ভাতি হাতে। আমি যততো এ অল্পে যেহেতু যেতে পারবোনা। তবে আমি তাঁকে দেখবার ক্ষেত্রে আমার ক্ষম বোবো এই পূণ্য ভারতভূমিতে, বরিশের নগনমণি হ'য়ে।

যেহেতু জানে তাঁর সমস্ত বাবার দুর্লভতা। তাঁর ভাবাবেগ নানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে যেহেতু ভাবে নিরন্তর করা প্রয়োজন; তাই মারগত হেনে ব'লে ওঠে—বাবা, আমার শরীরটা পরাপ লাগছে, আর ব'সতে পারছি নে।

—আচ্ছা, চল চল শুবি; হুঁফো বাবার কাছে থেকে তোমার কী কী হয় আমি বুঝি। কী ক'রবো শাখা নেই তা' মোচন ক'রবার। তাকে কমা করি না।

অজ্ঞানের মাক্যমাকি। ভরা শ্রীতকাল না হলেও এ সময়ে মাক্যমাকির আবহাওয়ার আলর শ্রীতকালের করণ আভাস পাওয়া যায়। মুরলীধরবাবুর অনেকদিনের অজ্ঞান ব্রাহ্মবৃত্তে শব্দাত্যাপ ক'রে নির্জনে ইষ্টনাম জপ করা।

যেদিন শেষ রাজি; মুরলীধর শব্দা ছেড়ে বাইরে এলেন মুখ গোবার ক্ষেত্রে। গারে একখানি কলম লড়ানো। হুতবাস্য যেহেতু ঐশ্বর্যময়ী অতীতের বিশ্বত মাকি। মাকির একটি ভালো থেকে খটি ভ'রে মল সিরে চোখেমুখে দিলেন। মোমা হ'য়ে ঈড়্যতেই তাঁর অচকল চাহনি পেল প্রানকর

শোভমান নীল নভোপটে। স্তম্ভ জয়োদশীর চাম হেসে
প'ড়েছে বনরাঙিনীল পশ্চিম দিগন্তে। পুণ্যচলে
স্বকভার্যার চোখে তিনি নিশিত তোরণ পাতে আলোক-
অতিথির আগমনীর আভাস। মুরলীবাবু অথাকনেহে
সেদিকে চেয়ে হুঁহাত তুলে প্রশ্ন করলেন। তাঁর
নাতিমূল থেকে স্পষ্ট হ'য়ে কণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো—

‘অবাহুস্থল লক্ষ্যঃ কান্তপেদঃ মহাত্ম্যাত্ম্ণু

ধ্বজ্যাজিঃ সর্বপাপহঃ প্রণতোহস্মি বিবাকরম্।’

যবে এসে প্রবীণ জেলে তাঁর বোণাসনখানি হুঁজতে
লাগলেন। এই বোণাসন বাঘছালের। বৌবনে তিনি
হিংস্রমহুগিকার প্রিয় ছিলেন। এটি তাঁরই নিজের হাতে
মারা একটি বাঘচালে তৈরী।

একহাতে বোণাসন অপরহাতে প্রবীণ নিয়ে তিনি
অভাষ স্বানের পানে চ'ললেন। একখানি মায় ভীষ
আটচালা ঘর। সেই ঘরেই তিনি ও মেয়ে দু'জনে
থাকেন। ঘরের পূর্বদিকের জানালার সামনে তাঁর
অভাষ ঘান।

মণির শিরে নিয়ে যেতেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন।
পলা পর্বত একখানি পাতলা কাঁধা মুড়ি দিয়ে মণি ঘূমিয়ে
আছে। তাঁর মুকের পানে চাইতেই মুরলীবাবু চমকে
উঠলেন। সাতা দেহ অস্পষ্ট ভাবের শিহরণে বোম্বাঙ্কিত
হ'য়ে উঠলো।

মিটিমিটি প্রবীণের আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে
মণির মুখখানি। তাঁর লাগনা-চলচল উজ্জ্বল মুখমুহুরে
বহুদিনের তুলে-বাওরা এমনিতরো একখানি মুখপ্রিয়
ছায়া। মণি দেখতে অবিকল তাঁর মায়ের মতো।
মুরলীবাবুর হাত থেকে প্রবীণটি প'ড়ে নিতে গেলো।

অনেকদিন আগেকার কথা। মহাস্ত্রা গাছীর অসহযোগ
আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদানের ফলে তিনি
সাজবোঝে কবলিত হন। বিচারে দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
হয়। যখন জেলে বান তখন মণি তাঁর মায়ের গর্ভে
এসেছে।

মণির মায়ের একমাত্র ভাই সে খবর পেয়ে বোনকে
বাড়ীতে নিয়ে যান।

মণি গণ্ডে পা নিয়ে এসেছিলো; তাঁর জন্মের পর
প্রপতির হয় মৃত্যু। মুরলীবাবু তখন ঢাকা খেটুল
জেলে স্থানান্তরিত হ'য়েছেন। মণির মামা এ সংবাদ
মুরলীবাবুর ঠিকানায পাঠান। ‘সেন্দূরভ’ হ'য়ে তাঁর
হাতে পৌঁছতে প্রায় বিন পনের লাগে। আনন্দের
প্রলেপ-বেগা বেহনাবহ শত্রুখানি প'ড়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে
তিনি ব'লেছিলেন—সে আমার সর্ব্ব হ'য়ে নিয়ে গেল
তবু আমারকেও একেবারে নিঃশ্ব ক'রে রাখনি।

বিস্মৃত স্মৃতিকে মন থেকে কাড়া দিয়ে কেলে মুরলীবাবু
আবার প্রবীণটি জেলে থপাফানে গেলেন। আদমখানি
পেতে পুখুখো হ'য়ে ব'লে ইষ্টদেবের মূর্তি মনে এনে
তিনি ধ্যানস্থ হ'লেন।

ইন্ডিরে বহিমুখী ক্রিা নগর হ'য়ে আশুতট আন্তিক-
অস্তর উষল হয়ে উঠলো। চেতনা কীপনয় হয়ে এলো।

বেশীকণ না যেতেই পোষ ইষ্টদেবের মূর্তি ধ্যান-নগরের
মুখ থেকে দীর্ঘ দীর্ঘে মিলিয়ে গিয়ে সেখানে ভেসে
উঠলো প্রিবাক্রপদী নারীমূর্তি। কবপ্রকাশমান মায়ের
মাথল্য-মোহিনী নারীমূর্তি। মণির মাথের ছবি। শ্রেয়
ও প্রায়ের এই অভেদ স্পর্শ—এ মূর্ত্ত কীভাবে দু' কন্ড
আলে।

চৈতন্য ফিরে আসতেই নিজের গবে তাঁর শিরক্তি
এলো; ধ্যান-ভাঙা ঝাঁখিগুণ জলহলহল হ'য়ে উঠলো।
ইষ্টনাম জপে আর কোনোদিন এমন বিয় ভো খটেনি।
তবে আজ কেন এমন হ'লো। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হ'য়েছে
ভেবে বাইরে গিয়ে চোপে মুখে মাথায জল দিয়ে আবার
বসলেন ধ্যানে। এবারও সেই একই বিষ। দেহতার
ঠাই প্রিা এসে মথল ক'রে নিলো। সেহিনকার মতো
খ্যানভঙ্গ হ'লো।

এদিকে বাইরে ফস' হ'য়ে এসেছে; দুর্গ-লাবণী
অকণের রক্ত উকীলের অগভাগ দেখা দিয়েছে পুণ্যচলে।
মুরলীবাবু জানালা দিয়ে দেখতে গেলেন ককেকন লোক
লাঠি-হাতে কী যগাবলি ক'ছে।

বহুতা বুলে বাইরে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ও
কারা ওখানে?

একজন হিন্দুধর্মী পুলিশ এগিয়ে এসে বললো—ক্যা অ্যাপ্ মুরলীধর ?

—চোপ্, বেকুপ্ ; বোলো মুরলীধরবাবু ।

দুর্ভাগ্যময়ী ব্যক্তির সাথে চোপোচোপি হ'তেই সে মাথা নীচু ক'বলো । একজন বাঙালী পুলিশ এসে নমস্কার জানিয়ে ব'ললো আজ্ঞে আপনার নামে একথানা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে ।

তখন বিশ্বাশী দ্বিতীয় মহামুন্দের বিভীষিকা । তারতবর্গে তার চোটে লেগেছে । বর্ষা ঋণানের করকবলিত । কলকাতার বোমা প'ড়েছে । শাসক কর্তৃপক্ষ পুরাতন দেশসেবীদের সম্বন্ধ ক'রে গ্রেপ্তার ক'রে কারাবন্দী ক'রুছেন—পাছে তাঁরা কেউ নজর সচর হ'য়ে পড়েন ।

পরোয়ানাখানি হাতে ক'রে মুরলীধর ব'ললেন—আরে স্বধীর বে । এসো, বোসো । তা তুমি আগে না এসে ঐ বেকুপটাকে পাঠালে কেন বলো তো ? ওরে মণি, স্বধীর এসেছে ।

মুরলীধর বখন টুকুমারীর ছিলেন, স্বধীর ছিলো সেট ইন্সপেক্টর দল্লী । ইন্সপেক্টর কালে অনেকদিন সে এসেছে এ বাড়ীতে ; মণি তখন ছোটো ছিলো—তাকে স্বধীরলা ব'লে ডাকতো ।

সামান্য বেতনে পরিবার প্রতিপালন না হওয়ায় ইন্সপেক্টর চাকরী ছেড়ে দিয়ে স্বধীর পানবিড়ির দোকান ঘেঁষে স্থানীয় বাজারে । পরে মুন্দের প্ররোচনে বখন অনেক লোক নেয়া হয়, তখন স্বাভাব্য স্থপাশিমে সে পুলিশে ঢোকে ।

বাঙালী পুলিশ স্বধীর আমতা আমতা ক'রে বললো—আজ্ঞে, যেহেতাবাবু সঙ্গে আছেন ; তিনি ললিতাবাবুয়ের বাড়ীর ওখানে আছেন । আপনাকে শীঘ্রই নিয়ে যাবার কথা ।

মুরলীধর বেলে বললেন—ও ললিতেরও বৃত্তি তাক প'ড়েছে ? একটু পাড়াও বাবা, আমি মণিকে বলে আসি ।

ঘরে উঠতে উঠতে মণিকে ভেঁকে বললেন—ওরে মণি, আজ ভোরে আবার বাড়ীতে রাখুত এসেছে । আমার বড়ো শুভদিন । আমাকে এবনি হেতে হবে ।

মুম-ভাঙা চোখে মণি উঠে এলো । ব্যাপারটা সে ভালো করে বুঝতে না পেরে বললো—কী ঘেছে বাবা, তুমি অমন অস্থির হ'য়েছো কেন ?

—রাজার ডাক ; আমাকে একুনি হেতে হবে । ঐ জাপ রাখুত বাড়িবে । ভোর স্বধীরলা রাখুত হ'য়েছে বে ।

—বেশ তো ঠাা বহন । তুমি হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে যাও ।

—সে কি হয় মা ? আমার বেতে ঘেরী হলে ভোর স্বধীরলাকে জবাবদিহি ক'রুতে হবে ; ওর কতি হবে বে ! আমার লাঠিখানা এনে দে যা ।

মণি লাঠিখানা এনে দিলো । বড়ো অহুগত সহচর এই লাঠিখানি । বহন ধ'রে সম্পূর্ণ বিপদে সে লম্ব দিয়ে এগেছে । ওর বিরহ তিনি সইতে পারেন না ।

স্বাভাব্য বেলায় তিনি ব'লে গেলে সে তিনে তিনি মণির মাঝার কাছে চিঠি দেবেন মণিকে তাঁর কাছে নিয়ে রাখ'তে ।

মণি তার বাবার ভাষা-বিপর্কের ব্যাপারের সঙ্গে পূর্ব-পরিচিত । সে পুলিশ-বেসিত বাবার গতিপথে চেখে হইলো । বার বার মনে হ'তে লাগ'লো । স্বধীরের কথা । সেই স্বধীর বাকে সে বড়োদিন নিজে হাতে ধাইয়েছে । ক'দিন পুলিশে চাকরী নিয়ে এত নিষ্ঠুর হ'য়ে গেছে সে ।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশক্রমে মুরলীধর নিরাপত্তা রাখবন্দী হ'য়ে কিছুদিন বশোর জেলে থাকেন ; তারপর এইতপ রাখবন্দীর সাংখ্যিক হওয়ায় তাঁদের কয়েকজনকে আলিপুর পেট্রোল জেলে স্থানান্তরিত করা হয় ।

বশোর জেল থেকে পরে মণির মাঝার কাছে দমত জানিয়ে কোনো ফল হ'লো না । তিনি ছিলেন মুরলীধর এর কাছের ঘোর বিরোধী । তিনি বহবার বলছেন যে দেশদেবোটেবা সন্দেহ বড়লোকের স্বামখোদার কাম । গরীবের ও 'ঘোড়াবাই' লাভে না । সে উপদেশ মুরলীধর পরে কর্ণকরী না হওয়ায় তিনি শেষে দমত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রেছিলেন ।

মণির বাবা এককালে বেশ স্বচ্ছল ধানীপানী গেরত ছিলেন। কিন্তু বৈমরিক কুটুম্বির অভাবে সন্তকের ছলনা ও নিষ্কের উদার মনোভবির চরিতার্থে সব গিরে এখন আছে শুধু একটি আমকীটালির বাগিচা আর সামান্য কয়েক বিধা ক্ষেত বাসার।

ভাগ্যবীরা চাব আবার ক'রে ভাগের ভাগ বা' খেজার দিরে যায়, তাতেই বাপ ঘেঁষের গ্রাসাচ্ছাদন চলে। নগর আয়ের মাঝে—আমকীটালি বিক্রী ক'রে বা' হয়।

মণি বাড়ীতে একা। অভাবত: সে লাজুক এবং হরিবীর মতো। ভীকগ্রাসা, তার দুখে ছুখী হবার মতো কেউই নেই। তারপর নিষ্কের হুং আনিরে পরের সাহায্য চাইবার মতো প্রগল্ভতাও তার নেই।

গৌকের দাবামাত্রি, আমন ধানের মরমুদ। ভাগ্যবীরা দেব ধানের অংশ এনে উঠোনে ঢেলে দিরে যায়। মণি সাগাদিন ধ'রে কুলো কাড়া ক'রে সেগুলি ঘরে তোলে। কাছের চাপে কোনোদিন দুপুরে বাওচা হয়, কোনোদিন হয় না। সাগাদিন কাছকর্ম ক'রে লভ্যা বেলায় কেনাভাত রেখে যায়। তারপর মরমুদ বন্ধ ক'রে ঘরে শুয়ে বক্রিচক্রের উপভোগ নিরে পড়ে। বাবার কাছে কিছু বাংলা লেখপেড়া শিখেছিলো; তা' দিরে বাংলা বই প'ড়ে মোটামুটি ভাবগ্রহণ করতে অনুবিধা হয় না।

গ্রামের নতুন পাশ-করা ডাকার ফকীবাবু মুরলীধাংক আত্মরিক প্রভা কহুতেন। তিনি সমস্ত জানতে পেরে 'কলে' বাতায়নের পথে মৈনিক দু'একবার এসে মণির অনুবিধা-অনুবিধা জেনে বেতেন। বাজার থেকে কোনো জিনিসপত্র আনবার মরকার হ'লে বাড়ীর লোক দিরে আনিরে বিতেন।

পাড়া গাঁ; গ্রামাভীবন এবং মহুর জীবনের তথ্য নিরে ধারা মহুরে ব'লে প্রবন্ধ নিরে গ্রামা লোকদের মহুরবাসীদের চেয়ে অধিকতর মরল এবং পরভূৎকাতর ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত ক'রে রাস বেন, বা বাক্যবহন বক্তৃতা দিরে লভা হাততালি পান, উত্তর অনেকেই অর্প-শিক্তি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'অজ্ঞ'। কালেকশিন্ পায়ে

এলেও আভিকাতোর ক'রে গাঁয়ের লোকদের মাগে মেসামেশি হয় না।

পাড়াগাঁয়ের চমকপ্রদ দিবর চ'ক্ষে তার গ্রামা-ব্রাহ্মনীতি। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মনীতির আসরে ধারা ব্রাহ্মণ্যাত, উত্তর ও পাকা গ্রামা ব্রাহ্মনীতিবিশ্বের বুদ্ধির মধ্যে এঁটে উঠতে পারেন কিনা সম্ভব। অগত এঁদের অধিকাংশের বৈমনিষ জ্ঞানচর্চার বিষয়বস্ত্র চ'ক্ষে শবের হুং শোনা শবরের কাগজের শবর আর অনুকের দিন আনকাল কেমন আছে—এই।

মণিরের গ্রামের নাম তৈলকুণ্ডী; মরকুনা মহুর ক্রিনেবা থেকে মাইল নরেক দূরে। একদিন এই গ্রামে বনে বনে শব্দে সম্পদে সন্তুষ্টিপালী ছিলো। আজ সে জনহীন জনহীন অশ্মান সমতুলা; বনে ভরলে পরিপূর্ণ; বেগানে একদিন সভা মাছুরের জুগাবান ছিলো সেখানে আজ হিম্মত বগ্যগ্রাস্টের রাসমরমুদ। প্রভৃতি পরিশোধ নিরেছে। কালের বিপুল বহুভূৎপেথের মাছুরের বিগাট স্রুটি বিকল হ'য়ে গেছে।

তৈলকুণ্ডী গাঁয়ের প্রধান হুংকন ভগ্নোপলমাব্য। বরলে বুদ্ধিতে প্রবীণ, বসে ও হুংকন নরী। নিষ্কের দ্রব্যাক্রমি নিরে বর মাংসা ক'রেছেন; কিতেরেচন, হেংকেরেচনও। পরম্পর হুংকন কাশচাতুর্টি দিরে ঘোকদমা বাঘিরে বে পক স্রুটি হ'য়ে সেট পক্ষকে আইনের পরামর্শ দিরে নিষ্কের স্বার্থ দিতি ক'রেছেন। সর্বোপরি তিনি স্বানীয় উইনিধন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। গাঁয়ের লোকে তাঁকে ভক্তির চেয়ে ভয় করে বেশী। পায়ে প'ড়লে অনেক নিরীহ প্রতিবেশী প্রণামী দিরে তাঁর পরামর্শ নিতে আসে। প্রণামীর তাগতমতা অনুপারে উপদেশ দিরে পাকা গৌকের ক'রে চোরাহাসি হেসে বলেন—বাবাজী, মংসারী হ'লে না তো তা' আর বুদ্ধি পাকবে কী করে! ছাখো, মংসার দম করতে করতে আমার চুল সাধা হ'রে গেল শুধু আমি-ই বা কতটুকু বিষয়বুদ্ধি রাধি।

মেদিন দুপুরে মণি বাওচা দাওচা সেবে ঘরে গেছে এমন সময় এঁদের মতল তার ভাগের ধান ঢেলে দিরে

গেলো। বিজ্ঞান করা হ'লোনা; মণি ফুলো নিয়ে ধান ভাড়াতে বসলো।

কষ্ট ভাঙার 'কন' থেকে কিয়ে বাবার পণে ওদের বাড়ীতে এসে কিছুকণ কথা বলে বেগিরে প'ড়লেন, এমন সময় ভয়গোপালবাবু চ'কো হাতে ক'রে গলার খাঁকর দিতে দিতে এগিরে এসে বললেন—বলি, কেমন আছো নাতনী।

গ্রাম সম্পর্কে মুরলীবাবু এঁকে খুঁজামণার বলে চাকতেন শেট হয়ে মণি ভাকো হাড় বলে।

আচমকা মণি চেয়ে দেখলো ভয়গোপালবাবু। কোনোদিনই তিনি তাঁদের খোঁজ খবর নেন না। অথচ আজ দরদীকণ্ঠে কুশলপ্রশ্ন শুনে তার বিস্ময় হ'লো।

হিঁক হুলগুলি পিঠের পর ছড়িয়ে যেতে বললো—ভালো আছি বাহু।

—কী এসেছিলো হুঁজি? ওকি আমার বেগে চ'লে সেলো?

—না বাহু; কাকাবাবু কল' থেকে কিছুবার সময় বা 'কলে' বাবার সময় আমার খোঁজ খবর নিয়ে ধান।

—তা' তো ব্যববই। কার মেয়ে তুমি? মুরলীর মতো ছেলে এমন দলখানা ইউনিয়নের মাঝে নেই।

বাগাও প্রশংসায় মণি চুপ ক'রে রইলো। ভয়গোপাল বাবু কিল্লাসা কবুলেন—ভাগ্যবীরা ধান দিয়ে গেছে হুঁজি? তা বেগে টেপে নিয়েছো তো?

ধান ভাড়াতে ভাড়াতে মণি বললো—ওরা বেগেই দিয়ে গেছে।

তোমাকে ছেলে সাহুবে পেলে ঠাকতে পারে তো?

সরলপ্রাণ সে; দুঃস্থতে পারেনা—কাউকে না ঠকালে কেউ কাউকে ঠকতে পারে। একটু হেসে সে বললো—আমরা ওদের ঠকাওনিতো বাহু। তা' ছাড়া বাবাও কোনোদিন নিজে বেগে নেননি।

তা' বেশ; ধান বাগছো কোথায়, ঐ ভাড়া ঘরে হুঁজি? বুকের জন্তে ধানের ধান বা' বেড়ে উঠছে; তারপর এ বিকের লোকের ভাবগতিক তো জানেনা। আমার তার ছর চোরের নকর টকর না পড়ে। তুমি

বহুবা ঘেবে, ভগবান না ককন, একটা চোচোটি হ'লেও তো লজ্জার কথা।

মতিাই তো ঘর ভাড়া; বাড়ীতে সে একা মেয়েমাছ। চোর এলে সে কী ক'রতে পারে! অথচ এটাই হচ্ছে তাদের সারা বছরের সম্বল। মনে তার কালনিক ভয়ের লগ্না হ'লো। ভীত কণ্ঠে সে বিজ্ঞাসা করলো—তাঁহ'লে কী ক'রবে বাহু?

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ মণির সামনে হাত পাঁচেক হুরে দিয়ে বললেন।

—ওকি, আপনি ঘাটতে বললেন যে বাহু? আমি আসন এনে বিজ্জি।

—আরে নাতনী, চ'য়েছে। একটা আবার নিষেধ বাড়ী। তার চেয়ে তুমি আমার একটু আগুন এনে দাও।

কলকেটি নিয়ে স্নায়বর থেকে আগুন ঘিরে হুঁ মিতে মিতে সে বেগিরে এলো। মৃদু আগুনের পিথার তার তকণ মুখখানি অপরূপ আভার উজাসিত হয়ে উঠলো।

বৃদ্ধ কলকেটি মিতে মিতে বললেন—আহা। নাতনী, এই ঝাঁপী খেটে খেটে তোমার পাকা জালিমের মতো মুখখানি কেমন শুকিয়ে উঠেছে ভাবো তো।

কোনোদিন কোনো পুরুষের মুখ থেকে সে তার ক্রূরের কথা শোনেনি; সে ছাত্র আকাখাও জাগেনি মনে। একমাত্র বাবা ছাড়া আর কোনো পুরুষের সম্বন্ধ সে পায়নি। তবু আজ এই বৃদ্ধ বৌবন পঙ্কশী বৃদ্ধের মুখ থেকে তার জগের প্রজ্ঞার প্রশান্তি শুনে কণিকের জন্তেও তার রক্তপ্রবাহ চকলতর হ'য়ে মুখ লামগতিম না হ'রে গেল না।

বৃদ্ধের কোটরগত চক্ষুগজর থেকে একটি হিংস চাহনি বেরিয়ে এলো। অসম্বল মুখে ঝোঁর করে একটু হাসি টেনে বললেন—নাতনী আমার লজ্জা পেয়েছে বেশি। আরনাথ তো একবার মুখখানা দেখলে না।

মণিকে নিরুত্তর মেখে তিনি প্রলম্ব পরিবর্তন ক'রে বললেন—বাক' বা' দলছিলান। তোমার বাবা বাড়ীতে নেই। সে বা' হোক আমাকে বুড়ো ব'লে লজ্জা ক'রতো।

তোমারি অহুবিধে তো আমারই সেবা উচিত। মইলে
কিরে এসে আমার মন্ড বসলে আমি কী করার
হবে!।

মণি ধান কাড়তে লাগলো। হঠকোর কয়েকটি হুঁটান
দিয়ে খাতস্থ হ'য়ে ভয়গোপালবাবু বিনিধে বিনিধে বসতে
লাগলেন—তা' তোমার অন্যত না হ'লে আমার পক্ষের
ছোটো গোলায় তোমার ধান রাখতে পাঠো। আর
তোমার একটা পেট, ও বা' চাল লাগে আমার বাড়ী
থেকেই নিয়ে এশো। তোমার বাবা এলে তার সঙ্গে
হিসেব টিসেব হবে।

সেদিন বিকেলেই ভয়গোপালবাবু বাড়ীর চাকর এলে
মণিদের সমস্ত ধান ওবাড়ীর গোলায় নিয়ে তুললো।

মণির দিন কেটে যেতে লাগলো। ঘরে তার বাবা
মায়ের একখানি ধূপ ছায়া-ছবি বাঁধানো ছিলো।

বাড়ীর সামনে তারই হাতে লাগানো গাধা হুলের
পাছ। ঈশ্বরের মারিতাবে তাবের শাখার শাখার তবকে
তবকে পুষ-সমারোহ। মণি গাধা হুলের মালা পেঁখে
সমর কাটায়। গাধা হ'লে বাবা-মায়ের ছায়া-ছবির
পথপ্রান্তে গিয়ে সেই মালার সবধন অর্ঘ্য নিবেদন করে।
ছবির দিকে চাইতেই তার নববৌবনহুন্ন মরনমূলল অবাঙ্ক
বেদনাঃ সমল হয়ে ওঠে।

মাকে সে দেখেনি। পাড়ার লোকের মুখে শুনেছে
তার গুণবতার কাহিনী। মোহারা চেহারা, হালির
সারলা-মাধা বায়েছোজল মুখখানি, অশ্লক চাহনিতে
অশ্লক-সোতা স্বপ্নার কস্তারার অভিযুক্তি। যা যেন
জীবন্ত বৈধীভূতি। এমন মায়ের মেয়ে সে—ভাবতেই
বিধুর আনন্দে তার অকলুষ অন্তর আলোড়িত হ'য়ে ওঠে।
সে আনন্দবোধের কাছে তার হুঁখাচ্ছন্দ্যহীন প্রাত্যাহিক
জীবনের হুঁশ হুঁশার শ্রুতি তুচ্ছতার হ'য়ে যায়।

জোরে উঠে সেই হুঁশ ছায়া-ছবির নীচে একটি বিনয়
প্রণাম রেখে ঘরঘোর ও উঠানে ছড়াক'টি ঘেব, রান্নাঘর
নিষ্কোয়। বৈদিককর বরাদ্দ আদরের চাল ওবাড়ী
থেকে নিয়ে আসে। পীরের পুরাণো স্ত্রি বলার মাকে
দিয়ে হাট থেকে হুঁটার পয়সার তরীতরকারী এনে

থাকে। দুপুর বেলা খেতে খেতে বেলা প'ড়ে যায়, রান্নার
উষ্ম অংশ কিছু রেখে দেয়—রাতের ভঞ্জন।

কাস্তনের শেলাপেশি। নামে বসন্তকাল, ঈত বেশ
আছে। কবির বসন্ত বর্ণনার সাথে বাংলায় বসন্তকালের
বড়ো মিল নেই। বসন্তের বাস্তবত্ব এখানে ব্যাধির
করালমুতি। তবু হুঁ'একটা পথভোলা কোকিলের ডাক,
আচমকা গরম হাওয়া মার্চ-ভরা ভাঁটিগুলের যেতোজ্ঞান
আবের বোলের গন্ধ,—এরই পিছনে বিশেষণ এবং
সুপথে আরোপন হুঁতে বাগানী মনে মনে কত-বিলাস
করে! অশ্রু ব্যাধির বীষবাহী মাদির উপহাসে খাত
বিষাক্ত হয়ে ওঠে। ননী ও কুণের জল শুকিয়ে
যায়, অলহ তুচ্ছার বিস্তৃত প্রাঙ্গণের বুক কেটে চৌচির
হ'য়ে ওঠে।

সেদিন দুপুরে শুধু শুধু মণি বসন্তকালের 'রক্তকায়ের
উইল' প'ড়েছিলো। যাব যৌবনা রোহিণী পুহরঘাটে
চলেছে; পাছে বসন্ত কোকিল ডাকে—হু-হু, হু-হু।
রোহিণীর কাছে কোকিলের ডাক বাঘের মতো মনে
হচ্ছে! পড়তে পড়তে সে রোহিণীর সাথে একত্র হয়ে
ওঠে। বাইরে তখন একটা কোকিল মাকে মাকে ডেকে
উঠছিল—হুহ-হুহ। সে জানে না যে সেও অতুল-যৌবনা
রোহিণীর মত ভরা যৌবনের সিঁড়ি বাধা ঘাটের পথে
চলেছে। তবু বাইরে কোকিলের ডাক, মনে রোহিণীর
শ্রুতি ঠাঁকে উন্নয় না করে ছাড়ল না।

প'ড়ে চ'লেছে সে, রোহিণীর চরম পরিণতি গোবিন্দ
লালের হাতে মরণ-বরণ। যে গোবিন্দলালের কাছে সে
চেরেছিলো নব জীবনের সমুদ্রভাষা, যে গোবিন্দলালকে
রোহিণী তার বৌদনের মণিমন্দিরের বর্ণ বৈধীতে বাপনা
ক'রে শেখতাবোধে দীর্ঘদিন ধ'রে নিভৃত অঙ্গভঙ্গে পূজা
ক'রেছে, সেই দেবভাষা এমনিতরো বিচার-বিপণ্য।
মণির মাকেবার হুঁত বসন্ত ব'লে উঠলো—লেখকের এ
ভারী অন্তর। ভালোবেসে রোহিণী অপরাধিনী হ'তে
পারে না; ভালোবাসার অশ্রুভূ মটিয়ে অপরাধী
গোবিন্দলাল।

এমন সময় 'বলার মা' উঠানে এসে ভেঁকে বস্লে—
ও মনিমনি, ছান্নে ভাখো, তুমার একখানা চিঠি এগেচে।

মনির চিন্তাকাল ছিন্নবিছিন্ন হ'য়ে গেল। বইখানা
ধপ্ ক'রে রেখে উঠে এসে চিঠিখানা হাতে নিয়ে
দেখ্লে—বাংলায় লেখা 'মা মনি', আর সব ইংরাজিতে
লেখা। চিঠিখানার দু'খুলে আবার জোড়া দেওয়া।
উপরে একটি ইংরিজি সিল।

মনির বাবা চিঠি নিখেছেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেল
থেকে। 'সেন্সারজ' সিল খেঁচে এসেছে।

বাবার চিঠিখানা পেয়ে সে আনন্দে উবেল হ'য়ে
উঠ্লে। একবার, দু'বার, তিনবার প'ড়লো—তবু
সবটুকুর মর্মব্যথা হ'লোনা।

'বলার মা' অবাক হ'য়ে চেয়ে বস্লে—বলি কীভা
চিঠি সেলো? প'ড়তি প'ড়তি দিশেহারা হ'জ্ঞো যে!

সরল হাসি হেসে সে জবাব দিলে—এখানা বাবার
চিঠি বলার মা।

—কী ক'ছো নাতনী, বেথা নেই বে!—অস্বাভাবিক
হাসি হেসে লাঠি-হাতে অন্নগোপালবাবু মনিরের বাড়ীর
উঠানে এসে দাঁড়ালেন।

সহসা অন্নগোপালবাবুর আবির্ভাবে ঈর্ষ হ্রস্ব হ'য়ে
মনি বাবার চিঠিখানা বুকের কাগজের নাচে গোপন
ক'রতে গেল।

অন্নগোপালবাবুর তেনদৃষ্টিতে তা' ধরা প'ড়্লে।
তিনি অস্বাভাবিক অধরপাক্তি বিকশিত ক'রে বস্লে—
দেখে কেলেছি নাতনী, দেখে কেলেছি; ও কার চিঠি
নুহুঙ্কো?

সে ধীরে ধীরে জবাব দিলে—বাবার চিঠি হাছ।
তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রবার চলে বস্লে—ব'সু-বন
হাছ?

—না, না, ব'সবার দরকার নেই; দেখতে বুড়ো
হ'লেও, নাতনী, সোমত একেবারে বায়নি। দরকার
হ'লে এখনও তোবার মতো নাতুনী নিয়ে ঘর ক'রতে
পারি।

—বাবু হাছ, এমন ঠাট্টা ক'রতে আছে। মনি লজ্জার

বিরক্তিতে অস্বস্ত হ'য়ে উঠলো, অথচ কেমন ক'ট্টাই বা
এই বুড়ক চলে বেতে বলে। ভিল্লম্বন চূর্ণ করে খেঁকে
বস্লে—হাছ, বাবা নিখেছেন—

—হ্যাঁ হ্যাঁ কী নিখেছে বলো তো? ঈগুপ্তির আসু'ব
না কি?

—না, সে কথা নয়। এই আমাকে সাবধানে থাকতে
নিখেছেন, আপনাদের কথা মিথ্যালা ক'রেছেন—

কষ্ট-ক্লান্তি পূর্বের হাসি মুখে এনে তিনি বস্লে—
ক'রবে না? ব'লেছিলা মুরদার মতো ছেলে এমন
মশখানা ইউনিয়নের ঘাড়ে নেই।

—আর আমাকে নিখেছেন যে রাতে একা থাকতে
ভয় ক'রলে 'বলার মা'কে সাখ্যার জ্ঞতে। রাতে সে
আমাদের বাড়ী থাকে আর মাইনে কিছু পাবে, বাবা
এসে দেখেন।

—তা তো ভয় হবার-ই কথা; যেমন লক্ষ্যছাড়ার
পীএ, নরুর অভাব নেই। তারপর নাতুনী, তোমার
কথা আলাদা, তোমার ভগবোধই যে তোমার শত্রু।

বুড় মলিকতা ক'রে হাসবার চেষ্টা কর্লে, মনির মুখ
গভীর হ'য়ে উঠ্লে। বুড় অজ্ঞতায়ে কথার ঘের টেনে
বলতে লাগলেন—কেন, কী আশ্চর্য্য আসে না? তাকে
বস্লেও তো……

—তার সময় কোথায়? 'কল' থেকে কিম্বার পথে
আসেন একবার। তার লোক খুঁজে দেবার সময়
হবে না।

'বলার মা' এতদূর কথাবার্তা শুন্ডিলো, তাকে
উকেজ ক'রে মনি বস্লে—গাফে ভুনি বলার মা?
হাছ, ব'লে হিন্ না ওকে।

'বলার মা' পাকা স্ত্রি। অন্নগোপালবাবুর আলাপনের
মর্ম গ্রহণ ক'রে তাঁর মহাহুঁকি আকর্ষণ ক'রবার আশায়
বস্লে—তা' জুয়ার দরকার হ'লি তো বুড়ো কতট
বধন তখন জাখাডনো কতি পারে।

'বলার মা' দেখ্লে অন্নগোপালবাবু ধোঁকে হাত
দুদিয়ে চ'লেছেন আর মনি নিঃকণ্ডর। তখন আগের
কথার খেই টেনে তিরস্কারে বস্লে—তা আমায় আর

কী! ঝাড়াঝাড়া মুন্সি আমি; তুমার বসি ভালো
হয়, আমি খেতে আসতি পারি।

'বলার মা'র থাকটা বুকের ইচ্ছাহরণ না হ'লেও
যদি কথার সমর্থনে ব'লেন—তা' বেশ, বেশ। আচ্ছা
আমি উঠি নাহুঁ।

মুন্সীবাবু নিরাপত্তা রাজবন্দী হ'য়ে আলিপুর সেন্ট্রাল
জেলে আছেন। হোশার জেল থেকে তাঁরা কয়েকজন
এখানে স্থানান্তরিত হন। এখানে আরও কয়েকজন
রাজবন্দীর সঙ্গে তাঁদের আন্তরিক পরিচয় হ'লো।

বন্দী হ'লেও এঁদের মজ্জা কারাভায়ে একাংশ নিভি
আছে। সাধারণ অপরাধী বন্দীদের লাগে এঁদের
যোগাযোগ কন; এঁদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও নতন।
স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিধেয় বস্ত্রাদিও কর্তৃপক্ষ থেকে
পান। ইংরিজি বাংলা সংবাদপত্র কালিকলন কাগজ
সব কিছুই ব্যবস্থা আছে। শুধু বাইরের জগতের গতির
সঙ্গে এঁদের যোগসূত্র ছিঁ। কোনো প্রাণাণ অপরাধে
অপরাধী না হ'লেও শাসকতন্ত্র এঁদের বিমবী শক্তিতে
ভীত হ'য়ে বন্দী ক'রে রেখেছেন।

বিভিন্ন জেলার নির্বাসিত দেশবাসীর একত্র সম্মেলনে
কারাভায়ে একাংশ ভীর্ষে পরিণত হ'য়েছে। মনে
পড়ে ইংরেজ কবির উক্তি—

Stone walls do not a prison make,

Nor iron bars a cage ;

Mind innocent and quiet

Take that for a hermitage.

যে কয়েকজন অ-পূর্বপরিচিত রাজবন্দীর সঙ্গে মুন্সী
বাবু পরিচয় হ'য়েছে, তাঁর মাঝে আলাপনের অন্তরকথাও
সব চেয়ে আত্মীয় হ'য়ে উঠেছেন বয়ঃকনিষ্ঠ রাজবন্দী
মাদিকমোহন সেন। বয়স লাভাশ আঠাশ, বাড়ী পাবনা
জেলায়। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, বাড়ীতে বিধবা মা
ও একটি ছোটো ভাই। ভাইটি ইচ্ছুক পড়ে।

দ্বিতীয় মহামুগ্ধ তখন আসন্ন; লারা জাগতিক
রাজনৈতিক ঐক্যতির মুখে একটা ভয়াল তত্ত্ব। বেন

কোন্ ছাঁর কড়ার আবেগে তার অন্তর কম্পমান।
সেবার মাদিকমোহন লজ বি. এ, পতীকার উত্তীর্ণ হ'য়ে
মুতাচন্দ্রের বিমবী আদর্শে অহুপ্রানিত হ'য়ে দেশসেবার
আন্তরিকতা করেন। চট্টমান, পুটুতন, আন্তবিনালী,
শ্রীমতী এই বুকের লাগে বহুদিন বহুবিধে মুন্সীবাবু
আলোচনা হয়।

আদর্শের মিল নেই। মুন্সীবাবু গাঙ্গীপতী, মাদিক
মোহন মুতাচন্দ্র। একজন অহিংস বিপ্লবের সমর্থক,
একজন হিংস বিপ্লবের সমর্থক। তবু দুইজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
মুক্তিকামী অমুগ্ধ আত্মবলের স্রোতে পরস্পরের সাহিত্যে
এসে পড়েন। লক্ষ্য দেখানে এক, শক্তি দেখানে নিজীক
পথের স্বাভাব্য সেখানে হারান স্বব্যবধান রচনা করলেও
পথের শেষে যে মিলন অবশ্যসি। এখানে অমুগ্ধ
বিরোধের অবসর নেই। আপন অন্তরের উপলব্ধ সত্যকে
লক্ষ্য ক'রে যে না-পাওয়ার অভিসারে চ'লেছে সে অপরের
অন্তরের সত্যকে হের ভাবতে পারে না। গতি দেখানে
দুইজন নীতির বিরোধ দেখানোই।

মুন্সীবাবু অহিংসনীতির ব্যাখ্যা করেন, মাদিকমোহন
লজ অমুগ্ধের তা' শোনেন। মুন্সীবাবু বোঝাতে চান যে
বিক্রমশীল বৃটিশ শাসনের বিকক্ষে ধামধোলা ক'রে
বিম্ব যোণা ক'রলে শুধু নিরীহের রক্তপাতে দেশের
মটি ভিলে উঠবে।

সে-কথা যেন নিয়েই মাদিকমোহন বলেন—আমি
বিপ্লবে রক্ত আছে। অপেক্ষা শুধু বাইরে পেকে কিছু
রক্তপাতের ভয়ে চমকে উঠছেন কিন্তু তিল তিল ক'রে
গুলা আধারের রক্ত শুবে যে প্রাণশক্তি ক্ষয় ক'বে নিয়ে
আসছে—সেটাও কি রক্তক্ষয় নয়? দুইজনের মতো আমরা
অন্তরের সে অপচয় সহ্য ক'রবো তবু বাইরে থেকে সামান্য
অপচয়ের ভয়ে প্রতিবার ক'তে শাহস ক'রবো না?

—নিশ্চয়ই ক'রবো কিন্তু অহিংস উপায়ে; বাহবলের
হারা নয়, আত্মিক শক্তির সাহায্যে।

মাদিকমোহন আবেগকরিত হয়ে বলেন—আমি মনে
করি বাহটাও সেহের অগ, আর আত্মাও বেহা; তাই
শক্তি, তা' সে মনেরই হোক আর আত্মারই হোক, তাঁর

উৎস ঐ ব্লগ দেখের রক্তস্রোত থেকেই। দেহমুক্ত আত্মার অস্তিত্ববোধ আমার মাঝে নেই। আব উপাধের কথা বলছেন? আমার ধারণা বিপ্লবে হিংসা অহিংসার প্রশ্ন নেই। ও ছুঁতের ধ্বংস ভাব্যপত। বিপ্লব বলতে আমি ইংরেজ আত্মির বিরুদ্ধে যথা প্রচারও নয়, ইংরেজ আত্মির ধ্বংস প্রচেষ্টাও বুঝি না।

—কিন্তু ইংরেজ আত্মির পাতে আপনারা অসহ্যাত করবেন তবু ব'লবেন সেটা স্পৃহাও না, হিংসাও না?

—হ্যাঁ, তাই আমার ধারণা। এ বিশেষ কোনো আত্মির বিরুদ্ধে বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিরোধই নয়। বিপ্লব ব'লতে আমি ধ্বংস কথাটাই বুঝি না, আমি বুঝি এ নবতর সৃষ্টির আত্মা। অচল স্থিতির বিরুদ্ধে চকল গতির বিরোধ। দেশের শাসনতন্ত্র যখন শোষণবস্ত্রে পর্ববসিত হয়, অধিকাংশের শোষিত-শোষণে স্বাধীন ক্ষীণ হয়ে ওঠে, অধিকাংশের মানির বাশে ভূকম্পনের মতো প্রকৃতির নিয়মে বিপ্লব গড়ে ওঠে। তার গতি নিঃস্ব। আত্মি তার হিংস হ'লেও প্রকৃতি তার অহিংস থাকতে পারে। যে মুষ্টিমেয় স্বাধীন হয়ে মতো শাসনতন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের বিরোধে তাদের বিরুদ্ধে। আমরা সেই অমরালের প্রতীকদের ধ্বংস ক'রে নতুন মঙ্গলকর কিছু সৃষ্টি ক'রতে চাই।

যুবকের মূগ্ধকণ্ঠের ভাষণ মুরলীবাবু নির্বাক হ'য়ে শোনেন। যুবকের হিংসমনোভাব মুরলীবাবুর অন্তরে লাড়া আগার না তবু তার মূখর আগাশন শুনে মন লাগে না। তিনি স্বাভাব-পঙ্খীর হাসি হেলে বলেন—আপনারা যুবক; যৌবনের প্রকৃতই যে ব্যর্থত। তাই ধ্বংসকেই আপনারা সৃষ্টি বনে করেন। কিন্তু শুধু আপন আত্মির কল্যাণের জন্যে অপর আত্মির অকল্যাণের আরোহণ আমি সমর্থন করিনে। এ মহান্বয়ের কাছে মহা অপরাধ। তারতম্য এতবড়ো অপরাধ করতে পারে না।

—এ অপরআত্মির অকল্যাণের আরোহণ নয়, নিজেদের কল্যাণ-প্রতিষ্ঠার আরোহণ, নিজেদের ভগ্নগত অধিকার,—স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস। অপরের অকল্যাণের মনোপতভাব না নিয়েও যদি এতে কারো

কিছু ক্ষতি হয়, তা' হবেই। তারতম্য আগে স্বাধীনস্বতা নিয়ে বাচতে শিখতে হবে, তবেই সে মহান্বয়ের সঙ্গে ম'লবার অধিকারী হতে পারে।

—এ আত্মিকেন্দ্রিকতা, এ স্বীনমগ্নতা; এ তারতম্য আত্মার কাছে অপরাধ।

—না, না, না। ধ্বংসমাত্রই অপরাধ হ'তে পারে না। স্রাবের ধ্বংস যদি অপরাধ হয় তবে স্রাবের ধ্বংস না করাও অপরাধ। তারতম্যের মূর্ত আত্মা প্রকৃতি হুকুমের কী ব'লেছেন? বৃত্তমান স্রাবের হুকুমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালানোর সঙ্গে তিনি-ই না পাণ্ডবদের উত্তেজিত ক'রে ব'লেছিলেন—‘কৈবাল্যঃ মা ন গম্যঃ পার্থ’?

মুরলীবাবু দ্বিতীয়। এতদিন অহিংস ও হিংস পন্থার মধ্যে একটি কাল্পনিক ব্যবধানের পাতাবার রচনার ক'রে একতীরে ব'লে ইটময় ভূপ ক'রে এগেছেন। কিন্তু প্রাণধান যুবকের বশিষ্ঠ ভাবের বজ্রাস্রোতে যেন ছুঁতীর আঘাতে একাকার হয়ে যেতে লাগলো। যুগের সঙ্গে তিনি চমকিত হ'য়ে উঠলেন। প্রশ্নের যোড় ঘোরাবার উদ্দেশ্যে অন্তর্ভাবে ব'ললেন—কিন্তু অসহযোগের দ্বারা তো বিনারক্তপাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে।

সামিকমোহন অপেক্ষাকৃত লম্বুরে ব'ললেন—অসহযোগের অস্ত্র শক্তিশাল, আমি তাকে প্রমত্ত করি; কিন্তু সম্পূর্ণ অসহযোগ আমরা কার্যকরী ক'রতে পারবো না। অসহযোগের রূপাশ পাণিত ক'রতে চাই যিনিদের পাণবস্ত্রে। শক্তি যে শাসকের হাতে; যখনই সে দেখবে আমরা যিনিদের পথে পরস্পর হাত মিলিয়ে অগ্রসর হচ্ছি তখনই সে স্বার্থগতী ভেদনীতির মূল অস্ত্র নিয়ে হাফপথে পাড়িয়ে সমস্ত এগেটো স্বার্থ ক'রে দেবে। তাতে বাহিত কল্যাণের আবির্ভাব বিলম্বিত হবে বৈ নয়। কুটিল-অশ্লবের সাম্প্রদায়িক ষাটোয়ারার বিবে আশ্ব হিন্দু-মুসলিম মিলন-প্রয়াস বিধাত হ'য়ে উঠেছে। অস্ত্রের মৈত্রীর ময় রেখে বাইরে শত্রুভাবে শাধনা করলে যদি আমাদের কল্যাণ ওরিত হয়, আমি বিবাস করি—তা'ই সৃষ্টিকারী তারতম্যের অবলম্বন হওয়া উচিত।

হৃৎকর হৃক্তির আঘাতে বুকের চিন্তাভাবন ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যায়; তবু তাঁর স্বৈৰ্ঘ্যানি ঘটে না। হৃৎকর প্রতি মুরলীবাবুর একটি সপ্তক যেহ সঙ্গার হয়। তিনি মনে আভাস পান কেন এই আপাতবিরোধী অহিংস ও হিংস মতেরও মঙ্গলময় পরিণয় অসম্ভব নয়। তিনি তো অন্ত্যচলগামী স্বৰ্গ; আসর রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে কখন তাঁর ক্রমক্ষীণমান রক্তিরেখা যথেষ্ট মিলিয়ে বাবে। রাত্রির তপস্কার পূর্ণাচলে যে নব রক্তরক্তিরাপের অনুদান হবে সে রক্তির বিকীরণের মাসিক তো এই হৃৎকর দলট। হৃৎকর অকরণ আঘাতে তাঁর ছিন্নভঙ্গী মনোবীণা অশ্রুতরে ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে। তিনি আশা করেন—কারুণ্যের পর যদি-মানিকের শুভ মিলনের দ্বারা তিনি সারা 'ভারতের সমুখে একটি কল্যাণময় মহানু' আদর্শ রেখে যাবেন।

'বলার মা' সারাদিন পাড়ার পাড়ায় রি গিরি করে, সন্ধ্যার মণিমের বাড়ীতে আসে। সন্ধ্যা বোর হ'লে মণি সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া গেরে নেয়। মণি নিজে আগে খায় না; বলার মাকে খাইয়ে বা' থাকে নিজে খায়।

'বলার মা' জাতিতে বাঙ্গালী; জলচল না হলেও একসরে খেতে মণিও বাধে না। অস্পৃক্ততার বাধবিচার এ বাড়ীতে নেই। মুরলীবাবু আচার নিষ্ঠ হিন্দু হ'লেও কুসংসারবৃত্ত। বাছবকে মাহুয়ের মর্দায়া দেবার শিক্ষা মণি বাবার কাছে থেকেই পেয়েছে।

নৈশভোজন সমাপনান্তে মণি কিছুকণ বই পড়ে। কোনোদিন রামায়ণ, বাংলা গীতা বা বহুমতস্ত্রের উপপাঠ। 'বলার মা' এ সব বোঝে না তবু নাটোড়ফাফা হ'য়ে মণির মূখ দিয়ে পড়িয়ে পোনে। সে অবাধ হ'য়ে ভাবে—এতগুলি মাহুয়ের মূখের কথা ঐ ছোড়া বইয়ের পাড়ার কালোবাগের মাঝে কেন্দ্র করে বন্দী হ'য়ে আছে। সে-ও যেহেমাছ, মণিও যেহেমাছ; অথচ তার কাছে অসাধ্য, মণির কাছে তা' কতো সহজ। তদ্বর লোকে আর ছোটোলোকে কী আকাশ পাড়াল প্রভেদ!

প্রতি বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যার পর মণি লক্ষীর পাচালী পড়ে। 'বলার মা' শোনে আর ভাবাবেগে দেবীর উদ্দেশ্যে হাত তুলে প্রণাম করে; বলে—আহা-হা মিমিমণি, তুমার ঘরে লক্ষীজিরি হোক; শত্ৰু'র মূখি ছাই মিরে তুমার বাড়-বাড়শ হোক।

সেদিন হাটবারে বিকেল বেলা 'বলার মা' ভাতের পরলা নিতে এলো। মণি পাচ আনার পরশা দিয়ে ওরই মাঝে ততীতরকারী লবণ আনুষার কথা ব'লুলো। 'বলার মা' ঝাঁটলে গেরো দিতে দিতে ব'লুলো—মিমিমণি, আমার একটু আলা-তামুকির পাতা আনতি দিবা না? ওঁড়ো মূখি না মিলি আমার পেরাপড়া আই চাই করে। মণি একটু হেলে আর দুটি পরলা দিয়ে বিদায় হলো।

ঘরে মণির মাথের একখানা পুরাশো আয়না ছিলো। সন্ধ্যার অন্ধকার মনিখে আসুবার আগে মণি তুলশীতলায় প্রদীপ দিয়ে ঘরে এলো। আলগোড়ে ধাধা তুলগুলি পিঠের পরে ছড়িয়ে লিখে মণি সেই আয়নার সামনে এসে ঠাঁড়ালো।

পুরুষের চোখের আলোড়ন নারী চেনে নিজেও পুরুষের স্ততি না পাওয়া মণি আশ্রয় নিজের কাছে নিজে অচেনা হ'য়ে আছে। তবু দ্রুত পৌরুষ বৃত্ত ভয়গোপাল বাবু যেদিন থেকে মণিকে নাত্নী সম্বোধনে অণোভনতার আভাস-ভরা অদৃশ্যত ভাষার তার রপের কথা শুনিচ্ছেন, বুকের পর বিরক্ত হ'লেও তাঁর কথাগুলি পুরুষ জাতির স্ততির মতো তার কণে বেজেছে। তার অপরিণত মনের অজানা কোণে কোথায় যেন কী বেগাপাত ক'রে গেছে। তবে তার মাঝে কি এমন কিছু আছে যা পুরুষকে মূগু কল্পতে পারে। ভেবেভে আর মনে মনে নিজের পর নৃতনতরো মমতা কেগেচে। নারীর যে এ ভাবনাদও অলীম আনন্দ। মূখের ভাষা—পুরুষের ভাষা কখনই বা ঘাচাই করতে পারে; পুরুষের মূখের বীজতির কাছেই পরাজয় মেনে ভাট গঠে নিজের কাছে নিজে মাহিয়দী হ'য়ে ওঠে।

মণি নিজেও বেগে নিজে চ'ম্কে উঠলো। জুলে

গেল যে সে নাট্য। তার মনে হতে লাগলো যে যেন অজাতচুলপিল বাছপুত্র, চলেছে কোন তপস্ধার বাছকতার অভিলারে। চারিদিকে চেয়ে দেখলো কেউ তাকে দেখছে কিনা। 'আবদ হ'য়ে বসোবাস হবিগত করে যুগের 'পরকার এলিয়ে-পড়া চুলগুলি গরিয়ে যুগখানি আগির কাছাকাছি নিয়ে গেল। আপনায় এলো চুলের গন্ধে সে আপনি ঘোহিত হ'য়ে উঠলো।

'বলার মা' হাট গেরে এতক্ষণে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। মনিকে ঐ ভাবে বেধে সে একটু খ'স্কে বসলে—ভাগ তিনিমনি তুমার সবাই।

অজায় কাক কবুবার সময় বরা'ল'ফলে অপরোধীর বে অরিত ভাব-বিপর্ষ্য হয়, 'বলার মা'কে দেখে মণির ঠিক সেই অবস্থা হ'লো। 'বলার মা' নিকটই বেধে কেলেছে। মত হরিণীর মতো চুলগুলি হাতে জড়িয়ে খুঁটি বাধবার উত্তোণ ক'রে ব'লে উঠলো—রাখো 'বলার মা', আচ্ছি আমি।

'বলার মা' বয়ঃকোষ্ঠার মতো গভীর হয়ে ব'ললো—তিনিমনি, উভা ভালো না। সোমর বয়েস, খাটি সন্ডো বেলা চুল খুলা ভালো না। বৈশ্ব দক্ষিষ্টির ভয় কীতি হয় তো।

মণি লক্ষ্য পেয়ে চুপ করে বইলো। 'বলার মা' প্রদগ পরিবর্তন ক'রে ব'ললো—আজ হাটে তিনিমনি, মাছ বজ্জো নত্যা; কটুকীর পুঁটি, ইরা-ইরা তেলাচো পুঁটি। জুনি এয়োত্রীলোক, মাছটাছ না খালি গভর থাক্খি ক্যান?

'বলার মা'র সাধুভাবার বরদী সযোথনে মণি একটু হেগে ব'ললো—কী ক'স্বে। বলার মা, জানো তো বাবা বাভীতে নেট, অতো পরণা কোথায় পাবো?

মণির ঘরোয়া গুণের কথা 'বলার মা'র বন ঘরবে ভ'রে গেল। সমস্তার সহগ সমাধানের প্রত্যাব উখাপিত ক'রে বললো—তা তুমার আবার পইসার থাক্খি হবি ক্যান? যে ছপ তুমার। একটু এমন-অমন ক'রলিই তো...

মণি নিউরে উঠলো; কঠোর কঠমরে সে বলে উঠলো—বলার মা!

বলার মা মণির মুখের পানে চেয়ে দেখলো তার চোখের ভাণ্ডা হির হ'য়ে গেছে।

আমৃত্যু আমৃত্যু করে ব'ললো সে—না, না, তিনিমনি তা' না, আমি বলছি কি, ঐ যে ছুতরা ডাক্তারবানু আসেন, ইকটু বৃদ্ধি থাক্খি... না হয় ঐ বুড়ো বাবু আসেন। উনার কি সে গোমস্ত আছে না বয়েল আছে! নাভিনু হও, একটু হানি মরার। ক'লি কি হান্দি হান্দি গায় চলি গ'লি বুড়ো...

রাগে বিরক্ত ভগায় মণির বেধ নিকশ হ'য়ে গেছে, তিনিমনি তলিয়ে বেধেতে গিয়ে তার লম্বের হলো এ বেন 'বলার মা'র নিকের কথা নয়। সে যেন ঐ যুগের হীন মনোভাবকেই মাজিত ভাষায় ব'লছে। নইলে কবার ঠিকে কাঁকে এমন জড়তা আস্বে কেন?

মণিকে নির্ধাক দেখে 'বলার মা' ভাবলো হয়তো তার ওখ কাক ক'য়েছে তাই ছ'পক বাচিয়ে প্রবীণায় মতো উপসংহার টেনে বেতে লাগলো—তা' তুমার চাতি হবে কেন? সে বা' হয় আমি উনার মাখে খু'গ্গ, ক'স্বে।

মণির দৃঢ় বিশ্বাস হ'লো—এ-ও যুগের উক্তির প্রতিফলি; 'বলার মা'কে দোষী ভেবে তাকে পালি-গালাক ক'লে তার প্রতিকার হবে না; বয়ঃ তাতে সে চ'লে বেতে পারে। সব দিক্ ভেবে সে তাকে নরম ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে নিরন্ত ক'রবার চেষ্টায় ব'ললো—জাখো 'বলার মা' জুনি আমার মায়ের বয়সী লোক, ওগব বিদ্রী কথা মুখে আন্তে নেই; ওতে তোমার মেয়ের অকল্যাণ হবে।

নানা বৃক্তি দিয়ে প্রতিবাদ ক'রলে যে ফল না হ'তো, মেয়ের অকল্যাণের ইদিকে তার চেয়ে সহজে ফল হ'লো। 'বলার মা' এক ছেলে এক 'বেয়ের মা। মণির বাক্যাঘাতে তার মায়েকর মা জেগে উঠলো। নতানের অরবলের আশতার কাছে মায়ের আর সব আকাঙ্ক্ষাই বৃদ্ধি তুচ্ছতর হ'য়ে যায়।

'বলার মা' হতভয় হ'য়ে ভাবতে লাগলো—ভদ্র-লোকের মেয়ে তো, সে কি এত অগ্রে ইচ্ছত মান ক'স্বে

পারে। পান্নি বুড়োটা তাকে কী অপদস্থ-ই না ক'লো।
বলার মতো আর কিছু না পেয়ে সে বললো—তা' তুমি
যা' ভালো লাগে তাই করে।

প্রায় মাস দেড়েক পরে মণির কাছে আলিপুর শেট্টাল
জেলে থেকে তার বাবার পুত্র এলো। পত্রখানি পড়ে
অনাখিনি মণির মন আবার অকণিমায় রত্নী হ'য়ে
উঠলো।

সুদীর্ঘাব্দে লিখেছেন তাঁরা কয়েকজন সম্ভবতঃ আগামী
মাগফানেকের মাঝে পুনরায় বশ্যের জেলে স্থানান্তরিত
হ'তে পারেন। বশ্যের কীরে গেলে মণি যাতে তাঁর
সঙ্গে বেধা কবুতে পারে সে ব্যবস্থা ক'রবেন। কয়েক-
মাসের অপেক্ষা, তবু মণির মনে হয় সে বেন কতো বছর
বাবাকে জ্ঞাখেনি। বাবাকে দেখতে পাবার আশায় তার
মন অশান্ত হ'য়ে ওঠে।

তিনি আরও লিখেছেন যে সেখানে পাবনা জেলার
আরেকজন রাজবন্দীর সাথে তাঁর আলাপ আলোচনায়
বেশ দৃঢ়তা হ'য়েছে। তরুণ রাজবন্দী বলিষ্ঠবনা, আত্ম-
বিশ্বাসী এবং স্থির প্রতিজ্ঞ। তাঁর সাথে সুদীর্ঘাব্দ
মতের মিল হয় না তবু তরুণের অটল আস্থানিষ্ঠা তাঁকে
মুগ্ধ ক'রেছে। কারামুক্তির পর তিনি সেই তরুণ বন্ধুকে
বাড়ীতে নিয়ে আসবেন।

মণি রাজনৈতিক মতামতের পার্থক্য বোঝে না; তবু
তাঁর আশ্রয় পরহিতরত্নী গুণিত্বা বাবার মতেরও যে
কেউ বিরোধী হ'তে পারে, এ-ও মণির ধারণাভীত। সে
তাঁর বাবার মতের বিরোধী হবেও তাঁকে মুগ্ধ ক'রেছে।
এই রূপকথার রাজপুত্র লক্ষ্যে মণি মনে মনে এলোমেলো
কল্পনার জাল বুনে চলে।

মণির বাবার যে বিরোধী, সে মণিরও বিরোধের পাত্র
লক্ষ্যে নেই। আবার যখন ভাবে সে শত্রু হ'য়েও
চিন্তাহারী তখন মণির অকণট অন্তর অজ্ঞাতে কেমন যেন
এই অলক্ষ্য শত্রুর পানে প্রসারিত হ'য়ে যায়।

'বলার মা' সেদিন ডট্টাচাখি বাড়ী থেকে কাছকর্ম
সেয়ে লক্ষ্যার আগে ছর হ'য়ে মণিসের বাড়ী ফিরে এলো।

মণির নিবেদন সবেও রাগে ভাস্ত না থেবে ভাড়লো না।
পরদিন লক্ষ্যে বেধা গেল 'বলার মা' করে বেহ'স; তাঁর
গায়ে গুটি দেশা দিয়েছে।

প্রায়ের প্রাণে বসন্তরোগ দেখা দিয়েছে। মুচি
পাড়ার দুজন বারা গেছে। ঐদিক থেকে ব্যাধি গায়ে
মারে আসা আরম্ভ ক'রেছে। তহপন্নীর মাঝে
এ বাড়ীতে প্রথমে ব্যাধি দেখা গিলো।

মণি ব্যস্ত হ'য়ে কয়েকখানা নিমের ভাল ডেঙে এনে
ঘরের মাঝে রেখে গিলো। বিকেলে দেখা গেল 'বলার
মা' সর্বাত্মক জলবসন্তে ছেয়ে গেছে।

মণি অত্যন্ত ভীত হ'য়ে পড়লো। ঘনায়মান বিপদের
আশঙ্কায় বিশেষতঃ হ'য়ে সে জহগোপালবাবুর বাড়ী
ছুটে গেল।

জহগোপালবাবু তখন বেতের মোড়ার পর ব'লে
দুজন চৌকিঘরের সঙ্গে বেগেং শাসন সংস্কার বিষয়ে
পতীর আলোচনায় রত। পাশে ক্রান্ত হ'কোটি বিজ্ঞান
করুছে। লক্ষ্য অবিলম্বে বশ্য শঙ্কাতুরা তরুণের অকুঁ
পর্যাপ্তে রাজপুত্রের একটু চিন্তিত হ'য়ে উঠলো।

জহগোপালবাবু চেয়ে দেখলেন মণি দাঁড়িয়ে। মণি
কিছু বলবার আগেই তিনি ব'লে উঠলেন—কী গাখি
আজ আবার; নাতনী পায়ে হেটে বাড়ী চাখির যে।

চৌকিঘার হ'ল্লন একটু শ'বে গাড়াতাই তিনি তাদের
লক্ষ্য ক'রে বললেন—ওহে মোড়ল, ডোহরা একটু
তকাত্তে বাও, ইনি আবার তৃতীয়পক্ষ কি না! অবলায়
কী জন্তে এসেছেন তিনি, তারপর তোমাঘের সঙ্গে
কথাবার্তা বলো।

—বুড়োর আবার মতিছিন্ন প'রেছে—বলতে বলতে
চৌকিঘারদ্বয় শ'বে বেতে লাগলো।

মণির কাশে সে কথা গিয়ে পৌঁছিলো। সে কাতরস্বরে
ব'লে উঠলো—না, না, ওদের বাবার দরকার নেই।
বাড় 'বলার মায়' মাঝের অগ্রহ হয়েছে।

বুড় আবিষ্টের মতো জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তাকে
ছ'বেছো?

—আমি ছাড়া কে থেবে তাকে?

বৃদ্ধ অত্যন্ত ভীতভাবে মোড়া থেকে উঠে পাড়িয়ে মণিকে বললো—স'রে পাড়াও, স'রে পাড়াও; কাছে এসোনা।

যদি বিবর্তিতস্তে একটু পিছিয়ে গিয়ে বললো—কাছে যাক্কিনা দাঃ; আমাংগের দান থেকে পাচকাঠা। দান রেখে ক'টা টাকা দিন। ওকে ভাক্তার দেখাতে হবে।

—ছোটো সোফার অস্থব হ'য়েছে, আপনি সেয়ে যাবে। নিজে খেতে পারেনা তার আবার ভাক্তার কেখানে। যতো সব ইতরাশি—

কথাগুলি শেষ হ'তে হ'তে বৃদ্ধ ক্রতপায়ে বাড়ীর মুখে চলে গেলেন। হতভব হ'য়ে কিছুক্ষণ পাড়িয়ে থেকে যদি বাড়ী কিরে এলো।

পরদিন সকালে গাছের ভাক্তার কপী বোস তাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে ভিক্ষণকারীতে যাক্কিলেন। যদি বেহতে পেয়ে ভেবে আনলো। তিনি বেধে বললেন—ভয় নেই; দুপুরে তিনি একটা ওড়ো ওগু পাড়িয়ে দেবেন, স'রবের ভেল দিয়ে গায়ে লাগিয়ে দিলে দেয়ে যাবে।

ভাক্তার কিরে বাবার সময় যদি বললো—কাকা, একটু ভালো ওগু দেবেন। বাবা এলে আপনার পরদা দিয়ে দেবো।

ভাক্তার হেসে বললেন—আচ্ছা, মা, হবে। পরদার ভস্তে তোমার ভাবনা নেই; তোমার বাবা এলে আমি তাঁর কাছ থেকেই নেবো।

বলার মা ধীরে ধীরে সেয়ে উঠলো, রোগীর দেখা করুতে করুতে সেই রোগের বীজাণু সংক্রামিত হলো মণির বেহে। মণির সারা গায়ে ছোটো ছোটো গুটি দেখা গিলো। সংখ্যায় ও আকৃত্তিতে ভীতজনক।

কইবাবু বলার মাকে ওগু দিয়ে হুঃ ক'রে ভুলেছেন, তিনিই মণিকে বেধতে লাগলেন। ওগু গায়ে লাগানো হ'তে লাগলো কিন্তু একদিন দাঃ, হ'মিন দাঃ, গুটিগুলির বসে দাবার লক্ষণ দেখা গেল না। খজাবতীক যদি আরও শক্তিত হ'য়ে পড়লো। কইবাবু বাতায়ারতের পথে তিন-চারবার এলে মণিকে ঘেঁষে বান, সাইল গেল। যেদিন

সময় হয় সম্ভার পর ভিক্ষণকারী থেকে বাড়ী কিরবার পথে কিছুক্ষণ ব'লে গর ক'রে বান। অগ্রমনকতার কীকে যদি ব'লে-ওঠে—কাকাবাবু, বাবার সঙ্গে আর আমার দেখা হ'লো না। কইবাবু হেসে বলেন—পাগলী কোথাকার, ভয় কী? অস্থব হ'য়েছে, সেয়ে যাবে।

'বলার মা' সেবা শুভবাস্তব, সময় মতো ওগু পথা বেধার ব্যবস্থা করে, মণির সঙ্গে সারারাত্রি বেগে থাকে। যদি বলে—'বলার মা', আর ভয়ে ভুঁমি আমার আপনার লোক ছিলে, নইলে এমন কেউ কাকুর ভস্তে করে।

'বলার মা' ভিত্তে কামড় খেয়ে বলে—ছি, নিমিষনি আমি ভুঁমার ভারী কুশাম! ভুঁমি না থাকিল আমারে কাল ব্যামোরতে বাঁচাতো কী তা?

সেদিন ভোর উঠে 'বলার মা'কে যদি বললো—'বলার মা', কাল রাত্তিরে আমি মাকে যেখিত। মাক রাত্তিরে আমার একটু ঘুম এগেছিলো, চেয়ে দেখি মা দরজার কাছে পাড়িয়ে, কপালে বড়ো সিম্বুরের কোটা, গালভরা হাসি, আমাকে কোলে নেবার ভস্তে হ'হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

'বলার মা' চবকে উঠে বললো—ওগু বপনে বেধ'তি নেই নিমিষনি।

দিন চারেক যেতেই গুটিগুলো শেকে ওঠা আরম্ভ করুলো। ভাক্তার এলে বেধে দাঃ, ওগুখের পরদা লাগেনা। পথের খরচ বাবদ ভাক্তার কিছু দিতে গেলে যদি বলে—দরকার নেই কাকাবাবু, পথিয়ার পরদা ঘরে আছে।

এমিকে খবে ভাল নেই, থাকলেই বা কে রে'বে দেখে। 'বলার মা' আর রায়ে ওখানে থাওয়া হয় না। অস্ত বাড়ীতে সেখানে কি-সিরি করে, সেখান থেকেই ক'দিন শেষ দুপুরে খেয়ে এসে রায়ে না খেয়েই কাটিয়েছে। আর হ'মিন মণির রোগবৃদ্ধি হওয়ায় সে তার কাছ ছেড়ে অন্ত্র কামে যেতেও পারেনি। মণির হাতে যে কয়েক আনার পরদা ছিলো তাই দিয়ে চি'ড়ে খেয়ে কাটিয়েছে। আর যদি বললো—ভুঁমি ওবাতীর দাঃর কাছ থেকে গিয়ে

একজনের মতো। চাল-চোরে নিখে এগে এখানেই বেঁধে
পাও, আমাদের ধান তো আছে।

‘বলার মা’ বিকেলে মগির নির্দেশানুযায়ী তথ্যগোপাল
বাবু কাছ থেকে বিমূর্ণ হয়ে ফিরে এসে বললো—বুড়ো
সেলোনা বিসিবি, বলে তুমিদের ধান কবে ফুরিয়ে
গিয়েছে। তারপর সে নাকি নিজেরও অনেক নিয়েছে।
আর বেবনা? আর কী কর জানো? না কখনো নে।

—বলো না ‘বলার মা’, আমি রাগ করবো না।

—কর কী—ছি, ছি, ছি, ছি! কর যে ভাগ্যবান
তুমি একেই আসেন কান? তুমি নাকি তিনার
মাঝে...

অস্বস্তিতে পাশ ক্রিতে গিয়ে গায়ের অনেকগুলি
গুলি খুঁড়ে গেল। বেবনার সে কেঁপে উঠলো।
বলার মা ভয়ে ভয়ে তার মাথার পাশে গিয়ে মাথা রাখল
হাত দিতে লাগলো। ভাৎপন্ন বলে উঠলো—এ কী?
তুমি মাথার চুলির মাঝে মাঝে অহুগুগ হয়েছ!

মগি সে কথা শুনলো না। তার মনে কাঁটার মতো
বিধতে লাগলো এক বেবনা—বুড় শেবে তার নারীদের
পর ছোবারোপ না করে ছাড়লো না। সেয়ে উঠে সে
খুঁ বেধাবে কী করে; তার কাঁচাবুই বা শুনে কী
মনে করবেন! বুড় গায়ের প্রাচীন ব্যক্তি, অর্থশালী;
সে যা প্রচার করবে, লোকে তো তাই শুনে। কে
তার সত্যকে বাচাই করতে পারে! শরীরে বেবনা,
মনে বেবনা, আর কতো সয়! অতি করে সে ‘বলার
মা’কে বললো তার বাবা-মায়ের খুঁ ছাড়া ছিখানা কাছে
এনে দিতে। ‘বলার মা’ সেখানা এনে দিলে সে ব্যাপিকত
ছ’হাতে সেখানা বকের মাঝে চোপে খঁরে চোপ খুঁজে
কেন্দ্রলো।

পরদিন সকাল থেকে মগি অচৈতন্য হয়ে পড়লো।
জালো বেধতে পার না, কথা বন্ধ, কিছু বললেও তা’
বিকার হোমীর মতো অর্থহীন প্রলাপ। ‘বলার মা’
ভাৎ—বিসিবি, বিসিবি! মগি আধ-চাওয়া চোপে
তার দিকে তাকায়; ইয়ারায় কী যেন বলে। ‘বলার
মা’ বোকে না। তার চোখ দিয়ে অল ক’রে পড়ে।

ভাস্কর কীবাণু সকালে এলেন; মগিকে দেখে মনে
মনে বললেন—‘ল পদ্ম, একেবারে চামড়ার নীচে পৰ্বত
হয়েছে। ল পদ্মে গেছে। এ একেবারে চিকিৎসার
বাইরে।

বাড়ী এগে আলিপুর মেটাল ভেলের টিকানায়
মুন্সীবাণু কাছে একপানা পত্র বিধে জানালেন—মগির
ল পদ্ম হ’য়েছে; অবস্থা নিরিহাস। দেখবার ইচ্ছা
থাকলে যেন মগিকে কারাদুক্ত করে বাড়ী আসবার
ব্যবস্থা করেন।

পরদিন চারদিনে মুন্সীবাণুর হাতে গিয়ে পৌঁছলো।
প’ড়ে তিনি বিশেষতঃ হ’য়ে গেলেন। মগিকনোহনকে
চিঠিখানি দেখিয়ে তার পরামর্শ চাইলেন।

মগিকনোহন মুন্সীবাণুর কৃত্যবৎসলতার কাহিনী
অনেক শুনেছেন। তিনি বললেন—আপনি আবেশন
করুন ‘বঙ’ দিয়ে ছাড়া পাবার কষ্টে।

সরকারের নিয়ম আছে—যদি এট ধরনের রাজনৈতিক
বন্দীরা এই মর্মে লিখিত আবেশন পত্র সাধিল করেন সে
জীবনে তাঁরা আর কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে হুক
হবেন না, তা’ হ’লে ক’পক্ষ অবস্থা বিবেচনাও তাদের
মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন।

মুন্সীবাণুর জীবনে এট সরকারের বন্দীর প্রথম নয়।
আরো কয়েকবার তাঁকে সরকার বন্দী করে কারাবাসিত
ক’রেছেন। কোনোবারই তিনি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ক’রে
মুক্তির অস্ত্র জালায়িত হননি। এ ভাবে ব’উ আসতে
গেলে ভাৎে তিনি বসিষ্ট মৃত্তিতে নিরত্ত করেছেন।
কিছু আত নিজেদের বেলায় মৃত্তির খেট হাতিয়ে যায়।
লৌকিক কর্তব্যের পর অধরের আকৃতি ঘনী হ’তে চায়;
সেহরনের উষ্মলাগবে ভাবনাসী মৃত্তির তরলী জুঁ জুঁ
হ’য়ে যায়।

যে কয়েকজন রাজবন্দীর সঙ্গে মুন্সীবাণুর আন্তরিক
জানাখানি হয়েছে তাঁরা সবাই মগিকনোহনের প্রস্তাব
সমর্থন করলেন। কিন্তু যেন সে সমর্থন ক’রেও করে না।
আজীবন পদ তেড়ে যাবে?

শীঘ্র হুঁস্বনী ভাবনার পর তিনি আবেগের পর নখিল করলেন। উদ্ভূত কণ্ঠস্বরের অত্মোন্নয়ন ও অংশে অংশে আরও কয়েকদিন লেগে গেল।

মুন্সীবাথুর বৈধের বাপ ভেঙে গেছে। আত্মার সমস্ত তিনি সবাইকে হিদায় সজ্ঞাণ জানালেন। মানিক-মোহনকে বিশেষ করে বলে এলেন কারামুক্তির পর তাঁদের বাড়ীতে যেতে।

ভেল গেটের প্রহরীরা তখন বেশ একজন বৃদ্ধ নিরাপত্তা রক্ষককে ‘বও’ দিয়ে কারামুক্ত হ’য়ে যাচ্ছেন। মুন্সীবাথুর ভেলগেট পার হ’য়ে আত্মবাব সমস্ত তাঁরা মুন্সীবাথুর হিন্দে চলে মুখ ফিরিয়ে হাসতে লাগলেন।

মুন্সীবাথুর ও সিকে নম্র নেই। সংসার রাজ-বন্দীতের মূর্তির পর বাড়ী ফিরে আসবার উপযোগী হান-বাহনের বার পদমর্যাদাযুক্ত হয়ে দিয়ে সেম মুন্সীবাথুর মর্যাদার কথা কুলে গিয়ে তাই থেকে কিছু বাচিয়ে মেয়ের সঙ্গে কনসালেশন আত্মর কিনে সকে নিলেন। একবার তাঁর মনে হয় মণি নেই, আবার মনে হয়—না, নিকট আছে, এতদিনে হাতের ছত্র হ’য়েই উঠেছে। কণী তো তাঁক্তার মন্ড না।

মুখ অস্ত বাহ-বাহ : মুন্সীবাথুর গায়ে এসে পৌঁছলেন। বাড়ীর আড়িনাথ গিটে ডাকলেন—মণি, মা মণি, আমি এসেছি।

বাড়ী খা খা করছে কোনো সড়ক এলো না। বহু মণির ছবি যেন বলে বলে তাঁর চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে চলাকোরা করে বেড়াতে লাগলো।

‘বলার মা’ বেশতে পেয়েছিলো মুন্সীবাথুর বাড়ী যাচ্ছেন। সে ছুটিতে ছুটিতে পিছন পিছন এলো। তাঁর মাথো চোখোচোপি হতেই ‘বলার মা’ চোখে কাপড়’ দিয়ে হাট-হাট করে কেটে উঠলো।

বৃদ্ধের চাহনি কঠিন হয়ে এলো। হাতের সেই শাট-খানির পর ভর দিয়ে নিরুপস্থিত মতো তিনি বাড়ীয়ে হইলেন। তাঁর মুখ থেকে অশ্রু কয়েকটি কথা বেরিয়ে এলো—না এসেই বা কী ক’ববার ছিলো আর এসেই বা কী ক’ববার।

দীর্ঘ দীর্ঘে সারা আকাশ যোপে সজ্জার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

গরীবস্তান

প্রত্যন্ত বহু

চোখ বুজে আমি ট্রানে বাসে চলি

সনাতনী বুক এখনো কাঁপে

হঠাৎ যদি বা চোখে পড়ে সেই বৃহৎ মুখ

“অন্ন দাও !”

প্রতি চপ্তায় রেশন আনিতে গলিঘূঁষি দিয়ে

সোঁকানে ঘাট

বিচ্ছায়েগে ঘরে ফিরে আসি খাজ নিয়ে—

পাছে থলি হ’তে চাল কেড়ে নেয় বৃহৎ লোক ;

কলা কি যার ?

ঘরে থলি দিয়ে মনিব্যাপ খুলে পয়সা গুণি।

মরেছে কতট, মরবে অনেক আরো—

খেয়ে পরে সাজ আমি ও বাঁচি।

ভগবান, তুমি গড়ে দাও এক ‘গরীবস্তান’

কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দাও সেই দেশ ;

দূর থেকে শুধু সে বীণের পানে চেয়ে

গদ-গদ ভাবে বলিবে “আহা-হা-আহা !”

মড়াদের মাঝে জ্যান্ত মানুষ মোরা

ওহে ঈশ্বর, বল না কেমনে বাঁচি ?

ধনীর দয়া

শ্রীমন্তলা কর এম. এ.

চাঁদার ছেলে গোপাল আক লকালে মারা গেছে। সাতা গ্রামের লোক তার মৃত্যুতে দুঃখে পেরেছে। সে ছিল গ্রামের সব চেয়ে বলিষ্ঠ, দুর্দর্শন যুবক, বিধবা মায়ের বড় ছেলে। সরল, অমারিক এই যুবকটিকে সবাই ভালবাসত।

গ্রামের অধিনায়ক গৃহিণীর দয়া শাক্ষিপায় তুলনা নাই। গরীব দুঃখীরা তিনি মায়ের মত। প্রজাদের বিপদে তুহিনে তিনি সব সময় সামনে এসে দাঁড়ান। শোকে সাহসী বেন, বিপদে সাহায্য করেন।

অধিনায়ক গৃহিণীর কাছে গোপালের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছল। তার কোমল প্রাণ দুঃখীর দুঃখে কেঁদে উঠল।

গোপালের মৃত্যুর পরদিনই গ্রামের লোকেরা দিব্যি দেখল অধিনায়ক গৃহিণীর দাবী কিংবাং বোড়া পালকী, গোপালের মার ভাড়া কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে থামল।

পালকীর ভিতর থেকে নেমে এলেন অধিনায়ক গৃহিণী সর্বাঙ্গে দাবী অলঙ্কার পরে। যেমন তাঁর রূপ তেমনই তাঁর দাবী বেশকুয়া! দেখলেই মনে হয় যেন লাক্ষ্য দেবী অগচ্ছাত্রী।

কোনদিকে না চেয়ে চুক পড়লেন গোপালের মার তাবা কুঁড়েঘরের ভিতরে। ঘরের ভিতর এত অলঙ্কার যে প্রথমে কিছুই দেখতে পেলেন না। পানিক্ষণ চেয়ে থাকবার পর চোখে অলঙ্কার মরে গেল। দেখলেন ঘরের একপাশে ছোট উদান অলঙ্কারে, তার উপর একটি পুরাতন কড়া বসিয়ে, সামান্য একটু দুখ আল বিচ্ছে গোপালের মা।

কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলে উঠেছে, পরণে ছেঁড়া ময়লা শাড়ী। বাখার চুল কক, দেখলেই মনে হয় যেন শোকে, দুঃখে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু তবুও এক হাতে চোখ মুছে আর এক হাতে একধনে দুখ আল বিচ্ছে।

অধিনায়ক গৃহিণী বিষয়ে হতবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন—কি আকর্ষণ! এই সময়ও ওর দুখ আল দিতে প্রবৃত্তি হচ্ছে। লোকের যে বলে গরীব

লোকেরা মাথুং নয়, ওদের প্রাণ বলে কিছু নাই, তা দেখছি সত্য। না হলে মা হয়ে ছেলের শোক কুলে কখনও মাজই রাখা পাওয়ার কথা ভাবতে পারত?

অধিনায়ক গৃহিণীর মনে পড়ল গত বছর যখন তাঁর ন'বছরের মেয়ে দুখা মারা যায়, তখন শোকে তিনি কি রকম কাতর হয়ে পড়েছিলেন। সে বছর গ্রীষ্মকালে তাঁর দাবীর সহস্র অকুরোনেও তিনি পাহাড়ে বায়ুপরিবর্তন করতে গেলেন না। সারা পরমকাল বাড়ীতে দুখার ঘরে শুয়ে কাটালেন। তাঁর নিজের ব্যবহারের সঙ্গে এই ছোটলোক গোপালের মার ব্যবহারের কত তফাৎ।

দুখার নাক কুঁচকে তিনি আর না থাকতে পেরে বলে উঠলেন—“গোপালের মা! সত্যি, তুমি আমার অবাক করে দিয়েছ। তোমার গোপাল সব কাল মারা গেছে, আর আজই তুমি বলে দুখ আল বিচ্ছে। এসময়ও তুমি পাওয়ার কথা কুলতে পারনি। ছেলের শোক কি তোমার একটুও লাগেনি?”

অধিনায়ক গৃহিণীর কথা শুনে গোপালের মার চোখ দিয়ে জল জল করে তল গতিয়ে পড়তে লাগল। ছেঁড়া কাপড়ের ঝাঁচলে চোখ মুছেতে মুছেতে গোপালের মা দুখা গলায় বলল—“গোপাল চলে গেছে যে শোক কি আমার কুক বাজে নি? তার মাওখার সঙ্গে সঙ্গে আমার সব দুখ শান্তি ছুটিয়ে গেছে।

যিরে তেঁরা আমার কি আছে। তবে দুখটুং দুখা বলছ মা। ওটাতো জল নিতেই হবে। এখনই আল না দিলে যে নষ্ট হয়ে যাবে। পানের বাড়ীর গিন্নী ওটুং দিয়েছে, আমার ছোট ছেলে বাবে বলে।”

অধিনায়ক গৃহিণী দুখার নাক মুখ কুঁচকে গেরিগে গেলেন। একটুও সাহসনাও কথা বললেন না। মৃত্যুতে পারলেন না একটু ছুনের দাম এমন কি যে তার অস্ত্র ছেলের মৃত্যু শোক কুলেও দুখ আল বিচ্ছে বসতে হবে।

অধিনায়ক বাড়ী প্রতিদিন অল্প দুখ ফেলা যায়, কে তার শোক রাখে।

সামা ও শ্রমবিভাগ

শ্রীশান্তিনুশা ঘোষ

কতগুলি ঐশ্বর্যের কথাই প্রাচীন-প্রত্নতত্ত্বের আলোকে মণ্ডিত যে অজস্র হইয়া থাকে সেগুলিকে ক'ড়িয়া ফেলিয়া এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি পাঠকবর্গও সেইভাবে ইহাকে গ্রহণ করিবেন। কেন না, পুঁথিগত কোনও প্রচলিত বৃত্তকে মানিয়া নিয়া এ প্রবন্ধের ভিত্তি নাহ, এ নিত্যতাই সহজ শালা চোখে বিবহনবৃত্তকে দেখা।

বর্তমান বিজ্ঞানের ও ব্যাপক বয়সভাতার উত্তরোত্তর প্রীতিরূপে কৰ্মপন্থতির মূলে বহিয়াছে শ্রমবিভাগ। এবং নবীনতর আগামী সভ্যতার ভিত্তিতে থাকিবে সামা, তাই তাহাদের বখাযোগ্য বৌদ্ধিক পরিণতিতে টানিয়া লইয়া গেলে কোথায় শিল্পা পাড়ার এবং ক্রিয় সম্পর্কে পাড়ার, সেবিবার কৌতুহল হইতেছে।

সমাজের এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় কাজগুলিকে বিভিন্ন পাত্রের হাতে ভাগ করিয়া লিখেই যে কাজ পরিণতিভাবে এবং ক্রতগতিতে অগ্রসর হয়, সে সমাজ কোনও সংস্কারের অবকাশ নাই। বিশেষতঃ, যেখানে প্রতি ক্ষেত্রে অহসিন বহুলোকের সমবায়ে বিরাট শ্রমকার্য পরিচালনা করিতে হয়, এমন সমাজ পরিকল্পনার তো ইহা ছাড়া কার চলিতেই পারে না। হস্তরাং কৃষ্টির শিল্পের পরিবর্তে বহন বহনশিল্প চালু করিতে চাই, এবং ক্রমাগত ক্রততরগতিতে অতিক্রমের পরিমাণে শিল্পসত্তার চাই, তখন পুঁথিহুপুঁথিভাবে শ্রমবিভাগ অনিবার্য, এবং ফলতঃ শ্রেণীবিভাগ। এমন কি কৃষ্টির শিল্পেও শ্রমবিভাগ অত্যন্ত সুকলগ্রহ, কেননা, একই ব্যক্তির বা শ্রেণীর অধিনত একই ত্রব্য উৎপাদনে অত্যন্ত থাকার ক্রমঃ ঐ নিম্নে দক্ষতা জন্মে। সামাজিক জীবনের এই শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের সহই পুণাতনকালে আমাদের দেশে পেশা অঙ্গুসারে বর্ণবিভাগের স্রষ্ট হইয়াছিল।—তুণু শিল্পোৎপাদন সম্পর্কেই নহ। মাতুলের জীবনযাত্রার মধ্যে যে অসংখ্য রকমের প্রয়োজন প্রয়োজনেরই আছে তার

সবগুলিই মাতুল ভাগ করিয়া লইয়াছে, এবং আরও বৃহত্তর বিভাগের নিক মনোযোগ দিতেছে। ঘণা, কেউ গোপা, কেউ নাদিত, কেউ পাচক, কেউ শিক্ষক, কেউ চিকিৎসক ইত্যাদি। পাচকের মধ্যে মাংসের কেউ ইংলিশ ভিনে স্পেশালিষ্ট, কেউ হস্তোত্তা মোগলাই ভিনে। শিক্ষকের মধ্যে কেউ জুগালের মাতার, কেউ অল্পের মাতার। যদি এই ভাবে কালের বিভাগ উত্তরোত্তর বাড়াইয়া লইয়াই চলি, তবে কল কি হয়? হয় এই, কর্মীগণ নিজ নিজ বিশেষ বিষয়সমূহে অধিকতর পারদর্শী হইবার সুযোগ পাইবেন এবং অত্যন্ত সম্ভব বিষয়ে পণ্ড ও পরমুখ্যপেক্ষী হইয়া থাকিবেন সমাজ-বহুর প্রয়োজকটি কলকল। যদি নিয়মিত লক্ষ্যযোগিতার চলে তবে যতটুকুই ক্রমগতর সঙ্গে চলিবে; আবার যদি কোনও একটি কল। থাকিবা যায় অর্থাৎ এখন পর্যন্ত করিয়া বলে, তবে আগাগোড়াই বিকল হইয়া পড়িবে। যে বাহার বিচিরা থাকিবার নিত্যর আবশ্যক কাজগুলিও হুইভাবে চালাইতে পারিব না, কেননা, নিত্যর অভ্যন্তর একটি মাত্র বিষয় ছাড়া আর কোনও বিষয়েই অভিজ্ঞতা নাই। শ্রমবিভাগের স্বকল এবং সুকল ঘোটাছুটি এই।

এখন দেখা যাক সামাজ্যের কথা। পৃথিবীতে বৈষম্য দেখা যায় দুই রকমের—ধনের ও মানের। কেউ লম্বা, কেউ খর্ব, কেউ রূপ, কেউ মূল ইত্যাদি যে সব অকিঞ্চিৎকর বৈষম্য, তাহা লইয়া কোনও মারামারি, কাড়াকাড়ি নাই। ওগুলি অব্যাহত। ধনের ও মানের বৈষম্যের মধ্যে আর্থনিক রূপে আমরা ধনের উপরই বেশী জোর দিয়া থাকি এবং মনে করি, মানের বৈষম্য, ছোট বড় ভেদাভেদ, ধনের মাপকাঠির দ্বারাই নিয়মিত হয়। অবশ্য আসল তথ্যটি ঠিক সে রকম নহ। মাতুল প্রাকৃতিক বুদ্ধি (common sense) প্রণোদিত হইয়াই কতগুলি গুণকে, কতগুলি কাজকে অত্যন্ত অপেক্ষা বেশী মধ্যায়া দিয়া থাকে; এবং সেই গুণের ও কাজের অধিকারী যে, তাহাকেই পারিশ্রমিক, বা লক্ষ্যার্থ দিলাবে অধিক দৃশ্যও লম্বা দেখে। মানের সঙ্গে সঙ্গে তাই

ধনের তারতম্যও একই কারণে ঘোটাছুটি হইয়া থাকে।
এই হইল যুগ আভাবিক সমাজের নিয়ম। কিন্তু সমাজের
অন্য বিস্তৃত অবস্থাও আছে, যখন অর্থনৈতিক কতগুলি
জটিল কারণের কার্যদায় বাধিয়া অল্পটী ও সমাজের
অল্পগুলি ব্যক্তিও অগাধ ধনের অধিকার লাভ করিয়া
লয়—যেমন উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যুগে যিশেষভাবে
দেখিতেছি, পূর্বেও বহুসংখ্যে বহুতরুণ দেখা গিয়াছে।
কিন্তু আভাবিক দিনেও ধনের অধিকারই মানুষকে
অপরিহার্যরূপে সমাজের অধিকার দেয় না। মানুষের
অর্থনৈতিক common sense আশ্রয় লভাগ। চণ্ডী
ধনের কাছে সে ভয়ে মাথা নত করিয়া লয় দেখায় বটে,
কিন্তু অতঃপর সম্মান দেয় না। একজন অশিক্ষিত
চোরাগরীবাসী মহানগরের চেয়ে জনৈক অধ্যাপনসিঁই
অধ্যাপকের সম্মান আশ্রয় জনসাধারণের চোখে বেশী।
পূর্বোক্ত দিনের আব্যানেও ক্রিয়াকারী বা বৈজ্ঞানিকের
চেয়ে নিম্ন ব্রাহ্মণের আসন সমাজের কাছে উর্দ্ধে ছিল।
সুতরাং ধনের বাগাই মানের গুণ নির্ভারিত হয় না।
ধনের বৈষম্য বিদ্রুত করিতে পারিলেই সমাজে মানের
মিক হইতে স্বেচ্ছাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এবং বৈষম্য
থাকিলেই যদি কেবলমাত্র থাকিতে হয়, তবে সে কেবলমাত্র
তখনও থাকিবে।

অতএব দেখিতে হয়, মানের বৈষম্য বুড়ানো সম্ভবপর
কিনা। খনসাম্য কখনো সম্পূর্ণভাবে কোনও দশাবে
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিনা, সে বিতর্কমূলক প্রশ্ন বাদ
দিয়াই দেখি, শুধু কারণের তফাতের জন্য মানুষের কাছে
মানুষের সম্মানের তারতম্য কেন হয়, কোন নিয়ম
অনুসারে? যে গোলাবাসক তৈরী করে; বা যে ঔষধ
তৈরী করে কর্মী, তাহাদের দুইজনের মধ্যে মানের
কোনও পার্থক্য নাই; যে উকীল অথবা ডাক্তার অথবা
শিক্ষক, তাহাদের মধ্যেও নাই; যে ঘরের চাকর বা
বাহিরের মালী তাহাদের দুইজনের মধ্যেও নাই। অথচ
মালী ও ক্যান্টিনের কর্মী ও ডাক্তার-শিক্ষকদিগের মধ্যে
সম্মানের গুরুবৈত্তম্য থাকে। এটি কেন হয়, তাহা
জঙ্ক-কুলী ও মার্শাল গোলিনের মধ্যে ধনের প্রার্থক্য মাত্র

২০ আর ২০০০ পার্থক্য হইতো বা হইতে পারে, কিন্তু
মধ্যমার পার্থক্য সহজাতিক।

মানুষ যে বস্তুটির প্রভাবে আর সকলের চেয়ে উচ্চাঙ্গ
পাইয়াছে, সেটী মগজ ভিনিগটির কল্পনামূলক কল্পন
কল্পিতে পারে না। তাই মগজের কাছে বাহ্যিক নিম্নত,
মস্তিষ্কের বস্তুতা বাহ্যিকের বেশী তাহাদেরই মস্তকমধ্যে
মান ও মূল্য বেশী। কঠিন পরিশ্রম বাহ্যিকের পেশা
ভাগ্যে তাই নিজেতে তুলনার একটু ছোট বলিয়াই মনে
করে। ছোট পড় এ প্রভেদ আইন তৈরী করিয়া হয়
নাই, ধনতান্ত্রিকের কারসাজিতেও নহে। স্বাভাবিক
নিয়ম অনুসারেই "বস্তুর পূজ্যত্বে বাহ্যিক, বিধান সর্বত্র
পূজ্যত্বে।" তাই ডাক্তার ইকিনিসার-উকীল-শিক্ষকের
চেয়ে কারখানার সম্মান কম; কারখানার যে মগজ
পরিচালনা করে, কুলী মজুর তাও করে না, তাই
তাগদের স্থান আরও নীচে। বৈজ্ঞানিক পরিশ্রমের
মধ্যেও আবার বাহ্যিক মগজের কাছে লিঙ্গ, ধর্ম,
অস্ত্রের উচ্ছ্রিত খালোয়ান পরিষ্কার করে যে চাকর,
অস্ত্রের মধ্যম কাপড় সাজ করিয়া দেয় যে খোপা,
ছিন্ন খুলিগিলি পাতকী ঘেঁষাঘেঁষা করে যে ছুঁই, মজা কেলে
যে মুদ্রাকর, অস্ত্রের মলমল পরিষ্কার করে যে বেথর,—
তাহার সমাজে আরও অসমতার হইয়া পড়িয়াছে। অথচ
সামাজিক প্রয়োজন হিসাবে ইহাদের কাজের কোনও
মূল্যবান হইতে পারে না, অত্যাশ্রয় প্রয়োজনীয় অপরিহার্য
কাজ তবু মানুষ তাহাদের সমান চক্ষে গ্রহণ করিতে
পারিতেছে না। "Dignity of Labours" বৈধ প্রবন্ধ
বহুরূপের পর বহুরূপের লিপ্যনো ও শিপ্যনো হইতেছে
ভাবি-বস্তিতে বহিরা মহাভা। গান্ধী বেথরের কাজের
মহামূল্যতা সম্বন্ধে বহু উপদেশ বিতরণ করিয়াছেন। তা
সম্বন্ধে মানুষের স্বাভাবিক কটিকোণ ও মূল্যনির্ধারণ বোধ
তাহাকে সম্মান, উচ্চ পর্যায়ে বলাইতে ইচ্ছাকৃত
করিতেছে। শুধু তারতম্য নহে, সর্বত্রই। বাহ্যিক বস্তুতঃ
সম্মান নহে, তাহাকে সম্মানযোগ্য গ্রহণ করিতে সমান মূল্য
দিতে বাধ্য করা যায় না। মুঁড়ি-মিছুরির একদর 'ঠাকুর-
খলের' হেলেই লগ্ন অতএব শ্রমবিভাগের বৈধক্য

যদি আমরা এমন সীমা পর্যন্ত টানিতে চাই, যাহাৎ এক একদল শুধু মগজের কাজ মিটাই থাকিবে, এক একদল শুধু বৈদিক পরিশ্রম করিবে, এক এক ভ্রমী থাকিবে আরামপ্রদ আবহাওয়ায় স্বকর কাজে সমাসীন, এক এক শ্রেণী অধিরত তাহাদেরই প্রয়োজন মিটাইতে অপরিস্রব কৃপাশ্রমক কাজের ভারবাহী হইবে, শিব চাকুরের কনদের মত “এক কক্ষে রাখেন বাড়েন, আরেক কক্ষে খান”, তাহা হইলে সাম্য কখনও সমাজে আসিবে না, নিকি মাথিয়া ধনসাম্য প্রতিষ্ঠিত করিলেও না।

অথচ আমরা সাম্যও চাই, শ্রমবিভাগও বজায় রাখি। দুইটি সরলরশা ছুঁিয়া একটি ক্ষেত্ররচনা করিতে চাই—যা হইবার নয়। দুনিয়া বারি বে, মাহুকের জীবনচরিত সকল দিক্ দিয়া নির্মূত করিয়া রচনা করার যত্না প্রকৃতিসেবী রাখেন নাই। এক দিক্ পূরণের চাহিতে গেলে আর এক দিক্ ধাটো হইয়া পড়ে। পরিপূর্ণ একখানি সর্কাসবন্ধর অঙ্গাবরণ কিছুতেই দুনিয়া উঠিতে পারি না। তাই নানা দিক্ হইতে কিছুটা ব্যর্থ মিথ্য মিথ্য একটা চলনসই গোছের সামরুত করিয়া লইতে হয়—একটি golden mean। সভ্যতার যুগে যুগে নানা বিপ্লবের মধ্যে মিথ্য তাহাই চেষ্টা চলিতেছে।

যদি আমাদের সাম্য ও শ্রমবিভাগ দুইটিতেই বজায় রাখিতে হয়, তবে দুইতেই ছাঁটাই করিতেও হইবে। সামাজিক যে ব্যবস্থার আমরা অভ্যস্ত, তাহাকে পরিবর্তিত করা চাই। সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যাহারা নৃতির চালনা নিয়া ব্যত আছে, তাহারাও প্রাত্যহিক জীবনের কিয়দংশ কাজে পরিশ্রমে নিমূত করিবে, এবং বৈদিক শ্রম যাহাদের পেশা তাহারাও মস্তক চর্চার কাজে প্রতিদ্বন্দ্বের কিয়দংশ নিমূত থাকিবে, এ যদি হয়, তবে বৈদ্যের ব্যবধান অনেকখানি কমিয়া আসিবে।—যদিও সম্পূর্ণ নয়। রানিয়ার সামাজিক গঠনতন্ত্রে এ ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়াই “সেখানে পরস্পর সাম্য অনেকটা বেশী। কিন্তু শুধু ততটুকুই নয়। মাহুকের প্রাত্যহিক জীবনব্যতায় যে কাজগুলি অপরিহার্য অথচ অপরিচ্ছন্ন, রুচিবিশীত, তাহার কোনও শ্রমবিভাগ যা

শ্রেণীবিভাগ থাকিলে চলিবে না। সেগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিকে পদনিম্নদেশে, শ্রী-পুরুষ নিম্নদেশে নিম্নের হাতে নিরে সম্পন্ন করা চাই। যেমন বাবু আন করিয়া মহলা কাপড়পান ছাড়িয়া রানিয়া গেলেন, শ্রী অবস্থা কি চাকর সেটি পরিচর্য করিয়া কাটিয়া দিবে; একজন খাইয়া উঠিয়া গেলেন, আর একজন তাহার উচ্ছিন্ন শাক্ করিবার কাজে লাগিয়া যাইবে; এক লক্ষ্যধার পাথরানার প্রবেশ করিবেন, আর এক লক্ষ্যধার সেই পাথরানার কল্যাণতা পরিচর্য করিবে; এ গ্রন্থা একেবারেই ভাদিয়া দিতে হয়। সেই ভাদির খাতার আর যে কোনও প্রকার বে—কোনও পরিবর্তনেরই প্রয়োজন হউক না কেন এই অকটিকর নিত্যকর্ণগুলি প্রত্যেককে নিজের হাতে সম্পন্ন করিতে হইবে যে সমগ্রটুকু বৈদিক ব্যয় হইবে; সেটুকু সময় স্পেশালিষ্ট তার স্পেশাল কাজে নিয়োজিত করিলে অনেকখানি অগ্রসর হইতে পারিতেন সম্ভব নাই। কিন্তু না করিলে অল্প কতগুলি মাহু সমাজে পিছাইয়া থাকিত। হুতরাং সাম্যপ্রতিষ্ঠার ব্যতিরেকে সে পারদর্শিতার শোভটুকু ত্যাগ করিতেই হইবে। যাহারা সাম্যবাদের দাবীতে অগ্রণী তাহারা সাম্যপ্রতিষ্ঠার এই খুঁটিনাটির দিকে নজর দিয়াছেন কিনা জানি না।

শ্রমবিভাগের দৃষ্টান্তকে এমনভাবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কমাইয়া আনিতে পারিলে সেই পরিমাণে সমাজে মনের সাম্য আসিতে পারে। যদিও পরিপূর্ণ সাম্য-স্থাপনার কল্পনা আকাশকুহুম—দানেরও ধনেরও। পক্ষান্তরে শ্রমবিভাগ কমাইয়া আনার ফলে অব্যাপ্যধনের কিপ্রগতি কিছু মথর হইয়া আসিবেই। হুদ হুদ খেপে কেবলই উৎপাদন করিব, জীবনব্যতায় উচ্চ মানসও উচ্চত্তর করিব, এ আশ্বর্ষের পথে কিছু ব্যাঘাত পড়িবে। হুতরাং কোনটি চাই? যাহাদের আশ্বর্ষ কেবল plain living and high thinking, সভোগশীলতা নয়, তাহারা সাম্যের ব্যতিরেকে শ্রমবিভাগের কার্যক্ষমতাকে বলি দিতে রাজি হইতে পারেন। কিন্তু যাহারা ব্যক্তিক সভ্যতার উত্তরোত্তর ব্রীড়িত কামনা করেন, অথচ সাম্য-স্থাপনার আশ্বর্ষও স্থাপন গোঁব করিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে তাহারা দেখিবার বিষয়—কোনটি কতটুকু চাই?

ত্রন্দসী

বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মাসিক পত্রিকার পাতা উন্টাতে উন্টাতে হঠাৎ চমকে উঠলো মিনতি। শুণু চমকানো নয়, সারা শরীরটা বেন অকস্মাৎ কিশোর উত্তেজনায় শিউরে উঠলো। পর লেখকের নামটা তার একান্তভাবে পরিচিত—শৈলেশ দত্ত রায়।

কতদিন লেখেননি শৈলেশনা? মনে মনে হিসেব করতে থাকে মিনতি। বোধ হয় তিন বছরেরও বেশি হবে। তার সঙ্গে শেখবার দেখা হবার পর আর তিনি লেখেননি। সে ঘানডো বাঙ্গালার বিজ্ঞান প্বেষণাগারের কোন্ অঙ্ককার ককে শৈলেশনা চািরিবে গেছেন, ষাটবের আলো বাতালেের স্পর্শ তার গারে লাগে না হয়তো যে আলো বাতালেে সে বাস করছে।

মিনতির বিয়ের দু'একদিন পরেই হঠাৎ তিনি এসেছিলেন। নববধূর দাখে সজ্জিতা মিনতি তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছিল। বলেছিল—আমাকে তুমি কমা করো দাখা, আমার কথা তুমি কুলে বেও।

হুঁকোটা অশ্রুবিদু চক্চক্ করছিল তার চোখের কোবে। চোখদুটী আবেগে কঁপছিল, স্বরও কঁপছিল তার, বলেছিলেন—তিনবছর আগে তোমাদের বাড়ী থেকে যখন বেরিয়ে আসি তখনো বিচ্ছেদ হয়নি, আশ হলো। একমুহূর্ত হুপ করেছিলেন—তারপর শুণু বলেছিলেন—তোমার কথা তুমি রাখলে না মীছ, কিন্তু আমার কথা রাখবো আমি।

কথাটা আশও মনে আছে মিনতির, পরস্পরকে তারা ছাড়বে না কখনো, যদি ছাড়তেও হয় কখনো অত কাউকে তারা গ্রহণ করবে না।

কথাটা হয়েছিল ছয়বছর আগে। মিনতির বয়স তখন তেরো। শৈলেশদার বয়স বোধ হয় আঠার, উনিশ, অথচ সেবিনের স্বপার ভিক্তর কি আশ্রয়িকতা ছিল শৈলেশদার। কাউকেও জীবনে তিনি গ্রহণ করেননি, মাখী করেছেন ল্যাবরেটরীর অঙ্ককারকে।

এক মূহূর্তও না ষাড়িয়ে থেরিয়ে ষাঞ্জিলেন তিনি, মিনতি পথ ষাটকে রাখলো, বললে—আমার কাছে তোমার কি রইলো দাখা?

—রইলো আমার মনট, ত্রিক আর নিঃস হয়ে ফিরছি আমি।

—আমার কাছে কোনদিন আসবে না আর? ভারী হয়ে উঠলো মিনতির স্বর।

—ভবিষ্যৎকে তো জানিনা মীছ, হয়তো তোমার কাছে এসেই আমার আশ্রয় মাগতে হবে।

আশও মিনতির কাছে সেই 'হয়তো' লম্বাবনাই রয়ে গেছে। শৈলেশদার মমত আসেনি এখনো, বেখতে বেখতে তিনটি বছর পেটিয়ে গেছে।

বকনা নিয়ে ফিরে গেছেন তিনি, মিনতিই অপরাধী, সে তার কথা রাখতে পারেনি।

মাসিক পত্রিকাও পর লিখতেন তিনি, মিনতি কত আগ্রহের সাথে পড়েছে সে সব গল্প, সবগুলিই সত্ত্ব করে রেখেছে নিভের কাছে। তার পরের তিনবছর একহাতও লেখেননি তিনি, হয়তো একেবারে ছুরিয়ে গিচেছিলেন, আশ্র আবার শক্তি ফিরে পেয়েছেন।

তার বিয়ের বছরেই এম. এস. সি. পাশ করেছিলেন তিনি, তারপর সেই যে বাঙ্গালোরে কিশোর রিসার্চ করতে গেলেন আর ফিরে আসেননি, তার কোন স্বর এসে পৌছায়নি তার কাছে।

হুঁকোটা চোপের সল তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। বিয়ের পর থেকে এ দাখা কত হয়নি কখনো, আশও মিনতি রোখ করতে চাইলো না।

বীরে বীরে উঠে টাকটি কুলে পুংযোগে মাসিকগুলো সে বের করলো। আর তার একখানা কটো, তার বি. এস. সি. পানের ছবি, কনডোকেশনের গাউন পরা, তার কাছে তিনি পাঠিয়েছিলেন। কি স্বন্দর বেখতে তাকে, অতুল নয়নে ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলো মিনতি।

বি. এস. সি. পানের একবছর আগে তাদের বাসাখ এসেছিলেন তিনি। তার বাবার এক হরিত্র বন্ধুর পুত্র, এখানে থেকেই পড়াশুনা করবেন এই ঠিক হয়েছিল।

এলেন অনাদৃত কিন্তু গেলেম তাকে আর তার নাকে চোখের সঙ্গে ডাসিড়ে, যা আত্ম নেই, কিন্তু সে ত এখনো বেঁচে আছে, সরকারী অফিসারের স্ত্রী সে, মধ্যম দপ্তরে তার অসুস্থ দম্পত্য, তার প্রতি স্বামীর অপূর্ণ ভালবাসা, ঘরে বাইরে কিছুই তার অভাব নেই : স্বচঃ...

যা তাঁকে ভালবাসতেন হেলেনের চাইতেও বেশি, ভালবাসার যোগ্যও ছিলেন, সেহে মনে তিনি তখন অসুস্থ ছেলেমানুষ। তাই ত তাঁকে মিনতির এত ভাল লেগেছিল।

স্তের বছরের মধ্যে তখন সে। সেদিনকার শিশুদন এই মাহুতটোকে একান্ত আপনাত্ব করে চেঁবে নিয়েছিল। তাঁর কাছে পড়তো সে, তাঁর কাছ থেকে একমুহূর্তও হরে থাকতে পারতো না সে। কেনন একটা আত্মা মূহুর্তা ক্ষিপ্র তাঁর স্বভাবে, কোনদিন কোন কারণেই তাঁকে রাগতে দেখেনি মিনতি। কত বেদনা, কত অপমান তিনি সহ করেছেন, তিনি বলতেন—স্বীকৃতি এসবকেও স্বীকার করে নিতে হয় মীহ।

অর্ধের প্রাচুর্যের সাথে সাথে তার বাবাও অহংকারও ছিল প্রচুর। তার কাকার আরও বেশি। তাই অনাদৃত যে এসেছে, তাকে আপন করে নিতে আপত্তি ছিল তাদের, হরতো আপন করে নেবার শক্তিরও অভাব ছিল।

যা কিন্তু তুল করেননি, প্রথম দিনেই একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন তাঁকে। তাঁকে সেবীর মতই ভক্তি করতেন তিনি, এমন অপূর্ণ ভালবাসার নতীর কখনো দেখেনি মিনতি।

বাবা সহজভাবে নিতে পারেন নি মায় এই আত্মবদ, তাই নিপুণীত তাঁকে কম করেন নি। বোধ হয় এর মতই শের পর্যন্ত শৈলেশদাকে তাদের বাসা থেকে চলে যেতে হয়েছিল। তখনও ছেলেমানুষ মিনতি। সব কিছু তলিয়ে বুঝার মত বয়স তার হয়নি। কিন্তু বাবাকে আত্ম পর্যন্ত কমা করতে পারেনি সে, তিনি যদি জানতেন শৈলেশদা কতবড়, ভিতরে বাইরে তিনি কত দৃঢ় !

হঠাৎ একদিন বললেন তিনি—আমি চলে যাবো মীহ।

—কেন ? বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলো সে।

—কেন বুঝতে পারো না ? তোমরা ত কেউ আমাকে চাও না, তোমাদের কাছে বাস করা তাই কঠিন।

অভিমানে কালো হয়ে উঠলো মিনতির মুখ। বললে—কেনন করে আপনি বলতে পারলেন যে আপনাকে চাইনে আমি। আপনাকে ছাড়া একমুহূর্তও কাটেনা আমার।

আমর করে তাকে কাছে টেনে নিলেন তিনি। বললেন—না, না, তুমি তুল বুঝোনা মীহ। তোমাকে একথা আমি বলিনি, আমি জানি, আমাকে কতখানি তুমি ভালবাসো, তুমি আর তোমার মাকে তুলতে কোনদিন পারবো না আমি, কিন্তু তুমি দেখছো না তোমার মাকে আমার মত কতখানি কষ্ট সহ করতে হচ্ছে।

যাচা নত করে রইলো মিনতি। সত্যি সে ত জানে মাকে কত কথাই না শুনতে হয়। বললে—তাহলে আপনি আর আসবেন না ?

—তোমাকে ভেড়ে থাকতে পারবো না আমি, সুযোগ পেলেই আসবো।

তার বুকের ভিতর মুখ লুকিয়েছিল মিনতি। মনে আর সে হির থাকতে পারবে না।

শৈলেশদা ডিক্লেস করেছিলেন একটি কথা রাখবেন মীহ।

—কি বলুন ?

—তাহলে একটা গল্প পোনো।

—কিগল্প গল্প।

—ছোট্ট একটি বোন ছিল আমার। ভারী ভালবাসতাম তাকে আমি, কখনো কাছছাড়া করিনি, ভারী হয়ে এলো তার শর।—তারপর হঠাৎ হু'মিনের জ্বর সে চলে গেলো আমার কাছ থেকে। কিন্তু তুলতে পারিনি তার কথা। একটুখানি খামলেন তিনি, তারপর বললেন—হঠাৎ একদিন দেখলাম তোমাকে, কি জানি মনে হলো আমার সেই হাগানো বোনকে কিরে পেলাম,

তাই তোমাকে ছাড়তে এত কষ্ট আমার। অনেকক্ষণ পরে বললেন—আমাকে তুমি 'দাদা' ডাকবে ?

কি আশ্চর্য্য তার কণ্ঠে। মিনতির কানে যেন মিনতির মতো শোনালো। বেঘনায় টনটন করে উঠলো তার মন। শোন রকমে বললে—ডাকবো।

—বলো, আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না তুমি।

—না। আত্মরিক ভাবেই বললো মিনতি।

—কোনোদিন যাবে না।

—না। আরও পতীরথরে সে জবাব দিলো।

—তা হলে নিশ্চিত আমি, কোমল বায়পানে মিনতিকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। কি মধুর সে হাসি। অস্বাভাবিকভাবে এককালি টাবের হঠাৎ আবির্ভাবের মতই চক্চক করে উঠলো সারা মুখখানা, বললেন—তোমাকেও সারা জীবনে ছাড়বো না আমি, তোমার আর আমার মাঝে কাউকে আসতে দেবো না।

তারপরের কটা দিন কূলে কূলে ভরে উঠেছিল মিনতির সারাবাস, কিন্তু কটা দিনই মাত্র। একদিন দাবার আয়োজন হলো। সকাল থেকেই কাঁধছিল মিনতি। দার চোখেও অশ্রু, সে যেথেনি, কিন্তু শৈলেশবাবকে একটুও সে কাঁধতে যেথেনি। বলেছিলেন—ওকি। কাঁধছো কেন ? আমার আসবো আমি।

কবে ? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল সে।

—নির্ধাসনের যেমদ ছরালোই। একটু থেমে বললেন—তোমার মাঝে ভেমনি কথা যেথেনি মৌহ। চুপি চুপি কখনথর বললেন—কাঁকে একা কখনো থাকতে দিও না মৌহ, বলো—সূবে গেলেই কি হারিয়ে যাব ?

তবু পতীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো তার। মিনতির মনে হলো—এ প্রশ্নের জবাব নিম্নের মনে মনে অদীর হয়েই খুঁজছেন তিনি।

তিনি চলে গেলে। যেথের উপরই গড়িয়ে পড়লো মিনতি। যেন সারা পৃথিবী শূন্য হয়ে গেলো তার সামনে। কোথাও কিছু নেই, বাঁচবার কোন অর্থ নেই জীবনে।

অনেকক্ষণ পড়ে রইলো ভেমনি করে। যা এলে

টেনে তুললেন, বললেন—ছিঃ অমন করে কাঁধতে হয়, আমি জানি—সে নিশ্চয় আমার আসবে।

তার দিকে আশ্রয় নেমে ডাকিয়ে রইলো মিনতি। মনে মনে প্রার্থনা করলো—এই যেন গতা হয়, তিনি যেন আমার আসেন।

হু'তিন দিন সে কি আশ্রয় প্রতীকা। আরও পরিকার মনে পড়ে মিনতির। কূলে গিয়ে সে অহমমন হয়ে পড়লো, পড়তে বললে চোখে শুধু বল আসলো, থেতে গেলে ক্রিমে চলে যেতো, তারে চোখের মলে বাসিন যেতো ভিম্ব। মনে হতো জীবনে তাকে ভালবাসে এমন কেউ নেই, পৃথিবীর কারো সাথে তার কোন আত্মীয়তা নেই।

মনে মনে একটা প্রচণ্ড অভিমান হতো তার। কেন তিনি এমনি করে তার সকল কাজ, সকল চিন্তাকে জড়িয়ে রইলেন। কেন তার ক্রতোকটি মেহের কর্ণাকে সে মনে মনে এমনি করে লাগন করছে ?

একদিন তিনি এলেন, শরীর ঈর্ষ হয়েচে, মুখের উপর বেঘনায় একটা ছাপ পড়েচে স্পষ্ট হয়ে, চোখ চটী কোটরপত হয়ে গেছে, দৃষ্টিতে নেই আগের সজীবতা। যেন নিঃশেষ হয়ে ক্রিমে পড়েছে।

চোখ তুলে তার দিকে ডাকিয়ে রইলো সে। মুখ দিয়ে শুধু বোলল—এলে ?

—হ্যাঁ, যেন।

—এতদিনে বুঝি মনে পড়লো, আমি ত ভাবলাম তুলেই গেছো আমাকে।

জড়িয়ে ধরলেন তাকে। বললেন—আমার দিকে ডাকিয়ে বুঝতে পারো না যে তুলবার সামর্থ্য আমি হারিয়েছি।

অনেকক্ষণ ছিলেন তিনি। তার সঙ্গে গল্প করছেন, মাঝেও যেন আর নূতন বেথেনে মিনতি। সেই চাতুর্য্যর মুখে কেমন যেন একটা ছায়া, অকস্মাৎ বয়স যেন দল বছর বেড়ে গেছে মার।

আরও বিহার হিন্দে কাতা এলো মিনতির। বলল—আমার কবে আসবে ? আমার যে দিন কাটছে না।

—আমারও কি কাটছে মীহ? কিছু কি করি! আমার আঙ্গা বাঁধাও ত সহ্য নয় তোমাদের কাছে। একটু খেয়ে বললেন—দুঃখ কতো না মীহ, পাওয়ার মত হারানোও সহ্য নয়।

না বুকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মিনতি। শিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বসেন তিনি।

এমন সময় বাবা হঠাৎ বদলী হয়ে গেলেন। কলকাতা ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না মিনতির। তের বছরের সেই বেনা আঙ্গও মনকে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। দাদার সাথে আর যে দেখা হলো না।

নতুন ছায়গাঘ এসে দিন আর কাটনা মিনতির। দিন হুঁতিনখানা বেধে মিনতি। লিখে ছিঁড়ে আবার কেলে বেধে, কোনটা বা ভাঙে দেয়। ভাঙে দিতেও কত অসুবিধা। পোষ্ট অফিসে গেলেন না। বাইরের দিকে যেতেও পারে না বিশেষ। অল্পকে চিঠিটা দেখাতেও তার ভয় করে। বাবা যদি বলেন!

তাঁর চিঠি কিছু নিঃশব্দ ভাবে আসতো মার কাছে। মিনতির কাছেও তিনি লিখতেন। কত বেননা মাখানো সে সব চিঠি। পড়তে পড়তে কান্না পেতো মিনতির। বুকের মধ্যে চেপে বসে থাকতো সে।

একদিন রাত্রে অনেক রাত আবধি বসে বসে চিঠি লিখছিল সে। হঠাৎ বাবা এসে প্রশ্ন করলেন—ওটা কি লিখছো।

জবাব দিল না মিনতি।

—যেদি আমাকে লাগে ত একটু, বলেই টেনে নিলেন চিঠিটা। মিনতি চুপ করেই বসে রইলো।

বাবা অনেকক্ষণ ধরে পড়লেন চিঠিটা। কর্কশধরে প্রশ্ন করলেন—এ সব কি লিখছো?

এবারও জবাব দিল না মিনতি।

ছুপ্‌ছুপ্‌ করে চলে গেলেন তিনি। মা তখন সবমাত্র আদিক সেয়ে উঠেছেন। বললেন—তোমার মেয়ের কীষ্টি দেখেছো?

—কি?—হাললেন তিনি।

—হালতে হবে না তোমাকে। কর্কশভাবেই

বললেন তিনি। তুমিই ত সোহাগ দিয়ে এতখানি গড়িয়েছো?

—কিলের কথা বলছো? শক্তিকণ্ঠে তিনি শিঞ্জেল করলেন।

—সেখানে এই চিঠি। মা মেয়ে মিলে কি অন্যায় যে তোমরা আশঙ্ক করেছো। মেয়ে লিখেছেন দুনিয়াতে তার আপন বলে কেউ নেই, মা হয় তো লিখবেন তোমাকে না যেনে একদুর্ভাগ্যও বাচবে না। কি মানে হয় এসবের?

হাত পেতে চিঠিখানি নিলেন তিনি। বুকে পাঠলেন সবই কিছু কিছু বললেন না সে সম্পর্কে। শুধু বললেন—পৃথিবীর সব কিছুই মানে বোধগম্য হয় না সবায়।

কেনন একটা স্ফুটতা বেছে উঠলো মার কণ্ঠে। আশ্চর্য হয়ে গেলো মিনতি। মার পক্ষে এটাও অস্বাভাবিক।

—কি বললে তুমি? বাবা প্রশ্ন তীব্র করে উঠলেন। আমি বলেছিছি এর পর তার সঙ্গে যেন কোন সম্পর্ক না রাখো তোমরা। আমি পছন্দ করি না এ সমস্ত।

স্বামীশ্বের অহঙ্কার নিয়ে তিনি বেগিয়ে গেলেন।

সেখানেই কাঠের পুতুলের মত গাড়িয়ে রইল মিনতি। ঘোর করে দরজাটা চেপে ধরলো। মায়া শরীর কাপছে তার। মাঝার ভিতরটা ঘণ্‌ ঘণ্‌ করছে।

—ওকি, অমন করছি কখন মীহ? স্বাভাবিক ভাবেই যা প্রশ্ন করলেন, যেন কিছুই হয়নি। কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

তাঁর বুকের ভিতর ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো মিনতি, বললে—তুমিই বল মা, আমার কি অপরাধ হয়েছে। তাঁর কাছে লেগা কি শক্তিতে অপরাধের?

—না! মা গভীরভাবেই বললেন। দুঃখ করি না মীহ, অকারণ অত্যাচারও মেয়েদের মইতে হয় অনেক।

তারপর একদিন রাতের কথা। নিম্নাহীন চোখ মেলে তাকিয়েছিল মিনতি। কোন্‌ দুহাতে গড়ে আছেন

পৈলেশ্বর ? কি জানি তার কথা তিনি ভাবছেন কি না।
না জুবে গেছেন লেখাপড়া—। এমন সময় সে তুলল
বাবা বলছেন মাকে—তোমার নামে একটা চিঠি এসেছে
আমাকে।

—তার চিঠি ?

—পৈলেশ্বর। খুলে আমি পড়েছি সবটা। বলিনি
তোমাকে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না ?

—এমনি আবেশ কেন করছ তুমি ? আমাকে কি
জোর করে দেখানোর বস আছে এমনো মনে করো ?

—না, আমি চাইনা আমার জী কারও সাথে
আত্মীয়তা পাতায়। তোমাকে একথা স্পষ্ট করে বলবার
সময় এসেছে।

কি কর্তার কর্পনতা বাবার কণ্ঠে। রাগে স্থপায়
আর অভিমানে মিনতি বেন মাটির সাথে মিশে থাকে।
কড়িনাখালে সে প্রতীক্ষা করে রইলো।

—আমি নিজেই তার কাছে লিখবো—বাবা বললেন
একটু পরে—লিখবো যে আমার জী কিবা ঘরের কাছে
ভবিষ্যতে কোন চিঠি না লিখলেই স্থী হব আমি।
তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চাইনা আমি,
হরিও তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন।

মা'র কাছ থেকে কোনো জবাব এলো না।

—আর তোমাকেও সেই করতে হবে সেই চিঠিতে।

—আমাকে ? কেন !

—বে তোমারও এতে সম্মতি আছে।

প্রায় পাড়িয়ে উঠলেন না। তীব্রকণ্ঠে বললেন—
না, আমি তা পারবো না, আমার সম্মতি এতে নেই,
তাকে এমনি করে কিছুতেই লিখতে পারবো না আমি।
বাবা বললেন—চ' !

মার কাছ থেকে সম্মতি আদায় করেছিলেন কিনা
জানেনা মিনতি। তবে একটা যে খুব অশ্রুতিকর
ব্যাপার ঘটে গেছে তা' বুঝতে তার কষ্ট হ'ল। এরপর
মুখে হতাশা কেউ কিছু বলেনি আর, কিন্তু কর্পনতায়
সমস্ত কলহকে এটা ছাড়িয়ে গেছে। মার কাছে বেতেও
ভয় করত মিনতির। চোখ দু'কেনন বেন অবাধাবিক

হয়ে উঠেছে, দৃষ্টিতে সেই মাধুর্য নেই, বেন আঙনের
জুলুকি বেয়ের মাঝে মাঝে। বিশ্রী হয়ে উঠেছে মারা
চোখা।

ঠাকে কি মা লিখেছেন এ সম্বন্ধ ? তবে তিনি
এলেন না কেন এতদিনেও ? মিনতি ভাবে হত না
আমাই ভাল। কেন তিনি অথবা কষ্ট পাবেন !

অবশেষে একদিন এলেন তিনি। মিনতি জানতো
না, জর হয়েছিল তার। পড়েছিল বিছানায় কয়েকদিন
থরে। স্বপ্ন দেখছিল তিনি আসছেন।

মার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল শোনেনি মিনতি।
কিন্তু হঠাৎ সে দেখল মার। এসে তার বিছানার পাশে
পাড়িয়েছেন। অভিমানভরা চোখ মেলে তাকিয়ে
রইলো মিনতি।

—জর হয়েছে তোমার ? ডাঙা ডাঙা হয়ে বললেন।
মাথা হাত বুলাতে লাগলেন।

—সেয়ে উঠবে তুমি, নিশ্চয় সেয়ে উঠবে তুমি, হৃৎ
করো না, যীহু। কোন কথাই মিনতির মুখে এল না।

একটু পাড়িয়েই বললেন—এবার তবে হাই আমি,
হাই ? কণ্ঠে তার কি বেদনা !

জল-ভরা চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে রইল
মিনতি। তার গুণে একটি চুম্বন করলেন তিনি।
মিনতির মনে হলো তার চেয়ে উত্তম মাদার শরীর।
নিজের গুণ বেন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

তিনি এক পা এক পা করে বেরিয়ে গেলেন।

উত্তাপের জ্বালা ঘেঁচেনি আদায়। মারা মনেও
জ্বালা খরিয়ে বেধে মাঝে মাঝে।

আর আসেননি তিনি। মিনতি পেনিন হুয়েতে
পারেনি কোন্ বিধায়ের জ্বর বেতেছিল তার কণ্ঠে।
কয়েকমাস পরে ভাকে একটা পার্কেল পেয়েছিল সে।
খুলে দেখলো একটা ছবি। বি. এম. সি. পাশের পর
তুলেছেন। কি জ্বলন্ত দেখাচ্ছে ঠাকে। ছবিটাকে
প্রণাম করলো সে।

মার শরীর মন প্র'হে ভেঙ্গে পড়েছে। বিছানা থেকে
প্রায়ই উঠতে পারতেন না। ছবিটা রেখে দিলেন তার

কাছে। বলেন—অভিমান করে সেই যে চলে গেলো
আর এল না। আর তাকে খেঁখো না কোনদিন।

কিন্তু মাঝে কঠে বেদনা করে পড়তো। মিনতি
কিন্তু সাধনা লিখ টাকে।

বলতো—দেখবেই তুমি না। কোনাকে ছেড়ে
তিনিও কি থাকতে পারবেন।

—আমিও তাকে আসতে বাধ্য করেছিলাম যীহু।
বোধ হয় আমাকে, তার মন সে কমা করতে পারে নি।

মিনতি কোন ভাব লিখে পারতো না। ভাবতো
—এমনই বৃত্তি হয়। এমনি করেই বৃত্তি মাহু বেদনা
পার সংপারে।

—আমার একটা কটো সে চেয়েছিল। আর তোর
একটা। তার প্রবন এক শেষ চাহিয়া। পাগিয়ে দি-
তো নীহু।

—তার ত্রিকানা যে জানি না।

—পুরানো ত্রিকানার পাগিয়ে যে, সে হাত পায়ে।

মিনতি তাই করেছিলো। গেয়েছেন কিনা কে
জানো।

পরের বছরেই বিয়ে হয়ে গেল মিনতির। তার
নিজের আশ্রিত 'ত' ছিলই। আরও একটা আশ্রিত
ছিল। তু বাবা কাকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্যকরী
হয় নি তারের প্রতিবাদ। এখনো মিনতির শাঠ মনে
পড়ে মা'কে কতখানি বরণা গেতে হয়েছিল তার বিয়ের
ব্যাপারে। কিন্তু মাঝের কল্ম অল্পনয়ও সেদিন গ্রাঙ্
হয় নি।

বিয়ের রাত। চূর্ণ করে বাসর ঘরের একাঙ্গে
বসেছিল মিনতি। ভাবছিল—তিনি এখন কোথায় ?
তার কাছে কথা ভাব করলো মিনতি। তিনি দুঃখ
পাবেন, হাতো সারা জীবনই—এ বাথাকে তিনি কুলতে
পারবেন না, তু- তু সে কি করবে ?

হৃদয় করে অল্ল করেছিল তার চোখে। মোমটার
আড়ালে সেই অস্ত্রবিন্দু নীরবে করে গেছে। প্রচান
করেছে অজ্ঞাত কোন গণে তার পায়ে পৌঁছানোর মন্ত্র।
তার প্রার্থনার নৈবেদ্য। তার ক্রমাভিষ্কার প্রতিনিধি।

তারপর শুধু একদিন তিনি এসেছিলেন। কয়েকদিন
পরে শব্দর বাড়ীতে। আর আসেন নি, আর তার বেথা
মেনেনি।

একদিন বাবী মিজাসা করেছিলেন—রাতদিন অত
কি তাবো বলত ?

—কিছু না, এমনি।

—ও, বলবে না বৃষ্টি আমাকে ? অভিযানে হলুদ
করে উঠলো বাবীর চোখ। —আমাকে বৃষ্টি তোমার
বিষাল হয় না!

হেসে উঠেছিল মিনতি। ভাল লাসে এই ছেলে-
মাহুই তাব। আর একজনকে চকিতে মনে পড়ে যায়।
তিনিও এমনি ছিলেন।

—ভাবছি বাবার কথা। সেদিন যিনি এসেছিলেন।

—মৈলেশবাবু ? তিনি তো বাবালোরে চলে
গেছেন। কয়েকদিন আগে বাগজে দেখেছি। কিলের
নাকি রিসার্চ করছেন।

তাই নাকি। শুধু বললো মিনতি। সেত জানতো
এমনই হবে। এমনি করেই তিনি চলে যাবেন। থাকে
জানিয়েছিল মিনতি। বলেছিল তার সঙ্গে দেখা হবার
কথা। মা তখন অস্থির। দীর্ঘনিশ্বাস কেলে বলেছিলেন
—আমার ওপর অভিমান তার যুচলো না, অথচ ভগবান
জানেন আমি কোন অপরাধ করিনি।

• • • • •

আজ আর মানেই। কিছুদিন আগেই তিনি চলে
গেছেন। মিনতি শুধু একা বহন করছে এতবড় ছুটি
শোক। কাউকে জানাবার উপায় নেই, কারও কাছে
প্রকাশ করার উপায়ও নেই।

শুভ দৃষ্টিতে ভবিষ্যতার দিকে তাকিয়ে রইলো
মিনতি। কি জানি এখন তিনি কেমন হয়েছেন।
হাতো কাকালে হয়ে গেছেন, সারা শরীরের হাড়গুলো
চামড়ার দর তেল করে আশ্রয়প্রকাশ করেছে, চোখের
দৃষ্টিও আজ তিমিত ? কি জানি।

অনেককাল এমনি করেই তার কাটলো। মাথাটা
টেবিলের উপর রেখে চুপ করে বসে রইলো। অনেককাল,

ভাষ্যের চুঁচু মনে হলো গল্পটাতো এখনও পড়া হয়নি। এতদিনে তবু তাঁর কিছু চিহ্ন পেয়েছে মিনতি। মাদিকের পাতাটা উলটিয়ে একবার সে দেখলো। তিন পাতার মধ্যে ছোট একটা গল্প। প্রথমেই সম্পাদকের ছোটো মন্তব্য। লেখকের কাজ থেকে গল্প আলাদা করার বাহ্যুদ্রীটা বিনয় সহকারে প্রকাশ করেছেন। মিনতি পড়তে লাগলো—

“পুরাণো চাকরটা চলে গেছে কয়েকদিন আগে। সারা বাড়ীটা একেবারে ঠাকা ঠাকা ঠেঁকেছে। এতবড় নিম্নক বাড়ীটাতে আমি একা। সে আর আমি শুধু থাকতাম এখানে। সে শুধু আমার চাকর ছিল না, সানী, বন্ধু, অভিভাবক একাধারে সবই ছিল সে। হঠাৎ স্ত্রীর অস্থ করাতো তাকে বাড়ী চলে যেতে হয়েছে।

লাইব্রেরী ঘরটাতে একা বসে বসে ভাবছি। আমার চারিদিকে পাহাড়ের মত বইয়ের স্তুপ। আমার সারা জীবনের একমাত্র সঞ্চয়; শেষ জীবনের একমাত্র সঞ্চয় এই বইগুলো। ছোট বড় অনেকগুলো আলমারিতে ভরা সজ্জিত। আমার নিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁসছে।

এ ঘরের প্রতি ত্বরে বনমালীর হাতের ছাপ। সে গেছে অর্থাৎ এ ঘরে সব বিপুল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে কিছু গুছিয়ে করতে পারি না। কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। তাই বসে বসে ভাবছি—সে কবে আসবে।

বাঙালী চাকর পাওনা দায় না এ অঙ্কলে। সেখ থেকে এতদূরে কেই বা আসবে। বনমালী অবশ্য একজনকে দিয়ে গেছে। তার দেখা পাইনি এখনো। হয়তো আসবে একটু পরে।

দাবার সময় কেন জানি না বনমালী ঝাঁকছিলো। হয়ত এতদিন আমার সঙ্গে থাকতে থাকতে বেতে তার ইচ্ছা করছিল না। মায় পড়ে গেছে আমার ওপর।

হেসে ভিগোল করলাম—কি হ'ল? বুড়ো যখন ছেলেনাচুয়ের মত কাঁদছিল কেন?

—আমার কপাল, বাবু। তাই কেঁদে মরছি।

এমনিই বনমালীর কথার দরন। বললাম—

ভাড়াভাড়া বন্দা ছাই। বউয়ের অস্থ বেড়েছে? আর কিছু টাকার ব্যবহার?

—বাড়ার চাইতে মরলে আরও খুশী হতাম বাবু। বুড়ী মরলেই আমি বাঁচি। সে অস্তে ঝাঁপছি না।

—তবে কি?

একটুগানি ইংল্যান্ডে করল সে। তারপরে বলল—
বুড়োর একটা কথা রাখবে বাবু?

—আগে বল না।

—তুমি একটা বিয়ে করো।

হেসে উঠলাম—এমনি ত' বেশ কাটছে বনমালী। বরদ বেড়ে গেছে, কেউ এখন মেয়ে মেয়ে নেই।

—একটা কেন, একশটা বেলে। তুমি মত মিলেই আমি এখনই যোগাড় দেখতে পারি। —সরল মাছুষটির চোখ দুটি আশ্রয় চক্চক করে উঠলো। চুপ করে রইলাম। আমার চুপ করাকেই সে তব করে সবচেয়ে বেশি। দুর্ভাগ্য পূর্বের আশ্রয়ের বন্দি মিনিটে গেল তার মুখ থেকে। বললে—কই, কথার ব্যবস্থা নাও।

—তুইত' সবই জানিন্। তবু কেন জালাতন কবিস্ বারবার?

—এমনি করেই কি শেষ করে দেখে নিচ্ছেক। কর্তৃত্বভাষে সে বলে উঠলো!—আমি বাবু আর পারি না। আমার বুড়ো হাড় তোমার ঘর গোছাতে গোছাতে জল হয়ে গেল। বাড়ী গেলে আর আমি কিরক না এবার।

—তোর যেমন খুশি তাই করিন্, আমি উঠছি, কয়েক ঘেরোতে হবে।

—ওকি। এমনি উঠবে কি? পেয়ে যাবে না?

—আমার টেবিলের ওপর বেধে নিন্। এসে খেয়ে নেব।

—না বাবু, সে হবে না। সে আমি করবো না। তাহ'লে থাকবেই না তুমি, মনেও থাকবে না।

—মনে থাকবে, এখন তোরা সাথে আর বসবক করতে পারছি না।

বেঠিয়ে বাজিলাম। বনমালী দৌড়ে এসে দরজা—

আটকে লাড়ালে, বলে—আমাকে খাড়া গিরে ফেলে দিতে চলে বাও। তা হলে তুমিও বাচবে, আখিও বাচি।

হেসে উঠে ঘাওয়া থেকে নিরস্ত হ'লাম। বললাম—দাড়াইলোক পেয়ে গেলেও তুই এখনো ছেলেমানুষ বনমালী। তোকে স্থলে ভঙ্গি করে রেখে।

—হা খুশি করো। হাসিমুখেই ঘরের ভিতর ঢুকে পেল সে।

এই বনমালী চলে গেছে। তাই বড় একাকী মনে হচ্ছে।

চলে চলে পড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মন বেন লাগছে না। কেমন অনমনস্ক হয়ে পড়েছি। অন্ত-মনস্তা ভাল লাগে না আমার। ক্রমে বাথো বলে তাই পোষাক পরলাম।

নতুন চাকরটি এলো এমনি লমবে। ছোকরা বটে, পনের বোল বছর বয়স, মুখে বোকা বোকা হাসি। জিগোস করলো—চা খাবে না বাবু?

—খাবো ত', কিন্তু নেই কে? এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

—বাথারে খেলায় যে। কৈফিয়তের হুত্রে বলল সে। আবার হেসে উঠল।

—আমি বললাম—আমি বলছি, তুই চা নিয়ে আয়! ধোঁয়া করবি না তো?

—না, বাবু, এতুনি নিয়ে আসছি।

চা খেতে খেতে তাকে বললাম—এই নে চাবিগুলো। লম্বা সরাসরি তাল খুলে ভাল করে খাঁট মিল। বিছানার চাদরগুলো বদলিয়ে দিস্ আর ঘেঁষবি ছবিগুলোতে স্থল ধরেছে কিনা।

—এত চাবি কি হবে বাবু? বোকার মত প্রশ্ন করল সে—বন্ধ ঘরগুলোও খাঁট দিতে হবে?

—হ্যাঁ।

—কেন? শুধানে কেউ থাকে নাকি?

—আজকে না থাক, একদিন থাকবে ত'। যা

এবার নিয়ে যা।

—আমি অত পারবো না বাবু।

—পারবি না মানে? —কঠিন হয়ে উঠলো স্বয়ং—কি পারবি না? ঘর খাঁট দিতে পারবি না?

—অত ঘর খাঁট দিতে বাথো কেন? কেউ বধন থাকে না?

তার বোকাহিতে হেসে উঠলাম। সেও কিছু করে হেসে উঠলো। ভারী নিষ্ঠা তার হাসিটা, দেখতে বেশ লাগে। রাগ করা যায় না তার উপর।

—আচ্ছা, থাকে। এখন যা!

—কে থাকে? আমি ত' দেখছি তালো বন্ধ।

—তালো খুললেই লোক দেখতে পাবি। দেখগে।

চোখের দৃষ্টিতে তার ভীতি হুটে উঠলো। বললে—তা হ'লে ত' আমি পারবো না বাবু। ভয় করবে।

—কেন ভয় কিলের?

—বন্ধ ঘরের লোককে ভয় করবে না আমার?

আবার হাসলাম। বললাম—আচ্ছা, চল তোকে ঘেঁষিয়ে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও ছেতরে এল। সামান্যসামান্য সরকাওয়া হুটো ঘর। হুটোতেই তালো দেওয়া। একটাও তালো খুলে ফেললাম আমি। উৎসুক দৃষ্টিতে ঘরের ভিতরে সে তাকালো। আমিও তাকিয়ে যেলাম। মনে মনে প্রশংসা না করে পাশোয় না বনমালীর। কেমন কক্ককে করে রেখেছে ঘরটা, যেন এই মাত্র তালোবন্ধ করে কেউ বেঁধিয়ে গেলেন এই ঘর থেকে।

চলি পল্লভাঙ্গি বহরের একটি মহিলায় একটি অংশে পেন্টি সামনের সেরালে। গরবের লাল পাড়টা চতুর্ভুজ করছে যথার উপর। নীচে পুন্ডার কতকগুলি সরঞ্জাম, একটি লক্সীদৃষ্টি, আর ছুঁতিনটি নানা হেবদেবীর ছবি। তার সামনে হুশ্বরতাবে একটি আসন পাতা আছে। সবই বনমালী করে গেছে। এমনি করেই সে বসাবস করবে। আমাকে ভাবতে হয় না। এ ঘরে আমি আসি না। আসতে ভাল লাগে না। মনটা কেমন ভারী ভারী হয়ে ওঠে এ ঘরে প্রবেশ করতে করতেই।

—কায় ছবি বা এটি? তোমার মায়ের।

—হ্যা, আমার মা বইকি একরকম। জবাব দিলাম একটু হেসে।

—তবে তিনি মারা গেছেন?

—দুখ বোকা মারা যাবেন কেন? তাঁর কাছে যেতে পারি না তাই ফটোটা এমনি করে বড় করে রাখিয়ে রেখেছি।

—ও! কি করে হেসে উঠলো। বললে—এ বিছানাটা তবে কার?

ঘরের আর এক পাশের খাটটার দিকে ইকিতে দেখিয়ে দিলো।

তিনি এলে এখানেই থাকবেন। এখানেই পুজো করবেন।

আমার মুখের দিকে বোকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। আমি চোখ কিরিয়ে নিলাম। সে দৃষ্টি কেন লইতে পারছিল না আমি! তার হাসির শেষে দুখ কিরিয়ে দেখলাম। বললে—চলো এবার ওঘরটিও দেখিয়ে দেবে।

—না, না। তুই মেখে নিল। আমার দেহী হয়ে থাকছে। ব্যস্তভাবেই বলে উঠলাম।

অন্ত ঘরের ডালাটা সেই খুললো। ঘরের ভিতর প্রবেশ করলো। হাজার বছরের অন্ধকারায়র অনাবিকৃত গুহা থেকে যাত্রার ইতিহাস সংগ্রহ করছে যেন সে। আমার মনে হলো—সেইই আবিষ্কার করছে, আমি শুধু তার পথের লক্ষ্যত।

ঘরের মাঝখানে পাড়ালো সে। একথানা টেবিলের উপর লম্বা চাদর বিতানো। পরিষ্কার স্বচ্ছ করছে। কয়েকটা বুলপাঠা বই তার উপর। পাশে একটি চেয়ার। আর এক দিকে একটি ছোট বাট, তার উপরও বিছানা পাড়া। দেয়ালে একটি বড় ছবি, উপরে কালো একটি পর্দা ঝুলছে।

তার দিকেই অসুনি নির্দেশ করলো সে। বললে—ছবিটাকে ঢেকে রেখেছে কেন?

জবাব দিতে একটু সেরী হলো। বললাম—খারাপ হয়ে যেতে পারে, তাই।

—পর্দাটা উল্টিয়ে দেখবো একটু?

—দেখ না।

আগে আগে পর্দাটা সে উল্টিয়ে দিলো। তেজো চৌদ বছরের একটি কিশোরী মেয়ের ছবি। মুখে কেমন একটি কল্প হাসি। তার মত আনিও নিমিত্তে মনে চেয়ে রইলাম। কতদিন দেখেছি, তবু কেমন বেথতে ইচ্ছা করে।

চমক ভাঙলো তার কথায়। বললে—আমি কেমন সুন্দরী মেয়েটি। এতোমার কে বাবু?

—আমার বোন।

একটুখানি চুপ করে রইলো সে। তারপর সংগ্রহ কর্তে প্রশ্ন করলো—এত বেঁচে আছে?

—হ্যা, বেঁচে আছে বই কি! তবে আমার জীবনে আর বেঁচে নেই।

আমার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো সে। কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারে নি। আমিও আর কোন কথা না বলে 'কিহে লাইব্রেরী ঘরে চলে এসাম।

চেয়ারে বলে হঠাৎ কাঁদা গেলো আমার। দৃঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম—স্বাভাবিক বিবেচনার দিকে। মনে মনে ভাবলাম—হ্যা, তারা দুজনেই বেঁচে আছে। কিন্তু আমার কাছে তারা মৃত। ঐ ঝুঁকি পেটিংগুলোই তার স্বাক্ষর। আমার ঘরে তারা কখনো আসবে না। খাটের উপর বিছানাগুলো চিরদিনই এমনি করে পাতা থাকবে। আচ্ছরের মত বলে রইলাম।

একি শুধু গল্প? মিনতির কাছে এত অজ্ঞাত একটা ইতিহাস। ছবিগুলো না দেখলেও মিনতি কি বুঝতে পারে না সেগুলো কার কার?

বক্তা নেমেছে মিনতির চোচোপ বেয়ে। হ্যা! মৃত মনে তোমার কল্পনা চিরদিন কল্পনাই থেকে গেলো। তোমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা কোনদিন পূর্ণ হলো না। ঠাকি ভরে উঠলো না তুলে ফলে। তুমি জানো না, একজন পৃথিবী ছাড়িয়ে ইতিমধ্যেই অনন্তের পথে রওনা হয়েছে। আর একজন জীবনের বেড়াগুলো বন্ধী!

খোলা পাতার উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাগজে লাগলো মিনতি। মনে মনে শুধু বললো—কমা করো, আমাকে তুমি কমা করো।

কতক্ষণ এমনি করে সে ছিল কে জানে। মাথার উপর একটা হাতের নিতল স্পর্শে মূগু তুলে তাকালো নে। দেখলো—স্বামী কখন এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন

—ওকি! অমন করে হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কানছো কেন মীহ?

উঠে দাঁড়ালো মিনতি। জাঁচল দিবে চোখ দুটি ভাল করে মুছে নিলো, মানিকগুলো কুড়িয়ে গোছগাছ করে নিলো। মুখে একটা হাসি টেনে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো—কানভেঙে মাঝে মাঝে বেশ লাগে।

প্রান্তিক

শ্রীসংযুক্তা কর বি. এ.

রক্ত দিনের সূর্য্য নামিছে পাটে
ছায়া তারি পড়ে জীবন-ভঙ্গ পরে
হে ফুলধরা ব্যর্থ জুজুটা তব
মরা গাঙে বালু চড়া। এখন আসেনি দিন।
ভরা ভোয়ারেতে হাল ভাসাবার দিন।
জীবন-মরণে কঠিন আলিঙ্গনে
ফুকারিছে আজ কাতর-আর্ন্ত ধ্বনি।
দিন গণি গণি প্রাণ বাঁচানোই দায়
তোমার প্রেমের বৈভব তাই গ্লান।
মাটির ধূলায় মুছেছে চিহ্ন তব
রক্ত আলোর পরিচয় আঁকা সেথা।
অতীত স্বপ্নে কীদে করাফুল চাঁদ
রূঢ় সত্যের বিজ্ঞান কলে মেখে।
মন তুরঙ্গ খরাব বেগে চলো
পিছে কেলা পথে কেন ফিরে ফিরে দেখা?
বাপ্তিক দিন কুরায়েছে জ্ঞান নাকি?
জ্ঞান না এসেছে বীজ বুনবার কাল
নব ফসলের নতুন আশার কাল?

সীমানা

অধ্যাপক হুবোদরজ্ঞান রায়

কতটুকু পথ গেরিয়ে এলাম কতদূর আর বাকী,
হুঁপানে চিহ্ন কিছু পাইনে তো পুঁজে?
কোটি নর-পক্ষ-লাহন বৃক রক্ত রেখার আঁকি
নে পথ প্রান্ত সীমার গেল কি দূরে?
কি মাটির টানে ঘর ছেড়ে আনে কষ্টকর্মের পথ,
কি দোহন আপা ভোগায় অপেরা দুখ?
দুহা-উগল পায় চলেছে ভেদি' সন্ধ্যা পর্বত,
চলার আবেগে তুমুল উদ্ভূত।
লক্ষ চরণে বত না পথিক খেমে গেছে পথ পাশে,
দুখের ধূলায় হয়ে গেছে কেহ সীন,
তবু তাহাধের বস্ত্রবিভোর দৃষ্টিতে বৃষ্টি ভালে,
পথ প্রান্তের চিত্র সে অমলিন।
এসেছি কি যোরা চির-কাল্পিত জীবনধীর তলে,
হেথা কি পথ স্বধীর সে পথের?
সব বস্ত্রের সব সাধনার দিগ্ধি কি হেথা কলে,
যার কি খুলি দৃষ্টির স্বর্গের?
তবে এসো যোরা অস্তর হতে প্রভার ডালি ভরি'
অগ্র পথিকে জানাই নমস্কার,
এ পথ ওষেরি ওচনা, ওয়াই ওষেরি হাত বরি'
নিখর নিঈখে করেছিল অভিনয়।
গাধক হোলো তিমির-কারার ওষের খোঁজের ধ্যান,
অন্ধ্র ধবে বনস্পতির তপ,
সম্ভবাতীত রূপ লক্ষ্যের চলেছিলো সন্ধান,
পথ নিয়ে তাই সন্ধ্যা অগ্র রূপ।

চাঁদমগুলের বোড়।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌষলায় অশ্বরে। অশ্ব তেনে শুনেই একাক
করা। ঠেপন থেকে পুরো ন' মাইল পথ। গরু গাড়ী
ছাড়া কোনো উপায় নেই—বাড়ী পৌছবার অগ্রে ভিতরে
ভিতরে ঘনটা অস্থির হ'য়ে উঠলো। ঠেপনে নেমে
বেশি তিনটে বেগে গেছে অনেকক্ষণ। বেশ রোষ
উঠেছে। পরিকার আকাশ। শুন্লায় আগের দিন
এখানে কুঠি হ'য়ে গেছে। আশকা ছিলো আজকেও
কুঠি হবে। বর্ষাকালের গ্রামকে ছোটবেলা থেকেই ভয়
করি। মহরের মাজব—কৈশোরে বা হু একবছর গ্রামে
কাটিয়েছিলাম তার পুড়িত। গভীর হ'য়ে আছে—তাই
এখানে আসবার লক্ষ্যে পোড়ার থেকেই কেমন একটা
সংকোচ বোধ ক'রেছি।

কিন্তু উপায় নেই। শ্রীর মজল চোখ সব সংকর
টলিয়ে দিয়েছে—ভারপরে সত্যিকথা বলতে পাকিঙানে
আগা এই আবার প্রথম। একটা গভীর কোতুলক
ছিলো—নানা কারণে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রী হয়েছিলাম।

পাকিঙান মানে ইতিয়া ইউনিয়নের খুব কাছাকাছি
আগা। ঠেপনের নাম রাহগত। সংগে সেজ স্রালক
রয়েছেন—তার মূণে রাহতার বর্ণনা শুনে ঘনটা অনেকদিন
থেকেই এদিকে আসবার মত উৎসাহী ছিলো। আজ
নানা কারণে তাই আর এ হুদোগটাকে ছাড়িনি। বিয়ে
করেছি এক বছরের বেশি—কিন্তু শরাদালরে পদার্পন হবে
এই প্রথম—বিয়ে হয়েছিলো ক'লকাতায়, হতরাং
শরাদালরে আসা আর এর মধ্যে ঘটে ওঠেনি।

সেজ স্রালক বললেন, আহ্নন, এই খাবারের
খোকানটার ব'লে একটু বিশ্রাম ক'রে নেওয়া যাক। উঃ,
গাড়ীতে যা ভীড়, সম বহু হ'য়ে উঠবার যোগাড় হয়েছিলো।

বিক্রি করলাম না—অনেকক্ষণ থেকেই জলের অগ্রে
ঘনটা চকল হ'য়েছিলো। এগিয়ে গেলাম। ছোট
খোকানটী। কিন্তু প্রায় সবই পাওয়া যায়। সাবান
লক্ষ্যে বিহুট থেকে আরম্ভ ক'রে গরম সিঁচাড়া পর্যন্ত,

সব। শুন্লায় খোকানটী চিন্তুর। ভতলোকের নাম
অদীর নিয়োগী। কিন্তু চিন্তুর ব'লে এখন আর কিছু নেই
নামে মাত্রই চিন্তুর পোড়ান। সকলেই এখানে এগে
বিশ্রাম করে, বাহ—কাথো সংগে চলে অন্তঃকরের আলান
প্রদান,—কারো সংগে যা সেলাম।

চুকতেই বাহিকে একটা উত্তরে আগুন জলছে। একটা
অন্ন বধনী ছোকরা একটা বড়ো কড়াতে কচুরী ভাজছে।
ভিতরে গিয়ে বলতেই হাতমুখ পোড়ার ভগ্নে আর একটা
ছেলে একঘণী জল নিয়ে এলো বাওয়াবাওয়ার আরোক্তনটা
শেষ পর্যন্ত নেহাৎ মন্দ হোলো না। পন্ন পাতার ক'রে
সেই শরম কচুরী, সিঁচাড়া, বড়ো বড়ো দুটা ক'রে
রসপোড়া, তারপরে চা—আবার ত্রো বিরক্তিই লাগেছিলো।
কিন্তু এই অবসরে যদি আবার দেহ স্রালকটার ভরী এবং
ভরীপতি—প্রীতির কথাটা না উল্লেখ করি, তাহ'লে অস্ত্রাৎ
করবো।

শিখালয় থেকে আমাদের হুখহুখিয়ার বিন্দুমাত্র বাতে
কোনো অস্থিবে না হয় তার অগ্রে সে কী ভীড় দৃষ্টি
ভীর। এতোকক্ষণ টেপের ভীড়ে ঘনটা বড়ো। অস্থির
হ'য়েছিলো। সংক্ষেপে জলযোগ পর্যন্ত শেষে শরাদালরে
দিকে রওনা হ'তে পারলেই ভালো হয়। তাই সেজন্য
বধন শুভীরবার আরো কিছু নিদ্রী নেবার মত অহুঃরোদ
জানালেন, শুধন বাগা হয়ে হাত ভোড় ক'রে টেবিল
ছেড়ে উঠে পাড়ালাম। অস্তঃপুর ভতলোক কী আর
করেন, জলযোগ পর্ব সেখানেই শেষ হোলো।

চেয়ারে ব'লেই খোকানটীর বিপরীত দিকে একটা
টানের ঘরের দেয়ালের দিকে আবার লক্ষ্য পড়েছিলো।
কালো কালিতে কতোগুলি বড়ো বড়ো বিজপ্তি মোপলেম
গার্ডনের লক্ষ্যে কি একটা নিপেশনামা; এ-ছাড়া তাঁরা
যে অনেক কষ্টে আজ এট পাকিঙান অর্জন ক'রেছেন
একথা শ্রবণ করিয়ে দিবে মোপলেম স্রালকাল গার্ডনের
প্রতি কতোগুলি লক্ষ্যদেয়নও লিপিবদ্ধ দেখলাম।

পরের ছপানে আরো অনেক খোকান। বেশীর ভাগই
পানবিক্রির।

আমরা বলে যাছি, এমন সময়ে পায়জামা ও

নীলচন্দ্র। পরা একটা মোটোসোটা চেয়ারার ছেলে এসে
দেয় চুকলো। তারপরে এরিকে গুলিতে তাকিয়ে দশাল
ক'রে একটা খেকির উপরে ব'লে প'ড়ে সিগারেটে টান
দিয়ে সোকানসারকে বললে, কী নিকশী মশাছ আছো
কেমন?

ভুললোক হেসে কি ঘেন বললেন, ঠিক বোকা
গেলো না।

সেইদিনে গাড়ী ঠিক করবার মত্রে বাইরে
গিয়েছিলেন, একটু পরেই ফিরে এসে আমাদের
ডাকলেন। বললাম, আপনারা হান, আমি একটু পরে
হাছি, ব'লে গানের সোকান থেকে সিগারেট কিনবার
অছিলার এগিয়ে গেলাম। আমল উদ্ভেদ, পাকিস্তানী
আবহাওঘাটা লম্বা করা। ওয়া চলে গেলেন।

সেই পারজামা পরা লোকটী তখন বলছে : তোমার
বজ্জা মলে হ'য়েছে নিকশী, পাকিস্তানে ব'লে ওগব
হিহুনি চলবে না বুকেছো, বেখেছো হো বাবা আমার
ভোম্বালী—ভু, ক'রে একদিন দেবো পেটের মধ্যে
চুকিয়ে। ব'লেই একবার আড়চোখে আমার দিকে
তাকালো।

নির্যোণী মশাই এবারও বুদ্ধমত্রে কী কথা ব'লে ঘেন
হাসলেন।

সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে পুরে আন্তে আন্তে
টেননের দিকে এগিয়ে গেলাম।

দেখি, একটু দূরে সেম্বা গাড়ী ঠিক ক'রে আমার
মত্রে অপেক্ষা করছেন। মালপত্র সব ওঠানো হ'য়ে
গেছে; আরো আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সেটা গরুর গাড়ী
নয়—বোড়ার গাড়ী। আকৃতি অবিকল ছোট ধরনের
গোরুর গাড়ীর। কেবল দুটা গোরুর বসলে একটা
বোড়ার টানে সেটাকে।

ছোট ছই। অন তিনেক তার মধ্যে কোনো রকমে
বসতে পারে। গাড়োয়ান চাবুক হাতে নিয়ে সামনেই
পাড়িয়েছিলেন, কাছে আসতেই এলো আনন—জানাইবাবু
পরনাম হই—ব'লে ছই হাত ধোড় ক'রে নমস্কার
করলো।

এতদিনমত্রে ক'রে মনে মনে ভাবলাম দাবু, আমার
কাছে এ এক কম নৃতনম্ব নয়—শ্রী একটু দূরে
পাড়িয়েছিলেন। আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসলেন
একটু, তারপরে বললেন, নাও, উঠে পড়ো।

গাড়ী ছেড়ে নিলো গাড়োয়ানের ঠিক পিছনেই আমি
ব'সেছিলাম। আলোপ হোলো তার মলে। নাম
টাধমওল। বরেন তিরিশের মধ্যেই। কাঁধে একটা
গামছা। বড়ো বড়ো গোপ এক কথার চমৎকার হাস্য।

খানিকটা বেতেই একটা ঠাক পড়লো। মোড়ের
উপরেই কুকচুড়া গাছ একটা। আমার পাশেই শ্রী
ব'সেছিলেন, বাঘনা ধরলেন, ওই ফুল চাই উর।

ঘেন শুভেট পাইনি, এইভাবেই টাধমওলের মলে
কথা ব'সেছিলাম, কিন্তু তিনি ছাড়বার পাতী নন, বিরক্ত
হ'য়ে বললেন, গাড়ীও বাবু, ফুল তোমার বাগের বাড়ী
দিয়ে অনেক পাবে। টাধমওল ইতিমধ্যে গাড়ীটা এক
পাশে ঠাক করিয়ে দিয়েছে, বললে, এই যে আমি দিই
আমাইবাবু, আতা, দিমিঘনি চাইছেন, ব'লে গাড়ীর উপরে
ঠাকিয়ে সে গুইগুই ক'রে কথেকটা ভাল ভেঙে ফুল পেড়ে
তার দিমিঘনির হাতে দিলে।

তারী খুশী হোলেন দিমিঘনি, একটা ভবক নিয়ে
তখুনি খোঁপায় পরলেন, আরেকটা হাতে নিয়ে আমার
দিকে চেয়ে বললেন, 'বেথলে তো? টাধ আমার
কতো ভালো দোক!' ওমিকে চেয়ে বেধি, পান
চিবোতে চিবোতে সেম্বা আমার দিকে চেয়ে হাসছেন।

আবার গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো। টেননের
পরেই স্থারী কোম্পানীর বিরাট কারখানা। কাঁচামালীর
স্রাত্তা, ধুলোর ভরা। গতকাল বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, তাই আল
আর ধূলা নেই—চমৎকার ককরকে স্রাত্তা। পাগের
পাথের মতো মশন—কোনো কোনো স্রাত্তা। বিকলের
রোম্ভর প'ড়ে চিক্ চিক্ ক'রে জলছে। স্রাত্তার
স্রাত্তার স্রাত্তার একটু আধুই কাধ। কিস বির ক'রে
হাওরা বইছে। এবারে হ'পাশে আকের কেত। সবই
সেই কোম্পানীর। টাধ মওলের মলে এই নিয়ে তখন
গল্প করছি।

বললাম, তুমি তো তাহ'লে হিন্দু ঠাণ্ড, কি বলো ?
হেসে আমার দিকে চেয়ে চাঁদ বললে, এঁজো না বাবু,
আমরা মুছলমান ।

তা বেশ বেশ ! ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলাম,
বললাম, এখানে আছে তোমরা অনেকদিন, না ?

লপাং ক'রে এক ঘা খোড়ার গিটে খসিয়ে দিয়ে
বললে, এঁজো তা বাবু ঠাণ্ড পুঙ্খ হবি, কম দিন তো নয় !

—তা তোমার জমি জমা আছে তো ?

—এঁজো আপনাদের কিরণায় আছে বৈ কি !

—তুমি নিজেই দেখাওনা করো ?

—করি বটে, তবে আমার লোকও আছেন—তার।
সব তোমার গিরে কাজ কর্ম করেন—আমার এট
খোড়ার গাড়ীর বাবুনা কিনা—তা দুভো আর এক সাথে
পারি নে ।

পকেট থেকে সিগারেট কেশটা বের করলাম এবার ।
একবার পুখ দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে সে, তারপরে
আরো ঘোরে বাবার অন্তে তাকা দিলে তার খোড়াকে ।
একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম তার দিকে । জারী
খুসী হালো চাঁদমণ্ডল । একগাল হেসে সে হাত বাড়িয়ে
দিলে আমার দিকে—দেখলাইটা দিলাম ।

বেশ আনন্দ ক'রে সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে চাঁদমণ্ডল
আবার আমার সংগে গল্প করতে আরম্ভ করলো ।

সেজ্জার দিকে চেয়ে দেখি, তিনি গাড়ীর একপাশে
ব'লে চুলছেন, আমার স্ত্রীও এর মধ্যে কাত হ'য়ে কোনো
রকমে একটু শোবার জায়গা ক'রে নিয়েছেন ।

চাঁদের সংগে কথা বলতে বলতে বেশ অন্তরঙ্গ হ'য়ে
উঠলাম, বললাম, তা তুমি বিয়ে ক'রেছো তো ঠাণ্ড ?

—এঁজো বাবু তা কব্বি ।

—ক'টি ছেলে মেয়ে তোমার ?

এবারে আমার হাসলো চাঁদ, তারপরে বললে,
ছেলেপিলে নেই বাবু এই গালি একটা মেয়ে আছেন ।
তায় এই বছর আটক বয়স ।

বললাম, বেশ তাহ'লে তো ভালোই । বন্ধী ছেলে
মেয়ে না থাকাই ভালো, তা কি নাম রেখেছো মেয়ের ?

—এঁজো, আমি তো খুবী ব'লেই ডাকি, তবে আবার
পরিবার নাম রেখেছে পদ্ম ।

—হাঃ, খুব চমৎকার নাম !

তারী খুসী হোলো চাঁদমণ্ডল । আমার মতোন এ
রকম ক'লকাতার বাবু হয়তো ইতিপূর্বে নে অনেক
দেখেছে, অনেক বৈচিত্র্যও হয়তো তার চোখে পড়েছে
তাদের মধ্যে কিন্তু আমার সংগে কথা বলতে বলতে যে
অন্তরঙ্গতার পটভূমিতে সে নেমে আসতে পেরেছিলো—
সম্ভবতঃ এর আগে আর কখনো তা সে পারেনি ।

সিরিসির ক'রে হাওয়া বইছে । হুপুয়ের বরবরোহ
ক্রমশঃ অপরাহ্নের কোলে লুটিয়ে পড়েছে—আমাদের ট্রিক
মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক কী বেন পাবী দীর্ঘ জেপী
ঘটনা ক'রে উড়ে চলে গেলো । লবে আঘাত এসেছে ।
গ্রামের এই অকৃত্ত ভ্রাম্যহিত রূপ আমার চোখে লতাই
খুব নতুন বলে মনে হোলো । হু পাশেই এবার ধান
খেত আরম্ভ হ'য়েছে । খানিকটা যেতেই একটা খাল
চোখে পড়লো । আর মল হ'য়েছে । শুষ্ক, বর্ষার
সময়ে এ-সব দিকের নৃত্ত আরো চমৎকার । চারদিকই
নাকি মলে ভ'রে যায় । চাঁদমণ্ডল একসময়ে বললে,
বর্ষার সময় যদি আসেন জামাইবাবু, তাহ'লি আর গোল
খোড়ার গাড়ী লাগবে না, একেবারে টিনেদ থেকে
দৌকো ক'রেই হাতি পারবেন ।

জনে তো আকাশ থেকে পড়লাম । বললাম, বলো কি
চাঁদ, এতো মল হয় এরিক ?

—আইজা জামাইবাবু, ত হ'ন ননী গান্ধি বিল
আপনার গিরে সব এক চইয়ে যায় ! আহা ! —কি
মজাটা তখন রে !

সেজ্জালকের ইতিমধ্যে তস্তার ডাবটা কেটে
দিয়েছিলো—আখশোয়াগায়ে ব'লে একটা সিগারেট
ধরালেন, বললেন, তা হাঃ—একবার লতিাই পুছোর পর
আমরা টিনেদ থেকে দোকা নৌকো করে আমাদের বাড়ীর
পুছর ঘাটে গিয়ে উঠেছিলাম । আঃ সে কী চমৎকার
আদর্শ সেবারে আবার ছিলো স্যোংগার রাত—আহা !

ব্যাবহিক, ঘনটা আমাদেরো একটু চকল হোলো ।

এমন সময়ের কথা কাকেই না সেলা দেব? আস্তে আস্তে একটা আশংকার ভাবকে টেনে এনে বললাম, তা এভাবে বাওয়া আসা দেব পর্যন্ত নিরাপন্ন ছিলো তো?

—তা একরকম তা ছাড়া সব তো আমাদের চেনাশেনা লোক। না—না! ভয়টর আবার কিম্বদ?

ভাবতে ভারী ভালো লাগছিলো! কি নিঃশব্দে তোমার একটিন এই চন্দ্রাঙ্গণের উপর হিঁদে নিশ্বাস নিয়ে বাকী দিয়েছে। বিগল কি হ'ল নি? নিশ্বাসই হোত, ম'ল থাকতো পথে, বাঘের পাখের চিহ্নও এখানে বিরল নয়, তার ওপরে ছোটখাটো ঠাণ্ডা কি ভাকাতের মল, এ-সব তো স্বাভাবিক ঘটনা। তবু মাছের বেতো। তবু মাছের মস্তিষ্ক পর মস্তিষ্ক গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পার হোত। বিলম্বী দ্বারা আসতে, তাঁরাও নিঃশব্দে—এমন করে তাঁদের মনে নোয়াখালীর বিতীভিকা জলে উঠতো না কোনদিন।

হঠাৎ মনে তোমো অনেকক্ষণ চুপ করে ব'লে আছি। ঠান ছোটো একটা শব্দ করেছে, এখন মনে পড়লো, সন্ধ্যা তোমার উত্তর দিয়ে নিজের ভাবনার মধ্যেই চলিয়ে গিয়েছিলো। কিরিয়ে আসলাম মনকে, বর্তমান পরিবেশের মধ্যে নিশ্বাসে দিলাম নিশ্বাসে, বললাম, তা সত্যি, সেনটা তোমাদের কিছু খুব ভালো ঠান।

বললে, তা মাইজা, আগনি সত্য কথাটাই বলছেন জামাইবানু! আমার তো কোথাও আর বাস্তি ইচ্ছা করে না, এহেনকার বাড়ি যা, তা আর আপনারে কি কবো?

খটা চারেক কেটে গেলো এইভাবে। ঠানের ঘরের কথা মনে কান্দলাম—জানতে হয়নি—ঠান নিজেই আমাকে একপটে সব ব'লে গেছে।

যার চার ঘন্টার এই পরিচয়, তবু কতো সহজে সে আমার এতো কাছে নেমে এলো যে তা ভাবতে বিশ্বাস লাগে। সবই ভালো ঠানদের—খালি তার ম'লারে বস্ত্রভার ভেঙেই হতো অশান্তি। বজো বস্ত্রাঙ্গী। একটু কিছু হ'লেই ম'লনে বা পাবে, ডেঙেডেঙে একবারে ছত্রদান করে বেবে। ওই একবারে মেয়ে তার। তবু

মাঝে মাঝে এমন ব্যবহার করে যে এটা বেন ভাও নিজের মেয়ে ভামাই নধ। হ'ল তো আরো কথা হোত, কিছু গ্রামের খুব কাছাকাছি এগে প'ড়েছি ততক্ষণে আমরা। খুব শিব মন্দিরের চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। আমার স্ত্রী ইতিমধ্যে উঠে ব'লেছেন। লজ্জা হয়নি কিছু আকাশের আলো ক্রমশঃ হান হ'বে আসছে চারদিকে। ম'লনে একটা ছোট খাল। মাঝারই জল আছে। ওই টুই পার হ'লেই আমার স্বজনের দীর্ঘ কলেব বাগান নাকি আরম্ভ হবে। স্ত্রী উঠে ব'লে থালাখা প্রসাধনের চেষ্টা আরম্ভ করলেন। ছোট চিকিৎসা এসিয়ে দিয়ে বললেন, মাথাটা একটু ঝাঁড়ে নাও, কি যে শিকাকালের মতো চেহারাটা করে রেখেছে!

বিনা প্রতিবাদে আমাকেও নিজের বেশ প্রসাধনের দিকে মন দিতে হোলো। প্রতিবাদ করেও তো কিছু লাভ হোত না। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি পরিবেশের মধ্যে দিয়ে পড়বো একটু পরে—আর—না, ভাবতে পারলাম না। আমাদের বেশে নতুন জামাইদের নিয়ে কি রকম আনন্দ উৎসব অর্ঘ্যিত হ'ল তা ছোটবেলা থেকে যাবার বেখবর সুযোগ ঘটেছে, সহজেই তার বা স্বপ্ন দেখছি, তাতে বেধে মনে সেই যথেষ্ট ঝাপ ধ'রেছে, এ হোলো অল্প পরী গ্রামের ব্যাপার—নিঃসংশয় হ'য়ে নিশ্বাসে খটনা প্রবাহের হাতে ছেড়ে নেওয়া ছাড়া আর আমার কোনো উপায়ই ছিলো না, শেষ পর্যন্ত তাই দিলাম। সব থেকে বেশী ভেবেছিলো, তবুই জালিকাভিলির কথা। বিবাহের সময়ে বাসরে তাঁদের তিন চারজনের বে মনুনা দেখছি তাতেই চমকিত হ'য়েছি। এখানে, অর্থাৎ বৃষ্টিভাগে নাকি বৃষ্টি একটা জালিকাভিলিনি আছেন, অবশ্য খুড়তুতো, আড়তুতো, মাসভুতো এই সব মিলিয়েই। তাঁদের সম্মিলিত গ্রাম্য আক্রমণের কথা বলনা করে মদ্য পাত্র বেন অবসর হ'য়ে এলো। জানিনা, সুখীর্ষ এই এক বংশের মধ্যে বহু সুযোগ ঘটা সন্ধ্যা বস্ত্রাঙ্গণে না আদার মূলে আমার অবচেতন মনে এই আশংকা হ'ল তো বিশেষ কাল করে ছিলো।

বিরাট সিংহরোজার কাছে আমাদের অবস্থান ধাম্বার অনেক আগেই আমি যে এসেছি সে সংসার বিদ্যামণ্ডিতে অমর মহল প্রচারিত হ'য়ে গিয়েছিলো। সিংহরোজার এসে এখন আমাদের গাড়ী ধাম্বা, তখন যেমি কোড়ুসী পুনরাবীয়া অনেকই অধ্যয়নার অন্তে রতাকা পর্বত এগিয়ে এসেছেন—কোনো স্থানিকা ভাসিকা যে হুগুননি বিচ্ছেদ, সেটাও স্পষ্ট কানে ভেসে এলো।

কিন্তু একটা কথা। আমার মস্তুরালয়ের এই বর্ণনা আমি এই পর্বতই আপনাদের কাছে নিবেদন ক'রে রাখলাম—কারণ আজ আপনাদের কাছে যে কাহিনীর বর্ণনা দিতে বসেছি, তার মধ্যে এ সব অবস্থার।

এর পরে পুরো চারদিন কেটে গেছে। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছিলাম, দেখলাম ছুটিটা দীর্ঘতরো চলে নেছাৎ মন্ড হোত না। বতোটা আশংকা এবং উৎসীড়নের কথা ভেবে বিচলিত চিন্তে এখানে পরাপণ ক'রেছিলাম, শেষ পর্বত দেখলাম তার সবটাই অমূলক। গ্রাম হ'লেও সহরের তেউ এখানে চমৎকার স্পর্শ ক'রেছে। ধারেকাছে বাসিকা বিভাগর না থাকলেও এদের বাড়ীর ব্যবস্থা এমনই যে স্বী-শিক্ষা সেখানে একেবারে থেমে থাকেনি। অন্তরাং তাঁদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেলাম তাকে নিঃসন্দেহেই কতিমাসিত বল। চল।

দ্বিতীয় দিন বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতে যাবার সময়ে দেখা বসলেন, এই বিকে চাঁদমণ্ডলের বাড়ী তারপরে ছ' একপ। এগিয়ে গিয়ে দেখা ভাকলেন, চাঁদ—ও চাঁদ—চাঁদ—আছো গো!

একটু পরেই চাঁদ হাতে কতোগুলি পাছের শিকড় নিয়ে বেরিয়ে এলো, হেসে ছই হাত জোড় ক'রে বললে, পৌরনাম আমাই বাবু, আমাদের আপনেশা ভাকুতছিলেন? বললাম, হ্যা—তা এইখানেই তোমার বাড়ী নাকি চাঁদ?

—আইজা হ, আপনাদের কিরপায় এই হানেন? আমার ঘর, বাসে আমার খত্তর মহারও এইখানে থাকেন।

সংবাদটা আগেই পেয়েছিলাম—চাঁদ ঘর আমাই হ'য়ে আছে। একটা মাত্র ঘরে। বাপ খাচের ভয়ানক আধরের। তাই শেষ পর্বত চাঁদকে নিজেব ডিটেমাটা ছেড়ে এখানেই থাকতে হ'য়েছে। চারখানা পোস্তর গাড়ী আছে চাঁদের খত্তর ট্যাকারখিনের, আর একখানা ঘোষের গাড়ী। এ ছাড়া খোড়ার গাড়ী দুখানা—তারই একখানা বিয়েছে চাঁদকে এককথায় চাঁদের খত্তর থাকে বলে সংগতিপর চাখ।

কিন্তু তবু অনেক বৃষ্টি চাঁদ মণ্ডলের। দেউা ম'লুতে পারলাম চতুর্থ দিন সন্ধ্যার। বিকেল চ'লেট মনটা কেমন ছটকট করতো। ইচ্ছে হোত সমস্ত গ্রামখানা ভালো ক'রে ঘুরে ঘুরে দেখি। কিন্তু এমিকে যে ভাসিকা বাহিনীর মধ্যে সারামিন আটকে পড়ে থাকতে হোত তাতে তাঁদের হাত থেকে বেরিয়ে আসা ক্রমশঃ আমার একটা সমস্যা হ'য়ে উঠেছিলো। হেখবার নাম ক'লেই একেবারে সকলে বেন হরোকা বহু ক'রে এসে মান্দ্রের দাঁড়াতেন। কিন্তু তবুও তার মধ্যে লেখার আগে একটু বেরিয়ে পড়তাম। প্রথম কয়েকদিন সেজন্য সংগে ছিলেন—তারপরে একলাই

চাঁদের সংগে ঠাকা একটা বড়ো মাঠের ধারে ব'সে আমাদের পল হাছিলো। আবার বলছি, একথা ঠিক, আমার মস্তোন এরকম একটা মহাহুতুতিল শ্রোতা পেয়ে চাঁদমণ্ডল স্তম্ভভার কোথায় যে আমাতে বসাবে, কি খাওয়াবে তার ঠিক নেই। যেই উনেছে, আভিভেদ আমি একদম মানি না—এমন কি তার হাতের হান্না বেতেও আমার আপত্তি নেই—তখন মতিভট্ট সে ভয়ানক আতর্ষ হ'য়েছিলো তারপরে অবস্ত বিদ্যহটা ক'মে এসেছে। একদিন 'হরিজন'দের নিয়েও অনেক কথাবার্তা হ'য়ে গেছে। মাংস হুগিয়ে চাঁদ সেদিন ব'লেছে। আপনাদের গাড়ী মহারাস, রাই বলেন আমাইবাবু, মনিমি লম, ওগাব কীবনডাই স্নাতেন না তেন—হায় হায়, এই রকম ক'রে তাঁরে কিনা আপনাদের লোকে মারলো আমাইবাবু। চোখ দুটা চলল ক'রে এলো চাঁদ মণ্ডলের।

কথটা ঘুরিয়ে নিলাম। মনে পড়লো একদিন বিকেলে ধর্মতলা ষ্ট্রিটের কথা। ওয়েলিংটন বোম্বারের কাছে ছুটিপাথে পাড়িয়ে বিশ্ব-দূর-সম্মেলনের শোভাযাত্রা দেখছিলাম। শীঘ্র শোভাযাত্রা—অনেকজন পাড়িয়ে আছি—একটা মহলা ভাঙা পরা বিস্ময়ানী ঠিক আমার পাশে এসে পাড়িয়েছিলো। বহুত ৪০ বয়েস হবে, হটাৎ বললে, বাবুজি, ইহা ক্যাঁদা কার? তারপর আরো কয়েকটা প্রশ্ন করলো, তার মূল-বক্তব্যটা ছিলো, এই শোভাযাত্রা এই লোকজন কংগ্রেসের কোনো ক্ষতি করবে কি না? কি কি কথা তার সংগে বলেছিলেন, স্পষ্ট মনে নেই—তবে এক সময়ে হটাৎ মহাস্বাক্ষীর কথা উঠলো। সেই তুললে। একেবারে ছেলেনাচুবের মতো ছুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো তারপরে। বললে, বাবুজি, ঠায়ে হাম্মলোকন কা পাগ। কথা বেশী বলতে পারলো না। কিন্তু কী অকপট সে কথা। বড়োভাঙারে তার ছোট্ট একটা চিহ্ন কাপড়ের দোকান আছে। এর আগে কাপড় ফেরি ক'রে সে রাস্তার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। কি জানি কেন, ঘটনাটা বোধ হয় তুলতে পারবো না কখনো।

শেষ পর্যন্ত আবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ফিরে এলো ঠান মওল। বললে, ঠায়া পদসার ততোটা বেশী অভাব লয় বাবু, আমাদের সংসারে অশান্তিটাই সব থেকে কঠোর।

ইতিহাসটা সহই শুন্লাম। বলল হ'য়েছে ট্যাকালফিনের। কিন্তু এখনো আশ্চর্য তার শারীরিক ক্ষমতা। সব থেকে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে তার পানাসক্তি। আন্তর্জাল প্রায়ই সে বাড়ী ফেরে না—স্রীর সংগে বলতে গেলে মূখ মেথাবেধি নেই। ছোট্ট গ্রাম পেরিয়ে অনন্তধূরে কোন্ একটা বাড়ীতে তার প্রায়ই রাত কাটে। সেইখানেই তার নাকি মনের মাহুখ আছে। অনেক লোকেরা সঙ্গ ক'রেছে ট্যাকালফিন তার সঙ্গে। কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়। ঠানকেই তার সবত বিধব লক্ষ্য সিংগাওনো করতে হয়। এই তো মাস দুয়েক ধ'রে ট্যাকালফিন বিছানার ওয়েছিলো। অনন্তধূরের লোকেরা

কোনো এক রাত্রে তাকে এই কক্ষে এমন প্রহার দিয়েছিলো, যে প্রায় মৃত্যুর বরোজা থেকে ফিরতে হয়েছে তাকে। গৃহস্থ চাখীঘরের বউ তির উপরে এমন নজর থাকলে অবশ্যই সেটা অস্বাভাবিক নয় কোনো ক্ষেত্রেই!

তার শান্তনী, ট্যাকালফিনের স্রী, তার আর দু'বের মত নেই। তন্ মেয়ে জাখাইএর মূখের দিকে চেয়ে হৃদয়ের আশার সে বেঁচে আছে।

আসবার দিন ঠান মওলের গাড়ীতেই কোরা ঠিক হোলো। এক'রিনে তার লগারের অনেক সংসার লগ্নেই ক'রেছিলাম, আসবার দিন তার শান্তনী নিজের হাতে আমাকে কিছু আচার আর হাঁপের ভিম উপহার দিয়েছিলো, বলেছিলো নিয়ে যান বাবু মশায় আমাদের নাম কইরা বাইবেন এগুলান।

এখানে এসে ঠান মওলের সংগে আমার এই অন্তঃসংগতা বলা বাহুল্য আমার অর্থাঙ্গিনীর একেবারেই ভালো হ'লে মনে হয় নি। তাই অনেক সময়ে আমাকে আকারে ইংগিতে তার বিরক্ত মনের আভাস দিতে ভোলেন নি—কিন্তু যেমন ইতিপূর্বে হালকা হাসিতে তাঁর মনের আরো অনেক রকম বিরক্তি দূর ক'রেছি, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দাম্পত্য শান্তি ফিরিয়ে আনতে বিলম্ব হয় নি।

গ্রাম ছাড়িয়ে এখার আমাদের গাড়ী সেই মাঠের পথ ধ'রেছে। একটু আগে দামাত বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঠানের সংগে তার ঘোড়ার গল্প করছিলাম। ঘোড়াটাকে সত্যিই বড়ো বেশী ভালোপাসে ঠান।

বলে, অনেক কষ্টে তবে ঘোড়াভারে কিনছি বাবু, তবে ঘোড়াভা বড়ো সুবোধ, বা বলি তাই শোনে, সেই ছোট বেলো খেয়েই মাহুখ করছি কিনা!

বড়ো ভালো লাগলো ওর কথা। বললাম, তা বটে, এমন সুবোধ ঘোড়ার সঙ্গে কার না মন কেমন করে? তা তোমার ঘোড়াটার কি নাম রেখেছো ঠান?

এবারে একপাল হেসে ঠান চাইলো আমার বিকে। বললে, নাম আর কি, তবে 'হুবি' ব'লে ডাকলে ও বাবু

ভারী খুশী হয়—গাভরবের ক'রে চি-হি-হি ক'রে সে কি হাসি হাসে একেক দিন।

পথের একটা বাক ঘুরতেই দেখি কালো মতো একটা লোক, চৌকা মাথার ক্ষেতের মধ্যে থেকে উঠে আমাদের গাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। সংগে তার বছর মশেক বয়েনের একটা ছেলে।

সেই সিগারেট ধরিয়ে গাড়ীর একধারে ব'লে আরাম ক'রে ধোঁয়া ছাড়ছেন, বললাম, লোকটা যত্ন নাকি সেখান। একবার গলা বাড়িয়ে দেখল সেখান তোর দিকে, তারপরে বললেন, ও কাশেমালি? হ্যা— এই বছর চারেক হোলো অম্ব হ'য়ে গিয়েছে—বোবনে ও ছিলো এ গায়ের মোড়ল, বাঘের শক্তি ছিলো লোকটার।

কাশেম আলির দিকে চেয়ে রইলাম। বিরাট হাড়ির মতো কালো একটা শরীর। মতো বড়ো বড়ো শান। বাড়ী—সমস্ত শরীরে মাংসের কুকন বেগাভলি এখন থেকেই শাই সেখ'তে পাচ্ছিলাম—একটু কাছাকাছি এগিয়ে আসতে দুই পড়লো ওর চোখ দুটির উপরে। দুটা চোখই আছে—কিন্তু একেবারে জানি প'ড়ে গেছে সে দুটিতে। হাতের মোটা লাঠিটা হুকতে হুকতে আমাদের গাড়ীর দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

—বলি কে বার গো!—কার গাড়ী?

কাশেমালি চীৎকার ক'রে উঠলো। গাড়ীর শব্দ পেয়েই।

সংগে সংগে চাঁদ উত্তর দিলে, বললে, আমি চাঁদ মণ্ডল গো—আমার গাড়ী যায়!

—ও তুমি? তা যাও কই?

—তারপরে।

—অ, তা গাড়ীতে যায কে গো?

—সাইজা বাবুর মেয়ে জামাই, আর তানার সাইজা ছেইলা।

—আহা! তাই নাহি! বেশ! বেশ! কাশেমালি এসে এবারে আমাদের গাড়ীর পিছনের অংশটা খ'রে আতে আতে হাঁটতে লাগলো।

চাঁদ ইতিমধ্যেই গাড়ীটার গতি কমিয়ে এনেছিলো, বললে, তা তুমি কেমন আছো আলি ভাই?

—আর আমাগোর খাসা—অ-খাসা! পেরাণ্ডা গেলেই এবারে পাঁচি মোঙলের পো! আর সখি হুচ না।

—কেন, কী হ'য়েছে কালীম? সেজদা বললেন, পাকিস্তান হ'য়ে এটা তো তোমাদের রাষ্ট্র হোলো কতো সুখে থাকবা এখন তোমরা।

—রাইখ্যা ভান আপনাগো পানীধান, আগে তো তবু যা হয় খাতি পরতি পাণ্ডান বাবু, এতনু তো কিছুই কোডেনা, না পরণের কাপড়, না সূখার অর—পানীধান হইবে তো শেরানভা দার খুঁচ এবারে!

সেজদা বললেন, আরে হাং দিন তোমাদের এরকম কই হবেই গো, তারপরে ভাব্বা, সব ঠিক হইবে গেছে, শেরখম শেরখম এরকম কইতা হুচ-ই! ব'লে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

—আর ঠিক হইছে! সকলট তো গেছে, চরিশ টাহা মন চাউল, একেউ করনো শোনুছে কওনি?

মাঝখানে কি করেকটা সামান্যিক কথাবার্তা উঠলো চাঁদের সংগে তা আর আমার মনে নেই—তবে নতুন জামাইএর কথাটা হটাৎ মনে পড়তে কাশেমালি চাঁদকে জিগেশ করলে—তা জামাই বাবুর জাল বনে গো?

—কইলকাতা!

—অ—তা বেশ! তা বেশ! কি করেন তিনি?

—আপিসি খুশ বড়ো চাকরি করেন।

চাঁদমণ্ডলের এরকম ক্ষত উত্তর দেওয়া বেধে একটু বিম্বিত হোলাম, ভাড়ী চটপটে লোক তো চাঁদ!

ঠিক এর পরেই প্রাণ হোলো—তা বাবু কতো টাহা ব্যাভন পান?

চাঁদমণ্ডল এবার তাকালোওনা আমার মুখের দিকে। অমানবমনে চ'লে গেলো।

—আশি টাহা!

—অ, তা বেশ! তা বেশ! কাশেমালি বললে।

ভারী খুশী হোলো কাশেম। তারপরে আমাকে উদ্দেশ্য ক'রে বললে, তা জামাইবাবু আপনাদের আরে-

চোখে দেখুতি পালান না—আজ্ঞা চোখে হু তোর নিভেন, এমন দেবালতা নিলিষ্ট বাতি—আর ভালো: লাগেনা। বলি ও চান—চললাম—এইধেয়ে আমারে একজু লামতি হবে—লালান জামাইবাবু।

কাশেম আলি তার সেই ছোট নাতিটার হাত ধরে আস্তে আস্তে নীচে ধানের ক্ষেতের দিকে নেমে গেলো।

আমার স্ত্রী এতোক্ষণ হাসরোপ করে বেন আমারে কথাবার্তাগুলি গলাগকরণ করছিলেন, কাশেম আলী চলে যেতেই বললেন, উঃ জানো! ও লোকটা ভীষণ ভাঙাত ছিলো, বাবার কাছে কতো গল্প শুনেছি ওর। দূর দূর গ্রামে গিয়ে ভাঙতি করে আসতো, বাবারে! ওকে দেখলে ভীষণ ভয় করে আমার।

অধঃগিনী পাচের উপরে কান হ'য়ে পড়ে একটু চোখ বুজলেন।

বাৎসল্য এসে গেছে। চাঁদের সংস্পর্শে আরো অনেক কথা বলেছি—তার পারিবারিক ব্যাপার থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ দীর্ঘে ঐতিহাসিক ভঙ্গি আলাচনাতত্ত্বও যে কখন নেমে এসেছি, তার কোনো খেয়াল ছিলো না।

একদমের চাঁদ বললে আবার কবে আসবেন বাবু চাঁদের।

একটু বেন আমন হ'লাম এবার। বললাম, ঠিক তো নেই, তবে আসবে বইকি আবার, তখন এলেই তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

ভারী খুশী হোলো চাঁদ। বললে, আপনার কথাবার্তা শুান বড়ো ভালো জামাইবাবু—পেরাপতা শুন্নি ঠাণ্ডা হয়।

বললাম, ওলো না আমারে সব কলকাতার, কখনো তো হাওনি শুনলাম—নতুন বেশ, যেখে আসবে—বেখবার মতো আরো বটে একটা।

—হা বাবু, হেনে চান আবার মাথাটা হেলানো একটু, বললে, ব্যতি তো ইচ্ছা করে—তবে বাবু আমার এখনকার কামই এতো যে সময় পাই না—তা বাক বাবু, আপনাপোষ বাসাতই বাবো একদিন।

ভাপা ভালো। ট্রেপটা পাওয়া শেষ পর্যন্ত গেলো।

গাড়ীটা ধানিকটা 'লেট' ছিলো তাই রকে—না হ'লে সঙ্গে পর্যন্ত ওড়োপের আর সীমা থাকতোনা।

দেখা চটপট গাড়ীতে বিনিময়পত্র তুলে ফেললেন। ভীষণ ভীড়। ইন্টার ক্লাসের টিকিট ছিলো—কিন্তু লামনে উঠে পড়ে বেশি এটা লেগেও ক্লান্ত হ। হোক গিয়ে, বাপাখাটে পৌঁছে তখন একটা বাহন্য করা বাবে। এখন বে ভালোর ভালোর উঠতে পেরেছি এই চের।

মনে আছে, চাঁদকে সেবারে পুরো ট্রেটা টাকা বন্ধুই দিয়েছিলাম। ভারী খুশী সে। গাড়ী ছাড়বার আগে আমার পারে হাত দিয়ে প্রশ্নম করবার ভয়ে সে এগিরে এসেছিলো। ভাড়:ভাড়ি বাধা দিলাম, বললাম, ছি চাঁদ, পারে হাত দিতে নেই—অসভ্য: আমি যিই না! এই নাও, ট্রেটা টাকা মিলুম তোমাকে, তোমার মেয়েকে যিষ্ট কিনে দিও।

যতোক্ষণ ট্রেপটা ছিলো, টেশনের উপরে আমারে দিকে চেয়ে ততোক্ষণ ধাঁড়িয়ে ছিলো চাঁদ।

একটা কথা, চাঁদের বা কাশেম আলীর মুখ দিয়ে যে কথাগুলি বলিয়েছি তা হয় তো সব জায়গায় ঠিক হয়নি। ক'লকাতার ছেলে আমি, বেটু হু মনে আছে, তাই ব্যতি খেবে উভার করে দিলাম।

ভাষণের ক'লকাতার কিরে এসেছি। বাপ চাঁদেরকে কেটে গেছে। নানান কালের ভীড়ে চাঁদমণ্ডলের কথা মনে গিয়েছিলাম। সেদিন সেহ'না এগেছিলেন আমারে এখানে; ক্খার করার চাঁদের কথা উঠলো বললেন, আপনি তাকে নিয়ে কি একটা গল্প লিখবেন বলেছিলেন। সে সেই আপনি নিয়ে আজো য'লে আছে এবারে কানীপুর থেকে আগবার সঙ্গে তার গাড়ীতেই এলাম—বাহবার আপনার কথা স্মরণ করছিলা, য'লে গিয়েছে, গমটা বেন এবারো সংস্পর্শ নিয়ে যাই—আর তাকে ভাষণের পড়ে মোদাই।

মনেই ছিলো না ঘটনাটা। একটু আঁপটু সেবার অভ্যাস ছাত্রবীথনে ছিলো বটে। কিন্তু সংসারের ঘণ্টা রথচক্রের উল্লার সে সব উজ্জ্বলিমা অনেকেবিনেই তো চুপ হ'য়ে গেছে—কিন্তু কে জানে, অবচেতন মনে তার

ভিত্তি হয় তো আদো দূর হ'য়ে গাথা ছিলো, তাই চাঁদের
সংগে স্থূণ দুধের অনেক কথার মধ্যে এমনই একটা
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কোনো সময়ে। আত্ম আমি
নিষিকার চিন্তে শেকবা কুলে ব'সে আছি—কিন্তু চাঁদমণ্ডল
প্রতিদিন তার রক্তে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

এখন মনে পড়ছে, বলেছিলেন বটে, তোমার ঘোড়াকে
নিরে খুব ভালো একটা গল্প লিখবো ঠাধ—আহা!
তোমার ঘোড়াটাকে সত্যি বড়ো ভালো লেগেছে আমার!

আরো কয়েকটা মাস কেটে গেছে। অকিসের কাজে
একবার বিদী বেতে হ'য়েছিলো। আমাদের দেখানকার
ব্রাক্ষে অর্ধ নৈতিক একটা গুরুতরো পোলাবোপের ব্যাপারে
আমারই উপরে সমস্ত তবস্তের ভার দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ।
দিন পনের থাকতে হ'য়েছিলো সেখানে। অত্যন্ত ক্লান্ত
মনে কিরেছি। কিছুক্ষণ হোলো আলিঙ্গন শৈশব পার
হ'য়ে এসেছি। সস্ত্রিতি বাড়ী থেকে চিঠি পেয়েছি
যারের খুব অস্থূণ, হাত নিয়ে আবার অসম্ভব কঠ পাজ্জেন
তিনি, ছোট কাকার ব্রাত প্রেসার বেড়েছে। গৃহিণী
চারদিন শয্যাশায়িনী—জাকারী অভিমত, ইনুয়েজা।

কয়েকটা পারিবারিক ব্যাপারে অসম্ভব খরচ হ'য়ে
গেছে এ মাসে। সামনে এখনো পুরো কুড়িটা দিন ধা
ক'রে লোললীল্লা মেলে ব'সে আছে, ভাব্তে ভাব্তে
ভারী একটা জালা অল্পভব করছিলাম সমস্ত শরীরে—
তারপরে অকিসের এই জটিল জ্বাংগাম। একাজে
লাভের মধ্যে কিছু শক্ষ বুঝিই ক'রে গেলাম।

জান্সা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।
ভাজের ক্রান্ত অপরাহ্নে। আকাশে কয়েকটা ছোট ছোট
মেঘ। গাড়ীর গতিটা ঈশং মধুর এমন—হয় তো সামনে
কোনো গ্রীষ বা শৈশব আশুছে। আরেকটা অপরাহ্নের
কথা মনে পড়লো। চাঁদমণ্ডলের গাড়ীতে ক'রে কালীপুর
থেকে শৈশবের কিরে আশুছি। চাঁদমণ্ডল গল্প করছে
আমার সংগে। আত্ম হাট আছে রায়গঞ্জে। কিরবার
সময়ে চাঁদমণ্ডল হাট করে বাড়ী কিরবে। ব'লেছিলো
কিরবার সময়ে জামাইবান্দা মোটেই হাংগাম নাই—
জিনিষগুলান গাড়ীতে উঠোয়ে এহেবারে ঘুমোতি ঘুমোতি
আগবো ছানে।

বলেছিলেন, সে কি ?

—আইজা—‘হুদি’ আমার বড়ো হুবোধ ও রিক
গাড়ীভারে টান্টি টান্টি বাড়ীতে উঠোয়ে গেবে।
জানে মনে বাড়ী না শৌছলি তো আর ছাড়ান নাই
বাছাধনের।

ভারী ভালো লেগেছিলো। কী চমৎকার প্রদান্বিতে
হাট ক'রে চাঁদ সেদিন গাড়ীতে গুয়ে গুয়ে নিজেব বাড়ী
কিরে গেছে।

ছোট জীবন। পারিপার্শ্বিকের কোসাহলও তার
অনেক ছোট। সমস্তর কথা, অবাস্তব!

আমাদের সাহিত্য-ভবন,
কলকাতা

নবজাতক

স্থানালকান্তি মুখোপাধ্যায়

অভীতের দুঃখভরা কুলে বা ওরা দিন
কিরে কিরে আসে মনে গোপালির হুরে,
ঐশের কোন এক নবর আঘাতে
কতো কাঁচা-কচি প্রাণ গিয়েছিলো বয়ে।

স্থায়ী পৃথিবীর অবিবাসী যোরা
জীবনের স্তবগান হয়েছি বিশ্বত—

আহুলে আহুলে আত্ম মিতালী বৃথাই,
বাহুড়ের বহুধ বেন শাখার প্রাকারে!

পৃথিবীর হুকে হুতি নবজাত যোরা!
দিকে দিকে বসন্তের মনোহর শাখা :
হাতাসের মাকে পাই প্রাণের আত্মাণ
আশার শুণ্ড মোত মনের পাহাড়ে।

কোনো খেদ নাই

অমিরজীবন সুখোপাখ্যায়

কলতলার এক পান্দা জামা-কাপড়ের লামনে ঠাঙিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল বেন হুলতা।

একটি দিনও কি এর প্রতিমাণ একটু কম হ'তে নেই? ভবেশের গোটা দুই ময়লা পেঞ্জী, খান কয়েক নতুন-কাড়া কমাল, খান তিনেক গামছা আর তোষালে। তার নিজের গোটা দুই বাগিনের গুড়া। চিরকরা বিধবা ননদের তিনটি ততোদিক রুগ ছেলেমেয়ের গোটা। চারেক প্যাঁকি আর কুক। সাবান দিয়ে দরগুলি কেচে ফেলাতে হবে একটুও আর দেরি না ক'রে।

সকালবেলা প্রতিদিন ধাঁধা নিজের এই কাপড় কাচা। একলারই সব করতে হয় তার। চিরকরা বিধবা ননদ স্থাবসিনীর করবার কয়টা নেই কিছু। ছেলেপিলেগুলিও তার যেমনি হোগ-জর্ধর, তেমনি দুই, তেমনি নোংরা। শান্তকী স্বর্নরী একে বুড়ো মাহু, তারপরে আবার বাতে পলু। ধোবার বাড়ীতে কাপড় সেওয়া চলে না খন খন; আরে কুলোর না। মাল ত'রে বেশির ভাগই কাচতে হয় তার নিজের, ধোবার বাড়ীতে দু-একটা জিনিস দায় কচিং কখনও। সত্ত বিয়ে হবার পরে দুচার মাস একটা টিকে বি রেখেছিল ভবেশ, কিন্তু তারপরে তাকেও বেওয়া হ'ল ছাড়িয়ে। এর ভেতর কেটে গেছে তিনটি বছর। অতি-উর্বর বাবালীর ঘরের ঘেয়ে সে, এই তিন বছরে (মনে মনে মোটাগুটি একটা হিসাব করে মাঝে মাঝে হুলতা) তিনটি নিত্যক না হোক অন্ততঃ ছুটি ছেলে কিবা মেয়ের মা হতে পারতো সে-ও নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন সে এখনও মা হ'ল না? কেন হ'ল না, সে তা' নিজেই জানে। এবং একমাত্র সেই জানে—আর জানে না কেউই। না ভবেশ, না শান্তকী, না ননদ। শান্তকী আর ননদের গবেষণা চলে, নানা মন্তব্যে মুগ্ধ তারা। মাঝে ভবেশও ঘামায় না তা' নয়। কিন্তু সেই মাথা-ঘামানোটা বৃত্তিতে ধারালো নয়; শুধু বোকামিরই নিরুপমা আত্মপ্রকাশ। হুলতা হাসে শুধু প্রাণপণে মনে মনে।

মনে মনে হুলতা। বায়ে বায়ে ধর্ম্মবাদ দেয় তার অন্তরম বন্ধু লতিকাকে। ভাগিন লতিকা ওই সব বই পড়েছিল আর ওই সব ছিনিস খানতো; আর ভাগিন লতিকা। এ সব ব্যাপারে নানাভাবে তাকে সাহায্য ক'রেছে! ভবেশের মনে ভীতুতা নেই, অসুস্থতা নেই, কৌতূহল নেই। কোন এক আপিস আর কোন এক আফিস ভিতর দিয়ে, প্রভাত্যের বৈচিত্র্যহীন আহা-নিহা-ভিতর দিয়ে, ভবেশের অতি-বুল জীবন-যাত্রার, অতি-বুল মানসিকতার হুলতার এই গোপন কাজটুকু প্রতিবিম্বিত হয় নাই কোনও দিন কোনও ভাবে; ভবেশের অন্ধরে এই দিক থেকে কোনও প্রহর আগে নাই। হুলতার ঠাণ্ডা দমকে, সেই ঠাণ্ডের কোনও কিছু লুকানো জিনিস লম্বা বিশেষ কোনও মাথাবাণা নেই ভবেশের; নিজেই বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে বিশেষ ধরনের কতকগুলি অসুবিধার পাখরে হোটেট খেতে হ'লেও সামান্যতিক বিজ্ঞাটের স্ত্রী অমৃতঃ এখন পর্যন্ত হয়নি তেমন কিছু। অসুবিধার ভিতর দিয়েই এ ব্যাপারে নিজের ব্যবস্থা ক'রে চলবার কায়দা আয়ত্ত্ব হয়ে গেছে হুলতার। বন্ধু লতিকার সহযোগিতাও আছে নানাভাবে। ভবেশের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে হুলতা চালিয়ে নিচ্ছে নিজেকে টিক।।.....

টোঁপি, বৃতি আর কটিক। স্থাবসিনীর এই দুই কস্তার আর এক পুত্ররত্নের সাপটেই অমির, নরক একেবারে জলজার। এর ওপর যদি তারও হ'ত গুটি দুয়েক, তা' হলেই হয়েছিল আর কি! বিয়ের প্রথম বছরটা দু' বছরের কলোনে পড়া মেয়ে হ'য়েও নিজের অজ্ঞতা নিয়ে বুড়ো বাঁচা বেঁচে গিয়েছে সে। তারপরে এলো লতিকার শিক্ষা, উপদেশ আর সহায়তা—যখন নাকি জীবনের মানিতে তার অন্তর কানার কানার পূর্ণ হয়ে উঠেছে! অসীম কৃতজ্ঞতা লতিকার কাছে তার।।...

আমগুলি কাচা কোনও মতে শেষ করে ফেলল হুলতা আর। তালো পরিষ্কার হ'ল না সবগুলো, কিন্তু আত্মকে সমর্থ নেই বেশি তার। প্রত্যেকটি কাজই সারতে হবে তাড়াতাড়ি ক'রে। আমগুলি বুয়ে চুইপট

যেলে নিল হুলতা বাগ্মান্যর তারের ওপর। তারপরেই গান ক'রে নিল ছ' মিনিটের মধ্যে।

ভবেশ ক্বিরে এলেছে বাজার থেকে। হুলতা তড়াতাড়ি ক'রে এগিয়ে গিরে ভবেশের হাত থেকে নিয়ে নিল বাজারের থলিটা। জিজ্ঞাস ক'রে ভবেশকে :
মাছ ঠিক মতো এনেছো তো ?

—এনেছি।...ভবেশ কৌচাটাকে ঝাড়া দেয়। কিছু এই নামে মাছ কিনবার কোনই মানেই হয় না। ...পরশাই নটো।...তোমার ঘত সব বাস্তিক ! যে নাম লাগুক, ঘত টাকা লাগুক, আনতেই হবে।...না আনলে চলবেই না ! বস্তো সব—

ভবেশ বিড় বিড় করতে করতে চুকচুক গিয়ে ঘরে। হুলতার সমস্ত ঘুরের চেহারাটা মুহূর্তের মধ্যে একটুখানি কঠিন হয়ে উঠলো, কিন্তু ভবেশের কথায় কোনও স্ফাব দিল না সে। যে টাকা দিয়ে এই মাছ এলেছে সে টাকা ভবেশের নয়। তার গরিব পিতা বেশ থেকে প্রতি মাসে তাকে হাতঘরটা ব'লে পাঁচটি টাকা পাঠান, তাই-ই সে রেখে দেয় কমিয়ে। মাঝে মাঝে ছ'চার টাকা তা' থেকে খরচ করে দে। অনেক সময় ভবেশও জোরজবাবদত্তি ক'রে যে ছ'চার-টাকা না নিয়ে যায় তা' নয়। ছ'টি মাসেরও ওপর ছোট তাইটি মটু প'ড়ে রয়েছে হাসপাতালে। যোজাই তো হাসপাতালের সেই একঘেয়ে ষাণ্ডা, মধ্যে মাঝে হুলতা এখন এটা-ওটা একটু রাসা ক'রে নিয়ে যায়, কী খুশি মটু। অথচ এর মজ কত কথাই না শুনেতে হ'চ্ছে। বাক তবুও মাসে দুদিনের মধ্যে যে মটুকে একটু দেখতে রাখার অজবাবি ভবেশের কাছ থেকে অনেক ব'লে ক'রে, অনেক কান্নাকাটি ক'রে পাওনা গিয়েছে সেই চের। এইরকম ভবেশও শান্ত্তী আর নন্দনের, গজ-গজানির শেষ নেই, কিন্তু হুলতা ভ্রক্ষেপ করে না। তাকে একটি দিনের মধ্যে বাইরে কোথাও একটু নিয়ে যাওয়া ভবেশের কোঠিতে লেগা নেই। আজাই কাষরার এই আলো-হাওয়া বহীন গায়রার খোপে তার প্রতিদিনের বন্ধী-জীবন চলতে থাকে হোচট খেয়ে খেয়ে।

—আর, শোনো, ঘা ক'রে একটু শিগ'র ক'রে

কিরে এমো হাসপাতাল থেকে। কিছু বললেই তো হ'য়ে যাও একেবারে অরিগন্য, কিছু অমন ধেরি ক'রে ফিরবার ক্ষেত্রে এদিকে যে কী কামেলা হুক হ'য়ে যায় সেটা বোঝবার সাধ্য তোমার নেই—

সাঁট আর গেলিটা গা থেকে খুলে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবার বল ভবেশ।

কিন্তু অরিগন্য হবার বিশেষ কোনও লক্ষণ দেখা গেল না হুলতার। সে আপন মনে শুু কেটে যেতে লাগলো মাছগুলিকে। একটা ঘুগার হাসি শুু চকিতে খেল গেল তার ঠোঁট গুটিতে। ভবেশের শান্ত্তীর আর নন্দনের কথার জীয়ে এরকম নিয়ত বিদ্ধ হ'চ্ছে সে। এতে এখন আর নতুন কিছু নেই।

কিছুই কেলে রাখলো না হুলতা। দমত রাসা শেষ ক'রে, ও বেলার মধ্যেও আলাপ ক'রে তরকারিগুলি গুছিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে সবশেষে মটুর মধ্যে মাছটুকু তৈরী ক'রে নিল সে। এবেলার উছন পরিষ্কার ক'রে ফেলে দিয়ে ও-বেলার কথলটাও এখনই দাঙিয়ে রেখে দিতে বুললো না।

বিকলে রোম শান্ত্তীর সর্গকে বাতের তেল দিতে হয় বট্টাখানেক ঘ'রে মালিশ ক'রে। লকাল আর বিকলে। আজ দেইটে বিকলে না হ'য়ে রাত্রির হবে। কামেলা বাতে কিছু নিখেই কখনও না হয় তার মধ্যে সতর্কতার অবদি নেই তার। তবুও লেগেই আছে কামেলা। তবুও অপমানিত, অর্জিত হ'তেই হচ্ছে কথার বিধে।

আঙনের ঝাঁচে হুলতার মাঝা মুখখানি ডিরে গিয়েছে ঘামে। চোখ দুটিও উঠেছে রাসা হ'য়ে; চোখের কোনাগুলি কেমন বেন উঠেছে ছলছল ক'রে। হযতো আঙনের ঝাঁচেই।...

এ-গুলি ও-গুলি ক'রে হুলতা এসে পড়লো বড় রাস্তার ওপর। সামনেই একটা দোকান থেকে কিনে নিলো ক্রীম-কেকারের টিন। এক হাতে টিনিন ক্যারিয়ার আরেক হাতে বিদ্যুটের টিন নিয়ে মাঝ রাস্তা থেকে টামে

বাসে ওঠা সহজ কথা নয়। কিন্তু এই সময়টা ভিড়টা তেমন সামান্যতক নয়। এক রকম ক'রে ওঠা বাবে। বিছুট কিনতে গিয়ে কল আর কেনা হ'ল না আজকে। কিন্তু মত বড়ো একটা চিংড়ি মাছ ভাতা আর সর্দে-বাটা দিয়ে মত বড় কই মাছটা পেখে ডরডর খুশি হবে নিচ্চর মটুটা। আরও দুটো জিনিস বড়ো গ্রিথ ওর—শিঙার আর পানভুয়া। কিন্তু দিবির হাতে বাড়ীতে রাখা করা জিনিসই নাকি সব চাইতে ভালো লাগে ওর। যেচার!...বাড়ী থেকে কিছু না কিছু রাখা ক'রে প্রত্যেক বাবেই নিয়ে গিয়েছে হুলতা। কিন্তু কিছু কলও সঙ্গে নিতে ভোলেনি। ভাতার রক্ত পরীক্ষা ক'রে ঘেবেছেন রক্তে ওর ডিটামিন সি বড়ো ক'মে গিয়েছে। অথচ ডিটামিন সি-র খুবই প্রয়োজন ওর। ভাতার ব'লেছেন নিয়মিত কিছু কিছু টাটকা রদাদো কল খেতে। হুলতা নিবেও কিনে নিয়ে যায়, মাঝে মাঝে ছ'চার টাকা রেখেও আসে ওর হাতে—কাউকে দিয়ে আনিবে নেবার অন্তে অথবা হাসপাতালের ভিতরেই ফিরিওয়ালার কাছ থেকে কিনে নেবার অন্তে। কিন্তু ঠকতে হয় বড়ো ওতে। দয়া ক'রে স্টাকের দু-একটি লোক রোগীদের বাজার ক'রে দেবার ভার নেন, তাঁরা দয়া করে এমন মারাই মারেন যে গরীব রোগীর পক্ষে সে দয়ায় ওপর বেশি নির্ভর করা সম্ভবপর হবে ওঠেনা আর। হাসপাতালে স্টেশনারী জিনিস নিতে, কল নিয়ে ছ'চারঘন ফিরি-আলা আসে, তারার রোগীদের কাছ থেকে যে জিনিসের যে সব নাম অনেক সময়েই আদায় করে তাকে রোগীরা সৎকপে নাম দিয়েছে সলা-কাটা। কাজেই হুলতা নিজে মটুর অন্তে সব কিছু কিনে নিয়ে যেতে পারলেই হয় সব চাইতে খুশি। কিন্তু তার কাছে বাওরাটা তার বাসে যাত্র দুটি দিন। কতো অসুবিধা যে হয় মটুর—। ছ'টি বাস কেটে গেল—আরও নাকি কম ক'রেও থাকতে হবে দুটি মাস। কী যে অসুখ! তবুও যেচারার সেরে যে উঠেছে একটু একটু ক'রে সেই চের।।...

ট্রায়ে বসে কতো কথাই যে মনে এলো হুলতার। কবিরের এই স্তুতিটুকু তার সমস্ত অস্থির কী বিপুল

আলোড়নই যে মাগিয়ে তোলে! হু-র সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে কোনও মতে দুটি বছর কলেজে পড়েছিল সে। তার পড়াশোনার ব্যাপারে আত্মীয়টির এমন বেশি গুরু কিছুই ছিল না; এদিকে বরিত শিতাও তার বিয়ের জন্যে হ'য়ে পড়েছিলেন ব্যস্ত। ছ'টাও কেনন করে খুঁজে পাওয়া গেল ডবলবেক। মাস্ট্রিক পাশ না করেও বাজা দিয়ে বলেছিল বি. এ. অবধি পড়েছে। পঁচাত্তর টাকা মাইনের কেরানী হ'য়ে বলেছিল হুশো পঁচিশ টাকা মাইনের অফিসার। কোনও রকম আর্থিক বক্ষলতা না থাকলেও ব'লেছিল ঠাকুরদার আমলের যেটা টাকা আছে ব্যাংক গচ্ছিত। নিয়ে হ'য়ে গেল। তারপরে ছ'মাসের ভেতরেই সব কিছু দিনের আলোর মত পরিভার হ'য়ে গেল হুলতার কাছে।

ট্রান্স অতিক্রম ক'রে ক'রে চলেছে হাজরা বোড়, কানীঘাট, লেক মার্কেট, পতিভিরা। দুপাশে দুটপাথের লোক চলাচলের নিকে মূঢ় চোখে তাকিয়ে থাকে হুলতা। কলেজে যখন প'ড়েছে—তবু কিছুটা ধ্যানীভতা ছিল, রাতার অন্তরার ভীড়ে কখনও কখনও অব্যাহে যে আল গ্রহণ না করা যেত তা নয়। কিন্তু সত্যার আকাশের বলাকা-রেখার মত সেই বিনগুলি কোথায় যে লক্ষ্য গেল মিলিয়ে! তারপরে জীবনে যে দুঃখের তার এলো নেমে, তার নিঃশব্দ বেদনার সমস্ত আকাশ আজ তার ধূসর হ'য়ে গেছে।।...

ভাড়াভাড়া ট্রান থেকে নেমে পড়ে হুলতা—গড়িহা-হাটের মোড়ে বাসখানা ছাড়ে ছাড়ে। এই বাসখানা না ধরতে পারলে আবার যে কতোক্ষণ দাঁড়াতে হবে তার ঠিক নেই। যুদ্ধের সময়ে মিলিটারি সরির উৎপাতে ভেঙে-চুরে বাওরা রাস্তার স্বাকানি বেতে বেতে বাসটা হাসপাতালের একেবারে পেটের সামনে পৌঁছে দিয়ে সেখানেই থেবে থাকবে।।...

হুলতা ঘরে ঢুকতেই হাতের পত্রিকাখানা বালিশের পাশে সরিরে রেখে মটু উঠে বসে বিছানার ওপর। হাত বাড়িয়ে সামনের চেয়ারখানা টেনে দেয় হুলতাকে হাসিমুখে।

কিন্তু হুলতা বসলো না চেপারে। বলে হুলতা :
আবার চেয়ারটাকে টানাটানি করছিল কেন ? আমার
ভালো লাগে তোব এই জানালার ওপর বসতে।... আ,
কী মিষ্টি হাওয়াটুকু তোব ঘরে মটু ! আর কতো বড়
আকাশ—কী নীল আর কী পরিষ্কার ! আর নিচের
খালগুলো কী ভালো আর কী সবুজ ! আমি ঠিক বলছি
মটু, একটুও বাবড়াসনে তুই। এখানে তুই নিশ্চয়
ভালো হ'বে ঘাণি। আপনা থেকেই রোগী ভালো হয়ে
বেতে পারে এমনভরো জায়গায়।...দিনরাত এখানকার
চারখকটাকে চোখ ভ'রে তাকিয়ে দেখবি, ভালো ক'রে
বিশ্রাম নিবি—ঠিক যেমনটি ডাক্তাররা বলেছেন, আর
যা বখন পাণি খুব করে খেয়ে নিবি—খুব শীতলীয়ে তুই
হু হুয়ে ছুটি পেয়ে ঘাণি, বলছি আমি।...আর, আজকে
তোব জন্তে কি এনেছি এই জ্যাম...মাগে এই বিদ্যুটের
টিনটা ধর, তারপরে এই জাম...

টিফিন ক্যারিয়ারটা খুলে একটা বাটি থেকে চিংড়ি
মাছ ভাজা, আরেকটা বাটি থেকে কই মাছ চুড়চুড়ি।
হুলতা ঢেলে দিল মটুর লকারটার ওপরে স্টেটখানাতে।

মটুর মাগা চোখ-মুখ খুঁততে ওঠে নেচে।—আঃ,
মনের মত মিনিস এনেছো! কিন্তু ঘিি আজ একেবারে।
ওই দুটো বাটিতেও কিছু আছে নাকি ?

—আছে, এই একই মিনিস। তোব মস্তে নয়।
এ দুটো হ'চ্ছে অকণপ্রকাশ বাবুর জন্তে। কেমন আছেন
রে অকল বাবু ?

—বেশ ভালই আছেন অকণ্য। আজকাল খর
একটু বেড়ানোর অহুমতি পেয়েছেন, লকাল-বিকলে
হু'তিন ঘণ্টা বেশ লিখছেনও। কবিতাই বেশি
লিখছেন।।.....হাসে মটু।

সঙ্গে সঙ্গে হাসে হুলতাও।—আচ্ছা এবারে বিদ্যুটের
টিনটা খুলে খানকতক থা মটু। মাছ দুটো বহু রাসে
বাস। কিবা চিংড়ি মাছ ভাজাটা এখনও খেয়ে নিতে
পারি।...আর ওই পত্রিকাবানা সে তো ঘেঁষি ! ব'লে
ব'লে ঘেঁষি একটু...

পত্রিকাবানা সোভিয়েট রাশিয়া সবুজে। একটি

পাতায় দুখানি বড়ো বড়ো ছবি। উজবেকিস্থানের
একটি কৃষিপ্রতিষ্ঠানে কাজ করছে একদল লোক।
নিচের ছবিখানা হ'চ্ছে—সমস্ত মাঠ ফসলে বেছে ভ'রে।
একটি কোণে একটি মেয়ের ফ্রোজ-আপ। বাথের
লাবণা দারো বেছে ঢল-ঢল করছে। দুখানা ভ'রে
উঠেছে মিষ্টি, সরল, ব্রিড হাসিতে। ছবিখানার
ক্যাপশানে রয়েছে : The Earth smiles, and she
smiles across the centuries to see her people
prosper.

মটু জিজ্ঞাস করে : নিচের ছবিখানা আর তার
ক্যাপশানটা কেমন লাগছে ঘিি ?

মুখ কঠে হুলতা উত্তর করে : চমৎকার।

—জানো ঘিি, এই নতুন আর অতৃত দেশ সবুজে
নানা বই পড়ছি এখানে শুয়ে শুয়ে। একটা মিনিস শু
এখনও আমার বিশেষভাবে জানবার আছে। ঘিি
জানতে পারি একেবারে নিশ্চিতভাবে যে রাশিয়ার
মেয়েরা পৃথিবীর অল্প সব দেশের মেয়েদের চাইতে সব
চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারে, তা'হলে ঠিক ক'রেছি
অহুখ থেকে ভালো হ'য়ে রাশিয়ারে চ'লে বেতে প্রাপণ
চেষ্টা করব।...হাসতে থাকে মটু।

হুলতাও হাসলো।—বেশ তো, রাশিয়ার গিহে
আমাকে চিঠি লিখবি। আর আমাকে জানাবি পৃথিবীর
অল্প সব দেশের ছেলের চাইতে রাশিয়ার ছেলেরা
সব চেয়ে বেশি ভালোবাসতে জানে কিনা। ঘিি জানে
ব'লে বুঝতে পারি, তা'হলে—

—তা'হলে তোমাকে তৎক্ষণাত্ জানিয়ে দেব, আর
তুমি বুঝি তৎক্ষণাত্ রওনা হবে রাশিয়া-মুখো ?

—ঘা' বলেছিল.....

ভাই-বোন একমুখে ওঠে হেসে।

—সত্যি ঘিি, সমস্ত পত্রিকাটির ছবিগুলি উন্টে
দেখ ভাল ক'রে। অল্প সব পত্রিকার মত গিপ্‌টিক
আর ইন্‌টিং ক্যাসন আর নাইট ক্রীমের বিজ্ঞাপন নয়—
মাটির প্রতি, যে মাহুয়েরা সেই মাটিকে ফলে-ফুলে,
সোনার কপলে ভ'রে তোলে সেই মাহুয়ের প্রতি,

মাটি-বাঁধের অনেক বাধা আর অনেক বেহের দান এই সব সোনার কপলের প্রতি কী দরহ, কী শ্রদ্ধা আর কী মমতা! কী ভালোই বে লাগে।

—তুই-ও বে বীতিমত কবি হ'য়ে উঠবি মটু!

বাবু সঙ্গে নিশ্চিন্দ বৃষ্টি খুব?

—হ্যাঁ দিদি, তা' নিশি বই কি! বেশ লাগে কিন্তু অকলশাক্কে আমার। তবে অকলশ বাস্তবিকই এক অদৃষ্ট, খাপছাড়া লোক। এখানকার কোনও বোপীর সঙ্গেই মিশতে চান না, কারও সঙ্গে খাপও খাওয়াতে পারেন না মোটে। তার কল ঠর শুধু বরুই বাড়ছে ক্রমাগত। অবিশি আমার মত বোপী আরও হুঁচরটে বে না আছে তা' নব। তাগা অবিশি অকলশকে খুবই শ্রদ্ধা করে আর ভালোবাসে। কিন্তু তাদের চাইতে পরূপকই বেশি প্রবল হ'য়ে উঠেছে। তবে, কি জানো দিদি? ইয়ারদান বলেছেন: To be great is to be misunderstood. অকলশের ভেতরে নানা বৈশিষ্ট্য আছে বলেই বতো হয়েছে মুখিল। সেটাকেই সহ করতে পারছেন? এরা কেউ!

হুলতা উত্তর নিল না কিছু। হাসলো শুধু খানিকটা।

বিষুটের টিনটা কাটা হ'য়ে গেছে এরি মধ্যে মটুর। দুখানা বিষুট বে'র ক'রে নিয়ে খেতে খেতে চলে তাই-বোনের নানা গল্প। হুলতা বলে: অকল বাবুকে খাবারটা দিয়ে আসি মটু, বোন্ তুই...

অকলশের দর হাসপাতালের ভিন্ন একটা ওয়ার্ডে। ঘরে ব'সে অকল খাটের হেলিঙ-এর সঙ্গে বালিশে হেলান দিয়ে কি লিখেছে।

হুলতা আসতেই কাগজকলম রেখে হাসিমুখে নমস্কার করে অকল।

—কি লিখছিলেন বলুন তো ব'সে ব'সে এমন গভীর হনোবোপের সঙ্গে? ভিজিটিং আওয়ারে আবার অতো লেখাপড়া কিসের? ব্যাঙ-টাটিগুলো কোথায় গেল আপনার? লকারের ভেতরে বৃষ্টি? দাঁড়ান...

মর্মে-বাটা দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কই মাছ চকড়ি, আর ঠিক সেই রকম বড় একটা চিংড়ি মাছ ভাঙা। অকল অছ্যোগ করে: কেন আবার এত কাণ্ড বলুন তো?

—কেন এত কাণ্ড তা' জানাবার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু খেতে ভালো লাগবে তো? আপনাকে?

—আমার একুনি ভিভের মল এসে গেছে।

—বাড়িয়ে বলছেন না তো?

—একটুও বাড়িয়ে বলছি না। পুঁইভাঁটা আর কুমড়োর ঘাঁট খেতে খেতে পাগল হ'য়ে উঠেছি। মাছও এক-আধ টুকরা পাই বটে, কিন্তু সেটাকে পুড়িয়ে এমন ক'বে রাখে যে সেটা মাছ কি অস্ত কোনও বস্তু তা' চিনতে পারিনে। পুঁইভাঁটা আর কুমড়োর গুণর এমন ঘোরা ব'রে গিয়েছে যে মনে ক'রেছি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা কান্ধিতে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের মাথার এই দুটো জিনিস দিয়ে আশ্রাব্য—বাস্তে জীবনে আর কখনও এ দুটো না খেতে হয়। কেন, মটু বলে না কিছু আপনাকে এখানকার রান্না লম্বা?

—বলে। কিন্তু আমার ঠাকুরমার মুখে কি শুনেছি জানেন? শুনেছি, সব চাইতে যে জিনিস বেশি ভালোবাসা হয়, বাবা বিশ্বনাথের মাথার সেই জিনিসই দিয়ে এগে তিরজীবনের মত তা ত্যাগ করতে হয়। আপনার হুঁচকোর বিষ হ'য়ে উঠেছে পুঁই ভাঁটা আর কুমড়ো, আর তাই দিয়ে আসতে চান বাবা বিশ্বনাথের মাথার? খুব লোক আপনি সেখনি!

অকল হাসে: দেখুন, ব্যাপারটা আমার ভাল ক'রে জানা ছিল না। আপনার কথা শুনবার পরে তাবছি তাহলে আর বেবনা। কিন্তু যে সব জিনিস সব চাইতে ভালোবাসি তা' যেওনাও তো মুখিল আমার পক্ষে!

—কে আপনাকে দেবার অস্তে মাথার মিলিয়া দিয়েছে তাই বলুন তো? থাকলে ওলব। কি লিখেছিলেন বলুন।

—একটা কবিতা। আমাষের এই হাসপাতালটা নিয়ে।

—বটে? দেখতেই হবে তা' হলে আমাকে। পুঁই ভাঁটা আর কুমড়োকে খুব ঠেকেছেন বৃষ্টি? দিন ঈশ্বর—

অন্ধের হাত থেকে কবিতাটা এক রকম কেড়েই নিল হুতা। প'ড়ে যেতে লাগলো :

এখানেও ফোটে ভুল। এখানেও ফুলেবের গায়ে অনেক রঙের মেলা। এখানেও ফুলেবের বৃক শৌরভ লুকায়ে আছে, আর আছে নিঃশব্দ হাসি—
আর আছে ভীক গ্রোণে স্বপ্ন-খোঁজা অজ্ঞান প্রত্যাশা,
অব্যক্ত রহস্যবন সুধের পথের সন্দেশে
অনেক প্রতীক্ষা আর অধেষণ।

এখানেও আলো আছে, সে আলোক আরও গ্রোণ-ভরা :
এখানেও বাতাসেতে দক্ষিণের দাক্ষিণ্য অনেক,
এদের আকাংক্ষা ভরা অসুস্থ কল্যাণ-কাঁদনা—
বলম্ব-দিনের দীপ্ত নবভর-অর্ধভরা বাপ্পী,
অনেক পানীয় হ'বে পৃথিবীর নূতন সূচনা।

জীবন এখানে প্রিয় :
এখানে ক'রেছে ভীড় জীবনের পলাতক স্বভি,
এখানে আবার খোঁজা জনতা হারানো নিম্নের—
ছায়াযুক্ত-অবসরে নিম্নের আবার বিদে বেধা।
এখানে ঐশ্বর্য আসে গোষ্ঠলি রক্ত রঙে রেঙে :
এখানে জীবনে আসে ঘুম-ভাঙা, ভুল-ভাঙা রাত :
অনেক মায়া আসে সে রাজির প্রশান্ত স্তম্ভতা।

বিশ্বস্তির ব্যাধা আছে, হারানোর কত ইতিহাস—
এখানেও কতো ভুল স্বরে :
কতো আছে বিব্রোহীর অবসর আশ্র-সমর্পণ—,
কতো না নির্মম শর অতিক্রমে বন্ধ এসে লাগে।
এখানে স্বর্গস্থী ফুলেরা ভুল হালি-ভরা—
ভাবের নিভৃত ঘরে স্বপ্নের নিত্য মহোৎসব।
এখানে অনেক গ্রোণ দিনে দিনে রিক্ত হ'য়ে কাঁদে,
এখানে অনেক গ্রোণ পূর্ণতার লভে অধিকার।

কবিতাটা পড়া শেষ ক'রে খাতাখানা হাতে নিয়ে
কিছুক্ষণের ভ্রমে তব্ব হ'য়ে ব'লে রইলো হুতা।

তারপরে বললো দীর্ঘে দীর্ঘে : একখানা কাগজ আর
আপনার পেনটি দেখেন একটু আমায় ? আমি কবিতাটি
নকল ক'রে দেব। দিতে আপত্তি আছে কি ?

—না, না, আপত্তি কেন থাকবে ?—কাগজ আর
কলম হুতায় হাতে দিতে দিতে অল্প জিজ্ঞাসা করে :
কেমন লাগলো সে কথা বললেন না তো ?

একটি ক্লান্ত, কলম হাসির-বেধা মুটে ওঠে হুতায়
দুটি চোটে। —কেমন লাগলো ? আচ্ছা, আরেকদিন
এলে বলবো।

কবিতাটি নকল ক'রে খাতা আর পেনটি ফিরিয়ে দেয়
হুতা অন্ধের হাতে। জিজ্ঞাসা করে : শুধু কবিতাট
কি লিখছেন এখন ? গল্প, প্রবন্ধ, উপভাস ?

—অপারেশানের পরে শিঠির ব্যাধা ঘাবনি এখনও
ডালো ক'রে। ব'লে ব'লে বেশিক্ষণ ধ'রে একটানা কিছু
লিখলে বৃকের সমস্ত শাখাগুলো ভীষণ কন্ কন্
করতে থাকে এখনও। আরও কিছুদিন না কাটলে
পরে—

—সেই ভালো, আরও কিছুদিন থাক, তারপরে
আরও বেশি ক'রে ক'রে লিখবেন। কী ভীষণ কঠ
পেয়েছিলেন অত বড়ো বড়ো দুটে। অপারেশানের সময়ে
সে কথা ফুলে যাবেন না যেন। অত্যাচার যেন মোটেই
করবেন না। জানেন অগণবাহু, আমার যদি উপায়
থাকতো, কোনও কিছু নকল ক'রে দিলে বা কোনও কিছু
লিখে দিলে আপনার যদি সুবিধা হ'তো তবে নিশ্চয়
দিতাম। তবে যেদিন আমি আসতে পারি, ঘণ্টা খানেক
বা ঘণ্টাধেড়েকের ভ্রমে ইচ্ছে করলে যে কোনও কাজ
আগনি আবাক দিয়ে করিয়ে দিতে পারেন। এর ভ্রমে
আপনি একটু লক্ষ্য বা লক্ষ্যে করবেন না। কেমন তো ?
এই কথা রইল তো ?

অল্প হাসলো।—বেশ, সামনের তারিখে যে-দিন
আসবেন আমার কতকগুলো গান কপি ক'রে দিয়ে
দাবেন। আপনার ভ্রমে সব বেতি ক'রে রাখবো।

—হ্যাঁ, তাই রাখবেন। হাসে হুতা। এবারকার
পুছো সংখ্যাপ্রসিদ্ধে কিছু লিখছেন না ?

—ছ'টারটেই লিখবো নিশ্চয়ই, কিন্তু বেশির ভাগ কাগজেই লিখবার আর সময় নেই। মনে তো ক'রেছিলাম লিখতে পারবো। অনেকগুলি কাগজেই; কিন্তু মাঝখানে শরীরটা খারাপ ক'রে নাট ক'রে মিল সব।

—সেখুন, অকপবাবু, মটু একদিন আমায় বলছিল মাঝে মাঝে নাকি আপনি লেখাটোটা সব ছেড়ে ছুড়ে দিতে চান। কবর বন্ধরের অনেক লেখা রয়েছে নানা মাসিকের পাতায় ছড়িয়ে, নিজেও অহুহতার ভয়ে সেগুলিকে বই ক'রে বের ক'রতে পারছেন না, প্রকাশক-দের কাছে সৌভাগ্যে ডি করতে পারছেন না, সবাই আপনাকে মনে রাখবার বদলে ভুলেই চ'লেছে, এর ওপরে লিখে চলবার পথেও আছে আপনার লগ্ন্য বাধা। তাইতেই নাকি রীতিমত হতাশ হ'য়ে যান আপনি মাঝে মাঝে, না কি বলেন যে লেখাটোটা সব ছেড়ে ছুড়ে বিভিন্ন যোক্তান করবেন এবারে একটা। গতবারে মটু বলছিল আমায় এই সব। —কিন্তু আমার একটি অহুহরোখ রাখবেন? আপনি কিছুতেই দেখা ছেড়ে যেবেন না। শরীরটা সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে গেলে অপ্রত্যাশিত ভাবে কত সুযোগ এসে যেতে পারে, কেউ হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে কত কিছু করতে পারে আপনার দ্বারা। আগামী এক বছরের ভেতরে অনেকগণি আপনি এগিয়ে গিয়েছেন—এটা দেখতে চাই আমি। কাকর মাঝখানে আপনি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে এলেন ছোট হ'য়ে থাকবেন এটা বলনা পর্বত করতে পারিনা আমি। আমার মন বলছে এবারে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে অনেক কিছু করতে পারবেন। সত্যি, লক্ষীটী, আপনি যেন নিজে থেকে ভুল দূরবেন না—

নিজের কবিরের আবেগে নিজেই লক্ষিত হ'য়ে পড়ে স্থলতা। হেসে বলে : অনেক উপদেশ দিয়েছি আজকে আপনাকে, আর নয়। তাহলে পানগুলি ঠিক ঠাক ক'রে রাখবেন, সামনের দিন এসে নকল ক'রে দেব। উঠি তা'হলে আজকে, কেমন? সামনের দিন এসে আপনাকে যেন আরও ভালো যেমি

স্থলতার কঠোর দ্বিজে উঠলো প্রকৃত বেহে আর মনস্তায়।...

বাতের বিছানায় শুক, বাড়ই হ'য়ে প'ড়ে আছে স্থলতা। ভবেশের লতকুণ্ডলী মধ্যে হাসপাতাল থেকে ফিরতে আজও দেখি হ'য়ে গিয়েছিল তার। দেখতে অনেক সুশিক্ষিত মনুষ্য স্তন্যে হয়েছো তার ভবেশের কাছে। অনেক কটু-কাটবোর পরিক্ষণ করেছেন শক্তী স্বর্নয়ী আর নম্র হৃদয়ালিনী। স্থলতা প্রত্যক্ষ করে নাই। কাকর ওপরই কোনও প্রতিপোধও গ্রহণ করে নাই। প্রত্যেকের ভেত্রেই যা করবার দীরবে সে তা' দেখ করেছে। শুধু নিজে অতুত ছিল—এই পর্বত। কিন্তু সে যে কিছু খায় নাই, সে তা' জানতেও যেমন কাউকে। নিঃশব্দ ভবেশের পাশে প্রতিরাতের মতই শুয়ে পড়েছে এনে। অতিযোগ কিছু নেই, অতিমানও নেই কিছু। ভবেশকে তুণ করবার কথাও সে ভুলে গেছে আজ।

ভবেশ চান দেখ স্থলতার একখানা হাত খ'য়ে। কিন্তু কিস' ক'রে বলে : গৃহলে না কি গো?

স্থলতা এই কঠোরের স্বর্ন জানে, এই স্পর্শের ইচ্ছিত বোঝে সে। প্রতি রাতের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, বাধা দেবার কিছু নেই।

ভবেশকে বাধা সে দেবেনা ঠিক; কিন্তু বাধা দেবে সে তার অনাগত শিক্কে—যে শিক্ত এক বিচিত্র চেতনা হ'য়ে ঘুরে ঘুরে যেতার তার প্রতি রক্তকণিকার মধ্যে, যে শিক্ত-চোলানাথের তথক-নাথ সে কান পেতে স্তন্যে পায় তার স্তন্য দ্বয়ের প্রতিটি স্পন্দনের তালে তালে। এই পৃথিবীতে, ভবেশের ঘরের এই পঙ্খিলতার আবোষ্টনে টে'পি, বুচি আর ফটিকের অপরিক্ষণ লগ্ন্যে সে তার সন্ধানকে আদতে যেবেনা কোনও দিন, অন্যত আলোক-ময়, অপর ঐশ্বর্যময় তার শিক্তকে সাধনানে লুকিয়ে সে রাখবে তার মনের গহনে। অতল সন্ধাননা-ভরা তার শিক্তকে এই ত্রেণ-গানির মাঝখানে টেনে এনে হ'তে যেবেনা সে অপমানিত। লগ্ন্য-বাধার ধোয়া আনন্দ হ'য়ে তার শিক্ত মিশে থাক তার প্রতি দাখ-দখখ, প্রতি শির।

উপনিরায়, প্রতি কোবে, প্রতি তক্ততে।... মণ্টু আর কয়েকমাস পরে জুহু হ'য়ে চলে যাবে তার স্বয়ং, অক্ষয়-প্রকাশ বাবু আজকের চিত্তশৌৰ্য্যকে জয় ক'রে একদিন নিষেক হারিয়ে ফেলবেন হয়তো অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর জীবনে আশা নহয় ব্যাতি আর প্রতিষ্ঠার ভীড়ে। অল্পের সঙ্গে একদিন হয়তো বেথা আর তার হবে না, তবুও তো থাকবে তার স্মৃতিটুকু, তার হাসি-ভরা মুখের ছায়াটুকু, তার জীবনে আরও কিছু পাওয়ার স্বপ্নময় প্রতীকার ইতিহাসটুকু, জুহুর আগনে সোনা হ'য়ে যাওয়া তার বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সঞ্চয় প্রকাশটুকু। অক্ষয়কে দে ফুলবেনা, আর এই না ভোকার স্মৃতিটুকু থাক তার সারা জীবন-জুড়ে; নিকরেশের পথের পাথের হ'য়ে। সব ছঃখ,

সব বেদনা থাক তার ধূলায় মিশে, কালের সমুদ্রে ওপর ঘিরে পায় হ'য়ে যেতে থাকবে সে অনন্ত রাত্রি আর অনন্ত জুহু, তারপরে স্মৃতি সেবা যাবে কোনও এক দিন মন্থন সূর্যোদয়ের রেখা...তারপরে স্মৃতি...তারপরে...তারপরে...

ভবেশের মনের পশু তখন কৃষ্ণিলাভ করেছে। ফুলতাকে নিজের বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে আবার পে শান্ত। ফুলতাকে একটা বৃষ্টি ঝাড়া ঘেরে আবার ভবেশের সেই ফিস্ফিসানি : ওগো, গুনছো? এমন শক্ত হ'য়ে প'ড়ে রইলে কেন গো?

উত্তর নাই।
ফুলতা ঘুমিয়ে প'ড়েছে।

আড়াই-ঘণ্টা : আড়াই-মিনিট

ঘনিমালা কাশভণ্ড

সেখানে গিয়েছিলাম ছবি। সে-ও গিয়েছিলো। সঙ্গে যেতে পেরে তাঁর ভারী আনন্দ। সিনেমা আদি মোটেই ঘেঁষি না এবং সে খুবই সেখে। ঘনিও সে বাইরে যে সোলাইটী পেরেছিলো, তা রুটির ইতিহাসে রূপনত। ঘোষ দুই। তবু এইটাই তার সর্বাধিক গর্বের বস্তু। আমার কাছে আসে নিতাপরিচিত পৃথিবীর কাছে থেকে অল্প ভাগি—, সর্গাধারনের অস্ত্র নতুন কঠিকে উন্মোচন করবার নির্দেশ।—ভাই বাইরের চাওরায় মিলিয়ে যেতে পারিনে—, নিষেক আড়াল দিয়ে নিয়ে কাশ করে চলি—, ফড়ির কাশ। আমার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব : কয়েকটা একত্রিত ধারা। তা ঘতই জীবনগো হোক না কেন, তাতে অন্যতাকে আশ্রয় দেওয়া চলে। তবু সর্গ করিনে। আকাঙ্ক্ষা করি—, আমার অজানিত আরও অনেক উন্নত এক নতুন পৃথিবীর আসো। —কিন্তু সেদিন আবার নতুন করে প্রাণ কাঁদলো কেন!

সে আমার পাশে বলে বিজ চালে অনেক কিছুই বলে চলেছে—সিনেমা। যে আটলগতের একটা মস্তবড় দৃষ্টিকোণ—, একথা বলতে গিয়ে সে বিস্তর কথা বলে গেলো। তার হাবভাব যেন আমার মধ্যে একটুখানি প্রায়তার আভাস পাবার ভঙ্গ বাস্তবায়ন করছিলো। সমস্তই বুঝতে পেরে আমি সেমনা বোধ করলাম এবং বখালস্বয় নিষেক অস্ত্রতার অভিনয় শুরু করলাম কারণ তাতে 'তার মনে শান্তি আসবে। আমি তো জানি তার বখাখণ পরিচয়। জানি তা'র বিজা—, বখাখাঁই কম জানের ক্ষেত্রে—, ভিগীর ক্ষেত্রেতো বটেই। শেষেরটাকে কিছু কম হ'লেও ক্ষতি ছিলো না, যদি তা'র মধ্যে প্রথমটির অগ্রিম সম্বন্ধ থাকতো বিজ্ঞানের স্বীকৃতি।—ছেলেবেলা থেকে একথা তা'কে অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। কিন্তু আসলে তা' বলতে চাই তা' ও বাড়ীর পবি-পিসির নিয়ন্ত্রণা নিয়ন্ত্রণকে বদলে তিনি বোঝেন, কিন্তু বোঝেনা সে। সে তাবে—, যে কোনো প্রকারে আমাকে একটু ভয় ঘনি করা দায়—বা আমার সামনে কিছু কেতাচীতালে ধোঁয়া গুড়ালে অথবা আধুনিকদের পরিচ্ছন্ন নিয়ে

সমালোচনা করলে—কিন্ধা মাত্রে মাত্রে আমাকে উপেক্ষা দেখিয়ে তোনা উগ্র-কাগজী ভাবার অনর্গল কথা কয়ে গেলেই বুঝি আমাকে জয় করা যায়। সবস্ত এর চেয়ে বেশী আশা করাই আমার ভুল—একথা সেদিনেই আমার বোঝা উচিত ছিলো, যেদিন সে বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছিলো। তবু তাকে সেদিনেই এই তেবেই ক্ষমা করেছি যে—অমর্যাদা মন্থে কোনো নিতুল ধারণা তার নেই। তাই দীর্ঘকাল তারে মরে এলাম—চোঁরা কবরদাম আত্মরিকভাবে তার চোখের সামনে একটা হৃদয় আলো জ্বালাতে। কিন্তু সে নিশ্চেষ্টভাবে হুঁ ফিরিয়ে বসে রইলো—আলো দেখবার চোঁও করলো না। উটে আমাকেই টেনে নিয়ে যেতে চাইলো অন্ধকারের হাতের। অবশেষে বুরলাম—, তাকি কাগাবার ভক্ত নিষেক কোথার নাথিয়েছি—কত হৃদয় আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছি—, তা' তার চোখে পড়েনি। তেমন দূরী—তেমন কষ্ট তার নেই। সে শুধু আমার পারিপার্শ্বিকতার দিকে নজর রেখেই ভেবেছে—, আমি অনায়াস-লভ্য। তাই এই আড়াই ঘণ্টার ব্যবহার আমার মনের মধ্যে এক অহুত ব্যথার সৃষ্টি ক'রলো।— এমন পিছিয়ে পড়া মন—, পারলাম না—পারলাম না, তাকে জাগাতে। পারলাম না—একটা অজানকে আলো দেখাতে—, অথচ বেশ আমার উপর ভার দিয়ে রেখেছে বিরাট।

সংগঠনকারী ভই যে একটা বিশেষ দল—পরিপূর্ণ বিশ্বাসে আমাকে করতে চাইছে একটা ইতিহাসের স্রষ্টা—, ওরা কি তবে ভুলই করেছে না?

পরের দিন ছুটে গেলাম বলের মর্ক্যাদিনারকের কাছে। বললাম—, ডাক্তার—, তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সব ভুল—, তোমাদের দৃষ্টিশক্তি স্তীর্ণ—, তোমরা ঠকবে অনেক।

ডাক্তার নিশ্চিত—নির্লিকারভাবে জনলো আমার সমস্ত কাহিনী। শেষকালে হেসে উঠলো এক হৃদয় লম্বাণহারক—হাসি। তারপর ধীরে-স্থিরে বাথা হুলিয়ে বললে—, অশলা—, ওই আড়াই ঘণ্টার অহুতুভিই তোমার নতুন অধ্যায়ের সূচনা। তুমি জানো না—, তোমার জন্ম—, দুর্ভাগ্যে মহাহুতুভি—মহতা বা মেহে ক'রবার জন্মই হয়নি—, তোমাকে এক বিরাটের পায়ের কাছে গিয়ে পৌছতে হবে।

—তাহোলা কি বলছো ডাক্তার, লকলের মত লম্বাক আমার হবে না—? আমি উৎসাহী হ'য়ে এর করলাম।

—নিশ্চয়ই হবে। যে একটা দুর্ভাগ্যে তুমি আলো দেখাতে চেয়েছিল, সে আলো তোমাকে দেখাতে হবে একই সঙ্গে অনেক দুর্ভাগ্যকে। তোমাকে আত্মলম্বণ করতে হবে, তোমার চেয়েও আরও অনেক অনেক বড় পাণ্ডিত্যও কাছে। তারি আলো তোমারি মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে পড়বে গিয়ে অসংখ্য—অসংখ্য প্রমবিসুখ—, অসংখ্য—কষ্টহীন দুর্ভাগ্যের উপর।

বুহুর্গে কি মনে হ'ল। বলে কেললাম—বহি না বাই, বহি কিরে বাই সেই দুর্ভাগ্যের কাছে—ব্যক্তিহীন ইতিহাসের মধ্যে?

হা-হা করে হেসে উঠলো ডাক্তার।—তারপর রূপ গাঙ্গীর্থের সঙ্গে বললো,—গেলেও একদিন কিরে আসতেই হবে! জনসাধারণের পক্ষে বা একান্ত বরকার, তার অপবতুতা আমার ঘটতে দিতে পারি না। অশলা—জনসাধারণকে বহি কিছু দিতে চাও তো উচুর দিকেই নিবেশ দিতে দেখো।

চিত্তাও ভুবে গেলাম আমি। ডাক্তার আড়াই মিনিট ধরে আমাকে লম্বা করে এমন হাসি হাসলে,—বেশান থেকে আমার মনে রেখাপাত ক'রলো আইনঠাইনের একটা চমৎকার তত্ত্ব।

পুস্তক পরিচয়



বাংলা বর্ষলিপি (৪ম বর্ষ) ১৩৪৪ । শিশির কুমার
আচার্য চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত । সংস্কৃতি বৈঠক বালিগত
হতে প্রকাশিত । মূল্য—২৮

এই বইখানা ইংরাজী Year Book এর অনূদিত



সম্পাদিত :—বোপ হু এই বইখানাই বাংলা ভাষার প্রথম
Year Book । ইংরাজী Year Book এর মতোই বিভিন্ন
অধ্যায়ে গ্রন্থখানা বিভক্ত । স্বাধীনভারতের বাংলা ভাষায়
লিখিত এই বর্ষলিপি নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক তথ্য
পূর্ণ । ভারতের অর্থাৎ ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের
বহু জাতীয় বিষয় ছাড়া আন্তর্জাতিক অনেক বিষয়ের
সংবাদও এই বইতে স্থান পেয়েছে । ব্যবসায় বাণিজ্য,
খেলা-মূল্য, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি—প্রভৃতি সব বিষয়ের
আলোচনাই এতে আছে । এককথায় ইংরাজী Year
Book এ যে সব খবর পাওয়া যায় তার সবই এতে আছে ।
বইখানার নামও কম, ছাপাও বোটার উপর ভাল । এর
বহুল প্রচার কামনা করি ।

শিকারের কথা—ঈন্সপেক্টর চন্দ্র সিংহ (সংস্কৃতি বৈঠক,
১৭ পতিতিয়া প্লেস, কলিকাতা) পৃ: ১৪৬+৬ মূল্য ২৮

লেখক বিখ্যাত মূল্যবান রাক্ষসের । শিকার বিষয়ে
এই বংশের খ্যাতি বহুদিনের । বংশ পরম্পরাসত্ত
অভিজ্ঞতার উপর নিম্নের অভিজ্ঞতাও লেখকের এই বিষয়
আছে । পুস্তকখানা দুই অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশ
কিশোরদের জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত, কিন্তু বয়সের
পক্ষেও এই অংশ উপভোগ্য হয়েছে । হুম্বর বন,
আম্রাবতের পাঠায়ে অঙ্গল, উড়িষ্যা, হোটোনাগপুর প্রভৃতি
অঞ্চলের শিকারকাহিনী এই পুস্তকখানিতে আছে ।
কয়েকখানা ছবি এই বইতে আছে । ছবি কয়খানা ছাপা
আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল ।

লেখকের ভাষা সরল ও বিষয় বস্তুর উপযোগী ।
শিকারকাহিনীগুলি যেনোজ্ঞাভাবে লিখিত হয়েছে ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা—দ্রোণেশ্বর চন্দ্র বাগল । (৬
ভারতী পাবলিশার্স, ২০২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা—
পৃ: ২৪১ ; মূল্য ৪৮

ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস বিষয়ে
বোম্বেনবাবুর খ্যাতি সুপরিচিত । এই বিষয়ে তাঁর
একাধিক বই বাজারে প্রচলিত আছে । এই পুস্তকখানা
একই নতুন ধরনের । এই পুস্তকখানা প্রকৃতপক্ষে অমৃত
বাজার পত্রিকার প্রথম তিন বছরের বিভিন্ন প্রবন্ধের
সংকলন ও চয়ন । ১৮৯৮, ১৮৯৯ ও ১৮৭০ অব্দে
অমৃতবাজার পত্রিকার ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক
ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে যে সব লেখা বের হয়েছে
এই গ্রন্থে লেখক তাই চয়ন করে সাজিয়েছেন ।

আলোচ্য বইখানা হিন্দি আম্রাবতের স্বাধীনতা
আন্দোলনের ইতিহাস মত । তবুও একখানা Source-
book হিসাবে, এর দরখেই মূল্য আছে । কাগজের কলমে
বা কলমে হতে বসতিল, বহু পরিভ্রমণ করে যোগেশনাথ
তা উদ্ধার করে এই গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন । ৮০ বছর
পূর্বে আম্রাবতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমগ্রামসমূহ কি
ভাবে আলোচিত হ'ত—তা মতাই কৌতুহলোদ্দীপক
পাঠ্যবস্তু ।

১৮৯৯ সালের ১লা জুলাইর সংখ্যার থেকে জানা যায়
যে—“জিনিস এখন মহাশয় হইয়া উঠিয়াছে । পূর্বে আম্রাবত
এ মণ করিয়া বাস্তবিক হইতে দেখিয়াছি : এক্ষণে ১০০
মণ পাওয়া হুকটিন ।” টাকায় পেছ মণ খান বিক্রিকে
তখন লোকে মনে করত মহানক মহাশয় । আর আজ
“কৃষকের ‘মজুরী’ তিন পয়সা কি চার পয়সা ছিল

নে বিচারের কোন ইচ্ছাও প্রবন্ধের প্রায় শেষ
লিখিত হইয়াছে—“এত পরিশ্রম করিয়া ইহারা
কিছু উপার্জন করে তাহা সমুদয়ে প্রায় তমিঙ্গার
উপরস্থ হইবে।

নব্যচিন্তনের কীতদংশ বলিলে অত্যুক্তি হইবে।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বস্তু

আলোচনা হইবে। অর্থাৎ, বিবাহ, তাক সমাজ,
শ্রুতি ও কথক, মতাবিত্ত, ও শাসন—পিতল
শাভিস পরীক্ষা, তমিঙ্গার ও তমিঙ্গার প্রকৃতি।
বৈজ্ঞানিক ১৮ খণ্ডে চবি আছে।

অংশকবি পুণ্ডরিকান হুদী সমাজ

ভাবের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক

ইতিহাস আলোচনা করতে চান, তাঁদের
বিশেষ দৃষ্টি আছে।

রেকর্ড সমালোচনা

কলম্বিয়ার মূডন রেকর্ড নাট্য

এবার পুঙ্খানুপুঙ্খ নাটকের উপলব্ধিমান সমস্তের
শ্রেষ্ঠ কবি “স্বাধীনতার সাধনা” সত্যখানি কলম্বিয়ার রেকর্ডে

বাচিত হইয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের চমকপ্রদ কাহিনী
এই নাটকে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অভিনয়ের ও
সঙ্গীতের সিক পিচাও এই রেকর্ড নাট্যটি উজ্জ্বল
হইয়াছে। আমরা “স্বাধীনতার সাধনা” বস্তু প্রচার
কামনা করি।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ড নাটক

“স্বদেশিক”

(N. 27939-47)

বিমানবাহনযুক্ত জড়ভরত গোবিন্দ নবপরিষ্কৃতি বস্তু
চতুর্দশীর সাধনা ও চব্বির মানুষের কেন্দ্র করে মজবুত
হইবে উল্লেখ্য, তাই বস্তু মজবুত ঘটনার সংঘাতে মনোমাল
বলোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্য স্বদেশিকের কাহিনী,
সংলাপ ও সঙ্গীতে গঠিত রেকর্ড-নাটক স্বদেশিক
“হিজ মাস্টার্স ভয়েস”এর শ্রেষ্ঠ রেকর্ড পিল্লী। অভিনয়
করেছেন। অনবদ্য অভিনয়ে, যত্ন পরিবেশনে এই
রেকর্ড সেটি আমাদের দৃষ্টি জগৎ করেছে। এমন একখানি
রেকর্ড-নাটক, যা ঘটনার বৈচিত্র্য, নৈতিক আদর্শে
প্রতিষ্ঠিত, তা প্রকাশ করার জন্য আমরা গ্রামোফোন
কোম্পানির কর্মসিচনের স্বকৃতি-গোবিন্দে অভিনন্দিত করছি।





গান্ধী জয়ন্তী

শেখরা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিন। গান্ধীজী চেয়ে-
ছিলেন—সাধারণ ব্যক্তিক মানুষকে তাঁর মর্যাদা প্রদীপিত
করতে। আজ সাধারণ মানুষটিকে এই জন-সমাগমের
মধ্যে খুঁজে পাওয়া মুশকিল—সে এর মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে।

মার্কস যে সমাজ ব্যবস্থা দিয়েছেন—তাতেও ব্যক্তিক
মানুষের অস্তিত্ব গলিয়ে যায় সমাজ-মানবের প্রবাহে।
বাংলার কবি চণ্ডীদাস গেয়েছেন—

জনরে মানুষ ভাই

সবার উপরে মানুষ সত্য

তার উপরে নাই।

গান্ধী এই সাধনারই সাধক ছিলেন। এরই ভ্রম্ভ তার
সমগ্র রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি, তিনি
জানতেন—ব্যক্তিক মানুষের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা
প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, কেউ তাকে তাঁর মর্যাদা দিবে
না। এখানেই নিহিত আছে তাঁর আত্মজীবনী মর্মকথা,
এখানেই পাওয়া যাবে তাঁর সূত্রের শিল্পের মূল উদ্দেশ্য
এখানেই লুক্কায়িত আছে তাঁর বনেন্দ্র শিক্ষার তত্ত্ব। শ্রমের
মর্যাদার প্রথমশীল জনতার বাণে সমাজের অধিপতি হতে
পারে—এই ত ছিল গান্ধীজীর শিক্ষা।

গান্ধীজী বিপ্লবী, বিশ্বের সমস্ত বিপ্লবীদের চেয়ে তাঁর
বিপ্লবের আদর্শ হল ব্যাপকতর ও গভীরতর। তাঁর
নেতৃত্বে ও প্রেরণা—ভারতের বিপ্লব এগিয়ে চলেছে
ধাপে ধাপে। কেবল বিশেষের দাপন থেকে মুক্ত হওয়াতেই
তাঁর বিপ্লব আদর্শ সূত্র হয়নি।

আজ তাঁর জন্মদিনে আমাদের এই নীকাই গ্রহণ করা
সরকার যেন গান্ধীজীর আদর্শ মতো আমরা বিপ্লবকে
পূর্ণতা ও সাক্ষাৎপ্রাপ্ত করতে পারি। তাঁর জীবন ও
মৃত্যু, তাঁর কার্য ও বাক্য সবই প্রকৃত বিপ্লবীর উপযোগী।

আজ তাঁর জন্মদিনে তাঁর শিক্ষাকে অরণ্য করে আমরা
যেন নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যেতে পারি।

হায়দারাবাদ—

চার দিনের সাময়িক অভিব্যক্তির ফলে, হায়দারাবাদ
ভারতের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে বিনা শর্তে।

আমাদের এক বছরের স্বাধীনতার ইতিহাসে বোধহয়
সবচেয়ে বড় ঘটনা হ'ল—হায়দারাবাদ। লাম্বিক আলি
ও রেজভি মিলে এখানে যে অন্যায়ের সৃষ্টি করেছিল
তাঁর অবসান হ'ল। এটা কেবল একটা স্বাধীন ব্যাপার
নয়; এটা কেবল সাময়িক অশান্তির অবসান নয়।

ভাবে হায়দারাবাদের পরিস্থিতি গড়িয়ে চলছিল, তাতে
লম্বিক ভাওরতের অর্থাৎ ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের
শান্তি ও সংহতি নষ্ট হ'ত এবং উভয় রাষ্ট্রের অসংখ্য
হিন্দু ও মুসলমান নর-নারীর জীবন, ধন, স্বাস্থ্য নষ্ট হ'ত।
হায়দারাবাদের কোটিখানেক হিন্দুর উপর যে অত্যাচার
এতদিন চলছিল এবং যা ক্রমেই আরও তীব্র হচ্ছিল,
তারও অবসান হ'ল।

ইন্ডিয়ান লীগের মুখে পাচ শতাধিক সৈন্য প্রত্যেক
প্রায় উলকিরে দিয়ে বলে গেল—সর্বনাশমুক্ত করে দিলাম
তোমাদের; ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে পর-পালের মতো
তোমরা যথেষ্ট অর্জন করে বেড়াও। ছোট বড় সব
দেশীয় রাজাই যেন করে নিল—ভার্য সবাই স্বাধীন।
শ্রীমামশনী মুসলিমদের আজ সংযুক্ত জাতিসমূহের
বৈঠকে হায়দারাবাদের বিরুদ্ধে ওভাসাজী করছেন। কিন্তু
হায়দারাবাদ আজ যা করছে, মহিন্তর রাজ্যের বেগধান
হিসাবে তিনি তাই করার চেষ্টা করেছিলেন।
ত্রিবাঙ্করের বেগধান হিসাবে শ্রী পি-স্বামস্বামীও ঐ

শিকে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন; এমন কি তিনি পাণ্ডুহানের সঙ্গে যোগ স্থাপনের চেষ্টাও করেছিলেন। হাঙ্গারিয়ার মহারাজা মার সেদিন সন্তোষের ভাবে অনিবার্য বাস্তবের নিকট বজ্রতা স্বীকার করেছেন। কাজেই আজ হাঙ্গারিয়ার হা করেচে, তার চেষ্টা অসম্ভব অনেক ব্যর্থই করেছে।

উপরের মন্তব্য হ'তে এটা বুঝা যাবে যে হাঙ্গারিয়ার সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রের এই যে সংঘর্ষ, এর মধ্যে সন্তোষের ভাবে সাম্প্রদায়িক কিছু নেই। কারণ হাঙ্গারিয়ার মুসলমান নিজেই না হ'বে, মহিষ, ক্রিষ্ণের বা বংশের হিন্দু রাজাদের বেলারও ভারতীয় দৃষ্টিতে ঠিক একই মনোভাব নিয়ে কাজ করেছে। তবুও একথা স্বীকার করা যাবে না—যে পাকিস্তান ও কিছু পরিবোধহীন মুসলমান হাঙ্গারিয়ার প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক সমস্যাতে বিরুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি, সাধারণতঃ-বিরুদ্ধি মনোবহন ভাবের প্রকাশ ঘোষণা করেছিলেন যে হাঙ্গারিয়ার সামরিক অভিযান প্রেরিত হ'লে সবচেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক বহিঃক্ষেপে উঠবে।

এটা প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক বাধা স্রষ্টার উদ্দেশ্য। পাকিস্তান সরকারও ভারতীয় সরকারের নিকট কতকটা এই মর্মে চিঠিপত্র লিখেছিল। বাক—অত্যন্ত হুণের বিষয় যে ভারতীয় মুসলমানরা কোন প্রকার গোপনাল সৃষ্টি করার চেষ্টারও দায় নি; ভারতের হিন্দুদেরও ধর্মবিশ্বাস দিতে হয়—হাঙ্গারিয়ার সামরিক অভিযান ও বিজয়ের উদ্দেশ্যে তারা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করে নি।

চার দিনের সামরিক অভিযানের ফলেই শান্তি আসি ও কার্শিম রাজত্বের আবুদোসেনী যন্ত্র ঘুচে গেছে। মৌলিক বহু বীর্য প্রকাশের পর আর কোন প্রকার বাধা না দিয়েই তারা পলায়ন করল। নিজেদের এরা কতকটা বন্দীদশার রেখেছিল; তাকে বিপদের মুখে টেনে এনে, হঠাৎ তারা পলায়ন করল। ভারতের সামরিক শক্তির নিকট তাদের অফারদের যে কোন দৃষ্টি

নেই, তা উপলব্ধি করতে তাদের ঘেরা হয়নি। এটা অত্যন্ত হুণের বিষয় যে অতি দ্রুত সামরিক অভিযানের সাফল্য পরেই হাঙ্গারিয়ার সমস্ত সমাধান হয়েছে। এখন আশা করি গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমস্তই হাঙ্গারিয়ার পৌর শাসন (civil administration) প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাঙ্গালার পৌরশাসন

আমরা স্বভাবতঃ প্রাথমিক বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোন সাধারণ ব্যাপারকে দেখতে চাই না। হাঙ্গারিয়ার সামরিক অভিযানে যে কয়জন সামরিক কর্মচারীর নাম প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টি পরিচালনার জন্য উল্লেখিত হয়েছে তারা তিনজনই বাঙ্গালী। মেজর-জেনারেল চৌধুরী, মেজর-জেনারেল কং ও আকাশ অভিযানের নেতা এয়ার-মার্শেল মুখার্জী—এই তিন জন সেনাপতির নামই প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টি পরিচালনার জন্য বারবার উল্লেখিত হয়েছে। সবচেয়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যে পৌর এই তিনটি বহু-সত্তার তা আরও একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছেন। কাঁচার অভিযানের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম অবস্থায় সেনাপতি রায় হানাদারী বাহিনীকে বাধা দিতে গিয়ে প্রাণত্যাগ করেন; তার এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্রীমঙ্গল রক্ষার পথ অনেকটা সহজ হয়েছিল। সামরিক বিষয়ে বাঙ্গালীর কোন প্রাতি নেই; বরং সুখ্যাতিই আছে। তাই বাঙ্গালীর সেনানায়কদের এই কৃতিত্বে প্রত্যেক বাঙ্গালী পৌরব বোধ করবে।

হাঙ্গারিয়ার ও পাকিস্তান

পাকিস্তান সরকার নানাভাবেই হাঙ্গারিয়ার প্রতি আগ্রহ ও সহায়ত্ব প্রকাশ করেছে। হাঙ্গারিয়ার চার দিনের সামরিক অভিযানের ফলেই আত্ম-সমর্পণ করবে—পাকিস্তান সরকারের তেমন কোন দাবী ছিল না। হাঙ্গারিয়ার ব্যাপারের এই পরিণতিতে যে তারা হুণিত হয়েছে—তা স্বীকার করার নয়। পাকিস্তানের রাজনৈতিক—চেতনামূলক মুসলমান জনতাও

এতে ভূখণ্ডিত হয়েছে। নানাজাতি পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে তারা এই বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে ও করছে। শহরবাসী হিন্দুদের উপর চোটখাটো উৎপাত এরা করেছে। কলিকাতার হিন্দু পরিচালিত সংবাদ পত্র, ভারতীয় বেতার-কেন্দ্রের ঘোষণা শ্রবণ প্রভৃতি পূর্ব-পাকিস্তানে প্রায় নিষিদ্ধ হয়েছে—‘আইন’ও না হ’লেও কার্যত। পাকিস্তান হঠাৎ অস্থির করল—তার আত্ম-রক্ষার ভাল ব্যবস্থা এখনই করা দরকার। তাই নানাপ্রকার অর্ধ সামরিক বাহিনী গঠন করার তাগিদ এসেছে; সৈন্য বাহিনীর সব বিদ্যার কেটে দেওয়া হয়েছে।

আজ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সম্পর্ক ঝড়িয়ে গিয়েছে, তাতে ভারতের সামরিক বলের নিকট হায়দারাবাদের এই শোচনীয় পরিণতিতে পাকিস্তানের মনে আসার ভাব আসা খুবই স্বাভাবিক। পারস্পরিক বন্ধু ও শ্রীতির সম্পর্কের পরিবর্তে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আজ প্রকৃত সংঘর্ষের সম্পর্ক এসেছে। কান্দীয়ে তা’ রূপ পরিগ্রহ করেছে—সামরিক সংঘর্ষের। অস্ত্র ত্যাগ সামরিক সংঘর্ষের পক্ষে না এসে—অস্ত্র থাকে বলা যায়—armed neutrality অর্থাৎ সশস্ত্র নিরপেক্ষতায় এসেছে। এই অস্ত্রের অবস্থার দীর্ঘকাল থাকা যায় না। একদিন এছপার-ওছপার বা হর একটা হ’তেই হবে। হয় ফিরে মৈত্রী ও শ্রীতির পথে আবার ছুই রাষ্ট্র আসবে; না হয় সংঘর্ষ আরও তীব্র ও প্রকট হবে। সেই ক্ষেত্রে ভারতের সামরিক বলের এই পরিচয়ে পাকিস্তান অস্থির না হ’য়েই পারে না। তা ছাড়া—এটা আশা করা তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল যে কোন প্রকৃত সংঘর্ষের সময় হায়দারাবাদও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতের সামরিক শক্তিকে দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভক্ত করে রাখবে। কিন্তু হঠাৎ হায়দারাবাদের কার্যত তিরোধানের ফলে পাকিস্তানের পক্ষে সমস্তা অনেক দুর্বল হ’ল। এখন আশা করা যায় পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে বিবেচনা ক’রে তাঁদের সমস্ত মনোভাব পরিবর্তন করবেন। তাঁদের আভ্যন্তরীণ সংগঠন সমস্তা এত আছে যে সেইমতো

তাদের শক্তি ও সময় নিয়োগ করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এর উপর—পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জনাব জিন্নাহর মৃত্যুতে তাঁদের আভ্যন্তরীণ সমস্তা আরও গুরুতর রূপ ধারণ করেছে। তাই ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষমূলক সম্পর্ক তার পক্ষে আজ পরিহার্য।

জনাব জিন্নাহর লোকান্তর গমন

বহুদিন যাবৎই কারণে আরম্ভ জিন্নাহ গুরুতর পীড়ার সংবাদ রাষ্ট্র হচ্ছিল। পাকিস্তান হ’তে নানাজাতি প্রতিবাদও আসছিল। পাকিস্তানের অভ্যন্তরের মধ্যে জিন্নাহী এমন ঘনিষ্ঠভাবে ঘড়িত যে তাঁর চঠাৎ মৃত্যুতে পাকিস্তান স্বভাবতই দল্লত হতে পারে। কালেই এই সব প্রতিবাদে লোকের বিশেষ আস্থা ছিল না। তারপর হঠাৎ তাঁর মৃত্যু সংবাদ এল।

জীরাহী এককালে সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতা বঞ্চিত জাতীয় নেতা ছিলেন। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সমস্ত নেতাদের মধ্যে জিন্নাহী ছিলেন সবচেয়ে আ-গামকীয় (secular) অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা বঞ্চিত। সেই জিন্দা একদিন হঠাৎ সাম্প্রদায়িকতার পুরোহিত হ’লেন—দুর্ভাগ্যে তিনিতে জাতি গড়ার দরমে দ্বি-জাতিত্ব প্রচার করলেন। অথচ তাঁর জীবনের মৃত্যুদিন পর্যন্ত জিন্নাহীরা আর্থিক সত্ততার খ্যাতি অটুট ছিল;—কোনপ্রকারে ইংল্যান্ডের প্রেলোডনে পড়ে তিনি এইভাবে নিজের রাজনীতি পরিবর্তন করেছেন—এমন অভিযোগ কেউ করতে পারে নি। তাঁর রাজনীতি, তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত কার্যপদ্ধতি—প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের যত্নের ঐক্য ছিল না; কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত সত্ততার প্রতি কোন মিনও সন্দেহ আমাদের হয় নি। নিজের অভীষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য একনিষ্ঠ আগ্রহ নিয়ে তিনি চলেছেন; অপর কোনও দিকে তিনি পরোয়া করেন নি। তাঁর সাধে যারা সেই তারা দবাই তাঁর দৃষ্টিতে লক্ষ্যবস্তু এবং তাদের দিক দেখবার কোন দায় বা দায়িত্ব তিনি বোধ্য করেন নি। এই একরোখা ভাব তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

প্রায় আসতে পারে একদিনের সাম্প্রদায়িকতা বঞ্চিত

প্রাচীর নেতা কি ক'রে সাম্প্রদায়িক নেতা হ'লেন ? ইতিহাসে গড়ে ওঠে অবস্থার চাপে ; ভারতে এমন সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল দার কলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি অতি উগ্ররূপে ফুটে উঠতে পারল । এত দিন সমাজের নেতা ছিল স্থিতিশীল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু । কাজেই এই পরিবর্তনের দায়িত্ব তাদের অনেকখানি আছে । অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে সামাজিক অবস্থার সুযোগ নেবার ক্ষমতা বিশেষী রাষ্ট্রশাসকগণ সব কিছুকেই বিপক্ষে চালিত করেছে ;—সমাজ মেয়ের থাকে বলম দিয়ে সারাবার চেষ্টা না ক'রে তারা চেষ্টা করেছে বুড়িয়ে যা বাড়াবার ।

এই নীতি অনুসারে ইংরাজ সরকার তার সৈয়দ আমের, তার আগা ধী এবং সর্বশেষ জনাব জিন্নাকে বাড়বার সুযোগ দিয়েছে এবং নিজেদের প্রয়োজনে লাগিয়েছে ;—কিন্তু এদের সৃষ্টি তারা করেনি । এদের সৃষ্টি করেছে—প্রচলিত সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা—যাতে মুসলমানরা প্রায় সর্বনিম্ন স্থানে ছিল । তা থেকে উঠতে হ'লে সমাজসেহে কাটল সৃষ্টি ক'রেই তাদের উঠতে হবে । কাজেই এর ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ে সমাজ-পতিদের উপর—অর্থাৎ স্থিতিশীল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের উপর ।

কিন্তু সে ত অতীতের কথা । সমাজের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকটা বেন অর্থনৈতিক শ্রেণীগত বৈষম্য এসে গিয়েছিল ; এটা ঘুর না হ'লে সমাজের সুস্থ বিকাশ সম্ভব নয় । জিন্নাকীর চেষ্টায় তা দূর হবার রাস্তা তৈরি হয়েছে । জিন্নাকীর মৃত্যুর পরও সমাজের সমীকরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকবে হ'লে আশা করি । হযরত এর কলে উভয় সম্প্রদায় ছোট-বড় মনোভাব ভাগ করে একদিন সুস্থভাবে নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস করতে পারবে । ভারত বিভাগের প্রবর্তক হিসাবে জিন্নাকীর স্মৃতি না থেকে ভারতীয় জাতির সভ্যতার মিলন ও সংগঠনের পথ তৈরি ক'রে গিয়েছেন—এই হিসাবে যদি তাঁর স্মৃতি বেঁচে থাকে তবেই তাঁর কাজ সার্থক হবে ।

বাঙালী ব্যাঙ্ক

বাঙালী ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন প্রবেশ করেছে । এই বিষয়ে তাদের প্রধান সহায় হ'ল বাঙালী ব্যাঙ্কসমূহ । যে সব অ-বাঙালী ব্যাঙ্ক বাংলা দেশে লক্ষ লক্ষ টাকার লেন-দেন করে, তাদের হিসাবে বাঙালী ব্যবসারীদের সাহায্যের অর্থ খুবই সামান্য,—যে সব বাঙালী ব্যবসার ক্ষেত্রে খুব লক্ষগ্রস্ত, হযরত তারা কিছু আর্থিক সাহায্য এই সব অ-বাঙালী ব্যাঙ্ক থেকে পায় । কিন্তু যে সব বাঙালী ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন আসছে এবং যাদের পক্ষে ব্যাঙ্ক থেকে অর্থসাহায্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন—তাদের নিকট এদের ভাগ্যবান প্রায়ই কিছু থাকে । তাই পর পর বাংলার ব্যাঙ্কগুলির উপর যে হামলা হচ্ছে, এতে বাঙালীর পক্ষে ব্যবসার করা কঠিন হয়ে উঠছে । এই ২১০ মাসের মধ্যে দুবার এই প্রকার হামলা হ'ল ; তাতে বাঙালী ব্যাঙ্ক থেকে ২০১২ কোটি টাকা উড়ে গেছে । অর্থাৎ ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙালী যে অর্থসাহায্য পেত, তার পক্ষে ২০১২ কোটি টাকা কমে গেল ।

বাঙালী ব্যাঙ্কের আমানতকারী প্রায়ই মধ্যবিত্ত ও প্রবীণ ;—আবার এরাই অন্ততঃ এই সব ব্যাঙ্ক থেকে টাকা কর্তৃক নিয়ে ব্যবসার করে । পূর্বে বাঙালীর ঘরেও টাকা ছিল না, ব্যাঙ্কও তার টাকা ছিল না । গত যুদ্ধের পূর্বে এখনকার বড় বড় বাঙালী ব্যাঙ্কের মূলধন ও আমানতের টাকা অ-বাঙালী ব্যাঙ্কের তুলনায় হাতিয়ার । গত যুদ্ধের সময় বাঙালীরা কিছু ব্যবসারের সুযোগ পেয়েছে—অবশ্য বাঙালীর অ-বাঙালী ব্যবসারীদের তুলনায় কিছুই নয় । ৪২ মাসে আপাত্তি বোমার ভয়ে এখন বড়বাজার প্রায় খালি হ'য়েছিল, তখন কিছু কিছু বাঙালী ব্যবসারী ওখানে বসবার ঘর ও ব্যবসার করার পরিপোষিত ছিল । তারপর বহু ব্যবসারের বন্ধন নিম্নপ্রাণ এল, তখন প্রায় সমস্ত বহু ব্যবসার গিয়ে পড়েছিল—অ-বাঙালী একটি সংঘের হাতে—Bengal Textile Association (B. T. A.) । আজ ব্যবসা হয়েছে সমবার সমিতির মারফৎ কাপড় বকুন করা হবে—অর্থাৎ বহু ব্যবসারের অনেকটা বাঙালী ব্যবসারীদের প্রভাব আসবে । কিন্তু

এই সব সমস্যার সমিতির হাতে এর সমস্ত পূর্ণাঙ্গ টাকা নেই। এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক এগিয়ে এসেছে—তারের সাহায্যে। তা ছাড়া, করলা ও চা ব্যবসায় ও বর্জন ব্যবসায় বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের যে অংশ আছে, তাও অব্যাহত রাখা যায়। মনে হতে পারে যে কিংবা সমস্যা।

তাই এই সময় পর পর বাঙ্গালী তপস্বী ব্যাঙ্ক (Scheduled Banks) সমূহের উপর এই আক্রমণ অনেকের মনেই সমস্যা হতে পারে। সেই সমস্যা হতে বলা অনেক কথা রাষ্ট্র হয়েছে; যা ফলে কিছু অসুবিধাও সৃষ্টি হয়েছে। তবে ঐ সমস্যা হতে বলা কতটা সত্য আছে বলা কঠিন। কিন্তু একথা বলা যায়—যে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলি বিবেচনা করে তপস্বী বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলি যারা গেলে বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যবসায় ক্ষেত্রে কিছু করা যাবেই কঠিন হবে। আজ বাঙ্গালী সব দিকে দাবি আছে। আসামে, বিহারে ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালীর স্থান কমেই সঙ্কট হ'য়ে আসছে। পূর্ব বাংলায়ও আজ ব্যবসায়ের অসুবিধা অবস্থা নেই। কেবল এই একটু পশ্চিম বাংলা আছে; এখানেও যদি বাঙ্গালী নিজেদের ব্যাঙ্কগুলি রাখার পথ নেই, তবে নিজেদের সর্বনাশই তারা সাধন করবে। ভীত জালে যদি সবাই টাকা তুলবার জন্য ছোটে, কোন ব্যাঙ্কই টিকে থাকতে পারে না। তাই বাঙ্গালী আমানতকারীরা যেন বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের সত্যতা বাড়াবার কাজে সাহায্য করে।

অপর দিক

বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক বজায় রাখার পক্ষে আমাদের দায়িত্ব যদি থাকে না কেন, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের অসত্যতা বা অযোগ্যতার প্রমাণ দিতে আমরা সক্ষম নই। কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহের প্রস্তাবের উত্তরে ব্যবসায়-সচিব হিসাব দিয়েছেন যে বিশ্বস্ত সেবাব্যবস্থা পূর্ব ৩৭০টি বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে। গত ২১০ বছরের মধ্যে ৪টি তপস্বী ব্যাঙ্ক বরখাস্ত করা হয়েছে। এই সব ব্যাঙ্কের পরিচালনা কোন অসত্যতা বা অসত্যতা ছিল কিনা—তা অসম্ভব করা সরকার। ভারত সরকার এক অভিনব প্রকারী ক'রে বিপর্যয়বাহক রক্ষা করার সমস্ত ব্যবস্থা

করেছে।—ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank of India) বিপর্যয়বাহক অর্থ সাহায্য করতে পারবে। এই ব্যবস্থা আরও কয়েকদিন পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি কোন সাহায্য দেয়, তবে তাকে কিছু অধিকারও দেওয়া উচিত—যাতে ব্যাঙ্কগুলির সমস্ত কার্য তদারক করা যায়। আমরা মনে করি এই ব্যবস্থা কেবল তদারক্যের সমস্ত সব অসত্যতা সমস্যাও প্রমাণ। অর্থাৎ যে সব ব্যাঙ্ক কাজ-কর্ম বন্ধ করেছে, সে সব ব্যাঙ্ক সমস্যাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ভার দেওয়া উচিত—যাতে গুলির সব হিসাবপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। যে সব ব্যাঙ্ক সমস্যা বন্ধ করেছে, তাদের আমানতকারীদের টাকা যাতে নষ্ট না হয়, তার সমস্ত ঐগুলির সম্পত্তি ও পাওয়ার হিসাব করে কতগুলিকে এক সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কিছু করা যায় কিনা—তাও যেমন দেখার সরকার আছে, অপর দিকে এমন ব্যাঙ্কের পরিচালকদের সত্যতা ও কর্মপটুতা কোন দোষ দ্রুত থাকলে, তাদের বিরুদ্ধে কোন সৎস্ফলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব কিনা—তাও দেখতে হবে। বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক পরিচালকগণ সবাই অসম্মান বা অকর্মণ্য—একথা আমরা বিশ্বাস করি না। অথচ আজ ভারতের সর্বত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলি অসম্মান ও অকর্মণ্যের দৃষ্টান্ত স্রষ্টা হ'য়ে উঠেছে—এগুলি ব্যাঙ্ক পর পর বরখাস্ত করা হচ্ছে। কাজেই একটা তদন্ত হওয়া উচিত যার দ্বারা অসম্মান ও অকর্মণ্য ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণ বিশেষভাবে চিহ্নিত ও সত্য হ'তে পারে।

যে প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে ও যে সমস্যা অর্থ-দল নিজে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলি গড়ে উঠেছে এবং বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের পথ বন্ধ করেছে, এবং পর পর কষ্ট হামলা যে ভাবে তারা পার হ'য়েছে, তাতে বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক-পরিচালকদের সত্যতা ও কর্মপটুতার প্রশংসা পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তবুও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে এগুলি ব্যাঙ্ক সমস্যা বন্ধ করার ফলে সাধারণের মনে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলির সত্যতা ও কর্মপটুতা

মধ্যে সন্নিবেশিত। দু'চারজন ভাগ্যবশী অসুস্থ ব্যক্তি-পরিচালকের কাজের ফলে বাংলায় সমস্ত ব্যক্তিগত উন্নতি লোকের আস্থা ধার ধরে না থাকে—এটা অত্যন্ত অসঙ্গত। তাই ভারত সরকারের নিকট অমেরের আবেদন যে সব ব্যক্তি প্রজাতি বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম—অসুস্থ পরিচালকগণ দ্বিতীয় হুকুম এবং সমস্ত হুকুম এই সব ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি ও পাওনা হিসাবে করে কোন সংযুক্ত ব্যক্তি স্থাপন করা হুকুম করে। অসুস্থকারীরা অসুস্থ কিছুটা টাকাও কেবল পেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও আছে। যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত আর্থিক আছে, তাদেরও একসঙ্গে মিলিত করার ব্যবস্থা করা প্রকার। আমরা জানি—এমনি আলোচনা বহুবার হয়েছে এবং অনেকটা দূর এগিয়ে তারপর সব বেঁচে গেছে। হঠাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচালকের মনেই আশঙ্কা আছে—মিলিত ব্যক্তি হলে সবাই ত বড়কর্তা বা মেনেজিং ডিরেক্টর হয়ে থাকতে পারবে না। যেহেতু যে এরা মিলিত হলে সে ভয়। আমাদের বিশেষ নেই। কাজেই এখানেও ভারত সরকারের এগিয়ে আসা প্রকার—যাতে আসন্ন কালের এদের মিলিয়ে দেওয়া যায়।

মহাভূজরাজ তৈল

মস্তিষ্কের দুর্বলতা দূর করিয়া ঘনকৃষ্ণ চিকুণ কেশদাম সৃষ্টি করিও অদ্বিতীয়!

অশোকারিষ্ট

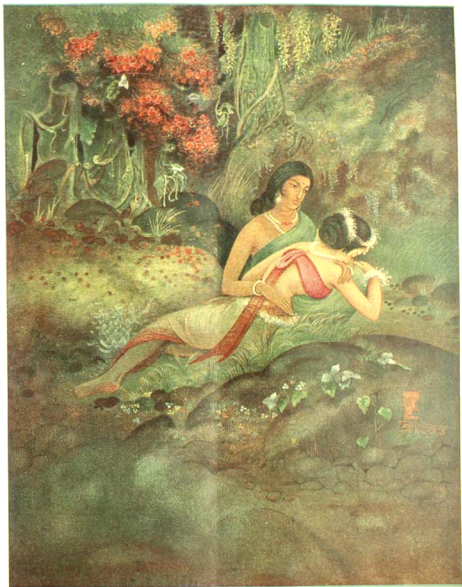
নারীর দেহ নীরোগ করিয়া
প্রকাশ্যে স্বাস্থ্য ও নান্য দান কর!

শ্রী ঔষধালয় লিমিটেড

বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধ পরিবেশক
৪৩৮ • রঙ্গা রোড • টালিগঞ্জ • কলিকাতা



बन्निदा



दिनेश्वरी ठाकुर

—স্মৃতিস্রোত—

একাদশ বর্ষ

কার্তিক—১৩৫৫

সপ্তম সংখ্যা

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ বাহুগোপাল মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রত্যুষ

তমলুক, মেদিনীপুর জিলার একটি মহকুমা। রূপ-নারায়ণ নদের উপর অবস্থিত। রূপ-নারায়ণ আয়তনে বিশাল। ওপারে মণ্ডলঘাট, হাওড়া জিলায়। মাঝে আশুপাল বেহুড়ীয়া চড়া দেখা যায় এটা। তখন ছিল না। নদের মোড়ার ভাঁটার পরাক্রান্ত, পুষ্টি অবস্থায়ও কী, জীর্ণ মেঘ প্রতিনিয়ত শ্রবণ করিয়ে দিত—এই রকম অন্ধাধার ও গভীর নিম্নে জীবন—জাতীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক। কিন্তু একটা বিষয় খুব ঠিক, এর চেয়েও ঠিক। সেটা হচ্ছে এই যে বহিঃস্থের সন্তার সংগে নিয়ত যোগ রাখা যায়, তবে সাময়িক পরিবর্তন যা। কিন্তু ঘটে তাকে অতিক্রম করেও মহৎ ও পৌরুষের বাঁচন বাঁচা বেতে পারে। রূপ-নারায়ণ সাগরের সংগে যোগ রেখে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছে।

তমলুক নিয়েই একটা উদাহরণ। ছোটখাটো হিসাবে। তমলুকের পুরাণ নাম তাম্রলিপ্ত। মহাকার্ত্ত্তের যুগে এর প্রসিদ্ধি যথেষ্ট ছিল। তাম্রলিপ্ত রাজা ইন্দ্রপ্রস্থের চক্রবর্ত্তি মহাট্ট বুদ্ধিরের আশ্রিত্য অস্বীকার করছিলেন। তাঁর ফলে পাণ্ডবের সংগে তাঁর যুদ্ধ হয়। প্রত্যাহত, অন্তঃসারথ্য বীর অর্জুন তাম্রলিপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে বে-কার্য্য হলে যেমন উঠেছিলেন। শ্রীশ্রী, ক্রান্ত, রণাবল্লভ দ্বন্দ্ব

বার বার কপাল মুছতে বাধ্য হয়েছিলেন। রূপ-নারায়ণের উপস্থিতি ঐ এক কারণ। এটা অবশ্য পৌরাণিক কাহিনী। এমনকি তমলুকের অপর এক নাম কপাল-মোচন তীর্থ।

তমলুকের আর এক মাহাত্ম্য। স্বনাম রূপ-নারায়ণে বাণ আসে, সে এক তীক্ষ্ণ শব্দের উৎপাদন ক'রে নানারকম ডেউয়ে জলবুদ্ধির খোঁজা করতে করতে প্রচণ্ড বেগে ছুঁপায়ের তটভূমিকে আঘাত করতে করতে ছুটে আসে। আওলাতটাকে একপ্রকার উৎকট শঙ্খধ্বনি বলা যেতে পারে। কিন্তু বে সময় বাণ-সেবতা বর্গ-ভীমার মন্দিরের পেছনে এসে পৌছয় তখন নীরব হয়ে যায়। তারপর মন্দিরের অধিকার পার হয়ে আবার শঙ্খধ্বনিতে ওল ও শুলের মাহাত্ম্যের ভীতি উৎপাদন ক'রে উত্তর দিকে ছোটে। আশুপাল একথা হুতোমা খাটে না। কারণ ভীমার মন্দির এবং যৌবনপ্রাণ নদের মধ্যে ব্যবধানটিও বেশ সূত্রহীন হয়ে পড়িয়েছে। এই চরটি প্রাণ এক মাইল বর্ত্তমানে হবে। Zone of Silence বা নিস্তব্ধতার এলাকা ভৌগোলিক ব্যবস্থার অন্তর্গত, পরার্থবিজ্ঞান অমুখোদিত ব্যাপার। কিংবদন্তী হচ্ছে যে মা ভীমার ছেলের খুম ভেঙ্গে যেত ঐ অপোভন আওলাত। তাই মা চকুম নিয়ে

দিয়েছেন ঐ খানটার বাপকে চূণ ঘেরে বেতে। যা
জীমাকে ভয় না ক'রে বেচারী বাণ করে কি ?

এর পর এল বৌদ্ধগুণ। এবেশের সাজা ১৪২১ বেশ
বিবেশে বিতরণ করতে যেত “কত প্রার্থী সার্থ-
বাহৌয়ল”; আর নিলিঙ্গ, ত্যাগী, মহতের অহুসারী প্রবন
ও তিস্ত-তিস্তুগীরা। এই ত ছিল বিশাল বন্দর। দাপরগামী
গোত এখান থেকে ছাড়ত, আবার ফিরতি পথে এখানেই
এসে আশ্রয় নিত। সেদিন ভারত ছিল সংস্কৃতির হাত।
এরীত। ছিল অস্ত্রেরা—পূব ও পশ্চিমের লোকেরা।



গুরুদেবের মূর্তি

যাবার সময় বাজীরা লনবেত কঠে, ভাবাপ্রসূত দ্বয়ে উদাত্ত
হুয়ে বলে যেত—“জবে চলিলাম তমালিকা! তমালিকা,
চিরমেহনদী, হুবেদী যা আমার, মহিমা-আবাস
জগদ্ধাম।”

ভীরের লোকেরা উত্তর দিত—“লিবাতে পদ্যন।”
পথটা তোমাদের ভালদ ভালদ কাটুক। কড়, ঝাপটায়
পড়ে দাপর-দোলা উবেগ ও উত্তেজনা জাগালে বাজীরা
গাইত—“গাই অনননন অননন নাম তোমার।”

এই রকম গল্প শুনে শুনে আমি মাঝের কোলে
ঘুমিয়ে পড়তাম। সার্থী থাকত আমার চাইবোনেরা,
সার্থী থাকত আমার প্রিয় বন্ধু হুয়েন রক্তিত।

কৈবর্ত রাজারা পশ্চিমালী সাম্রাজ্য বাংলায় গড়ে
তুলেছিলেন। তখনক তথা খেদীনীপুর, বাহুড়া
কৈবর্তদের কোলা বললে অস্বাভাবিক হয় না। আরও একথা
যাচাই। সে এক গৌরবের অধ্যায়। বাংলার ইতিহাসে
চিরস্মরণীয় ঘটনা। ভারতের ইতিহাসে বেধা বায় ব্রাহ্মণ,
কজির, বৈক ও পুত্র রাজা হয়ে গেছেন। কাবুলের বে
রাজার মধ্যে সর্বপ্রথম পাঠান রাজা মহম্মদ গোরীর সৎসর্গ
হয়, সেই রাজা জয়পাল ছিলেন ব্রাহ্মণ। লিঙ্গুর রাজা
মাহির, ধারদকে সর্বপ্রথম জয়পথে এসে আরবের সৈন্য
মহম্মদ বিন্ কাশিমের অধীনে হৃত করে, তিনিও ছিলেন
ব্রাহ্মণ। কজির রাজাদের কথা আলোচনা ক'রে বলার
প্রয়োজন নাই। তাঁদের ত এই ছিল বিশেষ বৃত্তি।
পবচরে বড় সাম্রাজ্য ভারত ও ভারতের বাইরে অবধি
বিস্তৃত হার ছিল, সেই সম্রাট হর্ষবর্ধন ছিলেন বৈক।
বাংলার কৈবর্তদের সেকালে পুত্র বলে গণ্য করা হ'ত।
স্বতন্ত্র ভারতের রাষ্ট্রে সব সময় একটা বর্ণের বা একটা
বিশেষ দলের কায়েদী হ'ত ছিল না।

আমি গল্প শুনে শুনে কখনও বা প্রশ্ন করতাম—
—“তাহলে এরা আমাদের কে হ'ল ?” যা বলতেন—
“ভাই”; জিজ্ঞেস করতাম, কেননা একটু অবাক বোধ
করতাম “এরা সবাই ? হিঁদু, মোছরমান ?” যা বলতেন
—“হ্যাঁ, সবাই যে এক মাঝের সন্তান।” —“এক মাঝের
ছেলে ? সবাই ? হিঁদু, মোছরমান ?” যা ছেলের
চিন্তে তান হাতটি ঠেঁকিয়ে বলতেন “জাগো, বাবু।”
আরও বিষয়ে জানতে চাইতাম, “বল না, আমাদের
ভিত্তর কে কি ?” যা সাধারণ জবাব দিতেন “কে কি নয় ?
সবাই নব।” বাম্বকের মন এতে উঠত না। সে বিরক্ত
হয়ে বলে উঠত, “এম নাম তোমার গল্প ? ছাই গল্প।” যা
বুঝিয়ে বলতেন—“বহুতলী যে আমাদের বাড়ী এসে কত
কি সেজে বেধিয়ে বার। এমনি ত সে বোধ আসে
যেন এক একজন নতুন লোক। কিন্তু সত্যি ত তা’

নয়। ঐ মাঝগুলোকে ফেলে দিলে বেরিয়ে পড়বে একটাই লোক।” আমি বললাম—“কি যে বল ঠিক বুঝতে পারছি না। বহুতরী ত একটা লোক। সেজে গেছে নতুন নতুন হয়। কিন্তু হিঁদু মোড়লমানরা ত আলাদা আলাদা লোক?”

মা বললেন—“বড় হলে ভাল করে বুঝতে পারবে। বাইরের পোষাক, কিংবা কি কি কাজ করে তাই দিয়ে মানুষ চিনতে নাই। ও’ত বাইরের জিনিষ, মুখোশ। ভেতরে যে চেহারা আছে তাই হচ্ছে আসল পরিচয়। সেখানে সব এক। তাকে বলে মানুষ। মানুষ হিসেবে সব এক।

আমি আলো-ঐশ্য্যারে হয়ে রইলাম। নাই বা বুঝলাম আদ। মা এখন বলেছেন তখন ঐ কথা সত্যি। বড় হলে বুঝতে পারব।

এর পর এল কোম্পানীর কথা। সেটা হবে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ব্যাপার। আক্ৰিমি জাতির নগণ্য উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ভারত সরকারের লড়াই হচ্ছিল। একজন কাবুলী একদিন এসে আমার বড় ভাইকে বলল—বাবু, এই মণিঅর্ডারটা লিখে দিন ত? তিনি বললেন—কাকে পাঠাবে? উত্তরে জানা গেল, বাবু মহম্মদের ছেলেকে। বাবু মহম্মদ এখানে ব্যবসা করত। আর লোককে টাকা ধার দিত। কিন্তু অল্প কাবুলী সঙ্গারদের মত মরশুমী ব্যবসায়ী সে ছিল না। তাদের দেখা পাওয়া যেত শীতকালে। গরমের সময় তারা চলে যেত। বাবু মহম্মদ বারো মাস এই শহরে থাকত।

বাবু মহম্মদকে এখন বলা হল যে সেটা লড়াইএর সময়, নিয়মশৃঙ্খলা সে দেশে নাই। আক্ৰিমিরা লুণ্ঠতরাজ করে সর্বনাশ করছে। কার টাকা কার হাতে গিয়ে পড়বে কে জানে? কথা শুটি শুনে বাবু মহম্মদ থানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে দূরত্বের সঙ্গে অসুস্থরোধ জানাল যেন মণিঅর্ডারটা লেখা হয়ে যায়।—“আমার ছেলের হাতে পড়লে, টাকা নিয়ে সে কি করত। খেত আর লড়ত। অল্প লোকের হাতে পড়লে তারাও থাকে, আর লড়বে। দিন টাকা পাঠিয়ে।”

তাই বোনের আসরে সে কথা ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হলো না। তারা তাদের খেসড়ীদেহ কাছে লোভাশুভি গল্প করে বেড়াতে লাগল। ছোটদের মুখে লড়াইএর কথা বর্ণনা ব্যস্ত হচ্ছে শুনে একজন মুক্শি গোছের গ্রাম্য বৃদ্ধ আমাদের সাবধান করতে লাগল। “এ সব কথা মূখে এনো না, মুখের কথা কইতে নাই। কোম্পানীর লোক ধরে নিয়ে যাবে।”

“কোম্পানীর লোক ধরে নিয়ে যাবে।” এ এক কৌতূহল জাগ্রাব্য ব্যাপার হ’ল। “বল না রামচাঁদ কাকা, কোম্পানীর লোক কেন ধরে নিয়ে যাবে?” সে বেচারা মিষ্টি কথায় সাবধান করা গেল না বেবে ধমকে উঠল। বলল “যখন ধরে নিয়ে গিয়ে, শ্রীর যথাবে, টের পাবে।”

“শ্রীর কি কাকা?” “মানার বাড়ী, তারী মজার জায়গা। বাসি ওখানে কুড়ী দিমি যা নেই। এই যা তফাৎ।” এবার তফাৎটা জলের মত বোকা হয়ে গেল। মানার বাড়ী, বিদ্যুৎ দিমিমা-বমাগয়ের ছোট ভাই। এতটা অস্বাভাব্য জান ছেলেদের ঐ সময় হয়েছিল। অল্প শাস্ত্রে বা’ সিদ্ধ, তা’ স্বতঃসিদ্ধ। শ্রীর সম্বন্ধীয় কৌতূহল আর হইল না। বরং এখন মনে করি কি মাহেন্দ্রফণেই না রামচাঁদ খুঁড়ো শ্রীরের নাম উচ্চারণ করেছিল! শ্রীর জীবনের একটা অবস্ফুটনীয় বিভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীর দেখতে মামার বাড়ী ত নয়, শহুরে বাড়ীও নয়। ওটা নিছক ছেলখানা। বড়ের মধ্যে যে কোন বন্দর অভিজ্ঞেহ হতে পারে। এটা আত্মজবানবীর কাম্য। কিন্তু সামান্যতিক্ত ছোড়ো জীবনে অত্যন্ত অনভিজ্ঞেহ বন্দর হচ্ছে এই ছেলখানাটা। অনভিজ্ঞেহ হলেও ঐ জীবনের সঙ্গে ওস্তাদেহভাবে জড়িয়ে আছে ঐ “বাবু” আরগাটি।

শ্রীর ত গেল। কোম্পানীর লোক কে? কি? কোথায় থাকে? কি করে? কেন ধরে নিয়ে যায়? ছেলে-খরা বুঝিবা হবে? এই সব প্রশ্ন মনে ভাগতে লাগল। রামচাঁদ কাকা বড়ো টেক-থরো লোক। ওর কাছে সুরিধা হবে না। শ্রীতুম্যাকে ধরা গেল। শ্রীতল ঘাইতি স্বরেনদের প্রাণো চাকর। তাদের মামাবাড়ী

পেয়ে এসেছে। হুইনের মা তাকে ডাকেন ঈতু মায়া। তাই সে হুইন এবং তার লসীদেবীর নাম, ঈতুমায়া।

ঈতুমায়া ভারী স্বল্প লোক। তালপাতার ডেপু বানিয়ে দেয়। আমাদের কসি ঘরে গাশী ক'রে দেয়। ছোট ছোট পুতুল তৈরী ক'রে—বাটি দিয়ে বা প্রাকডা দিয়ে—অমনি অমনি ভালবেলে লবাইকে দেয়। ঘরে বসলে গল্প বলে। ঈতুমায়া কোম্পানীর কথা শোনাতো বলত। বলত—“ঐ যে তোমরা ‘রূপে’ বেলেতে বাণ্ড, ওটা হচ্ছে ওয়াটসন কোম্পানীর হাতা”। ছেলেরা যে বাঠে বেলেতে যেত সেটা ছিল আদালত পার হয়ে আরও উত্তরে গিয়ে বাণপুত্রের ঘরের একটা বড় মাঠ। তাকে লোকে বলত ওয়াটসন কোম্পানীর হাতা, বা লন্। ইংরেজী Law. ঈতুমায়া বলে চলত—“ঐ হাতায় সেই যে প্রকাণ্ড একটা বাড়ী ভেবে পড়ে আছে, ওটা ছিল ওদের কাচারী। ওয়াটসনের নীলের ব্যবসা ছিল। সেই ঋ তৈরী করানর জন্ত লোককে অবরুদ্ধ করত। নীলের চাব করতে লোকের ধানের চাষে ক্ষতি হত। সত্য নীল করে সিতে হত ব'লে লোকে ঐ চাব করতে রাজী হত না। কোম্পানী জোর করে প্রজাদের ঘরে আনবার জন্ত পাইক, বরখস্জা পাঠাত। মার, ধোর, ভারী অত্যাচার করত। বেধে হোমে বা জলে ফেলে রাখত, দ্বারা প্রজাদের ধ'রে বেধে আনত তাদের বলত কোম্পানীর লোক।

এক কথার বেকল আর এক কথা। ঈতুমায়া কোম্পানীর লোক বোঝাতে গিয়ে আরও নতুন প্রশ্ন তুলে বলত।

ছেলেরা জিজ্ঞেস করত—“আজ্ঞা, ঈতুমায়া, তারপর কি হ'ল?”

যভাবতই ছেলেরাদের পনের দুশকটের কাহিনীতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

ঈতুমায়া বলত—“লোকে ধর্ষিত করল।”

এ আবার আর এক ক্যাসাস ধর্ম মানে পুজা, পাঠ। ঘট মানে কলসী, কিন্তু ধর্ষিত করাটা কি? ঈতুমায়া লোক বোঝাতে বেশ বেশ শোভে হত। অনেক কথা কলসীটির পর এই সাব্যস্ত হ'ল যে লোকে ধর্মের নামে

এক ঘট পেতে, গর হয়ে দিবা কবেছিল যে বড়ই কিছু দুর্গতি হোক, এই হাতে আর নীল বুনে না। প্রজাদের সমবেত দিবা ও বিত্রোহে কোম্পানী চমকে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নীলের চাব তুলে দিয়ে বেশের চাব প্রবর্তন করেছিল। আবার আগামে চাষের ব্যবসা কেঁপেছিল।

এই অবধি কথাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল যে কোম্পানী একদিন ছিল। তার লোক না হয় তখন থাকে তাকে ধরে আনত। কিন্তু এ কি? সে ওয়াটসন কোম্পানী ত আর নাই। উঠে গেছে। আজও তবে কোম্পানীর লোক কোথা থেকে এসে ধরে নিয়ে যায়?

ঈতুমায়া এ সমস্তার উপর বিশেষ আলোক সন্পাত করতে পারল না। কচি-কাঁচাঘের সমস্তা তারও সমস্তা হয়ে ঈড়াল। যখন চারিধিক অন্ধকার, আমি আনতায় মায়ের কাছে গেলে সব সম্বন্ধের নিরসন হয়ে, সেদিন মাকে জিজ্ঞেস করতে যা বুঝিয়ে দিলেন যে পুলিশের লোককে কোম্পানীর লোক আজও বলে। পূর্বে ইংরেজরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছিল। ব্যবসা থেকে গেল বাণপুত্রি। তাগের বলত কোম্পানী। সেই থেকে কোম্পানী কথাটা চলে এসেছে। এই প্রসঙ্গে তার ইতিহাস বড়টুকু জানা ছিল বলেছিলেন। বাবার কাছে গল্প শুনে যা বেশবিশেষের ইতিহাস বেশ কিছু জেনেছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহীরা ক্ষেপে, বিস্ফো গিয়েছিল। ব্যারাকপুর থেকে বিদ্রো পর্বত সে এক হৈ হৈ ব্যাপার। অনেক ক'রে সে হাকামা ধামে, তারপর থেকে কোম্পানীর দ্বারা গিয়ে হুইনের রাজা আরম্ভ হয়। হুইন ডিক্টোরিধা বড়গুণের রাণী।

আমি সব শুনলাম। হুইনের কথা লোকে পথে ঘাটে বলত। এমন স্মৃতিটি ক'র শোনা যায়। শুনে শুনে মনে হত হুইন বৃষ্টি আধাঘের আগনার জন—একময় আগন। এক ডাক দরকার একদিন বলেছে—এক জমল দিয়ে সে ডাক নিয়ে বাড়িল, পথে হঠাৎ চোখে পড়ল একটা বাঘ জুরে। তার ক'ব'ব' আওয়াড ডয়ের চোটে বেধে গেল। কি করে, বহা ভাবনার

পড়ল। আগে গেলে বাবে ধরবে। পিছু ফিরলেও নিস্তার নাই। এরূপ উভয়দিকে পড়ে গেছে চিঠি উঠল—দোহাই মহারাণী হুইন ডিক্টোরিয়া! বাব অমনি উঠে, রাগা ছেড়ে দিয়ে হুড়ু হুড়ু করে অন্তরিকে চলে গেল।

হুবার হুবার কগড়া, মারামারি বেধে উঠলে যদি কেউ রাগের মাথায় বলত—মেরে খুন করে ফেলব। অমনি আকাশ ব্যক্তি বলে উঠত,—“মেরে খুন করবে! এটা হুইনের রাজ্য।”

বুঝা বলত—রামচন্দ্রকে হার মানিয়েছে এই মহিমান্বী রাণী। খুন্ তপস্বীর মাথা কেটেছিলেন রান। কিন্তু পায়রাডুবারি ভোলা কাপা আতে ভোম। নির্ভাবনায় লাসুগিরি করছে।

ছেলেরা শুনে শুনে অশ্রু করণে কম হইল না। ঠাণ্ডি কিংবা হুঁড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি হলে বলত—কেড়ে নেবে! এটা কি মনের মূহুর? মশাই, মনে থাকে যেন এটা হুইনের রাজ্য।

মাটার মশাই বার বার মনে করিয়ে দিতেন—“নি কইন ইচ্ছা, শুভ, ঐ রাণী হন উত্তম।” খুন্ প্যারীটান সরকার, আর চিরজীবী তাঁর ‘লাইবু’। তাতে ঐ পাঠ আছে।

কিছু অতি পুরাতন বাসিন্দা ও ‘মহাস্থবির’ অর্থাৎ বেজার বুড়ো নগেন বাবু বলতেন—“ছেলেরা ভাল করে লাঠি ভাঁজো।”

“কোম্পানীর হাতে বাবে ছিল রাজ্যভার, না করিত দেবী সিংহ কোন অভ্যাচার, অল্প স্বভাব দুই দুর্বৃত্ত প্রধান, লাঠির ভয়েতে লেগে ছিল কাম্পান
লাঠি হাতে বদমর ঠাড়াইত হবে,
বীর খুন্ বকজুনি কে বলিত তবে।”

লাঠি ভাঁজতে বলার কারণ ছিল, আমাদের শিতা হুশিক্ষিত। পাকা লাঠিহাল রেখে ছেলেদের লাঠি, তরোয়াল খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর অল্প বয়সী নাক মিটকে বলতেন—“ভদ্রলোকের মাথায় পোকা ঢুকেছে। ভগবান ভয়পরে ভয় দিয়েছেন। সেই

ছেলেগুলোকে কিনা ছোটলোক তৈরী করছেন। বলি—ও কিপোরীবাবু, ছেলেগুলো কি নাগোয়ানী করবে?”

কেবল এক। নগেনবাবু উৎসাহের স্বরে কথা বলতেন : তিনি ছুঃখ করে বলতেন—

“নির্বংশ লাঠির বংশ বহনিন হার
সে আসনে হুন্ড বসি এবে শোভা পায়।
গোষ্ঠপুত্র গন সেই বিশেষ আনীত,
বাবু-কর বাকাদৌর করিছে শোভিত।”

আমার মাথায় কোম্পানীর চিন্তা দৃঢ়ভাবে বসে গেল, আমি ও আমার বন্ধু যুগেন ভাবতাম কোম্পানীর রাজ্য আর মহারাণীর রাজ্য—এ দুটো পৃথক? না, এক? কখনও মনে হত পৃথক, আবার কখনও এক। পৃথক এইরকম যে নামই শুধু আলাদা আলাদা। এক এই মন্তব্য যে হুইনের সেপাই সারীকে ত বদছে কোম্পানীর লোক। অনেক গবেষণার পর স্থির হল কোম্পানীই অমর। যুগেন বলতেন—বাপ মরে গিয়ে যেমন বেটাতে গিয়ে যল রক্ষা হয়, এও তেমনি। কোম্পানী চলে গেছে কিন্তু তার বংশ বেঁচে আছে।

রামচাঁদ কাকার কথা মনে হ’ল। “হুন্ডের কথা বোলো না, কোম্পানীর লোক ধরে নিয়ে যাবে।” আমি, যুগেন তখন নব বা যশ বহরের। কে আক্রমি, আমাদের তা জানা ছিল না। সাম্প্রতিক হিন্দুবাদী বা বঙ্গবাসী কাগজ পড়ে বড়ো হুন্ডের কথা আলোচনা করতেন। তোচি উপভাষার হুন্ড। কোথায় তোচি তা এই ছেলেরা জানত না। ইংরেজের সংগে তাদের সাক্ষাৎ বিরোধিতা কিছু ছিল না। অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বিচারশক্তি তখনও তাদের ভাগেদি। কিন্তু কেন কে জানে, আক্রমিদের ভাড়াহুন্ডের আক্রমণে রুট শিবির বিস্তৃত হবার স্বরে তারা আনন্দিত হত। গোরা সৈন্তের হাতে আক্রমিদের হার তারা চাইত না। আবার ভারতীয় সৈন্ত আক্রমিদের হাতে পরাধীন না হুৎ এটা তারা কামনা করত। রুট সেনানায়ক জেনারেল লুকাট নাকি রিপোর্ট কোন সময় করেছিলেন যে আক্রমিরা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার অস্ত্র বন্ধুরে দাম সংগ্রহ করত

নিজের ঘর ও গৃহিণী পর্যন্ত বন্ধত দিতে প্রস্তুত থাকত। আমাদের এ খবরটা খুব ভাল লাগত। আমরা ঐ পার্শ্বতা ভাবিতদের প্রতি এই অল্প প্রদানস্বরূপ হয়েছিলাম। যেপের প্রতি কি অকৃত্রিম ভালবাসা! কি অপূর্ণ স্বাধীনতা! শূন্য এই আত্মসিঁদুর!

রামাবণ ও মহাভারতের গল্প, প্রতাপসিংহ, বনবিহঙ্গসিংহ ও শিবাজীর কাহিনী শুনে শুনে আমরা একপ্রকার প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলাম। হুহু হুহু খেলা সন্ধ্যার মধ্যে প্রবর্তিত হল। ছেলেরা ভাঙ্গা মাটির দর বেখানে পাথ বেখানে বানাহ কেলা। ওয়াটসনের ভাঙ্গা বাড়ী হল, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সীমান্তবাসীদের কেলা। কারণ ভাঙ্গা বাড়ীটা উঁচু ছিল। পাছাড়ের উচ্চতা এই নিয়ে কল্পনায় গড়ে তুলল। তার উপর ভাঙ্গা ইট, শোচা হ'ল পরোক্ষা কেলায় গোলাগুলি। আত্মসিঁদুর যে কামানের গোলা ছিল না সে কথা এরা শুনেছিল। কিন্তু বড় বড় পাথরের চাকড় উপর থেকে গড়িয়ে নিয়ে উঠায় শব্দ সৈন্তকে ভাঙ্গা গুড়িয়ে দিত। এই কথায় তারা তাদের উপদ্রুত অল্প আবিষ্কার করতে পেরেছিল। মাঝে মাঝে গাছের কোঁপে লাঠি লুকান থাকত। কোথাও কোথাও ছোট ছোট খুঁটিও লুবিয়ে রাখা হত। মূলতঃ হুহু খোঁপা না করে যদি অতকিতে কেউ আক্রমণ করে তাহলে ঐ লাঠি লখন। কেলা কাছে থাকলে তার মাটির ভেলাগুলি লখন। কেলায় সেরালের আড়ালে আত্মগোপন বেখে হুহু চালান তাদের একটা রণকৌশল। প্রয়োজন হলে মাঝের মার দিয়ে নাক্তরে পুত্র পার হয়ে ঐ লুকানো শুকনো কাপড় পরে ভাল ছেলের মত বাড়ী চলে যেতে পারবে। এদের হলবন্ধীর মূল লক্ষ ছিল অতকিত আক্রমণের আরও প্রচণ্ডতর অতকিত উত্তর বেওয়া। হঠাৎ অন্তর্ধান। অল্প শক্তিতে প্রবল শক্তিকে বৈগতিক করা।

বর্গী হাঙ্গামার কথা কোন্ বাঙ্গালী শিশুর না জানা ছিল? এই পথায় শক্তিদান হওয়া এদের মনের মধ্যে বাঙ্গা বাঁধল। কমশক্তি দিয়ে বেশী শক্তিকে হাঙ্গরান করা উদ্দেশ্য। সন্ধ্যার নিয়ে এর অল্প প্রয়োজনীয় কুচকাওয়াজ

আরম্ভ হল। বল বেখে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পড়ল হুহু কড়াই গুটির বাটে। কচি কচি ভাঙা মটরগুটি খেতে ভারী লুন্দর। বিনা বাঁকে তোলে আর খায়। ভাঙা খেলে পালায়। একদিন এক ক্ষেতের স্বামী যে জানী, সে বেখেতে পেয়ে দূর থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল। তার যৌবিক ভাঙার কেউ ভর খেল না। ক্রমশঃ চীৎকার বাড়ছে শুনে তার বাড়ীর বা পাড়ার লোকেরাও এসে ছুটল। এবার তুঙ্গ লংগ্রাহ সন্ধ্যীন। বিপক্ষ সৈন্তরা ছুই মলে বিভক্ত। একমিকে কয়েকটি কিশোর অপরিকিত লা-আরান মনকতক। তারপর চান্দী পাল দিতে আরম্ভ করল। এই মলে বুড়াও একজন ছিল। ব্যাপার গুরুতর, বুদ্ধি সাহসের লায়। এই পথায় ছেলের একজন পরামর্শ দিল—ভাগি, এসো। অর্থাৎ যে পালায় সে চিরকৌবি হয়। পালাবে কি পালাবে না ছেলেরা ভাবছে ঠিক এমনি সময় অপর পক্ষীয় এক হুবক একটি ঠোকা তুলে থেবে এল। বলপতির হুহু হ'ল—কিরে ঠাড়াও। শব্দকে ভয় পাইয়ে তবে পালাতে হয়। এই হল বর্গীর নিয়ম। ডেহু ছেলেরের মধ্যে বহলে ছিল একই বড়। বছর চোখ পনের হয়ে। ইট মারায় পাকা হাত। কত আম, আমড়া, কামরাঙ্গা, তেঁতুল, ফুল, তার স্টীটেপে আত্মহারা হয়েছে। দে বলল—মাথায় এক ইট, অর্ধেক লড়াই জিত। প্রথমে যে আক্রমণ করে তার হয় জিত। কথা যুক্তিযুক্ত। লবাই ভরসা গেল ইতিমধ্যে ডেহু তাক করে এক ঢোকা কেড়ে বসেছে।

...কোরব দিথিয়ে হাঙ্গাকার। কুবক মদরা চকিত হয়ে গেল। লাঠি নিয়ে বাকীরা তেড়ে এল। লাঠি লংগ্রাহ প্রয়োজন। বাসক-চু এক আঁধকিতে গিয়ে ঢুকে পড়ল। আঁধ উপড়ে বা ভেগে করতে লাগল লাঠি। বোঁ, বোঁ শব্দে লাঠি চালাতে চালাতে নবীর ধারের দিকে এসে পড়ছিল। ইতিমধ্যে প্রাচীরের আরও লোক এসে পড়েছিল। আমি না বেখেই একজনের উপর আরসে লাঠি চালিয়েছি, লাঠি চকিতে কুণে গেল একজনের ছোট একটা "ভাং"এ। "ভাং" খুব ছোট লাঠিকে বলে। চেয়ে দেখি আমাদের লাঠির ওড়ান সাধনে। আর

কওয়া কওয়া নাই। সমলবলে ছেলেরা সোঁড়ে তপনারাধণে গিয়ে স্বপ্ন দিল। সেই যে বুড়ো লোকটি গ্রামের ভিড়ে ছিল সে চোঁতোতে লাগল—ওরে, তোরা উঠে আয়, কিছু বলব না। ভালমাস্থ্যের ছেলেরা হাঙ্গর স্থানীয়ে বাবে। আয়, আয়, ফিরে আয়। ছেলেরা ততক্ষণে পা-ডাঙ্গান দিয়ে দিচ্ছে।

আর একদিন। বাংলা স্থলের পেছনে একটি বড় গোছের আম বাগান। অপরিস্রব বাগানে কত লক্ষ লক্ষ বোখা দিয়েছে। স্থলের পক্ষিরা রাত্তার ওপারে একটি চালাহীন পরিভাষ্য ভাষা বাড়ী। হাত দুই তিন উঁচু মাটির বেগুন পরিণীম। মাগিয়ে আছে। ভাষা বেগুনের মাথা লুপ্তিত মাটির বড় বড় তেলার। সংকেত; ভারী প্রচোদনীচ সাময়িক সংকেত। বর্ণীরা বেখলেই বৃকতে পারে—বহি একটি কি দুটো তোপ পড়ে তবে বলপতির সংগে শ্রু এসে মিলতে হবে। তোপ মানে মাটির চাঞ্চড় রাত্তার নিষ্কেপ। সামনে বড়। আমার কাছে একে একে, দুইয়ে দুইয়ে সন্নীরা এসে জুটল। কারণ সেদিন তোপ পড়েছিল। রাত্তার লাল হুরকীর ওপর মাটি রকের থুলা বিরাজিত। ব্যাপার কি? আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম—ছুটত কেন। ঠিক আছে কিনা। বন্ধুরা অবাব বিল—আছে। ছুটত কেন। একটি পরিচায় করা দরকার। বাংলা স্থলের ঠিক সামনেই রাত্তার ওপারে ছামিলটন হাই স্কুল। এটাকে বলা হত ইংরেজী স্কুল। অনাবৃত হেডমাটার রানেন্স ওপু খুব সৌখীন লোক ছিলেন। স্থলের মাঠে নানারকম লতা, ফুলগাছ ও গাছের কাড় লাগিয়ে বেবেছিলেন। পিছনে ছিল পুঁহর, ব্যায়ামশালা, গোলাপ বাগান। গোলাপ বাগানের পর হয়ে বানিকটা আদ্যগাথ শশা, কাঁকড়, লাউ, কুমড়োর ক্ষেত। ঠাকুমা ছিলেন ছেলেরা, ছোট বড় সবাইয়ের আপনাত ঠাকুমা। ঠাকুমার কথা পরে বলছি। এই সব কাঁড়ে কাঁড়ে লাগি লুকান থাকত। ব্যায়াম ক্ষ্মির পূবে যে সীমানার উঁচু দেয়াল ছিল, তার মাথার খানকতক ইঁট খোলা রাখা হত, কারণ এইখান দিয়ে একটা সর রাস্তা ভীমার বাবার অবধি গেছে, সেটা “লম্বা” দেবার পথে যেন

খোলা থাকে। স্থলের সামনে দিয়ে যে ভাল রাস্তাটি পূবে-পশ্চিমে বিস্তৃত সেইটাই সর রাস্তা। সবাই দেখান দিয়ে যাওয়াত করে। বৃহৎ বাগলে লক্ষপক্ষত সে পথটা জানবেই। সেলভ রণভাটুগের পতাবশপদরের পথ একটা আগে থেকে লুগম রাখা দরকার। এই লাঠির আড়ত আর এই পথ ছিল ছুটত কেন। সন্নীরা জানাল সব ঠিক আছে। তারের পরদিন তিনটার আদতে বলা হল।

স্থলের মাঠে বিকেলে খেলার পর লম্বা লম্বাগমে ঠাকুমার কাছে অর্থাৎ রানেন্স বাবু মায়ের কাছে, ছেলেরা গিয়ে বসত। তিনি নানারকম রূপকথা, রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প বলতেন। প্রত্যেক ছেলের অন্ত একটি করে শিঁচে থাকত। ছেলেরা তাতে বসত। তাঁর নিম্নের মাটি শিশু ও শিশু ছিল ছেলেরা পরম প্রিয়। আমরা শিশুর সমবয়সী। তাকে বলতাম সন্ধ্যার। শুণু গল্প শোনান নয়, ঠাকুমা প্রায়ই মিথিমা করাতেন। এমন ঠাকুমা কি আর হবে?

খেতে বেশ কচি কচি শশা দেখা দিয়েছে। তখনকে বড় হুহমানের উৎপাত ছিল। এদের দৌরায়ে, ফল, পাঁকড় রাখা হুহমান। শশা ঠাকুমার কড়া পাহারা ছিল। ছ’ একজন মালী প্রায় ঐ রিকটার থাকত, ছেলেরা ঐমিকে খেতে পেত না। একদিন সৌভাগ্যক্রমে মালীনের অহুগবিত্তিতে একটা হুহমান ইংরেজী স্থলের মাঠে এসে পড়েছিল। হুরেনরা ঠাকুমার হুহো হবার ভক্ত খেলা ছেড়ে অহুগবিত্তিতে নিতে ছুটল। “ঠাকুমা, হুহমান এগেছে, ওটাকে ভাঙিয়ে দেব?” বাংলা স্থলের দিকে ভাঙিয়ে দিতে হুহমান হল। ঠাকুমার ভয় ছিল শশা ক্ষেতের দিকে যেন না আসে। হুহমানের চেয়ে ছেলেরা ভয় তাঁর বেশি ছিল। কি রকম দৈব-ভবিষ্যৎ! ভাড়া করা মাত্র ভয় খেয়ে হুহমান পুঁহর পাড়ের দিকে হুণ, করে লাফ, দিয়ে এসে পড়ল। এক ঢিলে হুহমান বেশছাড়া। কিন্তু আমার বন্ধুরা ক্ষেত ছাড়া আর হুহুই চায় না। ঠাকুমা আর নিশ্চিত থাকতে না পেরে বাড়ীর চাকর কৈলাসকে পাঠালেন। হুহুছাড়া কৈলাস! এগেই উঁচুস্থের চৌচিরে উঠল—ঠাকুমা এরাই যে সব শশা ছুরি করে খেয়ে

ফের। ঠাকুরা ওসিকে কাকীমাকে (বাজেনবাবু স্ত্রীকে) বললেন—মেথলে গৌমা, এদের মাছাখি? শ'শার কিনে তাড়াবার জন্তই এত তাড়া। বৈলে কি আর চুহমান তাড়াবার জন্ত এতটা? বাবুন ঠাকুর বিড়কী দরজা দিয়ে বেরিয়ে টেচিয়ে বলল—ঠাকুরা বলছেন, ওদের বের নিয়ে আর, কৈলাস।

বাগ্নে, আর কথা আছে? বন্ধুরা সব দৌড় ঘেরে পাঠিল পার।

ঐ পথে পড়ে ব্যারিটার পালিডের বাসা। উমেশ কোটাল শস্যের বাড়ীতে ইনি তাড়া বাকতেন। তার ছেলে ছিল আমাদের সমবয়সী। তার ছিল একটা মীমে চলা খেলার রেলগাড়ী। গাড়ীতে জল দিয়ে একটু শ্লিফট জালিয়ে দিলে তাপ হয়ে গাড়ী চলত। খানিও আপনা হ'তে বাজত। ভারী ডাম্বল ব্যাগার। এরকম খেলার গাড়ী তদন্তকে কিনতে পাওয়া যেত না। হুতরাং এইটার জন্ত সবাইকে এদের বাড়ী আসতে হত। সে রেলগাড়ী চালাত, অগ্নির বেধত। ক্রমে দেখার কোকুল মটলে চালাবার কোকুল বাড়ল। সে কিছুতেই কাউকে চালাতে দেবে না। কিন্তু পোপনে

দু'একজনকে চালাতে দিয়ে বর্ণীর বল সে ভাঙছিল এবং আগনার একটা বল গড়ছিল। বর্ণীর বল বলে এদের নামটায় কিছু ছিল না। শিবাজী সবচেয়ে এদের কাছে ভাল লাগতেন। গুব ভাবে, আক্সিবিধের ভাব, বামায়ণ মহাভারত থেকে অস্ত্রোপানা—এই সবকে মিশিয়ে একটা অন্যতরী কাণ্ড এরা অজ্ঞানে ঘড়ীর বসছিল। বোকা সহজ হবে বলে গ্রন্থকার এদের বর্ণী নামে সজ্ঞানিত করছেন। বর্ণীদের আপোষে যন কথাকথি এতদূর উঠে উঠেছিল যে একটা খোদামূলি বোকাগড়ার গ্রন্থোজন অস্বকৃত হতে লাগল। আশ্র এরা ভিনজনে শেষ গ্রন্থের শেষ উক্তর নিতে এগেছিল। বর্ণীদল ভাবা সে ছাড়বে কি না, এবং রেলগাড়ী চালাতে দেবে কি না? মটার পালিত স্পষ্ট না বলে ছিল। এই নিয়ে বাধল হুত, হুতের নিয়ম এদের এই ছিল। খোদা ক'রে হুত করতে হ'বে। চোরের বত অতিক্রমে আক্রমণ বীর ধর্ম বিকৃত। হুতের সময় ও স্থান নির্দেশ করা থাকবে। হুতকে বিধিতরা বিজ্ঞেতাদের মলযোগ করিয়ে শান্তি বা পদ্ধিপ্রাপ্তি হবে। ষিটমার হয়েও বাবে।

(ক্রমশঃ)

অ-বিখ্যাত লেখক

অধ্যাপক বিজুরঞ্জন শুক

আমরা অ-বিখ্যাত লেখক, আমরা কব্যের উপেক্ষিতের দল! তবে আমাদের নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করবার জন্তে বেঁচে নেই দরবী স্বাধীনতা। তাই হে অস্বপ্নমী বিখ্যাত, তোমাকেই জানাই আমাদের মালিন, হয়তো তুমি বুঝবে আমাদের দুঃখ। বিখ্যাত এখনও হইনি আমরা, নামজাদা কাগজের হুটীপটে আমাদের নাম এখনও মাগা হয় নি। নেহাৎই নাম-না-জানা কাগজে হল্পতা ছাপা হয়েছে, দুটি কবিতা, একটি প্রবন্ধ।

ছোট গল্পও একটা ছাপা হবে, আশা রাখি।

নিশ্চয়ই বলে—ও ক'টা ছেপেচে খাতিরে, নিজা অল্পবোধ এড়াতে না পেরে।

অথবা কাগজের পৃষ্ঠা ভরি করবার জিনো না আর কোন উপায়ান, তাই এ দশা!

বন্ধুরা বলে, আছে কিছু বস্তু আমাদের লেখার।

যদি আমাদের সত্তা করে ভালবাসে

তাইই শু জানে তবিতঃ বাংলা সাহিত্য স্রবণ করবে

আমাদের,—

সে সত্যনা রয়েছে আমাদের লেখার।

হে বিখ্যাত, তোমার কাগজে সুকোনো নেই তো কিছুই!

তুমি তো জানো, কত দুঃখের মৌলন এ সাহিত্য-সাধনা।

কোনো চাকরিপথেই হয়তো ক্লাসের শিখনের বেকে বলে,

একেশ্বর কি বামাসুহু বকে গেছেন

তাতে কান না দিয়ে। কোন লেখা লিখেছি

পত্রিকার পড়া ঠাকি ঘিরে,
গার্জিয়ানের চোখে খুশো ঘিরে, পড়ার বই
নামনে খুলে, নীচে লুকিয়ে রেখে কবিতার ব্যতা ;
হয়তো সেখাটা পড়েছি কলেজের লাহিত্য-সভায়,
হাততালি পেয়েছি ;—পেয়েছি কখনও বা সহপাঠিনীদের
কাছ থেকে নীরব দৃষ্টি পুরস্কার ।
ব্যতিরিক্ত যে কড়া মন তার পেয়েছি তো কিছু আশ্বাস ।
তাইতো লেগেছে বেনা—খামতে পারিনে ।
যে কাগজে লেখা ছাপা হয়েছে, ক'লকাতা থেকে,
গাঠের কড়ি খরচ করে' কিসে আনি দু'কপি, আটকপি ।
নিজের লেখার নীচে লাল কালির দাগ কেটে
লুকিয়ে পাঠিয়ে দি, কলেজে দেয়তের কনক্কেবে,
রেখে ঘিরে আসি, ছাত্র কেতারভ্রান্তনের পড়ার টেবিলে,
পাবলিক লাইব্রেরীতে ।
পত্রিকার লেখা পাঠাই, হুপুর রোবে যেমে, পোষ্ট অফিসের
ভীড় টেলে ।

(সে যে কী কই, সম্পাদক মশাই, তোমরা কি তা জানো ?)
লেখা আবার রেজিষ্টারী করে না পাঠালে ভয় থাকে
পাছে বা না পৌছে । সে খরচ কি সামান্য ?
কত্নে কয় লাফে চার আনা !
হে বিখ্যাত, তুমি তো জানো,
গার্জিয়ান থেকে চুকট আর সিনেমার পরদা
আদায় করবার লাহনা ও রানি,
সে কঠোর পরদা থেকেই তো এই ডাকটিকিটের দাম
যোগায়েত হয় ।

বাংলা বাসের পরদা এলে রোজ অপেক্ষা করে থাকি
ডাক গিরনের অন্তে যদিই বা কোন পত্রিকার লেখা
বেরিয়ে থাকে ।

সে অফটন প্রায় ঘটেই না, বলতে পেরে ।
বিখ্যাত পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক মহাপরদা
বলে থাকেন, যদি খাঁটা মোটা কেদারা স্টেশন ঘিরে ।
সবর কোথায় তাঁদের আশ্রয়ের মত অবিখ্যাতদের
লেখা পড়বার ?

তাই পড়েই রইলো আমায়ের লেখা
নামজাদাদের লেখার তলে চাপা ।
ধাঁধের আছে একটু বিশেষ বিবেচনা (!)
তাঁরা মিলেন কেহ পাঠিয়ে বুকপোটে
হয়তো একবার চোখ বুলিয়ে নাঘটা ঘেঁষেই !
হার প্রবীণ সম্পাদক ; তোমাদের কাছে এ নিষ্ঠুর অথহেমা
হয়তো বা থেলা,
কিন্তু আমাদের বুক কি বাধা যে বাজে,
তা কি তাবো কোনদিন ?
আমাদের কত হুশের, কত মনের লেখা,
তার করো তোমরা চূড়ায় অগমান কত লগ্ন অস্থিরে ।
আজ্ঞা সম্পাদক মশাই, সত্যি করে অবাধ দাও তো,
তোমরা যে সব রাণি ছাপো, বাসের পর দাগ,
তার চেহেরও অধম আমাদের লেখা ?
লেখা তো কেহ পাঠাই, কিন্তু অন্ততঃ একটু ভ্রমতা
করেও তো

আমাদের আত্মদমন অস্থির রাখতে পারতে ।
এই কথা লিখে, "দীর্ঘ বলতে লেখাটা ছাপানো গেল না ।"
জানাতো পারতে তার ভগ্নে মাদুলী হুঃখ ।
যাক, হে বিখ্যাত, মনে রইলো এসব অগমানের কথাই ।
আমরা তুলবো না ।
টিক খেনো—চাকা একদিন ঘুরবে ।
আমরাও বিখ্যাত হবো ।

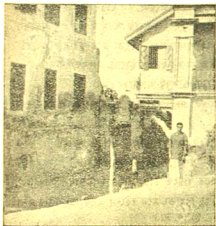
সেদিন করবেন সম্পাদকেরা ভীড় আমাদের হওকাহ,
মানে, তাঁদের কাগজে দখল করে লেখা দেবার জন্তে
আসবে চিঠির পর চিঠি, কত অহুঃখ, অহুঃখ !
সেদিন আমরাও শোধ তুলবো ।
তাঁদের কেহ বুকপোটেও লি রইলো মনোনে
সে লেখাগুলিই সেদিন তাঁরা ছাপবেন আদর করে ।
এখন সে লেখার জন্তে দক্ষিণা আদায় করতেও তুলে
হাবো না ।

হে বিখ্যাত, তুমি রইলে আমাদের এ প্রতিজ্ঞার লক্ষ্যে ।
তবে ভয় এই, বিখ্যাত পত্রিকাগুলির হুড়ো সম্পাদকগুলো
ভতমিনে মরে না ঘর ।
তা হ'লে তাদের কমা কটা ছাড়া
আর উপায় থাকবে না,—এই হুঃখ ।

গুজরাট

বাসুদেব চক্রবর্তী

১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট। হুবাটে তাম্রী নদীর দেতুর উপর পাড়াইয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম ফ্যাক্টরীর ভগ্নাবশেষ দেখিতেছিলাম। সহরে স্বাধীনতা-বিপ্লব পালনের বিপুল আয়োজন চলিতেছে। প্রধান প্রধান রাস্তায় তিফিন্‌র অক্ষর বিরাট তোষণ, দলত রাস্তার উপর জাতীয় পতাকা, প্রতি দোকানে প্রদীপ এবং লাউচ



ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম ফ্যাক্টরী

স্টীকারে বন্দোবস্তরত সংগীত। টালাওঘালা, বিখাওঘালা, মোটরগাড়ী ফুলের মালা ও জাতীয় পতাকায শোভিত। ঘোড়ার পাত্রে, গায়ে ও মাথায় জাতীয় পতাকা এবং গ্রাফ প্রতি গৃহের সম্মুখে শাখিরা অর্থাৎ আলনা। সহর মাতিয়া গিরাছে এবং এই জাতীয় উৎসবে বিন্দু, মুসলমান পানী, মারাঠী, গুজরাটী, সিখি, মুটে মজুর, উকীল ভক্তার উচ্চপদস্থ কর্মচারী মায় পুলিশ কনস্টেবল সকলেই যোগ দিরাছে। ভাবিতেছিলাম ইংরাজ ১৬১০ সনে হুবাটে প্রথম ফ্যাক্টরী করিরাছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ আজও পাড়াইয়া। সেই ইংরাজ এককাল রাক্ষস করিয়া আম-রাত্রি ১২টার পর ২ইতে শালন ক্ষমতা ভারতীয়ের হাতে ছাড়িয়া দিবে। নিউকাল হইতে বে স্বাধীনতার দশ

দেখিরাছি এবং এককাল বাহা বস্ত্র বলিরাই আনিতাম আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইতে চলিতেছে। ঠিক যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। আরও ভাবিতেছিলাম এই স্বাধীনতার দশ এককাল বাহাও পুন্নিশের লাগি চালনা, পাইকারী অরিখানা, চাকরী হইতে বহিঃস্থ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, কারাগার, লাহনা এমন কি দৃঢ়ত্বও পর্যন্ত বরণ করিরাছে আজ তাহারা কোথায়? তদ্বয় হইয়া ভাবিতেছিলাম হঠাৎ পেছন হইতে শুনিলাম পরিচার বাংলায় কে মিলাসা করিতেছে আপনি বাঙ্গালী?

পেছন কিরিয়া দেখিলাম এক গুজরাটী ভহলোক। ভহলোক নিজেই বলিতে লাগিলেন—আপনার ধৃতি ও পাকারী পরা দেখিরাই দৃষ্টিরাছি আপনি বাঙ্গালী; আর আপনি ভাবুক ও কবি। বাংলা ছাড়া এত কবি আর কোথায় আছে?

ভহলোকের সঙ্গে আলাপ কিনিয়া উঠিল এবং আলাপ ক্রমেই বহিঃস্থায় পরিণত হইল। ভহলোক হুবাটে দিহের বাবসাধ করেন। নিম্নের চেটায় বাংলা



স্বাধীনতা বিপ্লবে মুসলমানদের পোতাঘাটা

শিখিরাছেন। এখানে আরও অনেক গুজরাটী বাংলা জানে এবং বাংলা শেখার বেশ রেওয়ার আছে। স্থানীয় কলেজে কেম্‌ব্রিজ প্রত্যাগত এক গুজরাটী অধ্যাপক দত্তরমত বাংলা সাহিত্যের রচনা করেন। এই ভহলোক কিছুদিন কলিকাতা ছিলেন। সেখানে বাঙ্গালীদের সঙ্গে বেশ বহিঃস্থাবে মিশিরাছেন। শাঙ্কিনিকেতন, বেদুড়-

মঠ প্রভৃতি বাংলার যে সকল প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র স্থপরিচিত সে সকলই শ্রেণিগত এবং অনেকের সঙ্গে পরিচয় আছে বেশিলায়। ভদ্রলোকের বাড়ীতে বক্রিচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বই, গিরীশ দ্বৈব, যোগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাটক এবং বিদ্যুতিকরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী অন্নদাচরণের সত্যসত্য প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থও আছে এবং ভদ্রলোক বাংলার অনেক ধরনের রাখেন। ভদ্রলোকের নাম চিন্মনলাল সগনলাল বেশাই। সকলে চিন্মনডাই বলিয়া থাকে। আমিও কয়েকদিন পর চিন্মনডাই বলিয়া থাকিতে স্বর করিলাম।

আমি ভাবুকও নই, কবিও নই। কোম্পানীর মাল চালুকিতে এবং আমার কোম্পানীর মালই যে ভগতে শ্রেষ্ঠ এই সত্য প্রতিপন্ন করিতে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই। সম্ভ্রতি বয়ে হইতে হুয়াট আসিয়াছি এবং কোম্পানীর হেড অফিস হইতে নির্দেশ পাইয়া এখানেই অবস্থান করিতেছি এবং বেশ বুঝিতেছি আরও কিছু দিন এখানে থাকিতে হইবে। চিন্মনডাইকে আমার হোটেল লইয়া গেলাম। প্রায়ই সে আসিত। মধ্যে মধ্যে আমিও তাহার বাড়ীতে বাইতাম। তাহার স্ত্রী হুনা বেন ও দুই পুত্র জীতুডাই ও নবীন ডাইর সঙ্গে বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে। এদেশে পরমা প্রথা নাই। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা। এই দেশের স্ত্রীলোক এত স্বাধীন যে আরাদের পক্ষে তাহা ধারণা করা শক্ত। ইউরোপের স্ত্রীলোকও এত স্বাধীন কিনা জানি না। অথচ এই স্ত্রী স্বাধীনতা ইংরাজী শিক্ষার ফল নয়। ইংরাজ ইংরাজী জানে না, অভিনয় রক্ষণশীল খাটি হিন্দু এবং চালচলন বীতিনীতিতে ইউরোপীয় প্রভাব নাই। ঘেরেরা নিজেরাই একা বাজারে ঘাঘ, বেনাকাটি করে, ট্রেনে, গাড়ীতে, ডাক্তারখানায়, স্থল কলেজে সর্বত্রই পুরুষ অভিভাবক ছাড়া চলা ফেরা করে। কলেজে শিল্পবিভাগে প্রায় অর্ধেকই মেয়ে বনে হইল। কেহই অধ্যাপকের সঙ্গে ক্রান্ত প্রবেশ করে না বা অধ্যাপকের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসে না। এক সময়ে বসে। ধরকার হইলে

কথাবার্তা বলে, টেনিস ব্যাডমিন্টন খেলে এবং ছেলে মেয়েতে কলেজে নাচ গান থিয়েটার করে। অথচ খাটি হিন্দু। অতি আধুনিকতা বা কলঙ্কীয়ানা নাই। সাইকেলে চড়িয়া কলেজে আসে এবং গরু নাচে যোগ দেয়, দল বাঁধিয়া শিক্‌নিক করে কিন্তু ঠাকুরমারা যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছে সেই ভাবেই চলে। ভদ্রপন্নীতে কোথাও বাড়ীর টিকানা বাহির করিতে না পারিলে যে কোন বাড়ীর সম্পূর্ণ অপরিসীম বউকে জিজ্ঞাসা করিতে অসম্মান বোধ করে না। অনেক সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করে এবং নিম্ন হইতে পথ দেখাইয়া দেয়। বসে বা গাড়ীতে নেমে পুরুষ পালা-পালি বসে এবং স্থান না থাকিলে ঘেরেরা গাড়ীয়া থাকে। পুরুষ স্থান ছাড়িয়া দেয় না। বাংলার গর উপত্যকায় অনেক কিছুই হয়, গিনেবার সকলই সম্ভব এবং কলিকাতার কোন কোন অঞ্চলে ঘেরেরা স্বাধীন হইয়াছে কিন্তু সেই স্বাধীনতা সম্ভ্রতি অস্তিত এবং সাহেবদের অহঙ্করণ দ্বারা এবং সেজন্য আমাদের সমাজে এখনও সহজ হয় নাই। বাংলার গ্রামে এখনও আমরা মা বা ভদ্রী ব্যতীত অন্য বয়সী স্ত্রীলোকের মূখের দিকে তাকাই না বা কথা বলি না এবং আমাদের মা বুড়ী জেঠি সকলেই পুরুষ বেশিলে ঘোমটা বেন। সেজন্য আমার চক্ষে এই জিনিষ প্রথমই ঠেকিল। কদমাস এখানে থাকিতে হইল। চিন্মনডাইর সঙ্গে খুব ঘুরিয়া বেড়াইলাম এবং অনেকের সঙ্গে মিশিলাম। গুজরাট ও গুজরাটি সম্বন্ধে বাকালীঘের জ্ঞান বড়ই শীঘ্রবদ্ধ। আমার অনেক ধারণাই বদলাইয়া গেল। গুজরাটীয়া মাড়গুয়াই হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক সময় উত্তর দেশই এক ছিল এবং ভাষাগত সাম্যও কিছুটা এখনও আছে। গুজরাট মেয়ে মাত্রই মোটা নয় এবং নাজীবেন বাহির করিয়া মূখ ঘোমটা বিছা আধবন সোপার অলঙ্কার দেখে বহন করিয়া হাটে না। গুজরাটীয়া পুরুষ প্রধানত ব্যবসা করিয়া কীটিকা নির্বাহ করে এবং শুধু নির্বাহ করে না স্বতন্ত্রমত প্রচার অর্থ অর্জন করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বেশ শিক্ষা ও কৃতি আছে। ব্যবসায়ের

ইহারাই ইউরোপীয়দের সমকক্ষ এবং যথেষ্ট সহর ও এই অঞ্চলে ইউরোপীয়দের বড় পাক্তা নাই। যথেষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বাণিজ্যে খুব উন্নত এবং গুরুত্বপূর্ণ ও পার্শ্ববর্তী এই শহুরে কার্য। দারিদ্র্য তেমন চোখে পড়ে না এবং অতি সাধারণ কৃষক মজুর এত ভাল ও কর্তী পোষাক ব্যবহার করে যে বিস্মিত হইতে হয়। বাংলা দেশের মত এত পরিপাটি রাস্তার বাংলাই এখানে নাই। বেশ সম্পূর্ণ নিয়ামিত। কটী, সামান্য ভাত, একটি এক মিনিবের হাণ্ড বেগুন, লাউ, ফুফা বা কপির তরকারী, আচার চাটনী, দুধ দুই বি প্রভৃতি প্রধান খাদ্য। মাছ মাংসের বাংলাই নাই। সুত, চর্চরি, কাল, কোল, অমল ও পাচ পদের সস্তার এদেশে অপরিসীম। সেসকল এই দেশের গৃহস্থ নারী মিবলের এবং জীবনের সমগ্র অংশ রান্না ঘরেই অতিবাহিত করে না। প্রত্যেকেই নিজে বাড়ীতে দাবান রান্না কাপড় কাঁচ ও ইষ্টা করে এবং বিকাল ছয়টার পূর্বেই আহার পর্ব শেষ করিয়া বাগান পার্কে বা সিনেমায় চলিয়া যায়।

অতি ভয়ঙ্কর ঘরে একটি বড় ঘোমতা থাকে। এদেশে বসে হিচুকা। সমানিত অতিথি আসিলে বাড়ীর মেয়েরাই অগ্রবর্তী হইয়া ‘বাওরে, বোসো’ বলিয়া সন্মোদন করে। নিষেধা ঘরের ভিতর লুকাইয়া শিশুদের গেলিয়া মিজালা করায় না আপনি কে বা কাকে খুঁজিতেছেন। না চাহিলেও এবং ভুড়া বোধ না করিলেও এক রূপ ঠাণ্ডা জল আনিয়া দিবে এবং তারপর ছোট একটি কাড়ী ও আত্ম হুগারী দিবে। অতিথি বিশেষ পরিচিত ও সমানিত হইলে এক পেয়লা চা আনিবে কিন্তু সে চা আমাদের পক্ষে পান করা নক্ত। বিনা জলে দুধের মধ্যে চা সিদ্ধ করা হয় এবং তাহাতে প্রচুর মিষ্ট এবং আদা, তেজপাতা, ঘি, গরম মলা নকলই থাকে। চিমতভাইর সঙ্গে বত দায়গার গিয়াছি এবং বত লোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে সকলেই বাঙ্গালী দেখিয়া বেশ বড় ও সন্তোষের সঙ্গে কথা বলিয়াছে। বাংলার বাহিরে আশ্চর্য্য বাঙ্গালী বিষয়ে এত বেশী যে এই ভাবটি অনেকটা বিস্ময়কর। কিছুদিন পূর্বে কাহারও

সঙ্গে নতুন আলাপ হইলে প্রথমেই মিজালা করিত, হুজাব বহু সন্তোষ তোমার কি মত? তিনি কি বাচিয়া আছেন? হুজাব বোধ সন্তোষ লোকদের জ্ঞান, বিশ্বাস ও কৌতুহলের সীমা ছিল না। শরৎ বোস সন্তোষ এই দেশের লোকদের সে ধারণা নাই। এরা সকলে শরৎ বোসকে হুজাব বোনের ভাই বলিয়াই জানে। সন্তোষ সে প্রশ্ন অনেকটা চাপা পড়িয়াছে। এখন প্রথম প্রশ্ন তোমার বাড়ী পূর্ববঙ্গে না পশ্চিমবঙ্গে এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা কিরূপ? দেশটা আসলে হিন্দু এবং অহিংস। কিন্তু এই অহিংসার ভিত্তি মনের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পথে ঘাটে মারামারি বা তগড়াবাড়ি বড় দেখি নাই। সাইকেলের দাকা বাইয়া দুই পক্ষই গায়ের ধূলা ছাড়াইয়া নিঃশেষে চলিয়া যায়। পূর্ববঙ্গ বা শ্রীহট্টের হবিগড়ের মত কথায় কথায় দাঙ্গা, মারামারি এবং শেষ পর্যন্ত রক্তাক্ত ও কৌশলময়ী এই দেশের রীতি নহে। ব্যবসারী জাত হুজুরা বিনা স্বগড়ায় এবং অল্প ব্যয়ে ক্রিান্তাবে নিজেদের মধ্যে পোলমালা মিটাইতে হয় তাহা জানে। এই দেশের মুসলমানরা বাংলার মুসলমানদের চাইতে অনেক শিক্ষিত, ধনী, মাজিত এবং অহিংস। রায়ে একটা ইদুর বিরক্ত করিতেছিল। উঠিয়া ইদুরটি মারিলাম এবং পরদিন সকালে কিকে বলিলাম মরা ইদুর বাহিরে ফেলিয়া দিতে। মৃত ও রক্তাক্ত ইদুর দেখিয়া কি প্রথমে চীৎকার দিয়া ভয়ে দুই হাত পিছাইয়া গেল। প্রয়োজন হইলে গুরুত্বপূর্ণ ইদুর বা ব্যাদ মারিতে পারে না। কিন্তু হিন্দু বা ধর্ম শুনে বলিষ্ঠতায় হিন্দু বা মুসলমানদের খুব ঠাণ্ডাইতেছে এবং মুসলমানরা ধর্ম শুনে পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা হিন্দুদের খুব উৎসাহিত করিতেছে তাহা হইলে এরা অন্তরে পরম প্রীতি অনুভব করে। নিষেধা অহিংস কিন্তু অস্ত্র কেহ হিংসারীতি অহংস করিলে ইহার ভিতরে ভিতরে প্রভা না করিয়া পারে না। বাংলার বিপ্লবীপন ইহাদের নিকট বড়ই প্রভাব পায়। বাংলার নানাব্যবসায় বিশেষ করিয়া চট্টগ্রামের বিপ্লবীপনের কাহিনী মুখ হইয়া প্রবণ করে। গুরুত্বপূর্ণ বাংলা প্রীতির

ইহা একটি প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ বাংলায় সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা অতি উচ্চ। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যের মানসিক লক্ষণের সহিত পরিচয় অল্পই। প্রাপ্ত শিক্তিত ঘরেই রবীন্দ্রনাথের একখানা ফটো এবং সীতাকলীর গুজরাটি অলুবার পাওয়া যাইবে। বিশেষ শিক্তিত মহলে রবীন্দ্রপ্রীতি অস্তিত্ব। কিন্তু জনসাধারণ শুধু রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছে বলিয়াই লক্ষ্য করে। ভারতীয় এক কবি ভারতীয় ভাষায় কবিতা লিখিয়া বিশ্বের দরবারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্মান পাইয়াছে—ইহা ভাবিয়া প্রত্যেক গুজরাতি গৌরব অলুভব করে। হুগলের বিষয় এই দেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের তেমন কোন অব্যবস্থা নাই।

হুগলে কয়েকমাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে চিনমতাই একটি কলেজের ছেলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিগাছে। এক সময় হুগলে শিবাবীর সৈন্তদের সঙ্গে মুঘলসৈন্তের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই স্থান দূরিত্বা বেড়াইতেছিলাম। একটি ১৭১৮ বৎসরের কিশোর,—লম্বা চুল, ছাফ প্যাণ্ট, উদালসুট—এক কথায় কবি কবি ভাব—নিকটে আসিল। এই দেশে তুল কলেজের ছাত্রদের ধুতি পরিতে দেখি নাই। ছাফপ্যাণ্ট অথবা পাজামাই ব্যবহার করে। ব্রাহ্মণ গড়িত ও বেনে শেঠা ধুতি পরে এবং কোন হিন্দুই কোন অবস্থায় লুঙ্গি পরে না। কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি চক্রবর্তী শেঠ?

শেঠ সন্ধানেনে গৌরব অলুভব করিলাম। বাবু সন্ধানেন করিয়া আমাকে শিক্তিত কেরাণীর মনে ফেলে নাই। ধনধান বেনে ব্যবসায়ী মনে করিয়াছে। আগাপ হুক করিলাম। তাহার নাম অরুভিন্দ, স্থানীয় কলেজে আই, এ পড়িতেছে। চিনমতাইর নিকট আমার কথা শুনিয়াছে এবং অনেকবার আমার সঙ্গে দেখা করিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা হইয়া উঠে নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার বাড়ী কোথায়? এই দেশে আপনি সন্ধানেন নাই। সকলেই সকলকে ভূমি বলিয়া সম্বোধন করে। অরুভিন্দ বলিতে লাগিল, যে তালুক

এক সময় রাজনীতিক চেতনাবোধে ভারতের স্বাধীনতা ছিল, যে তালুক এক সময়ে বৃটিশ সিংহকে বিচলিত করিয়াছিল, যে তালুকের নাম আজ ভারতের ধরে ধরে উচ্চারিত সেই বারমৌলি তালুকে আমার জন্ম।

পূর্বেই চেহারা দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম। এইবার স্থির বিশ্বাস হইল অরুভিন্দ একজন স্বভাব কবি। তিন মাসের উপর হুগলে আছি অথচ বারমৌলি যাই নাই শুনিয়া অরুভিন্দ বিস্মিত হইল এবং জিজ্ঞাসা তালুকের সংঘর্ষে এক প্রকার ট্যাং লক্ষ করিয়া তাহার বিশ্বাসের মাত্রা আরও প্রকট করিল। এই প্রকার লক্ষ এই দেশে ও মহারাষ্ট্রে খুব প্রচলিত কিন্তু পূর্বে ইহার ব্যবহার অল্প কোথাও শুনি নাই। তাহার লক্ষ বারমৌলি যাইতে রাজী হইলাম। পরদিন সে পরিবারের সকলের সঙ্গে শিক্তিত করিতে বাড়ী যাইবে এবং তাহার সঙ্গে আমি যাইব এবং একদিন বা ইচ্ছা হইলে কয়েকদিন থাকিয়া কিরিত। তাহার পিতা রেলওয়েতে কাজ করে এবং সকলে হুগলে লহরে থাকে। দেশের বাড়ীতে লচরাচর কেহ থাকে না।

পরদিন টেনে অরুভিন্দের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে প্রায় তাহারই বয়সী ভগ্নী পদ্মাবেন—এইবার ম্যাট্রিক লিখে এবং ছোট ছোট কয়েকটি ভাই বোন কিন্তু তাহার পিতা, মাতা বা অন্য কোন বয়স্ক অভিভাবক নাই। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। পদ্মাবেন দূর হইতে আমাকে লক্ষ্য করিল, কয়েকবার অন্তরিক্ত তাকাইয়া রহিল এবং অনন্যবোধের ভান করিল কিন্তু টেনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া আসিল, আমাকে ঠেলিয়া একটা কামরায় তুলিল এবং তুলি ভাঙিয়া নিজেদের বাৎস প্যাটার ও ভাই বোনদের সামলাইতে লাগিল। টেনে হীড় ছিল না এবং এত ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। টেনে পদ্মাবেন আমার সম্মুখে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিল। বাড়ীর গল্প, মুলের গল্প, কবে বরোদায় গিয়াছিল সেই গল্প। বালক বালিকারা প্রথমে একটু দূরে বসিয়াছিল। ক্রমেই নিকটবর্তী হইতে লাগিল এবং বারমৌলি

পৌছিতে পৌছিতে গ্রাম কোলের কাছে আসিল।
 ট্রেনে হইতে জোয়ার ক্ষেতের মধ্য দিয়া ২১৩ মাইল দূরে
 বারদৌলির পাশের গ্রাম। অতীতকালে নিঃশব্দে ঘরে
 গেল না। সেটা ভাল বন্ধ এবং কেহ থাকে না বলিয়া
 বনের অযোগ্য। পাশের এক গৃহস্থ বাড়ীতে সকলে
 উঠিল। অরতিমের জাতিভাই একজন সম্পন্ন গৃহস্থ।
 বিরাট এক ইটের হল ঘর। কোঠা নাই। মধ্যে
 কতগুলি খাটো শাভা আছে। হাসপাতালের মত।
 খাটোর উপর পুরু ও বিরাট তোষক। আসবাবের মধ্যে
 হিচকা, কয়েকটা চেয়ার এবং প্রচুর দেবদেবীর ছবি।
 ঘরের লম্বুখেই বিরাট এক গোয়াল। তাহাতে গ্রাম
 ৩৪০৬০টা বলিষ্ট গরু ও মহিষ। প্রত্যহ প্রচুর দুধ হয়।
 প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মটকিতে দুই পাউন্ড দুধ এবং প্রত্যহ
 চারজন করিয়া মজুর এক সঙ্গে দুধি মখন করিতে
 থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে মাখন হয়। মটকি ভরিয়া
 ছাঁচ, অর্থাৎ ঘোল হয়। সকলেই প্রত্যহ সকালে ৪-৬
 গ্রাস ঘোল পান করে। এক সময় স্ত্রিয়াজি বাংলা
 দেশেও দুধি মখন একটি প্রাত্যহিক পারিবারিক ক্রিয়া
 বলিয়া গণ্য হইত। আত্মকাল বোধের এই ব্যাপার
 একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামে পৌছিয়া অরতিম
 নিখোঁদ হইয়া গেল। গৃহস্থানী—আমরা যাহার অতিথি—
 দূর হইতে আমাকে একবার অবলোকন করিয়া তিনিও
 নিখোঁদ। আর তাহাকে কখনও ঘেঁষি নাই। লোকটির
 মাথার চুল সযান করিয়া ছাটা—শীর্ষে এক টিকি শোভা
 পাইতেছে। পরিবেশ বহু অভ্যস্ত ময়লা এবং বহন
 চাকরদের সঙ্গে কান্না করিতেছিলেন যখন কে তুতা ও
 কে প্রভু তাহা বুঝা শক্ত। গৃহস্থানী লজ্জাবোধে—
 বেশকিছু অনেক ভাল এবং মজ্জিত। তিনি বৃথালাভ
 অন্তরীক্রে থাকিয়া পদ্মাবেনের মারক্ণ আমার তন্তু-
 তালাপ করিতেছিলেন। এখানে কেহ হিম্মি জানে না
 এবং আমার নৃতন গুহুয়াটি বিভাৎ ইহাদের সঙ্গে
 কথাবার্তা চালান অসম্ভব। পদ্মাবেন ইংরাজী বুকে ও
 কিছুটা বলিতে পারে। এই গ্রামে বোধহয় ইতিপূর্বে
 আর কোন বাঙ্গালী সন্ধান পদার্পণ করে নাই এবং

গ্রামের কেহই এই পর্বত বাঙ্গালী দেশে নাই। আমার
 পোষাক ও ইংরাজী ভাষা সকলেই ধারণা করিয়া লইল
 আমি এক প্রকার মাত্রাণী। ইহাতে আমার পৌরষ
 অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইল। মাত্রাণীদের এই দেশে কেহ বড়
 প্রভাব চক্ষে দেখে না।

পদ্মাবেন সহ কিছু দেখাইল এবং সকল ভিনবের
 ব্যাখ্যা করিল। লজ্জার বহু পূর্বে আহ্বার শেষ হইল।
 চাপাটি, পুত্র, কেরলা ভাষা, দুধ দুই, বরকি ও দুধমি
 প্রভৃতি শিশুও দুধপাক ইত্যাদি। একটি কাঠের আসনে
 বলিমাৎ এবং অন্য একটি কাঠের আসনে থালা রাখিয়া
 থাইলাম। গায়ে হলুদের এক খাটোয়া আমার বিছানা
 হইল। পাশের এক খাটোয়া এক কুড়া কাপিতেছিল, অন্য
 খাটোয়া পদ্মাবেন। অরতিম এইবার কিরিয়াকে। সে
 কবি মাল্লম। হিচকার বিছানা করিয়া ঘোল বাইতেছে এবং
 ঘূষের চোটা করিতেছে। লজ্জী বেনের পক্ষ হইতে একটি
 অল্পরোপ আসিল। লজ্জী বেনের মেয়ে হইয়াছে। এই
 দেশের রীতি অল্পসরে মালীকে নামকরণ করিতে হইবে।
 কোথাও নৃতন শিশুর স্তম্ভাগমন হইলে তৎক্ষণাৎ মালীর
 নিকট বর পাঠান হইবে। নামকরণ কাঠি মালীর
 একমাত্র অধিকার। আমাকে বলা হইল ঘূষের একটি
 নাম পছন্দ করিতে। এই বিষয়ে অরতিমের উৎসাহ
 সকলের চাইতে বেশী। সে বলিতেছিল বাঙ্গালী
 নামগুলি কি মিষ্টি! উমাশমী! কাননবাগা! How
 poetic! উপরোক্ত নাম দুইটি হইতে লতা সত্য মধু
 করিয়া পড়িতেছে কি না জানি না কিন্তু আমি রাণী
 হইলাম না। দুই অক্ষরে ছোট নাম, টুক করিয়া ভাক।
 বাইবে, গলায় আটকাইবে না, জিজ্ঞাসা অভ্যাহবে না—
 এই প্রকার নাম আমার বড় পছন্দ। কেন জানি না
 এই প্রকার একটি নাম আমার বড় ভাল লাগে। টুক
 করিয়া ঘূষ আসিল এবং বলিমাৎ বীণা।

বলা মাত্র, নামেরই মাহাত্ম্য কি না জানি না,
 তাহারই সমর্থন করিল।

পরদিন সকালে ময়লাঘলে জোয়ার ক্ষেতে গেলাম।
 সতরকি পাতিয়া আমরা তাহাতে বলিলাম। ছোটরা

অবল হইতে জলী কল ও মূল ফুড়াইতে ও পুকোচুরি খেলিতে লাগিল। লছরী বেনের কর্তৃত্বাধীনে কয়েকজন চাকর স্বেচ্ছ হইতে জিনিষ সংগ্রহ ও রান্না আরম্ভ করিল। এদের পথে বাহারা ঐমিকে বাইতেছিল তাহারা লক্ষ্যেই আসিল এবং বিনা নিমন্ত্রণে ও বিনা সজ্ঞাতে ধোপধান করিল। গ্রাম তিনটার সময় বোকে অর্থাৎ ঘনভোজন শেষ করিলাম এবং ঐদিন রাতে হুয়াট করিলাম।

অরভিন্দকে লইয়া বিপদেই পড়িয়াছি। কোথায় কোন মানসীর ভরীপুত্র হইয়াছে নাম পছন্দ করিয়া দিতে হইবে। বাংলাদেশে মানসীরা অনেক সময় নামকরণ করে কিন্তু মানসীদেরই করিতে হইবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই। রাত্রিতে বিছানার শুইয়া মানসী বোনপো সম্পর্ক সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। বর্তমানে বাংলায় অপরিচিতদের মধ্যে যে নতুন সম্পর্ক গড়িয়া উঠে তাহা অনেকগুলোই মানসী সম্পর্কিত। বাংলার তরুণ নতুন কোনও পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে হইলে গৃহস্থানীকে যেসো বলিয়া সম্পর্কের স্বরূপাত করে না। গৃহস্থানীকেই মানসী বলিয়াই হুক করে। ইহার আরও একটি সুবিধা আছে। পুরুষকে বাবু বলিয়া সম্বোধন করা চলে। স্ত্রীলোককে কি বলিয়া সম্বোধন করা যায়! মিসেস অমুক ইঙ্গবদ সমাধে চলে। অন্নবধনী হইলে অমুক বি। কিন্তু বর্ষাঘরীদের সঙ্গে বিধি সম্পর্ক চলে না। এদেশে এইসব গুণগোল নাই। যে কোন বয়সের যে কোন ভদ্রমহিলাকে বেন অর্থাৎ বহিন বা বোন বলা চলে। কুম্ভাকে মণিবেন, তাহার কস্তাকে হংসাবেন এবং তাহার কস্তাকে হুংবুবেন। পুরুষকেও সকলে ভাই বলিয়া ডাকে, কুম্ভার মেয়েও আমাকে ভাই বলিয়া ডাকে এবং কুম্ভার পুত্রবধূও ভাই বলে। অনেক সময় এই ভাই শব্দ নামের সঙ্গে এমন জড়াইয়া যায় যে ইহা Proper name হইয়া যায়। ইহা হিন্দু মুসলমান পার্শী সকলের উপরই প্রযোজ্য। যথা দাদাভাই নাওরোজী, বজ্রভভাই প্যাটেল, ফলভাই রহিমাতালা ইত্যাদি। এই দেশে ব্যক্তি বিশেষের নাম তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি নির্দেশ

ব্যক্তিগত নাম, দ্বিতীয় পিতার নাম এবং তৃতীয় বংশের উপাধি। যেমন মোহনচাঁদ বরমচাঁদ গান্ধী বা প্রেমচাঁদ কানজী ঠাকর। বংশের নাম ক্রত পরিবর্তনশীল। গান্ধীর পুত্রের নাম যে গান্ধীই হইবে তাহা নহে। ব্যবসা বা স্থান অনুসারে বংশের নাম (Surname) ঘন ঘন বদলায়। যেমন, পি. এন. ইঞ্জিনিয়ার, এস. কে. কন্স্ট্রাক্টর, বি. এল. ডক্টর, আর. বি. করাচীওয়ালা বা কলকাতাওয়ালা, এন. এম. বোতলওয়ালা, দাকওয়ালা, লাঞ্চওয়ালো বা সিনেটওয়ালো। এক তহলোকে নাম বি, এম, টাইপসাইটার। নাম শুনিয়া ধর্ম বোঝা যায় না। যেমন গান্ধী নামে হিন্দু, পার্শী ও মুসলমান তিনই আছে। অবশ্য নামে কিছু আসে যায় না কিন্তু অনভ্যস্ত কানে কেমন শোনায। এদেশে মাকে বলে বা, বড়কে বলে মোটা, শিশুকে বলে বাবু, পিতাকে অনেক সময় বলে কাকা। সে বাহাই হউক মানসীত্ব ও ভাষাতত্ত্ব ছাড়িয়া আবার গুজরাটিদের কথাই বলি। অরভিন্দ একদিন একটি ছেলেকে লইয়া আসিল তাহার নাম বৈষ্ণুঠ। ত্রোচে তাহাংগা রবীন্দ্র স্মৃতি নিবস পালন করিবে। আমাকে বাইতে অহুরোধ করিল।

হুয়াট হইতে ২-১২ মাইল দূরে নর্মদার মোহনার ত্রোচ সহর। এক সময় অর্থাৎ গুটের ভগ্নের পূর্বে ইহা খুব বড় সমৃদ্ধি সম্পন্ন বন্দর ছিল এবং তখন ত্রোচের সঙ্গে মিশরের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। লক্ষ্মি নদীর পারে খুব উচুতে এই সহর অবস্থিত। আয়তনে ছোট, লোকসংখ্যা অল্প এবং সহরের ভিতর যেমন-মুসলমান ও পার্শীই বেশী। এতদিন শুধু ব্যবসায়ী গুজরাটি দেখিয়াছি, এইবার গুজরাটের অন্তরূপ দেখিলাম। কুম্ভার দাখিত্যমণ্ডল বলিয়া গুজরাটি ছাত্রছাত্রীদের এক সমিতির পক্ষ হইতে এই উদ্যোগ করা হইয়াছে। স্থানীয় এক প্রবীণ উকিল কংগ্রেস নেতা খালোদ্বিত হইয়া সভাপতির আসনে বসিয়াছেন। কয়েকটি মেয়ে বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিয়া বীণা হাতে লইয়া সরস্বতী গান্ধিরাছে। ক্রমে পান, গুজরাটি ভাষায় পরবা নাচ, রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরাজী ও গুজরাটি ভাষায় আবৃত্তি, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ

লকলই হইল গুজরাটিতে। আমেদাবাদের এক গুজরাটি ভ্রমলোক কয়েক বৎসর শাস্তিনিকেতনে ছিলেন। তাহারই চেষ্টায় এই অস্থান। সমস্ত অস্থানটি এত নিপুণভাবে সম্পন্ন হইল যে মুদ্র হইয়া গেলাম। ছাত্র-ছাত্রীরাই সব নির্বাহ করিচ্ছিলেন এবং কুমারী গুজরাতি বলিয়া একটি পার্শী মেয়ে সব কিছু তত্ত্বাবধান করিতেছিল।

ব্যাপার এইখানে শেষ হইলে ঠিক হইত কিন্তু আমার কপালে ছিল লাকনা। কুমারী গুজরাতি আমাকে অহরোহ করিগা বলিল কিছু বলিতে হইবে। বালো। রবীন্দ্রনাথের দুই একটি কবিতা পড়িরাছি। দুই চার লাইন এখনও মনে আছে। রবীন্দ্রনাথ খুব বড় কবি ছিলেন এবং ভারতের পৌরব লোকধর্ম মনে আছে। কিন্তু গ্রন্থ সমস্তা পাড়াইয়া বলিতে হইবে, দ্বিতীয় সমস্তা অমৃতঃ ১০।১২ মিনিট বরিয়া বলিতে হইবে এবং তৃতীয় সমস্তা অমৃতঃ কিছুটা জ্ঞানপূর্ণ হওয়া দরকার। নতুবা বাবলা ও বাবালী সম্বন্ধে ইহারা কি ভাবে। কোম্পানীর পড়া মনোহারা মাল ভাল বলিয়া বাছারে চালান আমার নিত্য কর্ম। আজ আমাকে বাবালী কুটির প্রতীক হইতে হইল। আজ বালো বলা অভ্যাস আছে, লোকের গাল খাওয়া অভ্যাস আছে, কথার চালে পরিচারের মনোভূতি করাও কিছুটা জানা আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমি কি বলিব? করজোড়ে কাতর মনে ওয়াখিয়া ধৌকে নিবেদন করিলাম রবীন্দ্র সাহিত্যের আমি কিছুই জানি না—তাছাড়া হিম্মি, গুজরাটি জানি না, বাংলা কেহ বুঝিবে না—ইংরাজীতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিয়া হইবে কেন। আমার পরম দুর্ভাগ্য আমার এই মিনতি সকলে অকমিয় বিনয় বলিয়া মূলিল। বিশেষ পরিচাপের বিষয় যে এই পর্বত সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা তা বলিয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিল। এবং বেশ সম্মান পাইয়া আসিতেছিল। আমার আপত্তি এখন কেহই গুলিল না তখন মনে মনে রবীন্দ্রনাথকে শ্রবণ করিলাম। কবির সম্মান কবিই রাখিবে। মাথ মানে নর্থমার ভীরে ঘামিতে ছিলাম। অগত্যা ভাবগদগদ করে কীপিতে কীপিতে ইংরাজীতে

আরম্ভ করিলাম। ইংরাজীতে দুই মিনিট কয়েকটা বাক্য ছাড়িলাম। এবং অপর দুইটি বস্তু কবিতা আঙুলি করিতে লাগিলাম। দ্ব্যর্থ শব্দক হইতে আরম্ভ করিগা ওমর খৈয়াম পর্বত বাহা মনে আসিল অনর্গল বলিয়া গেলাম। কোন কিছু ছাড়িলাম না—মাথ পানী সব করে সব রাস্তা পোহাইল। কবিতা আঙুলির সঙ্গে সঙ্গে জনতা মুদ্র হইয়া গেল। আমিও বুকে বল পাইলাম। সকলকে লড়াপডিক, উচ্চাভ্যাসকে ধস্তবাস দিয়া বক্তৃতা শেষ করিলাম এবং দস্ত দস্ত পড়িয়া গেল।

সভা শেষ হইলে গুজরাতিদের বাড়ী গেলাম। ইতিপূর্বে পার্শীদের এত নিকটে কখনও যেছি নাই। বাবাভাই নাওরোজী, জেমসেরনি টাটা, স্যার হেলাসী সোমী প্রভৃতি বড় বড় পার্শীর নাম শুনিরাছিলাম। পার্শীরা অগাধ বড়লোক, সিধ ছাড়া ব্যবহার করে না এবং ইউরোপীয়দের মত চাল চলনে থাকে এই ধারণাই ছিল। এই দেশে আসিয়া পথ বাট হাটে বাছারে অতি সাধারণভাবে তাহাদের দেখিরাছি। গায়ে রক্ত, ময়লা একপ পার্শীও দেখিরাছি, দুই বোকারের মালিক, পম্বিকা ফেরীওয়াল ও ব্যাকের পিগন একপ পার্শীও দেখিতেছি। বহুত বৎসর পূর্বে প্রাচীন পারস্ত ও ইরান দেশ ছাড়িয়া পার্শীরা এখন ভারতবর্ষে আসে তখন তাহারা গুজরাটে আরব সাগরের উপকূলে বসতি আরম্ভ করে। স্রোতে বহ পার্শীর বাস। ক্রমে তাহারা সমস্ত বর্ষে প্রেসিডেন্সী ও ভারতের অগ্রস্ত স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এভাবে বলিয়া চাষবাদ করে একপ পার্শীও আছে কিন্তু বেশীর ভাগই সহরে থাকে। উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কম্পাউন্টার, ব্যাপারী, বৈজ্ঞানিক, প্রোফেসর প্রভৃতি লাইনে পার্শীরা ভারতের নির্বাহন অধিকার করিরাছে। সাংখ্যার সময় ভারতবর্ষে বোধ হয় ১০,০০০ কিন্তু বিজ্ঞা, বুদ্ধি, ধন ও কর্মকুশলতার তাহারা অনেক উন্নত। ব্যবসা বাণিজ্যে তাহারা ইউরোপীয়দের সঙ্গে সমান চলে চলিতে পারে। বর্ষে সহরে ইউরোপীয় বণিকদের প্রাধান্য নাই বলিলেই চলে। বড় বড় ব্যাচ, ইনসুরেন্স কোম্পানী

হোটেল, কারখানা প্রভৃতি পার্শ্বীরা অত্যন্ত নিপুণতার সহিত চালাইতেছে। টাটকার কারখানা, ব্যাক অব ইতিহা, ওরিয়েন্টাল ইনসুরেন্স, ডাকমহল হোটেল, বথে ইলেকট্রিক ও ট্রাম—এইগুলি যেখিনে কে বলিবে ভারতবাসী organisation জানে না? পার্শ্বীদের মধ্যে অশিক্ষিত বড় নাই কিন্তু ইহাদের বিজ্ঞা ও বুদ্ধি শিল্প বিজ্ঞান ও বাস্তব কর্মমুশলতার নিরোদ্ধিত। কবিশ্ব বা দ্বানিকতা ইহাদের মধ্যে বড় দেখা যায় না। গুয়াবিঘ্যাসের বাড়ী আসলে হুয়াটে এবং হুয়াট কিরিয়া অনেক পার্শ্বী পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হইল। হুয়াট হইতে কয়েক মাইল দূরে এক পার্শ্বী ভয়লোকের বাড়ীতে দিন দাতক ছিলাম। চাষবাস করেন। বয়স প্রচুর কিন্তু চেহারা এখনও বোয়াই আমের মত। খুব বলিষ্ঠ কোথান পার্শ্বী সচরাচর দেখা যায় না। শিল্পের এবং বয়স কৃষ্টি বাইন পর্বত সকলকে অতি রূপবান ঘেবশিত বলিয়া মনে হয়। গায়ের রঙ দুপে আলতা? মিশান, চোখ কালো, নাক মুখ থাথড়া নহ। চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বয়স হইয়া গেলে অত ভাল লাগে না। বাহা খুব ভাল না হইলেও পার্শ্বীরা খুব দীর্ঘায়ু। পার্শ্বীরা খাটি আর্থ। প্রাচীন পারস্তের অধিবাসী ডারিয়সের (Darius) বংশধর এবং যে সকল আর্থ প্রথমে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহারা একই জাতের। অরথুর ধর্মাবলম্বী পার্শ্বী ও গুরুবয়সের ভারতীয় আর্থ, ধর্ম ও আচার ব্যবহার প্রায় একই। কালক্রমে আর্থ ধর্ম ভারতে প্রায় লোপ পাইয়াছে। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া আর্থ ধর্ম বর্তমান হিন্দু ধর্মে ঝাঁড়াইয়াছে কিন্তু কতক পারম্পরিক নিজেদের ধর্ম ও আচার ব্যবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত রাখিয়াছে। পারস্তদেশ এখন ইরান মেনে পরিণত এবং সকলেই মুসলমান। কিন্তু বাহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহারা এখনও তাহাদের ধর্ম ও জাতি (race) হারায় নাই। পার্শ্বীরা মাছ মাংস ভিয় খায়। জাতিভেদ নাই তবে পুরোহিত শ্রেণী পৃথক। তাহাদের বসে দস্তর। পুরোহিত শ্রেণী অন্তর্গত নয়। উপনয়ন অল্পষ্ঠানের মত পার্শ্বী মেয়ে ও পুরুষের এক অল্পষ্ঠান আছে। তাহাকে

বলে হুটি, পৈতায় মত কোমরে জড়াইতে হয় এবং গায়ত্রী মন্ত্র প্রত্যাহ পাঠ করিতে হয়। সাদা লঙ্কতের বেনিটান ইহাকে বলে হুভে—গায়ে রাখিতে হয় এবং এই হুইটি ক্রিয়া প্রত্যাহ পার্শ্বীর অবশ্য করণীয়। স্বী বাধীনতা ও শ্রীশিক্ষা এত বেশী যে সচরাচর প্রথম খণ্ডিত বিবাহ হয় কিন্তু আচার নিষ্ঠ হিন্দুদের মত। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে এবং জাতি ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। বড় অধিক বয়সে তাহাদের বিবাহ হয়। ত্রিশ বৎসরের শত্রী ও পঁচত্রিশ বৎসরের পাত্র অতি সাধারণ। আমি যে বাড়ীতে ছিলাম সে বাড়ীর কনিষ্ঠা কস্তার বয়স ২০২১—ত্রক পরিমা বি, এ ক্লাসে দায়। এই কস্তার উপেক্ষা তিন ভগ্নী কাহারও বিবাহ হয় নাই, সকলের ছোট বলিয়া ইহাকে সকলেই নাবালিকা মনে করে, সকলের মধ্যে আমিও ইহার সঙ্গে নাবালিকার মত ব্যবহার করিতে লাগিলাম। পার্শ্বীরা বাহিরে বত বাধীন হউক আসলে তাহারা ধর্মপরায়ণ ও রক্ষণশীল। আধুনিক বয়সভাষের মত উদারগামিনী নয়। সামাজিকভাবে তাহারা ভারতীয় সমাজ হইতে হুত্ব বন্ধায় রাখিয়া চলে এবং অন্য সমাজে বিবাহ প্রায় নিষিদ্ধ।

পার্শ্বীদের নিজেদের ধর্মমন্দির আছে। একই মন্দিরা উপাসনার কোন ব্যবস্থা নাই। মন্দিরে পার্শ্বী ভিন্ন কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। মন্দিরে সব সময় বৈদীতে আগুন থাকে এবং চন্দনকাঠ আগুনে দিয়া আগুনের উপাসনা করে। পার্শ্বীদের মাতৃভাষা গুজরাটি। ধর্মকার্যের ময় প্রাচীন আভেস্তার পারসীক ভাষা। জাতিভেদ নাই এবং শ্রীপুরুষের সমান অধিকার। তবে শীলোক পুরোহিত নাই। এই সেনে থাকিতে থাকিতে এই দেশের অনেক নিম্ন তাহাদের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। যেমন মেঘেরা শাড়ী ও শিখুর ব্যবহার করে, ভ্রাম্বণ দিয়া পিত্তর জর হুওনী প্রস্তুত করার। সংখ্যা লখিত বলিয়া এবং আমিই বায় বলিয়া স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গে তেমন সদ্ভাব নাই বরং মুসলমানদের সঙ্গে একা বেশী। মেঘের প্রচলন বড় বেশী। কিন্তু প্রকান্তে মাতাল হইতে বড় দেখা যায় না।

পানীসের দ্বতসেহ লংকার বড় বিচিত্র। আনানসের চকে বড়ই অতুত ও নির্ধম। চারিদিক বেগবাণে ঢাকা উচু স্থানে (Tower of silence) দ্বতসেহ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং পল্লব আশিরা তাহা বাইরা ফেলে। সে সময়ে ভিতরে কাহাকেও বাইতে বেগো হয় না।

পূজার সময় গুমরাটে পূজা। নাচের মূল পড়িয়া যায়। পরৎকালে মহাপদার পর বনমীর পূব পর্বত নগরাত বা নবরাত্রি বলে। এই সময় বেগীকে আঙ্গান করিতে হয়। কাংগায়েনে গমী হইতে ২০০ পর্বত বেগীর প্রতিমা পড়িয়া পূজা এবং বনমীতে বিজয়া। এই গুণে বিজয়া পূজা সমরোহ করিয়া করা হয় কিন্তু বেগীর প্রতিমা পূজা নাই। নবরাত্রিতে প্রত্যাহ লক্ষ্যার পর সকল বয়সের মেয়েরা বধ্যস্থানে প্রদীপ রাখিয়া তালে তালে নাচে, হাততালি ধের এবং গান গায়। ইহা মুটে বন্ধুর হইতে আকর্ষ করিয়া মহা লক্ষ্যে মহিলারা সকলেই সমরোহে করিয়া থাকে।

গুমরাটে আরেকটি জিনিষ বড় বিচিত্র ঠেকিল। আবেহা/বাবে এলিগ জৌনে হোস্টেলে গাড়াইয়া আছি লকাল বেলা। প্রায় ৩০০৫ জন জৌনোগ নীলাবরী পাড়ো পরিয়া দল বাধিয়া রাত্ৰায় বাহির হইয়াছে এবং কিছুদূর অগ্রণর হইয়া নাচের তালে তালে পা কেনিয়া দুই হাত বুক চাপড়াইয়া হায় হায় করিতে লাগিল। বেশ কিছু সময় এবং বিভিন্ন শুকতে ইহা করা হইল। অনিলাস কোথাও মুচু বটলে প্রতিবেশীরা এবং ভাড়াটে

শোকপ্রকাশকারিণীরা এইরূপ করিয়া থাকে। এইরূপ শোকপ্রকাশ শুভদ্যাটসের মধ্যে পূব সাধারণ।

একদিন আর একটি ঘটনা বড় অতুত ঠেকিল। কাংহু গুমরাটে এক বাগানী লক্ষ্যায় আশিরাছে শুনিয়া দুই গুমরাটিতে ডুপল কপড়া। লগনডাইর পাচ মেয়ে। বড় ছগনডাইর লকে কল্টু কট হইয়াছিল এই পাচ মেয়েরকে বিবাহ করাইয়া দিতে পাইকারী দ্বারে ৫৫৫=২৫ হাজার টাকাধ। চারটি মেয়ের বিবাহ দিয়া বড় তাই ছগন বলিতেছে সে আরও টাকা না হইলে পক্ষ্য মেয়ের বিবাহ দিতে পারিবে না। কাংহু জিনিষপত্রের দায় বাড়িয়া দিয়াছে এবং পচিশ হাজার টাকা বরচ হইয়া দিয়াছে। লগনডাই বলিতেছে পূবে চার কলার বিবাহে পাচ হাজার করিয়া বরচ হয় নাই। সেই লাকের টাকাপেল কোথায় লাভ এবং টাকা পরদার ব্যাপারে গুমরাটিয়া কাহাকেও ছাড়িয়া কথা বলে না কিন্তু বেইমানী বা বিশ্বাসভঙ্গ লচরচর করে না। হোটেলের জিনিষপত্র এমনি রাখিলে কেহ স্পর্শ করে না এবং চাকররা কলিকাতার চাকরদের মত চোর নয়। হোটেল বা বর্নশালার একই ঘরে ৪৫ জন লক্ষ্য বিয়েই লোক থাকে। দরজা আনালা সকল সময়ই খোলা থাকে। প্রত্যেকে নিজের জিনিষ বিছানায় রাখিয়া বিছানা ঢাকিয়া বিছানা ও দুটকেন রাখিয়া চলিয়া যায়। কখনও কোন জিনিষ চুরি হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় না, অথচ বাংলা গুণে—কি কলিকাতা সহরে কি গ্রামাঞ্চলে—চুরির উপভবের তুলনা হয় না।



চরণদাস দেবের শ্রদ্ধাঞ্জলি !*

ঐকালিকের সেনগুপ্ত

ঐরাধারমণ চরণ দাসের চরণ পুতার লাগি'
হুবহা হুহুতি বিহীন হুবহু আনিরাছি অহুহাণী
সেই হুগে পুতা হইবে কি আশ ?
পাছে নাহি হুহু মনে বাসি লাজ
কীট-কটক-সহ ঘোর লহু চরণে শরণ দাগি
মহৎ কৃপাধ তপস্বী কৃপা তাই আশা উঠে আগি ।
হেলাধ ফেলাধ পড়া-পাখী প্রায়—
পড়িয়াছি কত "নাম"
কত ভক্তি রশ্মিযত মতি
লেপ নাহি লডিলাম—
অলসে অবশে রণনার বশে—
মুখে লাল্য সবে লাললা রডসে
মজিল না মন হরিণাম রসে
গোপসে মজিলাম—
বৈভবরসীর হুহু তরঙ্গীর
পারাবির কড়ি নাম ।
মতিমীর মত শত শত লোভ
কণে কণে মনে তোলে বিকোভ
মিনে মিনে কীণ পরমাণু হীন
কি হইবে পরিণামে—
দুস্তের ধার্য কে পারিবে দায়—
নিবাতে কামনা কামে ?
কুমদ-কর্ণ-রসায়ন গান
নবাহ-রঙ্গনৌ নব নব তান
আগি সারা রাতি সাধা দিনমান—
সকল বিধান তুগি—
সকল বীধান খুগি—

তুঘিতে দিক্ত করি অধিরাম
চিত্ত তরিয়া তুলি
"হরি-হরি" নাম লহু লডিলাম
বৈকুণ্ঠ পদধূলি ।

নব বরষার নবন আলার
ঘনোক্ত ঘনতান
মনোভিরাঘের রবোভিরাঘের
নবাভিরাঘ ধাম,
যমুনার তীরে বীর ললিত—
বীশরীতে রাধানাম ।
ঐরাধারমণ চরণদাসের
শরণ মহোৎসবে
নাম-বজ্রের "রামদাগ"
প্রধান পুত্রোদা হবে ।

দিগন্তনারা দিবে লুপ্তলি
নবীয়ার ঠান উদিবে আপনি
নিজাই তুলিবে গরজন ধনি
অলস যন্ত্রণেবে
নরনারী বরষা আশি বারি
তুলি ধুধরিত হলে ।
লোচন দাসের পরাণ পুতনী
ধরা দিবে গোরা ঠান ।
ঐরাধারমণ চরণ দাসের
এমনি মোহন ঠান ।

* দ্বিখি বৈকুণ্ঠ মন্ত্রলীতে গঠিত । ২০শে বৈশাখ, ১৩৪৪ সালে ।
বৃহস্পতিবার ।

একটা দিন

কমলা দাসগুপ্ত

সেদিন সকাল বেলা প্রাণ মন ভেবে চলেছে অতীত জীবন কথা। অতীতের মিনগুলি সংগ্রহ করে গেছে, আর যন্ত্র দেখেছে স্বাধীন ভারতের অপূর্ণ তুষ্টিভরা আনন্দের ছবি। কিন্তু আজকের ভারতের কতবিকৃত সৃষ্টি দেখে মন বেন প্রচণ্ড মায় খেঁচে চলেছে। চারিদিক থেকে ঝাঁপার ঘিরে আসছে, স্রাস্থিতে ছেঁবে গেছে মন : একী হল ? এরই ভিত্তি তখন জীবনগুলি নিঃশেষে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে গেছে ? এ ভিত্তি কি তারা সেই কঠিন সংগ্রামের অসঙ্খ সাহস ও ভ্রূসং হুংহ হাশিহুংহে বরণ করেছিল ? তবে কি সব বার্ষ বায় ? ঠংরেও শাসন এসেছে ছেঁড়ে গেছে কী ? সে কেমনতর বাণী যে বেখে গেল স্রাস্থবয়ের বাবদ্য ? যে বাবদ্যার কল লক্ষ লক্ষ উষ্মান্ত নরনারী জন্মের রোলে ভাবতের অস্ত্রাক্ষকে হুঁপ বিচুর্প করে দিচ্ছে ? এ কেমনতর Quit India বে হুঁচে দিয়ে গেল পাণ্ডীতীকে হত্যার গহ্বর ? কে বেন উত্তর দেয়, দুল্য সিতে হবে বৈ কি ? আরো দহতো কত দুল্য সিতে হবে !

কিন্তু এমন ক'রে একটার পর একটা উত্তাল ভরল এনে ফেলে স্বাধীন ভারতের জীবন-সংকট কিসের পথ করে চলেছে ? যন্ত্রে চাওয়া মুক্ত ভারতের সেই ছবি বেন হারিয়ে যাচ্ছে। লোকে খেতে পায় না, পরিধানের আবরণ খুঁজে পায় না—অর্থ নেই, অথচ চারিদিকে চলেছে চুনীতি আর চোরকারখার। ঘিরে আসছে হায্যকার ভরা স্বত্কার। প্রাণ বর্জ্যবর্তের পরে কোথায় আত্ম পরিবর্তন ? এমনি ক'রে নত আঘাতে স্রিষ্ট মন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। উষ্মাহ, উত্তম, কর্ণের উষ্মাহনা সবই অবসাদে আচ্ছন্ন মনকে ছেঁড়ে যেতে চাইছে। সেদিনের প্রত্যাত বেন বাদল লম্বার সত ঝাঁপারে ডুবে যেতে লাগল।

এমন সবর আসেন পূর্বপাকিস্তানের এক আশ্রয়প্রার্থী। বলেন, কিছু একটা করে মিন এখানে থাকা পাওয়ার

বাবদ্য, নইলে সপরিবারে মরে থাকি। পাকিস্তানে চলে মেয়ে নিয়ে থাকা বায় না। স্থল নেই, বাজার পড়বে কোথায় ? মাঠবনের দলা শেষ, থাব কি ? উকিলকেও তো কেউ পোছে না। চাকরী তো দেখানে আমাদের জন্ত নয়। তা ছাড়া, পাড়ার দশ ঘরের মধ্যে আট ঘরই চলে গেছে ; কী করে থাকব বসুন তো ? যেতে না গেলে, ছেলেমেয়ে স্থলে যেতে না পারলে, পাড়ার লোক না থাকলে আপনি কেমন করে তবু থাকতে বলেন ? সে অসম্ভব। এখানে যা হোক কিছু বাবদ্য ক'রে মিন। Red Cross-এর হুঁচুই বেন বন্ধ করে দেবেন না। হুঁচুইয় ভাংক্রান্ত পা ফেলে চলে যান তিনি।

কিছুক্ষণ পরে এলেন পরেশবাবু। Book Binder তিনি। বলেন, আমি দেখাব আপনাকে বই বাধানো। নতুন কাগ পিণ্ডে আনন্দ পাবেন আপনি। আনন্দ শেবার প্রেরণা ঠাণ্ড মূখ ছেয়ে হাসছে। অথচ ছোট-তাইটিকে পড়াতে পারেন না, বই ধরিয়ে এমন আর। কাগজ জামা ছিন্ন মলিন, কারো কাছে আসতে লজ্জা বেশ। নিজের অমৃই ছাড়া কোথাও ঠাণ্ড নাগিন নেই। টেইই পান না যে বেশ স্বাধীন হয়েছে। ঠাণ্ডই জন্ত বে ভারতের মুক্তি একথা ঠাণ্ডই ঘরে পৌছায় না। আগে তবু বাছ ভাত খেতেন, ৩৪ থানা পুষ্টিও ছিল, মা তাইমোনকে নিয়ে সাধারণ সঙ্গার চালিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন মিন আর কাটে না। তবু মূখতরা হাণি নিয়ে দেখাতে এসেছিলেন বই বাধানো। ফিরে যেতে যেতে বলে গেলেন, আবার আসবেন দেখাতে।

এমন সময় ইরা এসে স্বড়ের বতো ঘরে ঢোকে। বলে, Red Cross-এর মূখ, বিহুট আশও যেমনি ? আর কবে বেবে ? বজীতে বেব কী ? তারা যে সব অপেক্ষা করছে ! আচ্ছা, আমি একবার Red Cross-এ যাই, ব্যাপার বুঝে আসি। দাখত বজীর ছোট ছোট ছেলেরা সব মূখ শুকিয়ে চলে যাবে যে। সে কেমন করে হয় ? যেমন বেগে চুকছিল তেমন বেগে বেরিয়ে যায়। একটা প্রাণ স্থলিন। বিহুট, মূখ তাকে আনতেই হবে। মন বলে, এমের জন্তই তো আজকের কর্কশেত্র। Red

Cross দুপ কখনো বন্ধ করছে, কখনো কম দিলে, পাকিস্তান হওয়াটাই নাকি কারণ। কিন্তু উরা তাতে হবে না, সম্বন্ধে হবে পড়ে না। জগতে অজ্ঞত ক'র ক'রে সহজ আঘাত খাওয়া এখনো জীবন ভ'রে বাকী রয়েছে। ছুটে চলে বর্তমান জগতের সঙ্গে। ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ এদের হাতে গড়ে উঠবে।

এসে পড়লেন প্রভাসবাবু। বলেন এমন মনমরা হয়ে বসে থাকলে কি চলে? আমরাই তো যুক জনসাধারণের প্রতিনিধি। চারদিকে দেখে শুনে হ'লিয়ার হয়ে যদি আমরাই না চলতে পারব তবে আর চলবে কে? দাব্ব নবীতে ভরাডুবি করাবেন নাকি? দাব্বি নিয়ে দাব্বা দাব্বি পালন করতে পারছেন না, আমরা আছি দাব্বি তাহের বুকিয়ে ছাড়তে। আপনাতর ক্রান্তিকালে ছাড়ছি না কেউ। জানেন, আমরা প্রাদেশিক কংগ্রেসের মধ্যে তিনজনে মিলে একটা কেন্দ্র করছি। বত চোরাকারবার আর দুর্নীতি চলছে তার বা কিছু খবর আমরা পাব তা নিজেরাই মনন করার ভার নেয়েছি। গভর্নমেন্ট তো সাহায্য করবে বলছেই, তাছাড়া নিজেরাও আমরা চোরাকারবারী বা ঘুষখোরদের সাজা দেব। সে নিজে থেকে মাথা পেতে মেনে নেবে। দেখবেন সে বিচার আপনিও। আপনাকেও তাই নিয়ে দাব। হাদিমুখে বেরিয়ে যান তিনি। কর্মমুখর জগতের কলোজধনি ইরায় সঙ্গে নিয়ে এগেছিল। সে ধনি এখন স্মৃতির শোনা দাব। তবু মনে লাড়া জাগে না।

বিকালে আসেন শরৎবাবু। বলে চলছেন, দেখছেন আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা? এর কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। এর বিষ বেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তার সমাধান এখনই করা সরকার। নইলে ক্রমে এরা সমাজের পারাসাইট হয়ে উঠবে। ভিক্ষা ছাড়া এরা কাজ চাইবে না। শু বলবে, তোমরা বসিয়ে ধাওয়াও। যেভাবে কাতারে কাতারে এরা পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসছে, আমরা যদি সে রকম ক'রে এদের কাছে লাগিয়ে না নিতে পারি তবে সমাজে এরা পাশের শ্রানি বইয়ে যাবে। তখন

মেগের বিষ ছড়িয়ে তাদের ঘেরে ফেলতে হবে। ভারতেরে এখনি এরা কিছু না কিছু কাজে লেগে দাক। বলে বলে গেন কেউ না দাব দেখবেন। কংগ্রেসের রয়েছে গঠনমূলক কাজ। সেট গঠনমূলক কাজের তার এক একটা করে চাপিয়ে যিন। কাজ না করলে খেতে পাবে না। আর কিছু না করক দাবার তৈরী করা তো সহজ। মেহেরা দাবার তৈরী করবে, চেলেয়া বাইরে বিক্রি করবে। দেখুন গিয়ে পাঞ্জাবের আশ্রয়-প্রার্থীদের। সাধারণ একটু ছাউনি দিয়ে বলে পেড়ে দোকান ক'রে রাস্তার ধারেই হুতো।

তাছাড়া ওরা তেল, সাবান ইত্যাদি তৈরী করা গিয়ে নিতে পারে, সে ব্যবস্থা ক'রে নিতে চেরা করন। স্টেশনারী ভিনিষ বাড়ী বাড়ী গিয়ে বিক্রি ক'রে আছ। আরেকটা কথা। আছ বেশে মলে মলে technician তৈরী হওয়া সরকার। স্থল, জল, নভোতল সবই বেগে পড়ে আছে কোথাও তো কাজ তেমন হচ্ছে না। চুকে পড়ুক বেথানেই হোক, গিয়ে নিক নতুন টেক্‌নিক। যেনটা গড়ে উঠুক। জাতিটার মধ্যে ক'রের উদ্যমতা এনে দিক, আমরা দাহু্য হয়ে বেচে উঠি। এরাই তো মলে মলে নতুন জীবনধারা বেধে দরা সমাজে বিস্তার আনবে, নতুন ভারত তৈরী করবে। এরা আছে, জাতিগঠনের অঙ্গন কাজের প্রয়োজন আছে। আমরা আছি, বিদেশী শাসনমূলক গভর্নমেন্ট আছে, তবু কেন কেঁধে মরব যে এমন ভারত আমরা চাইনি? যে ভারত চেয়েছি তাহলে গড়ে নিতে তো হবে আদ্যাবতই। শু গভর্নমেন্টের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, তাকে গালাপালি আর সমালোচনা করলে চলবে কেন? আমাদের দাব্বিও তো গভর্নমেন্ট দাবী করবে! বেশ কি শু গভর্নমেন্টের? আমরাই কি বেশ নই? আমরাই কি ইংরেজ তাড়াইনি? ইংরেজ তাড়াত্তে গিয়ে যেমনি শু ভেঙ্গে ভেঙ্গে গেছি। ভাস্কর কাজে পোক্ত হয়েছিলাম ব'লে আছও যদি শু গালি দিয়ে ভেঙেই চলি, তবে জাতিগঠন না হবে, জাতিকে চৌচির ক'রে গুড়িয়েই দিয়ে দাব। কিন্তু আমরা করব এমন

তবে কী সংগ্রাম করেছিলাম? কী ব্যস্ত
নেবেছিলাম? সে হবে না, উঠুন, আমরাই খুঁজে বার
করব কোথায় আছে পঠনশুদ্র কর্মক্ষেত্রে গভান।
জনম না কোনো কথা। আবার আদম, আপনাকে
নিম্নেই বার হবে। প্রেরণার একটা প্রবল বজ্রা বইয়ে
দিয়ে চলে যান শরৎবাবু।

চরুভট্টা বাবুর সঙ্গে তারপরই দেখা হয়ে যায়। সব
জন্ম বলেন, আনন্দের কোম্পানীতে হাজার হাজার
গোষ্ঠে মিষ্টি। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েনই হবে।
জাহাজে পালানী, সাহেব, কাম্বান এই হচ্ছে একটা
কোর্স। সামান্য ৪৫ মাস কই ক'রে গেতে হবে যদি
বাজীর পেয়ে টেনিং নিতে না পারে। কোন কাককেই
চীন মনে কথা চলবে না। তারপর যখন কাজে চুকে
পড়বে তখন তো আর কোন ভাবনাই নেই। জাহাজে
সেই বিশেষ দেখবে। কাজ করবে, চোখ খুলে চললে
বেশ বিবেকের আরো কত কিছু পিঁখে নিতে পারবে।
আরেকটা আছে ইন্ডিনিয়ারিংএর বিভাগ। মেশিন, টুল,
কলকলার সব কাজ পিঁঝতে পারে এখানে। আরেকটা
কোর্স আছে ইলেকট্রিসিটিও। যার বেটাতে রুচি বেধে
জন্মে বেছে নেবে। বর্তমান আমলে সব আমরা
নেব, আপনি পাঠিয়ে দেবেন। সাড়া জাগতে চায়
কাজ মনে। অগত্যা দুই মগনে হেসে উঠছে।

সন্ধ্যাবেলায় আবার আসে ইয়া, আসে বিজলী। কী
উৎসাহভরা হাসিমুখ। ইয়া বলে “বজীর জগৎ দুখের
ব্যবস্থা ক’রে এসেছি। তারপর Blind School এ
গিয়েছিলাম। অন্ধ ভক্তের কাল পরীক্ষা। ওর হয়ে
৯২ ঘণ্টা লিখে ‘দিতে অজ্ঞতাও করছে।’ ইয়ার ইচ্ছা

আছে, পরীয়ে কুলাব না। “দুঃখনেই Sacrificeটা ভাগ
করে নাও।” উচ্ছল হাসির তরঙ্গ তুলে দুজনে চলে যায়।
বজীতে শিকা দেব, তাদের দুইবছর বিকটে লড়াই করে।
বলে, আমরাই এদের গড়ে তুলব, এদের জগৎ তো
আমরাই কিলান-মজদুর-রায়ে। সে রাখে আমরা ছাড়া
কে আনবে? আনা, উদ্বোধনা, আমলভরা গরজন
যেবে বার ওদের পথে পথে। এই তো স্বাধীনদেশের
চবিত্ত্ব। ওরাই তো আছে। আছে শিল্পকেন্দ্র গড়ে
তুলে দুঃখকে আবলম্বী করার দুঃখ প্রচেষ্টা, আছে অন্ধকে
পথ দেখিয়ে বাহুব করে তোলাব আমল, আছে তাকে
যোগ্য নাগরিক করে তোলাব প্রথম কর্তব্যজ্ঞান, অথচ
সেই বর্ধিতবে। আছে হরিজন বজীকে গড়ে তোলাব
প্রেরণা, যুগা নেই দারুণ বলে। আছে লাইব্রেরীর মধ্যে
জুবে বাৎসর্য স্বপ্ন, আছে সেখান থেকে বহনধন খুঁজে
আনবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। আর আছে প্রভাববাহু
কর্মের প্রেরণা, শরৎবাবু আনন্দের ভ্রোতে ভালিয়ে নিয়ে
হাবার উদ্ভাসনা। লিঙ্কনে পড়ে থাকবার, মলিনমুখে
হুতাপ হবার পাত্র এরা নয়।

কখন যে বিবাহভরা প্রভাত আকাশ কেটে গিয়ে
সন্ধ্যার রাগা আভার মাহুর্থে আকাশ লাল হয়ে উঠেছে
টের পাখি নি তো ঘন। সেই প্রভাতকে মনে ক’রে
মনটা বলে, হুং? সে আবার কোথায়? চারিদিক
তো হান্তিতে ছেয়ে রয়েছে। সেখানে পাতনা ভীষন
স্বপ্নন? বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা যে ছুটে চলেছে তোমারি
চতুর্দিকে। অতল সেই স্পন্দনের মধ্যে নেমে এসে মনটা
অজ্ঞান্যতে কখন সে পাখার যোগ দিয়ে জুবে যাবে।
চকল আঁধার আসে তারতের নবজীবন সাগরে।



গ্রন্থাগার সংগঠনের গোড়ার কথা

শ্রীকণ্ঠকুমার রায়

প্রকৃত চেষ্টার পর সকালবেলায় পাঠকে ঘে নির্জনতার স্রষ্টা করতে পেরেছিলাম তাকে নিয়েবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বন্ধুর আবির্ভূত হলেন। একেবারে আক্রমণের সুরে আরম্ভ করলেন, "সবেরই আন্দোলন। লাইব্রেরীতে বই গোড়াতে তারও আবার আন্দোলন। এদিকে ঠিকমত বই দিতে তো কোনও কর্তাকেই দেখা যায় না।" হাল্কা সুরের অস্ত্র করেকটা কথার ভিতর দিয়ে বন্ধুবরকে অস্ত্র আলোচনা দিয়ে পেলেন। জানিতো অজ্ঞাত তাকিকের দৃষ্টিকে বিম্বিত করলেও তর্কের গতিবোধ করে না। আর নিজের অজ্ঞতাকে বোকার করে নেওয়ার মত চিত্তেও দৃঢ়তা যে খুব বেশী পোকের থাকেনা তা' অল্পাধায়েই বোধ করা যায়। কাজেই বন্ধুবরের অজ্ঞাত মগতের অহলদানী অভিধাত্রী মনকে জ্ঞাত মগতের দিকে কিরিয়ে এনে বন্ধুর কর্তব্য পালন করলাম। তাঁকে বোঝালাম যে তারতম্যের বিশেষ করে বাঙলা দেশের এই অস্বাভাবিক আবহাওয়ার নানারকমের কৌটলভয়ের আবির্ভাব মোটেই বিচিত্র নয় আর তার কিছু বহি কোনও হ্রিস্রপথে করেকটা লোকের মস্তিকে ঢুকে গোলোযোগের স্রষ্টা করে তা'তে বিচলিত হবার বিশেষ কারণ নেই।

হাটহোক এতো গেল একটি মাত্র বন্ধুর উকীল মনকে শান্ত করে আবার কাছিনী। কিন্তু এই ধরনের চিত্তপাণ্ডা তো শুধু আবার ঐ বন্ধুটির একার নয়। সময়েই একটা অংশের মনের গঠনের তিনি প্রতীক মাত্র। এঁদের কৃতিত্বাণ যে রাজনীতির পর এটি আর একটি ক্ষেত্র যেখানে বিনা মাধ্যম বেড়িয়ে বেড়াবার বা খুসীমত মতব্য করবার অধিকার সকলেরই কম বেশী আছে। পাড়ায় লাইব্রেরীর বাংলা উৎসাহী সাধারণ সভা তাঁদের এ অধিকার তো রীতিমত আইন লগত বলা চলে। আর অ-সাধারণ বাংলা অর্থাৎ কার্ধ্য-নিরীক্ষা-চক্রের একজন তাঁদের বক্তব্য নত মস্তকে শোনাই বোধহয় রীতি হওয়া উচিত। বলা

বাহলা তাঁদের এই অধিকার প্রকাশ অধিকার হলেই লাইব্রেরীর সাধারণ কাগ্যপ্রণালী নির্ণয়ের ভিতরই নীমাবদ্ধ থাকেনা। সমস্ত বাধ্যবিশ্যকে ডুঙ্ক করে এর বিবিধতাই অভিধান চলে গ্রন্থাগারের সামগ্রিকতম কাজকেও নিজেদের নির্ধেয়মত থাকিয়ে দেওয়ায়। উপাযহীন গ্রন্থাগারিক যিনি হরতো কিছুদিনের কষ্ট কার্যক্ষেত্রে সোভাস্থিক অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করতে পেরেছেন তিনি কেবল কলম দ্বীপে এই বেষ্ট্রাচারগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন আর অনেকগুলি হামাল শিশুর নিতপার শিতার মত বতটা পানেন এই অনিয়মগুলিকে আঁকড়িয়ে লাদলে রাখার চেষ্টা করেন। এই অদৃষ্ট শিশুদের দহ্যতা সাধারণ পাঠকে গ্রন্থাগারিকেরই কর্তব্যমত। লক্ষ্য সম্বন্ধান করে তোলে। হরতো সারা বছরের কাজের পর নিজস্ব ভালি মাধ্যম নিয়েই ঠাঁকে বিচার নিতে হয়। অস্ত্র এ সমস্তকে অতিক্রম করেও আশ্রয়প্রাপ্ত লাভ করার মত মনোবল অবস্থা অনেকেরই থাকে তার উপকারের বহলে নিম্নাংগ যে গৌরবের এ ধারণা তো ছাত্রজীবনে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, বিকাশাগর মহাপ্রবেশ জীবনী প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাণপণে আনাদের মস্তিকে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। কিন্তু এ ধরনের গোলোযোগের মূল যে কোথায় এবং তি উপারে যে এর প্রতিকার করা যেতে পারে তাকে প্রকৃত দৃষ্টির লব্ধে চেয়ে দেখাও চেষ্টা আনাদের বাস্তব শিক্ষার দৃষ্টিক শীড়িত মনে বিশেষ হতে দেখা যায় না। উচ্চতর ধারা জ্ঞান কলীরের অভিজ্ঞতা বা বিশেষ জ্ঞানকে মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না আর সাধারণ পাঠক নিজেদের হাবী লব্ধে অনেক সময়েই সচেতন থাকেন না বা কোনও তথ্য না পেলে কিছুকণ চীৎকার করে অস্ত্রের জ্ঞানান বিলেও সেটা যে কোন পেলেন না তা ভেবে দেখার চেষ্টা করেন না। কলে উপর থেকে আসা "মাস্টার" নির্দেশ আর নীচের থেকে ওঠা "অস্ট্র" হাবীর মধ্যে মাধ্যমত মাধ্যমত এনে মণিতের গঠিত মাধ্যম গণিতকের আইনে গ্রন্থাগার চলতে থাকে। এক রবিবার থেকে অপর রবিবারে, এক দৃষ্টি থেকে অপর দৃষ্টিতে পৌছানোর আশ্রয়কার বরকোনের ভিতর দিয়ে গ্রন্থাগারিক তাঁর

গ্রন্থাগার চালিয়ে যান। নির্দিষ্ট সময়ের শেষে বীরের সম্মান না পেলেও বীরের মতই লক্ষ কতচিহ্ন পরীবে বহন করে তিনি উত্তরগামীরা হাতে কর্ণটার অংশ করে অবসর গ্রহণ করেন। এই ধরনের ঘটনা আমাদের কাছে এতই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে তাতে মনে কোনও আন্দোলনেরই স্ফূর্তি করতে পারে না।

কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বেধে গেলে সমাধির সমস্ত ভাগ্য লক্ষ সঙ্কেই সমাধান প্রচেষ্টাও চলতে থাকে। অধিকাংশ লোকই সমস্তকে মেনে নেন বটে কিন্তু সমাজের একটা অংশ থাকে যেখানে এই সমস্তের আবির্ভাব সমাধানের সচেষ্ট ভাব জাগিয়ে তোলে। বলা বাহুল্য পাকিস্তান দেশের দাপকাঠিতে বেধে গেলে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থালনের এই চেষ্টা আজও আনন্দীকণিক মাত্রা চাতিয়ে উঠতে পারেনি। তবুও ব্যাধি সচেতনতা যেমন পরীকের স্ব স্ব সংস্থানীর ইচ্ছিত শেষ সমাজ পরীকের এই ক্ষুদ্র সচেতনতা টিক তেমনি ভাবেই জাতিয়ে শেষ যে আমাদের সমাজের এইনিকের স্বাধাধারা ক্ষীণ হয়ে এলেও আজও তা সম্পূর্ণ রকমে বিলুপ্ত হয়ে যাবনি। সমাজ পরীকের স্বত্বাধার মতই সারা দেশের অল্প কয়েকজন ব্যার ব্যার বোভাতে চেয়েছেন যে গ্রন্থাগারকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পন্থায় পুনর্গঠিত করা ব্যার বহুল বিশাসিত। মাত্র নয়, তা জনসাধারণের পরম উপকারী ও একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই এবং শিক্ষা বিস্তারকে আরও ব্যাপক করবার জন্য গ্রন্থাগার রূপন: তার শ্রেষ্ঠ বিশেষের চিত্তবিনোদনের ঐকীকরণ পরিচাল্য করে কল্যাণবরী আনন্দাত্মীয় রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে চলেছে। গ্রন্থাগারের এই কল্যাণবর সত্যকে ক্ষততর পতিতে পূর্ণ পরিবর্তিত দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সমাজের এই চিন্তাশীল অংশের উপরই। সহজে ধনী হওয়ার কোনোও উপায়ের সম্ভান না থাকার জন্যই এতে “ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের” কোনো উৎসাহী একই সঙ্গে “নিজের এবং কল্লের উপকারী” সমাজের সাক্ষাৎ পাওয়া ব্যার না। অতদিকে জনসাধারণও নিজেদের দ্বারী লক্ষ্যে বহেষ্ট সচেতন নন বলে পাড়া, লহর

বা গ্রাম এমনকি রাষ্ট্রের পরিচালকের কাছেও মনোর স্থায় দিকটা এতদিন অনজ্ঞাতই হয়ে এগেছে। বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যাধার পরিবর্তন ঘটে থাকলেও এ সমস্তার সুই সমাধানের পথ সাধারণকে ওদের দ্বারী লক্ষ্যে সচেতন করে তোলায়। প্রত্যেক চিন্তাধারার মতই এতেও বিশেষজ্ঞদের জন্য একটি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট থাকলেও সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য একজন কর্মীর কর্তব্যের থাকে। গ্রন্থাগার সংগঠনের এই প্রচারের দিকটা এতদিন অনেকটাই অবজ্ঞাত হয়ে এগেছে। নিজেদের চিন্তাধারাকে সহজবোধ্য করে সাধারণের কাছে পরিবেশন করা এবং তাঁদের মতামতকে সূচিত্তিত ও সুক্টিপন্থত হয়ে সঙ্গে উঠতে সাহায্য করার দায়িত্ব এ বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকেরা এতদিন পথ্য পরিপূর্ণভাবে পালন করেননি। কলে গ্রন্থাগার সংস্থার আজও সাধারণের কাছে সুস্পষ্টাও সবেহজনক ব্যাপার আর কল্পনকের কাছে অন্তর সহজবোধ্য অব্যায় মাত্র।

হাইস্কো এই সুস্পষ্টাধারার অভাৱ ভুলে দিয়ে জনসাধারণের অকৃত্রিম দৃষ্টিৰ আশীর্বাদের পথকেই এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাক্ষ্যের পথ করে তুলতে হবে। যেকোন থেকে কেনার পর হ'তে নষ্ট হয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়াৰ আগে পথ্য বইয়ের যে জীবন পাঠকের কাছে প্রকাশিত তাকে কি ভাবে উজ্জলতর করে তুলতে পারা যেতে পারে তা' এই পাঠকের জানানোর কর্তব্য আমাদের। বর্তমানে গ্রন্থাগার সাধারণের মূল কথাটি দাঁড়িয়েছে এই আলোকলম্পাতে। শ্রেষ্ঠ বিভাগ, তালিকা প্রণয়ন প্রকৃতিত দায়বৎ বইগুলির উপর বিভিন্ন দিক থেকে আলো ফেলার ভিত্তর দিয়ে যে কোন পাঠকেই তার বিষয়বস্তুর খোঁজে সাহায্য করার চেষ্টা চলতে থাকে। পাঠকের এই অভিজ্ঞার পূরণে সময়ের অপব্যয়কে ন্যূনতম করে রাখতে পারাই অস্বত্ব পন্থার উৎকর্ষের সাক্ষ্য হবে। আমাদের পরিচিত সাধারণ লাইব্রেরীগুলিতে এই লক্ষ্যে ব্যয়ের মাত্রা নির্ভর করে পূরণো কর্মীদের বৃত্তিপন্থির উপর। কলে পূরণো কর্মী কোনও কারণে অহুপস্থিত হ'লে গ্রন্থাগারিকের পন্থপূরণ করে যিনি যেনে

তার অবস্থা চরম শোচনীয় হয়ে ওঠে। সম্মিলিত ব্যাবস্থাব্যবস্থার নির্ধন অক্রমণের মাঝখানে বিভ্রান্ত হরিণ-শিঙা মত তাঁর অবস্থা কল্পনাতেও আমাদের সহ্যহুত্বজিত করে তোলে। যে কোনও বসু নিয়ে "সময়কে হত্যা" করার দেশের ধোঁয়াক বাঁধা বুঁজে বেকান তাঁদের কথা বাহন বিন কিছু মনের কোনও গভীর ঐশ্বর্য্য মেটাবার আগ্রহ নিয়ে বা চরম প্রয়োজনের মুহুর্তে বহন অনেককণ ধাতিয়ে থাকার পরেও প্রয়োজন মত বইয়ের বগলে হাতের কাছের বইটিকেই "ভালো বই" বলে গছিয়ে দেওয়ার ককণ চোঁটা চলতে থাকে তখনকার অববর্ণীয় দৃষ্টে কার মনেই বা গভীর আগোচ্চনের স্রী না করে। মাহুকে হাসি মুখের মুখোশ পরিয়ে তখনকার তাঁর বিবাহ প্রযুক্তিকে কতটা শক্ত আড়াল দিতে মনঃ হরণেছেন প্রাণিক থেকেই বেন তারই পরণ চলতে থাকে। পাজার সাধারণ এম্বাগারগুলি ছাড়া অনেক বড় এম্বাগারেও এই ধরনের পুরাতাপেক্ষীয় অসুস্থিস্থির কারণ নির্দেশ করে পরে আসবার সনির্গত অহুগোণ অনেককেই স্তনতে হয়েছে। কিন্তু পোড়াতাই বলেছি যে এই ব্যাধি কেন আর এর প্রতিকারই বা কি এ সময়ে সাধারণকে সচেতন করার দায়িত্ব এর চিকিৎসকের। বখাধচাবে পালন করবার সুযোগ পাননি, তা' সে যে কারণেই হোক। ফলে ভূমিকম্প, বজ্রপাতের মত এ দুর্ঘটনাকেও সাধারণ পাঠক ভগবানের অভিসম্পাত হিসাবে উপগ্রহীয় ভাবেই মেনে নিয়েছে।

অল্পকথায় কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বিনিমটা আরো পরিষ্কার হয়ে বাবে বলেই আশা করি। সকলেই জানেন বই কেনার পরই বইটির শ্রেণীবিভাগ করার প্রস ওঠে। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ, রমা আর নারীর মূল্য কেনা হ'লো। একটা সাধারণ এম্বাগারে এর শ্রেণী বিভাগ হবে পল্লীসমাজ—উপন্যাস, রমা—নাটক আর নারীর মূল্য—বিবিধ। শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই বইগুলির স্থানও নির্দিষ্ট হয়ে গেল বিভিন্ন আলমারি। ফলে বইগুলি যে ভাবে পর পর কেনা হয় ঠিক সে ভাবে আলমারীতে সামান্য থাকে না। কারণ কেনার

ক্রমিকতায় নিম্নের উপর ভোর দেওয়া সম্ভব নয়; আগার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগে কেনার ক্রমিকতাকে প্রাধান্য দেওয়ার কোনও প্রসূত ওঠে না। তবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে একই বিষয়ের ভিত্তর কেনার ক্রমিক ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায় তার সংখ্যার ভিত্তর দিয়ে। কারণ উ, না প্রকৃতি চিহ্ন দিয়ে বইগুলির শ্রেণীবিভাগ করার পর বইয়ের উপর যে সংখ্যা দেওয়া হয় তা এম্বাগারের সংগৃহীত পুথকের ক্রমিক সংখ্যাই। "পল্লী-সমাজ" বইটির সংখ্যাখিনি "উ ১১১" ধরা যায় তবে তার পাচখানা বইয়ের পরে কেনা উপন্যাসখানির সংখ্যা হবে "উ ১১২" এবং এটি আলমারীতে "উ ১১১" এর পাশেই থাকবে। মাহুর বইগুলি তাদের বিষয় মত চিহ্নিয়ে যাবে। বলা বাহুল্য এই "উ ১১২" শরৎচন্দ্রেরই কোনোও উপন্যাস হ'তে বাধ্য নয়। শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাসের পর হয়তো এলো রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাস তারপরে ম্যান্নিম্ গোকি, বীনেস্স রথ, মাদিক বন্ধ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি করে একমিত উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণকমেই মিলিয়ে রইলো। ব্যাপারটিতে ক্রটি ঘটে ছ'রকমের। প্রথমতঃ শ্রেণী বিভাগ নির্ধারিতের ক্রটি বিভীষতঃ পুস্তকসংখ্যা নির্ধারিতের ক্রটি। শ্রেণী বিভাগের ক্রটির কারণ কোনও হুচিহ্নিত উপায়ে শ্রেণী নির্ধারিত না হওয়া। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ সাধারণ অভিজ্ঞতার পথে সংগৃহীত জানের মধ্য থেকে কয়েকটি ভাগ ঠিক করে নিয়ে বাকি বইয়ের আখ্যান অর্থাৎ অভাগাদের আশ্রয়দাত্রী হিসাবে বিবিধ ভাগটিকে রাখা হয়। অতীতের সাধারণের সামান্য অভিজ্ঞতার সাহায্যে গড়া শ্রেণী বিভাগ আলমারির বহনীয় বহিষ্কার প্রসূত শ্রেণী বিভাগ পদ্ধতির সঙ্গে কোনও রকম মিলেই তুলনীয় নয়। অসামান্য বিবিধ ভাগটিকে বাহন মিলেও অপর বিভাগগুলির বিভিন্ন অংশের নির্দিষ্ট ভাগ প্রকাশিত করে তোলা পুরাতাপ শ্রেণীবিভাগের সাহায্যে সম্ভব নয়। বর্ণনের বিভিন্ন চিন্তাধারাকে, ধর্মের মতবাদের পাণ্ডিত্যের বিভিন্ন মূল প্রকৃতিতে উৎসুক মনের কাছে প্রকাশিত করে ধরতে হলে পুরাতাপ শ্রেণীবিভাগের আমূল পরিবর্তন দরকার। তারপরের

সমস্ত পুস্তক সংখ্যা নির্ধারণের। অর্থাৎ বিধের সঙ্গে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে যে পুস্তক সংখ্যা হয় সেইমত বই রাখলে শব্দচন্দ্র বা বসীন্দ্রনাথ বা যে কোনও লেখকেরই একই বিষয়ের এগাদিক বই একত্র রাখা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া একই বিষয়ের মধ্যেও লেখকদের সংখ্য বা বর্ণিতকর্ম অনুসারে কোনও হুচিহ্নিত পদ্ধতিতে বই রাখা এ উপায়ে সম্ভব নয়। কলে শব্দচন্দ্রের কোন কোন বই গ্রন্থাগার থেকে বাহির হয়ে যায়নি তা' জানতে হ'লে প্রত্যেক বইয়েই সংখ্যা কানো বরীকায়, এবং দেওলি বিভিন্ন আলমারীতে থাকা নোটেরই অসম্ভব নয়। কালেই তাহের দ্বারা বার করতে হলে পুরাতন কর্মীদের দৃষ্টি-শক্তির সাহায্য পেলেও হতরাণিটা যে উৎসাহী তা নোটের বলা যায় না। সেই ক্ষুদ্র পুস্তকসংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে বিষয় লেখক ইত্যাদি ভিতর দিয়ে। ক্রমিক সংখ্যাটি অঙ্কগোণন করবে বইয়ের ভিতর হতে সরকার হ'লে তার সাহায্যে বাস্তব করে গিয়ে বইটির গ্রন্থাগার জীবনের আওতায় ইতিহাস জেনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। বলা বাহুল্য এই ধরনের একভাবে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে বইগুলি যে আর একভাবে অবস্থান করতে লাগলে এই দুই ধারার ভিতর যোগাযোগ রাখতে হ'লে গ্রন্থাগারকে কতগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। এই ব্যবস্থার কলকাঠিগুলি মানুষের হৃৎপিণ্ডের মত সাধারণ পাঠকের কাছে অদৃষ্ট থাকলেও একে অগ্রাহ্য করে গ্রন্থাগারের কোনও কাজই চলে না। গ্রন্থাগারকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলতে দেওয়ার ক্ষমতা এই কৃতদিত সংগঠন আর তার ক্ষমতা নিরময়ত খাতি সরবরাহ অনেক স্থলেই সাধারণের কাছে অপরিহার্য কাছ বলে বোধ হয় না।

যদি হোক পাঠক আর কর্মীদের সময়ের সম্ভাব্য অপব্যয়কে নিরস্তম নানে রাখার দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগার সংগঠিত হ'লো। পরের ধাপেই প্রয়োজন হ'লো এই সংগঠিত গ্রন্থাগারকে বিভিন্ন দিক থেকে সেখানে। এই কাজ ক্যাটালগ বা গ্রন্থতালিকার। এরপর দৃষ্টি রাখতে হবে যে গ্রন্থাগারের সংগঠন পদ্ধতির সঙ্গে

পরিচিত বা অপরিচিত যে কোনও পাঠকই সাধারণতঃ তথ্য এনে থাকলেও যেন কৌতুহলকে অতুণ রেখে ফিরে যেতে বাধ্য না হন। যে শোক জ্ঞাতবা বিখ্যাত মাত্র জানেন, যিনি লেখকের নামটাই জেনে এগেছেন বা যিনি বইয়ের নামটুকুই মাত্র মনে রাখতে পেরেছেন প্রত্যেকেই যেন তার ক্ষুধা-মেটানোর খোরাক খুঁজতে সাহায্য পান এই দিকে দৃষ্টি রেখেই গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত হবে। শুধু এই মাত্রই নয়, গ্রন্থাগারের কোনও একটি বইকে একটি মাত্র গ্রন্থাগারেই রাখা সম্ভব হতে পারে কিন্তু তালিকা প্রণয়নে সেই বইটিই একাধিক ভিত্তির সমষ্টি হ'লে তাকে একাধিক স্থানে দেখিয়ে সম্ভাবী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য এর ঐক্যমিতিক অর্থাৎ তথ্যাতিক "অভিজ্ঞতাসম" সমাধানের বিকাশ বহু গ্রন্থাগারেই দেখা সম্ভব; কিন্তু বহু ভাবনের হুচিহ্নিত অভিজ্ঞতার প্রকাশ যে গ্রন্থতালিতে তার সঙ্গে এই ধরনের যে কোনও গ্রন্থাগারের পরিচালক-মণ্ডলীর আবিষ্কৃত পথের তুলনা চলে না। নানা কারণেই তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, উপায় থাকে না। গ্রন্থাগারের সংগঠিত গ্রন্থতালি, তাহের লেখকের নাম, বিষয়বস্তু নাম প্রভৃতিকে এবং প্রয়োজনীয় স্থলে গ্রন্থের বিষয়কে বিশ্লেষণ করে সমস্ত তথ্যকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তাকে পরিবেশন করার নৈপুণ্যের উপরই গ্রন্থতালিকার উৎকর্ষের বিচার চলবে। গ্রন্থতালিকার বিষয় নির্ধারিত থেকে পাঠক জানতে পারলে যেন তার কাক্ষিত বিষয় কোন শ্রেণীভুক্ত, গ্রন্থকার নির্ধারিত থেকে পাঠক জানলেন যে তার নির্ণাত লেখকের কোনও বই আছে কিনা বা থাকলে কোন বিষয়ে আছে আর মূল তালিকা থেকে সংগ্রহ করবেন যে, যে বিষয়ে তিনি খুঁজছেন গ্রন্থাগারে তার বই আছে কি কি আর কতগুলি গ্রন্থ ইত্যাদি আছে কোন কোন বইয়ের ভিতর চড়িয়ে। পাঠকের ভ্রম লাঘবের পথে এই যে তালিকা পড়ে উঠলো সেই পথের তার উপকার সমাজকেই সমুদ্বিধানী করে ফুলবে। গ্রন্থাগারের অবস্থিত খেদে-থাকা ভিত্তকে বেয়ে কামিয়ে, অমাবস্ত্রক কোলাহলকে বেয়ে ধামিয়ে আর অহুগম্যনাকে বহু সময়েরই নির্দিষ্ট পথের ইঙ্গিত দিয়ে তার

সময়ের অপব্যয়কে যোধ করে আনন্দের মাত্রা বেধে বাড়িয়ে।

বলা বাহুল্য সব চেয়ে পরিচিত দিক হ'লেও গ্রাম্যায় বিজ্ঞান এট শ্রেষ্ঠ বংশ আর তালিকা গ্রন্থনের ভিতরই বা তাও আত্মপূর্ণিক গ্রাম্যায় সংগঠন আর পরিচালন বিজ্ঞার ভিতরই নীমাত্মক নয়। এখটি ছোট পটীর গ্রাম্যায়ের যন্ত্র এই ধরনের বিজ্ঞা আহরণ করতে পারলেই তা দেখে হয়ে যায়; কিন্তু কোনও উচ্চতর পুস্তক সংগ্রহ থেকে সব চেয়ে ভালো কাছ আহার করতে হ'লে এ ছাড়া আরও অনেক চিন্তাই জানা এবং করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইংলণ্ডের বর্তমান বাস্তবায়ী বাড়ীর ঠিকানা কি, আমেরিকার কোনও একটি পত্রিকার অভিনের ঠিকানা কি, ঠাকুর টাকার দার কি রকম, তাঁরা কি ধরনের লেখা নেন আর কি রকম পারিশ্রমিক দেন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা আর মুসলীম লীগের সভাপতিদের অভিজ্ঞতায় হুল বতব্য কি ছিল, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বাংলা কবিতার উপর আধুনিক যুরোপ কবিতার আর ঘনিষ্ঠ প্রভাব সম্পর্কে কোনও বই লিখতে গেলে কি কি বইয়ের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তার গ্রন্থপত্রী হয়ে দেওয়া প্রকৃতি বহু বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরবরাহ করার উপায় পদ্ধতিও গ্রাম্যায় বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অল্প এম্বাগারিককে কিছুটা সমস্যার অংশ নিতে হয় আর কিছুটা তাঁর জানা না থাকলেও জানবার উপায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উপর নির্ভর করে। সমাজের দিক থেকে যেখানে গ্রাম্যায়িকের এই পথপ্রদর্শক অংশের দায়ও একেবারে উপেক্ষীয় নয়। অনেকের দায়িত্ব খোলাপুণীকে তুলে করা ছাড়াও বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান সহায়ক অপব্যয়ের হাত হতে রক্ষা করা বা সমাজের কল্যাণকামীদের অগ্রগমনে সাধ্যমত সাহায্য করার ভিতর দিয়ে যে প্রকৃত সমাধ সেবাই চলে থাকে তাকে কোনক্রমেই অবীকার করবার উপায় থাকে না। অল্প এই ধরনের সাহায্যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করতে হ'লে গ্রাম্যায়িককে তাঁর নিজের কৌতুহলের ক্ষেত্রে বিতীর্ণত্ব করে তুলে ভবিষ্যতের

গ্রন্থের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতাকে হ্রাসিত করে গড়ে তুলতে হবে।

এরপরেই আসবে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা আর জ্ঞান-স্পৃহাকে ব্যাপকতর করে ছড়িয়ে দেওয়ার অল্প সাহায্যের গ্রাম্যায়গুলির পারস্পরিক সাহায্য ব্যবহার ভিত্তি রচনা আর জ্ঞানমান পাঠাগারের সংগঠন। দেশের যে কোনও অংশের এক অখ্যাত গ্রাম্য গ্রাম্যায়ের সংগঠন পাঠিক হয়েও বিশেষ কোনও বই কোথায় আছে কি না তার বখর পাওয়া এবং দুইয়ের কোনও গ্রাম্যায়ের থাকলে নিজের গ্রাম্যায় গ্রাম্যায়ের মাধ্যমে সেটিকে পাওয়া ইত্যাদির উপায়ও এই বিজ্ঞানে বহু পরীকার কলে প্রায় একটু নিষ্ফল এসে পৌঁছেছে। অল্প আনন্দের দেশের বর্তমান অসহায় এই ধরনের গ্রাম্যায়ের পারস্পরিক সাহায্যের পরিকল্পনাকে অনেকেই "হাটের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব" বলে থাকা পথে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এটা ঠিক যে হাটের সাহায্য ছাড়া ব্যাপকভাবে এ সম্ভব সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা না পেলেও পাড়া বা গ্রাম বা মহলের অনেকগুলি গ্রাম্যায়কেই জ্ঞান সাহায্য এই ব্যবহার ভিতর দিয়ে পারস্পরিক সাহায্যের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করতে পারি। বর্তমানের হুবিলা লাভ তাতে দেখেই বাড়বে এবং সেই দেখেই ভবিষ্যতের কালের যোদ্ধা বাবে হাস্যকর হবে। আর শিক্ষাদিগ্গাহের কাজে জ্ঞানমান পাঠাগারের দান যে কি পরিমাণ হতে পারে তা বোঝবার অল্প কোনও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। মনের পূর্ণ পরিণতির দিক দিয়ে যে দেশের অধিকাংশ লোককেই এখনও শিশু বলেই আখ্যাত করা যেতে পারে মনের খোরককে দুইয়ের কাছে তুলে দবার প্রয়োজনীয়তা যে কোনও রকমের সম্ভাব্য বাধ্যক দূর করে দেওয়ার ভিতর দিয়ে জ্ঞান বিস্তারের কাজ শ্রুতভাবেই চলতে থাকবে। যে পাঠক কোনও কারণে গ্রাম্যায়ের পৌছতে পারলেন না গ্রাম্যায় তাঁর কাছে এগিয়ে আসছে এইখানেই জ্ঞানমান পাঠাগারের দায়িত্ব।

যাই হোক এই ধরনের বহু তথ্যের সমাবেশে আর বহু জীবনের পটীর চিহ্নর ভলেই গ্রাম্যায় বিজ্ঞান আর

তার বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। আজকের উন্নয়নশীলতা আজ আমাদের দেশে তাকে অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করলেও এই ধরনের প্রতিরোধী শক্তির পক্ষে বহুদিন টিকে থাকার মোটেই সম্ভব নয়। গোড়াতেই বলেছি এই বিকৃত শক্তির এখনও পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকার একমাত্র কারণ সাধারণের মনে নিজেদের দাবী সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব। অসংগঠিত গ্রামাঞ্চলের চেয়ে সংগঠিত গ্রামাঞ্চল কিভাবে আমাদের বেশী কাজে লাগতে পারে এবং কেন এর জন্য অভিজ্ঞ গ্রামাঞ্চলিক প্রয়োজন তা পাঠকদের বৃত্তিরে মিতে পারলেই অনভিজ্ঞের হাস্যরসাত্মক আশিসের থেকে আমরা গ্রামাঞ্চলকে মুক্ত করতে

পারবো। আজকের উন্নয়নশীলতার উত্তর হয়তো আমরা বিজ্ঞের উন্নয়নশীলতা দিয়েই দিতে পারি; কিন্তু সে পথে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা হ্রাসপরাহত হয়েই থাকবে। তা'তে মাহুষের মনোবৃত্তি বাস্তবিক রকমের সম্ভাবনা পরিচয়হীন এই পরিবর্তনের প্রত্যাবর্তন তীব্রমিশ্রিত সংশয়ের চোখেই দেখতে থাকবে; বর্তমানের অল্প পরিচালকমণ্ডলীর দৃঢ়তাই দৃঢ়তর হয়ে উঠবে, আর আপনাতঃ আশা করলে বহুই বিরক্তি আর কৌতূহলম্বাধা মনে গ্রামাঞ্চলিক আন্দোলনের দিকে তাকিয়ে একটি নোতুন গোলোমোলো দেখার আনন্দ উপভোগ করতে থাকবেন।

বাসুকী ও উর্বশী

মহোদয়

অস্থির সন্ধ্যার ছায়া পেচকের বিবরে ঘনালে।
জটায়ু আকাশ তলে আঁধারি বেন বড়ো অসহায়;
বড়ো অসহায় বেন নয় প্রাক পুরাতনিক প্রান্ত
ভোগের পেয়াল। মুক্ত—চোরাবালি করে হাশাকার।

ভু বাঁচিতেই চাই। রোমন্থনে ঘেঁটোনাতো ক্ষুধা
মোগানের কুকর্মে ঢাল নেই—নেই তরোয়াল;
তবালি দুর্ধ্ব বীর—মুক্ত খুঁজি ডোতা হাতিয়ার
মনের আহার্য বাসি, নবায়তো হুজুপাও বটে।

বিদ্যাক্ত বিরক্তিক্ত শুধু ছায়া বীর্ণ মনর সন্ধ্যায়
সম্মুখেই ভীড় চলে ভীড় চলি ভীক পলাতক;
কোথায় আশার আলো উজ্জ্বল নিশ্চয় নয়
আরক্ত গ্রামের ক্ষুধা—আনন্দ। কি তার আয়োজন।

বাসুকী ভেগেছে জেনো। উর্বশী তো কবে গেছে সরে,
নিরক্ত বেদনা তার আলো ভাসে সন্ধ্যায় আকাশে;
বাসুকী ছেড়েছে বিব—নীলকণ্ঠ ভাগিবে কি আর
এ'বার মৃত্যুর ডাক অমৃতের পূর্ণপণ শোন।

হা হতোষি! শুভাচার্য ভূগিরাছে স্তম্ভ লজ্জাবনী।
হিংস্র বড়বড় কর্ণ, অপহৃত কবচ হুওল;
বাসুকী ছেড়েছে বিব—কোথা ক্ষুধা, বিব শুধু বিব
লক্ষ হর অহরের সুরারছে আঁধার বেন আঁধা।

শান্তনার কাহা নেই। বাঘাবর অপো দুর্গানায়।
বাঁচিলে বাঁচিতে পার আঁধার পুনর্জন্ম পরে;
বাসুকী মুহূর্ত্ত ঘবে—ক্ষুধা তার মিটিবে যেদিন
উর্বশী উঠিবে আঁধারি বিহীন ভয় নয়া তলে।

সূতার অভাবে নোয়াখালির তাঁতীদের সংকট

রজনকুমার বসু

গল্প ইহা নহে। একটি গল্প ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকটের কথাই বলিতে চাই।

সন্ধ্যা হইতে উঠনে আগুন জালিয়া বসিয়া আছে— প্রতীকার, দরিদ্র তাঁতের কন্ডা। উন্নয়ন হইয়া প্রতীকার আছে, কেন? বাবা আসিবে রিলিকের চাউল লইয়া, তবে রাগা চড়িবে, তবে দুটে। ভাত পড়িবে পেটে— নিষেধ ও ছোট ভাইবোনদের।

বসিয়াই আছে—বাবা তাহার মিরে না। আগুন নিভিয়া যায়, আবার জ্বলে, আবার নিভিয়া যায়, সে আবারো জ্বলিয়া বসিয়া থাকে—এমনি করিয়া কুখার কিন্তু হইয়া বাবারই ওপর রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে বসিয়া বসিয়া কাঁপিতেছে। ভাবিতেছে বাবা আসিলে কতই না তাহাকে পালন করিবে? কেন এত দেয়ী হইল? কেন তাহাদের কথা বাবা ভুলিয়া গেল? বাবা আসিলে তাঁহার সহিত ভাণ্ডার্য কথা বলিবে না, বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে—ইত্যাদি অনেক কথাই ভাইবোনে ভাবিতেছিল।

রাতি দশটা হইল তাহাদের বাবার কিরিয়া আসিতে। ঘাবার সহিত দেখা করিবে না ভাবিয়াছিল, কিন্তু পারিল না। বাবার কণ্ঠস্বরে পথ হইতে "খুঁকী" নাম ভনিয়া, খুঁকী কি আর কির থাকিতে পারে, খুঁকী একটি পিটশিটে কুপি বাতি হাতে লইয়া বাবাকে আগাইয়া আনিতে চলিল। তাহার সব রাগ, সব অভিমান পড়িয়া গেল। ভাবিল, বাবা আসিয়াছে—এবার রাগা চাপাইবে, রাগা হইলে ভাইবোনদের খাওয়াইবে, বাবাকে খাওয়াইবে, নিষেধ বাইবে। এই আগ্রহে সবকিছু ভুলিল সে?

কত আনন্দে সে বাবার কাছে আগাইয়া গেল। গিয়া সে কি বৈছিল? বৈছিল—বাবার চোখে জল। খুঁকী আর কথা বলিতে সাহস পায় না—কে জানে, খুঁকি বা তাহার বাবা চাউল সংগ্রহে অপারগ হইয়াছে। কিন্তু পেট জ্বলিতেছিল, না বসিয়া পারিল না।

বাবা বসন বদলি—মা, আরও ভাল পাওয়া গেল না—আর, মি, ও'র (Relief Circle Officer) ভরসাঘ আশার আশার তাত নটা পর্বত বসিয়া বহিলাম—এখন তিনি বলিলেন—"না, আর পাটবে না, কাগ আসিও" তখন আর কি করি, কিরিয়া আসিতেই বাধ্য হইলাম।

ভাবিয়াছিলাম আর দুই দিন এমন করিয়া পূর্তিতেছি, কিছুই ছুটাইতে পারিতেছি না—আর বাড়ি কিরিয়া কি করিব, তোমাদেরই বা কি বলিব, কি পাওয়াইব—তাহার চাইতে আর বাড়ি কিরিব না। তাহা হইলে তোমাদের এই দুঃখ, এই কুখার আতঁনার ভোগের উপর বৈশিতে হইবে না। কিন্তু মা, আবার ভাবিলাম—তোমাদের কি উপায় হইবে, তোমরা ছেলেমানুষ না খাইয়া, আমাকে না পাইয়া কেমন কঠো স্থির থাকিবে—তাই আবার আসিতেই হইল।

অগত্যা মেয়েটি প্রতিবেশীর বাড়িতে ঘাইয়া ঐ দ্বারেই গোটা কয়েক তাল চাহিয়া আনি। উচাই বাইচা সে-দ্বারের মতো তাহারো লগ্ন রহিল।

এইভাবে দিন ঘাইতেছে। একজনের মতে—বহুশত তাঁতি পরিবারেই এই অবস্থা চলিতেছে। কেবল তাঁতিদেরই কি? কামার, কুখার, জেলে—হিন্দু-মুসলমান সকলকারই এই हाल। মিনের পর দিন এও করণ চিত্তের স্তম্ভ চলিতেছেই।

পাকিস্তান সরকার নিরুপায় বসিয়াই নির্বাপ শাস্তিয়া বসিয়া আছেন। এরিকে মাফ হে জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর অভাবে ক্ষীণিত অধির হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যে সরকার না জানেন তাংগ নহে। হিন্দু তাঁতি, মুসলমান তাঁতি সকলকারই অবস্থা অনশনে কাটাটবার মতো। ঘরে তাঁত থাকিতে বসিয়া আছে—হুতার অভাবে। বেকার বসিয়া রোরগারও নাই, তাং ডিক্কার চাউল অর্থাৎ রিলিকের চাউল সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতে হয়। কিন্তু এমন করিয়া কয়দিন চলিতে পারে? ডিক্কার

হঠাৎ কাহার ইচ্ছা হয়? আর সমর্থ শরীরে ডিকাই বা
বর্ণিত কেন? অথচ ডিকাই করিতে হইতেছে। অত
আগুন রাষ্ট্রে দেশের শিল্প-সম্পদকে গড়িয়া তুলিবার চক্র
সরকার কত ভাবেই না প্রদর্শন কর। আর আমাদের
রাষ্ট্রনায়করা চলিমাছেন আত্মকলমে মতিয়া।
সংগঠনাত্মক বৃত্তি ছাড়া আমাদের রাষ্ট্রনায়করা
চলিমাছেন ধ্বংসাত্মক বৃত্তির মধ্যে। কে বলিবে যে
আগার গোনা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের হাতের
মুঠার মধ্যে হাইচা পড়িবে না?

রাষ্ট্রকে সংগ্রহের শক্তিশালী ও সমুন্নত করিবার জন্য
যেমন সংস্কারকে সংগঠন ও উৎসাহমূলক হইতে হইবে,
জনসাধারণকেও তেমনি রাষ্ট্রের জন্য আন্তরিকতা
হইবে। সরকার ও জনসাধারণ একে অপরকে ছাড়া নয়।
দুইয়ের শুভ সংকল্প ও প্রচেষ্টাতেই আনন্দের রাষ্ট্রের
কল্যাণী বসিত হইতে পারে, পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের
অস্তিত্ব রাষ্ট্রের অকল্যাণের ভীষণ কারণ। ইহা
সরকারকেও বুদ্ধিগা দেখিতে হইবে, জনসাধারণকেও বুদ্ধিগা
দেখিতে হইবে।

যে যে কোনো সংকটের মধ্যে পড়ুক না কেন,
সরকারকে পথ বাহির করিতে হইবে, জনসাধারণেরও
উচিত রাষ্ট্রের সংকট বুদ্ধিগা আস্ত কঠোরে পালন করিয়া
যাওয়া। জাতীয় সরকার জনসাধারণের পূর্ণস্বত্বের
সমস্তার দিকেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সংকটকালে
তাহাদের হৃদয়ভিত্তিক ও সামগ্রিক চেতনার সংকট পার হইবার
পথ দেখিবে।

বর্তমান সরকারের চরিত্র ও নীতি পরিবর্তিত হওয়া
সরকার। সরকারী শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি এখনভাবে
প্রবেশ করিয়া ছেবে সরকারী কর্মসূচীকে ঘারা দুর্নীতি
দমন করা একত্রণ অসম্ভব বলা চলে। তেনে না দুর্নীতিকে
আশ্রয় করিয়া বাহারা বর্তমানে সমাজজীবনে চলাকরা
করিতেছে তাহাদের সহিত জাতীয় হিসাবে সরকারী
কর্মসূচীও ভিত্তি, আর তাহাদের হাতেই আর্থিক
সম্পদের শাসনকার আশিরা পড়িয়াছে। কামেই তাহারা
আর্থিক সংকটে পড়িয়াছেন।

দেশের অভ্যন্তরে সমস্ত সমস্ত লোক নিরস্ত ও বেকার
হইয়া পড়িয়াছে, পড়িতেছে। ইহাদের কাছে লাগাইবার
কোনো ব্যবস্থা নাই, তাই অভাবের তাড়নায় দুর্নীতির
আশ্রয় তাহারা ব্যতির্যক চেষ্টা করিতেছে; অথচ
হৃদয়ভিত্তিক ও হৃদয়গঠিত পথে জাতীয় উন্নয়ন-পরিচালনা
ইহাঙ্গিকে কাজে নিয়োগ করা হাইতে পারিত এবং
তাহার কল সর্বোচ্চভাবে ভালই হইত। একদিকে
জনসাধারণের মনের চাকলা, ক্ষোভ বিঘ্নিত হইত,
নৈতিক অবনতি ঘটতে পারিত না, তেমনি সরকারও
অনিশ্চয়তা লাভ করিতে পারিতেন, দেশও সমুন্নত পথে
আগাইয়া চলিত।

পল্লী জনপদের অবস্থা বাহির হইতে গ্রিক গ্রিক ধারণা
করা হাইবে না। ভিতরকার অবস্থা দেখিয়া জনসাধারণ
সরকারের প্রতি আস্থাশীল হইয়া পড়িতেছে।
রাষ্ট্রের প্রজামনের এই অনির্ভর অবস্থা সরকারকে
বহুলাংশে হইবে—জনমতকে উৎসাহ না করিয়া
তাগানের জায়া দাবী ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।
প্রত্যেক নাগরিক কি হিন্দু কি মুসলমান, কি অল্প কোনো
সম্প্রদায়ের লোক রাষ্ট্রের জন্য দীর্ঘকাল বোধ করিতে পারে
এমনতর আবেগতা ও কল্যাণী সরকারকে জনপদের
সহায়তা পড়িয়া তুলিতে হইবে।

আম খাও নাই, বস্ত্র নাই, কল্যাণ নাই, স্বতন্ত্র নাই
—কেবল 'নাই' এরই তালিকা বৃদ্ধি পাইতেছে। শিল্প-
সরঞ্জাম অভাবে ও হৃদয়গঠিত সমবাহিক সাধনের অভাবে
কিছুই পড়িয়া তোলা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইতেছে না।
ব্যক্তিতে নৈতিক বলের অভাব একান্তভাবে দেখা
হাইতেছে কলে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা কারো নাই।
আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার অভাবে ব্যক্তি নিম্নের
শক্তি কতটুকু, ও তাহার ঘারা সে কি করিতে পারে সে
বোধও হারাইয়াছে। এইজন্য ব্যক্তির উৎসাহনশক্তি
কমিয়াছে, ব্যক্তির কমিয়াছে বসিয়া সমাজেরও কমিয়াছে,
কলে শ্রমীবাদী রূপভুক্তিও নষ্ট হইয়াছে। ভিক্ষুক কেন?

আমাদের জন্য, এই 'নাই'-এর মধ্যেও যে-ব্যবস্থা করা
হাইতে পারিত সরকার তাহাও করিতে সক্ষম নহেন।

গঠনমূলক কাজের কোনো পরিচলনাই আজ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার জনসাধারণের সম্মুখে ধরেন নাই, পশ্চিমবঙ্গে বা ভারত ভোমিনিয়াম এতাবৎ কিছু ককক বা না ককক, পরিচলনাই অনেকই গ্রহণ করা হইয়াছে, আর দেখানো সরকার কিছু না করিলেও, বহু জনকল্যাণ সমিতি আছে, বহু গঠনমূলক সংস্থা আছে বাহাও এনিকেই যেতো প্রকৃত হইয়া এই অবকাণে অগ্রসর হইবেন। পাকিস্তানে এইরূপ সংস্থার অভাব। দুই একটি পাকিস্তানে সরকারী উদ্যোগবস্ত্র: তাহার বিবেশ কিছু করিয়া উন্নীতে পারিতেছেন না। জনসাধারণের মনকে অবহুক্ষে আকৃষ্ট করিতে সরকারী প্রচেষ্টা চাই।

নোয়াখালিতে গান্ধী ক্যাম্প এই প্রচেষ্টার, প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল, নিখুঁত আছেন। গান্ধী ক্যাম্পের পরিচালক ও বাংলার প্রবীণ গঠনকর্মী নেতা শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের পুনঃপুনঃ গঠনকর্মের ওপর ভরসা রাখা আসিতেছেন। এ বিষয়ে সতীশচন্দ্রের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান। পাকিস্তানের ভারত সরকার তাহার কর্মকমতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অপরিসীম নহেন। কিন্তু সরকারী উদ্যোগ এনিকে এত দেখে যে ভারতগঠনের ও রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন সরকারের দৃষ্টি একেবারেই নাই বলিব।

সতীশচন্দ্র কয়েকবার মেলা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন কিন্তু তাহাদের সহায়ত্বিত ও দৃষ্টি এনিকে টানিতে পারেন নাই। সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট কয়েকবার কয়েকটি পরিচলনাই দেওয়া হইয়াছে কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো লাভ পাওয়া যায় নি। জনসাধারণের প্রতি তথা রাষ্ট্রের গণকল্যাণের প্রতি সরকারের এই কর্তব্যহীনতা কেন? রাষ্ট্রের নক্তি, দল্লদ, শ্রী ও গৌরব বৃদ্ধি পাউক—ইহাই আশাদের কাব্য। সরকার যদি এমন কিছু করেন বাহার দ্বারা রাষ্ট্রের কল্যাণ ব্যাহত হইতে পারে বলিয়া মনে হয়, জনসাধারণ অবহুই তখন তাহার সমালোচনা করিবে ও সরকারকে পথ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিবে।

লোক আবারো অস্থির চকম হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার বাদিরে বা পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া যাউতে চায়। এখানে না খাইয়া, শ্রম করিতে প্রস্তুত থাকিয়াও যদি তাহাদের না খাইয়া থাকিতে হয় তবে এখানে বাস করিবার উৎসাহ গোষ্ঠে পাঠেন কেমন করিয়া। হিন্দুগণ তো বলেই—গান্ধী ক্যাম্প আছে বলিয়া এতকাল দর সহিয়া পড়িয়া আছি, কিন্তু আজ যখন পেটে মরিতেছি তখন অল্প পথ ঘেঁষিতে হয়, এবেশ ছাড়িতেই হয়। মূলমমান জনসাধারণ তো বহুকালের দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেই। তাহার আরো মূল্যকিলে পড়িয়াছে। তাহাদের জুগ ঘেঁষিবে কির পালা যায় না। তাহাও অনেকই ভারতীয় ইউনিয়নে কারের চেষ্টায় বাহির হইতেছে, তবে রাষ্ট্রীয় নক্তি-দল্লদ বাড়াইবার নিমিত্ত কাহারা চেষ্টা করিবে? এক, ঘেঁষিতেছি চিৎকার করুকই পড়িয়া থাকিবে আনুতুই লটকা, সে কিছু উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া। কিং তাহাদের অবস্থাও কি আজ সহ্য আছে? অতিবরণ, বস্ত্র, অসময়ে বরণ—এই প্রাথমিক ধরণে তাহাদের কপালও ডালা।

নোয়াখালিতে লাইসেন্স-প্রাপ্ত তাঁতের সংখ্যা পাঁচ সেরিয় হাজার হইবে। গড়ে গুটি কয়লা মোকদম দি এক একটি তাঁতের ওপর তীব্রবিশেষ কল্প নিউনটন হয়, পরিচালনা যায়, তবে বলিতে হয় দেখ লক্ষে উপর লোক আজ নিরস্ত্র ভিক্ষুক হইতে চলিয়াছে। সুতা পাইবার ওস্তাদ তাহাদের কতই না কাতর প্রার্থনা? কিন্তু কে ভাবিবে তাহাদের এই কাতর আবেদন? গবর্নমেন্ট নিকপায় হইয়া হুহুচাব অগম্য করিয়াছেন—তৎপত্তার কোনো নিশ্চয়ন ঘেঁষিতেছি না। জনসাধারণও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহাদের দাঁতেই যেহয় আছে তাহার প্রয়োগ জানিলে এই সংকটে তাহাদের পড়িতে হইত না। রাষ্ট্রকেও বহুর মস্ত অস্ত্রের বিকে ত্যাকটয়া থাকিতে হইত না। কলের দ্বারা উপর নির্ভর করিয়া থাকতেই এই সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে সরকারকে তথা জনসাধারণকে পড়িতে হইয়াছে।

অবশ্য সরকারকেই কেবল দায়ী করা চলে না।

কেননা জনসাধারণও তাহাদের কর্তব্য পালন করে নাই।

আজ কেবল কনের হাতের উপর নির্ভর না করিয়া হস্ত-
উৎসাহের সাহায্যে প্রতি প্রত্যেকের ঘরেই থাকিত তবে
এই সংকটে আমাদের পক্ষে হইত কি? আজ কাপড়
নাই—একখানা কাপড়ের ভেত্রে কিই না করিতে হইতেন,
ভিলিক সাংঘাত্য কাছ হাত পাতিতে হইত, কালোবাখারের
কলং গায়ে মাখিতে হইত, ডুবু পাওয়া যায় না। এই
দুঃসহ অবস্থান ও অবস্থা কেন আমাদের কপালে?
আমাদের জীবিকার সব ব্যবসাই তো আমাদের হাতেই
বহিয়াছে। তবু কেন আমাদের উৎসাহীনতার অভাব,
কেন আমরা পরদৃষ্টিশীল? কেন ভিক্ষণজীবী?

অন্যদের সাহায্য ছোট বয়সেরা কি উপেক্ষণীয়?
এক দমন চম্পাই ভারতের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত ছিল;
কিন্তু এখন গ্রাম ছিল না, শ্রেণী ছিল না, উহার মধ্যে
অসংখ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ও শৃংখলা
সম্পর্কে লোকের চেতনা ছিল না। মালিকের বিধি
চারে কাটুনিয়ের কাজ করিতে হইত; ইহাতে অসমত
হইবার কোনো উপায় ছিল না। গাছীরা সেই চরখার
মতোই স্বাধীনতা লাভের অল্পমাত্র শক্তির পরিচয়
পাইয়াছিলেন। তাই চরখা আর অসমতের মনে গ্রামে
মুক্তির বিরোধে জ্বলিয়াছে। উহা আজ স্বাধীনতার
প্রতীক হইয়াছে। শোষকের বিরুদ্ধে সজীব প্রকৃতি অস
হিসাবে উহাকে আজ দেখিতে হইবে।

গাছীরা মনের কথা এই যে ভারতের সমগ্র নরনারী
ও বালকশালিকা রাষ্ট্রের প্রতি অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে
যদি কিছুটা করিয়া হতা কাটে তবে তাহারা এত হতা
উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে যে তৎক্ষণাত ভারতের চল্লিশ
কোটি লোকের আবেগের বহাধির অভাব মিটিয়া যাইবে
এবং এ দেশের বহু কোটি টাকা ব্যাতিয়া যাইবে। এই
টাকা অসমতের ঘরেই সঞ্চিত বহিল, কোনো খনিজ বা
পুঁজিপতির হাতে বাইরা পড়িবে না বরং জনসাধারণের
স্বাধীনতার শক্তি বাড়িবে, রাষ্ট্রের উৎপাদনশক্তি ও
জনশক্তি বাড়িবে। একটুকরা বস্ত্রের জুতা, হাতের জুতা
বিলের দিক, বিশেষী রাষ্ট্রের দিকে 'হা পিভেন' করিয়া
জাকাইয়া থাকিতে হইবে না।

কিন্তু উহাই আসল ব্যাপার নহে। চল্লিশ কোটি
লোকের মিলিত চেতনের ফলে যে শক্তির উদ্ভব হইবে
তাহাই আসল। অল্প এমন কোনো ব্যাপক বিবেচনিক
শিক্ষাবলম্বন নাই বাহ্যিক আশ্রয় করিয়া দেশের সমগ্র
পরিবারগুলি ছোট ছোট ইউনিট হিসাবে আশ্রয় হইয়া
থাকাইতে পারে এবং অসমত শোষণ না করিয়া এত
অধিক সংখ্যক লোকের কাজের ব্যবস্থা করিতে পারে।
হতা বা কাপড়ের ফলে ইহা হইতে পারে না।

কলে কবেক লক্ষ শোষকের কাজের ব্যবস্থা হইতে
পারে যাহা, কিন্তু অধিকাংশ লোক আর্থিক বা পুঁজিপতি
বেকার থাকিবেই। অতীতে লোক মিথের জন্ত চরখা
কাটিয়াছে, উহার উদ্দেশ্য ও শক্তি লক্ষ লোকের ধারণা
বা অগ্রহুতি ছিল না—এই অগ্রহুতি চরখা পরিত্যক্ত
হইয়াছে।

আজ অসমত-শক্তি জানে বা সমাজে চরখা প্রবণ
করিতে হইবে। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যজানে চরখা নষ্টে
হইবে। যোদ্ধা চাই, চরখার অর্থ শোষণ হইতে মুক্তি।
ইহার অর্থ শক্তিরভাবে অহিংসা পালন, নৈতিক ভিত্তিমূলক
স্বাধীনতাপন। জনসাধারণ চরখার গঠন-শক্তির পরিচয়
পাইলে, উহার মধ্যে নিহিত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কল্যাণ
অসমত করিতে পারিলে চরখা ত্যাগ করিবে না। উহার
মধ্যে যে নৈতিক শ্রেণী বহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে
পারিলে শ্রেণীহীন সমাজ স্বাভাবিক ভাবেই গড়িয়া
উঠিবে, কলহ বা সংঘর্ষের দ্বারা উহাকে পাইবার চেষ্টা
করিতে হইবে না। চরখার নৈতিক ও সমাজ-সাংগঠনিক
শক্তি অসমতের মনে উজ্জ্বল করিতে পারিলে সমগ্র জনগণে
ভারতবর্ষই হইত শান্তি ও ঐক্যের অগ্রদূত।

বস্তুত এই ভাবনা কর্মজনের চিত্রপটে রূপ লইয়াছে।
কি সম্ভাব্য, কি জনসাধারণ সকলেই যেন নিরুপায়, যেন
অসমতের ও আত্মবিদ্যায় ও আত্মপতিতে বৈজ্ঞানিক
নয়। কেন এই বৈজ্ঞানিক, কেন এই শক্তিশীলতা? আমাদের
যেখানে পাই নৈতিক পন্থাই ইহার একমাত্র কারণ।
ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি আমাদের শক্তিকে অমনি সংকট
হইতে দিতেছে না—এইজন্যই আমরা শ্রেণী হারায়া

ফেলিয়াছি। সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে এই সম্পদ অবসর ভাবে যে একদিন আসিবে তাহা আমরা জানিতাম এবং জানিতাম বলিয়াই পুনঃ পুনঃ সরকারকে গঠনমূলক ও সমাজের নৈতিকবল বৃদ্ধির কাজে দৃষ্টি দিতে বলা হইয়া আসিতেছে; কিন্তু সরকারের আমলাতান্ত্রিক, জাতীয়তা-বিরোধী মনোভাববশতঃ উহার দিকে তাঁহারা দৃষ্টি যেন নাই, দৃষ্টি বেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করিতেছেন না।

পূর্ব বাঙলার মূল্যবান জনসাধারণের মধ্যেও চাকলা ও বিদ্যোক্ত দেখা বিরাজে। নোয়াখালির গ্রামে ৩০ টাকা চালের মধ্য দ্বিতীয় জনসাধারণের কঠোর অবস্থি নাই। কোন্‌ পথে চলিলে তাহাদের কঠোর অর্থ হইতে পারে, রাষ্ট্রেরও শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার ইঙ্গিত তো দেওয়াই হইয়াছে। পাক্ষীকী বিদ্যা শিখাছেন, গঠনমূলক কাজের কর্মী ও নেতারাও বিদ্যেছেন, কিন্তু কেবল সে-ইঙ্গিত মতো চলিতেছে না। না সরকার চলিতেছেন, না জনসাধারণ। সরকার কোনো দায়িত্ব নিতে না পারিলেও, জনসাধারণের হাতে যে এই বিপুল শক্তি নিহিত আছে এই চেতনাও তো লোককে দিতে পারিতেন? তাহাও যেন নাই।

কারিগরিগণ পাক্ষীকাম্প প্রকাশিত শাখিমিন দিল্লিগিতে মধ্যে মধ্যে প্রত্যেক সভাপ্রবাসু এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। সরকার অপরূপ হইলে জনসাধারণ বাধ্য করিতে পারিত তাহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু লোক নিষ্কৃতি, অসমর্থ। জনসাধারণকে রাষ্ট্রের কল্যাণে নিবৃত্ত করিবার অত্র বোধ্য শিক্ষাও তো দিতে হইবে তাহারিগণকে। সরকার সে-সবক্ষে কেন উদাসীন থাকিবেন?

সরকার যখন ব্যবস্থাবলম্বনে অক্ষম, তখন নিষেধ হইয়া বসিয়া না থাকিয়া। কৃষ্ণশিল্পের উপর নির্ভর করিয়া জনসাধারণের উচিত স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা দেখা। নিষেধ হত্যাণ হইয়া বসিয়া থাকার মতো নিরুদ্ভিত।

মার নাই। এই পথানুসরণে জনসাধারণের মনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি সঞ্চে নিরুদ্ভিত। আসিবে—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সংগে সংগে সরকারকেও প্রভাবিত করিতে হইবে—লোকের স্বচ্ছন্দ জীবন-ব্যাপনোপযোগী ত্রাণাদি সরবরাহ করিতে, শিল্পক্ষেত্রকে শিল্পসরঞ্জাম দিয়া কাজে নিয়োগ করিতে।

নোয়াখালির ৩০ হাজার তাঁতের বোয়া হতা চরখা উপর করিতে হইলে—দেড় লক্ষ কাটুনীও কাজ পাইবে। বর্তমান লক্ষটো ও সরকারী অক্ষমতার এই অর্থনৈতিক দ্বাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গী নইয়া আমাদেরিগকে চলিতে হইবে। তবেই আমরা বাঁচিব। জাতীয় সরকারের মর্যাদা ও সম্মান কতকটা রক্ষা পাইবে।

আমরা জাতীয় সরকার হইলেও, বর্তমানেও আমাদের এই সরকার প্রাগজাপ আমলাতান্ত্রিক নিয়মেই চলিতেছেন। উহা পরিবর্তন করিয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার লজ্জা প্রভাব আনিতে হইবে।

কালোবাজার পূর্ণাঙ্গমে চলিতেছে, সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা পালনে শৈথিল্য ও আমলাতান্ত্রিক প্রভুত্বপ্রাণ মনোভাব অপরিবর্তিতই রহিয়াছে, পরিষদের কঠোর ক্রন্দন তাহাদের কর্তব্যবোধ জাগাইতে পারিতেছে না। সরকারীরা মোটা মাহিনার দ্বিবি শ্রীভাসের বিলাস-বাষ্টি জীবন চালু রাখিয়াছেন এমিকে গরীবের ঘরে খান নাই, খাবার নাই, শিল্প বস নাই, গৃহ নাই, বহু নাই, বাটীরা খাইতে চাহে, কিন্তু কাজ নাই। বেকার অর্থায় ভিক্ষুক। সরকারের তৎপরতার কোনো পরিচয় নাই।

সরকার যখন নিষ্ক্রিয় ও অসমর্থ, তখন জনসাধারণকেই পথ বাহির করিয়া লইতে হইবে। আজ তাই জনসাধারণকেই বলিব—পরিবর্তিত। কমাইয়া আয়-নির্ভরতার শক্তি বাড়াইতে। বেকার নিয়ম হইয়া গিলে গিলে না মরিয়া বশাবে পাড়াইবার শক্তি অজ্ঞন করিতে হইবে।

ইতিহাস

প্রপুণের সরকার

শুভভারতা বপ্, বপ্, করে জলছিলো,
পূবের আকাশ রক্তরাগের আলপনার
তখনো রত্নী হয়ে ওঠেনি।

দীর্ঘদিনের দুর্গম পথবাকীরা
একটা বিগাট আলোড়নের পর
উষ্ম ভিমিরে পড়েছিলো।

তুঙ্গ ভূকানের মাঝে দুর্দৃষ্টি নিয়ে
ধারা দূতপথে হালের রক্ত ধরেছিলেন,
তাঁরা বিবেককে শেষ হ্রাস দিলেন
মতঃ ও প্রীতির মধ্য দিয়ে।

অন্ধকার আবার গাঢ় হয়ে এলো।
দুশা বছরের সজিত কয়রাগের বীজাণু
বা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়ে মিছেছিলো ওরা,
আত্মপ্রকাশ করলো বিরাট ব্যাদান মুক্ত করে।
শেষ শানিত অঙ্গি প্রতিফলিত হলো—
জাঁধারের মাঝে বিদ্রাঘ স্বলকার মত।
লাল তাহারকে ভামলা ধরণী হলো
কলুণিত। সীতা, হমহস্তীর বংশধরেরা
আহুতিক শক্তির শক্ত কীসে আবদ্ধ হয়ে
হান নিলো অন্ধকার গ্যাড গ্যাডে বস্তির মাঝে।
সমাজের স্রেষ্ঠ স্রেষ্ঠী হলো সমাজচূত।

সেই ঘন অন্ধকার মাঝে
দীপালোক নিয়ে এগিয়ে এলো সম্বাসী, একাকী।
তার সজীবন ময়ের পরশে প্রকৃতির হলো
রক্তোন্নয়ন অস্ত্রের বংশধরেরা।
শাস্তির বারি নিকর করলেন, ছাঙ্ক দুর্কল
দেহ নিয়ে ভারতের ঘারে ঘারে।
অভের পর প্রকৃতি হলো পথপথে।

বিশাল ও প্রাচীনতম মহীকূলের অর্ধাঙ্গ
খণ্ডিত হলো। ব্যাধানের তুল্লম্য প্রাচীর
নিমেষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হলো—হাজার
বছরের কুপ্তি, লভ্যতা ও শিকাকে অস্বীকার করে।
নিমেষের আত্মাকে বিসর্জন দিলো
ঈর্ষা ও স্বার্থের স্রোতবতীর মাঝে।

অন্ধকার একটু হালকা হয়ে এলো,
শুভভারতার দীপ্তি যেন এলো জ্বিলিয়ে।
বিরাট পূর্বের আত্মপ্রকাশের প্রথম স্তম্ভ
হলো সমাপ্ত। লভ্য ও প্রেমের সেই স্রেষ্ঠ পুজারী
দুত করে আত্মান জামালেন অহিংস মতে।
নব্যকণবহের সাথে সাথে স্বর্গালোকে
অবগাহন করলো দুষ্কর লগ্নোন্নয়ন।
অন্ধকার বায়ুহীন লক্ষ কারাগার থেকে
বেরিয়ে এলো বেশমুক্তকার একনিষ্ঠ পুজারীরা।
দিল্লীর বিরাট চত্বরে প্রতিফলিত হলো
লক্ষ্যাসীর মানসপুত্রের কণ্ঠস্বর।
লালকল্লার পত্, পত্, করে উড়লো
ভেরদা ঝাঙা।

বিরাট সূর্য্য পরিবেষ্টিত হলো একধান।
ঘন কালো মেঘে। দীর্ঘ দিনের দুঃখ
বিগড়িত সংসারে সকল আকর্ষণ ছিন্ন করে
হাজারে হাজারে আত্মার নিতে ছুটে এলো।
উৎকল অস্ত্রে আত্মান আনালো তাদের
চোরাকারবারী ও ধালালের সেলামী,
গণিতের নৃতন হিঙ্গব পত্তন করে।
ঐর্ষ্যের মাঝে লানিত পানিত শিকিত সমাজ
স্রবোণ লক্ষ্যনী আত্মীরে আত্মীয়তায় কুট
হয়ে, আত্মা নিলো বস্তির অন্ধকারে।

পূর্বের সাথে অকস্মাৎ সংঘাত হলো
নব্যত্বের। প্রকাত একটা বগ উভার মত'

ছুটে বেঁচে গেলে। নটরাজের প্রলয় নাচনে
সমস্ত পৃথিবী উঠলো কঁপে। স্বপানে
এলোকেই অলিত বলনে অট্টহাস্ত করে
উঠলো। হৃদিভেদে অন্ধকারের মাঝে স্তম্ভকণ্ঠ
ভারভের বৃক্ পতীর কাটল স্রষ্ট করলো।
দীর্ঘদিনের হুমহান ইতিহাসের প্রথমপৃষ্ঠা হলো।
মণীলিত। মুহমান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা
নির্ভীক হয়ে গেলো—কমতা লোভে বিস্মিত
সন্তানের পিতাকে হত্যা করা দেখে।

উদ্ধৃত অসি নিয়ে অন্ধকারে শিশুরাষ্ট্রকে
আঘাত কর্তে বাসবী পরাধন স্থণা

নারকীর শক্তি ব্যস্ত। দাত্তিক কমতালোভী
নরপতি, একজুর কমতার আশায়
উদ্ধাদের কবলে কলিত।

অন্ধম বিবেশী অহতবৎকাবি দেশহোত্রী
সহোদর আশিও অলীক আশায় উৎফুল্ল।

অন্ধকার বীরে বীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।
গুপ্তভাষাটা আত্মগোপন করেছে—হৃদয়ের
আড়ালে। উজ্জল স্বর্ণরশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে
শাভলা সূক্ষ্মার আবরণ চিরে।
সত্য, প্রেম ও সংগঠনের মন্ত্রপুত
অহবাজার রথ গিয়েএচলেছে—নিঃশব্দে।

ব্রজেন কাব্যের দার্শনিক ভিত্তি

ঐক্যলব্ধি
(পূর্বসংগতি)

এই হ'ল বিশ্ববের পান। নব যুগের নব দৃষ্টিভঙ্গী,
রবীন্দ্রনাথের নিম্নত্ব বর্ণন। এই পুস্তকের 'বৈশাখ' নামক
কবিতা "হে ঐশ্বর্য, হে রক্ত বৈশাখ", বলে যে দেবতার
বন্দনা করেছেন, তাও বিশ্ববের-ই বৈশিষ্ট্য—পতিশীল
সমাজেরই দেবতা—স্থিতির শাস্ত সৌম্য দেবতা নয়।

কিন্তু 'বলাকার পূর্ব পর্বত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল শান্ত,
সৌম্য, স্থিতিশীল দেবতা ও জীবনের দিকে। 'মানসী',
'সোনার তরী', 'চিডা', 'নৈবেদ্য', 'উৎসর্গ', 'খেদা',
'ঐতাল্লি', 'ঐতালী' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য হ'ল
স্থিতিশীল শান্ত জীবনের বন্দনা। স্রষ্টার দেবতার হাতে
মানব একটি জীড়নক মাত্র তাই কবি গেয়েছেন

"—আমি বহিভেদে

প্রাণে বোঝ শান্তিধারা, মনে হইতেছে

স্বপ্ন অতি সহজ সরল, কাননের

প্রশুট ফুলের মতো,"...

(স্বপ্ন, 'চিডা')

"স্বপ্নের পর" কল্পনা করে তিনি লিখেছেন

"আমিও হয়েছি শান্তি জীবনের ভুল নাতি
নব গেছে চুকে
রাতিদিন খুঁ খুঁ তরলিত স্বপ্নে
খামিগাছে বৃক্।"

এ হ'ল static সমাজের কথা, দাত্তিক ঐশ্বর্যবাদের
উপাসকের কথা, স্থিতির পূজারীর কথা।

কবির এই দৃষ্টিভঙ্গীর চরম বিকাশ হয়েছে 'ঐতাল্লি'তে।
কবি 'ঐতাল্লি' হ্রস্ব করেছেন সৌন্দর্য আত্মনিবেদন
দিয়ে

"আমার মাথা নত করে দাঁও হে তোমার

চরণ ধূলার তলে

সকল অহঙ্কার হে আমার "

ভূষাও চোখের মলে।"

পানে পানে তিনি তাঁর জীবন প্রভুর কাছে এই
আবেদন করেছেন

"তুমি যদি দেখা না পাও

করো আমার হেলা

কেমন করে কাটে আমার এমন বাসল বেলা।"

বানল বেলায় যে বিরহ তাঁর ভেগেছিল ঠিক সেই
বিরহই ভেগেছিল শ্রাবণের প্রভাতে—

“হে একা লখা, হে শ্রিরতন

উয়েছে খোলা এ ঘর মম

মধু দিয়ে ঝণন মম

যেহো না বোরে হেলায় তৈলে।”

দীন ভক্তের শেষ আবেগন নিয়ে ‘ঈশ্বরালির’ শেষ
কবিতায় তিনি লিখেছেন—

“দ্বিধা যদি শাস হ’ল, না যদি পায়ে পানী

স্নান বাধু না যদি আর স্নেহ—

এবার তবে গভীর করে ফেল গো মোরে ঢাকি

অতি নিবিড় ঘন তিমির তলে।”

ঈশ্বরালির প্রধান কথা দীনভক্তের আত্মনিবেদন ছিল
বলেই ক্যাথলিক কবি Yates এই বই-এর এত উক্ত হন
এবং অনেকটা এই ভক্ত ইউরোপে এই বইয়ের এত
আদর হয়।

তবুও ‘ঈশ্বরালির’ মধ্যেই একটা নতন স্তরের সন্ধান
পাওয়া যায়। সেটা হ’ল Pantheist বা সর্বঈশ্বরবাদের
স্বরূপ—কতকটা ভারতীয় অষ্টৈতবাদের স্বরূপ। বেদান্তের
অষ্টৈত দর্শনের মধ্যে একটা পৌরুষ ভাব আছে—তারই
বলে অষ্টৈতবাদী বলতে পারে—‘সিবোহং’। ইউরোপীয়
Pantheism-এর মধ্যে সেই ভাব নেই। সেখানে
আছে কেবল একটা Passive অহুত্ব। অষ্টৈতবাদে
একটা প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অহুত্বই হয়, Pantheism-এ
শুধু জ্ঞানের খেলা মাত্র। কথিত আছে বিখ্যাত হুজী
সাধক আবু ইবনে বিখ্যাত অভিজিহা (Avicenna)
নামক মুসলিম দার্শনিকের সঙ্গে আলোচনা করে
বলেছিলেন—“আমি যা দেখি, তা তিনি জানেন” এবং
অভিজিহা বলেছিলেন—“আমি যা জানি, তা ইনি
দেখেন।”

অষ্টৈতবাদী বা প্রত্যক্ষ অহুত্ব করেন, Pantheist
তা জানের দ্বারা বোঝেন।

ঈশ্বরালির Pantheistic স্বর অনেকটা এই স্তরের
“দীয়ার মাঝে অসীম তুমি বাঁধাও আপন স্বর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ, তাই এত মধুর।”

আবার নিবেদন করেছেন—

“তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করে লও যে মোরে,”
আবার পেয়েছেন—

“বিশ্ব-সাথে বোপে বেধার বিহারো

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমার-ও।”

ঈতিহাস ও ঈতিহাসি পেরিয়ে এর পর এল বলাকার
মুখ। সেই ভীক দীনভাবের পরিবর্তে চঠাং বেন কবি
বীর সাধক হয়ে উঠলেন। তাঁর ভীক ভাব কেটে গেছে,
পরিবেষ্টনের বন্ধন কেটে বের হবার সাহস তাঁর হয়েছে।
হয়ত তাঁর বিকাশের পক্ষে Nobel পুরস্কার পাওয়ার
প্রভাবও কার্যকরী হয়েছে। এত বড় প্রতিভাশালী,—
অবশ্য তিনি সবাই ভয়ে ভয়ে পা বাড়িয়েছেন তাঁর কাব্য
প্রতিভার উপযুক্ত সমাদর বলা না, এই অভিযোগ বা ভয়
তাঁর বরাবরই ছিল। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার প্রতিক্রিয়া
হিসাবে হয়তো তাঁর সেই ভয় কেটে গিয়েছিল—হয়ত
তাঁর কলেই কাব্যের বিধর বন্ধ নিবাচনে—unconven-
tional—অগত্যাগতিক হতে পেরেছিলেন। চঠাং মনুষ্য
ও অবুদ্ধের বন্ধনায় তিনি যেতে উঠলেন—

“ওরে নবীন, ওরে আমার ঈশা !

ওরে মনুষ্য, ওরে অবুদ্ধ
আধমরাদের যা ঘেরে তুই বাচা।”

এ হ’ল প্রত্যক্ষভাবে দ্বিভাষী সমাজের বিরুদ্ধে
বিত্রোহ, এ চ’ল ভাষার গান—বিদ্মবের বন্দনা।

স্বর্গীয় চাকলা ভবন কবির মনকে পেয়ে বসেছে।
এমন যে পটে ঈশা “হবি”—তাকেও তিনি তুলনা
করেছেন—“ওই দে স্বর্গ নীহারিকা”, তাঁর সঙ্গে।
আক্ষেপ করে বলেছেন

“এই ধূলি, এও সত্য হার !

এই তুমি বিশ্বের চরণতলে দীন
এরা বে অসির—তাই নড়া নবি।”

অস্থির বলেই এরা সবাই সত্য এই হ'ল কবির কথা।
এ বিশ্বের কোন কিছুই তার চোখে আর স্থির ও অদ্য
নয়। তাই ছবির কথাও বলেছেন—

“নহে নহে শুধু ছবি
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিম্নতম ক্রমশে।”

ভাষ্যমহলের মর্মর সৌধেও তিনি প্রাণের ঢাকলা
খেঁচেছেন ও'র মাঝেও “সম্রাট কবির” “ছবির ছবি”
ফুটে উঠেছে। তাই ভাষ্যমহল এক “নব মেঘবৃত্ত” তিনি
জীবনের ঢাকলা স্বরণ করে লিখেছেন—

“স্বপ্নের আবরণে মরণের ঘরে বাঁধে ঢাকি
জীবনের কে রাখিতে পারে
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।”

এর পর বলাকার “নবী” কবিতা। ইংরেজ কবি
Tennyson-এর Stream চলছে ধীর ময়রগতিতে,— সে
কণি ধরে বলেছে

“Men may come, men may go
I go on for ever.”

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নবী বেগবান, ক্ষিপ্ত, চকল। তার
চটুল ঢাকলা মুখ হয়ে কবি গেয়েছেন

“ওগো নদী, চকল অলসী

অলসী হুম্বরী

তব স্রুত্য মধ্যাকিনী নিত্য বরি বরি

তুলিতেছে শুচি করি

স্রুত্যমানে বিশ্বের জীবন।”

“নদীর” গতি তিনি শেষ করেছেন পিছনকে অগ্রাঙ
করে শুধু স্রুত্থের গতিতে,—

“তীরের নকশ তোর পড়ে বাক তীরে

ভাকাসনে কিরে

স্রুত্থের বাণী, নিক তোর টানি

মহাজোতে

পশ্চাতের কোলাহল হতে

অতল আধারে, অকুল আলোতে।”

এর পর “পুরবীতে” আর এক ছব বেলে উঠল অস্ত
তালে। এখানে কবি যেন আরও উচ্চতর দার্শনিক গুরে
উঠেছেন। “তপোভঙ্গ” নামক কবিতায় স্থির অস্থিরিত্ত
কথ বা dialectic ফুটে উঠেছে। তাই কবি গেয়েছেন—

“জানি জানি, এ তপস্রা দীর্ঘায়ি করিছে সম্মান
চকলের নিত্যমোতে আপন উদ্ভব অবদান

দ্রবস্থ উন্নাদে।”

স্থির তপস্রা রত শাস্ত্ররূপ যে চকলের নিত্যমোতে
তার অবদান খুঁজে বেড়ায়—এই ত হ'ল বিশ্রবের মূল
কথা। তাই ত কবি বলেছেন—“বিশ্রবী নবীন বীর
স্থিরের শাসন-নাশন।”

পুরবীর আর একটি কবিতার কথা উল্লেখ করা
যরকার। সেটি হ'ল ‘হুম্রভাত’। এই কবিতাটি
‘বলাকার’ পূর্বে লেখা, ঠিক বোমার দৃণ বলে যেটা
বাংলায় পরিচিত এটা সেই সময় লেখা—১৯১৬ অব্দে।
১৬ বছর পরে ‘পুরবীতে’ এটি এবং এট সময় লিখিত
আরও ছটি কবিতা চুকিয়ে দেন। বোমার মামলার দিনে
“কর বীশাখ” যে হুম্রভাতের বাণী জনেহিহন—তারই
প্রতিধ্বনি আছে এই কবিতায়। হয়তো বিশ্রব মাদকদের
অভয় দিবার অন্তই তিনি লিখেছিলেন—কিন্তু এতদিন তা
কোন গ্রন্থে স্থান দিতে কবি হৃদয় ভরসা পাননি। কবি
অস্তর দিয়েছেন—

“তয় নাই, ওরে তয় নাই—

নিঃসেবে প্রাণ যে করিবে নান

কয় নাই, তার কয় নাই।”

হুম্রভাতকে বরণ করে তিনি বলেছেন

“ভালোই হয়েছে প্রভাত এমসে

মেঘের সিংহবাহনে,

মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালবে

বস্ত্রশিখার-মহনে।”

এর পর ‘মহাবার’ কবি অব্যাহত কিরে গেলেম তার
Romantic কাব্যে। তার পর এল ‘বনবাণী’—প্রকৃতির
মধ্যে জীবনের বন্ধনা হ'ল এই গ্রন্থের প্রাণবন্ত। বলা যায়
Romantic Pantheism হ'ল বনবাণীর মর্মকথা।

এর পরে হুগ হ'ল গল্প কাব্যের যুগ। গল্প কবিতার ঠার প্রথম চেতার নিদর্শন পাওয়া যায় "পরিবেশ" গ্রন্থে। তখনও তিনি প্রকাশভরী ও বক্তব্য বিহীন সম্পর্কে ভীত। নতুন সৃষ্টির সাহস তখনো হয়নি। "পরিবেশে" পদ্ম ও গল্প দু'রকম কবিতাই আছে। "পলাতকার" যেমন তিনি পদ্মকাহিনী বা গল্প লিখেছেন, "পরিবেশে" তিনি গল্প কাহিনী বা গল্প লিখেছেন, এলব যেন কতকটা experimental.

তার পর এল 'পুনর্জন্ম'। ভাবে ও প্রকাশভরীতে এর অনেক কবিতাই Unorthodox—গতাহুগতিকতার বাইরে। একটু নমুনা দিচ্ছি—

"বেলা দুপুর
আকাশ কাঁটা করছে—
ধূ ধূ করছে মাঠ
তপ্ত বায়ু উড়ে যায় হু হু করে
খেয়াল থাকে না।"

আবার এই একই কবিতায় লিখেছেন—

"মনে আনবার অনেকদিন অনেকক্ষণ আহারো আছে
অনেক কথা অনেক দুঃখ।

তার কানের ভিতর ঘিষেই
নতুন বসন্তের হাওয়া আসে
রক্তনীলজ্বার গড়ে বিস্ময় হয়ে।"

এবার আদি একটা বিশেষ কবিতার আলোচনা করব। তার শেষ জীবনের কবিতার মধ্যে দুটা কবিতা আমার কাছে বিশেষ করে কবির বিশ্বদর্শনের পরিচয় দেয়। "পুনর্জন্ম" বইয়ের অন্তর্গত "শিশুভীর্ণ" এবং "পত্রপুটে" বইয়ের অন্তর্গত "পৃথিবী" নামক কবিতাঘরেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের পরিপাক বিশ্বদর্শন ফুটে উঠেছে। যে অন্তর্জ্ঞানের ভিত্তর দিয়ে মানব ইতিহাস বিকশিত হয়েছে—তদনুসারে এই দুই কবিতায় সেই অন্তর্জ্ঞানের ছবিই নিখিঁবদ্ধ হয়েছে, পৃথিবীকে লক্ষ্য করে তিনি "পত্রপুটে" লিখেছেন—

"হাজারবর্ষজী তুমি বীরভোগ্য
বিপরীত তুমি সলিতে কঠোরে

মিশ্রিত ভোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে
মাছেরে জীবন হোলাহিত কর তুমি হুগল ঘরে।"

অপর দিকে "শিশুভীর্ণে" লিখেছেন—

"অন্ধ কাল হুগলভারের গোলক ধাঁধায় ঘোরে
পথ অজানা

পথের শেষ কোথায় খেলাল নেই।

পাহাড়তলীতে অন্ধকার ভূত রাক্ষসের চক্ষুকোঠারের মত ;

তুপে তুপে মেঘ আকাশের দূক চেপে ধরেছে ;

পুঙ্খ পুঙ্খ কালিয়া শুভায় গর্ভে মংলায়

মনে হয় নিশীথ রাত্রের ছিন্ন অশ্ব-প্রতাল ;

বিগল্ডে একটা আয়ের উগ্রতা

কণে কণে আসে আর নেতে ;"

আবার কবি লিখেছেন—

"মেঘ সরে গেল

শুকভায়া দেখা মিল পূর্ব-দিশে

পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘশ্বাস

পল্লবময়র বন পথে পথে হিমোলিত,

পানী ভাক মিল শাখায় শাখায়।"

প্রকৃতির এই দুই বিরোধী অবস্থার মধ্য দিয়ে মানব-
যাত্রী চলেছে—কিন্তু পথ কে দেখাবে ?

"পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে

আমরা যাকে মেরেছি, সেই দেখাবে।"

তারপর ?

"তারায় আর পথ শুধায় না, তাবের মনে নেই মংলায়
চরণে নেই জ্ঞান্টি।

নৃত অধিনেতার আত্মা তাবের অন্তরে বাহিরে ;

সে যে কৃত্যকে উজীর্ণ হয়েছে

এবং জীবনের লীমাকে করেছে অতিক্রম।"

যাত্রীরা চলেছে, "রৌদ্রবন্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর
কাটল"—"গভ্যবেলায় আলো এখন জান" তাও কাটল,
রাত্রির অন্ধকারেও তার চলল, তারপর—

"প্রভাতের প্রথম আভা

অরণ্যে শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে সলয়ল করে উঠল।"

মন্দির ঘারে এসে তারা ভাকল

“মাতা হার খোলো।”

“না বসে আছেন তৃণশয্যা, কোলে তার শিশু

উষার কোলে যেন শুকতারা।

হারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরাধ স্বপ্নরশ্মি

শিশুর মাথার এসে পড়ল।”

কবি দিল আপন বীণার ডারে স্বকায়, গান উঠল আকাশে
“অয় হোক মাদুঘের, এই নবজাতকের, এই চিরজীবিতের।”

যে দ্বাত্রার স্বরূপে কবি বলেছিলেন—

“মাতার চারিদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল

সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ডিবিয়ে, পথহীন প্রান্তর

উজীর্ণ হয়ে।”

“এল নীল নদের ঘেন থেকে, গঙ্গার তীর থেকে

তিস্রতের বিমলজ্বিত অবিভ্যাক থেকে।”

সে দ্বাত্রার পরিসমাপ্তি হ’ল এই নব জাতকের
অনিবন্ধনে। মানব ইতিহাসের ক্রমবিকাশের এই ত
হ’ল মর্যকথা, এই ত হ’ল সংঘর্ষমূলক, বিপ্লবমূলক ক্রম-
বিকাশের কথা। আর ঠিক এই কথাই পৃথিবীর বন্দনার
বলেছেন—

“ভান হাতে পূর্ণ করো হৃদয়

বাস হাতে চূর্ণ করো পাত্র

ভোমার লীলাক্ষেত্র যুগরিত কর অটবিক্ষেপে ;

দুঃসাধ্য করো বীরের জীবনকে, মহৎজীবনে দার অধিকার।

জ্যেধকে করো দুর্ভূলা

কুপা করো না কুপাপাতকে।

ভোমার পাছে পাছে অন্ধর রেখেছো প্রতিমুহুর্তের সংগ্রাম,
কলে শব্দে তার জঘনাল্য হয় দার্বক।”

বেশী বাক্য উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি
করতে চাই না। যোড়ের উপর বলা দায়—এই দুই
কবিতা এক সঙ্গে পড়লে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদর্শন পাওয়া
যায়। Cosmic process—বিশ্ববিস্তার এবং historic
process ইতিহাসের ইতিবৃত্ত এই দুইয়ের মধ্যে যে একটা
মৌলিক বোণ আছে এবং সেই বোণ গ্রথিত হয়েছে

সংঘর্ষমূলক বিকাশের ভিত্তর দিয়ে—তার প্রকটতম
কাব্যিক অভিব্যক্তি হ’ল এটো দুই কবিতায়। এখানেই
হ’ল রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয়। Deist
রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে হয়ে উঠলেন পুরোপুরি
dialectic revolutionary—বাস্তবিক ইশ্বর ভূবে গেল
বিশ্ববিধানের মধ্যে। বেলে থাকে বলেছে কত—চীনা
দর্পনে থাকে বলেছে তা-ও (Ta-o) তারই নাম হ’ল--
the inexorable law of creative evolution।

আমরা সম্মুখে যে জিনিষ পৃথীত হয় নাই, তিনি
দিক-চক্রবালের অন্তরালে তাকে উপলব্ধি করেছেন—
এক- তারই গান গেয়ে গেছেন। তাই রাষ্ট্রনৈতিক ও
বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে তার একটা আদিক
(organic) বোণ স্থাপিত হয়েছিল।

একটা কথা মনে রাখা দরকার। স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ
বিশ্ববিস্তারকে তাঁর কাব্যের মধ্যে এনেছিলেন তখন তাঁর
স্বকল্প মন (creative mind) বিজ্ঞান হিসাবেও এর
অভ্যুদয়ন করেছিল। তাঁর “বিশ্বপরিচয়” এই সময়েই
লেখা। এই গ্রন্থেও তিনি বিশ্ববিস্তারের বিবর্তনের
দিকটাই বিশেষ করে দেখিয়েছেন। একনিকে আছে
নির্দয় ভাড়া-চোরা ও অপরদিকে আছে আদিহীন,
অন্তহীন ও ছেদহীন গতি। এরই মাঝে থাকে জীবন গড়ে
উঠেছে—ইতিহাস গড়ে উঠেছে। ঠিক যেন কানিড্যানের
ধরলোডের মধ্যে কমলদল ফুটে উঠেছে।

এর কিছুদিন আগে থেকে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে
স্বকল্প করেন। তাঁর ছবির রেখা হ’ল চকল, যেন ছুটে
বেকছে। তাঁর চিত্রের এই হ’ল বিশেষত্ব। তুলির
লিখনে তিনি সৌন্দর্যের চেয়ে ভাব-গতিমোড়ক ভাব
স্বষ্টি করতেই যেন চেয়েছেন। তাঁর ‘ছবি’ নামক বিখ্যাত
কবিতায় “ছবির” যে কল্পনা তিনি করেছেন, নিজের
অ্যাক্ত চিত্রেও সেই কল্পনাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।
সে ছবির তুলনা করেছেন তাঁর বেগবান অদয়
নীহারিকার সঙ্গে

“ওই যে হৃদ নীহারিকা

যারা ক’রে আছে তীক্ষ্ণ

আকাশের নীড়
ওই দ্বারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিরাছে আঁধারের দ্বারী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদের মত সভ্য নও!

যে গ্রাণ-চাকলা তাঁর কাব্যের অন্তর-বস্তু হয়েছে, সেই
গ্রাণ-চাকলাই তাঁর চিত্রের অন্তরের কথা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে Epstein এর ভাষণের কথা।
তাঁর খোদিত মূর্তির মধ্যে 'ভেনাস' (Venus) 'সৃষ্টি'
(Genesis), 'দিন ও রাত্রি' (Day & Night) নামক
মূর্তিগুলি সাধারণের কাছে যথেষ্ট লাঞ্ছনা পেয়েছে।
গ্রীক ভাষার মত এগুলি সূর্যর বা পৃষ্ঠ-মধুর নয়, তাদের
পেছের গঠন যেন বৈদিক সৌন্দর্যের অভাবে অতি নয়
হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্পর্কেও সে কথা
প্রযোজ্য, তন্মধ্যে এই যে তিনি বৌদ্ধভাবের নরনার
প্রশংসা করেন। কিন্তু রবীন্দ্র-চিত্রে ও এপস্টাইন-ভাষণে গ্রাণ-
চাকলা সমানভাবেই দেখা যায়। তাঁর 'সে' নামক
পুস্তকের ছবিগুলিতে এর পরিচয় বিশেষ ভাবে
পাওয়া যায়।

আবার রবীন্দ্রকাব্যে কিয়ে আসা যাক। ১২০৭
সালে তাঁর যে গুরুতর অসুখ হয়, তারপর তাঁর কাব্যের
আর এক স্তর দেখতে পাই। এই অসুখের পর যে সব
কবিতা গিয়েছেন—তাঁর প্রকাশভঙ্গীও পশু কবিতার
প্রকাশের চেয়ে অন্তরকম।

কবি গুলি সব ছোট ছোট—প্রকাশভঙ্গীও
ভেদোন্মীলন নয়। কিন্তু সম্ভবমূলক বিশ্ব-বিকাশের
ধর্মকে তিনি ত্যাগ করেন নাই।

"মানো এ বায়ে
দিশ বায়লের পালা এল
বোঝো বুগের বাকে।
স্বক হবে নির্মল এক নূতন অখ্যার
নইলে কেন এত অপব্যয়,
আসছে নেনে নিটর অন্তর

অন্তরেতে টেনে আন অস্তরেতেই হুত
তবিত্তের কৃত।"

('অগ্রমির্ন'—১৩)

আবার দেখুন অশু এক কবিতায়
"অগ্নানে বিহার বিলাসিনী
ছিন্নমত্তা, মূর্ত্তেই মাদ্রবের মূখ অশু মিনী'
বক ভেদি দেখা দিল আন্তরহারা,
মত প্রোভে নিম্ন রক্তধারা
নিম্নে করি পান।
এ কুৎসিত গীলা হবে হবে অবদান
বীভৎস ভাঙবে
এ গাণ গুণের অশু হবে
মানব তপস্বী বেশে
চিত্তভর শয্যাতলে এনে
নব সৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে
আমি সেই সৃষ্টির আদান
বোঝিছে কামান।"

এর মধ্যে ব্যক্তিক ঈশ্বরের রূপা ও সর্বকমতার কথা
নেই। বিশ্বজ্ঞতা বা বিশ্বভাগ্যবিধাতার বন্দনার কথা
নেই। এর মধ্যে আছে সংসারের ভিতর দিয়ে সৃষ্টির
বিকাশ, ইতিহাসের বিকাশ, মানব সভ্যতার বিকাশ।
বিশ্বকর্ষনের মধ্যেই স্বকর্ষনের বীজ নিহিত আছে, যে
"ছিন্নমত্তার" কথা তিনি এখানে বলেছেন, সমস্ত মানব
ইতিহাস সেই ছিন্নমত্তার বেলা, আশঙ্ক ও বিপর্যোডা
বা চলছে, তাও সেই ছিন্নমত্তার বেলা। কিন্তু
এরই মধ্যে কবি সব সৃষ্টির আদান জনতে
পেয়েছেন।

এই বিশ্ববিধান নির্মল ও অদল্ভা; এর মধ্যে কোন
খোদালী ঈশ্বরের দ্বারাদ্বার বেলা নেই। তারই ছবি
কবি দিয়েছেন—

"অগন্তের দারদানে বুগে বুগে হইতেছে জবা
হুতীর অক্ষয়া।

অগোচরে কোনখানে একটি রেগার হোলে তুল
দীর্ঘকালে অকস্মাৎ আপনারে করে সে নিদ্রণ

সাক্ষ্য ভাষণ এবং পূর্ণেরি আবেশে
কী অপূর্ণ স্রষ্টা তার বেধা বিবে শেষে
ওঁড়াবে অব্যথা মাটি, ধাঁধা হবে দূর,
বহিরা নৃতন গ্রাণ উঠিবে অস্থর
হে অক্ষমা—

স্রষ্টার বিধানে তুমি নক্তি যে পরমা
শাস্তির পথের কাঁটা তব পদপ্রান্তে
বিঘ্নিত হবে বার বার বার আঘাতে আঘাতে।”

দর্শনের ভাষায় বাক্য বলা হয়েছে—not
reconciliation but conflict of the opposites,
কবির ভাষায় তাকেই অক্ষমা রূপে বন্দনা করা হয়েছে।

এই ত হ'ল নবযুগের গান—যে' যুগের স্বর্গা এখনো
দিক-চক্বালের অহরালে আছে।

আর কোন পদ উদ্ধৃত করতে চাই না। আমার বা'
বক্তব্য তার সম্বন্ধে অনেক পদ উদ্ধৃত করা হয়েছে।
ব্যক্তিক ঈশ্বর থেকে কবি বিশ্ববিধানের পূজারী ও কবি
হয়েছিলেন। তার শেষ বয়সের কাব্যে যে বেবত্যাকে
তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন—সে হ'ল বিশ্ববিধান। সেই
বিশ্ববিধানই তার কাছে হ'ল বিশ্বদেবতা। সেই বিশ্বদেবতার
প্রকাশকে—অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা ও বিবর্তনকে
তিনি দেখেছেন সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে। ন্তিকিৎকে বৃত্তে
হলে গতিকেও বৃত্তে হই। আলোকে বৃত্তে হলে
অন্ধকারকেও বৃত্তে হই, অমৃতকে বৃত্তে হলে মৃতের
ভিতর দিয়েই বেতে হবে। তাই কবি “পৃথিবীকে” বন্দনা
করে বলেছেন—

“বিগরীত তুমি ললিতে কঠোর”

স্বাধার তিনি “পৃথিবী”কেই লক্ষ্য করেই লিখেছেন—

“এলে যুগে তোমার সন্মাহীন রণরঞ্চুমি
সেখানে স্তূতার যুগে ঘোষিত হই বিজয়ী প্রাণের বার্তা।
তোমার নির্ণয়তার ভিত্তিতে উঠেছে গভাত্যার অমর্তোরণ।”

এই ত হ'ল dialectics of life and of history —
এই হ'ল সংঘর্ষমূলক বিশ্ববিবর্তনের দর্শন।

রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা কবি,—মানবমন ও বিশ্বপ্রকৃতির বৃত্ত
ভাব, বৃত্ত সংগ্রাম, বৃত্ত অস্তিত্বিক সবই তার কাব্যে
স্বাক্ষরতর হয়ে ফুটে উঠেছে। বিশ্বের অন্ত কোন কবির
সঙ্গেই হয়তো তার কোন তুলনা হয় না। সংঘর্ষের
সর্বকালের কবির চেয়ে তিনি এই বিষয়ে স্রষ্টা। তবুও
মানবমন ও বিশ্বপ্রকৃতির লীলা নিয়ে কবিতা তাঁদের কাব্য
প্রতিভা যুগে যুগে স্রুতিয়ে তুলেছেন। কিন্তু মানবমন ও বিশ্ব-
প্রকৃতির এই সংঘর্ষমূলক অস্তিত্বিক রবীন্দ্রকাব্যের বিশেষত্ব।

কালিদাস বিশ্বপ্রকৃতিকে নিয়ে গেলেছেন—তার
কাব্যের ভিতর দিয়ে রূপে ও রসে বিশ্বপ্রকৃতিকে স্রুতিয়ে
তুলেছেন। জগতে এর তুলনা হুলু। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি
তার কাছে দ্বিধা, শাস্ত, প্রশ্নবোধের ও প্রশ্নবোধের
পরিণামক। প্রকৃতির মৌল্যায়িত গতিই তার কাব্যে
ধরা পড়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির যে একটা রূপ, পৌরুষ ও
সংহারমূর্তি আছে কালিদাসের কাব্যে তা' ফুটে উঠে
নাই। “ওতুলংহার”, “মেঘদূত” বা “রুম্যংলম্বনে” প্রকৃতি
শাস্ত, মৃদু, মধুর, মধুরগতি বা গতিহীন। হিমালয় তার
কাছে শান্ত ও মধুর—সেবদালা ও কিরীতের প্রিয়
লীলা-নিকতন। হিমালয়ের আর একটা রূপ তিনি
দেখেছেন—“স্থিত: পৃথিৱ্যা ইব মানবঃ।”—পৃথিবীর
মানবের স্তায় অবস্থিত—অর্থাৎ হিমালয়ের গ'তহীন
বিগটিত্ব ও বিনাশত্ব তার কাছে ধরা পড়েছিল। ও
অন্ধকার গহ্বরে বিবাক্ত সর্প ও হিংস্র পশুর চেয়ে বেশি
দেখেছেন আলোপকারী ঐশ্বর্যের দ্বারা আলোকিত ও
তবায় প্রশংসিত কিরীতীরা খেলা করেছে।

“লগচরান্নাঃ বনিত্য-লগান্নাঃ বনিত্য-লগান্নাঃ-মিথক ভাগঃ।
ভবন্তি যত্রোবধয়ে। রাজ্যামৃতল-পূরা স্বতঃ প্রদীপাঃ।”

কবিরাজ একদেবদানিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ
ভাবে মুক্ত ছিলেন। এইটাই রবীন্দ্রনাথের একটা উত্তেজ-
বোধ্য বিশেষত্ব। তাই পরিণত বয়সে তিনি হয়েছিলেন
বিদ্রবের কবি, বিদ্রবের দার্শনিক। বিশ্বের, জগতের, মানব
ইতিহাসের সংঘর্ষমূলক বিবর্তনই হল—বিদ্রবের দর্শন।

এই মর্শন তাঁর পরিণত বয়সের কাব্যে শুধুকে শুধুকে
ফুটে উঠেছে ; বর্ণে, সৌরভে, শোভায় এর তুলনা বিশ্বের
কাব্যে নেই। কিন্তু তাঁর যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি
অন্তরের অহুত্বিত্ব দিয়ে এই মর্শনকে লাভ করেছিলেন।
যে যুগ তখনও বহু দূরে সে যুগের সন্ধান তিনি কবির
দৃষ্টিতে পেয়েছিলেন।

“তাকে যেন, তাকে যেন, সিদ্ধ ঘোরে তাকে যেন,

আজি চারিদিকে ঘোর কেন কারাগার যেন ?”

তাই প্রাণের আবেগে বলছেন—

“ওরে চারিদিকে মের

এতি কারাগার ঘোর

ভাঙ, ভাঙ, ভাঙ, কারা—আঘাতে আঘাত কর।”

কিন্তু কেন ? এই ভাঙবার উদ্দেশ্যতা কেন ? এত
কেবলই ভাঙন নয়—

“অগতে ঢালিব প্রাণ

গাহিব করুণা গান

উৎসাহ অধীর হিয়া

স্বপ্নর সমুদ্রে গিরা

সে প্রাণ দিশাব, আর সে গান করিব শেষ।

তারপর কবির কল্পনা এর পরও গিয়েছে—

তটিনী হইয়া দাইব বহিয়া

দুবয়ের কথা কহিয়া কহিয়া

দাহিয়া দাহিয়া গান,

যত দেব প্রাণ বহে দাবে প্রাণ

ছুরাবে না আর প্রাণ।”

এই কয় পংক্তির মধ্যে কবি প্রাক-বিগ্নব যুগের রক্ত
আবেগের কথা বলেছেন, বিগ্নবের ভাঙনের কথা
বলেছেন, বিগ্নবোত্তর গঠনের কথা বলেছেন—তারপর
বিগ্নবজাত কল্পিত কথা বলেছেন, পরিণত বয়সে
বিগ্নবের এই রূপের সাধনা তাঁর কাব্যের স্তরে স্তরে ফুটে
উঠেছে।

‘জীবন-সংঘাত ও পরিণতি’

লক্ষ্মী দেবী

বাতব আশ ভিমির-ঈশ্বারে ঘেরা,
তাই— মনের দুঃস্বাদে আঘাত হানিয়া ফেরা,
বভাবে-অভাবে ক’রে কোলাহল,
গতিয় প্রেরণা হলো নিচ্ছল ;
চির-দুঃস্থ স্থানব প্রতিভা—
আত্ম-শাস্তিহারা,
মন যৌবনে মৃতের ধারণা—
শরণে আনিগ লাভ।।
প্রতিভা-বন্দী জীর্ণ-সংসারে,
জীবনে দানিল শত বহন-আশা,

উদ্বাহ আমি ! আঘাতে চিনিতো তাই

তিলে তিলে আশ রক্ত বিস্ম-ঢালা।

অনম, জীবন, মরণ-সমাপ্তিতে,

আমি চাই শুধু অনাগত দিনে—

আঘাতে রাখিয়া যেতে।

ভালো-মন্দর দিশাব-খাতায়—

চাওয়া-পাওয়া দিবে ভরেছি পাতায় ;

লব-সমস্তা হ’বে সমাধান,

প্রলয় ধ্বংস বৃকে,

কালের প্রবাহ দমাণি রচিতবে—

নব-পটনের হৃদে।

হোমার্গি

শ্রীমদভুজার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাহারা যে ক্রাসে আসিল না সেটা যেন অভ্যস্ত সহজেই ঘটিল। তাহাটা যেন এই যে আশ্রম যেন ছুটির দিন। সমস্ত ফুলটা খা খা করিতেছে। ঈশ্বরের যিনের মধ্যকার রোজে চারিদিক যেন কিম্ব কিম্ব করিতেছে, যমকা বাতাস নৃত্য ক্রাসের ঘরে ঘরে এক একবার এমিক হইতে ওমিক দিয়া বহিয়া বাইতেছে। অথচ ছেলেরা বোঝি—এ আপন আপন ঘরে কেহ শুইয়া ঘুমাইল, কেহ গল্প করিয়া, হাসিয়া কাটাইল। বাহার জন্ত তাহারা এই সমস্ত করিতেছে তাহার আলোচনা একবারও করিল না। সমস্ত মিনিবটকে তাহারা অভ্যস্ত সহজে লইয়াছে।

মাষ্টারদেরও তাই। তাহারা কেহ কোন কথা বলিলেন না, এ বিষয়ে একবারও আলোচনা করিলেন না। তাহাদের ডাবটা এই—বেশা থাক ছেলেরদের দৌড়ই কতদূর। হুই এক দিন ক্রাস না করিয়া বেই ক্রাস করিতে আগিবে অমনি একবার হইতে কাইনের ব্যবস্থা করিবেন। তাহারা ধ্যাননিয়মে ঘণ্টার ঘণ্টায় ক্রাসে গেলেন। ছেলে না থাকায় ফিরিয়া আসিয়া অফিসে আধার গল্প করিতে লাগিলেন। ফুলের ঘণ্টা ঘণ্টা নিয়মে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজিল, শেষে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়া ফুল শেষ হইল। মাষ্টাররা যে বাহার ঘরে ফিরিলেন। অশোক ও তাহার ব্যতিক্রম করিল না।

চন্দ্রবাবু কিন্তু মনে মনে বড় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সন্ধ্যাবেলায় অশোককে আপনার ভয়ের কথা বলিলেন—অশোক, আমার কেনন কেনন লাগছে! মাষ্টারদের আর সন্ধানন্দবাবুর ভাবগতিক অভ্যস্ত নরক। ছেলেরা মারাত্মক অবস্থায় পড়বে।

সন্ধ্যাবেলায় কিন্তু সন্ধানন্দবাবুর ওখানে মত্ত সভা বলিল। চন্দ্রবাবুও হাল্ধির ছিলেন। ফুলের ব্যাপার দেখিয়া সন্ধানন্দবাবু রহিয়া গিচ্চাছেন। চন্দ্রবাবু তাহাকে বার বার মিটমাট করিয়া লইবার জন্ত অল্পরোধ করিলেন।

সন্ধানন্দবাবু একেবারে উপেক্ষা করিয়া দে কথা উড়াইয়া বলিলেন। বলিলেন—দেখুন আপনি, দুটো দিন দেখুন, সব গায়েত্তা হয়ে যাবে।

তাহার পর এক একদিন করিয়া দুই দিন গেল। কিছুই হইল না। উত্তর পক্ষই নিরীকার। ছেলেরা মাষ্টারদের চোখের সামনে বেড়াইতে আর, খেল, হাসে, গল্প করে, লকাল সন্ধ্যা পড়িতে বসে। কিন্তু ক্রাসে যায় না।

চতুর্থ দিন। শিক্ষকরা অভ্যস্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সন্ধানন্দবাবু বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইই হইলেন। তিনি চন্দ্রবাবুকে দিয়া একটা সাক্ষীর আরা করাইলেন—যে যে ছাত্র আগামীকাল হইতে ফুলে ক্রাস করিতে না আগিবে তাহাদের নাম খাতা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে।

কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। ছেলেরা কেহই ক্রাসে আসিল না। সাক্ষীরবালা ছেলেরা পড়িল কি পড়িল না, বা পড়িয়া উপেক্ষা করিল—তাহাও শিক্ষকেরা বা সন্ধানন্দবাবু নৃকিতে পারিলেন না। সন্ধানন্দবাবুর নির্দেশে মাষ্টাররা পূর্ববৎ অবহেলায় লগে দেখিবার ভান করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর অবহেলা করা চলিল না।

ছেলেরা ট্রাইক আরম্ভ করিয়াছে নভেম্বরের পরল। হইতে। মাসের লাভ তারিখ মাহিনা দিবার শেষ দিন। দেখিতে দেখিতে লাভ দিন পার হইয়া ট্রাইক অষ্টম দিনে পড়িল, অথচ এক পরমা মাহিনা আদায় হইল না। মাসিক মাহিনা গ্রাফ আটশো টাকার উপর আদায় হয় অথচ আটশো টাকার আটটা পরমা আদায় হয় নাই।

মাষ্টারেরা চক্রে অন্ধকার দেখিলেন। তাহারা সন্ধানন্দবাবুকে গিয়া সমস্ত জানাইয়া বলিলেন—এ অবস্থায় ছেলেরদের লগে মিটমাট করিয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সন্ধানন্দবাবু তাহাদের তিরস্কার করিয়া বলিলেন—আপনারদের দুদিন মাইনে পেতে দেখী হচ্ছে আর ভয় পেয়ে নেছেন? আজ্ঞা কাল সাক্ষীর দিন যে যদি আগামীকাল থেকে ছেলেরা ক্রাস করেন না করে, যা

মাইনে মিটে না শেষ তবে আশের ছল থেকে ডাক্তরে
হেঁদা হবে। আর বোজিএব ছেলের বোজি থেকে
ডাক্তরে মিথে বোজি বন্ধ করে হেঁদা হবে। তাতেই
মি না হয় তখন পুলিশ এনে সব ঠাণ্ডা করে দেব।

এইবার মাইনেরা ভর পাইলেন। পুলিশ! আবার
পুলিশ! সন্ধ্যাবেলার চন্দ্রাবু অশোককে বলিলেন—
অশোক, সন্ধানম্বাবু পুলিশ আনবেন বলে ভর দেওয়াছেন।

অশোক শান্তভাবে বলিল—আপনি নিশ্চিত থাকুন
মাইনবন্দার পুলিশ কোনদিন এখানে আসবে না। আর
সন্ধানম্বাবু সে ভুলসাহস করেন না। আর একটা কথা।
ট্রাইব আর ডাক্তারের মধ্যে শেখ হবে—আপনি দেখবেন।
কারণ ছল অথরিটি গুটো বক কারণে Compromise
করতে বাধ্য হবেন। কারণ প্রথমতঃ তাঁদের হলোই এবার
ভাঙন ধরেছে। মাইনে আদায় না হওয়ায় মাইনরা
নাটক হার পড়েছেন। দ্বিতীয়তঃ সাধনে এগাহাল
পরীক্ষা এসে গেছে। এ অবস্থার একটা মিটমাট ছাড়া
অন্ত পথ নেই। আচ্ছ, আর এক পথ আছে—ছল ভুলে
দেওয়া।

কিন্তু অশোকের মত আশাস সঙ্গেও চন্দ্রাবু শেনিন
জারে দুমাইতে পারিলেন না। শুইয়া শুইয়া তিনি
বিছানাও ছটকট করিতে লাগিলেন। বাহাদের সাহচর্যে
তিনি এককাল কাটাইলেন তাহাদের মঙ্গল কামনাই
তাঁহাকে শুইয়া থাকিতে দিল না। বাহাদের মন্ত চিন্তা
করিতে করিতে অকালে—অকালে বৈকি—সবীর জীব
হইয়া গেল, বাহাদের মন্ত প্রথম যৌবনের আশর্শকে বার
বার পূর করিয়া শেবে তাহাকে প্রায় ত্যাগ করিতেই
কৃষ্ণ করেন মাই, বাহাদের কথা ও চিন্তা তাঁহাকে ঈষৎ
চিন্তাও ভুলাইয়াছে, কোন বৈষম্যের রূপ কল্পনা করিতে
পেলে আজ বাহাদের মূগ বার বার মনে ডালিয়া উঠে
তাহারাই যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে, মনে পড়াইয়া দিতেছে
—হেঁদাও আমদের যেন কোন অকল্যাণ না ঘটে! তিনি
বিছানা ছাড়িয়া বাহিবে আসিলেন। ভূসাহসিক কণ্ঠে
লিঙ্গ সন্ধানের মন্ত শিঙা। যেমন উল্লাস হন, তিনি যেমন
ভূসাহসী পুত্রের শয্যাতল বার বার শোপনে বেঁধিয়া আসেন

সন্ধান টিকই আছে; চন্দ্রাবু ভেমনই যোবাভিত্তের
জার প্রতিটি কণ্ঠবার ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া
ঘুরিয়া বেড়াইলেন। দুমাইতেছে—সব দুমাইতেছে।
নিশ্চিত নিস্তার বক্ষম নিঃশাস সব ঘরেই শোনা
মাইতেছে। তিনি নিশ্চিত হইয়া ফিরিলেন। তাঁহার
চিরকালের তত্ত্ব সন্ধান উহাঃ! বীর উহাঃ! শালী
উহাঃ! কতবড় বিশেষের সম্মুখে নিশ্চিত রহিয়াছে।
দুখাক! নিশ্চিত হইয়া দুখাক! উহাঃ! জবী হোক!
তাঁহার চোখ অনন্ত মৃত্যুতাব মধ্যে অন্ধকার রাত্রির
তারাভরা আকাশের দিকে চাহিয়া বার বার জলে ডুবিয়া
আসিল। আকাশের তাহার উজ্জলতার মত তাঁহার
চিরতরঙ্গ সহযাত্রীদেব যৌবন অলান থাকুক।

অশোকের কথাই ঠিক হইল। তাহার পর দিন
সকালে সন্ধানম্বাবু তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।
বলিলেন—মশাই, খুব শিকা হয়েছে। আপনার দ্বারা
সহকর্মী তাহের কথা আর বলবেন না—কাগুয়ার্ডের
একশেষ! এক মাসের মাইনে বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে
ঈশ্বর সাহস শেষ হয়ে গেছে। তার গুণও ঈশ্বর বলছেন—
সামনে ইয়ারি পরীক্ষা। কাজে কাজেই মাথা হেঁট
করে এইবার ছেলের সঙ্গে মিটমাট করতে হচ্ছে।
কম্প্রোমাইজ হয়ে থাক—আমি ছুনের সেক্রেটারীশিপ
থেকে রেজিগনেশন দেব। এরপর ঐ ঈশ্বর মন্ত
কাগুয়ার্ডের নিয়ে আর কাজ করা চলে না। আর
আপনি দেখবেন, আমি বলে রাখলাম, ছেলের দাবী
এরপর ক্রমে ক্রমে বাড়তে বাড়তে তাঁর পাওয়ার অবস্থায়
ধাঁড়াবে। বেশ কথা, ভাল কথা মশাই। আপনারদের
হাতে পড়ে আমার শেষ জীবনে খুব সন্ধানটা হ'লো
না হোক। মাইনবন্দের সব তেঁকে পাঠান। একবার
কথাবার্তা বলা দাক।

পরাক্রান্ত লজ্জাহত শিককের হল সম্মুখে আসিয়া
বলিলেন। অশোকও আসিয়াছে। সে একেবারে
শিঙনে চূপ করিয়া শান্ত হইয়া বলিয়া আছে। সে যে
এই পরাক্রান্ত পক্ষের কনিষ্ঠতম ব্যক্তি এই কথাটাই সে
তাহার মুখেও ভাবে বলিতে চাহিতেছে। সন্ধানম্ব

তাহাকে যেখিনিও কিছু বলিলেন না। আলোচনা আরম্ভ হইল। আজ আর তাহারও মুখে কথা নাই। কথা বলিয়া গেলেন কেবল সনানন্দবাবু। বলিলেন চন্দ্রবাবুকে তা হ'লে ছেলেদের সঙ্গে ডেকে কথা বলুন! ওদের চার্সে আমরা রাজী। কেবল মাইনেটি কমানো হবে দু'মানার জায়গায় টাকায় এক মান। কারণ তা না হ'লে চারিদিক দিয়েই অস্বিধে হবে। মাস্টারদের মাইনে বাড়িতে গিয়ে কমে যাবে, খুল কাণ্ডের টাকাও টান পড়বে, ডিপার্টমেন্ট থেকে কড়া রিমার্ক আসবে। এ ছাড়া আর সব রাজী। তবে আমাদের একটা টাঙ্ক আছে। সেটাও মানতে হবে। সেটা না মানলে ট্রাইক বত দিন খুদী চলুক চলতে দিন, আমি টাকা দেব। তারপর খুল উঠে বার যাবে। আমার টাঙ্ক হচ্ছে অশোকবাবুকে এই খুল থেকে চাকরী ছেড়ে চলে যেতে হবে।

সকলেরই বুক ধক করিয়া উঠিল। চন্দ্রবাবুর বুকটা বেশদূর মুচড়াইয়া উঠিল। অল্প সকলের বুকের খাতাটা অভিরিক্ত আনন্দের স্তম্ভ। কেবল তাহার কথা বলা হইল তাহাই কিছু হইল না। সে হাসিমুখে সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পাড়াইয়া বলিল—ছেলেদের সঙ্গে যদি compromise হয় ঐ টাঙ্কস্‌এ, তবে আমি চলে যেতে খিঁচা করবো না জানবেন!—সে নামিয়া চলিয়া আসিল।

ছাত্রদের সন্দের সংবাদ ও তাহার সঙ্গে অশোকের চলিয়া যাওয়ার সংবাদ ছাত্রদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। অশোক তখন আপনার ঘরে আসিয়া গায়ে লেশমুড়ি দিয়া অর্ধশায়িত হইয়া বসি পড়িতেছিল, শুটি তিনক ছেলে তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের যেখিয়াই হাসিমুখে অশোক উঠিয়া বলিল, বলিল—বন্দো। কেমন, জিত হয়ে গেলো তো?

জয়ের আনন্দ কিন্তু ছেলেদের মুখে সফ্যারিত হইল না। তাহারা বলিল—কিন্তু আপনি নাকি চলে যাবেন অশোকবা? এই আমাদের অস্ব হ'লো? আমাদের কত বড় হার হ'ল পরে বুঝতে পারব আমরা।

অশোক হাসিমুখে বলিল—আমি নিজেই চলে যাব।

সনানন্দবাবুর কথা নহ। আমি নিজে থেকে ইচ্ছা করে বেতে না চাইলে কারও সাধা ছিল না যে আমাকে এখান থেকে ডাড়া—এইটুকু ভেবে রাখ। আমি নিজেই যাবি। কেন যাবি তোমাদের বলে রাখি। আমার এমন কাজ আরও অনেক আশপাশ করতে হবে তাই! এখানে আটকে থাকলে চলবে কি করে? তোমরা রান ক'রো না—তাহার কঠোর কোমল হইয়া উঠিতে উঠিতে অকস্মাৎ অত্যন্ত ব্যবহারিক হইয়া উঠিল। সে বলিল—কাল তিনটের সময় compromiseএর চুক্তি হবে। আমি কন্সট্রামাইজ হ'লে যেখিনিগেনশ্‌ হবে। তোমরা সব ছেলেবা সাহনের মাঠে থেক সে সময়। আমি সকলের সঙ্গে দেখা করে যাব। আমি এখান থেকে কাল রাত্রেই চলে যাব। কেমন?

ছেলেরা খড় নাড়িল। বলিল—বেশ। কিন্তু কি হবে আমাদের আপেক্ষা? আপনি যাবেন আর ওরা আমার কন্সট্রামাইজ অস্বীকার করবে।

অশোকের চোখ দুটো তরঙ্গ নীপিতে জলিয়া উঠিল, সে টোটে টোট চাণিয়া বলিল—অস্বীকার করবে? এত শক্তি? তোমাদের পিছনে হেড মাস্টার যশাব আছেন। তার ওপর তোমরা নিজেরা আহ তোমাদের আমি এবার আশ্বিনিত্তরতায শক্ত মাস্টার ওপর ধাঁড় করিয়ে দিবে পেল্লাস। আমি জানি তোমাদের পাঠের তলার সে মাটি কোন ক্রমে লবে না। তোমাদের অধিকার যেখানে বখনই ক্ষুর হবে তোমাদের আশ্রমখান্য তখনই বাধা বেবে। নিশ্চিত থাক। যদি অস্বীকার করে তবে আমাকে বলে দিতে হবে না যে তোমরা কি করবে। তোমরা সে নিজেরাই ঠিক করতে পারবে। আজ যে তোমাদের জিত হ'ল, যেন রেখো, সেটা আমার জয় নয়, তোমাদের নিজেরা শক্তিতেই সেটা হয়েছে। আর আজ এই জিতটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হলো এই জয়ের কথা দিয়ে তোমাদের শক্তির পরিচয়; তোমার অধিকারের সীমা দেখা, তোমার মর্যাদার মাত্রা আজ সব ঠিক হয়ে গেল।

পরদিন অকস্মকমে সনানন্দবাবু, চন্দ্রবাবু, হরেন্দ্রবাবু,

শিক্ষকের পক্ষে, তাহারা বসিটাই ছিলেন। আর অপেক্ষা, কৃপাল ও কোষিকালের একটি ছেলে মিটমাটের ভঙ্গ অকস্মে আসিয়া পাড়ায়। চন্দ্রবাবু তাহাদের বসিতে বলিলেন। এ সম্মান ছেলেরা ইহাও পূর্বে কোন দিন পায় নাই। আর তে তাহারা ছাত্র নয়, একটি গন্ধ তাহারা।

অতঃপর লক্ষিত হইল। সমানবাবু একবার তাগজ দলের সম্মানে পড়িলেন। তাহাকে কুলের বাহিনী টাকার এক খানা কন্যার হইল, স্টুডেন্ট ইন্সটিটিউটকে স্বীকার করা হইল, শিক্ষকরা অকারণে ছাত্রদের গ্রহণ বা তিরস্কার করিতে পারিবেন না ইহাও স্বীকার করা হইল। সমানবাবু তাগজখানা অপেক্ষার দিকে অগ্রসর করিয়া গেলেন। কিন্তু অপেক্ষা লইল না। কৃপালকে লটতে বলিল। তাগজখানা কৃপাল তুলিয়া লইলে

অপেক্ষা দীর্ঘ দীর্ঘ পকেট থেকে একখানি কাগজ বাহির করিয়া চন্দ্রবাবু হাতে দিবে বলল—আমার রেজিগনেশন লেটার। আমি আজ রাতেই চলে যাব।

কাগজ শেষ হইয়া গেল। ছেলে দুইটি আগে চলিয়া গেল। অপেক্ষা দীর্ঘ দীর্ঘ চন্দ্রবাবুকে প্রণাম ও সমানবাবুকে নমস্কার করিয়া অকস্মে দরজার দিকে পা বাড়াইল।

চন্দ্রবাবু চোখ দুইটা ভলে ভরিয়া গেল। অপেক্ষার অপেক্ষায়মান নৃষ্টি চোখের ভলে আর উত্তার নম্র পড়িল না।

অপেক্ষা দীর্ঘ দীর্ঘ সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। নামতেই দেখিল কুলের তিন শত ছাত্র তাহারই প্রতীকার অকস্মে দিকে চাষিয়া নিঃশব্দে পাড়াইয়া আসে।

(আগামীবারে সমাপ্ত)

“গ্রামের অচেনা অতিথি”

শ্রীপতি চৌধুরী

চলিয়া সকলে ১৯২০ সনে যে দাপ্তর ভূমিকা চলেছিল সে কথা পৃথিবীর কারও অবগিত নেই। সুবিমলতা গ্রাম খানা ভূমিকার প্রকাণ্ড প্রায় অনশ্রু হয়ে পড়েছিল, দ্বারা বেঁচেছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রাশিয়ার একচ্ছত্র সম্রাট তার নিকোলাসকে বলশেভিকরা হত্যা কর্তে পারেনি, যদিও সম্রাটের হত্যার বিশদ বিবরণ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়ে, যথেষ্ট চাকল্যের সৃষ্টি করেছিল। এ খবর প্রকাশিত হবার এক বছর পর সম্রাট নাকি সত্য সত্যই সুবিমলতা গ্রামে এসেছিলেন এবং খুব সরল ভাবেই জনসাধারণের সঙ্গে বেলা বেশা করেছিলেন, আর এ ছাড়াও সম্রাট নাকি এমন একটি নিবন্ধন রেখে গিয়েছেন যা দ্বারা সত্যই প্রমাণিত হয় যে তিনি এ গ্রামে এসেছিলেন।

প্রথম যখন এই সুস্বত পত্রটি ঐ গ্রামের কয়েকজন

দাবারণ কৃষকের ও একজন গ্রাম্য কবির কাছে গুলেছিল। তখন আমি মোটেই বিশ্বাস কর্তে পারি নি। যথোক্ত আমি এই ধরনের গল্প শুনেছি এবং কাহানে যাবার সময় রেলের কামরাতেও অনেক দিক্‌তি রাশিয়ান ভ্রম্যলোকের কাছে এ গল্পটি শুনেছিলাম, তারাও বিশ্বাস কর্তে আর নিহত হন নি, পলায়নের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, কেউ বলেন আর নাকি দাবারণ কৃষকের পোষাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে হুড়ে বেড়ান, সম্রাটের বেশে কোন আশ্রমেও নাকি তাকে বেধা গিয়েছে।

পৃথিবী-বিশ্বাভ্যাস লোকদের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অবিশ্বাস গল্পের সৃষ্টি হয় এটিও ঠিক সেই ধরনের গল্প বলেই আমার ধারণা।

যথাস্থে দ্বিতীয় রিচার্ড ও দ্বিতীয় এডওয়ার্ড স্তম্ভ - দাতকের হাতে নিহত হয়েছিলেন, তাদের সেই সম্মানিত করার পরেও তাদের পলায়নের অনেক চমকপ্রদ গল্প তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল; এমন কি গভ মহাধর্মের সময়েও অনেকের ধারণা ছিল যে কিসের “দাম্পত্যের”

আহাঙ্কে ডুবে দারা দান নি তিনি নাকি আঁখানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। হুতরাং বাণিধার সম্রাটের নিহত হবার পরেও অনিশ্চিত কৃষকদের মধ্যে এই বহুবল পারণা হওয়া খোটেই বিচিত্র নয়, তারা লড়াই বিশ্বাস করেছিল যে তাদের “লিটল ফাদার” বেঁচে আছেন। কণ বিপ্লবের পূর্বে সম্রাটকে তারা “লিটল ফাদার” বলে সম্বোধন করত।

বে গ্রামা কবিতার কথা আগে বলেছি তার নাম ছিল লাচা, বয়সে তরুণ ও আর একটু খামখেয়ালী ধরনের। সে গভীর ভাবে বিশ্বাস করত গ্রামে বে অচেনা লোকটী এসেছিল সে স্বয়ং নিকোলাস দার ব্যতীত আর কেউ নয়, যদিও লোকটী নিজেই নিকোলাস আসলমাত্রো ভিচ নামে পরিচয় দিয়েছিল। যদি অন্য কোন ব্যক্তি লোক হত তবে তার কথাবার্তা এত জ্ঞানপূর্ণ ও অভিজ্ঞাত মূল্য হতো না। লাচা এখন আমাদের এই বহুস্তময় কাহিনীটী বলেছিল তখন সেখানে ফুলের শিক্ষায়িত্রী সেনিবে, মাইকেল এবং তার স্ত্রী এ্যানা উপস্থিত ছিল।

১৯২০ সনের শরৎকালে সবে মাত্র বরক পড়তে শুরু করছে, ভগলা নদীর জল তখনো জমে দানি, ভগলা নদীর অল্পগ্রামের মত লুমিমন্ড্রা গ্রামে হুঁতক প্রকট ভাবে বেলা দিল। দারুণ ধান্যভাবে গ্রামেতে মৃত্যুর দার ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল, চারিদিকে শুষ্ক অনাবার, দানি ও বিভীষিকা—মৃত্যুর চেয়েও দয়াদায়ক মৃত্যুর ভয়াল প্রতীক্ষা, কৃষকদের মধ্যে বে বরক জন খুব আশ্চর্যান ও লাহলী ছিল তারা আঁখানদের বিরুদ্ধে বীরব্রত লগে যুগুও করেছিল, কিন্তু এখন দেখলো যে না খেতে পেয়ে তাদের ক্ষেলেমেয়েরা শুকিয়ে বরে যাচ্ছে তখন তাদের বীরত্ব নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল। বে বহাঙ্গীরা তাদের গ্রামে প্রবেশ নিবেশ করেছে আজ তাকে বাধা বেতার দামর্থ-ইহুও কারও ব্রহ্ম না।

অক্টোবরের দ্বাদশমি একদিন বিকালে হঠাৎ একজন অপরিস্ফুট লোক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করল, গ্রামের কেউ দেখেনি কোন দিক দিয়ে সে এল। বরকের উপর তার প্রতিটি পায়ের ছাপ গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়ে দাঁড়িল, সেখানে কার্টের ছোট বাজীতে মেরিমা নামে একটি কৃষক

মেয়ে বাইরের দিকে একমনে তাকিয়েছিল, যার তার মুখ, মা, টাইকানের আক্রমণে মৃত্যু পথ-বাজী, মাকে এই দারুণ দয়ণা থেকে মুক্তি দেবার জন্য মেয়েটি গুপিবানের কাছে প্রার্থনা করছিল, হঠাৎ তার বগের সামনে দিয়ে একজন অজানা লোককে চলতে দেখে সে চমকে উঠল, লোকটী দীরে দীরে গ্রামের ফুলের দিকে এগিয়ে দাঁড়িল, লোকটির দাঁড়ি আছে গভীর চোপ ছুটি খেন দুখে ভাঙ্গাফার, পরণে তার পিপকিনের একটি ছিন্ন কোট, পায়ের জুতো ছোড়াও অত্যন্ত জর্জর, তার চলার ভঙ্গিতে ক্রান্তির ছাপ পরিষ্কৃত হয়ে উঠছিল। মেয়েটী প্রথমে অবাক হয়ে গেল, বর্তমান যার এ গ্রামে বাইরের কোন লোক আসে না বরক দারা বছরের ফসল এখন এখানে মঠ হয়েছিল তখন অনেক লোক দার অবস্থানে বাইরে দিবেছিল, কেউ কেউ নৌকাতে ডলগা নদী পার হয়ে অন্য জেলায় গ্যাছে এবং কেউ কেউ ট্রেনে মন্ডো চলে গিয়েছিল কারণ অনেকের দারগা ছিল যে মন্ডোতে নাকি সব কিছুই পাওয়া যায়, কিন্তু তারা হুঁতটা দাবার আশায় বাইরে গিয়েছিল তারাই আবার বলেছিল জর্জর ক্যাললার বেহ নিয়ে লপরিবারে কিংবে আসতে লাগল, না খেতে পেয়ে পথে অনেকে দারা গেল, দুঃস্থ টাইকান বোগের আক্রমণেও অনেকে মৃত্যু যুখে পতিত হলো, এর চেয়ে নিজেই বাজীতে দীরে দীরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করাও বোধ হয় অনেক ভাল, কিন্তু এখনও একজন অচেনা লোক কেন এই অতুত ভাবে গ্রামে প্রবেশ করল? মেরিমা ভীত হয়ে পড়লো—তার মনে হতে লাগল এ আর কেউ নয়, বরক মৃত্যু তার নিজেই রূপ পরিগ্রহ করে এ গ্রামে প্রবেশ করেছে। হঠাৎ লোকটী একবার মেরিয়ার দিকে তাকাল। মেরিয়ার মনে হলো মৃত্যু ব্রি তাকে ডাকছে কিন্তু আর কোন অন্তি না করেই লোকটী সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো, কিছুদূর দাবার পরেই মাইকেল তাকে দেখতে পেল।

মাইকেল সে লম্ব তার গলটিকে দেখতে বাইরে এসেছিল, দাবার অভাবে তার গলটীও মরতে বসেছে। কিন্তু দাবা কণির পাতা মাইকেল পক্ষ অগ্র রেখেছিল, কিন্তু

তাও সুবিধে পেছে এ মস্ত প্রতিবেশীদের অনেক কথাট
তাকে শুনেত হঠাৎ তারা বলাবলি করত "দেটা এমন
নয়তান আমাদের ছেলে যেহেঁরা যখন না গেয়ে যাবে তখন
ও গলকে বাগদাও, ওকে নরকে পড়ে মরতে হবে"—একট
মাইকেলও মাঝে মাঝে ভীত হয়ে পড়ত । গ্রামের অস্ত
লোককে বক্তিত করে গলকে বাগদান বোধ হয় অস্ত্রাধ,
তপস্যান এ মস্ত বোধ হয় তাকে শাস্তি যেহেন, কিন্তু সে
কি করবে ? একটা মাত্র গলর দুখ দিয়ে সে কি করে
গ্রামের শিকড়ের বাগদাবে, সে নিজেও কখনও এক কৌটা
দুখ বামনি, তার শিক্ত লগ্নানগুলোকেই বেতে যিচ্ছে,
যেহেঁর টুকরো আর ভূমি দিয়ে তৈরী কষ্টী কন্যাগত কদিন
ধরে থাকে তাও খুব সামান্য পরিমানে, গলটাকেও আত
স্তিহি সিন হল কিছু বেতে দিতে পারে নি, সে ঠিক করেছ
গলটাকে এবার মেয়ে কেলবে । এর মাস দিয়ে বেশ
কিছু দিন কাটিয়ে বেগুনা বাবে, কিন্তু গলর দুটি কল চোখ
মেখেই সে কেনন অতিক্রান্ত হয়ে পড়ে কিছুতেই ওর শরীরে
সাব্যাস করতে পারেনা অথচ এই দুর্ভাগ্যের জন্ত মাঝে
মাঝে লক্ষিত হতো, সেদিন মাইকেল বনকে দূত করে
গলটাকে হত্যা করতে পেল, বাইরে এসে পাড়াত্তেই দেই
অচেনা লোকটী তার নম্রের পড়লো । গলীর বিশ্বয়ে মাইকেল
তাকে দেখতে লাগলো, লোকটী ধীরে ধীরে তার মিকে
এগিয়ে আসতে থাকে, তার চোঁট দুটো নড়তে থাকে,
বোধ হয় কথা বলতে চেষ্টা করে, তারপর মাতালের মত
টলতে টলতে খুব খুবয়ে ধরকের উপর পড়ে গেল ।
মাইকেল প্রথমে বিশ্বয়ে হতভাক হয়ে ধার, তারপর বিরক্ত
হয়ে বলে উঠে "লোকটা কি কোথাও মরতে যায়না পেল
না ? নিজেই বাড়ীতেও তো মরতে পারত, এ লোকটী
নিশ্চয় সেই বয়সায়েশ বয়স, আবার দেখে পলুতা করার
জন্তই এখানে এসে মরছে, কিন্তু লোকটীর কাছে গিয়েই
মাইকেল চবকে গেল, না, এ তো বয়স নয় একে তো
এর আগে কখনো দেখিনি, লোকটীর হাত দুটা দেখে সে
আরও বিস্মিত হলো, এমন নরম দুগল দুটি হাত তো
সাধারণ লোকের হয়না, লালস চোলা বা হাতুড়ি পোটা হাত
কি এমন স্বন্দর হয় ! দুসের মাঠায়ণী সেনিয়ার হাত দুটাও

অনেকটা এমনি নয় । তারপর খুব মনোযোগের সঙ্গে
লোকটার মুখবানা দেখতে লাগলো ; গলীর চোখ চোখ
ও দীর্ঘ নাসা দেখে তার মনে হতে লাগলো একে যেন
আর কোথাও দেখেছে, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে
পারছেনা কোথাও অনেক আগে দেখা যন্ত্রের মত একটা
অস্ত্র ছবি যেন তার চোখেই লামনে তাগতে লাগলো,
লোকটীর পরনে কলকের পোষাক বটে । কিন্তু চেহারা
যোটেই কলকের মত নয়, অনিশ্চিত মাইকেলের কাছে
সমস্ত ব্যাপারই হেরানীর মত মনে হতে লাগলো, প্রথমে
মনে হলো এ কোথায় কোন লাল ; পরক্ষণেই মনে হোল
বীতথুটের চেহারার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে কেনন যেন
তব করতে থাকে মাইকেলের, ভীতারা কষ্টে চীৎকার
করে তার স্বীকে তাকে "এানা এানা"—

স্বামীর এই অস্বাভাবিক কষ্ট শুনে এানা তাকাতাকি
বেরিয়ে আসে, তারপর মাইকেলকে জিজ্ঞাসা করে—

"গলটাকে যেতে কি ? ওরে বাবা ! এ আবার
কে ?" তারপর লোকটীকে ভাল করে দেখে বলে "আহা !
বেচারী যবে বেঁচেছে"—এানার বোকামীতে বিরক্ত হয়ে
বলে "না না, মরেনি, হেঁখ না এখনও নিঃশ্বাস পড়ছে,
চল একে আবার ধরাধরি করে যবে নিয়ে বাই, বরকের
মধ্যে পড়ে থাকলে ও মাঝা বাবে "

"পাগল হয়েছ না কি ? যবে নিয়ে একে কি বাগদাবে
গনি ?"

"গলটাকে মাঝব, এর মাগে মাস দুয়েক বেশ কেটে
বাবে, আমার বাড়ীর লামনে লোকটা যদি মরে তবে
ভগবানের অভিপাত আমাদের উপর পড়বে, ঈশ্বগির পা
দুটা ধর, নইলে মেয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব ।"

দুজনে ধরাধরি করে লোকটীকে ঘরের তিতর নিয়ে
এল, তারপর মাইকেল ও এানা কল নিঃশ্বাসে লোকটীর
মুখের মিকে তাকিয়ে রইল, ওদের মেয়ে ক্যান্টিনকা
বিছানার উপর শুয়ে ছিল, বাবা ও মাকে একজন অচেনা
লোককে এ ভাবে ধরে আনতে দেখে সেও প্রথমে হতভব
হয়ে গিয়েছিল, তারপর বিছানা থেকে উঠে আস্তে আস্তে
মায়ের কাছে এসে পাড়াল । এই ছোট্ট মেয়েটী লোকটীকে

দেখে বর—“এ অনেকটা আমাদের সিটল্ কাহারের মত দেখতে। তারপর কোম্বারের দিকে তাকাল, দেখলে কিছু-দিন আগেও সম্রাটের একখানা ছবি ছিল, বসপেটিক সৈন্তেরা সম্রাটের সমস্ত ছবি বাজেয়াপ্ত করেছে কিন্তু ক্যাটিনকা খবরের কাগজ থেকে সম্রাটের একখানা ছবি কেটে লুকিয়ে রেখেছিল, তাত্তাতাডি উঠে গিয়ে সে ছবিটা খুঁজে বের করল তারপর লোকটির খুঁবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলো, মেঘেচীর পাগলাবো দেখে মাইকেল বলল—“যেহেটা আত বোকা, তারপর না খেতে পেয়ে পাগল হয়ে গেছে।”

এানা বলে—“আমরাও যে এতদিন পাগল ছইনি এই আচর্য।”

মাইকেলও হঠাৎ কোতুহলী হয়ে মেয়ের হাত থেকে ছবিখানা নিয়ে লোকটির চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলো—রাজপোষাকে সজ্জিত আরের ছবি, হুম্বর করে ছাটা ঝাড়ি, অযত ছুটি চোখ, খজের মত দীর্ঘ নাসা, পেট ট্যানিশলসের রত্নখচিত তারকাটা তার বুকের উপর জল জল করছে, টোন্টের কোণে বৃদ্ধ হাসি কি হুম্বর! কিন্তু যে লোকটি অচেতন হয়ে ঘরে পড়ে আছে তার অঙ্গে রাজপোষাক নেই, খুঁবে হাসি নেই, বুকের উপর তারকাটাও নেই, কিন্তু তবুও ছবির সঙ্গে এ লোকটির চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য সে দেখতে পেল—হঠাৎ এানা কি ভেবে লোকটির সামনে হাটু পেড়ে বসে তার জীর্ণ কোম্বার ভেতর হাত লুকিয়ে দিয়ে কি খেন খুঁজতে লাগলো, উত্তরনার তার হাত খর খর করে কাঁপছে; তারপর খুঁজতে খুঁজতে লোকটির গলার কাছে একটা নৃশ্ব রূপার চেন আবিষ্কার করলো, খুব ভোরে চেন ধরে টান দিতেই মূল্যবান রত্ন খচিত একটা তারকা বেরিয়ে এল, তখন সম্রা হায়েছে, ঘরে তখনও আলো জ্বলেনি, বাইরেও বন্যধনে নীরবতা, আর বস্তুর চোখ বার শুধু বরফ, পরিহ্র অশিক্ষিত কৃষক বন্যপতির মনে হলো এ রত্ন স্বয়ং ভগবান ওদের উপহার দিয়েছেন, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ক্যাটিনকা চীৎকার করে বলে উঠে—“সত্যি, সত্যি ইনি আমাদের সিটল্ কাহার।”

এানা পাগলের মত বলতে থাকে—“না, না, দীপ্তপুরে নিজে স্বাধ আমাণের গরে এসেছেন।”

এমন সবদ লোকটি বৃদ্ধ স্বাধিনাদ করে একবার চোপ মেলে তাকাল, এানা ভয় পেয়ে তাত্তাতাডি আবার কোম্বার ভেতর তারকাটা লুকিয়ে রেখে দিল। লোকটি কপালের ওপর হাত রেখে বৃহকণ্ঠে বলল—“উঃ; মরণ আর কতদূর?”

কৃষক বন্যপতি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিছু করবার সামর্থ্যটুকুও বেন ওদের নেই। ক্যাটিনকা তখন তাত্তাতাডি জল এনে তার খুঁবে চোখে ছিটিয়ে দিল।

লোকটি দীর্ঘ দীর্ঘ ক্যাটিনকার দিকে তাকাল, তারপর খুব আন্তে আন্তে বল—“কে তুমি বাছা! আমার ছোট যেহেটৌই কি তুমি?”

ক্যাটিনকা বলে,—“তুমি আমার সিটল্ কাহার।”

“বারা আমাকে ভালবাসে তাদের সকলেই তো আমি সিটল্ কাহার।”

একটু সাহস লক্ষ্য করে মাইকেল বলে—“সত্যি করে বলুন আপনি কে?”

বিস্মিত নম্রেন সে মাইকেলকে দেখতে লাগলো, কোন উত্তর দিল না, তারপর সমস্ত শক্তি লক্ষ্য করে কছুইয়ের ওপর চাপ দিয়ে মাথা একটুখানি তুললো, ঘরের চারিদিকে চেয়ে একটু জোরে বললো—“আমার নাম নিকোলাস আলেকজান্দ্রোভিচ। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়াই আমি। জানি মরণ আবার ঘনিরে আসছে, তোমাদের খুব বেশী কষ্ট দেব না—এ গ্রামের নাম কি বলতে পার?”

মাইকেল ও এানা কোন উত্তর না দিয়ে নির্জাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, অব্যবহিল ক্যাটিনকা—“এ গ্রামের নাম দুবিভক্তা”—কিছুক্ষণ খেন তারপর বল—“জানো সিটল্ কাহার আর ছবির বাণে এ গ্রামের সকলের খাবার সুবিধে বাবে, তখন আমরা সবাই মরে যাব।”

কপালে করাঘাত করে লোকটি বলল—“হাংরে হতভাগা হাশিরা।” তার চোখ দিয়ে জল পড়তে জ্বালাল, ক্যাটিনকা উঠে গিয়ে এক টুকরো রুটি নিয়ে এল, মিনতি করে তাকে বল—“খাও সিটল্ কাহার।”

চোখের জল মুছে বৃহৎ হেসে উত্তর দিল—“আমি এখানে মরতে এসেছি বাছা! খেতে আসিনি।”

“কিছু ভূমি না খেলে আমি কাঁদব।”

“আমার যে মোটেই খিদে পারনি বাছা।”

এ কথা শুনে ক্যাটিনকা ছুপিয়ে ছুপিয়ে কাঁদতে লাগলো। লোকটা তখন কটার ছোট্ট একটু টুকরা মুখে নিয়ে বসে—“সব লোক যদি তোনার মত হতামু হত তাহলে হুমিয়ার মুখে বলে কিছুই থাকত না।”

মাইকেল তখন লস্করনে বসে—“আমাদের যা কিছু আছে সবাই মিলে আমরা খাব দিষ্ট কামার।”

অভিকৃত হয়ে সে উত্তর দেয়—“আমি বলছি ভগবান তোমার ভাল করবেন।”

সেইদিন রাতে আলেকজান্দ্রোভিচ, যখন গভীর ঘুমে অস্তিত্ব হতে আছে তখন মাইকেল অতি সতর্কপে— একটা লঠন হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এল তারপর বরকের উপর দিয়ে হেঁটে লাচার বাড়ীর দিকে এসিয়ে যেতে লাগলো। মাটা নিকে একজন কবি, বাড়ীতে শুধু তার মা ও পল্লু বোন লিভিয়া থাকে। প্রথমে লাচার আধিক অস্বস্তা খুব সঙ্কল ছিল, বরাবর মতোতেই থাকতো। লাচার বাবা সন্ত্রাসের সৈন্য বিভাগে বড় অফিসার ছিলেন, বিস্ফোরকের হাতে তিনি নিহত হন। মতোর বাড়ীখানাও বলশেভিকরা দখল করে, লাচার মাও ঘনিষ্ঠভাবে রাশ-পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এরপর থেকে তারা গ্রামের বাড়ীতেই বাস করছে। বয়স দশিও তার মাত্র তুড়ি কিন্তু এ বয়সেই সে গ্রামের একজন গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠেছিল। এখানকার সোভিয়েট একেট ভ্যাভিসির, ইহুদী প্রনবার্ণ ও তার বেয়ে লারাকে গ্রামের সবাই ভয় করে চলত, শুধু ‘ভর’ পেত না লাচা, সোভিয়েট সেনারা এখন গ্রাম থেকে সমস্ত ফল মস্কোতে চালান দিচ্ছিল তখন একমাত্র লাচাই তাদের বাধা দিয়েছিল, একমু কিছুদিন তাকে তেলও খাটতে হয়। একমু গ্রামের কারও কোন বিশ্বাস হলে লাচার সঙ্গে পরামর্শের ক্ষমতা ছুটে আসত, মাইকেলও তাই লাচার কাছে যাচ্ছে তার সম্বন্ধে খবর করার জন্য এ লোকটা লভাট রাশিয়ার সন্ত্রাস্ট কিনা, সে

যখন লাচার ঘরের লামনে এসে পৌঁছাল তখন লাচা মোমবাতির সামনে বসে একগানা বই পড়ছিল, তার পল্লু বোন বিছানায় শুয়ে আছে আর মাথার কাছে বিয়দ মুখে বসে আছে তার মা, দরজা খুলতেই বাইরের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ঘর প্রবেশ কর্তে লাগলো, তাড়াতাড়ি দরজা আবার বন্ধ করে মাইকেল বলে—

“তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে লাচা।”

“কি কথা মাইকেল, কোন হুমসংবাদ নয় তো?”

“হুমসংবাদ নয়! একটা অস্বস্ত বাপার, এখনও নিজেই চোখে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।”

লাচা স্নিগ্ধ করে—“কি যেবেছ ভূমি?”

মাইকেলের মনে হোল ঘোরের লামনে কথাটা বলা বোধ হয় ঠিক হবে না, যদি জানামানি হয়ে যায় তবে রক্ষে নাই, বলশেভিকরা হুমসংবাদের মত ওদের গুলি করে মারবে। তারপর বলে—“কিছু মনে করো না কথাটা আমি গোপনে বলতে চাই, একবার বাইরে আসবে কি?”

“না, না, বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা, ভূমি নির্ভর আমার মা বোনের লামনে সব কথা বলতে পার।”

একটু ইতঃভ্রত করে মাইকেল বলে—“আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি।”

এ কথা শুনে লাচার মা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে—“ক্যাটিনকার কোন অস্বস্ত বিষয় নয়তো।”

মাইকেল তখন বলে—“আমি একজন অচেনা লোক এসে আমার ঘরের লামনে প্রবেশ করে পড়ে, আমার তখন তাকে ঘরের ভেতর নিয়ে যাই; ক্যাটিনকা আরের একগানা ছবি লুকিয়ে রেখেছিল, ভূমি বিশ্বাস করবে না ছবির সঙ্গে লোকটার চেহারার একটুও তফাৎ নেই, হুমসং এক রকম, আমার স্ত্রী তার কোটের নীচে একটা খুব দামী পাথরের তারাতাও বেঁধেছে, সন্ত্রাস্ট নিশ্চয় মারা যান নি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে লোকটা আমি এসেছে সে আমাদের সন্ত্রাস্ট ছাড়া আর কেউ নয়।”

মাথা ঘরে বেন প্রচণ্ড বিশ্বাসের একটা ডেউ খেল গেল, সব কটি লোক নিশ্চয় হয়ে বসে বইল। শুধু

নিঃসৃত্য ভঙ্গ করে লাঠা মাইকেলকে জিজ্ঞাসা করল—
“তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে মাইকেল?”

“দারিদ্র্য আর অনাহারে মাথা খারাপ হওয়া মোটেও
বিচিত্র নয়, কিন্তু আমি মনে গ্রোধে বিশ্বাস করি আমার
যেবে আশ্ব বে এসেছে সে আমাদের রাজা আর নিকোলাস
বৈ আর কেউ নয়।”

পরম আগ্রহে লাচার মা এবং বোন মাইকেলের
প্রতিটা কথা শুনছিল, তাদের সুখে চোখে যীরে যীরে
ভরের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠে—মাইকেলকে সাবধান করে
লাচা বল—গ্রামের আর কাউকে এসব বোলাও না,
সোভিয়েট এজেন্ট ভ্যাডিমারের কানে একথা গেলেই সে
মস্তোতে ধবংস পাঠাবে, গুলী পেয়ে তোমাদের সবাইকে
মরতে হবে।”

পরদিন লাচা সকালেই মাইকেলের বাড়ীতে গেল,
আলেকজান্দ্রোভিচ তখন ক্যাটিনকাকে নিয়ে গল্প
শোনাচ্ছিল, দরজার কাছে যেতেই মাইকেলের সঙ্গে দেখা
হল। লাচা জিজ্ঞেস করল—“গল্টাকে ঘেরছে?”

“না তবে আজই যাব।”

অচেনা গলার আওয়াজ শুনেই লোকটি লাচার দিকে
তাকাল তারপর কৃষ্ণ হেসে বল—“সুপ্রভাত! কমরেড,
যেখেন লুনিমত্কাতে কেমন হুন্সর একটি ছোট্ট বচ্ছ
পেয়েছি।”

“আপনি কোথেকে এগেছেন জানতে পারি কি?”
জিজ্ঞেস করে লাচা।

“তা জানি না, আমি শুধু ঘুরে বেড়াই, বাবার এত
অভাব সবেও গ্রামের লোকেরা আমার বেতে দিচ্ছে।
এ সব দেখে বচ্ছ আনন্দ হয়, নিরাশার অন্ধকারে যেন
জ্বালোর রেখা খুঁজে পাই।”

“আজ না হয় কাল আমাদের সবাইকে মরতে হবে,
কোন আশাই আর আমাদের নাই।”

“তোমাদের সঙ্গে মরতে পারলে সত্যি আমি
আনন্দিত হবো, আমার ভ্রাতামাণ জীবনেরও বোধ হয়
শেষদিন ঘনিষ্ঠে এসেছে।”

“কিন্তু তরুণ বরষে আমি তো মরতে চাই না।”

“আমি বৃদ্ধি, পৃথিবীর সমস্ত কৃষ্ণেরা তরুণদের বকনাই
করেছে, তারাই বৃদ্ধবয় করে তারা পৃথিবীতে ছড়ায় যুদ্ধের
আগুন আর তরুণদের ঠেলে দেয় দারিদ্র্য আর অনাহারের
মুখে, পুরুষপুষ্করের পাণের শাস্তি পাষাৎ পদপদেরা, আমিও
কৃষ্ণ, জানি আমারও পাণের কণ তরুণদের বোধ হয় বচ্ছ
মিয়েই শোধ করতে হবে, কিন্তু আমার পরম লাক্ষনা যে
ক্যাটিনকা আমার ক্ষমা কোরেছে, কি ভাবে আমি
নির্যাত্তিত ও বঞ্চিত হয়েছি, তা জানলে ভগবানও বৃদ্ধি
আমাকে ক্ষমা করবেন।”

পাষণ স্তম্ভির মত নিম্মল হয়ে ঝাড়িয়ে আছে লাচা,
ঠাৎ যেন মনের সূচতা এক মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে গেল,
তার সামনে তাড়াতাড়ি গিয়ে হাটু পেড়ে বসে পড়ে,
দম্বলনয়নে শুধু বলতে লাগলো—

“লিটল কাদার। আমার লিটল কাদার!”

আর্তনাদ করে সে পিছিয়ে যায়, ক্যাটিনকাকে কঁপে
থেকে নামিয়ে লাচার কাছে আবার এগিয়ে এসে, লাচার
মাথার সম্বন্ধে চুপন করে বলে—“ও নামে আমাকে ডেকে
না, আমি শুধু তোমার কমরেড, বুদ্ধি নবনারীর
আহ্বাণে আমি ভাগ বসাই, এই হৃতিক ও মহামারীর
রাজ্যে আমার চেয়ে বঞ্চিত আর কেউ নেই, তারা আমার
আগে মরেছে তারা সবাই ভাগ্যবান, তারা রাশিয়ার
সকল পাণের বোঝা বৃদ্ধি আমাকেই শুধু বইতে হবে।”

লাচার কথার বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করি—“সত্যি
কি তুমি বিশ্বাস করেছিলে যে সেই লোকটাই নিকোলাস
জার?”

লাচা উত্তর দেয় “সত্যি আমি বিশ্বাস করেছিলাম,
এতটুকু সন্দেহও আমার ছিল না।”

“কি করে তুমি এত নিঃসন্দেহ হয়েছিলে?”

“ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে একবার জারের প্রাসাদে
আমি গিয়েছিলাম, জারের টিক বা কানের নীচে একটা
তিল দেখেছিলাম, এ লোকটার টিক সেই জাহগাঘ একটা
তিল দেখেছি।”

নিকোলাস আলেকজান্দ্রোভিচের সঙ্গে পরিচিত হবার

পর সাচা মাকে মাঝেই তার সঙ্গে আলাপ কর্তে দেত, অতঃ পরে সন্তে তার প্রতিটি কথা সে শুনত, প্রাণ রোভই সাচা দেখতে পেত লোকটা ক্যাটিনকাকে তোলে নিয়ে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ বীর ও মহাপুরুষের গল্প শুনাচ্ছে, গল্প বলার সময় মাকে মাকে বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বেবিয়ে আসত, কখনও দুটি হয়ে উঠত উজ্জল, কখনও বা মরণ হতাপণে লুপ্তিত হয়ে পড়ত তার মন, মাঝে মাঝে কি এক গভীর ভাবে সে উদ্ভ্রাণ হয়ে পড়ে, কেমন যেন সে ধানগরীর হয়ে ঘাট, শুধু অস্বাভাৱ শিক্ত করতে থাকে তার কপোলকে, হঠাৎ সখিং ক্রিরে গেয়ে সে বলে—“হা কি যেন বলছিলাম?”

তার ধান-গরীর মূর্তিকে বিব্রত করবার সাহস কখনও হয়নি সাচার। মাইকেলের বাড়ীতে সবাই বধন বেতে বসত তখন সবচেয়ে কম বেত আলেকজান্দ্রোভিচ, এত কম বেতের কি করে সাহস বে বেতে থাকতে পারে সেটা সবাইর কাছে একটা বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দাঁতাল। সন্তীকে বেতের বধন রাখা কথা হলো ছোট্ট একটুকরো। নামসও সে বেতে পারলো না, কতীর ছোট্ট একটা টুকরো মাংসের কোলে ডিঙিরে সে খেল, এর বেশী সে দেখতে পারলো না, এত কম বেতের সে হুঁসল হয়ে পড়তনি, সে বেশ স্বচ্ছন্দেই হাটতে পারতো।

পরদিন সকাল থেকেই খুব তুষারপাত আরম্ভ হোল, বাইরে তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস। সেদিন সন্ধ্যায় সাচা তার মা, বোন ও সোনিয়ার সঙ্গে এই লোকটার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল, অঙ্ককারেই তারা আলাপ কচ্ছে, বোমবাড়ী সব ছুরিরে গেছে, এমন সময় দরজায় কড়াবাত শুনতে পাওয়া গেল, আলাপ থামিয়ে সাচা প্রহর করে—“কে?”

উত্তর এল—“আমি ককির নিকোলাস আলেকজান্দ্রোভিচ।”

ব্যস্ত হয়ে উঠে এসে সাচা সরজা খুলে দিল, লঠন হাতে ধাক্কিরে আছে সেই রক্তনয় লোকটা, লঠনের দুই আলোয় তার রাশকীর দীর্ঘবেহ উজ্জল হয়ে উঠেছে, সাচার মনে হোল যেন স্বর্ণের কোন সেবদূত শাস্তির

বস্ত্রিকা হাতে এসেছে এই অশান্তির রাজ্যে, লোকটা তখন বলে “ক্যাটিনকা! বড় অসুস্থ, খুনের শিকড়িডী সোনিয়া নাকি এখানে আছে? আমি তাকে নিয়ে যেতে এসেছি।”

“আমার নাম সোনিয়া, চলুন এখন যাচ্ছি।”

“আমি জানতুম তুমি বাবে, তোমরা যে মাংসের আত, মাংসের বিপদে তোমরা কি না গিরে থাকতে পার? শুগবান তোমার মঙ্গল করবেন।”

হঠাৎ তীব্র আন্তর্য্য গুনে সাচা পেছন ফিরে তাকায়, তার বুঝা যা হুঁসলবেহ নিয়ে উঠে ধাক্কিরেছে, টলতে টলতে লোকটার শায়ের সামনে বলে পড়লো, চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে তার বুক, অস্টুত্বেরে শুধু সে বলতে লাগলো—“লিটল্ কাবার! মি লর্ড! আমি তোমার চিনেছি, আমার কুীর আর ধর হলো। লিটল্ কাবার! আমার লিটল্ কাবার!”

লোকটা বল—“আমি শু তোমাংয়ের শ্রাষ্ট নই, আমি ককির, আমি মহাপণী, আমার পাণের মত নই, তাই আমি আমি সমাচ্চাত, জাতিচ্চাত।”

তারপর সোনিয়াকে নিয়ে সে চলে গেল, সাচা তার মাকে ধরে বিছানার কাছে নিয়ে গেল, তখনও তার মা, আপন মনে বলছে—“গতি! গতি, এ আমাংয়ের শ্রাষ্ট, আমি চিনেছি, সেই চেহারা, ঠিক সেই কণ্ঠস্বর।”

কিন্তু মাইকেলের স্ত্রী এ্যানা কথাটা গোপন রাখতে পারলো না, একজন ছজন করে এঁামের সতলেই কথাটা ছেনে ফেল, পরদিন সকাল না হতেই কৌতুহলী নয়নাভীর জনতা মাইকেলের বাড়ীর সামনে ভীড় করতে লাগলো, কেউ কেউ আবার জানালা দিয়ে উকি দিতে লাগল। ওদের ভেতর একজন বলে—“তগবান আমাংয়ের প্রাণীনা শুনেছেন, আমাংয়ের আর না খেয়ে মরতে হবে না আমাংয়ের বাচাবার মজই শুগবান ঠকে পাঠিয়েছেন।” আর একজন বলে,—“উনি একবার স্পর্শ করলেই ক্যাটিনকা ভাল হয়ে বাবে!”

ছোর গলায় আর একজন বলে উঠল—“গতি, উনিই আমাংয়ের লিটল্ কাবার।” “তবে অত ছোরের চৈচিও না জানাখানি হলে বলশেভিকরা ওকে ঘেরে কেনাবে।”

এই সব গুত্তরোল শুনে ভ্রাতৃমিয়ার সেখানে উপস্থিত হোল, একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তার সামনে গুণাগুণে দুখ ফেললে বলে—“আমাদের সম্রাট কিরে এসেছে, এবার সব বলশেডিককে ফাঁদিয়ে বাটে খুলতে হবে।”

“কি বলছিস তুই”—সঙ্গে বলে উঠে ভ্রাতৃমিয়ার।

বৃদ্ধার কথা চাপা দেবার জন্য আর একজন এগিয়ে এসে বল—“ও কথা বিশ্বাস করবেন না। কয়েকজন, বুড়ো হয়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে।”

ভ্রাতৃমিয়ারে সামনে এসে আব একজন স্ত্রীলোক চীৎকার করে বলে—“ও যা বলেছে সব সত্যি, এ গ্রামে আমাদের শিল্পী কান্ডার এসেছেন, সেদিন আর তার পরতান সহচরগুলোর এবার আর রক্ষে নেই।”

দমক দিয়ে ভ্রাতৃমিয়ার বলে—“পাম, তোরা বেই গোলামাল করলে সবাইকে ছেলে পুরে রাখব।”

সেখান থেকে চলে এসে ভ্রাতৃমিয়ার আরও ভাল করে খোঁজ নিল, তারপর ইহুদী মেয়ে সারাকে সঙ্গে নিয়ে মাইকেলের বাড়ীতে গেল। ক্যাটিনকার মাথার কাছে বসে সোনিয়া তখন ঐকথ্য তৈরী করছিল, হুস্ত টাটফাস বাধির আক্রমণে অচেতন হয়ে আছে ক্যাটিনকা। মাঝে মাঝে তীব্র বহুণায় তাঁর সর্শ্বসরীর কঁপে উঠছে, কাছে বসে তাঁর মা নীরবে অশ্রুবিগর্জন করছে, এমন সময় ভ্রাতৃমিয়ার ও সাধা কোন কবর না দিয়েই হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করল, তাদের দেখে সনাকোতে মাইকেল বল—

“কি ঘনে করে কয়েকজনে?”

“তোমার বাড়ীতে কে এসেছে আমি দেখতে চাই।”

“এই যে আমি” বলেই আলেকজান্দ্রোভিচ, উঠে পাড়ালেন।

“কে আপনি? আপনার নাম কি?”

“আমার নাম নিকোলাস, গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে বেড়াই আমি।”

“কোথেকে এসেছেন আপনি?”

“গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে শুধু মরণকে খুঁজে বেড়াছি, তুও ত আমার মরণকে পেলায় না।”

হো হো করে হেসে ভ্রাতৃমিয়ার বলে—

“এ গ্রামে কিছুদিন থাকলেই মরণকে আপনি খুঁজে পাবেন, সবাই মরণে এখানে।”

সাধা বলে উঠল—“কি বিকী গল্প বলছিস, আমার এখানে ভাল লাগছেনা, চল বাইরে যাও, এ লোকটা নির্দোষ।”

এবার কিছুটা নরম হয়ে ভ্রাতৃমিয়ার বলে—“এখানে আর আপনি বেশি দিন থাকবেন না, সবাই আপনাকে জ্বর বলে ধরে নিয়েছে, এরা ভো আঁধা জানে না যে জ্বর কবে মরে ক্ষুদ্র হয়ে গ্যাছে, কাজেই এখানে আপনি থাকলে এদের বিপদ ঘটতে পারে।”

“আমি আর এখানে থাকবো না, সত্যি আমি চলে যাবো, বিপদের মুখে এদের রেলে রেব না।”

এমন সময় গ্রামা টেঁচিয়ে কেঁষে উঠল ক্যাটিনকার জীবনের আশ্রয় চিরদিনের মত খেমে গেছে, কেঁট্ট দ্বন্দ্বনেহটী ভড়িয়ে ধরে অন্নের খাবার শুধু সে কাঁহতে লাগলো, নিকোলাস উঠে গিয়ে কখনোই মাইকেলের মাথায় হাত দিয়ে শান্তনা দিতে দিতে বল—“কেঁসো না ভগবান বরা করেই একে নিয়ে গিয়েছেন।”

সেদিন শঙ্কায় ঘরন মাচা সোনিয়াকে নিয়ে আসতে গেল তখন বরজার সামনে শুধু নিকোলাসকে দেখতে পেল ক্যাটিনকার দূতনেহের পাশে বসে মাইকেল, গ্রামা ও সোনিয়া প্রার্থনা করছিল।

কিছুক্ষণ নির্ঝাঁক পেতে নিকোলাস বলে—“আমার ছোট বন্ধুটি আমার আগেই চলে গেল। এই বিশাল পৃথিবীতে আমি আবার একা।”

“বলতে পারেন গিটল কান্ডার! আমাদের এ দুঃখের দিন কবে শেষ হবে? আমাদের বাচাতে আবার কবে আসবেন?”

“কিন্তু আমি তো তোমাদের বাচাতে পারবো না। নতুন শক্তি দিয়ে তোমাদেরই নিজেদের বাচিয়ে তুলতে হবে, আমাদের পুরুষদের অজ্ঞানের মূল্য দিতে হচ্ছে আমাদের, আমি জানি দুঃখের ঝাঁপের রাতি কেটে গিয়ে নতুন সূর্য্যের অন্নাবহ হবে, সেদিন কোন ছন্দই বোধ হয় আর থাকবে না।”

“কিন্তু সত্যি কি আপনি আর ফিরবেন না ?

“না এ চূপসে বাধার বোঝা আমি আর বইতে পারছি না, আর আমি বড় ক্লান্ত। শেষ বিদ্রাম আনাকে নিতেই হবে।”

তারপর হঠাৎ কোর্টের নীচে থেকে তারকাটা বের করে লাচার হাতে নিয়ে বলে—“এই আমার শেষ সম্পদ, আর আমার কিছু নেই। পূর্বপুরুষের ঐতিহাসিক হিসেবে এটা আমি এতদিন সংরক্ষণ করে এনেছি, তুমি এটা মজোতে নিয়ে যাও, এটা কেনবার লোক এখনও অনেক আছে, এর দুসো যদি ছুটি স্বার্থ লোকের মুখেও বাবার দিতে পার তবেই এর সার্থকতা।”

“কিন্তু মজো যে এখন থেকে অনেক দূর।”

“তবে কোন মূল্যটাই এর নেই।”

● তারপর ধীরে ধীরে সে ঘরের ভিতর চলে গেল, তারকাটা বুক পকেটে নিয়ে এল, সারাযাত্রা লাচা ঘুমতে পারলো না, শুধু মনে হতে লাগলো এটা দুখ্যবান তারকা নয়, বেন একধর ভল্লভ অসার তার বুক থেকে বেরছে, কি যে ভীত প্রলাপ তার, সে ঠিক করলো কাল সকালেই এটা নিয়ে মজোতে যাবে, বিক্রী করে সেই টাকা আর অনেক লাভ। কিনে গ্রামের লোকদের খাওয়াবে, সেদিন সকাল থেকে আরও প্রচণ্ডভাবে জ্বাংপাত শুরু হলো কিন্তু লাচা কোনসিকে দুকপাত না করেই সোঝা মাইকেলের ব্যক্তিগত গেল, মাইকেল তখন ক্যাটিনকার কফিন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, গেছনে কখনরত এ্যানা ও সোনিয়া, এই কলম দৃষ্ট দেখে লাচাও অল্প সময় করতে পারলো না—চোখের জল মুছে তিরোদ করলো—“সে কোথায় ?”

সোনিয়া উত্তর দিল—“এই মাত্র চলে গ্যাছে, বাবার আগে দেহবারের মত ক্যাটিনকারে চুমু খেতে গেছে।”

অবৃত্ত ভাবে চীৎকার করে বলে উঠে লাচা—“আমি ডাকে ফিরিয়ে আনব, সব কথা আমার বলা হয়নি।”

“কি করে বাবে ? বরফের ওপর তার পায়ের দাগ খুঁজে পাবে না।”

কোন বাধা না শুনে লাচা এগিয়ে যেতে লাগলো, ক্ষত পাদক্ষেপে গ্রামের শেষ প্রান্তে এল গ্রামপথে চৌচিরে ভাঁকলো—“কিরে এস মিটলু কাদার ! শেষ কথা তোমাকে যে বলা হয় নি।”

কিন্তু কোন উত্তর সে পেল না।

এবল জ্বাংপাত ও হিম ঝটিকা উপেক্ষা করে নিশেচ চিত্তে এগিয়ে চলেছে সেই রহস্যময় লোকটা, লাচার উদ্যত আঙ্গানে বুড়াপুত্রীর মত নিঃশব্দ জ্বাংপাত আকাশই শুধু বিলীর্ণ হবে, উত্তর সে পাবে না কোন দিন, দীর্ঘ পল্লু বেহুদারী রহস্যময় পুরুষ আবার শুরু করেছে তার যাত্রা, অন্য কোন গ্রামে এমনি করে ভুলবে বোধ হয় আলোড়ন, হরত সেখানে আর কণের শেষ বোগমুদ্র ছিন্ন করে আসবে তার ঠলিত বুড়া, তার বুড়ুতে রামকীর শব্দযাত্রা আর হেশবাসীর মনে আগাবে না চাকলা, স্থিতি বা হিম শীতল জ্বাংপাত রামের উদ্ভূত আকাশের নীচেই রচিত হবে তার মীন সমাধি।*

● “The stranger in the village”—Sir Phillip Gibbs.
এর নাম অলমসে।

জন্ম সংশোধন .

গত শাহাবী সংখ্যা। মন্দিরার পুস্তকপরিচয় বিভাগে “শিকারের কথা” বইএর লেখকের নাম ভুলবশতঃ নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ ছাপা হইয়াছিল। উহা ভুলশ্রুতেন্দ্র সিংহ হইবে।

একটি রোমাণ্টিক কবিতা

শ্রীবাসুদেব দত্তরায়

নির্বাসিত বিহংগের
শৃংখল কনকমা, শুনিতে কি পাও !
শুনিতে কি পাও
বন্ধনময় আশ্রয় ক্রন্দন :
অগ্নীম আকাশ আলোড়িত হয় যবে
তারাগুলো মাগে আকাশের তালে—
বহুতরন আলোকের ছন্দিত স্পন্দন ।
হে অন্ধকার রাত্রি,
আমার আশ্রয় ক্রন্দন
আমার পঙ্কের বিধ্বন
দূর বেশে বয়ে নিয়ে যাও তুমি,
আমার বিতরণী বধু একা
প্রতীক্ষিছে বেধা
আজি যধুনাসে
ফাগুনের আপন বিহ্বল গন্ধময় রাতে ।
হে নির্বাসিতের কথা
অন্ধকারে রাত্রি ঘোর,
নীহারিকার কাছ হ'তে
আগামী মিলন বাণী
বয়ে নিয়ে যাও
বন্দীর প্রিয়ার কাছে ।
ব'লো তারে
অন্ধকারে রাত্রিশেষে
আলোকের প্রভবন
আশ্রয় অনির্বাপ শিখা
বেধা দিবে ;
ক্লেশাক্ত মুহূর্ত শেষে
আশ্রয় মূর্তির বাণী
আদিবে স্বদূর নীহারিকা হ'তে
নির্বাসিত বিহংগের বেশে ;

তবে আঘোষিত মিলনের শুভলগ্ন
পর্যগের আপন দৌরভেদ
পলাশের লাল রঙে
আঘোষিত আকাশ
বনানী উঠিবে জেগে, হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে ।
অপেক্ষা করিও তুমি
মিলনের লগ্ন লাগি
জীবনের পরম কণে ।
কহিও তাহারে
হে বন্ধু ঘোর
এক বিহ্বলী বিহংগ
নিখিল আশ্রয় মূর্তির লাগি
বিহ্বলতার অধীনশাল জেগেছিল
সমস্ত কলুষ নাপিতে
লে প্রচেষ্টা ; বার্ষিকতার কশাঘাতে আত্ম নিরাপিত প্রাণ ।
তবু আমি
একদিন সমস্ত নিখিল বিশ্ব
সমস্ত অস্ত্রায় কলুষ বহিতে
আগিবে মশাল :
নীহারিকার মূর্তির বাণী পাঠবে শুনিতে
আজিকার বন্দীর হল ।
সেই দিন হইবে মিলন
আমাদের গোবে,
বিহ্বলতার বেশে আগিবে আলো
আগিবে পুষ্পিত লতাগন, মিলন প্রভাতে
বহুল চামেলী ধূমিকা আগিবে
মুক্ত আমাদের লাখে ।
হে রাত্রি
হে বন্ধু ঘোর
নির্বাসিত বিহংগের
পঙ্কের কাপটা শুনিতে কি পাও !
শুনিতে কি পাও
বন্ধনময় আশ্রয় ক্রন্দন ।

ভারত ও পাকিস্তানের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কের পটভূমিকায় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমস্যা।

শ্রীকীরোরদত্ত সান্ডাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর।)

দুই

পারি শ্রুতিস্তান-খ্যাতিসম্পন্ন ব্রিহু সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় কিছুদিন পূর্বে কয়েকটি বিবৃতি ও প্রবন্ধে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সমস্যা সম্পর্কে যে কতিপয় মন্তব্য করিয়াছেন তাহার মধ্যে সবগুলিই বিতর্কমূলক নয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার সহিত একমত হওয়া সম্ভব নয়। দুইটি অপ্রমাণিত বিষয়ে তাহার মন্তব্যের সমালোচনা করিয়া দুইটি অপ্রমাণিত ওজনপূর্ণ বিষয়ে তিনি যে প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন তাহার বিদ্যুত বিশ্লেষণে প্রচাঙ্গ পাইব।

দাসগুপ্ত মহাশয় পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমিগকে বাস্তব্যাগে নিরুৎসাহ করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের সম্মোহন ও সম্পন্নহীনতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে আপত্তির কিছুটা থাকিতে পারে না। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন যাহাতে এইরূপ ধারণা হইতে পারে, যেন পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তগণের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সহানুভূতিহীনতা কতকটা সর্বসম্মত। এইরূপ মনোভাব নিঃসন্দেহে আপত্তিকর। ব্রিহু দাসগুপ্ত নিজেই এই মনোভাবের পরিপোষক নহেন, কিন্তু তাহার লেখ্য ইহার পরোক্ষ সর্বসম্মত গ্রহীত। পশ্চিমবঙ্গের পরিমিত ভোগাভোগে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তগণের ভাগ বন্টন উচিত নয় ব্রিহু দাসগুপ্ত যেন ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে, উদ্বাস্তগণ যেমন একদিকে সম্প্রদায় করিবে তেমন অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের সম্পন্ন বৃত্তিতে তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিতেও সক্ষম, যদি গঠনমূলক পরিকল্পনা অভ্যবসায়ী ইচ্ছাসম্মিলিত কায়ে লাগান যায়। পশ্চিমবঙ্গের অল্পবয়স্ক, ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভিত, জনসাধারণ ও বিরলবসতি অঞ্চলগুলিকে উদ্বাস্তগণের সাহায্যে জাতীয়

সরকার হুমলা-হুমলা-পত্রপ্রদান করিয়া তুলিতে পারেন। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত সমস্যা সমাধানের দাবি কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একথা মনে করা কুল। ইহা সর্বভারতীয় সমস্যা। সুতরাং ভারতীয় সরকার বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী বঙ্গভাষা-ভাষী প্রাদেশিক অঞ্চল ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে, এই সমস্যা সমাধানে তৎপর হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সতীশবাবুর মত পোষকেই উদ্বাস্তগণের গণ হইতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে হইবে।

প্রশ্নকরমে ব্রিহু দাসগুপ্ত হিন্দু সরকারী কর্মচারীগণের পাকিস্তান ছাড়িয়া যাইবার দাবি তাহাদের ক্ষেত্রেই চাপাইয়াছেন, অথচ দেশ বিভক্ত হইবার পর দুইটি অংশের রাষ্ট্র নাযকগণই পরস্পর আলোচনা করিয়া সরকারী চাকরিদারগণকে উভয় রাষ্ট্রের যে কোন একটিতে চাকুরী করিবার ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ করিয়া, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সৈন্যদল পুনর্গঠন করিয়া বেদনাকারী কর্মচারীগণকে এইরূপ সুযোগদান করা তাড়া হইতো গভীর ছিল না। তাহা না করিলে কর্মচারীগণের একটি অংশের প্রতি উভয় রাষ্ট্রের সরকারেরই অবিশ্বাস ও সন্দেহ থাকিত। যাইতে এবং কর্মচারীগণের অনেকে ইতিপূর্বেই লম্বত কারণেই মদেহতাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তা ছাড়া, হিন্দু কর্মচারীগণ পাকিস্তানে থাকিয়া সেলো তাহাদের হাতে কতটা ক্ষমতা থাকিত তাহা বিতর্কের বিষয় এবং তাহাদের চাকুরীর দাবি ও পন্থামতিও নির্ভর করিত বিষয়বস্তু। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সরকারের পানথেরালের উপর। পূর্ব

পাকিস্তানে ইতিমধ্যেই অবাঞ্ছানী মুসলমান সরকারী কর্মচারীদের বিকল্পে কিছুটা অসন্তোষ দেখা মিচছে, এই কারণে, যে ইহারা বাঙ্গালী মুসলমানের স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। হিন্দু কর্মচারীরা পূর্ব পাকিস্তানে থাকিয়া গেলে এই অসন্তোষ হ্রাসে একটু ভিন্নরূপ ধারণ করিত। তখন প্রায় উঠিত পাকিস্তান অধিত হইবার পরও যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু কেন সরকারী চাকুরী মঞ্চ করিয়া আছে। যে পরিমাণে চাকুরী হিন্দুদের কবলিত সেই পরিমাণে মুসলমান সরকারী চাকুরী হইতে বঞ্চিত, অতএব রূপ উঠিত—ইহাদের ভাড়াও। বাহা হউক, যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে হিন্দু চাকুরীধারণের পাকিস্তান ভ্রাপের কলে সংখ্যালঘুদের অবস্থা আরও বারান হইয়াছে, তাহা হইলে এই প্রকাও ভুলের দায়িত্ব সেই মঞ্চ রাষ্ট্র-নায়কগণকেই লইতে হইবে বাহারা সরকারী কর্মচারী-গণকে উত্তর রাষ্ট্রের যে কোন একটিতে চাকুরী করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপনের সুযোগ দিয়াছিলেন। শ্রীকৃত দাসগুপ্ত, শ্রীকৃত শ্রীপ্রকাশ ও পণ্যমাত্র আরও অনেকেই মতে অনুক আপদা ও বৃক্টিহীন আতঙ্কই (fear complex & panic) পূর্ববঙ্গ হইতে ব্যাপক বাস্তভ্রাপের মূল কারণ। তাহারা বলেন পূর্ববঙ্গের অবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানে হইতে স্বতন্ত্র। এখানে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও অভ্যাতার অস্বস্তি হয় নাই, স্বতন্ত্রাণ্ড ভয় পাইবার কোন মঞ্চ কারণ নাই।

“ পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুগণ যে ভীত বা আতঙ্কিত হয় নাই একথা কেহ বলিবে না। কিন্তু সেই ভয় বা আতঙ্ক যে একেবারেই অনুক ও অর্থহীন সে বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। প্রাণহানি ও শারীরিক উৎপীড়নই যদি একমাত্র উহার কারণ হইত তাহা হইলে অবশ্যই বীকার করিতে হয় যে পূর্ববঙ্গে ঐক্য ভয়ের কারণ এখনও ঘট নাই। কিন্তু শারীরিক মৃত্যু অপেক্ষাও আত্মার অপমৃত্যু অধিক ভয়াবহ। পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুগণ মনে করে তাহাদের মন্ত্রনকে তিলে তিলে পিষিয়া মারিবার বড়দয় চলিতেছে।

“ কেবলমাত্র মৃত্যুভয়ভীত হইলে পাশ্চাত্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ববঙ্গ হইতে ব্যাপক বাস্তভ্রাপ ঘটিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। বাহারা পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে

তাহাদের মধ্যে অনেকেই অনেক বিচার বিবেচনার পর জানিয়া শুনিয়া অনিশ্চিত অশ্বকারে কাপ মিচছে। ইহারা মকস্কেই ভীক, কাপুক নয়। বেশ বিতন্ক হইবার পূর্ব পর্যন্তও, এমন কি নোহাবানী হত্যাকাণ্ডের পরও পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুগণ মনে মনে বাস্তভ্রাপ করে নাই। ঢাকা শহরে ক্রমাগত দাঙ্গা চলিতে থাকা কালেও তত্বে সংখ্যালঘুগণ স্থানভ্রাপের কথা চিন্তা করে নাই। গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী অহিংস সংগ্রাম না করিলেও তাহারা ভীকতা প্রদর্শন করে নাই। দাঙ্গা অবলম্বন করিয়া সরকার-সমর্থিত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কৃত দাঙ্গাকারিগণের বিকল্পে সাধ্যমত লড়াই করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাহাদের মেরুও তামিরা দাঙ্গা, রাষ্ট্রশক্তি ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ শক্তির বিকল্পে লড়াই করা অসম্ভব বোধে তাহারা বাস্তভ্রাপ করিবার মঞ্চ করে। প্রতিহিংসাধারণ রাষ্ট্রশক্তির বিকল্পধারণ করা কিন্তু দুঃস্থ তাহা হাফভ্রাপের মূর্ত্তা হইতেই প্রতীয়মান হয়। সেখানে যেখান জাগ লোক অমুসলমান হওয়া সবেও নিজামতন্ত্রে বিকল্পে মাথা তুলিতে পারিতেছিল না। স্বতন্ত্রাণ্ড পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুগণের গকে পাকিস্তানী জুলুমের সক্রিয় প্রতিবাদ একরূপ অসম্ভব।

কেবলমাত্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে গণে গণে যে সব অহুবিদা ও অপমান মঞ্চ করিতে হয় আত্মমর্থাবাসম্পন্ন অনেকেই কেবল উদহারের মঞ্চ তাহা হরণ করিয়া বাইতে গান্ধী নহেন, অথচ প্রতিকারের আশাও স্বপ্নগম্যহত। মাত্রের মৌলিক অধিকারের মঞ্চ সংগ্রাম করার উচ্চাধর্ষ ঘোষণা করা সহজ, কিন্তু ব্যস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময়ই সংগ্রামের প্রবকাশ থাকে না। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। পূর্ববঙ্গে একটি শহরে বিগত ২৬শে জাছমরী ঝাণীনতা দিবসে স্থানীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি জনসভা আয়োজন করা হয়। নীল নেতৃত্বের মধ্যে পূর্বাঞ্চে আলোচনা করিয়াই এই সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু সভা আরম্ভ হইবার সময় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কৃত এক উত্তেজিত জনতা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সভাস্থলে আসিয়া কংগ্রেস পতাকার

অপসারণ দাবী করে। অনেক তর্কবিতর্কেও পর
বশন তাহাঙ্গিকে কিছুতেই নিরস্ত করা সম্ভব হইল না।
তখন সভার উদ্ভোক্তাগণ আরও হইবার পূর্বেই সভাস্থল
যোষণা করেন। এক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার রক্ষার
দাবীতে যদি সংগ্রাম পতাকা অবনমিত না করিয়া সভার
কার্য চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইত,
(উদ্ভোক্তাগণের সেই দাবীর অভাব ছিল না, তাহারা
সভালয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ লাননা ও
দুঃখবরণ করিয়াছেন) তাহা হইলে সেই সভাস্থলে যে
তাৎপর্য হইত তাহার স্বেচ্ছা ক্রমে গিয়া বিস্তৃত
কেহই বলিতে পারে না। তবে ইহা একরূপ নিশ্চিত যে
তাহা হইলে সমস্ত সহরে অন্ততঃ কিছুকালের ভয় স্টপগার্ড
ও লস্কাকামারি বন্ধ হইয়া যাইত, কেননা হাঙ্গামা-
কারিগণ কিছুকাল দাব্য ঐরূপ একটি হযোগের অপেক্ষাই
করিতেছিল। একথা জানা ছিল বলিয়াই সভার
উদ্ভোক্তাগণ শেষ পর্যন্ত সূচত। অবলম্বন করিতে পারেন
নাই। অনেকই বলেন, বিচ্ছিন্ন ঘটনা দ্বারা সমগ্র দেশের
অবস্থা বিচার করা চলে না। কিন্তু ঘটনা অপেক্ষাও
যে সব কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটিতে পারে সেই কারণ
সমূহ ও ঘটনাগুলির পটভূমিকাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।
ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন হইলেও যে কোন সময় যে কোন স্থানে
অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে—এই সম্ভাবনাই
আপত্তা ও আতঙ্কের উদ্ভব। তাছাড়া, ডুজ ব্যাপার
লইয়াও অনেক সময়ে সাম্প্রদায়িক কলহ ক্রিয়ার উপক্রম
হয়। তাই সংখ্যালঘুগণকে সর্বদাই সন্ত্রস্ত হইয়া কণাবার্তা
ও চলাকেরা করিতে হয়। কাপড়ের অভাব, অথবা
কোরোসিন পাওয়া যাউতেছে না এ কথা বলিলেও বিপদ
ঘটিতে পারে, কেননা তখনই হুতোমনিতে হইবে—
পাকিস্তানে থাকিতে হইলে অসুবিধা হইবেই। না
পোষায় হিন্দুস্থানে চলিয়া যাও। এই কথার উপর
নিশ্চয়ই কেহ মৌলিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম বা
সত্যগ্রহ স্বরূপ ক্রিয়ার পরামর্শ দিবেন না, অথচ ঐরূপ
খোঁচা অহরহ হজম করাও কঠিন। একথা সত্য যে
সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমান শান্তিপ্রেমী এবং তাহারা

সংখ্যার অধিক, কিন্তু অশান্তি পুষ্ট করিতে অধিক সংখ্যক
লোকের প্রয়োজন হয় না এবং শান্তিপ্রেমী জনসাধারণ
প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নিক্রিয়।

পাকিস্তানে বাস ক্রিয়ার শান্তি স্বরূপ সংখ্যালঘুগণকে
অর্থনৈতিক ও অসুবিধা দেন সকল বাস্তব অসুবিধা ভোগ
করিতে হয় তাহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই।
সংবাদপত্র মাধ্যমে এই অসুবিধাগুলির তালিকা বহুবার
প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে পাকিস্তানে
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মর্যাদাবোধের উপর যে
আঘাত আসিয়া পড়িতেছে তাহার উপরই মৌর্য দেওয়া
হইবে। শ্রীকৃষ্ণ দাসগুপ্ত অথবা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে
সাধারণ মানুষের বৈষম্য জীবনে ঐরূপ আঘাতের
কল্পনাই যেমন তাহা অসম্ভব করা সব সময়ে সম্ভব নয়।
কেননা তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যক্তি এবং বাহির হইতে
কয়েকদিনের ভ্রম আসিয়া তাহাঙ্গিকে পদে পদে সাহস
ও অগমান সত্ত্ব করিতে হয় না। দ্বাদশ অধিদায়িত্বের
পক্ষে ব্যক্তিমান বহিরাগতদের মত সাময়িক ক্রেশ-
মীকারের আশ্রয়লাভ করাও সম্ভব নয়, অথবা লস্কাক-
কালের মধ্যে দুই একটি সহর পরিদর্শন করিয়া সরকারী
কর্তব্য সমাপনের পর কূটনৈতিক প্রয়োজনে (f) বিস্তৃত ও
অর্থনৈতিক বিস্তৃতি প্রচারেরও সুযোগ নাই। যে সকল
মধ্যস্থিত প্রেমীর মুসলমান পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া গিয়াছে
তাহাদের মধ্যে অনেকই মানিকর আবহাওয়ায় একরূপ
দাসত্ব হইয়াই স্থান ত্যাগ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে
এমন লোকও আছে যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বশক্তি
করিতাহিলেন। সাহসী লোকেরও অভাব নাই। পূর্ববঙ্গের
বাস্তবতাসীদের মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ছেঁচ বরণ
করিতে, এমন কি প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ব্যক্তিও
আছেন। আজ যদি কান্ট্রী বর্ণাধারে বাইরা মুক্ত ক্রিয়ার
আজ্ঞান আসে তাহা হইলে বাস্তবতাসীদের মধ্যে হইতে
যেজ্ঞানবৎক বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু ইহারা কেহই
পাকিস্তানে থাকিতে সম্মত হন নাই। সেখানে থাকিয়া
লব্ধপ্রকার অগমান ও লস্কাক বরণ করিয়াও মাতা কামড়াইয়া
ব্যক্তিবার প্রেরণা তাহারা বোধ করেন নাই। “বাহাই

ঘটক না কেন, কোন অবস্থাতেই বাস্তবিকতা ছাড়া চলবে না”—ইহার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ ভাবপ্রবণতা আছে, উচ্চাধর্মের ভাগিন তত্ত্বাবধান নাই। ইহাই যদি বাস্তব হয় তবে দর্শনক্ষেত্রে ও সমকালে ইহা জাতিগত চলনে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মনুষ্যবাহিত বিভিন্ন সভ্যতাসমূহের উদ্বেগ ও শঙ্কার সম্ভব হইত না। আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষেই আধুনিকের আগমনও ঘটত না, আধুনিকভাবের বিস্তারও হইত না। এই প্রসঙ্গে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে বাহা ঘটনায়ে এইরূপ দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করা বাইতে পারে। নিবিঘ্নে ধর্মাত্মের উদ্বেগে যে সকল মহাপ্রাণ ইংরেজ (Pilgrim fathers) একসাথে এসে ছাড়িয়া নতুন আমেরিকায় গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই দেশভাগী দলটিকে নিশ্চয়ই আজ কেহ বার্ষিক ও ভৌক বলিয়া তিরস্কার করিতে সাহসী হইবে না। বর্তমানে বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসী অগ্নি উপাসক পারসী সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষগণ ধর্মীয় প্রেরণাবশতই একসাথে দেশত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের উপকূলে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া লইয়াছিলেন। তাহা না করিলে অল্পকালের মধ্যেই অসুস্থতার কারণেই মৃত্যুবরণ করিয়া যেত। তাহা না করিলে লোক এবং পর্বতও ধরা পৃষ্ঠে কেহ থাকিত কিনা সম্ভব।

বাহারা পূর্ব বঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই তাহারা সকলেই আত্মবাহিনী নয়, মুসলমানীও নয়, অধিকাংশ লোকই সর্ব প্রথমে উদ্ভাবনের কথা চিন্তা করে। বাস্তবত্যাগ করিলে অপরিচিত আবেষ্টনীতে উদ্ভাবনের সংস্থান করা অধিকতর কষ্টসাধ্য হইবে মনে করিয়া (এবং এইরূপ মনে করা অত্যন্ত স্বাভাবিক) অশেষ অসুবিধা ও অবিচার মূখ্য খুঁজিয়া সহ্য করিতে হইবে আনিয়াও তাহারায়ও রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন বাহারা মনে করেন যে, যে কোন মূল্যে জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মান সম্মত স্বার্থের পিতৃপিতামহের পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত শ্রির অমূল্য পরিভ্রমণ করিয়া অশেষ দুর্গতি ও ব্যতিক্রম বরণও প্রেম। বাহারা প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বাইতে পারিতেছে না অথচ জানা ও অজানা বহুবিধ আশঙ্কার বাহাদের জীবন দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছে, যিনি পর দিন বাহারা—আজ

কায়েমে আত্মক চিন্তা, জানা লিখাও জানা থা অথবা নাস্তিহীন সাহেব কি কতোখা মিলেন, কাল প্রাথমিক, জেলা, মহকুমা অথবা ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ বা মুসলিম নেতাদের পার্শ্বের পাঠাগার কি অথবা জাহাজ করিবেন, পরম স্বাভাবিক জীবনধারার উপর আরও কত কি সমস্যা বা বেসরকারী বাণা নিষেধ আরোপিত হইবে অথবা অপমান সহিতে হইবে—এই প্রকার দুঃখিতার আত্ম: কথ করিতেছে, তাহানিকে সরাইয়া আনা অথবা তাহার বাহাতে সমস্যা মনোবল করিতে পারে সেই বাস্তব। করা ব্যক্তিগত, এমন কি সংখ্যালঘুগণের সমষ্টিগত চেতনাও সম্ভব কিনা সম্ভব। যদি না তাহার পক্ষে থাকে কোন প্রবল রাষ্ট্রশক্তির সক্রিয় সমর্থন। পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুগণের অবস্থার সহিত সিদ্ধি অমূল্যমানগণের অবস্থার তুলনা করা চলে। সিদ্ধিগ্রন্থে পাঠ্যবের মত ব্যাপক হত্যাকাণ্ড অস্বীকৃত হয় নাই। তৎসত্ত্বেও সংখ্যালঘুগণের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল বাহার ফলে ভারতীয় সরকার বাধা হইয়া তাহানিকে সরাইয়া আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে তত্বে অমূল্যমান-মিগকে সরাইয়া আনার প্রস্তাব ছাড়িয়া মিলেও, কোন তৎপট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। তাহাদের অপরাধ তাহারা সওয়া কোটি। ইহার ফলে পূর্ববঙ্গের সমস্ত অধিকতর অটল সম্ভব নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত এড়াইয়া গেলেও চলবে না। তাহা হইলে সমস্ত তাহাব আপন সমাধান খুঁজিয়া লইবে। এমনও হইতে পারে অমূল্যমান-গণের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক ধর্মাত্মক হওয়ার ফলে অমূল্যমানগণের সংখ্যা কমিয়া ভারত সরকারের পক্ষে তাহানিকে সাহায্য অনেকটা সহজ হইবে; কিন্তু গুণ্ডার লগ্ন হওয়ার এইরূপ সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ভারত সরকারের পক্ষে স্বীকৃত নয়।

সাম্প্রদায়িক মনোভাব “আমার পাকিস্তান” নামক প্রবন্ধে একটি উচ্চ আদর্শের ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বাহার প্রেরণায় সংখ্যালঘুগণ সাহস অবলম্বন করিয়া পাকিস্তানের নাগরিক অধিকার লইয়া সমস্যা মনোবল বাস করিবার চেষ্টা করিতে পারে। পাকিস্তান আমায় বেশ, পাকিস্তান

গভর্নমেন্ট আমার গভর্নমেন্ট, এইরূপ মনে করিতে পারিলে, যদি সেই গভর্নমেন্টের কার্যকলাপে কোন দোষত্রুটি থাকিয়া থাকে, যদি সেই গভর্নমেন্ট ভুল পথে চলে, তাহা হইলে সেই ত্রুটি সংশোধন করিবার, গভর্নমেন্টকে ত্রিক পথে পরিত্যাগিত করিবার অধিকার ও হাতিব পাতিত্বানের নাগরিক হিসাবে সংখ্যাগুরু মুসলমানের বতখানি—সংখ্যালঘু অনুসন্ধানেরও ত্রিক ততখানি। কথাটা তিনিতে মন না হইলেও বুঝিলে নয়। ব্যাপারটা একটু তলাইয়া বেশিলেই হাসপু মহাশয়ের বুদ্ধির বুনিয়াছে যে প্রকাণ্ড কাটল গ্রহিয়াছে তাহা ধরা পড়িলে। পাকিস্তানকে মনে প্রাণে আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়া নিতে পারিলে ঙ্গে ছিল না, কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। এই সমস্ত কারণে যে পাকিস্তানকে আপনার ভাবিতে চাহিলেও পাকিস্তান বাহারা অর্জন করিয়াছে বলিয়া দাবী করে তাহারা ইহা ভাবিতে নিতে নাহায়। কোন গৃহ বা অট্টালিকাকে যে কেহ আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু মনে করিলেই তাহা আপনার হইয়া যায় না, যদি না উহা বাহাবের দখলে তাহারা দখল অংশীদার রূপে অপরকে হেঁচা ভোগদল করিতে দিতে বাধ্য হয়। কখনও কখনও এক্ষণ হয়, আজ বাহাকে মালিকানাধনে কোন গৃহে বাস করিতে দেখা যায়, কাল ঘটনাক্রমে তাহাকেই হস্ত ভাঙাটিয়া রূপে এই গৃহে থাকিতে হয়। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুগণের অবস্থাও হইয়াছে অনেকটা সেইরূপ। এখানে তর্ক উঠিতে পারে, ইহা অস্ত্রায় হস্তায় অধিকার স্বার্থে প্রয়োজন হইলে সংগ্রাম করিতে হইবে তাহাই ধর্ম। দেখা যাউক এইরূপ সংগ্রাম সম্ভব হইলেও তাহাতে প্রার্থিত কল্যাণের সম্ভাবনা কিরূপ ?

রাষ্ট্রশক্তি এবং রাষ্ট্রের অধিবাসী জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের দ্বারা প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁটিয়া ওঠা সংখ্যালঘুগণের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। এক বা দুইমেরকে সংগ্রামে পূর্ণদত্ত করিয়া একাধিক বা বহু ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছে ইতিহাসে একরূপ নব্বীর অনেক আছে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি অথবা রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু দলের বিরুদ্ধে যদি কোন সংখ্যাগুরু দল সংগ্রাম শুরু করে তবে তাহাকে দলা হয়

বিত্রোহ। অবশ্য বিত্রোহীরা জরী হইলে ক্ষমতা হস্তগত করিয়া তাহারা বিরুদ্ধবাহীদিগকে নিবুল করিতে প্রয়াস পায় এবং প্রচলিত আন্তর্জাতিক বিধান অমুযায়ী ইহা দুইদিকের নয়। সংখ্যাগুরু হইয়াও বস প্রযোগে বেশীর ভাগ লোককে শাসনত করায় সম্ভব। কিন্তু পূর্ববাংলা (তৎকালীন পাকিস্তানের) সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কি এই পৈয়সাচারের আশ্রমে উদ্ধৃত হইয়া সংগ্রামে লিপ্ত হইবে? তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যাউক—সংগ্রামে তাহারা জরী হইল, কিন্তু তাহার পর? যদি পণ্ডতাত্ত্বিক পদ্ধতি অমুসরণ করিতে হয় তাহা হইলে আবার সংখ্যাগুরুদলের হাতেই ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব যদি থাকিয়াই যায় তাহা হইলে আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দাবী সমাধান হইবে না। আর যদি পণ্ডতাত্ত্বিক বিদ্যায় অভিন্নম্বন জানাইতে হয় তবে দেখা দ্যতঃ। বাহারা অধিঃসাধ বিদ্যাসী তাহারা বলিবেন শাসনত্বকে হস্তগত না করিয়াও মৌলিক অধিকার স্বাকার সংগ্রাম চলাইয়া যাওয়া সম্ভব এবং তাহাতে জরী হওয়াও সম্ভব। হস্ততো সম্ভব! কিন্তু কতগুলি শীমাবদ্ধ অধিকার, দখা ধর্মচরণের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার ইত্যাদি—শান্তির স্তম্ভ, বেশ স্বাধীন হইবার পরও, দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম শুরু করিতে অনেককেই উৎসাহবোধ করিবে না। তা ছাড়া কাগলপথে অথবা মৌলিকভাবে দাবী স্বীকার করিয়া নিলেও শাসক সম্প্রদায় আপনার খেয়াল খুশীমত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনাহালেই তাহা অস্বীকার করিয়া চলিতে পারে। সম্প্রদায় বিশেষের উপর আইনগত কোন বিধিনিষেধ আরোপ না করিয়াও এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব যে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যবসায়ীগণ হয়তো কোন প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র বা অমুযতি পত্র (Licence or permit) পাইল না অথবা তাহাদের উপর অত্যধিক বারায় আরকর ধর্ম হইল বাহা করলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যবসায়ীগণের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহাদের পক্ষে টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ইহার প্রতিবোধে সত্যাপ্রহ করিয়াও হুকম লাভের আশা

কম। আসল কথা যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্প্রদায় বিশেষ হারীভাবে সংখ্যালঘু শ্রেণীকৃত হইবার ফলে তাহার পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনার সম-অসমী দাখিল লাভের আশা হ্রাস পরাহত দেখানে, ব্যক্তি, সম্প্রদায় অথবা জাতি-ধর্ম-নির্দেশে সকলের পক্ষেই কল্যাণকর কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করা একরূপ অসম্ভব। বৈষম্যের উপরই বাহার ভিত্তি দেখানে পক্ষপাতের না চওড়াই অস্বাভাবিক। অহিংসার বিশ্বানীর্ণন হয়তো বলিবেন তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিলে সংখ্যালঘুগণের পক্ষেও সংখ্যাগুরুগণের অধিকাংশের ক্ষয় হয় করা সম্ভব এবং লোকেরে সমিচ্ছাপ্রদায়ন ব্যক্তিগণের সংখ্যা অধিক হওয়ার গণতন্ত্রসম্বন্ধ প্রণালীতেই শাসনব্যবস্থার বৃহত্তর স্বার্থে পরিচালনা করা সম্ভব হইবে। হয়ত হইবে, কিন্তু কতদিনে তাহা লইয়াই বস পোলে। পাকিস্তানের পরিচালিত অহিংস সংগ্রামের ফলে ইংরেজ বিতাড়িত হইলেও সাম্প্রদায়িক সেনবিভাগ বন্ধ হয় নাই। হয়তো অহিংসার প্রয়োগ কৌশল (Technique of Ahinsa) এখনও পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই, হয়তো অহিংসার নামে আমরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতিই (Passive resistance) গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাই অচলিত ফলাফল ঘটে নাই। কিন্তু গুলম যেখানেই থাকুক না কেন একথা সত্য যে অহিংসা মন্ত্রের উপরাত্তা মহামায়া পাকিস্তানের আত্মীয়ন সাধনা সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক বিভেদ থাকিয়াই গিয়াছে। তাহার অবর্তমানে নেতৃত্বহীন পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে সংখ্যাগুরুগণের ক্ষয় হয় করিতে কত যুগ লাগিলে নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না। ততদিন পর্য্যন্তায়ন করিয়া নির্ধাতন গৃহ করিতে লক্ষ লোকের সংখ্যা দুইই কম। আর সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর করিবার পক্ষে বাধারও অংশ নাই। পাকিস্তান নীগনেতৃত্বের অশ্রুত নীতিই প্রবলতম বাধা। এই নীতি খানিকটা বিরোধ করিয়া যেবা প্রচেষ্টা ন।

দুইজাতিতত্ত্বের মোহাই বিধাই পাকিস্তান দাবী করা হইয়াছিল, সে দাবী স্বীকৃত হওয়ায় দুইজাতিতত্ত্বকেই স্বীকার করিানেওরা হইয়াছে। কংগ্রেস নেতৃত্বক বলিতে

পারেন, হই জাতি তত্ত্বের স্বীকৃতি হিসাবে নয়, যেহেতু দেশের একটা অংশের দেশের জাগ লোক বুন করিয়াই হউক অথবা মানিয়া ভনিয়া বিচার বিবেচনা করিয়াই হউক জাতির বৃহত্তর অংশ হইতে পৃথক হইয়া বাইতে চাহিয়াছিল, আকস্মিক আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অগ্রদ্বারী, যে নীতি মানিয়া লইতে কংগ্রেস ইতিপূর্বে স্বীকারাধিক হইয়াছিল, তাহাদের সেই পৃথক হইয়া বাইবার দাবী স্বীকার করা হইয়াছে, এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বিবেকের মনন আসা কুলিবার চেষ্টা করা বাইতে পারে, কিন্তু ইহা আত্মপ্রবন্ধনরই নামান্তর। আমরা বাহাই মনে করি না কেন তাহাতে কিছু আসিবে যায় না, বাহারা দাবী কুলিয়াছিল তাহারা কোন মুক্তি দেখাইয়া দাবী করিয়াছিল তাহাই বিচার বিচার। দাবী মানিব, অথচ যে মুক্তির উপর উহা প্রতিষ্ঠিত তাহা নানি ন, আত্মকল্পির মত নিষেধ মনগড়া মুক্তি খাড়া করিন—ইংরেজ বলে “উড়ো থৈ গোবিন্দাধ নমঃ”।

তা ছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকাংশ নামে কোন বিন ভারত পাকিস্তানের মত অস্বাভাবিক ভাবে বিভক্ত হইয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ নদীর মত। তর্কের খাতির কোন দেশের প্রাস্তবর্তী অকল বিশেষের পৃথক হইয়া বাইবার অধিকার হয় তো স্বীকার করিবে নেওদা সম্ভব, কিন্তু পূর্ব বাংলায় মত একটি বিচ্ছিন্ন, চতুর্দিকে ভিন্নরাষ্ট্র কর্তৃক পরিবেষ্টিত অকলের পৃথক হইয়া বাইবার দাবী মত কোন সভা দেশের শাসনতন্ত্রের স্বীকৃত হয় নাই।

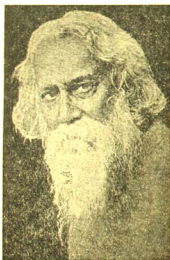
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে নাই। কিন্তু সেই অধিকারের দাবী কতদূর বিস্তৃত হওয়া মুক্তিযুক্ত? তাহার মত আত্মনিয়ন্ত্রণ? কোন বিশিষ্ট ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী পৃথক সংখ্যক মানবগোষ্ঠী এই অধিকার দাবী করিতে পারে সভা। যদি দাবী লওয়া হাৎ যে ভারতীয় মূলসমানগণ সর্বস্তোভাবে অমূলসমানগণ হইতে পৃথক একটি বিশিষ্ট মানব গোষ্ঠী এবং তাহারা স্বায়ত্বশক্ত ভাবেই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিতে পারে তাহা হইলেও সেই অধিকারকে দেশ বিভাগ পর্বত বিস্তৃত হইতে নেওদা কোন মুক্তিভেদেই সমর্থনযোগ্য নয়।

ক্রমশঃ

আধুনিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

বিগত মহাবৃহদের অল্পকাল পরেই প্রকট হয়ে উঠেছিল বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধাধিপত্যের পর ব্যারে ব্যারে শাস্তি স্থাপনাব উদ্দেশ্যভার লক্ষণ দেখা দেয়। সব দিক হোতে সকল আন্তি একত্রিত হ'য়ে পরিব্রূণে গোড়ে তোলে। পৃথিবীর এক প্রান্ত হোতে অপর প্রান্তে পর্য্যন্ত বিস্তারমান জন সমুদ্রের মাঝে শাস্তির বার্তা ঘোষিত হয়। সাধারণ মানুষ নিঃশ্বাস কলে বাচে। যুদ্ধে ধ্বংসলীলার কলে ক্ষতিগ্রস্ত মানব সভ্যতাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলে। নতুন উল্লেসে পুনর্গঠনের ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'ব রাষ্ট্রে ও সমাজে।



রবীন্দ্রনাথ

যে ক্ষত সারাবার এত চেষ্টা, যে ক্ষতের কোন্ স্থানে যেন থেকে যায় প্রান্ত জীবাত্মসুল আত্মগোপন করে। উপরে ক্ষতের মূণ বন্ধ হোসেও ভিতরে তার কিঞ্চিৎ অস্তিত্ব থেকে যায়। অবসন্নতা কেটে গেলেই আবার জ্বলের ধর্ম্মাহুদারী ভিতরে ভিতরে ঝড়বয় করে, শক্তি

মদনমত্ততার নতুন কোরে আঘাত হানে নব জীবনী-শক্তিকে। ক্ষণকালের মধ্যে প্রলয়ের ঘূর বেয়ে ওঠে। এ,—ঘাত প্রতিঘাত; এ শোষণ ও শোষিতের সংগ্রাম। একদিকে লোভ, ঘোহ, হিংসা; আর একদিকে মহত্ত্ব বর্ধ্যাদা বোঝে উৎসাহতা, সম্মান মানবিকতা, সম অধিকারের প্রচেষ্টা।

যুদ্ধ লেগেছিল, যুদ্ধ থেমেও গেছে। যখন আরম্ভ হয়েছিল, তখন চতুর্দিকে সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছিল। লোভীর হল বিজ্ঞা সংবরণ কর্ত্তে না পেয়ে চারিদিকে লুণ্ঠনই নিয়ে তাকিয়ে কিচ্ছিল। কিন্তু গোতে উদ্বৃত্ততায় সে নিজেবই পলায় ঠাগীর হাড়ি কুণিয়েছে।

১৩২৬ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জাপান যাত্রা করেন। এই যাত্রায় তিনি পথে পথে ভ্রমাবধ দৃষ্ট লক্ষ্য করে চিত্তাধিত ফোরে বসেছিলেন, "সেই খিসিরপুরের ঘাটে থেকে আরম্ভ করে আর এই হংকং-এর ঘাট পর্য্যন্ত, বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের চেহারা বেগে আসছি। সে যে কি প্রকাণ্ড, এমন করে থাকে চোখে না দেখলে বোঝা যায় না—তুখু প্রকাণ্ড নয়, সে একটা অঘড়ম্বল ব্যাপার। কবি-কখন চতীতে ব্যাধের আহ্বারের যে বর্ণনা আছে;—সে এক এক গ্রামে এক এক ডাল গিলুছে, তার ভোজন উৎকট, তার শব উৎকট,—এও সেই রকম; এই বাণিজ্য ব্যাধটাও হাস কাস কর্ত্তে কর্ত্তে এক এক পিতৃ মুখে বা পুরছে, বেঁ বেগে আর গুহ হয়—তার বিরাম নাট, আর তার শব্দই বা কী। লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলছে, লোহার ধাত দিয়ে চিবছে, লোহার পাকস্বরে চিরপ্রবীণ জঠরানলে হজম করছে এবং লোহার শিরা উপশিবার ভিতর দিয়ে তার জগত মোড়া কলবরে সোনার রক্ত স্রোত চালান করে দিচ্ছে।

একে দেখে মনে হয় যে এ একটা জড়, এ যেন পৃথিবীর প্রথমযুগের মানব দহন্তগণের মতো। কেবলমাত্র তার ল্যাঞ্চার আয়তনটা দেখলেই শরীর জ্বাতকে উঠে।

ভায়গর সে বলচর হবে, কি স্থলচর হবে, কি প্রাণী হবে, এখনো তা স্পষ্ট ঠিক হয় নি,—সে খানিকটা মরীচকের মতো। অগ্ন্যোষ্ট্য বলতে যা বুঝায়, তা তার কিছুমাত্র নেই। তার গায়ের চামড়া ভরষার মূল; তার খাবা যেখানে পড়ে সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সর্ষ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেঁধিয়ে পড়ে; চলবার সময় তার বৃহৎ বিরাট ল্যাম্বটা যখন নড়তে থাকে, তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হয়ে এমন এমন আওয়াজ হোতে থাকে যে বিগতনারা মুগ্ধিত হয়ে পড়ে। তারগরে কেবলমাত্র তার বিপুল এই যেটটা রক্ষা করার জন্য এত রাশি রাশি ঘাস তার মরকার হয় যে প্রতিরী স্রিষ্ট হয়ে উঠে। সে যে কেবলমাত্র খাবা খাবা মিনিষ খাচ্ছে —রী পূর্ব্ব ছেলে কিছুই সে বিচার করে না।

কিন্তু অগ্নের সেই প্রথমস্থগের ধানবলতগুলো টিকলো না। তাদের অগ্নিরমিত বিপুলতাই পরে পরে তাদের বিরুদ্ধে শাকী বেগবাতে, বিধাতার আদালতে তাদের প্রাণধ্বংসের বিধান হোলো। সৌর্য্য মিনিষটা কেবল মাত্র সৌন্দর্য্যের প্রমাণ যেন না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়। হাদফাটা যখন অভ্যস্ত বৈশি চোখে পড়ে, আয়তনটাও মধ্যে যখন কেবলমাত্র শক্তি দেখি, স্রী যেখিনে,—তখন বেশ বুঝতে পারা যায় বিশ্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই; বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে তার শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ হোতে হোতে একদিন তাকে হার বেনে হাল ছেড়ে তুলিয়ে যেতে হবেই। প্রকৃতির গৃহীনিপনা কখনই কর্ণা অমিত্যচারকে অধিকদিন ধইতে পারে না—তার ঝাঁটা এসে পড়ল বলে। বাদির্জা ধানবটা নিজেই বিরাটতায়, নিজেই প্রকাণ্ড ভানের মধ্যে নিজেই প্রাণধও বহন করছে। একদিন আগছে যখন তাহার লোহার কতালগুলোকে আঘাতের ধুগের ভরের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করে পুরাতত্ত্ববিদ্যঃ এট সর্ষকৃষ্ণ ধানবটার অকৃত্ত বিবমতা নিয়ে বিশ্ব প্রকাশ করবে।”

রবীন্দ্রনাথ একদিন যেমন পৃথিবীঝোড়া নোড়ীর হলের বক্রা ব্যাখ্যা করেছিলেন, অপরদিকে তার পরিণতি কী, সে কথা বলতেও ছুদেন নি। পৃথিবীতে হাফা ব্যাভাবিক,

হাফা ব্যাভাবের উপযোগী, সেটাই কালের পরিবর্তনের মূগে আপনসত্যকে উন্নততর করে টেকে রাখে। কিন্তু কালের উপযোগী না হোলে, তার ব্যাবিষ বৈশি গিন নয়। দুই-গিনে থাকলে যেমন পেতেই টকা করে, কিন্তু ইচ্ছায্যবায়ী বেলেই কি বেহের পুই হয়? তাতে বরক অকীর্ততা বেড়ে উন্নয়ম প্রকৃতি হোগের স্রিষ্ট হয়, দুর্লভতাকেই বাড়ায়। বা প্রকৃতিসত্ত নয়, সেটা দুই, সেটা দুর্লভতাও লক্ষণ, সে কেবল চিত্তকে নিশ্চিতের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। একদিন এসিয়ার নুকে যে সত্যতা পড়ে উঠেছিল, তাতে যেন ছিল প্রাণের স্মৃশ্মন। তখন মাছবে মাছবে সন্ধ্য আরও নিশ্চয় ছিল। কিন্তু প্রাণ-শক্তির মূলে যে ব্যাভাবিকতা আছে, সেখানে যখন সত্যতারের অছতা বৃদ্ধি পেল, তখন চোলো সত্যতার আপবত্ব।

“সচল প্রাণের শক্তি বত দুর্লভ হবে আসে, যেতের অকৃত্ত ততই নানাপ্রকারে উৎকট হয়ে উঠে। একদিন যর্ষে কর্ণে জানে এসিয়ার চিত্ত প্রাণবান ছিল, সেট প্রাণধ্বংসের প্রভানে তার আত্মপটী নিচিহ্ন হয়ে উঠত। তার শক্তি যখন ক্রাণ ও স্রুগ্মির তোলো, তার পটীর তাজ যখন হোলো বক্র, তখন তার সর্ষ কক্ষ অভাণ আচ্যার বক্রবৎ পুনরাবৃত্তিতে নিবর্ধক হয়ে উঠল। একেই বলে অকৃত্তবৎ, এতেই মাছলের সকল সিকে পরাভব ঘটায়।

অপর পক্ষে পাকাতা ব্যাতির মধ্যে বিপদেব লক্ষণ আয় বা বেধা দিয়েছে, সেও একট কারণে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও শক্তি তাকে প্রভাবশালী করেছে, এট প্রভাব সত্যের বরধান। কিন্তু সত্যের সঙ্গে মাছলের ব্যাবহার কনুসিত হোলোই সত্য। তাকে ফিরে মাঝে। বিজ্ঞানকে যিনে যিনে যুরোপ আপন গোড়ের বাহন করে লাগায় ধায়ছে। তাতে করে গোড়ের শক্তি হয়ে উঠছে প্রচণ্ড, তার আকার হয়ে উঠছে বিরাট। যে ঠেং, হিংসা, মিথ্যাচারকে সে বিশ্বব্যাপী করে ছুপছে, তাতে করে যুরোপের রাষ্ট্রসত্তা আয় নিবর্ধক। প্রকৃতির প্রাণবান্যও মাছলের অছবের লক্ষণ, তার বৃদ্ধি তার টকা তখন কালের পুতুলের মত চলিত হয়। এতেই মাছলের বিনাশ। এত

কারণ হয় নহ, এর কারণ আত্মিক তামসিকতা, মোহ, হিংসা, পশুপুষ্টি। বোধনখোলা উন্নত বহন আবহাওয়া করে তখন স্মৃতিই তার কারণ নয় তাৎ কারণ মনস্তা।”

মাহু সন্মতগ্রন্থ। প্রয়োজন আছে বলেই পরম্পরে সমাজ বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চায়। কিন্তু এখন মাহুয়ের প্রকৃতি প্রয়োজনের উল্টে চলে যায়, তখন স্মৃতির বিচিত্রতার নাকে ভাসন ধরে। একদিন মাহু ঘৌবনদ্বার উপকরণ-গুলিকে ভাগ্যভাগী করে নিয়েছিল প্রয়োজনের ভাগিদে। তখন সমাজের প্রতিষ্ঠার আত্মনিয়োগ করে সামাজিক বেনে নিচেছিল। কিন্তু সামাজিক বহন ব্যক্তিগত শক্তি, হৃৎ ও মার্যাদালাভে প্রদান পেল, তখনই ব্যক্তিগত হৃৎ হৃৎয়ের খাতিরে মোহে প্রাবল্যে মনুষ্য বিকিরে গেল। রাজ্য হোতে চাইলেন সম্রাট। নিরন্তর প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষে মাহু আপন সত্যকে বাচিরে রাখতে চায়, তাই আদিম যুগে মাহু গঠনমূলক কর্তব্যগুলির ভিতর দিয়ে স্মৃতির সত্যকে বাচাবার প্রয়াসে কল্পশক্তিকে এক বিভাগীয় প্রতিনিধি স্থানীয় কোরে তুলেছিল। এই আত্মীয় শক্তি বহন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা মেটাবার কারণে চালিত হোতে লাগল তখন এই আত্মীয় কল্পশক্তি আর সমাজ ব্যবহার প্রয়োজনে এল না। স্মৃতি হোসো স্মৃতি সনাত। মনগত মনভাব নিয়ে বিশ্বকে গুটে নেবার চক্রা চলে থাকল। সমাজসংস্কারেরা হয়ে উঠল সাম্রাজ্যবাদী লোপুপ। কিন্তু এই লোপুপতার যুগে রয়েছে মাহুয়ের বিকৃত চেতনার অভিব্যক্তি। “সাম্রাজ্য বলতে বুঝে বার। আত্মীয় নয় তাদের অনেককে এক সড়ির বোধন বেঁধে কলেবরটাকে অস্বাভাবিক মূল করে তোলা। দুঃসময়ে বোধন টিপে হয় তখন এই অস্বাভাবিকের সংঘাত বাচিরে আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হোতে থাকে।”

আজ পর্যন্ত কোন সাম্রাজ্যকেই টেকিয়ে রাখা পেল না; কেন না এটা মানবিকতার বিরুদ্ধে গন্তমূলত প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটা অযোগ্যতা প্রকাশের আণ্ডাভিকতা। তাই শুধাবিত্ত সামাজিক বহন সাধারণ মাহুয়ের স্বাভাবিকার মূলে চরম আঘাত হেনেছিল তখন উদ্ধৃত সাধারণ মাহু আপনায় মধ্যে বেনে আপন সত্য খুঁজে পেয়েছিল।

তাই সেদিনকার যুরোপ সামাজিক কঠোরতাকে উপেক্ষা কোরে মনস্তত্ত্বকে স্বীকার করেছিল। এই নবমার্গরণের লাভা এক প্রান্ত হোতে আর এক প্রান্তে পর্যন্ত ডেসে গিয়েছিল,—তারের মধ্যে কর্ণে। যে সাম্রাজ্যবাদ বাটমনি পারব এতদিন শিকড় গেঁড়ে বসেছিল, তাতে সংস্কারের বজ্রতা হয়েছিল, তাই মনগত মোহের পরিধি কমলেও বিস্ময় হয় নি! সেবে একদিন চারহাত বেলে স্মৃতিতে চেয়েছিল।

যুরোপ বেনাশার যুগে আত্মস্মৃতিতে বেক্ত হোসেও আত্মপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বলাতে পারল না। নিম্নের সমাজগতীয় মধ্যে এখন তার মোহকে টেকিয়ে রাখতে পারল না, আত্মস্বাভা হোরে উঠল, তখন সে ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের চতুর্দিকে,—তারতবার্ণে, চীনে, আফ্রিকায়...

“যুরোপ বেখানে সিঙিলভ করেছে, সেখানে আমাদের স্মৃতি পড়েছে অনেক দিন থেকে, সেখানে তার ঐশ্বর্য বিশ্বের প্রত্যক্ষগোচর। বেখানে করিনি, সে জায়গাটা গভীরে, মূল, তাই সেটা অনেককাল থেকে প্রকল্প রইল। এইখানে বিশ্বের নিরাক্ষর কতি করেছে এবং সেই কতি ক্রমেই ফিরে আসছে তার নিম্নের অভিমুখে। তার বে লোভ চীনেকে আকৃষ্ট বাইরেছে সে লোভ তো চীনের মরশের মধ্যেই মরে না। সেই নির্ধর লোভ প্রত্যহ তার নিম্নে মোহাঙ্ক করেছে, বাইরে থেকে সেটা আমরা স্পষ্ট দেখি বা না দেখি। কেবল ভৌতিক জগতে নয় মানবজগতেও নিষ্কাম চিন্তে সত্য ব্যবহার মাহুয়ের আত্ম-রক্ষার চরম উপায়। সেই সত্য ব্যবহারের সাধনায় প্রতি পাক্যাত্মনে প্রতিদিন প্রজ্ঞা হারাকে; তা নিয়ে লক্ষ্যও থাকে চলে, তাই জটিল হয়ে উঠছে তার সমস্ত সমস্ত, বিনাশ হোয়ে এল আগর। যুরোপের স্বভাবের অন্ধ-অহঙ্কারী আপন সিঙিলমমস্ততার নিত্যত্বের কথাটা মূলেছে তা বেবাই থাকে। কিন্তু চিরন্তন স্বেচ্ছত্ব আপনি অমোঘ শাশন মূল্যে না একথা নিশ্চিত হেনে রাখা চাই।”

যম্মতি শ্রীতি ঘটলেও, একবা সেদিন যুরোপ স্বীকার করে নিতে পারলে না, আতি বা গোষ্ঠী বিশ্বের বিরাট

মানবসমাজেরই একটি অংশমাত্র। সংস্কারে বহুদূর
জানতে চাইলে না সমুদ্রপারের মাটির সহিতও দেশের
মাটির যোগসূত্র আছে। সেখানকার মাহুগুলোও
মানবিক সত্তা নিয়ে আমাদেরই মত স্ত্রে মস্ত্রে সংসার
পাতায়। তাই গোনার ভারতবর্ষে, আফ্রিকায়, চীনে,—
আমেরিকার পথে যেখান দলে দলে যেখানে পড়ল, সেদিন
থেকে তার গোধ এমনি এক অনির্দিষ্টের পথে এগিয়ে
চলল যে তার দৃষ্টান্তের সচল অবস্থা বিকৃত হোলো।
নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে না। চিরন্তন সত্যের
অবমাননা করে যে হোলো সত্যভ্রষ্ট। চারিদিকে যে
দশাল জ্বালিয়ে মিলে তাতে তার নিজেরই বিপদ ঘনিষ্ঠে
এল। এই নিবাক্স সত্যকে অবহেলা করে আপন
মুগ্ধোপের আত্মঘাতী সাধনার পুন্ডরীক হয়েছিল। কিন্তু
সংঘাতকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। মুগ্ধোপেরও রাষ্ট্রশক্তি
হোলো বিপন্ন। যে লোককে আশ্রয় দিয়েছিল তারা
আপন মানসিক চেতনার সেই লোভের সংঘাতেই তারা
ব্যতিক্রম দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু দুর্বলতা লাভের
পূর্বেই তার বিশ্ব ছড়িয়ে দিয়ে গেল, যেখানে বোসে পান
করছিল মুহূর্তে মুহূর্তে। সেখানকার সমাজের মাহুগের
গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। অর্ধ নৈতিক বিকৃতি দিয়ে ও সামাজিক
পরিপ্রেক্ষিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি করল যে মাহুগের
প্রয়োজনোপলব্ধির মধ্যে লোভের অংশ গেল বেড়ে।

রবীন্দ্রনাথ মাহুগের এই সামাজিক ও অর্ধ নৈতিক
দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করে বললেন, “মাহুগের দরকার মাহুগের
পূর্ণতাকে যে কতখানি ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এর আগে কোন
দিন আমি সেটা এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাইনি। এক
সময়ে মাহুগ এই দরকারকে ছোট কোরে দেখেছিল ;
টাকা রোজগার করাটাকে সম্মান করেনি। ঘেবপুন্ডা
করে, বিভ্রাধান করে, আনন্দ দান করে হারা টাকা নিয়েছে
মাহুগ তাদের ঘণা করেছে। কিন্তু আজকাল জীবনযাত্রা
এতই বেশী দুঃসাধ্য, এবং টাকার আয়তন ও শক্তি এতই
বেশী বড় হয়ে উঠেছে যে দরকার এবং দরকারের বাহন-
গুলোকে মাহুগ আর ঘণা করতে পারেন না। এখন
মাহুগ আপনাতঃ সর্বস্বত্বেরই মূল্যের পরিমাণ টাকা

দিয়ে বিচার করতে লজ্জা করেন। এতে করে সমস্ত
মাহুগের প্রকৃতি বদল হয়ে আসছে—জীবনের লক্ষ্য এবং
গৌরব অন্তর থেকে বাহিরের দিকে, আনন্দ থেকে
প্রয়োজনের দিকে অত্যন্ত দূরে পড়ছে। মাহুগ ক্রমাগত
নিজেকে বিক্রী করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করছে না।
ক্রমশঃ লম্বাঘের এমন একটা বদল হয়ে আসছে যে টাকাই
মাহুগের যোগ্যতা রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ এটা কেবল
যারে পড়ে ঘটছে, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। তাই এক
সময়ে যে মাহুগ মাহুগের বাস্তবের টাকাকে অবজ্ঞা করতে
জানত এখন সে টাকার বাস্তবের বহুতরকে অবজ্ঞা
করছে।” চতুর্দিকে যে আর্থিক সমস্যা বেধা দিয়েছে
তার ফলে রয়েছে বিরাট অব্যবস্থা, বৃহদীক নীতি।
পূর্ণ শ্রম-গুলনামগণ, ইংরাজ-ফরাসীগণ একসময়ে পাড়ী
দিয়েছিল তাদের বাসিন্দা তরী নিয়ে। যে সকল দানে
তাদের তরী ভিক্টরিয়ায়, সে সকল দানের অধিবাসীদের
সঙ্গে এক হয়ে মিলে যেতে পারল না। তার কারণ তারা
করতে এসেছিল বাণিজ্য। শুধাকথিত স্থানগুলির প্রাচুর্য
সম্ভার মেখে তাদের তাক লেগে গিয়েছিল। তাই
মানবও ধরে আর বসে থাকতে চাইল না ; রাষ্ট্রশক্তিকে
গ্রাস করতে চাইল। অন্তর্ভুক্ত দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে বারে
বারে আঘাত করে ভাঙাফেঁটে সফলকাম হোল। যেখান
সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারল না, সেখানেও আত্মপ্রতিষ্ঠা
হবার জন্য নানাভাবে বিশ্ব ছড়িয়ে মিল তাদের মূল
বুদ্ধিতে। কালক্রমে এই উপনিবেশগুলির মধ্যে তারা
একাধিপত্য আরম্ভ করে মিল সর্বমুখি হোতে। বীরে বীরে
সেখানকার সমাজ ব্যবস্থার মূলনীতিগুলি গেল বদল হয়ে।
ইউরোপ গুহই জানে বিজ্ঞানে উন্নত হোতে লাগল ততই
শিল্পনীতি গেল বদলে। শিল্পপতিগণ, বিজ্ঞানকে শিল্পের
বাহন করে তুলল। কৃষীর শিল্প হল দুগ্ধসাৎ। তা
হোক, তাতে যে মাহুগের ক্ষতি বেশী হয়েছে তা নয়।
ক্ষত মূল্য, বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে শিল্প উন্নয়নের ভার
শিল্পপতিদের একচেটিয়া হয়ে গেল। শোভার দল মন্থন
করে আত্মপ্রকাশ করতে চাইল। মূলধন খাটিয়ে মুনাফা
গ্রহণের ব্যবস্থা এমন চমৎকার করে তুলল যে সমাজের

প্রতিটি মাসের উপর এর প্রভাব এনে পড়ল। এতে সাধারণ মানুষের কর্তব্যকৃতি নষ্ট হোতে চলল। গোলাদি-পনাকে কোন মানুষই আর এড়িয়ে যেতে পারল না। শতকরা অধিকসংখ্যক লোকের উপর পুষ্টিপতনের এই যে বিরাট দাবী রূপে সংস্কারগত হোতে চলল। এর ফল হল এই ধনতরবারীরাই গণতরবারীরূপে পৃথিবী ছুড়ে লুটের বাজারের সৃষ্টি করল। মূলমুদ্রসম্পন্ন সাধারণ মানুষ সমাজপতিদেরই অহঙ্করণ করতে চাইল। কিন্তু কুল শেল না, তাই সব খোঁজাতে বসল। মানুষ নিম্নার্থ বৃদ্ধি করে অর্থকে সিলি মর্যাদা। ফলে আর্থিক সঙ্কট সিলে সিলে বেড়ে চলল। এল দুর্ভিক্ষ, এল মহামারী; কত মানুষ অমাহারে মরে গেল, ঈশ্বরের অভাবে, পথের অভাবে কতজন অকালে মরণ বরণ করতে বাধ্য হল, দুর্ভাগ্যে পিতৃহীন অগণনীয় সংখ্যক কবরস্থ হল। মানুষ বরিয়্য হয়ে উঠল। মৃতের কতাল মানুষকে শরণ করিয়ে দিল,—এ অন্ধ অহঙ্করণে ভ্রষ্ট নই, বৃত্তিরে দিল যে মানুষ মানুষকে মর্যাদা দেয় না, সে মানুষকে অন্ধমার্যে বদ্ধ হয়ে তার কৌলিন্দকে স্বীকার করে নেয়ার অর্থ নিম্নেকে প্রবক্তা করল। তাই সেই চেতনার অগ্রিকূণে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাইল,—সেই সোভীয়মলকে। গণজাগরণের সাজা এল দিকে দিকে। মানুষ মানুষের হাতে কলের গুলু হতে থাকতে চাইল না। এ,—নিপীড়িত জনগণের অভিধান। এরা বিশ্বের মানবসমাজের বিরাট অংশ। এরা চার মুক্তি, তাই এ বিরাট গণচেতনাকে রুদ্ধ করে কোন দলই পারল না। এশিয়ার একপ্রান্তে যে আগুন জলে উঠেছিল, সেখানে রক্ত পিপাসুর দল প্রতিঘাত ব্রিতে চেষ্টার ক্রটি করে নি। কিন্তু এ উৎসাহের যে ধরে ধরে প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রবল পক্ষপাতিত্ব।

এরা চাইল আমূল পরিবর্তন। একথা কুলে চলবে না যে সেদিন কস্টার যে গণবিশ্ব দেখা দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সকল শোভার হল একত্রিত হয়ে অভিধান চালিয়েছিল। এ অব্যবহিত চক্রান্তে, জার্মান ও রুশ ভাবেদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এশিয়ার এদেশি,—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান। বিশুদ্ধপ্রায় ভারতব্রের

অন্তরালে থেকে এরা সেখানে লুটের বাজার সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, এদের লুট সৃষ্টি ছিল এখানকার শত্রু ও বনিজ সম্পদগুলির উপর। সেকারণে বছরের পর বছর এখানকার মানুষগুলো শত্রুর চেয়েও নগ্ন হয়ে রইল। এদের মর্যাদিক বৈষম্যের কথা আজও চক্রান্তকারী দলের কুতূহলিক শরণ করিয়ে দেয়। নিশেপণে যে অসমর্থ সৃষ্টি হল, তাতে সংস্কারের প্রাচীর গেল ধলে। মার্কস আদর্শ পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ব্রিবেদিয়েছেন,—মানুষ রয়েছে কোথায় ধাড়িয়ে, সেই সৃষ্টিভিত্তি নিয়ে লেনিন জাতীয় শক্তির ভিত্তির মূলে মানবিক অধিকারকে স্বীকার করে নিলেন। তাই সেখানে শাস্ত্রানুগার লগে লগে এ নীতিগত প্রভাব মূহুর-প্রসারী হয়ে উঠল। এর কারণ এরা বিশ্বের মানুষের স্বাভাবিক আত্মসম্মতিতে বাধ্য না দিয়ে প্রেরণা মূহিরে চলল।

এ পক্ষপাতিত্ব সাংস্কৃতিক সংস্কারের বন্ধন বার টুটে, অন্ধবিশ্বাস জ্ঞান হয়ে যায়, এতে মানুষের মূল ভেঙ্গে যায়, এতে মানুষ আত্মসম্মতিতে সচেতন হয়ে ওঠে। তাই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের পরিবর্তিত সমালোচনা তার সৃষ্টি নিয়ে গেলেন, বিশ্বের একপ্রান্তে। তিনি বললেন, "আর একটা অখ্যাত কোন কি ঘটছে চোরে দেখো। কস্টার কুতূহানে শোভিয়েট গভর্নমেন্ট অতি অন্ধকারের মধ্যেই এশিয়ার মকচরজাতির মধ্যে যে নৃতন জীবন লভ্য করেছে তা আলোচনা করে দেখলে বিস্মিত হোতে হয়। এত ক্ষতবেগে এতটা লাকাল্য লাভের কারণ এই যে এদের চিত্তকর্ষ সাধন করতে এদের আত্মসম্মতিক পূর্ণতা দিতে সেখানকার শত্রুকারের পক্ষে অস্ত্রভ: লোভের। হতরা ঈর্ষার বাধ্য নাই। মকতলে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এই সব ছোট জাতিকে আপন আপন বিশালাক স্থাপন করতে অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এদের বিভ্রান্তের আয়োজন প্রকৃত ও বিচিত্র। পূর্বেই অন্তর লগেছি মূহুরাতিসকল বৃহৎ শোভিয়েট সাম্রাজ্যে আজ কোথাও সম্ভাব্যে সম্ভাব্যে সারামারি কাটাকাটি নই। জারের সাম্রাজ্যিক দাপনে সেটা নিতাই ঘটত। মনের মধ্যে যে বাহ্য থাকলে মানবের আত্মীয় লগে বিকৃতি ঘটে না সেই বাহ্য আগে

শিক্ষা এবং স্বাধীনতা। এই শিক্ষা এবং স্বাধীনতা নতুন বর্ষার বজ্রাঝলের মতো এশিয়ার নবীনালার মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। তাই বহুদূর পরে এশিয়ার মানুষ আত্মস্বাধীনতার চূর্ণটি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে ঝড়াল। এই মুক্তির প্রহসনের আরম্ভে যতই দুঃখ স্বপ্না থাক, তবু মহত্ত্ব-পৌরব লাভের জন্য এই যে আপন সব কিছু পণ করা, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছু নেই। আমাদের মুক্তির দ্বারাই সমস্ত পৃথিবী মুক্তি পাবে। একথা নিশ্চিত মনে রাখতে হবে, যুরোপ আজ নিজের বাহিরে আপন বন্দীদের হাতেই বন্দী।”

এশিয়ার মুকে যে আগুন জলে উঠল, তার ব্যাপ্তি আজ দিকে দিকে। চীনের গৃহযুদ্ধকে আজ আর গৃহযুদ্ধ বলা চলে না, সেখানে সম্পূর্ণ স্থানান্তরী বিপ্লব ঘটে চলেছে। এটা চীনের স্বাভাবিকতাবোধ। চীন আজ লড়ছে আপন সত্যকে কিরিয়ে পাবার জন্য। শুধু চীন নয়, পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে আর এক প্রান্তে, দিকে দিকে যে আলোড়ন আজ বেধা দিতেছে, এতে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটছে তাতে মানুষ মহত্ত্বমর্যাদাবোধে আত্মপ্রতিষ্ঠা হোতে চাইছে। কিন্তু চাইলেও সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার দাবি

যে বাধা রয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে দ্ব্যতঃ নারাবিশ্বের ষাতিয়ে এখনও কয়েক দূরের অহমসরণ করতে হবে। তা হোক, তবু একথা নিশ্চিত, যে দ্বারা আজও লোভকে সযবরণ করতে পারল না, লোভে উদ্বৃত্ততার দ্বারা আজও বিশ্বকে গ্রাস করতে চাইছে, মাটির মানুষের সঙ্গে মিতালী পাতাতে নারাজ তারা একদিন অতলতলে তলিয়ে যাবেই। তাই দুচ্ছাবপানের পর সেদিন যখন শান্তির বার্তা দিকে দিকে ঘোষিত হোলো তখন ভরসা না পেলেও আশার সন্ধান হয়েছিল। কিন্তু অল্পকাল পরেই ল্পষ্ট জানা গেল, যে পুত্রাতন প্রতিযোগিতা আজও চলছে, বিশ্বগ্রাসী স্থা আজও নিবৃত্ত হোলো না। তাই আজও সেই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটছে, “The war is imminent.”

দুঃখে রয়ে গেল; মূলের ক্ষত আজও লাগে নি! দ্বারা আত্মির দেকরও, ত্যাহের আঘাত করলে, আঘাত যে নিজের মুকেই বাজে একথা আজও বৃদ্ধলে না! তাই বিশ্বের দরবারে দাহনকে স্বীকার করে নেওয়ার যে আবেদন তা আজও মূলত্ববী রয়ে গেল! এ আবেদন শুধু আজকের দিনের নয়, এ আবেদন চিরদিনের, চিরকালের।

জাগতিক

শ্রীমদ্বৈরাগ্য রামচন্দ্র

ভাতি-সম্মেলন সাধারণ অধিবেশন আজ অনেকদিন ধরিয়া পারি সহরে চলিতেছে। কিন্তু যে সকল গুরুতর সমস্যা সমাধানের অপেক্ষার আছে এবং বিশ্ববাসী বাহ্যিকের সর্ববাস্তবী সমস্ত সমাধানের আশায় অপেক্ষা করিয়া আছে তাহাদের সমাধান কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না। আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ, পার্বত্য ও অগ্নিয়ার শক্তি, ইত্যাদির উপনিবেশগুলির বধ্যবন ব্যবস্থা, জাপানের সহিত শক্তি, এই সবগুলি গুরু মহামুদ্রের সঙ্গে জড়িত। ততদিন এগুলির বধ্যবন সমাধান না হইবে ততদিন বিশ্বযুদ্ধ অবসান হইয়াছে বলিয়া মনে করা সম্ভব নয়। ইহার উপরে রহিয়াছে দুইভক্তের নতুন নতুন সমস্যা—ব্যা বাসিন সমস্যা, যদিও এই সমস্যা গুরু মহামুদ্রের ফলস্বরূপই বলিতে পারা যায় তথাপি ইহা মিত্রমণ্ডলীর পরস্পর বিরোধের নতুনতম পরিণতি। বলকান সমস্যা; জুত গ্রীক রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধবন দুই আদর্শ পরস্পরকে আঘাত করিতে উত্তর; এশিয়ার অন্তর্গত জুত কোরিয়া রাষ্ট্রকে লইয়াও এই একই বেলা চলিতেছে; কিস্তিনি দেশকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরোধ চলিতেছে তাহার রূপ শেষ পর্যন্ত কি ঠাড়াই তাহা এখনও ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে এই সমস্যা সমাধানের উপর বিশ্ব শান্তি যে বিশেষ ভাবে জড়িত সে কথা অস্বীকার করা যায় না; ইন্দোনেশিয়ার সমস্যাও আর পর্যন্ত সমাধানের দৃশ্য দেখিল না; কাস্ট্রীর সমস্যা যদিও বিশ্বশান্তির সঙ্গে জড়িত করা ইংরেজের একটি কূটনৈতিক চালেই পরিণতি তথাপি একবার যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোতে পরিমণ্ডলে ইহাকে টানিয়া লওয়া হইয়াছে তখন আন্তর্জাতিকভাবেই ইহার সমাধান হওয়া বাহ্যিক।

কমিউনিষ্ট চীন ও চীনা সরকারের ভিতর যে বিরোধ চলিতেছে তাহাকেও আমরা পরস্পর-বিরোধী দুই স্বত্ববাদের সংগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি। জাপানের সহিত শক্তি সমস্যাও এখনও কোন সমাধান

হইল না। সর্বোপরি নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা লইয়া যে ব্যক্তিগততা চলিতেছে তাহার ফল যে কি ঠাড়াইবে তাহা সহজেই অসম্ভব। ইউ, এন, ওর নামে দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকাকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা লইয়াও একটি নতুন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে; যদিও আইনের দ্বারা এই সমস্যাকে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া সমস্যা হিসাবে ধরিয়া লইবার চেষ্টা হইতেছে তথাপি ভারতের প্রতিনিধি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের উদ্বোধনে এই চেষ্টার বিরোধিতা প্রবল হইতে প্রবলতর রূপ ধারণ করিতেছে। ভারতের প্রত্যয় হইল এই যে দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা অধি পরিষদের কঠোরবাহিনী থাকিবে।



শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

এই তোপেল আন্তর্জাতিক পরিহিতের অটলতার স্বরূপ। এই অটলতার অট খুলিয়া আন্তর্জাতিক জীবনে সহন অবস্থা প্রবর্তন করার দায়িত্ব সম্বলিত শান্তি পরিষদের। কিন্তু সাধারণ অধিবেশনে ও ইহার সাধারণবিষয়গুলির আলোচনা হইতে এমন কোন আশ্বাস পাওয়া যায় না বাহ্যতে মনে করা বাইতে পারে এই পরিষদ এই গুরু দায়িত্ব বধ্যবন পালন করিতে শেষ পর্যন্ত সক্ষম হইবে;

বরং দিন দিন ইহার পরিপন্থী লক্ষণগুলি ক্রমবর্ধমান সংখ্যাধিক। এই আশঙ্কারই সূচনা করে যে পূর্ণ পূর্ণ আন্তর্জাতিক সংগঠনের মত বর্তমান সঞ্চিত জাতিগণ্ডও অচিরেই ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া পাইবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মার্কিন সভাপতি উল্ট উইলসনের চেষ্টায় লিগ অব নেশনস গড়িয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের প্রাক্কালে একদিকে যেমন ফ্যাসিবাদী ও ন্যাসী-বাদী শক্তিগুলি এই লীগকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল অন্যদিকে তেমনি ইংরেজ ও ফরাসী নায়কগণ ইহার অকর্ণশ্রুত। প্রচার করিতে সূত্ৰাঘাত করে নাই এবং ইহাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুরাতন পন্থায় তাহাদের বৈশেষিক রাজনীতি পরিচালিত করিয়াছে। ফলে, আন্তর্জাতিকভাবে যদিও এই প্রতিষ্ঠানের অবদান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সম্পূর্ণ হইয়াছে তথাপি ইটালির এবেসিনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং জাপানের মাল্‌কিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আন্তরিকতার অভাব এবং সেই হেতু অর্থ-নৈতিক অবরোধের সোচনীয় ব্যর্থতা হইতেই এই লীগের প্রকৃত অবদান ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বর্তমান সময়েও এইরূপ ভুলক্ষণের অভাব নাই।

বার্লিন—

বার্লিন সমস্তা সমাধানের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। সোভিয়েটের রাজধানী মস্কো সহরে মসিয়ে' টালিনের সহিত ত্রিশক্তি প্রতিনিধিদের ঘরোয়া বৈঠকগুলি মাসখের মনে যে আশার সঞ্চার করিয়াছিল তাহা বার্ষ হইয়াছে এবং ব্যর্থতার কারণ লইয়া উত্তরপক্ষে পরস্পর-বিরোধী বিরূতি বিরোধ আরও ঘনাইয়া তুলিতেছে। রাজনৈতিক পরিঘবে সর্বশেষ যে আলোচনা হইয়াছে তাহাও নৈরাশ্র-জনক। এই পরিঘবের সামনে সর্বশেষ যে প্রস্তাব উপাধিত হইয়াছিল সোভিয়েট প্রতিনিধি হ' ভিনিনস্কি নাকচ করার বিশেষ ক্ষমতা বলে তাহা বাতিল করিয়া দেন। এখন এই সমস্তা সাধারণ পরিঘবে উপাধিত হইবে, সেখানেও কোন স্থল ফলিবে বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিমা দল চাহিতেছেন বার্লিন সমস্তা সমাধানমূলক

আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্বে বার্লিন অবরোধ তুলিয়া লইতে হইবে। সোভিয়েটের দাবী পশ্চিম জাতিগণীতে প্রচলিত নৃতন মূহুর প্রসার বার্লিনের পশ্চিমা শক্তিমের অধিকৃত অঞ্চল হইতে তুলিয়া নিতে হইবে। ইহার পূর্বে কোনরূপ আলোচনা সম্ভব নহে।



মসিয়ে' টালিন

বর্তমানে বার্লিন সমস্তা সমাধানের ত্ত ১৩শক্তি সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া জাতিগুণ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সভাপতি ও সেক্রেটারী রেনারেল, ডাঃ হার্বার্ট ইভাট ও মিঃ হাইগতি লাই এক আবেদন পর প্রচার করিয়াছেন। ১৯৪৫ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের মস্কোচুক্তি ও পরিঘবের শান্তি সম্প্রকিত চুক্তির উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, মস্কোচুক্তি স্বাক্ষরকারী সমুদয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ বিধাহীনচিত্তে এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে ও ইহার পক্ষে ভোট দান করিয়াছে। তাহার মূপরিপ-গুলিও গ্রহণ করিয়াছে; অন্যবিধগণে বাহাতে ঐগুলি কার্যকরী করা হয় তাহার ত্ত সমগ্র পৃথিবী আশা করিয়া আছে। এই উদ্দেশ্যে বার্লিন প্রস্তের সমাধানই প্রধান কাজ বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। বর্তমানে উহা নিরাপত্তা পরিঘবের বিবেচনামূলক। নিরাপত্তা পরিঘবে

শিক্ষা—কাণ্ডিক, ১০৪৫

এই গ্রন্থ লইয়া যে আলোচনা হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই মনে হয় যে, ইহার মীমাংসা সম্ভবপর। বালিন লইয়া অচলাবস্থা হওঁদিলে চলিতে থাকিবে, সমগ্র জাতির শান্তি ও নিরাপত্তার আশঙ্কা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ভবিষ্যৎ সংস্কারের আশ্রয় কোন দেশই গত দুই দশকের ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করিয়া লইয়া যেমন শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। সাধারণ পরিষদ তথা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সমগ্র কার্যকলাপ ইহার ফলে বিলম্বিত ও ব্যাহত হইতেছে। এই আবেশনপত্র দ্বারাও নিকট প্রেরিত হইল, তাহারাই ইচ্ছা করিলেই শান্তি বিস্তার এই সমস্তের সমাধান করিতে পারেন। ইহার জন্য অনতিদিলবে আশাপ আলোচনা ও আন্তর্জাতিক ব্যবহার প্রচেষ্টা। ইহার ফলে আর্থনী, অস্ত্রীয়া ও জাপান সম্পর্কিত অনীমানসিত শান্তি প্রস্তাবগুলির সমাধানের পথ উন্মুক্ত হইবে। বালিন গ্রন্থ সমাধানের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতেও চতুঃপাক্ষিক পূর্ণভাবে সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। সমস্ত সমাধানের জন্য আশ্রয়ের কোনরূপ সাহায্য চাওয়া হইলে আশ্রয় শাসন তাহাতে সম্ভব হইবে।

কিন্তু এই আবেশনের ফল স্বতন্ত্র আশ্রয়ের পূর্ব আশ্রিত হওয়া সম্ভব নহে কারণ অর্থক ব্যালিনে বাস্তব পরবর্তারের জন্য বিধান চলাচল লইয়া বিরোধ থানাইয়া উঠিতেছে।

গ্রীস—

ইউ. এন. ওর বক্তৃকান কমিশনের বিবরণ সম্বন্ধে করিয়া সাম্প্রতিক পরিষদ এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তথায় বিরোধীদল দুগলোভিয়া, এলবানিয়া ও বুলগেরিয়ার নিকট হইতে সাময়িক ও আর্থিক সহায়কদের সাহায্য পাইতেছে। এই সাহায্য বন্ধ করিতে হইবে এবং বসকান কমিশন স্থায়ীভাবে তাহার কাজ চলাইয়া যাইবে। সোভিয়েট পক্ষের দাবী গ্রীস হইতে বিনোদন সৈন্য অপসারিত

করিতে হইবে এবং ফার্মিন সাহায্য দ্বারা, প্রাপ্তি বিরোধ প্রতিক্রিয়ায়ই সার্বভৌম সূত্রের শাসক পক্ষকে পুঁই করিতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। ইংরাজ সরকার কিন্তু জানাইয়া দিচ্ছেন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাহারাই সৈন্যপদসংগ্রহ করিবেন না। এ অবস্থায় প্রস্তাব পাশ করা হইলে হইবে বলিয়া মনে হয়।

পশ্চিম ইউরোপ—

ব্রাসেলস্ মহরে ইংরেজ, ফরাসী, বেলজিয়াম, হলও ও লাক্সেমবার্গ এই পঞ্চপক্ষের ভিতরে এক পাচ্চাত্য সম্মিলন গঠিত হইয়াছিল। যদিও মূখে বলা হইয়াছে যে এই সম্মিলন ইউ. এন. ও সনদের আওতাই স্বীকার করে তথাপি এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলায় প্রয়োজনীয়তা বোধই জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাম্প্রতিক; কিন্তু এখানেই এই প্রতিষ্ঠানের শেষ নহে। আমেরিকা, ক্যানাডা ও উত্তর ইউরোপের ইচ্ছুক রাষ্ট্রগুলি এবং হংকো মার্সাল সাহায্য-প্রাপ্ত সমস্ত জাতিগুলিকে লইয়াই অবশেষে একটি সম্মিলন গড়িয়া উঠিবে এইরূপ সম্ভাবনা মূহুর্তে দেখা যাইতেছে। উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তাচুক্তি থলড়া তো ইতিমধ্যেই প্রায় তৈরী হইয়া আছে। এই চুক্তি সর্বশেষে ব্রাসেলস্ চুক্তিকারী পক্ষসমূহের সাম্মতিক আদেশিকার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আলোচনা করিবেন। ফরাসী থলড়ার একটি বিবরণ আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে একটি স্থায়ী সেক্রেটারীশেট স্থাপিত হইবে এবং ঘন ঘন বৈদেশিক মন্ত্রীসংঘের আলোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে, পক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধের তৎক্ষণাৎ বাধ্যমানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্থায়ী করা হইতেছে যে, এই সম্মিলন ইউ. এন. ও সনদের একপক্ষীয় দ্বারা অস্থায়ী গঠিত হইতেছে—এই দ্বারা অস্থায়ী, নিরাপত্তা স্বকায় অন্য আঞ্চলিক সংগঠন সৃষ্টি করা বিধি বিস্তৃত নহে।

পশ্চিম অঞ্চলে এইরূপ পরিণতির পাশ্চাত্য হিসাবে অথবা এইরূপ পরিণতির আশঙ্কা করিয়াই সোভিয়েট

নেতৃত্বে পূর্ণ ইউরোপে নবাগণতন্ত্রের কমিউনিষ্ট বলগুলি কবিনকর্ষ নামক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। এখন শোনা যায় যে এই বৈশ্বগণি লইয়া একটা ফেডারেশন গড়িয়া তুলিবার জন্য আইন বিশেষজ্ঞগণ প্রায় সহরে মিলিত হইয়াছিলেন। এই গুচ্ছবের সভ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। যদিও অনেকে মনে করেন এইরূপ পরিণতি শেষ পর্যন্ত সোভিয়েটের স্বার্থবিরোধীও হইতে পারে। আবার কেহ কেহ মনে করেন মূলপ্রতিদ্বন্দ্বীর স্বাধীন পথে চলার বিরুদ্ধে এবং প্রকৃত পক্ষে সমস্ত পূর্ণ ইউরোপকে সরাসরিভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ইউ.এস.এস.আর.এর স্বত্বচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ পরিণতি সোভিয়েটের স্বার্থের পরিপোষক।

চীন—

সমগ্র এশিয়া যত কমিউনিষ্টদের তৎপরতা প্রদর্শন লাভ করিতেছে। কোরিয়া, মালয়, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার তাহারা বিশেষভাবে সক্রিয় কিন্তু তাহাদের সাফল্য চীনদেশেই সবচেয়ে ব্যাপক। চীন সরকারকে শোচনীয়ভাবে পরাসিত করিয়া সমগ্র মালয়িয়া তাহারা দখল করিয়াছে। আমেরিকা হইতে প্রচুর সাহায্য পাইয়াও মার্সাল চিয়াং কাইশেক তাহাবিগকে বাধ্য হিতে পারিতেছেন না। এখনও আক্রমণোদ্ভগ কমিউনিষ্টদের হাতেই রহিয়াছে। যদিও দাবী করা হইতেছে যে নানকিন প্রবেশের সিংহাসন স্বরূপ হুচাউএর পূর্ণাঙ্গিক আনুষ্ঠান অকলে কমিউনিষ্ট আক্রমণ সমগ্রভাবে পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে এবং উক্ত সংগ্রামে প্রায় ৪০ হাজার কমিউনিষ্ট সৈন্য হতাহত হইয়াছে কিন্তু উত্তর চীনে কমিউনিষ্টদের আক্রমণের ফলে প্রায়গিট সহর সরকারী সৈন্যরা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে। হোনান প্রদেশের রাঙ্গধানী কেটুকেং এবং সানটান প্রদেশের রাঙ্গধানী সীনান পূর্ণ হইতে কমিউনিষ্টদের দখলে আসিয়াছে।

জাপান—

প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া সুদৃঢ়াঙ্গীনে জাপানী নেতৃত্ববলের হুজুপরাধে অভিযোগে বিচার চলিতেছিল। গত ১২ই নভেম্বর আন্তর্জাতিক সাময়িক টাইফুনাল জেনারেল হিবেকি তৌজের প্রতি কাসীর হুকুম দিয়াছেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান কর্তৃক পার্লামেন্টারি আক্রমণ হওয়ার দুইমাস পূর্বে জেনারেল হিবেকি তৌজো জাপানের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। টাইফুনাল প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উপর জাপানের আক্রমণের জন্য জেনারেল তৌজোকে দায়ী করেন।

অপর ২৪ জন জাপান সমর-নায়কের প্রতিও টাইফুনাল দণ্ডাধেয় প্রদান করিয়াছেন। একমাত্র মামুরো শিগেমিৎসু এবং মধ্যচীন বাহিনীর অধিনায়ক ইওয়ানে মাংহুই ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত জাপানী আক্রমণোদ্ভগ হুকুমের বহুবল করার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নেতাদের প্রতি কাসীর হুকুম দেওয়া হইয়াছে—হিবেকি তৌজো, কেনিগি নইহারা, শিশিহো ইতাগাকি, কোকি হিরেতা, হেইতানো কিমুরা, ইওয়ানে মাংহুই এবং আকিহা মূতো।

ভারতীয় বিচারপতি ডাঃ রাধাবিনোদ পাল এই বর্বরোচিত বিচার প্রদানের বিরুদ্ধে নিজেদের মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার স্বাধ আদালতে পণ্ডিত দেওয়া হয় নাই। এই স্বাধ তিনলক্ষ শব্দ সম্বলিত। ডাঃ পাল বলিয়াছেন বিচারপতিরা তাহাদের বিচার পরিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন। যে অপরাধে জাপানী নেতাদের কাসী হইতেছে সেই অপরাধে বিজয়ী নেতারাও যে দায়ী নহেন এমন কথা বলা যায় না। তিনি আরো বলিয়াছেন জাতীয় প্রজাতন্ত্র ধ্বংসনে লক্ষ্য করার চেষ্টা প্রত্যেক জাতি করে। জাপানের বেলায় এই আশঙ্কামূলক পরিণতির জন্য প্রত্যেকভাবে অট্টোমিয়ার ১৯১৫ হইতে '২৩ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডাবলিউ হিউজেনকে দায়ী করিয়াছেন। লিগ এক বৈশ্ববিশিষ্ট জাপানী প্রতিনিধিরা জাতি সমাজকে চরমভাবে সমাজানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এই চেষ্টার প্রধান বাধা সৃষ্টি করেন মিঃ হিউজেন। প্রথমে এই জাতি বৈর স্বাধীন সমগ্ররূপে আশ্বস্তকরণ করে কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহা স্বাধীনতাত্ত্বিক এবং অর্থনৈতিক কারণের অধুহাতে সমস্ত শেডজাতির ভিতরে ব্যাপকভাবে আশ্বস্তকরণ করে এবং অবৈজ্ঞানিকগুলির উপর আইনগত ব্যাপার প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া হয়। এই অবস্থায় জাপানী নেতৃত্ববল যদি আশ্বস্তকরণের জন্য নিজেদের জাতিকে জাতির ধ্বংসের মনে মনোনিবেশ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন তবে তাহাদের অপরাধ হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।



বিজয়া সন্ধ্যা—

বাংলা হিন্দু সব চেয়ে বড় উৎসব হ'ল দুর্গোৎসব। আজ বাংলা বিভক্ত: বাংলার দুই ভূভাগের হিন্দুরা আজ উৎসব হবার মুখে। নিম্ন বাসভূমিতে তারা আজ যেন নিষেধের কোন অধিকার বোধ করতে পারছে না। তার ফলে দলে দলে পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দুরা এদিকে আসছে। তারা আসছে—তারা বাস্ফারার, কুতিহারার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার উপর উত্তর বাংলাতেই জীবন-যাত্রা আজ অতি কষ্টসাধ্য হ'য়ে উঠেছে। এর মধ্যে বাংলার হিন্দু দুর্গোৎসবকে ভুলতে পারেনি। আমরা সাধারণত আত্মনৈতিক ধর্ম থেকে নিষেধের পত্ন রাখতে চেষ্টা করি। তবুও সর্বসাধারণের উৎসব হিসাবে দুর্গোৎসবকে স্বীকার করতে বাধ্য। সবদিক দিয়ে ধর্মের চুম্বকই মানুষের জীবনকে নীরস করছে। তখন ৩৪ দিনের অস্ত্র ও হানি তারা একটা উৎসবের আনন্দ উপভোগ করে, তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা।

দুর্গোৎসব চলে গেলে; উত্তর বাংলার নিবিঘ্নে তা পালিত হয়েছে। পূর্ব বাংলা থেকে যে সব বিবরণ আমরা পেয়েছি, তাতে এটুকু বলা বাহ্যে ও ধানকার সরকার ও মুসলমান জনতা পূজার ব্যাপারে সাধারণত বখাযোগ্য ভাল ব্যবহারই করেছে, যা হলে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটে থাকলেও তা নিতান্তই ব্যতিক্রম হিসাবেই দেখা উচিত।

দুর্গা পূজার পর আসে বিজয়া। বিজয়া হ'ল বাঙালীর পক্ষে খ্রীতি ও দিলনের উৎসব। ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের গভী পেরিয়ে সকলের সঙ্গে নতুন করে খ্রীতির বন্ধন স্থাপন করাই হ'ল বিজয়ার আলিঙ্গনের উদ্দেশ্য। আমরাও সকলকে বিজয়ার খ্রীতি সন্ধ্যা জানাচ্ছি। বিশেষ ক'রে আবারের গ্রাহক, অগ্রগ্রাহক—সকলকে আমাদের বিজয়ার খ্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ঈশ-দোবারক—

বিজয়ার পরই এস উষ্ম। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার নিবিঘ্নে মুসলমানদের এই উৎসব সম্পন্ন হ'য়েছে:— কেবল পশ্চিম বাংলার এক গ্রামে গো-হত্যা নিয়ে একটু সামান্য পোলদাল হয়েছে। আশা করি পশ্চিম বাংলা সরকার এরমত বখাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন। আমরা সকলকে ঈশ দোবারক জানাচ্ছি।

ধার্মিক সংস্কার—

ভারতে আজও প্রায় ৪ কোটির বেশী মুসলমান আছে। পাকিস্তানের পূর্ণাংশে আজও এক কোটির মতো হিন্দু আছে। ধর্মের ভিত্তিতে আতি বা রাষ্ট্র পঙ্কবার আমরা বিরোধী। ধর্মের আত্মনৈতিক গোড়ামিকে আমরা মনে করি—ধর্মের বা মূল তত্ত্ব তার সম্পূর্ণ প্রতিফল। মুসলমানদের তত্ত্ব হতে এই শতাব্দীর গোড়ামিতে কতগুলি দাবী ওঠে—যা আমরা মনে করি মূলত ধর্মের মূল তত্ত্বের বিরোধী। মসজিদের সামনে বাত বাজালে বা প্রতিমা নিয়ে কোন হানি নিয়ে গেলে, বা বাঁচার পঙ্কবে এভাবে হত্যা না ক'রে অস্ত্রভাবে হত্যা করলে মানুষের ধর্মের কোন হানি হয়, একথা আমরা মানি না। বন-স্তম্ভ আন্দোলনের সবরই এই সব দাবী আমরা প্রথম শুনি,— যা থেকে শাটই মনে হয়েছে এ সব দাবীর পিছনে ধর্ম-বুদ্ধি নেই, আছে রাজনৈতিক উস্কানী। পাকী হিন্দুদের তত্ত্ব থেকে দাবী উঠল গো-হত্যার বিরুদ্ধে; প্রতিমা নিয়ে কোন এক বিশেষ রাজ্য নিয়ে বাত সহ না পেলেই নাকি তাদের ধর্মের হানি হ'ল। আমরা মনে করি এমন সব দাবীও ধর্মের মূল তত্ত্বের বিরোধী।

আজ বেশ বাধীন হয়েছে; ভারতের দুই অংশে দুই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা পরিষ্কার বলে অনেকখানি

কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতিরা নানা ভাবে ইহাই প্রচার করছেন যে পাকিস্তান মূলত ইসলামিক রাষ্ট্র এবং ইসলামী বিধান অনুসারে তা স্থাপিত হবে। ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্র স্পষ্টতই মিশ্রপ্রকৃতির যেনে চলছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইহা একটি অ-ধর্মাত্মক (secular) রাষ্ট্র। তত্ত্বও একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুধর্ম সংখ্যার বলেই প্রাধান্য পেয়েছে এবং ভোগ করছে।

আজ পূর্ব বাংলার মুসলমানরা কতকটা হিন্দুর ধর্মগত দাবী-দাওয়া অগ্রাহ্য করে চলছে। ঠিক তেমনি ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুরা মুসলমানদের ধর্মগত দাবী-দাওয়া কতকটা অগ্রাহ্য করে চলছে। পূর্ব বাংলার গোহত্যা প্রভৃতি লক্ষ্যে হিন্দুদের মনে যে সব সংস্কার আছে, তা আজ তারা প্রকটত প্রতীকার দাবী প্রায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। তেমনি অসম্মানের সামনে বাধ্য বাধ্যনো প্রভৃতি ব্যাপারে মুসলমানদের মনে যে সংস্কার ছিল, তাও তাহা আজ ভারতে প্রতীকার চেষ্টা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। মুসলমানরাও পূর্ব বাংলায় হিন্দুদের মনের ঐ সংস্কারকে সন্ধান করছে না; ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রেও হিন্দুরা মুসলমানদের মনের সংস্কারগুলিকে সন্ধান করে চলে না। ব্যক্তিগত আচরণের দিক দিয়ে এটা সত্য।

কিন্তু সামাজিক জীবন ও জাতীয়তার দিক থেকে এর একটা ফলও আছে। আমরা পূর্বে বলেছি ধর্মগত ঐ সব দাবী অনেক সময়ই অবৈতিক এবং কুসংস্কারমূলক। কুসংস্কার মাহাত্ম্যের বনকে এমনি শক্ত করে জাঁকড়ে থাকে, যে সবক্ষেত্রে তার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আবেষ্টন ও বিধি-নিষেধের চাপ ভিন্ন কুসংস্কারের বন্ধন শিথিল হয় না। কাজেই উভয় রাষ্ট্রে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থার চাপে উভয় সম্ভাব্য অনেক কিছু আজ সবে চলতে বাধ্য হচ্ছে, আমরা আশা করি এর ফলে ব্যাপকভাবে কুসংস্কারের বন্ধন শিথিল হওয়া সম্ভব হবে এবং অ-ধর্মাত্মক (secular) মনোভাবের প্রসার হবে।

পাকিস্তানের সংখ্যালঘু—

পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবস্থা কয়েক দশক হ'য়ে উঠেছে। বৈশ্বাসিন জীবনযাত্রার ব্যবস্থার দাম কয়েকি চড়েছে; চাউল আজ প্রায় শুল্কশের কোঠায় গিয়ে উঠেছে; সরিষার তেল ৪/- সের, বরষে কোন মূল্য, লবণ ৪/- থেকে ৮/- সের, তাল একটাকার সের বা তারও বেশি। তার উপর পূর্ব বাংলার সাধারণভাবেই ব্যবসায় বাণিজ্য প্রায় বন্ধ; কাজেই লোকের আয়ের পথ বন্ধ। এর মধ্যে আবার হিন্দুদের পক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্য বা জীবিকার পথ প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ। সরকারী চাকরি বা টিকাকারী বা কণ্ঠীতি হিন্দুর ভাগ্যে ছোটো না বা অতি কম। ওকালতী, ভাকারী, মাঠারী, মোকাদ্দারী এ সবও হিন্দুর পক্ষে আজ ক্রমশই সম্ভব হ'য়ে আসছে। এই ভ'লে অর্থিক দিক।

এর উপর রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকও আছে। হায়দারাবাদের পতনের সঙ্গে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু অধিবাসীদের মনোভাবের বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। একথা স্বীকার করে সত্য নেই যে পাকিস্তানের মুসলমানরা হায়দারাবাদের পতনে খুবই অসন্তুষ্ট হ'য়েছে; —তারা একটু সহনশীল হয়েছে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আজ পারস্পরিক সম্ভাব্যের সম্পর্ক নেই; কয়েকি পরস্পরিক সম্পর্ক বিস্তারিত প্রতিকূল পথে চলছে। পাকিস্তান সরকারের ও তৎপকার মুসলমানদের মনে ভরসা ছিল, উভয় রাষ্ট্রের সম্পর্ক যদি ক্রমে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের রাস্তা নেয় তবে হায়দারাবাদ তাদের সহায়তা করবে। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান ও হায়দারাবাদ—পশ্চিম, পূর্ব ও মধ্য থেকে এক লম্বা ভারতকে বিস্তৃত করতে পারত যদি হায়দারাবাদ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার বাইরে থাকত। তাদের সেই ভরসা আজ আর রইল না। তার উপর, ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের সাময়িক শক্তির পরিচয় পেয়ে পাকিস্তান সহনশীল হয়েছে।

এই সব কারণে পাকিস্তান আজ একটু বেশি পরিমাণে স্পর্শ-কাতর ও অসহিষ্ণু হয়েছে। হায়দারাবাদের পতন ও জনাব জিন্নার মৃত্যু প্রায় একই সময়ে হয়েছে।

পাকিস্তান সরকার মনে করে উৎসাহ উত্তম সম্প্রদায়ের মনোভাব এই বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী। তাতে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে অকথ্য দাবী হয়েছে। তাই পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের পক্ষে উৎসাহ বাস করা আরও কঠিন হ'য়ে উঠেছে। কোথায় কে অন্যে ঘিরা সঘেছে কি উক্তি করেছে, বা কোথায় কে হায়দরাবাদ সঘেছে কি অভিমত ব্যক্ত করেছে, তা নিয়ে হিন্দুদের উপর কিছু ভুলুম চলছে। ভারতবর্ষের বেতিও বা বেতার শোনা অনেক স্থলে নিষিদ্ধ হয়েছে, ভারতীয় খবরের কাগজ তেঁনে নিবে শোড়ানো হয়েছে, সন্দেহের বশে দ্রুত ব্যক্তির অথবা লাহনা ও অমরাসা করা হয়েছে। কাজেই হিন্দুও আর দলে দলে পূর্ববাংলা ত্যাগ ক'রে পশ্চিম বাংলার আসছে।

এর প্রতিফলিত ও প্রতিকার—

এমন ক'রে লাখ লাখ লোক যদি ঘনবস্তি পশ্চিম বাংলার আসতে থাকে, তবে পশ্চিমবাংলার দাসন-সুখলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। এখানকার খাজ-ভাণ্ডার খুব পর্যাপ্ত নয়; তার উপর এট ১৪১২০ লক্ষ লোকের বাস্তবতার দাবি এলে পড়েছে। এদের বাসস্থান সংগ্রহ ও ভৌমিকার সংস্থান করা এক বৃহৎ ব্যাপার। তা ছাড়া এই বাস্তবতার লোকদের মন স্বভাবতই বিষয়ে পরিপূর্ণ, এই বিষয়ে এদের বাক্য ও আচরণে সনাই প্রকাশ পায়। পশ্চিম বাংলার সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির পক্ষে এই সবই বিশেষভাবে প্রতিফলিত।

এই সব দিক থেকেই পশ্চিমবাংলা তথা ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এই জনপ্রবাহকে জনমের না দেখার মনেই কারণ আছে। হায়দরাবাদের অবস্থা নিয়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল বলেছিলেন—বে ভারতের আভ্যন্তরীণ সুখলা ও শান্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাঘাত না ক'রে হায়দরাবাদের বর্তমান অরাজকতাকে ভারত চলতে দিতে পারে না। (We can not have a campaign of murder, arson, rape and loot going on in Hyderabad without raising communal passion in India

and jeopardising the peace of the Dominion.) পূর্ববাংলার অবস্থা লক্ষ্যেও ভারতীয় সরকারের মনে যে এমনি দৃষ্টি কখনও আসবে না, তা বলা কঠিন। সর্ব মূগেই পার্শ্ববর্তী ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একটা পারস্পরিক দায়িত্বের দাবী থাকে। একের সুশাসনে যদি অপরের শান্তি-সুখলার ব্যাঘাত হয়ে, তবে সেদিকে রাষ্ট্র তার প্রতিকারের দাবী করে। ভারত সরকারও যে সে দাবী করবে না এমন কথা বলা যায় না। যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্র অক্ষমতা ও বৈজ্ঞানিক অন্যাচারের ফলে সেই পারস্পরিক দায়িত্ব বজায় না রাখে, তবে প্রতিবেশী অপর রাজ্য ঐ দায়িত্ব পূরণের দাবী করতে পারে। কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ঐ দায়িত্ব বজায় না রাখলে অপর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সুখলা ও শান্তি ব্যাঘাত হয়।

কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন—

প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ক'রে এবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। ডাঃ পট্টভী



ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া

সীতারামিয়া ও ত্রিপুরবোম্বাই টেওনকী এবার সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিলেন। আরও কয়েকজন প্রার্থী

ছিলেন; তাঁর মধ্যে ছ'জন ডাঃ পট্টভীর পক্ষে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করেন; একজন তা কিছু উল্লেখ না করেই নাম প্রত্যাহার করেন। ডাঃ রামেন্দ্রপ্রসাদও নিজের নাম প্রত্যাহার করেন এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল টেওনসীও নিজের নাম প্রত্যাহার করেন। কিন্তু টেওনসীও তা করেননি।

আমরা মনে করি কংগ্রেসের এই সম্মানিত পদের নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হওয়া উচিত নয়। উপর থেকে একজনের নাম চাপিয়ে দেওয়া গণতন্ত্রবিরোধী। উপযুক্ত প্রার্থীরা নির্বাচনের ক্ষমতা রাখবেন এবং দেশের জনসাধারণ নিজেদের বিচারক বৃত্তি মতো ভোট দিবে—এই ব্যবস্থাটি হওয়া উচিত।

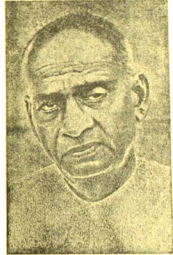
যে দুজন প্রার্থী ছিলেন, তাঁরা উভয়েই উপযুক্ত ও খ্যাত কংগ্রেস নেতা। এঁরা উভয়েই অসহযোগের সময় হতে কংগ্রেসের সেবায় নিয়োজিত আছেন; উভয়ের ত্যাগ ও কর্মক্ষমতা খ্যাত। উভয়েই কিছুটা পরিমাণ থাকে বলা যায় দেখাড়া—অর্থাৎ সহজে অপরের মতের সঙ্গে মত দিতে সম্মত নন। তবুও এর মধ্যে ডাঃ পট্টভী বহু বৎসর দায়ক কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভ্য; বেশী রাজসমূহের গণ-আন্দোলনের পরিচালক হিসাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; তিনি সুপণ্ডিত ও বহু গ্রন্থের লেখক।

আমরা ডাঃ পট্টভীর নির্বাচনকে অভিনিষিত্ত করি। আশা করি তাঁর ধরদৃষ্টি ও হৃদয়বৃত্তির ফলে কংগ্রেসের ভিত্তিকার অন্যায় অনেকটা দূর হবে। আশা করি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের বা আদর্শ ভারতীয় রাষ্ট্রের শাসন-পরিচালক হিসাবে যাতে কংগ্রেস তা কাজে পরিণত করতে পারে, তাঁর প্রকৃত প্রচেষ্টাও ডাঃ পট্টভীর অধিনায়কত্বে হ্রাস হবে।

সর্দারজীর মাগপুর বক্তৃতা—

সর্দার বলভভাই পেটেল পূর্ব বাংলার বাঙাল্যঙ্গী হিন্দুদের সন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছেন—যে যদি পাকিস্তান এইভাবে হিন্দুদের বাঙাল্যঙ্গ বহু করতে না পারে, তবে ভারতের পক্ষে যে সমস্তার সৃষ্টি হবে তার হামিষও

পাকিস্তানকে নিতে হবে। যে পরিমাণ জনসংখ্যার অল্পপাতে যে পরিমাণ জমি নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা গঠিত হয়েছে, আজ পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু চলে আসার সঙ্গে জনসংখ্যার হ্রাসের সঙ্গে জমির পরিমাণেরও হ্রাস হওয়া সম্ভব। সর্দার বলভভাই কংগ্রেসের একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা; ভারতীয় সরকারের সহকারী প্রধান মন্ত্রী এবং ঐ বক্তৃতা দেবার সময় তিনি অস্বাভাবিকভাবে প্রধান মন্ত্রীর কাজ করছিলেন। কাজেই তাঁর এই বক্তৃতা কেবল ব্যক্তিগত খেয়ালের কথা নয়; আমরা মনে করি এই দাবীর সঙ্গে ভারতীয় মহামণ্ডলীর সমর্থন আছে। কাজেই এই দাবীকে সেলো করে দেবলে চলবে না।



সর্দারজী

সর্দারজীর কথার পিছনে যুক্তি ছাড়া এই যে—ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে সোরা কোটি লোকের বা যে ২০১২৫ লক্ষ লোক এ পর্যন্ত এসেছে, কেবল তাদেরও বসবাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। অথচ পূর্ব বাংলা থেকে বাঙাল্যঙ্গী আলায়-প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে। পশ্চিম বাংলার উপর এই চাপ বিশেষভাবে পড়ছে। পশ্চিম বাংলা অত্যন্ত ঘনবসতি গ্রন্থন, প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৮০০ জন লোক এখানে বাস করে। পশ্চিম পাকিস্তান

থেকে প্রায় ৯০ লক্ষ লোক ভারতে এশেছে এবং তেমনই এই পরিমাণ লোক (মুসলমান) ভারত থেকে পাকিস্তানে গিয়েছে। কাজেই নবাবত্বের বসবাস জীবিকার উপযুক্ত বালি (vacant) সংস্থান ছিল। তবুও এই ৯০ লক্ষ লোকের পুনর্বসতির ব্যবস্থা একবছরের মধ্যে হ'তে পারেনি এবং এরমত ভারত সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।

পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের মতও বোধ হয় প্রতিমাসে সরকারের ৩০০০ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে; অথচ প্রযোজনের তুলনায় এটা হল তপ্ত খোলায় জেলের কৌটার মতো। কাজেই ভারত সরকারের পক্ষে সবচেয়ে অত্যন্ত গুরুতর। বিশেষ গুরুতর এইমত যে এবার জনমোহিত নিত্যস্বই একমুখী। কোথাও বালি সংস্থান এতটুকুও নেই; বরং সর্বত্রই স্থান ও জীবিকার অভাব। এর কি প্রতিকার হতে পারে? সাধারণত উভয় লোকের মনে প্রথমেই আসবে—বেশ, শুধান থেকে হিন্দু আসছে। এখান থেকে সেই পরিমাণ মুসলমান চলে যাক; সেই দৃষ্ট হানে এখের বসানো হবে। এই কথা কংগ্রেসের নয়, এবং কংগ্রেস পরিচালিত সরকারেরও নয়। পূর্ববাংলার সরকার বা অধিবাসীদের অংশবিশেষ কি অস্বাভাবিক করে, তার মত ভারতের আইন-অঙ্গমারী মুসলমান অধিবাসীদের ধরে ধরে ওপারে চালান হবে এটা অস্বাভাবিক ও বর্বরোচিত। কাজেই এই কথা অগ্রাহ্য।

এরপরই আসে সর্গারজী যে দাবী করেছেন। তাঁর দাবীর মধ্যেও দুটা অংশ আছে। হয় জনসংখ্যার অনুপাতে অধি পাকিস্তান ছেড়ে দিক, না হয় পাকিস্তানের কোন অংশে সবচেয়ে হিন্দুদের এনে বসতি করা হ'ক, যাতে এই অঞ্চলে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। এই দ্বিতীয় প্রস্তাবও খুব সম্ভব নয়। পাকিস্তানের কোন অঞ্চলে হিন্দুদের বসতি স্থাপন করতে হলে, এই অঞ্চল থেকে মুসলমান সরিয়ে দিতে হবে—নইলে এই হিন্দুদের স্থান হ'তে পারে না। এইভাবে লোক সরিয়ে দেওয়া, আমরা মনে করি—অস্বাভাবিক ও বর্বরোচিত। তা ছাড়া এইভাবে এতটা হিন্দুপ্রধান অঞ্চল করতে পাকিস্তান কখনও রাজী হবে না।

সর্গারজীর এই দুই প্রস্তাব কার্যত প্রায় একই। এর কোনটাকেই পাকিস্তান রাজী হবে বলে মনে হয় না। অথচ এই প্রস্তাব হঠাৎ উভয় রাষ্ট্রের আসন্ন আলোচনার মধ্যেও আসবে। বরংই নেওয়া যেতে পারে—পাকিস্তান রাজী হবে না। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে—এর পর কি?

এমিকে কান্সিদের ভারত ও পাকিস্তান কার্যত মুক্ত শিল্প এবং দিল্লিতে বিমান বাহিনী দিয়ে অল্প পাঠানোর ব্যাপার নিয়ে সেখানে ভারতীয় ও পাকিস্তানী বিমানে প্রত্যেক সংঘর্ষ ২২ বার ঘটছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটেই বলে আশঙ্কা করা যায়। এর অর্থ এই পাড়ায় যে কান্সির নিয়ে উভয় রাষ্ট্রে সংঘর্ষ কমেই প্রত্যাক, ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠবে। তার উপর আবার পূর্ববাংলার বাস্তুভাঙ্গীদের নিয়ে যদি সংঘর্ষ শুরু হয়—তবে এর পরিণতি কি হবে—তা অজানা। ইতিমধ্যেই পূর্ববাংলার প্রধান মন্ত্রী জনাব হুসল আমিন সর্গারজীর উক্তিও উত্তরে যা বলেছেন তাকে বলা যায় উভয় রাষ্ট্রের অস্ত্রবলের পরোক্ষের আদান।

আমরা উভয় রাষ্ট্রের মৈত্রীর পক্ষপাতী; উভয়রাষ্ট্রে যাতে হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীরা ধর্ম নিবিশেষে পূর্ণ নাগরিক অধিকার নিয়ে বাস করতে পারে। সেই অবস্থা প্রতিষ্ঠার আমরা প্রার্থী। অবস্থার ও ঘটনার সন্ধিতে তার ব্যতিক্রম কেবলে আমরা ঘূর্ণিত হই।

ভারত ও ব্রিটেন—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল বিলাতে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ জাতিপুঞ্জের প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগ দেবার মত। সেখানে বাবার পূর্বে তিনি পরিষদের কংগ্রেসী সভ্যদের সঙ্গে এক যত্রোয়া বৈঠকে অনেক কথা আলোচনা করেন। তাঁর কথার আর্থ্য মর্ম ছিল—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বা জাতিপুঞ্জের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কি হবে। ব্রিটেনে এই সম্পর্কে পণ্ডিতজী কিছু আলোচনা করেছেন। বেশে কিংবদন্তি এনে, তিনি এই সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন।

স্বভাবতই মনে আসবে—ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের

কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। এত বছর আমরা এট সাধনাই করেছি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। আজ সেই সাধনাকে কাজে পরিণত করার সুযোগ পেয়ে ভারত আবার ওদের কাছে পা বিবে কেন? ভারতের গণপরিষদ প্রত্যাব পাল করেছে ভারত স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে। কালেই ব্রিটেনের রাজার প্রতি আহ্বগতা ভারতের থাকতে পারে না।

এটা হ'ল একটা বিক—প্রধানত ভাবাবেগের বিক। কিছু আরও একটা বিক আছে সেটা হ'ল বাস্তব রাজনীতির বিক। আমকার ভূনিচাতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন



গণিতকী

হ'য়ে এককভাবে ভারত টিকে থাকতে ও তার স্বাধীন রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা গড়তে পারে কি না তাও ভেবে যেখবার প্রয়োজন আছে। বর্তমানে দুটি নুতন শক্তি যুগতকে ছেয়ে রেখেছে। একদিকে কবিয়া ও অপর দিকে আমেরিকা; আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেনও ওড়িত আছে। ব্রিটেন ও আমেরিকার যৌথ রাষ্ট্রীয় কারবারে, ব্রিটেন হ'ল ছোট হিন্দু। একদিকে সোভিয়েট ইউক্রাষ্ট এবং অপর দিকে আমেরিকা ও ব্রিটেন। এর মধ্যে

সোভিয়েট রাষ্ট্র লেনিনের মত ও পথ থেকে অনেকখানি সরে গাড়িয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর লেনিন কাজে ও কথায় প্রচার করেছিলেন—বিনা ক্ষতিপূরণে ও পরবর্তী থেকে কোন অংশ গ্রহণ না করে দখল হওয়া সরকার। এই মন্ত্র অহুণারে তিনি পারস্ত, তুরস ও চীনে কবিয়ার অধিকৃত স্থান ও স্থিতিস্থাপন ছেড়েছিলেন। আর আজ রাগিন আবার চীনের পোর্ট আর্থার (Port Arthur) দখল কবলেন, পারস্তের কাছে তেলের অধিকার দাবী করছেন এবং তুরসের নিকট ভূমি দাবী করেছিলেন। ইতালীর কৃতপূর্ণ আফ্রিকায় উপনিবেশ থেকেও অংশ দাবী করছেন; পোল্যান্ডের যে অংশ বহু বছর পূর্বে রাশিয়ার সম্রাটগণ জয় করেছিলেন এবং যা প্রথম মহাযুদ্ধের পর কবিয়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, তাও আবার রাগিন এবার কবিয়ার দখলে এনে পোল্যান্ডকে ক্ষতিপূরণ করলেন তারেইই খাম ভূমির একটা বিরাট অংশ তাকে দিয়ে। বর্তমানের কবিয়া বা সোভিয়েট পুরাতন কবিয়ার সম্রাট বা ভারতের অহুণরণে সমস্ত ব্রাড বেশময়ূহের দুরন্তী ও দাতব্যর হ'য়ে বসতে চাচ্ছে। তা ছাড়া সোভিয়েটের ওপ্তচর কন্মুনিষ্ট পার্টীর গোষাকে সব মেনেই ছড়িয়ে আছে; ভিতর থেকে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা বদিয়ে দেওয়া এদের শিক্ষার ও রাজনৈতিক কর্মভানিকার অঙ্গীভূত। ব্রহ্মে, চীনে, ভারতীয় দীপপুর্বে এদের যে কার্যপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া গিরাছে, তাতেও এদের সমস্ত লোকের মনে ভাল ও সম্মোহের দকার হবে।

সোভিয়েটের নুতন প্রসার-নীতির (expansionist policy) একটা গতি হ'ল পারস্ত দাগয়ের দিকে; পতনযুদ্ধের পর নানাভাবে সোভিয়েট পরিস্থেয় মধ্যে নিষেধ প্রতাব বিস্তার করতে চেষ্টা করেছে। ভারতের পক্ষে এটা খুব প্রীতিকর নয়। এই সব নানা কারণে অনেকের মনেই সোভিয়েট কবিয়া সমস্তে কিছু সম্ভেদ ও আতঙ্ক আছে। নকিত্তে, তবিশ্রং সম্ভাবনায় ও বর্তমান আশা-আকাঙ্ক্ষায় নুতন উত্তীর্ণমান শক্তি হিলাবে, সোভিয়েট কবিয়ার প্রতি এমনই সম্ভেদ ও আতঙ্ক অনেকটা স্বাভাবিক।

কায়েই মোজিমেটের সঙ্গে মিত্রতা করা চলে না। অর্থ আরও দুর্নিয়তে একেবারে একা চলাও সম্ভব বলে মনে হয় না। গত দুই মহাদুর্ভিক্ষে প্রমাণিত হয়েছে শান্তি ও সুখ উভয়ই অবিভাজ্য। প্রথম মহাদুর্ভিক্ষ থেকে দ্বিতীয় মহাদুর্ভিক্ষ বিকৃততর ও তীব্রতর হয়েছিল। তৃতীয় মহাদুর্ভিক্ষে তখন সবাই প্রস্তুত হচ্ছে; এই দুই আরও তীব্র ও বিকৃত হবে। ভারতবর্ষ তার বন্ধন থেকে অব্যাহতি পাবে না। কায়েই তাকে আত্মবিকার মস্ত প্রস্তুত হওয়া দরকার। এ ডিগ্রি এসিয়াতে ভারতের একটা বিশেষ দাবির আছে। এই দাবির কতক আছে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান থেকে এবং কতক আছে ভারতের ঐতিহ্য ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব থেকে। এশিয়ার তরুণ ও শিশু বাঙালিদের বহু ব্যাপারে ভারতের দিকে তাকাতে ও তাকাত্তে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান হ'ল পৃথিবীর প্রাচ্য দিকবাহিনী। ভারত মহাসাগর ভারতের একান্ত দাম সাগর, এর দুইদিকে দুই মহাসাগর—প্রশান্ত ও আটলান্টিক। ভারতের প্রায় ১৫০০ মাইল সাগরতুল (coast) আছে। তারকা করার এবং কাগজ তিনটি মহাসাগরের মতকা রক্ষা করার উপযোগী নৌবাহিনী ভারতে গড়তে হবে। এশিয়ার জাতিসমূহের প্রতি এর দাবির রক্ষা করার ক্ষমতা, ভারতের শক্তিশালী নৌবাহিনী দরকার। বিনাম বাহিনীও এর উপযুক্ত পরিমাণ তাকে রাখতে হবে। এ সব আবার কোন শক্তিশালী জাতির সাহায্য ছিঁর ভারত পাবে না। আমরা স্বীকার করি ভারত গাছীকীর শাস্তিবাসে বিনাসী; কিন্তু গাছীকী আদর্শবাদী হলে অব্যাহত আদর্শবাদী ছিলেন না। বর্তমানে বিশ্ব-রাজনীতিবাদের এড়িয়ে তা অগ্রাহ্য করে ভারত চলতে পারবে না। তাই তাকে সামরিক শক্তি সংগ্রহ করতে হবে এবং তাইই মস্ত কোন শক্তিশালী জাতির সঙ্গে যোগ রাখতে হবে।

ভারত আত্ম-স্বাধীন এবং নতুন শাসন-বিধানে স্বাধীন সার্বভৌম গণতন্ত্র ব'লে নিজেকে ঘোষণা করতে থাকে। ইংরাজ রাজের প্রতি ভারতের কোন বিশেষ আকর্ষণ থাকতে পারে না; তাঁর প্রতি আত্মগতের গণতন্ত্র নেওড়া

ভারতবাসীর আত্মসম্মানে আত্মা লাগবে। এর কোন ব্যতিক্রম ভারত বরদাস্ত করবে না। এরপর যদি ব্রিটিশ জাতিগুণের সঙ্গে কোন জৈবিক (organic) সম্পর্ক সম্ভব কিনা এবং তা ভারতের সঙ্গে কোন নতুন বন্ধন হবে কিনা তা তাৎপর্য প্রয়োজন আছে।

নিজের শাসন-বিধান প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করার পূর্ণ অধিকার আত্ম ভারতের আছে। কায়েই ব্রিটেন ও তার সঙ্গে জড়িত জাতিসমূহের সাথে আত্ম কোন ব্যবস্থা করলে নিজের প্রয়োজন মতো ভারত তা পরিবর্তন করতে পারে। কায়েই কোন স্বাধীন বন্ধন এতে আসবে না। বর্তমানে ইংরাজ যে ভাবে তার প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা ভারতের হাতে ছেড়ে দিয়ে দিয়েছে তাতে নানা দোষের সাথে ভাগও কিছু হয়েছে। ভালমন্দ জড়িয়ে আত্মকর্তার ব্যবস্থার ইংরাজের সঙ্গে আমাদের পূর্ব সম্পর্কের কতকটা আত্মও চলতি আছে। হঠাৎ এ সব কেটে গিলে, সব ব্যবস্থার যে ওলটপালট ঘটবে, তার ক্ষমতা বেশ মানসিক ও বাস্তব (psychologically and objectively) দিক থেকে তৈরি নয়। ব্যবসায় বাণিজ্য, যন্ত্ররক্ষা বিধান, অর্থ-নীতি, প্রকৃতি বহু বিষয় আত্মও ব্রিটেনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আত্ম হঠাৎ তা ছেড়ে দিলে, ভারতের আর্থিক, সামরিক ও শাসনিক (administrative) কাঠামো কতটা মজবুতও থাকবে তা তাৎপর্য কথা। তা ছাড়া ইংরেজের বহু উপনিবেশে ও বহু ভারতবাসী আছে। কিম্ব, বরিশাল, ব্রিটিশ রাজ্যে স্কিননা প্রকৃতি মেনে ভারতবাসীরা সংযোগগঠিত। আত্ম হঠাৎ ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁদে করলে ঐ সব লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী হয় ভারতের নিকট পর-রাষ্ট্রবাসী (alien citizen)—না হয় তাদের ঐ সব আবাস খুলে তারা পররাষ্ট্রবাসী বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তারা ভারতের নাগরিক হলে ঐ সব দেশে বিদেশী ব'লে গণ্য হবে। ঐ সব দেশের নাগরিক হলে ভারতের গণতন্ত্র বিদেশী হবে এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের প্রতি কোন অধিকার হ'লে, বা তাদের মুখ কষ্ট নিয়ে ভারতের কোন কথা বলার থাকবে না। এইভাবে ভারতের বাইরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

বহু লক্ষ ভারতবাসী আছে। ব্রিটেনের ভারতের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে, এদের বিষয়ও ভাব্য। সরকার।

আরও একটা বিষয় বিবেচ্য আছে। ব্রিটেন জানে সে আজ পড়ন্ত জাতি; তাই নিজেদের বোঝা হালকা করবার জন্য সে ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহল থেকে সরে গেছে। এখন তার বিশেষ সমস্যা হল—নিজের ঘর শুছানো। তার শক্তি ও স্পৃহা এখন হ'বার সম্ভাবনা কম যে নতুন করে তার জিহ্বা ভেঙ্গে উঠবে এবং পৃথিবীর চক্ষে আসের কারণ হবে। কিন্তু নতুন উঠতি শক্তি হিলাবে সোভিয়েটের সম্বন্ধে সে ভরসা করা দায় না। আজ ব্রিটেনের চেষ্টা হবে পৃথিবীতে যাতে শান্তি বজায় থাকে; সোভিয়েটের ভেতন চেষ্টা হবার কোন কারণ নেই অবশ্য যদি সে সেনিনের আদর্শ নির্ধারণ করে বজায় রাখত, তবে বরং এই ভরসা তার সম্বন্ধে করা যেত।

এই সব নানা কারণে পণ্ডিত জওহরলালজী ইচ্ছা—নিজের স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সত্তা বজায় রেখে, ব্রিটেনের রাজ্যের প্রতি আত্মগতের লক্ষ্য বাহু দিয়ে যদি ব্রিটিশ জাতিপুঞ্জের সঙ্গে কোন সম্পর্ক বজায় রাখা যায়, তবে ভারতের পক্ষে ভাল। এদিকে ব্রিটেন ও তার সঙ্গী জাতিসমূহের সম্মেলনে নির্ধারিত হয়েছে ব্রিটিশ জাতিপুঞ্জ (British Commonwealth of Nations) কথাটা থেকে ব্রিটিশ শব্দটা বাদ দেওয়া হবে। এতে

ভারতের পক্ষে এই জাতিপুঞ্জের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা অনেকটা সহজ হয়েছে।

সার্বভৌম ও পণ্ডিতজীর জন্মভাষিক—

অল্প কিছুদিনের মধ্যে সর্গের বরষাভাই পেটেনের ও পণ্ডিত জওহরলালের জন্ম-ভাষিক এল ও পেরিয়ে গেল। এঁরা যে আজ কেবল ভারতের প্রধান-মন্ত্রী ও সরকারী প্রধান-মন্ত্রী তা নয়, কেবল এই পরিচয় দিয়ে এঁদের সেখানে ভুল করা হবে। এঁদের প্রধান পরিচয় স্বাধীনতা যুদ্ধে এঁরা জাতির অধিনায়ক করেছেন এবং হঠাৎ করে নিজস্বের স্বাধীন পূরণ করে জাতিকে স্বাধীনতা পৌছে দিয়েছেন। ওটাই গিয়েছে এঁদের জীবনের স্রোত ও গৌরবময় দিন। আজ এঁদের আজ্ঞা স্বাধীনতাকে স্বাধী ও জনসাধারণের প্রীতি ও সহযোগিতার উপর গড়বার দায়িত্বও এঁরাই গ্রহণ করেছেন। এই নতুন দায়িত্ব, এঁদের অভিজ্ঞতা নেই; বাধাও অনেক নতুন রকমের আছে। তাই ভুল-ত্রুটি অনেক হতে আর হচ্ছে। কিন্তু এ কথা ভুললেও চলবে না যে এঁরাই জাতির বিশ্বাস-ভাজন নেতা—এঁরা জাতির স্বার্থকে বিসর্জন দিবে না। যে প্রতিফুল অবস্থার ভিতর দিয়ে এঁদের চলতে হচ্ছে, তাতে ভুল-ত্রুটি অনিবার্য।

আরও বহুবার এঁদের জন্মভাষিক কীরে আহুক এবং আরও বহু বছর এঁরা জাতিকে সেবা করার স্বযোগ পাবে—এই আমাদের কামনা।

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অকশ্যুত গুহ

কংগ্রেসের পথ

১০০

“আবেলন নিবেদনের অর্থ্য হইতে কংগ্রেস কনশঃ
কি উত্তর বস্তুমান সংঘমান বৈমবিক মহাপক্ষে
পরিণত হইয়াছে, তাহাওই দ্বাভাব্যিক হুনিপুণ
বিবেষণ ইত্যতে বহিচ্চাছে।” —আনন্দ বাজার

নগেন্দ্রনাথ দত্ত

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতি
বিপ্লবের পথে কংগ্রেস

অধ্যাপিকা শান্তিহুদা ঘোষ

নারী

১৮

এ দুগের প্রত্যেক নারীর এই বইখানা পড়া উচিত।

ডাঃ কালকমল ঘোষোপাধ্যায়

বিশাল বাজালা

১৮

‘টুই আর্টি’ আবেলনে বিশাল বাজালার চিত্র ও
দৃশ্যমান দৃশ্যক সমাজ এট বটখানিতে পথ নির্দেশ
পাইসেন। সর্বর উচ্চ প্রশংসিত।

অধ্যাপক দিলীপচন্দ্র বিখাস

ভারতীয় সভ্যতা ও সাম্রাজ্যিক সমস্ত। ১০০

ডাঃ শ্রীহুদার বন্দোপাধ্যায়

বাল্মীকি সাহিত্যের কথা

ডাঃ ভবোদয় সেনগুপ্ত

Sarat Chandra : Man and Artist 5/-

অধ্যাপক প্রিয়রতন সেন

Western Influence in Bengali
Literature

কৃষ্ণচন্দ্রনাথ দত্ত

Indian Revolution and the
Constructive Programme 2/-

—কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ গল্পের বই—

ভাট্টাশ্রম দ্বারা

শান্তিন্দার সেরা গল্প

টুপেনিচ, টলস্টয়, পুশকিন, শেক্সপীয়ার প্রভৃতি শান্তিন্দার
শ্রেষ্ঠ লেখকদের কয়েকটি সেরা গল্পের অঙ্কবান।

গোপালচন্দ্র চৌধুরী

কয়েকটি বিদেশী গল্প

২৫০

হেট হিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, হুইটেন, টটালী
প্রভৃতি কয়েকটি দেশের হুনির্দীচিত গল্পের
অঙ্কবান।

অকশ্যুত গুহ

জীবনের বসন্ত

২৫০

আনন্দবাচার, দুগাভর, বিশ্বনাথ স্যোভাও প্রভৃতি
পরিচয় উচ্চ প্রশংসিত। গ্রিহকনকে উপহার
দিবার মত।

—ছোটদের জন্য—

মনোমোহন চক্রবর্তী

ভাট্টাশ্রমের দ্বিধিগয়

২০০

টিউলক্টি-এর ভাট্টার ডুসিটলের অপরূপ কাহিনী।
পৃথিবীর শিশু সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পাতায়
পাতায় ছবি।

শান্তিন্দার রাতদুত (২৫ সংস্করণ)

২০০

অঙ্কবান সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর বই বলে সমাদৃত।

নগেন্দ্রনাথ দত্ত

হুন্ডোপটাস

১৮০

ছেলে মেয়েদের এমন অতিবন্দন্যের বই বাংলাতে
নাই। ছবিতে ভরা।

অকশ্যুত গুহ

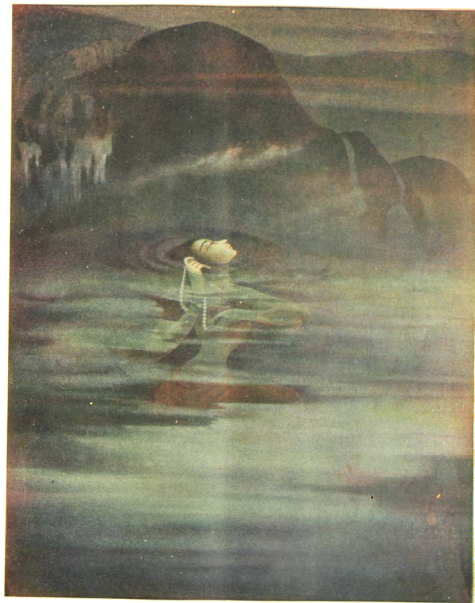
দ্বিধি ও সভ্যতা

১০০

দ্বিধির প্রথম উয়েন চইতে সভ্যতার বিকাশ পর্দায়
পৃথিবীর চিত্রিত।

সরস্বতী লাইব্রেরী : সি. ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দিঘল), কলিকাতা

অন্ধিদা



—ইন্দিরা—

একাদশ বর্ষ

অগ্রহায়ণ—১৩৫৫

অষ্টম সংখ্যা

প্রথম জেনের অভিজ্ঞতা

শ্রীমুশ্রুমুদ্রার দত্ত

লালবাজারে গনের দিন কাটল। রাত্তি তালিকা গনের-বিনেরই এক। সকাল সাড়ে দশটা আশ্রয় একটি ভ্রাঙ্গ কনটেইনল রাহা ক'রে মিথে হাথ ভাত, মূগের ভাল, পটলের কোল—best sauce দিয়ে খাই, অম্বতের মতো লাগে। রাত আটটায় দোকানের চারখানা পুরী এবং ঠোঁকার তলায় একটু আলুর ছেচুকি। সকালে বিকালে কিছু নয়। ঘরের দরজার সামনে ব'সে চারটি কনটেইনল, একজন ঝাড়িয়ে বসুক ও সন্ধান হাতে। কনটেইনলরা সন্ধ্যায় অঙ্ককারে ছোলা ভাঙা চিবাতে শুরু করবে। একজন বলে, আগনার তো কিনে পেয়েছে নিচ্ছই, সরকারের নয়, আবার নিজের ছোলা, চারটি ঘিই, খাবেন?

পায়চারি করছিলাম, দরজায় একটু ঝাড়িয়ে বললাম, না ভাই, তোমরা বাও। আমি আমার নিজের ভাবনা, গায়ের ও মাথার ব্যথা ও ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ঘুরে বেড়াই। হাতের গলির বা প্রায় শুকিয়ে এসেছে, তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে।

প্রথম দিনটি অম্বনিই কেটে গেল, দ্বিতীয় দিনে বেলা আটটা আশ্রয় বুদ্ধ সার্জেন্টটি এল। অম্বনিতেই একটা বিশ্ব চেহারা, আমি গলায় হাড়ি মিটে পেরেছিলাম ব'লে সে এখন আরও বিষয়—এ কথা পরে শুনেছিলাম।

মিঃসেস করলো—You must be badly needing a bath?

বললাম, হ্যাঁ।

খুলে বের ক'রে একটা স্নানের ঘরে ঢুকিয়ে দিল। কাপড় গানছা নেই, একটি খাকি জামিচা তখন আমার পরতে দিয়েছে। তাই নিচেই ঢাক'রে প'ছি, ঐ কখনো হান করতাম। তবুই ভূপি বেগে হ'ত।

তৃতীয় দিনে সার্জেন্টটি ভূপবে এসে বললে—You have nothing to pass your time with. Shall I ask for some books for you?

Please, do.

সন্ধ্যাবেলায় আর একটি অ্যাগায়েডা হকিপরা ইউরোপীয়ানকে নিয়ে এল, তার গলায় ফুলনো একটা অরোফান (বদ্বিরমের কলা শুনবার বহ)।

বললে, আপনি বই চেয়েছেন?

I never asked for anything.

সার্জেন্ট বললে, আপনার সময় কাটাবার কিছু নেই।

বললাম, that's true.

Please ask the Deputy Commissioner when he comes round. I too shall speak to him.

কিরে এসে নিজের জায়গায় বসব ভাবছি, জিজ্ঞেস করলে, আপনার নাম কি ?

বললাম।

জিজ্ঞেস করলে, আপনি কোথায় থাকতেন ?

পূর্বাণো মেনের ঠিকানা বললাম, পটলভাড়া।

Where's that ?

Near the Amherst Street and Harrison Road crossing.

Did you happen to know শ্রমজীবী সমন্বয়, অমরেন্দ্র চাটাকি, মমথ বিশ্বাস and all that ?

What do you mean by all these questions ?

কিংবার উপক্রম করছি, ব্রজ Sergeant-টি বললে, না, না, ও কিছু নয়, he is only a brother Sergeant.

স্বামনে এসে কবলের উপর আসন ক'রে বললাম। ওরা পেছনে দাঁড়িয়ে কি একটু বিড় বিড় ক'রে আপন ক'রে শ'রে পড়লো।

এই পনের দিনের ভিতর দিন তিনেক গোন্ডি সাহেবের আধিভাব হ'ল। সে বোধ হয় তখন শোশাল ব্রাকের ডেপুটি কমিশনার। মনে হয়, ধরা পড়ার পর দিনই একবার এসেছিল। বললে, you tried to commit suicide ?

What of it ?

But why did you do it ?

Because the sooner I am out of the foreigners' clutches the better.

তারপর চললো গুরু গুরু অফিসার জেরা, আর আমারও সব ঘোড়াড়া জবাব। লোকটি কথা বলে ভিলে বেড়ালের মতো মিউ মিউ ক'রে। গাল খেতে বেশ পারে।

ঐ দিনই হবে, কি ওর পরে আর একদিন আমার কোনো কথার জবাবে আমার প্রথম দিনের কথার রেশ টেনে জিজ্ঞেস করলে, সেও কি স্বদেশ-প্রেমিক নয় ?

Yes ! But had you been one, you would now be either in Flanders or in Mesopotamia. But I know, you have had it recommended, your services are indispensable here.

একটু জ্ঞান হানি হেসে কেটে পড়লো।

পনের দিনের দিন ভাক পড়লো। সকাল সকাল ঘাইয়ে ঘাইয়ে ব্রাক মেরিয়ার চুকিয়ে থাকশাল ঠাঁট কেটে নিয়ে গেল। পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা সমানই। কেটে নিয়েও কিছু ব্রাক মেরিয়া আর খোদেই না। যখন খুললো, দেখা গেল ঘরবার দুপাশে দুটি সার্কেট, আর লাম্বে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট হইন হো, পাশে দাঁড়িয়ে পরকাণী উকিল। কোটে আর আমায় নেওয়া হ'ল না, ব্রাক মেরিয়া থেকেও বের করা হ'ল না। উকিল বললেন, আমি চাই আসামীকে পনের দিনের জজ জেল হাফতে রাখা হোক। মজুর ক'রে দিবে ম্যাজিষ্ট্রেট আর এক নম্বর আমার আপাসমন্তক নিরীক্ষণ ক'রে চলে গেলেন, আমার গাড়ীও সপক্ষে বন্ধ হয়ে কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে এসে হাজির হ'ল প্রেসিডেন্সি জেলের কটকে।

সেখানে ছিল এক ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার। সে জেলারকে ডেকে পাঠিয়ে আমার নাম ধাম লিখে নিল। রাশভারী, বিখ্যাত জেলার ছিল সাহেব—জেলে মরেন গোঁসাইয়ের হত্যার পর আসামাদের বিশেষ আদালতী। চেহারাতে শুধু শিকারী নীকা নয়, বাত অবধি ধরা পড়ে। রেঙেটি খাতায় আমার নামটা প'ড়েই আপাসমন্তক কটুট ক'রে ডাকালো, তারপর যেন হাঁড়ির ভিতর থেকে যে আগুয়ান্টা বের হ'ল, সেটা হ'ল, "follow me."

প্রথমখটা কুরতে গাড়ি নি, ভিতরের দিকে পানিকটা এগিয়ে আবার আমার দিকে ফিরে বদলো, "I speak but once."

'যমকে চমকে উঠিয়া ঘাইব, আমি যদি সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তাহা হইলে আসিতাম না'—"কুরুকালের উইলো"র এই কথাটা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, একটু হানি গেল। ওর পেছন পেছন চললাম। জেলের সিপাই ভিতরের দিকের দরজা খুলে দিল। ভিতরের আরও

গোটা দুই দরজা খুললো, বস্ত্র হ'ল, তারপর বেথানটায় পৌছালো, সেটার নাম গোগা ড্রিয়ার বা ইউরোপিয়ান গ্যার্ড। এখন এসব স্থান সুপরিচিত, একদিন বছর আগে কে চেয়েছিল, জেলখানায় গিয়ে অমন ঘরে থাকব।

বাগানখান বসেছিল একটি ইউরোপিয়ান গ্যার্ডার। এর নাম ছিল আক্সেলার্ট। পরে প্রায়ই দেখেছি, কাজ-কর্ম নেই, ব'লে ব'লে প্রেমপত্র লিখতো। ও-স্ট্রেক্টর বডোঙলি জীব তখন প্রেসিডেন্সি জেলে বেরেছি, এই লোকটিকে বেরেছি, বেশ ভদ্র।

জেলার সাহেবকে বেরে ধড়মড় ক'রে উঠে পাড়াল। হাঁড়ির ভিতর থেকে আবার হুকুম হ'ল লামনের সেলটা খুলবার। উপরে গেখা অন্য। ওদের দুজনের মাঝখানে আমি ঘরে ঢুকে এক কোণে পাড়ালো। তার পর শুরু হ'ল জেলার সাহেবের দুর্দান্ত অভিনয়—সবটাই অভিনয়—ঐ ধমক চমক।

লোহার খাটটাকে হড়হড় ক'রে টেনে দরজার কাছে নিয়ে এল, মশারির ভাঙাগুলো টেনে বাইরে কনকন ক'রে ফেললো। এর ভিতর ছুটো করেছি ঢুকলো, তারা এসে সাহায্য ক'রে শেষ পর্যন্ত যেটা পাড়ো করলো, তাতে আমার শয্যা রইলো চটের একটা গদি, এবং গায়ে দেবারই হোক বা গবির উপর পাতবায়ই হোক, একখানি কালো কপল, আর মাথার তলার জন্ত চটেরই সেকলে কানখালিশের সাইজের একটি বস্ত্র। এক কোণে আলকাতরা মাথা একটা। টুকরি ঘেঁষে মনে হ'ল, মুরজাণের ব্যবস্থা ঘরেই।

জেলার সাহেব আমার সেই জাদিয়ার পকেটেও হাত দিয়ে তল্লাসী নিলেন। দাবার বেলায় সেই ইউরোপিয়ান গ্যার্ডারটাকে আদেশ হ'ল, রোজ সকালে বিকালে দুবার তল্লাসী করবে, কড়া নগর রাখবে এবং সে কাজে সাহায্যের হস্তে আর একজন গ্যার্ডার পাঠাবেন ব'লে বীরবিক্রমে বেরিয়ে গেলেন।

বেচারীর দোষ ছিল না। দু'একদিন পরে দেখতে পেলাম, ইউরোপিয়ান গ্যার্ডারের সান্নে যে একখানি

খাতা থাকে—যা'তে লেখা পড়ে, কোন্ গ্যার্ডার কখন ঢুকলো, কে কখন বেরিয়ে গেল, ইন্টারের ভিতর কে কখন এল বা গেল, দশটা সেলের বন্দীরা কে কখন স্নানের ঘরে গেল, কার জন্ত এক টুকরো কাপড় কাঁচা দাবান বা ফল বা হাসপাতাল থেকে ঔষধ বা আত্মীয় স্বজনের চিঠি এসে—সেই খাতার একটি পাতায় তখনকার দিনের আ্যাকশনাল পোলিটিক্যাল সেক্রেটারী কামিং সাহেবের একখানি টাইপ করা চিঠি কাঁটা রয়েছে। তাতে আমার নাম ইত্যাদি দিখে লেখা আছে, অন্তত্ব বিপজ্জনক বন্দী, আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল, ইউরোপিয়ান গ্যার্ডার অন্য সেলে সার্জেন্টের সান্নে তাকে রাখবে, অন্তত্ব কড়া নগরে রাখবে এবং তেমন নগর রাখার জন্ত এর লামনে আর একজন বিশেষ গ্যার্ডার নিযুক্ত করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐ কাগজখানার তলায় সব ইউরোপিয়ান গ্যার্ডারদের পই করতে হয়েছিল।

জেলার সাহেব বেরিয়ে যেতে যেন কড় খেমে গেল—সারা বায়টী নিঃস্রুত। সান্নে সেই ইউরোপিয়ান গ্যার্ডারটি চুপচাপ ব'লে নীল কাগজে চিঠি লিখে। এর ভিতর বেশী একটি গ্যার্ডার এল। এই গ্যার্ডারটিই বিখ্যাত কতে বাহাদুর খাঁ, প্রেসিডেন্সি জেলের বড় জমাদাররূপে অনেক রাজনৈতিক বন্দীর কাছে পরে সুপরিচিত হয়েছিল। আমার বিশেষ পাহারাদাররূপে এ কিছু দেহদণ্ড আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিল। অন্ত কড়াকড়ি পাহারা এবং আমার বেশ দেখে গ্যার্ডাররা এবং জেলের করেছি সবাই বলাবলি করতো, আমার ফাঁদি হবে। কাজেই লক্ষণ ব্যবহারই করতো।

বেলা তিনটে বাজলো। একটি করেছি এসে সাহেবের টেবিল থেকে চাবি নিয়ে উপরে গেল। একটি কিছুকিছু ভ্রমশোক কোথা থেকে সামনের মাঠের ভিতর এসে নিশপদে জোড় হাত ক'রে নমস্কার করলেন। আমিও প্রতিদয়তার করলাম। কিন্তু মনে কেমন খটকা লাগলো। এ কে? কোথা থেকে এল? পুলিশের লোক নয় তো? মিনিট পনের ভক্তলোক বাইরে দুরলেন, তারপর আবার আমার একটি

নমস্কার করে পানের দিকে কোথাও চ'লে গেলেন। আমার অম্মি আর একটি ভ্রমলোক এলেন। তিনিও মাঠে ঐ পনের মিনিটের ভ্রম ঘুরলেন। কিন্তু তিনি নমস্কার ইত্যাদি করলেন না। পরে শুনেছিলাম, অল্প নদের তীরে যে বিপ্লবের আয়োজন হয়েছিল, সেই সম্পর্কে এক মামলার সংকল্প ছিল। সেই মামলার রাজসাক্ষী হবার ভ্রম তৈরী হয়ে তিনি ওখানে ছিলেন। ইনি চলে গেলে পনের পনের মিনিট পর পর এক একটি ভ্রমলোক দেখে আবিষ্কার করলাম, আমার আগে গালে এবং উপরে আর যে নয়টি সেল, তার প্রত্যেকটিতেই একজন করে রাজসাক্ষী আছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সি জেলের তখন এম্মি অবধা যে, ঐ যে লাড়ে বারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত আমি শুধানে কাটলাম এবং তার ভিতর জেলারের ঐ যে সপ্ত অভিন্ন হয়ে গেল, তার ভিতর টেরও পাই নাই যে, সবগুলি সেলই উন্মুক্ত। ঐ আড়াই ঘণ্টা ধরে আমার ধারণা ছিল ঐ বাড়ীঘানিতে আমিই একমাত্র বন্দী।

ওর ভিতরও সব যিন, সব সন্ধ্যা, সব সন্ধ্যা একরকম হয়ে নাই, সব ওয়ার্ডারও একরকম নয়। হ'লে মাহুকে প্রায় সব বন্ধ হয়েই মরতে হয়। বৈচিত্র্য যে ওর ভিতরও আছে, একটু বানাই টের পেলাম। একটি করেমি, সে জেলের মেথর, ঘরের প্রদোষের টুকরি পরিষ্কার করতে এল—সাহেব ভাল, মেথর নিজে হাতেই চাষি খুলে ঘরে ঢুকলো। কানের কাছে মুখ এনে একরকম শব্দবিহীন আওয়াজে—এ যে কি বস্ত, তা জেলের বন্দী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না—বললো, পারখানার নাম করে বাথরুমে যান, সেখানে দেয়ালে কি লেখা আছে পড়বেন।

একটু পরে সাহেবকে বললাম, পারখানার দায়। দরজা খুলে আমার স্পেশাল ওয়ার্ডার পেছন পেছন চললো। বাথরুম বটে, কিন্তু প্রায় সবই বোলা। স্পেশাল ওয়ার্ডার নজর রাখবার ভ্রম আর ভিতরে এল না। এইটুকু কৃপা করলো। দেখি, দেয়ালে করলা দিয়ে লেখা, ভক্তার কোথায়, কেমন আছেন? রাসবিহারী বাবু কোথায়? অতুল ঘোষ ধরা পড়েন নাই তো?

এখনও বিদেশ থেকে অল্পপাতি আমার সম্ভাবনা আছে কি? এম্মি, যেখানেভরা আরও অনেক প্রশ্ন।

দেখারটি চাই করে কোথা থেকে এসে এক টুকরো করলা হাতে দিয়ে চাই করে দ'রে পড়লো। প্রথমতঃ জল দিয়ে বুঝে ফেললাম। কে কোথায় আছেন, তা আর নিখলান না, সবাই যে ভালই আছেন, তাই নিখলান। এবং আর কিছু আশা করবার নেই, সে কথাও।

রাজসাক্ষীদের বিকলের ধাবার এল—এনায়েলের স্ট্রেটে লাহানো ভাত, ভাল, তরকারি, মাছ, ভিন্ন স্নেহ ইত্যাদি। আমারও খাবার এল—সে আশা, বিচারায়ী বন্দীর খাদ্য, একটা বালুতিতে করে ভাত, আর একটা বালুতিতে ভাল এবং একখানা বড় বাস্তের ভালার মতো একটা পাত্রে তরকারী নামধারী—এক একটা শাকের ডালা। সে কি শাক আমি না, চিবোলে একটু রসের বেশি আর কিছু গলার তলার দায় না। আমার ভ্রম এক সোফার খালি ধাবার তুললো।

খাবার এখন এসেছে, বর্তমান শিমলা ব্যাবায় শমিত্তির জমর বোল তখন বেড়াচ্ছেন। নিশ্চয় খাবারের খালাওলোর কাছে এসে ঠাড়ালেন—ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার না দেখার ভান করে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলো। কতে বাহাজুর ঠাড়িয়ে দেখতে লাগলো, কিছু বললো না। অন্যরবাবু কোনো কোনো খালা থেকে কিছু ভাত, কোনো খালা থেকে তরকারী, বোধহয় নিধের খালা থেকেই মাছ ভিন্ন সবটা আহার সোফার খালার তুলে দিতে করেমিটিকে ইচ্ছিত করলেন। সবটা কেওয়া মেখে আহার বেড়াতে লাগলেন। মনে হ'ল এঁদের ভাল কাপড়-চোপড় থেকে স্নেহ করবার কিছু নেই। তখনও তো কারও নাম বা পরিচয় জানিনে।

পরিচয় থেকে হেবতায়, হয় অন্যরবাবু, না হয় ময়মনসিংহের শনি চৌধুরি (বর্তমানে হুজিরা মোহিনী মিলের সেক্রেটারী) ক্যারিক বা ডিসেন্ট হ'লে যে দুটো নাম করা শরতান ওয়ার্ডার ছিল, তাদের ডিউটি না থাকলে হোজাই এই কাজটি করতেন।

ঐ বেলায় আমার খাবার নমুনা দেখে কতে বাহাদুর বৃকে মিল, বেশ খেতে পারি। সে ডিউটিতে থাকলেই লগ্নিই হোক, ডাউই হোক, ডালই হোক, প্রচুর পরিমাণে নিয়ে আসতো।

কলে, ঐ বিচারাদীন একমাসে ১২২ থেকে আমার ওজন পাঁড়ালো ১৪০ পাউন্ড। অফিসার মহলে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। এটা ব্রিটিশ আর্মির জেলের ছিল একটা সনাতন চাকুরী। পুলিশের হাম্মতে প্রায় প্রথম হুই দপাচ কাটাতে হয়। তখন লালবাচ্চারে যা খাওয়া পেতাম, সে কথা উপরে বলেছি। এরপর পেটপুরে বাত পেলে ওজন বাড়বেই। আর বাইরে থেকে জেলের বন্দীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বহন প্রায় হ'ত তখনই সরকারী জবাব আসতো, জেলে প্রবেশের সময় বন্দীর ওজন ছিল এত, বর্তমান ওজন এত।

সন্ধ্যাবেলা কটায় ওয়ার্ডার বসি হ'ল। বে এল তার নাম রবার্টসন, বুড়োবাহু, রসিক লোক, কিন্তু বদরসিক। তবে একে মাঝে রেখে, এর সঙ্গে আলাপের উপলক্ষ্য ক'রে আশে পাশের রাজবন্দীদের পরামর্শের এবং আমার সঙ্গে আলাপ চালাতো। নামে জ্ঞানভাষ অনেককে। এখন পরিচয় হ'ল। এমন কি উপরের বরগুলাতে কে কে আছেন পাশের বন্ধুরা তাঁদেরও পরিচয় দিলেন।

পরদিন অন্ধকার থাকতে ঘরের দরজা খুললো, একজন ক'রে বাথরুমে, আর একজন ক'রে ভোয়ের একশায়-লাইয়ের জন্য বের হ'তে লাগলেন। সকাল লাড়ে আটটা আখ্যায় সুপারিন্টেন্ডেন্ট এল—যেহর টমসন, ভারতবাসীর প্রতি বৃণা, উচ্ছতা ও অসং এবং অভ্যাস্যারী বভাবের জন্য লোকটি ধ্যাতি অর্জন করেছিল। একটি অসুস্থ ব্যাপার দেখলাম—সুপারিন্টেন্ডেন্ট বহন ইয়ার্ডের মধ্যে চুকবে, দরজার কাছ থেকে একটি কয়েদি যেট বা পাহারাগুলা চাঁৎকার ক'রে বলবে “দরকার সেলাম।” আর যে বোঝানোই বাসুক, সবাইকে ছুঁচা হাত কহুই ডেকে বৃকর পাশে আঙুল ডড়িয়ে তুলে দরতে হবে।

আমি ব্যাপারটা জানিনে। লক্ষ্য করলাম,

সুপারিন্টেন্ডেন্ট চুকবার বেলায় তিনিই লক্ষ্যের মাঠে বেড়ান, তিনিই ঐ বক্তব্য করেন। তখন বুঝলাম, ঐটাই রেওয়াজ। আমি ঘরে বসে, দরজার সামনে পাড়িয়ে ব্যাপারগুলো দেখি। হাত যেমন থাকবার থাকে, সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসে দু'একটা কথা বলে দায়, কোনদিন কিছু বলে না, জেলায় হিলও না। একদিন কোন্ এক ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার এসে বলে, হাত তুলে পাড়াবে। মনে মনে বলি, দায় পড়ছে!

আমার ঘরে সারারাত আলো জ্বল, যেহার পোকা ঢোকে। ঘুমের ব্যাধাত আমার বিশেষ কিছুতে কোনো কালেই হয় না। তবু সেদিন সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসে বহন বলে, কিছু চাই? আমি বলি, দায় রাতে আলো নিভিয়ে দাও, নহতো দশটি দায়।

ও বলে, you can have neither.

আমি শেহন কিরে নিজেব জাংলায় এসে বসি, ও চ'লে দায়।

কিছু দায়। এমন, সেই দিন থেকেই আলোটা হঠাৎ এমন নিস্তেজ হয়ে গেল যে ঘরে আর পোকা ঢোকে না।

দু'এক দিন দায়, আবার এসে একদিন টমসন জিজ্ঞাস করে, Do you want anything?

সোজা বলি, No.

টমসন চ'লে দাবার পর সেই রবার্টসন হৈ চৈ শুরু করলো। আমার পাশে চেন ঘরে ছিলেন সিলেটের মেবেন চৌধুরি। তাঁকে বলে, দেখলে, সুপারিন্টেন্ডেন্টকে কি বক্তব্য অপমান করলো? কিছু নেই, দাহেব জিজ্ঞাস করলো, কিছু চাই? বলে, না।

আমি বলি, অপমান আবার কিসে করলাম?

মেবেন বাবু বললেন, আপনি বক্ত মাঠে বেড়াবার অস্বস্তি চান। তিনিই রবার্টসনকে বললেন, তুমি লিখে পাঠাও যে, উনি বেড়াতে চান।

তাঁই লেখা হ'ল। আধ ঘটাবানিক দাহেব এলাম এল, পুলিশকে জানানো হয়েছে।

আশেপাশের বন্ধুরা একই আশ্চর্য হ'লেন, তবে কিছুই আশ্চর্য নয় এমন ভাবও দেখালেন।

একদিন বাদে হুতুম এল, হুতুমখানা সুপারিক্টেওটেতে লেখা। বাঁধার ব'লে একটি ওয়ার্ডার ছিল তখন ভিউটিতে। সে পড়লো। মর্ম এই, সুপারিক্টেওটে বতকখন জেলে হামির থাকবে, ততকনের মধ্যে দেওয়ালের পাশে এবং মরমার বিশেষ কড়া সাহায্যের ব্যবস্থা রেপে পনের মিনিটের গল্প আমার বেড়াবার সত্ত্ব বের করা বেতে পারে। হিলু এল। বাঁধারকে নিয়ে চারসিক ঘুরে দেখে কি পরামর্শ করলো, কি ব্যবস্থা ক'রে পেল।

হিল চ'লে গেলে ফতে বাহাদুরকে ঠাড়া করলো ইয়ার্ডের ফটকে, একটা নেটকে ঠাড়া করলো বাথকমের কাছে, আর একটা কথেনিকে ঠাড়া করলো বেয়ালের কাছে এবং জায়গার একটা রাস্তার ও কীটালগাছ আছে লেখানে, আর মেথরটিকে ঠাড়া করলো আর একপাশের বেয়ালের কাছে, তার পর এসে আমার ঘর খুলে বের ক'রে হেসে জিজ্ঞাস করে, Do you think you can scale over that wall? আমিও হেসে জবাব দিই why not?

বেচারী চেয়ার ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে রইলো। ঐ পনের মিনিট আমি একটি প্রবন্ধবীর বস্তু হ'রে খুশলাম। এর পর বোধ হয় ২০২২ দিন ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে ছিলাম। রাজাই ঐ ব্যবস্থা।

জেল লাইব্রেরী থেকে বই আসে। আঙ্গেরায়ে বই যা পাই, তাই পড়ি। ল্যা মিয়ারেবল্‌খানা আগে পড়েছি, বারোকোপেও দেখেছি। কিন্তু এখন প'ড়ে হজো ভালো লাগ লো, তেমন আগে লাগে নাই।

আগে পাশের বন্ধুদের মধ্যে বেথি, এক অমর বোদ আর মরমনসিএর স্থানীয় রায় ছাড়া আর সবাই কোপ্টিন-বস্তু এবং কাপড় অর্থে ক'রে ছিঁড়ে কাছা না দিয়ে পরেন, কেউ কেউ পেকুরা র-য়ে ছুপিয়ে। সেবেনবাবু লম্বা কুলও বেগেছেন। প্রথম বন্ধন বৃত্তলায় বে, এ'রাও বন্দী, তখন মনে হয়েছিল কোনো আঙ্গেরার ব্রঙ্কচারীসেরই বা ধরে এনে রেবেছে। এ'রা ধীরবদ্যপন প্রায় সেই ব্রকমই করতেন। সেবেনবাবু তো একটা গ্রহণের দিন লম্বতটা কন পীতা আর চণ্ডী বেশ উঠ রাবে প'ড়ে কাটিয়ে

ছিলেন। এঁদের মুখের উপরও সবাইই যেন কেমন একটা ছান ছাড়া এসে পড়েছে। তবে কাপড় ছিঁড়ে পরার একটা কারণ পরে আবিষ্কার করলাম, প্রেসিডেন্সি জেলে রাজবন্দীদের তখন কাপড় ইত্যাদি দেয় না। চিঠিপত্রও একান্ত বিরল এবং অনিয়মিত। রাজবন্দী হয়ে বাড়ী থেকে কাপড় আনিবে পরাও অনেকে সম্মত মনে করেন।

কেবল অমরবাবুকে আর স্থানীয়বাবুকে বেথি, ওর মধ্যেও মোটামুটি কটকাট গ্রহণ। স্থানীয়বাবু বাবে থাকে মাঠের ভিতর বাড়িরে বোধ হয় আমার তখনকার দিনের পালাঘানি চেহারা দেখে বুকের উপর ঐ হাত রেখে জান হাত দিয়ে বুকে আবার চ্যালেঞ্জ জানান। আমি নিঃশেষে হাসি।

একদিন দুপুরের পরে ডাক পড়লো জেলের ফটকে। বেথি মন বারজন বন্ধুবান্ধবকে জেলের বিভিন্ন স্থান থেকে ও অন্তর থেকে নিয়ে এসেছে সনাক্ত করারায় অন্তে। তার মধ্যে আছেন অধ্যাপক পরম খোশ, অধ্যাপক বিপিন দে, সাংবাদিক হরেন সিং এবং আরও কয়েকজন। চোখ-মুখের অবস্থা প্রায় কারও সুবিধার নয়। গোস্তি, হিল এবং জনকতক বাগানী অভিনায়ও আছে এক পাশে। আমরা বন্ধন সবাই একত্র জড়ো হয়েছি, একজনকে ধরলাম। জিজ্ঞাস করলাম, “সব খাঁকার করেছ কেন?”

“কি করব? দেখুন, অ— বাবু সব ব'লে মিথোছেন।” এই অ— বাবুও দেখানে হামির ছিলেন।

“অ— বাবু বলে মিথোছে ব'লে ডোমাকেও বলতে হবে? হালান্ধা হাউজে নিরে গিয়ে কাগজ চেয়ে নিরে আজই লিখে পাঠাবে, বা-কিছু বলেছ, পুলিশের তাড়নায় বলেছ, সব মিছে কথা। আজই লিখবে, তা নইলে মরবে।”

“নিশ্চয় লিখব।”

বন্ধুতা সবাই নীরব। আমিই একা কথা বলছি। কাজেই সহজেই হিলের নজর পড়েছে আমার দিকে। গটমট করে এসে জিজ্ঞাস করলে, “you were talking to him?”

"Why should I not?"

তখন এক হাতে আমার ধরলো, এক হাতে বন্ধুটিকে ধরলো, নিয়ে গোড়ির কাছে হাম্বির করলো।

"Mr. Goldie, he was talking to him."

গোল্ডি একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নীচু করে বললে, "All right, I take note of it."

আমরা বড় জন, তত জন উড়িয়াবে ব্যাটা থেকে ধরে নিয়ে এল। আমাদের এক একজনের পাশে পাশে ওদের এক একজনকে দাঁড়ো করিয়ে দিয়ে ২০২৪ জনের এক লাইন করলো। এ রকম বাইরের লোক মিশানোর কি অর্থ হয় বুঝলাম না। বাঙালী ভ্রল্লোকের আর উড়িয়া ঠাকুর ঠাকুরের তো চেহারা থেকেই আলাদা করে দেখা যায়। আমার কিন্তু জাতিঘাটা ঢেকে কোথা থেকে একটা খুঁতি আর একটা বোতামহীন সাট পরিচয় দিল। জাতিঘাট খুঁতির ভিতর দেখা যায় আর জামা কাপড় দেখলেই বোঝা যায়, ওগো আমার নথ, অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকমে দান্নানো হয়েছে।

দাকী হামের একে একে আনুলো, সবাই আমার দিকে বিশেষভাবে তাকালো, কিন্তু কেউই সনাক্ত করলো না। কাউকেই করলো না। কেবল একটি বিহারী ছোকরা কনটেবল বিপিনবাবুকে দেখিয়ে বললো—"আমি এই বাবুকে গুলি ছুঁড়তে দেখেছি।"

গোল্ডি বললে, ভালো করে দেখো। কনটেবলটি আঁর দিয়ে বললো, আমি নিশ্চয় দেখেছি।

হামলা কিন্তু কারও নামেই হ'ল না।

এর পর আবার আমার ভেলে নিয়ে গেল।

দু সপ্তাহ ভেলে কাটাবার পর আবার একদিন সকাল সকাল থাইয়ে কোটে দেবার জন্ত ভেল পেটে নিয়ে গেল। পুলিশের ব্র্যাক মেরিরা আসতে দেবী হচ্ছে দেখে এক ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে দিল। সেই গাড়ীতে আর একজনকেও তুললো। তাঁকে নিয়ে বাবে ষোড়াদাঁকো কোটে, আবার নেবে বাকশাল ট্রাটে। ডব্রলোককে আমি চিনতাম। ইন্সপিরিয়াল ব্যাকে দুখানা হামার

টাকার নোট ভাঙাতে গিছে, কাঁচাপুতুর ভাকতির নোট সনাক্ত হয়ে ধরা পড়েছেন।

গাড়ীর ভিতরে ও উপরে পুলিশ পাহারা ছিল। তা গ্রাহ্য না করে ততলোককে জিজ্ঞেস করলাম, "সব স্বীকার করেছেন কেন?"

তিনি অভ্যাচারের এক লম্বাচোড়া কাহিনী কেন্দ্রে বললেন। বললেন, গোরলে সাহেবের বাড়ীতে নিয়ে ব্যাটারি লাগিয়েছে, আরও অনেক কিছু।

বললাম, অভ্যাচার করবে, একি জানা ছিল না? অভ্যাচার করলেই স্বীকার করতে হবে? স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে বললাম। তা তিনি করেন নাই। কলে, কারামতও ভোগ করেন।

ধানিক দূর বেতে মান্দ্রে থেকে এক ব্র্যাক মেরিরা এসে গাড়ি ধামালো। দুজন শাস্তকণ্ট ছিল। একজন বললো, প্রেসিডেন্সি জেলের কাণ্ড দেখ! এই বন্দী সন্দেহে আমাদের লালবাজারে এত সাবধান বাঁধা শোনালো, আর একটু দেবী না করে প্রেসিডেন্সি জেল একে এই ছ্যাকড়া গাড়ী করে পাঠিয়ে দিয়েছে। পাঠিয়েছে কিন্তু চাককড়ি লাগিয়েই।

কোটে নিয়ে গেল। সেদিনও ঐ অবস্থা। অনেক-কল বাবে বধন গাড়ীর হরজা খুললো, সেই প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, আর সরকারী উকিল সামনে। সরকারী উকিল বললেন, আমি এক মাসের সময় চাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলে, কেন, সাধারণ এক অস্ত্র আইনের মামলা, দারবার কেন মূলতুখী রাখবে?

উকিল বলে, বন্দী আমাদের হাতে নেই (অর্থাৎ আমি পুলিশের হেপাফতে না থেকে জেল হেপাফতে), কাজেই অহুলতানে দেবী পড়ে যাজ্জে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলে, না, আমি চুই সপ্তাহের সময় দিচ্ছি। আবার গাড়ী বন্ধ, আবার কেল। দাবার আগেই অপরাধের ভেলের বন্ধুরা বসেছিলেন, মাঝা হবে না, ঠেইগ্রিজন্যর করবে। এবারে তাঁরা আরও জোর করেই বললেন, ঠেইগ্রিজন্যরই হবে। অন্য সেলের দেবনবাবুও মশার পিতলদহ ধরা পড়েও ঠেইগ্রিজন্যর হয়েছেন।

ও-গুণে ওরকম অনেকের বেলায় হয়েছিল। ওরা আশা করেছিল এবং আমাদের অনেকবার বলেছিল, টেট প্রিজনার বাপের করা হয়েছে, তাদের সারা জীবন রাখা হবে।

কথাবার্তা বলা নিষেধ স্বযেও এবং তার সুযোগও বিশেষ না থাকা স্বযেও নানাভাবে কথাবার্তা বলে, বই পড়ে আগের মতোই আশেও পনের দিন কাটিয়ে বেওয়া সেল। বর্ষা এলে পড়লো। দরজার পোড়ার বলে মেঘ দেখি, আর আমার গলাতেও গাই—

“নেতের পরে মেঘ জমেছে

খাঁধার ক’রে আসে

আমায় কেন বসিয়ে রাখ

একা ঘাবের পাশে।

কাজের দিনে নানা কাজে

থাকি নানা লোকের মাকে

আজ আমি যে বসে আছি

তোমারই আশাসে।

এর ভিতর দুদিন ছুটা ছোটখাটো ঘটনা ঘটেলো। ছুটি ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার সংক্রান্ত। ছুটিরই নাম পূর্বে বলেছি। ক্যারিক্ ছিল রামবন্দী, কয়েবি, সিপাই সবায় সম্পর্কে অভ্যস্ত বড়, কেবল নিষেধ সম্পর্কে নয়। বেসিনই কয়েবীদের জন্য পাটনাই মটরের ভাল হ’ত, ও রাত্রা ঘর থেকে আটার কটি আর ভাল আনিতে পেত। মাইনে বেসিন পেত, সেদিন যদি আবারের ওয়ার্ডে ওর জাতের বেলার ডিউটি থাকতো, নীচের ডলার কারও আর পুন্মোবার উপায় থাকতো না। নথ ধরে এসে বারাকামের নেচে বেড়াতে আর গান গাইতো।

একদিন লম্বায় বদ্ধ করবার বেলায় আবার ঘরে ঢুকলো তত্তালী নিতে। আমার আশিয়ার পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমার তখনকার বিনের চেহারা সন্কেও ওর বোধ হয় হবের ঠোঁকে একটু বধ রসিকতার খেলায় জেগে উঠলো। আমি ঘরজালা চীংকার দিয়ে বলে উঠলাম, “What’s that?” এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দিয়ে

তাড়াতাড়ি তালো বদ্ধ ক’রে দিল। আর কোনো বিন আবার ঘর তত্তালী করতে ও আসে নাট।

আর একটি ওয়ার্ডার ভিসেট। কতে বাতায়র ছাড়া আমার আর একজন স্পেশাল ওয়ার্ডার জুটেছিল কেবার রাখ। কাজ কর ততো কিছুই নেই। সে বসে বসে বিমোত। একদিন ভিসেট তাকে বলে, তুমি বগতে পাবে না, ঠাড়িয়ে ডিউটি দেবে।

কেবার রাখ বলে, তুমিও ওয়ার্ডার, আমিও ওয়ার্ডার। তুমি আমায় হুকুম করবার কে?

ভিসেট চীংকার দিয়ে বলে, আমি হুকুম দিচ্ছি, তুমি ঠাড়িয়ে ডিউটি দেবে। কেবার রাখ কবার ঠোঁকে একবার উঠে পড়েছিল। এখন সে সমানই চীংকার করে বললো, আমি বসে ডিউটি দেব, তুমি যা করবার কর।

বসে বসে পড়লো।

এ নিয়ে আফিসে কি হয়েছিল জানি না। কিন্তু সে ডিউটি থেকেও সরলো না, ঠাড়িয়েও প্রায় কোনোদিন ডিউটি দিল না, ভিসেটও আর কোনো দিন গুকে খাটালো না।

একদিন বাথরুমে ঘাবার পথে কেবারাম আমায় বলে, আপনায় যদি কারও কাছে চিঠিপত্র যেবার থাকে যাবেন।

সুতল, চাক, অমর চাটাজি—ওদের পত্রের জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম। চিঠিও দিয়েছিলাম, অযাবও পেরেছিলাম, কোনো গোলমালও তা নিয়ে হয় নাই। জবাবের সংকেতে বুলায়, অমরমা তখন নিরাপদে গৌহাটিতে পৌঁছে গেছেন।

কেবার রাখ বড়ো রক্তজাতাবে আনাল, ধীর কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, তিনি গুকে খুব খাতির বস্ত ক’রে বাইরেছেন, এবং ছুটি টাকা দিয়েছেন। দরকার মতো আবার খবর নিয়ে বেতে বসেছেন। বারবার পাঠানো তখনকার দিনে হবিধার ব্যাপার নর বলে আর পাঠাইনি।

(শেখাং ৫৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ)

বুড়ি

অধ্যাপক বিক্ৰমজ্ঞান গুহ

“ওক, ওক:।”

বাহিরের বারান্দায় ককণ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এই গুরুনাম শ্রবণেই বুলিলাম, আমাদের বুড়ি আশিষ্যছে। সহরে এমন বাড়ী নাই যেখানে বুড়ির পাতের ধূলা পড়ে নাই এবং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বুড়িকে “সেবা কৰ্তা” ইয়া পুণ্যলাভ করে নাই এমন গৃহিণী এ পাড়ায় অল্পতঃ দূৰ্ভাগ।

বয়স হইয়াছে বুড়ির কম নয়; কিন্তু এমন দিন যায় না যেদিন বুড়ি ভিক্কার সন্ধানে সারাটা সহর প্রদক্ষিণ করিয়া না আসে। রাত্তার বুড়িকে লক্ষ্য করুন, প্রায় সিংহ হইয়াই হুন্ হুন্ করিয়া ছাটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু কোন বাড়ীতে চুকিবার আগেই কোন নরনরনে বুড়ি ছাড়াইয়া, সম্পূর্ণ অসহায় অথবা আত্মর ভিত্তিবিহীনভাবে পরিণত হইবে। তখন তাহার দীর্ঘনিশ্বাস এমনই ঘন আর ককণ আবেগন এমনই মৰ্শাত্মক হইয়া ঠাড়াইবে যে তাহাকে সামান্য কিছু অল্পতঃ সাহায্য না করিবে এমন পান্য-ভক্ষ্য মাংস অল্পগ্রহণ করে নাই। এদিকে বুড়ি নাকি কানে শোনে না কিন্তু পিছনে দশহাত দূর হইতে খুব আন্তেও একবার বলুন “বুড়ি, চারটি পরমা নাও”—অমনি সেখিবেন বুড়ি টিক আশিষ্য হাত পাতিয়া ঠাড়াইয়াছে।

বুড়ির ভিক্কার নমুনাটিও একই পৃথক। চাল, ডাল বা কাঁচা ভরকাঠী সে ভিক্কা নেয় না। হয় তাহাকে খাইতে দাও না হয় পরমা দাও। মনতব্ব বুড়ির জ্ঞান অজ্ঞান। বাড়ীর কৰ্ত্তা দুপুরে অক্লিষ কাছারী গিয়াছেন, বাড়ীর গৃহিণী আন করিয়া সবে আহারে বসিয়াছেন এমন যোক্ময় মুহূৰ্ত্তিতে বুড়ি আশিষ্য হানা দিয়া রান্নাঘরের মোড়মোড়ায় সেখান ঠেস দিয়া বসিয়া সত্যতঃ গুরুনাম উচ্চারণ করিতে থাকিবে। সাধ্য নাই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন। পরীক্ষার দিনটিতে তাহাকে দেখিবেন কলেক্টর ফটকে কালীবাড়ীর প্রাসাদী মূল লইয়া পরীক্ষাবীষের—বিনেদ্ব করিয়া তরুণী পরীক্ষাবীষীদের

—অবাচিতভাবে লাকল্য কামনা করিবার অস্ত্রই যেন উপস্থিত। কিছু না কিছু সেদিন মিলিবেই।

ভিক্কা কক্ক, কিন্তু অভিমানটি বুড়ির কম নয়। সেদিন বাসায় চুকিতেই সেখা। কক্ষভানেই বলিলাম, “এসেছো তো পেতে?” বুড়ি অমনি দপ করিয়া বলিল, “তোমাদের বাসায় রোজ খেতেই আসি, না? আর ঘরের বাতান্দার হুম্মর রোজ, তাই পোষাতে এলাম। কোন বাড়ীতে রোজ আমি পাত পাততে যাই না।” বলা বাহুল্য আমি কলেক্টর বাহির হইয়া গেলেই বুড়ি স্বভাবসিদ্ধ কোণে গৃহিণীর আহারের ভাগে জাগ বসাইয়াছিল।

আমাদের ছোট একটা আশ্রয় আছে—গরীব ছেলেদের জন্ত। পরিচালনা করেন পরিমল বাবু। সেদিন বুড়িকে দেখিয়া পরিমলবাবু বলিলেন, “পাতি না বুড়ির বস্ত্রাঘর। রোজ আসবে, কিছু আগতে না করে যাবে না।” বুড়ি অমনি কোপ করিয়া উঠিল, বলিল, “রোজ আমি আমি? অমন মিছে কথা বোল না। সেই তো লোমবার এই চারটি কড়কড়ে ভাত দিয়েছিলে আর আশ্রয় দ্বন্দ্বার। আর আশ্রয় তো এখনো কিছু দাওনি।” পরিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন “কেন বুড়ি ভাল নাওনি, বুড়ি আব তেল?” বুড়ি রাগে গদগদ করিয়া বলে “এই এ্যাভোতাইহুন তেল, আর আশ্রয়ই শুধু: বুড়ি—তার অস্ত্রে এত কথা! নিজে নিও মাংস!”

লোকে বলে বুড়ির নাকি অনেক টাকা। মিথ মথবিত্ত ঘরের বউ কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছিল। ছেলে আছে, চাকরী করে মাকে বাড়ীতে রাখিতে চাহে। কিন্তু বুড়ির ওই বন্যোপ ভিক্কা করিবেই। তা ছাড়া বুড়ির এক বিষয় বেশা—আফিং। রোজ আট রতি আফিং না হইলেই নয় আর রাত্রে একবাটি দুপ। এ নিষা ছেলে বউ খাঁচ খাঁচ করে তাই বুড়ি ছেলের কাছে থাকে না। কালীমন্দিরে একটা গোড়ো ঘরে রান্না-বাড়ার বালাই নাই। বাড়ী বাড়ী খাইয়া বেড়ায় আর ভিক্কার পরমা দিয়া দুপ আর আফিং কেনে। বাড়ী পরমা নাকি উদায়। কোথায় রাখে কেউ জানে না।

আমি একদিন ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, “বুড়ি তোমার দেলাই তো পড়ল। শওনা কিছু আমাদের অমোঘমন্ত্রে—সবীষ ছেলেটা এখানে থেকে পড়ে ওঠের সাহায্য হবে। বুড়ির চোখ সন্ধ্যা হইয়া উঠিল। রাগ করিয়া বলিল—“মুখশোড়ার হাটের বেড়ায় আমার পরশার কথা। বেড়ে যেবার কেউ নয় সব হা করে আছে আমার টাকার জগ্রে।” তারপরই সুর নরন করিয়া বলিল “টাকাই যদি থাকবে বাছা তবে আর নাহুয়ের দোরে দোরে এমন করে লাথি মারি। বুড়িরে বেড়াই? হা আমার অসুখ! শুক: শুক:!

এমন সময় আশ্রমের কয়েংবেল গাছ হইতে গুপ করিয়া একটি শাকা বেল পড়িল। অদনি বুড়ির চোখ চক্‌চক করিয়া উঠিল। কিন্তু বুড়ি নড়িবার আগেই আশ্রমের একটি ছেলে লোচাইয়া আসিয়া বেলেটি ছুড়াইয়া লইল এবং এক আচ্ছাদে কাটাইয়া খাটতে শুরু করিল। এবার বুড়ি আর থাকিতে পারিল না। ছেলেটাকে অহুস করিয়া বলিল, “যে না একটু, সবটা খেলে তোর অহুস করবে।” ছেলেটি মুখ ভ্যাংচাইয়া বুড়িকে আধখানা দিল। ভাঁড়াতের চাবি হাতে পরিমলবাবু আসিয়া পাড়াতেরেই বুড়ি বলিতে শুরু করিল “কয়েংবেল তেল নুন লিচ্ছে যেতে ভালো।” গুনিয়া পরিমলবাবু হাসিতে লাগিলেন। একটি ছেলে একটু তেল নুন বুড়িকে আনিয়া দিল। পরিমলবাবু বলিলেন “পরশাটা বাকী রইল কিন্তু বুড়ি।” বুড়ি ততক্ষণে কয়েংবেল তেল নুন মাখিয়া চাটিতে বাস্ত। যুদু যুদু করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘাইবার সময় বলিয়া গেল “তোমাদের আশ্রমে কটা তেঁতুল গাছ কর, বাবু।” টক্‌ কিন্নিবে বুড়ির ভয়ানক লোভ।

এদিকে আশ্রম নিঃশব্দ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছি। শুড়ে রান্নাঘরটি পড়িয়া গিয়াছে। অল্প ঘর নাই যেখানে রান্না করা যায়। অথচ হাতে একটি টাকার নাই। আশ্রমের নিত্যকার খরচই চলে না। এতদিন সঙ্কল্প ব্যক্তিরের সাহায্যে কষ্ট করিয়াই আশ্রম চলিয়াছে। পাকিস্তান হওয়ার পর এ সাহায্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে। অবস্থাপন্ন লাভ্যরা সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। ঠাহার আশ্রম

ঠাহারও আমারই মত দুদিনে সংসারের দায় মিটাইতেই চোখে পরিণামূল দেখিতেছেন। শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছে হাট্টিয়া হাট্টিয়া হরণ হইয়া গেলাম। টাকা মিলিল না এও পরশাও, কিন্তু সন্তপণে মিলিল প্রচুর “পাকিস্তানে এ সব আশ্রম করিয়া লাভ কি? কবে কাড়িয়া নিয়া দুসলমান হোটেল বানাইবে।” ইত্যাদি। হাক্‌ পরিমলবাবু নিজ পকেট হইতে ২০২ মিলেন। কিছু হোল্‌না টাটাই ও বাপ কিনিয়া একটা ছোট একচালান তোলা হইল। কিন্তু বর্ষার দিন বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল।

বুড়ি এ করসিন রোজই আনিয়াছে কিন্তু লতাই ঘাইতে চায় নাই। ছেলেদের জিন্দাদো করিয়াছে ভাল করিয়া রান্নাঘর তোলা হয় না কেন। ছেলেটা বলিয়াছে “টাকা নাই। তুমি শাও না বুড়িমা।” বুড়ি বলে “আ মরণ! আমার টাকা কই? টাকা থাকলে মানুষ ভিক্ষা করিয়া খায়?” বুড়ি আশ্চর্য বেন লতাই দুর্জল হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার চলিতে চলিতে মাকে মাঝেই এক হাটুর উপর তর করিয়া বেন ঘর লইয়া লব। মাছেরের অত্যা চরমে উঠিয়াছে কে ভিক্ষা দেখ? দুখের সের বার আনা। বুড়ির অনেক দিনই খাওয়া মিলে না। বুড়ি আশ্রমে আসে, বায়ে বায়ে আশ্রমের ব্যাখ্যা গুইয়া পড়ে। যেন হয় বুড়ি আর বেশী দিন বাচিবে না।

বাসার আর এক মন্ত ঠাসাসে পড়িয়াছি। ঠাহুরদা আফিং খান। আফিং এর নামও চড়িয়াছে কিন্তু পাওয়া ঘাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ নাকি পাকিস্তানে আফিং চালান বন্ধ হইয়াছে। দেশ বাধীন হইয়াছে তাই নাকি বাধীনভাবে আফিং গাছা খাওয়া আর চলিবে না। নিয়ম হইয়াছে সকালে ১০টা হইতে ১১টা এই আদ্যক্টা মাত্র আফিং এর বোকান খোলা থাকিবে। তখন সামান্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আফিং মাত্র বিক্রয় হইবে। প্রতিদিনে মাত্র ১০ নামের আফিং বেওয়া হইবে। নির্দিষ্ট আফিং কুবাটলেই বোকান বন্ধ হইয়া গাইবে। আফিং কিনিতে বোকানের নামে লাইন দিয়া পাড়াইতে হইবে। ঠাহুরদার আফিং টান পড়িয়াছে। ঠাহার ষোর

তারিমে দুদিন ব্যবস লাইনে পাড়াইতেছি। আমা ছিঁড়িয়াছে, মেজাজ খিঁচড়াইয়াছে কিন্তু আকিং পর্যন্ত পৌছিতে পারি নাই। এত লোকে আকিংএর মত পাগল ইহা আগে কল্পনাই করিতে পারিতাম না। এখানে ভয় ইত্যরের ভয় নাই। মৃত এই বিষয়—বাড়ি ধরিয়া আনাবের শার্ক ভেনোক্তাদী শিক্ষা দিয়াছে। 'লাইনে' মিলিল না কাজেই বে-লাইন চেষ্টা করিতে হইল। Excise Supdt-এর ব্যবস্থা হইল যে তিনি জানাইলেন stock সামগ্র্য তাই ডাক্তারের certificate ভিন্ন special permit বেগা চলিবে না এবং তাহাতেও একমুদ্রা ১০ আনার বেশী বেগা হইবে না। আকিং-ভেতর বাহুর সঙ্গে কিছু পরিচয় ছিল। একদিন রাত্রে তাঁহার বাসায় গেলাম। সেখানেও বেথিলাম আশ্রয় মত বহু প্রার্থীর ভিড়। ভুললোক হাতভোড় করিয়া জানাইলেন তিনি নিরুপায়। সমস্ত দিন পুলিশ দোকানে বসে থাকে। পুলিশ কর্তাদী মাণিয়া আকিং বাহির করিয়া দেয়। মাণিয়া তালো বন্ধ করে। নির্দিষ্ট সময়ের বাহিরে এবং নির্দিষ্ট সময়ের বাহিরে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী বেগা তাহার সাধ্যাতীত। বাকী রহিল কালোবাজারের স্বত্ব পথ। বিখ্যাত ফেলুগুণা জানাইল ইয়া মাল দিতে পারে তবে দাম পড়িবে ৪০ টাকা ভরি। দাম অগ্রিম দিতে হইবে। মাল দশ দিনে দিবে। সে টাকা দিয়া লাইনে লোক পাড় করাইয়া আকিং সংগ্রহ করিবে। লাইনে জাহাঙ্গীর নাকি কালোবাজারী বায় আছে। হাক্ এত টাকা কোথাও পাইব? কাজেই হাল ছাড়িলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদার জীবনভরস্বীও বে-হাল হইবার উপক্রম হইল। আকিংএর অভাবে তিনি পাপলের মত ছুটাইয়া পড়িতে লাগিলেন। নিশ্চিত সংবাদ পাইলাম নরেনবাবু দুই তোলা আকিং নারায়ণগঞ্জে লোক পাঠাইয়া আনাইয়াছেন। নরেনবাবু নিজস্ব নিকট আস্ত্রীয় ঠাকুরদা তাহাকে গিয়া ধরিলেন। নরেনবাবু আকিং সংগ্রহের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার ভেদ করিলেনই বরং ঠাকুরদাকে কিরিয়া অস্বরোধ করিলেন কলিকাতায় ছোট

কাকার কাছে চিঠি লিখিতে, যেন তাঁহার মত ১ তোলা অন্ততঃ আকিং কিনিয়া কাহারও ব্যবসে পাঠাইয়া দেয়। অগ্রিম টাকা পর্যন্ত দিতে চাহিলেন। টাকা, নারায়ণগঞ্জ কলিকাতা, সমস্ত আস্ত্রীয়ের কাছে চিঠি লেগা হইল। আগরতলা লোক পাঠানো হইল। কিন্তু কোথাও আকিং সংগ্রহ হইল না। এই দুদিনে হঠাৎ বৃদ্ধির কথা শ্রবণ হইল। ঠাকুরদা বৃদ্ধির কাছে বহু মিনতি করিলেন নিকি তোলা আকিংএর মত মগধ দুই টাকার লোভ দেখাইলেন কিন্তু কি আশ্চর্য! বৃদ্ধি আকিং ধার একখাই স্বীকার করিল না। টাকাও নিল না। আমরা অবাক হইলাম। বলিলাম বৃদ্ধির ভীষণতাই হইয়াছে। ঠাকুরদার আকিং একেবারে নিঃশেষ হইয়াছে। কাল শুধু আকিংএর কোটা দুইখা মল খাইয়াছেন—আর কিছুই ছুটে নাই। ঠাকুরদা একেবারে শয্যা লইয়াছেন। বৃদ্ধি কালও নাকি সন্ধ্যার পর আসিয়া ঠাকুরগঞ্জে বেথিয়া হঠাৎ কখন চলিয়া গিয়াছে—কোন ডিঙ্গা চাফ নাই।

আজ সকালে উঠিয়া খবর পাইলাম বৃদ্ধি মরিয়াছে। কালীবাড়ীর পুরোবিত্তই খবর দিলেন এবং অত্যন্ত কাতর অল্লস করিলেন বাহাতে বৃদ্ধির সংস্কারের ব্যবস্থা করি। তিনি বলিলেন গত চার পাঁচদিন ব্যবস বৃদ্ধি বামে হইকই করিয়াছে। আকিং আর দুখ খাইতে না পাইয়াই নাকি বৃদ্ধি মরিয়াছে। সাহ করিতে গিয়া বৃদ্ধির বিজ্ঞানায় আবিষ্কার করিলাম একটা আমের আচাংয়ের শিশি। কাল সন্ধ্যায় গৃহিণীর ঘরের তাক হইতে ইহা উড়াও হইয়াছিল। আশ্রমের ছেলেরের নিচা বৃদ্ধির শব্দ শুভ্যর আয়োজন করিলাম। যেন যেন গালি মিলায় "কিপুটে বৃদ্ধি, মরিবার দিনও আচাং চুরি করিয়া খাইয়া গেল।"

কিন্তু বাসায় কিরিয়া অবাক হইয়া শুনিলাম গৃহিণীর বিজ্ঞানায় নীচে একটা ছোট কীপার বাটি ও তাহার মধ্যে ময়লা কাপড় মড়ানো একটা পুটলী পাওয়া গিয়াছে। পুটলী খুলিয়া বাহির হইল মূচরা কানি, দুয়ানি, শিকিতে মিলাইয়া তিনশত ছয় টাকা নথ আনা, এবং এক টুকরা কাপড়। তাহাতে জাঁকা ধাকা অন্ধরে লেগা "আশ্রমের

ঘর"। পুটুলীর ভিতর আর একটা ছোট কোঠা পাওয়া গেল, তাহাতে প্রায় দুই ভরি আকিং। কানার বাটিতে নাম খোশাই করা "ক"। শুনিলাম বুড়ির নাম ছিল কান্তমণি। কানীহাজীর পুরোহিত বলিলেন এই বাটিটাই বুড়ির দুখ খাইবার বাটি।

অবাক হইয়া ভাবিলাম অশ্রদ্ধার মধ্যে বাহ্যকে আনরা জানি তাহাকে আনরা কত অন্ন জানি। আর

মনে হইল আমাদের বুড়িকে বড় ভিক্ষা দিয়াছি যরনের দিনে বুড়ি কি সব অণু নিঃশেষে শোধ করিয়া গেল? না এ আচার চুরির গ্রাহ্যকিত? না এ বুড়ির চরম রসিকতা?

জাবিতেছি বুড়ির টাকা দিয়া আশ্রমের পাকের বরটা মেরামত করিব। আর আশ্রমের পশ্চিম সীমানার কয়েকটা ঐতুলগাছ করিতে হইবে।

রোম্যান্স

রূপকর হস্ত

একটু সরে বসো নিকি
প্রবন্ধটা লিখি।
এখন পোল করো না মেলা,
কোথা থেকে
ছুটে এসে, ভেঙ্গে দিলে,
আমার বলম-বেলা।

জান না ত কত ভট করে
জ্যাকিগুলো সব সামাল দিছি
কসে বেঁধে ধরে।

জান না ত আলোচনার তোড়,
ঘরের মাঝে বসে থাক

নিজকে নিয়ে ভোর।

এটুকু-ওটুকু টুকি-টাকি
কেবল মাঝা ঘসা,
আর নয়ত সখি ভেঁকে
গল্প করতে বসা।
আমরা হাটের মাছধ,
কথা নিয়ে, বেচা-কেনা
উড়ে চলা কাছধ।

লক্ষী, এখন ছাড়ো খেলা,
এর পরেতে গল্প করো
সারা লক্ষী খেলা,

নিতবে বদন দিনের বাতি,
নাহবে আকাশ তেঁপে
অন্ধকারের বান,
পাখীরা সব জাগ হুলায়
আহুল হয়ে ছুঁবে হবে পান।
মিশেহারা কান্না পবিক
একা ঘনের মাঝে,
অন্ধকারের আগোশ ভেঁকে
খুঁজে যে নী যে,
তারি সঙ্গে ভোমার খোঁজা
আমার হবে শুক,
চলতে পথে কাগজে ঢুক ঢুক
ছোট্ট ভীক আশা।
মনের মাঝে বড় বড় বাঘ
মুখে নেইকো ভাষা।

(তখন) তুমি কিছ বনের মাঝে
বেঁধে হুঁসারখানি,
ধাড়িয়ে আঁধ পথ চেয়ে
ঘোর জানি।
দূর থেকে ঘোর ঘুরের ধনি,
যেই না কানে শোনা,
অমনি দুয়ার বন্ধ করে
শুক হলো বোনা,
অতিমান-যোড়াই করা
কথার তত্ত্বজাল।
মনখানা যে টলমলিয়ে
হলো বেশামাল।

মুখর অতীত(৪)

কমলা দাশগুপ্ত

আগষ্ট আন্দোলন

১৯৩২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইউরোপে যুদ্ধ বাধলো।

এরা সেপ্টেম্বর, ইংরেজ ভারতবর্ষকে তার মত না নিয়েই যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করল। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রা ঘোষণা করলেন, নিষেধ কার্যের ক্ষত্র ইংরেজ যুদ্ধ করছে না। গান্ধীজী বললেন তা হ'লে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার কর ইংরেজের এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার কথা কংগ্রেস জানতে চাইল। নেতৃত্ব বললেন, যুদ্ধোদ্ভমে একমাত্র স্বাধীন ভারতবর্ষের সাহায্যেরই দ্বারা থাকতে পারে। Viceroy রাজী হলেন না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বন্ধলো। তাঁরা ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস ময়ীপন পদত্যাগ করবেন। ১৪ দিনের মধ্যে ৮টা প্রদেশ থেকে কংগ্রেসী ময়ীপন পদত্যাগ করলেন। কত বছরের দুঃখ এবং ত্যাগের ইতিহাস নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই ময়ীপন। কংগ্রেসের আদর্শে একমুহুর্তেই তাঁরা গলে এলেন। যুদ্ধে নিলেন, পুনরায় সংগ্রামের আহ্বান আসছে, প্রস্তুত হতে হবে।

Viceroy গান্ধীজীকে ভেঁকে বললেন, তোমরা মূলনীম লীগের সঙ্গে একমত হয়ে প্রবেশে এক কেন্সের Executive Councilএ এসো। কংগ্রেস বললো, হিন্দু মুসলিম আত্মবিশ্বাসের ঘরোয়া ঐক্য। তোমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার করে বল, ভারতবর্ষকে স্বাধীন ঘোষণা কর। ১৯৩০ সালের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষত্র প্রস্তুত হ'তে আহ্বান করলেন। রামগড় কংগ্রেসের সভাপতি বোলানা আবুল কালাম আত্মবিশ্বাস করলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্ষত্রকে নিষেধ নাগে চাপিয়ে রাখতে ভারতবর্ষ সাহায্য করবে না।

তখনো গান্ধীজী সংগ্রাম শুরু করার মত বেশ প্রস্তুত বলে অনুভব করতে পারছিলেন না। তিনি চাইলেন

নিষমাহুযুক্তিতা, গঠনমূলক কাজ এবং তার মধ্য দিয়েই গণসংযোগ। কারণ জনসাধারণ যোগ না নিলে আইন অমান্ত আন্দোলন ব্যর্থ হবে। সংগ্রামের ক্ষত্র তাঁর নির্দেশিত পথ জানিয়ে নিলেন এবং বললেন, তাঁর অভিধানে পরাজয় বলে কোন কথা নেই।

ওদিকে গভর্নমেন্ট দলে দলে লোককে গ্রেপ্তার করতে লাগলো। মনননীতি ক্রমেই আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। গান্ধীজী দেখলেন জাতির যৈর্ঘ্যের হুম্বোগ নিয়ে তাকে যেতে দেয়ার প্রচেষ্টা চূণ করে সম্ব করা সম্ব নয়। ব্যাপকভাবে অহিংস গণআন্দোলন আরম্ভ করার মত প্রস্তুতি তখনো ছিল না। সেই গণআন্দোলন আরম্ভ করার ক্ষত্র শেষ সংগ্রামের ক্ষত্র প্রস্তুত করার ক্ষত্র তিনি ব্যক্তিগত সভ্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন। সভ্যাগ্রহীরা গ্রামের পর গ্রামকে এই কথা জানিয়ে যিবে যাবেন যে, এই যুদ্ধে সাহায্য করা ক্ষত্র। এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কেউ একটা পরমা বা একটি লোক যিবেও সাহায্য করো না। গান্ধীজী চেয়েছিলেন সমস্ত গ্রামগুলিকে এই ভাবে আগিয়ে তুলে, এই যুদ্ধে অসহযোগিতার মধ্য যিবে দেশকে শেষ সংগ্রামের ক্ষত্র প্রস্তুত করতে। তাই এটা ছিল সংগ্রামের প্রস্তুতির ক্ষত্র সভ্যাগ্রহের আহ্বান।

বিনোভা ভাবে ছিলেন প্রথম সভ্যাগ্রহী। তারপর ওয়ার্কিং কমিটি A. I. C. C. প্রাণেশিক কংগ্রেস কমিটির ঘেষারগণ এবং ময়ীপন একে একে মকলেই সভ্যাগ্রহ করে বেশটাকে চকল করে তুলতে তুলতে গ্রেপ্তার হলেন। শুধু গান্ধীজী বইলেন মুক্ত।

একদিকে চাচিল দায়েব মদর্পে ঘোষণা করলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তিনি হাতছাড়া কনবেন না। আরেকদিকে ব্যক্তিগত সভ্যাগ্রহ আন্দোলন যুদ্ধের সংগ্রামের ক্ষত্র প্রস্তুত করে চলেছে। জেলগুলি পরিপূর্ণ হয়ে যেতে লাগলো। প্রায় ৩০,০০০ জন সভ্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হলেন। ২ লক্ষ টাকারও বেশী জরিমানা আদায় করা হ'লো। গ্রেপ্তার ও অভ্যাসের বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বেশ চকল হয়ে উঠতে লাগলো গান্ধীজী আন্দোলনের অগ্রগতি লক্ষ্য করে চলেছেন।

ঠান্ডে ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে সত্যাগ্রহীদের গভর্ণমেন্ট হুকি দিতে লাগলো। উদ্ভক্ত ছিল অচল অবস্থার অবদান ঘটান দায় কিনা। গান্ধীজী বইলেন অটল।

১৯১১ সালের স্বাধীনতা দিবসের সমস্ত ব্যক্তি গোষণা করা হলো যে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কংগ্রেস আহ্বান করলেই সকলেই যোগদান অব্যাহত রক্ত প্রবৃত্তি থাকবে। সংগ্রামের চরিত্রাধীনে বীর পথ দেখিয়ে চলতে লাগলো।

১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে নতুন সমস্ত চাতে Sir Stafford Cripps এসে উপস্থিত হলেন। সমস্ত অনেক নতুন কথাই ছিল, ছিল না কিন্তু দেশের রাজ্যের প্রজাতন্ত্রের কোন অধিকারের উল্লেখ, ছিল না ভারতবাসীর দেশ স্বতন্ত্র অধিকার। নিজের কথা এই ছিল যে, সকল দেশ একই চরিত্র হতে পারে বলা সমস্ত স্বাধীন করে তুলে দেশের কাছ ভারতবাসীর উপর দেওয়া যাবে না। গান্ধীজী সব দেখে ভনে নাকি Cripps সাহেবকে বলেছিলেন—“এই যদি তোমার প্রস্তাব হয়, তবে ভূমি পৃথক Plane বা কী ৬০১” Cripps নাকি কখন দিয়েছিলেন “সে কথা ভেবে যোগদান।” গান্ধীজী Cripps প্রস্তাবকে নাকি ‘Post-dated cheque on a crashing bank’ বলে অভিহিত করেছিলেন।

বল আলাপ আলোচনার পর কংগ্রেস বুঝে নিল দল স্বীকা করল। ইংরেজের এ দেশ ত্যাগ করার কোন ইচ্ছাই নেই। বার্ষিক হোলো Cripps প্রস্তাব। সমস্ত বলই ঐ প্রস্তাবকে নিজের নিজের দিক থেকে প্রস্তাব্যমান করেছিল।

Cripps প্রস্তাবের ব্যর্থতার পরে গান্ধীজী কেবলই ইংরেজকে জোর দিয়ে বলতে লাগলেন Quit India, এদেশ ছেড়ে তোমরা চলে যাও। তাঁর সেবাধ, বক্তৃতায়, আলোচনায় তিনি Quit India প্রচার করতে লাগলেন। দেশে ইংরেজ বিবেচনা আরো তীব্র হয়ে উঠতে লাগলো।

ওদিকে কাকোদাহ, ভিক্রেগাপটনে জাপানী বোমা পড়লো। Bay of Bengal এ জাপানী জাহাজ দেখা গেল। দায়, শিলাপুর, বার্বাদো আগুনই গেছে।

এবার ভারতে জাপানী আক্রমণ যেন আসন্ন হয়ে উঠলো। কংগ্রেস বললো এদেশে ইংরেজ আছে তাই জাপান আক্রমণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে। আমাদের নিকট ইংরেজ জাপান সব সাম্রাজ্যবাদীই সমান। দুজনকেই আমরা বাধা দেবো।

১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট বয়েতে কংগ্রেস প্রস্তাব পাঠ করলো যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার লাভের জন্য গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস এখনই সংগ্রাম আরম্ভ করবে। গত কুড়ি বছর ধরে সংগ্রাম করে যেন যে যে শক্তি অর্জন করেছে, সেই সমস্ত শক্তি নিয়ে সে আজ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। সকল প্রকার হিংসা ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য দেশকে তাঁরা প্রস্তুত থাকবার জন্য আবেদন করলেন। তাঁরা বললেন, হয়তো এমন সময় আসবে যখন জনগণকে নির্দেশ দেবার সুবিধা থাকবে না। তখন সংগ্রামরত প্রতিটি নরনারী নিজেই নিজের নির্দেশক হয়ে সংগ্রাম পরিচালিত করে যাবেন। স্বাধীনতা লাভ করতেই হবে। এবার প্রতিষ্ঠা হবে কৃষাণ-মজুর-প্রজাবাহ।

তারপরে গান্ধীজী কথা বললেন। যেন তাঁর অন্তরের বাণী স্মৃতিতে শুভ হয়ে আস্তিক প্রেরণায় উদ্ভূত করে কথা ক’রে উঠলো। তিনি বললেন, আমাদের অন্তর বলছে যে সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে আমাদের একা গাঁড়িতে হবে। সে বলছে “রক্তচক্ষু জাতির সুখোমুখি গাঁড়িও। কিছু ভয় নাই।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন “স্বাধীনতা চেয়ে ভারতবর্ষ কি অপরাধ করেছে? যদি আজ সমস্ত জাত এমন কি সারা ভারতবর্ষও আমাদের বিরুদ্ধে যেতে বলে, তবুও আমি এগিয়ে চলবই। আজ কংগ্রেস সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করেছে। আমি এবং কংগ্রেস আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কংগ্রেস হয় বাস্তব সাধন করবে, নয় তার মৃত্যু হবে। ‘Congress will do or die.’”

৯ই আগস্টই তিনি জিলা সাহেবকে চিঠি লিখলেন। প্রেরণকে নির্দেশ দিলেন যে, সমস্ত লাহন্য সম্বন্ধে যেন তত্ত্বা নিতিভাবে কাজ ক’রে যান। দেশের রাজ্যের

রাজাদের বললেন, যেজাতীয় ত্যাগ করে শাসনতন্ত্রে
প্রজাদের সারিস্বত্বের অংশ দিতে হবে। নইলে স্বাধীন
ভারতবর্ষে তাদের স্থান থাকবে না। ছাত্রদের বললেন
সমস্ত প্রকার ত্যাগের অস্ত্র প্রস্তুত হও।

গান্ধীজী ধাঁপে ধাঁপে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি দ্বির
করেছিলেন, Viceroy-এর সঙ্গে আপোষ বোঝা করবেন।
তারপর সিদ্ধান্ত করবেন গণ-আন্দোলন আরম্ভ করবেন
কিনা। কিন্তু এই অগাধ শেখ-রাত্রি ৪-৩০ তার সময়
গভর্নমেন্ট গান্ধীজীকে এবং সমস্ত নেতাদের গ্রেপ্তার করে
নিরে পেল। গভর্নমেন্ট প্রস্তুত হয়েই ছিল। সেমস্ত
সংগ্রাম হুক হবার পূর্বেই, হুক ঘোষণার আগেই মূল শিকড়
অবধি উপড়ে কেলে আন্দোলনকে গভর্নমেন্ট শেখ করতে
গেল। গান্ধীজী রইলেন আপাখা প্রাসাদে। কয়েক
দিনের মধ্যেই সেখানে গেলেন মহাদেব ঘোষাই এবং
কতরাং। অস্ত্র নেতাদের রাখা হলো আহমেদনগর
ফোর্টে।

নেতাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতি ঘেন ক্ষেপ
গেল। টিক ইলেক্ট্রিসিটির মত সমস্ত যেশে ত:ফুর্ত-
ভাবে আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়লো। গান্ধীজীর
অনারহ কালের ভার তারা নিজেরাই গ্রহণ করলো।
গান্ধীজী বলেছেন, Quit India, জাতি পণ করেছে,
ইংরেজকে Quit India করিয়ে তারা ছাড়বে। Do or
die. আরম্ভ হয়ে গেল গণ-সংগ্রাম। যাকে বলে
open rebellion.

গভর্নমেন্ট তার নির্ধ্যাতনের চাকা নির্ধমভাবে চালিয়ে
বিল। সমস্ত কংগ্রেস কমিটিগুলি বে-আইনী ঘোষিত
হলো। Tear gas, লাঠি চার্জ ও গুলি চললো।
মিলিটারী প্রথমই এলো। বম্বে, মাদ্রাস, বাংলা, বিহার,
উড়িষ্যা, আসাম, ইউ. পি. কোন প্রদেশই আর বাকী
রইলো না। সর্বত্রই নিশেঘনের চাকা গড়িয়ে চললো।
সংবাদপত্রের কঠোরোখ করে সমস্ত সংবাদ চেপে দেওয়া
হতে লাগলো।

জনগণ মরিয়া হয়ে উঠলো। আইন অমান্ত করতে
বলে বলে হাঙ্গামে হাঙ্গামে তারা এগিয়ে এলো। চললো

মিলিটারীর গুলি, মেসিনগান, aerial firing, অর্থাৎ
এরাগ্লেন থেকে গুলির গুলি এবে নিরস্ত্র জনতাকে পরাশারী
করে দিতে লাগলো। কোথাও লাগে মাদ্রাসের সেই
Timur Lame অথবা চেমিশ খার বর্বরতা। কিন্তু
জনগণ রেল লাইন উপড়ে ফেলতে লাগলো, ট্রেনশ পুড়িয়ে
দিতে লাগলো, শস্তের গুদাম লুট করতে গেল,
টেলিগ্রামের তার, ট্রামের তার কেটে দিতে লাগলো।
দুখের অস্ত্র যা কিছু শ্রমোজনীর ধানবাগন সবই নষ্ট করতে
চেষ্টা করতে লাগলো। গভর্নমেন্টকে অচল করে
তোলাই তাদের উদ্দেশ্য। ওদিকে কৃষকেরা অধিবাসের
কাছারী পুড়িয়ে দিচ্ছে, ছাত্রগণ মূল কলেজে পিকেটিং
করছে। আয়েশাবাদের মিল বন্ধ হয়ে গেছে। Tata
Iron Steel Works-এর ২০,০০০ লোক নিয়ে সমস্ত
staff ধর্মঘট বন্ধ করেছে। এবার আর তেলে বাতায়
আন্দোলন ছিল না। এবার ছিল ক্ষমতা বহলের
সংগ্রাম। গণশক্তি আত উৎসাহ।

বাংলা যেশে মেদিনীপুর জেলায় এবং বাসিন্দা ও
নাভারতে ক্ষমতাসম্বল করে পাশাপাশি স্বাধীন গভর্নমেন্ট
তারা গঠন করলো। শুধু মেদিনীপুরেই ৮১টা থানা
এবং গভর্নমেন্টের বাড়ী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পুড়িয়ে
দেওয়া হলো। এবং গভর্নমেন্ট মেদিনীপুরে ১২০টা
কংগ্রেস ক্যাম্প পুড়িয়ে দিয়েছিল। সমস্ত দেশ আম
পাগল। হাঙ্গামে হাঙ্গামে লোকগুলি মার খাচ্ছে,
মরছে, গ্রেপ্তার হচ্ছে, কিছু অক্ষেপ নেই। জাতি মরণপণ
করে বলছে Quit India.

এইভাবে চলতে লাগলো অগাধ আন্দোলন।
সবাই বেগলোচা, সবাই ঘেন মরিয়া। ১২১ মাল থেকে
'৪২ মাল অবধি সংগ্রামের স্বত কুণ ছিল সবই তারা
একসঙ্গে হানতে লাগলো। বিদ্রোহী ভারতের এই রূপ
বেশে ইংরেজ জড়িত হয়ে গেল। তারা বুঝে নিল
জাতীয় চেতনার এই হুমিনার শক্তি, সংগ্রামের আন্তনের
এই সেলিহান ত্রিস্তা তাদের ভাবতবর্ষ থেকে বিভাঙিত
করবে। ২৮ বছরের শাসনের কাঠামো তাদের ক্ষয়ে
জমে যাচ্ছে। দিন তাদের ছুরিয়ে এসেছে। অগাধের
জাতীয় সংগ্রাম মেরিন সমুদ্রের ওপারে অস্থি নির্দেশ
করে ইংরেজকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে, Quit India—এই
ছিল কংগ্রেসের সাধনা। এই ছিল গান্ধীজীর মন্ত্র। •

হে নূতন হে নন্দিত

ঐশ্বর্যশেখর রায়

তুমি এসো হে নূতন,

জাতির জীবনে তোমার সঙ্গীতবী শূন্য সাগর,

তাকে কহো গতি-সকল তোমার কর্তব্য প্রেরণার প্রকৃত

আবেগে ।

আমার জাতি স্বপ্ন বেধে বেধে স্বপ্নাসু হতে গেছে,

উদ্ভাস সে, পশু সে, ভীষণ সে নয় বিলাসের অসুখ

মালসায় ।

তার প্রাণ গিয়েছে মরে, সেহে তার শক্তির সঞ্চয় নাই ।

তুমি এসো শিশু-শিশুগণ হাতিয়ে,

আমাদের চলার পথকে তোমার রক্ত আলোর উদ্ভাসনার

পুলকিত করে ;

তুমি আমাদের জীবনে এসো ।

আমাদের রক্ত জীবনকে তুমি পূর্ণ করো দীপ্ত উৎসাহে,

স্বপ্নচোর বীরের আবেগ চকলতায়,

বীরনের প্রদীপ্ত উজ্জ্বলনায় ।

বুহতের সাথে আমাদের বিচ্ছিন্ন বোগদুঃস্বপ্নকে তুমি

চূড় করে ।

চূড় করে আমাদেরকে ভয় থেকে, কণ থেকে ।

হে নূতন, হে নন্দিত, হে স্বপ্নের তুমি এসো, তুমি এসো ।

অগ্ন্যা জ্যোতিষ্কে প্রাণী-জগৎ

ডাঃ হারল্ড শ্বেলার জোল্ এফ. আর. এস.

অবস্থান—ক্রীস্টান মুখোপাধ্যায় বি. এন্ড. সি.

এই বিরাট বিশ্বের বিশালত্বকে আরও বিশদভাবে জানিবার জন্য বর্তমানের বৈজ্ঞানিকমহলে অতি বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রসমূহের ব্যবহার নিয়তই হইতেছে । দূর্য্য একটি বিশাল নক্ষত্রের অগ্রদূত এবং তাহার চারিপাশে প্রায় দশ লক্ষ নক্ষত্র বিহার করিতেছে । তাহারা এতটা দূরত্ব লইয়া বিচরণ করিতেছে যে উহার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলো পৌছিতে এক কোটি বৎসরের প্রয়োজন । (আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ দ্বিমাসি হাজার মাইল ।) এই যে অনন্ত মহাপুত্র, ইহা এই প্রকারের আরও বহু সৌরজগতে পূর্ণ, এবং তাহারা আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেকটা আমাদের এই সৌরজগতের মতই । এই পর্য্যন্ত প্রায় ১০০০০০০০টি সৌর-জগতের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ।

স্বভাবতই মনে হইতে পারে, আমাদের এই পৃথিবী ব্যতীত অনন্ত মহাপুত্র, অনন্তকালচাৰী এই সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে জৈব-প্রাণ আছে কিনা ? এই বিষয়ে

কি এই পৃথিবীই একমাত্র উদাহরণ ? এই কথা বিদ্যান করিতে অনেকের আগ্রহী করিবেন যে, এই অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে কেবলমাত্র আমাদের এই পৃথিবীই জৈব-প্রাণ লইয়া বিচরণ করে ।

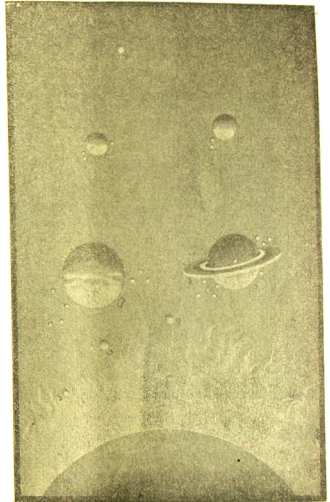
অসম্ভব জ্যোতিষ্কের অবস্থার ও আমাদের এই পৃথিবীর অবস্থার অনেক পার্থক্য । হুতরাং আমাদের এই পৃথিবীর জৈব-জীবনের অগ্রদূত জীবন সেখানে থাক সম্ভবপর নয় ! কিন্তু, একমাত্র সেই অগ্রই কি আমরা মনে করিতে পারি যে সেখানে প্রকৃতই কোন জৈব-প্রাণ নাই ? ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, এই পৃথিবীর রথ আবর্তনে যে জীব গড়িয়া উঠিয়াছে, বিভিন্ন জ্যোতিষ্কে সেই প্রকারের জীব বিভিন্ন আকারে বাঁচিয়া আছে । (সেই সমস্ত জীবের সহিত পৃথিবীর জীবসমূহের কোনরূপ সাম্যত্র থাক সম্ভবপর নয়) । এই পৃথিবীর উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবকোষ বিশ্লেষণ করিয়া সেবা যায় যে, যদিও তাহারা আকৃতিতে ভিন্ন রকমের, তথাপি প্রত্যেকেই সাধারণতঃ কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটেশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও অগ্রদূত অসম্ভব উপাদানে গঠিত । ইহা ধরা করা হইতে পারে যে অসম্ভব জ্যোতিষ্কের প্রাণীসমূহের

জীব-কোষ ভিন্ন উপাদানেও গঠিত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাউতে পারে যে, কারবনের স্থান যদি সিলিকন্স অধিকার করে তবে সেট জৈব-কোষ আরও অনেক বেশী উন্নতপন্থা কথিত্যে গঠিত্য থাকিতে পারে। সেট উন্নতপন্থা হইতে এই পৃথিবীর জৈব-কোষকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। একটি উপাদান সমস্ত জ্যোতিষিক-একট বাসগনিক ক্রিয়া করে। অধিকন্তু, আমরা এই কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, পৃথিবীর মধ্যেই বিভিন্ন উপাদানে গঠিত জৈব-কোষ নাই।

প্রথমতঃ সমস্তপ্রকার জৈব-কোষেই উপাদানের একটা ঐক্য থাকা আবশ্যক (তাহারা যে ডায়েট বর্তমান থাকুক না কেন)। সমস্ত জৈব-কোষেরই আণবিক (molecular) গঠন যৌগিক এবং বিশ্লেষণযোগ্য (fragile)। উন্নতপন্থা, যারা এই সমস্ত যৌগিক জৈব-কোষকে অনাধায়েই বিশ্লেষণ করা যাউতে পারে। উন্নতপন্থার নিকট সমস্ত জৈব-কোষই ধ্বংসশীল (sensitive)। জৈব-কোষের সংগঠন বতাই ভগ্ন হইবে, কোন না কোন প্রযোজক (agent) সাহায্যে তত সংক্ষেপেই উহার ধ্বংস হইবে। কারণ, জৈব-কোষের প্রাণ (protoplasm) যদি ধ্বংস হয় তাহা হইলে জৈব কোষের সমস্ত ক্রিয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ওলট-পালট হইয়া যায়। কোন কোন জৈব-কোষ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা সহ করিতে পারিলেও নিরতাপে জৈব-কোষ জীবন ধারণ করিতে পারে না। তাহা হইলে আমরা এই কথা একপ্রকার নিশ্চয় করিয়াই বলিতে পারি যে, যে জ্যোতিষিক

অত্যধিক গরম বা অত্যধিক ঠাণ্ডা, সেখানে প্রাণীজগৎ থাকা সম্ভবপর নয়।

জৈব-কোষের জীবন ধারণের পক্ষে তাপট একমাত্র



বৃহৎ ও তার গ্রহণ

১-বৃহৎ, ২-শুক্র, ৩-পৃথিবী, ৪-ধ্বংস, ৫-বৃহস্পতি, ৬-শনি,
৭-ইউরেনাস, ৮-নেপচুন, ৯-প্লুটো।

জিনিষ নহে। জল প্রভৃতির মত আরও অত্যাশ্চর্যকীয় উপাদানসমূহেরও বরকাবে। জলের সহিত রাসায়নিক

এবং সকল পোষণ করিগাই জৈব-কোষ বাড়ে এবং বংশ
বৃদ্ধি করে। জল বাতীত কোন প্রকারেই উদ্ভিদের
জীবন ধারণ সম্ভবপর নহে। উদ্ভিদ এবং প্রাণী, উভয়েই
পারোষিক কোষ-সমষ্টির (tissue) অত্যাবশ্যকীয় উপাদান
জল। যদি দেখা যায় যে, জলাভাবের জীবকোষ ধ্বংস
হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে সেই সময় উহা জলবাহ্য
ছিল। আমাদের পরিচিত গ্রাহ সমস্ত প্রকার জীবই
তাহাদের বাহ্যার জল মৃত্ত অস্তিত্বের সাহায্য লয়।

শালিকার, ত্রোহিণ, প্রভৃতি পুরোক্ত গ্যাসগুলির দ্বিভিই
জীব-জগতের অভাব বলিয়া মাক্ষা দেখ। কোনরূপে
আবহাওধ্যাব অভাব হইলেও প্রাণীজগৎ থাক। সম্ভবপর
নহে।

কাজেই আমরা এখন এই কথা বলিতে পারি যে,
সূর্য্য এবং অক্সিজেন জ্যোতিষ্ক জীবজগৎ থাক। অসম্ভব।
কারণ, সর্বাণেকা নিম্নতাপ বিশিষ্ট জ্যোতিষ্কের উত্তাপও
এত অধিক যে উহার বহিরাবরণের বায়ুনগলে দায়



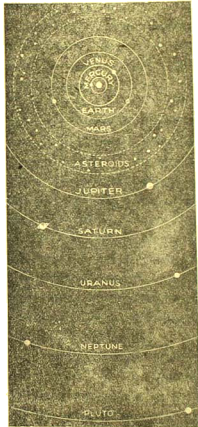
জলসমিতে জীবজগতের বহিঃস্থ অবস্থা।

(যদিও অস্তিত্বের অভাব সকলক্ষেত্রে মৃত্যু আনয়ন
করে না) এ্যানোনিয়, ত্রোহিণ, কার্বন মনক্সাইড,
শালিকিউরোট, হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস উহার পক্ষে
বিষাক্ত। কিন্তু একান্ত আদর্য মনে করিতে পারি না যে,
যে সমস্ত জ্যোতিষ্কের বায়ুনগলে এই সমস্ত গ্যাস আছে
সেখানে প্রাণী বাচিতে পারে না। তবে থাক। খুবই
কষ্টকর। যে সমস্ত জ্যোতিষ্কের বায়ুনগলে জলীয় বাষ্প,
অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, আছে, সেখানে প্রাণী
থাক। সম্ভবপর। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে ইহার অভাব এবং

সর্বাণেকা সরল যৌগিক (Simplest Compound)
পদার্থ বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে এবং অটীল যৌগিক
(Complicated Compound) জৈব-কোষ উক্ত তাপের
সমীপবর্তী হইলে নিশ্চয়ই ভাঙিয়া যাইবে।

এতদ্বারা আমরা সূর্য্য ও নক্ষত্রসমূহের কথা
বলিতেছিলাম। এইবার আমরা অক্সিজেন জ্যোতিষ্কের
কথা বলিব। এই সমস্ত জ্যোতিষ্কের নিম্নম কোন
আলো বা তাপ নাই; সূর্য্য হইতেই তাহারা আলো
বা তাপ পাইয়া থাকে। দূর্তাগোর বিবরণ, দূরস্থিত

নক্ষত্রপুঞ্জের স্ব স্ব সৌরজগৎ আছে কিনা এবং থাকিলেই বা তাহারা কিরূপ, আশ্চর্য্য পূর্ণ সে সমস্ত জানা যায় নাই। উহাদের বায়ুমণ্ডল ও উত্তাপের বিষয় আমরা এই সৌর-জগৎ অপেক্ষাও কম জানিতে পারিঘাছি। এখন আমরা যে সমস্ত ভৌতিকের বিষয় আলোচনা করিব, তাহা আমাদের এই সৌর-জগতের মধ্যেই লীনাবদ্ধ



সৌরজগৎ

থাকিবে। এই সৌর-জগৎকে বর্ণাসাধ্য বিশ্লেষণ করিয়া আমরা একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইব মাত্র।

গ্রহ উপগ্রহ সম্বন্ধে আমাদের এই অল্পসঙ্খ্যাতা সম্পূর্ণরূপে নিরাস হইয়া নাই। বালোমিটার (Balometer) নামক একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে আমরা উহাদের

উত্তাপের বিষয় জানিতে পারি। উহাদের বায়ুমণ্ডলের গঠন সম্বন্ধেও বর্ণালীর পরীক্ষা (Spectroscopic examination) দ্বারা কিছু কিছু বিশ্লেষণ জানিতে পারি। গ্রহসমূহে নিম্নতর কোন আলো নাট। আমরা সূর্য্য হইতে গ্রহের উপরে প্রতিফলিত (reflected) ও প্রতিবৃত্ত (refracted) আলো দ্বারা তাহাকে দেখিতে পাই। মনে করুন, একটি গ্রহের বায়ুমণ্ডল আছে। সূর্য্য হইতে উক্ত গ্রহাভিমুখে আলোক দ্বারা করিয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত গমন করিল এবং প্রতিফলিত বা প্রতিবৃত্ত হইল। এই আলো ও সূর্য্য হইতে নির্গত আলোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ঐ গ্রহের বায়ুমণ্ডলে সূর্য্যালোকের কোন কোন রং (সূর্য্যের আলোকে সাতটি রং আছে।) শোষিত হইয়াছে। এখন উক্ত আলোর বর্ণালী ও আমাদের সূর্য্যালোকের বর্ণালীর তুলনা করিলে উক্ত গ্রহের বায়ুমণ্ডল সূর্য্যরশ্মি হইতে কি রং শোষণ করিয়াছে,—বৃত্তিতে পারা যায় এবং ইহার মৌলিকতাও জানিতে পারা যায়। তবে ইহার মধ্যেও একটু গড়গোল আছে। ঐ গড়গোলের কারণ, এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। কারণ উহার ঐশ্বর্য্য দ্বারা আমরা সূর্য্যরশ্মি ও উক্ত গ্রহ রশ্মি অবলোকন করি। এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সলীল বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, ওজোন ও অন্যান্য গ্যাস থাকার দরুন সূর্য্যরশ্মি শোষিত হয়।

উক্ত গ্রহের বর্ণালীতে এমন বর্ণশোষণ ব্যাপ্তর দেখা যাইতে পারে যাহা গ্রহের বর্ণালীতে আছে। একতরপও যেথা যাইতে পারে, যাহাদের উৎপত্তি এই পৃথিবী হইতেই। প্রথমোক্ত কারণের তত্ত্ব উক্ত গ্রহের বায়ুমণ্ডলই দায়ী এবং সেনেক্স কারণের তত্ত্ব উক্ত গ্রহের বায়ুমণ্ডল অথবা এই পৃথিবী বায়ুমণ্ডল দ্বারা হইলেও হইতে পারে। আমরা এই দুইটি সীল গ্রহের মীমাংসা করিতে উক্ত ভৌতিকের ও সূর্য্যের বর্ণালী গ্রহণ করিব।

কোন যানযন্ত্র হইতে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াও এই বিষয়ে আমরা কিছু কিছু জানিতে পারি। কোন গ্রহ উহার বায়ুমণ্ডলকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা টানিয়া রাখে।

যদি একটি উপলব্ধ এই পৃথিবী হইতে প্রতি সেকেন্ডে সাত মাইল বেগে উর্ধ্বে উৎক্লিষ্ট হয়, তবে উহা আর এই পৃথিবীতে কিরিয়া আসে না। এই গতিকেই মাধ্যাকর্ষণ অভিক্রমকারী গতি (Velocity of Escape) বলে। অত্যন্ত গ্রহের পক্ষেও এইরূপ নির্দিষ্ট বিভিন্ন গতি আছে।

আমরা যে বায়ু বাষ্পপ্রবাহের সহিত গ্রহণ করি তাহার প্রত্যেক ঘন ইঞ্চির মধ্যে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মিলিয়ন অণু পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘর্ষিত হইতেছে এবং বিচরণ করিতেছে। অণু বড় ছোট, উহার গতিবেগ তত বেশী হয়। হাইড্রোজেনের গতিবেগ সেকেন্ডে প্রায় ১৬ মাইল (গড়ে)। কিন্তু নাইট্রোজেন বা অক্সিজেনের গতিবেগ সেকেন্ডে ৬ মাইলের বেশী হইবে না। তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে কি প্রলম্বতাও বর্তিতেছে! সেখানে অণুগুলি তাহারের গড়গড়তা গতিবেগ অপেক্ষা কি ভীষণ বেগে সন্তত ঘুরিতেছে। যেন করা বাউক, এখানে কিছু হাইড্রোজেন আছে। তাহারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অভিক্রম করিয়া পৃথিবী হইতে দূরে সরিয়া বাইতে পারে। যদি না তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত পাড়া খায়, তবে বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ হইতে হাইড্রোজেনের দখল অপসরণ আশা করা হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অতি অল্প হাইড্রোজেনই আছে। এই অল্পতার একমাত্র কারণ, ইহা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আবরণ হইতে সরিয়া গিয়াছে। অপর পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ অভিক্রমকারী গতিবেগ, নাইট্রোজেন বা অক্সিজেনের গতিবেগ অপেক্ষা কৃষ্ণগুণ অধিক। সেইজন্যই এই গ্যাস দুইটি পৃথিবীর বৃক করেদীর মত বন্দি হইয়া আছে।

এখন বৃহস্পতি ও চন্দ্রকে পৃথিবীর সহিত তুলনা করা বাউক। পৃথিবীর পক্ষে যেমন হাইড্রোজেন বায়ুমণ্ডলে রাখা কঠোর, চন্দ্রের পক্ষে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন রাখাও তেননই কঠোর। পৃথিবী হাইড্রোজেনকে হারায়া অনেক কাল ধাবৎ অবস্থান করিতেছে, চন্দ্রও সেইরূপ কেবলমাত্র হাইড্রোজেন বিহীন নহে; ইহাতে

নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, অম্লীয় বাষ্পেরও অভাব আছে। হুতরাং চন্দ্র বায়ুমণ্ডল বিহীনও হইতে পারে।

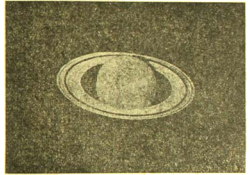
অপর পক্ষে বৃহস্পতিতে মাধ্যাকর্ষণ অভিক্রমকারী বেগ (প্রতি সেকেন্ডে ৩৬ মাইল) এত বেশী যে, সর্ল্যাপেক্ষা হাল্কা গ্যাস হাইড্রোজেনও উহার বায়ুমণ্ডল হইতে ছুটিয়া আসিতে পারে না। হুতরাং বৃহস্পতিতে আমরা এক খিরাট বায়ুমণ্ডলের আশা করিতে পারি। কিন্তু আমাদের কেবলমাত্র আশা করিলেই চলিবে না, প্রমাণ দ্বারা সব কিছু গ্রহণ করিতে হইবে। চন্দ্র এখন কোন নক্ষত্রের লম্বু দিয়া যায়, তখন তারকাটি বিজ্ঞান গতিতে দৃষ্টি বহিষ্কৃত হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, চন্দ্রের বায়ুমণ্ডল নাই; যদি থাকিত, তবে তাহার আগলো উহার ভিতর দিয়া প্রতিসৃত (refracted) হইত এবং তাহার ফলে তারকাটি ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি বহিষ্কৃত হইত। চন্দ্রই আমাদের নিকটবর্তী জ্যোতিষ, উহার উপরিভাগই আমরা একটু ভালভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারি। চন্দ্রে আমরা পর্বতশ্রেণী, প্রকাণ্ড সমতল ভূমি এবং পার্শ্বতা সফ পথ ও কাটল দেখিতে পাই; কিন্তু সেখানে কোন নদী, ব্রহ্ম বা সমুদ্র নাই। যদি চন্দ্রে কোন-প্রকার জলশর থাকিত তবে সেই জল বাষ্প হইয়া শূন্যে মিশিয়া বাইত। যদি চন্দ্রে কোন অধিবাসী বাস করিত এবং সে যদি একটা পলিশালী দূরবীক্ষণ ব্যবহার করিত তবে পৃথিবীতে মানববসতির অনেক চিহ্নই দেখিতে পাইত। কিন্তু চন্দ্রে জীববাসের কোন চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই না। হুতরাং চন্দ্র একটি জলবায়ু ও প্রাণী-শূন্য বৃতা পৃথিবী।

বৃহস্পতির আকৃতিই ভিন্নরূপ। উহার নিব্ববেরখার সমান্তরাল করিয়া অছকার এবং উজ্জল লহরী (patches) দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমে উহাঙ্গিগকে গ্রহের উপরিভাগ বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উক্ত লহরীসমূহ সত্যত পরিবর্তনশীল এবং কোন স্থানেও দুইটি একপ্রকার নহে। বোটের উপর আমরা বাহা দেখিতে পাই, উহা কেবল পৃষ্ঠীভূত মেঘ। আমরা কোনক্রমেই বৃহস্পতির উপরের কঠিন আবরণ দেখিতে

পাই না। বৃহস্পতির বর্ণালী পরীক্ষার ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উহার বায়ুমণ্ডল এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। সেখানে অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অলৌহ বাষ্পের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। সেখানে অলকণা বা ধাকার আচ্ছাদ্য হইবার কিছুই নাই। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে সেখানে উত্তাপ মাত্র 200° কাঃ।

বৃহস্পতির বর্ণালী পরীক্ষার আরও প্রমাণিত হয় যে, উহাতে এ্যামোনিয়া ও মাস' গ্যাস নামক বিসাক গ্যাসের বিরাজ করিতেছে। ইহা যদিও অদৃশ্য বলিয়া মনে হয়, তথাপি আচ্ছাদ্য হইবার কিছু নাই। কারণ সূর্য হইতে কিছু পদার্থ (mass) বিচ্ছুরিত হইয়া বৃহস্পতি এবং অস্ত্রাশ্র গ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। সূর্য প্রখানতঃ হাইড্রোজেন দ্বারা আবৃত। বৃহস্পতির ঘন ভাগ হয়, তখন নিশ্চয়ই ইহা বহল পরিমাণে হাইড্রোজেন রাখিয়াছিল। বৃহস্পতির অতি প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হাইড্রোজেনকে উহা হইতে ছুটিয়া যাইতে দেয় নাই। ঘন বৃহস্পতি ঠাণ্ডা হইতে লাগিল, তখন উহার হাইড্রোজেন ক্রমে ক্রমে অক্সিজেনের সাথে মিশিয়া অলকণা তৈয়ার করিল এবং এই অলকণাই আরও অমিয়া উহার উপরে কঠিন বরফের গুহ সৃষ্টি করিয়াছে। অতিরিক্ত হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন এবং কার্বনের সাথে মিশিয়া অস্ত্রাশ্র যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ লঘু পদার্থের মধ্যে সর্বাঙ্গপক্ষা উবাধমান (volatile) হইতেছে এ্যামোনিয়া এবং মাস'-গ্যাস। এই দুইটি গ্যাসই বৃহস্পতিতে আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। যদিও পর্যবেক্ষণ দ্বারা দেখিতে পারি না, তথাপি আমরা ধারণা করি যে, বৃহস্পতিবায় বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন বর্তমান। এই বিসাক বায়ুমণ্ডলে এবং যেখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন ও অলৌহ বাষ্প ঘোটেও নাই, এবং যে গ্রহ অতি নিরতাপসম্পন্ন সেখানে প্রাণীজগতের কোন প্রাণই উঠিতে পারে না। শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন প্রভৃতি বড় বড় গ্রহগুলির কথা ধরা বাউক। বৃহস্পতি সূর্য হইতে দূরত্ব দূরে, ইহারা

তাহা অপেক্ষাও অধিক দূরে অবস্থিত এবং ইহাদের নিজস্ব কোন উত্তাপ নাই। কাজেই ইহাদের উত্তাপ আরও কম হইবে। ইহারা সূর্য হইতে যে তাপ পায় এবং তাহার দ্বারা যে তাপ বিকিরণ করে, তাহার মধ্যে সামান্য আছে। সূর্য হইতে একটি গ্রহ দূরত্বের অবস্থান করে, তাহার উত্তাপও তত কম হয়। কাজেই উহাদের উপরিভাগে তাপও কম হইবে। এই তিনটি গ্রহ প্রচুর হাইড্রোজেন তাহাদের বায়ুমণ্ডলে রক্ষণ করিয়া আছে। তাহাদের বায়ুমণ্ডলের একটি প্রধান উপাদান মাস'-গ্যাস।



উপগ্রহের আণবিকমাণ্য বৈচিত্র্য পরিচয়

কিছু ঠাণ্ডা দূরত্ব বাড়ে এ্যামোনিয়ার পরিমাণও তত কমিয়া যায়, এবং ক্রমে ইহা বায়ুমণ্ডলে ভস্মিয়া য়ে। নেপচুনের তাপ এত কম যে সেখানে নাইট্রোজেন কঠিন অবস্থায় মাত্র বর্তমান আছে কাজেই এই লঘু গ্রহে প্রাণীজগতের কল্পনাও আমরা করিতে পারি না।

আমাদের নিকটতম গ্রহ বুধের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহার মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রমের বেগ (প্রতি সেকেন্ডে ৬২ মাইল) চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রমকারী গতিবেগ (প্রতি সেকেন্ডে ১৭ মাইল) অপেক্ষা খুব বেশী নহে। বুধের এক অর্দ্ধাংশ সর্বদাই সূর্যের নিকটে মূণ

করিয়া আছে :—যেন অর্ধেক বৃষে সর্বদাই দিন এবং অপরার্ধে সর্বদাই রাত্রি। যুর্ধ্বের দিকের অর্ধাংশ অত্যন্ত গরম। এই অতি উত্তাপের জন্য কোন বায়ুগণ সেখানে থাকিতে পারে না। কারণ উত্তাপ হত বেশী, বায়ুগণের বর্ণাগুলি তত দ্রুত সঞ্চয়নশীল। যতদূর আমরা এই শিখাভে উপনীত হইতে পারি যে, চাক্রের মত বৃণ্ড বায়ুগণসমূহ এবং বৃত্ত। যুর্ধ্ব উপরিভাগ কতগুলি অত্যন্ত ঘোলাঢাণে আবৃত। সম্ভবতঃ এইগুলি সমস্তল ক্ষেত্র।

শুক্র এবং মঙ্গলের বিষয় আমরা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিতে চেষ্টা করিব। শুক্র পৃথিবীর প্রায় সমান আয়তনের ও সমান ওজননের। শুক্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর প্রায় সমান বলিয়া আমরা শুক্রের উপর বায়ুগণের আশা করিতে পারি; কিন্তু শুক্র বায়ুগণের হাইড্রোজেন নিস্করই চলিয়া দিয়াছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, শুক্র গ্রহের উপরিভাগ গভীর মেঘাবৃত। সময় সময় উহার উপর বিদ্রি রকমের ঘোলা দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার ইন্সট্রা-রেড্ আলোর কটো ও লক্ষ্য হইয়াছে। এই কটোর সাহায্যে এই গ্রহ সম্পর্কে গণিত-চেষ্টা করা হইয়াছে। ইন্সট্রা-রেড্ আলো কৃষ্ণাণ এবং বেগের ভিত্তর দিয়া অস্ত্রান্ত্র আলো অপেক্ষা তাড়াতাড়ি দাতারায় করিতে পারে। এই বস্তু (sensitive) ইন্সট্রা-রেড্ স্পেক্টের সাহায্যে উহার বিষয় বিশেষ করিয়া জানিবার অস্ত্রই উহার ছবি তোলা হইয়াছে। সাধারণ চোখে এই ছবি দেখিয়া আমরা বুঝি যে ইহার মেঘমণ্ডল অত্যন্ত গভীর।

ইহার তাপও মাপা হইয়াছে। ইহার যুর্ধ্বের দিকের তাপ ১০° — ২০° ফাঃ। অপর পৃষ্ঠের তাপ বরফের তাপের (freezing point) ৪০° ফাঃ নীচে। শুক্রের দিন অতি বড়,—আমাদের দিনের প্রায় ত্রিশ দিনের সমান; এবং এই কারণেই অধিক তাপ ও রাত্রির তাপের মধ্যে এত প্রভেদ। এই দ্বারী বেগের দ্বয়ের নীচের তাপ স্থিরীকৃত (fixed) তাপ অপেক্ষাও বেশী বলিয়া মনে

হয়। মোট কথা এই যে, এই তাপে, শুক্র প্রাণী-জগৎ থাকিবেক না। একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহার বায়ুগণের অবস্থা কেমন? এ পর্য্যন্ত উহার বায়ুগণে অম্মিজেন্ অথবা অলৌহ বাষ্পের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অম্মিজেনের পরিমাণ অতি দৃশ্য; অলৌহ বাষ্পের অবস্থাও প্রায় সেইরকমের। এই অলৌহ বাষ্পের অভাব আশ্চর্যজনক। কারণ, শুক্রের মেঘসমূহ অলৌহ বাষ্পের দ্বারা গঠিত এবং উহার এই পৃথিবীর মেঘেরই অনুরূপ। এইরূপ হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মেঘের উপরি-ভাগের বায়ুগণ কিছু শুষ্ক। এই মেঘবস্তুর নিম্ন বায়ুগণ শিষ্ণ। শুক্রের বায়ুগণে প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। শুক্র অম্মিজেনের অভাব ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রাচুর্য্য। শুক্র গ্রহের মত ঠাণ্ডা হইতেছে এমন গ্রহে পলিত পর্জন্ত হইতে আমরা অলৌহ বাষ্প এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড দেখিবার আশা করিতে পারি। শুক্রের বায়ুগণে অম্মিজেনের অভাব আশ্চর্যজনক নহে; পরন্তু পৃথিবীতেই ইহার প্রাচুর্য্য আশ্চর্যজনক! পৃথিবীর অম্মিজেন অস্ত্রান্ত্র পদার্থের সংস্পর্শে আদিরা প্রতি নিরন্তর হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে বৃষ্ণ প্রভৃতির দ্বারা বায়ুগণ হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পোষিত হইয়া বৃষ্ণাধির ভিতর থাকিয়া যায় এবং অম্মিজেন বাহির হইয়া এই অভাব পূরণ করে। আবার কার্বন-ডাই-অক্সাইডও যখন, পচন এবং প্রাণাসের দ্বারা প্রতিনিরন্তর সৃষ্ট হইতেছে। পৃথিবীতে যখন এখন প্রাণীর আবির্ভাব হয়, তখন বোধ হয় অম্মিজেনের তুলনায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড অনেক বেশী ছিল। তাহা হইলে দেখা যায় যে, শুক্রের বর্তমান অবস্থা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেরকার পৃথিবীর অবস্থার সমতুল। খুব বেশী হইলে, শুক্র এখন উদ্ভিদ জগতের প্রাথমিক অবস্থা যাহা। তাহা হইলে বহু কোটি বৎসর পর হয়ত শুক্রের প্রাণী জগতের অবস্থা বর্তমান পৃথিবীর প্রাণী-জগতের মত হইতে পারে। শুক্র গ্রহের জীব সম্ভবতঃ পৃথিবীর জীব হইতে বহুতর বড়ও হইবে। তখন হয়ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর কোন চিরও থাকিবে না!

পৰিশেষে আমাৰা সৰ্বাংগা আৰুভগৎক এই মন্থলৈ
বিষয় আলোচনা কৰিব। মন্থলৈ গ্ৰহৰ ৰং কমলা সেনু
ৰংৰ মত। ইহাৰ উপৰিভাগে মেঘৰ কাৰণে
চিৰস্বামী হইয়া আছে। এই গ্ৰহৰ এক একটী মিন
আমাৰে মিন অপেক্ষা ৪০ মিনিট বড়। বৰেৰ সহিত
দৰ্শনকৰণ কৰিলে দেখা যায় যে এই মন্থলৈ মাৰে মাৰে
মিলাইয়া যায়। কতু পৰিবৰ্তনৰ মত ইহা আংশিকভাবে
হায়! ইহাৰ মন্থলৈ সূৰ্য্যগোচৰ হয় এবং সেখানে বতৰলৈ
উজ্জল মায়া টুপীৰ মত মিনিট দেখিতে পাওয়া যায়।
মন্থলৈ গ্ৰহৰ এই মিনিটলৈ মিতকালে বৃত্তিগ্ৰাহক হয় এবং
গ্ৰীষ্মকালে সঙ্ক্ৰান্তি হয়। তাহাৰেৰ আৰুভগৎ দেখিও মনে
হয় যে পৃথিবীৰ মতই সেখানে মন্থলৈ চাৰিগাৰে বৰক
জয়া হইয়া আছে। এই বৰকৰ পৰ কৰক ইকিৰ যেন
হইবে না।

মন্থলৈ গ্ৰহ পাল, নাসা প্ৰকৃতি আছে কিনা, সে
বিষয়ে মতবিশোধ আছে। উহাতে কাল বৰ্ণৰ মন্থলৈ এবং
বৰু আৰুভগৎক মাৰ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া
অনেকে মাতী কৰেন। আমাৰিকান জ্যোতিৰ্কিৰ মি:
পেৰিভল লোৱেল (Perival Lowell) এই মন্থলৈ
বিষয় লইয়া চমৎকাৰ এক আলোচনা কৰিয়াছেন। তিনি
সেইগুলিকে কাটান থাৰ-বিল প্ৰকৃতি বলিয়া মনে কৰেন।
এই মন্থলৈ থাৰ-বিললৈ মন্থলৈ গলিত বৰক বহন
কৰিয়া লইয়া যায়। তিনি সিদ্ধান্ত কৰিয়াছেন যে, মন্থলৈ
গ্ৰহে একগ্ৰকাৰ বৃত্তিমান মাতী আছে; তাহাৰা বাঁচিবাৰ
মত প্ৰাণপণ চেষ্টা কৰে। অতি কমতাশালী মন্থলৈ
সাহায্যে, অতি মন্থলৈ এবং মন্থলৈ আবহাৱাৰ ভিতৰ দিয়া
মন্থলৈ দেখিয়া অনেক এই সিদ্ধান্ত কৰিয়াছেন যে, মন্থলৈ
গ্ৰহৰ একগ্ৰকাৰ মন্থলৈ মন্থলৈ মন্থলৈ মন্থলৈ। আমাৰা
লোৱেলৰ মতবাৰ বাৰ দিব। প্ৰকৃত ঘটনাটি হইতেছে
এই যে, মন্থলৈ উপৰ একগ্ৰকাৰ আমাৰা দেখিতে পাই
এবং তাহাৰ কাৰণ সেখানকাৰ কতু-পৰিবৰ্তন। ইহাতে
মনে হয় যে সেখানে সাময়িক গাহপালা আছে।

মন্থলৈ এওঁ কম মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি অস্তিত্বৰে বেগ
দেখিয়া মনে হয় যে ইহাৰ বায়ুমণ্ডল অতিশয় অপৰিসৰ।

আমাৰা আল্ট্ৰা ভায়োলেট এবং ইনফ্ৰা ৰেডেৰ মন্থলৈ
চিৰ ভুলিয়াও এই গ্ৰহমাৰ পাৰ ইনফ্ৰা ৰেডেৰ মন্থলৈ-
গ্ৰাহিত মন্থলৈ গ্ৰহৰ উপৰিভাগেৰ মাৰগুলি মন্থলৈ দেখিতে
পাওয়া যায়। আমাৰা আল্ট্ৰা ভায়োলেট মন্থলৈ
উজ্জল মাৰগুলি মন্থলৈ দেখিতে পাওয়া যায় না। আল্ট্ৰা
ভায়োলেট আলোৰ ছবিগুলি ইনফ্ৰা ৰেড আলোৰ ছবি
হইতে বড়। এই দুটী আলোৰে পৃথীত ছবিগুলিৰ তুলনা
কৰিলে দেখা যায়, মন্থলৈ বায়ুমণ্ডলৰ পাতীৰতা ৪০
মাইলৰ কম নহে। পৃথিবীৰ ছবিৰ সহিত তুলনা কৰিলে
দেখা যায় যে, মন্থলৈ বায়ুমণ্ডলৰ চাপ পৃথিবীৰ বায়ু-
মণ্ডলৰ চাপেৰ কৰক মন্থলৈৰ মন্থলৈ হইবে না।

মন্থলৈ যে বায়ুমণ্ডল আছে তাহাৰ অন্তৰ্ভুক্ত গ্ৰহমাৰ
তাহাৰ মেঘৰ আৰুভগৎ। ইহাৰেৰ আৰুভগৎ দুটী প্ৰকাৰেৰ।
কতকগুলি আল্ট্ৰা ভায়োলেট মন্থলৈ দেখিতে পাই হয়;
কিছু ইনফ্ৰা ৰেড আলোৰে ইহাৰ দেখা পড়ে না। এই
মন্থলৈ মেঘ বায়ুমণ্ডলৰ উৰে এবং এওঁ অপৰিসৰ যে ইহাৰ
চিত্তৰ দিয়া ইনফ্ৰা ৰেড আলোৰ মন্থলৈ কৰিতে পারে।
আমাৰা অন্তৰ্ভুক্ত ইনফ্ৰা ৰেড আলোৰ মন্থলৈ
দেখা পড়ে, কিছু আল্ট্ৰা ভায়োলেট আলোৰে পড়ে না।
এইগুলি মন্থলৈ মন্থলৈ বায়ুমণ্ডল মন্থলৈ মন্থলৈ
দেখা। ইহাৰিকৈ একটী পাতীৰ বৰ্ণৰ বায়ুমণ্ডল
ভিত্তৰ দিয়া দেখা যায়।

মন্থলৈ গ্ৰহৰ বায়ুমণ্ডলে কাৰ্বন-ডায়া-অক্সাইড এবং
অক্সিজেন আছে কিনা, সে মন্থলৈ অনেক ভুলভাৱে
হইয়াছে। কিছু, এই বায়ুমণ্ডলে এই মন্থলৈৰ পৰিমাণ
আমাৰেৰ পৃথিবীৰ বায়ুমণ্ডলৰ এক মন্থলৈৰ কম।
সেখানে বায়ুমণ্ডলে মন্থলৈ বায়ুমণ্ডল মন্থলৈ আছে। কাৰণ
উজ্জল গ্ৰহৰ মন্থলৈৰে যে বৰক আছে, তাৰা পূৰ্ণই উজ্জল
হইয়াছে। লোৱেল মাধ্যমিকৰে একটী উজ্জল মন্থলৈ
এবং চক্ৰেৰ বৰ্ণালী পাতীকাৰ মন্থলৈ মন্থলৈৰেৰ মাৰ পাওয়া
গিয়াছে। এই পৰ্য্যবেক্ষণ কাৰণ অতি শুভ বায়ুমণ্ডল
মন্থলৈ কৰা হইয়াছিল। মন্থলৈ এওঁ মন্থলৈ মন্থলৈ উজ্জল
গ্ৰহমিত মন্থলৈৰ সহিত অস্তিত্বৰেৰ মাধ্যমিক হইয়াছে
বলিয়াই। সেইকৰ চক্ৰেৰ এই মন্থলৈ (gray) বৰ্ণ ইহাৰ

অক্সিডেনশ (unoxidised) পাহাড়ের স্তম্ভ। সেখানে সামান্য অক্সিডেন থাকিলেও থাকিতে পারে। মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডলের এই কৃষ্ণতার স্তম্ভ দাতী উহার দৈনিক তাপের তারতম্য। মঙ্গলের এই ক্ষীণ বায়ুমণ্ডল (সেখানে ৩মীঃ বায়ু খুব সামান্য আছে) উহাকে খুব ভাল করিয়া আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যাহ্নে কিছু-কিছু অকালে তাপ প্রায় ৫০° কাঃ উঠে। অপরান্ত্রে সূর্য অস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাপও তাড়াতাড়ি নামিতে আরম্ভ করে এবং সূর্য্যাস্তের পর এত অধিক ঠাণ্ডা পড়ে যে রাতে সেখানে তাপ ০° হইতে ১০° নীচে নামিয়া যায়। এইরূপ তাপ তারতম্যের মধ্যে জীবন ধারণ অতি কঠিন, সম্ভব নাই। সেখানে পশু এবং জীব বাস করিতে পারে কিনা সম্ভব! তথাপি ইহা স্মরণ করিয়া বলা যায় না যে সেখানকার আবহাওয়া অসুব্যবস্থা প্রাপ্তি কখনও জন্মিতে পারে না। মঙ্গল গ্রহে এখন আমরা তাহা বেশি সহস্র কোটি বৎসর পর পৃথিবীও এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। তখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অবশিষ্ট প্রায় কিছুই থাকিবে না।

এই ক্ষুদ্র অক্সিজেনে পৌর জগতের একমাত্র এই পৃথিবী ব্যতীত অস্ত্র কোথাও জীব বাস করে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গেল না; কেবল মাত্র মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ-জীবন সম্ভব বলিয়া আশা করা গেল। মঙ্গলগ্রহে জৈব-প্রাণ প্রায় ক্ষয়ের মুখে বলিয়াই মনে হয়। শুক্রে জৈব-জীবন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অস্ত্র কোথাও প্রাণী জগতের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

আজ্ঞা, অস্ত্র নক্ষত্রের যে পৌরজগৎ আছে, তাহাতে জীব বাস করে কি? অস্ত্র তারকারও গ্রহ আছে এবং তাহাদের উপস্থিতি কিরূপ? সমগ্রই গ্রহেলিকামর বলিয়া মনে হয়। ইহাে কোন স্ফেগেজেনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই সমস্ত গ্রহগুলির উপস্থিতি নিরীক্ষিতভাবে হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। কোটি সহস্র বৎসর পূর্বে একটি নক্ষত্র সূর্যের সমূহ সিদ্ধা বাইবার কালে, উক্ত নক্ষত্রের বায়ু তড়ানের কালে সূর্যের কিছু অংশ বাড়িয়া যায়। এই অংশ ক্রমাগত বাড়িতে বাড়িতে সূর্য হইতে পৃথক হইয়া ছুটিয়া আসে। ইত্যবসরে উক্ত তারকাটি

তাহার অন্তর মধ্যে সূর্যকে পিছনে রাখিয়াই চলিতে থাকে। সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন এই অগ্নিশিঙটিই কালক্রমে গ্রহে পরিণত হইয়াছে। তাৎকালের পরস্পর দূরত্ব এত বেশী যে, তাহারা কখনো একে অস্ত্রেব সম্মুখীন হয়। পূর্ণনা দ্বারা দেখা যায় যে, এইরূপ ঘটিতে প্রায় ৫০০০ লক্ষ বৎসর কাটিয়া যায়। ‘পৌর-জগৎ’ প্রমাণ সর্বত্রই নিয়ম নহে, বরং ইহা একটি ব্যতিক্রম। আমাদের সূর্য ছাড়া এমন কোন নক্ষত্র নাই তাহার ‘পৌর-জগৎ’ আছে।

যে কোন ‘পৌর-জগতে’ প্রাণী বর্তমান আছে,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা খুঁজিলকত বলিয়া মনে হয় না। যদি কোন গ্রহ উহার ‘সূর্যের’ অতি নিকটে থাকে, তাহা হইলে উহা অস্ত্রের সমন্বয় হইবে এবং অতি দূরে থাকিলে অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইবে। ইহাদের আয়তন যদি আবার পৃথিবী হইতে ছোট হয়, তবে উহার বায়ুমণ্ডল ধারণ করিতে অসমর্থ। অপরূপে ইহা যদি খুব বড় হয়, তবে ঐ গ্রহ হইতে হাইড্রোজেন চলিয়া গাশিতে পারিবে না। ফলে, তাহার বায়ুমণ্ডলে এ্যামোনিয়া, ম্যাগ-গ্যাস প্রভৃতি বিঘাত গ্যাসের বিধি অনিবার্য।

অনন্ত তারকারাবলীর মধ্যে আমরা অল্প সংখ্যক গ্রহ দেখিতে পাই এবং তাহাদের মধ্যে আবার অতি অল্প সংখ্যকই জীব বাসের উপযোগী। অপরূপে, সূর্যের অন্তরে বিঘ্ন আমাদের শ্রবণ রাখা উচিত। আমাদের পর্যবেক্ষণ নজি দ্বারা ইহা আমরা ১০০০ লক্ষ বিভিন্ন বিশ্ব মহাসূত্রে দেখিতে পাই। ইহা ব্যতীত আরও কত আছে, কে জানে? যদি এই সকল বিশ্বের প্রত্যেকটিতে দুই তিন জন নক্ষত্র তাহাদের গ্রহাবলী লইয়া অবস্থান করে, তবে গ্রহগুলির মোট সংখ্যাও অবলোকার্য বোধ্য নহে। যদি প্রতি দশ লক্ষ গ্রহের একটি মাত্র গ্রহে জীব বাস করে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তথাপি এতগুলি গ্রহ প্রাণী-অধ্যাক্ষিত যে তাহা হাতে তুলিয়া দেখ করা যায় না। আমাদের এই পৌর-জগতের পর্যবেক্ষণে মনে হয় যে, জীব বাস করার মত পৃথিবীর সংখ্যাও অল্প নহে। কাজেই, অস্ত্র আরও স্ফোটকে প্রাণীজগৎ আছে বলিয়াই মনে করা সমীচীন। সেই সমস্ত স্ফোটকে প্রাণী হইতে আমাদের পরিচিত প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একদম নিষ্কার ধর'। আমি সশীঘ্রের আবার সঙ্গে মিলিত হ'তে সংকেত করেছিলাম এই অস্ত্র। বন্ধু গুপ্তচর সবজ্ঞ। পালিত-পুত্রের একটা বন্ধু ছিল। এয়ার গান্। সে রকম অস্ত্র আবারের ছিল না। তার ছিল একটা খোড়া। তাও আবারের ছিল না। বাই হ'ক বৃদ্ধ বন্ধন অনিবার্য এবং বোধিত হয়ে গেছে, তখন কোন বীর তা' থেকে পলাতন হ'বে? বাইরের কেউ জানবেনা, তখনেনা, অথচ বৃদ্ধ হ'বে। ব্যবস্থাসহ্য ধার্য করা দিনে বীরগণ যে যার স্থির করা দিক নিয়ে বশাচনে অবতীর্ণ হ'ল। বন্ধুকের ববলে আবার করালাম গুপ্তচর ব্যবস্থা। বাংলা ইকুলের বাবেরকেলার আমি রইলাম গুপ্তচর নিয়ে। গলে করেবটি গোলন্দাজ বা "চিলন্দাজ"। বাংলা ইকুলের পেছনের আনবাগানে, পোটাকিসের দিকে এসিয়ে ছিল নিয়ে কতুয়নে গুপ্তচর রইল অর্থাৎ-লক্ষ্য তেহু। স্মরেন বলতে লাগল—"গুপ্তচর যার বড় যার, বন্ধুকের গুলি বরং ফাটতে পারে; কিন্তু গুপ্তচর বাটুল গিয়ে রগ কাটিয়ে দেবে নিশ্চিত।" ভরসার কথা "ভারত গুপ্তচর নিয়ে রাম বহুর্ভবের চেয়ে বেশী বীর্য দেবাতে পারত।" আরও ভরসার কথা, "জোপাচাৰের জীবের চেয়ে ছিল পরভারতের টাকী আরও ব্যালা।" খুব বুদ্ধে বল হেবার গুপ্তচর। এদন ত' হল। রণসরজার বা কোশলায়ক ব্যবস্থা ঠিক করা চাই। আর চাকুর্ভবের সঙ্গে সৈজদের সফালন, কোশলায়ক ব্যবস্থা এই হইল যে গুপ্তচর পাঠিয়ে ড-পক্ষের ঠাঁট, বাট, বিভাগ সাখ্যা, স্থিতি খেনে নিতে হ'বে। এবং আবারের পক্ষ থেকে প্রমথকে ডাকিয়ে নিয়েছে; তাকে আপনই ঠাঁই ছাড়া করতে হ'বে, ভাপান্তে হ'বে। কারণ সে এমিকে ছিল, এমিককার লড়াইয়ের করণা অনেকটা অবগত। সৈজ সফালনে রণ চাকুর্ভব হ'বে এই রকম, কিন্তু গোলন্দাজ গিয়ে পালিতের বাড়ীতে বাটির গোলা নিক্ষেপ করবে। তা হ'লে সে

উভয় হয়ে ভাড়াভাড়ি খেরিয়ে পড়বে। সে খেলপেই 'গোলন্দাজ'রা পালারার তান্ করবে। হুতরাং এদের বিপ্লব করার অস্ত্র নির্যম মত সৈজ বিভাগ না করেই গুলা ছুটে আসবে। তখন আবারের পক্ষ ছুটতে কোলার পাটিল টপকে শিঙনে গিয়েও আক্রমণ করবে। পথে আবার গোল পাড়া ক'রে ধুলোর বেঁয়া হাওরায় উড়িয়ে দিতে হ'বে। তাতে খোড়া ভয় পাবে এবং পালিত ভাল দেখাতে পাবে না। সেই সময় গুপ্তচর আবারে তাকে পরাভ করা যাবে, হয় সে শতে যাবে, নহত খোড়া নিয়ে পালিয়ে।

আলি বলে একটা আর পাগলা লোক ছিল। তাকে গুপ্তচর নিযুক্ত করা হল। কারণ কেউ তাকে সন্দেহ করবে না, সে সব দেখে শুনে এসে খবর দিল পালিতের বাড়ীতে তখন যা চলছে। গোলন্দাজেরা গিয়ে বশাচন বড় বড় বাটির ঢোলা তাদের বাড়ীতে ছুঁড়ে ধুলপং আওরায় ও ধূলা হাটী করল। গুপ্তচর আবেগ বেশ অনেক উঠেছে।

এমন সময় গ্রাং বৈগুণ্যে বড় গৃহবর্তা পালিত সাহেব খেরিয়ে এলেন। তাঁর এখনও বাড়ী থাকার কথা নয়, খোলা ভিনটে এই অস্ত্র সময় ধার্য করা হয়েছিল। তিনি কয়েকটি হোকরাকে এই রকম ইটী ছোড়া, ধূলা ও নোংরা করা দেখার রাগে লাভবুধ খিচিয়ে চিবকার করে উঠলেন—কেহ হুতরাগারা বাপীর সঙ্গে লাগতে এসেছিল? ইশবুর, চাকুর্ভব নিয়ে আর ত, হারাম-জাদাবের বা কতক লাগিয়ে দিই।

যাখার উপর এরূপ অলম্যাপিত বশাচাত দেখে "গোলন্দাজ"রা বা সৈজ অগ্রহুতরা টেনে লগা। বানিকটা এসে শিছু ফিরে দেখল ইশবুর চাকর বা তার মনিব শিছু হাওরা করেনি। তখন পাড়িয়ে "হেয়ে গেল, 'বাপী' পালিত; হেয়ে গেল," বলে চোটেতে লাগল।

এ রকম ভাবে লক্ষ্য দেওয়া কোন বীর সহ্যে পারে? প্রমথ ত' অলম্বিন গুলিকে দেখে, সে পাবল না। বলবল নিয়ে হাওরা করল। বাপীও পেছনের বহা দিবে খেরিয়ে বন্ধু হাতে খোড়-সোয়ার হ'য়ে

গড়ল। কাটু ফাটু দু-চারটে বন্ধুর আওরাজ পোনা গেল। কেজার পাঁচিলের মোড়ার আনধা বলে গুলির ব্যাড়া কাটিয়ে মিলায়। এখান থেকে দমাম্বু মাটির পোলা পথে গড়ে আওরাজ করতে লাগল। ইংরেজী মূল হয়ে পাঁচিল পার হয়ে শক্তের পেছন থেকেও মাটির পোলায় আক্রমণ করা হল। চতুর্দিক গুলোর মূলো হয়ে গেল। বাপী পালিস্তের খোড়া গেল শুভকে এবং তার নিজের চোখ গেল বলে ও গুলোর আপ্লা হয়ে। শুধুর গুলুটির পালার ভেতর হিসেব মত একত্রে দেওয়া হয়েছিল। মেরেনের কথা সত্যি হল। বন্ধুদের গুলি কতাল। কিন্তু বাটুল নির্ধাত বার মারল। বাপী পড়ে গিয়ে খোড়ার মাগামি বের পালাল। তেজুর একটা চিলে প্রবন্ধ মাথ; কাটল। তেজু চেঁচিয়ে উঠল—লাল। সবাই দেখল লাল। নিজেরদের মধ্যে মারামারি করে রক্তপাত এরা এর আগে দেখেনি। রক্তের দৃষ্টে উত্তর পক্ষ ছাড়ে গিয়ে যে যেদিকে পারল দৌড় দিল। সেদিন যুদ্ধ এই অবধি হয়ে ক্ষান্ত হইল।

সহরমত হুতুয়ে সন্ধি ভিকার প্রস্তাব এল। কাঁচা সন্ধি সেদিন হয়ে গেল। বাপী পালিস্ত তিনিমাথা, মূলবারি বিধুট সবাইকে খাইয়ে দিল। কাঁচা সন্ধি এই জন্ত যে বাপীর বাপ বুড়ে ভাগ নেবেন এই কথা শু ছিল না। সেজন্ত সন্ধি হলেও শান্তি আসছিল না। তারা মিটমাট করতে চাচ্ছিল, কিন্তু অধুই কি বলছে সেটা দেখার জন্য আর একটা খেলার ভাবে যুদ্ধের দরকার। উত্তর পক্ষ সম্মত হ'ল। আমরা হলান আফ্রিলা, এবং বাপীরা হল ইংরেজ। ওরাটগনের হাতার হল সে যুদ্ধ। ইংরেজ ভাড়া করার আফ্রিলা তাদের পার্বত্য কেজার আলার দিল। ইংরেজ সৈন্ত তাদের খেয়াও করে পরাস্ত করতে যত্ন করল। পাহাড়ের ওপর ও নিচে থেকে ঢেলা ও চাঁকবার চলেতে লাগল। বৈবক্রবে নিচেই ছোঁড়া একটা ইট ওপরের মারা আর একটা ইটে এগে ঠকাসু করে লাগল। যুদ্ধ সমানে সমানে মিটে গেল। অধুই ইমিত বোকা গেল কি না? এবার পাকা সন্ধি হয়ে গেল।

খেলাধরের ইংরেজ ও আফ্রিলাদের মিল হল যটে কিন্তু প্রকৃত ইংরেজ ও আফ্রিলা আনধ ও মিলতে পারে নি। মনের অভাব!

কি রকমে কে জানে এই সব যুদ্ধান্ত মনেন বাবুর কানে পৌছাল। তিনি আমাদের সবাইকে ভেবে হাসিমুখে পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে বললেন—বেশ খেলা বার কংহে, চমৎকার। বাঙ্গালীদের মাথার খুব ভারী বলকের ভাল। সে বলক কি কেউ বুঝ করতে পারবে? তোমাদের বেখে মনে হয় আমিও যেন অমনি হয়ে যাই। ভগবানের কাছে, যা বর্ষভীমার কাছে প্রার্থনা করি যেন তোমরা বাঙ্গালীর তীক অপবায়টা দূর করে দিতে পার। তোমাদের ভিত্তর বিয়ে যেন মজুন বাঙ্গালী গড়ে ওঠে। তারপর আওড়ালেন—

“শিতপ্রার বাঙ্গালী ভরিবে? পত্তপ্রার বাঙ্গালী ভরিবে? হেন শিত মধে বাঙ্গালীও, হেন পত্ত নাহি বাঙ্গালী।”

পারবে? পারবে এমনটা করতে তোমরা? আগেই বলেছি ১৮৭১-৮০ সালে বাবা হেলেনের লাঠি ও তলোয়ার খেলা খেলানয় বাববা করেছিলেন। ওতাদি বাড়ী এগে মিথিয়ে যেত। সে ছিল হিমু। তার সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে যায়। তার যুদ্ধ পিতার সঙ্গেও চেনা-শোনা হয়ে গেল। যুদ্ধ একদিন বলল—বাবুয়া, লড়াই হু'রকবে হয়। লাঠি তলোয়ারে, আর হয় বর্ষভটে। বর্ষভট করে Valoon কোম্পানীর মীলকরের অত্যাচার তারা দূর করেছিল। লোক সব বলবৎ হয়ে প্রতিজ্ঞা করল—লাহেব এ হাত কেটে ফেলে দাও; তবু এ হাতে আর মীল হুম্ব না। এবং তারা এই উপায়ে সকলকাম হয়েছিল। মহিলে ও অধিলে—ছুটি অস্ত্র আমরা আরোজননত যেন ব্যবহার করি—এই ছিল যুদ্ধের উপদেশের উদ্দেশ্য। বর্ষভট—বলে সকল হয় অর্থাৎ ভারে কাটে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমাদের বাড়ীতে যে সব আলোচনা হ'ত, তার থেকে কিছু লোকের নাম ও তাদের কীর্তি লম্বকে কিছু

কিছু আদি শিখেছিলাম। হু'জনের নাম আমাদের পুত্র
তাল লাগত। প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন সেশপুত্র নেতা
মুহম্মেদশাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেজ্রনাথ বক্ষ্যোশাখার।
দ্বিতীয় ব্যক্তি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। জিতেজ্রনাথের
সেশ, বিশেষের কর্তী-কথা আমায় জানেছিলাম। বিলাতে
থাকাকালে কালা-আদরি বলে তাঁকে দ্বিগুণ ও তৃণ
করার প্রতিশোধ তিনি বেতাবে নিয়েছিলেন তা'
স্বপ্নীয়। পুষোপুবিতে উচ্চত শেতাঙ্ক বুৎকবের বরাশায়ী
ও কবাপ্রায়ী করে ছাড়তেন। সাহসী, বীর বলে তাঁর
খ্যাতি ওদেশে খুব রটে। দেশে কিরে এসে উচ্চত
শেতাঙ্কবের তিনি দুইবুড়ে বিশেষ শিক্ষা নিয়ে ছাড়তেন।
কলকাতার ভালভলা বা বোবাঝার এলাকায় নীচশ্রেণীর
শেতাঙ্কবের দুর্দান্তপনার লোকজন অভিষ্ট হয়ে উঠত।
যানে যানে চলাফেরা করতে তার পৈত। থাকে তাকে
হরে তারা মারত। কালা আদরি যেন তারের হাত-
সাকাইয়ের মাল ছিল। এক স্টপাত ঘিরে চলা গায়
ছিল। সামনে গড়লে বুটের ঠোঁড়র যা হড়ির আঘাতে
তারের পথ ভাঙতে ছুঁত করা হত। জিতেজ্রনাথ এর
সম্রাট প্রতিকার করে সবর বক্তবাহারী হয়েছিলেন।
আমাদের কাছে তিনি হয়ে দাঁড়ালেন উপাত্ত বীর।
নেপোলিয়নের ত কথাই নাই। সর্বাঙ্গী-সম্রাট অধিতীর
সেনা-নাথক ত ছিলেনই, তা'হাফা তাঁর মনের স্রুত্বার
বুড়ির পরিচায়ক অনেক গল্প আমাদের আরও বিশেষ করে
অভিতুত করেছিল। কথিত আছে কোন এক বন্দী
ইংরেজ বুৎক পৈত ব্রাণের বন্দীখালা থেকে পালাজিল,
পথে সে ধরা পড়ে। বিচার যখন হয়, সে বলে যে তার
মাকে বেষবার ভক্ত সে এত অধার হয়ে উঠেছিল যে তার
পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা অসম্ভব হওয়ায় সে এই অগ্নির
কাণ্ড করে কেলে। নেপোলিয়নের কাছে এই রিপোর্ট
পৌছালে তিনি তাকে মুক্ত করে বিলাতে চলে যেতে
সেন। নেপুলনের গল্পও বেশ লাগিত। নেপুলন ইংরেজের
দুইয়ের আহাওয়ার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সবচেয়ে ভাল
লোগেছিল তার সেই বুকায়ীন কথা'টি—ইংলণ্ড তার
প্রত্যেক সন্ধানের কাছে তার প্রতি কণ্ঠ্য আশা করে।

আমার বাবা ওকালতী করতেন। সমুদ্রের ধারে বা
বড় নদীর ধারে নদীর ভাল থাকবে বলে তদমলুকে
আসেন। পরে মেদিনীপুর চলে যান। বাড়ীর বাহির
মহলে আমি অনেক কিছু গুনতাম। অন্যর মহলেও
শিক্ষা কম হ'ত না। বাহির মহলে শিতা ও তাঁর বন্ধুদের
কথোপকথনের টুকরো টুকরা সংগ্রহ করতে পারতাম।
অন্যর মহলে বেনীটা পাওয়া যেত মারের কাছে। আর
খামিকটা পেতাম আমায় বয়স জ্ঞাতা ও শিতার কথোপ-
কথন থেকে। এঁদের আলোচনার যোগ দেবার বয়স
তখনও আমার হয়নি। এই তাইটি অনেক ভাবা
জানতেন, কামালী, কামালী, ক্যাটিন, ইংরেজী, সংস্কৃত,
বৈদিকী, হিন্দি। আমি ছিলাম সত্যাপন: বদ-ভাবী,
দীর্ঘ, লাজুক। যা করার একবারে কাজে করে দেওয়ার
ধাত। কোন কিছু করতে হ'লে দীর্ঘ বিচারের পর
কর্তব্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু একবার সিদ্ধান্তে এসে পৌছালে
বিদ্যাপ্রবেশে সৌী কাজে করে মেলা চাই। চটপট বিচার
এবং তড়িৎ বড়িতে কাজ করে বলা আমার হাতের
বিশদীত।

মায়ের কাছে মায়ের নাম বেনী গুনতাম বা বেনী
মায়ের বিষয়ে আলোচনা গুনতাম, বিশেষ করে তাঁদের
নাম হচ্ছে—বিজ্ঞানাগর, রাধকৃষ্ণ, পরমহংস, বহিমজ্ঞ,
হুগিৎ বুৎক। মায়ের কাছে থেকে এঁদের বৈশিষ্ট্যের
লগ্নে পরিচিত হয়েছিলাম। মায়ার সাগর বিজ্ঞানাগর ও
মোলায়ের জুহরের মাতব ছিলেন না। তিনি তারী আখ-
মদীয়া সম্পন্ন লোক ছিলেন। নিজের জাতীর রুগ্ন বা
সংকুচিত্তে বিশেষ প্রজ্ঞাবান। একবার লাট সাহেবের
মিষ্ণুপে যান। পায়ে স্তম্ভলার-চট্ট ও গায়ে চামর।
আমি নাই দেখে মরবারী পোষাকের লোকদের সাগর
অভিগমনে বাগতকারী ক'রতারা এঁকে ভিতরে যেতে
বের নাই। ইনিও নিজ জাতীর পোষাকের ইচ্ছা রকায়
নাছোড়বান্দা। মরবার অগ্রাহ করে চলে আসেন।
সকলে সমান। বিজ্ঞানাগর অসুপস্থিত দেখে খোঁজ
পড়ল। লাট অসুস্থান করেন এবং ব্যাপারটা খেলে
বিজ্ঞানাগর মরবারের কাছে হুঃ প্রকাশ করেন। লাটের

প্রয়োজনে যেতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু পরজ তাঁর নয়। তাঁর ঐ বেশকে সম্মান না দেখালে তিনি ওদিক মারাত্মক নয়। অবশেষে কন্যারী পোষাক ত্যাগ করিবার হইল না। মাতৃহত্যা পরাক্রান্তি তিনি দেখিয়েছেন। তাঁর দেশ ছিল বেলগির। কার্য করতেন কলকাতায়। যা ডেকেছেন, বিজ্ঞানগত মহাশয় রতন হলে। পথে পেলেন বস্ত্রাঘাত ওপার ভাঙ্গা বাহোদর। মারি নৌকায় খোঁজা দিতে তবু অস্বীকার করল। বিজ্ঞানগত মহাশয় মারের ডাক কেমনে অপারক। সীতায় পার হলেন। বলা বাহুল্য পানোপ্যের এই ভাষাটায় কুণ্ডীর উৎপাত গ্রন্থি। মাতৃ-আত্মা পালনে তিনি বেশরোজ। যা পরমহংস বলে আখ্যাত করতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ বেবকে। এমনভাবে তাঁর কথা কইতেন যে আবার মনে হত পরমহংস দেব বোধ হয় আমাদের কেউ আত্মীয় হবেন। দুঃখের সমাধি। মামুষ মামুষকে যেমন দেখে তেমনি তিনি তপস্বিনকে দেখতে পেতেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইতেন। তপস্বিনকে যা বলে ভাবতেন। পরমহংস কি করতেন না করতেন সেটা বস্তা না আবার মনে বসেছিল তাঁর চাইতে বেশী বল—যা মন পানোপ্য হন, এই ভাবটা। হুখে কিছু বলতাম না, কিন্তু মনে মনে ভাবতাম মারের সামনে কোন দেবতা, উৎসাহ নাই। সব যা এক, এক মারের তিতর সব যা হয়েছেন। যা কাহারো মরে না, মরতে পারেনা, না চিরজীব, সর্বত্র বিরাজমান। যাতে যাতে আবার হুখে হত যদি আমি আর হু-এক বছর আগে অশ্রুতাম তারলে হুস্ত পরমহংস বেবকে দেখতে পেতাম। এরকম একটি অদ্বুত লোককে দেখার ভাষা সাধ। কিন্তু সে সাধ স্টোনার উপায় ছিল না।

যা বলতেন—যারা পৃথিবীতে এখনকার ব্যাপার নিয়ে বড় হয়েছেন তাদের লোকে ভুলে যায়। আর তারা এখনে থেকেও মনের হাফো বড় হয়েছেন তারা অর্থ হয়ে থাকে।

নেপালিয়ন, নেপালকে লোকে ভুলে গেছে। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, বীণা, মহাদেব এদের লোকে ভুলেছে না, রোজ শ্রবণ করে। বলা বাহুল্য বাবার কাছে নেপালিয়ন, নেপালনের কীর্তি-কাহিনী শুনেছিলেন।

বহিঃকল্প কত কি গল্পের বই লিখে লোকের কাছে খুব প্রিয়। কিন্তু আনন্দময় ও দেবী চৌধুরী তাঁর অপরূপ সৃষ্টি। মারের অস্ত্র শোনা গল্প থেকে নিজের মত গড়ে উঠেছিল। তিনি বলতেন বেশীর ভাগ লোকের বেশী হুখে। কথাকথা লোকের অতিরিক্ত হুখ। সমাজের এটা ভাল না, হওয়া উচিত বেশীর ভাগ লোকের বেশী হুখ। কথাকথা লোকের সবচেয়ে কমেও কথ হুখে। সে অবস্থা আনতে গেলে তাহলে হবে—কি করতে হবে? কে সে কাজ করবে? আর কি করে ভা কথ যাবে? যদি চাইলে সে রকম ভাষা তেবেলিখে রেখে গেলেন। বসেবাসের বসন উনি মূলতঃ হয়েছেন তখন দেখে তাঁর কথাই একদিন বাটবে। আমি এই কথা কইটি অমূল্য রতনের মত অস্ত্রের মণিকোঠায় ভুলে রেখে দিয়েছিলাম।

হরিশ মুখোপাধ্যায়। বাংলার উৎপীড়িত, অকথা ভাবে লালিত প্রজারা মীলকর কোম্পানীর বিরুদ্ধে যখন সর্ববিপণ করে বিরোধ করে তখন বাংলা মারের এই কৃতি সুলভান তাদের পক্ষ অবলম্বন করে ষড়্ভিঃয়েছিলেন। তখনকার ভাষার অকথার একমাত্র আলো ছিলেন ইনি। তাঁর সঙ্গে ছিল লং সাহেব। এঁর অকাল মৃত্যুতে প্রজারা আকুলোষ করে গিয়েছিল—“অলমরে হরিশ ম’লো, লংয়ের হ’ল কাহালা।” লাহো, অবিচার, উৎপীড়ন ভোগ করে মুখোপাধ্যায় আশার আশার থেকে যখন লাহা বাসে। যা রাষ্ট্রের নিকট সুবিচার পাওয়া যায় তখন লাহা ও রাষ্ট্রের লোকের অস্বনিহিত শক্তিই বিচারের তার নিজের হাতে ভুলে নেয়। এটা প্রকৃতির দিহা। বহিঃকল্প পরিচরনা, হরিশের কর্মপদ্ধতি দেখিন অপেক্ষাকৃত ছোট রচনাকে যে রাষ্ট্রের অভিনয় দেখিয়ে গেল তাই যে প্রায় বছর কৃষ্ণ গ্রন্থ বাবে ভারতের বিশাল রচনাকে কাহা গ্রন্থ করবে কে দেখা তেনেছিল? যা বুঝিয়েছিলেন—উৎপীড়করা শুভটা শত্রু নয়, বস্তা উৎপীড়িতরা নিজেরা নিজেদের শত্রু। নিজেদের মধ্যে যে লোকেরা উৎপীড়িতের নিকট-শত্রু গাছকে উৎপাত করতে আসে এবং বধ্যপথে নিজেদের দিন কিনে মেরে তারাই উন্নতির পরম শত্রু। শুভারক শক্তিকে তারা কাণ

ও দুর্বল করে এবং বিপদের সঙ্গে বেহাওয়ার মত যোগ দেয়। অত্যাধের সঙ্গে কোনরূপ রক্তা, আশোষের একবম বিহীন ছিলেন না।

দুর্গত, দলিত, দরিদ্র, আতুর, কাতর, পীড়িতের প্রতি তাঁর অকল্প্য ও সহানুভূতির সীমা ছিল না, চিত্তের প্রসার, বহু ও ব্যস্ততার দিকে তাঁর পূর্ব লক্ষ্য থাকত। পরকে সহজভাবে আপনায় করে নেওয়ার তিনি পূর্ব কুশলী

ছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েদের সাহায্য নিয়ে গোপনে বিপন্নদের সেবা শুশ্রূষা পূর্ব করতেন। অর্থ কাছাকাছি সঙ্গে আসেনি, কাছাকাছি সঙ্গে যাবেনা, একে সংভাব্যে ব্যয় করে বাওরার অর্থ-সম্পদ হওরার সার্বিকতা। তিনি বলতেন, হুঃ, হারিয়েছো মহিমা যুক্ততে পাখা, দুর্গতের, দুর্গতের দুকাবিল করা, বৈধের বহু দরদর কব: ব্যয় তার কর্ম নয়। বিলু চাই। (ক্রমঃ)

হোমায়ি

শ্রীমৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(হুড়ি)

কুলের অধিকার সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সে যেখিত পাইল তাহার কথামত কুলের ভিনশো ছেলে তাহাকে বিদায় দিবার অস্ত্র বিশেষে তাহারই আসার প্রতীক্ষা করিতেছি। কয়েক পদ চোখের সরেই ব্যাঙ্গল বেদনার দৃষ্টি তাহারই সর্ব অবস্থার দিকে নিবন্ধ হইয়া আছে। এক বুদ্ধের তাহার কুণ্ডের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত আত্মীয়বিশেষের অসহায় বেদনার পীড়িত হইয়া উঠিল। তবে সঙ্গে চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল। এ জল হাত দিয়া মুছিবার উপায় নাই। উহাদের দৃষ্টিতে পড়িবেই। সে জল মুছিবার অস্ত্র হাত তুলিয়া আবার নামাইয়া লইল। পড়ুক, উহাদের অস্ত্র যে জল পড়িতেছে তাহা উহাদের সামনেই এখানকার মাটিতে করিয়া পড়ুক। এই সামান্য দুর্বলতার কাহিনী তাহার জীবনে অন্ধর স্বাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

যে বার বার তাবিল ইহারা তাহার কে? অন্যায়, পর—তাহা ছাড়া আর কিছু নয়। তবু ইহাদের অস্ত্র এমন করিয়া চোখে জল আসে কেন? ছোট বেলার অকারণে চোখে জল আসিয়া পড়িত। এই দীর্ঘ দিনের ভিল ভিল চোখের তাহাকে সে অস্ত্র করিয়াছে বলিয়া

কল্পনা করিয়াছিল। তবু আজ জল আসিতেছে। সে যখন এখানে পড়িতে আসিয়াছিল, পড়িতে আসিয়া যখন আইন-অমাত্র আকোলনে যোগ দিয়াছিল তখনও এমনি করিয়া চোখে জল আসিত। আজ কি সেই প্রাচীন পরিবেশের মধ্যে পড়িয়া আবার তখনকার দিনের প্রাচীন অল্পভূক্তিগুলি আগ্রস্ত হইতেছে? কিন্তু তাহাও নয় তো? সে তো এখানে ঘাটরাট ছদ্মবেশে আপনায় কাজ করিতে আসিয়াছিল। আসিবার পূর্বে অত্যন্ত ব্যবহারিক চিন্তাই করিয়াছিল, এখানে আসিয়া ব্যবহারিক কর্মে ও হাটিতে আপনায় কাজ করিয়া চলিয়াছে। কোনো বন্ধনকে তাহার তো আনিলে তাহার তো চলিবে না! সে তো মানেও নাই! আপনায় কাজের অস্ত্র বতহুঁকু করা বরকার তাহারই করিয়াছে। এই ছাত্রগুলির মধ্যে সে তো ভেজ ও শক্তিকে আগ্রস্ত করিবার অস্ত্র আনিয়াছিল। তাহাও সমাপ্ত হইয়াছে। তবে? সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল উহাদের অস্ত্রের ভেজ ও শক্তিকে আগ্রস্ত করিতে গিয়া কবে তাহার নিজের মনেও প্রেম, একান্ত ব্যক্তিগত ভালবাসা, আগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের সমস্ত বন্ধন ছেদন করিতে গিয়া সে নিজেকে নতুন বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে।

সে মাঝার উপর তাকাইয়া বেলিল দুপুরের সূর্যের অকল্প্য আলোতে মাটির উপরটা বেন পড়িয়া বাইতেছে। আর সেই তীব্র রৌদ্রালোককে উপেক্ষা করিয়া এই ছেলেগুলি বতকণ হইতে তাহারই অস্ত্র বাড়াইয়া আছে।

তাহার চোখের জল করিয়া পড়িল সকলের সানন্দেই। তাহাদের দিকে তাকাইয়ঃ দেখিল আট বশ হইতে সত্যতো, আটতো, উনিশ পর্য্যন্ত বয়সের ছেলেরা সকলে ভীড় করিয়া গাড়াইয়া আছে।

সেই বীরে দীর্ঘাঃ স্কুলের বড় দিড়ির তিনটা বাপ অতিক্রম করিয়া গিয়া একটু উপরে গাড়াইল যেন তাহাকে সকলে দেখিতে পারে। অন্ধদের বড় জানালা দিয়া দাঁটারেয়া বিভিন্ন-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ছেলেরাও তাহার দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছে। সে আপনাদের মনকে চূড় ও ভড়িত কর্ত্তকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—তোমরা সব আমার ছোটো ভাইয়ের মত। আমি আজকে আমার সেই ভাইয়ের স্কোটে চলে যাব। তোমরা তার সঙ্গে যাই হুঃ কর তবে আমিও বড় হুঃ পাব। আমি তোমাদের যেমনটি তৈরী করতে চেষ্টালাব, তেমনি করছি। তোমাদের দারিদ্র্যের তার তোমরা নিজের হাতে পেয়েছ। এ দারিদ্র্যকে যেন কোন দিন তোমরা অপব্যবহার করে নিজের এং আনার অদ্বান ক'রো না। তোমরা নিজের স্বর্গ্যপার প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, সে স্বর্গ্যপার সন্ধান রেখে তোমরা। আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি তোমাদের সংবাস পাব। যদি শুনি, তোমরা নিজের অস্বর্গ্যা করেছ, এই দারিদ্র্যকে স্ক্র করেছ কি দারিদ্র্যে তা' হ'লে বৃহাভূলা হুঃ পাব। আর তোমরা আজ স্বগ্রন্থিত হয়ে যেন যেন ভেব না—তোমাদের কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল। যেন যেন—তোমাদের সন্ত্যিকারের কাজ আজ থেকে আরম্ভ হ'ল। এইবার থেকে যে স্বর্গ্যালা পেয়েছ তার উপভুক্ত করে তিলে তিলে নিজেকে তৈরী ক'রো। কাটকে বসে দিতে হবে না, নিজেকে দেখতে পায়ে তোমাদের অনন্ত কর্ত্তব্যে সাধনে পড়ে হয়েয়ে। চূড় বুদ্ধি শক্ত বেকবত্ত, কষ্টনি সাহস নিয়ে আগুনিই ভবন তার মধ্যে বেতে পারবে। সংগারে কারও উপর নির্ভর করলে তোমাদের চলেবে না। নির্ভর করতে হবে কেবল নিজের ওপর। আর একটা কথা বলে যাই। তোমরা স্কুলের ছাত্র। দাঁটারদাঁটারের সঙ্গে তোমার লক্ষ

বিশ্বাসের, বন্ধুত্বের, সহযোগিতার। তাঁরা পরম সন্মানের পাত্র। তাঁদের যদি কোনো দিন অদ্বান ক'রো সে তোমার নিজের অদ্বান করা হবে যেন রেখে।

সে বলিতে বলিতে অকস্মাৎ বাসিল। দেখিল ছেলেগুলি তাহার দৃশ্যের দিকে চাহিয়া তাহার কথা তনিত্তেছে। কিছু দৃশ্যের তীর্থ আসলে তাহাদের চোখ ধাঁধিয়া তাহাদের বড় কই হইতেছে। তাহার বলা বড় হইয়া গেল। তাহার চোখ বার বার জলে করিয়া গেল। সে নিজেকে তীর্থ বিজ্ঞারে বিভক্ত করিল। সে করিতেছে কি? সে চলিয়া যাইবে, তাই বলা সবারোহ করিয়া বক্তৃতা দিতে বলিরাছে? সে কে বাহার জ্ঞ এই কটি কটি ছেলেগুলিকে সে এমনই করিয়া দাক্ত হোত্রের তাপে পোতাইতেছে? সে কি টাকার এক আনা করিয়া বাহিনা কহাইয়া উপকার করিরাছে বলিয়া? কেন সে এমন করিবে? এই যে কটি কটি কোমল যুগগুলি হোত্রের স্রোতে তকাইয়া তপ্ত ও স্রিষ্ট হইয়া উঠিতেছে তাহার জীবনে সে এমন কি অর্জন করিরাছে বাহার দুল্যে ইহা জ্ঞ করিতে পারে? এযাং আবার চোখে জল আসিল— নিজের উপর অভিমানে।

সে বয়সখণ্ডেই তাহার কথা শেষ করিয়া তাহাদের পথিত নিরহকার দৃষ্টি সন্মুখ হইতে নিজেকে লুপ্ত করিবার জ্ঞাই তাকাতাড়ি নাহিয়া চলিয়া গেল।

যে আসিয়া সে অনেকক্ষণ চূপ করিয়া শুইয়া থাকিল। তারপর উঠিয়া আসিয়া জিনিষপত্র গুহাইতে বলিল। জিনিষপত্র আর কি। পোটা তিনেক পছরের জামা, খাম পাঁচেক ধুতি, তাহার দুইখানা জামপার জামপার হিঁড়িয়াছে। দুইটা গেলী আর দুইটা বিছানার চামর। ব্যাগ। জিনিষের মধ্যে এক ডাণি বই। সে একে একে সব তকাইয়া একটা পোটালা বাহিনা ফেলিল। কিছুক্ষণ পর ভূপাল আসিয়া গাড়াইতেই সে বলিল— আমি ভাল সকালে যাব ভূপাল। তুমি আমার এই জিনিষগুলো আজকেই অংশনে পাঠিয়ে দাও। তা হ'লে আমি বাসি হাতে যেতে পারব, কেনন?

তারপর বাসি জৌকির উপর একখানা বই হাতে

লইয়া বলিল। বহুবিনের বিদ্রুত এক লাইন গান তাহার অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল। বীণা পূর্ব ভালবাসিত আর অনুবর্ত্ত পাহিত। তাহাকে তাহারই অস্ত বাহ্য বার সে বিরক্ত করিত। কিন্তু ছাত্র ছিলোবে এখানে থাকিতে যাবার তাহারই কলঙ্ক। সে ভজন করিত—“বে কথা ঘন অন্তরে আনিছ তুমি টানি, আনিয়া কোন বন্ধুর তাহারে দিব বাণী।” সে কি লাইন ছুইটা ভজন করিতে করিতে আকাশের দিকে চাইল। সে কোন্ কথা সে তো আতঙ্ক আনিতে পারে নাই। কোন্ কথাকে সে কেমন করিয়া রূপ দিবে? গান বন্ধ হইয়া গেল। শুধু পুত্ৰ হইতে মৌনস্রাবিত আকাশের অনন্ত নীলিমার দিকে পূন্য বৃষ্টিতে চাহিয়া বসিল।

চিরকাল পর সে বর হইতে বাহির হইল। যেদিন চক্রবাসু শুইয়া আছেন। সে বীরে বীরে তাহার কাছে গিয়া তাহার হাতে খানে বন্ধ একখানা চিঠি বিল, বলিল—আমি চলে গেলে আপনি পড়বেন।

সে চক্রবাসুকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

চক্রবাসু কোতুলক সন্ধান করিতে পারিলেন না। অশোক পড়ে কি এমন লিখিয়াছে বাহা সে থাকিতে পড়া চলিবে না। তিনি খামখানা ছিঁড়িয়া পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। অশোক লিখিয়াছে—
*প্রিয়পেশু,

আমার প্রণাম লইবেন। বন্ধ হইয়া এক বাবা ছাড়া আর কাহারও মনকে প্রীতরূপ বলিয়া বন্ধন করিতে পারি নাই। সে বাহুব বুঝিয়া পাই নাই। সে হরতো আমারই দুর্ভাগ্য। সে বাহুব আরও অনেক আছেন বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি। বাক—বাবার পর এই আপনাকে সম্বন্ধে প্রণাম নিবেদন করিবার সৌভাগ্য পাইলাম। প্রণাম করিয়াই বিদায় লইতেছি।

আমি যখন এখানে পড়িতে আসি, বাবা আমাকে আপনায় হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। আপনিও শিশুসেবে ও পিতার উদার কঠোরতার আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি আমার শিশুত্ব। আপনার

কাছে অনেক পাইয়াছি। তাহার অস্ত আত্ম বণ বীকারের প্রয়োজন দেখিয়া সে বণ শোধ করিবার কল্পনাও করিনা। আপনায় কাছে কইই থাকিয়া গেলাম। আমার সমস্ত জীবনে আপনাকে স্মরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে বণকেও প্রদায় সঙ্গে স্মরণ করিব।

আমি যে অস্ত এখানে আসিয়াছিলাম তাহা বস্তুটা পারিলাম। বাকীটা ছেলেনের হাতে থাকিল। তাহার অবশিষ্টটুকু থাকিল আপনায় হাতে। আপনি তাহাধের আমার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসেন, আমি জানি। তবু বাইবার সময় বলিয়া যাঁই তাহাদের তার তাহাদের উপর থাকিলেও সে তার তাহারা রক্ষা করিয়া চলিতেছে কিনা তাহা দেখিবার তার একান্তভাবে আপনায় উপরেই রহিল। তাহারা যেন একমিকে আপনায় অবিকারের ক্ষেত্র লঙ্ঘন করিয়া গিয়া অন্যায় না করে বা অপর দিকে যেন তাহাদের অবিকারের গভী সঙ্কীর্ণিত বা অবিকার ব্যাহত না হয়।

আমি বুঝিয়াছি তাহাদের কঠি মনে দুর্ভর সাহসও শক্তি তাকার আছে, তরুণ পায়ে দত্ত পতি তত্ত চূড়তা আছে। সেই সাহস ও বীর্যকে জাগ্রত এবং পতিতে ছন্ডিত করিবার তার অস্ত একান্ত করিয়াই আপনায়।

আমি ইতিহাসের চাত্র ছিলাম, আপনাদের কলে ইতিহাসের শিক্ষক ছিলাম। তাই আমার বক্তব্যটুকু ইতিহাসের কথা দিয়াই বলি। আমার সুবিধা হইবে। আপাতদৃষ্টিতে ইতিহাসকে মনে হয় কতকগুলো বিজির কাহিনীর সমাবেশ। কিন্তু আসলে ইতিহাসের প্রাণবন্ত অস্ত। আজিকাল থেকে সমস্ত পৃথিবী দিয়া প্রাণশক্তি বারবার আপনাকে সঙ্কল্পম উপরে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। তাহার উদ্বেগ প্রেতম আত্মবিকাশ। ইতিহাস সেই প্রাণশক্তির ধারাবাহিক আত্মবিকাশ চেষ্টার কাহিনী।

জীবজগতে একদল শক্তিম্যান, অস্তদল অপেক্ষাকৃত দুর্বল। সেই প্রাণশক্তির গুঢ় তাড়নায় দীর্ঘ শক্তিমানেয় অস্তকে পোষণে, দুর্বলের দলদের বিরুদ্ধে বিজিতে বার বার একটিল হইতেছে। যে নিরন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেও

অতিশয় বটনের মত। দিবাগ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেই বট বটন, সূক্ষ্ম ক্ষেত্রের কথা ইতিহাসের অসুখোক্তনে বলা পড়ে না। বলা পড়ে তার যেটা। স্মৃতি প্রকাশগুলি। সেই প্রকাশের অস্ত্রে প্রাণশক্তি আপনার সহজাত বুদ্ধি বলে সেই বিশেষ সন্ধ্যাপেক্ষা সহজ প্রাণ্য রূপটি বাহিয়া লয়।

এতদিন ধরিয়া আপনার এই শিকারতনের ক্ষুদ্র পরিবারে যে বন্দ, যে বিবোধ, যে আঘাত ও প্রতিঘাত বার বার প্রকটিত হইল তাহার মধ্যেও সেই প্রকাশেরই কথা। এই দুইয়ের ইতিহাস ও সেই আত্মপ্রকাশের ইতিহাস।

তবে ইতিহাসে একটা কথা উচ্চ রাখিরাছে। আমি অস্বস্তি: বিশ্বাস করি যে এই সংগ্রাম সাধায়া এবং পরিণামে, কি বৃহত্তর কি ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে দিন দিন কমিয়া আসিবে। ব্যক্তিগত বা অবিদ্যায় ও হৃদয়ের পরিবর্তে প্রেম ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সে আপনারকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিবে। অস্বাভাবী হিংসা পত-সামন্য যে বুদ্ধির প্রেরণার সংবন্ধ হইয়াছিল সেই বুদ্ধিই তাহাকে এই পথে লইয়া যাইবে।

সত কিছুকাল হইতে এই সুলভির ক্ষুদ্র পরিবারে বাহা বার বার ঘটিল, শেষে ছাত্রেরা অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহাও ঐ সীতিরই পুনরাবৃত্তি। আপনি তাহাদের সেই শক্তিকে আত্মপ্রকাশের সহজতম পথে বিকশিত হইতে সাহায্য করুন।

ইহার প্রয়োজন কি—এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রশ্নের কথা এ প্রয়োজনের কোন কারণ নাই। এ প্রকাশের জন্য সাহায্য করার বহিঃকোন কারণ থাকে তাহা জাতির মুক্তির জন্য, সর্বমানবের মুক্তির জন্য।

এখানে বধন আদিরাহিণীর তখন বনে বিধা ছিল, বন ছিল। আজ বধন কিরিয়া বাইতেছি তখন অশেষ আপা ও প্রচুর আত্মবিদ্যায় লইয়া কিরিয়া বাইতেছি। ইহা পাইয়াছি ছাত্রদের মধ্য হইতেই। আপনি দেখিবেন বাহ্যতে তাহাদের এই বিকশিত সূলের মত স্তম্ভ ও কঠিন রূপটি রূপ না হয়।

আর কি বলিব! আমার প্রশ্নের লইবেন ও আমাকে আশীর্বাদ করিবেন। ইতি

প্রণত

অখোঁকনাথ সেন

সন্ধ্যাহু চিঠিখানা পড়া শেষ করিলেন। পড়িতে পড়িতে বার বার চোখ জাপলা হইয়া আসিল, শরীর অস্বস্তি অস্বস্তিতে বার বার হোঁচকিত হইয়া উঠিল। তাঁহার জীবনে আর কি আছে? ঐ ছাত্রেরা ছাত্রেরা আর আত্মপ্রকাশের কোন ক্ষেত্র নাই তো! উহাদের মধ্যায়া সাহেল ও শক্তির ভিত্তর মিলাই তো তাঁহার আত্ম-প্রকাশ ঘটবে। তাহাদের সাহায্য না করিয়া তিনি বাঁচিবেন কেমন করিয়া?

তিনি একটা নিবাস কেলিয়া চিঠিখানা লম্বা বাজে রাখিয়া দিলেন।

ক্রমে লম্বা হইল, আলো জ্বলিল, ছেলেরা পড়িতে বসিল, বাহিরে অন্ধকার বন হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাহু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। খাবার বটা পড়িল, নিশ্চেষ্টে বাইয়া আসিলেন। তারপর আলো কনাইয়া তইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যাহু তাবিলেন—পাশের ঘরে অপেক্ষা লুপ্ত চৌকিতে তাঁহার যেওরা একটা বাজুরের উপর স্নানার্থ ঢাকা বিরা নিশ্চিৎ হইয়া ঘুমাইতেছে। এতক্ষণ ঘোর হয় সে তাহার ভাবী কর্মের কোন স্বপ্ন দেখিতেছে। ঘোর হয় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সন্দের ঘোরে হাসিতেছে। তাহার ঘরে একটা লম্বা পথ হইল। ঘোর হয় অপেক্ষা পাশ কিরিয়া তইল।

আজ তাঁহার স্বপ্ন কোথায় গীন হইয়া গিয়াছে। দাঁক। ছেলেরা আছে। রাণি রাণি কচি সূলের মত সুখ। তাহাদের কথা, তাহাদের কীর্তি, তাহাদের ক্রোধ, তাহাদের হাসি।—তাঁহার সুখ আসিতেছে। তবু ছেলেরা হাসিতেছে, তাহাদের হাসিতে গোটা-তুলটাও হাসিতেছে বেম।

“নাট্যের মশাই!” “নাট্যের মশাই!”

কে ডাকিতেছে? তিনি বদকড় করিয়া বিছানার উঠিয়া বসিলেন। কে ডাকিতেছে—“নাট্যের মশাই!”

তিনি ভাল করিয়া শুনিলেন। সত্যই কে ডাকিতেছে। তিনি ভাড়াভাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। অর্ধবহু অঙ্ককারের মধ্যেই দেখিলেন অশোক ঝাড়াইয়া, আনা কাণ্ড পরিয়া, পাশটা পাট করিয়া অভ্যস্ত। সে কি বাইবার অস্ত্র প্রস্তুত হইয়া বাহির হইল ?

তিনি ভিজ্ঞান করিলেন—কুনি কি এখনই বাবে নাকি ? এখনও তো টেপের অনেক ঘেরী ! এখন থেকে গিরে কি করবে ? তা হাড়া হেলেনের সঙ্গে দেখা করবে না।

অশোক বলিল—না, আর বাবার সময় হেলেনের সঙ্গে দেখা করবে না। সেই ভয়েই এত ভোরে বেরুছি। আর এখন ট্রেনেও বাবো না। খবর পেলেই হেলেনা গিরে ট্রেনে ভীড় করবে। আর সবাতোহ ভাল লাগছে না বাটার মনাই। তা ছাড়া দেখা কতে, বাবার সময় আর দুঃখ বিরে কি দুঃখ পেরে যেতে চাই না। হেঁটেই অগ্নে চলে বাব। এই তো বাইল চ'রেক রাত্তা।

চক্রবাসু চুপ করিয়া বহিলেন। অশোকও চুপ করিয়া বহিল। এখনও রাতি শানিকটা আছে। আকাশ হইতে বাটির বুক পর্যন্ত অর্ধবহু অঙ্ককার। সেই বিপুল ব্যাপ্ত অঙ্ককারকে অবলম্বন করিয়া যেন দূর বৃত্তান্তবর্তী কোটি কোটি তারকার অস্ত্রাঙ্কল আলো কীণ হইতে কীণতর, কীণতর হইয়া অতি নিম্নকে বাটির উপর নামিয়া আসিতেছে। আর সেই রাশি রাশি আলোকের নিম্নে সজারের মধ্য দিয়া যেন লক্ষ লক্ষ অজানিত অগন্তের বার্তা বিপুল লক্ষে ধ্বনিত হইতেছে। সে কোন্ বার্তা। আর সবস্ত গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী, বাটি-বুলা যেন সেই আলোক-বস্তার মধ্যবর্তী সেই বিচিত্র লক্ষ সজারকে প্রাণপণে গ্রাস করিয়া চলিয়াছে। তাহার সামনে অশোকের নিম্নতর বাক্যহীন ছায়াবৃত্তিও যেন কোন কথা বলিতেছে।

চক্রবাসু যোমাক্ত হইয়া তাহাকে শুনিবার চেষ্টা করিলেন। পারিলেন না। তাহার মনে পড়িল একদিন বেলায় বাঠে আনন্দবরের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া এবনি অহুত্ব তাহার হইয়াছিল। সন্ধ্যা সমস্ত লক্ষ্যনিকে ছাপাইয়া যেন অশোকের কণ্ঠ শোনা গেল—আমি তাহ'লে চলি বাটার মনায়।

এশার মনে চক্রবাসু তাহাকে বলিলেন—এস। তারপর তাহার প্রবৃত্তি বাবার উপর এক অদ্বুত সমর্থনের ভিত্তিতে আশনার হস্ত দুইখান উত্ত করিলেন।

অশোক রাত্তার নামিল। অঙ্ককারের মধ্যে একটু বৃণা উড়িল, পদধ্বনি হইল। তাহার লাগা ভাষাটা একবার আঁহা দেখা গেল। তারপর তাহা মিলাইয়া গেল। তাহার পর আবার নীরবতা। আবার সেই বিচিত্র গভীর ধ্বনি।

চক্রবাসু চুপ করিয়া প্রসন্ন মনে বসিয়া বহিলেন। ক্রমে অঙ্ককার অগলিত হইতে লাগিল। দূরের বিচ্-চক্রবাল কানী আলোকের বার্তা যোগনা করিল। ক্রমে আলো হুটুয়া উঠিল। নূতন দিন, নূতন কাল সমাহার একশে লাভ করিল।

চক্রবাসু দিনের কাজ করিবার অস্ত্র বস্ত্রোপ হইতে বাটিতে নামিলেন।

উপসংহার

ইহার পর কিছুকাল গত হইয়াছে। উনিশশো চুয়াল্লিশ সালের শেষ। আনন্দবর এখন সাহিত্যিক হিসাবে বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এক সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে ইন্ডোভাসিটি ইন্সটিটিউটে একটি মন্ত সত্যের নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। সত্যের মধ্যে বড় গরম যোগ করিতে বাহিরে আসিয়া হুটপাতের উপর ঝাড়াইলেন। একটা সিগারেট ধরাইলেন। সিগারেট টানিতে টানিতে মৃত্যুদণ্ডে কলেক্টর'রের পুত্রের দিকে চাহিয়া বহিলেন। পাশে দুইটি ছেলে ঝাড়াইয়া গল্প করিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। অঙ্ককার এখনও ভাল করিয়া মাঝে নাই। তবু হুঁতী বেগয়া গ্যালের আলো অগ্নি উঠিয়াছে। সন্ধ্যের বৃক্ষে সমবেত লক্ষ লক্ষ বাহুরের পুচ্ছকৃত মানির মতই খোয়ার বাটির বুক হইতে অগ্নিবর্তী উপর পর্যন্ত যন অঙ্ককার। তাহাই অস্ত্র গাছলগ্নাকে, ট্যাঙ্কলগ্নাকে পর্যন্ত চিনিবার উপায় নাই। অঙ্ককারে কৃপের মত মনে হয়। তবু উপরে আকাশ নীল। তাহার তাহার তথ্য। শুক তারটি এত

বক হইয়া এত নীচে জলিতেছে যে বহু উঁচুতে বাশিত
একটা ইলেক্ট্রিক আলোর বত্ব বনে হইতেছে।

পাশে যে ছুইটি ছেলে ঝড়াইয়া গল করিতেছিল
তাঁহাদের একজন অকস্মাৎ তাঁহার কাছে আসিয়া
ঝড়াইল। তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—
আমাকে চিনতে পারছেন? অপর জনও আসিয়া তাঁহাকে
প্রণাম করিল।

অনিন্দর অত্যাচারের মধ্যে ছুইজনকে অনেককণ
বসিলেন, বলিলেন—ঠিক চিনতে পারলাম না তো।

প্রথম ছেলেটি তাঁহাকে বলিল—আমি অপোক। আর
এই কনি।

অনিন্দর দ্বন্দ্বের আনন্দে হতবাক হইয়া ঝড়াইয়া
রহিলেন, কেবল বলিলেন অপোক, কনি? তোমরা
কোথা থেকে।

অপোক হাসিয়া বলিল—এই বিটিংয়ে এসেছিলাম।
এখানেই কনির সঙ্গে দেখা হল।

অনিন্দর এবার হাসিয়া বলিলেন—তারপর আমার
সঙ্গে? খ্যা? এ যে হারাবনের দশটি ছেলে
হোল যে। তা তোমরা কোথায় আছ? কেমন
আছ?

অপোক বলিল—তোমরা আর একসঙ্গে বলবেন না।
আমরা একেবারে বিপরীত দলভুক্ত। তা ফুলের খবর
কিছু জানেন?

—জানি বৈ কি। এবার পূজোর একটু আগেই
বাড়ী গিয়েছিলাম। চন্দ্রবাহুর সঙ্গে দেখা হ'ল। চন্দ্রবাহু

তোমনিই আছেন। তোমনি হাসি হাসি খুব, মিলি খতাব।
রূপ একেবারে নেই। তব্বে তাঁর বাবা বাচাপ হয়ে
আসছে খুব ভাড়াভাড়া। কিন্তু তেলেনেব দুনি আচ্ছা
পথ বড়িরে দিয়ে এসেছে অপোক। অতি চমৎকার কাজ
করছে ছেলেরা। পতবারের আগে অগাঠি দুতবেটেও
ছেলেরা খুব জোর যোগ দিয়েছিল। পতবারের কেরিনেও
খুব জোর মিলিক নিচ্ছেনই দিয়েছিল।

বাটার দশাররা সব কেমন আছেন?

খুব চমৎকার। তাঁরা আগ্যাবল বিভাগ্যী ব্যক্তি।
ভালই আছেন সব। তা তোমাদের ট্রিকানা কি হে।
কনি, অপোক! আমার ট্রিকানাটা লিখে নাও।

—আমরা শেয়েছি আগনার ট্রিকানা। আমাকেই
পেয়েছি।

—তবে যেহে একদিন। একসঙ্গে না হয়, আলাদা
আলাদাই যেহে।

—তাঁই বাব।

ভিনজনেই কথা কুড়াইয়া গেল। ভিনজনেই কলেজ
জোয়ারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অত্যাচার আরও বন
হইয়া উঠিয়াছে। সকলের মৃত্যু মৃষ্টিতেই একই ভবি একই
সঙ্গে বোঝ হর ভাসিয়া উঠিল। পূর্বের আলোর সমস্ত
ফুল, বোভিৎ ছোট ছেলের হাসির বত্ব হাসিতেছে। সমস্ত
ফুলগুলো ছেলেরে ভরা। তাহাদের চোখে স্বচ্ছ বাহ্যবাহু
মৃষ্টি, দুখে মিলি হাসি। আর গরদের কোট, তাহার উপর
গরবের পাটকরা চাবর গায়ে দিয়া চন্দ্রবাহু ফুলগুলো
যেখিয়া খেড়াইতেছেন।

ভারত ও পাকিস্তানের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কের পটভূমিকায় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমস্যা

শ্রীকিরোম চন্দ্র সান্দাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বহুক্ষেত্রিক মুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রেই বিশিষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতির বাহক জনসমন্বিত আত্ম-নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। রূপ শাসনতন্ত্রে সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই মুসলিম-প্রধান অকল-তলিকৈ প্রাথমিক আত্মকর্ষ বৈধব্যের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। মুসলিম লীগ ইহাতে রাজী না হইয়া পাবি-ত্বানের অর্থোক্তিক দাবীতেই অটুট রহিল। লীগের পিছনে ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের বৃহত্তম অংশের সমর্থন, এ অবস্থায় কি করা বাইতে? বাহা অধ্যাত্মবিক, বাহা অজ্ঞার সর্বপ্রকারে তাহা প্রতিরোধ করা অথবা গণতন্ত্রের নামে মুক্তিহীনতার প্রস্তাব দেওয়া? প্রতিটি ও ইতিহাস সংখ্যাতীত সূত্রে ভারতীয় ঐক্যের ইচ্ছাশাল বুনিয়াছে। নির্ধর্ম অধ্যাত্মে তাহা দ্বিগুণ করা অথবা সর্ব পূর্ণ বাবিয়া ইহাকে রক্ষা করা? অনেক লোক একদমে চেষ্টামেচি করিল বলিয়াই বাহা যৌবনের অজ্ঞার ও অর্থোক্তিক তাহা স্তায়নত ও মুক্তিপূর্ণ হইয়া যায় না।

মাকিন মুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল একদা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে স্বাভাব্য যোগা করায়াছিল। ইহার পশ্চাতে উক্ত অঞ্চলের জনমতের সমর্থনও ছিল। কিন্তু বলপ্রয়োগে স্বাভাব্যবাসীসগকে পরাজিত করা হইয়াছিল। সেই পরাজয়ের স্মৃতি আজ আর কোন মাকিনী নাগরিকের মনে স্মরণিক হইয়া থাকে না। স্বাভাব্যবাসীরা যে জুল করায়াছিল তাহা আজ স্মরণীয়সমত। কংগ্রেস নেতৃত্ব সংঘর্ষের পূর্ব একাইয়া চলিয়াছেন। ইহা সত্যই হইয়াছে। গৃহবিধানে লিপ্ত থাকিলে বৈদেশিক শাসন বিলম্বিত হইত। ইংরেজের অধ্যবসায়ের পর বিস্তৃত ভারত পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হইবে এই ধারণাখনেই পাকিস্তানের দাবী বাবিয়া লভ্য হইয়াছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরকারেবে

আজম জিয়ার করার সুরে অতাবিত পরিবর্তন পহিলকিত হইয়াছিল। পাকিস্তানে সকলেই সমান সুবিধা পাইবে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই নাগরিক অধিকার লাভ করিবে ইত্যাদি অনেক ভাল কথা শুনা গিয়াছিল। আশা করা গিয়াছিল সবিস্তার উচ্চতাপে বিবেচনের বরক পসিবে, যত দূর বিস্তৃতি তাতে আবার কোড়া লাগিবে। কিন্তু হাওয়ায় সতি পরিবর্তিত হইতে দেখী হইল না। পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র, সেখানে শরিয়াতী শাসন প্রবর্তিত হইবে—এরূপ প্রচার শুরু হইল। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। যে ধর্মোক্তার আওনে ইহন যোগাইয়া পাকিস্তান পাওয়া গিয়াছে তাহা নির্দাশিত হইতে দিলে পাকিস্তানের তিত্তমূল নড়িয়া উঠিবে। পাকিস্তানে মুসলমানের অধিদাবানী আধিপত্য না থাকিলে, বিশেষ সুবিধা না থাকিলে, পাকিস্তানে মুসলমান হইবে শাসক অমূলমান হইবে শাসিত—এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে—পাকিস্তান পাওয়ার কি লাভ হইল? ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের মত পাকিস্তানও যদি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয় তাহা হইলে পৃথক হইবার কি প্রয়োজন ছিল? তাই সুর না বদলাইয়া গত্যন্তর নাই। এই পরিবর্তন শুধু করার বাস্তব্যাচ নয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন “শরিয়াতী” শাসন ও গান্ধীজীর “হান রাগা” একাধ-বাচক। কিন্তু সত্যিই কি তাই? গান্ধীজী বহুবার তাহার রামরাজ্যের কল্পনা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার বাস্তব্যাচও নাই। কিন্তু শরিয়াতী শাসনের ব্যাখ্যা-বস্তারার বার বার বলিতেছেন—ইহা হইবে ঐশ্বর্যমিক গণতন্ত্রগত, যেন গণতন্ত্রও সাম্প্র-দায়িক জাতি বিভাগ সাপেক্ষ! এই ঐশ্বর্যমিক গণতন্ত্রের রূপ শুধু মুখের কথাতেই সীমাবদ্ধ নাই। ইহাকে ব্যাব-হারিক রূপ দেওয়ার চেষ্টাইও ত্রুটি নাই। পাকিস্তানের

পতাকাটিকে বিবেচন করিলেই ঐক্যমিত গণতন্ত্রের বহুপ উৎসাহিত হইবে। পতাকা রাষ্ট্রে মূলগত নীতির প্রতীক। পাকিস্তান পতাকার যেখানে পতাকার অংশ ই সংখ্যালঘু অসুসলমান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব জ্ঞাপক। ইহাও অর্থ পাকিস্তানে অসুসলমান ডিএমই সংখ্যালঘু শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকিবে। কাজে কাজেই শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ব্যক্তিকে না তাহার কার্যকরী কোন অধিকার, তাহাকে সংখ্যাগুরু মূলমানের চক্রবাহার বাল্য কহিতে হইবে। পাকিস্তানে মুসলিম লীগের পুনর্নির্বাচন, বেহের চতাবর বহু পতাকাই উঠা কোন অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক মূল্যকে সমর্থন না করিবার জন্য পাকিস্তানের মূলমান-পক্ষে প্রতি কালেই আত্ম বিস্তার কতোতা, এইরূপ সংশ্লিষ্ট-কেন বসন্তরূপে জ্বলন করা হইবে বলিয়া নীমাত্মের উদ্দেশ্যে আত্ম আকুল কাহ্নর বীর মতোক্তি (ও প্রবাস) —ইত্যাদি মুসলিম একাধিকতার মূল্যকেই পরিমুখিত করিয়া তুলে। সর্বাপেক্ষা মাহাত্ম্য ব্যাপার ঐক্যমিত আত্ম (১) অসুসলমিত শিখা নিয়ন্ত্রণের পরিচয়না। এইরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপরই হিটলার-তন্ত্র দাঁড়াইয়াছিল। পাকিস্তানি বৈষম্যের অসুসলমিত শিখানিয়ন্ত্রণের চোটা দুইই স্বাভাবিক এবং সেই অসুসলমিত সংখ্যালঘুগণের তন্ত্রে কালে সর্বাধিক। ভারতীয় সংস্কারকে গলা টিপিয়া মারার চেষ্টার ক্ষুদ্র হইবে না। ইহাই হইবে সর্বাপেক্ষা মাহাত্ম্য আত্মবল। এই সব সূত্রে বাহারা বলেন—পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুগণের উচিত তাহারা যে রাষ্ট্রের অধিবাসী তাহার প্রতি আহুগতা স্বীকার করা, তাহারা হর আত্মপূজিত না হর মানিকর পঠতার আশ্রয় লইতে উৎসাহমান করেন। পাকিস্তান ভারতীয় ঐক্যের আত্ম প্রতিবাদ। বাহারা আত্মবল ঐক্যবল তাহাদের বসন্ত দেখিয়াছেন, মাহাত্ম্যের আত্মবল আত্মবল বিখ্যাপ করিয়াছেন, তাহাও পাকিস্তানের প্রতি আহুগত হইতে বলায় অর্থ আত্মবল্য কহিতে বলা। আর বসি তাহাদের কথায় এই অর্থ হর যে মূখে আহুগতা প্রকাশ করিয়া অসুসল ইহার বিপরীত ভাব পোষণ করা, এক কথায় পক্ষমাহিনীর নীতি অসুসল করা তবে তাহা

নিষ্ঠারই অসুসল। লক্ষ লক্ষ লোককে অসুসল কহিতে অসুসল সেও তাহাদের নীতিতানবোধকে অসুসল করা। ইহা অসুসল বিবেচনা হইয়া থাকত লক্ষ্যভেদে মের। কেহ হইতো মনিয়ে—ভারতের মূলমানেরা তো ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আহুগতা প্রকাশ কহিতে, পাকিস্তানের অসুসলমানেরা তাহা করিবে না কেন? ভারতীয় মূলমানগণের মধ্যে বাহারা লীগের মের মনিয়ে লইয়াছিল এমন কি তাহাদের আহুগতা প্রকাশও আত্মিক বলিয়া বহিয়া লইলেও একথা মনে রাখা কঠিন যে তাহাদের পক্ষে বাহা লক্ষ পাকিস্তানের অসুসলমান-গণের পক্ষে তাহা লক্ষ নয়। লক্ষ নয় এই কারণে যে লীগমতী মূলমানগণ পাকিস্তান চাহিয়াছিল, পাইয়াছেও। সূতরাং পাকিস্তান হইয়া বাইবার পর বাহারা পাকিস্তানের বাহিরে পাকিস্তানে তাহাদের পক্ষে আত্মিক ভাবেই ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আহুগতা প্রকাশ কিছুমাত্র অসুসলিক নয়। কেন না তাহাদের বসন্ত মূল হইয়াছে। কিন্তু অসুসলমান পাকিস্তান চাহে নাই, মাহাত্ম্য ইহার বিরোধিতা করিয়াছে, তাহা সূত্রে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাও বসন্ত মূল পক্ষেও হুংকরণকে স্বীকার করিয়া। চাওতা ও পাওতার মধ্যে আর সব ক্ষেত্রেই একটা ব্যবধান থাকিয়া যায়। কিন্তু অনতিপ্রেরিত কিছু ঘটিলেও হানিমুখে তাহা প্রের কহিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বাহারা ভারতীয় ঐক্যের মাহিনীতাব অসুসল আত্মবল সংগ্রাম করিয়াছেন, ভারত বিখ্যাপকে মাহাপাণ বলিয়া বিখ্যাপ করিয়াছেন, পাকিস্তান মাহাপাণ হইলেও তাহাদের পক্ষে পাকিস্তানের প্রতি আহুগতা প্রকাশ অসুসল। মাহার পাকিস্তানে থাকিলেও তাহাদের মন মুদ্রিয়া মের ভারতীয় রাষ্ট্রের চকু-নীমান্য। ভারতীয় সরকারকেই নিজের সরকার, ভারতীয় পতাকাকে নিজের পতাকা বলিয়া তাহাদের মের বসন্ত-অর্থ অসুসল জানায়। হাই মনিয়ে মের প্রকাশের “এক দেশে দুই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য” (two states in one country) ইত্যাদি মেরশোল কহিত মেরিয়া উঠত তন্ত্রমাহার তাহাদের অসুসল কুপিত্য কহে না। সংখ্যাগুরু মাহাত্ম্যের মাহার

দান গ্রহণ করিতে, তাহাদের রক্ষিত ভাস্করণে (let out) অস্বস্তান করিতে তাঁহাদের আত্মরক্ষা বিব্রোহ করে আন্তর্ভৌমনিয়ন আলোচনার কলে ভাস্করণ সংখ্যালগ্ন সন্তোষের দৃশ্যব্যবস্থার কিছু উন্নতি হইতে পারে কিন্তু ইহাতে মূল সমস্যার সমাধান হয় না। আহুগত্য প্রকাশের কথা বিহারা নির্বিচারে বলেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে আহুগত্য বীকার প্রধু অধিকার লাভের প্রয়োজনে নহ (আহুগত্য বীকার করিলেও পাকিস্তানের সংখ্যায় সন্তোষের পক্ষে সমান অধিকার লাভ যে সম্ভব নয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে), আহুগত্য বীকারের অর্থ দায়িত্ব গ্রহণও। সেই দায়িত্বের পত্তী সূচী নহ। পাকিস্তানের ঐতি অল্পমত ন্যায়িক পাকিস্তানের হইয়া বৃদ্ধ করিতে বাধ্য। পাকিস্তান আজ স্বাধীন দেশ। ইচ্ছা করিলে

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেও পাকিস্তান সক্ষম (ক্যানিওর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি তো চলিতেছেই)। পারস্পরিক সহযোগিতার চৌর্য ক্রটি না হইলেও ভারত ও পাকিস্তান কখনই যুদ্ধে নিপু হইবে না অতি বড় আশাবাহীও একথা বলিতে পারে না। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে পাকিস্তানের হবে অল্পমত সংখ্যালগ্ন অল্পমতানের কতব্য কি হইবে? আহুগত্য যদি আন্তরিক হয় তাহা হইলে ভারতের বিরুদ্ধে অন্তরণে করাই হইবে তাহাদের কতব্য। বিহারা অল্পমত প্রকাশের কথা বলেন, পাকিস্তানের সংখ্যালগ্ন অল্পমতানিয়মেও তাঁহারা অন্ত হুই ঠেলিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন কি? প্রস্তুত থাকিলেও পাকিস্তানের সংখ্যালগ্ন ইহাতে রাজী হইবে না।

(ক্রমঃ)

হেথাও ওঠে চাঁদ

ঐ অল্পমত প্রস্তুত

(তের)

ক্রীষের দুটির অবশানে শান্তা কলিকাতা চ'লে গেছে, মালতী আর কলিকাতা ফিরে গেল না। কলিকাতার সব স্মৃতি সে যুগে কেমনে চায়। ঢাকার এক ঘেরের ঘুলে বাট্টারী নিরে সে ঢাকা র'য়ে গেল; এবং ঘুলের ঘেসে সে থাকে। সন্ধ্যা, ও সুস্থায়ীর সঙ্গে দেখা করতে সে প্রায়ই তাহের বাড়ী যেত। তাহা-ও ওকে বুঝই দেহ করত। শান্তার বন্ধু হিগাবে সন্ধ্যার ভাঙে ছোট বোনের বতাই দেখত।

সন্ধ্যার একদিন মালতীকে বলল—“বাট্টারী-ই এখন জীবন ভর করবে, তখন B. A. টা পাশ করা ভাল।”

মালতী বলল—“অনেক দিন যাবতই এই ইচ্ছা ছিল; নানা কারণে হয়ে ওঠে নি। আবি-ও তাহা, এবার B. A. দেবার আয়োজন করব।” সুস্থায়ী বলল—“তাহী

বুঝি কয়েল! ভিরকালই কি বাট্টারী করবে? না, মালতী, ও বুঝি যেতে দাও। দেখ, ঐ একটা প্রস্তাবের প্রস্তাবণার তোমার সমস্ত জীবন নই হ'তে যাবে, এটা মেনে নিও না; এ অস্বাভাবিক লক্ষ্যে না। তোমার কাছে এসব কথা এভাবে বলা, হ্রস্ত তোমার দান। পছন্দ করবেন না; কিন্তু মেয়েদের মর্যাদা নেহেতা ভাল থেকে। তোমার মন ঠিক করে ফেলো।—দেখ, মালতী চুটী পথ আছে—যদি লোকটার ও সমস্ত ব্যবস্থা মানতে হয়, তবে তপনের কাছে ফিরে যাও। আর যদি না মানো, তবে ও বন্ধন কেটে বেরিয়ে পড়—ওর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করো। সমাজের মধ্যে নতুন ও পুরাতনের এই যে ঝগড়া ঝগড়া আঁতার ছুঁতে পাথর—এই মারমাঝে পড়ে মেয়েদের জীবন গিয়ে চাতু হ'য়ে থাকে। যা হয় এক পথ নাও।...”

সন্ধ্যার বলল—“আমি কি আপত্তি করেছি এতে? তুমি একটি বড় ছুঁতে দাও, আমি কন্যা দান করব। কিন্তু তবুও বলি B. A. পাশটা করো।”

এমনি কথাবার্তার মাঝে সন্ধ্যার নিজের কাছে বেরিয়ে

সেল, মালতী ও সুকুমারী রয়েল। মালতী বলল “খোকা ও খুকা কোথায় যৌদি?”

সুহৃ—“কেন, তাদের কেন আবার?”

মালতী ওঠে গিয়ে নিয়ে এল—একটা মটর গাড়ী ও একটা এয়ারোপ্লেন, খুকা ও খোকার জন্য সে এনেছে। সুকুমারী বলল—“এসব আবার এনেছে কেন? তুমি বস্ত্র বাড়্যাবাড়ি করছ, মালা।”

মালতী অন্তরীনের হৃদয়ে বলল—“আমাকে তুমি পর মনে করো যৌদি। শান্তিই ওদের এসব বিলে ত’ কুনি এমন কথা বলতে না।”

সুকুমারী মালতীর নাবাটী নিজের বুকের উপর ঢেলে ধরে হালতে হালতে বলল—“শাপলী কোথাকার! হৃদয়ের সাধ তি বেলেলে বেটে। নিজের বধন খোকা খুকা হবে, তখন তারেও ভাল করে মনের গুখে সব দিল।”

মালতীর মুখ লজ্জার লাল হয়ে উঠল। সে বলল—“কি যে বলছ যৌদি। তুমি ত জান আমার জীবনের সব শেষ হয়ে দিচ্ছে।”

সুকুমারী মালতীর চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখখানো তুলে বলল। সে বলল—এই আমার মুখ, এই জীবন, যৌবন, এই সৌন্দর্য্য, মনের এত বাসনা—এই সব-ই কি বুঝা যেতে দিবি কোন! নিজের নারীত্বের সম্মান বজায় রেখে, নিজের বাঙ্গালা ভাষাতে আশ্রয় করে দিল, এর জন্য সামান্য দোকানপাট, সামান্য দোকানচার—এ সব যিরে জীবনকে পব্ করিল না। কিন্তু নারীত্বের নিজের মহত্ববোধ বর্থাণা ও সম্মান কোথাও পব্ করিল না।” মালতী চলে গেল। রাজ্যে সে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কথা ভাবল। তার আত্মকার স্বাক্ষর জীবন ত’ বেজা হুচিঁত নয়—কোন বহুৎ প্রেরণার নয়। ত্র্যাপের পথ্য তার নয়। দেশ চার জীবনকে ভোগ করতে। অথচ সবায়ের সব ব্যবস্থা হচ্ছে তাকে ভোগের পথ থেকে হুয়ে গিরিয়ে রাখতে। কে তাকে আত্ম পথ দেখাবে। এই অজ্ঞকারে এতটুকু আলোর সন্ধান-ত সে পাচ্ছে না। হন চার—নিজের পথ দেখে নিতে, অজ্ঞ বশবন নারীর বস্তো স্থানী, সম্মান ও সাংসারিক

সম্পদের স্বাক্ষর চলতে। কিন্তু বাধা—ব্রহ্মজ্ঞান বাধা; তা উত্তীর্ণ হবার সাধ ও কন্যতা তার নেই।

মালতী যাঠারী করে ও B. A. পরীক্ষার জন্ত তৈরি হচ্ছে। সমীরই ব্যবস্থা করে বিল, বিমান বলে এক বস্ত্র মালতীর পড়ার ঘরে ঘরে সাহায্য করবে।

সেটা ছিল ১৯০০-০২ সালের কথা; একদিকে চলছে বাঙালার বিদ্যারী যুগবোধের আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ;—অপর দিকে চলছে—কংগ্রেসের নির্দেশে গণ-আন্দোলনের ব্যাপক যুদ্ধ বিদ্রোহ। এই দু’রকম আঘাতেই চাকার আবহাওয়া চকল হ’য়ে ছিল।

সে দিন একটা ঘটনা নিয়ে ওদের মূলে বেশ একটু উত্তেজনার দগ্ধি হয়েছিল। বিতা নামে ওদের মূলে একটু শিকড়িতা ছিল। সমীর জানত তার বিয়ে ঠিক হ’য়ে আছে।—সেই দুখটি প্রত্যত; যেভিকেল কলেজে বধন সে পড়ে তখন বিতার সঙ্গে তার পরিচয়। তার বাবা মারা যাওয়ার তার পক্ষে যেভিকেল কলেজে পড়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিতা প্রত্যত বিল, সে যাঠারী করে প্রত্যতের পড়ার সাহায্য করছে, নিজেকে অন্তরীকৃত খাটরে প্রত্যতকে সাহায্য করছে, আজ এক বছর হল প্রত্যত যেভিকেল কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। কিন্তু তখনও বিতার অর্থ সাহায্যের উপরই তার কলিকাতার জীবন নির্ভর করছে বিতা তখন আসল বিলনের বস্ত্র বেছেছে; ভবিষ্যতের রত্নী হবি তার সর্ব্ব ইঞ্জিরকে ঘিরে আছে। এমনি সময় এক রত্নী লিপি এল—কোন জমিদার কন্যা অদিবা দেবীর সঙ্গে প্রত্যতের বিয়েতে বিতার সাধারণ নিয়ন্ত্রণ।

আর সব যেরেই কোলাহল করছে—প্রত্যত এমন কি সকল পুত্র্য প্রেমীর উপর-ই কটু ভাবন করছে। বিতা সেই রত্নী চিত্রিমালা হাতে দিয়ে চূপ করে বসেই রইল। একটু কথাও সে বলল না। মূল পুত্র্যের আবহাওয়া তার কাছে তপ্ত হয়ে উঠল। মালতী এসে বিতার পায়ের বলল—কোন কথা বলল না। নিজের জীবনের একটু অভিশপ্ত রত্নীর কথা তার মনে পড়ল। বহির্দী

এক শিকড়িহী মালতীকে হসিতে বলল বিতাকে নিয়ে
বেসে চলে যেতে। মালতী বিতার একখানা হাত বনে
বলল—“বিতা! বাগার চলো।”

বিতা—“না, এখন বাব না; আমার ক্লাস আছে।”

মালতী—“না, তোমার আজ আর ক্লাস নিতে হবে
না, আজকের মতো তোমার ছুটি মথুর হয়েছে।”

আর কোন আপত্তি না করে সে মালতীর সঙ্গে
বেহিমে গেল—পথে সে মালতীর হাত ধরে চলে
বলল। ক্রমে যেন বেহের তার মনের পক্ষে অলম্বনীয়
হয়ে উঠল—সে মালতীর কাঁধের উপর তর দিয়ে চলল।
মালতী এক হাত তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকে ধরেন
করে রাখল; অপর হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে
বলল।

যে গিরে কিছু সময় পর বিতা বলল—“মালতী
এখন তুমি বাও; কিছু সময় আমি একা থাকতে চাই—
কিছু মনে করো না তাই।”

মালতী—“না, মনে করব কেন? এখন তোমার
কিছু সময় একা থাকাই ভাল। আমার নিজের জীবন
দিয়ে এটা আমি বুঝতে পারি।”

বিতা—“দরজা বন্ধ করে দিয়ে যেও।”

সন্ধ্যার পর মালতী আবার এস—বিতা তাকে
বেগাল, সে প্রত্যন্তকে চিঠি লিখেছে—তোমি চিঠি। সে
লিখেছে—“জীবনে তোমরা দু-জনে সুখী হও—এই
একটি কামনা তোমাদের জানাছি। এবং যত্নে আমার
আজীবন গুণ ইচ্ছা জানাবে।।.....”

মালতী বলল—“সত্যিই অজর থেকে তাদের এই
আশীর্বাদ করতে পারছ?”

বিতা—“কেন পারব না মালতী। যে প্রত্যন্তকে
ভালবেসেছি, সে যে আমারই মনের স্রষ্টি। নিজের
মনের কোণে বাগনার যে রূপ জন্মেছিল, প্রত্যন্ত হ’ল
তারই বহিঃপ্রকাশ। তাকে আঘাত করলে যে নিজের
হৃদয়েই আঘাত হানা হয়।”

মালতী—“চিরকাল এই ভাব রাখতে পারবে বিতা?”

বিতা—“জামিনা। যদি কোন দিন মনের সেই ছবি
মুছে বাধে বা বললে বাধে, তবে হয়ত অতঃপর হতে
পারবে। কিন্তু তখন তাকে আমার অভিসম্পাত দ্বারপ্রাণ
কোন প্রয়োজন থাকবে না। আজ যে অভিযোগ তার
বিজ্ঞে হওয়া স্বাভাবিক, তখন সে অভিযোগের কারণ
থাকবে কি? তখন নতুন ছবি আমার মনকে ভরে
রাখবে তাইই পরে নতুন নতুন অরলি সাজাবে, তাইই
পলার হোজ মন মন মালা পরাবে। তখনও প্রত্যন্তকে
যেন অভিষেক না দেই, মালতী।”

মালতী বলল—“আমার কি মনে হয়েছিল, জান।
সবাই স্বপ্নে তপনকে মারবার উপক্রম করছিল, তপন
আমার মনোভাব কতকটা তোমার মনের মতোই
হয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নে সবাই মিলে বেনাচারের ও
পাত্তের মোহাই দিয়ে, আমাকে তাইই সত্যি রাখতে
এল, তখন আমার মন বিচলিত করল। তারপর
স্বপ্নে তপন নিজে এসে তার ধারী প্রতিষ্ঠা করতে
—আমার প্রতি তার ভালবাসার ব্যাখ্যা করতে—
আমাকে পাবার জন্যে এসে ঐ দুঃখজনক করেছে, এই
কথা বলতে এল, তখন আমার মন একেবারে বিপর্যয়
উঠল।।.....”

বিতা—“এই হলো করার কারণ সে কি বলেছিল?
কেন সে সব কথা গোপন করেছিল?”

মালতী—“সে বলল—মালতী তোমার পাবার জন্যেই
তোমার প্রতি আমার পতীর ভালবাসার জন্যেই আমি এই
প্রস্তাবনা করেছি। আগের বিশেষ স্বপ্নও আমি স্বীকার
করিনি; ঐ স্বপ্নে স্বপ্নও স্বী বলে গ্রহণ করিনি। তার
এই অথবা শুনে আমার যেজন্ম আরও বাধা হ’য়ে
গেল।”

মালতী সেই পুরানো কাহিনী আবার বলল। বিতা
বলল—“মালতী, রাগ করোনা, কিন্তু আমার মনে হয়,
তুমি ভুল করেছ। তোমার ভালবাসার উপর তোমার
বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল। হৃদয়ে ভালবেসেছ তার
চরিত্রের যোগ্য জটিল যদি সহ করতে না পার, তবে তোমার
ভালবাসার মূল্য কি, সে যদি তোমাকে বর্জন করে চলে

যায়, তবে অবশ্য আলো দিও। তোমাকে পাবার জন্য তোমার ভালবাসার জন্যই সে তোমাকে প্রত্যাশা করেছিল, এ ত' তোমার প্রতি তার ভালবাসার সত্যতাই প্রমাণ করে। থাক সে ত' তোমার ঘুচে গেছে।—”

এই উত্তরনাও খেদ পেল—আবার যিনি স্বাভাবিক সজ্জিত চলল। কিন্তু এই ঘটনার ছাপ ও বিচার ঐ সব ক্ষুণ্ণের যেন তার মনে থেকে লুপ্ত হুইবে পেল না। সে বিচার কথাগুলি নিয়ে নিজের মনে অনেক আলোচনা করল।

আর হৃৎকর হল তপনের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়েছে। বিচার ঐ সব কথা কষ্টপাথরে নিজের মনে গভীর করে খেল—তপনকে সে সত্যিই ভেদনিষ্ঠাবে ভালবাসত না। তার অবহেলিত যৌবন অনেক কাল অপেক্ষা করে কেবল উপেক্ষাই পেয়েছে। মনের দহন সে খুলেই রেখেছিল—তপন এসে দরজার বা দিতেই দহন খুলে গেল। তপন না হ'লে বহি পবন বা বজ্র বা এমনি কেউ আগন্ত, সেও দহন খোলাই পেল। বড় বড় ছোট্টোলে, যে কোন অতিথি লেগানে থাক, অমনি তার জন্ত সব ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কোন অতিথিই মনে করে না যে এসব ব্যবস্থা তারই জন্ত করে রাখা হয়েছিল। তার মনের পক্ষে তপনের অত্যাচার কি ভেদনই নয়।

নিজের প্রতি তার বিচার এল। কি শুভাং তার সঙ্গে অপর এক স্রেণীর নারীর। তার মনের বন্ধ আজ খালি পড়ে আছে।—কোন অতিথিকে অত্যাচার করার জন্ত যেন সে উদ্ভীষ্ট হয়ে আছে।—

বিমান লগ্নাহে হুঁতিনদিন ক'রে মালতীকে পড়াতে আসে। পড়াবার ঘুমে অনেক কথা আলোচনা হয়।

হুঁতিন আগে লগ্নাহে কোন লগ্নাহকে বিমানবাহীরা শুনি করেছে। তারপর হুঁতিনদিন পর্যন্ত পুলিশ পটেন ও লগ্নাহের গুণা ছিল লগ্নাহের উপর অকথা অত্যাচার করল। মালতীকে যেসে খানাতল্লাশী করার উদ্দেশ্যে পুলিশ আগে এবং খানাতল্লাশী করার অধীনে পুলিশ ও যেসে এক দীর্ঘকাল কাট করল। দেহের মন-ব্যাধি পর্যন্ত বিপর হ'য়ে উঠল—

হুঁতিন শিকড়টিকে প্রেরণ ক'রে দিল। বিমান পড়াতে এসেছে—মালতী তখনও সন্ধানের ব্যক্তি লগ্নাহতে পারেনি। শারীরিক আঘাত বা সে পেয়েছিল তা ভেদন ক্ষুণ্ণ নয়—কিন্তু মানসিক ব্যক্তি বা পেয়েছিল, তাই ছিল ক্ষুণ্ণ।

মালতী বলল—“একদল গুণা নিয়ে এরা এসেছিল—কেউ বেহেদের সত্যি মনে টানে, কেউ বা অস্ত্র ইচ্ছিত বা প্রত্যাখ্য করে। কি বল বিমান দা, এ যে কখনও হতে পারে, তা এই আগে বলনাও করিনি।”

বিমান—“লগ্নাহের উপর যিরে এক মানবের নৃত্য চলছে, হুঁতিন বাবৎ। সে সব কথা আজ আর বলব না। কোথায় লগ্নাহে তোমার মালতী? তখনই, তোমার কোথায় খুঁজ লগ্নাহে।”

মালতী তার বাহু ধরে করে বেগাল, বাহুতে, জানায় ও কাঁধের উপর কালো লগ্নাহ আছে এবং মাথায় একটা আঘাত লগ্নাহে লগ্নাহে আছে। বিমান তার মাথায় ও বাহুতে হাত দিয়ে আঘাতের স্থান অনুভব করল। বহুদিন পর, আজ প্রথম পুরুষ স্পর্শ তার মেয়ে পড়ল। তার লগ্নাহ সেই স্পর্শ অনুভব করল। বিমানের বহুদীর্ঘতম হস্ত চকল হ'য়ে উঠল।

পরিচায়িকা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে এসে পড়ল। (ক্রমঃ)

প্রথম জেলের অভিজ্ঞতা

(৪০২ পৃষ্ঠার পর)

এর পরে যেদিন কোর্টে নিল, সেদিন কিছু গ্র্যাক মেরিয়ার বরখা হুলে আমার কোর্টের ডিউরই নিয়ে গেল। কোথা থেকে যে ছয়টি সার্কেট বাছাই করে এনেছিল জানিনে—ইংরেজের চেহারা নয়, আর্শান চেহারা, সাদে ছয় ফুট করে লম্বা—সবগুলোই প্রায় লম্বান। দুজন আগে, আর চারজন পেছনে। আগামীর কাঠপড়া আমার ঢুকালো না, ওরই কাঠপড়া হয়ে রইলো। ওদের কাঁক দিয়ে দেখলাম, আমার নাম ডাকতে, উকিলদের মাঝখানে বাবা উঠে দাঁড়ালেন, আমার দূর থেকে দেখতে চেষ্টা করছেন।

কিন্তু হু' মিনিটের বেশী লম্বার কোর্টে থাকা হ'ল না। এই কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট বাঠালী, তবে তাঁকে বিশেষ কিছু করতে হয় নি। সরকারী উকিলই এগে বললেন, You are discharged. হাতের হাতকড়ি হুলে দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপর একটি চাপড় দিয়ে বললেন, But you are rearrested under the Defence of India Act.

সেই সার্কেটটা আমার আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এলে গ্র্যাকমেরিয়াস্তুে ঢুকালো। নতুনের মধ্যে হ'ল হাতকড়ি খসে গেল।

এবারে নিয়ে গেল আমার সেই ইলিশিয়াম রোডে (বর্তমান লর্ড সিং রোড)। কয়েকটি অফিসারের মাঝখানে একখানা খালি চেয়ারে বসতে দিল। ইসমাইল ব'লে একটি অফিসার করেখানি ফটো নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, এঁদের চেনেন?

আমি বললাম, একবারেই তো ব'লে দিয়েছি, আমি কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না।

দাঁতের একটা চেয়ারে ব'লে মলিনী যজুমবার ঘোটা একটা খাতার পাতা উন্টাইল। ব'লে উঠলো, There were more than 50 statements against Bhupen Dutta. নাহেবকে ব'লে দিন "regulate" করে দিতে।

এই ছিল ওদের তপনকার দিনের ঝগড়া ও ভাষা। More than 50 statements বললে খাড়ে খাখ, আর "regulate" কথা মানে Regulation III তে দারাজীবন হেটপ্রিভনার করে রাখবে।

একটি ভারতী অফিসার হয়ে ঢুকলো। আমার দিকে দেখিয়ে পাশের একটি লোককে জিজ্ঞেস করলো, Why has he been arrested?

সে জবাব দিল, ঠকেই জিজ্ঞেস কর, he speaks English perhaps better than you do.

তখন গ্রাকামি করে আমার জিজ্ঞেস করে, Why have you been arrested? What's the charge against you?

আমি বলি, You know that better than I do.

আজ্ঞেবখা না ব'লে স'রে পড়লো। এর পর ফটো তুললো, আগুলের টিপ সই নিল। তারপর উপরে নিয়ে গেল গোবিন্দ কাছে। সে বলে, You still refuse to answer questions by a foreign Government's officers?

Yes.

এর পর বোথ হয় আমার নামে Defence Actএর অর্ডার সই করতে করতে বলে—

"Will you tell me where is Nawab Habiulla Saheb?"

আমি চুপ করে রইলাম।

নবাব হাবিউল্লা সাহেব আমাদের ডিউর কারও নামই ছিল না। ঝালাখা হাউসে আমার এক বন্ধু তখন ছিলেন টার্কি সৈন্যপুত্রের প্রিভ্যাটডোং, রাহ চৌধুরি। তিনি পুলিশের সঙ্গে এবং অস্ত্রাভিযুক্তদের সঙ্গে ডাঃ বাহুগোপাল মুখার্জি সম্পর্কে পুলিশ হত বকম খবর পেয়েছে, সব লংগ্রহ করে গোপনে আমায় পারিমেজিলেন—বাহুগার নামের বদলে নবাব হাবিউল্লা সাহেব নামটি ব্যবহার করেছিলেন। বে-বুহশতিবার আমি ঘরা পড়ি, তার পরের শনিবার আমার গৌহাটিতে বাবার কথা ছিল, সেখানে বাহুগার

সঙ্গে হেঁচা হবে, চিঠিটা তাঁকে দেখাবো বলে মঠ না করে পকেটেই রেখে দিয়েছিলাম, ঘরা পড়ার সময় চিঠিটাও ঘরা পড়ে। তবে তা'তে অল্প অনিষ্ট হবার মতো কিছু ছিল না।

নীচে নিয়ে এল। পাড়ী তৈরী করছে, আমি ধাক্কিয়ে আছি। ইনস্পেক্টর কালিদাস যোবান বললে, কুপেনবার, রোকে ধাক্কিয়ে আছেন কেন? এখানে ছায়ায় এশে ধাক্কান। কাছে বেতে বললে, অনিষ্ট হয় এমন কিছু আমি বলতে বলছি, দু'একটা গ্রন্থ আপনাকে করবো?

আমি বললাম, Have you been asked to interrogate me?

ও বললে, আমার authority কিছু আছে কিনা যদি জানতে চান, তা হ'লে বলি, আছে।

তারপর একটু নোক গিলে বৃহস্পতি বললে, বিশ্লেষণ করতে পারি?

You may not.

আচ্ছা, থাক, থাক।

আবার জেল। বন্ধুরা উৎসুক, কারণ, নামলা গেল, এখন হয়তো বললে পাবেন।

একটু বাবে কিছু জেলার এল। আমার নিয়ে চললো অল্প কেধায়। এই যে কথা প্রায় না বলেও বন্ধু, সেই বন্ধুয়ের নামা ছেড়ে যেতে একটু কেমন লাগলো। যে ছুটো ঘরের দিকে একটু দৃষ্টি দিতে পারি, তার অধিবাসীদের সঙ্গে চোখে চোখে বিদায় হয়ে গেল।

এলে চুকলাম বিখ্যাত ৪৪ ভিত্তিতে। দেখলাম আমার আগে আগে একটি মেট্রনব জেলের মানুষের কার্টের বরজাগুলো বন্ধ করে দিতে দিতে চলেছে। শুভানকার ঐ রেওয়াজ: কথা তো বলতে পাবেই না, কেউ কারণ বুঝে দেখতে পাবে না। আমার নিয়ে যে-ঘরটা চুকালো, সেটা ২১নং সেল, ক্রিস্টিন কানরা। সেলে চুকবার পর আগ মিনিটখানিকের ভিত্তি আমার মেসেরও বরজা বন্ধ হয়ে গেল। বৃহস্পতি, আমার এট করে আর কেউ ছিলেন, আমাকে চুকবার আগে তাঁকে

২২নং এ চুকিয়েছে। তার পর তাঁকে আমার ঘরের সামনে নিয়ে অল্প চাপান করেছে। আমার ঘরের সামনে গিরে বেতে যে-সময়টা লেগেছে, সেই সময়টা আমার ঘরেরও বরজা বন্ধ হ'ল। পরে শুভানব তাঁকে নিয়ে সেল ইউরোপিয়ান ইয়ার্ডে আমি যে-সেলে ছিলাম, সেই সেলে। এবং তিনি আমাদের কিরণ লা—কিরণ দুখাছি।

আরও শুভানব, ঘেমিনীপুর জেলে একটা ছয় মিনের হাকার ট্রাইক হয়ে গেছে। তখন অনেককে সব অস্ত্র জেলে সরিয়ে দিয়েছে। তার তিত্তর কিরণলা এসেছেন প্রেসিডেন্সিতে।

একটু বাবে সেই ইউরোপিয়ান গুর্ভার রবার্টসন এল। এসে বলে, "এই দেখ, এক ডুইলোক ছিলেন এখানে, বহু লোক, হাত ভাঙা, পা ভাঙা। ঠর বাতে কোনো অস্থিবিদ না হয়, সর্বপ্রকারে আমরা সেই চোটা করতাম, আর উনি করেছেন কি ভান?" সেলের ভালা বন্ধ করার আয়গার যে একটা খুলখুলি মতো থাকে, সেইটে দেখিয়ে বলে, "উনি এখানে পা দিয়ে ঐ অ্যাক্সিসেলের হোয়ালের উপর গিরে ওপানের সেলের লোকের সঙ্গে কথা বলতেন। তুমি যেন আবার ঐরকম হুইমি কোরো না।"

মনে মনে বললাম, পাগলা না'কে। নাড়িলে। বেশ পরটা দেখিয়ে গিলে। ঠার বর্ণনা দিল, তিনিই আমাদের কিরণ লা।

এইবারে শক্তি-শক্তি সেলে এলাম। বোধ হয় হাত লাতেক লম্বা, হাত পাতেক পাশে এক একটা ঘর। সামনে লোহার গরাদে দেওয়া বরজা, তার সামনে অটটা সাইকেলের একটা ঘোয়ালে ঘোরা আয়গা, তার উপরে ছাদ নেই। এইটেরই নাম অ্যাক্সিসেল। তারই সামনে ঐ কার্টের বরজা—যা অপর রাজনৈতিক বন্দী দাবার আসবার সময় দিনে পঞ্চাশবার বন্ধ হয় আর খোলে।

আবার শেপাল গুর্ভার থাকতে স্থিতি ছিল—আমার সেলের বরজা নেহাৎ ডিসেন্ট বা ক্যারিক থাকলেই কেবল বন্ধ করতো।

সেলের মেজের এক ইকি দেউ ইকি পুঙ্ক করে চুপের পৌচ দিয়ে তার শাস্ত্রকার ব্যবস্থা হয়েছে। হাওয়া

প্রবেশের স্তম্ভ সামনের ঐ দরজাই কতোটা সাহায্য করে—তাও তার সমান্তরাল কোনো আনন্দ তো নেই-ই, আবার আকিসেলের একটু পরেই স্কুলের বাইরের উচ্চ দেয়াল। কাজেই হাওয়ার বালাই সেলে প্রায় নেই। যা আছে, তাতে বরং অসোয়াতিই বেশী সৃষ্টি হয়। কারণ, এখানে আলো বাতাস না থাকতে ঘরের টুকরিই সমস্ত—হাওয়া বেটুকু ঢুকতে পারুক বা না পারুক, ওরই জ্বাশ বহন করে আসে। এই হাওয়ার অবস্থা, আর আকাশ দেখতে হ'লে বাটখানাকে টেনে দরজার সামনে নিয়ে আসতে হবে। তাই নিয়ে আসতাম, কারণ, তৈরি আচ্ছাদনের দরম। একখানা হাতপাখা অবস্থ দিয়েছিল।

স্নায়ু পড়বারও এখানে উপায় ছিল না। কারণ, হারিকেন থাকতো ঘরের বাইরে। দরজার কাছে ঘটে চৌহ হয়ে শুয়ে সেই আলোতেই পড়াশুনো যা করবার করতে হ'ত।

ঘরে খাবার ঘরের একটা কুঁজো ছিল। কিন্তু সাড়া দিলে স্নায়ুও, কাণ্ড কাচার, বাসন মাঝার স্তম্ভ এক বালুতি জল ঐ আকিসেলে নিয়ে বেত। আমার আরও একটা সুবিধা ছিল। বাসন মাঝার কাছটা আমার নিম্নের করতে হ'ত না—স্পেশাল ওয়ার্ডার ওটা। কোনো করেবিক দিয়ে করিয়ে নিত। কাণ্ডের বালাই তে। ছিলই না। আদিত্য ছাড়া একটা ডোয়ালে বিধেছিল।

সেইদিন সন্ধ্যাতেই বাবা এলেন দেখা করতে। স্কুল পেটে ভাক পড়লো। বাবা তালের দরজার ওপাশে, আমি এপাশে, আর আমার পাশে ঠাঁড়িয়ে বনবিহারী মৃগাঙ্গী—তখন বোধ হয় সাব ইন্সপেক্টর।

অন্ত কথাই ভিতর বাবা বললেন, ওঁরা বলছেন, তুমি যা জান, সব যদি বীকার কর, তা হ'লে তোমার মগুহে আবদ্ধ রাখবেন।

বনবিহারী মাথা নীচু ক'রে বলছে, হ্যাঁ সেরকম আমরা ক'রে থাকি।

ওর এই মাথা নীচু ক'রে থাকার সুযোগ নিয়ে বাবা সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার মাথা ও চোখ নেড়ে সাবধান ক'রে দিলেন, খবরদার, কিছু বেন না বীকার করি।

আমি বললাম, আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

সেইদিন আমার সম্পত্তি হ'ল। বাবা একটা ট্রাক ক'রে কিছু কাণ্ড জামা জুতো, বাসনপত্র ও রান্নাঘর মহাভারত এবং অন্তর্গত কিছু বই নিয়ে গেলেন।

খালা বাটি এল, বই সেল সেলগারে, এবং এখন আমি কাণ্ড পরতে পারি কি না, তার অহমতি সাপেক্ষ কাণ্ডগুলো গেটে জমা হ'ল। পরদিন পুলিশের অহমতি নিয়ে সেগুলো আমার পাট্টায়ে রিল।

৪৪ ভিগ্লি ব্যাপার সব আলোচনা। প্রথম এগারটা সেলে তখন থাকে স্কুলের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ছিল, কিন্তু বীকারোক্তি করেছে, তেমন সব লোক। সিপাই কয়েদির কাছে জানালাম, এদের কয়েকজনকে মাঝে মাঝে ছপুহবলা ভেলপেটে তৈরিক নিয়ে দায়, সি আই ডি অফিসাররা খাবার, কাণ্ড জামা সব নিয়ে আসে, আর এদের কাছ থেকে স্কুলের অন্তর্গত বন্দীদের সম্পর্কে, সব খবর সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যায়। সিপাই কয়েদিরা ওদের অত্যন্ত দুশা করে। অস্ত্র ইয়ার্ডে যে সব ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডারের ব্যবহার ভাল, এদের তথ্যে এখানে তাদের ব্যবহারও পরচাপ।

এর ভিতর একজন ছাড়া আর সবাই ছিল একটা ডির দলের লোক। কাজেই নাম শুনেও কাউকে চিনতে পারলাম না।

এদের এগারটা সেল বাধ দিয়ে ছিলেন চারজন মুসলমান রান্নাঘরী। এঁরা সবাই মোলানা আজাদের পরিচিত কর্মী—তুর্কনের বাড়ী বোধ হয় ছিল রান্নাঘরীতে।

তার পরের সেলগুলিতে ছিলেন দলীয় ব্যানার্জি—রানবিহারী মনে ক'রে এঁকে পূর্ব এশিয়া অফিসে সন্থকের ভিতর কোনো জাহাজে ধরেছিল। খ'রে যেতুন জেলে দশবাস আটক রাখে, তারপর এখানে পাটিয়ে দেয়। বেশ শিক্ষিত, সন্যাসকল হাসিমুখী ব্রহ্মকৃষ্ণ ভক্তলোক। আর ছিলেন রান্নাঘরী বোস, আমার পূর্বপরিচিত, রানবিহারী বাবুর আত্মীয়, এবং চম্বননগরে এঁরা এক বাকীতেই থাকতেন। আমি প্রেসিডেন্সি জেলে থাকতেই

এক কোন্‌ বীণে অন্তরীণ করবার চক্র নিয়ে ঘাটিল। শিলালম' গৈলেন পুলিশের অমনোযোগের হ্রোগ নিয়ে এক ট্যান্ডি ভাড়া ক'রে বরাবর চন্দ্রনগরে পৌঁছে ধাম। এবং শেষ পর্যন্ত চন্দ্রনগরেই থাকেন। আর ছিলেন জরেশ রাসের লক্ষ্যকিত দুই ভাই। জরেশবাবু মাঝে ও স্ত্রীকে নিয়ে চন্দ্রনগরে এক বাড়ী ভাড়া ক'রে ছিলেন পলাতকদের আশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যে, আর ভাই দুইটি বিয়ের ব্যবস্থা করতেন। এ'রা রাজনীতির কিছুই জানতেন না। কাজেই অত্যন্ত ছিন্নদান থাকতেন। এ'রা চারজন ছিলেন Ingress into India Act এর বন্দী।

আমার গ্রিক পাশের সেলে থাকতো রাণাঘাটের একটি ছেলে, ভারতরক্ষা আইনের বন্দী, এক মাস সেলে থাকবে, ভারতর বাইরে অন্তরীণ হয়ে যাবে। প্রথম রাত্রে সে ঘেরালে পাখার ভাঁটা দিয়ে হুঁকে হুঁকে জিঞ্জেল করলো আমার নান কি, কোথার ধরা পড়ছি ইত্যাদি।

আমিও এই উপায়ে যে ভাবা বিলাম, বোধ হয় সে সব ধরতে পারলো না। শেষ রাত্রে ঘরজা ঘুলে দিতে ভনি গান গাইবার আছিলার এই সব প্রদই জিঞ্জেল করছে। আমার স্পেশাল ওয়ার্ডার থাকার সেভাবে ভাবা দেবার হ্রোগ হ'ল না। পাখার এক অংশ ডেসে নিয়ে, আগের দিন সন্ধ্যার একটি ছোট পেরেক কুড়িয়ে পরেছিলাম, তাই দিয়ে সব লিখে এক ঠাক বেয়ালের উপর দিয়ে কলে দিলাম।

এখানে বেড়াবার ধরন দেখলাম খুব। তখন ষ্টেট প্রিন্সিপালদের দুটো স্ট্রেঞ্জিতে ভাগ করেছে, X Class আর Y Class, অধিক আর অল্প বিপদজনক। X Class-এ এই ইউরোপিয়ান ইয়ার্ডের ওরা—কারও সাথে কারও ব্যাক্যালাপ নিষেধ। আর Y Class এই ৪৪ ডিগ্রিতে ধরা আছেন তাঁরা। এ'রা মকাল বিকাল যখন বেড়াতে বের হতেন তখন কথা বলতে পেতেন, কিন্তু সবাই সবে সবাই নয়। এই প্রথম মিকভার সেলে যে ১০১১ জন ছিলেন, তাঁদের সেলগুলো বেখানে শেষ হয়েছে যেখানে নামনের বেয়ালে মোটা ক'রে একটা

চুপের দাগ দেওয়া। ওরা এই অন্তটা আরগা ধ'রে বেড়াতে পারবেন, আর পরস্পরে কথা বলতে পারবেন। তার পরের মুদলমান চার জনের অল্প এই রকম ডিগ্রি ব্যবস্থা এবং তারপরই চারজন Ingress into India Act এর বন্দী—তাঁরাও ডিগ্রি। এ'রা দুই মল পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না, কিন্তু এই চুপের দাগ যেনে বেড়াতে ও নিজেরা কথা বলতে পারবেন। আর আমি আর এই রাণাঘাটের ছেলেটি ভারত রক্ষা আইনের বন্দী। আমরা এই দার দার অ্যাক্সিসেলটুইর বাইরে বেতে বা কথা বলতে পাব না। একদিকে ১ থেকে ২২নং পর্যন্ত সেল, অপর দিকে ২৩ থেকে ৪৫ নং পর্যন্ত। হাফগানে বলে আছে ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার। আইন ভেঙ্গে কথা বলতে যেখালেই কয়েকি যেটকে বলে—আর সে চীৎকার করে, "আই, বাত মাং করো।" আর রাজবন্দীরা সব মূখ ঘুরিয়ে যে দার বেড়াতে থাকে।

আমাদের অ্যাক্সিসেলের ঘরজা বন্ধ থাকবার কথা। কিন্তু স্পেশাল ওয়ার্ডার আমার সেল খুলেই রাখতো। আর সেই হ্রোগে সজীববাবু, রাণাকান্তবাবু, মহেন্দ্র ও বিমল (জরেশবাবুর দুই ভাই) আমার ঘরজা পর্যন্ত এসে ঠাক ঠাক কথা বলে যেত। মহেন্দ্র ও বিমল যেন আমার ওখানে গেয়ে খুব একটা বল পেল। রাণাকান্তবাবুও ডাফি খুশি। সজীববাবু বেশ বাস্তবান লোক, আমার চেহারা দেখে সেই ইউরোপিয়ান ইয়ার্ডের স্ত্রীসবাবুর মতো কুস্তির চ্যালেঞ্জ আনিতে বান। ডব্রলোকের নিষেধ কতকগুলো ভাল ভাল বই ছিল। লাভরি ব'লে একটি নতুন ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার এসেছে। সে ওখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে ভাল ব্যবহার পেতেন। আমার কাছে এসে জুখজুখের কথা কইতো। সেই আইন ভঙ্গ ক'রে সজীব বাবুর কাছ থেকে বই এনে আমার পড়তে দিত। রাজবন্দীরা পরস্পরের বই পড়তে পাবে না, এই ছিল টমল সাহেবের অথবা আই, বিয়ে রকুম। সবসের কাগজ তখন রাজবন্দীর পক্ষে দিব। লাভরি মাঝে মাঝে ষ্টেইম্যান এনে দিত।

আমার স্পেশাল ওয়ার্ডার কোথারামের হঠাৎ

একদিন বলি হয়ে গেল। তার জায়গায় এল এক সাঁই পালাওয়ান—নাম জগদেও ভেঙঢ়ারি। এ লোকটিও দরজা খুলে রাখতো, কিন্তু বেশ নম্র রাখতো, আমি কাব সঙ্গে কথা বলি, সেই দিকে। বিমল আর মহেন্দ্র আমার সঙ্গে কথা বলবার প্রতিটি সুযোগ খুঁজে নিত। আর, জগদেও জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো, এরা নিশ্চয়ই আপনাদের চেনা। আমি বলতে বলি, এখানেই চেনা হয়েছে, ও ততো আমার রেগা করে। আমার কাছ থেকে জবাব পেয়ে শেষ পর্যন্ত বখন খুঁসি হ'ল না, তখন বেড়ানার সময় হ'লেই ও বাইরে থেকে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিত। এই লোকটির বোধ হয় ভেলবিভাগ ও শুষ্ঠ পুলিশ বিভাগ দুই দিক থেকেই অর্থাগম হ'ত।

ভারতরক্ষা আইনে লগ্নাহ্বানেক থাকবার পর একদিন গোষ্ঠি এল আমার সেলে। একখানা কাগজ বের ক'রে হাতে দিল। তা'তে পনের বিশটা নাম আছে দাবের সঙ্গে আমি রান্নাধারার দড়ব্ব করছি, আর এ করছি, তা করছি এই রকম পাঁচশাউটা চার্জ। আমি বললাম, I refuse to answer these charges. বললে তা-ই লিখে দিল। লিখে দিলাম, ও চ'লে গেল।

পাঁচ দিন ভারতরক্ষা আইনে থাকবার পর একদিন ভেলার এসে জানাল, আমি ১৮১৮ সাহেব ওনং আইনে

স্টেটপ্রিন্সিপাল হয়েছি। তখনই আমার ঐ ৪৪ ডিগ্রিরই অপার মিকে ২৬ নং সেলে নিয়ে গেল। সন্ধ্যার আগে, অপরেবা তখনও বেড়াচ্ছেন। একটা অদাবধানতার ব্যাপার হয়ে গেল। তাঁদের বন্ধ না করেই আমার বের ক'রে ফেললো।

বিমল আর মহেন্দ্র করুণভাবে চেয়ে রইলো, রাখাকাত আগেই চলে গেছেন এবং ন'রে পড়েছেন। সজীববাবু নমস্কার জানালেন, আমি সবার প্রতি একটি সূত্র নমস্কার জানিয়ে অপর পাশে নিবাসিত হ'লাম। শুভনাম, সেদিকে অপর কোন সাক্ষরী ছিল না। সেইদিনই সকালে থাকে এনেছে, তাঁর নাম অদ্যুত সরকার। পরদিন ভোরে এলেন অরুণা মজুমদার (বর্তমানে অদ্যুতবাবুজীর পরিচার্য্য কাজ করেন)—আবার পূর্বপরিচিত।

পরদিন সকালে ঐদের সঙ্গে আলোপের সুযোগ হ'ল না, ঐদের বেড়ানার সময়েই হুপারিটেডেট এসে পড়লো। আমার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলো, Suppose, you are kept in this cell for the rest of your life, what will you be doing?

"I shall be praying for the downfall of this Empire".

সেইদিন বিকেলেই আমাকে আলিপুর সেন্ট্রাল ভেলে চালান ক'রে দিল।



সিঁমোর বাবা

প্রয়োজ্য বস্তু

ঠিক দুপুর হয়েছিল, ইকুলের দরজা খুলে গেল। বালকেরা একজন আর একজনকে খাঁজা দিতে গিয়ে ডাড়াভাঙি করে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু নিষিদ্ধ নিয়মের ব্যতিক্রম করে অর্থাৎ বাড়ীর দিকে অগ্রসর না হয়ে ডাড়া পৃথক পৃথক ভাবে দলবদ্ধ হয়ে এক এক জায়গার কানে কানে কথা বলতে শুরু করল।

বাগ্যারটী হচ্ছে ল্য ব্রানচটের ছেলে সিঁমো সেইদিন সকালে প্রথম খুলে যোগ দেয়। ছেলেরা বাড়ীতে সবাই ল্য ব্রানচটের নাম শুনেছে এবং সাধারণের কাছে যথেষ্টভাবে সুপরিচিত হলেও মা'রা নিজেদের মধ্যে তাকে ডাকিলেয়ার সঙ্গে বরা প্রদর্শন করত। এবং ছেলেরা ডাকিলেয়ার কারণ না কেনে তা শিখেছিল। কিন্তু সিঁমোকে তারা চিনতনা কারণ সে কখনও বিশেষ যায় নি। গ্রামের রাস্তায় কোনদিন ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে যেখা বাঘনি এমন কি নদীর ধারেও তাকে যেখা বাঘনি। কাজেই তারা তাকে অর্থাৎ ভালবাসত এবং অত্যন্ত আনন্দ ও আশ্বস্তির সঙ্গে আত্ম সাক্ষাতে তারা দলবদ্ধ হয়ে একটা কথা বারবার বলতে লাগল যেটা একটা চোখ বছরের ছেলে তৈরী করেছিল বলে "তুমি কি সিঁমোকে জান? ওর বাবা নেই।"

ল্য ব্রানচটের ছেলে খুলের দরজায় উপস্থিত হ'ল। সাত কি আট বছর তার বয়স, রান কিন্তু পরিষ্কার এবং তার ব্যবহার অত্যন্ত ঠিক প্রকৃতির ও কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক ছিল।

সে যখন বাড়ীর দিকে যায় কাছে বাবার অস্ত্র অগ্রসর হচ্ছিল তখন ভিন্ন ভিন্ন দলের খুলের ছেলেরা, বারো অবিরল কানাকানি করছিল এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত তার প্রতি দৃষ্টিপাত করছিল, তারা তার উপর একটা বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করার অস্ত্র তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের দাবাদান সে অস্বাক ও বাতুল হয়ে ঠাড়িয়ে রইল, ভেবে পেলনা তারা তাকে কি করবে। যে বালকটী বং

এনেছিল সে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে দ্বিজাস্য করল—"তুমি নিজেকে কি বলে ডাক?" যে বলে "সিঁমো।" আর একজন বলে "সিঁমো কি?" বালক হতভম্ব হয়ে আবার বলে "সিঁমো।" সেই বালকটী চিন্তাকার করে বলে "তোমার নাম নিশ্চয়ই সিঁমো কিন্তু একটা হ'বে শুধু সিঁমো ত' আর হতে পারেনা।" সে অন্তরা গোঁবে উত্তর দিল "আমি সিঁমো নামেই পরিচিত।" বালকেরা হাসতে শুরু করল এবং ঐ বালকটী বলে "তোমরা দেখতেই পাছ ওর বাবা নেই।"

সবাই হুপ হয়ে গেল বালকদের কাছে বাবা না থাকা যেন একটা মত অপব্যয়ের জিনিষ। তারা সবাই সিঁমোকে একটা অস্বাভাবিক ভাবে বলে ধরল এবং তখন বৃত্তল কেন তাদের মা'রা ল্য ব্রানচটকে কল্পার চক্রে দেবে। সিঁমো তখন নিজেকে পড়ে ধাওয়া থেকে কোন রকমে নামলে নিল, যেন একটা মত কি ঘটে গেছে তার ওপর, ঐ রকমই তার অবস্থা হয়েছিল; সে অনেকক্ষণ ধরে বলবার চেষ্টা করার পর চোঁচিয়ে বলে "হ্যাঁ আমার বাবা আছে।" সেই বালকটী জিজ্ঞেস করল "কোথায় তিনি?" সিঁমো হুপ করে রহিল। বালকেরা ভীষণ ভাবে উত্তেজিত হয়ে চিন্তাকার করে উঠল। ঐ এঘের ছেলেগুলির মনোবৃত্তি অনেকটা পশুদের মত ছিল। দৃষ্টিভাষা যেমন তাদের মনের একজনকে আঘাত দিয়ে তারপর তাকে ঘেরে ফেলতে চায় এঘেরও ঠিক তাই ছিল।

সিঁমো হঠাৎ আর এক প্রতিবেশীর ছেলেকে বলে—"তোমারও ত' বাবা নেই।" সে বলে "হ্যাঁ আমার আছে।" সিঁমো বলে "কোথায় তিনি?" ছেলেরা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলে "তিনি বৃত্ত।" ঐ কথার আঘাত বাবা আছে।" সবাইয়ের মা'রদান থেকে বেশ একটু খুশী লব পাওয়া গেল যেন তার বৃত্ত বাবা থাকা একটা মত কারণ হ'ল সিঁমোকে বিভ্রত করা। অপর সব বালকেরা বাঘের দাবা'রা কেউ মাডাল, চোর, বদলোক কেউ ব্রীমের সঙ্গে অত্যন্ত ধারণা ব্যবহার করে তারা ক্রমশঃই সিঁমোর কাছে ঘেঁসে আসতে লাগল, কেন যেন তারা সিঁমোকে তাদের চোঁপে ঘেরে ফেলবে। সিঁমোর পাশের ছেলেরা

হঠাৎ জিজ্ঞাসা বার করে কানের কাছে চিৎকার করতে লাগল—“বাবা নেই, বাবা নেই।” সিন্ধো তার মাথার চুল ধরে পায়ে দিল এক লাখি এবং খুব ভোরে গালে দিল কামড়ে। ভীষণ ব্যারামারি আরম্ভ হ’ল। সিন্ধো যেখন সে ভীষণভাবে মার খেয়েছে, মাথা ছিঁড়ে গেছে এবং মাটিতে তাদের মাথখানে গড়াচ্ছে। উঠল, উঠে আসা থেকে দুলো কাড়ল, একজন চিৎকার করে বলে “বাও বাবাকে গিরে বলে দাও।”

সিন্ধো মনটা বজ্র ভেঙ্গে গেল, অস্ত্র বালকেরা তার অপেক্ষা বলবান ছিল তারা তাকে ঘেরেছে এবং তার বলবারও কিছু ছিল না কারণ সত্যিই তার বাবা ছিল না। কিছুক্ষণ ধরে খুব চেষ্টা করল চোখের জলকে দমন করার কিছু পারল না। সে হুঁকিরে হুঁকিরে ধৈর্যে উঠল তখন তার লস্কীদের খুব খুঁড়ি হ’ল এবং তারা সবাই হাত ধরা ধরি করে তাকে ঘিরে গানের সুরে বলতে লাগল “বাবা নেই বাবা নেই।”

কিন্তু হঠাৎ সিন্ধো থেমে গেল। সে ক্ষেপে উঠল। তার পায়ের তলার পাখর ছিল সে ভুলে নিল ও লস্কীদের দিকে ছুঁড়ল। হুঁতিন অনেক গায়ে লেগেছিল আর সব চিৎকার করতে করতে গালাল এবং তখন সিন্ধোকে এমনই বলবান যেখাছিল যে অনেকে বীতিমত ভয় পেয়েছিল। ভীত ছেলেরের দল তাকে একলা ফেলে গালাল। হঠাৎ তার কি মনে হ’ল সে নবীর দিকে ছুটল, ঠিক করল যে সে ডুবে মরবে। আসলে তার মনে পড়ে গেল যে কয়েকদিন আগে একটা লোক যে তার জীবিকা ভিক্ষে করে চালাত, ভিক্ষের অভাবে ডুবে মরে। এখন লোকটাকে মল হতে ভোলা হ’ল তখন সিন্ধো ধাঁড়িয়েছিল এবং সেই লোকটির মৃত দেহ তার মনের ওপর একটা ছাপ ফেলেছিল; আর সব দ্বারা ধাঁড়িয়ে ছিল বলে—“লোকটী মৃত।” এবং তাদের মধ্যে একজন বলেছিল—“ও এখন স্বাধী।” হুতরাং সিন্ধোও নিজেই ভোভাবে চেয়েছিল কারণ তার বাবা ছিল না।

সে মনের কাছে গেল অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। যেখন মাঝে মাঝে হাছ জলের ওপর লাফ দিচ্ছে ও পোক।

ধরছে। তার কাছা পামল কারণ তার ঐ মাছেরের বাওয়া দেখতে বেশ ভাল লাগছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে এখন বড় উঠছিল তখন সে খুব ব্যথার সঙ্গে বলছিল—“আমি ডুবে মরতে বাচ্ছি কারণ আমার বাবা নেই।”

আবহাওয়াটা বেশ ভাল ছিল খেঁধার সুহ ক্রিয়ণে ঘাল শুকিরে গিয়েছিল, মল ঠিক আয়নার মত স্বকমক করছিল এবং সিন্ধো ঐই দৌলধাঁকে পুরোপুরি উপভোগ করছিল এমন কি এক একবার হাচ্ছে হাচ্ছিল ঐ নরম ঘানের উপর করে পড়ে।

একটা ছোট্ট মন্থর ব্যাড পায়েও তলার লাকাল। সে তাকে ধরবার চেষ্টা করল কিন্তু ব্যাড পালিয়ে গেল। তিনবার তাকে অতুলন করল কিন্তু পারল না, শেষে তাকে পিছনের পা দিয়ে ধরল, ও দত ব্যাডটা পালাবার চেষ্টা করছিল তত ও হাঙ্গছিল। ব্যাডটা তার বড় পা দুটোকে লম্বা করে দিল, ছোট পা দুটোকে লাহনে দিকে এনে নাকোতে লাগল। তাই দেখে তার ছোটবেলার একটা ক্যাটের খেলনার কথা মনে পড়ে গেল। তারপর সে আবার তার বাড়ী ও মার কথা মনে করে কাঁদতে লাগল। হাটুর ওপর বসে সে প্রার্থনা করল, তার চোখের জল কিন্তু কিছুতেই বন্ধ হ’ল না। হঠাৎ তার কাঁধের ওপর একটা বেশ ভারী হাত পড়ল এবং একটা স্বর বলছে শোনা গেল “তোমাকে কে এত কষ্ট দিচ্ছে?” সিন্ধো ফিরে তাকাল। যেখন একটা লম্বা মাছ, বাড়ী আছে, মাথার সুকিত চুল আছে, তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে ক্রোধভরা গলায় ও জলভরা চোখে বলে—“ওবা আমায় ঘেরেছে আমার বাবা নেই বলে

লোকটী হেসে বলে “কি!” “কেন সবাইয়ের বাবা আছে,” সিন্ধো অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে বলে “কিন্তু আমার নেই।”

লোকটী তখন গম্ভীর হয়ে গেল, সে লা ব্রানচটের ছেলেকে চিনতে পেয়েছিল, কিন্তু তার ভীষনী সবুছে একটা আচ্ছা ধারণা ছিল। সে বলে—“আচ্ছা পোক। শান্ত হও এবং আবার সঙ্গে এসো তোমার মার কাছে, তিনি তোমার বাবা দেবেন।”

কায়েই তারা বেতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা একটি ছোট পরিষ্কার বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল; বালকটী চিংকার করে উঠল “এই যে বাড়ী।” তারপর “মা” বলে ডাকল।

হঠাৎ সামনে একটি লম্বা শ্রীলোক এসে উপস্থিত হ’ল এবং ভহলোকটী এতক্ষণ হাসছিল এখন হাসি বন্ধ করল, কাবণ বুঝেছিল যে এই লম্বা শ্রীলোকটীর সঙ্গে তামাশা করা চলবেনা। সে এমন ভাবে ধাঁড়িয়ে ছিল সেখেন মনে হচ্ছিল যেন সে নিজেকে অপর ব্যক্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে সেখানে সে আর একজনকে ঘারা প্রভাবিত হয়েছিল। ভহলোকটী অনেক কষ্টে বলে “নাহায়া, আমি আপনাদের ছোট ছেলেকে ফিরিয়ে এনেছি সে নদীর ধারে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল।”

কিন্তু সিঁমো নার গলা ঝড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে—
“না মা আমি নিজেকে ভোবাতে চেয়েছিলাম কারণ বালকেরা আমার মেরেছে আমার বাবা নেই বলে।” শ্রীলোকটীর মুখ লাল হয়ে উঠল এবং সে ছেলেকে অতি নিবদী ভাবে আলিঙ্গন করলে ও চোখ দিয়ে জল পড়িয়ে পড়ল। ভহলোকটী বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং ভেবে পেলেন না যে কি করে পালাবেন। কিন্তু সিঁমো হঠাৎ লৌড়ে গিয়ে তাকে বলে “আপনি আমার বাবা হবেন।”

লা ব্রানচট লক্ষিত হয়ে একেবারে বোবা হয়ে পেলেন, হাত ভুটীকে বুকের ওপর রেখে দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। বালকটী ভহলোকটীর কাছে কোন উত্তর না পেয়ে বলে “যদি আপনি এ ইচ্ছা না করেন তবে আমি আমার ভূবে মরতে বাব।”

ভহলোক কথটা ঠাট্টা মনে করে বলেন “আমি নিস্তরই ঠাট্টা করি।” বালক বলে “আপনার নাম কি বলুন; ওরা জিজ্ঞেস করলে হাতে বলতে পারি।” তিনি বলেন “কিলিপ।” সিঁমো মুহূর্তের অন্ত্র চূপ করে রইল যেন নাঘটা মনে মনে মুখস্থ করে নিল তারপর সে অত্যন্ত সুদীর্ঘ সন্ধে বলে—“আচ্ছা কিলিপ তাহলে আপনি আমার বাবা হলেন।” শুধন তিনি বালকটীকে মাটি থেকে তুলে আদর করে চলে গেলেন। পরের দিন যখন বালক ফুলে

গেল বালকেরা তার দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞপের হাসি হাসল এবং ফুলের শেষে বগন বালকেরা আরম্ভ করতে বাজিল সিঁমো বলে উঠল—“আমার বাবার নাম কিলিপ।” চারিদিক হ’তে চিংকার উঠল “কিলিপ কে।” “কিলিপ কি।” কোথা থেকে কিলিপকে ছুড়িয়ে গেলে।” সিঁমো কিছু বলেনা তার বিবাহে অটল থেকে সে তারের দিকে কড়া ভাবে তাকিয়ে রইল এবং তাকে বেঁধে মনে হচ্ছিল যে সে কিছুতেই পালাবেনা। তারপর ফুলের শিকক তাকে উদ্ধার করল ও সে তার মার কাছে ফিরে এল।

তিনমাস ধরে কিলিপ প্রায় লা ব্রানচটের বাড়ীর কাছে ঘিরে বেত এবং যখনই সে লা ব্রানচটে কে জানালায় ধারে সেলাই করতে বেতত তখনই সে কথা বলত। লা ব্রানচট তার কথা উত্তর দিত তত্ব কিন্তু পতীর ভাবে, ঠাট্টা তামাশা কখনও করতনা এবং বাড়ীতে প্রবেশ করতে কোনদিন দিত না। কিন্তু ভহলোকটী বল্লনা করলে যে, লা ব্রানচট যখন তার সঙ্গে কথা বলত তখন নাকি সে পোলাপি হ’ত। কিন্তু তাতে প্রতিবেশীদের, মারের সমালোচনা বন্ধ হ’ত না। সিঁমো তার নৃতন বাবাকে বুঝি ভালবাসত এবং প্রায় প্রতিভূক দিন সন্ধ্যার বেড়াতে যেত। সিঁমো ফুলেও রোজ যেত এবং দাবীমের সঙ্গে খুব মধ্যাশা স্পন্দর ভাবে মিশিত।

একদিন সেই গুর্জের বালক তাকে বলে “তুমি মিথ্যা কথা বলেছ তোমার কিলিপ নামে বাবা নেই।” সিঁমো খুব বিরক্ত হয়ে বলে—“কেন তুমি ও কথা বলছ?” বালকটী বলে, “কারণ, যদি তোমার বাবা থাকত দায়’র বামী হ’তেন।” সিঁমোর কি রকম গোলমাল লাগল তবুও উত্তর করলে “তিনিই আমার বাবা।” বালকটী বিজ্ঞপের সঙ্গে বলে “তাহ’তে পারে কিন্তু উনি তোমার প্রকৃত বাবা ন’ন।”

সিঁমো মাথা নীচু করে গেই কারিগরের কামার-পালায় দিকে চর। হানটী ছিল অত্যন্ত অন্ধকার, আগুন জলছে কামাররা লোহা শিটছে। তারা ঐ আগুনের মাঝে যেন মৈত্রেয় মস্ত কাশ করছে। তাদের রক্তাক্ত চোখ ঐ লাল লোহার উপর নিবন্ধ রয়েছে। সিঁমো

কা'রো নম্বরে না পড়ে ভিতরে চলে গেল এবং ফিলিপের আবার হাত ধরে তাকে ডাকল। সবাই তখন তার দিকে তাকাল। সে সেমিকে ড্রেকপ না করে বলে "ফিলিপ আমার বল কেন বলেছেন বলেছে যে তুমি আমার গ্রিক মত বাবা নও।" কারিগর বলে "কেন?" শিশু অত্যন্ত সরলভাৱে বলে "কারণ তুমি আমার মার স্বামী নও।" সবাই চুপ করে রইল; কেবল একজন বলে "যে'ত না ব্রানচট অত্যন্ত ম' ও ভাল বেবে, তার ছুঁতাপা হওয়া সত্ত্বেও, সে এখনও সং সোকে'র ভাল স্ত্রী হ'বার উপযুক্ত।" আর সকলে বলে—"সে সত্যি কথা।" কারিগর বলতে লাগল—"এটা কি স্ত্রীলোকটার দোষ যে তাকে বিবাহের প্রতিজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরে বিবাহস্বতকতা করা হয়েছে।" আর সকলে বলে "সে সত্যি কথা।"

কারিগর আবার বলতে আরম্ভ করলে "বোচারী কত কষ্ট করে ছেলেকে লেগা পড়া শেখাচ্ছে, একমাত্র চার্চে ছাড়া সে কোথাও যায় না।" তারপর এক আশ্রমে হাওয়া বেওয়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। ফিলিপ তাড়াতাড়ি সিঁমোর কাছে নীচু হয়ে বলে—"বাও বাজী গিয়ে মাকে বল আমি আসব ও তার সঙ্গে কথা বলব।"

তারপর সে কাঁধ ধরে তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিল ও তাদের কাজ আবার নিয়মিত অহুলারে একই সঙ্গে চলতে

লাগল। কারিগর এখন না ব্রানচটের বাড়ী এসে পৌঁছিল তখন আকাশ তারার তরে গেছে তার শরণে ছিল রবিবারের গোখার। তরুণী বলে "এত রাত্ৰিরে আমি খাওয়া যি: ফিলিপ।" সে উত্তর দিতে চাইল কিন্তু কথা আটকে এল এবং হতভয় হয়ে তার সামনে পাড়িয়ে রইল।

স্ত্রীলোকটি আবার বলে "আপনি বোসেন ত' বে আমি চাইনা যে আমার সঙ্গে আবার মদ্যলোচনা হোক।" সে তখন বলে "যদি আপনি আমার স্ত্রী হ'ন তা'তে কি আসে যায়।" কোন উত্তর এল না শুধু ঘরে পড়ে বাওয়ার একটা শব্দ এ'ল, তাড়াতাড়ি করে কামার ঘরে প্রবেশ করলে। সিঁমো বিছানায় শুয়ে শুয়ে যদি একটা আশে বলে তাই শুনল। তারপর হঠাৎ সে বেখল নিজেই ফিলিপের কোলে—ফিলিপ বলছে "কাল তুমি স্থলের ছেলেরে বোল যে তোমার বাবা ফিলিপ রেখী এবং সে তাদের যে কেউ একটু তোমার অনিষ্ট করবে তাদের কান মলে যাবে।" পরের দিন সকালে সিঁমো পাড়িয়ে বলে "আমার বাবা কামার ফিলিপ রেখী তিনি বলেছেন দাদা অনিষ্ট করবে তাদের কান মলে যাবে।" এই সময়ে আর কেউ লাগল না কারণ কামার ফিলিপ রেখীকে সবাই জানত এবং তার মত বাবা পেলে সবাই গর্ব অহুত্ব করে।*

● বোশাণীর "Simon's papa" অবস্থার।

গান্ধীজী ও শ্রমিক

প্রথম যোড় রাত

স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় বাণীর প্রথম পাঠ্যপুস্তকেই একথা অঙ্গীকার করা হয়েছে যে প্রত্যেক মানুষেরই পরিচর্যাস্বত্ব ফল উপভোগ করার ক্ষমমত সহজ অধিকার রয়েছে।

এই সঙ্কল্পবানী—রচনা করেছিলেন গান্ধীজী নিজে। এবং এই থেকেই প্রম ও প্রমিক সম্পর্কে গান্ধীজীর মৌলিক প্রতীতির খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মানুষকে বন্ধনা করে যে বৈজ্ঞানিক উদ্ভব হয় তা কখনই সমাজের কল্যাণকর হতে পারে না। কিন্তু বিত্তের বিনাশেও সমস্যার সমাধান হবে না। বৈজ্ঞানিক বিকেন্দ্রীকরণের ভেতরই সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত

নিহিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আন্তর্জাতীন করতে হলে, বৈজ্ঞ উৎপাদনের বন্ধনগতিকে আগে আন্তর্জাতীন করা প্রয়োজন। কেন না ধনোৎপাদনের বন্ধনগতিকে অতিক্রম না জানতে পারলে ধনের বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব। গান্ধীজী সারা জীবন ধরে ধনোৎপাদন বিকেন্দ্রীকরণের সাধনাই করে গেছেন।

গান্ধী দর্শনের মূল কথা বাস্তব, কিন্তু নন। কিন্তু বস্তুর প্রভাব যে বাস্তব জীবনে প্রবল এ সত্যকে গান্ধীজী অস্বীকার করেন নি। কেন না তিনি ভাব-বিশ্বাসীমাত্র ছিলেন না—পরন্তু বাস্তব আদর্শবাদী ছিলেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি: I am not a visionary. I claim to be a practical idealist.

বাস্তব আদর্শবাদী কথাটী পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু গান্ধীজীর সমস্ত জীবনই ত আদর্শকে বাস্তবে

পরিষদ করবার এক অশুভ সাধনা। অথবা ঘরিরে বলা হার গান্ধীজী যেন বাস্তবকে আনন্দরূপে সেবার দিয়া সাধনাই জীবন ভরে এবং পরিষদের মৃত্যুভয় মৃত্যুর ভেতর দিলে করে গেলেন।

গান্ধীজীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র ব্যক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচয়ের সমাপ্তিও কলমই রাখিত দৈবত্ব। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাই ধনোপাধানে সঞ্চিত অংশ গ্রহণ করতে হবে তা না হলে ব্যক্তিও অথবা সমষ্টিগত ভেদে উপাধানে অসম্ভব।

গান্ধীজীর ধারণার সমাজের স্বেচ্ছা প্রমিত। ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত একটি ছড়া কবিবার দৃষ্টির মত তাঁরও প্রত্যক্ষ বেন:

When Adam delved and Eve span,
Who was then a gentleman?

প্রমহান জীবনকে তিনি তস্করের জীবন বলে অভিহিত করেছেন। অমহান বনিবনের জীবনকে তাই তিনি পরগাছার সপোন বুলনা করেছেন।

প্রমহানই কিন্তু কার্যকর প্রমহান নয়। যদিও কার্যকর প্রমের উপরেই গান্ধীজী অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বোধ করে জোর দিয়েছেন। কারণ পরে বসিছি।

বস্তু ও প্রতিযোগিতাই যতমান বস্তুকোশলিক সভ্যতার অভিজ্ঞাপন স্বরূপ। বস্তু অথবা মানবের মস্তিষ্ককেই সৃষ্টি। কিন্তু এ যেন এক নতুন ভাষাগোল—এক অভিনব Frankenstein প্রত্যেকেই ভয় করতে—প্রত্যেকেই গ্রাস করতে সম্মত। কিন্তু বহুৎ ক্ষমতার উত্তাবন মানবকে নিবের পর দিন কোর করে দিচ্ছে। এক দিকে ভূতাত্ত্বিকদের গোল বেড়েই চলছে অন্যদিকে নিরস্তর সংখ্যাও বেড়ে চলছে। নিরর্থক বাহ্যিকের বিবর্তকে অভিজ্ঞাপন দিলে অথবা ইনিরে বিনিরে বিজ্ঞাপন করলেই এই সমসার সমাধান হবে না। আবার প্রেমী সমাজের পথেও এই সমসার সমাধান ছিলবে না।

গান্ধীজী তাই জোর দিয়েছেন কার্যকর প্রমের উপর। বস্তু মনকে তিনি গোড়া থেকেই আরও গ্রাসতে চেন। তাঁর পরি-কল্পিত ‘স্বরাজ্য’ তাই নিজের উপর নিজের রাজ্য। নিজের কাছেরের সৈন্যধীন প্রয়োজনের সব জিনিসপত্রকেই নিজের প্রস্তুত করে নিতে হবে—। এই ব্যবস্থার পরিচয়ের বন থেকে কাটকে বন্ধনা করার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে না—এবং প্রতিযোগিতার স্থানও ইয়াতে নেই।

এই সমাজ পরিকল্পনাই জীবনায়নের পন্থা—। এটা অতীতের কল্পনাকে মিলে বাবার আহ্বান নয়। কিন্তু এই জীবনের পরিকল্পনাতে চান্দ্র করতে প্রথমই প্রয়োজন সংযমের—প্রয়োজন সেই দ্বিধা দিকের বার জোড়ার কথা ভেদ ভাঙেন ভূতাত্ত্বিক।

আর এইখানেই আসে গান্ধীদর্শনের অন্য মৌলিক প্রতিষ্ঠা—সত্য, অহিংসা ও প্রেমের কথা।

ব্যক্তি একটি বস্তু নয়। পরস্তু তার জীবনে সাম্প্রতিক চৈতন্য, মানবিক ভাবনা ও দ্বিধা ধারণার স্বচ্ছন্দ অবকাশ রয়েছে। অসম্ভবমহান ব্যক্তিক জীবনকেই ব্যক্তিক জীবন বললে মাত্রাভুক্ত বুল করা হবে। অনেকের মতে মাত্রকপীর দর্শনের ব্যাখ্যাক

টুটিই এইখানে। পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশ মানব জীবনকে প্রভুতভাবে—অসত্য প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করে রাখে—কিন্তু পারিপার্শ্বিক প্রভাবই জীবনের সবকথা নয়—না একটী ব্যক্তি কথা নয়। পরিবেশের অতীত যে মানবিক সত্য রয়েছে—পারিপার্শ্বিকের উৎসাহ যে মানবিক চৈতন্য রয়েছে তাকে অস্বাভাবিক করে কোন সমাজ পরিকল্পনাই বাস্তব হতে পারে না—তা সে বতই কমবুখানী হোক না কেন।

গান্ধীজীর সমাজ পরিকল্পনা বাস্তব—কিন্তু বস্তুবাদী নয়। তিনি তার সমাজ পরিকল্পনাকে রাম রাজা বলেছেন। কিন্তু এ রামরাজা—আধ্যাত্মিক বস্তু নয়—না তাই বিলাসীর স্বপ্ন নয়।

জীবনের প্রথমভাগে যে প্রমহান গান্ধীজীর জীবনকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল সেটা হচ্ছে মনস্বী রাস-কিনের “Unto this Last”। এই প্রমের একটি অর্থের উক্তি আছে: I must be just before I am generous. অর্থাৎ উনার হবার পূর্বেই অন্যতম ন্যায়পরায়ণ হওয়া চাই। গান্ধীজীর রামরাজা এই ন্যায়ের রাজ্য। উনার হওয়ার চাইতে ন্যায় পরায়ণ হওয়ার উপরই তিনি বোধ করে জোর দিয়েছেন। সমাজের প্রতিটী মানবই ন্যায়পরায়ণ হউক ইহাই গান্ধীজীর কামনা ছিল—আর এই ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সমাজ ও করে গেছেন জীবন ও মরণের তিতর দিয়ে। সাধারণ ভিত্তিতে কোর শর্যক স্থাপনই ছিল তাঁর স্বপ্ন। কিন্তু অন্যায় স্বাভা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অন্যায় পূর্বে বহুতর অন্যায়ের স্মারই পূর্বদেয় পাঠে কিন্তু কল্যায়ের পথে নিয়ে যেতে পারে না। এ ন্যায়ের রাজ্য পূর্বে সভ্য, অহিংসা ও প্রেমের স্মারই স্মার্যাপিত হতে পারে। গান্ধীজী অন্যায়ের সপোন অসহযোগের কথাই বলেছেন—কিন্তু অন্যায় করতে বলেননি।

কৃষ্টির শিল্পের এবং কার্যকর পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে যে ব্যতিকোশলিক সমাজব্যবস্থার পরিকল্পনা তিনি করেছেন সে ব্যবহার সভ্যতারের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা এক সাম্প্রতিক নৈরাজ্যেই সম্ভব। কিন্তু এ সাম্প্রতিক নৈরাজ্য রাতরাতি স্থাপিত হবে বলেও তিনি কল্পনা করেননি। এ কামা পরিণতিতে সম্ভব করতে সাধারণ প্রয়োজন আর সেই সাধারণ জন্য অসম্ভবতা সম্বন্ধেও প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন এই: এই অসম্ভবতা সম্বন্ধে বিতর্কালী কি আরও বিতর্কালী হবে—নির্ধন কি আরও নির্ধন হবে—? প্রথম কি তার প্রমমন্ড ফলের পরিপূর্ণ ভোগের অধিকার পাবে না? গান্ধী পরিচালিত নৈরাজ্য বর্তমান না স্মার্যাপিত হচ্ছে ততদিন গান্ধীজীর অনুযায়ীদের নিকট দুইটী ব্যক্তি পন্থা উন্মেষ্ট। নিজের জীবনে ভেদ ভঙেন ভূতাত্ত্বিক এই দ্বিধা বাণীর মহৎ দিককেই প্রতিষ্ঠিত করা—ও ধনোপাধানে পন্থা বিবেচনাত্মক করা—এবং অন্যটী হচ্ছে ব্যক্তি বনী ভাঙের নিজেদের ঐশ্বর্যের অর্ধাংশে থেকে সমাজ কল্যাণেই পূর্বে ঐশ্বর্য নিয়োজিত করতে অনুপ্রাণিত করা।

গান্ধীজীর ধারণার মানব সমাজ বিশ্বাশ্রিত নয়—কেননা মানবিক ব্যক্তি এক ও অশুভ—। কাজেই ধনিক ও প্রমিত

শ্রেণীবিন্যাস বিশেষ প্রস্তুত। সুতরাং শ্রেণী সংগ্রহ ও শ্রেণী বিশেষ কলাগকর হতে পারে না।

গান্ধীজী যে শ্রেণীহীন, বর্ণহীন ও জাতিহীন সমাজের পরিকল্পনা করেছেন—যে গরিবমানর ভারতের ‘শ্মশান’ তিনি দেখেছেন তার প্রতিষ্ঠা শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হতে পারে না—তার প্রতীতি সত্য, অহিংসা ও প্রেমের পথেই শৃঙ্গ তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

জীবন হিসেব, অসত্য ও বিশেষ ‘বে’ আছে—হিসেব

উন্নত পৃথিবীর নিত্য নিত্য স্বপ্নের মধ্যে দাঁড়িয়ে তা কি করে অস্বীকার করা যায়?

কিন্তু হিসেব, অসত্য, ও বিশেষের প্রতি গান্ধীজী নিজের জীবন দিয়ে এই অমর উত্তর রেখে গেছেন:

তোমার চেয়ে আমি সত্য।

এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ

শিখ সত্য, লান্টি সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক*

● কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে প্রচার।

অনুবৃত্তি

প্রিয়তম প্রাণী

এখনও মেয়েটি শূন্য আছে। বিপর্যাস্ত বেশে এলোমেলো ভাবে শূন্য আছে। গভীর নিয়ন্ত্রণ স্বপ্নালয় হতে আছে আর ঘুটি অস্তিত্ব চোখ। তার নরম চুল পর্শ করে আছে একধানা হাত। আর একধানা আলতোভাবে বিছানার একপ্রান্তে পড়ে আছে। জনালার পর্শা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে কোঠাপতি ভদ্রণ স্বপ্নানার হীরেয় রাস। স্বপ্ন আর কলোবাঝারের কলায়ে আজ ব্যান্ধে তার অপব্যাস্ত টাকা। হাতে তার চলন্ত সিগারেট, কী বেনে গভীর চিন্তায় সে আচ্ছন্ন। মেয়েটিকে সবাই চেনে। গতকাল তার কুড়ি বছর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তাকে মোটেই যোবার বেলাই মনে হয় না। তার কথের চারিদিকে কালো কুচকুচে কোকড়া চুলের গুচ্ছ ছড়িয়ে আছে। ছোট্ট মূকোর নীচে তার পেলব গ্রীবা দেখা যায়, মঙ্গণ ঘুটি ঝাড়। নিবিড় শূন্যের নিম্নবাসে তার সুগোল কোমল বক করণ কণে কাঁপছে। তার সারা অবয়ব অশ্রুত দৃঢ়তামান। সারা বিশ্বের কামনা তার সম্বলণে বেনে ছড়িয়ে আছে। পৃথিবীর আঁশম লাগসার ও শিশুর সরলতার বিচিত্র সমন্বয়ে ঘটেছে তার বেহে। তার হৃৎ ও কামনের প্রাচুর্য। সোসাইটীর অন্য মেয়েদের ইর্ষার কারণ। তার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করা সত্যি বড় দুঃস্থ ব্যাপার। তাঁর সূর্য্য উদ্ভব সেলায় সে বেনে বিড়ের করে সময়কে।

পান ফিরে সে বাঁ হাতের ওপর তার মাথাটী নামত করল। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকিয়ে নিবিষ্ট মনে ফিকে নীল স্রং-এর পর্শার দিকে চেয়ে রইল। ঘরের বিচিত্র মহাব্যাস আলবাব ও তার এই অনিন্দ্যসার্থিত সত্যই সাধারণতঃ নজরে পড়ে না। কন্যাসৌ বেনে তার উপবৃত্ত নীড় বৃঞ্জে পেরেছে। ঘরটী হালকা নীলরং-এর। মৃদু-সুগন্ধ ব্যাস্ত হয়ে আছে সারা কক্ষ। জনালার কাছে তখনও বসে আছে হীরেয় রাস। শেষ টান দিয়ে সিগারেটটী ছুড়ে ফেলে দেয়। সে তার প্রিয় ঘোড়াটীর কথা ভাবছিল, কাল পড়ে গিয়ে ফোঁরা বড় বাধা পেরেছে। পাঁজরার হাড় ভেঙ্গে যাওয়াও অশুভবী নয়।

তখনও সে ওঠেনি, তেমনি ভাবে শূন্যে আছে। কাল রাতের

স্বপ্নের কথা বৃষ্টি তার মনে পড়ছে, চোখের সামনে বৃষ্টি ভেসে উঠেছে কোন রশ্মান মূর্ত্ত। তার পাতলা সোলোপী টোপের কোণে হাঁসির সূক্ষ্ম রেখা কুটে ওঠে। শরীরের আড়-মোড়া ভেঙ্গে সে ধীরে ধীরে উঠে বসে হঠাৎ কি মনে করে তাকাতাড়ি উঠে দরজা খুলে দ্রুত পদক্ষেপ বাইরে চলে যায়।

হঠাৎ হীরেয় রাস দেখতে পেল তার ঘোড়াটী বেশ লক্ষ্যসেই হাটছে। তাহলে বেশী ব্যাধা পারানি ঘোড়াটী। বৃক থেকে দৃশ্টিচলতার বোকা নেমে গিয়ে তার মন আনন্দে ভরে উঠলো। আর একটী সিগারেট ধরিয়ে বিছানার ওপর বসে নিশ্চিন্ত আগ্রাসে ধূমপান করতঃ লাগলো। হঠাৎ নীল রংএর পর্শার ওপর তার নজর পড়ে। কি মনে করে সে পোবার ঘরের সমস্ত পর্শাগুলোর দাম মনে মনে কষতে শুরু করল। ঘরের সব মূল্য-বান আসবাব ও পর্শাগুলোর দাম একত্র করে একটা বিরাট সংখ্যা তার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। গত জীবনের মধ্যে বহুমান অবস্থা তুলনা করে গর্বের ও আনন্দের তার বৃক ভরে যায়। আয়ের দিনগুলোর কথা মনে হলে তার মন ধূমপান সম্বৃত্তিত হয়ে যায় তার মন। সিগারেট মেলে দিয়ে বালিশের ওপর শরীর এলিয়ে দেয়। মেয়েটির নরম দেহের উত্তাপ এখনও বালিশে লেগে আছে। একগাছি মঙ্গণ চুল বালিশে পড়ে আছে। সেটাকে তুলে নিয়ে আদালত জড়াতে জড়াতে মেয়েটির কথা ভাবতে লাগলো। মনে হোল এ হৃৎ শৃঙ্গ এ বয়েই মানস।

বেলাজয়ন কার্পেটের ওপর পা দিয়ে ভাল দিতে দিতে একটী বিলাতী গান গুলু গুলু করে গাইতে লাগলো।

হঠাৎ তার রাইডিং বুট জোড়ার কথা মনে পড়ে। আজ তিন ঘাস ধরে সে উঠে কয়েক রোজ সকালে কে বেনে তার বুট জোড়াকে চক্‌চক্‌ পালিশ করে তার পোবার খরে রেখে যায়। অথচ কে যে পালিশ করে তা সে জানতে পারে না।

মেয়েটির কথা ভাবতে শূন্য করলেই তিনঘাস আগের একটী ঘটনা তার মনে পড়ে। এক ঘুড়ীর পরিবারে অসামান্য হৃৎ নিয়ে সে জন্মেছিল। সেই নোয়া পরিবেশে বড়ই বেমানান লাগতো তাকে। কালো মেঘের মাঝে একটী হুপোলী রেখার মতই মনে হোত। মাত্র পাঁচহাজার টাকার বিনিময়ে তার বাপমায়ের কাছ থেকে তাকে নিয়ে আসে। সে আর একটী সিগারেট ধরল। আরও একটা ব্যাপার তার কাছে হেঁয়ালীর মত মনে হয়। যোজ সকালে আখ ফটার জন্য মেয়েটি বেনে কোথায় উঠাও হয়ে যায়।

এতদিন সে কিছু মনে কর্তান কিস্তি আজ ঠিক করেছে তাকে খুঁজে বের করবেই।

মীর খাঁজে সে ঘরের বাইরে এসে বাড়ি। কান্টকে কোন প্রশ্ন না করে তার বিরাট প্রসাধনের প্রতিটি ঘর খুঁজে দেখতে লাগলো। হঠাৎ কোণের একটা ছোট ঘরে খন্ খন্ আওয়াজ সে শুনে পেল। শব্দ বৃদ্ধির সিরে কেউ কেন কিছু ঘবে ঘবে পরিষ্কার করছে। সে ভাবল হয়তো কোন চাকর। এর করছে হয়তো মেয়েটার খোঁজ পাওয়া যেতে পারে, এই ভেবে এগিরে গিরে ঘরের চৌকাত পা দিয়েই প্রচণ্ড বিস্ময়ে সে হতকাক হয়ে দাঁড়িয়ে হইল।

ঘরের নাকখানে মেয়েটা হাটুগড়ে বসে তার একটা রাইজিং বুট নিয়ে প্রাশপনে বৃষ্ণ দিয়ে ঘবে পরিষ্কার করছে। তার খাঁ পাশে আর একটা বুট রয়েছে। নিশ্চয় হাতের পালিসে আঘাতের মত সেটা উল্লঙ্গ হয়ে উঠেছে। জুতোর বত মরলা তার চার-দিকে ছাড়িয়ে আছে। জুতো থেকে মরলা বুটে তোলবার জন্য একটা ছুঁড়ীও পড়ে আছে সেখানে। কোন দিকে দৃকপাত না করে আপনি মনেই সে জুতো পরিষ্কার করে চলছে। নিজেতে এ কালের মহা সেন হাতির কেলোছে। ছোট কপালটীতে বিপ্লু কিশু'র মত ক্রমে উঠেছে, তার ওপর তুলসীলো এলোমেলো ভাবে এসে পড়েছে। মাকে মাকে হাত দিয়ে তুলসীলো সিরিয়ে বের আবার একদমে তার কাজ সুরু করে। ক্রমে ক্রমে এলোমেলোও সুরুতে হয়ে ওঠে। তার মূখ হাসিতে ভরে ওঠে। জুতোটাকে পুরনো আয়ত্নে বাক্যে চোপে ধরে, কী সেন গভীর আনন্দ সে ওতে পায়। নিঃশব্দ তার হৃদয়ের হয়ে ওঠে।

কীর্তন বাড়ী

সুন্দরানী ঘোষ

১৯৪৪ সাল। সমাগরা মেরিনী জুড়িয়া সমরসেবতার তামড়লীলা চলিয়াছে। মহাবিরসে মহতর সময় পরিপূর্ণ মহিমার সহিত অগ্রসর হইতেছে। বিশ্বব্যাপী এই বিপুলে আয়োজনের একটি ক্ষুদ্র তরণা বিশ্বের অতিক্রম এক কেহন তরণাকৈর ক্ষুদ্র এক কল্যাণীকনে যে বিশ্ববের সৃষ্টি করিয়াছিল সেই সামান্য কীর্তনীটিই এখানে বিবৃত করিব।

কীর্তনীটির পটভূমিকা হইল একটি কল্যাণকূট। যুগের দ্বন্দ্বাতর অপরিসর্য অঙ্গ হিসাবে করলার চাহিদা বহুদূর বাড়িয়া গিয়াছে। দর্শকের সে কল্যাণদ্বারা সমস্ত ভারত-বর্ষ—কিশোর করিয়া বাঙ্গালানগকে উল্লসিত করিয়া তুলিয়াছে কল্যাণকূটীর মজ্জার তাহা স্পর্শ করে নাই বলিলেও চলে। গভর্ণমেন্ট স্বয়ং তাহদের প্রয়োজনীয় প্রণালি জোগাইবার ভার লইয়াছেন।

প্রথমে এই গল্পের নায়ক কীর্তন বাড়ী এইরূপ একটি

তার শিরার বইয়ে তারই বাগ্ময়র রক্ত। কিছুতেই সে ওটা ভুলতে পারে না। প্রতিদিন যুগ থেকে উঠেই বাগ্ময় বাড়ীর নোহো সিকুর কথা মনে পড়ে। সেখানে বাগ্ময়র নানা মকমের অনেক জুতো থাকত। সেখানেকের মাকে মাকে মনেও সে দেখত। কিছু পরিষ্কার করবার একটা অম্মা সেখা তাকে গেরে বসত। জুতো হলেও তার কোন আশ্রিত ছিল না। মানুকের মনের সেবার মত এটাও ছিল তার একটা সেখা। কিছুতেই এটাকে ছাড়তে পারতো না। তাই রোজ সকালে উঠে জুতো পরিষ্কার করবার জন্য এই ছোট ঘরে সে বুটে আসতো। সুন্দর আশ্রিত দিয়ে বুটে বুটে জুতোর মরলা তুলতো। বতক্সন এটা না করতে পারত ততক্সন মনে হতো সে যেন তার জীবনের প্রেষ্ঠ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। সে আর শিখর থাকতে পারতো না।

হীরেন আস্তে আস্তে পেশনে দিয়ে তার বাহু স্পর্শ করে। মেয়েটা অপ্রতিত হয়ে তারিখের থাকে যায়। তার হাত থেকে বুটে ছোড়টা তুলে দেয় তারপর মেয়েটার দিকে দুটো টাকা ছুড়ে ফেলে দিয়ে হীরেন ঘরের বাইরে চলে যায়।

কিছুক্সন বাসে অতন্ত বিব্রত ও ব্যাপ্রাশিত হয়ে মেয়েটা তাকে একখানা চিঠি লিখল। তাকে অবমাননার জন্য একলাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করে সে হীরেনকে এই পত্র দিয়েছে।

হীরেন শুধু জুতো পরিষ্কারের জন্য রোজ দুটো হিসেবে ডিনমাসের পারিশ্রমিক একশ আশী টাকা পত্রবাহকের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল।

• Emile Zola একটা বঙ্গ মনসবন।

কল্যাণকূটীর মজ্জা। গল্প আরম্ভের পূর্বে তাহার সাক্ষ্যন্ত চরিত্রটিপ ও পুঙ্খ ইতিহাসে কিছু বলা প্রয়োজন। কীর্তন সাধারণ একটি কাকাইকুলী কিশু তাহার চরিত্রটি ঠিক সাধারণ নহে। কৌতুহলী মনস্তত্ত্ববিদের গবেষণার বিষয়বস্তু হইতে হইতে পারে। বাড়ীর সমাজের অন্য পাঁচজনকে সঙ্গে নালা-বিশ্বেরই তাহার আশ্রিত। সে অত্যন্ত হিসাবী ও সঙ্করা—বাহা বাড়ীরসমাজে একান্ত দুলভ; সে কখনও মম খায় না বা জুতো খেলে না—বাহা আরও দুলভ। লোকটি অত্যন্ত সাদাসিমা—সোজাতাবার বেশ প্রতিমত বোকা। কিছু অভিনয় সংস্কৃতি। কীর্তনের আর একটি বিশেষ স্তায় প্রতি ঐকান্তিক বত। বাড়ীরদের ভিতর নিষ্ঠাবান শ্রমী বা আবেগবাহুল প্রেমিকের দরত অভাব নাই কিন্তু কীর্তনের মত স্তায়িক বত। কর্তত সহসা দেখা যায় না। কীর্তনের স্তায় একবার শুধু অকুণ্ঠ হর—সে তখন বহুদিন বাক তাহার চিকিৎসা করার—নিজঘরে দানী টানক কিনিয়া বাওয়া; দু' একদিন নয়—বহুদিন সে এইভাবে স্তায় চিকিৎসা করে, সুস্থ হইবার পরও তাহাকে বাসে বাড়িতে বের না। বাড়ীরদের পক্ষে স্তায় এইরূপ বত। কতাই স্তায়ী আশ্রিত। ইহা ভিন্ন নানা বৃষ্টিনাটি ব্যাপারে তাহার ঐকান্তিক বত। সর্বনাই আতপ্রকাশ করত। কীর্তনের পত্নীপ্রেম বেশ

একটা প্রবাদবাক্যের মতই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বাউরীসমাজের মেয়েরা এত বড়ো অভ্যস্ত নয় বলিয়াই বোধ হইত কীর্তনের বৌ ভাষার এ স্বল্প প্রেমামৃত্যুর মধ্যদা বৃক্ষিল না। আশ্রম মানবের রস এখনও তাহাদের দিয়ার, শিয়ার—তাহারা বোকে অনুভূতির অতপট উপলব্ধ প্রকাশ। প্রেমিকার হৃদয়ে কখনও প্রস্তুত প্রহার—কখনও বা তেমনিই প্রলম্ব সোহাগ—দুইই তাহারা প্রণয়লীলার রূপভেদ বলিয়া জানে। মোড়ের উপর বন্য নারীর উজ্জল রত্নধারা সত্য মানবের স্বল্প রসবোধের ধার ধরে না—উদ্ভাস প্রেমের লীলাই তাহারা বোকে সহজে। কারণ বাহাই হউক কীর্তনের বৌ তাহার এত আদর-বত্ন উপেক্ষা করিয়া একদিন অপর এক বাউরীস্বরের সহিত গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বাউরীসমাজে এহু পত্নীত্যাগ বিস্ময় বিবল বা অস্বাভাবিক নহে কিন্তু এহু পত্নীপ্রেমিক স্বামীর গৃহত্যাগ এহু অল্প অল্পরূপে গৃহত্যাগ আলম্ব্য বোকে? সন্দেহই অস্বাভাবিক হইল কারণ মনের গহনে নিজেও অসোচারে কোন গোপন ডাকঘরা যে কীর্তনের বোকে ঘর বাড়ীইহুই তাহার সম্ভাব্য কে রাখিতে পার? সে নিজেও কি জানে?

কীর্তন তো একবারেই মহামান হইয়া পড়িল। অত্যন্ত সরল মানুষ সে—এহু অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতা কখনও আশঙ্কা করে নাই। এইভাবে প্রায় একবছর কাটিয়া গেল। এমন সময়ে করলাকুঠীর বহুসংখ্য ছাত্র আসিয়া নবতর আশ্রমের দৃষ্টি করিল কীর্তনের স্বীকৃতি। বকসিমে, মাঙ্গসীভাতার, বর্ষিত মাহিনার—করলাকুঠীর বহুসংখ্য শ্বাঙ্কলার আর সীমা রহিল না। এই প্রচুরের মধ্যে নতুন করিয়া ঘর বাঁধবার স্বপ্ন জাগিয়া উঠিল কীর্তনের মনে। দ্বয়ের এক গারে একটি ভাল মেয়ের সম্ভাব্য পাইয়া নিজের সম্ভাব্য নিজেই করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে সে গেল। সেই গ্রাম তখন '৫০ এর রম্যস্তরের অভাব ও অনটনে পূর্ণ—করলাকুঠীর স্বল্পসুবিধা তো তাহারা পায় না—তাহারা কীর্তনের শ্বাঙ্কলা দেখিয়া বিস্মিত হইল। এমিকে তখন খান্দে মেয়েমজুর নামা পুণ্ডে:প্রচলিত হইয়াছে; আইন হওয়ার পূর্বে শ্বাঙ্কলার নীচে কাজ করিত এমন দৃঢ়চরিত্র বন্য স্ত্রীলোক সেই গ্রামে ছিল—তাহাদের নিষ্ঠুর স্বপ্ন দানিয়া ও কীর্তনের সম্বন্ধপ্রকার প্রচুর দেখিয়া কীর্তনের ভাবী বৌ গুজরী গ্রামের আরও কয়েকজন স্ত্রীপুত্রদের সহিত কুঠীতে কাজ করিতে আসিল। কিছুদিন বাসে করলাকুঠীতেই কীর্তনের সহিত গুজরীর বিবাহ হইয়া গেল।

বেশ সুখেই এবার কীর্তনের দিন কাটিতে লাগিল। গুজরী মেয়েটি শান্ত ও নম্র। অভাব অনটনের বেশ হইতে আসিয়া নিজের ও কীর্তনের উপাঙ্গত্বে এবং কীর্তনের ভালবাসার নিজেও সন্তুষ্টিশালিনী ও সৌভাগ্যবতী ভাবিয়া বেশ সুখেই ছিল। মনে হইতছিল দিনগুলি এখন হইতে কীর্তনের এই-এহু নিরুদ্বেগ আনন্দের মধ্যেই কাটিয়া যাইবে। কিন্তু ইতি-মধ্যে ঘটিল এক বৈষম্যবাক্য।

খান্দে কাজ করিবার যেমন সুখ আছে—দুঃখও আছে। কিছু কিছু দৃষ্টান্ত সেখানে অনিবার্য। সেইহুপ একটি দৃষ্টান্ত

একদিন ঘটিল গেল কীর্তনদের খান্দে। খান্দে ছিল ইনস্টাইন বা সিদ্ধি দাস। প্রায় ৫০০ ডিগ্রী নীচে করলা—সেখান হইতে ইতিমধ্যে সাহায্যে করলাভার্ট টন উপরে উঠান হয়। তাহার পাশেই কিছুসংখ্য লোক ওঠা-নামার রাস্তা। পায়ে পাড়ার শিকল ঝিড়িয়া করলাভার্ট পাড়ী এমিকে এমিকে ছিটকাইয়া পড়িয়া প্রাণহানি করে এই আশঙ্কায় লোক চলাচলের রাস্তাটি কিছু দূরেই করা হয়, আরও নিরাপত্তার জন্য হলেমজারদের মাঝে মাঝে কয়েক হাত অন্তর স্থান-হোল Manhole অর্থাৎ নিরাপদে লুকাইয়া থাকিবার মত গর্ত এক একটি থাকে। কিন্তু সভ্যতার বিপদ বন্ধন মানুষের অদৃষ্টে আসে তখন ঐতিহ্যের রাস্তা সহজ কথা নয়। সেদিন এম খান্দে একজন লোক বন্ধন উপরে উঠিতেছিল সেই সময় চালায়ানদের চেন লাগাইবার ভুলে ভাঙ্গাল হইতে একসঙ্গে খালি পাড়ী ছুটিয়া গিয়া তার-বেগে খান্দের নীচে নামিতে থাকে। আসন্ন বিপদের সম্মুখে বিভ্রান্ত লোকেরা দীর্ঘনিশ্বাস জ্ঞানশূন্য হইয়া চেচানিতে ও ছুটাছুটি করিতে করিতে স্থানহোলে প্রায় গইবার পূর্বেই পাড়ী-খালি তাহাদের উপরে আসিয়া পড়ে।

কীর্তনের বৌ গুজরী ও তার দলের লোকেরা এই দলের ঠিক পরেই উপরে উঠিতেছিল। তাহারা গ্রামের লোক—করলা কুঠীতে এই প্রথম কাজ করিতে আসিয়াছে; করলাকুঠীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠাভিত্তিক মজুরদের মত দৃষ্টান্তের আওতায় তাহারা মানুষ নহে—মানুষিকের মত দৃষ্টান্তকে নির্যাত্ত বলিয়া মানিয়া গইবার মত মনোভাব তাহাদের তখনও হয় নাই। এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া তাহারা আরম্ভে যেন দিশাহারা হইয়া গেল, কোনমতে উপরে উঠিয়া আসিয়াই তাহারা—গ্রামের কয়েকটি লোক বলিয়া—পলাইয়া গেল। কুঠীর লোকেরা তখন সকলেই খান্দের ধারে দৃষ্টান্তের বিবরণ লইয়া ভটলা করিতেছে; তাহাদের এই পরামর্শ তাই কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না।

এমিকে কীর্তন ঘরে আসিয়া দেখে দরজার শিকল তোলা, অন্যায়দের মত চুলার উপর ভাতের হাড়ি চাপান নাই, গুজরীও ধারে কাছে কোথাও নাই। সে ভাবিল তাহা হইলে গুজরী হয়ত তখনও অন্য কার্যমন্দের সঙ্গে এই দৃষ্টান্তের ব্যাপার লইয়া ভটলা করিতেছে—কীর্তন তাহাকে খুঁজিয়া আনিতে গেল। কিন্তু গুজরীকে তো খুঁজিয়া পাওয়া গেলই না—তাহার গ্রামের অন্য লোকদেরও কোন সম্ভাব্য পাওয়া গেল না; তখন সকলেই বৃক্ষিল যে তাহারা পলাইয়াছে। কীর্তন তখনই—সেই প্রান্ত অতিক্রম দেখেই দৃঢ়চরিত্রতার গ্রামের দিকে রওনা হইল। একবার ঠিকিয়া সে বৃক্ষিয়ারে, এবার আর কাল বিক্রম নয়। কিন্তু গুজরীও আনিত যে কীর্তন তাহাকে খুঁজিতে আসিবে, সেইজন্য সে নিজের গারে না ফিরাইয়া অন্য এক গারে দৃঢ়চরিত্রের কুঠীঘরের বাড়ী লুকাইয়া রহিল। সে আর কোনকালেই করলাকুঠীতে ফিরাই যাইবে না—গারের মেয়ে গারেই থাকিবে—তাহাতে যত দৃঢ়চরিত্রই সহ্য করিতে হউক না কেন।

কীর্তন অনেক খুঁজিল—কিন্তু গুজরীও খোঁজ কোথাও পাইল না—গুজরী অস্বাভাবিকজন সকলকেই নিষেধ করিয়া ঘিরিয়াছিল তাহার সম্ভাব্য কীর্তনকে না জানিতে। প্রায় একমাস

পরে সে পুনরায় কুঠীতে আসিয়া কাজে ভর্তি হইল। প্রথমে পুষ্করীর সহিত বিবাহের পক্ষে, পরে তাহার খোঁজ করিতে কীৰ্ত্তনের সঙ্গিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যত্ব এখনও পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে—কাজে ভর্তি হইয়া আবার সে

যথেষ্ট উপাধ্বনি করিতে লাগিল—আবার সে সত্তরে ঘন দিল। কে জানে দূরত না কোন এক মহত্মা-মণির চঞ্চল ফলশ্রোমিন আবার তাহাকে নীড় বাগার স্বপ্নে উত্তলা করিয়া তুলিবে।

জাগতিক

ঐশ্বর্য্যের চক্রে রায় চৌধুরী

ইউ, এল, ও সন্মিলন—দীর্ঘ তিন মাস হইয়া গমনিত জাতিপুত্রের সাধারণ অধিবেশন পার্য্যী মহা-নগরীতে অক্লান্ত হইতেছিল। সেই অধিবেশনের অবলম্বন ঘটনাছে কিন্তু কলাকলের দিক হইতে বিচার করিলে, শান্তিকামী বিশ্বমানবের নৈরাশ্র ছাড়া আর কিছুই তাহারা স্বপ্ন করিতে পারে নাই।

আনবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদ শেষ হইতে হইতে এক বৎসরের জন্ত টিকিয়া গিয়াছে। ২। আন্তর্জাতিক আইনের দিক হইতে বিচার করিলে 'জীনোসাইড' বা ব্যাধক হত্যা—তাহা বিশেষ কোন ধর্ম্ম গোষ্ঠী-বা সামাজিক গোষ্ঠী নির্মূল করিবার জন্তই হউক যে-আইনি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব এখন বিভিন্ন সভা রাষ্ট্রগুলির বিবেচনাধীন। ৩। মানবতার অধিকার সম্বন্ধী বিলম্বীও বৃহত্ত হইয়াছে। মানব সভ্যতার উপর ইহার কল্যাণ সম্পূর্ণ অনিচ্ছিত। ৪। ফিলিস্তিনের জন্ত নতুন করিয়া একটা মীমাংসা কমিশন গঠিত হইয়াছে। যদিও সন্মিলন তথাকার সমস্তা নিরাকরণের জন্ত কোন সঙ্গত পন্থা নির্ধারণ করিতে সক্ষম বা সাহসী হন নাই। ৫। কোরিয়া ও বলকানের জন্ত যে কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহাষের জীবনকাল আর একবৎসরের জন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই দীর্ঘ তালিকা মানুষের মনে কোন আশার লক্ষ্য করিতে পারে না। দুই একটা বিষয় বাদ দিলে প্রায় সবগুলিতেই পূর্ক এবং পশ্চিমের শক্তি সমষ্টির ভিত্তর আত্মপূর্ণতা বিরোধের কলে কোন একটা বিষয়ে আত

মীমাংসার নানতম সভাবনাও দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই অধিবেশনের সমাপ্তির শেষে উৎসবের আলো এখন একে-একে নিস্তৃত হইয়া আসিতেছিল, সভাপণ স্রাস্তি, নৈরাশ্র এবং অবলম্বন পরম্পরের সহিত বিবাহ সভাবনের পান্না ক্রমতম করিয়া গৃহস্থনী হইতেছিলেন তখন এক অজ্ঞাত নারী মহিলার 'শান্তি দীর্ঘজীবী হউক' এই আবেগন অতি আত্মলভাবে ধ্বনিত হইলেও কোন প্রাণেই সাড়া তুলিতে পারে নাই? সভাই কি শান্তির সভাবনা নাই?

ফিলিস্তিন—সন্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদ স্থির করিয়াছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স ও তুরস্কের প্রতিনিধি লইয়া ফিলিস্তিনের আপোষ কমিশন গঠিত হইবে। উক্ত কমিশন শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিবে। বর্তমানই আরম্ভ মীমাংসা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবে কিন্তু আরম্ভ মীমাংসা ভিত্তরে তাহানের আভাষ পাওয়া যাইতেছে। এবং ইসরাইল ও ট্রান্সজর্ডনের ভিতর ঘরোয়া আলোচনার কলে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে আব্বায়া ও মিশরের ভিতর বিরোধ অবস্রম্ভাবী। ফিলিস্তিনের আরম্ভ অকল ও ট্রান্সজর্ডনকে লইয়া একটা নতুন রাষ্ট্র গঠিত হইবে এবং আব্বায়া সেই রাষ্ট্রের অধিপতি হইবেন। মিশর এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিতেছে। তুরস্ককে আপোষ কমিশনের অন্ততম সভা মনোনীত করার পিছনে গৃহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। যদিও সামাজিক, ধর্ম্মবিশ্বাস ও অন্ত্যস্ত সংযোগ আরম্ভ জগতের সহিত তুরস্কের অতি ঘনিষ্ঠ এবং সেই কারণে তাহার নিঃপেক্ষতা। সবেহের চোখে দেখা যাইতে পারে, এবং যদিও তুরস্ক ফিলিস্তিন বিভাগ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিল, তথাপি যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব তাহার পক্ষে এড়াইয়া চলা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এবং এই প্রত্যয় যে ইসরাইলের অস্থূল সে সম্বন্ধেও কোন সম্বন্ধের অবকাশ নাই। তাহা ছাড়া ইসরাইলের যে পুত্র মানবিক শক্তি এবং সংগঠন ক্ষমতা গত কয়েকমাস খরিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহাতে তুরকে দল নিম্নলিখিত ইসরাইলের উপর নির্ভরতার মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে। তুরক যথাক্রমে যে কোন উপায়ে শান্তি স্থাপনের ব্যপারে স্বার্থবান। কাজেই হস্ত সর্বাধিক বিধা বিচার করিলে তাহার মনোনিয়ন স্বাধী শান্তির পরিপন্থী হইবে না।

কোরিয়া—সংশ্লিষ্ট আভিপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদ কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং তথা হইতে বৈদেশিক সৈন্ত অপসারণের জন্য অস্বাধী কোরিয়া কমিশনের দ্বারা একটা স্বাধী কমিশন গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; সোভিয়েট সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'টাস' সংবাদ দিয়াছেন যে সংশ্লিষ্ট আভির সাধারণ পরিষদে এখন কোরিয়ান প্রায় আলোচিত হইবে, তখন কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতিকে ইহাতে যোগদান না করিতে দিতে রাজনৈতিক কমিটি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র (এ পর্যন্ত সোভিয়েট অধিকৃত উত্তর কোরিয়া) তাহার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আভির নিকট প্রতিবাদ করিয়াছে। কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী জানাইয়াছেন, যে কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অঙ্গুপস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে কোরিয়া গবর্নমেন্ট ও অনসাধারণ তাহা স্বীকার করিবে না।

কোরিয়া একত্রিত হইয়া একটি সংযুক্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিতে এবং কোরিয়া হইতে সমস্ত বৈদেশিক সৈন্ত অপসারিত করিতে চাহে। যদিও কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত।

চীন—অগতে সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কমিউনিষ্ট চীনের বিষয় অভিধান। যুক্তেন মহরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মার্কিনিয়া প্রদেশ তাহাদের করায়ত্ত হইয়াছে। তাহাদের বিষয় অভিধান এখানেই শেষ হইবে নাই। ষটিকায়েগে তাহারা অগ্রসর হইয়া চীনের রাজধানী নানকিং মহরের ৩০ মাইলের ভিতরে আনিয়া পৌছিয়াছে, শুধু তাহাই নহে, পুরাতন চীনা রাজধানী পিংিং নগর আজ অব্যবহৃত। সরবরাহ পুত্র ও যোগাযোগ পুত্র সরকারী অফিসের সহিত তাহার ছিন্ন হইয়াছে। এই নগরীর পতন আসন্ন বলিয়া মনে করা হইতেছে। গত ২৪ বৎসর খরিয়া মার্শাল চিৎস কাইশেকের নেতৃত্বে যে কে. এম. টি শাসন চীনে কয়েক ছিল তাহার অবলান আসন্ন। ইতিমধ্যেই গুপ্ত রটনাছিল যে মার্শাল পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রগতিশীল দলগুলি তরু হইতে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা চলিতেছে। আপোষমূলক কোন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা সম্ভব কিনা তাহারও চেষ্টা চলিতেছে নাকিন মুখপাত্র বলিয়াছেন—ধর্মমতের স্বাধীনতা ও রাজ্য স্বাধীনতা বত্যে রাখিয়া যে কোন সম্মিলিত পলীট সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র বখারীতি সাহায্য করিবেন। কিন্তু কমিউনিষ্ট অবলিত চীনকে তাহারা কোনরূপ সাহায্য করিবেন না। বর্তমানে যে সাহায্য করিতেছেন তাহাও বন্ধ করিয়া দিবেন। সর্বশেষ ধববে প্রকাশ যুক্তরাষ্ট্র চিৎস সরকারকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিবেন। কিন্তু এই সাহায্য তাহাকে এতদিন কমিউনিষ্টদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। কে. এম. টি. শাসন দেশবাসীর আস্থা হারায়াছে। যে শাসন হুশাসন-এরই নামাঞ্চর রূপে দেশবাসীর নিকট প্রকট হইয়া পড়িয়াছে বাহিরের সাহায্য সেই হুশাসনকে আর কতদিন জিয়ারতঃ রাখিতে সমর্থ হইবে।





ভারতের শাসন-বিধানের খসড়া

ভারতের বিধান-পরিষদে (Constituent Assembly) শাসন-বিধান নিয়ে আলোচনা চলছে। এই বসড়া বিধানের উপর কয়েক সংশোধন (amendment) প্রস্তাব হয়েছে। ৩২ কোটি লোকের ভবিষ্যৎ শাসন-বিধান প্রণয়ন একটা গুরুতর ব্যাপার। খুব বিধান-পরিষদে শাসন-বিধানের মূলসূত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং তখনকার বৈশিষ্ট্য সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই এই খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ভিত্তি একটি ছোট মূল্যবিশা কমিটি (Drafting Committee) গঠিত করা হয়েছিল। কংগ্রেস পক্ষ থেকে তখন একটা মন্তব্য তুল করা হয়েছিল যে এই মূল্যবিশা কমিটিতে একটাও প্রকৃত কংগ্রেসী শোভা রাখা হয় নি। শ্রীমুক্ত দুল্লী অবসর কংগ্রেসেরই শোক ছিলেন। কিন্তু তিনিও পরে কংগ্রেসের সঙ্গে মতানৈক্যের জন্য কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। তা ছাড়া তিনি সংসদেই ছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই মূল্যবিশা কমিটিতে তিনি প্রায় স্বপ্নও উপস্থিত হতে পারেন নি।

মূল্যবিশা কমিটির সভাপতি সর্বাধি আইনজ্ঞ। সকলেই ইংরাজের আইন ও ১৯৩৫ সালের শাসন-বিধানের সঙ্গে সুপরিচিত। নিজেদের কাজ সহজ করার স্বাভাবিক মনোভাব সর্বত্রই থাকে, কিন্তু কোন বিশেষ আশ্রয় ও ভাবের প্রতি তেমন নিষ্ঠা বা আকর্ষণ না থাকলে, এই স্বাভাবিক মনোভাব বিশেষভাবে প্রবল হয়, কোন কিছু

অবরণ করার তাগিদ থাকে না। আমাদের বিধানের মূল্যবিশা কমিটির মধ্যে কোন বিশেষ আশ্রয় বা ভাবধারার প্রতি বিশেষ নিষ্ঠা ও আকর্ষণ না থাকায়, নিজেদের কাজ সহজে শেষ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রবল হতে পেরেছে। তাঁরা হাতের কাছে পেলেন ১৯৩৫ সালের শাসন-বিধান এবং পূর্ণাঙ্গ পরিমাণে এরা তার অনুকরণ করেছেন। কাজেই এই যে খসড়া বিধান, তার মধ্যে কংগ্রেসের চিন্তাধারা বা আশ্রয়ের প্রভাব বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। বরং বৈশিষ্ট্য নীতি নির্ধারণ করে রেওয়া হ'ক না কেন, মূল্যবিশা দ্বারা করবে তাদের মনের ছাপ মূল্যবিশার মধ্যে বিশেষ ভাবে ফুটে উঠবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে মূল্যবিশা কমিটি গঠনের সময় এটা খোঁজ করা হয় নি কেন? কংগ্রেস পক্ষের যে ওতে গণিত হয়েছে, তা অস্বীকার করে লাভ নেই। কিন্তু এত বড় তুল করার কারণ কি? আমাদের মনে হয় প্রথম কারণ হল কংগ্রেসের বাইরে থেকেও বারা আমন্ত্রণ সহযোগিতা করতে এসেছেন, তাঁদের প্রতি উদারতা দেখাবার একটা সূচী। কংগ্রেসের বহাবহরই ছিল। তারই বশে, কংগ্রেসের বাইরের কৃতবিত্ত লোকদের বেছে বেছে মূল্যবিশা কমিটিতে নেওয়া হয়েছিল,—এটুকু তুলিয়ে না দেখে যে মূল্যবিশার সময় ব্যক্তিগত মনের ছাপে কংগ্রেসের ছাপ একেবারে ঢাকা পড়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় কারণ হল ইংরাজের থেকে শাসন ভার গ্রহণের সময় থেকে (অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে) কংগ্রেস অন্তর্ভুক্ত দলের লোকদের নিয়েই শাসনকার্য চালিয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বন্ধ, স্বাধীনতা লাভ করা হল তখনও এই রেওয়াজ রয়ে গেল। শাসন কার্যের খুব দায়িত্বপূর্ণ বিভাগসমূহ অ-কংগ্রেসী মন্ত্রী হাতে এঁরা দত্ত করেছেন। কাজেই বিধানের মূল্যবিশা গঠনেরও তাদের উপরই নির্ভর করাটা খুব গণিত বলে

০ সাধারণত বাংলা পত্রিকাসমূহে Constituent Assembly বলিয়া প্রতিপদ বোঝা হয় খণ্ড-পরিষদ, কিন্তু এই প্রতিপদ ঠিক ভাবে ভোক্ত নহ। খণ্ড-পরিষদের শাসনিক অর্থ হল Popular Assembly জনতার প্রতিধ্বনি গঠন। কিন্তু Constituent Assembly প্রতিপদ বোঝা হয় বিধান-পরিষদ। আমরা মনে করি অর্থের সঙ্গতির বিকল্পে বিধান-পরিষদই প্রযোজ্য।

মনে হয় নি বরং নিজেদের উদারতার পরিচায়ক বলেই বিবেচিত হয়েছিল। তৃতীয়ত কংগ্রেসের নেতারা শাসন-কার্য নিয়ে এমনি ভড়িয়ে পড়লেন যে অপর কোন দিকে নজর দেবার ভরস্বৎ এদের হত না। এঁরা মনে করলেন—ওদক আইনের খুঁটিনাটিও মধ্যে এঁদের বাবার সম্বন্ধ হবে না,—প্রস্তুতিও নেই, হয়ত একটু ভরও আছে। ব্যাঙ্গ বরাবর আইন ভেঙেছে, শাসন-বিধানকে অগ্রাহ্য করেছে, তাদের আশ্রয় গড়তে হবে শাসন-বিধান। এই অনভ্যস্ত দায়িত্ব যদি অপরের উপর চাপানো যায়, তবে একটা ব্যক্তি-বোধ যে এঁরা করবেন তা ত খুবই স্বাভাবিক। এমন করে নানা কারণের বোঝা-বোঝে, বিধানের সুসাবিধা করবার ভার নিয়ে পড়ল একটা সম্পূর্ণ অ-কংগ্রেসী কমিটির হাতে।

যে সব মৌলিক নীতি পূর্বে বিধান-পরিষদে গৃহীত হয়েছে, তার ছোঁরেই এই বগড়া বিধানের মধ্যে কিছুটা কংগ্রেসের ছাপ এখনও আছে। কিন্তু মৌলিক নীতির বাইরে অনেক ছোট বিষয়েই প্রকৃত বিশেষত্ব ছুঁতে গঠে। সেই হিসাবে কংগ্রেসের বিশেষ ছাপ এই বগড়ার মধ্যে খুঁই কম। আশ্রয় মনে করি পাকীস্তানের প্রেরণায় কংগ্রেসের কথক্ৰমে বিশেষভাবে ছুঁতে উঠেছিল দুটি বিষয়—বি-কেন্দ্রিত শাসন ও বি-কেন্দ্রিত অর্থনীতি (decentralised administration and decentralised economy)। আমরা পাকীস্তান সবে আর একটা বিষয়েও বিশেষ স্তব্ধ দেখি—মূলতঃ সব রাষ্ট্রই বারান; এর মধ্যে যে রাষ্ট্র যত কম শাসন করে, সেই রাষ্ট্র ততটা পরিমাণে ভাল। সে সত্তাই শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনীতি বড়টা বি-কেন্দ্রিত হবে ততই সেখানে মানুষ ব্যক্তিক দায়িত্ব বোধ নিয়ে ব্যক্তিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। খসড়া বিদানে বি-কেন্দ্রীকরণের কোন ব্যবস্থাই ছিলনা; স্বত্বের বিষয় পরে সংশোধন প্রস্তাব হিসাবে এর ব্যবস্থা বোঝান হয়েছিল। একটা সংশোধন প্রস্তাবে গ্রামা পঞ্চায়তের কথা বলা হয়েছে এবং অপর একটি সংশোধনকে বলা হয়েছে ছুটির শিল্প ও সমবায় প্রণালী কথা। আশা করি আরও কংগ্রেসী চা এই বগড়ার মধ্যে

স্থান পাবে। কংগ্রেসী হল এই বিষয়ে ধরদৃষ্টি রাখবে ইচ্ছাই কাম্য।

বিধান প্রণয়নে বিলম্ব—

কংগ্রেসী দলের বর্তৃপক্ষের মত ছিল ২৭শে জানুয়ারীর মধ্যে স্বাধীন ভারতের বিধান তৈরি শেষ করা হবে—যাতে আমাদের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিবার ২৬শে জানুয়ারীতে স্বাধীন ভারতের শাসন বিধান প্রচাৰ করা যায় এবং ঐ দিন নতুন স্বাধীনতা সন্থা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব হবে না। বড়টা জানা যায় জুলাইর মাসের মধ্যে সমস্ত বগড়া বিধানের এক-তৃতীয়াংশও আলোচিত হবে না। একটা মেশের শাসন-বিধান তৈরী করা একটা শাণের আইন প্রণয়ন নয়। যথেষ্ট ভাবে তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। কাজেই সমস্ত ধারা ও উপধারা বিশেষভাবে বিবেচনা করার বরকার আছে। কংগ্রেস হল থেকে তাকাতাকি শেষ করার খোঁসাদা চেষ্টা সব্বেষে বেতা। সম্ভব হচ্ছে না—এটা খুণ পরিচাপের ব্যাপার বলে মনে করি না। পরিষদে কংগ্রেসী সভ্যরা সংখ্যার গরিষ্ঠ; ইচ্ছা করলে সংখ্যাধিকার জোরে তারা অনেক কিছু করে নিতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক বিধান তৈরি করার মুখেই গণতান্ত্রিক মূলনীতি বিলম্বিত হওয়া যেতেই বাক্যনীয় নয়। নাগরিকের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights), রাষ্ট্রের আদর্শগত নির্দেশ (Directive Principles) প্রকৃতি বিষয়ে সমাক্ আলোচনা করতে না দেওয়া খুবই অগ্রাঘ হত। বিশেষ করে আমাদের বেদাল রাহা দরকার যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সন্ত্রাসের হিদাবে মুসলমান সংখ্যার নিজ নিজ মত প্রকাশ করার অধিকার খুব করা সম্ভব নয়। ভারতে যে সাম্প্রদায়িক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে মুসলমান সন্ত্রাসের ঘটামত প্রকাশের অধিকার ক্ষুর করা চলে না, এটা কেবল জনকথেক মুসলমান সভ্যদের দিকে তাকিয়ে বলছি না; ভারতের শাড়ে চার কোটি মুসলমানের ক্রম পরিবর্তনশীল মনোভাবের দিকে তাকিয়েই এই খেদাল আমাদের রাখা উচিত।

কান্দির—

আজ এক বছর হ'ল কান্দির নিয়ে ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের একটা পরোক্ষ সংগ্রাম চলছে। প্রথমে এটা ছিল একবারেই প্রকট, —পাকিস্থান তখন স্বীকার করত না যে কান্দির হচ্ছে তার কোন অংশ আছে। ৪.৫ মাস পূর্বে জাতি সন্ধিস্থানের তত্ত্ব কথনপনের নামনে পাকিস্থানকে স্বীকার করতে হয়েছে যে কান্দির হচ্ছে পাকিস্থান প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করছে। সিলগিটে আকাশ পথে পাকিস্থান মধ্য-পশ্চিম পাঠাঙ্গিল; ভারতের আকাশ-বাহিনী তাতে বাধা দেয় এবং উভয় রাষ্ট্রের মতী আকাশ-বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। মূল পথে লডাকের অন্তর্গত হু হু কয়েকমাস পূর্বে পাকিস্থান অধিকার করে এবং এরপর তার চোঁটা খাতে লডাকের রাজধানী লেহ (Leh) অধিকারের। লেহ অধিকার করতে পারলে প্রায় সমস্ত লডাক প্রদেশ পাকিস্থানের অধিকারে আসত। লডাকের অধিকাংশ অধিবাসী হল বৌদ্ধ; এর পূর্বে লডাকের বহু নিরীহ বৌদ্ধকে এরা হত্যা করেছিল ও নানানভাবে ক্রুর ঐ অঙ্গনে তারা চালাজিল। এখন লেহ অধিকার করতে পারলে, স্থানভার বহু বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির গণিত ধনরত্ন এরা লুণ্ঠন করত, অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করত এমন সন্দেহ করার বংশে কারণ ভারত সরকারের আছে। তাই পাকিস্থানী বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দিবার নৈতিক হাতিব ভারত সরকার এড়াতে পারে না।

অন্ত কারণও পাকিস্থান বাহিনীকে বাধা দিবার প্রয়োজন ভারত সরকারের আছে। গোড়ার কথা হল কান্দির ভারতের অন্তর্গত প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য। এখানে পাকিস্থানী বাহিনীর প্রবেশের কোন অধিকারই নেই; —তারা মূল সন্ধির সজ্জিত হয়ে কান্দির আক্রমণ করেছে। মূল জাতি সন্ধিস্থানের প্রতিনিষিদ্ধের নির্দেশ ভারত মানতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু নানা ক্ষেত্রে ভুলে পাকিস্থান তা মানতে রাজী হয় নি। তখনও ভারত কেবল নিষিদ্ধ ঘাটী রাখা করে আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থাই করছিল। ভারতীয় বাহিনী কতকটা হাফজাবেই ছিল; —কোন আক্রমণোদ্ভবই করে নি। কিন্তু এখন পাকিস্থানী

বাহিনী মূল জাতি সন্ধিস্থানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে বরং আরও এগিয়ে আগার চোঁটা করছিল, তখন তাকে বাধা দেওয়া ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে অনিবার্য হাতিব হয়ে ওঠে।

এই বাধা দেবার অভিধান হল—জোজিলা গিরিসঙ্কট (Zojila Pass) পেরিয়ে গুমরি, ভ্রাম ও কারগিলি দখল করা। জোজিলা এটিটি তিব্বতী শব্দ, এর অর্থ হল জোজি কৃষ্ণের বর্ত বা গিরিসঙ্কট + লা (la) শব্দের অর্থ হল গিরিসঙ্কট বা pass। এই গিরিবর্তের উচ্চতা প্রায় ১২০০০ ফিট। এখানে কোন রাস্তা ছিল না। একজন তামিল সেনানীর অধিনায়কত্বে এই দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা রাস্তা তৈরী করেছে এবং এ রাস্তা দিয়ে ট্যাঙ্ক (tank) ও অন্যান্য ভারী আধুনিক অস্ত্রসমূহ পাঠ করা হয়েছে। এই গিরি বর্তের দু পাশে উচ্চ পাহাড়, তার শিখরে পাকিস্থান বাহিনী ছিল। তাদের আক্রমণ, প্রকৃতির প্রতিকূলতা ও শেষ আঁতোর ও নতুনবয়ের বেশ উগ্র ঈর্ষ—সব কিছু অগ্রাহ্য করে ভারতীয় বাহিনী রাস্তা তৈরী করে অগ্রসর হয়েছে। জোটা-জোটা বলা যায় যে নেপোলায়নের আল্পস (Alps) অতিক্রমের চেয়েও এটা দূরত্ব সাময়িক অভিধান এবং এত উচ্চ স্থান দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরী করে ট্যাঙ্ক (Tank) প্রকৃতি পার করার কাহিনী সাময়িক ইতিহাসে খুব বেশী নেই। জোজিলা পার হ'য়ে ভারতীয় বাহিনী গুমরি অধিকার করে এবং ওখান হ'তে ভ্রাম ও কারগিলি ঘাঁটি স্থাপন করে। এর ফলে সমস্ত লডাক প্রদেশ এখন নিরাপন্ন হয়েছে।

কান্দির সমস্যার সমাধান—

কান্দির সমস্যার সমাধান কি? বরকে আবৃত পাহাড় ও বনভূমলে পূর্ণ কান্দির নিয়ে দুই দেশের এই কলহ কেন? কান্দির ভারতের অংশ; কথিয়া, চীন, আফগানিস্থান ও ভারতের সংযোগস্থলে কান্দির অবস্থিত। যহ্ন অনাবিকৃত ধনরত্ন কান্দিরে আছে; তাছাড়া সম্ভাবিত বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতির সত্ত্বও কান্দিরের দ্বারা ঘণ্টে।

অনেকের ধারণা এটম বোমা দিয়ে যুদ্ধের পক্ষে গিলগিট খুব উপযুক্ত খাঁটি। কান্সিওর এখনও প্রচুর অনাবাসিত পল্লার আছে যা ভারতের বা পাকিস্তানের পক্ষে সরকার। এই সব নানা কারণ ছাড়া ভারতের পক্ষে কান্সিওর একটা রাজনৈতিক মূল্য আছে এবং তেমনি পাকিস্তানের কাছেও এর রাজনৈতিক মূল্য আছে। পাকিস্তান হাবী করে হিন্দু ও মুসলমান হুঁটা বিভিন্ন জাতি,—তাই মুসলমান প্রধান কান্সির পাকিস্তানেরই স্বত্বগত। অপর দিকে ভারতবর্ষ মনে করে জাতীয়তাবাদের পক্ষে ধর্মের কোনই সম্পর্ক নেই, তাই মুসলমান প্রধান কান্সিরের অনগ্রসর প্রতিষ্ঠান “জাতীয় সম্মেলন” ভারতের পক্ষে কান্সিরকে যুক্ত রাখার যে অহরোধ জানিয়েছে, তার মর্মান্বনক করা ভারতের কর্তব্য ও রাজনৈতিক দায়িত্ব কান্সির সমস্তার গোড়ার কথা হল এই। অগ্রান্ত কথা অনেকটা আহুপসিক।

এখন যুদ্ধের যে অর্থবা তাকে বলা যায় যে দ্বি ভারতীয় বাহিনীকে অগ্রসর হবার খোঁসা হকুম দেওয়া যায়, তবে অতি শীঘ্রই তাবা কান্সির ভয় করতে পারে। কিন্তু যুক্ত জাতি সংলেনের তদন্ত ও অগ্রান্ত রাজনৈতিক কারণে ভারতীয় বাহিনীকে কতকটা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা মাত্র অবলম্বন করার হকুম দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক ভয় হারাই কান্সির সমস্তার সমাধান হবে বলে মনে হয় না এবং সেই কারণে ভারত সরকার সরাসরি সামগ্রিক অভিযানের আদেশ বিচ্ছেদ না। এরপর আসে কান্সির বিভাগের প্রশ্ন—যেমন পালাব ও বাংলায় জেলায় করা হয়েছে। কিন্তু এখন বিভাগ হওয়া মুসলিম বা ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই মেনে নিবে। রাজনৈতিক সমস্তা—অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে জাতির বিভাগ বা বিভাজিত হওয়া ছাড়াও, উভয় পক্ষকে তুষ্ট করার মতো বিভাগ হতে পারে না। ঐ রাজ্যটির পুরো নাম হ’ল কান্সির-অম্বু এর মধ্যে কান্সির উপত্যকাই হল সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে শোভনীয়। এটা বাক দিয়ে কেবল অম্বু ও ল্যাডাক প্রভৃতি স্থান নিয়ে কেউ তুষ্ট থাকবে না। তা ছাড়া যে রাজনৈতিক কথা কান্সির সমস্তার গোড়ার কথা, তাকে এখনভাবে বিসর্জন কোন দেশই বেছায়

রাজ্য হবে না। বাংলা ও পালাব বিভাগের বেলায় ইংরা সরকার ছিল; রেডক্লিক দায়েনকে এনে হকুম দিল এবং রেডক্লিক ঘাট ঘাট করে বাংলা ও পালাবকে কেটে নিয়ে গেলেন আর আমরা কাল কাল করে কেবল চেয়ে চেয়ে বেখলায়।

কথা উঠতে পারে যুক্ত জাতি সংঘ ত এমনি একটা ভাগ বাটোয়ারার ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু যুক্ত জাতি সংঘ বা পারে বা পারে না—তার প্রধান ইতিমধ্যেই কান্সির ও অগ্রান্ত ব্যাপারে পাওয়া গিরাছে। কান্সির ব্যাপারে যুক্ত জাতি সংঘের নির্দেশ পাকিস্তান মেনে নেয়নি। কোরিয়া, গ্রীস ও প্যালাস্তাইন ব্যাপারেও যুক্ত জাতি সংঘের নির্দেশ মর্মান্বন। পাচনি। কাজেই যুক্ত জাতি সংঘের উপর বিশেষ নির্ভর করা চলে না।

এরপর একবার শব্দ থাকে—জনমত গ্রহণ। ভারত প্রথম থেকেই বলছে কান্সিরের বেশ সীমানা হবে জনমত দিয়ে। কিন্তু সে পক্ষেও অস্বীকার আছে। এখন কথা হ’ল—যুদ্ধের বিরাম না হলে জনমত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কাজেই প্রথম সরকার যুদ্ধের বিরতি। যুক্ত বিরতির তিনটা উপায়। এক হ’ল—আপোষে—দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্মতিতে। দুই হ’ল—যুক্ত জাতি সংঘের মধ্যস্থতার এবং তিন হ’ল যুক্ত একপক্ষের পরাক্রমে বা হয়রানিতে। যুক্ত বিরতির পরও জনমত গ্রহণে কিছু বাধা আছে। পাকিস্তান বলছে—প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক অর্থাৎ মুসলমান কান্সির ছেড়ে গিয়েছে; এট সব বাস্তব ত্যাপীরা স্বত্বদিন না কান্সির কিরে দায়, ততদিন কোন জনমত গ্রহণ চলতে পারে না। আবার হিন্দুও কিছু কান্সির ছেড়ে গিয়েছে; অতএব তাদেরও পুনর্বাসতির ব্যবস্থা করতে হবে। একাজ ৩৬ মাসে সম্ভব নয়। ভারতের ও পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় এই ৩৬ লক্ষ লোকের পুনর্বাসতির ব্যবস্থা করতে অন্তত ২১ বছর সময় লাগবে। তারপর—জনমত গ্রহণের পূর্বে নিম্ন নিম্ন প্রচারণা পূর্ণ অধিকার ভারত ও পাকিস্তানের তরফ থেকে হাবী করা হবে। এই প্রকার প্রচারণার ফলে রাজ্যে আবার হাস্যহাস্যামা হক হবে। কাজেই জনমত

এবং খুব সহজ ব্যাপার নয়। একদিকে যেমন সময় সাপেক্ষ, অপর দিকে তেমনি এর মধ্যে আছে বিপদের সম্ভাবনা।

কিন্তু যে সমাধানই যথা যাক এবং যে তাৎপর্ষ্যই ঐ সমাধানের পক্ষে আশ্রয় অগ্রদূত হই না কেন এটা মেনে নিতেই হবে—যত সম্ভব সম্ভব যুদ্ধের বিধান হওয়া সরকার। কাম্বির যুদ্ধ হত বীর্ষমি চলে—ততই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মন কষ-কষি বাড়বে। অথচ উভয় রাষ্ট্রের জৌগলিক সংস্থান এমনি যে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মন কষ-কষি বাড়তে বেগবাৎ কলে একটা গুস্তর পরিহিত অনিবার্য হয়ে পড়বে।

ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক—

সত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক, এমনি একটা অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল যে তখন উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধের আশঙ্কা অনেক করেছে। উভয় পক্ষ থেকে পরস্পরের উদ্দেশ্যে যে সব বাক্য নির্গত হয়েছে তাকে যুদ্ধের আহ্বানও বলা যায়। এমন কি পণ্ডিত অওরলাঙ্গীও বলেছেন—উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক চোঁটা সবে সস্ত্রীতি পথে চলছে না এবং এট সম্পর্ক চর সস্ত্রীতিও পথে চলবে, না হয় একাক্ত বিরোধিতার পথে চলবে—এর কোন মাঝামাঝি ব্যবস্থা হতে পারে না। হায়দ্রাবাদ, কাম্বির ও পূর্ব বাংলা নিয়ে এই সম্পর্ক আরও নর্য হতে উঠেছিল। সৌভাগ্যের বিষয় সেই সঙ্কট কেটে গিয়েছে।

এটা স্বীকার করে লাভ নেই যে আশ্রয় ও হিসাবে ভারতবর্ষ বিভাগে কংগ্রেস দৃষ্ট হইছিল, তা পূর্ণ হয়নি। কাজেই আজ এই দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কে নূতন পরিবেশের ভিতর দিয়ে বেগতে হবে। সস্ত্রীতি উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটা আলোচনা সম্মেলন হ'ল। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মতের ঐক্য প্রায় সব বিষয়েই হয়েছে—এই হল সংবাদপত্রের রিপোর্ট। প্রতিবারই এমনি আলোচনার পর সম্পূর্ণ একমত হবার রিপোর্ট আশ্রয় পাই; কিন্তু কার্যকালে দেখি কিছুই হয় না। যদি কোন

কল প্রত্যাশা করত হই—তবে যাহ বিষয়ে এই দুই রাষ্ট্রের পরস্পর স্বাধীনতার স্বাধী বর্ষ করতে হবে। দুই রাষ্ট্রই যদি সার্বভৌমত্বের ও পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় স্বাধার স্বাধী নিয়ে চলতে থাকে, তবে এরের সম্পর্ক সস্ত্রীতির হওয়া খুবই কঠিন। ভূগোল ও অর্থনীতিকে এভাবে কোন রাষ্ট্র চলতে চাইলে, তার চলা পক্ষ বা বক্রগতিতে হবেই। উভয় রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে হবে যে ভূগোল এদের একটা জৌগলিক সংস্থার অল হিসাবে দর্শে, আরও স্বীকার করতে হবে যে পূর্ব ও পশ্চিম বকের মধ্যে একটা খুব খনি অর্থনৈতিক যোগদূত এখনও আছে এবং ভারত ও পাকিস্তান অর্থনৈতিক বহু বিষয়ের পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কাজেই তারা এমনি বতই স্বাধীন হক না কেন, ব্যবহারিক দৃষ্টে সেই স্বাধীনতাকে বর্ষ করে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ও আশ্রয় হতে হবে।

পাকিস্তানের স্তরক থেকে অন্যত্র ভিত্তি একাধিকবার বলেছেন যে পাকিস্তান ব্রিটিশ জাতিপুঞ্জের সম্বন্ধে থাকবে। ইতিপূর্বে ব্রিটিশ জাতিপুঞ্জের নাম থেকে ব্রিটিশ শব্দটি দূর দেওয়া হয়েছে এবং এর প্রতিতির কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকেও এমন আভাস দাঙ্কে যাতে মনে করা যায় ভারতও এই ভূগোলভিত জাতিপুঞ্জের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে। এই নূতন ব্যবস্থার কলে দ্বৈত নাগরিকাধিকার (double citizenship) প্রথাও প্রবর্তন হবে। অর্থাৎ ভারতের নাগরিক এই জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত সমস্ত দেশের নাগরিক অধিকার পাবে, এটা হবে দ্বিতীয় স্তরের নাগরিকাধিকার। তেমনি ঐ জাতিপুঞ্জের সব দেশের অধিবাসীরা ভারতের নাগরিক অধিকার পাবে। অতএব ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও এই পারস্পরিক দ্বিতীয় স্তরের নাগরিকাধিকার প্রথা থাকবে। এই ব্যবস্থার আর একটা কল এই হবে যে—এই সব দেশের মধ্যে পারস্পরিক সর্বোত্তম মিত্রতার (Most favoured Nation treatment) সম্পর্ক থাকবে। আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় এই সম্পর্কের বলে ব্যবসায় বাণিজ্যের অনেক সুবিধা থাকে—যথা শুদ্ধ ও আমদানী রপ্তানীর কঠোরতা অনেক হ্রাস করা হয়।

এই একই জাতিপুত্রের সভ্য চওড়ার ফলে একই বুদ্ধির নাগরিক অধিকারের ভাণ্ডি হ'বে ভারত ও পাকিস্তান। কয়েকই উভয় দেশের মধ্যে স্বাভাবিকতার নিয়ম অনেক সহজ করা যায়—passport এর—চাচপনের প্রয়োজনীয়তা একদম উঠিয়ে দেওয়া যায় যেমন ব্রহ্মের সঙ্গে এতদিন ছিল এবং সিংহলের সঙ্গে এখনও আছে। সর্বোত্তম নিয়ন্ত্রণের সম্পর্কে বলে—উভয় দেশের মধ্যে যুগ্ম কূট চষ (joint customs) ও অবাধ আমদানী রপ্তানীর ব্যবস্থা করা বোটেই কঠিন নয়। যৌথ নাগরিক অধিকারের ফলে উভয় রাষ্ট্রে অধিবাসীরা অপর রাষ্ট্রেও নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। ব্যবসায়, বাণিজ্য ও সরকারী চাকুরির ব্যাপারে অনেক অধিকার একদেশের অধিবাসীরা অপর দেশে ভোগ করতে পারে—যেমন অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা ব্রিটেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র সেই অধিকার পাচ্ছে ও পাবে। এই বিষয়ে আমেরিকাণ্ডের অধিবাসীরা ঠিক পূর্বের মতো ব্রিটিশ নাগরিকের সব অধিকার ভোগ করবে।

এই সব বিষয়ে যদি উভয় রাষ্ট্রে নিজেদের মন ও মত পরিষ্কার করে ব্যক্ত করে, তবে উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকটা ভাল হতে পারে। এককালীন ব্রিটিশ জাতিপুত্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক রাখার পক্ষে যে সব বৃত্তি আছে, তার মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সবচেয়ে বড় বলে আমরা মনে করি। অধ্যাপক দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অনেকটা গৌণ এবং পরোক্ষ;—কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক প্রাত্যহিক ও প্রত্যক্ষ। এই সম্পর্ক যদি কয়েকই বিরোধিতার পথ নিতে থাকে, তবে তা যে কেবল ভারতের ও পাকিস্তানের পক্ষে বিপজ্জনক, তা নয়। এখান থেকে এমন উৎপাতের সৃষ্টি হ'তে পারে, যার ফলে সমস্ত বিশ্বের শান্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই আমরা মনে করি একটা বুদ্ধির স্বাভাবিক সংস্থা হিসাবে জাতিপুত্রের (Commonwealth) সভ্য হয়ে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের পথে চালিত করতে পারলে সে চেষ্টা সফল হই করণীয়।

ভাষার ভিত্তিতে প্রবেশ গঠন—

ভাষার ভিত্তিতে প্রবেশ গঠনের প্রত্যাব বহু বছর পূর্বে কংগ্রেস থেকেই তোলা হয়। ১৯২১ সালে মহাত্মাভীর নাতকয়ে কংগ্রেসের যে গঠন-বিধান তৈরি হয়, তাতে ভাষার ভিত্তিতে কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটি বিতর্ক হয়। নীতি হিসাবে এও সর্বদা আমরা করি;—কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে কোন নীতিকই উৎসাহের আধিক্য যদি যোগ আনা চাড়াইয়ে আঠায়ে আনার টানতে চেষ্টা করা হয়, তবে তার নাস্তিগত ফলা নষ্ট হ'য়ে যায়, এমন কি কোন নীতিই যোগ আনা কাজে ফলায় না। ঠিক যেমন খাঁটি গোনা বিধে মলমলার তৈরি করা সস্তর নদ, তেমনি কোন নীতিও যোগ আনা কাজে লাগাতে গেলে তার কর্মোপযোগিতা নষ্ট হ'য়ে যায়। ভাষার ভিত্তিতে প্রবেশ গঠন নিয়েও ঠিক তেমনি অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছে। তা ছাড়া; রাষ্ট্র-ভাষার বিতর্ক এমনি ঘরে গিয়ে পৌঁছেছে যেতে এটা একটা স্ববিধাবোধী কথা জেগীর কায়েদী স্বার্থের হৃৎকোষে ভাষার অস্থিলা হ'য়ে উঠেছে। হিন্দী ভাষা যদি রাষ্ট্রের একচেটিয়া ভাষা হয় তবে ঐ ভাষাভাষীদের এখনই চাকুরি ও সরকারী মহলে যে স্ববিধা মিলবে, অসিন্দী ভাষী—বিশেষ করে মকিন ভারতের প্রাবিড় ভাষীদের সেই স্ববিধা ত মিলবেই না বরং অস্ববিধা হ'বে অনেক। এই বিতর্কের ফলে ইংরাজী ভাষা দীর্ঘকাল চলতে পারবে তারই অভ্যাস আমরা দেখতে পাচ্ছি।

ভাষার ভিত্তিতে প্রবেশ গঠনের নীতিও কথা জেগীর কার্যেই স্বাধাধেষণ স্পৃহার স্বাণ্য কলুহিত হয়েছে। আমাদের ও বিহারে যে বাঙালী বিধেয় স্বাধ্য চলছে, তার পিছনে এখনকার প্রত্যাক কারণ হ'ল—মধ্য প্রদেশের স্বাধাধেষণ। অবশ্য পূর্বে বাঙালীরা ঐ সব প্রদেশের লোকদের প্রতি যে উচ্ছ্রাসপূর্ণ ব্যবহার করেছে, তার ফলে যে তিক্ততার সৃষ্টি হ'য়েছিল, তা এখনও আছে। কিন্তু আমরকার দিনের এই বিধেয় প্রচাদের মূলে হ'ল উদীয়মান আসামী ও বিহারী মহাপ্রদেশের সঙ্গে বাঙালী মহাপ্রদেশের স্বার্থের সংঘর্ষ। তামিল, প্রাবিড়, গুজরাতি, মহারাষ্ট্র, কেনাডী

প্রকৃতি ভাবীকেব মধ্যে পারস্পরিক মধ্যস্থতির স্বগড়াত
হ'ল—আত্মকার বিভিন্ন প্রদেশ গঠনের দাবীর মূল কথা।
সক্রে সকে পাও বী, হারিবান, আদিবাসী ও বিভিন্ন
দেশীয় রাজ্য নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠনের দাবীর উঠছে
এবং এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের
সীমানার পুনর্নির্দেশ। বাংলার দাবী এই বিষয়ে সকলের
চেহে বড়।

আমরা মনে করি এখন এই সব দাবীর কোন একটা
সীকার করতে পেল, যন্ত্র কোনটার দাবী অগ্রাহ্য করা
চলে না। অর্থাৎ আত্ম সব সেরে বড় কথা হ'ল দেশের
ও রাষ্ট্রের একত্বতা (integrity) ও সূততা পড়ে ভোলা।
আত্ম যদি এই বি-অন্তরকরণের দাবী মেনে নিতে হয়,
তবে রাষ্ট্রের ভিত্তি দৃঢ় করার পক্ষে অব্যবাহার সঙ্গী হবে।
আমরা মনে করি এই সময় এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত
করার চক্রে ভাঙে প্রচলিত একটা কনিটি নিয়োগ
করা অসমীচীন হ'য়েছে। যাক হুধের বিষয় এই কনিটির
রিপোর্টে বলা হয়েছে যে এখন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ
গঠনের প্রস্তাব স্থগিত রাখা উচিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলতে চাই।
রাজনৈতিক সংস্থা বা উনত (unit) হিসাবে প্রদেশ
গঠনের পিছনে বড় কথা হওয়া উচিত অর্থনৈতিক।
বোটাঘোড়া ভাষার সামগ্রিক রেখে আর্থিক হিসাব ক'রে
প্রদেশ গঠন করা উচিত। এই অর্থনৈতিক হিসাব দ্বারা
আমরা এই প্রশ্নের আর্থিক সম্ভবতার কথা বলতে চাই
না; আমরা বলতে চাই প্রশ্নের আর্থিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়
(industrial) সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করা উচিত।
যেমন ছোটনাগপুর ও তৎসংক্রিষ্ট ছোট ছোট দেশীয়গোত্র
একটা আর্থিক চক্রের অন্তর্গত। এবং এইগুলি সবই
বিহার বা উড়িষ্যা থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। এদের নিয়ে

একটা আলাদা প্রদেশ গঠন করা চলে—অথচ তাতে
কোন ভাষার দাবীর প্রতি কোন জুসুম করা হয়
কারণ উড়িষ্যা, হিন্দী বা বাংলা এই সকলে মুখ্য ভাষা নহে
অধিকাংশ ও বৈলকি অধিবাসীরা আদিবাসী এবং নিম্ন
নিম্ন বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে।

চীনের সঙ্কট—

চীনের জাতীয় সরকার বা কুনিষ্ঠার সরকার আত্ম
বিশ্ব। এই সরকারের যোযুক্তি বহু আছে; তবুও
ভারতের সঙ্গে এর যোগ বরাবরই সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল এবং
এর পতনে ভারত ক্ষুব্ধ হবে। তা ছাড়া আরও অনেক
কথা এর মধ্যে ভাববার আছে। আত্ম কমান্ডি বাহিনী
জরী হচ্ছে এবং ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আমেরিকাও
আত্ম আর কুনিষ্ঠার সরকারকে সাগাধা করা কৃপা ব'লে
মনে করে। আমেরিকা বলছে কুনিষ্ঠার সরকার যেন
কমান্ডি সরকারের সঙ্গে সন্ধির চেষ্টা করে এবং সম্ভব
হ'লে যেন উভয় দল মিলে যৌথ মন্ত্রীসভা (Coalition
Cabinet) গঠন করে।

কমান্ডি নীতির প্রতি আমাদের কোন বিতর্কতা
নেই বরং এর মূলনীতি সর্বদেশেই যোগ্যযোগ্য ক'রে
গ্রহণ করার আমরা পক্ষপাতী। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রের
জীবনধারণ রাষ্ট্র হিসাবে চীনে যদি কমান্ডি রাষ্ট্র স্থাপিত
হয়—যেমন হ'য়েছে যুগোস্লাভিয়া ব্যতীত পূর্ব ইউরোপের
স্বাভাৱণ মন্ত্রণে তবু তা আমরা ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক
মনে করি। তাইই যদি চাচ-কাচ-সেক ও ভাঃ সান কো
কুনিষ্ঠার ও কমান্ডি দলের মধ্যে কোন সমঝাও ক'রে
একটা যৌথ মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারে, তার কলে
সোভিয়েট রাশিয়ার জীবনধারণ রাষ্ট্র কখনো স্থাপিত হ'বে
না, তবে সেই প্রচেষ্টা এ'মের কথা উচিত।

—ইন্দিরা—

একাদশ বর্ষ

পৌষ—১৩৫৫

নবম সংখ্যা

বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি

ডাঃ বাবুগোপাল মুখার্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার শিষ্য ছিলেন বিজ্ঞ ও সভ্যাহুয়াসী। বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ভৌতীক, বেশ-বিনেশের সাহিত্য ও সঙ্গীতের পরমাহুয়াসী। ছেলের দলও হওয়া তিনি চাইতেন না। তারা বেশ বেশ-হিঠৈতরী, হুইল ও ভত্ হত—এই ছিল তাঁর কামনা। পাচ্চাতোয় বা কিছু ভাল তা নিতে হবে। তারতবর্ষটা একটা মহাদেশ। কিন্তু এখানে চিরদিন সংস্কৃতির সমরও হয়ে আসছে। এই ধারা বুঝে এর সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যা কিছু এই দেশে একমাত্র তাই ভাল, আর সব বন্ধ—এই বিচার তুল। এর উদ্দেশ্য আরও জ্ঞানপূর্ণ। দেশের সেবা করা পরম কর্তব্য। পাঁচে মিলি করি কাছ, হারি মিলি নাই লাভ। দেশের সংস্কৃতি থেকে বসন্ত উৎসারিত হচ্ছে এই মহা অবস্থানের বাণী। এই শিক্ষা জীবনে কলিয়ে তুলতে হবে। পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই, কৌরবরা একশ' ভাই। এখন তারা আপোষে লড়ে তখন ভাই বটে। কিন্তু বাইরের লোকের দলে লাগাবার বেলা তারা একশ'-পাঁচ-জন। এই শিক্ষা তুলে ভারত পরগমন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন ধর্মগুরুসার পরম্পরে যুবকমান থাকতে ভারতের মুক্তি নাই। পাঁচ ছেলের লাক্ষী হচ্ছে ভারত। তুলে তুলে লড়াই করে আত্মঘাতী হলে লাক্ষী

সাক্ষ্য হবে কি নিয়ে? এখানকার মূল শিক্ষা সভ্যতা ও সাধনার দ্বারাকে সব প্রদেশে পুষ্ট করে নিজের পক্ষে নিজেকে গাঁড়িতে হবে। শুধু ব্যক্তিগত মুক্তির দিকে কিছু মানে হবে না যদি না অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, চেটিয়াস বা পরাধীনতার পাস না কাটা হয়। ছিল তাঁর—রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক মুক্তির মতবাদ।

তিনি কাহুলিরের স্বাধীনতা স্মৃতিতে সব পক্ষন করতেন। সমকালীন ভারতের পক্ষে এটা একটা আত্মশ্রম মত তিনি মনে করতেন। ইংরেজ কাহুল ওচ করেছেন কিন্তু কাহুলিসের ওপর বাধ্য করতে পারে নাই। এইখানেই কাহুলিসের গুণগনা। একটা স্মৃতিরের বা ধরে এনেছিলেন। সেটাকে গোয়াং চোটে করেন। নাচ, ডিম, ঘাস কিছুই সে স্পর্শ করতে না। কয়েকদিন বাঘে মরে গেল। তাকে লেখিয়ে ফেল-মহেনের বলতেন—এর নাম স্বাধীনতা স্মৃতি। মরে গেল, তবু পরাধীন জীবনকে রাখা করল না গুণ করে গেল।

হারিহ্রা-ব্রত নিয়ে বেশ সেবা করতে পারলে ভারত তাদের চেটোর পরাধীনতা একদিন খুঁড়বে। পথের ভাংলে সাধনা দেওয়া, পথের ছাং বুক পেতে নেওয়া, পথের কটকে আপন বোধ করা তাদেরই কর্ম যাদের বিন-মুদ্রী

কবে বাঁচারই সময় কুলোয় না। বাবু-ডাইসের দিবে তা হয় না। তেননা আলস্য, বিলাসে, কারণ, স্বকারণে তাদের প্রাণেই গা মাঝ, মাঝ করছে। জীবনব্যয় সময়ই নষ্ট পরেও কথা। মাথার একটা চুলে শাক ধরলে তাবা মনে করে ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেছে। নিজের চিন্তা করবে, না গংের স্ত্র মাথার বাগা ধরবে? ব্রতী-পরাবসের আমরণ যৌবন রাখতেই হয় বাগা হয়ে। পরের স্ত্র জোগা ও নরা অন্ততঃ এনে দেয়। বাগা বরতে পারে তাঁরাই প্রকৃত বঁচে! বাবুদানীও করত এবং বেশ সেবাও করত এতে সখের হাভা বা খিরেটার হতে পারবে, আসলে কিছু হবে না। এই লোকগুলো খেতাব চাকরী বা উচ্চপদ নিয়ে ইংরেজের অধীনে থাকাকেই বাখীনতা বলে ঘোষণা করে দেবে এবং জনসাধারণকে তাই বোঝাতে থাকবে। এদের নেতৃত্ব মেনে কোনদিন ছেলেরা যেন মাতানোতি না করে। এটা বিশেষ করে তদানীন্তন রাজনীতি-চর্চাকে লক্ষ্য করে বলতেন। ১৮২৭—১৯০০ সালের কথা চম্কে। সরকারী চাকরী কেউ যেন না করে। তাঁর বংশে কেউ যেন কোন চাকরী না করে।

বোম্বাইয়ে নতুন কাপড়ের কল হয়েছিল। ভারী মোটা মোটা কাপড়। সেই কাপড় পরিবারে ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। ঐরামপুর ও বালির কাপড় ব্যবহার করতেন। বিলাতী কাপড় ও কাপড় বাড়ী ঢোকা বন্ধ। না বেশী কলের ও আলোয় বোনা তাঁতের কাপড় পরতেন। কিছু স্থানী ব্রি ভারী আশক্তি করতে লাগল।

আমরা তমলুক ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা প্রবর্তন করি। আমার বড় ডাইগা ভাল খেলত। ছাত্র ও নৃকষের মধ্যে চাকলা খরী হল। নতুন জিনিষের উত্তেজনা যেননটা হয়। ক্রিকেট আসে আগে। ফুটবল আসে ১৮৮৮ সালে। প্রসিদ্ধ উকিল হুর্গারাম বসুই হুযোগ্য পূত্র বদন্তবাবু প্রথম ম্যাচের রেকর্ড হন। দুটো দল হয়েছিল—বিভাগ্যপূর স্ত্রাব এবং জিষ্টোরিয়া স্ত্রাব। আমরা খেলতাম জিষ্টোরিয়া স্ত্রাবে। জিষ্টোরিয়া সে সময় ভারতের জন সাধারণের কাছে কত আপনাতাই প্রতিষ্ঠাত হতেন।

একদিন ছোট্টের মাচে জিতে আমি ও আমার সহকারী স্মৃতিতে 'দন' থেকে সভ্যতা বাড়ী ফিরছি। পথে পড়ে দুটো স্ত্রীমাথ স্টেশন। গভর্ণমেণ্টের ও হোর-মিলার কোম্পানীর। হোর-মিলারের জাহাজ, পেছনে পাখা। সামনে দুটো চিমনী, সোতালা। নাম—উর্বশী, কিরী, প্রকৃতি। গভর্ণমেণ্টের জাহাজ, মাঝে চিমনী দুখারে ঢাকা। নাম—ব্রহ্ম, ভগ্নলাস প্রকৃতি। এগুলো একতারা। সরকারী মোতালা জাহাজও ছিল। চেহারা ঐরকম, কিন্তু আকার আরও বড়। নাম—কম্ব, লিফন। স্মৃতি নামে ছোট্ট একটা জাহাজ ছিল। তার পাখা পেছনে। হোরমিলারের জাহাজের আর এক নাম বাটালের জাহাজ। একদম কলকাতায় এসে পঙ্গার ধারে আরানী ঘাটে প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিত। সরকারী জাহাজ ভায়মও হারবার পর্যন্ত যেত। সেখান থেকে রেল চড়ে পিয়ালবহে নামতে হত। আমরা রেল-জাহাজ ব্যবহার করতাম। লোকে এই লাইনকে বলত রেলের জাহাজ। সকালে জাহাজ আসত বিকেলে জাহাজ ছাড়ত। বর্তমানে জেলে বাস করতে করতে যেমন সামনৈতিক কথবোধের মধ্যে জেল-বাদেশীকতা (Jail patriotism) বা ওয়ার্ড-পেট্রি ঘটিত সুখো বাথ, তখন তমলুকের ছেলেরের মধ্যে জাহাজ-প্রেম স্রষ্টাতে দেখা দেত।

"কোন জাহাজ ভাল?"

"হোর মিলার।"

"না, কিছুতেই না। রেলের জাহাজ ভাল।"

হোর মিলারী বলল, "গেণোশালি, কুঁকড়োহাটির পরই তোমার রেলের জাহাজ ভরে স্ত্রাব গুটিয়ে পালাল। মা-পঙ্গার হুকের উপর ভাসতে পারে? হোর মিলার পঙ্গার গা ভাগিয়ে হেলতে হুন্তে স্টান কলকাতায় পোঁছে যায়। পুণ্ডিও হয়, কলকাতা যাওয়াও হয়। পাণ্ডুরা যায় রেল-স্ট্রীমারে।"

প্রতিপক্ষ উত্তর করত—"হোর-মিলার 'পাণ্ডুরের জাহাজ। পুণ্ডিাস্থানের পঙ্গকে ধরকার হয় না। সমুদ্রের হাওয়া খেতে পারে ও জাহাজে গেলে? ভায়মও হারবার আর পঙ্গাপুর ত' জমজ তাই। জাহাজা রেল চকরা

মজা কোথায় পাবে ওতে? বাকটপুরের জাব, গোলাপ-
খাম চোখে দেখেছ বাবু? শোনারপুরের সিঁদাড়া?”

এই রকম হাস্য-পরিহাস থেকে বক্তৃতির স্রষ্টি হত।
কেউ বলত—“কি দুর্গা। শেষে আর্থানী যাটে? ওইহত
কাছাকাছি আন্ত-শ্রাঘ ঘাট, নিমন্তলার ঘাট। ওটুহু
একত্রে আর বাকী কেন?”

প্রতিপক্ষ বলত—“শেখারপোড়ার গড় শুকতে যায়
রেল-স্টেশন-ওয়লায়া। শেখার বাবার মতলব তে—
তমলুকে কি শেখার পাওয়া যায় না? ত্রাণে অর্দ্ধতোষন।
দুবার গড় শুকলে পূর্ণ ভোজন। শেখার খেয়ে ব্যামো
ধরিখে বোঝারের ল্যাম মোটা শেখারের কাছে যায়
লায়াতে।”

বলা বাহুল্য শেখারদার মোড়ে এক L. M. S.
ডাক্তারের ডাক্তারখানা ছিল। বেচারার দুর্ভাগ্য যে
সাইন বোর্ডের এক কোণে নামের সঙ্গে তাঁর খেতাবও
লেখা ছিল। L. M. S. ছেলের হাতে পড়ে হয়ে
গিয়েছিল ল্যাম মোটা শেখার।

এবার যা বলছিলাম। ছেলেরা মাচ খেলে আনন্দ-মস্ত
হয়ে চোঁচাতে, চোঁচাতে আসছিল। কলকাতা থেকে একটি
নতুন ছেলে এসেছিল। সে খুশা খাল—হিপ্ হিপ্ হুহুয়ে।
ক্ল্যাপ, ক্ল্যাপ, অলটুগেনার। হিপ্, হিপ্, হুহুয়ে। সঙ্গে
সঙ্গে কোর হাত তালিও চলছিল। নগেনবাবু করতেন
রেল-স্টেশনের স্টেশন মাস্টারী। তিনি বেরিয়ে এসে
খামালেন ছেলেরের; খামালেন ডায়ের হৈ, হর।।
বললেন—একেত বিশেষতী খেলা খেলে অপকর্ম করেছ।
তার ওপর মনের উল্লাস প্রকাশ করছ বিদেশী ভাষায়,
বিদেশী ভঙ্গীতে। এ সব ছাড়তে হবে। এতে লজ্জা
বোধ করতে হয়। ভাষাও যে আখ্যায়ের না হন। কথায়
বলে যাক-ভাষা। আন? সংখ্য ত কেউ চায় না?
তবে নিজের না বেঁচে থাকতে তাঁকে গলা টিপে মেরে
ফেরা কি রকম ছেলের কাণ?

এখন ভাবে এই কয়টি কথা কইলেন নগেন বাবু যে
ছেলেরের মনে কলনার ভেঙ্গে উঠল যেন তারা আপনায়
মাকে ঐ রকম নিষ্ঠুরভাবে অমর্যাদা করেছে। লজ্জার

কষ্ট তোধ,—কলরোলের ভাষণা নিল। তারা চুপ করে
রইল, ঘোরতর অপরাণীয় মত। মনে মনে সম্মত
করল আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গী আর কোনদিন এ পথে
এ রকম নয়। নগেনবাবু বললেন বেশী খেলায় প্রকৃত
আনন্দ ও শরীর ভাল হয়। পরমা লাগে না, সব জায়গায়
খেলা যায়। কপাটি, চোরবন্দী, ভাঙগুলি, মূল-কপাটি
প্রকৃতি। এতে বেশের জিনিষগুলো বাঁচে, আর বিশেষে
টাকাগুলো যায় না। দেশের টাকা বিশেষে পাঠান
লাহায়া করা ত পাপ।

নগেনবাবুর কথাই হল আংশিকভাবে ফল। বেশী
খেলা বন্ধই রইল। নরহুম বুকে ক্রিকেট ও ফুটবল
চলল। আনন্দ প্রত্যন্ত টংরেজীতে একরম বহু হয়ে গেল।

সময়, ইউইস্ক, ওলমান, জামালুদ্দিন ক্রিকেট ও
ফুটবল খেলার দাবী ছিল। মোহিনী, বলদ, নেংচা
কুচ্চান ছেলে। এরা কলকাতা থেকে নতুন নতুন
এসেছিল। ফুটবল খেলার এরা ছিল সেভা। সে সময়ে,
সে বয়সে, ছেলেরের মধ্যে মনুষ্য বেগ এতটা ছুটেছিল যে
শাস্ত্রাচারিক দৃষ্টিতে কেউ বাউকে বেধত না। তেমন
কৃশিকা তখনও এদের মধ্যে আসে নি।

এক সময়ে কলমুল, জলখাবার, সবং প্রকৃতি চলে যেত।
আমালুদ্দিন ফিজিও চমৎকার। “ক্যাচ” ধরায় শুভান।
বলের সামনে থেকে সবাই ধরে। বলের পিছন দিক
থেকে খপসু করে ধরতে পারত জামাল।

সহর থেকে এ্যামে বাওয়া এবং চাষাভূষাদের সঙ্গে
মেলামেলা ছেলেরের একটা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার
ছিল। মঙলখাটের মেলায়, কুণবেড়ের আতে, ধম্মা-
মধুরীর আখ-মড়াই উপলক্ষে এরা খুব বাওয়া আসা
করত। পৌষ সংক্রান্তিতে মকরের মেলা তমলুক
মহুইয়ে লাগত, কপাল-খোচন তীর্থে গমন করতে হাজারে
হাজারে নানারিক থেকে শ্রীশুক, ছেলে-মেয়েরা আসত।
সেদিন মনে হত তাত্রিলিত বৃত্তি বা আবার বেঁচে উঠল।
তীর্থে ভীড় সব দিকে। বিশ্রামের মিন কুরিয়েছে।
বন্ধুরে বৃত্তি দাত্রীরা এসে নেবেছে। দাত্রার হুপসে
দোকানপাট সব রকমের জমকে উঠত। ছোট ছোট

জেন মেঝের বাড়ীর পোর গোড়ায় ঝড়িয়ে প্রহরী সন্ধ্যার
বসতে থাকত—

“অথবা গাছে, বট গাছে ঘুঙ দেগেছে,

ডেল-সামলীর মেয়েগুলি দেখতে নেমেছে।”

যাত্রীরা বস দিক থেকে কতকগুলি দিতে এসেছিল।
কত কিছু নিয়ে যাবে এই সব লোকেরা। আবার কি
ভারত ও ভারতের বাইরের দেশে ভাব ও চাওয়ার আদান
প্রদান হুক হল? কখনা পাখা মেলে হৃদয় বিগড়ে
ছুটত।

একদিন অতি সুপ্রসিদ্ধ দায়ক মোরারী আশি ঋ
এসে উপস্থিত। তিনি আমার পিতার দ্বিতীয় শিক্ষক
ছিলেন। বাড়ীতে দু'ব পান সাধারণ লু। তরীতরকারী
কোটা ও খুঁচ চলেছে। বৃষ্টির আভা বাড়ীতে বহলোক
সমাগন হয়ে। বাড়ীতে লোকজন অনেক আসা, বালক
বালিকারা। স্বভাবতঃ ভালবাসে। তাপের কি হবে না
হবে সেটা ধারণা করা তাদের দক্ষিণ অতীত। অনেক
লোক এসেই মাসীমা, শিদিমা, কাকীমা, ঠাকুমা,
অনুক সিদি, অনুক বাবা, জানাইবাবু। নিচ্চ আসবেন।
থোকা মল নিয়ে এস, পান নিয়ে এস, পাখীর খোঁজাবেন
বাড়ীয়ে যেও, নূন পরিবেশন কর প্রকৃতি করনাস খেটে
নিজের কৃতিত্ব ও হানীত মানুব করে উঠে হবে। সবচেয়ে
আজ্ঞার নতুন, নতুন অনেক খেপুড়ী নিলে একসঙ্গে খেলা
ও চীৎকার করার সুবিধে হবে। আমি এমিক থেকে
সব একবারে পানের আসরে গিয়ে পৌঁছলাম।
দু'ব পান ভয়েছে। গুজরাটী বীহাতে তানবু। ধরে
“গাও” “গাও” ধনি ভুলেছেন। হুঁবে পান ও তান
চলেছে। তান হাত মাঝে মাঝে নাড়ছেন; গড়ে
মাথাও। যে পাথোয়ায় বাজাছিল সে বাড়ি হেঁট করে
ডহাতে নানারকম বোল, তাল ভুলতে ভুলতে মাথা
দু'ব বোঁ নাড়ছিল। বানিক বানিক অবশেষে আলার
জন্তে সবাই মাথা নাচাচ্ছে। গুজরাটী বেরন হাত নেড়ে
বলে উঠছেন ঠাঁ; তখন ত আর কথাই নাই। সব
মোতা নির্বিশেষে মাথা ঝুকিয়ে দিচ্ছিলেন।

আমি বানিকবন্দন বলে মেঝে বস না গেরে ঝড়িয়ে

পর্ববেশন করতে লাগলাম। সুবিধা হল না—বসেওনা,
ঝড়িয়েওনা। কথা ও হর কিছুই বুঝিলাম না। হিন্দী
ভাষার গান, গুজরাটী হুঁবে পাওয়া। হুটোর কোনটাই
বোঝার মত আমার বয়স বা অবিকার তখনও হয়নি।
নেতির দিকে সেল এটা। ইন্ডির বিজে আধিকার হল,
বিশেষ আকর্ষিতভাবেই, মানবিক অপ্রকৃতিত্বতা সত্যতঃ
স্বাভাবিক। আমার মনে হল সবাই পাপল হয়ে
পেছে। হৈলে খালি খালি এত মাথা নাড়ছে কেন?
গান শুনে, শোনে। বাজনার আওতা কানে পূরবে
শোয়। কিছু মাথা নাড়া-নাড়ি কেন? গুজরাটী
পাইছেন। কিছু তিনি মাথা না হর নাড়তে পারেন।
পাথোয়াতী পানের সঙ্গে বাজাচ্ছে। অজ্ঞে, না হর,
সেও মাথা নুসুচ্ছে? কিছু বাজীরের ত কোন কৈফিয়ৎ
নাই। হাসি চাপতে না গেরে অবশেষে অম্বর বাড়ীতে
চলে সেলাম। এবং বানিক বাহে ঘূঁমিয়ে পড়লাম।

সকালে দু'ব ভাততে পূর্বপ্রাতের কথা মনে পড়তে
আবার বানিক হেসে গড়াসিঁ দিলাম। বাড়ল হুঁবে
পাওয়া মন ভোতা পাখী, একবার সাধাক্ক বল দেখি
তনে বৃকতে পারতাম, হুঁবও হত। গুজরাটী কি এক
অপভ্রম হুঁবে, কি এক অধোধ্য ভাষার পাইছিলেন।
উপসি, খুসি, ঘন পরবোঁ, মোরারীআশি ঋ মালকোথ
স্রাগের অধিতীর বিশেষত্ব বলে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর
ছাত্রদের মধ্যে ছলোগোপাল, আমার পিতা, মদুহাজের
বাজ-গায়ক বহু বার প্রকৃতির বশ দেশে ছেয়ে গিয়েছিল।
তা হ'ক আমি মন কথাটা বৃকতে পারতাম, ভোতা
পাখিও বেগেছি। সাধাক্কের নাম ও চেহারা আমার
পরিচিত ছিল। হুটরা যে হুঁব তনে আনন্দ জাগে,
যে পানের কথা বোঝা যায় এবং যা শুনে ভ্রোতের পদে-
চলা যায় তাই তখন আমার মতে সখীত এই কল্পী পাখরে
ক'বে গুজরাটীর গান নিকব, বিখ্যাত পেলাম। বানিক
বেলা হতে বৈঠকখানার দেখতে পেলাম আবার পান
বাজনার ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি? বেধলাম যে সে লবের
এখনও কিছু নয়। মিক্সা সাহেব একলা বসে আছেন।
লাগ্নেরদের ছেলে, নাসির জুলা, আমার করে হিন্দুস্থানীর

বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন—কাল কেমন গান হোলো ? আমি 'বিনা দ্বিগত রায় জাহীর করে দিলাম—আপনি ভাল গাঠিতে পারেন না ? উত্তরে গুণ্ডামজী হেসে কুটি-কুটি। প্রবীণ লোক, বৃদ্ধের গলদটা কোথায়। তখন আঙে আঙে ভাড়াভাড়া বাংলায় হাঙ্কা হুরে গাইলেন—

“সে কেনো বোলে গেলো
আদি বলে, আশা দিয়ে
আর নাহি কিরে এলো।”

পরে প্রশ্ন করলেন—এবার কেমন ? এবার আমার আশপ্তি করার কিছু ছিল না। নব্বই এবার কুত্বিহি। বয়ঃ আমার খাসা করে আলাখা, একলা একটা গান শুনিযেছেন গুণ্ডামজী। এই পরিবার আলাখে আটখানা হয়ে বায়ের কাছে স্বর্গের চাঁদ পাওয়ার কথা বলেতে ছুটলাম। বাবার আগে বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে গেলাম—“কাল কেন এমন গাননি, নব্বই স্থাখ্যতি করত, ভাল বলত ?”

পূর্বদিন রাতে গুণ্ডামজীর মালকোষ নাকি এমন উৎরেছিল এবং ঘষেছিল যে তেমন গান কচিং, কথ্যচিং তিনি পেয়ে থাকবেন। শ্রোতাদের মুখে বাহাবার অর্থ ছিল না। হালির মধ্যে কথা প্রলম্বে গুণ্ডামজী আমার পিতাকে না বলে পারেন নি—“তোমরা বাটা নুকে আছা ইনামু দিয়া।” অর্থাৎ তোমরা ত ধন্ত ধন্ত করছ, কিন্তু তোমার ছেলে আমার খাসা পুরস্কার দিয়েছে। আমি ভাল গাইতে পারি না। আমার সমস্তহারিতে, দুজনে দুই খানিকটা হাসলেন।

তমলুকুর আনন্দের হাটে ভান্নন ধরল। ডেই একদিন এসে বলল হোরমিলায়ের ইদন মাঠার স্বরণ করেছে। কেন ?—জিজ্ঞাসা করলাম। ডেই উত্তর করল—“তাও বুঝি জান না। সংরে চলরে এসেছে। হরিলভা জাঁকতে হবে। সংকীর্তনের বল বার করতে হবে।” বুরলাম কলোয়া আরম্ভ হয়েছে এবং পূব লোক মরছে। শৈশন মাঠার হরিলভা বিষালী। ডেইর কথা চা ছিল ঐ রকমের। আমাদের কিছু গপরের থাকের ছেলেরা একটা নীতি-মতা করেছিল। ইংরেজী ছুদের

পুতুরমাটে রবিবার রবিবার হুত তার অধিবেশন। নতুন কিছু হলে তার সম্বন্ধে আগে ছেলেরদের অধিবেশন। আমাদের অধিবেশনে বাবার হুত্ব ছিল না। বহুদয়ের কাছে প্রস্তাব করলাম যেমন করে হ'ক একবার নীতি-মতাও বেতে হবে। যদি ওটা ভাল তিনিই তবে বড় ভাইরা ছোট ভাইয়ের বেতে যেনে না কেন ? ডেই প্রস্তাবটি মাটে ঘেরে দিল। সে বলল—“দুব, দুব। কতগুলো অসভ্য মিলে করেছে একটা নীতি-মতা। ওখানে না খাবোটে ভাল।”

ঠাৎ আর একদিন খবর এল আমানুদ্বিন কলোয়ায় মারা গেছে। সব ছেলের মন শোকে, বিখানে দ্বিগমান হয়ে গেল। আমানুদ্বিন যে তামেরই একজন। ছেলেরদের জ্ঞাত নাই। বই নিয়ে গোল নাই, খেলা আর ভাল লাগে না। আপনা আপনি খেলা বন্ধ হয়ে গেল। আমার একটি স্নেহময়ী ভ্রাতা মারা গেল। শোকে-তাপে আমার মা-বাপ ডেবে পড়লেন। হেত মাঠার রাঙেনবাবু—মজিদিংএ বদলী হয়ে গেলেন ঠাকুমা, সিধু, নিধুও লম্বে গেলেন এখন ছেলেরা ইমুল বাড়ী ৬ বেলার মাঠের দিকে তাকাতে পারত না। যেন পারীগুলোও ক্ষুধিহীন হয়ে গিয়েছিল। বুলবুল, কোকিল, সোয়েল, শ্রামা, ভরতপাখীও আর তেমন মিষ্টী ভাকে না। প্রজাপতি, হং বেরকের ডড়ি, ইনটুনী, বাবুপাখী তেমন আর আকর্ষণ করে না। গাছের ফুলগুলোও যেন রান, ক্রীহীন, শোভাহীন হয়ে গিয়েছিল। এই সময় অনেকগুলি পরিবার তমলুকু ছেড়ে খেসিনীপুর বা কলকাতার চলে গেল। আমরাও বারি মরে গেছে তাদের কথা জিজ্ঞেস করলে এবং তারা কি আর আমাদের কাছে আসবেন জানতে চাইলে মা বলেহেন—“তারাতাও আছে। আর এক বায়গাথ আছে। জান না ? তারাতা দ্বয়ের কিরণ দিয়ে দ্বালে, রাঙের কুঠিতে কানে কানে কথা কথ, ছুনের চোখ দিয়ে মেখে। পরিবার আকাশ থেকে উকি মারে।”

আমার এক কাকা এসে আমার মা-ও ভাই, বোনদের নিয়ে কলকাতার বাড়ীতে চলে গেলেন। বাবা আমাদের

বলেন—“তুমি বাবে, না, থাকবে? বেতে চাও যেতে পার।” যদি থাক, তবে নতুন ব্যাট-বল কিনে দেব। আমি একটা দিক দেখেছিলাম। সেটা আমার নিজের দিক। আমার বাপেরও যে একটা দিক সেটা আমি করতে পারিনি। না, তাই, বোনদের ছেড়ে থাকা—একটা শকু কাণ্ড। শকু বলেই ওটা করতে হবে। এট কথ্য ভাগল আমার গ্রামে। ব্যাট, বল—মত বড় খুব নয়। আমার বাপও একজন দানব। সবাইকে একসঙ্গে বিবাহ দিয়ে একলা থাকার মনের যে উৎকট উপহাস চলবে তার একটা উপায় উদ্ভাবনের কিংবদন্তি ঠাট্টার আদ্যাক ব্যাট, বলের কথা বলেছিলেন। বীরের মত না, তাই, বোনদের জাহাজে চড়িয়ে ফিরে এলাম। কেন একলা থাকতে পারব না? একলা এমনই বা কি? বাবা ত আছেন। আর আছে বন্ধু, বোহরপন বোহর—হুয়েন।

বাবা চলে গেলেন আমায়তে। তাঁর পেনা যে ওকালতি। তখন ওপরে, শেখলার গিয়ে আমার হল সে এক নতুন অন্ধকূতি। সেটা বাড়ীটা বেন গিলতে আসছে। খানিকটা এঘর, ওঘর করলাম। তারপর নগীর দিকে চেয়ে জানলার কাছে বসে রইলাম। জানলার চিটকিনির উপর হাত আপনা আপনি চলে গেল। সারসের মত এইটে ঘূড়িয়ে জাহাজ মনে মনে চালাতাম। হুয়ে, বতহুয়ে চাই তপনাগারের জল—বালি জল। ওপার চোখে ঠেকত না। তিন দিন হয়ে গেছে। মাঝের জল মন কেনন করা বাড়ছে বই কমছে না। আপনা আপনি বুকের কাছটা ঝেঁপে ঝেঁপে উঠত। একটা অব্যাক বেদনা যা বহুশ জড়-পিঙটাকে দুচড়ে ছিড়ে কেলতে চাউত। থেকে থেকে প্রকারেণে চোখ উপড়ে জল বেরিয়ে আসবার উপক্রম হত। অনেক করে সেটাকে চাপতাম। চোখেতে তিরস্কার করতাম এমন করে আদ্যাক বাবার সামনে খেলো করে দেওয়ার চেষ্টায়। অবশেষে একদিন বাপের অস্থিরচিত্তে, বালি ঘরে, জানলার ধারে—বসে হাপুস নগনে নগীর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলাম ঐ যে অনেক দূরে কালো ঘেঘের মত আকাশে কি একটা

ভালছে ওটা। বোহ হুডগলগি জাহাজের খোঁয়া। এটা হেডভাগা জাহাজটাই আমার বত হুংগের মূল। এটাই ত আমার মা, তাই, বোনদের নিয়ে চলে গিয়েছিল। চোট-ছেলের মনে কই মিয়েছে বলে রত তার অস্থির হয়েচে। আত্ম বুঝি শেখল মা, তাই, বোনদের কিংবদন্তি নিয়ে আসছে। যদি অমন করে আসছে, তবে আমক তাতাতাতি বতটা পারে। এই ভেবে খুব জোরে জানলার চিটকিনি ঘুরাতে লাগলাম। আকাশে যা অন্ধ কাল ছিল, পাড়তর কালজল ধারণ করল। আগে মনে মনে বলছিলাম, পরে মুখেও বলতে লাগলাম (full force) মূল কোর্স। তাত্তে বোঝাছিল বেন তর্গলাপ কাছাকাছি এসে বাচ্ছে। হাওটার ক্রমণ: সোজা বোঁটার লাইন, বৈকি বেলে পড়ল। একটা আদ্যনে ছিল। হয়ে গেল টুকরো, টুকরো, খণ্ড খণ্ড। অবশেষে কিকি হতে হতে দুটী থেকে অপস্থত হয়ে গেল। অমনি বদু, বদু বদু—চোখ মিরে জল স্রুতে লাগল। কদিকেই কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে ফেললাম। না, কিমি নি, বাহা আপনি আসছিল। বাবার কাছে কি করে খুব রেখাব—যদি কিমি? ভাবছি কি করব, হঠাৎ মনে পড়ে গেল বালগকাথর তিলকের কথা। বাবার কাছে শুনেছিলাম মহাভাট্টা বৈশে একজন খুব পণ্ডিত এবং ভাল লোক হয়েছিলেন। নাম তাঁর বাল গজাধর তিলক। বোঝাইয়ে ১৮২৭ সালে ম্রগ হয়। সে সময় কি একটা কড়া আইন চালাতে ব্যাণ্ড নামে এক ইংরেজ ভারতীয় পরীব অনুযায়ারের উপর খুব অবহতি করেছিল। অত্যাচারিতদের কাতর অন্নয় ও চোখের জলে বিফল হারে বনমালী ও হামোবার চাপেকার, দুতাই প্রতিশোধ নিয়েছিল। সেই সম্পর্কে চাপেকারদের প্রতি মহাভুক্তি করার তিলকের এক বছর সন্ময় কাগানও হয়। বাবা মাকে একদিন এই কথা বুঝিয়ে বলছিলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। পরে মা পুজোর সময় ঠাহুর প্রণাম করতে করতে বলছিলেন—“মোহো দ্ব্যামর, আমাদের মাঝের তিলক বেন অকালে অন্ধকারে না হুছে যায়।” প্রবৃত্ত-মাথা তুলতে দেখতে গেরেছিলাম মার চোখে জল।

“মা তুমি ঠান্ড কেন?” প্রশ্ন করায় তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে তিনি বলেছিলেন, “তুমিও ভগবানকে ভেবে এই কথা সেলাম। কি জানি, আমাদের চোখে, ছোটছোটদের কথা তিনি তাড়াতাড়ি শুনতে পারেন।”

ভিলক আশ্রয় হলো: একা, আবহ। তারই মস্ত ঘরের তিনি ভালবাসতেন, ছেড়ে থাকতে পারতেন না, তারের কাছে ছাড়া হয়ে রইতেন। কি থাকেন? কোথা গেলেন? পরতে কি দিয়েছে? যদি মন কেমন করে, কে ঠাক বোঝাবে? তিনি কি কাঁদছেন? বোধ হয় না। অনেক বড় যে তিনি। আশ্রয় আমিও যে তাঁর

মত আবহ। বাড়ীটাটাই হয়ে গেছে মেলখানা। মনে হল, ভিলক মহারাষ্ট্র তুমিও একা; আমিও একা। দুজনেরই এক দুঃখ। তোমার ছেলে-পিলের মস্ত হৃদয় তুমি ভাবছ? আমার মস্ত কি ভাবছ না? আমিও যে যে একটি ছেলে। আমারও যে আশ্রয় সব থেকে কেউ নাই। তারের আশ্রয়ের মতো কি আমারও আশ্রয় করছ না? তারপরই মায়ের উপদেশ মনে হল। কল্পজোড়ে প্রার্থনা করলাম—“ভগবান আমার মত আর বেন কেউ কষ্ট না পার। আমাদের ভিলক বেন অকালে মূছে না যার, এই কীর্তি।” (ক্রমশঃ)

ছিন্নমস্তা পৃথিবী

ঐক্যপত্রের ভূহ

সিদ্ধেশ্বর ঠাকুর—কেউ বলে সিধে পাগলা; কেউ বলে সিধে চট্টা; কবাচিং কেউ বলে সিদ্ধেশ্বর ঠাকুর। ব্রাহ্মণ হয়েও সে অপাংক্তের এবং সমাজ-বহিষ্কৃত; কারণ জাতিতে সে মহাব্রাহ্মণ বা অগ্রহণী ব্রাহ্মণ। সংসারে তার কেউ নেই; কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত তার বুদ্ধি বা বেচে ছিলেন। বুদ্ধির বড় সব ছিল—ছেলেকে সংসারী করে দাবেন। কিন্তু বেয়ে আর জুটল না। মহাব্রাহ্মণ যে,—কে তাকে ঘেরে দেবে! ধারে কাছে যে দু'চারজন মহাব্রাহ্মণ ছিল তারা সবাই এই হীনতাত্মক বুদ্ধি ত্যাগ করে, অস্ত্রবুদ্ধি অবলম্বন করেছে। পূর্ব বুদ্ধির অপমান থেকে মুক্ত হবার মস্ত এরা অনেকেই হান ত্যাগ করে অগ্রর বসতি স্থাপন করেছে। তারপর, নাম যার সিধে পাগলা, তাকে-ই যা কে ঘেরে দেবে! কাজেই বুদ্ধির ঘনের সব মনে-ই হয়ে গেল—তাঁর আশ্রয়ের সিধুক আর সলামী করা হ'ল না। মার মৃত্যুর পর সিদ্ধেশ্বর প্রাণ খুলে এক চোট কাঁদল; সে তুলেই গেল সে তার মার আশ্রয়ের সিধু খোঁকাটি নয়—যখন তার ৩১০২ হয়েছিল। কেউ তাকে সাধনা দিতেও এলো না। সে যে পতিত ও

বড়; সমাজের সকলের নীচে সে। জীবন-ব্যস্তার পথে যে বড় পাণ লক্ষ্য করেছে, বৈতরণীর এপারে সে সব পাণ রেখে যেতে হবে; আর সকলের সব পাপের বোঝা বহন করছে এ মহাব্রাহ্মণ; তাই সে সকলের নীচে ও সকলের চেয়ে ছোট।

মার মৃত্যুর মতে মতে তার সিধু নাম মুছে গেল; সিদ্ধেশ্বর নাম তার উচ্চারিত হ'ল, কেবল তখনই যখন অপরের পাপের বোঝা বহিতে হয়। সিধে পাগলা নামই সাধারণত চলছিল এখন কেবল ঐ নামই সে শুনছে। শ্রমানে একটি ঘরে এক কালীমূর্তি আছে। শ্রমানে ব'লে সিধে পাগলা পাঁচা যায়; জুটল মদ-ও যায়। যা থাকতে এসবটার অনেক বাপো পড়ত; মার চোখের মেলের সাহায্যে তার সব উজ্জ্বলতা ও কাঠির বেন হয়ে পড়ত। কিন্তু আশ্রয় আর সে কার মস্ত সংসৃত জীবন বাপন করবে! শ্রমানে ও গৃহের মধ্যে তার কাছে পার্থক্য কতটুকু! গৃহে বাবার কি আকর্ষণ তার কাছে! সকলের উপেক্ষিত ও পুণিত জীবন নিয়ে তার দিন কাটছিল। শ্রমানে শব-মাহের সময় সে দেখত—আত্মীয় বিধোপে কেমন বন্ধ-ভেদী কান্না সকলের অন্তর থেকে বের হয়। সেখান থেকে সংসারের অনিত্যতা দেখে তার মনে আর কোন সংসার রইল না। তবুও যখন সে দেখত ৮১০ বছরের বালক

এসেছে পিতার বা মাতার দ্বাশরিষ ভ্রত, আর তাকে-ই এই কাজের নহু পড়াতে হ'ত—তখন সেই ক্রন্দনহত পিতর ভ্রত তার অক্ষর কোঁদে উঠত। এক এক দিন এমনি দুঃখের আবেশে সে কালীমূর্তির সামনে পড়ে—সন্তিকার কামাই কাঁদত।

তার জীবন এমনি করে লগিতে কটোরে—হুই বিপরীত কৃতির আশ্রয় নিয়ে গড়ে উঠছিল। চোট কালে সে শাব্য লেখাপড়া শিখেছিল; তার উপর কিছু সাংঘ্য করেছিল তার ছরছাড়া জীবনশ্রোতে উপলব্ধের মতো। সংযুক্ত বিত্ত তার হা' ছিল তাতেই সংযুক্ত প্রোকে বিকৃত করে উজ্জ্বল করতে পারত এবং তাবোধিক বিকৃত অর্ধ করত সেই সব প্রোকে। তার জীবন চলছিল পুরোপুরি সমাচ্চের ভিতরে থেকে নয়, কতকটা তার প্রায় সীমার বাস ক'রে।

গেঁদোবাণি থেকে বে বাস আরও উত্তরে চলে গেছে, তার পারে এক গ্রামে তার নিবাস। আজ ৪৪ বছর হয়েছে তার মার মৃত্যু হয়েছে, এই ক'বছরে তার বেহের ও মনের পরিবর্তন হয়েছে অনেকটা। গাভা, হাড়ি, মদে—সর্বপ্রকার নেপাথ ও গোঁব-বুটী-স্বৈতে পরীর তার কঠিন; শিরাতলি সব প্রকট হয়ে ছুটে উঠেছে। চোখ কোটরগত এবং প্রায়ই লাল হয়ে থাকে। মাকে মাকে একদিন দু'দিন হরতো কোন আহ্বায়ই ছুটল না। নেপা করে কালীমূর্তির সামনে স্ফানের মধ্যে হরত সমস্ত দিন আসন করে বসে থাকে—এমন ঘটনা খুব বিরল হ'ত না। তারপর দু'একদিন সিঁকেবর যেন কতকটা শান্ত হয়ে চলত। গ্রামে ছেলেনেয়েরা প্রায় সকলেই তাকে ভর করত;—মনে করত সে প্রেভসিদ্ধ। বুড়োরা তাকে বর্জন করে চলত, ঘাঁটাতে সাহস পেত না। কিন্তু একটি লোকের কাছে তার খাতির ছিল,—তার নাম মনীষ। তারপ সকলের সংগেই মনীষের খাতির ছিল।

বহু বংশর বাবৎ মনীষ গ্রামের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান নিয়ে আছে। নিষ্ঠায়, সেবায়, ভ্যাগে ও কঠোরত্বে, মনীষের তুলনা নেই। মনীষ বখন কোন কাজে সিঁকেবরকে ডাকত, সিঁধে পাদলা সব কুলে গিয়ে মনীষের

কাঙটাই আগে করত। হাতের কাজে সিঁকেবর খুব শাব্য ছিল। এর চরকাটা চেঁচে গেচে, শিখে তা মেয়ামত করে সিঁকে; এর তাঁত ঠিক চলছে না, শিখে ঠিক করে শিল। ওর নৌকার ছোঁদা হয়েছে, গাবেও ঝাঁটার নেকড়া তিচ্চিয়ে সে তা বদ্ধ করে শিল। এই সবই সে করত মনীষের করমানে।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস। তিন বছর পরে দুই চলছে; দুইর দুই ধারে এসে দুইর কোণে কড়াবার স্থাপন করেছে। মরবর আম সাধারণ লোকের অর্ধের ও সামর্থ্যের বাইরে; শিড়ার ষষ্ঠ মধ্যা ও গ্রাম জুয়াপা হয়ে উঠেছে। জীবন রাখতেই তখন লোকের জীবনপাত হচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী নানাপ্রকার প্রচারে গ্রামের অজ্ঞ লোকেরাও জানছিল—এই দুই বিশেষ জনসাধারণের স্বাধীনতা ও মরলের ভ্রত। কিন্তু সেই স্বাধীনতা ও মরল যে কোথায় আছে ও কবে এসেই ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসবে তা কেউ বলছিল না। তুঁ-ও একটা আশার আভাস দৃশ্যকপথে প্রবেশমান প্রথম আলোকবস্তির মতো তাদের মনের অন্ধকার ককে আলোকপাত করছিল। সেই আলোর সন্ধানী দৃষ্টি যিরে তিতর-বার অন্বেষণ ক'রে তারা খেঁজছিল—কোথাও এক টুকু মরলের চিহ্ন নাই, কিন্তু বিকৃতকৃষালের বাইরে যেন একটি রক্তভিলক ছুটে উঠেছে। এমনি সময় বরর এল—মহাত্মা দাদী ও অপরাপর নেতাদের প্রেক্ষতার করা হয়েছে; মনীষ বোখাই থেকে কিংছিল;...তারপর তার কোন বরর নেই।

সমস্ত ভারতবর্ষময় আগুন জলছে। অনাহারগ্রস্ত দুই জনতার বুক্ণিক্ত বকে ও উষরে বে আগুন জলছিল, তারই কয়েকটি স্থলিষ শিখে পড়ল বাইরের শাখ্যান আবর্জনা। হাউ হাউ ক'রে জলতে লাগল। সিঁকেবরদের গ্রামেও এর ছুঁচরটি স্থলিষ এসে পড়ল। কোথাও থানা পুড়িয়ে শিল একমল লোক এসে; কোথাও গোঁদ অশ্লিষ ভরীকৃত হ'ল—কোথাও পেল শাসমরল বা ইউনিয়ন-বোর্ডের দুই বা কণ্ণাশ্লিষ বোর্ড। গ্রামের লোক কিপ্ত। কোথা হতে একটার পর একটা গোপন ইজাহার আসছে।

আমি রাষ্ট্র হ'ল—মহাদেব দেশাইর হৃদয় থেকে মহান্বাণী মুক্‌মান হয়ে আছেন; কাল কে প্রচার করল—যেহরলাপের অবস্থা সমুদ্রজনক। এমিকে শব্দ রটছে—আপানী সৈন্ত ব্রহ্ম সীমা পার হয়ে ভারতে আসছে; সরগারী মহল থেকেও জনহুঙ্কারীদের তরফ থেকে কিছুদিন দাব্যই রাষ্ট্র করা হচ্ছিল—হুঙ্কার আপানী হস্তা আসছে; সে আসলে সব কেড়ে নেবে; তাই নৌকা, ধান, চাল সব ধরিয়ে কেলো।

সহর থেকে পুলিশ এস, পল্টন এস—বিত্রোহী প্রজাদের শাস্ত করতে হবে, কিন্তুতার প্রত্যুত্তরে চলল কিন্তুতা। মনীশকে চাই—মূল্য যোবিত হ'ল তার প্রেক্ষতারের ভিত্তি। প্রানের পর গ্রাম, বাড়ীর পর বাড়ী তার তর করে খোজা হ'ল—কোথাও মনীশকে মিলল না। মনীশ কোথাও নেই, অথচ সে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মনীশের বাড়ী মুখে মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ইয়াহাযের পর ইয়াহায প্রচারিত হচ্ছে :—শান্ত সংঘত হ'য়ে বিদেশী রাষ্ট্রকে উপেক্ষা ক'রে পকারেয়ী রাষ্ট্র গঠন কর...

এমনি করে চলছিল শক্তিমান ও শক্তিহীনদের সংঘর্ষ। পেটে ঘানের খাবার নেই, বৃত্তি ঘানের অপহৃত হয়েছে, হাড়ভাঙ্গা পরিভ্রমের বিনিময়ে ঘানের জীবিকা নির্বাহ হয় না, পিছনে বা সম্মুখে ঘানের এতটুকুও আশার সন্ধান নেই, এ হ'ল তাদেরই বিত্রোহ। গান্ধী ও কংগ্রেস ছিল তাদের আশার একমাত্র প্রতীক, একমাত্র ভরসা। তা-ও আজ কারাককে আবদ্ধ। তার উপর সরকার ও সরকারী দল—জনহুঙ্কারীরা—প্রচার করছে, ঐ আপানী আসছে; হুঙ্কারপার বোকা নিয়ে সে আসছে। শত শত মাইল পার হয়ে সে আসছে; কুর্টেন, আমেরিকা, চীন, কেউ তাকে রুখতে পারে নি। ভারতের সীমায় যে এরা তাদের রুখতে পারবে সে ভরসাও ত কেউ দিচ্ছে না। বরং উল্টো কথাই এরা বলছে :—তাই ধান, চাউল, নৌকা, বাড়ী, সাইকেল সব কিছু এরা নিয়ে যাচ্ছে।

নিরাশার চরম অবস্থায় মরিয়া হয়ে নিরস্ত্র জনতা কিন্তু হয়ে উঠলো। হযত ইহা বিত্রোহ, হযত ইহা বিদ্রোহের পথ-রচনা।

এমনি অবস্থায় এল বস্তা। ঠিক পুণ্যার দিন থেকে শুরু হ'ল। আকাশ ঘন ভেঙ্গে পড়ছে। আর পর্যন্ত ভাগ্য-দ্বার খুলে দিলেন; তা থেকে নেদের করণা অবিশ্রান্ত দ্বারাও করতে শুরু হলো। পল্টন খুলে দিলেন তার পূর্বেই অর্গলমন্ত সব রুক্ষ; নর বাতাস বৃষ্টির তালে তালে নেচে উঠল। বকন তার মলমলার বলগা আলগা করে দিলেন; কনিদীর মতো তারা সব ছুটে বের হল নিজ নিজ আবাস থেকে।

প্রাণন, বস্তার মল, বৃষ্টি!—পূর্বেই পূর্ব পড়ছে, বৃষ্টির পর বৃক্ষ উৎপাতিত হচ্ছে। বৃন্দ-গুচ্ছের মতো মাল্লব জলের মোতে ভেঙ্গে যাচ্ছে। কেবল মাল্লব নয়—পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা—সবই ভেঙ্গে যাচ্ছে। আসছিল বিদ্রোহ—সব প্রাবিত করে, সব কলুষ হয়ে মুছে নিয়ে নতুন সমাজের পত্তন করতে। শক্তিমান তার শক্তি দিয়ে বোধ করতে এল তার গতি। তারপর এল প্রাণন,—সব ভাসিয়ে নিয়ে চলল। বারা চেয়েছিল বিদ্রোহ—সমাজকে বিশেষ রূপে প্রাবিত করতে, তারা আজ প্রাবিত হয়ে যাচ্ছে প্রাণনের মুখে। বারা বোধ করতে এসেছিল বিদ্রোহের গতি, তারা বেধল—প্রস্তুতিই তাদের সহায় হয়ে তাদের কাঙ্ক্ষা সাধন করে দিচ্ছে।

এমনি প্রাণনের মুখে গিয়ে পাগলা একটা বৃক্ষে আশ্রয় নিয়ে আছে। এক অর্ধপণ্ডিত বৃক্ষের ডালে ডালে সব মাল্লব খুলে আছে। মাটি থেকে গাছেব গোড়া বেয়ে এরা কেউ গাছে ওঠেনি। কেউ এসেছে ভাসমান ভলের উপর ভাসতে ভাসতে; কেউ এসেছে ভাসমান ছোট বৃক্ষ আশ্রয় করে। কেউ কার চালালো ডেলায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে এই বৃক্ষের শাখায় এসে ঠেকেছে। কেউ কেউ বা এমনি ভেলার বনে বৃক্ষশাখা পরে ভেঙে ভেঙ্গে মাংগার হাত থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে। সেই বৃক্ষে কেবল মাল্লব নয়—শাপ, বিড়াল, ইমুর, পানী প্রভৃতিও আছে। এমনি পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পাগলাও এই বৃক্ষের আশ্রয়েই আছে।

হঠাৎ এক নারীকণ্ঠের কাতর জনিতে দিচ্ছের সে দিকে তাকিয়ে দেখল—একটি শিশু টেউএর আঘাতে

জলে ছিটকে পড়েছে; আর তার মা কতকগুলো চীৎকার করছে সেই নারী লাফিয়ে মগ্ন পড়তে থাকিল—এক পুরুষ তাকে ভড়িয়ে ধরে ফেললে। কপের প্রবল স্রোতের মধ্যে সেই দুইল শিশুর বাঁচার চেষ্টা সিঁদেবর দেখছিল,—সাঁতারে ভেসে থাকবার চেষ্টা করছিল; আর ভাসমান বৃক্ষশাখা বা তৃণখণ্ড বা শাখিল, তাকে ধরেই আঁধার ঘূঁরিছিল। কেমন একটা আবেশের বশে সিঁদেবর জলে ভাঁপিতে পড়ল। সিঁদেবরের চেয়ে দ্বারা বুদ্ধিমান তারা ডাকিয়ে বেধে বলল—“পাগল আর কাকে বলে!”

আর শতদিন ধাবং চলছে এই প্রাণন; চল এখন নামছে। অথই চল থেকে থই চল হয়েছে। মেনে নৌকা নেই একথানাও; বেধে বাবার নেই একতপাও। এমনি করে সাত দিন গেল, বশ দিন গেল। বাইরের লোক আনল না—কি হয়েছে ঐ অকলে। বৃদ্ধ পরিস্থিতিতে গোপনতার প্রয়োজন বৃদ্ধ বেশি। এই অকলের এমনি অবস্থা টের পেলে ভাপানী শরুরা তার সুযোগ নেবে। কে জানে কোন্‌খান দিয়ে তারা এসে কি উৎপাত শুরু করবে……বৃদ্ধ পরিস্থিতি! হান বাহনের অভাব। গর রাষ্ট্র হলেই লোকজন এখানে আসতে চাইবে; তাতে বৃদ্ধ প্রচেষ্টার হানি হবে। হান বাহনের টান পড়বে। অতএব প্রাণনের গর চোপে বেতে হবে।

বৃদ্ধ পরিস্থিতি—মেশবর পাখ তবোর অভাব, তার উপর এই অকলের সব মজুত খাত নষ্ট হল। ভীতি-চাকল্যে অল্প অল্প থেকে এগানে খাত আমদানী হতে থাকলে, দনন্ত প্রবেশে বাতের অভাব ঘটবে। তাই সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। অতএব বস্ত্রার সংবাব বাইরে বেন তাঁ বায়। এটা জনবৃদ্ধ এর স্বর্গ উপলব্ধি না করে দ্বারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক’রে বৃদ্ধ প্রচেষ্টাকে বিব্রত করছিল তাদের শাস্তি দিয়েছেন ভগবান্। গোদার নার, ভূনিয়ার বার; এই শাস্তি শু এদের বদন করছেই হবে। তাই সংবাস গোপন করা হ’ল। বাহির-বির জানল না—কি দুর্ভাগ্য বয়ে গেল। জনবৃদ্ধের কোবার এদের বইতেই হবে, অন্যথারে,

বিনা চিকিৎসার রোগে এরা আঁল মরছে—পতে পতে, হাটাবে হাটাবে,……কিছু উপায় কি?……বাঁচবার যোগ্যতা এদের নেই; তাই ত এরা মরছে।

সাত আট দিন পর সিঁদে পাগলা একথানা নৌকার চড়ে সেই পাছের কাছে এসে ছাটিল। আঁল আর পাখীর মত পাছের পাখার পাখার মাছব নীড় বেঁধে নেই। কতক স্থলিত হয়ে দাবনের স্রোতে ভেসে গিয়েছে, কতক বর্ষার স্থায় মরে করে পড়েছে; আর দ্বারা অবশিষ্ট ছিল, তারা জল কয়ে বাওয়ার পাহা থেকে নেমে নিম্ন নিম্ন নৃহের তল্লাসে গিয়েছে।……

সিঁদে পাগলার নৌকার এক শিশুর মৃতসেহ; পচে গলে দুর্গন্ধ বের হয়েছে। সিঁদু খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই শিশুর মাঝে। বহন ঐ কুকের কাছে এসে দেখল, তার মা নেই, শুধন সেই মৃতসেহ ধরে তুলল; কিছু সময় তাকিয়ে থেকে ছোরে ছুঁতে কেলে দিল। চারিদিকে মৃতসেহের ছড়াছড়ি, মাছব পত্ত পক্ষী সবরে মৃতসেহ এক গলে ভড়িয়ে আছে। শুধনও চিল, শহুন আসতে শুরু করে নি; বেশের শৃগাল সুহুর গ্রাঘ নির্বাপ হয়েছে। মৃতসেহ সংকার বা সবাবি ধোয়ার লোক নেই। যে যেখানে মরেছে, সে সেখানে পড়ে আছে। চিল, শহুন, শিয়ার কুহুরে বেধেও ঐ বেহের পুতি গন্ধকে দূর করতে পারছে না।

সেদিন অলম্বোতে লাফিয়ে পড়ে সিঁদেবর ভাসতে ভাসতে চলল, কত খোজ করল সেই শিশুর—কোথাও তার খোজ মিলল না। স্রোতের মগ্নে মগ্নে সে ভেসেই চলল। বহুদূরে এক উৎপাটিত বৃক্ষ স্রোতের গতি রোপ করে জলের মধ্যে পড়ে আছে। সিঁদেবর সেই কুকের পাখার আঁল দিল। শুধন মজার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পাখীর মতো সেই বৃক্ষশাখার নীড় বেঁধেই সিঁদেবর রাত কাটল। তোরের আলোয় সে দেখল, সেই কুকের পাখা প্রাণাখার কত মৃতসেহ জমে আছে। সুহুর, বিফাল, গল, ছাপল, মাছব—বৃদ্ধ, শিশু, নর, নারী……আরও মৃতসেহে ভেসে আসছে।……কিছুকণ পরে সে দেখল—একটি শিশুর মৃতসেহ ভেসে আসছে।……তার মনে

হল এই ত সেই শিশুর মৃতদেহ; কিছ কি করে সে চিনবে। সেই হতভাগিনী রমনীর করণ আত্মনাশ তার করে বেতে উঠল। ...কিছ কি করে সে চিনবে—ঐ শিশুক! তার সব পরিচয় যে প্রাণনের বলে ভেসে গিয়েছে, ...নাম গোত্রের সব পরিচয় তার লগাট হতে ধুয়ে মুছে গেছে—আর অবয়বের পরিচয়, তাও যে প্রাণনের নোনা বলে লোপ পেয়েছে। কেবল মনে পড়ল সেই মার পাগলপারা ছটকটানি। হৃৎক: এই শিশুর মৃতদেহ বকে ধরেই তার উত্তম পূরুষকে কিছুটা প্রশমিত হবে। শাখার পয় শাখা ধরে ধরে সে জলের কিনারায় গিয়ে, ঐ শিশুর শবকে ধরে জুসল। পরদিন এক আত্মভাঙা নৌকা ভাসতে ভাসতে এসে গাছের মাগে লেগে ইইল। শিচ্ছেবর অবাক হয়ে দেখল, ...সবই তবে হৃৎকর আন্তনে পুড়ে ছাই হয় নি। নদী, পাল, নালার এই অকল; নৌকা এর গ্রাণসকারণী ধমনী। আত্ম হবি নৌকাগুলি থাকত, তবে কি এমন করে গাছের শাখায় নাহব পেচকের মতো জ্বলে থাকে।

মৃতশিশুর শবট। নিয়ে পরদিন সে নৌকায় উঠল। সেই শোকাভুর মাকে সে উপহার দেবে এই শিশুর মৃতদেহ। দিন চলছে—শিচ্ছেবর নৌকায় ভাসছে। বধা থেমে গিয়েছে, জল নামছে, বহ দিন পর আত্ম শক্ত মাটির স্পর্শ মাহুয পাচ্ছে। তবুও সব জল নেমে যায়নি। তার সেই পূর্বের আশ্রয়বল—সেই অধপতিত হৃৎকের কাছে এল;—কেউ নেই দেখানে, ...তারপর। ...আবার সেই নৌকা নিয়ে জলে ভেসে পড়ল, শিশুর মৃতদেহকে ফেলে দিয়ে গেল।

করেকদিন কেটে গিয়েছে। শিচ্ছেবর আত্ম শভাই পাগল। নোনা জল, বৃষ্টির জল, বড়ো হাওয়া অনাহার সর্বোপরি এই জ্বলের তাণ্ডব মৃতি, ...সব মিলে তাকে আত্ম পাগল করে তুলেছে। সে তার নৌকা করে এ গৃহ হতে গৃহে ঘাচ্ছে—সে দেখতে গৃহের চিহ্ন গ্রাহ নেই। কোথাও গৃহ আছে ত মাহুয নেই—কোথায় মাহুয আছে ত গৃহ নেই। নৌকা নিয়ে ভাসতে ভাসতে সে গেল—সেই অশ্বানে। তার সেই গৃহ সেই কালীমন্দির এখনো

খাড়া আছে। শিচ্ছেবর ভেসে গিয়েছে। আত্ম কদিন পর সে শক্ত মাটির উপর ঠাড়া। নিলুপ্ত কালীমূর্তিকে লক্ষ্য করে সে বলল—মা, ভেসে গিয়েছিল—তুই ও প্রাণনের মুখে ভেসে গিয়েছিল—তালই করেছিল—রাক্ষসী! আত্ম ভোর ছিন্নমস্তা রূপ হৃতিয়ে তুলেছিল দিকে দিকে—নিজের কণীর নিজে পান করছিল; আত্ম কি আর মন্দিরের ককে তুই আত্ম থাকতে পারিস।

গাতি এসেছে; পরিজ্ঞাত সিধে পাগলা সেই মৃশানের গৃহে শুয়ে আছে। সমস্ত দিন সে নৌকা নিয়ে এখানে, ওখানে গিয়েছে। এই সর্বব্যাপী বিকৃত। ও জ্বলের মধ্যে সে মৃত্যু শেরেছে—নৌকার চড়ে এর ওর নাগদা করেছে। আত্ম আর সে পতিত নয়;—আত্ম যে সবাই মৃত্যুর দ্বারে। আত্ম বৈতর্নিকের দ্বারে শাড়িয়ে—সবাই যে সিধে পাগলার অপেক্ষার আছে—সব পাগের বোঝা তার উপর চালিয়ে নেবে। ...হঠাৎ কার ঈশ্বরনি সে স্তনতে পেল সে কাণ খাড়া করে আছে। আত্মে মৃত্যুর সামনে থেকে কে যেন ডাকল—শিচ্ছেবর। শিচ্ছেবর লাফিয়ে উঠল। এ কঠোর সে ভুলতে পারে না—অন্ধকার থেকে আবার পদ এল—শিচ্ছেবর, আমি এসেছি।

শিচ্ছেবর অন্ধকার চায়ামূর্তিকে অগিমন করে বলল—না, না, তুমি চলে যাও; কেবল বলে যাও আমায় কি করতে হবে। আমি সব করব—জীবন পণ করে করব—কিছ তুমি থেকে। না—...ভানো না—আত্ম এই দেগজোড়া মৃশানের মধ্যে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ওরা দেখতে—মৃত বা জীবিত তোমাকে কোথাও পাওয়া যায় কিনা। কত এলোভন, কত পুষ্কারের লোভ, কত অভ্যাসের চলছে—তোমার এই ক্লম ছবল বেহকে পুবার মস্ত। যাও, যাও, তুমি পালাও।

অন্ধকার হাতে আবার সে বলল—“শিশু, কোথায় আমি দাব। বেঁচে থাকার কি মাহুযের সব চাইতে বড় শার্কত। এই মৃত্ত আমি দেখছি—নিজের নিরাপত্তার মস্ত আমি পানিয়ে দাব—তোমাদের এর মধ্যে রেখে। ...তা হয় না। তবুও আমি শাবধান হবে চলছি। আমি আত্ম

এসেছি তোমার এই নৌকাখানার ওপর। কাল একটি লোক আসবে তাকে ওটা তুমি দেবে। নেবে ওটা?”

শিখের—“আর কিছু চাই তোমার? আর ত কিছু নেই। আমার ত আছি কেবল আমি। আমাকে দিয়ে তোমার কোন কাল আছে কি?”

—“আছে সিধু! তুমি ত চূপ করে নেই। কাল ত তুমি করছ। তবুও যে লোক কাল তোমার কাছে নৌকা নিতে আসবে, তার সংগেই তুমি কাল করে, ... কলিকাতা শবর গিয়েছে। সেখান থেকে খাবার আসবে, শোক আসবে, ঔষধ আসবে। কিন্তু সব চেয়ে বড় কাণ হ'ল—মৃতদেহের গুপ সন্ধিরে কোলা! ... মল, বাতাস, রাতারাতি মৃতের দুর্গন্ধ ভরে আছে। বাতাস মরেছে—মাছুষ, পত, পানী—তারার তাদের দুর্গন্ধ আদিগুন দিয়ে জীবিতদের ঝাঁকড়ে ধরে টানছে। এর ব্যবস্থা করতে হবে সিধু।

শিখের—কিন্তু ভেবে না তুমি। মৃতের সঙ্গতি করাই যে আমার বংশধরমুকি জীবিকা, শুধু তাদের আত্মার নয়, তাদের দেহের সঙ্গতি করার ... তারও আমি নিলাম।

তবে আজি বাই সিধু! ...

—আর দেখা হবে না! ...

—হত হতে হবে। জানত আজ এই বেশ অশানে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে আমি আছি প্রেতের মতো। মৃতের মধ্যে আমি নেই। মৃতের মতো আমারও নবা নেই। সৃষ্টির আজ ছিন্নমস্তা রূপ; নিজের কথির যে আজ নিজে পান করছে। আজ আমি লম্বাহীন, লম্বাহীন, ভীত—বিশ্বের আর আতঙ্কে—অন্ধকারে ঠাট্টায়ে দেখছি। ... সিধু, পৃথিবীর রিডরুপ আবার আগবে—প্রকৃতির বিধানই তা' আসবে; তার অপেক্ষা আছি। আজিকার ছিন্নমস্তা রূপ দেখে স্পষ্ট, ভয়ে ও নৈরাশ্রে হুঁ ফিরিয়ে নিও না।

অন্ধকারের সব অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সেবতা

বন নিভ্রিত, হানব উত্থন সন্ধ্যা। হাছবের বন রাত্রির অন্ধকারের বিদায়—পেচক শূণ্যের তখন উত্থব সময়। অন্ধকারে শূণ্য জেদে উঠল—আজ তাদের উত্থবের রাত্রি; গ্রাহনের চল নেমে বাওয়ার সাথে সাথে, আবার কোথা থেকে মরম উত্থবের ভেজে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ পেয়ে এরা এসে চৌক করেছে। শিখের বৃত্তে নিল—হুগে করা ধূম; আজ এরই উত্থব সময়। হুগে হাত কপালে ঠেঁকিয়ে দে বলল—“আলোর বহু, সর্বব্যাপী সৃষ্টিদাবী অন্ধকার—এর মধ্যে তোমার স্থান নেই। ... তবু তোমার লম্বাহীন! ... আবার প্রভাত দুর্বের সংগে তোমার বিন আসবে। ... ঠিকই বলেছ—আজ সৃষ্টির ছিন্নমস্তা রূপ—এ তার নিজের কথির নিজে পান করছে—আর তার অংশ বিচ্ছেদ তার ক্ষেত্রে সন্ধ্যার। ...

... অন্ধকারের গর্তে দিনের বীজ, সৃষ্টির বীজ উঠে হচ্ছে; তার অন্ধুর উত্থব হচ্ছে—আজ তোমার সময় নয়। তোমার সাধনার এই বীজ দিনের আলোর হুটে উঠবে, পৃথিবীর ছিন্নমস্তা রূপ সংবর্তিত হবে—আবার যা অগ্ন্যবসী রূপে হাসবেন। তখন তুমি হবে তার পূজারী।”

দিনের দৃষ্টান্ত তার মনে পড়ল—পৃথিবীর আগ্নেয়তা, সর্বমাত্র রূপ; তার হিংস্র রক্তমাখা লম্বাহীন নিজে সে তার কংসের রূপ হুটিয়ে তুলছে। সঙ্গে সঙ্গে রক্তপিপাসা প্রেত-সন্ধি ও শূণ্য শব্দের বল আসার জুড়ে টোঁটোঁটি হুগে করেছে।

অন্ধকারে সে সব থেকে বেরিয়ে এল—দূরে গালের পার ঘিরে ছায়ায় বেঁধে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তার মনে কেবল জেগে উঠল—নিজ কথির পান-মস্তা ছিন্নমস্তা পৃথিবী।

অন্ধকার তখন গভীর ও ঘন; দূরে পেচক ভেঙ্গে উঠল। সেই ধনি অন্ধকারের গায়ে ঠেকে প্রতিধ্বনিত হল... সেই ধনি শিখেরের কাণে বাজল—ছিন্নমস্তা। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল—তোমার প্রার্থনা, ছিন্নমস্তা পৃথিবী!

মহাভারত ও মানুষের ধর্ম

রজনকুমার দত্ত

পরাশর-রত্ন ব্যাসদেব-রচিত 'মহাভারত' বাট লক্ষ লোকে গীতা একখানি মহাগ্রন্থ। মাহাত্ম্যের ভাণ্ডারে অর্থাৎ মর্তবাসীর ভাণ্ডারে কিন্তু ওই বাট লক্ষ লোকে গীতা সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি ঘোটে নি। মানুষের ভাণ্ডারে জুটেছে নাম একলক্ষ লোকে গীতা খণ্ড মহাভারত। বাকীটা খেঁকে তাক্সা বকিত। কেন বকিত তা একবার অহুসজ্ঞান কোরে দেখতে হয়।

আবার লোকগুলো যে যে লোক বা সমাজের মধ্যে বসিত, সেই সেই লোক বা সমাজ ও সেই সেই সমাজে ওর প্রথম বক্তা বা পাঠক ও শ্রোতা বা শ্রোতাদের মধ্যেও বৈমিল্য আছে দেখতে পাওয়া যায়। ৬০ লক্ষ লোক মধ্যে ৩০ লক্ষ লোক দেবলোকের উদ্দেশ্যে নির্মিত হই: আর দেবলোকে তার প্রথম পাঠকের বা বক্তার মর্যাদা লাভ করেন দেবর্ষি নারদ, শ্রোতা হুয়লোকবাসী; গির্জাশ্রম বা প্রেতলোক লাভ করেন পনর লক্ষ লোক, সেখানকার অধিবাসীরা প্রথম পাঠ শ্রবণ করেন অসিত-দেবল মুখে; বক্ষ গন্ধর্বাদির ভাণ্ডারে ঘোটে ১৫ লক্ষ লোকসমবিত গ্রন্থাংশ, তাঁরা শোনেন সিদ্ধজ্ঞান শুকসেবের মুখে। আর অবশিষ্ট এক লক্ষ লোক লোকে গীতা গ্রন্থাংশ লাভ করেন মর্ত্যলোকবাসী—তার প্রথম বক্তা বা পাঠক হলেন ঐশ্বর্যশম্পাষণ, শ্রোতা হলেন মহারাজ পরীক্ষিত-ভদ্র ঐক্সয়েশ্বর।

এই একলক্ষ লোকে গীতা মহাভারতখানি মর্তবাসীকে বা সিরেছে, তা বর্ণনাজীত। এখানি 'দ্বায়িকালের' সর্বমাত্র জীবনবর্ণন গ্রন্থপর্বাণের একটি অনূয়া অহুপম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিশেষ। এর অভ্যন্তর ভাণ্ডারে রচনাগত কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বা হিতার্থে নয়, সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যেই এর আপ্যানবস্ত। ব্যাসের রচনাকালে এত সব সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না,—আর যেদন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি; তখন ছিল আর্থ-অনার্থ, মজা-অমজা অর্থাৎ সাধু-অসাধু, দায়িক-

অদায়িক রূপে পরিচয়। বেদে আদি শাস্ত্র, বেংগলোকে আদি হিন্দুদের মৌলিক ধর্মগ্রন্থ বলে মানা হয়, সে-গুলোর মধ্যে কোথাও এমন কোনো সম্প্রদায়ের নামোচ্চেষ্টা নেই, আর বাণী কোনো একটি বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোকের উদ্দেশ্যেই ও নির্মিত বা রচিত, তা মনে করা যেতে পারে। বরং কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি মানব-জাতির উদ্দেশ্যেই রচিত হলেও, ওগুলোর বয়স বা প্রাচীনত্ব অনেক কম। অন্তর্গত, ওগুলোও বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতির স্তরই সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যেই ঐশ্বরিক বাণীরূপে সর্বমানবতার স্থান পায়।

মহাভারত এত বড় একটি বিশাল গ্রন্থ—দার পাতার বিভিন্ন কুল ও বংশপর্বাণের, রাজা প্রজা, ধর্মীসিদ্ধি, মুনি ও ঋষিদের জীবনগুস্তান বর্ণিত হয়েছে, পশুপক্ষী, বিটপী ও লতার পরিচয়ে পুঁথি বাতায় ঘটে নি, কিন্তু তথাপি বড়-বৃহৎ সম্প্রদায় হিসাবে মানুষের পরিচয় মহাভারতের কোথাও পাট নে। সর্বমুঠ, ভেদেব মধ্যেও মিলন-রাখী হুপ্রতিষ্ঠিত, অহুসজ্ঞানী পুঁথি নিয়ে তাকালে তা চোখে পড়বে। দর্শকে নিয়ে এত যে বিভ্রান্তি আর, আমাদের মধ্যে, মহাভারতের কোথাও তার অস্তিত্ব হুঁকে পাই নে। আছে আর্থ-অনার্থের নিশান, আছে দায়িক-অদায়িকের নিশান। তা বোলে অদায়িকের দায়িক বা অনার্থের আর্থোচিত ওপের অদিকারী হতে কোথাও কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না। দর্শেব নীতি বা বিধি আচরণের দ্বারাই দায়িক চরিত্রের অদিকারী হওয়া সর্বমুঠ লম্বা ছিল। আর তাউকে ধর্মপথে আকৃষ্ট করার রীতি, সে-ও ছিল 'অহিংসা ও প্রেমের পথে'। গাতীতীর পথ—কাল্পনিক নয়, বাবহারিক, বাস্তব অহুশীলনের পথ, ধর্মের পথ। সে শুধু তর্কত্বের পথ নয়, সে ছিল "অভয়ং লম্বমংগুস্তিল্লান্নযোগব্যবসিতি:"র পথ, সে ছিল লম্ব্যমক্কাধভাগ: শাস্তিরপশুগনম্"এর পথ, সে ছিল "তেজ: ক্ষমা ধৃতি: শৌচমহোদ্যো নতিমমিতা:"র পথ। সে-পথে যে তর্কত্বের দ্বারা লোককে আকৃষ্ট করা যায় না বা সে চেষ্টাও যে প্রতিবন্ধক আবদাওয়ারই বীজ অংকুরিত

করা হয়, গীতা কোরাণেই তার সমর্থন পাচ্ছি। গীতা বলছেন,

“ন বুদ্ধিত্বেদং জনয়েদজ্ঞানাত কর্ণপ্ৰতিমাম্।

বোদ্ধয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান যুক্ত সমাচরণাম্।” [৩: ২৬]

অর্থাৎ বর্ণে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তির বুদ্ধিতে জানী বেন ভেদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা না করে, বরং সমস্ত তত্ত্বা কোরে আপন পথে কর্মস্থলীন হাও। তাকে আকৃষ্ট করতে প্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করে। (তর্কের দ্বারা নয়, কর্মভ্যাসের দ্বারা)।

আর এই ভেদই অর্থাৎ অশ্রদ্ধাবীলের সহিত তর্কবুদ্ধে অবতীর্ণ হ'য়ে তাকে অহুপ্রেরিত করার চেষ্টার মধ্যে 'হিতে বিপরীত' হওয়ার সম্ভাবনা থাকতেই গীতার শেষ অধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকে ভগবান সতর্কতার ইঙ্গিত করেছেন :

“ইদং তে নাভ্যুপদ্যত না ভক্তাঃ কশচন।

ন চাত্তপ্রববে বাচ্যং ন চ দ্যং যোহচ্যুদ্যতি।”

অর্থাৎ যে তপস্বী নয়, যে শ্রদ্ধাশীল নয়, যে স্তন্যে অনিচ্ছুক ও আনার প্রতি অস্বাভাবিক হাওক এ তর্কের দ্বারা কখনো বোঝাতে চেষ্টা কোরো না। (অর্থাৎ আপন আচরণ ও কর্মস্থলীনের দ্বারা তাঁদের অহুপ্রেরিত করা সম্ভব, বক্তৃতা, তর্ক বা বিবৃতির দ্বারা নয়।)

কোরণ বলছেন : “নহম্মদ ! তুমি গ্রন্থদারিগণকে ও অজ্ঞ পৌত্তলিকগণকে বলা, তাহারা এছলাম গ্রহণ করিবে কি ? যদি তাহারা এছলাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারা পক্ষপ্রাপ্ত হইল। যদি তাহারা এছলাম গ্রহণ না করে, তাহাতে তোমার দাবি নাই, কেবল আল্লাহ্, তাআলার ব্যাক্তগুলি তাহাদের নিকট পৌছাইয়া দেওয়াই শুধু তোমার একমাত্র কর্তব্য। [কো: ৩: ১২ ;]

এখানেও সেই একই কথা। তর্ক নয়, কর্মস্থলীন দ্বারা পক্ষপ্রদর্শকের দাবি পালন করতে হবে—প্রোক্ত যদি সে-পথে নাই চলে, তাতে তোমার দাবি নেই। অগাই নাগাই যে 'কলসীর কাঁধ' কেলে ঘেরেছিল, তাতে কি নিতাই নিবাই নাও বিলাতে বিস্তৃত হ'য়েছিলেন, 'আপনি আচরিত ধর্ম' তাঁরা প্রেমের পথই দেখিয়েছিলেন, তবে না ধর্মের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল।

কোরণ আবারো বলছেন :

যোছলমানগণ ! তোমরা তাহাদিগকে বলা—

তোমরা কি সেই ঈশ্বর লক্ষ্যে আমাদের সহিত বিবাহ করিবে, যিনি তোমাদেরও ঈশ্বর, আমাদেরও ঈশ্বর ?

[কো: ২: ১০২]

এখানে মূলমর্মান তাহাই দ্বারা সত্যের পথে, আল্লাহর পথে, কল্যাণের পথে চলে। আল্লাহ তাআলার প্রতি-আত্মগতা স্বীকার কোরে তাঁর নির্দেশ মেনে চলাই মুসলমানের ধর্ম। হিন্দুর লক্ষ্যেও এই একই কথা, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রকৃতি রূপধারণ তথাকথিত ধর্মপন্থী সম্প্রদায়ের লক্ষ্যেও এই একই কথা। তবে বিরোধটা কোথায় ?

সকল সম্প্রদায়ের মূলধর্মগ্রন্থের মধ্যেই দেখা যায় যে নিম্ন নিম্ন ধর্মতত্ত্বে সকল গ্রন্থেই 'সার্বজনীন' বলে ঘোষণা করা হ'য়েছে এবং সকলকারই ধর্মভাবনার মূলনীতিগুলো একই অর্থ ও ভাবভাঙক এবং সার্বজনীন। কালেই দেখা যাচ্ছে যে বিরোধটা সত্য নয়, আমাদের অর্থাৎ পার্থক্যবাহী বাহ্যের মনগড়াই। বিরোধটা আসবেই কোনো ধর্মকে তিনি কোরে নয়। গ্রন্থ হ'তে পারে তবে ধর্মের এত নামান্তর কেন ? সকল ধর্মগ্রন্থেই সকল ধর্মপ্রবর্তকই যদি এই একই কথাই বিভিন্ন ভাষায় ঈশ্বর, আল্লাহ, গণেশ উক্তি বা নির্দেশনামা বলে ঘোষণা করেছেন—তবে কেন আমরা পরস্পরের পথে এত বাধান সৃষ্টি কোরে তুলেছি ? ধর্মতো অতিথি, অগণ্ড, অপরিবর্তিত এবং সনাতনী সত্য, তবু কেন এই ভেদবুদ্ধি ?

এরও সহস্রর আচ্ছে। আসলে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান বা আরো বতগুলোই ধর্ম-সম্প্রদায় থাকুক না কেন, সবগুলোই মূলে এক, নামে বিভিন্ন। জল, পানি, অগ্নি, ওয়াটার এর মতো হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান—এ সবও একই বিষয় বা ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। বিরাট বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গীতে বা শব্দভাষা বা ইঙ্গিত দ্বারাও প্রচারের চেষ্টার ধর্মের বিভিন্ন অভিব্যক্তি সৃষ্টি আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে কেলেছে—অন্তথা মূলে সব ঠিকই আছে।

গোমাংস ভক্ষণেই বা পাঁচবার নামাজ পড়নেই কেউ

মুসলমান হয় না, আবার ফোঁটা, তিলক, শিবী রাগনেই কেউ হিন্দু হয় না, আর গাভী ধর্মের বড়ই করচেন, যে-আওয়াজ তুলে দেশটাকে জালিয়ে গুড়িয়ে ধর্মের চরম পর্যায়ে এনে ছেড়েছেন, বস্ত্রতপস্ক উরা বা হিন্দুও নন, মুসলমানও নন—তাঁরাই স্বীতা কোরাণের শয়তান কাকের। যে হিন্দু, সে মুসলমানও বটে, সে খৃষ্টান, সে বৌদ্ধও বটে। মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি আত্মচৈতন্য আচারের দ্বারাই গড়ে তোলা হ'য়েছে। ও ধর্ম নয়। ধর্ম ভেদ জানে না। যে-ধর্ম ভেদ স্বীকার করে সে-ধর্ম ধর্মই নয়।

মহাভারত কি বলছেন ?

"ধর্মঃ যো বাধ্যতে ধর্মো ন স ধর্মঃ ক্বার্থং তৎ।

অবিরোধাৎ তু যো ধর্মঃ স ধর্মঃ সত্যবিক্রমঃ ॥

[বনপর্ব—১৩১, ১১]

কোনো ধার্মিক বা খাঁটি মুসলমানের পক্ষেই এ কথা চলে না যে তিনি হিন্দু নন, তেমনি কোনো খাঁটি হিন্দুর পক্ষেও এ কথা চলে না যে তিনি মুসলমান নন। সকল ধর্মমতের লোকদের সম্বন্ধেই ওই একই কথা। তাদের একমাত্র পরিচয় যে তারা মানুষ, বণ্ডভাবে যদি পরিচয় দিতেই হয় তবে আত্মিক পরিচয় দেওয়া যেতে পারে—যেমন ভারতবাসী, চীনাবাসী, আমেরিকাবাসী ইত্যাদি। ধার্মিক ভাবনার মূলনীতিতে কোথাও বিরোধ নেই, বিরোধটা আচার-ধর্মে, আর আচার-ধর্মই ছিল মৌল বিষয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আচার-ধর্মকেই আধুনিক অগতের লোক মুখা দান দিয়েছে, সবার ওপরে স্থান দিয়েছে তাই বিরোধটা যেন খুব পরিষ্কার ও তীব্রতর হয়ে দেখা দিয়েছে। সভ্যতা ও মহত্ত্বধর্মও সেই পরিমাণে পীড়িত ও রান হচ্ছে, অস্বর্গসিদ্ধ ও অবলুপ্ত প্রায়।

এই আচার-ধর্মই আমাদের সর্বনাশের মূল, মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টির মূলে এ-ই। তবে কেন এই আচার-ধর্ম? আচারধর্ম যদি এতই সংকীর্ণভাৱী তবে কেন লোকে সেই সংকীর্ণতাকে আঁকড়ে ধরে স্রষ্টার অশুভের, বিশ্বের পর্বাপ্যকলের সর্বদিকে স্রষ্টা লগ্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছে ?

ধর্মের মূলনীতি, সেখানে পাওয়া যাচ্ছে এক, সনাতনী সত্য ও অশুভ এবং তা ঐশ্বর্যপীঠী। বিভিন্ন স্থানিক শব্দ ও ইতিপক্ষে যে-সব শব্দ, স্রষ্টা বা ঐশ্বর্য বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মনীষির বিশ্বাস, চেষ্টা ও সাধনার আবিষ্কৃত ও রচিত হ'য়েছে—তাদের মূল ভাবের মধ্যে কোথাও ব্যত্যয় ঘটেনি বা পরস্পরের মধ্যে কোথাও বড় একটা অসঙ্গতিও দেখা যায় না। প্রশ্ন উঠিতে পারে তবে এত ধর্মমত ও সম্ভার কেন ? তার কারণ ক'ଣ ?

মূলধর্মের সঠিক সামাজিক আচার-ধর্ম এখন দুক্ক হয়, তখন ধর্মের মূলনীতিকে মানুষ বিস্মৃত হয় এবং আচার-ধর্মকেই প্রাপ্ত বিদে আরম্ভ করে। এনিকে আচার-ধর্ম সর্বথা সর্বত্র নির্মল নিঃশূন্য ছিল না। মানুষ স্বার্থপর হ'য়ে উঠে আচার-ধর্মকেই স্বার্থসেবার ব্যবহার করতে থাকে—ধর্মমনি সর্বত্র পরিগাপ্ত হয়। ধর্মের মূলনীতি থেকে ছাড়া হতে পড়ে সমগ্র মানব সমাজ। প্রত্যেক এমন এক একটা ক্ষেত্রে এক একজন মনীষির চোখে এই সব ধর্মমনি পীড়া-দায়ক হ'য়ে উঠে—তাঁরা আচারধর্ম তপস্বীর মধ্যে থেকে ধর্মের সনাতনী মূলনীতি ও স্বত্বপক্ষে বিশ্বাসীরা চোখের সম্মুখে স্পষ্টাকারে তুলে ধরেন। আর এটাই এই সব মহামানব সাধুসন্তদের মূল ধর্মচ্যুতের দ্বারা ক'ণ নির্ধাতন ভোগ করতে হয়নি—এমন কি জীবন বিনিময়ে অগতের কল্যাণে তাঁরা এ ক'রে গেছেন, আমাদের পাণের পংক থেকে উদ্ধার করার নব-জীবন দান ক'রে গেছেন, সভ্য ও কল্যাণের পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা ভগবান কৃষ্ণের নাম করতে পারি, ভগবান যীশু, সজ্জাতি, পশুপথ মহামতের নাম করতে পারি, কবীর দাদু প্রভৃতি মহাত্ম্যের উক্তির নাম করতে পারি। আর গান্ধীজীর সৃষ্টা তে আমায়ের চোখের সামনেই এখনো ডাসছে। এঁরা সকলেই ধর্মকে বিশ্বজনীনরূপে দেখেছেন, এঁদের অলঙ্কৃত, প্রস্তুতি ও আচরিত ধর্মসূত্র ও সাধনানী। আর বেহেতু ধর্ম এক, অশুভ ও সনাতনী সত্য। সেই হেতু তাঁরা কখনো ধর্ম-বিরোধীদের গায়ের ঘোরের বোঝাতে চেষ্টা করেন নি—তাঁরা ছিলেন আবিষ্কারক, প্রকাশক ও সংস্কারক, স্রষ্টা নন। ধর্ম এখন যখন পাণ্ডাছর হ'য়ে পড়েছে

তখন তখন এঁরাই ঈশ্বর প্রেরিত হ'লে এসে ধর্মকে পাশাচাষের গভী থেকে মুক্ত কোরে দেবিগে বিচ্ছেদন যে—এই ধর্ম, ধর্ম 'ছোবড়া' নয় 'শাঁদ'—হিংসা ও কোন্দল নয়, প্রেম ও মৈত্রী।

তাই না কোরাণ বলছেন: "ধর্মের সত্ত্ব কোনোরূপ বলপ্রয়োগ নাই, সত্য অসত্য হইতে আপনাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। [কোঃ ২, ২৪৩]

"ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দ্বন্দ্বকে তাহারা ঈশ্বর জানে পূজা করে, তাহাবিগের সেই কলিত ঈশ্বরদিগকে তোমরা কদাচ পানি বিও না, কাণ্ড তাহা। হইলে পাছে তাহারা সীমা অতিক্রম করিয়া অকৃত্যবশত তোমাদের ঈশ্বরকেও পানি দিবে।" [কোঃ ৬, ১০২]

কোরাণ আরো বলছেন: "হে মোসলমানগণ! তোমরা তাহাঙ্গিকে ঈশ্বরের পথে অধ্যবসার ও বিনয়ের সহিত এবং মৃত্যু ভাষায় আত্মদান করো। সং ও বহুভাবে তাহাদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হও।" [কোঃ ১৬, ১১৪]

অর্থাৎ বৈরভাবে বা দায়িত্ব তর্কবৃত্তির দ্বারা বিরাগীকে পরাধীন করতে চেষ্টা না করতেই উপদেশ দিচ্ছেন।

হয়াকর দ্বন্দ্বের কথা আমরা জানি, সে একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছুরাচারী ছিল, অন্যই ছিল, দেববি নারদ ও ব্রহ্মার সহুপদেশে সগাচার লাভ কোরে হলেন মহামুনি বাস্তুকি, আর্ষগুণগ্রামসীল মহামোক্ষী, মহাকবি। এমন বহু দৃষ্টান্তে রামায়ণ মহাভারত পরিপূর্ণ।

কোরাণ বলছেন: "হে মানব! তোমাদের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় থাকবে বাহা মানবসমাজকে আল্লাহর পথে, কল্যাণের দিকে আত্মদান করবে এবং সংকর্ষে আদেশ ও প্রেরণা দানে ও অসং কণ্ঠে নিষেধ ও নিবৃত্তি দানে সাহায্য করবে।" [কোঃ ৫, ১০০]

এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ধর্মব্রত সম্পর্কে যে বিরোধ তার কোনো সন্নিতি নেই। বিরোধ সৃষ্টির বিদ্যুৎস্রোত ইচ্ছাও যে প্রবর্তকদের ছিল না তাও শাস্ত্রোক্তি থেকে পাওয়া যায়।

বস্তুত 'ছোবড়া' অর্থাৎ আচারধর্মকে ভাগ্য কোরো বা গ্রীষ্মান্ত না দিয়ে শাঁদটুকুর পরিচয় গ্রহণকন হলে দেখা

যাবে ধর্মমত ও সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোথাও কোনোও পারস্পরিক সংঘর্ষের বা অসহিষ্ণুতা ও অসহযোগিতার অবকাশ নেই। এই শাঁদটুকুই চিনতে বলি, আমাদের চিনতে হবে। অগ্রবা ধর্মও নেই, বৃত্তিও নেই শাস্তিও নেই।

মহাভারতে যে একলক যোদ্ধার পরিচয় আমরা পেয়েছি সে কি কম কিছু? তার যোগ্য সমাধির কি আমরা কোরতে পেরেছি কখনো, না সেই দৃষ্টান্তের দিকে চেয়ে থাকি। আমাদের দৃষ্টান্তে ছানি পড়েছে, বস্তুত ছানিই সে। চোখ থাকতেও দৃষ্টান্ত লাতে বসিত, চর্মচোখেই ধর্ম বৃত্তিতে চেষ্টা করছি, তাই না আমাদের ব্যর্থতা; আমাদের মুঢ়তা ও নিবৃত্তিতার সীমার ধরই কি আমরা রাখি? স্ত্রীতাই না ভগবান বলেছেন, অর্জুনকে—

"ন তু মাং শকাসে ত্রৈয়নৈবৈব স্বচক্ষুণ।

দ্রিষ্যং দদামি তে চক্ষুঃ পুত্র মে যোগদৈববরম্।" (১১ : ৮)

অর্থাৎ তোমার ওই চর্মচক্ষুণারা আমাকে দেখতে পারবে না, অতএব তোমাকে আমি দ্রিষ্য (জান) চক্ষু দান করছি, আমার ঐশ্বরিক যোগ অর্থাৎ বিশ্বরূপ দেখতে হলে এরাই প্রয়োজন।

এ অেনেও যদি আমাদের চৈতন্যের না হয়, তবে আর কিসে কেমন কোরে হবে? তাহলে বলবো, আমরা 'নারায়ণসত্ত্বজানা', আমরা 'নারায়ণ ভাবমাস্তিতা'। সেই বিশ্বাসী লাভ করতে হলে অর্জুনের মতো নিষ্ঠাবান হতে হবে, বিনয়ী ও সন্মুখ হতে হবে, জ্ঞানপিপাসু হতে হবে। আর, একবার সেই বিশ্বাসী লাভ করলেই আমাদের ধর্মব্রতের জ্ঞান উন্মোচনা ও অসহিষ্ণুতা শাস্ত হয়ে যাবে, আমরা গুণ পাবো, দেখতে পাবো যে আমরা যে বাই করি না কেন, একই ঘাটের জল পানার চেষ্টাই করছি সকলে। আর তাই যদি হয় তবে কলহ বিবাদের দ্বারা সেই ঘাটে পৌছানো ও জল পাওয়া আমাদের ভাগ্য খটে উঠবে না, বরং বৈদ্যী ও সহযোগিতার দ্বারাই জুত সেই ঘাটে পৌছানো সম্ভব হবে ও জল লাভ হবে অর্থাৎ ধর্ম লাভ হইবে। আমরা এক অর্থও, সনাতনী

মতা ও ধর্মকে জানতে ও চিনতে পারবে। আমাদের
আচারমানসিক দূর হবে, পরম্পরে একতানে গঠিতে
পারবে—

“নব ভারতের (বিবেক) জনতা
এক জাতি, এক গ্রাম একতা।”

তাই বনি, এক লক্ষ শ্লোকে গাঁথা এই ধণ্ড-হলেও-
বিরাট মহাভারতবার্নিতেই যে-সম্পদ পরিপূর্ণ হ’য়ে আছে,
মর্ত্যমানবের ভগ্নে তা বহি আমরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে,
প্রচলিত হ’য়ে গ্রহণের চেষ্টা করতাম তবে আল এই
অধিকতর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দৃষ্টিে আমরা এমন কোরে
দুঃশঃ ভাগ, দুঃশঃ ও অশান্তি ভোগ করতাম না। আমরা
বিশ্বব্যাপী হুবা সমাজ গড়ে তুলতে পারতাম, এই দরাস্তেই
স্বয়ংলোক গড়ে তুলতে পারতাম, কবির গানকে লার্ক
কোরে তুলতে পারতাম—

“বর্গ কোথাঃ আনিস্ কি তা ভাই

তার ঠিক ঠিকানা নাই !

তার আরম্ভ নাই, নাইরে তাহার শেষ

ওরে, নাইরে তাহার দেশ,

ওরে নাইরে তাহার দিশ।

ওরে নাইরে দিবস, নাইরে তাহার নিশ।

বর্গ আমার মন নিল মাটি-মাঘের কোলে

বাতাসে সেই ববর ছোটে আনন্দ-কম্বোলে।”

উদয়

জ্যোতিগ্রন্থাব বস

বস্তির ছেলের নাম কখনও ‘উদয়’ হয়? শুনেছে
কেউ কখনও? কোন দিন? অমাবস্তার রাতে চাঁদ
উঠতে দেখেছে কেউ? তবু হরগোবিন্দ গায়েরনের ছোট
ছেলেটা নাম জিগ্যাস করলে বুক ফুলিয়ে বলে ওঠে,
ঐউদয়।

একেই নামটায় চমক আছে, তার ওপর ঐ কায়দা
করে বলাটার, বানিশ উদয়ের নিজের কৃত্তিম। উদয়ের

সে-ই তো বর্ণাশ্রম, বেখানে পরাম্পর নেই, পরম্পর
নেই, সকলেই পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-ব্যবহারে তৎপর,
লম্বা-প্রলম্ব, লম্বা-দুন্দী। প্রতিভাপের বিষয় এত অগ্রসরের
পরেও আমরা নিজেদের অসহায়, শক্তিহীন ব’লে মনে
করতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে বৈজ্ঞানিক
অগ্রগতির পথে বহুব্রহ্ম অগ্রসর হবার পরেও আজও কেন
আমরা শক্তি সংরক্ষণ করতে পারছি না। কেবল মনে
হচ্ছে, বা ছিল আমাদের, তা যেন হারিয়েছে আরো
হারিয়েছে। বা অর্জন করছি তা যেন ধরে রাখতেও
পারছি না। প্রতি-শক্তিরই যেন একান্ত অভাব হ’য়ে
পড়েছে জাতির। তগবান যে পরমকারক এইখানেই
তার পরিচয়—যে, এই অসমর্থ অজ্ঞ অল্পবোধ মর্ত্যমানব
ওপর মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোকের অধিক ভার তিনি
চাপান নি। কেননা ঐটি লক্ষের তুলনায় এই ক্ষুদ্রতম
জন্মের মর্যাদা বক্ষা করার মতো শক্তিও নাহলেই নেই,
আর অধিক কি? এইজন্যই বলি মর্ত্যলোকের প্রতি
তিনি পরম কৃপা দেখিয়েছেন। না কি?

কোরবর উক্তিগুলো পোশকর আদিত্যদেব আদিত্য প্রদীপ
“মাতঙ্গারে এলম্বা” হতে গৃহীত।

পর কি আছে, নাথ না কুমার, চন্দ্র না গোবিন্দ, তা শুনে
না কেউ ওর মুখ থেকে। ওর পরিচয়ের মধ্যে পদবীর
কোন স্থান নেই। উদয় শুণ্ড উদয়। ভোর করে কেবল
নাঁমের আগে একটা অনাবস্তক ঐ। গাড়ীর আগে
যেমন ঘোড়া, লাটপাহেবের আগে যেমন পুলিশ, উদয়ের
আগে তেমনি এক কদাকার ঐ। বস্তিরই আর এক
খয়ের ছেলে গণেশটা বলে ওটা যেন হাতির আগে শুঁড়।
নিজের নাম গণেশ বলে হাতির মাথা লম্বা লম্বা গণেশের
মাথা বাখার অর্থ নেই।

লোকের কৌতুহলের বৃত্তি আর শেষ থাকে না।

নিতান্ত যে হরগোবিন্দ গায়েন, বৌবাজারের মোড়ের
শেখনারী শোকানের এক হস্তভাগ্য কর্মচারী, তার
ছেলের নাম উম্ম রাখে কোন হিসেবে? হরগোবিন্দ
ইতিহাসের পাতা গুটোর নি কোনদিন যে নজর পড়বে
উম্মসিংহের পৌকুণ্ডালা ছবি। বাক্স-খিচোরের
আসরে হরগোবিন্দের স্থান নেই; কারণ কানে সে একটু
বাটো? তবে?

এই তবুটুকু খবর পেলে লোকে বিস্মিত হয়ে যায়
প্রথমে, তারপর হেসে ওঠে হো হো করে। উম্মের অল্প
খেনিন, পেনিনই শকালে শোকানের কোন পরিবারকে
কি যেন একটা জিনিষ ছেঁড়া খবরের কাগর সিরে মুড়ে
নিজ্জিল হরগোবিন্দ। হঠাৎ নজর পড়ে গেল একটা
ছবি। মত্ত পাগড়ী আর বিস্তৃত পোকুণ্ডালা এক
মহারাজা উম্মঠান.....আরও যেন সব কি! বাস,
মতিবির করে ফেলল হরগোবিন্দ, ছেলের নাম হবে আর
কিছু নয় উম্মঠান। কথাটা এতই উৎসাহ করে তুলেছিল
যে হরগোবিন্দ বাবুকে আনিরে দিল। বাবু হাপলেন
মুখ বেকিয়ে। ভাবটা এই: যুগ যে, খুঁটে জুন্নীর ছেলে
পদ্মোচান!

বাহীতে গিয়ে উম্মের মাকে কথাটা বলতে উম্মের
না হ। করে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। এতদিনে যদি বা
ছেলের মুখ দেখা গেল কোথায় ঠাকুর সেবতার নাম
রাখবে তা নয় দত্ত সব আনচেটে নাম। গরীবের গরুর
ছেলের গুরুত্ব ভদ্রলোকের নাম, শেখটা একটা
গোলমাল হবে না ত! উম্মের মায়ের কেমন যেন ভয়
ভয় করে। কিন্তু হরগোবিন্দ মত পরিবর্তন করবে না।

সেই থেকে উম্মের নাম উম্ম।

মহারাজা না হলেও বস্তির ছেলের মাতঙ্গর হয়ে
উঠেছে উম্ম নিজের কৃতিত্বের কোরে। মার্বেল খেলার
তার অর্ধাৎ লক্ষ্যে বিচলিত হয়ে ওঠে ছেলের দল, বতই
চোঁতা হোক তার আল উম্মের লাট্টু এক ইকি গর্ত করে
সিরে যাবে অহের লাট্টুকে। এ-ধরনের বৈশিষ্ট্য
আধিপত্যের চেয়ে ঈর্ষার বিস্তার করে বেশি। উম্মের

এই ছোট্ট জীবনের সীমাবদ্ধ গভীর মধ্যেও তার ব্যতিক্রম
হয়নি। ওর আগে হাং ছিল মাতঙ্গর তারা ছোট
বেগেছে ওর বিপক্ষে, চোখ রাঙ্গিয়ে দল ভাটী করেছে
নিজেদের। বাবা দেখনি উম্ম। পায়ে তার মোর কদ,
দলটাও ভাটী নয় তেমন, তাই হুৎপের অপেক্ষা থাকে
সে। যে হুৎপে হাওয়ার বেগে ছড়ানো মেঘের মত
তাকে বিস্তৃত করে নেবে দলের হুৎপে-হুৎপে। আর সেই
মেঘের আড়ালে তার ব্যক্তিগত হুৎপের মত জগবে।

এইই মধ্যে কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটে গেল। বিজ্ঞ
দলের হাতে পড়ে একদিন বিশী রক্তের মার পেয়ে এল
উম্ম। মার্বেল খেলা নিয়ে লেগেছিল সঙ্গ। পানুর
কাছে বসে ছিল উম্ম অরীর আগ্রহে। ইতিমধ্যেই
অনেকগুলো মার্বেল প্রতিপক্ষের কাছ থেকে স্নিতে
নিরেখে উম্ম। হঠাৎ ঠক করে একটা মার্বেল এসে
লাগল ওর জান চোখের ঠিক ওপরে। দুহুর্কের অল্প
অস্বস্তি দেখল উম্ম। তারপর তড়িত দৃষ্টি নিয়ে উঠে
গাড়াল। বেমনার শনকন করছে লাগা মাথা। চোখটা
কান্না হয়ে গেল কিনা কে জানে? চোখের মধ্যে ঠেলে
এল রক্ত। পলার ভেতর কেমন যেন নোনা নোনা জ্বা।
ভেতর দিয়ে রক্ত বরছে নাকি?

তবু রূপে গাড়াল উম্ম। হু'পা এগিয়ে গিয়ে হাতটা
চেপে ধরল যে ঘেরেছে তার। মারলি যে বড়?

—আহা ইচ্ছা করে ঘেরেছে নাকি? অথবা দিল
আর একজন ওর হয়ে।

—ইচ্ছা করে না ত কি? বেগবি যম্মা!

—হা দেখব! কি করবি তুই?

এক স্তলকে উম্মঠান মহারাজের রক্ত চন্ করে মাথায়
উঠে গেল। যে ঘেরেছে সেই পটলার পলটা দুই হাতে
সজ করে টিপে ধরল উম্ম।—পুন করব তোকে আছ!

হুৎপে পেয়ে গেল সস্তলে। মার মার...ব্যাটা
আত ভাকাত...নিহে নে মার্বেলগুলো...! দুহুর্কের মধ্যে
কি যেন হয়ে গেল! গম্ভীর আক্রমণে মাটিতে লুটিয়ে
পড়ল উম্ম। কিন্তু রক্তও ব্রি করে পড়ল কাটা-ছেঁড়া দিয়ে।

রাজা-মহারাজাদের দিন ব্রি আর নেই!

দু'তিন দিন চুপ করে শুয়ে রইল উন্নয়ন ঘরের মধ্যে। তার এই আট বছরের রোমাঞ্চকর জীবনে এ এক আশ্চর্য অবসর। চালা ঘরের নীচে ছোট একফালি জানালা দিয়ে অনেক কিছু আবিষ্কার করল উন্নয়ন শুয়ে শুয়ে। একটুখানি আকাশের কালিও সেখানি নিল কোন রহস্তময় ঠাক দিয়ে। পথে না বেরিয়ে শুধু জানালা দিয়েও আকাশ দেখা যায় তার বিচিত্র আনন্দ আবাড়ের সমস্ত বেননাকে আচ্ছন্ন করে দিল নিমেষে।

ওদের বস্তির একদিকে মত্ত এক পাঁচিল। সেই পাঁচিল বায় বাহাদুর বিজয়ান মুখোবর মত্ত বাড়ি আর সমস্ত বাগান ঘিরে পাকার অর্ধেকটাই জুড়ে রয়েছে। পাঁচিলের ওপারে ঢোকে নি কেউ—উন্নয়ন, নগেন পটলা .. কেউ না। গোড়ের ঠাক দিয়ে ওদের বিস্তৃত দৃষ্টি কৌতূহলের চূষকে এক-এক ফালি আশ্চর্যের টুকরো যদি-বা আকর্ষণ করে নেয়, তাতে কৌতূহল বাড়ি বিশ্ব নেটে না। পাঁচিলকে ভিসিয়ে চারতলা বাড়ীর উপর উল্লাসলোয় আলো জলে, চকচকে পোষাকের কতগুলো মাহু-পুতুল চলে, ফেরে, গাঁড়ায় গান গায়। আর গোড়ের ঠাক দিয়ে হস্ করে আহাভের মত্ত গাড়ী ঢোকে আর বেরোয়। ওরা এক নিমেষেই শুধু গাড়ীর পিছনের ছোটো লাল আলোর চোখ বাকানী দেখে মার, আর কিছু নয়।

উন্নয়নের গবেষণায় অন্ত নেই ও-বাড়ী সযত্নে। মহা-হাকার সঙ্গে মিলনো তার নাম, প্রাণায়ের দিকে নজর ত তাই থাকবে! উন্নয়নের প্রিয়তম সহচর বে গগেন ওরই সঙ্গে কোনও নিঃশব্দ অবসরে উন্নয়নের প্রয়োত্তর চলে ও বাড়ী সযত্নে। একদিন ওরা চুকবে যে করে হোক। পাঁচিলটাও ত এমন কিছু উঁচু নয়।

আহত হয়ে শুয়ে থাকার অবসরে উন্নয়ন অবাক হয়ে বেগল ওদেরই জানলায় এক কোণ দিয়ে পাঁচিল ভিসিয়ে একটি ঘরের জানলা দেখা যায় ও-বাড়ীর। জানলা যদি থাকে খোলা, ফুল-কাটা শাটিনের পর্যা চশমা যদি থাকে সরানো, তাহলে দেখা যায় ঘরের অন্ত-মহল। একখানি প্রশান্ত শব্দ ঘরালের অংশ। তার ওপর কোলানো মত্ত এক ছবি। পেটা মাহুয়ের না কুহরের, কিছুই বোকা

যায় না। ছবির নীচে একটা কাচের আলমারির মাথা দেখা যায়। আলমারির মধ্যে লাল নীল নানা রঙের জিনিসের ভীড়। তারের কাউকেই চেনে না উন্নয়ন।

আর দেখা যায় মাহু, মাহু-পুতুল। মাহু বেশি আসে না ও-ঘরে। একজনকেই দেখা যায় দাধরবত্তঃ। ফুটফুটে দেখতে, দবধবে গায়ের রঙ, ফুটফুটে কলো ফুলে ছোট ছোট টেউ, আর লাপের মত লম্বা বেষ্টী। নানা রঙের শাড়ী পরে ও। নানা ছোটের স্টাউ। কানো পরলেও বেন সারা গা ওর স্পষ্ট দেখা যায়, এমনই এঁটে এঁটে থাকে। উন্নয়ন অবাক হয়ে যায়।

ও এসে গাঁড়ায় জানলাটায়। বাগান আর টেনিস-কোর্ট পেয়িয়ে পাঁচিলের চৌকীঘরীকে ঠাকি সিঁচে উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে থাকে বেন ওরও এই চালা ঘরের বেড় ফুট জানলার অবিবাক্ত অবকাশ দিয়ে।

আম্বায়ে বুকেছে উন্নয়ন ওটা ওরই ঘর। ওখানে ওর একচ্ছন্ন আধিপত্য। মারে মারে ওখানে ভীড় হয়। সে বোধ হয় ওর রাজত্বের সরবাসের সময়। কিংবা ওটা ওর দেশের রথ-চড়কের মেলা, বিজয়ার মিছিল, নীটিংয়ের হুজু। তাছাড়া এক এক সন্ধ্যায় অগ্নি এক শব্দকণ ঘনায় ওর এই ঘরের রাজত্ব। তখন গান আসে কলনো দিয়ে। টেবিলে রাগা ফুলঝির ওপর মিথে তাকানো রজনীগন্ধার ডালের শিব দেখা যায়। লম্বা আর রোণা, কদা' আর স্বকল্পকে চেহারার কোনও ভুলোককে দেখা যায় আর দেখা যায় দানী কোটের বাটনহোলে একটুকরো ফুলের ইষৎ উঁকি। এ-সব দেখে উন্নয়ন, একা-একাই দেখে।

তারপর সেয়ে যায় ওর চোখের সেই বাধা, কাটা-হেঁড়ার রক্তের হাপ।

উন্নয়ন ঠিক করে রেখেছে এবারের সরস্বতী পূজার ফুল চেয়ে আনবে ওদের বাগান থেকে। অবাক করে দেবে লকলকে। উন্নয়নের এই একান্ত গোপনীয় স্বপ্ন যেন যেঘের মত্ত ঘুমো, যে যেঘে ছড়িয়ে পড়বে লবাব ফুয়ে ফুয়ে! এই ত সেই সুযোগ। দোনার মত্ত সুযোগ।

কিন্তু, সরস্বতী পূজার অনেক আগেই আর এক

অতঃপর সুযোগ এল। ১৯৪৬ সালের ১৬, ১৭, ১৮ই আগস্টের দিনগুলোয় এসেছে বড় সুযোগ, বাগের সুযোগ বলাই ভাল। সুযোগ নিয়ে খেলা করেছে অনেক মানুষ, অবশেষে কয়েকটি অনেক সুযোগকে এমন মানুষের সাধ্যাও অম্ভ নয়। সুযোগ-প্রাপ্তের ক্ষুধাটিকার একটু বৃত্তি জানে স্বপ্ন কেবলার সত্যি হয়ে সেল উল্লেখের।

ঐ কথটা যিনেই কোন এক রাত্রে রাঘববাহাদুরের পাঁচিলের উত্তর পারের এক বস্তির মানুষ উল্লেখের বস্তির মানুষের শব্দ হয়ে উঠেছিল। দুর্বার তাদের শক্তি, দুর্ধা আয়োজন। এদের বসি ভৈরী হল মরতে। রাঘববাহাদুরের বাড়ীতে আসল মানুষরা কেউ নেই। শুধু যোগ কর রাঘববাহাদুর নিয়ে আছেন, আর আছে টাকা নিয়ে পোকা নেপালী।

পাড়ার সকলে বিশেষতঃ বস্তির এই হল গিয়ে বরল রাঘববাহাদুরকে - দয়া করে যদি বাড়ীর ছানে উঠতে দেওয়া হয় এক্ষেত্রে তাহলে ভারী সুবিধে হয় লড়াই করবার। চারটে মানুষেরই রাখতে পারে চার খার।

রাঘববাহাদুর মাথা নাড়লেন। ও-সব বে-আইনী কাজ তাঁর বাড়ী থেকে হবার নয়।

—কিন্তু আপনার ভিনটে বন্ধু আছে যে!

—বন্ধু আছে, গুলি ছোড়বার রকম নেই।

তর্ক করবার সময় আর নেই। সময় নেই দয়া নাচার, করুণার। ভিনপো লোকের বিরুদ্ধে আয়োজন যদি হতে পারে, ভিনটে বন্ধু হাতে বে-নেপালী তারাগে তুচ্ছ বাটে!

রাত বারোটার বিঘনটা গুরুতর হয়ে উঠল। সব বৃত্তি শেষ হয়ে এল। রাঘববাহাদুর তাঁর প্রাঙ্গণের নিভৃততম কক্ষ এক হাতে টেলিফোন বার টাংকার করে চলেছেন, অস্তগত সুস্থিৎ। বোধ করি স্ত্রী তাঁর একেবারে শূন্য নয়। অবসরপ্রাপ্ত জেলা-স্বয়ং রাঘববাহাদুরের স্ত্রীর মধ্যে তখনও আইনের বন্ধ।

তবু আগ্রহ্য শোনা গেল। প্রচণ্ডতর আগ্রহ্য। একটা নর-সুটো। টেলিফোনের রিডিন্গটা গড়ে গেল রাঘববাহাদুরের হাত থেকে। তবে কি—!

না। আগুন দেখা গেল ওপাশের বস্তিতে। যেখানে আফালনের হুদুকি ছুটছিল, সেদিক থেকে এখন গভীরতার আভ্যন্তরীণ শিখা উঠল। যেহেতু থেকে নিনাশ উঠছিল সেখানে আত্মনাশ ছুটল।

প্রথমটা অবাক হয়েছিল পাড়াগাও সবাই। পরে সব পরিষ্কার হয়ে এল। কীভাবে আসলে উল্লেখের। মাঝেমাঝে অব্যর্থ ভাক দায়, ভোঁতা আসলে লাটু বার হাতের গুণে এক টুকি গর্ত করে থের এ কাছ তাব, সেই উল্লেখের। ওষের বস্তির পিছন দিয়ে একটা সজ পলি রাঘববাহাদুরের পাঁচিলের পা দিয়ে চলে গেছে উত্তর দিকে। একটা মানুষ বেতে পারে এত সজ। পলিটার শেষ হয়েছে ঐ শত্রুপক্ষের বস্তিটার দূরে। সামনেই এক মত জাইবিন। দুপক্ষের আত্মজ্ঞানার সম্মুখ। ওইই মধ্যে জুব দিয়ে বসে অসামান্য সাধন করে এসেছে উল্লেখের।

জনে ভাব হয়ে গেলেন রাঘববাহাদুর। পুলিশের হাঙ্গামে আবার কি হয় না হয়। তাঁর বাড়ীর ছান থেকে এই দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অবশ্য: সাধারণ বুদ্ধিতে এই ধারণা বহুদূর হয়ে যাওয়ারই কথা। কতগুলো ছোটলোকের জন্তে শেষটা বড়ো ব্যসে পেলন নিয়ে টানটানি হবে নাকি? এদিক-ওদিক পাড়ী নিয়ে পৌঁড়তে হয় রাঘববাহাদুরকে দু'চারটে টেলিফোন, তাঁর জুয়ি রমে যেতাবেয় কাগজখানা বাঁধানো যে ক্রম আর যেতাব পাওয়ার দিনে যে পার্টির ছবি দেখলো একটু কেঁদেফুঁড়ে চকচকে করে রাখেন, অবশ্যে দেখলোও কাজে লেগে যায়।

রঙ্গশোভা গায়নের আভ্যন্তরীণ নীচা নেই। ছেলেরা যে সব কাণ্ড করে এসেছে তাতে সবশুদ্ধ না লাইকে যায়। যতবার দেখা বন্দী করে রাখে ছেলেকে। ব্যাপারটা যাতে পাচ কাণ না হয় তাঁর জন্তে প্রয়োজন অপ্রয়োজনে ছেলের নর আর বিনারী স্বভাবের অবস্থা প্রচার করে বেড়াই। বহুদিন আগে দেখা সেই উল্লেখ্য মহারাজের ছবিটা যেন দিনে, রাতে, জাদুগণে, যত্রে ভরষর ক্রুদ্ধতায় আর স্তম্ভিত বিজ্ঞপণ সর্বনাশের অবজ্ঞাবাদী ইচ্ছিতে ধ্বংস করে। ছেলেকে ছোর পলায় ভাকতে স্বরটা কেঁপে ওঠে

হরগোবিন্দর। উষরের মা পাড়ার স্ত্রীলা যদিও মানসিকের দুল চড়াই।

উষর যেন নিজেও মনে পেছে অনেকগানি। উৎসাহ নেই কিছুতে। না খেলায়, না কাজে : ওব আশা ছিল সেই প্রচণ্ডের আওড়ার দলের মধ্যে ওব একজনের আশ্রিততার সঙ্কেত স্থায়ীভাবে ঘোষণা করে দেবে। মিথেন্ধিলও তাই। কিন্তু সেই আগুনেরই প্রতিধ্বনি যেন সেই ঘোষণাকে বোঝা করে দিল। উষর যেন মনমরা পেছে। গনেশ, পটলা, দাদিক, শি...এরা সকলেই একবারে স্বীকার করে নিয়েছে উষরের অসাধারণ কৃতিত্বকে। উষর এখন ওদের রাজস্বের সুস্থটীলি লড়াই। বক্তির মধ্যে তারা প্রধান তারা পর্বত সমীহ করে চলে উষরকে। বাপের দানী লজ্জার কাল!

ছোপের দল বলে রেখেছে উষরকে এবারের সরস্বতী পূজার দুল এনে দিতেই হবে রাহবাহাদুরের বাগান থেকে। কতরকম পাতবাহারের গাছ আছে, সেই সব পাতাও কিছু কিছু চাই বিজয়ী দলের পুজো, ওরই মধ্যে স্বাক্ষরযুক্ত তা একই বেশি হওয়া চাই। কথাটা মন নয়। উষর নিজেও ঐ ফুলের কথা ভেবে ঠিক করে রেখেছে। ওদের দেড় হুট জানলার অবকাশে পাঁচিল আর বাগান পেরিয়ে ঐ উপরতলার জানলার কাঁকে যে রাখবে, যে মাছ-পুতুলের বাস, তার কাছেই কথাটা পাড়বে একদিন। আর একটি অভূতপূর্ব সাফল্যের লড়াইনা-গৌরবে উষরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কিন্তু সরস্বতী পুজো এখন এল সব যেন গোলমাল হয়ে গেল : পুজো পর্বত জয়ল না এবার। শাকি নেই মৃগুয়ের মনে। রাগে আলো নেই। কারকিউর মৃগেশ-পরা বাজি। এর মধ্যে আবার পুজো। তাহাজা রাহ-বাহাদুরের, বাড়ী প্রায় আগের মতই কাঁকা পড়ে আছে। বাড়ীর লোকেরা সেই-যে গোলমালের সময় চলে গিয়েছিল তারপর থেকে ফেরে নি এখনও। উষরের মনে হল, দুল চাইবার লোক বাকি নেই। শুধু, দলের চাপে এগোতে হয়েছিল ওকে রাহবাহাদুরের কাছে। এক দমকে পানিতে মিথেন্ধিল রাহবাহাদুর—ব্যাটা

ছোটলোক গওমুখা, স্তোমের আবার সরস্বতী পুজো! তার আবার দুল! পুজো কি একটা খেলা নাকি?

পুজোটা খেলা নয়, কিন্তু মার্গেল আর লাই, খেলার আসরে এই পুজো। মেনতার মতই দুলত বটে! মাথা হেঁট করে ফিরে আসে উষর রাহবাহাদুরের সামনে থেকে। প্রতিবাদ পর্বত করে না। কি হবে ওদের দুল নিয়ে? ওদের দুল না নিয়েই ত চলে এসেছে এতদিন! তবে?

১৯৪৭ সালের দিনগুলো বড়ের মত কেটে চলে। নিত্যানন্দন ঘটনার গোমাকে প্রাত্যহিক জীবন অভিনববে চকল হয়ে ওঠে। সেদিনকার উদ্বাহবতা আর উৎসাহ, অভিব্যক্তি আর মৃগেশ যেন অস্তিত্ব লহতে, অপরূপ প্রত্যাহার অভ্যন্তর গলগলে বাত মিথিয়ে! তুলে বাত অনেক অনেক-কিছু। রাহ-বাহাদুরের ঘর বাড়ী আবার কোন দিন যে ভরে উঠেছে দাগ কাটে না গণেশ, পটলা, শি...দের মনে। উষর যেন আশ্চর্য্যভাবের চেয়ে বেশি ঐ পাঁচিল আর দুলবাগানের ওপারে পাটনের পর্দার দুল সমীহ হয়ে উঠেছে একদিন। কোন অধিবাস্তব অবকাশে একটি-বা স্বকীয়গতীর শিখ, টবং মাথা দুটিয়ে দায় হাওয়া লেগে। কিন্তু ওলব দিকে মনও সেখানের দুলত নেই উষরের। মেন নাকি স্থানীয় হবে তারই আয়োজনের ব্যপ্ত, মিটিং আর মিছিলের উল্লাসে ওর দেহমন যেন শুধু থরথর করে কাঁপে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন আলোক-সন্ধ্যা দেখা গেল রাহবাহাদুরের আগার জুড়ে। বাগানে সামিহানা পড়ল, গোটে নবযতের মক। রাহবাহাদুরের নাকি মেয়ের বিয়ে। চেনা অচেনার সকলের মৃগেশ মৃগেশ একটা কোতুহলের চিহ্ন, জিজ্ঞাসার কূকন। উষর বেশি তার জানলা দিয়ে উপরতলার পাটনের দুল তোলা পর্দা অনেকখানি সরানো। ঘরে বহু লোকের সীত, হাওয়া-আলা। গান বজ, সেই বাহী কোটের কাঁকে দুলবাগানো মাজুরের দুল শুধু দেখা যায় না। জানলার বাহরে কেবল সেই মাজুর পুতুল এসে ধাঁড়ায়। খবরদে মৃগেশ চেহারা, চোখ দুটো আকানের দিকে ফেরানো। উষরের না ওর

দিকে আত্মসমর্পণে উদয়ের বাবাকে বলে, একেই বলে বড়লোকের কাণ্ড দিলে যেহে, আত্ম বামে কাল বিধে জানলার দাঁড়িয়ে কাঁচা করছেন। গারে একটু কাপড়টাও টেনে সিন্তে ত পারিস্!

উদয়ের বাবা বলে, বড়লোকের মেয়ের দিকে তোমারই বা ডাকানো কেন বাবু? ও কি তোমার পুটি?

মায়ের মুখটা কালো হয়ে আসে পুটির কথা জাবলে। ১৫ বছর বয়স হল তার ওপর যে বাড়ন্ত পড়ন! গারে জামা ছোটে ন। অর্ধেক সময়। সামনের বাড়ীর কলোকে-পড়া ছেলেরা জানলার ধারে বই খুলে বলে হাঁ করে বেন গেলে! বহুণ আর কি!

মায়ের কথাই কেনন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার মুখটা ভারী হয়ে আসে উদয়ের। কোথায় বেন শূন্য মনে হয়। জানলার দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির আঙ্গুর বিদ্যায়ের কলশ লগ্নটিকে বেন নবতার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলতে চায় উদয়ের এই আট বছরের মন।

বিয়ের রান্ধিরে ওয়াও ভীড়ের সঙ্গে ভীড় বাড়তে দিচ্ছেল। ওয়া অর্ধে শিবু, গণেশ, পটলারা। বায় নি কেবল উদয়। পোন্টের টিক দারটার ওয়া হল পাঁকিয়েছে। বাওয়া-দাওয়া ঢুকলে পর ওয়া গিয়ে ঢুকবে। অটেল, অপর্গাপ আরোমন। কাষেই ছুটেবে না কিহু, এমন নয়। অতঃ আত্মকের মিনটার ওয়া নিশ্চয়ই মেঘাশ মেঘাবে না। কাল্লনিক ভোষ জু হুয়েছিল ওদের। শিবুটা বরলে ছোট কিন্তু গলার জোয় আছে। তাই সকলকে দাবিয়ে চীৎকার করছিল পানভূয়ার আকাশ নিয়ে। শিবু নাকি কোন ঠাকৈ দেখে এসেছে। কিন্তু এত বড় রক্তভটাকে বীকার করতে চাইছে না কেউ। শিবুর পানভূয়ার চেয়ে গণেশের মুখ থেকে চিংড়ী হাছের আত্মতির বর্ণনাটা বিবাসযোগ্য। চিংড়ীবাছ ত বাইরে থেকে ভেতরে গেছে গণেশ দেখলেও দেখতে পারে বটে। কিন্তু শিবুর গলার জোয় প্রায় কোনাঙ্গা করে ফেলছে গণেশকে। ওমিকে গণেশের দলটা ভারী। একটা হায়াবারি বাধে আর কি!

হতভাগাগুলো জালালে দেখছি। দরওয়ান কেহা করতা ছায় তোম?

ভেতর থেকে শুকগরীর কঠ শোনা যায়। পরক্ষণেই নেপালী দরওয়ানের ভোজানীর বাঁকটা তিরিক হয়ে ফুটে ওঠে পোন্টের ধার থেকে। পালার শিবু, গণেশ, পটলা...। পালাবার সময় মলামলি নেই আর!

উদয় বলে, তোরা যেমন জানোয়ার, তিথিরী! কি মরকার ওদের মরকার বাবার!

ওদের চোখ ছলছল করে ওঠে। শিবুর পানভূয়াগুলো বেন আরও বৃহত্তর আকারে ধোরাকেরা করতে থাকে না-দেখতে-পাওয়া চোখের সামনে দিয়ে। দূর, উদয়টা বেন কি!

শা'ব আর উল্লুনিতে হঠাৎ চকিত হয়ে ওঠে চারদিকে। নহবত্তের সাহানা রাগিনী বেন ছাপিয়ে বেতে চায় আকাপকে। বর এল। সবলেই ভীড় করেছে প্রবেশ পথে। বাড়ীর উঁচু আলগেতে হুয়ারেলেট আলোর রশ্মিগুলো পর্যন্ত বেন নতমুখে তাকিয়ে। হঠাৎ হুম্ করে এক শব্দ তারপর অন্ধকার। আর ইকরো ঠাচ করার ছন্দহীন শব্দ!

কি হল? কি হল? আলো ডাকলে কে? অন্ধকারের ছোপ ধরা দেওয়ালে দেওয়ালে কোলাহলের ঢেউ বেন কেনাচিত হয়ে আছড়ে পড়ল। এসিয়ে এলেন রায় বাহাদুর। সম্মুখে তাঁর তুচ্ছটো কুঁচকনো—সেই হতভাগাটার কাক নর ত যে বাটা বোমা মেরেছিল?

কে? কে? বোমা? গুলি? কি কাণ্ড!

উদয় বাইরে বেরোবার পথ পায় নি। হঠাৎ কোন ডাডুনার আরও ভিতরদিকে ছুটে গেল ও। তপা'শ দিয়ে ওপরে বাথরুমে বাবার মোটার প্যাচানো দিড়ি। তরতর করে তাই দিয়ে খানিকটা উঠে গেল উদয়। তারপর তিনতলার এক বীকের আড়ালে গুঁড়ি নেয়ে গোপন করতে চাইল নিষেকে। কিন্তু, কার গলার আওহাল আসছে না বারান্দা থেকে? একটু মাথা উচিয়ে ডাকাল উদয়। দেওয়ালের আলো নিতে বাওয়া

এদিককার কোণটায় একটু আবছা অন্ধকার। ওখানে ঠাড়িরে দুখন কথা বলছে। আর একটু ভাল করে তাকাল উষর। হ্যা, সে-ই ত, তারাই ত! সেই আনন্দের ভগ্নভেদে মাছুষ-পুতুল আর কোটের কাকে ফুল-লাগানো কর্ণা আর স্বতমকে মুখ।

কথাগুলো বোকা যাচ্ছে না। একটু যেন কান্নার আভাষ পাওয়া যায়। কর্ণা মুখ যেন বলছে, তাগিল আসোটাশো ডেবে একটা কাও হল। না হলে দেখা পাবারই উপায় নেই, উঃ।

তারপর আরও কি যেন সব বলল ওরা। এগিয়ে গেল আরও পরস্পরের দিকে। অন্ধকার ভেদ করে সৌধীন নাড়ী আর খাঁটা জামাকে ডিবিরে ওষ নেহ যেন দেখা যায় পুতুলের মত। তারপর আড়ষ্ট হয়ে গেল উষর। তার আট বছরের বালক মুখ হাকা হয়ে গেল।

ঐ কর্ণা-মুখ একটা ফুলের গুচ্ছ তুলে ছিল ওর হাতে, সবুজ বাহারী পাতা, হলদে-কি যেন ফুল আর রজনীগন্ধার গাল স্পষ্ট যেন দেখা যায়।

হঠাৎ কর্ণা-মুখের নজর পড়ে যায় উষরের দিকে।

—কে?

পুতুল এসে মুখে ঢাক। বেধ ওর।—আতে চৈচিও না পাগলের মত! ও আমানের উষর।

মুখ ঢাকা গিড়ে গিয়ে ফুলের গুচ্ছটা পড়ে যায় নীচে। সেটা ছড়িয়ে নিয়ে ছুটে নেমে চলে উষর। তারপর বাগান দিয়ে ছুট।

ধর-ধর.....গেল-গেল.....রব ওঠে চারদিক থেকে। ছুটারটে ঝিল চড় গায়ে এসে পড়ে। পিঠের ওপর নেপালী দরওয়ানের ছোট একটা নাটিও বুঝি পড়েছিল। টন টন করে সেখান-টা। চোখে ঝল আসে। কিন্তু অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী উষর বেচিরে আসে বাহভেদ করে। তারপর ছড়িয়ে দেয় ফুলগুলো দিবু পটলা আর গনেশের মাঝখানে। সবুজ বাহারী পাতা, হলদে-হলদে কি যেন ফুল আর রজনীগন্ধার শিখ।

উষরটান মহারাষ্ট্রের দিকে তারিখে থাকে ওয়া।

হেথাও ওঠে চাঁদ

ঐক্যপন্থ প্রব

(১৫)

বিমান এখন রোজই আসে—যদি কোন দিন না আসে বা আসতে দেবী হয়, মালতী উষরীষ উৎকণ্ঠায় এতিকা করে।

এর কয়েকদিন পরেই বিভা ও প্রভাতের এই ব্যাপার ফুল।

সেদিন সন্ধ্যায় বিমান পড়াতে এসেছে। মালতী বিভার কাহিনী সব বলল। বিমান বলল—“এই প্রভাত যে অধিকারকে না কাকে দিয়ে করল, এই বিয়ের কি অর্থ আছে? হয়ত ঋমিয়ারের কাছ থেকে কিছু অর্থ পেয়েছে—অথচ ভ্রমের মধ্যে হয়ত প্রাণের কোন বোণ নেই। তপন ও তার পুত্র স্ত্রী হদিকা—এদের সম্পর্কেই বা

কি বলা যায়? তপন হদিকাকে কোনদিনই স্ত্রী বলে স্বীকার করেনি—অথচ সন্তান পুষ্ট হয়েছে।...

“মালতী, তোমার কাহিনীটা যেদিন প্রনাম প্রণমেই যেন হল, আমায়ের সমাজে মাছুষের জীবনের কোন দায় নেই। নির্ভয় সমাজ তার বধ চালিয়ে যাচ্ছে—বধ-চক্রতলে কীটপতকের মতো মানুষ পিঠে হচ্ছে। দেখ, হিন্দু ধর্মে একটা কথা পড়েছিলাম—অনন্তকাল বা নিকপাতিক সময় ব’লে কোন বাস্তব পার্থ নেই, ওটা আমাদের মনের বিস্তার, বর্তমান-ই হল সত্য, ভবিষ্যৎ হল অগ্রবৃত্ত—বার এখন-ও অল্প হদিকা কিন্তু বার সন্তানবদা আছে; আর অতীত হল লুপ্ত বা হৃত। অথচ সমাজ যে ব্যবস্থা আমাদের জীবনে চালাচ্ছে, তা হল সব-ই অতীতকে নিয়ে—অতীত-ই আমাদের কাছে সত্য, ভবিষ্যৎকে টুটি টিপে রেখেছি—তার বৃত্ত সন্তানবা আছে,

তারের বের হবার সব পথ বন্ধ করে রেখেছি—আর যা একমাত্র সত্য—বর্তমান মুহূর্ত তাকে ভবেছি অস্বীকার।...

“তোমাদের জীবনের সে অতীতের একটা ঘটনাই একমাত্র সত্য—বর্তমানও নেই, ভবিষ্যৎও নেই। এই করেছে তা’ জীবন চলে না। জীবন হল গতি—সে গতিকে বন্ধ করার স্বর্থ হয় জীবনকে অস্বীকার করা।”

মালতী একটু পরে বলল—“কিন্তু বিমানবা, অতীতকে ত জীবন থেকে মুছে ফেলা যায় না। শাস্ত্রাণ্ডি-ও পারেনি, বিজা-ও পারেনি। তা ছাড়া অতীতকে নির্ভরভাবে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলা-ও কি শোভন? এই মুহূর্তে যা বাস্তব ছিল, ঠিক পরের মুহূর্তেই তা হবে অতীত।—তখন তাকে অস্বীকার করা কি অতি নিষ্ঠুরতার পরিচয় নয়?”

বিমান—“তা কেউ বলছে না। তা সম্ভব-ও নয়, সম্ভব-ও নয়। কিন্তু নামব প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বাসি ব’লে একটা মিনিব আছে। মনোবিজ্ঞানে পড়বে—বিশ্বাসি মানুষের মনের বিকাশের সহায়ক।—এই বিশ্বাসিই অতীতকে হুলিয়ে নতুনকে আহ্বান করে আনবার পথ হ্রদয় করে দেয়। মানুষ ও সত্য বিধান মিলে যদি সেই বিশ্বাসিকে মোটেই আমল না দেয়—কটোপুষা, খড়ম পুষা, কৃষ্ণ-গাধন প্রভৃতি নানা পন্থায় যদি অতীতকে কেবল জীয়ে রাখতে চেষ্টা করি, তবে নন যে কেবল অতীতকে নিয়েই পড়ে থাকবে।... থাক, মালতী, এ নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই। সমাজের দ্বারা অগ্রগামী—জারাই এখন-ও এসব কথা মানবে না, তোমাদের আর বোধ হবে লাভ কি?”

উত্তর আর বিমান আবার বলল—“মালতী, অতীতের গর্ভে জন্ম মানুষের সমাধি অতি করণ দৃষ্ট; যাকে সমাধি বেঁধা হয়, তার পক্ষেও এটা ঐতিকর নয়, দ্বারা বেধে তাদের-ও এতে আনন্দ বৃদ্ধি হয় না।”

মালতী বলল—“জন্ম মানুষকে সমাধি করলে, তার পক্ষে যে সেটা ঐতিকর নয়, এটা ত সর্বজনমাত; কিন্তু সত্যিমানের বেটা যদি কাউকে তার অতীতের সঙ্গে সবাই মিলে সমাধি করে দেয়, তবে সে বেচারার কি উপায়

আছে।—তাকে সমাধিই হ’তে হয়। হত ধর্ম বা নীতির বোহাই দিয়ে যথাকে সমাধি করেই নিতে হয়। এমন যে স্বর্ধ—তাকে-ও পাতলা বাপীর মেথের নীচে সমাধি করা হার।”

বিমান বেরিয়ে যেতে যেতে বলল—“তা বাব, কিন্তু বরাবরকার অস্ত্র নয়—আর-ও উজ্জলতর হয়ে সুখ আবার বের হয়।.....”

তারপর কয়েক মাস কেটে গেছে। সম-দুর্ভাগ্যের বন্ধনে বিভা ও মালতীর মধ্যে একটা যথুর বন্ধন স্থাপিত হয়েছে। সেদিন অতি প্রভুবে মালতী বিভার ঘরে গিয়েছে—বিভার তখনও সুখ তাকে নি। মালতী গিয়ে তাকে ভাকতেই বিভা তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে পাশে শুইয়ে পানের হয়ে বলল—

“ভাল হইল আরে বহু আগিলা সখালে
প্রভাতে হেরিলাম মূখ দিন বাবে ডালে।”

মালতী বিভানায় শুবে পড়ে বলল—“ঈশ্বর আর এল কৈ? সারারাত বৃষ্টি ঈশ্বার স্বপ্ন দেখেছিল?”

‘কাহ্ন নাহি আইল ঘোর ঘরে।

কাহার লাগিয়া মূকী সাক লাগিলাম গো
পরান কেমন কেমন করে।

চাঁদ হেরিয়ে ঘোর তাপ বাড়াবে গো
বিব লাগে হলধেরি বাত।’

তারপর দুই সপ্তাহ পরস্পরকে জড়িয়ে শুবে এক সঙ্গে শুপ শুপিয়ে গান ধরল—বিভা প্রথম হুক করল, মালতী পরে যোগ দিল—

“সকলি আমার বোধ যে বহু

সকলি আমার বোধ

না জানিয়ে যদি করেছি পিরীতি

কাহাবে করিব বোধ।

সুখার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া

পাইছ আপন হয়ে

কে জানে পাইলে পরল হইবে

পাইব এতক মুখে।”

বিভা বলল—“বালভী, দুঃখ পাওয়াই আমার সার হবে। কিন্তু তোমার কপালে যে আর-ও দুঃখ জন্মে উঠেছে। এ কি ভূমি করছ?”

মালভী কোন কথা না বলে বিভার বুকের কাছে মুখ তুলে গড়ে রইল। বিভা আবার বলল—“ভূমি এত শক্ত, এত বুদ্ধিমতী, সব ঘেন্নে শুনে এই আগুন হাত দিচ্ছ কেন?”

মালভী এবার অবাক হল—“আগুনের দিকেই যার টান, সে কি আগুনের হাহানের কথা মনে করে? সে যেথেকে কেবল আগুনের জ্যোতিঃ। —কোন অদৃষ্ট শক্তি আমাকে টানছে—কিছুতেই নিজের শক্তি কিরে পাই না। আর আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। কতদিন বৌবির কাছে বাইনা—নিজের অপরাধ বোধ থেকে একটা লজ্জা উঠে আমার সবকিছু বিকল করে দিচ্ছে।……”

“বিমান বাবু-ও বোকা উচিত। তার এজেন্টু বাহির নেই কেন?”

“না ভাই, তাকে বোধ দিয়ে লাভ নেই। এখন আমার অধর নিঃশব্দতার উপর ভূমিতে পড়ে ছটকট করছিল, তখন তিনি আমাকে দেখে, মহাহুস্কৃতি ও প্রস্ফার উর্বর ভূমির সন্ধান দিলেন। তিনি বা দিয়েছিলেন, তা দিয়েছিলেন স্নেহ ও মহাহুস্কৃতি থেকে, আমার মহত্বের প্রতি, আমার নারীত্বের প্রতি প্রভা থেকে—আর আমি আমার বিধাত মনের ছাঁচে ঢেলে তাকে করে নিলাম বিশ্ব ষটিকা। সেই বিশ্ব ভূমানে মিলে বেটে খেয়েছি—নেপথ্য যৌর ধত্বণ থাকে, ভত্বকণই তার আনন্দ—তারপর আসে অবসাদ। তখন আমার একমাত্র শান্তি হচ্ছে তোর কোল।……”

বিভা জুলে গেল মালভী তার চেয়ে বড়ো বয়ঃ বড়ই হবে; তার মনে হলো বেন তার ছোঁই শাবকটি বাহিরের কড় কাপটীর আঘাত পেয়ে তার বুক আঁর্ষ নিয়েছে। নারী হৃদয়ের শাভাবিক মাতৃব্যবোধ তার অন্তরে মেগে উঠল। মালভীকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল—মালভী ছুঁপিয়ে ছুঁপিয়ে কান্নাতে লাগল।

বিভা বলল—“দেব্, মালভী—to sin and to

repent—ক্রমাগত অপরাধ করে বাহিষ্ এবং তার অন্ত অন্তর্যাপ করছি—এটা মাহুনের সব চেয়ে বাহিষ্গ্রন্থ মনের অবস্থা। এতে মাহুণকে একেবারে দুর্বল করে দেয়। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হবে।……”

কিছু সময় খেমে বিভা আবার বলল—“একটা কথা তোমাকে বলব—প্রায় অপ্রায় বোধ একটা মানস subjective ভিনিঃ—এর বাস্তব দত্তা খুবই সামান্য। নর হত্যা পাশ—আম্ব এটা সর্বজনমাত্র। কিন্তু খুব বেশী দিনের কথা নর ইংল্যান্ডের নীতি বোধে এর অতি সহজ স্থাননের ব্যবস্থা ছিল—একটি কৃষকে হত্যা করলে ২০০ শিলিং অর্থাৎ প্রায় বেত্ব ন’ টাকা বিলেই সেই পাপের স্থানন হত; একটি ভদ্রদাহকে হত্যা করলে ১২০০ শিলিং বা ৮০০ টাকার মতো বিলেই পাপ হতে মুক্ত হওয়া যেত।

“আম্ব যে সব প্রথা বা নীতি নীতিকে আমরা অন্তর্য ব’লে মনে করি, ইতিহাসের কোন কোন যুগের কোন না কোন দেশে সে সব-ই প্রায় ও নীতি-সমস্ত ব’লে মনে করা হত।……

“……নর-নারী সম্পর্কে আমার মনে হয়, convention বা লোকচারকে বড় করে দেখা ঠিক নয়। এর প্রায়-অপ্রায়ের একপ্রায় কঠি শাখর হল—আধুনিকতা। সত্যিকার ভালবাসা যদি থাকে তবে লোকচার বা লম্ভায় বিধি দিয়ে তাকে শাসন করা অপ্রায়। কিন্তু সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের কাছে আমাদের দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্বের দাবী যদি কেউ পূরণ করে, তবে তারপক্ষে, আমি অন্ত কোন বাধ্য দেখছি না।…… মালভী, তোমার মন ভূমি এখানে বুক দেখে।……

“প্রেম বা ভালবাসার সঙ্গে যদি বিনীততা না থাকে, যদি তার সঙ্গে লুকোচুরি বৈজ্ঞ ও অপরাধির মানি জড়িয়ে থাকে, শুভে, তাকে মনের গোপন কোঠা থেকে বের করা উচিত নয়। যদি মনের সে বল আছে মনে কর, যদি সামাজিক দায়িত্ব নেবার লাহস থাকে—সর্বোপরি যদি তোমাদের পরস্পর সম্পর্ক সত্যিকার ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত মনে কর, তবে এগিয়ে যাও; অন্ত সব বিবেচনা

বাধা তোমার কাছে তা হ'লে তুমি। যদি তা না হয়, তবে এখনও পিছিয়ে পড়—এখানে থেকে অন্তর চ'লে যাও। ...”

মালতী বলল—“বিভা, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সত্যিকার ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, সেখানেই আমার লক্ষ্য আছে। বহন ও অবস্থার অনৈক্য এত, যে এখানে ঠিক ভালবাসা থাকা সম্ভব নয়। আমি ত' তোমায় বলছি—তিনি আমার নিষেহিলেন যেহে, সহ্যহুত্ব ও নারীত্বের সর্বস্বা—আমি তাকে ক'রে নিষেহি কামনার ইচ্ছা। আমার স্মৃতি ও বক্তিত যন হৃদের লগ্নে ঘোলে মিটাক্ছে। :.....

“বিভা, এখানে আমার একর কথা নয়। তার সামাজিক গরু সর্বস্বা আছে, বাড়ীতে স্ত্রী আছে, সন্তান আছে। এদের দখাইকে ক্রমী ক'রে এত লোকের অভিশম্পাতের উপর আমার হৃদের সৌধ গড়তে চাই-ও না, পারব-ও না।”

বিভা—“তবে কি করবে?”

মালতী—“স্থান ত্যাগেন।”

সে দিন-ই প্রাতে দু'এককটা পর ববর এস—বিমানের স্ত্রী ভারতী আত্মহত্যা করেছে।

• • • • •

আর-ও মাস বানেক কেটে গেল। মালতী ঢাকা ত্যাগ ক'রে চলেছে। এই একমাস মালতীর সঙ্গে বিমানের বিশেষ যোগা হয় নি—বা ২১১ বার যোগা হয়েছে, তা কতকটা সামাজিক সোহা-সুনা, একক লাক্ষ্য প্রায় হয়নি। বিমান ও মালতীকে নিয়ে যা ছিল এতদিন গুঞ্জন, ভারতীর আত্মহত্যার পর তা হয়ে উঠল জনরব ও কলহব। মালতী এই একমাস প্রায় কোথা-ও বের হয়নি। বিদায়ের আগে সে হুজুমারী ও বিমানের সঙ্গে যোগা করতে বেকল। এখন গেল বিমানের কাছে।

হুজুম-ই প্রায় চূর্ণ চাপ। বিমান কথা বুক করল—“মালতী, বাহন যে কত দুর্বল, তা আমি নিম্নের জীবন বিধে বুঝি। লগাই যেন অবস্থার দাস। স্ত্রী নির্দোষ নারী—বাহনের উভয়ের মঙ্গল কামনা আমি অন্তরের সহিত

করেছি—জাহেব এমন সর্বস্বা যে আমার দ্বারা হবে, এ আমি কখন-ও সম্ভব মনে করিনি। ...

“আমি প্রায় ১৪ বছর ভারতীর সঙ্গে বাগ করছি—সর্ব কাছের আমাকে স্ত্রী করাষ্ট যেন ছিল তার একনিষ্ঠ সাধনা। সে আমার মস্ত যে ব্যবস্থা করত। তা যদি না যেনেছি, তবেই সে অভিমানে ভরে উঠত। একটা হৃদয় স্ত্রী তার পেই অভিমানতরা বুধে টুটে উঠত। ঠিক যেন দাবাড়ুর লম্বাছের বাদল আকাশের মতো—গাঢ় কালো মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ—মল যেন পড় পড়।

“... আমি প্রায় দু'মাস ধাবং তার পেই অভিমান তরা হুধে যেনি নাই। নিম্নের অপরাধী মন একটু হাফা করে, তাকে একদিন দ্বিজ্ঞাসা করলাম—‘ক-ই এখন ত' রাগ কর না।’ সে-ও একটু শুক হাসি হেসে বলল—‘মাতৃহের বুদ্ধি-বুদ্ধি ও ত একদিন হয়—বরাবরই কি বোকার মত রাগ করে। তার জবাব শুনে বুকটা কেঁপে উঠল। কিন্তু তার সঙ্গে এ নিধে আর আলোচনা করতে পারলাম না। ...

“মালতী, সে ত' চলে গেছে—আমার ভাবনার-ও অতীত, শারিরিক-ও অতীত। কিন্তু মালতী, তোমার জীবনে বহু দুঃখ ভবেছিল; আমি যে তা আবার বিগল, চতুর্গুণ করে যেন এটা কখনও যথেষ্ট মনে করিনি। চেয়েছিলাম, তোমার মনের বন্ধনগুলো মুচিয়ে তোমায় জীবনকে আবার সহজ পথে চলতে লাতাধ্য করব। ...

“আজ-ও আশা করি, প্রার্থনা করি, যেখানেই থাক, জীবনে সুখী হও। আর কমা প্রার্থনা—সে সব কথা বলতে চাই না। ...”

মালতী বাধা দিয়ে বলল—“কমা আপনি চাইবেন কেন, আমি-ই এসেছি আপনার কাছে কমা ভিক্ষা করতে।”

বিমান বাধা নীচু ক'রে রইল। মালতী আবার বলতে লাগল—“আপনি এসেছিলেন, আমার হৃদে সহ্যহুত্ব নিয়ে, আর তার পরিবর্তে, আমি আপনার হৃদের সংসার ছারখার করে দিলাম। আপনার ঘাতি,

প্রতিপত্তি সব নষ্ট করলাম। যদি পারেন জীবনে কোনদিন বেন আমার কমা করেন।...”

বিমান—“মালতী, প্রার্থনা করি, কমা বেন আমার। উভয়েই উভয়কে করতে পারি। নইলে, উভয়েরই জীবন অসঙ্গ হ’লে উঠবে।”

বিহারের আগে হুকুমারী মালতীকে বলল—“মালতী, একটা কথা বলছি—বা হয়ে গেছে, তা আর কি হবে না। ভারতী চলে গেছে—তাকে কিহানো যাবে না। কিন্তু ছেলে, মেয়ে, বিমানবাবু, তার ভাষা সংসার—এ সবই আছে।...”

মালতী তাড়াতাড়ি হুকুমারীর হৃৎ হাত দিয়ে কথা বন্ধ করে দিয়ে বলল—“বৌদি, এমন কথা মুখে এনো না। তোমার পায়ে পড়ি। আমার জীবনকে আর জোড়া দেবার চেষ্টা করো না।...”

একটু পরে হুকুমারী আবার বলল—“তবে থাক, তবু বলছি, তেবে বেশি...”

—“আমার সব ভাবনা দেব হয়ে গেছে। ও-কথা ছেড়ে দাও বৌদি।”

—“এখন কোথায় যাবি?”

—“বিষ্ণু বা ব’লে আমার দামার এক বন্ধু আছেন দেশে আমাদের বাড়ীর কাছে বাড়ী। সেই বিয়ের পর ছেড়ে আসার দিন তিনি বলেছিলেন—‘জীবনে দাই ঘটুক, আমার কাছে আশ্রয় সব সমই পাবি—দরকার হলেই খবর দি’। তাকে চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি অস্বাধ দিয়েছেন—পুলিশদার ওপাশে একটা ছোট্ট রেলওয়ে স্টেশনের ধারে তিনি থাকেন—কি একটা ব্যবস্থা করেন। এখন তার কাছেই যাব।”

শেষ বিষয় হল বিভার কাছে। মালতী বলল—
“বিভা, তুমি আমার যুগা করবে না ত’।”

বিভা বলল—“ছি: কি যে বলত। মালতী জীবনে দুঃখের ভগ্ন পূর্ণ করে নিয়ে যাক, স্বামী হবে এ প্রার্থনা করতে সাহস হয় না। কিন্তু কামনা করি ও আশা করি—আর দুঃখ বাড়িও না।”

“মালতী, কেবল অপরকে অভিযাচ দিয়ে নিজের জীবন গ’ড়ে তুলতে পারা যায় না। প্রভাত, তপন, বিমান,—এমনি লোক দুনিয়ায় সর্বত্র বিচরণ করছে; আরও দশটি মেয়ে যদি এদের হাত এড়িয়ে স্বামী হ’তে পারে, আর আমরা যে পারি নি, এর দশটা দায়িত্ব কেবল প্রেমের ঘাড়ে চাপালে মতোই অপলাপ হয়। নিষেধের কোন দুর্বলতার গন্ধ, যিহে ননি আমাদের জীবনে প্রবেশ করেছে, তারই সন্ধান করা উচিত, মালতী। হুই গ্রহ দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে, আর সগাইকে ছেড়ে আমাদের জীবনেই প্রবেশ করল কেন এক-কিভাবে?”

মালতী—“বিভা, কাউকে আমি অভিযাচ দেব না। তাদের জীবন ও ত’ স্বামী হরনি। আমি যদি তাদের অভিযাচ দি তারাগে আমার ভেতরিন অভিযাচ দিতে পারো।

দুঃখের ও মহাহুঙ্কৃতের সহজ বন্ধনে দুটি খুবতী-দুগধ পরস্পর আকৃষ্ট হচ্ছিল; আর বিদায় দিনে তাদের অঙ্করের পুতীকৃত দুঃখ বিগলিত ধারায় আলিঙ্গন-বন্ধ পরস্পরের বক্ষকে সিক্ত করল। বিভা বলল—“মালতী, আজ আমাদের জীবনে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই রইল না। সে দিন তুমি গান করেছিলেন—‘স্বা পান করলাম, কপালগুণে সবই হল গরল।’ এর মত কাকে দোষ দেব বোন? হুতী কবির বয়ান শুনেছি।

‘প্রেম এই মর্ত দেহকে তুলে ধরে

বর্গের দৌণ শিরের

আর পাহাড়ের নাচিয়ে তোলে

আনন্দের নৃত্য-হিলোলে।

—আর আমাদের বেলায় সেই প্রেম-ই হল দুঃখের নিদান। কে এর মত সাহী?”

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মালতী বলল—“কাকে সাহী করব। হয় নিষেধ কপাল, না হয় নিজের কর্ম।...”

(কমল:)

বিধুর বেটা

শ্রীশুশ্রূষাধী ঘোষ

আমি এখন প্রথম করলাবৃত্তিতে আসি তখন ডরা বর্ষা, আষাঢ়ের প্রথম। এখানে তখন আমার বিশেষ কোনো শরীশাবী ছিল না, সারাদিন একাই কাটাতে হত গ্রাং। আমাদের বাড়ীটা একেবারে কুঠিও বাড়ীখানে—বারাষায় ঠাড়াগেই গেলগির পুলিচাকা, বরলাও চিবনী সব দেখা যায়। পশ্চিমের দিকে বাড়ীর খানিকটা দূরে সারি সারি অনেকগুলো ধাওড়া—সেখানে গ্রাং ৪০০ কুলী-কামিন থাকে। পূর্বদিকে ঘরের একেবারে কোল বেঁসে আরম্ভ হয়েছে মাঠ, মাঠের দূর চিত্রে চলে গেছে কোলিঘাটীর হলেজ লাইন—সেখানে দিনরাত হলেজ চলছে পাশাপাশি লাইনে একই সবে বোকাই ও খালি করলার টব হচ্ছে ও আসছে। হলেজ লাইনের একপ্রান্তে করলার চিপো সেখানে হাটুত করলা ভনা হয়ে রয়েছে, অপরপ্রান্তে খাদের চালক—সেখানে লোকজন বসে ওঠানামা করে, বোকাই টব ওপরে উঠে আসে, খালি টব নীচে নেমে যায়।

আমি গ্রাংই পূর্বের দ্বারে জানলাটির কাছে বসে এইদম দেখি। বেশি ছোট ছোট ক্ষেতগুলি জনমঃ সূজ খানে ভরে উঠছে—তার নাঝে সারাবেলা ধরে চলছে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি বেল। ধানক্ষেতের পাশেই করলা খাম—প্রভতির নীলার পাশেই মাছবের হুন্দির কাঠসান্নী। ঐ একঘণ্টা পড়লো, বোকা। গেল বোকাই টব উঠল, ঐ তিনঘণ্টা পড়লো তাহলে এবার যাব্বু উঠবে। এইদম দেখে শুনে আমার মনের অনেকখানি সময় কাটে।

আমার মেথার অল্লও একটি জিনিষ ছিল ;—একমল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাদের নিকেলের তিনগুন লম্বা এক একটা লাঠি নিয়ে আমার জানলার ঠিক নীচেই গল, ছাগল বা বোব চরিয়ে নিয়ে বেড়াত। আমি তাদের কুল, কাগজের মোকা, সবরের কাগজ খেকে কাটা ছবি, লজ্জল, রকীম কাগজের টুকরো—এইসব দূর বেগুতে তারা লম্বা, সচোচ কাটিয়ে আমার নগে গর

করতো। এইদম অতি তুচ্ছ অথচ তাদের সরল শিশু-মনের কাছে গরম লোভনীয় জিনিষ পেয়ে তাদের দূর এমন তুলির হাসি মুটে উঠতো, এমন আনন্দের উজ্জল ভেগে উঠতো যে আমি রোজই তাদের মস্ত কিছু না কিছু উপহার সংগ্রহ করে রাখতাম। এমনি করে তাদের শিশুমনের অনেকখানিই আমার আয়ত্রে এসে গেছিলো। বেশ লাগতো আমার এমের সঙ্গে গল্প করতে—এট সরল শিশুদের কথাবার্তার ভিতর দিয়ে আমি যেন আমার এই অপরিচিত মৃতন পারিপার্শ্বিককে একটু একটু করে চিনে নিছিলাম।

একদিন বিকালে সব কাজ সারা হয়ে গেল, অভ্যাসমত জানলার দ্বারে বেরে বলতেই চোপ পড়লো। একটা ছোট ছেলের উপর, একখানা কাত্রে নিয়ে ঘাস কাটছে। বিকালে ওখানটাও কোন ছেলেপুলে বড় একটা থাকেনা—আর এ ছেলেটিকে দেখিওনি কোনদিন, সেমস্ত আদ্য একটু কৌতূহল হল, আমি তাকে কাছে ডাকলাম। প্রথমে ত সে কিছুতেই কাছে আসবেনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার ভাণ্ডারের সেই শিশু মনোহারী তুচ্ছ জিনিষগুলির প্রসোভনে পড়ে কাছে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম “এই তুমি কে রে? কি নাম তোরা?”

“আমার নাম হল আখনা—আমি বটে তোমাদের বিধুর বেটা।”

“আমাদের বিধুটা আবার কে রে?”

“ঐ যে বইলারের ছাই ফেলার, আগে তোমাদের বাগার কাজ করতো নাই?”

“ও—তা তুমি কি করছিল এখানে কাত্রে নিয়ে?”

“ঘাস কাটছি গো।”

“কি করবি ঘাস নিয়ে?”

“এই গল, ছাগল, খরগোশ—সব খাবে।”

“তোমের অতসব আছে নাকি রে?”

“না গো—আমাদের কেনে হবে—ঐ গায়ের বাবুদের যটে—ঐ যে বাম্বাকির কাজ করেনা? আমি তাদের বাগাল বটে তাদের বহৎগুলো গল, ছাগল, খরগোশ, হাঁস সব রইছে। আরও বাগাল আছে আদিও রইছি।

কষ্ট। নতুন বাড়ির হইছেনা? ভানের লাগে বাস চাই—
তা উত্তরা বললে যে হেথাকে বহৎ ভাল বাস আছে
তথেষ্ট আশেছি—”

“তা এত বেরী করে এলি কেন? বাস নিয়ে পাওড়ায়
কিরে আসতে রাত হয়ে বাবে না? ছেলে নাহয়—একা
আসতে পারবি? তার করবেনা?”

“কিরে আসবো কেন? আমি ত উত্তরের ঘরেই
থাকি।”

“তোমার মাও কি ওখানেই থাকে নাকি?”

“না—সে কেন হেথায় থাকবে—সে এই পাওড়াতেই
থাকে।”

“তা তুমি মায়ের কাছে থাকিস না যে?”

“আগে তাই থাকতাম—এই কতকদিন হতে
এখানেই রইছি।”

আমার কেমন বেন দম্বেহ হল। অন্তরুই ছেলে—
এখনই মায় কাছ থেকে আলাখা থাকে—সন্ধ্যা নয় তো?
আমি আবার মিজামা কল্যায়, “এই তোমার মা তোকে
ভালবাসে?”

আমার এই প্রশ্নে সে বেন একটু বিস্মিত হল—প্রথমট।
বোধহয় কি উত্তর দেবে ঠিক করতে না পেরেই একটু
ইতস্তত করতে লাগলো কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘাড় কাত
করে বললো—“হ্যা—মা ভালবাসে—ঐ বাগেই দেখতে
লারে। সেইত বলে মিথ্যেই রাবুথের থাকতে। মা
লুকারে লুকায়ে পয়সা বেশ মিঠাই খাবার লাগে, পরবে
নতুন কাপড়কামা কিনে দেয়—হ্যা—মা ভালবাসে।”—
এই বলেই সে ছুটে চলে গেল। বেশ লুলাম মাতৃ-
স্নেহের এই নিদর্শনগুলি উদ্ভূত করে আমাকে বোঝানার
সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের মনকেও আশ্বাস দিচ্ছে। অর্থাৎ
এরকমভাবে আলাখা রাখার জন্য তার মাকে মাকে মায়ের
স্নেহে দম্বেহ হয় বটে কিন্তু তবনই আবার ঐশ্বর্য ভেবে
সে স্নেহের নিরাকরণ করে। শিশুচিত্তের এই
মনস্তাত্ত্বিক বেন লক্ষ্য করবার মত।

মাইহোক আমি কিন্তু সবতত্ত্ব দিলে ব্যাপারটা ভাল
লুলাম না—অনেক সংশয়, অনেক প্রশ্ন রয়ে গেল মনে—

কৌতুহলও হল খুব। শোখ নিয়ে বিদু আর তার বেটা
আখনের ইতিহাস শব জনে তপে আমার খতি হল।

সত্যই শিশু আগে আনানের বাড়ী কাছ করতো,
এখন বয়সেরে ছাই ফেলার কাছ করে, তার রান্না কুখ
হল হলেন খালানী, তবে সে তার “বিদ্যালা পুখ” নয়,
“সাকালো পুখ” অর্থাৎ বিদ্যার পক্ষের রান্না। আখন
বখন খুব ছোট তার বাপ তখন মাংস দায়—আখন
নামেরও একটা ইতিহাস আছে, অগ্রাণ মাসে হয়েছিল
বলে সাধ করে বাপ রেখেছিল ঐ নাম। কিন্তু এত
আমরের আখনের কশালে বাপের স্নেহভালবাসা নইলো
না।

আখনের বাপ মারা যাওয়ার পর থেকেই কুখ বিদুকে
সাকালো রান্না সাখামাখি করছে, কিন্তু বিদু কিছুতেই
রাগী হয়নি। একতো তার আর সাখা করবার ইচ্ছাই
ছিল না—তার উপর তদ ছিল পাছে তার এত আখনের
আখনের কোন অধর হয়। বাড়ী কামিন সে—নিজের
গতর খাটিয়ে একটা ছেলে মায়ের করা তার পক্ষে এমন
কিছু কষ্টের নয় বা অশক্ত নয়। ভয় খালি অস্থির-বিস্থির
হলে—তার যে তিন কুলে আর কেউ কোথাও নেই।
আর শেষ পর্যন্ত এই অস্থির পড়েই বিদু মারা করতে
রাগী হল।

সেবার বিদুর খুব অস্থির হয়েছিল, মায়ের ঘোরে
অট্টেত্তর হয়ে পড়ে থাকতো—কুখ তখন খুব দেখাশোনা
করেছিল। কুখার ভাতারবাথুক শবর দিয়ে নিয়ে আসা,
তার কাছ থেকে গুখ এনে খাওয়ান, ছেলেটাকে কুখিয়ে
রাখা, এমন কি বিদুর পখ্য তৈয়ারী করা সবই কুখ
করতো। আখনের সঙ্গে তো তার রীতিমত ভাব হয়ে
গেল। লালমামা, মিঠাই, খেলনা প্রভৃতি দিয়ে সে
আখনের শিশুচিত্তিত্ত্ব মৃদ করে নিল, এমন কি তাকে
“বাবা” বলে ডাকতেও দেখাল। বিদু ভাল হয়ে দেখলো
যে আখন কুখের একাধ অস্থির হয়ে পড়েছে—তার
আমল ভয় ছিল এইখানে, তা সে তদ তো কাটলো
তারপর সে আরও তাবলো আবার যদি তার এমন
অস্থির করে কিবা বর ঠাহর না করেন—তার আখনের যদি

কোন অসুখালা হয় তখন একা ঘেঁষেমাছুর সে কি করবে ? এইসব সমস্যা একজন সফল পুরুষের আশ্রয় পেলে উত্তর। হয় মনে। এমনি সাতপাচ ভেবে অসুখ অবস্থার এক দুর্দশ মূর্তি সে ভূষণের অস্থানদের উত্তরে মত দিয়ে মিল।

এতো গেল তাদের সাক্ষর বিবরণ। ভূষণের যে আশ্রয়ের প্রতি বিশেষ টান ছিল জানা। বিধুর মন ভালোনের জরুরি সে ঐ উপায় অবলম্বন করেছিল। কাজেই কার্যসিদ্ধি হবার পর তার স্বরূপ প্রকাশ পেতে বেশী ঘেরী হন না। আর আশ্রয়কে তেমন গুরু করতে পারতো না। বিশেষ করে যখন থেকে তার নিজের ছেলে হয়েছে, তখন থেকে সে আশ্রয়কে মোটেই দেখতে পারত না—তাকে নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই ভীষণ অশান্তির স্রষ্টা হত। শেষ পর্যন্ত ভূষণটিক করে নিল কুঠীর গায়ে-লাগে। গায়ে তারা পদস্বাধীন বাড়ী আশ্রয়ের মত একটা বাগানী কাজ দিত হন সে সেখানেই থাকে থাকবে

বিধুর ভেবে কেবল যে এই ব্যবস্থাই ভাল, তা হলে সে তবু মাঝে মাঝে প্রাণভরে আশ্রয় করতে পারবে, সুকিমে চুপিবে এটা পেটা দিতেও পারবে।

বিধুর এককে যে ছেলেমেয়ে ছুটি হয়েছে তাদের উপরেও তার ধ্বংসের হেতু আছে নিশ্চয়ই—মায়ের মেহের কাছে সব সম্মানই সমান; তবুও যে ছেলেটি ক্রম, দুর্দশ বা মূর্খ হয়, যে অসুখ হয়, যে আর কারও মহাশুদ্ধি পায় না মা তাকেই বেশ বেশী করে অভিযে ধরে, তার উপরই মার টান বেশ হয় বেশী। এইজন্যই বিধুর সমস্ত মন অশ্রুক্ষণ করে থাকে তার সেই পিতৃদার, মাতৃদার বক্ষিত অভাগা বালকটির কথায়—তারই মত গভীর বেদনায় তার মাতৃদার অসহ্য হতে হতে কেঁদে কেঁদে ওঠে।

সমস্ত বিবরণ শুনে আশ্রয় সব সংসারের নিরাকরণ হয়ে গেল, সব প্রস্তাবই উত্তর পেয়ে গেলাম। আশ্রয়ের সেই বিধাগ্রস্ত মূন, সেই ইতস্ততঃ ভাবের প্রকৃত কারণ এবার মনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

ভারত ও পাকিস্তানের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কের পটভূমিকায় পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমস্যা

শ্রীকিরোচন্দ্র সান্ডাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভিন্ন

পণ্ডিত নেহেরু একাধিক বক্তৃতাঃ বসিরাছেন যে পাকিস্তান ধার্মিকতা ও বিশ্বাস উপর প্রতিষ্ঠিত। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই এই উক্তিঃ স্বাভাবিক উপলব্ধি হইবে। যে ভূমি জাতিভেদের উপর ভিত্তি করিয়া পাকিস্তান ঘানী উত্থিত হইয়াছিল, তাহা ভূমি মনৈতিহাসিকট নর, সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও ইহার অংশবিশেষে অসুখলমান রহিয়াছে এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রনাগরকগণ অসুখত এখন পর্যন্তও ইহা নিশ্চিত করিয়া বলেন নাই যে পাকিস্তানে অসুখলমান নাগরিক অধিকার পাইতে পারে না, যদিও

তাহাদের কার্যকলাপে অসুখলমানগণের সাধারণ মৌলিক অধিকারও অনেক সময় সূর হইতেছে। অপরপক্ষে ভারতীয় রাষ্ট্রে যে পরিমাণ অসুখলমান এখনও রহিয়াছে, তাহা পাকিস্তান বাস্তব পৃথিবীর অন্য যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসীর লংখ্যা হইতে অধিক। সুতরাং ভূমি জাতিভেদ পূর্ণাঙ্গভাবে অসুখলমান করা সম্ভব অসুখত এখন পর্যন্তও পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষগণ মনস্কির করেন নাই।

অসুখলমানগণের বিশেষ সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মীয় আশ্রয় অসুখ রাশিধার উৎসেই পাকিস্তান

প্রয়োজন, এইরূপ বলা হইয়াছিল। তর্কের পাতিরে যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে ঐ বিশেষ কারণে মুসলমানগণের পক্ষে পত্তন শাসন ব্যবস্থার সভ্যত প্রয়োজন তাহা হইলেও বহুকেন্দ্রীক দ্বুতরাণীয় শাসনতন্ত্রে মুসলিমপ্রধান অকলসমূহের জন্ত আভ্যন্তরীণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিনায় বীকৃত হওয়ায়, ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা ছিল না। কিন্তু ইহা সবেও মুসলীম লীগ পাকিস্তানের কবে কিছুতেই রাবী হইল না। তাই দেশ বিচক হইল। মুসলীম লীগের পাকিস্তান দাবীতে অটল থাকিবার কারণ অতি জ্পষ্ট। মুসলিম জনসাধারণের ধর্মোদ্ধারনার আগুনে ইছন যোগাইয়া যদিও তাহাদের বৃহত্তর অংশের সমর্থন লাভ মুসলীম লীগের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা হইলেও একথা অব্যাকার করার উপাদ্য নাই যে কতিপয় স্বার্থাঙ্ক ব্যক্তি তাহাদের ব্যক্তিগত প্রাধাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মানগেই মুসলমান সামাজকে কেপাইয়া তুলিয়াছিল। অধিকসংখ্যক লোকের (মুসলিম সম্ভ্রমাঙ্কের) সমর্থন কেবলমাত্র একটা গণতান্ত্রিক মুখাস। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে অনেকদিন তুলাইয়া রাখা অসম্ভব নয়, বিশেষ করিয়া যেখানে বিশেষ শাসকগোষ্ঠী সহস্র উপায়ে ভারতীয় মুসলিম সমাজকে বিপথে পরিচালিত করিবার প্রচাস পাইয়াছে। বৃহৎপূর্ব জার্মানীর মত আধুনিক দেশেও ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বৈরাচারী হিটলাঙ্কের পক্ষে জনমতের (জনতার) সমর্থন লাভ সম্ভব হইয়াছিল। হুতরাং মুসলীম লীগের দাবীর পিছনে মুসলমান সম্ভ্রমায়ের বৃহত্তর অংশের সমর্থন ছিল বলিয়া সেই দাবীকে সভ্যতারের গণতান্ত্রিক দাবী মনে করিবার কোন কারণ নাই। গণতান্ত্রিক দাবী তাহাই চাহা জনসাধারণের কল্যাণ কামনার উচ্চুত। মুসলীম লীগের দাবী সৃষ্টিমের ক্ষমতালিঙ্গু ব্যক্তির দাবী। এক্সাহায লিখন বলিয়াছিলে :—

It is possible to fool some people for all time and all people for sometime, but it is not possible to fool all people for all time.

কিন্তু তাহার উক্তি "sometime" কত দীর্ঘ হইবে

তাহা অনেকটা নির্ভর করে বাহাদিগকে যোকা বানাইবার চেষ্টা হয় তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা কোন স্তরে আছে তাহার উপর। তাহারা যদি ১০ই আনো অজ্ঞ হয় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে অনেকদিন যোকা হইয়া থাকে ছাড়া গভার নাট, বিশেষতঃ বাহারা যোকা বানাইতে তৎপর তাহারা যদি খুব সেরমান হয়। অবজ্ঞা পরিপাণিক অবস্থার চাপে অস্বাভাবিক ক্ষুত্রগতিতেও মোহ কাটিতে পারে, যেমন জার্মানী বা জাপানের জনসাধারণের মোহ বিগত হুচ্ছে দ্ব্যুতগা ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়া অনেকটা কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি (inner contradictions) এবং পরিপাণিক অবস্থার জলে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্ভ্রমায়ের মোহও একদিন কাটিবে, কিন্তু তাহার কত দেরী নিশ্চয় করিয়া বলা মুখিল। বাহা হউক, জাহাদের আদল প্রতিপাত্ত বিষয়ে— পাকিস্তান দাবী যে গণতান্ত্রিক দাবী নয়, দাঙ্গাবাজি মাত্র—তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভারতের পাকিস্তান স্বর্জনের পদ্ধতি আলোচনা করিলেও দেখা যায়, যে "Direct Action" বা প্রত্যাক সংগ্রাম করিয়া পাকিস্তান অস্তিত হইয়াছে বলা হয়। সেই প্রত্যাক সংগ্রাম বিশেষ শক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয় নাই, হইয়াছিল লক্ষ লক্ষ নিরীহ ও অসহায় শ্রী পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ নিবিশেষে স্বদেশবাসীরই বিরুদ্ধে, যদিও Direct Action ইংরেজের হাত হইতে ক্ষমতা স্বর্জন করিবার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত হইয়াছিল বলিয়া প্রচার করা হয়। এক কথায়, সাম্প্রদায়িক বিশেষ, বিশেষ সাহায্য পরিপুষ্ট দেশত্ৰোহিতা এবং অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাঙ্কের সাহায্যেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হুতরাং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, যে অবস্থার মধ্য দিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই অবস্থার জাপ ও প্রভাব ইহার পরবর্তী আচরণে প্রকট হইবে। যে হিন্দুবিষেধ ও হুশের কলে পাকিস্তান সম্ভব হইয়াছে তাহার জের টানিয়া বাওয়া ছাড়া পাকিস্তানের গভার নাই। ইহাই বিশিলাপি। হুতরাং ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণ হুতই সলিদ্ধা পরায়ণ হউন না কেন, পাকিস্তান তাহার উত্তরাধিকার

ছাড়িতে সক্ষম নহ, তাই সহযোগিতা অপেক্ষা সংঘের পক্ষে সে বাড়িয়া গিয়াছে। পাকিস্তান কিছুতেই ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইতে পারে না, কারণ ধর্মের গোহাই দ্বিধাই মুসলমান সম্প্রদায়কে পাকিস্তানকাহী করা হইয়াছিল। তাই পরিত্যক্ত শাসনের চীৎকার ধীরে ধীরে কণ্ঠস্বর হইয়া উঠিতেছে। পরিত্যক্ত শাসনেই যদি প্রতিষ্ঠিত না হইল তাহা হইলে পাকিস্তান হইয়া পাত হইল কি? ইহার অবস্ফুর্তা পরিণতি হিসাবে পাকিস্তানে অনুশ্লিষ্টমানের অবস্থা অনেকটা “নিজ বাসভূমে পরবাসী” হইতে বাধ্য। কলে ভাঙত-পাকিস্তানের সম্পর্কও তিক্ত হইয়াই আছে। কিন্তু সংখ্যালঘু সমস্তা ছাড়াও অসংখ্য স্বাভাবিক কারণেই ভাঙত-পাকিস্তানের সম্পর্ক তিক্ত হইতে তিক্ততর হইতে বাধ্য এবং অত্যাচার্য্য কিছু না ঘটিলে উভয়রাষ্ট্রের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটা সমস্তা সম্ভাবন বেন অনিবার্য বলিয়াই বনে হয়।

স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমাগতই দারাবের বিস্তে হইতেছে। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমস্তিকে রাষ্ট্রের সম্পদবৃদ্ধির কাজে না লাগাইয়া কাস্মীর অভিযানের নত সম্পদকরকারী প্রয়োজনে ব্যয় করা হইতেছে। কলে বখন দুইবছর চরবে উঠিবে তখন আভ্যন্তরীণ বিশ্রয় এড়াইবার সমস্ত পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ প্রকৃত ভারত আক্রমণে উহার জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবে। যদি জনসাধারণের দুর্গতির মাত্রা বাড়তে তাহা হইলে আভ্যন্তরীণ বিপর্যয় ঠেকাইতে গিয়া ভারত আক্রমণ অনিবার্য হইয়া পড়িবে। মহারাজ রঞ্জিৎসিংহের সূত্রার পর উজ্জ্বল আলগা সৈন্ত-দলকে আত্মসান করিতে না পারিয়া রাষ্ট্র বিলম্ব শেষ পর্যন্ত তাহাঙ্গিকে ইংরেজ অধিকৃত অকল আক্রমণ করিবার আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে অনুশ্লিষ্টমান অপসারিত হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানে বাহাঙ্গা আছে তাহারও নগণ্য। এই অবস্থার হিন্দুবিষয়েই হান ভারত-বিষয়ে দিয়া পুণ্য করিবার চেষ্টাই স্বাভাবিক। সম্প্রতি ভারতে মুস্লিম সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া পাকিস্তানে

প্রচার শুরু হইয়াছে। ইহার পরিণতিও শুভকর হইবে বলিয়া বনে হয় না। হুগতো পাকী উঠিবে—ভারতের অধিনীত মুসলমানকে পাকিস্তানে হান দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের আবেত্তন বৃদ্ধি প্রয়োজন। কোন্ প্রস্তাবই বাধ্য চরবে উঠে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু একথা ঠিক যে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিবেশে ও আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের কলে প্রত্যেক সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত না বানিলেও অস্বস্ত দীর্ঘদিন ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক পরকৃত্যমূলক থাকিতে বাধ্য। এই তিক্ততার প্রতিক্রিয়া-স্বস্ত পূর্বপাকিস্তানে অনুশ্লিষ্টমানের (পশ্চিম পাকিস্তানে তো অনুশ্লিষ্টমান-শুধুই হইয়াছে) ভাণ্ড্যও বিভ্রান্ত হইবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ ও দুঃখ হইতে আন্ত অস্বাভাবিক লাভের আশা তাই ভ্রম্য পরাবৃত্ত। অনেকেই বিশ্বাস করেন শেষ পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান আবার পুনর্মিলিত হইবেই। অস্বস্ত তাহা না হওয়া পর্যন্ত এই উপ-মহাদেশের দর্শনাধারণের দুঃখ ঘূরিবে না। পরস্পর-বিরোধী কার্যকলাপে, সাময়িক প্রতিষ্ঠিতে ও অসংখ্য সম্পদকরকারী আয়োজনে শক্তি ও সামর্থ্য ব্যাহত হওয়ার জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিবার প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে। কিন্তু বর্তমান সেই স্বপ্ন মল্ল না হয় ততদিন পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে ভারতীয় সরকারের কি করা কর্তব্য তাহাই বিবেচ্য।

ভারত সরকার অথবা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এখনও এ বিষয়ে মনস্থির করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বনে হয় না। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বেন তাহাদের ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহা হইবার হইয়া এইরূপ ভাব। কিন্তু ঘটনাবলিতে পা ভাসাইয়া দেওয়া এই নীতি (policy of drift) কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। সত্য ঘট ভারত সরকার কাস্মীর-হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি সমস্তা নিধা ব্যতিব্যস্ত। তদুপরি পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্যম পুনর্মিলিত সমস্তাও কম জরুরী নয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের হতভাগা সংখ্যালঘুগণকেও সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থার আর অধিকতর ফেলিয়া রাখা যায় না। অতঃ সম্বাইকে ভারতীয় রাষ্ট্রে সরাইয়া আনাও সহজসাধ্য নয়। এই

অবস্থার একমাত্র করণীয় বাহা তাহা এই যে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সম্মতিক্রমে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু-গণকে তাহার কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে চাই তাহা বাছিয়া লওয়ার সুযোগ দেওয়া। সরকারী কর্তৃত্বাধীনগণকে যে ভাবে কে কোন রাষ্ট্রে চাকুরী করিবে তাহা বাছিয়া লইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুগণকে বর্তমানে অল্পরূপ সুযোগ দেওয়া উচিত। প্রথম উল্লিখিত ইহাতে আন্তর্জাতিক গোপনযোগ্য বৈধা নিতে পারে, কেননা উভয় রাষ্ট্রে বহুল পরিমাণে বিদেশী থাকিয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে আইনতঃ এখন পর্যন্ত বিদেশী বলিয়া গণ্য না হইলেও উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুগণকে কার্যত অনেক ক্ষেত্রেই সম্মেহ করা হয়। এই গোপন সম্মেহ ও বিস্ময় অপেক্ষা খোলাখুলিভাবে জানা থাকা ভাল কে কোন রাষ্ট্রের প্রতি অঙ্গুণ্ড। ইহার ফলে যদি পূর্ববর্তের সংখ্যালঘুগণ মানসিক বল সকার করিতে পারে, (তাহা পাত্রা খুবই স্বাভাবিক এই ভাবিয়া যে তাহার বৃহত্তর রাষ্ট্রের নাগরিক) তাহা হইলে অনেকেই পাকিস্তানে বিদেশী হিসাবে থাকিয়া যাইতে ভরসা পাইবে। প্রয়োজনবোধে তাহাদের সাধ্যার্থে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি আগাইয়াও যাইতে পারে। অল্পরূপভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রে যে সকল পাকিস্তানের নাগরিক থাকিবে তাহাদের স্বত্ব সুবিধা দেখিবার নৈতিক অধিকার পাকিস্তানেরও অঙ্গিবে। উদাহৃতঃ বাধ্যবাধকতা থাকায় কাহারও পক্ষে অপর রাষ্ট্রের নাগরিকগণের (বাহারা বিদেশী হিসাবে পরিচিত) উপর জুলুম করিবার সুবিধা তত্তটা থাকিবে না, এখন বড়টা আছে। বর্তমানে পাকিস্তানে অমূল্যমান ও ভারতীয় রাষ্ট্রে মূল্যমানের উপর অভ্যাসের হইলে আন্তর্জাতিক বিধানাহুযায়ী অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলিবার নৈতিক অধিকার কোন রাষ্ট্রের নাই। কিন্তু উপরে যে প্রস্তাব করা হইল তাহা কার্যকরী হইলে এই নৈতিক অধিকার অঙ্গিবে। আর পাকিস্তানে অমূল্যমান অধিবাসী ব্যবসা বাণিজ্যের কোন সুযোগ পাইতেছে না। উপরোক্ত প্রস্তাব কার্যকরী

হইলে ভারতীয় রাষ্ট্র ও ভারতীয় ব্যবসায়ী সমাজের সাহায্যে তাহার সেই সুযোগ করিবা নিতে পারিবে। এমন কি বাধ্যভাবে হইলেও কেবলমাত্র পাকিস্তানবাসী ভারতীয় নাগরিকের সাধ্যার্থে বাধ্য প্রেরণ (ভারত হইতে) অঙ্গুণ্ড হইবে না। তত্পরি যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া চলা পাকিস্তানের সংখ্যালঘুগণের পক্ষে বিশেষ উৎসাহের কারণ হইয়াছে—প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সহজেই সেই উৎসাহ দূরীভূত হইবে, কেননা পাকিস্তানবাসী ভারতীয় নাগরিক উক্ত ব্যবস্থার নিষেধের শিক্ষা ব্যবস্থা নিজেরাই নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। অপরপক্ষে পাকিস্তান ও ভারতের অধিবাসী পাকিস্তানের নাগরিকগণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। ইহাতে ক্ষতির কারণ কিছুই নাই। তবে লাভ-ক্ষতির হিসাব মিলাইয়া দেখিলে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু তথা ভারতীয় রাষ্ট্রের লাভই বেশী হইবে। কারণ সলল গাণিতিক হিসাব অল্পবাসী পাকিস্তানে অসমসামান্য সংখ্যা ভারতে মূল্যমানের সংখ্যা হইতে অনেক কম। সুতরাং যদি ভারতের সমস্ত মূল্যমানকেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বা অঙ্গুণ্ড সাহায্য করিতে হয় এবং অল্পরূপভাবে যদি পাকিস্তানের সমস্ত অমূল্যমানকেই ভারতীয় রাষ্ট্রের সাহায্য করিতে হয় তাহা হইলে ভারত অপেক্ষা পাকিস্তানের দায়িত্ব গুরুতর হইয়া পড়ে। কখনও যদি এমন প্রস্তাব উঠে যে উভয় রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘু-গণের অবস্থা এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারিগণকে সম্পূর্ণভাবে সরাইয়া আনা প্রয়োজন তাহা হইলেও ভারতীয় রাষ্ট্রে বর্তমান অমূল্যমান আসিবে পাকিস্তানে তদপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক মূল্যমানকে (বাহারা পাকিস্তানের নাগরিক হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে) যাইতে হইবে। অনেকেই যেন বলেন যে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হইলেও বহুসংখ্যক ভারতীয় মূল্যমান পাকিস্তানের গুরুতর অথবা পক্ষমতাহীন হিসাবে ভারতীয় রাষ্ট্রে থাকিবা যাইবার মানসে প্রকৃত্তে পাকিস্তানের প্রতি আহুগত প্রকাশ করিবে না। তর্কের

খাতিরে একথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহা সম্প্রতি যে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ না দিলেও ইহার যথি যথার্থই পত্তনবাহিনীর কাজ করিয়া ঘাইবার সম্ভব করিবার থাকে তাহা হইলে সর্ব অবস্থাতেই তাহার সেই চেষ্টা করিবে। তাই বলিয়া পাকিস্তানের সংখ্যালঘুগণকে ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করার কোনই সার্থকতা নাই। কারণ তাহানিগকে এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করার ফলে ভারতে পাকিস্তানের তাবী পক্ষম বাহিনী নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িবে না। বরং ইহা প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার ফলে যে সকল মুসলমান পাকিস্তানের প্রতি আত্মগত প্রকাশ করিবে তাহানিদের মনোভাব আর এখনকার মত চাপা থাকিবে না। পাকিস্তানের অমুসলমানগণ প্রকৃত্তে ইহা প্রকাশ করিবার সুযোগ না পাইলেও তাহাদের সকলকেই ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি অমুগত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। তাহাদের সম্পর্কে পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের মনে বিন্দুমাত্রও বিধা আছে বলিয়া মনে হয় না।

হয়তো তর্ক উঠিবে অপর রাষ্ট্রের অধিবাসী স্বকীয় নাগরিকগণের স্বার্থরক্ষাকল্পে একে অস্ত্রের আভাসবরীণ ব্যাপারে হতজ্ঞেপের সুযোগ পাইবে। কিন্তু যেহেতু উভয়েরই হতজ্ঞেপের সুযোগ রহিয়াছে সেইজন্য কেহই হতজ্ঞেপের অধিক কারণ ঘটাইতে উৎসাহ বোধ করিবে না। তা ছাড়া সংঘর্ষ বাধিবার হইলে অজুহাতের অভাব হয় না। ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষ যদি অনিবার্য হয় তাহা হইলে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুগণ তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া যুগ্মে যুগ্মে আত্মগত স্বীকার করা সম্ভব (অথবা বিপরীত ভাবে পোষণ করিয়া) সেই সংঘর্ষ বাধিবেই। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুগণকে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী আত্মগত প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার ফলে যেহেতু উভয় রাষ্ট্রই অপরকে ধোঁয়া লইবে সেই হেতু এবং সেই পক্ষেই বহু সংঘর্ষের কারণ জন্মে দূরীকৃত হইয়া ঘনিষ্ঠতা বাড়িবে এবং পারস্পরিক সম্মতবাদের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুগণের অবস্থার উন্নতি হইবে। উপরোক্ত প্রস্তাব কার্যকরী হইলে অন্তত পাকিস্তানের সংখ্যালঘু অমুসলমান-

গণের ভিতরে যে অশান্তি বলসকার হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহার পাকিস্তানের প্রতি আত্মগত স্বীকারে অক্ষম হইয়া পাকিস্তান ছাড়িয়া আশ্রয়লাভ তাহাদের অনেককেই আবার ভারতীয় নাগরিক হিসাবে পাকিস্তানে ফিরাইতে হইতে পারে। এইরূপে পূর্ব পাকিস্তান হইতে ইতিমধ্যেই ব্যাপক বাস্তবতার ফলে যে গুরুতর দশা দেখা যিয়াছে তাহা অনেকটা সম্ভব হইয়া আসিতে পারে।

চরম নিরাশা লইয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে হয়তো শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান হইতে সমস্ত অমুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত লোককেই ভারতীয় রাষ্ট্রে সরাইয়া আনিতে হইতে পারে। তাহাতে বিরাট পুনর্বাসিত ব্যবস্থার বাধিত ভারতীয় রাষ্ট্রের উপর আসিয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। অতুষ্ণভাবে পাকিস্তানকেও সম্মতিমান, হয়তো অনেক বেশী পরিমাণ, খাজা সামশাইবার প্রদান পাইতে হইবে। কিন্তু অধিক পরিমাণ সামর্থ্য লইয়া ভারতের পক্ষে বহুটুকু করা সম্ভব হইবে, অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ সামর্থ্য লইয়া পাকিস্তানের পক্ষে তাহার চাইতে অনেক কম করা সম্ভব হইবে। ফলে পাকিস্তানের আভাসবরীণ গোলাবোণ বৃদ্ধি পাইয়া উহার অভ্যন্তরীণ বিপর্যয় হইয়া উঠিবে এবং একাবল ভারতীয় প্রচেষ্টা ছাড়া সেই সমস্তার মীমাংসা না হওয়াই সম্ভব। অনেকে বলেন পূর্ব পাকিস্তান হইতে সমস্ত অমুসলমানকে যদি চলিষ্টাই আনিতে হয় তাহা হইলে ভারত আবার একাবল হইলেই বা কি লাভ হইবে? ইহার উত্তর দেওয়া শক্ত নয়। ভারতবর্ষের কোন অংশে কোন সম্প্রদায়ের লোক অধিকসংখ্যায় বাস করে তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ইতিহাসে অমোঘ বিধানে বিতর্ক ভারত আবার একাবল হইবেই। জল বেতন স্বাভাবিকভাবেই যে কোন চালু আদায় ব্যাপক হইয়া পড়ে সেইরূপ সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী একই রাষ্ট্রশক্তি যতদিন পর্যন্ত না নীর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে ততদিন পর্যন্ত ভারতবাসী তাহাদের সভ্যতারের ঐতিহাসিক কৃনিকার অবতীর্ণ হইতে পারিবে না এবং শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক ভারতীয় একা অশান্ততাবী।

সেই ভবিষ্যতের ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক শ্রেণীবিভাগ থাকিলেও তাহা জাতীয় বিভেদ সৃষ্টি করিবে না। মুসলমান সংযোগগরিষ্ঠ কান্ট্রীর পক্ষে বর্তমান অবস্থাতেই ভারতীয় রাষ্ট্রের অস্থবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব হইলে তাহী ভারতবর্ষে কেবলমাত্র মুসলমান অধুষিত পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বঙ্গ (যদি সেখানে হইতেও সমস্ত অমুসলমান সরিয়া যায়) অনাথ্যাসেই বৃহত্তর রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারিবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অস্থবৃদ্ধি মুসলমান অঞ্চলগুলি যেমন বিনা প্রতিবাদে কোন কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যাখ্যান চালাইতেছে এবং তাহার ফলে উপকৃত হইতেছে, তাহী মহাভারতের অপর্যাপ্ত হিসাবে টহার মুসলমান অঞ্চলগুলি অচ্যুতভাবেই সম্মানে উপকৃত হইবে।

সবশেষে একথা মনে রাখিতে হইবে যে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে অমুসলমান লোকসেই ভারতে চলিয়া আসা সত্ত্বেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিই একথা মনে করেন না যে ইহার ফলে ভারতীয় ঐক্যের পথে স্বাধী

বাধা সৃষ্টি হইল। তাহা হইলে মুসলমানপ্রধান মীমান্ত প্রদেশে কখনও কংগ্রেসের বাণী প্রচার সম্ভব হইত না, কান্ট্রীর পক্ষেও ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদান খণ্ডিত না। কাজেই যদি কোন কারণে পূর্ব পাকিস্তান হইতে সমস্ত অমুসলমানের একদিন ভারতীয় রাষ্ট্রে চলিয়াও আসিতে হয় তাহা হইলেও তাহাতে তাহীকালে আজিকার বিভক্ত ভারত পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হইবার পথে কোন বাধা থাকিবে না।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান হইতে সমস্ত অমুসলমানকে সরাইয়া আবার 'চকতর' দাবি যদি অবিলম্বে গ্রহণ করিতে না হয় তাহা হইলে সেখানকার সংখ্যালঘুগণকে পাকিস্তানে বাস করা সত্ত্বেও ভারতীয় নাগরিক হইবার অধিকার বিহীন হইবে। তাহাতে কেবলমাত্র বিপুল ব্যয়ভার বহন ও ব্যাপক লোকোপসারণের আত্মগতিক বিলুপ্তলাই একজন হইবে না, চরমোৎকর্ষ ইতিহাসিক পটভূমির বর্তনের ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে অধিক সংখ্যক অমুসলমান চলিয়া আসার আগেই ভারতীয় ঐক্যের চিরস্থায়ী আধার ভোড়া লাগিবে।

সমাপ্ত

আমাদের সাহিত্য

সমীর ঘোষ

এ যুগের ছোট গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র

'পুতুল ও প্রতিমা' সংকলনের মধ্যে 'হৃদয়' গল্পটি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করবো। একটিমাত্র ছোট গল্পকে কেন্দ্র করে এইভাবে পৃথক আলোচনা প্রথম দৃষ্টিতে পাঠকপাঠিকার মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করলেও, অচ্যুতলাই আলোচনার অঙ্গসংগ্রহ করলে বৃকতে পারবেন 'হৃদয়' এই পৃথক আলোচনার দাবী রাখে। প্রেমেন্দ্র মিত্র আলোচনার আমরা এখানে তিনটি শ্রেণীবিভাগ করেছি, তা হলো :

(১) নিয়মগতের সামাজিক জীবনের গল্প।

(২) উচ্চমধ্যস্তরের সামাজিক জীবনের গল্প।

(৩) বিস্তারিত সামাজিক জীবনের গল্প।

'হৃদয়' এই তিনটি বিভাগের কোনটির মধ্যে পড়ে না। 'হৃদয়'র পৃথক আলোচনার দাবী তাই আরো স্পষ্ট হোয়েছে বলে মনে হয়।

'হৃদয়'র কাহিনী সংগঠিত হোয়েছে অচ্যুত পট-ভূমিকার। নাগরিক অর্থব্যয় নাগরিকার সংগে পরিচয় কখনোই ক্ষণে এই কাহিনীতে গল্পকার 'সর্বোচ্চ' পাঠকপাঠিকার নামে আসেন। গভীর দুর্ভোগের রাত্রি। জল আর স্বপ্নে কলকাতার পথ পথের পূর্ণহৃদয়। বক্তা বাস থেকে নেমে বাসার আদার পথে একটা সমাপ্তপ্রায় নদীর সেতু পার হোতে গিয়ে এক বিশদ্বন্দ্বিতক ঘটনা ঘেবলেন। সেতুর সপ্তগ্রায়ে এক বাণী ভার স্রীকে ঠেলে বলে

নেওয়ার চেষ্টা করছে। বক্তার অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি যে নাহায়া বিবেচিল সেই বৈধ শ্রীকে সে ব্যাঘাত অপরিস্রবিত হুত্ব থেকে বক্ষা করে। এই বক্ষা পাণ্ডারকের উপলংঘ্য হিগায়ে ষাঁড় করিয়ে বলা হোয়েছে গল্প। অর্থাৎ গল্পকার একটা সজ্ঞাননার ওপর অতীতের একটা কাহিনীকে তুলে এনেছেন আখ্যায়ের নামনে। শ্রীর নাম দিয়েছেন লাংগা, বামীর পরিচয় হোচ্ছে 'মহিম'। বসন্তিকা উঠলে গ্রন্থে যেথা বাব নাহিকা 'লাংগা'কে লবগ্রন্থমহার বহুভূষণ 'মহিম' সংসারে নিয়ে আসছে। সে-ও এক অসুত রহস্যপূর্ণ ব্যাঘাত। এক ভয় প্রসাধকজন, কালের নির্ধর আখ্যাতের তার লগীক অরুণ, ভবু। অঙ্গল আর কলসত্বের মধ্যে সঙ্গায়িত হোয়ে গেছে গ্রন্থেরনাম। সেই গথ এমন ভয়ানক যে বহু লক্ষিনী দানী সেই গথে চলতে চলতে শটকটে বলে, 'কেমনতর বোয়াকিরে বোয়ান্না পো!...ওথা এরা বলে কি গো! এই পোড়ো বাড়ীতে বাহু থাকে!' (পৃ ৪২)।

এই পোড়ো বাড়ীই কিন্তু লাংগার বামীপুর। বাপের বাড়ীর দানী চল পেল। সংসারে লাংগা গৃহিণী হোল। সংসার বলতে বামী, বামীর একচক্ষু বিপিনা পিসিয়া আর অপর লাংগাবতী 'মাহুদী'। মাহুদী যে এ সংসারে কে তা লাংগা বুঝতে পারলো না। তবে এটা ঠিক মাহুদী তার দানী হোল। সংসার ভুল হোল লাংগার। বৈদিক জীবনযাত্রার লগে লাংগা সংসারের গভীরে গিয়ে ঢুকলো। একটু একটু করে বামীকে চিনলো সে। বুঝতে পারলো মহিম সে নারীকে, সে নারী নিজের স্ত্রী হোলোও, বিবাহ করে না। পিসিমাকেও সে চিনে কেললো। ওই বুঝা অতীতের বৃত্তি আর ঐশ্বর্য ওপর বক্ষিতর মতোন অহরহ বসে আছেন। তাঁর লক্ষিহান দৃষ্টি লক্ষকে সব সময় বিদ্ধ করে চলেছে। কিন্তু লক্ষ ওলনা এবং ধারণার বহির্ভূত হোচ্ছে মাহুদী। কলহাতের বীণাকংকার তুলে বিয়ের কনে লাংগাকে সে অভ্যর্থনা জানায়, হৃদয়হার স্পন্দনজাপর বাসরে নিজে মোহিনী সেজে আসে। মহিমের বাসনের ঠাঁকে ঠাঁকে লাংগাকে নিয়ে সে মুক্ত হাওয়ায় পালিয়ে যায় আর মহিমের সমস্ত

অসলের ও অদৌতিক ব্যবহারের কৈকিৎ হিসাবে লাংগাকে বলে এ বাড়ীর দুর্দশা হোচ্ছে, "মেয়েমাহুদের শাপে; হাছার হাছার মেয়েমাহুদের শাপে এ বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘরের ভিত্ত পথত স্বাক্ষর হোয়ে গেছে। লাংগা পুণ্য ঘরে এরা মেয়েমাহুদের এমন অপরমান, লাংগা নেই, যা করে নি। তাবের সে অভিলাপ বাবে কোথায়! যা নিয়ে একদিন তিনিমিনি বেলেছে তারই ভাঙে হুত্ববন্য তোর বরের বুক কুরে কুরে বাচ্ছে! ও যে বংশের শেষ বাড়ি।"—(পৃ ৬৬) মাহুদীর হৃদয় মুখ তখন অমাহুদিক রূপে আর ফুরাবে বীভৎস বোয়ান।

এমনভাবে চলতে চলতে একদিন বিশেষ ঘটলো। মহিমের লাংগাকে কাঁকি বিধে মাহুদী লাংগাকে নিয়ে পেল বক্ষিণী পিসিমার ঘরে। পিসিমা তখন অহুগস্থিত। সেই ঘরে এই পুণ্যপ্রায় পরিবারের সমগ্র ঐশ্বর্য সংগৃহীত ছিল। মাহুদী সেই ঐশ্বর্য পুখারপুখরুপে লাংগাকে বোঝাচ্ছে এমন সময় পিসিমা এলেন। এক মুহূর্তের ভাঙে তিনি ঐশ্বর্য বোঝলেন। তারপর বাইরে থেকে শিকল তুলে ঘিরে চলে গেলেন—কলে লাংগা আর মাহুদী হোল বক্ষিনী। সজ্ঞাবেলা তারা মুক্ত হোল। বরজা উন্মুক্ত করে মহিম আর পিসিমা এনে ঘরের মধ্যে ষাঁড়ালেন। কোনরূপ শূন্য কিংবা তিরজারের অপরতা অথবা অপেক্ষা না রেখে লক্ষকে উপেক্ষা করে মাহুদী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লাংগাও বেরিয়ে এলো নীরবে। কোনো কথা নেই—মহিমও নীরব। নীরবতা জাঙ্কলো পরের দিন দুপুরে। মহিম অকস্মাৎ দিনা বিজ্ঞপ্তিতে লাংগাকে সংগে নিয়ে কলসকবসিত এই প্রাণায় পরিভ্রমণ করলো, বলালো, নতুন করে সংসার রচনা করবে। তাদের বৃহৎকার্যেই পরই হুৎপাং নামে। নানাহানে ছুর বোড়ানোর পর, নিদেহ অস্তরের বিভিন্ন অহুত্বিত ও বিভিন্ন চিত্তার লগে লগে করে মহিম যে কি নিষ্ঠাভাঙে এসে পৌঁছেছিল সে কথা পরকার পরের হুত্বনায় আখ্যায়ের লগেছেন। এর পরের কাহিনী আশ্চর্য অজ্ঞাত।

'হুত্ব'র সমাপ্তি হোয়েছে এইখানে। অপর কোচ্ছে এই গল্পটি। কোনো কথা বলার পূর্বে স্বীকার করতে হবে

আমাদের সাহিত্য

এর আবিষ্কার বৈশিষ্ট্যের কথা। এমন অসম্ভব আবিষ্কারে 'হয়ত' কবিতা চোরেছে যে অনেক সময় রূপকথা বলে মূল চর। রূপকথার যে পটভূমি, যে পরিমণ্ডল এবং যে পরিমণ্ডলি রূপকথাকে বিস্তৃত এবং আনন্দিত করে তার মূল অলঙ্কার এই সঙ্গে বর্তমান, অথচ রূপকথার শৈবাণিক অসামঞ্জস্যতা, নিষ্কর্তব্যতা এই সমস্ত প্রতিপক্ষে। যুবরো চোরে শুধু শিখর ভাষায় না, অনেক সময় অসৌন্দর্য্য বলে বিবর্তিত ভাষায়। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একটি যার ছোট গল্পের আখ্যায়িক 'হয়ত'ই সমস্তের পরিচয় প্রাপ্তি বিবর্তিত করে রাখে। আমরা 'স্বপ্নিত পাখাঘের' কথা বলছি। 'স্বপ্নিত পাখাঘের' সাহিত্যের সেই রূপকথাবিনীত কবিতা যা যেমন কোনোদিন গল্পের নায়ককে পোনালোক আমাদের পোনালে পাবে নি, ঠিক সেই একই ধারায় সাহিত্যকে নিয়ে যিনি পথে যার চোরে আসার বাহুরীকে কোনো ইতিহাস আমরা জানতে পাই না। 'স্বপ্নিত পাখাঘের' উপলক্ষ্যের থেকেও একটি কবিতা 'হয়ত' আমাদের অসম্ভবতর অভিজ্ঞ করে। 'স্বপ্নিত পাখাঘের' আমরা পরিচয় বৈশিষ্ট্য পাই নায়ক প্রাসাদের সেই যাত্রার মুহুর্তে আকর্ষণ ছিন্ন করে চলে আসতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু 'হয়ত'ই সে অবকাশ ঘটে নি। আমরা জানতে পারি না সেই জরপ্রাসাদে 'প্রতিমী-বাহুরী' কেমন করে কি আত্মা দূরে থেকে আর যিনি পরবর্তী স্থানে জীবনের সেক্ষেত্র করে সাহিত্যকে কি অসম্ভবিত করেছেন।

'হয়ত'ই বর্তমানের চরিত্র হোচ্ছে ছুটি। পরে প্রাপ্তে কি আর পুঙ্খভুক্ত বাহুরীকে চারিটি চরিত্র। বাহুরী, যিনি, সাহিত্য আর শিল্প। এবার যারা প্রাপ্তেই চোরে পড়ে বাহুরীকে। বিদ্যাক্ষমতার মতোই সে জল আর গভীরতর। রূপে সে অলঙ্কার। কথার ভাষাতে সে বৈদ্য বিদ্যুত করে চলেছে। সে যে যিনিবর্তনসময়ে আছে একথা কোনদিন যিনি বীভৎস করে নি, তা মনেও সে সাহিত্যকে যিনিবর্তন কো বলে বীভৎসি হিলো সাহিত্যের লবঙ্গব বাহুরীকে আসন্নবর্তন মন পঞ্চমনি করে। সাহিত্যকে যিনিবর্তন জীবনে প্রতিষ্ঠিত

করলো সে-ই। যিনি-সাহিত্যের মূলমন্ত্রের আঘাতের কেউ করে নি, বাহুরী কিছু করেছিল। 'সহিত্য পুঙ্খভুক্ত অলঙ্কারে কবিতা বাহুরী সাহিত্য বনবর্তীকে মতোই সাহিত্য আনিচ্ছিল। সে রূপ বৈশিষ্ট্য চোরে কোনো মতো।' —(পৃ ৪২)। মূলমন্ত্রের অলঙ্কার সে অসম্ভবিত উপলক্ষ্য নিয়ে পেল। 'যিনিবর্তন মনে পুঁটিলি জুনিয়া মইয়া বিদ্যার কণর নামাইয়া জুনিয়া কেমিতেরি কিছু কথা জিয়াছিল তাহাতাতি জুনিয়ার মূল বা পুঁটিলি কবিতা বীভৎস করে যে কারণেই চোরে মূলভূমি মনভূট চটকানো।'—(পৃ ৪০) বিদ্যাক্ষম যিনিবর্তন বনবর্তীকে হওয়া মনেও বাহুরীকে উপলক্ষ্য মতোই আকর্ষণ করে বাহুরীকে চাই। যিনিবর্তন বাহুরীকে অলঙ্কারী চোরে এই জরপ্রাসাদ প্রাসাদ ভবনের বাইরে এলো, জীবনকে অলঙ্কারে মনু করে পড়ে তোলাবার সাহিত্য, যিনিবর্তন আঘাত বাহুরীকে চরিত্রকে কথা পেল 'শিখরে বাহুরী আনিবার সর্বক অলঙ্কারে কবিতা কবিতা বাহুরী তাহাবের বাহুরীকে যিনিবর্তন মনভূট মনভূট চারিটিছিল। এইটুকু শুধু সে কবিতা আনিচ্ছিল এ বাহুরীকে প্রথম প্রাপ্তবর্তন মনে যে রূপকথার ভাষাকে অলঙ্কারী কবিতাছিল, সেই কলঙ্কটি বিদ্যার বৈশিষ্ট্য তাহার কণে রূপকথার হইতে লাগিল।'—(পৃ ৪৮)।

বাহুরীকে এই উপলক্ষ্য এবং বিদ্যার কলঙ্ক। আমাদের মনে বৈশিষ্ট্য মনভূটে আনিবার কণে তা হোচ্ছে এই পড়ে বাহুরীকে জান কোথায়? চিহ্ন প্রাপ্ত বীভৎস চোরে সাহিত্য আর বাহুরী। এর মধ্যে বাহুরী যে অসম্ভবতর প্রাপ্তবর্তী সে কথা অলঙ্কারী। গল্পের পটভূমি বা গভীরতর কথা বলছেন, তাকে একশ্রমে মনভূটে রেখে বাহুরীকে ফিকে যিনি চোরে দেখি, তবে এ বিবর্তন কোনো মনভূটে থাকে না যে বাহুরী এই সমস্ত সাহিত্যের আসন্ন অসম্ভবতর করে বলে আছে আর এই সমস্ত মনভূটে বাহুরীকে পরিচয়প্রাপ্তবর্তন। গল্পের বা কিছু কণ, সাহিত্য আর মনভূটে মনই উল্লসিত চোরে উল্লসিত বাহুরীকে সাহিত্যে।

বাহুরী এ গল্পের সাহিত্য। তার অলঙ্কার মৌলবর্তন অলঙ্কারে যে রূপকথার অলঙ্কারের পট করে রেখেছে

সেইদিকে দৃষ্টিপাত করে যে প্রশ্ন অতঃপর আপন ভাষায়ে
মাথুরীকে? ওর মধুরিমা কোথায়? লাবণ্যর সংসারে
হৃৎ কিবা শক্তি ও যে কোথাও মিথ্যেছে তা সে। চোখে
পড়ে না, বং দেখতে পাই লাবণ্যকে সে সহজীবন
থেকে দুর্গমপথে নিয়ে যাওয়ার বড়ইর করছে, না হয়
প্রয়োচনা নিজে মহিমকে বাক করে: "হঠাৎ কখন কোথা
হইতে আশিরা লাবণ্যর গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমা খাইয়া
বলে—“তোকে বন্ধ ভালবেসে কেলেছি; চ, তোকে নিয়ে
কোথাও পালটি।”

অর্থ-হীন অসংলগ্ন কথা; তবু লাবণ্যকে হাসিয়া জবাব
দিতে হয়—‘কোথার পালাব?’

“কেন দিল্লী, লাহোর!.....রোজগার করে খাওয়াতে
পারি ত?”—(পৃ ৫৮)

অথবা

“তাহার পর শিকলি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া মাথুরী
বলিল, আর আমি এই তেবে নিচ্ছি হোরে বসে আছি
যে তুই গালিয়ে গেছিস! সেখ-বেশি ভোর অস্ত্রা!
এমন করে মানুষকে হত্যা করে?”—রান হাসিয়া লাবণ্য
বলিল, ‘ঘরের বাড়ী ছাড়া পালাব কোথার ঠাকুরবি!’

যেন সাগরে তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া মাথুরী
বলিল, ‘দূর ঘরের বাড়ী চাখি কেন? পৃথিবীতে আর
আরগা নেই! পালাবি বল, সব বন্দোবস্ত করে দিই তা
হ’লে: বাড়ীর মাছটি পুথি টের পাবে না।’—(পৃ ৬৬)

হাস্তপল, রক্তচট্টল কথা হোচ্ছে এইগুলি। পরিহাস-
রসিকা হৃদয়ী বিবেচ করে মাথুরীর মতোন, তরুণীর মুখে
এইগুলিকে বাধ কি বড়বস্ত্রের প্রয়োচনা বলে কল্পনাও
করা যায় না। একথা ঠিক যে ঘতো সহজে গছিয়ে
হালকা করে মাথুরী বসুক না কেন যে জীবনের ইচ্ছিত সে
এইভাবে বের, তাকে স্বীকার করতে লাবণ্যকে কীপতে
হয়, সময় সময় কীপতেও হয়। মহিমের শাসন প্রাপণে
চোঁটা করে চলেছে লাবণ্যকে নতুন করে সৃষ্টি করতে।
যে জীবন এই ভর প্রাসাদভবনে প্রবাহিত তাকে সহজে
পরিহার করে সে লাবণ্যকে সেই জীবনে নিয়ে যেতে
চায় যেখানে মানুষের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু

প্রতিপদে চোখের সামনে ধরা পড়ে মহিমের জীবনে
বীর্ষছায়া বিস্তার করে মাথুরী গাড়িয়ে আছে, ঘতোই
উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করুক না কেন মহিম কোনো প্রকারে
তাকে অনাকীর্ষ্য বলে ঘোষণা করতে পারে না। বরং
মহিম ঘতোই পাপ কটাক না কেন মাথুরী ঠিক আসে,
বন্ধুত্বকীর্ষে মহিমের ললাটে ছাপ ঘেঁষে নিয়ে যায়।
ললাটের বৃত্তিত রেখায়া বেন বলে: যেখা মাথুরী বলছে,
আমি আছি! একদিকে আভিজাত্যের নীলরক্ত
মহাকালের প্রচণ্ড প্রহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হোয়ে অরণ্যের
অবগতনে মূখ্য ঢাকছে আর অপরপ্রান্তে গাড়িয়ে আছে
ঐশ্বর্যের শেষ হীরকবও, নীলরক্তের বিজয়ধামা
মাথুরী তার অপতপ লাবণ্যময় বেহেশত্বারের পণ্য
সাধিয়ে।

পরিমিত সত্যি জটিল। মাথুরীর বাধ অথবা
প্রয়োচনা যেন হয় অল্পকৃতিহীন নয়। বরং একটা সংসার
ঘনকালো ছায়াপাত করে, বলে: আচ্ছা মাথুরীও কি
লাবণ্যের মতোন করে সংসার রচনা করতে চায়, এই
ভর প্রাসাদ এবং তার অভিশাপগ্রন্থ ঐতিহ্যকে পাপ
কাটিয়ে দে কি মুক্ত হাওয়ায় গিয়ে নীল আকাশের নীচে
জীবনকে চুহাতে গছিয়ে নতুন স্রের কংকার তুলতে
আগ্রহশীলা? কয়েক মুহূর্তের ভেত্রে এই সংসার একটা
ঢাকলোয়- সৃষ্টি করে। তারপর যেন হয় অগ্রগমনের
বিরোধ প্রচণ্ড থেকে ক্রমে প্রচণ্ডতর হোয়ে উঠছে।
নীলরক্ত প্রাপণে চোঁটা করছে লালরক্তের বজাকে
প্রতিরোধ করতে। যে জীবনের ধারা শাসনতান্ত্রিকতার
শেষতম প্রান্তে এসে ভেঙে পড়েছে তাকে আমরা বাংলা
সাধিতে। বহুপথে যেখাছি এমন কি আমো যেখাছি।
কিন্তু ‘হৃৎ’র যে সহজ আর অমূলক ইচ্ছিত প্রেমের
আমাদের এই শাসনের অবশান দেখিয়েছেন তা শুধু
অপূর্ণ নয়, আমো অহনকরনীয়। আর এই অসাধারণ
অহন যেখাতে যেখাতে ঘনে হয় মাথুরীও কোনো অস্বনিহিত
মাথুরী থাক আর নাই থাক, আছে ওই হৃৎ পরিত্যক্ত
জীবনময় বাধ। ওই ব্যঙ্গের প্রান্তে মানুষ কীভাবে আর
উপায়ে এসে অল্প চোখের পাতা থেকে মুক্ত ফেলতে

পারে না—যদিও মাদুরী একইভাবে কলহাতের কংকার তুলে ধার।

যতটাই বিরোধ থাক, মহিম সামাজিক সম্বন্ধকে যতটাই অস্বীকার করুক, একথা কোথাও প্রচ্ছন্ন থাকে না যে এই নীরব মাহুগতি অগ্নিরে মাদুরীর ভগ্নে কিছু রক্তমাখা আছে। তাই লাভ্যাকে নিয়ে একেবারে সে নীলরক্তের প্রভাবের বাইরে প্রথমদিনেই সংসার না পেতে, এগেছিল এই প্রমোদভবনে, মনে মনে চেয়েছিল মাদুরীও নীলরক্তকে তুলে ধাক।

মাদুরী হয়তো ভুলতো। লাভ্যাকে নিয়ে পলাতক। হওয়ার মধ্যে যে ইতিহাসের কথা পূর্বে বলেছি, তা মাদুরীর জীবনের পোপনতন কথাও তো হোতে পারে। সে-ও হয়তো চেয়েছিল ছুটি হাতে অতি সাধারণ অঞ্চ হৃদের সংসার। কিন্তু কিছুই হয়নি। মহিম মাদুরীকে কোনো সুযোগ ঘের নি। রূপের অভ্যন্তরে অল্পকম্পা থাকতে পারে, কিন্তু মহিম বিশ্বাস করতে পারে নি মাদুরীকে। মাদুরীও সে কথা বুঝেছিল। তাই বোধ হয় সে লাভ্যাকে নিয়ে গিয়েছিল এমন এক জায়গায় যা মহিমের চিরদিন অনজিগ্ৰেত। শুধু তাই নয়। মহিমকে ঘিরে যখন যে নিজের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করার, তখন তার মধ্যে যে দুগ্ধভঙ্গী থাকে তা বীতিমতো প্রসীপ। মনে হয় নিজের কথা প্রচারিত করার দাবী মাদুরী কোন স্থান হোতে পেয়েছে? সামাজিক জীবনে মাদুরী যে মহিমের কতোখানি অন্তরঙ্গ তা কোথাও উল্লিখিত হয় নি। মাদুরীর সঙ্গে মহিমের যে কি সম্বন্ধ তা-ও অজ্ঞাত। যাকে যাকে দেখি শুধু মাদুরী মহিমকে 'দাদা' বলে ডাকছে। সমাধান করি আমরা মাদুরী ভরীস্থানীও বলে। কিন্তু মহিমের ব্যবহারে এ কথাও ছাড়াছুর, থাকে না যে মাদুরীকে সে ভরীই সেই অথবা সম্মান দেয় না—এমন কি 'বোন' বলে মুখের কথার উল্লেখ করে না। মনে হয় লাভ্যগোর অধিকারে, যদি মহিম চলবার পথ না পরিবর্তিত করতো, তবে মাদুরী এসে অন্যথাসে প্রতিষ্ঠা নিতো। কার্যকালে তা হয় নি। সেই কারণে মাদুরীর সঙ্গে মহিমের একটা পরিষ্কার

মানসিক ব্যবস্থার সম্বন্ধ আমাদের চোখের সামনে ভাসে।

এই হোচ্ছে মাদুরী। সাময়িকতাত্ত্বিকতার অবদান আভ্যো ঘটে নি বলেই বোধ করি 'মাদুরী'র লম্বাতি নেই। গল্প যখন বহনিকা আড়ালে চলে যায়, তখন বেশি লম্বা সময়ভাবে উজ্জল হোয়ে রবেছে : "কে জানে, মাদুরী হয়ত সেই জনহীন ধর্মসাধনটি প্রাসাদের কক্ষ কক্ষে এগনও প্রেতিনীর মতো ঘুরিমা বেড়ায়।"—তারপরই মহিমের সঙ্গে মাদুরীর কাল্পনিক সংঘর্ষ তীব্র হোয়ে ওঠে—গল্পকার বলেন : "হয়ত আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাভ্যাকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে!"—মহিম ভাবে লাভ্যা মাদুরীর প্রভাবে নিশ্চয়ই আচ্ছন্ন!

এই ব্যবস্থার শেষ আভ্যো আসে নি। নীলরক্তের সমস্ত আভিভাষ্যাবোধকে অস্বীকার করে মহিম যে লালরক্তকে তার ধমনীতে পরিষ্কৃত করতে চায়, তা কিছুতে সফল হবে না যতোক্ষণ মাদুরী থাকবে। সেইভগ্নে গল্পের লম্বাতিতে এসে পরিষ্কার দেখতে পাই মহিম লাভ্যাকে নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশের পথে যাত্রা করেছে এবং প্রতিটি মুহূর্তে বৃদ্ধ কবে চলেছে মাহুগতী মাদুরীর সঙ্গে :

"মহিম গাঢ়ঘরে ডাকিল,—লাভ্যা।"

লাভ্যা স্বামীর বৃকে মাথা রাখিয়া বলিল—"কি?"

"আবার আমরা লম্বা মাহুগতের মত সংসার আরম্ভ করতে পারি না কি লাভ্যা? সাত পুরুষের পাপ দেহ থেকে বুয়ে ফেলে আবার নতুন জন্ম পাওয়া যায় না কি? যেখানে কেউ আমাদের জানে না এমন ভাংগাখ, একেবারে নতুন করে জীবন আরম্ভ করলে আবার আমি লম্বা হোতে পারব না কি?" (পৃ—৭১)

জানি না কোন প্রভাবের উজ্জল আলোকে মহিম বাহিত পরিবেশে নৌছাবে আর সমস্ত বৃদ্ধ শেষ করে লালরক্তের লাভ্যার হাত থেকে বিজয়ী প্রাপ্য স্বর্ণদুট পরবে।

মাদুরীর পর ওঠ প্রমোদভবনে যদি কেউ নীলরক্তের ঐক্য নিয়ে সত্যিকারের বেঁচে থাকে সে হোচ্ছে 'সিনিমা'। সব কিছু শেষ হোয়ে গেছে, অতীত মুছে

যাচ্ছে, তবুও হুঁচকি প্রাণপণে ওই অধঃপ্রাণ কঙ্কালকে ধরে আছে। বসিকীর মতোই প্রেতদুস্তীতে, অমাত্রিক আকর্ষণে আগলে বেড়াচ্ছে ঐশ্বর্য। ‘পিসিমাকে’ রেখে মাকে মাঝে মনে হয় এই গল্পে সত্যিকারের প্রেমিতা যদি কেউ থাকত, তবে সে তোচ্ছে ওই। নিঃশব্দ পায়ে এই হুঁচকি ধেন বার বার বলে যাচ্ছে : ঐশ্বর্য কথাটা হোচ্ছে কুবেরের, ওতে কোনো লক্ষ্যই নেই, কোথাও কোনো কলাপ নেই। ‘হৃৎ’র মধ্যে অতি অল্পহীন নিয়ে এই পিসিমা বিরাজিত, কিন্তু এতো উজ্জল চরিত্র বোধ হয় ‘হৃৎ’র মধ্যে আর কোথাও নেই। কতো অল্প কথায় যে এতো ভীক মন্থন তৈরী হয় তা প্রেমেন্দ্র পার্শ্বভাবে দেখিয়েছেন।

তৃতীয় স্ত্রী চরিত্র ‘লাবণ্য’কে আলোচনা করার আগে এই প্রাণোচ্চারণের বিদ্রোহী মাছের মহিমাকে একবার দেখা দরকার। মাদুরীকে দেখার পর মহিমাকে বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না। মাদুরী আমাদের বুকের পেছা পেছা সে শুধু যে নারীকে অবিবাহ করে তা নয় ঐশ্বৰ্যের গুণবৎ তার বিশেষ গভীর। একথা জনশ্রুতি করতে কোনো কষ্ট হয় না যে মহিম লাবণ্যকে অতি সাধারণ ঘর থেকে বেঁধে এনেছিল, তেমনি সে চেয়েছিল লাবণ্য তাকে নিয়ে সাধারণ জীবন অতিবাহিত করুক, ঐশ্বৰ্যের ছায়াও বেন তাকে ঘেঁষে আড়াল দেয় না। মহিমের এই চাওয়াই তাকে উদ্বোধিত করে এক নিষ্ঠুর প্রবোধভাপে, আর মাদুরীকে বার বার জীবনরহস্যময়ের সামনে এসে পাৰ্শ্ব-প্রবীণের সমস্ত আলোক সর্বস্ব গ্রহণ করে মহিমের তথাকথিত অংশের কিছা নির্বাক পাষাণের মতোই নীরবতার উত্তর দিতে হয়। ফলে মনে হয় মহিম নিজেই এক প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে।

মহিমের পর আসছে লাবণ্য। লাবণ্য অতি সহজ। আমাদের স্তম্ভ বাঙ্গালার সাধারণ মেয়ে সে। তার চেষ্টা হোচ্ছে চিরন্তন শিক্ষার ভিত্তিতে বধু হয়ে সংসার করার। স্বতরাং তার কাছ থেকে অন্তঃর কোনো উজ্জল স্ফোতি যদি বিকীর্ণ না হয়, দেখতে তার হুঁচকি কিছু কমে না।

প্রেমেন্দ্রের ছোট গল্পসাহিত্যের পথালোচনা এখনও শেষ হয় নি। জানি এখনি কোনো সামগ্রিক মন্তব্য এর ছোট গল্প সাহিত্যের গুণর কথা যথোচিত হবে না, তবুও একথা না বলে থাকা অসম্ভব যে প্রেমেন্দ্রের রচনা শিল্পক্ষেত্রে ‘হৃৎ’র এক ভাবের স্ফোতিত। তার সাহিত্যে যাত্রা আর একটি এমন রচনা আছে যার সঙ্গে এই ‘হৃৎ’কে শ্রেণীভুক্ত করা চলে। আমরা ‘শৃংখলার’ কথা বলছি। (মুসিফুর)। ‘শৃংখলার’ ‘কৃপতি’ এবং ‘হৃৎ’র ‘মহিম’র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—আপাতদৃষ্টিতে একথা সত্যি মনে হোলেও একটা দিক যা চোখে পড়ে তা হোচ্ছে ‘কৃপতি’র বিকলা ‘মহিম’এ লক্ষ্যমিত হোলেও কার্যক্ষেত্রে সেবা যার যে ‘মহিম’এ জীবনে পাঁচবার অন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। লাবণ্যকে নিয়ে যে দিন সে পথে এসে ঝড়াল, সেদিনও তার সেই অমিহিত বাত্মার প্রথম পর্যায়ে লাবণ্যর গুণর তার শুভজ্ঞা ছিল, ‘কৃপতি’র মতো ‘বিনতি’র মতকে অভিলাষ বর্ষণ করার কোনো গুঢ় অভিপ্রায় ছিল না :

‘গাড়ী কিছুক্ষণ চলিবার পর মহিম প্রথম কথা বলিল যে একেবারে নতুন মাছের ইয়া।

বলিল, তোমার অনেক কষ্ট দিয়েছি লাবণ্য ; এত দিনের ব্যবহারে আমার মনে মনে তুমি ভুল করতে লুপ্ত করছে কি না তাও জানি না ; কিন্তু একটি কথা বুঝে আস আমার কথা করতে অল্পবোধ করছি লাবণ্য। ও বাড়ীর হাওয়া পৰ্ব্ব বিবাক—এইটুকু মনে তুমি আমার মার্কনা করতে পারবে না কি কখন ?—(পৃ ১১)

‘বিনতি’র মতো লাবণ্যও ছিল আমাদের বাঙালী বধু। সেই লাজুকতা, ভীকতা আর সংসারকে আপন করার প্রচেষ্টায় দিনরাত্রির অস্ত্রাঘাত। কিন্তু ‘কৃপতি’র ক্ষুদ্র আখ্যাত তার কোমল অন্তর থেকে সমস্ত দৃষ্ট অল্পভূতিকে পমহলিত, লাহিত করে তাকে প্রাণহীন বিবেক প্রতিমায় রূপান্তরিত করলো। লাবণ্যও এই অভিলাষ থেকে পরিত্রাণ পেতো না। শুধু তাই নয় যে রহস্যময়ী মায়াবিনী মাদুরীকে আমরা এতো জনদহীনা হোতে দেখেছি ; সেখানি মহিমকে পথে পথে বিজ্ঞপ্ত করতে,

লাবণ্যকে প্রেরণা দিতে, সেই মাধুরীকে স্বীকার করে নিয়ে মাধুরীর প্রদর্শিত পথে লাবণ্য যদি যাত্রা করতো, তবে সে যে অনায়াসে 'মাধুরী' আর 'বিনতি'কে অতিক্রম করে যেতো, এ তর্ক সম্পূর্ণ বলিষ্ঠ থাকলে উত্থাপিত করা চলে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় নি। গল্পবস্তা যে পর্যন্ত দেখেছেন তার সে 'মহিম' জীবনকে আবার স্বীকার করে লাবণ্যকে পুনরায় জীবনের সেতুচূড় করতে চেয়েছে এমন কোনো পরিপত্তির স্থানিষ্ঠ ইঙ্গিত আর কোথাও পাওয়া যায় নি। শুধু তাই নয় জীবনকে গল্পবিত্ত হওয়ার কোনো সুযোগ দেওয়ার অন্তেই যেন হয় যে নিষ্ঠুরতা 'ভুলতি' আর 'বিনতি'তে কুটে উঠেছে, সেই নিষ্ঠুরতা, ভয়তা প্রকাশ করেছে মহিম আর মাধুরীতে মাত্র—লাবণ্যের কোমলতা এই ক্ষমের মধ্যে সম্পূর্ণ হ্রাসিত হয়েছে বৈচে আছে; মাঝে মাঝে কে যেন বলে এ স্রগতে, এই প্রাশংগিকত্বই যদি কারণের ওপর তোমার সহ্যক্ষমতা বিস্তে হয় তো নাও মাধুরীর ওপর। কি ভগতে সে বাস করে, কি ক্ষম তার জীবন ছিন্নভিন্ন হোলে যাচ্ছে। তবুও কোথাও তার আশ্রয় নেই, নেই সংসার রচনার সেই পরম আশ্রয়। যেদিন সংসার এই প্রাশংগিকত্বকে পরিভ্রাণ করে চলে গেল, সেদিন কি মাধুরী সত্যি হেসেছিল, না, তার কলহাতের প্রতিটি মুহূর্তই পরি-
তক্তার কান্না করে করে পড়েছিল। সেই কান্না ওর অন্তরে আছে বলেই না ও অতো সহজে মহিমের আশঙ্কাকে প্রকাশ করতে পারে, অতো ঘনিষ্ঠ হোলে লাবণ্যকে প্রথমদিনে অভ্যর্থনা জানায়। মাধুরীর দিকে চেয়ে থাকলে যেন হয় ও পশ্চিম অত্যাচলবাসিনী আর পূর্বতোরণ পার হোলে অরণ্যভাড়া শাড়ী পরে আসছে লাবণ্য। পরিষ্কার বোকা বাঘ বিশিষ্ট রচনা হিসাবে 'শৃঙ্খল' থেকে 'হয়ত' শুধু গভীর নয়, সন্ধাননার অধ্যবস্থা। প্রবেশের পরবর্তী শিল্পীরা এই স্রষ্টার সন্ধাননা অকুণ্ঠিত চিন্তে গ্রহণ করেছেন।

'শৃঙ্খল' ছাড়া আরো একটি গল্পকে আমরা 'হয়ত'র আলোচনার স্বরণ করেছি। আদিকের দিক থেকে 'স্বপ্নিত পাখা' যে 'হয়ত'র পঞ্চদশবর্ষিক সে কথা যেমন

উল্লেখযোগ্য তেমন 'হয়ত'ও অন্য একটা দিক থেকে 'স্বপ্নিত পাখা'র চাইতে প্রকাশপুষ্ট। প্রাশংগিক পাখায়ে পাখায়ে ব্যক্তি প্রাণের অবমানিত সাহিত্য আত্মা অহরহ কেঁবে বেড়াচ্ছে, মাহুতকে পাগল করে বিচ্ছেদ অতীতের অত্যাচারকে রাহির পর রাহিতে নিশ্চয় অন্ধকারের অতীত দুঃখ, প্রাণশ্রিত হওয়ারও সন্ধাননা কী। অভিব্যক্তি যতো মধুর হোক, যেমন যতো গভীর হোলে মাহুতকে আঘাত দিক, একথা অনস্বীকার্য যে ওই, পাখায়ে মধুর অবসান কোনোদিন যে মাহুত ঘটতে পারবে এ আশা 'স্বপ্নিত পাখা' কোথাও নেই। 'হয়ত'র প্রকাশ ভর, 'হয়ত'র বাখানা প্রতি ঘটনার উন্মোচনে আহত করে। কিন্তু এই ভয়তা, এই আঘাত সঙ্কর বাঘ এখন ঘেঁষে নিতুন করে জীবনকে গড়ে তোলার অবকাশ হয়ে গেল। যেন হয় ছায়াঙ্কুর স্রগতের তমসাকীর্ণ পথের প্রান্তভাগে এসে মাহুত যেন ঈড়িয়েছি—যদিও ঐশ্বর্যময়ী পিসিমা আর তপসী অভিশাপ মাধুরী নিবাসিত হোল। এইবার পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত হবে অন্ধের স্বর্গলোক : মহিম নতুন করে ঠাটবে, লাবণ্য পাতবে মাহুতের তেহমত সংসার। দর্শনের অপর এই অকনিহিত প্রাণমত্তার অন্তে স্বীকার করি যে 'হয়ত' বাংলা সাহিত্যের দৃশ্যকরী ছোট গল্প। এ গল্পকারকে বাংলা সাহিত্যে পাঠ্য পাঠ্যিক কোনকালে বিশ্বস্ত হোতে পারবে না।

আরো একটা দিক আমাদের মূগ করে : 'হয়ত'র নামকরণ। পৃথিবীর সাহিত্যে যে সমস্ত কালভরী রচনা নামকরণের ক্ষেত্রে গৌরব করে থাকে, 'হয়ত' তাদের সম পূর্ণাঙ্গত্ব। এই নামকরণের মধ্য দিয়েও যেন শিল্পীর সত্যকে দেখতে পাওয়া যায়। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয় কেন 'হয়ত'র গল্প এলো। সেই সুযোগপূর্ণ রাহিতে অন্য কোনো গল্প সেই শহরের পটভূমির ওপর রচিত না হোলে, স্রষ্টা এক ভর প্রাশংগিক নিষ্ঠুর কক্ষে ওই রহস্তপূর্ণ পরিবেশে এই দৃশ্যপট তোলা হোল কেন ? হয়তো মহিম আর লাবণ্য দুবোঝ যাত্রাকে ইঙ্গিতময় করার জগে ওই বিশেষ রাহির প্রয়োজন ঘটেছিল।

ডায়া লম্বা ছুটি কথা বলবার আছে। ‘পুতুলও প্রতিমা’ আলোচনা করার সময় যে কথা বলেছিলুম সেই কথার আবার উল্লেখ করছি। প্রেমেন্দ্র মচেন্তন শিল্পী—তিনি আগামী সংস্করণে ‘হৃদয়’র ডায়েরী ওপর দৃষ্টি দেবেন বলে আশা রাখি। যেমন পু-২০’র যে অংশ পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছিল, তাতে একটা কথা রয়েছে ‘চটকানো’। মনে হয় ওই স্থলে প্রেমেন্দ্র অনাবাসে ওর থেকে অনেক প্রতি-মূর্ত্ত কণা ব্যবহার করতে পারতেন। ‘হৃদয়’র কণ্ডকের কাছে আমায়ের গানী তাই। যে গল্প অন্তরসাধারণ গল্প,

তার সকল দিক থেকে অসাধারণ হওয়া যে বাস্তবীক এ কথা শিল্পী যখন স্বীকার করতেন আশা করি।

এই সার্বিক গল্পটির মধ্যে প্রেমেন্দ্রকে অভিনয়ন জানানো নিরর্থক। কারণ কালজ্যে ‘হৃদয়’ তাঁকে যে স্মরণের সম্মান আগামীকালের পাঠকপাঠিকার কাছে দেখে, তার থেকে জ্যেষ্ঠতর কিছু যে আমরা বিতে পাওযো সে কথা স্বয়ং করা কঠিন।

আমায়ের সাহিত্য-ভবন
কলকাতা।

শরৎচন্দ্রের “গৃহদাহ”

শ্রীঅবনীন্দ্র রায়

শরৎচন্দ্রের কয়েকখানি বই লম্বা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি কিন্তু “গৃহদাহ” লম্বা করি নাই। তাহার কারণ বইখানির আলোচনা আমি পরিণত বয়সের স্ত্রী রাখিয়া দিয়াছিলাম। অচলার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে হইলে যৌবনের কেনাথিত উত্তেজনা কাটাঠিয়া প্রৌঢ়ের উপনীত হইতে হয় এট আমার ধারণা। তবে আজ যে আমার সে বয়সে উত্তীর্ণ হইতে বাকি নাই একথা ধীহারা আমাকে জানেন তাহার স্বীকার করিবেন।

অচলার চরিত্রে একটি বিশেষ মনস্তত্ত্ব শরৎচন্দ্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন—অথচ কাহাণীকে যে সে লজাই ভালবাসে তাহা সে জানে না। নারীর কৌমার্যের পরিণতি স্বরূপ যে প্রথম ভালবাসা তাহা সে মহিমকে দিয়াছিল কিন্তু হরেশ আসিল তাহার জীবনে রাহ স্বরূপ। ঘটনার স্রোতে এবং পিতার লুপ্ততার হরেশ অচলার জীবনের সহিত জড়াইয়া গেল। হরেশের মত পুরুষকে যে কোন নারীর পক্ষে ভাল না বাসিয়া থাকা একরকম অসম্ভব বলিবেই চলে। সে হৃৎকণ্ঠ সরলচিত্ত

এবং অমাবিক—তাহার অনেক টোকা। কিন্তু তার চেয়েও যে বড় গুণ নারীকে চিরকাল অভিহৃত করে তাহা হরেশের ছিল—সে প্রেমাস্পদের স্তম্ভ দব কিছু করিতে পারিত। এই ‘দব কিছু করিতে পারা’ একটা সহজ কথা নয়—ইহা মানব-জগতের একটা বিরাট লক্ষ্য। মাহুদ স্বভাবতই সংকীর্ণচিত্ত—আপনার আবেশের সীমা যাহা নীমাবদ্ধ। যখন হরেশের আবেশে সে এই সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায় তখন তাহার কন্ডের চেহারাটা দেখকমই দেখাক, সে তাহার জগতের বিশালতার এবং চিত্তবৃত্তির আনন্দিকতারই পরিচয় দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তার অন্ধ আবেশ জুল পথে ধাবিত হয় (misdirected) যেমন এখানে হরেশের ক্ষেত্রে হইয়াছিল। কিন্তু তবু স্বীকার করিতে হইবে চিত্তের উপার্বেয় দিক দিয়া সে বিষমলগ ঠাটুর বা স্বীকার স্বগোত্র। ক্ষুদ্র চিত্তের সাধ্যও ছিল না নিজের জীবনের সর্ববিধ আশা আত্মজ্ঞা পরিণতিতে ফলাফলি দিয়া লম্বা চিত্তবৃত্তিকে একটি মাত্র সংস্কে কেন্দ্রীকৃত করা। হরেশ তাহা পারিয়াছিল বলিয়াই অচলাকে যোগলদরায় টেনে মহিমের নিকট হইতে বেন ধৌ মাতিয়া কাড়িয়া লইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার ভুল হইয়াছিল। অচলার ব্যবহার সে ঠিকমত ধরিতে পারে নাই। হরেশের স্ত্রী অচলার দুর্বলতা ছিল না তাহা নয় কিন্তু সে দুর্বলতা মহিমের স্ত্রী তার যে

গভীর ভালবাসা তার তুলনায় কিছুই নয়। স্বপ্নে মনে করিয়াছিল যে তাহার মস্ত অচলার যে দুর্বলতাই হুঁ আচ্ছ তাহাকে মূলধন করিয়া একত্রে বসবাস এবং গৃহস্থালী আয়ত্ত করিলে একদিন না একদিন তাহার মনের সম্মান পাইবে। কিন্তু একসঙ্গে বসবাস করিয়া এবং নিঃশেষ বহুবিধ চেষ্টা খাড়া অচলার মনোরঞ্জন করিয়াও সে শৈবিল প্রথম দিন যেমন অচলার মনের বাহিরে পড়িয়াছিল সেদিনও তাহাই আছে। ইহাতে অচলার কোন ঘোষ ছিল না। ভালবাসা ভগবানের একটি সৃষ্টি—তাহা স্বতঃই অন্তর্গত করে। কতমাস দিয়া তাহাকে তৈয়ারি করা যায় না বা কর্তব্যবোধেও তাহা দেওয়া যায় না। কর্তব্যবোধে বাহা অন্তর্গত করে তাহা দয়া—ভালবাসা নয়। স্বপ্নের মস্ত অচলার মনে এই দয়া ছিল—নচেৎ মেগের যুগে দুই পথবাসী স্বপ্নশকে দেখিবার মস্ত মাহুলা গ্রামে সে বাইতে পারিত না। কিন্তু নিঃশেষ বিকল্পে সে নিঃশেষ বাইতে পারে না—হুতরাং ভালবাসা দিবে কোথা হইতে ?

প্রেমাম্পদের মস্ত সব কিছু করিতে পারার চেয়েও স্বপ্নের আর একটা বড় গুণ ছিল বাহা মাহুলের পর্বে তাহাকে যথ উল্লেখ তুলিয়া ধরিয়াছিল। সে পরের দুঃখ কিছুতেই সজ্জ করিতে পারিত না। ইহার বহু প্রমাণ সে সমস্ত জীবন ধরিয়া দিয়াছে। বালাকালে মহিষকে সে জলে ডোবা হইতে বাচাইয়াছে, অশ্বখের মুখ হইতে বাচাইয়াছে। মহিষ না হয় ছিল তার অকৃত্রিম বন্ধু কিন্তু নিঃসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে আঙনের গ্রাস হইতে বাচাইবার মস্ত সে কি আঙনের মধ্যে কাঁপ দেয় নাই ? মেগের প্রত্যেক স্তন্যি সে যে মাহুলা গ্রামে গরীব দুঃখী মোকদ্দম চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে ছুটিয়া গিয়াছিল সে ত কোন আত্মীয়ের টানে নয়। অচলার ভালবাসা না পাইয়া জীবনে বিতৃষ্ণ হইয়া সে যে মাহুলা গ্রামে মৃত্যুবরণ করিতে গিয়াছিল এ কথা ভাবিলে ভুল হইবে। অচলা জানিতে পারিলে বাইতে দিবে না বলিয়া অচলাকে লুকাইয়াই সে গিয়াছিল। তারার বাওতার প্রকৃত কারণ গরীব দুঃখীর কষ্ট সে সজ্জ করিতে পারে নাই। মেগের

চিকিৎসায ভক্তারের যে দানবানতার প্রয়োজন তাহাও সে অবলম্বন করিয়াছিল কিন্তু ভগবান বিমুখ বলিয়া তাহাতে সে ফললাভ করিতে পারে নাই। ধনীরা চলাল কলিকাতায় যার সুবৃহৎ অট্টালিকা, সেখানে থাকিলে যার চিকিৎসার মস্ত ভক্তারের তিত্ত লাগিয়া যাইত, সে গিয়া মরিল কিনা বিহারের এক পল্লীতে একরকম বিনা চিকিৎসায। শরৎচন্দ্র এই ভাবে end of poetic justice বজায় রাখিয়াছেন। “বেবদাসের” চরিত্রেও ইহা আমরা দেখিয়াছি। স্বপ্নে এবং বেবদাসের চরিত্রের ভাল দিকটা কোটাইয়া তুলিয়া তিনি পাঠক পাঠিকার সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাহাও কৃত্রিম প্রকৃত নয় হিতে ডোলে নাই। সহানুভূতি বড় হইয়া তাঁহাকে গ্রাহ্যে মাননও হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। এখানেই আটটিটের গুণনবোধের (Sense of proportion) পরিচয়।

সত্যই স্বপ্নে এবং অচলা শরৎচন্দ্রের অপর সৃষ্টি। ইহারা একই সময়ে মাহুলাকে কাছের টানে, আবার দুঃখ সরাইয়া দেয়। স্বপ্নের উদারতায টাকা পল্লাস লব্ধে নিশ্চিন্ততায, বহুদৈব অকৃত্রিমতায, দৌলভবোধের অপূর্বতার দরিত্রের মস্ত তাহার ক্ষমতার আনন্দিক বেদনাবোধে আমাদের মন মুগ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই স্বপ্নের দুর্ভাগ্য অসংখ্য এবং বহুপক্ষীকে হরণ করিবার কক্ষ চেষ্টার আমাদের মন আবার স্ত্রি চেষ্টা গঠে। মনে ভাবি এই দুই পরস্পরবিষোধী মনোভূতি একই লোকের মধ্যে বাসা বাধিয়া ছিল কিরপে ? অচলাও ব্রাহ্ম পরিবারের শিক্ষিত মেয়ে—বাহু, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং লব্ধবাক্য। তার উপরে সে মহিষকে ভালবাসে। সেই অচলা যে কি করিয়া স্বপ্নের শরৎচন্দ্রের উদাত্ত তাক্ষে যোগ দিল তাহা বুঝিয়া গঠা দুঃখ। মতেভন মনে না হইলেও অচেতন মনে যে স্বপ্নের এই নির্লক্ষ অভিযানে অচলার সাথ ছিল তাহা অসম্ভব নয়। তাহা না হইলে সে যখন বোগলসরাই ট্রেন ত্যাগ করার পর জানিতে পারিল মহিষ সেই ট্রেনে নাই তখন তাহাকে উদ্যোগসম্মী

ক'রে। লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইত। আর কিছু না থাকক সে ট্রেন হইতে লাফাটরা পড়িতেও গেল। কবিত। এই সাধ না থাকিলে ভিতরী বাড়িতে দিনের পর দিন স্ত্রীর পরিচয় দিয়া হুরেশের সঙ্গে বাস করা তাব পক্ষে অসম্ভব হইত। এইখানেই গোটা বার সে দৈবী মনোভাবের এবং মানুষী মনোভাবের মধ্যে একটা ফকা (compromise) করিয়াছে। ভাষাধরে বলা যায় তাহার মন flesh-এর উপরে উঠিতে পারে নাই—flesh-এর নিকট পরাক্রম স্বীকার করিয়াছে।

কিন্তু এই ধরনের কাম যুগলের মত মেয়ের দ্বারা করান অসম্ভব হইত। সে মরিত তবু আত্মপ্ন ত্যাগ করিত না। এই কালের বেগে আত্মপ্ন লুপ্ত হইয়াছে। মত শক্ত হয়। সেখানে কোন কল্পনামাইজ নাই—আত্মপ্ন চিরকালই তাহার মনে নিখুঁত আত্মপ্নপটে পুজা পায়—ব্যক্তি হুঃ, দারিদ্র্য অক্ষমতা সেই আত্মপ্নের নিকট তুচ্ছ যুগল যে ছোট বয়স থেকে মহিমের অহুয়ানি, তাদের পরস্পরের বিবাহের কথাবাটাও হইয়াছিল, ইহা গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন। তারপর সেই সর্বজনবোধী মেয়ের বিবাহ হইল যোবালা মনায়ের সঙ্গে বীর হুই দ্রী গত হইয়াছেন এবং বীর বয়স পলালের উপর। কিন্তু যুগল কোন দিন এই বৃদ্ধ স্বামীকে অতিক্রম করে নাই প্রমেও নিজেদের ভাগ্যকে অভিশপ্তাত বের নাই। তার কারণ স্বামী তার মনে কোন ব্যক্তি নহ, স্বামী একটা আত্মপ্ন। পরচন্দ্র যুগলকে অচলার প্রত্যুত্তররূপ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না। পরচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছেন যুগলের মত সর্বসহা মেয়ে একমাত্র হিন্দুসমাজেই সম্ভব। কারণ হিন্দু সমাজ তাহার বহুদিনের ঐতিহ্য দ্বারা একটা আত্মপ্নকে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে—যে আত্মপ্নের পরিপূর্ণতার জন্য তার অহুয়ানিগ নিজেদের বলি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু অচলা ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে—সে সমাজে এখনো কোনো স্বামী ঐতিহ্য গড়িয়া গঠে নাই। সেখানে সমস্ত সমস্তার বিচার হয় বুদ্ধি (reason) এবং বুদ্ধি দ্বারা—instinct দ্বারা নহ। সেই অজ্ঞ অচলার শিতা কেদার বাবু যুগলের ইতিহাস গুলিয়া

তাহার পুনরায় বিবাহ দিব্য পদার্থ দিয়াছিলেন। তিনি অসম্ভবভাবে এত পরামর্শ দেন নাই—নিজের জ্ঞান এবং বুদ্ধি মতই দিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরামর্শ instinct দ্বারা পরিচালিত নহ। Flesh-এর উপরে গঠিত পরামর্শ এ নহ।

মহিম পরচন্দ্রের আর একটি বিশিষ্ট গুণ। "চরিত্র-হীনে" উপনি ছাড়া পরচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যে আর এমন গঠিত বিজ্ঞানটি নাই। ইহার কথা বলে কম, মতা কথা ছাড়া বলে না, নিজেরা হুঃ পায় কিন্তু অপরাধকে কদাচ হুঃ দেখে না। ইহার আত্মসম্মানবোধ এমন তীব্র যে কোন কালেই তাহাকে ক্ষম হইতে দিতে পারে না। পাঠক পাঠিকার মতন হইবে যদিও মহিম দ্বিতীয় হইয়াও ধনী বহু হুরেশের এক পরবার মান কোনদিন গ্রহণ করে নাই, যদিও হুরেশ মতাই ভালবাসিতা তাহার কোন একটা কাণে লাগিতে চাহিত। এই দিতে চাহিবার প্রবৃত্তির মধ্যে হুরেশের কোন অহমিকা কিংবা মহিমকে অসম্মান ছিল না। মহিম তাহা বুদ্ধিত কিন্তু তবু সে নিজের হুঃের দ্বারা একমাত্র ক্ষমপতি হইয়া বিচার করিতে চাহিত—কাহাকেও তার মন দিতে চাহিত না। এই সেনসেবের একটা ব্যবহারিক (practical) দিকও আছে—ঈর্ষির মধ্যে দখল তাহা স্বক হইলেও বরাবর তাহা থাকে না এবং একদিন না একদিন এহীতাকে সে অপমানের ধূলির মধ্যে আছড়াইয়া রাখে।

সত্যই মহিম যদি অচলাকে তাহার অনাবিল স্বামীত্বের মধ্যে ছাড়িয়া না দিত, যদি কোথাও না কোথাও রাস করিয়া ধরিত, একবার তাহার স্বামীকেই অধিকার দাবী করিত, তবে অচলা তাহার নিকট হইতে এমন করিয়া অন্ত হইয়া পড়িতে পারিত না এবং "পৃথিব্যের"ও সৃষ্টি হইত না। কিন্তু মহিম কেবলমাত্র অচলার সেহটা পাইবার কামনা করে নাই সেহটাকে সর্ববিধ জাঁক হইতে বাচাইয়া নিজের ভোগে লাগাইবার কোনল তাহার মানা ছিল। কিন্তু সে চাচিয়াছিল অচলার সত্যিকারের ভালবাসা দ্বারা হিন্দু একমাত্র কামা—বাহা এই অজ্ঞ হইতে পরচন্দ্রে প্রকাশিত হয়।

সেই বস্তু যে চাহে সে জানে যে অচলা ভুল করিবে, মোহগ্রস্ত হইবে কিন্তু একেবারে বিচ্যুত হইবে না। তাহাদের বিবাহের মত যদি মতা হয় তবে অচলা ইহাশ্রমে না হয় পরজন্মে তাহার নিকট ফিরিয়া আসিবে। রবীন্দ্রনাথের “রাজা” নাটকের। King of the Dark Chamber) মনে এইখানে শরৎচন্দ্রের একটা ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের রাজাও অন্ধকার হুঁহুরি মধ্যে নিঃশব্দে আবদ্ধ রাবিয়া রাষ্ট্রকে ভ্রমরসগন্ধ পরিপূর্ণ বিশাল জনতে অবাধে বিচরণ করিবার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। রাষ্ট্র প্রথমে বেহের রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন, পরে তাহার কাপুরুষতার রাষ্ট্রের মোহ কাটিয়া গেল এবং তিনি চোপের ভিতর দিয়া একদিন রাজার সঙ্গে পুনর্মিলিত হইলেন।

মহিম অসীম পৈতৃক প্রতিদ্বন্দ্বি। কোন কঠিন আঘাতেই তার পৈতৃক বাধ ভাঙিয়া যায় না। গ্রন্থকার হুয়েনের মৃত্যুর সময়ে ছই বন্ধুকে আর একবার একত্রে মিলাইয়াছেন। আশ্চর্য এই এতদিনের এই বিকল্প ব্যবহারেও ছই বন্ধুর মধ্যেকার বোণমুখ একেবারে ছিন্ন হয় নাই—যেন তাহারা পূর্বকার সেই অকৃত্রিম বন্ধুই আছে—মধ্যেকার ঘটনাক্রমে যেন ছাধাবান্নির মত অর্ধহীন। তাই মৃত্যুর সুখোন্মুখী ঠাড়াইয়া হুয়েন যখন শেষ ভাক দিতে চাহিল তখন কোথাও লক্ষ্য তাহাকে বাধা দিল না। মহিমও সে ভাকে সাড়া দিতে বিধা করিল না। হুয়েন বলিয়াছিল, “ছলেবেলা থেকে সংসারের মধ্যে অনেক গ্রন্থিই পাকিয়েছি, আর তাদের বোলবার ক্ষমতা এই মাহুগটিকে তির্যকি আবস্তক হয়েছে।” তার জীবনের শেষ গ্রন্থি মোচনের অন্ত অভ্যাসবশতই হুয়েন মহিমকে স্বরণ করিয়াছিল। নিজে ত পরপারে চলিয়া গেল কিন্তু গ্রন্থি-মোচনের আবস্তকতা রহিল অচলার সম্বন্ধে। সে এখন কোথায় বাইবে? যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহার পর মহিমের মত নীতিবিরোধী ব্যক্তি কোথাকো অচলাকে গ্রহণ করিবে ইহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। মহিম গ্রহণ করেও নাই। যে ট্রেনে মৃণাল এবং কেশববাবু ভিহরিতে আসিয়া নামিলেন সেই ট্রেনেই মহিম

কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। হুয়েনের সম্বন্ধে তার কর্তব্য শেষ হইয়াছিল। ব্যক্তি ছিল কেন অচলার সম্বন্ধে কর্তব্য। অচলা মহিমকে ভিজায়া করিয়াছিল যে বিশেষ অফলে তার মত হতভাগিনীদের অন্ত আশ্রম আছে—এখানে তেমন কিছু আছে কি না? মহিম এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে নাই। গ্রন্থকার এইখানেই এ প্রশ্নের শেষ করিয়াছেন। অচলার মনের ভাব বোধ হয় এই যে কোন একটা আশ্রমে থাকিয়া ব্যক্তি জীবন সে অসুভাগ্যের অন্তরে নিজের পাশ আগুন করিবে। মৃণালের কথা মধ্যে কিছু ইহার একটা ভাবের প্রতিকৃতি আছে। মৃণাল বলিয়াছিল যে শ্রীলোকের আশ্রমই বল আর আশ্রমই বল, সে যে কোথায় সে যবর আমি সেতনিকে দিতে পারিব। মনে হয় মৃণালের ভাবধারা এই যে নারীর চিরকালের আশ্রয় তার স্বামী—সে যত অপরোধেই অপরোধী হোক তার স্বামীর আশ্রয় দায় না। যা যেমন সম্বন্ধের যেহে নৃশির্ষক-মলিন হইলেও তাকে কোলে লইতে বিধা করেন না তেমনি স্বামী স্ত্রী এবং স্ত্রী স্বামীর মত অপরোধেও তাহাকে আশ্রয় দিতে পারেন না যদি সে সত্যিকারের আশ্রয় হয়। গ্রন্থকার এই সমস্তার স্পষ্ট সমাধান করেন নাই—হুতরাং আমাদের অস্থান সমস্ত কিনা ইহা পাঠকপাঠিকার মত সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে।

শরৎচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের কেদারবাবুকে লইয়া উপজাল হুত করিয়াছিলেন। প্রথমে দিকে কেদারবাবু যে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও উদ্বেগ হয় না। কেদারবাবু টাকার গোটে মহিমের সঙ্গে কণ্ডার বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিতে বিধাবোধ করিলেন না যদিও জানিতেন মহিমের সঙ্গে বিবাহেই রক্তা সম্বন্ধ। হুয়েনের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তার নিকট হইতে টাকা লইয়া নিজের মৃত্যু অন্তর্গত শোষণ করিয়া বিধা বস্তুর নিঃশব্দ কোলাহালিলেন। শরৎচন্দ্র বিন্দু সমাজ ছাড়িয়া কোন ব্রাহ্ম সমাজে তার গমনে পটভূমিকা স্থাপন করিলেন তাহা অস্থান করা শক্ত। মনে হয় হুয়েনের মুখ বিধা যে কথা বাহির করিয়াছেন তাহা শরৎবাবু নিজেও মনের কথা।

অর্থাৎ যাগের আদ্যের হিন্দুসমাজকে হুম বুলি যা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের আমি ছ'ক্ষে দেখিতে পারি না। এ নালিশ সভ্য হইলে গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা পক্ষপাতবোধ কথা। কিন্তু শরৎবাবু এই পক্ষপাতবোধ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন এবং কেদারবাবু চরিত্র ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে। ইহার কারণ কেদারবাবু যুগলের মত মেঘের লম্পর্শে অগ্নিহো ছিলেন। হিন্দু লম্পর্শের বা কিছু ভাল, বা কিছু কল্যাণ তার নির্ধারিত যুগলের চরিত্রে অধিগত হইয়াছিল। সেই যুগলের নিকট অতিথি হইয়া, তার সেবা বহু আদর পাইয়া তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা লাভ করিয়াছিলেন। ফলেই আগুন পুড়িয়াও কেদারবাবু চরিত্র পূর্বাপেক্ষা নির্মল হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্র শ্রবণের চরিত্রে আর একটা বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ব চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রবণ ভগবানে বিশ্বাস করিত না। শেব পংখ্য করে নাই—মহিম বখন মুক্তা নিশ্চিত জানিয়া

তার লঙ্গতির লগ্ন ভগবানকে শ্রবণ করিতে বলিল, তখনো শ্রবণ মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়াছিল ও লগ্ন আমার লাগে না। কেহ কেহ মনে করেন শ্রবণ বৈষ্ণব ভূষণ পাওয়াছিল, অন্যত্র তবের মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও তার জীবন বৈষ্ণব বার্ষ্যতার পর্বেবসিত হইয়াছিল তাহাতে তার ভগবানের প্রতি বিশ্বাস কিরিতা আসিবার কথা। কোন কোন ক্ষেত্রে এ যে সভ্য হয় তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু শ্রবণের মত লোকও যে পৃথিবীতে আছে বাহ্যনের কোন ঘটনায় প্রস্তায্যাতাই চৈতন্য হয় না, তাহাই শরৎচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছেন। ইহার অহঙ্কলে কেবল এইমাত্র বৃত্তি যেওনা যাও যে ইহাদের এখনো সময় হয় নাই। তৎপূর্বে আঘাত বস্তু গুরুতরই হোক, চৈতন্য আসিবে না। তবে আশার কথা এইটুকু যে এ-জীবনে না হইলেও কোন জীবনে একদিন তাহাদের ভগবানে বিশ্বাস করিবার সুসময় উপস্থিত হইবে।





জয়পুর কংগ্রেস অধিবেশন

আজ ২৩ বঙ্গাব্দ ধরে কংগ্রেস ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করছে। প্রথমে একটি মুহূর্ত্তী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর ভয় হয়; কিন্তু গত ২৮ বঙ্গাব্দ ধাবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রামের পরিচালনা ভার কংগ্রেস প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেছিল। দীর্ঘ সাধনার পর কংগ্রেসের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে;—আজ ভারত বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হ'বে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জয়পুরের কংগ্রেস অধিবেশন স্বাধীন ভারতের প্রথম কংগ্রেস। ডাছাড়া এর আরও বিশেষত্ব চল একটি দেশীয় রাজ্যে এই প্রথম কংগ্রেস। এতদিন কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যে কোন শাখা প্রতিষ্ঠা করে নি বা কোন কার্যক্রম নেই নি যদিও দেশীয় রাজ্য সবচেয়ে কংগ্রেসের মত স্পষ্টভাবে বহুবার ব্যক্ত করা হয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় সব দেশীয় রাজ্যই কার্ণাট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশের শাসিত হয়েছে এবং ঐ সব দেশীয় রাজ্যে এখন কংগ্রেস প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছে। তাই স্বাধীন ভারতের প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন অন্ততম দেশীয় রাজ্য জয়পুরে চওড়া খুঁই সম্ভব হ'য়েছে।

এই কংগ্রেস অধিবেশনের আর একটি বিশেষত্বও উল্লেখ করতে হয়, যেটি নিতান্তই বিবাহের। জাতির জনক, স্বাধীনতা সংগ্রামের একচ্ছত্র সেনাপতি যুগপ্রবর্তক ব্রহ্ম মহাত্মা গান্ধীর মেহতাপের পর এই প্রথম অধিবেশন। যিনি এই ২৮ বঙ্গাব্দ ধাবং কংগ্রেসের একমাত্র নেতা ও পরিচালক ছিলেন—যিনি নিজের সম্ভাবনের মতো কংগ্রেসকে গড়ে তুলেছেন, তাঁর অভাব প্রতিপদে আজকের কংগ্রেস অঙ্গুভব করছে। তাঁর মৃত্যু

জাতির ইতিহাসে চিরকাল বিবাহবন্দ গোব্বোজ্ঞানভাবে উল্লেখিত হবে। তাঁর মৃত্যুর পর কংগ্রেসের এট প্রথম অধিবেশন।

যিনি পরীর উপস্থিত ছিলেন না তিনি দেখানো উপস্থিত ছিলেন সকলের চিন্তা ও ভাবগারা। তাঁর একটি প্রকাণ্ড ইতালিচি নামনে ছিল; কিন্তু এর বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল ব'লে মনে হয় না। কারণ সর্বজন সর্ব কাজে সর্বজনেন মনেই তিনি বিবাহমান ছিলেন। মৃত্যুর পর মানুষের কি চয়—তা নিয়ে বত বিতর্ক আজ পর্যন্ত হ'য়েছে। কিন্তু মৃত মানব যে অমৃতক অমৃতালি ও প্রিয়জননের সন্নিধ্যে ও সাহুজ্যে অবস্থান করে, এট বিবরে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। ভগ্নপুত্রের সমস্ত মালাচানার মধ্যে গান্ধীজী তাঁই অপরীহীতাবে উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসের প্রস্তাব

স্বভাবতই জয়পুর অধিবেশনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হ'ল—চতুর্থ প্রস্তাব—বার মধ্যে মহাত্মাজী বান্ধীর দারোগ দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবের নাম চল The Message—এর হিন্দী নাম হ'ল—পদগোব না সন্দেশ এবং বাংলা হল—বাণী। গান্ধীজী কি বাণী, কি শিক্ষা আমাদের ভয় রেখে গেছেন—তাঁর ভাবন ও মৃত্যু থেকে কি আদর্শ ও প্রেরণা আমরা পেয়েছি, তা-ই এট প্রস্তাবে বলা হয়েছে। মহাত্মাজী বান্ধী বেশকালের শীমা উত্তীর্ণ হ'বে মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভাগ্য হয়ে থাকবে। তিনি যে আদর্শ দিয়ে গেছেন তাকে মোটামোটি কয়টি প্রধান বিষয়ে ভাগ করা যায়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-ই পঞ্চম নম; সামাজিক ও আর্থিক স্বাধীনতা বাস্তব সাধারণ মানব ভোগ করতে পারে তা-ই কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং আজ সেই বিকেই প্রথম নম্বর

অস্থিরা—পৌষ, ১৩৫৫

সেও উচিত : ধর্ম, ধর্ম বা জাতের পার্থক্য খুঁচিয়ে
 ভারতে এক সমন্বয় জাতীয়তা (Composite
 Nationality) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাকিস্তানের
 সীমার দাবী করছেন—যাদের ভিত্তিতে জাতীয়তা ও
 রাষ্ট্রীয় সত্তা নির্মিত হবে; তার উত্তরে গান্ধীজীর শিক্ষা
 হল রাষ্ট্র ও জাতি ধর্ম নিরপেক্ষ। এই আশংক্যে প্রতিষ্ঠা
 করার চেষ্টাতেই গান্ধীজী নিজেকে আহ্বিত গিয়েছেন।
 ততীয় কথা হল—বৈশিষ্ট্য। জাতি ও জনসাধারণের সেবাই
 প্রত্যেক কংগ্রেসীর ব্রত—যাতে অগোপনে শ্রেণীহীন
 গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। মার্কস-পরাইর
 শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলে; কিন্তু কথার ও কার্যে ভারী
 গণতন্ত্রের বিরোধী। তাদের আদর্শ হল একতন্ত্র
 (dictatorship) প্রতিষ্ঠা; তাদের ভাবমতে তাদের
 মূল বা party ভিন্ন অপর কোন মূল বা party নির্বাচনে
 প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না। এটা হল গণতন্ত্রের
 মূল কথাই বিরোধী। গান্ধীজীর শিক্ষা তা নয়;
 তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক। মতে ও কাজে যাতে
 গণতন্ত্র অব্যাহত থাকে, সে মিকে ঠায় সবার ব্যগ্রত দৃষ্টি
 ছিল। চতুর্থত—আর্থিক ও বাস্তব অবস্থার দাবী স্বীকার
 করেও গান্ধী বলেছেন—মানব জীবন কেবল তা দ্বারাই
 চালিত হ'লে বিপর্যাসই আসে; মানুষ সর্বোপরি একটি
 নৈতিক প্রাণী (moral animal); কাজেই নৈতিক
 মানদণ্ড দিয়ে মানুষের সব কিছু বিচার করতে হবে।
 বাটবেলে বলা হয়েছে—Man does not live by
 bread alone—কেবল ভাত-ভটি দিয়েই মানুষ বেঁচে
 থাকে না। গান্ধীজীর এই আদর্শকে হুসাইন জাব্বার
 প্রকাশ করে অগ্নিশ্রম কংগ্রেস এভাবে বিশেষ প্রসংগনীর
 কাজ সম্পাদন করেছে।

অন্তান্ত প্রত্যাবের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল—
 ভারতের পররাষ্ট্র নীতি, ভারতবিশ্বাসের ফলে দুর্গতদের
 প্রতি, সাম্প্রদায়িকতা, প্রমিত সমতা, অর্থনৈতিক প্রত্যাব
 ও সাধারণ আচরণের সত্যতা ইত্যাদি প্রত্যাব।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বলতে গিয়ে এই প্রত্যাবে বলা
 হয়েছে যে ভারত আজ স্বাধীন সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে;

সংযুক্ত রাষ্ট্র সংঘের মধ্যে থেকে বড়টা লম্বা বিখ-সাবির
 জন্ত চেষ্টা ভারত করবে। তা ছাড়া ব্রিটেনের সঙ্গে
 ভারতের সম্পর্ক কি হবে তারও ইঙ্গিত এই প্রত্যাবে দেওয়া
 হয়েছে। পারমাণবিক মূল্য ও বিশ্ব শান্তির জন্ত,
 ব্রিটেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাধীন জাতি সমূহের সঙ্গে সংযোগ
 রাখা কর্তব্যও ভারতের আপত্তি নেই। এক কথা
 বলা যায়—যা পূর্বে ব্রিটিশ জাতি সমূহের জোমিনিয়নের
 সমবেত রাষ্ট্রগোষ্ঠী ছিল, ভারত তার মধ্যে থাকতে
 স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সম্পর্কে হস্ত অনেক
 দুর্বলিস্থিতিমূলক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হ'বে। তাই কংগ্রেসকর্মীদের
 উচিত—এই প্রত্যাবের মর্মকথা জনসাধারণের নিকট ভাল
 ক'রে ব্যাখ্যা করা।

প্রমিত ও অর্থনীতি সম্বন্ধে দুটি প্রত্যাবে প্রধানত
 ভারত সরকারের প্রমিত ও অর্থনীতির সমর্থন করা
 হয়েছে। প্রমিত সম্বন্ধে প্রত্যাবটি ভালই,—কারণ এই
 বিষয়ে ভারত সরকার অনেক আইন প্রণয়ন ক'রে
 প্রমিতদের অবস্থার উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা করেছে। প্রম-
 যন্ত্রের মতো শ্রমজীবনরায় মূল্যতা ও প্রগতিশীল
 মনোভাব নিয়ে নিজের মস্তকের কাজ চালাচ্ছেন; অগ্নিশ্রম
 অবিশেষণে তিনিই এই প্রত্যাব উত্থাপন করেন। প্রমিত
 প্রত্যাব বিষয়ে যে কথা বলতে পারলাম, অর্থনৈতিক
 কার্যক্রম সম্বন্ধে সে কথা বলতে পারলে খুসী হতাম।
 অর্থনীতি বিষয়ে ভারত সরকার আজ পর্যন্ত কোন একটা
 বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারে নি। আজও
 তাঁরা যেন অন্ধকারে হাতরাচ্ছে। অবশ্য এর মধ্যে
 কারণও আছে। দুইদিকের সমাজে অর্থনীতির এমন
 উল্টা পাশো গতি হুক হুক, যে কোন বেশই প্রায় আজ
 পর্যন্ত একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারে নি।
 তাছাড়া ভারতের অবস্থা অত্যন্ত রকমে অস্বাভাবিক।
 ভারত বিভাগ, এর পরবর্তী দালা-দালা, লক্ষ লক্ষ
 লোকের স্বাধীনতা, আশ্রয়হীন হ'য়ে খুঁবে 'বেড়ানো—
 এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বহু বছরের সঞ্চিত
 আতঙ্ক—এই সব মিলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি
 হয়েছে, যে এর মধ্য থেকে পথ বের করা খুবই কঠিন।

অবশ্য তবুও বলব—স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারের এই বিষয়ে যে সাহস ও যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আগ্রহের হওয়া উচিত ছিল, তা তারা করতে পারে নি। তাই কেবল সরকারী কার্যের তারিক ক'রে প্রস্তাব এই বিষয়ে লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। জাতীয় সরকারের মন্ত্রীরা সাহস পাচ্ছে না যে কংগ্রেসের এতদিনকার প্রচারিত স্বাধীনতা চান্দ্রকার বিশেষ চেষ্টা করে; তাদের পক্ষে অনেক আগ-পিছু ভাববার দরত প্রয়োজন আছে। কিন্তু জরুর কংগ্রেস এই বিষয়ে একটা বিশেষ নির্দেশ দিতে পারত। এই প্রস্তাবের মধ্যে একটি কথাই আছে যাতে এর কংগ্রেসী ছাপটা বন্ধ থাকে:—সুটির উৎপাদন ও আম আমদানির ইণ্ডাস্ট্রিক উৎপাদন দিতে হইবে এবং এই রকমের বি-কেন্দ্রিত উৎপাদন ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার একটা দায়ী অঙ্গ হবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হ'ল—সাধারণ আচরণে সততা রক্ষা বিষয়ে। আম জাতির সর্বত্রই আমরা দেখিছি অসততা। যুদ্ধের সময় সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনে ইংরাজ সরকার আমাদের জাতীয় চরিত্রকে ধরে দিবার ক্ষমতা ব্যাপক অসততার প্রকাশের। প্রথমে কর্মচারীদের দিবে হুক ক'রে এবং কোন কোন রাজনৈতিক বলকে এই কাজে পরে ভিড়িয়ে দেয়। আম লক্ষ্যের দৃষ্টি বলতে হয়—কংগ্রেস ক্ষমতা হাতে পেয়ে এর গতি রোধ করতে পারে নি। পুরাতন কর্মচারীদের উপর মৈনদ্দিন শাসন-কার্য খুব বেশী নির্ভর করছে; এই অসাক্ষ্যের প্রধান কারণ হ'ল তাই। আরও পরিতাপের ও লক্ষ্যের বিষয় এই যে আম বহু কংগ্রেস কর্মীও এই ব্যাপক অসততার হাত থেকে অব্যাহতি পায় নি। এই প্রস্তাবের সংশোধক (amendment) এসেছিল—সাধারণ কংগ্রেসীও ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে মন্ত্রীদেরও যে এই বিষয়ে দায়িত্ব আছে—তা উল্লেখ করে। এই সংশোধক বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে পৃথিত হয়; পরদিন আবার বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন ডেকে পণ্ডিতগণ ও সর্বাঙ্গী মন্ত্রীদের উল্লেখ আপত্তি করেন;—তাদের দ্বারা এই সংশোধক কার্যত মন্ত্রীদের উপর অনাস্থাপ্রাপক।

পত্রিকার এই স্পর্শ-কাতরতা আমরা সর্মগন করি না এবং এ কথাও মনে করি—সাধারণ আচরণে সততা রক্ষা বিষয়ে মন্ত্রীদের গাফিলতি অনেকের চেয়ে কম নয় এবং এই বিষয়ে তাদের দায়িত্ব অনেকের চেয়ে বেশী। মন্ত্রীদের আচরণ যোগ্য হয় কোথাও সমালোচনার ও সম্মেলনের উদ্দেশ্যে নয়। পৃথীত প্রস্তাবকে পাল্টে দেবার অপনীতির প্রবর্তন—এবং তা-ও এমনি বিষয়ে—নোটাই পোতন হয় নি।

জরুর কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির কতকটা বিপর্যিত বিশ্লেষণই আমরা করলাম। কংগ্রেস আম দেশের শাসন-ভার নিয়েছে, দীর্ঘ সাধনার পর বেশকিছু স্বাধীন করেছে; সেই স্বাধীনতাকে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আম কংগ্রেসের,—রাজনীতি, স্বাধীনতা, সমাজনীতি—সর্বক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করার সুযোগ সৃষ্টি করা আম কংগ্রেসের মহান দায়িত্ব। এট দায়িত্ব সূত্রভাবে পুরণ করার উপরই কংগ্রেসের প্রকৃত সফলতা নির্ভর করে। কংগ্রেসের পরিচালক, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এট সব বিষয়ে সুশীল নির্দেশ রেখে গেছেন। আম বিত-স্বাধ ও স্বাধীনতার সূত্রটি বেখে বেন আমরা বিভ্রান্ত না হই। ইংরাজের সূত্র বাধা গুলন আমরা অতিক্রম করতে পেরেছি, তখন তাদের সূত্র এই সব স্তল বালুর তাপে কেন আমরা ভগ পাব!

কংগ্রেস জয় থেকে জয়ের পথে এগিয়ে এসেছে:—জরুরে সেই জয় রান হয় নি—বরং তা আরও উচ্চল ও মহীয়ান হয়েছে।

কান্দীর যুদ্ধের অবসান

পহেলা জাহাঙ্গীরী রাত বারোটায় এক মিনিট পূবে—অর্থাৎ ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিন অবসানের এক মিনিট পূবে কান্দীর যুদ্ধের অবসান হ'য়েছে:—উত্তর পক্ষ (ভারত ও পাকিস্তান) দ্বারা দ্বার সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ পাঠিয়েছে—অস্ত্র সমরণ করতে। ব্যাপারটা সাধারণের নিকট এসেছে খুব আকর্ষক ভাবে; কিন্তু

ভিতরে ভিতরে কথা এগিয়েছিল অনেকদিন ধারং। যা
সংবাদপত্রে বের হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় যে মুক্ত-
বিরতির পর উভয়পক্ষে একটা সাময়িক শান্তি (truce)
হবে। পাকিস্তান নিষেধ সব সৈন্যবাহিনী কাম্বির থেকে
সরিয়ে আনবে; সীমান্তবাসী উপহবকারীদের ও
অ-কাম্বিরী আশ্রয়-কাম্বির বাহিনীর লোকসংখ্যে পরিবে
আনার ব্যবস্থা করবে; ভারতীয় সৈন্য শান্তি ও শৃঙ্খলা
রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ কাম্বিরে থাকবে এবং
পরে গণ-ভোটের দ্বারা কাম্বিরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণিত
হবে।

এ থেকে বুঝা যায়—সংস্কৃত আভিমানের প্রতিবিম্ব
কমলাস পূর্বে যে স্তর দিয়েছিল, মূলত সেই স্তরেই আজ
মুক্ত বিরতি চল। যদিও উভয় পাকিস্তান এতে রাজী হত,
তা হলে এই ৪৫ বার অনবরত লোকসংখ্য ও ধনসংখ্য হত
যাক—যার শেষ ভাল, তাই ভাল। তবুও যে
এতদিনে উভয় রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের গুণভূমির উদয় হয়েছে
—এতেই আমরা দুই আশ্রয় অস্তিত্ব ঘোষণা করি
আলোচনা না করে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে উভয়
রাষ্ট্রের নায়কদের চলা উচিত।

আমরা অকপটে স্বীকার করি ভারত ও বঙ্গ বিভাগকে
আমরা অকপট ভারতের ভারতবাসী বা অকপট বাংলার
বাসিনীদের পক্ষে মঙ্গলের বলে মনে করি না। হতই
ভাগ বটারা হ'ক কুগল, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির
ধারাকে অস্বীকার করা যায় না, এবং সর্বোপরি বর্তমানের
অর্থনীতিক ও অস্বীকার করা যায় না। আশ্রয়কালকার
বাঞ্ছা ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্তান—কেউই অর্থে
ও সামর্থ্যে প্রাপ্য নয় এবং তা হওয়াও খুব কঠিন।
মুঠ রাষ্ট্র এক সন্ধে না প্রাকার কলে প্রাপ্তিক প্রচলিত
অনেক অর্থ উভয়েরই আর্থিক অবস্থার কিছুটা অবনতি
ঘটেছে। তার উপর এসে মুঠেই লক্ষ লক্ষ বাস্তবতা—
যাত্রা পয়সা করে না এক রুতি প্রত্যয় এবং যাদের মৈনস্বিন
বরচের একটা মোটা অংশ উভয় রাষ্ট্রের তহবিল হ'তে
মিটে হয়। উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই এটা একটা মজা বড়
বোকা। এরও উপর ছিল কাম্বির মুক্তের প্রচলিত। ভারতের

পক্ষে এর জন্য গত বছরে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা খরচ
করতে হয়েছে।

যখন রাষ্ট্র দুইদিকের সবচেয়ে বড় শিরশীড়া হল—
ঘাটতি বাজেট, তখন এই আশ্রয়বাসী মুক্ত-মুক্ত প্রতি মাসে
৩৪ কোটি টাকা কেবল ভারত সরকারেরই খরচ হত।
পাকিস্তানের আর্থিক বোকাও এই মুক্তে কম ছিল না।
তাই এই ধার থেকে অব্যাহতি পেয়ে উভয় রাষ্ট্রই হাঁক
ছেড়ে বেচেছে। এই অর্থ দিয়ে জাতি গঠন ও আশ্রয়-
প্রার্থী বাস্তবতাগিরমণ পুনর্বাসিত কাছ অনেকটা হতে
পারবে। গত সংখ্যার কাম্বির সমস্ত আলোচনা
উপলক্ষে আমরা লিখেছি—“যে সমাধানই ধরা যাক এবং
যে ভাবেই ঐ সমাধানের পথে আমরা অগ্রসর হই না
কেন, এটা মেনে নিতেই হবে—যত সত্ত্ব সত্ত্ব মুক্তের
অবধান হওয়া সরকার। কাম্বির মুক্ত হতে হীর দিন
চলবে, ততই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মন-কম্বাকবি বাড়বে।
অথচ উভয় রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সংস্থান এমন, যে উভয়
রাষ্ট্রের মধ্যে মন-কম্বাকবি বাড়তে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা
গুরুতর পরিস্থিতি অনিবার্য হয়ে পড়বে।”

এত সত্ত্ব যে কাম্বির মুক্তের অবধান হবে, তা আমরা
তখন আশা করি নি; কিন্তু কারোমনোবাক্যে তা প্রাধান্য
করেছি। আশা করি আশ্রয় মিত্রতার পথে উভয় রাষ্ট্র
এগিয়ে যাবে।

বাঙালিসম্মিতি ও ভারতের আর্থিক অবস্থা

বছর বছর ভারতবর্ষকে বাহির থেকে বাঙালি আশ্রয়
করতে হয়। এই আশ্রয়বাসী বাঙালি মুক্ত ও পরিমাণে
বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। শুনা যাচ্ছে এ বছর
প্রায় ১৫০ কোটি টাকার বাঙালি আশ্রয়বাসী করতে
হবে। অথচ সরকারী মন্ত্রণ হতে থেকে থেকে এমন
সব বিবৃতি দেওয়া হয় যাতে লোকের মনে আশা আগে
যে বেশের বাড়ির অবস্থা উন্নতি হ'তে পারে। বাঙালি
থেকে বহু বিবরণ বের করা হয়,—কি কি ঐ মন্ত্রণ করছে
ভারত অনেক কাম্বিরী ও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু
তার পরও ঐ অসঙ্গত সত্যটা থেকে যাচ্ছে যে ভারতের

বর্তমান আর্থিক অনটনের দিনে এক 'ন' বেড়ে 'শ' কোটি টাকার বাস্তবিশেষ থেকে আমদানী করতে হচ্ছে।

এটা কেবল বাস্তব ব্যবহার কথা নয়—সেবার সমস্ত আর্থিক অবস্থার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। বিশেষ থেকে মাল কেনবার ক্ষমতা, ভারতের খুব সীমিত। গত দু'বছর সময় কিছু সফল ভারতের হিসাবে বিলাতে আছে; প্রধানত তা ভেঙ্গে আত্মবিশেষ থেকে মাল কেনা হচ্ছে। মোটের উপর আন্তর্জাতিক ব্যবসারে ভারত হল অসমর্থ—অর্থাৎ হতে টাকার মাল ভারত বিক্রয় করে, তার চেয়ে অনেক বেশী মাল ভারত বিশেষ থেকে ক্রয় করে। ঐ কমানো টাকা ভেঙ্গে তা করা হচ্ছে। এইভাবে ত বেশীদিন চলতে পারে না। অথচ ভারতের অর্থসম্পদ বাড়ানোর চক্র বহু কল কারখানার সরঞ্জাম আমদানের ক্রয় করা সরকার। ভারতের ক্রয়শক্তি বাড়তে হ'লে এখান থেকে রপ্তানী বাড়ানো সরকার। অথচ ভারতের রপ্তানী বাড়ানোর মতো ত্রা আত্ম খুব বেশী নেই। মনে রাখা সরকার অর্থও ভারতের সম্পদ বণ্ডিত ভারতের নেই। অথচ ভারত রপ্তানী করতে প্রধানত কাঁচা মাল—বিশেষ ক'রে চা, তুলা ও পাট। আত্ম পণ্ডিত ভারতে রপ্তানীর উপযুক্ত তেমন পাট নেই; তুলায় ত' আত্ম আমরা যাটতি। বাস্তব ত্রা যাটতি; অন্ত্যস্ত প্রস্তুতমণীর তৈরি মালেকও (finished goods) আমরা যাটতি। পূর্বে কিছু কাপড় ভারত থেকে রপ্তানী করা হত;—এখনও করা হয়—বহি আত্ম নিষেধের লক্ষ্য নিবারণের পর্ণাঞ্চ বস্ত্র আমদানেরই নেই। তবুও পেটের ভাত জোগাবার অন্ত পরনের কাপড় আমদানের বিক্রি করতে হয়। তা-ও, আপনানী কাপড় বাজারে আসতে শুরু করলে, তার মধ্যে দরে আমরা পেয়ে উঠব না;—তখন অবস্থা আরও সঙ্গীন হবে। ইতিমধ্যেই আপনানী কাপড় বিভিন্ন ঘেঁষে যেতে শুরু করেছে। কানেই এই বাস্তব-শত্রু আমদানী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের অবস্থা একই কঠিন ও সঙ্গীন হবার আশঙ্কা আছে।

কেবল আন্তর্জাতিক হিসাব ছাড়াও আত্মীয় অর্থনীতির

দিক হ'তেও এত টাকার খাত আমদানীতে অপব্যয় কারণ আছে। ভারত সরকার বিশেষভাবে চিহ্নিত—অর্থ-ক্ষীতির অন্ত। অর্থের দ্বারা পেতে কবে এবং ত্রাবার দ্বারা বেড়েছে। কলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার পরচ আর্থের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। এর প্রতিকারের অন্ত যে সব পণ্য সকলের স্বীকৃত, তার মধ্যে প্রধান হল—সরকারী যাটতি বাজেট বহু করা—অর্থাৎ সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয় বাড়ে বেশী না হয়, তার চেষ্টা করা। বাস্তব আমদানী ও বিক্রিতে প্রতি বছর সরকারের কয়েক কোটি টাকা লোকসান হয়। ভারতের বাস্তবশত্রুর স্থাপন নিয়ে, প্রায় সব দেশই ভারতের নিকট বাস্তবশত্রুর অন্ত অত্যন্ত চড়া হাম আঘাত করে। ঐ পাত লোকের কাছে বিক্রি করতে গিয়ে সরকারকে প্রতি বছর বেশ মোটা টাকা লোকসান খেতে হয়। কারণই সব দিক গিয়েই এই বাস্তবশত্রুর যাটতি ও বিশেষ হ'তে আমদানী ভারতের আর্থিক অবস্থার পক্ষে খুবই এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্ববাংলার বাস্তবায়নী

পশ্চিম বাংলায়, আপামে, ত্রিপুরা রাজ্যে, বিহারে ও অন্ত্যস্ত অকলে কয়েক লক্ষ লোক পূর্ব বাংলা থেকে নিষেধের বাস্তব-চিটা ছেড়ে এসেছে। প্রথমত: ভা: প্রচুর যোবের মসিহের আমলে এই বাস্তবায়নী সমস্যা স্বীকারই করা হয় নি; তঁরা বহাঘরই প্রায় বলেছেন—পশ্চিমবাংলায় পূর্ববাংলার বাস্তবায়নী বিশেষ কেউ আসে নি। ভা: রাজের মসিহের সময় মসীসজা স্বীকার কলেন—হী, কিছু লোক এসেছে। এদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক অনেক হচ্ছে,—এবং হচ্ছে। মোটের উপর বলা যায় কমপক্ষে ১৫ লক্ষ লোক এসেছে। তার মধ্যে অধিকাংশই এসেছে পশ্চিম বাংলায়।

যদিও ভারত সরকার স্বীকার করেছে যে পূর্ববাংলার বাস্তবায়নী পশ্চিম পাকিস্তানের বাস্তবায়নীদের সঙ্গে সমানভাবেই আচরিত হবে, কিছু আত্ম পণ্ডিত এদের অন্ত প্রায় কিছুই করা হয় নি। এতদিন তবুও এদের

কিছু কিছু বেশনের পাখি নেওয়া হৃত,—বর্তমানে তা-ও নাকি বন্ধ করা হয়েছে। তার ফলে বহু লোক অভাব ভুগ্ন অবস্থায় পড়েছে। এইভাবে লক্ষ লক্ষ লোককে বিনা-নুলা বা মুক্ৎ সাহায্য কোন সরকারই দীর্ঘদিন মিতে পারে না। কেবল অধিক হিলাফ জাভাও, আমরা এই দাওয়া শানের বিরোধী—কারণ তাতে সমষ্টিগতভাবে জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটে। মূল উৎপাদিত জনতা স্বভাবতই সামাজিক বন্ধন থেকে খালাস পেয়ে সামাজিক বৃদ্ধি হারিয়ে ফেলতে চায়। তার ফলে নানা প্রকার দুর্নীতি শরণার্থীদের ক্যাম্পে (camp) দেখা দেয়। জাহাজা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিগত শরণার্থীর আশ্র কোন প্রকৃতি উৎপন্ন করে না। কাজে যখন বেশে পশতাব ও ব্যবহার প্রবোধ এত অভাব, যখন সবদিক থেকেই জাতির নেতাদের আশ্রান আসছে—উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা, তখন এতগুলি লোক বসে বসে থাকে;—নিজের বা অপরের অর্থে—সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা হ'ল কোন কিছু উৎপাদন না করে এরা থাকে। জাতির অর্থনীতির মিক থেকে এটা এক বিরাট ক্ষতি।

জাত শরণার্থীদের ক্যাম্পে আসলে বসির লাগরানো নানা কারণে জাতির মিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত। কিছু তা বলে এদের পুনর্বাসিত কোন ব্যবস্থা না করা, বারা দুই তাদের মুক্ৎ সাহায্য না করা কোন ক্রমেই সম্বন্ধনযোগ্য হ'তে পারে না। যে নীতি পশ্চিম প্রাক্তিগান হতে আগত শরণার্থীদের ক্ষমতা অবলম্বন করা হয়েছে, মোটামুটি সেই নীতিই পূর্ববাংলা হইতে আগত শরণার্থীদের ক্ষমতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত ভারত গভর্নমেন্ট গ্রহণ করেছে। কাজেই তার ব্যতিক্রম স্ব'রে দুই লোকদের দুর্গতি আত্মও বাড়ানো। মোটেই সম্ভব নয়। কিছু তার চেয়ে-ও বড় কথা হল এই কয়েক লক্ষ দুই বাঙ্গালীর পুনর্বাসিতের ক্ষমতা পশ্চিম বাংলা সরকার আশ্র পক্ষীয় কিছুই করে নি। এমন কথাও আশ্র রাষ্ট্র হচ্ছে যে পশ্চিম বাংলা সরকার চায় না যে এই পূর্ববাংলার লোকেরা পশ্চিম বাংলার স্থান পায়। বর্তমান মন্ত্রীসভার মধ্যে সংশ্লিষ্ট একটি দলের এই বিষয়ে বিশেষ অধ্যাতি

প্রচারিত আছে। সেট প্রচার লোকের নিকট আশ্র লাভ করছে—পুনর্বাসিত লক্ষের বর্তমান মন্ত্রীসভার কোন-রূপ আশ্র বা চেষ্টা না দেখাতে। পূর্ববাংলা হ'তে আশ্র ভিক্ষা করতে বারা এসেছে, তারা বিভাগ দায় পড়েই এসেছে। তারা নবায় বাঙ্গালী; তাদের অনেকের ভারতের দাবীনতা আন্দোলনে কিছু কিছু অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়েছে। কংগ্রেস শাসিত পশ্চিম বাংলার বা-ভারতে তাদের কিছু দাবী আছে। সেই দাবী অগ্রাহ করা আশ্রদাতী ও হুঁসুটি প্রণোদিত।

বাংলার বাইরে বাঙ্গালীরা আশ্র বিকৃত;—বাংলার ভিতরেও যদি আশ্রদাতী বৃদ্ধির বশে আমরা পরস্পরকে হিংসা ও আঘাত করতে থাকি—তবে সমস্ত বাঙ্গালী সমাজেরই তা ক্ষতির কারণ হবে। বাংলার বর্তমান শাসনিক বিভাগকে বারা বাঙ্গালী সমাজের স্বার্থী ও সর্বতোমুখী বিভাগ বলে যেন করে, তারা বাংলার ও বাঙ্গালী সমাজের হিতার্থী নয়।

আর একটা কথাও এ গ্রন্থে বলা দরকার। বড় বাধাই আহুক না কেন পূর্ব বাংলা থেকে কিছু লোক বরাবরই এমিকে আসবে। ইতিমধ্যেই কলিকাতার ও আশ্রপাশের অঞ্চলে পূর্ব বাংলার লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি। পূর্ব বাংলার লোকেরা অধিকতর কর্মোৎসাহী (enterprising) এবং অধিকতর জেদী। সাধারণ বুদ্ধি, সংগঠনতা ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাও তারা পিছে নয়। কাজেই সহস্রভাবে এদের গ্রহণ করলে সমগ্র পশ্চিম বাংলার উন্নতির পক্ষে এরা সহায়কই হ'ত। বিশেষ ও হিংসার স্বাভাবিক যদি হুক হয়, তবে তা সমগ্র প্রবেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

সেদিন একমল আশ্রপ্রার্থী পণ্ডিত জগদীশলালের নিকট নিম্নোক্তের কথার বলতে বাজিল। এদের পিছনে দুই লোকের দুই বৃদ্ধির উদ্দেশ্যী হস্ত ছিল। তা মধ্যেও নিরাশ্র জনতার উপর কাঁচুনে বোমা (tear bomb) ও লাঠি চার্জ করা আশ্রা গহিত অস্ত্রায় মনে করি। মন্ত্রী সভার মধ্যে পূর্ব বাংলার লোক কয়েক জন আছেন। আশ্র যদি তারা পক্ষা পার হ'য়ে মনে করেন

যে পদ্ধতির ওপারের লোকদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই তাঁদের নেই, তবে তা মন্থর-পুঙ্খ কালের মতোই দেখাবে।

পরিশেষে আর একটি কথা সরকারকে ও শরণার্থীদের বলতে চাই। কলিকাতার ধারে কাছে কয়েক লক্ষ শরণার্থী আছে। সরকারী মহলের অপটুতা ও হুমুসহীনতার ফলে এদের দুঃখ-কষ্ট ভগ্যাকার হচ্ছে; তার হ্রবোগ নিচ্ছে কমুনিষ্ট, হিন্দুসভা, প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দল। মাহুম্ব বখন আশ্রয়হীন হয়, দুঃস্থ হয়, নিজের দুঃখ কষ্টের কোন প্রতিকার দেখে না—তখন অপরের উসকানীতে পড়বার মতো মতিভ্রম তার হয়। এই কয়েক লক্ষ পূর্ব বাংলার আশ্রয় প্রার্থীরা সাধারণত কংগ্রেস অহুরাণী; কিন্তু যদি সরকারী নীতির ফলে এরা কংগ্রেসে ও কংগ্রেসীসরকারের বিরুদ্ধে বিগড়ায়, তবে তা কংগ্রেসী সরকারের পক্ষে দ্বাধার ব্যাপার হবে না এবং কংগ্রেসের পক্ষেও শুভকর হবে না।

এই সব কারণে আমরা মনে করি পশ্চিম বাংলা সরকার এই সব শরণার্থীদের প্রতি যে নীতি অবলম্বন করছে, তা সর্বতোভাবে ক্ষতিকর। প্রদেশের বার্ষ, ভারত সরকারের অর্পে তাদেরই সিদ্ধান্ত অল্পমাত্রী চলবার দাবি, স্বভাষা-ভাষী লোকদের প্রতি মহাশুদ্ধি প্রদর্শন, ভারতের বৃহত্তর মঙ্গল এবং সর্বোপরি দুঃস্থ মাহুম্বের প্রতি সন্তুষ্টি আচরণ করা—এই সব দিক হ'তেই আমরা মনে করি পশ্চিম বাংলা সরকার ভুল করছে এবং অবিলম্বে এট ভুল শুধরে এই লোকদের পুনর্বাসতির ব্যবস্থা করা সরকার। পশ্চিম বাংলা যদি এই কাজ আত্মনিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে, তবে পার্শ্ববর্তী আসাম, বিহার, প্রভৃতি প্রদেশ এবং কুচবিহার প্রভৃতি রাজ্যসমূহ-ও ঐ দাবি গ্রহণ করবে। আর তারা ঐ দাবি এড়াতে পারছে, পশ্চিম বাংলার দৃষ্টান্ত দেখে এ দেখিয়ে।

দি

ইণ্ডিয়ান হ্যাণ্ডলুম ব্যাতুফ্যাকচারিং

কোম্পানী লিমিটেড

সর্বপ্রকার তাঁত, চরকা ও তকনী নির্মাণকারক
একটি প্রথম শ্রেণীর বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান।

বাংলার নির্ধাতৃত্ব নারী! মা, মা, মাগো, কে বলে
তোমায় মায়াহত্যা করে মরতে হবে! ভারতের
স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত হয়ে বাঙ্গালী যখন কাঁটার
পথে নেমে গিয়েছিল তখন সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে
দ্বিশ শতাব্দীর সভ্যতা গৌরবে গৌরবান্বিত বৈদেশিক
শত্রু আক্রমণ করবে তার মায়ের মধ্যদিকেও। ভারতের
স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনা নায়িকা হবি মা তুই স্বয়ং
মহিষমর্দিনী! তোর সোণার অঙ্গে লাগবে স্বাধীনতা
সংগ্রামের আঘাত। বিজোহী বাঙ্গালীর মুকুটমণি মা
আবার, বাঙ্গালী তোমায় চিরদিন মাথায় করে রাখবে।

অবশিষ্ট শেক্সপার বিক্রয়ের জন্য সংক্রান্ত এজেন্ট আবশ্যিক।

হেড অফিস:

এও, ক্লাইভ বিল্ডিংস

৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা ১৮১৭

টেলিগ্রাম : ইটিসি

—ইন্দিরা—

একাদশ বর্ষ

মাঘ—১৩৫৫

দশম সংখ্যা

সম্ভবামি যুগে যুগে

ঐত্থপেন্দ্রকুমার দত্ত

কথাটাকে এক যুক্তিহীন যুগের কোনো খেয়ালী ভগবানের বৈরাচারপ্রবণতার নিদর্শন হিসাবে না দেখিলেও চলে। কিন্তু না বেগিয়া উপায় থাকে না যদি সংস্কৃত 'ধর্ম' কথাটাকে ইংরেজিতে 'রিলিজিয়ন' পাড়ে। করাইয়া আমাদের বুঝিতে হয়। ইংরেজ শিক্ষায় আমরা মাহু হইয়াছি, এবং এই শিক্ষারই সঙ্গে পাটমাহি পশ্চিমের যুক্তিবাদ বা Rationalism। দুটি বস্তু আদ্যোবদেব কাছে প্রায় অবিকল্প হইয়া উঠিয়াছে। ফলে "ওক্টোষ্টোমেটে"র কথাও যদি আমরা ইংরেজিতে পাই, তাহার মধ্যে বস্তু যুক্তি খুলিলেও খুলিতে পারি, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ব্যক্ত কোনো কথায় যুক্তি থাকি অসম্ভব!

আগমনের ধর্ম কি তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমার ধর্ম কি তাহা আমি জানি না। ভারতের ধর্মোপদেষ্টা তাই বলিরাছেন, আত্মানা বিড়ি—নিজেকে জান। নিজেকে জানিয়া চলাই ধর্মপথ অহুসরণ করা। নিজেকে জানিয়া চলার এই যে ধর্মোচরণ, তাহার মাধ্যমে যেমন আছে ব্যস্তির, তেমনই আছে সমষ্টির। সমষ্টির ধর্ম ধরা পড়ে কোনো সমাজের বা জাতির নেতৃস্থানীয়দের কাছে, অথবা সমষ্টির ধর্ম তাহাদের চোখে-ধরা প'ড়ে বলিরাই তাহারা নেতৃস্থানীয় হইবার যোগ্যতা লাভ করেন।

এই যে ধর্ম, তাহার ধ্বন গ্রানি বা বিকৃতি খটে তখনই

একটা নতুন যুগের সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর সে সম্ভাবনা শকলতা লাভ করে বা শকলতার দিকে যায় কোনো ব্যক্তিরক আশ্রয় করিয়া। সেই বাস্তবিক অবজার না বলিলেও চলে, সভ্যতার আশ্রয় দিলেও না। তবু বলিবার স্বভাব হইয়া আছে আমাদের ভাবত্বাসীল্যের। একটা ভূবল যুগের সঞ্চিত এই স্বভাব এবং এট স্বভাবকে জড়াইয়া আছে অনেকখানি ভুলভ্রান্ত—হাজার ওলায় চাপা পড়িয়াছে জাতির পুঙ্খকরে, আর বাহ্যিক উপরে কমা হইয়া উঠিয়াছে বৈবে বিশ্বাস। এট বৈবে বিশ্বাসেরই কণাস্বর যে-কোনো ক্ষমতাসীলীতে বিশ্বাস। নিজে কিছু করিব না, ভগবান আসিগা করিগা নিবোন। ভগবানের স্থান এককালে লইল ইংরেজ, পরে লইয়াছে কংগ্রেস।

ব্যক্তির ধর্মেরও গ্রানি বা বিকৃতি খটে যুগ হইতে যুগান্তরে। ইতিহাসের নদী বহিয়া চলিয়াছে। সেই নদীকে জাকিয়া করি বলিরাছেন—

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
প্রাশ্চিতরে

পাড়াও বনকি',
তখনই চমকি'

উজ্জিগা উঠিব বিশ্ব পুত্র পুত্র বস্ত্রের পঙ্কজে;

পল্লুক কবচ বহির আধা
দুলতল্ উৎসবী বাধা

সবায়ের ঠেকায়ে দিয়ে ঠাড়াইবে পথে ;—

অশ্রুত পত্রমাণ্ড আপনার ভায়ে

সকলের অচল বিকারে

বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্মশূলে

কলুষের বেদনার শূলে ।

ইহাই অধর্মের অকুশল । এক যুগের ধর্ম আর এক যুগের অধর্ম । উত্তিহাস এক শূলে ঠাড়াইয়া নাই । নবীর মত সে নিমন্ত বহিরা চলিয়াছে । এই প্রবহমান ধারায় বানরের পরের স্তরে মানুষ আদিয়াছে, একবা যিনি মানিতে না চাহেন, ঠাহাকে নানাইবার আগ্রহকে প্রচণ্ড করিয়া তুলিবার প্রয়াসন নাই । তবে মানুষ এককালে জীবন্ত পুড়াইয়া খাইত, অথবা বহুজন বনভাঙের ঘাড়া খুঁধা মিটাইত, অথবা ঘরের বৈতে মাটি হইতে বীন জীবিকা আহরণ করিয়া সন্মারবাড়া নির্বাহ করিত—এসব কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ।

তখন তাহার সংখ্যা এবং বহিষ্কের শক্তি দুই-ই ছিল দুর্বল । সাধারণের এই দুর্বলতার ভিতর দুই পাশ্চাত্য প্রবল ব্যক্তি দেখা দিতে লাগিল । তাহারা গোষ্ঠিপতি সমারপতি, রাষ্ট্রপতি হইয়া উঠিল । সাধারণের দুর্বলতার সুযোগে ইহারা কেহ হইল অমিতা, কেহ হইল মহাজন, কেহ হইল লক্ষপতি । ইহাদের কথায় সাধারণ খাটে, কারণ, না খাটিলে শক্তিমানের অবরোধিতে উপবাস ছাড়া গতি থাকে না । আরের পথ বেখানে সংকীর্ণ, সেখানে শক্তিমানরা সহজেই সে পথ জুড়িয়া বসে । কথায় খাটিবার তাহাদের কথা নয়, ধনা, ভিন্ন এলাকার লোক, তাহাদের অস্ত্রের সংখ্যান—প্রধানতঃ ও প্রধানতঃ অমি—হাত করিবার ক্ষম উদ্ভাবন হইল অস্ত্রের । গোষ্ঠীর পরে গোষ্ঠী দাল হইল । অনেক ক্রীতদাসও হইল ।

এসব অমিতারী তত্ত্বের যুগের কথা । আধুনিক বহুশিল্পের যুগে সকালের দিনের দাস বা ক্রীতদাসের বংশধর হইয়াছে বেতনভূক্ত অমিতা । অনেক বংশধর অমিতা অমিতেই বাঁধা রহিয়াছে । সেখানেও দাসত্ব তাহাদের অনেক ক্ষেত্রে সমানই রহিয়াছে । অশ্রুতিক, বহুশিল্পের মালিক যে অমিতারী সবাই হইতে পারিয়াছে

তাহা নয় । অল্প অনেকও নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে এবং মালিক হইতে পারিয়াছে ।

করেক সহস্র বংশের উত্তিহাসে এই যে পরিপত্তন বা বিবর্তন খটিয়াছে, ইহা ঠিক সহজ, সরল, অবিশেষ দারাদ হয় নাই । অমিতারী আমলে সমাজে বাহাদের কর্তৃত্ব ছিল, কারণনা এবং বহুশিল্পের আমলে তাহাদেরই কর্তৃত্ব থাকিলে শিল্পের প্রসাধে বাধা পড়িত । বাধা পড়িয়াছিলও । সেখানে যুগপরিবর্তন বা বিপ্লব হইল । যুগপরিবর্তনের মত ছিলেন কখনো—সামা, মৈত্রী, স্বাধীনতা । নূতন ভিত্তিতে নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা হইল ।

অমিতারীর উপরওয়ালার রাজার এবং সঙ্গে সঙ্গে অমিতারীর ক্ষমতার হ্রাস হইল । ক্ষমতা বাড়িল শিল্পপতিদের এবং তাহাদের আশ্রিত মধ্যবিত্তের । ইহাদের পালিগামেন্টারী শাসন পৃথক পৃথক রূপে বিভিন্ন দেশে আওত চলিতেছে । সামা মৈত্রী স্বাধীনতা কিন্তু এই পালিগামেন্টারী শাসনের দিনে সকলের জীবনে ছুটিব না । অর্থের মালিক অর্থাৎ জীবিকা উৎপাদনের ব্যবসায়ী আসবাবের মালিক বাহাণ, স্বাধীনতা তাহাদেরই একচেটিয়া হইয়া রহিল । বাকীরা বেতনভূক্ত অমিতা । মালিকদের খুশির উপর তাহাদের নোংরা । বহুশক্তি হাত বাড়িতে লাগিল, খাটিবার যন্ত্রের প্রয়োজন তত কমিতে লাগিল । মালিকদের খুশির ব্যাপকতা তাই ক্রমে সংকুচিত হইয়া আসে—না আসিলে লাভের অর্থ করিয়া যায় ।

তখন কথা উঠিল, হাতে খাটিয়া বাহারা সমাজের অল্প উৎপাদন করিলে, জীবিকা উৎপাদনের ব্যবসায়ী আসবাবের তাহারাই হইবে মালিক—অমিতা ও কৃষকের হাতে বাইবে রাষ্ট্রের ও সমাজের সমস্ত কর্তৃত্ব । আর এক যুগপরিবর্তনের দিন আসিল । এই যুগপরিবর্তনের মত ছিলেন কার্লমার্ক্স, সমাজে ইহার প্রথম স্বরূপ ছুটাইয়া তুলিলেন সেনিন ।

আর এক নূতন সমাজব্যবস্থার পত্তন হইল, বাহার ফলে সমাজকর্তৃত্ব গেল সাম্প্রদায়িক ও প্রয়োজনীয় ভ্রমের উৎপাদক কৃষক ও অমিতারীর হাতে । ইহাই কমুনিস্ট

কমানিষ্ম নামে পরিচিত। কিন্তু কশিরা ছাড়া অন্য কোনো যেশে স্থায়ীভাবে রাত্রা, ভূমিগার, শিল্পপতিদের হাত হইতে ক্ষমতা পানো গেল না। অল্প বয়ঃ কমানিষ্মের সমাজগঠন পদ্ধতিতে অল্পসংখ্যক করিয়া সর্বাঙ্গিক রাষ্ট্রের পত্তন হইল। ইহাতে রাষ্ট্রপতি শিল্পপতিদের একচ্ছত্রী ক্ষমতা আরও নিখুঁত হইয়া উত্তীয়ার দিকে গেল। সাধারণ লোকের দাপখ ইহার ফলে আর অজ্ঞানবনীরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে।

না বাড়িবার কোনো হেতু নাই। মানুষ যত্নে উদ্ভাবন করিয়াছে তাহার নিজের সাহায্যের অস্ত্র, তাহার জীবিকার উপায়কে সংযমসাধ্য ও যমসংযমসংযম করিয়া তুলিবার অস্ত্র। পক্ষর গাড়ীতে ভ্রমণ বন্ধ করিয়া মানুষ আর রেল, মোটর ও হাওয়ার ইঞ্জিনেই চলাকরা করে। কিন্তু সমাজে যত মানুষের দাপ না হইয়া বর্তমান সমাজ মানুষকেই যত্নে দাপ করিয়া তুলিয়াছে। যত্নে উৎপাদন শক্তি ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। যত্নে শক্তির এই বৃদ্ধির সহিত মানুষের পাটীয়ার প্রয়োজন কমিয়া বাইতেছে। এই যত্নের মালিক আর সর্বাধার্য না হইয়া যদি লাভের মোড়ী মুষ্টিমেয় শিল্পপতিই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সেই লাভকে বাড়াইবার চেষ্টা করে। কম মানুষকে পাটাইয়া পারে, তাহারই চেষ্টা করিবে। ইহাই স্বাভাবিক। ইহার ফল লাভাইবে, অধিকাংশ মানুষ বেকার হইয়া পড়িবে। সমাজ দারিদ্র্যে ছাইয়া বাইবে।

ইহার আরও একটি দিক আছে। যত্নে শক্তি বাড়িতে বাড়িতে আণবিক শক্তিরও আবিষ্কার হইয়াছে। অল্প কক্ষনীশক্তি যে কতো প্রচণ্ড তাহা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেই কিন্তু ইহার ক্ষমতার শক্তি মানুষের কংকণ হইয়াছে কে-সমাজের অধিকাংশ মানুষ দাপ বা বেকার বা জীবিকার উপায়হীন, তাহাকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য প্রয়োজন প্রচুর সৈন্তের। এই সৈন্তেরা নিজেদের পেটের দাপে নিজেদের ক্ষুধা ভাই বা ছেলে বা স্বামী বন্ধুদের গুলি করে মালিকদের বাচাইয়া রাখিবার জন্য নিজেদের ব্যংগধরনের দাপ করিতে বা দাপ করিয়া রাখিতে ইহার আনিয়া শুনিয়াও সাহায্য করে। এত করিয়াও

যাহা হউক এত কাল কতগুলি লোকের অস্ত্র জুটিত। কিন্তু আণবিক যোদ্ধার আবিষ্কারে এই পরনের সৈনিকের প্রয়োজনও কমিয়া বাইতেছে। দুই পাঁচজনই অল্পসংখ্যে একটা গোটা সমাজকে দাপ করিয়া দিতে পারে। অর্থাৎ যেমন জীবিকার উপায়, তেমনি যুদ্ধের অস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে আর মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত। এই মুষ্টিমেয় সাহায্যের চাপ তাহারের বাঁধাইয়া বাঁচাইয়া রাখিবে, সাহায্যের চাপ না, তাহারের অস্ত্র দিয়া হউক, ভূমিক দিয়া হউক নিশেধ করিবে।

সমাজের ভিত্তি তাই আর হইতে চলিয়াছে মুষ্টিমেয়। কমানী বিশ্বে উচ্চশ্রেণীর হাত হইতে ন্যায়বিশেষ হাতে ক্ষমতা গেল। সমাজের ভিত্তি প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল। কশিষ্মে উৎপাদনকারী কক্ষশ্রমিক সমাজের মালিকানার ভরসা পাইল। কিন্তু অল্প জুড়িয়া প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে।

এ যুগের ধর্ম হওয়া উচিত ছিল প্রতিটি মানুষের হাতে ক্ষমতা দাওয়া। তাহার পরিবর্তে অত্যন্ত সংখ্যকের হাতে দাইতেছে। ইহাই ধর্মের মানি বা বিস্তারিত।

সমাচ ছিল এতকাল ব্যক্তিগতস্বত্ববাদ (individualist) সমাজের এই ব্যবস্থা আনিয়াছে তাহার প্রাচীন দারিদ্র্যের দৃশ্য হইতে—বাহার বাহার পাথরের টুকরা বা বর্ণা বা কাটি বা দাপল বা ভাঙ দিয়া জীবিকা অর্জনকরিত, আপন আপন পৃথক জীবন দাপন করিত। তাহার পরিবর্তে আর আনিয়াছে অনেক মানুষ মিলিয়া কলকারখানার অধ্যক্ষ উন্নত চাষের ক্ষেত্রে দৌড়ভাবে জীবনব্যতীর প্রথা। অল্প সমাজপতিদের ব্যবস্থায় সেই বিচ্ছিন্ন জীবনব্যতীর প্রণালীটী তুলিতেছে। দৃশ্য তাহার নিজের ধর্ম পায় নাই, অধর্মের অনুমান ঘটতেছে।

এই অধর্ম আর জীবনের ধর্মক্ষেত্রে ছাইয়া গিয়াছে। উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীকে ভিত্তি করিয়া এত দৃশ্য ধরিয়া যে ভূমি দ্যভা ও শিক্ষাদীক্ষা গড়িয়া উঠিয়াছিল, আর তাহার মূল ভিত্তাইয়া পাতা রাখিয়া পড়িতেছে। বুদ্ধিমান কিং ন করোতি পাণ্ডা? সকলেই যখন বেকার, নিরস্ত হইয়া

উল্লেখ্য, তখন আত্ম আর কেহ কাহারও নয়। যে ব্যাহকে পারে, কীকি সিদ্ধান্তের চেষ্টা করিতেছে। সকলেরই সম্মুখে অনিশ্চয়তা। কে কাহার হিলাব রাখে? কে কাহার কথা ভাবে? চোরাবাড়ার, গোপনসকল, উৎকোচগ্রহণ—এ সব আত্ম আর ব্যক্তি বিশেষের আকস্মিক বিকৃতি নয়, অথবা স্বেচ্ছায় বিগত হুঁদের অন্বায়ী ফলও নয়।

হুঁদের কালে ব্যক্তিগত উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়। বিগত হুঁদে বৃদ্ধি পাটগাছে অসম্ভব রূপে। অথচ এই বর্ধিত শক্তির সঙ্গে সমাজের মাল্যবের প্রয়োজনের সামঞ্জস্য খটাইবার কোনো চেষ্টা হয় নাই—সে চেষ্টা করিলে সমাজপতিদের লাভের অর্থে হাত পড়ে। কলে যত্নের এই বর্ধিত শক্তি কোটি কোটি মাল্যবকে কর্তন, বীণ পরিভ্রমণ পরিণত করিতে চলিরাছে। মাল্যবের নিজের কাছেই নিজের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। আত্ম দত্ত অজ্ঞান, ভুলুম, মিথ্যা, হিংসা, হানাহানি, চৌকুরি, অপরাধ-প্রবণতা দেখা দিয়াছে, তাহা সমাজপতিদেরই লাভের লোভের সৃষ্টি—হুঁদের অধর্ষ, সর্বব্যাপী অধর্ষের অন্বাহান।

আত্মের এবং মানবজগতের এই ভবিষ্যৎ যেন হুঁদের মাল্যব মহাস্বা গাছীর অন্তরে ছায়া কেলিরাছিল বহু বৎসর পূর্বে। তিনি তাঁহার স্বরাজের কল্পনা করিয়াছিলেন যেন এই ভবিষ্যৎকেই সূত্রের সম্মুখে রাখিবে।

মার্কস চারিখাটিলেন সাম্যবাদী সমাজ পুঁজিবাদী বা capitalist সমাজের নেতি (negation) হিসাবে। ইতিমধ্যে ত্র্যাপিষ্ট সমাজের সর্বাত্মক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া দুই বিরোধী প্রকার পারস্পরিক অগ্রসরণ (interpenetration of opposites) ঘটনা গেল। এখন সাম্যবাদী সমাজেরও নেতি (negation of negation) হিসাবে একমাত্র গাছীজির সর্বোচ্চ সমাজের ভিত্তিই এক উচ্চতর সম্ভব সম্ভব।

গাছীজির সর্বোচ্চ সমাজে সকলের প্রাথমিক প্রাচুর্য-সূত্রের কল্পনা আছে, সেখানে কেহ কাহারও প্রথমত্ব খনে লোভ করিবে না (যা পুণ: কল্পবিধন)। সকলের

প্রাথমিক প্রাচুর্যের সৃষ্টি, সেখানে জীবিকা অর্জনের উপায়ানও সকলের যৌথ সম্পদ, কাষেই লোভেরও অবকাশ কম। যৌথ সম্পদের ব্যবহার ও কল্যাণের ভিত্তিও ব্যক্তিগত স্বাভাব্য ও মর্যাদা অঙ্গুর থাকিবে বলিয়া পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী সমাজ হইতে সর্বোচ্চ সমাজে যে পার্থক্য ঘটবে সে পার্থক্য গুণগত পার্থক্য (qualitative change)। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে প্রয়োজনীয় উৎপাদনের বেধন এবং তাহার ফলে মাল্যবের যে চরিত্র পক্ষিয়া উঠে, গাছীজির কল্পিত সমাজে এই উভয়েরই আমূল পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য—যে পরিবর্তনকে মার্কসের ভাষ্যলেক্টিক্সে change of quantity into quality বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

কিন্তু এই সমাজ প্রতিষ্ঠার যে সম্ভাব্যতা, সেখানে মূলকথা অহিংসা। কারণ, হিংসার পন্থা যে বিঘ্ন, তাহার ভিতর অনেকেখানি স্থান ছুঁড়িয়া থাকে আকস্মিকতা বা বৈষ। কিন্তু যে ব্যক্তি-স্বাভাব্য মূলক স্বজনপদ্ধতি ও সমাজ প্রায় মানবেতিহাসের আদি হইতেই প্রচলিত হইয়া আছে, তাহার অপসারণে আকস্মিকতার কোনো স্থান থাকিতে পারে না। হিংসার আয়োজন সকলও হইতে পারে, বিফলও হইতে পারে। আরও বিশেষত: আত্ম এই আণবিক বোম্বার হুঁদে হিংসার পন্থা বিঘ্নের বিকলতার সম্ভাবনাই অধিক।

গাছীজির পুনঃপুনঃ বলিরাছেন, তাঁহার বিঘ্নে বিকলতার কোনো স্থান নাই। কারণ, তাঁহার বিঘ্ন নির্ভর করিবে সকল মাল্যবের জাগ্রত চেতনার উপর। এই চেতনার আগরণের পন্থা ব্যবহার বিকলতা দেখা দিতে পারে—যেমন ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামেও দেখা দিয়াছে। কিন্তু আত্ম মাল্যবকে শিথিতে হইতেছে নিম্নত “হুঁদের হায়ে ব’গে।” কাষেই চেতনা জাগিবেই এবং এ বিঘ্নের বিকলতাও অর্থ মানবেতিহাসের শেষ।

এ বিঘ্নে চেতনা আগরণের ক্ষমতাও হিংসা যে মানব সমাজকে কোন্ সর্বনাশের দিকে টানিয়া লইতে পারে তাহাও ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। চেতনার

আগরনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ব্যক্তি যেরূপে তারার প্রতিবেশী, হয়তো বা তারার আত্মীয় পরিজনই, তারার পরিপূর্ণ মৃত্তির পথে কটক, তারার অশ্রুতমের হীনতা দৈত্যের মূল। এইরূপ অসম্পূর্ণ আগরনের স্তরে হিংসার পক্ষা মাছবের জাতকে কোথায় লইয়া বাইতে পারে, তারার কিকিং নখরা গুত দুই তিন বৎসরের মধ্যে তারতবর্ষে আমরা হেঁপড়াছি। যেখিয়া জাতির তবিত্ত্ব সম্পর্কে অনেক নিরাশ হইয়া উঠিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির তবিত্ত্ব সম্পর্কেও।

এই চেতনার আগরনে দ্যাক্টরির পক্ষা তাই বুনিয়া দি। ক খ পড়াইয়া, বার বৎসর বরিয়া ব্যাকরণ দুখত করাইয়া মাতৃশিক্ষা শিক্ষা দিবার দিন আশ আশ নাট। আশ বুনিয়া চলিতে মাছবের অনেক মিনিব শিববার প্রয়োজন আছে। মতবুত বুনিয়াটা অত্যন্ত কাছাকাছি আশিয়া পড়িয়াছে, আর সে বুনিয়াটাও বর্তমান যুগে অত্যন্ত ক্ষততালে গতিশীল বুনিয়া। ইহার সহিত পরিচিতি হইতে হইবে, আর পরিচিতি হইতে হইলে জুগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, বাসাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, বিভিন্ন সমাজের চিত্তাধারা—ইহার অনেক কিছু জানা চাই। এই সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত নিজেই জানা চাই—আজ্ঞানং বিত্তি। না জানিলে প্রতি সঙ্গে চোক্তর বাটব, সমাজে চলিবার অযোগ্য, জীবনযুদ্ধের অযোগ্য হইয়া থাকিব।

বুনিয়া দি শিক্ষাপদ্ধতিতে তাই কল্পনা,—যে কোনো এক বা একাধিক শিল্প শিখাইতে শিখাইতে সেই শিল্পকে উপলব্ধ করিয়া শিক্ষক মুখে মুখে অনেক কিছু শিক্ষা দিবেন। এইরকম একটি শিল্প শিববারও প্রয়োজন আছে আগামী সমাজ-প্রতিষ্ঠার বিপ্লবে। আজ তাহার কলে কাজ করে, অথবা অন্ত কোনো ভাবে কোনো মানিকের প্রতিষ্ঠানে নিজের জীবিকা অর্জন করে, বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জীবিকা অর্জনের আপ্য হুয়ানা। তাই তাহাকে প্রয়োজনে নিজের পায়ে ঠাড়াইতে হইবে। দীর্ঘদিন ধরিয়া যে বিপ্লবের কথ

চলিতে থাকিবে, তাহার ভিত্তর অন্ততঃ মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাবে কেত ভাঙিয়া না পড়ে, তাহারই উপাশ হিসাবে একটি বা একাধিক শিল্প শিক্ষা বুনিয়া দি শিক্ষার অন্ততর লক্ষ্য।

ক্রমপরিবর্তনশীল সমাজের ভিত্তিকে পাঠপাথরে বাধিয়া বাধিয়া অচলাবস্তন করিয়া রাখিতে চাহিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রামের ভিত্তর নিচা এমনি করিয়া দাবলদী, গচেতন, সাহসে দুগ্ধ মাতৃশ গড়িয়া উঠিবে। তাহার কাহারও দানস্ব নিজেরাও জানিবে না, এবং অপরকে দান করিতে বা দান করিয়া রাখিতে সাহায্যও করিবে না। কমতাগালীর মেওয়া অন্ত ধরিবে না, তাহাদের অন্ত তৈজ্য করিতে সাহায্যও করিবে না। এমনি করিয়া কবিশ্বেরে, কারখানার ও অপরকার কর্মীদের পরস্পরের সহযোগিতায় যে সমাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহাতে অর্থের মালিকদের হাতে সমাজের মালিকানা থাকিবে না। যেজ্ঞাৎ পরস্পরের সাহচর্যে যেখানে সমাজের অন্ত প্রাচুর্য সৃষ্টি হইবে, সেখানে হিংসার প্রভীক্ ট্রেটের অস্থিৎও বাহলা হইয়া উঠিবে এবং আপনার অপ্রয়োজনই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে

বে-সমাজ, সমাজের মাতৃশ, তার বিধি-বিধান,

কাহন, শাহ, মত, বিশ্বাস, সংহিতা, আচার, অত্যাশন—সব কিছুই—

অবিচ্ছিন্ন অবিরল

চলে নিরশি

তাহাকে যদি “সত্যের অচল বিপার” কোথায়ও বাধিয়া রাখিবার প্রয়াস চলে, তখনই সমাজ-জীবনের সর্বশিক্ষে ধর্মের রানি উপস্থিত হই, সমাজের সর্বাত্ম জুড়িয়া অর্থের অভাবান যেথা গের ৮ আশুৎ নয় যে সমাজের এমনই সত্তাবানার চূড়ায় পরিপত্তির তালে আমাদের মধ্যে সেই মাতৃশকে পাইয়াছিলাম, যিনি জীবনের প্রতি সিকের দুকৃতের বিশেষের মত মানবজাতিকে শিক্ষা দিতাছেন। আর তাহার জীবন ও মৃত্যুর ভিত্তর দিয়া দিয়াছেন not peace but a sword.

গান্ধীজীর মৃত্যুর শিক্ষা

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

গান্ধীজী ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের নেতা ছিলেন; নিঃসংশয় বলা যায় নব ভারতের তিনি জনস্বামী :— ভারতীয় জাতীয়তা বোধের তিনি স্রষ্টা। কিন্তু এটাই তাঁর জীবনের চরম কথা নয়—যা এই তাঁর চরম পরিচয় নয়। তিনি একটা নতুন সামাজিক আদর্শ দিয়ে গেছেন; তিনি একটা নতুন অর্থনীতির সীকা দিয়ে গেছেন; তিনি একটা নতুন নৈতিক ভিত্তি ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের



অন্ত বেখে গেছেন। কিন্তু এরপরও তাঁর জীবনের আর একটা অধ্যায় আছে—যে অধ্যায়ের কেবল দৃশ্যনা তিনি ক'রে গেছেন—যার পরিসমাপ্তি দূরের কথা বাক্যে পরিগতির পথে নেবার-ও হৃৎস্পর্শ তাঁর জীবনে ঘটেনি।

ভারতের এই যে নতুন রাষ্ট্রীয় বোধ—এর ভিত্তি কি? ভারত এক বিশিষ্ট দেশ;—জাতির ধর্ম পরিষ্কৃত, রক্তের মিশ্রণে এর বৈচিত্র্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতের ভৌগোলিক একাধিক (integrity) অপরদিকে সকলের উপরে ছাপিয়ে ওঠে। প্রকৃতি ভারতকে একটা মহাদেশ ক'রে সৃষ্টি করেছে—যার নানা বৈচিত্র্যের

সমাবেশ দৃষ্টিও একাধিক সংচেতন প্রকট হ'য়ে ওঠে। ভারতের এই ভৌগোলিক একাধিকতার ফলেই এর সাংস্কৃতিকগত ঐক্য ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। রাসের দাক্ষিণ্যে, অতিথানে, স্থিতিশীলের অধমেষ বজ্রের অধ নিয়ে নরুল ও মরুদেশের দিক-বিশিষ্ট দাতাঘাত, কং, জরামণ্ড প্রভৃতির হত্যা সবই ভারতের সাংস্কৃতিকগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার অভিযান। এই প্রচেষ্টার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন— সব চেয়ে অগ্রদূত। এক কথায় বলা যায়—বোধ হয় তাঁরই মনে ভারতের এই সাংস্কৃতিক ঐক্য সংগ্রামের বিশেষভাবে সক্রিয় হয়।

এরপর ঐতিহাসিক দৃষ্টেও আমরা দেখতে পাই হুন্দর, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম প্রবর্তক ও সাংস্কারকগণ সবাই চেষ্টা করেছেন গোটা ভারতবর্ষকে একই সাংস্কৃতিক সংস্কার আনতে। সমগ্র ভারতবর্ষ একই সাম্প্রদায়িক সংস্থা বা উনিত (unit) পূর্বে কখনও হয়নি; কিন্তু সমগ্র দেশটা একই সাংস্কৃতিক সংস্থা বরাবরই ছিল। বৃক্সের নিজে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিচালনা করে সম্পূর্ণ প্রচার করতে পারেন নি; কিন্তু তাঁর অল্পবিস্তীর্ণ দক্ষিণ ভারত এবং সিংহল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এনেছিলেন। সম্রাট অশোক সমগ্রভারতে তাঁর সাম্রাজ্যিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি; কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব তিনি বিস্তার করেছিলেন ভারতের সীমা পেরিয়ে সিংহল পর্যন্ত। অগত্যা বিজ্ঞপণ্ডিত অতিক্রম যেমন এক সাংস্কৃতিক দিগবিজয় অভিযান, ঠিক তেমনি মহেশ ও সাধবিজয়ার সিংহলে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বাঙলা-ও ভারতের সাংস্কৃতিক দিগ-বিজয়ের অভিযান।

এর পর আমরা পাই আচার্য শঙ্করকে। দক্ষিণ ভারতের এক কোণে জন্মগ্রহণ ক'রে মাত্র ৩২ বৎসর আত্মজ্ঞানের মধ্যে সমগ্র ভারত তিনি পরিচালনা ক'রেছিলেন এবং ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেন। দক্ষিণে রামেশ্বর, পূর্বে পুরি, পশ্চিমে ব্যারক ও উত্তরে হরিদ্বারে ধর্মস্থান হিসাবে চারটি মঠ স্থাপন ক'রে আচার্য শঙ্কর ভারতের কৃষ্ণগত একাধিকতারই শাস্তা স্থাপন করে যান। আরও পরে আসেন চৈতন্যদেব। তিনিও



ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন ভারতের সাংস্কৃতিক একাদমতার অহুত্ব থেকে।

মুগলমান আমলেও সাম্রাজ্যিক বিজয় অভিদানেব মিক দিয়ে চেষ্টা হত ভারতের একাদমতকে প্রতিষ্ঠা করার। কিন্তু এই চেষ্টা বিশেষ ভাবে বেধতে পাই—ইংরাজ আমলে। তাদের এই চেষ্টার উদ্ভব হয়—তাদের রাজ-বিজ্ঞার ও তত্ক্ষনিত ব্যবহারিক সুবিধালাভের আকাংখা থেকে। ইংরাজী শিক্ষা ও বাতায়ানের আধুনিক ব্যবস্থা এই একাধোথকে আরও ব্যাপক ও সহজ করে বেধ। এর পর এল রাজনৈতিক জাগরণ। সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক সংস্থা হ'ল ভারতীয় জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেস। স্বাধীনতার একই নিগড় ও একই দুঃখ ও লাগনা এবং ঐ থেকে মুক্তিলাভের সম-প্রদানে একই কংগ্রেসের নেতৃত্ব—এই একাধোথকে সাধারণ মানুষের মনেও প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এই বোধ মতই প্রবল হ'তে লাগল ইংরাজ ততই যা মেয়ে মেয়ে একে ভাঙতে লাগল। মহা-ভারতের ভৌগোলিক বোধে প্রধান আঘাত এল তত্ক্ষন থেকে ছিন্ন করায। অপরমিকে প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক বোধ আগিড়ে মূল ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক একাদমতার আঘাত হানা হতে লাগল। গান্ধার, মজ, পুরুষপুর একদিন ভারতের অঙ্গ ছিল; পরে তা ভারত থেকে বেরিয়ে যায়। ইংরাজ আমলে তার কতকটা আবার ভারতের অঙ্গীভূত হয়। আবার ইংরাজই এই একাধকে ভাঙবার প্রচেষ্টার মন দিল। স্বাধীনতা আন্দোলন বড় ব্যাপক ও ভীষণ হ'তে লাগল, ইংরাজের ঐ সাম্রাজ্যিক দুইবুধি ততই ঐ সিকে খুঁকতে লাগল। ১৯০৮ সালে মলি-মিটে। সংস্কারের সময় যা ছিল সামান্য অহুত্ব, ১৯২০ সালের মটেগো-চেমফোর্ড সংস্কারে তা হয়ে উঠল একটি চারা গাছ। তার পর ১৯৩৫ সালের হোর-উইলিংডন সংস্কারে তা হ'ল একটি বলিষ্ঠ বৃক্ষ; এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ সালে ঐ বৃক্ষ একটি বিষময় মহীকূহে পরিণত হ'ল।

কন্যাবিজ্ঞার নেতৃত্বে মুগলিম লীগ হাবী তুলল—হিন্দু ও মুগলমান ছুটা তির জাতি এবং ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করতে হবে হিন্দু ও মুগলমানের সংখ্যাধিক্যানুসারে।

এই হল পাতিধান দাবীর হল কথা। প্রথমে টে দাবীকে লোকে উপভাসের সঙ্গে নির্যেচ; কিন্তু কতকটা ইংরাজ সরকারের উদ্দেশ্যেতে মুগলমানদের সত্যিকার অভিযোগের ফলে, প্রায় সমগ্র মুগলমান সমাজে



গান্ধী

এই দাবী সমর্থন করল। ধর্মের ভিত্তিতে জাতির বিভাগ শরিতই ভারতের একাধত্বকে (integrity) আঘাত করল। ভারতীয় মহার মৌলিক অহুত্বের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের প্রতিরোধে ঠাড়াগেল গান্ধীজী। অথচ

কেল থেকে বের হ'য়েই তিনি জিয়ার সঙ্গে আলোচনার পীকার করলেন মুসলমানদের উজ্জ্বল বিরুদ্ধে জোর ক'রে তিনি তাহের ভারতের মধ্যে রাখার বিরোধী তিনি বলেন নিলেন—যদি মুসলমান-অধ্যুষিত মকলের অধিবাসীরা পারিধান দাবী করে, তবে তাহের সেই দাবী পীকার করতেই হবে। কিন্তু জিয়ার লাহেব এতে ভুট্ট হলেন না।

কিন্তু হু'বছর পর প্রায় এই প্রস্তাবই যখন ইংল্যান্ডের তরফ থেকে এসে—তখন জনাব জিয়ার প্রহণ করতে বিধাবোধ করলেন না। কংগ্রেস ও লীগ ইন্টারজের প্রহণ সিদ্ধান্ত প্রহণ করল। গান্ধীজী এই ভারত বিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দৃঢ় ছিলেন; ১৯৪৫ সালে তিনি জিয়ার্তীঃ যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ও বছর পর ইংল্যান্ড প্রায় সেই প্রস্তাবই বিল। তবুও কেন এর বিরুদ্ধে দৃঢ় ছিলেন? প্রধান কারণ হল এই যে এটা হল বিশেষী শাসনতন্ত্রের বেহুতা বিধান; আর তাঁর প্রস্তাব ছিল—নিরপেক্ষের বেহুতাকৃত ব্যবস্থা। তাঁর প্রস্তাবে আনুশঙ্গিক হিংসা, বেহ, সন্বেহ ও অধিধান আসত না—যা এই ভারত বিভাগে এসেছে এবং আসবে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। গান্ধীজী এর সম্পূর্ণ বিরোধী হ'য়েও, নিঃ ভারত কংগ্রেস কনিষ্ঠিত হুপারিণ করলেন বাতে এই প্রস্তাব তথায় পুতীত হয়। কিন্তু এইভাবে ভারতকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে তাঁর যে মৌলিক আগন্তি ছিল, তা হয়ে গেল এবং ভারত বিভাগকে কার্যতঃ অস্বীকার করেই তিনি চলতে মনস্থ করলেন। এ করার অর্থ এই নয় যে জোর ক'রে তিনি এই বিভাগ গ্রহিত ক'রে দিয়েন; তাঁর কংগ্রেস ও লক্ষ্যের অর্থ হল এই—যে পারাম্পরিক সন্বেহ ও বিবেহ থেকে ভারত বিভাগের প্রয়োজন হ'য়েছে, সেই পারাম্পরিক সন্বেহ ও বিবেহ দূর করতে পারলেই ভারত বিভাগের কোন প্রয়োজন আর থাকবে না। গান্ধীজীর কথা হ'ল—এ পারাম্পরিক ইধা ও বিবেহ, সন্বেহ ও অধিধান দূর হ'লে বাক্ত শাসনিক (administrative) বিভাগ থাকলেও, জাতির সামুদ্রিক ঐক্য ব্যাহত হবে না।

যখন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট রাতে হুপুরে স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র উৎসবের হাত থেকে শাসনকার গ্রহণের উৎসবের ব্যত। যখন শাসন-পরিষদের সভারা ঠিক করল জাতির জনক গান্ধীজীকে পরিষর দৃঢ় এনে জাতির প্রধা ও ভ্রুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হবে, তখন গান্ধীজী বললেন— তাঁর উৎসবের দিন তখনও আসে নি; ঐ যেনবাণী উৎসবকে এড়িয়ে বাবাহু জ্ঞত তিনি বিদ্রো থেকে হুবে দূরে থাকেন। সনরনতী আশ্রয় থেকে সনর করিয়ে বেওয়া হ'ল—তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত তিনি ঐ আশ্রয়ে কিয়ে থাকেন না। আশ্রয় স্বাধীন ভারতে সনরনতী আশ্রয় করছে তার প্রতিজ্ঞা গান্ধীকে তথায় কিয়ে যাওয়ার জ্ঞত। তিনি অব্যব বিলেন—আশ্রয় সনরনতী তাঁর কাছ থেকে বহু দূরে; নোয়াখালী বহা নিকটে। স্বাধীনতা উৎসবকে বর্জন ক'রে বিদ্রো ত্যাগ ক'রে তিনি চললেন—নোয়াখালীর পথে। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম ও শেষতম ব্রত হ'ল—ভারতের একাধিককে প্রতিজ্ঞা করা;—ধর্মবিবেশের মহাজাতি স্থাপন করা।

ব্যক্তিগত আলোচনায় তিনি বলেছেন—জীবনের শেষ কষ্টা দিন তিনি নোয়াখালী ও পূর্ববাংলায়ই বাস করবেন এবং ওখানেই বেহত্যাগ করবেন। আমতা ব্যখিত হ'য়ে মনে করিয়ে দিয়েছি—তিনি শোয়াশ বছর বাচবার লক্ষ্য করেছেন; কানেই এখন বেহত্যাগ করার কথা বলেন কি ক'রে? উত্তর দিয়েছেন—“আমি ত বাচতে চাই—১২ বছর কেন—আরও বেশী; কিন্তু সবাই মিলে যদি আমাকে বাচতে না বেহ, কি ক'রে আমি বাচবো?” লকলের সব অল্পবোধ উপেক্ষা ক'রে তাই তিনি উৎসবের ১০১২ দিন পূর্বে দাখা করলেন কলিকাতার দিকে;—সেখান থেকে তিনি নোয়াখালী যাবেন।

নোয়াখালী কেন? মুসলিম লীগ দাবী ভুলেছে, ভারত এক বেণ নয়, ভারতের লোক এক জাতি নয়। লীগের এই দাবী বিশেষ ভাবে ছুটে উঠেছিল নোয়াখালীতে;—তাই ঐ মতবাদের নৃতি বা প্রতীক দ্বিনাবে তিনি নোয়াখালীকেই বেছে নিলেন সেখান

থেকে এর প্রতিবাদ শুরু করা যায়। গান্ধীজী দাবী করলেন ভারত এক অগণ দেশ; ভারতবাসীরা এক জাতি এই সাধনার তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি নিয়োজিত করলেন—এই হল তাঁর সম্মান। সাধারণ লোক মনে করে গান্ধীজী বয়স পূর্বেই মারা যাবেন বলে আশেপাশের লোকের দাবী যেমন নিয়ে রাখতেন তেমন করেছিলেন; ভারত বঞ্চিত হবার ভয় তিনেই দায়ী। তারা কুলে যায় গান্ধী ছিলেন পূর্ণ মনোবাহক। মুসলমান সমাজের বা মুসলমান অধিবাসীদের অধিবাসীদের জনমতকে তিনি স্বীকার করলেন—এটাই তাঁর ধর্ম ও নীতি। তাদের এই অধিকার স্বীকার করে ভারতের একাত্তর বছর রাগা দায় এবং তা বন্ধায় রাখার গুটাই হ'ল প্রকৃষ্ট পন্থা। এখানে ইতিহাসের একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বিপ্লবের পূর্বেই লেনিন প্রচার করছিলেন— সাম্রাজ্যিক ক্রিয়াকার অধিকৃত দেশসমূহ ইচ্ছা করলে তাদের পৃথক জাতীয় রাষ্ট্র গড়তে পারবে এবং ক্রিয়াকার হ'তে আলাদা হ'তে পারবে। অর্থাৎ কমানিষ্ট লেনিনের রাজ-নৈতিক মত হ'ল—সাম্রাজ্যিক ভিত্তিতে বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপন করা। কার্যতঃ ক্রম বিপ্লবের পর ক্রমশঃ দেশ-সমূহ, যথা এশিয়ার দেশসমূহ, উক্রেন, শ্বেত-ক্রিয়াকার (বা বেসো-ক্রিয়াকার), ফিনল্যান্ড, বলটিক দেশসমূহ—সবই ক্রিয়াকার থেকে পৃথক হ'ল। কিন্তু তাতে এটা বুঝতে হবে না যে লেনিন সাম্রাজ্যিক ভিত্তিতে বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপনের আদর্শ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি স্বীকার করে নিলেন যে এই সব দেশের অধিবাসীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার আছে এবং সেই অধিকার অনুযায়ী তারা পৃথক জাতীয় রাষ্ট্র গড়তে পারে। কিন্তু তিনি এ-ও বিশ্বাস করতেন যে এখন একটা অবস্থা আসতে পারে এবং আসবে—যখন এই সব জাতি থেকে ক্রিয়াকার সঙ্গে মিলিত হ'বে এক নতুন সমাজ ও নতুন রাষ্ট্র গড়তে সক্ষম হবে। সেই বিশ্বাস নিয়েই তিনি এই সব দেশের প্রতি সহায়তামূলক মনোভাব ও কর্মসম্পত্তি গ্রহণ করেন। ফলে ১৯১৭ বছরের মধ্যেই ফিনল্যান্ড ও

বলটিকের অতিক্রম কণ্ঠ দেশ ভিন্ন, আর দাবী থেকে ক্রিয়াকার সঙ্গে মিলিত হ'ল।

অন্য জিহাদ নিম্নে গান্ধীজী বা স্বীকার করেছিলেন, তা লেনিনের এই সব দেশসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাদিকার স্বীকারেরই অন্তর্গত। এবং পরে যে কর্মসম্পত্তি ও যে মনোভাব নিয়ে তিনি পূর্ব বাংলার এসেছিলেন, তা-ও লেনিনের পরবর্তী মনোভাব ও কর্মসম্পত্তিরই অন্তর্গত।

লীগের দাবী হ'ল যাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও জাতি গড়তে হবে; গান্ধীজী দাবী হল, না—রাষ্ট্র ও জাতি—ধর্ম নিরপেক্ষ;—আস্তির মূলে রয়েছে সংস্কৃতির ঐক্য এবং রাষ্ট্রের মূলে রয়েছে সামাজিক ও আর্থিক বিচার এবং এই উভয়ের মূলে রয়েছে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক একত্ববোধ। মিশ্রজাতি বা composite nation—এই হ'ল বর্তমানের রাষ্ট্রদলতার ভিত্তি। ধর্মের, বক্তার, কৃষির এবং চরিত্র ভাষার ও সংস্কৃতির মধ্যে আভ্যন্তরীণ সব জাতি গড়ে উঠেছে। ভারতের ইতিহাসেই এর সব চেয়ে প্রকট উদাহরণ পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই এখানে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আরও অন্যান্য সংস্কৃতির ভিত্তির দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি। আভ্যন্তরীণ মনোভাব বা শিব—কতখানি অনাথ ও কতখানি আর্থ সে হ'ল বিচার না করেও, মোটা-মোটা বলা যায় উভয় সংস্কৃতির বিশেষত্বই সৃষ্টি হ'ল নীলকণ্ঠ মহাদেবের দ্বারা এক দিকে শিব—মঙ্গলের দেবতা, অপরদিকে নটরাজ—ধর্মের তাওব দেবতা। এক দিনের আরাধ্য অহং, পরে হ'লে ঈশ্বর ধর্ম বিরোধী আভ্যন্তরীণ অহং;—হয় ও অহং কেবল নাম ঠিক রেখে পরস্পর ধান ও পর্বাধ পরিবর্তন করে নিল।

পারসিক রাণী সেমিরামিস (Semiramis) হ'তে শুরু করে ক্রাইসোপেট্রিস পর্যন্ত কত এল—কত গেল। ভারত কাউকে প্রত্যাখ্যান করে নি বা কাকুর কাছে নিজেকে জুঁবিবে দেখে নি—যেমন প্রাচীন গ্রীক বা রোম করেছে। ভারত নিয়েছে ও দিয়েছে সমান ভাবে। আর হঠাৎ হাত জুড়িয়ে তার ভিত্তি পাঁচাবে—এটা ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গোদারিত্ব নয়। ভারতের

এই যে সনাতন প্রথা—যা নানক, কবির, লাহু, চৈতন্য প্রভৃতির মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল—তা নিম্নেই গাছীকী বলেন বাংলায়—ভারত হ'তে বিজিত, বাংলা হ'তে বিভক্ত পূর্ব বাংলায় বাবার ভক্ত। তিনি, আশা করতেন হিংসা বিবেকের এই যে ঘৃণীভক্ত—এর গতি কিভাবে বাংলায়। তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলাকে এই উন্নততার হাত থেকে বাঁচাতে পারলে, সমগ্র ভারতকেই বাঁচানো সম্ভব হবে। তিনি বলতেন—বাংলা যদি তাঁর এই বাণী প্রদান করে, তবে দু'দিন পর সমগ্র ভারত তা গ্রহণ করবে। কলিযুগে এসে স্বাধীনতা বিপক্ষে তিনি যে লাকলা লাভ করলেন, তাতে বাংলার প্রতি তাঁর আস্থা এবং বিশ্বাসের তর্ক পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাস বেড়ে গেল।

লেনিন পথ নিয়েছিলেন—সামাজিকত্বের ভিতর দিয়ে, গাছীকী পথ নিলেন নূতন গণতন্ত্রের ভিতর দিয়ে। তিনি জানতেন—নৃনলমানদের সত্যিকার অভিযোগ আছে—আর্থিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত। এই অভিযোগ দূর করতে হবে—সেবা দিয়ে, নূতন সমাজ গঠন করে, ব্যক্তির আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করে।

গাছীকীর অকলুষ পথে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। তাঁর নিষিদ্ধ আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র স্থাপনের অধিকার আজ আমাদের হাতে এসেছে। এই অধিকার কতটা ব্যয়ে লাগবে, তা নির্ভর করে আমাদের কর্তব্য ও চিন্তার সত্যতার উপর। কিন্তু তাঁর জীবনের এই

যে শেষ ব্রত বা উদ্দেশ্যপন করতে গিয়ে তিনি জীবন আহতি মিলেন তা এখনও জাতি যেমন আশ্চর্যকর সঙ্গ্রে গ্রহণ করে নি। তিনি জানতেন তাঁর জীবন বিপন্ন; একবার তাঁর জীবনের উপর আক্রমণ হ'ল; আবারও হ'তে পারে। সব চেয়েও, তিনি কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা; গ্রহণের অসুস্থতি মিলেন না—হয়ত বুঝেছিলেন—কর্ম দিয়ে বা বাক্য দিয়ে বা শিকা দেবার, তা তিনি দিয়েছেন এবং জাতি তা গ্রহণও করেছে। কিন্তু তাঁর এই নূতন শিকার অসুস্থল মনো-কুহি আজ জাতির নেই। কাম ও, কমা দিয়ে এই শিকাকে গ্রহণযোগ্য করার সমর্থও তাঁর নেই। জাতি তখন আত্মঘাতী কলহে পরম্পরকে নিষ্ঠুর আঘাত দানছে। তাই তিনি ঠিক করলেন উল্টো জাতির এই দুই কলহপরায়ণ অংশের মাঝে পাড়বে তাঁদের আঘাত নিজেদের বক্ষ পেতে নিবেন। কোন সতর্কতা অবলম্বন তিনি করলেন না। একবার প্রকৃত আক্রমণের পরও, তিনি সকলের নিকটই সমানভাবে অধিগম্য হয়েলেন। জাতির বনজাগরণের আলোড়নে লমুহ মগনে যে বিঘের উদ্ভব হ'ল, নীলকণ্ঠের মতো তিনি তা পান করলেন। ১২৪ বছর বাঁচবার সমগ্র ত্যাগ করে বিশ্বের জীবনকে আহতি মিলেন—উন্নত জাতির চৈতন্য জাগাতে।

আজ এক বছর পূর্ণ হ'ল তিনি জীবন আহতি দিয়েছেন। আজ জাতির কাছে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন কি দূলা আজ জাতি ঐ মহৎ দূতাকে দিয়ে।



বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি

ডাঃ বাদুগোপাল মুখার্জী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলকাতায় এলাম। আমার আগে বাবার সঙ্গে বৈদ্যনাথপুরের জল ময়লগুণে খুব ঘুরে এসেছি। শিখে এলাম দাঁওতালি ভাষা আর তীরন্দাজী। পরে আর একবার গেলাম স্থল ভেড়ে নানা বেশে। এবার ছোটগানপুও ও ছত্রিশগড় ঘুরে আসা হল। আসা হল আমার পিতামহীর নির্বন্ধান্তরণে। তিনি পণ করে বললেন—“আমার বংশে তুমি দেখাপড়া না শিখে, পুছারী বামুন, বাঁদুনী বামুন হয়ে থাকবে?” এমনটা তাঁর প্রাণে সইবে না। তাঁর বেগা বাচাতে তিনি মাতৃভক্তি হয়ে আনালেন এবং খুগে ভক্তি করিয়ে দিলেন। তিনি অস্বাধীন বিদ্যুৎ ছিলেন। সংস্কৃত ভাগবত তাঁর কর্তব্য ছিল। সে যুগে স্ত্রী শিক্ষার নিষাৎ থাকার তাইতো বই লুকিয়ে পড়ে পড়ে বিভ্রাট লাভ করেন।

এবার একরকম পাকাপাকিভাবে কলিকাতাবাসী হতে হবে। উড়ে: পাবীকে খাঁচার পাবী কংলে তার যে দণ্ড হয়, আমারও তাই হল। ১৮৮৮—১৮৮৯ সালে কয়েক মাস ডঙ্কলেভিজেট স্থলে পড়লাম। ১৮৮৯—১৯০০ সালে কিছুদিন পড়ে আবার অস্থানীয় হই। আবার আমাকে ১৯০২ সালে স্থলে দেখা গেল।

এই ক'বছরের অভিজ্ঞতা ভাবী শাবী। পাঠ্যর ভেল্লের সঙ্গে ভাব হ'ল। কোথায় তমসুকের স্বপ্ন, অরুণা, ভেল্ল, সিধু, নিধু, চাগরী সিং, আর কোথায় ম'তে, ভীষ্মরাজ, গোকুলো, টাররা, বৈটো, গোবে, পিকে ইত্যাদি? তারা ত প্রথমটা আমাকে আমলই দেয় না। হুসু মথো বক: বধা নয়, যেবলম আমি বক: মথো কাক: বধা। ভীষ্মরাজ বলল—গোং ভোকে মোটেই মানায় না। বজ্র পাড়ারগের চেহারা। গানটান জানি? বা জানতাম তাই বললাম—‘ঐ সিংহ পুঠে মহাশায়া।’ বহুরা পাশ করল না, কথা শুধু দুই অটল। তারপর

হল—‘বল, মথয়া কিদের তরে ধরায় প্রেমী।’ এটা মথায়ার বটে। তবে পাড়ারগে চললেও এখানে চলবে না। তারপর হল—‘জুড়াইতে চায় কোথায় জুড়াই।’ শুনে বলল—এটা জুড়াইয়ের গান মগাপায়ে পা চল চলবে। তারপর হল—‘ম'থে মথাম, আর এ মথাম।’ দু' দু' এক একটা গান? বৃহস্পত্যের বাখাল বলকের গান, কিবা “এ যে লেটুটা” জানি? আমি বললাম না। তারপর প্রশ্ন—দুবাসার পারদের কোন গান? উত্তর দিলাম—না। বিরক্ত হয়ে বহুরা বললে আলিবাখার? বললাম নামও কোনদিন শুনিমি। দু'ধ, যে ডাবে ভিবা? এ খোড়াটা একরম অটল। ভীষ্মরাজ কলকাতাপূর্ণ হল। ছ-চারদিন খাড়াগে আবহায়ে আমাকে দেখালে কোটে স্থল শুকনো ভালে পরে একদিন গাইলাম, এ প'মটি শুনে বহুরা মাং। তাতিক করে বলল—এই ত, রাণী, স্বাধার মণিক! সব ব্যাড়া'জলে বৃষ্টি?

তারপর কামাখার জল বদান্যে নাপিত আসতে বহুরা নির্দেশ দিল—“মাখার চুল, ম'ম-ম'মা, ছ-মান, বৃহৎ পরামাণিক।” এর চেয়ে বেশী ছোট বড় কংলে বাড়ীতে বকবে। হাড়ী খার শোকানের জুতোয় চলবে না। চাই ডলন অভাবে লাঠিমাঝে জিক্।

স'তে বলল—কিছু ভাবনা নাই। দিনকতক বাল্যম চাল পেটে পড়ুক। তারপর গায়ের আগের, আগের কলের চল, ব্যক্তিটা করে নেবে। তখনও কলকাতার সর্ব-সাধারণের জপ টেলেক্টিক্ লাটট হয় নি। লঙ্কার মথ হাওড়ার পোল, জারিস্ রোড এবং ইন্ডেন গার্ডেনে বিজলী ব্যক্তি জলত। কেউ জালাচ্ছে না, আলো-গলা মই ব্যক্তি করে ছুটছে না। আন-আমগনি পই পই করে আলো জলে যাচ্ছে। এক অভিনব বাগার। এই লঙ্কার আলো জালা দেখতে কত ভেল্লু'ডো উপহাসক তিন জায়গার গিয়ে হাজির হত। হাওড়ার পোলে ঠাড়িয়ে কেউ কেউ অবাক হয়ে গাইত—“কি কল বাসিয়েছে সাহেব কোম্পানী।” কেউ বা ম'তে—“টংরেজের কি বৃদ্ধিবা, পোলের নীচে বইছে জল।” অভিব্যক্তি ও অভিব্যক্তির স্তরকে খেকে কিছু সতর্কবাণী এল—

“হত ভাগ্য। বকটে ইচ্ছার ছেলেনের সঙ্গে মিশ্বে না।
পাথরা ওড়ানোতে যোগ দেবে না। ব্যাঙলাই কেউ খেতে
বললে খাবে না, তাত্তার হুগিক না দেখে পার হবে না,
ছুটগাথ বই চলবে না, কোন অচেনা লোক কোথায়
নিরে যেতে চাইলে, দাবে না। ওরা ছেলেনেরা, ধরে
দরিত্র সহরে চালান করে দেবে।” পরে আনা গিয়েছিল
মরিত্র সহর হংক—Mauritius Islands.

তবে, ভক্তিতে, ভাবনার আঘার সহরে ভীবন আশং
হল। আশংকীর আশংক বড় মধুর ভাবে। তনমুক
ধাকতে সফলে মৃদু ভাগতে না ভাকতে টানলোক
এসে সপরে ঠাড়িয়ে থাকত। তারা মোকানপর—আমার
নিরে গিয়ে একবার ক'রে নিম্নের নিম্নের সোফানে
বসানে, এই ধাকতে তাদের অস্তিত্ব। আমার এমন
পর যে বললেই ভাল বউনি হয়। শশী মালের বাগানের
সোফান, শিবু বেনের মহিয়ারি সোফান। এক একদিন
মালতে এবং বেনেতে লেগে বেত লড়াই। আমাকে
কে আগে নিয়ে যাবে? আমি তনমুক থেকে কলকাতায়
যখন আসি শিবু আমাকে বাড়ীতে পৌছে দেবে অসীকার
করে সঙ্গে নিয়ে আসে তার স্বত্ববাড়ী ছিল
কলকাতায়। কিন্তু সে চারদিন সে কলকাতায় ছিল
সে চারদিন সে আমাকে নিম্নের স্বত্ববাড়ীতে রেখে
দেখ, আমার বাড়ীতে গিয়ে আসে নাই। শিবুর স্ত্রী
ও শশুভী এক আমাকে বর করতেন যে আগের লেকখা
কুসতে পারিনি। পরবর্তী জীবনে অনেক উপান, পতন
হয়েছে। যখন চারিখিকে বিপদ, ধর্ম ও উদ্বোধনায়
ছাড়া কিছু ছিল না, তখনও কোথা হতে এই “নাও
বোনের” সহানুভূতির পরশ অবাচিতভাবে এত পেয়েছি
যা তার ইয়রা হয় না। মনে মনে, অবসরকালে যখনই
জীবনের পাওয়া আর বোয়ানোর কথা মনেকারে দেখি
যা ভাবি, সব চেয়ে উঁচু হয়ে ওঠে একটা কথা। সেটা
হচ্ছে বাংলা, তথা ভারতের বা-বোনদের অশান্ত
অবস্থান। জীবনে যদি ভারতকে নিয়ে গৌরব করার
কিছু পেয়ে থাকি তবে তার অধিকাংশটাই হচ্ছে বাহু-
জান্তির মান। মনের অগতে এঁদের তুলনা নেই।

কাল্পনিক ভাবেই বৈজ্ঞানিক সে জিনিষটা। গড়ে উঠেছে।
আজ কিছু নাই। তাই বী ও শাস্ত্রীর সংঘর্ষ কালি না।
কিন্তু তাদের উন্নয়ন ও মৃত্যু কিছুতেই দুপক্ষে পারছি
না। বাড়ীর কাছে ছেলে এসে যদি বাড়ীর কথা মনে
না করতে পারে তবে সে এই গুরুত্বের কত বড় গুণপনা!
বাইরের মা ঘরের মাকে প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছিল।
বাইরের বোন ঘরের বোনকে ছাড়া দিয়ে ঢেকে কেটেছিল।
বললে অস্বাভাবিক হবে না। এ দুটি বোন ছিল নমুনা।
যেখানে বন্ধন পরে মা-বোনের ছাড়া পেয়েছি এদেরই বোন
তাদের ভিতর বেগেছি। অথবা বিরাটর বোন মা এবং
বোন হলে বাহ্যিক আচার সামনে উপনীত হয়েছেন।
তাদের স্বপ্ন শোধ হবার নয়। কপের বোকা যদি কিছু
হাস্যাত্মক হয় এই ভয়ে তাদের কথা উল্লেখ করা। আচার
বা বা চেয়েও লক্ষ্যন করার এই মত আচার শিখিয়ে-
ছিলেন—পুত্র রূপ বা মনের দেবী। স্ত্রী রূপ বা বিচিত্র
সেই। অথবা নিষ্কল্যাণ ধারণে পতিব্রত লক্ষণময়।

কলিকাতার প্রথম প্রথমটা শরীর ভাল হাছিল না। কেউ বলত জাঙ্গো বদল, কেউবা বলত নতুন জল, কেউ বলত ব্যাঙ্ক বঙ্গল, কেউ বলত বুনা পানীকে পোষ মানানোর কল। পাড়াতো জামাধের নাম, বশ, বাঁহির, প্রতিপত্তি খেটে ছিল। কলকাতার ছেলের মতন চালচলন নয়, নিভাত্ত সালাগিখে বলে পাড়াপড়শীদের লড়াইকৃত্তি খুব পেতোয়।

পরীয়াটা খুব ঈর্ষ চরে পড়েছে, হা-হায়েছে কাকাদে,
 মনে দৃষ্টি নেই, বেধে ক্রান্ত। একলা একদিন হাতার
 ধারে, পাড়াত্তেই, একজনদের বাড়ীর চোয়াকে
 বসেছিল। বৃষ্টি নামে একটি ছেলে আমাকে দেখতে
 পেয়ে কাছে এল। বিভ্রাণ করল,—কি যাত্রার, এমন
 বিরল বসনে বসে যে? বললাম—আম্বল। বৃষ্টি হেসে
 বলল,—আম্বলের বাজারে কার মনে লুখ আছে রাজা?
 যোগ কি গারে মেখে থাকতে আছে? এঁকে নেচে
 পেয়ে ভাগিয়ে দিতে হয়। আমি একটু শুকনো হাঁসি
 হাসলাম। এ ঘাঁড়ের ছেলে আমি পূর্বে কখনও দেখিনি।
 “বৈচে থাক, বৈচে থাক নবপুত্র রতন”—গুণগণিয়ে গাইতে

গাঠিতে বুটু ঢলে গেল। সে নতুন নতুন যিগেটোরে যোগ দিয়েছিল। গোবিন্দ পাল আমাকে নতুন মেখে বুটুকে দূর থেকে স্নিগ্ধ করলেন—এ ছেলেটি ধাবাশো, সেট বা কোথায়? কৃপাকান্দ করেই বা কোথায়? কি বাক্সে ভাষা কলকাতার। বুটু উত্তর করল—মাঠের মশাইয়ের বাড়ীতে। এ মাঠের মশাইয়ের ভাইপো।

বানিক পরে পাড়ার “পাক-সাঁড়ানি” মশায় পথে যেতে যেতে এসে উপস্থিত। আমাকে দেখে কাছে এসে সহানুভূতি স্বরে বললেন—কিগো, বাবু, এমন মিঠেবে গেল কেন বলত? কি হয়েছে? বিনোদভাবে আপনার অহুত্বতার কথা জানালাব। একটুতেই যদি লেগে যায়, এই হচ্ছে আগল কর।

‘পাক-সাঁড়ানি’ মশাই বললেন—ও, বাওরাখান। এই? তা, এর জন্যে মন খাবাপ করার কি আছে? আমি যেহেতু না শীত, গ্রীষ্ম বর্ষার পরোয়া করি? রাত ব’রোটাখ, কখনও দুটো তিনটেই বাড়ী কিরি। হিন্দু হিন্দু, সদির চৌকপুরুষকে গলাটিপে সাবড়ে দিই। আমি যোহ ন’ আনার বাই, জুনি ন’ পরনার ‘ধাত্তবরী’ টান দেখি, সর্দি ভঙ্গ হয়ে বাবে।

বলা বাহুল্য পাক-সাঁড়ানি মশায় বিখ্যাত মাতাল ছিলেন। একদিন তিনি মৌজের মাথায় কলকাতার কোন এক বিজ্ঞ ভাক্তারকে স্নিগ্ধ করে বসেছিলেন—বলত ভাক্তার, আমার ছাগল কি খাপ খায়? ভাক্তার হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন—না, মাটি খায়। সেদিনই তার উড়বার সপ্ন হয়। ছাতের আগলে থেকে—‘আমি উড়ছি, বাবা’, বলে পাখীর ডানার অহুত্বগুণে দুটি হাত নাড়তে নাড়তে ঝাপ দিয়েছিলেন। উড়েছিলেন, তবে ওপর দিকে না গিয়ে মাটিতে এসে পড়েছিলেন। কি ভাগ্যে তখন এরোপ্লেনের বালাই ছিল না, নৈলে হাসপাতালে ঘটনার উক্তি ঘিতে গিয়ে বলতেন প্লেন আকস্মিকভাবে ঝাপ করে গেছে মশাই।

তদনুকে থাকি কালীন এ ধরনের উপহাস কেউ আমাকে কোনদিন দেয় নাই। সেও একটা সহর, কলকাতাও একটা সহর, কিন্তু কি পরিবর্তন দুটো

জায়গায়! সেখানে ইয়ার ঢেলে, বকাটে চোঁড়া, বার্ডসাই পাওয়া, ভূমি নাট। এখানে ঝাঁপের মেজধাক্কী যখন বলেছিলেন—শেষেরে হেব’লোটা কি হল গো। ‘বার্ডসাই’ বাব, ইহুদ পালার। প্রথমটা কথাটা ধরতে পারিনি। পরে বুঝেছিলাম বার্ডসাই পাওয়া মানে খোলা সিগারেটের মশলা পাতলা কাগজে ঢেলে দেছে খাওয়া। সিগারেট তৈরী, এখনকার মত তপনও, মোটা কাগজের বাস্তবের মতো বিক্রী হত। বার্ডসাই লতা হত। তদনুকে ছাত্রদের এ কৃ-অভ্যাস জানতাম না, কৃষক শ্রমীর ছাত্ররা অনেকই তামাক খেত।

মনটা অতীতের সুখ স্মৃতির দিকে কুঁকলো। তপনরায়ের ধারে সুমনস্কুমীর কথা মনে পড়ল। সেখানকার সেই চড়াটা দেখানে কাপড়স, শরের জরস, হোগলার বন হাওয়ার বেলে দুলে কত আনন্দ মিত। আকাশে মাথার উপর লোশ ডিল চকু দিত। শব্দর ডিল—লাল পা, সাধা গলায়, টা-খ্যা খ্যা করে ডাকত। নৌকো চেউয়ে তলে দুলে উঠত। মাঝা পালগুলি হাওয়ায় ফুলে উঠে টান ধরলে ময়ূর গতিতে নৌকাগুলি চলত। তা’ দেখে গল্পে পড়া পেটুক গুলনের চেহারা মনে উদয় হত। চিত্ত ছুই হত। ‘ভোজনোতে বড় পটু ভাগব উদয়’ এইটাই বেন উদাহরণ দিয়ে দেখাবার জন্য পালে হাওয়া নৌকা আমার সামনে কেউ চালাত। আপনার মনে কত হাস্যভাষ—নৌকোটা বেকায় থেয়েছে তাই চলতে পারছে না। ওধারে ভাটার জাগা বাবু চরে কত রকম পানী তাহের প্রাত্যাহিক গুলতানি করত। আবার জলে ভাণা অপস বহু রকমের পানীয় তাহের সৈন্যবিন মেলাবেশা ও কলরবে দিক্‌মণ্ডল মধুময় করত। বড়হাস, বালিশাস, গাফিল, মাঘখোল, বেগুজী, খরন, চকাককী, পানকোটী, মাছরাগা আরও কত কি। আমার পিত্তা কোন একটা ছুটি ছাঁটায় অবকাশ করতে পারলেই লপরিবারে বনভোজনে আসতেন। পাড়া-পড়শীরাও অনেক লগে আসতেন। সেখেন এক নতুন স্ট্রী, নতুন আনন্দ নিয়ে লগ-লগত জলোদগত চড়া আপনার বিকাশ প্রকট করত। যন্ত্রালাগে বেন বকপের পুরী থেকে

লোকজন এসে এখানে হাসি, খেলা, গান, গল্পের মেলা লাগিযেছে। কিন্তু এখানে আমাদের প্রথমে আকাশ বাতাস শুভ উদ্ভাস থাকবে। লক্ষ্যের দীপ-নির্দেশ। মনের মত সব কিছু মিলিয়ে যাবে। নিরানন্দ ও অন্ধকার সব জাগরণটিকে মল ও গ্রাস করবে। আতঙ্কের দাঁতিতে সব লব্ধপ্রাপ্ত হবে। ভাল মার কিছু থাকবে না। বটিকা ক্যা বলেছিলেন—“বানের নদীর ধারে বাস, তাদের চাষনা বার মাস, হরত ভাল নরত মন, নরত মনোপ।” কিন্তু সত্যি কি তাই? পুনরায় একদিন মাহুদের হাত এসে কি সব জাগরণে সংস্কৃত উদ্ভাসিত করবে না?

মনে হল লক্ষ্মী, উগাতি, অমিলা, প্রমীলা, বননের কথা, মনে হল রক্তিতের সেই বৌটি যে একলা চিলে ঘরে থাকত। বাড়ীতে সবাই আমাদের আহ্বান করত। কিন্তু সে থাকত সব থেকে দিগন্ত হয়ে। তার কথা বিশেষ করে মনে হল কারণ আমার মা তাকে মাকে মারে ধরে নিয়ে আসতেন। এখানে তাৎক্ষণিক মূর্ছে হাসি দেখা দিত। আমি পরে বুঝেছিলাম সে ছিল বিধবা। অমিলা প্রমীলা মা বকা মেয়ে। নিকেনের মা পৈশবে হারিয়েছে। আমার মারে তারা নিরুদ্দেশ মা পেয়েছিল। আমার মাহুদেরে তারা বংশালার। তবু তারাও পর নয়। তারা যে আমার বোন নয় একথা ভাবতেই পারতাম না। বনন স্ত্রীর মনে বোন। সে অনেক সময় স্ত্রীর ও আমার খেলাধুলার গৌরবমির কথা জানতে পারলেও দুই পরিবারের অভিজ্ঞতার কারণে প্রকাশ করে দিত না। আমাদের অনেক ক্রটি সে জানত। কিন্তু ধরিয়ে দেয় নাই। এতদিন বোলতার চাক ডাকতে গিয়ে স্ত্রীর ও আমি কিছু গুণাগুণি করেছিলাম। বননকে আমাদের মনের কথা সেদিন আগে থেকে জানাই নাই। বোলতার চাক চেয়ে নিয়ে আমরা বড়দের অন্ধকারে মাছ ধরতে চলে গিয়েছিলাম। বনন আমাদের অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যেখানে চাক ডাকা হয়েছিল সে দিক দিয়ে সে পার হইছিল, এমন সময় কুঁড় একটা বোলতা বিনা সোঁথে তাকে কামড়ায়। অসুখীতে সে অস্থির হয়ে আমার মারের কাছে আসে।

তিনি ঐকম লাগিয়ে তার কষ্ট নিবারণ করেন। ভ্রমণে বলে ছোঁড়া চাকবটা বননকে চাক ডাকাই কথা বলে দেয়। সে এ ব্যাপারটা জানত। বননের বাপ হল ছুঁকারণে। প্রথমটা তাকে না জানিয়ে আমরা এতবড় একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার করেছি। বিতীতঃ পরের সোঁথে বোলতার চাক লাগি মিল। দুটো গুলন করে প্রথমটা তাকে বেশী বাধিত এক বিশ্রোহী করেছিল। অনেক কথার পরে জানত। কত সোঁথে শেলুকিথে খেঁখেছিল। তার কাছে এটা গোপন করা কেন? কষ্ট মনে দুইতে দুইতে সে খবর পেলে তার জাতি দুটি রূপনারায়ণের ধারে জালেট বিজ্ঞানী পুত্রে ছিপ কেসে মাছ ধরতে বসেছে। একমুণ্ডে ছুঁট গেল। তারপর অপরকর্ম নিগে দেখে কত দৃষ্টিতে ভয় দেখিয়ে বলল এখনই সব কথা তার মা ও জ্যাঠাইমাকে বলে দিতে যাচ্ছে।...মাকে সে জ্যাঠাইমা বলত। বিজ্ঞানের মত দুটে বাড়ীর দিকে চলে গেল। তাকে কথাগুলো সামলে নিতে বননের অবকাশ আমি ও স্থান পেলাম না। অপরকর্ম কি? মাছ ধরতে একটা বটেই। তার চেয়ে ভয় ব্যাপার আরও দুটো এট লম্বা হয়ে গেছে। বোলতার চাকডাকা এক নবর, দুইবার সম্প্রতি রূপনারায়ণের জোয়ারের জোরে অত্যধিক হয়েছে। অনেকদিন তীর উপড়ে এসে এ পুতুরটাও জুবে ঘর পেই জলে। লোকে তার পার কুমীর জোয়ারে এসে জাটায় বেরিয়ে না গিয়ে এতরকম বানে বেগে বেতে পারে। কুমীরের আঁজা অত সোঁথে জোয়ারের মধ্যে থাকে না। কুমীর যদি লুকিয়ে থাকে, তাহলে তারপক্ষে রূপনারায়ণের মত সোঁথানী মানব-লঙ্কানকে পেলে সে কি ছেড়ে কথা কইবে? বনন গিরে মারেরে কাছে বলে মিল—বীরের বাট গুলনর ভেলেরা কুমীর শিকার করছে মাছ ধরা ছিপ, বড়ী ও কুমার নিয়ে রূপনারায়ণের ধারে। এরপর আর কিছু কি বলতে হবে? যবের খুঁ থেকে আচরুকা ছেলে ফিরে পাওয়া—ভগাভুরা মায়েরা বা করে থাকেন আমার ও স্ত্রীরের লম্বা আমাদের মারেরের তরক থেকে তার অগ্রবা হল না।

বননের সঙ্গে কথা-বল হল। সে মিটমাট করতে

এলে তার প্রস্তাব গ্রহণাধ্যাত হল এই বলে যে মেয়ে হয়ে সে মেয়ের উচিত কাজ করেনি। ভাইদের বোম্ব চাকবে তবে ত বোন। সাথে কি মেয়েদের বশতাত কাপড়ে কাছা হয় না? হুমীর বমি তারের খেয়ে ফেলত হে। তাতে তার কি? তার মত ভীতু তারা হবে না।

বসন নত হল। মাফ্, চাইল, ভাই কোটার বেনী গাওয়াবে বলল, তবু আমরা তাকে ঠেসে দিই— "নিম্নেরা ভীতু, অস্ত্রধারও ভীতু বানাতে চাই"—বলে সেখান থেকে চলে গেলাম। অদ্বৈত-শ্রী, বৃত্তান্তি আমি তখন কি জানি যে পরে ১৯২০ সালে মেমিনীপুরে বড়বর মামলার বসনকে কত সাহসী হতে হয়েছিল? বসনের স্বামী এতে একজন আপাদী ছিলেন। মেমিনীপুরে আমি এলে আমাকে বাড়ীতে ডেকে একথা সেখান পর দেখিনের সেই লক্ষ্মীছাড়া ঘটনাটার উল্লেখ বসন করেছিল। সে কথা ভুলতে পারে নি।

আর লক্ষ্মী, উলাদির কথা? এঁদের ভালবাসার লীমা পরিমীমা ছিল না। ছুটি মেবী। এঁদের বিষয় অধিক আর উল্লেখ করব না। পাছে তাঁদের গুণ পাঠতে গিয়ে তাঁদের ছোট করা যায়। শুধু এই বললে যথেষ্ট হবে যে তাঁরা আমার স্মৃতিতে বেঁচে আছেন।

এখানের লক্ষ্যের তুলনার মনে পড়ল ক্ষুরিয়ার, পূর্ণ, কানকী, স্বরেন প্রভৃতিকে। ক্ষুরিয়ার এক ক্রান্ত নীচ পড়ত। পূর্ণ সেন এক সম্বোধী পড়ত। এঁদের মধ্যে ছায়া নামোত ছিলই না, ছিল এমন একটা ভিন্নিৎ বা পরবর্তী যুগে দেহবধী বাকে চিরায়ী বেশমাক্কাৎ রূপান্তরিত করেছিল। বেশ সেবার বজ্রবধীতে বাণ-লেশনীন আশ্বলীতে যে প্রোজ্ঞল হোমায়ি আল ও বৌগ্যমান তাতে প্রথম সমিৎ ও শহীদ হয়েছিল বীর বালক ক্ষুরিয়ার। পূর্ণ, স্বরেন, বোগজীবন, জাহ্নবী ও আপন আপন শক্তি অল্পসারে মায়ের বোধনে নৈবেদ্য বৃগিয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার যা কি করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতেন, কলকাতার বিজ্ঞানিকা করতে এসে আমার তা মনে

পড়ল। তখনুক থেকে চলে আসার আগে একদিন ভুল পথে লেফটার সময় বাড়ী এসে দেখি এক সমারোহ ব্যাপার। পূর্ণ মুনসেমে রাত্রিগোত্রা হচ্ছে। লুচী, পোলাও, মাছ ইত্যাদি রত্নাদি। নানা বসন হল, মিঠা এসেছে। আমার নিমি একটা পিড়ের আল্পনা নিয়ে শুকিয়ে রেখেছেন। একখানা নতুন আসন এক ভাগসে রাখা হয়েছে। তাতে কাউকে হাত বিতে দেওয়া হচ্ছে না। অনেক বাড়ী থেকে মেয়েরা পাঠী করে নেমক্কর রাখতে আসছেন। লনেনদিদি, লক্ষ্মীদিদি, উলাদিদি, বম্বীদিদি, লরংদিদি, হত মাদীমাগে ছিলেন, বৌদিদিগে ছিলেন, কাকীমা, পিণীমা এবং মুনসের ঠাটুমা একে একে সব এসে পড়লেন। ব্যাপার কি আগে কেউ জানতেন না। ত্রিশে বা জানলেন তাতে ঠাণ্ডা অবাক হয়ে গেলেন এবং খুব হাসলেন। কিন্তু আমার মনেবে এই সম প্রচেষ্টার আত্মবিশ্বাসে যোগ দিলেন। সে দিনের সেই অল্পসার বা উৎসবের কাণে হচ্ছে আমাদের চিহ্ন-দাপার বইয়ের সাগরত্ম। চিহ্ন-দাপা লোকটি কৈ? সে ভিল বাড়ীর বৈশব। তার বই লখন-লখনা এই প্রথম লখনের মা হবে। তাই আজ আমাদের বাড়ীতে এত আনন্দ কে লাগল। সমসমত চিদাদাপার বৌকে একখানি অতি তম্বর কুপলার ঢাকটি পাড়ি পরিবে নতুন আসন ও আনোদার পিঁড়েতে বসিয়ে দীপ, ধূপ জ্বলে, শাঁখ বাজিয়ে, ধানবীতি সাগরত্ম কখন হল। তাকে বাড়ীর উঠানে বসান হয়েছিল। বাকীরা বসে-ছিলেন শাওরা ঘরে। আমি ও আমার ছোট ভাই বোমরা জোড় হাত করে চিহ্নাদাপার বৌয়ের দিকে মূখ করে দ্বাব পাঠ করছিলাম—“পুং রূপাং বা স্মরং দেবীং সী রূপাম্ বা বিচিহ্নয়ে অথবা নিদগাং ধ্যয়েৎ সক্তিমানম্ লক্ষ্মদম্।” বৌবীকে পূজভাবে ডাবা বাক, হুইপেট বা ডাবা বাক অথবা নিগুপভাবে ডাবা বাক—তিনি সক্তিমানম্বরপা।

বেশ আমাদের আলোচ্য কমে উঠেছে এমন সময় আর একটা পাঠী এসে নিডকীতে লাগল। কোন বাড়ীর মেয়েরা বাকি ছিলেন তা আর হিসেব করে দেখার

অবকাশ কাকর ছিল না। কুমারী বেচেরা ছুটে গেল
সাগর-বাড়ীতে নিয়ে আসতে। সানন্দ অর্থাৎ করে
আনন্দ আনন্দ বলে ডাকতে লাগল। কিছু কিছু
বেলপাতা না পেলে পাখির হরহর মূলতেই খোমটার ভিতর
থেকে চোখে পড়ে গেল এক গৌরবর্ণা মূর্তি। মেঘেরা
সব ওগো, মাগো, কেগো বলে ছুটে বাড়ীর ভিতর
দড়ুড়িয়ে পালিয়ে এল। কোনোহলে আমি ও মুরেন
এগিয়ে পেশাম লাঠি নিয়ে দ্রুতগতি উঠত। পক্ষা গিতে।
গিগে হেঁপে সে এক অসুস্থ আনন্দধারক বিষয়। আনন্দ-
ধন মূর্তি দ্রুতগতিবাহু হামাই বসন্তবাহু পাখি থেকে
বেরিয়ে গাড়িতে গাড়িতে হারছেন। তিনি ছিলেন
সরোজবির রানী, উকিল, সুবাসে এ বাড়ীর আমাই।

এই মিত্র রহস্ত-পরিহাসে বাড়ী শুধু লম্বাই খুব প্রভা
হলেন, খাতিবেরা করে তাঁকে বৈঠকখানার বসান হল।
জার আহারের সময় শানী মণ্ডকের সকলে তাঁটার চোটে
বসন্তবাহুকে অগ্রস্বরের চূড়ান্ত করে একবার খুব শোখ
তুলে নিলেন। বসন্তবাহুকে কি কি তাঁটা করা হয়েছিল
আমার সব মনে নেই। তবে তিনি বিনা নিমন্ত্রণে কেন
এসেছিলেন। বপক সম্বন্ধে বা বলেছিলেন তার কিছু
মনে আছে,

"মুটি, বেগুন, পটলজাতা বিনা কিছু বাবনা,
করেছি ইংরেজী পাপ খাবার ভরে জাননা?"

নবীন মেটা ছিল মুরেনের চাকর। শিবু মাইতি
ছিল আমাদের চাকর। এ দু'জনের স্থান ছিল
অসাধারণ। নবীনকে উঠতে, বসতে খালা বসতে হত।
শিবুকে কখনও দালা, কখনও খালি শিবনারায়ণ বললে
চলত। আমাদের বাড়ী চাকরী করতে এসে শিবু
প্রথম ভাগ পড়ে নিরকর ঘোষ কাটায়। আমাদের সে
শেখার অ, আ, ক, খ; দিগির কাছে বিতীর ভাগ পড়ে
আমি আবার শিবুকে পড়াই, 'ঐগা, বাণ্য, মাদিক্য।'
শিবু পরে কানী খণ্ড, মহাভারত, রামায়ণ, কলিতমোহিত
প্রভৃতি পড়ে ফেলেছিল। শিবুর মাতাশ্রীর সময় আমি কিছু
অভ্যয়নও হওয়ার শাঁকানী দিয়ে শিবু গানের আনন্দ চিন্তে
সে। বাবার কাছে নালিশ করেও হুঁদা পাইনি।

শিবনারায়ণের বিয়ে। আমার মায়েও এ বিয়ে বা
করতাই সব করেছিলেন। আমি ও আমার ছোটভাই
খনগোপালের ওপর হুমু হল গ্রামে শিবু বাড়ী এমত
যেতে। পক্ষর গাড়ীতে চড়ে নবীনবার অভিভাবকতার
আমরা লেখা হাই। আমাদের বসতে বিশেষ আসন
হিলে, মায়ের উপদেশমত তা আমরা প্রত্যাখ্যান করে
শিবুর জাহি, কুটুম্বের লস্কো মাহুর একসঙ্গে বসেছিলাম।
জগার শীতলা যা এই সকলে প্রসিদ্ধি মেবা। সকলে জান
সেতে, শুধু লত হয়ে মায়ের পাখি বহে নিবে এল।
ব্রাহ্মণ ধারাবিহিত উপচারে পূজা আরম্ভ করলেন। যা
কুলটল সব নিলেন, কিছু পূজারী তাঁহুর মাথার হাবার
বেলপাতা দেহ, খোকাতে খোকা বেলপাতা মায়ের মাথা
থেকে পড়ে যায়। ব্রাহ্মণ হিম্মিদ্ ধোয়ে গেলেন।
আমল কাটা খেতেও দেবতা। এর লস্কো ঢালকি ঢালবে
না। কে কি মানসিক করে মাকে দেব বলে দেব নাই।
তাই যা মাথা নেড়ে বেলপাতা ফেলে দিচ্ছিলেন, ভয়ে
ভয়ে সকলে মনের কথা মূগু করতে লাগল। এক বৃদ্ধা
মুগুকা বলছিল—"মা জানে বাপ; মন জানে পাপ।
যে বার অপরাধ খীকার কর বাহু." অনেক ঘোঁটাঘুটি ও
অযেবনের পর অপরাধী ধরা পড়ল। একটি বউ সেড়
বছর আগে মাকে একটি সোনার 'বেলপাতা' মানসিক
করেছিল। কিছু অবস্থা বৈগুণ্যে গেল দেওয়া হয় নাই।
এইবার সে বিয়ে বাড়ীতে ধার করে মূল্য ধরে দিল। মা
আনন্দে পূজার বেলপাতা মাথা পেতে নিলেন। সে কি
বেলপাতার গালা চটান হল। একটিও ভুঁয়ে পড়ল না।
ভয়ে ও ভক্তিতে লোকেরা গুড় হয়ে মাকে প্রণাম করতে
লাগল ও নাক, কান মূলতে লাগল। পূজারী তাঁহুর
বললেন—মাহুরের অহকার, টহকার সব মিছে। বাহবল
টাহবল কিছু নয়। 'বলং বলং বৈব বলদ'। শিবনারায়ণের
মত এমন সত্যতা পরাধন বিশ্বাসী, সত্যালসী লোক
বিরল। আমার জীবনের নানা রঙে রঞ্জিত অহুত্বের
দীর্ঘ জালিকার মধ্যে ভেদন লোক খুব কম। উপরি
আয়ের নেশা তার কোনদিন ছিল না। উপকারীর
উপকার সে প্রাণ দিয়ে করত। কৃতজ্ঞতার খাতাবিহ

জন্মের মধ্যে। তা'ছাড়া সে ছিল পরহুংকাতর। আমার মা লুকিয়ে বাপের টাকা, পেন্সা, আহার্য, বস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য পাঠাতেন, তাদের মধ্যে বাবার জন্ত নিজের ছেলেকেমেরের সঙ্গে শিবুও ছিল একজন সূত। হুংমামী লোকদের মান না যায় সে জন্ত কেউ যেন না জানে, না বেধে, না শোনে—সাহাবাবাহীনের কাজের সময় আমার মা এই সতর্কতা সর্বদা অবলম্বন করতেন। "হাতে কাজ করবে, চোখে পথ ঠিক বেগে হবে, মুখ থাকবে একেবারে বন্ধ।" এই ছিল তাঁর অঙ্গুশাসন।

তমলুক ছেড়ে আসাধ অনেক কিছু হারান হয়েচে বার জন্ত হুংমামীর নয়। কৌতুকের মিশ্রিত হারণও একরকম হুংম। তেমন অস্বস্তি ছুটি গেছে—গুডমনিং কালীবানু এবং গুডনাইট ড্রিংকেল ওয়াটার। তাদের আমার জন্তও প্রাপ্তি মারে যাক্ হায় হায় করে। রিনোদন জীবনের এক অপরিহার্য প্রয়োজন। সেটা কোন পথ দিয়ে আসে তা অবজ্ঞা বিচার্য বিষয়। ভেপুটিবানু নন্দলাল ব্যাক্টার এক আত্মীয় ছোকরা এসে উদয় হল তমলুকে। ইক্সলের ছাত্র, কিছু অনর্থক ইংলিশ ঝাড়ে। লোকে বলতে লাগল এ বে ইংরেজী ঝাড়া বালশব্দ। বাংলা ভুলেও সে উচ্চারণ করত না। তার সঙ্গে সব ছেলে বাংলায় কথা বলে, সে উত্তর দেয় বা বলে অপরিণত ইংরাজীতে। তাই তার ব্যাবের নাম হয়ে

গেল "গুডমনিং কালীবানু।" সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাতি সব সময় তার গুডমনিং। এমন আমোদের মনেটি হারিয়েছি। হুংম হলে না? দ্বিতীয় ব্যক্তি হল "ড্রিংকেল ওয়াটার।" তার সঙ্গে লহরে সব সময় দেখা হত না। সে ছিল গোপী অমাব্যার। তমলুকে সব জেলের সর্বস্বদা মালিক। সে জানত ছুটি ইংরেজী কথা। তাই সে ঝাড়ত। একটি ছিল "গুডনাইট", তার সঙ্গে দেখার কালাকাল ছিল না। সব সময় তার গুডনাইট। অপরটি কোথা থেকে সে আহরণ করেছিল ড্রিংকুল ওয়াটার। তাতেই পেকিরে ফেলছিল মূখ বা বা মিতের দোবে। তার সঙ্গে দেখা হলেই ছেলেরা টেটিয়ে উঠত "গুডনাইট বা গুডনাইট ড্রিংকেল ওয়াটার।" আমরা মনে করতাম তার নামই বৃষ্টি গুডনাইট। অস্তমিকে লোকটা ছিল ভাল। তবে জেলের জীব হওয়ার বোধ হয় আমাদের আঁকটির ভিতর জেলে আসার বীজ বুন দিয়ে থাকলে। কারণ পরে আমাদের জীবনে জেলে ড্রিংকুল ওয়াটার একাদিকবার করতে হয়েছে। আমরা চার বন্ধু। একে একে জেলে আসি। অন্যমন্ত কুমিরাম, পূর্ণ সেন আশিপুর বোমার মানলায় পড়ে। যোগজীবন ঘোষ মেনিনীপুর বড়বর মানলায়। আমি ছবার রামবন্দী হয়েছি মাত্র।

(জন্মণঃ)



ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই

শ্রীকমলময়ী দেবী

স্বাধীন ভারতের স্তেরতা নিশান,
নব গৌরবে উড়ে
সারা ভারতে ছাটে, মাটে, বাটে,
হুতীরে, প্রাশন-চূড়ে :

বচসিনতার বহু-রূপে পাওয়া,
বহু প্রাণে, প্রাণে, মূপে চূপে চাওয়া ;
প্রাণ দিয়ে এর উপরে ধরিল,
সেই সব ধরাবাহী,
এগছি তাদের আনতে প্রণাম
তাহাদের গান গাহি ।

মুক্তি-মঞ্চে আহতি দিয়েছে
তাদের নাহিকে। কম,
সারা ভারতের জ্বর গাঢ়িছে
“জয়, শতীদের জয়” ।
এ’ ছ’টী নহে শক্তি বিপুল,
গগন-পবন করিছে আতুল,
বেশ-বাদীদের চিত্ত ব্যাতুল
মৃত্যুরে নাহি ভয় ;
পূর্ব-গগনে আলোর আভাস,
আর নাই সংশয় ।

মহা-মাস্তানে কত নারী আসি,
• ষাড়য়ে পতাকা লয়ে,
বেতের আঘাত হাসিমুখে গেল
দীপ্ত-আননে সয়ে ;

কত না কিশোর মা’র কোল ছেড়ে,
তাঁপায়ে পড়িল কুশি’ নিখেগেরে,
চুখিল ধরা শোথিতে ভাসিরা’
মহা গৌরব বয়ে,
জাতীয় পতাকা তুলিরা ধরিয়া
“বন্দে, মা” গেল করে ।

সোণার মাথেরে ভালবাসি তবু
আছে আঝো অপমান ;
কত বকনা, কত ঝঁঝা,
ক্লান্ত হয়েছে প্রাণ ।

তবু তো বিবল হ’নি সাধনা,
মকল হয়েছে অনেক বাগনা,
পূর্ণ হুংতে বাঁধা আঁচি বীণা
নব-রূপে ডোলে তান,
উষ্ম শিবের বে রবি ঝাপিছে
তারি আঁচি আছান ।
ইতিহাস বরা রচনা করিবে
তারের মিনতি করি
পরের মিথ্যা গ্রহণ না করি’
সত্যে লইও বরি’ ।

সারা ভারতের ধূলিকণা-মাকে,
রক্ত-লেখায় বে লিপি বিরামে ;
ধূলা খাটি তারে উদ্ধার করি’
সবার নামনে ধরি’
মতো তাহার সম্মান যাও
আজিকে মিনতি করি ।

মানুষ কি করে এগোচ্ছে

শ্রীজ্ঞানদাচরণ দাস

প্রথম অধ্যায়

ভারতের প্রাচীন শিল্প

ভারতের পল্লী শিল্প :—

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে ছোট ছোট সম্ভ্রমায় বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করত। তাদের কৃষিকৃষির চারদিকে ঘরবাড়ী বেঁধে তারা থাকত। বৃহৎ একটী সম্ভ্রমায় বা অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট সম্ভ্রমায় নিবদ্ধভাবে বেঘানে বাস করত তাকে বলা হোত গ্রাম। এই গ্রামেই হোয়েছিল তখন ভারতীয় শিল্পের গোড়াপত্তন।

কৃষিই ছিল পল্লীর প্রধান শিল্প। চাষের জমির পায়তন ছিল ছোট—কখনও এক একর। কখনও বা ছিল আরও কম। এই সকল চাষের জমির ছিল ব্যক্তিগত মালিক বা গোষ্ঠীগত সর্বাধিকারী। জমির খাজনা শাসক শ্রেণীকে দেওয়া হোত। প্রতি কৃষকেরই কিছু নিজের জমি থাকত যে সেই জমি তার পরিবার পরিজনদের সাহায্যে চাষ করত। কৃষি ছাড়া প্রত্যেক গ্রামে নানা রকমের শিল্পও প্রচলিত ছিল। যে সব তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প, কামারশালা, তেলের ঘানি প্রভৃতি। চাষের কাজ সকলেই করত। কিন্তু অপর যে সব শিল্পের কথা বললাম তার কোন একটীকে কেউ কেউ বিশেষ বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করত।

গ্রামে দ্বারা খেতে খেত তাদের তৃত্যনে বিভক্ত করা হোত—কৃষক এবং হস্তশিল্পী। কৃষক বোঁগাত খাতি এবং কাঁচামাল। আর সহজ সরল গ্রামাঙ্গীনের অপর নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু বোঁগাত হস্তশিল্পী। যেমন কাঁসার, কুমোর, তাঁতী ইত্যাদি। এছাড়া গ্রামে যেসব লোক বাস করত তাদের কাজ ছিল অপরের সেবা করা। যেমন নাপিত, ধোপা, স্বাড়ুয়ার প্রভৃতি। বাংলা ও উত্তর ভারতের অপর প্রদেশগুলিতে জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রাম প্রত্যেক গ্রামে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত বাস করত। আদিম এই কয়েকটী প্রাচীন সম্ভ্রমায় ছাড়া

কালক্রমে এল ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, ষোড়শ ইত্যাদি। তখন মোটের উপর প্রত্যেক গ্রাম গ্রামাঙ্গীনের প্রয়োজনীয় দাবী মেটাতে পারত। কোন গ্রাম বাহিরের উপর না নির্ভর কোবেও চালাতে পারত।

নাগরিক শিল্প ও হিন্দুদের বৈদেশিক বাণিজ্য :—

ঐতি কালের বহুপূর্বে থেকে ভারতবর্ষের সহরের সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানী, তীর্থস্থান ও সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর, শিল্পক্ষেত্র হিসাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এসব শিল্পক্ষেত্র থেকে বণিক ও ধনকুবেররা দূরবর্তী স্থানে মাল প্রেরণ করত। কোন কোন সহর একটী বিশেষ শিল্পের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। যেমন ঢাকা ছিল মসলিনের জন্য বিখ্যাত, কালিকার জন্য ছিল কালিকট।

হিন্দুরা বাণিজ্যের জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে খ্যাতি লাভ করেছিল। মালাবার উপকূলের সঙ্গে ব্যাবিলনের বাণিজ্য চলত। ঐষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ রোমের সঙ্গে বেশ বড়ো রকমের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ভারতের মসলা, মরিচা প্রভৃ, মসলিন এবং মৃত্যুর তৈরী নানাবিধ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হোত। দোনা রপা বিদেশ হোতে অতি বড়ো আমদানী হোত প্রায় ৪৫০০০ পাউণ্ড মূল্যের; পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রোক্স প্রধান বন্দর হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত চেনি বিখ্যাত বন্দর বলে পরিগণিত হতেছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে গোদা এবং দ্বারাট ইথোরোপীয় বণিকদের আমলে প্রসিদ্ধ লাভ করে। ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দুটী বন্দর থেকে ঐষ, রত, কলাশির এবং মসলা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হোত।

উপরে যা বললাম তার থেকে বোঝা যাবে যে যদিও প্রত্যেক জনপদে বহা-সম্পূর্ণ গ্রাম্য শিল্প ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তথাপি ঐষ্টকালের বহুপূর্ব থেকে আস্তে আস্তে ভারতের সহরে অপর শিল্প ও ব্যবসা গড়ে উঠতে থাকে। যে হস্তশিল্প পল্লীর স্বাভাবিক পরিবেশে প্রথম জন্মলাভ করে, তা কালক্রমে জনপ্রিয় সহরে বিশেষ সমৃদ্ধ হই। পরবর্তী দিনে এখন ভাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হোল তখন পৃথক পৃথক শিল্প জাতি-বিশেষের বৃত্তি হয়ে পাঁড়াল এবং

প্রত্যেক শিল্প জাতিগত নিম্নতম সন্ধ্যা (Caste Guild) দ্বারা পরিচালিত হোতে লাগল। বোড়ল ও সপ্তমশ শতাব্দীতে বোম্বল সন্ধ্যাটির শালম কাজে এই সন্ধ্যাগুলি তাঁদের পূর্ণপোষকতায় উন্নতির চরম শিখরে গঠিত।

আধুনিক বস্ত্রশিল্পের অভ্যুদয় :—

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বাংশ ভারতবর্ষে নিম্নের প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতা হাবতীয় বস্ত্র প্রস্তুত করত। উচ্চতর ব্রহ্মসম্রাট বিদেশে রপ্তানী করত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতীয় শিল্পের স্থানান্তরকারী পরিবর্তন দেখা গিল। ইংল্যান্ডে তখন বহুশিল্পের বিপ্লব (Industrial Revolution) পাকা হোয়ে গেছে। ভারতের প্রস্তুত মালের আর ইংল্যান্ডের প্রয়োজন নেই। তখন ইংলও তার কলকারখানার তৈরী বিভিন্ন ভারতবর্ষের বাজারে এনে ফেলছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌলতে ভারতবর্ষের কাঁচামাল ইংলওের কলকারখানার সরবরাহ হোচ্ছে। এবার ইংলওের কারখানার সেই কাঁচামালের প্রস্তুত বিভিন্ন ভারতবর্ষকে প্রেরণ করতে বাধ্য করল বিদেশী স্বাধীনতা। ইংলওের কারখানার তৈরী সস্তা চকচকে বিভিন্নের সঙ্গে আর দেশের তৈরী বিভিন্ন পাল্লা দিতে না পেরে নরতে হুক করল। শিল্প গেল, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীও গেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এই পরিবর্তনের কলে ভারতের নিম্নতম শিল্প ব্যবস্থা (Industrial organisation) সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ল। হস্তশিল্পীরা হোলো সঙ্গীপেচ্ছা ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, তাদের তৈরী বিভিন্ন আর না বিকোর দেশের বাজারে না বিদেশের বাজারে। তখন তাদের সম্পূর্ণরূপে অধির উপর নির্ভর করতে হোল। এতদিন যে চালের কমি তাদের হস্ত-শিল্পের পরিপূরক বাক্স ছিল; আজ তা তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র সন্ধান হয়ে গাড়াগ। জাতিগত শিল্পব্যবস্থা (Craft System) ধ্বংস হতে হুক হোল। ইতিমধ্যে, স্থাপত্য এবং নানাবিধ শিল্পকলাতা নৃপপ্রায় হতে লাগল। ভারতীয় শিল্পব্যবস্থা ধ্বংসের অঙ্গগমন করল জাতির মানসিক পক্ষিতা এবং নৈতিক শাস্তি।

কলকারখানা :—

এই অবস্থা থেকে গড় আদী, পাঁচালি বছর ধরে ভারতবর্ষ দীর্ঘ দীর্ঘে আধুনিক বহুগুণে এসে পড়েছে। একদিন যে পল্লীশিল্প ব্যবস্থা তার নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে সস্ত্রের থাকত আজ তার সেদিনের পরিবর্তন এসে গেল। হঠাৎ সমগ্র দেশ ও বিশ্বের বাজার তার নিকট উন্মুক্ত হয়ে গেল। এখন তার কাঁচামাল থেকে মাল উৎপাদনের ক্ষমতা নিম্নতম হোচ্ছে। দেশের কারখানায় প্রস্তুত কোন কোন বিভিন্ন নিম্নের প্রয়োজন মিটিয়েও বিদেশের বাজারে গিয়ে পড়েছে।

বানবাহনের ক্রমবর্ধমান সুবিধা এই পরিবর্তনের পক্ষে বিস্তার লাভ্য করে। যে সব অংশে নদীনালা দিয়ে একদিন বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসাবানিজ্য প্রবর্তিত হোত, আজ সেইসব, এই নদীনালা ব্যবসাবানিজ্যের পহারক হোল। শুধু তাই নয়, হিন্দু ও মুসলমান রাষ্ট্রকালে যে সব বড় বড় বাজা নির্মিত হয়েছিল আজ সেগুলি কম কাজ মিল না। কিন্তু ভারী বানবাহন চলচলনের ক্ষমতা পাকা রাখা বেশি দিনের নয় ১৮৫০ সালে মাত্র কয়েক মাইল পাকা রাখা ছিল। কিন্তু ১৯১৮—১৯ সাল নাগাদ ৫৬২২৬ মাইল পাকা রাখা তৈরী হয়। আর কাঁচা রাখা ১৪২০০০ মাইল। ১৮৫০ সালে প্রথম রেলগড়ে রাখা নির্মাণ হুক হয়। ১৮৬১ সাল নাগাদ মাত্র ৫২৭ মাইল রেল রাখা তৈরী হয়। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত রাখা ব্রিটিশ ভারতে রেলগড়ে ছিল ৩৬৭৩৫ মাইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলকারখানায় জমিকের অভ্যুদয়

প্রাচীনকালে জমিকের স্থান :—

আগেই বলেছি ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করত। সেখানে তাদের জীবন জমি ছিল। এইসব জমির মালিক ছিল যৌব পরিবার অথবা ব্যক্তিগত। একদিন ভারত অথবা কৃষকের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল। অধিদারী প্রথা সেভাবে প্রচলিত ছিল সেখানে সে তার দেশ উপর শক্তির অংশ অধিদারকে থাকনা স্বরূপ

মিছে স্বাধীনভাবে দিন কাটাত। দারী নীচ কাম ও ভুতোর পাজ করত তাদেরও অর্থনৈতিক অবস্থা বাহতদের অপেক্ষা খারাপ ছিল না। কারণ তাদের সমাজের প্রয়োজনীয় এই বলে বণা হোত। শেমিন তারা পলী সমাজ ব্যবস্থার অংশরূপ বলে পরিগণিত হোত। প্রাচীনকালে গ্রামে হরহেছিল শিল্পের গোড়াগঠন (Industrial Unit)। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। ছোটলোক বাহের বলা হোত তাদের কাম অগৌরবের ছিল না। তারা যে পারিশ্রমিক দাবী করত তা চিত্রাচরিত ব্যবস্থা অল্পমাত্রের শক্তের মূল গ্রহণ করে মিষ্টিব নিত। তাদের বসবাসের ভিটা বা বাস ছিল। বেষীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের চাষের নিত্যম অমি ছিল। হুশিলা ও অল্পাত শ্রেণীর লোকদের প্রায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল।

তখন সব শিল্পই ছোট আকারের ছিল সেজন্য কৃষক অথবা হুশিলাদের নিজ নিজ পরিবার পরিভ্রমের সাহায্য ছাড়া প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণের উপর নির্ভর করতে হোত না। পরস্পরের সহযোগিতা তখন সহজলভ্য ছিল। যদি কারো অতিরিক্ত সাহায্য নেবার দরকার হোত, সে ভাকত তার প্রতিবেশীকে। তার পারিশ্রমিক চিত্রাচরিত নিয়মে শক্তের দ্বারা দেওয়া হোত। তখন পলীর অমিক ছিল স্বাধীন। বাণবিক এক প্রাগৈতিহাসিক যুগ ছাড়া ভারতবর্ষে ক্রীতদাস প্রথা কোন দিন বড়ো আকারে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। উচ্চ জাতি বা ধনীতের সংসারে কিছু কিছু ক্রীতদাস রাখার প্রথা ছিল সত্য, কিন্তু সে প্রথা কোনদিন ব্যাপক আকারে প্রচলিত হয়নি; অথবা প্রভু বাসের অমের উপর বসে খেতো না। এইসব ক্রীতদাস গৃহস্থালীর ভূত্য অথবা প্রভুর ব্যক্তিগত অহুতর রূপে থাকত। ভারতবর্ষে ক্রীতদাস প্রথা অমিক খুটি করে নি যেমন করেছে ইউরোপ ও মাণানে। তাপান এবং ইউরোপে অনেক মেনের ফিউডাল প্রথা বেভাবে শক্ত খাটি গড়েছিল ভারতবর্ষে সেভাবে কোনদিন হয়নি।

সহরের শিল্প-কারিগর (craftsman) ও ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল। তারা নিজেদের কাম নিজেয়া করত,

কখনও কখনও অমিক খাটাতো। তাদের সাগুরেদ (apprentice) বলে নেওয়া হোত। এই সাগুরেদরা হর নিজস্ব ব্যবসা করতো অথবা নড় কারিগর হয়ে সেই হুযোগ খুঁমতো। অধিকাংশের মেলায় তাদের আশা কলবতী হোত। বাসের মে মাণা মিটত না তাদের কোনদিন বিনমজুরে পরিণত হবার কারণ খোতো না। তখন প্রভুত্বের বণো মণ একটা পার্থক্য না খাংবার চুটো কারণ ছিল। প্রথমতঃ অমিক প্রায় মনিবের সমকাত হোত অনেকক্ষেত্রে স্বাত্তীয় হোত। কখনও কখনও সাগুরেদী করতে এসে সে মনিবের পরিবারে বিবাহ করত। দ্বিতীয়তঃ অমিক বোধপরিবারের মধ্যে বাস করতো। এই বোধপরিবারের কেউ কেউ স্বাধীন কারিগর বা স্বাধীন ব্যবসা করত। গ্রামের নতো সহরেও অমিক ছিল স্বাধীন।

প্রাতিচের প্রথার গোড়ার কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক। উপরে বলেছি মনিব ও অমিক প্রায় একজাতি হোত। অতএব সমাজে মনিব ও অমিক আলাদা শ্রেণী হিমাংবে কোনোটিনি গড়ে উঠেনি কিন্তু আধুনিক কলকারখানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বারী কলকারখানার কাজের জন্ত ভীড় করল তাদের মণো তিনটা স্বতন্ত্র শ্রেণী দেখা দিল।

আধুনিক অমিক কারা হোল :—

(১) রাতে অথবা কৃষক বারী স্বগণাতীতকাল থেকে কৃষিকার্যকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেছিল এবং যে সব হুশিলা বিদেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেইব শির নট হয়ে দাবার কলে সম্পূর্ণরূপে কৃষিকার্যের উপর নির্ভর কোরতে বাধ্য হোয়েছিল।

(২) হুশিলা বা কারিগর দ্বারা নিজ নিজ পারিবারিক পেশার ভিতর থেকে আধুনিক কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবার চেষ্টা কোরেও পেটের ভাত মোটাতে অসমর্থ হোল।

(৩) গ্রামের ছোট জাতি বা নিম্নশ্রেণী নিজ নিজ গ্রামে স্বীয় বৃত্তি অহুধারী কাজ না পেয়ে গ্রামের পক্ষে

অন্যতরক হয়ে উঠলো। এমন কি যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তারা কাজ পেতো। তা হিরে তাদের দিন ওরফে ১লা সাহ হোয়ে উঠল। তাদের অভাব হতই বিন যেতে লাগল বেড়েই চললো।

ইতিমধ্যে চাষের জমি বাড়লেও লোকসংখ্যার অসুপাতে বাড়েনি। ব্যক্তিগত চাষের জমি ক্রমাগত হাত বদলাতে থাকে। ক্রমে টুকরো টুকরো করে ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার অভাব মোড়নের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

শ্রমজীবী (wage-earner) :—

শ্রেণী হিসেবে শ্রমিক প্রথম কথা সিল বখন একশ্রেণীর লোক অপরের চাষের জমিতে কৃষিক্ষেত্রে (peasant farmers) তাদের অংশিক সময় নিয়োগ করতে বাধ্য হোল। ১৮২১ সালে প্রথম সেন্সাস গ্রহণ করবার পূর্বে এই জাতীয় শ্রমিকের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। প্রথম সেন্সাসে দেখা যায় সময় লোকসংখ্যার মাত্র শতকরা ৬% কৃষক। ১৯১১ সালের সেন্সাসে পাওয়া যায় গ্রাম ২ কোটি চাষের মজুর (farm servant)। ১৯০১ সালের সেন্সাসে এই সংখ্যা বেড়ে পড়াল ২৬০,০০০। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আংশিক সময় কাজ করতো। তাদের সঙ্গে কৃষকের পার্থক্য বড়ো বেশী ছিল না। এই সব কৃষকের মাত্র ৫% একর চাষের জমি থাকতো।

বিভিন্ন শিল্পে শ্রমজীবী :—

প্রথমে ইংরাজ আবাদকারীদের (planter) জমিতে চাষ করবার শুরু এই শ্রেণীর শ্রমিকের প্রয়োজন ঘটে। নীল ও ককির চাষ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক কাজ পেলো। কিন্তু চাষের চাষ চালু না হওয়া পর্যন্ত তা বাগানের শ্রমিকের দেরশ চাহিদা ঘটেনি। ১৯১১ সালের সেন্সাস অনুসারে ৪৮২টি ককির আবাদ : ১১১টি নীলের এবং ১০১টি চা বাগানের হিসাব পাওয়া যায়। এই তিনটি আবাদে বনাক্রমে ৫১৩২৩, ৩০১২৪ এবং ১০০৮৫ শ্রমিক কাজ করতো।

উপরিংশ শ্রমজীবীর প্রথমতাপের কিছু পরে ভারতের বাহিরে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় শ্রমিকের চাহিদা দেখা দেয়। ১৮৩৫ সালে ১১০১ জন শ্রমিক ইমিগ্রেশন আইন অনুসারে মরিশাস, নাটাল, ব্রিটিশ গায়ানা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রেরিত হয়। ১৯১৪ সালে এই সংখ্যা বেড়ে বাড়ায় ২৫৬১৬।

রেলসড়কা নির্মাণের ওপর শ্রমিকের চাহিদা ঘটে। এই কার্যের শুরু ১৯১১ সালে ৩৫,১১১ জন শ্রমিক নিযুক্ত হয়। ১৯১৮—১৯ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ৬৫২৬৫ জন হয়। তার মধ্যে ইউরোপীয় ৬১০৬, অ্যান্টো-ইন্ডিয়ান ১০৪৪৬ এবং ভারতীয় ৬১৮০৩। কৃষিক্ষেত্রেই প্রথম আধুনিক শিল্পবানিজ্যের পথ্য গোপাতে লাগল। কৃষকের জমি ছোট, মজুরি সস্তা। কৃষক বিভিন্ন ও নিরক্ষর সে না পায়ল ক্ষেত্রে মার যোগাতে না পায়ল আধুনিক বস্ত্রের সাহায্য নিতে। কিন্তু ইতিমধ্যে কতকগুলি উৎপন্ন কাঁচা মালের বিক্রেতার বাড়ারে কারখানা হয়ে বাড়াল। ইংল্যান্ড ও অপর ইউরোপীয় দেশে ভারতবর্ষের খামশক্ত ও কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি হোলো। প্রথম ব্রিটিশ বণিকের বাণিজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতে নীলের চাষ বাড়তে লাগল। ককি চাষের প্রবর্তন হোলো পরে। ১৮৪১ সালে চাষের চাষ বেশী পরিমাণে হয়নি। সে সময় মাত্র ১৩২৭২ পাউন্ড মূল্যের চা বিদেশে রপ্তানি হোলো। ১৯১৯—২০ সালে চা রপ্তানি হয় ২০৫৫০,৪১০ কোটি টাকা মূল্যের। নীল, ককি ও চাষের চাষ ব্রিটিশ বণিকের করতো। আর পাট ও অন্যান্য খামশক্তের চাষ দেশীয় কৃষকরা করতো। ১৮৫২ সালে পাট রপ্তানি হয় মাত্র ৬৮,১১১ পাউন্ড মূল্যের। ১৯১৯—২০ সালে ২৪,১৩৪৪২০ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচা পাট রপ্তানি হয়। পাটের তৈরী মিনিব রপ্তানি হয় ৫০০,১৪৬২১ কোটি টাকার। কাঁচা তুলা ১৯১৯—২০ সালে ৫৮৪৪২০.১০ কোটি টাকার রপ্তানি হয়।

ওয়ালটেনারের পথে

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন দুর্গম বাঘাবী পথে
 বেয়ালী আকর্ষণে,
 পথিক তোমাকে ভাক দিলে।
 বুঝি সমুদ্র-দৈকত ?
 পড়লো কি ছেদ, নগরীর নীল
 জীবিকার কর্ণে
 কিছ্র তোমার এই যাত্রার
 মনতার কৈ মত ?
 জানি বানুবেলা ভেঙেছে তোমার
 উদ্যম বাহু ভুলে
 নারিকেল খেদা ছোট্ট বীপের
 মূহু মধু হাতছানি ;
 বিদ্রাঘ-প্রথ বাশ্পানের
 ব্যস্ত জীবন ভুলে
 কতো সহজেই ফেলে এলে পিছে
 যন্ত্রের কাংরাগি !

এখানে পাহাড়ে দিগন্ত ছুঁয়ে
 নীলের অমৃত ঝরে,
 সেই সে কুরাশা দিগন্ত-কৈ কি
 পরালো অংগ-রাখা ?
 কোথায় বা লাগে মদলিনী কাজ
 সেরা শিল্পীর করে
 মেঘেমের দেশে স্বপ্নরা বেন
 হঠাৎ বেলেছে পাখা !
 আন্নার ধারে বসে আছি শুধু
 দৃষ্টিকে ঘেলে দিয়ে,
 উষাগীন বকু হঠাৎ পাখায়
 পত্র রচনা করে ।

মাথা কি তার একটি আশ্রয়
 মনে মনে পাঁড়ে নিড়ে
 হ্রসবে দিই মোনার তবেরতে
 আমার বীণার 'পরে ।
 ছোট লাল পথ নির্দেশ দেয়
 অজান: দিগন্তের
 রক্ত-বন্দনা-ডক্টর-চরণ
 —কম্পিত পরদুলি,
 ওড়ে গ্রাম পথে, বেন বীণ ডাঙা
 লোহিত বলয়ের
 অপরিহার্য-পরিমাণিত
 নিশানটী মিল তুলি !

ছোট নদী বাহ—একটী মহিলা
 আকর্ষণে ভবে অ'ছে,
 পুটে তাহার কি জানি কী হবে
 হঠাৎ চতুর্ভুজ পানী
 শির শির ঝির গান বেতে ওঠে
 নীল তালের গাছে
 লম্বা তার ডল ডাঙায়
 বার্তা পাঠালো না কি ?

এখানে পাহাড়, ওখানেতে নেদ
 ছোট ছোট গ্রাম বাহ
 আর আমি শুনি সতরুণ ডাক
 নীলকূত সাগরের ;
 ছোট পাহাড়, আকাশের মেঘ
 আশ্বিন সন্ধ্যায়,
 নৃত্যের তালে যোগ দেবে নাকি
 যাত্রা পালনের ?

আমাদের সাহিত্য-জগৎ
 কলিকাতা

জামাই

অধ্যাপক ত্রিবিজয়চন্দ্র গুহ

কথায় বলে,—“হন, জামাই, ভাগিনা,

এ তিন নয় আপনা।”

এ হেন জামাই নাকি অবিনাশ ঘোষালের কপাল
কিহাটল।

চারের ঠেলে বসিয়া ছোটহারোণা কলিন্দিনি সাহেব
দুঃখ করিতেছিলেন, “ইংরেজ আমলে সুবিচার নেই যে
হাল। নইলে না—অবিনাশ দারোগার জামাই করলে
কমেন্ডে, তাৎ হোল প্রমোশন, আর লাগা দিনরাত এই
ডাকাত ছোকরাদের পেছনে ঘুরে হস্তগত হয়ে গেলাম—
আর আমার Caseটা সাহেব ভেবেও দেখেন না।”

ইংরাজ রাজত্বে সুবিচার সভাই নাই তবে ইংরাজ
জনদের রূপবোধ আছে ইহা বলিতেই হইবে।

নিত্যই নিরীহ নিরীকারী মানুষ আমাদের ব্রহ্মদুলাল।
ঠেরোপ্তরে দেহটি বিশাল—কিন্তু শরীরে কোন বাধুনি
নাই। চলে যখন হাত দুখানা তুলাইয়া তুলাইয়া—মনে হে,
কখন বুঝি শনিয়া পড়িয়া ঘাইবে। ব্রহ্মদুলাল-পুত্রিষ্ট
তরঙ্গিনী বলে “যেন একটি তুলাই ছালা।” এটা রাগ
করিয়া, না অহরাগের বাতুলো ত্যাগ অবস্থা জানি না।
জুধু এটুকু জানি ব্রহ্মদুলাল এ কথায় রাগ করে না। রাগ
করিতেই বুঝি সে জানে না। সহজ, অলস মানুষ সে।
জীবনে মাত্র তিনটি বিষয়ে তাহার উৎসাহ—ভোজন,
ভাণ্ড ও প্রথম। ব্রহ্মদুলাল সংবাদপত্রের ধার ধারে না—
রাঙনীতির কাছাকাছিও ঘেঁষে না। পুলিশের লাল
পাগড়ীকে তাহার বড় ভয়। তাহার সম্পর্কে গ্রামের
হাইস্কুলের হেড্‌মাস্টার মহাশয় বলেন, “আকার সর্বশেষ
প্রাক্তন।”

এমন মানুষ ব্রহ্মদুলাল তাহার নাকি এমন বিপত্তি!
আত্মহারা নামের শেবালেশি শীতের রাত না পোহাইতে
তাহার ভ্রমণের সখ উৎফুল্লিত হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা
আপনারের কাছে আকস্মিক এবং উদ্ভট মনে হইলেও তরঙ্গিনী
প্রকৃত কারণ ঠিকই অন্বেষণ করিলেন,—ব্রহ্মদুলালের

ডাকের পুঁজি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মদুলালের
সত্তরালয় কুশিলা সহরে—তাহার গ্রাম হইতে দশ মাইল
দূর। এক মোটা পঞ্চরের চানরপাথে চাপাইয়া ও মাথায়
পঞ্চরের টুপি ঝাটিয়া তোর রাত্রে ব্রহ্মদুলাল সত্তরালয়
অভিমুখে রওনা হইল। তরঙ্গিনী নিষেধ করিলেন কিন্তু
বেখানে এমন অকস্মী কাকের ভাগির সেখানে “মাইয়া
শোক” এর কথাই নিবৃত্ত হওয়ার মত কাপুরুষ ব্রহ্মদুলাল
নয়—তা বতই সে “মাটির মাহু” হোক না কেন। কিন্তু
বেলা সাড়ে ষাটটায় যখন সে সহরে পৌঁছিল তখন
তাহার গীলে চমকাইয়া গেল। পথে পথে এত পুলিশ
লাঠি হাতে, সাইকেলে, মোটরে একি ব্যাপার!

মহাশয় পাখীর নেতৃত্বে Civil Disobedience-এর
আন্দোলনে সমগ্র দেশ এখন উত্তেজিত। জনসভা,
শোভাযাত্রা ও “গুপ্তি পাশ্চাত্যবাহ ধরম হুঁক,”
“বন্দেমাতরং” ধ্বনিতে এই ছোট মধ্যস্থল সহরও যেন
মাতিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে অধুনা যেখানে গুপ্তি-সিংহের
নিহায ব্যাঘাত ঘটয়াছিল কিনা জানিনা কিন্তু বাংলার
প্রত্যন্ত প্রদেশের এই ছোট সহরটির ক্ষুদ্র কালো চামড়া
ম্যামিষ্টেট সাহেবের বৈধ্ব্যচ্যুত ঘটিল। সাধা চামড়া ভোহাটি
সাহেব পুলিশের কর্তা। এই সহরেই এক বন্দুর পুরী
একজন ম্যামিষ্টেট সাহেব এবং একজন পুলিশের সহিত
টেরিটোরি রিসলভারের ভলিতে প্রাণ হারাইয়াছেন।
কাজেই ভোহাটি সাহেব তো খান্না হইয়াই ছিলেন।
হালিসে আত্মহারা “বাধীনতা দিবস” পালন নিষিদ্ধ হইল।
কিন্তু দেশপ্রেমের এই “বৌদন অলসত্বক রোপিত কে?”
পটিলে আত্মহারা সমগ্র রাত্রি পুলিশ সহর পাহারা দিয়া
বেড়াইয়াছে। তথাপি হালিসে আত্মহারা প্রভাতে দেখা
গেল সহরের প্রাচীরে প্রাচীরে রক্তের অক্ষরে লেখা শব্দ
শব্দ ইত্যাহার, সহরের মধ্যস্থলে টাউন হল প্রাঙ্গণে উজ
বাসায় গাছের চূড়ায় ত্রিবার্ণকিত পতাকা—দেশের আশা
আকাঙ্ক্ষা, সাধন ও স্বত্বাধারের অমর প্রতীক। শোভা-
যাত্রা নিষিদ্ধ। তথাপি পাড়ার যুবক ও কিশোরদের
ছোট ছোট দল মাতীহ পতাকা হস্তে বন্দেমাতরং ধ্বনি
করিয়া পুলিশকে নাচাইয়া বেড়াইতে লাগিল। পুলিশ

যেখানে পারিল “বুহু লাঠি চার্জ” করিয়া এসব দলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে লাগিল।

এই আগুনের মধ্যেই আশিয়া পড়িয়াছে ব্রজহুলাল। হঠাৎ সে বেখিল দূর হইতে পুলিশ একটি ছেলের দলকে লাঠি উচাইয়া তাক্কা করিয়া আসিতেছে। সে তাহার মেমবিশুল সেটিকে নিরা সৱিতে পারিল না—কিছুক্ষণের ভিত্তর এই ‘বন্দেদী’ দলের অস্ত্র-বৃত্ত হইয়া পড়িল। পুলিশ আসিতে আসিতেই ছেলেরা ছুই ছুই আশে পাশের গলিতে উণাও হইল কিন্তু ব্রজহুলাল রহিয়া গেল। ভোক্তপুত্রী কনষ্টেবলের সব কয়টি লাঠির আঘাতই তাহার পিঠে পড়িতে লাগিল। সে বিম্বিত হইল, বিরত হইল, আপত্তি করিল, ভাইনে সরিল, বায়ে ঘুরিল। তাহার অনহুকরিত্ব চৌদ্দগ্রামের ভাবার অহনয় করিয়া জানাইল যে নির্দোষ—কিন্তু সবই বুঝা। তাহার বুঝতে লাঠি অহনয়ারে ববিত হইতে লাগিল। যেন সেই Charge of the Light Brigade—

“Cannon to the right of them
Cannon to the left of them
Cannon behind them
Volleyed and thundered”

• • •

সাত্তায় একথার দিগা মৈবক্রমে ব্রজহুলালের শত্ৰুগণদের পুরাতন ভূত বনমালী তখন বাজারে ঘাইতেছিল—ব্রজহুলাল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া তাহার শরণাপন্ন হইল। সেও তার সেশেরই লোক। বনমালীও জানাইল ব্রজহুলাল সত্যই তাহারের জামাইবাবু। কিন্তু পশ্চিমা পুলিশের দল তো বনমালীকে চেনে না। তাছাড়া যে সব বন্দেদীবাবু এমন ঈতের রাতে তাহারের “লোটাডর” সিদ্ধির জমাই নেশা এমন করিয়া ভাঙিয়া সাত্তায় “হাংবাই” করিয়া ঘাৱিয়াছে তাহারের পালের গোশা একজনকে হাতে পাইয়া কাহারও “জামাইবাবু” বলিয়াই তাহার ছাড়াই যাবে, সরকারের প্রতি “নিয়ক-হাৱাষ” তাহার নর। স্বতরাং হাসি ঠাট্টা মন্তব্যর সাথে সাথে ব্রজহুলালের প্রসন্ত পৃষ্ঠদেশে লাঠিবৃষ্টি

চলিতে থাকিল। ব্রজহুলালের পুনঃ পুনঃ অহনয়, আপত্তি এবং সর্জন্যের ক্রমশঃ সংঘেও এতটুকু গিৱায় হইল না। কিন্তু এবার এক আকস্মিক কাণ্ড ঘটিল। হঠাৎ চোখ খুঁজিয়া, বুক চিতাইয়া ব্রজহুলাল সুরিয়া পাড়াইয়া প্রাপণে চীংকার করিয়া বলিল “ত-বুইলে বন্দেদীতরং। শুভাভি যদি মাইব পাওনই লাগে—তইলে বন্দেদীতরং কইরাই মাইব ধামু।” তারপর পালের মত চীংকার করিতে লাগিল “বন্দেদীতরং,” “বন্দেদীতরং।” দুহুর্কের মধ্যে ব্রজহুলালের নির্কোষ মুখখানাও যেন অপূর্ণ মধ্যাহ্ন স্নিগ্ধিত হইয়া উঠিল।

অবাক হইয়া পুলিশের দল লাঠি ধামাইল। ঠিক এমন সময় বনমালীর কাছে সংবার পাটয়া সব-ইনসপেক্টর অবিনাশবাবু মাইকেলে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাত্তায়ি জাগরণে এবং কিংকি বিলাতী আসবপানে তাহার চমু হইটি চুপুচুপু। কিন্তু জামাতা ব্রজহুলালকে এমতাবস্থায় শব্দে দেখিয়া তাহার নেশা এক নিমেষে টুটিয়া গেল। কিন্তু পুলিশের কর্তব্যে অবহেলা চলে না। তিনি হস্তস্থিত বেটন দ্বারা জানাতা বাবাজীকে শব্দ ধাক্কা দিয়া বলিলেন “ঈগুদ্বী বাসায় যাও।” রামত্রি তেওয়ারী “নিগুপ্তকার বাবু”কে জালুট করিয়া সিজাসা করিল এই “শালা শোগুকা” ধানার নিরা হাইবে কিনা। অবিনাশবাবু মুখ বিকৃত করিলেন এবং বলিলেন যে ধানার নিবার দরকার নাই—তিনি নিজেই এই “বেয়াবু আৱামী”র ব্যবস্থা করিবেন। ততক্ষণে ব্রজহুলাল শত্ৰুগণের দিগা পৌছিয়াছে।

কিন্তু বাপারটা এখানেই শেষ হইল না। দট্টা তিনেক পরে জোহাট্টা সাহেব অবিনাশবাবুকে তলব দিলেন। অবিনাশবাবু প্রমাদ গলিলেন। কিন্তু তাহার কপাল ভাল। সাহেব আশ বিলাত হইতে Air Mailএ নবপরিণীতা বেনমাহেবের ভাল চিঠি পাঠিয়াছেন। অনেক মাধ্য সাধনার পর তিনি বেটিভের “barbarous land”এ আসিতে রাজী হইয়াছেন এবং এই সম্ভায়েই তিনি বিলাত হইতে বণনা হইতেছেন এ সংবাদ দিয়াছেন। অবিনাশবাবু সেলাম করিয়া পাড়াইতেই

সাহেব বলিলেন "What's this! I hear about your son-in-law? Is he a terrorist?" অবিনাশবাবু মনে মনে ঠাণ্ডা হইলেন কিন্তু মুখি হারায়েলেন না। তিনি উত্তর দিলেন "No Sir, he is not terrorist. He is a foolish—he is a idiot, Sir."

ইংরাজী বিস্তৃত হইল না কিন্তু পুলিশবিভাগ ইংরাজী গ্রামারের ইস্কুল নহে। সাহেব শুধু একটু হাসিলেন। বলিলেন, "So, he is only an idiot!" অবিনাশবাবু সাগ্রহে কহিলেন "Yes Sir, Yes Sir." সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন "Tell me in your d—Bengali, what really happened. I hear it was rather funny."

ভোহার্ট সাহেব বাংলা ভাল জানেন বলিয়া অকস্মে তাহার খ্যাতি আছে।

অবিনাশবাবু সাহেবের প্রসন্ন বসন দেখিয়া আশঙ্ক হইলেন। তিনি সত্য কথাই সব বলিলেন। ইতিপূর্বেই তিনি ব্রজলাল ও বনমালীর নিকট হইতে সবটুকু ঘটনাটা

জানিয়াছিলেন। সাহেব মাথা নাড়িয়াই সব কাহিনী শুনিলেন এবং ব্রজলাল নিজের নিকপার হইয়াই "তুই হইলে বন্ধেঘাতক" বলিয়াছিল শুনিয়া তিনি হো হো কহিয়া হাসিয়া বলিলেন "I see a warm also will turn!" অবিনাশ এহার সাহস পাইলেন। তিনি জানাইলেন—ভাড়া হউক নিজ জামাতা হইলেও তাহাকে তিনি ক্ষমা করেন নাই। তাহার অপরাধের জন্য উত্তম করিয়া বেটনের শ্রুতি দিয়া তাহার শাস্তিবিধান করিয়াছেন এবং পুরস্কারেই তাহাকে গ্রামে ফেরা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

তিনি ভোহার্ট সাহেব অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিলেন এবং বলিলেন, "So you knocked some sense into his silly head! That's all right. I shall recommend your promotion."

পক্ষর মুখে এবং কক্ষিমুখের মুখে চাই দিয়া ভোহার্ট সাহেবের সুপারিশে অবিনাশবাবু ইন্সপেক্টর হইয়া গিয়াছেন।

পৃথিবী-দোহন ও কচুরীপানার কম্পোজিট সার

রজনীকান্তের পদ্য

'পৃথিবী-দোহন' কথাটা একটু বিস্ময়কর বোলে মনে হলেও ইংরেজীতে 'গ্লো বোর ফুন্ট' এর বাংলা অর্থ এর ব্যবহার চলেতে পারে। সেই দৃষ্টান্তেই কথাটা এখানে ব্যবহার করছি। বর্তমান পৃথিবীর ব্যাপক খাঙ্কলকেট লক্ষ্য কোরে পৌরাণিক যুগের একটি আখ্যানের কথা মনে পড়ছে।

ক্রীমছাপবস্তুর কথা। রাজর্ষি অংগের বেন নামে অতি নিষ্ঠুর ও পশু প্রকৃতির এক পুত্র ছিল। বেনের সেই নিষ্ঠুরতা, তার বেগবোচা অবাধ্যতা বধন অভিনাজ্যের জীবন ও দুর্দমনীয় হ'রে ওঠে, বধন সে শাসনেরও বাইরে চলে যায়, শুধন রাজর্ষি অংগ অত্যন্ত দুঃখকাতর হ'রে

পড়েন। পুত্রের উদ্ভ্রমলতা ও অধমিক আচরণে প্রজাদের দুঃখকষ্ট ও অশান্তি ঠাকে অত্যধিক পীড়িত কোরে তোলে। তিনি স্বীয় পুত্রের এতাদৃশ চরিত্র সম্বন্ধে না পেয়ে একরা রাত্রিকালে নিমাই-এর স্নায় নিদ্রিতা স্ত্রী হনুধাকে পরিভাগ কোরে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী ছেড়ে দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে বনে চলে যান। রাণা ছিলেন প্রজারক্ষক, কাজেই রাণাকে হারিয়ে প্রজারা যে খুবই শোককাতর হ'রে পড়বে এতে আর আশ্চর্য কি? তারা চতুর্দিকে রাণার অঙ্গলক্ষ্যানে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু বার্ষ্য হোয়ে ফেরে—রাণাকে তারা পায় না।

এখিকে স্রুতিপালক ও হৃদয়ালক না বাক্যার প্রজারা

পারম্পরিক আত্মঘাতী কলহ ও হিংসা প্রতিহিংসায় নিগ্রহ ও ত্রেণ অহুত্ব করিতে থাকে, কেউ আর বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে না, লক্শ্যেই স্ব স্ব প্রধান ও বৈরাচারী হ'য়ে ওঠে। লোকে পারম্পরিক স্নান-পালনে, পারম্পরিক কর্তব্য-পালনে নিজ নিজ বৃত্তিধর্ম-পালনে বিরত হয়। লোকের এই অকর্তব্যাতার, অনাচার ও ধর্মহীনতার কলহ না-বাটিও শুক বরুণমিষ ও নিফলময় প্রায় হয়। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখ।

জনসাধারণের এই অবস্থিত হুঃখত্রেণে বনবাসী মুনিবিশেষেরও মন ব্যথিত চকল হয়ে ওঠে। অনেক ইতস্ততের পর পৃথিবীর অবাধকালের অবসানকালে তারা অসংখ্য অধ্যাত্মিক বেনকেই রাজ্যসনে বসালেন। মুনিরা ভেবেছিলেন যে রাজসম্মান পেলে হয়তো রাজ্যধর্মের দায়িত্ব-পালন হেতু বেনের চরিত্রে লংঘন, ঈগতা ও পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, কিন্তু কল তার বিপরীতই হল, বেন রাজসম্মতা লাভ কোরে আরো অধিকতর অসংঘন ও অসাহিবিকতার পরিচয় দিতে থাকে। প্রজাদের অবর্ণনীয় হুঃখের হাংকার ও অভিসম্পাতে বেনের মৃত্যু আসন্ন হয়ে এল। মুনিবিশিষ্ট ও লগতের কল্যাণের ত্রেণ, শান্তি ও সমৃদ্ধির লগ্রে মৃত্যু কামনা করতে থাকলেন। অবশেষে গীড়িতের কাতর প্রার্থনায় ও দীর্ঘনিঃশ্বাসে বেনের দেহান্ত হল।

মুনিরা বলেছিলেন :

“লোকসমুদয়ঃ দহিত্যামঃ স্বতেজসা”

[শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৩র্থস্কন্ধ, ১৪৭ অং]

রাজধর্ম ধ্বন বৈরাচারমূলক হয়, প্রজাপালনের হলে প্রজাপীড়ন ধ্বন রাজার নিত্যকর্মরূপে দেখা দেয়, প্রকৃতিও তখন বিমুখতা অবলম্বন করে। প্রজার চোখের জলের তাপে, প্রজার হুঃখবেদনার নিঃশ্বাসে রাজ্যসন টলে ওঠে ও ব্যাজার শক্তিমানমত্ততা ও অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে ধূ-বায়। এ মৃত্যু হিংসুর সমস্ত ধর্ম ও পূরণ প্রছাদিতে আঘরা দেখিতে পাই। পৃথিবীর বর্তমান হুঃখধর্মশা থেকে বিশেষ কোরে আমাদের এই ভায়তবর্ষের (পাকিস্তান ও বং ভারত) দুই অংশের জনসাধারণের

আয়বত্র ও আশ্রয় লগ্ধে হাংকার ও অতিষ্ঠ বিমুখ ভাব দেখেও আমার টিক এট অবস্থাটাই মনে আসছে।

কল্যাণ, হুঃখ ও শান্তিই যদি আমাদের কামনার বস্তু হয়, তবে প্রজা-সাধারণের তথা রাষ্ট্র পরিচালকবর্গের ধর্ম ও কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে চলা দরকার, মনে মনে, সম্ভ্রমারে সম্ভ্রমারে, দেশে দেশে সহনঈলতা ও সহযোগিতার ধর্ম পালন করা দরকার। অন্যথা বর্তমান হুঃখের অস্থ হওয়ার কোনো ক্ষত সম্ভাবনা দেখছি না, পৃথিবীর শুকন ও নিফলময় ও অচিরে বিমূর্তিত হবার কোনো লক্ষণ নেই। বৃত্তি-চ্যুতি, বৃত্তি-লংঘন ও না-বাটির প্রতি অনাদর ও অকর্তব্যাতাই আমাদের এই হুঃখসৈন্তের মূলে। রাজ্য বেনের রাজসম্মতালেও বাটির প্রতি বরনহীনতার লগ্রেই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, লোকের অধ্যাত্মচরণে ও অধ্যাত্মিক মনোভাবের লক্ষ প্রকৃতিও বিতপতা লাভ করে।

রাজ্য বেনের মৃত্যুর পর তৎপূর পৃথু রাজ্যসন লাভ করেন। তিনি স্ত্রায়ণরায়ণ ও ধার্মিক রাজা ছিলেন, প্রজাপালক ও প্রজাহরক ছিলেন। কিন্তু তিনি যে কালে রাজসম্মতা হাতে নেন, তখনও তা বেনের সমকালেরই সেই অজ্ঞা ও দুর্ভিক্ষ চলছে, প্রজারা অজ্ঞাভাবে, আশ্রয় অভাবে কট পাচ্ছে, কাজেই পৃথু প্রজার হুঃখে কাতর হলেন, পৃথিবীর ওপর তার হ্রোণ হয়। তিনি পৃথিবীকে লগ করতে ধর্মধারণ হাতে নেন। তখন পৃথিবী ভয়ে বিনীত হয়ে যা বলেন শ্রীমদ্ভাগবত থেকে তা এখানে উদ্ধৃত করছি।

“পূরা কষ্টা কোষযথা ব্রহ্মণা বা বিশম্পাতে।

ভূজামান্য ময়া মৃষ্টা অদস্তিরগুতত্ৰৈতঃ ১০

অপালিতানামৃতা চ ভবন্তিগৌকপালকৈঃ।

চৌরীকুতেহতা লোকেহং ঘন্যৈবৈব্রহ্মসমোষীঃ ১১

মুন্য তা বীকঃ কৌণা মরি কালেন ভূধন।

তয় মূঠেন যোগেন তনানামাত্মদৃষ্টি ১২

বংসঃ কলহ মে বীর। বেনাঃঃ বংসলা তব।

ধোক্ষ্যে কৌরময়ান্ কামানহরুপক মোহনম্ ১৩

বোদ্ধায়ঃ মহাবাহো! কৃতানাম্ কৃতভাবন।

অরমীলিতমুখব্রহ্মণান্ বাহতে যদি ১৪

সমাক কুক মাং রান্না! সেবয়িত্ব হংসপক্ষ:

অপর্জাবাপি তহং তে উপাধর্তে মে বিভো! ১১১"

(৪র্থ স্বরূপ ১৮শ অধ্যায়ঃ)

এর ভাব এই যে শ্রী হস্তির প্রারম্ভে শত্রু ও বীভাষি উৎপাদনের যে গুণধর্ম মুক্তিকার মাথে দিয়ে গিয়েছিলেন, অকর্তব্যধারণ, হুঁকুস্তেরা তা ভোগ ও অপহরণ করতে থাকে, তার অপ-ও অনিত-ব্যবহার করতে থাকে। রাজাও শৈর্যচারণবশত হস্তিকার্থে উগাসীন হন, প্রজারাও নিয়মিত কর্তব্যপালনে অর্থাৎ মুক্তিকা ও বোগ-ধর্ম-পালনে (যেমন কৃষিকর্ম ঘাং: শস্ত্রাদি উৎপাদন, কালাগযোগী চাষ ও সার-প্রয়োগ ঘাং: জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়ানো ও সংরক্ষণ করা প্রভৃতি কার্যে) শিথিলতা প্রদর্শন করে। ফলে হস্তিকা স্বভাবতই অলুপ্ততা প্রাপ্ত হয় ও পতিত অবস্থার পড়ে থাকে, আর প্রজালাধারণের শস্ত্রাভাবে, অশান্তাবে দুর্গতির একশেষ হয়। কিন্তু জমি পতিত থাকলেও মুক্তিকার সহজাত গুণ কখনো নষ্ট হয় না, কর্তব্যে মুক্তিকার স্তর যেমন খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়, তেমন প্রাকৃতিক ধর্মে ও জীবাত্ম-সাধ্যায়ে কৃমিকাত লতাওদ্ধারি হতে মাটি তার নিম্নের উৎপাদিকা শক্তি সংগ্রহ করে ও সংরক্ষণ করে।

সমযোগযোগী পরিস্থিতির স্রব সাধনা করলে অর্থাৎ—কর্তব্য ঘাং ও লতাওদ্ধারিকাত সার প্রয়োগে জমির দ্রুত নিলে জমিও তার প্রতিদানে অনেক দিতে পারে। জমির বহুদ্রুত, অলুপ্ততা দূর করে জমিতে এমনভাবে সমতল ও সারবাণ কোরে তুলতে হবে যাতে করে সকল কতুভেই জমি যথেষ্ট পরিমাণে যথিককে অর্থাৎ প্রথমশ্রী স্বরূপে শস্ত্রাদি বাহিত কল দিতে পারে। কলত শ্রম করা চাই, উপযুক্ত আদর না মাটিকে করতে হবে তবেই বাহিত অঙ্গাদি কুরি পরিমাণে আমাদের দ্বিমে আমাদের ঘর ভরে তুলতে পারবেন, আমাদের সকল অভাব থেকে আমরা মুক্তি পাবো।

রাজা পুখুকে তাই না ধরিত্রী বলেছেন যে আর যদি পেতে আশা করেন, প্রজাবৃন্দকে যদি বলগ্রন্থ অঙ্গাদি প্রদান করতে ইচ্ছা করেন, তবে মুক্তিকা যাতে 'বংসলা' হোয়ে প্রচুর গুণি অর্থাৎ অঙ্গাদি প্রদান করতে পারে

তেমন বংস চাই, দোহনপাত চাই, দোহনকর্তাও চাই (অর্থাৎ তদুপযোগী সার-প্রয়োগ, কৃষি-সরঞ্জাম ও জ্ঞান এবং প্রয়োগকর্তা অর্থাৎ কৃষকও চাই)। তাহলেই মুক্তিকা আশাহরণ কল ও অঙ্গাদি দিতে পারে। অগতির অধরুই তাহলেই দূর হতে পারে। "হো বোয় মুক্ত" অভিধান তবেই সার্থক হতে পারে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে মাটিকে বংসলা করার দিকে আমাদের দৃষ্টি নেই, আমাদের ধারণা কম, যথেষ্ট ও উন্নত ধরনের সরঞ্জামের অভাব, (যেমন সবল হস্ত ও কর্মী বলের অভাব, হারিত্র্যজনিত সরঞ্জামের অভাব), স্থিতিশীল, স্থলক কৃষকেরও অভাব। আর তাই আমাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতার পথবিস্ত হচ্চে। বৈজ্ঞানিকের হো অভাব নেই এখনকার দিনে, তবুও সার্থক চেষ্টা আর পর্যন্ত সম্ভব হল না। গত ১৯৩৬এর চুক্তি-সংকটের কাল থেকেই "হো বোয় মুক্ত" অভিধান চলছে, কিন্তু সংকটকে এড়ানোর মতো কিছু এতাবৎ করতে পারা যায় নি। এতে বৈজ্ঞানিকের অভিধানের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়।

এই ব্যর্থতার দল কারণ হুশুখেল ও স্থিতিশীলভাবে পৃথিবীকে 'বংসলা' করার কোনো চেষ্টা হয় নি। যা হ'য়েছে, তা বিকৃৎলভাবে ও বিকৃৎল, ইত্যদ ও অশাস্ত্রীয় অনৈতিক ভাবে—কাজেই হেরের অভাব ও দৈন্ত তাতে যোচে নি, হাদ্যকার আরো অবরগতি ঘন পৃথিবীজুড়ে মানবসাম্রাজ্যের ওপর চেপে বসতে চাইছে। এই সংকট থেকে পার পেতে হলে, আমাদের চারপাশ ও বাহিত কর্তব্যধারণ হতে হবে, যা-মাটিকে আর করতে হবে, তাকে 'বংসলা' অর্থাৎ উর্বর করতে হবে। মাভা-ধরিত্রী রাজা পুখুকে যে স্বপ্নদর্শন দিয়েছিলেন, আমাদেরও সেট পত্রাধর্মমত চলা বরকার। তবেই 'সোনার বাংলা', 'সোনার ভারত'—এই সব বৈশিষ্ট্যের সার্থকতা থাকে। আর, কিছু না হোক এদেশের লোক খেয়ে পরে বাঁচবে।

এখানে মা-মাটিকে 'বংসলা' করার অস্ত্রে কচুরীপানা থেকে কম্পাট সার তৈরীর প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক বিশেষজ্ঞের একটি লেখা উদ্ধৃত করছি। লেখক অবিদিত

বাংলার গবর্নরের এন্টো জুপারিটেণ্ডেন্ট, ই, এক, ওয়াশিংটন। ইং ১৯০৭ এর জাছুয়ারী সংখ্যা—‘ইন্ডিয়ান কানিং পত্রিকা’ উক্ত লেখাটি তিনি প্রকাশ করেন। সেখাটি সংক্ষিপ্ত আকারে বোয়াখালি গান্ধী ক্যাম্প কর্মীদের উদ্দেশ্যে লিখিত ক্যাম্প পরিচালকের পত্র থেকে এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হচ্ছে। এর প্রয়োগ ও পরীক্ষা অম্মেনলনবোগা।

“বাহাদুরের জমিতে কচুরীপানা অর্ধ হয় তাহাদের অনেকেরই ধারণা নাই যে কত মূল্যবান দ্রব্য আদিয়া জমিয়াছে। কচুরীকে এক আশ্চর্য জিনিষ বলা যায়। উহা সূর্যকিরণ হইতে শক্তি লইয়া অক্লান্ত সেলুলোজ (আপ পদার্থ) উৎপন্ন করে এবং সেজন্য জলের সাধে যে লবণাদি সার পদার্থ বহিয়া বাইতেছিল তাহা আটক করিয়া ভাণ্ডার গঠন করে লাগায়।

“কচুরী পানার মূল্য বৃদ্ধিতে হইলে কম্পোষ্টের মূল্য বৃদ্ধিতে হইবে। বধাযোগ্যরূপে তৈরী কম্পোষ্ট দৌবরাতির মত সার বাগ্য হইতে ভূমি আবৃত্তকীয় হিউমাস পদার্থ পচানো পাতা-আবর্জনারাজ্য মাটি পাইতে পারে। ঐ হিউমাসের অল্প অমির ক্ষুদ্র ত আছেই, কিন্তু ইহা চাচা এই কম্পোষ্ট সারে প্রয়োজনীয় জীবিত ব্যাক্টেরিয়া (জীবাণু) থাকে বাহারা হিউমাস বাইরা জীবন ধারণ করে ও ঐ হিউমাস ও ভূমিতে প্রাপ্ত অল্প হিউমাসকে উদ্ভিদের খাত্তোপযোগী রকমে পরিণত করে। সেই অল্পই কম্পোষ্টকে কেবল সার মাত্র মনে না করিয়া উহাকে জীবন দানের ব্যাক্টেরিয়াপূর্ণ জীব-পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই হেতুই কম্পোষ্ট সার ঠিক বপন করার পূর্ব সময় হালকাভাবে ক্ষেতে ছড়াইয়া দিলে সব চাইতে ভালো কাজ পাওয়া যায়।

“কচুরীপানা হইতে উৎকৃষ্ট কম্পোষ্ট করার অল্প ইন্দোয় পদ্ধতির মৌলিক তত্ত্ব স্বরণ রাখিতে হইবে। কম্পোষ্ট গুণ এমন হওয়া চাই বাহাতে উহার তাপ ১৪০° এক (৬০° সি) ডিগ্রী হয়। (ঐ তাপ চামড়ার কটে সহ্য করা যায়) উক্ত তাপ ক্ষুদ্র উৎপন্ন হওয়া চাই বাহাতে বীজ সমূহ ও পরকুলগুলি মরিয়া যায়। ঐ প্রকার উত্তাপ উৎপন্ন করার অল্প কার্বেটেশন পীলিয়া উঠানো চলিতে

থাকা আবশ্যক। কিন্তু ঐ প্রক্রিয়ায় এলিত উৎপন্ন হয়, কার্বেটেশন বন্ধ করিয়া দেয় যদি না ঐ গুণের সহিত কিছুটা ক্ষার পদার্থ মাটি বা ছাইএর আকারে মিশান হইয়া থাকে। গুণে বখাখোণা হওয়া চলাচল করার পথ থাকা চাই বাহাতে বায়ুভোজী ব্যাক্টেরিয়া বাচিয়া থাকিয়া কাজ করিতে পারে। উহাদের জীবন ক্রিয়ার অল্প কিছুটা অলীম পদার্থও থাকা চাই। এই ব্যাক্টেরিয়াগুলিই পাতা ও ঐ জাতীয় আবর্জনাখি উদ্ভিদ পদার্থকে সারে পরিণত করে।

“এই দ্রুতিতে ইহা সহজেই বুঝা বাইবে যে কচুরী-পানাকে তামাকাকীড়া অবস্থায় কম্পোষ্ট করা চলিবে না। এই প্রকার করিলে পুত্রেবর পাড়ে তোলা কচুরী যেমন দেখা যায়, তেমনি একটা বস্তুধে পিণ্ডে পরিণত হইবে। আবার উহা অতি শুষ্কও করা চলিবে না কেননা পেষণ করিলে পুনরায় কিছু জল ঢালিয়া উহাকে কিছু নরম করিয়া লইতে হইবে। জল হইতে কচুরী তুলিয়া উড়া পাতলা করিয়া জমিতে ছড়াইয়া শুকাইতে দিতে হইবে। আর এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ পরে উহা ঠিকমত শুষ্ক হইবে। কিন্তু এইরূপ করিতেও সাবধান হইতে হইবে যেন তাপ-ধরা এখন পিণ্ড না হয় বাহার ভিতর হাওয়া চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। একারণ কচুরীর সহিত এমন আরো কিছু বস্তু মিশান প্রয়োজন বাহাতে উহা ফাপা ফাপা আলুগা আলুগা থাকে। শুকনা বাস বা পাতা বা জগল মিশানো বাইতে পারে।

“প্রথম প্রথম অভিজ্ঞতা লাভের অল্প কম্পোষ্ট করিতে একটা বিশেষ বাধারীর ঢোলের আকারের পাঁচা বানাইয়া লওয়া ভাল। উহার তলা হইতে মাথার দিক কম পরিমার হইবে বাহাতে উপর হইতে টানিয়া তুলিয়া লওয়া বাইতে পারে। তলার দিকে ৫ ফুট ব্যাস ও দুই পাড়াই এবং মাথার দিকে ৩৫ ফুট ব্যাসের করা চাই। মাটি খুঁড়িয়া নরম করিয়া এই ফ্রেমটা তাহার উপর ঠাড করাইতে হইবে। মাথার দিক কমঃ দক্ষ করার হেতু এই যে বাহাতে বোকাই করা ও কাজ সমাপ্ত হইলে খাঁচাখানা টানিয়া তুলিয়া লওয়া যায়। খাঁচাখানার

তলার দিকের ছয় ইকি বাস ঘিঘা উপর বিকটা মাটি দেখিয়া দিবে। তলার ঘিঘা হাওয়া চুকিবে আর উহার দা ঘিঘা বাতাসের প্রবাহ চলিতে পারিবে না।

“অথ শুক কচুরীর সহিত অন্ন পাতা। অংগলাদি উদ্ভিদ-পদার্থ বা আবর্জনা বাহা পাওয়া যায় তাহা মিশাইয়া আধ হাত পুত করিয়া বিছাইবে। উহার উপর এক ইকি বা ত্রাহার অংশেকা বেশী পুত করিয়া বিছাইবে। গোয়াল ঘরের চোনামাখা মাটি এই কাজে সব চাইতে ভালো ভিনিষ। তাহার উপর এক স্তর শুভা মাটি বা চাই বিছাইবে। ভেনের মাটি, পোচালার আশেপাশের মাটি এমন ভাল, কিন্তু মাটি শুকনা হওয়া চাই এবং সমান ছড়াইয়া দেওয়ার যোগ্য হওয়া চাই।

“এই স্তর সমূহকে একশ্রেণী তল উপর করিয়া মিশ্রিত করিয়া ফেলিবে। কচুরীর প্রত্যেকটি পাতাতে একটু গোবর একটু মাটি লাগিরা থাকা চাই।

“যেখানে কম্পোষ্ট শুপের জমি তৈরী হইয়াছে তাহার উপর বাশের খাচাখানা পাড় করাইয়া উহার মধ্যভাগে একটি ৫ ফুট বীশ জমিতে হালকাভাবে খুঁড়িয়া পাড় করাইবে। উপরে বর্ণিত উপায়ে প্রস্তুত কচুরী, সার ও মাটির শুপ ভাংগিয়া তুলিয়া লইয়া ঐ মধ্যস্থ বাশের খাচাখানা বোঝাই করিতে থাকিবে। খাচা ভরিয়া গেলে কতকটা উহার উপরও শুপ থাকিবে। চারদিন এইভাবে রাখিবে। ইহাতে শুপের খ্যাড়াই বসিয়া গিয়া অর্ধেক হইবে। এষ্ট সময় মধ্যস্থ খাচাখানা তুলিয়া লইবে বাহাতে শুপের মধ্যে তাহার ল্প স্থান ঠাণ্ডা থাকিবে। ঠাণ্ডাখানা তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে বাশের পোড়ার বিকটা এত গরম হইয়াছে যে হাতে স্পর্শ করিয়া সহ্য করা যায় না। কচুরী, গোবর, মাটি ইত্যাদি নিয়মমত ভাল করিয়া মিশান হইয়া থাকিলেই এইরূপ উত্তাপ দেখা দিবে।

“হাওয়া চলার যে ঠাঁক একশ্রেণী খাঁচার মধ্যভাগে রাখিয়া গিয়াছে উহা হইতে বোঁতা উন্নিতেছে দেখা যাইবে। যদি এইরূপ তাপ না হয় তবে জানিবে যে মাস বেশী ভিজিয়া গিয়াছে এবং কম্পোষ্ট তৈরীর দিকে

অগ্রসর না হইয়া মাইলেজ বা সংরক্ষিত অবস্থায় থাকার দিকে গিয়াছে। এই প্রকার হইলে খাচাখানা তুলিয়া লইয়া শুপ ভাংগিয়া ফেলিয়া উহা দুই একঘণ্টা নাড়চোড়া করিয়া উহাকে শুকাইয়া বাইতে দিবে। পরে পূর্বের দ্রব্য পুনরায় খাঁচার মাঝাইবে। খাঁচার ভিতরের শুপ বিন পদর এইরূপ তল অবস্থায় খোঁড়াইতে থাকিবে, তাহার পর বীরে বীরে ঠাণ্ডা হইতে থাকিবে। যদি খুব-তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়, তবে জানিবে যে ছাই ও মাটি বড়টা প্রয়োজন ততটা দেওয়া হয় নাই।

“কুড়িদিন পর খাচাখানা তুলিয়া পাশে বসাইবে। এখিকে দেখিবে যে শুপটা গরম আছেই আর উহার গায়ে ছাত্তা ধরিয়া মাটি লাগাতে হইয়া গিয়াছে। এইবার শুপটা ভাংগিয়া নতুন করিয়া পূর্ববৎ খাঁচার মধ্যে মাঝাইতে হইবে। যে সকল অংশ বেশী শুকাইয়াছে তাহা খাঁচার মধ্যভাগে দিবে আর বেশী ভিজা অংশ খাঁচার গায়ে রাখা যাইবে, পূর্বের দ্রব্য বাসখানা পোতা থাকিবে ও চারদিন পর উহা টানিয়া তুলিয়া লইবে। ইহার পর সপ্ত দিন মধ্যেই খাচা তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর খাঁচার আবর্জক থাকে না। উহা এক নতুন কম্পোষ্ট শুপের জন্য লাগাইতে পারা যাইবে। দ্বিতীয়বার খাচা তুলিয়া লওয়ার পর যে শুপ হইল তাহা আর দুই মাস ঐ ভাবে থাকিতে দিবে। অর্থাৎ শুক হইতে তিনমাস সময় কাটিবে। তখন দেখিবে যে ঐ শুপ অনেকটা বাষ্পীয় রংএর সুরসুরে একটি পদার্থে পরিণত হইয়াছে। উহা তখন ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছে। শুপ পাড়াইয়া থাকা কালে যদি দেখা যায় যে উহা বেশী শুকাইয়া গিয়াছে তবে মাঝে মাঝে উহার গায়ে জল ছিটান বরকার হইতে পারে। যদি শুপ ভাংগিয়া তখনই ব্যবহার না করা হয় তবে উহাকে রন্ধা করার জন্য তপরে এক প্রস্ত মাটি ঢাণা দিবে ও উহা গন্ধের মত করিবে বাহাতে বৃষ্টি পড়াইয়া যায়।

“এই প্রকারে তৈরী কম্পোষ্ট কৃষকের একখানা ক্ষেতের ৭ অর্ধেকটাকে ব্যবহার করিয়া অপর অংশ পূর্ব মতো রাখিয়া ফসল উৎপাদন করিয়া কি ফল পাওয়া যায় তাহা দেখান বরকার। এইরূপ দেখানো হইলে কৃষককে আর এই

কম্পোষ্ট তৈরী করা ও ব্যবহার করার সস্তা উপরোধ অস্বীকার করার প্রয়োজন নাই। কি বে লাভ হয় তাহা ত সকলেই গ্রহণ করিতে পারিবে।

“এই উপায়ে কচুরী পানা ব্যবহারের লাভ বাহারা দেখিচ্ছে তাহারা এত আগ্রহান্বিত হয় যে সে-খানে বাহাতে পর বৎসর পানা জমিতে পারে এতটুকুও বীজের মতো পানাও আর সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না।”

কাম্বিরমিল গান্ধীকাম্পো এই প্রক্রিয়ার কচুরী পানাকে উৎকৃষ্ট কম্পোষ্ট সারে পরিণত করার একটা প্রচেষ্টা চলছে। জনস্বাস্থ্যসাধনকে এই প্রক্রিয়ার কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত করার অধিকে ‘বংল্যা’ করার চেষ্টার উদ্দেশ্যে

হতে বলি। বাংলা দেশের সর্বত্রই কচুরীপানা চরকের কাছে কৃষির অস্ত্ররায় বরাদ্দ হ’য়ে আছে। কিন্তু অল্পজন-সাধারণ ওর ব্যবহার জানিলে একে আর চর্বিবহ মনে কোরবে না। বসন্তপক্ষে ওটা যে প্রকৃতির কত বড় দান তা লোকের ধারণাতেই নেই। তা যদি জানত লোকে তাহলে কি একে ঘূঁষে পাওয়া যেত? ও যে সোনার চাইতেও মূল্যবান বস্তু আজ সেই পরিচয় পেয়েছি আমরা। এখন আর চর্বিবহ মনে হবে না। কোন দূর সমুদ্র হতে পাহাড় পর্বত অসম ভিগিরে আমাদের বাড়ীর ঘাটে এসে পড়িয়েছে ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ—আমরা কি আজ তা বুঝতে শিখব না?

হেথাও ওঠে চাঁদ

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

(১৬)

বালরা স্টেশন থেকে অল্পদূরে একখানা ছোট বাড়ী। বিজুবাবু সেখানে থাকেন। মালতীকে নিয়ে তিনি সেখানে ছিলেন। বাসায় একটি ও-বেশী কি ও একটি চাকর আছে। এরাই বিজুবাবুর সঙ্গী—আর তার সঙ্গী হচ্ছে দুই আংলারী বই এবং পত্রিকা। ওখানে বসে চালানী করবার করেন; তার অভাবও বেশী নেই; কাজেই অর্থোপার্জনের তাগিদও বেশী নেই। মনে কিছু হোমিওপ্যাথি ঔষধ আছে—আশেপাশের গরীবলোকদের বিনা পয়সায় ঔষধ দেন; ব্যবসায় করেন, বাসায় কিছু বাগান করেন; আশে-পাশের গরীব দুঃখীদের সুখ-দুঃখের খোঁজ নবর নেন; এবং এরপর যা অবসর থাকে তা বই ও পত্রিকা পড়ে কাটান।

মালতীকে বাসায় নিয়ে বিজু ঘর সরজা দব দেখিয়ে বলল—“এখানে তোমার সঙ্গী বেশী পাবে না। এখানকার গ্রাম্যচাষী ঘেরাঘেরা সঙ্গে একটু মিশো; তোমার মতো শিক্ষিতা নয়, কিন্তু এরা লোক খুব ভাল। আর সঙ্গী

পাবে এই বই এবং যদি লগ থাকে ঐ বাগান। তবে আমি ব্যবসায়ী লোক, আমার বাগান কিন্তু কেবল ফুলের নয়—ওতে ফলও আছে তরী-তরকারীও আছে আমাকে খুব বেশী সময় বাগার পাবে না মালতী, মতিয়া আছে—ও তোমার সঙ্গে থাকবে। বুধা চাকর পাক-লাক করবে—চমৎকার পাক করে।” বলে বিজু হেসে ফেলল।

মালতী বলল—“তা ওর কুত্তার মতো চেহারা সেখেনি বুকেছি; হাক, সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু বিজুলা, আমাকে মালতী বলে ডেকে না। নামের সঙ্গে অনেক গুণ্ডি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে ও-নাম পর্যন্ত ভুলতে চাই।”

বিজু—“তবে কি বলে ডাকব?”

মালতী—“কেন, মনে নেই সেই ছোট কালে আমার কি বলে ডাকতে? এখন খেলার সময় পাতাতাম—ডাক দিতে ঘেরী হ’ত, বা পাক ডাল হ’ত না, তখন যে চুলের গুড়ি ধরে খারতে, মনে পড়ে? তখন কি বলে ডাকতে?”

বিজু—“খেলার সময় ত’ বৌ বলে ডাকতাম;—তাই বলে ডাকব কি?” বিজু একটু হাসল।

মালতী বিজু মুখে বলল—“সে ত’ ছিল খেলা,—আর

এখন যে অতি কঠোর বাস্তব জীবন বিকুশ। আমার তখন একটা নাম-ও 'ত' ছিল, বিকুশ। যে নাম ধরে ভূমি ঘরের পিছন থেকে ভাক সিতে আর রোজ ঠান্ডারমা স্তোমার মুখারির ব্যবস্থা করতেন।"

বিকু—"রাধা, রাধু না-রে। রাধু, তখন তোকে খুব মারতাম, না? আমার উপর খুব রাগ হতো না তো?"
রাধা চুপ করে রইল—মতীতের ছবি তার মনের পথে একে একে ফুটে উঠতে লাগল। সত্যিই বিকুশ। মারে মাকে মারত—তবুও তাকে না হলে খেলাই যেন চমত না।

মতিয়া ও বুধার জিম্মার দালতীকে রেখে বিকু নিজেই কাজে একটু বেরিয়ে গেল। মতিয়াকে সে বলে গেল—
"মতিয়া, মতিজীর সব কাজ ঠিক মতো করে দিল—গোছল ঘরে ভাল দিল।".....তারপর রাধার দিকে ফিরে বলল—"রাধু, আমি একটু কাজে বের হই—সকালেই ফিরে আসব। তুই জান করে নে আগে—তারপর একটু বিশ্রাম কর।"

রাধা তাকিয়ে কেবল রোদের তেও তখন বেশ গ্রন্থর হয়েছিল। সে বললে—"এই রোদের মধ্যে যাচ্ছে, কখন ফিরবে বিকুশ?"

বুধ তার নিশ্চিত বাংলা ভাষায় বলল—"বাবু ত' রোজ এই রকম দাঁড়িয়ে—কত মানা বরি, শুনেছে না। এখানে-ওখানে কার কি অস্থ আছে, কার কি লাগবে—যিন ভর কেবল তাই চুরে বেড়াবে।"

বিকু একটু হেসে বলল—"খোঁটা নালিস করছিল! আজ্ঞা সেখান—সব্বর কর।"—একটু হেসে সে বেরিয়ে গেল।

রাধা জান ক'রে এলে পর বুধ তাকে চা এনে দিল। চায়ের সঙ্গে হালুয়া। চা ও হালুয়ার চেহারা দেখে রাধার চক্ষু স্থির। রাধা বলল—"এটা কিয় বুধ?"

বুধ—"চা আর হালুয়া আছে দাঁড়ী। আজ্ঞা হচ্ছে না?"

বিড়বিড় করে রাধা বলল—তোমার মাথা হয়েছে—
তারপর বুধকে বলল—"বা এখন তুই তোর কাছে যা।"

জানলা দিগে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখেছে—
হাওড়ার উপর দিয়ে রোজের ডেউ খেলছে। অল্প দূরে ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। তাদের রিত অদে রোদের কলক গিয়ে পড়ছে। চোখের সামনে কেবল লালচে মাটি। হুজলা জামলা বাংলার মেঘে রাধা তাকিয়ে দেখেছে এই কল্প দেশ—কোথাও এর সন্মততা নেই, সবই এখানে বর সৌন্দর্যে লুপ্ত হয়েছে। তার মনে কেবল একটা আতঙ্কের স্থিতি হল। চোখ পে ফিরিয়ে নিল এই লুপ্ত থেকে। শুধান থেকে রাধা গেল রাসার ঘরে। সেখানকার অবাবস্থা ও বিশৃঙ্খলা দেখে সে আর নির্বিকার তট্টা থাকতে পারল না। তট্টা থেকে উপদেষ্টা এবং তারপর নিজেই কর্ণচেষ্টার মেঘে এল।

বেলা বারটা বেজে গেছে—রোস থা থা করছে, এমনি সময় বিকু ফিরে এল। রাধাকে অস্ত্র ঘরে না দেখে, মতিয়াকে জিজ্ঞাসা করল—
"মতিয়া, বলল, রাধা থাকের ঘরে আছে। বিকু থাকের ঘরের দরজার এসে দেখে কোমরে আঁচল জড়িয়ে রাধা বহুতে পাক করছে; উনোনের আঁচ তার মুখের উপর পড়ছে। বিকু বলল—
"বা, এই ত', বহুদিন পাবে আজ পেট ভরে খাওয়া বাবে।"

রাধা পিছনে তাকিয়ে বলল—"কেন, বুধার পাক তোমার খুব ভাল লাগত না। খুব ত' নাকি উমদা পাকাত—রোজ ভূমি মুখ্যাত করত।"

বিকু—"তা, করব না কেন, ভাত চমৎকার পাক করত—তোমার চেয়ে ভাল ভাত পাক করবে। তোমার মত কেন কেলে মিত না। আউর চোখা আউর ভাঙ্গি।"

রাধা—"চোখাটা কি? বা পেটের ভিত্তর গিয়ে চোখা শিংয়ের মতো খোঁচায়—তাই কি?"

বিকু—"আরে নেই নেই, চোখা বহু উমদা চিহ্ন—
হাকে মছলীখোর বাঙ্গালী বলবে শিঙ বা জাতে—বুধা আনুশিঙ বা আনুভাতে। আর ভাঙ্গি জানতা নেই বাংলারও ত' বুধা—ভাঙ্গি কিছ কো কহতা হৈ।"

বুধা উৎসাহের সহিত বলতে লাগল ভাঙ্গি কাকে বলে। দু'জনের ব্যাখ্যা থেকে রাধা এইরূপ বুঝল যে শাক থেকে আরম্ভ করে আলু, কুমরী সব কিছুইই একমাত্র

পছন্দ হল ডাকি ;—এটা বাসালী ঘরের না তরকারি না ভাঙ্গা—মাকানারি একটা অবস্থা।

সন্ধ্যার পর বিষ্ণু ও রাধা ব'সে গল্প করছে। বৈকালে ওরা খারের পাছাড়ের কাছে বৈকালে গিয়েছিল—রাধা মাটির প্রান্তের পেরিয়ে ঘেঁটে আসতে রাধার বেশ কিছু পরিশ্রম হয়েছে। বিষ্ণু বলল—“তোমার ত' খুব কীয়ে পেরেছে নিকট?”

রাধা—“কুখার পেটের নাকিহুড়ি জলে যাচ্ছে। এ তোমার রান্ধলে বেশ।”

বিষ্ণু কুখাকে ভেঁকে ধিল—কুখা কী ও কিছু কল এনে ধিল। রাধা বলল—“হা, চা ঘিবে না।” বিষ্ণু বলল—“এই সরসের মধ্যে চা বাবে?”

রাধা—“Tea Market Expansion Board-এর বিজ্ঞাপন দেখাও—গ্রীষ্মে উষ্ণ চা বিক্রয় কারক।”

কুখা চা-ও নিয়ে এল। বিষ্ণু বলছে—“এখানে তোমার খুব একা একা লাগবে। B. A. পরীক্ষার পড়া শুরু কর। পাকের ঘর থেকে কুখাকে একেবারে নির্বাসন দিও না—অবশ্য একেবারে গর একাধিকারে পাকশাল যে ছেড়ে দিতে পারবে না, তা আমি বুঝি। একটু-আধটু বেধিয়ে দিও। নতুবা তোমার হস্ত অধঃপেটা খেয়ে থাকতে হবে।”

রাধা—“তুমি কি ভেবেচ, আমি তোমার হু' বেলার রাধুণী হয়ে এগেছি?”

বিষ্ণু—“আমি কি তা বলছি। তবে ভয় হচ্ছে—নাথই যায় রাধা, সে রাধুণী হবে না আর কি হবে।”

রাধা হেসে ধিল ;—বলল—“বিষ্ণু, হা তোমার পাচক, তাতে বাধা হয়েই রাধা ঘরে বেঁটে হবে। এই খেয়ে তুমি কি করে থাকছ এত বছর?”

বিষ্ণু—“বেশ, ভালমত সবই হল তুলনামূলক। আমার একবার জীবন—মনে মনে নিজের একটা ধায়া গড়ে নিয়েছিলাম। তার মধ্যে খাওয়াটা নিত্যস্বই বেহের কর্মক্ষমতা বজায় রাখার স্তর। সেখিক ঘিয়েই আমি দেখছি ;—স্বাভাবিক বিক বিধাও যে খাওয়া বিচার করার প্রথা আছে, সে কথা মনেও হয়নি।”

রাধা—“এইভাবে একবার জীবন নিয়ে দেখানির্বাসনেই বা জীবন কাটাচ্ছে কেন?”

বিষ্ণু—“খোয়া শ্রমটা অতি সহজভাবে করলে, কিন্তু এর জবাব তেমন সহজ নয়। এক কথায় মানুষের জীবনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তুমি আমায় আমার এই অরহো আশ্রয় নিলে কেন? এর কি জবাব দিতে পার?”

রাধা—“আমার জীবনের সহিত কি তোমার জীবনের তুলনা হয়? আমার ভাঙ্গা তরী,—কোনখানে এগেছি।”

—“এটা কোন জবাব হল না রাধা। হাক ও-কথা ছেড়ে যাও……”

—“না, তা হবে না। বলো তোমার সব কথা। এখানে এগেছি প্রায় পোনের বিন হল। এর মধ্যে তোমার লগে আমার প্রায় কোন কথাই হয়নি। আমাকে এরকম দুঃস্বপ্ন করে রাখলে……”

—“এই বুক হল মেয়েলী অস্ত্রের গেল।। রোজ কত কথা বলছি, তবুও……”

—“হা, কথা বলছ বৈ কি, কেবল চাট। বিজ্ঞান—খাওয়ার কথা, আমাকে তুলিয়ে রাখার কথা, এসব ছাড়া একবারও বিজ্ঞাপন করেছ, কি আমার হয়েছে, কেন আমি এখানে এগেছি। বড় আশা করে তোমার আশ্রয়ে এলাম, আর তুমি বিনশাত তোমার কাজ নিয়ে খুঁজছ, আর আমার সঙ্গে উন্নতির আলাপ করছ।……বলতে অভিমানে রাখার কষ্ট রক্ত হয়ে এল।

কিন্তু রাধার একপাশা হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে বলল—“রাধা তোমার লগে উন্নতির আলাপ করিনি। জীবনে অনেক গুণ পেয়েছিল; সে সব কথা তোমার ও বলতে কষ্ট লাগবে, আমারও শুনতে কষ্ট লাগবে। রাধা, তোমার জীবনে কি খট্টেছে না খট্টেছে তা দিও ত' তোকে চিন্তে হবে না। আমি তোকে চিনি, তাই তোমার জীবনের খুটি-নাটি ঘটনাকে জানবো বা চিনবার আমার দরকার নেই। তাই ওসব অশ্রীতকর কান্ডি শুনতে চাইনি।……”

রাধা—“বত দুপেরই হ'ক, কাউকে বলতে পারলে

মনের ভার অনেকটা লাঘব হয়। আমার জীবন এমন দুর্বল যে সহ্যক্ষমতা নিয়ে আমার কথা শুনবার লোক-ও পাই না।”

—“রাধা, এ-ও তোমার খুব ভাল কথা। তুমি দুঃখের কথা বলতে চাইলে সহ্যক্ষমতা সহকারে শুনবার লোকের অভাব নেই। সহ্যক্ষমতা-ই লোকের কাছে বড় কথা নয়; আসল কথা হ’ল তোমার দুঃখের জীবনকে কেউ শ্রদ্ধা করবে কি না? সহ্যক্ষমতা অনেক সময় একটা ভাবনিক ব্যাপার। তোমার জীবনকে যে দিকার দিবে, বিব্রণ করবে, সে-ও হয় ত তোমার দুঃখের কাহিনী শুনেতে আঁহা, উহ করবে বা ছ’কোটা চোখের জল ফেলবে।।।”

“তোমার কাছে কিছু না শুনেও তোমার জীবনকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারি। আমি জানি—তুল তুমি বরেন্দ্র—তার ফলে নিজেই আত্মত পেয়েছ, নিজের জীবনকে কত বিকৃত করেছ: কিন্তু হীন বা নীচ তুমি হও নি, যার মত তুমি আমার শ্রদ্ধা হারাতে পার, আমার স্নেহ হারাতে পার।।।”

রাধা একটু পর বলল—“তুমি জান না, কত ধারণা আমি, কত অন্তর আমি করেছি।।।”

—“রাধা, অন্তর-ও সকলেই করি, ধারণা বান-ও সকলেই করি। তাতে মাছ ছোট হয় না, নীচ হয় না। তাতে মাছ দুঃখ পায়, কষ্ট পায়। একটা কথা মনে রেখো—বত বড় তুল, বত বড় দুঃখ, বত বড় অন্তরই জীবনে আহুক, মাছ তাকে তার জীবনের আশীর্বাদে রূপান্তরিত করতে নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। জীবনের প্রকৃত বল মাছ তা থেকে পেতে পারে।”

রাধা বলল—“বিক্ষুধা, নীতিগতভাবে কথাটা খুব সহজ, কিন্তু বাস্তব জীবনে একে সত্যি ক’রে নেওয়া বড় কঠিন। ...দুঃখের চাপে, তুল ও অন্তরের চাপে মাছের জীবন হুঁপ হয়ে যায়—ওড়িয়ে যায়। যেখান তুমি বিক্ষুধা?—কোথায় যেখানে তুমি।—তোমরা পুঙ্খ, নিজের পৌঙ্খ পর্বে তোমরা অন্ধ। মাছের জীবনের দুঃখ বেধবার তোমাদের অবসর কোথায়?”

বিষ্ণু—“রাধা, তা যেখান—প্রতি ঘরে ঘরে তা যেখান। আমরা পরদীন দেশের মাছ। দুঃখ-কষ্টের পেশে জীবনের তুল-ভাঙ্গির চাপে মাছ ওড়িয়ে যায়, চুরিয়ে যায়;—এ দুঃখের অভাব আমাদের দেশে হবে কেন? কিন্তু তবুও যেন মাছ দুঃখ-কষ্টকে অর্থ ক’রতে পারে, তুল-ভাঙ্গির উপরও উঠতে পারে। মাছ নিজের জীবনকে গ’ড়ে নিতে পারে, নিজের জীবনকে চালিয়ে নিতে পারে—এটা মনে রেখো রাধা।”

রাধা—“হাই পারে। এটা তোমাদের পুঙ্খের অহঙ্কার। আমার জীবন যেখান। কত দুঃখ-দৌখ পড়েছিলাম—নিজের মত ও পার্শ্বচরদের মত। জান ত? তুমি, আমার চোঁচ-ও অভাব ছিল না। ইচ্ছারও অভাব ছিল না। সব সময়ে নিজের জীবন-ও ছাঁবার করলাম—সঙ্গে সঙ্গে ছ’টি পুঙ্খ ও ছ’টি নারীর জীবনও নষ্ট করলাম।।।

“তুমি কি বলতে পার আমি এ সব চেয়েছিলাম? নিজের অন্তরে নিয়ে ছিন্মিনি খেলতে চেয়েছিলাম? চার চারটা মাছের জীবনকে নষ্ট করতে চেয়েছিলাম আমি?...”

নিজের কথা উত্তেজনার রাধা দীর্ঘশ্বাস নিতে লাগল। অন্তরের আবেগে তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল—একটা ইন্ডিন নিজের আবেগে যেন কাঁপতে থাকে। বিষ্ণু এক হাতে রাধার হাতখানা ধ’রে অপর হাত তার উপর বুলাতে লাগল—যেন সাপের ওকা হাত বুলায়ে সব বিষ বের ক’রে নিচ্ছে। শরীরের এতটুকু অংশে যে স্পর্শ সে পাচ্ছে তা যেন তার সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হচ্ছে।

বিষ্ণু বলল—“রাধা, জীবনে আমরা কি যে চাই আর কি যে চাই না, তা নিয়েই হয় গোলমাল। দৌবনের প্রারম্ভে এক অস্বীকার বিধবীর স্পর্শ পেয়েছিলাম। তার অন্তরের আগুনের ছোঁয়াচ পেয়ে আমার অন্তরেও আগুনের তুলকি বেধা দিল। তুল হল;—মনে করলাম, ঐ আগুন বৃষ্টি আমার সত্যিকার সম্পদ। তার সঙ্গে হুঁপা চলতেই তুল ধরা পড়ল, তার অন্তরের আগুনে তার পথ যখন উদ্ভাসিত, আমি তখন দেখছি চারিদিক

পোষায় আত্মর-বোর অন্ধকার। কুলের দণ্ড আনাকে পেতে হয়েছে। যা আমি চেয়েছিলাম, তা কুল করে ছেড়ে দিয়েছিলাম—মনে করেছিলাম, তা পাওয়ার চেয়ে তা ভাগ করার জীবন আমার দীর্ঘ হবে—স্বপ্নী হবে। যা আমি চাইনি—তাকে মনে করেছিলাম চেয়েছি। আর তাকেই স্বাক্ষরে ধরে বিখ-মালিন্যের জালা বোধ করছি।—সেখেন্দ্র, রাধা, ছোট পিত্তা অনেক সময় মগ-মগে আগনের অন্ধার ধরে এবং কখন ঘুবেও যেন। সত্যি-ই কি সেই পিত্ত অল্প আগনের অন্ধার ঘুবে দিতে চেয়েছিল? কি যে সে চায়, তা মাহু অনেক সময় জানতে পারে না;—তাই দণ্ডও তাকে পেতে হয়। পিত্ত বা প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষ—কেউ-ই এই কুলের দণ্ড থেকে অব্যাহতি পায় না।”

উভয়েই কিছু সময় চুপ করে রইল। তখন রাত একটু হয়েছে। বিনের দাহ রাতের স্নিগ্ধতার কাছে হার মেনেছে;—ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আকাশে কৃষ্ণপঙ্কজের চাঁদ উঠেছে। স্নিগ্ধতা ও চাঁদের আলো মিলিত হয়ে হাওয়ার ভেসে আসছে; আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে কুল-বাগান থেকে কোমল সৌরভ। দূরির মাঝে প্রান্তর ছড়িয়ে আছে—লোকবাসের ছেন তার অগ্ৰহানি করেনি। এই কৃষ্ণহীন প্রান্তরকে দিনের খর তাপে মনে হত কৃত সর্ব্ব দুঃখ-বুঝ মানবের উত্তর জীবন; রাত্রির সুরভিত, স্নিগ্ধ, আলোর খাতায় তাকে দেখাচ্ছে—উল্লার উন্মুক্ত মানব জীবন যেন প্রকৃতির আঙ্গানে মাড়া মিছে—যেন প্রেরণীর প্রতীক্ষায় প্রসারিত করে মিছে তার কৃষ্ণের কল্পন;—কঠোর মাটির স্পর্শ এড়িয়ে সেই নৃৎ বক্ষ স্পন্দনের তরঙ্গধারায় নেচে নেচে তার দয়িতা আগবে—যেন তারই প্রতীক্ষার সে আছে। উভয়েই দৃষ্টি বাইরের দিকে আকৃষ্ট—যেন নিম্ন নিম্ন অস্তর বাইরে প্রসারিত হয়েছে।

রাধা বলল—“আমার জীবনের সব কথা শুনবে, কিছু না? কাউকে না বলতে পারলে যেন আমার পক্ষ কেটে সব বের হচ্ছে। শুনবে, বৈধ হবে তোমার?”

—“বল, শুনবে না কেন?”

রাধা বলতে শুরু করল—তার জীবনে প্রথম চাওয়া ও প্রথম প্রত্যাখ্যান এল বিষ্ণুর কাছে থেকে, তখন সে কেশবলায় কৈশোর ও যৌবনের প্রাণ দীপায়; চাওয়ার গভীরতা বা প্রত্যাখ্যানের বেধনা—কোনটার পূর্ণ পরিমাণই সে তখনও করতে শিখে নি। সন্ধ্যা-শাসনকে যেনে বিষ্ণু যখন তার সব ভাগ্য করে চলে এল, তখনও রাধা ঠিক জানে না, এর পরিণতি কোথায়। সেখান থেকেই শুরু হল তার বিচ্ছিন্ন জীবন ও প্রত্যাখ্যান যৌবন। তার প্রত্যাখ্যান যৌবন যখন তার আত্মীয়-স্বজন সকলের পক্ষে এক দুর্ভাবনার বিষয় হয়ে উঠল, তখন সে কি করে কলিকাতায় এল, সেখা-পড়া শিবল, কুলে মাঠারীর কাজ নিল। দিন তার আগছিল আর ঘাচ্ছিল—একের থেকে অপর দিনের মধ্যে কোনই পার্থক্য ছিল না;—তার মনের কাছে কোন দিনেই কোন বিশেষ স্বপ্ন-গন্ধ-বর্ণ ছিল না। একঘেয়েমির বোতা তার মনের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল—কোথাও এতটুকু বৈচিত্র্য নেই—সবস্ত অস্তরে এতটুকু কল্পনার সন্ধান-ও সে পাচ্ছিল না, তার প্রবাহে মনের সঞ্চিত জ্বালি, জ্বাট নীধা এক ঘেয়েমির জড়ত গলে দেব হ’তে পারে। এমন সময় এল তখন,—এক উষ্ম প্রাণ তার জীবনের উপর দিয়ে ব’য়ে গেল। মনে করল এই প্রাণ-প্রবাহে তার তরী ভাসিয়ে দিতে পারবে। তারপর যখন সন্ধ্যা ছেড়ে তরী ভাঙতে গেল, দেখে তার নিচেকার সব জল ঘুরে সরে গেছে;—তার তরী ভাঙার আটকে আছে।

আবার দিন চলল—কিন্তু গভীরনের সঙ্গে পরের দিনের বা আত্মকর দিনের সঙ্গে আগামী দিনের মধ্যে মনের দিক দিয়ে কোন ছেঁদ-ই নেই;—সবই তেমনি ভগ্নহীন, ভগ্নহীন, গভীরহীন—কোন মাধুর্য তার বহন করে জানে না। তুমার চাতক এক বিষ্ণু বারির মন্ত্র শুভ কণ্ঠে চীৎকার করছে; অথচ আকাশের গায়ে—একখণ্ড জলহীন লাল বেধেরও সন্ধান পায় না—যা দেখে সে অস্তিত্ব প্রত্যাবার শান্তিও পেতে পারে। জীবনে যার প্রাণা কিছুই নেই—কোন আশা-ই তার নেই, তার পক্ষে প্রত্যাবার বা সন্তের কণিক আশাও যে একটা পুঙ্ক এনে

৩৫। তাও তার জীবনে খেপা মিছে না—ওধু থেকে থেকে অতীতের একটা বেদনা। তখন? তখনকে কি সত্যি পে বুঝেছিল? না, ভোলেনি। সমস্ত অতীতের বেদনা ও অশ্রুমানের সঙ্গে সে মজিয়ে ছিল। তখনই বুঝি কি কোন আনন্দের তখন তাকে দিয়েছে? না, তা ঘেঁষে নি; নিয়েছে হাঃ—অন্তর্জালা। তখন তাই মনে সত্যিই সন্দেহ জাগল—সে তখনকে কতটা ভালবাসত। হৃদয় মোটেই বাসত না। হৃদয় সামান্য একটু বাসত। নিজের মনের দিকে দৃষ্টি পড়ল—বিলম্বের এক কর্তব্য রূপ ফুটে উঠল। তাই তাকে নিয়ে দাঁড়াতে করতে বিশেষ সাহস হল না। মনের অন্ধ বিপর থেকে ছোট ছোট কালপাপ বেরিয়েছে! কি ছিল তার মনের গল্পের? এই সব কালপাপ লুকিয়েছিল তাই মনের চক্রে রক্ত?

বহু করে মিল সে মনের জানালা—যে জানালায় ঐক্য দিয়ে তার আত্ম-বিলম্বের আলো মনের অন্ধকার কোণ-গুলিকে আলোকিত করছিল।

তারপর এল বিমান। সে এল তার দুখে সঙ্গাতৃষ্ণা নিয়ে, তার মর্যাদা-বোধকে জাগিয়ে তুলতে। ব্যথার জালায় সে বিব পান করল—যা ছিল মানিশের প্রথম; যা ছিল মানিশের দ্বিতীয় প্রলেপ, তা সে পান করল দ্বিতীয় ঔষধ মিলে। সমস্ত মেহে জালা দূর পেলে—অন্তঃ জগৎ, মেহের ভিতরে-বাহিরে অন্ধ জালা বোধ করছে। আগুনের মতো বিব মজিয়ে আছে তার সংস্পর্শে, সর্ব ইন্দ্রিয়;—ভিতরে তার জলে বাজে—সমস্ত সাগরের জল ঢাললেও যে সে জালা থামবে না। কি নির্ভর সে স্তম্ভিত, যে নারীকে এমন করে স্তম্ভিত করেছে—শিখিল পথেই তার শায়া জীবন চলতে হয়—সব পথই তার চড়াই—একবার পা পিছলে গেলে কেবল নীচের দিকেই তাকে টানবে;—হৃৎকীর অন্ধকার গল্পের তাকে গ্রাস করার জন্য যুব ব্যাসন করেই আছে।

আর্তবোধ সে বলল—“বিকৃতা, কোন অব্যাহতি নেই আমার? এই অন্ধকার গল্পের আনি বেতে চাই না। কেউ কি আমাকে বাঁচাতে পারে না? তুমি-ও পার না, বিকৃতা!”

বিকৃ উঠে তার মাথা নিয়ে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল—“রাধা, কোন ভয় করি না তুমি। কোন অমঙ্গল আমার আশ্রয়ে তোকে স্পর্শ করতে পারবে না।” রাধা হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল,—বিকৃ তার মাথায় হাত বুলায়ে তাকে সাহায্য দিতে লাগল।

বিকৃ বলল—“রাধা, জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছ,—কিন্তু নিজের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে তোমার বুজ থাকলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। গোকার আগুনে জাপিয়ে পড়ার মতো যদি তুমি ভুল করে আগুনকে আলিঙ্গন কর, তবে তার জন্য দণ্ড পেতেই হবে। আমাদের সংস্কৃত মর্মে একটা কথা আছে—জানমাতা বিদ্যাপাহারী—কেবল দুই অঙ্গহারা জান—যে অঙ্গে জান লাভ করা হয় এবং যে অঙ্গে জান চলে যায়। আমাদের জীবনের অনেক কিছুই এইরূপ বিদ্যাপাহারী। বিশেষ করে, আমাদের অনেক চাওয়াই ঠিক বিদ্যাপাহারী। তখনকে কখন যে তুমি চাইলে এবং কখন যে সেই বাসনা হারালে—হৃদয় কেবল তারই একটা কীল বোধ তোমার আছে, সত্যিই তাকে চেয়েছিলে তারই একটা বেদনাময় বৃত্তি রেখে সব চলে গেছে। বিমানের বেলারও ঠিক তাই। এর নাম সত্যিকার চাওয়া নয়, ভালবাসা নয়।...”

একটু থেমে আবার বিকৃ বলতে লাগল—“কাতুক্ষুণ্ণ দিয়ে লোককে হাসানো যায় জানো? সেই হাসি-ও যেমন হাসি নয়, তখনের প্রতি, বিমানের প্রতি তোমার ভালবাসা-ও ভালবাসা নয়। এ ঠিক কাতুক্ষুণ্ণ দিয়ে আহার করা। তখন না এসে যদি পবন বা বরুণ এসে তোমার মনে কাতুক্ষুণ্ণ দিত, তবেও ঠিক এমন-ই তুমি সাড়া দিত। কোন পার্থক্য তোমার মনে হত না। তখনই চরিত্রের কোন দিকটা তুমি লক্ষ্য কর, বল দেখি? তার চরিত্রের প্রতি যদি তোমার প্রভা থাকত, যদি তার উপর নির্ভর করার সাহস থাকত—এ দুটো হল ভালবাসার অপরিহার্য অঙ্গ—তবে তুমি, বলতে পারতে—

একো হি যোবন্তনগ্নিপাতে নিমক্কাহীলো: কিরণেধি-বাক্য—চন্দ্রের কলসের মতো বহু গুণের মধ্যে একটা যোব

জুবে ঘাঘ। তোমার ভালবাসায় সে দূততা তো ছিল না।
এত ভুলে যে ভালবাসা, তার কি নাম আছে ?

“Welding” যেনে—দুখও দখ খাতুকে (ভোড়া)।
লাগাতে যেনে? অতি তীব্র আঙনের তাপে তাদের
নরম করে নেয়—প্রায় গলিয়ে নেয়। দুটি প্রাপ্ত বয়স
নর-নারীর হৃদয়কে এক সঙ্গে যুক্ত করতে হলে,
ভালবাসায় তেমনি সাহন চাই—যাতে দুটি হৃদয়ই নতুন
গঠনোপযোগী কোমলতা পায়, প্রায় গলে যায়।

“না ও ছেলের মধ্যে যে বন্ধন, তা অতি সহজাত ;

ছেলের কত অপরাধ মা ক্ষমা করে ঘাঘ বলত’ ? নর-
নারীর সম্পর্ক তেমনি সহজাত নয়—এখানে পরকে আপন
করতে হয়। এখানে ভালবাসা অরণ্য কত ঘাতলহ
হওয়া সহকারী ? এদের প্রেম আরও কত দূর হওয়া
সহকারী ?—যাতে বাহিরের অস্ত্র শত বন্ধন ছিন্ন করে
দুটি হৃদয়কে এক সঙ্গে মূড়ে দিতে পারে।”

একটু খেমে কিছু বলল—“এখন গঠো, রাখো। জানের
ঘরে গিয়ে আন করে ফেলো—শরীর ও মন দুই-ই ঠাণ্ডা
হবে। অনেক রাত হয়েছে—।”

বিশ্বদেব

মৃত্যুর রাইতি

জীবনের ভরী পেগেছে আজিকে বাতাসেবের ঘাটে
হাবার ভাক বে এসেছে আমার ঘারে,
ওপারে হোখার দিনাবলানের দূর প্রান্তর পারে
নেমেছে সূর্য অস্তাচলের ধারে।
শিঘরের ঐ বাতাসন হাঁত
তব হৃৎ আসে আলোকের স্রোতে,
সে হৃৎ অগাধ কত দিবনের শক্তি বেষনারে
চেয়ে আছি তাই দিগন্ত পরপারে।

আমার নমনে নামিয়া এসেছে মৃত্যুর মলিনতা
জীবনের দীপ শুধাবে শূন্যতায়।
তাইত তোমার আলোর দেবতা দেখিবার ব্যাকুলতা
ঈশ্বার নামিছে মাঠের রিক্ততায়।
হৃদয় ভূমি তব অভিশার
বার্ষ হয়েছে কত বার বার,
প্রদোষ-বেলায় যখন নামিছে নিবিড় নির্জনতা
পাঘ কি তোমার অশ্রু-সিক্ততার ?

ঐ দেখা বার স্বর্ণ স্রোতের সর্গবিহীন তীরে
দূর বাদুস উষর আভরণ।
আরও আলো আখির মাখায় তাহার উপর ধীরে
বিপুল বিশ্ব বিমূর্ত বিমগন।
নবীতীরে আর প্রান্তর পরে
বনের পাতার নব শিঘরে,
সে রঙীন আলো আপনি লুটায় আখির-ঈচল ঘিরে
একি ধরতীর অপকল্প প্রসাধন !

করেছিছ তব এ জীবনে আর পাবনা তোমার পেখা
হয়ত পাবনা পৃথিবীর পরিচয়।
জীবনের মানি পূর্ণ হয়েছে হিলাঘ বয়েছে লেখা
শুধু যে করেছি কী পাপের সঞ্চয়।
মনে ভেগেছিছ যবে সিনমান
ঈশ্বারের ঢাকিরা হয়ে বাবে মান,
হয়ত তখন মুছে বাবে মোর জীবনের পথ-বোনা
আমি শুধু গাঘ দিনান্ত পরাভয়।
সে তুল আমার হেগে গেছে আঁখি সেনেছি বিশ্বদেব
অস্ত্রাশ্রয়ের দিগন্ত-ভরা ছবি।
মৃত্যু আমার মধুর হয়েছে কিছু নাই মোর খেব
প্রাণের আকাশে উষর হয়েছে রবি।
অচেনা আমার নহ তুমি কত
কত পরিচয় তব সাপে প্রত্ন,
কত অনন্দের জানা পোন। শুধু এই অনন্দের নহ
অস্ত্র-আলোক অরণ হয়েছে সখি।

এবনি ঈশ্বারে ঢাকিবে আকাশ তুমি ত আড়ালে বাবে
পৃথিবীর পথে ঢালিবে অন্ধকার।
এই জীবনের প্রান্ত বেলায় প্রদোষ এখন হবে
মুক্ত হয়েছে মৃত্যুর ঢাক;
তাইত আজিকে তব শেষ ধান
নীলবে লটুছ হোক না সে মান,
নিঃশেষে এই নিঃশব্দ প্রাণের এ পেছ ঘুমায়ে রবে
সায়ছে তাই রহিল নমস্কার।

মহাকাব্যের ভূমিকা

নগেন বসু

(১)

ঠাকুর ঘরে মা তব পাঠ করে আর শাস্ত্র তাই চুপ
করিয়া বলিয়া শোনে। মা পড়ে :

শম্ভু-চক্র-গলা-পদ্ম-দ্যৌঃ বিষ্ণু মুষ্টি। চারিবারে তার
বিচিত্র ফুলের সনাতন। চকনের বৃদ্ধ পড়ে, ধূপের ধোঁয়ায়,
ফুলের স্বপ্নে কেবল তার মন, গৃহের গীতাবলি আবহাওয়া
মবিত। সন্তোষিতা মায়ের নীরব নৃষ্টি শাস্ত্রের মনে প্রগাঢ়
বিস্ময় ছড়াইয়া দেয়। উজ্জ্বল লগাটের মতো উজ্জল
শিখরের (চোটা), আরও আকর্ষণ করে শাস্ত্রের মনকে। সে
একবার বিষ্ণুমূর্তির দিকে আরেকবার মায়ের দিকে
বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে তাকায়। অলঙ্কারালোচনার মতো
বিষ্ণুর মূর্তিখানি স্পষ্ট বিরাজমান। শাস্ত্রের মনের গহনে
একটি প্রীতির লতা বাকিয়া-বাকিয়া আশ্রয়ল প্রীতিয়া
বেড়াই। বিষ্ণু মূর্তির দিকে তাকাইয়া বড় মায়া হয়; ইচ্ছা
হয় ঐ নীরব নৃষ্টির কাছে প্রেমের ভালি উজাড় করিয়া
দেয়, আর অগ্নি ভরিয়া তাহার দেওয়া সন্ধান মৌনের
তবকে তবকে গাঁথিয়া রাখে। মেঘতা, কাঁচ ভাল হয়
নাই—মনের সবটা জুড়িয়া বলিয়া মনটাকে বিজ্ঞাত করিয়া
কাঁচ ভাল হয় নাই। এতে যে সবই ভুবিরে মায়ের স্নেহ,
ঠাকুরমার আশ্রয়, সান্নিধ্যের মনতা সবই ত তোমার আকর্ষণে
চূর্ণ হইয়া বাইবে। হৃৎকণের তেজ ধাক্কা ভাল, কিন্তু
আকর্ষণ যদি এতই প্রবল হয় যে অগ্রদূতের কক্ষচূড়ি ঘটে
তবে ত দিবস বিনুখলা।

না বলেন, শাস্ত্র নবগায় কর, বাবা, ঠাকুরকে।

শাস্ত্র গড় হইয়া নবগায় করে। মা কোমল
হইতে বানিকটা ভল তুলিয়া বিষ্ণুর পাখ ঢালিয়া দেয়।

পূজার প্রাণম শাস্ত্রের হাতে বিয়া মা আকর্ষণ করে।
চিরজীবী হও।

শাস্ত্র মাঝে গড় হইয়া প্রাণম করে। শাস্ত্র
অন্তরময় হইয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আকাশের খোলা ময়দানে মেঘেরা খেলা করিয়া
বেড়াই; ইহা আর তেমন বিচিত্র কি? কিন্তু বিচিত্র
শাস্ত্রের মন, তাহাই দেখিবার অস্ত্র কোড়ালী হইয়া
ঘটে। কোড়ালী হইয়া আবার মনের বড়ে সন্তব
অস্ত্রব করিয়া মেঘ লাগাইতেও শুরু করিল। শাস্ত্রের
মন মেঘ লাগাইতে বলিল।

কাউকে হাতী লাগাইয়া সিংহের সঙ্গে লড়াই বাড়াইয়া
বিল। আবার কাউকে অশ্বের মতের সারথী করিয়া
সোজা ছুটাইয়া বিল হু মিগন্তের পানে। সেই কালীদমন
ঠাকুরটি না হইলে হয় ত শাস্ত্রের মাথার হু-পড়া পড়িত না
তাই তাকেও জাতিয়া আনিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শিখিপুঞ্জ-
বালা চুড়া পরিহিত কেই ঠাকুরও নাচিতেছেন। খোলা
ময়দান পাইয়া মেঘের আলাপোনা বাড়িয়া গিয়াছে—আর
শাস্ত্রের মনের বড়ের কোথায় খেলাপ হইবার উপায়
নাই। হেথাকা তুলি কাড়িয়া যাকে যেমন ইচ্ছা তেমনই
লাগাইয়াছে। হঠাৎ পণ্ডিত মশাইর কথা মনে পড়িয়া
বিস্ময়ভরে বাইতে হইল নতুন মেঘই আঁজিকার দিনের
শাস্ত্রের মনের উপজীব্য। ঐ পণ্ডিত মশাই রামায়ণ
পড়াইয়া ছিলেন। রাম যে অগ্নিবার বহুপূর্বে রামায়ণ
রচনা হইয়াছিল না হয় জানিয়া নিলাম, কিন্তু আমি
অগ্নিবার পূর্বে?

এইবার শাস্ত্র বেশ সোজা হইয়া পাড়াইয়া
নিষেক প্রের করিল—উত্তর কি পাইল বলা মূল্য
তবে রাণী কৌশল্যার কথা মনে পড়িল। রাণী কৌশল্যা
জাগবতী বয়ঃ ভগবান তাহার গর্ভে অন্ন নিয়াছিলেন।
এমন ভাগ্য ক'জন্যার—পণ্ডিত মশাই তাহাই
বলিয়াছিলেন। সেদিন আকাশের দিকে চাকাইয়া
পণ্ডিত মশাই বলিয়াছিলেন, সবই লীলাময়ের লীলা।
কেই-বা লীলাম আর কাহারইবা সব লীলা—তাহা
বুঝিবার অস্ত শাস্ত্র আকাশের দিকে তাকাইয়াছিল।

কিন্তু সেদিনকার আকাশে মেঘ ছিল না কাষেই সান্নাধ্য মেঘের দেখাও মিলে নাই, লীলামঘের খোঁজ ত দূরের কথা। কিন্তু শাস্ত্রের মনে খটকা বাধিল লীলামঘ কহিয়া নুনা আকাশের পানে তাকাইয়া স্বপ্ন কি? শাস্ত্র কিন্তু পথ চলিতেছিল। অগ্রমনক হইয়া অকস্মাৎ হোঁচট খাইয়া বাধা পাইল। বাধা পাইলেই পাণের শাস্তি হয়—পণ্ডিতমণ্ডাই তাহাই বলিয়াছেন ও শিখাইয়াছেন—শাস্ত্রের দোষ কি, সে যাহা শিখিয়াছে তাহাই ত ভাবিয়াছে—অতএব ধরিয়া লইল পাণের শাস্তি হইল। কিন্তু পাণটা কোথায়, কবে ঘটিল? পাণ্ডি দেখিয়া শুভদিনের যাত্রা হইতে পারে, পাণের যাত্রা হইয়া, ইহা স্বতন্ত্র তাই প্রবান প্রয়োপেরও প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন শুধু মানিয়া লইবার। হাঁ। শাস্ত্র মানিয়া লইয়াছে যে পাণ কোথায়ও-না-কোথা ঘটিয়াছে—নচেৎ হোঁচট খাইবে কেন? মন যে এতক্ষণ মেঘ লইয়া আগজু-বাগজু ঘেলিয়াছে তাহা এই সব হোঁচট খাওয়ার কারণ নহে ত? শাস্ত্র মানিয়া লইল পাণ—কিন্তু বোলতাটা কি ঘোষ করিয়াছে? সে বেচারা মরিয়া পথের একপাশে পড়িয়াছিল তাহাকে পিঁপড়ার দল বাধিয়া কোথায় লইয়া চলিল। মরিয়াও নিতুতি নাই—কাহারও না কাহারও আহাৰ্য্য হইতে হইবে। জীবিত কাল ত পড়িয়াই রহিল।

বৈশাখী যৌবনের দোষ নাই, সে উগ্র মেজাজ দেখাইয়াই থাকে। প্রকৃতিতে সে উকপখী। যদি সে জ্বলিত যে তাহার উগ্রতা সবার পক্ষে সহনীয় নয় তবে ভালই হইত তবে জ্বলিয়া-তলিয়াই শাস্ত্রকে বাগানো যাইত। তাহা ঘটে নাই, বৈশাখী যৌব আপন প্রকৃতিতেই উগ্র, কাষেই কাহার উপর তাহার উগ্রতা এত প্রথর তাহা সে টের পায় নাই। একিকে শাস্ত্র কিন্তু চটিয়া আড়ন। তাহার ব্যবহারে ভ্রমতা নাই তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকাই ভাল। শাস্ত্র সোঝা ছুটিয়া মাঠ পার হইয়া চলিল।

মাঠের ও-পাশে বিস্তীর্ণ সবুজ বনের সীমানা নিশ্চিন্দাছে। শাস্ত্র ছায়ায় ঝাড়াইয়া বেন হাক ছাড়াইয়া বাঁচিল।

রবি-শস্ত্রের দিন। চাষীরা মাঠে গোটা রোদ মাখায় করিয়াই চাষ করিতেছে। মাঠে-না-না তাহারের গরু ভাড়াবোর হকার শ্রমঘর মধ্যাক্ষর নীরবতা ভরিতেছে। একটা ভিয়ে তেতালা ছন্দ বাধিয়া গরুগুলো সমুখপানে অবিরাম হাস টানিয়াই চলিয়াছে, মনে হয় দিনগত পাণকর এই মাঠের হাল টানিতে শেষ করিয়া বাইবে। বনের মে দিকটা অপেক্ষাকৃত নিবিড় ও নিশ্চল সেই দিকটা দিয়া শাস্ত্র পুনরায় হাটিতে শুরু করিল। অন্ধকার ঘন জীবন্ত মাছের মত নড়াচড়া করিতেছে, গাছের পাতাগুলো কণিক ছলিয়া স্বর্গ-রশ্মির প্রবেশপথ সহজ করিয়া দিতেছে। দোখটা কাঁটবিড়ানোর সে শুকনো পাতার উপর নিয়া গটান বৌদ্ধ মারিল আর শাস্ত্রও চমকাইয়া উঠিয়া—ভনিতে পাইল—ছবু-বু-বু-বু। গোপাশটা কাল তারের মত শিত বাহির করিতে-করিতে ছুটিয়া দেখার স্থান পাইল সেইখানেই অশ্রব লইল—ভয়? কাটার? বোকা মূগিল। শাস্ত্র বেগুন খাঁকাইয়া উঠিয়াছে গোলাপও শাস্ত্রকে দেখিয়া ডুকুকাইয়াছে। উভয় খাঁকাইয়া উঠিয়া বিভিন্ন পথায় বিভিন্ন পথ লইয়াছে। শাস্ত্রের পা আর মোটেই আগাইতে চায় না। যে চকু নিয়া সে মেঘের খেলা দেখিয়াছে সেই চকুই দেখিল এক অতিকায় জীব তার সামনে ঝাড়াইয়া আছে। আর শুধু ঝাড়াইয়া নাই রোতিমত হতে ইঙ্গারা করিতেছে। কিন্তু আগুনকে কে হইবে ভনি। শাস্ত্র দেখিল অতিকায় জীবটার কপালে শিঁদুর, মাথায় চুলের চূড়া, রক্তজবার মত দুইটা চকু লাল, আর বেহের রঙ? সে বলিবার নহে—ঘন কালো মেঘ। চুলের চূড়ায় বসিয়া আছে বিষধর কণী। হাতে কি একটা ছুত তমক অথবা ত্রিশূল হইবে—এটা কি! মাগো!

তরুণ গলার চাঁকর তীব্রই হইবে হরত, চাষীর কানে দিগা বিধিতে বেশি সখ লাগে নাই—গুড়িতে চাষী ছুটিয়া আসিল।

শাস্ত্র জাগিয়া উঠিয়া শোনে বাহিরে চাষী কহিতেছে, 'কর্তা ছেলপুলে অমন ছেড়ে দিও না। ভয় পাবে।'

মা বুকের কাছে কুঁকিয়া পড়িয়া শুধাইল : শান্ত কেমন আছিল বাবা ?

বাবা অনুরে ধাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আজকালকার ছেলেদের সবই অসুস্থ, অস্বস্তার মধ্যে ভয় পায়।

মা মুখ তুলিয়া বলে : তুমি ভাব তাই, আমার বিশ্বাস ও নিশ্চয় কিছু বেখেছে, ঠাকুর রক্ষে কর।

মা লম্বা হাত ধুলাইয়া বলে : এখন ভাল আছিল বাবা।

শান্তর ভাবে, ইহা কি হইল ?

(

সেদিন বাড়িতে একটা অশ্লুপ্তান-কাণ্ড চলিতেছিল। কেহ কিছু বলিতে পারে না বটে, তবে সবাই আশঙ্কা করিতেছে, হঠাৎ শান্তর আবহুলনের বাড়ি গিয়া থাকিবে। এ সম্বন্ধের বা আশঙ্কার মুক্তি অবশ্যই আছে। শান্তর কাণ্ডকলাপ তাই সাক্ষী দিতেছে, সানন্দী মনে মনে চটিয়া আস্তান, ধাঁড়া ও একবার পাঠলে হহ, এমন পিষ্টি দেব—ঠাকুরমা সবাইকে ভাকিয়া শুশাইতেছেন শান্তর বাড়ি কিরিয়াকে কিনা ? ঠাকুরমাকে অংবা গিয়া কেহ সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই : আর এবার পাইলে ঠাকুরমা সন্তুষ্ট হইতেন কি বিতপ হইতেন তাহা বলা মুশিল। আশঙ্কা করিয়া ঠাকুরমা বুদ্ধিহা ছিলেন, যে ব্যাপারটা গুরুতর। অগ্রস্ত বার যেনন শান্তর খোঁজ পাওয়া যায় না—অথচ পরে সবই জানা যায়, এবার সবাই তাহাকে এড়াইয়া চলিতেছে। ঠাকুরমা আশঙ্ক্য হইয়া গ্লান করিতেছেন : ওরে তোরা শান্তর গবরটা খুলে বল।

সানন্দী ঠাকুরমাকে এক ধনক দিয়া বলে : আচ্ছা ঠাকুরমা তুমি কী, সবটাই তোমাকে জানতে হবে ?

ঠাকুরমা কোন উত্তর করেন নাই রাগে গুন্স হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁর মনের কথা কেহ বোঝে না। সে যে শান্তর জন্ত মনে-মনে আশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝাইতে গিয়া আত্মা অব্যবের যোরা বাড়িবে, কোন লাভ নাই—একদল পাবও বাড়িতে ছুটিয়াছে ইহাদের কাহারও প্রতি কোন

শরম নাই, কিন্তু হোঁচর গেল কোথায় ? এ পাবওর দল ত খোঁজ করিবে না। আমি নিজেই খোঁজ-খবরে বাহির হইব। ঠাকুরমার চুক্তি হইয়াছে, শত্রুর অত্যাচার নাই কে যে কোথা হইতে কোন সন্ধান করিয়া বসে। তাছাড়া ঠাকুরমার যেন মনে পড়িতেছে—শান্তর নামেই একটা ঠাড়া। মৈত্রিক বাছুন সেদিনও সাধন করিয়া দিয়াছে বল আর আগনের ভয় আছে। কি জানি, কেউ ধাক্কা মারিয়া গলে ফেলিয়া দিল নাভ : ঠাকুরমা কিন্তু মনে-মনে ভাবিতেছেন, আর মেয়ে শিহরিয়া উঠিতেছেন—মাকে মাকে চুক্তি সাজীব হইয়া যেন উকিঝুঁকি মারে। ঠাকুরমা নিজেই বাহির হইয়া পড়েন। একটু লক্ষ্যের ভীততা আছে কেউ টের না পায়। টের পাইলে আর রক্ষা নাই ঠাকুরমাকে তখনই ঘরে ফিরিয়া ঘাইতে হইবে। সানন্দী ও স্বর্ষ ঠাকুরমার শত্রু। অস্বস্ত ঠাকুরমা তাই মনে করেন, আসলে কে যে কাহার শত্রু তাহা বলা মুশিল। তবে বাহির হইয়া কোথায়ও আছাড় খাইয়া হাত-পা ভাঙিয়া পড়িয়া থাকিবে এই আশঙ্কার সানন্দী ও স্বর্ষ ঠাকুরমার প্রতি কিছু কিছু শত্রুতা করিয়া থাকে। কাজেই শত্রুর চক্ষু এড়াইয়া ঠাকুরমা লাঠিঘানিতে ভয় করিয়া নিশেমে বাহির হইয়া পড়িল। ভয়, স্বর্ষ মেয়ে মেথুক, কিন্তু পোড়ারমুখী সানন্দীর দৃষ্টিতে যেন না পড়ি।

সানন্দী হুটনো-কাটা ফেলিয়া উঠিয়া গলার স্বচর দিয়া কহিল, আমার এখন হুটনো-কাটা বড় হ'ল তখন ওর রক্ষে নই। আর ও হোঁড়ার হাড় মাল আলাদা করে তবে ছাড়ব।

স্বর্ষের রাগটা একটু পুঙ্খোচ্চিত, সে স্থির করিয়াছে, শান্তরকে কানে ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া গাছের ডালে বাধিয়া পিটাইবে। বোন্না কথা, একটি চৌদ পনেরো বয়স কিশোরের প্রতি বাড়ির হেন কৌণ নাই যে চটিয়া আস্তান হহ নাই, সবাই চটিয়াছে। 'গুন্স' মাতা বুগালিনী একটা কথা মনে ভাবিয়া আতঙ্কিত হইয়াছেন, যদি তাই ঘটয়া থাকে তবে আর স্বস্তি উঠিবে। এ কড় যে শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়াইবে তাহা শুধু মাই জানেন।

অগত বাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই সব রক্তের আবির্ভাব ঘটতে পারে তাহাকে দোষী করিবার ক্ষমতা মনের মন চায় না।

মা নিষেধ মনেই উক্তি করেন, ওর কি দোষ তপি এসব কিছু বোকে? তাহাকে ছুঁইতে হইবে কাহাকে ছুঁইতে হইবে না? যে অস্ত্র তাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না।—হে ঠাহর, হে ভগবান কেউ যেন টেব না পার।

আবদুল ও শাস্ত্রহু গলাগলি বাধিয়া ভাতার অপর দিক হইতে আসিতেছিল। শাস্ত্রহুর পাঠশালার বন্ধু আবদুল। যে যগ্রে এক পণ্ডিত মহাশয়ের শিক্ষার ভ্রমণ মাছুব দুই বিভিন্ন মনোবৃত্তি লইয়া বড় হইতে থাকে ঠিক সেই যগ্রে হইতেই আবদুল ও শাস্ত্রহুর মধ্যে সাহচর্য পড়িয়া উঠিয়াছিল। দুই পরিবারের মধ্যে ধর্মপত ব্যবধান একটা বাধা ছিল বটে তবে এতদিন শাস্ত্রহু ও আবদুল তাহাকে কোণে এড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছে। আবদুলও বুঝিয়াছে যে শাস্ত্রহুর বাড়ি যখন-তখন চুকিয়া পড়া ঠিক নহে। শাস্ত্রহুকে ঠাকুরমা বুঝাইয়াছেন যে স্কুলে বাড়ি গেলেই জ্ঞাত দ্বার অন্তঃসাবধান। এই সাবধানবাণী শাস্ত্রহুর মনে রাখিয়াছিল কিনা বলা মুশকিল। তবে ঠাকুরমা যতই সাবধান করিয়াছে শাস্ত্রহুও ততই সাবধান হইয়াই চলাকোরা করিয়াছে—অর্থাৎ ধরা বাতে না পড়ে তাহার ক্ষমতা বড় কোণল অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহাই করিয়াছে। কিন্তু পাপ চাপা থাকে না, তা ছাড়া ধর্মের বল নাকি বাতাসে নেড়ে। আর পাপও চাপা থাকিবে না জানাই কথা—তাই শাস্ত্রহুর স্কুলেবাড়ি অবাধ গমনাগমনের পাপ ধরা পড়িবার উপক্রম হইল। বোঝা বাইতেছে শাস্ত্রহুর জ্ঞাতব্য সন্ধ্যা পাকাপাকি জ্ঞান জন্মায় নাই। তাহা না হইলে আবদুলদের কটি-পিঠা, মাংস ইত্যাদি মনে পাল্লাইয়া বাইবার কথা নহে। সেই দিনের কথাই যদি বলিতে হয় তবে ইহা বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে যে শাস্ত্রহু আবদুলের অগ্ররোধ এড়াইতে পারে নাই, আবদুল করিয়াছিল: দুই ঘণ্টা ফেল ভাই কেউ টের পাবে না। শাস্ত্রহু: না তাই আমার ভাবি ভয় করে, কি জানি পাছে কেউ টের পায়।

কোথা হঠাৎ কি রকম সব ব্যাপার হইয়া গেল। আবদুলের অগ্ররোধ শাস্ত্রহু এড়াইতে পারে নাই, সে করেক বার এদিক-ওদিক চাইয়া, চক্ষু-অনিচ্ছায় মিশ্রিত এক মানসিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া টুকরা হুই থাকির মাংস ও কটি-পিঠা বাইয়া ফেলিল। বাকিটা আবদুলের অগ্রপথিতর সুযোগ লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। শাস্ত্রহুকে একটুখানি “মেগ্নাই” পিঠা শাইবার ক্ষমতা আবদুল বহু কাহুতি-মিনতি করিয়াছিল, সম্ভবত শাস্ত্রহুর মনে তখন এই পাপো হইয়া থাকিবে যে আর পাপ বাড়িতে না। দ্বারা খাইয়াছে তাহার ক্ষমতা প্রাপ্তি করিবে। তবেই পাপ মুছিয়া বাইবে। শাস্ত্রহু আর সেদিন আবদুলের সাথে কথটি পঞ্চাশ কহিতে পারে নাই—কোন রকমে ছুটিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। মনে হইতেছিল কে যেন তার বুকের মাঝে কাহুতি পিঠা-ইচ্ছা-পিঠা-ইচ্ছা একটি কথা তৈয়ারী করিতেছে, কাজ অস্ত্রার হইয়াছে। সেই রাতে শাস্ত্রহু—বন্ধু বৈদ্যিছিল, ঠাকুরমার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, ঠাকুরমা তপালে করাখাত করিয়া কাঁদিয়া-কাঁদিয়া সবাইকে কহিতেছেন, সব গেল, ভাত গেল, ধর্ম গেল। ওং বারো, ভট্টাঙ্গি মণিকে তাক প্রাচ্যকিন্তের ব্যবস্থা দিয়ে থাক। শাস্ত্রহু যেন কাঁদিয়া-কাঁদিয়া কহিতেছিল, আমি ত বাইনি। কি রকম করে চললে, তাই গেছে ফেললাম। হ্যা ওরা অমনিই করে—এলিয়া ঠাকুরমা চন্দ্র তল মুছিলেন। আমার বংশ গেল, আমার ভাত গেল—ঠাকুরমা তাই চীৎকার করিয়া যেন সবাইকে বলিতেছেন। শাস্ত্রহুর ঠিক মনে আছে সেদিন বাড়ি ফিরিবার পথে কতগুলো তুলশী পাতা চিবাষ্টা পাটয়াছিল। তাছাড়া একটু পোবর মুখে দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল আবদুলের সঙ্গে বড় ভাবই থাক ক্ষমতা সব কিছু করিবে কিন্তু কোনদিন কিছু খাইবে না। কেহ টের পাইলে বাবাকে অবধি একঘরে করিবে।

আবদুল প্রাণেই বলিত:

ওতে মাত দার না।

: তাবের মলে ভাত দার না ত?

আবদুল বেগ জোরের সঙ্গেই বলিচ্ছিলেন : না।

: তবে যে কেউ হেন টের না পায়। কিন্তু জল খেলে উল্লাসিত বাহ ?

: তা বটে, কিন্তু এত ভগবানের দেয়া জল। এতে মানুষের জোষাচ নেই।

শাস্ত্র আর প্রতীতিবাদ করে নাই। এমন আরও বহুদিন খাওয়া-দাওয়া মেলা-দেনার মধ্য সিঁধা শাস্ত্রই বুঝি যাচ্ছে যে জাত ভাংবার ব্যর্থ নাই। আর নগরজনের জাত যেমন রহিয়াছে তারও ঠিক তেমনই রহিয়াছে। তবু ভয় ঠাকুরবাঁকে।

আবদুল কহিল: মিছরের বাড়িঘরের কথা ছিল, বাবিনে।

আবদুলের সঙ্গে কথা কহিতে-কহিতে সে যে বাড়ির এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা শাস্ত্রের বেলায় ছিল না। ভূত দেখিয়া মানুষ যেমন ঝাঁকুড়াইয়া ওঠে, শাস্ত্রই বুঝি হইতে কি একটা। দেখিয়া ঠিক তেমন ঝাঁকুড়াইয়া উঠিল। সোজা উঠা মোড় কিরিয়া সে দাঁড়াইল।

ঠাকুরবা এই পথেই আসিতেছিলেন।

আবদুল অবাক হইয়া কহিল: কি রে! মিছরের বাড়ি বাবিনে। সেই পাকা পেরায়া।

: না—বলিয়া শাস্ত্রই খুব জরুরি পায় হন্ হন্ করিয়া হাটিয়া চলিল।

আবদুল খানিকটা অবাক হইয়া হতভম্বের মত টাঁহিয়া থাকিয়া একটু জোর করিয়া তাক দিল: শাস্ত্র

শাস্ত্রই তখন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে।

আবদুল শাস্ত্রকে লইয়া বিশেষে পড়িয়াছে। তাহার মনের কথা সে আত্মকাল বোঝে না। ভাব যে কখন কি হইবে তাহা খোঁজা চানেন। আবদুল মনে-মনে স্থির করিল শাস্ত্রের সঙ্গে আজ হইতে বাক্যালাপ বন্ধ। অতি অপ্রীতিকর অবস্থায় লইয়া আবদুল এক পা দূর গা করিয়া তাহার বাড়ির দিকে আগাইতে লাগাইল। আবদুল ভাবিল, কেন এমন হয় ?

উইলসন সাহেব

পুন্সরাষ্ট্র ঘোষ

উইলসন সাহেব বিখ্যাত বেঙ্গল কোল কোম্পানীর একটি বড় কর্মসূচীর ম্যানেজার। এখানেই পোড়া পস্তন হইতে শুরু করিয়া আজ একাদিক্রমে দীর্ঘ ২০ বৎসর তিনি এখানেই আছেন। খাট একরকম তাহারই হাতে গড়া। ইহার সিকি-এক সপ্তাহ তিনি কার্খানার পাইয়া এখানে আসেন আর আর সেই বাসে চাকরী কাটানও শুরু হইয়া গিয়াছে।

কৃত্রিম কর্মচারীদের হইতে কুলী কামিন পর্যন্ত সকলেই উইলসন সাহেবকে আত্মীয়ের মত ভালবাসে; তাহার জন্যে যে সাহেবের মত তাহারের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রকৃত আত্মীয়ের ভিতরেও খুব বেশি নাই। একবার বাহারা উইলসন সাহেবের নিকট কাম করিয়াছে তাহার আর

আহাকে ছাড়িয়া বাইতে চায় না, তিনিও আর তাহাদের ছাড়াইয়া দেন না। কর্মচারীদের ও কুলীকামিনদের অর্থ-বিব্রুৎ, বিপদে-আপদে যে কোন দুঃসময়ে তিনি উপরওয়ালাদের সহিত লেবাসেবি করিয়া কখনও হস্ত বগড়া করিয়াও তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন। কোন কর্মচারী অর্থ হইয়া পড়িলে তাহার কাজ বরং নিজে চালাইয়া লন ওখালি অন্ত ম্যানেজারদের মত তাহার জায়গার অস্থায়ী নৃতন লোক নিযুক্ত করিয়া তাহার বেতনের অংশ কাটিয়া লইতে চান না। এ বিষয়ে উপরওয়ালাদের সহিত মতভেদ হইলে তিনি যে কোন প্রকারে নিজের ব্যবসায়ী বন্ধ্যা রাখিতে চেষ্টা করেন।

নিজের ব্যক্তিগত জীবনে উইলসন সাহেব ছিলেন অত্যন্ত নিতব্বারী, বাহাকে প্রায় কৃপণ বলা চলে। কোন সন্ধ্যা, কোন বিলম্বিতাই তাহার ছিলনা। এ সম্বন্ধে তাহার কেহই নাই; শুধু এই যে যৌবনে তিনি কোন একটি ভদ্রকৈকে ভালবাসিয়াছিলেন কিন্তু তাহার প্রতিদান পান নাই। তবুও আর কাহাকেও ভালবাসেন নাই—

• যশবন্তের হইতে কল্যাণ উত্তালদের মত যে প্রকাণ্ড দুর্লভ কাটিয়া কল্যাণের জন্ম পৌরিত সে—সেই দুর্লভ কাটিয়ে গিয়াছে।

বিবাহও করেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার সেই প্রথম প্রেমের স্মৃতি এখনও তাহার অন্তরকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। সারা জীবন তিনি কাল লইয়াই আছেন; ঐকান্তিক কর্ম্মাহুতগই তাহার বার্ষ প্রেমের কুণ তুলিয়া। রাখিয়াছে যোগদয়। স্বমনহীন বৃদ্ধ উইলসন সাহেবের দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের সঞ্চিত বিপুল অর্থায়নির শেষ পরিণতি কি হইবে—তাঁহা লইয়া অনেক ভ্রম্ননা কল্পনা চলে; কেহ বলে তিনি উহা তাহার সেই প্রেম পাত্রীকে দিয়া বাইবেন, কেহ বলে হাশপাতাল বা অল্পতপ কোন সমস্থানে দান করিয়া বাইবেন।

এইভাবে নিরুপদ্রব শাস্তির ভিতর দিয়া দীর্ঘ ৩০ বৎসর কাটিয়াছে। উইলসন সাহেব কুঠীর কাল লইয়া বাতিয়া থাকেন, বেশ আনন্সেই তাহার দিন কাটে। কোলিয়ারী তাহার হাতে বেশ ভালই চলিতেছিল; অধীনস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং প্রমিকেরাও বেশ স্বপে ও সম্মতিতে বাস করিতেছিল। কর্ম্মজীবনের বাকী কয়েকটা বৎসরও অল্পতপভাবে কাটাওয়া দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বিজ্ঞানমহু উপভোগ করিবেন—উইলসন সাহেব এইরূপই আশা করিয়াছিলেন কিন্তু দেখা গেল তাঁহার সে আশা পূর্ণ করা বিধাতার অভিশ্রাণ নহে।

দীর্ঘকাল পরে কয়লার বাজার হঠাৎ চড়িয়া গিয়াছে। চিরকাল এ বাজার থাকিবে না। সকল কোলিয়ারীর কর্ম্মপুঙ্গবগই "রেজিং রেজিং" করিয়া অধির হইয়া উঠিয়াছেন। কলিকাতার হেড অফিস হইতে উইলসন সাহেবের নিকটেও কোর তলব আসিল যে কোন উপায়ে হোক রেজিং বাড়ান চাই-ই চাই। উইলসন সাহেব ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রেজিং বাড়াইবার নিমিত্ত সমস্ত কি কি উপায় অবলম্বন করা হইতে পারে তাহা স্থির করিয়া কার্যে সিদ্ধ হইবার পুর্বেই পুনরায় তাগিন আসিল। কর্ম্মপুঙ্গব জানাইয়াছেন অবিলম্বে রেজিং বাড়াইতে না পারিলে তাঁহারা বৃদ্ধ উইলসনকে এই দুর্ভর কর্ম্মের দায় লইতে নিশ্চিতি দিতে বাধ্য হইবেন—অতঃ এই বৃহৎ কোলিয়ারীর কার্যভার তাঁহাকে আর কোনক্রমেই বেওয়া চলিবে না; কর্ম্মতৎপর উৎসাহী

কোন যুবক ম্যানেজারের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। উইলসন সাহেবকে অল্প কোন কোলিয়ারীতে বানাহুতিত করা হইবে।

এই পন্থের মধ্যে রেজিং বাড়ানর চাহিয়া ভিন্ন আরও একটি কারণ লুকাহিত ছিল। হেড অফিসের পুরাতন কর্ম্মকর্ত্তারা—বাহারা এই পুরাতন উইলসন সাহেবকে চিনিতেন জানিতেন তাহারা কেহই আর এখন নাই—তাঁহাদের স্থান নবীন যুবকেরা অধিকার করিয়াছে। ইহাদের বহুদল দারপা এই যে যুবকের যে কর্ম্মকর্ম্মতা ও কর্ম্মতৎপরতা থাকে যুবকের কখনও তাহা থাকিতে পারে না, ইহাদের বশে তরুণ যুতরাং অভিজ্ঞতার মূল্যের অভিজ্ঞতা তখনও হয় নাই। এইজন্যই ইহারা কোম্পানীর অনেক কোলিয়ারীতেই পুরাতন বৃদ্ধ কর্ম্মচারীদের পরিবর্তে যুবকদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু উইলসন সাহেবের মত প্রতিপত্তিশালী পুরাতন ম্যানেজারের স্থানে লহা অল্প কাহাকেও নিযুক্ত করিতে মাহল হয় নাই। এবারে এই হযোগে সেই চেষ্টাই করা হইতেছিল।

ষষ্ঠীয়পত্র পাইয়া উইলসন সাহেব অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন। চাকরীর অল্প তাহার ভাবনা ছিল না। অনায়াসেই তিনি সেই মুহূর্ত্তে বাস্ত ছাড়িয়া দিয়া অবসর লইতে পারিতেন। অর্ধের অভাৱ তো তাহার ছিলই না তা ছাড়া চাকরী করিবার ইচ্ছা থাকিলে বিতীর্ণ কোল-কিন্ধে তাহার মত প্রবীণ অভিজ্ঞ ম্যানেজারের চাকরীর অভাৱ হইত না। কিন্তু তাহার চিন্তা তো চাকরীর অল্প নয়, চিন্তা এই কোলিয়ারীটির অল্পই। তিনি যে এখানে অপরের হইয়া কাল করিতেছেন, একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র এ দারপা লইয়া তিনি কোনদিন কাল করেন নাই। তাঁহাকে যে কোনদিন এই কোলিয়ারী হইতে দিচ্ছির হইয়া থাকিতে হইবে দেখাও তিনি কখনও ভেমন করিয়া ভাবিয়া দেখেন নাই। এখন ঐ পত্রখানি পাইয়া এই কথাগুলি মধ্যস্থতিকভাবেই তাঁহার হৃদয়লয় হইল। কিন্তু তাঁহার সবচেয়ে দুঃ ও কোপ হইল বদনীর কথায়—তাঁহারা ভাবিয়াছে কি? এই কুঠী যদি ছাড়িতেই

হয়, তিনি কি আবার এখন অল্প কোথাও কাজ করিতে যাউনেন না কি? তত্পরি এবে তাঁহার কর্তব্যমতের উপর তত্ত্বের ইতিহাস। এত দীর্ঘ কর্তব্যবনের সাধ্যাচ্চে শেষে কি তাহাকে এই অপবাধ লইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে?

কিন্তু তিনি তা রাগ করিয়া এক কথা এ কোলিয়ারী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন না—বৌবনে আত্মিক প্রেমের প্রত্যাখ্যানের সাক্ষ্য হুঃ তিনি যে কোলিয়ারীর কাছে হুনিয়াছেন, যে কোলিয়ারী সম্পূর্ণভাবে তাহারই হাতে পড়া, যে কোলিয়ারী তাহার লোকজন, স্বরগতি, কলকজা প্রভৃতি কুটনীতি ভিনিষ লইয়া গ্রাম তাহার সম্বন্ধের মত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে কি এক কথা ছাড়িয়া যাক? বায়?

যাহা হউক বর্তমানে এত সমস্যার কি করিয়া সমাধান করা যায় তাহারই পরামর্শ করিবার ক্ষমতা তিনি তাহার অধ্যয়ন কর্তব্যান্তিরের ভাঙিয়া পাঠাইলেন। উইলসন সাহেবের এইটি ছিল বিশেষত্ব—তিনি সর্বদাই অধ্যয়ন কর্তব্যান্তিরের পরামর্শ নষ্ট করেন, শেষ পর্যন্ত হস্ত তাহার দীর্ঘ শিক্ষণ অধ্যয়নী ব্যক্তি করিতেন কিন্তু সে শিক্ষণের কথা পূর্বে তাহাদের জানাইতেন না এবং শেষে এমন ভাবে বলিতেন যাহাতে কর্তব্যান্তিরী দৃষ্টিতে যে সেইটিই শ্রেষ্ঠ শিক্ষণ; হুতরাং তাহারা সে কাজ নাকি বলিবে আবেগপূর্ণের দিশায়েই করিত না—উহাই যে সঙ্গোপেচ্ছা উৎসর্গ উপায়—একথা উপলব্ধি করিয়াই করিত। ইহাতে তাহাদের শিক্ষণ হইত, কাজও ভাল হইত, উত্তরপক্ষে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিত এবং সঙ্গোপেচ্ছা বড় এত হইত যে তাহারা নিজেদের উপরোগালার আদেশ-পালনকারী হুতবিশেষ মনে না করিয়া বুদ্ধিভুক্তিসম্পন্ন মানুষ বলিয়া ভাবিতে পারিত। কর্তব্যান্তিরী সকলেই উইলসন সাহেবকে পরমাত্মীর মত ভালবাসিত। তাহারা খুব ভাল করিয়াই জানিত যে এমন বলিষ সহসা তাহারা আর পাউনেন না—আর কেহই তাহাদের এতপভাবে ভালবাসিবে না—তাহাদের সর্ববিধ অভাব-অভিযোগ, স্বল্পজ্ঞানের সম্মান রাখিয়া তাহার প্রতীকারের ক্ষমতা প্রাপ্ত

হেঁটা করিবে না; এককথায় উইলসন সাহেবের বসনে যে কেহই আসেন না কেন তাহার মত গোটা হুতীর প্রত্যেকটি লোককে আপন পরিবারভুক্ত পরিজন মত কেহই রাখিতে পারিবে না স্বয়ং তাহার বিপরীত ঘটনা ঘটনাৎ সম্বন্ধনাই বধেই রহিয়াছে।

উইলসন সাহেব আগেই জানিতেন যে ক্ষুদ্র যেহিঃ বাড়ীতে হইলে ঠানবী থাকের উপর ভোর মেওয়া-ভিন্ন উপায়াস্তর নাই—যেখানে অপর সকলের মত-ও তাহাই। কিন্তু কেন যে তিনি সব জানিয়াও থিা করিতেছিলেন তাহারও কারণ ছিল। সে ৩০-৩৫ বৎসর পূর্বের কথা, তখন সব কয়েকটি বাড়ী হুতীতে ঠানবী থাকের কাজ বন্ধ হইয়াছে, ভিনিষটা তেমন প্রচলিত হয় নাই। একেই বিপর্যসকুল কাজ তাহাতে অজ্ঞতার ব্যবধান—ব্যাপারটা মজুরমহলে অতিশয় ভয়াবহত্বপেই প্রতিক্রিয়া হইত। ঠানবীপাদে কাজের কথা শুনিমই তাহারা বলিয়া উঠিত, “ও বাবা! উকে করতে থাকে!”

কিন্তু ঠানবী থাকে কোরে কাজ চালান ছাড়া বখন পতাস্তর নাই তখন আর এল অস্থবিধার কথা ভাবিয়া লাভ কি? যে করিয়াই হউক মজুরদের ব্রাহ্মীয়া রাখী করিতেই হইবে। হুতরাং তখনই মালকাটার সন্ধারমের ভাঙিয়া ব্রাহ্মীয়া বলা হইল যে সমস্ত বৈশি কলার প্রয়োজন হওয়াতে কলিকাতার বড় আপিগ হইতে কোর আপিগ আসিয়াছে যেমন করিয়া হউক রেজিঃ বৈশি চাইই। এমনটা ঠানবী থাকে বৈশি করিয়া কাজ করা বরকার হুতরাং তাহারা সেখানে কাজ করিবার ক্ষমতা প্রায়ত থাকৃ অস্ত্র এমনটা তাহারা মজুর পাইবে বধেই বধিলগ নিগিবে প্রচুর।

সর্বাধোরা কিন্তু থাকিয়া বলিল। ঠানবীপাদে জীহনের আলদা বৈশি, অর্ধের বিনিময়েও রূপ বিশিষ্টকণ কাজে সকলে রাখী নহে; তাছাড়া নিখুণ অধিক বাড়ীত যে কেহ সেখানে কাজ করিতেও পারেনা। হুতরাং একজের অস্ত্র লোক ছোটানো বড়ই শক্ত। তাহারা নিজেরা কখনও অস্ত্র কাজ করিতে রাখী আছে কিন্তু তাহাতে আর কতটুকু কাজ হইবে? এই বলিয়া

তাহারা সেদিনকার মত বিবাহ লইল। ছোট সাহেবও তখন তাহাদের আর বেশি কিছু বলিলেন না, ভাবিলেন পরে আবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেই ঠিক হইয়া যাইবে, এখনই বেশি ভোর করিতে গেলে বরং বিগড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

কিছুক্ষণ পরে কিন্তু সেই সব সর্দারেরা আপন। হঠাৎই ছোট সাহেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আশ্চর্য হইয়া শুনিলেন যে তাহারা পরদিন সকাল হইতে সকলবেলা চান্দনী খানে কাজ করিতে যাইবে। ছোট সাহেবের বিশ্বাসের আর সীমা রহিল না। আরও দু'একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলে যে তাহারা রাণী হইবে এ ভরসা তাঁহার ছিল কিন্তু তাই বলিয়া যে এত শীঘ্র এবং আপন। হইতে আসিয়া স্বীকার করিয়া যাইবে এ তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

কিন্তু মালকাটারদের মনোভাবের এই দ্রুত পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ যদি তিনি আনিতেন তাহা হইলে এত বিস্মিত হইতেন না। তাঁহার নিকট হইতে যাইয়া এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে তাহারা সুষ্ঠুর বড়বাবুর নিকট গিয়াছিল যে হেতু আপিস হইতে হুজুম আসিয়াছে তেজি বেশি না হইলে বড়সাহেবকে অস্ত্র বন্দী করিয়া দিবে। এই কথা শুনিবামাত্র তাহাদের মত বদলাইয়া গেল। বিশেষ বিচার বিবেচনা না করিয়াও মাত্র সংস্কারবশেই বেন তাহারা বুঝিতে পারিল যে সম্ভবপর চূর্ণটার আশঙ্কার অপেক্ষা বড়সাহেবের অস্ত্রস্ত্রাবী বিদায় তাহাদের পক্ষে অধিকতর দুঃখের কারণ হইবে।

তখনকার দিনে চান্দনী খান এত বেশি ছিল না। সেজন্য চান্দনী খানে কাজ করিবার উপযুক্ত প্রমিকও বেশি ছিল না। যে দু'চারজন চান্দনী লোক চান্দনী খানের কাজ কিছু কিছু জানিত তাহাদের এবং আনাড়ী অনেকগুলি লোককে লইয়া সর্দারেরা তাঁর পরদিন বদলমত্রে কাজ করিতে আসিল। বড়সাহেব ছোটসাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া ওয়ারমান, সর্দার সকলেই চান্দনী খানে

কাজ করিবার কৌশলটুকু মজুরদের শিখাইয়া দিবার দ্রুত আয়োজন চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মালকাটার। তো। খাণে নানিয়া গেল, এমিকে লংবাখ পাইয়া তাহাদের মাতা, স্ত্রী, কস্তা, ভগ্নীয়া বড়সাহেবের আপিসের সামনে ভীড় করিয়া পাড়াল। খাণে নানিয়ার আগে মালকাটার। তাহাদের বলিয়া যায় নাই যে তাহারা কোন খাণে নানিবে। এখন লোকের মূখে মূখে তাহাদের সকলেরই চান্দনী খাণে কাজ করিতে যাইবার কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল। তখনকার দিনে চান্দনী খাণে কাজ করা এক বকম খেজার নিকের জীবনকে বিপর্যয় মত বিভীষিকাময় বলিয়াই কুশীকামিন মহলে প্রসিদ্ধ হইত। কাজে কাজেই বামী, পুত্র, পিতা, জাত। সকলেই সেই চান্দনী খাণে নানিয়াছে তিনি তাহারা পাগলের মত তাহাদের অন্তি শ্রিত বড় সাহেবের নিকট গিয়া আসিয়াছে। কেহ বলিতেছে, “আমার মরণ উদ্ঘাটেই গেছে, যেটাটোকে আর দিল না সাহেব!” কেহ বলিতেছে, “সাহেব, বাপ ছাড়া আমার আর কেউ নাই, বাপ গেলে আমার কি হবে? উৎসাহে ছাড়ো দে”—আর একজন বলিতেছে, “আমার বাপ ভাই দু'জনেই ঐ চান্দনীতে গিয়েছে, আমার মরণটোকেও কি লিবে।” ইত্যাদি অন্তরের অন্তঃস্বর হইতে উৎসাহিত এমনি সব আশঙ্কাকাত ও ভয়ানকুল আবেগন একত্রে বড় সাহেবের কানে ধনিয়া উঠিল, শুধু কানেই গেল না তাঁহারও ঘর্শে যাইয়া প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, সত্যই এমন দায়িত্ব লগয়া কি উচিত হইবে? এতগুলি প্রাণের দায়িত্ব? এতগুলি বেহুণী শবাকাতর দুঃখের জীবন-ব্যাপী দুঃখের দায়িত্ব? তদপেক্ষা কার্য ত্যাগ করাই কি প্রের নহে? কিন্তু পর মূহুর্তেই মনে পড়িল তাহা হইলে তো চলিবে না কাজ তো করিতেই হইবে এখন হইতে সকলকেই চান্দনী চান্দাইতে হইবে। নহিলে বেশি কল। তোলায় আর যে কোন পথ নাই। তিনি কাজ ছাড়িয়া দিলেও অন্ত যে কেহ আসিবে তাহাকেও তো চান্দনী চান্দাইতে হইবে হুতরাং তাহার ভয় পাইলে চলিবে কেন? একজন

জোর করিয়া মানসিক দুর্বলতা স্বাভিহা ফেলিয়া তিনি স্বামিনদের ভরণা দিয়া ঘরে পাঠাইলেন, বলিলেন ভরে কোন কারণ নাই, খুব লাবধানেই কাজ হইতেছে, তিনি নিজে গুরুগা দেখানো করিতেছেন, বিশেষ তেমন আশঙ্কা থাকিলে তিনিই কি আর তাহাদের পাঠাইতেন ? বড় সাহেবের আশাস্বাধীতে কথঞ্চিৎ আশ্রয় হইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

এদিকে কাজ কিছু বেশ ভালভাবেই চলিতে লাগিল, যেহা গেল হস্তখানি হই পাওয়া গিয়াছিল ব্যাপারটা ততখানি হ্র পাওয়ার মত কিছুই নহে। যেহিৎ ধবেই হইতে লাগিল, কর্তৃপক্ষ খুশি হইলেন, বড়সাহেব স্বস্তিলাভ করিলেন, কর্তৃগারীরাও নিশ্চিন্ত হইল এবং হেইৎ পরস্পা পাইয়া স্থলীকামিনরাও সন্তুষ্ট হইল।

এটাবে প্রায় ৩০ সপ্তাহ কাটিয়া গেল। গারনী-ধায়ে কাজ করা এবং কয়লা ধবন মালকাটারের ও বনির কর্তৃগারীরের বেশ ধাতস্থ হইয়া আসিয়াছে, সকলেই ধবন বেশ নির্ভর সাধারণভাবে কাজ করিতেছে, সেই নিশ্চিন্ত নির্ভরতার অবসরে বিনামধ্যে বঙ্গপাতের মতই স্বতর্কিতে বহু-শক্তিত ভূমিপাক ঘটিল। কয়লা কাটিতে কাটিতে সহসা চাল ধসিয়া গিয়া কয়েকজন মালকাটার খনি-অভ্যন্তরে কয়লাস্তূপের মধ্যে ভীষণ সমাপি হইয়াগেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের উদ্ধার করা সম্ভব হইল না।

বহুক্ষণ ধরিয়া সর্ববাকম চেষ্টা করিয়াও কোনক্রমেই মালকাটারের উদ্ধার করিতে না পারিয়া বার্ষক্যম বড়সাহেব ধবন হত্যার ভয়ে খনির অভ্যন্তরে হইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন ভূটনার সংহার ততক্ষণে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি উঠিবামাত্র নিহত মালকাটারের স্বীকৃতা, মাতাভরী সব ছুটিয়া আসিয়া তাহার নিকট ঝাটুয়া পড়িল “সাহেব তখনই তো ভুঝে বলেছিলম যে—ভুই যে বলি কোন ভর নাই, তাহেইতো চাচ্চে সিংহেলম—এখন যে সকলকে কিয়ায়ে যে—”

সমাপিষ্ট লোকের নিকৃপার, করণ আর্ন্তনয় তখনও বড়সাহেবের কানে বাজিতেছিল, তদুপরি সন্ত প্রিয় বিরোগ বিদ্রুগা শোকার্ত রনীরের করণ বিলাপ তাহাকে আরও

অধীর করিয়া তুলিল। তিনি ব্যক্শক্তি রহিত হইলেন, একটা সাহসার বাগীও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ছোট সাহেব তাহার অবস্থা বৃত্তিতে পারিয়া বলিলেন, “আগনি বাংলোর দান, আমি এসের দেখছি—” বড় সাহেব বিকল্পিত না করিয়া চলিয়া গেলেন, এ করণ পুত্র তিনি আর লক্ষ করিতে পারিতেছিলেন না।

সেদিন রাতি বিশ্রহেরও বড় সাহেবের বনিবার ঘকে আলো ধলিতেছিল। টেবিলে একখানি অর্ধ-সমাপ্ত পত্র পড়িয়াছিল আর সাহেব ঘরের ভিতর অস্থিরভাবে পথচারণা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। জীবনের প্রায় অর্ধেককাল যেখানে যে কর্ণে কাটা হইয়াছে, সেখান, যে কর্ণ ছাড়াইয়া দাইতে—বাহাদের সাহচর্যে বাস করিয়াছেন, বাহাদের স্বহৃৎ নিজে করিয়া লইয়াছেন, চিরদিনের মত তাহাদের ছাড়াইয়া দাইতে মনে বজাবতই থিা ধাপিতেছিল, অস্থর অন্তঃই ব্যাভুল হইয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু তখনই আবার কাণে ভাগিয়া আদিতেছিল পুত্রহারা, শিষ্টহারা, শোকার্তা রনীরের করণ বিলাপধ্বনি, বিশেষ করিয়া তাহাদের সেই ভিরকারপূচক আবেশোক্তি—তিনি তাহাদের ভরণা দিয়াছিলেন বলিয়া তাহার উপর তাহাদের যে একটি অণও বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসের কোরেই প্রিয়জনদের ঐ বিপদমল্ল কর্ণে দাইতে দিয়াছিল। এই স্বপাটিই তিনি কিছুতে ভুলিতে পারিতেছিলেন না, মালকাটারের মৃত্যুর লজ তাহার নিজেই একমাত্র দায়ী বলিয়া বেধে হইতে লাগিল, এবার আর কোন থিা সম্বোধি চলি না, গুণপদক্ষেপে টেবিলের নিকট বাইরা তিনি তাহার অলমাপ্ত পদত্যাগপত্র লেব করিয়া অশেপকৃত নিশ্চিন্ত-চিত্তে শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন।

তাহার এই পদত্যাগপত্র পাখিলের কথা জানিলেন শুধু ছোট সাহেব। আর সকলের নিগটেই ইদ্যা গোপন রহিল। যে কয়দিন হেত অক্লি নৃতন ম্যানেজারের বসোপত্ত করিতে না পারিলেন, সে কয়দিন উইলসন সাহেবকে কাগ চালাইতেই হইল কিন্তু আর তাহার মুখে কেহ হাসি দেখে নাই।

নূতন যানেজারের যেদিন আদিয়া পৌছিবার কথা তার আগের রাতেই উইলসন সাহেব কুঠী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ঘাইবার পূর্বে ছোট সাহেবকে সব চাক্ষু বুঝাইয়া দিয়া গেলেন, তিনি বহুদিনের পুরাতন অধিকার লোক তিনিই সব দেখাইয়া শোনাইয়া দিতে পারিবেন। তত্ত্ব তিনি নিজেও সব বুঝাইয়া প্রকাণ্ড একটি দ্রুতি লিখিয়া রাখিলেন, নিজে উপস্থিত থাকিয়া সব বুঝাইয়া দিয়া দাঁতে পারিলেন না বলিয়া কখনো প্রার্থনা করিয়া নূতন যানেজারের নামে একখানি পত্রও লিখিয়া গেলেন। নূতন সাহেবকে যেখানেই কুঠীর সকলে কোঁজুলী হইয়া উঠিবে, তখন আর ব্যাপারটা চাপা থাকিবেনা, সকলে ব্যাহুল হইয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিবে—এইরকমই তাঁহার এত সতর্কতা অবলম্বন। এতলোকের লজ্জা ভালবাসার আবেগ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিবার মত মনের জোর আর তাঁহার ছিল না, তাঁহার নিজের অন্তরই যে অতিশয় চঞ্চল ও অস্থির হইয়া উঠিয়াছে—সকলের সম্মুখে সে দুর্বলতা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই।

বিদায় গ্রহণের পূর্বে তিনি ছোট সাহেবের নিকট কিছু অর্থ দিয়া গেলেন যত মালকাটারের পরিবারবর্গ কুঠীর কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণের যে টাকা পাইবে তাহার সঙ্গে দিয়া বিদায় লয়। যদিও উইলসন সাহেব কখনও ভাবেন নাই যে অর্থের দ্বারা তাহাদের ‘ক্ষতি’ পূরণ করা যায় তথাপি এই নিষ্কাশন শোকের উপর বাহাড়ে আসবার জীবনধারণের সমস্তা বিব্রত হইতে না হয় সেজন্যই এই অর্থ প্রদান।

দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; উইলসন সাহেবের

সংবাদ কেহ জানে না, কানাবুয়ার স্ত্রী গিয়াছে যে তিনি কুঠী পরিত্যাগ করিবার কয়েকদিন পরেই তাঁহার জন্মভূমি ঝটল্যাও অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু কুঠীর লোকেরা কেহই তাঁহাকে চেনেন নাই। তাহাদের মর্ফরলটিতে তাহার মত যে অধ্যাচালকবাসীর আসন তিনি তাঁহার উত্তর অধঃকরণ ও সঙ্গর আচরণের দ্বারা গ্রহীতা করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। যে লগ শিক্তা উইলসন সাহেবকে কখনও দেখে নাই তাহারা পর্যন্ত গল্প শুনিয়া তাঁহাকে পরিচিত শ্রদ্ধাভনের মতই জানিয়াছে। তিনি হৃদয় ঝটল্যাওর অবস্থান করন বা অথ যে কোন দ্বানেই অবস্থান করন না কেন এই ভারতবর্ষের একটি সূত্রস্থানের কয়েক শত লোকের মনে আজও লগৌরবে বিরাজ করেন।

একদিন সহসা লগনের একটি বড় এটর্নী অফিস হইতে একখানি পত্র আসিল। তাহাতে জানা গেল যে উইলসন সাহেব সম্ভ্রান্তি টহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার সজিত অর্থের অর্ধেক তিনি এই কুঠীর মন্ত্রের উন্নতিকল্পে দান করিয়া গিয়াছেন। কে জানে উইলসন সাহেব এই দীর্ঘ দশ বৎসরের নিঃসঙ্গ জীবনের কতখানি সময় হৃদয় ভারতবর্ষের এই কুঠীর চিন্তায় ভরাইয়া রাখিতে।

তাহাদের নিকট আরও জানা গেল যে এতদিন তিনি ঝটল্যাওর একটি ক্ষুদ্র পরীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার বেশির ভাগ সময় কাটিত একটি পুষ্পাভ্যাসের পরিচর্যা ও ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে খেলা করিয়া। তাঁহার বাকী অর্ধেক অর্থ তিনি সেই গ্রামটির কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন।

প্রশ্ন ?

মাতা ঘোষ

“হিসাব বিলতে মন ঘোর নাহ রাজী”—তাই কি হয় ব্যস্ত ভগতে ? ওতো কবিকের কবি কল্পনা ! হুমিয়ার মাহুৎ প্রতিমূর্ত্তে হিসাব নিকাশ কোরে চলছে, কথ কতি লাভ লোকসানের ; সে চুলতে পারে না নিজের ভাল মন্দকে, সে চায় না নিজের একতিল স্বার্থকে ত্যাগ কোরতে ; তাই সে সধা জীক, সধা লস্কিত ; তাই সে ক্ষতিবে বেধে, চুল চিরে বিচার করে, কেমন কোরে চললে, কোথায় কি বললে তার বজার বাক্যে সবখানি। ব্যাতি, অর্থ, বশ, মান, প্রভৃৎ, হুৎ, আরাম সবই তার চাই সে জীবনে ! ...আমি ? আমিই কি এর ব্যতিক্রম নাকি ? ...আদর্শবাদী আমি, মিথ্যাচারকে মনে গ্রাহে স্থাপ্য করি, তবু...থাক্ ঐ তবু পঙ্খস্থই !

ধর বাবু নতুন বাড়ী তৈরী কোরেছেন ! মাকথানে উঠোন, দুপাশে দুটো অংশ ভাড়া দেবার জন্য । সেই ধর বিজিৎ-এর ডান অংশতে এসেছেন হাওড়া পরিবর্তনের জন্য মামীমার রাঙামামা, অর্থাৎ আমাদের হুইট ! গেলাম তাঁদের বাড়ী বেড়াতে । বাড়ীর অস্ত অংশে ধারা আছেন, ভব্রমহিলা এঁদের বাড়ী বেড়াতে এসেন, আলাপ হলো ! একদিন আপনেন বলে প্রতিক্রিয়া দিলেন ! ...কয়েকদিন পরে ব্যস্ত আছি ভব্রমহিলা বেড়াতে এসেন । উজ্জ্বলিত, সন্মেনের মস্ত ধন্যবাপ দিতে লাগলেন বার বার । বলেন—“তাইরা বলছিল সম্মেশ তোমার একলার মস্তই পাঠিয়েছেন, তোমার সঙ্গে সেদিন আলাপ হয়েচে”—একটু অবাক হোয়ে বাই । সম্মেশ পাঠানো হোয়েছে জানতাম না তো ! মামীমা তাহলে হুইটমবাড়ী পাঠাবার সময় পাঠিয়েছেন বোধ হয় । ভব্র-মহিলা উজ্জ্বলের সঙ্গে সম্মেশের কথা বলতে চলেছেন বোনের মুখের নিকে তাকিয়ে দেখি হাসছে । হাসির ব্যাপারে বেবানে হাসি অহুভিত, মুখে ও হাসে না বড় । গুর চোখ দুটো আনিরে দেখে । এবার বুকে নিই

ব্যাপারটা । সম্মেশ তাহলে ওঁদের পাঠানো হয়নি, বাহক ভুল কোরে হুইট বাড়ীতে নাহিখে বাহিকে দিয়ে এসেছে । মামীমার কীতি এটা ! হাসি পার আমারও ! তবু সংকত হোয়ে বলি—“কি আর এমন পাঠানো হয়েছে ? মামীমা পাঠিয়েছেন !”

—“নানা, ভারী চমৎকার সম্মেশ, বিশেষে এমন আপনার মনের মতন পাঠিয়েছেন”

ভব্রমহিলার কথাই আশ্চর্যকতার ছোঁয়াচ লাগে । সেই পিপাসা মন, বিশেষে এলেও আপন মনের মতন : অমূল্যমানে ব্যাহুল ! মামীমা আসেন । একই চুপ করে থেকে ব্যাপারটা বুকে বলতে থাকেন—“কি আর এমন পাঠিয়েছি ?” “ঐ এমন কিছু পাঠানো হয় নি” হুয়েখরি আমি ।

ওবাড়ীর ছোটখুড়ি বুঝ মস্তা কথা বলেন ! প্রায়ই লোকের মিথ্যা কথা ধরিয়ে দিয়ে, কষ্টকটিয়ে কথা ভনিখে যেন । মরকার হোলে তাই নিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে সগড়া করেন । সগড়ার সময় খানিকটা গুণ ফেলে অপরের মিথ্যাবাসিতায় স্থাপ্য প্রকাশ করেন । তাঁরই ছেলে অঝিনাশ । গেদিন ছোটখুড়ির ভাই মোরে সাইকেলটা নিয়ে যেহিয়েছিল । আনাড়ি হাত, ভাল চালতেও জানে না । পথের মধ্যে থিল ফেলে ! নিজেও পড়লো ছিটকে কার্যার মধ্যে, সাইকেলটা পতনের খল লক্ষ কোরতে পারলো না, থিলগে গেল । ফলে অঝিনাশ সাইকেল চেপে বাড়ী ফিরতে পারলো না । কাঁধামাথা অবস্থায় সাইকেল হাতে ঠেলতে ঠেলতে বাড়ী চুকলো । মাঝে জানালো পতন এবং সাইকেল বেগড়ানোর খবর । ...বিকালে তাইপো ঠাক দিলেন—“সাইকেল ভাঙলো কে ?” ছোটখুড়ি অনেকক্ষণ বেতাই বক্তে আরম্ভ কোরেছেন ওবাড়ীর সাময়কে । মাঝে মাঝে সাময়ও সাইকেল নেবে—তাঁদেরই আখ্যায় । —“কেবল সাইকেল নেবে । নিয়ে দিয়েছে থিলগিথে,” ছোটখুড়ির হুর লগথে চুকলো ।

তাইপো চুপ কোরে গেলেন, হতুহ হলো সাময় যেন তাঁর সাইকেলে হাত না দেয় ।

ছোটখুড়ির ককর খামেলা না—ভাগ্যি তিনি ছিলেন, তাই এতখানি দরদ দিয়ে ভাইপোর সব কিছু আগলে থাকেন...

মিস চৌধুরী, খুশান দর্শ প্রচারিকা। দীন্তর দর্শ, সত্য অহিংসার বাণী প্রচার করে বেড়ান বাড়ী বাড়ী। নাক্তে যা হোয়েছে তাঁর! খুব বাবা! মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে। ভাকার মাসালের কাছে দান—“আপনার কাছে নাকের ঘাচের গুহু আছে?”

—“হা আছে, কাক নাকের ঘা হোয়েছে?”—ভাকারের কাছ থেকে উত্তর আগে!

—“এই আনাদের কি-এর মেয়েত, বড় কষ্ট পাচ্ছে বোকারী!”

—“দান এই কোটাটা নিয়ে দান, তেরো আনা দান, খুব কোরে বলে ঘসে লাগাতে বোলবেন।”

“হা বলবো বইকি। লোকের কষ্ট যেথতে পারিনা। নাকের ঘা বড় খারাপ জিনিষ।...জীবে দয়া...এই তো দীন্তর আবেশ...”

মিস চৌধুরী তেরো আনা পয়সা বার কোরে নেন!...

শাফা, জয়া, পুটু তিন জনে তুলে যাচ্ছে বাড়ীর গাড়ীতে। নরেনবাবু ড্রাইভার, খোকা অভিভাবক। আমিও আছি, দরকার চশমার বোকানে। আগের দিন গুদের পরীকা ছিল, পুটু ঘামনি। সে তুলে গিয়ে আগের দিন পরীকা না বেওয়ার কি কারণ মর্শাবে, শাফা তারই ভালিম দিতে থাকে।

“তুমি বোলো পুটু—আমি জানতাম না কাল পরীকা ছিল, তাই আসিনি!”

পুটু শাফাকে বাধা দিয়ে সজোরে বলে ওঠে—“হা জানতাম, শাফা থমকে চুপ কোরে দায়! একই অশ্রুস্তও হয়! শাফার অশ্রুস্ত ভাব বেখে পুটুকে ভিজায়া করি—“পুটু, কাল পরীকা ছিল জানতে, তুু বাওনি কেন?” পুটু সোজা জবাব দেয়—“তুলে গিয়েছিলাম।” পুটু বড় সহজে জবাব দেয়, অত সোজা নয় কিন্তু ব্যাপারটা। ক্রাস টু-এর মেয়ে, পরীকা হেন জিনিষ তুলে গিয়েছে।

শাফা বলে—“তবে তাই বোলো।”

একটু ডেবে বলে—“হ্যাঁ মেজদি, তুলে গিয়েছিল বললে দিমিদি যে ভীষণ রাগ কোরবেন!”

পুটু নিবিকারে! যেন দায় শাফারই। এবার শংসর আবার। বৃত্ততে পারিনা পুটুকে কি নির্দেশ দেবো? দিমিদির রাগ সত্য কোরে সাত্তা বড়র একটি ক্রাসে পড়ে থাকবে না নিখ্যা কথা বলবে? না জানায় হয়তো। কমা আছে কিন্তু তুল দে উপেক্ষা। অত সহজে নেবেন কি তাঁরা?

তুু একটু ডেবে বলি—“না পুটু, তুমি সত্য কথাই বোলো, বোলো সে তুলে গিয়েছিল, যা হবার হবে।”

কোথায় যেন একটু দুর্ভলতা ছিল, দায় ভক্ত ‘যা হবার হবে’ কথাটা অত জোরের সঙ্গে বেরোয় মূণ দিয়ে। খোকা বাপা যেখ “না না ‘তুলে গিয়েছিলাম’ বললে ‘প্রমোশন’ পাবে না।”

শাফা বলে—“কিন্তু নিখ্যা বলতে হবে তো।” আমি বলি—“না পুটু তুমি সত্যি কথাই বোলো”, পুটুর কাছ থেকে কোন কথাই যেন জবাব আসে না। কি বলতে হবে না হবে, দিমিদিরা কি বোলবেন না বোলবেন, ক্রাসে উঠে না উঠবে, কোন ভাবনাই নেই ওর! ওর শাফা সমাহিত ভাবময় মূখ্যনার নিকে তাকিয়ে অশ্রুমনক হোয়ে দাই। ছোট পুটু, বড় শংসর, বড় সহজ, গুণে গুণে পা তেলেনা, হিসাব কোরে কথা বলেনা। শাফা কতিব নিকেশ নিয়ে উগাও হয় না! দিমিদির রাগ বিরাগ এক বড়র এগিয়ে দাওতা, পিছিয়ে থাকা সবেতেই খাত ও পরম নিবিচার, চরম উদাসীন। আমজকের এই নিশূদতা, এক বড়রের শাফা কতিব প্রতি এতখানি উদাসীনতা এতো ওর অপরিণিত বৃত্তির, না-জানা শিশুমনের অভিব্যক্তি যাত্র। কিন্তু বিন এগিয়ে চলেছে।

আমজকের ছোট পুটু এত ছোট থাকবে না। বড় হবে ও একদিন। নিজের ভালমত চরম সত্য হোয়ে দেখা দেবে ওর জীবনে। সেদিন ওকি এত সহজেই এতখানি অনাপত্তির সঙ্গেই, এই রকম উদাসীনতা বিহেই গ্রহণ কোরেও জীবনের লাভ লোকসানকে? এতখানি বেহিলাবীই কি থাকবে ও?—কিন্তু তাহলে? কোন চোখে দেখবে ওকে হিসাবী মানুষ? হিসাব ভোলা যে জন, কি মধ্যমা দেখে তাকে সত্য দুনিয়া?

গান্ধী-বচন

[৩০শে জাম্বুগারী ভারতের ইতিহাসে একটি কালিদায়ক দিন, কিন্তু জাম্বুগারী দিন নয়। ভারতবর্ষের যে দর্শন সত্য ও অহিংসার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই দর্শনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এই দিনটিতে, গান্ধীজির পৌরবন্দর আত্মসমর্পণের বধ্য দিবে। গান্ধীজির সমগ্র জীবনদর্শনের দর্শকগণটি এমন করে অক্ষয় হৃদয়ের বধ্যস্বর প্রতিষ্ঠিত করে সিতে ঠিক এমনভাবে হৃদয়ই তাঁর ছিল প্রয়োজন। তাঁর হৃদয়বাহিনীতে তাঁর অমর বার্তাকে স্বরণ করে আমরা তাঁকে পাকি আমলেই নকিবান—সকলের অন্তরে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পরে হৃদয় আশ পর্বত দিল্লীতে বিভিন্ন প্রাথমিক ভাবে তাঁর সেই সময়কার যে চিন্তাধারাটি প্রকাশিত হয়েছে তা ঐ সময়কার ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক একটি মূল্যবান হলিল। নবজীবন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'Delhi Diary'তে তাঁর এই সকল ভাবন সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আমরা তার থেকে তিনটি বিভিন্ন বিষয় লুপ্তে গ্রহণ তিনটি বিভিন্ন সময়ের ভাবন এখানে অস্থায়ী করে যিচ্ছি। নং নং]

এই কি স্বপ্ন ?

(১২শে অক্টোবর ১৯৪৭)

(এই দিন প্রার্থনা সভার আত্মসমর্পণ পণ্ডিত ধারে কর্তৃক সংগৃহীত ভক্তবন্দী থেকে একটি ভক্তন গাওয়া হয়। এই গানটি মহাত্মজীর একজন সহকর্মী, পরলোকগত মনলাল পাকী প্রারম্ভে গাইতেন।)

গান্ধীজি বলেন যে মনলাল প্রায়ই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এট ভক্তনটি গাইতেন, এই গানটিতে কবি ভগবানকে যুগোয়নি দেখতে না পাওয়ার কারণ নৈরাত্ত প্রকাশ করেছেন। প্রতীকার রাত্রিটি যেন একটা দুঃস্বপ্ন যত মনে হয়। মনলালের ঠিকর হচ্ছেন তাঁর স্বপ্নের

স্বপ্নের বাস্তবরূপ, অর্থাৎ ভগবানের সাক্ষ্য। মনে হচ্ছে সে স্বপ্নের সাক্ষ্যতা অনেক দূর। কেবলমাত্র গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিদ্বারা এই সে স্বপ্নের সাক্ষ্যতা সম্ভব। যদি ভগবানধারণ তাঁদের সামনে তুলে ধরা গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিকে চালিয়ে যেতে পারতেন, তবে কখনই তাঁরা এখন যেসব দৃষ্ট চারদিকে দেখতে পাচ্ছেন তা পেতেন না।

সুতরাং ১৫ই আগস্ট তারিখে স্বপ্নকে এসেছে বলে কথা হয়। কিন্তু তিনি (গান্ধীজি) একে 'স্বপ্ন' বলতে পারেন না। স্বপ্নকে তাই তাই-এর গলা কাটে না। স্বাধীন ভারত সরকারের বন্ধু হতেই চেয়েছিল, সমগ্র পৃথিবীতে কোন শত্রু না রাখারই ছিল এর ইচ্ছা। কিন্তু হারয়ে! আজ এর নিষেধ লঙ্ঘনহীন,—একমিকে হিন্দু ও শিখ ও অন্যান্য মুসলিমরা পরস্পর পরস্পরের রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছে।

গান্ধীজি সকলকে বলেন যে যদি তাঁরা তাঁদের স্বপ্নের সত্যিকারের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে চান তবে পরলোকগত মনলালের যত তাঁদেরও সকলেরই দর্শকদের সঙ্গে এর প্রতি একটা ভীত আগন্তিক বোধ করা উচিত। ঠিকর হচ্ছেন নিরাকার, মায়াবী তাঁকে বিভিন্নরূপে কল্পনা করে নেয়। যদি তাঁরা ভগবানকে 'রাম-রাম'-রূপে দেখতে চান তবে তাঁর সঙ্গে সব চাইতে প্রথম যে জিনিষটি প্রয়োজন তা হচ্ছে আত্মসমর্পণ, তাঁদের নিষেধের খুঁতগুলোকে সহ্যওণ করে' মনের আয়নাতে প্রতিফলিত করতে হবে এবং প্রতিবেশীর ঘোষণার দিকে চোখ বুজে থাকতে হবে। আলল প্রগতির একমাত্র পথ হচ্ছে এইটি। আজ তাঁদের অবনতি ঘটেছে। হিন্দু ও শিখদের মুসলমানরা শত্রু বলে মনে করে আর মুসলমানদের তাই মনে করে হিন্দু ও শিখেরা। পরস্পরের ধর্মের প্রতি তাঁদের কাকুরই বিদ্বেষ প্রভা নেই। মন্দিরকে ধ্বংস করে মন্দিরে পরিণত করা হচ্ছে আর মন্দিরকে ধ্বংস করে করা হচ্ছে মন্দির। এই অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এর কল উভয় ধর্মেরই বিনাশ সাধন ছাড়া আর কিছু চ'তে পারে না।

আন্তঃপ্রাণী শিবিরসমূহের পরিচ্ছন্নতা

(১৩৪ নভেম্বর, ১৯৪৭)

প্রাণী সন্তান বোমা

(২১শে অক্টোবর, ১৯৪৮)

(১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে দিল্লীতে অবস্থানকালে গান্ধীজি তৎকালে তৎকালীয় বিভিন্ন আন্তঃপ্রাণীশিবিরসমূহের ও নগরীর অবাধ্যতাব পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁর প্রাণান্দিক ভাবে আলোচনা করেন।)

পরিচ্ছন্নতাটা প্রত্যেকেই কাম্য বস্তু। তাঁর মতে ক্যাম্পের বাইরে যারা আছেন তাঁদের কর্তব্য প্রত্যেকের নিজের নিজের এলাকা আগমন সাহায্যেই পরিচ্ছন্ন রাখা, অশুভ্রতার কলহ হিংস্রত্বের পৌরবেক রান ক'রে দিচ্ছে। এই কলহকে দূর করেবার একটা পথ হচ্ছে সকলেরই এক একজন 'ভাঙ্কি' হ'য়ে যাওয়া। মেঘরের কাম কখনই নোংরা কাজ নয়, এই কাজই পরিচ্ছন্নতা এনে দেয়। যদি দিল্লীর নাগরিকরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত-ভাবে নগরীর পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি দেন, তাতে ক'রে তাঁরা যে শুধু মিল্লীকে নন্দোহর ক'রে তুলবেন তাই নয়, এর ফলে তাঁরা একটা ব্রহ্ম প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করবেন। আলতাপরারন হ'য়ে শুধু ভাস খেলে বা আড্ডা দিয়ে সন্ধ্যা কাটানোর ফলে কেবল লোকের নৈতিক অবনতিই ঘটে থাকে। হাতো কাটা, তাঁত বোনা, সেলাইএর কাজ, ছুতোয়গিরি, চাষবাগ বা যে কোন একটা নিজের কচি অগ্রহাণী বৃত্তিকে গ্রহণ ক'রে নিজে তাঁদের খুশী হওয়া উচিত। এ বিষয়ে গান্ধীজির মনে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁদের সকলেরই উচিত অপরের উপরে নির্ভর না ক'রে নিজেরদের পায়ে দাঁড়াতে শেবা। তাঁর বিশ্বাস এই যে আন্তঃপ্রাণীরা যদি সকলে কাছে জড়িয়ে পড়তে পারেন তবে তা'দ্বারা তাঁদের জর্জবেগের ক্ষুধকে অনেকটা তুলতে পারবেন, গান্ধীজি বলেন,—যে সব নির্ধাতন তাঁদের সকলকে সজ্জ'রতে হয়েছে তা' তিনি জানেন, এবং 'অজ' মুহূর্তের ভ্রমও তিনি, দ্বারা তাঁদের উপরে এই সমস্ত নির্ধাতন করেছে, তাদের সমর্থন করেন না। কিন্তু একথাও তিনি অবশ্যই বলবেন যে মন্দের বদলে ভালকে ফিরিয়ে দেওয়াই হচ্ছে খাটি পথ।

এই দিন গান্ধীজি তাঁর প্রাণান্দিক ভাবে বিড়লা হাউসের ভেতরে আগের দিনকার বোমা কাটার কথা উল্লেখ করেন। ঐ ঘটনার পর থেকে অনেকে উষ্ম হয়ে তাঁর খোঁজ খবর নিচ্ছেন আবার দুঃখের দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত না হওয়ার মকল তিনি অনেকের কাছ থেকে প্রশংসাও পেয়েছেন। তিনি কিছু ভেবেছিলেন যে ওটা বোম্বের কোন সাময়িক কূটকাণ্ডের অঙ্গ হয়ে থাকবে এবং তা'তে দ্বন্দ্বভাবের কিছু নেই। প্রাণী পেশ হওয়ার আগে তা' তিনি বুঝতেই পারেন নি যে ওটা ছিল একটা বোমা কাটার আওতাধর এবং বোমাটা আবার তাঁকেই লক্ষ্য ক'রে ছোঁড়া হয়েছিল। বাস্তবিক বদন তাঁকে লক্ষ্য ক'রে ছোঁড়া একটি বোমা তাঁর সামনে এসে বিদীর্ণ হবে তখন তিনি ঠিক কি ভাবে তার সম্মুখীন হবেন তা' শুধু ভগবানই বলতে পারেন, হৃতপ্রাণ তাঁকে প্রশংসা করার কিছু নেই। যদি এরূপ একটি বোমার আঘাতে তিনি পড়ে' যান এবং তথাপি দৃষ্টকর্তার উপরে কোন রোপ না থেকে তাঁর মূখে লেগে থাকে এক টুকরো হাসি, কেবল তা' হলই তিনি একটি প্রশংসাপত্র পাওয়ার উপযুক্ত হবেন। তিনি এট বলতে চাচ্ছেন যে ঐ বিশপগামী হৃদকের উপরে যেন কেউ কুহ না হ'ন। যে বোম্বের গান্ধীজিকে হিংস্রত্বের একজন শত্রু ব'লে মনে করেছিল। মহোপরি, স্মিতার কি একথা লেখা আছে না যে যখনই কোন দুরাত্মা ধর্মের অনিষ্টসাধন করতে থাকে তখনই ভগবান সেই দুরাত্মাকে নিধন ক'রবার মত্রে কোন একজনকে এই পৃথিবীতে পাঠান? ঐ বিখ্যাত শ্লোকটির একটি বিশেষ মানে আছে। হৃদকটির এটা খোঁজা উচিত যে যারাই তাঁর বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী তারাই সেমত্রে দ্বন্দ্বন নয়। ভাল লোকদের দ্বন্দ্বনশীলতা ছাড়া মন্দের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে অপরাধী যেমন মনে করেছিল, তেমনভাবে কারাই নিজেকে এমন খাটি লোক ব'লে মনে করা

উচিত নয় যে চরিত্রবিশেষের শাস্তিবিধানের ভয়েই সে
ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন

অপরোধীকে কমা করুন

[প্রার্থনা সভার বোমা ছোড়ার অপরাধে যে
দৃষ্টান্তের প্রেক্ষাপট করা হয়েছিল লোকের হাতে তার
উপরে ক্রোধ না হইলেও গাফীতি নিজেই তাঁর
প্রাথমিক ভাষণে সকলের নিকটে উক্ত দৃষ্টান্তের ভিত্তি
কল্পনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ আমাদের মনে পড়ছে
মহাত্মার সেই শেষ দিনটি—যেদিন নাথুরাম কর্তৃক
কলিকাতার পথে তাঁর মূণে লেগেছিল একটি কমান্ডারের
শিঁড়ি ছাড়া আর কোনও উপায়ে ইচ্ছাটি ব্যর্থ হয়েছিল,
'যেমন অপরাধীকে উপরে কোন প্রতিশোধ না দেওয়া হয়'।
গাফীতির সমগ্র জীবনকালের মূল আশ্রয়টির পরিপূর্ণ
বিস্তার ঘটেছে। তাঁর গোঁবন্দ্য দৃষ্টিই মাঝে মাঝে
তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূল উৎস যে কমান্ডারিতা,—তারও
পরিপূর্ণ বিস্তার ঘটেছে তাঁর এই ধর্মের কথাতে। শঃ মঃ]

বোমার ফাটার কথা প্রসঙ্গে গাফীতি বলেন যে কতিপয়
শির বন্ধুরা এসে থাকে বলেছেন, যেন তিনি এটা না
ভাবেন যে বিশ্বজুড়ে এই ব্যাপারে কোন হাত ছিল।
তিনি জানেন যে দৃষ্টান্তটির মত, কিন্তু সে শিরটি ছোড়,

হিন্দুই ছোড় বা একজন মুসলমানই ছোড় তাতে কি
আশে বাত? গাফীতি সকল প্রকৃতকারীর সঙ্গেই মঙ্গল
কামনা করেন। তিনি পুনর্জন্মের ইন্সপেক্টর
হোনারেলকেও বলে দিয়েছেন যেমুসলমানের কোনও
উৎসাহিত না করা হইলে, তাঁদের উচিত অপরাধীকে জয়
করতে ও তাঁকে ঠিক পথে চালিত করতে চেষ্টা করা।
গাফীতি এই আশা প্রকাশ করেন যে দৃষ্টান্তটি এবং তাঁর
পেছনেও তাঁর পরিচালকবৃত্তম্ব তাঁদের মূল দৃষ্টান্তে পরিণত
কারণ এটা হিন্দুধর্মের এবং দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। সে
সঙ্গে তিনি শ্রোতাদের সাবধান করে দেন যেমুসলমান
অপরাধীর প্রতি ক্রোধ না হইবে। সে জানত না যে সে
যা করছিল তা মূল। লোকের উচিত তাকে করণ করা।
যদি তাঁরা (দেশের লোক) গাফীতির (মানসাদিক
ঐক্যের ভিত্তি) উপস্থাপন করার ফলে মনের ভেতরে রাগ
পূর্বে রেখেও কেবল দেশের একজন পুরোনা লোকের
জীবনরক্ষা করার ভিত্তিতে শাস্তি বজায় রেখে থাকেন তবে
নিশ্চয়ই ছোটটা তাঁদের মতলবে, যে দৃষ্টান্তটি বোমা ছুঁড়ে
ছিল তাঁর নয়। আর যদি তাঁরা লক্ষ্যকরণে নিজেদের
ইচ্ছাযুক্ত শাস্তি বজায় রাখবার প্রতিজ্ঞাটি নিয়ে থাকেন
তবে এই দৃষ্টান্তের মত গোকেটা শেষ পর্যন্ত তাঁদের মতে
আসতে বাধ্য।

টেলিগ্রাম: 'বাক'

কোন: ৫ই মে ১৯৫১

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস:

২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	২৫,০০,০০০ টাকা
বিক্রীত মূলধন	১২,৫০,০০০ টাকা
বিক্রয়ার্থ মূলধন	১২,৫০,০০০ টাকা
আমোদিত মূলধন ও	
মজুত অস্থাবর	১৪,০০,০০০ টাকা

আপনি ৪৫/৬ মিলেট আমাদের ৫০ টাকা মূল্যের
৫ বৎসরের ক্যাস সার্টিফিকেট ক্রয় করিতে পারেন।
ইহা যে কোন সময়ে ডাঙান যায় এবং আপনার
সিন্ধুকে ধারার মতই নিরাপত্তা অর্থাৎ সুদও পাওয়া
যাইবে।

জীবন বীমায়

বলেন মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেল সোসাইটি লিমিটেড

ভারতবর্ষ

প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত—১৮৭১

দস্তিদার এণ্ড সন্স

চীফ এজেন্ট

৮নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন: কলিকাতা ১০১৮



গানের মৃত্যুবার্ষিকী—

গানের মৃত্যু বার্ষিকী—“সম্রাট যুগে যুগে”—খর
গানের জন্ম এবং পাণের বিনাশের জন্ম ভগবান যুগে
যুগে অবতীর্ণ হন। এই হ'ল গীতাভ ভগবানের প্রতিশ্রুতি।
আত্মকার যুগে আশ্রয় বচনের মোহাই দিয়ে বা অসুস্থ ও
অপ্রাণী ভগবানের মোহাই দিয়ে কোন কথা বলার
সার্বকতা নেই। কিন্তু জাতির ঐতিহ্যের সত্ত্বা হাজার
হ'ল একদিকে যেমন তার ইতিহাস—অপরদিকে তেমনি
তার শ্রুতি ও বৃত্তি—তার শাস্ত্র গ্রন্থ। বেদ-ঊপনিষদ-
গীতা বাইবেলকে আমরা সেই ভাবেই দেখি। পাণের
অতিরিক্ত বৃত্তি হ'লে, মাহুকের নৈতিক চরিত্রের ও বৃত্তির
বৈধি কিরিয়ে আনার জন্ম এক এক জন মহাপুরুষ এক এক
যুগে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐক্য, রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, যিশু,
মহাত্মা, কহলিমিথাস প্রভৃতি মহাপুরুষরা নিজ নিজ দেশ-
জাতির কোন সমস্যাতে এসেছিলেন। ঠিক তেমনি
ভারতের এক মহাপুরুষ সময় এসেছিলেন—মোহনদাস
করমচারী গান্ধী।

কৌশল্য দুর্বল বৈধ, দৈনিক দৌলতবাহীন এই লোকটি
আমাদের যুগে প্রভুতির একটা খেয়ালের মতো এক অতি-
মানব হিলাবে এসেছিলেন। আমরা যারা তাঁকে দেখেছি—
তার সঙ্গে চলেছি কিরেছি, তার বৈদ্যমিন কাজকর্মের সঙ্গে
পরিচিত হইছি এবং তার নেতৃত্বে এক মহা বিপ্লবের
সংগঠনে অংশ গ্রহণ করেছি—সেই আমরা তাঁর প্রকৃত
মূল্য হস্ত দিতে পারি নি। আমরা তাঁকে নিয়েছি—
ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিচালক বলে। তাঁকে না
হ'লে, আমরা ঐ যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারতাম না,
তাই তাঁর সব বেয়ালু ও মলিনকে স'ধে গেছি—বংশান্ত
ক'রে গেছি—যদি অসুস্থ করতে চেষ্টা করিনি।

তাই স্বাধীনতা লাভের প্রাচ্যালেই আমরা তাঁকে
অস্বীকার করেছি এবং স্বাধীনতা লাভের পর প্রয়োজন
নতো তাঁর মোহাই দিচ্ছি কিন্তু তাঁকে নিজেদের জীবনে
ও কর্মে, নিজেদের চিন্তার ও আদর্শে গ্রহণ করতে পারি
নি। হৃদয় তাঁর মৃত্যুর পর, আমরা কতকটা অসুস্থ
করছি—গান্ধী কি ছিলেন। কর্মময় জীবনে সাধারণ
মাহুয ভাবতে পারেন না এবং চাও না,—কর্মের উদ্যমান
হুটে চলে। কার্যেই তাঁর শ্রম অসুচর ও অস্বতীর্ণের
পক্ষে এই ঋতি কতকটা স্বাভাবিক। ইতিহাস গান্ধীর
মূল্য দিবে। পেলেরাইন বা ইলিরা বিস্তারিত গ্রহণ
করেনি, তা বলে বিস্তারিত মূল্য ইতিহাসে কমে নি।
ইতিহাস তাঁর প্রকৃত মূল্য দিয়েছে। আর বা আরবীর-
গণ মহত্বকে গ্রহণ করেছিল। তার জন্ম ইতিহাস তাঁকে
কোন অতিরিক্ত মূল্য দেয় নি। আত্ম আমরা গান্ধীকে
কতটা গ্রহণ করেছি কি করিনি—তা দিয়ে গান্ধীর মূল্য
ইতিহাসে নির্ণীত হবে না।

তবুও এই যুগের ভারতবাসীর অসুখাবন করা বরকার
—গান্ধীর স্বেচ্ছা-মরণের অর্থ কি। তাঁর জীবনের উপর
আক্রমণ হ'তে পারে, এমন সংবাদ তাঁর জানা ছিল।
একবার জীবনের উপর আক্রমণ হল। তা সত্ত্বেও তিনি
সতর্ক হলেন না, ভারত সরকারকে সতর্ক হ'তে দিলেন
না—যেমন জীবনহাতির জন্ম তিনি দিব সংকল্প ছিলেন।
তাঁর জীবনের মূল্য তিনি জানতেন; তাই তাঁর ইচ্ছা ছিল
শোণা ব' (১২১) বছর বাঁচবেন। তবুও তিনি মৃত্যুকে
বরণ করতে বাধ্য হ'লেন না। তিনি বুঝছিলেন, যে
উদ্বৃত্ততা জাতিকে পেয়েছে, তাতে যুগের কথা বা নেহের
কাজে জাতির সজ্জিত কিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।
তাই নিজে বকে তিনি বস্ত্রাঘাত করলেন—জাতিকে
এক মহত্ব দীক্ষার দীক্ষিত করার জন্ম। এই মৃত্যুর মর্ম

সবচেয়ে ভালভাবে বুঝাবে তারা তারা একটা আদর্শের প্রেরণায় হাসিমুখে জীবনকে রক্তাক্ত বা কালীমাকে বিলিয়ে দিতে পাওত। একটা ক্রাপ: কুহককে মারাও তবু দুই তিনটি বৃক কলিকাতার বাস্তব বা কোন গৃহে কালীতে জীবন দিয়েছে বা দিতে তৈরী হয়েছিল। গাছী অতি মহৎ—অতি গড়:—তার লগে কাকর তুলনা হব না;—কর্মে, চিন্তায়, কার্যশক্তিতে—সব বিষয়েই তিনি অশ্রু ও একক। তুংগ ই ক্রাপা বৃকগণ ও গাছী একই গোষ্ঠী!—তাদের সবচেয়ে কবি বলেছেন—

“আমি যে বৈবিশ্ব তরুণ বালক উদ্ব্রাণ হয়ে ছুটে
কি ধরণায় মরেছে পাথরে নিফল মাথাকুটে।”

শেব পর্যন্ত যে এই বৃত্তা একেবারে নিফল হয় না—
তাও কবি বলে গেছেন—

“ভব নাই, ওরে ভব নাই।

নিঃশেষে শ্রাণ বে করিবে লান

কর নাই, তার কর নাই।

গাছীজীর জীবন-সানের বুঝা হরি আত্ম হ্রস্বকন করতে না পারি, তাতেই তা নিফল হবে না। কিন্তু নিফল হবে—আমাদের হ্রস্বকৃতি ও বৃদ্ধিকৃতি, নিফল হবে আমাদের রাজনীতি ও সমাজনীতি।

জাতির মনে ভেদ-বৃদ্ধির যে পাখা প্রাচীর উঠেছে, তারই পরে মাথাকুটে গাছীজী নিচের জীবনকে বলি দিয়েছেন। আশা আছে—তার এই মাথা-কাটা একেবারে বুঝা হবে না এবং বিশ্বাস করি একেবারে বুঝা হয় নি। আশা-বাচী কলহ অস্ত্র সাময়িক ভাবে স্থগিত আছে। তার সমস্ত ছিল পূর্ব বাংলার গিয়ে তিনি বাস করবেন এবং জীবনের শেষ মিনগুলি দেখানেনই কাটিয়ে যাবেন। সেবা দিয়ে যাবের আশা ও বিশ্বাস পাবার ইচ্ছা তার ছিল, বৃত্তা গিয়ে তিনি বহুমাংশে তারের আশা ও বিশ্বাস অর্জন করেছেন। কিন্তু আততায়ী তার প্র-জন; তারাই তার সেহকে নয়—তার আদর্শকে আত্ম হত্যা করেছে। জাতির পক্ষে এটা চরম নৈতিক দলট।

আমি গাছীজীর বৃত্তাবাবিকীতে আমাদের সার্বিক সবচেয়ে আমাদের সঙ্গণ হও। দরকার। তার বৃত্তার দীকা

যদি আমরা জীবনে বরণ করতে না পারি, তবে বুঝাই উঠে “জাতির জনক” বলে আমাদের সম্মান দেখানো।

কলিকাতায় ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ—

কলিকাতার হাওয়া একমুখ ছাত্র শোভাযাত্রা করে বের হয়—সংসারী কিছু কাকের প্রতিবাদে। বৃত্তার বাস্তবতা আশ্রয়প্রার্থীদের শোভাযাত্রা ও ভারতীয় মালার (Indonesia) দাবী উপলক্ষে শোভা উপর পুলিশের লাঠি চালানোর প্রতিবাদে ছাত্রগণ বিব্রিতভাবে হতে এক শোভাযাত্রা বের করে। পুলিশ এতে আগ্রহ করে—কারণ শহরে ১৯৪৪ দাবী ছিল এবং তার ফলে এই প্রকার শোভাযাত্রা বের করা বে-আইনী। পুলিশের এই আইনগত আগ্রহ থেকে অল্পে অল্পে দাবী হয়ে ওঠে এবং ছাত্রদের নব্বয়টি বৃক পুলিশের গুলিতে নিহত হয় এবং বহু লোক আহত অবস্থায় হাসপাতালে যায়।

ব্যাপারটার ঘটনা সামান্য,—কিন্তু এর পরিণতি গুরুতর। ছাত্রগণের পিছনে দুই লোকের উদ্ভাবনী ছিল, এদের পিছনে দুই লোকের বড়বয় ও প্রবৃত্তি ছিল। হঠাৎ হাতের কাছে বোমা পাওয়া ও তা পুলিশের উপর নিক্ষেপ করা—রাস্তার ট্রাম ও সরকারী বাস (Bus) ধরে পড়িয়ে দিয়ে অগ্নি লাগানো—এ সবই পূর্বের প্রবৃত্তি ও বৃত্তিক্রিয় প্রয়োজনীয় পরিচায়ক।

কিন্তু এ সব লগেও সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৯৪৪ দাবীর অনতিক্রম্য পবিত্রতা (sanctity) পূর্বের বিশেষ পুলিশ রাজত্বেরই বিশেষ ছিল;—বাধীন ভারতের অনগ্রসর মন্ত্রীমণ্ডলের আমলে কেবল ১৯৪৪ দাবীর ব্যতিক্রম হওয়ার অপরাধে এমন কাণ্ড ঘটানো এক অস্বাভাবিক অপরাধ হার ফলে এতগুলি বৃক নিহত ও আহত হয়েছে। যে পরিবারের একটি বৃক নিহত হয়েছে তারা ও তাদের আত্মীয়-বন্ধু বহুদিন পর্যন্ত মনে রাখবে—কংগ্রেসী মন্ত্রীর পালনে তাদের একটি তরুণ পুত্র নিহত হয়েছে।

আমরা জানি যে স্বাধীনতা ও উচ্ছ্বাস এক নয়।

আমরা নীকার করি স্বাধীনতার সঙ্গে দাবীর চেয়ে দাবির
আগে বেশী—অধিকারের চেয়ে কর্তব্য আগে অধিক
পরিমাণে। আমরা এ-ও জানি—যে এত বছরের রাজ-
নৈতিক আন্দোলনের ফলে জন-সাধারণের মনে প্রতিরোধ
শক্তিই বৃদ্ধি হয়েছে—মানে নেতৃত্বের বৃদ্ধি এখনও আগে
কর্তব্য-ও মানছি যে কংগ্রেস বিরোধী বৃত্তি লব্ধ হল
কমিউনিটি হতে রাষ্ট্রীয় স্বত্ব লেবক দল পর্যন্ত সবাই
এই ভাব পেলেই বর্তমান সরকার ও কংগ্রেসের
জনতাকে দেখিয়ে তুলবে।

তার অর্থাৎ বরং কংগ্রেস ও কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে
আরও বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। Spare the rod
and spoil the child—নীতি বর্তমানে পাঠশালায়ও
অচল। কাজেই ছাত্রের ন্যায় কেবল পুলিশ ছেকে
জনতাকে সায়েস্তা করাও জনপ্রিয় মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে
অচল। আবার এই জনতার দ্বারা এই কংগ্রেস ও এই
মন্ত্রীদেরই ভোট ভিকা করতে হবে। বিলাতেব
গণতান্ত্রিক Reforms Act পাশ হবার পর রাজস্টোন
বলেছিলেন—যে অগণিত ভোটার ভৈরি হল, তারাই
এখন মন্ত্রীদের ও পালিম্যমেন্টের সভ্যদের প্রকৃত প্রত্ন
(masters); তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রম প্রতিষ্ঠাবর্ষেও মন্ত্রীদের ও কংগ্রেসের প্রধান কর্তব্য
তখন শাসন-সংস্থারের ফলে যে কয়েক কোটি ভোটার
ভৈরি হচ্ছে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আজ কংগ্রেসের
হাতে শাসন ভার এবং কংগ্রেস এখনও আভির পরিচালক
এবং অধিনেতা। তা সত্ত্বেও যদি সাধারণ জনতা বা
ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিটি প্রকৃতি প্রতিভিরাষ্টল দল প্রভাব
বিস্তার করতে পারে, তার অস্ত্র বোম্বী ও দাবী ত' কংগ্রেস
এবং এর অস্ত্র হও-ও পেতে হবে কংগ্রেসকেই। জনতার
উপর পুলিশের কাঁড়নে বোম্বা, লাঠিচালনা ও গুলিচর্চা
ক'রে এর প্রতিষ্ঠা হইবে না।

প্রথম বর্ষ ২১৩ নত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন হতে
বের হল—তখন হয় তাদের সামনে মন্ত্রীদের তরফ থেকে
কাকুর উপস্থিতি হওয়া উচিত ছিল, নয় ত ১৪৪ ধারার
চর্চিবাই বর্জন ক'রে এই ছাত্রদের শোভাযাত্রাকে উপেক্ষা

করা উচিত ছিল। পুলিশের বাধা না পেলে, এই মুষ্টিমেয়
ছাত্র ঘটাপানেক ১৫-২০ ক'রে কিছু সময় পর দার দার
গৃহে চলে যেত। এর ৪৬ দিন পর ত' ১৪৪ ধারা
প্রত্যাহার করা হল; তার ফলস্বরূপ নিয়ে ছাত্ররা শহরের
রাগের সাম্প্রতিক দৃষ্টি চীৎকার ক'রে কিছু সময়
শোভাযাত্রা করেছে। তাতে ত' কাকুর কোন কতি হয়
নি। জনতার ভোটের উপর দাবীর নির্ভর করতে হবে,
তাদের পক্ষে সম্মানবর্তী মতের মতো এত স্পর্শকাতর
হ'লে চলবে কেন?

এর চেয়েও ভাল হ'ত যদি কোন মন্ত্রী বা প্রাদেশিক
কংগ্রেসের কোন কর্তব্যী বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্রদের
সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাদের দাবীর দাবি গ্রহণ করতেন।
বাংলার আজ তেমন নেতা নেই। কাজেই সে পদা যে
গ্রহণ করা হয় নি—এটা কতকটা স্বাভাবিক। কিছু
স্বত্ব জনতার দাবি গ্রহণ করতে দ্বারা পারবে না, তাদের
পক্ষে দেশের শাসনভার পরিচালনা করা কঠিন। তাদের
পক্ষে অল্পেই জীতি-চকল হওয়া স্বাভাবিক এবং বাধ্য
হচ্ছে তারা বেশী পরিমাণে পুলিশের উপর নির্ভর করবে।
একথাও এখানে মনে রাখা দরকার—এই পুলিশ ও সংস্কার
আমলাভার ইংরাজের স্বত্ব এবং এদের শিক্ষা, দীক্ষা ও
প্রেরণা ছিল—পুলিশি বেকারে আইন ও পৃথগা দ্বারা
রাখা এবং দেশের জনতাকে দাবিদে ঠাণ্ডা রাখা। সেই
পুলিশকে এখন বলা হল আত্মরক্ষার অস্ত্র গুলি করতে
পারবে তখন তাদের গায়ের ঝাঁকড়া বাঁচাবার অস্ত্র জনতার
গায়ের চামড়া তুলে ফেলতে বা তাদের জানে মারতেও
পুলিশ সক্ষম করবে না। ছেকে আনতে বললে, বেঁধে
আনা এবং আনবার পথে ২৪ ঘা জড়ার বা বেওরা—
দাবীর শিক্ষা ও প্রথা, তাদের এমন বিরুদ্ধ হ'ল বেওরা
বুই অস্ত্র। তাছাড়া কলিকাতা পুলিশের বর্তমান
কর্তার খ্যাতি এবং পূর্ব আচরণও মন্ত্রী-মণ্ডলীর খোদা
রাখা উচিত ছিল।

ব্যবস্থা পরিষদে তা: রায় বলেছেন—পুলিশের গুলি
কতটা সম্ভব হয়েছে, তা নিয়ে তিনি অহুসস্থান করতেন।
আশা করি, এই অহুসস্থান প্রকৃত অহুসস্থানই হবে—

অপরোধী ও অপরাধকে ঢেকে রাখার প্রয়াস যেন না হয়। আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি—এমনভাবে গুলি করার পন্থা কার্য ছিল না এবং পুলিশ প্রচেষ্টারের অতীত গুলিবর্ষণ করেছে। যদি এটা অসুন্দরভাবে লাগত হয়, তবে কলিকাতার সমগ্র পুলিশ সংগঠন সহজেই যেন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়।

এখানে একটা কথা বিশেষ কংগ্রেসী মহী-মণ্ডলীকে মনে করিয়ে দিতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি—ঐ সব বিক্ষোভ-মূলক হে-চৈর পিছনে কমান্ডিটের হাত ছিল ও থাকবে। কিন্তু এই ভাবে জনতার উপর গুলি করে সরকার কমান্ডিটের খ্যাতি দিতে পারবেন না। ঐ জনতার মধ্যে হুগু ২১টি কমান্ডিট ছিল, পুলিশের গুলিতে যে কমান্ডিট মরেছে বা মরবে—তা বলা যায় না। যদি ২১টি কমান্ডিট এতে মরে-ও তাতে-ও তাদের দল পরোয়া করবে না। তাহলে দলের উচ্চতর সভা বা নেতৃবানীয়ে কেউ প্রকাজতঃ ঐ সব হে-চৈর মধ্যে আসে না। তারা নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলতে জানে। তাদের উদ্দেশ্যই হল—হে-চৈর পর সরকার গুলি করুক; কিন্তু লোক নিহত ও আহত হ'ক। এর ফলে কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকার লোকের নিকট অগ্রিম হবে। তাদের লাভ এইটুকু এবং তারা ঐ উদ্দেশ্যে ২১টি লোকের জীবন-ন্যসকে হিসাবেও মধ্যে ধরে না। যতই কংগ্রেসী সরকার এই ভাবে গুলি করবে, ততই তারা কমান্ডিটের উদ্দেশ্য সাধনে প্রকারান্তরে সাহায্য করবে। এই কথা যেন কংগ্রেসী সরকার বিস্মৃত না হন।

প্রাথমিক কংগ্রেসের সভাপতির প্রতি অসৌজন্য—

ঐ হুগিনের দাবায় যে সব পরিতাপজনক ঘটনা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক কংগ্রেসের সভাপতির লাহনা। ডাঃ হুগেশ বানার্জী গিবেছিলেন মেডিকেল কলেজে আহতদের দেখবার জন্ত। অন্তর-ও তিনি আহতদের দেখা-শুনা করেছেন। মেডিকেল কলেজে যখন সভার পর ডাঃ বানার্জী যান তখন কতক লোক তাঁকে বেধিবে দিয়ে চাঁকায় করে এবং তাঁকে আক্রমণ

করে। তাঁর গাড়ীতে আঁচন লাগানো হয় এবং তাঁকে বিশেষভাবেই আক্রমণের চেষ্টা হয়েছিল। কলেজের কিছু লোক তাঁকে তুলে নিয়ে যায় এবং গুরুতর আঘাত থেকে তাঁকে বাঁচায়। এরপর একদিন প্রাক্তন সভ্য-ও নাবি ডাঃ বানার্জীর প্রতি অসৌজন্য দেখানো হয়।

এর কারণ কি? ডাঃ বানার্জী জানী—তঁর বেশকমী। সেবার জন্ত তাঁর ভাগ্য ও লাহনা-বিষয়ে কাকুর মনে কোন লম্বে নেই। তিনি বড় প্রাণেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। তা ছাড়া—বড় জাতীয় প্রতিক্রিয়ার তিনি সভাপতি; কংগ্রেসী মহলে তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তিও বিশেষভাবে ব্যাপ্ত। এর পূর্বে কখনও প্রাণেশিক কংগ্রেসের সভাপতির প্রতি এমন অসৌজন্য ও আক্রমণের ঘটনা আমরা শুনি নি। ১৯৪৬ সালে নীপের প্রত্যেক কর্তৃপক্ষিত (Direct Action Day) বিল হতে এক বছর পূর্বের কলিকাতার স্বাধীন জনতার ক্রিয়াকর্মের যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, তার তুলনা পূর্বে বা পরের কোন ঘটনার সঙ্গে হয় না। বন্ধীর কংগ্রেসের তৃত্তপূর্ব সভাপতি জেরেনবাবু ঐ সময় কিন্তু জনতার মাঝে একাধিকবার পড়েছেন; কিন্তু ও মূলমহান উভয় প্রেক্ষিত্ত কিন্তু জনতাই তাবের স্বরনবাবুর পরিচয় পেয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছে—যদিও তখনও কংগ্রেসের প্রতি বিবেক উভয় সম্প্রদায়ই প্রচার করত।

আম যখন কংগ্রেসের চেষ্টায় স্বাধীনতা আহুত হয়েছে, যখন স্বাধীন ভারতে এবং স্বাধীন বাংলায় কংগ্রেসী মহী-মণ্ডলী শাসনকাণ্ড চালাচ্ছেন, তখন কংগ্রেসের সভাপতিকে বিশেষভাবে বেছে আক্রমণ করা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। আমরা আবারও বলছি হুগে লোক আছে যারা হুগে অভিজ্ঞি নিয়ে কংগ্রেসকে হের করতে চায়। কিন্তু বড় যৌবনম্ যৌব—ঐ প্রাচীন প্রবচনের নজির দিয়ে, সবই ঐ হুগে লোকের উপর চাপিয়ে যদি কংগ্রেসী নেতারা নাকে তেল দিয়ে স্বনিজায় থাকেন, তবে একদিন তাঁদের নিশ্চা হুগা হেগে হবে সর্বগ্রামী আগুনের হলকথি।

প্রথম দিন গুলি বর্ষণের পর হুগেশবাবু যে বিকৃতি দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত পরিতাপজনক। জনতার

মনোভাব বৃদ্ধার ক্ষমতা, তাদের মনের কোণে কি লুকিয়ে আছে, নিজের কল্পনা-শক্তি দিয়ে তা অন্বেষণ করার ক্ষমতা যদি কারুর না থাকে, তবে আজকার জটিল পরিস্থিতিতে বিরত তাকে হতেই হবে। আমাদের দাবী—বিবৃতি স্বরূপবাবুর নিজের রচনা নয়। তিনি মনোভাব—মনতার মনোভাব বুঝে বেতন-পুষ্টি গ্রহণ কর্তৃপক্ষের তীর খাড়া স্বাভাবিক। যদি এই তীর রচনা না হয়ে থাকে, তবে যে বা দ্বারা এটি তার নামে প্রচার করেছেন, তাঁরা তাঁর বন্ধুর কাজ করেন কি। আর যদি এটি তাঁর নিজেরই রচনা হয়ে থাকে, তবে বলব তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও কর্ম-সহচরদের উচিত ছিল এর প্রতিক্রিয়া সহজে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বহু কর্মে ব্যস্ত থাকার জন্য হয়ত তিনি সব দিকে খেয়াল রাখতে পারেন না।

কেবল কমুনিষ্টদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে নির্দিষ্ট থাকলে চলবে না। স্বল্প জনতার দল ও দাবীকে বুঝতে হবে; কমুনিষ্ট প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে—নাতির ঘায়ে বা বন্ধুদের গ্লানিতে নয়—তাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। কংগ্রেসের পক্ষে আজ এইটাই প্রধান দাবী।

স্বল্প জনতা—

এতকাল কংগ্রেস জনতাকে যে কোন উপলক্ষ ধরে সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে এবং স্বাধীনতা লাভের পর যে রামরাজ্য আসবে—তার স্বপ্ন-ও প্রকারান্তরে দেখিয়েছে। স্বাধীনতা লাভ হল—কিন্তু তাদের কামা রামরাজ্য আজও আসে নি। হুং-দারিস্ত্রা তেমনই আছে; তদুপরি তারা দেখছে যে সব রাজ-কর্মচারী ইংরাজ আমলে সর্বপ্রকারে জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করেছে আজও তারা সর্বব্যাপারে মাতঙ্গরি করেছে এবং পূর্বের চেয়ে সরকারী আকিসে অক্ষমতা (Inefficiency) বেড়েছে, কর্মচারীদের বেতন বেড়েছে, —সর্বোপরি বেড়েছে ক্ষমতা। স্বভাবতই জনতা স্বল্প জনতার দ্বারা নিবেছে স্বল্প হলেই সরকারী

ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে হবে—কোন্ প্রকাশ করতে হবে।

এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কমুনিষ্ট ও অল্প কংগ্রেস বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল দল। ভারতীয় কমুনিষ্টগণ যুদ্ধের সময় জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছে; দুর্ভিক্ষ দৃষ্টি, দুর্নীতি প্রচার, প্রতারণা, ও প্রদান, জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়তাকে ভেঙ্গে দেওয়া, উদ্ভবের মেয়েদের বিয়ে বিদেশী সৈন্যদের পরিতৃষ্টি সাধন প্রভৃতি সর্বপ্রকার দুষ্টা কাজে এরা ইংরাজের সহায়তা করেছে। লীগের পাকিস্তান দাবীকে তারা নানাভাবে প্রচার ও সমর্থন করেছে, হারদাসবাবুকে রাজাকারদের সহায়তা ও অসহায়িকতাকে মর্মে নিয়েছে এবং বর্তমানে গোড়া হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের বহু সেবক সংঘের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। ইউরোপে—বিশেষ করে জার্মানিতে কমুনিষ্ট দল হিটলারের অত্যাচারকে প্রথমে সাহায্য করেছে—নরমণ্ডী সমাজতন্ত্রী দলের বিরুদ্ধে হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। জাপানে গত মহাযুদ্ধের পূর্বেও তারা এই কাজ করেছে এবং বর্তমানে জি-পল পন্থী চরম দক্ষিণী দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে; যেখানে কোন গোলমাল দেখবে, সেখানে এরা গিয়ে জুটবে;—গোলমালের পিছনে দৃষ্টি আছে কি না, তা নিয়ে এদের শিরঃপীড়া নেই; এদের লক্ষ্য হল প্রচলিত শাসন ও সমাজব্যবস্থাকে এই গোল-মালের সুযোগ নিয়ে বা মারা।

বাংলার ছাত্র ও যুবকদের কাছে আমাদের বক্তব্য তারা যেন যে কোন লোককেই তাদের বন্ধু বলে মনে না করে; তারা যেন এটা বুঝতে পারে—সরকার মতো কাজে লাগিয়ে, তারপর তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিতে ওদের একটু-ও বিধা হবে না। আরও একটা কথা তাদের বুঝতে হবে—কোন দেশেই স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা রাতারাতি বদলে যায়নি। ১৯১১ সালের কল বিদ্রোহের পর অল্প ৮-১০ বছর পর্যন্ত জন-সাধারণ কোন প্রকারেই কোন সুখ-সুবিধা পায়নি; বরং পূর্বের চেয়ে খেটেছে বেশী সময়—শান্ত-পরিত্রা

ব্রিটান-আরম্ভণে পেরেছে পূর্বের চেয়েও কম। শ্রমিকদের পক্ষে পর্যটক করার কোন অধিকারও তখন কথিত্যে ছিল না। ইতিহাসের এই শিক্ষা যেন তারা ভুলে না যায়। যে সব কমানিটি তাদের হৃৎকণ্ঠ নিয়ে শব্দ ফেপাতে আসে, তাদেরই যেন বিজ্ঞানী করা হয়—১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর কথিত্যে কি অবস্থা চলছিল—কতটুকু ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বৈয়কিক স্বত্ব-সংগোপন লোকের জাগো সেখানে জুটত।

আজ কংগ্রেসী সরকার তেজে বা প্রবেশে যা কিছু করছে—তার সব কিছু অসদর্থনযোগ্য এ দাবী আমরা করি না, বা তার সব কিছুই অবস্থা গতিকে অনিবার্য, সে কৈকিছত-ও আমরা সিদ্ধি না। নিজেদের ক্ষয়-সংসারে আমরা সবাই কত ভুল ত্রুটি করি—তা যেন তারা ভেবে দেখে। এতদ্ব্যতীত একটা রাষ্ট্রের ব্যাপারে যে বিষয়ে আমাদের পূর্বের অসিদ্ধতা নেই—অথচ যাতে বাধ্য ও অস্বাধিগা আছে প্রকৃত—তাতে যত্নের পক্ষে ভুল ত্রুটি অনিবার্য। যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, তাকে ধৈর্য ও পারম্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। এই দাবিই আমাদের সকলের। অগ্রদরসাল পক্ষে হুক করে রাষ্ট্রের দীনতম লোকটিকে এই দাবিই অগ্রত্ব করতে হবে—নিজ নিজ বড় ছোট কর্তব্যগতী মধ্যে।

দক্ষিণ আফ্রিকার দাঙ্গা—

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় ও কালি অধিবাসীদের মধ্যে দাঙ্গা হয়েছে, বর ভারতবাসী হয়েছে। আরও বেশী আকৃত হয়েছে, তাদের বিয়-সম্পত্তি সৃষ্টি হয়েছে। কালিদের মধ্যে হতু ও আহত অনেক হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী বিবরণে বলা হয়েছে যে ভারতবাসীর চেয়ে বেশী কালি হয়েছে ও আহত হয়েছে, তাদের বিয়-সম্পত্তি বিশেষ নেই—কাজেই তা সৃষ্টির কথাও আসে না। কি নিয়ে দাঙ্গা আরম্ভ হল তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এটা অস্বাভাবিক করা যায় যে এই দাঙ্গার পিছনে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বা

তাদের বর্তমান কর্তৃত্বের মতাবলম্বী লোকের উস্কানী ছিল। কিন্তু এই উস্কানী কেবল হাওয়ার উপর কাজ করতে পারে না;—কোন্ডের কোন কারণ থাকলেই দুইবৃদ্ধি লোকের উস্কানী কাজ করতে পারে। ভারতে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী দুইবৃদ্ধি সাম্রাজ্যিক ভেদ ও বিধেবে উস্কানী দিয়েছে;—এখানে হিন্দুর বিচ্ছেদ মুসলমানের এবং বর্ণ-হিন্দুর ভগ্নদীন হিন্দুর সত্যিকার অভিযোগের কারণ ণি তাই ইংরাজের উস্কানী এখানে কাজ করেছে। তেমনি ভারতবাসীদের বিচ্ছেদে আফ্রিকা অধিবাসীদের সত্যিকার কোন অভিযোগ না থাকলে, যত্নী মানান বা ঠার অস্বাভাবিক উস্কানীর বলে এমন দাঙ্গা হতে পারত কিনা সন্দেহ।

দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার আরও অধিবাসী হল—তুফান কালিরা। সংখ্যার তাহা বেশী—বর গুল বেশী, কিন্তু সামাজিক অবস্থার তাহা সখনিরে। দুইয়ের যেতাকতা হ'ল—প্রকৃতপক্ষে ও বেশের মালিক। ভারতবাসীদের সংখ্যা এদের চেয়েও কম; কিন্তু সামাজিক অবস্থার দিক দিয়ে এদের অবস্থা কালিদের চেয়ে উপরে যেতাকদের চেয়ে নীচে। আদর্শ জ্ঞানি ব্রহ্মদেব—ভারতবাসীরা ইংরাজের ভাবেদারী করে স্থানীয় লোকদের উপর অত্যাচার ও শোষণ করত। তার ফলে কালিরা (জগবান বৃদ্ধের) বেশের লোক বলে ভারতবাসীদের যে খাতির করত, তা ত গেলই; পরে ভারতবাসীদের ওহা রীতিমত হুগা করত। ভারত বিরোধী দাঙ্গাও কয়েকবার হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকারও তেমন কিছু আছে কিনা অহলদান করা সরকার।

এই দাঙ্গা উপলক্ষে ভারত সরকার হতু কিছু অহলদান করবে। ভারত সরকারের পক্ষে ত্রুটি দিয়ে আর বেওয়া সরকার। প্রথমে ত দক্ষিণ আফ্রিকার মানান সরকারকে স্পষ্ট তাখার বলা উচিত—যে ভারতবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার যে দাবিই ভারত উপর আছে, তার খাতিরম সেখানে ভারত সরকার রীতিনবতা অস্বত্ব হবে। অপর দিকে

দি

ইণ্ডিয়ান হ্যাণ্ডলুম ম্যাচফ্যাকচারিং

কোম্পানী লিমিটেড

সর্বপ্রকার তাঁত, চরকা ও তকলী নির্মাণকারক
একটি প্রথম শ্রেণীর বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান।

বাংলায় নির্মোহিতা নারী! মা, মা, মাগো, কে বলে
তোমার মাতৃহত্যা করে মরতে হবে! ভারতের
স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত হয়ে বাঙ্গালী যখন কাঁটার
পথে নেমে গিয়েছিল তখন সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে
বিশ শতাব্দীর সভ্যতা গৌরবে গৌরবান্বিত বৈদেশিক
শত্রু আক্রমণ করবে তার মায়ের মর্যাদাকেও। ভারতের
স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনা নাড়িকা হবি মা তুই স্বয়ং
মহিষমর্দিনী! তোর সোণার অঙ্গে লাগবে স্বাধীনতা
সংগ্রামের আঘাত। বিজ্রোহী বাঙ্গালীর মুকুটমণি মা
অমার, বাঙ্গালী তোমায় চিরদিন মাথায় করে রাখবে।

অবশিষ্ট শেক্সার বিক্রয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যিক।

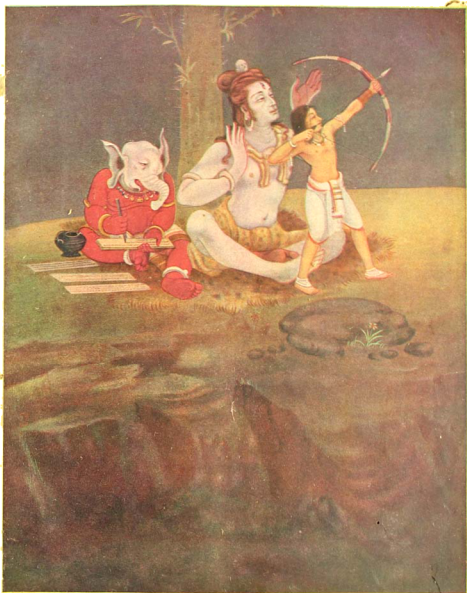
হেড অফিস:

এও, ক্রাইভ বিল্ডিংস

৮, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা ১৮১৭

টেলিফোন : ই.টম



—স্বপ্ন—

একাদশ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৫

একাদশ সংখ্যা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রেম

অধ্যাপক প্রিয়ব্রজ সেন

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাঙালীর হৃদয় জয় করেছেন, এ কথা আজকের দিনে কাউকে বোঝা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাঙালীর হৃদয় জয় করেছেন, এ কথা আজকের দিনে কাউকে বোঝা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাঙালীর হৃদয় জয় করেছেন, এ কথা আজকের দিনে কাউকে বোঝা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাঙালীর হৃদয় জয় করেছেন, এ কথা আজকের দিনে কাউকে বোঝা যায় না।

এই মধ্য দিয়ে বাঙালীর হৃদয় জয় করেছেন, এ কথা আজকের দিনে কাউকে বোঝা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাঙালীর হৃদয় জয় করেছেন, এ কথা আজকের দিনে কাউকে বোঝা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাঙালীর হৃদয় জয় করেছেন, এ কথা আজকের দিনে কাউকে বোঝা যায় না।

বাক্যের দিক থেকে বাক্য—যদি তিনিসের বাক্য তে: হুবেই, বাক্য নইলে তার গভীরতা বা বিশালতাও বৃদ্ধি বোধ: যায় না।

কিন্তু জর্জর্গনন্দিনীর মধ্যে প্রেমের স্রোত বা উৎসই ছবি হোল আবেগের মনোর। আবেগের রূপ বর্ণনা করতে বহুবিভিন্ন কিছুছাড়া কার্পণ্য করেন নাই—বিবশা ও তিলোত্তমার ভ্রমের সঙ্গে তার ভ্রমের তুলনা করে বলেছেন, যেমন উজানদ্বারা পল্লব এ আঘাতিকা মধ্যে তেমনি আবেগের। অতএব এই কথোক্তও তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কি না তা বিচারসাপেক্ষ। মনোবিশিষ্ট বলে আবেগের অতিরিক্ত গৌরব নয়, তলে গুণে আবেগের ভাসবাস্যের তার মতই। নিম্নে কথাকাল্পের অঙ্কতার ভেদ করে তিনি বর্ণন বলে উঠলেন, 'এই বর্ণী আবার প্রাণেশ্বর', তখন শুধু কলমানেই আশ্চর্য হন নাই, বাবালী পাঠকও সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত বোধ করেছিলেন। বহুবিভিন্ন ভাষায়, যদি তদুচ্চৈর্যে বাক্যমধ্যে বহুগতন হইত, তবে তাহাপ্রতি কি পাঠান অধিকতর চমকিত হইতে পারিতেন না? আবার তার সঙ্গে বলি, বাবালী পাঠকের কথাটাও ধরে নেওয়া যায়। আবেগের এই স্বীকৃতির মধ্যে অস্পষ্টতা কিছু নাই, কুহতা কিছু নাই, বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষাও নাই—'গোলা বিবাহ, তাহা বিবাহি; তোমার নিবট প্রতিদান বিচুই চাহি না।' আবেগের প্রেম হৃৎসরী, কথার মধ্যে দখল যেওবার মত নয়, চোখের ভলে তার শেষ, দিম তার মধ্যেই আছে স্তম্ভি।

যারা বহুবিভিন্ন প্রকারে ভাবধারার বাহন বলে মনে করেন, এবং ফুটের নকশা আউজানসের আদর্শ বহুবিভিন্ন জর্জর্গনন্দিনীর মত হয়েছে বলতে চান, তাঁদের পক্ষে অবশ্যই কিছু বল। আছে সম্ভব নাই—তবে সে ভাবধারা বহুবিভিন্ন যেমন মনো অঙ্গটিকে তার প্রাণ তে, নি বাজাবিক ও স্পষ্ট, তাই বহুবিভিন্ন প্রেমের স্বীকৃতি তে বহুবিভিন্ন হতে উঠেছে। জর্জর্গনন্দিনীতে বহুবিভিন্ন নিজকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন, প্রেমের বহুবিভিন্ন রূপ দেখিয়েছেন, অতঃপরও এতদধীন আকাঙ্ক্ষা বিচলিয়েছেন কি না সে কথা পরিতোষ ভেবে দেখুন।

'আমার ইংলোকে আর কিছু কামনা নাই—আর কিছুই কামনা করতে দিগি নাই'—এই নির্মোহ প্রেম আবেগকে যেমন মহীচলী করে:ছে, তেমনি কমনীয় করে:ছে সমরকে। সেই কামনার সাধনাই প্রথমকে দিয়ে বসিয়েছে, 'মনে রাখিও, একদিন তুমি বৃষ্টিবে—এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আত্মিক সে: কোথায়?' কামালীনা মত আভিমাত্রিনীও ছবি বহুবিভিন্ন এবেছেন সমরের মধ্যে। বোহিনীকে বহুবিভিন্ন প্রেমের পত্নীর মধ্যে স্থান মেনে নাই, প্রাণময়ী করে গড়েন নাই। বহুবিভিন্নের তাহার 'এ যেহিনী প্রদর নছেন—এ তপস্বী, এ যে নহে—এ ভোগ, এ ছন্দ নহে—এ মন্দার বর্ণ পীড়িত বাহুবিন:বাগনির্গত হলাহল, এ ধবস্তরী ভাঙনি:মত স্থা নহে।'

বিবাহিত প্রেম অবশ্যই পেয়েছে বহুবিভিন্নের নিজটে তার ভাব্য সমান—আবেগের প্রেম প্রাণীও নিম্নার্হতায় তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। কলমানেই মধ্য দিয়ে ততটা প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু চরিত্রের প্রকাশের শেষ স্বীকৃতির মধ্যে তার অল্পতপ হৃৎসি পাওয়া যায়। রমানন্দ স্বামী বর্ণন দুইটি প্রস্তাবকে বিজ্ঞাপন করেন, 'তুমি পৈশবিনীকে ভাল:বাসিতে?' প্রত্যং তখন স্বচীর দিগে বলে উঠলেন, 'কি বৃষ্টি, তুমি সত্যি! এ তগতে বাহু কে আছে যে আমার এই ভালবাসা বৃষ্টিবে?.....পাপ হিতে আমি তাঁর প্রতি অহংক নহি—আমার ভালবাসার নাম, জীবন বিশর্ঘনের আকাঙ্ক্ষা। পিতার শিষ্য বৈদিতে গোপিতে অস্থিতে অস্থিতে আমার এই অল্পভাগ অধোভাষ বিচল করিচ্ছে।' রমানন্দ স্বামী ঠিকই বলেছিলেন, 'প্রত্যং কর এই ইচ্ছার বহুর তুল্য হইতে পারে না।'

বিবাহিত প্রেমের মধ্যেও আবার পূর্ণাঙ্গের চিত্র বহুবিভিন্ন বহুবিভিন্ন আছে, তবু সম্প্রদায় গুণ ও পাত প্রেমকেই বহুবিভিন্ন বর্ণনীর বলে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন, যথাক্রমে ভবকৃতি বার বর্ণনা করে গেছেন 'বৎ যেহনীরে স্বিতম্' এই কথা বলে। তাই কত হিতোপদেশ বহুবিভিন্ন দিয়ে গেছেন, কলমনি ঐশ্বর্যের বিনোদন চিত্রে বলা দিয়ে, কলম বা গোলা বর্ণা, যেমন 'হাঃ'কে আকাশ তাহাকে মনোর আদ বর্ণিও না। কলমত ১৩৪৬

first sight-এর কথা তিনি সীতারামে আলোচনা করেছেন। উপহাসও করেছেন love at first sight-এর প্রসঙ্গে। 'প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। যেখান আর মনিস, আর কিছু মানিস না, বই, এমন দাবানল তো সংসারে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুত্রকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে ভালবাসা যেহেতু প্রেমের মত কোন সাবস্ত্রী দেখিতে পাই নাই। সুতরাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না।' ঐরূপ একটা আকর্ষণ, একটা মোহ সীতারামের নৈকে নৃতন করে হওয়া কেমন করে সম্ভব, সেই প্রসঙ্গে বহিঃসংস্করণ এ কথাটার অবতারণা করেছেন। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে সেই প্রথমবর্ণনে প্রেমের কথা কি প্রাথমিক বর্ণনা করেন নাই?

কৃষ্ণকান্তের উইল, বিদ্যুৎ, সুপালিনী, কপালকুণ্ডলা এসবের মধ্যে স্পষ্ট আকর্ষণের বিরুদ্ধে বহিঃসংস্করণ লেখনী ধরেছেন হয়তো, কিন্তু তাঁর 'এক' অর্থাৎ আনন্দমঠ, সীতারাম ও দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে প্রেমকে তিনি কিভাবে বীকার করেছেন? এই তিনটি উপস্থাপন এক সমস্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সীতারামের জীবন ছয়ছাড়া করে দিল এই প্রেম। ঐ বহি না তাঁহাকে ত্যাগ করে গমন করেন? তবু কি চিত্ত বিশ্রাম সম্ভব হোত? সমস্ত উপস্থাপনটির পরিণতি নির্ভর করেছে এই একটি ব্যাপারের উপর। তবু সীতারামের প্রেমের বর্ণনাও আছে—নন্দারও বটে, রমারও বটে, ঐরূপ তাই কথায় নাই। ঘটনাবাহিনীর মধ্যেও দিলেন সে প্রেমের সমাপ্তি। আনন্দমঠেও প্রেম, বেঙ্কামবৃত্তির উপকর্মে উপনীত হয়ে কল্যাণী জন্মিলেন, কল্যাণী চলে গেলে মহেন্দ্র ব্রত পালন করতে পারিলে ছবনে একই অনন্ত স্বর্গভোগ করতে পারবে—সুতরাং আনন্দমঠে, বিবাহ করবে।

জীবনম-পাশ্চাত্য সেই কথা। জীবনম-পাশ্চাত্য বলছেন—'আমি সফল সম্বন্ধ বুঝিতে পারি না' যে, কোন নিক ভারী হয়।' দেবী চৌধুরাণীর একটি কথা প্রকৃষ্টরূপে জীবনের যোক্তা ক্রিয়াকে বোঝে—'তুমি আমার বেবতা'। ব্রহ্মের স্বয়ং প্রকাশ্যত্বের বৈকল্য তলব করলেন, 'স্বাক্ষাতি কর না কি?' তখন প্রকৃত বলছেন—'তুমি আমার বেবতা, আমি সত্তা বেবতার অর্চনা করিতে শিখিতে ছিলাম—শিখিতে পারি নাই; তুমি সব বেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমার বেবতা।' বহিঃসংস্করণ প্রেমকে কতখানি বীকার করেছেন, তা এই একটি কথা থেকেই বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু এই প্রেম সীতারামে চলে গেল না; প্রেমের পরিণতি মহত্ব প্রাপ্ত হইতে। তাই কল্যাণকান্তের নগ্নত্বের আঘাতে তিনি বলেছেন—'বহি সত্তা কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মহত্বকর কথা।' বলেছেন, 'মহত্ব-ভাবের উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি সত্তা হুঁচু চাই না।' বলেছেন, 'বে সত্তা ইচ্ছা পরিচালিত কর পদসন্দর্শনের আবাসী, সে যেন কখনও কল্যাণকান্ত পদার নগ্নত্ব-মুক্তাবলী পড়িতে বলে না! আমি বিলাস-প্রিয়ের মূর্খে "এগো এগো ধু এগো" বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মহত্ব মহত্বের সত্তা হইয়াছিল এক জনম সত্তা জননের সত্তা হইয়াছিল—সেই জনমে জনমে সংসার, জনমে জনমে মিলন। ইহা মহত্ব জীবনের হুঁচু।'

কল্যাণকান্তের নগ্নত্বের আশোকে বহিঃসংস্করণ প্রেমের বীকৃতি আদর্য পূর্ণতর ভাবে বুঝিতে পারি। নরনারীর প্রেম যদি মহত্বপ্রীতিতে না পরিণত হয়, তবে তার পূর্ণতা ঘটিলো না।*

* কল্যাণকান্তের নগ্নত্বের পটভূমি।

উদ্বোধন পর্ব

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র কুমার দত্ত

বিশেষী শাসনের অধীনে মুক্ত বেঙ্গলার প্রাণি বধন কোনো জাতির জীবনে অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন সেই জাতির কোনো না কোনো মন্ত্রণেবর মতো বাহুবল বা নিষে পাবে, একখানা লাঠি নিয়ে পাবে, একখানা ছুরি নিয়ে পাবে, এক টুকরো পাথর নিয়ে পাবে, আর কিছু না পেলে নিজেই হাতখানা দিয়েও সেই বিশেষী শাসনের বিরুদ্ধে আঘাত হানবে। সে-অর্থশ্রমে প্রবল প্রকর হাতের কোনো অস্ত্রই হয় না, কিন্তু জাতি প্রাণ পাবে। বাঙালী জাতির হয়ে ঘটন ঘুমাতিও বঙ্গভঙ্গের পূর্বে একদিন এমনি আঘাত চানতে চেয়েছিলেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, যখন লর্ড কর্জন কনট্রোলকনন বঙ্গভঙ্গ সনদ হাতের কপালে লাহনার তিক্রা এঁকে দিয়েছিলেন। তিনি ছুটি পিতৃপন দিয়ে দুই বন্ধুক চুইগ্রামে পাতিয়েছিলেন লর্ড কর্জনকে চত্যা করতে। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু বিরাটের আয়োজন এর পর শুরু হয়। সেই আয়োজনে বাংলার প্রথম শরীফ প্রকর চক্রবর্তী প্রাণ বেন বোমা পরীক্ষা করতে গিয়ে সেখানে তারপর হাসতে মুগ্ধবান জাতির প্রাণে দাড়া ভাগ্যলেন প্রকর ঢাকা ও কুহিবাম, সন্তান বোম ও কোনোই নিজ নিজ প্রাণ অফাতের বিশিয়ে গিয়ে।

স্বাধীনতার তৃকা আগলো দায়। কিন্তু পাশে থাকে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলতে হবে, দুর্গবর্ধ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে জাতিকেও দুর্গবর্ধ করে তুলতে হবে। অর্ধচাই, অস্ত্র চাই, সামরিক শিক্ষা চাই, বিশেষী জাতিবের সঙ্গে সন্ধি ব্যবস্থা চাই। ১৯০৮ সাল থেকে শুরু করে অনেক বাঙালী এই সব লক্ষ্যের সম্মুখে একে একে বিশেষে বেরিয়ে পড়েন। তার প্রতিষ্ঠার কয়েকটি নামেরই দায় উল্লেখ করা চলে। বর্তমানবাদের অন্ততম লক্ষ্যবর্তী ভারতবাসী বাস, বাহুবল ত্যাগ, হেববল গুপ, বাহুবলগালের কনিষ্ঠ বন্যাপাশ ঘুমাতি ও বীরেন চট্টোপাধ্যায়। হরেন কব, সন্তান সেন, বিজেন লাহিড়ি—এরা বান আরও পাবে।

এদের চিত্তের কেউ কেউ সোরা মাঘেবিকাশ বান। কেউ বা আপান হয়ে। কেউ বা লতনে চকবর্ধা প্রতিষ্ঠিত ইতিয়া হাউপে কাজ করেন। পরে ইউরোপ বা আমেরিকায় বান।

১৯০০ সাল থেকে ১৮ সালের মধ্যে কলকাতার শ্রীমদবিশেষী পাশে থাকা কোটেন, তাঁদের মধ্যে বর্তমানবাস বন্যাপাশ্যায় বা স্বাধীন নিরলব, বর্তমানবাস ঘুমাপাশ্যায়, বাসবিশ্ববর্তী বহু, অধিবাস চক্রবর্তী, অঘবেরজনাথ চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল দাস অন্ততম। স্বাধীন নিরলব এর পরে পাশ্যায়, বন্যায়, ঘোবাই অকলে বিশবীষল প্রতিষ্ঠিত করেন। পাশ্যাবে এর সঙ্গে থাকা কোটেন, তাঁদের মধ্যে তপস্বি-এই পিতা সর্দার বিশেন সিং তাঁর জাই অমিত সিং, লালচাঁদ কালকু ও হরবালদেব নাম উল্লেখযোগ্য। অমিত সিং বেশ থেকে পাশিয়ে পাশিয়া হয়ে টাকিতে বান এবং হরবাল ১৯১১ সালে সাম্রাজ্যবাদের গিয়ে 'ঘুমাভর আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে সেখানে থেকে 'পদম' নামে কাগর বের করেন। ১৯১৪ সাল থেকে যে ভারত-স্বাধীন বহুবল হয় তাকে ইংরেজের বিশপার্টে নানা বিজির খণ্ডে বিতক করে যেখানে থাকা হেবহে সব বহবের অভাবে। কিন্তু এই সময়ে যে বিশবের আয়োজন হয়, তা একই বহবের কল। সেই আয়োজনে হরবাল এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালেই আমেরিকার পরকাব তাকে করে। তিনি স্বাধীনে থালাপ হয়ে ইউরোপে বান এবং সেখানে থাকা মহেগ্রনতাপের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে থাকেন। থাকা মহেগ্রনতাপের সঙ্গে একযোগে থানো ভন সোয়াইটের দায়কত শ্রীমদগুনের লতীপ সেনগুপ্তের ও অন্তরমিকে তাঁর কলকাতার লক্ষবর্তী যোনানা অঘল কালাম মালাবেহ সঙ্গে পণ্ডিত ভ্রামবহর চক্রবর্তী বোপ ছিল। বাংলাবেহে বেবন ঘুমাভর কাগর থেকে বিশবী হলের নাম ঘুমাভর, আমেরিকাত্তেও তেমন 'পদম' কাগরের নাম থেকে হয় পদম বল। উভয়েই লক্ষবর্ধ। ঘুমাভর কাগর, বিশবহত: তার বে গুপ সাম্রাজ্যে বোলাব করঘা ছিল, সেই সংখ্যা ইতিয়া হাউপে আমেরিকায়,

জেপ্পে, লাহোরে, আগ্রা, বোম্বাইতে, কলকাতা, দাদিগে, পুণা, দাদিগে, হাভেলগানে এবং আরও বহু স্থানে গিলি হয়। গরু কাগজ ও তেমনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় আমেরিকা, পূর্ব-এশিয়ার প্রায় সর্বত্র এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিসর্জনের দ্বারা প্রচলিত করে।

হতীশ্রমণ বসন্তের আশ্রয়ণ হয়ে এশিয়ার হুইজার্মাণ্ড, ভারতের বিসর্জনের আয়োজন এখানে কেন্দ্র করে হয়ে। ভারতীয় নিবেশিত জোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যাংক ও গণ্য পেন্সিওন দল গড়েন। ব্যাংক থেকে তখন উত্তর শ্যামে প্রায় বর্মার সীমান্ত পর্যন্ত বেলগণ্ড তৈরী হয়ে। এর সব এশিয়ার ছিলেন জার্মান। কন্ট্রোল ও অগ্রাধিকার পান। এঁদের সঙ্গে জোলানাথ যোগাযোগ স্থাপন করে বেগে কিয়ে আসেন। শ্যামের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ রাখার জন্য হাঙ্গেরিয়ার প্রায় কীয়েকগোপাল বসন্ত রেপ্পেন।

১৯১১-১২ সাল থেকে জ.স. বর্ষের আসতে থাকে জার্মানী শ্রী ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা। হতীশ্রমণ হাঙা যুদ্ধের মাধ্যমে থেকে মুক্ত হয়ে সহ-কর্মীদের উপদেশ দেন হত্যা ভাঙতি বন্ধ করে বিসর্জনের আয়োজন করতে। অধীশী আমোদনের সময় থেকে জালাব সর্বত্র বহু সমিতি গড়ে উঠেছিল। এগুলিকে বোম্বাইনী ঘোষণা করার পর থেকে সব গুপ্তদল পরিণত হয়। এদের পরস্পরের ভিতর আর্শের ও জ্বরের যোগ ও সংযোগিতা ছিল। বারিনবাবু দ্বারা পড়ার পর তাঁদের দলের অবশিষ্টাংশ ও আবি অধুনীশন অবিনাশ চক্রবর্তীর উপদেশে একযোগে হতীশ্রমণের নেতৃত্ব কাশ করতে থাকেন। মানিকতলা বাগানের ধরাকড়ের সময় বাগবিহারী বন্ধু ও দ্বারা পড়ার সভাবনা হয়ে ওঠে। তিনি প্রথমে গুপ্তদল হয়ে ঘোষণা দান। পরে সেখানে অস্ত্র চাহুরী গ্রহণ করেন। এখানে থাকা কালে লাহোর ও বিলোতে চরমদলের লক্ষ্যবর্তী হয়ে পড়েন। দ্বারা পড়ার সভাবনা বন্ধ পেয়ে বেগে তিনি আবার কলকাতা ও চম্পদনগরে আসা হাঙা করতে থাকেন। তাঁর কথা মতো প্রাচীন লক্ষ্যবর্তীর বসন্ত বিখাল চম্পদনগর

থেকে ঘোষা নিয়ে গিলি দান। বসন্তই এই ঘোষা ১৯১২ সালে হাতিগের উপর ফেলেন। এর পর বসন্ত তাল বিহারীর চাকর দেতে কাশী থেকে লাহোর পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানেন। ভারতীয় বিসর্জনের জার্মানী সাহায্য পাওয়া দাবে এই বর্ষের পাখার পর হতীশ্রমণের সঙ্গে দিকপেশের মাঝে বাগবিহারীর বিসর্জনের সম্পর্ক মোটামুটি আলোচনা হয়। সেই থেকে কাশীতেই তাঁর প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পালা বর্ষের আসবার পর আরও একবার চম্পদনগরে হতীশ্রমণের সঙ্গে কর্মপদ্ধতির আলোচনা হয়। বাগবিহারী উত্তর ভারতে ইংরেজের সেনারী সৈন্যদের ভিতর বিহার জাগ্রাণের দিকেই বিশেষভাবে মন দেন। ইতিমধ্যে ১৯১১ সাল থেকে অগ্রাধিকার দলগুলি ক্রমে পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে আসে। উত্তর বর্ষের দুটি দল হতীশ্রমণের নেতৃত্ব এবং চম্পদনগরের গ্রন্থ ও সাধনা সমিতি হেমেন্দ্র কিশোর অগ্রাধিকার চৌধুরী নেতৃত্ব এত হয়। বারিনবর্ষের দ্বারা প্রজ্ঞানবল সল ও এঁদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে থাকে। ১৯১৩ সালের শেষের দ্বারা এই সব দলের নেতৃবর্গীয়রা সম্মিলিত হন এবং হতীশ্রমণের সঙ্গেও অনেকের পরিচয় হয়। যুদ্ধের, এবং বিসর্জনের সাহায্যের বর্ষের আগের পর এঁরা দ্বারা হতীশ্রমণকে নেতৃত্ব বরণ করে বিসর্জনের কাশিগে পড়ার সংকল্প করেন। ফরিদপুরের পূর্ব দ্বারের দল পরে কলকাতায় অতুল ঘোষের সঙ্গে এসে মেলেন।

কেবল তাঁকার একটি দলের নেতারা এই আয়োজনে যোগ দিতে রাজী হন নাই। এতে দুইদলের মেলন দল ওরকে গিবিয়া বাবু এবং আরও দু'একজন অস্ত্র হন। তাঁরা অগ্রাধিকার মধ্যে কাশিতে শতীন সাহায্যকেও বর্ষের দেন। শতীন প্রথমে কলকাতা অধুনীশনের কাশী পাখার সভা ছিলেন। কিন্তু ১৯১২ সালে দ্বারা বসন্তের সঙ্গে যুক্তের অমিল হওয়ার দ্বারা অধুনীশনের সঙ্গে একযোগে হুই বসন্ত কাজ করেন। এখন বর্ষের মেলন তাঁদের দল বিসর্জনের আয়োজনে যোগ না দেওয়া দ্বারা করে, তিনি কলকাতার তাঁর পুত্রাতন বসন্তের সঙ্গে দেখা করেন। হতীশ্রমণ তখন তাঁকে কাশীতে গিয়ে বাগবিহারীকে

সাহায্য করতে বলেন। গিবিরা বারু এবং ফরিদপুরের নলিনী মুন্ডাও পুরাতন কালের মোহ ভাগ করে শতাব্দীর লোক যান।

১৯১৪ সালের ৩রা আগস্ট বিবাহের স্তর হয়। ঐ মাসেই রক্ত কোলনীর কুমারী হারুন খিহ্ন ২০টি মদ্য পিত্তর ও ৪০০০ বাট্টির নিয়ে লব পড়েন। বতীজনাথ এই পিত্তর বিভিন্ন দলের মধ্যে বাট্টোয়া করে দেন।

নবম মাসে সন্তান সেন ও গিলে আমেরিকা থেকে কলকাতার কবিবার বিজয় বাঘের আশ্রয়ে ওঠেন। সন্তান সেন প্রথমে জাপান গিয়েছিলেন। সেখানে লান ইকাই সেনের সঙ্গে সেনা কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে অস্ত্র আন-হানীর অর্থনীতি চান। সে অর্থনীতি তিনি পান নাই। তারপর অস্ত্র ব্যবস্থা হয়। সেই ব্যবস্থাই খবর নিয়ে প্রাচ্য আসেন। কথা হয় ল্যাংহাইয়ের জার্মান কল্যাণ জেনারেল ব্যাটাভিয়া ও ব্যাটর এই উভয় নিক দিইই অস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা কখনো। ব্যাটরকে কয়েকজন জার্মান অফিসার আমেরিকা ভারতীয়ের দুইবিলা: শিখাতে এবং সেখানে যে দস্ত্র আসলে তাই নিয়ে, ভারতে যখন বিদ্রোহের আভাস জলে উঠবে তখন এই দৈত্য বাহিনী প্রবেশে আক্রমণ কবে। আর ব্যাটাভিয়া থেকে অস্ত্র আহাজে করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নামিয়ে দেওয়া হবে।

আমেরিকার গবর্নর ল থেকে ইতিমধ্যে প্রচার চলতে থাকে। আমেরিকার ও এন্ডার প্রবাসী ভারতীয় বার্তা আসছেন, তাঁদের লবাইকে ভারতে আসতে বলা হয় ভারতে বিদ্রোহের বাতের জ্ঞত। মালয় প্রবাসী গুনিং সিং হংকংএ গিয়ে একজন জার্মানের সাহায্যে জাপানী সাহাজ কোমা গাট্টা মাক চাট্টার করেন। উদ্বেত ছিল, ভারতীয়দের আমেরিকার নিয়ে বিদ্রোহের কাণ্ডে বীকা বেওলা ও বীকিত ভারতীয়দের ভারতে পৌঁছে দেওয়া। ৩৫ জন নিবী ও ২১ জন পাঠাবী মূলমামান নিয়ে ভায়াড্রাবে শৌরীয়ে তাঁদের প্রার কাউকে সেখানে নামতে বেওলা হয় নাই। এতে এরা বিশেষ দুঃস্থ হন। কিন্তু সেখানকার নিদ্রাবীদের কাঙ থেকে টাকা, অস্ত্র বিদ্রোহী সাহিত্য নিয়ে

ইয়োকাহাওয়া ও কোব মধ্যে ভারতের বিদ্রোহ রওনা হন, এখানে বিদ্রোহের কাজের জ্ঞত। সেপ্টেম্বর মাসে জাহাজ-খানি বকবজ পৌঁছায়। সেখানে ইংরেজ এক স্পেশাল ট্রেন লাগিয়ে বেবেছিল—ওদের লোকা পাঠাবে নিয়ে বকী করার জ্ঞত। ৩রা ট্রেনে না উঠে কলকাতার বিদ্রোহ মাট করার উদ্ভোগ করেন। তখন পুলিশের সঙ্গে যাক। হয়, এরা আমেরিকান হিতলবার নিয়ে লড়াই করেন। ১৮ জন যাক। যান। ৬০ জনকে ট্রেনে পোরা হয়। বাকীরা পালিয়ে যান। তাঁদের ভিতর ২৩ জনকে পুলিশ ধরতে পারে নাই। এঁদের অনেকে হাওড়া শিব ভ্রমোয়ারা বুদ্ধ বেওলায় সিংহর কাছে আশ্রয় পান। এবং ১১-১২ কলেজ টিট ভা: নীলমতন ধরের মধ্যে বতীজনাথের সঙ্গে, নরেন সেন কোথায় সাভকতি ব্যানারি বেলে শাহুগোপালের সঙ্গে ও হিন্দু হোটেলে গভীণ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করেন। এঁদের পাঠাবে গিয়ে কাণ্ড করতে বলা হয়। পাঠাবে এরা ফিরবার পর বিশেষ উত্তেজনার স্রষ্ট হয়।

এক মাস পরে ভোমামাক সাহায্য আমেরিকা, ম্যানিলা, ল্যাংহাই ও হংকং থেকে ১৭৩ জন পাঠাবী বিদ্রোহী নিয়ে কলকাতায় আসে। এঁদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহের কাণ্ড অভিজ্ঞ ছিলেন। পুলিশের হাতে অনেকের ধরা পড়ে যান। বাকীরা ধরা পড়েন নাই, তাঁদের ভিতর পরে বিভিন্ন বড়দের মামলায় অনেকের কাসি, অনেকের বীপাত্তর হয়। আরও কয়েকগণা সাহায্যে এইভাবে গবর্নর বিদ্রোহী আসেন ও পাঠাবের বিদ্রোহ প্রচার কার্যে চলে চান।

ইতিমধ্যে বাগিনে German General Staffএর লগে কাণ্ড করতে থাকে চম্পকরদন গিলে প্রতিষ্ঠিত Indian National Party—এর সভা ছিলেন হরমাল, জারকলাপ, বরকতুলা, হেবগুপ্ত প্রভৃতি। কিন্তু আমেরিকা থেকেই ভারতে সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা হরণে বৈধি হবে যেন করে হেবগুপ্ত আমেরিকার জার্মান কল্যাণের সঙ্গে যোগ রাখবার ক্ত পাঠানো হয়। ব্যবস্থা হয়, ব্যাটাভিয়া থেকে অস্ত্র পাঠানো হবে

ভারতের উপকূলে বিভিন্ন স্থানে। এই সব আয়োজন হ'তে হ'তে জাৰ্মানীর প্রতি আমেরিকার মনোভাব নানা কারণে পরিবর্তিত হ'তে থাকে। এর সফল যে সময়ে যে কাজ হবার কথা ছিল, তারি বিস্তৃত ঘটে।

মানক্লাসিকের এক জার্মান বায়নাধী মাতেরিক ব'লে এক জাহাজ বেনে। কথা ছিল, এই জাহাজখানা মেসিকোর ৩০০ মাইল পশ্চিমে সবড়ো বীণে যাবে। স্যানি লাপের্নে ব'লে আর একখানা জাহাজ ৩০,০০০ মাইকেল, প্রান্ত্যক মাইকেলের সঙ্গে ৪০০ ক'রে ওলি এবং ২ লক্ষ টাকা মাতেরিকে ভুলে বেবে। মাতেরিক তখন জাহাজ সাজের বন্দর হয়ে বাট্যাভিয়ার যাবে। বাট্যাভিয়া থেকে অল্প ভারতে আসবে। এই অস্ত্রের কতক অংশ পাভাবেবের দিকে রাসবিহারীকে পাঠানো হবে। বাংলা থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রবেশ পর্বত একসঙ্গে দৈনিক বিস্ত্রোহ ও বিপ্লবের আয়োজন চলতে থাকে।

বিদেশের সঙ্গে এই সব ব্যাবহার সব আয়োজনের ভার ছিল বাহুগোপাল মুখার্জির উপর। তার পরামর্শনাতা ছিলেন সতীশ শেনগুপ্ত ও ডাঃ আভতোভ দাস। অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রমুখবী সমবায়ে স্বতীজ্ঞানাপ নরেন চট্টাচার্য (বর্তমানে এম এন রায়), অতুল ঘোষ ও ভোলানাথ চট্টাচার্য সমস্ত ব্যাবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ করেন।

ঋষি হর অল্প তিন ভাগে বিভক্ত ক'রে কতক নামানো হবে হাতিয়া বীণে, কতক স্বন্দরবনের হরিণঘাটায় এবং কতক বালেশ্বরে। এরা অনেক আশা করেছিলেন, ইংরেজের তখন এক কম লৈঙ্গ ভারতে ছিল যে, এই অস্ত্র পেলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে পারবেন—বিশেষতঃ যখন ইংরেজের ভারতীয় সৈন্তরা ইংরেজ পক্ষ ত্যাগ ক'রে বিপ্লবীদের পক্ষ নেবে এমন সম্ভাবনা দেখা গিল। স্বতীজ্ঞানাবের এবং তাঁর সঙ্গে বহিষালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দেব দায়ণা ছিল, বেশ কখনই আমবা স্বাধীন করতে পারবেন। কিন্তু বহি ঐ অস্ত্র পাওয়া যায়, তাহ'লে যেনেব বিভিন্ন স্থানে আমবা খণ্ড বৃদ্ধ ক'রে মরতে পারিব। তাতে বৃত্ত বেনে প্রাণের সকার হবে।

বিপ্লবীরা বাংলাদেশকে অস্বস্ত লাময়িকভাবেও স্বাধীন

করতে পারবেন, এমন ধারণা রহ। সেই অস্ত্রধারী ঠিক হয় বাংলায় বাট'রে থেকে নেন ইংরেজ ক'রে লৈঙ্গ আমদানী করতে না পারে, সেইসঙ্গে স্বতীজ্ঞানাপ বালেশ্বরে গিয়ে মাস্তার লাইন এবং ভোলানাথ চক্রবর্ত্তের গিয়ে বোম্ব লাইন অবরোধ করেন এবং সতীশ চক্রবর্ত্তী অমর নরেন শোল উড়িয়ে দেবেন। বহিষাল বলা হাতিয়া বীণের অস্ত্র নিয়ে পূর্ববঙ্গ অধিকার করার ভার নেন। এখানে ও জন জার্মান অফিসারও আসবে—তারা লৈঙ্গবলকে শিক্ষিত ক'রে ভুলবে এবং কতক লোক পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতার দিকে অগ্রসর হবে। কলকাতার নিকটবর্তী সমস্ত অস্ত্রাগার বলা ক'রে নরেন চট্টাচার্য ও বিপ্লবী গাঙ্গুলী কোটি উইলিয়াম ও কলকাতার পূর্ব দল করবেন।

রেষার রেষার ব'লে পাঠানো হ'ল দল্ল মিলিটারি পুলিশ হস্তগত করতে এবং অস্ত্রাগার ও ঐক্যবীচলির উপর নজর রাখতে। যেখানে যেখানে ইমার চলে, সেই সব জাহাজ বিপ্লবীদের বলা হ'ল ইমারের দায়ব'দের সঙ্গে তার ক'রে ঐক্য ও ভালোনা বিশপ্তে। সব জাহাজতেই গোপনে প্যারেড, সিগনালিং ও বন্দুক দেখার মুখ লেগে গেল। হেমেন্দ্র কিশোর বিদ্যুৎ চন্দ্রসমান কৃষ্ণবনের মধ্যে লৈঙ্গ সাজেরের কাছে লগলেন। চন্দ্রনগরে ও দেওঘরে বোম্বা তৈরী চলতে থাকলো।

কিন্তু অস্ত্র যে কবে এলে গোঁড়ায়ে তার তখনও কোনো খবর পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে পাভাবে অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠলো। সতীশ শেনের সঙ্গে আমেরিকা থেকে কলকাতায় আসবার পর শিশুলেকে রাসবিহারীও কাছে পাঠানো হয়। তিনি রাসবিহারীকে খবর দেন কয়েক সহস্র পাভাবী এলেছে, আরও অনেক সহস্র আসছে। রাসবিহারী শিশুলেকে ও শতীশকে পাভাবে পাঠান হুম্মলার মাঝে আয়োজন করতে। পাভাবে ঐরা বিদেশ থেকে কিয়দেহে তাঁরা উত্তেজিত হবেই কিয়দেহে। তাঁরা ইংরেজের দেশীয় সৈন্তদেরও উত্তেজিত ক'রে ভুলেছেন। তার উপর তাঁরা যখন শিশুলের কাছে সুনলেন বাংলা ও পাভাবে একসঙ্গে বিস্ত্রোহ ঘোষণা করবে, তাঁদের খেঁচের বীধ ভেঙে গেল। শিশুলে ও শতীশের ঘূষে সব শুনে রাসবিহারী

প্রধান পদে। তিনি স্বতন্ত্রভাবে কান্টে বেতে
অন্তঃস্থ কান্টে।

স্বতন্ত্রভাবে কান্টে, পাত্রেই বসি পত্রের বিস্তার
আগেভাগেই হতে পারে, তাতেও ভয় পাবার কিছু নেই।
বিস্তার হ'লে তা চলেই থাকবে। সাধা দেখেই উত্তরনা
বাড়বে, ইংরেজ তা মনে করতে পারবে না।

রাসবিহারী বোম্বে ও অর্থ চাইলেন। স্বতন্ত্রভাবে
কলকাতায় ক্রেতাদের কলকাতায় কলকাতায় পাত্রে,
অর্থ পৌঁছাতে কৌণিক কেন হচ্ছে তার খবর নিতে।
এদিকে বস্তু বিস্তারের ভাই মন্থকে বিবেচনা কান্টে
বোম্বে পাত্রেই ছিলেন। এই সময়ের প্রচেষ্টাতেই কেবল
তিনি ভাঙতিব অসম্মতি ছিলেন। অতুল বোম্বে ও নবীন
ভট্টাচার্যের আয়োজনে কলকাতায় প্রথম ট্যাঙ্কি ভাঙতি
হল পার্ভেন হাউস ও বেলঘাটার। এর থেকে রাসবিহারীকে
ট্যাঙ্কি পাত্রেই হ'ল।

ইতিপূর্বেই রাসবিহারী অদ্বৈতের পৌছে লাহোর,
কিরাতপুর ও রাওয়ালপিন্ডির ক্যান্টনমেন্টে লোক পাঠা-
লেন। মোগল, কানপুর, এলাহাবাদ, কলকাতা, লক্ষী
এবং বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে পত্রের পাত্রে পাওয়া গেল।
পাটুগোপাল বানার্জি ও আশুতোষ বোম্বে কলকাতায় কোর্ট
উইলিয়ামের পত্রের সঙ্গে যোগ রাখছিলেন।

একই কালে পদত উত্তর ভারতের ছাউনীতে ছাউনীতে
বিস্তারের আয়োজন করলেন রাসবিহারী। বোম্বে ও
অর্থ বা পাওয়া যায় সংগ্রহ হ'ল, অস্বাভাবিকতা পত্রের
বাবু হ'ল, রেল ও টেলিগ্রাফ লাইন নষ্ট করার আয়োজন
হ'ল। স্বাধীন ভারতের পতাকা তৈরী হ'ল, হুজুর ও
স্বাধীনতার বোম্বে বাণী বচিত হ'ল। সংশ্লিষ্ট পাত্রে,
বরকতলা, হুগলী অধ্যাপনা, অমিত সিং প্রভৃতি তুরকের
সহজাত্যে কান্টে এসে অস্বাভাবিক পত্রের পত্র
করলেন।

টিক এই সময় ভাঙতিব অর্থ প্রাপ্তি ও পুনঃ প্রবাসী
ভারতীয় প্রবাসী। একই মূলদানে পত্রকে উত্তরিত
করে তোলে। লিলাপুর প্রবাসী কান্ট মন্থ ও কান-
পুরের মূলদান লিলাপুরে পত্র পত্র দুইটি বেগিনেটে বিস্তার

হটল। এই বিস্তারী পত্রের অনেক বেগুনে আসে।
দোহনগাল পাঠ ও হাসান বা; ব্যাঙ্ক থেকে এসে কান্টে
গোপালের সঙ্গে মিলিত হন। আকলান মাদিদি বা
এবং অর্থ সংগ্রহে সাহায্য করেন। এই সময় হেনার
সিং বর্মার মিলিটারি পুলিশের ভিতর এবং লোহনগাল
মৌণ্ডের Mountain Batteryর ভিতর কাজ করতে
থাকেন।

ইতিমধ্যে কলকাতায় পার্ভেনহীচ ও বেলঘাটা
ভাঙতিব পত্র শত্রুবিধাটার এক বাড়িতে স্বতন্ত্রভাবে
এক পরিচিত গুপ্তচর বেবে কলে। চিত্রপ্রিয় বায় তাকে
সঙ্গে লুকে ওলী করেন। পার্ভেনহীচের ভাঙতি সম্পর্কে
ইন্সপেক্টার জুয়েল মুনসিফ নবীন ভট্টাচার্যকে প্রেরণ
করে। স্বতন্ত্রভাবে আবেশে জুয়েলকে হত্যা করা হয়।
নবীন সেই দিনই জামানে খালি হন।

পত্র পত্র একত্রে পত্র পত্র পত্র পত্র কলকাতায়
পুলিশের বসতিগততা এত বাড়তে যে লগ্নেই মনে করেন,
স্বতন্ত্রভাবে আর কলকাতায় থাকতে নেওয়া সমীচীন হবে
না। দেশের বিভিন্ন অংশে গুপ্তচর বেবে বিস্তারের কাজ
চালাবার জন্য কতকগুলি আশ্রয়স্থল টিক করার মিক
স্বতন্ত্রভাবে মনে দেন ১৯০৮ সাল থেকে। এই কাজে তাঁর
প্রধান সহায়ক ছিলেন মাদিদি কর। মদ্রতন্ত্রের কপিশবার
তিনি এই সময় এক আশ্রয়স্থল গড়ে তোলেন। স্বতন্ত্র-
ভাবে দেখানো চলে যান।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন লাহিড়ী আদর্শ ও আবেশিকা
জুয়ে এসে পাবার মনে, অর্থ আনবার বাবু সম্পর্কে
আলোচনার জন্য কাটকে ব্যাটিকিয়ার আদর্শ কল
হেলফেরিথের সঙ্গে দেখা করতে হবে। নবীন ভট্টাচার্য
মার্টিন নাম নিয়ে এপ্রিল মাসে যান ও হেলফেরিথের সঙ্গে
দেখা করেন। এই মাসেই মাতেরিক কালিকদিয়া থেকে
বাত্তা করে। হেলফেরিথ বলেন, অর্থ করাচিত্তে বাবে।
নবীন ভট্টাচার্যের কথা রটে অবেশেই লাহিড়ী-এর কল
কেনাবেলের সম্মতি নিয়ে ঐ অর্থ জুজুর মনে পাঠাবার
বাবু হ'ল। ছায়া এও মূল বলে এক বোকা মনে করেন
হরিদ্বার চক্রবর্তী প্রায় এক বছর আগে বাইরের সঙ্গে

যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যে। এখান থেকে ব্যাট-ডিম্ব টেলিগ্রাম দায় ও বহুসংখ্যে চম্পি হাজারের উপর টাকা আসে। নতুন জুন মাসে দিওর এসে বপ্তিশপাথ হতীজনাথ ও বাহুগোপালের সঙ্গে পরামর্শ করেন। অসুস্থতা আহাজ সম্পর্কে এ বিপ্লবের আয়োজন সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা হয়। আহাজ থেকে অসুস্থ নামিমে স্থানে স্থানে প্রেরণের ভার নেন অতুল ঘোষ। নৃনগরের হতীন রাজা নৌকা ও মাকির ব্যবস্থা করে

দেন। হরিন্দ্রের চক্রবর্তী, সতীশ চক্রবর্তী, ডাঃ হতীন ঘোষাল প্রভৃতি অসুস্থ আনতে হননগরে গাছনগরের মুখে যান। কথা ছিল ১লা জুলাই মাত্রেবিক আসবে। জাহাজের উপরে লাটটি আলো পাশাপাশি অগ্নি উঠলে, এঁরাও হুসরবনের পাছেহা মাথায় পাশাপাশি লাটটি আলো জ্বলে দেবেন।

কিন্তু বোধন না হ'তেই কি করে দশমঘট ভেঙে গেল, সেই কাহিনী আর একদিন বলব।

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ বাহুগোপাল মুখার্জী

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

পূর্বাহ্ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি স্থলে ভক্তি হলাম। এই সময় থেকে আমার জীবনে দুঃ-সন্নিহিত লক্ষণ দেখা দিল। একদিকে কতকগুলি জাতিব, স্বাধীনতাহারী বুদ্ধ, আর একদিকে আহুতবের, পরান্ডনের মাথা তোলায় প্রচেষ্টা। বোম্বার বুদ্ধ হ'ল দক্ষিণ আফ্রিকা। বম্বার বুদ্ধ হল চীনে, প্রথম চীন জাপান বুদ্ধ-চীনে, আমেরিকার স্পেনের সঙ্গে বুদ্ধ ও কিউবা অধিকার এবং রুশ-জাপান বুদ্ধ মার্কিয়ার রুশিয়ার প্রথম বিপ্লব চেষ্টা। আকাশে বাতাসে কেমন বেন এবটা শেকল ছেঁড়ার গর্জমান কহ ডাব হরদী প্রাপক আক্সান জানাজিল।

বুদ্ধতা পরস্পরে দেখা হল বলেন—আর আমাদের থাক কেন? এখন গেলোই হয়। চারদিকে দস্ত অবিচার, অন্যায়, হুজি-জাতি একাকার এসে পড়ল। প্রৌঢ়া বলেন—নব একাকার হবার কথা, তা বেন হরগ এস। ভবিষ্যৎ পুরাণের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে আসছে। জাত,

বর্ণের বিভা-ত হইল না, তাড়াডা বোন দ্বৈতও সম্পর্কের বার-বিচার বৃত্তি আর থাকে না। হুগরা বলে—লেখাপড়া করতেই যদি জীবন শেষ হয় তবে আর ভোগ—ভাত করবে কবে? কেউ বলে বেন বোম্ব হুগর হর ও বোম্ব হুগর-বাড়ী লাগা দায়। কেউ বলে বেন বোম্ব মাস-কাঁবার হর, বোম্ব হোববার হর এবং বোম্ব মাইনে পাওয়া দায়। অধিক রাতে এবং একটি রাত কহাও আশ্রণ কাঁকরী হ'লেই ভাল হয়। কিপোররাও ভাবে। তারা চাবে হুগর পুখিবি; হুগর হ'ক তার ব্যবস্থা। কম পড়া, বেশী ছুটি, পাওয়া পয়া যেমনটি চলছে, তেমনটি বেন আত্মবন বজায় থাকে। কেবল এখন তাপের মা-বোনদের সঙ্গে কেউ বলে যে তারা জাত-লগেত, মতা লগেলেয় অধম। সেগুলোকে-ত দেখানে দেখানে এখন ইচ্ছে কেলিয়া তাপা দায়, এদের তা করা চলে না। এখন অপরিণীত লক্ষ্য তাপের মাথা কাটা দায়। "বুৎ, বুৎ বেতে হেবে এ পাশ, এ লাফ।"

ছাত্রা কহ—ছাত্রজীবন। কিন্তু তার থেকে বিদ্যুত হবে পরীক্ষাগুলো। পরীক্ষা বিদ্যুত বা দ্বিগুণ ছাত্র জীবনই মনবজীবনে সর্বোচ্চ সময়। এই তাপের সূর্য্যাস-সম্বত, অসিগাধিত মত। অর্থাৎ একটি অসিগাধির মাথা আর এবং নিষ্ঠাভাটের জীবন।

"অলমমলম" মনপূর্ণা নয়া করে বর বিতে চাওয়া

টাইরী পাটনী চাই করে বলে কেলস—“আমার সন্তান যেন থাকে তুখে-ভাতে”। পেট ও পুরাতন সন্ধ্যাই জীবনের সব সমস্তার দেহা বয়েই গেছে।

খালি হুয়েন বাড়িঘোরা চান সবকারী মনসে থাকিষ্ঠা হাত। কংগ্রেসকে বন্ধ-বন্দের আগর ও আজ্ঞা বলে লোকে ঠাট্টা করত। সন্ধ্যারী বলেন—“দিনমে তাকিনী, রাতমে বাছিনী, ঘন ঘন লহ চোখে” যে বহনীর বক্তা তাৎপর্য নিয়ে ঘরকন্না করা কি মহাভ্রম। অথচ সবাইকার বাসনাভাষ্য তাই করে আসছে। উপদেশের বদলে সংসারী পুত্র ও স্ত্রী-সর সন্ধ্যাতা ও সাহায্য নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট।

উপস্থিতরা বলছেন—“সাহুর কথা কানে তরি, অবতারের গীত ধরি”

‘তবু স্বপন হোয়া, মেঘের মাথা,
সে সুখখানি হ্রদে ঘাগে।’

নেমেয়া বলেন—চায়তবরো নারী জন্ম যেন আর না হয়। কত বড় অভিশাপ থাকলে বাহুব এসেলে মেয়ে হয়ে অস্বাভ।

কৃষ্ণ বলে—চাখ আখায়ে সূলাকে না, সহরে যাও ছোলেমেয়েরা, চাকরী-বাকরী, হুজুরী, লেব একটা বহি বিচ পাও। আর না বাড়ালে আর চলছে না।

মজুর বলে খেটে খেটে প্রাণ গেল। কোন রকম জ্বায়ে হচ্ছে না, মিহি, কাহিলব, ধরত, উত্তি, পোটো, সংাই বলছে—বাগ, ঠান্ডারী টুটাকা মালে এমন বোল তুর্পোজ্ঞ করে গেছে, কিন্তু আমাধের কিছুতেই পেট-টাও চল না।

সমাজচিত্রের এই গেল একদিকের ছাপ। অস্ত্র একটা বিকণ আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় হুঁকুম। মানব মন। একটা মন, ব্যাপণানের ভাব-ভাবণার অতি বন্ধ মনুষ্য। শুধু দুহুইই নয়, অতি সহরে নড়া-কলেয় কাটার মত ঐ ভাবধারা ধরে নব আগন্তকের নির্দেশক। বাস্তবের ভাল প্রদর্শন ‘অন্যত’ বলা যেতে পারে এমন মনকে। অপর বন্ধন যে মন আছে তা ভাল মাত্রের ‘আখাত’ প্রতিপাদক। যে বোল বাহুকে শুধু তার কনি তাতে আসে। যে বোল এখনও বাকি

যাছে, কিন্তু আসবে, তার কিছু ইবিত এতে নাই। তেজলি সাধারণ মন তার ছাপ উপরোক্ত উক্তিগুলির ছবিতে পাওয়া যায়। এব থেকে শুধু একটা অসম্ভব সংকেত মেলে। অপর বন্ধনের মনের প্রতিটি পাওয়া গেল তৎকালিত জীবনের নতুন সন্ধান।

আমি ভাগ্যক্রমে কয়েকটি ছাত্রবন্ধু এবং সর্বাঙ্গের একজন উচ্চাঙ্কুর শিকক পেয়েছিলাম স্থলে। এদের অবলম্বন করে ‘অন্যত’র সন্ধান পেয়েছিলাম। একদিকে আমাধের বাড়ীর হুজুর। সেখানে আখার বাবা, কাকা ও তাইদের আশাশ, আলোচনা আমাকে নতুন দৃষ্টিমর্শন ও তার পাথের দান করত। অপর দিকে এই শিককটি তাঁর অভিনব শিক্ষা প্রণালীতে আমাকে ঐ পাথের প্রত্যক্ষ শবিক গড়ে তুলেছিল।

মাটির মগাধের নাম প্যারীমোহন দাস। কড়ি ও কোমল দিয়ে তাঁর খাতু গড়, ছাত্র বন্ধুদের নাম অক্ষর ও শব্দ।

বাড়ীতে জনতার একটা নতুন বুল আসতে বাধ্য। এই চোখে তার টিকি কেউ না দেখলেও মনের চোখে সে ধরা দিয়েছে। এ মেয়ের সর্বাঙ্গীণ ইহলৌকিক অস্ত্রাঙ্গ কেউ ঠেকাতে পারে না। এ মেয়ের একটা বিশেষ ঐক্যটি আছে। এ মেয়ের সংস্কৃতি ও ভাগ্য মাঝে মাঝে সান হয়। কিন্তু সেই ঐক্যটি অস্বনিহিত শক্তি জাগ্রত করে নতুন আশা, নতুন আলো মাগিয়ে তোলে। প্রায় হাজার বাথোপ’ বছর বাগে বাগে তার খেলা দেখা যায়। বহু পূর্বে যখন এমন মেঘ সকার হয়েছিল, তখন এসেছিলেন বৃদ্ধ। তারপর এসেছিলেন শব্দর। কিন্তু সেই সবরে মূলমান অস্ত্রাঙ্গের হুঁ। ভারত বিশেষীর আক্রমণের পর আক্রমণে মূলমান হয়ে পড়েছে। পাঠান এল, মোগল এল, ইংরেজ এল। এবার ওঁদের পালা। ওঁদের পালা নীচের দিকে নামতে নামতে একদম অস্বিতে এসে ঠেকেছে। আর নামবার মাথিগা নাই। এবার উঠতে হবে। একভাবে থাকার বো নাই।

ওঁঠা সূত্রে সবাই একমত হলো কি উপায় অবলম্বন করে ওঁঠা টিক হবে তাই নিয়ে এখন ছিল কিন্তু মতামত।

আমার পিতা কেবল বিজ্ঞানের ওপর বেশী জোঁক দেবার পক্ষে। আমার এক কাকা ছিলেন বিজ্ঞান ও যেশের সংস্কৃতিকে লড়িয়ে ওঠার পক্ষে। আমার মেজহা বলতেন, এ বিষয়ে আমাদের কোন মীমাংসাই ঠিকতে পারে না। যুগ যুগেছে তার যুগ-ধর্ম নিয়ে। সে নিজের কাজ নিয়েই করিয়ে নেবে। আকাশ-ভাষা মেঘ বন আলো তরল অল খাবার গলে, কেউ কি বলতে পারে সে লক বা মোটা কোটার আসবে, কোথায় ভালবে আর কোথায় ভালবে না? আমাদের "হা" "নাহ" নিরপেক্ষ হবে সে যুগের অভিজ্ঞান। এই পরিবর্তনটা আসছে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির একটা, ওলট-পালট করতে। বন, বন্য বা আমূল পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষনীয় কিনা তা দেখা যেতে পারে। এটা বন্য বিচার, বিরোধের বিষয় হতে পারে। উদ্ভট কিছু হবে না বটে। কিন্তু শিকড় পর্বত উপড়ে—আগাছা তুলে নতুন আবাদ আগা কয়; দাঁহ। - ভারতের অস্থঃশক্তি বাইরের প্রবল আক্রমণে প্রথমটা মুহুর্তে পড়ে। কিন্তু আবার তার জীবনীশক্তি চাপান বেয়। আবহমানকাল এইটে হয়ে আসছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। আমার কাকা বলতেন—সে যাই হ'ক, প্রত্যেকের কত'ব্য বিষয় এই থাকে উচিত যে ক্ষমতার সমূহের চেয়ে মরণের সমূহে বেশকি যেন উন্নত বেথে যেতে পারে। জীবনকে সেই কোঁক ঘিরে গড়তে হবে এবং চাপাতে হবে। মাহুতোহী চেপের মত, বেশতোহী জীব না হয়ে বেন কিরি।

পৃথিবীর লমায় ও রাষ্ট্রবিপ্লবের অধ্যায়গুলি বার বার অলোড়িত হত। ওরিকে মাটার মহাপন—ভিনি ইতিহাস পড়াতে পড়াতে আপশোষ করে বই বন্ধ করে দিতেন। বলতেন—এতে যা লেখা আছে তা লেখা না বললে বিশ্ব-বিদ্যালয় তোমাদের পাস করাবে না। পাসের লগ্ন তা না লিখে তোমাদের উপায় নাই। কিন্তু দেখানে দেখানে এবং যা যা মিথ্যা আছে, আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। পরে মন থেকে বইয়ের শিক্ষা মুছে ফেলবে। মুখে মুখে যা বলছি তাই ঠিক বলে জেনে রেখো। বড় হয়ে আরও পড়ে, আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা যা সঠিক হ'ব নির্ণয়

কোথো। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কুশিকা থেকে বাচতে হলে এটা বাণী (motto) অন্তরে স্থির করে রাখবে, তবে আত্মা বকা পাবে। সেটা হচ্ছে *unlearn mostly what you learn here*—এখানে যা শিখেছ তার অনেক কিছু তুলে বেও। পরাম্বীনতার লব চেয়ে বড় অভিজ্ঞাপি কি জান? *Cultural conquest*—নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলা।

আমি বাড়ীর মহলিল থেকে যা লক'ব বেবেছি তার লগ্নে মাটার মশাবের উপদেশের দ্বারা মিল হয়ে থাকিল। এখানে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ও বিস্তারে লাভ যে কিছু হয় নাই তাও নয়। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশী হয়েছে। কতগুলি শোকের চঠবানল নিরুত্তির হৃদয় স্থপিত হয়েছে। কিন্তু তথা আত্ম-ত্বিকে হারিয়েছে। আত্মকে বেড়ে অনাত্মকে লক'ব করার মত। পোনা দার মেলে লাহেব নাকি ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যম এমন ভারতের কল্পনা কয়েছেন যে ভারত ইংলণ্ডের শাপনকে খাকা একত্বিন দেবে। কিন্তু তার চলের (policy) মধ্যে অস্থঃপ্রতি হলে সে খাকাটার স্বত্ব বরা পড়বে। শিক্ষা বিভাগটা হবে কেরানী গড়ার কারখানা। শিক্ষিতরা উক্ত কোলাহল করবে, আন্দোলনে জনমণ্ডলকে বিক্ষুব্ধ করবে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টার পাহাড় মূখিক প্রসব করলেই তাগা জুটবে, খালি লংকারের বোড়া তালি ছাড়া তারা কখনই ভারতে ব্রুটিন শাপনের মূলোৎপাটন ভারতে পারবে না, কোনদিন কামনা করবে না। জীবন লমূত্রের বিপর অহোম-গুলির নির্ভর, নিরাপন পোতাঙ্গর পাথে এদের ছত্র ছাড়া-তলে। ইংরেজী শিক্ষিতরা বেধেবে তাদের দ্বার্ষ ও অস্থিত্ত বহাধ খাকবে ভারতে ইংরেজ শাপনের দ্বার্ষ ও দ্বারিষের কার্যনীতে।

এই লম্বা স্থলের সুপারিটেডেডে ছিলেন টমারী সাহেব। সাড়ে বশটায় প্রার্থনার পর স্থল বললেই তার প্রথম কাক ছিল বেত হাতে ক্রালে ক্রালে ঘোরা এবং তখন যে মাটার ক্রালে খাকতেন তাকে মিডালা করা *Any bad boy in the Class?* এই ক্রালে কেন

দুই বালক আছে। তখন যোগেন সবকার মশাধের "হালিগুপ্তি" হাঙ্গি বের করা। শব্দটি ছেলেরের মনে পড়ে যেত।

"আর সকলে ভয়ে ভয়ে নিতির নিতির চায়।

কাকতপালে কি বে আছে বলা নাই বাহ।"

যাঠার মশায় উল্লভন প্রদ্বর আলেন মাত্র না করে পাঠতেন না। দেবিরে দেবিরে মিতেন। সাহেব ছেলেরের প্রার্থনা কামারায় নিয়ে গিয়ে লগাল কয়েক-খা বেত লাগিয়ে ছাড়তেন। বে হল (Hall) কিকিংপুইই মুক্তি-বাকী প্রচারিত হয়েছিল, সেইখানেই নির্দাশন আচরিত হত। অনুষ্ঠের পরিচাল না, কি বলতে হবে এত ?

প্যারী বাহুর আন্ত-সম্মানী গ্রাণ এই ব্যবস্থাকে লক্ষ করেত পারেন না। সাহেবের প্রবেশ উত্তরে বরাংর বলে মিতেন—No না, এক্ষণে খাণাণ ছেলে কেউ নেই। সাহেব চলে গেলে তিনি ছেলেরের বলতেন—দেখ, তোমাদের মধ্যে শতাব্দের যদি কোন বসন্তাল বা স্বপদা, বারামবি হয়, আবার জানিও। সাহেবের কাছে নাগিল কোরো না। আমাদের মনসা আমতা যোগা। ভাবে নিশ্চিন্ত করব। বিশেষীনের এতে হাত গিড়ে দেও। উচিত হবে না। যদি এ ব্যবস্থা না মানো, তোমাদের এমন একটা বন অচ্যাস গড়ে উঠবে যা এদের শিক্ষা ব্যবস্থা চায়। তিল থেকে তাল হয়—একখাটা। বোধ হয় শুনেছ। আন্ত-নির্ভরতা আমাদের এমনি করে চলে গিয়েছে। তাকে আবার কিভাবে আনতে হবে। হোদী আমতা; বিচারকও আমতা। বাইরের কেউ কখনও নয়।

হেলেরা এই সম্বন্ধকার লাভবান হল। আমাদের বরোদা গণগোলের অন্তর্গতের ব্যয় হয় না। ছোট প্রান্ত থেকে আতীর জীবনের বিভিন্ন বিভাগে প্রযুক্ত হবার উপদ্রুত প্রতিভা এটা। ঠিক উটো। ব্যাপার হওয়ার ব্যয়ব্যয় বাইরে থেকে আনত্বিত হয়ে বিশেষীয়া লাভবান হয়েছে এবং ভারতবাসী তাদের গোলাবী করেছে।

বিম্বিনি এই ভাবে চললে সাহেব বিরক্ত হলেন। তিনি প্যারীবাহুরকে বললেন "Are you dealing with angels in your class?"

সব জ্ঞান থেকে বন ছেলেরের নাম পাচ্ছি, তুমি কি— শুধু স্বপ্নীয় দৃতবের নিয়ে জ্ঞান করছ ?

প্যারীবাহুর লব সাহেবের অস্ত ছিল না। তিনি বললেন—হ্যাঁ! সাহেব তাঁর কথা মানতে পারলেন না। তিনি নতুন প্রথা লক্ষ করলেন। প্রতি ক্রাণে একজন ক'রে মনিটর (Monitor) নিযুক্ত করলেন। তার কাজ হবে সংশয় সাহেবের কাছে বসে পৌঁছে দেওয়া। প্যারীবাহুর আবারও পত্রিকা উন্মোচন করলেন। "দেখ Monitor, যেন man-eater হয়ে দেখা না। মাহুদের রক্তক হয়ে যেন শুক হয়ে যশো না।" যথেষ্ট আদ্যের ক্রাণের মনিটর হয়ে ছিল বটে, কিন্তু প্যারীবাহুর প্রভাব সে এভাবে পারে নাই।

একদিন অপর একটি-ক্রাণের ছাত্র প্যারীবাহুর এই ক্রাণের এক ছাত্রের নামে টমারী সাহেবের কাছে নাগিল করে। স্থলের পথে, বাড়ী বেতে যেতে রাতার ভাবের স্বপদা এবং পথে মাহুয়ারি হয়। টমারী সাহেব শিক্ষারী বেড়ালের মত লম্বা ওং পেতে থাকার দীর্ঘ দিন বামে শিক্ষার পেয়ে তিনি যে কি উৎসাহ হয়েছিলেন তা বর্ণনা করা যায় না। শুধু এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে তিনি তার মাহুয়ারি বাইরের একটা ঘটনা টেনে এনে প্যারীবাহুরকে যে অপ্রতিভ করতে চেয়েছিলেন তাতেই যেন সর্গস্থ অহত্ব করেছিলেন। প্যারীবাহুর সব সময় আমাদের ক্রাণে পড়াতেন না। শুধু প্রথম ঘটটি পড়াতেন। তারপর আরও চারজন শিক্ষক তার ঘটী পড়াতেন। প্যারীবাহুর অন্ত ক্রাণেও পড়াতেন। সাহেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ প্রত্যাহ হ'ত এই ক্রাণে। সাহেব ছিলেন বেশ-হাসি। সর্বদা মুখে হাসি বেশে থাকত। এমন হাসি-মুখ দোকও যে কল্লাব হ'তে পারে—আমি ইতিপূর্বে তা কল্পনাও করতে পারতাম না।

সাহেব প্রচারিত প্রার্থনার পর ক্রাণে এলে প্যারীবাহুরকে বললেন—"At last you have got a devil amongst

your angels. তোমরা স্বর্গীয় পুতরের মধ্যে একজন অস্বভাব: শব্দান বেরিয়েছে।" প্যারীযানু বোয়ের মত প্রভাবিত ভাবেই বললেন—"I shall be surprised if he turns out not to be an angel.—সে ছেলেটি যদি দেখত না থেকে থাকে তবেই আমি বিশ্বাস্ত হবে।" সাহেব প্যারীযানু কথার কান না দিয়ে ছেলেটিকে তেঁকে নিয়ে চললেন। সে বলির পাঠার মত কাপড়ে কাপড়ে সাহেবকে অহুসিত করল। প্যারীযানু বললেন, তুমি সাহেবকে খোঁসো যে তুমি পক্ষপাতহীন জাতিবিচার চাও। প্রার্থনা হল, সাহেব উত্তর পক্ষের কথা শুনে দুটিকের দাবিরে ত্যাগলেন। শেষ পর্বত ছেলেটি নির্দোষ সাব্যস্ত হল, ছেলেটি-ত বেত খেলই না, উটে সাহেব ক্রাণে পুনরাগমন করে প্যারীযানুকে অভিনন্দিত করে চললেন—"In fact your angel has cleared his conduct—তোমার দেখত নিঃ স্নানদের বলক নিষ্কাশিত করতে সমর্থ হয়েছে।

প্যারীযানু মূৰ্খ, চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ক্রাণ শুদ্ধ লকলে এক অনির্বচনীয় স্নেহোন্মাদে উদ্ভাসিত বোধ করল।

তিনি বললেন—আমাদের বাস্তবিক আন্দোলনের কারণ যাটছে। শুধু মানস নয়, জ্ঞানও আমরা লাভ করলাম। ভাত বাদ্যবাস সময় ভাত ষ্টিক সিদ্ধ হয়েছে কিনা নাযাওয়ার আগে বাঁধুনীয়া বেবে নয়। দু'একটা ভাত টিপে আন্দাজ করে নেয় কখন নাযাবে। দু' একটা গান, খুব ক্ষুদ্র সংখ্যা, কিন্তু তাই দিয়ে সময় সময় কৃষ্ণ পরিচালকের শব্দ বোকা বাব, আমাদের হুপারিটেডেট সাহেবের ব্যবহার দিয়ে বুটল শালনের ভিতরের অবস্থা বোকা যেতে পারে। সাহেব লোকটি কেমন মিষ্টি!—"করিতেছে বোকাভাত, তবু ঘুবে হাসি।" এই এই পরিচয়, ঘুবে ত' হাসি, কিন্তু কবে কি? সে এক ভাবাবস্থ ব্যাপার। এ বেশে শান্তি, শৃঙ্খলার নামে যে শাসন চলছে তাও অস্বাভাবিক। শাসনমুখ তেরনবীর পারের এক বেশের লোকের শেট ভরাতে এখানকার লোককে গরীব ও বৃহস্পতি করে রাখা হচ্ছে, ওপরের গরীব মানে তাদের কঠোর

দ্বৈতিক মাখন না লেগে একদিকে লাগতে; আর হেথাকার গরীবদের কঠোর নাই। এ লেগের মাছ মাছের মধ্যে দখল নয়, তাদের হক, হকই নয়।

আমরা তিন বছর প্যারীযানুকে পেয়েছিলাম, বাকী দুটো ওপরের ক্রাণে তিনি পড়াতেন না। যে সম্পর্ক শুধু নিজে গড়ে উঠেছিল তা ইদুর কলেক্টর বাইরেও বন্ধ ছিল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। প্যারীযানু হুজুরি বিধান ও বহু ভাষাবিৎ অধ্যাপক ক্রেজ্ঞ নাম শিল্পের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বাস্তব ও বেনেডোথি বিনিময় চক্র পাণ এবং বেনেডোথি হুবিয়াত মনোরম গুহ ঠান্ডারত ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। প্রবাসী সম্পাদক হামানন্দাবু এবং ব্রজনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন।

ক্রমে প্যারীযানু চাকুরির বললেন আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা। কোথার জেনে দেয়ী দুই কণ্ঠে হল। ইংরেজদের একটা মস্ত গুণ হচ্ছে যে ওরা নিজেদের মধ্যে কণ্ঠা বিবাহে বিভিন্ন থাকে; সত্য ও অসত্যের সমানে বেশের দ্বাৰ্ধে এক জোঠ হতে পারে, আমরা তা পারি না। এইটাই আমাদের লক্ষণে হুড এবং হুড ক্রটি। এ মাস্তুলক বোদ বেনন করে হক আমাদের ডাড়াতে হ'বে। এর অঙ্ক চাই নতুন আচরণ, নতুন উপক্ৰ।

"আপনি আসেনা গিন, আসেনা বনন, বিনেরে আনিয়ে হক কবি আবাহন, তার তরে শিকা চাই, নীকা চাই নয়, তক্তি তরে প্রাণ তেল কবে আচরণ।"

দুটো দ্বিবি চাই, একতা এবং বেকার নিজেদের নিষাধবৃত্তিতা। বেশ মাঘের প্রতি তক্তির পক্তিতে, জ্ঞানের আলোর এগিয়ে চলতে হবে। পথে চলতে গেলে বিপ্লবী না হও সে'ত একটা কল্যাণ থাক। অবশ্য অবশ্য দরকার। সে কল্যাণ হবে সেই সফল দায় বলে অলাভ সাধন করেও বেশক বড় করতে হবে। সেটা হবে, "যে দায় থাক, যে থাকে থাক, তুমি চিনিছ তোমার ডাক।"

তারপর তিনি শির করে গেলেন একটা পুণ্ডক

তানিক। যা স্থলের ঘটার পর একটা সময় করে সবাই ঘিরে পড়া হবে। তাতে ছিল অক্ষর মৈত্রেয়র সিরাসকৌমা, সখারাম গলেপ বেডেজের কাপীর রাণী, বাজী বাও এবং পরে দেশের কথা। এই রকম বাছা বাছা আরও কতকগুলি এই ছিল। Seely's Expansion of British Empire, Raskin's Brown of the Wild Olive, Life of Mazzini, বন্দনী গুপ্তের দিগাহী বিঃহাঃর ইতিহাস, হেনসল্লের, মাইকেলের, রবীন্দ্রনাথের বাছা বাছা বসনা। বৃটশ লেখার পাটিঃ Rig Hardee ও Mac Donald এর কিছু লেখা, Failures of Lord Curzon, বানিমোহন রাণের জীবন, বিজ্ঞাপঃরর রোনী, বিবেকানন্দের পত্রাবলী ইত্যাদি।

পরের রক্ত মন না কাপলে নাঃস্থই হওয়া হল না। লে জন্ত ছাত্রদের তঃনীঃন অধ্যাপঃদ্বারী কনভার বা স্থলাত তেমন টাঃঃ সংগ্রহ ক'রে বাঃত্বের পোষাঃ ওদুঃ, পুখা, বাপড় বিনে নিয়ে আসা হ'ত। তিনি থাকতেন অগ্রষ্ট। আমার মনে পড়ে একবার কিছু টাঃঃ সংগ্রহ ক'রে পঃঃ, চঃঃনাথ, অক্ষর ও আনাকে তিনি সঙ্গে ক'রে এক বিখ্যা আঃঃনে নিঃঃে বান। পঃঃে ছেলেরা মিঃঃাঃা করে আঃঃদের অধ্যাককে কি ক'রে সঃঃান মেঃঃাতে হবে। তিনি বললেন—মঃঃি যেমনভাবে অঃঃা ও সঃঃানে আঃঃন করব তেমনরাও তাই ক'রবে। বলেছিলেন যে সে মহিঃঃনী মহিলা কোন নঃঃি নাঃঃরিকের তঃঃী। নিঃঃের

ব্যঃঃার বাখাঃঃুবের ব্যাখা দূঃঃ করার প্রঃঃণা পেঃঃেছিলেন। তিনি তাঁকে ভূমিঃী হঃঃে প্রঃঃাম করেছিলেন, ছাত্রাও তাঁর অঃঃগমন করল।

এইভাবে ক্রমে বাছাবাছি হ'রে কয়েকটি সতীঃে মিলে পঃঃাপকাঃের কঃঃে গেঃঃে যইলাম। আঃঃরক্ত জীবনে কঃঃের যোগ্যতা লাঃঃের মত এই ভাবে মন গড়া চলেতে লাগল।

১৯২২ সাল। প্যারীঃাঃ আঃঃাঃের ক্রঃঃে বেঃঃে একটি গান লিখে ব্যাখ্যা ক'রে বৃত্তিঃে বিঃঃেছিলেন। ছাত্ররা তা লিখে নিল, কঃঃুঃ করল ও গাইতে লাগল। গানটি রবীঃঃ্রনাথের "লঃঃি, জুঃঃন মন মোহিঃঃী", এ হ'ল এক পঃঃম বিঃঃ। লেখঃঃেঃ মাঃঃান গানের চলন তখন সাঃঃাঃে ছিল না। তখন পঃঃে, ষাঃে, হেলে, ঝিঃঃাঃে, ট্রাঃে বা গঃঃনার নৌকাঃঃ বেঃঃের, ধঃঃের বা লেঃঃঃেঃী লোকেঃঃ কথা বা আলোচনা শুনা যেত না। এক লঃঃে কিছু লোক জয়া হ'লে আলোচনা উঠত—কাঃঃ বাঃঃের প্রাঃঃে ক' মন হই হঃেছিল। নেমঃঃর বাঃঃীতে মাঃঃের তেমন প্রাঃঃুঃ ছিল কিনা? কঃঃ'বাঃঃীর সাঃঃিঃানার নীচে অঃঃন বেঃঃিয়া ঠিক হঃঃ নিঃঃ। অঃঃবা খেঃঃীঃ বিঃঃেতে খেঃঃীঃ বাঃঃের কাছে এত ভঃঃী গোঃা চাঃঃবা কি ঠিক হঃেছে? ইত্যাদি। আঃঃাঃের একটা লেঃঃ আছে, তাঃঃ প্রাঃঃি আঃঃাঃের একটা কতঃঃা আছে, তা কথা হঃঃ নি, উঠে পড়ে লাগতে হবে। এ ভাঃঃের আঃঃাপ আলোচনা বা কোন কথা ছিল না বললেই হয়। (ক্রমঃঃ)

পাঞ্জকার কুলপঞ্জী

আরতি দেবী

বিশ্ব শতাব্দীর এই অতি সভ্যত্বগুণে পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কিছু বলা হয়ত একেবারেই নিম্নপ্রয়োজন। কিন্তু পঞ্জিকার উন্নয়নও আলোচনা করা হয়ত প্রয়োজন। পঞ্জিকার আবহ যে কত প্রাচীন এবং পঞ্জিকার মূল যে কত গভীর তা আমরা অনেকেরই ভেবে দেখি। আমরা হবনম দেখে গোটা ব্যবহার করছি এবং যেগুলো না হলে আমাদের সভ্যতাবীন একেবারেই অচল সেই মাস, বার, দিন এই সব সময়-পরিমাপকগুলোর ভিত্তি যে কত প্রাচীন কালের দিকে আমরা মূলমূল্য বলে সেই আদিম মানবের দৈনন্দিন লক্ষিত ঘটনা থেকে পাওয়া তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

সময় লম্বাছে জ্ঞান সেই আদিম-যুগের বস্তু মাত্রের সময় থেকেই শুরু হয়েছে এবং তথু সময়ের জ্ঞান নয় সময়ের পরিমাপও। এ সম্বন্ধে আমরা আশা যে সময় বৈজ্ঞানিক তথ্য দেখছি বা পড়ছি এসবেরও গোড়ার সেই আদিম মানব।

পঞ্জিকা বিজ্ঞানেই মান। বিজ্ঞানের শুরু হয়েছে যখন সময়গতির মূল তার চরমে পৌঁছেছিল এবং গতির সঙ্গে যখন মিলনোপ হতে বসেছিল। তখনকার সেই আদিম পরিবেশে একমল লোকের মনে প্রত্যেক ঘটনারই এক এটি নবী করে তবিস্বতের মজ্জা রাখা করার দিকে স্বাক্ষর চাপল, এবং এর প্রয়োজনীয়তা সময়ক বৃত্তে পেরে ঐ কাজে লেগেও রইল। এই যে নবীকায় মনোবৃত্তি এও পঞ্জিকা সৃষ্টিতে অনেক সাহায্য করেছে। তবে পঞ্জিকার অস্তিত্বাত্মক আরম্ভ হল মানব সভ্যতাবৈ কৃষি মূল থেকে। কৃষিকার্যে স্থিতির মজ্জাই এর বিকাশ ও প্রসার প্রাধান্য: আবহ হয়েছিল। নবীমাতৃক দেশে পঞ্জিকা না হলে অর্থায় সময়ের পরিমাপক কিছু না থাকলে কাজ চলতে পারে না। শিল্পেরও মীল নবী এবং বৈবিশ্যেণ ও এলিবিদ্যায় তাইগ্রিল 'ও ইউক্লিডিস এই নবীগুলোর উপর সে দেশের কৃষি অত্যন্ত

নির্ভরশীল। হুতরং অতি প্রাচীন কালেই এরূপ দেশেই পঞ্জিকার প্রসার ও প্রচলন আবহ হয়েছিল। গ্রীক ও রোমক সভ্যতা পাকাতা সভ্যতার গোড়ার কথা হলেও পঞ্জিকা সৃষ্টির গোড়ার কিছু গ্রীক বা রোমক মন যেমন-ভাবে অংশ গ্রহণ করেনি। কারণ তাদের তেমন তারিখের বাণাই ছিল না।

সময় লম্বাছে মোটামুটি কতকগুলো ধারণা অতি আদিম-যুগের বস্তু মাত্রবাদের ভিত্তিরও ছিল। সেই আদিমযুগে কিত্রপ ছিল তারিখের অনেক তরু আছে। এই আদিম যুগকে বলা হয়েছে State of Nature—প্রকৃতির রাজ্য।

এই আদিমযুগে লম্বাছে আমরা অনেক মনোবৈ কল্পনা গড়ে ব্যক্তি কিছু কবিদের কল্পিত স্বর্ণযুগ ঐ বস্তুমানব চোগ করত কিনা বা যোগ শোক বস্তুিত রাজ্যে ব্যাপ করত কিনা এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে। তবে একটা ব্যাপারে মনে হয় যানিষ্ঠা জোর দিয়েই বলা যায়, তাহলে এই বস্তু-মানবের উপজীবিকা লম্বাছে। এই আদি মানবদের উপজীবিকা ছিল পশু শিকার, মৎস্ত শিকার ও বনের ফল আহরণ করা কিন্তু এর কোনটাত্তেই প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ছিলনা হুতরং তাদের খাওয়ার নিত্য ঘটত না। কারেই তাদের নিষেধের ভিত্তর থেকেই কেউ কেউ প্রাপ্তবর্ধের খাতিরে পশু শিকারের মজ্জা তীর বহুক আবিষ্কার করল। এর পরে তারা শিল্প সূহ্ময় প্রতিপালন অথবা জীবন ধারণের মজ্জা পশুর সাহায্য গ্রহণ এবং আরও পরে তারা শিল্প কৃষিকার। কিন্তু এটা এস বেশ অনেক দিন পরে। পূর্বে কোনরূপ পশুশালন বা মজ্জা কোন বস্তুবৈ উপপালন পদ্ধতিই তাদের জানা ছিল না। এভাবে জীবনের পথে নতুনতর স্থিতি আবিষ্কারের আগ্রহই বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করল। কিন্তু সেই যে মানব-সমাজের প্রসারকাল তখনও সেই বস্তু মাত্রবৈ ভিত্তরেই কিছুটা সময়ের জ্ঞান ছিল। কিন্তু যখন তারা কৃষিকার্য আবিষ্কার করল তখন থেকেই লঘি-কারের বিজ্ঞানের গোড়াপত্তনও হল আর পঞ্জিকারও শুরু হল। তারপরে মাহু সভ্যতা শিখে ব্যই ব্যাপে ব্যাপে

উঠে এসেছে পতিকাও সেই তাগে তাগে নিখুঁততায়
হয়েছে। এখন অবশ্য বিজ্ঞানের অনেক কৃকলও দেখা
যাকে কিন্তু এ লোক বিজ্ঞানের নয়। এখন লোক যাবৎ
হয়ে উঠে, বিজ্ঞানের কৃকলও জনকল্যানের প্রয়োজনে
প্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক হল তখনই বিজ্ঞানের অধঃতি
হুক হয়েছে। কিন্তু সে যত প্রলম্ব। আদর্য আদ্যে
প্রলম্বই কিয়ে গাই। কৃকলও কৃকল তাগিদে কৃকল
সকল পরিচিত হতে হল এবং একে অর কৃকলও কৃকল
কৃকলও কৃকল হল। এই অধিধান নীতিমাতৃক বেশেই
বিশেষ জ্ঞান লাভ করল কার্য প্রয়োজনের তাগিদ ছিল
সে সব বেশেই বেশি। ইতিপূর্বে তারা সৌরকল্যানের
বে সমস্ত পরিবর্তনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল
সেগুলোকে দুই ভাগ করে লক্ষ্য করতে লাগল। একই
জিনিসের পুনরাবর্তন তাগের মনে এক গভীর বেখাপাত
করেছিল। যেমন তখনকার দিনে কৃকল দেখত প্রত্যহ
সূর্য্য প্রাতে বিগতের একই দিকে উদিত হয় এবং সন্ধ্যায়
বেখত প্রত্যহই একই দিকে বিগতের দিগন্তে অস্ত যায়।
এই প্রতিদিনের লক্ষিত ঘটনা থেকে তারা পূর্ণপন্ডিত
দিকের বিভিন্নতা বুঝতে পেরেছিল ও সেই অল্পদূরে নাম
করণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছিল। মিশরের
লোকেরা লক্ষ্য করতে, নীল নদীতে জোয়ার আসার পূর্বে
লুচক নক্ষত্র কি ছুলাই মাসে সূর্য্যোদয়ের কক্ষের ঘিন্টি
পূর্বে পূর্ণাঙ্গানে দৃশ্য হয়। এই লুচক নক্ষত্রটি ছিল তাগের
কাছে সৌর্য্যোদয়ের লক্ষণ কেননা এই দিনে তারা নীল নদীর
জলের আশা করে কৃকল্যার আশঙ্ক্য করতে। এমনি করে
সেই আশিন দুগের লোকেরাও আশঙ্ক্য অনেক কিছু
প্রাকৃতিক ঘটনা লক্ষ্য করতে। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে
কোন জিনিসের চারার পরিমূল্য দুগের পর্য্যাপ্ত করতে থাকে
এবং অগের মধ্যস্থ সূর্য্যোদ পরে বাড়তে থাকে এবং ঐ
চান্ন সূর্য্যোদয়ের দিগন্তের দিকে হেলতে থাকে এটাও
তাগে লক্ষ্য করতে। তাছাড়া আর একটি বিষয়ও তারা
লক্ষ্য করেছিল যে দুগেরের সেই সূর্য্যোদ চারটি প্রত্যহ
একই দিক নির্দেশ করে থাকে।

এভাবে যত্ন বিকারীরা অর কতগুলো সময় লোকের

সঙ্গে পরিচিত ছিল যেমন দিনে এবং রাত্তিতে দুধার অলম্ব
প্রোত বাড়ত এবং কমত; এ থেকে দিনের দিশাও হত!
এ ছাড়া এরা তখনকার দিনে কতগুলো নক্ষত্রমণ্ডলের
উপর অস্তের সঙ্গে পরিচিত ছিল।

Twilight (কাক-জোয়াংরা) প্রত্যেকের লক্ষ্য
ঘটনা। এটা আবার কতদিন পর পর আসে তাও বিশেষ
করতে লাগল। কালপুত্র, কখনকত্র, ক্যাণ্ডিগিরা এসে
সঙ্গেও তাগের বিশেষ পরিচয় ছিল। ঘোড়াঘুটি তাগের
মৌলিক যে জ্ঞান ছিল তাও পরিবার্জন এবং অতীত
ঘটনার এই সারসংগ্ৰহ ও পুনরাবর্তনের দিশাও নিয়ে ভবি-
ষ্যতের অর যে প্রাতি এ থেকে বিজ্ঞানের প্রসাধ আশঙ্ক্য
হল কার্য তখন তাগের মৌল দায়নের প্রয়োজনে এমন
এক গোষ্ঠির সৃষ্টি হল তাগের শুধু কাণই হল এই সব
গোষ্ঠিরের উল্লম্ব অস্ত বা গতি পর্য্যবেক্ষণ, লিখন ও তার
উপসংহার স্বতন্ত্র নতুন নতুন আবিষ্কার; এই যে গোষ্ঠি
এমের ব্যাগাই বিজ্ঞান প্রসাধিত হতে লাগল। ঘোড়াঘুটি
তাগের এই সত্যসম্পর্কনের দায়কে বুঝতে হলে বা পতিকা
কল্প জানতে হলে যে সমস্ত সৌর-মণ্ডলের ঘটনাবলী
অপরিহার্য্য তাগের নিয়মিতভাবে ভাগ করা যায়।

ঐতিহাসিক ঘটনা বা আধুনিক গতিবিধি কল্প :-

(ক) ক্রমে তারা লক্ষ্য করতে লাগল যে প্রত্যহ সূর্য্য
পূর্বে দিকে উদিত হলেও পশ্চিম দিকে অস্ত গেলেও বঙ্গের
বিভিন্ন দিনে পূর্বে বিগতের বিভিন্ন স্থানে উদিত হয় এবং
তেমনি পশ্চিম দিগন্তের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিনে অস্ত
যায়। (খ) মধ্যাহ্নের সূর্য্যোদ ছাড়া সূর্য্যোদ বিগতের কোন
একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট করে অবস্থান করে এবং
রাত্তিতে ঠিক ঐ বিন্দুতেই সমস্ত রাত্রি ক্রম নক্ষত্রকে দেখা
যায়। (গ) প্রত্যহ ক্রম পূর্ব্বদিকে উদিত হলেও বঙ্গের
বিভিন্ন দিনে বিগতের বিভিন্নস্থানে উদিত হয় এবং পশ্চিম
দিগন্তের বিভিন্ন স্থানে অস্ত যায় অর্থাৎ সূর্য্যোদই যত। এবং
ঐ ক্রমে গতিও আপাত দৃষ্টিতে ঐ পূর্বে থেকে পশ্চিমে।
এছাড়া রাত্রি ব্যাধার সঙ্গে সঙ্গে অগ্ৰাঙ্গ নক্ষত্রমণ্ডলকেও
ক্রম নক্ষত্র (Pole Star) এর চারপাশে পূর্ব থেকে পশ্চিমে

চলতে দেখা যায়। এই Pole Star বা ঐশ নক্ষত্রঃ নিকটতম নক্ষত্রকে বাজিতে এর চতুর্দিকে কৃত্যভাবে ঘুরতে দেখা যায়। তখন এর গতি উপরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে নীচে পশ্চিম থেকে পূর্বে। স্বতঃনঃ বাজিতে নক্ষত্রের গতি দেখে সময় নির্দেশ করা যায় এবং এতে ১৪ মিঃ এর বেশি ভুল হয় না।

যা হোক এভাবে দেখা গেল যে সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র এদের প্রত্যেকেরই বিপত্তের কোন এক নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটা গতি আছে। এখন এই গতির ব্যাখ্যা কৃত্যভাবে করা যায় যেমন আমাদের ঘূর্ণি অথবা সূর্য্য চন্দ্র এগুলো ঘুরছে। তবে তারা ঘন করত আমাদের ঘির এবং সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এরাই আমাদের পথে ঘুরছে। স্বতঃনঃ তাদের ব্যাখ্যা যেমন নিলে এদের কল্পনা করতে হয় এমন ভাবে বেন সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এরা সকলে একটি মত আকাশ গোলকের উপরিভাগে অবস্থিত এবং আমরা একবারে শুধু এই গুলোর আর্দ্রকটা দেখতে পাই। এখন সূর্য্য এই আকাশ গোলকের উপরে থাকে তখন নক্ষত্রমণ্ডল আমাদের দিকট অদৃশ্য থাকে, আবার সূর্য্য এখন আমাদের বিপত্তের নীচে অদৃশ্য থাকে তখন এদের আকাশে দেখতে পাই। এই গোলক একটি মেরুগুণ্ডের চতুর্দিকে একদিন একবারে পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং তার সম্পূর্ণ ঘুরে আসে। (যখন North Pole star উপরে থাকে)।

এখন আমরা আবার এভাবেও ব্যাখ্যা করা যাও যেমন নক্ষত্রগুলো ঘির, পৃথিবী সেই একই মেরুগুণ্ডের স্টপের ওর বিপরীত গতিতে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘোরে।

যাহোক ত্যস্ত্র সেই প্রাথমিক কল্পনাই জুটিয়াবলী (World map) তৈরীর প্রথম ধাপ। বাস্তবে এবং নষ্টম মাটিতে তারা এখন কৃত্য আঁকতে শিবল তখন তারা পহিমাণ শিল্পের একটি অতি প্রয়োজনীয় ধাপ পেরিয়ে গেল। মধ্যাহ্নের ক্ষুদ্রতম ছায়া সর্ব্বাধা একই দিকে অবস্থান করে এ থেকে তারা দুটি এমন সময়ল ক্ষেত্রের কল্পনা করে নিল যা থেকে সত্ত্র ঘটনাত্তলোর ব্যাখ্যা করা সম্ভব হোল। এই দুটি সময়ল ক্ষেত্রের একটি হল ক্রিতিক-

তল (Horizontal Plane) এর উত্তর দক্ষিণ বিন্দু আমাদের দিগন্তকে পূর্ব পশ্চিমে সমানভাবে ভাগ করেছে। অর্থাৎ হল একটি মত অর্ধগুণ্ড বা Meridian — এর সর্গোচ্চ বিন্দুর নাম Zenith টা। আমাদের মধ্যস্থ টিক উপরে। সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র আকাশ গোলকে অনেক উপরে আছে তবে এরা যে কৃত্য ঘোরের সেটা আমাদের meridian কে স্পর্শ করে যায়।

দ্রাণিক পঞ্জিবর্ধন বা ঘটনাঃ—

বাহ্যিক পক্ষে বলতে গেলে চান্দ্র ঘটনাত্তলোর ভিতর যে সময়গততা আছে তা থেকেই দিন, মাস, সপ্তাহ এসব শ্রেটীবদ্ধন (Grouping) আমরা পাই। এখনও এমন অনেক মাত্রার আছে যাদের হিসাবে প্রতি বৎসরে সময় পরিমাণ মাপ থাকেনা কোথাও কোথাও মাপের ব্যঙ্গের গণনা করা হয়। তবে মাসের ক্রীড়িত প্রাচীনমূলের সেট শিকারীমূলের লোকদের মনোবৃত্তিঃতপ পাওয়া যায় এটাই লক্ষ্যীয়। চন্দ্রালোক তখনকর মূণ প্রতিটি গেলের দৈনন্দিন জীবনের একটি প্রাণোবলীর ঘটনা ছিল। এখনও বহুভূবের সময় সেটে যেঃ হোল বা দ্রাণিতে কেন কাজ করতে হলে পূর্ণিমার সময়টাকেই বেছে নেওয়া হয়।

দুটি পূর্ণিমা বা দুটি অমাবস্তার ভিতরে ৩০ দিনের পার্থক্য। এই ৩০ দিনকে অংবার ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। চন্দ্রের আকার এখন ৯০ট চতে থাকে সেই "পক্ষে" যেদিন অর্ধচন্দ্র দেখা যায় সেদিন হল মাসের ৫ অং এবং চন্দ্রের আকার এখন বাড়তির দিকে তখন যেদিন অধঃচন্দ্র দেখা যায় সেদিন মাসের ৫ অং। এভাবে যে ভাগ হল সেটা প্রায় আমাদের সপ্তাহের সঙ্গে খাপ খায়।

সময়ের নিকটবর্তী দানে দেখা যায় যে অমাবস্তা ও পূর্ণিমার সময় তলের স্রোত ঘূর্ণ বেড়ে যায় এবং প্রথম ও কৃত্তীর সপ্তাহে ঘূর্ণ কমে যায়। চন্দ্রের আকারের পরি-
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা প্রাণোবলীর ঘটনাও তারা লক্ষ্য করত যেমন চন্দ্র এখন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে বা কমেতে থাকে তখন দিনের পর দিন একই ঘেটী করে পূর্ব দিকে

দৃষ্ট হয়। প্রথম সপ্তাহে সূর্য্যোত্তর সময়েই চন্দ্রকে আকাশের উপর দেখা যায় এবং মধ্যরাত্রেই অদৃশ্য হয়। পূর্ণ চাঁদ সূর্য্যোত্তর সময়েই দেখা যায় এবং মধ্যরাত্রেই আকাশের মাথার উপরে দেখা যায় এবং পুনরায় সূর্য্যোত্তর থেকে অদৃশ্য হয়। ৩য় সপ্তাহে অধিক চাঁদকে মধ্যরাত্রেই দেখা যায় না, সূর্য্যোত্তর সময়ে ইহাকে বিকালোকে প্রান্তে মাথার উপরে দেখা যায়।

সূর্য্যোত্তর মনে হয় বগীর গোলকের যে গতি তাতে চন্দ্রও অংশ গ্রহণ করে যেমন পূর্বে হিকে উঠে পশ্চিম হিকে অস্ত যায়। কিন্তু তব্বি এও ক্রমে লক্ষ্য করল যে যদি চন্দ্র কোন মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট নক্ষত্রের সঙ্গে একই সময়ে উদিত হয় তাহলে পরের দিন চন্দ্র সেই নক্ষত্রের উত্তরে কিছু পথে আকাশে দেখা দেবে। এবং একসপ্তাহ পরে এই নক্ষত্র সূর্য্যোত্তর সময়ে মেরু-বিন্দু (pole) উপরে থাকবে। এভাবে দেখা যায় যে চন্দ্র প্রত্যহ সূর্য্য এবং কোনও দিবস নক্ষত্রের গতির থেকে উঠে। দিক বিছুটা মিথিবে পড়ে। এবং এর কালে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের ব্যবধানে চন্দ্র তাঁর পূর্বে স্থানে ফিরে আসে। এবং এই কয়েকটি দিনই হল আবারের মাস। সূর্য্যোত্তর একমাসে চন্দ্র তার পূর্বে স্থানে ঘুরে আসে। এবং মনে করা যায় এর গতি পৃথিবীর আক্ষিক গতির মত। যেভাবেই হোক চন্দ্রের একটা নিম্নগত গতি আছে এটাই বোঝা যায়।

বাৎসরিক ঘটনা :—

কতর উপরে নির্ভরশীল কৃষ্ণ-সগতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বৎসর নির্ধারণের বিশেষ প্রয়োজন হয় পড়ল। যে বৎসর নিরবচ্ছিন্ন এবং সতর্কতাবল্লক পর্যবেক্ষণ এর ক্ষেত্রে চলে থাকে এবং বৎসরের সঠিক নির্ধারণ নিশ্চয়তা যে তাই নির্দিষ্ট হয় সে সমস্ত চেষ্টাকে স'নবতার ইতিহাসে ল'ক্ষিতমূলক প্রচেষ্টা বলেই আখ্যা দেওয়া যায়। পূ: পূর্বে ৪২৪১ অব্দে ইন্দিয়ান পুরোহিত ৩৬৪ দিনে এক বৎসর নির্দেশ করে গেছেন, সূর্য্যোত্তর দেখা যায় বৎসরকে সময় পরিমাপের একক হিসাবে স্বীকৃতি থেকেই দিনগতি সভ্য-তার মূল। নব্যপ্রবর যুগের লোকের এই স্বীকৃতির মূল

তারের দৈনন্দিন জীবনের ত্বরকম স্বাভাবিক ঘটনা। একটি নক্ষত্রের আচরণ এবং অপরটি সূর্য্যের ছায়ায় পরিবর্তন। নক্ষত্রমণ্ডলী প্রত্যহই পূর্বাশ্রমের চাইতে একটু আগে ওঠে। যদি কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন নির্দিষ্ট নক্ষত্র সূর্য্যোত্তর সময়েই দৃশ্য হয় তাহলে কয়েক সপ্তাহ পরে সূর্য্যোত্তর সময়ে সেই নক্ষত্রকে দিগন্তের বহু উপরে দেখা যায়। যদি কোন নক্ষত্র মার্চ মাসে সূর্য্যোত্তর সময়ে পশ্চিমদিকে থাকে এবং সূর্য্যোত্তর সময়ে পূর্বাশ্রম থেকে থাকে, তবে জুন মাসের শেষে এই নক্ষত্র আকাশের উচ্চতম স্থানে অবস্থান করবে। এবং ছ মাস পরে (যদি এটা মেরুর খুব নিকটবর্তী নক্ষত্র না হয়) এই নক্ষত্র সূর্য্যোত্তর সময়ে পশ্চিমদিকে অদৃশ্য হবে। যদি এই নক্ষত্রটি মেরুর খুব নিকটবর্তী হয় তাহলে উত্তর দিগন্তে জন্ম: নামতে থাকবে। এইরূপ কোন (Circumpolar) নক্ষত্রকে যদি মধ্যরাত্রে মেরুর ঠিক উত্তরে দেখা যায়, তবে আবার ছ মাস পরে মধ্য রাত্রে একে মেরুর ঠিক নিচে দেখা যাবে। এরকম (অর্থাৎ Circumpolar) খুব কম নক্ষত্রই আছে। সূর্য্যোত্তর নক্ষত্রগুলো বৎসরের বিভিন্ন অংশে তারিখেই শুণু দৃশ্য হয়। যেটামুটি সমস্ত পরিবর্তনগুলোই নিয়মাহুগভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানের মধ্যে ঘটে। তাই বাস্তব: সূর্য্যের অবস্থান দ্বারা নক্ষত্রের সম্পর্কে স্থির নয়। যেহেতু নক্ষত্রগণ প্রত্যহ পূর্বাশ্রমের সঙ্গে আকাশে দৃশ্য হয়, সূর্য্যোত্তর সূর্য্য বগীর গোলকের দৈনিক ঘূর্ণনের অংশ গ্রহণ করার সময়ে চন্দ্রের মত উঠে-বিচে। বিছুটা মিথিবে পড়তে থাকে যদিও এর গতি চন্দ্রের গতির মত জটিল নয়। এক বৎসরের ব্যবধানে সূর্য্য একটি বৃত্তের চতুর্ভুজিক ঘুরে পুনরায় এর পূর্বাশ্রমে ফিরে আসে। পূর্বে এই সময়ের হিসাব করা হত যার (১২) বার ৩০ দিন অর্থাৎ ৩৬০ দিনে। এবং এ থেকেই আকাশের সূর্য্যের জন্মপথকে ৩৬০ ভাগে ভাগ করার রীতি প্রচলিত হয় এবং এটা আমবা এখনও ব্যবহার করি। ইতিপূর্বের বতে ৩৬০ দিনে বৎসর নির্ধারণের মূল সূর্য্যের সঙ্গে Sirius (সূর্য্য) এর সম্পূর্ণত্ব অর্থাৎ সূর্য্যোত্তর সময়ে এই নক্ষত্র স্থানে পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করেই Sirius নীত কালের নক্ষত্র, এবং January মাসে সূর্য্যোত্তর

সময় উপস্থিত হয়। এবং মার্চের প্রথমে মধ্যরাত্রিতে অস্ত যায়। এবং June মাসে সমস্ত রাত্রি অস্ত থাকে এবং পুনরায় July মাসের কোন একদিন সূর্যোদয়ের পূর্বকণ্ঠে পূর্বদিকে দেখা যায়।

এখন আমরা জানি যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী আপন জঘন পথে বতাই অগ্রসর হয়, ততই পূর্বাংশে নূতন নূতন নক্ষত্রমণ্ডল দেখা যায় এবং পশ্চিমাংশের নক্ষত্রমণ্ডলগুলি ক্রমশঃ অস্তিত্ব হয়। এদের মধ্যে মেঘ, বুধ, শিশুন, ককট, শিহর, কক্কা, তুলা, বৃশ্চিক ধনু, মকর, কৃত্ত, মীন এই নক্ষত্র মণ্ডল পশ্চিম হতে পূর্বদিকে পর পর অবস্থিত থেকে আকাশের গায়ে ও পৃথিবীর চারিদিকে ঘেরা একটা বলয় রচনা করেছে। এই বলয়টি নক্ষত্রমণ্ডলের এক একটিকে রাশি এবং যে চক্রে উদয়াগ অবস্থিত তাহাকে রাশিচক্র (Zodiac) বলে। রাশিচক্র এক পূর্ণবৃত্ত হুতরায় ৩৬০° পরিমিত। উহার ৩০° পরিমিত এক একটি ভাগে এক একটি নক্ষত্রমণ্ডল আছে, এদের পরিবর্তনই আদিম মানব লক্ষ্য করে সিদ্ধি বদ্ধ করে গেছে এবং মেঘ বুধ শিশুন এদের নামাকরণও অনেকটা তারা করেছে। এভাবে সমস্ত দিকেই দেখা যায় যে তাবের দান কম নই। তারা সূর্য্যাত ও সূর্য্যোদয় লক্ষ্য করার জন্য বা কোন বিশেষ নক্ষত্রের উদয় অস্ত লক্ষ্য করার জন্য Pyramid ব্যবহার করত। তারা Pyramid এখন ভাবে তৈরী করত ঘন মণ্ডলিভূত ও অলুবিভূত সংক্রান্তিত্তে বেবিকে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাত হতে সেদিকে মূখ করে রাখত। কোনটা প্রথমকালের দিকে মূখ করে রাখত। কোনটা রাশিচক্রের উজ্জল নক্ষত্র-

গুলোর দিকে, কোনটা উত্তর অক্ষাংশ বা ককটক্রান্তিতে সূর্য্যোদয়ের দিকে মূখ করে রাখত। এছাড়া তারা এমন ভাবে মন্দির তৈরী করত যার দ্বারা দ্বার উপস্থিতভাগে একদম যশোবন্ত থাকত বা দ্বারা সূর্য্যোদয় অথবা সূর্য্যাতের সময়ের সূচ্য করেকটি বস্তি ওদান দিবে তেজ করে যেত। এভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং সামাজিক পৰ্য্যবেক্ষণের একটি সাধারণ মিলন কেন্দ্র ছিল এই মন্দিরগুলো।

জ্যোতিষিগণ সূর্য্যোদয়তা এই Observatory দ্বিধিবে সামাজিক প্রয়োজনও যেত। তাহের এসময় তৈরীর তেতরই একটি মস্ত বড় কাক'শিল্পের হুক। মন্দিরের শিরামিতের মত কর্ণাকের দ্বিধিবেয় হুটুক তত্বস্ট্রী, তাহতের দাক্ষিনাত্য প্রবেশের 'গোপুরের' মত বিশাল ভোবণ এসময়ও Observatory কাজের মস্ত ব্যবহৃত হত। আমরা যে একটি বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করি এবং ডিগ্রীকে মিনিট সেকেন্ডে ইত্যাদিতে ভাগ করি এও আমাদের শ্রবণ করিয়ে দেয় যে তারা বৈধ। মাপের চাইতে কোণের মাপটাই আগে শিখেছিল। কৌনিক দূরত্ব সময় পরিমাপের একটি প্রয়োজনীয় চিন্তি।

হুতরায় আদিমযুগের অলভ্য দোকানের যুগের দৌর-ভগন্তের মৈনম্বিন ও অস্ত পরিচিত কতগুলো ঘটনা থেকেই এই বর্ণপঞ্জির হুক। দৌরভগন্তের পরিবর্তন লক্ষ্য করার জন্য যে একদল লোককে নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল তাবের সেই পৰ্য্যবেক্ষণ থেকেই নিখিত ইতিহাসের হুক। হুতরায় আমরা দেখছি যে বর্তমান সভ্যযুগেও সেই আদিম ইতিহাসেই পুনরাবৃত্তি।

শ্যামাদিদি

শ্রীসমীপ চট্টোপাধ্যায়

অনিপেক্ষ আমি প্রথম মেসি ২০২২ বছর আগে খ্রীষ্টের হাটে। অত্যন্ত আকর্ষকভাবেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়টা ঘটে গেল। তুচ্ছ এক ঘটনা অবলম্বন করে তার সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল; কিন্তু তার সামান্য জীবনের সামান্য ছ'একটি ঘটনা চিরদিন অতি মধুর স্মরণীয় সঙ্গে মনে করে আসছি।

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ছাত্র। গ্রীষ্মে ছুটিতে খ্রীষ্টের এসেছি। আমার এক অল্পস্বত্ব সহ বেগেছিল হাটে যাওয়া। যেদিন রব্বি'র যে হাটে যেতাম তা নয়। বাড়ীর অবস্থা মন্দ নয়; হাট-বাড়ার ব্যবহার মস্ত সবকার চাকর সবই আছে। তবু হাটের বেচাকেনা, হরকষাকবি দেখতে কেমন একটা রাজ্য লাগত। ভিক্টর থেকে বুয়ে হাটের একপাশে একটা উঁচু ভাণ্ডার বাড়িয়ে হাটের ব্যস্ততা, গোলমাল, ঠোঁট উল্লেখ্য করতে বেশ লাগত, একটা নিমিল্পে কোঁচক ঘোষ হ'ত, যেমন করে সংসারভাগী সন্ধ্যাশীতা সংসারী জীবনের দুর্দশা দেখে মনে মনে করুণা মল্লভব করেন।

এমনি এক হাটের দিন, অভ্যাসমত হাটের একপাশে আমার সেই প্রিয় উঁচু ভাণ্ডারটা বাড়িয়ে চারিদিকে দেখছি। সবই চোপে পড়ছে, সবই দেখছি! দারিদ্র্য-হীনভাবে দেবার একটা পুষ্টির ভাব আছে; বেশ লাগছে এই আলমুটি। হঠাৎ অদূরে একটি কান্না শুনতে পেলাম—কোন স্ত্রীলোক কাঁদছে। চেয়ে দেখি এক বুড়ী কতকগুলি কলমি শাক তার সাবনে, হোপা নিঃ-বাস-করা হাতের উপর রাখা রেখে অশ্রুতে কাঁদছে, চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়ছে। হাটের অন্ত গোলমালের ভিতর শাক-বুড়ীর চুল করে কান্নাটো অস্বাভাবিক করে বিল। এতো দশ মিনিটে বিনিময়ে বিনিময়ে স্বপ্ন করে কান্না নয়—এর সত্যই কিছু ক্ষতি হয়েছে। তাকাতাড়ি কাছে গেলাম। এর মধ্যেই শাক-বুড়ীকে

বিবরে উলসান কোঁচকলীর ডিঁড়টা। অথ্যে উঠেছে, এমনকি দু'একজন নানাবকম মন্তব্য করে চলে যাবারও উপক্রম করছেন। তাঁদের পোকের ও উপবেশের কথাবার্তা শুনে, লোকজনকে বিভ্রান্তাবার করে বুঝলাম বুড়ী শাক বিক্রী করে ছ'খানা পরগা তার কাপড়ের বুটে বেঁধে য়েপেছিল যেমন করে হুট মূলে পরগাটি পড়ে গেছে। হুঁমে পাচ্ছে না। এক ভরলোক এই ইতিহাসটুকু শেখ অংশ সম্পূর্ণ করে উজ্জ্বল হয়ে বস উঠলেন, "এতেই বুড়ীর পুষ্টিলাক লেগেছে মশায়!" ভিক্টর অধিকারের মনেই এই রণিকতাটি বেশ লেগেছে মনে হ'ল, তাবাত হেলে উঠে সমর্থন জানালেন, "ঠিক বলেছেন, পুষ্টিলাক!" আমি স্পষ্টভাবে এই হাসিতে যোগ দিলাম না বটে, তবে স্তম্ভাঙ্গ লকলে চলে যাচ্ছে দেখে আমিও বাবার অন্ত শিহ্ন কিলাম। কিন্তু যাওয়া হ'ল না। পেছন ফিরে দেখি শাক-বুড়ীর শিহ্ননে একটি ১০-১১ বছরের ছেলে বাড়ির কাছে, যেন সেও কাঁদছে; তবাতের মধ্যে এক কোটা জল নেই। কেন জানিনা আমার চোখ ওখানেই ঝাঁপ পড়ে গেল, ছেলেটির কাঁদ কাঁদ মৃদুমানির প্রতি চেয়েই বইলুম। হৃদয় বাধ্য। শাভাবিক জ্যোতি: তার দেহের সজ্জা থেকে ছুটে বেরছে। ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট আর কাল বস্ত্রের একটা ফকুয়া গোড়ের মাঝা সবল দেহটিকে আঁবও স্নায়ব করে তুলেছে। মাথাবা কাঁকড়া কাঁকড়া চুল, চুলে ঘরের চিহ্ন বর্তমান, তবু টেরী কাটতে যেন সজ্জাও হয়েছে, সামান্য ভাবে একটু শিথি কয়া। ছেলেটির বা হাতে একটি গামছা। জান হাতে, শুধে দেহলায়, দশটি পচলা। বুঝতে দেয়ী হ'লনা ঐ দশটি পরলাই ছেলেটির হাটের মূলধন। আমার একটু দ্বন্দ্ব যোগ হ'ল, একটি ছোট শীর্ণনিখালও পড়ল। শাক-বুড়ী তখনও তেমনি কাঁদছে।

"বুড়ীমা!"

যেন চমকে উঠলাম। ছেলেটি শাক-বুড়ীকে ডাকছে "বুড়ীমা!"

“বুড়ীমা, তোমার এই ছ’মানা পশা। আর ছ’ পশা শাক বাও।”

শাকবুড়ী ছেলেটির বিকে ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে বইল, আমিও ব্যাপারটি বুঝতে পারলাম না। ছেলেটি তার হাতেঘর সব পশাগুলি বুড়ীর কৌড়েতে ঢেলে দিয়ে বলে, “হ্যাঁ, ছ’ পয়সার শাক বাও।” বুড়ী তখনও ধোকার মত চেয়ে আছে। ছেলেটি আর অপেক্ষা না করে কতকগুলি শাক উঠিয়ে নিয়ে, গাছছায় বেঁধে চলে গেল। আমি কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে সেইখানে বাকিয়ে বইলাম। তারপর খাতা নিয়ে শাকের লোকজন সরিয়ে দিয়ে ছুটে গেলাম ছেলেটির কাছে। সে ততক্ষণ হাতের বাহিরে এসে পড়েছে! তার হাত দুটি ধরে বন্ধাম, “আমাকে চেন ?” সে তো বানিফটা চমকে পিছেভিল, কিন্তু আমার কথা শুনে উত্তর দিলে, “না”।

“আমি তোমার কিছু চিনি। তোমার বাবার নামটা কী বলতো।”

“ঐদ্বীপ চট্টোপাধ্যায়।”

“তবে তো ঠিকই চিনেছি, কুল হয়নি।” ছেলেটি আমার বিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বইল। তারপর আশে আশে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, “খনি চিনে থাকেন তো আমাধের বাড়ীতে চলুন। আবার না আর যেমনসক মনে দেখা করবেন,—যেমনসকে চেনেন নিচরই ?”

“নিচরই। যেমনসক ভাল নামটা কী বেন—”

“মহর”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহর। তোমার বাবাতে তো খাবই। তা—তোমার বাবার কথা ছ’লনা তো।”

“এই শাক ছ’লেই হবে; আমার মা এতেই ফুটিয়ে বেবেন।”

“আহা, তোমার মাকে কি আর বুঝি না। কিছু আমার পাপ হবে যে।”

“আপনার পাপ হবে ? কেন ?”

“হ্যাঁ বুড়ীমার ছ’মানা পশা তো আমিই ফুটিয়ে গেয়েছিলাম। একটু বাতে সে সাবধান হতে গেবে তাই তাকে—মানে, একটু ইয়ে কললাম।”

“তাই তাকে এত কাপালেন ? এ কিছু আপনায় ভাবী মজার।”

“আর কখনও এমন মজার হবে না তাই। কিন্তু মিছামিছি তোমার ছ’মানা পশা লোকলান করে নিয়ে আরও মজার করতে পারব না।” এই বলে তার হাতে একটা মো-মানি ভরে দিলাম। তারপর একথা লেখা বলতে বলতে পথ চলেছি তার সঙ্গে। হঠাৎ সে বলে উঠল, “এ আপনি কিংব নিম। এ দু-মানা আপনি শুধু শুধু আমাকে বান করছেন। আপনি কখন সেই বুড়ীমার পশা ফুটিয়ে পান নি।” বুঝলাম ছেলেটি বুঝিমানে। এও বুঝলাম ধরা পড়েছি, আর বিখ্যা বাড়ান উচিত নয়। একটু অহুযোগের হুরে বন্ধাম, “দেখা কেন সেই বুড়ীকে আমিই দু-মানা পশা দিয়েছি। পুখাটা তোমার না হয়ে আমার হল। এতে তো তোমার আপনি থাকার কথা নয়।” সে কী ভাবল, বলে “মাজু, তা হলে এর থেকে চার পশা তোমার বাবার ভগ্নে কিনে নিয়ে যাই।”

তোমাক কিনে বাকী বাপাটুই নামা গল্প-গুস্তব করতে করতে চললাম। কথার ঠাঁকে ঠাঁকে তার নাম, দেশ, কে কে আছে, আদিক সংস্থা—সব ভেবে নিলুম। উত্তরের অজ্ঞাতপারে একটা ঘনিষ্ঠতা পড়ে উঠল। তার সঙ্গে আমার দিক থেকে ভেগে উঠল পরিচ ছেলেটির প্রতি আশ্চর্যিক সহানুভূতি। একটা, মাঝার টানও বন বোধ করলাম। তারপর ছেলেটির চাশা ঘরের বাগানদার এসে বিদায় নিলাম, বলে সেলাম পরে এসে বাড়ীর আর লকলের লগে, আলাপ করে দাব। সে বাসা ঐ টুইই বইল।

এর পর অনেকদিন অনিশের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। সাংসারিক কারণে আমাকে তিন বছর পরেই টাক্য চলে যেতে হয়েছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে পত ইচ্ছা থাকলেও অনিশের বাড়ী যাওয়া ঘটে উঠল না অতঃ প্রতিনিবের শত-সহস্র কাতে, নতন নতন পরিচয়ে, নানারকম আঘো-প্রোমোশে শাকবুড়ি আর অনিশের কথাটা মনের ভিতর

অশ্লীল হয়ে এসেছিল। তবু একেবারে হুঁহু বাতনি। তার পরেই কাতর মুখখানি আবছা আবছা মনে পড়ত; তার “বুড়ীমা” ভাষাটা মাঝে মাঝে কাণে বেজে উঠত।

পূজার ছুটিতে আর একবার ত্রিপুর আসতে হয়েছিল। ত্রিপুরার জমিদারের বাসনা দিতে। সন্ধ্যাবেলা ত্রিপুর ট্রেনে নামলাম। ট্রেন থেকে আমাদের বাড়ী ঘাবার পথেই পড়ে অনিলদের চালাঘরটা। ডাবগায় অনিলদের সঙ্গে দেখাটা পেয়েই বাড়ী ঘাব। আমাদের বাড়ীতে এখন চাকর ও গারোয়ান ছাড়া তো কেউ নেই, বেরী করে পছন্দিলে কোন কতি নেই। ত্রিপুরটা কি নির্জন! সন্ধ্যার হৈ হৈ আর চোখে খোঁজা দেওয়া বিহীন! বাড়ির আলো থেকে এসে যেন এ ভাগ্যটা আরও নিতীবা লাগছে। বিশেষ করে অনিলদের পাড়াটা একেবারে যেন মরে গেছে। একই তো হুঁকটি পরিবারের বাস; তার উপর ছাত্রদের যে ভাবনাটা! অল্প সময়ের পাড়ার প্রাণ সত্যি কত, পূজার ছুটিতে এক সেটা, হুঁককারে তাদের বাড়ীটাও যেন হারিয়ে গেছে। অনিলের বাড়ীর সামনাসামনি রাস্তার উপর পাড়াতেই মনটা ছাঁক করে উঠল। একটা অকাণ্ডে আসল। মনটাকে চেপে ধরে লাগল। বাড়ীটির অশ্লীল আকৃতিটা দেখে কেনন যেন অনেক বলে থোপ হল। মনে হ’ল কতবার পরে এ বাড়ীটাতে আসছি; শাক-বুড়ীর কাহিনীটা কত বছর আগে ঘটেছিল! ইতিমধ্যে কোন নিরাকরণ পরিবর্তন এই চালাঘরটির ভিতর ঘটে গেছে, আর সেই পরিবর্তন ঘটতে কত দীর্ঘ সময়ই না লেগেছে।

সন্ধ্যার ভর করে বাড়ীটার দিকে কয়েক পা অগ্রসর হলো। একটা পথের মাঝে সন্ধ্যা বাড়ীটাকে ঘিরে রেখেছে। দিব্যে, নৈরাজ্যে বাড়ীটা অন্ধকার, শুষ্ক। সন্ধ্যার আলো কই? ধরজাটা বহু, না? অনিলের বা কারও গলায় শব্দ শোনা যাচ্ছে না তো! এরা কি লব এখন থেকে উঠে গেছে নাকি? হুঁহুতো অনিলরা উঠেই গেছে। হুঁহুতো কেন, নিশ্চয়ই উঠে গেছে। আবার মন আপনা থেকে লিখা শুরু করে নিল উঠে গেছে তবু। এই নিরানন্দ পরিভাষা বাড়ীটার কোন ঘরে

অনিল যেন আছে কল্পনা করা যায় না। অনিল যেখানে থাকবে, সেখানে একটু হালি, একটু আলো থাকবেই। তাই এখন নেই, তখন অনিলও নেই।

অনিলও নেই! কথটা নিজের মনে উচ্চারণ করতেই হুঁকটা ধড়াক করে উঠল। ঘোর ঘিরে যেন উঠলো ‘না, না, না। তা নয়, তা হতেই পারে না। এই ছোট গুহা গ্রীষ্মে এসেছিলো, সে আর ক’মাস। ওলং নয়। তাহা কোথায় গেছে—একই খোঁজ নিলেই তো চুকে যায়। মিছামিছি আগে থাকতে কতকগুলি কল্পনা করে হুঁহু পাওয়া যাক। হুঁহুর জোরে নিজেকে জোবাল করে, জুতা মলমল করে একেবারে সোজা দিয়ে উঠলো অনিলদের বাসনাঘর। বাসনাঘর ভিতরটা আরও অন্ধকার। অনেক ভাবনাগে ভেবে চুরে গেছে, ইটগুলো অন্ধকারে গীত বাধ করে আছে। ও পাশে পাঠালের একটা অংশ ভেঙে পড়ে গেছে। লম্বা চালাটা দায়নের দিকে ক্রমশঃ হুঁক পড়ছে। গোটা কতক বাণের খোঁজ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। চালের বগ ভাঙাঘর বড় নেই, আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাসনাঘর এক অংশে একটা হুঁহুর খাট পড়েছিল—নৈরাজ্যে পাটকল পশ্চিমা কুলিরা যে খাট ব্যবহার করে সেই খাট। সাধারণত খাটটার উপর বসে পড়লাম। হুঁহুর জোরে তখন ঘুরিয়ে গেছে, নৈরাজ্যের ভাটা দেখা দিয়েছে মনে। হাতের উপর মাথাটা রেখে চোখ বুজে ভেবে নিচ্ছি কী করা উচিত। অনিলদের কিছু এখটা হয়েছে। এ বাড়ীটা পোড়ো বাড়ী। কুত প্রভেদ ছাড়া মাঝে এ বাড়ীতে বাস করতে পারে না। অতএব খোঁজ করা অথবা সব ছেড়ে দেওয়া। খোঁজ করতে গেলে কে আবার কী সব বাধে খবর দিয়ে বলবে। কী হুঁহুর খোঁজ করে। এত ঘনিষ্ঠতা কিসের? আলো তো এক হুঁহু ঘটনা নিয়ে—সে এই প্রকাণ্ড ঘনিষ্ঠতা কতটুকু ঘটনা? এক শাকগোলায় পরমা হাতান, এই তো? জামনার মাঝে হুঁহু উঠল সেই হাট, সেই বুড়ীর কাণ, অনিলের কাঁধ কাঁধ হুঁহু, আর তাদের ঘিরে ভুলোকাঁধের হালি ভাসাম।

একটি বৃদ্ধ আলো চোখ স্পর্শ করার আমার চমক ভাঙ্গল। চেয়ে দেখি সামনে বারান্দার ওপারে তুলসী-তলায় একটি প্রাণী জগছে। একটি শ্রীলোক গায়ে আঁচল দড়ি দিয়ে কুঁচিয়ে হুঁড়ে প্রাণী কবছে। বাট থেকে লাফিয়ে উঠল। তুল দেখছি না তো! বাহু ডো। শ্রীলোকটি প্রাণী দেখ করে প্রাণীটি হাতে নিয়ে বীরে বীরে উঠে পাড়ল। বয়স ২০-২২ বছর। তত্ত্ববৎসের বিদ্যার মত স্থির, দীর্ঘ। ওর পায়ের হুঁটা বড় কাল, আর সর্দায়ে বাহিরের ছাপ। তত্ত্ববৎসের হ'লেও তাঁর ছায়াবাসন যে যৎপোড়িতভাবে চলছেন। এটা নিশ্চয়। কিন্তু একে কি কোথাও বেখেছি? কোন বাড়ীতে? কোন পন্থায় পবিচারিকার কাজ করতে? হঠাৎ মনে পড়ল, বেখেছি। এই বাড়ীতেই বেখেছি। এ অনিলদের বি—অনিল সেদিন একে স্ত্রাবাধি বলে ডেকেছিল। নিশ্চয় অনিলের স্ত্রাবাধি বি।

“বাহু কি দালাবাহুকে খুঁজছেন?”

“আমি অনিলদের খুঁজছি। তারা কি এখানে আছে?”

“বহন আমি ডেকে বিজি”—বলে প্রাণীটিকে আঁচল দিয়ে বাতাস থেকে আড়াল করে বাড়ীর ভিতর ঢলে গেল।

তখন আমার মানসিক অবস্থা কী তা ঠিক আমার মনে নেই। কেবল মনে পড়ে, অনিল আছে এ সংবাদটিতে আমি যেন কোন গুপ্তচর থেকে বেরে সেলাম। কিন্তু অনিলদের এই গোড়ো বাড়ীটা অত্যন্ত পীড়া বিতে লাগল, বেবান্না মনে হ'তে লাগল। হঠাৎ এতটা দারিদ্র্য কী করে হ'ল বুঝতে পারলাম না।

খুঁচ করে দরজটা খুলে গেল, অনিল এসে পাড়ল। দরজার গোড়ায়। ক্রান্ত অবস্থা। মুখে বৃদ্ধ হাসি। এ তার স্বাভাবিক হাসি তো নয়; হাসবার মত পজিটুইও যেন তার নেই। শিচ্ছে প্রাণীর আলো-ছায়া অনিলকে অচেনা ভগবতের প্রাণীর মত বেখাজিল।

“আহন মলমল, গবে আহন।”

“অনিল!”

“বড় বেগা হ'য়ে গেছি। ১৩দিন একেছবি জর। বহন না বিছানাটাতে।”

অশবের বিছানাতে থোঙা বসটা আমি কোনকালে পছন্দ করতাম না। এর বৈজ্ঞানিক কারণ কী তা অনিল জানি না। তবে বড়লোকের ছেলের ঐক্য একটা গোড়ামি বা থাকলে নিজেকে বড় বলে মনে রাখা যায় না। এ ব্যাধি ব্যতিক্রম ঘটল। লম্বা হুঁটা অনিলের বিছানার মলে পড়ল। মুখ তুলে ত্রিভাঙ্গা করলাম, “মা কোথায়?”

“মা-বাবা গেছেন বেগে, বাড়ীটা বিক্রী করতে।”

“গেছেন ভিটে বিক্রী করবেন—তোমার মা?”

“বড় টাকার দরকার। তাছাড়া বাড়ীটা নাকি ভেঙে যাচ্ছে; পরে আর লম হবে না।”

“বড়বাবু কোথায়? তিনিও গেছেন নাকি?”

কয়েক দূরত্ব চুপ করে থেকে মুখটা নীচু করে বীরে বীরে অনিল উত্তর দিল “মেজরা মাথা গেছে না।”

মেজরা মাথা গেছেন! আমার ক'রে লম্বা পরিচর হয়ে গেল! এই অন্ধকারময় গোড়ো বাড়ী, এই অশ্রুতে আবহাওয়া, অনিলের ক্রিষ্ট চেহারা, তার মায় প্রাণবিক্রির শ্রীর তত্ত্ববৎস বিক্রী—সবই ঐ একটি ব্যাধি ঘটনা, শব্দ-বাহুর মূঢ়া থেকে বোকা গেল। ত্রিভাঙ্গা করলাম, “মা কতদিন গেছেন? তুমি জানি কেন?”

“মা আর ২০ দিন হল গেছেন। পূর্বদান সংবাদ ছাড়া আর কোন চিঠি আসেনি। কী জানি মা কেন গেছেন। আমার বাগা? কেন করে হবে? মেজরা মায়া বাগদার পর আমার ঐ ঠাটটিই তো ভরসা। গ্রামছার টানা দিয়েছি। এমন কোথাও গেলে হুতোমসা নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া বেত্তেও জো আবার দরত।”

অনিলের মুখে তার বৈজ্ঞানিক কথা আমার অসঙ্গ লাগল। অল্প কথা আরম্ভ করে বিলম্ব, “তোমার অঙ্গ, যাকে জানাওনি?”

“জানিয়ে ডাকে কীরান ছাড়। আর কী লাভ হ'ত। না এখনও সাবলাতে পাবেন নি; মনে একটু আশ্বাস পেলেই অজান মত হয়ে যান।”

"কিন্তু তোমার তে: অ'তীর বন্ধু মাছেন।

তো জানাতে পারতে।"

এইখানে একটি মগাব কথা মনে পড়ে। আমার একটু বয়স হইলি মনিঃস্বৰ উপর—কেন, সে তো আমাকে জানাতে পারত। আর কেউ না থাক, আমি তার বাবু ক'রে দিতাম। এ অভিমান যে কত অর্থোক্তিক ত: এমন ২২ বছর পরে বুঝতে পারি। তখন লতাই ব্যবহিত হয়েছিল। আমি যেনে উত্তর দিল, "জানামি রয়েছে। আমার কোন কইই হয়নি। তবে জানাবির কতি হচ্ছে। অর ব'তীর কাত ছেড়ে দিতে হয়েছে, এ'তীর টাকার পাচ্ছে না। মা মার ছাড়াইটি টাকা তার হাতে গিয়ে গেছেন। তাতে আমার তক্ত দল এলোছে, ম'স'তের খসত হয়েছে এই সুড়ি দিন। কী করে যে কী হচ্ছে কী জানি। মা যোগ হয় টাকাকটি ময় পড়ে বিয়ে পেয়েছেন"—এই বলে আমি আবার হেসে উঠল।

"সানাবাবু, বাবুর ভক্ত চা নিয়ে ব্যক্তি। চা দেখেই বেন চা পেতে চাইবেন না।"

আমি চা খাব না বলে প্রতিবাদ জানাতে ব্যক্তি, এমন সময় সে চা নিয়ে এস, প্রতিবাদ করা হ'ল না। আমি একটু স্বাভাবিকের সুরে বল, "একটুখানি আমাকেও দাওনা জামাদি।" "কী লোভী ছেলে বাবা" বলে মা'ল মূখে চেপে হাপতে হাপতে জি চলে গেল এবং পরকণেই একটি ছোট্ট ছেলে-ভূগানো কাপে করে সামান্য একটু চা এনে অনিলকে দিল। অনিল ঐটুই চা দেখেই বেগে বলে উঠল, "বেশলেন মগ'রনা, আমাকে ছেলেবাহুব পেয়েছে।" জামা ময় থেকে ঘেঁড়িয়ে গেল। বাবায় সময় লে গেল, "যে ছেলে শরের পাওগা দেখে খেতে চায় তা'কে কী বলে?" অনিল বেগে চূপ করে বইল। আমিও নিঃশব্দে চা শেষ করে অনিলের কাছ থেকে উঠে পড়লাম।

পরদিন বেলা দশটা আমায় অনিলের বাড়ীর দিকে ব'ল হ'লাম। প'রের ক্ষুত্রে ভোড়া গুলে ঘেঁষে খালি পারে চলায়—ভুতোগলো ব'ল মস'ল শব্দ করে, অনিলের বাড়ীতে নবটা ব'ল বিজ্ঞাপনের মত বোঝায়। এলে

পরজার কাছে হাঁড়িয়েছি। কানে এসে অনিলের বাবু প্রতিবাদ। অনিল কী একটা করতে চাচ্ছে; জামা কিছুতেই করতে দিচ্ছে না। চূপটি করে হাঁড়িয়ে শুনেতে লাগলাম। অনিল বলছে, "ম'ল একবার না বেলেন কী করে হ'ব জামাদি।" জামাদি বলে, "না হ'ব না হ'বে। আমি মোটে প'বা করছেন আপনি, আমি কি খুশীকো কর, চলে, মা এসে তা'ল আপ'র মূখে ক'টা মারবে।"

"কত আর খাব করবে দিবি?"

"জাবার ওসব কথা। বাবু না হ'লে কান মলে দিহুয়। কালীতো পাঁচখানা গামছা; কাল আমিই ওগুলো হাটে বিক্রী করে দিয়ে আসব বন।"

আমি আর প'লেকা না করে "খ'ত বলেছ ন'কি অনিল" বলে মোকা তার বাবায় কাছে গিয়ে হাঁড়ির হলো। তার পাতে তহিতহকারির অবস্থা দেখে চোখ দুটা আমায় জ্বালা করে উঠল। বহু ধরে পরিবেশন করা হয়েছে বটে, কিন্তু যা খেতে যেওনা হয়েছে তাতে জেলের লাবায় স্বাধীনতাও অনুপন আরম্ভ করতে। এ যে পাতে এক পাশে প'থের চিহ্নব'ল চারটি চূপো মাছেই বোল দেওয়া হয়েছে, ওটা আরও গ'ড়ারায়ক।

"প'রে মলগা, বহন, বহন। ও জামাদি একটা আসন—"

"বাক, বাক। এই যে বসছি।" একটা ব'ল'র তক্তা পড়েছিল, তার উপর ব'লে পড়লাম। বেশ সহজ ভাবে বল্যম, "ম'ল ছুটোর পাড়ীতে খেতে হ'ব। তাই সময় থাকতে খোটা করে গেলাম। তা—জামাদির ল'কে তোমার কী নিয়ে সগড়া হ'ল্ল বল দেখি; কী বিক্রী করতে হবে?"

"আপনি তেনে খেলেছেন বুঝি? আমা দেখুন তো কী মজার। কতগুলো গামছা বিক্রী করতে হবে; তা আমি তো আন পারতাম। তা নয় জামাদি, মেয়েছেলে হয়ে কিনা নিয়ে যাবে হাটে সেগুলো বিক্রী করতে।"

আমি খেন বিম্বিত হয়ে বল্যম, "গামছা! গামছা তোমার আছে ন'কি? আ: বাটা গেল; খোয়াখুঁ

থেকে রেহাই পাওয়া গেল। আবার তো এখনই ছ'সাত থানা গাঘড়া দরকার। আমাদের বাড়ীতে ও ছ'সাত থানাতে কিছু হবে না। উপস্থিত যা আছে দিয়ে দিও। পরে বাড়ীগুলো যেন দিও অর্ডার দেওয়া যাইল।"

"আপনি কিন্তু বেশ। সেদিন হাটে শু শু বুড়ীমার দু-মানা পরলা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। আর আমার আপনায় হঠাৎ গাঘড়া দরকার হল।"

আমার খস পড়া ভাবটাকে কাটিয়ে যেবার মস্ত বেশ একটু আহর-মড়ান ধকের মতো বলে উঠলাম, আঃ, মাথো তোমার ভাব্যি তোমার কান মলে দিতে চায়।"

পানের ঘরে চাপা হাসির লম্ব শোনা গেল। হাসি সামলে স্বাভাবিক বলে, "দাবাবাবু, দেখবেন, আমার উপর রাগ করে সব ভাতগুলো যেন খেয়ে ফেলবেন না।"

"অ্যা, সে কি! সবই যে খেয়ে ফেলেছি।"

"কেন খেলেন? অস্থির পর বুঝি বেশী খেতে আছে?"

"আর, কী আমার ডাক্তার। সকলবেলা বস ইচ্ছে কুপা করিয়ে—আচ্ছা! স্বাভাবিক, আর কী পছন্দ ছিল বলতো। এমন করে শিঙার, পাখার সব সান্ত্বিত, পাখরের খালায় করে দিলে যে খেতে, বেশ ভাল করে আঁদন পেতে স্বাক্ষরক করে—আর কী ছিল?"

দেওয়ালে অনিলের নাম লেখা একটি ছবি টাঙানো ছিল, ডাইকোটোর ছবি। আমি স্কোফুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওটা বুঝি তোমার আঁকা?" অনিল ছবিটার দিকে এক মুহূর্ত চেয়েই টেঁচিয়ে উঠল "ওহো, আর ডাইকোটো। তাই বলি আর পথের বিন এত—কুপা কখন করে তুমি করালে। এক কাপের বেশী দু'কাপ চা দিতে চাওনা তুমি, আচ্ছা আমাকে বলনি কেন যে আর আমার ডাইকোটো।"

"ছিঃ দাবাবাবু, আসসা ছোটলোক, আপনায় বাবুন। আপনাদের ডাইকোটো যে এ কি আমরা বলতে পারি? গাপ হবে যে। আপনি উঠুন।"

স্বাভাবিক আর অনিল, এদের দুজনে দরবারই ক্রোধের দুর্ভাবস্বামী খ্যাখ্য করতে গেছে, ততবারই যেন দাবাবাবু

বাইরে গিয়ে পড়েছে এরা। বহু ক্রমা আর অনিলের সঙ্গে অনিলের কাটাতে আঁকা ডাইকোটোর ছবিটির স্বকর্ম ছিল আছে। চুপে থাক ক্রোধের। টেঁচ-গাটটার দিকে চেয়ে সেই আঁকা দেখে কটা চলে। "ওলি অনিল; স্বাভাবিক চরম" বলে বেঁচে পড়লাম।

হাংগর, সুদীর্ঘ সময় কেটে গেছে। সংসারের ঘূর্ণিতে আমি কোন মূহুর দিকীতে ভিত্তি পড়লাম। অনিল বহিঃ, ঐশ্বরের ভিতর কোথায় কী এটা কাজে নিজেই দেখে ফেলল। তার সঙ্গে দেখা সাক্ষ্য হয়নি বলেই চলে—কলকাতার শহরে রাজ্যের উপর দৈবায় কখনও কখনও দেখা হয়েছে। চিঠিগত্রে দৃষ্ট। সন্তান যোগাযোগ বেগেছে। তাও আমার ডাবাবাবুকে, অনিলের চিঠিগত্রে প্রায় আসেই না। তাকে চিনি। তার সত্যে হবেই আমাকে চিঠি দিতে বা আমার সঙ্গে দেখা করতে। এখন আমার টাকডাক খুঁ, ব্যাকের তহবিল বেশ ঘোটা। ঐশ্বরের তালুকটো-তিন চার হাত খুঁ, সব শেষে আমার পতনের হাত পেড়িয়ে আমার হাতে এসে পড়েছে। স্বাভাবিক আমাকে তার বাহাদুর উপাধি দিয়ে আমাকে আরও জাতিভি করে দিয়েছেন। সব দিক দিয়ে আমি একটা মস্ত লোক। ছিলুম মিত্র অর্থাৎ আমার স্ত্রী বি, এ, পান; বাবল—অনেক কুলে গেছেন; আধুনিক স্কীতে আর নৃত্যে তাঁর ব্যক্তিও খুঁ! প্রায়ই দিবারদের বাড়ী থেকে, স্বাভাবিক তাঁর নিয়ন্ত্রণ আছে। আমরা দুজনেই অবিদ্যায় সভাপতিত্ব উচ্চপদ অলঙ্কৃত করতে বাই। সন্তান আমাদের সঙ্গে মেলামেলা করা কি অনিলের চলে, স্বাভাবিক এখন তার নাগালের বাইরে।

কিন্তু স্বাভাবিক সন্তাননা নেই তাও তো ঘটে। আমার কাছে অনিলের নিজে থেকে আসাটা অসম্ভব বলেই জানতাম। তাও একদিন সম্ভব হল।

আমি বিনকতক ঐশ্বরের বাড়ীতে এসে বস করছি। মজুন তালুকটার সঙ্গে জমিদার বাবু পরিচয় থাকা তো দরকার। নিজেই ঐশ্বরের নানা অংশে খুঁ বেড়াচ্ছি,

প্রকাশের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে নিছি। রাত বাইট।
বিছানায় পড়ে আছি, মাঝে মাঝে একটা ডিটেন্টড
উপস্থানের শব্দ। এলোজি। মিলে মিলে গেছেন মি:
গুপ্তর সঙ্গে লাবনা বোসের নাচ দেখতে। তাঁরও আলবার
সময় হয়ে গেছে, যে কোন মুহুর্তে তাঁর বোটেরে হাঁ
বেকে উঠবে। চাকরেকা সব দুমুখে, সব চুপ চাপ।
এমন সময় হঠাৎ বাতের নীরবতা ভঙ্গ করে টিং টিং করে
লাইকেনের বেল বেজে উঠল; তার সঙ্গে সঙ্গে একটি
বহরনের চেনা গলা শুনতে পেলাম। বিছানা থেকে
ঝেঁদে জানাশা নিয়ে বাইরে নীচে চেয়ে দেখলাম অনিল
কাঁড়িয়ে, বাবোয়ানকে নিয়ে আমার কাছে বসে পাঠাবার
চেষ্টা করছে। হিন্দুর এ আনন্দে মনটা আমার মাঝি
উঠল। বললাম, “উপরে সোফা উঠে এস অনিল।”

“আপনার ঘর ভেঙে পেল, কিন্তু উপায় নেই।”

“আমি একা আছি, চলে এস।”

অনিল এসে বসল। তার চেহারাটা আশ্চর্য একটু বেশ
অপেক্ষা, একটু অস্বাভাবিক। একটা কিছু সাম্প্রতিক
ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হতে গেলে মাহুদ যে বকম উদ্বিগ্ন
হয়ে পড়ে, উদ্ভারের মত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, চট্‌কট করে,
অনিলের অবস্থা সেই রকম। জিজ্ঞাসা করলাম—“কী
ব্যাপার? এত রাতে কোথা থেকে?”

“কলকাতা থেকে আসছি। রাত বাইট। ট্রেনটার
নেমেছি। সবচেয়ে আশ্চর্য, বাবা হয়ে কলকাতার বেতে
হয়েছিল। দেবী হয়ে গেছে। আর দেবী করা উচিত
নয়।”

“কী দেবী করা উচিত নয়? আমিই বা কী করে
মিতে পাবি।”

“আপনিই তো পাতেন, আমি যে পাবিনা। আপনি
অমিত্য, অর্থবান, ন্যায় আছে। আপনাকে কেউ কিছু
বলবেনা। বরং বলবে আপনি সংস্কৃত, বাতা। প্রত্যেক
রান করলেন। আমি মিলে সুখ্যাতি হটেবে।”

অনিলের কথাগুলো অত্যন্ত অসংলগ্ন, অর্থহীন শ্রবণ।
তার অস্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিত চেহারাটার মত কথাগুলো
ধরনটাও অস্বাভাবিক। বহু, “অনিল, তোমার কথা আগ-

গোড়া না শুনলে তো। কিছু বোকা হয়েছে। তোমার
কথা থেকে মনে হচ্ছে তুমি কোন প্রত্যেক কিছু রান
করবার মত বর্ন। আমি রান করলে আমার ব্যক্তি
বাক্যে, তুমি রান করলে তোমার নিজে মটবে। লম্বা
বৈচালীর মত নয় কি?”

“কিন্তু ভাবাদি তো তাই রয়ে।”

“ভাবাদি? কোন ভাবাদি?”

“ভাবাদি ১৩১৭ বছর আগে আমাদের বাড়ীতে কাম
করত। আপনিও তাকে দেখেছেন, তবে আপনায় মনে
থাকবার কথা নয়।”

“নিশ্চয় মনে আছে, স্পষ্ট মনে আছে। যে তোমাকে
ভাইফোঁটা দিয়েছিল, সে তো?”

“হ্যাঁ সেই, তবে ফোঁটাটা হয়তো ভাবাদি মনে মনেই
দিয়ে থাকবে।”

অনিলের কথাটি আমার মনেও ভিতর এক অস্বাভাবিক-
পূর্ণ আলোড়নের সৃষ্টি করল। বা এতদিন মনের তলায়
তুলিয়ে গিয়েছিল, শ্রেণি অস্বাভাবিক মাধুর্যে চোখের সামনে
ফুটে উঠতে লাগল। তুলে পেলাম আমি অমিত্য, বায়
বাহ্যিক, তুলে পেলাম আমি মিলে মিলে মিলে মিলে। আমার
সমস্ত বর্তমান ১৩১৭ বছর অতীতে ডুবে গেল। দেখলাম
অস্বাভাবিক মনটা বাবা পোড়ো বাড়ীর বাবামার কাঁড়িয়ে
আছি। সামনে তুলনী মূলে প্রাণী জানিয়ে অনিলের
ভাবাদি প্রণয় করছেন। বোধ করি ভাইটির মন কামনা
এলছে ঐ শ্রেণি প্রাণী শিখাটিতে। মূর্ত মিলাল। দেখলাম
মধ্যম শ্রেণি অনিলের কপালে হাত দিয়ে উত্থাপ বেখে
শাপে বসে বিধি কমলা সেবু ছাড়িয়ে গিয়েছেন। সে
ছবিও অস্বাভাবিক। ফুটে উঠল—অনিলের আনন্ডি হাতে
আঁকা ভাইফোঁটার ছবিটি বেগমালে মূলছে; তারই
তলায় বসে ভাবাদি অনিলের কপালে মল ফোঁটা এঁকে
দিয়ে। আচ্ছা অনিল যদি ভাই ফোঁটার ছবি না এঁকে
নিও কোলে কোন মাঝের ছবি আঁকতো তাহলে কি
তুল হ’ত?

নিজের দীর্ঘনিঃশ্বাসে চমকে উঠলাম। অনিল শূন্য
দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। আছে আছে

মিজাপা করলাম, “তুমি কি তোমার বাড়ীতে এখন আব্ব বাস করে না?”

“না। দিন কতক আগে মাত্র হঠাৎ নেখা পেলাম; এই ১৭ বছর ধরে কোন সংবাদই তার পাইনি। কত যে খুঁজেছি তার ঠিক নেই। ডোরবেলা বেড়াতে যাবার নাম করে তাকে খুঁজেছি। বিকেলবেলা স্থল থেকে কিংবা খেলতে যাবার ছলে কাছাকাছি গ্রামগুলোতে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি। স্ত্রীমাদি সেদিন থেকে যে কোথায় নিজে কলিকাতায় থাকবে তা আরও জানি না।”

“সেদিন থেকে? মানে, কবে থেকে?”

“সেদিন থেকে মা তাকে মগধ দিলেন।”

“তোমার মা জবাব দিলেন তোমার স্ত্রীমাদিকে? কেন?”

“দর্শনিক সে সব! একদিন সন্ধ্যাবেলা নিদি কাম সেয়ে তার বাড়ী কিংবা। একটা মাতাল তাকে এসে পথে আটকাল, অস্বাভাবিক গালাগালি দিতে লাগিল আর যায়ে যায়ে বলতে লাগল ‘টাকা খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্ যে?’ আমাকে মা টেনে বসিয়ে দিলেন। মার কিংবা ‘ভয়ে বসেই বইলাম; মাতালটা দিহিক চলে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। পরদিন সকালে মা ঘুম ভেঙে উঠেই স্ত্রীমাদিকে বলে দিলেন, ‘তোমার এখানে এসে কাম নেই। কালকে সব বেখেছি, সব শুনেছি। তল-লোকদের বাড়ীতে থেকে তোমার ওলদ যাবসা চলবে না।’ স্ত্রীমাদির সে বিস্মিত, ব্যথিত মুখ জীবনে জোল-বার নয়। কিন্তু মার বরা হল না, হাত তুলে ধরত দেখিয়ে দিলেন। তখন দিহির হাতমর বাসন মাজা ছাই। অচেনাটা তুলে মুখ ঢেকে স্ত্রীমাদি কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল। বাস! তারপর এই ১৭ বছর!”

মাহুকের মন কী বিয়ে গড়া যে এত দুর্ভাগ্য? এত অজ্ঞে ভাল মন্দ বুঝে যায়! বিচার বুদ্ধি তদিয়ে যায়। মাতালের এই ব্যাপারটি আমার কাছে এত কুৎসিত বলে মনে হল যে আমার সকল প্রত্যেকে জান করে দিয়ে এক স্থগার তার জেপে উঠল। স্ত্রীমাদির নৃতি আমার

থানে যে সিদ্ধ দীপ্তির নৃতি গ্রহণ করেছিল তা স্মৃতিশ্রুতের অধকারে ঢাকা পড়ে গেল। তবু মনের ভাব থালাখা গোপন করে বললাম, “মা তোমার ঠিকই তো কতখিলেন, অনিল!” সঙ্গে সঙ্গে অনিল চেঁচিয়ে উঠল, “চাইনে আপনাদের ভাল-মন্দ বিচার। কুলে যাবেন না, তল-বানের বিচার আর মাহুকের বিচার এক নয়। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু অপ্রস্তুতভাবে বলে, ‘কমা করবেন মলমল ধন মনে পড়ে আমায়ই অজ্ঞের সময় হল কিনতে আমাকেই বাধ্যতে দিদি ঐ মাতালটার কাছে টাকা দাবি নিয়েছিল, আর মাতালটা তারই স্ত্রীমাদি নিয়ে কুৎসা বট্টে দিহিক আত্মদর্শন করতে বাধ্য করল তখন আমার সময় পড়ি দিয়েও নিজে সাক্ষাতে পারিনি।”

চেয়ে দেখলাম অনিলের মুখে তীব্র বেদনা ফুটে উঠেছে। তার প্রতি অল্প কামার ফেটে পড়ছে। চোখ রক্তবর্ণ; এক কৌটা জল নেই চোখে। অনিলকে জানি। সে এখন কীভাবে তখন সে বেহ-মন-প্রাণ সব নিয়েই কাঁবে। আমার মনে আবার উঠা স্রোত বইতে লাগল। মনে হল আমায়ই কুল, অনিলের নয়। মনের মধ্যে হাছ-মুচ্চ চন্দ্রের মত ১৭ বছর আগেকার স্ত্রীমাদির তুলসী ফুলে প্রণবের শুধ, পাখ রপটি ফুটে উঠল। মনে মনে কমা চাইলাম। তারপর অতি সন্তোষের সঙ্গে মিজাপা করলাম। “তুমি কী করে জানলে এসব,”

“তার স্বামীর কাছেই শুনেছি।”

“স্বামী!”

“হ্যাঁ, স্ত্রীমাদির স্বামী। আমায়ের বাড়ীর দার ধন ৩৬ হল, সমাজ ধন মিথ্যা কুৎসার সজাণ হয়ে ফলা তুলে ঠাঙাল, তখন স্ত্রীমাদি ‘সেই’ মাতালের কাছেই চলে গেল। তারপর এই ১৭ বছর ধরে চলছে স্বামী সেবা। সেবা তো নয়, সাধনা। মাতাল মদ ছাউল, ছর-ছাড়া মাহু গৃহী হ’ল। কিন্তু থাকবে সে কথা। বড় সেরী হয়ে যাচ্ছে! দোহাই মলমল, এই কটা টাকা তাকে পছন্দিয়ে বিটেই হবে আপত্তি করবেন না। পারেন তো আমায়কেই।” এই বলে তার পকেট

থেকে কয়েকখানা মণ্ডাফার নোট বার করে আমার হাতে বিলে। আমি বিপদাপন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—
“কোবার তোমার ভ্রাম্যাদি থাকেন, পেটা তো আমার জন্যে চাই।”

“ঐ যে আগনার বাগানের পশ্চিম দিকে দেখা যাচ্ছে তাই চালাটা, ঐটে তার বাড়ী। সে তো আমারই প্রভা।”

“কিন্তু ঐ চালাটাতে একজন কৃষ্ণবর্ণী থাকে জানি। অল্প দিন শান্তক তাকে বেঁধেতে দেখিনি, নইলে সে দোতাই ভিকের করতে যেত।”

“হ্যাঁ, সেই লোকটিই ভ্রাম্যাদির স্বামী।”

আমি চমকে পেলাম। দুখ দিয়ে যেমিহে পেল—
“কৃষ্ণবর্ণীকে লোকটি ভ্রাম্যাদির স্বামী?” অনিল আমার মনে বলে চলল, গত ৪৩ বছর ধরে দিগির কী কষ্টে না হলে। জান করাম, বাগান, পোড়ান, সবই তো ঐ দিগির। মাছুব আর কত পারবে? দিগির আর কত পরীক্ষা যে বাকী আছে তা কে জানে। সেদিন দিকিৎ বেলছিলাম, ‘ভ্রাম্যাদি ওকে কৃষ্ণবর্ণী পাঠিয়ে দিই।’ তিবি রাজী হলনা বলে, ‘সেখানে কে দেখবে মানাবার।’ আর কহিনই বা ও বাঁচবে। যে কহিন থাকে এখানেই থাক। তুমি কিছু টাকা পাঠিয়ে দিও।” অনিলের শেষ কথাগুলো আমাকে চাবুক যেরে লগাণ করে দিবে বলতে লাগল, এখনও বলে আছে? বা দেবার এই বেলা দিয়ে দাও। আর দেবী নয়। তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে নেমে কাছের ড্রয়ারটা থেকে এক ঘুঠোতে বা কিছু টাকা পসো নোট উঠে এসে, তাই দিয়ে হস্ত-বাক্ষ বিদিত অনিলকে টানতে টানতে ঘর থেকে যেমিহে পড়লাম “চল অনিল এখনই। বা দেবার দিয়ে দাও, এই বেলা। আর দেবী নয়।”

তারপর ভ্রাম্যাদির বাড়িরে এসে আমার দাঁড়া-লাম। ভিতরে ঢুকতে যেমন যেন ভর ভর করতে লাগল। তবু মনের মধ্যে কে যেন অবিরত তাকা দিচ্ছে আর দেবী নয় এই বেলা। অনিল আমার হাত ধরে টেনে বসে, “চলুন বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে।

ভিতরে বাই। এক রাত হয়েছে; আমাকে মাঝারি এবং বাকী দিহতে হবে।”

অনিলের কথাই বাস্তব জগতে কিংবে এল মনটা; সামনের কর্তব্য লুৎতে লুৎতেন হয়ে উঠলাম। ভর, দিগা কাটিয়ে যা বাড়ালাম কিছু ঐ পথান্ত। ভিতরে দু এক পা গিয়েই জ্বলেন খমকে দাঁড়ানাম, পাছুটা মাটিতে ঘুট তাইবে আটকে পেল। স্পষ্টই বোঝ হল অনিল কাপছে, সমস্ত পৃথিবী যুখে অচেতন। চারিদিক যুতের মত স্পন্দনহীন, নিমৃত। আকাশের অগণ্য নক্ষত্রগুলি নিঃশব্দে জল জল করছে। সামনে সুপলীতলার কৃষ্ণবর্ণী অশাফ বেহটা পড়ে রয়েছে, ভ্রাম্যাদি পাথের পোড়ান খুটি ঠেলান দিয়ে চুপ করে বসে আছে। কে কী বলবে, কং কী বলবে আছে? যেন হল এ বিরাট শব্দময় কং-ময় পৃথিবীর সব সোলমাল সব ব্যস্ততার শেষ হয়ে গেছে। কংর কিছু বলবার, কংর কিছু কংবার নেই। যদি কেউ কাঁপতে চাই লে কাঁপক, কিন্তু চোখের জল যেন মাটিতে না পড়ে, লস না হয়।

ভ্রাম্যাদি ঘীরে গীরে এসে দুখ থেকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাকে প্রণাম করলে। তারপর অনিলের দিকে চেয়ে বলে, “সব চুকে গেছে, মানাবার। বাকীটুকুই ব্যবস্থা আপনি করে দিই। দেহটা যেন কুহুবি বিড়ালে না যায়, আগুনটুকু যেন পায়।”

আমার সমস্ত পরীর টলুতে লাগল, আর যেমিহণ দাঁড়ালে হরতা পড়ে বাব। এমন সময় মিসেস মিসর মোটরের ধর্ষ বেগে উঠল, আমি বাঁচলাম। “খবর দিও” বলে কোন দিকে না চেয়ে তাড়াতাড়ি যেমিহে গেলাম।

পরের দিনটা ঘরের ভিতরে নিঃশব্দে বসী করে বেবে দিলাম। কেউ যেন লক্ষ্যন না পায়। আমি যেন লগাতক আশামী; চুরি ডাকাতি করে, খুন-কংয়ে লুকিরে লুকিরে বেড়াচ্ছি। লক্ষ্যের সময় আমার ত্রী ফি গুপ্তর লকে কোথায় চাখের নিয়ন্ত্রণে গেলেন। আমারও বাবার কথা ছিল, পরীরেব অজুহাতে বাড়ীতে বসে পেলাম। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য হল। অস্তকংর নেমে এসে পথ-বাট-বাট সব ঢেকে ফেললে। লংসারের লত লহর কোলাহল!

কমে এল। ঘরে ঘরে শাঁক বেবে উঠল। জানালায় ক'ক দিয়ে দু-একটা বাড়ীতে লক্ষ্য-বীণা জ্বালা দেখলাম। তারপর কানে আসতে লাগল ঢেলে মেয়েদের পড়ার আর পড়ানোর কলরব। তারই সঙ্গে ঢেলে এসে নিভবের ঘুপচাড়ানোর নানাবক্য শ্রব। কখনো তা'ও নীরব হয়ে এল। আকাশ, বাতাস, মাটি, জল—সব তন্ত্রাজ্বর হয়ে পড়ল।

ভীত, লজ্জা পলাতক আলস্যের পকে বাড়ীর বাইরে বাবার এই তো উপস্থিত সময়। একটা চান্দর মুড়ী দিয়ে খালি গারে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ঘেঁষে পড়লাম। চলতে চলতে আবার বেহ মন ঘরির হয়ে উঠল, বলে উঠল, 'দেখী নব, দেখী নব।' গুতরাবের মত উঠানে এসে দাঁড়ালাম। কেউ নেই। অপেক্ষা করলাম, এবিধ এবিধ চাইলাম—কেউ নেই। উঠানের একপাশে উনানের কাছে ঘোটাকতরু কাঠি ফুটো ভেঁড়া কচা বয়েছে, কেউ নেই। একবার তরে তরে তাকলাম, 'শ্রামাধি।' নিঃশব্দ বর্ষাঘটিত কিংবে এসে আবার কানে আঘাত করল। বড় বেখাঙ্গা লাগল আবার বর্ষাঘট। মনে হল, যে মহাশক্তি এখন সারা জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছে, আকাশের ঐ অলংকারাগুলি যে শাস্তির দ্বান করছে, যে শান্তিতে কুষ্ঠব্যাদির লকল বহুপ্রাণ শেষ হয়েছে, তাকে যেন আঘাত করছে আবার ভাবাতাকি। লজ্জা বিশ্বের কাছে আবার অবহাণ অমে উঠেছে।

"হাজারাবু এখানে?"

কিরে যেখি ভক্ত চৌকীদার। ভর হজিল, পাছে সে

বেশী কথা বলে। তবু বিভ্রান্তি করলাম, "এহা কোথায় রে?"

"কুঠি রোপটি" মরে গেছে। বউটা কোথায় পানিয়ে গেছে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী বানু—গাফা। মনিলবাবু বলে ওপাড়ায় একজন তহলোক আছে—সে তহলোক না, ছাই—তা সে এসে কতকগুলো ছেলে নিয়ে লোকটাকে পুড়িয়ে গেছে। ওদের ঐ কারাই কিনা, ওদের—"

তাড়াবাড়ি দুটো টাক্য বার করে চৌকিপাশের দিঃ বললাম—"হা এখানে বেঁকে।" সে ঢলে গেল।

তারপর? তারপর আর নেই! সব তারপরই শেষ তো হয়ে গেছে! তুলসীতলায় যেখানে কাল শ্যামাদির স্বামীরা বেহুটা মাটির উপর পোড়ান ছিল, আমি সাতকে সেখানে শুয়ে পড়ে কি যেন অপ্রভব করতে চাইলাম। সেখানে কী শেল্যাম জানি না। তবে দেখেছিলাম লম্বাও বেহ নিয়ে মাটিকে স্পর্শ করে বসাম "হে মাটি তোমাতোই প্রাণ, তোমাতোই মৃত্যু। তোমাতোই আশ্রয়, তোমাতোই শাস্তি। স্বামীকে আশ্রয় দিয়েছ, শাস্তি দিয়েছ। শ্রামাধিকে কেন দূরে রেখেছ! তাকে টেনে নাও তোমার আশ্রয়ে, তোমার শাস্তির কোলে!"

• • • • •

আজ এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে বসেছি। আরও জানি আবার সে প্রার্থনা কেউ শুনেছে কিনা, শ্রামাধি তার আশ্রয়টুকু পেয়েছে কিনা!

• হেথাও ওঠে চাঁদ

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

(১৭)

বিজু বাপার নৌ। বাধা সমস্ত দুপুর ঘরের বয়সী জানালা বন্ধ করে ছুটফুট করেছে। অপরাস্ত্রে সে বাতাসঘাট এলে ঠাড়িয়েছে। তখন গংন কমেনি; হাঁওয়া এখনও উষ্ণ। সমুদ্রে বিস্তৃত প্রান্তর, তার ওপরে বিহীন পক্ষী দেখা যাচ্ছে। বিহীন বকীল হায়ে উঠছে—অগুণামী খুঁজ তার শেষ বন্দি ছড়িয়ে গিয়েছে দিহল্লের অন্ধে। বাধা তারিফে লেবেছে—খুঁজ তুংছে। সমস্ত আলোর আধার অগ্নিময় খুঁজ অন্ধকারের গল্পের ভুবুছে। এই কি তার নিয়তি। তার সহস্র কর সে চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছে—কোথাও এতটুকু আশ্রয় খুঁজতে পারে কিনা—যে আশ্রয়কে ধরে সে কোথায় গতেই আত্মবৎ থেকে অগ্ন্যাহুতি পেতে পারে, না, কোথাও কোন আশ্রয় নেই। তার পৃথিবী পয়টনের মধ্যে কোথায় সে কি অপরায় করছে—কোথায় কোন হুল তার হয়েছে—এই কালো গল্পের ভিতর তাকে যেতেই হবে।

নিজের জীবনের সঙ্গে বাধা তুলনা করল;—চড়াই পথের সেই কালো গল্পের তাকে যেতেই হবে। আর কি গতি আছে তার জীবনে? পাপ, তার মেঘের অভ্যস্তরে! দিনে দিনে বাড়ছে—তার সমস্ত অস্তরকে জ্বালা দিয়ে ধরে আছে। নাগপাশে তার সব অস্তর বাধা পড়ছে। এ থেকে মুক্তি চাই? এ গল্প কে পান করবে? কে সে নীলবর্ণ হবে?

না, তার কোন পথ নেই। বৃত্তাই তার একমাত্র বন্ধু—সেই আত্ম তার বন্ধু, সেই আত্ম তার প্রিয়।

জীবনে আর কি কাব্য আছে? কি আর সে পেতে পারে? দুটি পুরুষ, দুটি নারী ছয়জকে সে নষ্ট করেছে—আর কেন? মনে পড়ল বিভূতির বিদায় বানী—“জীবনে সুখী হবে এ আশা করতে পারি না, কিন্তু আশা ও

প্রার্থনা করি হৃৎক আর বাড়িও না।” কে জানে আরও কত হৃৎক তার মস্ত মন। আছে। তার চেয়ে……

কিন্তু যখন ত’ আসে না। তবে……তবে কি আসবে……না, সেই পাহল তার নেই। তা’ নাকি মহাপাপ—আর পাপের বোঝা বাড়াবে না। অস্ত্রত: আগামী জীবনে সে সুখী হতে চায়। বাধা জীবন, গুণের জীবন বনে করা যত্ন জালা—এবার সেই জালায়-ই তার জীবন গেল আগামী গল্পে সে সুখী হতে চায়। কল্পনার তার মন তবে উঠল—বাঁখী পুর করা তনয়ে সুখী ও তাগাবতী সে হয়েছে।

কিন্তু আবার আগামী গল্পেও যদি হুল করে চায়—যদি নিম্নের মনকে আধার-ও বুকেতে না পারে, যদি আধার-ও কাঁতুতু মেঘের প্রবেশ ছলনাও সে পড়ে! এ জীবনের অপ্রিয়তা কি কিছুই তার মনে থাকবে না! কে জানে……! অন্ধকার, সেখানেও অন্ধকার।

হঠাৎ পিছন থেকে কে তার লম্বিত কোশের এক গুচ্ছ দ’রে টানল—তারিফে লেবে বিজু। তখন খুঁজ তুবে গেছে, চারিদিক অন্ধকার হয়েছে। বিজু বলল—“বি ভাবছিলিরে বাধি? একেবারে তুম্বল হ’য়ে গিয়েছিলি।”

বাধা বলল—“বাবো, বা-তা বলে আমাকে ভাববে বুঝি! বাধি আবার একটা কি ভাব হল।”

বিজু—“কেন, বাধি বলে কি আজই প্রথম ভাবছি?”

—“সেই কোন ছোট বালকের সঙ্গে বুঝি এখনকার তুলনা হয়?”

—“কেন হবে না, এই বেশ, এখনও হুল ধরে টানছি, এখনও কিল দিচ্ছি।” বলেই সে হুল ধরে বাধার মাথাটা নিজের হাটুর উপর ঘুরিয়ে এনে পিঠে ঘঁটা আস্তে কিল দিল। বাধা সে-ভাবেই নত হয়ে রটল বিজুর হাতটা তার পিঠের উপর ই আছে। একটু পরে সে অবসাদ-ই বাধা বলল—“আবার সেই কালে ও সেই বয়স কিরে বাওয়া দার না, বিজু?”

বিজু—“কেন হবে না, বাধু? আমার কাছে. মাঝখানে আর-এক বছর বাধ দিবে, তুই ত’ সেই বাধা

খাচ্ছিল। ঠিক তেমনি বাধু।”

—“ঠিক তেমনি আছি, আমার জীবনের সব কথা শুনেও বলছ।”

—“হা, এর চেয়েও দুঃখের যদি কিছু তোমার জীবনে ঘটত, তবুও আমার কাছে ঠিক সেই বাধু-ই থাকতিল।... তোমার ঘেঘোরা বড় খোকা, বাধু। নিজের মনও বুঝি না, অশ্রুর মনও বুঝি না। বুঝি নিয়ে ত’ তোমার চলিল না, তোমার চলিল ঠিক আন্তরিকতা পোকাগুলির মতো—কেবল জ্বরের আবেগ দিয়ে। বুঝি বাহু দিয়ে জ্বরের আবেগ দিয়ে চলা হল—অন্ধের চলা। লাঠি ঝুঁকে ঝুঁকে, হাতড়ে হাতড়ে অন্ধ যে ভাবে পথ চলে, ঠিক তেমনি করে তোমার জীবনে চলিল।...”

—“বিজুবা, তুমি কি আমার ভালবাসতে?”

—“...রাখা, এককাল পরে, এ খোঁজ নিয়ে তোমার কি হবে? যদি শতাই জীবনের প্রয়োজনে এ প্রশ্নের জবাব চাও, তবে অন্ধরিন এর আলোচনা করা যাবে। আর যদি শুধু কৌতূহলের মাত্র জবাব চাও—তবে আলোচনা বুঝা। মল্লারামির উপর বসে ছোট ছোট উমি ওঠে—আবার সবে সন্ধ্যা তারি মিলে যায়। তারের মন্ত্র ও পরিণতি নিয়ে কৌতূহল নিতান্তই বুঝা।...”

“তার চেয়ে চল রাখা, এই অন্ধকার ঐ মাঠে গিয়ে একটু বেড়াই—বেশ লাগবে।”

—“চল, কিছু টর্টরা সঙ্গে নিও।”

—“এই ত’ হল ঘেয়েলি বুড়ি। টর্টর আলো নিয়ে জীবন চলে না—সাধারণ পথে-বাটে চলেতে পার। কিন্তু হিংস মজ্জা যে মনে আছে, সেখানে টর্টর-নিয়ে চলা নিরাপদ নয়। যে আলোতে নিজেকে ছাড়া কেবল অপরকে দেখতে পার, জীবন পথে তা স্থিতির লঙ্ঘন নয়। নিজেকে না দেখতে পারলে অপরকেও চিনতে পারবে না।...”

রাখা কোন জবাব দিল না—কেবল একটু পরে বলল—“মনে হইল—এখন চল, বেড়াতে যাবেনা কি?”

জুঁজনে আঁধারে বের হল। সিঁড়ি ঐতল হাওয়া দুঃখ-দুঃখ প্রবাহিত হচ্ছে। পাতলা সিঁড়ি আঁধারে গড়ন।

পরিহিত বাধুর আলিঙ্গন রাখা তার প্রতি অশ্রু অশ্রু কণ্ঠে লাগল। সেই আলিঙ্গনে সে ভুবে গেল। তবুও হুঁই চলছিল। শান থেকে বিজু টেবের বোতাম টিপল। হঠাৎ একটা আলোর স্পর্শ এসে রাখার সন্নিবিধ কিরিয়ে আনল। সে বলল—“মার হাও না, এখানে বসো কিছু সময়।”

বিজু বলল—“বেশ বসো।” জুঁজনেই বসল। একটু পরে বিজু বলল—“কেমন জ্বর অন্ধকার—একটা গান গাইবে রাখা?”

রাখা একটা গান ধরল। অন্ধকারের ডেউহের পর গানের ধ্বনি চোলে আশ্রুতে লাগল। গান থেকে সেলোও কিছু সময় বেশ অন্ধকার পবন হিলোলে তার অশ্রুর স্রোত চলল। তারপর বিজু বলল—“কি মনে হল রাখা, গান।”

রাখা—“কি?”

বিজু—“অন্ধকারের মধ্যে বেন একটি অপরোচি জ্বর মনের দ্বারে এসে দাঁড়া দিচ্ছে।”

রাখা চুপ করে বইল। আবার বিজু বলল—“কি, কথা বলছিল না যে? কি বারছিল?”

একটু পরে রাখা বলল—“বিজুবা, একটা সত্যি কথা বলবো?”

—“তোকে কি এতদিন নিখো কথাই বলেছি?”

—“না, তাত’ বলছি না। তবুও বল, আমার প্রেমের সত্য জবাব দেবে?”

—“কি তোমার প্রশ্ন, বল সত্য বল দেবে।”

—“আজ্ঞা, তোমার এই বনবাসে খাচার সন্ধ্যা সন্ধ্যা কোন সম্পর্ক আছে?”

—“আমার জীবনের বহু ঘটনার সন্ধ্যাই তুমি জড়িত আছিল। আমার এই বনবাসে আমি ত’ একটা আকস্মিক একক ঘটনা নয়। জীবনের বহু ঘটনার সন্ধ্যাই এটা জড়িত, কারোই তোমারও সম্পর্ক থাকে। ত’ এমন কিছু বিচিত্র নয়।”

—“না বিজুবা, তুমি প্রশ্ন এডিং গেলো। আজ্ঞা, আমাকে জল খেন করবেই, খোঁজার মতোই জিজ্ঞাসা করছি—আমাকে কি তুমি ভালবাসতে?”

—“বেশ ত’ কি অসুস্থ প্রভু? ছোট কালে তোমাকে বড় মেরেছি। ভাল না বাসলে কেউ এমন করে মাঝে? তুইও ত’ এটা জানিস? আমার হাতে মার খেয়েও আমার কাছে আত্মি! তোর চক্ষু বড় কাটা বখই, বেশ কল প্রকৃতি উপাসের কল এমন দিতাম; আর কাটার গা বেটে যেত মনে আছে?”

একটু পরে বাধা বলল—“আমার কথার ভাব মিলে না, বিজ্ঞান। না মিলে! অজ্ঞান, এতই যদি আমার ভালবাসে—তুমি কোব করে আমার মিলে না কেন? এত কষ্টও আমি পেতাম না, এত নষ্টও আমি হতাম না। তোমার জীবনও এই বন্যানে কাটত না।”

বিজ্ঞান একটু সম্বলিত ক’রে থেকে জবাব দিল—“হ্যাঁ, এসব কথা আর অলোচনা করে কি লাভ আছে? এটা তুই জানিস—টিক তখনকার মতোই আজও আমি তোর মকলবাদী। আমার হাত যদি তোর জীবনের এতটুকুও হত নাহির বিধান হতে পারত তা করত বরাবরই আমি প্রস্তুত আত্ম। বাধা আমার কাছে তোর জীবনের মাকের বকে বড় নেই। সেই বাধাই তুই আমার কাছে আত্ম আছিল। একটা কথা মনে রাখিল পাণ পূর্ণা বলে কিছু আমি মানি না—এব কোন বাস্তব সত্য নেই।……

“দুঃ-প্রয়োজনে ও বেশ-প্রয়োজনে মানুষ পূর্ণা ও তার ব্যতিক্রমকে পাণ বলে খ’রে নেত। এ দুগের বা এ সমাজের পাণ অপর দুগের বা অপর সমাজের পূর্ণা—তেরনি পাল্টা পালটি (Vice versa)। এসবই হল লোকেই বামনো—তারের মনের উদ্ভাবন। এই দুঃ প্রয়োজন বা বেশ প্রয়োজনের সামাজিক দ্বন্দ্ব আছে; সেই দ্বন্দ্বও আমি বিতে প্রস্তুত। কিন্তু অনেক সময় প্রয়োজন কৃষ্ণে গেলও তার জের চলতে থাকে; মস্তকের গহাঙ্গনিক মন এই সৃষ্টি ভাঙতে চাখ না সর্বত্র। আমার মানুষ বিশেষ-ও এই প্রয়োগকে সংকত করতে হয়। তা-ও প্রচলিত সমাজ বিধি মানতে রাজী হয় না। দুঃ বা বেশ প্রয়োজনের চেয়ে মানুষ বড়। যদি এমন কোন বিধি মানুষকে গিলে ফেলে, তবে আমি

মস্তকের পাণে দাঁড়িয়ে এই বিধির বিরুদ্ধে বিস্তার করব।……

“কাজেই জীবনের কোন অবস্থাতেই, কোন বিপর্যয়েই আমার কাছে তোর সংকট নেই, বাধা।”

অজ্ঞানের বাধা বিজ্ঞান একবার: ভাত নিজেই হুঁহাতের মধ্যে ধরে বলল—“বিজ্ঞান, তোমরা জিনিষটা বেশক তোমাদের দিক থেকে। আমার জীবনের এই কষ্টটা বড়ক তুমি তোমার কল্পনার প্রলেপ দিয়ে ঢেকে ফেলছ—কিন্তু আমার জীবন থেকে কি তাতে এই সবক লোপ পায়। আমার জীবন ধারা তার উৎস মুখেই রয়েছে ফোলাটে, আজ বন্ধ বাধাধারা সে কোথায় পাবে? তবে আমার জীবনের উৎস থেকে পরিচ্ছন্ন জল বেরবে, কে জানে!……

“তুমি বলছ, ঠিক আগের বাধাই আমি তোমার কাছে আছি; সব অবস্থায়ই বিনা সত্যাতে আমি তোমার কাছে যেতে পারি। এটা হল তোমার দিক্কার কথা। আমার দিক থেকে জিনিষটা কি এতই সহজ। নারী-জীবনের সার্থকতা কি, জান? জীবনে একটি পুঙ্খকে সে নিজেই ক’রে নেবে, নিজের প্রীতি ও প্রেম ছাড়া তাকে হুঁহী করবে—এক তার সুখে নিজে হুঁহী হবে। তাকে কেন্দ্র ক’রে ছোট্ট একটা নীড় গড়ে তুলবে। নিজের সার্থক দিয়ে সেই নীড় ভরে তুলবে। জীবনে যদি অপরকে হুঁহী করতে না পার, তবে সে নারী-জীবন বুঝা। আমার জীবনে কি হয়েছে? চারটি জীবন আমি নষ্ট করেছি—নিজের জীবনও ছাত্রবার করেছি।……

বিজ্ঞান বলল—“জীবনে যদি অপরকে হুঁহী করতে না পার, তবে কেবল নারীর জীবন কেন, নয়ের জীবনও বুঝা। এই মানসও দিয়ে আমি তাকে হুঁহী করেছি।”

বাধা—“বিজ্ঞান, এ তুলনা ঠিক হল না।”

বিজ্ঞান—“থাক, আশা আর নঃ; অনেক রাত হয়েছে— এখন বাগদা চলো। বাবার তৈরী হয়ে গেছে এতক্ষণ।”
ছতনে উঠে চলল।

আর-ও কখনই কেটে গেল। সমাজিক আশ্রয় তখনও বহুদূর উপর নামেনি। অজ্ঞানী দুঃ-বিশ্ব বিধায় আবির্ভবে খরী জ্ঞান বদীয়ার উদ্ভাসিত হ’য়ে উঠেছে।

সমস্ত দিনের রোহ-নাহনের পর শাল বৃক্ষগুলি শিথ শমী-
বণের স্মরণে গুহরিবে উঠছে। আর তাদের ডালে
ডালে আশ্রয় প্রার্থী শাখীরা কুচন দিয়ে তাদের মিলন
উৎসবের সজীভ রচনা করছে। সন্ধ্যা হ'য়ে বাধা বেধছে—
প্রকৃতির এই এক অসুখ দৃশ্য। প্রভাত ও সন্ধ্যা, দিন ও
রাত্রির এই মিলন, অন্ধকার ও আলোর এই সম্বন্ধ।
দিনের পর দিন এই সম্বন্ধ ঘুরে আসছে। প্রকৃতির বন্ধে
ত' সবই এমনি ক'রে—চক্রাকারে কিংবে আসে। কেবল
মাত্রদের জীবনেই যে বায়, সে চায়—আর কিংবে আসে না।
প্রকৃতির অকুবন্ধ ভাঙাবে কিছুই হারায় না—সবই কিংবে
আসে, কেবল মাত্রদের ছোঁড়ি জীবনেই যা একবার বায়, তা
আর কিংবে আসে না। হৃদয় আল নিয়ে থাকি বলেই
তা হয়। তাই কবি বলেছেন—

“বল লইয়া থাকি;—তাই ঘোর বাতাস দায়, তাতা
বায়। কণাটুকু যদি হারাই—তা লয়ে প্রাণ করে হয়ে
হার।”

সেমে অন্ধকার নেমে আসছে—অনেকক্ষণ হ'ল সূর্য
ভূবে গিয়েছে। আকাশ ও ধরিত্রীর বিভিন্ন বন্ধ-
আলিঙ্গনের মধ্যে আকাশ-বন্ধে কোথায় হাঙ্গিয়ে গিয়েছে।
অন্ধকারে সেই আলিঙ্গন বেধা বেধা দাঁধে না। রাধার
দুই দুই প্রলাপিত ধরিত্রী থেকে আকাশের দিকে গেল।
নব বধূর মতো আকাশ বহু রত্নখচিত নীল শাড়ী পরেছে।
অন্ধকারের ঘন আবরণ কেটে যাচ্ছে—পূব চক্রবালকে
আলোকিত ক'রে তখন মাত্র চাঁদ উঠেছে। কৃষ্ণ পক্ষীয়
চাঁদ আকাশের কপালে সিন্দূর বিন্দুর মতো তার শোভা
বুদ্ধি করছে। আকাশের গায়ে অসংখ্য নক্ষত্র জুটে উঠেছে।

নিজের নিরাভরণ জীবনের কথা মনেই তার মনে
আসছে। প্রকৃতির এই শোভা আর তার অন্ধকারের
মিষ্টতা! কি সে করবে? তার এই অভিলষণ জীবন
নিয়ে কি করবে? বার উপর এই জীবনের নিঃশ্বাস পড়ছে,
তাই পড়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছে। এই জীবনের ভার আর
সে বইতে পারছে না। আর এর লে-লুপ গুটি পড়েছে
বিজুর উপর। তপন গেল, মনিকা গেল, বিধান গেল,
ভাবতী গেল—আর আবার বিজুকে বেতে বসেছে।...

হৃদয় সিন্দূর তাকে আগের মতো এখনও ভালবাসে,
হৃদয় বিজু এখনও তাকে চায়। কিন্তু কি অধিকার তার
আছে, যাক বিজুর প্রতি মৃত্যু মৃতি রিতে। এ চিন্তাও
তার পক্ষে শাপ। তার শরীরে শাপ, মনে শাপ—এই
শাপের বোঝা নিয়ে সে কোন বিজুকে ভোঝাতে যাবে!
এ শাপ নিয়ে সে কোথায় যাবে! বিজুর এখানে তার
আর থাকার চলে না। মনের শাপ, মেহের শাপ নিয়ে
এখানে থাকার চলে না। কিন্তু কোথায় সে যাবে! আর
কোন আশ্রয় আছে!...

না, সবই তার একমাত্র বন্ধু—একমাত্র আশ্রয়।
বন্ধু—মৃত্যু—মৃত্যুহত্যা—আশ্রয় বিধে না কুহি আমাকে?
হৃদয়ী ধরিত্রী—আবার ক্যাশা বোঁধন, মনোহর জীবন—
বিবাহ—বিবাহ, ভোম্বাদের কাছে। হে যোব জীবন
মেহতা—মৃত্যুহত্যা শাপ আমার কমা ওবে।—কি
দুখে আমি এ পথে যাবি, তা তুমি জান। জীবনকে
বন্ধ ভালবেসেছিলাম—সব শাপ আমার অসুখ র'য়ে গেল।
বিবাহ...কিন্তু তব তব করছে। জীবনের আকবণও ছাড়তে
পারছি না। তবুও, তবুও.....

গোপন অনেক রাত শব্দ রাধা ও বিজু গান ও গল্প
করল। রাধার মনে তখন হাতা হ'য়ে গিয়েছে,—সে তার
শব্দ নির্বাহ ক'রে নিয়েছে। তাই গান, হাসি, ঠাট্টা
কোনটোতেই আর রাধার আঁটকাঙ্ক্ষিত না।

অপরাত্রে বিজু ও রাধা একটু ঘুরে একটা পাহাড়কে
বেড়াতে গিয়েছে। ছোঁড়ি ধরিত্রীর মতো রাধার ঝটপাতে
পাহাড় মুখরিত হ'য়ে উঠেছে। কখনও রাধা বিজুর আগে
যোড়ে যাচ্ছে, কখনও সে পিছনে পড়ছে। একটা দল
চড়াই পথে তারা যাচ্ছে—হানে হানে নীচে গভীর গর্ত
বেধা যাচ্ছে। রাধা উজ্জল স্রোতবিনীর মতো লাফিয়ে
লাফিয়ে চলছে। বিজু তাকে বঁচ সাবধান করছে, সে
ততই উজ্জল হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ শিঙনে একটা শব্দ
ধ'ল—বিজু দেখল একটু নীচে রাধা প'ড়ে গেছে এবং
উৎসাহী বেধে-ট্রিন প্রবৃত্তি ঘ বেধে বেধে তা। হেত
কিন্তু নীচে পড়িয়ে গিয়েছে। বিজু যোড়ে গিয়ে তার
কথিবাক্ত বেহ তুলে ধরল—রাধাকে কোলে ধ'রে বিজু

ভাঙাভাঙি ক'রে দুই ভিনটি লোক আনিবে নিল। তাহের
সাধ্যেও বাধা অজান হেঁহ বহন ক'রে নিয়ে চলল।

বাধার গিহে সে বাধার নাকী পরীক্ষা ক'রে দেখল—
তখনও শ্রাণ আছে। অবিস্মৃত রক্ত বোষণ হচ্ছে।
ভাকার এল—ঐহেদের ব্যবস্থা ক'রে পতীর দুখে বিদার
নিল।

বাধার আপ ভাকার বলল—“খুব serious case,
বিকু বাবু। একেবারে আপা নেই তা বলতে পারি না :—
তবে খুবই করিম। এবে সেবা শুশ্রূষা তা আপনার বাধা
স্ব হতে পারে না; একজন নার্স হলে ভাল হয়—যেমন
ডেমন একটা বাস্কানী নার্স হ'লেই চলবে।”

বিকু বলল—“আমার সন্ধান ত কোন নার্স নেই।
আপনি যদি খোঁজ ক'রে আনতে পারেন।”

ভাকার—“আমি যাঁচিতে খোঁজ করব।”

পরের দিনই রাঁচি থেকে যে নার্স এল—সে মণিকা।
ভাবপর দিন বাধার জ্ঞান হল। তিনদিন পর সে চোখ
মেলি চারিত্রিক দেখল—পরে বলল—“আমি কোথায়
আছি?”

বিকু এগিয়ে এল—বলল—“বাধা, আনার ভিনতে
পারচ'না, আমি বিকু।”

—“উ-উ, কে বিকু?” আমি বাঁচব—বিকুলা।
আমাকে বাঁচাতে পারবে ত?”

বিকু তার কপালে ও মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে
বলল—“বাঁচবে কি। দু'চারদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে
উঠবে।”

মণিকা বিনম্রতা বাধার সেবা করছে। বাধা একটু দুঃ
হয়ে উঠেছে। এরা দুজন একে অপরকে চিনতে পারেনি।
তখনও ক্রমাগত বাধার রক্তস্রাব হচ্ছে—সেদিন হঠাৎ জাব
বোড় পেল। নার্স ও ভাকার একটু চিন্তিত হল। তারা
দু'জন কি বেন গোপন পরামর্শ ও আলোচনা করল। বিকু
বহন চিন্তিত ভাবে ভাকারকে জিজ্ঞাসা করল, ভাকার
জবাব দিল—“চিকার কোন কারণ নেই, ভ্রম বটে গেছে।
ইনি পূর্ববর্তী ছিলেন—খুব অল্পদিনের। ভিতরে পেটা
হয়েছিল—বেড়িয়ে গিয়েছে।”

বিকু একটু বিস্মিত হল। কিন্তু এখন বাধার অনেক
বিষাদ উজ্জ্বল অনেক অশুশোচনার সর্গভার কাছে
পরিকার হল; তার এত আত্মবিকারের কাহন এখন বিকু
পরিকার বুঝতে পারল।

বাধার মন কিছুতেই স্থব্ধ হচ্ছে না। মণিকা প্রথম
এসেছিল অল্প কয়েকদিনের মাত্র। কিন্তু বাধার পরীষদ
না হওয়ার তার বেতে বেরী হতে লাগল। বাধা একদিন
মণিকার হাত ধরে বলল—“মণিকাদি, আমার মজ কত
কষ্ট তুমি করছ।”

মণিকা বলল—“কই কি, এই ত আমার ব্যবসায়।”

বাধা—“না, মণিকাদি, কেবল টাকার ব্যস্তিরে কেউ
এতটা করে না।...আমি বড় গুণী দিদি, বড় ধার্মণ্য।...”

মণিকা তার মাথায় হাত বুদিয়ে দিতে দিতে বলল
—“এখন ও-সব ভাবে না বোঝ। দুঃখ কাব জীবনে না
আছে—বিশেষ ক'রে মেয়েদের জীবনে।”

—“না, মণিকাদি, আমার মতো আর কাউকে পারে
না।” মণিকা বাধাকে সাহস্যা দিয়ে ঠাণ্ডা করল। বাধার
শীর্ণ পুণ্ড বেহে কথেক ভেঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।
মণিকা তা মুছিয়ে দিল। বাধা তার হাতখানা নিষেধ
পালের নিচে চেপে তারদিকে ফিরে মত হ'য়ে গেল। নিষেধ
হাত ছ'খানা মণিকার কোলের উপর ছড়িয়ে দিল। মণিকা
তার মুক্ত হাতখানা ওর হাতের উপর আঙে বুলাতে
লাগল।

দু'জনের দু'জনের মধ্যে একটা এগ্রি পড়ল। পিপাসিত
চাতক তার কাছে বারি প্রার্থনা করছে, সে কি নিতুই
মেঘের মতো তাকে বাহির ববলে বজ্র দিয়ে নিরাপ
করবে? না তার সমস্ত সম্ভব নিড়ে তাকে বাহির মেঘে?—
এই তা হল বাহুদের ধর্ম।

তপনের লুপ্ত আগ থেকে নিষেধ নারীষের মধ্যমাকে
বাঁচাবার মজ সেই সে মণিকা হাসপাতাল থেকে পালাল—
ভাবপর থেকে শুরু হল তার অজ্ঞাতখাল ও আত্মনিগ্রহ।
নারীষের মধ্যমাকে বাঁচাতে গিয়ে সে নারীষকে হত্যা
করতে শুরু করল। নারী জীবনের বা ধর্ম—তাব বা
সৌর্য ও শোভন—সেই সে কোমল বৃত্তিকে সে নৃশংস-

ভাবে হত্যা করতে লাগল। সে আর না—নারী নয়। এই ক'বছর মণিকা চালাচ্ছিল একটা যান্ত্রিক ঘোঁরন। সঘর রুতির কোন প্রস্রবই সে দেখে না—এই ছিল তার লক্ষ্য। কৃষ্ণাশ্বিন ও কঠোরতা দিয়ে লম্বা কোমলমুখিক সে শিখে যায়বে—এই ছিল তার ব্রত। কিন্তু এই হত-ভাদ্রিনী যুবতী—তার চেয়েও দুঃখী। এ যে তার কাছেও করুণা প্রার্থনা করে। তার কোলের কাছে মাথা বেগে এই যেহেঁটি কাঁধে—এই দৃঢ় তার অন্তরকে গদিয়ে দিল। সে আস্তে মাথাটা কোলের উপর তুলে নিল।

মণিকা তার মাথা কোলে নিয়ে ভাবতে লাগল—“কে এই যেহেঁটি? মনে হয় সর্বজন পরিজ্ঞাত। বিধবা নয়; তবে কি? লম্বা? সিন্দুর চিহ্ন নেই—এরোস্ত্রীর কোন লক্ষণ এর আছে নেই। অথচ এ ছিল গর্ভবতী। শুনছি বিকৃষাবৃত এখানে এসেছে মালখানেক হল...কিন্তু এ তো আগের ব্যাপার!”

সে সঙ্গেহে পিঠে হাত বুলাতে লাগল—রাধাও মণিকার কোলে উপুড় হয়ে সুশিখে কীমতে লাগল।

ছুদিন পর রাধা মণিকাকে বলল—“মণিকাদি, তোমার খোকা কোথায়?”

: মণিকা একটু চমকিয়ে উঠল। সে বলল—“আমার খোকা।”

রাধা—“হাঁ, মিথি, আমি বেখেছি, তোমার খোকার ফটো তোমার স্মৃতিকেন্দ্রে আছে। রায়ে স্বপ্নেও তুমি মাঝে মাঝে ‘খোকা’ ‘খোকা’ বলে চিৎকার কর।”

কিন্তু লম্বা চুপ করে থেঁকে মণিকা বলল—“সে নেই, রাধা। খোকা আমার ছেড়ে গিয়েছে—ভাইজি আমার এত দুঃখ।”

রাধা—“তোমার জীবনেও দুঃখ! কি জুখ তোমার! বলবে আমার?”

মণিকা—“রাধা, যেহেঁদের জীবন কেবল দুঃখেই ভরা। কলসন এর মধ্যে স্থায়ী আছে।”

—“বলো আমার।”

—“কি হবে শুনে! যেহেঁদের দুঃখের কি কোন সীমা আছে।”

—“না, বলতে হবে আমার।” রাধা মণিকার হাত ধরে টানতে লাগল—ছোট খুঁচীর মতো সে আঁদার করতে লাগল।

মণিকা বলতে শুরু করল। তার নিজের বিয়ের কথা—স্বামীরা অসুখ, শান্তির লাহনা—তার একমাত্র সাহায্য ছিল তার দেহ। তবু দিন তার কাটছিল—একটি খোকা তার কোল আসোক্তিক করে এল। সেই খোকা আর নেই।—“আমার বড়ই দুঃখ হ'ক, খোকা আমার বেঁচেছে। তার শিশুশরির নেই, সেই শিশু বড় হয়ে কোন লম্বা নিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়। জান বোন এও আমাকে স্বামীরা কাছে শুনতে হয়েছে—নয়-নারীর ব্যতিক্রমে-ও ত' লম্বা নয়—ঐ লম্বানের অন্ন সেহকম ব্যতিক্রম।—তিনি নিরেক আমার স্বামী বলে স্বীকার করতে রাজী নন—আমার সঙ্গে তার লম্বা হল ব্যতিক্রমের লম্বা। এর পর খোকার মৃত্যুতে শোক করব কেন? আমার অশ্রুর মণিকোঠার আমার খোকা আরও আছে। সে আর কাকর নয়।” মণিকার কণ্ঠ কঁদু হয়ে এল। রাধা তার হাত চেপে ধরল। একটু হেসে মণিকা আবার বলতে শুরু করল—“সে যখন শুনল তার স্বামী আবার বিয়ে করছে, তখন সে দ্বিগুণ হয়ে উঠল। দেবর তেলেনকে নিয়ে সে ছুটল বিবাহ সভায়—তাতে রাধা দিতে।

হঠাৎ রাধা চমকিত হয়ে উঠল—মাথা তুলে সে জিজ্ঞাসা করল—“কোথায়, কোথায় সে বিবাহ, কার সঙ্গে?” মণিকা বল—“বেধ, আমার কি যে দুর্বুদ্ধি যাড়ে চাপল—নিজে যা ভোগ করতে পারব না, অপরের ভোগে তা দিতে দিলাম না। আমার সে ভালবাসনা, বহাবরই তা জানতাম—তবুও কেন অপর একজনের কপালও ডাকবার বুদ্ধি এল! তাকেও নষ্ট করলাম; নিজেও মরলাম।...যেহের পক্ষে চরম অপমান যা তাঁ-ও তাকে আনলাম; যে দুঃখের আশ্রয় এলব করলাম, সে দুঃখ কোথায়—জীবনের* কোথাও তা খুঁজে পাচ্ছি না।.....”

তত্ব হ'য়ে সে বলে থাকিল—রাধার প্রশ্ন তার কানেও যেন গেল না। রাধাও তাকে পুনরাব জিজ্ঞাসা করতে সাহস করছিল না—যদি তার আপত্তা সত্য হয়। যখন

দুঃখের আবেগে হঠাৎ মণিকার বলবার ভৌক ডেকে
গেল—‘তখন সে হঠাৎ যেমি গেল—তখন রাধা আবার
জিজ্ঞাসা করল—কথা বল পেতেই তার স্মৃতিহারা সেই
মণিকার কোলে এলিবে পড়ল।’

মণিকার চাইতেই বিষ্ণু এল—‘তু’কেনে বসে ও দেখায়
রাধার জ্ঞান কিরে আসতে দেবী হল না।’

তখন রাধা একটু হুঁপ আছে। মণিকাকে তার
কাছে বসিয়ে মণিকা একটু বিশ্রাম করছে। বিষ্ণু ও
মণিকা সন্ধ্যার পর ব্যালাল্য’র বসে কথা বলছে। লগাল
বোলার কথাই বিশেষ ক’রে হচ্ছিল—‘বিষ্ণু কি বেন
জিজ্ঞাসা করছিল; তার জবাব না দিয়ে মণিকা জিজ্ঞাসা
করল—“বিষ্ণুহা, এই মেয়েটি কে? এর পরিচয় কি?”’

বিষ্ণু বলল—“আপনার কাছে লু’কিয়ে কি হবে—রাধা
আমার ধোনের সন্ধান। আমার এখানে এসেছে মা’র, মাল-
হানেও হল; জীবনে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পায় নি।—
অনুত বলে গরল পান করে আমার এখানে এসেছে—কত-
বার বলেছে, আমার সেই পাপ ছড়িয়ে আছে—মনে পাপ
ছড়িয়ে আছে। ‘তখন ত’ ভানতে পারিনি—এখন মনে
হয় পাতাল থেকে পড়ে যাওয়াটা আস্তরত্যা’র চেয়ে—অস্তর-
যেছা’র—”

মণিকা বলল—“আমারও তা মনে হয়। পড়ে যাওয়াটা
ইচ্ছাকৃত—আন্তরত্যা’র জন্ত হবার নয়,—কিন্তু তবুও
ইচ্ছাকৃত।”

বিষ্ণু তখন রাধার পরিচয় খোঁটানুটি মণিকাকে বলল।
মণিকা বলল—“রাধা! কিন্তু এ নাম ত’ নয়—আমি একটা
নাম—”

বিষ্ণু—“হা, ওর আর একটা নাম আছে—মালতী।
রাধা হল ওর ছোট বাল্যের নাম—এখানে এসে বলল—
‘বিষ্ণুহা, আমার মালতী নাম নিয়ে অনেক জালা জড়িয়ে
আছে—আমি নতুন করে জীবন হুক করতে চাই—আমার
ছোট বয়সে যে নামে ডাকতে, সেই নামেই তুমি ডেকে।’
সেই থেকে ওকে রাধা বলেই ডাকছি। কিন্তু আপনি ওর
অপর নামের কথা কি করে জানলেন? ওকে চিনতেন
আপনি?”

মণিকা বলল—“বিষ্ণুহা, আমি-ই ওর কপাল পুড়িয়ে
দিয়েছি।”...তারপর সে নিজের পরিচয় সব বলল—।

বিষ্ণু বলল—“মণিকা দেবী, এই হ’ল জীবনের রহস্য বা
প্রাণেলিকা। আপনিও মনে করছেন ওর ভবিষ্যৎ সব
আপনি নষ্ট করেছেন; আবার রাধাও মনে করছে, সেই
আপনার পাতানো লগাল্য ছাড়া আর কিছুই—”

এই ঘটনার পর মণিকার মনে একটা সঙ্কোচ এল।
এই ভাগ্যলাভিত মেয়েটির প্রতি একটা সেহের টান
অন্তরব করছিল; অপরদিকে তার মনে হচ্ছিল, তার
উপস্থিতি রাধার আত্মপা লাভের পক্ষে অন্তরায় হবে।
এই যোমন অবস্থায় সে বিষ্ণুকে বলল—“আমার উপদেশ
দিন—আমি কি করব।” বিষ্ণু বলল—“দেখুন, মণিকা
দেবী।” রাধা দিয়ে মণিকা বলল—“ঐ দেবীটা
চাঁদুন ত’। দেবীর দিয়ে কেন অনর্থক আমাদের
বিড়ম্বিত করেন। আমি রাধার চেয়ে বিশেষ বড় হ’ব না।

সেই সম্পর্কে আমি ও না হয় আপনারকে কিছু-শাট বলব—
কারণ বলতে আপনি বড়ই হবেন—অন্যদিকের বড়বের
কথা না হয় নাই তুললাম।” একটু নুহু হাসি মণিকার
মুখে খেল গেল। পুত ছুঁতিন দিন বিষ্ণু-ও মণিকার প্রতি
একটু সরে আস্তরিকতার সৃষ্টি আচরণ করেছে। এর
লগাল্য জীবনের লালনা বেন একে বিষ্ণু লগ-গোজী ক’রে
তুলেছে। বিষ্ণু বলল—“মণিকা, তুমি বেও না;—আমি
কতকটা নাস্তিক—ভাগ্য বা ভগবান বিশেষ মানি না।
তবুও আমি অস্বাভাবিক তোমাদের দু’জনের সাক্ষাৎ আমাকে
অচিন্তিত করেছে। তোমাদের দু’জনের জীবন কেবল
দুঃখে ভরা। রহত রাধার জীবনের কাল সুখিয়ে এল।...
এই সময় তুমি ধারে থাকলেই রহত ও’ হুঁবী হবে—হয়ত
ওকে একটু সেবা ক’রে, ওকে ক’র ছোট বোনের নজো
আরও ক’রে তুমি-ও হুঁবী হবে।...নারীর ধর্মকে তুমি
অস্বীকার ক’রে চলছ ত’—এটা আস্তরিক-ও নয়, হুঁব-ও
নয়। জীবনের ধর্মকে যেমন নিও। তাকে অস্বীকার
ক’রে কেউ হুঁবী হতে পারে না।...”

কদিন পর বিষ্ণু-জিজ্ঞাসা করল—“রাধার অবস্থা
কেমন মনে হয়?” পরীহ ত’ ওর শাখছে-ই না। কি
মনে হয় তোমার?”

মণিকা বলল—“কি বলব বিষ্ণুহা, ওর খুবই আছে।”
(ক্রমঃ)

মহাকাব্যের ভূমিকা

নগেন্দ্র মল্ল

(পূর্ণ প্রকাশিতের পর)

এমন অবস্থা হইত যেরূপও হয় আপনাব লকরের ভাবে আগনিই কাটিয়া পড়ে। বাহির হইতে ইহা বোঝা যায় না—কাটিয়া যে পড়িল তাই সবাই মনে, কিন্তু কেন কাটিয়া পড়িল তাহা হইত অনেকেই খোজ রাখে না। আগ্নে যে ঠাকুরমা রাগ-দুঃখে নিজের মাথা খুল নিজেই ছিড়িতেছেন তাহা কি বাহির হইতে কাহারও বুদ্ধিবার বো আছে? পথ চলিতে ঠাকুরমার পাথের কাছে ঘটিটা ঠেকিয়াছিল। পাথ বত জোর আছে তত জোরেই তিনি লাথি মারিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারো যে উদ্বেগ করিয়া ঘটিটাকে অবধি লাথি মারিয়াছেন তাহা এক মাতা মৃণালিনী ছাড়া কাহারো বোধগম্য হয় নাই। আকাশের দিকে চাহিয়া ঠাকুরমা বলেন, ঠাকুর আর কত দেবী। এবার আমার নাও। আর বইতে পারি না পারের বোঝা।

সামন্তী দূর হইতে এই সব মেথিরা-তুনিরা হাসিয়া খুন।

পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তপণে ঠাকুরমার পিছনে গাড়াইয়া সামন্তী একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়াই অমনি মুখে কাপড় চাপিয়া কহিল, ঠাকুরমা সন্ধ্যা করবে চল।

—আঃ হারামখানী তোর সন্ধ্যার মুখে আগুন—বলিয়া মূৰ ঘুরাইয়া ঠাকুরমা সামন্তীর পিঠে এক ঘা বশাইয়া দিল। রাগের মাথায় কোন অকস্মে নিজের সেই সামন্তীহাতে গিয়া ঠাকুরমা পাশের বিড়ালটার গায় হুড়ুড়ি বাইয়া পড়িল। বেচারি বিড়াল, আশ্চর্যকারণে যে ভাবে পারিল সেই-ভাবেই আক্রমণ করিল—ভায় অর্ধ, নবদত্ত সবটাই পুরোহিতের সম্মানভাৱ করিল। ঠাকুরমা মাটিতে পড়িয়া গলার শব্দ হুতটা উঠে গ্রামে বাধা বাধ তুতটা বাধিয়া বিভিন্ন সুবোধক ভাষা উচ্চারণ করিয়া জানাইয়া দিল যে “শেখের সেইদিন” অতি সন্নিকট—তোমরা যে কেহ আদিয়া দেখিয়া যাও।

শাশু হু হু হইতে ঠাকুরমার আঁর্গ চীৎকার তুনিয়া ছুটিয়া আদিল। যে মাহুৎ এক দুর্ভাগ্য পুথিবীর লোককে তারপরে জানাইয়া দিয়াছে যে শমন আসিয়া এইমাত্র শমন ভারী করিয়া গেল, অতএব পুথিবী তাহার গোথে নিচিয়া পাইতেছে, সেই মাহুৎ শাশুহকে দেখিয়া মৃণাল ক্রোধে বেহটাকে একেবারে কৈটোর মত নিদেখে গুটাইয়া লইল। তারপর দলিতা কবিনীর মত কবিতা উঠিয়া কহিল,—বাঃ বাঃ হতজ্ঞাড়া, রেহ, আমার কাছ থেকে দূরে যা।

ঠাকুরমা একেবারে মূৰ অন্তরিকে কিরাইয়া বহিল যেন শাশুহ তোপে না পড়ে। সামন্তী অবাক হইয়া একবার ঠাকুরমার দিকে একবার শাশুহর দিকে তাকাইয়া বহিল। ঠাকুরমা অন্তরিকে মূৰ কিরাইয়া আছে আর শাশুহ আছে অথোবদনে মাটির দিকে তাকাইয়া।

এই সব ঘটনা দাহার উপলব্ধি করিবার সে সবই অন্তরালে থাকিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। বাড়ির আব-হাওয়া এখনই সন্ধ্যের ভাবে ভাবাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। মেঘ যেমন একদিন জল-বায়ুর ফাটিয়ে পড়ে ইহাও গুনি একদিন কাটিয়া পড়িবে; কিন্তু জলধারা কিস্তন বধন হইবে তাহা কেহ জানেনা। কিছু দিন হইতে সামন্তীও বেশ গভীর হইয়া উঠিয়াছে; সে শায়তনকে শাশুহর নাম মুখে আনেনা। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সামন্তী জলের কলসী লইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। শাশুহ নিজের মনেই কি একটা গান গুণ-গুণ করিয়া ঠিক সেই পথেই পা দিতে বাইবে এমন সময় সামন্তী গলার আঘাতবিক কণ শব্দ করিয়া একটা কানি দিল। শাশুহকে কে যেন বুঝাইয়া দিল সবিতা গাড়াইতে। সে একটা অজ্ঞাত ইঙ্গিতের সাজা পাইয়া যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হুততবের মত সবিতা গাড়ল। ঘটনাসী-মাথের দৃষ্ট এড়ায় নাই।

মাতা মৃণালিনী তপু কোশে একটি প্রাণ করিয়া-ছিল; জলে আবার ছোঁয়াচ-টোয়াচ লাগেনি ত, সাবধান-এসেছিলাম না।

সামন্তী হঠাৎ যেন স্তম্ভ হইয়া উঠিল—কি যে বল
যা, এখানে আবার হোয়াচ এস কোথেকে।

—কোথেকে আসবে ত? আমি কি বরষ বলব।
 লেগেছে কিনা তাই জিজ্ঞেসছি—কথাটা বলিয়া ফেলিয়া
 মুশালিনী নিজেই একটু লজ্জা পাইয়াছিল। কেননা কথাটার
 আসল অর্থ সামান্যের কাছে ধরা পড়িয়াছে। বাড়ির শি
 চাকরের কাছে এমন নিজেই প্রকাশ করিতে মুশালিনীর মনে
 কোথায় স্ত্রীচা বোধ হইতেছিল। মুশালিনী আর কোন বাক্য
 বার না করিয়া দোতা নিজেই দোবার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিয়াছে ঠাকুরমা মাগার বাঁপী
খুঁজিতেছেন। এখনই বৌশাইয় নাম জপিতে হইবে।
মাগার বাঁপীটি যেখানে বিয়াজ করিত আজ সে স্থান
হইতে অশাখিত হইয়া অত্র কোথায় রক্ষিত হইয়াছে,
তাহা ঠাকুরমা জানেন না। ঠাকুরমার নতুন জ্ঞান হইতে
খুঁজিয়া বাহির করিবার মত মানসিক খেঁচা নাই, মাগা
বাঁপী বধ্যস্থানে নাই দেখিয়াই ঠাকুরমা আতঙ্কিত।
উঠিলেন, কি জানি হতজ্ঞা! ছুঁইয়া দেখে নাইত। মেজ্জা
ত কিছুই মানে না কোথাও বেসিয়া শেষ নাই ত !
ঠাকুরমা নিজেই মনোব চিন্তার খাধার একই স্থানে বাহ-
বার খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন আর বিড়-বিড় করিয়া কি সব
বকিতেছেন। সামখী ঘরে ঢুকিয়া যেখান ঠাকুরমা ইতস্তত
খুঁজিয়া-খুঁজিয়া কি সব বকিতেছেন। শিখন হইতে সামখী
সজায়ে ডাক দিল, ঠাকুরমা।

ଡାକ୍ତରୀ, ଚେକିଙ୍ଗ ଓ ଟିଞ୍ଚି ଓହସ ବଢ଼ିଲ, ଏମ୍ । ।

—তোমার মামার বাঁপী ঐ খানটার বেগেছি,
শেয়েছ ত।

ঠাকুরবা ঘেন আকাশের ঠান হাতে পাইলেন।
কৃতজ্ঞতাঃ তাদিবা গড়িয়া নিয়েই বলিয়া বাইতে লাগি-
লেন—তুই না ধাকসে এ বাড়িতে আমার আর একঘণ্ডও
ধাক। চলেনা। ঠায়ে জলের কলসীটা আবার ছোড়া
হুয়ে যেবিন্ত। বাড়িটা ঘেন রেজ্জাবনা হয়ে উঠেছে।
কানলায় কান পাতিয়া মাতা মুনালিনী দূর হইতে
সবই শুনিতে পায়।

শাপটা লতার বত জড়াইয়া-জড়াইয়া বাহিয়া মনসার
ঘট, উঠিতেছিল ঠাকুরমা তাহা দেখিতে পার নাই।
জাবনের শেষ বেলায় মনসামকল পুথি তনিয়া ঠাকুরমার
একটু-আবটু ঘুমেব কোঁক আসিয়াছিল। মামতী তুল-
সভ দিশাইয়া যাক্য পারিবাছে তাহাই পড়িয়া শুনাইয়াছে।
মৃণালিনী একটু আলগা হইয়া পড়িয়াছে। ইংলিন: ঠাকুরমা
যাহাকে বেশ করিয়া বিবস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার
ভায়দায়া মৃণালিনীকে বক্য করিতে হইবে। কুসের
একটা কীটসেই পাপড়িকে ছিড়িয়া কেলিতে গিয়া
ঠাকুরমা গোটা পাছ ধরিয়া টান দিয়াছেন। মৃণালিনী
বুঝিবাছে ঠাকুরমার আকস্মিক লক্ষ্য কেবল শাপড়ই নহে।
তাই নীরবে সবটাই ছুই হইতে লক্ষ্য করিবে মনস
করিয়াছে। ঢেট যমি উঠিয়া তাহার উপর দিয়া
বহিয়া যায় তবু নিশ্চল বহিবে, পলিবাটারি তর পড়িবার
পূর্জাহেই সকল হুইয়া শুদ্ধিয়া কেলিবে। তবু মনটাকে
দ্বিগ করিবার লক্ষ্য করেকটা দিন পুথি পাঠ হইতে সে
ছটি লইয়াছিল।

শ্রাবণের মেঘ আলোর নরখা বহু কবিরা মিথ্যে বীড়ি-
মত খণ্ডনকারী শুক কবিরাচ্ছে। মধ্যে-যথো দু'একটা
সর্গনে নিজ পৌকষের পরিচয় দিতেছে। সামন্তীও
তুলন্ত পুঁবি পাঠের সাথে একটু-আট্টু বিম্বাধি
লইতেছে। তন্ত্রা হোগটা ঠাহুঝা হইতে লঞ্চিত-
হইয়াছে। সামন্তী পাশে বসিয়া চন্দ্র ব্রজিয়া সমানে
ঢলিতেছে।

হয়ত শাওর তাড়িয়াছিল আর একটু হইলেই সাপটা।
ঠানুসমাকে ছোঁবল মাঝিবে। তাই সাপটা কোন
বকমে ঠানুসমার কাঁধে ঝাটাইয়া সোজা সাপটাকে লক্ষ্য
করিয়া ছুড়িয়া মাড়িল। দল বাহা হইবার তাহাত
হইয়াছে। ঠানুসমা ও সামন্তী অর্ধ তস্ত্রার মত একে
অন্যকে ঝড়াইয়া ধরিয়া চোঁচাইতে লুফ করিয়াছে।
সাপটা মুহূর্তে কোদ করিয়া উঠিয়া সোঁ করিয়া পল্লের
মধ্যে ঢুকিয়া গড়িয়াছে। পটে আকা মনসার খট তাড়িয়া
বন বান বান, ঠানুসমা ও সামন্তী কপিকের অন্য কাণ্ড-
জানহীন চীৎকার বন্ধ করিয়া চক্ষু রপড়াইয়া বন

তাকাইল তখন ভয়ে আতঙ্কে উঠরই শিরষিগা উঠিল;
ঠাকুরমা ও সামন্তী মাধব হাত দিয়া, প্রণাম
গণিল—এখন উপায়! আর কিছু নয় মা মনসার ঘট!
সাক্ষ্য দেখত। স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিবাহ করিয়া ঠাক-মদার
ঘনে-ঘনে চৌদ্দভিগা সব হারাইয়াছে। ঘটনাটো এই
মাত্র সামন্তী পড়িয়া শুনাইয়াছে। অতএব প্রথম করনার
ঠাকুরমা ধরিয়া লইলেন যে অহুতপ ঘটিবেই। ঠাকুরমা
মাধব হাত দিয়া হাথ হাথ করিতেছেন; সামন্তী কহিতেছে,
থাম, ঠাকুরমা থাম।

দুর্গাশিনী ঠাকুরা শুনিয়া ক্ষতপদে যতনে আসিয়া
হাশির। ঘটনা বেরিয়া কি যে করিবে তাহা স্থির
করিতে পারিতেছে না—এ কী! স্বপ্নে আসিয়াছিল।
এইরূপ ঘটনা নিতাইনমিত্যিক ব্রিটিশ পরিচয় পড়িবে
ভাবিতেছিল। কিন্তু আলিফার ঘটনা যেন একটু
অস্বস্তপ? স্বপ্ন ভাঙ্গা ঘটেই পান তাকাইয়া ব্রিটিশ,
সমুদ্র বিপদ, আর রক্ষা নাই।

শাহু দর দর করিয়া কপিংতেছিল। আবদুল
তাহাকে ধাঁধে হাত দিয়া পাছের তলায় বসাইয়া দিল।
খড়ের পাহার সামনে আসিয়া শাহুদর পা ছম ছম করিয়া
উঠিল। সাপ ইহার মধ্যেও বাস করে। সম্ভবত ইহা
জাত হিসাবেই হিংস্র, একের প্রতি অত্যধিক রাইলে
অন্তে হুত তাব প্রতিশোধ লইতে কহুর করে না।
অতএব সাপ মাজেই শাহুদর তর ও তুশিতার কারণ হইয়া
পাড়াইল। আবদুল ক্বাইয়াছিল, ডর কি, হাতে লাঠি
খাতিতে সাপ আবার কি করিবে, শাহুদর ঘনে-ঘনে
অবিসারের হাসি হাসিয়া অব্যাহা দিয়াছিল। মা মনসার
কোথ, কাছাকাশেও বেহাই ঘের না। বেহলা সাহা রাহি
আগিয়া-আগিয়া লখিমপুরকে পাহারা দিয়াছিল, কোথা
হইতে যে পোহার বাসর ঘরে কাল নাগ প্রবেশ করিয়াছিল,
তাহা কি বেহলা জানিত? না কোন মতেই জানিবার
অবকাশ থাকেনা। শুধু তাবিবারই অবকাশ থাকে।
শাহুদর আবদুলকে কহিল—তুই বাড়ী বা।

আবদুল শুধাইল, তুই?

আমি?

হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ এখিয়া শাহুদর উত্তর করিল, আমি—আমি
একিৎক ব্যক্তি, স্থির আখার। শাহুদর আর পাড়াই
নাই, আবদুলকে আর কথা কহিবার অবকাশ না দিয়াই
সে পা বাড়াইল।

শাহুদর ভাঙ্গা মন্দিরটার ক্যাপা তোরণ বন্দ করিত।
সমস্ত দিন ভিৎকা অথবা ভিৎকা না করিয়া সন্ধ্যায় মন্দিরে
কিরিত। তারপর মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া কি করিত
সে সবচেয়ে বহু পর আছে, লোকেরা ক্যাপা তোরণ
সবচেয়ে বাহা বলিত সে কথা না হয় থাক। কিন্তু যারেরা
হুই, ছেলেকে তুম পাড়াইবার সময় বলিত ঐ, ক্যাপা
তোরণ আসিয়াছে, তাহার নাকি চোলে খরা কাম।
পদায় নোভুন পুল বঁধা হুত হইয়াছে। একশ একটি
নর-মুত না হইলে পুলের কাচ দশগ হইবে না। ক্যাপা
তোরণ তাহার খোলায় করিয়া সেই নর-মুতের উপায়ন
শিষ্ট বহিয়া বেড়াইত। ঠাক পাঠলেই মুগে কাশুত ভাঙিয়া
বিয়া শিঙকে কোলার পুচিয়া লয়। শাহুদর এমন কথা
ক্যাপা তোরণ সবচেয়ে শুনিয়াছিল ঘটে, তবে অনেক ছোট
বয়সে। সে বয়স কাটিয়া গিয়াছে, লোকলের ভয়-ভাবনা
একালের পরিবর্তনের খোঁজা বোণাইতেছে, তবু যেন
মনে হইল, ক্যাপা তোরণ আলিফাল হুত অস্ত বিত
করিয়া থাকে। সবাই বলিত, ক্যাপাটা “তত্ত্ব-মন্তব” কিছু
জানে, ওর এমন অনেক মন্তব জানা আছে যাতে বিপদ
কাটাঁয়া উঠা যায়।

শাহুদর বিপদ হইতে জ্ঞান পাইবার আগায়ই
ছুটিতেছে। বত মন্দিরের কাছে আসিতেছে ততই
কুতর মধ্যে চিপ চিপ করিয়া কে যেন হাতুড়ি পিটাঁইতে-
ছিল। ক্রমশ দল বেহ বাগিয়া কখন হুত হইল।
শাহুদর কেন যে ক্যাপা তোরণের কাছে আসিয়াছে তাহা
সেবার বার ঘনে আঙড়াইয়া ও সুবের তাহার তুটাইয়া
তুলিতে পারিতেছে না। ক্যাপা তোরণ তখন পাখায়
দর দিয়া, বোম ভোলা বোম ভোলা বলিতে শুরু
করিয়াছে। পাশে চার পাঁচটি লোক গোল হইয়া দিয়া
অর্ধ-নিমিত্ত চোপে শুনিয়াইতেছে। হঠাৎ ক্যাপা

তোষণ গলা দেওয়ার সবাই চমকিয়া উঠিয়া রক্ত
বরিল—কি হ'ল বাবা? চিমটা দিয়ে জলধ কাটো
খোচাইয়া আগুনের ছসিক আকাশে উড়ানাইয়া কাপা
তোষণ হাসিয়া উঠিল। পাশের সিঁড়ি হাতে লইয়া বার
কয়েক ঢুকিল।

গিয়ার লব্ধ গনিয়া দায়ুহ কাপিয়া উঠিল। অল্প তীত্র
বহ শিঙা হইতে বাহির হইল; তৎক্ষণে দায়ুহ কাপা
তোষণের একবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। কখন,
চিমটা, বাঘের ছাল, গেকচাৎসন ইত্যাদি সবই আছে,
এখানে কোলাটার মধ্যে কি যে আছে—তাঁহা ভগবানই
জানেন। শব্দহু সন্ধিহু দূরিতে বার বার ঐ কোলাটার
প্রতি তাকাইতে ছিল। কাপা তোষণের কোলা দেখিয়া
সেও একদিন ভঙ পাইয়াছে। কোলার মধ্যে কি ভগ্ন বহুত
রহিয়াছে তাহা যে আশিও জানেন না। মনে হইতেছে
পুথাতন ভট্টা আবার নৃতন করিয়া গান্না গাহিতেছে।
ইহায়া যে কোথায় এতদিন লুকাইয়া ছিল জানা নাই,
অথচ আত অবলা পাইয়া পুথাতন ভগ্ন বহুতপে মনে
উপরে আঁকিয়া বসিয়াছে।

কাপা তোষণ কোলা হইতে মড়াহ খুঁটিয়া বাহির
করিয়া সামনে বসাইয়া দিল। শব্দহু দেখিয়াই আঁখকাইয়া
উঠিল একটা হাড় বিয়া তাহাতে বার কয়েক ঠোকাঠোকি
করিয়া ঠুং ঠুং উচ্চারণ করিল। আবার হাড়-
পানি কোলার পুথিয়া রাখিল। পাশে দায়ুহা বসিয়াছিল
তায়ুহা বলাবলি করিতেছিল, বাবার কি মহিমা ঐ যে
বহু যেক্ষ দিগ্গহর ওর মৌলন্তে—বলিতে বলিতে সেই ব্যক্তি
একেবারে বহুজাজর হাসিতে মাটিতে বেন লুটিয়া পড়িল।
কাপা তোষণও মুখ নিচু করিয়া একটু হাসিয়া লইল। যে
ব্যক্তি কথা করিতেছিল সে কুলের মালা গাঁবিতেছিল। রক্ত
মথার মলা ভাড়া পুজার আর কোন উপকরণ নাই। অগ্নি-
কুণ্ডের কাছেই গাঁহার কলিকায় গাঁজা লাগানো হইয়াছে।
ভোলানাথ কলিক তাহলে তাকে আগুন দেই কি বল।
চক্ষু টিপ দিয়া দিগ্গহর বুকাইয়া দিল এখনও সময় হয় নাই।
অদমবে তাকে আগুন দিলে—বাবার ক্রোধের দকার
হইতে পারে। অতএব সময় ও সুযোগ বুঝিয়া

তাকে আগুন দিয়া বাবার সামনে নথিতে হইবে।
কুলের মালা মন্থুণের উপর বসাইয়া কাপা তোষণ
ছুই গাল কুলাইয়া, বহু বহু শুক করিয়া দিল। শব্দহু
সব লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু সে কথা বলিবার অবসর
পার নাই। ভীত ও সহত শব্দহু কোঁতুলী হইয়া উঠিল।
ইতিমধ্যে ভোলানাথ কলিকার অগ্নি সংযোগ করিয়া
কাপা তোষণের সামনে বসিয়াছে। কাপা তোষণ
বসু করিয়া কলিকাটার পিছনে বানিফটা ন্যাঁকড়া গুজিয়া
দিয়া, ছুই হাতের ডাকের মধ্যে রাখিয়া লজ্জাবে গোটা
ছুই টান রাখিল। কলিকার আগুন বসু, করিয়া ললিয়া
উঠিল, বোঁধা ও তীত্র পক্ষ চারিদিকে চড়াইয়া পড়িল।
দায়ুহর নাকে বোঁধা ও পক্ষ চুকিয়া একটা
তীত্র অবস্থিকর অহুতুতি জালিল। সে সুখানিক
কিরাইয়া দাস বহু করিল, তাহিল হুত দাস বহু
করিলে এট অবস্থিকর তীত্র পক্ষ হইতে রেহাই
পাইবে।

কাপা তোষণ মুখ নীচু করিয়া বোঁধা ছাড়িতে
ছাড়িতে ভিজাসা করিল, কী যে বাটা। সে আর
কথা না বলিয়া একেবারে কাপা তোষণের পা
লল করিয়া জড়াইয়া ধরিল। ছুই চক্ষু কোণ-
বাহিয়া অল্প পড়াইয়া পড়িতেছে। কি অপরাধ যে
সে করিয়াছে তাহা নিজেও স্মৃতি জানেনা। ঠাকুরদায়
জীবন বক্ষ্য করিতে গিয়া হুত অপরাধ হইয়া
থাকিবে। কিন্তু সে ত ইচ্ছা করিয়া মনলাব অপমান
করে নাই। মনলাবেরীকে পূর্জও বেঘন ভয় ও ভক্তি
করিত এখনও তেমনি করে। কিন্তু ঘট ডাকিয়া
অবধি ভক্তি কর্পুণের মত উবিয়া গিয়াছে। ভয়
জাবনা ছাড়াও মত অবিযাব অহুদরণ করিতেছে।
রেহাই পাইবার আশায় সে বাঁচী হইতে পালাইয়া এই
নির্জন স্থানে আসিয়া উপস্থিত, কাপা হুত কাপা
তোষণের কাছে এমন কোন বহুত সন্ধান দিলিখে দায়ু
সহে থাকিলে আর সাপের ভয় থাকিবে না। সাপ সেই
ওধুধের গুহে পালাইয়া দাঁড়াবে। সে বহুবার গনিয়াছে
দায়ু সন্ধানীর কোলায় এমন অনেক ওধু থাকে।

ক্যাপা ভোবের শ্য ভাইয়া দিয়া শাস্ত্র তাহার
মুখের দিকে বানিকল্প তাইয়া বহিল। তারপর
সে অগোচ্য ভাষায় কীপ স্বরে কি যে বলিয়াছে তাহার
মনে নাই। এক হুকরা আলোক লতা শাস্ত্রের হাতে
জ্বালাইয়া দিয়া ক্যাপা ভোবের বহিল, যা ব্যাটা বা।
আর ভর নেই। জ্বালায়ের সত্য্য তখন মন্দিরের ছাতে
সুজিয়া পড়িয়াছে। বিভ্রা জ্বল সুজিয়াছে। আর বেলা
নাই। শাস্ত্র সতরে বীয়ে বীয়ে নির্জন স্থান পরিভ্রমণ
করিল। স্বাক্ষরকের কথা মনে পড়িয়া যায়, যাকে
নাগপাশে রাখিয়াছিল। সে এক গুরু পক্ষী কপাল-ই
বিপর হইতে উদ্ধার পাইয়াছে।

ঠাকুরমা প্রোক্ষিত করিতেছেন। পূজা বস্ত্র পোড়ারে
হইতেছে, মনসার বট নৃতন করিয়া বসিয়াছে, ঠাকুর
মশাই কখনো বোটাঘটি মন ঘের নাই। পাঠা বলি হইল,
চাক বাহিল। ভাড়ে করিয়া গুণ আসিল, যা মনসাকে
গুণ কলা দিতে হইবে। প্রকাণ্ড একটা পায়ে গুণ ঢালিয়া
ও আর একটা পায়ে জল ঢালিয়া দুই-ই পরিপূর্ণ করিয়া
ঠাকুরমা মণ্ডনের হায়া বস্ত্র করিয়া বসিলেন। কেননা
এখন কাল-নাগ আসিবে। সে গুণ খাইয়া মনের
পায়ে বিধ ঢালিয়া চলিয়া যাইবে। ঠাকুরমা পাহারায়
বাস্ত, সেই বিধ-বিলিত মনেরপায়ে যেন কোন

প্রকারে অস্ত্র কোথাও না পড়িয়া যায়, খুব
সাবধানে এক বনের মধ্যে ইহা রাখিতে চাইবে। স্থান
পূর্ণ হইতে দ্বিধ করা আছে। এখন কাল-নাগ
হায়া করিলেই হয়। কপা করিয়া হুটু-নিঃশেষে পান
করিয়া মনের পায়ে বিধ ঢালিয়া রাখিয়া গেলেই হয়।
বিপরটা এই যে, ঐ বিধ ঢালিয়া না খাওয়া পর্যন্ত ঠাকুরমার
নিশ্চিন্ত হইবার কারণ নাই। কেননা এই বিধই,
শাস্ত্রকে কাকে পাইয়া কালনাগ ঢালিত। যেনভাঃ সবে
লতা করিয়া লাভ নাই একথা ঠাকুর-মা বহবার
বলিয়াছে—আর তুচ্ছাঃ প্রমাণও ত হইয়াছে। সন্নিহিতকে
কি লোহার বালর করিয়া বাঁচাইয়া রাখা দিয়াছিল।

সামন্তী মিজাসা করিল, যা ঠাকুরমা, আমাদের এই
শাপটা লেজ কাটা?

ঠাকুরমা বলিলেন : ই। একেবারে আসল সেই
কাল-নাগ হার লেজ বেহলার হাতে কাটা পড়েছিল।

সামন্তী অবাধ হইয়া পুনরায় মিজাসা করিল। তা
সেই থেকে ও বেঁচে আছে?

ঠাকুরমা বিজ্ঞের মত উত্তর দিলেন : তা সেই থেকে
ও বেঁচে থাকবে কেন? ওর বংশের সব লেজ কাটা।
সামন্তী অবাধ হইয়া লইলেন।

(ক্রমিক :)

কাব্য

শ্রীমদ্ভজ্ঞান বিখ্যাস

অন্ধকার হৃদয়লোকের পথ হাতড়ে শ্রীমন্ত এগিয়ে চলে। দীর্ঘ তিন বৎসরের দাতারাতের অভ্যস্ত পথ, তাই কোন অসুবিধা হয় না তার। বগলের নীচে নতুন কেনা শাড়ীটার অস্থির অহতব করে শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘ-বাস ছাড়়ে। অনেক কষ্টে, অনেকখানি বেহেরে হত জল করে সে ভোগাড় করতে পেরেছে শাড়ীখানি। ভোগাড় করেছে হাটে, আর সাথে সাথেই গুণের পাহাড়টাও তার মাথা চাড়া দিয়ে বেশ খানিকটা উঠে গেছে আকাশের দিকে। তবু তাকে কিনতে হয়েছে, সেই অর্থের বিনিময়ে ধুনা দিতে হয়েছে কালো বাজারের দরজার।

একটা অহুতুতিম্ব প্রাণিকর আবিলতার সমুদ্র বেষ্মন আচ্ছন্ন হ'য়ে আসে তার। মাঝার জন্ত ছুৎ হয় শ্রীমন্তর, বেচাখিকে আশ সে যে লাহনা দিয়েছে, তার জন্ত সমস্ত মনটা তার আশ্রয়ানিতে ত'বে উঠেছে, নিরাক্ষর অস্তর্য্যাহে সে যেন পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কি ক'রে যে সে পারলো মাঝার গায়ে হাত তুলতে! অথচ সকলবেলার সেই প্রচণ্ড পানব ক্রোধের কোন পরিমাপই সে এখন করতে পারে না। ক'কেই বা সে বেশে যাবে এ'রন্ত! ক'কে করবে মারী! মাঝার কথা হেবে ছুৎ হয় শ্রীমন্তর। তাবের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ পথটা মায়াও তার সাথে সাথে সমান তালে হুত্ব এসেছে নিম্নম বারিভ্রমের সঙ্গে; আর আশ্রয় শ্রীমন্তর সাথে সে'ও ভেঙ্গে পড়েছে প্রবল হতাশার, অপরিমিত নৈরাশ্রের ভায়ে।

সেই কবে থেকে শ্রীমন্ত যেনে আসছে মাঝার নির্বিকার সহনশীলতা। মুখ ফুটে যে বলেনি কোন দিন একটা কথা, জ্ঞানার নি কোন বিধরে এতটুকু প্রতিবাদ, সেই বোঝা মেয়েটি আশ্রয় নারীত্বের অসহ্য অবমাননার আগমনের

নিখার মতই লুকলুকিয়ে উঠেছে। এক টুকরা শতদ্বিধ জাকড়া দিয়ে সর্ধাণ ঢাকবার ব্যর্থ প্রয়াস শ্রীমন্ত কতদিন প্রত্যক্ষ করেছে, তবু সে কিছু করতে পারে নি,—সামর্থ্য ছিল না তার, শুধু হু'চোখ করে দেখেছে নারীত্বের অবর্ণনীয় লাহনা। অবশেষে বোঝা মেয়েটি করেছে বিত্রোল, অসহনীয় বিচারে সে আঘাত করতে পেরেছে শ্রীমন্তের পুরুষত্বের দরবারে, নারীত্বের অভিমানে।

একটা অপ্রকৃত কাগর স্রোত শ্রীমন্তের ভিতরে উবেল হ'য়ে ওঠে। -- কিন্তু কি করে বুঝবে মাঝা আশ কতখানি অপমান, কতটা লাহনা সহ্য ক'রে সে ভোগাড় করেছে কয়েকটি টাকা এই শাড়ীর জন্ত। তিনুকের মত সে আশ হাত পেতে বেধিরেছে বন্ধুত্বের মোহের বোঝে। মানবাস্ত্রায় এই নিরাক্ষর অপমান,—এর কতটুকু বোস্তবার ক্ষমতা আছে মাঝার।

নিম্নল কোঁত আশ গ্রানি তার অহুতুতির আঘারে কেনামিত হ'য়ে ওঠে।

পথ হুমিয়ে এসেছিল; অন্ধকার বাড়ীর দোর গোড়ায় কিছু সময় সে অর্ধদীন ভাবে ঝাঁড়িয়ে থাকে, তারপর চমক ভেঙ্গে একসন্ধ্যা ভেতরের ঢুক যায়।

কোথায়ও এতটুকু লাহনা নেই; তবু বাড়ীটা যেন গভীর ঘুমে অচেতন। আশ পারামিন অভিমানাহতা মাঝা সে শুধু কৈয়েছে শ্রীমন্তর তা' নুততে ঘেরী হয় না। কয়েক ভেজানো দরজাটা ঠেলে দিয়ে সে অন্ধকার ঘরটা'র ঢুক পড়ে, তারপর আশ্রয়ে হুইচ টিপে আলোটা আগিয়ে দেয়।

দ্বিত্ব ঘরে ত কেউ নেই। অপরিদর দরখানি নিঃসঙ্গ একাকীত্বের নিখর। "শ্রীমন্ত কিছু আশ্রয় হয়। একটা অমানিত আশ্রয়র পরীয়াটা তার শিরু শিরু করে ওঠে। কোথায় গেল মাঝা। কয়েকটি নিম্নল মুহুত্ব, একবার মনে হয়, অন্ধকার রাগাধরেই-হয়ত পড়ে রয়েছে অভিমানিনী মেয়েটি।

শ্রীমন্তর সঙ্গরমান পুষ্টিটা উল্ল'পনে সহসা স্থির হয়ে

যায়। কি বেন বলতে গিয়ে তার কথা আটকে
যায়। কানীও হড়ি গলায় নিয়ে নিশ্পন্দাবে স্থলুছে
মাথার শীর্ষ নয় তল্ল-বেহটা। জন্গিওট। ঈশ্বরের

গলায় কাছে এসে হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বেশ
বেন।

নির্বাক পুতুগটি শুধু চেয়ে থাকে, হুঁচোখে তার
এচও বিজ্ঞান।।...

কুসুম-প্রশস্তি

প্রিয়াকীর্তন কর্ণকায়

[১]

ছায়াবেয়া কোন উপবনে বসি বামাইলে বীণাবাদি ।
লক্ষ হিমায় ধনিয়া উঠিল স্বপ্নের তারি বাদী ॥
তোমার পানেতে কোটে মনোবনে কতনা নৃতন ছন্দ ।
বুকুলের প্রাণে বুকুলের বনে ভাবে ওঠে মুগ্ধ গন্ধ ॥

[২]

ভাষা-ময়-কবি মগত-সভায় ভাষা দিলে হুঁরে হুঁরে ।
বাঙালীর ঘরে ভাঙা বীণীবাদি বাঁধিয়াছে মধুপুরে ॥
বঙ্গবাসীর হৃদয়ে সেখানে নব বিশালীর সন্ধ্যা ।
স্বর্ঘ্যমুখীর অগ্রখানিতে তুটিল রজনীগন্ধা ॥

[৩]

"বন-ভুলদীপ্তে" মক বাঁদিলে জাগাতে সখার প্রাণ ।
জদি শতবলে স্বরে লুখা তার ওঠে জাগরণী গান ॥
নৃতনের হুঁরে নৃতন হাতেতে শালাও বাণীর ডালা ।
বঙ্গমাতারে হাসাও স্বপ্নে মুকুটায় গাঁথি মালা ॥

[৪]

নবাক্ষর রাগে আঁকো আঁখি জ্বলি নৃতন যুগের ছবি ।
কি ভাষা তোমার দিব উপহার নহি আমি মহাকবি ॥
ঐটি যদি কিছু হইবে থাকে মোর কথ্য কোরো অপরায় ।
সাগরের বুকে আলো-হাসি দিবে শেখ তুলিও নাদ ।

* ১০১৪ সালের কান্তন মাসে কবির প্রশস্তি উপলক্ষে এই প্রশস্তিবাদি শিল্পী কবিকে উপহার বিরাহিলেন ।

অভিশপ্ত

ঐশ্য্যক্যকুসুমার ভট্টাচার্য্য

ওরে উন্নতশির !—
হয়েছিল আত্ম কথলিত তুই
হাতিশ্য সেনানীর ।
বহি তোর বর হুত্বাব ভর,
নত হবে পড়—কি জানি কী হবে !—
বহুদূরে শাবিত কৃপাণ
দুর্ভাগ সেনানীর ।
মুহুর্তে তুই লুটাবি ধূল্য
ওরে উন্নতশির !

ওরে বিপ্লবী বীর !
কশ্যপাতে তোর শীর্ণ শরীর
তবু নির্ভীক,—বীর !
সমাজে নাইসে আর তোর ঠাই
আকাশলন আত্ম মিছে হবে ভাই
বগুণ তোর হবার তো নয়
বিধান বেঁটনিষতির—

পরাক্রম তোর বিধাতারই কান
ওরে বিপ্লবী বীর !

অমলিষ্ট বীর !
কুখ্যাতুর তোর শীর্ণ উদর
তবু তুই গভীর !
অশুণবমাণু খবে খবে কাশে
হয় যে চূর্ণ আত্ম অতিশাশে
হাতিশ্য-কায়া-বশনে আত্ম
তুই যে বন্দী বীর !—
লাঞ্ছনা বত রয়েছে লগাটে
তবু তুই গভীর !

ওরে নির্ভীক বীর !
নিষ্পত্ত তোর চোখদুটো আত্ম
তাই—প্রশাস্ত-বীর !
কক্ষ-কশের গুচ্ছ ধরিয়া
হলিন বগ্ন ছিঙ্ক করিয়া
সবলে বৃত্তা হংকার দিহা
টানিতেছে হিড়হিড় !
অভিশপ্ত, এ জীবন যে তোর
তাই প্রশাস্ত-বীর !

রামপ্রসাদ*

শ্রীকালীদাস রায়, কবিশেষকর

দুদিনে আদি ভোষারে 'রহি'
 অলে তব বীণ অমা বজ্রবীণ
 সারা শতাব্দী উজল করি ।
 হর কলেবর সরোবর 'পরে
 কোকনর বৃগু ছটাইলে তুমি
 ওগো মধুকর তব গুণনে
 পাখো মূৰ্ছিত বঙ্গভূমি ।
 ভব-সংসার এখানে ওপারে

পড়ালে আর গৃহ সংসারে
 উক্তিও সাথে উক্তি মিলিয়ে
 শক্তির সেতু বেখেঁচ গড়ি ।
 স্তাম্যর চরণই চরণ লক্ষ্য
 পরম লে আবর্ষ ময় ।
 স্বর্ণেয়ে তুমি তুচ্ছ গণেছ
 স্বর্ণেগরে তাঁর করনি ভয় ।
 তক্ত সত্যর তুমি আদি কবি
 রক্ত সত্যের করেছ হৃদয়িত
 স্তায়ানাদ্যন্তে অমর বর্ষ
 আশ্রিও বিতরে পাথর কড়ি ।

* দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ স্মৃতিস্মৃতি পট্ট ।

সব-না-পাওয়ার দেশ

অমিরজীবন সুখোপাধ্যায়

সব-না-পাওয়ার দেশে আছে কোঠাবাড়ী
 সাধারণ বাড়ী নয়—অজস্র প্রাসাদ সারি সারি
 আকাশের ওলা ছুঁতে ছুঁতে
 'বেঁধা বেঁধি ক'রে ক'রে কতো আছে গব-বাট জুড়ে !
 কতো রঙ—রঙে, রঙে, কতো ছবি কতো না বাহার
 পাখরে-লোহার মিলে দস্ত কতো তার—
 মর্মর-স্বরের মাঝে মেগে আছে মেঘচুড়ী ঐশ্বর্য়ের রেশ—
 অনেক কোঠার ওলা এই পৃথিবীর বুক
 কতো সব-না-পাওয়ার দেশ ।

এক কোঠাবাড়ী, তবু মাছবেয়া পথে পথে ঘোরে
 মাছবেয়া ঐতে কাপে, অলে ভেজে—
 ঘোরে ঘোরে গোড়ে—

দিনের মূলির মাঝে ঘুরে ঘুরে ডিকা-অন্ন মাগে
 - নক্ষত্রের দিকে চেয়ে স্নানভরা দীর্ঘ রাত্রি কাগে !

মনে-মনে, ছবির-ছবিরে
 নিঃশব্দ শূন্য করে সারাভা বিস্তার
 পাছের আড়ালে আর সেতুর ঠাঁধারে ব'রে-স'রে
 তবু বকে নিতে তব দীর্ঘ-জীর্ণ প্রেতনীর তার !
 প্রতি বত-কীটে জাগে কামনার পাট-চকলতা—
 কড়ালের সূঁচ-সাথ—মুখে নেই কথা—
 সেখানেও মরে শিত ! তারপরে শবের আছরানে
 এই সব-না-পাওয়ার দেশে—
 কে কোথায় ভেলে বাৎ—কেউ নাচি মানে ।

পৃথিবীর এই সব-না-পাওয়ার দেশে
 হাসে মাটি অনেক কলসে
 অনেক সরু আর অনেক সোনার আর অনেক আবেশে
 স্নানভরা ওলা-বুক টলে !
 এখানে উদার মেঘ বহে মেঘে ঢেলে বাহু জল
 এখানে উর্বর ক্ষেত পশু-পর্বে করে টলমল
 কৃপণতা নেই কোনওখানে—
 এখানে হেমন্তবাতী পাখীরা আনার গানে পানে ।

এখানেই মাঠ ভ'রে গ্রাণে-গ্রাণে অনেক উৎসব
ভরা-মাঠে ঘুৎ-ঘুৎ অনেক আশার হর্ষরব ।

এত ভরা-মাঠ, তবু ঘরে ঘরে হাছাকার জাগে
বিনের হুগির মাঝে মাছবেলা ঘুরে ঘুরে ভিক-অর মাগে,
অঁর জালায় তারা কালো—

বুকে-বুকে, চোখে-চোখে নিভে আসে জীবনের আলো !
তবু হারি বাঁচার বিশ্বাসে

একটু ব্যস্তের কথা কখনও বা পথে পথে
খুঁজে বার শব্দচরী দু'বা পলকসের পাশে পাশে—
কখনও বা আপনায় দুঃখ নীচ হতে
নারী খোঁজে শেষ পথ : অত্যাধনা বেহের ক্রেতাবে
—অবসন্ন-অভিসারে ! অসহায় বেবনার ভাবে

সকোচ-সংকট-বন্ধ তার
হস্তিকার মত নহে । কবিতা পারে না অস্বীকার
তবু এই জীবনের ।

উল্লস-সম্বন্ধে বেধা দুটো হাসে, তবু তারা আশা নিয়ে কেঁরে
সব-হাঙ্গা ভিখারীর বেগে ।

পৃথিবীর এই সব—
এই সব-না-পাওয়ার বেশ !

সব-না-পাওয়ার বেশ হুপে-বসে-গছে হুয়ে-গানে
প্রতিদিন যন্ত্রণার ; অনেক বসন্ত বহি' আনে
কতো ফুল কোটার বিলাস । কতো আছে
উপভোগ-সমারোহ ; কতো না উৎসবে, কতো কাজে
অমল সম্পদ, আর হেলায় অমল অপচর !

দিনে দিনে পূর্ণ হ'ব
হৃদয়ের ভাঙার কতো । কতো লুপ্ত-ঘুৎ করে হাসি
কমতার চেতনার । জীবনের বাঁশি

সব-না-পাওয়ার বেশ মাঝে
দক্ষিণ-বাতাস, আর
হুগুগু, মেঘদুস্ত-নভোতল পূর্ণ ক'রে বাজে !

তবু এই সব—
এই সব-না-পাওয়ার বেশ হুড়ে ওঠে শুধু ক্রান্ত কলরব ।
এখানেই অগণিত গ্রাণ
লভিল চরম অশ্রুমান :
কতো না কিশোর
বন্ধের সোণিত মিহে পথের হুগিরে করে রাঙা,
এ জীবনে না হাসিতে ডোব
কতো না তরল হ'ল নীচ ভাঙা, সব-যন্ত্র-ভাঙা ।
আলোর পিপাসা বুকে বহে
এখানেই মাছবেলা মিছে এক পোনালী-আগ্রহে,
জীবনের সত্য-অধিকারে
আপন প্রতিষ্ঠা আর আপন কল্যাণ খোঁজে মিছে, বায়ে বায়ে !
এখানে এমন পূর্ণতায়—
মাছবেলা এত বিজ্ঞ, এমন শব্দিত হ'ল, হায়—
বন্ধনার বিবে কালো ! হৃদয় আসেনা তার ঘরে
স্বতর্ক প্রচলন বত ব্যর্থতার বোঁদীমূলে বাঁধা খুঁড়ে মরে—
বন্দী আত্মা কাঁদে অশ্রুমান :
দুঃস্বপ্ন-স্পর্ধা বত অস্ত্রাঘের নির্বিচার
আত্মকলন ওঠে সবখানে !

এখনও এ পৃথিবীতে বহু আছে এই সব-না-পাওয়ার বেশ :
এখানে তো সবই আছে—
তবু আছে মাছবেল চিরকাল না-পাওয়ার ক্রেশ
বিশ্মিত এ দৃষ্টি চোখে চেয়ে যেখি পৃথিবীর
—এই সব-না-পাওয়ার বেশ ।

মায়া কুটীর

খ্রিস্টোজিনী-প্রভা বসু

আখ্যার কুটীর খানি নদীর তীরে
উদ্যম চকল বার বরবেগে নদী-ধার
চকল বীচিমালা চপল নীরে
ভেগে ধার বৃকে তবী উড়াইয়া পাল
কণ্ডারী দৃঢ় কণ্ঠে ধরিয়াছে হাল
চলেছে কোন ঘেমে দিব্যানিধি ভেগে ভেসে

ভিড়িবে অহশেষে কত যে নূরে
গপাবে তেনি টানো কাবল বেথা
নিবিড় ঘন ছায়া কুঠেলি মাথা
তব্ব মোন তটে বিচল অঁপার ঘাটে
নিভা মীপ-শিখা আকুল নীরে
জুহে বাজে দাঁই গভীর স্থানি
অবোধ যুদ-বোধে স্বপনে শুনি
জাগে বত কুলকলি সুপ-নয়ন মেলি
সোনার কমল ভাগে আপনি বীরে
আখ্যার কুটীর খানি তটিনী তীরে।

খাপিত

১৯১৯

বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স

এণ্ড

লিমিটেড প্রপার্টি কোং লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

১৬,০০,০০০ টাকার উপরে দাবী মিটান হইয়াছে।

গত সালেব্র ভ্যালুয়েশ্যানে প্রশংসনীয় উন্নত

প্রিন্সিপালস যোন্স, এন্ড এন্স-এ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মি: বি. ই. এম. বোস
সেক্রেটারী



কিরণকর রায়—

কিরণকর রায়ের মৃত্যু বহর বেদন আকস্মিক, যেমনি বিপদনয়। বহু বছর এক সঙ্গে কাজ করেছি; রাজনীতির বহু ত্যাগ-পড়ার ভিতর দিয়েও আমাদের সহযোগিতা রিক ছিল। এটা কেবল বাস্তবিক সত্যযোগিতা ছিল না,—তা থেকে এক প্রকার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও হয়েছিল। তাই গত কয়েকমাস পূর্বে যখন তাঁর সঙ্গে আমাদের বাস্তবিক মতভেদ দেখা দিল, তখন তা আমাদের এবং মনে করি তাঁরও, পক্ষে পীড়াবাদক মনে হত।

বনৌ সন্তান, অভিজাত বনৌ পরিবারের আবাসে লালিত-পালিত, সুশিক্ষিত ও বিদ্বান, সচিব, বুদ্ধিমান ও হৃদয়নির কিরণকর একটু ইচ্ছা করলেই আশ্রয় ও সামাজিক সন্মানে যৌবন কাটাতে পারতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পর থেকে তিনি পদোন্নয়ন করলেন—ম্যাজিস্ট্রেট ভিতর থেকে দেশ সেবা। এই পথে যদি তিনি থাকতেন, মৃত্যুর পূর্বে তিনি শিক্ষা বিভাগে উচ্চ পদে উন্নত পথে আদৌ থাকতে পারতেন। তিনি ব্যাটলার ছিলেন; বুদ্ধিমান ও সচিবও ছিলেন। আপাত করা বাই ব্যাটলারী করলে তিনি প্রচুর না হক অস্বস্ত পাপপুণ্ড অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। বিদেশী শাসকদের আইন নিয়ে অর্থ উপার্জন করার চেয়ে, তিনি পছন্দ করলেন ইংল্যান্ডের আইন চেষ্টা করাধরণ করতেন। ১৯২১ সাল থেকে তিনি অর্থ উপার্জনের সব পড়া ত্যাগ করে দেশ সেবা করতে লাগলেন গীতিমতো অর্থহস্তের মধ্যে। বনৌ আত্মীয়স্বজন একই পুঁজে বাস করে, পারিবারিক আভিষেকের আবেশে থেকে, অর্থ কটে সংসার চালানো এক যৌবন কাটানো যে কি কষ্টসাধ্য, তা হৃদয়কম করা কঠিন। তাঁর ম্যাজিস্ট্রেট-বৃত্তি সে আবেশেই স্নানার বহু

হয় না,—হয় উপহারের ও সামাজিক অশান্তির কারণ। কিরণকর হাসিমুখে এ সব নিয়ে গেলেন।

কিরণকর ছিলেন বিদ্বান ও শক্তিত ব্যক্তি; তিনি ছিলেন ক্ষমতাশালী বুদ্ধিবল। বাংলা সাহিত্যের আসরে তিনি যথেষ্ট ব্যক্তির ও স্থান পাবার অধিকারী ছিলেন। অনেকেরই পরিচয় করত—কিরণকর সাহিত্যিক ত্যাগ করেছিলেন বলে। কিন্তু বাস্তবিক ও বেশেপেবার অত্যাগ আগ্রহে তিনি সাহিত্যিক বর্জন করতে বিধা করলেন না। এমন একান্ত আগ্রহ ও একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে খুব কম লোকই রাজনীতি করেছেন।



কিরণকর রায়

চাষটি বাস্তবিক আবেশান তাঁর বাস্তবিক যৌবনের উপর দিয়ে গিয়েছে, প্রত্যেক আবেশানেই

কিরণপঙ্কজ-জ্যেষ্ঠ গিয়েছেন। অথচ দারা রাহনীতিতে লিপ্ত, তারের মধ্যে অনেকের ধারণা আছে, কিরণপঙ্কজ জ্যেষ্ঠে যাওয়া এড়িয়ে চলেছেন। ১৯২১, ১৯২২, ১৯৩২ ও ১৯৩২ সালের প্রত্যেক আন্দোলনেই তাঁকে কাব্যগায়ের ঘেঁটে হয়েছে। ১৯৩২ সালে এক মাসের মধ্যে তিনি খালসা পান। কিন্তু সেটা তাঁর অপরানের লক্ষ্যের অঙ্গ নয়—সেটা তখনকার বাংলায় সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তাঁর কারাবাস তেমন আত্মবিক ছিল না। অস্বাস্থ্য প্রদেশে নির্বাচিত মহীর শাসন লোপ পেয়ে ইংরাজ-সার্টের বাগ শাসন চলছিল। কাজেই কোন ব্যক্তির সাম্প্রতিক মর্যাদার কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু বাংলার তখন মৌলবী ফকরুল হকের মহৌষ চলছিল, এবং এই মহৌষ নির্ভর করত এমন করত সভ্যদের উপর দাওয়া কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞাভীতা না হানলেও কংগ্রেসের মোহাই নিয়ে বামের চমকে হত। কিরণপঙ্কজ তখন কংগ্রেসী বলের নেতা; কাজেই মৌলবী ফকরুল হক নিজের স্বার্থের ভাঙনায় পুণিস্থের মধ্যে স্বকাকি করে কিরণপঙ্কজের প্রতিবাদন করান।

কিরণপঙ্কজ একজন বক্তৃতাগায়ের মাস্থ্য। বোধ-গুণ নিয়ে যেমন সব মাস্থ্যের চরিত্র গঠিত হয়। কিরণপঙ্কজের চরিত্রেও বোধ ও গুণ উভয়ই ছিল। কিন্তু বাংলার রাহনীতিতে তাঁর বিরুদ্ধে দৃঢ় কথা উঠেছিল, দৃঢ় নিষা। তাঁর সবচেয়ে লোকসম্মানে রাষ্ট্র ছিল—তাঁর অনেকগুলিই তিথিব্রীণ ও অকারণ। ব্যক্তিগত জীবনে মাস্থ্য বা কিছু কখনো করতে পারে, তাঁর সবই কিরণপঙ্কজ পেয়েছিলেন; এবং তাঁর প্রায় সবই তিনি বেশদেবার অঙ্গ হাঙ্গিন্থে বিশর্জন দিয়েছিলেন। এই ত্যাগের কোন প্রতিফলন তিনি চান নি; নেতৃত্বের গৌরবের অঙ্গ তিনি কখনও লাভাভিত হন নি; বেশদেবার পুরস্কার বৈজ্ঞানিক কোন মর্যাদা, সাধারণের কাছ থেকে কোন সম্মান, বা কোন আর্থিক। বিনিময়ের অঙ্গ তিনি কখনও লাভাভিত হন নি। বেশদেবার সার্থে সাথে অর্থ উপার্জন করার প্রথা বা অপ্রচলিত বা খুব বিকৃত নয়; কিন্তু কিরণপঙ্কজ সে চেষ্টা করেন নি। সাহিত্য দেখা করলে হয়ত কিছু অর্থ এবং

কতকটা নাম হয় তিনি অতি সহজেই পেতেন—সে বিবেচনা হান নি।

কিরণপঙ্কজের উচ্চাভিলাষ ছিল না;—এটা তাঁর চরিত্রের একটা দ্রুটি। তিনি জমসদায় বক্তৃতা করতে যেতেন না; অথচ তিনি স্বতন্ত্র ছিলেন; তিনি সব সময়ে শিখন থাকতেন;—এসিয়ে যেতেন না। এটা তাঁর প্রকৃতিগত দ্রুটি। তারই কলং লোকে তাঁকে অনেক সময় তুল বুঝত। তিনি সাধারণের চেয়ে বেশী বুদ্ধি রাখতেন, বাংলার রাহনীতির বহু বিষয়েই তিনি লোককে এবং বিশেষ করে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ দিতেন। এ-ও তাঁর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগের কারণ হত। তিনি সু-শাসনীয় ছিলেন; কিন্তু স্ট্রট কথা বলতে শিঙাতেন না বাহ কলে তাঁর প্রতিপক্ষ অনেক সময় স্ক্রু হতেন। এই স্পষ্টবাগিতা তাঁর আভি-জাত্যের গর্ব ও অহংকার বলে লোকে মনে করত।

কিরণপঙ্কজ আর সব বিতর্কের অতীত। কিন্তু একটা বিতর্ক তাঁর শেষ জীবনে একটু বিবলময় হয়েছিল। ১৮ মাস পূর্বে যখন ভারত ও বাংলার বিভাগ হয়, তখন তাঁর বন্ধু-বান্ধবগণ বিশেষভাবে তাঁকে অজ্ঞায়েণ্ড করে, পশ্চিম বাংলার পরিবেশ থাকবার অঙ্গ। তিনি কিছু রাজী হলেন না;—বললেন—পূর্ব বাংলার থাকার লক্ষ্যের ব্যতিক্রম তিনি করতে রাজী নন। তখন এমন বহু লোক ছিল, দারা প্রত্যন্ত সভার ব্যাবহার বোধনা করে ছিলেন, বহু বিভাগ হলে তাঁরা পূর্ববাংলার থাকবেন। তাঁদের কেউ কেউ বহু বিভাগের পরই পশ্চিম বাংলার চলে এসেছেন। কিন্তু কিরণপঙ্কজ কখনও তেমন কোন ঘোষণা করেন নি; এই লক্ষ্য ছিল তাঁর নিজের নিকট। তখন কিরণপঙ্কজ পশ্চিম বাংলার থাকতে রাজী হলে তিনি অনায়াসে পরিবেশ কংগ্রেসী বলের নেতা ও পশ্চিম বাংলার প্রধান মহী হতেন।

পরে নানা ঘটনার চাপে তিনি পশ্চিম বাংলার আসার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে মৌক্তিকতা লক্ষ্যে যতটুকু থাকতে পারে; কিন্তু তাতে তাঁর প্রথম সিদ্ধান্তের আনন্দবিকতা লক্ষ্যে সম্মেহ আসে না বা তাঁর

ঐ দ্বিতীয় দিকান্তের গিছনে তার কোন ক্ষুদ্র স্বার্থগতির আয়োজন করা হয় তাহা নেই। ভারত ও শাক্তিবাদের সম্পর্ক প্রথম এক বছরের মধ্যে যেভাবে রূপ পরিগ্রহ করছিল, তাতে কিরণপঙ্কজ নিজের পূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেননি এ কথা এখানে গোপন করতে চাই না— তার বহু রাজনৈতিক সহকর্মী তার ঐ সিদ্ধান্তে একমত হতে পারেন নি। বাংলার সঙ্গে তার সংযোগিতা গ্রাম ২৭২৮ বছরের, বাংলার সঙ্গে তার সম্পর্ক, রাজনীতির গভীর অতিক্রম করে অনেকটা ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের পর্যায় গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে এই বিচ্ছেদ তার বা তার বন্ধুত্বের পক্ষে সমানভাবে নীড়াক্রমক ছিল। হয়ত কিরণপঙ্কজ আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে, তার ও তার রাজনৈতিক বন্ধুদের মধ্যে ঐ ক্ষেত্র দুই হত।

কিরণপঙ্কজের স্থান বাংলায় রাজনীতিতে অপূরণীয়; এই দৃষ্টান্তের তার দৃষ্টি বাংলায় পক্ষে অপরিসীম কঠোর। তাঁর পুত্র হ্রদ্বান কল্যাণ, তার স্ত্রী ও কল্যাণের সঙ্গে বাংলার বহু রাজনৈতিক কর্মী কিরণপঙ্কজের মৃত্যুতে স্বল্পম বিরোধের বেহুলা অহুত্ব করবে। লোকান্তরিত বন্ধু ও সহকর্মীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

শান্ত পরিদৃষ্টি

আজ ভারতের পক্ষে হয়ত সখ্যে বড় সমস্তা হল, শান্ত সমস্তা। আগামী বছরের বাজেটে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ের দ্রুত বাটতি দেয়া হবে হয়েছে। মোট প্রায় ১৫০ কোটি টাকার ব্যয়শক্তি বাহির থেকে আমদানী করা হবে। প্রতি বছরই ব্যয়শক্তি আমদানীর পরিমাণ বেড়ে থাকছে। এটা যে ভারতীয় স্বাধীনতার দিক থেকে কত বড় ক্ষতির তা আমরা পৌষ মাসে আলোচনা করেছি। এই সমস্তার গুরুত্ব অহুত্ব করে কেন্দ্রীয় পরিদর্শন জমিন-যাপী আলোচনা হয় এই ব্যয়শক্তির নিয়ে। বিভিন্ন প্রদেশের সভাপতি একের পর এক সরকারী ব্যবস্থার নিদা করেছে। এই প্রদর্শন বনে রাধা সরকার এই সব সভা বৈধী ভাগই কংগ্রেসীদের স্বার্থে যে মনের হাতে

আজ বেশেব শাসন তার প্রাপ্ত আছে। তার কেউ নিছক নিদা করার দ্রুত বিরোধীদের মনোভাব নিয়ে ঐ সব উক্তি করেন নি;—সমস্তার গুরুত্ব ও সরকারী ব্যবস্থার কঠিন অহুত্ব করেই তারা ঐ প্রকার সমালোচনা করেছেন।

যে সব সভা ঐ আলোচনার অংশ গ্রহণ করেছেন, তার অনেকই বেশকর্মী, বেশেব মনোভাব সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এবং বেশেবাব অভিজ্ঞতাও তাঁদের আছে। তাঁদের বক্তব্য বিষয়কে যেটি দৃষ্টান্তে ফেলা যায়—(১) ব্যয়শক্তি বেশী উৎপাদন করা এবং (২) সরকারী বিভাগীয় কর্মচারীদের ও ব্যবস্থার মধ্যে সভা ও কল-গ্রন্থতার অভাব। মানুষি ভাবে ইংরেজ আমল থেকে বেশী ব্যয়শক্তি ফলাও বা Grow more food— নামে এর অভিজ্ঞান চলছে—যাতে ব্যয়শক্তি বাড়ছে কিনা বেশবাসী জানে না, কিন্তু জানে বরত বাড়ছে এবং কিছু কর্মচারীর সংখ্যাও বাড়ছে। সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে একদিকে অভাব হচ্ছে কর্মোপযোগিতার ও অন্যদিকে প্রাচুর্য হচ্ছে মনোভাব।

ব্যয়শক্তি ব্যাভার দ্রুত সরকারী মনোভাব কেবল বড় বড় পরিবর্তন হচ্ছে—যার উৎপাদন হবে পাওয়া যাবে, কেউ বলতে পারে না। “বাহতে সব কিছু বাড়তে লব না।”—এমনি বাংলার ক্ষুধার জড়না, তাহের, যদি বলা হয়—দায়োষ ও অভ্যস্ত নদী উৎপাদ্য বাধানো হচ্ছে, মন বছর দুই কর ব্যয়শক্তি নিয়ে বেশেবে কেবল তখন তাহের পক্ষে খেঁচ রাগা কঠিন হয়। ১৯২ বছরে কিছু করা যায় কিনা—সেদিকেই আজ সর্বপ্রথম দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বহু পণ্ডিত যদি বেশেবে আছে। বেশেব প্রায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ একর যদি এমনি পড়ে আছে। এর ছোট ছোট টুকরা নিয়ে টিউব ওয়েল বা নলুয়া, বা ইঁদুরা কেটে মল সেচের ব্যবস্থার দ্বারা এই সব কর্মির কতক অংশে ব্যয় উৎপাদন করা যে খুব কঠিন—তা অহুত্ব পরিবর্তন সভা মনে হবে না। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে সে দিকে যে বিশেষ কিছু হচ্ছে তার কোন আভাসই দেখা যায় না।

আলোচনার উত্তরে সরকার পক্ষ থেকে বাস্তবমন্ত্রী শ্রীমহাশয়গণ মৌলভীরা বা জবাব দেন তার মূল কথা হল খাত রেশনিং তুলে নিয়েই আদাও বিপদে পড়েছি এবং খাত উৎপাদন, যাতে আরও বেশী টাকা বরাদ্দ না করলে এর চেয়ে বেশী খাবার পাওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত জবাবটাই যেন সভ্যদের উপর "ঠেস" দিয়ে বলেছেন। পরিণত থেকে প্রস্তাব পাশ করেছিল—খাত রেশনিং বা বর্কট প্রথা রহিত করা হুক এবং পরিষদ তাঁর বিভাগের ক্ষমতা আরও অর্থ বৃদ্ধি করে নাই—মতএব গোপন। সেই যেন পরিষদের এ শ্রীমহাশয়গণ বহুদিনের কংগ্রেসী নেতা; কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভ্য-ও তিনি ছিলেন। কাজেই তাঁর নিকট আদাও এমন আড়ট (bluff) জবাব প্রত্যাশা করি নি।

অবশ্য ঐ আলোচনার সময় সভ্যরা কিছু কড়া কথা বলেছে মন্ত্রী মহোদয় লম্বচ্ছে এবং তাঁর বিভাগের কর্মচারীদের লম্বচ্ছে। তা বলে মন্ত্রী এমনি ভাবে ঠেস দিয়ে—যেন মজা দেখাবার ভাব নিয়ে—জবাব দিতে পারেন না।

এবং অবশ্য অবাস্তব কথা। আমাদের আশস্ত ভাবনার বিষয় হচ্ছে খাত সমস্যা—মন্ত্রী মহাশয়ের কথার ওজন ও রকম তাতে নিতান্তই অবাস্তব। চলতি বছরে ১০০ কোটি টাকার বা ২৮ লক্ষ টন খাতপত্র আমদানি করা হয়েছিল, আগামী বছর আমদানী করতে হবে ৪০ লক্ষ টন অর্থাৎ প্রায় ৩০০ কোটি টাকার। এতটাকা নিতান্তই বৃথা আমদানি বিশেষের দিকি। এখন বিশেষ থেকে প্রয়োজনীয় জিন্স কেনবার মতো সাধারণও আমদানি নেই, তখন খাতপত্র এতটাকা বিশেষে পাঠানো যে কত বড় গুরুতর বাণিজ্য তা হ্রাস করতে হবে না এবং এর ক্ষত ভারত সরকারের আগামী বছরে ৩০ কোটি টাকা লোকগান ঘাবে এবং প্রাথমিক সরকারের ও ১০১২ কোটি টাকা লোকগান ঘাবে।

পশ্চিম বঙ্গার বাজেট—

প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট প্রস্তাব দশ পেন হয়েছে। প্রাথমিক সরকারের অনেকেরই আর্থিক

টানাটানির পণ্ডির ঐ সব বাজেট প্রস্তাবে পাওয়া যায়। আশাম, বাসনা, গোষ্ঠী প্রভৃতি প্রদেশে গাঠিত বাজেট পেশ করেছে। সংস্কৃত প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে সামান্য তরফ লক্ষ্যটাকার উত্তর দেখিয়েছে। বিহার কিছু বেশী উত্তর দেখিয়েছে কিন্তু খাতপত্রের উপর-ও বিজয় করা বসাতে হয়েছে। কেন্দ্র থেকে যে সাহায্য প্রদেপে করায় কথা ছিল মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র সেভাবে প্রদেশকে সাহায্য করবে না এবং প্রত্যেক প্রদেশকেই এমন নিজ নিজ অর্থ ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। অথচ প্রত্যেক প্রদেশেরই মাদুলি ও চলতি ব্যয় ভিন্ন উন্নতি বিধায়ক (development) কার্যে বেশ কিছু খোটা টাকা বরাদ্দ রাখতে হচ্ছে। ইংরাজ শাসন ছিল—আইন-সুখ্যা স্বকার মত পুলিশ শাসন;—স্বাধীন ভারতের শাসন তা বলে চলতে পারে না। জনতার জীবন যাত্রার মান উন্নত করতেই হবে;—তাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ যাত্রা-যাত্রা নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে বহুটাকার বরাদ্দ রাখতে হচ্ছে। তাছাড়া কেন্দ্র ও বাংলার শুল্ক পাকিস্তান হতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের মতও প্রচুর ব্যয় হরকার।

পূর্বে বাংলায় এক তৃতীয়াংশ নিয়ে বর্তমান পশ্চিম বাংলা গঠিত। মধ্য ও উত্তর পশ্চিম বাংলায় দেই অল্পসম্পত্তে কমে নি। মন্ত্রী ও তাদের উচ্চ বেতনভূক পেজেটারীর সংখ্যা পূর্বে মতোই আছে; হাইকোর্টের জজের সংখ্যাও বিশেষ কমে নি। পুলিশের উচ্চ কর্মচারীর সংখ্যাও বিশেষ কমে নি। এর উপর আছে বিরাট আশ্রয়-প্রার্থী সমস্যা। এই অবকার পশ্চিম বাংলার আর্থিক অবস্থা যে খুব সম্ভল হবে না এটা সহজেই অল্পমের। তাই এক বোটি এগার লক্ষ টাকার বাটতিতে আদাও বিশেষ বিস্তৃত হইনি। কিন্তু আদাও বিস্তৃত হয়েছে এই বেবে যে সরকার পক্ষ থেকে ব্যয় কমানার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। উচ্চ বেতনের কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করা বা তাদের বেতন কমানোর কোন প্রয়াসই দেখা যায় না।

বাজেটে বলা হয়েছে—বেদাময়িক সরবরাহ বিভাগে (Civil Supplies) এক কোটি টাকা এই বছরে

২

লোকসান হয়েছে। এই লোকসানের কারণ কি? যে ঘরে চাউন কেনা হয় তার চেয়ে বেশ কিছু বেশী ঘরে চাউন সাধারণের দিকটিকে বিক্রি করা হয়। পশ্চিম বাংলায় সরকারী ক্রয় হয় হল ঘন প্রতি ঘোঁটামুটি ১২ টাকা। অর্থাৎ বিক্রির হয় ১৮ টাকার উপরে। তবুও এই এক কোটি টাকা লোকসান কি করে হ'ল? এই বিভাগের নানা ব্যাপার নিয়ে সভ্যতাই বহু কথা রাষ্ট্র হয়; তার উপর অবৈতিক উপহেতার প্রচুরের ফলে, নানা গুণের আরও সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তার উপর এই এক কোটি টাকা লোকসানের খবর জনসাধারণ একটু উপস্থাপন করবেই।

হাস দুই পূর্ব বাংলা সরকার কিছু নতুন কিছু কর বসিয়েছে। তার মধ্যে সিমার তেল, খবরের কাগজ, মিঠাই প্রভৃতি সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপরও বিক্রয় কর বসানো হয়েছে। এই করের আওতা আরও হ্রাস আশেবে বলে তদ্রূপে বোঝানো হয়েছে।

এবারকার বাজেটে তথ্যবস্তুর দিকে চেয়ে উন্নতিসাধক পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোনই বরাদ্দ করা হয় নি। কেন্দ্র থেকে যা দেবে তার উপর গুণ করে আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করা হবে যাত্রা তৈরীর জন্য। এই বছর ও আগামী বছরে পূর্ব বাংলা থেকে বাস্তবায়নী পরিকল্পনার জন্য নানা খাতে প্রায় ১৪ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে; অল্প প্রায় সবটাই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া যাবে। এই ব্যবস্থা যদি চূড়ান্ত বা এক বছর পূর্ব করা হত, তবে ঐ লক্ষ লক্ষ হস্তশ্রমিকের দুখে দুখীনা এতটা তীব্র হত না;—প্রবেশ অবস্থায় এত প্রবল হ'ত না, এবং কমানিটি প্রভাব এমনভাবে বৃদ্ধি পেত না। ভা: বোধ হয়তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তিনি স্বীকারই করলেন না যে পূর্ব বাংলা থেকে কোন লোক পশ্চিম বাংলায় এসেছে। ভা: রায় প্রধান মন্ত্রী হয়ে আসার প্রার্থী অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার না করলেও এরপর পুনর্বাসিত কোন ব্যবস্থাই করলেন না। কত লোক পূর্ব বাংলা থেকে এসেছে, তার সংখ্যা নিয়ে অনেক বিতর্ক বেশ অনেক দিন; তারপর বেশ উঠল ব্যাংক এসেছে,

তারপর মধ্যাহ্নে কিংবা বেতে হবে। আদং কথা ছিল মন্ত্রীমণ্ডলীর একটা শিগ্গে অংশ পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় মধ্যে চীনা প্রাচীর তুলে নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে আরও কায়েমী করতেই উৎকর্ষিত ছিল। ইংলণ্ডের রাজা কেনিউট হুজুম দিবে সমুদ্রের জলের গতি বোধ করতে চেয়ে ছিলেন। সমুদ্রের জল তাঁর হুজুম মান্য করল না। কিন্তু তিনি চিরকালের জন্য আহ্বানকর দৃষ্টান্ত হয়ে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলেন। পশ্চিম বাংলায় ঐ ক্ষুদ্র বুদ্ধি রাজনৈতিক দলটি কেনিউটের দৃষ্টান্ত বেখেও সত্যক নে নি।

এই বাজেটের আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল স্বাধীনতা। সংগ্রামে ব্যাংক অংশ গ্রহণ করেছেন, তাদের জন্য সামান্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্ধ পর্যাপ্ত নয়;—কিন্তু তবু এই বিষয়ে যে এঁদের একটা আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা হয়েছে এতেই আমরা স্বীকৃতি। বাজেটের শেষ অংশে মন্ত্রীমণ্ডলীর যে সব রাজনৈতিক উপদেশ দিয়েছেন তার কোন প্রয়োজন ছিল না,—ওটা না দিলেই ভাল হত।

হিন্দু কোড—

কেন্দ্রীয় পরিষদে হিন্দু কোডের থলডা আলোচনায় মন্ত্র তা: আমেরকার যে চাষণ দিয়েছেন, তা নানা দিক থেকেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য। ঐ ভাষণে ভা: আমেরকারের পাতিভ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভা: আমেরকার মহারাষ্ট্র প্রদেশের অতি নিয় জৈন্তব মহারার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। বাংলার কেউ বুঝবে না—ঐ সমাজে মহারারের স্থান কোথায়;—বাংলায় এর কোন তুলনা নেই। ঐ বংশে জন্ম গ্রহণ করার সামাজিক দণ্ড তিনি বহু ভোগ করেছেন। এদনি সামাজিক আবেগেই জন্ম গ্রহণ করেও তিনি উচ্চতম শিক্ষা লাভ করেছেন;—এটা তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। উচ্চ শিক্ষা পেয়েও সামাজিক ব্যবহারে ফলে কোন দৃষ্টি আশ্রয় পাওয়া, বা কোন গৃহ ভাড়া দেওয়া তাঁর গণকে কঠিন হত। এই অবস্থায় হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার

উপর তাঁর বিরূপ ও বিবেক খুবই স্বাভাবিক। সেই বিবেক ও বিরাগের বশে তিনি আন্দোলন তুলেছিলেন অস্পষ্ট সব ভাষা দিয়ে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম ত্যাগ করে। তিনি একবার এমন ঘোষণাও করেছিলেন যে তিনি কিছুতেই হিন্দু থাকবেন না। তিনি যে ভক্তি রূপে এমন কথা বলেছিলেন তা নবাই বুঝতে পারে। তাঁর মতো একটি গোত্র যদি কোচে হিন্দু সমাজ ত্যাগ করে যেত তবে তা হিন্দু সমাজের পক্ষে অপরিণয়ী সম্ভাব ও কতিয় কারন হত।

আমি এখন কেন্দ্রীয় পরিষদে, দেখছি ডাঃ আদেবকার, বহু, পরালয়, রাজবন্দ্য প্রভৃতির বোহাই দিয়ে—‘FIC’-এর আদম্য বলে হিন্দু সমাজের সংস্কারের ক্ষমতা আবেদন করেছেন তখন মনে একটা আশঙ্কা বড়াতই লাগে। আদম্য বাম্বানী,—রাজা রামমোহন ও বিজ্ঞানগণের প্রবেশের লোক। এই দুই মহাপুরুষ হিন্দু সমাজের সংস্কারের ক্ষমতা ও হিন্দুত্বীয় অধিকারের ক্ষমতা চেষ্টা করেছেন। বলা যায় বাংলা এই বিষয়ে অগ্রণী। তাই বাংলা থেকে এই আইনের কোন তীব্র প্রতিবাদ আশা করি না। অনেক আইনগত আপত্তি পরিষদে উঠেছিল। তার মধ্যে প্রধান হল এই যে এই পরিষদ শাসন বিধান পরিষদের ক্ষমতা অতিক্রম করেছে; এই প্রকার সামাজিক আইন প্রণয়নের অধিকার এই পরিষদের নেই। এই আপত্তি অত্যন্ত অব্যোক্তিক। এমনি শব্দকালীন আইন পরিষদই সুস্থ-প্রগতি সাংসদিক বিধান তৈরি করে। ফরাসী বিপ্লবের পর ও কব বিপ্লবের পর আমরা এই পুণ্ডিতই দেখেছি। যে আইন সভাকে আদম্য সার্বভৌম বলে দাবী করি—সে আইন পরিষদ একটা সামাজিক আইন প্রণয়ন করতে পারবে না—এই দাবী অত্যন্ত উদ্ভট বলে মনে হয়। আইনের অগ্রাঙ্গ কূটতর্ক ও এই প্রসঙ্গে উঠেছিল, পরিষদের সভাপতি speaker সব গুণন করে তাঁর বায় দিয়েছেন—এই আইনের আলোচনা হতে পারে।

ডাঃ আদেবকার বলেছেন এই আইন লব প্রকারেই আমায় শাস্ত্র বিধির সহমোদিত, এই প্রস্তাবিত আইন

বিষয়বস্তুক ত নাই এমনকি কোন মৌলিক পরিণত নও এর মর্থা নেই। তাঁর মতে এই আইন অত্যন্ত মূঢ়। প্রতিপক্ষের আপত্তির তীব্রতা মাথব করার ক্ষমতাই তিনি এই ভাবে বলেছেন। প্রায় পথে পথেই তিনি শাস্ত্রের বোহাই দিয়ে বলেছেন—লবই শাস্ত্রের দাবী সমর্থিত। প্রায় একশ বছর পূর্বে বিজ্ঞানগণের পরামর্শ লঙ্ঘিত্য বোহাই দিয়ে বিধবা বিবাহ সমর্থন করেছিলেন। আরও যে শাস্ত্রের বোহাই দিয়ে আমায়ের লবই সংস্কার করতে হচ্ছে—এটা পরিচালনা। আমবা দূরী হতম যদি ডাঃ আদেবকার জ্ঞায় করে বলতে পারতেন—সমাজের বহুদের জন্য এর বিধি-ব্যবহার মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে—তাই এই আইনে সেই মৌলিক প্রয়োজন পরিবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে। সমাজের সংস্কার শাস্ত্রবিধির বোহাই দিয়ে হওয়ার চেয়ে পরিবর্তিত অবস্থায় সামাজিক প্রয়োজনের দাবীতেই হওয়া উচিত।

হিন্দু কোডের প্রণয়ন আমবা সমর্থন করি। এর প্রত্যেক ধারা ও উপধারার আলোচনা বপন হবে, তখন বিচার করে দেখার সময় আসবে—কিন্তু কি পরিবর্তন করা প্রকার। বগড়া বেডাবে এগেছে, তার সব কিছুই যে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় গৃহিত হবে, এমন দাবী আমবা করি না। কিন্তু আইনে প্রাথমিক আলোচনা এই বহু করতে হবে—এর আমবা বিবোধী।

সম-সমের স্বতন্ত্রতা তারপর ও শিক্ষা—

১০ই জানুয়ারি সমসমে এক বা বরেক নল অগ্রদারী গুংক নানা উপগ্রহ করেছে। সম-সম উডোমারামের টেনপে, শাস্ত্রের কারখানা, জেলপের কারখানা এবং পথে বলিহাটে বানায়, কোষখানায় প্রকৃতি যানে এরা লুটশাট, মায়-খর, অগিধাৎ প্রকৃতি বহুপ্রকার অনাচারের সৃষ্টি করেছে। কিছুদিন ধাবই তারের আধাভরী ও বাহিক অবস্থা একটা শব্দভরনক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। এমন লব্ধের করার মধ্যেই কাহন আছে যে কোন কোন রাজনৈতিক নল লগ্নয় বিহোহ করে শাসনিক (administrative) ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার বাসনা পোষণ

করে। এর মধ্যে কমুনিষ্ট হল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দলকে এক একটা দেশের আলাদা হল হিসাবে দেখলে তুল করা হবে; সব দেশের কমুনিষ্ট দলই এক নীতি ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে চলে, কেলে সুযোগ-সুবিধার ব্যতিক্রমে যেটুকু পার্থক্য হবার তাই হয়। এই দল চীনে আনু ৮১০ বছর বাবং চেষ্টা করছিল ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য। এত দিনে হয়ত এটা কৃতকাব্য হতে যাচ্ছে। গত বছর ক্রান্তি বিদ্রোহের চেষ্টা এটা করছিল; সেই চেষ্টায় কার্যনবের সঙ্গে এদের বিশেষ সংঘর্ষ হয়। এবার এখন কার্যনব (Karens) বিদ্রোহের চেষ্টা করছে, তখন কমুনিষ্ট দল তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে যত্নের ও গুণত বছরের বিরোধ সত্ত্বেও। কয়েকমাস পূর্বে এটা ভারতীয় যৌগপুত্র পণ্যতান্ত্রিক ভারতীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করে। জামে ও দিকাপুরে এটা কিছু গোলমালের চেষ্টা করছিল।

এদের কর্মপদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে একটা নিক বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার আছে—নক্ষিপ-পূর্ব এশিয়ায় ছবি নিজেদের দলের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা—অথবা অন্তত এমন একটা রাজনৈতিক অধ্যক্ষতার সৃষ্টি করা, যাতে কোন শক্তিশালী পণ্যতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই সকলের বেশদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে।

গত বছর কলিকাতায় নক্ষিপ-পূর্ব এশিয়ায় ছাত্র কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এর প্রকাশ্য সভার পিছনে যে সব গোপন বৈঠক বলে তাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অথবা বলা চলে যে এই সব সিদ্ধান্ত বিশেষ থেকে নির্দেশ হিসাবে ওখানে আসে—বার কলে ওখানে নতুন সৃষ্টিকোন নিয়ে চলবার ব্যবস্থা হয়। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ এর ডিসেম্বরে পাটনার এক ছাত্র কংগ্রেস হয়; সেখানেই কমুনিষ্ট দলের প্রতি এই বৃহৎ সম্মেলন নতুন নির্দেশ আসে। এই ছাত্র কংগ্রেসের পর হতেই ভারতীয় কমুনিষ্ট দল এই বৃহৎ সম্মেলন তাদের মত পরিবর্তন করে। গত বছরের ছাত্র কংগ্রেস ও ভারতীয় কমুনিষ্ট দলের সঙ্গে এক নতুন কর্ম নির্দেশের সূচনা করে।

এই কংগ্রেসের পর কিছুদিনের মধ্যে ভারতীয় কমুনিষ্ট দলের আভ্যন্তরীণ সংগঠনের বিশেষ পরিবর্তন হয়। ভারতীয় রাজনীতিতেও তাদের মত পরিবর্তনের প্রকাশ্য পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বে অন্তরীণ সব দলের আক্রমণ থেকে কংগ্রেসী সরকারকে এটা সমর্থন করতে, যদিও সময় সময় তাঁর সমালোচনা করত। কিন্তু এর পর এদের কর্মপদ্ধতি হল কংগ্রেস বিরোধী যে কোন দলের সঙ্গে সহযোগিতা করা। এর প্রকৃতি পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ছাত্রসাবাহে রাজাকারদের সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং কলিকাতায় ছাত্রসাবাহী দলের গোলমালের সময় হিন্দু সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে সহযোগিতা করা। কোনরকমে নিজেদের আশ্রয় উদ্ভেদ সফল করতে এটা সবদাই যে কোন দলের সঙ্গে হাত মিলাতে হাকী ছিল। জামেনীতে মুহুম্মদী সমাজতান্ত্রিক দলের বিরুদ্ধে জামেনী কমুনিষ্ট দল হিটলারের সঙ্গে সহযোগিতা করে হিটলারের এককিণ্ডা প্রতিষ্ঠার সাহায্য করেছিল; ফ্রান্সেও এই সময় ফরাসী কমুনিষ্ট দল মুহুম্মদী সমাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে নক্ষিপ পণ্যতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। ভারতেও এটা তাই করছে ও করবে।

এটা যুগে মার্কসের ঘোষাই দেখে, কিন্তু যে দেশের পররাষ্ট্র নগরের নির্দেশে এটা চলে সেই সোভিয়েট রাশিয়াতে আর্ম মার্কসের অসুপারী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কতটা চলছে—তা আর্ম বিচার করার দিন এসেছে। সংযুক্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রকাশ্য অভিযোগ হয়েছে যে লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে দাব্যতাত্ত্বিক বেসারী প্রদ নিতে বাধ্য হচ্ছে এবং এটা সবাই বন্ধীনিধিরে জীবিতদায়ের মতো বাগ করছে। এই সম্প্রদায় বাগ সোভিয়েট প্রতিনিধি এখনও ঘের নি। সেখানে নিরস্তর ও উচ্চতর আয়ের বৈষম্য বহুগুণ; এই অভিযোগেরও কোন প্রতিবাদ মাঝরা পাই নি। কাজেই ভারতীয় কমুনিষ্টগণ যে বর্ণবর্ণাভ্যাস ছবি যুবকদের সামনে বসছে তাবের উচিত তা একবার যাচাই করে নেবা। কেবল তুমি কথাই বেন যুবকরা বিশপে চালিত না হয়।

হয়তবে যা ঘটছে—তার মধ্যে সাধারণ দৃষ্টিতে

রাজনীতির কোন চিহ্ন দেখা যাবে না। আর দেশ
শ্রাবীরা এবং সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে।
কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা কিন্তু কোথাও বিরোধীপক্ষের
ভাবে বন্ধ করা হয়নি—যা সোভিয়েট রাশিয়াতে করেছে।
প্রমোদীনের বন্দী করা ক্ষমতা-ও লোপ করা হয় নি
যেমন সোভিয়েট রাশিয়াতে করেছে। হত বন্ধ
বানেকের মধ্যে নতুন শাসন-বিধান গঠিত হবে;—
এবং তারপর দৃষ্টান্ত সত্ত্বে এই গণতান্ত্রিক বিধানে
নতুন নির্বাচন হবে। যে কোন দল ইচ্ছা করলে
নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জনতার সমর্থনে ভোটের ভয়ে
শাসন ক্ষমতা অধিকার করতে পারে—যেমন ব্রিটেনে
শ্রমজীবী দল (Labour Party) করেছে। যদি মার্শাল
কথাও এবেদে আস্থা থাকত তবে তাঁর এই কথাও
একটি বিধান করতে যে গণতান্ত্রিক দেশে সশস্ত্র বিদ্রোহ
দির গণতান্ত্রিক উপায়েই সমাজতান্ত্রিকগণ বা কম্যুনিষ্ট-
গণ ক্ষমতা আহরণ করতে পারে।

দ্বন্দ্ববোধ এই ব্যাপারে একটা বিজ্ঞ দলটো হিসাবে
দেখলে সবই স্পষ্ট করা হবে। একটা ব্যাপক ও সুস্থ-
প্রণালী কার্যক্রমের এটা হল অঙ্গ। কংগ্রেসের কর্ম-
কর্তব্যেরও যেমন এটিকে খোলা রাখা সরকার যাদের
হাতে দেশের শাসন ভার আছে তাদেরও এটিকে
খোলা রাখা সরকার। মুক্তকারীদের বিরুদ্ধে আইনের
বিধান সরকার এবং তা দিয়েই কম্যুনিষ্ট প্রভাব বেশে
স্বয়ং ও জনতার মনকে মুক্ত রাখা যাবে না। শাসনিক
ব্যবস্থার-ও উন্নতি সাধন করা সরকার এবং গণসংযোগও
কংগ্রেসের ও সরকারের বাড়ানো সরকার। শাসন
দল আর চলছে বহুলাংশে গণসংযোগ এড়িয়ে পূর্বের
আনুমানিক পদ্ধতিতে। শাসনবোধের আনা উচিত দেশে
অনিবার্য ভাবেই বহু দৃষ্টান্ত আছে। অসংখ্যের অভাব
একদিনে কেউ বুঝতে পারবেনা এই সরকারও পারে
নি। কিন্তু একমুখ যে অসংখ্যের অভাবই লোকের
মনে আছে তার সুযোগ নিয়ে কম্যুনিষ্টরা—কারণ
কংগ্রেস ও সরকার যেমন ভাবে গণসংযোগ বজায়
রাখেনা।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট

২০শে ফেব্রুয়ারী ভারতের অর্থমন্ত্রী ডাঃ জন বাখাই
১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট পরিষদে দেশ করেছেন।
এই বাজেটে সাধারণ জনতা খুশী হবে না;—খনি
সম্প্রদায় খুশী হয়েছে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি
ব্যবসায় কেন্দ্রের বণিক সমিতি সন্তুষ্ট তাদের সন্তোষ
প্রকাশ করেছে। সাধারণত লোকে ধরে খনিয়া যাতে
তুই হয় সাধারণ লোকের নিক থেকে তাতে তুইর কারণ
নেই। কথাটা অনেকটা সত্য; কিন্তু তবুও কেবল
সেই মানবত দিয়ে ডাঃ বাখাইর বাজেটকে বিচার করতে
চাই না। আদ্যে জানি সময় আঁত শরৎময়, হঠাৎ
কখনও একটু এনিক-ওনিক হলেই হত ওকতর বিশদ
এসে যাবে;—এনি শরৎময় সময়ে অর্থনীতির পক্ষে
সঠিক বাস্তবের কথা খুঁই কঠিন। যারা ডাঃ বাখাইর
আজ সমালোচনা করেছে বা করবে, তারা কেউ এ
অবস্থায় পড়লে যে কি করতে তা বলা কঠিন। এই
অর্থ শরৎময় হিনে একটা বিরাটদেশের অর্থব্যবস্থা সঠিক
ভাবে নির্ণয় করা খুঁই কঠিন।

এই বাজেট প্রস্তাবের কঠিন দলন দেখাব, তখন এ
কথাও আদ্যে স্পষ্ট না যে অত্যন্ত শরৎময় অবস্থায়
ডাঃ বাখাই হতটা পেয়েছেন চোঁটা করেছেন। পাণ্ড
সরকারে—আগামী বছর ৩০কোটি টাকা লোকসান
হবে, পাঁচশতান হতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের অল্প
হয় হবে ৩০কোটি। ভারত বিভাগের পূর্বের দেনা
বাৎসর হিচতে হবে ১০কোটি। এই প্রায় ৭০কোটি টাকা
বলা যায় নিকট বৃথা ব্যয়। এই টাকটা যদি সাধারণ
কার্যের অল্প পাওয়া যেত তবে আমাদের বাৎসরিক
বাজেট এমন কালের ব্যাপার হত না। ডাঃ বাখাই কিছু
ট্যাক্স বর্হিত করেছেন এবং কিছু নতুন ট্যাক্স বসিয়ে-
ছেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা সরকার আজ
সরকারের সবচেয়ে চিন্তার ব্যাপার হল—মুদ্রাস্ফীতি।
এই প্রতিকার হিসাবে বেশব ব্যয় প্রস্তাবিত হয়েছিল
তার মধ্যে সর্গ-সম্মতিক্রমে একটা বিষয় ছিল সরকারী
স্বত্ব কমিয়ে যাতে সরকারী আদায়ের সামগ্র্য্য থাকে।

মৃত্যু কর বসানো নিয়ে কোন আপত্তি হবে যদি, তা প্রত্যক্ষ কর দেখ। প্রত্যক্ষ করে প্রচুর বা উৎকৃষ্ট অর্থ থাকে হাতে আছে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়, এর ফলে উক্ত অর্থ সরকারী তহবিলে আসবে। কাজেই অর্থের প্রাচুর্যের ফলেই তৎপ্রাচুর্য বোধে দায়-এক মুহুরীতি দেখা দেয়, সেই অর্থের কতক যদি সরকার টেনে আনতে পারে তবে অর্থের প্রাচুর্য কমেতে বাধ্য। পরোক্ষ কর বসালে—অগ্র-মূল্য বসাবতই বেড়ে যাবে,—আত্ম কামড়ের উপর, তিনিই উ-চ, ট্যাক্স বসানো হলে—এর ফলে লোকের জীবন-ব্যয়্যার খরচ বেড়ে যাবে। অর্থের আদায়ের তুলনার দ্বি তার মূল্য বেড়ে যাবে তবে মুহুরীতির দ্য লক্ষণ তা সমাজে আরও বাড়বে। ভাঃ মাথাটির এই বাজেট প্রত্যক্ষ কর কিছু কথিয়ে—পরোক্ষ কর বসানো বা বাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যেও সবগুলি খরচ বিলাস প্রথা নয়;—সামান্য লোকের জীবন-ব্যয়্যার প্রথা দেখ। তিনি, মোটা ও সাধারণ কৃষক, মূসারী, পোষ্ট কার্ড প্রভৃতি। এই সব বিষয়ে ভাঃ মাথাটির দৃষ্টি সেওয়া উচিত ছিল।

গত তিন বছর ধাব্য সরকার থেকে কেবল ধনপতিরের জোঁড়ার করা হচ্ছে—বাজে তারা উৎসাহন মূল্য ব্যবহারী প্রতিষ্ঠানে বা ইত্যাদিতে অর্থ খাটতে উৎসাহিত হয়। প্রতি বছরই এর মত তাদের কিছু কিছু উৎসাহিত সেওয়া হচ্ছে; এবংও সেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের তরফ থেকে এখনও সেভাবে কোন শাস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় পরিষদে ও বাইরের ভাঃদে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী বহুবার বলেছেন যে ধনপতির ভাঃদের উপর নাকি বিলাসের বর্ধনা রাখছে না,—তারা জাতির প্রতি বিশ্রামদায়কতা করছে। তারা বস্ত্রোপযোগ করে অভিজিত মূল্যক করছে ইত্যাদি। তারপর হঠাৎ তাদের উপর এই আদায় প্রবর্তনের কারণ কি? হঠাৎ আদায় তাদের তোলায় করার জন্য অভিজিত আগ্রহ কেন।

আদায় ভানি এখনই সব ব্যবহার ও ইত্যাদি ব্যক্তিগত মাদিরদের হাত থেকে ভারতীয় অধিকাংশ আনা কঠিন—হয়ত পুরই কঠিন। কিন্তু যেটি ছোট ইত্যাদি ও ছোট

উৎসাহন বা বিশেষ করে সবব্যয়িক ইত্যাদি ধাব্য দেশের ধন সম্পদ ও ব্যবহার-প্রথা বৃদ্ধি দেয়া তা সরকার করতে পারত। রাজনীতি ও কংগ্রেসের আদর্শ অহুসারে সেই প্রকারের অর্থনীতির দিকেই ত এই সরকারের বেশী মন সেওয়া উচিত ছিল।

বাজেট সবথেকে আর একটি কথা আদায় কমবে। সামগ্রিক দায় নিয়ে কংগ্রেস ব্যবহার প্রতিদায় করেছে। স্বাধীন হবার পর-ও ভারতের সামগ্রিক দায় কমেদিনি বন্ধ বাড়ছে। এর কারণ হল এতকাল ভারত ছিল ইংল্যান্ডের অধীন দেশ; এর দায়ের দায়িত্ব ছিল ইংল্যান্ডের এবং ঐ দায়-ও অর্থ ছিল—আমাদের পরাবারীতাক বহান রাখা। কিন্তু স্বাধীন ভারতে দেশস্বাক্ষর অর্থ হল দেশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আদ্য আদায়ের। অতঃপক্ষে নৌবাহিনী (navy) বলতে প্রায় কিছুই নেই। নৌবাহিনী তির দীর্ঘ সমুদ্র তুল সমর্থিত দেশের রক্ষা সম্ভব নয়। আমাদের প্রায় কোন উড়ো বাহিনী (Air Force) নেই; বর্তমান মূগে উড়ো বাহিনী তির কোন সামগ্রিক বাহিনীই পূর্ণ নয় এবং কোন দেশ-রক্ষা ব্যবস্থাই কার্যকরী হতে পারে না। এর উপর রয়েছে ভারত-বিভাগ-জনিত পরম্প-রের প্রতি অধিদায় ও বিশেষ ভাব পূর্ণ দুটি রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্থান। পরম্পরকে রক্ষা করার চেয়ে পরম্পরের প্রতি আক্রমণমূলক মনোভাবই আছে উভয় রাষ্ট্রে প্রবল। এর ফলে উভয় রাষ্ট্রই সামগ্রিক প্রভৃতিকে প্রধান দায় ও দায়িত্ব বলে মনে করবে ও করছে। বর্তমানে এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রতি ও বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপিত না হবে ততদিন সামগ্রিক দায়ের বহান্দ করা সম্ভব হবে না। ভারতের বাজেট শব্দে বহনধা বলবার আছে। সম্ভব হলে এর বিভাবিত আলোচনা আগামী সংখ্যায় করা যাবে। এর মধ্যে আগাকরি পরিষদে এর কিছু অবল বলল হ'বে কিছুকটি সংশোধিত হবে। একটি কথা—

রাখি—এই বাজেটের ফলে সাধারণ লোকের হাত বিশেষ জরুরীত হবে—পরোক্ষ বহের ফলস্বরূপ সমস্ত বেড়ে যাবে এবং তাদের জীবন দায় কঠিনতর হবে।

পাকিস্থানের বাজেট—

পাকিস্থানের বাজেটও একই দিনে করাচীতে পাকিস্থান পরিষদে পেশ করা হয়েছে। ভারতের আর ১২২ কোটি; তার মধ্যে ১৭৭ কোটি টাকা ব্যয় হবে সামরিক ব্যবধে। পাকিস্থানের আগামী বছর আর ৭৫ কোটি। এর মধ্যে রেলের আর হবে প্রায় ৩৭ কোটি। ভারতের বাৎসরিক আর-ব্যয়ের হিসাবে রেলওয়ের আর-ব্যয় ৭৪০ হাজার। তুলনামূলক হিসাবে এটোকা ব্যয় দিয়ে পাকিস্থানের আর ৬০ কোটি টাকার মতো। এর মধ্যে সামরিক ব্যয় হবে ৪০ কোটি টাকা এবং জন-স্বার্থের ও জনসেবার ব্যয় হবে ২০ কোটির মতো। অর্থাৎ বেসামরিক হিসাবে ভারতে জনপ্রতি ৭০০ টাকা পয়সা হবে এবং পাকিস্থানে পয়সা হবে জনপ্রতি ৩০০ টাকার নীচে। অর্থাৎ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানে ২:১ সম্পর্ক আছে তাতে পাকিস্থানের পক্ষে এমনি ব্যয় না করেও উপায় নেই। এই হিসাবে পাকিস্থানের অর্থ-নীতির যে মজবুত করেছেন আমবা উভয় রাষ্ট্রের মরলের মজবুত সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তিনি মনে করেন উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিবেচ্য ও অবিবেচ্যের সম্পর্ক হতে কাকতই সম্ভব হতে পারে না; বরং উভয় রাষ্ট্রেরই সম্ভব মিহিত আছে পারস্পরিক মৈত্রী ও বিশ্বাসে। তিনি আবেদন করেছেন—উভয় রাষ্ট্রই কি এমন স্বাভাবিক বৃত্তি নেই যাতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে স্বেচ্ছা প্রতীতি করে সহযোগিতার পথে চলতে পারে; তা না পারলে, তাঁর মতে, উভয় রাষ্ট্রের স্বাভাবিক বৃত্তি খেউনিয়ে হয়েচে বলতে হবে।

ভারতের অর্থনীতির তা: সাবাইও উভয় রাষ্ট্রের মৈত্রী ও সহযোগিতার জন্য আবেদন করেছেন। আপা করি উভয় রাষ্ট্রের দুঃস্বপ্ন ও সাধারণ জন-স্বার্থের শুভ ও অশুভ কবতে পারবে। স্বাধীন হিসাবে বিভক্ত হলেও একথা তুললে চলবে না যে ভারত ও পাকিস্থান একই ভৌগোলিক সংস্থার অন্তর্গত এবং স্বাধীনতার সম্পর্ক উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী—বৈবর্তিতার নহ। এককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, অপরের স্বাধীনতা বা সামরিক নীতি চালাতে হলে এখন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হবে যে তা উভয় দেশের পক্ষেই কঠিন হয়ত বা সর্বনাশের কারণ হবে। পাকিস্থানের অর্থনীতি—ভারতে যে নাট আমদানী হয়ে, তার উপর শুভ দার্ব করে বলেছেন আপা করি উভয় দেশের পক্ষেই বঙ্গোনা হবে না—বনি আর্থনৈতিক মৈত্রী (Tavann) সত্যপ্রিয়ী সর্বোত্তম মিত্র হিসাবে

ভারত পাকিস্থানের প্রতি আচরণ করে। আমবা মনে করি আর্থনৈতিক চুক্তি চাড়াও ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সর্বোত্তম মিত্রের আচরণই থাকা উচিত এক বোধ হয় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বানিমা শুভের ঐক্য (customs union) এবং দেশসংঘার ঐক্য (Defence union) থাকা উচিত। আমবা মনে করি এই বিষয়ে ভারতেরই অগ্রণী হ'য়ে যাওয়া উচিত ছিল এবং এখনও তা করা উচিত। পাকিস্থান অর্থনৈতিক, জনবল ও ভৌগোলিক বিস্তার ভারতের চেয়ে অনেক ছোট—ভারত একটা চলতি শাপন পেয়েচে; পাকিস্থানকে প্রায় সবেই স্তব্ধ করে গড়তে হয়েছে। তাকে বহুবিধ অস্থিবিধি' ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। কাজেই গায় পড়ে এগিয়ে যাওয়া পাকিস্থানের পক্ষে একটু কঠিন। তাছাড়া অনিচ্ছা স্বাভাবিক ও সচেতন জনসংখ্যার দিক দিয়েও ভারতেরই এই দিশেরে এগিয়ে যাওয়া উচিত। ভারতের তিনি উপর শুভ বঙ্গোনা ফলে, ভারতের তিনি পাকিস্থান বঙ্গোনা হতে প্রায় নির্বাসিত হয়েছে। হয়ত বঙ্গের থেলাও অনেকটা তাই হবে। আমবাদের মনে রাখা উচিত বঙ্গোনা করার মতো কাচা মাল পাকিস্থানের অনেক বেশী আছে। পাট চামড়া, তুলা ও চা আছে পাকিস্থানের, জুতারের আছে চা ও হৈরকীক। হৈরি মাল এখনে বঙ্গোনা করে ওখান থেকে ভারতের পাট ও তুলা আমতে হবে। হৈরি মালের মধ্যে তিনি প্রায় ওখানে চলান বড় হয়েছে—কারণ পাকিস্থান সত্তার তিনি পাতে বড় বেশ থেকে।

পাকিস্থান বাজেট পরোক্ষ শুভ কিছু বহিত বধ্য হয়েছে তনুও সেড খোটি টাকা উত্ত্বত হয়েছে। মোটের উপর আর্থিক হিসাবে পাকিস্থানের অবস্থা গারাপ নহ। কিন্তু জন-কল্যাণের মজবুত বঙ্গোনা মাথা পিছু মাত্র ২০০ টাকার একটু উপরে। এর ফলে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা ঘাট প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ জনতার অধিযোগের কারণ থাকবে। মাথা পিছু যে ২০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা থেকে পিছু বাধ্য বেশ মোটা টাকা বাবে। সে সব ব্যয় দিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা-ঘাট, পানীয় জল প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণই থাকবে। সেই বিষয়ে ভারতের সাধারণ জনতা প্রায় দ্বিগুণ পাবে। উভয় রাষ্ট্র জীবনব্যবহার ওজন পার্ব ব্যবস্থার মধ্যে যদি একটা লম্বা না থাকে তবে যে দেশের ব্যবস্থা নীচু গুরের হবে সে দেশের জনতার মনে কোণ্ডের উত্তেজক হবার সম্ভাবনা আছে।



কয়েকগানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্তী—

ভোলাসেবের মেরে বই

রাশিয়ার রাজদূত ২৥০

ডাক্তারের দিগ্ভিজয় ২৥০

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও

সাম্প্রদায়িক সমস্যা ১৥০

পরিচায় উচ্চ

জীবনের বসন্ত

—ডাঃ ব্রাহ্মকমল মুখোপাধ্যায়—

বিশাল বাঙ্গলা

—অগেন দত্ত—

সাম্রাজ্যবাদ ও

ঔপনিবেশিক নীতি

—গোপাল ভৌমিক—

কায়কটি বিদেশী গল্প

গল্প হিসাবে সব গল্পটি উৎসর্গ করা হয়

—অক্ষয়চন্দ্র গুহ—

কণাগ্রাসের পথ

সৃষ্টি ও সভ্যতা

১৥০

(ভোটমের বই)

—ভারপদ ব্রাহ্ম—

রাশিয়ার সেরা গল্প

কবি কথাদ্বিহোয়র আত্মজীবনিক

প্রাচীন দ্বিহোয়র প্রেরণ গল্পগুলির বহুভাষ্য

গল্পের বহুভাষ্য : এটি একটি গল্প

কবিতা

—অনন্তবাবু

—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

সরস্বতী লাইব্রেরী : সি. ৮-১১ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (খিড়ল), কলিকাতা

— ইন্দিরা —

একাদশ বর্ষ

চৈত্র—১৩৫৫

দ্বাদশ সংখ্যা

বালেশ্বরের পরে

শ্রীকৃষ্ণকুমার দত্ত

হতীজনাথ চিত্তপ্রিয়কে সাথে নিয়ে মনুভক্ত পৌড়ে

১৩১৩ খ্রিস্টাব্দ

শিমলিগাল পাহাড়ে ঘেরা মহলভিরাজ অশ্রয়

৪৮ চক্রবর্তী

১৩৫০

কিন্তু এটা শুধু তাঁর আশ্রয়স্থলই নয়। কিছুদিন

১৩১২ দিন

শৈলেশ্বর বহু পৌছানেন মনোরঞ্জন ও নীরেনকে নিয়ে

তার পরই ইংরেজের পুত্র

শৈলেশ্বর পূর্বের এসে ইউনিভার্সাল এক্সপেরিয়েন্স বলে

বলে, উপস্থিত

গোকান খোলেন বালেশ্বর শহরে। উদ্বেগ—হতীজনাথের

ছুটিলে।

সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ রাস্তা। বালেশ্বর শহর থেকে

অন্ত বেশ দূরে

১৩৫৩

কিন্তু দূরে সমুদ্রসৈকতের কাছে একখণ্ড ভূমি

সমুদ্রে বাগিচায়

করতে

হয়। বলা হয় চাষের ভূমি। কিন্তু আসলে

আমেরিকা

১৩৫৪

বিদেশ থেকে আস্তের জাহাজ ডিডবার কথা।

কলকাতা, মাদেগিকের অর্থ তিন ভাগ হবে—এক

১৩৫৫

যাবে কলকাতায়।

মাদেগিকের অর্থ কিন্তু পাওয়া গেল না। ভারতের

১৩৫৬

নিউইয়র্ক থেকে অর্থ সংগ্রহ করে লান দিয়েগো বন্দরে

প্রবেশ করে

১৩৫৭

অ্যানি লারেন্স আহায়ে তুলে দেয়। আমেরিকা সরকারের

১৩৫৮

সবকিছু দৃষ্টি কলে অর্থ সংগ্রহীত করতে নেই হয় তাই

১৩৫৯

সবকিছু বীপে বসন এই আহায়ে পৌছান, তার আগেই

১৩৬০

মাদেগিক অপেক্ষা করে করে হেনলুলু হয়ে জাহাজ ওল

১৩৬১

১৩৬২

১৩৬৩

১৩৬৪

১৩৬৫

১৩৬৬

১৩৬৭

১৩৬৮

১৩৬৯

১৩৭০

১৩৭১

১৩৭২

১৩৭৩

১৩৭৪

১৩৭৫

যাত্রাকার্য্যে তাবিহিতও পাছে পুনিশ জেনে গিয়ে
খাটাই। ১২শে ফেব্রুয়ারী ক'রে সেখান হ'ল।
সিঃ পঞ্চম মেসার্স এই তাবিহি জেনে

সর্ব্বত্র তখন চা উত্তেজনা ও কর্ম্মব্যবস্থা
সিদ্ধান্তে। কিন্তু মনঃস্থিতি খেল। কৃপাল সিং ব'লে
সেইসময়টা সব খবর পুনিশে বিচ্ছিন্ন, তাইই উপস্থিতিতে
২২ বৎসর বয়সে, আমেরিকা ফেরত কর্ত্তার সিং বাসবিহারীর
কাছে তাবিহিটা উত্তেজ ক'রে করেন।

সিঃ পঞ্চম সাত বাসক ধরপাকড় হয়। ১২শে তাবিহিই
বাসবিহারীর আশ্রয়স্থলও পুনিশ বেলাও করে সাতজন
আমেরিকা ফেরত বিদ্রোহী থকা পড়েন। কিন্তু বাসবিহারী
এ পুনিশ পলায়নে সক্ষম হন। সিংহের প্রায় এক বাস
পরে বিহারীর হাটীতেই বোনাসনেত থকা পড়েন। বহুখ
এই বেনা বাসনা থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে সাহোব
বড়র বাসনাও সিংহের জমি হ'ল।

বাসবিহারীর নামে সেনান হরিয়া ভারী হয়েছিল। আর
ঐরা লোক সেবে খাটা সত্তর ব'লে দেন হ'ল না। তিনি
চন্দ্রনগরে গেল এসেন। বতীশ্রনাথ তখন হরিয়া কাখে
নিয়ে বাসবিহারীর পুণ্ডে। অস্ত্র বহুদেব সঙ্গে সেখানাকাং
ক'রে শাসবিহারী তাপন বরেনা হয়ে যান।

সাহোবের বিশ্রোভের কার্য্যতা ও ধড়পাকড়ের খবর
শুনে কার্য্যের অমীর ভয় পেয়ে যান। অস্থায়ী প্রবর্ণ-
নোষ্ট্রা সভ্যদের খবতে চেষ্টা করেন। মহেশপ্রভাত প্রভৃতি
পুণ্ডেতে সন্দর্ভ হন। স্বকীয় অধ্যাপনা থকা পড়েন,
ক'রুদের জেলে পরে ঐরা সত্তা হয়।

উত্তরপশ্চিম ভারতে বেনন সর্ব্বনাশ হ'ল কৃপাল
সিংহের বিদ্রোহযাত্রাকার্য্যে। বাংলায়, পূর্ব্বভারতে ও পূর্ব্ব
ঐন্দিয়ার সব আয়োজন পণ্ড হ'ল একদল বিদেশী বিদ্রোহী
কিন্দ্রাকার্য্যে। বাংলায় তখন আর্ম্মপ্রীতির ছোয়ার বেগেছে।

সেই আর্ম্মপ্রীতির বৃত্ত বিস্তার বতীশ্রনাথ। ঐরা সঙ্গে
প্রজ্ঞানন্দন, হেনেজকিশোর প্রভৃতি আর থাকা ছুটেছিলেন
ঐরাই সম্পর্কে বিদ্রোহযাত্রাকার্য্যে বাংলায় কর্ম্মই হয়েছিল।
অপরাধকে বাহুগোপাল, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী,
নরেন ঘোষচৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হুজেন ঘোষ, সত্যেন

মিত্র, গোপেন যে সবক'র প্রভৃতি, থাকা বিদ্রোহের আয়ো-
জন করছিলেন, তাঁদের ব্যবস্থায় বিদ্রোহী কর্ম্মীদের কোনো,
নাযেই তাপিকা কোথাও থকা পড়েন নাই। এমন কি,
কোনো কর্ম্মী সেদিন বিভিন্ন কর্ম্মীগোষ্ঠীর লোকসমূহ একত্র
প্রয়োজনে ছাড়া কর্ম্মই চিনতে। এই সময়ে ফলে, এই
সব কর্ম্মীগোষ্ঠীকে নিয়ে কোনো ব্যাপক বড়র বাসনা কুরনও
সম্ভব হয় নাই। এমন কি, সতীশ গেনগুপ্ত, আভ্যতোষ
দাস, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন ঘোষ, নরেন দাসগুপ্ত প্রভৃতি
থাকা অনেক গুরুতর কাজে শিপ্ত ছিলেন, তাঁদের অনে-
কের নামও পুনিশ জানতো না। বাহুগোপাল, অতুল
ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, অহর চাটোবি, নলিনী কর প্রভৃতি
বহু মত হসিয়া নিজেও ঐ ছয় সাত বছর কালের ভিতর
থকা পড়েন নাই।

কিন্তু সর্ব্বনাশ চেষ্টায়ে থাকা গেল না। আমেরিকায়
তখন পুনিহারী বিভিন্ন দেশের বিদ্রোহীরা একত্র হয়েছেন।
তাঁদের সেখানে উৎসাহ আবেগ সীমা ছাড়িয়ে গেছে।
পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্রের ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের
ভারতীয়েরা বেনন সেখানে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের
আয়োজন করছেন ভার্ম্মানীর সাহায্যে, চেকোস্লোভাকিয়া
তেমনি বিদ্রোহের আয়োজন করছিলেন আবার লোই ভার্ম্মানী
অস্ত্রিয়ার বিরুদ্ধে ইংরেজ ও কানাডীর সাহায্যে। ভার্ম্মানী
নিজেদের ক'র হাঙ্গারি করবার জন্য ইংরেজ পক্ষকে
খুশি করতে চান। ভার্ম্মানী ভার্ম্মানী করবার জন্য
খবর ইংরেজ ও কানাডীকে দিয়ে দেন। বিদ্রোহী হিসাবে
ভারতীয়েরা চেকোস্লোভাকিয়ার অবস্থান করেন নাই।
ভার্ম্মানী তাঁদের কাছ থেকে রাহমতসে অস্ত্র আশ্রয়ানীর
খবর এবং হাঙ্গারি এও সমস্তের টিকানা-পর্ব্বত ভার্ম্মানী
দায়। খবর কিন্তু এখন সময়ে পায় যে, রাহমতসে থাকা
গিয়েছিলেন, ভার্ম্মানী কিয়ে আসবার পরে পুনিশ সেখানে
যায়।

কিন্তু হাঙ্গারি এও সল থেকে হয় টেনে আসবার
বয়ের ইউনিভার্সাল এস্পেরিয়ান ও সেখান থেকে কিয়ে-
পলয় ভার্ম্মানীরা অস্ত্রেরবলের সর্ব্বনাশ করবার
পুনিশ এখন থেকো বহু পায় নাই, বহুখ থেকে

প্রাপ্ত খবরের উপর ভারতের Central Intelligence Bureau থেকে ডেনহাম এসে সর্বত্র তল্লাশী করে।

বতীন্দ্রনাথকে ধরা সহজ হবে না, ওরা জানত। জাই গ্রামে-গ্রামে রাউট করে, জার্মান ডাকাত এসেছে, বাঙালী ডাকাত এসেছে। তাদের ধরিয়ে দিলে সরকার ইনার হবে। এদিকে বতীন্দ্রনাথ খবর পেয়ে নিজে নবীতে নেমে ঘুর থেকে বখন ডাক বাঙালির আসোতে তিনটি সাহেবকে দেখতে পেলেন, বুতলেন, ও তখন ওঁদেরই উদ্দেশ্যে ছাড়া ওরা যারনি। আশ্রয়স্থল বতীন্দ্র চক্রবর্তী বললেন, চিত্ত ও মনোরঞ্জনকে নিয়ে সরে যেতে। কিন্তু নয় মাইল ঘুরে তালভিহার তখন আর একটি আশ্রয়ে ছিলেন নীরেন ও বতীন্দ্র। সহকর্মীদের বিপদের মুখে ছেড়ে যেতে বতীন্দ্রনাথ কোনো দিনই রাঙী ছিলেন না। তিনি চিত্ত ও মনোরঞ্জনকে নিয়ে তালভিহা গেলেন। পরদিন মহলভিহার বাড়ী তল্লাশী করে পুলিশ মোতায়েন বেগে সাহেবরা চলে গেল। বতীন্দ্রনাথ গভীর রাতে কিংবা মণীবাবুর কাছ থেকে পাথের সংগ্রহ করে কলকাতার দিকে রওনা হলেন। তালভিহা থেকে ২ মাইল, ও মহলভিহা থেকে আর ৩১ মাইল হেটে জোরে বালেশ্বরে গৌড়ান। টেনে যে টেনে গাড়িতে ছিল, উঠতে গিয়ে বুলেটেন, পুলিশের স্পেশাল ট্রেন। কলকাতার হাটাপথ গুললেন। পূর্বঘরের দোড়ে সর্বত্র গ্রামবাসীরা অহুসরণ করে। ছোট খাটো সংঘর্ষও হয়।

কলকাতার দিকে আসা বখন অসম্ভব বুললেন, তখন মাঠভাড়া মল, ধানক্ষেত আর কাটাখানের ভিতর চিরে ঘুরে-ফুরে পথ ধরেন। বৃহৎ নদী পুলিশের নিষেধ সত্ত্বেও একজন গ্রামবাসীই পার করে দেয়। বিকেলে বালেশ্বর নদীর সেকেন্ড চানিপুর Proof Range এর Commander জাফরকেও ও বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট কিমবির নেতৃত্বে বহু সৈন্য ও পুলিশ এসে পড়ে। এরা তখন চলহুসিয়ার কুমার সেকেন্ড সার্জার কেটে পার হয়ে চবাবতের মাঠে এক পুকুরের ধারে এসে পড়েন। আর দেড় মাইল পথ থেকে পুকুরের তীরে প্রবেশ করতে পারতেন।

ইদুরা বখন, কিন্তু গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে। ওরা

পুকুরের ধারে এক কোণের ভিতর ঢুকে পড়েন। উই-পোকায় নাট তুলে টোকার মধ্যে ক'রে রেখেছিল, তখনই আড়ালে বসে মশারের হাতলে তার Case ভাগে লাগিয়ে রাইফেলের হাতে ধ'রে সৈন্যদের গুলির প্রজ্বলিত দিতে থাকেন।

প্রায় সওয়া বতী দুন্দের পর গুলি ফুরিয়ে যায়। বাসাব-কোর্ড মাটিতে শুয়ে গুলি ছুঁড়ছিল। অপর লক্ষ থেকে গুলির আওতা বন্ধ হয়ে গেছে সেখান থেকে হেটে পেছন দিকে এসে পড়ে। লেখ, গির তখন সূতপ্রাণ, বতীন্দ্রনাথের কোলের উপর শুয়ে। বতীন্দ্রনাথ নিজের আত্মত, জলগেটে গুলি লেগেছে। বতীন্দ্রনাথ পাতে ভগ্ন হয়েছেন। এই অবস্থায় ওঁদের মধ্যে বতীন্দ্রনাথের পরমিত হাস-পাতালে বৃত্তা হয়। এই প্রদন বাঙালী লক্ষ ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঐক্য থেকে মুখ ক'রে প্রাণ দিলেন। বৃত্তার আগে বতীন্দ্রনাথ বলে যেনে "I and Chittapriya Ray die to vindicate the honour of Bengal" বাংলায় অংকান থেকে কত বড় এপ্রশাস্ত হ'ল বাঙালীজাত তা জানতেও পেল না। এর পর মামলা হয়ে মনোরঞ্জন ও নীরেনের মর্শি হয় বতীন্দ্রনাথের লেখা একখানা খাতা পুলিশের হাতে পড়িয়া। মামলার সময় এই সেখান কথা উঠের ক'রে তখনকার বিচার-উড়িয়ার পুলিশের ডি আই রি রাইলাও বলেছিল, এই ব্যক্তি বেঁচে থাকলে সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষক ও নেতৃবর্গের হাতে পারতেন। স্বাধীন ভারতে এই সেখাটির সম্মান করতে গিয়ে কিন্তু জানা গেল, ইংরেজ তা নষ্ট করে গেছে।

"দাদা"র বৃত্তান্তে সময় নিরবী সময় ভেঙে পড়ল। কিছু আয়োজনের তখনও কালি হ'ল না।

নরেন ভট্টাচার্য বখন দ্বিতীয় বার জাড্য হান, তুপি লগে গিয়েছিলেন। তিনি বরাবর সংগ্রহই চলে যান। মাতেরিকের প্রাধান্য ব্যর্থ হ'ল ব'লে কবির কথায় সংগ্রহ-বের জার্মান কনসাল জেনারেল আরও দুই ভাড়া জম্ম পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। যদি ২০ হাজার রাইফেল, ২ হাজার পিস্তল, বোমা এবং ২ লক্ষ টাকা নিয়ে নিয়ে আসবেন হাতিয়ারে, অপর মাহাজখানি ১০ হাজার রাইফেল

৬ অসহ্যে বাগদহর। কিন্তু চেম্বের্স-অফ-সেপারেটর বহুই উত্তর, পূর্ব এশিয়া, আমেরিকা ইত্যে প্রভৃতির তৎপরতা এই সময় অত্যন্ত বেড়ে গেছে। ফলি সাংঘাতিক ধরা পড়ে যান

একপাশে জাহাজ অবন সাগরের উপকূলে গোতরীতে চিড়বৎ কথা। মহারাষ্ট্রের দলের সহযোগিতায় এই জাহাজ থেকে অস্ত্র নানাবার ব্যবস্থা করতে জোলাবার ও বিনয় সন্ত গোয়ার যান সেখানে ধরা পড়ে জোলা পুবা জেলে আত্মহত্যা করেন

যেহে গুণ দেবী এস বসে আর এক জাহাজে যোহেন ও এডেন নামে দুইজন জালালি অফিসারকে পাঠান এই শিষ্ট ছিল। কথা ছিল,

শিষ্ট প্রাথমিক: সীমাবদ্ধ রাখবেন, তিনি এখন ভারতীয়ের দুর্বলতা দেখাবেন। বাকী শিষ্ট প্রচেষ্টা নিয়ে দেখা হবে। কিন্তু মালিয়া থেকে সাংঘাতিক পৌড়াবার পর সেনাবাহিনীর গুরু বিভাগ অস্ত্রপে ধরে ফেল। জাহাজ হেলিকপ্টার যাত্রা যোহেন এখন থেকে বাটোভিলা হয়ে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে বিদ্রোহের গুরু টাক: নিয়ে বাতক রক্তা হন। পাবে শিষ্টাপুরে ধরা পড়েন। এদেশের কাছ থেকে ২০ হাজার ডলার পেয়ে তার কতক অংশ বাতকের উকিল কুমুদ মুখার্জি কলকাতার বাহুগোপালকে দেবার চক্র আসেন। কুমুদ কিন্তু টাকা নিয়ে আসতে পারেন না। বাহুগোপালের সঙ্গে দেখা করে ঐ ২০ হাজার শিল্পের সংবাদ জানিয়ে যান, কিন্তু সে অস্ত্র সে ইতিমধ্যে ধরা পড়ে যায় তা বলেছি। বিভিন্ন সংবাদ নিয়ে লাভিপন মুখার্জি, কপতিবন্দুবার, শৈলেন যোগ ও দিবপ্রসাদ গুপ্ত ও বিশেষ বেতে বা কিরবার পদে ধরা পড়েন। দেহর, এদেশে যোহেনের পরে চিকাগো ফু-বল মাদ্রাস এবং শৈলেন ও অপর বহু ভারতীয়ের যান জালালিরা বহু সংখ্যক মাদ্রাস বিচার ও লাঞ্ছিত হয়। অনেক শিষ্টাপুরে বন্দী থাকেন।

দুগ্ধার ও গরুরকে কেন্দ্র করে এই সব বড়বড়ের আর একটি লাখা কত বরতো কনট্রোলিনোপের জাহাজে-

ই-ইসলামকে কেন্দ্র করে। ১৯১৪ সালে কাগজখানি বের হত এবং বিভিন্ন ভাষার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং ভারতবর্ষে, বিশেষত: কলকাতায়, দাহোয়ে, করাচিতে, পেশোয়াবে ও রেহুনে প্রচারিত হ'ত। রাসা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও হরদয়াল ও এই বড়বড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। এর বিশেষ উদ্যোগী কর্মী ছিলেন ওবেছা। রেহুনে সীমোদ-গোপালের সঙ্গে ও শিষ্টাপুরে দুগ্ধারের সঙ্গে ও সেখান-কার শিষ্টাপুরী বিদ্রোহের সঙ্গে এই আন্দোলনের যোগাযোগের কথা পূর্বে উল্লেখ করছি।

জার্মান পররাষ্ট্রবিভাগের সঙ্গে সৈনিক যোগাযোগ রাখতেন বীহেন চট্টোপাধ্যায়, বরকজুলা ও হরদয়াল। ১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে কিন্তু কাবুলে দুটো কৌ-আর্মার মিনারী হুজুতে পাবে, ভারতের বিদ্রোহের আশা ছুটিয়ে গেছে। তারা তখন কাবুল ছাড়ে। কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপ আশা ছাড়েন নাই। তিনি চলিয়ার আরকে চিঠি যেন ইত্যে পক্ষ ত্যাগ করে ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে। কুমুদ মুখার্জির শাসককেও দেখেন। এদিকে সেখ-উল-ইসলামকে ওবাবের মোলানা মহম্মদ হাসান ও মকা থেকে তুর্ককে ঐ মর্মে চিঠি যেন। চিঠিগুলি ধরা পড়ে যায়, এবং সেখ-উল-ইসলাম ইত্যেদের হাতে বন্দী হয়ে মালদহ নিবাসিত হন। মো: আবুল কালাম আজাদ ও মো: মহম্মদ আলি ও শওকৎ আলিও অন্তরীণাবদ্ধ হন।

ইতিমধ্যে একপাশে জার্মান হুজু জাহাজ আত্মহত্যা আক্রমণ করবে কথা ছিল। সেখানকার সামরিক বন্দীদের ও শিষ্টাপুর সৈনিক বিদ্রোহের বন্দীদের নিয়ে পরে সেন্সন আক্রমণ করবার কথা। কিন্তু কপি সাংঘাতিক ধরা পড়ার পর জাহাজে করে ভারতে বিদ্রোহ চেষ্টায় সাহায্য পাঠাবার সম্পর্কে জার্মানরা নিরাস হয়ে পড়ে। হেলিকপ্টার কিন্তু একজন টানাকে বিদ্রোহের কপিল টাক: পাঠান। কথা ছিল, টাকটা পেনাং জোলাবার হাতে, অথবা, তা সম্বন্ধ না হ'লে কলকাতার বাহুগোপালকে বা অন্তরীণাবদ্ধকে পৌছে যোহেন। টাকটা কিন্তু শিষ্টাপুরে ধরা পড়ে যায়।

১৯১৪ সালের অক্টোবরের আর দুইজন চীনারও কতকগুলি আর নিয়ে আসামের প্রান্ত দিগে ভারতে আনবার ব্যবস্থা হয়। একই কারণে এঁরাও সাংহাইতে থাকা পড়ে যান। আবার এঁদের সম্প্রস্কিত পথেরের জের টেনে ভ্রাম্যবর্মার সীমান্তে পাকোর এতিমিয়ার আর সিংএর লন্ডান ইংরেজ পায়। পরে বাম্বালার বড়ব্রহ্ম বাম্বালার অমর সিংএর ফাঁসি হয়।

হেলস্কেরিগের চেষ্টার ইতিমধ্যে ব্যাটাভিয়ার অন্তরীণ মার্চেরিক মাছাছ আনেরিকা রওনা হয়। এই মাছাছে পাঁচ জন ভারতীয়ের ভিতর হরি সিং নেবে থাকেন, নরেন ভট্টাচার্য তাঁর স্থান নিয়ে বাম্বালার নেবে পড়েন। সেখান থেকে সাংহাই যান। রাসবিহারী তখন সাংহাইয়ে। উভয়ে আপানে লাঙ্গপত রাগের সঙ্গে একত্র হন এবং লান ইয়াট সেনের সঙ্গে দেখা করেন। এরা চান আপান যেন ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ঘোষণা করে। তার ফলে আপান এশিয়ার নেতা হবে। কাউন্ট অহুদা তখন কিন্তু ইংরেজের প্রভাবে। হেরথ গুপ্তও পরে আপানে এসে রাসবিহারীর সঙ্গে মিলিত হন। আপান সরকার এঁদের ধরতে চেষ্টা করে। নরেন ও হেরথ পৃথক পৃথক ভাবে আমেরিকায় পালায়ে যান : রাসবিহারী পি. এন. ঠাকুর নামে 'চকমা' ও ব্রাক ড্রাগন পোসাইটির সাহায্যে আপানেই পুকিয়ে থাকতে সক্ষম হন।

এদিকে জাৰ্জানীর সঙ্গে বড়ব্রহ্মের ও পাভাবের সিপাহী বিদ্রোহের খবর পেয়ে ইংরেজের ত্রিদিনের রক্তচক্ষু ক্রম হয়ে উঠলো। বড়ব্রহ্মের বাম্বালার পর বাম্বালা চললো লাহোরে, কত বীরের যে ফাঁসি হ'ল, মাঝলীখন নির্বাসন হ'ল, তার সংখ্যা কণা জার। কানীতেও এক বড়ব্রহ্মও বাম্বালা হয়। বাংলায় চললো বিনাবিচারে কলী করায় পালা; বানাভঙ্গাঙ্গী, শ্রেণ্ডায় খরে করে নিত্য নৈমিত্তিক।

এরই মধ্যে একদিন গভীর রাত্রে অতুল ঘোষ ও সতীশ চক্রবর্তীকে পাবে আশার পুলিশ শালকিয়ার এক বাড়ী ঘেরাও করে। দুই পকেই গুলি চলে। অতুল পের্দে-ছিলেন না। সতীশ গুলি লাগতে লাগতেই মরে পড়েন।

পরপাকড় সঙ্গেও পুলিশ বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারে নাই। দেশের ও বিদেশের আয়োজন, বিশেষতঃ গোপন আয়োজনে অর্ধের প্রয়োজন গ্রহীত ১৯১৪ সালে অনেকগুলি ডাকাতি হয়। তার মধ্যে প্রাগপুর, শিবপুর, কণোয়েশন টাট ও কর্ণওয়ালিস টাটের ডাকাতি বিদ্রোহীদের সাহস ও নৈপুণ্যের মন্ত উল্লেখযোগ্য। প্রাগপুরে ও শিবপুরে পুলিশের সঙ্গে বীরশক্তি ধরে গুলি চালাচালি হয়। শিবপুরের সম্পর্কে অনেকগুলি উজনিপকিত বুক ধরা পড়েন প্রাগপুর থেকে ফিরবার পথে লড়াই করতে করতে, প্রথমতঃ বীর উপলক্ষ্যে বাংলায় প্রথম বোমা কাটে, আর থাকে নিয়ে বাঙালী জাত একদিন গান গেয়েছিল—

আমায় বেত বেড়ে কি মা দুলাবে

আমি কি মায়ের সেই ছেলে ?—

সেই হুদীল শেন পদ্মার পাড় ভেঙে পড়ে যান, সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতের মবারের গুলি গলায় লেগে মস্তিষ্ক ভেদ করে চলে যায়।

ডাকাতির সঙ্গে সঙ্গে আই বি পুলিশ পেছনে লাগে। মশজিদ বাড়ীতে তাই গিরীম ব্যাণাধির হত্যা হয় এবং দিন দুপুরে মেডিক্যাল কলেজের লামনে মধু ভট্টাচার্য মরে।

এদিকে ঢাকা অহুদীলন বিদ্রোহচেষ্টায় যোগ দিল না বটে, কিন্তু ডাকাতি ও পুলিশ কর্তারী হত্যা অনেকগুলি করে—ডাকাতি, পূর্ববঙ্গে এবং কর্তারী হত্যা প্রধানতঃ কলকাতায়। রাজাবাঘারে একটা বোমা। তৈরীর আড্ডাও ধরা পড়ে। নুগেন-ঘোষের হত্যা উপলক্ষ্যে ব্যারিষ্টার নটন ঘোষের নির্বলকায় রায়েক লাভি থেকে ধাচান, তাতে বিশেষ চাকদোর স্বষ্টি হয়েছিল। বসন্ত চাটাজির উপর মুলমামলাপাড়া লেনে বোমা পড়ে। সেখানে বেঁচে যায়, কিন্তু '১৬ সালের জুনমাসে তাঁকে অসাধারণ কৃতিত্বের সাথ হত্যা করা হয়।

কিন্তু রাজাবাঘারে এবং বিভিন্ন স্থানে এঁদের কতকগুলি সভ্যতালিক। ধরা পড়ায় সংঘের অনেক ধরার পুলিশ পেয়ে যায়। বরিশালে পর পর দুইটি বড়ব্রহ্মের মামলা হয়। পূর্ববঙ্গের ডাকাতিগুলি উপলক্ষ্যে বহু লোক ধরা

পড়ে। চুই নতুনই বন প্রায় সমস্ত কবী ধরা পড়েছেন, তখন চুই নতুন নেতারা আবার একসঙ্গে চলেতে থাকেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কক্ষ সংস্থা বলে একজন বিশ্বাসঘাতক ভেঙ্গে ব'লে ব'লে বহু সংবাদ পুলিশকে দিয়ে বের। কলে গৌহাটিতে করেছজন পলাতক বিদ্রোহীকে পুলিশ ধরতে চেষ্টা করে। উভয়পক্ষে গুলি চলে। অন্যদিকে চট্টোপাধ্যায় পাশিয়ে যান। মলিনী খোদ প্রকৃতি করেছজন ধরা পড়েন। এই বিশ্বাসঘাতককেই সংবাদের কলে ঢাকা কলকাতাবাজারেও পুলিশের সঙ্গে এক সংঘর্ষ হয়। সেখানে মলিনী বাগ্গি ও তারিহী মল্লমার শহীদ জীবন বরণ করেন।

ইতিপূবে বঙ্গ চট্টাঙ্গির হত্যার পর থেকে ইংরেজ সরকার কিন্তু হয়ে উঠলো, বানবিচার ব'লে কিছু হঠলো না—সেইজন্যে তত্ত্বাসী, প্রেস্চার ও মন্তব্যে। Regulation III ও Defence Act-এর বন্ধীতে কলে ভরে উঠলো। তার উপর শুক হল নির্বন প্রহার, অস্ত্রবিধ নির্বাহন এবং ভেলবানার অবস্থিক আচরণ, নির্ভর কারাবাস। কলে, অনেক পাগল হয়ে যান, অনেকে অস্ত্রহস্ত্য করেন। দালাল্য ইটম কুখ্যাত হয়ে উঠলো, নির্বাহন ধর্মের করতে হবে, তাঁদের সেখানে বন্দী ক'রে রাখা হত, আর কিছুটুকু খানার নিয়ে পাঁচ মিন লাভ দিন অন্যদ্বারে অনিচ্ছায় বিবাহিত পাড়ো করে রেখে রোম রাস্তে রাস্তে প্রহার ও নানাবিধ অকথা লাঞ্ছনা চলতো। বাঙালীর ছেলে তবু ভেঙ্গে পড়লো না। কিন্তু বেদের সাধারণ লোক আতংকিত হয়ে উঠলো। এঁদেরই বেলনা মূর্তি পেল ত্রাণ স্বত্বমধ্য আচারের ও কণথপূজা। অ্যানি বেপাঙ্কের মূখে।

হত্বকথা তার উপাধি ত্যাগ করলেন, অ্যানি বেশান্ত নির্বাসিত হলেন। তাঁর এই নির্বাসনে তড়িৎশব্দের মতো জাত নুসুতা বেড়ে কলে আবার উঠে পাড়লো। দেশ ছুড়ে এখন আন্দোলন শুরু হ'ল যে বেনীদিন তাঁকে বন্দী ক'রে রাখা ইংরেজের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। এই আন্দোলনের উপলক্ষেই কংগ্রেসের ভিতরকার গরম দল ১৯০৭ সালের পর এই প্রথম আবার তাঁদের গৌরবময়

আগনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ইংরেজের হুমুদবাণী কিছুদিনের মতো ত্রিভিত হ'ল।

যেলে বংগোচিত নিষ্পত্তির মুহূর্ত্ত ভাবের মধ্যেও কিছু সত্যিকারের বিদ্রোহী ধারা ছিলেন, তাঁরা অগ্নিস্নেহ ভিতরই স্বাধিকারপ্রদত্ত হয়ে উঠলেন। স্বাধিকারের যেমত বর তখন তাঁদের স্থানে পৌছোতে: "স্ব না করিলেও যখন চলে এবং স্ব না করিলেও যখন ভাল চলে তখন স্ব করি কেন?" বন্দীর অস্ত্র অনশন। বাংলায় বন্দীরা এই পর্যাতেও ঘোলের 'মধ্য' ভিতরে ইংরেজকে বাধা করলেন।

বাঙালীজনে তার নির্বীৰ্ত্ততার অপবাদ মূঢ়াতাই বেন সেদিন বহুস্বিকার। দেশের বাইরে রাগবিহারী, নয়েন চট্টাচার্য ওরফে এম, এন, দাস, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, তারক লাল, ডাঃ কুলদেব, হেবল ওপ্ত, আর তাঁদের সঙ্গে হরনাথ, রামা মহেশপ্রতাপ, বরকতুহা, স্বরিন্থ সিং, ওবেজুনা বেন মুখকতুর মতো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত বিপদকথা যাড়ে নিরে ছুটে যেড়িয়েছেন তার-বের স্বাধীনতার হুকুকে সকল করতে। দেশের মধ্যেও যে অদাণ্ড সাধনের চেষ্টা চলেছিল জীবন মৃত্যুকে একাত কুচ্ছ ক'রে, তারও কিছুই আকাশ দিয়েছি। বা কলেমু মস্তের সাধক হঠাৎপ্রাণ বলতেন, আদ্যনা বরব, জাত আগবে।

সে যত্র সকল হ'ল, কিন্তু এক অভাববীর পরান্ত্য বিদ্রোহের যে বিপুল আয়োজন হয়েছিল, তার গৌরবময় বার্ষিক্যই হ'ল যেন কল্লুকে গণমাগরণের আহ্বান। অগ্নি আয়োজনের সভাবনাতে তিরকালের মতো মুড়ে কেলবার স্বধীরতার ইংরেজ রাওলাট আইন জারী করলে, মলি-হানওগালায় তাওব মৃত্যু নাচলো। এই প্রতিবাদে মহাস্থা গান্ধী যেদিন গণমাগরণের আহ্বান জানালেন, জাতের বীৰ্য্যবীরের সক্তি অকুতা ছুটতে শুরু করলো। এই আদ্যতেই বিদ্রোহী বাংলা প্রথম দাঙ্গাপাঙ্গে একদিন গেরেছিল—

ওদের বাধন হতোই পক হবে

মোদের বাধন ইটম

• ২২/১০২ তারিখে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে পঠিত।

ধন্য চট্টগ্রাম

ঐতিহাসিকদাল দাস

কবিগুরু স্বাধীনতার মনে একদিন প্রশ্ন জেগেছিল—
“স্মৃতির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?” সে প্রশ্নের
উত্তর দিচ্ছে বাংলার বিপ্লবীরা আপন বৃক্কের রক্ত ঢেলে।
পরানবীণার তব্রিষ রাতে তারা স্বাধীনতার বিদ্যুৎ প্রজ্জ্বলিত
জ্বল জ্বল তপস্যা করেছে। সে তপস্জ্বল তারা অতুলনীয়
ত্যাগ, অনমনীয় দৃঢ়তা ও চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয়
দিচ্ছে। একটা বিদেশী শক্তি যখন সমগ্র ভারতটাকে
ঘিরে বীজে অদাহ্য করে তুলেছে—অজাতি, গণিত্য, অশিক্ষা
আর ভাঁকতার গর্ভে সমগ্র দেশ যখন আকর্ষিত—নিমজ্জিত—
প্রতিবাদের সাহস নেই, প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা নেই, একটা
উপায়বিহীন অন্ধকারের স্তব্ধ কোটি কোটি নরনারী বেলনার
মুহামান—নিশ্চেষ্টে তাদের দেহের দেহের ওপর, কাপড়ের
কণকণ পাখর তাদের বৃক্ক ঢেলে আছে—তখন এই
বিশেষী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ক্রোধ লাভ্যার হৃদয়
সাহস নিয়ে, বীর্যের মহান মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের
কঠিন সাধনা করেছে মুহুর্তে এই বাংলার বিপ্লবীরা।

এই সাধনায়ই একটি মৌর্যবোজ্জল অধ্যায় রচিত
হয়েছে ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বিপ্লবী
কর্মচারীরা, বা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে রক্তের
আখরে লেখা হয়ে থাকবে। মুক্তিপাগল বাঙালীর ছেলে-
মেয়েরা সেদিন অস্বপ্নের সাধনায় আপন বলতে বাঁকিছু
আছে সর্বত্র বিপ্লবের গির্জা, এমন কি নিজেদের প্রাণ
পবিত্র উৎসর্গ করে দেশস্বাধিকারের স্বপ্ন পরিপোষ করেছে।
কল কলকল করে বাগকণ্ড সেদিন বজ্রের কঠোরতা নিয়ে
এগিয়ে এসেছে, হাসিমুখে নিপীড়ন সরেছে, কাঁদার রশি
বরণ কঁপে নিচ্ছে। মেয়েরাও পিছিয়ে থাকেনি। স্বভাব-
কোন্দন বোনেরাও সেদিন ছুঁড়েছে গিটল, ভেঙেছে চিরা-
চরিত্র সন্মার, বরণ করেছে দুঃখনির্গাতন, মুক্তিভঞ্জন অংশ-
গ্রহণ করেছে দ্বিমুখী ভাইদের সাথে।

মেশেরশব্দে বাতির ইতিহাসিক প্রয়োজনেই যে সেদিনের
এই স্বকণীন বিপ্লবী কর্মচারীরা প্রয়োজন ছিল, তা উপলব্ধি

করতে হ’লে একটিকে যেমন জানা চাই সেদিনকার স্মার-
নৈতিক পরিবেশ, অগ্রগতিক ভেদনি ভেদে সাধা দরকার
বিপ্লবীদের চিন্তা ও ভাবধারার একটু ইতিহাস।

১৯২৮ সালে কারাকান্ড ও অন্তরীণাবদ্ধ বিপ্লবীরা যখন
মুক্তি পেলেন, তখন চিত্রকালের বিজ্ঞান বাংলার প্রধান
মুক্তি বিপ্লবী দল যুগান্তর ও অহুসীলনের মধ্যে একটা
মিলন সংঘটিত হ’ল একযোগে কাজ করার সংকল্প নিয়ে।
চাকার হেঘ ঘোবের ছোট দলটি এর পূর্বেই যুগান্তরের
সঙ্গে মিলে গেছে। এই সম্মিলিত বিপ্লবী দলটি বাংলার
কংগ্রেসকে তখন পরিচালনা করছিল।

কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশন আগত প্রার। অধিবে-
শনের শুরু বৈজ্ঞানিক বাহিনী গড়ে তোলা প্রয়োজন।
বিপ্লবীদের নেতৃবর্গ স্থির করলেন, এই সুযোগে বৈজ্ঞা-
নিক দলকে শুধু দল হিসাবে নয়, একটা আন্দোলন
হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বিরাট
বৈজ্ঞানিক বাহিনী গঠিত হ’ল এবং এর স্বাধীনতার কথের
ভার বেগুনা হ’ল স্বাভাবিক বহুর উপর। অস্ত্রাভ বিপ্লবী
নেতারা এই বাহিনীর নায়কদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাদের
ভিতরে বিপ্লবী ভাবধারা সঞ্চারিত করলেন। এই বৈজ্ঞা-
নিক বাহিনী বেধে বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে সমাগত
যুবকদের মনে লাগলো চমক। এর পর জেলায় জেলার
এমনিধারা বৈজ্ঞানিক বাহিনী গড়ে উঠলো এবং সর্বত্র
ভার নেতৃত্ব রইল বিপ্লবীদেরই হাতে।

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের প্রধান প্রস্তাব ও
আন্দোলনের বিষয় ছিল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে।
সর্বদল সম্মেলন কর্তৃক গঠিত নেতৃবর্গ কমিটির রিপোর্ট
অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী জ্যোতির্বিদ্যে টেটালুই কংগ্রেসের
লক্ষ্য বলে প্রস্তাব পাশ করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু
বাংলার বিপ্লবীরা এর বিরোধিতা করলেন এবং দল
প্রস্তাবের সংশোধন হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের
লক্ষ্য বলে ঘোষণা করার দাবি ব্যক্ত হয়ে উঠলেন। প্রাক্তন
অধিবেশনে বিপ্লবীদের এই ব্যক্ততা তারা শেল স্বাভাবিকের
মুখে। শেষ মুহুর্তে গান্ধীজী একটি মাঝামাঝি রকম করলেন
এই মর্মে যে, এক বছরের মধ্যে যদি জ্যোতির্বিদ্যে টেটালু

না। তবে অগোমী ১৯২২ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে গৃহীত হবে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যথোপযুক্ত কর্ম-দ্বীপ গ্রহণ করা হবে। বিপ্লবীরা এই প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং সরকারিসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

বেশতে বেশতে একটি বছর কেটে গেল, ভোম্বিনিয়ন টোন্স বিলম্বো না। সালের ৩১ মে হিসেবের লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী নিজেই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনলেন এবং প্রতিষ্ঠিত মতিলাল নেহরু তা সমর্থন করলেন। প্রস্তাব পাস হ'ল এবং পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্য আইন অমাত্র আন্দোলন শুরু করার সর্বত্র কর্তব্য দেওয়া হ'ল গান্ধীজীর উপর।

এবারে বিপ্লবীদের নিজস্ব কর্মধারা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বেশা দিন অপরিস্রবত্বপে: উদ্বা স্মৃতি বৃত্তে পারলেন, মহাত্মাজীর আইন অমাত্র আন্দোলনের আঙ্গানে আসনূর হিন্দোল হুলে উঠবে, লক্ষ লক্ষ নরনারী জাতির মুক্তি প্রদানে ত্যাগের পথে, জুখবরদের পথে, অহিংস সংগ্রামের পথে নির্ভীক পথে অগ্রসর হবে। কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরাও নিশ্চেষ্ট বসে থাকবে না। তাদের সমস্ত শক্তি তখন মুক্তিকামী ভারতের উপর সীমাহীন বর্বরতার কাঁপিয়ে পড়বে, অহিংস আন্দোলনকে গিঁথে ধারবার জন্ত তারা চরনন হিংসার অস্ত্রের নেবে। নিরস্ত্র জনতার উপর লম্বা পুলিশ-কোষের নিউর অত্যাচারে, একতরফা মায় খেয়ে খেয়ে জাতির নৈতিক শক্তি বখান নিঃশেষ হয়ে আসবে, আত্মবিবাস শিথিল হয়ে পড়বে, বলগাহীন পর-কারী হিংসার পীড়নকে অহিংস পন্থার প্রতিরোধ করার কবলা হারিয়ে কেলবে, তখন আখাতের উত্তরে প্রত্যাখাত ক'রে জাতির নৈতিক শক্তিকে, প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রত্য-রক অব্যাহত রাখার দায়িত্ব নিতে হবে বিপ্লবীদের। তখন কোনো-একটা সনীয় ক্ষেত্রে হলেও, ইংরেজের শক্তিকে পরাভূত ক'রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তর দিয়ে সেনাবাহী বনে ভরসা যোগাবার, বাস্তব পথ দেখাবার দায়িত্বও নিতে হবে বিপ্লবীদের। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁরা পূর্বে থেকেই প্রস্তুত হতে থাকলেন।

ইতিপূর্বেই দৃষ্টিগোচর অগ্নীশীল নিলন ভেঙ্গে গেছে। পূর্বেও যে সমস্ত কারণে এই দুটি প্রধান বিপ্লবী দল একসঙ্গে কাজ করতে পারেনি, সেই একই কারণে এই নিলনও খাটী হতে পারেনি না। হুতরাং শুধু দৃষ্টিগোচর ও তার লক্ষ্যে সন্নিহিত ছোট দলগুলি বৈরবিক প্রকৃতির কারণে আত্মনিয়োগ করলো। স্বাধীনতা নামে দৃষ্টিগোচর দলের একটি সাম্প্রদায়িক সুশ্রুত তখন প্রকাশিত হচ্ছিল। এই কারণে সমগ্রদের পর সমগ্র খ'রে আগামী বিপ্লবের গতি, প্রকৃতি ও ভগ কি হবে তা নিয়ে বিলম্ব ও খোলাখুলিতাবেই আলোচনা চলতে থাকলো। এইভাবে বাংলার স্বকলের মনে সৈমবিক চেতনা জাগিয়ে তোলায় কাজ লক্ষ্যতার সঙ্গেই এগিয়ে চললো। আর গোপনে চলতে থাকলো অস্ত্র সংগ্রহ ও বোমা তৈরীর কাজ।

বিপ্লবীদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ছিল, প্রকৃতি সম্পূর্ণ হ'লে সঙ্গ্রাম বাংলাদেশে এবং বাংলার বাইরেও যেখানে যেখানে সম্ভব একসঙ্গে আত্মপান ঘটাবার। কিন্তু চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা। ইতিমধ্যে কিছু অস্ত্রের সংগ্রহ করেছেন এবং জেলার সনীয় ক্ষেত্রে উপযোগী একটা মোটামুটি কর্মদ্বীপও তাঁরা স্থির করে কেলছেন। অত্যাচার জেলার প্রকৃতি তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। অস্ত্রের অভাব পূরণের জন্য কল-কাতার বিপুল সংখ্যক লোনা তৈরীর যে আয়োজন চলছিল তাও তখনও প্রাথমিক স্তরে মাত্র। কিন্তু চট্টগ্রামে এবং বাংলার বাইরেও কয়েকটি স্থানে যে শক্তি তখন সংগৃহীত হয়েছে, বিলম্ব ঘটলে তা পাচ্ছে নই হয়ে যায়, এই জন্য স্থির হ'ল যে, প্রথমে চট্টগ্রামে আত্মপান হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জেলার জেলার বিচ্ছিন্নভাবে যেখানে যতটা সম্ভব ইংরেজ শক্তিকে আখাত হেনে হেনে বিপর্যস্ত ক'রে তোলা হবে।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত্রি নটা পরভাগিন নিনিটের সময় বিপ্লবীরা স্ব'ব সেনের ওরকে খাটারবার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের পুলিশ আর্ধারী ও রেলওয়ে আর্ধারী আক্রমণ ক'রে অস্ত্রের লুটন করেন। সন্ধ্যা সন্ধ্যা চট্টগ্রামের সহিত বাইরের সংযোগপথ স্থির করার জন্য তাঁরা রেলওয়ে লাইন ধল্ল করেন এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন একত্রে

বিকল করে দেন পুলিশ অফিসারী আক্রমণকারীদের
অধিনায়ক ছিলেন অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ। বেলাওয়ে
আর্মারী হারা আক্রমণ করেন, তাঁদের অধিনায়ক ছিলেন
নির্মল সেন ও লোকনাথ বসু। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন
একত্রে অগ্নি আক্রমণকারীদের নেতৃত্ব করলেন অধিকারী
চক্রবর্তী এবং হুম ট্রেনের নিকট বেলাওয়ে লাইন ফাল
করতে যে দল গেল তাঁর নেতৃত্ব করলেন উপেন ভট্টাচার্য।
এই ছয়জনই ছিলেন সর্বাধিনায়ক যুঁধ গোনের দক্ষিণে
স্থাপন। এই ক'জনের সাহায্যে যাত্র ৬০৭০ জন বিদ্রোহী
যুবকে নিয়ে যুঁধ সেন বৈ অশাখা সাধন করেছেন, যে
কল্পনাশক্তি, কর্মক্ষমতা ও অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে-
ছেন তা বিশ্বের যে-কোনো স্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক, স্রেষ্ঠ সেনাপতি
ও স্রেষ্ঠ কবিবীরের সঙ্গে তুলনীয়।

২০ শে এপ্রিল সকালে বাইরে থেকে সরকারী সৈন্ত-
দল চট্টগ্রামে এসে হািমির হয়েছে। বিদ্রোহীরা শহর
আক্রমণের জন্য ২১ শে এপ্রিল রাতে ক্ষেত্রাবাদ পাড়ায়
থেকে লহরের বিকেল বাজা করেন, ভোর হতে বেগে তাঁরা
আলালাবাদ পাড়ায় আক্রমণ গ্রহণ করেন। কোনো যুদ্ধে
শবর পেয়ে সরকারী সৈন্তবাহিনী অপরাক্ষের সিকে এসে
তাঁদের ঘিরে ফেলে। তখন তাঁরা লক্ষ্য সময় অবতীর্ণ
হয়। দুই ঘণ্টাব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো। বিদ্রোহীদের
অক্লান্ত গুলীবর্ষণের সুখে পাড়াতে না পেরে দু'ঘণ্টা
পর ইংরেজের সৈন্তবাহিনী পলায়নপর করতে বাধ্য হ'ল।
বিদ্রোহীরা সেদিন বে বীরত্ব ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়ে-
ছিল তা ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই
যুদ্ধে বিদ্রোহীদের ১২ জন বীর সেনারী সময়ক্ষেপে শেখ
শায়া রক্তা করলেন। অপর পক্ষের হাজারহাজার শাখা
প্রকাশ করা হয়নি।

কিছুসময় বাঘে রাডের অন্ধকারে এক অলক্ষ্য স্থান
থেকে শত্রুপক্ষের লুইস গানের গুলীবর্ষণ মাঝে মাঝে খেয়ে
খেয়ে চলতে থাকলো। গুলীবর্ষণের ধরনে বিদ্রোহীরা বুঝে
নিলেন, 'শত্রুপক্ষ' নতুন শক্তি সংগ্রহের (reinforcement-
এর) জন্য হুহুতা শহরে গেছে এবং ততক্ষণ লুইস গানের
বাঘে বিদ্রোহীদের ব্যাপৃত রেখে তাঁদের গোলাগুলি শেখ

কলী-উইটেডে এই অবস্থায় সেট পাড়ায় অপর
শাখা সন্নীতীন নয় বাঘে তাঁরা লুইস গুলীবর্ষণের অলক্ষ-
বিক কাড়কাড় শেখ অতিবাহিত ঘনিষ্ঠে সেখান থেকে
অদন্তক করলেন বাঘের অন্ধকারে শুধু হ'ল তাঁদের
নিকটস্থ বাঘ:

আলালাবাদ পাড়ায় যখন যুদ্ধ চলছে এবং ইংরেজের
দক্ষিণে সেখানে নিয়োজিত, সেই অবস্থায় অনন্ত সিং
প্রবুধ চারজন বিদ্রোহী সৈন্যের বাইরে বাঘের তত্ত্ব লওনা
হ'লেন। কোনো যুদ্ধে শবর পেয়ে কৌরীরা পালাপা সল-
বলে ট্রেনে অলক্ষ্য করতে থাকে সেখানে গুলী
থেকে তাঁদের নামানো হয় শত্রুপক্ষের তাঁরা বিচলিত
বেব ক'রে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাঘের লক্ষ্য অলক্ষ্য হয়ে
যান।

এই যে রাতে ক'লাবগেল নামক স্থানে ছেজেন
পলাতক কিশোর বিদ্রোহীকে পুলিশবাহিনী ও গ্রামবাসীরা
নিলে তাঁরা করে তখন দুই পক্ষে সম্মানে গুলী গলে
পুলিশের গুলীতে আহত অবস্থায় দুইজন য'ল পড়েন।
যাকী চরজন গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে অন্ধকারে অলক্ষ্য হয়ে
যান। ভোমের আলো ফুটে উঠতেই এক শবরবন য'ল
তাঁদের আবিষ্কার ক'রে পুলিশবাহিনী তাঁদের ঘিরে ফেলে
তাঁদের দুই পক্ষে প্রবল সংঘর্ষ। একদিকে যাত্র ১৭৪৪
কিশোর বিদ্রোহী অতদিকে পুলিশের বিপুল বাহিনী আহত
হয়েও বিদ্রোহী ততক্ষণে মাটিতে বুক দিয়ে গুলী ছুঁড়তে
থাকেন। বেহে যতক্ষণ তাঁদের প্রাণ ছিল, ততক্ষণ তাঁদের
গুলী ছুঁড়তে দেখা যায়। চারজন বীর কিশোর অনমনীয়
দৃঢ়তা নিয়ে বৃষ্টি শক্তির সঙ্গে লড়লেন—আত্মসমর্পণ
করলেন না, পরাজয় মানলেন না, গবিত বাঘের তত্ত্ব
পোষিতে সেমাদুকার বৌদীপীঠ রাত্তিরে ঘিরে গেলেন।
এই বীর কিশোরদের নাম:—বজ্র সেন, দেবীপ্রসাদ চন্দ্র,
মনোরঞ্জন সেন ও অমল বাঘ।

চট্টগ্রাম অস্বাভাব্য লুটনের কয়েক মাস পরে ততক্ষের
বিদ্রোহ সংঘটিত হয় সাংবাদিকদের নেতৃত্বে। বালাব বিদ্রোহীদের
সঙ্গে লাভ'লানের যোগাযোগ ঘটে অভিনব উপায়ে দুগুণের
সৈন্য নেতা কুশেন্দ্র কুমার দত্ত ১৯২৭ সালে ট্রিট প্রিন্সার

অর্থাৎ তিনি বেঙ্গলেশনের বকী অবস্থায় ত্রয়ো প্রেরিত হইয়া দেখেন তিনি পূর্ব পূর্ব বেসিন, দাঙ্গালয়, খেইটদি ও ৫ ইনসিন জেল কাটান ইনসিনে তখন ঢাকা জেলার মুখ্যতর কৰ্মী ছিলেন যোয বিদ্যাবী সঙ্গ গড়ে তুলছিলেন। ইনসিন জেল থেকে কুপেনবাবু এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন অল্পদিনের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে নির্বাসন দেন, লোকনাথ বঙ্গ প্রকৃতি করেকজন বিশিষ্ট কৰ্মী কৰ্মীর গিয়ে কুপেনবাবুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন যোগেশ্বর সঙ্গে নিয়ম দেনদের একযোগে কাজ করার ব্যবস্থা করে দেন। খেইটদি ও জেলে অবস্থানকালে বঙ্গীয় বাঙালী উল্লী নীরা ভাটায় সঙ্গে কুপেনবাবুর ঘনিষ্ঠতা ত্রয়ো ত্রয়োদশে তথ্যিত বিদ্যাবীর কি ভাবে কাজ চলতে পারে তা নিয়ে এর সঙ্গে কুপেনবাবুর বিপর আলোচনা হয় উল্লী নীরা ভাটায় নিকি পর্বত পর কুপেনবাবু, নির্বাসন দেন, ছিলেন যোয প্রকৃতি বাঙালী বিদ্যাবীর সঙ্গে এর যোগাযোগ করে দেন এবং ইনিই বঙ্গ বিদ্যাবীর নেতা সাংসানের সঙ্গে এঁদের সংযোগ করে দেন। রেজুনে বাঙালী কৰ্মীদের মধ্যে তখন ১৯১৮ সালের বেকালী যেদিনেই কেবল নিঃস্বামী ছিলেন। ১৯৩০ সালে ইনি সাংসানের সঙ্গে লোকেশ্বর খাবাও-ভাটায় ফরলে মুখবিজা ও মুচকাওজা নিকা দিলেন।

এদিকে চট্টগ্রামের পাচমন পলাতক বিদ্যাবীর আত্মনা দরজে চন্দনগরে। মুখ্যতর বলের নেতা কুপেনবাবুর বৈতর উদ্যোগে এই আন্দোলনকেই স্থাপিত হয়েছে। ১৯৩০ সালের ২৮শে জুন অল্পতম নায়ক অনন্ত সিং একাকী এই আন্দোলন থেকে কলকাতায় গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়ার্টারে এসে আত্মসমর্পণ করেন।

১ম। লেপ্টেনার। কোনো অজ্ঞাত দরজে থেকে পূর্ব পূর্ব বাহিনী ত্রয়োদশে সময় কলকাতার পুলিশ কমিশনার বঙ্গ পুলিশ ও মিসিটারী সঙ্গে নিয়ে চন্দনগরে এই আন্দোলনকেই ঘেঁষাও করে পুলিশের আগমন টের পেয়ে বিদ্যাবীরা খাব খাব রিডলডায় ত্রয়ো নিয়ে প্রাচীর উপর পার্শ্ববর্তী পুষ্করণে গিয়ে হাজির হন। টেডের আলোর ত্রায়ের বেগতে পেয়ে কতজন ত্রয়োদশে গুলী করে। গুলী প্রত্যন্তরে বিদ্যাবীরাও গুলীবর্ষণ করেন। কিন্তু অগণিত পুলিশ ও মিসিটারীর সম্মুখে ত্রায়ের প্রতিরোধ শক্তি সেদিন অকিঞ্চিৎকর। উভয় পক্ষ থেকে কিছুক্ষণ গুলীবর্ষণের পর গণেশ যোয, লোকনাথ বঙ্গ ও আনন্দ গুপ্ত খা পড়লেন আর বীরেন যোযাল গুলীর আঘাতে নিহত হলেন।

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসের ৫ে সপ্তাহে চট্টগ্রামের বিদ্যাবীরা অসম্মানসিকতা নিয়ে আত্মগার লুণ্ঠন করে সেই লুণ্ঠিত অর্থ নিয়ে বাংলালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজের কোঠের সঙ্গে অতুলনীর বীরত্বের সহিত লড়াই করলেন, ঝাঁক ঝাঁক গ্রাণ দিলেন, সেই সপ্তাহে মুখ্যতর বলের মুখপত্র “বাবীমতা”র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ “দুঃখ চট্টগ্রাম” বিরোনামা দিয়ে এই বিদ্যাবী কৰ্মীরাকে অভিনন্দিত করলো। সত্যই চট্টগ্রাম দুঃখ। মরণোন্মুখ আত্মিক কুকে অতুলনীর তেজবিত্ত ও গ্রাণগ্রাস্তের পতন দিয়ে গেলেন এই চট্টগ্রামের বিদ্যাবীরা। আত্মিক ভয়গ্রস্ত অশাড় চিত্তে তারা একটা নতুন প্রেরণার সকার করে গেলেন। গোটা জাড়াই যেন এক মুহূর্তে যেকোনো সোনা করে দাঁড়ালো— নৈরাশ্র ও নিঃশেষতার অন্ধকারের বুক চিরে আত্মপ্রত্যয়ের একটা সম্মুখল রেখা জাতীয় বীরনের নিগম বীণ করে ছুটে উঠলো।

ভারতের ভাষা সমস্যা

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে— ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হবে? মূলতঃ আন্দোলন ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল কারনী; ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কারনী ভাষা সেই সম্মানের অঙ্গন থেকে বিচ্যূত হল এবং ইংরাজী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হ'ল। এতদিন এসব পরিবর্তনে দেশের অগণিত লোকের স্বাধ-স্ববিচার কোন হিসাবই করা হয় নি, বিদেশী শাসকদের সুবিধা ও ইচ্ছাহুসায়েই এসব ব্যাপার নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু আজ ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে; আজ এসব বিষয়ে জনমতই প্রবল হবে। তাই দেশ-বাসীর সামনে ও বিধান পরিষদে প্রশ্ন উঠেছে ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হবে। একথা হয় তো বিশেষ করে উল্লেখ করার প্রকার নেই যে বিদেশী ইংরাজী ভাষা বরাকর এই দৌরবের আগুন দগল করে থাকতে পারে না। ইংরাজী ভাষা বিদেশী—কেবল এই কারণেই জাতীয় সম্মান বোধ বা জাতীয় ভাবাবেগ থেকে এই কথা অমর্য-বল্হি না। ইংরাজীর বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হল—জন-সাধারণের সঙ্গে এর সংযোগের অভাব। যে ভাষা জাতির জনসাধারণের কেউ জানে না বা বোঝে না—সে ভাষা জাতীয় ভাষা হতে পারে না। দেখুন বছরের সরকারী চৌর্য ফলেও দেশের শতকরা দু'এক জনের বেশী ইংরাজী ভাষা জানে না। আরল্যাও অতি ক্ষুদ্র দেশ এবং ইংল্যান্ডের সদস্য। পাঁচ শত বছরের উপর ইংল্যান্ড চৌর্য করেছে, সেখানে ইংরাজী ভাষা চালাতে। এই চেষ্টাও ফলে আইরিশ ভাষায় বড় বড় পণ্যক কোন আধুনিক সাহিত্য গড়ে উঠতে পারেনি; আইরিশ ভাষা দল নবীর ধারায় মতো কোনক্রমে আত্মগোপন করে বেঁচে ছিল মাত্র। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরই আরল্যাও নিজেদের মাতৃভাষার বাবী স্বীকার করে নিল। অল্প

ও কনিয়ার অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে ২৩ শতাব্দী পর্যন্ত জার্মেন ও ফ্রান্স প্রভৃতির চৌর্য হয়েছিল। ভারতের মতো প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতির ও সাহিত্যের কোন ঐতিহ্য ঐ সব কোন দেশেরই ছিল না। তবু পেট্রিয়ার, ফিলোজ, লিথুয়ানিয়া, ইথোপিয়া, বেলোজিভিয়া, উক্রেইন, রুশগেরিয়া, মুগোজিয়া, মজিরা, অরেনিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে বিদ্যমান শাসকদের ভাষা চালু হতে পারে নি। ইংরাজ শাসকদের পক্ষে সম্ভবত এটাই স্বীকার করতে হবে যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য এদের আমলে গড়ে উঠবার ও বাড়বার সুযোগ পেয়েছে। কাজেই দৃষ্টান্তে ইংরাজী শিক্ষিতের দ্বারের বাড়তির অসমাপ্ত ভবিষ্যৎ হংসীং কোটি ২ ভারতীয় জনতার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষার যোগ্য ভাষা হ'ল—এ দাবী কেউ স্বীকার করতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস না

স্বতই এখন প্রশ্ন আসতে পারে: কি—এর পর কি কোন ভাষা এই সম্মানের পাত্র অধিকার করবে? এতদিন সংস্কৃত হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার সম্মান দিয়ে এসেছে। হিন্দী ও হিন্দুস্থানীর পার্থক্যবিশিষ্ট ভাষা ও বিভ্রান্তের ভিত্তর প্রবেশ না করে সম্ভবত সংস্কৃতের ক্ষয় ও অক্ষয় এখন হিন্দী বলেই ঐ ভাষাকে উল্লেখ করব। এখানে এটুকু শুধু বলে রাখা ভাল যে হিন্দী ও হিন্দুস্থানীর সঙ্গত: কতকটা পারিবারিক সঙ্গত—এক জন নিজেই প্রধানত।

হিন্দী'র এই বিশেষ দৃষ্টান্ত নিয়েছেন হংসীং গাভী—

হয় তাঁর-ও পূর্বে বাংলাদেশে বহিঃভ্রম ও স্বাধীন মঞ্চ ও সভ্যরাজ্য ভাষা হিসাবে হিন্দী'র দাবী অনেক স্বীকার করে গেছেন। মহাত্মা গান্ধী নিজেকে হিন্দীভাষী না হ'লেও কেন হিন্দীকে এই ক্ষেত্রে নিয়েছেন, বা তাঁর-ও পূর্বে বহিঃভ্রম ও বিবেকানন্দ কেন হিন্দীকে প্রাধান্য দিয়েছেন—তা একটা বিচার করা প্রকার

ভৌগোলিক বিচারে হিন্দী হ'ল ভারতের মাতৃভাষা ভাষা। বাংলা, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি সব ভাষাই ভারতের এক এক লীম্বার অংশের ভাষা

‘মক’ বাস-সম্প্রদায়ের বাইরে-ও হিন্দীভাষা প্রায় সব ভাষার অঙ্গভূতই কোন এক প্রকারে—স্মরণ করে—স্মরণেও ‘একটি ভাষা’ ছাড়া—তাই সব প্রদেশেই একটা বিস্তৃত

শৌণ্ডিক্য রূপে প্রসার লাভের সুযোগ হিন্দী পেয়েছে।

ভাষাতত্ত্ব এতটা বেশ বিকৃত অর্থে বা কৃত্রিম হিন্দী-ভাষার প্রচলন আছে—মূলধারার প্রায় সর্বত্রই হিন্দুধর্মী

উচ্চ ভাষা ভাষনে এবং এই ভাষাকেই নিজেদের সাহিত্যের ভাষা বলে মনে করে—বাংলা ও অন্যান্য পশ্চিম প্রান্তের কতক মূলধারার ছাড়া। ভেল, পুলিগ, সৈত্র প্রভৃতিতে হিন্দী ভাষার প্রাধান্য সমস্ত উত্তর ভারতে ছিল। হিন্দীভাষী ভ্রমচারীরা সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিজেদের ঐতিহ্যিক বস্তু, ভাষা যেখানেই থাক—নিজেদের হিন্দী-ভাষী ভাষা কথা বলত এবং এখনও বলে। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের পুরনো আফ্রিকার পরোয়ান, ভূতা, পোলা প্রভৃতির এবং বস্তুগত হিন্দী বস্তুগতের সঙ্গে হিন্দীতেই কথা বলত ভারতীয় কর্মচারীগণ-ও এই প্রথাই অঙ্গভূত করেছে। হিন্দীভাষী ভ্রমচারীদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, হাটে, বাটে, অফিসে, অদালতে, কারখানায় এবং গৃহে-ও হিন্দী ভাষার চলতি ছিল। ভারতের প্রায় সর্বত্রই শহর ও গ্রামের হিন্দী নিয়ে কথা চালিয়ে আসা যেত, এমন কি ব্রহ্মদেশেরও বড় শহরগুলিতে তা চলত। কাজেই কংগ্রেস

বঙ্গভাষা গাঙ্গী হিন্দীকে যে রাষ্ট্রভাষা বলে গ্রহণ বসেছেন, তা প্রকৃত পক্ষে বাস্তবকে স্বীকার করে নেওয়া, —কোন নতুন কিছু প্রবর্তন করা নয়। তা ছাড়া হিন্দী ভাষার সংখ্যা অথও ভারতে-ও অল্প যে কোন ভাষাভাষীর চেয়ে বেশী ছিল; খতিয় ভারতে বাংলার সাড়ে চার কোটি লোক ভারতের বাইরে বাঙালার পর হিন্দীভাষী সংখ্যার অঙ্গভূত আর-ও বেড়ে গিয়েছে। পূর্ব পশ্চিম হিন্দী, হিন্দী ও হিন্দুধর্মী বা উচ্চ প্রভৃতি বিভিন্ন ভূগোল-ও এই সামাজিক হিসাব থেকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কাজেই এটা মনে নেওয়া উচিত যে হিন্দীভাষীর সংখ্যা ভারতের অল্প যে কোন ভাষার চেয়ে বেশী এবং বেশ কিছু বেশী। সাহিত্যের আলোকে আদি অঙ্গের সংখ্যা তুলে রচনা করতে চাই না।

কিন্তু হস্ততঃ অঙ্গভূতঃ ধারণেন হিন্দী-এই ধারী যেনে নেওয়ার সব আবার ‘কিছু’ কি করে আসে। বাস্তবকে স্বীকার না করেও, সব যন্ত্রেরই একাধিক বিক থেকে বিচার করার প্রয়োজন আছে। সে জন্যই ‘কিছু’ এখানে-ও আসছে। কথা-বাংলা, ভাষাতত্ত্ব এমন স্বাধীন ও গণভাষিক। মূলধারার কারসী চালিয়েছিল—সামাজিক বহুনের ঘোরে : ইংল্যান্ড ইংরেজী চালিয়েছিল ঠিক এই একই ঘোরে। আমৃত ঠিক তা চলছে না। কেবল শাসন বস্তুর ইচ্ছিতে বা নির্দেশে হিন্দী চলতে পারে না। বিধান পরিষদে ভোটের ভোরে হিন্দীকে পার করানো খুব সহজ নয়। কারণ অন্য যে কোন ভাষার তুলনায় হিন্দীর গোষ্ঠী বড় হলে-ও অল্প সব ভাষার সবচেয়ে গোষ্ঠীর চেয়ে হিন্দীর গোষ্ঠী অনেক ছোট।

আনাদের রাজনীতির একটা দৃষ্টে এটা আছে,—সব সমাজই সমাজের উচ্চতরের শ্রেণীগত স্বার্থের স্পর্শে কম্বিত হয়। সাম্প্রদায়িক, গোত্রগত এবং ভাষাগতিক সমাজ আত্ম বিবিকার ভাবে বিচার করা কঠিন;—কারণ শ্রেণী স্বার্থ এর মধ্যে এসে পড়েছে। ইংল্যান্ডকে নিয়ে হিন্দীকে বস্তু ভাষাভাষী প্রতিষ্ঠা করা যাবে তত ভাষাভাষী হিন্দীভাষী প্রাধান্য সমস্ত শাসন বস্তু প্রতিষ্ঠিত হবে—এমন মনোভাবের আভাস অনেক পাচ্ছে। বিধান পরিষদের গত অধিবেশনে শাসনতন্ত্র তৈরী করার উপলক্ষে এই বিভক্ত এমন তীর হয়েছিল যে ভাষার ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধী দাবা মূলতঃ বাস্তব হয়েছিল। এই উপলক্ষে “হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ” (Hindi-imperialism) ধর্ম-ও জন্ম গিয়েছে। কাজেই ভোটের ভোরে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা কথা সম্ভব কিনা সম্বন্ধ এবং সম্ভব হলে-ও সম্ভব কিনা তা-ও বিচার্য।

আর-ও একটা প্রশ্ন এসে রাষ্ট্রভাষার সমাজকে বহুস্তরের করেছে। কংগ্রেস বহুদিন দাবতই ভাষার ভিত্তিতে প্রবেশ গঠনের দাবী করে এসেছে;—কংগ্রেসের নিষেধ প্রাধান্যিক বিভাগ ২৮ বছর পূর্বে ভাষার ভিত্তিতেই করা হয়েছিল। ভাষার ভিত্তিতে প্রবেশ বিভাগই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হলে-ও এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার

পক্ষে অনেক অন্তরায় আসছে। কেবল একটি ভাষার লোক বিবেচনা গঠিত প্রায় কোন প্রদেশই ভারত হতে পারে না। ভাষার সীমানা নিয়ে আত্মপ্রশ্নে প্রদেশে তুবল কণ্ঠা হুক হয়েছে। পারম্পরিক বিচ্ছেদ এ নিয়ে এমন প্রকল হয়েছে যে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ও ভারত সরকারের প্রধানগণ এখনকার মতো এই প্রসঙ্গ মূলতঃ বিবাহই স্থির করেছেন। বাংলাদেশী লোকদের এই ব্যাপারে বিশেষ অভিযোগের কারণ আছে। তাঁদের মনে আছে এই আশঙ্কা রয়েছে যে বিভিন্ন দিক থেকেই বাংলাদেশী অকলমে সঙ্কীর্ণ করার চেষ্টা হচ্ছে।

ভারত এক ভাষার দেশ নয়—বহুভাষা এখানে কথিত হয়। হরত ইংরেজের প্রবীত সেবাস্য অঙ্গনরে এর সংখ্যা ৩ শতের মতো হবে। বহু ছোট ছোট ভাষা আছে—যাতে ছুঁচার শত থেকে ছুঁচার লক্ষ লোক মাত্র কথা বলে এবং যাতে কার্ণত কোন সাহিত্য নেই। সে সব ভাষা বাহু বিশেষে বহুগোষ্ঠী ভাষা আছে, যাতে অন্তত কয়েক খানেক লোক কথা বলে এবং যার একটা বিশিষ্ট সাহিত্য আছে। আধিকার দুনিয়াতে একাত্মিক ভাষার দেশ আরও বহু আছে। সে সব দেশে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তা-ও একবার দেখা ভাল।

কবিয়াতে পনেরোশটি বড় ভাষা আছে এবং তা ছাড়া আরও বহু ভাষা আছে যার গোষ্ঠীর অন্তর্গত লোকের সংখ্যা খুব কৌন নয় এবং যাতে কিছু একটা লিখিত সাহিত্য মাত্র ইংলান্ডেই গড়ে উঠেছে। ক্যানাডাতে ইংরাজী ফরাসী—দুটা ভাষা আছে। ওপানকার ফরাসী ভাষীরা হল ইংরেজের নিকট পরাজিত এবং সংখ্যা-ও কম। তবুও ফরাসী ভাষা ইংরাজীর সহিত সমান মর্যাদা পাচ্ছে। সুইজারল্যান্ডে তিনটি ভাষার লোক আছে—সমগ্র সুইজারল্যান্ড হরত আয়তনে ও জনসংখ্যার বাংলায় একটি জেলার সমান হবে। তবুও ওখানে জার্মান, ফরাসী ও ইটালী এই তিনটি ভাষার পর রোমেনস নামে আর একটি ভাষাও গাড়াচ্ছে—যদিও এই ভাষা বলবার লোকসংখ্যা মাত্র ত্রিশ পঞ্চাশ হাজার হবে। পশ্চিম আফ্রিকার ইংরাজী এবং ডাচ ভাষার অপসঙ্গ আফ্রিকান

ভাষা ব্যবহৃত হয়। এই সব দেশেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে কোন একটি ভাষা বিশেষ প্রাধান্য পায় নি। এই বিষয়ে কবিয়া কিছুটা বৈশীভূত গিয়েছে। দেখানো যোগ্য গণতন্ত্রের যোগ্য ভাষাই সমানভাবে তাদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে (Supreme Soviet এ) ব্যবহৃত হ'তে পারে। তবু তাই নয়—যে গণতন্ত্রে সরকারী চিঠি বা কাগজ যাবে, তা সেই গণতন্ত্রের ভাষায় যাবে এবং দেখান থেকে তাদের ভাষায়ই জবাব আসবে। শিক্ষার ব্যবস্থা-ও জায়েব নিজ নিজ মাতৃভাষায়। ক্যানাডা, পশ্চিম আফ্রিকা ও সুইজারল্যান্ডে সব কয়টি কথিত ভাষাই রাষ্ট্রীয় ভাষাভূষণে ব্যবহৃত হয়। কোন ভাষারই দেখান কোন বিশেষ দাবী নেই। যাকে বলা হয় polyglot বা বহুভাষী দেশ, তাদের সর্বত্রই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে।

ভারত বহু ভাষার দেশ—সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা ভাষার চিত্রিতে প্রদেশ গঠিত আছে ও হবে। একথা আত্মবীকৃত যে প্রত্যেক প্রদেশ তার নিজ ভাষায় শাসন কার্য চালাবে। ভারত সরকার একথাও স্বীকার করেছে যে ভাষাগত সংখ্যা-লঘুতা-ও তাদের ভাষা ব্যবহার ও লিখবার অধিকার পাবে। ভারত সরকার এমন নির্দেশ-ও দিয়েছে—যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার অধিকার ভাষাগত সংখ্যা-লঘুতা-ও বা linguistic minority-ও পাবে। অন্তত একথা স্বীকার করতে হয় যে, সব প্রদেশ এই নির্দেশের মর্মার্থে বা Spirit-এর মর্যাদা রাখা করছে না। ব্যবহারিক প্রয়োগে সংখ্যার হিসাব ও ভৌগোলিক সীমা-রেখা নিয়ে দগা-দবি 'হাই হুক'—নীতি হিসাবে এ সবই স্বীকৃত হয়েছে। আত্ম বিতর্ক উঠছে—সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে কোন ভাষা সুহীত হবে। নিজ নিজ অকলে প্রাদেশিক ভাষার অধিকার নিয়ে বিতর্কে বিশেষ কিছু নেই।

ভারতের পঞ্চাশ শাসন-বিধানের ২২ ধারায় বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় পরিষদের কার্য-কর্ম হিন্দী বা ইংরাজীতে নির্বাহ করা হবে—কিন্তু যদি কোন সভা এই দুই ভাষায় নিজ মত ব্রহ্মরূপে ব্যক্ত করতে না পারেন, তবে তিনি নিজের মাতৃভাষায় বলতে পারবেন—আমরা মনে করি-

নিজ মাতৃভাষায় কেন্দ্রীয় পরিচয় বলার অধিকার সর্বস্বীন ভাবেই থাকে উচিত;—হিন্দী ও ইংরেজী বলার অধিকার জানা করার বিধান এর ক্ষমতা থাকাই সম্ভব। কথিতব্যে যেমন সুখ্য পদ্যবোলেটি ভাষা সমান মর্যাদার সঙ্গেই কেন্দ্রীয় সোভিয়েটে কথিত হয়, ঐক্য ভেদমনি সমান অধিকার ও মর্যাদা ভারতের লক্ষ্যপ্রায়ই সুখ্য ভাষার থাকে উচিত। আসামী, বাংলা, উড়িয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, কানারা, কানারী, খালসার, তামিল ও তেলুগু—এই এগারটি ভাষা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কথা ও সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে চলতি আছে। নতুন শাসন বিধান এই এগারটি ভাষাকেই পরিচয়ে সমান মর্যাদা দেয়া উচিত।—নতুবা অনর্থক হাজার হাজার সেনা একটা ‘স্টাটী’ নামিতে পরিণত হতে পারে।

সোভিয়েটে কথিতব্যে চৌধুরনের কোটি সোক্তের ক্ষমতা বোলটি ভাষা ব্যবহারের অধিকার ও ব্যবস্থা হ’তে পারে, তবে ভারতের এ কোটি সোক্তের ক্ষমতা এগারটি ভাষার ব্যবহারের অধিকার ও ব্যবস্থা হবার পক্ষে কোন বাধা আদ্য দেখান। এই প্রদক্ষে আরও একটি কথা মনে রাখা উচিত—যে সোভিয়েটে রাষ্ট্রের ব্যবহৃত ভাষা সমূহ ভাষার সৌন্দর্য-বিচার-বা Philologically—সম্পূর্ণ বিভিন্ন সৌন্দর্য অঙ্গবর্তক। অর্থাৎ চারটি বা পাঁচটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাষা-সৌন্দর্য অঙ্গবর্তক ঐ বোলটি ভাষা। ঐ সম ভাষার মধ্যে ব্যাকরণ, শব্দ ভাণ্ডারে, রচনা পদ্ধতিতে, বর্ণমালায় ও নিপিতে প্রায় কোনই মিল ছিল না এবং এখনও বিশেষ নেই। কিন্তু ভারতের এই এগারটি ভাষা মাত্র দুটি ভাষা-সৌন্দর্য অঙ্গবর্তক অর্থাৎ ভারতীয় আর্য ও দ্রাবিড়। ভাষাভাষা-এই এগারটি ভাষার মধ্যে পারস্পরিক, সাংস্কৃতিক ভোগে একে সীমাবদ্ধনের এবং একে গভীর ও ব্যাপক সে কর্তৃক, দিগ্গি, স্বকভাণ্ডার, রচনাপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় সমান একটা গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। কামেই এই এগারটি ভাষার সর্ববিস্তার প্রসারণের অধিকার দিতে বিশেষ আপত্তির কারণ হতে পারে না।

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়—একটি ভাষাকে সর্বব্যাপক করতে পারলে রাষ্ট্রের ও জাতির সংহতি বাড়বে—

নতুবা জাতির মনে যে কেন্দ্রীয় বিশ্বস্ততার ভাব বা Centrifugal tendency আছে, তা আরও বেড়ে যাবে। এই মূক্তির বিরুদ্ধে প্রধান দাবী দিয়েছে যত বিশ্বস্ততার সমর্থন সোভিয়েটে রাষ্ট্র। ভাষার এক পার্থক্য থাকা সঙ্গে-ও রাষ্ট্রের সংহতি পেপানে অটুট ছিল, অপরদিকে জাতিবৈচিত্র্যের মধ্যে ভাষার একা থাকা সঙ্গে-ও, এটা বহু-বহুই বিচ্ছিন্ন আছে। কৃত্রিম স্বাধীনগাওত্বের চারটি ভাষা বহু-বহুই বেধে-ও তিন দিকের প্রবল আকর্ষণ অগ্রাহ্য করে নিজেদের সত্তা বজায় রেখেছে। বোলভিয়ানের এক অংশ কানাডীয়, সে অংশ বোলভিয়ানই ভাষার আকর্ষণে ফ্রান্সের সঙ্গে আসতে উদ্যোগী হয়নি। আরবভাষী মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ একই ভুলক শাসনের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে এক আরব রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা আরম্ভ করেনি। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও বিচ্ছেদ প্রচুর আছে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার পনেরটি রাষ্ট্রে এক স্পেনীয় ভাষা কথিত হয়। অর্থাৎ স্পেনের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে এরা এক অংশ স্পেনীয়ভাষী রাষ্ট্র গঠন না করে পারস্পরিক বিচ্ছেদ ও কলহে অভ্যন্তরীণ ভিত্তিতে গঠন পনেরটি বিভিন্ন রাষ্ট্র গঠন করেছে এবং বোলভিয়ার (Bolivar) স্বাধীনতা অভিমানে পরে আর সোভিয়ত বহু-বহুই হয়েছে;—কিন্তু এক ভাষার ভিত্তিতে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে কোন একতা জাই আদ্যে।

পূর্বে রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে ভাষার বন্ধনের গুরুত্ব প্রয়োজন ছিল, আর তা-ও নেই। আর রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে—অর্থনীতি ও সমাজনীতির ভিত্তিতে। কোন অর্থনীতি এবং কোন সমাজনীতি নিয়ে কে চলছে, তা দিয়েই আর নির্ভর্য হতে, তার সঙ্গে কে আকর্ষণ ও বন্ধন অচূড়ন করবে। মঙ্গোল্যান্ডের এক অংশ ১৯১৬ বছর পূর্বেই আকর্ষণ অচূড়ন কর’ল সোভিয়েটের সঙ্গে; অপর অংশ রয়ে গেল চীনের সঙ্গেই। এর একমাত্র কারণ হল অর্থনীতি ও সমাজনীতি। আর সোভিয়েটে রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির ও ভাষাভাষীর সমন্বয়ে এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে অর্থনীতি ও সমাজনীতির ভিত্তিতে।

ভারতীয় রাষ্ট্রের সংগতি-ও স্বাধীন পাকিস্তান আশা করি-
গান্ধীবাদী অর্থনীতি ও সমাজনৈতিক চিন্তিতে,—ভাষার
ভিত্তিতে নয়। বরং আদর্শ মনে করি জোর করে এক
ভাষার বন্ধনে সবাইকে বঁধতে গেলে—স্বতন্ত্র বৈদ্যন কেটে
কেবারে আগুই বাড়ে। বর্তমানে রাষ্ট্রের রূপ বহু
পরিমাণে বদলে গেছে। পূর্বে রাষ্ট্র হ'ত Unitary State
বা উনতন রাষ্ট্র।—বর্তমানে রাষ্ট্র প্রায়ই হচ্ছে Federal
State বা সংঘবদ্ধ রাষ্ট্র। এর কারণ হল এই যে পূর্বের
যতো রক্তের বা জাতির বা ভাষার বন্ধনে রাষ্ট্র গড়ে
উঠেছে না—গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ভাষাভাষীর সমন্বয়ে
স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার বন্ধনে।

তাই আমাদের হস্তাক্ষিত অভিন্নত, নতুন শাসন বিধি
আলোচনার সময় ২২ ধারার এমন পরিবর্তন সাধিত হওয়া
উচিত—যাতে ভারতের প্রধান এগারটি ভাষা কেন্দ্রীয় পরিষদে
সমান মর্যাদা পায়। আমাদের বিশ্বাস এতে ভারতের
সংগতি বাড়বে, প্রাদেশিক বিষয়ে কলহ হবে এবং এক
সাংস্কৃতিক বোধ জেগে ভারতকে একটা মূলতন্ত্র জাতিতে
পরিণত করবে।

স্বস্তি এ সব মত-ও হিন্দীর মর্যাদা সম্বন্ধে আমাদের
মনে যেন কোন সন্দেহ না থাকে। আজ সেডিয়েটে
রাষ্ট্রে যেমন কেবল সংখ্যার মোহেই রূপভাঙ্গা প্রবল—
তেমনি ভারতে-ও সংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থানের মোহেই
হিন্দী প্রবল হবে। কেন্দ্রীয় পরিষদে যে যা বলবে, তা
কেবল তাঁর নিজ প্রবেশের মুহূর্তের লোকদের বোকাবার
জ্বতে নয়—পরিষদগৃহের সব বা বহু সংখ্যক সভ্যর
বুঝবার ক্ষমতাই। নিজ নিজ কথা সকলের বোধগম্য করার
গরজেই সভ্যরা বিশেষভাবে হিন্দীর প্রচলন করবে।
কাজেই বাংলার অধিবাসীদের কাছে আমার নিবেদন
তারা যেন হিন্দী বিষয়ে ত্যাগ করে হিন্দী শিক্ষার
চেষ্টা করে। ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে মুলদানার সাম্প্র-
দায়িক গর্বে ইংরাজী শিক্ষাকে পাণ বসে বর্জন করল;
কলে তারা সর্বব্যাপারে পিছিয়ে পড়ল। আজ যদি বাংলা
প্রাদেশিক বা ভাষাগত গর্বে হিন্দী শিখতে অবহেলা করে,
তবে তারা-ও সব বিষয়ে পিছিয়ে পড়বে। বাংলা ও

হিন্দীর মধ্যে সাদৃশ্য আর কোনো যে বাংলার পক্ষে হিন্দী
শেখা খুবই সম্ভব। কিন্তু বাঙালীরা যেন পণ করেই
আছে যে হিন্দী তারা শিখবেই না। তাই আজ কংগ্রেসে
ও ভারতীয় সাধারণ পরিষদে বাংলার স্থান অনেক পিছে।

হিন্দীর বিস্তৃত দুটি কথা এখানে বলতে চাই। প্রথম,
বাংলা এবং সম্ভবত মারাঠী ও গুজরাটী সাহিত্যের তুলনায়
হিন্দীতে ভাল আধুনিক সাহিত্য নেই। বিদ্যারত্ন, হিন্দী
ব্যাখরণে এমন একটা অনবদীপ্ততা বা আড়ম্বর আছে
যার প্রভাব থেকে হিন্দীর মুক্ত হওয়া দরকার। সমগ্র
উচ্চ ভারতের ভাষাতেই কি করে যে সেমিটিক (Semitic)
প্রভাব এমন প্রবল হল তা বলা কঠিন। ক্রিয়াপদের
লিঙ্গ নির্ণয় কোন অর্পণাচার এমনভাবে নেই। এটা
বিশেষভাবে আরবি, হিব্রু প্রকৃতি সেমিটিক ভাষার প্রভাব।
হিন্দীর গ্রাম গুজরাটী, মারাঠি প্রকৃতি ভাষা ও এই
মিশ্র আছে;—নেই কেবল বাংলা, আসামী ও উড়িষ্যতে।
আমরা মনে করি ব্যাকরণের এই কাঠিন্দ হিন্দী থেকে
মুক্ত হওয়া উচিত। বাঙালীরা যে ভাবে ইংরাজী শিখে
ইংরাজী শিক্ষার ক্ষমতা অর্জন করেছিল—অর্থাৎ নিজেদের
মাতৃভাষার সাহিত্যকে সর্ব মাক'বে—সেই ভাবে যদি আজ
বাঙালীরা হিন্দী শিক্ষার ও বলবার ক্ষমতা অর্জন করতে
পারে তবে হিন্দীর পূর্বোক্ত দুটি কঠা অনেকটা সংশোধিত
হতে পারে। হিন্দীর সাহিত্য ভাষার-বাঙালীরা অনেকটা
পূর্ণ করতে পারে এবং হিন্দী ব্যাকরণের এই বাড়াবাড়ি
ভাষার পক্ষেও তারা অনেক সাহায্য করতে পারে।
সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দীকে গড়ে তুলবার পক্ষে
বাঙালীরা এবং বিশেষভাবে যে সব বাঙালী বাংলার
বাইরে অবস্থান করেন—ওদের একটা বিশেষ দায়িত্ব
আছে। এখানে বলা দরকার সম্ভ্রান্ত 'ভাষার লোকস্বা-
বেদন হিন্দী শিখবে, তেমনি হিন্দীভাষীদের পক্ষে-ও বাধ্যতা
মূলক ভাবেই উচ্চশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে অল্প কোন ভারতীয়
ভাষা শেখা উচিত।

আমার এই নিবন্ধ শেষ করার পূর্বে আর-ও ২৩টি
বিষয় উল্লেখ করব। ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে
গেলে স্বভাবতই বর্ণমালা, লিপি, ভাষার শব্দ সম্বন্ধ
প্রকৃতির কথা আসে।

ভারতের সব ভাষারই বর্ণমালা প্রায় এক—অবশ্য উর্দু বারি দিয়ে। প্রাচীন ভারত অক্ষরগুলি তামিল বর্ণমালা'র সংখ্যা কম—কিন্তু একই ভারতীয় অর্থ বর্ণমালা দেখলে-ও ব্যবহার হয় শুধু ভাষারই নয়, সিংহল, ত্রাং, ব্রহ্ম, নেপাল ও তিব্বতে-ও ভারতীয় বর্ণমালা ব্যবহার হয়। কাজেই এক-হিসাবে বলা যায় যে ভারতীয় বর্ণমালা কেবল একটি দেশের বর্ণমালা নয়—এটা একটি আন্তর্জাতিক বর্ণমালা। অল্পত ৫০-৫২ কোটি লোক এই বর্ণমালা ব্যবহার করে। কিন্তু কেবল সৈনিক খুসড়া বা সংখ্যার জোরেই কেন অনেক দাবী প্রতীতি করা সব সময় ঠিক নয়, তার প্রমাণ গুণের বিচার-ও করা প্রত্যয়।

বর্ণমালা'র উদ্ভব হল ধনি ব্যক্ত করা। একটি বর্ণমালা'র বিভিন্ন বর্ণ বা অক্ষর থাকার উদ্ভব স'ল—প্রত্যেক ধনির জন্য একটি অক্ষর বা বর্ণ এবং প্রত্যেক অক্ষরের জন্য একটি ধনি নির্দিষ্ট থাকা। যদি একই বর্ণ একাধিক ধনি ব্যক্ত করে—যেমন ইংরেজী "G" অক্ষর গ ও জ ধনি ব্যক্ত করে বা যদি একই ধনি একাধিক বর্ণের দ্বারা সূচিত হয়—যেমন ইংরেজী অক্ষর "C" ও "K" একই "ক" ধনিকে ব্যক্ত করে, তবে বুঝতে হবে সেই বর্ণমালা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক—বা বর্ণমালা'র প্রকৃত উদ্ভব এই দাবী পূর্ণ হয় না। অথবা যদি কোন বিশেষ ধনিকে ব্যক্ত করার অক্ষর কোন বর্ণমালা'র না থাকে—যেমন "ত" বর্ণ, "ড" বর্ণ, "খ, ঘ, ঙ, ঞ" প্রকৃতি ধনি ব্যক্ত করার কোন বর্ণ বা অক্ষর রোমান বা ইংরেজী বর্ণমালা'র নেই—তবে বুঝতে হবে সেই বর্ণমালা প্রয়োজন সাধনের পক্ষে অপর্যাপ্ত। এই নানদণ্ড দিয়ে দেখলে—ভারতীয় অর্থ বর্ণমালা সবচেয়ে সেরা ও বিজ্ঞানসম্মত। এর কোন বর্ণ-ই একটির বেশী ধনি ব্যক্ত করে না এবং সব ধনির জন্যই একটি বর্ণ এর তহবিলে আছে—হয়ত কোন মাস্ট ধনি ব্যক্ত করার বর্ণ এতে নেই। যেমন ইংরেজী "Z" বা উর্দু "যিম"—যার অভাবে "পরশুরাম" খুলনাশেলার কবিরাম মহাপতের উক্তি'তে Z এ আকার দিয়ে লিখেছেন Z-এ নতি পাওনি। এটি অত্যন্ত দোষ ধরি।

তাই আমাদের মনে হয় ধনি বিজ্ঞানের দিক থেকে ভারতীয় বর্ণমালা বাহিল হবে অন্য বর্ণমালা প্রবর্তন করা অসম্ভব। তাছাড়া—ভিন্নত, শব্দ, ব্রহ্ম প্রকৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ আছে, তার দৃশ্যও কম নয় এবং তার পাতিবেও এই বর্ণমালা বদলানো অসম্ভব হবে।

এর সব আসছে-হরণ বা লিপির প্রদ। বর্ণমালা সম্বন্ধে যেমন জোব করে বলা যায়—যে ধনি-বিজ্ঞানের দিক থেকে আমাদের বর্ণমালা খুবই বিজ্ঞান-সম্মত, লিপির বা Script সম্বন্ধে তেমন জোর করে বলা যায় না। বর্তমান যুগ হ'ল দ্রুতির যুগ—জরুরেগের যুগ। যে লিপিতে কোথের সমাবেশ হয় কম হবে সেই লিপি তত দ্রুত লেখা সম্ভব হবে বাংলা বা দিকী লিপি বা script সেই হিসাবে খুবই দ্রুত পূর্ণ। ইংরেজী লিপির সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই আশনাটা বেগতে পারেন—বাংলা বা দিকী লিখতে কতবার কলম ঘুরতে হয়। দ্বিতীয় কথা হ'ল—সব অক্ষরের লিখিত আকারও একটা সমতা থাকলে ছাপ-বেগবার পক্ষে-ও শোভন এবং মুদ্রণ কাঠের পক্ষে-ও সহজ। আমাদের অক্ষর কতক মাত্রা ছাড়িয়ে মাঝারি টিকি উপরে তুলে দিচ্ছে, কতক আবার একটি লাখুল নীচে তুলিয়ে দিচ্ছে। বর চিহ্নগুলি প্রায়ই মাত্রা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে। এতে ছাপবার সময় বেশী স্থানের প্রয়োজন হয়। মুদ্রিত ছবি সারি লেখার মধ্যে এর জন্য সুনাব্যাক বেশী ফাঁক রাখতে হয় এবং হরণ-ও প্রয়োজন মতো ছোট করা যায় না। তৃতীয়ত—আমাদের দ্রুত অক্ষর একটি অতি গোলাঘলে ব্যাপার। এর ফলে মূদ্রন শিকারী'র পর পক্ষে সময় অনেক বেশী লাগে। ছাপার কাজে দ্রুত অক্ষর বর অসুবিধার সৃষ্টি করে—ছাপবার type বা হরণের সংখ্যা অল্পতব রকমে বাড়িয়ে দেয়। সূনাব্যিক পক্ষাশিট হরণের ফলে দ্রুত অক্ষর থাকার ফলে হরণ হয় করেক শত। Type writer ও Lino type প্রকৃতি দ্রুতকি বিধে আমাদের অক্ষর প্রায় অটল হয়েই ছিল। সম্মতি পূর্ণাধ হরণের সঙ্গে কয়েকটি অর্ধেক হরণ তৈরী করে দ্রুতকি মূদ্রণ সম্ভবপন হচ্ছে। যে সব অক্ষর

সাধারণত অল্প অক্ষরের একে মুদ্রিত হয়। সে সব অক্ষরের
কল্প একটি অর্ধাঙ্গ হলল তৈরী করে নিজে lino-type
ও type-writerএ হিন্দী ও বাংলা মুদ্রণ ও লিখন
লোকে। কিন্তু এটা আর্থ-ও সময় করা উচিত। কোন
একটি যোজনী চিকু নিজে একাধিক অক্ষরকে সংযুক্ত করেই
মুদ্র অক্ষরের কাজ চলেতে পারে। যেমন 'দধ' শব্দ হ'লে
মুদ্র অক্ষর বর্জন করে 'দগ,ধ' বা 'ধ,গধ,' ভাবে লেখা
হ'লে। তাতে হাতের লেখার পক্ষে-ও অনেক সুবিধা
হ'বে—বাস্তবিক মুদ্রণ-ও সহজ হবে। যোজনী চিকু
দ্বারা যদি একাধিক অক্ষরকে মুদ্র করার প্রথা প্রবর্তন
করা হয়—তবে সংযুক্ত অক্ষর একময় রহিত হতে পারে
অমৃত ভা ভাষার কোন সার্বকথাই থাকে না। তাহলেও
সব ভাষা থেকেই সংযুক্ত অক্ষর বাদ দেবার চেষ্টা করা
উচিত।

আবার আমাদের মূল বক্তব্য কিরে যেতে হয়। Script
বা লিপি সম্বন্ধে আমাদের ত্রিবিধ সংস্কার প্রকার। হ'লে
ভারতের সব ভাষার একই অক্ষর প্রচলিত হয় এবং হাতে
অক্ষরগুলি যথ কোণ বা বাক বিশিষ্ট না হয় এবং হাতে
সংযুক্ত অক্ষর রহিত করা যায়। এই তিন দিক থেকেই
আমাদের লিপির সংস্কার করা উচিত। একই অক্ষরে
যদি ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য লেখা হয়, তবে
বিভিন্ন ভাষার ও সাহিত্যে আদান প্রদান অনেক সহজ
হয়। একই সংস্কৃতি সমগ্র ভারতে গড়ে তুলবার পক্ষে
বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে এই যোগাযোগ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আমি একটি বিষয়ে সতর্ক করে আমার এই নিবন্ধ
লেখ করব। আমি ভারতের বিভিন্ন ভাষার রাজনৈতিকও
বৈজ্ঞানিক বয় সব নতুন তৈরী হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষার
মধ্যে এই বিষয়ে কোন যোগাযোগ না থাকায়, এসই
ইংরেজী শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন
শব্দ গ্রহণ করা হচ্ছে। এসই Constituent Assembly
শব্দের প্রতিশব্দ বাংলায় করা হয়েছে গণপরিষদ আর
হিন্দীতে করা হয়েছে বিধান-পরিষদ। এমন বয় পরিভাষা
সাধারণতের স্বাক্ষর আদ্য চলে থাকে;—অথচ বিভিন্ন
ভাষার মধ্যে কোন সংযোগ না থাকায় পরিভাষার দিক

থেকে কোন শব্দও থাকতে না। ভারতীয় সব ভাষাট
বেশ হ'লে তাহলে জির প্রবিশ্ভ ভাষা কয়েটিও সংযুক্ত
থেকেই বৈদ্য ভাষা শব্দ আচ্ছন্ন বা চলে যায়—যেমন
ইউরোপীয় ভাষা সমূহে শব্দ চলে যায় গ্রীক ও লাতিন
হ'লে। একই সংস্কৃত থেকে শব্দ চলে যায় বাংলায়
অমৃত্যু করল গণপরিষদ, হিন্দী তাহ'ল অমৃত্যু করল
বিধান পরিষদ। এই প্রকার অমাবস্তক পার্থক্য
পরিভাষার বিষয় সব দিক থেকেই চেষ্টা
যাতে ভারতের বিভিন্ন ভাষা পর্যায়ের মিলটি সহজ
যোগ্য হয় এবং যাতে বিভিন্ন ভাষার
গুণি শব্দ বিভিন্ন প্রদেশের সংযোগের সহজ
এক board বা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে পরিভাষা
চেষ্টা করা উচিত। ভারতের বেতার কেন্দ্রগুলি
বিষয়ে সহযোগিতা করে তার অমৃত্যু সমস্ত
পারে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ও এই বিষয়ে কিছুটা
করবার আছে। অমৃত ভারত সংস্কারের সঠিক এই বিষয়ে
সব চেষ্টা বৈদ্য। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা সমূহের মধ্যে
যোগাযোগের কথা আমরা বিশেষ করে বলছি
যে-ভাষাই সভ্যজাতীয় ভাষা হিসাবে
পুট ও সমৃদ্ধ হবে ভারতের বিভিন্ন
সহযোগিতায়,—সে ভাষা ও তার সাহিত্য
পারম্পরিক অংশ প্রদানের দিক দিয়ে

এবার আমার কথা শেষ করতে চাই আমার বক্তৃ-
কাকে মূল মত্রে পাড়ো করে বলতে হলে বলা গেল—

(১) ভারতের প্রাদেশিক এগারটি ভাষাকেই কেন্দ্রীয়
পরিষদে সমান মর্যাদায় ব্যবহৃত হতে দেওয়া উচিত।

(২) কিন্তু ভৌগোলিক সংস্থানে ও সংস্কার আদিক
হিন্দী প্রাধান্য অমৃত বীকার করতে হবে। সভ্যজাতীয়
ভাষা হিসাবে হিন্দী দাবী অমৃত্যু করা।

(৩) সেই হিসাবে বাঙ্গালী যদি পরোক্ষভাবে
নিজেদের প্রাপ্য অংশ পেতে চায়, তবে তাকে হিন্দী
ভাল করে শিখতে হবে, নতুবা মুসলমানদের ইংরেজী
শিক্ষা বর্জনের মধ্যে তুল তারা করবে। হিন্দী ভাষীরাও
উচিত আর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করা।

(৩) চাকরির ব্যতীপক্ষে লঙ্ঘন করা অবশ্যক এবং চাকরী ব্যতীপক্ষে হিন্দী সাহিত্যে হাত দেওয়া বরখারাজ।

(৪) বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সংযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হইবে। ভাষার আদান-প্রদানের সুযোগ রাখতে হবে—যাতে একই সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে—তখন ও সাহিত্যের কবোচ্চী প্রচীর তেমন প্রবল না হয়।

(৫) সেইজন্য পরিচালনা প্রণয়নের জন্য সর্বভারতীয় একটি পরিষদ বা board গঠন করা দরকার।

(৬) ভারতীয় বর্ণমালা রুনি-বিজ্ঞানের দিক থেকে পরীক্ষিত। এই বর্ণমালা ভারতের বাইরে নেপাল, ত্রাণ, ত্রাণ, সিংহল ও তিব্বতে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এটা কেবল ভারতের বর্ণমালা নয়।

(৭) কিছু ভারতীয় ভাষা সুসহন Script বা লিপিতে বহু ছুটি আছে, ছুটি লেখা, ধ্বনিক মূহন, ছোট হরণে মূহন প্রকৃতি বিবেচ্য অস্বাভাবিক আছে। এই অস্বাভাবিক দুই তরফে দুইই সমস্যা এবং তারজন্য যথোপযুক্ত সংস্কার করা দরকার।

লিপির সংস্কার প্রয়োজন এবং সেই সময় ভারতের বিভিন্ন ভাষায় যাতে একই লিপি ব্যবহৃত হয় তাও দেশে সংস্কার সংস্কৃত অক্ষর বর্ণনের চেষ্টা করা উচিত।

বাংলায় শুধু সমাজের নিকট আদার নিবেদন শেষ করার পূর্বে তাঁদের বলতে চাই—স্বীকারের প্রায় সমস্ত সময়ই বেটোছে সংস্কার মূলক সামনীতিতে; সাহিত্য নিয়ে

অসংগঠন করা হইবে বা সুবক্ষণ আদারের তেমন চাষি কাজেই আদার। এই নিবেদন নিত্যই অসংগঠন অসংগঠিতের কথা। চিন্তাধর্মের উত্তর। সেখানে,—অভিজ্ঞ ও সাহিত্যিকগণ যদি বিচার করে দেখার মতো কিছু এবং মধ্যে পান তবেই উত্তর। বোধ করব।

পরিশেষে বাংলার বাইরে সমবেত বাঙালী সাহিত্যিকদের বিশেষ করে দৃষ্টি করিয়ে দিতে চাই—বাংলা আদার বিভক্ত, বাংলার দুইভাষা আদার আদার রাষ্ট্রের মধ্যে। বাংলার জনমত যে কারণেই হ'ল—এই বিভাগ সমর্থন করেছিল। কিন্তু একথা বেন আদার না ভুলি—রাষ্ট্রের চেয়ে সংস্কৃতি বড়, রাষ্ট্রের চেয়ে ভূগোল শ্রেষ্ঠ, রাষ্ট্রের চেয়ে ভাষা ও সাহিত্য বড়। বাংলা সাহিত্যকে গড়বার পক্ষে বেন উভয় বাংলার আদার আদার ও কৃষ্ণ বহন হিসাবে তাকে আদার গড়তে পারি। সাহিত্যের বশে, বিবেচনের বশে, ক্ষুদ্র আদার বশে, আদার বিভক্ত হয়েছি। সাহিত্যকে বেন আদার তার উর্ধ্বে রাখতে পারি। বাংলা সাহিত্য একদিন ভারতের নব-আগমনের ও নতুন সংস্কৃতির বাস্তব বহন করেছিল। আদার বাংলার এই চরম দুর্দিনে বেন বাংলা সাহিত্য আদার-ও মহৎ বাস্তব বহন করতে পারে—যা শ্রেণী, ধর্ম ও রাষ্ট্রের গভীর অতিক্রম করে এক নতুন সংস্কৃতির ভিত্তি গড়বে।

—বসন্তকান্ত—

• প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিগত দ্বিতীয় অধিবেশনে গঠিত।

বহিঃশিক্ষা !

শিল্পীকী রত্নস্বয়ং

দিক-বলরেতে সূর্যের হাতছানি
দৃষ্টি থাকে লীল অক্ষরের ছোঁয়
জ্বরে জ্বরে ওই নীল দেব উড়ে চলে
মুগ্ধিত পথে করে পড়ে বহু দূর।
অন্ধ-আঁখিতে ফুটে ওঠে কত রূপ
অবশ-সূর্যে জ্বালার প্রাণের নতি
পূরণো শিবিরে রাত্রির খেঁজ-ছোঁয়

হৃদ বাজীর বটন গমন হু
আদার তবুও গমন হু
ছিন্ন-স্বপনে রত্ন কলিকা টানি।
রত্ন-টানের দিক-বহী আলো কাঁপে
অবশ-জ্বল-বাগরিক-প্রাণ শির
হে রূপ-বহি—“তবু প্রাণের শিখা
প্রোক্ষল করে তোলা প্রতি অক্ষরে।”

১৩৫৫র সাহিত্যসরস্বতী

ঐতিহাসিক বস্তু

বাংলাদেশে এখন একদিন ছিল এখন একঘরে জীবনযাত্রার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য আনিতে হইলে সাময়িক সাহিত্যের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি ছিল না। সেদিন বেশে দিনেমা আসে নাই, রেডিওর আবির্ভাব হয় নাই, প্রকান্তে বন্ধকে বাওয়ার অল্পবিধা ছিল। কনের বিজ্ঞান recreation এর জন্য কবিতা ও কথাগাহিতা চর্চা বিকশিত ও অবিকশিত উভয়েই প্রয়োজন ছিল। তাই বহিঃ-প্রাচীরের দ্বন্দ্ব সংগ্রামের পূর্বে পুরাতন কপালকুণ্ডলাব অন্ততঃ সাতাশটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছিল। সেদিন মতাবতার, আধ্যাত্মের মত পত্রিকা যে সমাদর পাইয়াছে, হামোবর প্রাচীরের যে সম্মান হইয়াছে, এখনকার কোনো বহুলপ্রচারিত সাময়িক পত্রিকা ও কথাগোষ্ঠের তা অধের অতীত। সেদিন কোনো ভালো লেখা বন্দনর অভাব ভারতী অথবা প্রাণী প্রকাশিত হইত, লেখা বাছারা বোঝে তাহাদের দৃষ্টিপথে সহজেই আসিত।

আজ সাহিত্যের সেই সম্মান দিনেমা কাড়িয়া লইয়াছে। রেডিও খোলাই আছে, কেহ শুধু না শুধু। মাসিক 'ও সাময়িক পত্রিকাগুলির বহুসংখ্যক হইবার হইয়াছে। চরম প্রতিযোগিতার দিনে শক্তিশালী লেখকেরও এখন অভাব হইয়াছে যে বলিবার নয়। রবীন্দ্রনাথ ও পরশুরামের মত আসন পূর্ণ করা দূরে থাকুক, তাহাদের ধারা বন্ধার রাগিবার মত লেখকীয় সম্মান মিলিতেছে না। চাহিদার অভাবে আমদানীও নাই, সাহিত্যের কারবারে আজ বড় দুর্দিন।

অথচ বাণ্যারটা অত্যন্ত দুঃখের। এখন বাণ্যারতার আবহাওয়া দেশের লোককে গড়িয়া তোলার জন্য উপযোগী সাহিত্যের প্রচলন বিশেষভাবে প্রয়োজন এখনই এমন দৃষ্টিক ও হাঙ্গারকার যে জাতির পক্ষেই অসম্ভবপনর জাহায়ে সমর্থ কি ?

রেডিওর যেমন প্রোগ্রাম নির্মাচনে অধ্যাতি চালাইয়া ধারে ছড়াইয়া পড়ার দশ আদর্শ সবদিন রেডিওয় দুগিনা, অনেক সময়ে অপ্রত্যাশিত ভালো প্রোগ্রাম কাগজকেও না চুলাইয়া পরে চট্টা যায়, বাংলা দিনেমা কাড়িবার দুর্দশতা যেমন বর্তমান হইয়া আছে, প্রবাসের আবশ্যক করে না, তবু হু'একখানি ভালো কিছু আমদানের প্রত্যাশায় হয়—সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যেমনি 'কোথাও কিছু পড়বার থাকে না' এই দাবিদার ভালো পত্রিকাও পাঠকের সন্তোষকৃত্তির অভাবে চুটিবার অংশেই করিতে পড়ে

নাম কথা কয়েকখানি কাগজেব শোভনীয় অযোগ্যতা ও নামকরা কয়েকজন লেখকের অসামান্য ব্যর্থতা সেখানে বাংলাদেশের পাঠক সম্মুখীন এমন দেখিয়া গেছে তাহাদের আর বাণ্য-বাক্য বলিয়া ছিটাইবার উপায় নাই

বাংলাদেশের মেয়েদের গল্পপ্রিয়তাব অ'তিশয়ো একদিন কত ছাইভয় পাব চট্টা গেছে, এখন মতাবতারের ভালো কথাগাহিতাও সেখানে 'কলক' পাব না

উইট রোম'ক নতুন পুরাতন পাঠ্যক্রমগুলি খানিকটা আশ্রয় করিয়া যেটুকু কতি বাকী ছিল তা শেষ করি।

তেছে—সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অর্থ অবলম্বিত পথে আর্থিক ক্ষয় সঙ্ঘ করিয়া যাহা নির্মাণপ্রায় প্রতীপে তৈল সকার করিয়া সামান্য পুণ্যক্রম এখনো উন্মাপন করিবার বাসনা রাগে, তাহাদের ধনে প্রাণে পক্ষ হইতে আর দেবী নাই।

এক রাতে যদি সমস্ত রক্তপীঠ ও দিনেমা-চুটিসেব আলো নিভিয়া যায়, চুটিপ-চুটিপে ভিত্তি কবিবার পথ বন্ধ হয়, ঐশ্ব্যের গোলাযোগে বেতার বন্ধ হয়, তবে হস্ত প্রতি প্রচাতে অবিকৃত পত্রিকাগুলির গতি হয়। তবে হস্ত নিষ্কাশ্য নাগবিক ও গল্পীয়াসী সাহিত্যের উৎসমুখ খুঁজিতে বাহির হয়

কিন্তু তেমন অসম্ভব পরিসরন করিয়াও লাভ নাই, তেমন পরিস্থিতি উত্তরিবিদ্যকও নয়, বাহ্যনীয়ও নয়

ইতিমধ্যে দেশের লোককে এমন মূল্যবান করিয়া তোলা উচিত যাহাতে 'বিচিত্র'র মত একখানি স্রেষ্ঠ মাসিক বন্ধ

হইয়া যাওয়ার মত দুইটুকু না থাও, তাহাতে সজ্জন পণ
করিব। ঐ অংশের প্রতিদ্বন্দী হইয়া প্রথম হইবে। তখন স্বাধীন-
ত্বের আভির্ভাব বহন করিবে।

শিক্ষা তা হইবার নিমিত্ত অজ্ঞান করিবে

শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন যে দুইটি
অংশে বিভক্ত তাহাতে সাহিত্যের পুরণীত পুরাতন বহির্ভূত
নতুন অংশের বিজ্ঞানকে আঁকার যে সাহায্য করিতে
পারিবে—অল্প ও বিহীন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই
যাহার দ্বারা ইতিহাস, যে একেবারে নিষ্কিঞ্চ না
হইবে সেও অভাবের চোখে বস্তুনিষ্ঠ এবং তখন তা
বোধগম্য হইবে

সাহিত্য লইয়া বাংলা লখন করবে তাহারা যেন চলিয়া
কেন, তাহারা কাহাণীর করে, তাহারা ই আগ্রহী কাহাণী
খাস্ত—এই রকম অবস্থা কিছুদিন চলিলে তবে হস্ত
শিক্ষা জানিতে পারে কৃষা অংশে পাবে—বক্তিত যাহার
সময়ে

আজকের বাসবল্লা আজকের আভির্ভাব—আমরা
গোবর্নের সান্নিধ্য

তবু ১৯৪৪ সালের শেষে বাংলা দেশের কোনো কবি
সাহিত্যসংগঠনী নদীর পেরাঘাট লুপ্ত হইবার আশঙ্কায়
শিহরিয়া উঠিয়া আবেগ করিয়া গেছে কোনো সাহিত্যিক
পত্রিকার পুরাণে—এ কথা উঠিয়া ১৯৪৪ বৎসর হইয়া থাকে।
আমরা কালের ভগ্নীত্বের দ্বারা এই ধারণা এই ক্ষেত্রে
হস্ত বা বিবৃতি করিতে পারিবে

বুনিয়াদি শিক্ষা ও তাহার প্রতিকূল আবহাওয়া

রতন, কুমার দত্ত

বুনিয়াদি আমাদের কাছে অপরিচিত
বিষয় নয়। কিন্তু এটা শিক্ষার প্রভাবের জন্ত যে
একটা কালোচন করেছ বছর ধরে চলছে তারতম্য ও
পারিপাক্ষিকতা, সে এখন সত্যত সত্যেই রয়েছে।

১৯৩৭ সালে গাজীপুরী সর্বপ্রথম হরিজন পরি-
কল্পে এ বিষয়ের অবতারণা করেন। তারপর থেকে এ
পন্থা যে পন্থা ও পন্থা নানাতর হুঁকি তরু বাণবিত্তা
হয়েছে। সত্যত, সাময়িক পর্যায়ে এ নিয়ে অনেক
আন্দোলন সংগঠনও হইছে। আন্দোলন হচ্ছে এবং
আন্দোলন হবে। প্রত্যেক প্রগতিশীল আন্দোলন
হয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, বা শিক্ষানৈতিক,
যেমনের ন্যূনতম প্রবল কথা পড়ে। এই বাধা আসে
সামাজিকবিরোধীদের কাছ থেকে।

এ নূন কথা কিছু নয়। তাহাই গাজীপুরী এখন
এখন এ বিষয়ের অবতারণা করেন। তখন যত বাধা
আসে গোড়া শিক্ষাবিদদের কাছ থেকে। গাজীপুরী নান-
ভাবে তার স্বতন্ত্র-বিশ্ব, প্রায়শঃ হুঁকির দ্বারা বুনিয়াদি
শিক্ষার ভবিষ্যৎ ও অতীত উদ্ভূত হুঁকি করেন
দিনের পর দিন। অসীম ধৈর্যের সহিত লোকের কৈফিয়ত
ও সমালোচনার জবাব তিনি দিয়েছেন।

সেদিন অতীত আজ।

এতকালের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ প্রত্যাখ্যাত
হয়েছে একথা বলতে পারি। বিশেষী শাসকের প্রকৃষ্টকে
বিকার করে নিয়ে যখন ও সাময়িকভাবে আদর্শ নিয়ে
হাতে বিকিরে দিয়েছিলাম। সমাজগত স্বার্থবাঞ্ছাকে
উৎসাহ করে লোক নিষেধ নয়, বরং স্বার্থের প্রতি
মোহবলত দেশের সমগ্র কল্যাণের কথা বুঝে ছিল।

শাসক এদেশে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে সাধারণের
স্বার্থ কারণে রাখতে, ভারতীয়দের কল্যাণ কামনা করে
নয়। সুতরাং ভারতবাসী ব্রিটিশের সে ছত্র চালাকি বুঝতে
পারে না। তারা শাসককে বলে করে। প্রকৃত দলী,
ভারতের জাগরুতা। তাই শাসককেই যখন করে দেয়

কুন্দিরাসি শিক্ষা ও ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বিধিবাণে। সেজগে হারা সরকারী কাছে নিখুঁত হতেন
ভাষা নিজেদের 'ভাণ্ডার' বলে বনে করতেন। আত্ম
অনেকে করেন।

এতদিনের অভ্যাস যাবে কোথায়?

শাসন করতে করতে শাসক করাটাই এমন লোভনীয়
হবে পড়েছে এদেশের শাসকের কাছে যে স্বার্থ কল্যা-
ণের পথ তারা দেখতে পায় না। পথ চিনিরে দিলেও
চলতে পারে না, চলতে চায় না।

কিন্তু আত্ম ও ইংরেজ রাজত্বের অবশান হয়েছে।

স্বাধীন হয়েছে ভারত দুক্তরাষ্ট্র ও গণতন্ত্র। স্বা-
ভাষার স্থান শেখ বিলুপ্ত। (অর্থাত্‌ ফিল্মী ও উচ্চ
সহজ সংস্করণ)। স্বাভাষার স্থান সবাই বেড়েছে
স্বাভাষাকেও স্বাভাষার স্থান দেওয়া হয়েছে, হচ্ছে
অর্থাত্‌ আত্ম ও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড মোহ শাস-
করা এতাবৎ ইংরেজ সহকারের গোলামী করছিল, আত্ম
ও স্বদেশের সেবা করবে—ইংরেজীর প্রয়োজনটা কোথায়?

অতঃ ইংরেজী শিক্ষাতে হবে। তার মানে শাসকই
ভালো লাগে। ওতেই যে রক্ত কাকন খোলাই করা
আছে। এই ধারণায় আত্ম ও লোক চলছে। কিন্তু এর
যে পরিণতিই অবশ্যক।

লোকের চিন্তাবোধ কি কি হবে না?

এতকালের শিক্ষা আমাদের যেতার করেছে, অকর্মণ্য
করেছে, পরমুখাপেক্ষী করেছে, আমাদের অসহায় বিলাসী
করেছে। আই, এ, বি, এ, পাশ করে এসে যুবকেরা
না পারে একটু শ্রম করতে, না পারে দেশকে সেবার
কম কিছু দিতে। তাদের আশা থাকে ব্রিটিশ, চার্লিস,
বা পঞ্চাশ টাকা একটা কেরানীগিরির পয় অবজ্ঞাই পাবে।
কিন্তু তাও পায় না আত্মকাল। শিক্ষিতদের মধ্যেই
বেকারের সংখ্যা বেশী অর্থাত্‌ অভিজ্ঞ আছে যে, দেখা-
পড়া শিখেছি—হাতের শ্রমে মান পোজাবো কেন?

কিন্তু যোগ্যতাই বা কোথায়?

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই আত্ম জাতির বোকা হবে
পড়েছে। শিক্ষার এই পরিণতিকেই কি আমরা বেনে
নেব?। কয়েকশত টাকা ব্যয় করে আই, এ, বি, এ,

পাশ করার পরও যদি যুবকেরা নিজেদের অসহায় অক্ষম
মনে করে, শিক্ষার হয়ে অসঙ্গ-জীবন যাপন করতে হয়,
তবে সে কি বন্ধের শিক্ষা? যে শিক্ষা মানুষকে জীবিকা
সংগ্রহের যোগ্যতাও দিতে পারে না, আরো অক্ষম, পরা-
বলসী করে তোলে, সে কি শিক্ষা? যে শিক্ষা আমাদের
উদার ও মহত্ববোধী ক'রে গড়ে তুলতে অসারগ, বা
কেবল অপরকে ঠকবার প্রকৃতির গোবন্ধ, বা লোককে
অহংকারী ও স্বার্থপর ক'রে তোলে সে ত শিক্ষা
পদবাচ্য নয়।

সে যে 'অশিক্ষা'।

আমি যে লোক গ্রাম ভেঙে শহর অভিমুখে দাবিত
হয়েছে, শহরের প্রতি আকর্ষণ হয়েছে ও হচ্ছে তার কারণও
বিশেষ শিক্ষা। ইংরেজী শিক্ষার অস্থিহিত বাসনাটুকু
অধিক বোঝানোর কারণ ও আশ্রয়ী শৌখিন জীবন যাপ-
নের মোহজনিত পাড়াগায়ে জনসংস্কারের প্রতি আকর্ষণ-
বোধও কতক পরিমাণে শিক্ষিতদের শহর-প্রিয় কোরে
তুলেছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামের সম্পদ ছেড়ে
শহরের প্রতি মোহবশ হওয়া কখনোই মুক্তিসংগত হয়
না। শিক্ষিতদের বর্তমান গ্রাম-মনোহরি সম্পদ হওয়া
ও গ্রামকে হান্ধা, শিক্ষা, শিল্প ও সম্পদ হান্ধা-সম্পূর্ণ
ক'রে গড়ে তোলা, জীবনকে দল, যদু ও
আকর্ষণীয় কোরে তোলা। শহরভাষার হওয়া ভেতরে
ব্রিটিশ শাসনের কুক্রিয় স্বার্থক হয়ে উঠেছিল, উঠেছে,
আর এ দেশের ভাষাে স্বরূপই হয়েছে। ভারতবর্ষের
গ্রামগুলি অনানুত উপেক্ষিত হয়ে মহা সমাজের বাসের
অনুপযোগী হয়ে গেছে।

লোক জীবিকার জন্তে শহরেই ছোটে। কেন? তার
কারণ ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি এদেশবাসীকে আত্ম-
নির্ভরতার শিক্ষা দেয় নি, দিয়েছে পরাধীনতার শিক্ষা।
এমন শিক্ষা যে সে শিক্ষার্থী গ্রামবাসীকে শহরেই যেতে
হবে, অগ্রগত অনার্যেরই মতো হবে। ভাস্করী, মোস্তারী,
ওকালতী চকুটী, ব্যবসায়-বানিজ্য, শিক্ষিতা সব কিছু
সমাবেশ শহরে। কাজেই জীবিকা সংগ্রহের জন্য শিক্ষি-
তকে শহরেই যেতে হবে। শহরে একবার গেলে লোক

আমের গ্রামের জনাডের জীবন পছন্দ করে না। শহরের চাকরিক্যপূর্ণ বিশালী জীবন তাকে বিমুগ্ধ ক'বে ফেলে, তার চিহ্নিত পরিবর্তন ঘটায়। দোকান হিতাহিত জ্ঞান হারায়।

বুনিয়াদি শিক্ষা এর বিপরীত। এ শিক্ষা জাতীয়তার ভিত্তি ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ শিক্ষার শিক্ষিত গ্রাম বা অতিচাষক গ্রামবনোদ্ধৃতি সম্পন্ন হবে, শহরবাসীকে গ্রামের দিকে আকৃষ্ট করতে পারবে এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটা প্রীতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলবে, শহরকে প্রাক্ষর্য পোষণ বৃদ্ধি হবে। গ্রাম হবে শান্ত্রী, স্বন্দর আনন্দোজ্জল—গ্রামবাসী হবে সুশিক্ষিত, কর্মী, নিচীক, বসিত ও সংযতঃ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কি তা আদরা পেয়েছি? না পেতে থাকি?

প্রচলিত শিক্ষার পেছনে আছে আর্থিক মোহঃ বহুত বিভাগের শিক্ষা হবে লেখনের সর্বাত্মক বিকাশের সহায়ক, সে হবে স্বয়ং দলব নৈসর্গিক ভিত্তিমূলক শিক্ষা, সে-শিক্ষার পিত্ত ও মানব মনের স্বত্ববর্ষের সহিত বহুতগতের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটবে। শিক্ষাবীর সেহ, মন, আদ্যার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই যে প্রকৃত শিক্ষা একথা কে না স্বীকার করবে? কেবল বর্ষ বা ভাষাবোধই শিক্ষা নয়।

গান্ধীজী বলেছেন:—"It (literacy) is only one of the means whereby men and women can be educated. Literacy in itself is no education. I would, therefore, begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. Thus every school can be made self supporting, the condition being that the state takes over the manufactures of these school....."

.....(Harijan—July 31, 1937)

এ ট্রিক যে, কেবল, ভাষাবোধই শিক্ষা হয় না। শান্ত্রের জন্ম-বনের পুষ্টির বিকাশ সাধন বুনিয়াদি শিক্ষা-ব্যায় তেজস দিয়েই সম্ভব। অর্থাৎ কোন এক বা

একাদিক অর্থকরী মানসিক উৎসর্গতা লাভের সহায়ক শিল্পকলাকে ব'হন ক'বে বিজ্ঞানীয় সেহ মনের বিকাশ সম্ভবঃ কিন্তু কেবল স্বয়ং শিক্ষা করা ও প্রয়োগ করাই যথেষ্ট নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে একে বুঝতে হবে, বুঝতে হবে শিল্পমনের স্বত্ববর্ষিত ভাব ও বুদ্ধিবৃত্তিকে সৃষ্টিতে তোলাই এই শিক্ষার স্বত্ববর্ষিত।

একালের যে শিক্ষা তা লোককে বেকার করেছে, অসহায় করেছে। কেন? কারণ ব্যবহারিক জ্ঞানের সহিত এর কোন যোগ ছিল না। বই-এর কতিপয় নির্দিষ্ট অংশ মুখস্থ করে ছাত্ররা লাগ কোরে আসে, কোন বুদ্ধি-প্রয়োগের বা মাথা পাটাবার অবকাশ তারা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পায় না। কাজেই যে 'কিতাবী-বিদ্যা' (Bookish knowledge) তারা পায় শিক্ষাকালে, শিক্ষা-অন্তে তার কোনরূপ কার্যকরী রূপান্তর তাদের দ্বারা হয় না। নিজেকে কোন কাজেও লজ্জা দিকাকে লাগাতে পারে না। অস্বপ্নিত বা প্রাক-অজ্ঞের কোন সামান্যল প্রগতি জীবন-অনুভূতিতে থাকলেও সেটুকুও বাস্তব অতীতল অচায়ে অননুভূতিই থেকে যায়।

বুনিয়াদি শিক্ষা এরও ট্রিক বিপরীত এবং সুচনাশ্রমক জিয়াশীল। শিল্পমনের যুগ, অশ্রুতিবিশেষের বিকাশ-সাধনই এবং তার স্বজন-প্রতিভাকে সক্রিয় বাস্তবক্ষেত্রমুখী করাই এ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তা ছাড়া এর স্বত্ববর্ষিত একটা বড় রকমের স্বয়ং সংগত বিকাশশীল বিশেষের উদ্ভি-স্থাপনেক্ষা গান্ধীজীর মনে ছিল। সে হচ্ছে শ্রেণী বিহীন অহিংস সমায় গড়ে তোলা। যে ডেপ-বৈষম্য আমাদের জাতীয় জীবনকে ও জাতীয় সামগ্রিকভাবে বিপর্যক'রে তুলেছে, যা আমাদের সমুদ্রক রাষ্ট্রব্যয়ের স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের পথে বির-বরপ বলে মনে হচ্ছে সেই স্বনিক-বাসিক, স্বক-বনিব, হিঙ্গু-মুসলমান, রাষ্ট্র-সুত্র, ধর্মী-বসিত স্বত্বের পাতিপূর্ণ অবলান করনা এই শিক্ষার স্বত্ববর্ষিত। শিল্পমন বজায়তই যে সব প্রগতিমর্ষের অহরণী তার উজ্জল-ভর ও নিশ্চিত বিকাশশীলতার পরিচয় আমরা এই 'মই তালিম' এর শিক্ষাপদ্ধতির তেজস পেতে পারছি, আর একে স্বস্বীকার বা উপেক্ষা করবার উপায় নেই।

কুমিয়াদি শিক্ষা ও ডাছার প্রতিকূল ব্যবহাওরা

এক শ্রেণীর দোকান মনে করলে পাথর বেগাভাজী বুনিয়ে বিক্রয়লগ্নে স্বাভাবিক হবার ভুলে চাপ দিয়েছেন তার মনে। নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষের দিকে নজর উপেক্ষাই করা হয়েছে। এতদূর ভাববার কোন সংযোগ কারণ নেই। কেননা শিল্পের ক্ষয় ও মনোবৃত্তির বিকাশ-স্বাভাবিক সহজসাধ্য ও কলগ্রন্থ করার মতোই কোন একটা আবশ্যকীয় অর্থকরী শিল্পক্ষেত্রে অবলম্বন করার কথা উঠেছে। বস্তুর সহিত বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দ্বারা একদিকে যেমন মানব মনের অন্তর্দর্শের বিকাশের পথ উন্মুক্ত হবে তেমনি অপর দিকে তার সমন-প্রতিষ্ঠা ও বস্তুগতভাবে তার আন্তর্নির্ভরশীলতার নিশ্চয়তা নিম্নের স্বপ্নপরিসর ক্ষেত্রে থেকে অধিকতর সম্ভারিত ক্ষেত্রে, বিবর্তাণ্ড কর্তৃককে কাজ করার যোগ্য করে তুলবে। এর মানে এ নয়, যে যেহেতু বিভাগলগ্নে স্বাভাবিক হতে হবে, অতএব সব রেখে কেবল বস্তু উৎপাদনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ নয়, যে বালক-বালিকারা কেবল স্তুতাই কাটবে, বস্তু বস্তুই করবে বা কৃষি ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকবে, তবে এসব বৌদ্ধিক শিল্পকলা শিক্ষা-মাধ্যমের অপরিহার্য অংগ বলেই মনে করতে হবে। বস্তুর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের লাভার্থে বাস্তব-জ্ঞান দান করা ও লাভ করা সম্ভব।

অনেক বিচার বিবেচনার পরেই তাই গান্ধীজী কোন শিক্ষককে শিক্ষিকার বাহনরূপে গ্রহণ করাব অভিযত প্রকোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, “আমার শিক্ষার পরিকল্পনা” অস্থায়ী কিন্তু লিখিবার বা লেখার দাগ বুলাই-বার আগে শিক্ষার্থী ধরিবে। জীবনে অন্ত্যস্ত জিনিষ জানিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কৰ্ম নানা জিনিষের ও বাক্যসমূহের নাম ও অর্থ গুলিবে। সমগ্র শিক্ষাই স্বাভাবিক ও অনায়াসসাধ্য, হৃৎকায় পৃথিবীতে সর্বোৎসাহী হৃৎকায় ও হৃৎকায় হইবে।” (কংগ্রেস সাহিত্য সম্মেলন প্রকাশিত—“গান্ধী দর্শন” পৃঃ ৬৭)

প্রচলিত বক্তবান শিক্ষাপদ্ধতি শিক্কে হস্তশাখা'।
যন্ত্রিক ও আশ্রয় অহীনগনের অভ্যাস থেকে দূরে রাখে,
নীলম বর্ণ ও শব্দ পরিচয়ের বোকা তার দৃষ্টিভেদ ও গুণ
চাপায়। এতে শিক্কে অকপ্রভাষাহিতে কদমোর থেকে

করে বর্ষপ্রাপ্তি ভদ্র প্রাপ্তি হয় ও কর্মনিপুণা-
লাভে সে আদর্শ হয়। শিশু আত্মার জাগৃতির পথ বন্ধ
হয়। এই সমুদয় দাঃসীমার দাবী এইরূপ ছিল যে:—

“হাতের আগে চোখ, কান ও জিত পড়িত হই।
শিঙের শিবিয়ার আগে পড়িত এবং বর্ষাভার অক্ষর
সমূহের ওপর বাগ ব্লাইন্ডের আগে ছবি অঁকিত।
বর্ষাভার দ্বারা শিঙের দিক। আরও কয়ল কলে বাধা-
প্রাপ্ত হইয়া তাহারে বোধগতি বেড়াই বিকশিত হই,
তাঁহা অগন্ধ। প্রকৃতি ও শিল্পকার্যের ভিতর দিয়া এই
স্বাভাবিক প্রণালীতে দিক। বিশেষ তাহার বোধগতি
বিকাশের অধিকতর সুযোগ লাভ করিবে।” [কংগ্রেস
সাহিত্য সংগ্রহ প্রকাশিত “গান্ধী দর্শন” পৃঃ ৬৮]

বসন্ত এতকালের শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবাসীকে গান-
কীর্তি সনাতন পরিণত ক'রে এসেছে। বেদের শিক্ষা, সম্পদ
ও ঐশ্বর্য কৃষ্টির কাজে, বাহ্য, শিক্ষা, কৃষ্টি ও জাতীয়
সভ্যতার উন্নয়ন এবং পুষ্টি-কল্পে বিশেষ সহায়তা করে
নাই বা বসন্তকু কল্যাণের অধিকারী হওয়া থেকে তার
বহুগুণ অকল্যাণ আমাদের সমস্ত, কিছুই হচ্ছে। প্রবেশ
ক'রে আমাদের সর্বনাশ সাধন ক'রেছে। প্রচলিত শিক্ষা
ব্যবস্থার এই কুফল যদি আমরা উপলব্ধি করতে পেরে
থাকি তবে এর বিশদীকৃত শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের গ্রহণ
করতে হয় অর্থাৎ যে মৌলিক ও বৈশিষ্ট্য শিক্ষাপদ্ধতির
পরিচয় আমরা পৌরাণিক গ্রন্থাদি, ইতিহাস প্রভৃতির মধ্যে
পাই, সেই সনাতনী শিক্ষাপদ্ধতিকেই আমাদের আদর্শ
শিক্ষার সাধন হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

‘নই জালিম’ অর্থাৎ এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতিই এদেশের ‘সনাতনী’ শিক্ষাব্যবস্থা। এই শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কোন আছে, পাক্ষাত্যের অধিকরণে যে শিক্ষাব্যবস্থা আছে। এদেশে চলছে, তার মধ্যে তা নেই। প্রাচ্যের স্ববি-বুণে এদেশে বিজ্ঞানীর অত্যাব ছিলনা, তাবের হতে, বিজ্ঞানী আনো। পৃথিবীতে হুগুও বলসেই চল। তবে তাঁরা ছিলেন বিশেষভাবে বনোজগতের বিজ্ঞানী, স্বপশিও নিরে তাঁরা ততো। মাথা মাথান নি, বত কেবী তাঁরা মাথা মাথিয়েছেন আত্ম ও বনোজগতের বিষ নিরে।

তাই ব'লে তাঁরা বস্ত্র ব্যবহার-বিজ্ঞানে অপরূপ বা অনুৎসর্গী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন স্থবী ও স্বাধীন, স্বাস্থ্য ও সম্পদশীল, তাঁরা ছিলেন সমাজের প্রতি বিশেষভাবে কর্তব্যপারদর্শন আত্মতা কোথায়? প্রত্যেক ভাবতীর্থ কৈশিকী 'সনাতনী শিক্ষারীতি', যাকে আমরা আজ 'মুনি-চারি' আখ্যা দিচ্ছি।

এখন তো স্বাস্থ্য ও কর্তব্যবোধ অগ্রাহ্য করে কেবল বস্ত্রপেটের গবেষণাতেই লোক উন্নত, পাগল, পবিত্র সূত্রী ও সংস্করণ শক্তির অপর ও অমিতব্যয়্যে বেষণেয়ো প্রভিবেগিত। চলছে। তীর্থতরু লংসাবক ও প্রতিহিংসাত্মক কার্যের সহৃদয় ব্যবহারে পাবেগা চলছে। আর তারই সত্যের হাতে আছে বর্তমান শিক্ষাত্ম-শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব। ফলে, পৃথিবী আজ অশান্তি ও অসন্তোষ, হিংসা ও প্রতিহিংসা, অবিদ্বেষ ও প্রবলতার চাপে পীড়িত ও বিস্তৃত হুতা, নীতি, ধর্ম ও শাসন আজ পশ্চিম তথ্য বর্ধনতার প্রভাবশীল কক্ষেই বস্ত্রতাত্ত্বিক গবেষণায় বৈজ্ঞানিকেরা হতে কেন না এগিয়ে চলুন, তনুসাধারনের একান্ত প্রয়োজনীয় 'মোটো ভাত কাপড় আর এক টুকরা ধড়ের চামা', এই ক্ষুদ্রতম প্রয়োজনটুকুও আজ পর্যন্ত তাঁদের দ্বারা সহজলভ্য হয়নি, শান্তি ও স্বাস্থ্যের লাভ তো দূরের কথা। গড়ার কাছে বিজ্ঞানের সাহায্য খুব কমই পাওয়া গেছে, বা পাওয়া গেছে তা ভাংগার কাছে, ধ্বংসের কাছে। এ হ'লে মুনিচারি শিক্ষার আদর্শকে বর্জন করার পরিণামকাল। সত্য ও প্রেমকে, তৎসহ আত্মা ও প্রকৃতিকে বর্জন করার অবসরস্বাধীন পরিণতি আজ পৃথিবী-বাসীকে ভোগ করতে হচ্ছে। মুনিচারি শিক্ষার মূল সত্য সত্য প্রেম, তাই এর বিকাশ ও পরিণাম সত্য ও শান্তিযাত্রক। পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কেরা যদি স্বার্থী শান্তিই কামনা করেন, মুক্তকে এড়াতেই যদি আশা রাখেন তবে গান্ধীজী-পরিকল্পিত মুনিচারি শিক্ষাকেই 'আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি'রূপে গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে ব'লে মনে করি।

সামান্য, মহাভারতে স্বেতে পাই সর্ববংশের ঐক্য-চক্রাধি, কৌতব কুলের ধৃষ্টিয় দুর্ধোনাগনি গুরুপুত্রই শিল্প লাভ করেছেন। সেখুণে গুরুপুত্রই রেখে প্রকৃতি

ও জীবের সর্বিৎ প্রত্যাক পবিত্র সাধনের উত্তর দিয়েই শিক্ষাদানের তীতি ছিল। বাহনীরতি, শাস্ত্র ও শাস্ত্র-বিজ্ঞা, কৃষি, গোশাসন, আয়ুর্বেদ প্রকৃতি গুরু নিরন্তর সাধনকে প্রকৃতির আশ্রয়েই শিক্ষালাভ করত। আর তাদের সে পারদর্শিতার মাঝে এখনকার কিছুইই তুলনা চলে না। শিক্ষাসমাপনান্তে লোকলের সাতকেরা নিজেদের অসহায় বোধ করত না।

কিন্তু এখনকার শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষা সমাপনান্তে প্রত্যেকের নিজের শক্তি সম্বন্ধে কোনো ধারণা বা সচেতনতাই থাকে না। বেশকি, জাতিকে সেবার কথা হুয়ে থাকে, নিজে ঝাটবে কেনন করে সেই ভাবনাতেই তার জীবন গুরু, অসহায়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। কারো ওপর নির্ভর করতেই সে চায়। এসেছেও অভিজাতবর্গের চৈতন্য হয় না? পাতকের বৃত্ত জলধ অগ্রিমিয়ার যোগ্য হয়ে কাশিরে পড়ছে, প্রভাবিত হচ্ছে ও হচ্ছে। বৈশ্ব তাদের বাড়ছে বই কমছে না। শুধুও দেশের সাধারণ তারা ছাড়তে পারছে না। পৃথিবীতে তাই আজ ষাট বৎসরেই একান্ত অভাব দেখা দিয়েছে। আর ষাট বৎসর পেতে হলে, শান্তি ও স্বাস্থ্য পেতে হলে, মুনিচারি শিক্ষাকেই আদর করতে হবে।

অনেক বিজ্ঞানাত্মক ও তীর্থ আলোচনা ও সমালোচনার পর মুনিচারি শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে অনেকের মত বদলার। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ণার জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়ে। ঐ সভাতে পৌরোহিত্য পদে বরণ করা হয় মহাত্মা গান্ধীকে। সাধারণত জাতীয় সেখেকোই এমিকে বেশী আড়ষ্ট হন ও ঐ সভায় যোগদান করেন। সাতটি কংগ্রেসী প্রদেশের শিক্ষা সচিব-রাও ঐ সম্মেলনে যোগদান করেন। বিশদ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর ঐ অভিব্যক্ত তাঁরা একাংশ করেন যে জাতীয়তার ভিত্তিতে সাত বছরের পাঠ সার্বজনীন করতে হবে, নির্মাণ ও বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ঐ শিক্ষাদানের বাহন হিসাবে মাতৃভাষাকেই স্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে। গান্ধীজী প্রভাব, যে কোনো সার্বক হস্তশিল্পকে বাধ্য করেই শিল্পমনের সাবাত্মক ও পূর্ণকর

বিকাশ সাধন সম্ভব ও সম্ভব, এও উক্ত সময়েই সর্বজন-
সম্মতি হয়। সম্মেলন এ আশাও করেন যে এই শিক্ষা-
ব্যবস্থা ক্রমশঃ শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বা বায়ডার বহনের
যোগ্যতাও অর্জন করতে পারবে। এ সম্ভাবনাও আছে
এই শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরে।

ভারতীয় ভারতীয় কংগ্রেসও এই শিক্ষাব্যবস্থাকে কার্যত
প্রদেয় করার পক্ষে যত প্রকাশ করেন এবং এমতে
একটি সর্বভারতীয় শিক্ষাসভা গঠনের আবশ্যকতাও অস্বত্ব
করেন। এই উদ্দেশ্যে ডাঃ আকির হোসেন ও শ্রী ই ভবানী
আর্থারসকম্ এম ওপর কার্যকরী পদাধিকারের দায়িত্ব
অর্পিত হয়। এঁদের প্রচেষ্টায় ১৯০৯ খ্রিঃ-এ “হিন্দুস্তান
জাতিবী সংঘ” নামে একটি শিক্ষাবোর্ডও গঠিত হয়।

এরূপ পরীক্ষামূলকভাবে এই নব-পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতি
অনুসারে কাম করার জন্য কতকগুলো বেসরকারী জাতীয়
শিক্ষাগার হাতে নেওয়া হয়। পরীক্ষামূলকভাবে মধ্যপ্রদেশ,
মুজফ্ফরপুর, বিহার ও বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণমেন্টও এই
শিক্ষাপদ্ধতি কতকগুলো বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করেন। কান্দীর
স্টেট কলেজও এই নতুন শিক্ষাকে পরীক্ষামূলকভাবে
গ্রহণ করেন।

আরওকালে শিক্ষক ছিলেন অনভিজ্ঞ, অনভ্যস্ত।
তাদের শিক্ষকতার সম্বল ছিল ভাষাবোধ, প্রাক্কল্প-সংস্কার
ও স্বভাববৈশিষ্ট্য। অভিজ্ঞাবকরা ছিলেন যৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ।
এমত সত্ত্বেও, পরীক্ষামূলকভাবে এই নতুনতর শিক্ষাচর্চার
সেই বছর পর ১৯০৯ অক্টোবরে পূণাতে বোম্বাই গবর্ণমেন্ট
কর্তৃক যে সম্মেলন আহ্বিত হয় সেই সম্মেলনে ভারতের
বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষক ও শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক
তাদের পরীক্ষাকার্যের ফলাফল, সুবিধা অসুবিধা ও এই
শিক্ষার ভবিষ্যত সম্পর্কে যেনব মন্তব্যসহ রিপোর্টাদি
প্রকাশিত হয়, তাতে এই শিক্ষাপদ্ধতির কার্যকারিতা
সম্পর্কে খুবই আশার ভাব পরিলক্ষিত হয়। পুণাহস্থ
আলোচনার পর যে স্থিতিস্থিতি অভিযন্ত এই সম্মেলনে
যাককরা হয় তা অভিজ্ঞাবক জনসাধারণ ও শিক্ষাবিৎদের
অনুমোদনীয়।

শিশু ছাত্রজীবনের পুঁজিতেই পাঠ্যক্রমের মধ্যে ইং-
রেজীকে অগ্রাধিকার করার ভারতের শিক্ষা-প্রগতি শুকতরঙ্গপে
কতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশ সাধনও
অনেক পরিমাণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। যৌরপূর্বক ইংরেজী
শিক্ষিত বাধ্য করার শিশু ও যাদবানিধাদের ওপর
শুকতর অধিকার করা হয়েছে, বলা চলে, এবং তাদের
জীবনবিকাশের প্রকৃত কতি-সাধন করা হয়েছে। অভিজ্ঞাব-
কেরা কি এমত বুঝতে চেষ্টা করেন? তাদের কাছে
বিজ্ঞানই হাস্যবরণ কোরে নেবার কথা মাত্র, তাদের
কাজে “সাবিধা বা বিমুক্তকো,” এমত, আর তারা হাস্যই
কামনা করেন, স্বাক্ষর করেন না।

বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতির সম্ভাব্য পরিকল্পনা ইংরেজী
শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয় নি। এই শিক্ষাকালে
যাককরাযাকেই শিক্ষানানের জ্যেষ্ঠ বাহন হিসেবে বীকার
করা হয়েছে। গত ক’এক বছরে বুনিয়াদি শিক্ষাধার-
বৈশিষ্ট্য দৃঢ় ও আশাশ্রিতভাবে প্রগতিশীল পদ্ধতিতে
পেরেছে এবং যেনব পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা আনত করা
গেছে, তাতে এ দৃশ্যই হয়ে উঠেছে যে এই শিক্ষা-
বর্তমান সমাজ ও শিক্ষাকালে এক নতুন বিশ্বই
করবে। জাতিকে সর্বতোভাবে হৃদয়ন্ত, হৃদয়ন্ত ও
হৃদয়গঠিত কোরে তুলতে এই শিক্ষাযোগ্যদেরই আবশ্যকতা
ছিল। একথা আজ বীকার করতে হয়েছে। আজ তো
বছর আট নয় হোসো, বুনিয়াদি শিক্ষা নানা অদৃশ্যতা
ও নানা বাধাবিধ সত্ত্বেও অনেক দূর অগ্রসর হয়ে চলেছে।
লোক বীকার ককক বা না ককক, যেনব বর্তমান
পরিস্থিতিই জাতিকে বুনিয়াদি শিক্ষার অগ্রদূত টেনে নিয়ে
চলেছে। অজ্ঞতা ও সংস্কারের প্রতি অধ-অভিমান বশত
‘বুনিয়াদি’ মাথটাকেই লোকে হনকরে না দেখতে পারে
কিঞ্চিৎ প্রগতি সেমতে কক খ কক হতে যেতে পারে না।
কালের সাথে তাকে চলতেই হবে। বিদ্রব ও বিকাশ
কালক্রমের নিয়মে অবশ্যজারী ও অনিবার্য।

সেদিন ইংরেজী ইচ্ছার অনৈক শিক্ষক বুনিয়াদি
বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু ধারণা অর্জন করতে
আসেন। তিনি কথ্যপ্রদেয় এক অশ্রুত প্রের করেন।

গাছী-আদর্শমিতি বাক্তি বাতীত অস্তে কি
বিভাগালয়ের শিক্ষক হইতে পারেন? এর উত্তরে
যে 'সত্য ও প্রেমই' বলি বুদ্ধিগতি শিক্ষা-
পদ্ধতির 'বীজব্রহ্ম' হইত তবে গাছী-আদর্শের সহিত স্থপতি-
'১৩২ বাক্তিই এই কাজের যোগ্যত্ব, এ বিষয়ে কোনো
সংশয় নাই। বস্তুত যে শিক্ষকের নিজেই আচরণ, আদর্শ

চাষিয়ে উদ্ভূততা, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার অভাব, যার জন্যে
পরমতসাহিত্যতা ও মানবপ্রদেয় অভাব তার চ্যুত শিক্ষ-
কতার সাধনা অসম্ভব সম্ভব নয়। শিক্ষকের বনে অস্তরে
দুঃখপূর্ণ থাকবে, ছাত্রপ্ররতি ও শিক্ষকপ্ররতি। কোনো
শিক্ষকই বলতে পারেন না যে তিনিই উপযুক্ত শিক্ষক।

একটা নতুন বিষয়। বিবর্তিত্বের বহু বহু পরঃ
পাত হারে এগুটি অর্থব্যবহৃত বহু চিন্তাধারা হলেই যে
এই গুণগতিই বহনক্ষম ক্ষমতা যাবে, এমন মোটেই নয়।
এই শিক্ষকতার পরদর্শিতা গাভ করিতে হলে প্রাকৃতিক
ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান আচরণ করা চাই। একটা শিল্প-
কলায় অবলম্বন কোরে শিল্পনের অস্বনিহিত বুদ্ধিগতি-
জ্ঞানকে জ্ঞান ও পুষ্টি করা, এক বস্তুর ব্যবহারিক
জ্ঞানের সহিত মানব বিকাশ-সাধন, এ তো ভেদেভেদে
না? অথচ কোনো একটা শিক্ষাপ্রদ বস্তুইই শিল্পনের
স্বল্প অল্প প্রতিভার পূর্ণবিকাশ সাধনের স্রষ্টা উপকরণ।
শিক্ষকের নিজেই, সজ্ঞানী-দৃষ্টি, ব্যবহারিক জ্ঞান, ও শিল্পের
মনস্তত্ত্বের অগ্রভাবনীলতা না থাকলে প্রকৃত শিক্ষক হওয়া
হইত না। বেত বেত বই মুখ করানো খণ্ডিত সম্ভব হয়,
জ্ঞানকে উত্তেজিত কোরে, ক্ষুদ্র কোরে, দুঃখ দিয়ে এ শিক্ষা-
ধারার শিল্প বা বাণ-চরিত্র গঠন করা সম্ভব নয়। এ
শিক্ষক স্রেহ, প্রেম, নিষ্ঠা ও অধ্যা চাই, সত্য ও সত্য
পালনের প্রতি আগ্রহীলতা চাই, অধ্যবসায় চাই।

শিল্পের অন্তর্গত বানব-বস্তুকে আকর্ষণ কোরে বুদ্ধিগতি
করা ও যুগপে পরিচালিত করার ক্ষমতা আকর্ষণীয় বিষয়-
পূর্ণ ও চাই। সেরা, নাচ, গান, খেলা, চিত্রাঙ্কন, রূপ ও
গোপালন, চরণা তাঁত প্রভৃতি স্থলীরাগবোধী বস্তুনিষ্ঠ প্রকৃতি
এই সবার মাধ্যমে কৃত্য, পরীকৃত্য, বস্তুত্ব, সমাধ ও
সংযে বিজ্ঞান সম্পর্কে আবশ্যকীয় জ্ঞান শিক্ষার্থীদের দিতে

হবে। এছাড়া শিক্ষককে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা, অস্তত
আংশিক অভিজ্ঞতা সক্ষম করতে হবে। আগে শিক্ষকেই
জ্ঞান হইবে হইবে শিক্ষকের নিজেই যথেষ্ট স্বভাব-
বৃত্তি আছে তাকে বিকশিত করতে হবে, তাকে বাধ্য করে
নাগাচ্ছন্ন হইবে। তবেই শিক্ষকের নিজেই যোগ্যতা সম্পর্কে
আন্তর্জিহাদ ও দৃঢ়তা লক্ষ্য হবে।

কিন্তু বুদ্ধিগতি শিক্ষার প্রতি রুচি কেবল কতিপয়
শিক্ষকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে কোনো বিশেষ কল্যাণ
হবে না। এ কঠিবোধ অভিজ্ঞতাব্যবহৃত অভিজ্ঞতাব্যবহৃত মধ্যেও
গড়ে ১০০ চাই। শিল্পের পরিবেশ ও আবহাওয়া বুদ্ধিগতি
শিক্ষা প্রবর্তনের সম্পূর্ণ প্রতিফলনই ও অধ্যবসায়।
এই অবস্থার কারণে বুদ্ধিগতি নয়, তথাপি পান্ডিত্য
শালনের ফলে শিল্পই আদর্শের কাছে বেশী বর্ণনা পেয়ে
এসেছে। ভাষাতত্ত্ব বৈশিষ্ট্য অর্থ্য পটী আদর্শকে শিল্পই
জ্ঞান ও জ্ঞান কোরে কেনেছে। আদর্শ বাচতে হলে, এবং
বাচতে হলে গ্রাম্যকেই শিল্পের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে
হবে। আর গ্রামই ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার মূল কেন্দ্র।
দ্বিও বর্তমান অবস্থার শিল্প ও গ্রামের মধ্যে একটা
সভ্যতার ভাব গড়ে তোলাই কাম। কাজেই শিল্পের
কথা না তুলে, সেই গ্রামের সম্বন্ধেই জ্ঞান কথা এখানে
বলছি। শিল্পের দী-পুঙ্খ, যুগ-যুগান্তের দিকে তাকালে
হতাশ হতে হয়। শিক্ষা কাকে বলে পান্ডিত্য প্রভাবে
তা তুলে গেছে বলা চলে (শিল্পের লোকজ্ঞে, বটেই),
তাই শিক্ষাকেই তারা বড় ভয় করে। অবশ্য প্রচলিত
পান্ডিত্য শিক্ষাই এই ভয়ের কারণ হয়ে পাড়িয়েছে।
বস্তুত বুদ্ধিগতি শিক্ষার ভয়ের কোনো দোষ নেই। এই
শিক্ষাপ্রদেই আদর্শ সোয়ান্তি, স্বাধ, ও স্বাধীনতা পেতে
পারি, সর্ব-অভাব থেকে মুক্তি আদর্শ পেতে পারি।

শিল্পীরাগের মনসাধারণের ক্ষুদ্রতা ও কুসংস্কার এবং
সামাজিক কড়-কণ্ঠসাধারণের অভাবই গ্রামবাসীকে শক্তিশীল,
নিরাপণ ও চিকিৎসারী কোরে তুলেছে। পারম্পরিক ঈর্ষা
ও হিংসাবশত লোক উসারতা ও অস্বস্তিকর্ষ ও বিদগ্ধন
দিয়েছে, বার্থ ও বিখ্যাচার বাতীত জ্ঞানী যাকে না কিছুই।
গ্রামের হিতে বা দর্শিতে কিছু করা তাদের স্বভাববলত

নয়, পুত্রস্বার বা প্রাপ্তির আশা ব্যতীত কিছুতেই তারা এক পা অগ্রসর হবে না।

প্রকৃত শিক্ষার অভিপ্রেতি ত এই অবস্থার সৃষ্টি। আশা পতীর পুত্রস্বারা বনে করে যে শীলেকিসের বৃহৎকোণে অশিক্ষিত ও শিল্পব্যবসায় কোরে বাণ্যই তাদের প্রতিষ্ঠার তথা মানবদায়ার পরিচায়ক। এখনকার দিনে এই সব কৃষকস্বার ও হীনোচিত বনোভার অজ্ঞতার পরিচায়ক ও বৈদেশ্যায়ক।

আমরা তো চাই, দেশের প্রত্যেকটা ভাইবোন উন্নয়ন, মহনশীল ও যত্নবানী হোক, সলককারই বনগ্রাণ, বাহ-হার বিনয়ী শিক্ষিত, নিজীক ও সংকোচমুক্ত হোক। সংকোচের দ্বন্দ্ব আশা জাতি হিলাবে মরে আছি, মরে যাকিও। গ্রামের গ্রী পুঙ্খ সংকোচের ও সংকীর্ণতার চাপে আছে বলেই সংকটকালে তারা সাহস হারিয়ে কেনে, আন্তরিকতা থাকে না। শিরালকৃষ্ণের জীবন যেন। বাহ্য হোয়ে এমন অবস্থার রাগা ও থাকা উভয়েই অব্যক্তি। এ অবস্থার পরিবর্তন কাম্য। এই সংকোচের ভাব এড়ানো চাই। সংকোচমুক্ত হোয়ে জলন্ত সাহস ও সন্তোষ নির্মল চরিত্রবল নিয়ে চলতে পারা চাই। প্রত্যেকটা গ্রীপুঙ্খ নিজীকভাবে, নিঃসংকোচে চলতে পারলে তাঁতির দৈন্ত ও বিপদও কম হবে। আমাদের এই জাতি শক্তিশালী হবে, শ্রাণপায়ন হবে। এই জন্তেই আবশ্যক দেশের শহর-পল্লী, সর্বত্র বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তন করা। তবে না ভারতের শিক্ষা-সাধনা সার্থক হবে?

আমি বীরাবনা চাই, বীরযাতা চাই। ভারতের ঘরে ঘরে ভেদবিনী মহীশয়ী নারী চাই, যা চাই। সংকোচের বিস্তারতার, লক্ষ্য, ভয়ে জড়োসড়ো মায়ের ছেলে কি সেবে বেশেক, আর কিই বা করবে নিজে? ভীত ভীক সংকোচজড়িত মায়ের সন্তান ভীকই হয়, চরিত্রবান মাত্র হয় না, সে-সন্তান খায়ী সাবলবী হবে কি, ভীকতাই তার অধিদাকার সকারিত থাকে।

এইজন্তে বর্ষি, মারীক বৃহৎকোণে আবহাওয়া আড়ালে রেখে দিয়ে, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে মাতৃভাতির অর্থবা করা হচ্ছে। মানসিক বৈজ্ঞানিক

হিনিকিত সর্ব সাহসী যুগে হুর্ভবের বা পতপ্রকৃতির সোকের অপবাধ-প্রবলতা লক্ষ্য পায়, জান চয়, সেই নারীর চরিত্রল অজ্ঞাতকারী কুশীলিত হয়। অর্থলক্ষ্য। নারীর ভগ্ন-বাহিরে গেলেই তার জাত যানে, তার মান যাবে। কাজেই সাতীজীবনই হে অবসা, পবনকারীনা খাঙ্ক, সর্বাবস্থার সে অসীমারী-থাকে। সেয তাদের নয়, আমাদের তথা সমাজের পুঙ্খপ্রধানের, মাতার তৈরী সমাজব্যবস্থার। কিন্তু যত সংকোচ নেই, গতিমুক্ত ও সাহসী এবং জানোজ, তার জাতি যায় না, তার মান ইচ্ছত অমান থাকে, বং উত্তরোত্তর শীল প্রতিভা-লক্ষ্য হয়। সে বিশ্বের স্নানীস্বরণ হয়। সে-যোগ্যতা যোগ্য শিক্ষাপ্রদানে সে লাভ করে। ইহর তার সত্যক হয়, তার মানসিক উপলব্ধি, তার মনো ও অজ্ঞিত-সংশ-প্রাপ্ততা তাকে সর্বজনের সম্মানের ও সম্মার পায়ী করে তোলে।

এমন যে 'মা' তার ক্রোড়ে যে সন্তান জন্ম লাভ করে তার শিক্ষা, সংস্কার ও আচার হবে সর্বজনস্বরণক, সে দেশ, কাম, শ্রেণী সম্প্রদায় নিবিশেষে সর্বজনের প্রীতি-উৎপাদনকারী, সে-সন্তান হবে দেশের জাতীয় পৌরবেশ বশ।

বুনিয়াদি শিক্ষার ভেতর দিয়ে আমরা তো এমনকি 'মা' বসি করতে চাই। অত মা চাই, শিক্ষক চাই। বিজ্ঞান কেবল পারিবারিক সম্পদ থেকে হবে অর্থহিত সাময়িক শিক্ষানিকেতনই নয়, প্রত্যেকটা গৃহই হবে শিক্ষা-গয়, আর মা হলেন সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম শিক্ষক। মার দারিত্র্য সকলের ওপরকার দারিত্র্য। বসতে গেলে, প্রাক-বুনিয়াদি শিক্ষা তো পুরাপুরিই মায়ের হাতে, কিন্তু প্রাক-বুনিয়াদির সীমাবদ্ধতা পার হ'য়ে বুনিয়াদি শিক্ষালয়ে প্রবেশ করলেও মায়ের বা অভিভাবকের পরিচর্য কমে না, বিশ্বাস্যও স্তম্বে না। বং উত্তরোত্তর বুনিয়াদি বিজ্ঞানময়ের শিক্ষাধারার সহিত নিজেদের চরিত্রবানদের ও পরিবর্তিত করে দেবার আবশ্যকতা দেখা দেয়। কেননা উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষারও অনেকটা পান্ডিত্য অভিভাবক-ল ওপরই এ অবস্থায় অভিভাবক এবং বিশেষ করে

নামের বাদি 'মই তালিমের' অর্থকুলে নিজেদের পরিচালিত না করবেন তবে শিক্ষার স্বকলের আশার অন্তরায় হুই হওন খুবই সম্ভব। এইজন্য এখানে বলা প্রকারে যে, হুনিয়াদি শিক্ষালয়ের ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষক তৈরী করা আবশ্যিক হ'য়ে পড়েছে তেমনি আদর্শের মাতৃভাষায় মনে প্রাণে ও আচরণে শিক্ষকতা-প্রকৃতিও জাগ্রত করা একান্ত-ভাবে প্রকার্য।

বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষাবিভাগের ও হিন্দু-স্থানী তালিমী সংঘের এই আট মত বছরের অভিজ্ঞতার 'সন্তুষ্টি' হুনিয়াদি শিক্ষালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের যোগ্যতার একটা নান নির্ণীত হ'য়েছে। হুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘের সাত বছরের কাণ্ডে যে বিবরণ প্রকাশিত হ'য়েছে তা থেকে কতক এখানে উল্লেখ করছি। চেলেরা শিক্ষার নিরঙ্কুশের অধিকারী হবে ব'লে আশা করা হ'য়েছে :—

- ১। ছেলেরের শরীর হবে সুসংগঠিত, সুস্থ ও সবল এবং কঠিন শ্রমসাধ্য কাজের উপযুক্ত হবে।
- ২। পারম্পরিক সহযোগিতার শুরুর প্রতিষ্ঠিত নতুন পরিকল্পিত প্রানবেত্রিক সমাবেজ্ঞান সম্বন্ধে পরিচার চিন্তা ধারা এবং গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার হুটার শিল্পের স্থান সম্পর্কে সঠি জ্ঞানলাভ করবে।
- ৩। প্রয়োজন হ'লে, ছেলেরা শিক্ষাকালে যে শিল্প-কাজের জ্ঞান লাভ করবে তদ্বারা ই নিজেদের আবশ্যকীয় অর্থ ও বস্তু সংগ্রহ করার পক্ষিলাভ করবে।
- ৪। একা কর্পাস বা তুলা হতে কাশড় প্রস্তুতের সর্বপ্রকার প্রক্রিয়াতেই নৈপুণ্য লাভ করবে।
- ৫। নিজেদের পাদার উপযোগী যথেষ্ট সৃষ্টি উৎ-পাদনে সক্ষম হবে।
- ৬। ছেলেরা স্বাস্থ্য কলার নিপুণতা লাভ করবে, পরিবার বা গোষ্ঠির ক্ষেত্রে খাদ্যভোগ্যের সংরক্ষণ, রাগা ও পরিবেশের সংরক্ষণ দাবতীর কাজের সম্বন্ধে তাদের উপযুক্ত জ্ঞান ও পক্ষতা লাভ হবে। বড় শাকপাশা পরিচালনার দায়িত্ব বহন করার পক্ষি এবং হিসাবপত্রাদি ও বাজেট তৈরীর যোগ্যতাও লাভ করবে।

৭। খাদ্য-উপাদান, গ্রাম পরিষ্কারতা, এবং গ্রামের ব্যক্তিক ও সামগ্রিক বংশধরকা সম্পর্কিত মৌলিক তথ্যগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবে।

৮। সাধারণ যাদিসমূহের প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরিচর্যা সম্পর্কে তারা জ্ঞান লাভ করবে। পরিণত চিকিৎসা-সাঙেও শিক্ষা লাভ করবে।

৯। সমবার সংস্থা, ভাণ্ডার প্রকৃতি পরিচালনার উপযোগী সমবার নীতিজ্ঞান ও হিসাবপত্রাদি রাখবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

সাধারণ সভাসমিতিতে সঠি ও সহজভাবে নিজেদের বক্তব্য বলার শিক্ষা লাভ করবে।

১১। নিজের মনোভাবে পরিচালনাবে যত্ন দরতে পারবে ও বিশেষাটাদি তৈরীতে অক্ষাত হবে।

১২। ছেলেরা মাতৃভাষায় লিখিত সাহিত্যের হস্তবাসে সক্ষম হবে এবং কাঞ্চ চালানোক্ষম হিন্দুস্থানী ভাষার জ্ঞানও এরা পাবে।

১৩। হিন্দুস্থানী ভাষা—উভয় লিপিতেই লিখতে ও পড়তে পারবে (বেদনাগরী ও উর্দু)।

১৪। আতীতভাবেধক ও প্রার্থনামূলক ভজন গান সমবেতভাবে গাইতে শিখবে।

১৫। চিত্রাংকন বিজ্ঞার জ্ঞান লাভ করবে, চিত্রকলা সম্পর্কে রসবোধের শিক্ষাও এদের অঙ্গতে আসবে।

১৬। সাইকেল ও মোড়া চড়তে এবং গোর্নেকট চালাতে জ্ঞানবে।

১৭। ছেলেরা বিজ্ঞালয়ে ও গ্রামে উৎসবদির পরি-কল্পনা ও পরিচালনার ব্যবস্থাপণ্ট হবে।

১৮। সংবাদপত্রাদি পড়ে হুনিয়ার অর্থনৈতিক, সমাজ-নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করবে।

১৯। হুটার শিল্পের বিভিন্ন দক্ষপাতি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি জ্ঞান ছেলেরা লাভ করবে।

২০। খাদ্য ও তুলায় চাষ, রাগা ও তৎসঙ্গ-কলায় শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রক্রিয়া, ব্যক্তিক ও সামগ্রিক বাহা-রকা এবং পল্লীবাংয়ের ব্যাপারে যে সব বৈজ্ঞানিক চিন্তা

ও দৃষ্টদার্য আছে, তখনই ছেলের পরিচয় লাভ ঘটবে।

২১। আর ও বহুল উপলক্ষ্য করে এরা ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর ব্যাপারে ভৌগোলিক জ্ঞান লাভ করবে।

২২। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাদি পাঠ করে যে জ্ঞানলাভ করবে স্ববিবেচনার সহিত তা ব্যবহার করতে শিখবে।

২৩। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও ক্রম বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

২৪। ভারতবর্ষের সকল ধর্মের প্রতি এরা শ্রদ্ধাশীল হবে ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য অঙ্গনের দিকে প্রবলীকৃত হইবে।

২৫। জাতিভেদ ও তৎসম্পর্কিত কুসংস্কার থেকে এরা মুক্ত ও স্বচ্ছ থাকবে।

২৬। গ্রাম ও গ্রাম-প্রকৃতির প্রতি এদের ভালোবাসা জন্মাবে, এক গ্রামে থাকার ও গ্রামের বেলা করার জন্ত এদের আগ্রহশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এরা গ্রাম মনোবৃত্তি সম্পন্ন হবে।

এর মধ্যে কিছুমাত্র অভিযোগ কি নেই। ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবেশের পূর্ব-পর্বত বুনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতির আধার ছিল এদেশে। আজ সে-আধার নেই। অস্বাস্থ্যপূর্ণ অনায়াসলভ্য সৌধীন ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির পথ হ্রস্ব ও স্থগণ হওয়ার এদেশের জনসাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহারিক-বিজ্ঞানের দিকটা উপেক্ষা করে এসেছে। ফলে, যে জ্ঞানবিজ্ঞান ও ঐশ্বর্যের অধিকারী আমরা ছিলাম, তা থেকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ও প্রবঞ্চিত হয়েছি। আমাদেরই অজ্ঞতার জন্তে, আমাদেরই সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ধবংস আমরা জানি না, বিদেশীর আধিপত্য-সাহায্যে ও হাথকড়ে তা আমাদের জানতে হয়, এর চাইতে লজ্জার বিষয় আর কি চতে পারে? এদেশের আত্মবৈত্তিক, এদেশের জ্যোতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের অতীত হওয়ার পর তাদের মুখেই আমরা শুনি, বিশ্বজি। বিসিতি ওহু পাশকরা বিলৈতকহরতা চিকিৎসক না হলে আজ আর আমাদের চিকিৎসাই হয় না। সব তত্ত্বের পূঁজিয়ার

হ'য়েও ব্যবহারিক জ্ঞান ও দৃষ্টিব অভাবে আমরা তাদেরই পরাধীন হই। লক্ষ্য ও মুক্তা আর কাকে বলে?

এই সেশেরই কাগামাল সম্ভাবনে যদিও করে নিয়ে যার পদ্ধতির লোকেরা, আর তা থেকে নানাবিধ মূল্য-বান তথ্য প্রস্তুত করে এদেশবাসীকে বেচে দিতে কোটি কোটি টাকা দৃষ্টে। আমাদের কলবিজ্ঞানের ব্যবহারিক জ্ঞান থাকলে আমরা কি এমন করে প্রবঞ্চিত হই? এই অবসান-কল্পে, এদেশে বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন একান্ত অপরি-হার্য বলে মনে করি। এই মনোবৃত্তির শোধকতার দ্বারা আমরা ভগবতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সবার অজ্ঞতাগে পড়িতে পথিকৃৎদের কাছ করতে পারি। পাশ্চাত্য দেশবাসী বুনিয়াদি শিক্ষার মূল্য জানে, তাই তারা পুরোমাত্রায় এই শিক্ষার উপযোগিতা অহত্ব করে ও একে তাদের বেদোপদেশী করে করে লাগায়। তাই, তাদের লাগে আমাদের তুলনায় হয় না। তাই: বিজ্ঞানী দৃষ্টি নিয়ে চলে, তারা সহজিতে ব্যবহারিক দৃষ্টি ও কলা-সম্পন্ন। তাই, তাইই আজ পৃথিবীর চতুর্বিজ্ঞানে সকলের আগে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু কেবল ভূত-বিজ্ঞান মানবমনের কৃপা মেটাতে পারে না, সেইজন্য পশ্চিম আজ স্বাধীন, পশ্চিমাদী রাষ্ট্র হ'য়েও পরাধীন অসহিষ্ণুতা ও বিমোহ-বশত মানসিক ক্রেশ ও অশান্তিতে শাসিত পাচ্ছে। এইজন্যে, এইখানটায় তারা ভারতীয় শব্দ, সভ্যতা ও আদর্শের কাছে কিছু পাওয়ার আশা করে। ভারতবর্ষ যে তা দিতে পারে সে-পরিচয় যুগে যুগে লোক পেয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবে সে-বিশিষ্টতা তারা ভারত-বর্ষ হারাতে বসেছে। আজ তাই হুমিয়ার হতে হয়। ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শকে সবকালের সর্ববিশেষ সর্ব-জনের বোধ্য সমাধবর্নীর করে তুলতে হলে বুনিয়াদি পাকা করতে হয়, আর সেই জন্তেই বুনিয়াদি শিক্ষাধারাকেই যান দিতে হবে, ওকে সর্বজনপ্রিয় করে তুলতে হবে। ছেলে-মেয়েদের তথা জাতির ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক দৃষ্টভঙ্গি নিয়ে বিচার না করে তাদের তথা জাতির সমগ্র বিকাশের ও প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের শিক্ষানীতি স্থির করতে হবে। জাতীয় সরকার এমনও যে পণ্য চিন্তা করছেন না, কিন্তু সরকার এটিকে উদাসীন থাকলেও জন-সাধারণ সরকারকে ঐ পণ্য উদ্যোচিত করতে পারেন। আর জনসাধারণকেই তা করতে হবে।

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ বাহুগোপাল মুখার্জী

পূর্বসংস্কৃতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"বাবা! ক'ন লেখা পড়া কি হইল তব?" প্রজ্ঞান কহেন, "লেখা পড়া শ্রীনাথবা"। প্যারীবাৰু ছাত্রদের মধ্যে অধ্যাপিত ভাল ছেলে হওয়াব আশ্রমে একটা পরীক্ষার প্রেরণ বীজ বুন দিতেছিলেন। প্যারীবাৰু আমাদের সেরে ভাল ছেলের দ্বারা বাহ্যিকভাবে ইংরেজের পোশাক-পুত্র হয়ে দেশের বিরুদ্ধে গোত্রান্তর লাভ করার বিশেষ বিচিন্তিত ছিলেন। তিনি বলতেন—যে, বাবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতি ছাত্রদের ছাপ নিয়ে যেকোন তারা প্রায়ই আমাদের পর হয়ে যাবে তারা বৈদ্যের ভাগ সরকারী চাকরী গ্রহণ করে। তার ফল শেচনীর। তারা বিদ্যোদয়ের গোত্রকে চুক পড়ে। দেশবাসী কত চকু-কুন্তি-সম্মানের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এই ভাবে? আমিও তেঁপে লোকে লেখা পড়া শেষে মাসের হবার গুণ। এসেলে পেলে চাকরী পাবার গুণ। এ বড় দুভাগ্য। প্যারীবাৰু চেষ্টা করতেন একটা কল্যাণিত সেন উদ্য-ছাত্রদের মধ্যে গড়ে ওঠে।

আমি প্রাণে বহুকেটি ছেলের সঙ্গে বিশেষ করে মিলে পড়লাম। ভবনকার মিলে অনেক চেপে বাংলা কুলে পড়ে ছাত্রগতি পাশ করে ইংরেজী কুলে পড়তে আসত। হজা-বস্তই তারা অপেক্ষাকৃত বৈদ্য বয়সে ইংরেজী ইকুলের নীচের কালে ভর্তি গুণ। আমার সঙ্গে বাহুর আগাগ হয়েছিল ভাবের মধ্যে ভবন ছিল এই প্রকর বড় ছেলে। নীচের গুরু বৈদ্যে বয়স পড়ে ভবন তাহের গৌরব বাড়ী গৈরিয়ে পড়ছিল। এরা পরীগ্রাম থেকে কলকাতায় পড়তে এসেছিল। তাদের অভিভাবদত্তা কলকাতায় বিবর কণ করতেন।

একদিন তারা আমাদের বাড়ীতে আসে দেখান্ধা করত। ছাত্র-অধ্যাপক বাড়ীতে এলে একই কলযোগের ব্যবস্থা করতে হয়। আলাপ-সংলাপের মধ্যে যোগেন কণকর বলল—এখন থেকে একটা লেখা-টোকা অভ্যাস করা উচিত। বাবা বিবেকানন্দ আবেদিকীর সিনে ভাবী নাম করে এসে-

ছেন। মহেন্দ্রও তাতে সাহা মিল। এসে গেল পাড়া পেছিল। তিন বড় শিখতে আরম্ভ করলাম। চিন্তার নেতা হয়েছিল কণকর। আমি বললাম—"লেখা ত' আগেছে না, কি করে লেখা যায়?" মহেন্দ্র বলল—"আগে ভাব আমি।" উত্তর দিলাম, "ভাব বৈদ্য এল, ভাবা ছুটবে কি করে?" মহেন্দ্র অগাধ মিল—"ভাবত আগে আমি?" যোগেন সাহা মিলে বলল—"ই্যা তাই ত' গ্রিক।" ভাব এলেই ভাবা এসে যাবে। ভাব রাখা, ভাবা তার দাসী, শিখনে শিখনে ছুটতে যাবে। এখন সদ্য হাল, ভাব কি করে আমি যায়? যোগেনের পরামর্শ হল কোন একটা বিষয়ে মন সন্নিবেশ করতে হবে। তা হলেই ভাবের কথা বইবে। খসি থাক, শীতকালে সকালে জলে ঘোঁরা বোঝা যাবে। কল্পনা করা গেল—গভীর আশ্রম দেগেছে। যাচ্ছে কি হবে? ভাবতেই এল ভাব। মহেন্দ্রও এই মুক্তি সমীচীন বোধ করল। এর পর প্রায় হল কি লেখা যাবে? গুণ না গুণ। আমি বয়স ছোট হল যোগেন স্থির করেছিল যে কবিতা লেখা সবচেয়ে গৌরব। কবিতাই লেখা হ'ক। খানিক চেষ্টা ও রানদিক কলক করে কেউ কিছু শিখতে পারল না। অনেক রকম ভাবল—গাছে কাকড়া উঠেছে, শেয়াল তলা থেকে লেজ দেখাচ্ছে। কাকড়া কিছুতেই নামল না। মহেন্দ্রের বাড়ী গুণ করে বসে গেল। গৌরব বাড়ীকে আনতে শিষ্ট শিষ্ট ছুটল। মহেন্দ্রের মুখ হয়ে গেল "খান্ধে লাগা"। মহাবিপদ হল। তার। কেউ তার মুখ দেখেনা। দেখলে অমাত্র। যোগেনের ক্ষ হয়ে গেল বর্ষীয় অমল। এত চুল যে গৌরব ঘোড়াটি নামল পরাভব। হয়ে গেল তার হু—ঝোড়া গৌরব। ওপর তলার আর নীচের তলার ভাড়াটে। আর তার কোন ভাবনা নেই। মাসে মাসে ভাড়া আসবে। সে বসে বসে থাকে। ইত্যাকার বহু রকম চিন্তা খণ্ড খণ্ড বেদের মত আমার মাঝার মধ্যে ভাসতে লাগল। শিখতে পারা গেল না এককল্প। "গৌরব গেল উড়ে। মাছটা খইল পড়ে।" এখন আরম্ভ করেও পেলিল চলল না।

কণ্ঠকার বলস গভীর হয়ে ভাব। সবাই মুখ ফিরিয়ে বসল। ফল হলনা কিছুই। চোপাচোপি হল হাদি আসে। মুখ ফিরিয়ে সবার হৃদয় হল। তাও হ'ল ধানিকন্ধ। কিন্তু চোপাচোপ বাড়ির মূখু ঘুরিয়ে ধরে এক কোন্ দিগে বেধে কেসতে লাগল। তাতেও এল হাদি। এক লাইন ও লেখা হল না।

এমন সময় চাকর খাবার ও ঘালের রাস গুলি বেধে গেল। বাঁচা গেল। কামস পেঙ্গিলও রেহাই পেল। গবোর গুলির সন্ধ্যাবহার করে বন্ধুয় বে ঘার বাড়ী ঢলে গেল।

আমার নাম এদের দেখেছিলেন। তারা চলে গেলে আমার কাছে খোঁষ নিসেন তারা কে? আমি বগন বললাম আমার সহপাঠী, তখন তিনি বিস্ময়-বিস্ফাবিত নেড়ে বসে উঠলেন—তোমার সহপাঠী! বল কি?—একজন হচ্ছেন পিতামহ ব্রাহ্ম; আর একজন বন্ধ প্রজাপতি। আমি কেমন সন্ধ্যাচ বোপ করলাম।

করেকদিন যায়। আমার মনে একটা ভ্রন উপস্থিত হয়েছিল। সেটার শব্দে মানসিক সংঘর্ষ চলছিল। কিছুতেই গোলযোগ নিটছিল না, তমলুকে যে দিকটা পূর্ব ছিল, কলকাতার সেটা হয়ে গেছে পশ্চিম।

আর তমলুকের পশ্চিমটা হয়ে গেছে কলকাতার পূর্ব। ব্যাপারটা গাড়িয়েছিল এই রকমে। তমলুকে দুখ থেকে উঠলে পাশের ওপারে দেখা বেত উঠত পূর্ব। কলকাতার সন্ধ্যার সময় পূর্ব দেখা যায় গবোর ওপারে। ঠিক তমলুকের বিপরীত। সেখানে ছিল বাড়ীর সামনে। এখানে হচ্ছে পিছনে। বাড়ীর সঙ্গে নবীর সম্পর্ক উল্টে গেছে। এইটা হচ্ছে আশংকা। নবী; শোবার ঘরের আনালা; রাজ্যার ওপর বাড়ীর দরজা যে মুখো, এই রকম করেকটা স্থির ব্যবস্থান দিয়ে বাহুবের মনে দিক বোধ সম্প্রস্কিত হয়ে যায়। ঠাঁই নাক্স ও ব্যবস্থান গুলির পরিবর্তন হলে দিক-বোধ বাধা প্রাপ্ত হয়। সন্দের উৎপাদন হয় এই থেকে। নতুন জায়গার কিছুদিন বসবাস করতে করতে মন অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং কুল ভেঙে যায়।

তমলুকে কলকাতা হুঁকাংগাই বাড়ীর সঙ্গে এদিক সম্পর্ক ছিল। কলকাতা নবীর পুরনো অবস্থান। তমলুকে নবীর পশ্চিমে অবস্থিত। হুতবাং রবির উল্লস ও অন্ত প্রথমটা মনে কুল খাবার উৎপাদন করে। তমলুকের বাড়ীর বাজার ওপরের দরজা ছিল পশ্চিম মুখো। কলকাতায় সেটা উত্তর মুখো। মাণেগিক সম্পর্কগুলি মনের দাগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে একটা সময় লাগে। মন চকল, গতিশীল। আবার কিছু কিছু বিস্মে নোড়ব কেসে দ্বিভিত্তি সম্পন্ন হয়ে যায়।

সে রাই চ'ক, কণ্ঠকার এই সিকড়দের কথা শুনে মাঝান্ত করলে গভীরভাবে এসে গভ্রনাম না ক'বে যে পাশ সন্ধ্যা হচ্ছে তাতে আমায়ে ভ্রাখ করে বসছেন দখ্। কলি হলে কি হবে? তবু এক 'শো' দখ্ ক বিরাহ করছেন। কণ্ঠকারের মুক্তি এটরূপ।

গম্বা, ঘম্বা, সরস্বতী প্রয়াগে নিলে হয়েছেন মুক্ত-বেবী। জালপর মোত বইতে বইতে হৃগলির ত্রিবেদীতে এসে হয়েছেন মুক্তবেবী। গম্বা, ঘম্বা, সরস্বতী আবার আলাবা আলাবা হয়ে গেছেন। কলকাতার পার দিয়ে গেছেন ঘম্বা, মাঝে আছেন সরস্বতী। আর হাওড়ার পার দিয়ে যাকেন মা-গম্বা নিজে। হুতবাং এ পারের লোকেরা শুয়ে দি ভালচে। গম্বা নেয়ে গম্বা হীন থেকেই যাকছে। হুতবাং এ ক্রটি-বিচুতি অস্বতঃ একদিনের অস্ত্র দূর করতে হবে। একদিন গম্বা নেয়ে এসে লারা মন্দের কাম হয়ে বাবে। "সন্তেক মোজান মূর খাকি, গম্বা গম্বা ব'লে ডাকি, শুনিয়া লাগয়ে চমৎকার।

এর ওপর আর কথা আছে। আগামী পরিবার দুটি আছে। কুলে ঘাসের প্রথম ও তৃতীয় পরিবার দুটি থাকত। এটা ছিল মাসের তৃতীয় পরিবার। ঐ দিন দুই বড় পুজি করে আসব ঠিক হল।

এর মধ্যে কবিতা লিখে ফেলতে হবে। শব্দ ক'রে ডা পুত্র না করা অদলভানীর পাণ। গম্বা জানেও নাকি এ পাণ কাটে না। কি বিস্মে কবিতা দেখা বাবে? কণ্ঠকারের নির্দেশ হ'ল হাতে পড়ি কবিতা নেয়ে মাস

স্বপ্নে "স্বপ্নে" "কেন?" কবিতার বল—"কবিতা
 মানে কবিতা" আশ্রয় হ'য়ে জিজ্ঞেস করলাম— "তার
 মানে?" কবিতার উত্তরে জবাব— "প্রবোধী ভণিতা আছে।"
 অর্থাৎ কোন নারী স্বপ্নে প্রবোধ লিখতে চায়। পূর্বা-
 হাঃ প্রবোধী কবিতা স্বপ্নের সৌন্দর্যের লাত ও গুণের
 পরিচয়। তেমন নারী বা কবিতা স্বপ্নে লিখে কবি-
 তার হাতে পড়ি করতে চায়। কবিতা কি করেছিল?
 আমার বস বস সেকছিল। কবিতার তার নিজ বাদীর
 ডাকের হ'ল নিজ। বল—মানবস্বাভা কি বসছিল?
 কোন সিংহাসনের কথা লেখ না? তাতে লেখ নাই।
 কবিতা স্বপ্নের হ'ল নিজের—স্বপ্নের গল্পমতি ওজর
 জানা—"স্বপ্নে" "কেন?" "কবিতার উত্তরে
 নিজে বল—"স্বপ্নের স্বপ্নে একটা উল্টে লেখ না
 কেন? তা হ'লে ও পারবে?" বললাম—স্বপ্নের গল্পও
 লিখে চলে? কবিতার বিরুদ্ধ হ'লে খবক দিল, তার
 সৌন্দর্য উত্তরে বিজ্ঞ হ'লে না। এবার না লিখে
 সত্যের নেই। তাই লেখা দ্বিধা হ'ল। কোন সিংহ-
 সনের বর্ণনা লেখা হবে? সমস্ত ছিল না। আমি
 ও কবিতার চতুর্নেত্রী বিরুদ্ধে আশা আশা বলে
 লিখে চলেলাম। কবিতারের এটা প্রবোধ লেখা নয়।
 সে প্রবোধে না খুঁসি লিখতে পারে।

আমার কবিতা—পক্ষিরা ছবিতে হ'ল, এটি এ বিশ্ব,
 ধরতলে চলে এবে স্থাপত্য উদয়।
 নীতের যোদ্ধার রাতি, আসে ঐ কবিতা,
 তার প্রায় ভূতনারে স্বেপ্নগো প্রাসিয়া।
 পেতে গিয়ে ভয়,
 ভয় দিল দিনব্যয়।

কবিতার লিখল—হে কৃপাসিক্ত
 ছিলে তুমি একবিন্দু।

তোমারে খেতেছে ইন্দু।

পত্র, পুষ্প হল হিন্দু।

আমার লেখা বেঁচে গেছে স্বপ্ন বৈদিকের বল কবিতারই
 পারায় করলে? এ কবিতা হ'ল। কবিতার জু গলে
 পলে দিল থাকলে হ'ল। তাতে মাধুর্য থাকবে, মানে

থাকবে। তা ছাড়া দিনব্যয় কোন কথা? দিনব্যয় লিখলে
 মানে থাকত। আমি বুঝলাম যে নীতকালে স্বপ্নের পূজা
 আছে। বা স্বপ্নের স্বপ্নে লিখা। তাই তারে পক্ষি
 পাটে স্বপ্নে লিখা আগে নিজে লিখি, ঠান উঠেছে বলে
 স্বপ্নে লিখ। বুঝার ও ভাল ঠান করতে পারেনা স্বপ্ন
 থেকে? আর যদি তেমন স্বপ্ন ঠানই উঠে ত পক্ষিরাতে
 কেন উঠবে? তাই বিশ্ব মানল। তারপর নীতের
 বিনত স্বপ্নে লিখা, হ'ল। হ'ল করে রাতির স্বপ্নের এগিয়ে
 আসছে। সেই ছাড়া স্বপ্ন থেকে লেখা ভাল বার বোধহয়
 ভাবের তাকি করছে। রাতে তাহারের স্বপ্নে। দুজনকেই
 প্রাণ করে, কিন্তু একসঙ্গে স্বপ্নে ও দুজনকে পাণ না। এগার
 একসঙ্গে গেয়েছে। তাই তাকি তাকি ছুটে ঐ করে লেগে-
 গিনি ও স্বপ্নগো গিলতে আসছে ভেবে চলে স্বপ্নে অগা-
 চলে ভুবে প্রাণ বাঁচল।

কবিতার বল—অত করে কি কেউ কবিতা লেখে?
 আমার মধ্যে অনেক কথা, উদ্ভাবন ফোটেতে হবে, তার
 নাম কবিতা। তুমি লিখাওনা গড়তে গিয়ে লিখাওনা মানে
 গড়ে কেলেছে। এতে অপবিত্রতা এসে গেছে। তা ছাড়া
 কবিতা কিছুই হয়নি। যেহেতু মাঝে বোঝাতে গেলে, আনতে
 হবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, দাতক কথা হয়ে ভল। জোয়ার ওতে
 এ লবের কিছু নাই। তোমার ওটা কবিতা না হয়ে
 ছবিতা হয়ে গেছে। কথা দিয়ে ছবি এঁকেছে, হা দিয়ে
 আঁকলে বহু বেসে চোখ জুড়তে। আমারটা দেখ, এক
 চন্দ্রবিন্দু, ঘণ্টা বসিয়ে, যত বিজ্ঞান। চন্দ্রবিন্দুই হিন্দু-
 ধর্মের প্রাণ। আধা কবিতা এই নীতের জোরে পক্ষিরাতে
 দান করে ঠক ঠক করে কাপতে কাপতে উজ্জয়ন্ত কর-
 তেন—হু। সেইটার প্রতীক হচ্ছে চন্দ্রবিন্দু—হিন্দুর
 বৈদ্য, গীতা, ধর্ম, সব, কি নয়? ওজর মানে অ, উ, হ।
 কবিতা, বিজ্ঞ, বোধহয়। স্বপ্ন, দ্বিভি, লত, এতে স্বপ্ন-
 পদ ও লিখা ছুটি আছে। যেখানে কত ভাল এই টুকর
 ভিতর। এক বলে আসল জিনিষ। কবিতা। কবিতা
 এইরকম লিখে নাম করে গেছেন।

হার মানলাম। পরদিন সত্যিকার গল্পস্বপ্ন করার
 বাধ্যবদ্ধ হইল। আজকে আবহাওয়ায়িক অহেতুক পাণের
 বোঝা আমার অস্তরকে বাহ করতে আরম্ভ করেছিল।
 কান বলে দ্বিধা করলাম, আর কখনও কবিতা লিখনা।
 কবিতা লেখার চেয়ে কানি মাগা সোজা।

স্মৃতি-তর্পণ

বিনোদ চৌধুরী

মহানবর মহাত্মা গান্ধীর এখন বৃত্তাবধিকী তিথিতে একটি কথাই বহুতর অমূল্য করিতেছি—এই একটি বছরের মধ্যে আমরা আনন্দের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করিয়া মহাত্মার আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য বৃত্তাবধি চেষ্টা করি-
রাছি! যদি তাহা না করিয়া থাকি তবে আমরা মহাত্মার বৃত্তাবধি তিথি সবোদোহে উৎসাহন করিয়া নিজেদেরই প্রতারণা করিতেছি মাত্র।

ভারত-সমুদ্র যখন বে গরল উন্মিত হইয়াছিল নীলকণ্ঠ মহাত্মা গান্ধী সে গরল আকর্ষণ পান করিয়া আশ্বাসদীপকে সর্বপ্রকার হিংসা, ঘেব ও সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। হিংসার উন্মত্ত ভারতে তিনি শ্রেয়, ঐতিহ্য, মৈত্রী ও ভালবাসার অঙ্গান করিয়া আশ্বাসদীপ করিয়া-
ছেন। সর্বপ্রকার দুর্নীতি, পক্ষপাতবৃত্তি, লোভ, স্বার্থপরতা ও কলুষতা এবং অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজী তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটি পর্যন্ত অতিবাহিত করিয়া-
ছেন, তিনি আমাদের অন্তরকে বিবেক কলহমুক্ত পবিত্র করার শিক্ষা দিয়াছেন। একতা, আত্মবিশ্বাস, অকুতোভয়াতা ও অধিকার ঘোষণার মন্ত্রে তিনি ভারতবাসীকে ঐক্য দিয়াছেন। মানব-পঙ্কজের নৈতিক বা আত্মিক বলে অহ-
প্রাণিত পরিবারই মহাত্মা প্রাণ পাইয়াছেন। গীতার নিকান পুরুষের দ্বারা কর্তব্যগামী গান্ধীজী মানুষের কর্তব্যভির উৎসাহ নিঃসারিত করার সাধনা করিয়াছেন। মানব শক্তি পৃথিবীকে স্বচ্ছ কলঙ্কিত করে, অন্ধকার ও বিভ্রান্তিত পথে ঠেলিয়া দেয় তাই পৃথিবীতে উৎপাদিতের কলস আর্দ্রনাশ প্রভূত হয়।
মুনিয়ার মানুষকে তাই মহাত্মা গান্ধী সভ্যপথের নির্দেশ দিয়া অহিংসার মঙ্গল আলোকবর্তিকা জগতে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। বিরাট ধরনের কবল হইতে পৃথিবীর অন্ধর মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য ঘেব-কল-বিভেদ-বন্ধ্যীত আদর্শ মানব-সভ্যতা সৃষ্টির প্রয়াসই মহাত্মা করিয়াছেন।
উৎপাদিত ও নিপীড়িতের সেবার উৎসর্গাঙ্কিত প্রাণ বৃত্তাবধি মহাত্মা জীবনের প্রতিটি আচরণে বিদ্যমানবসাইই বন্দা করিয়াছেন। “আগনি আগারি বর্ষ পরেরে পিথায়” এ সভ্য সভ্যতায় গান্ধীজীর জীবনে সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

সেবতার মূর্ত্ত তিনি। যুগে যুগে পৃথিবীর পৃষ্ঠাভূত বৈদ্যনা মোচনের মন্ত্র এরূপ সেবামূর্ত্তের আবির্ভাব হয়।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির বা লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রয়োজনে যে কোন উপায় অবলম্বনে মহাত্মা রাজী নন। উদ্দেশ্য হইবে কেন মৎস বা উচ্চ হোক না, শুচিত্ত উপায় ব্যতিরেকে তিনি সে আশ্রমে পৌঁছিতে নারায়। বিস্তৃত পথাই গান্ধী-
জীর মতে একটি আদর্শ। এই দিক হইতে বিচার করিলে পৃথিবীর অস্ত্রাত মহাপুরুষ হইতে মহাত্মা সম্পূর্ণ পৃথক। সনাতন ভারতের পূর্ণ প্রতীক মহাত্মা গান্ধী। হস্ত ভারতকে তিনি সোনার কাঠির মোহন স্পর্শে লম্বিত করিয়াছেন—
পরমহীনতার অভিশাপ ও নির্ধন মানি হইতে মুক্ত করিয়া-
ছেন। তাঁহার মঙ্গল শম্মনিন্দনে পরমহীন ভারতের নব-
জাগরণের মূর্ত্তনা—মুগ্ধ ও মুগ্ধমান ভারতের চারি মধুরকে তাই কাণের কাঁকে কাঁকে গান গাহিতে শুনা গিয়াছে
“মান হামির দ্বার অগর করবো ইসারা গান্ধীজী।”

অহিংসা তাঁহার অমোঘ পাণ্ডিত্য—সত্য তাঁহার বন্ধ। কবচ ভগবান। আমরা গান্ধীজীকে প্রভা করিয়াছি কি? অস্ত্রার মঞ্চকর ও ভীকৃত! প্রশংসা করা গান্ধীজীর মতে পাপ। আমরা প্রতি নিরস্ত্র অস্ত্রার কাম করিতেছি; ভীকৃত পরিত্যাগ করিয়া আমরা অকুতোভয় হইতে পারি নাই। অহিংসা ও সত্যের সাধনা আমরা তো করিতেছি না। তাই গান্ধীজীর বৃত্তাবধিকী তিথি পালন করিয়া আমরা কি নিজেদেরই স্মৃতি করিতেছি না?

নোয়াগালি সফর কালে এক অন্ধ বৃদ্ধ পাদস্পর্শ করিয়া মহাত্মাকে শ্রদ্ধাভঙ্গি নিবেদন করিয়াছিলেন ধরনের কাগজে পড়িয়াছি। কিন্তু মোহাঙ্গ ভারতবাসী মহাত্মাকে চক্ষুচোখে বহবার প্রত্যক্ষ করিলে-ও অন্তরের আলোকে তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই। অন্ধ বৃদ্ধ মহাত্মাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু চোখ থাকিতে-ও লক্ষ্যকোটি ভারতবাসী অন্ধকারে হাতড়াইয়া ফিরিতেছে। ধন-দৌলত, বিশাল ও কামনার পূজা করিয়াই আমরা চলিয়াছি। গান্ধীজীকে যদি স্বরণ করিতে হয় তবে “আত্মান: বিদ্” এই একটি মাত্র মন্ত্র আমাদের কাছে হইতে যেন বাগিত হইবে। নিজেই চিনিতে হইবে, নিজেই বিজ্ঞ-চরিত্র, নির্ধন করিয়া গঠন করিতে হইবে। নতুন ভ্রমভিত্তি বা বৃত্তাবধিকী পালনের সার্বভূতা মোটেই নাই।

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ৩

ঐক্যলভ্যতা কর এম, এ

দুনের রোজ জন্ম লকাল। বিদ্যাত চিকিৎসক রিচার্ড সাহেবের রোগী দেখবার ঘর দুটি দলে দলে বন্দারোগীদের ভরে উঠেছে।

আকস্মিক প্রকাণ্ড টেবিলের সাবনে বসে রয়েছেন অভিজ্ঞ ডাক্তার রিচার্ড। টিক ঙার দ্যালে গোল টেবিলের দাননে বসে আছেন সেক্রেটারী। সেক্রেটারীর হাতে একলাল ছাপান প্রেসক্রিপশানের কাগজ। দরবার সাবনে ঝড়িয়ে রয়েছে জোয়ার জোয়ার লাশ উদ্ভিগল আর্দ্রাসী। তার কাক হ'ল কীকায়, ককালসার বন্দারোগীদের হাত ধরে ডাক্তারবাবুর সাবনে নিয়ে আসা আর পরীক্ষা হতে গেলে কিকের জায়গাত পৌছে দিয়ে আসা।

বন্ধক করে কালতে কালতে জীর্ণীর্ণ বন্দারোগীরা টলতে টলতে এক এক করে ডাক্তারবাবুর ঘরে ঢুকছে। ঐক্যিকোণ বুক বসিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন—“জোবে জোবে মিথাস টান। এক, দুই, তিন, আছা বেশ টিক হয়েছে। এবার শোন তোমার কি করতে হবে। এই নাও প্রেসক্রিপশান।”

টিক পাচ বিনিটের মধ্যে প্রথম রোগী বেরিয়ে গেল। সেক্রেটারী ডাকল দ্বিতীয় রোগীর নাম ধরে। টলতে টলতে আর একটি বন্দারোগী ঢুকল। পাচ বিনিট বাসে বেরিয়ে গেল।

সবর কেটে বেতে লাগল, ঘড়িতে ব্যারোটা বাজল। ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন। আকস্মিক নত রোগী দেখা শেষ হল। দীর্ঘ ব্যারোকর ধরে ডাক্তারবাবুর রোগী দেখার ব্যাপার এবনি তাবে চলছে। নাত্র পাচ বিনিট সবর বিচ্ছিন্ন এক একজন রোগীকে পরীক্ষা করতে গিল্ড ভবু ত্তিনি বা নির্ধেন দিচ্চেন তা একেবারে অসম্ভব। বন্দারোগের চিকিৎসার ঙায় দশ ও সুনামের অল্প নাই।

ব্যারোই জুন। ঘড়িতে নটা বেজেছে। দলী পোষাক পরা এক জরাজীর্ণ ডাক্তারবাবুর সাবনে এসে বসল।

দোভটিক বেবেলেই মনে হয় যেন এক দীর্ঘত ককাল জোষ দুটি কোটরে বুক গেছে, গালের মাঝখানে গর্ভ হয়ে গেছে, হাকের ঙলর থেকে চাক্ষু হলে পড়েছে, থেকে থেকে সজোরে কাশছে।

ঐক্যিকোণ বুক বসিয়ে ডাক্তারবাবু রোগী পরীক্ষা করতে লাগলেন।

“এক, দুই, তিন, জোরে মিথাস টান। বাবু হয়েছে বাম। বুক ঙুটকে বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন—“কিছু করবার নাই। আমি ত আর ভগবান নই, কি করে তোমার বাঁচাব। ডানবিলের কুলকুলের কাছ চলবে বড় জোর এক সন্তাহ। আছা বেতে গ্যা।”

সেক্রেটারী দ্বিতীয় রোগীর নাম ধরে ডাকল। হঠাৎ ডাক্তারবাবু মুখ বিস্তিয়ে জ্বর করলেন—“তুমি কি ধনী? তোমার নাম কি?”

জোষের আসে তালতে তালতে, দুত্ভাবগঞ্জাল আসাবীর নত নিবাক্ষ হুত্ভাবজরা মুখে কাকর ঘরে সে বলল “আমার নাম ব্রহ্মট। আমি একজন কোটিপতি।” “ভবে শোন। টিক বেশা এগারোটার চড়বে তোমার এম্ব্রাগ্রেশের কাউন্সলে। তারপর হাতে আটটার উঠবে মারনেগিদের বেলে, সেখানেও কাউন্সলে। মারায়াক কাটাতে দাবী দুমাবার কাছরায়। তোমার আলো জুটতে জুটতেই নেবে। পড়বে, পাহাড়ে ঘেরা নাইসু বীশে। এতদূর বেতে বরত হবে তোমার বয় টাকা। কিন্তু ভাত্তে তোমার কি এসে যায়।

পুরো দুটি বাস সেই নির্জন বীশে কাটায়ে। আর বাসে সেই বীশের জলজ জাঙলা।

ভাল করে মনে রেখ পুরো দুটি বাস খেরে থাকতে হবে জুু সেই বীশের জলজ জাঙলা। কদী নয়, দুখ নয়, কল নয়, দাংস নয়। দর্ভায়ে মাখতে হবে সেই জাঙলার দল।

কোন ডাক্তারী বইয়ে এই চিকিৎসায় ব্যবস্থা নাই। এই চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি দিই জুু সেই রোগীদের হাদের বঁচবার আর কোন আশা নাই। বহিত নিয়ের

আবার এ চিকিৎসার উপর বিশেষ কোন বিশ্বাস নাই।”

ভাস্করবাবু একটু বেগে সেই জীবন্ত নরকখালের মত রোগীর পিঠ চাপড়ে বললেন—“হত্যাশ হলোনা। কে বলতে পারে হতত এই চিকিৎসাতেই তুমি সেরে যাবে। তব্বানের ইচ্ছার সবই সম্ভব হয়। আচ্ছা এল।”

টলতে টলতে ককালদার রোগী বিহার হ'ল। ছ'মাস কেটে গেছে। ১২ই ডিসেম্বর। ষড়্ভিতে ঠিক নটা বেজেছে। এমন সময় দাবী তক্তকে পোষাক পরা প্রচণ্ড শক্তিশালী এক ডব্রলোক দুর্জল বস্ত্রাঙ্গীর বলকে দাড়া দিতে দিতে ভাস্করবাবুর রোগী পরীক্ষার ঘরে ঢুকে পড়ল। ডব্রলোককে দেখলে যেন হয় ঠিক যেন এক বিরাট সৈত্য পৃথিবীর মাটি কাপিয়ে চলেছে।

ভাস্করবাবু ডিসেম্বরের শীতে কাপড়ে কাপড়ে টেবিলের সামনে বসেছিলেন। সৈত্যের মত লোকটি ছুটে এসে ছ'হাতে ভাস্করবাবুকে কোলে করে উঠতে ডুলে ধরল। তার বিরাট হাতের মুঠোর ভিতর ভাস্করবাবুর শরীর যেন হতে লাগল যেন একটি ছোট হালকা পাগলের বল। ডুলে ধরে ভাস্করবাবুর হুখে ঘন ঘন হুসু খেতে লাগল। তারপর আঙে আঙে নানিয়ে চেঁচিয়ে বসিয়ে দিল।

বেচারী ভাস্করবাবু হতভম্ব হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়ানক দৃষ্টিতে নরসৈত্যের দিকে চেয়ে রইলেন। সৈত্যের মত লোকটি গুরুগভীর গলায় গর্জন করে উঠল—“কি চান আপনি, বলুন। শীত বলুন। গুলাথ টাকা? তিন লাখ টাকা?”

আপনার কাছে আমি কণী। কি পেরেছি আপনার কাছ থেকে জানেন,—সুর্ধার আলো, স্বাস্থ্য বাত, ভোগপূর্ণ জীবন, প্রাণের নিঃশ্বাস। স্বতন্ত্র পুরুষের চান, যা আপনায় ঘন চায়। বাত্ব বা জাবতে পারে না। তেমনি পুরুষের আমি আপনাকে সেব।”

তবে কাপড়ে কাপড়ে ভাস্করবাবু চীৎকার করতে লাগলেন—“এই আর্দ্রালী এই পাগলটাকে ঘর থেকে বার করে দাও।” ভাস্করবাবুর চীৎকার শুনে আর্দ্রালী ছুটে এল।

“না, না, বার করে দিতে হবে না।” আর্দ্রালীর দিকে তাঁর দৃষ্টিতে চেয়ে চীৎকার করে উঠল ডব্রলোক।

ডব্রলোকের বিশাল মেহের দিকে তাকিয়ে লভয়ে আর্দ্রালী পেছিয়ে গেল।

ভাস্করবাবুর দিকে চেয়ে বেগে উঠল ডব্রলোক, বলল—“কি আশ্চর্য! আমার প্রাণবাতাও আমাকে ভিনতে পারছেন না? আমার নাম হল রবার্ট। সেই রোগী, যাকে নাইন্স বীণের জলজ জাঙলা খেয়ে বেঁচে থাকার জন্ত ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। সেই দ্রুত ককাল, ছ'মাস আগে বার বেঁচে থাকার কোন আশা ছিল না। নাইন্স বীণে ছ'মাস শুধু জলজ জাঙলা খেয়ে থাকা, জলজ জাঙলার রস খাওয়া। যেন পড়ছে না ভাস্করবাবু। দেখুন আমার বুকের ছোঁর দেখুন, আপনার চিকিৎসার কল দেখুন।”

বলতে বলতে রবার্ট বাঘের দ্বাধার মত মুঠা পাকিয়ে গজোরে নিজের লোহার পাতের মত বুকে খুঁসি ঘরতে লাগল। সে খুঁসি ছোঁরে একটা পাগলা হাড়ের দ্বাধার খুঁসি অনাগলে কেটে হেতে পারে।

নিরাক্ষর বিদ্রোহ স্তম্ভিত হয়ে ভাস্করবাবু যেন উঠলেন—“এ্যা, সেই নরকখাল, আজ তার এখনি চেহারা হয়েছে।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই নরকখালই বটে। সেই আমি আজ এখনি হয়েছি। কাল ট্রেন থেকে নেমেই আমি আপনার পাখরের প্রতিমূর্তি গড়তে হুযুম দিয়ে এসেছি। সেই প্রতিমূর্তি আমি শহরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কারাগার প্রতিষ্ঠিত করব।”

সোফার হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল রবার্ট। শরীরের ভারে সোফার স্প্রিংগুলো বড় বড় শব্দ করে উঠল। হাসতে হাসতে বলতে লাগল—“আঃ জীবন কি দুন্দর।” আবেশে তার চোখ বুজে এল।

ভাস্করবাবু এককণ বামে কিছু প্রকৃতি হ'লেন। এক মুঠে নরসৈত্যের দিকে চেয়ে রইলেন, নিজের সীক্তির মহিমা দেখতে লাগলেন।

মেথতে মেথতে তাঁর মুখ ক্যাবলে হয়ে উঠতে লাগল। কি যেন কি এক উত্তেজনার শরীষ কাপড়ে লাগল। হাতের ইসারাতে তিনি সেক্রেটারী আব আর্দ্রালীকে বাইরে

চলে যেতে বললেন। তারা দুজনে চলে গেল। ডাক্তার-
বাবু রবার্টের সামনে এসে বসলেন। দু'চার মিনিট স্থির
দৃষ্টিতে তার পিকে চেয়ে রইলেন। তারপর অস্বাভাবিক
দূরে বলে উঠলেন—“তোমার কপালের উপর একটা নাড়ি
বসেছে, ঠাণ্ডাও ওটা তাকিয়ে দিই।”—বলতে বলতে
জ্বলন্ত লালচে এগিয়ে এলেন।

পলকের মধ্যে পকেট থেকে ছোট নকশালাদী রিভলভার
বায় করে, রবার্টের কপালের শিরা লক্ষ্য করে অতি দ্রুত
দুবার গুলি করলেন। বেগতে বেগতে রবার্ট নাকিতে
পড়ে গেল। মাথার খুলি কেটে গেল, বকে ঘরের দানী
কাপের ভেত্রে যেতে লাগল।

জ্বলন্ত ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন। ঘরের দরজা
ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। মোহাবিষ্টের মত বসে
পড়লেন তার পাশে। লম্বা কটি দিয়ে টুকরা টুকরা করে
কেটে ফেললেন তার দানী পোষাক। অস্ত্রোপচারের ধর
দিয়ে কেটে বার করে ফেললেন তার বিরাট নকশালাদী
ফুল।

অন্যদিক কেটে গেছে। ডাক্তারবাবুর আঙ্গিনের বন্ধ
দরজা সন্ধ্যার দাঙা দিয়ে খুলে ফেলেন ভিতরে ঢুকল
পুলিশ সার্জেন্ট, সেক্রেটারী, আঙ্গিনের অন্ত লোকেরা।

অবাক হয়ে সবাই দেখতে লাগল, বিরাট এক নরশব্দের
সেই নাকিতে পড়ে রয়েছে, হকের প্রোতে ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে,
নাথার খুলি কেটে গেছে।

ঘরের এক পাশে ডাক্তারবাবুর টেবিলটির উপর পড়ে
রয়েছে দুটা বিরাট আকারের ফুল। স্ত্রীর মাগুনি-
ফাই হাল নিয়ে ডাক্তারবাবু তন্নর হয়ে পরীক্ষা করছেন
জলজ ভাঙলার গুণগ্রাণ্ড সেই ফুল দুটি। কারও
দিকে লক্ষ্য নেই। একমনে পরীক্ষা করছেন কেমন করে

জলজ ভাঙলার গুণে দ্রুত বদ্যার বীজ ফল প্রাপ্ত হয়েছে।

ঘরের সকল লোক ভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার
দেখতে লাগল। এমন কি পুলিশ সার্জেন্ট ডাক্তারবাবুকে
পুলিশ আঙ্গিনে দাবার কথা বলতে পধ্যত্ব দুলে গেল।

কতক্ষণ রাখে ডাক্তারবাবুর পরীক্ষা শেষ হল; পাছদুখে
অন্যদিক দিকে তাকিয়ে হাসলেন। পুলিশ সার্জেন্টকে
বললেন—“সার্জেন্ট, আমি এই ভরসেবাককে হত্যা করেছি
যটে, কিন্তু সে শুধু তার ফুলের পরীক্ষা করে, বৈজ্ঞানিক
সত্য আবিষ্কার করবার জন্য। এই আবিষ্কারের ফলে
অসংখ্য মৃত্যুমুখী রোগীরোগী হস্ত চিরকালের জন্য বেঁচে
যাবে। সুতরাং এই হত্যার জন্য যদি আমার মৃত্যুও
হয়, সে পও আমি বরণীর বলে মনে করব।”

ডাক্তারবাবুর প্রাণ আনন্দোচ্ছল মুখের দিকে তাকিয়ে
কারও মুখে কোন কথা থেরোল না।

কিছুদিন পরে শহরের সমস্ত বিখ্যাত সংবাদপত্রে
ডাক্তারবাবুর বিচার কাহিনীর বিবরণ বার হ'ল। প্রত্যেক
সংবাদপত্রেই বড় বড় হরকে লেখা হ'ল বিচারপতির
মন্তব্য। সে মন্তব্যটি ছিল এই—

“ডাক্তার রিচার্ড জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপে সন্ধান
পাবার যোগ্য। তিনি রোগী রবার্টকে হত্যা করেছেন
যটে কিন্তু সে হত্যার মহান উদ্দেশ্য আনন্দের মনে রাখতে
হবে। তার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ সাধন,
অসংখ্য মৃত্যুমুখী রোগীকে প্রাণদান। ডাক্তার রিচার্ড এই
মহান উদ্দেশ্যে প্রাণোদিত হয়ে নিজের হাতে তার প্রাণ
বাঁচিয়েছেন, তার প্রাণ নিতে ইচ্ছিত হননি। সুতরাং
তাকে বিনামূল্যে মুক্তি দেওয়া হ'ল।”

• (বিশেষী গল্পের ভাবাবুধ)

হেথাও ওঠে চাঁদ

ঐশ্বর্যশক্ত গুহ

(পূর্বাহ্নকাল)

(১০)

মালতীর অস্থির বদর পেয়ে বিভা কয়দিন হ'ল এখানে এসেছে। মালতীই বিভাকে খেতে চেয়েছিল; সে খবর পেয়ে বিভা এসেছে।

মালতী বললে—“বিভা, আর হরত বোঁদাখি বাচন না। মরবার আগে মনে হয়—জীবনে বত অপরাধ ও তুল করেছি, তার সব দণ্ড যদি আমি নিতে পারতাম তবে হরত একই শাস্তি পেতাম। আমার তুলের মত মত সোকে দণ্ড ভোগ করছে—এই চিন্তাই আমাকে সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে।……”

বিভা বললে—“মালতী, অপরাধ ত' তুমি কিছুই করনি। তবুও ত' সারা জীবন দুঃখ পেলে। জান মালতী, আমাদের সকলেরই দু'টা করে কথা আছে—একটা ব্যক্তিগত এবং জীবন; আর একটা সমাজগত সামাজিক জীবন। আমাদের স্বখ-দুঃখ প্রায় সবই সমাজের অবস্থিগে—আমাদের সামাজিক জীবনের অবস্থিতে। তোমার বল, মণিকার হল, তপনের বল—সকলেরই সামাজিক বন্ধনই দুঃখের কারণ হয়েছে।……”

মালতী—“হরত তাই হবে। বিভা, জীবনে কখনো কাউকে দুঃখ দেব না, সব অপরাধ সকলকে সুখী করে নিজে সুখী হবে—এই ছিল জীবনের আকাঙ্ক্ষা। স্বাধীন-নাথের কবিতার লাইন কতটা মনে মতো কতবার আউড়েছি

‘নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে সুখী

যে পথ দিয়ে চলিগা বাব সবারে বাব তুবি।

কিন্তু কি হল জীবনে! তুমি বলছ—সমাজের অংশ হিসাবেই আমাদের স্বখ-দুঃখ বিশেষ ভাবে নিরঞ্জিত হয়, তাই যদি হয়, তবে ব্যক্তিগত চেষ্টা-উদ্ভবের দায় কি? আমার সমস্ত জীবনের চেষ্টার কি এই প্রতিধান হল?”

বিভা—“তোমার সমস্ত জীবনের চেষ্টার যে পরিণতি তা কেবল তোমার জীবনেই দেখ হবে না; সমাজের জীবনেও তার ধাক্কা লাগবে। তোমার এই আত্মদানের ফলে হরত অনাগত ভবিষ্যতে সমাজের কত কত নারী জীবনে সুখী হবে। তোমার চেষ্টা ও উদ্ভবের শেষ তোমার জীবনের সাথেই হবে না; সমাজের অঙ্গ ভাঙারে তা জমা থাকবে।”

মালতী—“তা থাকবে, বিভা? আমার এই দুঃখ কষ্টের বিনিময়ে কোন সুখ ভবিষ্যতেও কাল জীবনে সুখের সিন্ধু দ্বারা পড়বে?”

—“নিশ্চয় পড়বে। এই বিবেকজ্ঞানি ত্যাগ, এত-খানি দুঃখবরণ বুঝা যায় না, যেতে পারে না।”

—“আঃ বড় শাস্তি দিলে বিভা। কেউ কেউ—কোন কালে যদি আমার দুঃখের বিনিময়ে সুখী হতে পারে, তবে আর আমার দুঃখ নেই।……”

—“এই বেশ, সেদিন মণিকার কাছে শুনিলাম তার সেবার তেজেনের কথা। তরুণ বৃদ্ধ—জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে লোকনা ভোগ করছে। তবে কিভাবে কেউ জানেনা—হরত কিরে আগবে তার স্বাস্থ্য ও অকাল বৃদ্ধ হ'রে। এমনি শত শত বৃদ্ধ লোকনা ভোগ করছে। সবই কি বুঝা? তা নয়। কিন্তু এঁদের জীবনে এঁরা কি পাবে?—হরত কিছুই না, হরত কেবল-ই সাহেনা—হরত যে বেশ ও জাতির মত এরা এই দুঃখবরণ করছে, সেই বেশ ও জাতি এদের এই ত্যাগের কোন মূল্য দেবেনা। কিন্তু তবুও এ বুঝা যাবেনা। জাতির হিসাবে জ্ঞানীর ঘরে এসব থাকবে।……”

—“কিন্তু এদের ত্যাগের ও দুঃখের সঙ্গে আমার তুলনা কি হয়? নহণ উৎসেপে বৈদ্যেত এরা দুঃখবরণ করে নিচ্ছে, আমার কোন্ ত' তা নয়।……”

—“নর কেন? দেশের উপর কতগুলি অস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এঁরা এগিয়েছিল,—মেলে দাবের বশেই এঁরা যান নি। অস্ত্রের প্রতিকারের মত নিজেদের স্বখ ও

মন্দিরা—ঠিক,

এঁরা বিশদ্বার্ম শিতে প্রবৃত্ত হয়ে বেরিয়েছেন। তোমার জীবনে কি তাই সত্যি নয়? মন্দিরার প্রতি অজ্ঞারের কথা মনে না এসে, তুমি তখনকে নিয়ে নিজের সংসার পাত্রেতে পারতে। পরেও ভারতীয় মন্ত্র জীবনের স্মৃতি মনে থেকে মুছে কেন্দ্র বিদ্যাকে নিয়ে স্থায়ী হতে পারতে।”

—“আজ্ঞা বিভা—দু’তাইয়ের মধ্যে কি তফাৎ? একজন আমাদের কলহ, আর একজন তার গৌরব। কি করে এটা সম্ভব হ’ল?”

—“তুই ভুলিয়ে যেখানে, সেখানে—দু’তাইয়েরই চরিত্রের মূল মূলে একই। দু’জনই জীবনকে উড়িয়ে দিলে—দু’জনই স্বপ্নান কেপেয়ে—নিজের জীবনের প্রতি একটুই মনকা নেই! কেবল তফাৎ হল এই—একইগুণি নিয়ে দু’জন দুই বিভিন্ন দিকে চলছে। কেউ যদি ঘোলা তপনের জীবনে এমন একটা বহুং বেয়াল চুকিয়ে নিতে পারত, তবে হস্ত তেজনের চেয়েও উজ্জ্বল পজিতে বহুং প্রেরণা নিয়ে সে ছুটত।...হাৎ, আর কথা বলো না। মন্দিরাদি এসে আমাদের শুধু গাল পাকবে।”

বলতে বলতেই মন্দির। এসে উপস্থিত—সে একটু হেসে বলল—“তুই সবীতে বসে ত’ খুব গল্প হচ্ছে, ঠেক পেয়েছে।”

বিভা বলল—“কে খাওয়াবে? আমার কি গাল খাওয়ার ভয় নেই যে তোমার খাস মহলে হাত দেব। কোথায় এতটুকু তুল-কটি হবে, শেষে গাল খেতে খেতে বরষ ত’?”

—“তুমি হলে বাঙালী, আর আমি হলান নাম’—মন্দির।—মন্দির।কারিনী। গাল দিতে তোমার সঙ্গে পারব কেন? ওটা ত’ মন্দিরবেরই খাস বহল।” বলে সে একটু হাসল।

বিভা বলল—“সারাদিন সেবা কর কলোই ত’ অবসর পেলেই একটু দুখ বসলে নাও—দু’চায়টা গাম-কম, খবক দিয়ে সারাদিনের শোধ তোলা। সেই গল্প জান না—মন্দিরার দুপুরে একটা লোক হাঙা দিয়ে নৌকাছে আর চাঁৎকার করে বলছে ‘না’ ‘না’। সবাই মনে করল পাগল। পুলিশ তাকে ধরল—কি ব্যাপার? সে মন্দির।বিল—সে কোরাণী, সম্রায়ে ছ’দিনই লাগা দুপুর তাকে কেন্দ্র,

‘হা’ ‘হা’ ‘yes sir’ ‘yes sir’ বলতে হয়। তাই আর মন্দিরার দুপুরে সে ‘না’ ‘না’ চাঁৎকার করে ‘না’ বলবার অভ্যাস বজায় রাখছে। তোমার অবস্থা—ও ত’ তাই হতে পারে।”

মন্দির। হেসে জবাব দিল—“তাংলে মন্দির।নীলের মন্দির।বের কি পরম সৌভাগ্য হওয়া উচিত। জ্ঞান মন্দির।বের উপর কড়া বেলাজ দেখিতে তার প্রতিজ্ঞার ঠাণ্ডা বেলাজ হবে আর মন্দির। প্রতি।.....”

বিভা বলল—“তুল করলে মন্দির।দি, এখন আর জ্ঞান-মন্দির।বের উপর কড়া বেলাজ বেলানো চলে না, জ্ঞানকা মন্দির। গ্রাইড—হয়তাল ক’রে বলবে। কড়া বেলাজ বেলানো আরর মন্দির। মন্দির। উপরই সহজ।”

মন্দির। হাসতে হাসতে বলল—“আজ্ঞা মনে মনে সব হয়েছ—একটি ভেমনি শে’ বেলায়ী মন্দির। জুটিয়ে এনে দেব। মনের মূখে কড়া বেলাজ তার উপর দেখিও।”

মালতীর রক্তহীন মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বললে—“বেশ হয় মন্দির।দি ওর একটা জুটিয়ে যাও ত’ বেশ ভাল একটি বর।”

মন্দির। হেসে জবাব দিল—“কোথার পাই, বল ত’? তোমার সম্রায়ে আছে কেউ?”

মালতী এবার গভীর ভাবে জবাব দিল—“আছে, আমার সম্রায়ে খুব ভাল বর। বেশ মানাবে হ’লেন। তুমি দু’জনকে জুটিয়ে যাও, মন্দির।দি।”

মন্দির। আবার হেসে জবাব দিল—“কে দেই বরটি। নামটি ত’ শুনি।”

—“বিকু গা।”

বিভা ধবক দিয়ে বলল—“জি! এসব কথা বলো না, মালতী।”

মন্দির। মালতীর পাসে বলল—বিভাকে বলল—“তুমি একটু বিশ্রাম কর দিতে, বিভা।”

বিভা বেরিয়ে গেল।

মালতী মন্দির।র হাত ধরে বলল—“মন্দির।দি, আমি ঠাট্টা করিনি। আমার এই লক্ষীছাড়া জীবনের বিবিধের অন্তত এটা স্থায়ী হ’ক। আমি বৈশ্যদিন ধারণ না।

আমাকে এই ভরসা দাও—তুমি এখের মিলিয়ে দেবে। আর মণিকাদি, তোমার সম্বন্ধে আমি কি প্রার্থনা করি, জান! তুমি বেন তোমার নিজের দিকেই পাশ্চি পাও। সাধারণ মেয়েদের চেয়ে তোমার বুদ্ধি বেশী; শক্তি বেশী, যা খেতে খেতে তুমি আর-ও সজ্জ হচ্ছ। যারা আমার মতো দুর্বল, শক্তিহীন—তাদের তুমি আশ্রয় দিও। তোমার সম্বন্ধে কোন ক্ষত হ'ল আমি প্রার্থনা করতে পারি না।

আমাকে কথা দাও, মণিকাদি,—বিভা ও বিকুলাকে, তুমি মিলিয়ে দেবে।" মিনতিভরা দৃষ্টি নিয়ে মালতী মণিকার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মণিকা বলল—“একি কথা বেগুণা দায় কোন! তবে আমি চেষ্টা করব, হৃদয় হবে।……”

জ্ঞানার, বিকু ও মণিকার মধ্যে কথা হচ্ছে। জ্ঞানার বলল—“বেশ, এর রোপ ঘেহের চেয়ে মনের বেশী। অবশ্য ঘেহের রোপও সানাত নয়। কামেই এর জীবনের আশা খুঁই কব। বেখছেন ত' জন্মেই দুর্বল হচ্ছে।”

(২০)

সন্ধ্যার পর মালতীর ঘরে কেবল বিকু বসে আছে। ঘরের আলো খুঁই ছোট করে এক কোণে ঢেকে রাখা হয়েছে। ঘর প্রায় অন্ধকার। মালতী বলল—“বিকু! আরও কাছে এসে বসো।” বিকু এগিয়ে মালতীর বিছানায় একপাশে বসল। মালতী তার হাতখানা ধরে নিজের কপালের উপর চেপে ধরল। ওরপর বলল—“বিকুনা, কৌতুহল আর বাঁচব না।” বিকু রাখা মিছিল; মালতী বলল—“আজ আমার আশা তোকা ভাঙা, বিকুনা। আমার বুকের মধ্যে হৃদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে আছে—অনেক কথা। সে কথাগুলো আমাকে বলতে দাও। নইলে মরবার সময়-ও হৃদয়ের বোঝা নিয়েই মরব—আমাকে একটু হাল্কা হতে দাও।……”

—“আজ্ঞা বসো।”

—“বিকুনা, তুমি আমার খুব ভালবাসতে—আজ-ও বাস। আমি তোমার কাছে ফিরে আসব—নির্বেশ দুঃখ নিভে যেমন এখানে শুভানে রাখা শেষে যার কোলে এসে

আশ্রয় নেয়, তেমনি ক'রে তোমার বুকে ফিরে আসব এই প্রতীক্ষার তুমি এতদিন ছিল। আজ আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি; এই লগ্নার থেকে আমার চির বিদায় নেবার-ও সময় হ'লিবে এসেছে। এক অজানা পথের দায়ী আমি হ'তে বাঞ্ছি—তুমি আমার কিছু পাথর নিয়ে যেবে না? বিকুনা—আজ বোধ হয় আমি ভুল করিনি; এ—বোধ হয় হৃদয় হৃদি বা কাতুহৃদয় প্রত্যাহ্বুতি (reac-tion) নয়। আমার বিশ্বাস করছ, বিকুনা?……

—“তা করছি রাধু।”

—“রাধু, রাধু…… জ্ঞা…… আজ্ঞা, তখন তুমি আমার টেনে নিলে না কেন? সাময়িক কখন আটকাত? সেটাই কি তোমার কাছে বড় হয়েছিল, বিকুনা?……”

বিকু কোন জবাব দিল না—রাখা বিকুর হাতে বসে। এনে নিজের মুখের উপর চেপে ধরল। একটু দূর নিয়ে রাখা আমার বলল—“আমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও না, বিকুনা—সেই আশ্রয়ের ছোটকালের মতো। তোমার কোলে রাখা দিয়ে আমি গুই……” বিকু একটু এগিয়ে বসল। রাখা তার কোলে রাখা রেখে তল—বিকু তার গায়ে হাত বুলিয়ে নিতে লাগল। রাখা বিকুর কোলে, মুখ তুলে প'ড়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে কান্নাকাতি সে বলল—“এবার আগে আমার শরীরে তোমার পরস নিয়ে বাঞ্ছি এই আজ আমার পক্ষম লাগবে।……

“জ্ঞানো, বিকুনা, মণিকাদি আমার কথা করছে। তুমি কথা করছ। আজ আমার অন্তরে কোন তাপ নেই, কোন ক্ষত নেই। একটা আমার আজ গল আছে। মৃত্যুর পরও যদি জানতে পারি আমার সেই গল পূর্ণ হয়েছে, তাহ'লে আমি যত বড় তৃপ্তি পাব।……”

—“কি তোব সাপ রাধু?”

—“বিকুনা, বিভা বলেছে আমার এই হৃদয় কঠিন নাকি কৃপা হবে না। এর বিনিময়ে বিশেষ নাকি হৃদয়ের কথা বেড়ে যাবে।—সে বলেছে, সময়ের অন্ধর ভাঙ'রে এ-সব নাকি জমা থাকবে। কোন অনাগত ভবিষ্যতে নাকি এই ন্যাস থেকে সব নর নারীরা ঢেক কোট খুঁচী হবে। সেই হৃদয় অনাগত ভবিষ্যতের দিকে আমার তত দৃষ্টি নেই,

বিষ্ণু। আস্তে ভবিষ্যতে যদি কিছু হতে পারে—সেই দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে আছে।……”

“জীবনের সব বেনা-পাওনা আমার শেষ করেছে—কখনও পৃথক অস্তরের সঙ্গে কথা হয়েছি। কি যেন হচ্ছে বিষ্ণু, জানো?—আমার এই বিজ্ঞ, উদার জীবনে অস্তর দুটি বহুরের ভিত্তি ও তার বাঁধার উদ্ভাবন গড়ে উঠেছিল। তার সৌরভ, তার নিম্ন ছায়া—তা’ত’ আমার জীবনে বিদ্যা নয়। চির জীবন ভরে সে আমাকে ধরনি বসে, যে হৃদয়ের সে বা গিয়েছে, তাকে-ও কি অভিশাপ হবে? তাই আজ অস্তরের সহিত আমি চাই জীবনে সে হুণী হ’ত। নবিকার সঙ্গে তার মিলন—সে কি আর সম্ভব? কোব হত না। কি বল, বিষ্ণু?”

বিষ্ণু ওর মাঝার চ্যুত ব্লাতে ব্লাতে বলল—“না, বাবু, তা বোধ হয় সম্ভব নয়। যদিও আজ অস্তর, জগতে চলে গিয়েছে। সে আজ আরও মহত্তর সন্ধান পেয়েছে—এর জীবনকে আর ঘাঁটিয়ে না। আজ ওর সমস্ত জীবন ছেয়ে আছে ওর খোকা। যে ছিল রক্তমাংসের ছোট্ট খোকা, সে আজ অপরীত হ’য়ে বিশ্ব সম্ভার মিলে গেছে। নবিকার সমস্ত লেহ, মন, ইচ্ছা—আজ সেই অপরীত শিক্তকে দ্বিগুণ পূর্ণ।……”

মালতী—“না, সে যে পাণ্ডি পেরেছে, তাতে আর বাধ সাধব না। সে সেবার ব্রত নিয়ে বেরিয়েছে—আজ একটা ঠিক বাস্তবায়িত বিরাগ নয়। অনেক জুহু-নাহনের পর সে এক নতুন সত্যের সন্ধান পেয়েছে।……”

“নিম্ন আমার জীবনে আজ সবচেয়ে বড় কে জানো?”

—“কে?”

—“তুমি ও বিভা। তোমরা জীবনে হুণী হবে—এটা জানলেই আমি হুণে বরতে পারতাম। বিভা বড় একাকী কেউ ওর সঙ্গে নেই, সান্নী সেই।……”

বিষ্ণু বলল—“না, রাধা এত একাকী সে নয় জীবনে; তা হ’লে তার অস্তরের দরবে সে দুটো আসত না। আর জানো রাধা—ইংরেজীতে একটা কথা পড়েছিলাম—‘between one and none there lies the infinity’ যে বাইরের সব সংস্পর্গ বর্জন করে চলে সে অস্তরের

একটা অনন্তের সংস্পর্গ অর্জন করে।……” সেখা, একবার নিম্নবীরের পাঞ্জার পড়ে মেলের নির্ঘন কক্ষে কয়েকমাস থাকতে হয়েছিল—কীট পতকে বা চোখে সামনের কুম্ভারীয়া বাড়িতে লকরণ-নীল সবুজ পাতার কপালে আমি যাবেন অস্তরের অস্তরুতি পেতাম। বাহির বিশেষ যে অস্তরুত জন স্রোতের সম্ভবিত চলছিল—আমার মৃণ্ম জগতের বাইরে হলে-ও তার সঙ্গে যোগ ত আমি হারাষ্ট নি।

“……আজ কথা হলো না, বাবু। বেনী কথা বলতে ভাকার নিবেশ করেছেন। খুব স্নান হ’য়ে পড়বে।……”

—“কি কতি বিষ্ণু? যে তুমি আছ, তোমাদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দে কাটাতে লাগে। তবে এখন আর পারছি না। খুব স্নান লাগছে।……”

আজ পাঁচ-সাতদিন হল মালতীর মৃত্যু হয়েছে। যদিও এসে বিষ্ণুকে বলল—“বিষ্ণু, এবার আমাকে বিদায় দিন। যার জন্য এনেছিলাম, তাকে ত’ রাখতে পারলাম না; আর এখানে থেকে কি করব? ও-দিকেও কাজ আছে।”

বিষ্ণু বলল—“এখনই যাবে যদিও? আর কয়েক দিন থেকে যাব না? এতদিন যে পরিশ্রম তুমি করেছ, কয়েক দিন বিদ্রাম নিলে ভাল হ’ত না?”

—“না বিষ্ণু, এখানে আমার বিদ্রাম হবে না। মালতীর স্মৃতি দিনরাতই আমার সমস্ত অতীতকে চোখের সামনে হুগে ধরে।”

—“যদিও তুমি পালাতে চাচ্ছে—রাও।……তোমার সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল না। এখন তোমাকে চিনলাম এবং ভাল বকমই চিনলাম।……কিন্তু সারা জীবন তুমি এত দুঃখ পেলে কোন অপরাধে?”

—“বিষ্ণু, বিভা এত দুঃখ পাচ্ছে কোন অপরাধে? মালতীর এই পরিণতি হল কেন? দাদা, মেরেদের দুঃসের কি কোন অস্ত আছে? না, এর কোন আদি আছে; এ নিয়ে ভেবে কি হবে, বিষ্ণু! জনৈকি, মূলশ্রম ও পুণ্ডানের শ্রমে নাকি মেরেদের আত্মা নেই বা নিয়ন্তরের প্রাণী বলে দাব্য করা হয়েছে। হুগত ‘সেটা-ই ঠিক।……খাব, বিষ্ণু, ও কথা ছেড়ে দিন। আপনাত-নিজের ব্যবস্থা কি করলেন? আপনিও কিছুদিন অস্তর

হান—বিভা এখন কিছুদিন থাকবে। তার ও মন পাড়াপ—তাকে নিয়ে কিছুদিন রীতা চলুন না। এখন রীতার খাখা বেশ ভাল—গরমওমন নয়। অল্পদিন পর বেশ ভাল climate হবে। তাই চলুন।”

—“বিভা “কি রীতা যেতে রাখী আছে? অবশ্য তোমার ধারে থাকতে পারবে। তুমি বরং এখনই তাকে নিয়ে যাও না?”

—“তা সে যাবে না—আপনাকে এই অবস্থায় কেলে সে কোথাও যাবে না এখন।”

—“বেশ্য থাক, না হুও রীতাই যাব—কিন্তু এখনই নয়—কিছুদিন পরে।”---

“মহিলা, তুমি ও এই অল্পসে প্রায় নির্বাণিত নিমেষ জীবন যাপন করছিলে; আশা কবি মালতীকে নিয়ে আমার সঙ্গে যে পরিচয় হল, তা একেবারে কুপে যাবে না।—বিক্রমকে একেবারে কুপে যাবে না ত? যদি তোমার স্বীকৃতি কখনও কোন প্রয়োজন পড়ে, যদি কখনও বিজ্ঞান নেবার দরকার পড়ে, তবে তোমার বিজ্ঞানকে স্বরণ কর।” একটু থেমে বিষ্ণু বলল—“কবে যাবে তুমি?”

—“আজই ত’ যেতে চাই।”

—“আজই যাবে? বিভার মত নিয়েছ?”

—“কাল গেলেও সে মত দেবে না, পোনের দিন পরে গেলেও সে মত দেবে না। তবে, তাকে না বলে ত’ আর যাব না।”

• • • • •

মালতী চলে গিয়েছে। বিভা ও বিষ্ণু এক ঘরের শ্রুতির বন্ধনে জড়িয়ে আছে। বিভা বলছিল—“বিষ্ণু, মালতী আমার কে? কেউ ত’ নয়। কথবিনয়েরই যা পরিচয়! তবু মাহুৎ কেনন জড়িয়ে পড়ে। যে দিন প্রজাতন্ত্র বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠিখানা পেলাম—সেই এক হুণ্ডের মাঝার যেন মালতীর কোলে গিয়ে পড়লাম। কত স্বপ্ন জ্বলে দেখেছি। কত হুণ্ড হুণ্ডের কথা জ্বলে বলেছি। তারপর বিবান এখন তার পৌষ শক্তি নিয়ে ওকে চানতে লাগল, কি হুণ্ড গিয়েছে ওর কীদ বন্ধের ভিতর? হুণ্ডের

নেয়াইতে পড়ে উঠতে এক মলক হাতুড়ির যা খেয়েছি অনেক। তার কলে আমাদের সংযোগ হয়েছিল মূঢ়। আত্মীয় বন্ধনের দ্বারের বিরাডে আমিই প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব ঠিক করি। কয়েকই প্রজাতন্ত্র এখন আমার সঙ্গে প্রস্তাবনা করল, কাকর কাছে হুণ্ডের কাগা কীভাবে গেলাম না, এর পূর্বে প্রজাতন্ত্রে পাবার আশায় বরদিন তন্নয় হ’য়ে ছিলাম,—বরদিন যাবৎ নিজের মনেই একাকী বাদ করেছি। সে একটা ছিল স্বপ্নজগত।---

“...তারপর হঠাৎ আমার সেই স্বপ্নজগতে গেল ভেঙ্গে আমি গিয়ে ছিটকে পড়লাম লোকসমাজের মাঝে। যে স্বপ্ন দিয়ে এত দিন বিয়ে রেখেছিলাম নিজেকে অপর থেকে আচ্ছাদন করে তা গেল ভেঙ্গে। তখন লোকের কাছে হুণ্ড দেখাতেই লজা হ’ত। তখনই এই জ্ঞান হ’ল—এক জনের হুণ্ডাণ্য অপর লক্ষ্যের কাছে উপভোগ্য হয় ‘অদ্বৈত’ অদ্বৈতের পরিচয়, আমার পরিচিত ও মলকমিত্রদের কাছে উপহারের খোঁজক খোঁজক। পুণ্ডের উপর বিশ্বাস ভাঙলে প্রজাতন্ত্র। মালতীর উপর বিশ্বাস ভাঙলে এরা—ই সব মেয়েরা। এই সবপ্রসঙ্গী অমৃততত্ত্বের মধ্যে মালতী শীপনিষার হস্তে আমার জীবনের একমাত্র অঙ্গনা ছিল। কেবল তার সংসর্গেই মাহুৎের উপর বিশ্বাস হারাইনি। এটা যে আমার তখনকার জীবনের কত বড় লক্ষ্য, তা অমৃত অঙ্গনি বৃত্ততে পাবারেন।”

বিভা খামল—যেন দখ নেবো ঘর। তাকে মাহুৎার ছলে বিষ্ণু বলল—

—“বিভা, মাহুৎ সহজে মাহুৎের উপর বিশ্বাস হারানতে পারে না, মাহুৎের কাছ থেকে প্রস্তাবনা ও মাহুৎের শেখ হয় না।...কতবছর এই নির্জন নির্বাণনে কাটিয়েছি—কে জানত মালতী এমনি ক’রে আমার কাছে আসবে এবং এমনি ক’রে চ’লে যাবে! আর তারার সময় আমাকে নৃতন বন্ধনে বেঁধে যাবে!” একটু থেমে বিষ্ণু আবার বলল—“এত বছর যাবৎ এখানে আছি। ‘মন আমার তুচ্ছ’ গিয়েছিল। এখানকার লোকদের সঙ্গে সামান্য মিলন কোথায়? সামাজিক বস্ত্রের মিলন—অমৃততত্ত্বের মিলন নয়। এখের মত হুণ্ড করিয়েছি; ঐহিকপণ্য দিয়েছি;—

এইটুকু বিপদে পড়লেও আমার কাছে এরা ছোট্ট আশে।..."

"...আনিও এতখানি দাগান্য করেছি। কিন্তু অস্ত্র দিয়ে নয়, সমাজ যন্ত্রের অক্ষ হিসাবে। তুলে গিয়েছিলো যে অস্ত্র দিয়ে, মানুষের সেবার এবং সেবার ভিত্তি আছে। সে খুশা জাগিয়ে দিয়ে গেছে রূপা। সমাজ মানুষের অস্ত্রকে শিখে রাখে—পতনকালে তার কঠোর রাখা করে। অথচ সব মানুষ ই কেবল বেহুঁকার এর ভাবে থকা দেয়।..."

মানুষের জ্বর হল, অস্ত্রকরণ হল, প্রেম-ভালবাসা হল, স্নেহ-মনতা হল,—সমাজবন্ধনের কাছে এরা কোন দমে নেই। বাসিকা বা দুইতী কতটা বিধবা হয়েছে—শিরশাস্তার অস্ত্র কি চায়, সেই মেয়েটির অস্ত্র কি চায়—তার খেঁচ কেউ দেয় না। সবাই খেঁচ করে শাস্তের বিধান কি, সমাজের অগ্রদূত কি। বাসিকা বিধবা কতকাল উপবাসে রেখে বা বিধবাবো কৃষ্ণাধনে বেঁচে, বাপ-মা ও তাদের নিত্যকার জীবন যাপন করে যাক,....."

"জেল কর্মচারীরা কীলীর কয়েদীদের কীলী নিয়ে থাকে। আইনের নামে এই যে নরহত্যা, এর বর্ধিততা তাদের স্পর্শও করে না। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে এরা এর সত্যিকার রূপ বহন করে নিউরে উঠবে। বিভা সমাজের কাছে মানুষের বাইরের দিকটাই হ'ল বড়। তপনের সঙ্গে নবিকার কি ছোটো বস্ত্র পড়ানো হয়েছিল—সেটাই হল সমাজের কাছে পতা, তপনের মন, নবিকার মন—এসবই হল বিধবা, এই ত' আশ্রয়কার সমাজ।"

বিভা—"কিন্তু সমাজ ছাড়াও ত' মানুষ চলতে পারে এটাও ত' ভূমি মানবে।"

—"দানব না কেন, মানছি আনি সবই। সমাজকে অগ্রাঙ্ক করে মানুষ চলতে পারে না। কিন্তু এটাও ত' তুললে চলেবে না, সমাজ ভ্রাতৃবোনের জন্ত, মানুষ সমাজের জন্ত নয়। মানুষ তার প্রয়োজনে সমাজকে গড়েছে, আবার তার প্রয়োজনেই সমাজকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়বার অধিকারও তারই আছে। সে অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে সমাজ চায়, মানুষকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে। বস্ত্র পলাব এখানেই, বিভা। মানুষ থাকে সর্ব

কবেছিল, সে-ই পানবীধ শক্তিতে তার নিষ্ঠুর প্রকৃতি হ'য়ে বসতে চায়—গ্রীষ্ম খেয়ে ক্রোধেরটাইনের সেই সৈন্তের মতো। এ'ত মানুষ সহ করতে পারে না।....."

একটু বেধে সে আবার বলতে লাগল—"তু' তিন হাজার বছর আগে যত্ন বা যোগেশ কি বলেছেন বা আফ্রিটল কি বলেছেন—আজও সর্বত্র তাই দিয়ে মেয়েদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আফ্রিটল বলেছেন—woman is an unfinished man. এবং সামাজিক পন্থায় তাঁর মতে নারীর স্থান হল—as slave to master. তারপর আড়াই হাজার বছর চলে গেছে—কিন্তু সমাজ আজও ঐ বিধান বেনেই চলছে। তপনকার মানুষের প্রয়োজনে যে পথিকছন্দা করা হয়েছিল, আজকের মানুষের পক্ষে তা হল তার প্রয়োজন বিহীন। কিন্তু নারী যদি এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাকে মাপজবান মতো, নবিকার মতো—তোমার মতো বস্ত্র পেতে হবে। এই ত' হ'ল আশ্রয়কার সমাজ।..."

বিষ্ণু হঠাৎ খেদে গেল,—বিষ্ণু কথার রেশ বেনে নিষ্কৃত বাহুব তরফে ভেদে বেঁকাতে লাগল। এত উদ্ভ্রমতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে বিষ্ণু কথাগুলি বলছিল যে তার শাব্দিক অর্থ ছাড়াও একটা আত্মিক অর্থ বেনে তার সঙ্গে মিলিত হচ্ছিল। বিষ্ণুর মন নিষেধ তত্ত্বজ্ঞান আরম্ভ ছিল,—আর তার কথার আবেগ সন্মোচিত করে রেখেছিল বিভাকে। তিনটি নারী চূর্তাগোর বন্ধনে এখন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল,—অথচ ব্যক্তিগতভাবে তাদের অপরূপ কি। বিভার মন খেনে গুত্তিত হয়েছিল,—ভাববার শক্তিও খেনে তপন তার ছিল না।

বিষ্ণুর কথাগুলি সত্য;—তবুও বিভা এর বিরুদ্ধে সমাজ-বিধানের সপক্ষে হুজি তুলেছে। কারণ এ ভিন্ন তার ত সত্যনা নেই। হয় সেটাই সত্য হবে অসুটে, নয় ত' আত্ম-সমর্পণ করতে হবে সমাজ-বিধানের কাছে। তা ছাড়া নবিকা, মালতী ও বিভার কি পদা আছে? বিদ্রোহ করে নিষেধ জীবনকে নিষেধ মতো করে গড়বার ইচ্ছা হল তাদের নেই,—সেই স্বযোগ ও সেই ক্ষমতাও তাদের নেই। অতএব—বেনে চলো, সমাজকে খেনে চলো, অসু

ভাণ্ডা-বিখ্যাতকে যেনে চলো।

কিছু সময় উভয়ে চুপ করে বসে রইল। অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে, নীরবতা তাকে আরো নিবিড় করেছে। অন্ধকারও নীরবতার আবরণ যেন এসেছে দেহের ও মনের সংযোগ সেতু হ'য়ে উভয়ের সান্নিধ্যকে অহুত্বের গোচর ক'রে তুলেছে। এদনি সময় বিভার এক কঁটা অঙ্গ হঠাৎ বিকৃত হাতের উপর পড়ল। কল্পিত কণ্ঠে বিকৃত বলল—
“বিভা, তুমি কিম্বা!.....”

বিকৃত আঙুলে নিখের হাতখানা বিভার মাথার উপর রাখল; আঙুলে হাতখানা তার মাথার উপর স্পষ্টভাবে সঞ্চারিত হতে লাগল।

বিকৃত আঙুল বলল—“বিভা-ছি, কিম্বা না!.....”

বিভা অচঞ্চল কণ্ঠে বলল—“কেন কিম্বা না, বিকৃত!.....
আমাকে কিভাবে বলতে হবে? এই কথাগুলি তুমি বললে।
স্বার্থ নিবৃত্তি মানুষকে জাগিয়ে তুলে যদি বল স্বার্থ
জাগা বোধ করবে না। তবে কি সেটা মুক্তি লক্ষ্য কথা
হয়? অনেক কণ্ঠে মনে ক'রে পাড়িয়ে রেখেছিলাম;
তাকে তুমি ও মালতী হিসেবে জাগিয়ে তুললে। আজ
আর কারা ছাড়া আমার কি সখ্য আছে!.....”

বিকৃত চুপ ক'রে রইল,—সে হঠাৎ ভাবছিল—তাই ত'
কি সখ্য আছে এর?.....সবই ত' তার আত্ম মৃত!.....

(ক্রমশঃ)

‘আবর্তন’

প্রবন্ধজন বিশ্বাস

(১)

সে আসিল দীর্ঘ ছয় বৎসর পর।

শুভ সন্ধ্যার সমুখে সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। নাই
কউ নাই! একটি মাত্র তুফানের ধাক্কা সব কিছু ভাঙিয়া
চুরিয়া গুণ্ডাট পালোটা করিয়া বিধা গিয়াছে।

ঘরের দরজাগুলি হা-হা করিতেছে; ধূলি-বলিন ঘেঁষে
উপর পণ্ড পকীর অসংখ্য পণ্ডিষ্ট আঁকা।

কালক্রমের লাক্ষ্য লাইয়া গুহ নীড়টি দাঁড়াইয়া আ
আজও। স্তম্ভ অতীতের শব্দসহ; কীর্ষ বিস্তৃতিগ্রস্ত।

শিঠের বোচকাটি নামাইয়া সে ধর্মাক্ত মুখখানি মুদ্রিল।
তাহার পর খুঁটিতে হেলান দিয়া, বুকপকেট হইতে একটি
বলিন কটোগ্রাফ টানিয়া বাহির করিল।

কটোগ্রাফের নীচে দেখা ‘আনি, মা ও মালিনী’

‘বাধা, বৈবনা’ আর বার্ষিক্য তার অহুত্বের আঘাতে
কেনিল আবর্তের স্তম্ভ হয়।

মা নাই, তাহার ধোঁকী ভগ্নী মালিনী হারাইয়া গিয়াছে
এই বিরাট পৃথিবীর শোকসাতার মাঝে! তাহাদের আর
খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

আজ হইতে তাহার একক জীবনের বিস্তীর্ণ পথে যাত্রা
হুক। সঙ্গীতময় পুনরাবৃত্তি। বৈজ্ঞানিক—আর কিছু
করিবার নাই।

অন্তরের ভগ্নখান কাগিতে পাঠে না।

শুধু গুহাইয়া ধরে।

একটা আঘাতের মগ্ধাঙ্গে বসিয়া একটা কাক
একটানা কা কা হবে ডাকিয়া চলিগাছে।

সমুখে বোতলদ্বয় দীর্ঘ পথ। উৎসাহীন বৈরাগী।

সে কিরিয়া গেল।

(২)

এদনি প্রত্যাহই আসিতেছে লৈলেন।

সেন্সিও আসিল।

অর্থহীন ভাবে একটানা কত কি বকিয়া হাঙ্গ সে,—
প্রশ্নাত্ত বৃত্তিতে পাঠে না। বোঝা চোখ মেলিয়া সে শুধু

চরিত্রা থাকে একটা নৈর্ব্যক্তিক উপাধীতে সমস্ত দেহ
মন অজ্ঞান হইয়া যায়।

কিন্তু শৈলেনের মুকাইবাব বিদ্যমান নাই।

মৃত্যু হইতে কানে ঘর অঙ্গের গুটি কয়েক কথার
টুকরা। হস্ত কবিতার ভঙ্গ—এক বাস্তবিক উল্লেখভাষ্য
তাহার জীবনযৌবনের দুই প্রান্তে কিসের শিখা জলিয়া
ওঠে। হস্তে তাহার নমোভগতে কিসের একটা বিদগ্ধ
ঘটনার আশঙ্কা হানা বিদ্যমান।

জীবনের পথে বেলায় অল্পগুল টানদল করিয়া ওঠে।
সহসা মনে পড়িয়া যায় জীবনের জীবীর্ষপথটি শৈল-
বেলায় উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কাণা আঁকাটি
জানি তাই তুমি আনন্দ করিয়া উঠিতেছে বৃষ্টি।

সে চরিত্রা বেশির বসন্তের আর ভবিষ্যতের পানে।
নাট, কোথাও এতটুকু ছাড়া নাট, একটু জামদিক, একটু
শিখর, সর্বত্র উৎস এক বিকট বায়ুবেলা।

শুধু একক জীবনের পুনরাবৃত্তির স্মৃতিকার অহঙ্কৃতি।
কিন্তু তাহা কবিতার। সে উত্তরজনা পরকণ্ঠেই আবার
নির্বিকার পাকিতে হইতে পাইয়া যায়। তখন বোঝা নিশ্চয়
চোপ বেদিয়া সে শুধু চাহিয়া থাকে।

শুধু শৈলেন কহিয়া যায়; কিন্তু আবার আসে।
অতঃপর অগ্রেপ্রথা ভোগ্য প্রদানের লগ্নের জড়িত মনে
পচ্ছাতে। মন টলে প্রদানের।

(৩)

যার পথে তাহা মূখ্য শিল্পন থমকাইয়া যায়।

দাবণাময়ী তলনী হুঁতী।

কৌবিলিপিত শীর্ষ অলকগুহ উন্নত কক্ষ উপর
হস্তিতেছে মূহু হুহু। কানের বোলদ্যবান হীরক দুল জোড়া
উজ্জ্বল আলোক সম্পাতে চিক্‌চিক্‌ করিতেছে। বিচিত্র
রক্তিম ওঁড়ারের মদসিক্ত হাসির গুণ ইহিত।

‘শীর্ষগতি নির্দিষ্ট চোখের কোণে আর অন্তর্জিত
ক্রিয়াসে এক আদিম আনন্দ ওৎ পথ করিতেছে।

সে আগাইয়া আসিল। রক্তিত পদপ্রান্তে আহত নূপুর
দুশমানি বাজিয়া উঠিল সাথে সাথে: প্রতি পদক্ষেপে

তাহার হৃদয় কংকার রমণীর বাহুর তুলিয়া শীর্ণাভিত
ভবিষ্যৎ সে নমস্কার করিল।

অতীত আর বর্তমান। তাহারই লক্ষ্যসে একবিধ
কালের উপর বসন্তের এক বসন্তের অলস রমণী।

সব মিলিয়া অগভ্রপ, অনির্বচনীয়।

পূর্বের অন্তর্ভাব অনির্বচন নারী কৃষ্ণা শীর্ণাভিত
রূপ। মন নূপুর উৎকৃষ্ট উপচার।

অনুভূত পাত্রিতে মনেন তরঙ্গ টলনল করিতেছে।

ভিতরের আঘাত বৃষ্টি পানব কৃষ্ণা ছোট্ট, কহিয়া
মহিতেছে: অকারণেই কানদ্বিট লাল হইয়া ওঠে প্রদানের।

সহসা প্রদানের মুখে কে যেন প্রাণ বেগে আঘাত
করে। কপালের দুইপাশে দিবাভাগি মণ, মণ, করিয়া
ওঠে এক মূহুর্তে।

পায়ের নীচে মাটিতে একটা বীর্ণাভাষী কপন হুহু হয়।

বীরে বীরে নিজের অজান্তেই তাহার তান হাতখানি
আসিয়া বুক পকেট লম্বা করে।

অনেক ইতিহাস, অনেক অল্পগুল আর বাণা লজিত
রহিয়াছে তাহার পচ্ছাতে।

মানসী তুলিয়াছে; কিন্তু প্রদানের চিনিতে বিলম্ব
হয় না।

ক্রমশে উপর করেটা বেগে তাহার হৃদিত -হইয়া
আসে বারেক। তাহার একক জীবনের তিতিল্পন ধসিয়া
বাইতেছে; নিশ্চয় যেকোন কালে আকাশের বেগে
কোণে বিদ্যুৎ-ঝলি বিদিক দিয়া ওঠে।

সে একবার তাকায় শৈলেনের বিকে। তাহার পর
বলে “আবার নাগ কর, তাই!”—তৎকর্ণ হুহুর পাত্রটি
পিক্‌বানীতে উপুড় করিয়া দিয়া সে বাহির হইয়া আসে।

তাহার গমন পথের বিকে চাহিয়া দাঁদি। কৃকনে
শৈলেন বলে, “কোণার্য।”

লোহিত বেশভূষা লিখিত বাহুবল আর বর্ণ বহুনের
কনকভারত লজিত হুহু বিলাইগা মানসী হাসিয়া ওঠে।

শেষে বলে, "ও' সব বোকা ছেলেদের কেন এখানে নিয়ে আসেন শৈলেন বাবু?"

চন্দ্রান প্রসঙ্গের কানে হাট কণাগুলি। কপালের পাশে শিবাভঙ্গি ফুলিয়া উরিয়াছিল; তুইহাতে টিদিয়া ধরে সে। তখনও হাসিতেছে মালিনী।...

তবু তিন যায়, রাত্রি আসে
কালক্রের দুর্ন ব্যাধত হয় না।

—:::—

আগামী বৈশাখ সংখ্যা

বহু খ্যাতিমান লেখকের রচনা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া

২৪শে বৈশাখ প্রকাশিত হইবে।

লেখক	বিষয়
শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	অর্থনীতি
শ্রীমদ্রথ রায়	নাটক
ডাঃ বাহুগোপাল মুখার্জী	আত্মজীবন
শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ	রাজনীতি
শ্রীতুপেন্দ্রকুমার দত্ত	জাতীয় আন্দোলন
শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	গল্প
শ্রীরসিকলাল দাস	বিপ্লবী আন্দোলন
শ্রীহেমন্তকুমার তরকদার	সাহিত্য
শ্রীপ্রবুল হোড় রায়	সাহিত্য
নগেন দত্ত	গল্প
অশোক সেনগুপ্ত	* কাটুন

আরও অনেকে

মহাকাব্যের ভূমিকা

নর্গেন দত্ত

আমি সকল হইতে দূর বেজার ব্যস্ত। তাহার কথা বলিবার অবকাশ নাই, বাস কেলিবার অবকাশ নাই। কিন্তু চুই লোকেরা করিবে কণ্ডা করিবার অবকাশ তা মিলিবে? হাটাই বস, কণ্ডাটা কাজকর্মের ঠেকে রসের জোগান দেয়, মনোরোচক চাটুনিও বটে। জোনবাও বেমন, উৎসী পদ্মর কিল-চড় না খাইলে আপনাকে ভাগ্যহীনা বলিয়া মনে করে! আর শঙ্ক? ওকে (উৎসীকে) কিসটা-চড়টা বদাইতে পারিলে নিম্ন সকল হইল বলিয়া মনে করে। একজন চড় হাইয়া আনিল পাত, আর একজন পাত আনিল তাহা হুলোমন্ত বদাইয়া।

ইহার অলোচনার লাভ কি? উৎসী সে কথা বলিবে দ্বার তাহার প্রতিবাদ করিবেই। হঠাৎ তীব্র কর্কশ চীৎকার করিয়া উৎসী কহিল, 'ও! তুমি বেজার পাখি শাহুদা, চুল ধরে টানছ কেন?'

দাহ গম্ভীরভাবে গভীর মনোযোগের সহিত কলাপাতা লাভাইতেছিল! নিম্নের কামের তিলমাত্র ব্যাঘাত না ঘটাইয়া, গভীর তাক্সেলের সহিত উত্তর কহিল, 'ভারি দার পড়েছে আমার তোমার শুকনো পাটের গড়ির মত চুল ধরি। যে বাহ্যতের চুল...তার আবার ইয়ে...'

এবার উৎসী রাগিয়া উত্তর করিল, 'ইয়ে না তু কি। মেঘ সব কলাপাতা ছিঁড়ে।'

দাহ আপন পৌকসে লগিয়া উঠিয়া উৎসীর নাকের ভগ্নার সামনে আঙ্গুল তুলিয়া কহিল, 'মে তু ছিঁড়ে।'

—'এই তু সিয়েছি, ক্রি করবে?'

'কিন্তু না'—বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে দাহ নির্দিকারভাবে উৎসীর গালে এক চড় বদাইয়া দিল। অম্বে ঠাড়াইয়া সে হাসিতেছিল সে কিন্তুরাম, ওরকে কিন্তু। চুলটানার অপকর্ম্মই সে করিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িয়াছে, দাহের দাহন জিন্দর উপর মারমুখা হইয়া

ওঠে। দাহর দাহন সবচে জিন্দর পূর্ণ অভিজ্ঞতা যুব যুবকর নহে। সেই শেখার চুরির ভাগের অমিল তারপর সৈনিক পাড়া। সবই মনে আছে। ওকে ক্যাপাইয়া লাভ নাই। পাকির ওকনের কিল খাইতে হইবে। দাহর গভীর মুখের শানে তাকাইয়া জিন্দর পূর্ণশক্তি কিরিয়া আনিল। কিন্তু উৎসীকে লহাহুকুতি জানাইয়া কি একটা বলিতে বাইতেছিল দাহর চোখে চোপ পড়িতেই মুখ নীচু করিল।

উৎসী অভিমানাশ্রুত চাপা কণ্ঠে কহিল, 'দা: দাহরা তু তুমি কেবল অমনি অমনি মার।' অজ্ঞার কি? আসল পাপীকে পাকড়াও করিতে না পারিয়া নির্দোষীকে অভিযোগ করিলে এইরূপ চল কলিবেই। কিন্তু এদিকেও ত কলা-কল বিঘম হইয়া ঠাড়াইল। উৎসীর কোমল মস্তন গালে চারিটি আঙ্গুলের ছাপ বেশ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। আঙ্গুলের ছাপসূচ অকল ইংগীত ও রক্তভ হইয়াছে, উৎসী মুখ রানিয়ার ভরিয়া গিয়াছে। চক্ষু কোন বাহিরা যে অলক্ষণা গড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা স্পষ্ট পরল রেবার আশিয়া গম্ভীরের নীচে চাঁই লইয়াছে। তথা হইতে দু'এক কোটা জল তখনও টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছিল। উৎসী চীৎকার করিয়া ধামে নাই বটে, তবে অভিমানের কারণ আর চক্ষু জল ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাকে বাধ 'মানাইবার অস্ত্র' বলতম চেষ্টাও করে নাই। দাহর কাছে উৎসীর মার খাওয়া নূতন নহে। কিন্তু আশিকার ঘটনার নূতন রোগ হইল চেতনার নব বিকাশ। উৎসীর মনে ভোখার যেন লজ্জা বোধ হইতেছিল জিন্দর সামনে অমন করিয়া মার খাইল। কিন্তু কিছুইত আর একা উপস্থিত নয়। মূর্তিপাড়ার নবীরাম, বাঙ্গীপাড়ার গম্বা, মালোপাড়ার মুহুল আর হরিয়াছে শাহুদা। আচ্ছা শাহুদা কি ভাবিয়াছে।—আমি বুকি এখনও কড় হই নাই।

দাহর কিন্তু তখনও ধ্যান অবস্থায় নাই। সে আপন মনে কলার পাতা পর পর লাভাইয়া পুষা যোগের চাল রচনা করিতেছিল। তাহার মাথার বৌক চাপিয়াছে এবারে

চাল উঠে না করিলে হয়ত বুঝিগাই আসিয়া গলা বাড়াইয়া এক নিঃশ্বাসে বাহা পারিবে তাহা বাইরা কৈলিবে। সেবারের মত সব কাছ পড় হইবে। অন্তঃস্বপ্ন, উদী ধর, শক্ত করিয়া চালটা বাঁধিয়া রাখি। কল্পনার বোকের মাথার মাছ একটু ঢোকা গলায় ভাকিয়া উঠিল, ধর উদী। এঁয়া চোখে হল!

উদী নীচবে মুখ নীচু করিয়া ঝাড়াইয়াছিল। বাহু বাধিত হইবে প্রায় করিল, 'হায়ে খুব লেগেছে বুঝি?' —'তা নহত কি। তুমি যখন তখন লবাইকে মারবে!' —ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চার করিয়া কিছু মোটা মুঠি একটা উত্তর বিদ্যে নবের কাল মিটাইয়া বলিয়া লইল। বাহু শুধু উত্তরে চোখ-মুখ বুজাইয়া কিছুই দিকে কলবাত তাকাইয়া ছিল। কিছু বাহুর মুখের পানে আর না তাকাইয়া সোখা অস্ত্র দিকে তাকাইয়া বহিল।

বাহু উদীর একান্ত নিকটে আসিয়া সমস্ত চোখে একবার আঁহত মুখখানির দিকে তাকাইল। তারপর মাথার উপর হাত রাখিয়া ধরা গলায় ভাকিল 'উদী।'

উদী মুখ তুলিয়া একবার অভিনয়ী দৃষ্টিতে বাহুর দিকে তাকাইয়া পূর্বা মণ্ডল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে দীর্ঘ দীর্ঘে রওয়ানা হইল। বাহু উদীর আঁড়ালে নিঃশব্দ চোখের হল মুছিয়া ছুটিয়া আসিয়া পথরোধ করিয়া ঝাড়াইল।

—'না ভোকে যেতে যেনো না।' উদীর চোখে বিজয়িনী আনন্দ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। একটু বৃদ্ধ হাসিয়া, মাথা ঝুঁকিয়া উদী কহিল, 'যখন যখন। অম্বরে নবীরা, জিজ্ঞাসা, মুসল লবাই একসাথে চীৎকার করিয়া উঠিল।

নব মুষ্টির ছেলে নবীরাবের মূল তুলিতে সাধ হইয়াছিল। পূজাপার্বণের দিনে অমন সাধ কার না হয়। বক্তব্যের গাছে লবুখ পাভা আর যেন নাই, অমন উদ্ভত রঙের ভেজ নবীরাবের চোখ খাখাইয়া বিগাছিল। নবীরাব দাকীবাড়ির ফুলের বাগানের অভিমুখে রওয়ানা হইল। বাগানের স্কোনে যে পাছটা ফুলের ডারে একেবারে ভাকিয়া পড়িতেছিল, নবীরাব তাহারই ডার লাফবের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। বনত ফুলের দিকে, সে কি জানিত ফুলের

ডার লাফব করিতে গিয়া দাকীবাড়ির লাঠির ডার তাহার দিটে চাপিবে। সে বেঞ্জারি আপনার মূল ডারে আপনি ডার লম্বা রক্ম করিতে হিমশিখ বাইরা বাইতেছে সে কেন নবীরাবের দেহভার সামলাইতে পারিবে?

একেবারে ভাকিয়া কুন্ডিত রক্তজ্বার পাছটা লুটাইয়া পড়িল। দাকীবাড়ি শব্দ শুনিয়া অপর্যায়কে চিনিতে পারে নাই বটে, তবে অপর্যায় কত গুরুতর তাহা ঠাহর করিয়াছিল। ফুলের বাগানে ফুল ফুটিবে, দেহভার পূজার্কর্ষণ তাহা বেওয়া হইবে—ইহাইক সাধারণ নিয়ম লবাই জানে। কিন্তু দাকীবাড়ির পাকা বঙ্গের পাকা সিঁদাছ, কোন কিছু ধান ধান করিতে হয় অস্ত্র অনেক বস রহিয়াছে, ফুল কেন? ফুলের শোভা বাগানেই স্বন্দর। কিন্তু দেহভার পায়ে কক্ষে বাহার স্থান তাহাকে শুধু বাগানের চার সেক্টালের মাঝে আটক রাখিয়া কি তাহার গৌরব বাড়িবে? অস্থানে অস্থানে কবাই গৌরব, স্থানভ্রষ্ট হইলে গৌরব লুপ্ত হয় কালেই ফুলের গৌরব তাহার জগৎখানে, বাসস্থানে। বৃক্ষহৃত হইয়া দেহভার পায়ে কক্ষে লুটাইয়া পড়িলে বুঝি পাইবেনা বস অক্ষয়িকর হইবে। তারপর একদিন পথে ধূলায় লুটাইবে অথবা স্কোনের জলে ভসিয়া বাইবে। কেন ফুল কি আনন্দীরাই হইয়া মানবের মস্তকে আসন পাথ না? কিন্তু সে কতক্ষণ শুনি? সে গৌরব অপর্যায়। গৌরব অক্ষয় করিতে হয় স্থানে-স্থিতে বসিয়া অক্ষয় কর স্থানভ্রষ্ট হইও না বসন্ত হইবে। নবীরাব কি ছাই অতশত বোঝে। দেবার্জনায় ফুলের প্রয়োজন সে দেখানে পাইবে সেখান হইতেই তাহা সংগ্রহ করিবে। ফুলের আবার মাপিকানা স্ব কি? ফুলত দেহভার, যে তুলিয়া দেহভার অক্ষয় দিবে সেই লম্বাবহার করিল। বাহুরা পাগুরা দিন তাহার শুধু ঝাড়াইয়া রাখিল যেন দেহভার উপহার অপর কাহারো ভোগে না লাগে।

দাকীবাড়ি টিকি বুঝিয়াছিল, বাবা যোগ বুঝিয়া নাওয়াই। এক্ষণে কথার বুঝি চাইতে বর্জির বুঝি যোগ্য কল লবাইবে। দাকীবাড়ি খুব সতর্কনে আসিয়া নবীরাবের দিঠের উপর বসি বুঝি প্রয়োগ করিল। প্রয়োগ ফুল

সঙ্গে লড়েই বলিল 'উঃ না'—বলিয়া নবীরাহ একসাথে কতটা শাবল ততটা আগাইয়া গিয়া সোকা ছুটিয়া চলিল। লাক্ষ্মীকুঁড়ি কিন্তু এক পা-ও নড়িল না বা শিঁহনে শিঁহনে তাকু করিবার তিলমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিল না। সোরকে চিনিতে পারিয়া দু'ঘর বিরক্তিতে সুখখানি ঘুরা-ইয়া অশনার মনে বলিয়া বেশিল, এ্যা নব্ব বুড়ি ছেলে গাছটাকে ছুঁয়ে দিলে।

এদিকে পুষ্কার আরোহনে কোন ত্রুটি নাই। কলা-পাতার ছাঁটনি বিরা পুষ্কার মতপ রচিত হইল। পুরাতন গদ্যের মূর্তি বাজিরা-খসিরা মওপের মধ্যস্থলে বসাইয়া বেওয়া হইল। এখন ব্যক্তি শুধু পুষ্কর, ত্রাশ্বদের অর্জনা কার্যটি লবধা কহা। পালেশই মেলা বলিল মনে হইতেছে দিটাইয়ের সোকা বসিয়াছে। পাতার তেপুঁ বাজাইয়া পড়ক। বাজার মাং করিয়া দিল। পুরাতন ক্যান্ডেজাৰ কাখে কুলাইয়া প্যাং বখেই নাচিল। ভোবা তার সঙ্গে ভাল রাখিরা কালর বাজাইল। পাড়ার হাসিরা-গিসিরা কেউ হাসিল কেউ কৌতুহল। হইয়া পুষ্কা দেখিতে আসিল। ঠাকুরবা কিন্তু স্বয় কমেও এদিকে পাঃ ব্যক্ত্যন নাই। তিনি জ্বনিতেই বে অন্যায় অস্বস্তি হইতেছে। পাণ হইতে হুং বাকাই ভাল। সামন্টা বাড়িতে গিয়া থবর হটাইল। বাতা দু'নালিরা কুঁড় হাসিলেন, তাবিলেন পাশ্বে অবধাই ওখানে হাসিরা পৌছাইয়াছে। ডায়া আর নৃতন করিয়া তাবিলার কি আছে।

নবীরাহ বখার মুক্তি চাইতে খট্টর মুক্তি প্রত্যেক কোষায় এক কতটা তাহা কিছু বুঝিয়াছে। এবে বক নির্ধর মুক্তি, গিটের এক অংশ এখনও বেদনাহ ট্ন্ ট্ন্ করিতেছে। সেই বে উত্তপালে নবীরাহ ছুটিতে গুচ করিয়াছে তাহার

গতি আর থামে নাই। একবারে মওপের কাছে আসিয়া পাড়াইয়া একটা মাথা অবনত করিয়া এক কোণে বসিয়া লইয়া গণেশের মূর্তি লকা করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। চকিতে কিছু জিত কাটিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, এ্যা কি করলি নবী, সব ছুঁয়ে দিল।

নবীরাহের গিটের বেবনা হঠাৎ তখনও প্রেমিত হয় নাই কিন্তু জিহ্বারের আকস্মিক চীৎকার যে কথা স্বরূপ কলাইয়া নবীরাহের মনে আঘাত দিল তাহা বোধ হয় লাক্ষ্মীকুঁড়ির লাট্রির প্রহার হইতেও নিম্ন। নিমেষে নবী-রাহের মূর্তি চোপের জলে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মনে হইল যেবা গদ্যের মূর্তি সে দেখিতে পাইলনা। মওপের লক্ষ্য হইতে দু'পা শিঁহাইয়া আসিয়া নবীরাহ তক্ত হইয়া পাড়াইয়া রইল। পাশ্বে শিঁহন হইতে ছুটিয়া আসিয়া নবীরাহের কাখে হাত দিয়া প্রশ্ন করিল, 'কি হয়েছে নবী?' কিছু রগিরা জবাব দিল, 'সব ছুঁয়ে দিলে আর কি হল। ওয়া যে...'

'খান কিছু'—বলিয়া বাহ চেঁচাইয়া উঠিল।

'ওঃ বাবা'—জনকাইরা কিছু লজ্জা হুণ করিয়া রহিল।

পাশ্বে বিনিত হইয়া প্রশ্ন করিল, 'ওদের ফুলে পুষ্কা হয় না বুড়ি?'

উদী মাথা দুলাইয়া-দুলাইয়া বলিয়া বাইতে লাগিল,

'না পাড়াবা, ওদেরটা খেতে নেই, ওদের ফুলে.....'

নবীরাহ ততক্ষণে মওপ ছাড়িয়া অনেকদূর প্যাগাইয়া গিয়াছে। লহা লাহর কোণ হইতেই সে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, নবী বিরে আর ভাই।

নবীরাহ হাত নাড়িল,—না ভাই।

(ক্ৰমঃ)

জাগতিক

স্বাধীনচন্দ্র রায়

জগতের সর্বত্র আর বিবোধের আশ্রয় মণিতেছে ১৯০৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল কিন্তু মানুষ আরও শান্তির সুখ দেখিল না। যুদ্ধ শেষের পর শান্তি প্রচেষ্টায় প্রতীক-বস্ত্র যে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আম ভাঙ্গিয়া হাইবার সুখে। আর তাহার পরে গড়িয়া উঠিতেছে, একদিকে সোভিয়েটকে কেন্দ্র করিয়া 'কোমিন্‌ক' আর অপরদিকে আমেরিকাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে—আন্তর্জাতিক চুক্তি।

আন্তর্জাতিক চুক্তি—

গত ৪ঠা এপ্রিল ১২টী পাস্চাত্যরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবগণ আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই অস্থানে চুক্তিবহু রাষ্ট্রসমূহ তাহাদের একের উপর আক্রমণকে চুক্তিবহু সকল রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ বলিয়া গণ্য করিবে, এই চুক্তি অস্থায়ী ১২টী রাষ্ট্র তাহাদের আঞ্চলিক সংহতি এবং বিশ্বের যে কোন স্থানে তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিপর্য হইলে আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিতে প্রতিজ্ঞা করিবে। এই চুক্তি অস্থায়ী ১২টী রাষ্ট্র নিজেদের স্বাধীন সংস্থাগুলিকে সক্তিশাসী করিবার অঙ্গ সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিবে, এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বিলোপ সাধনে সচেষ্ট হইবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে পররাষ্ট্র সচিবগণের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদাশ প্রেসিডেন্ট টুয়ান বলেন যে, চুক্তিটি আক্রমণাত্মক বলিয়া গণিত হইবে অর্থাৎ আক্রমণ ও আক্রমণের আশঙ্কায় বিরুদ্ধে রক্ষাব্যবস্থার প্রায় কাশ করিবে। ইহার কলে যে রক্ষাব্যবস্থার ব্যয় হইবে, পৃথিবীর জনসাধারণ তাহার পক্ষান্তে অবস্থান করিবার পূর্ণতা ও আনন্দপূর্ণ জীবন গঠন করিতে পারিবেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেও অপরকে আক্রমণের

কোন উদ্দেশ্য আমাদের নাই।

বিলম্বিত পণ্য

আমাদের ঐতিহ্য, অর্থ ও আক্রমণের বিরোধী সবসময় বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় আমরা সহযত হইয়াছি, কিন্তু আমরা যদি আক্রমণের আশঙ্কায় জনগণকে সতর্ক থাকি এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র যদি একভাবে 'আক্রমণ' বোধে সতর্ক প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমরা সক্ষম হইতে পারিব না। আমি মনে করি যে বর্তমান ক্ষেত্রে যে সকল রাষ্ট্র চুক্তিবহু হইতেছেন তাহারা যদি ১৯১৪ এবং ১৯১৮ সালে অতীত পর্যায়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হইতেন, তাহা হইতে দুইটা বিবর্তনাত্মক সংঘটিত হইত না।"

এই চুক্তির আওতায় রাষ্ট্রের মধ্যেই কিন্তু এই আশঙ্কায় ভরসা পাইতেছে না। সোভিয়েটের স্বাধীনতা নষ্টের সংশয় প্রকাশ যে 'প্রাচ্য' পত্রিকায় অভিযোগ করা হইয়াছে যে আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সোভিয়েটরাষ্ট্র বৈধত্ব প্রদান করা হইয়াছে অতীত পর্যায়ে আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন—অন্ত সোভিয়েট কমিউনিষ্ট দেশের মুখপত্র প্রাচ্য এই মর্মে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহকে অস্বস্তিক্ত করার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত উত্তর আন্তর্জাতিক চুক্তির যোগ সাধন করিতেছেন। প্রস্তাবিত প্রদাশ মহাসম্মেলন চুক্তি সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক সচিবের বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়া ইহাতে বলা হইয়াছে উত্তর আন্তর্জাতিক চুক্তি এই দেশটিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কল্পনাকল্পের সম্পূর্ণ নিরর্থকপণ্য থাকিবে। গুটিন ভোমিনিয়ান সম্মেলন হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার ক্ষমতা ব্যয় করিতে পারে। আরও বলা হইয়াছে "প্রদাশ মহাসম্মেলন তাহাদের পরিকল্পনা কাঙ্ক্ষিত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদাশতঃ জাপানের উপর নির্ভর করিতেছে।"

এই চুক্তিতে ১৩টা রাষ্ট্র আছে যখনও বলা হইয়াছে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীগণ মতন করিয়া ইউ, এন, ও এর উদ্দেশ্য ও নীতিতে তাহাদের অঙ্গাঙ্গীতা করিতেছে

এই সকল ভাষা ও সংস্কৃতি সহিত পাণ্ডিত্যে যোগ
করিয়ে ইচ্ছা জ্ঞান করিতেছে। নিজেদের স্বাধীনতা,
ঐতিহ্য ও সভ্যতা সুবিস্তৃত রাখিতে তাহারা যত্নবশিত—
অর্থ-স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন এই তিনটি
মূলনীতি পূর্কোন্নিবেশিত ঐতিহ্য প্রকৃতির ভিত্তি উত্তর আত-
মস্বত্ব অঙ্গণে স্থাপিত ও সুস্থ পাণ্ডিত্যের কাম্য।
শান্তি ও নিরাপত্তা স্বাক্ষর হইতে একযোগে চেষ্টা করিতে
তাহারা যত্নবশিত। পূর্কোন্নিবেশিত উচ্চতর প্রণোদিত হইয়া
এই সন্ধির অবস্থ হইতে তাহারা বীত হইয়াছেন।
প্রথমতঃ সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী ভাষাগুলি নিজেদের আত-
মস্বত্ব, শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক সংস্থার বক্ষণ রাখিবেন,
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সকল কবিত হইতে পাকিবেন এবং
বহিরাঙ্গন প্রতিযোগিতার ক্ষমতা স্বাধীন পদ্ধতি করিবেন।
দ্বিতীয়তঃ নিজস্বের ভিতরে পারস্পরিক বিরোধ, ইট, এম.
এফ নীতি অস্বাভাবিক নিয়মিত প্রতিক্রিয়া থাকিবেন।
পারস্পরিক অর্থনৈতিক নীতি এমন ভাবে নির্ধারিত হইবে
যাহাতে বিরোধ সম্পূর্ণ ভাবে দূরীভূত হয়। তৃতীয়তঃ
পরস্পরকে সর্ববিধে সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবেন।
এই সাহায্য অর্থনৈতিক সামগ্রিক ব্যবস্থা স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়
শান্তবক্ষণ ও মানবজাতি সর্বত্র পরিচালিত হইবে। দশমই
সেই ভাষা মনে করিবে যে তাহার নিরাপত্তা সাম্প্রদায়িক
স্বাধীনতা দেশের অক্ষততা বিপর্য হইয়াছে তখনই সকল
মিথি অঙ্গোপকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সন্ধির
পক্ষ সাধারণ বলা হইয়াছে যে ইউরোপ অথবা উত্তর
আমেরিকায় অবস্থিত এক বা ততোধিক দেশ আক্রান্ত
হইলে ইট, এম. ও সনদের ১১ ধারা অস্বাভাবিক এককভাবে
বা সম্মিলিত ভাবে সেই আক্রান্ত প্রতিরোধ করিতে বাধ্য
থাকিবেন। এই প্রতিরোধ বলপ্রয়োগ পর্যন্ত যাইতে পারে,
একতর প্রতিরোধের সাহায্য নিরাপত্তা পরিষদকে অবিলম্বে
জ্ঞান হইতে হইবে, এবং নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক
শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার ব্যবস্থা লক্ষ্য ভাবে না
করা পর্যন্ত এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী থাকিবে।
এই সন্ধিপত্রের এমন কিছু নাই যাহা ইট, এম. ওর সমস্ত
অধিকার বা স্বাধিকার বিরোধী অথবা নিরাপত্তা পরিষদের

আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বক্ষার প্রাধিকার বৈশিষ্ট্য
স্বয়ং করে এবং পূর্কোন্নিবেশিত কোন সন্ধি সত্তাবলী এই
চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে বাতিল হইবার কোন সভাবনা নাই।
এই সন্ধি সত্তাবলী কার্যকরী করিবার ক্ষমতা স্বাক্ষরকারী
শক্তিগুলির প্রতিনিধি লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইবে।
প্রয়োজন হইবামাত্র এই সমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা
থাকিবে। বিভিন্ন প্রয়োজনে পাঁচটি সমিতি গঠন করিতে
হইবে, বিশেষতঃ আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করি-
বার ক্ষমতা ব্যবস্থাপক আন্তরকারী পাঁচটি সমিতি অবিলম্বে
গঠন করিতে হইবে। যে কোন ইউরোপীয় ভাষা এই
চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া এই গোষ্ঠিতে যোগ দিতে পারিবে।
দশবছর পরে এই সন্ধি পূর্ববিবেচনা করিবার ব্যবস্থা হই-
য়াছে। চুক্তি বন্ধ পরে এক বছরের নৌশিপি যাহা যে কোন
স্বাক্ষরকারী ভাষা এই সন্ধির আওতা হইতে মুক্তিলাভ
করিতে পারিবে।

এই সন্ধি আণ্ডিক যোগ্যের আবেশিকার প্রাধিকার
ও নেতৃত্ব স্থানা করিতেছে। ১৯২৬ সালে আমেরিকা
দশন “নবোন্নিবেশিত” যোগ্য করে তখন ইংরাজশক্তি তাহাকে
সমর্থন করিয়াছিল। বিশ্বজাতিভিত্তিকে ইংরেজই ছিল
তখন অগ্রণী। আজ কালের চাক্ষুস্মিগ্রে এবং আমে-
রিকা ইংরেজের স্থান অধিকার করিয়াছে।

পূর্কোন্নিবেশিত আন্তরকারী ব্যবস্থা করে যে পাঁচটি সমিতি
গঠিত হইবে তাহার বীজ অঙ্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল।
তাহার একটি হইতেছে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির
আন্তরকারী সমিতি। এই পাঁচটি দেশের দেশরক্ষা মন্ত্রিগণ
সং ৮ই এপ্রিল একটি পরিকল্পনা অগ্রহোদন করিয়াছেন
এবং ইহাকে কার্যকরী করিবার ক্ষমতা কি কি ব্যবস্থা
অবলম্বন করা উচিত তাহা স্থির করিয়াছেন। বেগ সহরে
এই সমিতি অগ্রগতি হয়। বৈঠকের শেষে নিম্নলিখিত
বিকৃতি প্রচারিত হয়—“ব্রাসেলস চুক্তির অন্তর্গত শক্তি-
গুলির দেশরক্ষা মন্ত্রিগণ বেগে তাহাদের চতুর্থ বৈঠকে
সমবেত হন। পশ্চিম ইউরোপের আন্তরকারী ক্ষমতা তাহারা
একটি চুক্তি অগ্রহোদন করিয়াছেন এবং পরিকল্পনাকে
কার্যকরী করিবার ক্ষমতা ৪টি দেশের কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন

করা উচিত তাহা স্থির করিয়াছেন। পাঁচশী শতাব্দীর মধ্যে সৈন্ত ও অস্ত্রবল সংগঠনের প্রচেষ্টা ভাগ করিয়া দিবার জন্য বেশরক্ষা মন্ত্রিগণ করেকটা ব্যাপক প্রস্তাব পরীক্ষা অগ্রবোধন করিয়াছেন। পক্ষ শক্তির আশ্রয়কে ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে সহজ করিবার জন্য পরবর্তী কর্তব্য দেখে তাহারা ঠাক কনিটির প্রধানগণ ও সামরিক সরবরাহ বোর্ডকে নির্দেশ দিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার চীক অব হাউসের প্রতিনিধিগণ পর্যবেক্ষকরূপে অ্যালোচনার উপস্থিত ছিলেন।”

আতলাস্তিক চুক্তির সত্ত্বগতি কি ভাবে কাব্যবহী করিবার চেষ্টা হইতেছে তাহার প্রমাণ বহুল নিম্নলিখিত বিবরণীতে দৃষ্ট্য।—“পাশ্চাত্য ইউনিয়নের পাঁচশী বৎস এবং নয় ওয়ে, জেনারেল ও ইতালীকে অগ্রদক্ষার জন্য সামরিক ও অর্থিক সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব কংগ্রেসে উপস্থাপিত হইবে বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্নমেন্ট অত আতলাস্তিক-ভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়াছেন। উপরোক্ত ৮ টি জাতি জরুরী সাহায্যের জন্য যে অগ্রবোধ করিয়াছিল তাহার উত্তরে প্রথম নোটে আমেরিকান গবর্নমেন্ট এই প্রতিক্রিয়া দিয়াছেন। বেসরকারী হিসাবে বলা হইয়াছে যে প্রথম ১২ মাসে এই শক্তিগুলির ১২৫ কোটি ডলার সাহায্যের প্রয়োজন, আতলাস্তিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর দ্বিতীয় বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম হল্যান্ড ও লাক্সেমবুর্গ—ব্রুসেল চুক্তির এই শক্তিগুলির “সাধারণ আতলাস্তিক ক্লাব” গড়িয়া তুলিবার জন্য সাহায্যের আবেদন করিয়াছিল। আমেরিকার নোটে এই শক্তিগুলিকে ১৯৪২-৪৩ সালের জুলাই তাহারে আবৃত্তক সামরিক সাহায্যের একক বিশদ বিবরণ পেশ করিতে বলা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হি: জীন একিনস সাহায্যপ্রার্থী দেশগুলির নিকট “নোট” প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে আতলাস্তিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ এবং গ্রীস ও তুরস্কল অন্যান্য কয়েকটা দেশকে সামরিক সাহায্য প্রদানের আবৃত্তকতার উপর জোর দিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গণতান্ত্রিক ভগ্নাতের সমষ্টিগত নিরাপত্তা ও শান্তির উপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শান্তি নির্ভর করে।”

পশ্চিম ইউরোপীয় দলিলদলের বহির্ভূত পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন লইয়া একদিকে আমেরিকা ও বৃটেন ও অন্যদিকে জার্মানী রাষ্ট্রের সহিত মতবিরোধ চলিতেছিল। জরুরী অবস্থার, জার্মানীর শিল্পব্যবস্থা, জার্মান জাতির এককেন্দ্রিক গঠন ব্যবস্থা প্রভৃতি গুরুতর বিষয়গুলি লইয়া এই মতভেদ ঘটিতেছিল। ১৯৭০ হইতে আরম্ভ করিয়া আশ পথ্য ভিন্ন ভিন্ন বার জার্মান আক্রমণের ফলে এই জাতগীর প্রতি অবস্থান প্রত্যেক জার্মানী দেশ বাণীর মঙ্গলগত হইয়া গিয়াছে। কাজেই জাগরণ এমন কোন নীতি স্বপ্নও সমর্থন করিতে পারে না তাহার ফলে জার্মানী আবার একটি প্রবল সামরিক শক্তি রূপে গড়িয়া উঠিতে পারে। আমেরিকা কিছুকাল পূর্বে পথ্য কোন স্বাধীন নীতি অগ্রসরণ করে নাই। কিন্তু ওয়াশিংটনের ৮৩ এক্সেলের যথেষ্ট প্রকাশ যে—“পশ্চিম জার্মানীতে স্বপ্নসার গবর্নমেন্টের দ্বারা সম্পন্ন একটি “যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণতন্ত্র” প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছে। এই সাধারণতন্ত্রে জার্মানদের “গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা” লাভের সুযোগ থাকিবে। এই সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনটি মিত্রপক্ষীয় শাসন কর্তৃপক্ষ মিত্রপক্ষীয় সামরিক গবর্নমেন্টের স্বাধীন হইবে। প্রত্যেকটি শাসন কর্তৃপক্ষ এক একজন হাই কমিশনারের অধীনে থাকিবে এবং তাহারা একত্র মিলিত হইয়া ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা গঠন করিবেন। সামরিক অধিনায়কদের নেতৃত্বে দলদলীয় সৈন্যরা পূর্ণরূপে অবস্থান করিবে। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী হি: আর্নেস্ট বেভিন বর্তমান পর্যায়ে এখানে আমেরিকান ও জার্মানী পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সহিত জড়ত আলোচনা চলিয়াইয়া এই চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন। তিনি এই চুক্তিকে অভিনবিত্ত করিয়া বলেন যে, এই চুক্তিখানা জার্মানী পশ্চিম ইউরোপের শক্তি-সৌন্দর্য্য নথ্যে পুনঃ প্রবেশের সুযোগ লাভ করিল। ত্রিদেশিক কর্তৃক প্রবর্তিত এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে একটি ইউরোপীয় কাঠামোর গঠন চিত্তের একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীনে জার্মানদিগকে সহজত করা মিত্র শক্তির একটি প্রধান উদ্দেশ্য।”

‘মন্দিরা’র নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি
বিজ্ঞাপনের মূল্য হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—৫০,

অঙ্ক পৃষ্ঠা—২৮,

সিকি পৃষ্ঠা—১৬,

১৮ পৃষ্ঠা—১০,

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার

পত্রচারি জ্ঞাতব্য

অন্যদের জানাবেন।

লেখকদের প্রতি—

আমাদের ২৩ নেতা-পত্রের কোন বিজ্ঞাপনের
এক মট্টা হইবে আমাদের প্রত্যেক মট্টা মট্টা। কাজ শেষ
হবার পর যত ২৩০ মট্টার প্রত্যেক মট্টার নেবেন।

প্রবন্ধ, চিত্র, টোকা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি
নিজ ইচ্ছানুসারে পাঠাবেন।

মাগনেট—‘মন্দিরা’

অপার মাসিকের হার, বঙ্গবাসী

ফোন নং ১—বি, বি, ২৩২০

প্রবন্ধ, চিত্র, টোকা



সরোজিনী নাইডু—

বাঙ্গালী পিতা-মাতার সন্তান সরোজিনী সমস্ত জীবন কাটিয়েছেন বাংলার বাইরে। ডাঃ অঘোর চট্টোপাধ্যায় সরোজিনীর পিতা; অঘোরবাবু ছিলেন সর্বাঙ্গকরণে বাঙ্গালী। কিন্তু সন্তানরা সবাই হয়েছেন—নামে বাঙালি অ বাঙ্গালী এবং সব ভারতীয়। তবু ও বাংলার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অঘোরবাবুর সব সন্তানদের মধ্যেই পূর্ণ মাত্রায় ছিল। বাংলার বাইরে মাত্র হতেও, অঘোরবাবুর প্রধান পুত্র বীরেন্দ্র বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগে নিরাসিত ভাবে ভারতের বাইরে প্রায় সমস্ত জীবন অতি-বাহিত করেছেন। গত মহাদ্বন্দ্বের সময় বীরেন্দ্র কলিকাতা জেলে আবদ্ধ হন এবং রুগ্ন জেলের কঠিন বিধান তাঁর দেহের লহন ও বহন কদমতার অতীত হয়। সেখানেই তাঁর জীবনের অবসান হয়। অপর পুত্র হরিশ সাহিত্যিক ও শিল্পী হিসাবে ভারতে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

* সরোজিনীর মৃত্যু নিশ্চয়ই অকাল মৃত্যু নয়;—পরিণত বয়সে এবং সার্বকালের সুস্থির মধ্যে তাঁর জীবনের অবসান হয়েছে। তবু তাঁর মৃত্যু আমাদের-ও অন্তরকে আশোড়িত করেছে। সরোজিনী একটা যুগের প্রতীক; তাঁর মৃত্যু একটা যুগের অবসান সূচনা করছে।

সরোজিনী ছিলেন সাহিত্যিক। কিন্তু রাজনীতির আবর্ত বহু প্রতিভাকে তাদের নিজ নিজ স্বর্ণ থেকে রাজনীতির দিকে আকর্ষণ করেছে। সরোজিনী তাদের অন্যতম। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় সরোজিনী রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হন; ঐ সময় শ্রীমুক্তা আনি বেসান্টের "হোম রুল" (Home Rule) আন্দোলন তাঁকে আকর্ষণ করে। এর পর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন প্রাণের মধ্যে এসে অনেক স্বতঃস্ফূর্ত পোকে গাঙ্গল করে

তুলসী সরোজিনী' স্বাধীন থেকে এটি আন্দোলনকে সমর্থন করলেন। সাহিত্য থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও ঐ সময় হাতে তিনি পুণোপুনি সংঘে কলক রাজনীতি গভীর করেন। এর পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতি আন্দোলনেই তিনি ছেলে সিন্ধু-ছেন। সাহিত্যে নীতিব পিতা থেকে

এই রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস হৃদয়বিহীন।

পুনরাবৃত্তি এখানে করতে চাই না। গান্ধীজীর একান্ত অনুরোধ ছিলেন—কেবল রাজনৈতিক অনুরোধ নয়,—একটা গান্ধীজীর রাজনীতির অনুরোধ প্রতি তিনি পোষণ করতেন। গান্ধীজী জেলের হরি-অনন্দের পূর্ণ নিবাসে বারম্বার বিচারে পরোক্ষভাবে বসেন, তখন সরোজিনী ছিলেন তাঁর পরিচর্যা

পর আবার প্রত্যেকবেশনের ফলে তাঁকে পুণ্য জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তখন পুণ্য শহরেই সেটা দাখলানের গৃহে গান্ধীজী তিন সপ্তাহ উপবাস করেন। তখন-ও সরোজিনী বৈষ্ণব তাঁর পরিচর্যা সাহিত্য নিয়েছিলেন। ঐ সময়ের একটি ছোট ঘটনার কথা আজ মনে পড়ছে। বর বালক বাসিন্দা গান্ধীজীর নিকট আসতে, অনেক দূর নিয়ে আসত গান্ধীজীর হাতে দেওয়া দ্রব্য সরোজিনী তাদের বিশেষ আমল দিহেন না; কারণ ওরা গান্ধীজীর নামে নিয়ে একটু-অটুট গোমস্তা করতট। একদিন গান্ধীজী তা টের পেয়ে সরোজিনীকে ডুই ভঙ্গনা করে বলেন—If you don't allow the children to come to me. I shall send you back to Hyderabad."—অর্থাৎ ঐ শিশুদের যদি আমায় কাছে আসতে না দেবে, তবে তোমায় আমি হায়দরাবাদে পাঠিয়ে দেব। হায়দরাবাদ সরোজিনীর পতি গৃহ

স্বাধীনতার প্রতীক ও সর্বোচ্চ গভীর অর্থ ও আকর্ষণ ছিল। তিনি স্বতন্ত্র পর্বত বিজয়রতীর সভাপতি (President) ছিলেন।

সর্বোচ্চ বাঙ্গালী গৃহের কল্পা; বাংলার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সর্বোচ্চ-একটা বিশেষ স্থান আছে। বহু মন্ত্রী এই স্থানে বাংলার জব জয়গ্রন্থ করেছিলেন, সর্বোচ্চী তাঁদের অন্তর্গত। তাই ভারতবাসী হিসাবে তাঁর জন্ম যে দুঃখ অতীত কবি, বাঙ্গালী হিসাবে আরও একটু বেশী দুঃখ অতীত করছি। বাংলা আজ সর্বভারতীয় বাঙ্গালার নীচে নেমে গিয়েছে। তাই সর্বোচ্চীর স্বতন্ত্রা বাংলার বর্তমান সৈন্যকে আরও যেন আমাদের চোখে সৃষ্টিতে তুলছে; বিশ্বের ধরবাংবা সর্বোচ্চী ভারতের সমান বুদ্ধি করেছেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে যে সব মন্ত্রী ভারতবাসী বিশ্বের নিকট ভারতের গৌরবকে বুদ্ধি করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চী ও তাঁর ভ্রাতা বীরেন্দ্রের নাম উল্লেখ করতে হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারতবাসীরা লালিত হয়েছে: সর্বোচ্চী সেই উপলক্ষে বঙ্গি আত্মিক্য দিয়ে তাদের জন্ম চেষ্টা করেছেন। আমেরিকায়ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তিনি ভারতের দাবী ও ভারতীয় সংস্কৃতির বাণী প্রচার করেছেন। সর্বোচ্চীর গুরুত্বপূর্ণ কবিতার মধ্যেই ভাষার কবিতা প্রোতাসের মনকে আকর্ষণ করত।

তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ ইংরেজী সাহিত্যের সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। ইংরেজী সাহিত্যের নামকরা সমালোচকগণও সর্বোচ্চীর ইংরেজী কবিতার স্থপতি করেছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ইংরেজী কাব্যের যে চতুর্থ গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে, তাতে ইংরেজী ভাষার ভারতীয় লেখক ও কবিতার মধ্যে একমাত্র সর্বোচ্চীর কবিতাই স্থান পেয়েছে। সর্বোচ্চী কেবল ভারতের নয়—বিশ্বের ধরবারে-ও তাঁর উচ্চস্থান ছিল।

প্রাদেশিকতা—

স্বাধীনতা সংগ্রামের আগ্রহে সবাই আদর একত্র হয়েছিলেন; তার উপর ছিলেন মহাত্মা গান্ধী বিনি সব ক্ষতভার

উপে উঠে সমস্ত সমস্যার বিচার করতেন। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মনের সেই আগ্রহ ও ত্যাগ-স্বতন্ত্রা শোণ শোণ; তার স্থানে এক মানসিক শিথিলতা ও ভোগ-স্বতন্ত্রা। গান্ধীজীর অতি প্রিয় শিষ্য ডাঃ রাধেন্দ্র প্রসাদ পর্বত পুত্র বুদ্ধির উৎসে উঠতে পারছেন না বলে অভিযোগ আসছে। বাংলা ও বিহারের কণ্ঠা কয়েক বছরের পুরাতন ব্যাপার। ১৯৩১ সালে কংগ্রেস সভাপতি মোলানা আজাদ এই বিতর্ক উপলক্ষে আগোচ্যের মধ্যে একদিন বলেছিলেন—রাধেন্দ্রবাবু পর্বত কোন গোপনাল নেই, তাঁর নীচে গেলেই গোপনাল। আজ রাধেন্দ্রবাবু সত্যকেও সেই বিশ্বাস পোষকের নেই। বাংলা ও বিহার বিতর্কে কংগ্রেসের ভরক থেকে সব চেয়ে বেশী দাঁতিব পড়ছে রাধেন্দ্রবাবু উপর। এই বিতর্ক আশ্রয় করে উঠেছে যে প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ নেতারা পর্বত তাঁদের পূর্ব উক্তি ও বীজিত বুলে ধাচ্ছেন। শ্রেষ্ঠ ডাঃ সত্যনাম সিংহ বাংলার বিরুদ্ধে কঠিনতম এক পুষ্টি প্রচার করেছেন। সেরা এক উক্তি দিয়ে তিনি পুস্তক শেষ করেছেন। তাঁর মতে বিহারের অন্তর্গত কোন অঞ্চলে বাংলা-ভাষী বলে দাবী করাও অর্থ হল—“বাংলা ভাষাবাদ, বিহার দণ্ডবাস।”

অথচ এই ডাঃ সত্যনামই ১৯১২ সালের ৩রা আগস্টের এক বিখ্যাত প্রচার করে বলেন যে পুর্নিগার পূর্ব অংশ, শাওতাল পরগণা কতক অংশ, সমস্ত মানভূম জেলা (The whole district of Manbhum) ও সিন্ধুমেধ ধলভূম পরগণা বাংলার যাওয়া উচিত। তারই চারপাঁচ দিন পূর্বে ১৯১১ সালের কংগ্রেসে ডাঃ তেজ বাহাদুর শত্রু প্রস্তাবে এবং বিহারের অন্তর্গত নেতা ত্রৈলোক্যনাথ শাস্ত্রীর সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে বিহারের কল্যাণী অঞ্চল বাংলার যাওয়া উচিত।

ডাঃ রাধেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে মানভূম প্রাদেশিক সম্মেলন ১৯৩১ সালে প্রস্তাব পাশ করে যে মানভূম জেলা বাংলার অন্তর্গত হওয়া উচিত, এবং সিন্ধু-ও আজ মানভূমকে যিকি অঞ্চল বলে প্রমাণ করার প্রাণপণ চেষ্টা হচ্ছে।

এর পুনর্গতি এতদূর পর্যন্ত গিয়েছে যে বনভূমিও প্রচুর নেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ নেতা কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে ইত্যাৎ দিয়েছেন; তাঁর সহকর্মী শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও অন্যান্য পুরাতন কংগ্রেস কর্মীরা আজ কার্যত কংগ্রেস ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। সুশে বঙ্গের পরিবর্তে হিন্দী ভাষা চালাবার প্রতিবাদে মানকুম ছিল। ফুলের ছাত্রগণ ব্যাপক পর্যটন করে। এখন অভিযোগও এসেছে যে দোল উপলক্ষে সরকারী জিল গাড়ী ক'বে সরকারী কর্মচারীরা বাঙ্গালীদের উপর মাংসের দ'বে— লবই হোলি পেলার অত্যাচারে।

উদ্ভিদ্ধাচ চলছে আদিবাসীদের উপর আর এক প্রকারের অত্যাচার। কিন্তু ভার-ও উদ্ভেদ একই—অর্থাৎ নিজেদের ভাষার গভী বাড়াবার ইচ্ছা। আসামে-ও এমনি চেষ্টা চলছে। ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের উপর-ও হিন্দী চালাবার চেষ্টা চলছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রবেশ হবে— ভারই উত্তাপগর্ভ হ'ল এসব।

প্রথম থেকে কংগ্রেস ভারতের ঐক্য ও সংহতির দাবী ক'বে এসেছে। কংগ্রেসের সৃষ্টির মূল প্রদান কথাই ছিল—ভারতের ঐক্য। কংগ্রেসের চেটার ভারত স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু স্বাধীন হবার মূল্য স্বতন্ত্র ভারতকে বিভক্ত করিতে হয়েছে। পণ্ডিত ভারতের সংহতিও আর কংগ্রেসী মহোদয়ের আমলেই বিপর্যয় হচ্ছে। ইংরাজের শালন প্রণয় মূল সূত্র ছিল পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করা। সাম্প্রদায়িক বিভেদ থেকে ভারত বিভক্ত হয়েছে; ইংরাজের দেওয়া বিধের প্রক্রিয়ার আজ শুরু হয়েছে প্রাদেশিক বিভেদ। এই সময় কংগ্রেসের নেতারাও প্রাচীন কর্মধারা-ও তাঁদের হাতিব যদি কুলে বান—তবে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। আমরা সাধারণত প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক বিভক্তির যেতে চাই না। কিন্তু আজ এ কথা বলতে আমাদের দ্বিধা নেই যে বিহারে বাংলাভাষী লোকদের উপর যে অত্যাচার চলছে—তার ভবিষ্যৎ পরিণাম শুভ নয়;— এক সংহত রাষ্ট্রে রাখা বাবে না;—কোনো ই হইত বাবে না!

ভারত ও পাকিস্তান—

বাদীনতা লাভের আগ্রহে ও তৎকালীন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতায় বিভক্ত হ'য়ে কংগ্রেসের অভিজ্ঞ নেতা থেকে শুরু ক'রে সাধারণ লোক পর্যন্ত দুই বছর পূর্বে ভারত বিভাগের জন্য স্বপ্ন করছিলেন। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অপর এক রাষ্ট্রের সঙ্গে যে কি সম্পর্ক হইতে পারে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-ও ছিল না; কারণই কেউ ঠিক বুঝতে পারে নি—ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কি সম্পর্ক পাড়াবে। বেত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আজ অনেক উপলব্ধি করছে—প্রকৃত অবস্থা কি পাড়াচ্ছে। দিল্লীর কেন্দ্রীয় পরিষদে অর্থ-মণ্ডির ২৪ বাংলাই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—এতদিনে তাঁরা বুঝছেন বিভাগের ফলে কতদিক থেকে কত অসুবিধা হচ্ছে। তাঁর মতে আজ ভারতের আদিক ২৪ কিছু গোলামাল তার প্রায় সবটাই মূল হ'ল ভারত বিভাগ। এর পর বাণিজ্য-মণ্ডির শ্রীনিয়োগী এই কথাই প্রতিশ্রুতি ক'বে বলেছেন—ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শুধু সংযুক্তি (Customs union) স্থাপিত হওয়া পর্যন্তকায়েই বাস্তবীকৃত।

অপরদিকে পাকিস্তানের অর্থ-মণ্ডির জনাব গোলাম মহম্মদ ও পূর্ব বাংলার অর্থ-মণ্ডির জনাব হামিদুল হক চৌধুরী প্রায় একই প্রকার উক্তি করচেন ও চাকাত করেছেন। অবশ্য তাঁরা ভারতের যন্ত্রীদের মতো এখন স্পষ্ট ভাষায় বলেন নি;—যেমন একটু চপে চপে তাঁরা বলেছেন— যদি-ও স্বার্থ একই। তাঁদের কথা থেকে-ও এটা বোঝা যায় যে ভারত বিভাগের ফলে যে আর্থিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে—তা পাকিস্তানের পক্ষে-ও তেমন আরামের নয়।

উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এখন একটা ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সংহতি আছে যে এদের সম্পূর্ণ গিজির রাষ্ট্র হিসাবে সেপতে হ'লে—আর্থিক বিপর্যয় কিছু না হইত-ই পারে না। কিন্তু পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষের থেকে জেনেব বশে এরা বিচ্ছিন্ন হ'য়েছে। আজ-ও এল হিংসা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস ঘূর্ণ ঘূর্ণ নি। এই অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের ফলে উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক এমন অসুস্থ আছে

যে আদিত সমস্তির পক্ষে অধিবিক্র সাময়িক বৎ উভয় রাষ্ট্র-
কৈই স্বতন্ত্র হইবে। ৬ সাময়িক বৎসরের মোট
৪২৭ কোটি টাকার মধ্যে ১১২ কোটি টাকা ভারত
সাময়িক আয়োগের ব্যবস এই বছরে খরচ করছে, এবং
পাকিস্তানের সাময়িক খরচ হ'ল—১০৭ কোটির ভিতর
৩৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট টাকার শতকরা ৪২
টাকা সাময়িক আয়োগের ব্যবস ভারত খরচ করছে এবং
পাকিস্তান খরচ করছে শতকরা ৪৪ টাকা। ভারতের
পক্ষে ৬ একটী সাময়িক খরচ অধিবিক্র, পাকিস্তানের পক্ষে
এই বছর আরও ৬ কৌ অধিবিক্র।

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত ডঃ হুগো সালের একটি উক্তি বনে
পড়ে। এই দুই রাষ্ট্র এমন বন্দি সম্পর্কে গঠিত যে
এদের পারস্পরিক সম্পর্ক হইছে হস্তান্তর দিকে ঘুরে—
নতুন বৈবাহিকের দিকেই এদের সম্পর্ক চলেবে। ফ্রান্স
ও জার্মানীর পারস্পরিক সম্পর্ক এই প্রসঙ্গে লুপ্ত করা
উচিত। ফ্রান্সের রাজা চার্লসের বা Charlemagne-এর
রাজ্য ভেঙ্গে এই দুই রাষ্ট্র পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষ নিয়ে
গঠিত হয়েছিল এবং বরাবর যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্পর্কই এদের
মধ্যে চলেছে। তখন উভয় রাষ্ট্রের পক্ষে অস্ত্রই বস
হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কও যদি সেই
রাগে নেমে, তবে উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই তা অবশ্যের হবে।

বাক্যই আশা। আশা করি উভয় রাষ্ট্রই আলম যে
জগতের প্রয়োজনীয়তার অঙ্গুষ্ঠিত এসেছে, তা সেন কোন
মিনা পূর্ব বা সম্মান বোধের দ্বারা ব্যাহত না হয়।
আশা বরাবর যোগেই যে উভয় রাষ্ট্রের আদিক ও ব্যব-
সাদিক অবস্থা স্বয়ং-বাণীনভাবে চলতে পারে না;—এককে
অপরের উপর নির্ভর করাই হবে। এই বিষয়ে মোটের
উপর ভারতের অবস্থা বৎ একটু বেশী পরাণ;—কারণ
ভারতের হাতে রপ্তানীর উপযুক্ত কাচা বা তৈরী মাল
হেতন নেই। পাকিস্তানের হাতে রপ্তানীর নতুন পরাণ
পাট, তুলা, চামড়া প্রভৃতি মাল আছে। এই সব মাল
রপ্তানী করে পাকিস্তান তার প্রয়োজনীয় প্রথা বাইরে
থেকে আদানী করতে পারে;—অবশ্য তাতে তার স্বীয়
স্বাভাব্য মান উঠু করা সম্ভব হবে না। বর্তমানে ভারত

থেকে পাকিস্তানের শোকদের স্বীয়-স্বাভাব্য অনেক মীচু—
গঠনমূলক নতুন পরিবহন, সড়ক ও পার্কিস্তানের স্বতন্য
আদিক সম্বন্ধি হয়ে সম্ভব নয়।

অপর দিকে ভারতের রপ্তানী থেকে বা মাট, তথ্য
তার সব আদানী করা করা সম্ভব হয় না। গত
বছরের সময় বিলাতে ভারতের হিসাবে যে তহবিল
সঞ্চিত হয়েছে, তা ভেঙে বিশেষ থেকে বাল করা
হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দিক দিল্লি করতকা বহুল।
ভারতীয় প্রতিবছর ১০০১২০ কোটি টাকা তার পাঠ করা
করতে হয়। তা ছাড়া নতুন বৎ গঠনমূলক পরিবহন
ভারত সরকার শুরু করেছে; তার মন্ত-ও বৎ যা পাতি
বিশেষ থেকে করা করতে হয়। আশা করা যায়—দুইদিন
বছরের মধ্যে পাঠ আদানী বৎ পক্ষিগণে কববে। যে
সব নতুন কলকারখানা ও পরিবহনতে আদ্য প্রচুর টাকা
খরচ হয়েছে, সে সব থেকে কিছু উত্থল-ও দুইদিন কালের
মধ্যে পাওয়া যাবে।

তখন ভারতের এই উৎসার প্রবাহ জনা তাকে বাইরের
বাধার মুক্তক হবে। পাকিস্তানেই তার স্বাভাবিক ক্রিয়
কেন্দ্র হওয়া উচিত। পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের উৎসার
প্রথা করা স্বাভাবিক ও স্ববিধায়নক। কিন্তু উভয়
রাষ্ট্রের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও সন্দেহ যদি চলতে থাকে
তবে এই ক্রয়-ক্রিয়-ও বাহ্যত হবে এবং তাতে উভয়
দেশেরই আদিক স্বত্তির আশংকা আছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন—

দুই মাস মাত্র দিন পর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন উই
এম্পন স্থগিত হ'ল! এটি একটি দীর্ঘ অবিশেষন খেল-
কেন্দ্র সমস্তের দিক নিয়ে নয়—কার্যের দিক দিয়ে—ও এই
অবিশেষনের জরুর ছিল। ৪২টি নতুন আইন পাশ করা
হয়েছে এবং ১৭৮টি তারকাচিহ্নিত প্রার ও ১৪৪টি
অ-চিহ্নিত প্রারের জবাব দেওয়া হয়েছে। ১৪১৬টি প্রশ্ন
সময়ের মেসেজের প্রশ্ন ও ১৪১৬টি প্রশ্নের-ও জবাব
দেওয়া হয়েছে। এই সমস্তের মধ্যে ১৪১৬টি প্রশ্ন
জেরে জবাবি ব্যাপার ছিল বাজেট পাশ ক
নিয়ে এবার বিতর্ক-ও হয়েছে দুইটি এবং
কিছু কিছু নতুন প্রথা-ও প্রবর্তিত হ'বে

এবারকার বাজেট নিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেসী দলের মধ্যে বেশ বিতর্ক দেখা গিয়েছিল। আসের চেয়ে এবার সরকারী ব্যয় বহু পরিমাণ বেশী থাকায়, নতুন কর বর্ধিত হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা। তার উপর ধর্মীয়ের উপর নির্ভরিত প্রচলিত কর কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে; তার ফলে এই বছরে আয়-ব্যয়ের ঘাটতি বাড়ায় ২০ কোটি টাকা। নতুন কর বর্ধিত এই বিবৃতিটুকু টাকার ভোলা হ'ল। কংগ্রেসী সভ্যদের এত নীতি-বস্তু আশঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। তাই প্রাথমিক আলোচনার তীব্র প্রতিবাদ হয়,—এই প্রতিবাদের তীব্রতা এমন হয়েছিল যে বিদেশী পরিদর্শকগণ মনে করতে পারত যে এই মন্ত্রী-সভার কথা শেব হ'তে আসছে। কিন্তু এই প্রতিবাদ ও সমালোচনার ফলে কংগ্রেসী দলের সম্বন্ধি বরং দৃঢ়ি পেয়েছে। মন্ত্রী ও সাধারণ সভ্যদের মধ্যে যে ব্যবধান গড়ে উঠছিল, তা ঝঁকেনীটা এঁর ফলে হ'ব হয়েছে। মন্ত্রীগণ এটা বুঝেছেন যে সভ্যদের সহযোগিতা ও সম্মতি পাওয়ার জন্য তাঁদের সঙ্গে সংযোগ বন্ধ রাখা মরকার।

অপর দিকে সভ্যগণ-ও মন্ত্রীদের কার্যগতিক (practical) বাধা ও অববিধার বিষয় বিবেচনা করতে নিবছে। নীতি হিসাবে যা গ্রহণ করা যায়, তার সব কিছুই কার্যে পরিণত করা যে হ'ব সম্ভব নয়—তা-ও তারা বুঝতে পারছে। প্রত্যেক মন্ত্রী-বিভাগের (ministry) সঙ্গে পরিষদের সভ্যদের একটি স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) থাকে। এই সব কমিটি পরিষদের সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত। বর্তমানে ব্যবস্থা হচ্ছে—যাতে প্রত্যেক বিভাগের ক্যাডের সঙ্গে তার স্থায়ী কমিটির যোগাযোগ ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ হয়,—অবশ্য বৈতনিক ক্যাডের ব্যাপারে এই কমিটি হস্তক্ষেপ করবে না। এখানেও বৈতনিক নীতি ও কর্মপদ্ধতি কমিটির বর্ত প্রায় কখন-ও উপেক্ষিত

প্রদান (cut motion) আনা হ'ত। এই ছাটাই প্রস্তাব হ'ল কার্যত অনায়াস-সাধারণ প্রস্তাব। সরকারী দলের সভ্যদের পক্ষে—অর্থাৎ যে দল পেরে মন্ত্রী-সভার গঠন করা হয়েছে, সেট দলের সভ্যদের পক্ষে এই প্রকার অনায়াস-সাধারণ প্রস্তাব নেওয়া অপোচন। তীব্র ও দৃঢ়ীর্ণ আলোচনার পর প্রত্যেক সভ্য-ই ছাটাই প্রস্তাব প্রস্তাব করে নেয়; ফলে সমস্ত আলোচনাই শূন্য-পথে বিলুপ্ত হয়ে পড়ত। তাই এবার থেকে ব্যবস্থা হয়েছে—সভার সভ্যরা ছাটাই প্রস্তাব আনবে না—কিন্তু সাধারণভাবে গঠনমূলক সমালোচনা করবে। ছাটাই প্রস্তাবের পিছনে কোন-কোনো মনোভাব এমন প্রবলভাবে থাকে যে তা-ও সিন্ধু-প্রতি কোন মন্তব্য দেওয়া সম্ভব হয় না। সমস্ত সমালোচনাই হয় একশেষে নিকৃষ্ট। অথচ কোন সভ্যই মনে করে না যে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ কেবল কুপ-কটী করছে

যে সব আইন পরিষদ থেকে পাশ করা হয়—তার অবিকালেই অত্যন্ত মনুষ্যী রকমের, কোন প্রচলিত আইনের ২১১ টা ধারার অংশ-বল। তাই সে ছাটাই অনেক-তলি এমনি আইন পরিষদ পাশ করেছে। একটু চক্ৰ-পূর্ণ আইন হলেই, তা পাশ হবার পূর্বে পরিষদের সভ্যদের নিম্ন গঠিত এক "নির্বাচিত কমিটি" (Select Committee) দ্বারা ঐ আইন বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়। তার ফলে পরিষদের সভ্যদের মত অগ্রসরে মূল মূল্যবিধার (draft) অনেক পরিবর্তন হয়। এই ভাবে গণতান্ত্রিক প্রভাব পরিষদ প্রয়োগ করে।

ব্যবস্থা পরিষদের বর্তমান কর্ম-পদ্ধতি (procedure) ও নীতি-নীতির (rules and regulations) আয়-ও পরিবর্তন প্রকার। যে কেহ ইচ্ছা করলে কোন আইনের উপর হস্তক্ষেপ করে বলে যেতে পারে। আমেরিকায় একে বলা হয় filibustering—অর্থাৎ উচ্চ-ধ্বনি প্রতি-রোধ। অনেক সময়ই দেখা যায়—আলোচনার সময় কেবল কিছু বলায় বৌকই প্রবল হয়—ব্যক্তব্য বিবেচনায় অনেক সময় কিছুই থাকে না। অব্যাহত-ব্যবহা হ'ব মন্ত্রী বলে যেতে পারে—তাতে বাধা দেবার বিশেষ ক্ষমতা কাংদের নেই—অবশ্য ভাষার সাপীনতা বজায় রেখে বলতে হয়। এতে

যেমন চোখে কতকটা পুরাতন প্রথা অচক্যন
বর্তমান সভ্যদের প্রধান কাজ ছিল সরকারী
সমালোচনা করা এক তার
আমেরিকায় উপর একাধিক করে ছাটাই

নৈমিক সময়ে বুঝা নষ্ট হইত। তা ছাড়া প্রতিবোধ করার ক্ষমতা কোন কোন সময়ে সত্যায় দীর্ঘ বস্তুতা হুক করে। ইংবাক্ষ অমলে অনেক সময়ে এমন সব আইন করা হ'ত—যাহ বিজ্ঞে ডোন্টের চেয়েও জিতবার সম্ভাবনা না থাকায় এমনি প্রতিবোধ পুষা অবলম্বন করা হ'ত। বাংলাদেশে দুশমনীয় লীগের হঠাৎয়ের সময় উচ্চ-শিক্ষা বিধক আইনকে এই ভাবেই প্রতিবোধ করা হ'ত। এই বার কেন্দ্রীয় পরি-বাসে হিন্দু আইনের প্রতিবোধী হল কতকটা এমনি খাবস্থা অবলম্বন করছিল দীর্ঘ বস্তুতা বা প্রাথমিক আবেগানকে কিছুতেই সমাপ্তির দিকে যেতে দেওয়া হয় নি। এই প্রসঙ্গে বাংলার মুসলমান সভা জনাব নাজিকদ্দিন আহমেদের বিন শিরে প্রায় ৭ ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় পরিষদের পণ্ডিত মতিলাল নেরওয়াল সময়ে নৈমিক একটা বেওরা জলছিল যে এক সম্রাটের সম্রাৎ সম্রাৎমূলক কোন আইনে অল্প সম্রা-দাদের লোক প্রকার বাধা দিবে না।—জন্মাব নাজিকদ্দিনের আচরণে সেই অশ্লিষত ভ্রম-ভুক্তিও ব্যক্তিজন হ'ল বলে অনেক মনে করে।

এইভাবে পরিবর্তনের কারণে বাধা দিবার যথেষ্ট অধিকার বর্ধিত করা সম্ভবত কিনা—তা-ও পরিষ্কার দোকেবর অনুরোধে অংশগ্রহণ করেছে। তা ছাড়া—গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হাতে কাজ একটি তাত্কাহিক করা যায়—সে ৬৩-ও পরিবর্তনের বর্তমান কর্মনীতির কিছু পরিবর্তন সহকারে। বহু বলাবল্যক বক্তৃতা পরিবর্তে হয়—এই সব বক্তৃতার প্রধান প্রেরণা—কিন্তু একটা বলা এবং পর দিন অন্তত তার সারাংশটুকু কাগজে দেখা। অদোচা বিষয়ে নতুন আলোচ্যপাঠ করার প্রয়োজন খুব কম এক তাত্কেই সাধিত হতে থাকে। অধিকাংশই হয় ভুল্লী ধারণার এবং পুনরুক্তিসূলক। অথচ এতে সময় ৬-৭ বর্ষ নষ্ট হয় প্রচুর।

প্রতিনিধি সংখ্যা এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেক দায়িত্ব-ও এত বেড়েছে যে প্রচলিত পালে বেকারী প্রথার বিশেষ পরি-
মর্তন দরকার হয়েছে। পূর্বে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল প্রা-
ন্য—শান্তি ও সুখ্যা রাখা করা;—এখন সোকেস খাওয়া-

পাঠা, শিক্ষা-বাহ্য, খব-বাহী, দল-জন-স্ব-কিছুই রাষ্ট্র
নিঃস্বয় করে। তাই আইন পরিষদ বা প্যারলিমেণ্টর কাজ
বহুতল বৃত্তি পেয়েছে। কাজেই কিপ্রভার প্রয়োজন
আজ বিপদ। অথচ প্রচলিত প্রথা বা বাহ্য পরিষদ কিপ্র
কাজ করতে পারে না। তাই এর পরিবর্তনের কথা আজ
লোকের মনে উঠছে।

ব্রেন ও ডাক বস'বটোয় কখনকি—

কমুনিষ্ট দলের নির্দেশে ভারতের বেল ও তাক বিভাগে কর্মচারীদের সর্ব-স্থাপক ধর্মঘটের আয়োজন হয়েছিল। কমুনিষ্ট দলের উদ্দেশ্য হল—বেলের ও তাকের ধর্মঘটের কলে দেশে সভাব্যই কাজ-কর্ম, চলা ফেরা ও ব্যাবসায়-কলিকার বিচ্ছিন্নতা (dislocation) কটবে; তাতে জনসাধারণের দুখ-কষ্ট আরও বাড়বে এবং তার ফলে কংগ্রেসী সরকারের প্রতি তাদের অসন্তোষ ও বিদ্বেষও বাড়বে। বেশে যত দিবে, অসন্তোষ ও অশান্তি বাড়বে, ততই কমুনিষ্ট দল তাদের মতলব হাসিল করার সুবিধা পাবে। তাদের দলীয় যে সব কাগজপত্র সরকারী হাণ্ডে পড়েছে, তা থেকে বুঝা যায় যে বেল ধর্মঘটের ফলে খাদ্য-শস্যের চলাচল বন্ধ হলে সাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে এবং তাইই সুযোগ কমুনিষ্ট দল নিবে। এই যাবের মুক্তির বহর, তাদের পক্ষে কখন-ও-মুদ্রণের গীর্ষ, কখন-ও হত্যাকাণ্ডবাদের হত্যাকার এবং কখন-ও বিদ্রোহ, সভার সঙ্গে সশস্ত্র রাষ্ট্রদণ্ডের সেবকদের সঙ্গে মহাসাধিত করা ভিত্তিমাত্র বিচিত্র নয়।

বাক, তাবের এই বর্ষান্তরে চোঁ। সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।
প্রতিক ও কর্মচারীরা নিঃ নিঃ কর্মস্থলে প্রায় আত্মনিক
ডাকেই এক সময়তই এসেছে ও কাজ করেছে। দুই
সাপাত সংখ্যক কিছু লোক বর্ষান্ত্রে বোম্ব বেঁ।
২১০ বিশের মধ্যেই তারা ছিলেন। এই বর্ষান্ত্রে
নির্ধারিত দিনের পূর্বে ভারত সরকার এক প্রজ্ঞা
করায় প্রজ্ঞা করে এবং এই আইনের অধীনস্থ
উপস্থিত ও করা হয়েছিল। পরে
সরকার প্রজ্ঞাহার করে বেঁ।
হয়েছিল—এল, পোর্ট অফিস, অ

প্রকৃতি অভ্যাবশ্যকীয় কাছে ধনঘটকে যে-আইনী বলে ঘোষণা করার অধিকার সরকারের থাকবে। অবশ্য অধিক-বহু অত্যা-অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা-এ তাতে ছিল; কিন্তু এখন-তখন ধর্মঘট করলে সরকার প্রয়োজনমতো তাকে যে-আইনী বলে ঘোষণা করতে পারবে, তেমন কিয়ান এই আইনে ছিল।

এ খবর আইন নিয়ে সাধারণের মধ্যে কিছু বিপ্যা প্রচার চলছে,—সেই কংগ্রেসী সরকার সাধারণ নাগরিক অধিকার খর্ব করছে—। কিন্তু এই প্রশ্নকে মনে রাখা উচিত যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে বা কমিউনিস্টে আত্ম-ও ধর্মঘট নিষিদ্ধ। বিদ্রোহের পর এখন ক্ষমতা অনুগ্রহ প্রতিনিধিদের হাতে এসেছে, তখন কোন দেশেই ধর্মঘট যথেষ্ট ভাবে হতে দেয় না। অধিকবহু অর্থনৈতিক অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ধর্মঘটকে পেলিন—economism বা অধিকতা বলে বিভ্রম করেছেন। ফিলান্ত্রোপিক বিশ্ববুদ্ধির পর এখন ব্যাপক ধর্মঘট হয়, তার পর সেখানেও যথেষ্ট ধর্মঘটের বিরুদ্ধে আইন করতে হয়েছিল। এই বিষয়ে কমিউনিস্টদের দৃষ্টি দিয়ে গিয়েছে—কারণ সেখানে সর্বপ্রকার ধর্মঘট আত্ম-ও নিষিদ্ধ। অথচ কমিউনিস্টরা ইচ্ছিতে যে মূল চাপিত হয় তাই যথেষ্ট ধর্মঘটের অধিকার চায় এবং তা না পেলেই সাধারণ নাগরিক অধিকার খর্ব করার অভিযোগ করে।

আমাদের সমাজ বাহিনীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হতে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে হলে দৈর্ঘ্য সহকারে আমাদের এগুতে হবে। আমরা জানি-সেদের অনসাধারণের জুড়ি কষ্ট অনেক আছে। কিন্তু হঠাৎ ক্ষমতা হাতে পেয়েই সব অত্যা-অভিযোগ ছুঁ করা যায় না।

অবস্থা-পরিবর্তনা ও প্রতিরোধক এত আছে যে নীতি-ও ভাবনাই কাছে পরিণত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে থাকে সেখান থেকে বিদ্রোহের পর পূর্বের অবস্থার ও বা অর্থনৈতিক সহ্যাবে (stand) বহু মত-ন-করতে হয়। কম বিদ্রোহের পর সোভিয়েট করতে হয়েছে; আত্ম যে ভারতে ভারত পূর্ণ প্রতিশ্রুতি সবই কার্যে পরিণত

করতে পারছে না, তাতেই কংগ্রেস সরকারকে যেহেতু কার্য উত্তীর্ণ নয়। আত্ম যদি দুই অভিসন্ধি চাপিত রাজনৈতিক মনোর-কার্য কলাপের প্রতিরোধে মন কোন কঠোর বিধান অবলম্বন করা হয়, আত্ম অবস্থাপনিক প্রয়োজনের চাপেই তা করা হচ্ছে। এই সব বাবস্থা অবলম্বন না করাই কংগ্রেসী সরকারের নশ্ব কঠোরের অপলাপ বরাবরে।

জনতার ও অধিকবহু উপর ভারের প্রভাব কত-কম তা যে কমিউনিষ্টগণ এই ধর্মঘটের হুমকিতে দৃষ্টান্তে পেরেছে এটাই আমাদের লাভ।

কুমিরামের নৃত্যরঙ্গ—

আত্ম ৩১ বছর পূর্বে বিহারের মোকামপুরে কিশোর কুমিরামের জন্ম হয়। কলিকাতার মুগাছা বেলের প্রেরণায় এই তরুণ ও প্রকৃষ্ট চাকী কলিকাতা থেকে মোকামপুরে যায় কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট কিংসকোর্টের হুতা। কয়েকটি কুলে কেনেডি পরিবারের উপর গোনা পড়ে; এই অপরাধে কুমিরামের ফাঁসি হয়। এবং প্রকৃষ্ট চাকী দর-পড়বার সময় আত্মহত্যা করে রক্তক্ষতের মধ্যে অত্যা-ভক্ত পায়। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে এত শ্রমশীল কুমিরামই প্রথম ইংরেজের ফাঁসি হতে প্রাণ দেয়। সেই হিসাবে কুমিরামের নাম ও নৃতি গানে ও চর্চায়, অথচ ও সাহিত্যীতে বহু বিস্তৃত হয়। এই স্বপ্নের জগতের প্রতি বাস্তবায়ন মনে একটা বিশেষ দরদ আছে।

সেদিন মোকামপুরে বিহারের প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন হয়; পণ্ডিত জওহরলাল ভাভে উপস্থিত হন। এই সময় কুমিরামের নৃত্যরঙ্গ-ও এক বাবস্থা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত জওহরলালকে আকর্ষণ করেন কুমিরামের নৃত্যরঙ্গ। অত্যা-বোগ বোগের মত। এবং এই ধর্মও সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় যে পণ্ডিত জওহরলাল ভাভে রাজনীতি হতেছেন। সংবাদ পত্রের এই প্রচারণা নিতান্তই ভিত্তিহীন কারণ এই অত্যা-বোগ ২৫ দিন পূর্বে বহুরের কংগ্রেস সংবাদ পাওয়া মেল যে পণ্ডিত জওহরলাল কুমিরামের নৃত্য-অত্যা-বোগ বোগে দিবে না। কারণ বহুর বলা হল যে কুমিরামের ও জওহরলালের স্বাধীনতা অত্যা-বোগ ও মত এক নয়;—তাই ব্রাকি তিনি এই অত্যা-বোগ বোগে দিবে না।

পণ্ডিতজী এনি কোন কুকি বিরাজেন কি না—খানি
সেই প্রসিদ্ধ সংবাদ পড়ে বের হই নি। তাকে
যেন হুই সংবাদ স্তঃ। সেই ঐশ্বর্যে আদর্য বলতে
টাই—এই পণ্ডিতজীর পক্ষে অত্যন্ত অশোভন ও অশো-
ভন্য দৃশ্য হইতেছে। কে কোন মত বা পথ অগ্রসর
করিতে তা বিধি বনি দ্রুত মহামানবের প্রতি আশ্রয়
প্রদায় করিয়া কহতে হয় কহে প্রায় অবিকার প্রকা-
র নিবেদন করা প্রতিবন্ধ। অত্যাধিক আশ্রয়ের যোগ দেওয়া
হইতে পারে। পণ্ডিতজী ইতিমধ্যে শিবচন্দ্রের দ্বিতীয়াংশের
যোগ দিচ্ছেন। এবং তাঁর প্রতি তিনি অত্যাধিক নিবেদন
করছেন। এই সব শিবচন্দ্রের ধর্মিক ও রাজনৈতিক
পন্থ ও মতের প্রায় পণ্ডিতজীর পন্থ ও মতের যে পন্থ
অনুসরণ করে তা বলা চলে না। প্রায় এই একই মত
মিষ্টা ও উল্লুপিন্দ তরতের বিভিন্ন স্থানে ভগ্ন
সিংহের প্রতিবন্ধ্য পালিত হইতেছে। তদুক্ত কংগ্রেসের
বহু নেতা ও নেত্রী ভগ্ন সিংহের প্রতি অত্যাধিক
কলঙ্কিত। উল্লুপিন্দ প্রভৃতির জন্য অত্যাধিক আশ্রয়
প্রেমের সঙ্গে ভগ্ন সিংহের প্রতি অত্যাধিক
প্রতিবন্ধ্য পালিত হইতেছে। কয়েকটি স্থিরায়ের এক
প্রতিবন্ধ্য পালিত হইতেছে।

হুই পণ্ডিতজীর মনে আশ্রয় ছিল—হুইরায়ের প্রণয়না
করলে কুই তরুণ বিপদ চালিত হতে পারত। বিধি-
ভেদন আশ্রয় ও কোন কারণ ছিল না। হুইরায় যে
বলেন তরুণ বিধি, যোদ্ধা ফেলতে বিবেচিত, সেই প্রণয়না
কলঙ্কিত পণ্ডিতজীর উপস্থিতি করে ১৯২১ সাল হুইরায়
কলঙ্কিত হতে ও পন্থ পরিবর্তন করতে থাকে এবং পরিবর্তন
১৯২৮ সালে জায়া প্রকাশ্যে বোম্বা করে বিবেচনের দলের
বিশেষ সাধন করল এক সম্প্রদায়ের কংগ্রেসে যোগদান
করল। তদ্বারা আর বেশ স্বাধীন গণতান্ত্রিক নীতিতে
শেষ পালিত হইল। আর তৎপরে স্বাধীন ব্যবস্থা ও স্বাধ-
নিক অবস্থায় যে কোন পরিবর্তনই—গণতান্ত্রিক উপায়ে
হতে পারে। আর তাই প্রণয়না অত্যাধিক কলঙ্কিত

কোন স্বাধীনতাবাদ প্রণয়না হইবে। এই সব কলঙ্কিত
উপস্থিতি, তিনি কহতে পারছেন। তাকে অনুপ্রাণিত ও
রাজনৈতিক মত প্রচার করিতে প্রণয়না ও তিনি প্রণয়না
তা হুইরায় বাহ্যিক বর্তমান অবস্থায় ও রাজনৈতিক
অবস্থা ও তাঁর চিন্তা কলঙ্কিত হইল।

ক্রটি বীকার—

এই সংবাদে হুইরায়ের বহু হুইরায়ের প্রণয়না—
এই আশ্রয় অত্যন্ত কলঙ্কিত ও কলঙ্কিত। সব কলঙ্কিত
হুই ও সংশোধন দেওয়া সম্ভব নয়। এই ও কলঙ্কিত
যেটা কলঙ্কিত উল্লেখ প্রণয়না করি—

জায়া হুইরায়ের প্রণয়না—

১০২ পৃঃ ২২ তরু—অত্যাধিক প্রণয়না—হুইরায়ের
কলঙ্কিত

১০৩ পৃঃ ১৫ তরু—Brown of Wild Olive হুইরায়ের
হুইরায়ের—Crown of Wild Olive
এ—Kig Hardie—হুইরায়ের Kig Hardie

হুইরায়ের প্রণয়না—

১০৬ পৃঃ ১৫ তরু—১৫ পৃঃ পণ্ডিতজীর—এই
পন্থ একটি "না" হুইরায়ের। এই প্রণয়না পণ্ডিতজীর
বিচার লাইনে "উপস্থান" হুইরায়ের হুইরায়ের
এনি আরও বহু কলঙ্কিত হুইরায়ের।

তা হুইরায়ের—উল্লুপিন্দ হুইরায়ের প্রণয়না—এই
বেতার কলঙ্কিত (Radio) হুইরায়ের পণ্ডিতজীর
কলঙ্কিত পণ্ডিতজীর উল্লুপিন্দ হুইরায়ের প্রণয়না—
খাকার কলঙ্কিত প্রণয়না হুইরায়ের প্রণয়না—এই

এ প্রণয়না ১০১ পৃঃ ১৫ তরু—এই
—এই কলঙ্কিত প্রণয়না হুইরায়ের কলঙ্কিত
হুইরায়ের—হুইরায়ের

এই সংবাদে—এই কলঙ্কিত
কলঙ্কিত হুইরায়ের হুইরায়ের